যাত্রাপথে

কালবৈশাখী মাথায়, একেলা
বাহির হইনু পথে,
পথের দিশারী, কইগো দিশারী কই ?
ঘন মেঘজালে ছাইল গগন,
প্রলয়-ঝঞ্ঝা করে গরজন
বিদ্যুৎ-ফণা রক্ত-নয়ন
ফুঁসিয়া ছুটিছে ওই।
বিঘ্ন-নাশন তব পথ চাহি'
ভরা দুর্যোগ মাঝে
মুক্তির আশে শ্মশান জাগিয়া রই।

আজিকে দাসের ভবনে ভবনে
পলকে দৃষ্টি হরি'
ঘনাইল অমা-নিশীথ-অন্ধকার,
মৃত্যুর দূত পথে দেয় হানা,
ভ্রান্ত পথিক, পন্থা অজানা,
দুর্গম পথে নির্ম্মম মানা
সর্পিল গতি তা'র ;
দুঃস্বপনের ভয়-ব্যাকুলতা
বক্ষ চাপিয়া ধরে'
যুগসঞ্চিত যেন সে পাষাণ ভার !

এ গৃহকারায় বন্দী জীবন
শৃঙ্খল বাজে পায়,
অনুশাসনের কণ্টকে ক্ষত মন ;
দুয়ারে দুয়ারে সজাগ পাহারা,
সন্ত্রাসি' প্রাণ করে দিশেহারা,
আপন মনের এ পাষাণ-কারা
হরিছে পরম ধন।

শৃঙ্খল টুটি' লুটাবে ধরায়
তোমার নয়ন-পাতে
যাত্রাপথের সেইত পরম ক্ষণ !

ভরা দুর্যোগ ?—সেই ত সুযোগ
দাঁড়াইবে যদি তুমি
পথযাত্রায় সকলের পুরোভাগে,—
তব প্রদীপের উজ্জল শিখায়,
তোমার অভয়-মন্ত্র-লিখায়,
জাগাও পরাণ সকল দিশায়
সৃষ্টির অনুরাগে।
সবার নয়নে তব দীপ হ'তে
যুগ যুগান্ত বাহি'
অন্ধ নয়নে জ্যোতির মহিমা জাগে !

স্নিগ্ধ সে জ্যোতি নয়নাভিরাম
বন্ধুর পথে সাথী,
সেই দীপালোকে মিলিবে পথের দিশা ;
হোথা দিগন্তে যাত্রার শেষে
হে রুদ্র, তুমি দাঁড়াইবে হেসে,
অরুণ-নেত্রে চাহিয়া নিমেষে
ঘুচাইবে অমানিশা !
দেবতা তোমার পরম প্রসাদ
অমৃত রসায়ণে
নিখিল জনের মিটিবে পরম তৃষা।

ওই যে বাহিরে শত শত প্রাণীর আর্তনাদ—নিখিল বিশ্বে মাথা রাখবার জন্য এই যে তাঁদের প্রাণপাত পরিশ্রম—বাস্তবিক তুমি তাদের জন্য কি একবার ভাব? একমুঠো অন্নের জন্য তারা প্রখর রৌদ্রে কি পরিশ্রমটাই না করচে! আমরা ত সুখেই আছি—যে দিকে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমরা আমাদের ছায়াসুপ্ত আবাসে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি।

--ইব্‌সেন

এখন এসেছে আমাদের কাজের সময়—সেইটিই বোধ হয় পৃথিবীতে বই লেখা ও ছবি আঁকার চাইতে অনেক বড় জিনিষ—আমরা আগে চাই লোকশিক্ষক পরে চাই চিত্রকর।

—হপ্‌ম্যান

সমাজের সার বস্তু পারিবারিক জীবন—

—ইব্‌সেন

বিদায়-বেলা

[শিল্পী—শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার]
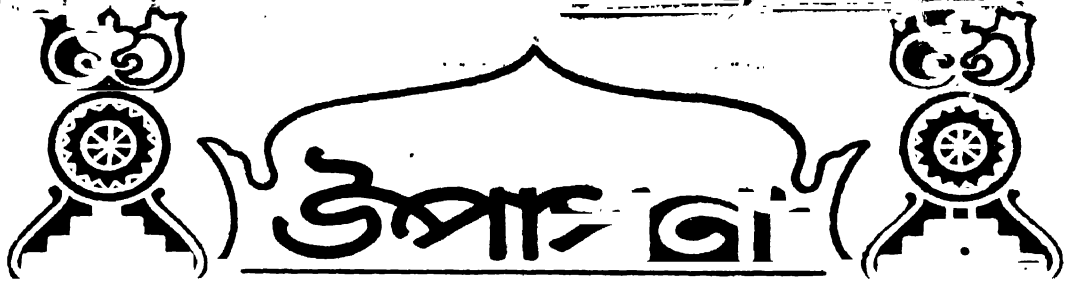
২৫শ বর্ষ বৈশাখ, ১৩৩৯ ১ম সংখ্যা

বৈশাখ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
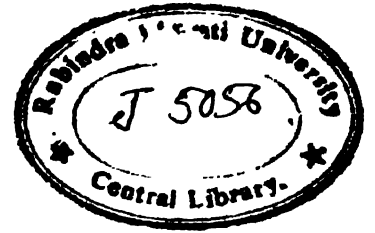
নিদারুণ দাহে জ্বলি' সারাদিন
কালিয়নাগের কুটিল বিষে
গভীর রাত্রে মৃত্যুর ঢুল
ঢুলে চৈত্রের একত্রিশে।
বহে কালিন্দী মগ্নচন্দ্রা
তমস্বিনীর অতল খাতে,
বাহে তার তরী ব্যোমের প্রহরী
কালপুরুষ সে বৈঠা হাতে।
চাহিয়া দেখিল নিনিমিষে.—
কালিন্দীনীরে ভেসে' চলে ধীরে
মৃত চৈত্রের একত্রিশে!

পূর্ব্বতটের সূতিকাকুটীর
সহসা ভরিল শঙ্খরবে,
মৃতবৎসার নূতন কুমার
নব বৎসর জন্ম লভে!
কালপুরুষের বৈঠা চলে,—
মৌননাদিনী কালিন্দী-বুকে
আঘাতে আঘাতে তারকা ঝলে

কালের ভগিনী অয়ি কালিন্দি,
নাগকালিয়ের পরমা সখি !
শুধু ভেসে' যেতে যে নামে ও স্রোতে
তার আগমন নিরর্থকই।
ঝাঁপ দিয়ে পড়ি যে দুঃসাহসী
ডুব দিতে পারে ও কালো দহে
তারি চরণের চির লাঞ্ছনা
কাল ভুজঙ্গ ফণায় বহে।

কে আসে সেই বালবৈশাখ.
যে বৈশাখের গোপন ডাকে
বার বার মোরা ক্ষমা কোরে চলি
পাঁজির পাতার অবৈশাখে ?
দু'মুঠো ধূলি ও ক'টা ছেঁড়া পাতা
উড়ায়ে ঘুরায়ে তুলিবে সে কি,
মামুলি মোদের প্রলয়ঝঞ্ঝা—
যারে কই মোরা 'কালবোশেখী' ?
মোদের ভোলাতে সেও কি দোলাবে
জলডুগুভ জলদ-জটে !
তারও মুখে শুনে' মেঘের ভেপু কি
ক'ব —ঈশানের বিষাণই বটে ?
তারও নয়নের বোমকটাক্ষ
শূন্যগভ বজ্ররবে
বিদ্রূপময়ী বিদ্যুৎসম
বার বার কি ব্যর্থ হবে ?
তার আগমনে সাগরে সাগরে
ঝাঁপ দেবে নাকি মরণলুভা ?
সেদিনও কি হবে আনাচে কানাচে
জীবন-ডোবায় হৃদয়ডুবি ?

বৈশাখ

জানি জানি দেবি, সে বৈশাখ ও
এ বৈশাখের প্রভেদ জানি,
সে এলে কি আর খাঁচার কোকিল
গাবে নিখিলের নিদাঘবাণী ?
এবারও আসিছে গতানুগতিক,
উনিশের পর যেমন বিশে ;
মহাবিষুবের ধ্বনির ভস্ম—
কোথা সে-চৈত্র-একত্রিশে ?
চৈত্রান্তিক এ কালো রাত্রি
সত্যই যদি মৃত্যুমুখে ;—
কৈ বৈশাখী পায়ের চিহ্ন
ফুটে ফুটে উঠে গগন-বুকে ?
সংক্রান্তির জীর্ণ পাঁজর
দীর্ণ করিয়া মহোল্লাসে
পহেলা চাঁদের তিলক ললাটে
বালবৈশাখ কৈ সে আসে ?

তব তীরে বসি' অয়ি কালিন্দি,
স্তব্ধতা নব শুনি যে শুনি,—
সে বৈশাখের আশায় আকাশে
কালপুরুষের বৈঠা গুণি ।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্য

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

জগতে যাঁহারা উচ্চসাহিত্যসৃষ্টির সুদুর্ল্লভ অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা আপনার অন্তরলোকেই সেই সৃষ্টির যাবতীয় উপাদানের সঞ্চয় লইয়া আসেন। বাহিরের উপকরণ তাঁহাদের নিকট উপলক্ষ্যমাত্র। উর্ণনাভের মতো বাহিরকে আশ্রয়মাত্র করিয়া তাঁহারা আপনার অন্তর হইতেই আপনার সৃষ্টিজাল রচনা করিয়া চলেন। অন্তরের উপাদানে এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনায়াস আনন্দসৃষ্টির নাম রসসৃষ্টি। কিন্তু এই রস-সৃষ্টির রহস্যজগৎ আমাদের বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। দৃশ্য যেখানে চক্ষু অতিক্রম করিয়া বক্ষের অনুভূতির বিষয় হইয়া উঠিল, সেখানে বাহিরের রবিকর আমাদের পথনির্দ্দেশ করিতে পারে না। বস্তু ও বিষয়ের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া যে রঞ্জনরশ্মি রসজগতের সহিত মানবচিত্তের পরিচয় ঘটাইয়া দেয়, তাহাকেই রসদৃষ্টি বলা যায়। সাহিত্যজগতে পথ দেখিতে ও দেখাইতে হইলে এই রসদৃষ্টির প্রয়োজন।

বঙ্গসাহিত্যের একান্ত সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথে এই রসসৃষ্টি ও রসদৃষ্টির অতি অপূর্ব্ব ও অভাবনীয় শুভসংযোগ ঘটিয়াছে। তিনি অন্বর্থনামারূপে একাধারে স্রষ্টা, দ্রষ্টা ও দর্শয়িতা। আকাশের রবির ন্যায়ই স্বীয় অন্তর হইতে স্বকীয় সৌরলোক রচনা করিয়া স্বপ্রকাশ ও বিশ্বপ্রকাশকরূপে তিনি আমাদের বহু উর্দ্ধে বিরাজ করিতেছেন।

এই সহস্রকর কবি যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছেন, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির আলোকে তাহাই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই সুবিপুল বিশ্বপ্রকৃতিরই মতো তাঁহার সৃষ্টিবৈচিত্র্যের আর শেষ নাই, বর্ণ ও বর্ণনাবিন্যাসেরও আর অন্ত পাওয়া যায় না। নব নব সৃষ্টি যেন তাঁহার অন্তর্লোকের আলোকপাতে প্রমূর্ত্ত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

রসসৃষ্টি ও রসদৃষ্টি তাঁহার এমন করায়ত্ত বলিয়াই মৌলিক রচনার বাহিরেও যে সমালোচনা-সাহিত্য একবার তাঁহার স্পর্শ লাভ করিয়াছে, তাহাই নূতন সৌন্দর্য্যে, নূতন রসে, নূতন অভিব্যক্তিতে জীবন্ময় হইয়া একটি স্বতন্ত্র রস-সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাই মহামহোপাধ্যায় মনস্বী হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মুখে যখন আমরা শুনিতে পাই—"তিনি উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধলোকে আরোহণ করিয়া উর্দ্ধতম জগতে আরোহণ করিয়াছেন এবং সেই জগতের সমস্ত রহস্য কবির নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে ;" তখন আমরা এই রসদৃষ্টি রহস্যের যেন চাবী খুঁজিয়া পাই। শাস্ত্রিমহাশয়ের মতো সংস্কৃতপণ্ডিত যখন বলিলেন, "রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণজ্ঞান ও শব্দবিজ্ঞান আমাদের অধিকাংশকেই ছাড়াইয়া গিয়াছে", তখন এতবড় বিস্ময়কর উক্তিকেও বিশ্বাস করিয়া লইয়া বুঝিতে পারিলাম, উচ্চস্তরের রসদৃষ্টির নিকট কিছুই অগোচর থাকিতে পারে না। তাই আবার যখন মনীষী সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলিলেন, "রবীন্দ্রনাথ বুঝাইলে, তবে কুমার-শকুন্তলা বুঝিতে পারিলাম"—তখন পূর্ব্বের কথাই পুনরায় প্রতিপন্ন হইয়া গেল।

গোড়ায় যে রসসৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই রস-বস্তুটি যে কি, তাহার সংজ্ঞানির্ণয় সুকঠিন; কারণ তত্ত্বের মতো ইহা প্রমাণযোগ্য নহে, অনুভবযোগ্য। যাহা যুক্তিমূলক তাহা প্রতিপন্ন করা সহজ, কিন্তু যাহা অনুভবযোগ্য, তাহা অনুভূত করাইবার সহজ পথ নাই। তথাপি রসো বৈ সঃ, ব্রহ্মস্বাদসহোদরঃ প্রভৃতি অনায়ত্ত গোত্রপরিচয়ের চেষ্টা ছাড়িয়া সাধারণভাবে রস বলিতে যাহা বুঝি, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারি। বিচিত্র বিরাট এই বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত মানবপ্রকৃতির সম্পর্ক ও সামঞ্জস্যের একটি সুগভীর অনুভূতিবোধে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সুখদুঃখাতীত যে আনন্দ ও প্রশান্তির উপলব্ধি হয়, তাহাই রস। রবীন্দ্রনাথ সেই উচ্চতম স্তরের কবিত্ব অধিকার করিয়াছেন, যেখানে এই অপূর্ব্ব রসভাণ্ডার শিল্পীর নিকট আপনার দ্বার একেবারে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। তাই, তাঁহার সমালোচনা-রচনাগুলিতেও এমন একটি সৃষ্টির পরিচয় পাই, যাহাতে চিত্ত বক্তব্য বিষয়টি অবলম্বনমাত্র করিয়া অনবদ্য ভাষা ও ভঙ্গীর সাহায্যে বিষয়বস্তুর অতিরিক্ত একটি সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সুপ্রগাঢ় সংস্থানসমাবেশের আনন্দ, সুদূরবর্ত্তীর

সহিত যোগসংযোগের আনন্দ পার্শ্ববর্ত্তীর সহিত বৈচিত্র্য-সাধনের আনন্দ লাভ করিয়া অমৃতরসে অভিসিঞ্চিত হইয়া উঠে। এই আনন্দের অভিসিঞ্চন তাঁহার সমালোচনা-সাহিত্য হইতেও লাভ করি বলিয়াই তাহাকে স্বতন্ত্র রসসৃষ্টি বলিতেছি।

সমালোচনার অন্তরালে যে নূতন সৃষ্টির কথা বলিতেছি, কয়েকটি উদাহরণ অবলম্বনে তাহাই পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব।

শকুন্তলানাটকে মহাকবি কালিদাস যে রসসৃষ্টির দ্বারা অমরত্বলাভ করিয়াছেন, দেশ-দেশান্তর যুগযুগান্ত ধরিয়া তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। গেটের মতো বিদেশী মহাকবিও সেই প্রতিভা-পূজার অর্ঘ্য যোগাইয়াছেন। সেই শকুন্তলার মতো অত বড় দিব্য চিত্রও যে রবিকরসম্পাতে নূতন মহত্ত্বে, মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে উজ্জলতর হইয়া অভিনব প্রাণ-প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ যখন বলিলেন, "শকুন্তলা যেন লীলা ও স্থৈর্য্যের, স্বভাব ও নিয়মের, নদী ও সমুদ্রের ঠিক মোহানার উপর স্থাপিত, তাহার পিতা ঋষি, তাহার মাতা অপ্সরা, ব্রতভঙ্গে তাহার জন্ম, তপোবনে তাহার পালন—যে তপোবন স্থানটি এমন, যেখানে স্বভাব এবং তপস্যা, সৌন্দর্য্য এবং সংযম একত্র মিলিত হইয়াছে, যেখানে সমাজের কৃত্রিম বিধান নাই অথচ ধর্ম্মের কঠোর নিয়ম বিরাজমান; বন্ধন ও অবন্ধনের সঙ্গমস্থলে স্থাপিত হইয়া শকুন্তলা একটি বিশেষ অপরূপত্ব লাভ করিয়াছে"—তখন তপোবনবাসিনী তরুলতা-চ্ছাদিতা সেই শকুন্তলার মুখে যেন সূর্য্যকরপাতের নূতন করিয়া অভিষেক ঘটিল। শুধু যে শকুন্তলা পড়িয়া যাহা বুঝিয়া-ছিলাম, তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু বুঝিলাম, তাহা নহে, শকুন্তলাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের অনুভূতির জগতে নূতন যেন একটি রসের সাড়া পড়িয়া গেল। কবি আবার বলিলেন "অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে অনসূয়া প্রিয়ম্বদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন, তপোবনপ্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র"। এ কথা শুনিবামাত্র নাটকবর্ণিত প্রকৃতি যেন তাঁহার একটি নূতন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আমাদের সেই-খানে সাদরে আহ্বান করিয়া লইলেন, যেখানে তিনি আপন নেপথ্য হইতে লতাপত্রফলপুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া তপোবনকে রঙ্গভূমিতে প্রেরণ করিতেছেন। তাহার পর হইতে তপোবনের মুখে আমরা যেন শকুন্তলা-বিদায়ের হাহাকারধ্বনি প্রত্যক্ষ শুনিতে পাই এবং কুটীরপ্রান্তচারিণী গর্ভভারমন্থরা মৃগবধূটি পর্য্যন্ত যেন পতিগৃহগামিনী শকুন্তলার অঞ্চল টানিয়া বলে,—প্রসবকালের আসন্ন বিপৎকালে, জননি, তুমি আমায় ছাড়িয়া কোথায় চলিলে?

কবি যখন পুনরায় বলেন—"কণ্বাশ্রম হইতে যাত্রাকালে তপোবনের সহিত শকুন্তলার কেবল বাহ্য বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, দুষ্মন্তভবন হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল—সে শকুন্তলা আর রহিল না। এখন এই দুঃখিনীর জন্য তাহার মহৎ দুঃখের উপযোগী বিরলতা আবশ্যক, সখীবিহীন নূতন তপোবনে কালিদাস শকুন্তলার বিরহদুঃখের প্রত্যক্ষ অবতারণা করেন নাই।.. কিন্তু অপরিচিত মারীচের তপোবনে সমস্তই আমাদের নিকট স্তব্ধ নীরব, কেবল বিশ্ব-বিরহিত নিয়মসংযত ধৈর্য্যগম্ভীর অপরিমেয় দুঃখ আমাদের মানস-নেত্রের সম্মুখে ধ্যানাসনে বিরাজমান"—তখন কবিরই ভাষায় 'সেই ধ্যানমগ্ন দুঃখের সম্মুখে কবি যেন একাকী দাঁড়াইয়া আপন ওষ্ঠাধরের উপর তর্জ্জনী স্থাপন করেন এবং সেই নিষেধের সঙ্কেতে সমস্ত প্রশ্নকে নীরব এবং সমস্ত বিশ্বকে দূরে অপসারিত করিয়া দেন' এবং শকুন্তলার সেই শোক-গম্ভীর তপঃক্লিষ্ট বিরল মূর্ত্তি চোখের সম্মুখে নূতন আলোকে দীপ্যমান হইয়া উঠে।

পূর্ব্বে যে রসদৃষ্টি ও রসসৃষ্টির কথা বলিয়াছি, তাহারই আলোকে কালিদাসের অমৃতময় কাব্যও উপলক্ষ্যরূপে যেন নব-সৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া উঠে, ইহাই আমাদের বলিবার কথা। কারণ সত্যকার স্রষ্টা যিনি, তিনি বিষয়বিশেষকে বর্ণনাসাহায্যে শুধু রূপ দিয়াই ক্ষান্ত হন না, সেই রূপকে অপরূপ করিয়া তুলেন; যাহা খণ্ডিত, তাহাকে অখণ্ড করিয়া, যাহা ক্ষণকালের, তাহাকে নিত্যকালের করিয়া, যাহা শুধু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহাকে মানস-গ্রাহ্য করিয়া তবেই তাহার ক্ষান্তি। এক কথায় রূপকে তিনি রসে উত্তীর্ণ করিয়া বিশ্ব-মানবের চিরন্তন উপভোগের সামগ্রী করিয়া তুলেন।

মন্দিরের বিগ্রহ নীরব থাকিলেও স্রষ্টা পূজারী বীণা-হস্তে তাঁহার যে বন্দনা গান করেন এবং পঞ্চপ্রদীপসাহায্যে তাঁহার

যে আরত্রিক আরাধনা করেন, অন্তরের ভাবরসের অভি-সিঞ্চনে তাহা প্রাণ-প্রতিষ্ঠ এবং নবালোকসম্পাতে তাহা দীপ্তিমান হইয়া উঠে। যাহা কেবলমাত্র ভক্তি ও বিস্ময়ের আধার, তপ্ত স্পর্শ লাভ করিয়া তাহা একেবারে আত্মীয়তার মূর্তি পরিগ্রহ করে।

তাই রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—"সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্য কুমারজন্মরূপ মহৎ ব্যাপারের উপযুক্ত ভূমিকা। মদন গোপনে শর নিক্ষেপ করিয়া ধৈর্য্যবাঁধ ভাঙিয়া যে মিলন ঘটাইয়া থাকে, তাহা পুত্রজন্মের যোগ্য নহে; সে মিলন পরস্পরকে কামনা করে, পুত্রকে কামনা করে না। এইজন্য কবি মদনকে ভস্মসাৎ করাইয়া গৌরীকে দিয়া তপশ্চরণ করাইয়াছেন। এইজন্য কবি প্রবৃত্তির চাঞ্চল্যস্থলে ধ্রুবনিষ্ঠার একাগ্রতা, সৌন্দর্য্যমোহের স্থলে কল্যাণের কমনীয় দ্যুতি এবং বসন্তবিহ্বল বনানীর স্থলে আনন্দ-নিমগ্ন বিশ্বলোককে দাঁড় করাইয়াছেন।" তখন বিশ্বের চিরন্তন বিরাট পুরুষ যোগেশ্বর মহাদেব ও চিরন্তনী মহাশক্তি গৌরীর পুণ্য মিলনের ফলে তারকাবিজয়ী ষড়ানন কার্ত্তিকেয়ের মতো কুমারসম্ভব আমাদের মনের মধ্যে অভিনব রূপে ও রসে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

কুমারসম্ভব সমালোচনা-প্রসঙ্গে কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—"সংসার মধ্যে ভারতবর্ষ বহু লোকের সহিত বহু সম্বন্ধে জড়িত, কাহাকেও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না; তপস্যার আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী। দুয়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব নাই, দুয়ের মধ্যে যে যাতায়াতের পথ, আদান প্রদানের সম্পর্ক আছে, কালিদাস তাঁহার শকুন্তলা ও কুমারসম্ভবে তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার তপোবনে যেমন সিংহশাবক ও নরশিশুতে খেলা করিতেছে, তেমনি তাঁহার কাব্য-তপোবনে যোগীর ভাব ও গৃহীর ভাব বিজড়িত হইয়াছে। মদন আসিয়া সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া কবি তাহার উপর বজ্রনিপাত করিয়া তপস্যার দ্বারা কল্যাণময় গৃহের সহিত নিরাসক্ত তপোবনের সুপবিত্র সম্বন্ধ পুনর্ব্বার স্থাপন করিয়াছেন। ঋষির আশ্রম-ভিত্তিতে তিনি গৃহের পত্তন করিয়াছেন এবং নরনারীর সম্বন্ধকে কামের হঠাৎ আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া তপঃপূত নির্ম্মল যোগাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।" কালিদাসের কাব্যে ভারতবর্ষীয় সমাজ ও তপোবনের এই হরগৌরী মূর্ত্তি যে এমন ভাবে এতকাল আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহা নবরবিকরসম্পাতের পূর্ব্বে কে দেখিতে পাইয়াছিল?

মহাভারত, রামায়ণ, মেঘদূত, কাদম্বরী, কাব্যের উপেক্ষিতা, উত্তর চরিত, বৈষ্ণব পদাবলী, কৃষ্ণ-চরিত্র, রাজসিংহ, মেয়েলী ছড়া প্রভৃতি বহুতর সাহিত্য-সমালোচনাপ্রসঙ্গে কবির অপূর্ব্ব রস-সৃষ্টির অজস্র উদাহরণ কাব্য-রসিকের অজ্ঞাত নাই। ভারতবর্ষের বিচিত্র ইতিহাসও যে কবি-দৃষ্টির নূতন আলোকে বিচিত্রতর রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারও প্রমাণ আছে।

রসস্রষ্টা কলাবিৎ গায়ক সঙ্গীতালাপের সময় অপূর্ব্ব তান-লয়সহযোগে রাগরাগিণীর মূর্ত্তি প্রকট ও পরিস্ফুট করিয়া তুলেন। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-মজলিসে বিখ্যাত গীতকারদের মধ্যে অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে, একের মুখ হইতে তান কাড়িয়া লইয়া অপরে অভিনব বিচিত্র তানে গীয়মান রাগ-রাগিণীতে নূতন রূপ ও রস সঞ্চার করিয়া থাকেন। মূল গায়ক যত বড় প্রতিভাসম্পন্নই হউন না কেন, তিনি সেই নবরূপরসসন্নিবেশে ক্ষুণ্ণ না হইয়া গৌরব বোধই করিয়া থাকেন। ফলে, বাণীর চির অফুরন্ত রূপরস নব নব প্রতিভা-কিরণে নব নব সৌন্দর্য্য-মহিমায় উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। রসসৃষ্টিসম্পর্কে এ কথার সার্থকতা রবীন্দ্র-প্রতিভায় নূতন করিয়া মনে পড়ে।

কাব্য-সাহিত্যসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের রসসৃষ্টির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলাম।

এইবারে ব্যক্তিত্ব ও চারিত্র সম্বন্ধে তাঁহার সূচ্যগ্রসূক্ষ্ম রসবিচার ও বিশ্লেষণী-প্রতিভার আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। মানুষ কি, মনুষ্যত্ব কি, অতিমানুষের বৈশিষ্ট্য কোন্‌খানে, মহত্ত্বের সত্যকার তাৎপর্য্য কোথায়—এই সকল বিষয়ে কবির রস দৃষ্টি যে কি পরিমাণ প্রখর ও উদার, দুটি একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণে সেই কথাটা পরিষ্কার করিতে চাহি।

বাঙ্গলার দুই বিরাট পুরুষ—রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে জীবন-চরিত, আখ্যায়িকা ও কথা-সাহিত্যের অভাব নাই। সযত্নে এসকল রচনা পাঠে উক্ত মহাপুরুষ-দ্বয় সম্বন্ধে যে আদর্শ আমাদের মনের মধ্যে জাগ্রত হয়,

রবীন্দ্রনাথের দুটি মাত্র স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে তদপেক্ষা কতগুণেই না তাঁহাদের মূর্ত্তি আমাদের মনের মধ্যে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে! দুটি একটি ছোট কথায়, দুটি একটি ক্ষুদ্র উপমায়, দুটি একটি অতি সামান্য বর্ণ-রেখাপাতে চরিত্রচিত্র এমনি উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে যে, সুনিপুণ জনতার মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিলেও তাঁহাদের উৰ্দ্ধায়িত বৈশিষ্ট্য চিনিয়া লইতে মুহূর্ত্তের বিলম্ব ঘটে না। রাত্রি হইতে দিনের আলোক যেমন স্বতন্ত্র ও অনায়াসপ্রত্যক্ষ, রবিকরোজ্জ্বল চিত্রগুলিও তেমনি সুস্পষ্ট ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগরসম্বন্ধে কবি যখন একটি মাত্র ছোট্ট কথায় বলিলেন—"আমাদের এই কাকের বাসায় এই দুটি কোকিলের ডিম কে আনিল?" তখনই সেই একটি মাত্র ঘরোয়া কথায় চরিত্রদ্বয়ের যে অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব আমাদের মনের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তাহা দুটি বৃহদাকার তথাকথিত চরিত্র-সমালোচনা-প্রবন্ধে ফুটিয়া উঠিতে পারিত না। মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে কি জানি কেন, পিকপ্রাধান্যের পরিচয় অতিক্রম করিয়াও ভারতবর্ণিত বিনতানন্দন মহাবলী অরুণ ও গরুড়ের বীর্য্যমহিমা মনে পড়ে। বাণীসাধকের চক্ষে বাণী এমনি মূর্ত্তিমতী হইয়াই দেখা দেন।

সাগর-মাহাত্ম্যের উপমা দিতে গিয়া কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—"বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গ সমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জ্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন; কিন্তু আমাদের শত সহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লীঝঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত পীড়িত অনাথ অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্ত্তমান নাই কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয় বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তলদেশে সমস্ত বাঙ্গালী জাতির তীর্থস্থান হইয়াছে; আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সূক্ষ্মতম তর্ক জাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া সরল সবল অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষালাভ করিয়া যাইব"। ইহা ত শুধু চরিত্রবিশ্লেষণ নহে, ইহা নব-সৌন্দর্য্য-সৃজন! এ দেশের এই মানসিক খর্ব্বতার রাজ্যে বিদ্যাসাগরের বিরাট ব্যক্তিত্ব বনস্পতিরই মতো শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া দাঁড়ায় এবং কবির ভাষায়—"এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গম-বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য্যবীর্য্য-মাহাত্ম্যের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব"—এ কথার যাথার্থ্যও যেন মনের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠে।

কবি যখন বলেন,—"ভাষা, প্রস্তর অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা ক্ষমতার কার্য্য, সন্দেহ নাই; তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা সেই সত্য ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা তদপেক্ষা আরো বেশী দুরূহ, তাহাতে পদে পদে কঠিনতর বাধা অতিক্রম করিতে হয়, এবং তাহাতে স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়"।—তখন সমস্ত বিদ্যাসাগর চরিত্রের প্রকৃত মূর্ত্তি এবং অনন্যসাধারণ বলিষ্ঠ বৈশিষ্ট্য সূর্য্যালোকে পর্ব্বতের মতো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। বিশ্লেষণী-প্রতিভায় এই চরিত্রসৃষ্টি মৌলিক রচনার ন্যায় সুসঙ্গত ও সৌন্দর্য্যময়।

রামমোহন সম্বন্ধেও এই দৃষ্টি তেমনি প্রখর তেমনি সূক্ষ্ম। কবি যখন রামমোহনের মহত্ত্ব বিশ্লেষণকল্পে লিখিলেন,—"তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, আবার তিনি যাহা না করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আরো প্রকাশ পায়। তিনি যে এত কাজ করিয়াছেন, কিছুরই মধ্যে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে নিজের অথবা কাহারো প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি গড়িয়া পিটিয়া একটা নূতন ধর্ম্ম বানাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া পুরাতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন; তিনি নিজেকে গুরু বলিয়া চালাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া

প্রাচীন ঋষিদিগকে গুরু বলিয়া মানিলেন। তিনি তাঁহার কাজ স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই বরং তাহার প্রতিকূলতা করিয়াছেন”—তখন সত্য সত্যই যেন সেই বিরাট কর্ম্মী পুরুষের নিস্পৃহ স্বদেশ-সাধনা একক স্বাতন্ত্র্যের মহিমামণ্ডিত তপস্বি-মূর্ত্তিতে দেদীপ্যমান হইয়া দেখা দেয়। “শিক্ষা বলো, রাজনীতি বলো, বঙ্গভাষা বলো, বঙ্গসাহিত্য বলো, সমাজ বলো, ধর্ম্ম বলো,”—সকল দিক হইতেই সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের উপর আলো আসিয়া পড়ে।

বঙ্কিম সম্বন্ধে কবির বক্তব্য শুনিবে? “বঙ্কিমকে কি আমরা স্বহস্তরচিত পাথরের মূর্ত্তিদ্বারা অমরত্বলাভে সহায়তা করিব? আমাদের চেয়ে তাঁহার ক্ষমতা কি অধিক ছিল না? তিনি কি নিজের কীর্ত্তিকে স্থায়ী করিয়া যান নাই? হিমালয়কে স্মরণ রাখিবার জন্য কি চাঁদা করিয়া তাহার একটা কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করার প্রয়োজন আছে?” এই মন্তব্য শুনিয়া অথবা ‘বঙ্কিমচন্দ্র সব্যসাচী অর্জ্জুনের ন্যায় একহস্তে বাঙ্গলার সাহিত্য রচনা করিয়াছেন এবং এক হস্তে তাহার কাঁটাগাছ মারিয়াছেন’—এই উপমার সাক্ষাৎলাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্য গঠনের গুরুভার সম্পর্কে বা বঙ্গসাহিত্যে অমর কীর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বঙ্কিমের শুভ্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি কি হিমালয়ের মতোই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠেনা?

এই প্রসঙ্গে মনে আসে, রসদৃষ্টির পক্ষে শ্রদ্ধাদৃষ্টিও কি পরিমাণ প্রয়োজনীয়! পূর্ব্ববর্ত্তী একজন প্রতিভাসম্পন্ন স্রষ্টার সৃষ্টিবিচার করিতে বসিয়া কতখানি শ্রদ্ধা লইয়া তাঁহার সৃষ্টির প্রতি চাহিলে তবে সে আপন অন্তরের বাণী সমালোচকের নিকট প্রকাশ করিতে চায়। আজিকার দিনে এই সর্ব্বত্র পাটোয়ারী বুদ্ধির যুগে এই শ্রদ্ধা-দৃষ্টির কথা বিশেষভাবে আমাদের স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে।

কাব্য ও চরিত্র সমালোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-পরিচয়ের যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা আমরা করিয়াছি। এই বিচিত্র বিপুল বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবি-হৃদয়ের সুনিবিড় আত্মীয়তা সম্পর্ক ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁহার রচনামধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া অপূর্ব্বসুন্দর রসসৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে কবির যে উদার মধুর মনোময় সম্বন্ধ, তাহা ঠিক ইন্দ্রিয়-সাহায্যে বুঝিবার নহে, অন্তরে অনুভব করিবার, এবং ঠিক সেই কারণেই তাহা যেমন-বা রসময় তেমনি রহস্যময়। যে পুষ্পগন্ধে আমরা নাসিকার চরিতার্থতার আনন্দলাভ করি, কবির নিকট তাহা সুগন্ধ মাত্র নহে, অন্তরের গভীর অনুভূতির সামগ্রী। সেখানে সে কত জন্ম-জন্মান্তরের সুখ-দুঃখ-স্মৃতির সহিত ওতপ্রোত। তাই আমরা যেখানে নিবিড় পরিতৃপ্তিতে আহা মাত্র বলিয়া অবসর গ্রহণ করি, সেখানে হয়ত কবির ব্যথাতুর চিত্তস্মৃতি দীর্ঘশ্বাসে হাহা করিয়া উঠে। আবার আষাঢ়ের বর্ষণমুখর মেঘাড়ম্বরে যে দিন সাধারণ মানুষ গৃহাশ্রয়ের জন্য চকিত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে, কবিচিত্ত হয়ত-বা তাহাতেই জন্মান্তর সংস্কারস্মৃতিতে ময়ূরের মতো হর্ষকলাপ বিস্তারে নৃত্য জুড়িয়া দেয়। এবং সে নৃত্য যে উন্মাদ-নৃত্য নহে, পরন্তু প্রকৃতিরই উচ্ছ্বসিত আনন্দরস-নৃত্যের সহকারী, কবি-রসদৃষ্টির আলোকে মনের মধ্যে আমরাও তাহা সম্ভ্রমে ও বিস্ময়ে স্বীকার করিয়া মোহিত হইয়া যাই।

নীলোজ্জ্বল আকাশ, বসন্তোদার বাতাস, দিন-রাত্রির আলোকান্ধকাররহস্য, রূপরসগন্ধবিহ্বল বিচিত্র ঋতুপর্য্যায়, প্রদীপ্ত সূর্য্যকরোজ্জ্বল বৈশাখ, বর্ষণঘন শ্রাবণশর্ব্বরী, নদী-কাননের কলকল মরমর মুখরতা, সচন্দ্র চৈত্রনিশীথ রাত্রির অতলস্পর্শ স্তব্ধতা কেমন করিয়া এই সকল কবিবক্ষের সমবেদনাতুর মর্ম্মতন্ত্রীতে যে আঘাত করে এবং কি করিয়াই যে তাহারি তারে তারে তাহারা নব নব রস রাগিণীর বিচিত্র মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কৃত হইয়া মনোমোহিনা মূর্ত্তি লাভ করে, রহস্য না বুঝিলেও, রস-প্রকাশের দিক হইতে আমরা তাহার পরিচয় পাই এবং মুগ্ধ হই। রবিরশ্মির সোনার কাঠিস্পর্শে জড়প্রকৃতি যেন সজীব হইয়া উঠে; সৌন্দর্য্যের মৃত রাজকন্যা তাড়াতাড়ি খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া কথা কহিয়া বলে,—বন্ধু অনেক দিন তোমার সাক্ষাৎ নাই, ভালো ত? বলো, কি করিয়া আজ তোমার পরিচর্য্যা করিব। কিন্তু এ সমস্তই হইল, প্রকৃতি লইয়া কবির সৌন্দর্য্যসৃষ্টির কথা, যাহা তাঁহার কাব্যে কাব্যে সঙ্গীতমুখর হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বাপর সমস্ত কবিই আপনাপন প্রতিভানুসারে ইহাই করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এই যে, তিনি এই সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতির প্রতিও তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-দৃষ্টি এমনি ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন যে বাঙ্গালা-সাহিত্যে যেন একটি স্বতন্ত্র প্রাকৃত-সমালোচনা-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কাব্যে তিনি বলিয়াছেন :—

গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে।

ইহাতে আরণ্য বর্ষা ও কেকা অনুভূতি ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়া রসমূর্ত্তি পাইয়াছে। কিন্তু তিনি আবার সেই কেকা-ধ্বনির সুনিপুণ বিশ্লেষণ করিয়া যখন বলিতেছেন :—“নব-

বর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারি গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে মাতৃস্তন্যপিপাসু উর্দ্ধবাহু শতসহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখাপ্রশাখার আন্দোলিত মর্ম্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটা কাংস্যক্রেঙ্কারধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলের মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান, কান তাহার মাধুর্য্য জানেনা, মনই জানে।"—তখন আমরাও কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে চাই—যে মাধুর্য্য কান জানে না, মনই জানে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি আমাদের মনের মধ্যে সেই অতীন্দ্রিয় সুর শুনিবার মতো কর্ণসংযোজনা করিয়া দেয়, যে শ্রুতিসাহায্যে কেকার কাংস্য-ক্রেঙ্কারে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলের মধ্যে আমরাও আরণ্য মহোৎসবের প্রাণস্পন্দন শুনিতে পাই।

নেত্র ও নেত্রপল্লবের মতো চিরসংযুক্ত নিত্যরহস্যময় যে দিন ও রাত্রি আমাদের জীবনের অভিন্ন সহচররূপে আমরা বর্ত্তমান দেখি, তাহার সম্বন্ধে কবি যখন লেখেন,—"শক্তিতে আমাদের গতি, প্রেমে আমাদের স্থিতি; শক্তি কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে ধাবিত করে, প্রেম বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে পুঞ্জীভূত করে; শক্তি আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে—সে চঞ্চল; প্রেম আপনাকে সংহত করিয়া আনে,—সে স্থির ...এইজন্য দিবাবসানে আমাদের প্রয়োজন যখন শেষ হয়, আমাদের কর্ম্মের বেগ যখন শান্ত হয়, তখনই সমস্ত আবশ্যকের অতীত যে প্রেম, সে আপনার যথার্থ অবকাশ পায়। আমাদের কর্ম্মের সহায় যে ইন্দ্রিয়বোধ, সে যখন অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে, তখন ব্যাঘাতহীন আমাদের হৃদয়ের শক্তি বাড়িয়া উঠে; তখন আমাদের স্নেহ প্রেম সহজ হয়—আমাদের মিলন সম্পূর্ণ হয়।"—তখনই কবিরসদৃষ্টিতে দিবারাত্রির বিচ্ছেদ-মিলন, বন্ধন ও মুক্তি আমাদের চক্ষে প্রত্যক্ষ ও মধুর হইয়া দেখা দেয়।

"আবার যখন দেখি, আমাদের এক যায়, আমরা আর পাই; এবং যায় বলিয়াই আমরা তাহা পাইতে পারি। দিনে সংসারক্ষেত্রে আমাদের শক্তিপ্রয়োগের সুখ, রাত্রে তাহা অভিভূত হয় বলিয়াই নিখিলের মধ্যে আমরা আত্মসমর্পণের আনন্দ পাই। দিনে স্বার্থসাধনচেষ্টায় আমাদের কর্তৃত্ব-অভিমান তৃপ্ত হয়, রাত্রি তাহাকে খর্ব্ব করে বলিয়াই প্রেম এবং শান্তির অধিকার লাভ করি! দিনে আলোকে-পরিচ্ছিন্ন এই পৃথিবীকে আমরা উজ্জ্বলরূপে পাই, রাত্রে তাহা ম্লান হয় বলিয়াই অগণ্য জ্যোতিষ্কলোক উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।"...

"আমরা একই সময়ে সীমাকে এবং অসীমকে, অহংকে এবং অখিলকে, বিচিত্রকে এবং এককে সম্পূর্ণভাবে পাইতে পারি না বলিয়াই একবার দিন আসিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দেয়, একবার রাত্রি আসিয়া আমাদের হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে"—তখন দিবারাত্রির বিচিত্র মর্ম্মকথা ও রসতাৎপর্য্য যেন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যময় মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে।

অনন্ত রহস্যময় নিত্যরসবিচিত্র এই বিশ্বপ্রকৃতিসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ও দৃষ্টি আমরা অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম! যে কয়টি উদাহরণের আশ্রয় লইয়া আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছি, সমালোচকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি ও স্রষ্টার বিচিত্র গঠননৈপুণ্যের অপূর্ব্বসমবায়ে সে সকল সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ অজস্র সংকলনসাহায্যে বক্তব্য সুপ্রতিপন্ন ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে কিন্তু অনিবার্য্য কারণে রচনা দীর্ঘতর হইবার উপায় নাই, তাই রসপরিচয়ের পথ নির্দ্দেশমাত্র করিয়া এবং আর একটিমাত্র মন্তব্যের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতে চাহি।

যে পঞ্চভূতসাহায্যে এই পরিদৃশ্যমান প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার গঠিত, রবীন্দ্রনাথ শুধু মাত্র তাহাদের রচনাবিন্যাসকেই রসসৃষ্টিতে রূপান্তরিত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, সেই পাঞ্চভৌতিক আদিম ধাতুগুলিকেও প্রমূর্ত্ত করিয়া সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। রবিকরস্পর্শে সেই রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দের নিত্য উপাদানগুলি মৌলিক ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া সেই স্বতঃসিদ্ধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এবং এই বিশ্বনাটকের পাত্র-পাত্রীরূপে দাঁড়াইয়া বিশ্ববাসী সুধীমণ্ডলীকে যে অপরূপ রসালাপ শুনাইতেছে, বঙ্গসাহিত্য কেন, জগতের সাহিত্যে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের রসসৃষ্টিসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বারবার এ কথা আমাদের মনে হইয়াছে যে, জগতে মানব-মনোরাজ্যের উত্তুঙ্গ কল্পনা-শৈলশিখরে বুঝি এমনই একটি তপোলোক আছে, যেখানকার দিব্যদৃষ্টি সমবেদনারস-সিক্ত হইয়া শাশ্বত ও সর্ব্বত্রপ্রসারীরূপে চিরদীপ্যমান রহিয়াছে। গহনগিরিগুহাবিহারী কিন্নরের নিশীথনর্ম্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া তপস্বীর চিত্তবৃত্তিনিরোধজাত একাগ্র তন্ময়তাপর্য্যন্ত যে দৃষ্টির রঞ্জনালোকে নিত্য উদ্ভাসিত এবং প্রকৃতি-সুন্দরীর সুগোপন রহস্যপুরীর যাবতীয় বিচিত্র রসচিত্র যাহার করদর্পণে চিরপ্রতিবিম্বিত। সত্যের বিরাটদৃষ্টি এবং সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্মদৃষ্টি একসঙ্গে শুভসম্মিলিত হইয়া সেই সম্পূর্ণ ধ্রুবরসদৃষ্টির অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। নতুবা বুঝি ব্যাস বাল্মীকি, কালিদাস ভবভূতি, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ—কাহারো এই অপূর্ব্ব অন্তর্দ্দৃষ্টিলাভের সম্ভব হইত না।

শিল্পীর সাধনা

শ্রীজগৎমোহন সেন

ফটোগ্রাফের প্লেট আর শিল্পীর হৃদয় ঠিক একই ভাবে বস্তুর প্রতিরূপ-গ্রহণ করে না। প্রথমটি জড়,—জড় বিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই সে চলে; সে যা পায় তার অবিকল নকলটিই আমাদের উপহার দেয়। কিন্তু শিল্পীর হাত থেকে আমরা বস্তুর অবিকল প্রতিরূপ পেতেও পারি, নাও পেতে পারি, তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ নকলটুকু মাত্র আমরা তাঁর কাছ থেকে আশা করি না। আমরা শিল্পীর ছবিতে খুঁজি তাঁর অন্তরের অভিব্যক্তি। তাঁর ছবি নকল হলেও ঠিক নকল তাকে বলা যেতে পারে না, যদি তাঁর দর্শন-জনিত আনন্দের অভিব্যক্তি তাতে থাকে। সে ছবি তখন একটা নূতন সৃষ্টি হয়ে দেখা দেয়। তখন সে মূক হয়েও মুখর, জড় হয়েও চৈতন্যময়। সাহিত্য সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলা চলে।

আমরা যা দেখি বা শুনি, সে সমস্ত আমাদের হৃদয়ে স্পন্দন জাগায়,—অনুভূতির স্পন্দন। এ আমাদের মনোধর্ম্ম। সাধারণের বেলা এই অনুভূতি অব্যক্ত থেকে যায়, কিন্তু শিল্পী তাকে রেখার বর্ণে অভিব্যক্ত করেন।

কিন্তু মানব মনের এই অনুভূতি প্রকারভেদে বহু। গঙ্গার জলের উপর বড় মাছটা যখন লাফিয়ে ওঠে তখন ধীবরের আর কবির হৃদয় একই ভাবে সে দৃশ্য উপভোগ করে না। একজন দেখে তার আকার,—ভাবে, ওটা ধরে বাজারে বিক্রী করতে পারলে কেমন লাভ হ'ত! তার রুচি, তার অনুভূতি পাশব। মন তার দেহের দাস, তাই দেহের পোষণের জন্য অহোরাত্র লাভ ক্ষতি খতিয়ে দেখতেই ব্যস্ত থাকে। তার মনের গতি শৃঙ্খলিত,—চলাফেরার সীমা তার দেহ-চিন্তারূপ অচলায়তনের পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট। প্রাচীরের বাইরে যে অন্য একটা বৃহত্তর জগৎ আছে সে তার খোঁজ রাখে না, রাখতে চায়ও না। কিন্তু কবি শিল্পী—তিনি শিল্পীর চোখ দিয়েই মাছের লীলায়িত গতিভঙ্গী, সন্ধ্যা-সূর্য্যের কর-রঞ্জনে তার দেহের বিচিত্র বর্ণ-সম্ভার উপভোগ করতে চান,—উপভোগের অব্যক্ত আনন্দকে তাঁর শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে ব্যক্ত [illegible] চান।

শিল্পীর বৈশিষ্ট্য এইখানেই। তাঁর রুচির বিশিষ্টতা এবং প্রকাশ করবার ক্ষমতা নিয়েই তিনি অন্য সকলের থেকে পৃথক্। আবার এও দেখতে হ'বে যে, অভিব্যক্তির উৎস-মুখ খুলে দেবার মালিক শিল্পীর অনুভূতির ধারা এবং তারও মালিক তাঁর রুচি। রুচি যে দিকে টানে মন সেই দিক দিয়েই চলে। শিল্পের সার বস্তু তার অন্তর্নিহিত রস। অভিব্যক্তির ক্ষমতা হয়ত অনেকেরই থাকতে পারে, কিন্তু রুচি যদি নিম্নস্তরের হয়, তখন শিল্প-সৃষ্টি নিতান্ত সাধারণ হয়ে পড়ে। সম্ভবতঃ এই জন্যেই Plato তাঁর Ideal State এর পরিকল্পনা করতে গিয়ে দেশের musicকে (music অর্থে তখন যা বোঝাত) পঞ্চভূতের চক্রে পড়তে দিতে চান নি, দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের হাতেই রাখতে চেয়েছিলেন।

যে শিল্প শুদ্ধমাত্র নকল, তার কথা এখন ছেড়েই দিলাম; কারণ যেখানে লোকের আসলটাকে দেখবার সুযোগ যথেষ্ট আছে, সেখানে নকল করার বাহাদুরীর কোন মূল্যই নেই। প্রাণহীন নকল আমাদের আনন্দ দিতে পারে না। আমরা খুঁজি শিল্পের প্রাণ—শিল্পীর অন্তরের আনন্দের অভিব্যক্তি, তাঁর রুচির আভিজাত্য। যা আছে তার চেয়ে আরও কিছু বড়, আরও কিছু ভাল পাবার আশাতেই লোকে বই পড়ে, ছবি দেখে, গান গায় বা শোনে। এইটুকু যদি না হয়, তবে এ সমস্ত করবার কোনো সার্থকতাই থাকে না। শিল্পীর রুচি যদি নিম্নস্তরের হয় তবে তাঁর সৃষ্টি যথার্থ আনন্দ দিতে পারে না। শূকর নর্দমায় গড়াগড়ি দিয়ে আনন্দ পেতে পারে, মহিষ হয়ত দেহে পঙ্কলেপন করে আনন্দ পায়, কিন্তু মানুষের আনন্দ স্বতন্ত্র। নিম্নস্তরের বা সমস্তরের শিল্পসৃষ্টি (যদি তাকে শিল্পসৃষ্টিই বলা যায়) থেকে লোকে যদি কিছু পায় তা মানুষের আনন্দ নয়, তার নাম মোহ। এ মোহ ক্ষণিক। এ কিছুতেই চিরস্থায়ী হ'তে পারে না। নেশার ঘোরটুকু কেটে গেলে মোহের উপলক্ষ্যটি নিতান্তই সাধারণ বলে ধরা পড়ে যায়, তার ছদ্মরূপ আর মানুষকে ভোলাতে পারে না। পারে না এই জন্যই যে মানুষ পূর্ণতার সন্ধানী। সে জন্মেছিল

প্রকৃতির কোলে অপূর্ণ অবস্থায়, কিন্তু নিজের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট সে থাকতে পারে নি। তাই যুগে যুগে প্রকৃতির অনন্ত রহস্য-ভাণ্ডার লুঠ করতে করতে নিজেকে সমৃদ্ধ করে সে পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছে, কালের বুকের ওপর দিয়ে। তা না হ'লে মানুষের নাম পর্য্যন্ত আজ পৃথিবীতে থাকত কিনা সন্দেহ। মানুষ হয়ত যেমন করে অন্যান্য প্রাণী গেছে, তেমনি করেই বহুকাল পূর্ব্বে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যেত, নচেৎ মানুষ আজ ইতর জীবের মধ্যেই অন্য কোনো শক্তিমান জীবের শাসনাধীনে ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকত। পৃথিবী শক্তি-ভোগ্যা। অশক্ত, অক্ষম জীবের এখানে বেঁচে থাকবার উপায় নেই। মানুষ তার শক্তির সাধনা করে। বংশানুক্রমে শক্তি সংগ্রহ করে সে শুধু পৃথিবীতে বেঁচেই থাকতে চায় না, পৃথিবীর উপর আধিপত্য করতে চায়। শাস্ত্রে, পুরাণে যাকে "পিতৃঋণ" বলা হয় তার একটা biological significance আছে, জীব-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তার একটা সার্থকতা আছে। বৈজ্ঞানিক তাকে survival and propagation of species বলেন। প্রকৃতির রাজ্যে বেঁচে থাকতে হ'লে জীবকে পরোক্ষে হোক, প্রত্যক্ষে হোক প্রকৃতির ছলনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। এ ছলনা অনন্তকাল ধরে চলেছে। জীবন যেন ধ্রুবের তপস্যা। অনন্তকাল ধরে জীবকে প্রাকৃতিকী মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের উপযোগিতা প্রমাণ করে বেঁচে থাকতে হয়। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র জীবকে প্রকৃতিই জোগান, কিন্তু হয়ত হাতে তুলে দেন না, জীব নিজেই বেছে নেয়। তারপর সুরু হয় প্রকৃতির কঠোর পরীক্ষা। যে নিজেকে বেঁচে থাকবার উপযুক্ত বলে প্রমাণ করতে পারে সে বেঁচে থাকে, যে পারে না, তাকে মৃত্যুর অতলে ডুব দিতে হয়। যে মহাশক্তির বলে মানুষ এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব রূপে পরিগণিত তার আধার মন, মনের পশুত্ব নয়, মনের মানবত্ব। এ মানব শক্তি মানুষের বংশানুক্রমিক সাধনার ফল।

Adam Eve এর উপাখ্যানেও আমরা অনেকটা এই কথারই ইঙ্গিত পাই। নিষিদ্ধ ফল খেয়ে আদি দম্পতি দোষ করেছিলেন কি না, সে কথার আলোচনা নাই বা করলাম, কিন্তু একথা বললে বোধ হয় দোষ হ'বে না যে, তাঁরা সে কাজ করেছিলেন শয়তানের প্ররোচনায় নয়, বিকাশোন্মুখ মানব শক্তির প্রেরণায়। মানব মনের আকাঙ্ক্ষা অসীম, সাহস অসীম। তাই সে Eden এর সীমার মধ্যে সসীম ঈশ্বরের হুকুমে তুষ্ট থাকতে পারে নি, সে চেয়েছিল অসীমের বিরাটত্ব উপলব্ধি করতে। অন্ধের মত হাতীর পা'টা জড়িয়ে ধরে, সেটাকেই হাতী বলে মেনে নিয়ে নিজেকে ফাঁকী দিতে সে চায় নি, সে চেয়েছিল চক্ষুষ্মানের মত সমস্ত হাতীটাকে দেখতে। অজানাকে জানতে, অজেয়কে জয় করাতেই তার আনন্দ।

সেই শক্তিরই শতমুখী ধারা আদি দম্পতির অপত্য পরম্পরার ভেতর দিয়ে যুগ যুগ ধরে বয়ে এসেছে। কোথাও পিথেক্যান্থ্রোপস্ ইরেক্টস্-এর (Pithe-canthropus Erectus) মত প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মধ্যে তার কোন শাখা কালের মরুভূমিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, কোথাও তার অপর কোনো শাখা অসভ্য জাতির মধ্যে বাধা পেয়ে নিশ্চল বা মন্থর হয়ে গেছে, আবার কোথাও অন্য কোনো শাখা সুসংস্কৃত উন্নত মানুষের মধ্য দিয়ে পূর্ণতার পানে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু অদৃষ্ট কালের অন্ধকারে মানুষের রুচিই এই শক্তিপ্রবাহের পথ নিয়ন্ত্রিত করেছে। একটু বিচার করে দেখলেই আমরা একথা বুঝতে পারি। বৈজ্ঞানিক এর অন্য নাম দেন, কারণ জীব-সাধারণ নিয়েই তাঁর কারবার। কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকাংশে একে রুচি বলাই সঙ্গত। রুচি যেখানে শক্তিকে বিপথে চালিয়েছে সেখানে শক্তির ধারা প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে বা থেমে গেছে, আবার অন্যত্র এই রুচিই ভগীরথের মত শক্তির গঙ্গা-প্রবাহকে পূর্ণতার সাগর-সঙ্গমে নিয়ে চলেছে।

মানব মনের এই শেষোক্ত রুচিকেই আমরা অভিজাত রুচি বলব। সাধারণের রুচিকে অভিজাত বলা যায় না। রুচির আভিজাত্য জনসমাজে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনেরই আছে। তাঁরাই সকল কালে অবতার (যদি না মানি) নামে, ধর্ম্মপ্রচারক নামে, শিল্পী নামে, সাহিত্যিক নামে, নেতা নামে মহামানবের গড্ডলিকার পথ নির্দ্দেশ করে থাকেন। সুতরাং শিল্পীর, সাহিত্যিকের যদি কিছু গর্ব্বের বস্তু থাকে, তবে সে তাঁর রুচির আভিজাত্য।

শিল্প বস্তুবাদীই হোক আর আদর্শবাদীই হোক, তার প্রাণ হচ্ছে তার অন্তর্নিহিত রস। এই [illegible] জন্যই অন-

সমাজে শিল্প সাহিত্যের আদর, কারণ এই উৎসারিত রসধারার গতিপথ লক্ষ্য করে মানুষ পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলতে চায়। কিন্তু শিল্পের মধ্যে যখন রসের ব্যভিচার সুরু হয়, তখন সে যাত্রায় বাধা পড়ে।

কিন্তু রস-ব্যভিচার আসে কোথা থেকে? এর মূলে আছে শিল্পীর নির্জ্ঞাননিহিত রুদ্ধ ইচ্ছা। শিল্পীর অমানবোচিত নিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা যখন ছদ্মবেশে মনের প্রহরীর চোখ এড়িয়ে সজ্ঞানে এসে উপস্থিত হয় তখনই শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে ব্যভিচার সুরু হয়। শিল্পী তখন জীব-বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে হীন কাম প্রবৃত্তিকে নারীর মধ্যে মাতৃত্ব-বাসনা এবং পুরুষের মধ্যে সৃজন আকাঙ্ক্ষা বলে প্রচার করতে চান। মাতৃত্ব-বাসনা এবং সৃজনাকাঙ্ক্ষা ভাল, সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষের পক্ষে শফরী-সৃজন নিশ্চয়ই গৌরবের বিষয় নয়। জীব-বিজ্ঞান একে উচ্চতর বিবর্তনের লক্ষণ বলে মনে করে না। সুতরাং শিল্পী যখন বিজ্ঞানের দোহাই দেন, তখন হয়ত তিনি বিজ্ঞানের বিপক্ষেই চলেন। শিল্প যদি তার স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা উভয়কেই নামিয়ে দেয় তখন বৈজ্ঞানিকের সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিকও পূর্ণতার সন্ধানী মানুষ। তিনি প্রকৃতির ফাঁকি ধরে' সত্য আবিষ্কারের চেষ্টাই করে থাকেন।

একটা কাব্য বুঝলেই কবিকে এবং একটা ছবি বুঝলেই শিল্পীকে যেমন বোঝা যায় না, তেমনি প্রকৃতির কায়া-বিশেষের রহস্য জানলেই সমস্ত প্রকৃতিকে জানা যায় না। রসস্রষ্টা যখন বিজ্ঞানের দোহাই দেন, তখন তার উচিত বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতেই সমস্ত বিষয়টা দেখা। প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক সত্য নির্ব্বিচারে জীবনে অবলম্বন করবার জন্য নয়, বরং বিভিন্ন সত্য পরীক্ষা করে নিজের পথ বেছে নেবার জন্য। শিল্পীর সৃজন-স্বপ্ন যদি স্বপ্ন মাত্রই না হয়, যদি সে স্বপ্নের কোনো সার্থকতা আছে বলে শিল্পী মনে করেন, তবে তাঁকে সমস্ত কথা বিচার করে দেখতে হ'বে।

শিল্পী-সাহিতিক শুদ্ধমাত্র স্বপ্ন-পসারীই নন, দ্বারে দ্বারে স্বপ্ন ফেরী করে বেড়ানই তার একমাত্র কাজ নয়। তার চেয়েও বড় তিনি,—জীবনের, চেতনার এবং সৌন্দর্যের উপাসক। তিনি অমৃতের সন্ধানী,—তিনি মানুষ। তাঁকে নিজেকেও বাঁচতে হ'বে, যাদের দ্বারে তিনি স্বপ্ন বিতরণ করেন, তাদেরও বাঁচাতে হ'বে। তাঁর সৃষ্টিকে জন-সমাজের হাতে তুলে দিয়ে তিনি যেন বলতে পারেন,—

অমরত্বের পথে অভিযান করে আমি যা পেয়েছি তার মধ্যে এই শ্রেষ্ঠ, এ নিয়ে তোমরাও এগিয়ে যাও, তোমাদের অভিযান জয়যুক্ত হোক।

"This is the best of me; for the rest, I ate, and drank, and slept, loved and hated, like another; my life was as the vapour, and is not; but this I saw and knew: this, if anything of mine, is worth your memory." [*Ruskin:—Sesame and Lilies*

তার শিল্পও বস্তু-অনুকারী হোক আর নাই হোক, দ্রষ্টার মনশ্চক্ষুর সামনে রস-উৎস মুক্ত করে দিয়ে যেন বলতে পারে:—

"This is the best of me .... this, if anything of mine is worth your worship."

পাখীর মুক্তি

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

বন্দী লভিল মুক্তি তবু যে ঘরে ঘরে হাহাকার—
প্রাণহীন দেহ দেখে বুঝি হ'ল বেদনা আবিষ্কার !
খাঁচার পাখীর কাতরতা শুনি'
তীক্ষ্ণ শায়কে দরদিয়া গুণী—
এনে দিল তারে মুক্তি-বারতা, শুভাশিস্ বিধাতার—
তবু চোখে জল ? হেন হৃদ্যতা—কেবা বলে অবিচার !

পড়েছে রক্ত খাঁচার ভিতর—কিছু নয় ! কিছু নয় !
কেঁপে উঠে সেই মুক্তির সাথে নাহি যার পরিচয় !
সারাদিন পরে সূর্য্য যখন—
থির হ'য়ে থাকে মুক্তি-মগন,
রঙীণ হইয়া ফুটে উঠে তার স্বপন আকাশময়—
খাঁচার পাখীর বুকের রক্তে মুক্তির পরিচয় !

পাখা ঝটপটি হ'য়ে গেছে থির, পথে করি' লুটোপুটি
পড়ে গেছে বুঝি ? ধূলায় তাহার পালক একটি
পাপ্‌ড়ির 'মমি' আঁকড়ি' যতনে—
ফুলের গন্ধ রাখিবে স্মরণে ?
উন্মাদ একি খেয়ালের বশে করো দেখি ছুটোছুটি—
স্মৃতিটুকু তার চারিদিকে দাও ছড়াইয়া মুঠি মুঠি !

মুক্তির লাগি' বন্দী পাখীর আছে চির-ক্রন্দন !
পিঞ্জরে বসি' তবুও সে করে সঙ্গীত আলাপন।
চারিদিকে রহে সস্নেহ হস্ত—
সংশয়ে মন সদাই ত্রস্ত।
জানে, তার তাজা রক্ত না হ'লে ঘোচেনাকো বন্ধন-
মুক্তি-প্রয়াসী সে কি ডরে কভু মৃত্যু-আলিঙ্গন !

অসীম আকাশ ডাকিছে তাহারে, বাতাস দিতেছে দোল,
দাঁড়ে বসে আর কতকাল কাটে সেই বাঁধা ধরা বোল !
পিঞ্জরে বসি' কতকাল আর—
করে পঞ্জরভেদী হাহাকার ?
সে চাহিছে শ্যামা বন-জননীর ছায়াভরা স্নেহ-কোল।
উদাসীর বাঁশী করিছে পাগল, বলে—বন্ধন খোল।

অসহায় পাখী উর্দ্ধে চাহিয়া মেলি' ডানাদুটি তার—
নিঠুর আঘাতে রক্ত উগারি' বলে গেছে বারবার—
খাঁচার পাখীরা আর কতকাল—
হেরিবে এমন হিংস্র ভয়াল—
পালনকারীর মমতা-বোধের নিলাজ অহঙ্কার—
বনজননীর স্নেহ ও সুষমা পুড়ে হ'ল অঙ্গার।

দূরে নির্জ্জনে পাতার আড়ালে কত পাখী দেয় সাড়া—
একের কণ্ঠ অসীম হইয়া বাজে একি একতারা !
রক্ত-ব্যথায় জাগে যেই গান—
অনল-সিন্ধু-লহরী সমান,
কে রোধিবে তারে ? কে রোধিতে পারে কল-কল্লোল-ধারা ?
দীপ হ'তে দীপ, প্রাণ হ'তে প্রাণ জ্বালায়ে ফিরিবে তারা !

খাঁচার পাখীর রক্তে জ্বলিছে—বনে বনে দাবানল—
ঝরা পালকের বুকে আঁকা তা'র কাহিনী সমুজ্জ্বল !

কাষ্ঠ-শিল্প

শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ

পরাধীন ভারতকে নানাভাবে সমৃদ্ধিশালী করিবার বিপুল আগ্রহ আজ বাংলার কর্ম্মী যুবকদের চঞ্চল করিয়া

শ্রীপ্রমথকুমার বসু

তুলিয়াছে। শুধু রাজনৈতিক বিষয়েই নয় বিভিন্ন লুপ্ত শিল্প-কলার উন্নতি-সাধনমানসে বাঙ্গালার তরুণ কর্ম্মিগণ যে প্রাণের পরিচয় দিতেছেন তাহা সত্যই আশাপ্রদ। আজ আমাদের দেশের এইরূপ একটী লুপ্ত শিল্পের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

পূর্ব্বে এদেশে কাষ্ঠের উপর খোদাই করিয়া নানাপ্রকার মনোরম ছবি ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা হইত। এই শিল্পের নাম ছিল কাষ্ঠ-শিল্প বা দারু-শিল্প। ইহার সৃষ্টিসম্বন্ধে নানারূপ মতবাদ শুনা যায়। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, প্রিয়জনের প্রতিচ্ছবিগ্রহণে মানুষের যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষা হইতেই ইহার উৎপত্তি। কেননা আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহার ছবি, তাহার নাম প্রতিক্ষণ নিজের সম্মুখে পাইতে ও দেখিতে চাই।

সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু সেই আদিম যুগেও মানুষ মানুষকে ভালবাসিত এবং তাহার প্রিয়জনের প্রতিচ্ছবি বৃক্ষশাখায় খোদিত বা অঙ্কিত করিয়া প্রাণে আনন্দ পাইত। সেকালে কাঠই একমাত্র সহজ-প্রাপ্য ছিল। কাজেই হাতের কাছে পাওয়া যাইত বলিয়া দারু-শিল্পের উন্নতিও হইয়াছিল যথেষ্ট। ইহা ছাড়া, বিংশ

"মুক্তির চেষ্টায়"

শতাব্দীতে এত ক্যামেরা ও ফোটোর ছড়াছড়ি সত্ত্বেও আমরা যেন প্রিয়জনের নামটি নিজের হাতে দেব-মন্দিরের গায়ে

কিংবা গাছের গায়ে চিরদিনের জন্য খোদিত করিয়া রাখিতে ভালবাসি। অন্তরের এইরূপ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেই কাষ্ঠশিল্পের জন্ম।

কিছু দিন হইল কয়েকজন উৎসাহী বাঙ্গালী যুবকের দৃষ্টি এই কাষ্ঠ-শিল্পের উন্নতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। এবং এই সকল উৎসাহী কর্ম্মীর কর্ম্মকুশলতা ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে এবং হইতেছে।
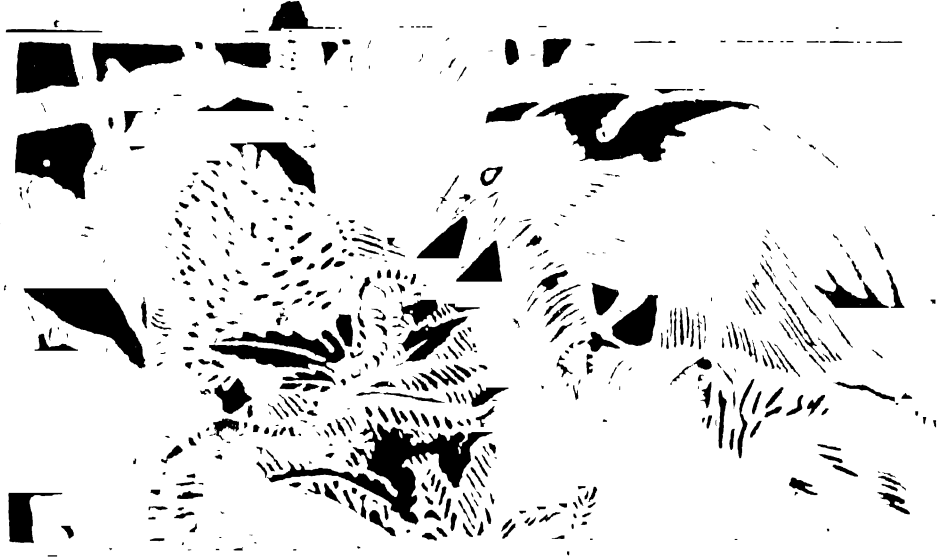
"ক্ষুধিত"

"পুরাণো-স্মৃতি"

বঙ্গদেশে কাষ্ঠ-শিল্পটীকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য যাঁহারা পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

শ্রদ্ধেয় রমেন বাবুর প্রধান ও কৃতী ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রমথকুমার বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত "মুক্তির চেষ্টায়" চিত্রখানা এখানে সন্নিবেশিত করা হইল। বন্দীর অন্তরের ব্যথা-ভরা গ্লানি যেন শিল্পীর সার্থক তুলিকাস্পর্শে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে; এখানে আমরা চিত্রকরের কৃতিত্বের প্রশংসা না করিয়া পারিতেছি না। প্রমথবাবুর এই 'মুক্তির চেষ্টায়' ছবিটী তাঁহার মৌলিক কল্পনাপ্রসূত নয়; লেখকের রচিত 'বন্দীর ব্যথা'র প্রচ্ছদপটের অনুকরণ মাত্র; তবু সঠিক ভাব বজায় রাখিয়া দারুশিল্পে ইহার রূপ দেওয়ায় বাস্তবিকই প্রমথবাবু সকলেরই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

এখানে শিল্পীর আরো দুইটী নিজস্ব পরিকল্পনা দেখান হইল। পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, দারুশিল্পে কি অমূল্য ভাবসম্পদকে রূপ দেওয়া যায়

"কলিকাতার বস্তী"

প্রমথ বাবু ইতোমধ্যেই কাষ্ঠ-শিল্পে বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এর পরিচয় এখানে বিশেষ না দিলেও চলিবে। কিন্তু আমাদের দেশের সুরুচিসম্পন্ন ধনী ব্যক্তিদের সাহায্য না পাইলে, এমন একটী সুন্দর শিল্পকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে গড়িয়া তোলা প্রমথ বাবুর পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও বেশী বলা হইবে না। তাই, আমরা দেশের ধনী ব্যক্তিদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিতেছি এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এই উদীয়মান তরুণ শিল্পীর পরিশ্রম সার্থক হউক।

ক্ষণেকের সংসার

শ্রীকালিদাস রায়

চলেছি নগর পথে—বৃষ্টি এলো শিলাবৃষ্টি সম
বাঁচাতে হ'লোনা রাজী শীর্ণ ছাতা জীর্ণ মাথা মম,
কি করি ? উঠিনু ত্বরা পথপাশে একটি রোয়াকে,
রুদ্ধদ্বার গৃহখানি— কেহ হায় ভিতরে না ডাকে।
আশ্রয়ের পরিসর সামান্যই—একে একে
তবুও সেখানে
জুটিল অনেকগুলি। কার বাড়ী কেহ নাহি জানে।
চামড়ার ঝুলি কাঁধে সসঙ্কোচে একটি চামার
ফেরিয়ালা ল'য়ে তা'র পশারাটি সাড়ে পাঁচানার,
ডাকের পুলিন্দা ব'য়ে নিরুপায় ডাকের পেয়াদা
উর্দ্দিপরা খালিপায় হাতে ভিজে চিঠি এক গাদা,
ময়লা নেকড়া ঢাকা চানাচুর ভাজার ডালাটি
নিয়ে বুড়া হিন্দুস্থানী। হাতে ল'য়ে ভিক্ষার মালাটি
ছেলেটির কাঁধ ধ'রে অন্ধ এক জুটিল সেথায়,
রোগজীর্ণ ভিখারিণী ঠেস দিয়ে দেওয়ালের গায়
বসিয়া পড়িল যেন ফিরেছে সে কুটীরে আপন
জীর্ণ ছিন্ন মলিনের হ'লো এক বিচিত্র মিলন,
জুটিল কুকুর এক তার সাথে দুইটি ছাগল
মুহূর্ত্তে সংসারখানি জমাইল নিরাশ্রয় দল।

মানুষ র'য়েছে পাশে চুপ ক'রে র'ব কতক্ষণ,
জুড়িয়া দিলাম গল্প যেন তারা কত প্রিয় জন,
গৃহের দ্বিতল কক্ষে উঠিতেছে হাস্যের ঝঙ্কার,
স্বাচ্ছন্দ্যের উন্মাদনা, বামাকণ্ঠে মূর্চ্ছিত মল্লার,
সামনে জলের ছাট—সরে' সরে' দাঁড়ায়েছি তাই
একেবারে গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি মাঝে ফাঁক নাই,
সমান সঙ্কট মাঝে একটুকু আশ্রয়ের স্থান
তাদের ঘুচা'ল কুণ্ঠা ঘুচাইল মোর অভিমান।
বলিলাম তাহাদেরে—"দুনিয়ার এইত নিয়ম
এ দেশের দুরবস্থা এর চেয়ে কিসে বল' কম ?"
কেউ তাহা বুঝিলনা—কই কেউ দিলনাত' সাড়া
চাহিয়া আমার পানে কুকুরটি দিল লেজ নাড়া,
পাখীরা উঠিল ডাকি—ইতিমধ্যে বৃষ্টি গেল থেমে,
একে একে সাথীগুলি সকলেই গেল ক্রমে নেমে,
একাকী দাঁড়ায়ে সেথা—ফেলিলাম তাপিত নিশ্বাস,
কি যেন পাইনু ব্যথা—করিবে না কেহই বিশ্বাস।
দণ্ডেকের এ সংসার ছেড়ে যেতে চরণ না সরে,
জানিনা ইহার তলে কি গোপন অস্বস্তি গুমরে।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

• যিনি সাহিত্যিক প্রতিভার বিনিময়ে রৌপ্যচক্রের পর্য্যাপ্ত আমদানিকেই জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া মনে করেন—সাহিত্যকে হাটবাজারের পণ্য করিয়া 'উনো কড়ির দুনো দাম' আদায় করিবার প্যাঁচ কষিতে গর্ব্ব অনুভব করেন—পাঠক সাধারণের হাততালি ও বাহোবা, প্রকাশকগণের চাহিদা ও সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদে যাঁহাদের সাহিত্যিক প্রেরণা চাঙ্গা হইয়া উঠে—তাঁহাদের সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচক বলিতেছেন—Get thee, behind him, Satan, how shall he dare to prostitute his gifts—not for necessary bread and cheese, but for things which are not necessary—riches, show and notoriety.

——

বর্ত্তমানে মানুষ জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে—জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে মতের অন্ত নাই। আন্দোলন ও আলোড়ন সমাজকে নূতন নূতন পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া প্রগতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। আর প্রগতি সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে মত গঠন ও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন উপলব্ধ হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নব্য-পন্থী সোভিয়েট রাশিয়া, সংগ্রাম-ক্লান্ত জারমেনী, দ্রুত উন্নতিশীল তুরস্কের কথা বলা যাইতে পারে।—কোথাও বিস্ময়, কোথাও উদ্বেগ, কোথাও অস্বস্তি এবং কোথাও বা বিরক্তির ভাব মানুষের মনকে স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে বাধা দিতেছে।—নিখিল জাতির নূতন নূতন সমস্যার সহিত তুলনা করিয়া ভারতবর্ষ তথা বাঙ্গলা দেশের কথা না হয়—নাই তুলিলাম;—শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে—এ দেশের সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম না হইলেও ইহা যে গুরুতর তাহা নিশ্চয়।

——

এক্ষেত্রে সাহিত্যের চর্চ্চা ও অনুশীলনের একেবারেই কোনও প্রয়োজন আছে কিনা এ তর্কও আজ কাল কেহ কেহ জোর গলায় করেন—গবেষণার মাল মসলা সংগৃহীত হইতেছে এমন ভয়ও দেখান' হইয়া থাকে।

সন্দেহবাদী বলেন—মানস কল্পনায় যাহা অতি সুন্দর, কবির কাব্য-সম্পদ হিসাবে যাহা অতি মহার্ঘ্য, তাহাও এই অনন্ত প্রবহমান সংসার-সমুদ্রের অবিরাম কল্লোলেরই প্রতিরূপ ও প্রতিধ্বনি মাত্র। আমরা যদি আমাদের সত্তাকে সুখ দুঃখ ও আনন্দ, আশা আকাঙ্ক্ষা ও ভাবুকতার মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল;—মানুষের উপলব্ধ সত্যকে আবার ভাষা ও ব্যঞ্জনার আভরণ পরাইয়া সাধারণের দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য করিয়া তোলার সার্থকতা কি?—উত্তরে বলিতে চাই—সার্থকতা আছে। দেবতার পূজা ফুলচন্দনে—ভাবের পূজা ভাষা-ভঙ্গিমায়;—মনের তৃপ্তি মানুষকে উর্দ্ধলোকের সন্ধান দেয়। সভ্যতা ও কৃষ্টির দিক দিয়া ইহা কম কথা নহে।

——

একটি দিনের সুন্দর প্রভাত, নির্মেঘ আকাশ, অরুণালোকের অপরূপ মাধুর্য্য, প্রস্ফুটিত বেলাচামেলীর সুষমা ও সুগন্ধ—সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করিয়া একটি পরিপূর্ণ স্নিগ্ধতার অনুভূতি আনে। একটি নিদাঘদিনের সূর্য্যকরোজ্জ্বল দ্বিপ্রহর—বহুদূর হইতে কোকিলকণ্ঠের মধুর ধ্বনি কানের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে—আম্রমঞ্জরীর মধুর গন্ধ চৈতী হাওয়ায় ভাসিয়া আসে—মনটা এলোমেলো হইয়া যায়—ব্যাকুলতা বাড়ে—প্রকাশ-ইচ্ছার অস্বস্তিতে মন বিহ্বল হইয়া পড়ে। একটি নীরব সন্ধ্যা,—পরিশ্রান্ত ধরণীর ম্রিয়মাণ কপোলতলে যেন শুশ্রূষার পেলব স্পর্শ বুলাইয়া যায়; মৃদুমন্দ সমীরণে ক্লান্ত ধরণী যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে—বহুদূরে শূন্য আকাশের গায় একটি পথভোলা পাখী নিরুদ্দেশের পথে আনাগোনা করিতেছে,—পথের একান্তে বসিয়া কে ওই উদাসী বাউল বাঁশী বাজায়—

পথের নেশায় ঘর ছাড়িনু
পথ ভুলালো নানান ছলে,
আপন জনে ফিরিয়ে বঁধুর
বুক ভেসে যায় চোখের জলে।

—একটি দুইটি করিয়া তারা ফুটে—মনের কোণেও একটি দুইটি করিয়া কথা জমিয়া প্রকাশের ব্যথায় গুমরিয়া মরে—তাহাকে ভাষা না দিয়া পারি কৈ? বর্ষণমুখর রাত্রে

নদীপার হইতে বাদল-হাওয়ার ঝাপ্‌টা আসিয়া ঘরের আগলে বার বার আঘাত করে—বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠে—মেঘে মেঘে অন্তরলোকের গোপন কথার বিনিময় হইয়া যায়—বর্ষাসুন্দরী এলোচুলে কাজরী নাচ সুরু করিয়া দেয়—নবনাগরীর অন্তরে মেঘমল্লারের সুর বেদনার মীড় টানিয়া চলে—গহনরাত্রির অন্ধকারে বিশ্ব-রাধার প্রেমাভিসার আরম্ভ হয়—কবির অমর লেখনী আলোকে পুলকে মধুবর্ষী উঠে—

"তোমার চ'খানি কালো আঁখিপরে
শ্যাম আকাশের ছায়াখানি পড়ে,
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে যূথীর মালা,
তোমারি ললাটে—নব বরষার বরণডালা।"

সমস্ত বহিঃপ্রকৃতিকে যিনি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে উপলব্ধি করিয়া প্রকাশের বেদনায় অধীর হইয়া উঠেন—বলিবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই। মধুর রসে যিনি ভরপুর,—অফুরন্ত রসভাণ্ডারের যিনি ভাণ্ডারী,—রসিক জনে রস বিলাইবার সহজ অধিকার তাঁহারই।

তাই বলিতেছিলাম—কয়া পয়সা ও ষসা আধুলী লইয়া যাহারা সাহিত্যের কারবার জমাইতে চায় মূক যুগের অভ্যুদয়ে তাহাদের জ্ঞানোদয় হইবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু রসবেত্তা ও রসিকের পক্ষে আত্মস্থ হওয়া রসের মাধুর্য্য দ্বিগুণ করিয়া বাড়াইবার জন্য। রসানুভূতির পূর্ণতায়—অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন বেদনায় যাহা অভিব্যক্ত হইতে ব্যাকুল—যাহার অভিব্যক্তি ভাষা ভাব ব্যঞ্জনাকে সার্থক করিয়া তৃষিত অন্তরকে নব নব রসে অভিসিক্ত করিয়া তুলে—এককথায় সাহিত্যের যে অনুশীলন ও সাধনায় কবি ও সাহিত্যিকের রস-পরিবেশন মানব-চিত্তের ক্ষুৎপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হয়; মানুষ যেখানে ব্যাকুল হইয়া বলে—"প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে তুমি আরো আরো আরো দাও প্রাণ" সেখানে—মূক নহে, মুখর যুগকেই আমরা সাদরে বরণ করিয়া লইব।

সাহিত্য-সন্দেশ

ভারতবর্ষ—বৈশাখ ১৩৩৯।

এই বৎসরে ভারতবর্ষ উনবিংশ বর্ষে পতিত হইল। প্রথমেই শ্রীবীরেশ্বর সেনের গীতার পরিচয় নামক মৌলিক প্রবন্ধ। প্রাজ্ঞ লেখক ইহাতে প্রমাণ করিয়াছেন—(১) গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, (২) গীতাকার বাঙ্গালী ছিলেন, (৩) গীতার রচয়িতা পদ্মনাভ দত্ত বৈদ্য ছিলেন। সেন মহাশয়ের যুক্তি সেন-হইয়াও-অবৈদ্য ভারতবর্ষ-সম্পাদক গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাহাতে প্রত্যেক বাঙ্গালী বৈদ্যের সহানুভূতি রহিয়া গেল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গীতাকার বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার প্রধান প্রমাণ প্রবন্ধ মধ্যে দেখিতেছি যে মাতালেরা যেমন Hippopotamus বলিতে গেলেই হিপ্‌ পট্‌ পট্‌ পটেমাস বলে (বিলাতের পুলিশ একমাত্র এই উপায়েই নাকি মাতাল ধরে), তেমনি বাঙ্গালীরা সম্বোধনসূচক ভোঃ শব্দ ব্যবহার করিতে গেলেই আদিকাল হইতে 'হে' বলিয়া ফেলে। আর গীতায় রহিয়াছে—'হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখেতি'। অতএব যে সংস্কৃত পুস্তকে 'হে' থাকিবে তাহা বাঙ্গালীর রচিত ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

বিশেষজ্ঞেরা এসব যুক্তির বিচার করিবেন; আমাদের কেবলই মনে হইতেছে যে গীতায় যদি Hippopotamus কথাটি থাকিত তাহা হইলে আমরা সঠিক জানিতে পারিতাম যে গীতার প্রণেতা মাতাল ছিলেন কি না।

এ মাসের ভারতবর্ষের আর এক বৈশিষ্ট্য 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়' নামক প্রবন্ধে। ইহাতে আমরা নানা পুরাতন সত্য ও তথ্য পাইতেছি। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর তথ্য এই যে, কিছুদিন পূর্ব্বেও কলিকাতায় যৌবনে চুল পাকিত এবং বৃদ্ধ বয়সে তাহা পুনরায় কাঁচিয়া যাইত। আমরা এই প্রবন্ধে সওয়া দুই ডজন চিত্রমূর্ত্তির পরিচয় পাইলাম। তন্মধ্যে মাত্র ৩টী মূর্ত্তির নিম্নে '(যৌবনে)' এই মন্তব্য দেওয়া আছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী ও তারকনাথ পালিত তিনটি পলিত-কেশ-শ্মশ্রু-গুম্ফ মূর্ত্তির পরিচয়ে লেখা হইয়াছে ইহা উক্ত ব্যক্তিত্রয়ের যৌবনের চিত্র। বাকী চিত্রে এবম্বিধ কোন বয়ঃজ্ঞাপক পরিচয় না থাকায় ধরিতে হইবে তাহারা হয় শিশু নয় বৃদ্ধ। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তখন যৌবনেই সকলের চুল পাকিত এবং হয় শৈশবে গোঁফ দাড়ি উঠিত, নয় বৃদ্ধ বয়সে আবার চুল কাঁচিত। ভারতবর্ষের সম্পাদক দাদাও অনেকটা সেকালের লোক; যথেষ্ট বৃদ্ধ হন নাই বলিয়াই বোধ হয় এখনও চুল কাঁচে নাই!

উত্তরা—ফাল্গুন। ১৩৩৮।

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্যাকরা' কবিতা। কোন স্যাকরার সহিত কথোপকথনচ্ছলে শিল্পীর মর্ম্ম-পরিচয় প্রকাশ করাই এই কবিতার উদ্দেশ্য। প্রথমে দেখি,—

কার লাগি এই গয়না গড়াও
যতন ভরে?
স্যাকরা বলে, একা আমার
প্রিয়ার তরে।
আমি বলি, কিনে ত লয়
মহারাজাই।
স্যাকরা বলে, প্রেয়সীরে
আগে সাজাই।

স্যাকরা জাতীয় শিল্পীদের মর্ম্ম-কথা আমরা ঠিক জানি না। কিন্তু কবির কথা মানিয়া লইতে আমাদের আপত্তি নাই, কারণ আমরা ধোপা জাতীয় শিল্পীদের খবর কিছু কিছু রাখি এবং জানি—

কার লাগি সব কাপড় কাচো
যতন ভরে?
ধোপা কহে, একা মোর ধো—
পানীর তরে।
আমি বলি, কাপড় ত লয়
পাড়ার সবাই,
ধোপা বলে ধোপানীরে
আগে পরাই।

ধোপা জাতীয় শিল্পী বাংলায় ক্রমেই বাড়িতেছে, পরের কাপড়ের ময়লা সাফ করাই যাহাদের কার্য্য। প্রশ্ন উঠিতে পারে—তাহারা শিল্পী হইল কোন্ গুণে? ধোপা শিল্পী হয় তা'র কাচা কাপড় আগে ধোপানীকে পরায় বলিয়া। ইহার প্রথম সাক্ষী চণ্ডীদাস। আর শেষ প্রমাণ,—রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই 'স্যাকরা' কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। যে ধোপারা কেবল কাপড় কাচে তাহারা কেবল ধোপাই, যেমন········ আচ্ছা আমরাই!

কবি দিলীপকুমার মহাপণ্ডিত শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়কে পত্র লিখিয়া নিজ কবিতা সম্বন্ধে যে সব বিষয় জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহারই উত্তর দিয়া গুপ্ত মহাশয় দিলীপকুমারকে যে পত্র লিখিয়াছেন উত্তরা সেটি পত্রস্থ করিয়া ধন্য হইয়াছে। গুপ্ত মহাশয় বলিতেছেন—রবীন্দ্রনাথ 'মেলডি'র পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তাঁহাতে যদি বা 'হার্ম্মনি' থাকে ··ইত্যাদি। কিন্তু আপনাতে দেখি ভিন্ন ধারা একটা। বিষমতার দিকটা আপনি একেবারে মিলিয়ে মোলায়েম ক'রে দিতে চান নাই। বাঙ্গলায় এ একটা নূতন সৃষ্টি।

দিলীপকুমারের ধারা যে ভিন্ন এ বিষয়ে আমরা একমত।

তাহার পর গুপ্ত পণ্ডিত বলিতেছেন—আপনার কবিতা আমার প্রিয় তার কারণ এই যে, আমি সেখানে দেখি আপনি সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে কবি।······আপনার কবিতা কবিত্বের অনাবিল গোমুখী হ'তে উৎসারিত।

এই স্থানে প্রবীণ পত্র-লেখকের সহিত আমাদের একমত হওয়া কঠিন, কারণ তাহা হইলে দিলীপকুমারকেই অপমান করা হয়। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের খবর আমরা রাখি না, কিন্তু একথা আমরা জানি যে দিলীপকুমারের কবিতা ভাল হউক আর মন্দ হউক, তাহা দিলীপকুমারের মুখ দিয়াই বাহির হয়, গোমুখীনিঃসৃত নহে, এবং একথা বলিবার অধিকার গুপ্ত মহাশয়েরও নাই।

এই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে;—দিলীপকুমারের ভিন্ন ধারা; তিনি সর্ব্বাঙ্গ দিয়া কবি; তাঁহার কবিতা গোমুখী নিঃসৃত; তাঁহার তত্ত্ব বস্তু ত' বস্তু নয়, তাহা যেন সপ্রাণ জীবেরই মত; —ইত্যাদি। পুনঃ পুনঃ এইরূপ ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যাজস্তুতি দ্বারা সূক্ষ্মবুদ্ধি গুপ্ত সমালোচক যে দিলীপকুমারকে সাধারণ্যে হাস্যাস্পদ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, আমরা তাহার সবিশেষ নিন্দা করিতে বাধ্য হইতেছি। এরূপ মাত্রাজ্ঞানহীন সোপম সমালোচনা কদাচিৎ লোচনগোচর হয়। তবে এ পত্র

কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলাম কর্ত্তায় সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ ব্যাকরণসম্মত। যথা—

ছাগলে কি না খায়?
পাগলে কি না বলে?

'ক্ষণ চপল' একটি গল্প। গল্পের আরম্ভে আছে:—

'পাড়াটা অত্যন্ত ঘিঞ্জি; সরুগলি রাস্তাটার দুই ধারে বেশির ভাগই খোলার ঘর।' উপাসনার পাঠকদের মধ্যে যাঁহারা এই গল্পের লেখক কে, অনুমান করিয়া জানাইতে পারিবেন, আমরা তাঁহাদের নাম পর সংখ্যায় পত্রস্থ করিব!

মোটের উপর ফাল্গুনের উত্তরা আমাদের ভাল লাগিয়াছে, আর তাহারই মধ্যে খুব ভাল লাগিয়াছে সম্পাদকের স্বরচিত নিবন্ধ দু'টি—

১। আগামী সংখ্যা
'উত্তরা'য়
শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের
—প্রবন্ধ—

২। শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের
—প্রবন্ধ—
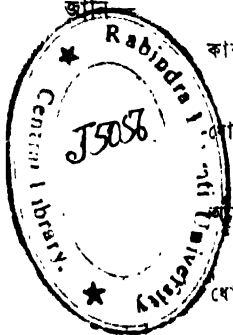
প্রকাশিত হইবার আশঙ্কা নলিনী বাবু করিয়াছিলেন কিনা সে সংবাদ আমরা জানি না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছেন দিলীপকুমারের ভিন্ন ধারা, গোমুখী। গুপ্ত সমালোচক দিলীপকুমারকে ব্যঙ্গ করিতেছেন না ত?

পরিশেষে পত্রলেখক আশা করিতেছেন—এখন, এতখানি প্রাচুর্য্যকে অঙ্গে অঙ্গে বেঁধে সাজিয়ে একটা স্থাপত্যসুলভ গরিমা,—হার্ম্মনিরই পরাকাষ্ঠা, এক আপনার হাতে ফুটে উঠবে, এই আশায় র'য়েছি।

মেলডির পরাকাষ্ঠায় আরম্ভ হইয়া পত্রখানির সমাপ্তি হইয়াছে হার্ম্মনির পরাকাষ্ঠায়। যে দিলীপকুমার মাত্র কাষ্ঠের হারমনিয়ম লইয়া পূর্ব্ব জীবনে গানে অসাধ্যসাধন করিয়াছেন, পরজীবনে তিনিই যে হার্ম্মনির পরাকাষ্ঠা দেখাইবেন এ আশা অবশ্য নলিনী বাবু করিতে পারেন, এবং আমরাও করি।

কিন্তু শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "দম্পত্যো কলহেচৈব" কবিতা একটি গোমুখী-নিঃসৃত অনাবিল কাব্যধারা বটে। দু' এক স্থানে অর্থবোধের অসুবিধা হইয়াছিল, যেমন: –

(১) "আকাশে যবে মেঘেতে ঢাকি
ডাকিবে গুরু গুরু।"

(২) "লাগিছে কেন চরণে ভারী?"

সাহিত্য-সংবাদ

সাহিত্য-সেবক সমিতি—

১৩১৮ সালের ১২ই আষাঢ় সাহিত্য-সেবক সমিতি স্থাপিত হয়। এই তারিখ অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের বয়স ২১ বৎসর। কিন্তু ইহার এই জীবন একটানা নয়, মধ্যে কিছুদিন বন্ধ ছিল। বর্ত্তমান বর্ষে ইহার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এবং সম্পাদক শ্রীঅবনীনাথ রায় ও শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। সাধারণতঃ প্রতি শনিবারে অথবা রবিবারে ইহার অধিবেশন হয়। ১৪।১ বেচু চাটুজ্যে ষ্ট্রীটে শ্রীগোপেন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে ইহার স্থায়ী অধিবেশন-গৃহ। সুপরিচিত কথা-শিল্পী শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, শ্রীমনোজ বসু প্রভৃতি লেখকগণ এখানে তাঁহাদের গল্প এবং কবিতা পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানটিকে আধুনিক সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের রচনা-সম্ভার দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছেন এ-কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহার সভ্যসংখ্যা বর্ত্তমানে এক শত, স্ত্রী-সভ্যও আছেন।

রবি-বাসর—

রবিবারে এই প্রতিষ্ঠানটির পাক্ষিক অধিবেশন হয়। রায় বাহাদুর জলধর সেন ইহার সর্ব্বাধ্যক্ষ। সুসাহিত্যিক শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ইহার সম্পাদক। চল্লিশ জনের বেশী ইহার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় না। গণ্যমান্য সাহিত্যিকগণ ইহার অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রতিষ্ঠান-টির একটি বিশেষত্ব এই যে সভার দিন প্রচুর আহারের আয়োজন থাকে। এক একজন সভ্য পালা করিয়া তাঁহাদের আবাসে ইহার সভা আহ্বান করেন। অতএব ইহার কোন স্থায়ী বাসগৃহ নাই। এই প্রতিষ্ঠানটিকে সুরুচিপূর্ণ চিত্তবিনোদনের একটি আশ্রয়-স্থল বলা যাইতে পারে।

পরিচয়-সভা—

প্রতি শুক্রবারে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়ীতে কিংবা 'পরিচয়' নামক ত্রৈমাসিক কাগজের সম্পাদক-সঙ্ঘের কোন সদস্যের বাড়ীতে ইহার বৈঠক হয়।

যোগ-বিয়োগ

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

ছেলের দল কলরব করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছিল।

সকলেই সমান ভাবে চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিতেছিল এবং শ্রীমন্ত অপ্রস্তুতের মত সকল প্রশ্নের যথাসাধ্য জবাব দিতেছিল—ও বেকুফ্ পেয়ারা চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া মার খাইয়াছে।

ওর মাত্র একটী জবাব সম্বল—"ধরে ফেল্লে ত কি করব?"

একজন বলে—"তুই ত গাছে গাছে চলে গিয়ে সব্বারই আগে বাগান পার হয়ে গেলি, তবে তোকে ধল্লে কি করে?"

ও বলে—"কে যে পড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, আমি ভাবলাম নমু পড়ে গিয়েছে, তাই ছুটে দেখতে গেলাম—তা দেখি কেউ কোথাও নাই, পিছু থেকে—"

আর ও বলিতে পারে না, বাকীটা ধরা পড়ার লজ্জাকর ইতিহাস; সেটুকু ব্যঙ্গবিষে ঝাঁঝালো করিয়া কহিয়া দিল আর একজন—"পিছু থেকে আগলদার এসে ধ'রে ফেল্ল, শেয়ালে যেমন ভেড়া ধরে, ঠিক তেমনি ক'রে —নয়রে?"

সকলে হাসিয়া উঠে, একজন কহে—"ভেড়ার মত চোখ বুজেছিলি—তুই?"

হাসির কলরোল আরও উচ্ছল উদ্বেল হইয়া উঠে, বেগ বাড়িয়া যায়, ও ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সবার মুখপানে চায়, এতগুলা মুখ চাপা দিবার মত কিছুই ও খুঁজিয়া পায় না।

হাসির বেগ ক্ষীণ হইয়া আসিলে একজন কহে—ভ্যাবাকান্তরে, সে ত মিথ্যে ক'রে চেঁচালাম আমি। নমু তখনও গাছ থেকে নামতে পারেনি, তাই বাগানের কোণে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে মিথ্যে করে চেঁচিয়ে উঠলাম, বেটা খোট্টা যেই আমাকে ধরবার জন্যে এসেছে, অমনি নমু গাছ থেকে নেমে ওদিক দিয়ে পঁয়ষট্টি; আর মাঝখান থেকে ভ্যাবাকান্ত এসে নাড়ুগোপালের মত ধরা পড়লেন, আহা হা।"

আবার হাসির রোল, পরম কৌতুকে সবাই পরম উপভোগের হাসি হাসে।

আবার একজন কহে—"আচ্ছা, তুই বল্লি না কেন যে, বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম কে পড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, তাই ছুটে আমি দেখতে এলাম কে পড়েছে, আমায় ধরছ কেন?"

একটু খানি আমতা আমতা করিয়া সে কৈফিয়ৎ দেয়—"বাঃ দাঁতে যে পেয়ারার কুটী লেগেছিল—।"

—"দন্তবিকাশ রে আমার, ধরা পড়বা মাত্রই বুঝি দাঁত মেলে ব'সে ছিলেন, ছিমন্ত কিনা!"

আর একজন কহে—"নামে ছিমন্ত কাজেও ছি-মন্ত।"

অপর একজন কহে—"ছিমন্ত নয়রে, নাম আবার শ্রীমন্ত, কাণার নাম পদ্মলোচন।"

শ্রীমন্ত এবার মরিয়ার মত একটা কৈফিয়ৎ দেয়—ছি-মন্ত হই আর যাই হই, তোদের নাম ত করি নাই আমি।

—"নিজে ত মার খেলি—"

এবার শ্রীমন্ত একটা মনের মত জবাব পায়, খুব একচোট হাসিয়া বলে—"লাগেই নাই আমাকে, সেই বেটা ছাতুরই হাত ফুলে উঠবে দেখতে পাবি,—খাঁটী রক্ত জমে যাবে; বাবা, এ পিঠে চাপড় যিনি মারবেন তিনিই ঠ্যালা বুঝবেন—হেঁঃ—হেঁঃ—"

—"না—মেলে আবার লাগে না—!"

—"মাইরী বলছি—লাগে না—দেখ তোরা, বিশ্বাস না হয় ত—।"

একজন সটান আসিয়া খা চার বসাইয়া দেয়, সঙ্গে সঙ্গে আর একজন,—আর একজন,—আর একজন,—মোট কথা বাকী কেহ রহিল না—যাহাকে বলে চাঁদা করিয়া মার.

শ্রীমন্ত দাঁতে দাঁতে টিপিয়া থাকে,—কোন ক্রমে বেদনা উপলব্ধির বিন্দুমাত্র আভাষও প্রকাশ পাইতে দেয় না, শেষ গোটা দুই দম লইয়া হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহে—"ওস্তাদের

মন্তর আছে রে,—আর জানিস, দমবন্ধ ক'রে থাকলে কিস্যু লাগে না।"

বেশ একটু সদম্ভ পদক্ষেপে কয় পা আগাইয়া আবার সে কহে—"বাবা গুরুমশায়ের কঞ্চি, বাবার পাঁচন, মায়ের হাতা, আর ওস্তাদের লাঠী পড়ে পড়ে পিঠ হয়েচে পাথর নসে—দেখি তোর হাতটা, শুধুই কচলাচ্ছিস্ কেন—রক্ত জমেছে বুঝি—দেখি—?"

মার খাইয়া ও বিজয়ীর মত চলে।

পাড়ায় ঢুকিয়া ছেলের দল ভাঙ্গিয়া পড়ে, যে যাহার আপন আপন পথ ধরে। শ্রীমন্তও আপন বাড়ীর পথ ধরিয়া চলে, এদিক ওদিক চাহিয়া ও এবার পিঠে ধরে ধীরে হাত বুলায়,—জ্বালাও করে, ব্যথাও বেশ, পিঠখানা ফুলিয়াছেও খানিকটা; একটু তেল হইলে হইত। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে মায়ের লোহার হাতাখানার কথা—।

ও শেষ কয়টা আগাছার ডাল ভাঙিয়া পিঠে ধীরে ধীরে বুলায়; জিনিষটা হেলার নয়, বিশল্যকরণীর পাতা, ইহাতে, লক্ষ্মণের শক্তিশেলের বেদনা ভাল হইয়াছিল—এতো কয়টা চড়-চাপড়।

ভগবানকে ধন্যবাদ যে, দুনিয়ায় মানুষের মধ্যে কেহ নামের মানে খোঁজে না,—খুঁজিলে শ্রীমন্তের কোন মানেই হয় না,—দুনিয়ার অভিধান হইতে বাদ পড়িতে হয়। ঐ ছেলেটা বলিয়াছে ঠিক—কাণার নাম যেন পদ্মলোচন; ঠিক তাই; শ্রীমন্তের কোন শ্রীই ছিল না;—দেহের শ্রী—রূপ, অন্তরের শ্রী—গুণ, ঘরের শ্রী—লক্ষ্মী তিনের একটিও না।

কর্কশ পাক-দেওয়া কঠোর গিঁঠ গিঁঠ দেহ; দীপ্তিহীন চোখ, তামাটে রুক্ষ চুল, বাঁকা বাঁকা পা,—মুখে অজস্র তিল, সর্ব্বোপরি কর্কশ-ফরসা রং তাহাকে বেশী শ্রীহীন করিয়া তুলিয়াছিল। সে যেন কাল হইলে এর চেয়ে ঢের বেশী শোভন হইত।

তবে হয় তো সে এর চেয়ে অনেকটা শ্রীমন্ত হইলেও হইতে পারিত। শৈশবের শিশু শ্রীমন্তের আর পাঁচটা ছেলের মতই ফুলো ফুলো গাল, নরম নরম হাত পা, শিশুসুলভ লাবণ্য, মোট কথা একটী মানবশিশুর যাহা যতটুকু প্রয়োজন সবই ছিল, ছিল না শীর্ণা জননীর বুকে দুধ, ছিল না বাপের গোয়ালে গাই, বা বাপের দুধ কিনিবার কড়ি।

শুকাইয়া শুকাইয়া শৈশব কাটিল, আসিল কৈশোর। কিন্তু সে যেন অনাবৃষ্টির বর্ষা, লাবণ্য পুষ্টি ফুলের মত কুঁড়িতে উঁকি মারিয়া ঝরিয়া গেল, দেহ পুষ্ট হইল না, হইল কঠোর,—লাবণ্যের রেশ শুকাইয়া সারা দেহ ব্যাপিয়া ফুটিয়া উঠিল একটা কর্কশ রুক্ষতা। 'সুখের ঘরে রূপের বাসা' কথাটা মিথ্যা নয়, অতি সকরুণ সত্য।

যাই হোক পাড়া প্রতিবেশীদলের সহানুভূতি অপরিমেয়, তাহারাই শ্রীমন্তের বাপ-মায়ের চরম অবিবেচনার অপরাধ সংশোধন করিয়া লইল, তাহারা শ্রীমন্তের নাম পাল্টাইয়া রাখিল ছি—মন্ত; আবার ছি-তে একটা লম্বা টান মারিয়া সুর যোজনা করিল।

শ্রীমন্তের তাহাতে রাগ রোষ নাই, সে হাসি মুখেই ঐ নামে সাড়া দেয়।

মা রাগ করেন, কহে,—"খেতে পরতে দেয় কেউ! আর নিজেরা ত সব মদনমোহন।"

শ্রীমন্ত আশ্চর্য্য হইয়া যায়, সে ত জানে তাহাকে অপমান করিবার অধিকার সকলেরই আছে; সে বলে—"বল্লেই বা—"

"বল্লেই বা! তোর দেহে কি পিত্তি নাই রে?"

বাপ বলে,—"পিত্তি বেশ আছে, কাজের তরে দুটো কড়া কথা বলে দেখ না—ছেলের লাল চোখ! মনে হয় দিলে বা খুন ক'রে, আবার বেহারী-বাগ্দী ওস্তাদের কাছে লাঠী খেলা শেখা হচ্ছে। নাই ঘটে বুদ্ধি,—ছি-মন্ত বল্লে কি বলা হয় তা মাথায় ঢোকে না।"

সত্যই বুদ্ধির বালাই শ্রীমন্তের একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। এ বিষয়ে তাহাকে নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত তুলনা করা চলে। দেশী মানুষের বুদ্ধি একটা না একটা থাকেই—সে সু-ই হউক আর কু-ই হউক; কিন্তু শ্রীমন্তের ঘটে দুইটার একটাও ছিল না। সে পেয়ারা চুরী করিতে গিয়া ধরা পড়ে, দাঁতে পেয়ারার কুচী লাগিয়া থাকার ভয়ে মিথ্যা সাফাই দিতে পারে না। আবার পাঠশালার ছুটী

বৎসরেও বোধোদয় বোধগম্য হয় না ; সারা উর্দ্ধটা খুঁজিয়াও উর্দ্ধ বানান সে করিতে পারে না।

কাজেই গুরু মহাশয় তাহাকে বিদায় দিয়া হাঁফ ছাড়িলেন, সেও ঐ উর্দ্ধ বানানেই। তাহার উপর সেদিন ওই পেয়ারা চুরীর হাঙ্গামায় জমিদার-বাড়ীর তাড়াটা আসিয়াছিল প্রচণ্ড রূপে ; গো-পাল উচ্ছৃঙ্খল হইলে দোষ চিরদিনই গোপালকের। একে ত ছেলের ছিল না বুদ্ধি, বাপ দিত না বেতন, তাহার উপর জমিদার বাড়ীর বেতন তাও বুঝি যায়।

কাজেই গুরু সেদিন ঠ্যাঙাইলেন গুরুতর রূপে। তারপর আবার ঐ উর্দ্ধ বানান, এবার গুরু মহাশয়ের শোধ তুলিবার একমাত্র যন্ত্র বেত, সে-গাছাও হইয়া গেল শেষ। অবশেষে বিদায় করা ছাড়া আর বোধ করি গত্যন্তর ছিল না।

শ্রীমন্তও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, সেও মস্তক উর্দ্ধে তুলিয়া দিবা বাড়ী ফিরিল। বাড়ী ফিরিয়াই সে হাঁকিল—"গৌরী, এই নে—"

গৌরী শ্রীমন্তের ভাগ্নী, মাতৃহীনা খয়াখয়া ফুটফুটে মেয়েটী শ্রীমন্তের বড় প্রিয়। বছর তিনেকের মেয়েটী অপটু পদে ছুটিয়া আসিয়া শ্রীমন্তকে জড়াইয়া ধরিয়া বলে—"কি মামা,—পেয়ারা দাও—"

শ্লেট আর ছেঁড়া বোধোদয়খানা আগাইয়া দিয়া শ্রীমন্ত কহিল —"না—, বই দপ্তর—"

ওইগুলির উপর গৌরীর লোভের সীমা ছিল না, নতুন বোধোদয়খানার মলাট ওই ছিঁড়িয়াছিল, শ্লেটখানায় পাথর দিয়া দাগ কাটিয়া একটা স্থায়ী হিজিবিজি—সে-ই রচনা করিয়া রাখিয়াছে। গৌরী পরম আগ্রহে হাত বাড়াইয়া কহিল—"দাও, মামা দাও।"

ওদিক হইতে শ্রীমন্তের মা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—"ছিঁড়ে দেবে, ছিঁড়ে দেবে—"

শ্রীমন্ত পরম নিশ্চিন্ত কণ্ঠে কহিল—"যা করবে করুক, আমার আর চাই না ওসব।"

—"কেন ?"

—"মাষ্টার আজ ঘাড় ধ'রে বের ক'রে দিয়েচে, আর, আমাকে নেবে না। বলেচে—কিস্যু হবে না আমার।"

কথাগুলির মধ্যে এতটুকু দুঃখবোধের চিহ্নও ছিল না—, মা তাহার অবাক হইয়া গেল। কিন্তু বলিবারও কিছু ছিল না, কারণ কথাটা তাহাদের জানা, সে নিজেই দিনে দশবার ওই কথাটা বলিয়া আসিয়াছে। যাক্, তবুও অপচয় তাহার সহ্য হয় না, কহিল, "ও মেয়েমানুষ, বই নিয়ে কি করবে ; যত্ন ক'রে রেখে দে, তোর ছেলে হয়ে পড়বে।"

শ্রীমন্ত বেশ একটু সলজ্জ পুলক অনুভব করে,—কিন্তু প্রথা অনুযায়ী আপত্তি জানাইতেই হয়, কহে,—"ধ্যেৎ!"

মা বিরক্ত হইয়া কাজে যাইতে যাইতে কহে—"তবে যা মন তাই কর ; ওই ত মেয়েকে মানুষ কচ্ছি, ঘরের দোরে থাকতে বাপের খোঁজ খবর নাই, আবার মেয়েকে দে আকাশের চাঁদ ধরে দে।"

মা অন্তরাল হইতেই কিন্তু শ্রীমন্ত গৌরীর হাত হইতে বই শ্লেট লইয়া সযত্নে তুলিয়া রাখে।

গৌরী কাঁদে।

মা ঘর হইতে শাসায়—"ওরে ও মুখপোড়া আকাট মুখ্যু, আবার ওকে কাঁদাতে ধরলি, দেখবি দোব পিঁরে হাতার বাড়ি—"

শ্রীমন্ত তাড়াতাড়ি গৌরীকে কোলে তুলিয়া ভুলায়—"পেয়ারা খাবি, পেয়ারা—ইয়া বড়, তুল্‌তুলে পাকা—"

গৌরীর সেই বায়না—"বই ছেলেট,—"

বাড়ীর বাগিরে শ্রীমন্ত চুমু খাইয়া বলে—"ছি মা—বই ছেলেট নিতে নাই, তোমার ভাইটী হয়ে পড়বে—।"

ভাই-এর নামে গৌরী কেমন ভুলিয়া যায়, সে কহে—"ভাইটী—মামা,—আঙা টুক্‌টুকে—"

মামার কর্কশ তাম্রাভ মুখখানা ঈষৎ কোমল রক্তাভ হইয়া উঠে।

তিন

অক্ষমের সম্পদও বিপদ—শ্রীমন্তের শ্রীহীন পিতার পুত্রের বেতন যোগাইবার অক্ষমতায় পুত্রের বিদ্যার্জ্জন সম্পদটুকু বিপদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল ;—গুরুমহাশয়ের তাগিদের জ্বালায় ওপাড়া দিয়া হাঁটিবার জো তাহার ছিল না। সুতরাং এ ঘটনায় সে আপত্তি ত করিলই না—বরং আরামের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া

বাঁচিল—কহিল, "বেশ করেছিস, ও ব্যাটা জানে কি যে ওর কাছে শিখবি? আর চাষার ছেলে লেখা পড়া করে হবেই বা কি, সেই বাবা হাল গরু হোৎ ত্যা-ত্যা—। আর না হয় ত চল্ সদরে গিয়ে দিয়ে আসি, মামলার তদ্বির করতে শেখ—।"

শ্রীমন্ত পূর্ব্বরাগের আতিশয্যে সেইদিনই হালের গরু দুইটার সেবায় প্রবল বেগে লাগিয়া গেল।

শ্রীমন্ত গোরুর সাফ করিতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে শব্দ শোনা গেল—

"আরে বাপরে বাপ, তিনদিন কা যোগী ইস্‌কে ভিতর পাঁও বরাবর জটা নিকাল গিয়া!"

কণ্ঠস্বর শ্রীমন্তের ভগ্নীপতি হরিলালের, গৌরীর বাপের। হরিলালের কথাই এমনি, মানুষটীও ঠিক তাই। কোন পরিমিতিতেই তাহাকে কষিয়া বোঝা যায় না, সে না যোগী না ভোগী,—উপার্জ্জনও করে, তা সে যে কোন উপায়েই হোক, আবার খরচও করে আঠারো আনা—মদে, মাংসে, গাঁজায়—কিন্তু একা নয় পাঁচজনকে লইয়া। দুনিয়ায় কোন কিছুতেই তাহার অরুচি নাই। মোট কথা—'ত্বয়া হৃষীকেশ যথা নিযুক্তোঽস্মি'—গোছের ভাবটা।

শ্রীমন্ত হরিলালের কথাটা ঠিক বুঝিতে পারে নাই, সে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। হরিলাল হা হা করিয়া হাসিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল—"কেয়া বচ্চু, সম্‌ঝা নেহি—? বাপ পাঠশালা ছাড়তে না ছাড়তেই ঘোর সংসারী, একদম গোবরে হাত; তিন দিনের যোগী হতে না হতেই পা পর্য্যন্ত জটা গজাল! বহুৎ আচ্ছা, জীতা রহো!"

হরিলাল হিন্দী বাত বলিতে কেমন ভালবাসে।

আবার শ্রীমন্ত হাসিয়া কহিল—"গরু দুটোর চেহারা হয়েছে দেখনা, এতে কি চাষ চলে—?"

তাহার মাথায় এক চাঁটা মারিয়া হরিলাল তাহার হাত খানা ধরিয়া টানিয়া কহিল—"ভাগ্, আয় আমার সঙ্গে আয়; চাষ করে কে কোন কালে বড়লোক হয়েচে, আমি তিন দিনে তোকে মানুষ করে দোব।"

শ্রীমন্ত চলিল। এর পর হইতে শ্রীমন্ত চাষও করে, হরিলালের হাতে মানুষও হয়, আবার বেহারী ওস্তাদের আখড়ায় লাঠীও খেলে—লোকে দু নৌকা ধরে, শ্রীমন্ত তিন নৌকা ধরিল।

শ্রীমন্ত হরিলালের হাতে মানুষ হোক না হোক, সাক্ষাৎ ফল একটা সে পাইল। জামাইটীকে শ্রীমন্তের মা বেশ সুনজরে দেখিত না, তাহার ধারণা ছিল গৌরীর মায়ের যে হঠাৎ বাকরোধ হইয়া মৃত্যু হইয়াছিল তাহার হেতু কোন রোগ নয়, তাহার হেতু ওই কাণ্ডজ্ঞানহীন জামাতার অত্যাচার, সে লাথি হোক, কিল হোক, চড় হোক, যাই হোক।—আপনার মেয়ের মেয়ে, তাই দায়ে পড়িয়া গৌরীকে বুকে করিয়া আছে, নতুবা ও বংশের ছায়াতে তাহার বিষদৃষ্টি ছিল, আর ভয়ও করিত। তাই যখন সে দেখিল যে ছেলেটাকে চেলা বানাইবার চেষ্টার অন্ত জামায়ের নাই, আর শাসনেও ছেলেকে বাগ মানান যায় না, তখন স্বামীর চোখে আঙুল দিয়া সমস্ত দেখাইয়া কহিল—"ছেলেকে হরিলালের সঙ্গ ছাড়াও। মাঠে যায় কিনা জানিনা, ঘর বাস ত ছেড়েছে, তা দেখছ?"

বাপ একটু অধিক পরিমাণে বাস্তব জগতের লোক, সে কহিল—"তা হরিলালের সাথে মিশলে দোষ কি? জান, ওর অনেক কিছু মাথায় খেলে, রোজগারে ওর মত মাথাই হয় না, শিখতে পারলে আখেরে ভাল হবে।"

শ্রীমন্তের মা ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর পানে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, ক্ষণপরে সে কহিল—"তা হলে ত রাধারাণীর মরণে তোমার কোন কষ্ট হয় নি।"

স্বামী চমকিয়া বিব্রত ভাবে কহে—"কেন?"

—"নইলে তুমি ওই জামায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হও, না ছেলেকে তার কাছে তারই আচারব্যাভার শিখতে দাও।"

শ্রীমন্তের বাপ এমন ভাবে নাই, এ কথার এমন মানে হইতে পারে এ তাহার ধারণারও অতীত ছিল। কিন্তু কথাটা শ্রীমন্তের মা ধরিয়াছে অনেকটা ঠিক। কিন্তু জামাইকে সে মার্জ্জনা করিয়াছে, কন্যাহন্তার উপর সে যে এখন সন্তুষ্ট এটা আরও ঠিক। ফন্দীবাজ জামাই রোজগার করে, মাঝে মাঝে সে যখন হাত পাতে তখনই সে কিছু পায়। পুরুষটী নীরবে কথাটা খতাইয়া দেখে,—সত্য—ওই নারীটির কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য! বুকের

ভিতরটা তাহার কেমন করিয়া উঠে. অভাবের নির্ম্মম পেষণে তাহার অন্তরাত্মার বিকৃত স্বরূপ দেখিয়া সে আজ শিহরিয়া উঠে।

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে উঠিয়া যাইতে যাইতে কহে, "রাধুর মা, তুমি কথাটা বলেছ ঠিক, কিন্তু কি করব বল, অ-ভর পেট সন্তান খেয়েও ভরেনি, তাই ক্ষিদের জ্বালায় কার কাছে হাত পাততে হয়, না হয় তাও ভুলেছি, উপায় নাই।"

স্ত্রীও এমন উত্তর প্রত্যাশা করে নাই, সে এই উত্তরে অভিভূতের মত স্বামীর পানে তাকাইয়া রহিল, কোন জবাবই তাহার জোগাইল না।"

দ্বিপ্রহরে স্বামী আহারে বসিলে শ্রীমন্তের মা কহিল—"ছেলের বিয়ে দাও।"

স্বামী তাহার মুখপানে তাকাইয়া থাকে।

শ্রীমন্তের মা আবার কহিল—"বিয়ে দিলে ছেলের ঘরে মন বসবে, তখন একটু বাগিয়ে ধরলেই ছেলে বশ মানবে।"

শ্রীমন্তের বাপের পুরুষের মন আজিকার এই শোক-স্মৃতিটা ভুলিবার জন্য এমনি একটা বিষয়ান্তর খুঁজিতেছিল, সে সোৎসাহে কহিল—"বেশ বলেছ, হাতীর গলায় ঘণ্টা না হলে হাতী ভাল চলে না, তালে তালে পা ফেলতে তার মন ওঠে না।"

ঘরের মধ্যে লুকাইয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে শ্রীমন্ত কথাটা শুনিয়া ফেলিল, একটা অপূর্ব্ব পুলকে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কেমন সরস হইয়া উঠিল। সে উৎসাহে সেদিন গোটা মাথাটা ব্যাপিয়া সীঁথি চিরিয়া, টেরী কাটিয়া, গাড়ী জুড়িয়া ধান আনিতে চলিল।

মনোরথ তাহার উড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু বুড়া বলদ দুইটার গতি মন্থর; সে তাহার সহ্য হয় না, সে তাহাদের পিঠে আঙুল টিপিয়া পেটে পায়ের গুঁতা দিয়া গরু দুইটাকে শেষ পর্য্যন্ত সে ছুটাইল এবং হাতের পাঁচন গাছটা উঁচাইয়া ধরিয়া হাঁকিতে লাগিল—হৈও চলে মটর ভর্‌র্ ভর্‌র্ ভোঁ ভোঁ।

চার

ঠিক ওই দিন হইতেই শ্রীমন্তের বেশ একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল, ঘণ্টার নামেই হাতী তালে তালে পা ফেলিতে সুরু করিল। হরিলালের আড্ডা সে ছাড়িল, ঘর দুয়ারে মন দিল, খামার নিকায়, ক্ষেতে যায়। এমন কি, উত্তরায়ণ সংক্রান্তির মেলায় খান কয় পট আনিয়া ঘরে দেওয়ালে পেরেক ঠুকিয়া সে টাঙাইয়া ফেলিল, মোট কথা ভাবী গৃহ-লক্ষ্মীর আগমন-প্রত্যাশায় সে দারিদ্র্যের মাঝেও শ্রী-শতদল রচনা সুরু করিয়া দিল। ঐ মেলা হইতেই সে দুই আনার দু'খানা সাবান আনিয়াছিল। আনিয়াই স্নানের সময় সে এমন প্রবল বেগে সাবান ঘসা সুরু করিয়া দিল যে, দশ দিনেই সাবান দুইখানা শেষ হইয়া গেল।

সেদিন গৌরী কহিল—"কে তোমাকে মেলে মামা, মুখ এমন লাল কেন হ'ল ?"

শ্রীমন্ত আরসী লইয়া খোলা আলোয় মুখখানা ভাল করিয়া দেখিল, সত্যই কে যেন ঝামা-ইট দিয়া মুখখানা ঘষিয়া দিয়াছে, তাহার উপর শীতের হাওয়ায় ফাট ধরিয়াছে।

যাই হোক মুখের ফাটে তাহার বিবাহ আটক রহিল না। ঐ রূপেই সে বর সাজিয়া বউ লইয়া ঘর ফিরিল। বউটী নেহাৎ ছোট নয়, বারো তেরো বছরের মেয়ে, নাম গিরিবালা, দেখিতে শুনিতে নিতান্তই সাধারণ, তা বলিয়া কুৎসিত নয়, শ্যামলা রং, মাঝারি চোখ, নাকটী একটু চাপা, কিন্তু দেহের গঠনভঙ্গীটি অনবদ্য, দেহখানি সুসন্নিবিষ্ট, দৃঢ়, সুপুষ্ট, গরীবের মেয়ে, আ-বাল্য পরিশ্রমে সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে, তা বলিয়া লাবণ্যহীন নয়।

দেখিতে গিরির মুখ মাঝারি রকমের হইলে কি হয়, এদিকে তাহার চোখ মুখ বেশ খরই ছিল। দেহের ওজনে মেয়েটী লঘুভার হইলেও গিরি মনের ওজনে গিরির মতই গুরুভার ছিল, সে ঘাড়ে চাপিয়া শ্রীমন্তকে বেশ কায়দা করিল। শ্রীমন্ত বেশই তালে তালে চলিতে সুরু করিল। কিন্তু তবু মায়ের ক্ষেদ মিটিল না, বাপেরও না। মায়ের আক্ষেপ—শ্রীমন্ত হরিলালের সঙ্গ ছাড়িল কিন্তু গাঁজা ছাড়িল না, বাপের আফশোষ—ছেলেটা এতদিন সাকরেদী করিয়া গুরুর রোজগারী ফন্দীর ষোল আনার এক আনা কি এক অণুও আয়ত্ত করিতে পারিল না।

এদিকে হরিলালের আড্ডায় শ্রীমন্তের এই নিয়মিত গড়হাজিরায় একটু চাঞ্চল্য উঠিল। এ দল ত ছাড়িয়া যাওয়া সোজা নয়, একটা কোকিল এই আড্ডায় পোষা হইয়াছিল, সেটাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মুক্ত-পাখীটাকে আজও দুধ আফিং-এর টানে নিত্য বৈকালে হাজিরা দিতে হয়; আর একটা ছোঁড়া কিনা শিকল কাটিল!

হরিলাল গাঁজা টিপিতে টিপিতে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে গান ধরিল—

রমণী রতন মনের মতন ও-হায় ভুলিয়েছে মন।

—শালাকো নয়া নিশা মিলা হ্যায়, আচ্ছা রহে দেও, তিন থাপ্পড়মে শালাকো নিশা টুটায়েগা হাম।"

শ্রীমন্তের সঙ্গী বিপিন, সেও এ পাঠশালায় নোতুন পড়ুয়া, সে কহিল—"গাঁজা না খেয়ে বৌয়ের সঙ্গে আলাপ জমায় কি ক'রে?"

হরিলাল ওধার দিয়া যায় না, সে কহে—"জমুক আর ফেঁসে যাক্, হাম লোককা কেয়া? যিস্‌কা ফাটে উস্‌কা ফাটে, ধোবিকা কেয়া? অগর্ হাম লোককা একরোজ খিলানা চাহি।"

হরিলাল সেদিন শ্রীমন্তকে ধরিল। শ্রীমন্ত মাঠ হইতে ফিরিতেছিল—পথে হরিলালের সহিত দেখা, হরিলাল কহিল—"এ-ও পাঠশালমে কেঁও নেই যাতা?"

শ্রীমন্ত চলিতে চলিতেই বেশ গম্ভীর ভাবে কহিল—"আর যাব না।"

—"কেঁও?" হরিলালের চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

—"কেঁও আবার কি? তোমার সঙ্গে মানুষে মেশে?—মিশে ত শেষে বউ খুন করতে শিখব।"

আর যায় কোথা! হরিলাল খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠে,—সে খপ্ করিয়া শ্রীমন্তের চুলের মুঠা ধরিয়া টান মারিয়া কহে—

—"কোন্ শালা এ কথা বোল্‌তা হ্যায়—কোন্ হারাম-জাদ,—খুন করেঙ্গে, কাট-ডালেঙ্গে—"

হরিলালের ওই একটা বিশেষত্ব, রাগিলেই সে তলোয়ার ভাঁজিত, শত্রুর শির সে আর রাখিত না—অন্ততঃ মুখে।

লাঠী-খেলা কঠোর কর্কশ হাতে হরিলালের প্যাকাটীর মত হাতখানা মুচ্‌ড়াইয়া শ্রীমন্ত আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল—"এই দেখ, আমার সঙ্গে বেশী চালাকী করো না বলচি, তোমাকে দুমড়ে ভেঙে দোব—।"

শ্রীমন্তের কথা বলা বাহুল্য হইল, হরিলাল সেটা পূর্ব্বেই বুঝিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু লম্ফঝম্প ত্যাগ করে নাই।

"দেখ লেঙ্গে—হাম, দেখ লেঙ্গে, হামরা সাথমে রহেনেসে তেরা আখের মে ভাল হোতা, আচ্ছা যাও—যাও,—তুমকো কুছ বোলা ঝুট, মানুষ হলে বুঝতিস্, বুঝলি—মানুষ হ'লে বোঝে কচু হ'লে সেজে—তোম দকর কচু হ্যায়,—দকর কচু—!"

হরিলাল তখন এই বলিয়া সরিয়া পড়িল বটে, কিন্তু একেবারে ব্যাপারটা ছাড়িল না। আবার গিয়া আসর পাতিল শ্রীমন্তর বাড়ীতে।—হাজার হোক শ্বশুরবাড়ী, শ্বাশুড়ী সুনজরে দেখুক না দেখুক,—অন্ততঃ খেদাইয়া দিতে পারিবে না। আরও ভরসা—শ্বশুর অবাধ্য নয়—, সে এবার এক ছুরী হাতে করিয়াই হাজির,—মুখে একটু মদের গন্ধ,—

"এ প্রাণ আর রাখবই না, —ছি-মন্তে আমার অপমান করে—।"

শ্বাশুড়ীর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করে,—শ্বশুরের পায়ে প্রণাম করে,"দাও পায়ের ধূলো দাও,—এ প্রাণ আর রাখবই না। একটা ছোট লোকের মেয়ের পরামর্শে ছি-মন্তে কিনা,—নাঃ—এ প্রাণ আর রাখবই না।"

শ্বাশুড়ী বিব্রত হইয়া কহে—"দোহাই, বাবা আমার, আসুক্ শ্রীমন্তে,—"

—"কভি নেহি—এ জান নেহি রাখে গা—।" বলিয়া সে ছুরীটা উঁচু করিয়া তোলে—।

শ্বশুর হাতে চাপিয়া ধরে—, শ্বাশুড়ী চেঁচাইয়া উঠে—। গিন্নি পিছন হইতে শ্বাশুড়ীকে কহে—"মা শ্বশুরকে হাত ছেড়ে দিতে বল।"

—"সে কি গো—খুন খারাপী হবে!"

বউ বলে—"হ্যাঁ খুন কতজনা হয়েছে, ও হবে, বলে একটা কাঁটার ঘা মানুষের সয় না, নিজের বুকে ছুরী বসাবে নিজে।" কথাটা শ্বশুরের কাণেও গিয়াছিল, বাস্তব রাজ্যের

লোক সে, কথাটা এক দণ্ডেই কাণের ভিতর দিয়া মরমেও গিয়া পশিয়াছিল। সে সত্যই হরিলালের উদ্যত হাতখানা ছাড়িয়া দিল।

কেহ ধরে না দেখিয়া হরিলালকেও ছুরী নামাইতে হইল। শুধু ছুরী নামাইতে হইল না, ওই এক রত্তি মেয়েটার কুবুদ্ধির নিকট মাথা নামাইয়াও সরিয়া পড়িতে হইল। ওড়া পাখী আর ধরা পড়িল না, শ্রীমন্তের আশায় তাহাকে হাত ধুইতে হইল।

পাঁচ

দিন দাঁড়াইয়া থাকে না, দিনের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার বয়স বাড়ে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্ত পুরা জোয়ান হইয়া উঠিল, গিরিও ঘরণী হইয়া উঠিল, শ্রীমন্তের মা বাপ বৃদ্ধ হইয়া একে একে চলিয়া গেলেন।

শ্রীমন্তের তাহাতে বড় আক্ষেপ নাই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে মা বাপের শোক ভুলিয়াছে. কিন্তু গিরির আক্ষেপের সীমা নাই,—সে শাশুড়ীর আক্ষেপ মিটাইতে পারে নাই,—নারী হইয়া একটী পৌত্র শাশুড়ীর কোলে সে তুলিয়া দিতে পারে নাই। শুধু ত আক্ষেপ নয়, এ নিষ্ফলতা তাহার নারীত্বের কলঙ্ক! শাশুড়ী বাজ্যের মাদুলী তাহার গলায় দিয়া তাহাকে কত ব্রতবার করাইয়াও যখন কিছুতে কিছু ফল পায় নাই—তখন সেকথা একদিন মুখ ফুটিয়া বলিয়াও ছিল, "নাতির জন্যে পাতা কোল আমার খালিই রইল,—আমার যেমন ভাগ্যি,—নইলে এমন অফলা হতভাগা মেয়ে আমার ঘরে আসবে কেন?"

বিপিনের মা ছিল কাছে বসিয়া, সে কহিয়াছিল,—"এক কাজ কর শ্রীমন্তের মা,—কাত্তিক পূজো কর—"

শ্রীমন্তের মা অতি ম্লান হাসি হাসিয়া কহিয়াছিল—"কি বল বিপিনের মা, কথায় আছে জান,—'হবে নারে বাঁজার ছেলে, কাত্তিক রে তোর বাবা এলে—.' ও সব মিছে,—ভাগ্যি, আমার ভাগ্যি— !"

ওই কথাগুলি গিরি আজও ভুলিতে পারে নাই। যখনই তাহার সন্তান-ক্ষুধাতুর নারী-মন আপন শূন্য কোলের পানে তাকাইয়া উদাস হইয়া উঠে, তখনই ওই কথাগুলি মনে জাগিয়া উঠে। এখনও শাশুড়ীর সে আক্ষেপ তীব্রকণ্ঠে তাহাকে ধিক্কার দেয়। নিরুপায়ে গৌরীকেই সে বুকে জড়াইয়া ধরে, সান্ত্বনাও পায়;—কারণ সংসারপালনের মমতাটাই বোধ করি সব চেয়ে বড়, ভূমিষ্ঠ হইয়া যে সন্তানটী মাতার যায়—তাহার শোক মায়ের ভুলিতে বড় বেশী দিন লাগে না, কিন্তু লালনে পালনে বর্দ্ধিত-বয়স্ক সন্তান মায়ের বুকে যে শক্তিশেল হানিয়া যায়,—সে শক্তিশেলের বেদনা কোন বিশল্যকরণীতেই উপশম হয় না। যৌবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে নারীর জীবন-পাত্রে যে স্নেহ-রসধারা উচ্ছল হয়ে উঠে, তাহাই মাতৃত্বের উপাদান, নারী সন্তান চায় শুধু ওই স্নেহরস-ধারায় তাহাকে সিঞ্চিত করিতে; ভ্রূণ সৃষ্টি করে অদৃশ্য হস্ত, সে ভ্রূণকে আপন স্তন্যে, স্নেহ-সুন্দর হস্তে, দিন দিন সুন্দরতর, পরিপুষ্ট করিয়া পূর্ণাঙ্গ সক্ষম মানবে সৃষ্টি করে নারী। সেইখানেই তার প্রত্যক্ষ সৃষ্টির আনন্দ।

গৌরীকে পাইয়া সেই আনন্দে গিরি আপন ব্যর্থতার বেদনা অনেকটা ভুলিয়াছিল, হয়ত সবটাই ভুলিতে পারিত—কিন্তু মাঝে মাঝে হরিলাল আসিয়া যখন কন্যার উপর দাবী জানাইয়া যাইত, তখনই গৌরী যে আপনার নয়—এই বেদনায় আপনার ব্যর্থতার ব্যথা তাহার মনে পড়িয়া যাইত।

ইদানীং হরিলালের সেই দাবীটা কিছু প্রবল ও ঘন ঘন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে, খাকৃতীর বাজার, পেটের ভাত জোটে না—গাঁজা জোটে কেমন করিয়া? কাজেই সে মেয়ের দাবীতে শ্রীমন্তের ঘরে ভাতের ব্যবস্থাটা করিয়া লইতে চাহিল। এখানে ওখানে যায়, ভগবান যেখানে মাপেন সেইখানেই খায়, কিন্তু গ্রামে ফিরিলেই শ্রীমন্তের বাড়ীতে ঢুকিয়াই হাঁকে, "গৌরী তোর মাসীকে—না—মা কি বলিস, তুই, বল, যে আমি খাব।"

একদিন, দুই দিন, চার দিন, শেষ পাঁচ দিনের একদিন গিরির আর সহ্য হইল না;—সেদিন সে ঘোমটার ভিতর হইতেই গর্জ্জন করিয়া উঠিল, কিন্তু সে গর্জ্জন হয়ত হরিলালের কানে গেল না, বা গেলেও সে তা আমলে আনিল না;—স্ত্রীলোকের কথা আবার ধরে!

গিরির আসল বিরক্তি কিন্তু ভাতের জন্য নয়, হরিলাল যে আসিয়া গৌরীর উপর একটা ভাবে ভঙ্গীতে কথার সুরে পিতৃত্বের দাবী জানায় তাহাতেই। সেটা বোঝা গেল যখন গৌরী শ্রীমন্তের নিকট হইতে ভিতরে ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়া কহিল—"মাগো, সেই মাতাল জামাইটা এসেছে, বিদেয় কর, বিদেয় কর, ভাত দিয়ে বিদেয় কর মা, বিদেয় কর,—ভাত নইলে ও যাবে না— ।"

তখন গিরির অধরে হাসি দেখা দিল. সে বরং গৌরীকে একটু পরখ করিয়া লইতে কহিল—"সে কিলো—ওই কি বলে— ? ও যে তোর বাবা হয়—।"

গৌরী মুখ বাঁকাইয়া কহিল—"হ্যাঁ—হয়। ওকে কক্ষনো আমি বাবা বলবো না।"

গিরির আর আক্ষেপ থাকে না, বরং করুণাই হয় একটু হরিলালের উপর, আহা, দুনিয়ায় আপনার বলিতে ত কেহ নাই ঐ লোকটীর—। সে দুই থালা ভাত বাড়িয়া শিকল বাজাইয়া শ্রীমন্তকে ইঙ্গিত করে।

দু'খানি থালায় আহার্য্য সাজান, কুটুম্বের থালাতেই পরিচর্য্যা বেশী।

রাত্রে ঘুমন্ত গৌরীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্রীমন্তকে গিরি কহিল,—"দেখ. আপন জন তোমার, তোমার একটু খোঁজ খবর করা উচিত।"

শ্রীমন্ত কথা না বুঝিয়া স্ত্রীর মুখপানে চাহিল।

গিরি কথা ভাঙ্গিয়া কহিল—"তোমার ভগ্নীপোতের কথা বলছি,—মানুষটা কি হয়ে গেল! শুধু যত্ন আত্তির অভাবে, যদি ঠাকুরঝি বেঁচে থাকত, তবে কি এমনি হত ?"

শ্রীমন্ত এবারও স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিল, গিরির সহসা এ পরিবর্ত্তনের কারণ সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

স্বামীর নীরবতায় ঠিক ওই কথাটাই গিরিরও স্মরণ হইল, সে বুঝিল সহসা হরিলালের জন্য এতটা ওকালতী তাহার পক্ষে নিতান্ত অশোভন হইয়াছে। তাই কথাটা সে ঘুরাইয়া কহিল—"আপনার জন বলেই বলছি, হাজার হ'লেও গৌরীর বাপ, গৌরীই ত ধর আমাদের সব।"

একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শ্রীমন্ত কহিল—"কাজেই, যার নিজের নাই, তার—"

কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না, ক্ষীণ-রশ্মি প্রদীপটীর ম্লান আলোকেই গিরির মুখ দেখিয়া সে কথাটা শেষ করিতে পারিল না। কিন্তু যে কথাটা মনের মধ্যে ফেরে সেটা চাপিয়া রাখিতে পারে মানুষ কতক্ষণ? অল্প একটু ক্ষণ উভয়েই নীরব, সহসা আবার শ্রীমন্ত কহিল—"জান, একটা কথা আজও আমি ভুলতে পারি নি, যেদিন আমি পাঠশাল ছাড়ি, সেইদিন পাঠশাল থেকে এসে বই দপ্তর দিয়ে ছিলাম গৌরীকে, গৌরীর ভারী লোভ ছিল বই শেলেটের ওপর ; তা মা বল্লে, 'রেখে দে, মেয়েতে বই দপ্তর নিয়ে কি করবে, তোর ছেলে হ'য়ে পড়বে।' সে বই শেলেট আজও তোলা আছে, ওই বেতের ঝাঁপিতে।"

গিরি আর শুনিতেও পারে না, কোন উত্তরও দিতে পারে না। সে নিস্তব্ধ হইয়া শুইয়া থাকে, উদ্গত অশ্রু গোপন করিতে চোখ মুদিয়া থাকিতে হয়।

গিরির এ বাধার নীরবতায় শ্রীমন্ত মনে করে গিরি ঘুমাইল বুঝি, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেও পাশ ফিরিয়া শোয়। পরদিন শ্রীমন্ত মাঠ হইতে ফিরিয়া বাহির হইতেই শোনে গৌরীর উচ্চ কণ্ঠে বাড়ীখানা মুখর হইয়া উঠিয়াছে, অবোধ্য একঘেয়ে অবিশ্রান্ত ভাবে গৌরী কি বলিয়া চলিয়াছে, সে বাড়ী ঢুকিতে ঢুকিতেই কহিল—"কি গো, গৌরী মা—?

গৌরী ব্যতিব্যস্ত ভাবে বাধা দিয়া কহিল—"চুপ কর, পড়ছি আমি, এই দেখ বই, এই দেখ শেলেট।"

সেই বই, সেই শেলেট, ছেঁড়া মলাটে তাহারই বাঁকা হাতে নাম লেখা, সেই শেলেটের কোণগুলি সে-আমলের সেই বুড়া রাম কামারের হাতের তার দিয়া বাঁধা। দুটি পয়সা সে লইয়াছিল।

শ্রীমন্ত নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া ওই বই-শেলেটগুলির পানে চাহিয়া থাকে।

সহসা পিছনে কাহার স্পর্শে ফিরিয়া দেখে—গিরি পিছনে দাঁড়াইয়া, কিন্তু এ গিরি ত সে গিরি নয়, এর দৃষ্টিতে ভিক্ষার ভাষা, ভঙ্গীতে ভিক্ষার ভাব। শ্রীমন্তেরও ব্যথা লাগে, স্নেহাস্পদের কাতরতা তাহার সহ্য হয় না। সে আদর করিয়া কহিল—"কি ?"

গিরি কহিল—"কিছু ব'লো না !"

—"বলবার মতো ত কিছু করনি তুমি গিরি।"

—"বই শেলেট আমি দিয়েছি।"

—"বেশ করেছ, তাতে কি হয়েছে ?"

—"দেখ ছেলেকে কিছুতে বঞ্চিত করতে নাই, তুমি দিয়ে কেড়ে নিয়েছিলে, তাতে ত ওর মনে দুঃখ হয়েছিল, দীর্ঘ-নিশ্বেস পড়েছিল, হয় ত তাতেই—।"

গিরির কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া পড়ে, চোখ সজল হইয়া আসে। শ্রীমন্ত অতি আদরে তাহার হাত ধরিয়া কহে—"ছিঃ— কেঁদনা, তোমার কোন্ কাজে আমি না করি বল ?"

গিরি একটু নীরব থাকিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া কহে—"তুমি যা ক'রে চেয়ে দেখছিলে বই শেলেটের পানে।"

শ্রীমন্ত হা হা করিয়া হাসিয়া কহে—"দেখলাম কি জান, বইএর মলাটে নিজের হাতের লেখা, সেই পাঠশাল মনে পড়ছিল—"

এবার গিরি কৌতুক করিয়া কহে—"আর গুরুমশায়ের মার—"

আবার হাসিয়া উঠে। গৌরী আপন মনেই নিবিষ্ট চিত্তে পড়িয়া যায়—"ক, খ, ল, ব, মা—বা—বা—গরু, গ, চ, ট, প।"

(ক্রমশঃ)

পরাভব

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

এতটা বাড়াবাড়ি সুষমার ভালো লাগে না এবং ভিতরে ধুঁয়াইতে ধুঁয়াইতে একদিন তার মনের গোপন ক্ষোভ অশোভন ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেইদিন হইতেই গল্পের সুরু।

রমেশ ড্রেসিং-টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া বুরুশ দিয়া চুল আঁচড়াইতেছিল। সুষমার মুখ এই কয়েক মিনিটের মধ্যে কিরূপ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে সে লক্ষ্য করে নাই। লক্ষ্য করিলেও সে বিশেষ কিছু বুঝিত এমন নয়। মানুষের মুখকে মনের দর্পণ হিসাবে চিনিবার ও জানিবার শিক্ষা তার কখনও হয় নাই।

সুষমা ক্ষুব্ধ অভিমানাহত স্বরে বলিল, "তাহ'লে আজ আমার যাওয়া হবে না?"

রমেশ চুল বুরুশ করা শেষ করিয়া জামার বোতাম লাগাইতে লাগাইতে বলিল, "কি ক'রে আর হয়! পিসিমা যে তুদিন থেকে' যেতে বল্লে!" কিন্তু তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই সুষমা যে জবাব দিল তাহার আকস্মিক তীক্ষ্নতায় সে অবাক হইয়া গেল।

সুষমা তিক্ত কণ্ঠে বলিল, "পিসিমা কি ব'লেছে তা ত' আমি জানতে চাইনি। আমি তোমার মত জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।"

সুষমাকে এত বিচলিত হইতে রমেশ কখন দেখে নাই। কিন্তু বিচলিত হইবার কোন কারণই খুঁজিয়া না পাইয়া সে বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার মত! আমি কি তোমায় যেতে বারণ করেছিলাম নাকি?"

সুষমা একটু আশান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাহ'লে?"

কিন্তু রমেশের উত্তরে তাহার মুখ আবার অন্ধকার হইয়া গেল,—রমেশ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "পিসিমা যেতে বারণ করবে আমি কি জানতুম!"

এবার সুষমার অধৈর্য্য আর অস্ফুট রহিল না।

ড্রেসিং টেবিলের কাছে আসিয়া সজোরে তাহার উপর একটা চাপড় মারিয়া সে বলিল, "পিসিমা আর পিসিমা! এ বাড়ীর কর্ত্তা তুমি না তোমার পিসী?"

এমন অদ্ভুত প্রশ্ন রমেশ কখন শোনে নাই। সে অবাক হইয়া বলিল, "বাঃ আমি ত' কর্ত্তা!"

"তাহ'লে পিসিমার কথায় আমার ওঠবোস ক'রতে হবে কেন বলতে পার।"

রমেশ এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—"বাঃ পিসিমা যে—"

সুষমা কিন্তু কথাটা শেষ করিতে দিল না, হাত নাড়িয়া মুখ ঝামটা দিয়া বলিল, "জানি গো জানি, তুমি যা ব'লবে তা জানি। পিসিমা তোমায় এতটুকু বেলা থেকে মানুষ করেছে, তোমার মা তোমায় পিসিমার হাতে মরবার সময় সঁপে দিয়ে গেছল, পিসিমা না থাকলে তুমি মানুষ হ'তে না—ওসব কথা শুনে শুনে কাণ প'চে গেছে। তোমার পিসিমা খুব ভালো লোক জানলুম কিন্তু তুমি ত' আর কচি খোকাটী নেই যে পিসিমার আঁচল ধ'রে ছাড়া চ'লতে পার না। তোমার নিজের ভাববার বোঝবার বয়স হ'য়েছে!"

রমেশ এবার রাগিয়া গিয়া বলিল, "বেশ যা তা ব'লছ ত'! আমি এখনো পিসিমার আঁচল ধ'রে চলি? আমি নিজে ভাবতে বুঝতে পারি না! এই যে সেদিন নতুন আলমারিটা কিনলুম পিসিমাকে কি সে কথা জিজ্ঞেস করতে গেছলুম!"

সুষমা হতাশ হইয়া বলিল, "না করাটা অন্যায় হ'য়েছে, কেমন?"

রমেশ তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইয়া বলিল—"অন্যায়টা আর কিসের? পিসিমা ত' আর বকে নি!"

ইহার পর আর কিছু বলিতে যাওয়া বৃথা; তবু সুষমা শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, "আমি আজ তাহ'লে যাচ্ছি, বুঝেছ?"

রমেশ হঠাৎ যেন অন্ধকারে একটা পথ খুঁজিয়া পাইয়া বলিল, "দেখ, পিসিমাকে আর একবার ব'লে দেখলে হয় না! আচ্ছা দাঁড়াও আমি ব'লে আসি!"

সুষমা হতাশ ভাবে খানিক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে রমেশকে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া তীক্ষ্ন স্বরে বলিল, "থাক্, যেতে হবে না তোমায়। আমি যেতে চাই না।"

রমেশের যাইবার উৎসাহ বিশেষ ছিল বলিয়া মনে হয় না। সুষমার কথায় খুশী হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে বলিল, "সেই ভালো। দুদিন বাদে গেলে আর কি ক্ষতি বল।"

ক্ষতি কিন্তু একটা হয়। এই ছোট পরিবারটির নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তির পক্ষে কোন উপকরণেরই অভাব ছিল না; তবু তাহার শান্ত জীবন-যাত্রার তলে তলে অশান্তির বিষ ধীরে ধীরে জমিয়া উঠে।

সুষমা খারাপ মেয়ে নয়, অকারণ কলহ তাহার ভালো লাগে না, সংসারে প্রভুত্ব করিবার এমন কিছু অস্বাভাবিক লোভও তাহার নাই কিন্তু তবু যে-সংসারে তাহার একলা গৃহিনীপণা করিবার কথা সেখানে স্বামীর এই দূর সম্পর্কের একজন আত্মীয়ার অবাধ প্রভুত্ব তাহার ভালো লাগে না। তাহার স্বামী এতটা বাড়াবাড়ি না করিলে সে পিসিমাকে লইয়া মানাইয়া চলিতে হয়ত পারিত, কারণ পিসিমার আর যাই থাক কর্ত্তৃত্বের ভিতর কোথাও গর্ব্ব বা কঠোরতা নাই। কিন্তু স্বামী যে এখনও সব কাজে একেবারে ছেলে মানুষের মত পিসিমার মুখ চাহিয়া থাকিবে ইহা তাহার অসহ্য। স্বামীকে সে নানাভাবে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করিতে এই তিন বছর ধরিয়া চাহিয়াছে কিন্তু রমেশের চারিধারে পিসিমার প্রভাবের প্রাচীর একেবারে দুর্ভেদ্য।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এ বাড়ীতে বধূরূপে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন সে আসিয়াছিল তখন এই পিসিমাই তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন সব চেয়ে বেশী। বিবাহ তাহার নিতান্ত ছোট বেলায় হয় নাই, স্বামী, ঘর-সংসার ইত্যাদির অর্থ তখন সে ভালো করিয়াই বুঝিতে শিখিয়াছে। নূতন জীবনে প্রবেশ করিবার আনন্দ-কৌতূহলের সঙ্গে অপরিচিত সংসার সম্বন্ধে আশঙ্কাও তাহার কম ছিল না। কিন্তু এ বাড়ীতে আসিয়া পিসিমার কর্ত্তৃত্বের নিঃশব্দ শৃঙ্খলায় তাহার সে আশঙ্কা আর কোনদিন মাথা তুলিতে পারে নাই। ধীরে ধীরে নিজের অগোচরে কেমন করিয়া যে পিসিমা তাহাকে নূতন সংসারে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছেন তাহা সে জানিতেও পারে নাই। জানিতে পারে নাই বলিয়াই পিসিমার প্রতি তাহার গোপন কৃতজ্ঞতার আর সেদিন অন্ত ছিল না। সেই কৃতজ্ঞতাই কেমন করিয়া এমন অসহিষ্ণুতায় পর্য্যবসিত হইল তাহার ইতিহাস বড় অদ্ভুত।

পিসিমা যে তাহার স্বামীর আপন পিসিমা নয় অতি দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়া মাত্র একথা তখনও সে জানিত না। একথা জানিবার সঙ্গে সঙ্গেও যে তাহার মনে কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু মানুষের মন বড় জটিল দুর্ব্বোধ ব্যাপার; এই সামান্য খবরটুকুই তাহার মনের গোপন কোণে কোথাও নিঃশব্দে একটি অস্বস্তি ধীরে ধীরে যে সৃষ্টি করিয়া তোলে নাই একথা কে বলিতে পারে!

সে অস্বস্তিকে খুঁচাইয়া তুলিবার মত বাইরের লোকেরও অভাব ছিল না। বামুন-ঠাকরুণ এবাড়ির অনেক কালের পুরান লোক। পিসিমাকে বিধবা অবস্থায় অসহায় আশ্রিত-রূপে এ বাড়িতে প্রথম প্রবেশ করিতেও তিনি দেখিয়াছেন; সুতরাং রমেশের পিতা ও মাতার মৃত্যুর পর এ বাড়িতে পিসিমার কর্ত্তৃত্বটা তাঁহার কাছেই সব চেয়ে খারাপ লাগে। সুযোগ ও সময় পাইলেই বামুন-ঠাকরুণ প্রথম প্রথম সুষমার কাছে আসিয়া বলিতেন—

"একলা ঘরের একলা ঘরুণী, কিসের তোমার অভাব মা! তাইনা তোমার অযত্ন দেখে চোখে জল আসে।"

অযত্নটা তাহার কিসের বুঝিতে না পারিয়া ও বামুন-ঠাকরুণের চোখে কিছু মাত্র জল দেখিতে না পাইয়া সুষমা অবাক হইয়া চুপ করিয়া থাকিত।

হলুদ-মাখা আঁচল দিয়া শুকনো চোখ দুইটি বার কয়েক মার্জ্জনা করিয়া বামুন-ঠাকরুণ হঠাৎ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন, "থাকত তোমার শাশুড়ী আজ বেঁচে, এমন হাল তোমার কে করত তাই দেখতাম।"

তাহার পর হঠাৎ সুষমার খোঁপায় হাত দিয়া বামুন-ঠাকরুণ বলিতেন, "আজ বিশ বছর এ বাড়ির নিমক খেয়ে মানুষ; চোখে দেখে আমরা ত' আর তা ব'লে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারি না! দাও মা দাও, খোঁপাটা ভালো ক'রে বেঁধে দিই।"

বামুন-ঠাকরুণের খোঁপাবাধার ধরণ যেমনই হোক সুষমাকে বাধ্য হইয়াই সে অত্যাচার সহ্য করিতে হইত।

বামুন-ঠাকরুণ খোঁপা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিতেন, "তোমার শাশুড়ী ত' আর মাটির মানুষ ছিল না, সে ছিল সগ্‌গের দেবী। তার দয়াধম্মের কথা পাঁচ মুখে ব'ল্লে ফুরোয় না। কি ব'লব মা তোমায়! বামুনদি ব'লতে তোমার শাশুড়ি একেবারে অজ্ঞান। 'বামুনদি এটা খা, বামুনদি এটা নে।'—সে ত' আর পর ভাবত না।"

তাহার পর আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বামুন-ঠাকরুণ সুরু করিতেন, "আর দেখলেত' মা, কালকে তুচ্ছু হলুদ বাঁটাটা নিয়ে কি মুখনাড়াটা দিলে তোমার পিসিমা! তুমিই বলত' মা, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এ বাড়ির রান্না রেঁধে চুল পেকে গেল, আমি বাসি হলুদ বাঁটা দিতে পারি তরকারিতে? হ্যাঁগা, রমেশের জন্য যত দরদ কি তোমার পিসিমার! রমেশের বাসি বাটনা সয় না, সে আর আমি জানিনে।"

সুষমা চুপ করিয়াই থাকিত। বামুন-ঠাকরুণ সহসা গলা নামাইয়া বলিতেন, "মানুষের সঙ্গে আচার ব্যাভার কি ক'রতে

হয়, জানবেই বা কোথা থেকে বল? ব'ললে আজ পেত্যয় যাবে না মা, এ বাড়িতে একদিন ঝিগিরি ক'রত বই ত নয়।"

বামুন ঠাকরুণ তাহার পর অত্যন্ত কুটীলভাবে হাসিয়া বলিতেন, "কথায় বলে না মা, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ"—এও হ'ল তাই।"

সুষমার কথাগুলো ঠিক ভালো লাগিত না। কিন্তু মানুষের মন দুর্ব্বল, তাহার কৌতুহলও সে চাপিয়া রাখিতে পারিল না।

সামনে আসিয়া তাহার সিঁথিতে ও কপালে সিঁন্দুর দিতে দিতে বামুন ঠাকরুণ তাহার মুখ দেখিয়া সেটুকু অনুমান করিয়া বলিতেন—"তাইত বলি মা শক্ত হও শক্ত হও। এ তোমার ঘর তোমার সংসার, তোমাকেই ত' আজ না হয় দুদিন পরে বুঝে শুঝে নিতে হ'বে মা।"

বামুন-ঠাকরুণ আর একটি গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসিয়া তাহার কাজ সমাপ্ত করিতেন।

কিন্তু বামুন-ঠাকরুণের মন্ত্র ও মন্ত্রণা যত ধারালোই হোক্ সুষমার মনে শুধু তাহাতেই ভাঙ্গন ধরিয়াছে বলিলে সত্য কথা বলা হইবে না,—বুঝি সুষমার প্রতি একটু অবিচারই করা হইবে।

এই পরিবারের প্রতি পিসিমার মমতা ও স্নেহের পরিমাণ যে কত বেশী তাহা সুষমা একেবারে বোঝে না এমন নয়। তাহার মূল্যও সে দিতে নারাজ নহে। ছোটখাট নানা ব্যাপারে পিসিমার যে পরিচয় সে পাইয়াছে তাহাতে সহজে তাহার উপর বিরূপ হইয়া ওঠা তাহার পক্ষে সহজ নয়।

এই সেদিন যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার রেশ এখনও তাহার মন হইতে মিলাইয়া যায় নাই।

পিসিমা হঠাৎ একদিন বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁরে রমেশ, ওবাড়ির বড়গিন্নি, চক্কোবত্তির মা সবাই গঙ্গা-সাগর যাচ্ছে—যাব তাদের সঙ্গে?"

রমেশ বিছানায় শুইয়া একটা কি বই পড়িতেছিল, বইটা মুড়িয়া রাখিয়া বলিল—"গঙ্গা-সাগর যাবে না আর কিছু! সেখানে মানুষ যায়?"

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁরে মানুষ যায় না ত' লোক যাচ্ছে কোথায়!"

"যাচ্ছে ত' কিন্তু ফিরছে কটা সে খবর রাখ—সেখানে বাঘের মুখ থেকে যদি বা বাঁচে, কলেরা থেকে আর রেহাই নেই।"

"না রে না, এখন আর সেদিন নেই! আর যদি নাই ফিরি তাতেই বা কি? বুড়ো হ'য়েছি না হয় সাগরে গিয়েই ম'রব।"

রমেশ উঠিয়া পড়িয়া, বইটা বিছানার উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া বিরক্তির স্বরে বলিয়াছিল—"বেশ বেশ, আমি জানিনা—যেখানে যেতে ইচ্ছে হয় যাও।"

পিসিমা সুষমার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"ও আবার আমায় কোথাও যেতে দেবে! আজ বিশ বছর ন'ড়তে পেরেছি? এখান থেকে এক পা বাড়ালে কালীঘাট, তা আমার কোনদিন যাবার জো ছিল না। 'ও পিসিমা তুমি গাড়ী চাপা প'ড়ে যাবে।' ব'লে কেঁদেই ভাসিয়ে দিত।"

তাহার পর রমেশকে আর একবার অনুরোধ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"হ্যাঁরে এখন ত' আর ছোটটি নেই—ঘর সংসার দেখতে শুনতে শেখ্। আমি ত' আর চিরকাল আগলে থাকব না, বুড়ো হ'য়েছি এখন একটু তীর্থ ধর্ম্ম না ক'রলে চলে।"

"তা করনা তীর্থধর্ম্ম, কে তোমায় বারণ করেছে!" বলিয়া রাগ করিয়া রমেশ বাহির হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু খানিক বাদেই ফিরিয়া আসিয়া উৎসাহিত হইয়া বলিয়াছিল, "আচ্ছা পিসিমা, আমিও ত' তোমার সঙ্গে যেতে পারি।"

পিসিমা হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"দূর পাগল, তুই সেখানে কোথায় যাবি?"

"বেশ, তুমি যেতে পার আর আমি পারি নে!"

"তোর কি এখন তীর্থ ক'রবার বয়স হ'য়েছে। আর সেখানকার কষ্ট তোর সহ্য হবে কেন!"

রমেশ উল্লসিত হইয়া বলিয়াছিল, "তাহ'লে সেইখানে কষ্ট আছে স্বীকার ক'রছ ত? না বাবু তোমার যাওয়া হবে না।"

কথাটা সেদিন চাপা পড়িয়াছিল কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীর অনুরোধে পিসিমা জেদ করিয়া রমেশকে শেষ পর্য্যন্ত এক রকম জোর করিয়া তাঁহাকে যাইতে দিতে রাজী করিয়াছিলেন।

তাহার পর যাবার দিন যতই আসন্ন হইয়া আসে রমেশের আপত্তি ততই নানাভাবে প্রকাশ পায়।

খাইতে বসিয়া পিসিমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া সে বলে—"তোমায় অম্বল দিতে বারণ করেছি না বামুন ঠাকরুণ। রোজ বিকেলে ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছে, অম্বল খেয়ে মরি আর কি?"

পিসিমা উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "জ্বর হ'চ্ছে কিরে? বলিস্‌নি ত আমাকে।"

রমেশ পরম ঔদাসীন্যের ভাণ করিয়া বলে—"ব'লে আর কি হবে! আমার খোঁজ রাখবার ত' কারু দরকার নেই।"

পিসিমা মনে মনে হাসিয়া বলেন, "আচ্ছা আজ বিকেলে গা'টা দেখাস্ দিকি।"

"গা দেখে ত' সব হবে!" বলিয়া রমেশ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে।

বিকালে কিন্তু পিসিমার পীড়াপীড়িতে থার্ম্মোমিটার দিয়া রমেশ কোনমতেই জ্বর প্রমাণ করিতে না পারিয়া থার্ম্মোমিটার গুলার উপরই অকারণে চটিয়া যায়।

কোনো দিন বা একটা খবরের কাগজ হাতে লইয়া রমেশ একেবারে পিসিমার পূজার ঘরে গিয়া হাজির হয়।

"এত আর গল্পর কথা নয়, দস্তুরমত খবরের কাগজে লিখেছে।"

পিসিমা জপ বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"কি লিখেছে?"

"সমুদ্রে কাল একটা মস্ত বড় জাহাজ ডুবে গেছে, জানো?"

পিসিমা বলেন—"তাতে হ'য়েছে কি?"

"হবে আবার কি; কিছুই হয়নি! যত সব অখদ্দে ভাঙা ষ্টীমারগুলো ওরা গঙ্গাসাগরে পাঠায় ত'! একটু ঝড় উঠ্‌লেই হ'ল।"

পিসিমা এবার হাসিয়া ফেলেন—"শীতকালে আবার ঝড় কোথায় রে পাগলা! আর তোর ভয় নেইরে ভয় নেই। আমার কপালে অমন সুখের মৃত্যু হবে না।"

"না হয় না হবে! আমায় তাতে কি আসে যায়। খবরের কাগজে প'ড়লাম তাই জানাচ্ছি।" বলিয়া রমেশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া যায়।

ওদিকে পিসিমারও ব্যস্ততার আর শেষ নাই। পাখী পড়াইবার মত করিয়া সুষমাকে তিনি সংসারের সমস্ত কাজ দিনে দশ বার করিয়া বুঝাইয়া দেন।

"আর বড় দেরাজটা খুলে গরম কাপড়চোপড়গুলো হপ্তায় হপ্তায় রোদে দিও বৌমা।"

"ও গোয়ালাকে বিশ্বাস নেই বৌমা; দুধ দোওয়াবার সময় না হয় তুমি নিজে একবার দাঁড়িয়ো। রমেশকে দেখতে বলা বেব্‌থা, ওর গা থেকে জামাটা কেউ খুলে নিলেও ও টের পায় না।"

"তোমার ও কাশিটা ত' ভালো নয় বৌমা, নিয়মমত ওষুধটা খেয়ো, আর গরম জলে চান ক'রতে ভুলো না। আমি নেই তার ওপর তুমি অসুখ বিসুখ বাধালে সংসার একেবারে ছারখার হবে। রমেশের এতটুকু যুগ্যতা নেই।"

"রাত জেগে ওকে কিছুতেই প'ড়তে দিওনা বৌমা। এগারটার পর আর কোন কথা শুনবে না। আলো নিভিয়ে দিও।"

"আর ও মাতুলির নেমকানুনগুলো মনে আছেত? দেখো যেন দোষ না লাগে বৌমা।"

"ধোপার খাতা এই আলমারীতে রইল বৌমা। আর মুদি এলে বোলো আমি এসে তার হিসেব মিটিয়ে দেব। নইলে তোমাদের ও নির্ঘাৎ ফাঁকি দেবে।"

"শীতকালে ভিজে চুলে থেকোনা বৌমা। তোমার শরীর তেমন শক্ত নয়।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এত করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত পিসিমার গঙ্গাসাগর যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। বিছানাপত্র সমস্ত বাঁধা। পিসিমার যাবার আয়োজন সম্পূর্ণ, এমন সময় সত্য সত্যই রমেশ কেমন করিয়া একটু সর্দ্দিজ্বর বাধাইয়া বসে। সর্দ্দিজ্বরটাকে কল্পনায় বাড়াইয়া নিউমোনিয়ার সূচনা বলিয়া প্রচার করিতে তাহার দেরী হয় না।

বিছানায় শুইয়া নিজের মনেই সে গজ্‌ গজ্‌ করে—"আমি ম'রছি নিউমোনিয়ায় আর এখন যত পুণ্য করবার পালা পড়ে গেল। তা পড়ে পড়ুক, আমি সে ছেলে নই বাবা, মরে গেলেও বারণ ক'রব না।"

পিসিমা ব্যাপারটা একবারে বোঝেন না এমন নয়, তবু সুষমাকে আড়ালে ডাকিয়া তিনি বলেন—"বিছানাপত্র খুলে ফেলতে ব'লে দাও বৌমা।"

সুষমার বিস্মিত দৃষ্টির উত্তরে তিনি একটু হাসিয়া বলেন—"ওর বয়সই শুধু বেড়েছে বৌমা, নইলে যেমনটি ছিল তেমনি ছেলে মানুষই আছে।"

এই পিসিমার বিরুদ্ধে সুষমার মনে স্পষ্ট কোন অভিযোগ গড়িয়া উঠিতে সহজে পারে না। যেখানে তাহার বিক্ষোভ সেখানে নিজের মনকে সামুনাসাম্‌নি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার সাহসও তাহার নাই। কারণ আসলে ব্যাপারটায় একটু নীচতার গন্ধই আছে। নিজের অজ্ঞাতে প্রত্যেক নারী তাহার স্বামীর উপর যে অখণ্ড অধিকার চায় সেই অধিকার সুষমার এক দিক দিয়া একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়াই তাহার এই অসহিষ্ণুতা। তাহার স্বামীর উপর পিসিমার এই প্রভাব-বিস্তারের মূলে কোন স্বার্থ, কোন অভিসন্ধি নাই বলিয়াই বুঝি তাহার আরো খারাপ লাগে। পিসিমা মন্দ লোক হইলে সে বুঝি এতটা আহত হইত না। নিজের বিক্ষোভকে সমর্থন করিবার মত একটা ভালো যুক্তি তাহার মিলিত। স্বামীর ব্যক্তিত্বের অভাবই তাহার সমস্ত পীড়ার একমাত্র কারণ, এই বলিয়া নিজেকে এত করিয়া তাহার বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইত না।

পিসিমার উপর স্বামীর অন্ধ নির্ভরতার দৃষ্টান্তের অবশ্য অভাব নাই। প্রত্যেক ঘটনায় ইহার পরিচয় পাইয়া সুষমা ভিতরে ভিতরে জ্বলিতে থাকে এবং ক্রমশঃ ভিতরের দাহ তাহার বাহিরেও কেমন করিয়া যে প্রকাশ পায় তাহা আগেই দেখা গিয়াছে।

ইহার পরও ছোট খাট নানা ব্যাপারে সুষমা পিসিমার কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে একেবারে বিদ্রোহ না করিলেও অসন্তোষ একেবারে গোপন রাখে না।

কয়েক দিন ধরিয়া রমেশের বড় শালা এ বাড়িতে আসা যাওয়া করিতেছে। রমেশকে কখনও কখনও সে ডাকিয়া লইয়া যায়।

রমেশ একদিন সুষমাকে ডাকিয়া বলিল—"তোমার দাদা কি বলে জান ?"

সুষমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলে ?"

"বলে টাকাগুলো মিছিমিছি ব্যাঙ্কে বসিয়ে না রেখে একটা ইট্‌খোলা ক'রতে—অনেক নাকি লাভ !"

সুষমা বলিল, "তা মন্দ কথা কি ? দাদা আর বছর ত' সত্যিই লাভ ক'রেছে

"মন্দ কথা কে ব'লছে ! তা বলে আমি ইট্‌খোলা ক'রতে পারি নাকি ?"

"কেন পার না ?" বলিয়া সুষমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। রমেশ একটু হাসিয়া বলিল—"পিসিমা ক'রতে দিলে ত' !"

সুষমা বিদ্রূপভরে ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, "তা না দিলে আর কি ক'রে ক'রবে—বল।"

রমেশ কিন্তু সে বিদ্রূপ বুঝিবার ধার দিয়াও গেল না, বলিল, "তাইত' ব'লছিলাম।"

কিন্তু রমেশের বড় শালার মন্ত্রণাশক্তির তারিফ করিতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত রমেশের মনও গলিল.

পিসিমা দুপুরে নিজের ঘরে বসিয়া চোখে চশমা দিয়া রামায়ণ পড়িতেছিলেন। রমেশ সেখানে গিয়া বসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া হঠাৎ বলিয়া বসিল,—"ইট্‌খোলায় আজকাল ভয়ানক লাভ হ'চ্ছে জান পিসিমা ?"

পিসিমা সে কথা জানিতেন না। কিন্তু এত বড় একটা সুসংবাদ শুনিয়াও তাঁহার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

রমেশ আবার বলিল, "শতকরা দেড় শ' এমন কি দু'শ' পর্য্যন্ত আর বছর লাভ হয়েছে !" এবং পিসিমা এ কথাটার তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই বলিয়া বসিল—"আমার বড় শালা কি ব'লছিল জান পিসিমা, দশ হাজার টাকা হ'লেই একটা ইট্‌খোলা আরম্ভ করা যায়—আর এক বছরেই মূলধন উঠে আসবে।"

পিসিমা চোখ হইতে চশমা খুলিয়া রমেশের দিকে একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"তাতে কি হ'য়েছে !"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রমেশ এবার মনের কথাটা বলিয়াই ফেলিল—"হাজার দশেক ফেলে দেখব পিসিমা ?"

পিসিমা গম্ভীর ভাবে শুধু 'না' বলিয়া আবার চোখে চশমা লাগাইলেন। অন্য সময় হইলে ইহার পরে রমেশ আর কথা কহিত না, কিন্তু তাহার বড় শালা তাহার মনে বেশ নেশা ধরাইয়া দিয়াছে। সে আরেকবার বলিল—"ব্যাঙ্কে কতই বা সুদ বল পিসিমা, আর এতে কিছু না হয় টাকায় টাকা লাভ।"

পিসিমা আবার বই নামাইয়া বলিলেন—"অত লাভে আমাদের দরকার নাই।" তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন—"কারবার ব্যবসা যারা ক'রতে পারে তাদের কাটাম আলাদা, তোর সে যুগ্যতা নেই। তোর দ্বারা হবে না।"

ঠিক এই রকম একটা সন্দেহ রমেশের নিজের মনেই ছিল। সেই জন্যই এই অযোগ্যতার ইঙ্গিতে সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তা'ছাড়া সুষমার বড় ভাই এতদিন মিছা-মিছি পরিশ্রম করে নাই।

রমেশ একটু অভিমানের স্বরে বলিল, "তোমার ওই এক কথা,—'যুগ্যতা নেই'। ওই ব'লে চিরটা কাল আমায় ঠুঁটো হয়ে বসে থাকতে হবে নাকি ! শুধু শুধু ব'সে ব'সে জমানো পয়সা খরচ ক'রব ?"

পিসিমা একটু হাসিয়া বলিলেন—"ভগবান যাকে যেমন ক'রে গড়েছেন তাকে তেমনি ভাবেই থাকতে হবে !—সেই ভালো।"

রমেশ কিন্তু একথায় আরো রাগিয়া বলিল, "তোমার ওই কথা ! ওই জন্যেই ত' আমার বড় শালা বলে যে বরাবর এমনি আওতায় রেখে রেখে তুমি আমার সকল কাজের বার ক'রে তুলেছ।"

পিসিমা এবারও হাসিলেন। তাহার পর রমেশের গায়ে সস্নেহে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"সে ভুল যদি ক'রেই থাকি তাহ'লে এখন হঠাৎ আওতা সরিয়ে নিলে ত' তোর অনিষ্টই হবে।"

"বেশ, তাহ'লে ইটখোলা করা হবে না ত ?" বলিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

পিসিমা বলিলেন—"নারে পাগলা, তুই এক পয়সার বাজার করতে পারিস্ না, ইটখোলা করা কি তোর সাধ্য !"

কিছুক্ষণ পরে রমেশ ঘরে ঢুকিতেই সুষমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি ব'ল্লেন পিসিমা !"

রমেশ মুখ ভার করিয়া বলিল, "আমি জানি, পিসিমা মত দেবেনা !"

"আমি আরো একটা কথা জানি" বলিয়া সুষমা বিদ্রূপের হাসি হাসিল।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল "কি ?"

"তোমার বেটা ছেলে হ'য়ে জন্মানো ভুল হ'য়েছে।" বলিয়া সুষমা ঘরের বাহির হইয়া গেল

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

পুস্তক-পরিচয়

প্রথমা—কবিতার বই। শ্রীপ্রমেন্দ্র মিত্র। গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং। ১১, কলেজ স্কোয়ার; কলিকাতা। দাম, দেড়টাকা। ছাপা, বাঁধাই সুন্দর।

'প্রথমা' প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কবিতাপুস্তক হইলেও সাময়িক পত্রের মারফৎ কবি হিসাবে তিনি ইতিপূর্ব্বে কাব্যানুরাগী পাঠকগণের কাছে কেবল পরিচিত নন, সমাদৃতও হইয়াছেন। এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবিতা-গুলি নিয়াই ইতিপূর্ব্বে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবি-প্রতিভা সম্পর্কে দুই একবার আলোচনাও হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সাহিত্য বিষয়ে যাঁহাদের স্মরণশক্তি দুর্ব্বল নয় তাঁহাদের মনে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যের একটি বিশিষ্ট স্থান বহু পূর্ব্ব হইতেই নির্ম্মিত হইয়া আছে। কেবল বিভিন্ন পত্রিকায় বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়িয়া যে-স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল, সম্প্রতি প্রকাশিত 'প্রথমা' তাহার পরিসর ও উচ্চতার সঠিক পরিমাপণে সাহায্য করিবে। পত্রিকায় প্রকাশিত যে কবিতাটি হয়তো এক সময়ে অভিনবত্বের আবেদন মাত্র নিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, আজ গ্রন্থের মধ্যে পাইয়া তাহার অন্য রূপ আবিষ্কৃত হইবে। এবং যে কবিতা হয়তো মাসিক পত্রিকায় পাঠকের এক সময়ে নিতান্ত নিরবলম্ব লাগিয়াছিল, পুস্তকে তাহার পশ্চাদ্‌পট আজ দৃষ্টিভূত হইবে। সুতরাং যাঁহাদের কাছে প্রেমেন্দ্র মিত্র অপরিচিত নন, তাঁহাদের নিকটও 'প্রথমা' কবির নূতন পরিচয়ই বহন করিয়া আনিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

পঁচিশটী কবিতায় 'প্রথমা' সম্পূর্ণ। বিষয়-বৈচিত্র্যে ইহাদের অধিকাংশই নিজেরা স্বতন্ত্র হইলেও একাধিক কবিতায় কবির যে সুর শুনিতে পাই, প্রথম কবিতাটি তাহারই প্রস্তাবনা।

"এ মাটির ঢেলা কবে কে ছুড়িল সূর্য্যের পানে ভাই
পৃথিবী যাহার নাম—"

এই সুরকে গদ্য করিয়া বলিতে গেলে বলা যায়, মনুষ্য-সভ্যতার এই সমগ্র অভিযান 'লক্ষ্যভ্রষ্ট'. এই লক্ষ্যভ্রষ্ট অভিযানের ফলস্বরূপ 'দুনিয়ার কিনারায়' 'হতভাগাদের বন্দরটি' একটা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার নানা কারণের একটি এই যে, আমরা কেবল একটি 'খেয়ালির খেলেনা।' সুতরাং বিদ্রোহ না করিয়া উপায় নাই, তাই 'জীবন-বিধাতা'কে 'প্রীতিহীন প্রণিপাত' ছাড়া আর কোন অর্ঘ্যও দিবার নাই। কিন্তু এই যে 'মাটির কোলের পরে' 'দেবতার জন্ম' হয়, এবং কিছুদিন পরে সেই দেবতাই 'কদাকার, লালসাজর্জ্জর' হইয়া 'বিদায় লইয়া যান',—ইহার আর একটি প্রধান কারণ 'আমার, তোমার—সর্ব্ব মানবের পাপ।' এবং এই জন্য 'বিধাতার নেত্রকোণে' 'অশ্রু জমে আর জমে।'—এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে 'বিশ্বজোড়া হাহাকারে' যাহার 'অভিনব স্তুতি' কবি রচনা করিয়াছেন, তাহারই অশ্রু প্লাবনের 'ভাঙ্গন-ধারায়', 'যত প্রাণ পুষ্টি বিনা মরে', সেজন্য 'যত গ্লানি মানবের হতেছে সঞ্চয়' তাহা 'মুছে যাবে কোন্ দিন।' সুতরাং আমরা বলিব, 'জীবন-বিধাতা'র বিরুদ্ধে কবির যে-বিদ্রোহ, সে-বিদ্রোহ তাঁহার সম্পূর্ণ অভিমানাত্মক। আমাদের মতের সমর্থক ভাব কাব্যের এখানে-ওখানে বহু পাওয়া যাইবে। যেমন,—

"যত কান্না ধরণীতে;
তার মাঝে তুমি কাঁদ এই শুধু জানি—
আর ধন্য আপনারে মানি।"—

কিন্তু একাধিক কবিতায় এই যে সুর আমরা শুনি, ইহাকে কবির মূল সুর বলিয়া ধরিয়া নিলে ভুল করা হইবে। এবং এই নিরাশার ও হতাশার সুর যদি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার মূল সুর হইত, তবে কবি হিসাবে তাঁহার স্থান খুব উচ্চে হইত না। 'প্রথমা'র কবি 'দুঃখবাদী' নন,—এই পরিচয়ই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশা, গ্লানি-পরাজয়, ব্যর্থতা-বেদনা করুণ হইয়া তাঁহাকে বাজিয়াছে, ইহার তিক্ততা ও ছলনা তিনি অনুভব করিয়াছেন, তাই মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়াছেন,—কিন্তু এই সমস্ত অতিক্রম করিয়া তিনি আশা ও ভরসার সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য 'রাত্রির প্রহরী'র কাছে 'নিযুত জীবন'এর হইয়া বলিয়াছেন,—

"—আলোকের আর্ত্ত স্বর, কাঁদে প্রতি তারকায়,
কাঁদে সারানিশি।
তারে মুক্তি দাও।"

মৃত্যুকে কবি স্বীকার করেন নাই,—

'মৃত্যুরে কে মনে রাখে?'
'মৃত্যু যায় মুছে।'

তিনি বলিতেছেন,—'রচ গান যৌবনের।'

এই সুর মাত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রাচীন সংস্কার হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে পাইয়া বসে নাই। ইহা তাঁহার স্বোপলব্ধ। প্রতিদিনের এই 'ব্যর্থ-ব্যথাতুর' জীবনকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই, কিন্তু তবু—

"এ বিস্বাদ জীবনের বিষপাত্রখানি
ওষ্ঠে তুলে ধরি
নিঃশেষিয়া যাব পান করি,—
শুধু তার সযতন অনুরাগ স্মরি
জীবন-শিয়রে বসি দোলা দেয় যে স্বপ্ন-সুন্দরী।'

সরস্বতীর তীরে বসিয়া পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা ইন্দ্রকে সোমরস পানের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে কাব্য পাঠে বুঝি পৃথিবীর দুঃখকষ্ট তাঁহাদের অজানা ছিল। তখন হইতে তিন হাজার বৎসর পরে 'ডেভিড' যে গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, দুঃখকষ্টের প্রথম স্পর্শ তিনি পাইয়াছেন; তাঁহার গানগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। সেই সময় হইতে আজ—এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে ধরণী রক্তে রক্তে পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কৃতঘ্নতা,

স্বার্থপরতার অক্ষৌহিণী বাহিনী মানুষকে বিপর্য্যস্ত, বিদীর্ণ করিয়াছে, আজিকার কোনও কবি ছন্দ দিয়া স্বপ্ন-সুন্দরীর জন্য অবিমিশ্র নৈবেদ্য সাজাইবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু স্বপ্ন হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইলে তাঁহার কাব্য লেখা ছাড়া অপরাপর লাভজনক কাজ অনেক জুটিত।

বর্ত্তমান জগতের বহুধা জটিলতা বর্ত্তমানের কবিকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। নিজেকে নিয়া তিনি যে কি মুস্কিলে পড়িয়াছেন, তাহার সীমা নাই।—যাহারা পৃথিবীকে বিশাল বলিয়া জানিয়াছে, নিজেকে তিনি তাহাদের 'দলের দলী' করিয়া বলিতেছেন—

"সুশীতল ধারা নদীটি বহুক্ মন্থরে তব তীরে
গৃহবলিভুক্ পারাবতগুলি কূজন করুক ঘিরে,
পালিত তরুর ছায়ে থাক্ ঢাকা তোমাদের গৃহখানি
স্তোত্র রচিও, যদি পার তব প্রিয়ার আঁখি বাখানি'
ছোট এই আশা সুখ
ঈর্ষ্যা করি না, ঘৃণা নহে ভাই, শুধু নহি উৎসুক—"

যাহাদের সহিত নিজের ভাগ্য তিনি মিলাইতে চাহিতেছেন, তাহাদের জীবনের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা 'ছোট এই আশা সুখ'ভরা জীবনের বাসনাই তাঁহার অধিকতর স্পষ্ট ও মর্ম্মস্পর্শী। মনে হয় কবির লোভও এইখানে বাঁধা আছে। থাকাই স্বাভাবিক। যে বলিষ্ঠ জীবনের কল্পনা তাঁহাকে এই আশা ও সুখ হইতে ছিনাইয়া নিতে চায়, তাহার কারণও অবশ্য বুঝি। ভিক্টোরিয়ান যুগের পরে সুন্দরের সাধনা, (worship of beauty) ত্যাগ করিয়া ইংরাজী সাহিত্যে যে কারণে শক্তির পূজা (worship of power) সূচিত হইয়াছিল এবং যাহার ফলে ঐ সাহিত্যে 'note of challenge' গড়িয়া উঠে,—আধুনিক বাংলা কাব্যের, সুতরাং প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যের সুরের ঝঙ্কারও ঠিক সেই একই কারণে মাঝে মাঝে উদ্ধত।

কিন্তু মূলতঃ প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবি-প্রতিভা 'চিরন্তন' কাব্য-উৎস হইতেই উৎসারিত। সেখানে সুন্দরের কাছে সমগ্র বিশ্ব আনন্দে একান্ত পরাভব মাগিয়া নেয়, 'ধূলি-ধূম্র-জটা-বিভূষিত-শির' 'নগরী'র উদ্দেশ্যে তিনি প্রার্থনা করেন—

'যন্ত্রের চক্রান্ত ভাঙি'
ভেদ করি ষড়যন্ত্র লৌহে আর লোভে
আসুক প্রভাতখানি,
—সৌম্য-শুচি কুমার সন্ন্যাসী
হে পতিতা তোমার আলয়ে।'

তাঁহার 'দেহের বীণাতে' 'সুরের প্রণতি' ঝঙ্কারিয়া ওঠে'—'সব অর্থ ডুবে যায় আনন্দের অতল সাগরে'—'আনন্দের ঝটিকায়' তাঁহার প্রাণ 'স্পন্দমান তারকার মতো কাঁপিয়া ওঠে।

চিরকাল ধরিয়া সব দেখে যে সূর্য্য উঠে, এ সেই সূর্য্যই। মেঘলা দিন বলিয়া দ্যুতিকে নিষ্প্রভ লাগে—। পুঞ্জীভূত মেঘ হইতে বর্ষা নামে—আবার ঈশান কোণে ইতস্ততঃ ঝটিকার মেঘ জমিয়া উঠে। মন তাই সিক্ত, অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, নিজের দুঃখে নয়, পৃথিবীর কোটি মানবের দুঃখ-স্মরণ করিয়া কবি 'পৃথিবীর ভাই বোন'এর নিকট হইতে বিদায় চান, শুধু 'নীল আকাশের গ্রহে' 'একটি প্রার্থনা' রাখিয়া যান।

"—পৃথিবী সুন্দর হয় যেন।"
"পৃথিবীর ভাই বোন মোর
এই বিলাপের গ্রহে, মোর কান্না রেখে যাই আজ,
একটি বাসনা আর।
পশ্চাতে আসিছে যারা
তারা যেন ধরণীর এ কলুষ দেখিতে না পায় ;
মোদের চোখের জলে শেষ হোক্ সব তাপগ্লানি
শেষ হোক্ মানব-আত্মার এই কাতর কাকুতি,
আমাদের বেদনায়।
তারা যেন সবে ভালবাসে।"

সুন্দর! অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটকীয় ভঙ্গিমা নাই, অসম ছন্দের আরোহ-অবরোহের উচ্ছ্বাস-কর্কশতা নাই—আন্তরিক দুঃখ-বেদনা-অনুভবের গভীরতা হইতে স্বতোৎসারিত সহজ একটি প্রার্থনা।—আমার মনে হয়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার কুঞ্চিকা এইখানে। নিজেকে তিনি ছোট করিয়া দেখেন নাই, পৃথিবী তাঁহার কাছে চক্রবাল ছাড়া আর কোনও প্রাচীরের অবরোধ আনে নাই। তাঁহার কামনা কোটি মানবের জন্য ; বিস্ময় তাঁহার এই কোটি মানবের অদৃশ্য ভবিতব্যের সেতুর শেষ ভাবিয়া—

"বিরাট সেতু সে এধারের সাথে ওধার জুড়েছে ভাই
সে সেতু হয়েছে পার ?
এধারে তাহার আলো জ্বালেনাক' ওধারে অন্ধকার :
—সেতু সে বৃহদাকার।"

একটি গ্রীক ভাস্করের গল্প পড়িয়াছিলাম। তাঁহার সকল মূর্ত্তির পাদ্র'খানি মানুষকে পাগল করিয়া তুলিত। কিন্তু মুখে চোখে বাহুতে, অপরাপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তাঁহার মূর্ত্তির আর কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না। অবশেষে, জানা গেল, তাঁহার 'স্ত্রী'র সৌন্দর্য্য ও কুশ্রীতাই তাঁহার সকল মূর্ত্তিকে ভর করিয়াছে। কল্পনা তাঁহার নিজের 'মডেল'এর পরিধি পার হইতে পারে নাই। শিল্পী হিসাবে ইহা অক্ষমতা। কল্পনার প্রসার যাঁহার আছে, তিনি কখনোই নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ রাখেন না। মনে হয়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্পনা অক্ষম শিল্পীর এই গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছে। বৃহৎকে তিনি জানিয়াছেন, বৃহত্তরকে তিনি অনুভব করিয়াছেন।

'ভাড়াটে কুঠি' ও 'পুরানো কাগজ'কে ব্যঞ্জনা দিয়া তিনি ইহাদিগকে অসামান্য করিয়াছেন। ছবি আঁকিবার ও সুর লাগাইবার কৌশলটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের আয়ত্ত।

'সার্সিতে জল সারেঙ্গ বাজে,
পথ আজি নির্জ্জন।'

একসঙ্গে স্বল্পবাহারের বাজার ও চিত্রকরের চিত্রালি মনে ভীড় করিয়া আসে।

তাঁহার দৃষ্টির দূরবীক্ষণের পরিচয় আমি দিয়াছি, অণুবীক্ষণ-শক্তিরও সে দৃষ্টিতে অভাব নাই। 'জীবন-মহাদেবের নৃত্য'এর তিনি বিমুগ্ধ দর্শক। ধরণীর তিনি সত্যকার অনুরাগী। সে অনুরাগে কৃত্রিমতা নাই। তাই বিশ্লেষণ-বোধ থাকা সত্ত্বেও কবিতা তাঁহার কদাচ কৃত্রিম হইয়াছে।

এই কৃত্রিমতার অভাবেই তাঁহাকে মাঝে মাঝে নিজকে নিজেই প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে। একটি বিশেষ মুহূর্ত্তের বিশেষ উপলব্ধি পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তের উপলব্ধিকে বরখাস্ত করিয়াছে। 'জীবন-বিধাতা' সম্বন্ধে নানাপ্রকার চিন্তার ইহাই একটি হেতু। সকল কবিকেই আমরা এ স্বাধীনতা দিতে বাধ্য। না দিলে তাঁহাদের বস্তঃস্ফূরণ বন্ধ হইবে। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে নিজের সমস্ত টাকা দিয়া যে মাইক্রোস্কোপ না কিনিলে শেলীর চলে নাই, এক ঘণ্টা পরে সেই মাইক্রোস্কোপ বাঁধা দিয়াই আবার টাকা ধার করিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। শেলীর কাব্যেও এমনই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বহু অঘটন ঘটিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া শেলীর কাব্য প্রলাপ-বাক্য নয়, কোন কৃতী কবিরই নয়।

প্রেম নিয়া 'প্রথমা'র শেষের দিকে যে চারিটি কবিতা আছে, সে কয়টি পড়িলেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রলাপোক্তি হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিবার সজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। চারিটি কবিতার প্রেমের চারিটি দিক তিনি দেখিয়াছেন—প্রেমের খেয়াল, অমিত্যতা, স্মৃতি আর স্বপ্ন। বাজে বকিবার বহু সুযোগ থাকাতেও একটিতেও তিনি 'টাল' হারান নাই। বাষ্প ছাড়াও প্রেমের কাব্য রচিত হইতে পারে, এ কবিতাগুলি তাহারই নমুনা বলিলে কবি নিজেকে অভিযুক্ত মনে করিবেন কিনা জানি না! আমার কিন্তু মনে হয়, আধুনিক মনের নারী-প্রেম সম্পর্কে প্রগতির এই দিকটা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যে প্রশংসার্হ রূপ নিয়াছে।

আধুনিক কাব্যের যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য 'প্রথমা'য় মোটামুটি আমরা তাহার সব গুলির আভাস পাইয়াছি। কবির 'দ্বিতীয়া'র আশায় আমরা উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

গীতিগুঞ্জ—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন। বাণী-বিতানের পক্ষে ২নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, নর্থ কলিকাতা হইতে শ্রীহরিহর চন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত। সুন্দর এন্টিক কাগজে ছাপা—মূল্য ১॥০। ২১৬ পৃষ্ঠা।

বাংলা দেশে প্রচলিত হিসাবে গান বলিতে যে ধারণা, অতুল বাবুর গানগুলি সে ধরণে গীত হইবার জন্য রচিত হয় নাই। বাংলা দেশে গানের দুরবস্থার সীমা নাই। ইতিপূর্ব্বে 'বাইজী'র মুখে রবীন্দ্রনাথের 'গানের সুরের আসনখানি'র দুর্দ্দশাগ্রস্ত সংস্করণ আমরা শুনিতে বাধ্য হইয়াছি। গায়ক ও শ্রোতার মধ্যে রুচিবৈধের নিমিত্তই এমন কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। অধিকাংশ সময়েই এদেশে গান যাঁহারা গান, তাঁহারা সঙ্গীত ছাড়া আর কোনও কিছু সম্পর্কে রুচির চর্চ্চা করেন নাই এবং অপর পক্ষে যাঁহারা শোনেন, তাঁহাদের সঙ্গীতে রুচি আর সব রুচির পশ্চাদ্‌বর্ত্তী। ফলে গায়ককে আসরে বসিয়া 'যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ'এ কানেড়া যোজনা করিয়া গান জমাইবার চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু এমন একটি স্তর আছে যেখানে রুচিমান গায়ক ও সমঝদার শ্রোতার মিলন হয়। যে গীতিকার নিজে শুধু গায়ক নন, বৈদগ্ধ্যের যাহা কিছু অপরিহার্য্য ভূষণও অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনিই মাত্র সেই স্তরে আসীন হইয়া গান রচনা করিতে পারেন। অতুলবাবু সেই স্তরাসীন 'রুচিমান' গীতিকার-গায়ক। তাঁহার গানে কলাবিদের চাতুর্য্য ও ভাবুকতার মাধুর্য্য প্রয়াগ-সঙ্গম সৃজন করিয়াছে।

অতুলবাবুর নিজের মুখের গান যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা জানেন গানে তন্ময়তা কি বস্তু। গায়ক হিসাবে অবশ্য বড় আসন তাঁহাকে কেহই দিবেন না, কিন্তু বড় গায়কেরও তাঁহার নিকট হইতে নিবার অনেক কিছু আছে। তাহার মধ্যে প্রথম ও প্রধান, গীত গানের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ, পরিপূর্ণ মজ্জমানতা। গায়ক ও গান যেন তাঁহার মধ্যে এক হইয়া যায়। এই মিলন-মাধুর্য্যের ক্ষণ হইতে তাঁহার গানগুলির জন্মের ইতিহাস বুঝিয়া নিই।

'গীতিগুঞ্জ'এ এই কবি-গায়কের কিঞ্চিদধিক দুইশতখানি গান আছে। পাঁচ ভাগে ইহারা শ্রেণীকৃত হইয়াছে, দেবতা, প্রকৃতি, মানব, স্বদেশ ও বিবিধ। ইহাদের অধিকাংশই রচয়িতার নামকে পিছনে ফেলিয়া বহু পূর্ব্বে দেশেবিদেশে মুখে মুখে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। তাই মাঝে মাঝেই এমন দুই একখানি গান নজরে পড়ে, যেগুলিকে এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট না দেখিলে কখনোই অতুল বাবুর রচনা বলিয়া জানিতাম না। গানগুলির ভাব, ভাষা, সঙ্গীতে যোগ্যতা সম্বন্ধে লিখিবার স্থানাভাব। প্রত্যেক গানের শীর্ষেই সুরের নাম আছে, এবং প্রায় গানই যে কোনও বাঙালীর শোনা থাকাতে, স্বরলিপি না থাকাতেও সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর পক্ষে এই বই হইতেই গান নেওয়া কঠিন হইবে না। স্বরলিপি থাকিলে ভালোই হইত। কিন্তু স্বরলিপি দিতে গেলে এতগুলি গানকে এমন দশটি পুস্তকে হয়তো প্রকাশ করিতে হইত। ফলে গানগুলি দুর্মূল্য হইত। সুতরাং এই ভালো হইয়াছে। এ পুস্তকের যে বহুল প্রচার হইবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

শ্রীকিরণকুমার রায়

অনুরাগ—শ্রীযুক্তা কনকলতা ঘোষ প্রণীত, ১৯৫।এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, নিয়োগী-নিকেতন হইতে প্রকাশিত।

শ্রীযুক্তা কনকলতা সাহিত্যক্ষেত্রে বিবিধ কবিতা ও প্রবন্ধ রচয়িত্রী হিসেবে পরিচিতা হ'য়েছেন। এখানি তাঁর নূতন প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। এর অধি-কাংশ কবিতাই শোক-কবিতা। কবিতাগুলি পাঠকমাত্রেরই মর্ম্মস্পর্শ ক'রবে। প্রিয়-বিয়োগে নারী-হৃদয়ের হাহাকার সত্য সরল অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই অনুভূতিকে কবি সরল সহজ ভাষায় প্রকাশ ক'রেছেন।

শোককবিতা ছাড়াও আরও কয়েকটি অন্য সুরের কবিতা এর মধ্যে স্থান পেয়েছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

ভারতে জাতিতত্ত্ব

শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ

মানুষের সভ্যতা যেখানেই বিশিষ্ট রূপ লইয়াছে, সেখানেই তাহা দুইটী স্বতন্ত্র দিকে আত্মবিকাশ করিয়াছে। একটি হইল বস্তুগত,—শিল্প-স্থাপত্য, বসনভূষণ, তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি বস্তুর বৈশিষ্ট্যে ইহার পরিচয়। অপরটী ভাবগত,—ধর্ম্ম, দর্শন বা চিন্তাধারার বিশেষত্ব, সঙ্ঘজীবন এবং তৎসংক্রান্ত নানা রীতিনীতি, আদর্শ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইহার অভিব্যক্তি। আমাদের দেশ যখন গৌরবের শিখরে আরূঢ় ছিল, সে দিন তাহার এইরূপ পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা বিদ্যমান থাকিলেও নানা কারণ বশতঃ তাহা সঙ্কুচিত, অবসাদগ্রস্ত এবং অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। আজ আবার আমাদের সমাজে নবজীবনের সূচনা দেখা দিয়াছে। আসমুদ্র-হিমাচল এদেশের লোকে এক জাতি (nation) হইয়া বাস করিবে, এ ইচ্ছা ক্রমেই দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণ আজিও অসংখ্য বর্ণ, শ্রেণী ও উপজাতিতে (tribe) বিভক্ত বলিয়া আমাদের সঙ্ঘজীবনের এই নূতন অভিব্যক্তির পথে নানা বাধা বিদ্যমান। সুতরাং এই মহাদেশের কোটী কোটী অধিবাসীদিগকে একচ্ছত্র জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে এতগুলি সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র আদর্শ ও স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ একীকরণের জন্য যথোপযুক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়া ভারতের বিরাট জনতার অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির (race) ইতিহাস ও কৃষ্টি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমেরিকার দৃষ্টান্ত বড়ই শিক্ষাপ্রদ। সকলেই অবগত আছেন যে ব্রিটেন, জার্ম্মানি, ইতালী, রাশিয়া প্রভৃতি নানা জাতির লোক আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে আসে এবং মার্কিন জনতার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। এতগুলি দেশের ও এতগুলি জাতির লোককে মার্কিণ সভ্যতার ছাঁচে ঢালাই করিয়া লইবার জন্য সে দেশের গভর্ণমেণ্ট নৃ-তত্ত্বের সহায়তায় একটী সুনির্দ্দিষ্ট নীতির অনুসরণ করিতেছেন। রাষ্ট্র ও সাধারণ লোকের দানে পরিপুষ্ট হইয়া আমেরিকার মিউজিয়াম ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এই নীতি অনুযায়ী নৃ-তত্ত্ববিষয়ক নানা তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতেছে। আমাদের দেশেও জাতীয় জীবন সংগঠনের কার্য্যে আমেরিকার মত বা ততোধিক বাধা বর্ত্তমান। আমেরিকার মতই নৃ-তত্ত্বের সহায়তায় এই সকল বাধা অপসৃত হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, এ সম্বন্ধে নৃ-তত্ত্বের যে কতটা উপযোগিতা আছে, তাহা এতদ্দেশীয়েরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। 'আত্মানং বিদ্ধি'—এই মহাবাক্য স্মরণ রাখিয়া কৃষ্টি ও জাতি (race) হিসাবে আমাদের আত্মপরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে। কেমন করিয়া আমরা এদেশে আসিলাম, আমাদের জাতীয় প্রকৃতি কিরূপ, আমাদের জাতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই বা কি—এ সকল অবধারণ করিতে পারিলে আমরা সঙ্ঘ-গঠনের কার্য্যে অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিব—সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিগুলির অবস্থান সম্বন্ধে যাহাতে মোটামুটী একটা ধারণা করা যায় এবং এদেশের লোকের মধ্যে যে স্বার্থ ও আদর্শগত নানা প্রভেদ আছে তাহার কারণগুলি যাহাতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে—এতদর্থে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতের জাতিগত ইতিহাস (racial history) লইয়া কতকটা আলোচনা করিব।

২

এদেশের জাতিগুলির কথা আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের আকৃতিগত পার্থক্যের বিষয় উল্লেখ করিতে হয়। শিখ, বাঙ্গালী, সাঁওতাল ও নেপালী প্রভৃতি দুই চারিটী জাতির তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, ভারতবর্ষে প্রদেশভেদে ও সমাজের স্তরভেদে শুধু যে কৃষ্টির প্রভেদ রহিয়াছে এমন নহে—অল্পবিস্তর আকৃতির পার্থক্যও বর্ত্তমান। নৃ-তত্ত্ববিদেরা সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন যে, এই সকল আকৃতিগত পার্থক্যে জাতিগত প্রভেদ সূচিত হয়। এতগুলি জাতিকে আশ্রয় দিয়া এতগুলি কৃষ্টিকে আজিও স্বতন্ত্র ভাবে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া এদেশের সম্বন্ধে নৃ-তত্ত্ববিদদের কৌতূহলের অন্ত নাই। এই সকল জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা হয়ত কেহ কেহ একদিন ভারতের অনেকখানি জুড়িয়া বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছে—ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। আবার ইহাদেরই প্রতিবাসী আদিম জাতিরা দুর্গম পর্ব্বত ও বনস্থলীতে আশ্রয় লইয়া নিম্নতর এবং প্রাচীনতর কৃষ্টিগুলিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। কোন কোন উন্নত এবং সুসমৃদ্ধ সভ্যতা বিলুপ্ত বা বিস্মৃতও হইয়া গিয়াছে।—তাহাদের প্রচুর নিদর্শন এদেশের মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত রহিয়াছে। সিন্ধু নদীর উপত্যকায় সম্প্রতি যে সকল প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহাতে ঐ প্রদেশের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সমৃদ্ধির আভাস পাওয়া যায়। স্থান-বিশেষে এদেশের ভূস্তরসমূহে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধুনা-বিলুপ্ত প্রাণীর অশ্মীভূত দেহাবশেষ (fossil remains) পাওয়া গিয়াছে। এই সকল অস্থি মানুষের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছে।

এদেশে জাতিতত্ত্বের আলোচনা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল দেশ আপনাদের জাতিনির্ণয়ের কার্য্যে অগ্রসর হয়, ভারতবর্ষ তাহাদের অন্যতম ছিল। দুঃখের বিষয় প্রচুর উপাদান থাকা সত্ত্বেও এতটা সময়ে এই বিজ্ঞানের অনুশীলনে আমরা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। নৃ-তত্ত্বের চর্চ্চায় ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান সকলেই আমাদের অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এমন কি ক্ষুদ্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও এ বিষয়ে বহু গবেষণা হইয়াছে। আমাদের গভর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নৃ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তাধারা ও বিজ্ঞানের প্রগতির সহিত সংযোগ রাখিয়া চলেন নাই। ফলে সেকালে Risley যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন, নানা ভুলভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও এদেশে জাতিবিশ্লেষণের কার্য্যে তাহাই আজিও আমাদের প্রধান অবলম্বন। Risleyর পরে যেটুকু কাজ হইয়াছে, তাহা কোন কোন নৃ-তত্ত্ববিদের ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলেই সংসাধিত হইয়াছে। Ujfalvy, Stein, Dixon উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, Waddel ভারতের পূর্ব্বাংশে এবং Rivers, Lapicque, Schmidt দাক্ষিণাত্যে নূতন করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। সম্প্রতি জার্ম্মান পণ্ডিত Baron Eickstedt দুই বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানের অধিবাসীদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কর্ণেল Sewell বেলুচিস্থানবাসী ব্রাহুই প্রভৃতি জাতির এবং বর্ত্তমান লেখক ও তাঁহার ছাত্রেরা কাফিরীস্থান ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের অনেক আকৃতিগত মাপ (anthropometric data) লইয়াছেন। এই সকল নূতন সংগৃহীত তথ্যের বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে কিছু সময় লাগিবে। এই নূতন গবেষণার ফল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের জাতিগত ইতিহাস বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইতে পারিবে না। তবে যাহাতে এদেশে নৃ-তত্ত্বের গবেষণা পৌরাণিক, সামাজিক বা শাস্ত্রলিখিত বিভাগের উপর নির্ভর না করিয়া বিজ্ঞানসম্মত পথে অগ্রসর হইতে পারে, এইজন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতে জাতিতত্ত্বের কেবল স্থূল ধারাগুলিকে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে

৩

আদিম মানবের উৎপত্তিসম্বন্ধে এদেশে যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে শিবালিক পর্ব্বতমালায় আবিষ্কৃত Primate * শ্রেণীর জীবের শিলীভূত অস্থিগুলি (Fossil remains) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পর্ব্বতমালা হিমালয়ের নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত ও হরিদ্বার হইতে ২০০ মাইল পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিমদিকে বিস্তৃত ইহার Middle Miocene † ও Upper Pliocene ‡ যুগদ্বয়ের ভূস্তরে বহুল পরিমাণে প্রাচীন মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জন্তুবর্গের (vertebrates) দেহাবশেষ পাওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে Sivapithecus এবং Dryopithecus নামক দুই শ্রেণীর বানরাকৃতি জীবের দেহাবশেষও আবিষ্কৃত হইয়াছে। Sivapithecus এর অস্থির সহিত মানবের অস্থির কতকটা স্পষ্ট আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখা যায়। Sivapithecus এবং Dryopithecus এর অস্থি আবিষ্কার করেন ভারত গভর্ণ-

* স্তন্যপায়ী জীববর্গের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী। † মধ্যাধুনিক। ‡ বহ্বাধুনিক।

মেন্টের ভূতত্ত্ব বিভাগের Palæontologist প্রসিদ্ধ ডাঃ Pilgrim। ইহাঁর মতে Primate বর্গের যে শাখাটী হইতে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে, Sivapithecusএর সহিত তাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ঠিক এতটা মানিয়া না লইলেও Sivapithecusএর পেষণে দন্তের (molars) তুলনা-মূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এ পর্য্যন্ত যে সকল বিলুপ্ত বানরজাতির অস্থি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে Sivapithecusএরই মানুষের সহিত আকৃতিগত সাদৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত এই প্রাণীটির কেবল চোয়ালের কয়েক টুক্‌রা অস্থিমাত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহার কঙ্কালের অবশিষ্টাংশ যতদিন না আবিষ্কৃত হইতেছে ততদিন মানবজাতির সহিত ইহার যথার্থ সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হইবার উপায় নাই। এই কঙ্কালের পুনরুদ্ধারের জন্য শিবালিক পর্ব্বতমালার ভূস্তরসমূহ খুঁড়িয়া দেখা যে কত প্রয়োজন তাহা সহজেই বোঝা যায়।

আধুনিক মানবজাতির (Homo Sapiens) আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই পৃথিবী প্রাচীনতর মানবজাতিগণের আবাসস্থল ছিল। ইয়োরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া-মাইনর, চীন প্রভৃতি দেশে এই সকল প্রাচীনতর মানবের অস্থিনিদর্শন বহুপরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় অদ্যাবধি ভারতবর্ষে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ধৈর্যসহকারে অনুসন্ধান না হওয়াতেই এইরূপ কোন নিদর্শনই আবিষ্কৃত হয় নাই। বায়ানা, শিয়ালকোট, নাল, হারাপ্পা, মহেঞ্জোদারো ও আদিত্তানাল্লুরে যে নর-কপালগুলি (skulls) পাওয়া গিয়াছে, তাহা লইয়াই ভারতবর্ষে মানবের পুরাতত্ত্বের আরম্ভ। এগুলি সমস্তই আধুনিক মানবজাতির। আগ্রার অনতিদূরে বায়ানা নামক স্থানে গুম্ভীর নদীর উপর দিয়া রেলের সেতু নির্ম্মাণ করিবার সময় ইঞ্জিনীয়ার Wolff ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রথমোক্ত নরকপালটী প্রাপ্ত হন। নদীগর্ভ হইতে ৩৫ ফিট নিম্নে পলিমাটীর ভিতর কতকটা শিলীভূত অবস্থায় ইহা প্রোথিত ছিল। উপরে এতটা মাটির স্তর জমিতে এবং এইভাবে শিলীভূত হইতে যে অনেক সময় লাগিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং এই নিদর্শনটী যে অতি প্রাচীন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ Mr. Hargreaves কিছুদিন হইল বেলুচিস্থানের অন্তঃপাতী 'নাল' নামক স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে একটী নরকপাল প্রাপ্ত হন। এদেশে লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সিন্ধু-নদীর উপত্যকায় যে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয়—এই ধ্বংসাবশেষ তাহারই অন্তিম পর্ব্বের সহিত সংশ্লিষ্ট; এখানে যাহার কঙ্কাল আবিষ্কার করা গিয়াছে, সে লোকটী খৃষ্টাব্দের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিল। লেফ্‌টেন্যাণ্ট Hingston পাঞ্জাবের অন্তর্গত শিয়ালকোট নামক স্থানে মাটীর ৬ ফিট নিম্নে একটী সম্পূর্ণ নরকঙ্কাল আবিষ্কার করেন। কঙ্কালটী যে ভাবে দক্ষিণ পার্শ্বে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল তাহাতে মনে হয় যে ইহা আকস্মিক ভাবে পতিত শব নহে, কেহ বা কাহারা যত্নপূর্ব্বক বিধি অনুযায়ী ইহাকে সমাহিত করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে তিন্নেভেলী জেলায় আদিত্তানাল্লুর নামক স্থানে Rea কর্ত্তৃক ১৯০১-১৯০৩ খৃষ্টাব্দে যে নরকপালগুলি আবিষ্কৃত হয়, সেগুলি বড় বড় মৃন্ময় কলসের মধ্যে প্রোথিত ছিল। কলসমধ্যে যে সকল লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, দাক্ষিণাত্যে লৌহের ব্যবহার প্রচলিত হইবার অনতিকাল পরেই এই সকল অস্থি সমাহিত হয়। যাহাহৌক, এই সকল আবিষ্কারের ফলে আমরা খৃষ্টাব্দের অন্ততঃ তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টাব্দের কয়েক শতাব্দী পর পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, উত্তরাপথ ও দাক্ষিণাত্যে মানবের পুরাতত্ত্বের সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি।

নরকপাল লইয়া আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই তাহার শ্রেণী বিভাগ করা প্রয়োজন। এইরূপ শ্রেণী-বিভাগের অবশ্য একটী নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। উপর হইতে মাথার খুলীর দিকে চাহিয়া দেখিলে তাহার প্রস্থের সহিত দৈর্ঘ্যের যে ক্রম (ratio) দৃষ্ট হয়, তদনুযায়ী নৃমুণ্ড অথবা কঙ্কালের করোটীকে যথাক্রমে dolichocephalic বা dolichocranial, mesocephalic বা mesocranial অথবা brachycephalic বা brachycranial বলা হয়। এইরূপ শ্রেণীবিভাগ অবশ্য খালি-চোখের আন্দাজে নিষ্পন্ন হয় না। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে করোটীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ লইয়া উক্ত ক্রম কষিয়া দেখিতে হয়। ললাটাস্থির (frontal bone) নিম্ন ভাগে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বিন্দু (glabella) হইতে

মস্তকের পশ্চাদ্বর্ত্তী অস্থির (occipital bone) শেষ সীমা পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা কল্পিত হইলে তাহার দৈর্ঘ্যকেই

১ নং চিত্র

ডলিকো ক্র্যানিয়াল—উত্তর-পশ্চিমা জাতির করোটী—উপরের দৃশ্য

করোটীর দৈর্ঘ্যের মাপ বলা যাইবে। এই সরল রেখার সহিত সমকোণ করিয়া আড়াআড়ি ভাবে যে বৃহত্তম মাপটী লওয়া হয়, তাহাকেই করোটীর প্রস্থের মাপ বলা হয়। এই দুইটী মাপের ক্রম নিম্নোক্ত প্রকারে নির্দ্ধারিত হয়।—

$$\frac{\text{প্রস্থের মাপ} \times ১০০}{\text{দৈর্ঘ্যের মাপ}}$$

এখন নিম্নের তালিকায় ক্রমফলের দিকে লক্ষ্য করিলে করোটী বা মুণ্ডের শ্রেণীবিভাগের রীতিটী বুঝা যাইবে ঃ—

(জীবিতের) মুণ্ডের শ্রেণী—	ক্রম	(কঙ্কালের) করোটীর শ্রেণী—	ক্রম
ডলিকোকেফ্যালিক—	—৭৫ ৯	ডলিকোক্র্যানিয়াল—	৭০.০—৭৪ ৯
মেসোকেফ্যালিক—	৭৬.০—৮০.৯	মেসোক্র্যানিয়াল—	৭৫.০—৭৯.৯
ব্র্যাকীকেফ্যালিক—	৮১.০. ৮৫.৪	ব্র্যাকীক্র্যানিয়াল —	৮০.০—৮৪ ..

[চিত্র—২]

পূর্ব্বোক্ত নরকপালগুলির মাপ লইয়া দেখা গিয়াছে, সবগুলিই ডলিকোক্র্যানিয়াল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাহা হইলেও তাহাদের আকার ও গঠনের বৈশিষ্ট্যদ্বারাও শ্রেণী-বিভাগ করা যায়। নাল ও শিয়ালকোটের নিদর্শন দুইটীতে করোটীর আকৃতি সুগোল, সমুচ্ছ্রিত গম্বুজের মত। ইহাদের পার্শ্ব দৃশ্যের (profile) নক্সা তুলনা করিলে প্রায় হুবহু মিলিয়া যায়। অবশ্য শেষোক্ত নিদর্শনটী স্ত্রীলোকের করোটী বলিয়া আয়তনে অপেক্ষাকৃত কম, এইটুকুই যা প্রভেদ। আদিত্তানাল্লূরের করোটীগুলির উচ্চতা সেরূপ অধিক নহে; ললাটাস্থি পিছনের দিকে বাকিয়া গিয়াছে (receding) মগজটীও উপরের দিকে এবং পিছনের দিকে বক্রভাবে অবস্থিত ছিল। নালের নরকপালটীর নাসিকাস্থি উচ্চ ও সুগঠিত এবং মুখাকৃতি ডিম্বের অনুরূপ (oval)। পক্ষান্তরে

২ নং চিত্র

ব্র্যাকী ক্র্যানিয়াল—অ্যালপাইন জাতির করোটী

আদিত্তানাল্লূরের নিদর্শনগুলিতে নাসা নিম্ন ও গণ্ডাস্থি সুউচ্চ। এই সকল কারণে নাল ও শিয়ালকোটের কপালদ্বয় হইতে

শেষোক্ত কপালগুলি ভিন্ন-জাতীয় মানুষের বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। সিংহলে ভেড্ডা (Veddah) নামক যে হ্রস্বকায় আদিম জাতি বাস করে তাহাদের ও আদিত্তানাল্লূরের নর-কপালের সাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক। বায়ানার কপালটী আকারে ক্ষুদ্রতর ও অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ হইলেও ললাটাস্থির গঠনে নাল ও শিয়ালকোটের করোটীদ্বয়ের অনুরূপ। নাসিকাস্থির গঠন ও উচ্চতার বিষয়েও এইরূপ সাদৃশ্য দেখা যায়।

উপরোক্ত আলোচনার ফলে সিদ্ধান্ত হয় যে, খৃষ্টাব্দের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম ভাগে যে জাতিটী বাস করিত তাহাদের নাসা ছিল উন্নত, ললাট প্রশস্ত এবং করোটী সমুচ্ছ্রিত গম্বুজের মত সুগোল। হয়ত আগ্রার কাছাকাছি ইহারই অনুরূপ আর একটী জাতির বাস ছিল। দাক্ষিণাত্যে যাহারা বাস করিত তাহাদের দৈহিক আকৃতিতে বর্ত্তমান ভেড্ডা জাতির সহিত সাদৃশ্য ছিল।

মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার আবিষ্কারের পর কোন্ জাতীয় মানব ভারতবর্ষে উহার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল সে বিষয়ে নানা আলোচনা হইয়াছে। সুমেরীয় জাতি যে ভাষা ব্যবহার করিত তাহা 'আর্য্য' ভাষাগুলির শ্রেণীভুক্ত নহে। নালের পূর্ব্বোক্ত ধ্বংসাবশেষের অদূরে ব্রাহুই নামক যে উপজাতি আছে, তাহারা একটী 'অনার্য্য' দ্রাবিড় শ্রেণীর ভাষা ব্যবহার করে। এই জন্য কেহ কেহ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন যে, দক্ষিণভারতের দ্রাবিড় জাতীয় লোকেরাই এই সময়ে ভারতের উত্তরপশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়া উক্ত সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করে। কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছেন যে, দ্রাবিড় হইতেই নাকি সমগ্র ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তি ঘটিয়াছে! কিন্তু উপরে আমরা করোটীসংক্রান্ত যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত আদৌ সমর্থন করা যায় না। দাক্ষিণাত্যের যে জাতি দ্রাবিড়ী ভাষার চর্চ্চা করিত, আদিত্তানাল্লূরের নরকপাল হইতে যদি তাহাদের আকৃতি ও দৈহিক গঠনাদি সম্বন্ধে যথার্থই কোন আভাস পাওয়া যায়, তবে বলিতে হইবে যে, প্রাচীন দ্রাবিড়দের সহিত সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন অধিবাসীদের কোন আকৃতিগত সাদৃশ্য ছিল না। নাল, শিয়ালকোট প্রভৃতি অঞ্চলে যে জাতি বাস করিত তাহাদের দৈহিক আকৃতি যে আদিত্তানাল্লূরের জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহাও বিবেচ্য যে, মেসোপোটেমিয়ার সুমেরীয় সভ্যতার কেন্দ্রে যে প্রাচীন নরকপালগুলি পাওয়া গিয়াছে, আদিত্তানাল্লূরের করোটীর সহিত তাহাদের কোন সাদৃশ্য নাই। এই সকল কারণে মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা অথবা সুমেরীয় সভ্যতার সহিত প্রাচীন দ্রাবিড়দিগের কোন সম্বন্ধ নিরূপণ করিলে তাহা বিজ্ঞানসম্মত হইবে না। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, 'আর্য্য', 'দ্রাবিড়' প্রভৃতি শব্দে কেবল ভাষাগত প্রভেদই সূচিত হয়। ঐগুলি 'জাতি'বাচক শব্দ নহে।

অল্পদিন হইল তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ও পাটলিপুত্রের খননকালে কয়েকটী প্রাচীন নরকপাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি লইয়া এখনও আমাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কাজ হইতেছে; সুতরাং তদ্বিষয়ে এই প্রবন্ধে কোন আলোচনা করা যাইবে না। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে নানাস্থানে খননকার্য্যের ফলে যে সকল কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল, তাহা এদেশের প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অজ্ঞতা ও অবহেলার জন্য সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইরূপে ভারতবর্ষের জাতিগত ইতিহাসের বহু অমূল্য উপাদান বিলুপ্ত হইয়াছে। তাই এবিষয়ে গবেষণা করিতে গেলে ভারতের আধুনিক জাতিগুলির সম্বন্ধে আলোচনা ছাড়া উপায় নাই।

৪

ভারতবর্ষের ইদানীন্তন জাতিতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এদেশের ভৌগোলিক আবেষ্টনের বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব দিকে পর্ব্বতমালা এই দেশটীকে এশিয়ার অন্যত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বাহির হইতে অন্য কোন জাতির এদেশে উপনিবেশ স্থাপন অথবা সমরাভিযান করিতে হইলে—হয় পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া, নয় সমুদ্র পার হইয়া আসিতে হইবে। সেকালে রেলষ্টীমার, এরোপ্লেন প্রভৃতি না থাকায় এ দুইটীই ছিল দুরূহ ব্যাপার। ফলে মধ্য-এশিয়া হইতে প্রাচীন কালে বারংবার যে সকল নরস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার কোনটীই এদেশে পূর্ণতেজে আসিয়া পৌছে নাই—প্রাকৃতিক বাধায় প্রতিহত হইয়া পশ্চিমের পথ ধরিয়া ইয়োরোপাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমের ও উত্তর-

পূর্ব্বের গিরিবর্ত্ম দিয়া যাহারা ভারতে আসিয়াছিল তাহাদের এই বিশাল অভিযানের শাখা-প্রবাহমাত্র বলা যাইতে পারে। চীনের দক্ষিণাংশ হইতে ঐতিহাসিক যুগের যে মঙ্গোলীয় প্লাবন দক্ষিণ দিকে নামিতে থাকে, তাহা প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশ ও মালয় উপদ্বীপের ভিতর দিয়া ইন্দোনেশিয়ায় চলিয়া যায়। ভারতবর্ষে শুধু তাহার কয়েকটী উপজাতি আসিয়া পড়ে। উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্বের যে সকল গিরিবর্ত্ম দিয়া এদেশে বারংবার জনস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, দক্ষিণের যে পর্ব্বতমালা ও মালভূমি এদেশের আদিম অধিবাসীদের আশ্রয় দিয়াছে সেগুলি ও তাহাদের সন্নিহিত স্থানসমূহে অনুসন্ধান করিলে একালের ভারতীয়গণের জাতিবিশ্লেষণের সূত্র পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যথাক্রমে ঐ তিনটী দিক হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ভারতীয়গণের দৈহিক ভেদাভেদ লইয়া আলোচনা করিব।

৩নং চিত্র

উত্তর-পশ্চিমা ডলিকোকেফ্যালিক জাতির ব্রাহ্মণ

উত্তরপশ্চিম সীমান্ত :—

খাইবার গিরিবর্ত্মের উত্তরে, পেশোয়ার হইতে পামির উপত্যকা পর্য্যন্ত ভূভাগে নানাশ্রেণীর পাঠান, কাফির প্রভৃতি যে সকল দীর্ঘকায় লোক বাস করে, পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের মস্তক dolichocephalic, করোটী উন্নত এবং অবয়বাদি সুগঠিত। ইহারা সকলেই যে জাতিটির অন্তর্গত,

৪নং চিত্র

উত্তর-পশ্চিমা ডলিকোকেফ্যালিক জাতির মহিলা

তাহা ইয়ারকন্দ পর্য্যন্ত অল্পবিস্তর দেখা যায়। কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও রাজপুতানার উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এই জাতির লোকের সংখ্যাধিক্য বর্ত্তমান (চিত্র ৩।৪)। নাল ও শিয়াল-কোটের নরকপালগুলির সহিত এই সকল লোকের করোটীর গঠন তুলনা করিলে তাহা একজাতীয়ই বলিয়া মনে হয়। খাটী আফগানদের অবশ্য কোন দৈহিক মাপজোক লওয়া হয় নাই, কিন্তু উত্তরাঞ্চলবাসী পাঠানদের (চিত্র ৫।৬) সহিত তাহাদের কোন জাতিগত পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কেবল গাত্রবর্ণের বিষয়ে একটু প্রভেদ লক্ষিত হয়। উত্তর দিকের পর্ব্বতমালার মধ্যে শীতপ্রধান আবহাওয়ায় যে সকল উপজাতি বাস করে তাহাদের গায়ের রং কটা। স্যার অরেল ষ্টাইন ইহাদের বর্ণ 'গোলাপী আভাযুক্ত 'সাদা' (rosy white) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইহাদের মধ্যে অনেকের চক্ষুর রংও কটা বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে কাফির জাতিটির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আজ পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে জাতি-সঙ্কর ঘটে নাই—সন্নিহিত

অপরাপর জাতির তুলনায় তাহাদের প্রাচীন রীতিনীতিও বজায় আছে। ইহাদের শতকরা ২৬জন লোকের চোখের

৫নং চিত্র

উত্তর পশ্চিমা ডলিকোকেফ্যালিক জাতির চিত্রালী পাঠান

রং কটা। বর্ত্তমান লেখকও এই সকল জাতির মধ্যে যে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেও ষ্টাইনের মতই সমর্থিত হয়। পক্ষান্তরে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা অল্প-বিস্তর পিঙ্গলবর্ণ (brown)।

হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে, বদাক্ষাণ (Badakshan) মরুভূমির চারিদিকে, পশ্চিমে সমরখন্দ ও বোখারা (বদাক্ষী, ওয়াখী, তাজেক প্রভৃতি উপজাতি) এবং পূর্ব্বে চীনা তুর্কী-স্থানের অন্তর্গত তক্‌লামাকান মরুভূমি পর্য্যন্ত (ডোলান, কেল্পিন, সারিকোলি ইত্যাদি উপজাতি) প্রদেশে অপর একটী জাতির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছে। দীর্ঘাকৃতি জাতিদের অন্যতম হইলেও ইহারা অপেক্ষাকৃত হ্রস্বকায়, গোলাকার করোটী এবং খগনাসাবিশিষ্ট (hook-nosed)। দক্ষিণদিকে ইহারা আফগানিস্থানের পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; সমগ্র বেলুচিস্থান জুড়িয়া ইহাদের বাস। বিশেষ করিয়া পিষিম অঞ্চলে, বালুচ, আচাকজাই, তারিম, কাকর ও পূর্ব্বোক্ত দ্রাবিড়ভাষী ব্রাহুই নামক উপজাতিদের মধ্যে এই জাতির সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। শেষোক্ত দক্ষিণা উপজাতিদের গাত্রবর্ণ পিঙ্গলাভ (brown), কিন্তু বদাক্ষাণ ও তক্‌লামা-কানের এই জাতির অধিবাসীরা শ্বেতবর্ণ। ওয়াখীদের মধ্যে ষ্টাইন শতকরা চল্লিশ জন লোকের কটা চক্ষু দেখিয়াছিলেন। পামির উপত্যকার উত্তরে খাস্‌গড়, ইয়ারখন্দ হইতে খোটান ও নার্ণি পর্য্যন্ত দেশভাগে খির্গী, খোটানী ও লপ্‌লিকগণের মধ্যে আরও একটী জাতির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের করোটী গোলাকৃতি, মুখ চওড়া ও চেপ্‌টা, এবং নাসাগ্র নিম্ন। চীনা প্রভৃতি মঙ্গোলীয় জাতিদের ন্যায় ইহাদের চোখের উপরের পাতাটী পর্দ্দার মত বর্দ্ধিত হইয়া নাসিকার নিকটস্থ অক্ষি-কোণটিকে (inner canthus) ঢাকিয়া দিয়াছে (epicanthic

৬নং চিত্র

উত্তর-পশ্চিমা ডলিকোকেফ্যালিক জাতির চিত্রালী পাঠান (পার্শ্বদৃশ্য)

fold)। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহারা মঙ্গোলীয় শ্রেণীর লোক। ইহারা দক্ষিণে লাডাখীদের মধ্যে ও কুলুপ্রদেশে এবং পূর্ব্বে হিমালয়

পর্ব্বতের দুইপার্শ্বের অধিত্যকাগুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। তকলামাকানের অধিবাসীদের তুলনায় গাত্রবর্ণ অপেক্ষাকৃত মলিন হইলেও ইহাদের মধ্যে অনেকের কটা রংএর চক্ষু দেখা যায়। এতদ্দ্বারা ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বকথিত জাতিগুলির সহিত বহুপরিমাণে রক্তসংমিশ্রণ সূচিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বোম্বাই প্রদেশস্থ চিৎপাবন ইত্যাদি অনেক

৭নং চিত্র

উত্তর-পশ্চিমা ডলিকোকেফ্যালিক জাতি। কাফিরীস্তানের লোহিতবর্ণ কাফির

ভারতীয় জাতির মধ্যে অল্পবিস্তর এইরূপ "বিড়ালাক্ষ" লোক দেখা যায়।

১৩নং চিত্রে আমরা যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের ফটো দিয়াছি, তাঁহারও চক্ষুর এই বিশেষত্ব আছে।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, উপরোক্ত জাতি তিনটীর অন্যতম তুর্কো-ইরাণীরা বাহির হইতে এই অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং সম্ভবতঃ মুসলমান প্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের মুসলমানদের সহিত তদ্দেশীয় হিন্দু ও শিখদের দৈহিক গঠনাদির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে কোন জাতিগত (racial) প্রভেদ নাই। ফলে সিদ্ধান্ত হয় যে, উক্ত প্রদেশদ্বয়ের অধিবাসীদের মধ্যে তুর্কো-ইরাণী জাতিটীর প্রভাব তেমন অনুভূত হয় নাই। বিগত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানী যে বহুসংখ্যক পাঞ্জাবী সৈন্যদের বন্দী করে, **Baron Eickstedt** তাহাদের দৈহিক মাপ লইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে পাঞ্জাবের হিন্দু, মুসলমান, শিখ সকল শ্রেণীর লোকই ছিল। তাঁহারও মতে ইহারা সকলেই একই জাতির অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে বৈদেশিক রক্তের প্রাধান্য থাকার কোন আভাস পাওয়া যায় না। আদম সুমারীর রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে যে, শতকরা ১৫ জন পাঞ্জাবী-মুসলমানের বিদেশীয় রক্তে উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ সিদ্ধান্তে যথার্থ ব্যাপারটীকে অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। পরিচ্ছদ ও কেশবিন্যাসের পার্থক্যের জন্যই পাঞ্জাবের মুসলমান ও হিন্দু প্রভৃতিকে ভিন্ন জাতীয় বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে।

উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত :—

জাতিতত্ত্বের হিসাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণের মতই উত্তর-পূর্ব্ব কোণটীকেও আর একটী ঘাঁটি বলা যায়। ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁক হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বে মিস্‌মি জাতির অধ্যুষিত প্রদেশের ভিতর দিয়া চীন ও ব্রহ্মদেশের সীমান্তে ইউনান পর্য্যন্ত, এবং পশ্চিমদিকে চিংপো, কাছাড়, মিকির, জয়ন্তীয়া ও গারোপাহাড় পর্য্যন্ত ভূভাগে যে সকল উপজাতি এই ঘাঁটি রক্ষা করিতেছে, তাহাদের কতকগুলি সাধারণ দৈহিক বিশেষত্ব আছে। ইহাদের মুণ্ড **dolicho-cephalic** মুখ ও নাসিকা চওড়া ও চেপ্টা, দেহ হ্রস্বাকৃতি। মঙ্গোল জাতিদের ন্যায় ইহাদের চোখের উপরের পাতা একটি পর্দ্দার মত বর্দ্ধিত হইয়া নাসার নিকটস্থ অক্ষিকোণটী ঢাকা দিয়াছে (**epicanthic fold**)। ইহাদের গুম্ফশ্মশ্রু ও গাত্রলোম প্রভৃতি পরিমাণে অত্যন্ত অল্প ও দেহের বর্ণ অল্পবিস্তর পিঙ্গলাভ। এই জাতীয় লোক ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকাধিবাসী জনতার নিম্নস্তরগুলি অধিকার করিয়া আছে। তাহাদের দক্ষিণে, চিন্দ্‌-উইন ও ইরাবতী নদীর উপত্যকা এবং পূর্ব্বদিকের পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীগণ প্রধানতঃ **brachycephalic**। ইহাদের মুখ ও চক্ষুর গঠনে মঙ্গোলীয় জাতির বিশেষত্বগুলি পরিস্ফুট। ইন্দোনেশিয়ার বাসিন্দারাও এই জাতীয়

লোক। এই দুইটী শ্রেণীর লোকেরই আদি-নিবাস তাহাদের বর্ত্তমান অধ্যুষিত প্রদেশে নহে। উত্তর হইতে চীনা প্লাবনের

৮নং চিত্র

দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ

বেগে প্রতিহত হইয়া ইহারা দক্ষিণ চীনের পাহাড়গুলি পরিত্যাগ করিয়া এই সকল প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছে।

দাক্ষিণাত্য :—

দাক্ষিণাত্য হইতে উত্তরাপথের দিকে প্রাচীনকালে কোন জাতীয় (**racial**) অভিযান হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে উত্তরাপথবাসী জাতিরাও কখন অধিকসংখ্যায় দক্ষিণের পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। (চিত্র ৮।৯) ফলে এই সকল স্থানে আজিও একটী আদিম জাতি নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া মধ্যভারত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। এই জাতীয় লোকের মুণ্ড **dolichocephalic** ও অনুচ্চ, নাসাগ্র নিম্ন ও বিস্ফারিত, দেহ হ্রস্বাকৃতি এবং কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের কেশ বাবরী শ্রেণীর (**wavy-curly**), কচিৎ কদাচিৎ চোয়াল-উচুঁ লোকও দেখা যায়। (চিত্র ১০।১১) যোলাগা, ইরুলা ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য বন্য জাতিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আদিত্তানাল্লূরের প্রাগৈতিহাসিক জাতির সহিত ইহাদের সৌসাদৃশ্য আছে। ইহারা এবং সিংহলের ভেড্ডা, মালয় উপদ্বীপের সকাই, ইন্দোনেশিয়া ও মেলানেশিয়ার কতকগুলি জাতি এবং অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীগণ—সকলে একই বিরাট জাতির পর্য্যায়ভুক্ত। এক সময়ে পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ স্থলভাগই ইহাদের অধিকৃত ছিল।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ও মালয় উপদ্বীপে নেগ্রিটো জাতির লোক আজিও বাস করে। নৃ-তত্ত্ববিদ্‌গণ পূর্ব্বে এদেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এই জাতীয় লোকের অস্তিত্বের প্রমাণ পান নাই। সম্প্রতি লেখক কোচিনে পরাম্বিকুলম্ পাহাড়ে কাডর (**Kadar**) উপজাতির মধ্যে খাঁটী নেগ্রিটো জাতির অবশেষস্বরূপ কয়েকটী লোক আবিষ্কার করিয়াছেন। নিম্নে ইহাদের একজনের ফটো দেওয়া গেল। (চিত্র ১২)

৯নং চিত্র

দ্রাবিড়—মলয়লী, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের লোক

চুলের বৈশিষ্ট্য হইতে মনে হয় যে, মেলানেশিয়ার আদিম অধিবাসীগণের সহিত ইহাদের জাতিগত সম্পর্ক বিদ্যমান।

ভারতবর্ষের উত্তরদিকের তুইটী সীমান্তে এবং দাক্ষিণাত্যে এইরূপে আমরা অন্ততঃ ছয়টী বিভিন্ন জাতির অস্তিত্বের সন্ধান পাই। অতঃপর এইগুলির সাহায্যে আমরা অপেক্ষাকৃত কেন্দ্রীয়

১০নং চিত্র

অষ্ট্রালয়েড্ কোচিনের কাডর উপজাতির পুরুষ

প্রদেশগুলির অধিবাসীদের জাতিগত বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাল ও শিয়ালকোটের করোটীদ্বয়ে আমরা যে dolichocranial জাতির পরিচয় পাই, কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও উত্তর রাজপুতানার আধুনিক অধিবাসীরাও সেই জাতীয় লোক। এই জাতিটী পূর্ব্বদিকে যুক্ত-প্রদেশের পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বারাণসী হইতে বিহার পর্য্যন্ত যতই পূর্ব্বে আসা যায়, অপর একটী জাতি—brachycephalic—ক্রমেই যেন সংখ্যায় বাড়িতে থাকে। বাঙ্গালীদের মধ্যে এই brachy-cephalic জাতি সংখ্যায় অত্যন্ত প্রবল (চিত্র ১৩—১৪)। Risleyর মতে বাংলার প্রত্যন্তবাসী মঙ্গোলীয় জাতির প্রভাববশতঃই বাঙ্গালীদের মস্তক এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকায় যে মঙ্গোল উপজাতীয়েরা বাস করে, তাহারা প্রধানতঃ dolichocephalic, brachycephalic নহে। সুতরাং এইদিক হইতে মঙ্গোলীয় প্রভাবের দোহাই দিয়া বাঙ্গালীদের brachycephalyর কারণ নিরূপণ করা যায় না। অবশ্য উত্তরের লেপ্‌চা (চিত্র ১৫—১৬) ও ভুটানী এবং চট্টগ্রামের চাক্‌মা প্রভৃতি মঙ্গোলীয় জাতি brachy-cephal বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু ইহাদের প্রভাবেই যদি বাঙ্গালীরা brachycephal হইত তাহা হইলে ইহাদের সন্নিহিত স্থানগুলিতেই brachycephalyর প্রাধান্য দেখা যাইত। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বাংলার দক্ষিণাংশেই এইরূপ

১১নং চিত্র
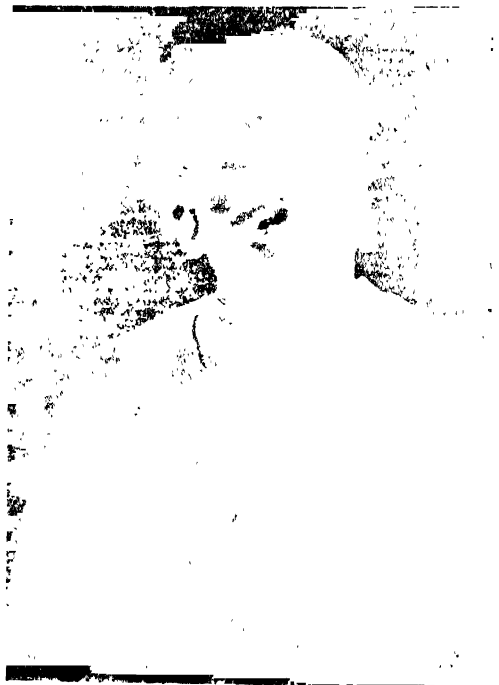
অষ্ট্রালয়েড্-কোচিনের কাডর উপজাতির স্ত্রী

প্রাধান্য দেখা যায়—পূর্ব্ব ও উত্তর বাংলায় নহে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, brachycephal শ্রেণীর বাঙ্গালীর নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত। পক্ষান্তরে লেপচা প্রভৃতি উপজাতিদিগের

নাসিকা দীর্ঘ হইলেও চেপ্‌টা ও অনুচ্চ। চেপ্‌টা মুখ ও মঙ্গোলীয় জাতির চক্ষুর বিশিষ্টতা (epicanthic fold) প্রভৃতি অন্যান্য লক্ষণও এই জাতীয় বাঙ্গালীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের দেহের কেশ লোমাদিও মঙ্গোলীয়দের মত অপ্রচুর নহে। ফলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, এই brachycephal জাতির লোক—বাঙলায় যাহারা

১২নং চিত্র

পেরাম্বিকুলাম পর্ব্বতের কাডর উপজাতির পুরুষ। নেগ্রিটো জাতীয়

১৩নং চিত্র

ব্র্যাকীকেফ্যালিক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ—সম্মুখের দৃশ্য

১৪নং চিত্র
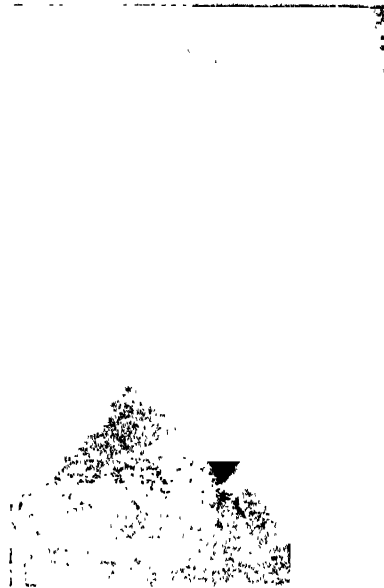
ব্র্যাকীকেফ্যালিক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ—পার্শ্ব দৃশ্য

১৫নং চিত্র

সিকিমের লেপ্‌চা রমণী। ব্র্যাকীকেফ্যালিক-মঙ্গোল জাতীয়

সংখ্যায় প্রবল এবং বিহার ও যুক্ত প্রদেশে যাহাদের অনুপাত অপেক্ষাকৃত কম—ইহারা মঙ্গোলীয় রক্তে উদ্ভূত নহে। পশ্চিম ভারতের সমুদ্রোপকণ্ঠেও এই জাতীয় লোক দেখা

১৬নং চিত্র

ব্র্যাকীকেফালিক মঙ্গোল জাতীয় লিপচা পুরুষ

যাইতেছে। মধ্য ভারতের ভিতর দিয়া এই শ্রেণীর বাঙ্গালীদের সহিত তাহাদের যোগাযোগ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ডাক্তার দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ১৯১১ সালের Indian Antiquary পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার একটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণদের (চিত্র ১৭) সহিত বাঙ্গালী কায়স্থদের বহুসংখ্যক পদবীর মিল আছে। বাংলাদেশে এই জাতিটী উত্তর-পূর্ব্বে কাছাড়ী ও কোচদের সহিত, চট্টগ্রামে চাকমা ও মগ ইত্যাদির সহিত, এবং পশ্চিমাঞ্চলে সাঁওতাল মুণ্ডা প্রভৃতির সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছে। অবশ্য বাংলাদেশেও কিয়ৎপরিমাণে dolicho-cephalic উত্তর-পশ্চিমা জাতির অস্তিত্ব আছে। ইহাদের সহিত কতকটা সংমিশ্রিত হইলেও brachycephal জাতিটা বাংলার কেন্দ্রীয় জিলাগুলিতে স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে। পক্ষান্তরে পশ্চিম-ভারতের সমুদ্রোপকণ্ঠে এই জাতি (কাথিয়া-বাড়ের 'গুজরাটী' ভাষী হইতে কর্ণাটের 'টুলু' ভাষী পর্য্যন্ত) পূর্ব্বোক্ত dolicho-cephalic নিম্ননাসাগ্র স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের সহিত সাঙ্কর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে। কুর্গ প্রদেশে এই জাতিটী সর্ব্বাপেক্ষা অমিশ্রিত অবস্থায় বর্ত্তমান। কানাড়ার অধিবাসীগণ (চিত্র ১৮ · ১৯) ও মহীশূর, মাদ্রাজের বেলারী ও কর্ণোড় জিলা এবং ৭৮° দ্রাঘিমা রেখা পর্য্যন্ত প্রদেশের তেলেগুভাষী লোকেরাও এই জাতির অন্তর্গত।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যে brach cephal জাতি আছে, তাহার সহিত এই জাতীয় লোকের কোন সম্পর্ক নাই,

১৭নং চিত্র

নাগর ব্রাহ্মণ-মহিলা—ব্র্যাকীকেফ্যালিক

কারণ তাহারা সে অঞ্চলে নূতন প্রবেশ করিয়াছে। প্রত্যুত বাংলা, গুজরাট, কর্ণাটের brachycephal জাতি যে অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ক্রমে পূর্ব্বে, পশ্চিমে

এবং দক্ষিণে এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে। সম্প্রতি হারাপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর

১৮নং চিত্র

কানাড়ার ব্র্যাকীকেফ্যালিক ব্রাহ্মণ- সম্মুখ দৃশ্য

ধ্বংসাবশেষ খননের ফলে যে সকল নর-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি অধিকাংশই নাল-শিয়ালকোট জাতীয় হইলেও তন্মধ্যে কয়েকটী brachycranial শ্রেণীর করোটীও পাওয়া গিয়াছে। স্যার জন্ মার্শাল কর্তৃক সম্পাদিত *Mohenjodaro and the Indus Civilization* নামক যে পুস্তকখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কর্ণেল Sewell ও লেখক এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। এই আবিষ্কারের ফলে মনে হয় যে, সিন্ধু প্রদেশ হইতে কূর্গ পর্য্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলে এবং পূর্ব্ব ভারত ও বাংলায় আজ যে brachycephalic alpine জাতিটী

১৯নং চিত্র

কানাড়ার ব্র্যাকীকেফ্যালিক ব্রাহ্মণ—পার্শ্ব দৃশ্য

বিস্তৃত হইয়া আছে, ইহারা মহেঞ্জোদারো হারাপ্পার প্রাচীন brachycephalic জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। *

আগামী সংখ্যায় সুদূর পর্ত্তুগালস্থ এভোরায় পুস্তকালয়ে সযত্ন-সংরক্ষিত ডন্ এ্যান্ট নিয়ো নামক বাঙ্গালী খৃষ্টানের লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের বঙ্গভাষার নমুনা সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি, বি-লিট, (অক্সন্) মহোদয়ের গবেষণামূলক সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবে।

* এই প্রবন্ধ কলিকাতা মিউজিয়ামে আমার প্রদত্ত একটী ইংরাজী বক্তৃতা হইতে সঙ্কলিত ও পরিবর্দ্ধিত। (Modern Review, নভেম্বর ১৯২৬)।

প্রাচীন বেদান্ত ও নব্য-বিজ্ঞান

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

যে-ধর্ম্মের ভিত্তি দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে, সেই ধর্ম্মই বলবান ও মানুষের কল্যাণকর; কিন্তু সেই দর্শনের আবার ভিত্তি হওয়া উচিত বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উপর। বিজ্ঞান বলতে বুঝতে হবে Science; Science বলতে সাধারণ লোক পাশ্চাত্ত্য দেশের জড়বাদকেই বোঝেন; কিন্তু Science মানে বিশুদ্ধ যুক্তিবিচারসহ বিশেষ জ্ঞান। শুধু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান আর্য্যশাস্ত্র মতে মিথ্যা জ্ঞান বা মায়া। যে বস্তু যা নয় স্বরূপে তাকে অন্যরূপে অনুভব করাকেই মিথ্যা বলা হয়; মিথ্যা অর্থে 'নাস্তি' নয়, যা নাই তার 'অস্তি'-বোধই মিথ্যা।

প্রাচীন ভারতীয় মনীষীরা আত্মা বা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এ সব তত্ত্বকেও বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত মনে করতেন। মন বা বিষয়-চৈতন্য যে Science-এরও আলোচ্য হতে পারে তা Psychology শাস্ত্রই প্রমাণ করছে।

বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে (subjective ও objective experiences) যুক্তিবিচার, পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ করে, নিখাদ্ করে দিলে, মন তার উপরে ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা দ্বারা দর্শনশাস্ত্রের ইমারৎ গড়ে তুলে, বিশ্ব-সম্বন্ধে ও আত্মাসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত খাড়া করে। ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ এই তিন তত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত হ'লেই জীবনের ব্যবহারের জন্য ধর্ম্মগঠন সার্থক হবে।

ভূমার সঙ্গে (ultimate real) জীবের বা জড়ের (apparent real) যে ঠিক কি সম্বন্ধ তা স্থির না হ'লে ভূমার realisation-এর পদ্ধতি বা পন্থা নির্ণীত হতে পারে না।

যে ধর্ম্ম যত বেশী বিজ্ঞান-অনুমোদিত দর্শনশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই ধর্ম্মই তত মঙ্গলজনক। এই লক্ষণ ধরে' চিরকাল সব দেশে ধর্ম্মের দুই ভেদ হ'য়ে এসেছে। অজ্ঞানীদের ধর্ম্ম লৌকিক ও বেশীমাত্রায় আনুষ্ঠানিক; বাহ্য ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভরশীল। জ্ঞানীর ধর্ম্মবিজ্ঞানে অনুষ্ঠানের ও আচারের বালাই নাই। অজ্ঞানীর অনুষ্ঠান ধর্ম্মভাবমূলক, ভয়, ভক্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত; জ্ঞানীর ধর্ম্ম জ্ঞানমূলক; তাতে ভাবের বাড়াবাড়ি নাই; মিথ্যার লেশমাত্র তাতে নাই; মানুষকে মাকাল ফল দিয়ে ভুলিয়ে ভয় দেখিয়ে ভাল করবার চেষ্টা জ্ঞান-ধর্ম্মে নাই।

প্রাচীন ভারতে আদিম কাল হ'তেই দুই রকম ধর্ম্ম পাশাপাশি চলে এসেছে। সাধারণ অজ্ঞানী লোকে বৈদিক যাগযজ্ঞবহুল ধর্ম্মসাধনা নিয়ে থাকতো; জ্ঞানী লোকেরা বিচার দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় ক'রে ইহ-পরকালের আশা আশ্বাস ছেড়ে পরম সত্য কি তারই অনুসন্ধানে জ্ঞানমার্গের পথিক হ'তেন; যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, কণাদ, বুদ্ধ এঁরা সব জ্ঞানধর্ম্মবীর।

ভারতীয় ষড়্‌দর্শন ক্রমপর্য্যায়ে ধর্ম্মকে দর্শনের উপর এবং দর্শনকে Science, বিশ্ব-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রবারই চেষ্টা।

বেদের বহুদেবতাবাদ এবং যাগযজ্ঞাদি দ্বারা দেবতাদের অনুগ্রহ ক্রয় করত স্বর্গলাভের ব্যবস্থাকে দর্শনশাস্ত্রপ্রণেতারা অজ্ঞানীর সকাম ধর্ম্মসাধনা ব'লে গণ্য ক'রতেন। গীতাশাস্ত্রেও এই ক্রিয়াবহুল বাহ্যধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শিত হ'য়েছে।

ষড়্‌দর্শনের চেষ্টা ধর্ম্মকে যুক্তির ভিত্তিতে, rational basis-এ প্রতিষ্ঠিত করা। এই চেষ্টার সূত্রপাত উপনিষদের ঋষিদের প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা হ'তে।

বিকৃত ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়াধীন মনকে প্রজ্ঞা দ্বারা শোধিত না ক'রে নিলে তাতে কোনো অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সত্য জ্ঞান হয় না। মনকে এই জন্য ঠিকভাবে যুক্তি-তর্ক করবার প্রণালীতে বিচারপটু ক'রে নিতে হয়। এই জন্য Logic বা তর্কশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা। দ্বিতীয় প্রয়োজন; মন ও বুদ্ধিশক্তির আলোচ্য বিষয়ে তন্ময়তা, concentration. Concentration অর্থ চিত্তের একাগ্রতা। এই একাগ্রতা পূর্ণমাত্রায় অনুশীলিত হ'লে সমাধি অবস্থা হয়। সমাধির এ অর্থ নয় যে, নবদ্বার বন্ধ করে অসাড় মূর্চ্ছাবস্থায় আসতে হবে। অবুঝ মূর্খ সন্ন্যাসীরা সমাধির এই কদর্থ ক'রেছে। সু-তর্কশক্তি উদ্বুদ্ধ হ'লে, সমাধি আয়ত্ত হ'লে তবে তত্ত্ববিচারে অগ্রসর হওয়া যায়।

এই জন্যই ষড়্‌দর্শনের সব গোড়ার শাস্ত্র হ'চ্ছে ন্যায় ও যোগ, হঠযোগ নয় রাজযোগ। Rational (যুক্তিমূলক) ধর্ম্মকে বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত ক'রতে গেলে মনকে অন্তর ও বহির্জ্জগৎকে জ্ঞানের দ্বারা আয়ত্ত ক'রতে হবে। যাকে বলা চলে Physics leads to Psychology and then to Metaphysics

কণাদ ঋষি বিশ্বের সৃষ্টিব্যাখ্যাতে দুটী মূল তত্ত্বের আভাস পান, জড় পরমাণু ও ঈশ্বর-চৈতন্য। অসংখ্য জড় পরমাণুর যোগবিয়োগে গুণধর্ম্মযোগে এই বিশ্ব উৎপন্ন কিন্তু efficient cause (মূল হেতু) হ'চ্ছেন ঈশ্বর-চৈতন্য। কণাদকে Dualist, দ্বৈতবাদী বৈজ্ঞানিক বলা চ'লতো, কিন্তু অসংখ্য পরমাণু মানাতে তিনি বস্তুতঃ Pluralist, 'বহুতত্ত্ববাদী'। মানবপ্রতিভার চেষ্টাই এই যে, অধ্যাত্মবিদ্যায় মূল তত্ত্ব সংখ্যা যত কমাতে পারা যায় ততই ভাল। কপিলের সাংখ্য শাস্ত্রে মূল তত্ত্ব দুইটীতে দাঁড়ায় – প্রকৃতি, Primal matter ও পুরুষ, Pure spirit; কপিল Scientific বা Rational Dualist. বেদান্ত আর একপদ উপরে উঠে এক তত্ত্বে পৌছুলেন – সেই এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব আত্মচৈতন্য বা ব্রহ্ম (pure consciousness)।

পাশ্চাত্যদেশে বিজ্ঞান-বিদ্যা মানুষকে স্বাধীন চিন্তাবলে যুক্তিবিচারসাহায্যে বিশ্বতত্ত্ব বুঝিয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের মিথ্যা মোহ হ'তে উদ্ধার ক'রতে অগ্রসর হয়। গ্রীসদেশের অতি প্রাচীন বিজ্ঞানবিদ্যা ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্‌ব্যোমকে পাঁচ মূল পদার্থ ব'লে মেনে নিয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্যার প্রথম দিকে জড় যে মূলে পরমাণুরূপী তা প্রচারিত হ'লো; এবং এই পরমাণুর জাতিসংখ্যা নির্ণীত হ'ল ষাট সত্তর রকম। ক্রমে উনবিংশ শতাব্দীতে পরমাণুর জাতিসংখ্যা নব্বই, বিরেনব্বই সংখ্যায় স্থির হ'ল। উনবিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞান সাংখ্যীয় দ্বৈতবাদ; কারণ জড় ও শক্তি এই দুই তত্ত্বের সহযোগে যে বিশ্ব উৎপন্ন, এই কথাই সেই বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিল। তবে সাংখ্যে ও আধুনিক জড়বিজ্ঞানে একটু ভেদ আছে, সাংখ্য-স্বীকৃত দুই তত্ত্বের মধ্যে, একটী spirit, অন্যটী matter; কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের স্বীকৃত দুই তত্ত্ব matter ও force আসলে non-spiritual; দুইই জড়-স্বভাবের। তাদের মতে 'চেতনা' পরভবিক; জড় হ'তে দৈবযোগে উৎপন্ন।

বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যবিজ্ঞান দ্বৈতবাদ ছেড়ে অদ্বৈতবাদে এসে পৌছেছে। এ মতে জড় ও শক্তি আলাদা দুই তত্ত্ব নয়। একটী মাত্র তত্ত্ব আছে, তার এক ভাব (aspect) static matter, অন্য ভাব dynamic শক্তি; যাবতীয় পরমাণু আর জড়ের চরম রূপ ব'লে গ্রাহ্য হয় না; সব জাতের পরমাণুই তড়িৎ-শক্তির (electricity) দ্বিবিধ কণিকার (proton ও electron) সজ্জাসমাবেশভেদে উৎপন্ন। এই আদিম পদার্থকে Sir W. Crookes protyle নাম দিয়াছিলেন; এখন দেখা যাচ্ছে সে বস্তু electricity ছাড়া আর কিছুই নয়। বিবিধ শক্তি heat, electricity, magnetism ইত্যাদি সমস্তই এখন জানা গিয়াছে তড়িৎ বা electricityরই অবস্থান্তর।

মোট কথা জড় ও শক্তি এখন আর দুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব নয়; একই বস্তু জড়বৎ ও শক্তিবৎ ব্যবহার করে। যাকে বলা যায় Electricity behaves as Matter, এবং Matter behaves as Electricity.

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ও বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ-ভাগে পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান দ্বৈতবাদে এসে পৌছেছে। কিন্তু এখনো এই বিজ্ঞান বেদান্তের অদ্বৈতবাদের ঠিক সুর ধরেনি।

সুর অবশ্য উঠেছে বিগত দশ পোনেরো বৎসর ধরে। যে মনচৈতন্যকে জড়ের আকস্মিক epiphenomenon ব'লে গত শতাব্দীর বিজ্ঞানবিদ্যা প্রচার করেছিল, এখন সেই মনকেই নব্যবিজ্ঞান সব মূলের একমাত্র 'তত্ত্ব' ব'লে প্রচার ক'রছেন। এবং সেই 'মন' সাধারণ বিষয়চেতনা নয়। এক নির্গুণ চিৎপদার্থই যে বিশ্বের মূলতত্ত্ব, 'new physics'এর যুগের পণ্ডিতরাই সেই কথা তুলেছেন।

বেদান্তের সঙ্গে নব্যবিজ্ঞানের ভাব-সাদৃশ্য কত যে নিকট, বর্ত্তমান প্রবন্ধে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে তাই দেখাবার চেষ্টা ক'রবো।

তদগ্রে বেদান্তের সিদ্ধান্তের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। কেননা অনেকে মায়াবাদ বেদান্তের সিদ্ধান্ত ঠিক ভাবে বোঝেন নি বা বুঝতে আগ্রহ রাখেন না।

ভারতের সব দর্শনের শিরোমণি ছিলেন বেদান্ত (এখনো আছেন)। সেই বেদান্তের ভিত্তিতে যে জ্ঞানধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত

তার নাম ব্রহ্ম-বিদ্যা। এই ব্রহ্ম-বিদ্যার সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রচারক ও সাধক ছিলেন উপনিষদের ঋষিরা। যে বেদান্ত ধর্ম্ম বনবাসী সন্ন্যাসী ও প্রাসাদবাসী দণ্ডধারী রাজর্ষিদের মধ্যে গোপন বিদ্যা ছিল, পরমকারুণিক বুদ্ধদেব সেই ধর্ম্মকে সাধারণের ধর্ম্ম ক'রবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। একথা পরম পূজ্য বিবেকানন্দের কথা এবং অতি গভীর সত্য কথা।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জগতে এই জ্ঞানমূলক দার্শনিক ধর্ম্মের স্থান নিয়েছে science বা বিজ্ঞান-শাস্ত্র। আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা অজ্ঞানে অর্থাৎ না জেনে বেদান্তবাদী: বেদান্ত শাস্ত্র জ্ঞানের দিক দিয়ে যুক্তি ও বিচারসাহায্যে, logic অবলম্বন ক'রে জীব ও জগৎকে বোঝাবার চেষ্টা করেন; বিশ্বের চরম কারণ বা 'মূল'কে বাইরের দিকে ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরবার বা বোঝবার চেষ্টা না ক'রে, আত্মা বা আত্মজ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে অন্তর্মুখ হ'য়ে জানবার ও বোঝবার চেষ্টা ক'রেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানবাদীরাও প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের লৌকিক সৃষ্টিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে নিজেদের জ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণযোগে বিচারযুক্তিসাহায্যে মন ও জড় জগৎকে এবং উভয়ের সম্বন্ধ কি, কি হ'তে এই দুই তত্ত্ব উৎপন্ন, এই সব বিচার ক'রতে ব'সেছেন।

বেদান্তবিদ্যার উদ্দেশ্য বিচার দ্বারা তত্ত্ব নিরূপণ ক'রে মায়া বা অজ্ঞানের বাঁধন হ'তে মিথ্যার দাসত্ব হ'তে আত্মাকে মুক্তি দেওয়া। বিজ্ঞানেরও উদ্দেশ্য যুক্তিবিচার ও নিপুণ পরীক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জীব ও জগৎতত্ত্ব বুঝে নিয়ে Nescience বা মিথ্যা জ্ঞানের হাত হ'তে উদ্ধার পাওয়া।

এ স্থলে পাঠক প্রশ্ন ক'রতে পারেন, "এ কি আশ্চর্য্য কথা! জড় বিজ্ঞান ও পবিত্র বেদান্ত বিদ্যার সিদ্ধান্ত এক?"

"কে না জানেন এই সে দিনকার কথা—বিজ্ঞানের পুরোহিত Tyndall, Hæckel যখন দর্পভরে প্রচার ক'রেছিলেন যে—জীব ও জগৎ উভয়ই এক অজ্ঞেয় আদিম জড় হ'তে উৎপন্ন, এবং জড়ের স্বরূপ হ'চ্ছে মূলতঃ পরমাণু প্রকৃতি! এঁরাই সদর্পে উক্তি ক'রেছিলেন এই যে আত্মা—এই যে মন ও তার চৈতন্য, এ দুইই জড় পরমাণুর পরস্পর মিলন-মিশ্রণ হ'তে দৈববশাৎ উদ্ভূত! Consciousness, চৈতন্য বস্তু জড়েরই একটা আকস্মিক ব্যতিক্রম, epiphenomena. এখনো জড় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে die-hard অনেক আছেন যাঁরা জগতের অভিব্যক্তির মূলে সচেতন মনের ক্রিয়ার কথা শুনলে হেঁসে অস্থির হন। এখনো তাঁরা সদর্পে জোর গলায় বলেন—Newton বা Plato, যীশু বা বুদ্ধ যত বড় মস্তিষ্কবানই হন, সবারই প্রতিভা ও আত্মার উৎপত্তি ঐ সুদূরতম প্রাণহীন, অন্ধ, জড় পরমাণু সমুদ্রসদৃশ ঘূর্ণমান বাষ্প-নীহারিকা হ'তে—

"তা ছাড়া সবাই জানেন যে বেদান্তের মূল কথা মায়াবাদ! আর জড় বৈজ্ঞানিক হ'চ্ছে ভীষণ মাত্রায় Realist বেদান্তের সিদ্ধান্ত হ'চ্ছে –

> "শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
> ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥"

"অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, জীব নাই জগতও নাই, জীব ব্রহ্ম একই বস্তু! এ সত্ত্বেও আপনি ব'লে ব'সলেন বিজ্ঞান ও বেদান্ত একই কথা বলে?"

উত্তরে বক্তব্য এই যে বিজ্ঞান ব'লতেই জড়বিজ্ঞান বুঝতে হবে তার মানে নাই। যে ব্যক্তির মতিগতি theistic তিনি নিজের ঈশ্বরবাদকে বা pantheismকেও আসল বেদান্ত ব'লতে সাহস করেন, তেমনি জড় বৈজ্ঞানিকও নিজের creedকে আসল বিজ্ঞানবাদ ব'লতে দ্বিধা করেন না। জড় বিজ্ঞান যদি বিজ্ঞান হয় আত্মবিজ্ঞানও বিজ্ঞান নয় কেন?

বিজ্ঞান শাস্ত্র ব'লতে বুঝতে হবে সেই শাস্ত্র, যার উদ্দেশ্য স্বাধীন যুক্তিবিচার ও পরীক্ষণ দ্বারা জগৎতত্ত্ব নির্ণয় করা। অন্ধ ভাবে ও গতানুগতিক ভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তিকে মেনে না চ'লে স্বাধীন চিন্তার ও ন্যায়ের বিচার দ্বারা কোনো সিদ্ধান্তে আসা বিজ্ঞান ও বেদান্ত উভয়েরই উদ্দেশ্য।

তা ছাড়া পাঠক মনে রাখবেন, বেদান্তে দুই ভিন্ন standpoint হ'তে তত্ত্ববিচার করা আছে। একটী হ'ল পারমার্থিক (theoretical) দৃষ্টি, অপরটী হ'ল ব্যাবহারিক (practical) দৃষ্টি।

পারমার্থিক দৃষ্টিতে বেদান্ত বলেন একটী চরম তত্ত্ব আছে; যার স্বরূপ ঐন্দ্রিক জ্ঞানে, অবিশুদ্ধ মনে জানা যায় না; এই sense-knowledge ও untrained মনের বুদ্ধিশক্তিকেই মায়া বলা হয়। চরম তত্ত্ব মায়ার দ্বারা আবৃত। অসংস্কৃত অবিশুদ্ধ জ্ঞানে চরম তত্ত্ব জানা যায় না, এই জ্ঞানে আমরা চৈতন্যকে ও বহির্জ্জগৎকে দুটা

আলাদা বস্তু ব'লেই ভাবি, এবং দুইকেই যেরূপে অনুভব করি সেই রূপটাকেই সত্য ব'লে ভাবি। আত্মাকে সাকার সগুণ দেখি, বিষয়বস্তুকে বর্ণে গন্ধে রসে রূপে বিচিত্র ও বহু দেখি; এবং এই দুই ছাড়া তৃতীয় এক সৃষ্টিকর্ত্তাকেও কল্পনা করি।

পারমার্থিক দৃষ্টিতে বুঝা যায়, আত্মার জ্ঞান হ'তে স্বতন্ত্র ভাবে কোনো পদার্থ রূপরসগন্ধ নিয়ে নাই। প্রতীয়মান জগৎটাই appearance, phenomena, মিথ্যা; অর্থাৎ যাহা যা নয় তাকে তাই দেখায়। জড় (matter), পরমাণু (atoms), এবং জড় হ'তে স্বতন্ত্র একটা substantial জড়ধর্ম্মী দেহ-বদ্ধ ছোট আত্মা ও বহির্জ্জগতের অন্তরে আর একটা বৃহত্তর আত্মা, এই সব কল্পনা assumption, theory, hypothesis মাত্র!

জীবের ব্যবহারজীবনে এই সব কল্পনা ধারণার মূল্য আছে, নইলে লোকব্যবহার চলেই না। চরম সত্য নিয়ে ঘর সংসার ও দ্বৈতব্যবহার করা যায় না।

আছে মাত্র অনুভবকর্ত্তার জ্ঞান। আর যা কিছু জড় বা পরমাণু, প্রাণ, জল, স্থল, বায়ু, স্বর্গ, নরক, দেবদেবী, মানবরূপী সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, গুরু-লঘু, সমস্তই এই জ্ঞানের খেলা—জ্ঞানের রূপভেদ মাত্র। যেমন সোণা এবং সোণার রূপ—হার, বলয়, কঙ্কণ, ইত্যাদি। সোণা হ'তে সোণার গহনাকে, সমুদ্র হ'তে তরঙ্গকে যেমন ভিন্ন করা যায় না, তেমনি consciouness বা চৈতন্য হ'তে তার নানা রূপকে তফাৎ করা যায় না। যেমন চাকার কেন্দ্র স্থির আছে, চাকা ও তার নেমিগুলা ঘুরছে, তেমনি আত্মার জ্ঞান আছেই, কেবল তার রূপ প্রবাহ ভাবে ব'দলে চ'লেছে। আত্মা বা 'ব্রহ্ম' নিত্য স্থির র'য়েছেন, জগৎ রূপ cinematograph বন্‌বন্‌ ক'রে ছুটেছে। জ্ঞান অর্থে ব্রহ্ম; ব্রহ্ম মানেই আত্মা; আত্মা কার? অনুভবকর্ত্তার, Knower ও Perciver যিনি, তাঁর; অনুভব করেন যিনি তিনিই আত্মা, অহং—'আমি'।

এই অহং একমাত্র, দুই নয়; অর্থাৎ যে নিজেকে অহং ব'লে অনুভব ক'রছে, সে দুটা 'অহং', দুটা 'আমি' ব'লে নিজেকে দেখে না; একটা 'আমি' দেখছি, দ্বিতীয় আমি দৃষ্ট হ'চ্ছে এ হয় না। Subject চিরকালই সর্ব্বাবস্থায় subject, বিষয়ী object হ'তেই পারে না।

এই কথার মানেই হ'চ্ছে 'আত্মা' এক, অদ্বিতীয়। এই আত্মার নামান্তর ব্রহ্ম; এই আত্মারই নামান্তর 'জীব'। ব্রহ্ম হ'ল metaphysical নাম; জীব হ'ল ব্যাবহারিক বা worldly নাম। জীব ও ব্রহ্ম একই আত্মা বা 'আমি' জ্ঞান-এর দুই ভিন্ন অবস্থার নাম। জগৎ দৃশ্য, বস্তুবোধ আমি জ্ঞানেরই বিষয়বোধ।

তত্ত্বতঃ তা হ'লে রইল একটী মাত্র বস্তু, ব্রহ্ম=আত্মা=জ্ঞান। এ ছাড়া স্বতন্ত্র বৃহত্তর এক সৃষ্টিকর্ত্তারূপ পরমপুরুষ ও জগৎ দুই-ই আত্মারই কল্পনা, assumption. এই কল্পনা মন বা 'মায়া' ক'রে নিতে বাধ্য হ'য়েছে…লোকব্যবহারের জন্য। যেমন গণনার সাহায্যের জন্য পৃথিবীকে অচলা ও সূর্য্যকে অচল কল্পনা ক'রতে বাধ্য হই আমরা। লোকব্যবহারের জন্য অনেক মিথ্যাকে নিয়েই চ'লতে হয়; নচেৎ জীবনযাত্রা চলেই না।

এখন দেখা যাক্, এই যে বৈদান্তিক মায়াবাদ, এই যে তথ্য যে, একমাত্র আত্মচৈতন্যই স্থির ও সত্য, আর সব জ্ঞান অনিত্য phenomena, মিথ্যা—এ কথার প্রতিধ্বনি, পাশ্চাত্য ও আধুনিক বিজ্ঞানে পাই কিনা।

আধুনিক চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে Sir Oliver Lodge ও Eddington এই দুই জনের নাম সবাই শুনেছেন।

Eddington Einstein-ব্যাখ্যাত Relativity তত্ত্ব আলোচনা ক'রে ব'লছেন—

"The Reality is in our own consciousness. There are mental aspects deep within the world of physics—' বস্তুবিশ্ব আমাদের নিজেদের অনুভূতির ব্যাপার, বহির্বিশ্বের মধ্যে আমাদের চৈতন্য চারিয়ে রয়েছে।

আধুনিক physics যে সব তত্ত্ব খুঁজে বার করেছে তার প্রায় সবই আমাদের মনেরই কল্পনাজাত।—"Every thing is relative to human perception"এর অর্থ এই নয় যে বস্তু-জগৎ ব'লতে 'কিছুই নাই' এর অর্থ হ'চ্ছে, মূলে একটা 'সৎ' আছেই, আমরা তাকে যে বিচিত্র রূপে দেখছি সে রূপ আমাদেরই মনগড়া, ইন্দ্রিয়ানুভূতিরই ফল। Sir Oliver Lodge মন্তব্যাচ্ছলে বলেছেন—"the pheno-

menal aspect which Reality assumes to us, in other words its appearance does depend on our modes or channels of perception. Reality exists, only we apprehend it in a human way" অর্থাৎ বস্তুবিশ্ব যে রূপে আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ হয়, মানে বস্তুবিশ্বের চেহারাকেই আমাদের, দেখ্‌বার কিংবা বুঝবার ভঙ্গীই রূপ দেয়। বস্তুবিশ্ব রয়েছে, শুধু আমরা তাকে চর্ম্ম-চক্ষুতে যেমন পারি দেখি।—

একেই বলা হয় মায়িক জ্ঞান।

একটা কিছু আছেই, তাকেই আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়যোগে বিকৃত রূপে দেখি। এই 'একটা কিছু'র যে কি চরম রূপ তা মানুষ কখনোই মায়িক জ্ঞানে (sense-knowledge) ব'লতে পারবে না। তা চিরকালই অব্যক্ত থেকে যাবে। তা 'সৎ' মাত্র অর্থাৎ undifferentiated জ্ঞানরূপ মাত্র। যে দ্রব্য নির্গুণ তার জ্ঞানও নির্গুণ (unconditioned); এক কথায় এ ক্ষেত্রে 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞেয়' মিশে এক হ'য়ে যায়।

বেদান্তগুরু শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকের ৫ম খণ্ডের ৪র্থ ব্রাহ্মণের ভাষ্যে অতীব স্পষ্টাক্ষরেই ব'লেছেন—"জ্ঞান ব্যতিরেকে বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নাই—অনুভূত বিষয় মাত্রই তেজ জল ও পৃথিবীর (matter in solid, liquid, gaseous forms) বিকার, উক্ত তেজ জল ও পৃথিবী সতেরই জ্ঞান পরিণাম" অর্থাৎ জড়ের এই তিনরূপ—সতেরই (thing in itself) জ্ঞান পরিণাম।—ক্ষিতি অপ তেজ বস্তুমাত্রই আকারতঃ মিথ্যা (mere forms in appearance) স্বরূপতঃ সত্তাহেতু সত্য (Real as thing in itself, unreal as apperance) উপনিষদে আছে "সঙ্কল্পেতাং দ্যাবা পৃথিবী" এই আকাশ বাতাস জল স্থল সমস্তই জ্ঞানের (ব্রহ্ম) কল্পনা। কল্পনা অর্থ fictitious নয় assumption, appearance; সৎ বস্তু আমাদের ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানে ঐ ঐ রূপে প্রতীয়মান।

Eddington তাঁর প্রদত্ত Swarthmore বক্তৃতায় ব'লেছেন যে আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক বস্তু দুইএর মধ্যে কোনটা বেশী সত্য, এ সন্দেহ হ'লে "Let us not forget this—Mind is the first and most direct thing in our experience......all else is remote inference." 'আত্মা বা ইদম্ অগ্র আসীৎ' শ্রুতি-কথা স্মরণ করুন। তার-পর আরো শুনুন—

"That envioronment of space, and time and matter, of light and colour and concrete things which seem so vividly real to us is probed deeply by every device of physical science and at the bottom we reach *symbols*. Its substance has melted into shadows. None the less it remains a real world if there is a background to the symbols—an unknown Quantity which the mathematical symbol 'x' stands for We think we are not wholly cut off from this background. It is to this background that our own personality and consciousness belong.—"*Science & the unseen wrold*, page 24."

অর্থাৎ স্থান, কাল ও পাত্রের, আলোক ও বর্ণের এবং পরিদৃশ্যমান যা-কিছু নিয়ে এই পারিপার্শ্বিকতা, যা নাকি আমাদের কাছে এত সুস্পষ্ট, বস্তু-বিজ্ঞান একে সম্পূর্ণ নগ্ন ক'রে আমাদেরকে এর অন্তরালে নিয়ে দেখিয়েছে যে, সেখানে রয়েছে কেবল কতকগুলি চিহ্ন। এর স্বত্তা ছায়ায় মিলিয়েছে সেখানে। কিন্তু এই চিহ্নসমষ্টির যদি আমাদের অজানিত কোন কিছুর পশ্চাদ্‌পট থাকে, অঙ্কশাস্ত্রে যাকে বলা হয়েছে—x, তাহ'লে এ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ সত্য। আমার মনে হয়, এই পশ্চাদ্‌পট হ'তে আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হইনি। এই পশ্চাদ্‌পটেই আমাদের ব্যক্তিগত চৈতন্যের বাসভূমি।

বক্তা আধুনিক শতাব্দীর বিজ্ঞান-জগতের একজন মান্য-গণ্য অগ্রণী এবং একজন "maker of modern science," তাঁর মুখে এই সুর। মায়াবাদ বেদান্ত হ'তে কোথায় এর পার্থক্য? শঙ্করের উক্তি স্মরণ করুন "জগৎ বা জীব নাম-রূপে মিথ্যা সৎরূপে সত্য।" ছান্দোগ্যভাষ্য।

গত শতাব্দীর জড়বৈজ্ঞানিকদের সদর্প উক্তি ছিল যে, জড় পরমাণুই জীব ও সজীব জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত। কে একজন ব'লেছিলেন—'give me atoms, motion and enough time and I will create a world-' এ সুর আর নাই; জড় পরমাণুর প্রতি এই অচলা ভক্তি ও দৃঢ়বিশ্বাসের ভিত্তি ট'লেছে।

এখনকার এই নব্য শতাব্দীর সুর একেবারে উল্টা—"We now realise that science has nothing to say as to the intrinsic nature of atom. The physical atom is a schedule of pointer readings—attached to some unknown background. *Why not attach it to something of a spiritual nature of which a prominent characteristic is thought ?*

Eddington—*Nature of physical world.*

অর্থাৎ আমরা বুঝ্ছি যে, পরমাণুর সত্তা স্বরূপ সম্পর্কে বিজ্ঞানের কিছুই বক্তব্য নেই। জড়পরমাণু হ'চ্ছে কোনও অনামিক পশ্চাদ্‌পটের ইঙ্গিতাত্মক চিহ্ন-বিশেষ। একে যদি আধ্যাত্মিক আখ্যা দিই (মনতো এরই অঙ্গীভূত) তবে তাতে কি দোষ ?

বিখ্যাত physicist R Millikan বলেন—Matter is no longer a mere game of marbles played by blind men. জড় পরমাণু ব'লতে আমরা এখন আর অন্ধ জনতার গোলা ছোড়াছুড়ি বুঝিনে।

গত শতাব্দীতে যেমন পরমাণুকে একমাত্র ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ ব'লে মেনে নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা জড়ের জয়ধ্বজা তুলে ডঙ্কা বাজিয়েছেন, এ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকরাই আবার সেই পরমাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই ঘোর সন্দেহ পোষণ ক'রেছেন। নব্যপদার্থ শাস্ত্র (new physics) পরমাণু ও ইলেকট্রনের পিছু ছুটে ছুটে ছায়ানুসরণের মতই ব্যর্থ প্রয়াস বুঝে এখন স্পষ্টই স্বীকার ক'রছেন যে 'জড়' ব'লতে যা আমরা বুঝছিলাম তার অস্তিত্বই নাই ; আমাদের কল্পনার ছায়ার পিছন পিছন ছোটাই সার হ'য়েছে। কায়াটা 'substance' আমাদের মনেরই ভিতর, এক কথায় আমাদের মনকল্পিত বা মন-গড়া একটা ideaকে বাইরে দেশে কালে প্রক্ষেপ ক'রে আমরা জড়ের concrete চরমরূপ প্রচার ক'রছি।

মোট সার কথা এই Eddingtonএর ভাষায় বলি, 'To put the conclusion crudely the stuff of the world is mind-stuff—by mind I do not exactly mean mind ; and by stuff I do not at all mean stuff ; the mind-stuff of the world is of course something more general than our individual conscious minds etc.—'

এর অর্থ এই যে, একটা নির্গুণ চিৎ তত্ত্বই বিশ্বের মূল পদার্থ।

"The fact that a piece of matter has been reduced by Relativity theory to a system of events, that it is *no longer regarded as the endurig stuff* of the world makes the hypothesis that the 'physical' and the 'mental' are essentially similar very possible." ভাব এই যে, Relativity theory যখন জড় খণ্ডকে কতকগুলা 'ঘটনার' সমষ্টিতে পরিণত ক'রলো, তখন জড়কে আর বিশ্বের অবিনশ্বর অব্যয় মূলতত্ত্ব ব'লে মানা যায় না। জড় আর 'চিৎ' এই দুই তত্ত্ব যে মূলে এক তত্ত্ব, এর আর সন্দেহ থাকে না। এই সত্য ধার্য্য হ'ল যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির মূল কারণ জড়পদার্থ নয়, কতকগুলা 'events ;—এই event গুলার স্বরূপে কি ? বিজ্ঞান উত্তর দিতে অসমর্থ। খুব সম্ভব "That these events are of the same nature as our percepts i.e. thay are what we call mental", (Eddington) আধুনিক বিজ্ঞানের এতাদৃশ যুক্তিবিচার হ'তে যে সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী হয় তা হ'চ্ছে, 'Religion first became possible for Reasonable scientific man from about the year 1927. Why ? because it was in that year physicists saw strict causality abandoned in the material world.'

অর্থাৎ জড় জগতে যে অলঙ্ঘ্য কার্য্যকারণবাদ বৈজ্ঞানিক অভ্রান্ত সত্য ব'লে মেনে আসছিল, তা বাধ্য হ'য়ে অতঃপর ত্যাগ ক'রতে হ'ল। এতে কি দাঁড়ায় ? the Hinterland of Science is a spiritual world ! দাঁড়ায় এই যে, জড় বিজ্ঞানের আয়ত্তের ও সীমানার বাইরে অর্থাৎ Beyond the veil একটা spiritual world আধ্যাত্মিক জগৎ আছে। এই বিশ্বাস জ্ঞানী মাত্রকেই ভক্ত ক'রে তুলবে। জড়বিজ্ঞানের উপাসকরা অনেকে নাস্তিক ও সন্দেহবাদী (skeptic) এবং অজ্ঞেয়বাদী ব'লে নিন্দিত হ'য়ে এসেছিল ; কিন্তু অতঃপর বিজ্ঞানবিদের পক্ষে ধর্ম্মসাধনা সম্ভব হবে। ভবিষ্য বিজ্ঞানশাস্ত্রে দর্শনের ও ধর্ম্মের মহামিলন হবে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, আজ পাশ্চাত্ত্য দেশে যা সম্ভব হ'তে চ'লেছে হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতের তপোবনেই ঔপনিষদ বেদান্ত বিভায় দর্শন ও ধর্ম্মের সেই অপূর্ব্ব সমন্বয় হ'য়েছিল।

আর্থিক-জগৎ

অর্থনীতি, ব্যাঙ্কিং, ইনসুরেন্স শিল্প-বাণিজ্য বিভাগের সম্পাদনে সাহায্য করিতেছেন ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, এম্‌-এ (কলি), পি-এইচ-ডি (লণ্ডন)।

নিবেদন

'উপাসনা' নববর্ষে প্রবেশ লাভ করিতেছে। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার সেবা ও সাধনা সার্থক করিয়া তোলাই 'উপাসনা'র পূজারিগণের প্রধানতম কামনা। কেবলমাত্র কাব্য, সাহিত্য ও ললিতকলার উপচারে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের দেবতার আজ যেন পরিতৃপ্তি হইতেছে না। তাই গত কয়েক বৎসর যাবৎ 'উপাসনা'য় আ র্থি ক প্র স ঙ্গে র অবতারণা করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষার জীবনকে সুনির্ম্মল সাহিত্যরসে অভিষিক্ত রাখিবার আদর্শ লইয়া 'উপাসনা'র জন্ম হইয়াছিল। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আজ পঞ্চবিংশতি বৎসর যাবৎ 'উপাসনা'র সেবকগণ সে আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছেন। বৈচিত্র্য ও কার্য্যকারিতায় আমাদের এই নব-উপকরণ-সংগ্রহ যদি দেশের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ সত্যের দিকে ফিরাইতে পারে তবেই 'উপাসনা'র এই দিকের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

সর্ব্বমঙ্গলা মহাদেবীর ন্যায় আমাদের দেশমাতৃকার রূপ ও শক্তি বহুধা প্রকটিত। তাঁহার উপাসনায় একদিকে যেমন সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকলার প্রয়োজন অপরদিকে তেমনি প্রয়োজন জীবনযাত্রার মূলস্বরূপ নানা দ্রব্যসম্ভারের। জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের সাধনা সার্থক হইবে তখনই, যখন কর্ম্ম-যোগের ভিত্তির উপর তাহাদের প্রতিষ্ঠা হইবে। তাই আজ 'উপাসনা' জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার উপাদান সংগ্রহ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উপাসক যাঁহারা, বৈশ্যকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের চলিবে কি উপায়ে। সমগ্র জাতি আজ যে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বিজয়লক্ষ্মীর সাধনায় ব্রতী হইয়াছে, লক্ষ্মীকে বাদ দিয়া তাহা কখনই সার্থক হইতে পারে না। তাই আজ আমাদের বৈশ্য দেবতার সেবা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

আর্থিক ভারত আমাদের এই বৈশ্য দেবতার বাস্তব প্রতিমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির প্রত্যেক অঙ্গাবয়বের সম্যক সেবা ও পরিপুষ্টির সাধনাই আজ আমাদের জাতির সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। আর্থিক ভারতের সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে প্রধানতঃ দুইটা শক্তির উপর—জনশক্তি ও প্রাকৃতিক উৎপাদনী শক্তি। জনশক্তিকে কর্ম্মকুশল এবং সহিষ্ণু করিতে হইলে একদিকে যেমন চাই সামাজিক আচার ব্যবহারের এবং জীবনযাত্রা প্রণালীর সংস্কার সাধন করা, অন্যদিকে তেমনই প্রয়োজন আমাদের নরনারীর প্রকৃত কার্য্যকরী শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা করা। জাতিকে বাঁচাইতে হইলে তাহার জনশক্তিকে সুস্থ, সবল সুশিক্ষিত ও কর্ম্মপ্রিয় করিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় কেন তাহা সম্ভব হইতেছে না, তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। পরমুখাপেক্ষা ও সর্ব্বতোভাবে দাস-মানসিকতাই যদি তাহার প্রধান কারণ হয়, তাহা হইলে সে কারণ দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। 'উপাসনা'র আ র্থি ক প্র স ঙ্গ বিভাগের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হইবে ইহাই।

প্রকৃতিজ দ্রব্যাদি জাতির আর্থিক উন্নতির সর্ব্বপ্রধান সহায়। ভারতবর্ষে ইহার অপ্রাচুর্য্য না থাকিলেও উৎপাদন প্রণালী কালোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত নহে। তাহা ছাড়া বিশেষ অর্থকর দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বিক্রয়ের ভার বিদেশীয়ের হাতে চলিয়া গিয়াছে। সেজন্য সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা ভূমির সন্তান হইয়াও আমরা দুর্ভিক্ষের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। কি উপায়ে আমাদের দেশের উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধি হইবে এবং আমাদের নিরন্ন দেশবাসীর ক্ষুধা মিটাইতে সে শক্তির প্রয়োগ করান সম্ভব হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

জাতির আর্থিক উন্নতির পরিচায়ক তাহার কৃষি শিল্পজাত ও খনিজ দ্রব্যাদি এবং তাহার আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিনিময় ও ব্যবসায়ের অবস্থা। এই হিসাবে আমাদের গবেষণার ক্ষেত্র হইবে প্রধানতঃ পাঁচটী, যথা :—শ্রমিক ও জন-শক্তি, কৃষি ও খনিজ দ্রব্যাদি, শিল্প, বাণিজ্য এবং অর্থবিনিময় অর্থাৎ আমাদের ব্যাঙ্ক, বীমা, নোট ও মুদ্রা এবং সরকারী আয়ব্যয়ের কথা। এই সকল বিষয়ে ভারতের স্থান পৃথিবীর অন্যান্য শক্তিমান্‌ জাতির তুলনায় কত নিম্নে, অতীতে কিরূপ ছিল এবং ভবিষ্যতেই বা কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। বস্তুতঃ এ সকল গবেষণা সার্থক হইবে তখনই, যখন আমাদের দেশবাসীর মনে এরূপ সঙ্কল্প জাগরূক হইবে যাহার বলে জাতির সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হইবে এবং জগৎসভায় পুনরায় আমরা শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী হইব। ইহাই আমাদের নূতন 'উপাসনা'র সাধন মন্ত্র। জাতীয় জাগরণের এই নবপর্য্যায়ে সেবার যজ্ঞে আহুতি যোগাইবার জন্য আমরা আমাদের পাঠক পাঠিকা, লেখক লেখিকা এবং সমগ্র দেশবাসীকে আহ্বান করিতেছি।

জীবনবীমার কষ্টিপাথর

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়

আমাদের দেশবাসীর মধ্যে বীমার অনুশীলন ও স্বদেশীয় প্রতিষ্ঠানে বীমা করিবার প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক বীমা-কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে। পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিও জাতীয় জীবনের এই উদ্দীপনালাভে বঞ্চিত হয় নাই এবং নূতন স্থানসমূহে কার্য্যবিস্তারের প্রচেষ্টা করিতেছে। ইহার ফলস্বরূপ ভারতীয় এবং বিদেশীয় কোম্পানীগুলির সুবিপুল বাহিনীর দ্বারা প্রতিযোগিতামূলক তীব্র প্ররোচনা চলিতেছে।

জনসাধারণ বিভিন্ন জীবনবীমা কোম্পানির চতুর এজেন্টগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং দালালগণের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কোম্পানির গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা ঠিক বুঝিতে পারে না কোন কোম্পানি নির্ব্বাচন করিতে হইবে—বিভিন্ন কোম্পানির সুখ সুবিধার বিচার করিবার প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা সময় সাধারণতঃ তাহাদের থাকে না।

এই প্রবন্ধটি লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা পাঠে সাধারণ ব্যক্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি ভাল বীমা কোম্পানি নির্ব্বাচন করিবার উপযুক্ত ধারণা পাইতে পারে।

একটি ভাল জীবনবীমা কোম্পানি নির্ব্বাচন করিতে হইলে আমাদিগকে নিম্নলিখিত তিনটী প্রধান বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে :—(ক) অতীত ইতিহাস (খ) বর্ত্তমান কার্য্যধারা (গ) ভবিষ্যতের কর্ম্মপদ্ধতি।

(ক) অতীত ইতিহাস—পুরাতন কোম্পানিগুলির অতীত ইতিহাস অনুধাবন করা যাইতে পারে। প্রায় অধিকাংশ জীবনবীমা কোম্পানিরই বিবিধ বিজ্ঞপ্তি-পত্র সাধারণ ব্যক্তিকে অধুনা নিশ্চয়ই প্রলুব্ধ করিবে কিন্তু ইহা অতি সাধারণ সত্য যে জীবনবীমার পলিসি-লব্ধ সুখসুবিধা প্রদত্ত চাঁদা অপেক্ষা কোন অংশেই বেশী হইতে পারে না। চুক্তিপত্র হইতে আমরা জানিতে পারি না যে, চাঁদার হার বিজ্ঞানসম্মত কি না ও কোম্পানির ব্যয় চাঁদার loading-এর মধ্যে আছে কি না এবং সর্ব্বোপরি মৃত্যু হার গণনা করিবার সময় চাঁদার হারের সহিত সামঞ্জস্য রাখা হইয়াছে কি না। কোম্পানীর ২৫ বৎসরের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলেই আমরা ইহা জানিতে পারিব—কোম্পানির অস্তিত্ব ২৫ বৎসর হইয়াছে ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হইবে যে, কোম্পানি অনেক পরিমাণে দাবী মিটাইতে সক্ষম হইয়াছে।

মেয়াদি বীমার পরিমাণকাল গড়পরতারূপে ধরিলে সাধারণতঃ ২০ বৎসর হয় এবং ২৫ বৎসর কার্য্যকালের পর যে কোম্পানি দাবীর টাকা মিটাইতে সক্ষম হইয়াছে ইহা কার্য্যপরিচালনার পক্ষে প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। সুতরাং বীমাকোম্পানি যতই পুরাতন হইবে, তাহা জনসাধারণের বিশ্বাস সাধারণতঃ ততই আকর্ষণ করিবে।

"সাধারণতঃ" শব্দটি আমি ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছি, কারণ দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন কোম্পানি আছে, যাহারা মৃত্যুজনিত দাবীর টাকা না মিটাইয়া নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। তাহারা চুক্তিপত্রের মধ্যে কোন খুঁত ধরিয়া দাবীর টাকা না মিটাইয়া অব্যাহতি পাইবার একপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়াছে। পাঠকবৃন্দ সরকারকর্ত্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক পুস্তক হইতে এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের কথা জানিতে পারিবেন যাহারা ভ্যালুয়েশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে সহসা সুপ্তি ভঙ্গে আবিষ্কার করিলেন যে কোনও একসময়ের প্রাপ্ত সমস্ত দাবীই মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত! তাহারা চুক্তিপত্র গ্রহণের সময় উদার কিন্তু দাবীর টাকা ফিরাইয়া দিবার সময় ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করেন। সকলেই জানেন সুদূর তিনেভেলী বা মসলী-পটম্ হইতে অসহায় বিধবার পক্ষে দাবীজনিত টাকা আদায়ের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে বৃহৎ জীবনবীমা কোম্পানির সহিত বিবাদ করা কত কষ্টকর। যে কোম্পানিগুলি এই সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা লইয়া ব্যবসা পরিচালন করে তাহারা সাধারণের পরিত্যাজ্য।

গবর্ণমেন্টের "Blue Book" হইতে আমরা একটি উন্নতিশীল সুবৃহৎ জীবনবীমা কোম্পানির কথা জানিতে পারি, যাহা এদিকে আরও এক ধাপ নিয়ে গিয়াছে ; যে লোভনীয় চুক্তিতে দেশবাসীর নিকট আবদ্ধ হইয়া উক্ত কোম্পানি বিশেষ জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন—তাহারই দাবীর সমস্ত টাকা মিটাইয়া দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। এই অজুহাতে যে ঐ চুক্তিজনিত ঋণের পরিমাপ অনুযায়ী টাকা তাহাদের বীমা-তহবিলে নাই! কিন্তু ইহার জন্য কোম্পানি কার্য্য স্থগিত

রাখিল না—শুধু এই বিভাগের কার্য্য স্থগিত রাখিয়া শাখা-হিসাবে ঐ চুক্তি বিভক্ত করিয়া উহার বৃহৎ দায়ের জন্য অতি সামান্য নামমাত্র তহবিল মজুত রাখিল এবং অন্যান্য কার্য্যপ্রণালী চালাইতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক এই যে, কয়েক বৎসর পরে এই চল্‌তি বিভাগে বৃহৎ উদ্বৃত্তি প্রকাশিত হইল কিন্তু কোম্পানি পৃথিবীর সভ্য-জগতের সমস্ত নিয়মানুযায়ী, লুপ্ত বিভাগের ঋণপরিশোধের জন্য কিছুমাত্র অর্থ না দিয়া অভাগ্য পলিসিহোল্ডাদের দাবীর টাকা আদায়ের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য উপায় না রাখিয়া নূতন কার্য্যসংগ্রহের জন্য চলতি বিভাগে উচ্চ 'বোনাস' ঘোষণা করিলেন। লুপ্ত বিভাগের কতক পলিসিহোল্ডার আদালতে যাইয়া নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিল ও তদনুযায়ী অর্থ আদায় করিল কিন্তু অগণিত পলিসি-হোল্ডারদের অধিকাংশকেই হয় চুক্তির অঙ্গীকৃত অর্থকে বিসর্জ্জন দিতে হইল অথবা প্রতিপত্তিশালী বিরুদ্ধপক্ষের প্রস্তাবিত সর্ত্তসমূহের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইল।

এইরূপ অবস্থা কখনই সম্ভবপর হইত না যদি দেশের গবর্ণমেণ্ট নিরীহ প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার প্রাথমিক কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত না হইতেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত বিশেষ বীমাবিদ্ যিনি এই বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তিনি সম্ভবতঃ সুপ্তিমগ্ন ছিলেন এবং তাঁহার "Blue Book"এ ঐ সংবাদটি একটি দীর্ঘ ব্র্যাকেটের দ্বারা দুই বিভাগকে সংযুক্ত করিয়াছিলেন। অসহায় সভ্যবর্গের পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় হইলেও এই কোম্পানিগুলির পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এদেশে রাজনীতিক্ষেত্র ভিন্ন জনসাধারণের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার স্থান নাই। আমি ইহা নিশ্চিত বলিয়া মনে করি যে—স্বাধীন দেশে, যেখানে সাধারণের মতামত প্রকাশ করিবার উপায় আছে তথায়—এই অপরিসীম লজ্জাজনক চুক্তিভঙ্গের ফলস্বরূপ কোম্পানি স্বাধীনচেতা, আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিগণের হস্তগ্রহ হইতে নিস্তার পাইলেও পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়া পাইত না।

এই সব কারণেই আমি বলিতেছিলাম বয়স দেখিয়া কোম্পানিকে সর্ব্বসময় বিচার করা চলে না। আমাদের দেখিতে হইবে, কিরূপে কোম্পানি অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে—কতটা ভ্যালুয়েশন হইয়াছে, ব্যয়ের হার, সর্ত্ত এবং সর্ব্বোপরি সভ্যদিগের সহিত মৃত্যুজনিত দাবীর টাকা মিটাইবার সময় কর্ত্তৃপক্ষ কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাইলে আমরা বিশেষ ইতস্তত না করিয়া একটি পুরাতন কোম্পানি নির্ব্বাচন করিতে পারি—অবশ্য যদি নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়—

ব র্ত্ত মা ন কা র্য্য ধা রা—যদি কোন পুরাতন কোম্পানির অতীত কার্য্যাবলী ন্যায়সঙ্গত হইয়া থাকে তথাপি আমাদিগকে ইহার বর্ত্তমান পরিচালনা লক্ষ্য করিতে হইবে। ইহা সম্ভবপর যে, পরিচালকবর্গের পরিবর্ত্তন হইলে কোম্পানির ব্যয় সংযত না হইয়া ও অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া একাধারে নূতন কার্য্য সংগ্রহ করিতে থাকিবে সুতরাং তাহাদের জীবননির্ব্বাচনে দায়িত্ব থাকিবে না, বিজ্ঞানসঙ্গত মৃত্যুহারকে বৃদ্ধি করিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য তাহাদিগকে সভ্যবর্গের প্রতি সেইরূপ রূঢ় ব্যবহার করি-তেই হইবে। অতীত ইতিহাস এবং বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতি সন্তোষজনক হইলে কোম্পানির ভবিষ্যৎ ইতিহাসও উজ্জ্বল হইবার আশা থাকিবে এবং আমাদিগকে এইরূপ কোম্পানিই নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

নবগঠিত কোম্পানিদের অতীত কার্য্যাবলী নাই, সুতরাং আমরা জানিতে পারি না যে তাহারা চুক্তি অনুযায়ী কাজ করিয়াছে কিনা, কিংবা তাহাদের লোভনীয় চুক্তিপত্র বিজ্ঞান-সম্মত কিনা ও তাহারা সেই অনুযায়ী চলিতেছে কিনা সুতরাং পুরাতন কোম্পানি অপেক্ষা তাহাদের বর্ত্তমান কার্য্যধারা আমাদের আরও বিশেষরূপে বিচার করিতে হইবে। প্রথমত আমাদিগকে দেখিতে হইবে ডিরেক্টারদের পদে কে কে আছেন এবং তাঁহারা কেবল নামেই বিরাজ করিতেছেন না কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন! আমরা বেশ জানি অসৎ বা অক্ষম ব্যক্তিগণ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া নিজেদের নাম দিয়া থাকেন এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ এই সুযোগ লইয়া আমাদের নিরন্ন দেশবাসিগণকে বিমুখ ও বঞ্চিত করিবার সুযোগ পায়। দেশের এই উদার ব্যক্তিগণ কোম্পানি দেউলিয়া হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অনেক সময় এক তীব্র পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়া কোম্পানির সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এদেশে স্বাধীন মত ব্যক্ত হইবার উপায় নাই, নচেৎ এই সমস্ত স্বনামধন্য ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের বন্ধু বা আত্মীয় স্বজনকে

প্রয়োজনাতীত সৌজন্যপ্রদর্শনের ফলস্বরূপ কৃত ক্ষতির জন্য উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা যাইত।

এই সমস্ত কারণে আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গকে লইয়া ডিরেক্টার-সভা গঠিত হইলেই তাহা সাধারণের বিশ্বাসভাজন হয় না। প্রকৃত কার্য্যের জন্য কি উপযুক্ত ম্যানেজার আছেন? তিনি কি কার্য্য-পদ্ধতি ভালরূপ জানেন? অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁহারা কি সততার পরিচয় দিয়াছেন? এই সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর স্বনামধন্য ডিরেক্টার আছেন কিনা সে প্রশ্ন অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

যদি কোম্পানি দুই একবৎসর কার্য্য করিয়া থাকেন তবে কার্য্যবিস্তারের প্রচেষ্টা, ব্যয়ের হার, সভ্যবর্গের সহিত ব্যবহার প্রভৃতির মধ্য হইতেই—আমরা পরিচালকবর্গের স্বরূপ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য অবগত হইতে পারি। যদি কোম্পানি অপেক্ষাকৃত নূতন হয় এবং আমাদের বিচার করিবার কোন বিষয়ই না থাকে, তবে দূরদর্শী কর্ম্মকুশল ব্যক্তিগণ ইহার অভ্যন্তরে না থাকিলে আমরা ইহাকে পরিত্যাগ করিব।

বীমা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে আমি যাহারা ভুঁইফোড়, কেবলমাত্র "স্বদেশী" নামের দোহাই দিয়া থাকে সেই সব কোম্পানির বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছি—অক্ষম বা অদূরদর্শী ব্যক্তিগণের দ্বারা এইগুলি গঠিত হইয়াছে এবং ইহারা কতকগুলি রাজনৈতিক নেতার সহিত প্রতিষ্ঠানের নাম বিজড়িত করিয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে হয় তাঁহাদের ক্ষমতার অতীত কার্য্য সাধন করিবার সাধু সঙ্কল্প পোষণ করিতেছেন নতুবা আমাদের অসহায় দেশবাসিগণকে প্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টায় আছেন। দেশবাসিগণও দেশের কাজ করিতেছেন ভাবিয়া শীঘ্রই তাঁহাদের কবলে পড়িতেছেন। দেশবাসিগণকে এই কার্য্যের জন্য শ্রদ্ধা করিলেও আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ইহা দ্বারা তাঁহারা দেশের প্রকৃত উপকার করিতেছেন না। আমি একথা বলিতেছি না—যে, জাতীয় জীবনের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে যে কোম্পানিগুলি জন্মলাভ করিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটি অবিশ্বাস্য। পরন্তু তাহাদের কয়েকটি প্রকৃত কর্ম্মক্ষম অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং বহুক্ষেত্রে অনেক পুরাতন কোম্পানি অপেক্ষা ভালরূপে কার্য্য পরিচালন করিতেছে, কারণ তাহারা অতীতের অভিজ্ঞতায় বর্ত্তমানের ঝঞ্ঝাবিহীন পথে চলিতেছে।

আমি দেশবাসীকে কতকগুলি ভুঁইফোড় কোম্পানীর বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছি—যাহাদের পরিচয় শুধু 'স্বদেশী' এবং যাহাদের প্রতিশ্রুত সুখ-সুবিধা পুরাতন শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অধিকতর। বিজ্ঞাপিত বলিয়া বিজ্ঞাপনপত্রের মোহে কোথায়ও যাইবেন না। প্রতিশ্রুতি করা খুব সহজ কিন্তু উহা রক্ষা করা সুকঠিন। ইহা হইতে আমরা তৃতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে আসিলাম—

(৩) ভবিষ্যতের কর্ম্ম-পদ্ধতি—"বর্ত্তমান ভবিষ্যতের আলেখ্য স্বরূপ" এই প্রবাদটির মধ্যে সত্যতা আছে এবং আমাদের নূতন বীমা কোম্পানির ভবিষ্যতের উজ্জ্বল লোভনীয় বিজ্ঞপ্তির উপর নির্ভর করা উচিত নহে—আমরা ইহার অতীত ইতিহাস থাকিলে লক্ষ্য করিয়া দেখিব, কিংবা বর্ত্তমানের কার্য্যধারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য আস্থা স্থাপন করা যাইবে কি না বিচার করিয়া দেখিব।

উপসংহার—মোট কথা এই যে আমরা সুপ্রতিষ্ঠিত পুরাতন এবং চুক্তিরক্ষাকারী কোন কোম্পানি অথবা কর্ম্মক্ষম, বহুদর্শী ব্যক্তিগণপরিচালিত নূতন কোম্পানি নির্ব্বাচন করিব—যাহাদের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ হইবে। পুরাতন কোম্পানী যাহারা চুক্তিভঙ্গ করিয়াছে অথবা দাবীকারীগণের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিয়া চলিতেছে এবং অনভিজ্ঞ বা অক্ষম ব্যক্তিগণের দ্বারা অসঙ্গতভাবে পরিচালিত তথাকথিত স্বনামধন্য ডিরেক্টার যুক্ত নূতন কোম্পানি সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই জীবন বীমা কোম্পানি নির্ব্বাচন করিবার পক্ষে প্রকৃত "কষ্টি-পাথর"।

বীমা-প্রসঙ্গ

স্বদেশী যুগে যখন বাঙ্গলায় 'হিন্দুস্থান' ও 'ন্যাশন্যাল'এর স্থাপন হয়, সেই সময় ১৯০৬ সনে সুদূর মদ্র দেশে ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওর কোম্পানীর জন্ম। দীর্ঘ ২৫ বৎসর সুপরিচালিত হইয়া আজ ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া তাহার রৌপ্য জুবিলী উৎসব গৌরবের সহিত সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন. ইহা ভারতবাসী মাত্রেরই গৌরব ও আনন্দের বিষয়। এই আনন্দ উৎসবের স্মারক যে 'Silver Jubilee Souvenir' পুস্তক কোম্পানি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা কোম্পানি ও তাহার উৎসব-দিনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে, একথা এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে।

১৯০৬ সনে যে-কোম্পানী ৫০০০ টাকারও কম মূলধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন এবং মাত্র ৭৭৫০ টাকার বীমা কার্য্য সংগ্রহ করেন, ১৯৩১ সনে সেই কোম্পানী ৪৫,০০,০০০ টাকার উপর নূতন বীমাকার্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা কম গৌরবের বিষয় নয়। আলোচ্য পুস্তক খানিতে কোম্পানির ইতিহাস, ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের নাম ও প্রতিচ্ছবি, প্রধান প্রধান বীমাবিদ্‌গণের শুভেচ্ছা-জ্ঞাপন-পত্র, উৎসবদিনের বর্ণনা ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। অধিকন্তু কোম্পানির ১নং পলিশি খানির অবিকল প্রতিলিপি এবং সেই পলিশিহোল্ডার মহাশয়ের বর্ত্তমান প্রতিকৃতি, আফিস গৃহ এবং কর্ম্মীদের প্রতিকৃতি ইত্যাদি অনেক বিষয় ইহাকে বিশেষ আনন্দপ্রদ করিয়া তুলিয়াছে।

কোম্পানির একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, ইঁহারা আমেরিকার অতিকায় 'মেট্রোপলিটান'এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যাহাতে পলিশিহোল্ডারদিগকে নানারূপে সাহায্য করিতে পারেন তাহার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা ইতিমধ্যেই কোম্পানির কর্ম্মচারী, কর্ম্মী ও পলিশিহোল্ডারদের ব্যবহারের জন্য মাদ্রাজে একটী ক্লাব-গৃহ নির্ম্মাণ করাইতেছেন এবং বাহিরের কোন পলিশি-হোল্ডার যাহাতে মাদ্রাজে গিয়া কোনরূপ অসুবিধা ভোগ না করেন, তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সুদৃষ্টান্ত অনেক বৃহত্তর কোম্পানিরও অনুকরণীয়।

কোম্পানির বঙ্গদেশের প্রতিনিধি মেসার্স চৌধুরী, দত্ত এণ্ড কোম্পানীর অংশীদার প্রথিতযশা দেশসেবক শ্রীযুক্ত চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন (লাল মিয়া) ও সুজন শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে বঙ্গদেশেও কোম্পানির কার্য্য অগ্রসর হইতেছে। কোম্পানির এই উন্নতিতে আমরা অতিশয় প্রীত। জেনারেল ম্যানেজার তীক্ষ্ণবুদ্ধি শ্রীযুক্ত এম্, কে, শ্রীনিবাশন্ বি-এ, বি-এল মহাশয়কে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। আশা করি কোম্পানি দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া ক্রমে সুবর্ণ ও হীরক জুবিলী উৎসব সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন।

১৯৩১ সনে জগতব্যাপী আর্থিক বিপ্লব ও ভারতব্যাপী অশান্তির ফলে কোম্পানির কাগজের মূল্য অত্যধিক হ্রাস হওয়ায় এক বিরাট সমস্যার উৎপত্তি হয়। যে সমস্ত কোম্পানির পঞ্চম বা ত্রৈবার্ষিক valuation ঐ সনে, বিশেষ ঐ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে পড়িয়াছে এবং যাহাদের বীমা ফণ্ডের অধিকাংশই কোম্পানির কাগজে গচ্ছিত আছে, এই সমস্যা তাহাদের পক্ষেই অতিশয় ভীষণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য কতকগুলি কোম্পানি ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট কোম্পানির কাগজের বাজারদর গত ৫ বৎসরের গড়ে ধরিবার জন্য আবেদন করেন। Indian Life Offices Associationও এই বিষয় লইয়া বোম্বাই এবং কলিকাতা উভয় স্থানে কয়েকটী সভা আহ্বান করিয়া আলোচনা করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহারা একমত হইতে পারেন নাই। কতকগুলি কোম্পানি মিলিয়া এবিষয়ে পৃথক ভাবে আবেদনের ব্যবস্থা করিতেছেন। বারান্তরে এই বিরাট সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এপ্রিল সংখ্যা Insurance World পূর্ব্বের মতই চিত্র-বহুল হইয়া পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে উপস্থিত হইয়াছে। সম্পাদকের বিবাহের বিবরণ এবং সস্ত্রীক একখানি চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। নবীন সম্পাদকের বিবাহিত জীবনের সুখ শান্তি ও পত্রিকার প্রতিষ্ঠা আমরা একান্তচিত্তে কামনা করি—কিন্তু "মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ" এই মহাজনবাক্যের অমর্য্যাদা তিনি করিলেন কেন ?

Insurance and Finance Review-এর Anniversary Number প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সান্যাল মহাশয় সম্পাদকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।—পত্রিকার আয়তন ও প্রবন্ধ-গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম।

Indian Insurance Journal যেন ক্রমেই স্থবির হইয়া পড়িতেছেন। যখন লিখিতেছি, তখন অবধিও এপ্রিল সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। মার্চ্চ সংখ্যার আকার প্রকারে স্থবিরতার লক্ষণ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন যে আগামী সংখ্যা হইতে পত্রিকার আয়তন বাড়িয়া যাইবে। আয়তনবৃদ্ধির সহিত প্রবন্ধ-গৌরব বৃদ্ধি পাইলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

Insurance Herald নামে আর একখানি নূতন পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি পাইয়াছি। পত্রিকাখানি দেখিবার সৌভাগ্য এখনও আমাদের হয় নাই। আমরা এই নবজাত শিশুর কল্যাণ কামনা করি।

সহযোগী "জীবনবীমা" বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র বীমাবিষয়ক পত্রিকা হইয়াও নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছেন কেন বুঝিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস যে বীমাবিষয়ক পত্রিকাগুলি কোন দল বা কোম্পানী বিশেষের মুখপত্র মাত্র না হইয়া স্বাধীন ভাবে পরিচালিত হইলে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা ও স্থায়িত্বের সম্ভাবনা অনেক অধিক হইবে।

Indian Insurance Institute, Federation of Chambers of Commerceএর সদস্য হইয়াছেন জানিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমরা Federationএর আইন কানুন জানিনা কিন্তু নাম হইতে অনুমান হয় যে ইহার সদস্য বিভিন্ন Chambers of Commerceএরই হইবার কথা। Institute ব্যক্তিগত সভা লইয়া গঠিত মূলে একটী সমিতি মাত্র। তাহারা কিরূপে Federationএর সদস্য হইলেন তাহা বুঝা গেল না।

Insurance Association of India প্রায় ৮।৯ মাস হইল জন্মগ্রহণ করিলেও ইহার বিশেষ কোন কার্য্য প্রচেষ্টা আমরা দেখিতে পাইতেছি না। সম্পাদক মহাশয়ের সহিত প্রেসিডেণ্ট ও কার্য্যকরী সভার হিসাবাদি লইয়া কি একটা গোলযোগ চলিতেছে।

এ সম্পর্কে আমরা Insurance Association of Indiaর সহকারী সম্পাদকের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছি যে councilএর সভায় প্রস্তাব পাশ করিয়া সহকারী সম্পাদককে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে কাগজপত্র ও টাকাকড়ি বুঝিয়া লইবার জন্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কার্য্যবিবরণীর একপ্রস্থ আমাদের নিকট আসিয়াছে! অনুসন্ধানে জানা গেল যে সম্পাদক মহাশয় অবশেষে কাগজপত্র বুঝাইয়া দিতে রাজী হইয়াছেন। Better late than never.

আমরা বরাবরই যে সমস্ত বীমা কোম্পানী বর্ষার ছাতার মত গজাইয়া উঠিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে সকলকে সাবধান করিয়া আসিতেছি। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে নূতন কোম্পানী হইলেই তাহাকে বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। যে সমস্ত বীমা কোম্পানী বিচক্ষণ ব্যবসায়ী বা উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ কর্ত্তৃক গঠিত ও পরিচালিত হইতেছে তাহারা অনেক সময় পুরাতন কোম্পানী অপেক্ষাও অনেক সুযোগ ও সুবিধা দিতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাঞ্জাবে 'লক্ষ্মী', বোম্বায়ে 'নি উ ই ণ্ডি য়া' ও বাঙ্গলায় 'মে ট্রো প লি টা ন'এর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই তিনটি কোম্পানীই বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া দ্রুতবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

এই ভারতব্যাপী দারুণ অর্থসঙ্কোচের মধ্যেও বাঙ্গলার 'ন্যাসন্যাল ইন্সিওরেন্স' কোম্পানী গত বৎসর ১,৩২,০০,০০০৲ টাকার উপর নূতন জীবনবীমার পলিসি প্রদান করিয়াছেন ইহা কম কৃতিত্বের বিষয় নহে। কোম্পানীর ব্যয়ের হারও ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালার অন্যতম বৃহৎ কোম্পানী 'হিন্দুস্থান'এর নূতন বীমার খবর এখনও বাহির নাই। বারান্তরে আমাদের আরও বলিবার রহিল।

"জাবালী"

স্বর্ণ-রপ্তানী

শ্রীকুলেন্দ্রচন্দ্র পাল

ভারতবর্ষের স্বর্ণ সম্বন্ধে একটা মোহ আছে এ অপবাদ বিদেশী পণ্ডিতগণ বহুদিন হইতেই দিয়া আসিতেছেন। বহু শতাব্দীর সঞ্চয়ের ফলে অন্ততঃ ১০০০ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ নাকি এদেশে জমা হইয়াছে—যাহা ভারতবর্ষকে বাদ দিলে প্রায় সমগ্র পৃথিবীর মুদ্রারূপে ব্যবহৃত নয়—এরূপ স্বর্ণের সমষ্টিরই সমান। তন্মধ্যে গত ৩০ বৎসরে নাকি এদেশে প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ আমদানী হইয়া অকেজো হইয়া আছে। পণ্ডিতগণের উক্তির মধ্যে কতখানি অতিরঞ্জন আছে তাহা এখানে বিচার্য্য নয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে এই মোহের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। কারণ তখন হইতে ভারতবর্ষ তাহার চিরন্তন প্রথা ত্যাগ করিয়া সঞ্চিত স্বর্ণকে বাহিরে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ফলে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত মাত্র পাঁচ মাসে মোট প্রায় ৫৩ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ এদেশ হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। এই বিপুল স্বর্ণ-স্রোত সমস্ত পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেও সকলেই ইহাকে একই চক্ষে দেখিতেছেন না। এই ব্যাপার দেশীয় নেতৃবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে পর্য্যন্ত আতঙ্কের সৃষ্টি করিলেও গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে শুধুই যে নির্ব্বিকার তাহাই নহে, তাঁহারা ইহাকে সম্পূর্ণ প্রীতির চক্ষেই দেখিতেছেন এবং ইহার ফলে তাঁহারা যে কতকগুলি "অসাধ্য সাধন" করিতে পারিয়াছেন তাহার জন্য নিজেদের ভাগ্যকে ধন্যবাদই দিতেছেন। অপর পক্ষে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ এ ঘটনায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন এবং সেজন্য বেশ গর্ব্বও অনুভব করিতেছেন।

এই মতভেদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রথমতঃ বর্ত্তমান স্বর্ণ-রপ্তানীর কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়। সকলেই জানেন যে, যখন গত ২১শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড স্বর্ণমাণ রহিত করে তখন ভারতের টাকাকে পাউণ্ডের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়। এই জুড়িয়া দেওয়ার অর্থ এই যে, পাউণ্ডের স্বর্ণ-মূল্যের উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে টাকার স্বর্ণ-মূল্যেরও উত্থান পতন ঘটিবে। পাউণ্ড ও ডলারের বিনিময়-হার হইতে দেখা যায় যে, ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করিবার চার দিন পরেই পাউণ্ডের স্বর্ণমূল্য শতকরা ২০·৭ ভাগ কমিয়া যায় এবং ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি এই মূল্যপতন শতকরা প্রায় ৩১·৭ ভাগে দাঁড়ায়। ফলে টাকার স্বর্ণমূল্যও সেই অনুপাতে কমিয়া চলে। অপর কথায় টাকার হিসাবে স্বর্ণের দাম বাড়িতে থাকে। কিন্তু টাকার মূল্য ১৮ পেন্স নির্দ্দিষ্ট করার পর হইতে এক ভরি স্বর্ণের সরকারী মূল্য এদেশে ২১৷৴১০। এবং তাহা এ পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও পূর্ব্ববৎই রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমান বাজারদর হইতে দেখা যায় স্বর্ণের মূল্য এখন ভরি প্রতি প্রায় ২৭ টাকা এবং কিছু দিন পূর্ব্বে প্রায় ৩০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। কাজেই ব্যবসায়িগণ স্বর্ণ-রপ্তানী করিয়া বেশ দু'পয়সা লাভ করে। কিন্তু এরূপ বিরাট পরিমাণে স্বর্ণ-রপ্তানীর কারণ নিশ্চয়ই আরও গুরুতর।

সকলেই জানেন, বর্ত্তমান ব্যবসায়মন্দার ফলে ভারতীয় কৃষকগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বহু পরিমাণে হ্রাস হওয়ায় আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে। প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য সেই অনুপাতে কিন্তু কমে নাই। কাজেই আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হইতেছে। অতিরিক্ত মুদ্রাসঙ্কোচের ফলে টাকার দ্রব্যমূল্য বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু সেই অনুপাতে করভারের লাঘব হয় নাই বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিপন্ন কৃষককে তাই আজ প্রাণের দায়ে তাহাদের শেষ সম্বল অলঙ্কারাদি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইতেছে। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যে, পূর্ব্বোক্ত ৫৩ কোটি টাকার স্বর্ণের অধিকাংশই এই বিপন্ন কৃষক সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্তদের শেষ সম্বল অলঙ্কারাদি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

স্বর্ণমান ত্যাগের পূর্ব্ব হইতেই এরূপ বহু স্বর্ণালঙ্কারাদি বিক্রয় হইতেছিল। কিন্তু তখন স্বর্ণের সরকারী মূল্য ও প্রকৃত মূল্যের মধ্যে কোন প্রভেদ না

থাকায় উহা বাহিরে পাঠাইবার কিছুমাত্র প্রেরণা ছিল না। ফলে গভর্ণমেণ্টের Paper Currency Reserveএ প্রায় ১৩ কোটি টাকার স্বর্ণ সংগৃহীত হয় এবং তন্মধ্যে মাত্র এক কোটি টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হয়। কিন্তু ২১শে সেপ্টেম্বর স্বর্ণমান রহিত করার পর এই স্বর্ণ রপ্তানী বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে সপ্তাহে গড়ে ১·৮ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ-রপ্তানী হয়। ডিসেম্বর মাসের রপ্তানীর পরিমাণ আরও ভয়াবহ, সে মাসে সপ্তাহে গড়ে ৩·৭ কোটি টাকার স্বর্ণ-রপ্তানী হইয়াছে। যাহা হউক জানুয়ারী মাস হইতে পাউণ্ডের ও সেই সঙ্গে টাকার স্বর্ণমূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই স্বর্ণ-রপ্তানীতে কতকটা ভাটা পড়িয়াছে।

স্বর্ণমান রহিত করার পর হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনে কোন্ তারিখে কি পরিমাণ স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে তাহার একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল:—

তারিখ	স্বর্ণের মূল্য
২৬শে সেপ্টেম্বর	২৫,০১,৫৩৩ টাকা
৩রা অক্টোবর	২,৪৬,৪৪,১৬৫ "
১০ই "	১,৩১,৭৭,০৮৭ "
১৭ই "	১,৮৫,১৮,৩৭৯ "
২৪শে "	১,২৪,০৭,৭২৩ "
৩১শে "	২,২৬,৯৪,৯০৭ "
৭ই নভেম্বর	২,৫৮,৫৬,২৯৩ "
১৪ই "	৯৩,৮৮,৩২০ "
২১শে "	২,৪০,৪৮,৯৪৮ "
২৮শে "	২,০৫,০২,৬৮৩ "
৫ই ডিসেম্বর	২,৩৯,৫০,৭৫৩ "
১২ই "	৪,০৯,০৬,১৯৬ "
১৯শে "	৪,৫২,৩২,৯৯০ "
২৬শে "	৩,৯৯,০৫,১৭৪ "
২রা জানুয়ারী	২,৪৫,৬১,৪৮৮ "
৯ই "	১,৭১,৮০,৭৮০ "
১৬ই "	৩,৬৫,৯৩,১৪৪ "
২৩শে "	১,৩০,৮০,৮৯৭ "
২৯শে "	২,৫২,৯৪,৯৪২ "
৬ই ফেব্রুয়ারী	১,৮৪,৬৮,০০০ "
১১ই "	৮৯,৭৬,০১৫ "
১৪ই "	১,১৯,৮২,২২৫ "
২০শে "	১,৫৩,৬৬,০৫৪ "
২৫শে "	৯০,৫৭,৯৮০ "
২৭শে "	১,২৬,৯৭,০৬৫ "
মোট	৫১,৬১,৯৩,৭১১ টাকা

এই ব্যাপারে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্যবহার লক্ষ্য করিবার মত। ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করিবার পর আরও বহু দেশ তাহার পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু সব দেশই সেই সঙ্গে স্বর্ণের রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। কারণ বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী মুদ্রা-বিপর্য্যয়ের প্রধান কারণ স্বর্ণের অনটন। সে জন্য সকল গভর্ণমেণ্টই স্বদেশের স্বর্ণকে সংরক্ষিত করিবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু দেশীয় নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়িগণের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভারত-গভর্ণমেণ্ট এই বিপুল স্বর্ণপ্রবাহকে বাধা দিবার কিছু মাত্র চেষ্টাই করেন নাই এবং এখনও করিতেছেন না।

গভর্ণমেণ্টের অবশ্য জনমত অগ্রাহ্য করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। স্বর্ণমান রহিত করার সময় গভর্ণমেণ্টের সম্মুখে তিনটি সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমতঃ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে টাকা ও পাউণ্ডের বিনিময়-হার ১৮ পেন্স নির্দ্দিষ্ট করার ফলে গত কয় বৎসরে গভর্ণমেণ্টকে বিরাট পরিমাণে (১৩৮ কোটি টাকা) মুদ্রাসঙ্কোচ করিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে স্বর্ণমান রহিত করার অব্যবহিত পূর্ব্বের পাঁচ মাসের মুদ্রা-সঙ্কোচের পরিমাণই ৩৮ কোটি টাকা। সকলেই জানেন, আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দশা ও শিল্পবাণিজ্যের দুরবস্থার জন্য এই মুদ্রাসঙ্কোচ কম দায়ী নয়। কিন্তু বিনিময়ের এই উচ্চহার বজায় রাখিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ক্রমাগতই এ সম্বন্ধে জনমত ও ব্যবসায়ের দাবী অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিকূল বাণিজ্যের (unfavourable balance of trade) ফলে স্বর্ণমানত্যাগের অব্যবহিত

পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের রিভার্স কাউন্সিল বিল বিক্রয় করিতে হয়।

তৃতীয়তঃ গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে দেয় ১২ কোটি পাউণ্ড বিলাতী ঋণ শোধ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তাহার উপর বিলাতের খরচের জন্য বাৎসরিক দেয় (Home Charges) ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ পাউণ্ড প্রদান সম্বন্ধেও গভর্ণমেণ্ট মহা সমস্যায় পড়িয়াছিলেন।

গভর্ণমেণ্টের এরূপ বিপদের সময় এই স্বর্ণ রপ্তানী তাহাদিগকে সমস্ত দুর্ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি দিল। ইহা একই সঙ্গে প্রথমতঃ প্রতিকূল বাণিজ্যকে "অনুকূল" করিয়া দিল, দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বোক্ত ১২ কোটি পাউণ্ড ঋণ শোধ করিবার উপায় বাত্‌লাইয়া দিল এবং তৃতীয়তঃ ঈপ্সিত মুদ্রাপ্রসার সম্ভবপর করিল। তদুপরি ইহা লণ্ডনের বহু দুরূহ আর্থিক সমস্যার সমাধানও করিয়াছে।

এক স্বর্ণের রপ্তানী হইতে এতগুলি সমস্যার সমাধান কিরূপে হইল তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে মোটামুটি দুই একটি কথা মনে রাখা দরকার। অনুকূল বাণিজ্যের ফলে যখন বিদেশের নিকট ভারতবর্ষের দেয় অপেক্ষা প্রাপ্য অধিক হয়, তখন সে প্রাপ্য এদেশে স্বর্ণ বা রৌপ্য পাঠাইয়া মিটাইবার কথা। কিন্তু সাধারণতঃ তাহা পাঠাইতে হয় না। কারণ ভারত গবর্ণমেণ্টকে বিলাতি ঋণের সুদ, কর্ম্মচারীদের পেন্সন, ইণ্ডিয়া অফিসের খরচা ইত্যাদি (Home Charges) বাবদ প্রতি বৎসর প্রায় ৩ কোটী ৩৩ লক্ষ পাউণ্ড বিলাতে পাঠাইতে হয়। এই অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতসচিব বিলাতে কাউন্সিল বিল বিক্রয় করিয়া থাকেন। বিলাত হইতে যাহারা ভারতবর্ষে টাকা পাঠাইবে তাহাদের এই কাউন্সিল বিল কিনিয়া পাওনাদারদের নিকট পাঠাইলেই চলে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই কাউন্সিল বিলের পরিবর্ত্তে টাকা দিয়া থাকেন। এই উপায়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের যে টাকা ভারতসচিবের নিকট পাঠাইবার কথা তাহা ভারতসচিব কাউন্সিল বিল বিক্রয় করিয়া আদায় করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য এই কাউন্সিল বিল বিক্রয় করার অর্থ টাকা বিক্রয় করিয়া পাউণ্ড সংগ্রহ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। অপর পক্ষে প্রতিকূল বাণিজ্যের সময় যখন ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে অর্থ পাঠাইবার প্রয়োজন হয়, তখন ভারত গবর্ণমেণ্টকে রিভার্স কাউন্সিল বিল বিক্রয় করিতে হয়। ভারতের যে বণিক বিলাতে পাউণ্ড পাঠাইবে সে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সেই বিল ক্রয় করিয়া বিলাতের পাওনাদারের নিকট পাঠাইয়া দেয় এবং ভারতসচিব সেই বিলের পরিবর্ত্তে পাউণ্ড প্রদান করেন। কাজেই অনুকূল বাণিজ্যের সময় তহবিলে যে পাউণ্ড সঞ্চিত হয়—প্রতিকূল বাণিজ্যের সময়ে তাহাতে টান পড়ে এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট বিলাতের খরচা প্রেরণ সম্বন্ধে মুস্কিলে পড়েন। উপরে যে ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের রিভার্স কাউন্সিল বিল বিক্রয়ের কথা বলা হইয়াছে তাহা এইরূপ প্রতিকূল বাণিজ্যের ফলেই ঘটিয়াছিল।

সাধারণ অবস্থায় ভারতবর্ষের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী এত বেশী হয় যে, তদ্দ্বারা ভারতসচিবের সমস্ত দাবী মিটাইয়াও ভারতবর্ষের আরও অনেক টাকা পাওনা হয় এবং সে প্রাপ্য মিটাইবার জন্য বিদেশী বণিকগণকে প্রতি-বৎসর বহু কোটি টাকার স্বর্ণ এদেশে পাঠাইতে হয়। কিন্তু ভারতের বাহির্বাণিজ্যের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, এপ্রিল (১৯৩১) হইতে জানুয়ারী (১৯৩২) পর্য্যন্ত দশ মাসে গত পূর্ব্ব বৎসরের (১৯২৯-৩০) এই সময়ের তুলনায় সাধারণ বাণিজ্য দ্রব্যের রপ্তানীর মূল্য ২৬৪ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ১৩৪½ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে এবং আমদানীর মূল্য ২০১ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ১০৫ কোটি টাকা হইয়াছে। অর্থাৎ গত পূর্ব্ববৎসরে এই কয় মাসে যেখানে অনুকূল বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৬৪ কোটি টাকা সে ক্ষেত্রে বর্ত্তমান বৎসরে তাহা ৩০ কোটি টাকারও কম। কিন্তু গত পূর্ব্ব বৎসরে এই সময়ে স্বর্ণরৌপ্যাদির রপ্তানী অপেক্ষা আমদানীর মূল্য ২০½ টাকা বেশী; সেক্ষেত্রে এ বৎসর এই দশ মাসে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর মূল্য ৪১ কোটি টাকা বেশী। কাজেই সাধারণ বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর সহিত স্বর্ণরৌপ্যাদির আমদানী ও রপ্তানী একত্র করিয়া হিসাব করিলে গত পূর্ব্ব বৎসরের ৪৩ কোটি টাকা অনুকূল বাণিজ্যের স্থলে এ বৎসরের অনুকূল বাণিজ্যের

পরিমাণ ৭১ কোটি টাকা। এই অনুকূল বাণিজ্যের অর্থ বিদেশী বণিকের ৭১ কোটি টাকা ভারতবর্ষে পাঠাইবার প্রয়োজন বা ভারতসচিবের ৭১ কোটি টাকার পাউণ্ড খরিদ করিবার সুযোগ। কাজেই স্বর্ণ রপ্তানীর পূর্ব্বে যেখানে গভর্ণমেণ্টকে পাউণ্ড বিক্রয় করিতে হইতেছিল, সে ক্ষেত্রে স্বর্ণ রপ্তানী আরম্ভ হওয়ার পর হইতে তাহারা প্রচুর পরিমাণে পাউণ্ড খরিদ করিতে পারিতেছেন। ফলে গভর্ণমেণ্ট যে পরিমাণে পাউণ্ড খরিদ করিতে পারিয়াছেন তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ১½ কোটি পাউণ্ডের ঋণই কেবল শোধ হয় নাই বর্ত্তমান বৎসরের জন্য ভারতসচিবের সমস্ত দাবীও মিটান হইয়াছে।

তা ছাড়া ভারতসচিব যে সব কাউন্সিল বিল বিক্রয় করিয়া পাউণ্ড সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার পরিবর্ত্তে এদেশে স্বর্ণরপ্তানীকারকদিগকে টাকা বা নোট দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাতে প্রায় ৫১ কোটি টাকার মুদ্রাপ্রসার সম্ভব হইয়াছে। এই মুদ্রাপ্রসার অতিরিক্ত (inflation) হইয়া পড়িয়াছে কি না তাহা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

কিন্তু এই স্বর্ণ-রপ্তানী কেবল ভারত গভর্ণমেণ্টের সমস্যারই সমাধান করে নাই ; ইহা ইংলণ্ডকেও বহু আর্থিক দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে স্বর্ণমাণ রহিত করিবার পর নানা কারণে ইংলণ্ড আর্থিক ব্যাপারে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারই একটা লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল পাউণ্ডের মূল্যের অধোগতিতে। ভারতের স্বর্ণ-রপ্তানী পাউণ্ডের সেই অধোগতি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কারণ এই স্বর্ণ-রপ্তানীর অন্যতম অর্থ ভারত গভর্ণমেণ্টের পাউণ্ড-ক্রয়। কাজেই এই স্বর্ণ-রপ্তানীর সঙ্গে সঙ্গে পাউণ্ডেরও একটা অপ্রত্যাশিত চাহিদার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের রপ্তানী স্বর্ণের বেশীর ভাগই প্রথমে ইংলণ্ডে গেলেও ইংলণ্ড তাহার খরিদদার নয়—তাহার খরিদদার আমেরিকা, ফরাসী প্রভৃতি স্বর্ণমাণে প্রতিষ্ঠিত দেশ সমূহ। কিন্তু এ সব দেশকে পাউণ্ডের সাহায্যে এই স্বর্ণ খরিদ করিতে হইয়াছে। পাউণ্ডের এই চাহিদার ফলে একদিকে তাহার মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং অপর দিকে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড এই বর্দ্ধিত মূল্যে পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে যথেষ্ট পরিমাণে ফ্রাঙ্ক ও ডলার হস্তগত করিতে পারিয়াছে এবং উহা দ্বারা ফরাসী ও আমেরিকা হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে যে ধার নিয়াছিল তাহা শোধ করিয়াছে। বলা বাহুল্য এই স্বর্ণ-রপ্তানী না হইলে তাহা সম্ভবপর হইত না। কারণ সাধারণ অবস্থায় পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে এত বিরাট পরিমাণে ফ্রাঙ্ক ও ডলার খরিদ করিতে চেষ্টা করিলে পাউণ্ডের অধোগতি আরও বাড়িয়া যাইত, কাজেই ফরাসী ও আমেরিকার প্রাপ্য মিটাইবার জন্য ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে স্বীয় সংরক্ষিত স্বর্ণে হাত দিতে হইত। ইংলণ্ডের বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেণ্ট মিঃ রান্সিমেন বলেন যে, ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ-রপ্তানী না হইলে পাউণ্ডের স্বর্ণমূল্য হয়ত কমিয়া তিন ডলারের সমান হইয়া যাইত।

এই ব্যাপারে ইহা ছাড়া ইংলণ্ডের আরও অনেক লাভ হইয়াছে। কারণ ইহাতে পাউণ্ডের প্রতি এবং সেই সঙ্গে ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস ফিরিয়া আসিতেছে এবং যাহারা কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে টাকা উঠাইয়া নিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহারা পুনরায় সেখানে টাকা জমা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড তাহার সুদের হার এক মাসের মধ্যেই শতকরা ৬ পাউণ্ড হইতে নামাইয়া ৩½ পাউণ্ড করিতে সক্ষম হইয়াছে। ভারতের স্বর্ণ-রপ্তানী ছাড়াও অবশ্য ইহার অন্যান্য বহু কারণ আছে এবং পাউণ্ডের এরূপ মূল্যবৃদ্ধি ইংলণ্ড সম্পূর্ণ প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেছে না, কিন্তু তাহা বর্ত্তমান আলোচনার অন্তর্গত নয়।

যে স্বর্ণ-রপ্তানীতে ইংলণ্ডের এত সুবিধা তাহা বন্ধ করিতে ভারত গভর্ণমেণ্টের আপত্তি সহজেই বোধগম্য। কিন্তু স্বর্ণ রপ্তানীর সমর্থকগণ এ ব্যাপারে কাহারো ক্ষতিই দেখিতে পান না। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, স্বর্ণের এমন কোন নিজস্ব মূল্য নাই যাহার জন্য সকল অবস্থাতেই তাহাকে আঁকড়াইয়া থাকিতে হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্যেরই তুল্য। কাজেই স্বর্ণের মালিকগণ যখন তাহা সুবিধা দরে বিক্রয় করিতে পারিয়াছে তখন এ ব্যাপারে তাহারা লাভবানই হইয়াছে এবং তাহা বিদেশে চলিয়া গেল বলিয়া কাহারো আপশোষ করিবার কারণ নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে বাণিজ্য অনুকূল হওয়ায় গভর্ণমেণ্টের যে লাভ হইয়াছে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে করদাতারই

লাভ, কারণ গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ের ভার তাহাকেই বহন করিতে হয়। তাহা ছাড়া ভারতের স্বর্ণ বিদেশে গিয়া পৃথিবীর আর্থিক সমস্যার সমাধানে ও শিল্প বাণিজ্যের পুনরুন্নতিতে সাহায্য করিতেছে এবং পরিণামে এদিক দিয়াও অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষও লাভবান হইবে। অথচ যে স্বর্ণরপ্তানী হইয়াছে তাহা এদেশে অকেজো হইয়া পড়িয়াছিল এবং আরও যে পরিমাণ স্বর্ণ এরূপ অকেজো হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার তুলনায় ইহা পরিমাণে কিছুই নয়।

কিন্তু এই যুক্তিজালের পশ্চাতে একটি প্রকাণ্ড মিথ্যা আত্মগোপন করিয়া আছে। স্বর্ণের নিজস্ব এমন কোন মূল্য আছে যাহার জন্য তাহাকে কোন অবস্থায়ই হাতছাড়া করা বা বিদেশে যাইতে দেওয়া উচিত নয়—এমন কথা মনে করা নিশ্চয়ই ভুল। কিন্তু যে পর্য্যন্ত স্বর্ণমান সম্পূর্ণরূপে ও চিরদিনের জন্য পরিহার না করা হইতেছে সে পর্য্যন্ত স্বর্ণ রপ্তানী করা আর পাট রপ্তানী করা একই কথা, এরূপ যুক্তির অবতারণা শুধু ভুল নয় অমার্জ্জনীয় প্রবঞ্চনা। কারণ স্বর্ণ সার্ব্বজনীন মূল্য-ভাণ্ডার (universal store of value)। কিন্তু পাট তাহা নয়। তাই সব দেশেই লোকে পাট বিক্রয় করিয়া স্বর্ণ সঞ্চয় করে—স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া পাট সঞ্চয় করে না। যখন কোন দেশের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর মূল্যাধিক্য ঘটে তখন তাহাকে এই জন্যই লাভবান বলা হয় যে, তদ্দ্বারা সে এই মূল্য-ভাণ্ডার হস্তগত করিতে পারিয়াছে। তাহা না হইলে অনুকূল ও প্রতিকূল বাণিজ্যের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যই থাকিত না। অনুকূল বাণিজ্য এই জন্যই বাঞ্ছনীয় যে, ইহা জাতীয় সমৃদ্ধির নির্দ্দেশক। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট যে "অনুকূল" বাণিজ্যের ফলে এই পাউণ্ড খরিদ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষ সাধারণ অবস্থায় দুই বৎসরে যে মূল্য-ভাণ্ডার সংগ্রহ করে, মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে।

এ ব্যাপারে ভারতবর্ষের একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় এই যে, এই সঙ্গে ভারত গভর্ণমেণ্ট বাৎসরিক বিলাতি খরচা ও একটা বড় ঋণ মিটাইতে পারিয়াছেন, যাহা সাধারণ অবস্থায় জিনিষ পত্রের রপ্তানীর দ্বারাই মিটিয়া থাকে। কিন্তু তবু ভারত গভর্ণমেণ্ট ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই দেখিতে পান না।

এখানে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে যে, এই স্বর্ণপ্রবাহ ভারতবর্ষের আর্থিক দুর্দ্দশার লক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু কারণ নয়; কাজেই ইহাতে ভারতবর্ষের ক্ষতি হইতেছে ইহা প্রমাণিত হয় না। এ প্রশ্ন খুবই সঙ্গত; কিন্তু যাহা দুর্দ্দশার লক্ষণ অন্য কোনও ক্ষতি স্বীকার না করিয়া যদি তাহা বন্ধ করা সম্ভব হয়, বুদ্ধিমান মাত্রেই সে চেষ্টা করিবে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ সে চেষ্টার প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করেন না এবং দ্বিতীয়তঃ তাহা সম্ভবপরও মনে করেন না। তাঁহাদের যুক্তি রাজস্বসচিবের বাজেট-বক্তৃতা হইতে যতদূর বুঝা যায় তাহা সংক্ষেপে এই যে, ভারতের এই স্বর্ণ-রপ্তানীর সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের কোনই সম্পর্ক নাই এবং তাঁহাদের সংরক্ষিত স্বর্ণ অটুটই আছে; তাহা ছাড়া এ কয় মাসে ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে তাহা ভারতের মোট সঞ্চিত স্বর্ণের তুলনায় কিছুই নয়। অথচ এই রপ্তানীর ফলে ভারতের বাণিজ্য অনুকূল হইয়াছে এবং ভারতবাসিগণ এই দুর্দ্দিনে সঞ্চিত স্বর্ণের কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া বহু দুঃখ কষ্ট হইতে রক্ষা পাইতেছে। তাহা ছাড়া বর্ত্তমান সময়ে অন্যান্য জিনিষের তুলনায় স্বর্ণের মূল্য অতিরিক্ত বাড়িয়া গিয়াছে। জিনিষপত্রের এরূপ মূল্যপতন বা স্বর্ণের অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধিই আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দশার মূল কারণ। এ সমস্যার কোনও সমাধান না হইলে, হয় পৃথিবীর বর্ত্তমান আর্থিক ব্যবস্থায়ই ধ্বংস হইবে অথবা পৃথিবীর সব দেশকেই স্বর্ণমান ত্যাগ করিতে হইবে। ইংলণ্ড এবং সেই সঙ্গে আরও বহুদেশ শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। আমেরিকা এখন পর্য্যন্ত স্বর্ণমান বজায় রাখিলেও তাহার অসুবিধার অন্ত নাই এবং সে জিনিষপত্রের স্বর্ণমূল্যবৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এ চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইলে অবশ্যই সে স্বর্ণমান বজায় রাখিতে পারিবে। কিন্তু তাহা না হইলে তাহাকেও স্বর্ণমান ত্যাগ করিতে হইবে। কাজেই পৃথিবীর সম্মুখে এখন দুইটি মাত্র পথ রহিয়াছে—হয় তাহাকে কোনও উপায়ে জিনিষপত্রের তুলনায় স্বর্ণের মূল্য কমাইতে হইবে অথবা মুদ্রা ব্যবস্থার ভিত্তিরূপে

স্বর্ণকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে এই দুই পন্থার মধ্যে যাহাই অবলম্বিত হউক না কেন উভয় অবস্থাতেই বর্ত্তমানে স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া ফেলাই লাভজনক। কাজেই গভর্ণমেণ্ট কেন ভারতবাসিগণের স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া লাভবান হইবার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবে ?

কিন্তু রাজস্ব সচিব জানেন, গভর্ণমেণ্টকে স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ করিতেই বলা হইয়াছে—স্বর্ণ বিক্রয় বন্ধ করিতে বলা হয় নাই। জনমত চায় গভর্ণমেণ্ট নিজেই বাজার মূল্যে এই এই স্বর্ণ কিনিয়া লইবে এবং তদ্দ্বারা Reserve Bank স্থাপন ও স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর করিবে, কিন্তু তাহাতে গভর্ণমেণ্টের অনেক আপত্তি আছে। রাজস্বসচিবের প্রথম যুক্তি এই যে, স্বর্ণমান ত্যাগ করার পর গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এখন স্বর্ণ ক্রয় করা জুয়াখেলার সামিল হইবে। দ্বিতীয়তঃ যে পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয়ের জন্য আনা হইতেছে, তাহার সমস্ত খরিদ করিয়া হাতে রাখা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর নয়, কারণ তাহাদিগকে নিজেদের বাহিরের দায়িত্বও (external obligations) মিটাইতে হইবে। তৃতীয়তঃ, যদি currency reserve রাখার প্রয়োজন হয় এবং তাহা সংগ্রহ করিবার গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা থাকে তবে স্বর্ণ না রাখিয়া বরং external securities (অর্থাৎ পাউণ্ড) সংগ্রহ করাই দরকার, কারণ যে পরিমাণ স্বর্ণ রাখা আবশ্যক তাহা গভর্ণমেণ্টেরও পূর্ব্ব হইতেই আছে। চতুর্থতঃ, গভর্ণমেণ্ট স্বর্ণরপ্তানীর সঙ্গে সঙ্গে পাউণ্ড সংগ্রহ করিতেছেন এবং যদি সম্ভব হয় তবে এতদ্দ্বারা তাঁহারা currency reserves বাড়াইবেন।

সর্ব্বশেষে ভারতসচিব বলেন যে, স্বর্ণ রপ্তানীতে হস্তক্ষেপ না করিয়া তাঁহারা নূতন কিছুই করিতেছেন না। কারণ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হলাণ্ড, আমেরিকা এবং দক্ষিণ এফ্রিকা স্বর্ণ-রপ্তানীতে কোনরূপ বাধা প্রদান করিতেছে না। এবং যে সব দেশ বাধা দিতেছে তাহারাও বিনিময় হারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই এরূপ করিতেছে। এ সম্পর্কে রাজস্বসচিব ইংলণ্ডের জনসাধারণের স্বর্ণ বিক্রয়েরও উল্লেখ করেন।

বলা বাহুল্য রাজস্বসচিবের যুক্তিতে ভারতের জনমত সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, রাজস্ব সচিব স্বর্ণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে থিয়োরী (theory) খাড়া করিয়াছেন ভারতবাসী তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। রাজস্বসচিব স্বয়ং অবশ্যই এই থিয়োরীর আবিষ্কর্ত্তা নহেন। স্বর্ণমান ত্যাগ করিবার পর হইতে ইংলণ্ড স্বর্ণকে তাহার বর্ত্তমান উচ্চাসন হইতে অপসারিত করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। তাহার প্রধান প্রস্তাব এই যে, পাউণ্ডকে ভিত্তি করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে। সার বেসিল ব্লেকেট ইহার একজন প্রধান উদ্যোগী। তিনি বলেন এই মুদ্রা-ব্যবস্থার মধ্যে যে কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহ থাকিবে তাহা নয়, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, জাপান, ঈজিপ্ট ও দক্ষিণ আমেরিকার যে সব দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়াছে তাহাদিগকেও ইহার অন্তর্গত করা যাইবে।

এই বিস্তৃত ভূভাগের মধ্যে স্থানীয় মুদ্রাব্যবস্থাসমূহের ও তাহাদের পরস্পরের বিনিময়-হারের স্থায়িত্ব (stability) রক্ষা করিতে হইবে "পাউণ্ড-মান" এর (Sterling Standard) দ্বারা। কিন্তু এই প্রস্তাব স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত দেশসমূহকে ভয় দেখাইয়া বাগে আনিবার পক্ষে যতই কার্য্যকরী হউক না কেন, রৌপ্য বা স্বর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে এরূপ কোন ব্যবস্থায় মুদ্রার ক্রয়শক্তি স্থায়ী (stable) রাখা সম্ভবপর বলিয়া ইংলণ্ডের পণ্ডিতগণও বিশ্বাস করেন না। কাজেই ইংলণ্ড স্বর্ণের নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিলেও তাহার মর্য্যাদার বিশেষ কোন লাঘব হইবে বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট হেতু নাই। এই অনুমান যে কতদূর সত্য, তাহা একথা হইতেই বুঝা যাইবে যে, ভারতবর্ষের এই বিরাট রপ্তানী সত্ত্বেও স্বর্ণের চাহিদার কিছু মাত্রই কমতি দেখা যাইতেছে না। কাজেই এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, স্বর্ণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাটা একমাত্র রাজস্বসচিবের মস্তিষ্কেই সীমাবদ্ধ এবং হয়ত বা ভারতবাসীদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া স্বর্ণ রপ্তানীর সহায়তা করিতেই সে দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের গরজ সুস্পষ্ট। কারণ ফরাসী, আমেরিকা, বেলজিয়াম, ইংলাণ্ড প্রভৃতি দেশ পৃথিবীর বেশীর ভাগ স্বর্ণ

আয়ত্ত করিয়া স্বর্ণের যে monopolyর সৃষ্টি করিয়াছে, ভারতের এই রপ্তানী অবাধে চলিলে তাহা অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে ভঙ্গ করিবে এবং ইংলণ্ডও ইচ্ছামত স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে পারিবে।

বলা বাহুল্য এই ব্যাপারে সবদিক দিয়াই ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। প্রথমতঃ ইংলণ্ড স্বর্ণকে পদচ্যুত করিতে চায় নিজের স্বর্ণাভাবের জন্যই। কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্ত সঞ্চয়ই স্বর্ণে। কাজেই পৃথিবীর মুদ্রাব্যবস্থায় স্বর্ণের কোন প্রয়োজন না থাকিলে ইংলণ্ডের যেমন লাভ ভারতবর্ষের তেমনি সর্ব্বনাশ। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ চায় স্বীয় মুদ্রাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংলণ্ডের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত করিতে। অপর পক্ষে বর্ত্তমান মুদ্রাব্যবস্থা বজায় রাখিলেই ইংলণ্ডের লাভ। কাজেই যখন ভারতবর্ষ দাবী করে যে, গভর্ণমেণ্ট স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ করিয়া সংরক্ষিত স্বর্ণ বর্দ্ধিত করুক তখন রাজস্বসচিব তাহার কোন প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করেন না এবং ভারতের স্বর্ণ বিদেশে পাঠাইয়া দিয়া পাউণ্ডের ভাণ্ডার বর্দ্ধিত করাকেই একমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের স্বার্থের যেখানে এত বিরোধ এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট যেখানে ইংলণ্ডের স্বার্থকেই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য মনে করেন, সেখানে জনমত ও গভর্ণমেণ্টের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকিবে কিরূপে? ভারতবর্ষের স্বার্থই যদি রাজস্বসচিবের একমাত্র চিন্তনীয় হইত তবে পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে স্বর্ণক্রয়কে তিনি কিছুতেই জুয়া খেলা মনে করিতেন না। এবং ইহাও বুঝিতে পারিতেন যে, বিপন্ন কৃষক সাধারণ ব্যবসায়ীর নিকট স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইতেছে গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং বাজার দরে তাহা ক্রয় করিলে তদপেক্ষা তাহারা ঢের বেশী টাকা পাইত। কাজেই অবাধ স্বর্ণ রপ্তানীতে হস্তক্ষেপ করিলে ব্যবসায়ীর ক্ষতি হইলেও যাহারা স্বর্ণ বিক্রয় করিতেছে তাহাদের তাহাতে লাভই হইত।

রাজস্বসচিব যে সব দেশে স্বর্ণ রপ্তানী নিষিদ্ধ নয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এক ইংলণ্ড ছাড়া আর সব দেশেই এখনও স্বর্ণমান বজায় আছে, কাজেই তাহাদের দৃষ্টান্ত এ ক্ষেত্রে গ্রাহ্য নয়। ইংলণ্ডের স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা না থাকিতে পারে, কারণ সেখানে জাতির প্রায় সমস্ত স্বর্ণই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সমূহে গচ্ছিত রহিয়াছে। কাজেই ইংলণ্ডের সঙ্গে এ ব্যাপারে ভারতবর্ষের তুলনা চলে না। স্বর্ণ রপ্তানীর কোন নিষেধ না থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ড হইতে যে স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে তাহার পরিমাণ হিসাব করিয়া দেখিলেই একথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

ভারতবর্ষ হইতে যে স্বর্ণ রপ্তানী হইতেছে তাহা যে গভর্ণমেণ্টের সংরক্ষিত স্বর্ণ নয়, তাহা সকলেই জানে; কিন্তু সংরক্ষিত স্বর্ণের সঙ্গে তাহার প্রভেদও তেমন কিছু বেশী নয়, কারণ গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই তাহা ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা সংরক্ষিত স্বর্ণ বর্দ্ধিত করিতে পারিতেন। এ বিষয়ে রাজস্ব সচিবের যুক্তি যেরূপ অবান্তর ভারতের মোট সঞ্চিত স্বর্ণের পরিমাণের উল্লেখও তেমনি অপ্রাসঙ্গিক। কারণ ব্যক্তিগত সঞ্চিত স্বর্ণের পরিমাণ যাহাই হউক, গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই প্রয়োজনের সময় যে তাহা পাইবেন তাহার কি স্থিরতা আছে?

যে পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয়ার্থ আনীত হইতেছে, গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেও তাহা সব ক্রয় করিতে কেন পারিবেন না তাহা রাজস্বসচিব স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই স্বর্ণ রপ্তানী মুদ্রাপ্রসারের দ্বারা প্রকারান্তরে তাঁহারাই সম্ভবপর করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য এই মুদ্রাপ্রসারের আইনত একটা সীমা আছে এবং কথা উঠিয়াছে যে বহুপূর্ব্বেই গভর্ণমেণ্ট এই সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও স্বর্ণরপ্তানী এবং সেই সঙ্গে মুদ্রাপ্রসার বন্ধ হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তাহা ছাড়া, এই আইনের সীমা শূন্য তহবিলে মুদ্রা প্রসারেরই বিরুদ্ধে। গভর্ণমেণ্ট স্বর্ণ ক্রয় করিয়া তহবিল পূর্ণ করিলে সে আপত্তি থাকে না। এ প্রসঙ্গে বাহিরের (অর্থাৎ বিলাতের) খরচের উল্লেখও সম্পূর্ণ অর্থহীন। কারণ এই খরচার একটা সীমা আছে এবং রাজস্বসচিবের উক্তিতেই জানা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসরে বিলাতের সমস্ত খরচা মিটাইবার মত পাউণ্ড এই কয়মাসেই সংগৃহীত হইয়াছে। তা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট স্বর্ণ ক্রয় না করিয়া পাউণ্ড ক্রয় করিতেছেন কেন? গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের একমাত্র ব্যাখ্যা এই যে, তাঁহারা ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করিতে অনিচ্ছুক। হইবারই কথা, কারণ তাহা হইলে ইংলণ্ডের ভারত-শোষণের একটি প্রধান অস্ত্রই যে হাতছাড়া হইয়া যাইবে!

লবণ-শিল্প-রক্ষণ শুল্কের মেয়াদ বৃদ্ধি

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বিগত অধিবেশনে দেশীয় ব্যবসা-শিল্প সংক্রান্ত যে সকল আইন পাশ হইয়াছে, তাহা দেশবাসীর যথেষ্ট মনযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। দেশের আসন্ন রাষ্ট্র-সংস্কারের উপর অধিকতর মনযোগ এই ঔদাসীন্যের একমাত্র কারণ নয়। যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত এই আইনগুলি পাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, গভর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে কৃত-সংকল্প ছিলেন। এই আইনগুলির বিরুদ্ধে জনমত যাহাতে ঘোরতর হইয়া না উঠিতে পারে তাহার জন্যই আইনগুলিকে যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত পাশ করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দু'একটী আইনের বিষয় আলোচনা করিতেছি।

বিগত মার্চ্চ মাসের শেষভাগে দেশীয় লবণ শিল্প-রক্ষণ শুল্কের মেয়াদ বৃদ্ধি করিবার জন্য যে আইন পাশ হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার জন্য জন-সাধারণকে যথেষ্ট অবসর দেওয়া হয় নাই। নতুবা অন্ততঃ বাঙ্গালা-দেশের পক্ষ হইতে এই আইন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি হইবার সম্ভাবনা ছিল। বর্ত্তমান বৎসরে লবণ-শিল্প সংরক্ষণের জন্য একেবারে নূতন কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরের আইনের মেয়াদবৃদ্ধির বিরুদ্ধেও যথেষ্ট আপত্তির কারণ ছিল। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে দেশীয় লবণ-শিল্প রক্ষণের জন্য বিদেশী আমদানী লবণের উপর মণ প্রতি সাড়ে চারি আনা হারে শুল্ক ধার্য্য করিয়া যে আইন পাশ করা হইয়াছিল তাহা সমগ্র দেশবাসী না হউক, অন্ততঃ বাঙ্গালার অধিবাসীগণ একেবারে নিরাপত্তিতে গ্রহণ করে নাই। বর্ত্তমান সংরক্ষণ-শুল্কের মেয়াদবৃদ্ধির মর্ম্ম সঠিক উপলব্ধি করিবার জন্য আমরা পূর্ব্ব বৎসরের মূল ব্যবস্থা-সংক্রান্ত কয়েকটী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিতেছি।

আজ কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতীয় লবণ-কারখানাগুলি বিদেশী আমদানী লবণের প্রতিযোগিতায় ক্রমাগত এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল যে, বিদেশী লবণের উপর গভর্ণমেণ্ট শুল্ক ধার্য্য করিয়া না দিলে শেষ পর্য্যন্ত ইহাদের পক্ষে টিঁকিয়া থাকাই অসম্ভব হইয়া পড়িত। এই শিল্পটীকে রক্ষা করিবার জন্য কি ব্যবস্থা করা সমীচীন হইবে তাহা বিস্তারিত অনুসন্ধান করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে তদন্তের ভার 'ট্যারিফ বোর্ড'এর উপর ন্যস্ত করেন। 'ট্যারিফ বোর্ড' লবণ-শিল্প সংরক্ষণের দাবী স্বীকার করেন বটে, কিন্তু আমদানী লবণের উপর রক্ষণ শুল্ক ধার্য্য করিবার প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। আমদানী লবণের দর ক্রমাগত হ্রাস-বৃদ্ধি পাইতেছিল বলিয়া 'ট্যারিফ বোর্ড' এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, লবণের বাজারদরের তৎকালীন অবস্থায় সংরক্ষণ-সহায়ক শুল্কের হার নির্ণয় বা বাজার দর অনুসারে ধার্য্য হারের নিয়ন্ত্রণ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয়। এই জন্য 'ট্যারিফ বোর্ড' এক অভিনব ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়া গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটী সরকারী ক্রয়-বিক্রয়-সমিতির গঠনের জন্য মন্তব্য প্রকাশ করেন। 'ট্যারিফ বোর্ড'এর উদ্দেশ্য ছিল যে, এই সমিতি সমস্ত দেশী ও বিদেশী আমদানী লবণের একচেটিয়া ক্রয়-ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়া তাহা দেশীয় পাইকার এবং মহাজনদিগের নিকট বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিবে। যে মূল্য পাইলে ভারতীয় কারখানাগুলি লাভবান হইতে পারে, ক্রয়-বিক্রয়-সমিতি সেই হারেই আমদানী লবণের দাম ধার্য্য করিয়া দিবে, ইহাই 'ট্যারিফ বোর্ড'এর অভিপ্রায় ছিল। দেশীয় কারখানাগুলিকে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টাথেই তাঁহারা এই কৌশলের উদ্ভাবন করেন, এবং তদানীন্তন ভারতীয় কারখানাগুলির আয়-ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, আমদানী বিদেশী লবণের মূল্য শুল্ক বাদে ন্যূনপক্ষে প্রতি একশত মণের জন্য ৬৬৲ ধার্য্য হওয়া উচিত। 'ট্যারিফ বোর্ড' যে সময় তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করেন, বিদেশী লবণের বাজার-দর তখন প্রতি একশত মণের মূল্য ৩৮।৪০ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এমতাবস্থায় 'ট্যারিফ বোর্ড'এর প্রস্তাব ও তাঁহাদের নির্দ্ধারিত ৬৬৲ বিক্রয়-মূল্যের হার গৃহীত হইলে, দেশীয় কারখানাগুলি স্ব স্ব উৎপন্ন মালের জন্য মণ প্রতি চারি আনা অতিরিক্ত মূল্য পাইত।

ভারত গভর্ণমেণ্ট 'ট্যারিফ বোর্ড'এর এই অভিনব প্রস্তাব যথাযথ গ্রহণ না করিলেও, তাঁহাদের প্রস্তাবের মূল সূত্রটী মানিয়া লইয়াছেন। এই কারণে গভর্ণমেণ্ট বিগত বৎসরে বিদেশী আমদানী লবণের উপর মণপ্রতি সাড়ে চারি আনা সংরক্ষণ-শুল্ক ধার্য্য করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক খসড়া বিল পেশ করেন। এ বিষয়ে 'ট্যারিফ বোর্ড'এর মতামতের বিরুদ্ধে তাঁহারা এই যুক্তি দেন যে, বিদেশী আমদানী লবণের ক্রমাগত মূল্যহ্রাসের মুখ্য কারণ বিদেশী কারখানা-মালিকের ব্যয়-সংকোচ নয়; ভারতীয় বাজার দখল করিয়া লইবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতাই ইহার প্রকৃত কারণ। এমতাবস্থায় ভারত গভর্ণমেণ্ট আমদানী লবণের উপর সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য্য করিবার জন্য কৃত-সংকল্প হইলে, বিদেশী কারখানা মালিকেরা প্রতিযোগিতাসূত্রে ক্রমাগত মূল্যহ্রাসের প্রচেষ্টা হইতে স্বভাবতঃই নিরস্ত হইবে, এবং আমদানী লবণের মূল্য উৎপাদনের ব্যয় অনুসারে কোন একটী বিশেষ হারে আপেক্ষিক ভাবে স্থিরীকৃত হইবে। তাহা হইলে 'ট্যারিফ বোর্ড' সংরক্ষণ-শুল্কের বিরুদ্ধে যে কারণ দর্শাইয়াছেন, তাহা সমর্থন করিবার আর কোন কারণ থাকিবে না। 'ট্যারিফ বোর্ড'এর প্রস্তাবিত ক্রয়-বিক্রয়-সমিতির ন্যায় কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর লবণ-শিল্প সংরক্ষণের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ন্যস্ত করা অপেক্ষা আমদানী বিদেশী লবণের উপর প্রথাগত ভাবে একটা সংরক্ষণ-শুল্ক ধার্য্য করিয়া দেওয়াই যে সহজ এবং সরল ব্যবস্থা হইবে, গভর্ণমেণ্ট তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন।

সে যাহা হউক, গভর্ণমেণ্ট বিগত বৎসর দেশীয় লবণ-শিল্প-সংরক্ষণের জন্য বিদেশী লবণের উপর মণপ্রতি সাড়ে চারি আনা শুল্ক ধার্য্য করিয়া ব্যবস্থা-পরিষদে যে বিল পেশ করেন, তাহার উদ্ভাবন হইয়াছে এই প্রকারে। কিন্তু বিল পেশ করিতেই বাঙ্গালা দেশ হইতে তুমুল প্রতিবাদ উঠিল। দুই একটি বিষয়ের উল্লেখ করিলেই এই প্রতিবাদের কারণ বুঝা যাইবে :—

ভারতবর্ষে আমদানী লবণের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, একমাত্র বাঙ্গালা দেশই সর্ব্বতোভাবে আমদানী লবণের উপর নির্ভরশীল। বাঙ্গলা দেশ বাদে আর কেবল ব্রহ্মদেশকেই আমদানী-লবণ ব্যবহার করিতে হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশগুলি আমদানী লবণের উপর নির্ভরশীল নহে। এই সকল প্রদেশের অধিবাসীরা স্থানীয় ভারতীয় কারখানার উৎপন্ন লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে। মধ্যপ্রদেশ বা যুক্তপ্রদেশে লবণের কারখানা না থাকিলেও ইহারা নিকটবর্ত্তী প্রদেশ হইতে অল্প ব্যয়ে লবণ আনাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলা বা ব্রহ্মদেশের ন্যায় স্থানে পশ্চিম বা উত্তর ভারত হইতে লবণ আনাইবার জন্য যে পরিমাণ রেল বা ষ্টীমার ভাড়া দিতে হয় তাহাতে এই সকল প্রদেশে ভারতীয় লবণের যথেষ্ট ব্যবহার ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণেই এ পর্য্যন্ত তুলনামূলকভাবে এই দুইটী প্রদেশে ভারতীয় লবণ অপেক্ষা বিদেশী লবণের আমদানী বেশী হইয়াছে। বোম্বাই, করাচী এবং কাথিয়াবাড় বন্দর হইতে উপকূলবাহী জাহাজে ভারতীয় লবণ আমদানী হয় বটে, কিন্তু বিগত বৎসর পর্য্যন্ত তাহার পরিমাণ বিদেশী লবণের তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ ছিল, বলিতে হইবে। বিদেশী লবণ আমদানীর উপর বাঙ্গালীর নির্ভরশীলতা কিরূপ বিষম তাহা কয়েকটী অঙ্কের পরিমাণ দেখিলেই বুঝা যাইবে। ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে যে ৬১৫ হাজার টন বিদেশী লবণ আমদানী হইয়াছিল, তাহার শতকরা ৮৭ ভাগই বাঙ্গালার বন্দরে নীত হইয়াছে। উদ্বৃত্ত ১৩ ভাগ মাত্র ব্রহ্মদেশে গিয়াছে। বাঙ্গালায় আমদানী-লবণের কিয়দংশ বেহার ও আসাম প্রদেশে সরবরাহ করা হয় বটে, কিন্তু বাঙ্গালাতেই তাহার অধিকাংশ ব্যবহার হইয়া থাকে।

এমতাবস্থায় ভারতে বিদেশী আমদানী লবণের উপর শুল্ক ধার্য্য করিয়া দাম চড়াইয়া দিলে, তাহার জন্য মুখ্য ভাবে বাঙ্গালার অধিবাসীদিগকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। বাঙ্গালায় প্রতি বৎসর যে পরিমাণ বিদেশী লবণের ব্যবহার হয় তাহাতে বিগত বৎসরের নির্দ্ধারিত শুল্ক অনুসারে এই ক্ষতির পরিমাণ ৩৬ হইতে ৪০ লক্ষ টাকায় পরিমিত হইয়াছে। এই পরিমাণ ক্ষতি বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালার সন্নিহিত স্থানগুলির অধিবাসীদিগকে, ধার্য্য শুল্ক প্রবল থাকাকালীন প্রতিবৎসর সহ্য করিতে হইবে।

বাঙ্গালার অধিবাসীর উপর এই গুরুভার চাপাইয়া দিবার স্বপক্ষে কি যুক্তি থাকিতে পারে? ইহার একমাত্র কৈফিয়ৎ স্বদেশী শিল্প-সংরক্ষণ। কিন্তু বাঙ্গালার পক্ষ হইতে এই শিল্প-সংরক্ষণের তাৎপর্য্য কি, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যে লবণ-কারখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া 'ট্যারিফ বোর্ড' এবং গভর্ণমেণ্ট সংরক্ষণমূলক প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই পশ্চিমভারতোপকূলে অবস্থিত। ভারতীয় কারখানার উৎপন্ন মাল যাহাতে যথাসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়া বাঙ্গালার তথা ভারতের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হয়, সেজন্য 'ট্যারিফ বোর্ড' এডেনসংস্থিত কারখানাগুলিও ভারতীয় কারখানার পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন,— গভর্ণমেণ্টও তাঁহাদের সংরক্ষণ-শুল্ক-মূলক বিল পেশ করিবার সময় 'ট্যারিফ বোর্ড'এর এই প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, এডেন বর্ত্তমানে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের অধীন এবং সেখানে লবণ কারখানাগুলির পরিচালকবর্গও অধিকাংশ ভারতবাসী। সে যাহা হউক, বাঙ্গালার পক্ষ হইতে ইহাই বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় যে, বোম্বাই তথা এডেনের কারখানাগুলির মালিক, পরিচালক এমন কি শ্রমিকেরাও সব পশ্চিম ভারতবাসী।

তথায় লবণ-শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিলেও চাকুরী বা লাভবণ্টন বিষয়ে বাঙ্গালীর কোন অংশ বা দাবী থাকিবে না। অথচ সে উন্নতির সহায়তা করিবে যে সংরক্ষণ-শুল্ক, তাহার ক্ষতির ভার সম্পূর্ণ বহন করিতে হইবে বাঙ্গালার অধিবাসীকে। এমতাবস্থায় শুল্ক ধার্য্য করিবার ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশ কোন সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারে কি?

অথচ লবণ-উৎপাদন যে একটা জাতীয় শিল্প তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই জাতীয় শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখা দেশের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু সে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে সমগ্র ভারতকে, কেবলমাত্র বাঙ্গলা দেশকে নহে। কোন একটি মাত্র প্রদেশের স্বার্থের সহিত সংঘাত করিয়া এই জাতীয় সমস্যার সমাধান করা চলিবে না। বস্তুতঃ এই প্রাদেশিক স্বার্থ-সংঘাতের বিপত্তি এড়াইয়াও বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। ভারতীয় লবণ-শিল্পের সমস্যাকে যদি জাতীয় সমস্যা বলিয়াই মানিয়া লইতে হয়, আর সে সমস্যার সমাধানের জন্য ক্ষতি-স্বীকার যদি অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সে ক্ষতি-স্বীকারও করিতে হইবে সমগ্র জাতিকে। এরূপ ক্ষতি-স্বীকারের পন্থাও একেবারে অনাবিষ্কৃত ব্যাপার নয়। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের রাজস্বের আদায় হইতে কোন জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিপূরণ-মূলক ভাতা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেই, এরূপ সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান হইতে পারে। বাঙ্গালায় গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত লবণ-শুল্কের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উঠিয়াছিল, তাহা এই যুক্তিকে আশ্রয় করিয়াই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া নহে।

ভারত গভর্ণমেণ্ট এই যুক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাই সংরক্ষণমূলক লবণ-শুল্ক আইন পাশ হইবার অব্যবহিত পরেই ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব-সচিব কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রস্তাব করেন যে ধার্য্য শুল্কের আদায় হইতে এক অষ্টমাংশ বাদ দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহার সম্পূর্ণ পরিমাণ যে-সকল প্রদেশ আমদানী লবণের ব্যবহার করে, তথাকার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে স্থানীয় লবণ-শিল্পের উদ্ধার এবং উন্নতিকল্পে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

ব্যবস্থা-পরিষদে এ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়ের সাল কাবার হয় নাই বলিয়া এখনও এই বণ্টনের ব্যাপার কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাহার পর বৎসর কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে। মূল সংরক্ষণ-শুল্কনির্দ্ধারক আইনের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এক বৎসর, তাহার আয়ু ফুরাইয়া আসিতেই প্রস্তাব উঠিল আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে হইবে,—ভারতীয় লবণ-শিল্পসংরক্ষণের প্রয়োজন এখনও সমান ভাবে প্রবল রহিয়াছে। নির্ব্বিবাদে মেয়াদবৃদ্ধির দাবী পূরণ হইয়া গেল। বাঙ্গালা দেশ তাহার ভাগের টাকা এখনও পাইল না বটে, কিন্তু শুল্কবৃদ্ধির জন্য সম্বৎসর কাল তাহাকে চড়া দামে লবণ কিনিয়া খাইতে হইয়াছে। শুধু তাই নয়, পুনরায় এক বৎসরের জন্য এই চড়া দাম বহাল রাখিবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে।

আইন ত' যথারীতি পাশ হইয়া গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে অনেক সমস্যাই অমীমাংসিত রহিয়া গেল। এ সমস্যার সমাধান আর কোন প্রদেশের পক্ষে না হউক, অন্ততঃ বাঙ্গালার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালায় গত বৎসরে যে লবণ আমদানী হইয়াছে তাহার শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশী আসিয়াছে পশ্চিম ভারত ও এডেনসংস্থিত কারখানাগুলি হইতে। এই অর্দ্ধ পরিমাণ আমদানী লবণের উপর গভর্ণমেণ্টের ধার্য্য শুল্ক আদায় হইবে না,—অথচ বিদেশী লবণের মত ইহার জন্যও বাঙ্গালার অধিবাসীকে চড়া দাম গুণিয়া দিতে হইয়াছে—প্রতি এক শত মণে ২৪৲ হারে। বাঙ্গালার অধিবাসী এই হিসাবে দেশী লবণের জন্য যে পরিমাণ বেশী টাকা দিয়াছে, তাহা আদায় করিয়াছে পশ্চিম ভারতের কারখানার মালিক। এই লবণের উপর শুল্ক রেহাই দিবার জন্য ভারত সরকারের সে বিষয়ে কিছু প্রাপ্য হইল না, আর বণ্টননীতির সূত্র অনুসারে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টেরও সে বিষয়ে কোন দাবী থাকিবে না। শুল্ক-বণ্টনের ব্যবস্থায় কাহারও যদি এই বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে যে এই ব্যবস্থা সাক্ষাৎ ভাবে বাঙ্গালার লবণ-খাদকের না হউক, অন্ততঃ পরোক্ষভাবে বাঙ্গালার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মারফৎ শুল্ক-বৃদ্ধিজনিত চড়াদামের সম্পূর্ণ ক্ষতি-পূরণ করিবে, তবে সেই ধারণা যে নিতান্তই ভ্রমাত্মক হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিয়া লওয়া উচিত।

কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বড় কথা হইল স্থানীয় লবণ-শিল্পের উদ্ধার। এ বিষয়ে অপর কোন প্রদেশ না হউক, অন্ততঃ বাঙ্গালার মনে যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ রহিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে বিগত শতাব্দী পর্য্যন্তও বিস্তৃতভাবে লবণশিল্প প্রতিষ্ঠিত

ছিল। বিদেশী লবণের প্রতিযোগিতা ও গভর্ণমেণ্টের অবহেলায় সে শিল্প বিপর্য্যস্ত হইয়া অধুনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আজ সেই নষ্ট শিল্পের উদ্ধারের আশায় সমগ্র বাঙ্গালা দেশ একেবারে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। তাই চড়া দামের অসহনীয় গুরুভারও বাঙ্গালার অধিবাসী নীরবে এক বৎসরকাল সহ্য করিয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট সে আশাপূরণের কোন আয়োজন করেন নাই। অথচ এ সম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল। অন্ততঃ বিগত বৎসরেই গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি নির্ব্বাচিত স্থানে এই শিল্পোদ্ধারের সুবিধা-অসুবিধা নির্ণয় করিবার জন্য পরীক্ষামূলক ছোট ছোট কারখানা চালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। সে জন্য যে টাকার প্রয়োজন হইত তাহা গত বৎসরের শুল্ক আদায় হইতে অগ্রিম কিছু কিছু বণ্টন করিলেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিবার মত ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতে পারিত। বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন তাঁহাদের অনেকেরই মত যে, মেদিনীপুর, সুন্দরবন প্রভৃতি অঞ্চলে সমবায় প্রণালীতে কুটির-শিল্প হিসাবে লবণ তৈয়ারীর ব্যবস্থা করা চলিতে পারে। ইঁহাদের এই মত অনুসারে বাঙ্গালায় লবণ-শিল্প উদ্ধার করা সম্ভব কিনা, গভর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান-তৎপর হইতে পারিতেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কিছুই হয় নাই,—এমন কি বাঙ্গালাকে এ বিষয়ে কোন আশ্বাসবাণী পর্য্যন্ত দেওয়া হইল না, অথচ যথারীতি লবণ-শুল্কের মেয়াদবৃদ্ধির বিল ব্যবস্থা-পরিষদে পাশ হইয়া গেল।

কথাপ্রসঙ্গ

ব্রিটিশ বাজেট

বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে ইংলণ্ডের অর্থসচিব নেভিল চেম্বারলেন পার্লামেণ্টে ব্রিটীশ বাজেট পেশ করিয়াছেন। নানা হিসাবে রক্ষণশীল দলের এই বাজেট পুরাতনীর ধারা বদ্‌লাইয়া দিয়াছে। নূতন রাজস্বনীতি অনুযায়ী গ্রেট ব্রিটেন শিল্পসংরক্ষণপন্থী হইয়া পড়ায় ইংলণ্ডের ট্যাক্স-আদায়নীতি পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছে।

গ্রেট ব্রিটেনের বাজেট হইতে যে কেবল তদ্দেশীয় বাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই নহে পরন্তু ঐ বাজেটের উপর ব্রিটীশ উপনিবেশ এবং অন্যান্য অনেক দেশের মুদ্রা-মান এবং আর্থিক চলাচল অনেকাংশে নির্ভর করে। সেজন্য আর্থিক জগতের সহিত পরিচিত থাকিতে হইলে, ব্রিটীশ বাজেটের ব্যবস্থা বিশেষ প্রণিধান করা প্রয়োজন।

মোটামুটি দেখা গিয়াছে যে ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব ফিলিপ স্নোডেন মহাশয়ের গত সেপ্টেম্বর মাসের বিশিষ্ট বাজেট বেশ সুফল দিয়াছে এবং তাহার ফলে ১৯৩১-৩২ সালে গ্রেট ব্রিটেন অপেক্ষাকৃত অল্প কষ্ট ভোগ করিয়াই গত বৎসরের অর্থসঙ্কট কাটাইয়া উঠিয়াছে।

আগামী বৎসরের ব্রিটীশ বাজেটের ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৭৬ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড এবং বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আয়ের পরিমাণ আশা করা যায় ৭৬ কোটি ৪৩ লক্ষ পাউণ্ড। সুতরাং বর্ত্তমান ট্যাক্স ইত্যাদির উপর নির্ভর করিলে প্রায় ১৭ লক্ষ পাউণ্ড ঘাটতি হয়। ইহা ছাড়া গত বৎসরের তুলনায় কোন কোন বিভাগে আয় অনেক সঙ্কুচিত হইবার সম্ভাবনা থাকায় মোট ঘাটতির হিসাব করা হইয়াছে প্রায় তিন কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। ইহার তুলনায় অপরদিকে গত বৎসরে আরব্ধ শতকরা দশ পাউণ্ড হিসাবে সংরক্ষণ-শুল্কের দরুণ ২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড, আমদানীর উপর নূতন শুল্ক হইতে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ব্রিটীশ সাম্রাজ্যে উৎপন্ন চায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব রাখিয়া চায়ের উপর যে শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা হইতে প্রায় ৩০ লক্ষ পাউণ্ড অতিরিক্ত আদায় আশা করা যাইতেছে। নূতন আয়ব্যয়ের পরিমাণ হিসাবে আগামী বৎসরের শেষে প্রায়

৮ লক্ষ পাউণ্ড উদ্বৃত্ত থাকিবে অর্থসচিব মহাশয় এইরূপ আশা করিতেছেন।

মোটের উপর বাজেটটা আশাপ্রদ বলিতে হইবে। ব্রিটীশ জাতির অদ্ভুত সহনশীলতার পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায়, এবং কোন অবস্থাতেই যে ইঁহারা হতাশ হইতে জানেন না ইহাতে তাহারও বেশ প্রমাণ রহিয়াছে।

চটকলের সঙ্কট

গত কয়েক সপ্তাহ পাটের বাজারে ও চটকলের মালিকদের মধ্যে বিশেষ আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। ইহার প্রত্যক্ষ কারণ কয়েকটী ভারতীয় পরিচালিত চটকলের অতিরিক্ত সময় কারখানার কাজ চালানর ব্যবস্থা। হেসিয়ানের চাহিদা আজ দুই বৎসর যাবৎ বিশেষ মন্দা। সেজন্য অতিরিক্ত মাল উৎপাদনের ফলে যাহাতে সকলে ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া পড়েন সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় জুট মিল্‌স্ এসোসিয়েশন ক্রমে ক্রমে কারখানার কাজ কমাইয়া আনিয়া বর্ত্তমানে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা মিল চালান এবং শতকরা ১৫টা তাঁত প্রত্যেক চটকলে বন্ধ রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া কাজ চালাইতেছেন। সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত না মানিয়া এসোসিয়েশনের বহির্ভূত তিনটী ভারতীয় মিল দৈনিক দুই এবং তিন দফায় কাজ করাইয়া সপ্তাহে মোট প্রায় ১০৮ ঘণ্টা কল চালাইতেছেন। ইহাতে সকলেই বিশেষ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং নানা প্রকারে তোষামোদ ও ভীতি-প্রদর্শন দ্বারা এসোসিয়েশন ও তাহার বাহিরের মিলগুলির মধ্যে চুক্তি মিটমাট করাইবার চেষ্টা চলিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এ যাবৎ কোন মীমাংসা করা সম্ভব হয় নাই এবং এক্ষণে জুট ব্যবসায়ী ও এসোসিয়েশনের দল গভর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইবার ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে।

পাট বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। পাটের দাম না থাকিলে বাংলার সকল শ্রেণীর লোকেরই দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। সুতরাং যাহাতে পাটের দাম বেশী না পড়িয়া যায় তাহার প্রতি দেশবাসীর ও গভর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

চটকলের মালিক এসোসিয়েশনের মেম্বররা বলেন যে পৃথিবীর চাহিদা ও আমাদের উৎপাদনের উপর চট ও হেসিয়ানের দাম নির্ভর করে। এবং হেসিয়ানের দামের উপর বাজারে ও মফঃস্বলে পাটের দাম বাড়ে কমে। সুতরাং পাটের দাম বেশী রাখিতে হইলে একদিকে যেমন অনিয়ন্ত্রিত পাট উৎপন্ন না হয় তাহা দেখা প্রয়োজন অন্যদিকে তেমনি যাহাতে হেসিয়ানের দাম চড়া থাকে তাহাও দেখা আবশ্যক। এসোসিয়েশনের বহির্ভুক্ত মিলগুলির ব্যবহারে হেসিয়ানের দাম পড়িয়া যাইবে, এবং তাহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল হইবে সমস্ত বাংলায় হাহাকারের সূচনা।

অপর পক্ষে এসোসিয়েশনের বাহিরের মিলগুলি ভাবিতেছেন যে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত নূতন কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এ অবস্থায় যদি বেশী ঘণ্টা কাজ না চালান তাহা হইলে খরচা তাঁহাদের এত বেশী হয় যে তাহার ফলে মিল রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। অতএব এসোসিয়েশনের মিল-গুলির তুলনায় তাঁহাদের বেশী ঘণ্টা কাজ করিতে দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আর্থিক হিসাবে এই সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কারণও রহিয়াছে যাহার দরুণ মিটমাট সম্ভব হইতেছে না। ঠিক এখন বোঝা যাইতেছে না যে এ সঙ্কটের মোচন হইবে কি উপায়ে।

যাহাই হউক, বাংলার সকল শ্রেণীর লোকের অন্ন সমস্যার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা উভয় দলকেই শীঘ্র এই বিষম গোলমাল মিটাইয়া ফেলিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

ব্রিটীশ সাম্রাজ্য-অর্থনৈতিক কন্‌ফারেন্স

গ্রেট ব্রিটেন, ব্রিটীশ উপনিবেশ এবং সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে অধিকতর আর্থিক সখ্য সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই ক্যানাডার অটাওয়াতে এক সুবৃহৎ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইবে। ভূতপূর্ব্ব ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত স্যর অতুল চন্দ্র চ্যাটার্জ্জির নেতৃত্বে স্যর জর্জ রেণী, শ্রীযুক্ত সমুখম্ চেটী, পদমজী জিনবালী প্রভৃতি সরকার মনোনীত সদস্যগণ ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সেখানে যাইতেছেন। আমা-দের ভয় এই যে আগামী শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্য-পক্ষপাতিত্বমূলক শুল্কনীতিতে আবদ্ধ করিবার জন্য এই চেষ্টা। ইহার বিরুদ্ধে আমাদের দেশের জনমতকে প্রস্তুত করিতে হইবে।

ভারত সরকারের নূতন বিলাতী ঋণ

কয়েকদিন হইল ভারত সরকার ইংলণ্ডে এক কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৪ কোটি টাকার নূতন ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতি ১০০ পাউণ্ডের জন্য ৯৫ পাউণ্ড দিতে হইবে এবং ঋণ শোধ করা হইবে ১৯৪২ হইতে ১৯৪৭ সালের মধ্যে। সুদের হার নির্দ্ধারিত হইল শতকরা ৫ পাউণ্ড। আগামী ১৫ই জুন তারিখে যে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে তাহারই জন্য প্রধানতঃ এই নূতন ঋণ গৃহীত হইল। ইহা ছাড়া রেলওয়ের মূলধন হিসাবে খরচ এবং গভর্ণমেণ্টের সাধারণ খরচের বাবদ বাকী টাকা ব্যয়িত হইবে।

ইংলণ্ডে টাকা সস্তা হইয়াছে। এ সময় অবশ্য শতকরা ৫ টাকা ঋণ লওয়ায় আমাদের কিছু সুবিধা বটে। কিন্তু এই অনাহারী ম্রিয়মাণ জাতির উপর আর ঋণের মাত্রা না বাড়াইলে কি চলিত না? সরকারের আর্থিক নীতির আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন যে কতদূর হইয়াছে তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে।

স্বর্ণ রপ্তানীর স্রোত

গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে ভারতবর্ষের স্বর্ণ রপ্তানির যে স্রোত আরম্ভ হইয়াছে তাহা এখনও প্রবহমান। গত ২৩এ এপ্রিল প্রায় ৯০ লক্ষ এবং ৩০শে এপ্রিল ৬৮ লক্ষ টাকার সোণা বোম্বাই হইতে চালান গিয়াছে। মোট ভারতবর্ষ হইতে এই কয় মাসে প্রায় ৭০ কোটি টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। এ বিষয়ে বিশদ করিয়া বর্ত্তমান সংখ্যার স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচিত হইল।

ভারতবর্ষের অর্থশোষণ বন্ধ হইবে কবে কে জানে?

সাম্রাজ্য-পক্ষপাতী সংরক্ষণ-শুল্কনীতি ও ভারতীয় বস্ত্রশিল্প

ইংলণ্ড এবং অন্যান্য ব্রিটিশ পতাকাভুক্ত প্রদেশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব রাখিয়া ভারতবর্ষকে সংরক্ষণ শিল্পনীতিতে আবদ্ধ করিবার জন্য সরকার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ভয় পাছে নূতন শাসন-সংস্কারে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়া গিয়া এদেশে ব্রিটিশ ব্যবসায়ের আর কোন বিশেষ সুবিধা না রাখে। তাই তাড়াতাড়ি অটাওয়া কন্‌ফারেন্সে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে, এবং যাহাতে একদিনও দেরী করিতে না হয় সেজন্য ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের পর্য্যালোচনা ও কাপড়ের উপর শুল্ক কি পরিমাণ হইতে পারে তাহা বিচারের জন্য ট্যারিফ বোর্ডকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

প্রবুদ্ধ ভারত এ সব গোপন ব্যবস্থা মানিয়া লইবে কি?

জীবন-কথা

আইভার ক্রুয়গার

দেশলাই জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট্ পরলোকগত আইভার ক্রুয়গারের আকস্মিক আত্মহত্যার কথা সকলেই শুনিয়াছেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধেও খবরের কাগজ গুলিতে নানা আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু আর্থিক জগতে এই অদ্ভুত মানুষটী যে কি পরিমাণ নূতন দান করিয়া গিয়াছেন তাহার পরিচয় খুব কম লোকেই জানেন। বাংলার পাঠকদিগকে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব। শোনা যায় যে, জীবিতকালে আইভার ক্রুয়গার ক্রমাগত খ্যাতি এড়াইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিতেই ভাল বাসিতেন। যখন তাঁহার শক্তি ও প্রতিভার কথা দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তখনও তাঁহাকে বড় কেহ চিনিত না। তাই ক্রুয়গারের নাম লোকে যতই জানিয়া থাকুক, ব্যক্তিটী চিরকাল তাহাদের কাছে অদৃশ্যই ছিল।

আইভার ক্রুয়গার ছিলেন শিক্ষায় ইঞ্জিনিয়র এবং ইস্পাতের বিশেষজ্ঞ। প্রথমতঃ তিনি কন্‌ট্রাক্টার ও ইঞ্জিনিয়ার হিসাবেই কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন এবং কয়েক বৎসর মেক্সিকো, আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে নানা

কার্য্য ব্যপদেশে ঘুরিয়া ষ্টকহল্‌মে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশে ফিরিয়া তাঁহার শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতি মন যায় এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বাল্যবন্ধু 'টোল্' মহাশয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া "ক্রয়গার ও টোল" নামীয় ব্যবসায়-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। শীঘ্রই এই প্রতিষ্ঠানটির খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়।

১৯১৩ সালে আইভার ক্রয়গার দেশলাই প্রস্তুতে প্রথম মনোনিবেশ করেন এবং তাঁহাদের ক্ষুদ্র সহর 'কালমার'এ প্রতিষ্ঠিত পিতার দেশলাই কারখানাটী হাতে নেন। চারি বৎসর যাইতে না যাইতেই নিজ প্রতিভাবলে ক্রয়গার সুইডেনের প্রায় সমস্ত দেশলাই-শিল্পীদের অগ্রণী হইয়া উঠেন এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত একযোগে মিলিত হইয়া ১৯১৭ সালে জগদ্বিখ্যাত "সুইডিস্ ম্যাচ্ ট্রাষ্ট"এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিল্প-সঙ্ঘের প্রথম মূলধন হয় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ ক্রোনার অর্থাৎ প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। অসামান্য অধ্যবসায় ও বুদ্ধির বলে আইভার ক্রয়গার এই ট্রাষ্টের কর্তৃত্ব নিজ করায়ত্ত করেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত "আইভার ও টোল" ফার্মের নামে ট্রাষ্টের কার্য্য-পরিচালনা আরম্ভ করেন।

এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে আইভার ক্রয়গার বা তাঁহার ফার্ম 'ক্রয়গার ও টোল' প্রত্যক্ষভাবে দেশলাই প্রস্তুতের কার্য্যে তেমন নিরত হন নাই। তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল নানা দেশব্যাপী এক বিরাট শিল্পানুষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা এবং তাহার শেয়ারের কারবারে সুইডিস জাতির ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশীয় ধনিকদের আকৃষ্ট করিয়া রাখা। ক্রয়গারের তত্ত্বাবধানে শীঘ্রই সুইডিস্ ম্যাচ ট্রাষ্ট পৃথিবীর নানা দেশে একচেটিয়া দেশলাই প্রস্তুতের অধিকার-লাভে সমর্থ হয় এবং ক্রমে "ক্রয়গার ও টোল" কোম্পানি ধনিক-মহলে বিশেষ প্রতিপত্তি স্থাপন করে। এই প্রতিপত্তির বলে পরলোকগত আইভার ক্রয়গার একের পর এক-দেশ "জয়" করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে তাঁহার ব্যবসায়-জাল বিস্তার করিতে থাকেন এবং পরিশেষে দেশলাই ছাড়া অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা শিল্পেও তাঁহার অধিকার জন্মে। তাহার মধ্যে প্রধান লোহা, সিমেন্ট, টেলিফোন, ইলেক্‌ট্রিক ও বল বেয়ারিংসংযুক্ত শিল্পাদি। ইহা ছাড়া অনেক বড় বড় ব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জ্জাতিক বন্ধকী এবং শেয়ারের কারবারেও 'ক্রয়গার ও টোল' ফার্ম যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জ্জন করে। এই কারবারের সুবিধার জন্য এবং অনেক স্থলে টাকা ধার দিবার ফলে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাজধানীতে বিশেষতঃ প্যারি ও বার্লিন সহরে বহু জমি ও বাড়ী "ক্রয়গার ও টোল" কোম্পানির সম্পত্তি ভুক্ত হয়।

আইভার ক্রয়গার

আইভার ক্রয়গার ছিলেন অসামান্য উৎসাহী, বিচক্ষণ ও সাহসী। তাঁহার ব্যবসায়ের সাফল্যের মূলে ছিল তাঁহার

প্রীতিপ্রদ ব্যবহার, অধ্যবসায় এবং নিষ্ঠা। দেশলাই শিল্পে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করিবার মূলে ছিল তাঁহার নূতন প্রণালীতে অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা। সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

অন্যান্য কারখানার মালিকদের মত একই স্থানে সুবৃহৎ কারখানা করিয়া পৃথিবীর সমস্ত দেশে মাল সরবরাহ করিবার বিশেষ চেষ্টা ক্রুয়গার করেন নাই। বিগত মহাযুদ্ধের পর যখন সমস্ত ইউরোপীয় জাতি আপন আপন ব্যবসায় সংরক্ষণ-শুল্ক দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিতে ব্যস্ত হন্ তখন আইভার ক্রুয়গার প্রত্যেক দেশে ভিন্ন ভিন্ন ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন, এবং প্রতি জাতির দারুণ অর্থসঙ্কটের সুযোগ লইয়া তাঁহাদের সরকারী ঋণের ব্যবস্থায় সাহায্য করিতে থাকেন। এই সাহায্যের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলেই তাঁহার দেশলাই শিল্পের একাধিপত্যের অধিকার স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আদায় করিয়া লন। বস্তুতঃ দেশলাই-সম্রাট্ আইভার ক্রুয়গারের ধনিক জগতে প্রতিপত্তির প্রধান কারণই ছিল তাঁহার আন্তর্জ্জাতিক ঋণ সংগ্রহ করিয়া দিবার ক্ষমতা এবং এই জন্যই সকল গভর্ণমেণ্টই তাঁহাকে বিশেষ খাতির করিয়া চলিত। দেশলাই কারবারে একচেটিয়া অধিকার পাইবার জন্য বিভিন্ন গভর্ণমেণ্টকে "ক্রুয়গার ও টোল" কত পরিমাণ টাকা ধার দিয়াছিলেন তাহার কিছু পরিচয় নীচের তালিকায় দেওয়া গেল।

	দেশ—	ঋণের পরিমাণ (আমেরিকান ডলার) লক্ষমুদ্রা
১।	জার্ম্মানী—	১২,৫০
২।	পোলাণ্ড—	৪,২৪
৩।	হাঙ্গারী—	৩,৬০
৪।	রুমানিয়া—	৩,০০
৫।	যুগোস্লাভিয়া—	২,২০
৫।	তুরস্ক—	১,০০
৫।	লাটভিয়া—	৬০
৬।	লিথুয়ানিয়া—	৬০
৭।	ডান্‌জিগ—	১০
৮।	ইকুয়াডর—	৩০
৯।	বলিভিয়া—	২০
১০।	গুয়াটেমালা—	২০
		২৮,৫৪

এতদ্ভিন্ন ১। গ্রীস— ১০ লক্ষ
২। রুমানিয়া— ৪০ " "
৩। এস্থনিয়া— ৭০ লক্ষ সুইডিস ক্রোনার।

এইরূপে মোট ১২০ কোটি ক্রোনার পরিমাণ টাকা 'ক্রুয়গার ও টোল' কোম্পানি বিভিন্ন সরকারী ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

সুইডিস্ ম্যাচ ট্রাষ্টের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া এবং ব্রিটীশ ও আমেরিকান ধনিকদের সহযোগিতালাভের আশায় ১৯২৭ সালে আইভার ক্রুয়গার "ইণ্টারন্যাশনাল ম্যাচ কর্পোরেশন" নামে একটী বিশাল কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই কোম্পানি কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকা, জাপান ও ইউরোপে অনেক সম্পত্তি ক্রয় করেন। ১৯২৮ সাল হইতে ক্রুয়গার ও টোল কোম্পানি দেশলাই কারখানার কাজের তত্ত্বাবধান ছাড়িয়া দিয়া সুইডিস্ ম্যাচের এবং ইণ্টারন্যাশনাল ম্যাচের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ ও তাহার উপযুক্ত ব্যবহারের ব্যবস্থার কার্য্যে নিযুক্ত হন। ক্রুয়গার ও টোলের বিশেষ খ্যাতি ও বিপুল সম্পত্তি থাকার ফলে সহজেই তাঁহাদের জামীনে নানা দেশ হইতে লোকে শেয়ার কিনিতে দ্বিধা বোধ করে নাই।

দুর্ভাগ্যক্রমে শিল্প-জগতে গত কয়েক বৎসর হইতে দারুণ নিরুৎসাহ দেখা দিল এবং আইভার ক্রুয়গারের আশানুরূপ উন্নতির স্রোতে অকস্মাৎ ভাঁটা পড়িল। পৃথিবীব্যাপী এই অর্থসঙ্কটের জন্য আইভার ক্রুয়গার প্রস্তুত ছিলেন না। তথাপি তিন বৎসর কাল অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষের অমানুষিক শক্তিরও একটী সীমা রহিয়াছে। সামান্য অবস্থা হইতে পৃথিবীব্যাপী সুবৃহৎ কারবার নিজ হাতে যিনি গড়িয়াছেন তাহারই আশু বিনাশের অবশ্যম্ভাবিত্ব বোধ হয় ক্রুয়গার আর সহিতে পারিলেন না। শরীরও তাঁহার ইদানীং ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাই তাঁহার শক্তি সামর্থ্যের সম্পূর্ণ খ্যাতি থাকিতে থাকিতেই নীরবে একদিন ইহজগৎ হইতে বিদায় লইলেন। ইহাই শক্তিমানের চরম শক্তিপরিচয়।

দেশলাইসম্রাট ক্রুয়গারের জীবনী হইতে পৃথিবীর শিল্পী ধনিক ও বণিকদের অনেক শিখিবার রহিয়াছে। তাঁহার অবর্ত্তমানেও তাঁহার প্রদর্শিত আদর্শ ও অর্থনৈতিক হিসাবে যে আন্তর্জ্জাতিক ঘনিষ্ঠতার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন তাহার শিক্ষা ব্যর্থ হইবে না নিশ্চয়ই।

পুস্তক-পরিচয়

ধনবিজ্ঞানে সাকৃরেতি—শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম্‌, এ, বি,-এল্‌, প্রণীত। ৩১৯ পৃষ্ঠা—মূল্য দুই টাকা।

বাংলা ভাষায় অর্থনীতির আলোচনা যথারীতি আরম্ভ করিয়াছেন অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় ও তাঁহার পরিচালিত বঙ্গীয়-ধনবিজ্ঞান পরিষদের কয়েকজন খ্যাত ও অখ্যাতনামা গবেষক। লেখক তাঁহাদেরই অন্যতম নিষ্ঠাবান্‌ কর্ম্মী। গ্রন্থের ভূমিকা হইতেই লেখকের অনুসন্ধিৎসা এবং প্রকৃত গবেষণা-স্পৃহার পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থখানি পড়িয়া আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। গল্প ও উপন্যাসবহুল বাংলা সাহিত্যের মধ্যে এখন নানা বিষয়ের উপর সুচিন্তিত প্রবন্ধের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। শিববাবুর বইখানি সত্যই আমাদের দেশের একদিকের অভাব-মোচনে সহায়ক হইয়াছে।

লেখক যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন তাহার প্রায় প্রত্যেকটী ১৯২৯-৩০-৩১ সালের বিশেষ সাময়িক সমস্যা হইলেও বর্ত্তমানেও সেগুলির আলোচনা অবান্তর হইয়া পড়ে নাই। সে হিসাবেও বইখানির আদর হওয়া উচিত। ৩৭টী আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

১। ভারতে বৈদেশিক মূলধন। ২। সংরক্ষণ শুল্কের কুফল। ৩। র‍্যাশনালিজেশান ও বেকার সমস্যা। ৪। ১৯১১ সনের ভারতীয় ফ্যাক্টরী আইন। ৫। কয়লার খনির মজুর। ৬। ব্যাঙ্কযোগে যুবক বাংলা। ৭। রুশিয়ার "গসপ্ল্যান"। ৮। কারখানা-শিল্প বনাম কুটীরশিল্প, এবং ৯। স্থানবদ্ধ শিল্পসমাবেশের সুফল।

ভূমিকায় লেখক তাঁহার ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছেন। নূতন বাংলার প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর শিব বাবুর সাকৃরেতির পরিচয় হইতে অনেক শিখিবার রহিয়াছে। কিন্তু বইখানির মধ্যে এত বেশী জিনিষের অবতারণা করা হইয়াছে যে অনেকগুলির আলোচনাই ভাসা ভাসা হইয়া পড়িয়াছে। আরও কিছু মৌলিকতা দেখিলে আমাদের আনন্দ খুব বেশী হইত। তাহা ছাড়া অধ্যাপক বিনয়কুমারের শিষ্যহিসাবে ভাষায় 'সাকৃরেৎ' প্রায়ই ওস্তাদ্‌কে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। বাংলা ভাষায় কোন বিষয় আলোচনার সময় উর্দ্দু ও ফার্সী পরিভাষা অধিক ব্যবহার করিলে অনেকস্থলে বিষয়ের গুরুত্ব কমাইয়া দেয়। কখনও কখনও হাস্যরসেরও সৃষ্টি করিয়া থাকে। আশা করি ভবিষ্যতে শিববাবু এদিকটা ভাবিয়া দেখিবেন।

পাটের কথা—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ৭৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫০ আনা।

বাংলার অমূল্য সম্পদ্‌ পাট। পাটের চাষ ও পাটের জিনিষ বিক্রয়ের উপর আমাদের আর্থিক জীবন অনেকখানি নির্ভর করে। অথচ এই পাটের বিষয়ে বাঙালীর ঔদাসীন্য অপরিসীম। তাহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে লেখক তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে পাট সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পাটের ক্রয় বিক্রয় ও বাজার সম্বন্ধে বইখানিতে বেশ কিছু জানিবার রহিয়াছে। পাটের কাজে যাঁহারা নিরত আছেন তাঁহাদের জন্য না হইলেও সাধারণ বাঙালী পাঠক এবং ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য বইখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

আগামী সংখ্যায় এই বিভাগে প্রকাশিত হইবে—

১। বাংলার লোন অফিস (সুরভি)।

২। ভারতীয় কাগজ-প্রস্তুতকরণ-শিল্প ও তাহার সংরক্ষণ-আইন—
—জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম্‌-এ, বি-এল্‌।

৩। বাংলার বস্ত্রশিল্প—শ্রীপরেশকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

দ্রষ্টব্য :—এই সংখ্যায় "জীবনবীমার কষ্টি-পাথর"-শীর্ষক প্রবন্ধটি মূল ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ।—উঃ সঃ।

কবীরের সাধনা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

এই বিভাগে প্রাচীন ও নবীন ভারতের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে। ইহার সম্পাদন-কার্য্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, এম-এ, (কলি) ডি-লিট্ (প্যারিস)—সহায়তা করিবেন।

ইউরোপীয় ইতিহাসের অনুকরণে ভারতের ইতিহাসেও আমরা যুগনির্দ্ধারণে ব্যস্ত। তাই প্রাচীন যুগের পর একটা মধ্যযুগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে সাধারণতঃ কোন সন্দেহ ওঠে না। কিন্তু চিন্তাজগতের বৈশিষ্ট্য দিয়েই যদি নূতন যুগের উদ্বোধন হয় তাহ'লে বস্তুতঃ ভারতের ইতিহাসে কোন মধ্যযুগের সত্বা নেই। তার কারণ খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে ভারতে যে সব সিদ্ধপুরুষদের আবির্ভাব হয় তাঁদের শিক্ষার ধারাই পরবর্ত্তীকালে অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হ'য়েছিল। কোন বিশেষ রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে ভারতীয় চিন্তা বা সাধনার গতি কোনকালেই প্রতিহত হয় নি, মুসলমান ধর্ম্মের আবির্ভাবেও নয়।

খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে বা সে সময়ের কিছু পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে যে সব সাধক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় তা'র ভিতর নাথ ও সহজ বা অবধূত সম্প্রদায়কেই সব চেয়ে বড় স্থান দিতে হয়। নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা মৎসেন্দ্রনাথের হাতে, ও পুষ্টি হয় গোরখনাথ, রাজা ভর্ত্তৃহরি, গোপীচন্দ্র প্রভৃতির হাতে। সহজ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কে তা' সঠিক বলা যায় না, তবে এই সম্প্রদায়ের যে সব সিদ্ধপুরুষদের আবির্ভাব হ'য়েছিল তাঁদের ভিতর ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতি—কৈবর্ত্ত, তাঁতি, তিলি প্রভৃতিও ছিল। নাথ ও সহজ কোন সম্প্রদায়ের ভিতরই জাতিবিচার ছিল না—যে কোন জাতীয় ব্যক্তিই নিজের প্রতিভাবলে আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নীত ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার অধিকার পেতে পারত। তাই ব'লে এমন কথা বলাও চলে না যে এই সব সাধকেরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটা অভিযান চালিয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ—প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের ধারা অনুকরণ ক'রে বর্ণাশ্রমের বাইরে এক উদাসী যোগী সম্প্রদায় সৃষ্টি করাই ছিল তাঁদের কাম্য।

সে যা'হোক্ অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলাভাষায় লেখা যে সাহিত্য সম্প্রতি প্রকাশিত হ'য়েছে তা'র আলোচনা ক'রলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই দুই সম্প্রদায়ের প্রভাব খৃষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। এর পরই উত্তর ভারতে গুরু রামানন্দ ও তাঁর বারোজন শিষ্যের আবির্ভাব।

রামানন্দ ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে অথবা চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। নানা গ্রন্থের কথা বিশ্বাস ক'রতে হ'লে ধরতে হ'বে তিনি ১১১ বৎসর জীবিত ছিলেন। পঞ্চদশ শতকের প্রথমেই তাঁর মৃত্যু হয়। কবীর সে সময়ে বালক। রামানন্দের বারোজন শিষ্যের নাম—অনন্তানন্দ, সুরসুরানন্দ, পীপা, সুখানন্দ, কবীর, ভবানন্দ, সেনা, ধন্না, রুইদাস, জীবানন্দ, রঘুনাথ ও পদ্মাবৎ। রামানন্দ প্রথম অবস্থায় রামানুজী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন—পরে সে সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে এক পৃথক্ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। তাঁর নূতন ধর্ম্মমতে ভক্তির স্থান থাক্‌লেও বর্ণাশ্রমের বন্ধন উঠে গেল। ব্যবহারিক আচারের ওপর তিনি আর জোর না দিয়ে নীচ জাতীয়দের স্বধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রলেন। তাঁর শিষ্যদের ভিতর রুইদাস চামার, ধন্না জাঠ, সেনা নাপিত ও কবীর জোলা। সে পরিচয় কবীর নিজেই দিয়েছেন—

> জাতি জুলাহা মতিকো ধীর।
> হরষি হরষি গুণ রমৈ কবীর॥—
> মেরে রামকী অভৈপদ নগরী কহৈ কবীর জুলাহা।—
> তু' ব্রাহ্মণ মৈ' কাসীকা জুলাহা।—

কবীর যখন সাধনমার্গ অবলম্বন করেন তখন তিনি বালক—রামানন্দের বৃদ্ধ বয়স। শোনা যায় তিনি প্রথমে কবীরকে দীক্ষিত ক'রতে রাজী হ'ন নি। পরে একদিন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে তিনি যখন গঙ্গাস্নান ক'রে কাশীর ঘাট দিয়ে ফিরছিলেন তখন দৈবাৎ এক নীচজাতীয় সুপ্ত পথিককে স্পর্শ করেন। তাঁকে স্পর্শ ক'রেই তিনি রামনাম উচ্চারণ করেন। সেই অস্পৃশ্য পথিকই বালক কবীর। তিনি রামানন্দের উচ্চারিত 'রামনাম'কে গুরুদত্ত মন্ত্র মনে ক'রে সাধনা সুরু করেন ও সিদ্ধ হ'ন।

কবীরের জন্ম ও মৃত্যুকাল নিয়ে নানা মতের সৃষ্টি হ'য়েছে। এর ভিতর সব চেয়ে যুক্তিপূর্ণ মত গ্রহণ ক'রলে স্বীকার ক'রতে হবে যে কবীরের জন্ম হ'য়েছিল চতুর্দ্দশ শতকের শেষ-

ভাগে (১৩৯৮—১৪০০) ও মৃত্যু হ'য়েছিল ষোড়শ শতকের প্রথমে (১৫১৮)। কবীর দিল্লীর পাতশা' সিকন্দর লোদির সময়ে জীবিত ছিলেন। সিকন্দর লোদির মৃত্যু হয় ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে ; তা' হ'লে বলা যায় কবীর ও চৈতন্যদেব অনেকটা সমসাময়িক। চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮৫ ও মৃত্যু ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে।

রামানন্দের সঙ্গে কবীরের সম্বন্ধ কতটা তা' আমরা জানি না—তবে কবীরের রচিত যে সব পদ সংগৃহীত হ'য়েছে তা' থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে নাথ ও সহজ সম্প্রদায়ের সাধন-মার্গের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। এ সব সম্প্রদায়ের সাধনার প্রধান অঙ্গ হ'চ্ছে হঠযোগ, কাম্য হ'চ্ছে সহজজ্ঞান। কবীরের সাধনাও তাই। তা' ছাড়া কবীরের রচিত পদের ভিতর ঐ সব সম্প্রদায়ের সাহিত্যের ভাষা ও ভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে। ঐ সব সম্প্রদায়ের সাহিত্যেই প্রথম দোঁহা বা দ্বিপথা-ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। কবীরের বেশীর ভাগ রচনাতেই এই ছন্দ ব্যবহৃত হ'য়েছে। প্রাচীন সহজসিদ্ধ তিল্লোপাদের রচিত—

তু মরই জহি পবণ তহি লীণো হোই নিরাস।
সঅসংবেঅণ তত্তফলু স কহিজ্জই কীস।

আর কবীরের রচিত —

জহাঁ ন চাড়ী চঢ়ি সকৈ রাই ন ঠহরাই।
মন পবন কা গমি নহী তহাঁ পহুঁচে জাই॥

এ দুই দোঁহার ভেতর যে শুধু ছন্দেরই মিল র'য়েছে তা' নয় ভাবেরও মিল আছে। উভয়েই মনপবনের গতিবিরহিত সহজ সমাধির কথা ব'ল্ছেন। কিন্তু ভাষা ও ভাবে এর চেয়ে গূঢ় সম্বন্ধ সিদ্ধসাধক সরহপাদ ও কবীরের কথার ভিতর। সরহপাদ ব'ল্ছেন যে সদ্‌গুরু হ'তে হ'লে নিজেকে আগে জানা চাই—যতক্ষণ নিজেকে জান্‌তে না পারছ ততক্ষণ শিষ্য ক'রো না, অন্ধ অন্ধকে চালিত ক'রলে দু'জনই কূপে পড়ে।

জাব ণ অপ্পা জাণিজ্জই তাব ণ সিস্‌স করেই।
অন্ধ অন্ধ কঢ়াব তিম বেণ্ণ বি কুব পড়েই।

কবীরও অসদ্‌গুরুর সম্পর্কে অনুরূপ ভাষায় বল্ছেন—

জাকা গুরুজী অন্ধলা, চেলা খরা নিরন্ধ।
অন্ধে অন্ধা ঠেলিয়া, দুন্যুঁ কূপ পড়ংত।

সহজসিদ্ধদের আর একজন গুণ্ডরীপাদ ষট্‌চক্র বা সাধারণ অবস্থায় মন পবনের অভেদ্য স্থান সম্বন্ধে ব'ল্ছেন—

সাসু ঘরে ঘালি কোঞ্চা তাল।

অর্থাৎ শ্বাসের ঘরে যে তালা দেওয়া র'য়েছে তা'কে ভাঙ্‌তে হবে। আর কবীর ঐ কথাই আরও কিছু স্পষ্ট ক'রে অনুরূপ ভাষায় ব'ল্ছেন—

ষট্‌চক্র কি কনক কোঠরী বস্তু ভাব হৈ সোই।
তালা কুংচী কুলফকে লাগে, উঘড়ত বার ন হোই।

পূর্ব্বসিদ্ধদের রচনা ও কবীরের রচনার ভিতর ভাষা ও ভাবের ঐক্য ছাড়া কবীর নিজের মুখে তাঁদের গুরু বা আদর্শ সিদ্ধপুরুষ ব'লে মেনে নিয়েছেন। তাঁর রচনায় গুরু রামানন্দের নাম ক্বচিৎ মেলে—যেমন "কাশীমেঁ হম প্রগট ভয়ে হৈঁ রামানন্দ চেতাএ", কিন্তু হঠযোগে সিদ্ধ গোরখনাথ, ভর্ত্তৃহরি ও গোপীচাঁদের নাম তা'র চেয়েও বেশী পাওয়া যায়—যেমন "অবধূ গোরখনাথি জাঁণী" (পৃঃ ১৪২), "গোরখ ভরথরী গোপীচংদা, তব মন সৌঁ মিলি করৈঁ অনংদা" (পৃঃ ৯৯),

"ভরথরী ভূপ ভয়া বৈরাগী।
বিরহ বিয়োগী বণি বণি ঢুঁঢ়ৈ,
বাকী সুরতি সাহিব সৌ লাগী।" (পৃঃ ১৮৯)

পূর্ব্বসিদ্ধদের ও কবীরের রচনার ভিতর আর একটা বড় ঐক্য আছে সাঙ্কেতিক শব্দের ব্যবহারে। তাঁরা সকলেই ছিলেন মর্ম্মবাদী বা mystic. তাই তাঁরা সাধনার গূঢ় কথা সহসা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত না ক'রে সাঙ্কেতিক শব্দের সাহায্য নিতেন। এই সব শব্দের সঠিক অর্থ গুরুর মুখ থেকেই উপলব্ধি হ'ত।

পূর্ব্বসিদ্ধেরা মনপবন বা কুণ্ডলিনী শক্তিকে 'মূষিক' ব'লেছেন, তার কারণ আঁধার ঘরে মূষিকের ব্যবহার চঞ্চল, সে চুরি ক'রে খায়। মনপবনের সাধারণ অবস্থাও চঞ্চল, যখন সাধক যোগস্থ হ'ন্ তখন সে পবন স্থিরীকৃত হ'য়ে দেহের ভিতরের ষট্‌চক্র ভেদ ক'রে সহস্রারে অমৃত পান করে—তাই পূর্ব্বসিদ্ধেরা যেমন ব'লেছেন—

"নিসি অন্ধারী মুসা অচারা।
অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ অহারা।"

কবীরও তেমনি ব'লেছেন—

মনরে জাগত রহিয়ে ভাই।
গাফিল হোই বসতি মতি খোবৈ,
চৌর মুসৈ ঘর জাই।

প্রাচীন সহজসিদ্ধ বীণাপাদ যখন যোগস্থ হ'য়ে তন্ত্রী বাদন করেন তখন তাঁর বীণের তন্ত্রী হ'চ্ছে সূর্য্য চন্দ্র অর্থাৎ দেহের ভিতরকার দুই নাড়ী, ইড়া ও পিংগলা। সে তন্ত্রিকার দণ্ডী, অবধূতী বা মধ্যমা নাড়ী সুষুম্না, যা'তে বা অনাহত শব্দ নাদিত হয়। আর সেই অনাহত রুণু রুণু শব্দ চিত্তগগনে প্রতিধ্বনিত হয়—

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী।
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা।

সেই সময়ে কখনো কখনো তিন পাটে বা নাড়ীতে ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুত হয়—

তিনিএঁ পাটে লাগেলি রে অণহ কসণ ঘন গাজই।

আর কবীরও সেই যোগের কথাই অনুরূপ সাঙ্কেতিক ভাষায় ব'লছেন—

জংত্রী জংত্র অনুপম বাজৈ, তাকা শবদ গগন মেঁ গাজৈ।—
সুরকী নালি সুংতি কা তুংবা, সৎগুরু সাজ বনায়া।—

অথবা—

অবধূ নাদৈঁ ব্যংদ গগন গাজৈ, সবদ অনাহদ বোলৈ।
অংতরি গতি নহীঁ দেখৈ নেড়া, ঢুংঢ়ত বন বন ডোলৈ॥

এই থেকেই বোঝা যাবে যে প্রাচীন সিদ্ধদের ও কবীরের সাধনা ও রচনার ভিতর সম্বন্ধ কত নিকট। সুতরাং যে সময় থেকে আমরা মধ্যযুগের সূত্রপাত মনে করি সে সময়ে কোন নূতন যুগ প্রবর্ত্তন ত' হয়নি বরং প্রাচীন সাধনা ও চিন্তার ধারা লোপ না পেয়ে নূতন সাধকদের হাতে প্রসার লাভ ক'রছিল ও ভারতীয় সভ্যতাকে পরিপুষ্ট ক'রে তুলছিল। অথচ কবীরের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বেই কত না রাজনৈতিক বিপ্লব উত্তর ভারতের নাগরিক জীবনকে উদ্ব্যস্ত করেছে!

এইবার কবীরের শিক্ষার মূলসূত্রগুলির পরিচয় দেব। পূর্ব্বেই ব'লেছি কবীর মর্ম্মবাদী বা mystic. তিনি নিজে মুখেই স্বীকার ক'রেছেন যে তিনি "বাউর", অর্থাৎ বাউল বা বাতুল, তিনি 'অবধূ' বা অবধূত। সর্ব্বোপরি "কবীর হীরা-বণজিয়া মান-সরোবর তীর" অর্থাৎ তিনি মানস সরোবরের তীরে হীরার বণিক। সে মানস সরোবর জলে পূর্ণ, সেখানে হংস কেলি করে, মুক্তাফল থেকে মুক্তা প্রস্তুত হয়, গগন অমৃত বর্ষণ করে ও কমল প্রকাশিত হয়।

মানসরোবর সুভর জল, হংসা কেলি করাহিঁ।
মুকুতাফল মুকুতা চুগৈঁ, অব উড়ি অনত ন জাহিঁ॥
গগন গরজি অঁমৃত চবৈ, কদলী কঁবল প্রকাস।
তহাঁ কবীরা বন্দিগী, কৈ কোই নিজ দাস॥

সুতরাং যে মানস সরোবরের তীরে কবীর হীরা বেচা-কেনা করেন সে সরোবর চিত্তে। হংসরূপী আত্মা বা ব্রহ্ম সেখানে কেলি করেন, সহস্রদল পদ্ম সেখানে প্রকাশ পায় ও চিত্তগগন অমৃতে মধুময় হয়। যোগী কবীর সমাধিস্থ হ'য়েই সেখানে হীরার ব্যবসা করেন। সেই কথাই স্পষ্ট ক'রে কবীর অন্যত্র ব'লছেন—

সরীর সরোবর ভীতরৈ আছৈ কমল অনূপ।
পরমজ্যোতি পুরুষোত্তমো জাকৈ রেখ ন রূপ।

[শরীর সরোবরের ভিতর এক অনুপম কমল আছে। আর সেখানে পরম জ্যোতিবিশিষ্ট অসীম ও অরূপ পুরুষোত্তম বিদ্যমান]।

কবীর তাঁর সাধনমার্গকে সূক্ষ্মমার্গ বলেছেন। সে মার্গ আধ্যাত্মিক, তা'কে অবলম্বন না ক'রলে এই দৃশ্যমান জগতের অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় না। কে কোথা থেকে এসেছে ও কোথায় যাবে তা'ও বুঝ্তে পারা যাবে না। সে পথ সাধারণতঃ দুর্গম, কেউ সে পথে সহজে যেতে পায় না—

কবীর মারিগ কঠিন হৈ, কোই ন সকই জাই।

সে পথ ধ'রে কবীর এতদূরে উঠ্তে পেরেছেন যেখানে পাখীরও গতিবিধি নেই; মুনিজনেরা সুরনরেরা হতাশ হ'য়ে ব'সে থাকেন কিন্তু কবীর সৎগুরুকে সাক্ষী রেখে সেই অগম্য মার্গ বেয়ে এক উচ্চ স্থানে ঘর বেঁধে বাস করেন—

জহাঁ ন চীঁড়ী চঢ়ি সকৈ, রাই ন ঠহরাই।
মন পবনকা গমি নহীঁ তহাঁ পহুঁচে জাই।
কবীর মারগ অগম হৈ, সব মুনিজন বৈঠে থাকি।
তহাঁ কবীরা চলি গয়া, গহি সৎগুরু কী সাখি।
সুরনর থাকে মুনিজনা, জহাঁ ন কোই জাই।
মোটে ভাগ কবীরকে, তহাঁ রহে ঘর ছাই॥

সেই অগম্য স্থানে পৌছুতে হ'লে সৎগুরুর সাহায্য আবশ্যক। সৎগুরুই সকল জগতের রহস্য অবগত করিয়ে দেন ও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেন। যে গুরু মিল্‌লে জ্ঞান উদ্ভাসিত হয় সে গুরুকে ভোলা যায় না, তিনি সংশয় ও ভেদজ্ঞানের উচ্ছেদ সাধন করেন, তিনি শান যন্ত্র, মনের ময়লা ছাড়িয়ে চিত্তকে দর্পণের ন্যায় করেন, তিনি ধোবী, আর শিষ্য কাপড়, প্রেমরূপ শিলায় যখন তিনি সেই কাপড় ধৌত করেন তখন আবার জ্যোতি প্রকাশ হয়। তাই কবীর ব'ল্‌ছেন—

জগৎ জানায়ো যোহি সকল, সো গুরু প্রগটে আয়ে।
যিন্‌হ্‌ আঁখিয়নহ্‌ গুরু দেখিয়েঁ। সো গুরু দেহিঁ লখায়ে।
কবির সংশয় খায়া সকল জগ্‌, সংশয় কোই না খায়।
যো বেধা গুরু অচ্ছর, সো সংশয় চুনি খায়।
কবির শিক্‌লি গর্‌, কিজিয়ে সব্দ মস্কলা দেই।
মন্‌কা ময়িল ছোড়াইকে, চিৎদরপণ্‌ করি লেই।
কবির গুরু ধোবি, শিষ কাপ্‌ড়া, সাবন পৃজনি হার।
সুরর্তা শিলাপর ধোইয়ে, নিক্‌লে জ্যোতি অপার॥

যখন সেই সৎগুরুর উপদেশ লাভ হয় তখনই প্রেমবারি বর্ষিত হয়। তখন কবীর হর্ষে বিভোর হ'য়ে বলেন—

বাদল প্রেম্‌কা হম পরি বরষা আই।

সৎগুরুর কৃপায় যখন চিত্ত দর্পণের মত পরিষ্কার হয়, সংশয় ও ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হয়—তখন ধ্যান অবলম্বন ক'রেই, কবীরের মতে সাধক গম্য স্থানে পৌছুতে পারেন। এই ধ্যানকেই কবীর ব'ল্‌ছেন 'সুমিরণ' বা স্মরণ। স্মরণই সাধনার সার,—"সুমিরণ সার হৈ ঔর সকল জঞ্জাল"। কিন্তু স্মরণ কাকে কর্‌তে হবে—সে কথাও কবীর ব'লেছেন। স্মরণ ক'র্‌তে হবে রামকে, রামই শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় নাম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ প্রভৃতি দেবগণ, নারদ শুকদেব প্রভৃতি ঋষিগণ, সনক, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তগণ সকলে রামকেই স্মরণ ক'রেছেন—

কবির রামনাম সুমিরণ করে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্‌।
কহেহিঁ কবীর সুমিরণ ক'রে নারদ শুকদেব্‌ শেষ॥
কবির সনকাদি সুমিরণ করে নাম ধ্রুব প্রহ্লাদ।

কিন্তু কবীরের রাম সগুণ দেবতা ন'ন, নিগুর্ণ নিরাকার ও শব্দরূপী, অর্থাৎ তিনিই শব্দব্রহ্ম। পরবর্ত্তীকালের বৈষ্ণবের ন্যায় সে রামকে সখা দাস বা পুত্রভাবে সেবা করাই সাধনার কাম্য নহে। সেই রামরূপ শক্তিকে জাগ্রত ক'রে সমাধির উন্মনী অবস্থাই সাধনার কাম্য। রামরূপী সেই শব্দব্রহ্ম অলক্ষ্য—তাঁকে লক্ষ্য করা যায় না।

কবির ওয়াকি গতি আস্‌ অলখ্‌, অলখ লখা নেহিঁ যায়।
শব্দ স্বরূপী রাম হায়, সব ঘাট্‌ রহা সমায়।

যখন সেই শব্দস্বরূপী রাম লাভ হয় তখন চিত্ত উন্মনী হয় ও শূন্যে বা গগনে প্রবেশ করে। সেখানে চাঁদ নেই অথচ চাঁদিমা বা জ্যোতি আছে, অলক্ষ্য নিরঞ্জন রাজা রাম সেইখানেই বিদ্যমান—

কবির মন লাগা উন্মুনী সোঁ, গগণ্‌ পহুচা যায়।
চাঁদ বিহুনা চাঁদনী, তাঁহা অলখ্‌ নিরঞ্জন রায়।

আর যখন কবীরের সেই রাম মেলে না, অর্থাৎ তাঁর চিত্ত উন্মনী হ'তে পায় না তখনই তিনি বিরহকাতর হ'য়ে ওঠেন। তখন তিনি অনাথ, বিরহভুজঙ্গ তাঁর দেহ মনকে দগ্ধ ক'র্‌তে থাকে, সে দারুণ দুঃখ তাঁর অসহনীয় হয়; প্রতি শিরায় অনাহত রামনাম ধ্বনিত হয়, আর তিনি তা শুনতে পান্‌ না। তখন সেই রাম-বিরহব্যথায় কাতর কবীর বলেন—

ইসু তন মন মধ্যে মদন চোর।
জিন জ্ঞান রতন হরি লীন মোর।
মৈঁ অনাথ প্রভু কহোঁ কাহি।
কাঁ কৌন বিগুতো মৈঁ কো আহি।
মাধব দারুণ দুঃখ সহো ন জাই।
মেরো চপল বুদ্ধি সোঁ কহা বসাই।
কবীর বিরহ ভুজঙ্গম তন্‌ ডছেও মন্ত্র না লাগে কোই।
রাম বিয়োগী ন জীঁয়ে জীঁয়ে তো বাউর হোয়।
কবীর রগ্‌ রগ্‌ বজে রবাব তন্‌, বিরহ সস্তায়ে নিৎ।
অওর ন কোই শুন্‌সি, সাঁই শুনে কি চিৎ।

কিন্তু বিরহে পাগল না হ'লে মিলন হয় না। তাই যেমন প্রিয়তম রামের নাম স্মরণ করা সাধনার অঙ্গ তেমনি তাঁর বিরহে পাগল হওয়া আবশ্যক। পাগল না হ'তে পার্‌লে—

কোন্‌ জগাওয়ে ব্রহ্মকো, কোন্‌ জগাওয়ে জীউ।
কোন্‌ জাগওয়ে সুরতিকো কোন্‌ মিলাওয়ে পিউ।

কে ব্রহ্মকে জাগাবে? কে জীবনকে জাগাবে, কেই বা প্রেমকে জাগাবে, কেই বা প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত করবে? তা'র উত্তর কবীর নিজেই দিয়েছেন—

কবীর বিরহ জগাওয়ে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম জাগাওয়ে জীউ।
জীউ জগাওয়ে সুরতিকো, সুরতি মিলাওয়ে পীউ।

বিরহই ব্রহ্মকে জাগ্রত করে, ব্রহ্ম চিত্তকে, চিত্ত প্রেমকে জাগ্রত করে। তখনই বিরহের অবসান। তাই এ প্রেমও দুর্লভ। কবীর তাঁর রচনায় আক্ষেপোক্তি করেছেন যে সকলেই প্রেম প্রেম বলে, কিন্তু প্রেম কেউ চিনে না, এ প্রেম সহজে পাওয়া যায় না। কবীর নিজের দেহকে জ্বালিয়ে কালী প্রস্তুত করেন, আর সেই কালীতে রাম লিখে যখন রামকে পাঠাতে পারেন তখনই তিনি প্রেম বুঝ্‌তে পারেন। অর্থাৎ স্মরণে ও বিরহে তন্ময়তা না আস্‌লে সত্য প্রেমিক হওয়া যায় না—

প্রেম প্রেম সব্‌হিঁ কহে প্রেম না চিহ্নে কোয়।
যোঁহি ঘট্‌ প্রেম্‌ পিঞ্জরে বসে, প্রেম্‌ কহাবয়ে সোয়॥

কবির প্রেম্‌ ন চিন্‌হিয়া, চাখি ন চিহ্নো সোয়াদেয়।
সুনে ঘরকা পাহুনা, যোঁও আওয়ে তৌঁও যায়॥

যহ তন জালৌঁ মসি করৌঁ, লিখৌঁ রামকা নাউঁ।
লেখনি করুঁ করংক কী, লিখি রাম পঠাঁউ।

সে অবস্থা আদর্শ পতিব্রতা নারীর অবস্থা। সে অবস্থায় কবীরের চিত্তে রাম ব্যতীত আর কারো রূপ প্রতিভাত হয় না, আঁখি দিয়ে আর কাউকে দেখ্‌তে পান না। তখন পাপিয়ার মত এক স্বাতি বিন্দুর আশায় তিনি সমস্ত সমুদ্রকে তুচ্ছজ্ঞান করেন ও অবলা নারীর ন্যায় প্রিয়কে ডাকেন, সে প্রিয়তম এক, তিনি শূন্যরূপী নির্গুণ রাম—অপর কেউ নয়—

কবীর নয়না ভিতর আউতূ, তেঁহ নয়ন ঝপেহু।
নাহি দেখ আওরকোঁ, না তু দেখ ন দেহু।
কবীর বারবার কেয়া আঁখিয়া, মেরা মন কি শোয়।
কলিতো উধলি হোয়গি সাঁই আওর ন কোয়।
কবীর রহে সমুদ্রকে বীচমে, রটে পিয়াস পিয়াস।
সকল সমুদ্র তিনুকা গণে, এক স্বাতি বুন্দকি আস।
কবির ময় অবলা পিউপিউ করৌঁ নিরগুণ, মেরা পিউ।
শূন্য সনেহি রাম বিনু আওর ন দেখো পিউ॥

যখন সেই শূন্যস্বভাব, নিরাকার ও নিরঞ্জন রামের সহিত মিলন সাধিত হয় তখনই কবীরের সহজ জ্ঞান লাভ হয়। তাই কবীরকে অনেকে সহজধর্ম্মী মনে করেন। এ সহজ ধর্ম্ম কি? কেহ কেহ মনে করেছেন যে সাম্প্রদায়িকতা হ'তে মুক্তিলাভই হচ্ছে এই সহজ ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। এ ধর্ম্ম কোন শাস্ত্রগ্রন্থের প্রামাণিকতায় বিশ্বাস করে না—বাইরের আচার ব্যবহারের অনুশীলনকেও ধর্ম্মের অঙ্গ মনে করে না। তাই কবীরের রচনায় অনেক স্থলেই পাষাণ বা দেবদেবীর পূজা, তীর্থভ্রমণ, পণ্ডিতের কূটতর্ক প্রভৃতির ওপর কটাক্ষ র'য়েছে। তাঁর মতে এ'র কোনটীতেই মুক্তি-লাভ হয় না। কিন্তু তাই ব'লে কবীরের সহজ ধর্ম্মকে natural religion of man বলা চলে না। তাঁর 'সহজ' 'natural' বটে কিন্তু মৌলিক বা ব্যবহারিক হিসাবে নয়, পারমার্থিক হিসাবে। সে সহজ কবির সহজ নয়,—সে সহজ লাভ ক'রতে হ'লে গুরুর দেওয়া মন্ত্র ও যোগ-সাধনার আবশ্যক। এই সহজ সম্বন্ধে যখন চণ্ডীদাস ব'ল্‌ছেন—

সহজ সহজ, সবাই কহয়ে, সহজ জানিবে কে?
তিমির অন্ধকার, যে হয়েছে পার, সহজ জানিবে সে।

কবীরের দোহাতেও সেই একই আক্ষেপ অনুরূপ ভাষায় পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ছে—

সহজ সহজ সব্‌কো কহৈ, সহজ ন চীহ্নৈ কোই।
জিহ্ন সহজৈ বিসিয়া-তজী, সহজ কহাঁজৈ সোই।
সহজ সহজ সব্‌কো কহৈ, সহজ ন চীহ্নৈ কোই।
জিহ্ন সহজৈঁ হরিজী মিলৈ, সহজ কহীজৈ সোই।

এই সহজ জ্ঞান লাভ ক'রলে যোগী আদর্শ যোগীপদ লাভ করেন, তখন তিনি একেলা উদাসীন ভাবে ভ্রমণ করেন, বাইরের চিহ্ন ধারণ করেন না, কারণ সহজানন্দের আনন্দে তিনি বিভোর, অনাহত বেণু বাজিয়ে তিনি চলাফেরা করেন—

বাবা জোগী এক অকেলা, জাকৈ তীর্থ ব্রত ন মেলা।
কোলী পত্র বিভূতি ন বটবা, অনাহদ বেন বজাবৈ।
মাগি ন খাই ন ভূখা সোবৈ, ঘর অঙ্গন ফিরি আবৈ।

তখন বহির্জগতের সুখদুঃখে চিত্তের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, বাস্তব জগতেব কোন আঘাতেই মন চঞ্চল হয় না—সে হ'চ্ছে এক উদাস অবস্থা। তা'তে ভাব-অভাব নেই, পাপ পুণ্য নেই, রাগ-বিরাগ নেই। সে সহজ স্বভাবতই নির্ম্মল। সে সহজ জ্ঞান উৎপন্ন হ'লে স্কন্ধ ভূত আয়তন ও ইন্দ্রিয় অর্থাৎ উপাধি সকল নষ্ট হয়, তাই সহজ নির্গুণ ও শূন্যস্বভাব। সে সহজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, অর্থাৎ চোখে তা'কে দেখা যায় না, ত্বক্‌ দিয়ে তা'কে স্পর্শ করা যায় না, ঘ্রাণে তার আঘ্রাণ পাওয়া যায় না—তাই পূর্ব্বসিদ্ধেরা তা'কে 'গ্রাহ্য-গ্রাহক-বিবর্জ্জিত' ব'লেছেন। আত্মস্থ হ'য়েই শুধু সে সহজ উপলব্ধি হয়। সে অবস্থায় চিত্তের আসা-যাওয়া থাকে না। তাই 'সহজ' লাভ ক'রতে পারলে মায়ার প্রতিকৃতি বহির্জগতের সঙ্গে বন্ধন টুটে না, আশা-পাশ খণ্ডিত হয় না, অপার নির্ম্মল আনন্দ অনুভূত হয় না—

আসাপাস সংড নহী পাড়ে যৌ মন হুনি ন লুটৈ।
আপা পর আনন্দন বুঝৈ, বিন অনভৈ কুঁ ছুটৈ।

কহ্যা ন উপজৈ উপজ্যা নহি জানৈঁ ভাব অভাব বিহুনা।
উদৈ অস্ত জহাঁ মতি বুধি নাঁহী, সহজ রাঁম ল্যো লীনা।

সুতরাং এই ভাব-অভাব-বিহীন সহজকেই কবীর খোঁজ ক'রতে ব'লছেন—

আবৈ না যাই মরৈ ন জীবৈ তাসু খোজ বৈরাগী।

কিন্তু এ সহজ কীসে লাভ হ'বে? বেদ পুরাণ বা অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ক'রে এ সহজ মেলে না। তীর্থস্থান, পূজা বা দেবমূর্ত্তিতেও তা' পাওয়া যায় না।

ক্যা পঢ়িয়ে ক্যা গুনিয়ে ক্যা বেদপুরাণা সুনিয়ৈ।
পঢ়ে সুনৈ ক্যা হোই, জৌ সহজ ন মিলিয়ো সোই।

যোগ অবলম্বন ক'রেই এ সহজ লাভ হয়—সে যোগ সিদ্ধাচার্য্যদের হঠযোগ। এই যোগে ষটচক্র ভেদের কথা রয়েছে। শক্তি জাগ্রত হ'লে প্রাণবায়ু বা মন পবন সেই ষটচক্র ভেদ ক'রে সহস্রারে আরোহণ করে। যোগী তখন সহজ সমাধিতে মগ্ন হ'ন। প্রাণবায়ুকে সহস্রারে যেতে হ'লে সুষুম্না নাড়ী বেয়ে উঠতে হয়। প্রাণবায়ু যখন অন্য দুই নাড়ী ইড়া পিংগলা দিয়ে যাওয়া আসা করে তখন বহির্জগতের সঙ্গে যোগীর সম্পূর্ণ যোগ থাকে ও মায়াশক্তির সৃষ্টি চল্‌তে থাকে। প্রাণবায়ু যখন সুষুম্নাগত হয় তখন বহির্জগতে সঙ্গে যোগীর সম্বন্ধ ছিন্ন হয়, অবিদ্যা কেটে যায়, প্রাণবায়ুর চঞ্চলতা নষ্ট হয়, আসা-যাওয়া বা অনাগমন বন্ধ হয়। তাই কবীর ব'ল্‌ছেন—

উলটন্ত পবন চক্রষট ভেদে সুরতি সুন অনুরাগী।
আবৈ ন জাই মরৈ ন জীবৈ তাসু খোজ বৈরাগী।—
সুঁনি মণ্ডল মৈঁ মংদলা বাজৈ, তাহা মেরা মন নাচৈ।
গুরু প্রসাদি অমৃতফল পায়া সহজি সুষমনাঁ কাছৈ।—
ইলা প্যংগুলা ভাটী কীন্হি ব্রহ্ম অগনি পরজারী।
ইড়া পিংগলা সুষমন বংদে যে অবগুন কতজাঈ।

ইড়া পিঙ্গলাকে প্রাচীন সিদ্ধেরা চন্দ্র সূর্য্য আখ্যা দিয়াছেন কারণ সে দুই নাড়ীতে যখন প্রাণবায়ু থাকে তখন কালজ্ঞান সম্পূর্ণ বর্ত্তমান—দিবারাত্রির ভেদজ্ঞান থাকে—তাই কবীরও ব'ল্‌ছেন—

চংদ সুর দোই ভাটী কীন্হী সুষমনি চিগবা লাগীরে—

সহজসিদ্ধ কবীরের নিকট বাইরের তীর্থের কোন আবশ্যকতা নেই—তাঁর দেহের মধ্যেই সব বিদ্যমান—

রে মন বৈঠি কিতৈ জিনি জাসী
হিরদৈ সরোবর হৈ অবিনাসী।
কায়া মধে কোটি তীরথ, কায়া মধে কাসী।
কায়া মধে কবলাপতি কায়া মধে বৈকুণ্ঠবাসী।
উলটি পবন ষটচক্রনিবাসী, তীরথরাজ গংগ তটবাসী।
গগন মণ্ডল রবি সসি দোই উলটী কুংচী লাগি কিবারা।
কহৈ কবীর ভই উজিয়ারা পংচ মারি এক রহ্যৌ নিনারা।

সুষুম্না বেয়ে প্রাণবায়ু যখন সহস্রারে আরোহণ করে তখন যোগী সমরসীভূত বা সহজানন্দে বিভোর হ'ন। সেই সমাধির অবস্থাতে আনন্দ উপভোগ করাকে সুধা বা অমৃতপানের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সে সুধারস যা নির্ঝরধারে বর্ষিত হয়, কবীরও তা পান ক'রেছেন—

সুরতি পিয়াস সুধারস অমৃত এহু মহারসু পেউরে।
নিরঝর ধার চুওঁ অতি নির্ম্মল ইহরস মনুআ রাতোরে।—
অচরজ এক সুনহুরে পংডিয়া অর কিছু সহন ন জাই।
সুর নর গণ গন্ধ্রব জিন মোহে ত্রিভুবন মেখলি লাই।
রাজা রাম অনহদ কিংগুরী বাজৈ।
জাকী দৃষ্টি নাদ লব লাগৈ।
ভাটী গগন সিড়িয়া অরু চুঁড়িয়া কনক কলস এক পায়া।
তিস মহিধার চুএ অতি নির্ম্মল রস মহি রস ন চুআয়া।

মোটামুটি এই হ'চ্ছে কবীরের মর্ম্মবাদ।

তাঁর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্বের খোঁজ বেশী না পেলেও তাঁর সাধনার ধারা আমরা অল্পায়াসেই ধরতে পারি। পূর্ব্বসিদ্ধদের ধারাই তিনি অনুসরণ ক'রেছিলেন—তবে প্রাচীন সিদ্ধদের রচনা বেশীর ভাগ সংস্কৃতে না হয় অপ্রচলিত প্রাকৃতে আর কবীরের রচনা দেশভাষায়, কারণ কবীরের কথায় 'সংস্কৃত কূপ জল ভাষা বহতা নীর'—সংস্কৃত কূপের জলের ন্যায় বদ্ধ, আর দেশভাষা বহতী নদীর ন্যায় প্রাণবতী। কবীরের রচনা শুধু দেশভাষায় বল্‌লেই ঠিক হ'ল না—তাঁর নিজের প্রতিভা ছিল। সেই প্রতিভার গুণেই তিনি, মধুর পদ বিন্যাস করতে পেরেছেন—তাই তাঁর বাণী আমাদের মর্ম্মে পৌছায়। সাধনায়ও তিনি নূতন ভাবের সন্নিবেশ ক'রতে পেরেছেন। পূর্ব্বসিদ্ধেরা সমাধিস্থ হ'য়ে শুধু শূন্যে বিচরণ ক'রতেন, না হয় কমলবনে মধুপান ক'রতেন কিন্তু কবীর সমাধিস্থ হ'য়ে গোবিন্দ বা রামের সঙ্গে মিলিত হ'ন। সে রাম নিরাকার, নিরঞ্জন ও শূন্যস্বভাব হ'লেও কবীরের এই ভাব-সমাধি বেশী মধুর। সে সমাধি অনাহত বাঁশীর ধ্বনিতে মুখরিত। তাই সমাধি বিয়োগ বা বিরহের অবস্থা কবীরের পক্ষে অত ক্লেশজনক।

আপেক্ষিকতা-বাদের গোড়ার কথা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন

বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রধানতঃ দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী হইতে সম্ভূত ? আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাত্রার মধ্যে যাহা দেখি, যাহা করি তাহার হেতু, তাহার মূল ও গূঢ়তা-আবিষ্কার-ই হইল বিজ্ঞানের বিষয়। - মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার যুগ যুগান্তর ধরিয়া প্রতিদিনের ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছে; কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কারের মধ্যে নৈসর্গিকতা কিছু আছে কি ? গাছ হইতে ফল পড়ে তাহা নিউটনের অনেক পূর্ব্ব হইতেই মানুষ দেখিয়া আসিতেছে এবং এ ব্যাপার কদাচ ঘটে না এমন হয় না। তবে কি নিউটনের ঐ আবিষ্কারের মূল্য নাই ? নিশ্চয়-ই আছে। প্রত্যেক সত্য ঘটনার মূল কারণটি অনুসন্ধান করিয়া এক সূত্র প্রণয়ন করিয়া সম-হেতু উদ্ভূত ঘটনাবলীকে একসূত্রে বাঁধিয়া দেওয়াতেই নিউটনের বিশেষত্ব; আর এই প্রাণের কথাটি বলিয়া দেওয়াতেই বৈজ্ঞানিকের সার্থকতা। ঘটনাকে আবিষ্কারের চোখ দিয়া দেখে বলিয়াই বৈজ্ঞানিক তাহাদের মূল কথাটি এক ভিত্তির উপরে দাঁড় করাইতে পারেন এবং একটি সংজ্ঞা দ্বারা সম-হেতুকী ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করিতে পারেন। অবশ্য স্থূল ঘটনার উপরে নির্ভর করিয়া নিজেদের জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির প্রভাবে বৈজ্ঞানিক এমন অনেক সূক্ষ্মতর তথ্যে চলিয়া যান, যাহা সাধারণের বুঝিয়া উঠা কষ্টসাধ্য; এমন কি অনেক সময়ে অবোধ্য হইয়া পড়ে। তাহার কারণ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম বিচার ক্রমশঃই পারিভাষিক (technical) হইয়া পড়ে। তখন তাহা বিশেষজ্ঞেরই আলোচনার বিষয়। সূক্ষ্ম দিক দিয়া যতই দুর্ব্বোধ্য বা কষ্টবোধ্য হউক না কেন প্রত্যেক বিষয়েরই স্থূল দিকটা শিক্ষিতসাধারণে বেশ বুঝিতে পারেন; অন্ততঃ যাহার উপর ভিত্তি করিয়া বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে সেই সকল পরীক্ষিত ঘটনাগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রত্যেক বিষয়েই কিছু না কিছু ধারণা করিয়া লইতে পারেন। সেই উদ্দেশ্য লইয়াই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইল। আপেক্ষিকতাবাদের সূক্ষ্মতর অংশ এতই দুর্ব্বোধ্য যে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই ইহার সম্বন্ধে বেশ পরিষ্কার ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। তাই দুই একটি অতি সাধারণ উদাহরণের ভিতর দিয়া সাধারণের পক্ষে সহজভাবে সামান্য ধারণা জন্মাইবার চেষ্টাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কাজেই আমি গণিতের জটিল প্রশ্ন মোটেই তুলিব না।

পৃথিবীর সমুদায় পদার্থের মধ্যে পরস্পরের আকর্ষণের কথা বলিলে লোকে এখন হাঁ করিয়া থাকে না; গ্রহগুলি সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে বলিলে ক্ষেপিয়া উঠে না। কারণ সাধারণে এখন তাহা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে পারে এবং তাহা হইতে তথ্য সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারে। আর ঐ সকল তথ্যের আবিষ্কারকের নামও তাহাদের নিকট অজ্ঞাত নহে। কিন্তু এ্যালবার্ট আইন্‌স্টাইন (Albert Einstien) সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সাধারণে বলিলে সে কে ! ইহার একমাত্র কারণ তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্য সম্বন্ধে সাধারণের জন্য সহজভাবে আলোচনা হইয়াছে অতি অল্প।

এই আইনস্টাইনই যুগান্তরকারী আপেক্ষিকতাবাদের প্রতিষ্ঠাতা। আপেক্ষিকতা-বাদ যতই জটিল হউক না কেন দুই একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা অন্ততঃ সামান্য ধারণাও তৎসম্বন্ধে জন্মিবে।

এক কথায় বলিতে গেলে দূরবর্ত্তী ঘটনাবলীর সমকালতার আপেক্ষিকতাই তাঁহার আবিষ্কার। এখন কথা হইল সমকালতা বলিলে আমরা কি বুঝি ? দূরবর্ত্তী দুইস্থানে সংঘটিত দুইটী ঘটনাকে তখনই আমরা সমকালভূত বলি যখন দেখি যে উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি দুইটী ঘটনা যুগপৎ একই মুহূর্ত্তে দেখিতে পান। আর ঐরূপ ব্যক্তি যদি বিভিন্ন মুহূর্ত্তে ঘটনা দুইটী দেখিতে পান তাহা হইলেই বলি অসমকালসম্পন্ন। অদৃশ্য দুই স্থানের দুইটী ঘটনার সমকালতা নির্দ্ধারণ করি কি করিয়া ? আমরা তখন ঘড়ীর সাহায্য লই। কিন্তু আইনস্টাইন বলেন যে দুইটী ঘড়ীর সময়ও অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে এবং সময়ের সমকালতা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে অবস্থার আপেক্ষিক (relative) তারতম্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। প্রমাণ করিয়া দেখান হইয়াছে যে কোন চলন্ত ষ্টীমারের আরোহী যখন ষ্টীমারের ঘড়ীতে দেখিতেছে ১২টা বাজিয়া ১৫ মিনিট হইয়াছে সেই সময়েই সে দেখিবে যে তীরবর্ত্তী ঘড়ীতে ১২টা বাজিয়া কেবল ১৪ মিনিট হইয়াছে; অপর দিকে নদীতীরস্থ দর্শক দেখিবে যে যখন তীরের ঘড়ীতে ১২টা ১৫ মিনিট তখন চলন্ত জাহাজের ঘড়ীতে মাত্র ১২টা ১৪ মিনিট। অর্থাৎ একজন লোকের পক্ষে ১৫ মিনিট সময় অপরের পক্ষে মাত্র ১৪ মিনিট। কাজেই দেখা যায় সময়ের সমকালবর্ত্তীতাও (simultaneity) নির্ভর করে দর্শক ও দ্রষ্টব্যের অবস্থার তারতম্যের উপরে।

সমকালতা সম্বন্ধে এখানে দু' একটি সাধারণ উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মিবে এবং শিক্ষিত সাধারণ তাহা হইলে আপেক্ষিকতা-বাদেরও কিছু ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন। অন্ততঃ আপেক্ষিকতার (relativeness) সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কোন চলন্ত জাহাজের আরোহী তাহার গতি সম্বন্ধে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না যদি জাহাজখানি শান্ত সমুদ্র-বক্ষে একই গতিতে চলিতে থাকে; এমন কি আশে পাশে না দেখিলে সে জাহাজের গতিটাও অনুভব করিতে পারে না।

তীরের দিকে দৃষ্টি করিলে তখনও তাহার পক্ষে জাহাজখানি গতিশূন্যই মনে হইবে ; কেবল দেখিবে তীর তথা তটবর্ত্তী গাছপালা সম্মুখ হইতে পিছন দিকে ধাবিত হইতেছে। তীরস্থিত ব্যক্তি কিন্তু দেখিবে জাহাজখানি বহু যাত্রীসহ বিশাল দেহ লইয়া সমুদ্রবক্ষে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া যাইতেছে।

এই চলন্ত জাহাজের সামনে ও পিছনে দুইটী বৈদ্যুতিক বাতি, একটি নীল ও অপরটি শ্বেত বর্ণের ঝুলানো রহিয়াছে। উভয় দীপের মধ্যবর্ত্তী আরোহী একটি যোড়া আয়নাতে (angle mirror) দুইটী দীপই দেখিতে পায়। আরোহী বৈদ্যুতিক আলোর বোতাম (switch) টিপিয়া দিলে আয়নাতে সে যুগপৎ নীল ও সাদা আলোকের রশ্মি দেখিতে পাইবে—এবং উহা ঐ ব্যক্তির পক্ষে সমকালসম্ভূত।

অপর দিকে তীরে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে ; সে-ও একটি যোড়া আয়নায় (angle mirror) জাহাজের আলো দুইটী দেখিতে পাইতেছে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে যখন আরোহী বোতাম টিপিল তখন তীরস্থ ব্যক্তি আরোহীর ঠিক বিপরীত দিকে—অর্থাৎ আলো দুইটির মধ্যবর্ত্তী স্থানে-ই দাঁড়াইয়া ছিল, সে-ও তাহার আয়নাতে প্রতিফলিত দুইটি রশ্মিই দেখিতে পাইবে ; কিন্তু সে দেখিবে নীল আলোর রশ্মি শ্বেত আলোর রশ্মিটার পরে প্রতিফলিত হইল। ইহার কারণ অতি সহজবোধ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তীরবর্ত্তী ব্যক্তি দেখিতেছে জাহাজখানি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। কাজেই নীল আলো চলন্ত জাহাজের সঙ্গে সম্মুখে আগাইয়া তীরস্থ ব্যক্তি হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে এবং শাদা আলোর পশ্চাদ্ভাগে ঝুলানো বলিয়া ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। আলোর গতি (velocity) উভয় দীপেরই এক ; অতএব যে আলোর আধার (source) দূরে সরিয়া গেল, তাহা তীরস্থ ব্যক্তির নিকট আসিতে নিকটতর আধার শাদা আলোর রশ্মি হইতে বেশী সময় লাগিবে। কাজেই জাহাজের ও তীরের দুই ব্যক্তির নিকট একই সময়ে সংঘটিত দুইটী ঘটনা দুই রকম পরিদৃষ্ট হইল। জাহাজের লোকের নিকট উহা সমকালসংঘটিত এবং তীরবর্ত্তী ব্যক্তির নিকট অসমকালের ঘটনা।

আমরা কোন ঘটনাই সোজাসুজি দেখিতে পাই না। ঘটনার মূল হইতে বিচ্ছুরিত আলোকের সাহায্যে আমরা তাহা দেখি। আর আলোরও তো ঘটনাস্থল হইতে দর্শক পর্য্যন্ত আসিতে সময় লাগে। আলোকরশ্মি আবার সমবেগে চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হয় ;—কাজেই ইহা হইতে পরিস্কার বুঝা যাইতেছে যে সমকালতাও (simultaneity) আপেক্ষিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

এইরূপ ঘটনার আপেক্ষিকতা হইতেই আইন্‌স্টাইন সময় (time) ও স্থানের (spatial) দৈর্ঘ্য সম্বন্ধেও আপেক্ষিকতা বাদ প্রচার করেন। অর্থাৎ উহারাও বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন লোকের অবস্থিতির উপর নির্ভর করে। প্রথমোক্ত সময়ের তারতম্যও তাঁহার এই আপেক্ষিকতা-বাদের ফলেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই গেল সমকালতার কথা। এখন আপেক্ষিকতার মূল কথাটি বলিয়াই শেষ করিবার ইচ্ছা আছে।

মাইকেল্‌সন্ (Michelson) ও মর্লে (Morley) নামক দুই বস্তুবিজ্ঞান-বিশারদ কয়েকটি পরীক্ষায় (experiments) দেখিতে পাইলেন যে তাঁহাদের পরীক্ষার ফল চলিত ও গৃহীত (established) মতবাদ অনুসারে হইতেছে না। ইহাতে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এক সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং এই সমস্যার মীমাংসা লইয়া নানা আলোচনা চলিতে থাকে। তখন আইন্‌স্টাইন দেখিলেন দুইটী অনুমান (hyphothesis) দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই দুইটী অনুমান হইল "Relativity principle" এবং "Principle of the constancy of velocity of light." এই দুইটী লইয়া মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। আইন্‌স্টাইন এই সকল মতভেদ সমসূত্রে গ্রথিত করিয়া "Special Relativity Theory" প্রণয়ন করেন। "Special" অর্থে কোন বিশেষ রকমের গতি সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য। অবশ্য পরে তিনি তাঁহার মতবাদ সকল প্রকার গতিসম্পন্নের জন্য প্রয়োগ করেন এবং তাহার নাম দেন "General Relativity Theory."

লুই পাস্ত্যর

শ্রীবীরেশচন্দ্র গু

মানবের বিজয়-অভিযানের যাহারা অনন্যসাধারণ মনীষা-সম্পন্ন নেতা তাহাদের মধ্যে ফরাসী বিজ্ঞানবিৎ লুই পাস্তার অন্যতম। ঐতিহাসিকগণ ও সাধারণ মনুষ্য-সমাজ আবহমানকাল হইতে অর্থ, রক্ত ও সাম্রাজ্য-পিপাসু তথাকথিত বীরবৃন্দকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু যে অসম সাহসিক জ্ঞান-পিপাসু লোক—হিতাকাঙ্ক্ষী বীরগণ সমস্ত জীবনব্যাপী দুর্জ্জয় সাধনার ফলে জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া মনুষ্য-সমাজের বহুবিধ দুঃখ কষ্ট দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের জ্ঞান অতি অল্প। এ বিষয়ে পৃথিবীর সমগ্র দেশের মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান অতি নিম্নে। আজ বের্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে প্রথিতনামা জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক হেল্‌ম্‌হল্‌ত্‌স্-এর প্রতিমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। হাইডেলবার্গে বিখ্যাত রস-শাস্ত্রবিৎ বুনসেন্-এর বিশাল প্রস্তর মূর্ত্তি হাইডেল বার্গার শ্লস্-এর পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়াইয়া জার্ম্মানীর বিজ্ঞানবত্তার পরিচয় দিতেছে। পারী নগরীতে ক্লদ্‌বের্ণার ও বার্থেলোর প্রতিমূর্ত্তি ফরাসী জাতির বিজ্ঞানানুশীলনের প্রতীক। কিন্তু "শিক্ষিত" ও "সভ্য" ইংলণ্ড দেশে বৈজ্ঞানিক-গণের স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্নে। সেখানে "বীর" জেনারেল্‌গণের ও রাজগণের প্রতিমূর্ত্তি স্থানে স্থানে "শোভা" পাইতেছে। কিন্তু যে ইংরেজ মনীষিগণ ইংলণ্ডের নাম পৃথিবীর ইতিহাসে অমর করিয়া গিয়াছেন,—আইজাক্ নিউটন্, মাইকেল ফ্যারাডে, কেল্‌ভিন্, চার্লস্ ডারুইন্,—যাঁহাদের সাম্রাজ্যের উত্থান পতনে যায় আসে না—গুণ-গৌরবে ইংলণ্ডের নাম আন্তর্জ্জাতিক জগতে সম্মানিত করিয়া রাখিবেন, তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি লণ্ডনের জনবহুল স্থানে বা পার্কে পরিলক্ষিত হয় না। হয়ত বা ভারতবর্ষ এই ইংলণ্ডের অধীন বলিয়াই বিজ্ঞানের সমঝদার হইতে পারে নাই। যতদিন ভারতবর্ষ বৈজ্ঞানিকদিগকে বুঝিতে ও বিজ্ঞানের সম্মান এবং অনুশীলন করিতে না শিখিবে, ততদিন ভারতবাসীর ভাবধারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রবাহিত হইবে না। যে বিজ্ঞান আজ পাশ্চাত্য জগতের উন্নতির মূলীভূত কারণ, যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা পাশ্চাত্য জগতকে আজ প্রতিরোধকারী ধর্ম্ম, সমাজ ও অর্থনীতিভুক্ত কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়াছে ও করিতেছে, সেই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা-শক্তিই ভারতবর্ষের মুক্তি ও উন্নতি আনয়ন করিবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের বিচিত্র জীবনের আলোচনায় ভারতবাসীর বিজ্ঞান-শ্রদ্ধা বলবতী হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

লুই পাস্ত্যরের জীবনচিত্র যে বাঙালীর নিকট চিত্তাকর্ষক হইবে তাহা নিশ্চিত। ফরাসী জাতি ও বাঙালী জাতির চরিত্রের মধ্যে খানিকটা সাদৃশ্য আছে। দুইই একটু ভাবপ্রবণ। পাস্তারের চরিত্রে এই ভাবপ্রবণতা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু ভাবপ্রবণতা, কল্পনাশক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভার আশ্চর্য্য সমন্বয় পাস্তারের ব্যক্তিত্বকে বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে।

লুই পাস্ত্যরের জন্ম ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর। তাঁহার পিতা নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টের সৈন্য-বিভাগে সার্জেন্ট্ মেজর ছিলেন ও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ছোট বেলা লুই পাস্তার তাঁহার ভাবী মনীষার কোনও বিশেষ পরিচয় দেন নাই। তাঁহার বাল্যকালের শিক্ষক শ্রীযুত রোমানে এইটুকু লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে লুই না জানিয়া কোনও কথা বলিতেন না, বা "বোধ করি" "বোধ হয়" প্রভৃতি শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহার করিতেন না। ষোল বৎসর বয়সে লুই পাস্তার পারির "একোল্ নর্মাল্" নামক কলেজে শিক্ষা আরম্ভ করেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই পিতামাতার বিরহে কাতর হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বাড়ীতে বসিয়া কিছুদিন চিত্র-বিদ্যা অনুশীলন করিয়া পাস্তার বেসাঁসোঁ-এর কলেজে প্রবেশ করেন। ২০ বৎসর বয়সে ডিগ্রী লাভ করিয়া তিনি আবার "একোল্ নর্ম্মাল্"এ গমন করেন। সেখানে তিনি ল্যাবরেটরীতে এত সময় যাপন করিতেন যে তাহার সহপাঠীরা তাহাকে "ল্যাবরেটারীর স্তম্ভ" বলিয়া পরিহাস করিতেন। এই সময় মাঝে মাঝে তিনি লুক্‌সেমবুর্গের বাগানে তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ শাপুই'র সহিত বেড়াইতেন এবং শাপুই'র নিকট নিজের এক্সপেরিমেণ্টগুলি বর্ণনা করিতে করিতে মাঝে মাঝে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "বল দেখি, শাপুই, এ হয় কেন? ওটার মানে কি?" ইত্যাদি। শাপুই দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত এবং কিছুতেই বুঝিতে পারিত না যে পাস্তার কেন এই সব সামান্য বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামায়, বিশেষতঃ যখন দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য প্রশ্ন-গুলিরই সমাধান হইতেছে না। পাস্ত্যরের পিতা আরো "প্রাক্‌টিকাল" ছিলেন এবং পাস্তারের বৈজ্ঞানিক কার্য্যে যে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন তাহা মনে হয় না। এই সময় পাস্তার টার্টারিক অ্যাসিডের এনান্টিও-মর্ফিজ্‌ম্-সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। এই গবেষণা আমাদের রসশাস্ত্র-জ্ঞানকে অস্বাভাবিক রূপে বর্দ্ধন করিয়াছে। জগতের খুব অল্প বৈজ্ঞানিকই এত অল্প বয়সে এত বড় বৈজ্ঞানিক কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ভীষণ বিপ্লবের মধ্যেও তিনি এই গবেষণায় নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার প্রফেসার বিয়ো পাস্তারের এই আবিষ্কারে এত অত্যধিক আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তিনি ল্যাবরেটরীতে পাস্ত্যরকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। পাস্তার ২৬ বৎসর বয়সে ষ্ট্রাসবুর্গ-এর প্রফেসার নিযুক্ত হন। সেখানকার রেক্‌টর শ্রীযুক্ত লরাঁ অতি অমায়িক লোক ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা মারীর সহিত পাস্তার প্রণয়াবদ্ধ হন। যদিও পাস্তার তাঁহার এই গোপন প্রণয়ের পরিচয় পাইয়া নিজেই ভীত হন তথাপি তাঁহার স্বভাব-সুলভ সরলতার সহিত তিনি শ্রীযুত লরাঁর নিকট লিখেন, "আমাদের পরিবারের অবস্থা স্বচ্ছল, কিন্তু আমরা ধনী নই। আমাদের যাহা আছে তাহার দাম পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ'র অধিক হইবে না এবং আমি অনেক দিন হয় সঙ্কল্প করিয়াছি যে আমি আমার অংশ আমার বোনদিগকে ছাড়িয়া দিব, অতএব আমার কোন অর্থই নাই। ভাল স্বাস্থ্য, কিঞ্চিৎ সাহস

এবং ইউনিভারসিটির চাকুরীই আমার সর্ব্বস্ব।" যাহা হউক পাস্তুর ও মারী অনতিবিলম্বে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। উপরি উক্ত স্ফটিক (crystal) সংক্রান্ত গবেষণার জন্য লুই পাস্তুর "র‍্যাসিমিক এ্যাসিড" এর সন্ধানে জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, বোহেমিয়া প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। "মানুষ কোন অমূল্য রত্ন বা কোন সুন্দরীকেও পাহাড়ে, উপত্যকায় এমন করিয়া খুঁজিয়া বেড়ায় না।"

১৮৫৪ সালে পাস্তুর লীল সহরে প্রফেসর নিযুক্ত হন। লীল সহরে বহুল পরিমাণে মদ (beer) তৈয়ার হইত। একবার এই মদ বিকৃত হইতে আরম্ভ করে। মদ লীল সহরের বড় পণ্য বলিয়া ইহাতে মদ-ব্যবসায়ীদের অনেক লোক্‌সান্‌ হয়। পাস্তুর এই বিষয়ে গবেষণা করার জন্য আহুত হন এবং আশ্চর্য্য মনীষার সহিত তিনিই ইহা প্রথম বুঝিতে সমর্থ হন যে মদ বিকৃত হওয়ার কারণ একরকমের জীবাণু।

জীবাণুবাদের প্রতিষ্ঠাতা পাস্তুর। যে জীবাণুবাদ এবং জীবাণুবাদ-সম্ভূত গবেষণাকার্য্য আজ পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য দেশে করা হইতেছে এবং যাহার ফলে আজ কোটী কোটী লোক মহামারীর হাত হইতে রক্ষা পাইতেছে, পাস্তুরের গবেষণাই তাহার মূল ভিত্তি। ইহা বলিলেই পাস্তুরের প্রখর কল্পনাশক্তি ও সত্যকে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, পাস্তুর মদ-বিকৃতকারী জীবাণুর সন্ধান পাইয়াই নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিলেন, "তবে কি এই রকম জীবাণুই মানুষের স্বাস্থ্যও বিকৃত করে?" কিন্তু একজন প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও একজন কল্পনা ও ভাব-প্রবণ কবির মধ্যে এই প্রভেদ যে, কবি কল্পনা করিয়াই খালাস, কিন্তু বৈজ্ঞানিক তার কল্পনা বা অনুমানের সহিত বাহিরের সত্যের (objective truth) সহিত কতখানি মিল আছে তাহার নিরপেক্ষ বিচার করেন। পাস্তুর মদবিকৃতির কারণের সন্ধান পাইয়া অতি সহজেই তাহার প্রতিকার বাহির করেন। লীল সহরের মদ ব্যবসায় বাঁচাইয়া রাখেন। এই সময় পাস্তুরের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং তিনি "একোল নর্ম্মাল" এর (যেখান হইতে তিনি ১৩ বৎসর বয়সে পিতামাতার বিচ্ছেদে আর্ত্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন) এডমিনিষ্ট্রেটার নিযুক্ত হন। তখন বিজ্ঞান-জগতে একটা মুখ্য প্রশ্ন লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। একদল বৈজ্ঞানিক spontaneous generation of life অর্থাৎ জীবনের স্বতঃ-উদ্ভবে বিশ্বাস করিতেন। পচা খাদ্যে যে পোকা জন্মে ইহাদের মতে তাহা নিৰ্জ্জীব খাদ্য হইতেই উদ্ভূত। অন্যদল বলিতেন যে খাদ্যের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই চক্ষুর অগোচর জীবাণু আছে। তাহাদের মতে নিৰ্জ্জীব জিনিষ হইতে জীবের উৎপত্তি হয় না। পাস্তুর এই পরবর্ত্তী মতেরই পরিপোষক। তিনি দেখান যে খাদ্য দ্রব্যকে যদি এমন ভাবে রাখা হয় যে তাহাতে কোন জীবাণু প্রবিষ্ট হইতে পারে না তাহা হইলে তাহাতে কোন জীবের সৃষ্টি হয় না ও খাদ্য পচে না। তিনি এই প্রকারে এই পরবর্ত্তী মতের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বলা উচিত যে ইটালীর বৈজ্ঞানিক স্পালানত্‌সানি এ বিষয়ে প্রথম পথ-প্রদর্শক ছিলেন।

১৮৬৪ সালে ফ্রান্সে সিল্ক-প্রসবিনী গুটিপোকার মহামারী হয়। দক্ষিণ ফ্রান্সের সিল্ক উৎপাদন ইহাতে এক রকম বিনষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ পাস্তুর তখনই দক্ষিণ ফ্রান্সের আলে সহরে আহুত হন। এবং তিনি আসিয়াই এই বিষয়ে গবেষণার জন্য আলেতে একটী ল্যাবরেটারী সংস্থাপন করেন। অবশ্য রেশমের চাষীরা ইহাতে একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন যে কেন একজন দক্ষ রেশম-চাষী না পাঠাইয়া একজন "সামান্য" রাসায়নিককে পাঠান হইয়াছে। পাস্তুর তাহাদিগকে একটু ধৈর্য্য ধরিতে বলিলেন।* সেই সময়ে তাঁহার পিতার এবং সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যার বিয়োগে তিনি শোকার্ত্ত ছিলেন। কিন্তু অসামান্য পরিশ্রম করিয়া কিছু দিনের মধ্যেই এই কার্য্যে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। গুটি পোকার ডিমকে যে বীজাণু আক্রমণ করে তিনি তাহার সন্ধান পান এবং স্বাস্থ্যবান্‌ গুটিপোকার ডিম কি ভাবে উৎপন্ন করিতে হয় তাহা দেখাইয়া দেন। তাঁহার প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করাতে ফ্রান্সের কোটী কোটী টাকা বাঁচিয়া যায়। এই সময়ে তিনি তদানীন্তন ফরাসী গভর্ণমেণ্টের উপর খুব কঠোর মন্তব্য পাশ করেন। টাকা বাঁচাইবার জন্য তখন গভর্ণমেণ্ট "একোল নর্ম্মাল"এর ল্যাবরেটারীর খরচ কমাইবার চেষ্টা করেন অথচ একটা নূতন "অপেরা হাউস" নির্ম্মাণ করিতে লক্ষ লক্ষ ফ্রাঁ খরচ করেন। এই সম্পর্কে বাংলা দেশের কথা আমাদের মনে হয়। এখানেও গভর্ণমেণ্টের বাজে কাজে যথেষ্ট টাকা ব্যয় হয় অথচ শিক্ষা-বিভাগে বা গবেষণা-কার্য্যে অর্থব্যয়ের সময় গভর্ণমেণ্টের অর্থসঙ্কট উপস্থিত হয়। পাস্তুর গভর্ণমেণ্টকে লিখেন, "যদি মানব জাতির হিতকারী কার্য্যগুলি তোমাদের হৃদয়কে স্পন্দিত করে তাহা হইলে আমি অনুরোধ করিতেছি যে তোমরা যে গৃহগুলিকে অবজ্ঞার সুরে ল্যাবরেটারী বল তাহার একটু যত্ন লও। কতিপয় জাতি সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছে। জার্ম্মানীতে বড় বড় ল্যাবরেটারী নির্ম্মিত হইতেছে। রুশ দেশেও ৩৫ লক্ষ ফ্রাঁ ব্যয় করিয়া গভর্ণমেণ্ট ল্যাবরেটারী স্থাপন করিতেছেন কিন্তু ফ্রান্স কোথায়?" পাস্তুরের জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রেমের উল্লেখ আমরা পরে করিব।

গুটিপোকার প্রশ্নের সমাধান করিয়া পাস্তুর আর একটী ব্যাধি সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য আহুত হন। ফ্রান্সে বহু মেষ অ্যানথ্রাক্স রোগে মরিয়া যাইত। এইখানেও অনুসন্ধান করিয়া পাস্তুর জানিতে পারিলেন যে এক জীবাণুই এই রোগের কারণ। এই রোগপ্রতিষেধার্থে তিনি immunological method আবিষ্কার করেন। এই উপায়ই ডাক্তারদের হস্তে মহামারীর সহিত সংগ্রামের একটী প্রধান অস্ত্র।

পাস্তুর বাল্যকালে এমন একটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন যাহা তাঁহার মনে চিরকাল মুদ্রিত ছিল। একদিন একটা ক্ষ্যাপা শিয়াল একটী ছোট ছেলেকে কামড়াইয়াছিল, তাহার ফলে তাহার ভীষণ জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু হয়। উপরি উক্ত গবেষণার পরে পাস্তুরের মনে হইল যে জলাতঙ্ক রোগও হয়ত পাগল শিয়াল বা কুকুরের লালা হইতে নিঃসৃত জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন হয়। তিনি এক্সপেরিমেণ্ট করিয়া দেখিলেন যে এই অনুমান সত্য। পাগল কুকুর লইয়া এই এক্সপেরিমেণ্ট গুলি যে বিপদ-সঙ্কুল তাহা বলা বাহুল্য। পাস্তুর দেখাইয়াছিলেন যে পাগল কুকুরের মস্তিষ্কের "মেডালা"কে যদি কিছুদিন শুকাইয়া ভাল কুকুরের চামড়ার নীচে "ইনজেক্ট" করান হয় তাহা হইলে ভাল

কুকুরকে পাগল কুকুর কামড়াইলেও ভাল কুকুর পাগল হয় না। বিজ্ঞানের ইতিহাসে পাস্তুরের এই গবেষণা চিরস্মরণীয়। ইহার কিছুদিন পরে, ১৮৮৫ সালের ৬ই জুলাই আল্‌সাস্ প্রদেশের একটী বালক, জোসেফ্ মাইষ্টার, একটী পাগল কুকুর দ্বারা ভীষণ ভাবে দংশিত হয়। এই বালকটী পাস্তুরের ল্যাবরেটারীতে আনীত হইলে পাস্তুর অত্যন্ত আশঙ্কা ও সতর্কতার সহিত তাহার উপর এক্‌সপেরিমেণ্ট আরম্ভ করেন। পাস্তুরের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হইল। রাত্রিতে তিনি ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিতে সুরু করিলেন—বালকটী যেন জলাতঙ্ক রোগে জর্জ্জরিত হইয়া চীৎকার করিতেছে। দশ দিন ইনজেকসনের পরে শেষদিন শিশু মাইষ্টার ঘুমাইবার আগে "প্রিয় শ্রীযুক্ত পাস্তুরের" নিকট হইতে একটী চুম্বন আদায় করিবার পরে স্বয়ং পাস্তুর প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কিন্তু শিশুটী ভাল হইয়া উঠিল এবং পাস্তুরের খ্যাতি সমগ্র ইউরোপময় ছড়াইয়া পড়িল। ইহার পরে সুদূর রুশ দেশ হইতেও বহু কুকুরদষ্ট রোগী পাস্তুরের নিকট আসিতেন। পাস্তুরের এই বীরত্ব ও স্নেহের তুলনা কোথায়? পাস্তুরের শেষ জীবনে তিনি বহু সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এই সম্মানগুলি নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতেন না, ফ্রান্সের প্রতি সম্মান বলিয়াই গণ্য করিতেন।

১৮৭০ সালের ফরাসী জার্ম্মান যুদ্ধের সময় পাস্তুর তাহার অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন এবং নিজেও বার বার ল্যাবরেটরী ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্দ্ধ পক্ষঘাতগ্রস্ত ছিলেন বলিয়া সৈন্য-বিভাগ তাহাকে গ্রহণ করে নাই। পাস্তুর বিজ্ঞান ও দেশকে এক রকমই ভালবাসিতেন। ফরাসী-জার্ম্মান যুদ্ধে ফরাসীর পরাজয় তাঁহার অন্তরকে শেলবিদ্ধ করিয়াছিল। গবেষণার জন্য তিনি বন্ সহরের জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সম্মান পাইয়াছিলেন তাহা ইহার পরই প্রত্যর্পণ করেন এবং লিখেন, "ইহা (এই মানপত্র) দেখাও আমার নিকট এখন ঘৃণা। আমার নাম তোমাদের রাজা উইলিয়মের নামের সহিত এই কাগজে সংবদ্ধ দেখিতে লজ্জা বোধ করিতেছি। উইলিয়মের নাম এখন হইতে আমার দেশের অভিশাপের বস্তু।" এদিকে পাস্তুর সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে ফ্রান্সের দুর্ভাগ্যের জন্য ফ্রান্সই দায়ী। "যে জাতি নিজের বিদ্যার ও গুণের মাপকাঠি ছোট করে সে জাতির দুঃখ পাইতে হইবে সন্দেহ নাই। আমরা পঞ্চাশ বৎসর বিজ্ঞান ভুলিয়া আছি। জার্ম্মানী যখন তাহার বিশ্ববিদ্যালয় ও ল্যাবরেটরী ইত্যাদি দিনের পর দিন বাড়াইয়া সমৃদ্ধ করিতেছিল তখন ফ্রান্স উচ্চশিক্ষার খুব সামান্যই আদর করিতেছিল।" তিনি আবার লিখেন, "আমার ইচ্ছা ফ্রান্স যেন তাহার শেষ লোকটি পর্য্যন্ত যুদ্ধ করে। আমার ভবিষ্যত লেখার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এই কথা অঙ্কিত থাকিবে—জার্ম্মনীর উপর প্রতিহিংসা।" কিন্তু পাস্তুর বুঝিয়াছিলেন যে প্রকৃত প্রতিহিংসা তখনই হইতে পারে যখন ফ্রান্সের নাম বিশ্ব-বরেণ্য হইয়া উঠিবে। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি নিজের বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা ফ্রান্সের নাম দিগ্বিজয়ী করিবেন। ইহাই পাস্তুরের প্রতিহিংসার রীতি। তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দের ১০ই আগষ্ট তারিখে কোপেনহেগেন সহরে সমগ্র পৃথিবীর মেডিকেল কংগ্রেসে তিনি বলিয়াছিলেন "ফ্রান্সের নাম লইয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। বিজ্ঞান কোন দেশের নহে। কিন্তু যদিও বিজ্ঞানের কোন দেশ নাই তথাপ বৈজ্ঞানিক তাহার দেশের গৌরবের কথা সতত মনে রাখিবে। প্রত্যেক বড় বৈজ্ঞানিকই বড় স্বদেশপ্রেমিক। তাহার স্বদেশের গৌরব বাড়াইবার চিন্তা তাহার বিপুল পরিশ্রমে শক্তি ও সাহায্য দান করে।"

পাস্তুরের জীবনে তাহাই ঘটিয়াছিল। ফ্রান্স পাশবিক যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু পাস্তুরের অসাধারণ বৈজ্ঞানিক কার্য্যের ফলে জার্ম্মানীসমেত সমস্ত পৃথিবী ফ্রান্সের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিল।

পাস্তুরের জীবন-আলেখ্যের মাত্র কয়েকটী রঙ উপরে দেখাইবার আমি চেষ্টা করিয়াছি। প্রাণবত্তা ও বৈজ্ঞানিক ক্ষমতায় পাস্তুর অতুলনীয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ যে "পাস্তুর ইনস্টিটিউট" সংস্থাপিত হইয়াছে তাহাই পাস্তুরের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

পাস্তুরের জীবন ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞানিকগণকে ও জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করিবে ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

বিমান-পোত

ত্রিজগতের বিভিন্ন জাতির ভিতর "stratesphere plane" নির্ম্মাণ করিবার যে বিরাট প্রতিযোগিতা চলিতেছে, জার্ম্মানী তাহাতে জয়লাভ করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে। এই যান উপরের তরল বায়ুমণ্ডলে বিপুল বেগে চলিতে পারিবে।

কয়েকদিন হইল ডেলী হেরাল্ড, নিউইয়র্ক হইতে যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, ক্যাপ্টেন কার্ল হম্ ১২ ঘণ্টায় বার্লিন হইতে আমেরিকাতে আটলাণ্টিকের উপর দিয়া উড়িয়া আসিবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমেরিকা ত্যাগ করিয়া জাঙ্কার কোম্পানির বার্লিনের কারখানায় গমন করিয়াছেন।

জার্ম্মান ইঞ্জিনীয়ারগণ গত দুই বৎসর ধরিয়া আকাশযান সম্বন্ধে যে গবেষণা করিতেছেন, ক্যাপ্টেন হম্ সেই গোপনীয় জাঙ্কার প্লেন ব্যবহার করিতে চাহেন। কাগজপত্রের হিসাবে এই প্লেন-এর গতি ছয় মাইলের উর্দ্ধে ঘণ্টায় ৩০০ হইতে ৪০০ মাইল।

যে জায়গাতে চালক বসিবেন সেই জায়গা বায়ু প্রবেশ নিরোধক করিয়া আঁটা। অনেক উর্দ্ধে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করা কঠিন বলিয়া সেখানে অনবরত অক্সিজেন সরবরাহ করা প্রয়োজন হইবে।

তাহার পরিচ্ছদও তড়িৎসংযোগে উত্তপ্ত করিবার বন্দোবস্ত থাকিবে।

এই পর্য্যন্ত এই যান সম্বন্ধে প্রাথমিক পরীক্ষা গুলি করা হইয়াছে। যে সামান্য খবর জাঙ্কার কারখানার বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে পরীক্ষাগুলি সম্পূর্ণই সন্তোষজনক হইয়াছে।

ফরাসী ও আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারগণও এই বিষয়ে কাজ করিতেছেন।

বঙ্গবাণী

পাশ্চাত্যের অভিযান

বহু বৎসর ধরিয়া আমরা নিজেদের বুদ্ধি, হৃদয়, রুচিকে এমনই দ্বিধাহীন ভাবে বিকাইয়া আসিতেছি যে এখন আর এই বিক্রয় ব্যাপারটা আমাদের নজরেও পড়ে না। 'আমরা আত্মবিস্মৃত', 'ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট নিয়োগটি আমরা কখনো ভুলিব না', 'য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানকে আমরা শুদ্ধ মাত্র ছাত্রের মতো গ্রহণ করিব না', 'ভারতবর্ষের যে সরস্বতী তিনি সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের দল ও দলাদলিকে একটি শতদল পদ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন', 'আমাদের মৃত্যুহীন শক্তি' ইত্যাদি কথা আমরা এত বেশী-বার লিখিয়াছি, বলিয়াছি ও শুনিয়াছি যে কথাগুলি প্রায় আমাদের নিকট অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। আসলে যে বোধই আমাদের আর নাই, সেই বোধকে সচেতন করিবার মতো কথাই বা কোথায় খুঁজিয়া পাইব? প্রাচ্যের আদর্শ, পাশ্চাত্যের আদর্শ, বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, সমস্ত কথা আমাদের কান ও মনের কাছে ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের সুদূর অতীত, আমাদের মহিমময় ঐতিহ্য প্রভৃতি কথা শুনিলে আমাদের হাসি যদি নাই পায়, শ্রদ্ধার ভাব আসে বলিয়া মনে হয় না।

ইহার কারণ বহুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বলিয়া গিয়াছেন, "দেশের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক, যাহা ইংরেজ ছেলেদের জন্য রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি. ইহাতে নিজের দেশ আমার কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।' (বঙ্গদর্শন, ১৩১২, বৈ,) কিন্তু পাঠ্য পুস্তক তো আজ পিছাইয়া পড়িয়াছে, নানা দিক হইতে আজ আমাদের মনের দুর্গকে এমনই বিভিন্ন ভাবে আক্রান্ত করা হইয়াছে যে মাঝে মাঝে মনে হয় এরকম আর কিছুদিন চলিলে আমরা ইউরো-ভারতবাসী বলিয়া কোনও নূতন জাতিতে রূপান্তরিত হইয়া যাইতে পারি। এই অভিযান-বাহিনীর একটি প্রবল উপাদান ছায়াচিত্র, মূক ও সবাক্। এই ছায়াচিত্র সম্পর্কে বিলাতী অভিমত নীচে দিতেছি।

ছায়াছবির ফলাফল

লণ্ডনের সাউথ ওয়েষ্টার্ণ পুলিশ কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কেয়ার্ণস্ 'মেথডিষ্ট টাইমস্' পত্রিকার জনৈক সংবাদদাতাকে বায়োস্কোপ সম্বন্ধে অভিমত দিতে বলিয়াছেন।

"আমাদের এই যুগটা নোংরামির যুগ, বায়োস্কোপ-ব্যবসায়ীরা তাহা জানে, জানিয়া সেই জ্ঞান তাহাদের কাজে লাগাইতেছে। যে কোনও ফিল্ম দেখিলেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। ফিল্মের সব চাইতে বড়ো আদর্শ হইতেছে গণিকাবৃত্তি। দাম্পত্য প্রেমের ব্যাপার ইহাদের কাছে পৌরুষহীনতার পরিচায়ক। যে স্বামী স্ত্রীকে বিশ্বাস করে ফিল্মে তাহার একমাত্র পরিচয় সে আহাম্মুক, আর যে স্ত্রী স্বামীকে বিশ্বাস করে, তাহাকে ঠকাইয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করা স্বামীর প্রায় কর্ত্তব্যের সামিল। নারীহরণ তো বায়স্কোপ-সমাজের একটা অঙ্গ বিশেষ। বায়স্কোপ দেখিয়া আমরা শুধু শিখিতেছি যে আত্মসংযমের মতো কাপুরুষতা আর নাই, নোংরামির মতো মজাও আর নাই।

বায়স্কোপ-ব্যবসায়ীরা মনুষ্য-সভ্যতার স্রোতকে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে। প্রেমকে কুৎসিত করিয়া ইহারা তরুণ মস্তিষ্কের সর্ব্বনাশ করিতেছে, ফলে আমাদের জেলের কয়েদী আর হাঁসপাতালের রুগী দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। ওদিকে অর্থগৃধ্নুরা তাহাদের অর্থকোষ ভরিয়া তুলিতেছে। আমার আদালতে তো প্রায়ই দেখিতেছি, অবিবাহিতা কুমারী জননী যাহাকে তাহার সন্তানের পিতা বলিয়া পরিচয় দিতেছে, সে ঈষৎ ব্যঙ্গ হাস্যের সঙ্গে সে কথা উড়াইয়াই ক্ষান্ত। এ কথা আমার বলিতে আজ একটুও দ্বিধা নাই যে বর্ত্তমান হোলিউড প্রাচীন গমোরার পরেই কীর্ত্তি রাখিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে। না জানিয়া যে কাজ করে কিংবা স্খলিত হয়, তাহার হয়তো মার্জ্জনা আছে কিন্তু জানিয়া শুনিয়া ইহারা যে শুধু টাকার জন্য মানুষের সর্ব্বনাশ করিতেছে! এই সব ফিল্ম হইতে যৌন প্রেরণা নিয়া

যে দেশের লোক চলাফেরা করিতেছে, সে দেশের আয়ু আর কত দিন ?

প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্ত্যের সভ্যতার আদর্শকে ফিল্ম দিয়া খড়ের কুটার মতো উড়াইয়া দিতে কত দিন লাগে ?—এই দিক দিয়া ফিল্ম তো অপ্রতিদ্বন্দ্বী, পৃথিবীর সত্য ও ন্যায়ের আমূল উৎপাটন ফিল্ম দ্বারা সম্ভব।

আমাকে হয়তো শুচিবাদী বলিয়া মনে হইবে—আমি তাহা নই, কেননা নিজের ইচ্ছায় যদি কেহ উচ্ছৃংখল হইয়া উঠে, তাহাতে আমার বাদ সাধিবার নাই। কিন্তু দেশের আশা-ভরসার স্থল যৌবনশক্তিকে দিক্‌ভ্রান্ত করিবার অধিকার তাই বলিয়া কাহারও নাই।

আমি বলিতে চাই যে যৌবনকে তাহার স্বপ্ন হইতে বিচ্যুত করিব কেন ? আমার চারিপাশে সোণার চাঁদ ছেলেরা বায়স্কোপের পাল্লায় পড়িয়া তাহাদের স্বপ্ন-স্বর্গকে ম্লান করিয়া ফেলিতেছে। এই তো সেদিন, আঠারো বছরের একটি মেয়ে তাহার বাবার 'বান্ধবী' নাই শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল,—বান্ধবী না থাকার অবস্থা সে বায়স্কোপ দেখিয়া কল্পনাই করিতে পারে না যে। বায়স্কোপে গিয়া আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে আমাদের ছেলেদের আর ফুলের মতো জীবন যাপন করিবার উপায় ইহারা রাখিবে না। ছেলেদের জন্যও কি ইহারা ভাবেনা ?

গির্জ্জা কিংবা নীতিবাদী সম্মেলন দ্বারা এই পাপের বিপক্ষে দাঁড়ানো চলিবে না, প্রবল জনমত গঠন না করিতে পারিলে অন্য উপায় নাই।"

বায়স্কোপের আধুনিক যে সংস্করণ হইয়াছে, তাহার যে কোনও একটি কাহারও দেখা থাকিলে উপরের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। কিন্তু এ অভিমত তো তবু পাশ্চাত্ত্যেরই। এই সব ছায়াছবি যখন আমাদের দেশে দেখানো হয়, তখন তাহার ফলাফল কি দাঁড়ায় তাহা কল্পনার বস্তু হিসাবে থাকাই ভালো। আমাদের আজন্মের সংস্কারের মূলে গিয়া ইহারা আঘাত করে। সব চাইতে দুঃখের বিষয় হইতেছে এই যে, বর্ত্তমানে যাঁহারা দেশীয় ছবির কর্ণধার হইতেছেন তাঁহারা বিনা দ্বিধায় আমাদিগকে এই সব বিলাতী ছবির অনুকৃতিই গলাধঃকরণ করাইতে চাহিতেছেন। এমনই করিয়া সমস্ত দিকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আমরা আজ বিকৃত করিয়া তুলিতেছি। বহুদিন ধরিয়া সংঘাতের বিরুদ্ধে অটল থাকার যে গর্ব্ব আমরা করিয়া আসিয়াছি, ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই যে স্থান দিতে চাহিবার দাম্ভিকতা দেখাইয়া আসিয়াছি, আজ বোধ হয় আমরা তাহারই মূল্য দিতে বসিয়াছি। এই মূল্যদানের ফলে নিজেরা কোথায় গিয়া দাঁড়াইব, সে হিসাবও রাখিবার ভরসা নাই।

ইংরাজীয়ানার ক্রমবিবর্ত্তন

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আমলে দেশে স্পর্দ্ধার সহিত বিলাতীয়ানার মহল্লা চলিয়াছিল। মাইকেলের জীবন-চরিত ইত্যাদি পড়িলে ইহার স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। প্যাণ্ট-কোট-হ্যাট-নেক্‌টাই পরিয়াই সে সময়ের ইংরাজীনবিশেরা ক্ষান্ত হইতেন না, বিসদৃশ ও উৎকট সাহেবীয়ানার যাহা কিছু লক্ষণ, মদ্যপান ও নিষিদ্ধ মাংসভক্ষণ হইতে সুরু করিয়া আরও অনেক কিছুই তাঁহারা গর্ব্বের সহিত অভ্যাস করিতেন। কিন্তু তবু সে সাহেবীয়ানা তাঁহাদের বাহিরের খোলসকেই শুধু বদ্‌লাইতে পারিয়াছিল, ভিতরে ভিতরে তাঁহারা ছিলেন খাঁটি দেশীয়। মাইকেলের কবিতা পড়িলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আজ কিন্তু যে সাহেবীয়ানার প্রচলন দেশে দেখা দিয়াছে, তাহা স্বতন্ত্র। আজ বাহিরের সাহেবীয়ানা হয়তো বর্জ্জিত হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক যুবক আজ ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শকে মনে প্রাণে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। এই আদর্শের যাহা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সেই সম্পর্কে জার্ম্মানির সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ও জীবনচরিত-লেখক এমিল লাডুইগ্ কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্কের 'টাইমস্ ম্যাগাজিন'এ বর্ত্তমান জার্ম্মানির তরুণ-তরুণীর আশা ও আদর্শ, তাহার সার্থকতা ও ব্যর্থতা নিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নীচে দেওয়া হইল।

যুবক জার্ম্মানির অবস্থা

"তরুণ জার্ম্মানি আজ সম্পূর্ণ দিগ্‌ভ্রান্ত। দেশে এমন কোনও দিশারী নাই যাহাকে সে নির্ব্বিচারে মানিতে পারে। পারিবারিক জীবনও যুদ্ধের ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং চারিপাশে চাহিয়া সে নিজেকে ছাড়া আর কাহাকেও মানিয়া চলিবার কারণ দেখিতে পাইতেছে না। আগেকার দিনে সামরিক ইউনিফর্ম্ম পরিয়া কুচ্‌কাওয়াজ করিয়া যে বয়সের ছেলেদের দিন কাটিত, আজ সেই বয়সের ছেলেরা ক্লাবে কিংবা খেলাধূলায় দিন যাপন করিতেছে, বড় জোর রাজনীতিক মিটিংএর মহল্লা দিতেছে। সুতরাং এখানে ওখানে ইহুদী, কমুনিষ্ট, হিট্‌লারবাদীদের দুই চারিজন মাঝে মাঝেই মরিতেছে। যুদ্ধ সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে কবে, কিন্তু সেই যুদ্ধেরই দরুণ বুড়াহাবড়ারা আজ একেবারে অক্ষম,—ছেলেদের সহিত তাহারা পারিয়া উঠিবে কেন? তাহাদের স্বপ্ন, সাধ, উন্মাদনা সব কিছু আছে কিন্তু কোনও কিছুরই কেন্দ্র নাই। যাহাকে বলে অপরাধীর জন্য নিরপরাধের প্রায়শ্চিত্ত, এ যেন তাই।

কমুনিষ্ট, ফ্যাসিষ্ট, যেথানে যত দল আছে, তাহাদের মধ্যে এমন কেহ আজ এ দেশে নাই যে এই 'যৌবনজল তরঙ্গ' রুধিতে পারে। চৌদ্দ হইতে একুশ বৎসরের এই নব্বই লক্ষ ছেলেমেয়েদের জীবন নিয়া যেন জুয়াখেলা চলিয়াছে। ইহাদের সত্তর লক্ষ ছেলেমেয়ে নিজেদের জীবিকা নিজেরা অর্জ্জন করিতেছে। একুশ হইতে ত্রিশ বৎসরের নরনারীদের সংখ্যা হইতেছে এক কোটি এগারো লক্ষ। তাহাদের কথা না বলাই ভালো। সমগ্র জাতির এক তৃতীয়াংশ এই ইহাদের দুর্গতির আজ সীমাপরিসীমা নাই। খেলাধূলায় অবশ্য কিছুটা সাম্‌লাইয়া যাইতেছে, আন্তর্জ্জাতিক দ্বন্দ্বে ইহারা অগ্রণী হইয়া নিজেদের মান খানিকটা রাখিতেছে। কিন্তু যাহাদের পিতৃপুরুষেরা পরাজয়ের কলঙ্ক মাথা পাতিয়া নিয়াছে, জাতি হিসাবে হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করিবার জন্য তাহাদের ছেলেমেয়েরা আজ মরিয়া। তাই সব দিকেই বাড়াবাড়ি মাতামাতির অন্ত নাই। যে সব ছেলেমেয়েরা 'কমুনিষ্ট' দলভুক্ত তাহারা একটা শেষ যুদ্ধের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে—শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের একটা শেষ অভিযান। যাহারা ফ্যাসিষ্ট দলভুক্ত তাহারা শোষক-শোষিতের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিতেছে, আন্ত-র্জ্জাতিক বৈঠকের ও বুজ্‌রুকি চাই না, পুরুষ যদি যুদ্ধ করিয়া রক্তপাতই না করিল, তবে সে করিল কি? যুদ্ধ ছাড়া পৌরুষের আর কি প্রমাণ হইতে পারে? আবার ধর্ম্ম নিয়া দুই দলের কোলাহল ও কলহ, তাও আছে।

যুদ্ধের ফলে অবশ্য ধর্ম্মের ভিত্‌ আর সব স্থানের মতোই এখানেও বেশ খানিকটা ধ্বসিয়া গিয়াছে। কিছুদিন আগে চার হাজার ছেলেমেয়েকে ভগবান সম্পর্কে তাহাদের একটা মতামত লিখিতে বলা হয়। অধিকাংশের উত্তরই ধর্ম্ম-যাজকদের পক্ষে আনন্দের কারণ হয় নাই। একটি ছেলে লিখিয়াছে 'ছোটবেলা হইতে দুঃখেকষ্টে কাটিতেছে, বাবা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে, মাকে যমে নিয়াছে—ভগবান আছে এ কথা আমি বিশ্বাস করি কি করিয়া?' একটি মেয়ে লিখিতেছে,—'বরং বার্লিনের বাহিরে গির্জ্জার কোন মানে খুঁজিয়া পাই, কিন্তু রাজধানীর উপরে এই গির্জ্জাগুলি দেখিলে আমার হাসি পায়।'—কয়েকটি মিস্ত্রীর ছেলে এমন ভাষায় ভগবানের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছে, যাহা এখানে লেখা অসম্ভব। চরমপন্থীদের সব দলই নায়কহীন। সাহিত্যে শিল্পে যাহারা কিছু দিবার মতো দিতেছে তাহারা সব বিশ্ব-প্রেমিক। মনে হয় জার্ম্মান চরিত্রের দিক হইতে বিচার করিলে ইহাদের চাই একজন ডিক্‌ট্যাটর।

ধর্ম্মের আর পারিবারিক প্রভাব হারাইয়াই ইহাদের হইয়াছে বেশী দুর্ভোগ। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা পূর্ব্বে একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স অবধি পড়াশোনা করিত, মেয়েরা ঘরে থাকিয়া বিবাহদিনের প্রতীক্ষা করিত। আজ দলে দলে ছেলেমেয়েরা, আঠারো পার হইতে না হইতেই জীবিকার্জ্জনের চেষ্টায় পথে বাহির হইয়া পড়িতেছে। মা-বাপকে তাহারা প্রায়ই অগ্রাহ্য করিয়া চলে। খুশীমতো প্রেমে পড়িতেছে, খেয়ালমতো বিবাহ করিতেছে। বিবাহ করিতে যেমন তর সহে না, বিবাহ ভাঙ্গিতেও তেম্‌নি পলক পড়ে না। হৃদয় বলিয়া কোনও বস্তুই নাই, গভীর অনুভূতির কথা বলিলে হাসিয়া ইহারা উড়াইয়া দেয়। লজ্জা সরম তো দূরের কথা, সামান্য শিষ্টতা, বিনয় সব কিছুর ইহারা মাথা খাইয়া বসিয়াছে। ক্লাবে কাগজে এমন সব জিনিষ নিয়া ইহারা আলোচনা করিতেছে, তর্ক তুলিতেছে—যাহার একমাত্র মাধুর্য্য গোপনতায় ও নীরবতায়। এবং এই সব করিয়া ভাবিতেছে, মহা একটা কাণ্ড করিয়া বসিলাম। সকলে যেন যন্ত্র, প্রেম, সমবেদনা, সব ইহাদের কাছে ভূয়া। কিন্তু ভালো দিকও আছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা আদর্শালু, তাহারা আত্মোৎসর্গ করিতেছে,—'সংঘং শরণং গচ্ছামি'

বলিয়া নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতেছে। আজকালকার ছেলেমেয়ের মতো এমন সমষ্টিবোধ (esprit-de corps) কোনও কালেই জার্ম্মানিতে দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ। অবশ্য ইহাদের মধ্যে বিপ্লবপন্থীরাও আছে। দল বাঁধিয়া ব্রত নিয়া তাহারা বিপক্ষকে রাত্রের অন্ধকারে সাবাড় করিয়া দিতেছে। বীরত্বও ইহাদের আছে, আবার গোঁয়ার্ত্তুমি, বিকৃতপ্রাণতাও আছে।

হৃদয় অনুভব হারাইয়াছে, রাজ্য রাজশক্তি হারাইয়াছে, শিল্প আকর্ষণ হারাইয়াছে কিন্তু তবু মনে হয় জার্ম্মানিতে আজও যাহা আছে, তাহাকে যদি শ্রদ্ধা করা যায়, তবে পিতৃপুরুষের দোষ-প্রক্ষালনের গ্লানি এই নির্দ্দোষ তরুণ-তরুণীরা ভুলিয়া নিজেদের যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে।"

পাশ্চাত্ত্যে প্রতিক্রিয়া

লেখক স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছেন, ধর্ম্ম ও পারিবারিক প্রভাবের অভাবেই এমন দাঁড়াইয়াছে। আমাদের তরুণ-তরুণীরা কিন্তু সেই আদর্শকেই চরম আদর্শ বলিয়া ধরিয়া নিয়া নিজেদের জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। অথচ পাশ্চাত্ত্যে তাহাদের এই সাধের আদর্শের প্রতিক্রিয়া ইহারই মধ্যে আরম্ভ হইয়াছে। মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে কিংবা পরে ও দেশে নিরীশ্বরবাদের যে প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়া আকাশের আলোকে ম্লান ও বাতাসকে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছিল, আজ সেই প্রাচীরই স্থানে স্থানে ধ্বসিয়া যাইতেছে। আমাদের কেবল দুঃখ হয় এই ভাবিয়া যে উহারা যে আদর্শকে বাতিল করিয়া ফেলিয়া দিল, আমাদের ছেলেমেয়েরা তাহারই টুক্‌রা নিয়া স্বর্গ রচনা করিবার অসাধ্য সাধন করিবার চেষ্টা পাইতেছে। মার্কিনের ডলার-পুঞ্জ ভেদ করিয়াও যে অরুণ-রেখা দেখা দিয়াছে, তাহারই নিদর্শন হিসাবে প্রায় এক শত শিক্ষায়তন ও বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরিয়া শ্রীযুক্ত টি, টি, ব্রামবাউ 'জায়নস্ হেরাল্ড' পত্রিকায় বর্ত্তমান আমেরিকার তরুণ তরুণীর ধর্ম্মসম্পর্কে ঔৎসুক্য নিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নীচে দিতেছি—

"ইস্কুলে-কলেজে-পড়া ছেলেমেয়েদের মুখে প্রায়ই নাকি আমরা শুনিয়া থাকি, 'ধর্ম্মের কথা ছিকেয় তুলে রাখ—' 'ও আমরা শুনতে তো চাই-ইনে, বিশ্বেস করিনে, মানেও বুঝিনে।' আধুনিক ছেলেমেয়েরা সব নাচ গান নিয়াই দিন কাটাইতেছে, ইহাও শুনিয়াছি। কিন্তু এক শত শিক্ষায়তন পরিভ্রমণ করিয়া আমার এ ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, এ যুগের যুবক যুবতীরা পূর্ব্ববর্ত্তী যে কোনও যুগের ছেলেমেয়েদের চাইতে নীতির দিক দিয়া অধিকতর বলশালী। এবং বিজ্ঞানের চরম ফলাফল দেখিয়াই হোক্ কিংবা আর যে কোনও কারণেই হোক্, তাহারা সকলেই জীবনের উদ্দেশ্য ও অর্থ জানিবার জন্য আজ সম্পূর্ণ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকার অধিকাংশ বিদ্যালয়েই ধর্ম্মানুসন্ধিৎসুদের একটা সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। এবং এই সব বৈঠকে কেবল মাত্র বিশেষ এক ধর্ম্ম-বিশ্বাসীরাই মিলিয়া মিশিয়া সংকীর্ণ কোনও ধর্ম্মমতের জয়ধ্বজা উড়াইতেছে না। সকল মত ও বাদই এই সব বৈঠকের সভ্য।

পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া, কর্ণেল, ক্যালিফোর্ণিয়া, মিচিগান, আইডাহো, পার্ড্ড্যু, ইলিনইস্, ক্যান্‌সাস্, মিস্সুরী, আইয়োয়া, কলোরেডো ইত্যাদি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতেই কোনও না কোন প্রকারে এই ধরণের একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। একটিতে সিকি মিলিয়ন ডলার চাঁদা সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠানগঠনার্থে আদায় হইয়াছে।

এই সব দেখিয়া মনে হয় যে, এ যুগের ছেলেমেয়েরা ধর্ম্মকে ইহার সত্য আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। এবং ইহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া আমার এমনও মাঝে মাঝে মনে হইয়াছে যে ওল্ড টেষ্টামেণ্টের যুগের পরে যে কোনও মহাত্মার কথিত বাণীর সহিত ইহাদের জীবন কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়া যায়।"

নিউইয়র্কের 'হেরাল্ড ট্রাইবিউন' পত্রিকায় ক্যানন রোজার্স আধুনিক ইংরাজ যুবকের সম্পর্কে লিখিতে গিয়াও ঠিক এই কথা লিখিয়াছেন—কোনও নির্দ্দিষ্ট মতবাদী না হইয়াও একালকার ছেলেরা আগেকার ছেলেদের অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মানুরাগী।"

অতিমানবত্বের সাধনা

ওদেশে যখন উহারা নিজেদের জালে নিজেরা পড়িয়া দম্ আটকাইয়া হাঁসফাঁস্ করিয়া মরিতে বসিয়াছে, তখন সেই

জালের বন্ধনে আমরা নিজেদেরকে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য কেবল যে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি, তাহাই নয়—মনে করিতেছি ঐ বন্ধনই একমাত্র মুক্তি। বহু সহস্র বৎসরের চিন্তার ফলে মানুষ ধর্ম্মবিশ্বাসকে একমাত্র রক্ষা-কবচ বলিয়া বুঝিয়া নিয়াছে, দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের যোগসূত্র হিসাবে নিজের এই বিশ্বাসকে সোপান করিয়াই যুগে যুগে মানুষ অতি-মানুষ হইবার সাধনা করিয়া আসিয়াছে. অবশ্য কখনও কখনও সে বিশ্বাসের অপব্যবহারে অনেক বিপর্য্যয় বাধিয়াছে—কিন্তু তাই বলিয়া নিজেকে বৃহৎ ও মহৎ বলিয়া জানিবার এত ব্যাপক পন্থা মানুষ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মাত্র মিথ্যা মোহের প্রভাবে এত বড়ো আদর্শকে আমাদের তরুণ তরুণীর মধ্যে বর্জ্জন করিবার বাসনা যখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, ওদিকে তখন উহারাই আবার আমাদেরই আদর্শকে পূজা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।—সমস্ত দিক দিয়াই আজ উহাদের দেশে নিজেদের বিপক্ষে নিজেদের অভিযান পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

গৃহাভিমুখী পাশ্চাত্য

'টাইম্‌স্' (নিউইয়র্ক) পত্রিকায় গৃহ ও শিশু-জীবন সম্পর্কে আলোচনা করিতে নিউইয়র্ক শহরের 'বোর্ড অব এডুকেশন'এর শিশু শাখার কর্ণধার ডাঃ লিওন্ গোল্ডরিচ্ যাহা লিখিতেছেন—এ প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য।

"ছোট ছেলে বিগ্‌ড়াইয়া যাইবার মূলে পিতামাতার সন্তানসম্পর্কে ঔদাসীন্য, তাহাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট যত্নের অভাব কিংবা তাহাদিগকে সাক্ষ্য রাখিয়া নিজেরা ঝগড়া করা কি অপর অন্যায় আচরণ করা ছাড়া আর কিছুই আছে বলিয়া মনে হয় না। যত রকম শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানই গড়িয়া উঠুক না কেন, গৃহকে ছাড়িয়া তাহাদের কোনটার প্রভাবই ছেলেমেয়েকে কিছু করিতে পারিবে না। হোম্‌ড়া-চোম্‌ড়া উপাধিধারী মনোবৈজ্ঞানিকের দল আর সমাজ-সংস্কারক—তাহাদের যে গোড়াতেই গলদ! শিশু-চরিত্রগঠনের জন্য অধীত বিদ্যার চাইতেও বেশী পরিমাণে চাই, তাহার প্রতি অন্তর্দৃষ্টি, গূঢ় সহানুভূতি, নিবিড় স্নেহ। 'নাই মামা'র চাইতে যেমন কানা মামাও ভালো—যে কোনও রকমের পারিবারিক প্রভাব জীবন্ত শিশুর পক্ষে তেমনই।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও অতিরিক্ত স্নেহের কুপ্রভাব হইতে শিশুকে নিষ্কৃতি দিবার জন্য বাপ-মার কোল ছাড়া করিয়া শিশুকে দূরে রাখিবার কথা শিশু-চরিত্রবিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছেন। আজ সে ধারণা উল্টাইয়াছে। অবশ্য যে ধরণের বাড়ী আমেরিকায় আজকাল বাড়িয়া চলিয়াছে, যেখানে মা কিংবা বাবা দিনরাত্রির অধিক সময়েই বাহিরে কাটান্, সে বাড়ীর কথা বলিতেছি না। কিন্তু গৃহ বলিতে এই বেপরোয়ামি, ইহাও আমেরিকা হইতে উচ্ছেদ হইল বলিয়া। আবার সেই 'হোম্ সুইট হোম'এর যুগই এখানে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। তফাৎ হইবে শুধু এই যে আগেকার দিনে যেমন গৃহই ছিল লোকের সর্ব্বস্ব, এখন হইবে সমাজ তাই, গৃহ মাত্র কেন্দ্র হিসাবে থাকিবে।"

পরগাছা-প্রবৃত্তি

এমনই করিয়া আজ উহারা ঠেকিয়া আমাদের যে আদর্শ তাহাকেই চিনিয়া নিয়াছে। এবং আমরা আধুনিকতার নামে উহাদের পুরাতন জামা-কাপড় পরিয়া আসরে নামিয়া রাজা সাজিবার উদ্দেশ্যে সঙ্ সাজিবার উদ্যোগ করিতেছি।—যে পরগাছা-প্রবৃত্তি হইতে আমাদের সেই উদ্যোগের সূচনা, সে পরগাছা-প্রবৃত্তির মূল উচ্ছেদ করিবার সময় আজ আসিয়াছে কিনা দেশের যৌবনশক্তিকে তাহা ভাবিয়া দেখিতে বলি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

অটাওয়া সম্মেলন

পৃথিবীব্যাপী বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটে বিলাতে যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং কিছুদিন পূর্ব্বেও সেই দুইটি কল্পনাতীত ছিল—(১) ইংলণ্ডের স্বর্ণমাণ বর্জ্জন। (২) ইংলণ্ডের অবাধ বাণিজ্যনীতি ত্যাগ। এই অবাধ বাণিজ্যনীতিই সর্ব্বথা উন্নতির উপায়, এই বিশ্বাসে ইংলণ্ড ভারতবর্ষেও তাহা প্রচলিত করায় এ দেশে একদিকে যেমন পুরাতন শিল্পের অনিষ্ট ঘটিয়াছে, অপর দিকে তেমনই নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদিনে ইংলণ্ড বুঝিয়াছে, অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতা পরাভূত করিতে হইলে, সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যকে একত্রিত করিয়া ব্যবসা-ব্যাপারে একটি সঙ্ঘ গঠিত করা প্রয়োজন।

অল্পদিন পূর্ব্বে বিলাতে আমদানী শুল্ক সম্বন্ধে যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার ফলে কতকগুলি পণ্য ব্যতীত আর সকল পণ্যেই বিলাতে শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে আমদানী শুল্ক আদায় করা হইবে এবং এ বিষয়ে যে পরামর্শ সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার অভিমতানুসারে শুল্কের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত করা যাইবে। এই আইন অনুসারে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে অর্থাৎ ভারতবর্ষে ও উপনিবেশসমূহে উৎপন্ন পণ্য গত ১লা মার্চ্চ হইতে আগামী ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত শুল্ক হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। এই যে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে উৎপন্ন পণ্য সাড়ে আট মাস কাল শুল্ক হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে, ইহার কারণ—এই সময়ের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশ বিলাতের সহিত বাণিজ্য-ব্যাপারে সর্ত্ত স্থির করিয়া লইতে পারিবে। যদি এই সময়ের মধ্যে সেরূপ সর্ত্ত স্থির করা না হয়, তবে ১৫ই নভেম্বরের পর বৃটিশ সরকার সে সকল দেশের পণ্যের উপরেও আইন অনুসারে শতকরা ১০৲ টাকা বা ততোঽধিক শুল্ক আদায় কারিতে পারিবেন।

এখন যে ব্যবস্থা করিবার কথা হইয়াছে, তাহাকে সাম্রাজ্যবদ্ধ সংরক্ষণব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের বিখ্যাত রাজনীতিক জোসেফ চেম্বার্লেন এইরূপ ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি বলিয়াছিলেন—

"যে সকল বন্ধন ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে একত্র বদ্ধ করিতে পারে, সে সকলের মধ্যে বাণিজ্যের বন্ধনই যে সর্ব্বপ্রধান, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহা উপলব্ধ হইলে ইংলণ্ডের সহিত তাহার উপনিবেশসমূহের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইবে এবং তাহাতেই বিরাট সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হইবে।"

চেম্বার্লেন যখন এই উক্তি করিয়াছিলেন, তখন জার্ম্মানী, রুসিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ সংরক্ষণনীতির দ্বারা আপনাদিগের দেশে শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; কেবল ইংলণ্ড সে নিয়মের ব্যতিক্রম। ইহার কারণ-নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে লর্ড গশেন বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ড শিল্পপ্রধান দেশ এবং তাহাকে বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে হয়; সুতরাং আমদানী শুল্ক প্রতিষ্ঠিত করিলে ইংলণ্ডে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বর্দ্ধিত হইবে এবং তাহাতে লোকের কষ্ট হইবে। ভারতবর্ষ তখন সংরক্ষণনীতি প্রবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন করিতেছিল, কিন্তু তাহা অরণ্যে রোদনমাত্র হইয়াছিল।

তাহার পর আজ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সহিত সুবিধা-বিনিময়ের সর্ত্তে কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তাহাই স্থির করিবার জন্য—সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করিবার পর—ইংলণ্ড অটাওয়া সহরে পরামর্শ-পরিষদের অধিবেশন-ব্যবস্থা করিয়াছে।

ইতোমধ্যেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে উৎপন্ন চা'র উপর আমদানী শুল্ক স্থাপিত করিয়া ইংলণ্ড, ভারতের ও সিংহলের দুর্দ্দশাগ্রস্ত চা'র ব্যবসায়ে কিছু সাহায্যপ্রদানের উপায় করিয়াছে। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কারণ, এরূপ ব্যবস্থা পরস্পরাপেক্ষী; ইহাতে ভারতবর্ষকেও বিলাতী পণ্য বিনাশুল্কে দেশে প্রবেশ করিতে

দিতে হইবে এবং অন্যান্য দেশের সেই সকল পণ্যের উপরই শুল্ক আদায় করিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে—এই ব্যবস্থা ইংলণ্ড ব্যতীত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে কিরূপ প্রযুক্ত হইবে, তাহাও বিবেচনার বিষয়। কারণ, দেখা গিয়াছে, নানা উপনিবেশে ভারতবাসীরা সেই সকল দেশবাসীর তুল্যাধিকার লাভ করা ত পরের কথা, অপমানজনক ব্যবহারই লাভ করিয়া থাকে।

বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ, তখন অটাওয়া সম্মেলনের নির্দ্ধারণে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের ইষ্ট বা অনিষ্ট সাধিত হইবার সম্ভাবনা। ইংলণ্ডের সরকার অটাওয়ায় আলোচনা করিবার জন্য ভারত সরকারকে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু ভারত সরকার এ দেশে ব্যবসায়ীদিগকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার প্রদান না করিয়া আপনারাই প্রতিনিধিনির্ব্বাচিত করিয়াছেন। ইহাতে এ দেশের ব্যবসায়ীদিগের সমিতিগুলি বিশেষ আপত্তি করিয়াছেন ও করিতেছেন। সমর সম্মেলন প্রভৃতিতে যেমন ভারত সরকারই ভারতের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন, এ ক্ষেত্রেও তেমনই করিয়াছেন। এই প্রতিনিধিদিগকে ভারতের জনগণের প্রতিনিধি না বলিয়া ভারত সরকারের প্রতিনিধি বলাই সঙ্গত। বিলাতে ব্যবসায়ীদিগের সমিতিসমূহের পক্ষ হইতে যেমন ৩ জন সদস্য মনোনীত হইয়াছেন, তেমনই আবার শ্রমিকদিগের সঙ্ঘদ্বারাও ২ জন সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। যে দেশ প্রকৃত পক্ষে স্বায়ত্ত-শাসনশীল অর্থাৎ যে দেশে সরকার দেশের লোকের কাছে কৈফিয়তের দায়ী এবং সরকারের অস্তিত্ব দেশের লোকমতের উপর নির্ভর করে সে দেশে যদি এইরূপ প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে হয়, তবে ভারতবর্ষের মত দেশে সেইরূপ প্রতিনিধি-মনোনয়নের প্রয়োজন কত অধিক তাহা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? ভারতবর্ষে সেরূপ প্রতিনিধি-মনোনয়নের পথে যে সব বিঘ্ন আছে, তাহা যে আমরা জানি না, এমন নহে; কিন্তু সে সব বিঘ্ন যে অতিক্রম করা যায় না, এমনও মনে করিবার কারণ নাই।

এ বিষয়ে আরও বিবেচনার বিষয় আছে। ভারতবর্ষে কাপড়ের কলে বর্ত্তমানে যে মিহি কাপড় উৎপন্ন হইতেছে, বিলাতের মিহি কাপড়ের সহিতই তাহার প্রতিযোগিতা। সুতরাং, বিলাতী মিহি কাপড় যদি বিনাশুল্কে ভারতে আমদানী হয়, তবে ভারতে উৎপন্ন চা বিনাশুল্কে ইংলণ্ডে যাইবে ও এ দেশে মিহি কাপড় উৎপন্ন করার পথ বিঘ্নাস্তৃত হইবে। কাজেই ভারতবাসীকে লাভলোকশান খতাইয়া অটাওয়া সম্মেলনে নির্দ্ধারণে সম্মতি দিতে হইবে। ভারতবাসী কি পাইবে, তাহা জানিতে না পারিলে কতটা ত্যাগ স্বীকার করিবে, তাহা স্থির করা তাহার পক্ষে দুষ্কর হওয়া অনিবার্য্য। সেই জন্যই ব্যবসায়ীদিগের প্রতিনিধির মতের প্রয়োজন। ভারতবর্ষ অল্প দিন হইতে প্রতীচীর প্রথায় কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতেছে সে সকল শিশু-শিল্পের সংরক্ষণই প্রয়োজন। অটাওয়া সম্মেলনের ব্যবস্থায় তাহা হইবে কি?

ভারতবাসীকে তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অটাওয়া সম্মেলনের সিদ্ধান্ত-প্রভাব ভারতে পতিত হইবেই। সুতরাং সে সম্মেলনে যাহাতে ভারতের অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা ভারতবর্ষ লাভ করিবার আবশ্যক চেষ্টা করিতে পারে, ভারতবাসী তাহাই চাহিবে।

বৃটিশ সাম্রাজ্য যদি অর্থনীতিক হিসাবে এক স্বতন্ত্র মণ্ডলীতে পরিণত হয়, তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যে সেই মণ্ডলীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে, সে সম্ভাবনাও আছে। কেন না, সকলেই নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিবে এবং বর্ত্তমান কালে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-ব্যবসায়ই রাজনীতির গতি নিয়ন্ত্রিত করে এবং রাজনীতির প্রভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়মেরও পরিবর্ত্তন হয়।

এই সময় ভারতের ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে একযোগে পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্যবিষয়ে অবিহিত হওয়া যে প্রয়োজন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের আর্থিক ব্যবস্থা

সাইমন কমিশনের পর গোলটেবিল বৈঠকের যে দুইটি অধিবেশন হইয়াছে, তাহার ফলে কতকগুলি বিষয়ের বিচারের জন্য কতকগুলি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সংপ্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের আর্থিক ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ জন্য গঠিত সমিতির বিবরণ ও সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। কোন্ কোন্ বিষয়ের রাজস্ব কোন্ কোন্ সরকারের অর্থাৎ কোন্ কোন্ রাজস্ব ভারত সরকারের আর কোন্ কোন্ রাজস্ব প্রাদেশিক সরকারের অধিকৃত হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া সমিতি যে আনুমানিক হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, যুক্তপ্রদেশে ২৫ লক্ষ টাকা ও পঞ্জাবে ৩০ লক্ষ টাকা আয় ব্যয় হইতে অধিক হইবে এবং আর সকল প্রদেশেই আয় অপেক্ষা ব্যয় নিম্নলিখিতরূপ অধিক হইবে—

মধ্যপ্রদেশ	...	...	১৭ লক্ষ টাকা
মান্দ্রাজ	...	...	২০ " "
আসাম	...	...	৬৫ " "
বোম্বাই	...	...	৬৫ " "
বিহার ও উড়িষ্যা		...	৭০ " "
বাঙ্গালা	...	...	২ কোটি টাকা

সুতরাং দেখা যাইতেছে বাঙ্গালার দুর্দ্দশাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের প্রবর্ত্তনাবধি বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া আছে—নূতন সংস্কারে তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না। অথচ সমিতি

মত প্রকাশ করিয়াছেন, বাঙ্গালা যে এই অবস্থার কতকটা পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, তাহা মনে হয় না। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে বাঙ্গালার এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা সমিতি বলেন নাই।

তবে সমিতির সদস্যরা সাধারণ ভাবে একটি কথা বলিয়াছেন—

"আমরা এ কথা অবশ্যই বলিব যে, আমরা আশা করি, ভারত সরকারে ও প্রাদেশিক সরকারসমূহে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের ব্যয় যথাসম্ভব স্বল্প করা হইবে। ভারতে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে এ দেশের শাসন-ব্যয় অত্যন্ত অধিক। যদি ব্যয়-বৃদ্ধি শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের প্রথম ফল হয়, তবে তাহা একান্তই দুঃখের বিষয় হইবে। এ বিষয়ে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহকে যে দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, তাহার উপর ব্যবস্থা বহু পরিমাণে নির্ভর করিবে।"

সমিতি এ দেশে সরকারের ব্যয়বাহুল্য সম্বন্ধে যে প্রচলিত মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশ হইলেও এই দেশে সরকারের বড় চাকরীয়াদিগের বেতনের হার যত উচ্চ তত আর কোন দেশে নহে। জাপানে মন্ত্রীর বেতন বার্ষিক ১২ হাজার টাকা, আমেরিকার মত ধনী দেশে ৩৬ হাজার টাকা, আর ভারতে ৬৪ হাজার টাকা! সিভিল সার্ভিসের সহিত বেতন-সামঞ্জস্য রক্ষা করায় এই ব্যবস্থা হইয়াছে। সামরিক বিভাগের ব্যয়ের ত কথাই নাই। দেশের লোককে দেশরক্ষার ভার না দিয়া বিদেশ হইতে সৈনিক ও সেনানায়ক আমদানী করায় এই বিভাগের ব্যয় অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ক্রমে শাসন-ব্যয় হ্রাস করাও হয় নাই। বিস্ময়ের বিষয় লী কমিশনের নির্দ্ধারণে চাকরীয়াদিগের বেতন হ্রাস না হইয়া বর্দ্ধিতই হইয়াছে এবং সামরিক বিভাগের ব্যয় ইঞ্চকেপ কমিটার নির্দ্ধারণানুসারেও হ্রাস করা হয় নাই!

শাসন-সংস্কারের প্রকৃত উদ্দেশ্য—দেশকে স্বায়ত্ত-শাসনশীল করা অর্থাৎ দেশের লোককে দেশরক্ষার ভার ও দেশের শাসনভার প্রদান করা। যদি তাহাই হয়, তবে তাহার ফলে সরকারের ব্যয়হ্রাস হওয়াই অনিবার্য্য। কিন্তু এ দেশে তাহা হইতেছে না। কেন?

দেশের লোকের বর্ত্তমান অবস্থায় নূতন কর স্থাপিত করিয়া সরকারের আয় বৃদ্ধি করিবার আশা দুরাশা মাত্র। সুতরাং ব্যয়সঙ্কোচ ব্যতীত আর কোন পথ নাই। যদি সরকার সে পথ গ্রহণ না করেন, তবে কেবল ব্যয়বাহুল্যের জন্যই শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমরা আশা করি, সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

বাঙ্গালায় ব্যয়-সঙ্কোচ

বাঙ্গালা সরকার এত দিনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ব্যয়সঙ্কোচের পথনির্দ্ধারণ জন্য এক সমিতি গঠিত করিয়াছেন—মিষ্টার সোয়ান (সভাপতি), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, খাঁ বাহাদুর আজিজউল হক, মিষ্টার বার্কমায়ার, মিষ্টার এস. কে, হালদার (সম্পাদক)।

ইঁহারা অবশ্যই ব্যয়-সঙ্কোচের কতকগুলি প্রস্তাব করিবেন। কিন্তু সে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইবে কি?

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে এইরূপ আর এক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা তাহার সদস্য ছিলেন—সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সভাপতি)। মিষ্টার (এখন সার) ক্যাম্বেল রোডস্, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, রায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, মিষ্টার স্প্রাই (সম্পাদক)।

এই সমিতির নির্দ্ধারণ গৃহীত হইলে বাঙ্গালা সরকারের বার্ষিক ব্যয় ১ কোটি ৯০ লক্ষ ২৫ হাজার ৯ শত ১০ টাকা হ্রাস হইত।

আমরা এমন কথা বলি না যে, তাঁহাদিগের সকল নির্দ্ধারণ অবাধে গ্রহণ করিবার পথে কোন বাধা ছিল না বা থাকিতে পারে না। কিন্তু আমরা এ কথা বলিতে বাধ্য যে, তাঁহাদিগের নির্দ্ধারণের মধ্যে কোন কোনটি সরকার ইচ্ছা করিলেই গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং ইচ্ছা করিয়াই গ্রহণ করেন নাই। যখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এক প্রদেশ ছিল, তখন এক জন ছোটলাট এক জন সেক্রেটারী লইয়া যে কাজ করিতেন, তাহার জন্য এখন গভর্ণর, ৪ জন শাসন পরিষদের সদস্য ও ৩ জন মন্ত্রী লাগিতেছে—সেক্রেটারী ত আছেনই। আবার মন্ত্রীদিগের বেতনও সামান্য নহে। দেখা গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে যখন মন্ত্রী ছিলেন না, তখন শাসন-পরিষদের সদস্যরাই তাঁহাদিগের কায অনায়াসে পরিচালিত করিতে পারিয়াছেন। তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়, শাসন পরিষদের সদস্য ও মন্ত্রী এতদুভয়ের সংখ্যা হ্রাস করিলে ক্ষতি হয় না—লাভই হয়। এইরূপে সমিতি কমিশনারের পদ তুলিয়া দিয়া বার্ষিক ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয়-সঙ্কোচ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সে প্রস্তাব আজও কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই।

শাসন-সংস্কারের প্রথম পর্ব্বে বাঙ্গালায় বার্ষিক ব্যয় ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪ শত ৬০ টাকা বাড়িয়া গিয়াছিল। অবশ্য ইহাই সব নহে।

বর্ত্তমান দুঃসময়ে ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে না পারিলে আর উপায় নাই। যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, সে সমিতি কিরূপ প্রস্তাব করেন এবং সরকার সে সব প্রস্তাব সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করেন, তাহা জানিবার জন্য বাঙ্গালার করদাতৃগণের ঔৎসুক্য স্বাভাবিক।

পুরাতনী

আমাদিগের সাহিত্যসেবা

মানবের কল্যাণসাধনই যদি যথার্থ ধর্ম্ম হয়, তবে সর্ব্ব-প্রকার সাহিত্যালোচনার দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে; সেই আলোচনা করিতে জানিলেই হইল। কাব্যের আলোচনা করিব; তাহাতে কেবল কি স্ত্রীমূর্ত্তির বিলাস-বিজড়িত রূপের বর্ণনাই করিব! যাহাতে কাম প্রবৃত্তির এবং অসংযমের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, কেবল কি তাহাই করিব? বর্ত্তমান সময়ের কোনও কোনও মাসিক পত্রিকার ন্যায় কেবল কি ইন্দ্রিয়লালসার উত্তেজক স্ত্রীমূর্ত্তিই অঙ্কিত করিব? নাটক ও নভেলে নিরবচ্ছিন্ন প্রণয় ও প্রণয়েরই ছড়াছড়ি করিব? বর্ত্তমান সময়ে যে সকল সদ্‌গুণ ও সদনুষ্ঠান সমাজের বিবিধ শ্রেণীর উপকারী হইতে পারে, তাহার চিত্র যথাযোগ্যভাবে কাব্যসাহিত্যে অঙ্কিত করিতে পারিলে সাহিত্যও সার্থক হয়, সেবাও সফল হয়। মেরী করীলির এক একখানি কাব্য সমাজে কত শক্তি দান করিতেছে, কত কল্যাণসাধন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এতদ্দেশে তদ্রূপ কাব্য কোথায়? নীচ যাহাতে উন্নত হয়, পতিত যাহাতে পবিত্র হয়, তেমন আদর্শ-সৃষ্টি বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্য হইতে কি চিরবিদায় গ্রহণ করিল? সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষতঃ পুরাণে কত আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ স্বামী, আদর্শ রাজা, আদর্শ প্রজা, এমন কি, আদর্শ শত্রু পর্য্যন্ত, অঙ্কিত হইয়াছে; তৎসমস্তের অনুশীলনে কত কত নবনারী উন্নত ও পবিত্র জীবন লাভ করিতেছেন, তাহার সংখ্যা হয়না। আমরা কেহ সাহিত্য-সম্রাট্ হইতেছি, কেহ আর কত কি হইতেছি! কিন্তু সমাজের ও সময়ের উপযোগী উন্নত আদর্শ কি একটীও অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছি? যাহারা কেবল বুঝে রাজত্ব ও আধিপত্য, স্বর্গকেও যাহারা Kingdom ভিন্ন কল্পনা করিতে পারে না, তাহাদিগের ভাষা ধার করিয়া লইয়া সাহিত্যেও আমরা প্রতিনিয়ত "সাহিত্য-সম্রাট্" "কবি-সম্রাট্" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়াই তৃপ্ত হইতেছি। আমরা ক্রমে যেরূপ অসহিষ্ণু ও অ-ধীর, বিলাসী ও সৌখীন, অলস ও অদূরদর্শী হইতেছি, তাহাতে আদর্শ-চরিত্রের চিত্রণ বোধ হয় আমাদিগের দ্বারা আর সম্ভব হইবে না। কষ্ট করিয়া ১০ পাতা যে পড়িতে পারে না, চিন্তা করিয়া দুইটি কথার যে মর্ম্মভেদ করিতে সমর্থ হয় না, কালব্যাপিনী চেষ্টা শুনিলেই যাহার দেহে জ্বর আসে, সে ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র, চুট্‌কী, চটুল, মজাদার, শ্রবণেন্দ্রিয়ের আপাতসুখকর দুই দশ লাইন কবিতা, কি একটু ছোট গল্প ভিন্ন আর কি লিখিবে? কি বা পড়িবে? এখন ইহারই নাম সাহিত্য-সেবা দাঁড়াইয়াছে। ইহা মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। কাব্য সাহিত্যের সহায়তায় মানুষকে উন্নত করা আর আমাদিগের বিবেচনার স্থল নহে।

সাহিত্য-সেবা এক্ষণে আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। তাহাও মঙ্গলজনক হইতে পারে, যদি সুপথে চালিত হয়। নচেৎ কেবল বৃথা গর্ব্বের প্রশ্রয় দিলে আরও অমঙ্গলের কারণ হইতে পারে। ইহার নাম ঐতিহাসিক আলোচনা। আমাদিগের জাতিটা পূর্ব্বে এত বড় ছিল, অত বড় ছিল, প্রকাণ্ড ছিল, ইত্যাদি জানিলে মঙ্গল আছে; তাই এ শাস্ত্রের আলোচনা। পূর্ব্বে বড় ছিলাম, এখন ছোট হইয়াছি; এ সংবাদ জানিলে কাহারও প্রতিজ্ঞা, উদ্যম, অনুষ্ঠান জাগ্রত হইতে পারে না, এমন কথা বলিব না। তবে অনেকেরই বৃথা গর্ব্বমাত্র জাগ্রত হয়; আর বিশেষ কিছু ফল হয় না। * *

* * কিন্তু ইহার আর একটা দিক আছে। সমাজ কিসে উন্নত হয়, কেনই বা পতিত হয়; অর্থবল, বিদ্যাবল, জনবল থাকিতেও পুরাকালে ইতিহাস-প্রখ্যাত অনেক জাতি কি কারণে উন্নত পদবী হইতে অধঃপতিত হইয়াছিল; মানবের উর্দ্ধাধঃ বিবর্ত্তনের প্রধান হেতু কি? এই সকল মানবতত্ত্বের সুতরাং জীবতত্ত্বের অংশস্বরূপ যে ইতিহাসের আলোচনা, তাহাই লোকহিতকর, তাহাই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। আর যদি লোকহিতজনক অনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম বলা যায়, তবে ঐরূপ অনুশীলনই ধর্ম্ম। অন্যবিধ অনুশীলন মানসিক ব্যায়ামমাত্র, এবং অনায়াসেই বৃথা গর্ব্বে পরিণত হইতে পারে। এই হেতু পণ্ডিতপ্রবর রে ল্যাংকেষ্টার বলিয়াছেন—"মানবজাতির জীবন-সংগ্রামের, মানবজাতির বিবর্ত্তনের ইতিহাসস্বরূপ লোকতত্ত্বের একাংশ গণ্য করিয়া ইতিহাসের আলোচনা করিলে মূল্যবান সিদ্ধান্ত সকল পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।"

শশধর রায়। সাহিত্য—বৈশাখ, ১৩২১।

মাসকাবারী

বৎসরের প্রথম দিনের প্রথম সংবাদ—বাংলার নানা স্থানে বহু ডাকাতি হইয়াছে। বিক্রমপুরের জনৈক ধনীর বাড়ী হইতে ৩০০০৲ টাকার জিনিস লুণ্ঠিত হইয়াছে। ঢাকা সহরে রাহাজানী হইয়াছে। প্রায় ১০০ শত বাঙ্গালী রাজবন্দী আজমীরের দেউলীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কানপুরে কয়েকজন গ্রেপ্তার হইয়াছে, নীলফামারিতে আরও কয়েকজন। টাঙ্গাইলে জনৈক বিবাহিতা বালিকা ভা'য়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। কানপুরের জনৈকা স্ত্রীলোক মৃতপতির চিতায় আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মর্দানে লালকোর্ত্তায় আর পুলিশে লড়াই হইয়া গিয়াছে। পারস্যের পথে রবীন্দ্রনাথ জাস্ক হইতে বুসায়ার রওনা হইয়াছেন। দক্ষিণ আমেরিকায় ৮টি আগ্নেয়গিরি স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে।

২-৩রা বৈশাখ—বেকার চীনারা কলিকাতা ছাড়িয়া চীন যাত্রা করিয়াছে। কলিকাতার এক গদীতে ডাকাতি হইয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সেতু সংস্কার করিতে জনৈক ইঞ্জিনীয়ারের মৃত্যু হইয়াছে। রাজসাহীতে সার্ব্বজনীন ভোজে ৫০০ শত নরনারীকে খাওয়াইয়া হিন্দু-সভা কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এলাহাবাদের মেল সর্টারকে কয়েকজন লোক সাবাড় করিয়াছে। জেনেভাতে ডাঃ প্রিভা ভারতবর্ষের দমন-নীতির নিন্দা করিয়াছেন। হিণ্ডেন-বার্গের হুকুমনামা অনুসারে নাজি দলের আড্ডা ভাঙ্গা হইতেছে।

৪ঠা বৈশাখ সার জন এণ্ডারসন, বাংলার নূতন গবর্ণর, সদলে দার্জ্জিলিং গিয়াছেন। ক্রুগার কোম্পানির তিনজন ডিরেক্টার গ্রেপ্তার হইয়াছেন। আমেরিকায় আগ্নেয়গিরি আবার ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছে। ওয়ারশ'তে মার্কিণ মিশনারী মহিলা নিহত হইয়াছেন। নিউ সাউথ ওয়েলসে প্রধান মন্ত্রীর সাহায্যকল্পে সওয়া লক্ষ লোক নিয়া এক বাহিনীগঠনের প্রস্তাব হইয়াছে। এদিকে যশোহরে নারীহরণের অভিযোগে পাঁচজন আসামীর ১৫ হইতে ৩ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। চম্পারণে ৪০টি গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন হইয়াছে। জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে বিহারে বহু স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। লর্ড স্যাঙ্কির চিঠিতে জানা গিয়াছে ভারতের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে বর্ত্তমান গবমেণ্ট পূর্ব্ব গভর্মেণ্টের সহিত একমত।

৫ই বৈশাখ কলিকাতায় ইদে গোলমাল হয় নাই। বেহালায় মুসলমান রমণী দুর্ব্বৃত্ত দ্বারা হত হইয়াছে। লাঙ্গলবন্দে ২০০ শত স্বেচ্ছাসেবক জাতীয় পতাকা উত্তোলন হেতু বন্দী হইয়া ছাড়া পাইয়াছে। মুন্সীগঞ্জে ৫ জন শিক্ষক হাই স্কুল হইতে বরখাস্ত, ইন্দাসে দেশী মদের দোকান ভস্মীভূত। হাজারিবাগ জেলায় অভ্র-খনিতে অগ্নিকাণ্ডে ১৭ জন শ্রমিক দম বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। লণ্ডনে নিখিল ভারতীয় খেলোয়াড় দল সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। হিণ্ডেনবার্গ ঘরোয়া সৈন্যের বিরুদ্ধে মত জারি করিয়াছেন ও এথিয়োপিয়ার সম্রাট [illegible] হইতে দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদ করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

৬ই পাটনার ষড়যন্ত্র মামলার রায়প্রকাশ, কুমিল্লায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড, আমেদাবাদে গুজরাট সভায় ৩৩ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত, গাইবান্ধায় বিশিষ্ট উকিলের প্রতি বহিষ্কার আদেশ জারী। নৈহাটিতে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা, এবং লণ্ডন মসজিদে ইদ উপলক্ষে মিঃ ষ্টুয়ার্টের মুস্লিম-ভারতে ঐক্য-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বক্তৃতা-সংবাদ। রবীন্দ্রনাথ সিরাজে পৌঁছাইয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্রোহ সম্পর্কে ৪৬ জন আসামীর ২ জনের প্রাণদণ্ড, ২ জনের ৫ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড এবং ৪০ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ। বর্দ্ধমান কর্ড লাইনে মোটরে ও ইঞ্জিনের সংঘর্ষে তিন জন লোকের মৃত্যু।

৭ই বৈশাখ লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সর্দ্দার কর্ত্তার সিং ও সুন্দর সিং ১৭ বছর দ্বীপান্তরের পর মুক্ত। দিল্লীতে কংগ্রেস অভ্যর্থনা-সমিতি বেআইনী ঘোষিত। ১০০ শিখ স্বেচ্ছাসেবক কংগ্রেসের কার্য্যে দিল্লী প্রেরিত। বগুড়ার এক আখড়া হইতে কালীমূর্ত্তি অপহৃত। রুশ জাপানে প্রবল মনোমালিন্যের খবর। সাংহায়ের চীন-জাপানে আপোষ ব্যর্থ। কমন্স সভায় ভারত-সচিব সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে দু'কথা বলিয়াছেন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে শপথ-গ্রহণ ইচ্ছাধীন করিতে স্বতন্ত্র শ্রমিক দল বিল উত্থাপন করিয়াছেন।

৮ই বৈশাখ এক পশ্চিমার মাথার ট্রাঙ্ক হইতে কলিকাতায় মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঠাকুরগাঁয়ে ভীষণ ঝড়। কালনায় কংগ্রেসকর্ম্মীর আত্মহত্যা, লাহোরে বিমানপোত-দুর্ঘটনায় দুই ছাত্রের মৃত্যু, আত্রাইয়ে অগ্নিকাণ্ডে ১ শত বাড়ী ভস্মীভূত, ঢাকার বনগ্রামে ২৫০০৲ টাকা মূল্যের ষ্টাম্প ও নগদ ৮০০৲ টাকা অপহৃত, মাণিকগঞ্জে রিভলভারী ডাকাতদের বিফলতার খবর। ওদিকে রুশজাপানে মনোমালিন্য নিয়া জল্পনা-কল্পনা। জেনেভা জাতিসঙ্ঘের জাপানকে সাংহাইত্যাগের নির্দ্দেশ, এবং ব্রিটিশ বাজেটের ১৭ লক্ষ পাউণ্ড ঘাটতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে

৯-১০ই বৈশাখ তমলুকের কংগ্রেস-কর্ম্মী জেল হইতে আমাশা নিয়া বাহিরে আসিয়া মারা গিয়াছেন। দিল্লীতে ৭ জন বস্ত্র-ব্যবসায়ীর উপর ১ সপ্তাহ কাল দোকান বন্ধ রাখিবার হুকুমজারি। চট্টগ্রামের কাচান গ্রামে জনৈক ভদ্রলোকের ডাকাতের অস্ত্রে প্রাণদান। 'আর্থিক মন্দা ও আইন অমান্য' পুস্তিকা কাঁথীর স্কুলে বিতরণ। হালিসহরে পাটের গুদামে আগুন, ফলে ৩৪ লক্ষ টাকার ক্ষতি। বিষ্ণুপুরে ৬৬ জন মহিলা পিকেটার দণ্ডিতা, তন্মধ্যে বাইশ জনের নিষ্কৃতি লাভ। বাঁকুড়া জয়পুরে বিশিষ্ট ভদ্রলোকের উপর স্পেশ্যাল পুলিশের কাজের নিমন্ত্রণ। ষ্টিভেন্স-হত্যা মামলার আসামীদিগকে কুমিল্লা হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরীকরণ। ওদিকে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের দিল্লী কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করিয়া মালব্যজীকে তার। ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপে ছাদ ভাঙ্গিয়া আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ১৫ জনের মৃত্যু। বিলাতের রয়াল অ্যাকাডেমিতে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিস্থাপনের প্রস্তাব নামঞ্জুর। জাতি-সঙ্ঘ কাউন্সিলের বিরুদ্ধে সাংহাইসম্পর্কে জাপানের মর্য্যাদাহানিতে ক্ষোভ-প্রকাশ।

১১ই বৈশাখ সরোজিনী নাইডুর পুলিশ কমিশনারের হুকুম অমান্য অপরাধে ১ বৎসর বিনাশ্রমে কারাদণ্ড। পণ্ডিত মালব্যজীকে ৬ জন সঙ্গীসহ

দিল্লীর উপকণ্ঠে গ্রেপ্তার। নানা প্রদেশের বহু কংগ্রেস প্রতিনিধিকে দিল্লী গমনে বাধাপ্রদান। ঢাকায় বাদামতলা ষ্টীমারঘাটে রিভলভারসহ দুই জন যুবক গ্রেপ্তার। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় বানরীপাড়ার ডিক্টেটর লাবণ্য প্রভা দাশগুপ্তার দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। ঝালকাঠিতে নৃশংস হত্যা-কাণ্ড। বিক্রমপুর কংগ্রেসের ডিক্টেটর হেমনলিনী গাঙ্গুলীর ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। রাজশাহী শহরময় লাল পোষ্টারের ছড়াছড়ি। ওদিকে আইরিশ পার্লামেণ্টে রাজানুগত্যের শপথ তুলিয়া দিবার বিলের মর্ম্মপ্রকাশ। জাপানের সমরসচিবের জাতিসঙ্ঘের প্রতি সাবধান-বাণী। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জিয়ানের সম্পাদক মিঃ স্কটের জল-সমাধি।

১২ই বৈশাখ, দিল্লীতে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার ৪৭শৎ অধিবেশন, ক্লক-টাওয়ারের উপর পাঁচটি প্রস্তাব গ্রহণ, ৪০০ প্রতিনিধির গ্রেপ্তার। কারাগারে মালব্যজীর পাচক ও ভৃত্য রাখিবার অনুমতি। কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির ৪০ জনের ১৭ জন আমেদাবাদে গ্রেপ্তার। গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে নাইডুর পর সভাপতি মনোনীত। কলিকাতা হইতে ৫০০ কয়েদীর নিষ্কৃতি। আগষ্ট মাস অবধি যাহাদের মেয়াদ, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার গুজব। বোম্বায়ে পতাকা-অভিবাদন-অনুষ্ঠান সম্পর্কে ৩৫ জন গ্রেপ্তার। ব্রোচ ও পঞ্চমহালে নোট ডবল করিবার প্রলোভন দেখাইয়া ধনী লোককে প্রবঞ্চনাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। 'না জাগিলে সব ভারত ললনা' কবিতা-আবৃত্তিতে ভাঙ্গার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আপত্তি। সিরাজগঞ্জে ৬০ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা বিনোদবালা সেনের দণ্ডকাল শেষ না হইতে মুক্তি। ওদিকে ব্রিটেনের নূতন শুল্ক-তালিকা সম্পর্কে ফরাসীদের অভিমত, জার্ম্মানী সমর-ঋণ বাতিল করিবার অজুহাত পাইতে পারে। কবি ইয়েটস আয়ার্লণ্ডের মঙ্গলকল্পে শপথ তুলিয়া দিতেই বলিয়াছেন।

১৩ই বৈশাখ বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ক্রোড়পতি সার দোরাব টাটা দাতব্য কার্য্যের জন্য তাঁহার তিন কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি এক ট্রাষ্টের হাতে দিয়াছেন খবর পাওয়া গিয়াছে। অপর একজন ক্রোড়পতি রণছোড়-লালকে নোটিশ অমান্য করায় অভিযুক্ত করা হইয়াছে। আহম্মদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির প্রেসিডেণ্টের উপর এক নোটিশ জারি করিয়া তাঁহাকে ভাণ্ডারের দৈনিক হিসাব নিকাশ দাখিল করিতে বলা হইয়াছে। গঙ্গাধর রাউ দেশপাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। নদীয়ার স্বেচ্ছাসেবিকাগণ ইউনিয়ন বোর্ডে পিকেটিং আরম্ভ করিয়াছে। ঘাটালের অধীন এক স্থানে পুলিশ কংগ্রেস অফিস তালাচাবি বন্ধ করিয়াছে ও জাতীয় পতাকা নামাইয়া ফেলিয়াছে। পল্লীতলার জনৈক ব্যক্তি তাহার ভায়ের জরিমানার টাকা অনাদায়ী থাকায় পুলিশের তাড়া খাইয়াছে। লাভপুরের এক জমিদার ম্যাজিক লণ্ঠন নিয়া নিজে প্রজাদের শিক্ষার্থে বক্তৃতা-সফরে বাহির হইয়াছেন। মেহেরপুরে অগ্নিকাণ্ডে টাকা লোকসান হইয়াছে—১০০০ মণ পাট পুড়িয়াছে। ঠাকুরগাঁ ষ্টেশনে জনৈক ভদ্রলোককে ট্রেন হইতে নামাইয়া ৭ দিনের মধ্যে তাঁহাকে শহর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। ঢাকায় হিন্দু-সভা দুইটি বিধবা বিবাহ দিয়াছে। ওদিকে জার্ম্মানিতে নির্ব্বাচন-যুদ্ধের খবর, প্রুশিয়া ও ব্যাভিরিয়ায় নাজিদল বিপুলসংখ্যক ভোট পাওয়াতেও হিট্লারের জয় হয় নাই, এ উপলক্ষে দুই দশটা খুনজখমও হইয়াছে। ইংলণ্ডে সিনেমারা আমোদকর ধার্য্যের কথা উঠায় ধর্ম্মঘটের সঙ্কল্প আঁটিয়াছে।

১৪ই বৈশাখ ভারতীয় বণিক-সমিতি-সঙ্ঘের সভাপতি অটোয়া সম্মেলনের সভাপতিকে জানাইয়াছেন যে, অটোয়া সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি মণ্ডলী কোন মতামত প্রকাশ করিলে ভারতবর্ষ তাহাতে বাধ্য হইবে না। কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা সার মহম্মদ ইকবাল প্রভৃতির ইস্তাহারের তীব্র সমালোচনা। বালুরঘাটে প্রবল ঘূর্ণীবাত্যা। চন্দননগরে ১১ বৎসরের সদগোপ বিধবার বিবাহ। মেদিনীপুর অভয় আশ্রমের জনৈক কর্ম্মীকে স্পেশ্যাল কনষ্টেবলী করিবার জন্য বলা হইয়াছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার জনৈক আসামীর ক্ষয়-রোগের সূচনা-সংবাদ। জামালপুরের জনৈক রাজবন্দী বহরমপুরের বন্দী-নিবাসে এপেণ্ডিসাইটিসে আক্রান্ত। মজঃফরপুরের জনৈক কর্ম্মী রামনন্দন সিংহের জরিমানা আদায়ের জন্য ৩৫টি গরু ক্রোক। কমন্স সভায় স্যার স্যামুয়েল হোর বলিযাছেন, কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে বেআইনী ঘোষণা করা হয় নাই, দিল্লীর সভা মাত্র বেআইনী ঘোষিত হইয়াছে। ভারত-সচিব ঘোষণা করিয়াছেন যে গত মার্চ্চ মাসে ৭ হাজার, ফেব্রুয়ারী মাসে ১৮ হাজার, জানুযারীতে ৩৫ হাজার লোক দণ্ডিত হইয়াছে। কান্দীতে দুই দলের বিবাদ মিটাইতে গিয়া জনৈক ব্যক্তি তাহার একটি কান হারাইয়াছে।

১৫ই বৈশাখ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুস্লিম লীগ পৃথক-নির্ব্বাচনের কুফল বর্ণনা করিয়া বিবৃতি দিয়াছেন। বহুবাজার ষ্ট্রীটে ট্যাক্সিতে ৫টি বোমাসমেত একটি যুবকের গ্রেপ্তার-সংবাদ। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ফৌজদারী দণ্ডবিধি সংশোধন আইন অনুযায়ী আটক ব্যক্তি যদি ঐ আইনের ১৩ ধারার আদেশ কি কোন সর্ত্ত অমান্য করে, তবে উহা পালনে তাহাকে বাধ্য করা হইবে মর্ম্মে বাংলা সরকারের ঘোষণা। কটক জেলে রাজবন্দীদের অনশন ব্রত অবলম্বন। সাপুর ডাক লুঠ মামলায় তিন জন আসামীর কঠোর শাস্তি। মীরাট মামলায় আসামী পক্ষের অ্যাড্ভোকেট পণ্ডিত প্যারীলালের মুক্তি। মেদিনীপুরে ডাকবাক্সে অগ্নি-সংযোগ। বাঁকুড়ায় গোটা দুই বন্দুক রুক্তের নোটিশজারী। রাজসাহীর জনৈক অন্তরীণ-মুক্ত রাজবন্দীর প্রতি ২৪ ঘণ্টার ভিতর রাজসাহী জেলাত্যাগের আদেশ। মাণ্টা ও সাসেক্সে বিমানপোত-দুর্ঘটনায় তিন জন বিমান-বীরের মৃত্যু। বিলাতি ইষ্ট ইণ্ডিযান এসোসিয়েসান সার মাইকেল ওডায়ার গান্ধী-আরুইন চুক্তিকে বিপ্লবীদের নিকট নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

১৬-১৭ই বৈশাখ—দমদম জেল হইতে দুইজনের মুক্তি। মেদিনীপুরের জমিদারের অর্ডিন্যান্স অমান্য করায় দেড় বৎসর কঠোর দণ্ড, যশোহরের জরিমানা অনাদায়ে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক। বরিশালে অর্ডিন্যান্স অমান্য করায় কঠোর দণ্ড। কুমিল্লায় ঐ অপরাধে ঐ দণ্ড। তমলুকে লবণ প্রস্তুত করিতে গিয়া কয়েকজন ধৃত। সুতাহাটা গ্রামে পিটুনী পুলিশের ব্যবস্থা। বাঁকুড়া জেলার জনৈক দেশী মদ-ব্যবসায়ীর মদে এ্যাকোনাইট বিষ পাওয়া গিয়াছে, অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার। বাঁকুড়ায় রাজনৈতিক ফেরারী আসামীর সভাসমিতি করার সংবাদে পুলিশ গিয়া অপরাধীকে পায় নাই। আইরিশ পার্লামেণ্টে শপথ বিল সম্পর্কে তুমুল বাকবিতণ্ডা। ডি ভ্যালেরার দলের জনৈক সদস্যের লর্ড ফ্রেঞ্চকে হত্যা-সংকল্পের কথা-প্র—

১৮ই বৈশাখ—মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলী। তমলুকে চৌকীদারী ট্যাক্স না দেওয়ায়, তিন জনের বাসনপত্র ক্রোক। দিনাজপুরে একুশটি বাড়ীতে খানাতল্লাসী। কুমিল্লা সহরময় সরকারী আফিসের

দেওয়ালে বয়কট-প্ল্যাকার্ড নবাবগঞ্জ আবগারী দোকানে পিকেটার গ্রেপ্তার। পল্লীতলায় বন্দুক বাজেয়াপ্ত। মজঃফরপুর, বারাণসী, বোম্বায়ে চিঠির বাক্সে আগুন। শিলচরের সাব-রেজীষ্ট্রার ও ছয়জনকে জালিয়াতী অভিযোগে দায়রায় সোপর্দ্দকরণ আসাম গভর্ণমেণ্টের আমদানী আয়ে শতকরা ৫০ টাকা হ্রাসের সংবাদ। শিউড়ী জেলে কুমারী সুশীলা দাসগুপ্তের অনশন ব্রত। শ্রীপ্রকাশের জরিমানা অনাদায়ে আসবাব-পত্র ক্রোক। কমন্স সভায় ভারত-বিতর্কে স্যর স্যামুয়েল হোর অভিযোগ করিয়াছেন যে কংগ্রেসের কার্য্যকলাপের ফলেই গভর্ণমেণ্ট অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত।

১৯শে বৈশাখ রাজবন্দী শরৎচন্দ্র বসুর ভাতা বাবদ সরকারের ১২শত টাকা মঞ্জুর। সিরাজগঞ্জে ভীষণ জলবৃষ্টি— দুর্গেশনন্দিনী বায়োস্কোপ নিয়া গোলমালের মামলা। হুগলী জেলে একজনের বসন্ত, অপরের টি, বি। বাঁকুড়ায় নিষেধাজ্ঞা। কাঁথীতে রিভলভার লাইসেন্স নাকচ। দমদম জেলে কুষ্টিয়ার তিনজন মুক্ত। খুলনায় ভীষণ ঘূর্ণবাত্যা, ২ জন মহিলা নিহত, ১৫০ জন আহত, ৯০টি পরিবার আশ্রয়হীন। বগুড়ায় গুড়ের প্রচলন বৃদ্ধি। মৈমনসিংহে ঘূর্ণীবাত্যার পরে পুলিশের দখলীকৃত কংগ্রেস অফিস ত্যাগ। করাচীর শেঠ হরিদাস লালজী ও শেঠ সুখদাসকে দিল্লীর পথে গ্রেপ্তার এবং বিচারান্তে দণ্ড। যশোহরে ফুলমণি দাসীর হরণ সম্পর্কে পাঁচজন আসামীর আত্মসমর্পণ। ভোটাধিকার কমিটির রিপোর্ট সিমলায় স্বাক্ষরিত। সাংহাই বোমা-বিস্ফোরণ সম্পর্কে ১১জন কোরিয়াবাসী গ্রেপ্তার। ফরাসী প্রতিনিধি পরিষদের ৬১৫টি সদস্য পদের জন্য ৩৬১৭টি প্রার্থী।

২০শে বৈশাখ—শিউড়ী জেলে বন্দী-বন্দিনীর অনশন-ব্রত—অভিযোগের প্রতিকার-আশ্বাসে অনশন ত্যাগ। ভোটাধিকার কমিটির তিনজন সদস্যের পৃথক মন্তব্যের প্রত্যুত্তর স্বরূপ অধিকাংশ সদস্যের দ্বারা একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রস্তুত। মৈমনসিংহে বিলাতী বয়কটের নামে ইস্তাহার। ধানুকা ডাকাতীর বারোজন আসামীর বিনাসর্ত্তে মুক্তিলাভ। ঢাকায় এক সময়ে একই সাইকেলে দুইজন আরোহীগমনে মিউনিসিপ্যালিটির নিষেধ-ঘোষণা। মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যাসম্পর্কে খানাতল্লাস। ফ্রান্সের মসিয়ে তার্দিউ পুনরায় নির্ব্বাচিত। মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের জেনেভা হইতে লণ্ডন প্রত্যাবর্ত্তন। কলিকাতা ষ্টার থিয়েটারে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের ৮৯ তম জন্মবার্ষিকী।

২১শে বৈশাখ—ঘাটালে জাতীয়পতাকা উত্তোলনে তিনজন মহিলা গ্রেপ্তার। জলপাইগুড়ীতেও গ্রেপ্তার। কৃষ্ণনগর জেল হইতে ১৩জন মহিলার মুক্তি। দমদম স্পেশ্যাল জেল হইতে ৮জন মুক্ত। বগুড়ায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধ পুস্তিকা ও ইস্তাহার বিতরণ। পাইকপাড়ায় মহিলা গ্রেপ্তার। শ্রীহট্টে পেট্রোলের দোকানে পিকেট। দিনাজপুরে শোভাযাত্রা করিয়া জাতীয় পতাকা উত্তোলন। টাঙ্গাইলে বন্দুক ক্রোক। কাঁথীতে অনাদায়ী জরিমানায় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক। মালব্যজী স্যর স্যামুয়েল হোরের বক্তৃতার সমালোচনা করিয়া দীর্ঘ বিবৃতি অন্তে বলিয়াছেন, ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে বন্ধুত্ব-প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য্য বিষয় ভারতের স্বাধীনতালাভ। মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার জোর তদন্ত—এ পর্য্যন্ত ৩৫জন গ্রেপ্তার। নব-বিবাহিত পত্নীকে নৌকায় হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ নদীতে নিক্ষেপ করায় বরিশালের কোনও স্কুলের ছাত্র দায়রার বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত। পারস্যের শাহের সহিত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অনেকক্ষণ আলাপ। আইরীশ ফ্রিষ্টেট শপথ-বিলের শেষপর্ব্ব। স্বতন্ত্র দলের জনৈক সদস্যের সংশোধন। মিঃ ডি ভালেরা ও অন্যান্য মন্ত্রীর ১৯১১ সালের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত নেতাদের আত্মার শান্তিতে প্রার্থনা। অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ল্যাংয়ের কমনওয়েল্থের নিকট আত্মসমর্পণ। মাল্টায় নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন। চীন-জাপানের যুদ্ধবিরতির চুক্তিপত্র স্বাক্ষর-সংবাদ।

২২শে বৈশাখ—রাজসাহীর সুদর্শন চক্রবর্ত্তীর পরলোকগমন। হিজলী মহিলা জেলের দণ্ডিতার বহরমপুরে চালান—উক্ত জেলটিও মহিলা-বন্দিনী শিবিররূপে ব্যবহারের সংবাদ। ব্যারিষ্টার মিঃ আর, এস, পণ্ডিতের প্রতি কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড। পাটনায় ডাকবিভাগের ১৫ হাজার টাকা আত্মসাৎসম্পর্কে সাব-পোষ্টমাষ্টারের পত্র গ্রেপ্তার। কুমিল্লায় অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার। মুন্সীগঞ্জে বহু মহিলা গ্রেপ্তার। কাঁটালপুরে পতাকা উত্তোলন অপরাধে দশঘা বেত। কৃষ্ণনগরে রাজবন্দীর হার্ণিয়া রোগ। গাইবান্ধায় ভীষণ শিলাবৃষ্টি। জার্ম্মাণ পার্লামেণ্টে নাজি ও কমুনিষ্টদের মন্ত্রীসভার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব আনয়ন সংবাদ।

২৩-২৪শে বৈশাখ—মৈমনসিংহ জেলে রাজবন্দীর পক্ষাবধি অনশন। ফেডারেল ফাইন্যান্স কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ। বোম্বায়ে ৩০০০ কংগ্রেস বুলেটিন পুলিশের হাতে। ফরিদপুরে, খুলনায় কাল-বৈশাখী। বারাণসীতে বোমা-বিস্ফোরণ। কমন্স সভায় ইঙ্গ-আইরিশ সন্ধি নিয়া তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা। ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাসেক্সের বিরুদ্ধে উৎকর্ষতা প্রদর্শন সংবাদ। চীন-জাপান যুদ্ধ-বিরতির চুক্তিপত্র স্বাক্ষর। আইরিশ পার্লামেণ্টে শপথ-রহিত বিল গৃহীত। ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট মঁসিয়ে ডুমার জনৈক রুশ ডাক্তারের গুলীতে নিহত। সম্রাট বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সার ষ্টানলি জ্যাকসনকে জি, সি, এস, আই উপাধি প্রদান। অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রিসভার সদস্যগণের পদত্যাগ।

২৬-২৮শে বৈশাখ—নোয়াখালিতে অনাদায়ী জরিমানায় কুঁড়েঘর ক্রোক। কুমিল্লা জেল হইতে মহিলার মুক্তি। মেদিনীপুর হইতে একজনের মুক্তি। কিশোরগঞ্জ মহকুমায় নানাস্থানে খানাতল্লাসী। গান্ধীদিবস উপলক্ষে ৪০জন গ্রেপ্তার। নাগপুর অনুন্নতদের সভায় আসন নিয়া তুমুল হট্টগোলে পুলিশ। করাচীতে নিখিল ভারত হিন্দু-যুব-সম্মেলন সভাপতি ভাই পরমানন্দের বক্তৃতা। শ্রীহট্ট টাউন হলে জনৈক মুসলমানের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে এক চমৎকার বক্তৃতা। তমলুকে লবণ প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রায় ৪১ জন মহিলা গ্রেপ্তার। গুজরাট কমিটীর জমি বোম্বাই গবমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত। নাগপুরে এক উকীলের বাড়ীতে বোমা বিস্ফোরণের ফলে দশ মাসের শিশুর পা জখম। প্রচণ্ড ঝটিকায় মৈমনসিংহ জেলের প্রাচীর ও ছাদ ভূমিসাৎ, বহু কয়েদী ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রোথিত হইয়া নিহত।

২৯-৩১শে বৈশাখ—আমেদাবাদে বরসাদ তালুকে ১৫৮ জন জমীদারের উপর ট্যাক্স দিতে অসম্মত হওয়ায় তাহাদের জমি বাজেয়াপ্ত হইল বলিয়া নোটিশ জারি করা হইয়াছে। জারমান চান্সেলার সতর্ক করিতেছেন তাহারা নিরস্ত্রীকরণ পন্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ইউরোপ যুদ্ধের সরঞ্জাম পূর্ব্ব সময় অপেক্ষা বাড়াইয়াছে। ইহা কিছুতেই চলিতে পারে না। আকোলায় (মাদ্রাজ) ৪০টি বিদেশী বস্ত্রের দোকান বন্ধ, সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ—কলেজের ছাত্র সংখ্যা এ বৎসর ২০,৮৭১ হইতে ১৮,১৮৯এ হ্রাস পাইয়াছে।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd., 56, Dharamtala Street, Calcutta.

২৫শ বর্ষ   জ্যৈষ্ঠ   ১৩৩৯   ২য় সংখ্যা

বৃন্দা

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বৃন্দাবন-বনতলে বৃন্দা তুমি বসা'লে নগর—
প্রেমের অমরাবতী—কল্পনদী কালিন্দীর কোলে ;
বারোমাস মধুৎসব—আনন্দের অমৃত-নির্ঝর
নিত্য প্রবাহিত যেথা রসে রাসে ঝুলনে ও দোলে।

চিরসুন্দরের সাথে চিরসুন্দরীর সম্মিলনে
অগ্রদূতী নহ শুধু, তুমি তার চিরপুরোহিত ;
আজন্ম সাধনমন্ত্রে ভরিয়াছ ভাবের ভুবনে
রাধাশ্যাম-রসকথা— অপরূপ প্রেমের সঙ্গীত।

প্রাণ চাহে প্রতিপ্রাণ ; সন্দেহসঙ্কোচলজ্জাভয়ে
নানা পথে নানা মতে গহন যে মিলনমন্দির ;
ললিতা চম্পকলতা বিশাখারে শুধু সঙ্গী ল'য়ে
দুর্ল্লভ সে প্রাণতীর্থ খুঁজে' তুমি করিলে বাহির।

কোথা সেই বৃন্দাবন, কোথায় বা দুরন্ত মথুরা !
অনিন্দ্য যৌবনকান্তি, সঙ্গে নাহি রক্ষী পরিজন,
শুধু নেহারিয়া চক্ষে—কাঁদে রাধা বিরহবিধুরা—
অমনি চলিলে তুমি সর্ব্বশঙ্কা করি' বিসর্জ্জন !

আপনি চাহনি কিছু, পায়ে ধরে' কাটাইলে দিন,
মনে মন মিলাইতে অপমানে মাননাই বাধা ;
কলঙ্কে করনি ভয় শুধিবারে বেদনার ঋণ—
নহিলে কে তব কৃষ্ণ, কে বা সেই রাজকন্যা রাধা ?

রসের অমৃত উৎস চিত্ত হ'তে বহি' চিত্তলোকে
প্রীতির পীযূষকুণ্ডে সারা বিশ্বে করাইলে স্নান ;
কোথা জীব কোথা জড়—প্রাণের অঞ্জন পরি' চোখে
প্রেমের রঞ্জনালোকে হেরিয়াছ সবারে সমান !

কুঞ্জে গাহে শুকসারি, পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটিছে ভাণ্ডীর,
কদম্বকাননতলে কাঁদে বাঁশী নিশিদিনমান,
দোলে দোলা, চলে নৃত্য, বেজে উঠে মোহন মঞ্জীর,
যমুনার জলধারা কূলহারা যে প্রেমে উজান !

গাভীদল ফিরে গোষ্ঠে হাম্বারবে গাহিয়া হাম্বীর,
গুঞ্জরিছে অলিকুল, কোকিল সাধিছে সুধাস্বর,
নবনীমন্থনধ্বনি গৃহে গৃহে উঠিছে গম্ভীর,
রাধাকৃষ্ণ-জয়গাথা কণ্ঠে-কণ্ঠে ভরিছে অম্বর !

বৃন্দাবনে তুমি বৃন্দা রচিয়াছ এ আনন্দ-পুরী,
রসের বৈকুণ্ঠলোকে মিলায়েছ নর নারায়ণ ;
ভোগের মন্দিরপীঠে সেবি' নিত্য ত্যাগের মাধুরী
ব্রজে বিরচিলে স্বর্গ মুগ্ধ যাহে নিখিল ভুবন ।

নাট্যকলা ও রসসৃষ্টির গোড়ার কথা*

—বিপিনচন্দ্র পাল

পুরাতন ধর্ম্মনীতিবাদীরা খ্রীষ্টীয় বাইবেলের দশ-আজ্ঞার ফুটফিতা ফেলিয়া সচরাচর কাব্যরসের, নাট্যকলার এবং নাটকাভিনয়ের দোষগুণের কালি কষিয়া থাকেন। স্রষ্টার গুণাগুণ তাঁহার সৃষ্টি-কার্য্যের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইবে, তাঁহার সাধারণ আচার-আচরণের দ্বারা নহে। এই কথাটা রসতত্ত্বের আলোচনাতে একটা মূল কথা। সেক্সপীয়র চোর ছিলেন না সাধু ছিলেন, তাঁহার পারিবারিক জীবন সুশৃঙ্খল বা উচ্ছৃঙ্খল ছিল, এ সকলের দ্বারা তিনি যে অলোকসামান্য রসচিত্রসকল আঁকিয়া গিয়াছেন তাহার বিচার হইবে না। রসের তুলাদণ্ডেই তাঁহার রসসৃষ্টির ওজন করিতে হইবে। কবির কাব্যের বিচার দেউলের বা গীর্জ্জার বা মসজিদের শুচিতা বা অশুচিতার দ্বারা হইবে না। এই বাহিরের শুচিতা বা অশুচিতার কষ্টি-পাথরে নাট্যকলার বা নাটকাভিনয়ের গুণাগুণ কষা যায় না। যখনই যেখানে এই চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই মনগড়া ধর্ম্মনীতির পীড়নে রসের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং ক্রমে মানবপ্রকৃতি এই অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলিতে যাইয়া অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়ার প্রবল স্রোতে সকল নীতির বন্ধন কাটিয়া দিয়া জনসমাজকে যথেচ্ছাচারের পথে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। ইংরাজের ইতিহাসে দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে ইংরাজ সমাজ ইহার সাক্ষ্য দিয়াছে। আমাদের দেশেও বৌদ্ধযুগের অন্তিম কালে কঠোর ও নিষ্ঠুর বৈরাগ্য-সাধনের প্রতিক্রিয়াতে যে ফল ফলিয়াছিল, বাৎস্যায়নের কামসূত্রে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

ফলতঃ রসসৃষ্টিকে বা রসস্রষ্টাকে মামুলী পুঁথিগত ধর্ম্ম-নীতির বাঁধনে বাঁধা যায় না; কখন কোথাও ইহা হয় নাই। রসসৃষ্টির জন্য যে মুক্ত জীবন প্রয়োজন, তাহাকে প্রচলিত লৌকিক সদাচারের কঠোর বেষ্টনীর ভিতরে বাঁধিয়া রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমান অবস্থাধীনেও যে রসসৃষ্টির কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, এমনও বলা যায় না। বর্ত্তমানে প্রচলিত সমাজ-জীবনের সঙ্গে সত্য রসানুশীলনের যে বিরোধ দেখিতে পাই তাহা স্থায়ী নহে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের একটা সনাতন আদর্শ আছে। সেই আদর্শের ইঙ্গিতেই অনাদি কাল হইতে মানব-সমাজের বিকাশ হইয়া আসিয়াছে। ভগবদ্গীতা "উর্দ্ধমূলো অবাকশাখঃ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" বলিয়া সামাজিক অভিব্যক্তির বা social evolution এর এই নিত্যসিদ্ধ আদর্শেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এখনও সমাজ এই আদর্শ লাভ করে নাই। ক্রমে ক্রমে এই আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইতেছে মাত্র। মানব-সমাজ যেদিন সম্পূর্ণ রূপে এই আদর্শ আয়ত্ত করিবে, তখন সমাজ বন্ধনমুক্ত হইবে। এই বন্ধনমুক্ত সমাজে প্রেমের শাসন মাত্র থাকিবে, অন্য কোন শাসন থাকিবে না। এই আদর্শ সমাজে মধুরাদি রস সহজ প্রকৃতির প্রেরণায় আপনি ফুটিয়া উঠিবে। এই আদর্শ সমাজের নরনারীরা 'স্বধর্ম্মাচরণ' করিয়া মুক্ত ভাবে বিহার করিবে। আমাদের বৈষ্ণব সাধনাতে এই নিত্যসিদ্ধ আদর্শ সমাজকেই ব্রজধাম বা বৃন্দাবন রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মনুষ্যসমাজ মাত্রই অনাদি কাল হইতে এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই আদর্শ যখন আয়ত্ত হইবে তখন ধর্ম্ম-নীতির সঙ্গে রসসৃষ্টির এবং রসানুশীলনের মিলন ও সমন্বয় ঘটিবে। বর্ত্তমানে এ দু'য়ের মধ্যে অনেক সময় যে বিরোধ দৃষ্ট হয় তাহা আর থাকিবে না। কৃত্রিম এবং কল্পিত সদাচারের সঙ্গে সহজ রসসৃষ্টির এখনও সঙ্গতি হয় নাই। কিন্তু আধুনিক সভ্য সমাজ এই সমন্বয়ের দিকে চলিয়াছে। যে পরিমাণে মানবসমাজ মধ্যযুগের শাস্ত্র-পুরোহিত-শাসিত মনগড়া ধর্ম্মনীতির বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মানবের প্রকৃতি-নিহিত যে ধর্ম্ম তাহাকেই জীবনের ধ্রুবতারা বলিয়া বরণ করিয়া লইবে, সেই পরিমাণে রসানুশীলনের এবং রসসৃষ্টির সঙ্গে ধর্ম্মনীতির এবং সমাজনীতির প্রাচীন ও বর্ত্তমান বিরোধ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া রসানুশীলন এবং ধর্ম্মাচরণকে একটা উচ্চতর ভূমিতে তুলিয়া লইবে। ইহার ফলে নাট্যকলা এবং রঙ্গমঞ্চ ক্রমে সকল ভদ্রসমাজে আপনার প্রাপ্য সম্মান পাইবে।

* স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের ইহাই সর্ব্বশেষ রচনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাবাহিক বক্তৃতার ইহাই উপক্রমণিকা।—উঃ সঃ

তবে এই বিরোধ সত্ত্বেও রসের রাজ্যেও তাহার নিজের একটা ধর্ম্ম বা নীতি আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক সাধনার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে মানবজীবনের বিভিন্ন বিভাগের স্বারাজ্য স্বীকার করিয়াছে। রাষ্ট্রনীতির নিয়ম ধর্ম্মনীতিতে চলে না। সাম, দান, ভেদাদির দ্বারা ধর্ম্মজীবন গড়িতে যাওয়া ধর্ম্ম নষ্ট করা মাত্র। আবার যে ঐকান্তিক অকপটতা ধর্ম্মনীতির প্রাণ তাহাকে রাষ্ট্রনীতিতে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তাই বলিয়া রাষ্ট্রনীতি যে ছল-চাতুরীর পথ ধরিয়াই চলিবে এমনও নহে; ছলচাতুরীর প্রয়োজন মন্ত্রগুপ্তি। শুদ্ধ বুদ্ধির কৌশলে এই মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করা অসাধ্য বা অসম্ভব নহে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রের এক নীতি। সেখানে সেনাপতিকে আপনার চাল লুকাইয়া রাখিতেই হয়, ইহা দূষণীয় নহে। যুদ্ধ-বিগ্রহের লক্ষ্য যখন পরপীড়ন বা পররাষ্ট্রাপহরণ হয়, তখনই তাহার দ্বারা ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে, মন্ত্রগুপ্তির দ্বারা হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে অহিংসানীতির ঐকান্তিক অনুসরণ সম্ভব নহে। যুদ্ধক্ষেত্রে এই ঐকান্তিক অহিংসা ধর্ম্মের অনুশীলন আত্মঘাতী বলিয়া ধর্ম্ম নহে, অধর্ম্ম। তবে ধর্ম্মযুদ্ধে হিংসারও একটা নিয়ম আছে। পতিত, আহত কিম্বা অস্ত্র ত্যাগ করিয়া যে অরাতি সংগ্রাম হইতে বিরত হয়, কিম্বা যাহারা অস্ত্রধারী যোদ্ধা নয়, তাহাদিগের বিনাশসাধনে উদ্যত হওয়া নিতান্তই অধর্ম্ম। আমাদিগের সাধনার পুরাতন ক্ষাত্র ধর্ম্মে একদিন এ সকল নীতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং ইহারই দ্বারা হিংসা ও অহিংসার আপাতঃ বিরোধ নষ্ট হইয়াছিল।

ফলতঃ বহুমুখ, বহুকর্ম্মশীল, বহুধর্ম্মপরায়ণ জটীল মানব-জীবনের ভালমন্দ বিচার কোন একটা বিশিষ্ট বিধানের দ্বারা হয় না, হইতে পারে না। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন প্রকৃতির এবং লক্ষ্যের দ্বারাই সেই সেই বিভাগের ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, খামখেয়ালের উপরে কোন বিধিনিষেধ গড়ে না। সকল কর্ম্মেরই একটা লক্ষ্য আছে। যাহাতে সেই লক্ষ্য লাভ হয়, সেই কর্ম্মে তাহাই বিধেয়, যাহাতে সেই কর্ম্মে ব্যাঘাত জন্মে তাহাই নিষিদ্ধ। ইহাই সার্ব্বজনীন নীতিসূত্র। ধর্ম্মসাধনের লক্ষ্য মোক্ষলাভ। এই লক্ষ্য দ্বারাই ধর্ম্মনীতির প্রতিষ্ঠা

সমাজ-জীবনেরও একটা লক্ষ্য আছে। মানুষে মানুষে সমাজের মধ্যে যে-সকল সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে, সেই সকল সম্বন্ধের অনুশীলনের দ্বারা সমাজের লোকের শ্রেষ্ঠতম মনুষ্যত্ব বিকাশ, ইহাই সমাজজীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যলাভের জন্যই গার্হস্থ্যনীতি ও সমাজধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। সমাজ বহু ব্যক্তির সমষ্টি। এই সকল ব্যক্তিকে নিজ নিজ স্বত্ব-স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সমাজের সমষ্টিগত জীবনকে রক্ষা করিতে হয়। এই ক্ষেত্রে সন্ন্যাসধর্ম্মবিহিত একান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া সমাজধর্ম্মবিগর্হিত। এই জন্য আমাদিগের প্রাচীন সমাজনীতির পরিভাষায় গার্হস্থ্যাশ্রমে সন্ন্যাসের নিয়ম চলে না। সন্ন্যাস আশ্রমেও গার্হস্থ্যধর্ম্ম খাটে না। মানব-জীবনের বিভিন্ন বিভাগের এক একটা বিশিষ্ট লক্ষ্য আছে। এই সত্যটা প্রত্যক্ষ করিয়াই আমাদিগের প্রাচীন আশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। জীবনের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য মানবের সার্ব্বজনীন লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জীবনের বিভিন্ন বিভাগের এই সকল লক্ষ্যের দ্বারাই সেই সেই বিভাগের ধর্ম্ম বা নীতির প্রতিষ্ঠা হইবে, মানবজীবনের সার্ব্বজনীন লক্ষ্যের দ্বারা নহে। জীবনের বিভিন্ন বিভাগের বিশিষ্ট লক্ষ্য লাভের সাহায্য যাহাতে হয় তাহাই সেই বিভাগে বিধেয়। সেই লক্ষ্য-লাভে ব্যাঘাত যাহাতে জন্মে তাহাই নিষিদ্ধ। ইহাই সার্ব্বজনীন নীতি বা ethics। আধুনিক নীতিশাস্ত্রে বা ethicsএ এই সাধারণ লক্ষ্যের নাম self realisation বা আত্মোপলব্ধি। আমাদের প্রাচীন সাধনায় ইহারই নাম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং প্রতিষ্ঠা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের নিজ নিজ প্রকৃতির উপরে। ইহাকেই গীতা "স্বধর্ম্ম" কহিয়াছিলেন। এই প্রকৃতিগত ধর্ম্ম ছাড়িয়া বাহির হইতে ধার করা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার অনুসারে জীবন-পরিচালনের চেষ্টাই পরধর্ম্ম। গীতা এই ভয়াবহ পরধর্ম্মকে বর্জ্জন করিয়া চলিতে উপদেশ দিয়া আধুনিক ethics বা নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে আপনার প্রতিষ্ঠিত স্বধর্ম্মাচরণের সমন্বয় করিয়াছেন। নাট্যকলার লক্ষ্য রসের রূপকে ফুটাইয়া তোলা। নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্যও ইহাই। এই লক্ষ্যের দ্বারাই নাট্যকলার এবং রঙ্গমঞ্চের ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় হইবে। এই লক্ষ্যলাভে যাহা সহায়, এক্ষেত্রে তাহাই ধর্ম্ম বা নীতি, যাহা অন্তরায়, তাহাই অধর্ম্ম বা দুর্নীতি। এই মূল সত্যের উপরেই নাট্যকলা বা রঙ্গমঞ্চের স্বারাজ্যের প্রতিষ্ঠা। এখানে মনুর বা পরাশরের, ত্রিপিটকের কিম্বা বাইবেলের নিয়ম খাটাইলে চলিবে না।

নিতান্ত নীতিবদ্ধ লোকেও সরাসরিভাবে ইহাকে উড়াইয়া দিতে পারেন না। অন্যদিকে বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের নটনটীরা নিজেদের আত্মমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা এবং চরিত্ররক্ষার একটা পথের ইঙ্গিত এখানে পাইবেন। নিতান্ত নীতিবদ্ধ যাঁহারা তাঁহারাও যদি কথাটা তলাইয়া দেখেন, তবে তাঁহাদের নিজেদের ধর্ম্মাধর্ম্মের সঙ্গেও রসসৃষ্টির একটা সমন্বয়ের পথ দেখিতে পাইবেন

কারণ, সংযম যেমন ধর্ম্মসাধনে সেইরূপ নাট্যকলা এবং রঙ্গমঞ্চেরও একটা অনুলঙ্ঘনীয় বিধান। রস-বস্তুর প্রকৃতি যাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই এই কথাটা মানিয়া লইতে হইবে। রস এবং ইন্দ্রিয়ভোগ এক নহে। ইন্দ্রিয়ভোগ মাত্রেই রসের পর্য্যায়ে উঠে না। আপনার বিশেষ বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ইন্দ্রিয়ের যে চরিতার্থতা লাভ হয়, এবং এই চরিতার্থলাভে মানুষের চিত্তে যে আনন্দের আস্বাদ হয়, তাহাই রস নহে। অথচ এই ইন্দ্রিয়সাক্ষাৎকার এবং আনন্দানুভূতি ব্যতীতও রস জন্মে না। কিন্তু রসবস্তু ইন্দ্রিয়সাক্ষাৎকারে জন্মিলেও প্রকৃতপক্ষে অতীন্দ্রিয়। যতক্ষণ ইন্দ্রিয়সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সীমাকে অতিক্রম করিয়া না যায় ততক্ষণ রসের জন্ম হয় না। রসের ভূমিকে ইংরাজীতে romantic plane কহে। রসের রাজ্য আধ্যাত্মিক বা spiritual। এ রাজ্যে ইন্দ্রিয়বিকারের প্রবেশাধিকার নাই। এইজন্য অসংযমে রসের অনুভূতি হয় না। আমাদের বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীতে এই সত্যটাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া কহিয়াছেন—

> সখি কি পুছসি অনুভব মোয়
> সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
> তিলে তিলে নূতন হোয়।
> জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারিনু
> নয়ন না তিরপিত ভেল।
> সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
> শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
> কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াযিনু
> না বুঝিনু কৈসন কেল
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
> তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

ইহাই ইন্দ্রিয়ভোগের সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতাকে লক্ষ্য করিয়াই আমাদের প্রাচীনেরা কহিয়াছেন যে ভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের লালসা নিবৃত্তি হয় না—হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়েরাভিবর্দ্ধতে। ঘৃতাহুতিতে আগুন যেমন আরও জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ বিষয়ভোগে ইন্দ্রিয়লালসা আরও বলবতী হয়। ভোগে যেখানে লালসা বাড়ে না, অন্যদিকে অবসাদও আসে না, সেইখানেই রসের সূচনা হয়। এই সত্যটার ইঙ্গিত পাইয়াই জর্জ্জ ইলিয়ট কহিয়াছেন:—"Our love at its highest flood goes beyond its object and loses itself in the Infinite."

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-লালসা যতক্ষণ না নিবৃত্ত হইয়াছে ততক্ষণ রসবস্তুর সাক্ষাৎকার হয় না। আমাদিগের বৈষ্ণব সাধনার রসতত্ত্বে ইহাই প্রথম কথা। "উজ্জ্বল নীলমণির" প্রথম সূত্র—

"নির্ব্বিকারাত্মক চিত্তে ভাব প্রথম প্রকাশ"

ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে ইন্দ্রিয়ের বিষয় উপস্থিত হইলেও যে চিত্ত সেই বিষয়ভোগের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইয়া উঠে না, তাহাকেই নির্ব্বিকারচিত্ত কহে। ইন্দ্রিয় জয় না হইলে অথবা যাহার সংযম অভ্যাস হয় নাই, সে কখনও এই নির্ব্বিকার অবস্থা লাভ করে না। এই নির্ব্বিকার অবস্থা যার লাভ না হইয়াছে সে কখনই সত্য রসের আস্বাদন করিতে পারে না। তাহার অন্তরে রসের অনুভূতি জন্মে না। যাহার অন্তরে রসের অনুভূতি হয় না, সে কখনই রসের ছবি আঁকিতে বা ফুটাইতেও পারে না। অসংযত ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় তাহার সতত চঞ্চল চিত্তে রসের রূপ কখনও বসিতে পায় না। নিয়ত কম্পিত দর্পণে যেমন কোন কিছুর রূপ ধরা যায় না, সেই প্রকার ইন্দ্রিয়লালসাবিক্ষিপ্ত চিত্তদর্পণে কোন রসের মূর্ত্তি প্রকাশিত হয় না। যে রসের রূপের সৃষ্টি করে বা করিতে পারে সে সেই সৃষ্টিকালে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-রাজ্যের বাহিরে অতীন্দ্রিয় জগতে যাইয়া উপস্থিত হয়। ইহাই রস-সৃষ্টির সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতা। ইহাই যোগসিদ্ধিরও অভিজ্ঞতা। যোগযুক্ত না হইলে রসস্রষ্টা হওয়া যায় না। যতক্ষণ কবি রসের সৃষ্টি করেন, ততক্ষণ তিনি যোগযুক্ত হইয়াই থাকেন। এই যোগ ভাঙ্গিয়া গেলে তাঁহার যে অবস্থা হউক না কেন, সে অবস্থার দ্বারা তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাঘাত হয় না, বিচারও হইতে পারে না। নটনটীও যোগযুক্ত না হইয়া রঙ্গমঞ্চে কোন রসের সত্যরূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন না

যে নট বা নটী রসের ভূমিতে যাইয়া উঠিতে পারেন, তাঁহাদিগকে রসসৃষ্টিকালে সেই সৃষ্টি কার্য্যের লাভে সংযম সাধন করিতেই হয়। যাঁহারা ইহা করেন না বা করিতে পারেন না, তাঁহাদের নাট্যকলা ফুটিয়া উঠে না, ফুটিয়া উঠিবার অবসরই পায় না। তাঁহাদের কৃতিত্ব নাট্যরসের বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। দেহের ললিত লাবণ্য, প্রসাধন পরিচ্ছদের পটুতা, কিম্বা রিরংসার হাবভাবের দ্বারা দর্শকবৃন্দের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহারা একটা সাময়িক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেও পারেন, কিন্তু সত্যস্রষ্টার পূত আসনে তাঁহাদের স্থান হয় না।

বাগ্মী, মনস্বী, রাষ্ট্রনেতা, সুসাহিত্যিক **স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পালের**
অপ্রকাশিত রচনা

১। বৈষ্ণব কবিতার রস-গ্রহণ
২। নির্গুণ-বাদ
৩। দেব-তত্ত্ব

ক্রমশঃ 'উপাসনা'য় প্রকাশিত হইবে। বিপিনচন্দ্রের চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতার অভিনবত্ব এই লেখা কয়টিতে পরিস্ফুট হইয়াছে।

গান

আমার মন জানে না মনের কথা
কারে শুধাই, শুধাই কা'রে!
অবহেলায় তা'রেই ফিরাই
জনম ভরে' চাইনু যা'রে।

পূজারতির প্রদীপ জ্বালি,
বাড়াই শুধু মনের কালী,
দীর্ঘশ্বাসে নিবিয়ে আলো
কেঁদে লুটাই অন্ধকারে।

মনের মাঝে যা'র মালিকা
জ্বালায় বিষের বহ্নি-শিখা,
সমাদরে সেই মালাটি
কণ্ঠে দুলাই বারে বারে।

যা'রে হৃদয় দিইনি কভু
তারেই করি প্রেমের প্রভু,
অন্তরে যার আসন পাতা
নয়নজলে ফিরাই তারে।

স্বল্পভাষী কাব্য

—শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

(জাপানী কবিতা)

ষোড়শ শতাব্দীর কথা। জাপানে তখন চায়ের আসরই কবিসম্মিলন ও কাব্যালোচনার ক্ষেত্র ছিল। সেদিন অতি-প্রত্যুষে রিকিউ-প্রমুখ জাপানের চারজন শ্রেষ্ঠ রসবিদ্ হিদেৎসুগু নামে এক কাব্য-রসিকের বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণে এসেছেন। তখন সবে নবাগত বসন্তঋতু তার হরিদ্রাভ দেহাবরণের উপর থেকে শীতের শুভ্র তুষারকণা ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে। অতি-প্রত্যূষের সেই স্বচ্ছ-তিমিরে তখন ছায়াশীতল বাতাস আলোকভীরু পরীর মত হিদেৎসুগুর অন্ধকার লতা-বিতানে থরথর করে' কাঁপছে। ঘরে আলো নেই; ঘরের এক কোণে চায়ের কেৎলীতে জল ফুটছে, সেই শব্দ ঘরের সুগভীর স্তব্ধতাকে আরো স্পষ্ট, আরো গম্ভীর করে' তুলেছে। অতিথিরা কেউ কথা বলছেন না, কারণ, মানুষের কথা সেখানে খাপ্ খায় না।

অকস্মাৎ সেই স্বপ্নলোকের মোহময় নিস্তব্ধতার মধ্যে পশ্চিমের জানলা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো অস্তগামী পূর্ণ চাঁদের পাণ্ডুর আলোর একটি টুক্‌রো; অতিথিরা মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে দেখলেন, সে-আলোয় জানলার পাশে টাঙানো এক টুক্‌রো 'শিকিশি' কাগজে লেখা একটি কবিতা পড়া যাচ্ছে:—

> কোকিল যেখানে তা'র সঙ্গীতের মোহে কাঁপ্‌ছিলো
> মুখ তুলে' আমি সেই দিকে তাকালুম, হায়!
> সেখানে কেবল অস্তগামী চাঁদের এক ফালি আলো পড়ে আছে॥

বলা বাহুল্য এই কবিতাটিকে রসবিদ্ পাঠকদের সামনে উপযুক্ত মুহূর্ত্তে উপস্থিত করবার জন্যই জাপানী রসিক এই নিমন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করে' রেখেছিলেন; এবং এ অভিনব উপায় অবলম্বন করে' তিনি যে তাঁর অতিথিদের মনে সবচেয়ে বেশী রসানুভূতি জাগ্রত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এ-আখ্যানে রসপিপাসু জাপানী মনের অনেকটা পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কল্পনাপ্রবণ, কল্পনাবিলাসী জাপানী বেশী কথা বলে না, বেশী কথা ভালোবাসে না, কারণ, ভাষা তাদের মনের আবেশকে আহত করে। কাব্য তা'রা ভালো-বাসে, তা' দ্বারা তাদের কল্পনা উদ্বুদ্ধ হয় বলে'। জীবনকে, প্রকৃতিকেই তারা উপভোগ করতে চায়, কবিতা তাদের সেই উপভোগের সহায় মাত্র। জাপানীরা কবিতা রচনা করার চাইতে কাব্যময় জীবন যাপনকে মহত্তর বলে' মনে করে। জাপানীদের মতে 'The real test for poets is how far they resist their impulse to utterance.' এবং যে-কবি কিছুই না বলে' একেবারে নীরব থাকতে পারে, জাপানীরা তাকেই বলবে বড় কবি, কেননা, এই অপ্রকাশের দ্বারা সে তা'র কল্পনাকে মনে মনে আরো ঘনীভূত করতে সমর্থ হয়েছে। একটি কল্পনা বা moodকে উদ্বুদ্ধ করা ভিন্ন কাব্যের আর কোনো সার্থকতা জাপানীরা স্বীকার করে না, অতএব তা'রা যখন কাব্য রচনা করে তখন তা' হয় দু'একটি রেখার সমন্বয়, রসবিদ্ পাঠকের কল্পনার মূলে আঘাত করে' তা'কে ঈষৎ জাগ্রত করে' দেওয়াই যা'র একমাত্র উদ্দেশ্য।

—২—

উদ্ধৃত আখ্যানে জাপানীরা যে-কথা বলতে চেয়েছে তা' হচ্ছে এই যে, যে-মুহূর্ত্তের আবেগ বা কল্পনা একটি কবিতায় রূপ পরিগ্রহ করে, মন যখন ঠিক তেমনি এক মুহূর্ত্তের atmosphereএ এসে' পৌছয়, তখনি সে কাব্য সবচেয়ে বেশী উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এই কথাকেই আরো ব্যাপক ভাবে বলেছেন, যে কাব্যের যা' রস তা' হচ্ছে "সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী", অর্থাৎ 'কাব্যরসাস্বাদী সহৃদয় লোকের মনের বাইরে 'রস'-এর আর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।' এমন কি অজ্ঞাতনামা ধ্বনিকার কাব্য-পাঠকের সহৃদয়ত্বের উপর এতই বেশী জোর দিয়েছিলেন যে তাই থেকে তাঁর নামই 'সহৃদয়' হয়ে গিয়েছিলো বলে' কোনো কোনো পণ্ডিত অনুমান করেছেন। যদিও অনুবোদ্ধার এই সহৃদয়ত্ব রসোপলব্ধি মাত্রেই প্রয়োজন হয়,

তবু, Lyric বা গীতি-কবিতায় সেটা যত স্পষ্ট অনুভূত হয়, এমন আর কোথাও নয়। কেননা Lyric কবিতা একটিমাত্র মুহূর্ত্তের আবেগকে রসে পরিণত করে, যে-মন সেই মুহূর্ত্তকে যত বেশী আপনার করে' নিতে পারে, সেই মন তত বেশী রসের আস্বাদন লাভ করে' ধন্য হয়। অপর পক্ষে সহৃদয়-হৃদয় কেবল তাকেই গ্রহণ করে যা' কবির অপূর্ব্ব যাদুকৌশলে প্রকৃত কাব্যরূপ লাভ করতে সমর্থ হয়েছে অর্থাৎ যে-কাব্য প্রাণহীন নয়।

আমাদের দেশের আলঙ্কারিকগণ কাব্যের সেই প্রাণ বা 'আত্মা'কে নানা ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। এ দেশের যারা প্রাচীনতম আলঙ্কারিক এবং কাব্যে মুখ্যতঃ যারা দেহতত্ত্ববাদী, সেই ভামহপ্রমুখ প্রাচীন মনীষীরাও কাব্যের সেই বিশিষ্ট অপূর্ব্ব গুণ লক্ষ্য করেছিলেন, যা'র বলে অতি সাধারণ কথাও যেন যাদুমন্ত্রে কাব্যরূপ পরিগ্রহ করে', পাঠকের মনে গাঢ় আবেগ সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়। ভামহ বলেছেন কবিদের এই কৌশল হচ্ছে 'বক্রোক্তি', অর্থাৎ শুধু ভাষাপ্রয়োগের কায়দাতেই অতি সাধারণ বস্তুও কবিদের হাতে অসাধারণ হয়ে ওঠে! ভামহ এই 'বক্রোক্তি' দ্বারা যে জিনিষের আভাস মাত্র ব্যক্ত করেছিলেন, পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ—ধ্বনিকার ও আনন্দবর্দ্ধন তাকেই পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, যে কাব্যের সেই গোপন যাদুমন্ত্র হচ্ছে 'ব্যঙ্গ্য' বা 'ধ্বনি' অর্থাৎ suggestion। এই 'ধ্বনি'-র অভাব ও অস্তিত্বে একই বস্তু যে অকাব্য ও কাব্য এই দুই বিপরীত রূপ লাভ করে এর প্রমাণস্বরূপ ধ্বনিবাদিগণ একই বিষয় নিয়ে রচিত দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন :-

> কৃতে বরকথালাপে কুমার্য্যঃ পুলকোদ্গমৈঃ।
> সূচয়ন্তি স্পৃহামন্তর্লজ্জয়াবনতাননাঃ॥

বরের কথায় কুমারীদের পুলকোদ্গম হয়েছে; তা' দ্বারা লজ্জাবনতমুখী কুমারীদের অন্তরের স্পৃহা সূচিত হচ্ছে,—এই হচ্ছে এ-কাব্যের বিষয়। ঠিক এই জিনিষই কালিদাসের হাতে কি অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করেছে দেখুন :—

> এবং বাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
> লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী॥

দেবর্ষি একথা বল্লে পিতার পাশে দাঁড়িয়ে অধোমুখী পার্ব্বতী লীলাকমলের পাতাগুলি গণনা করতে লাগলেন। এ-কাব্যের যা প্রকৃত অর্থ—পার্ব্বতীর অনুরাগমিশ্রিত লজ্জা—তা' এ কবিতার শব্দার্থের ভিতর দিয়ে শব্দার্থকে অতিক্রম করে' প্রকাশ পেয়েছে বলে'ই এ-কাব্য প্রকৃত কাব্য হ'য়ে উঠেছে। কবির হাতে সেই অপূর্ব্ব সোণার কাঠিটি আছে, যা'র দ্বারা তিনি তা'র প্রকৃত বক্তব্যের আভাষমাত্র ব্যক্ত করেও তা'কে আরো সম্পূর্ণতর ও তীক্ষ্ণতর রূপে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করতে পারেন। অবশ্য এ আভাষ বা suggestion-এর অর্থ এ নয় যে কবিতা সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে বা স্বল্প কথার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। এর অর্থ এই যে কবিতা দীর্ঘ হলেও কবি তাঁর মূল বক্তব্যটিকে এমন ভাবে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন যে আমাদের কল্পনার মধ্য দিয়ে তা' আরো তীব্র ভাবে ফুটবার অবকাশ পায়।

— ৩ —

কাব্যের মূলকথা যে এই স্বল্পের মধ্য দিয়ে বৃহতের প্রকাশ, আভাষের মধ্য দিয়ে বাক্যাতীত অনুভূতিকে মানব মনে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা, জাপানীরা অস্পষ্ট ভাবে এ-সত্য উপলব্ধি করেছিলো। এর ফলে জাপানীদের কাব্যে আভাষ ভিন্ন আর কিছুই স্থান পায় নি। কাব্য-অর্থ তাদের কাছে তাদের কল্পনার উদ্বোধক, তা'র বেশী কিছু নয়। জাপানী কবি নোগুচি বলেন, "Japanese poetry is different from Western poetry in the same way as silence is different from voice, night from day." এবং পাশ্চাত্য কাব্যের বিরুদ্ধে তাঁ'র অভিযোগ এই যে পাশ্চাত্য কাব্য কেবল কথা আর কথা আর কথায় ভর্ত্তি। নোগুচি এই উভয় দেশীয় কাব্যের মধ্যে যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করেছেন, তা' একটি জাপানী 'হক্কু' কবিতার সঙ্গে যে-কোন বিখ্যাত ইংরেজী কবিতার তুলনা করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। নীচের কবিতাটি বিখ্যাত জাপানী কবি ৎসুরায়ুকির লেখা :—

> I passed a vernal night
> Amidst the mountain height,
> And there a dream had I—
> Blossoms did fade and die.

এর বাংলা অনুবাদ করলে অনেকটা এই রকম দাঁড়ায়—

বসন্তের পুষ্পিত শর্ব্বরী
যাপি' এক পর্ব্বত চূড়ায়,
স্বপ্নে হেরিলাম—ঝরি' পড়ি'
মঞ্জরীর সৌন্দর্য্য ফুরায় !

এই কবিতাটির সঙ্গে Keatsএর *La Belle Dame Sans Merci* নামক কবিতাটির মূল ভাবের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু Keatsএর কবিতা যেখানে কল্পনার মধ্য দিয়ে এসে একটি অপরূপ মোহময় পূর্ণত্ব লাভ করেছে, জাপানী হক্কুটি সেখানে কল্পনার সীমারেখায় এসে ঘা দিচ্ছে মাত্র। কেউ যেন মনে না করেন যে আমি উপরের দু'টি কবিতাকে কাব্য হিসাবে সমশ্রেণীভুক্ত করে' Keatsএর কবিতার অমর্য্যাদা কর্‌ছি।

জাপানীরা এত বেশী কল্পনাপ্রিয় ও কল্পনাপ্রবণ যে, কাব্যে তাদের সেই কল্পনা সামান্য মাত্র উদ্বুদ্ধ হলেই তা'রা সন্তুষ্ট হয়। কবি তাঁর নিজের কল্পনা দ্বারা একটা সম্পূর্ণ রূপ সৃষ্টি করে' তাদের সাম্‌নে এনে' ধরুক, এ তা'রা চায় না। **"As the Japanese poetry is never explanatory, one has every thing before him on which to let his imagination freely play ; as a result he will come to have an almost personal attachment to it as much as the poet himself"**— এটা জাপানের নিজের মুখের কথা। জাপানের এই কল্পনাপ্রিয়তার আরো পরিচয় আমরা পাই, তাদের নাটকে। জাপানী নাটকে কোনো সিনের প্রয়োজন হয় না, সেখানে ষ্টেজের উপর একজন অভিনেতা চা খেতে পারেন, নিজের সাজসজ্জা করে' নিতে পারেন, সেটা জাপানীদের রসানুভূতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। জাপানীরা আশ্চর্য্য রকম সৌন্দর্য্য প্রিয় এবং তা'রা তাদের মানসলোকে সৌন্দর্য্যের কল্পনা-বিলাস কর্‌তেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে। কাব্য তাদের সেই মায়ালোকের সোপান পর্য্যন্ত পৌঁছে দিলেই তা'রা সন্তুষ্ট হয় ; এবং সেই জন্যই জাপানী কবিতার রস পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ কর্‌তে আমাদের একটু অসুবিধা হয়। একটি জাপানী কবিতা আছে, তা'র আক্ষরিক ইংরেজী অনুবাদ কর্‌লে দাঁড়ায় :

The well-bucket taken away
By the morning-glory ;
Alas ! water to beg.

কিন্তু এর প্রথম দু'লাইন যতক্ষণ না অনূদিত হয়

All around the rope a morning-glory clings,
How can I break its beauty's dainty spell ?

ততক্ষণ এ কবিতার রস আমরা পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ কর্‌তে পারি না।

অতএব জাপানী কবিতা পড়্‌তে হ'লে এবং পড়ে' তা'কে উপভোগ কর্‌তে হ'লে নিজের কল্পনাকে জাগ্রত রাখ্‌তে হ'বে। জাপানী কবিতা বেশী কথা বলে না, বস্তুতঃ জাপানী কাব্য-সাহিত্যে বড় কবিতা নেই বল্লেই চলে এবং যা' আছে তা' ভালো নয়। জাপানী কবিতায় যাঁরা একটি পরিপূর্ণ আবেগ খুঁজবেন তাঁরা হতাশ হবেন, কেননা জাপানী কবিতা নব-বধূর মত একটি স্বল্প উক্তি করে' প্রত্যাশা করে রসিক পাঠক বাকীটা বুঝে নেবে। এই স্বল্পভাষিতার দরুণ জাপানী কবিতা স্ফটিকরূপ প্রাপ্ত সেই অশ্রুবিন্দুর রূপ লাভ করেছে, যার' মধ্যে

'—যত প্রতিবিম্ব যেন দর্পণের তলে
পড়েছে আসিয়া।'

যে তা'কে ক্ষুদ্র বলে' তুচ্ছ কর্‌বে সে তা'র ভিতরকার সেই সৌন্দর্য্য-লোকের উপভোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

—৪—

জাপানী কবিতার শৈশব কেটেছে সম্রাটের সভায়। শিক্ষা ও প্রতিভা তখন জাপানে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এই জন্য সমগ্র প্রাচীন জাপানী কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে এমন একটি ভাব পাওয়া যাবে না, যা সুরুচি-সঙ্গত নয়, একটি শব্দ পাওয়া যাবে না, যা অশ্লীল। জাপানী কাব্যের এই আভিজাত্যের ফলে সে দেশে কবি এবং কাব্য চিরকাল রাজ-দরবারে সম্মানিত হয়ে এসেছে।

বর্ত্তমানে আমরা প্রাচীন জাপানী কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হ'তে পেরেছি, প্রধানতঃ দু'খানি কাব্য-সংগ্রহের মধ্য দিয়ে। এ দু'খানির নাম 'মন্-যোশু' বা 'মন্যো-শু' (সহস্র-পত্র-সংগ্রহ) ও 'কোকিন্‌শু' (প্রাচীন ও আধুনিক কাব্য-সংগ্রহ)।

জাপানী কাব্য সম্পর্কে তান্‌কা ও হক্কু এই দু'টি কথার সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠক বিশেষ ভাবে পরিচিত। তান্‌কা অর্থ ছোট কবিতা, এর বিপরীত হচ্ছে নাগা-উটা অর্থাৎ বড় কবিতা, তান্‌কা কবিতায় সাধারণতঃ পাঁচ লাইন থাক্‌বার নিয়ম, অক্ষরসংখ্যা যথাক্রমে পাঁচ, সাত, পাঁচ সাত ও সাত। বহুকাল পর্য্যন্ত জাপানে কাব্যরচনার এই রূপটাই বিশেষ

প্রচলিত ছিল। এই ক্ষুদ্রত্বের বন্ধনে বহু কাল আবদ্ধ থাকার পর জাপানীরা এই বন্ধন মোচন করার পরিবর্ত্তে এই বন্ধন আরো দৃঢ় করে' তুল্‌লো। ফলে জাপানে জন্মলাভ করলো তিন লাইনের 'হক্কু' কবিতা, এবং তাই তাদের প্রধান কাব্য-রূপ হয়ে দাঁড়ালো। বর্ত্তমান কালে এই হক্কু কবিতাই জাপানীদের সব চেয়ে গৌরবময় সাহিত্য।

পূর্ব্বেই বলেছি, ক্ষুদ্রত্বের মধ্য দিয়ে একটি কল্পনাকে জাগ্রত করাতেই জাপানী কাব্যের মূল্য। এজন্য ঠিক উপযুক্ত মুহূর্ত্ত ভিন্ন জাপানী কবিতা উপভোগ করা কঠিন। একজন ইংরেজ সমালোচক 'হক্কু' কবিতা সম্বন্ধে বলেছেন:—'**That is valueable as a talisman rather than as a picture. It is a pearl to be dissolved in the wine of a mood. Pearls are not wine, nor in themselves to be thought of as a drink, but there is a kind of magic in the wine in which they are dissolved.**' এই যে **Pearls are not wine, nor in themselves to be thought of as a drink** এই কথা জাপানী কাব্য সম্বন্ধে অতি বড় সত্য।

> Shall we make love
> Indoors
> On this night when the moon has begun to shine
> Over the rushes
> Of *Inami* moor?

উপযুক্ত মুহূর্ত্তে পড়্‌লে এ কবিতা যে মুক্তো সে-কথা কেউ অস্বীকার করবে না।

—৫—

স্বল্পভাষী জাপানী কবিতা যে শুধু আভাষ মাত্রের মধ্য দিয়ে আপনাকে ব্যক্ত করতে চায় এবং এই স্বল্পভাষিতার ফলে যে আমাদের মনে এক অদ্ভুত ও অভূতপূর্ব্ব ভাব জাগ্রত করতে সমর্থ হয়, তা'র প্রমাণ স্বরূপ একটী হক্কু কবিতা উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

> The hunter of Dragon-flies,
> To-day, how far away
> May he have gone!

পৃথিবীতে ছন্দোবন্ধে এর চেয়ে ছোট **elegy** কমই লেখা হ'য়েছে, এমন কি ল্যাণ্ডরের *Rose Aylmer* ও এর চেয়ে বহু গুণে বড়। অথচ এই সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে এমন কিছু আছে যা পাঠকের কল্পনাকে জাগ্রত ক'রে সেই 'hunter of **the Dragon-flies**'এর সন্ধানে নিয়ে যেতে পারে।

জাপানী কবি তা'র দুঃখের কথা বলে নি, হাহাকারের কথা বলে নি, শুধু প্রশ্ন করেছে—"সে না জানি এখন কতদূর গেছে!" শুধু অতি ক্ষীণ ইঙ্গিত মাত্র, কিন্তু কল্পনাপ্রবণ পাঠক এই প্রশ্নের অন্তরালে মায়ের শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ের যে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস শুন্‌তে পাবে—তা'র বেদনা অপর কোনো এলিজির চাইতেই কম নয়।

জাপানীদের এই কল্পনা-বিলাস ও স্বল্পভাষিতা তাদের কাব্যে সময়ে সময়ে কি অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করেছে একটি হক্কু কবিতায় তা'র সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাবে। বাশো রচিত এই কবিতাটী হচ্ছে: -

> Being tired,—
> Ah, the time I fall into the inn,—
> The *wistaria* flowers.

এ কবিতার সৌন্দর্য্যে প্রকৃত রসিক ব্যক্তিমাত্রই মুগ্ধ হবেন।

ইংরেজ কবিদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ জাপানী হ'লে এ কবিতা লিখতে পারতেন। সমস্ত দিবসের ক্লান্তির পর যখন শ্রান্ত পথিক সরাইখানায় এসে গা' মেলে দিয়েছে, তখন,—তখন বাইরের প্রশান্ত-সমাহিত জগতে ***wistaria*** ফুল ফুট্‌ছে ***Wistaria*** ফুট্‌ছে এর চেয়ে বড় সত্য পৃথিবীতে আর কি আছে? এর চেয়ে বড় সত্য আর কি আছে যা' মানুষের জানার প্রয়োজন? জীবনে কোলাহল ও শ্রান্তি আছে, অবসাদ ও মালিন্য আছে কিন্তু সব কিছুকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে ***wistaria*** ফুল, যা শ্রান্ত পথিকের চোখের সাম্‌নে সহসা অপরূপ সৌন্দর্য্যে ফুটে ওঠে। ওই ***wistaria***র প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্যের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য ধরা পড়ে, এক অপূর্ব্ব জগৎকে সে চোখের সাম্‌নে উদ্ভাসিত করে তোলে, ক্লান্ত, আহত পথিক যা' দেখে' উপলব্ধি করে যে সব-সত্ত্বেও—

> God's in His Heaven
> All's right with the world.

জাপানী কাব্য জাপানের সেই ***wistaria***; সে তা'র নিজের ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্যের মধ্যে এক বৃহত্তর সৌন্দর্য্যলোকের পরিচয় জাপানী মনের কাছে বহন করে নিয়ে আসে। জাপানী কাব্য যখন বলে,—

> I thought I saw the fallen leaves
> Returning to their branches:
> Alas, butterflies were they.

তখন জাপানী মন পাতা-ঝরা, প্রজাপতি-বিচিত্রিত এক কাননের সীমা অতিক্রম করে' শুষ্ক বিগতপত্র জীবনের বনবীথিকায় সঞ্চরণ করে, যেখানে নবাগত প্রজাপতির পাখায় রিক্ততার দৈন্য ঢেকে গেছে। সে যখন বলে :—

How will you manage
To cross alone
The autumn mountain,
Which was so hard to get across
Even when we went the two of us together ?"

তখন জীবনের সমস্ত বন্ধুর পথ জাপানের মনে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, যেখানকার তুষারময় পর্ব্বত দু'জনে মিলে পার হওয়াও সহজ নয়।

এম্‌নি ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে জাপানী কাব্য বৃহৎ সৌন্দর্য্যালোককে উদ্ভাসিত করে' দিয়ে' যায়। সে জাপানী মনকে ডেকে বলে

Ah, the *wistaria* flowers !

ছাখো *wistaria* ফুল ফুটলো, যার মধ্যে তুমি এক অপূর্ব্ব জগতের আভাষ দেখতে পাবে।

পাষাণ-প্রতিমা

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

অন্ন যা'রে দেন মাতা অন্নপূর্ণা পূজা তা'রি সাজে,
নিরন্নের আরাধনা পূজার প্রচ্ছন্ন পরিহাস,
সুবর্ণ প্রতিমা গড়ি' শিল্পী মরে ব্যর্থতার লাজে,
অটল পাষাণগাত্রে প্রতিহত তা'রি দীর্ঘশ্বাস।

ফুল দিল থরে থরে, দিল ফুল শূন্য করি শাখা,
অঞ্জলি ভরিয়া নিত্য রাঙা ফুলে করিছে বরণ,
ব্যঙ্গভরা মৃদু হাসি নির্লজ্জ পাষাণ চোখে আঁকা,
পূজার নৈবেদ্য তবু প্রাণমূল্যে করে আহরণ।

মন্দিরে মন্দিরে তা'র দেবতার অচলায়তন
মর্ত্তের মমতা ছাড়ি' দূরে গড়ে' পাষাণ-বেদিকা,
অবরুদ্ধ সূর্য্যালোক---বায়ু বৃথা খোঁজে বাতায়ন
অতল পাতাল তলে জ্বলে কিনা জ্বলে দীপশিখা !

সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুল প্রতিমার চরণে শুকায়,
পাষাণে বাজেনা ব্যথা, নিশ্চল সে পঙ্গু ভগবান !-
ভোগের প্রসাদ হোথা পথের কুক্কুরে কেড়ে খায়,
দেবতার অবহেলা নির্ম্মাল্যের করে অপমান।

নয়নে স্তিমিত দৃষ্টি, ওষ্ঠপুটে ভাষা রহে স্থির
আপন নিষ্ঠুর লীলা বন্দী করিয়াছে আপনারে,
মর্ত্ত-মানবের তরে উথলিছে দুঃখসিন্ধু নীর,
হৃদিহীন দেবকুল বঞ্চনায় ভুলায় তাহারে।

মৌন দেবতার মুখে যে ফুটাবে দৃপ্ত বরাভয়
নিশ্চল পাষাণদেহে অগ্নিমন্ত্রে সঞ্চারিবে প্রাণ,
উদয়শিখরে লভি' উষার প্রথম পরিচয়
অতন্দ্রিত সাধনায় অমৃতের সে পাবে সন্ধান।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙালী

-শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

পলাশীর যুদ্ধের ইতিহাসের সহিত বাঙ্গালী জীবনের এক বিষাদ-মলিন স্মৃতি বিজড়িত আছে। সেদিন বাঙালী যে শুধু রাষ্ট্র গৌরবই হারাইয়া ছিল তা নয়, সেদিন বাঙালীর ধর্ম্ম, সমাজ, তার অন্তর-শক্তি, সমস্ত কিছুর পরাজয় হইয়াছিল। তা'রপর পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য আদর্শ বন্যার বেগে বাংলাকে প্লাবিত করিয়া দেয়—সে প্রবল আকর্ষণের বিক্ষোভে বাঙালী আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে নাই—তাহার কি ছিল, কি গেল তাহা নিঃসঙ্কোচে ভুলিয়া বাঙালী এই জোয়ারে গা ভাসাইয়াছিল। জাতীয় জীবনের এই ঘোরতর বিপদের দিনে সাম্রাজ্যবাদী মেকলে আসিয়া বলিয়া গেল, বাঙালী ভীরু, কাপুরুষ, চোর।—আত্ম-বিস্মৃত, হৃতসর্ব্বস্ব বাঙালী তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে অন্ধ, পাশ্চাত্য আদর্শের অনুসরণে মসগুল—সে বিদেশী লেখকের গ্রন্থে আপনার এই কালিমালিপ্ত মুখের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া ইহাকেই আপনার প্রকৃত স্বরূপ মনে করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ভাবিল, নিজেরা আমরা যদি এতই হীন, এতই দীন তখন অন্ধ অনুরাগে আপনার পাজিপুঁথি আঁকড়াইয়া থাকিয়া লাভ কি? ভাব-প্রবণ বাঙালী অতি সহজেই বিদেশীয় আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি এমন কি ভাষা পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইল। তারপর হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা—এই হিন্দু কলেজেই বাঙালী তাহার নবতম যুগের ঐতিহ্য গঠন করিয়াছে তাহা অস্বীকার করি না, কিন্তু এই হিন্দু কলেজেই বাঙালী তাহার বাঙালিয়ানা হারাইয়াছে এ কথা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

বাঙালী জীবনের এই চরম অধঃপতনের দিনে বঙ্কিমের অভ্যুদয় যেন বাঙালীকে বাঁচাইবার জন্যই বিধাতার আশীর্ব্বাদের সূচনা। যখন বাঙালী বীর বলিতে নেপোলিয়ান ওয়াশিংটন, ব্লেককে বুঝিত, মহীয়সী নারী বলিতে জোয়ান্ অব্ আর্ক, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ছাড় আর কাহারও কথা ভাবাও যখন লজ্জার কাজ ছিল, বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন করিলে বা হিন্দুয়ানী মানিতে গেলে যখন অসভ্য নামে অভিহিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল ঠিক সেই সময়ই হঠাৎ বাঙালীর কাণে বাংলা ভাষায় বঙ্কিমের বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হইল—"যে বলে বাঙালী ভীরু, কাপুরুষ চিরদিন স্ত্রী-স্বভাব তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা—"

সমগ্র বাংলা চমকিয়া উঠিল, এ কাহার কণ্ঠ? কে এমন করিয়া মৃতপ্রায় বাঙালীকে নব জীবনের স্পন্দনে নাচাইয়া তুলিল? কৈ আমাদের ইতিহাস কৈ? কিসের বলে আমরা প্রমাণ করিব যে আমরা হেয় নই, আমরা মানুষ, আমরা জাতি হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারি? বঙ্কিমই আমাদিগকে প্রথম বাংলা ভাষায় বাঙালীর এই ইতিহাস দিলেন। সে ইতিহাস বিজাতীয় বিদ্বেষদুষ্ট অন্ধকূপের গ্লানিলিপ্ত মিথ্যা কলঙ্কের ইতিহাস নয়, সপ্তদশ অশ্বারোহীর ভয়ে পত্নীর হস্ত ধারণ করিয়া পাছ-দুয়ার দিয়া বাঙালী রাজার পলায়নের গালগল্প নয়, সে ইতিহাস জীবন্ত বাঙালীর বাঙালিয়ানার ইতিহাস। বাংলার ধর্ম্ম, বাংলার সমাজ, বাংলার রীতি-নীতি ও কৃষ্টি কি ছিল, যে বাঙালী আজ পদে পদে লাঞ্ছিত অপমানিত তাহার মধ্যে এককালে কেউ মানুষ ছিল কিনা, তাহার ইতিহাস বঙ্কিমই প্রথম আমাদিগকে শুনাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হইতেই আমরা দেশকে প্রথম ভালবাসিতে শিখিলাম। অবশ্য বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধ সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমের সৃষ্টি একথা বলিলে ইতিহাসের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে না—তাঁহার গুরু ঈশ্বর গুপ্তই লিখিয়াছিলেন—

> জান'নাকি নর তুমি জননী জনম-ভূমি
> যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে
> থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে
> কে কোথায় এমন দেখেছে?

তারপর 'পদ্মিনী উপাখ্যান'এ রঙ্গলাল পরাধীনতার ব্যথা যে কতখানি মর্ম্মন্তুদ হইতে পারে তাহা অপূর্ব্ব আবেগময়ী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, হেমচন্দ্রের কোন কোন কবিতাও বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধক রচনাবলীর পূর্ব্বের—কিন্তু ইঁহারা সকলেই জন্মভূমি রূপে একটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, সমগ্র ভারতকে আহ্বান করিয়া উদ্দীপনা সূচক ছন্দ রচনা করা ছিল তাঁহাদের সাহিত্যানুশীলনের লক্ষ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম বাঙালীকে দেখাইলেন যে এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলা দেশ আমাদের জন্মভূমি, এ দেশের

কল্যাণে আমাদের কল্যাণ, এদেশের গৌরবে আমাদের গৌরব —আমরা সেই প্রথম আমাদের এই দীনা জননীকে দেখিলাম, তাঁহার দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম। বঙ্কিমের দেশাত্মবোধ এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই তাহা এত সহজে আমাদের অন্তরের জিনিষ হইতে পারিল। আমরা লজ্জার সহিত অনুভব করিতে লাগিলাম যে নিজকে ক্ষুদ্র, ক্ষীণ মনে করিয়া আপনার পথ ছাড়িয়া পরপদানুসরণে কিছু মাত্র বাহাদুরী নাই—নিজের ঐতিহ্য, নিজের কৃষ্টি, নিজের আদর্শকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষ বড় হইয়া উঠে, পরের আদর্শ মক্স করিলে তাহা আদর্শই থাকিয়া যায়, জীবনের মধ্যে তাহার বিকাশ কখনও সম্ভব হয় না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কেবল

যুবক বঙ্কিমচন্দ্র

ধম্‌কাইয়া শুষ্ক ঐতিহাসিক বুলি আওড়াইয়াই এত বড় কাজটি নিষ্পন্ন করিতে পারেন নাই। নীরস নীতি-উপদেশ, মানুষের কাজে লাগে না বঙ্কিম তাহা জানিতেন, তাই তিনি অপূর্ব্ব কথা সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন, তাহার মধ্য দিয়া সরস সুন্দর চিত্তাকর্ষক ঘটনাবিন্যাসের সাহায্যে তিনি বাঙালীত্ব ও মনুষ্যত্বের পূর্ণতম পরিণতিটুকু সহজেই ফুটাইয়া তুলিলেন। আর্টের মাপকাঠিতে বিচার করিলে আজ বঙ্কিমের রস-সৃষ্টির ত্রুটি বাহির করা যায় না এমন নয়, কিন্তু তাঁহার শেষ তিন খানি উপন্যাসে (আনন্দ মঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম) তিনি—ঘরে ও বাহিরে যে বিরাট বাঙালী জীবন বিভিন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়া অগণ্য বৈচিত্র্য ও অসংখ্য বিপর্য্যয়ের তুফান কাটাইয়া আপনাকে বৃহত্তর সার্থকতার দিকে লইয়া গিয়াছিল, তাহার যে জলন্ত চিত্র দিয়াছেন তাহা আজিও তেমনি ভাল, তেমনি সুন্দরই রহিয়াছে—চিরদিন থাকিবে।

কিন্তু কথাটা লইয়া হয়ত তর্ক উঠিতে পারে, হয়ত কেন স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এ তর্ক একবার তুলিয়াও ছিলেন, এই যে দেবীরাণী, শান্তি, শ্রী ইহারা কি সত্য সত্যই বাঙালীর মেয়ে? এই যে আনন্দ মঠের সন্ন্যাসীরা ইহাদের সঙ্গে কি বাংলার সন্ন্যাস ধর্ম্মের নাড়ীর যোগ আছে? একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে তাহা নাই, তাহা থাকিতেও পারে না। গৃহে পত্নীও থাকিবে, বাহিরে বৈরাগ্যও চলিবে, একদিকে মা বলিয়া কাঁদা চলিবে, অন্যদিকে নিরীহ কোম্পানীর সেপাই বধ চলিবে, একদিকে জীব-সেবা দেশ-সেবার ফতোয়ার জারী করা হইবে, অন্যদিকে নারীরূপের মোহে আকৃষ্ট হওয়ারও কোন বাধা থাকিবে না, এ উদ্ভট বৈরাগ্য বাংলার মৃত্তিকার নয় এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই—মধ্যযুগের প্রটেষ্ট্যাণ্ট

প্রৌঢ় বঙ্কিমচন্দ্র

সন্ন্যাসীদের সহিতই এই সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধ অধিক। নারী-চরিত্র সম্বন্ধেও, দেবীরাণী বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন করিলেন, ডাকাইতের সর্দ্দারনী সাজিলেন, অবশেষে পুকুর ঘাটে বাসনও মাজিলেন, এ রকমের মেয়ে বাংলায় সচরাচর ত দূরের কথা কখনই ছিল কি না সন্দেহ—শান্তিও কতকটা আধমদ্দা ধরণের মেয়ে, শ্রী অপূর্ব্ব সুকুমারী নারী, তিনিও শেষে গাছে চড়িয়া 'মার' 'মার' করিতে লাগিলেন, এ সমস্তই আমাদের চোখে আপাত দৃষ্টিতে কতকটা বিসদৃশই ঠেকে। তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিয়ানা আনিলেন কোথায়? বিদেশীয় সাহিত্য ও ইতিহাস হইতে মালমশলা সংগ্রহ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যাহা খাড়া করিলেন বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনের সহিত তাহার ত কোন যোগ-সূত্র নাই! তবে বঙ্কিম সাহিত্যে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে বলা যায় কোন্ যুক্তিতে?

এ তর্কের প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন কল্পনাবাদী। অতীতে বাঙালী

যে একটি স্বাধীন জাতি ছিল, শিক্ষা দীক্ষা আচার অনুষ্ঠানে তাহার একটা উচ্চ স্থান ছিল, এটুকু তিনি অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিতেন, তাহারই উপর তিনি কতকগুলি বিশিষ্ট মতবাদ ও তৎসহ কতকটা কল্পনা চড়াইয়া এই সকল চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। কাজেই আমাদের অভ্যাসমলিন প্রাত্যহিক জীবনের সহিত ইহাদের সম্বন্ধের যোগটুকু আমরা সহজে ধরিতে পারি না। কিন্তু যোগ একটা আছেই, তবে সে দিকটা স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গ স্বভাবতঃ আসিয়া পড়িবে এই আশঙ্কা আছে। এই যে সন্ন্যাসীরা মা মা বলিয়া কাঁদে, হর হর বলিয়া গৈরিক পরিয়া কোম্পানীর সিপাহী মারে, ইহারা বাঙালীর চোখে অপরিচিত লোক নয়, ইহাদের কাঁদন শুনিলে আমাদের বুকের ভিতরেও ফুলিয়া ফুলিয়া ডুক্‌রাইয়া উঠে, ঐ গৈরিক উহাও আমাদের মৃত্তিকার— কিন্তু তবু বাঙালীর গার্হস্থ্য-প্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল জিনিষ তাই বঙ্কিম শেষ পর্য্যন্ত কঠোর বৈরাগ্যকে সমর্থন করিতে পারেন নাই—গৃহপ্রীতি আসিয়া তাই বৈরাগ্যকে মধ্যপথে আক্রমণ করিল, ইহার পরিণাম বঙ্কিম জানিতেন তাই তিনি নিঃসঙ্কোচে দেহবাদের জয়গান না গাহিয়া তুষানলে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন—এ চিত্র বাংলার চিরপরিচিত চিত্র, ভোগ ও ত্যাগের দ্বন্দ্ব বাঙালী যতটা বোঝে অন্য জাতি তাহা বুঝে কি? কাজেই এ সন্ন্যাসীদিগকে আমরা পরগাছা মনে করি কি করিয়া? তারপর নারী, আমরা বাঙালী নারীকে কেবল অন্তঃপুরে দেখিতেই অভ্যস্ত আছি, তাই বাহিরের জীবনে বিপ্লবকারিনী নারীকে আমরা সহজে বরদাস্ত করিতে পারি না। কিন্তু একদিন বাঙালীর মেয়ে যুদ্ধ করিয়াছে, ঘোড়ায় চড়িয়া শত্রুনাশে বাহির হইয়াছে, সেই সোণাবিবি, বিন্দুবাসিনীর কথা বঙ্কিম জানিতেন, তাই দেবীরাণী, শ্রী, শান্তিকে তিনি অস্বাভাবিক মনে করেন নাই— একথা স্বীকার করিতেই হইবে, উপন্যাসের চরিত্র যখন কোন দেশেই নিছক পথেঘাটে পাওয়া যায় না তখন শান্তি, শ্রী, দেবী ঝুড়ি ঝুড়ি আসিবে কোথা হইতে—এ চরিত্র সুলভ নয়, কিন্তু অপরিচিত ইহারা নয়। কিন্তু বঙ্কিম এ কথা স্পষ্টই জানিতেন যে বাঙালী ঘরবোলা জীব, শুধু বাহিরে ধ্বংসের বীজ ছড়াইলেই তাহার কাজ শেষ হইল না, ভিতরে সৃষ্টির প্রেরণা জোগানই হইতেছে তাহার আসল লক্ষ্য—তাই তিনি সকলকেই শেষ পর্য্যন্ত অন্তঃপুরের দিকে টানিয়াছেন।

কিন্তু এটা শুধু স্বভাবসুলভ গৃহপ্রীতি বশেই তিনি করিয়াছেন তাহা নয়, তিনি এই তিনখানি উপন্যাসে অনুশীলন তত্ত্বটি দেশকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, অনুশীলন তত্ত্বের গোড়ার কথা মোটের উপর হইতেছে অন্তরের সমুদয় বৃত্তির যথাযথ স্ফূরণ, এই স্ফূরণের দ্বারা বাঙালী উন্নতির চরম সোপানে উঠিতে পারিয়াছিল, ইহাই বঙ্কিমের আসল বক্তব্য— তাই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি অনেক স্থলে রূপকের আকার ধরিয়াছে, সম্ভাবনীয়তার বিচার সব সময়ে তাহাদের উপর আরোপ করা শোভনও না, সঙ্গতও নয়। আজিকার বাংলা সাহিত্যের সহিত বঙ্কিম-সাহিত্যের তুলনা করিলেই আমাদের বক্তব্য সবিশেষ পরিস্ফুট হইবে। আজ বাংলা সাহিত্যে বস্তু-তান্ত্রিকতার ধূয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আজিকার সাহিত্যের সহিত আমাদের অন্তরের যোগ আছে কি? আমাদের সংসার, সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা দীক্ষা, আজিকার সাহিত্যে রূপ পাইয়াছে কি? শুধু বিদেশীয় মতবাদের প্রতিধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া আমাদের কান ভোঁতা হইবার উপক্রম হইয়াছে—কিন্তু বঙ্কিমের সাহিত্য পড়িলে অন্তরের নিভৃততম স্তরে যেন অনেক দিনের হারান' একটি সুসংহত অতীত জীবন জাগিয়া উঠে, যাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ আজও একেবারে ছিন্ন হয় নাই—।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপর বিদেশীয় প্রভাব ছিল না এ কথা বলি না। কোঁতের পজিটিভিস্‌ম্‌, ফিক্‌তের অনুশীলনবাদ, রুসোর সাম্যবাদ তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টিকে পুষ্ট করিয়াছিল, সেই আদর্শে তিনি দেশের সমাজকে ধর্ম্মকে গড়িতে গিয়াছিলেন, কাজেই বিদেশী চূণ বালি মধ্যে মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রমাণ তাঁহার কৃষ্ণ চরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া উপন্যাস-গ্রন্থ সর্ব্বত্র অজস্র পরিমাণে পাওয়া যায়—কিন্তু মাত্র গিলিবার প্রবৃত্তি কোনকালে তাঁহার ছিল না, তিনি হজমও করিতে পারিতেন, যাহা ভাল, যাহার সহিত সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালে মানব মনের একটি স্বাভাবিক আত্মীয়তার সম্বন্ধ আছে তাহাই তিনি বাঙালীর জীবনে আমদানী করিয়া খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছেন, ব্যর্থ হন্ নাই তাহা নয়, কিন্তু তাঁহার সফলতাই সমধিক গৌরবের। মানুষ নিজের কথা শুনিতে ভালবাসে, তাই বঙ্কিম আমাদিগকে নিজের কথাই শুনাইলেন, কিন্তু পাছে অতীতের গরিমাকে আঁকড়াইয়াই আমরা অসাড় হইয়া পড়ি, তাই তিনি কমলাকান্তের চাবুক দিয়া আমাদিগকে ভবিষ্যতের পথ দেখাইতেও ভুলিলেন না—। মা কি ছিলেন তাহা তিনি দেখাইলেন, কি হইয়াছেন তাহা ত' আমরা দেখিতেছি, কি হইবেন তাহারও আভাস বঙ্কিম দিলেন—তাই বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি, তাই সাধারণ গল্প-লেখকে ও বঙ্কিমে এই আকাশ পাতাল পার্থক্য।

মরণ-মহোৎসব

—শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়

"মরণ হ'লে বাঁচি", "ম'লে হাড় জুড়োয়", "ম'রতে পা'রলে বাঁচি" প্রভৃতি উক্তি অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম, দরিদ্রের "যন্মরণং স এব বিশ্রামঃ"। বাস্তবিকই কি মানুষ মরিতে চায়? যদি সত্য সত্যই মরণ কাহারও বাঞ্ছনীয় হয়, মরণই বিশ্রাম বলিয়া যদি দৃঢ় ধারণা জন্মে, তাহা হইলে মরণের ত অনন্ত উপায় রহিয়াছে; সে সমস্ত উপায় মানুষ অবলম্বন করে না কেন? যাহারাও বা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ মনের আবেগে আত্মহত্যাজনক উপায় অবলম্বন করে, তাহারাও ত দেখি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঁচিবার জন্যই চেষ্টা করে! যদি কাহারও প্রার্থনা অনুসারে মৃত্যু সত্য সত্যই আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে তাহাকে সর্ব্বদুঃখহর ও শান্তির নিদান বলিয়া সহর্ষে আলিঙ্গন করিবে, না সেই বৃদ্ধা কাঠুরিয়াণীর ন্যায় বলিবে—"যখন আসিয়াছই তখন আমার কাঠের বোঝাটা মাথায় উঠাইয়া দিয়া যাও"?

একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষ যে মরিতে চায়, সেটা তাহার মুখের একটা অর্থহীন কথা মাত্র; এই কথার অন্তরালে বাঁচিবার ইচ্ছাই প্রবল। শোক, দুঃখ, দৈন্য, ব্যাধি প্রভৃতির যন্ত্রণা যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখনই সাধারণতঃ মরিবার ইচ্ছা-প্রকাশক উক্তিগুলি বাহির হয়; কিন্তু এই উক্তির অন্তরালে যে, জীবন-স্পৃহা বর্ত্তমান, তাহা উক্তিগুলিতেই প্রকাশ পায়। "ম'লে বাঁচি" উক্তিটীর মধ্যেও "বাঁচি" শব্দটা আছে। কাজেই দেখা যায়, মুখের কথা বলিতে গিয়াও, অন্তরের যে প্রকৃত ভাব অর্থাৎ বাঁচিবার ইচ্ছা, তাহা বক্তার অজ্ঞাত-সারে স্বতঃই ঐ কথার সঙ্গেই বাহির হইয়া পড়ে। অনেকে আবার এই বিপরীত ভাবটা, একটা "কিন্তু"র আবরণে আবৃত রাখিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন—"ম'রতে ত এখনই পারি, কিন্তু আমার রামা শ্যামা ধামার কি উপায় হবে, এই ভাবনাতেই পারি না"। আবার কেহ কেহ বলেন—"ইচ্ছে করে একবার ম'রে দেখি, আমার উপর তোদের কত ভালবাসা"। এক দিকে মরিতে চাওয়া, অপর দিকে মরিয়া দেখিবার ইচ্ছা! কি অদ্ভুত সামঞ্জস্য-বিহীন অসার উক্তি! যেন মরণের পরেও, দেখিবার যন্ত্রাদি ও শক্তি, সমস্তই ঠিকঠাক পূর্ব্বেরই মত বজায় থাকিবে! অমরণের ভাব লইয়াই মরণের কথা বলা হয়, কাজেই মরিতে বসিয়াও, রে'খো, মো'খো ও যো'দোর ভাবনা উঠে ও একটা বিশাল "কিন্তু" আসিয়া খাড়া হয়। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতরা শ্রীমতী রাধিকার মুখ দিয়া বৈষ্ণব-কবি বলাইয়াছেন—

"মরিব মরিব সখি, নিশ্চয়ই মরিব'

কথা ত ঠিকই। যে শ্রীকৃষ্ণ প্রাণের প্রাণ, অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে "যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে", তাঁহার অভাবে প্রাণ ত থাকিতেই পারে না; কাজেই "নিশ্চয়ই মরিব" উক্তি। কিন্তু এখানেও সেই একটা বিরাট "কিন্তু" উপস্থিত হইয়া মরণের বাধা জন্মাইতেছে—

"কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব"

আমাদিগের সকলের অবস্থাই সেই একই রকম। আমরা মনে ভাবি যেন আমরা সকলেই অনায়াসেই মরিতে পারি, কেবল "রে'দোর কি হবে" এই ভাবনাতেই পারি না। এখানেও সেই একই রকম "কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব" ভাবনায় আমাদেরও মরা হইতেছে না। রাধিকাকে মরাইতে গিয়া কবি আরও স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন যে, মরণটা কেবল মাত্র কথনীয়, জীবনটাই বাঞ্ছনীয়। কারণ দেখি, রাধিকা বলিতেছেন—

"না পোড়া'য়ো মম অঙ্গ, না ভাসা'য়ো জলে,
মরিলে তুলিয়ে রে'খো তমালের ডালে"

মরিতে গিয়াও মৃতদেহ রক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে কেন? কারণ অন্তরে অন্তরে পুনর্জ্জীবনের আকাঙ্ক্ষা আছে। তাই শ্রীমতী বলিতেছেন—

"কবহুঁ সো পিয়া যদি, আসে বৃন্দাবনে
পরাণ পায়ব হাম, পিয়া দরশনে।"

এখানেও দেখি মৃতদেহের দর্শনশক্তি কল্পনা করিয়াই "পিয়া দরশনে" উক্তি! কালিদাসের অমোঘ বাণী মনে পড়ে:—

"কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু"

সামান্য চিন্তা করিলেই দেখা যায়, মরিতে কেহই চায় না। অথচ মৃত্যুর ন্যায় ধ্রুব সত্য, জগতে আর কিছুই নাই—"অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ", আজ হউক, কাল হউক, শতবর্ষ পরে হউক, মরিতে হইবেই। মৃত্যু "জন্মনা সহ জায়তে"। বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি পরিবর্ত্তন গুলির দিকে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয়, জীব জন্ম হইতে ক্রমে মৃত্যুর দিকেই অগ্রসর হইতেছে। প্রকৃতির দিকে তাকাইলেও দেখা যায়, জগৎটা জন্ম-মৃত্যুর একটা তাণ্ডব লীলা মাত্র; যেন জীব মরিবার জন্যই জন্মিতেছে। শাস্ত্রেও তাই দেখি -"জায়তে মৃতয়ে লোকঃ"। যুধিষ্ঠির ঠিকই বলিয়াছেন—

> "অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্
> শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্"

আমরা ত সকলেই দেখিতেছি—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ"। অথচ এই ধ্রুব সত্যকে উপেক্ষা করিয়া কেবল চিরজীবন-স্পৃহাই পোষণ করি। কাহারও চাওয়া, না চাওয়া অপেক্ষা না করিয়াই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। মৃত্যুর দেশ, কাল পাত্রভেদ নাই; সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকলের নিকটেই মৃত্যুর অবাধ গতি, ইহা ত আমরা সকলেই দেখিতেছি। তবুও মানুষ মরিতে চায় না কেন? ইহার একই মাত্র উত্তর—মরণের আতঙ্ক। জগতে যত প্রকার ভয়ের কারণ বর্ত্তমান, মরণ-ভীতিই তাহাদিগের বীজস্বরূপ। এই ভীতিই বা কি জন্য? যাহার ভয় জন্মে, সে ত তখন জীবিত, সে ত জানেনা মরণ জিনিষটা ভীতি কি প্রীতিদায়ক; তবুও তাহার ভয় কেন?

আমরা সাধারণতঃ অপরের মরণ প্রত্যক্ষ করি, এবং মৃত ব্যক্তির দেহের অবস্থা দেখিয়া, মৃত্যুতে নিজের দেহেরও ঐ অবস্থা ঘটিবে, এবং ঐ দেহ সম্পর্কে যাবতীয় পার্থিব সম্বন্ধের যবনিকা-পতন হইবে, ইহা অনুমান করিয়াই মৃত্যু-চিন্তায় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি ও মরিতে চাই না। আমরা যদি কখনও কাহারও মৃত্যু প্রত্যক্ষ না করিতাম তাহা হইলে মরণ-জ্ঞান আমাদিগের পক্ষে সম্ভবই হইত না ও মৃত্যু-বিভীষিকাও দেখিতাম না। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি তাহাতে স্বরূপতঃ কোনও আতঙ্কের কারণ আছে কি না, তাহা সূক্ষ্ম-বিচার-সাপেক্ষ।

আমরা সাধারণতঃ দেহের ধ্বংসকেই মৃত্যু বলি। কাজেই দেহ সম্বন্ধীয় বিচারই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। দেহের দিকে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই, ইহা অস্থি, চর্ম্ম, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, লোম প্রভৃতির একটী পিণ্ড মাত্র। ইহারা সমস্তই জড় পদার্থ। জড়ে জ্ঞান বা চৈতন্যের অভাব বা সুপ্তাবস্থা, কাজেই তাহাদিগের স্বকীয় কোনও কার্য্যকারিতা নাই ও কোন প্রকার অনুভূতিই নাই; এই জন্য দেহের মরণভয়ও সম্ভব হয় না। ভয় জ্ঞানের একটী বৃত্তিবিশেষ মাত্র, কাজেই যেখানে জ্ঞানের অভাব, সেখানে ভীতি-সম্ভাবনা এককালীনই নাই। কাজেই দেহ মৃত্যুভয়ে ভীত নয়। বিশেষতঃ দেহের উপাদান গুলি পঞ্চভূতাত্মক; মৃত্যুর পর সেগুলি ক্রমে সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায় মাত্র, তাহাদিগের এককালীন নাশ হয় না। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে যেমন তাহা স্বকারণে বিলীন হইয়া যায়, কুসুম শুষ্ক হইলে যেমন তাহার সৌরভ অনন্তে লীন থাকে, সেইরূপ দেহও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তাহার উপাদানগুলি সূক্ষ্মাকারে প্রকৃতিতে লীন থাকে মাত্র, তাহাদিগের ঐকান্তিক অভাব হয় না। কাজেই দেখা যায়, স্বরূপতঃ দেহের নাশ, মৃত্যু বা ধ্বংস নাই। তবে যে আমরা দেহের অভাব প্রত্যক্ষ করি, তাহা বস্তুতঃ দেহের নয়, দেহের ঐ আকারটার মাত্র। আকারের আবার স্বকীয় কোনও পৃথক স্বরূপ বা সত্তা নাই; যাহাকে আমরা আকার বলি, তাহা একটা কাল্পনিক স্বরূপ মাত্র। যেমন সুবর্ণবলয়ে যে আকার দৃষ্ট হয়, সে আকারের একটা স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সুবর্ণই তাহার স্বরূপ, এবং ঐ বলয় পুনরায় পিণ্ডীকৃত হইলে সুবর্ণের অণুমাত্রও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, কেবল ঐ সুবর্ণের যে কল্পিত বলয়াকার দৃষ্ট হইয়াছিল তাহারই অভাব হয় মাত্র, দেহনাশেও সেইরূপ তদুপাদানের অণুমাত্রও নষ্ট হয় না, অভাব হয় কেবল মাত্র ঐ স্বরূপবিহীন আকারটার। এস্থলে বলয়ের নাশকে বলয়ের মৃত্যু বলাও যা, এই দেহ তদুপাদান পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়া অদৃশ্য হইলে, পূর্ব্বের মিশ্রিত আকারের অভাবকে তাহার মৃত্যু বলাও তাই। বলয়াসক্ত মানব যেমন বলয়াকারের নাশে বলয়ের অভাব হইল বলিয়া দুঃখ করে, আমরাও সেইরূপ অজ্ঞাতাপ্রযুক্তই দেহের নাশকে

মৃত্যু বলিয়া দুঃখিত ও ভীত হই। পরমাণুবাদীদিগের মতে প্রত্যেক দেহ বা আকার, পরমাণু সমষ্টির একটী বিশেষ সমাবেশ (arrangement) মাত্র। সেই সমাবেশের অভাব হইয়া যখন অন্য আকারে তাহাদিগের সমাবেশ হয়, তখন পূর্ব্ব আকার লোপ পায় ও নূতন আকার দৃষ্ট হয়; পরমাণুর অভাব বা নাশ হয় না। এস্থলে সমাবেশ বিশেষের অভাব বা কতকগুলি পরমাণুর এক arrangement হইতে অন্য arrangementএ transformation হইলেই আমরা পূর্ব্ব সমাবেশের বা arrangement-এর মৃত্যু বলি। এক্ষেত্রেও মৃত্যুটা সমাবেশের পরিবর্ত্তন মাত্র, তাহাতে স্বরূপতঃ উপাদানের নাশ বা মৃত্যু হয় না। কাজেই সে দিক দিয়া বিচার করিলেও, মৃত্যুতে দুঃখের বা ভীতির কোনও কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বশিষ্ঠদেব তাই রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন—

"নাশাভাবে হি, দুঃখস্য কঃ প্রসঙ্গো মহামতে"

দেহ সম্বন্ধে আর একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, দেহে জড়াতিরিক্ত একটা চৈতন্য-সত্তার অস্তিত্ব আছে, এবং প্রত্যেকের নিকটই তাহার উপলব্ধি হয়। এই চৈতন্যেরই অপর নাম জ্ঞান, এবং দেহসংস্কারবিশিষ্ট চৈতন্যই জীবাত্মা, ও সংস্কারবিহীন চৈতন্যই আত্মা বা পরমাত্মা নামে প্রসিদ্ধ। অনুভূতি বা বোধ এই চৈতন্যেরই ধর্ম্ম, এবং আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, প্রভৃতি বৃত্তিগুলিও এই চৈতন্যেরই কার্য্য; কেবল দেহ-সংযোগে বোধ জন্মে বলিয়া দেহকেই বোদ্ধা বা জ্ঞাতা বলিয়া ভ্রম হয়। যেমন জলের দাহিকাশক্তি না থাকিলেও, অগ্নি-সংযোগে অত্যুষ্ণ জলে হস্তাদি দগ্ধ হইয়া যায়, এবং আমরা ঐ জলকেই দাহক বলিয়া সাব্যস্ত করি, এই জড়দেহও সেইরূপ চৈতন্য-সংযোগে তাদাত্ম্য লাভ করিয়া চৈতন্যের ন্যায় অনুভব করে বলিয়া আমাদের প্রতীতি জন্মে। স্বরূপতঃ চৈতন্য জড়দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, কেবল দেহাশ্রয় বশতঃ নিজকে দেহধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া মনে করে, ও দেহের নাশকেই আত্মনাশ মনে করিয়া ভীত হয়। আমরা দেহের নাশ প্রত্যক্ষ করি বটে, কিন্তু "দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ম্" অর্থাৎ দেহী বা দেহাধিষ্ঠিত চৈতন্য-পুরুষ অবিনাশী। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব আত্মার ক্ষয় উপচয় নাই এবং আত্মা "দেহধর্ম্মৈর্ন লিপ্যতে," কাজেই দেহের নাশে তাহার নাশ হয় না।

তাই শাস্ত্র বলেন—

"শরীরে শতধা যাতে খণ্ডনা কা শরীরিণঃ
কুম্ভে ভগ্নে ক্ষতে ক্ষীণে কুম্ভাকাশস্য কা ক্ষতিঃ"

"ঘটাদিষু প্রণষ্টেষু যথাকাশাত্ত্বখণ্ডিতম্
তথা দেহেষু নষ্টেষু দেহী নিত্যমলেপকঃ"

অর্থাৎ কুম্ভ ভগ্ন, ক্ষত, ও ক্ষীণ হইলেও যেমন তদন্তর্ব্বর্ত্তী আকাশের কোনও রূপ ক্ষতি হয় না, সেইরূপ দেহ রুগ্ন, বিকৃত, দূষিত, বা ভস্মীভূত হইলেও দেহীর কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। আমরা যে সমস্ত বিকার বা পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করি, তাহা স্বরূপতঃ দেহেরই, আত্মার নয়, কবি তাই বলিয়াছেন—

"Dust thou art to dust returnest
Was not spoken of the soul."

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক Lord Haldane বলিয়াছেন—

"Something other than Physical and Chemical forces animates and sustains the dust of which we are made."

এই চৈতন্যই দেহের চালক, এই চৈতন্যই অনুভবিতা; এবং চৈতন্যসংযোগবিহীন হইলেই দেহ জড় ও শবে পরিণত হয়। সুতরাং দেখা যায় চৈতন্যের নাশ নাই, কাজেই তাহার মৃত্যুভয়ও নাই—

"দেহলক্ষাণি ম্রিয়ন্তে চেতনং স্থিতমক্ষতম্"

আর "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", এই মহাবাক্যই যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব ত সেই এক অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মেরই স্বরূপ; ইহার জন্মই বা কি, আর মৃত্যুই বা কি? একই জল পৃথক তরঙ্গাকারে জলে উৎপন্ন হইয়া আবার সেই জলেই বিলীন হয়, ইহাতে স্বরূপতঃ তরঙ্গের যেমন জন্ম বা মৃত্যু কিছুই হইল না, এই জগতের জন্ম-মৃত্যুও ঠিক সেইরূপই, অর্থাৎ কিছুই জন্মে না, কিছুই মরে না, কেবল অজ্ঞদৃষ্টিতে জন্ম-মরণ বলিয়া ভ্রম হয় মাত্র। জলে তরঙ্গের উদ্ভব ও লয়কে যদি তরঙ্গের জন্ম ও মৃত্যু বলিয়া উল্লাস ও শোক প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা যেমন কেবলমাত্র স্বকীয় অজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হয়, এই স্থাবরজঙ্গমাত্ম বিশ্বের আকার বিশেষের সাময়িক বিকাশ ও লয় দেখিয়া হর্ষ শোক প্রকাশ করাও, সেইরূপ

একমাত্র অজ্ঞতারই পরিচায়ক। স্বরূপতঃ "তস্মান্ন ম্রিয়তে কিঞ্চিন্ন চ জীবতি কিঞ্চন।" বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"যঃ কণো যা চ কণিকা যা বীচির্যস্তরঙ্গকঃ
যঃ ফেনো যা চ লহরী তদ্ যথা বারি বারিণি"

অর্থাৎ একই জল ফেন, বুদ্বুদ, তরঙ্গ, লহরী প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে প্রতীয়মান হইলেও, সে সমস্তই যেমন জলেই জল, এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বও সেইরূপ ব্রহ্মেই ব্রহ্মের বিকাশ। রামপ্রসাদ এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াই বলিয়াছিলেন—

'যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়
জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥"

বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতিও বলিয়াছেন :—

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত
না তুয়া আদি অবসানা,
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা।"

শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব এই জ্ঞান লইয়াই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—

"যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বতশ্চ যঃ
যশ্চ সর্ব্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ"

এই ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় "মরণং সর্ব্বনাশাত্ম ন কদাচন বিদ্যতে"। কিছুই জন্মিতেছে না, কিছুই মরিতেছে না,একমাত্র অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপই বিরাজ করিতেছে ; তদতিরিক্ত পৃথকভাবে জগৎ বলিয়া যাহা বোধ হইতেছে তাহা প্রকৃত-পক্ষে সেই স্বরূপ হইতে অভিন্ন ও তাহা "শান্তে শান্তং শিবে শিবম্", কাজেই মৃত্যু বলিয়া একটা জিনিষই নাই। যাহা কিছু অনুভূত হইতেছে তাহা—

"শূন্যং শূন্যে সমুচ্ছূনং ব্রহ্ম ব্রহ্মণি বৃংহিতম্
সত্যং বিতস্থতে সত্যে পূর্ণে পূর্ণমিব স্থিতম্"

আমরা যে দেখি এক জীব অন্য জীবকে হনন করিতেছে, এখানেও স্বরূপতঃ কেহই কাহাকেও ধ্বংস বা নষ্ট করে না, নষ্ট হইতেছে বলিয়া ভ্রান্তিতে বোধ জন্মে মাত্র। এক তরঙ্গের আঘাতে অন্য তরঙ্গ বিচূর্ণীত হইলে, যেমন কিছুই চূর্ণিত, হত বা নষ্ট হয় না, যে জল সেই জলই বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ এক দেহদ্বারা অন্যদেহ হত হইলেও স্বরূপতঃ "নায়ং হন্তি ন হন্যতে" ; এবং এক তরঙ্গাঘাতে অপর তরঙ্গের নাশ হইলেও স্বরূপতঃ যেমন জলের কোনও ক্ষতিই হয় না, সেইরূপ একদেহ অন্য দেহকে হনন করিলেও "নিত্য অবধ্য" দেহীরও কোনও অপচয় ঘটে না। শাস্ত্র তাই বলেন—

"যথোর্ম্মিণোর্ম্মৌ নিহতে ন কাচিৎ পয়সাং ক্ষতিঃ
তথা দেহেন নিহতে দেহে নাস্তি চিতেঃ ক্ষতিঃ"

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক Liebnitz বলিয়াছেন—"Properly there is no such thing as death"। কাজেই যাহার আদৌ অস্তিত্বই নাই, তজ্জন্য ভীতির সম্ভাবনাও নাই।

এখন একটা প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয়--যদি আত্মা ও দেহ উভয়েরই নাশ না হয়, তবে মরণ হয় কাহার? আমরা সকলেই বলিয়া থাকি "আমি মরিলাম" "আমি মরিব" "আমি মারা যাব" ইত্যাদি ; কাজেই স্বীকার করিতে হয়, আমাদিগের বর্ত্তমান জ্ঞানে "আমি" বা "অহং" ই মরে। এখন বিচারের বিষয় এই "আমি"র স্বরূপ কি? আমরা আমাদিগের স্বকীয় অস্তিত্ব বুঝিতে গিয়া, দেহ ও চৈতন্য ছাড়াও আর একটা স্বরূপের অস্তিত্ব অনুভব করি, তাহারই নাম "অহং" বা "আমি"। বিভিন্ন ভাষায় ইহার বিভিন্ন নাম—অহং, হাম্, আমি, মায়, I, *Ego* প্রভৃতি। এই অহং, না জড়, না চৈতন্য। বিচারপূর্ব্বক দেখিতে গেলে ইহার কোনও সত্তাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা যখন বলি, আমি হ্রস্ব, আমি দীর্ঘ, আমি অন্ধ, আমি বধির, আমি স্থূল, আমি কৃশ, তখন আমরা এই হ্রস্বত্ব, দীর্ঘত্ব প্রভৃতি আরোপ করি কাহাতে? সামান্য বিচারেই দেখিতে পাওয়া যায় এই বিশেষণ গুলি দেহকে লক্ষ্য করিয়াই প্রয়োগ করা হয় সন্দেহ নাই। কাজেই এক্ষেত্রে আমরা দেহকেই "আমি" বুঝিয়া দেহের গুণ ও ধর্ম্মকে আমার গুণ ও ধর্ম্ম বলিয়া বুঝি ও দেহই আমি এই জ্ঞান জন্মে। ইহারই নাম দেহাত্মবোধ। অপর পক্ষে আবার এই দেহকে নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আমরা বলি "আমার দেহ"। এখানে জ্ঞান পরিষ্কারই বুঝিতেছে দেহ "আমি" নয়, দেহ "আমার"। যেমন আমার ঘট আমার মঠ বলিলে, আমি ঘট ও মঠ হইতে পৃথক ইহা আমার জ্ঞানে সুস্পষ্ট অনুমিত হয়, সেইরূপ যখন "আমার দেহ" বলা হয় তখনও "আমি" দেহ হইতে পৃথক, এই জ্ঞান লইয়াই ঐরূপ বলা ও বুঝা সম্ভব হয়।

আবার জ্ঞানকে বা চৈতন্যকে নির্দ্দেশ করিতে গিয়াও "আমার জ্ঞান" বলি। যদি দেহ ও চৈতন্য উভয়ই "আমি" না হয়, তাহা হইলে এ "আমি" কে? স্বরূপতঃ আমির কোনও স্বরূপ বা সত্তা নাই, তাই আমাদিগের ভ্রান্ত জ্ঞানে ইহাকে একবার দেহ, একবার দেহাতিরিক্ত বলিয়া বোধ জন্মে। রাজা হরিশ্চন্দ্রের অহং জ্ঞান প্রবল থাকায় গুরু বিশ্বামিত্রের কৌশলে তাঁহার চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল ও কালে "আমি রাজা হরিশ্চন্দ্র" এই সংস্কার তাঁহার জ্ঞান হইতে এককালীন বিলুপ্ত হইয়াছিল। পরে যখন তাঁহাকে জানান হইল যে, তিনি চণ্ডাল নহেন, তিনি রাজা হরিশ্চন্দ্র, তখন তাঁহার চিন্তা আসিয়াছিল—"আমি ত তাহা হইলে স্বরূপতঃ চণ্ডালও নই, রাজাও নই, তবে আমি কে?" জ্ঞানের এই অবস্থার নামই বৈরাগ্য; এই অবস্থায়ই আত্মবিচারে স্পৃহা জন্মে ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকারী হওয়া যায়। বাস্তবিকই সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় "আমি" বলিয়া একটা জিনিষই নাই, বিচারের অভাবেই "আমি"র উপলব্ধি। শাস্ত্র তাই বলেন—"অহমস্ত্যবিচারেণ, বিচারেণাহমস্তি নো"। আমি বলিয়া একটা স্বরূপই নাই, অথচ আমরা সকলেই সেই "আমি" ও "আমার" লইয়াই ব্যস্ত হইয়া জীবনাতিপাত করিতেছি! শাস্ত্রাদিতেও তাই দেখি—

> "যস্যেক্ষিতস্য নো সত্তা নাধারো ন চ কারণম্
> সোঽহমিত্যেব যো শঙ্কো ন জানে কুত উত্থিতঃ।
> যস্যাহমিতি যস্যাস্য সত্যৈবাস্তি ন সত্যতঃ
> অহো নু চিত্রং তেনেমে ভবন্তো বিশীকৃতাঃ॥"

জ্ঞান ইন্দ্রিয়যোগে বিষয় অনুভব করে, এখানে জ্ঞান, ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই তিনের মাত্র অস্তিত্ব বর্ত্তমান জ্ঞানে স্বীকার করা যায়। তদতিরিক্ত যে একটা পৃথক্ জ্ঞাতা অহং এর বোধ জন্মিতেছে, ইহা ভ্রান্তিবশেই হইতেছে মাত্র। যদি অহং এর কোনও সত্তাই না থাকে, তাহা হইলে তাহার আবার মৃত্যু কি? বন্ধ্যাপুত্রের নিধনে, গন্ধর্ব্ব নগরের ধ্বংসে ও স্বকল্পিত প্রেতদর্শনে যে দুঃখ বা ভয়, মৃত্যুর জন্যও যে ভীতি বা দুঃখ তাহাও তদনুরূপই। অর্থাৎ যাহার অস্তিত্বই নাই তাহার জন্যই শোক ও ভয়! এখানে কল্পিত আমিই কল্পনায় কল্পিত মৃত্যুভয়ে ভীত হয় মাত্র, স্বরূপতঃ মৃত্যু-ভীতির কোনও কারণ বা অবসর নাই।

কেহ কেহ বলেন "ম্রিয়তে মন এব হি", অর্থাৎ মৃত্যুটা মনেরই হয়। মন কি? 'সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মকং হি মনঃ' অর্থাৎ জ্ঞানের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক অবস্থাই মন। শাস্ত্রা-দিতেও দেখি "সঙ্কল্প-মনসি ভিন্নে ন কদাচন কেনচিৎ," অর্থাৎ সঙ্কল্প ও মন একই জিনিষ। জ্ঞানের সঙ্কল্প-বিকল্প প্রসূত বঞ্চলাবস্থাই মন নামে আখ্যাত। কাজেই সঙ্কল্প-বিহীনতা বা চঞ্চলতাহীন হওয়াই, মনের মৃত্যু। শাস্ত্র তাই বলেন—

> "যত্তু চঞ্চলতাহীনং তন্মনো মৃতমুচ্যতে"

জ্ঞানের সঙ্কল্প-বিকল্পের অবসানই যদি মনের লয় বা মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে লয় ত আমাদিগের সুষুপ্তি অবস্থায় প্রতিদিনই হইতেছে; আমরা ত সেজন্য অণুমাত্রও দুঃখিত বা ভীত হই না। কাজেই মরণটা মনের হইলেও তাহাতে ভয়ের কিছুই নাই। বিশেষ মনটা যখন জ্ঞানের একটা অবস্থাবিশেষ মাত্র এবং সে জ্ঞান অবিনাশী, তখন মনের মৃত্যুতে জ্ঞানের মৃত্যুসম্ভাবনা আদৌ নাই এবং ভয়েরও কিছুই নাই। বরং মনের লয়ে জ্ঞানের স্বরূপ-বিকাশ, এবং সেটা আনন্দেরই কথা; তাই শাস্ত্র বলেন—

> "মনস্তত্ত্বং গতে তস্য স্বয়মাত্মা প্রকাশতে"।

উপনিষদেও তাই দেখি—

> "মনোনাশো মহোদয়ঃ"

মৃত্যু বলিয়া একটা ব্যাপারই নাই, অথচ আমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ" হইয়াও মৃতিভয়ে শঙ্কিত; ইহারই বা কারণ কি? ইহার একই মাত্র কারণ—আমরা অমৃতের সন্ধান হইতে বিরত। দেহ, জড় ও চৈতন্যের সমষ্টি। প্রতি দেহেই সেই চৈতন্য বা অবিনশ্বর আত্মা বর্ত্তমান। ইঁহারই অপর নাম অমৃত, বিশোক, আনন্দ প্রভৃতি। আমরা সেই চৈতন্যকে দেহ হইতে পৃথক করিয়া অনুভব করিতে পারি না বলিয়াই অমৃতের আস্বাদন পাই না, এবং দেহের ধ্বংসকেই আত্মার ধ্বংস মনে করিয়া মরণভয়ে ভীত হই। মহর্ষি অষ্টাবক্র রাজর্ষি জনককে বলিয়াছেন—

> "যদি দেহং পৃথক্ কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি
> অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি॥"

দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া অনুভব করার কৌশল গুরুগম্য। গীতায় ঐ কৌশলকেই "যোগ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"। রাজর্ষি

জনকও বলিয়াছেন—"কুতশ্চিৎ কৌশলাদেব পরমাত্মা বিলোক্যতে", অর্থাৎ কৌশল দ্বারাই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। কোনও শাস্ত্র বলিয়াছেন আত্মা দেহে তিলগত তৈলের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন এবং যেমন তিলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেও তৈলের দর্শন পাওয়া যায় না অথচ কৌশল পূর্ব্বক নিষ্পেষণ করিলে তৈল পৃথগাকারে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কৌশল অবলম্বন করিলেই এই দেহেই দেহস্থ আত্মাকে পৃথক্‌ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। দুগ্ধের অণু পরমাণুতে ঘৃত অনুস্যূত ভাবে অবস্থান করিলেও যেমন তাহাকে লক্ষ্য করা যায় না, অথচ কৌশলপূর্ব্বক প্রক্রিয়া বিশেষে মন্থন করিলে ঘৃতাংশ পৃথক ভাবে পরিলক্ষিত হয়, দেহস্থ আত্মাকেও সেইরূপ কৌশলপূর্ব্বক দেহ-মন্থন দ্বারাই লাভ করিতে হইবে। ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

"যথাচ কশ্চিৎ পরশুং গৃহীত্বা, ধূমং ন পশ্যেদ্ জ্বলনং চ কাষ্ঠে।
তদ্বচ্ছরীরোদরপাণিপাদং, ছিত্ত্বা ন পশ্যন্তি ততো যদন্যৎ।
তান্যেব কাষ্ঠানি তথা বিমথ্য, ধূমং চ পশ্যেদ্ জ্বলনং চ যোগাৎ।
তদ্বৎ সুবুদ্ধিঃ সমমিন্দ্রিয়াত্মা বুদ্ধিঃ পরং পশ্যতি তং স্বভাবম্॥

অর্থাৎ যেমন কুঠার দ্বারা কাষ্ঠ ছিন্নভিন্ন করিলেও তাহার মধ্যে ধূম বা অগ্নি দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই রূপ দেহ ছিন্নভিন্ন করিলেও দেহস্থ আত্মার সন্ধান পাওয়া যায় না। আবার যেমন কৌশলপূর্ব্বক কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে ঐ কাষ্ঠেই ধূম ও অগ্নি দেখা যায়, সেইরূপ সুবুদ্ধি সাধক ইন্দ্রিয় ও মনের সমতা সম্পাদন করিয়া কৌশলপূর্ব্বক এই দেহকে মন্থন করিলেই দেহস্থ আত্মার দর্শন পাইতে পারেন। উপনিষদেও দেখি "স্বাচ্ছরীরাত্মুপলভেতমেনং" অর্থাৎ এই আত্মাকে স্বকীয় দেহ হইতেই লাভ করিতে হইবে। শরীরকে কি কৌশলে মন্থন করিলে আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়, তাহার আভাস উপনিষদাদি শাস্ত্রে দেওয়া থাকিলেও, সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে তাহা বোধগম্য হয় না ও গুরু-প্রদর্শিত কৌশল অবলম্বন করিয়া সেই মন্থন-ক্রিয়া দীর্ঘকাল অভ্যাস না করিলেও, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ফললাভ, অর্থাৎ আত্ম-দর্শন, হয় না। এবংবিধ সাধন-বলে দেহান্তর্বর্ত্তী অথচ দেহাতিরিক্ত আত্মস্বরূপের অনুভূতি জন্মিলেই মৃত্যুভয়-রহিত হওয়া যায়; সেই জন্যই শাস্ত্রাদিতে দেহস্থ আত্মার নিত্য ধ্যানের ব্যবস্থা—

"নিত্যমেব শরীরস্থমিমং ধ্যায়েৎ পরং শিবং"

কাজেই মৃত্যুভীতি হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে "যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ং" সেই অভয়পদ পরমাত্মার আশ্রয়ই একমাত্র উপায়, কারণ—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ,।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

তদ্ভিন্ন মৃত্যুভয়নিবারণের আর অন্য উপায় নাই। উপনিষদ্ তাই বলিয়াছেন—

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

সকল দিক দিয়া বিচার করিলেই দেখা যায়, মৃত্যুভয়টা একটা অকারণপ্রসূত কাল্পনিক সংস্কার মাত্র, উহার স্বরূপতঃ কোনও সত্তাই নাই। তবে যতদিন পর্য্যন্ত গুরূপদেশে সাধন দ্বারা দেহাত্মবোধ-রহিত না হওয়া যায় ততদিন কল্পিত অহং কল্পিত মৃত্যুর জন্য কল্পিত ভীতি অনুভব করে মাত্র। আত্ম-জ্ঞান বিকাশ পাইলেই সাধক দেখেন মৃত্যু বলিয়া একটা জিনিষই নাই; দেহেরও আত্যন্তিক নাশ নাই, আত্মার ত নাইই। দেহাত্মবোধরহিত হইয়াই রামপ্রসাদ গাহিয়া-ছিলেন—"আমি তোর আসামী নই রে শমন"। সাধক গোবিন্দ চৌধুরীও এই অবস্থা লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন—"কাল পেয়ে হ'লে মৃত্যুর দরশন, সখা ব'লে ক'রো আলিঙ্গন দান", এবং মৃত্যুকালে গাহিয়াছিলেন "চল্লেম রে ভাই আনন্দ কাননে"। মহাপুরুষগণ আত্মার দেহবন্ধনকে দুঃখকর মনে করেন ও সেইজন্য স্বেচ্ছায় দেহ ত্যাগ করেন, ইহার প্রমাণ শাস্ত্রাদিতে বহু দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগেও ভাস্করানন্দস্বামী, ত্রৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাদিগের দেহত্যাগ-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে পরিষ্কারই অনুমিত হয়, যেন দেহত্যাগটা তাঁহাদিগের বাঞ্ছনীয় ও আয়ত্তাধীন। এই সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াও যে আমরা মরণ-ভয়ে ভীত হই ইহার একই মাত্র কারণ আমাদিগের স্বরূপজ্ঞানের অভাব। আমাদিগের বর্ত্তমান জ্ঞান ভ্রান্ত, তাই বালক যেমন স্বকল্পিত প্রেতদর্শনে আতঙ্কিত হয় আমরাও সেইরূপ আমাদিগের ভ্রান্ত জ্ঞানের কল্পনা-প্রসূত মৃত্যুসম্ভাবনায় ভীত হই; স্বরূপতঃ ভীতির কোনও কারণই নাই।

মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে কতকগুলি বিপরীত উক্তি প্রচলিত আছে, এবং সেগুলি অনেক সময় অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ভ্রম জন্মাইয়া দেয়, যেমন "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"। এবংবিধ উক্তি যে ভ্রমাত্মক তাহা, অধ্যাত্ম শাস্ত্রাদিতে যে সমস্ত অখণ্ড যুক্তি ও বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার

অবতারণা না করিয়াও, সাধারণ জ্ঞান দিয়াই বুঝিতে পারা যায়। দশ বৎসরবয়স্ক বালকের সঙ্গীতনৈপুণ্য, অপর এক বালকের মৃদঙ্গাদি বাদনে পারদর্শিতা, ষোড়শ বৎসর বয়স্ক বালকের উচ্চ গণিতের কঠিন অঙ্ক (problems) নিজের উদ্ভাবিত নূতন ও সহজ উপায়ে সমাধান, এ সমস্ত ত আমরা সকলেই জানি। এটা সম্ভব হয় কেমন করিয়া? দেহ ভস্মীভূত হইলেই যদি আত্মা ভস্মীভূত হইত, তাহা হইলে অশিক্ষিত বালকের পক্ষে দীর্ঘ শিক্ষা ও অভ্যাসলব্ধ নৈপুণ্য প্রকাশ কি কখনও সম্ভব হইত? দেহ ভস্মীভূত হইলেও সংস্কারবিশিষ্ট আত্মা ভস্মীভূত হয় না, সংস্কারানুরূপ দেহ পুনরায় গ্রহণ করে ও সেই দেহে সংস্কারানুরূপ জ্ঞানের বিকাশ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"নৈনং দহতি পাবকঃ"। শ্রীমদ্ভাগবতেও তাই দেখি—

'দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মবশানুগঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥"

সংবাদ পত্রে কখনও কখনও জাতিস্মরের বিবরণ পাওয়া যায়। কোন জাতিস্মর তাহার পূর্ব্ব জন্মের বাটীতে তাহার নিজের বাক্সের ভিতর কি কি দ্রব্য ছিল তাহা বাক্স না খুলিয়াই বলিয়াছিল, এবং তাহার পূর্ব্ব স্বামী সেই বাক্সটী যথাযথ ভাবেই রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া জাতিস্মরের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছিল। এই সমস্ত সাধারণ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিলেই স্বীকার করিতেই হয় যে, দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও আত্মার ধ্বংস হয় না। কাজেই এক্ষেত্রেও দেহধ্বংসের জন্য মরণ-ভীতি সম্ভব নয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

অর্থাৎ লোকে যেমন এক ছিন্ন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নব বস্ত্র পরিধান করে, দেহস্থ আত্মাও সেইরূপ এক জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ গ্রহণ করেন। কাজেই ইহাতে ত দুঃখের বা আতঙ্কের কারণই নাই, পরন্তু নূতন দেহ লাভ হইবে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করাই উচিত। বশিষ্ঠদেব তাই বলিয়াছেন—

"মরিষ্যামি মরিষ্যামি মরিষ্যামীতি ভাষসে
ভবিষ্যামি ভবিষ্যামি ভবিষ্যামীতি নেক্ষসে॥"

অর্থাৎ কেবল মরিব মরিব বলিয়াই ভীত হইতেছ, তুমি যে নূতন হইবে তাহা বুঝিতেছ না কেন? "পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও এ বিষয়ে গভীর গবেষণা করিয়াছেন। Sir Oliver Lodge বলিয়াছেন—"We shall certainly survive when the body is destroyed." Fiske বলিয়াছেন—"Atoms may come and atoms may go and leave not a wreck behind, but this Power goes on for ever." Swedenborg বলিয়াছেন—"When the body is separated from the spirit which is called dying, the man still remains and lives." অন্য এক দার্শনিক বলিয়াছেন—"Do not deceive yourself that the spirit dies when the body dies. The spirit is sojourning in a temporary home."

কোনও কোনও ক্ষেত্রে একদেহ ত্যাগ ও অন্যদেহ গ্রহণ ত আমরা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করি। তৈলপায়িকার এক দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ, শুঁয়োপোকার প্রজাপতিত্ব প্রাপ্তিপ্রভৃতি ত ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ। সুতরাং আত্মা যে একদেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণ করেন, তাহাতে আর সন্দেহের কোনও কারণ নাই, এবং এই দেহপরিবর্ত্তনে ভীতিরও কোনই সম্ভাবনা নাই। আত্মার দেহপরিবর্ত্তন যদি আতঙ্কের হইত, তাহা হইলে বাল্য, কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্যভেদে আমাদিগের যে দেহপরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাতে এক দেহে অন্য দেহের অভাব পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করিয়াও আমরা এবংবিধ পরিবর্ত্তনে অনুমাত্র শঙ্কিত হই না কেন? স্বপ্নাবস্থায় যে আমরা বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া বিভিন্ন দৃশ্যাদি অনুভব করি, এবং জাগ্রদাবস্থায় যে সেই সমস্ত দেহের ও দৃশ্যের কোনও চিহ্নই থাকে না, সেজন্যও ত আমরা শোক প্রকাশ করি না, এবং নিদ্রা আসিলে বর্ত্তমান দেহ থাকিবে না বলিয়া ভীতিও ত জন্মে না। বীজ হইতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এটা কি বীজের মৃত্যু ও বৃক্ষের জন্ম? বৃক্ষের জন্মটা বীজের মৃত্যু নয়, বীজেরই বৃক্ষাকারে পরিবর্ত্তন বা পরিণতি, অর্থাৎ বৃক্ষ বীজের একটা উল্লাসাত্মক বিলাস মাত্র। সেইরূপ আমাদিগেরও দেহ হইতে দেহে যে পরিবর্ত্তন, তাহাকে মৃত্যু বলা যায় না, পরিবর্ত্তন বা পরিণতি মাত্র বলা যাইতে পারে। এ পরিবর্ত্তনে আতঙ্কের স্থান কোথায়? আর যদি দেহান্তরপ্রাপ্তিতে পূর্ব্বদেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বলিয়াই ধারণা জন্মে, তাহা হইলেও ত দুঃখের বা ভয়ের কোনও কারণ নাই, বরং নূতন দেহ লাভ হইবে এই চিন্তায় আনন্দে উৎফুল্ল হওয়াই উচিত। শাস্ত্রও তাই বলেন—

"দেহাদ্দেহান্তরপ্রাপ্তৌ নব এব মহোৎসবঃ"

কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা
৯ই মাঘ, ১৩৩৮

সোভিয়েট রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্প

শ্রীপঞ্চশিখ ভট্টাচার্য্য

গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা-নির্ণায়ক কমিশন (State Planning Commission) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক কর্ম্ম-প্রণালীর বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকের হয় ত প্রথম পঞ্চবার্ষিক কর্ম্ম-প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানা না থাকিতে পারে, এই আশঙ্কায় প্রথমে প্রথম পঞ্চবার্ষিক কর্ম্ম-প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১৯১৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী ও স্বেচ্ছাচারী রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসের পতনের পর মহাপুরুষ লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্র শাসন-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রবিপ্লবের পর দেশে আভ্যন্তরীণ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের সর্ব্ব প্রকার উন্নতি ও মঙ্গলবিধানের জন্য মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লেনিন তাঁহার সহকর্ম্মিগণের হস্তে যে কর্ম্মপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের ভার প্রদান করিয়া যান তাহাই প্রথম পঞ্চবার্ষিক কর্ম্ম-প্রণালী (Five-year Plan) নামে বিখ্যাত। লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ষ্টালিন ১৯২৮ সালে ঐ কর্ম্ম-প্রণালী অনুসারে কর্ম্ম আরম্ভ করেন; ১৯৩২ সালে উহার উদ্‌যাপন হইবে। এই কর্ম্মপ্রণালী অবলম্বনের ফলে রাশিয়া কৃষি, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি সকল দিক দিয়া পৃথিবীর যে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলে মনে হয় স্বাধীন ও প্রজাতন্ত্র দেশের পক্ষে সবই সম্ভব।

শিক্ষার দিক দিয়া রাশিয়ার অবস্থা আমাদের মতই শোচনীয় ছিল। দেশে যাহাতে এক জন লোকও নিরক্ষর না থাকে তজ্জন্য সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যে অপূর্ব্ব আয়োজন করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পূর্ব্বে রাশিয়ায় শতকরা সাত আট জন মাত্র শিক্ষিত লোক ছিল। পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালী প্রবর্ত্তনের পর ইতিমধ্যেই শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৮৪ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আশা করিতেছেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালী উদ্‌যাপিত হইলে অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে দেশের একটি লোকও আর নিরক্ষর বা অশিক্ষিত থাকিবে না।

পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালী অনুসারে পনের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক বালক বালিকার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ইহার ফলে প্রতিবৎসর দেড় কোটিরও অধিক বালক বালিকা বিদ্যাশিক্ষা করিতে বাধ্য হইবে। ১৯৩০ সালে এক কোটি দশ লক্ষ বালক বালিকা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়াছিল। ১৯৩১ সালে শিক্ষা বিভাগের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য তিন শত বিরাশী কোটী কুড়ি লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। ১৯৩২ সালে ঐ বিভাগের ব্যয়ের পরিমাণ হইবে চারি শত একান্ন কোটি আশী লক্ষ টাকা। সুদূর সীমান্তবাসী অল্প-সংখ্যক অনুন্নত জাতিকে বাদ দিয়া সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ার আট হইতে এগার বৎসরবয়স্ক প্রত্যেক বালক বালিকাকে ১৯৩৩—৩৪ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সুবিধা দিতে পারিবেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট আশা করিতেছেন। ১৯২৮ সালে পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালী প্রবর্ত্তনের প্রাক্‌কালে বিদ্যালয়ে গমনকারী উক্ত-বয়স্ক বালক বালিকাগণের সংখ্যা ছিল পচানব্বুই লক্ষ। ১৯৩৩ সালে ঐ সংখ্যা যাহাতে এক কোটি সত্তর লক্ষ হয় তজ্জন্য ব্যবস্থামত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বত্র পাঠাগার স্থাপন, ভ্রাম্যমাণ পুস্তকাগার প্রবর্ত্তন, সংবাদ-পত্র বিতরণ এবং উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করিয়া গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিস্তারের এক বিরাট ও অভূতপূর্ব্ব আয়োজন করিয়াছেন। ১৯৩০ সালে পাঠাগারের সংখ্যা হইয়াছে তেত্রিশ হাজার এবং পুস্তকাগারের সংখ্যা চল্লিশ হাজার।

শিল্পক্ষেত্রে রাশিয়াকে বিশ্ববরেণ্য এবং অন্যনিরপেক্ষ করাও পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য। তাই শিল্পশিক্ষাবিস্তারের জন্যও প্রভূত আয়োজন এবং বিশিষ্ট ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক, অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিত, কৃষিবিশারদ এবং শিক্ষিত কার্য্যাধ্যক্ষের প্রয়োজন। এই সকল বিদ্যায় বিশেষ শিক্ষা দিয়া পারদর্শী করিবার জন্য বারটি শিল্প-কলেজ ও একশত পচাত্তরটি উচ্চশ্রেণীর শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল স্কুল কলেজে চৌষট্টি হাজারেরও অধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে এবং ইহাদের মধ্যে শতকরা নব্বুই জনই

সরকারী বৃত্তিভোগী। গত দশ বৎসরে প্রায় পনের লক্ষ শ্রমিক (manual workers) শ্রমিক সংঘের বিদ্যালয়, কারখানা সমূহের বিদ্যালয় এবং নিম্ন টেক্‌নিক্যাল স্কুলসমূহে নানা বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে পনের কোটি। ইহাদের সর্ব্ববিষয়ক সাধারণ জ্ঞান যাহাতে বাড়িতে পারে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৯২৮ সালে সাড়ে তিন লক্ষ রেডিও ষ্টেশন এবং আট হাজার পঞ্চাশটি সিনেমা স্থাপন করিয়াছেন। পাঁচ বৎসরে যাহাতে উহা যথাক্রমে সত্তর লক্ষ এবং পঞ্চাশ হাজার হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই পঞ্চাশ হাজার সিনেমার মধ্যে চৌদ্দ হাজার সিনেমা বিদ্যালয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—উহা দ্বারা বিদ্যালয়ের বালক বালিকাদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। সাধারণের মধ্যে সংবাদপত্র প্রচারেরও বিপুল আয়োজন হইয়াছে। সংবাদপত্রের গ্রাহকসংখ্যা সতের লক্ষের স্থলে পঞ্চাশ লক্ষ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মোটের উপর, শিক্ষাসম্বন্ধে সকল দিক হইতে এমন সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে, যাহাতে দেশে একটি লোকও আর নিরক্ষর না থাকে এবং স্কুল কলেজের পাঠ শেষ করিয়া যাহাতে সকলেই প্রকৃষ্ট নাগরিকরূপে সংসারে প্রবেশ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

১৯২৮ সাল হইতে পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালী অনুসারে শিল্পের দিকে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কি প্রচুর আয়োজন ও অর্থব্যয় করিতেছেন নিম্নে তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। ১৯২৯ সালে তিন শত ত্রিশ কোটি টাকা এবং ১৯৩০ সালে ছয় শত ষাট কোটি টাকা শিল্পায়তনপ্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যয়িত হইয়াছে। ঐ উদ্দেশ্যে পাঁচ বৎসরে মোট দুই হাজার সাত শত কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছে। আমাদের দেশেরই মত রাশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ অপরিমিত। ইহার সদ্ব্যবহারের জন্য পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালীতে অতি সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ফলে কোটি কোটি বিঘা অসমতল প্রান্তর শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। রাশিয়ার উত্তরস্থ তুষারাবৃত বিস্তৃত বনভূমি হইতে অপর্য্যাপ্ত পশুলোম ও বাহাদুরী কাষ্ঠ পাওয়া যাইবে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহ-খনিগুলিতে বহু শতাব্দী ধরিয়া কার্য্য করিলেও উহাদের লৌহ নিঃশেষ হইবে না। সমগ্র জগতে যত কেরোসিন তেল জন্মায় তাহার এক তৃতীয়াংশেরও অধিক এক রাশিয়াতেই উৎপন্ন হয়। লৌহ,পারদ, নিকেল, অভ্র, লবণ, প্লাটিনাম, ম্যাঙ্গানিজ, এসবেষ্টস্‌, সোনা, রূপা, তামা, সীসা এবং হীরক প্রভৃতি বহুমূল্য ধাতু এবং প্রস্তরের খনিও দেশে অপর্য্যাপ্ত। এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদ যাহাতে দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারে তজ্জন্য পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালীতে যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৩০ সালে গবর্ণমেণ্ট সাতশত কোটি টাকা ব্যয়ে তেষট্টিটি শিল্প-কারখানা ও বৈদ্যুতিক শক্তির যন্ত্রাগার স্থাপন করিয়াছেন।

রাশিয়া আমাদের দেশের মত কৃষিপ্রধান দেশ। উহার বিস্তৃতি তিরাশী লক্ষ বর্গ মাইল—পৃথিবীর স্থলভাগের এক ষষ্ঠাংশ। কৃষিসম্পদে দেশ যাহাতে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে তজ্জন্য পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালীতে পাঁচ বৎসরের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য বার হাজার নয়শত কুড়ি কোটি টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দুই কোটি ষাট লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রের কতকগুলিকে একত্রিত করিয়া এক একটি বৃহৎ ক্ষেত্র গঠন করা হইয়াছে। বহু লক্ষ কলের লাঙ্গল, উন্নত কৃষিযন্ত্র ও উত্তম সার আধুনিক উন্নততম বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে ব্যবহার করিয়া উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কৃষকগণকে আধুনিক উন্নততম কৃষিপ্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য এক লক্ষ লোককে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিয়া ১৯৩১ সালে একটি "কৃষি-সৈনিক দল" গঠন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও পঞ্চাশ হাজার যুবককে ঐ কার্য্যে ব্রতী করা হইবে।

কৃষিক্ষেত্রসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং কৃষকগণের অবস্থার উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালীতে চারি হাজার ছয়শত কোটি টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রগুলির সমষ্টীকরণ ব্যাপারে আটানব্বুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক শত কৃষক পরিবার অর্থাৎ শতকরা ৩৯·৬ জন কৃষক যোগ দিয়াছে। কলের লাঙ্গল দিয়া কৃষকগণকে সাহায্য করিবার জন্য উপযুক্ত স্থানে দেশময় ট্রাক্টর-(কলের লাঙ্গল) ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক ট্রাক্টর-ষ্টেশন প্রায় পঁচিশ সহস্র কৃষককে সাহায্য করে। ১৯৩০ সালের

শরৎ কালে প্রায় দুই শত ট্রাক্টর-ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে এবং উহাদ্বারা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ কৃষক সাহায্য পাইতেছে। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ শতকরা প্রায় ত্রিশগুণ বাড়িয়াছে। উন্নত কৃষিপ্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য ২২০টি কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহা হইতে সাধারণ কৃষকগণকে যন্ত্রপাতি ও উত্তম বীজ ধার দেওয়া হয়। ১৯৩১ সালের মধ্য ভাগেই পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালীতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার দ্বিগুণসংখ্যক সমষ্টীকৃত ক্ষেত্র গঠিত হইয়াছে অর্থাৎ সতের কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বিঘা জমি সমষ্টীকৃত হইয়াছে।

কৃষকগণের মধ্যেও শিক্ষাবিস্তারের প্রচুর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক বহু পত্রিকা এবং অসংখ্য পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপন নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া কৃষকের কুটীরে প্রেরিত হইতেছে। ১৯৩০ সালে "কৃষক গেজেট"এর গ্রাহকসংখ্যা সতের লক্ষ হইয়াছিল —উহা চারি পৃষ্ঠার এক খানি ছোট কাগজ। যে সকল কৃষক সবেমাত্র লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের জন্য এক স্বতন্ত্র "গেজেট" প্রাথমিক শিক্ষাপুস্তকের ন্যায় বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে এই গেজেট প্রথম প্রকাশিত হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই ইহার গ্রাহকসংখ্যা তিন লক্ষ বিশ হাজার হয়। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক বক্তৃতার সার মর্ম্ম, সরকারী বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম, বীজবপন, শস্যকর্ত্তনপ্রভৃতি সাময়িক কৃষিকর্ম্মসম্পর্কীয় বিবরণ অতি সরল ভাষায় এই গেজেটে মুদ্রিত করিয়া কৃষক-সাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়। কৃষকের ও কৃষির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে পঞ্চবার্ষিক কর্ম্ম-প্রণালীর সম্পূর্ণ দৃষ্টি থাকায় এই কয় বৎসরের মধ্যেই কৃষকের অবস্থার অতি আশ্চর্য্যরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

জলপথ ও স্থলপথে গমনাগমন এবং পণ্যাদিবহনের জন্য বহু সহস্র মাইল রেল ও ষ্টীমার পথ খোলা হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের উপযোগী মোটর, বাস ও লরীতে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। ১৯২২ সালে এরোপ্লেন চালাইবার জন্য প্রথম বিমানপথ খোলা হয়। ১৯৩১ সালে ব্যোমযানের ব্যবহার প্রায় দশ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মস্কো হইতে কনিগ্‌সবার্গ যাতায়াতের জন্য ১৯২২ সালে একটি রুশো-জার্ম্মান কোম্পানী গঠিত হয়। ১৯২৩ সালে ডব্রলেট, উক্রেনিয়া ও ট্রান্স-ককেসিয়ান নামক তিনটি সোভিয়েট বিমানবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তিনটির মধ্যে ডব্রলেট সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ডব্রলেটএর বিমানপথের বিস্তার প্রায় সাড়ে তিন হাজার মাইল। ডবলেট প্রতিষ্ঠার ফলে মধ্য এসিয়া ও সাই-বিরিয়ার যে সকল স্থানে যাতায়াত বহু ব্যয়সাধ্য ছিল তাহা দূরীভূত হইয়াছে। উক্রেনিয়া কোম্পানীর পথের বিস্তার প্রায় এক হাজার আট শত পাঁচ মাইল। এই কোম্পানীর প্রধান পথ মস্কো হইতে পারস্য দেশের পেথলেভি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ডরুলাফট নামে আরও একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পথের বিস্তৃতি প্রায় এক সহস্র ছয় শত পঞ্চাশ মাইল। ইহাদিগের প্রধান পথ দুইটি—একটি মস্কো, রিগা ও কনিগ্‌সবার্গ হইয়া বার্লিন পর্য্যন্ত এবং অন্যটি লেনিন-গ্রাড হইতে রেভাল হইয়া রিগা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা ছাড়া ইহার বহু শাখাপথও আছে।

পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালী অনুসারে ব্যোমযান চলাচলের জন্য অনেক নূতন পথ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ১৯৩৩ সালের মধ্যে বিমান-পথের বিস্তার প্রায় সাড়ে ছাব্বিশ হাজার মাইল অর্থাৎ বর্ত্তমানে যত মাইল পথ আছে তাহার প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি করা হইবে স্থির হইয়াছে। পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভ্লাডিভষ্টক হইতে জাপানের রাজধানী টোকিও পর্য্যন্ত বিমান-পথ বিস্তার করা হইবে। সাইবিরিয়ার অভ্যন্তরে যে সকল প্রদেশ দুর্গম বলিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, সেই সব প্রদেশে বিমানপথ খুলিয়া যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্য সুগম করা হইয়াছে। প্রধান প্রধান বিমানপথ গুলিতে সকল ঋতুতে চব্বিশ ঘণ্টাই এরোপ্লেন যাতায়াত করিয়া থাকে। পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মধারা কার্য্যে পরিণত করিতে সহস্র সহস্র বিমানপোতের দরকার বলিয়া বিদেশ হইতে উহাদের ক্রয় বন্ধ করিবার জন্য বিমান-যানের বহুসংখ্যক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। অল্প কাল মধ্যেই সোভিয়েট রাশিয়া আর পরমুখাপেক্ষী থাকিবে না বলিয়া আশা করিতেছে। যাত্রী ও পণ্যাদিবহন ব্যতীত বিমান-যানগুলি ব্যোমপথে ফটোগ্রাফ তুলিবার এবং শস্যক্ষেত্রে কীটনিবারক ঔষধসমূহ ছড়াইবার জন্যও যথেষ্টরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

রাশিয়ার প্রায় সমস্ত স্থানই সমুদ্র হইতে অত্যন্ত দূরবর্ত্তী বলিয়া জাহাজশিল্প ও পোতবাহিত ব্যবসায়ে রাশিয়া অত্যন্ত

পশ্চাদপদ্ এবং তজ্জন্য তাহাকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ইহার প্রতিকারের জন্য বহু সহস্র কোটি টাকা ব্যয়ে রাজধানী মস্কৌ হইতে বাল্টিক সাগর এবং মস্কৌ হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত দুইটি অতি প্রকাণ্ড খাল কাটান হইবে স্থির হইয়াছে। এইখাল পাশে এত বড় হইবে যে, তাহা দিয়া চারিখানি বড় বড় জাহাজ অনায়াসে পাশাপাশি যাতায়াত করিতে পারিবে। ইহা খনিত হইলে রাশিয়ার পোতবাহিত ব্যবসায়ের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইবে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় পরের অর্থ ও শ্রমে পরিপুষ্ট ধনী নাই। সেখানকার বড় বড় সকল ব্যবসায়ই গবর্ণমেণ্টের হাতে; সুতরাং সেখানকার সকলকেই নিজ নিজ শিক্ষা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়—কাজেই রাষ্ট্রের অধিবাসীরা সকলেই শ্রমিক ও কর্ম্মচারী। ইহাদের অবস্থার উন্নতিবিধানের দিকে গবর্ণমেণ্টের বিপুল চেষ্টা রহিয়াছে। ১৯২৭-২৮ সালে শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদিগের (কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, কারখানা প্রভৃতি রাশিয়ার সমস্ত কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে) মোট সংখ্যা ছিল এক কোটি নয় লক্ষ নিরানব্বুই হাজার। ইহাদের নিম্নলিখিত গড়পড়তা বার্ষিক বেতনের ক্রমশঃ বৃদ্ধি দেখিলেই বুঝা যাইবে প্রজাদের অবস্থার উন্নতির দিকে গবর্ণমেণ্টের কত দৃষ্টি।—১৯২২-২৩—৩৬০৲; ১৯২৩-২৪—৭১০৲; ১৯২৪-২৫—১০৪২৲; ১৯২৫-২৬—১২৯৬৲; ১৯২৬-২৭—১৪৪৮৲; এবং ১৯২৭-২৮ সালে--১৬০৪৲ টাকা। এককথায় বলিতে গেলে সেখানে রাজা প্রজা বলিয়া কিছু নাই। রাষ্ট্রের অধিবাসীরা যেমন রাষ্ট্রের তথা সমষ্টির উন্নতি ও রক্ষণের জন্য পরিশ্রম করে রাষ্ট্রও তেমনি প্রত্যেক অধিবাসী তথা ব্যষ্টির জীবিকানির্ব্বাহ, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা ও কৃষ্টির উন্নতি, নিয়মিত বিশ্রাম, খেলা ও আমোদ প্রভৃতি নানা প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছে। পঞ্চবার্ষিক কার্য্যপ্রণালীর এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য আছে। শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদিগের পুষ্টিকর আহার, সন্তানগণের প্রতিপালন ও শিক্ষা, বৎসরে নিয়মিত ছুটি, চিকিৎসা, রেলপ্রভৃতিতে বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ, প্রয়োজন হইলে বিনাব্যয়ে স্বাস্থ্যনিবাসে বাসপ্রভৃতি নানা হিতকর অনুষ্ঠানের বিধান ও ব্যবস্থা এই পঞ্চবার্ষিক প্রণালীতে সুনির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৯২৮ সালে আরব্ধ পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালীর উদ্‌যাপন ১৯৩২ সালে হইবে। সুতরাং ১৯৩২ সাল শেষ না হইলে উহার ফলাফলের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইতে পারে না এবং বিচারও চলে না। তবে বার্ষিক যতটা বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং কৃষি, শিক্ষাবিস্তার, শিল্প, ব্যবসায় ও যানবাহন প্রভৃতির যে অভাবনীয় উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহাতেই সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। রাশিয়ার এই উন্নতি ও প্রগতিতে সমস্ত বিশ্বের রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যপ্রভৃতির বর্ত্তমান ধারা অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়াছে এবং উহার গতি আর পূর্ব্বপথে চলিবে না বলিয়া সকল দেশের সকল মনীষীরই বিশেষ বিবেচনা ও চিন্তার বিষয় হইয়াছে। অধিকন্তু, প্রথম পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালীর সম্পূর্ণ উদ্‌যাপন ও ফলাফল প্রকাশিত না হইবার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঘোষিত হওয়ায় সমগ্র বিশ্ব একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমজ্জিত এবং সন্ত্রস্ত হইয়াছে। ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপের ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজ্যগুলি এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যখন দিন দিন বেকারের আর্ত্তনাদ বাড়িতেছে; পৃথিবীর সর্ব্বত্র যখন অর্থনৈতিক সমস্যা দিন দিন জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে; ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইটালী প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি যখন ঋণদায়ে জর্জ্জরিত; পৃথিবীর সর্ব্বত্র যখন একটা প্রচ্ছন্ন রণসজ্জার উন্মাদনা এবং যখন দিগন্তে রণদেবতার ভেরীনিনাদও শুনা যাইতেছে সেই সময়ে সোভিয়েট রাশিয়ার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালীর ঘোষণা সকলের পক্ষেই বিস্ময়ের বিষয় নহে কি? নিম্নে সংক্ষেপে এই দ্বিতীয় বার্ষিক সঙ্কল্পের সার মর্ম্ম বিবৃত হইল।

নূতন কর্ম্ম-প্রণালীর তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য। উহাদিগকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে ফলপ্রসূ করিতেই হইবে। উদ্দেশ্য তিনটি এই—(১) কাঁচা মাল উৎপাদনের মূল ভিত্তিগুলির আরও প্রসার; (২) শিল্পজাত দ্রব্যাদির আরও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি এবং (৩) রাষ্ট্রের সমগ্র মানবের জীবিকা ও বাসস্থানাদির আরও উন্নতিবিধান। ১৯৩৭ সালের মধ্যে রাশিয়া যাহাতে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান শিল্প-কেন্দ্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা প্রায় দেড় গুণ অধিক শিল্প-জাত দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে এই কর্ম্ম-প্রণালীতে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে সোভিয়েট

রাশিয়ার শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ তিন গুণ বাড়াইতে হইবে। উরাল পর্ব্বতের উত্তর ও পূর্ব্বে যে বিস্তৃত অনুর্ব্বর ভূমি পড়িয়া রহিয়াছে (Asiatic and Arctic Russia)— যাহার পরিমাণ রাশিয়া বাদ ইউরোপের ভূভাগের তিন গুণ— উহাকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে শস্যসম্পদশালী একটি সমৃদ্ধ প্রদেশে ও শিল্পকেন্দ্রে পরিণত করিতে হইবে। ফলে ইহা দ্বিতীয় ইউরোপ হইয়া দাঁড়াইবে।

কৃষির দিকে এবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। এবার যাহাতে সর্ব্বত্র কলের লাঙ্গল এবং কৃষি-যন্ত্রের প্রচলন হয় এবং যাহাতে একটি ক্ষেত্রও উহা হইতে বাদ না পড়ে, সেই দিকে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসরই শস্যোৎপাদক ক্ষেত্রের সংখ্যা সাত কোটি হইতে সাড়ে নয় কোটি বিঘা করিয়া বাড়াইতে হইবে। ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, উৎপন্ন শণ ও তুলার পরিমাণ দ্বিগুণ এবং বিটচিনির পরিমাণ তিন গুণ বর্দ্ধিত করিতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালী অনুসারে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অন্ততঃ এক শত ত্রিশ কোটি হন্দরে (এক শত বিরাশী কোটি মণে) পরিণত করিতে হইবে। কৃষি ও কৃষকের উন্নতির দিকে কার্য্য করিতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালী অনুসারে যত অসুবিধা ও বাধা হইয়াছিল এবার তাহা না থাকায় গবর্ণমেণ্টের আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হইবার সম্ভাবনা।

শিল্প, কৃষি, যানবাহন প্রভৃতির জন্য বিদেশ হইতে আর যাহাতে যন্ত্রাদি আমদানী না করিতে হয় অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে সোভিয়েট রাশিয়া কলকব্জার দিক হইতে যাহাতে সম্পূর্ণ অন্যনিরপেক্ষ এবং স্বাধীন হইতে পারে সেই দিকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালীর তীব্র দৃষ্টি ও প্রচেষ্টা লক্ষ্যের বিষয়। বৈদ্যুতিক শক্তি বাড়াইবারও বিরাট আয়োজন হইয়াছে। ১৯৩২ সালের মধ্যে উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ সতের শত কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা (Kilowatt hours) হইবে। ১৯৩৭ সালের মধ্যে উহার পরিমাণ দশ হাজার কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সাইবিরিয়ার নদীসমূহের জল-শক্তির সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত করিয়া মধ্য এসিয়াস্থিত সমগ্র ভূভাগকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করিতে হইবে। বর্ত্তমান বৎসরে উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ হইবে নয় কোটি টন অর্থাৎ দুই শত পয়তাল্লিশ কোটি পঁচিশ লক্ষ মণ। কয়লার পরিমাণ পঁচিশ কোটি টন অর্থাৎ ছয় শত একাশী কোটি পঁচিশ লক্ষ মণ, লোহার পরিমাণ দুই কোটি কুড়ি লক্ষ টন অর্থাৎ ষাট কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মণ, এবং তেলের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়াইয়া তিন গুণ করিতে হইবে। রেলওয়ে বিস্তারের দিকেও কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি কম নহে। আঠার হাজার সাত শত পঞ্চাশ মাইল নূতন রেলওয়ে নির্ম্মিত হইবে এবং সমস্ত লাইনই বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইবে। রেলওয়ে দ্বারা মাল বহনের ব্যবস্থার আরও উন্নতি করিতে হইবে। খাল খনন, বিমান-পথের বিস্তার ও মোটর যাতায়াতের উপযোগী রাস্তানির্ম্মাণের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

শ্রমিক ও কৃষকের আহার, বিহার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও কর্ম্মপ্রণালীর বিশেষ লক্ষ্য আছে। মাখন, মাংস, দুধ, তরিতরকারী প্রভৃতি জনসাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং কারখানায় তৈয়ারী নানাবিধ বিলাসোপকরণ— সকলেরই পরিমাণ চার পাচ গুণ বাড়াইতে হইবে স্থির হইয়াছে। কলকব্জা, কারখানা প্রভৃতি সমস্ত বিভাগই যাহাতে দেশীয় বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে, বিদেশ হইতে যাহাতে আর বিশেষজ্ঞগণকে আনাইবার প্রয়োজন না হয়, সে দিকেও গবর্ণমেণ্ট বিশেষ অবহিত। এইজন্য শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায় হইতে বহু লোককে হাতেকলমে শিখাইয়া বিশেষজ্ঞ তৈয়ারী করিবার বিরাট আয়োজন হইতেছে। আমেরিকা ও ইউরোপের বিশেষজ্ঞগণ হইতে তাহারা কোন অংশে নূ্যন না হয় ইহাই কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্কল্প। রাষ্ট্রব্যবস্থানির্ণায়ক কমিশন ঘোষণা করিতেছেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রণালী যে ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া সকল দিক হইতে বিদেশের সাহায্য-নিরপেক্ষ ও স্বাধীন হইবে এবং বিশ্বদরবারে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। এই জন্য বাহির হইতে যাহাতে কোন আক্রমণ না হয় বা যুদ্ধবিগ্রহে যাহাতে লিপ্ত হইতে না হয় তজ্জন্য সোভিয়েট রাশিয়া ধীরে ধীরে প্রায় সকল দেশেরই সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি যাহাতে আর রণ-সম্ভার বাড়াইয়া অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপক যুদ্ধের সূচনা না করে, সে জন্য সোভিয়েট রাশিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের (League of Nations) প্রায় সকলকেই সতর্ক করিয়া দিতেছে।

শিক্ষা, কৃষি, শিল্প এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জীবিকা ও বাসস্থানাদির উন্নতি প্রভৃতির দিক দিয়া সোভিয়েট রাশিয়া যে অভিনব অভিযান আরম্ভ করিয়াছে, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অপূর্ব্ব। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র ইহার আদর্শ গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ দেশের উন্নতিকল্পে কতটা অগ্রসর হয়, তাহা নির্ভর করিতেছে উপরি উক্ত কর্ম্ম প্রণালীর পূর্ণ সাফল্যের উপর। তাই ফলাফল জানিবার জন্য সকল দেশই উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে এবং ইতিমধ্যে সাফল্যের যতটা বিবরণ জানা গিয়াছে, তাহাতে সকলেরই উৎকণ্ঠার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; কারণ বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর কোন দেশই আর উন্নতিশীল অপর দেশের কর্ম্মপন্থাকে অবহেলা করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারিবে না—সকলকেই হয়ত ধীরে ধীরে রাশিয়ার পথে চলিতে হইবে।

।-সুন্দর

—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

উড়ায়ে ঝঞ্ঝার রথ মেঘে মেঘে মেলি' জটা-জাল,
ইরম্মদে তুলি' নাদ কাঁপাইয়া দিক-চক্রবাল,
হে রুদ্র-সুন্দর, যবে যাত্রা কর বাজায়ে ডমরু,
প্রেম-কুঞ্জ জ্বলে' উঠে হাহাকারে কেঁপে উঠে মরু।
তব সেই নর্ত্তনের মাঝে,
ত্রিলোক-যাত্রার গান প্রলয়ের ছন্দ হ'য়ে বাজে।
ভূকম্পনে বন্যা-রোলে শুনিয়াছি বম্ বম্ রব,
মৃত্যুর শ্মশানে নাচো হে ক্ষ্যাপা ভৈরব!
দাবদগ্ধ বৈশাখের মধ্যাহ্নের উদ্দাম পবনে,
বর্ষার ঝর্ঝর ধারে শরতের স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে,
হেমন্তের হেম কান্তি—হিমানীর হিম-তপস্যায়
বসন্তের মধুগন্ধে—চিত্তভরা উৎসব-সভায়,
নিত্য তব ছন্দ বাজে। এ সৃষ্টির সাগর মথিয়া,
উঠিল মরণ-বিষ। তাথৈ তাথৈ থিয়া থিয়া—
নাচি' ওগো মত্ত ভোলা, আনন্দে সে বিষ করি' পান,
হে রুদ্র, গাহিলে তুমি মৃত্যু-বীজে মৃত্যুঞ্জয়ী গান।
রূপে রূপে রসে রসে গাঁথো তুমি আনন্দের মালা,
অনাদি সৃষ্টির গীত বহে তব বন্দনার ডালা।
সৌন্দর্য্যের কলা-লক্ষ্মী রস-ভাণ্ড বহি' নিজ হাতে,
তোমার চরণ-প্রান্তে জেগে উঠে তরুণ-প্রভাতে।
বর্ণে বর্ণে খচি' বিশ্ব তোমারে সে নিত্য দেয় ডালি,
নরে নরে নারায়ণ দেয় তব সন্ধ্যারতি জ্বালি'
জ্যোতি-উপবীতে তব গ্রহে গ্রহে বেজে উঠে তাল,
জন্ম মৃত্যু বুকে করি' নেচে উঠে ইহ-পরকাল।
তোমার আনন্দ-কেন্দ্রে দেবেন্দ্র বিভোর সুধাপানে,
মহাকাল কেঁদে কেঁদে ফিরে নিত্য আয়ুর সন্ধানে,
তব নৃত্য-তালে-তালে। ব্যোমে ব্যোমে
বাজায়ে ওঙ্কার,
সৃজন-সঙ্গীতে গাঁথো' সত্য-শিব-সুন্দরের হার।
মার্কণ্ডে মাভৈঃ দিয়া ঝলে নিত্য
তোমার ত্রিশূল
ললাটে উজলে চাঁদ শিরে গঙ্গা বহে কুলকুল।
দক্ষ-যজ্ঞে হেরি' তুমি সতী-মৃত্যু পতি-অপমানে,
রুদ্ররূপে দাঁড়াইলে বহ্নি জ্বালি তৃতীয় নয়ানে।
শিবহীন এ বিশ্বের যজ্ঞবেদী কাঁপে থর থর,
নৃসিংহের ধ্বংসরূপী নমঃ নমঃ হিরণ্যের ডর।
ধ্বংসের কিশোর রূপে গর্জ্জিয়াছ তুমি মথুরায়,
সাগরে জাঙ্গাল বাঁধি' পশিয়াছ কণক-লঙ্কায়।
কাঁপিয়া উঠুক পুনঃ আজি ওগো হিমাদ্রি মৈনাক্,
কালীয়ের শিরে নাচি' দেহ বিশ্বে মৃত্যুজয়ী ডাক্!
জীর্ণ কাম-জগতের পূতিগন্ধ ভরা তরু-মূল,
উপাড়িয়া রুদ্রদেব, কর তারে কর গো নির্ম্মূল।
দেব-জন্ম-বীজে পুনঃ এ নিখিলে কর গো নির্ম্মাণ,
হে রুদ্র-সুন্দর, গাহ নীলকণ্ঠে সৃজনের গান।

মানুষের উৎপত্তি ও ক্রমাভিব্যক্তি

—শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

বিগত শতাব্দীতে বিজ্ঞানবীর দারুইন এই কথা প্রচার ক'রলেন যে মানুষ অন্যান্য ইতর জীবের সঙ্গে এক রক্তের সম্বন্ধে বদ্ধ; অন্যান্য ইতর জীব যেমন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন পদ্ধতিতে নিম্নতর অন্য এক জীব হ'তে অবস্থাগুণে রূপান্তর লাভ ক'রে এসেছে মানুষও তেমনি ঐ প্রণালীতেই অন্য এক অজ্ঞাতকুলশীল ইতর জীব হ'তে রূপান্তর লাভ ক'রে বর্ত্তমান দ্বিপদ, ভাষাভাষী, বুদ্ধিজীবী শ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত হ'য়েছে। বর্ত্তমানে জীবিত বনমানুষরা মানুষেরই দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতিভ্রাতা ও গিবন গরিল্লা প্রভৃতি বানররা এবং মানুষ উভয়েই এক আদি জীব শাখার দুই ভিন্ন প্রশাখা-বংশ। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সুসভ্য ইয়ুরোপের ধর্ম্ম ও সমাজের পাদরী পুরুষরা খেপে উঠে সমস্বরে দারুইনকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। দারুইনের মতকে লোক-সমাজে হেয় করবার জন্যও বটে আর কতকটা বুদ্ধিবিভ্রাট বশতঃ গলাবাজি ক'রে তাঁরা জানাতে লাগলেন যে দারুইন ধর্ম্মশাস্ত্রের মতের মাথায় লাথি মেরে এই অসম্ভব অসত্য প্রচার ক'রছেন যে জীবরাজ মনুষ্য (যা ঈশ্বরের অনুকৃতিতে নির্ম্মিত) ওরাংউটাং হ'তে সাক্ষাৎ ভাবে উৎপন্ন।

Bishop Wilberforce প্রকাশ্য সভায় পণ্ডিতবর Huxleyকে বিদ্রূপ ক'রে জিজ্ঞাসা করেন, "মাননীয় বক্তা (Huxley) কোন দিক দিয়ে বানরের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ দাবী করেন; মাতৃকুল না পিতৃকুল দিয়ে?" এর প্রতি-উত্তরে Huxley যে অমোঘ বাক্যবাণ বর্ষণ ক'রে বিশপের মাথা হেঁট ক'রে দেন তা বোধ হয় সবাই জানেন।

আমাদের নির্ভীক, সত্যপ্রিয়, জ্ঞানপ্রিয় পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে সত্য নিয়ে কিন্তু এরূপ ইতর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তার কারণ হিন্দুর মুনিঋষিরাই ব'লে গিয়াছেন যে বিশ্বাত্মা ভগবান জীবসৃষ্টি ক'রে জীবের মধ্যেই আত্মারূপে প্রবেশ করেন, এবং পুরাণকাররা ভগবানের দশ অবতার হওয়ার কাহিনীতে Evolution তত্ত্বেরই আভাষ দিয়ে গিয়েছেন। ভগবান মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদিক্রমে ক্রমিক উন্নতির শৃঙ্খলা ধ'রে সব শেষে রামকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেহে নরদেবতার রূপ ধরেন। দশ অবতার কাহিনীটা যে প্রকারান্তরে আধুনিক Organic Evolution এরই পূর্ব্ব পরিচয় তা প্রাচ্য পণ্ডিত Monier Williams তাঁর *Hindu Wisdom* গ্রন্থে স্বীকার ক'রেছেন। সুতরাং মানুষ যে বনমানুষের সঙ্গেই সুদূর এক অধুনালুপ্ত বংশ হ'তে দুই শাখাবংশ রূপে অভিব্যক্ত একথা হিন্দুর কাছে অপবিত্র, অশ্রদ্ধেয় ও হাস্যকর কথা হবে না।

আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্র এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে কি প্রমাণ দেন তা দেখা যাক্:—

মানুষের সঙ্গে বানর, চতুষ্পদ ও অন্যান্য ইতর জীবদের গঠনগত সাদৃশ্যের পরিচয় দিতে গেলে এই সব ইতর জীবদের মূল বংশগুলির একটু মোটা আভাষ আগে দেওয়া দরকার।

এপর্য্যন্ত প্রায় পাঁচলক্ষ জীব জাতির (Species) সঙ্গে প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌রা পরিচিত হ'য়েছেন।

এই সমস্ত জীবজাতিকে দুই মহাবংশে ভাগ করা হ'য়েছে। যাদের দেহের ভিতর হাড়ের কঙ্কাল ও মেরুদণ্ড আছে, (vertebrate বা chordates) আর যাদের কঙ্কাল ও মেরুদণ্ড নাই (invertebrate)। প্রত্যেক মহাবংশ কয়েকটা মূলবংশে (phylum) বিভক্ত। অমেরুদণ্ডীদের সঙ্গে এখন আমাদের সম্পর্ক নাই, সুতরাং তাদের বংশবর্ণনা থাক্; আমাদের সম্বন্ধ মেরুদণ্ডী জীবদের সঙ্গে; এই মহাবংশটী পাঁচটা মূলবংশে বিভক্ত; যথা (১) মৎস্যবংশ (fishes); (২) উভচর (যেমন ভেক) বংশ (amphibia); (৩) সরীসৃপ বা কূর্ম্মবংশ (reptilia), সাপ, কুমীর, গিরগিটী ও কচ্ছপ, এই চারটী শাখাবংশ বা গণ (order) (৪) পক্ষীবংশ birds, (৫) Mammals, স্তন্যপায়ী জীব, মেরুদণ্ডীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বংশ। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এগারোটা বর্গ (natural order) বা শাখা বংশ আছে; তাদের মধ্যে primate বর্গই সবচেয়ে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ-বংশ। Lemur, হনুমান, বনমানুষ, মানুষ এই চার শ্রেণীর দ্বিপদ জীব নিয়ে Primate বা প্রধান বর্গ। মানুষ এদের মধ্যে সব চেয়ে আধুনিক ও শ্রেষ্ঠ। যাঁরা প্রাণীতত্ত্ব (Biology) ও জীবতত্ত্ব (Zoology) শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ তাঁরা বলেন—

এই যে লক্ষ লক্ষ জীবজাতি (species) এদের যে গণে, (genus) বর্গে, (order), শ্রেণীতে, (class) ও বংশে (phylum) ভাগ করা হয়, এ ভাগ অত্যন্ত কৃত্রিম ; কোনো দুই ভাগে একেবারে ছেদভেদ নাই। কোনো-না-কোনো গঠনলক্ষণ দুই ভাগকে এক সম্বন্ধযুক্ত ক'রে রেখেছেই। এমন কি মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডীদের মধ্যেও পাকাপাকি ভেদ কোথাও নাই। এমন যোজক জীবজাতি আছে যার দেহে মেরুদণ্ডের ধরণে একটা chord আছে, যা ঠিক হাড়ের গাঁটযুক্ত মেরুদণ্ড নয় অথচ তার স্থানে ঐ ধরণের একটা কি আছে, যেমন lancelet নামক জলচর কীটবৎ জীবের।

সমস্ত জীবজাতিদের মধ্যেই একটা সম্বন্ধ-সূত্র দেখা যায়, যে সূত্র ধ'রে মানুষ হ'তে পিছু হাঁটিতে হাঁটতে আদিম এককোষ, protozoa জীবে পৌছানো যায়। এই লক্ষ লক্ষ জীবজাতি যেন প্রাণবৃক্ষের কাণ্ডলগ্ন শাখা, শাখালগ্ন প্রশাখা, প্রশাখালগ্ন ক্ষুদ্র শাখা, ক্ষুদ্র শাখালগ্ন পাতা।

মানুষ যে অপরাপর মেরুদণ্ডীদের সঙ্গে এক রক্তের সম্বন্ধে বদ্ধ তা' দৈহিক গঠন বিচার ক'রলে বোঝা যায় স্বরূপ ধরা যাক, 'ব্যাং'। ব্যাংএর কঙ্কালটার plan আর primate বর্গীয় মানুষের কঙ্কালের plan তুলনা ক'রে দেখা যায় উভয়েরই মেরুদণ্ড পিঠের দিক ঘেঁসা ; মস্তিষ্ক পদার্থ উভয়েরই দুটা হাড়ের কোটরে আছে। চোখ কান নাক মুখ দাঁত সবই একই ধরণে সাজানো ; উভয়েরই জোড়া জোড়া প্রত্যঙ্গ (limb) ; মানুষের দুই হাত, দুই পা, ব্যাংএরও দুই অগ্রপ্রত্যঙ্গ, দুই পশ্চাৎ প্রত্যঙ্গ ; মূল অভ্যন্তর-যন্ত্র দুয়েরই সমান ; যন্ত্রের ক্রিয়াও এক ; উভয়েরই liver, pancreas, adrenalin gland একই ধরণে কাজ করে।

ব্যাংএর সঙ্গে এত সাদৃশ্য সত্ত্বেও বৈসাদৃশ্যও অনেক। ব্যাং ছেড়ে অন্যান্য মেরুদণ্ডীদের সঙ্গে তুলনা ক'রলে দেখা যায় মানুষের উভচরের সঙ্গে যত নিকট সম্বন্ধ, মাছের সঙ্গে তত নয় ; আবার কুকুরের সঙ্গে যতটা নিকট সম্বন্ধ ব্যাংএর সঙ্গে তত নয়। আবার শিম্প্যানজী বা ওরাংএর সঙ্গে যত বেশী, কুকুর, কুমীর বা ব্যাংএর সঙ্গে তত নয়।

মানুষ ও বনমানুষকে এক primate বর্গে ফেলা হ'য়েছে কেন ? কারণ আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক গঠনে মানসিক মতিগতি ও ব্যবহারে বনমানুষের সঙ্গে মানুষের রক্তসম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট। দেহের গঠন ধ'রে তুলনা ক'রে দেখা গিয়েছে যে এমন কোনো একটা যন্ত্র, কোনো একটা পেশী বা শিরা বা অস্থি মানুষে নাই যা বানরে নাই ; বা বানরে আছে মানুষে নাই ; তফাৎ যা কিছু তা size, গঠনভঙ্গীতে ; এবং এ পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক কেননা উভয়ের জীবনপ্রণালী ও আচার ব্যবহার এক নয়।

মোট কথায় বনমানুষ মানুষেরই যেন একটা caricature বা বিকৃত সংস্করণ। ভাবভঙ্গীতে ও ভাবপ্রকাশের ধরণে শিম্প্যানজী ও মানুষে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। খেলাধুলায়, হর্ষ বা শোক বা রাগপ্রকাশে শিশুর প্রতি আদরযত্নে, স্নেহপ্রকাশে বনমানুষের ধারা ও ধরণ মানুষের সঙ্গে আশ্চর্য্য-রকমে মেলে। ইন্দ্রিয়গুলার ক্রিয়াপদ্ধতিতে, বিষয়বস্তুর অনুভূতিতে, ইন্দ্রিয়বোধের প্রখরতায় বনমানুষ সব চেয়ে মানুষের নিকটবর্ত্তী। Emotionএর বৈচিত্র্যে ও প্রকাশ-সামর্থ্যে বনমানুষের বাহাদুরী অন্যান্য মেরুদণ্ডী অপেক্ষা অনেক বেশী। স্বাধীন বিচার-বুদ্ধিপ্রকাশে, কলকৌশলযোগে ফন্দী আঁটতে ও পন্থাবিষ্কারে বনমানুষ যতটা মানুষের কাছাকাছি, এতটা অন্য কোনো মেরুদণ্ডী জীব নয়। যাকে বলে ঠেকে শেখা, learning by experience, তা বনমানুষের নিম্নশ্রেণী জীবদের খুবই কম। Professor Koehler তাঁর শিম্প্যানজীর বুদ্ধিপরীক্ষাতে জানিয়েছেন, বনমানুষ দায়ে প'ড়লে কি রকম ভেবে চিন্তে বুদ্ধি বার ক'রতে পারে। যাকে বলে চেষ্টাঘটিত উপায় আবিষ্কার deliberate invention, সে বিষয়ে একমাত্র বনমানুষেরেই কীর্ত্তির দৃষ্টান্ত আছে।

বনমানুষদের সঙ্গে মানুষের নিকট সাদৃশ্য বুঝতে পূর্ণাঙ্গ দুই জীবের মধ্যে তুলনা ছেড়ে দিয়ে ভ্রূণাবস্থায় ও শৈশবে উভয়ের গঠন ও ব্যবহারসাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রলে উভয়ের জাতিগত একত্ব কত নিকট তা বোঝা যায়। আশ্চর্য্য, এই মানুষ ও বনমানুষ পূর্ণ বয়সে এত বিসদৃশরূপ হ'লেও ভ্রূণাবস্থায় উভয়ের সাদৃশ্য অদ্ভুত মাত্রায় এক। বানর ভ্রূণবেশী নরাকার ; আর মানব ভ্রূণবেশী বানরবৎ। মানবভ্রূণের দেহ আগাগোড়াই কোমল চুলে ভরা ; জন্মের কিছুপূর্ব্বেই উভয় ভ্রূণেরই দেহ সম্পূর্ণ মাত্রায় লোম ও কেশহীন হয় (কেবল মাথা ছাড়া)। নবজাত মানবশিশুর পায়ের বুড়া আঙুলের

ভঙ্গী কোনো এক বানরবৎ পূর্ব্বপুরুষজাতির prehensile toeএর ইঙ্গিত বহন করে।

মোটকথায় জীবতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার ক'রে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মানুষ ভগবানের স্বতন্ত্র অনুগ্রহ-সৃষ্টি নয়; অন্যান্য ইতর জীবের সঙ্গেই তার এক মূল প্রাণী হ'তে উৎপত্তির আভাষ পাওয়া যায়। যাবতীয় মেরুদণ্ডী শাখা-বংশের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠবংশ হ'লেও অন্যান্য শাখাবংশের সঙ্গে তার রক্তের সম্বন্ধ আছে এবং এই সম্বন্ধ বর্ত্তমান বনমানুষদের সঙ্গে সব চেয়ে বেশী। উভয়ের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক দেহগঠন ও মানসিক আচার ব্যবহার ভাবভঙ্গীর তুলনা ক'রলে বুঝা যায় যে মহাজীব বৃক্ষের এক প্রশাখা হ'তে দুটী ক্ষুদ্র শাখা বার হ'য়েছে, একটীর পাতা নানা জাতের বনমানুষ, অপরটীর পাতা একমাত্র মানুষ (homo sapiens) একক জাতি (only species)।

মানুষই কি এই genus homoর একমাত্র species 'জাতি', এখনো অন্য species of homo দেখা দেয় নাই? না, অন্য জাতীয় homo (নর) দেখা দিয়েছিল সুদূর অতীতে, তাদের আর এখন অস্তিত্বই নাই, সে সব জাতি এখন লুপ্ত extinct হয়েছে?

Anthropology শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে মানুষের সগোত্র জাতিভ্রাতা ধরাবক্ষে দু'চারটে এসেছিল, কিন্তু তাদের আর জীবন্ত চিহ্ন নাই; তবে ভূগর্ভে ভূপঞ্জরের আধুনিক স্তরে তাদের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। যাঁরা মানুষের সঙ্গে বনমানুষের সগোত্রত্ব মান্‌তে অনিচ্ছুক, তাঁরা বলেন, "যদি তাই-ই হয় যে বানরবৎ এক দ্বিপদ জীব ক্রমিক রূপান্তর লাভ ক'রে বর্ত্তমান নররূপে অবতীর্ণ হ'য়েছে, তা হ'লে, ভূগর্ভের মৃৎস্তরে অন্যান্য জীবদের যেমন যোজক জাতি (link) পাওয়া যাচ্ছে নর-বানরের তেমন যোজক জাতি পাওয়া যায় নি, সেই missing link কোথায়? ডারুইনের সময় এই কল্পিত যোজক জাতির আবিষ্কার ঘটেনি; কিন্তু এখন এই যোজক জাতি পাওয়া গিয়েছে; শুধু যে নর-বানরের যোজক জাতিই পাওয়া গিয়েছে তা নয়; আরো দু'চারটে বানরবৎ নর জাতির মাথার খুলি ও অন্যান্য কঙ্কালখণ্ড পাওয়া গিয়েছে।

বিশেষজ্ঞেরা এই সব কঙ্কাল ও করোটি মাথার খুলি তুলনায় আলোচনা ক'রে একটা বংশসহ genealogy (মানব বংশের কুলজী) খাড়া ক'রেছেন। এই সব লুপ্ত নরকঙ্কালকে বলা হয় fossilmen অর্থাৎ যে সব species of homo লোপ পেয়েছে তাদেরই দেহচিহ্ন।

অতীতের এই সব লুপ্ত নরবংশের অগ্রপর পরিচয় বুঝতে হ'লে পৃথিবীর অতীত যুগ কয়টীর একটু উল্লেখ ক'রতে হবে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌রা গণিত সাহায্যে হিসাব ক'রে সিদ্ধান্ত ক'রেছেন যে, পৃথিবী সূর্য্য হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গ্রহজীবন ধারণ ক'রেছেন অনুমান ২০০ কোটী বছর পূর্ব্বে। পৃথিবীর সদ্যোজাত দেহ জীব-ধারণযোগ্য হ'তে বহু কোটী বৎসর লাগে। পৃথিবীতে প্রথম জীবের আবির্ভাব হয় অন্যূন ১০০ কোটী বছর আগে। এই ১০০ কোটী বৎসর ব্যাপী জীবকল্পকে চারটী মহাযুগে ভাগ করা হয়। প্রথম উৎপন্ন জীবাণু হ'তে সর্ব্বশেষোৎপন্ন মানুষে জীবের এই ক্রমিক উন্নতিপ্রবাহ চারটী প্রধান অবস্থান্তরের ভিতর দিয়ে চ'লে আসে। এই এক এক অবস্থার প্রাণীর আকৃতি প্রকৃতি ধ'রে মহাযুগ নাম করা হয়েছে।

আদিম মহাযুগ (Eozoic Era) এই মহাযুগে প্রথম জীব উৎপন্ন হয়। এবং এসব জীব প্রধানতঃ অতিক্ষুদ্র এক কোষাকার। শেষ দিকে শুক্তি, শামুক, গেঁড়ি এই সব জীব দেখা দেয়। এই যুগের স্থিতিকাল প্রায় ২৪ কোটী বৎসর।

প্রাচীন জীব মহাযুগ (Paleozoic Era)...এই মহাযুগের আদিভাগে মৎস্যজীবের আবির্ভাব, অন্তভাগে উভচর জীব দেখা দেয়। স্থিতিকাল ৩০ কোটী বৎসর।

মধ্য জীব মহাযুগ (Mesozoic) এই মহাযুগে অতিকায় সরীসৃপের প্রভাব ও প্রসারকাল। এর স্থিতিকাল ১২ কোটী বৎসর।

Cainozoic era বা নব্যজীব মহাযুগ—এই মহাযুগে স্তন্যপায়ী জীবের প্রভাব ও প্রসার। এই মহাযুগ দুইটী যুগে ও ছয়টী গর্ভযুগে বিভক্ত। নবজীব মহাযুগের একটু বিশেষ বিবরণ জানা দরকার। নচেৎ evolution of man, মানুষের ক্রমাভিব্যক্তি ব্যাপারটী ভাল বুঝানো যাবে না।

Cainozoic বা নব্যমহাযুগের আদি ভাগকে বলা হয় tertiary epoch; এর অন্তর্গত চারটী গর্ভযুগ eocene,

oligocene, miocene, pliocene। অন্তভাগের নাম quaternary বা post-tertiary ; এই যুগের অন্তর্গত দুইটী গর্ভযুগ—(১) হিমযুগ বা ice age (২) বর্ত্তমান বা recent।

নব্যজীব মহাযুগের এই মাত্র আরম্ভ ; এ পর্য্যন্ত এ মহাযুগের মোটে পাঁচ বা ছয় কোটী বৎসর কেটেছে। প্রত্যেক গর্ভযুগের কি পরিমাণ স্থিতিকাল নিম্নলিখিত diagramএ দেখানো হ'য়েছে।

Cainozoic Era (নব্য বা আধুনিক জীবযুগ)

	গর্ভযুগ	জীব-পরিচয়	স্থিতিকাল
Quaternary মানবযুগ	Recent (বর্ত্তমান)	খাঁটী মানুষের উৎপত্তি	২০০০০ বর্ষ
	Pleistocene (হিমযুগ)	উপমানুষ (Sub-men) জাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি	৪৮০০০০ বছর
Tertiary = তৃতীয়ক (চতুষ্পদযুগ)	Pliocene	অর্দ্ধ নর-বানরের উৎপত্তি Pithecanthropus Erectus,	৯৫০০০০০ বর্ষ
	Miocene	বানর শাখা হ'তে নর শাখার উৎপত্তি	৭৫০০০০০ বর্ষ
	Oligocene	Ape, বানর বংশের উৎপত্তি হনুমান বংশের বিস্তৃতি	১২৫ লক্ষ বর্ষ
	Eocene	দ্বিপদ, Primate শাখা বংশের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি	২ কোটী বর্ষ

প্রাচীন কালের আদিম মানুষ বা বনমানুষদের কঙ্কাল ভূস্তরে আবদ্ধ হ'য়ে পড়বার সম্ভাবনা খুব কম, সেই জন্য মানুষবংশের ধারাবাহিক উন্নতির ইতিহাস দৃষ্টান্তযোগে গ'ড়ে তোলা কঠিন ; তবু যে কয়টী আদিম যুগের নর-বানরের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, তাতেই এটা বেশ প্রমাণিত হয় যে বর্ত্তমান মানুষ বানরতুল্য এক আদিম জীব হ'তে ধীরে ধীরে রূপান্তর লাভ ক'রে এসেছে।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপের এক ভূস্তরে একটী মাথার খুলি এবং উরুদেশের একখণ্ড হাড় পাওয়া যায়। এই মাথার খুলির সঙ্গে একদিকে মানুষের ও অপরদিকে বনমানুষের খুলির সঙ্গে তুলনা ক'রে স্থির হয়েছে যে, এই আবিষ্কৃত খুলির অধিকারী জীব ape বা বনমানুষ হ'তে উচ্চতর জীব এবং খাঁটী মানুষ homo sapiens হ'তে নিম্নশ্রেণীর অন্য এক উপমানুষ জীব ; এই উপমানুষ বা অর্দ্ধনর জীবের মুখাকৃতি, খুলির ও কপালের গড়ন ছিল বানরেরই মত, কিন্তু জীবটী মানুষের মত খাড়া হ'য়েই চলাফেরা ক'রতো।

যে গর্ভযুগের স্তরে এই শ্রেণীর বানর-নরের (ape-man) fossil পাওয়া যায় তাকে pliocene যুগ বলে। Pliocene যুগের শেষ স্তরের বয়স পাঁচলক্ষ বৎসরের বেশী, কিন্তু ছয়লক্ষ বৎসরের বেশী নয়। এই অর্দ্ধনর অর্দ্ধবানরবৎ জীবের কঙ্কালের জাতিত্ব সঠিক নির্ণয় করা নিয়ে পণ্ডিতসমাজে বহুদিন তর্কযুদ্ধ চলে ; এখন সবাই একবাক্যে স্বীকার ক'রেছেন যে জীবটী সত্যই বানর ও নরের মধ্যাবস্থার এক জীব ; একে ape-man বলাই ঠিক ; বানরের মত মাথার খুলি, চোয়াল, কপাল, কিন্তু চলনে মানুষেরই মত ভঙ্গী খাড়া, এই বিরুদ্ধ লক্ষণগুলির জন্য এই জীবের নামকরণ হয় pithecanthropus erectus অর্থাৎ 'ঋজুদেহ বানর-নর'। যে missing link অর্থাৎ অজানা যোজক জীবের জন্য এত অনুসন্ধান চলছিল নৃতত্ত্ববিদ্‌রা যবদ্বীপের এই বানর-নরকে উক্ত যোজক জীবরূপে স্বীকার ক'রে নিলেন।

বানরবৎ জীব হ'তেই যে ক্রমিক রূপান্তর লাভ দ্বারা মানুষের উদ্ভব হয় এই pithecanthropus erectus তার চাক্ষুষ প্রমাণ—এ বিষয়ে মতভেদ আর রইল না।

এই শ্রেণীর আর দুইটী fossil পরে আবিষ্কৃত হয় ; ইংলণ্ডের সাসেক্স প্রদেশে Piltdown জনপদের ভূস্তরে একখানা দ্বিপদজীবের চোয়াল-হাড় (jaw-bone) পাওয়া গিয়েছে। এই jaw-boneএর আকার ও গঠন দেখে স্পষ্টই বুঝা গিয়েছে যে চোয়ালের অধিকারী জীবটী একটী ভয়ঙ্কর হিংস্রমূর্ত্তি বানরনরেরই সগোত্র ছিল। খুব সম্ভব এই piltdown দ্বিপদের অস্তিত্বকাল pliocene যুগের শেষ ভাগেই ছিল।

Pithecanthropus জীবে বানরত্ব ছিল বেশী মাত্রায় ; কিন্তু piltdown জীবে মনুষ্যলক্ষণ কিছু বেশী। কাজেই কাল হিসাবে piltdown জীব pithecanthropusএর পরবর্ত্তী।

Piltdown জীবের অপেক্ষা আরো পূর্ব্বকালীন এক উপমানুষের মাথার খুলি সম্প্রতি চীনদেশে পিকিন নগরীর কাছে এক ভূস্তরে আবিষ্কৃত হ'য়েছে। আবিষ্কর্ত্তা Mr. W. C. Pei এই জীবের নাম দিয়েছেন sinanthropus. স্তরের কাল পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে এই দ্বিপদ জীব pleistocene যুগের প্রারম্ভেই বর্ত্তমান ছিল। চোয়ালের হাড়ের গড়ন দেখে স্থির হয়েছে যে sinanthropus piltdown জীবের সদৃশই বটে, কিন্তু তার মাথার খুলির গড়ন pithecanthropus বানর-নরেরই মত।

এ পর্য্যন্ত বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত এই যে, pithecanthropus সত্যই এক অর্দ্ধনর-অর্দ্ধবানর জীব, মানুষ ও বানর

উভয়ের মধ্যবর্ত্তী জীব ; এবং বানর হ'তে মানুষ মূর্ত্তিতে আস্বার অবস্থায় এইরূপ মিশ্র মূর্ত্তি হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু piltdown (eoanthropus বা আদিনব) আরো উন্নত অবস্থার জীব ; piltdown জীবে মনুষ্য-লক্ষণ একটু বেশী বিকাশ লাভ করেছে।

Sinanthropus জীবও বেশীর ভাগ মানুষভাবাপন্ন বটে, তবে সম্ভবতঃ piltdown জীব হ'তে কিছু প্রাচীনতর।

এই দুই শ্রেণীর দ্বিপদ জীবকে পণ্ডিতেরা homo বা 'মানুষ' এই আখ্যা দিতে অ-রাজী নন্। তবে আধুনিক মানুষের সঙ্গে এক-গোত্রীয়, এক-genus যুক্ত ব'লে স্বীকার করেন না। Piltdown জীব 'মানুষ' বটে, তবে এক স্বতন্ত্র genus ভুক্ত। Sinanthropus-জীবও মানুষ বটে, তবে দ্বিতীয় এক genus ভুক্ত। বর্ত্তমান মানুষ-জীব হ'তে পূর্ব্বোক্ত দুই আদিম মানুষের গঠন ও আকারগত প্রভেদ এত বেশী : খাঁটী মানুষ হ'তে তারা এত নিম্ন জাতীয় মানুষ যে, তাদের man না ব'লে 'subman' ব'লে বর্ণনা করা হয় ; আমরা 'উপমানুষ' ব'ল্‌বো।

এর পর আরো তিনটী ভিন্ন ভিন্ন লুপ্ত মানুষজাতির কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। (১) জার্ম্মাণী দেশে হাইডেলবার্গ নগরের কাছে এক স্তরে ; (২) আফ্রিকার Rhodesia জনপদে এবং (৩) Neanderthal জনপদে।

যে যে স্থানে এই সব কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, সেই সেই স্থানের নামে লুপ্ত জীবের নামকরণ হয়েছে। যথা Heidelberg-মানুষ ; Rhodesian-মানুষ এবং Neanderthal-মানুষ : এই প্রত্যেক জাতীয় মানুষের সঙ্গে বর্ত্তমান খাঁটী মানুষের (homo sapiens) সাদৃশ্য ও নৈকট্য খুব বেশী। এই তিন শ্রেণীর তিন জাতীয় মানুষ আসলে খাঁটী মানুষ, কিন্তু বর্ত্তমান মানুষের সঙ্গে একজাতি (species) ভুক্ত নয়। খাঁটী মানুষ, true homo sapiensএর সঙ্গে এদের অঙ্গের গঠনগত ভেদ অনেক। Heidelberg-মানুষের চোয়ালটা খুব মোটা, থুৎনি (chin) সেইরূপ ভারী ও স্থূল। Rhodesian-মানুষের ভ্রূর হাড় খুব মোটা ও ভারী, (বানরের ভ্রূর ধরণে)। Neanderthal-মানুষের গড়নও অনেকটা বানুরে ধরণের। তিনটী জাতির প্রত্যেকটীর স্বতন্ত্র গঠনবৈচিত্র্য ; অথচ বর্ত্তমান varietyর মানুষের মধ্যে anatomical structureএর কোনো ভেদ নাই। এই সব কারণে Heidelberg বা Rhodesian বা Neanderthal-মানুষকে একটী স্বতন্ত্র species ব'লে ধরা হয়, যথা :—homo heidelbergensis ; homo rhodesiensis ; homo neanderthalansis ; আর বর্ত্তমান মানুষ বংশ হ'ল homo sapiens।

বর্ত্তমান মানুষ জাতি ও তাদের পূর্ব্বগামী অথচ লুপ্ত উক্ত তিনজাতির মানুষ (হাইডেলবর্গী, রোডিসীয়, নিয়েনডারথালী) একত্রে এক genus বা গণভুক্ত ব'লে গণ্য করা হয়। আর piltdown বা sinanthropus, এরা হ'ল দুই ভিন্ন উপ বা অর্দ্ধনর জীবের genus।

এই ভিন্ন ভিন্ন লুপ্ত মানুষ বা মানুষাকার জীবের সঙ্গে খাঁটী মানুষের বংশ-সম্বন্ধ দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো যায় এইরূপে ;—রয়াল বেঙ্গল বাঘের সঙ্গে চিতা (leopard) ও জাগুয়ারের যে সম্পর্ক, খাঁটী মানুষের সঙ্গে neanderthal বা rhodesian মানুষের সেই সম্বন্ধ ; বাঘের সঙ্গে কুকুরের ও ভালুকের যে সম্বন্ধ (generic ভেদ) আসল মানুষের genus-এর সঙ্গে piltdown-উপমানুষ ও sinanthropus-উপমানুষের সেই সম্বন্ধ। এক 'নর'-বংশ কয়েকটা genus-এ বিভক্ত হ'ল ; (১) Piltdown উপনর, (২) Sinanthropus উপনর, (৩) Homo ; এই Genus Homo বা 'মানুষগণ' কয়েকটা বিভিন্ন speciesএ বিভক্ত হ'ল। যথা, (৩ক) Heidelberg মানুষ (৩খ) Rhodesian-মানুষ (৩গ) Neanderthal মানুষ (৩ঘ) আসল বর্ত্তমান মানুষ (Homo-sapiens)। খুব সম্ভব পূর্ব্বোক্ত দুই উপমানুষের বংশ অনেক শাখাবংশে (species) বিভক্ত হ'য়েছিল ; এখন একমাত্র homosapiens জীবন-যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে টিঁকে আছে। আর সব লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আদিম বন-মানুষ হ'তে বর্ত্তমান মানুষ পর্য্যন্ত উন্নতির ক্রম-ধারা যদি এই সব লুপ্ত জাতির সূত্র ধ'রে সাজানো যায়, কালানুসারে তবে কুলজীটা দাঁড়াবে এইরূপ :—

পৃথিবীর অতীত জীব মহাযুগ-পরিচয়

গর্ভযুগ	জীব-পরিচয়	স্থিতিকাল
নব্যজীব মহাযুগ Cainozoic Era	দ্বিপদ স্তন্যপায়ী মানুষ চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী	ছয় কোটী বর্ষ
মধ্যজীব মহাযুগ Mesozoic Era	স্তন্যপায়ীর উৎপত্তি সরীসৃপ যুগ	১২ কোটী বর্ষ
প্রাচীন জীব মহাযুগ Paleozoic Era	উভচর যুগ, মৎস্য যুগ, শামুক যুগ	৪২ কোটী বর্ষ
আদিম বা আরম্ভ যুগ বা Archean	এই মহাযুগে প্রথম জীবসঞ্চার হয়, বসুন্ধরার জলময় গর্ভে জীব	৪০ কোটী বর্ষ
অজীব মহাযুগ	এই যুগে পৃথিবীর দেহ গঠন হয়	১০০ কোটী বর্ষ

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

হিন্দুত্বের পূর্ণ অধিকার

—শ্রীসারস্বত শর্ম্মা

হিন্দুত্বের পূর্ণ অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণেরই ছিল—ক্ষত্রিয়ের তিনপদ, বৈশ্যের দ্বিপদ,—আর শূদ্রের পক্ষে যতটুকু অধিকার তাহাকে 'নাস্তি' বলিলেই চলে। শক্তিমত্ততা, ভ্রাতৃ-বিরোধ, আত্মকলহ, সামাজিক প্রতিকূলতা, বিদেশী আক্রমণ ইত্যাদির জন্য ক্রমে ক্ষত্রিয়জাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হইল—বিদেশাগত শক, হূণ, লিচ্ছবি, কুশান ইত্যাদি জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করা হইল বটে কিন্তু ক্ষত্রিয়ের তিন পাদ অধিকার তাহারা পাইল না—কতকটা ক্ষত্রিয়-রক্তে জন্ম নয় বলিয়া—কতকটা বংশধারায় আর্য্যশিক্ষাদীক্ষা-সংস্কারের প্রবাহ না থাকায় এবং কতকটা বিদেশী বীরগণের নিজেদেরই ঔদাসীন্যে ক্ষত্রিয়ের পূর্ণ অধিকার তাহারা পাইল না। রামায়ণ-মহাভারতের ক্ষত্রগণের অধিকার ও হর্ষবর্দ্ধনের পর রাজপুতাদি জাতির অধিকারের তুলনা করিয়া দেখিলেই হয়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রভাব সব চেয়ে পূরামাত্রায় পড়িয়াছিল—দেশের বৈশ্য জাতির উপর। বৌদ্ধযুগের সাহিত্য, সমাজ ও বাণিজ্য সম্বন্ধে যাঁহারা ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা একথা নিঃসংশয়-রূপেই জানেন, ভারতবর্ষের বৈশ্য-জাতি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অথবা বৌদ্ধ-জৈন-প্রভাবে আবিষ্ট হইয়া ক্রমে হিন্দুত্বের অধিকারটুকু হারাইল। তৎপরে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপতন হইল—তখন বৈশ্য জাতি হিন্দুসমাজে ফিরিল, কিন্তু শূদ্র হইয়া ফিরিয়া তাহারা আর পূর্ব্ব অধিকারের কিছুই পাইল না। ফলে হিন্দুত্বের পূর্ণ অধিকার কেবল ব্রাহ্মণেরই থাকিল। উচ্চতর জাতি বলিয়া যাহারা গণ্য হইল—তাহারা না-ক্ষত্রিয় না-বৈশ্য—একেবারে শূদ্রও নয়। কোন বর্ণেরই নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রসম্মত অধিকার তাহারা পাইল না—হিন্দুত্বের আংশিক অধিকার মাত্র লইয়াই তাহারা তুষ্ট থাকিল।

বাংলা দেশে রঘুনন্দন বলিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া অন্য বর্ণ নাই। ভগবান নিজে যে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিলেন, সেই চাতুর্ব্বর্ণ্য কিরূপে ধ্বংস পাইতে পারে বুঝি না। মানুষ যত বড়ই হউক, নিজে যাহা দেখিতে পায় না বা দেখিতে চায় না, তাহা নাই অথবা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ মনে করে। রঘুনন্দন একজন মানুষই ছিলেন।—যাক্—মোট কথা, আমাদের বাংলা দেশে কয়েক লাখ লোক ছাড়া বাকী সবই শূদ্র অর্থাৎ এদেশে যাহারা হিন্দু বলিয়া চলিতেছে তাহাদের শতকরা ৯৫ জন লোকের হিন্দুত্বের পূর্ণ অধিকার নাই। কোন ধর্ম্মের নামে চলিবে অথচ সেই ধর্ম্মের পূর্ণ অধিকার পাইবে না—এমনটা জগতে কোথাও দেখা যায় না। যাহাদিগকে আমরা হিন্দু বলিয়া গণনা করি, তাহাদের অধিকাংশের মধ্যেই যখন ঐ ধর্ম্মের পূর্ণ অধিকার নাই—তখন হিন্দুর সমগ্র জাতি হিসাবে উত্থান, পতন, স্বাধীনতা, পরাধীনতা, শিক্ষাদীক্ষা সংস্কার ইত্যাদির কোন অর্থ নাই। কাজেই হিন্দুজাতি না বলিয়া 'অমুসলমান' জাতি বলিলেই ঠিক বলা হয়। এই নানাশ্রেণীভুক্ত অমুসলমান জাতির পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা এবং তদ্দ্বারা জাতীয় সমুন্নতিসাধন কিরূপে সম্ভবে?

বাংলার ব্রাহ্মণ, শতকরা ৯৫ জন বাঙালীকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিয়াছে, শূদ্র বলিয়া হিন্দুত্বের সর্ব্ববিধ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ব্রাহ্মণ বাংলা দেশের কেহই নহে—বাংলা দেশ তাহাদের বাড়ীঘর বা জন্মভূমি নহে—ইহাঁরা কান্যকুব্জ হইতে আগত পাঁচজন ব্রাহ্মণের সন্তান। ইহাঁরা আর্য্য-বর্জ্জিত বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়া দেশকে ধন্য করিয়াছেন। এই দেশের রাজার প্রদত্ত জমিদারী ও ৫৬ খানা গ্রামের উপস্বত্ব ভোগ করিয়া এদেশের সমাজের কর্ত্তা হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে আগত কয়েকজন ব্যবসায়ী ও তাহাদের বংশধর ও কান্যকুব্জ হইতে আগত পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের বংশধরের মধ্যে এদেশের পক্ষে বিশেষ তফাৎ নাই—উভয় দলের ব্যবহার একই—ক্ষেত্র পৃথকমাত্র। মূলতঃ Cultural Conquestই উভয় সম্প্রদায়েরই আত্মাধিকার স্থাপনের মূলভিত্তি।

বাংলার জাতীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ শুধু দেশশুদ্ধ লোককে হিন্দুত্বে অনধিকারী শূদ্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই—যাহাতে শূদ্রমনোভাব দেশের লোকের হাড়ে মাসে মজ্জায় বিজড়িত হইয়া পড়ে—যাহাতে তাহারা কখনো হিন্দুত্বের তথা মনুষ্যত্বের অধিকার না চায়—তাহার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম

করিয়াছে—কত পাঁতি পুঁথি পাঁজির সৃষ্টি করিয়াছে—কত নূতন নূতন নরক আবিষ্কার করিয়াছে—ইহজীবন ও পরজীবনের জন্য কত প্রলোভন উদ্ভাবন করিয়াছে। অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ভ্রান্তি, তামসিকতা যাহাতে চিরদিন অক্ষুণ্ণভাবে রাজ্য করিতে পারে—যাহাতে বাঙ্গালী কখনো মনুষ্যত্বের পূর্ণাধিকার না পায়, তাহার জন্য চেষ্টার ত্রুটি দেখা যায় না।

যাহারা হিন্দুত্বের পূর্ণ অধিকার কেবল নিজেদের জন্য রাখিল, তাহারাও শেষে লাভবান্ হইল না। শতকরা ৯৫ জনকে হিন্দুত্বের পূর্ণ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে গিয়া আপনাকেও 'মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার' হইতে বঞ্চিত করিল। পূর্ণ অধিকার নামে আপনার জন্য রাখিল বটে, কিন্তু সে অধিকারের সুবিধা ভোগ করিল না। অধিকাংশই অধিকার পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিল না। বংশগত অধিকার, সাধনাবলে অর্জ্জিত নয়—বিনাশ্রমে অনায়াসে লব্ধ সামগ্রী, যাহার জন্য ব্যয় নাই, যাহা কেহই হরণ করিতে পারে না—হারাইবার ভয়ও নাই— নিলাম-ডিক্রী-ক্রোক নাই—এমন সামগ্রীর প্রতি দরদই বা কতটুকু? এমন সামগ্রীর গৌরবরক্ষা করিতে ঔদাসীন্য আসা স্বাভাবিক। তাই তাহারা সে অধিকারের সদ্ব্যবহার করিল না। সর্ব্বপ্রযত্নে যাহা হইতে অপরকে বঞ্চিত করিল তাহার মর্য্যাদা তাহারা রাখিতে পারিল না। কাহারো কাছে তাহা শূন্য দম্ভে পরিণত হইল—কাহারো কাছে উহা ব্যবসায়ের মূলধন বা উদরান্ন-সংস্থানের উপায়মাত্র হইল। তাহারা আর এক-দিক হইতেও নিজেদের চরণেই পরশু হানিল। শূদ্রের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিল—আপন জাতির নারীর সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা করিল। সমাজপতিত্বের মর্য্যাদা কায়েম রাখিবার জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিল—'গৃহপতিত্বের একাধিপত্য' বজায় রাখিবার জন্য সেই প্রক্রিয়াই চালাইল। নিজেদের নারীগণকেও তাহারা হিন্দুত্বের তথা মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিল। স্ত্রী ও শূদ্র একশ্রেণীভুক্ত। প্রতিনিয়ত আহারে, বিহারে, শয়নে, চলনে প্রকারান্তরে শূদ্র সংসর্গেই থাকিতে হইল—তাহার ফল আপনাদের জীবনে বংশ পরম্পরায় ফলিতে লাগিল। কে না স্বীকার করিবে—মাতা পিতা উভয়েরই পূর্ণাধিকার না থাকিলে সন্তানে পূর্ণাধিকার বর্ত্তে না। ফলে কি দাঁড়াইল? শতকরা ৯৫ জন ধর্ম্মে পূর্ণাধিকার পাইল না—শতকরা ৫এর মধ্যে ২॥০ স্ত্রীলোক—তাহারাও পাইল না—শতকরা ২॥০এর মধ্যে আবার অধিকাংশই অধিকার সম্ভোগ করিল না। ফলে দাঁড়াইল—এদেশের হিন্দুদের হিন্দুত্বে পূর্ণ অধিকার তো নাই-ই—যতটুকু আছে তাহা 'নাস্তির'ই কাছাকাছি।

আত্মাবমাননা ও দাস-মনোভাব দেশে এমনি কায়েম হইয়া উঠিল যে—তাহারা আপনাদের অধিকারের বংশপরম্পরা-ক্রমে অসদ্‌ব্যবহার করিয়া চলিল, তবু তাহাদের বংশগত গৌরব ঠিক থাকিয়া গেল। ইহা হইতে বিস্ময়জনক ব্যাপার আর কি আছে? ধর্ম্মে পূর্ণাধিকার লাভের জন্য কখনো কেহই যে চেষ্টা করেন নাই—তাহা নহে। কিন্তু যখনই চেষ্টা হইয়াছে তখনই নির্যাতন হইয়াছে—অনধিকারীদের পক্ষ হইতেই বেশি বেশি। বর্ণগুরুদের মধ্যেও এমন সকল মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন—যাঁহারা বর্ণাশ্রম-শাসকদের অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করিয়াছেন—এবং নবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া আপামরসাধারণ সকলকেই ধর্ম্মের পূর্ণাধিকার দিতে চাহিয়াছেন। মানুষ আপনার অধিকার সম্পূর্ণ সম্ভোগ না করিতে পারে—আপন অধিকারের অসদ্ব্যবহারও করিতে পারে—যেমন বহু ব্রাহ্মণ চিরদিনই তাহা করিয়া আসিতেছে, তাই বলিয়া মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ অধিকার লাভের অধিকার তাহার কেন না থাকিবে?

শ্রীচৈতন্যদেব তাহাই বুঝিয়াছিলেন এবং বাংলাকে নূতন ধর্ম্ম দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও জাতি-গঠন হইল না। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে বংশগত অধিকারের ঠাঁই-ই নাই, —আপামর সাধারণের উহাতে পূর্ণ অধিকার—

জ্ঞানে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গো-সাঁই॥

কাজেই বংশগত অধিকারের মূল্য যাহাতে থাকিল না—পাণ্ডিত্য যাহার মধ্যে নিষ্প্রভ, বেদানুগত কর্ম্মকাণ্ডের যাহার মধ্যে ঠাঁই নাই—বর্ণাশ্রম-শাসকগণ তাহা সহ্য করিতে পারেন না। সে ধর্ম্মে আপামর সাধারণ সকলের সহিত একপংক্তিতে বসিতে হইবে নূতন আদর্শে হয়ত শূদ্রেরাও তাঁহাদিগকে মর্য্যাদায় অতিক্রমই করিবে। ভক্তিই সেখানে সব চেয়ে বড়, সেখানে শূদ্রের প্রাধান্যই স্বাভাবিক।—শূদ্রের অন্য অধিকার কিছুই না থাকুক--ভক্তি করিবার অধিকার হইতে তাহা-

দিগকে কেহ বঞ্চিত করে নাই। বরং বর্ণাশ্রম-শাসকগণ শূদ্রগণের ভক্তিধর্ম্মানুশীলনেরই প্রকারান্তরে সহায়তা করিয়াছে।—বর্ণাশ্রম-শাসকগণ সর্ব্বপ্রযত্নে এই নব ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে—যেই নবদ্বীপে প্রভু প্রকাশ পাইল।

যত ভট্টাচার্য্য একজনা না দেখিল॥

ভট্টাচার্য্যগণ যাহাতে নবধর্ম্ম প্রসার লাভ না করে, তাহার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে যেটুকু আভিজাত্য-মোহ কাটিয়া গিয়াছিল—ভট্টাচার্য্যগণের চেষ্টায় সেই আভিজাত্য দ্বিগুণবলে 'গোস্বামিত্বে' প্রকট হইয়া উঠিল।

সম্প্রদায়-বিশেষের পূর্ণাধিকার-ভোগ অন্যান্য 'জাত বস্তুর' ন্যায় অনিত্য অশাশ্বত। জাতস্য মরণং যখন ধ্রুবং তখন ইহার একদিন শেষ হইবেই! দীর্ঘায়ু হওয়া আর অমর হওয়া এক নহে। আজ পশ্চিম জগৎ হইতে আমরা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকারের আদর্শ লাভ করিয়াছি। বড়ই লজ্জার কথা যে, এই আদর্শ আমাদিগকে পাশ্চাত্ত্য-জাতির কাছ হইতে গ্রহণ করিতে হইতেছে। ভারতবর্ষের সেটা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ—যে আদর্শ ভারতবর্ষ বেদান্ত উপনিষদ্ গীতায় ঘোষণা করিয়াছে—যে আদর্শের কথা ভারতবর্ষ এজগৎকে প্রথম শুনাইয়াছে—সেদিনও যে আদর্শের বাণী বিবেকানন্দ প্রাচ্য-জগৎকে শুনাইয়া আসিলেন,—সেই আদর্শের বোধশক্তি আজ আমাদের মধ্যে জাগিল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্য দিয়া! পাশ্চাত্ত্য জগৎ আমাদিগকে মনুষ্যত্বের যেআদর্শের কথা শুনাইয়াছে, তাহা বেদান্ত উপনিষদের আদর্শের মত অত উচ্চস্তরের সামগ্রী নহে,—তবু যে আদর্শে আজ বাঙ্গালীর সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিকল্পিত তাহা অপেক্ষা সে আদর্শ ঢের উঁচু।

ধর্ম্মজীবনে যে সকলেরই পূর্ণাধিকার, ইউরোপ তাহা বহুশতাব্দীর বিগ্রহ ও রক্তপাতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক'রিয়াছে—আমরা ইউরোপের এই ধর্ম্মসম্পর্কীয় আদর্শটিকে লক্ষ্য করি নাই বটে, কিন্তু বিদেশাগত রাষ্ট্রীয় জীবনের জাতিগত ও ব্যক্তিগত পূর্ণাধিকারের আদর্শ আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। ঐ আদর্শের সঙ্গে মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ অধিকারের আদর্শ রক্তে মাংসে অস্থি-মজ্জায় বিজড়িত। তাই আজ আমরা রাষ্ট্রীয় আন্দোলন করিতে গিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, শুধু রাষ্ট্রীয় জীবনে পৃথক ভাবে পূর্ণাধিকার লাভ সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় জীবনে পূর্ণাধিকার লাভ মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ অধিকার লাভেরই অঙ্গমাত্র। তাই একসঙ্গে সকল ক্ষেত্রেই—কি রাষ্ট্রে, কি ধর্ম্মে, কি সমাজে সর্ব্বত্রই পূর্ণাধিকার চাই। ইহা পাশ্চাত্ত্য জগতের অনুকরণ মাত্র নহে—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তরাত্মার কথা। হিন্দুকে তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ণ অধিকার বা পূর্ণ স্বাধীনতা না দিয়া আমরা রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাধীনতা চাহিতেও পারি না—পাইতেও পারি না। যে অধিকার আমরা আমাদের মুখাপেক্ষীকে দিতে পারি না—সে অধিকার আমরা চাহিব কোন্ মুখে?

কলিকাতায় হিন্দুসভার এক অধিবেশনে হিন্দুমাত্রকেই হিন্দুত্বের পূর্ণাধিকার দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছিল। এই প্রস্তাবে অসঙ্গতি কিছু দেখা যায় না—এখন ইহা কার্য্যে পরিণত হইলেই দেশের কল্যাণ হইবে। এতদিন যে কেন এই প্রস্তাব হয় নাই—তাই ভাবি। জগতে এমন কোন ধর্ম্ম নাই—যে ধর্ম্মের অনুসারক মাত্রেরই তাহাতে পূর্ণাধিকার নাই। যাহারা ধর্ম্মবিশেষের আশ্রয়ে পুরুষানুক্রমে আছে, তাহাদের তো কথাই নাই—যে কোন ব্যক্তি ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণাধিকার লাভ করিবে—ইহাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কে কতটুকু অধিকারের সুযোগ সম্ভোগ করিবে তাহা ভাবিয়া অধিকার দেওয়া হয় না—মানুষের মনুষ্যত্বের জন্মগত দাবী বলিয়াই ঐ অধিকার দিতে হইবে। তাহাতে কি আপামর সাধারণ সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়া গেল? ব্রাহ্মণ বুঝি না, ব্রাহ্মণ্যের উচ্চ আদর্শ ও মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ বুঝি। সে আদর্শ ও মনুষ্যত্বের উচ্চতম আদর্শে কোন প্রভেদ আছে বলিয়া জানি না। সে আদর্শ শুধু জাতি ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলের নয়—মানুষমাত্রেরই অনুগম্য লক্ষ্য। সে আদর্শ হারাইলে বামুনের ছেলে ও বেণের ছেলেতে শুধু জন্মের অজুহাতে কোন তফাৎ থাকিতে পারে না। এ কথাটা এখন নির্ভয়ে জোর গলায় বলিতেই হবে।

আজ হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানে হিন্দুমাত্রেই যদি জোর করিয়াই পূর্ণাধিকার লাভ করে, তবে ব্রাহ্মণের বলিবার কিছু নাই—বাধা দিলেও বাধা টিকিবে না। বহু ব্রাহ্মণই এ বিষয়ে সাহায্য করিবে বা করিতেছে। ইহাই সব চেয়ে বেশী আশার কথা। ইহাতে মনে হয় সত্য-নারায়ণ

দেশের প্রাণে জাগিয়াছেন—তাঁহারি পাঞ্চজন্য-ধ্বনি ব্রাহ্মণ শূদ্র সবারই-কণ্ঠে বাজিতেছে—এ আন্দোলন শূদ্রের বিদ্রোহ বা ব্রাহ্মণের উদারতা মাত্র নহে—ইহা সত্যেরই জাগরণ।

আজ যাহারা হিন্দুত্বের পূর্ণাধিকারের দাবি করিতেছে, তাহারা জোর করিয়া গোঁড়া ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থাদির জাতি মারিতেছে না,—জোর করিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধন করিতে যাইতেছে না,—জোর করিয়া পংক্তি-ভোজন করিতেও যাইতেছে না। যদি তাহারা পুরোহিত না ডাকিয়া নিজেরাই পূজা করে—যদি তাহারা উদারচেতা মনস্বী ব্যক্তিদের সাহায্যে দেব-মন্দিরে প্রবেশ লাভ করে—অথবা নূতন দেব-মন্দির নির্ম্মাণ করে—যদি তাহারা পেশকারের সাহায্য না লইয়া খোদার দরবারে নিজের আর্জ্জি নিজেই পেশ করে—বর্ণবিভাগের আগে হইতে আর্য্যেরা যে মন্ত্রে সবিতার আরাধনা করিয়াছে সেই মন্ত্রেই আরাধনা করে—হিন্দুত্বের চিহ্নস্বরূপ শিখাসূত্রাদি বাহ্যাভরণ ধারণ করে—যদি বৈদিক সংস্কারগুলি বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করে—শ্রাদ্ধতর্পণাদি করে—আপনার গৃহ-দেবতাকে অন্নভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করে—সর্ব্বসংস্কারে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করে—নানাপ্রকার উপজাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে—এইরূপে হিন্দুত্বের সর্ব্বানুষ্ঠান প্রতিপালন করে,—তবে গোঁড়া হিন্দুর রাগ করিবার কিছু নাই—গোঁড়া হিন্দু তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন,—তাহাদের সংস্রবে যাহারা থাকিবে তাহাদিগকেও ত্যাগ করিতে পারেন। সকল হিন্দুই হিন্দুত্বের পূর্ণাধিকার পাইলে সকলেরই আনন্দের কারণ হইবে। কারণ, সমগ্র জাতিই উন্নত হইয়া উঠিবে—গোঁড়া যাহারা তাহারাও আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্যও আত্মোন্নতি সাধন করিয়া পার্থক্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবেন, দেশটা আর শূদ্রের দেশ থাকিবে না—শূদ্রের দেশ বলিয়া ঘরে পরে কেহই আর ঘৃণা করিবে না। যে জাত্যভিমান ব্রাহ্মণের চিত্তোৎকর্ষ-সাধনের সহায়ক বলিয়া কল্পিত হয়—সেই জাত্যভিমান অর্থাৎ হিন্দুত্বের অভিমান সমগ্রজাতিকেও উন্নত করিতে পারিবে। বড়ই আশার কথা, হিন্দুসভার অধিনায়কদের মধ্যে ধনী, শাস্ত্রজ্ঞ ও সুবিদ্বান ব্রাহ্মণও অনেক আছেন।

জাতির ধর্ম্মগত বন্ধনে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ঐক্যের মূল্য খুব বেশী। কেবল সমস্ত জাতির প্রার্থনার মন্ত্র যদি এক হয়, শুধু এক মন্দিরে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া—যদি সর্ব্বজাতির লোক উপাসনা করিতে পায়, তাহা হইলেও হিন্দুর জাতীয়তা দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপিত হইতে পারিবে। ইহাতে চমকাইয়া উঠিবার কারণ দেখি না—সকল ধর্ম্মেরই প্রার্থনা মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতে ব্যক্ত হইলেও একই—আর হরিসংকীর্ত্তন এক প্রকারের উপাসনা। এদেশে এক সঙ্গে সর্ব্বজাতির সমবেত উপাসনার নজীরও আছে।

ধর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ণাধিকার লাভের প্রসার দেশে বহুদিন হইতে জাগিয়াছে—শিক্ষাপ্রচারই তাহার কারণ। সকল জাতির মধ্যেই গুণী, জ্ঞানী পণ্ডিতলোক জন্মিতেছেন, তাঁহাদের মনোবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষের সহিত, কেবলমাত্র জাতির অজুহাতে, নিম্নাধিকারের ধর্ম্মানুষ্ঠান শোভন সমঞ্জস হইয়া উঠে না—সামাজিক নিম্ন পদবীর সহিত শিক্ষাদীক্ষার মিল হয় না। সেজন্য যে সকল জাতিতে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে সকল জাতি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের মর্য্যাদায় উন্নত করিয়া আচার অনুষ্ঠান পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাও সামাজিক জীবনে ও ধর্ম্মজীবনে আয়ততর অধিকার লাভ করিবার প্রয়াস মাত্র। এদেশে ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত 'জন্মের' সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ বলিয়া এই প্রয়াস জাতিবর্ণগত আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে।

ধর্ম্মানুষ্ঠানে পূর্ণাধিকার না থাকায় কত লোকের যে হিন্দুত্বের প্রতি মমতাই জন্মে নাই, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহার মনে পূর্ণাধিকার লাভের প্রয়াস জন্মিয়াছে,—নিম্নাধিকারের উপেক্ষিত দশা যাহার অসহ্য বোধ হইয়াছে—সে গত্যন্তর না দেখিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে। এক সময় ভারতের বৈশ্যগণ যে দলে দলে জৈন বা বৌদ্ধধর্ম্ম বরণ করিয়াছে—মুসলমান-রাজত্বে অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয়েরা যে শিখধর্ম্ম, কবীরের ধর্ম্ম, সুফী ধর্ম্ম বা ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছে, বৈষ্ণবতার আশ্রয়ে যে অনেকে শান্তিলাভ করিয়াছিল, ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে যে বহু হিন্দু খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছিল—অথবা ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার একটি কারণ, হিন্দু ধর্ম্মের আশ্রয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠানে পূর্ণাধিকার লাভের বাধা—আর অন্য ধর্ম্মের আশ্রয়ে পূর্ণাধিকার লাভের সুযোগ।

আজ শুধু হিন্দুকে হিন্দুত্বের আশ্রয়ে রক্ষা নহে,—বিধর্ম্মীকে হিন্দু করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে—হিন্দুর সংখ্যা বাড়াইবার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। এ জাতিকে বাঁচিতে হইলে তাহার সকল দুয়ার খুলিয়া রাখিতে হইবে—প্রাণের দায়েই আজ হিন্দু সমাজের আশ্রয়কে উদারতর ও আয়ততর করিতে হইতেছে। একাযা যখন আমাদের নিজের গরজেই করিতে হইতেছে, তখন বিধর্ম্মীকে দয়া করিয়া আস্তাকুঁড়ের পাশে ঠাঁই দিলে চলিবে না—তাহাকে হিন্দুত্বের পূর্ণ অধিকারই দিতে হইবে। তাহা না দিলে উদার সামাজিক জীবন ত্যাগ করিয়া কে কৃপার পাত্রের জীবন যাপন করিতে হিন্দুসমাজে আসিবে? আর একজন মুসলমান বা খ্রীষ্টানই যদি পরধর্ম্মের আশ্রয় হইতে আসিয়াও হিন্দুত্বের পূর্ণাধিকার পায়—তবে কোন্ যুক্তিতে পুরুষানুক্রমে হিন্দুসমাজের চরণতলে পতিত একজন হিন্দুকে তাহার ধর্ম্মের পূর্ণাধিকার দেওয়া হইবে না?

পরাভব

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

এমনি ছোটখাটো ঘটনা হইতে ব্যাপারটা এত শীঘ্র এমন কুৎসিত আকার ধারণ করিবে কেহ জানিত না।

সেদিন বিকালে পিসিমা সুষমার ঘরে যখন ঢুকিলেন তখন তাঁহার মুখ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর। রমেশ ঘরে ছিলনা। ঘরের এক কোনে সুষমা ভূমিশয্যায় শুইয়া ছিল এবং বামুন-ঠাকরুণ তাহার মাথার কাছে বসিয়া পাখা করিতেছিল।

"তুমি সকালে আজ ভাত খেতে যাওনি বউমা!"

সুষমা পিসিমার গলার আওয়াজ পাইয়া শায়িত অবস্থাতেই মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল। কিন্তু জবাব দিল না।

মিছে কথা বাড়ানো পিসিমার স্বভাব নয়, তিনি ঘোর প্যাঁচ না করিয়া তাহার মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "তুমি কি আমার ওপর রাগ ক'রেছো বৌমা?"

সুষমা এবারও চুপ করিয়া রহিল কিন্তু বামুন-ঠাকরুণ এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না, সুষমার প্রতি দরদে একেবারে গলিয়া গিয়া সামনের দেয়ালটাকেই বোধ হয় উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"রাগের আর দোষ কি বাপু—নিজের বাড়ীতে বাপভায়ের অপমান আর কে সইতে পারে!"

অপমানে ঘৃণায় পিসিমার সর্ব্ব শরীর কাঠ হইয়া গিয়াছিল। তবুও বামুন-ঠাকরুণের মুখে সুষমারই অভিযোগ ধ্বনিত হইয়াছে মনে করিয়া তিনি শান্ত স্বরে বলিলেন—"তুমি কি শুনেছ জানি না বৌমা, কিন্তু তোমার ভাইকে ত' আমি অপমান করিনি। বরং আমাকে যে কথা তোমার দাদা ব'লে গেছে সেগুলো ঠিক সম্মানের নয়।"

তাহার পর একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু আমি ত' তাতে কিছু মনে করিনি। ইটখোলার জন্য রমেশকে টাকা ফেলতে বারণ করেছিলেম ব'লে তোমার ভাইয়ের রাগ হ'য়েছে মনে হ'ল। তোমার ভাইয়ের ধারণা রমেশের টাকা বাঁচান'তে আমার কোন স্বার্থ আছে। আমি শুধু তার উত্তরে বলেছি যে যতদিন রমেশ আমার কাছে মত নিতে আসবে, ততদিন তার পক্ষে আমি যা ভাল বুঝি তাই তাকে আমি জানাব। আমার মত নেওয়া বা নিয়ে সে মত রাখা না রাখা তার ইচ্ছে।"

সুষমা ইহার পর হয়ত কিছু বলিত কিন্তু বামুন-ঠাকরুণ তাহাকে সে সুযোগ দিলেন না, আর একবার সম্মুখবর্ত্তী দেয়ালকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন—"হ্যাঁগা, এত মত দেওয়া নেওয়া কিসের তাও ত' বুঝিনা! ছেলে মানুষটি ছিল রমেশ, তখন না হয় তোমরাও মানুষ করেছ আমরাও করেছি। তা ব'লে লেখা পড়া জানা ছেলে,—বড় হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে—তার উপর টেক্কা দেওয়া আর আমাদের সাজে? যার ঘর যার সংসার সে কোথায় রইল তার ঠিক নেই আর কোথাকার কে, উড়ে এসে জুড়ে ব'সে আমরা ক'রব চিরকাল ফফরদালালী! লোকে ছিছি ক'রবে না?"

এমন রূঢ় নিষ্ঠুর ভাবে বামুন-ঠাকরুণ হঠাৎ বাক্যবিষ ছড়াইতে পারে একথা সুষমা কিন্তু কল্পনাও করিতে পারে নাই। এবার শুধু বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়াই তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

পিসিমা কোন রকমে টলিতে টলিতে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। বামুন-ঠাকরুণের কুৎসিত গালাগালিতে সুষমার অনুমোদন নাই একথা বুঝিবার কোন কারণই তাহার ছিলনা।

সন্ধ্যার পরে আসিয়া রমেশ দেখিল, সুষমা মেঝের এক ধারে শুইয়া আছে। অন্য কেহ হইলে এমন অসময়ে শুইয়া থাকার ভিতর একটা কিছু অস্বাভাবিকতা হয়ত দেখিতে পাইত কিন্তু রমেশের সে রকম তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বালাই নাই।

জামাটা খুলিয়া রাখিতে রাখিতে সে সুষমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "আজ তোমার দাদার সঙ্গে এক চোট হ'য়ে গেল কিন্তু! যা মুখে আসে শুনিয়ে দিয়েছি!"

দাদার নাম শুনিয়া সুষমা সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিল; উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদার সঙ্গে তোমার দেখা হ'য়েছিল?"

"হ'য়েছিল বই কি?—দেখ, তোমার দাদাকে আমি ভাল মানুষটি ব'লে জানতুম, কিন্তু দেখলুম লোক বড় ভয়ানক!"

সুষমা এইবার ব্যাপারটা কতকটা আন্দাজ করিয়া লইয়াছিল ; সঙ্গে সঙ্গে যে অভিমান ও ক্রোধ তাহার পিসীমার অপমানের পর হইতেই শান্ত হইয়া আসিতেছিল তাহা আবার নূতন করিয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। সে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "দাদার অপরাধ !"

"অপরাধ নয় ?---তোমার দাদা বলে কি জান ? পিসীমাকে এ বাড়ী থেকে না তাড়া'লে তিনি আর নাকি এ বাড়ী মাড়াবেন না। আস্পর্দ্ধা দেখেছ !"

সুষমা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের কণ্ঠে বলিল, "তুমি খুব অপমান ক'রে দিয়েছ বোধ হয়।"

রমেশ খুশী হইয়া হাসিয়া বলিল, "দিই নি আবার। সে আর তোমায় বল্‌তে হ'বে ?—পিসীমার ওপর ওঁর দেখি যত আক্রোশ, রোজ একবার ক'রে তাঁর নিন্দে আমার কাছে না ক'রে জল গ্রহণ করেন না। পাচ দিন স'য়ে স'য়ে আজ আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দিয়েছি। ব'লে দিলাম, আমাদের বাড়ী মাড়িয়ে আমাদের বাধিত ক'র্‌তে তাঁকে কেউ ডাকে না।"

"বেশ ব'লেছ ! কিন্তু এখনও একমাত্র যে ডাকে তাকে বিদেয় ক'রে সব ল্যাঠা চুকিয়ে ফেলে দাও।"

কথাটাকে মজার একটা পরিহাস মনে করিয়া রমেশ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—"তাই দিই যদি !" কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সুষমার কণ্ঠস্বরের রুক্ষতায় সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সুষমা তীব্রস্বরে বলিল, "তাই দিই যদি নয়—তাই দিতে হবে। এ বাড়ীতে যথেষ্ট অপমান আমার হ'য়েছে—আর আমি থাক্‌তে পার্‌ব না।"

রমেশ সত্যই আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, "সে কি ! তোমায় অপমান আবার কে করলে ?"

সুষমা এবার হতাশ হইয়া বলিল, "সে তোমাকে বোঝাতে আমি পার্‌ব না ;—আমি শুধু তোমায় জানিয়ে রাখলাম কাল আমি চলে যাচ্ছি।"

"জানি না বাপু, যা ইচ্ছে তাই কোরো।" বলিয়া রমেশ চটিয়া বোধ হয় হাত মুখ ধুইতেই বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু খানিক বাদেই কি একটা কথা মনে পড়ায় সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তুমি কি তা হ'লে বল্‌তে চাও পিসীমাকে ? আমার তাড়িয়ে দেওয়া উচিত—কেমন ?"

সুষমা মেঝেতে যেমন শুইয়াছিল সেই ভাবেই মুখ না তুলিয়া বলিল, "আমি কিছু ব'ল্‌তে চাই না—আমার নিজের শুধু এখানে থাকা অসম্ভব এইটুকুই জানি।"—তাহার গলা ভার—মনে হইল যেন কাঁদিতেছে

কিন্তু রমেশ তাহা গ্রাহ্য না করিয়া রূঢ়তর আঘাত দিয়া বলিল, "তোমাদের ভাই-বোনের অনেক দিন থেকেই পিসীমাকে তাড়াবার মতলব তা আর আমি জানি না

সুষমা কিন্তু একথার আর উত্তর দিল না।

সে রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর কথা হয় নাই।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সুষমার আচরণের ভালো রকম একটা অর্থ না পাইয়া রমেশ ঘুমাইতে পারিল না। সুষমা বামুনঠাক্‌রুণের একান্ত অনুরোধেও না খাইয়া মেঝেতে শুইয়াছিল। রাগারাগির পর এমন অনেক দিন রমেশ তাহাকে ডাকিয়া উঠাইয়াছে কিন্তু সে রাত্রে যে কারণেই হোক্ তাহা সম্ভব হইল না।

কিন্তু এমনি ভাবে রাত কাটিবার পর সকালে যখন পিসীমা আসিয়া হঠাৎ তাঁহার বহু দিনের বিস্মৃত বোনের বাড়ীতে কয় দিনের জন্য যাইবার প্রস্তাব করিলেন তখন বিস্ময়ে বেদনায় প্রথমটা রমেশের মুখ দিয়া কথাই বাহির হইল না।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "তোমাদের কাণ্ডকারখানা কি বল্‌তে পার ? কথা নেই বার্ত্তা নেই, কাল ও বাপের বাড়ী যাবার জন্যে একেবারে ধনুকভাঙ্গা পণ ক'রে বস্‌ল, আজ তুমি কোন্ চুলোয় তোমার বোনের বাড়ী চলে' যেতে চাচ্ছ—এর মানে কি ? বেশ বেশ ! যাওগে যার যেখানে খুশী ! আর আমারই বা তাহ'লে থাক্‌বার দরকার কি ? যাব যেখানে খুশী চলে' !"

পিসীমা কিন্তু ইহার পরও যখন জেদ করিয়া বলিলেন, "আজ পর্য্যন্ত তোর মুখ চেয়েই ত কোথাও যাই নি বাবা ! কিন্তু এবার আমাকে যেতে দিতে হবে বোন্‌টা চিঠি লিখে লিখে হায়রাণ হ'ল—থেকে আসি ক'দিন !" তখন সে হঠাৎ বলিয়া বসিল, "ক'দিন কেন, চিরদিনের মত গেলেই যে বাঁচি।"

পিসিমা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তাও কি আর যাবনা রে ! ভগবান করুন তোদের ভালোয় ভালোয় রেখে তাই যেন যেতে পারি তাড়াতাড়ি।"

রমেশ কিন্তু আগের মতই কটু কণ্ঠে বলিল,—"ভগবান কেন তুমি ইচ্ছে করলেই ত পার—বোনের বাড়ী থেকে আর ফেরার কি দরকার ?"

"না ফিরলে তোর চলবে ?" বলিয়া পিসিমা আবার হাসিলেন।

"না তোমার জন্যেই সব আটকে যাবে। এখানে থেকে আমার ত ভারী উপকার করছ ! আমার বড় শালাকে কাল অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে, ওকে কাল খেতে দাওনি—হুঁ জানিনা আমি, কোন দিন আমাকেই বলবে দূর হ'য়ে যা।"

এই অসংলগ্ন অভিযোগগুলির পিছনে কি আছে তাহা পিসিমা হয়ত জানিতেন তবু এবার তিনি হাসিতে পারিলেন না। বলিলেন, "বেশ ত তোরা না ডাকলে আর ফিরব না। এখন বাঁধাছাঁদা করতে হবে, আমি যাই তাহলে।"

পিসিমা চলিয়া যাইতেছিলেন কিন্তু দেখা গেল রমেশের কথা তখনও ফুরায় নাই। উত্তেজিত কণ্ঠে পিসিমার পাছু পাছু যাইতে যাইতে সে বলিতে লাগিল "এখন ত বোন, বোন-পোর কাছে যাবেই। আমার বড় শালা ত আর মিথ্যা বলে না—আপনার কেউ ত আর তুমি নয় যে আমার হয়ে সত্যি সত্যি টানবে। কাজ ফুরোলে সরে পড়াই ত তোমার মতলব।"

পিসিমা কিন্তু ইহাতেও বিচলিত হইয়াছেন কিনা বোঝা গেল না, শান্ত কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"আচ্ছা এখন তুই ঘরে যা দেখি ! তোর সঙ্গে বকবার এখন আমার সময় নেই।"

অগত্যা রমেশকে চলিয়া আসিতেই হয়; কিন্তু যাত্রার আয়োজন যতক্ষণ চলিল ততক্ষণ সে স্থির হইয়া এক জায়গায় বসিতে পারিল না—থাকিয়া থাকিয়া পিসিমার ঘরে আসিয়া সে কি যে বলিয়া যাইতে লাগিল—না বোঝা গেল তাহার উদ্দেশ্য, না পাওয়া গেল তাহার অর্থ।

সুষমা সারাদিনের অনাহারের পর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত স্বামীর কথায় কাঁদিয়া একটু বেলা পর্য্যন্তই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে ঘুম হইতে উঠাইলেন স্বয়ং বামুন ঠাকরুণ। বামুন ঠাকরুণ সুসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু সে সুসংবাদ সময়মত প্রকাশ করিবার মত ধৈর্য্য তাঁহার ছিল।

প্রথমেই আসিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"আহা কাল কি কুক্ষণেই রাত পুইয়েছিল গা—সারাদিন বাড়িতে কারুর মুখে অন্ন উঠল না।"

ঘুম ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গে গত দিনের সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া সুষমা অত্যন্ত বিরক্তি অনুভব করিতেছিল। স্বামী তাহাকে অকারণে অপমান করিয়াছে এবং সেজন্য বিন্দুমাত্র অনুতাপও বোধ হয় পরে করে নাই—করিলে কি একবার সকালেও খোঁজ লইতে পারিত না। মনের এই অবস্থায় বামুন ঠাকরুণের আদিখ্যেতা তাহার ভাল লাগিল না, সে নীরবে আগোছাল চুলগুলা দিয়া একটা এলো খোঁপা বাঁধিতে লাগিল।

বামুন ঠাকরুণ কিন্তু এসব সামান্য বিরাগ অসন্তোষ গ্রাহ্য করিবার পাত্র নন। সেইখানে বসিয়া পড়িয়া তিনি আরম্ভ করিলেন—"তোমরা দুজনে দাঁতে কুটি কাটলেনা মা, আমি আর কোন প্রাণে মুখে খাবার তুলি। যেমন নামিয়েছিলাম তেমনি হাঁড়ি কুড়ি বোঝাই বাসি খাবার পড়ে আছে। ভিখিরী টিখিরী এলে বিলিয়ে দেব।"

সুষমার দিক হইতে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া না গেলেও বামুনঠাকরুণ নিরুৎসাহ হইলেন না, বলিয়া চলিলেন—"দিনভর কিছু খাওনি তার ওপর রাতপিত্তি পড়েছে; আজ ত তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে হয় মা—মনুয়াকে কি আনতে হবে ফর্দ্দ করে বাজারে পাঠিয়ে দাও সকাল সকাল।"

এবার সুষমা বিরক্ত হইয়া বলিল,—"তোমার কি ভীমরতি ধরেছে বামুন ঠাকরুণ, বাজারের ফর্দ্দ আমি করি নাকি রোজ ?"

এই সুযোগেরই বামুন ঠাকরুণ অপেক্ষা করিতেছিলেন—অত্যন্ত সহজ ভাবে ভালোমানুষের মত বলিলেন—"তুমি বিনে কে করবে মা ! এক আমি করতে পারি, তা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে ত' শিখি নি কখন !"

হেঁয়ালি বুঝিতে না পারিয়া সুষমা অধৈর্য্য হইয়া বলিল, "যে রোজ ফর্দ্দ করে তার কাছে যাও না বামুনঠাকরুণ। আমার আজ মন মেজাজ ভাল নেই, আমায় বকিও না।"

সুখবরটা বেশ করিয়া তারাইয়া তারাইয়া প্রকাশ করায় বোধ হয় বামুনঠাকরুণের বিশেষ একটি আনন্দ ছিল। তিনি বলিলেন—"মন মেজাজ খারাপ তাকি আর জানি না মা তবু

একটু কষ্ট আজ করতে হবে যে—! যে রোজ ফন্দ করে সে ত আজ বিদেয় হ'ল—এখন তোমারই ঘর তোমারই সংসার।"

সুষমা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বিদেয় হ'ল? কে বিদেয় হ'ল,—পিসিমা?"

এইবার একগাল হাসিয়া বামুনঠাকরুণ বলিলেন—"তা বই আর কে? বাবু আমাদের ভালমানুষ বলে কি চিরদিন চোখে ধুলো দিয়ে রাখা যায়। পাঁচ দিন সয়ে' আজ সকাল থেকে একেবারে ক্ষেপে গেছে—আজ বাড়ীছাড়া না ক'রে আর জলগ্রহণ করবে না বোধ হয়।"

সুষমার কাছে ইহা সুসংবাদ হইবারই কথা। কাল রাত্রে স্বামীর কাছে আঘাত পাইয়া সমস্ত আক্রোশ তাহার পিসিমার উপরেই গিয়া পড়িয়াছিল। পিসিমা ভালো হউন মন্দ হউন তাঁহারই জন্য তাহার ভাই এ বাড়ীতে আসিয়া লাঞ্ছিত হয়, সে নিজে স্বামীর কাছে অপমানিত হয় ও তাঁহারই জন্য, এ কথা সে মন হইতে কিছুতেই দূর করিয়া দিতে পারে নাই। মনে মনে সেজন্য সে এমন একটি ঘটনা হয়ত কামনাই করিয়াছিল তবু কেন বলা যায় না আজ এ খবরে যতটা খুশী তাহার হওয়া উচিত সে হইতে পারিল না

তবুও হয়ত এতদিন ধরিয়া সংসারে যে কর্ত্তৃত্ব সে কামনা করিয়াছে তাহার মোহে পিসিমার চলিয়া যাওয়াটা তাহার কাছে বিশেষ খারাপ নাও লাগিতে পারিত কিন্তু স্বামীর ভাবগতিক দেখিয়া সুষমা একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। রমেশের ধরণধারণ দেখিয়া মনে হয় যেন সে বরাবর এই ঘটনার জন্যই প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছে এবং পিসিমার চলিয়া যাওয়ার কথায় তাহার উল্লাসের আর সীমা নাই।

সুষমা ঘরে ঢুকিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই রমেশ বলিল, "বড় যে পিসিমার আঁচল ধরা বলে তোমার ভাই বোনে নিন্দে কর! দেখলে ত কেমন শুনিয়ে দিলাম।"

তাহার পর সুষমার জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই সে আবার বলিল—"কেনই বা বলব না! মানুষ করুক আর যাই করুক, পর বইত নয়, আমার আপনার লোকজনকে অপমান করবার তার কি অধিকার? কি বল?"

সুষমা এইবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি পিসিমাকে বাড়ী ছেড়ে চলে-যেতে ব'লেছ?"

প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া হঠাৎ বেপরোয়া ভাবে রমেশ বলিল, "যদি বলেই থাকি তাতেই বা কি! আমি কি কাউকে ভয় করে চলি নাকি।"

সুষমা বুঝিল পিসিমার যাওয়ার যে কারণই থাক রমেশ তাঁহাকে যাইতে বলে নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল -"পিসিমা কেন যাচ্ছেন জান?"

ইহার উত্তরে রমেশ যাহা বলিল তাহাতে সুষমাই লজ্জা বোধ করিল।

"জানি না আবার, এখান থেকে গুছিয়ে টুছিয়ে নিয়ে এখন নিজের লোকের কাছে সরে পড়ছে আর কি! তোমার দাদা তাই না আগেই আমায় সাবধান করে দিয়েছিল।"

অবাক হইয়া সুষমা জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা তোমায় এই কথা বলেছেন?"

"বলবে না কেন, এ ত' সোজা কথা পড়ে রয়েছে! আমিও তাই পিসিমাকে বলে এলাম—বোনের বাড়ী যাও আর যেখানে যাও, এখান থেকে আর একটি পয়সা যাচ্ছেনা সেটি মনে রেখো। এখান থেকে মোটা সোটা মাসোহারা নিয়ে বোন্ বোন্‌পোকে দেবে সেটি হচ্ছে না!"

ইহার পর সুষমা আর কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার স্বামী দুর্ব্বলচিত্ত—কথায় তাহার কোন কালে মাত্রা থাকে না সে জানে, কিন্তু কত বড় বেদনায়, পিসীমার প্রতি কত গভীর ভালবাসার নির্ভরতা হইতে সেও এমন কথা বলিতে সাহস করিতে পারে বুঝিতে পারিয়া সুষমা খানিক গুম হইয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল।

গল্প ইহার পর আরো বাড়ান যায় না এমন নয়।

পিসীমাকে বোনের বাড়ী পাঠাইয়া, রমেশের বেদনা ও সংসারের বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়া, সুষমাকে ধীরে ধীরে কাবু করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত পিসীমার গৌরবময় প্রত্যাবর্ত্তনে হাসি অশ্রুর একটা জগাখিচুড়ি বানান সম্ভব—কিন্তু সে নেহাৎই গল্প হয়। তাছাড়া সুষমাকে নির্ব্বোধ ও একান্ত স্বার্থপর না করিয়া গোড়াতেই সে পথ বন্ধ করিয়াছি। সুষমা সত্যই অবুঝ নয়। সংসারে কর্ত্তৃত্বের মোহ তাহার যেমনই হোক, স্বামীর মনের শান্তি ও সুখের মূল্য তাহার কাছে অনেক বেশী। সুতরাং গল্পের ক্ষতি করিলেও সুষমা তাহার সংসারের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিল।

* * * *

সুষমা বুঝি পিসিমার ঘরেই গিয়াছিল—সেখানে তাহাদের কি কথা হইয়াছিল বলা যায় না। শুধু সুষমা বাহির হইয়া

যাইবার পর দেখা গেল পিসিমা কি কারণে চোখের জল মুছিতেছেন।

খানিক বাদে বামুন ঠাকরুণ সুষমার ঘরে আসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া চুপি চুপি বলিলেন—"মনুয়া ত গাড়ী নিয়ে এল না মা, ওদিকে মাগী যে দেখলাম মোটঘাট খুলে ফেলছে!"

সুষমা গম্ভীর স্বরে বলিল, "মাগী নয় বামুনঠাকরুণ—পিসিমা।"

বামুনঠাকরুণ একটু অপ্রস্তুত হইলেও ভড়কাইবার পাত্র নয়, দাঁত বাহির করিয়া বলিলেন—"তা বই কি মা, তা বই কি, পর হোক শত্তুর হোক বয়সে ত বড়। সমীহ করতে হবে বই কি! কিন্তু ও যা ছিনে জোঁক, কোন মতে একবার যদি ছেড়েছে, আবার কামড়ে ধরলে কি আর এবাড়ি ছাড়াতে পারবে? মোটঘাট খুলতে দেখেই ত আমার ভয় লেগে গেছে।"

সুষমা তেমনি গম্ভীর স্বরে বলিল—"ভয় তোমার একটু লাগবার কথা বামুনঠাকরুণ! এবাড়িতে বিশ বছর কাজ করেছ—এমন কাজ গেলে আর পাবে না।"

বামুনঠাকরুণ কথাটা বুঝিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া বলিলেন—"অ্যাঁ"।

সুষমা একটু হাসিয়া বলিল,—"যাক, আপাততঃ, পিসিমার কাছে ফর্দ্দ করিয়ে মনুয়াকে বাজারে পাঠিয়ে দাও গে।"

ব্রাহ্মণ

—স্বামী সেবকানন্দ

হে ব্রাহ্মণ! ভারতের প্রাণময় পুরুষ প্রধান!
মোহ-নিদ্রা পরিহরি তোল কণ্ঠে মহাস্তোত্র গান,
লক্ষ পদ্ম-কর তুলি—উর্দ্ধমুখে করহ বন্দনা;
দূরে যাক্ ভারতের ললাটের কলঙ্ক লাঞ্ছনা।
ত্যাগের বিমলাদর্শে মুছে দিয়ে ভোগের কালিমা
নীরবে ফুটায়ে তোল যোগের সে শান্তি মধুরিমা।
হেমময় প্রাচীমূলে অর্দ্ধোদিত আদিত্য মণ্ডল
কনক কিরণপাতে জাগ্রত করিছে জলস্থল;
তেমতি তোমরা দেব! অনলস করি জনে জনে,
জাগাও প্রসুপ্ত প্রাণ সুগভীর আত্মনিবোধনে।
আবার বৈদিক মন্ত্র ব্যাপ্ত হোক গগনে পবনে
গম্ভীরে বাজুক্ শঙ্খ ভারতের ভবনে ভবনে;—
আবার সে বনপথে বিপ্রশিশু গাহি' সামগান
সমিধসম্ভার বহি'—গৃহপানে করুক প্রয়াণ।
হোম-ধেনু দোহনের সুমধুর মৃদু মন্দ ধ্বনি—
কুসুমচয়নাসক্ত ঋষিবালা সারল্যের খনি—
চন্দনচর্চ্চিত ভাল দ্বিজশিশু পাঠে রত মন,-
সরিৎ সরসী নীরে ব্রাহ্মণের নীরব তর্পণ,—
নীবার কণিকালব্ধ আনন্দের কল গুঞ্জ রব,-
যজ্ঞীয় ধূমের সেই সুপবিত্র স্বর্গীয় সৌরভ,-
অতীত কালের কোন মায়াময় গুপ্ত কোষ খুলি,—
সঞ্জীবিত কর দেব! সে যুগের লুপ্ত দিনগুলি!
বিলাস-বাসনাদিগ্ধ এ দেশের নর নারী দলে,
নির্ভয়ে সঁপিয়া দাও গায়ত্রীর পুণ্য পদতলে।
বিশ্বমানবের মাল্যে মধ্যমণি তোমরা ব্রাহ্মণ!
তোমরা অপাপবিদ্ধ - ভক্তিময়ী শক্তির নন্দন!
তোমাদেরি মন্ত্রবলে ভর্গদেব স্বর্গ পরিহরি
নেমেছিল ভারতের তৃণাস্তীর্ণ মৃত্তিকা উপরি!
দুর্জ্ঞেয় সে সৃষ্টিতত্ত্ব যোগবলে করি উদ্ঘাটন,
তোমরাই চেয়েছিলে করিবারে নবীন সৃজন!
দেখাও সে মহাবিদ্যা—ভারতের হে গুরু শিক্ষক!
এ কনক ভূমি হ'তে তুলে ফেল ঈর্ষার কণ্টক!
শিখাও সে ঋষিদের স্বার্থত্যাগ পরহিত ব্রতে;—
ব্যাসের বিচিত্র জ্ঞান,—বশিষ্ঠের শিষ্টতা ভারতে।
ধণুষ্পাণি দ্রোণের সে অতুলন শরক্ষেপ লীলা,—
পরশুরামের তেজ—চৈতন্যের ভক্তি অনাবিলা,—
শুক চরিত্রের সেই সর্ব্বরিক্ত বৈরাগ্য মহান,—
অবনত এ ভারতে হে ব্রাহ্মণ দাও গো সন্ধান।

ভারতে জাতীয় আন্দোলন

বাঙ্গালীর নেতৃত্ব

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃ্তখরকরবালে,
অবলা কেন, মা, এত বলে।
বহুবলধারিণীং
নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং
মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে
বাহুতে তুমি, মা, শক্তি
হৃদয়ে তুমি, মা, ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণি
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্
অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাম্
মাতরম্।
বন্দে—মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্,
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।"

আমাদিগের এই শ্যামা জন্মভূমির সন্তান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত এই মাতৃবন্দনা আজ সমগ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। লোকমান্য বাল-গঙ্গাধর তিলকের নির্দ্দেশে ইহা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের সমাধিতোরণে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

এই বন্দনা পাঠ করিলে ইহাতে ভারতবাসীর—বিশেষ বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হইবে। ইহার স্নিগ্ধ শান্তভাব অন্যান্য দেশের জাতীয় সঙ্গীতে দুষ্প্রাপ্য। ইহাতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নাই; ইহা সমরতূর্য্যনিনাদ নহে; ইহা বিপ্লববহ্নি বিকীর্ণ করে না। ইহা পূজার মন্ত্র—ইহা স্তব। যে ভাবে বিভোর হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই বন্দনা রচনা করিয়াছিলেন, সেই ভাব—চিন্ময়ী মাতাকে মৃণ্ময়ীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং মৃণ্ময়ী মাতাকে চিন্ময়ীরূপে ধ্যান করিয়া তাঁহার বন্দনা—এই ভক্তের দেশে নূতন নহে। আদিকবির অসামান্য প্রতিভার সৃষ্টি "রত্নসৌধকিরীটিনী" স্বর্ণ-লঙ্কাপুরীর সান্নিধ্যে উপনীত হইয়া, সমীরসঞ্চারচঞ্চলিত নীলোর্ম্মিময় সমুদ্রের বক্ষে "কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে" তাহার রবিকরোজ্জ্বল শোভা সন্দর্শন করিয়া রামচন্দ্র ভ্রাতৃগতপ্রাণ অনুজ লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—এই যে হৈমবতী পুরী লঙ্কা, ইহা আমার রুচিকর নহে; কারণ—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। এত স্বল্প কথায় মাতৃভূমি সম্বন্ধে এমন ভাবের বিকাশ আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়?

যাঁহাদিগের সাধনায় দেশে জাতীয় ভাবের মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইয়াছে এবং তাহার পবিত্র স্পর্শে জাতি জড়ত্বশাপমুক্ত হইয়া দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদিগের অন্যতম—শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ—'বন্দেমাতরম্' রচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে ঋষিপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা—তিনি এই মাতৃমন্ত্রদ্রষ্টা। অরবিন্দ বলিয়াছেন, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে ঋষির, মুনির, বীরের আবির্ভাবাভাব হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবও সেই স্বাভাবিক নিয়মে হইয়াছে। ঋষি আপনি অসাধারণ না হইতে পারেন; কিন্তু তিনি যাহা প্রকাশ করেন, তাহা অসাধারণ। যখন কোন বাণী ঘোষণার প্রয়োজন হয়, তখন সর্ব্বশক্তিমান তাঁহার কণ্ঠে সেই বাণী রচনা করিয়া দেন; যখন কোন রূপ দেখাইবার প্রয়োজন

হয়, তখন তিনিই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া লোকসমাজে প্রকাশ জন্য দিব্য দৃষ্টি লাভ করেন। তাঁহার কথাই মন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' রচনাদ্বয়ে দেশ-প্রচলিত রাজনীতিক আন্দোলনকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন সেইরূপে ধ্বংসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখনই গঠনকার্য্যের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, উপর হইতে যে আঘাত পতিত হয়, নিম্ন হইতে প্রত্যাঘাতে তাহা প্রহত করিতে হয়; চণ্ডনীতিকে প্রহত করিতে হইলে জাতীয় ভাবের সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন করিতে হয়। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যাহারা "দ্বিশপ্ত-কোটি" ভুজে খরকরবাল ধারণ করিতে পারে অর্থাৎ যাহারা বাহুবলে বলী, তাহারা ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া পরের দ্বারস্থ হওয়া আত্মসম্মাননাশকর বলিয়াই বিবেচনা করিবে। তিনি তাঁহার 'দেবীচৌধুরাণী'তে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—বুঝাইয়াছিলেন, বাহুবলের পশ্চাতে আত্মিক বল না থাকিলে বাহুবল পশুবলে পরিণতি লাভ করে এবং কখন জয়যুক্ত হইতে পারে না। 'কৃষ্ণচরিত্র'এ তিনি কর্ম্মযোগের মূর্ত্ত বিকাশ দেখাইয়াছিলেন এবং দেশ-প্রেমকে ধর্ম্মের নামান্তর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি দেশসেবাকে দেশাত্মবোধের রত্নবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তির গব্য ঘৃতে পুষ্ট সাধনার পঞ্চপ্রদীপশিখায় তাহার আরতি করিয়াছিলেন। তাহার পর 'আনন্দমঠ'এ তিনি তাঁহার দেশবাসীর অজ্ঞানান্ধকারে আলোক বিকাশ করিয়া তাহাকে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইয়া ধন্য করিয়াছিলেন।

মা'র রূপ কি? তিনি জননীর তিন কালের তিন অবস্থার চিত্র দেখাইয়াছেন :—

প্রথম—

"মা যা' ছিলেন।" সে—মা'র—"সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি।"—"ইনি কুঞ্জরকেশরী প্রভৃতি বন্য পশুসকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্য পশুর আবাসস্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী।"

দ্বিতীয়—

"মা যা' হইয়াছেন।"-"কালী—অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্ব, সেই জন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা' কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা।"

তৃতীয় —

"মা যা' হইবেন।"—"দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত —তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীর-কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রু-বিমর্দ্দিনী,—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।"

বঙ্কিমচন্দ্র মা'র এই রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই যে ভাবের অভিব্যক্তি, ইহা স্বাভাবিক নিয়মে স্ফুরিত হইয়াছিল। যেমন শতদলের বিকাশের জন্য বিশেষ পারি-পার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন, রবিকরোজ্জ্বল নীলাম্বরে বর্ষণলঘু শঙ্খধবল মেঘের গতায়াত, সরিৎসরোবরে অপগতাবিলতা সলিলের সঞ্চার, পবনে মৃদুশীতল সুখদ স্পর্শ—এই পারি-পার্শ্বিক অবস্থা ব্যতীত কমলবিকাশ হয় না; যেমন মলয় পবনের মৃদু সঞ্চার, কুজ্ঝটিকামুক্ত অম্বর, গলিতকাঞ্চনবর্ণ রৌদ্র—এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা ব্যতীত মাধবীমুকুলবিকাশ সম্ভব হয় না, তেমনই আবশ্যক ও অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ব্যতীত ভাবের অভিব্যক্তি হয় না।

যখন বন্দেমাতরম্ বিরচিত হয়, তৎকালীন ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা তাঁহার রচনা সম্ভব করিয়াছিল। তখন যে দেশ জাতীয় ভাবে ওতঃপ্রোতঃ, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

'আনন্দ মঠ' রচনার পূর্ব্বেই কমলাকান্ত রূপে বঙ্কিমচন্দ্র 'মা যা' হইবেন' তাহা দেখিয়াছিলেন। তখনই তিনি কাল-সমুদ্রগতা মাতৃপ্রতিমা উত্তোলিত করিয়া আনিবার জন্য বাঙ্গালীকে আহ্বান করিয়াছিলেন :—

"এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র সকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণ প্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

এই যে ভাব, ইহার বিকাশ অন্যান্য রচনাতেও পাওয়া যাইবে। বঙ্কিম-মণ্ডলের অন্যতম জ্যোতিষ্ক অক্ষয়চন্দ্র সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'এ (২য় ভাগ) দশমহাবিদ্যার সহিত ভারতের দশ দশার তুলনা করিয়াছেন। "প্রথম দুই

দশায় কালী ও তারা মূর্ত্তি। আত্মদস্যুবিবাদ লইয়া যখন ভারতবর্ষ প্রত্যহ রক্তে স্নান করিত, এ সেই তখনকার মূর্ত্তি।" তাহার পর ষোড়শী ও ভুবনেশ্বরী দুই মূর্ত্তি। "তখন আর পূর্ব্বের ভাব নাই। সে নৃশংসতা বিদূরিত হইয়াছে; কিন্তু যুদ্ধ-স্পৃহা তখনও যায় নাই।" "তাহার পর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব; তান্ত্রিক যোগের সৃষ্টি।" তাই "আর ভারত রাজ্ঞী নহেন, ভারত যোগিনী, ভারত ভৈরবী।" "ষষ্ঠী দশায় তন্ত্রপ্লাবন। ছিন্নমস্তামূর্ত্তি।" তাহার পর ধূমাবতী মূর্ত্তি— ইহাই বর্ত্তমান দশার প্রতিমূর্ত্তি। "বিধবা ভারতের পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই; রুক্ষকেশা, রুক্ষাক্ষা; দন্ত বিরল হইয়াছে; শোকে তাপে দৃষ্টি কুটিল হইয়াছে, যেন সকল আশ্রয় পরিত্যক্তা হইয়া পুরাতন ভগ্ন-যান রথে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন; হায়! সেই রথের উপরি কাক বসিয়েছে।" বঙ্কিমচন্দ্র যেমন "মা যা' হইবেন" সেই মূর্ত্তি আপনি দেখিয়াছিলেন ও দেশবাসীকে দেখাইয়াছিলেন, অক্ষয়চন্দ্র তেমনই মা'কে মহালক্ষ্মীরূপে দেখিয়াছিলেন:—

"ভারতমাতার যুগযুগান্তের মলরাশি শ্বেতহস্তিগণ অমৃতবারি সিঞ্চনে বিধৌত করিয়া দিতেছে। ভারতমাতা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন, পদ্মাসনা পদ্মহস্তে জগতে অভয় দান করিতেছেন।"

'বঙ্গদর্শন'এর প্রথম খণ্ডের শেষ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞবর রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' পুস্তিকার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মিলে সব ভারত সন্তান" গানটি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার উপসংহার উদ্ধৃত করিয়া 'বঙ্গদর্শনের' সমালোচক লিখিয়াছেন:—

"রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প-চন্দন-বৃষ্টি হউক। এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক, হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক, গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্ম্মদা গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক, এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়-যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"

সমালোচকের হৃদয়-যন্ত্র যে এই মহাগীতের শব্দে বাজিয়াছিল, তাহা তাঁহার এই আগ্রহপূর্ণ আন্তরিকতাপূর্ণ উক্তিতেই বুঝিতে পারা যায়।

রাজনারায়ণ বাবু এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের প্রথম যুগের পরই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক মনীষীদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজের অনুকরণতৎপরতায় অন্ধ হইয়া বিদেশী আদর্শে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন— মদ্য ও নিষিদ্ধ মাংস গ্রহণের দ্বারা ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ করিবে। রাজনারায়ণ বাবুর পঠদ্দশায় ছাত্র-সমাজের সংস্কার কিরূপ ছিল—সে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলা কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা তিনি তাঁহার আত্ম-জীবনকথায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার জাতীয়তাপ্রীতি বিন্দুমাত্র পরিম্লান হয় নাই। তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহগামী না হইলেও উভয়ের মনোভাবে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আমরা যখন তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করি, তখন তিনি দিনান্ত তপনের মত বার্দ্ধক্যের পশ্চিম গগনে অবস্থিত, বৈদ্যনাথে বাস করিতেছেন। তখনও তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সেই সময় (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে) আমরা ইংরাজী নববর্ষে তাঁহাকে আমাদিগের ভক্তি নিবেদন করিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে তিনি আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন:-

"তোমাদের উদ্দিষ্ট উপহার পাইয়া বাধিত হইলাম। কিন্তু নববর্ষের অভিবাদন এখন করিব না, ১লা বৈশাখ (যদি তত দিন বাঁচিয়া থাকি) করিব। ঐ দিনের জন্য Art Studio দ্বারা বাঙ্গালা ক্ষুদ্র কবিতাযুক্ত উল্লিখিত উপহারের ন্যায় উৎকৃষ্ট উপহারদ্রব্য কি প্রস্তুত করাইতে পার না? কত কাল আর আমরা ইংরাজ থাকিব?"

এই পত্রের শেষাংশে তিনি লিখিয়াছিলেন, "ক্ষীণতাপ্রযুক্ত অধিক লিখিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবে।" যখন জরা তাঁহার দেহকে জীর্ণ করিয়াছিল, তখন তাঁহার হৃদয়ে জাতীয় ভাব কিরূপ প্রবল ও সমুজ্জ্বল ছিল, তাহা পত্র হইতে উদ্ধৃতাংশেই বুঝিতে পারা যায়।

হিন্দু জাতির ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি বলিয়াছিলেন—

"আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে, হিন্দুজাতির কীর্ত্তি হিন্দুজাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি।"

এই বক্তৃতায় তিনি যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত প্রসিদ্ধ গান উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মত সত্যেন্দ্রনাথও ইংরাজ সরকারের কর্ম্মচারী ছিলেন। ভারতবাসীদিগের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম বিলাতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া

আসেন। তাঁহার সেই সাফল্য কবিবর মধুসূদন দত্ত একটি কবিতার বিষয় করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। এই গীত বহুদিন ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের মত সভাদিতে গীত হইত। 'বন্দে মাতরম' জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হইবার পূর্ব্বে ইহা গুজরাতী ভাষায় অনূদিত হইলে রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছিলেন, ইহাই আমাদিগের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হইতেছে। ইহারও বৈশিষ্ট্য জাতীয়তা—

"মিলে সব ভারত-সন্তান,
একতান মনঃ প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।

ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনিরত্নের নিধান।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত-ললনা
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত ললনা।
হোক্ ভারতের জয়—
ইত্যাদি

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত-ভূষণ।
হোক্ ভারতের জয়—
ইত্যাদি

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্ম্ম স্ততো জয়।
ভিন্ন ভিন্ন হীনবল ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিবে কি ভয়?
হোক্ ভারতের জয়—
ইত্যাদি।

সত্যেন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কোন গান এক সময়ে সুপরিচিত ছিল।

যে সময় 'বঙ্গদর্শন' প্রচারিত হয়, তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে মেলার সাহায্যে জাতীয় ভাব প্রচারের প্রবল চেষ্টা হইয়াছিল।

এই সকল মেলাসম্পর্কে নবগোপাল মিত্রের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। মিত্র মহাশয় সর্ব্ব বিষয়ে জাতীয়তার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া লোক তাঁহাকে "ন্যাশনাল নবগোপাল" বলিত। চৈত্র মেলায় মনোমোহন বসু একবার ইঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"যে সকল গুণদ্বারা বহুজনসাধ্য বৃহৎ কাজের আবিষ্কর্ত্তা ও নিয়ন্তা হওয়া সম্ভব, তাঁহাতে সে সমস্ত গুণ সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান আছে।"

মেলার অধ্যক্ষ-সমাজকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল—

(১) অসম্বদ্ধ হিন্দুসমাজমধ্যে ঐক্য স্থাপন ও তাহাতে অনুরাগ উৎপাদন করিয়া দেওয়া এবং তাহার জীর্ণ-সংস্কারের চেষ্টা করা প্রথম শ্রেণীর কার্য্য।

(২) এক মেলার সময় হইতে অপর মেলার দিন পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজের যে কিছু উন্নতি বা দুর্গতি হইয়াছে, মেলার দিবসে এই শ্রেণীর অধ্যক্ষগণ তাহা বিজ্ঞাপিত করিবেন।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যক্ষগণ স্বাবলম্বিত শিক্ষাদান-ব্রতী ব্যক্তিদিগকে সমুচিত উৎসাহ প্রদান করিবেন।

(৫) পঞ্চম শ্রেণীর কার্য্য সঙ্গীত বিভাগে নিবদ্ধ রহিবে।

(৬) ষষ্ঠ শ্রেণীর অধ্যক্ষগণ মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি শারীরিক বলকৌশলনিষ্পন্ন বিষয়প্রদর্শনে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

এই সকল মেলা দেশে সকল শ্রেণীর লোকের মিলন-ক্ষেত্র হইত। মেলা এ দেশে বহুদিনের প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠানকে কালোপযোগী করিয়া জাতীয় ভাব বিস্তারের উপায়ে পরিণত করা যে বিশেষ দূরদর্শিতার পরিচায়ক তাহা বলাই বাহুল্য। মনোমোহন বসু দ্বিতীয় বার্ষিক চৈত্র মেলার বক্তৃতায় "মেলা কি?—মেলার উদ্দেশ্য কি?"—বুঝাইয়া-

ছিলেন। তাহাতেই কি উদ্দেশ্যে মেলার অনুষ্ঠান হয়, তাহা বুঝা যাইবে :—

"স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দ-বাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নিস্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ-তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবে। এত মনোহর হইবে যে, যখন জাতির গৌরবরূপ তাহার নবপত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারতভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে 'স্বাধীনতা' নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখনো দেখি নাই, কেবল জন-শ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথা শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে সে ফল না পাই, অন্ততঃ 'স্বাবলম্বন নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না। ফলতঃ একতাই সেই মিলনসাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এই সমাবেশরূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্য স্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আরে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।"

মনোমোহন বসু ১২৮০ সালে বারুইপুরে হিন্দু মেলার জন্য একটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাহাই সংস্কৃত হইয়া তাঁহার 'হরিশচন্দ্র' নাটকে সন্নিবিষ্ট হয় সেই "দিনের দিন সবে দীন" গানে—

অন্নাভাবে শীর্ণ চিন্তা জ্বরে জীর্ণ
অনসনে তনু ক্ষীণ"

ভারতের দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছিল। "অগুণিত ধন রত্ন দেশে ছিল" - সে সবই লুপ্ত হইয়াছে "সার শস্য" আর দেশবাসী সম্ভোগ করিতে পায় না,—"দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভুষি শেষে," আর

"তাঁতী কর্ম্মকার করে হাহাকার
সুতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর ;
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন !
* * * *
ছুঁই সুতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে ;
দেয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে .
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, নেতে—
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।"

মনোমোহন তাঁহার রচিত আর একটি সঙ্গীতে এই দরিদ্র দেশের করের বাহুল্যে লোকের দুর্দ্দশা চিত্রিত করিয়াছিলেন। নানা করের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"লবণটুকু খাব, তাতেও লাগে কর" এবং উপসংহারে বলিয়াছিলেন -

"মাদকতা কর-ছলে রাজ্যময়
মদ্যের বিপণি নিত্য বৃদ্ধি হয় .
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয়,
হাহাকার রবে নিরন্তর।"

হিন্দু মেলা কেবল হিন্দুর উন্নতিসাধনেই সচেষ্ট ছিল না ; পরন্তু তাহাতে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষের অধিবাসী সকলেরই আর্থিক ও রাজনীতিক উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্য সপ্রকাশ।

মেলা এদেশে পুরাতন প্রতিষ্ঠান। এ দেশে বহুকাল হইতেই যোগাদিতে মেলা হইয়া আসিতেছে এবং সহস্র সহস্র নরনারী সেই সকল মেলায় যাইয়া দেশে যেমন নূতন শিল্পের পরিচয় পাইয়া থাকে, তেমনই ভাবের আদান-প্রদান ফলে নূতন ভাব সংগ্রহ করিয়া আনে ও ধর্ম্মালোচনার ফলে নূতন অবস্থাও পাইয়া থাকে। মেলা এদেশের সম্বন্ধে পরিচিত বলিয়াই হিন্দু মেলা অল্পদিনে জনপ্রিয় হইতে পারিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

যোগ-বিয়োগ

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছয়

এর পর কয়টা দিন বেশ সুখেই কাটিতেছিল,—গৌরী বই-শ্লেট লইয়া অনর্গল পড়ে, কোন দিন বা প্রতিবেশীদের ছেলেদের সাথে পাঠশালে গিয়াই হাজির হয়।

গিরি রাঁধিতে রাঁধিতে দশবার এদিক ওদিক তাহাকে খুঁজিয়া ফেরে।

শ্রীমন্ত আসিতেই গিরি কহে—"দেখত, গৌরী বোধ হয় পাঠশালা গিয়ে ব'সে আছে,—কি বাই হ'ল মেয়ের মা, আসুক ত আজ, তার বই শেলেট শেষ ক'রব আমি।"

শ্রীমন্ত হাসিতে হাসিতে গিয়া তাহাকে লইয়া আসে। গৌরী আসে—একেবারে অভিধানের মত অনর্গল বানান আওড়াইতে আওড়াইতে—"ব এ আকার ল এ আকার—বাবা, ম য়ে আকার ল এ আকার মামা" শ্রীমন্ত হাসে, গিরিও হাসে—সে স্পষ্ট না বুঝিলেও বোঝে যে গৌরী নব অভিধানের সৃষ্টি করিতেছে।

মোট কথা এই শিশুটীকে কেন্দ্র করিয়া এই দুইটী নরনারী জীবনে যে একটী মধুচক্র রচনা করিয়া তুলিতেছিল সেটী দিনে দিনে বেশ রসঘন হইয়া উঠিল।

কিন্তু দিন সমানে যায় না, সেদিন মাস দেড়েক পরে সহসা ধূমকেতুর মত হরিলাল আসিয়া উপস্থিত হইল।

পড়ন্ত বেলা, সন্ধ্যা হয়-হয়, গিরি রান্না চাপাইয়া গৌরীকে পড়াইতেছে, গৌরী পড়িতেছে,—যেমন গুরু তেমনি শিষ্য, ভুলচুকের বালাই নাই, শাসন নাই, সংশোধন নাই, আছে শুধু শিষ্যের সপ্রতিভ উত্তর—আর গুরুর সপ্রশংস অজস্র উচ্ছ্বাস, শিষ্যের প্রতিভায় অগাধ বিশ্বাস।

উনানে কাঠটা ঠেলিতে ঠেলিতে গিরি গুরুগিরি করে—"আচ্ছা বানান কর দেখি—'কাঠ'।"

সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর উত্তর—"ক এ আকায় ল এ আকার।"

—"বাঃ—বাঃ—আচ্ছা বানান করত—'রান্না'।"

—"র, ব এ আকার—।"

—"বাঃ—বাঃ—সোনা মণিরে আমার।"

—"এইবার কিন্তু দ্বিতীয় ভাগ কিনে দিতে হবে আমাকে,—হুঁ—।"

—"আচ্ছা এই বানানটা ব'লতে পারলেই দোব—বানান কর—'ডিম'।"

—"বাঃ—রে, ও যে দ্বিতীয় ভাগের বানান, আমি বুঝি জানি?"

এমন সময় পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়া শীর্ণ কুব্জ লোকটা বাড়ী ঢুকিয়া হাঁকিল—"গৌরী"—।

অতিরিক্ত গাঁজা খাইয়া হরিলালের পায়ের শিরায় টান ধরিয়াছিল—গোড়ালী আর পড়িত না।

লোকটীর আবির্ভাবে এমন অভিনব বিদ্যার আদান প্রদানটুকু বন্ধ হইয়া গেল।

হরিলাল বিনা ভূমিকায় কহিল—"একবার বাইরে আয় দেখি,—"

গৌরীর মুখ শুকাইয়া গেল,—সে গিরির কোল ঘেঁসিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিলালের রুক্ষ মেজাজে এটা সহ্য হয় না, সে কটু কণ্ঠে কহে, "কানমে কেত্‌না ভরি সোনা উঠা হায়?"

গৌরী কাঁদ কাঁদ সুরে কহে—"আমি যে প'ড়ছি ."

হরিলালের চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠে, সে অনুরূপ বিস্মিত কণ্ঠে কহে,—"পড়ছি?—পড়ছি কি?"

গৌরীর আর কথা ফুটে না, গিরিও ঘোমটার অন্তরাল হইতে জবাব দিতে পারে না,—কিন্তু জবাব হরিলাল নিজেই খুঁজিয়া লইল, বই-শ্লেটগুলা তাহার নজরে ঠেকিতেই 'পড়া'র অর্থ করিয়া লইল,—সে অতি কর্কশ কণ্ঠে ব্যঙ্গভরে কহিল - "ও—'লি-খা প-ঢ়ি'—। আরে বাপ্‌রে বাপ্‌। চাষার মেয়ে ধানভানা ছোড়্‌কে—লি-খা—পঢ়ি, তাজ্জব কি বাত্‌! নাঃ, এরাই দেখছি আমার মেয়ের মাথাটা খেলে।—নে—নে, এখন আয় দেখি এক ঘটী জল নিয়ে, বাইরে লোক এসেছে।"

'আমার মেয়ে'! গিরির অন্তরটা টগ্‌বগ্‌ করিয়া উঠে। সে চট্ করিয়া উঠিয়া একঘটী জল গৌরীর হাতে ধরাইয়া দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া বাপের কাছে দাঁড় করাইয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে হরিলাল মেয়ের হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল, যাইবার সময় বলিয়া গেল,—"আমার সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক আছে, দুজন যাব,—উম্‌দা রান্না বানাও, মাছ-টাছ না থাকে—কেন।"

ধূমায়মানা গিরি জ্বলিয়া আগ্নেয় গিরি হইয়া উঠে,—সে হরিলালের পশ্চাতে বেশ উচ্চ কণ্ঠেই কহে—

"বলে নিজের ঠাঁই হয় নাক শঙ্করাকে ডাকে, সেই বিত্তান্ত, পারব না আমি পারব না বলে দিচ্ছি, আপন ব্যবস্থা সময় থেকে করুক যেয়ে· এঃ—আবার মাছ চাই ভাল রান্না চাই।"

আপন মনেই গিরি গর্জ্জন করিয়া চলে, কড়ার উপর হাতার শব্দটা সঙ্গে সঙ্গে সঘন এবং সুউচ্চ হইয়া উঠে;—

এমন সময় গৌরী ফিরিয়া আসে,—গিয়াছিল সে কাঁদিতে কাঁদিতে কিন্তু আসিল বেশ হাসি-মুখে গিরি ভাবিল বাপের কবল হইতে নিস্তার পাইয়া গৌরীর হাসি ফুটিয়াছে - তাহার অন্তরটাও একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিল, সে বাঁ হাতে উনানের মুখের কাঠখানা ঠেলিয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কেলো - গৌরী ?"

ঈষৎ একটু ঝঙ্কার হানিয়া গৌরী কহিল "জানি না।"

কিন্তু ঐ ঝঙ্কারটুকুর মধ্যে লজ্জার বেশ একটু আভাষ, গিরির হাতের হাতা স্থির হইয়া গেল, সে মুখ তুলিয়া গৌরীর মুখপানে তাকাইল।

গৌরী আপন ছোট হাতখানির ছোট্ট মুঠাটী চট্‌ করিয়া খুলিয়া আবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে কহিল—"দেখেছ, দোবনা তোমায়।"

চকিতের মত ক্ষণটুকু ক্ষীণ হইলেও গৌরীর হাতের জিনিষটা কি তাহা বোঝা গেল,—টাকা!

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! তারও উপর গিরির ঈর্ষা। হরিলাল মেয়েকে আদর করিয়া টাকা দিয়াছে, মুখের কথায় নয়, কাজেকর্ম্মে পিতৃত্বের অধিকার স্থাপন করিয়াছে ইহা গিরির সহ্য হয় না; সে বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গে কহে -

একশো বছর গিয়েছে চলে,
ভাগ্যি আমার, ভাগ্যি ভাল—
পড়ল মনে এতদিনে দুখিনী বলে।—

—ভাল—তাও ভাল। রেখে দেলো বাপের দেওয়া প্রথম টাকা"—

গৌরীর শিশু মন এই শ্লেষ বুঝিল না, সে এতগুলা কথার মধ্যে বুঝিল শুধু "বাপের দেওয়া টাকা—" ঐ কথাটারই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করিয়া সে কহিল—"যাঃ জামাই দেবে কেন, ও গাঁজার টাকা দেবে! আর পাবেই বা কোথা? দিলে সেই লোকটী।"

—"সেই লোকটী? কে সে লোকটী?"

আবার সেই সলজ্জ ঝঙ্কার দিয়া গৌরী কহে—"জানি না—।"

হরিলাল টাকা দেয় নাই শুনিয়া গিরি একটু লঘুভার হইয়াছিল, সে এবার একটু হাসিয়া কহিল—"সে লোকটীর নামে তোর এত লজ্জা কেন? সে তোর শ্বশুর না কি, তোকে দেখ্‌তে এসেছে?—"

গৌরী এবার টুক্‌ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া চট্‌ করিয়া কহিল—"হুঁ।"

"হুঁ! সে কি?"

গৌরী কহে—"ব'লছিল যে জামাই—।"

গিরি আর শোনে না—সে উঠিয়া গিয়া বাহিরের ঘরের পিছনে আড়ি পাতিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই তাহার সর্ব্ব অঙ্গ যেন হিম হইয়া গেল, অতি কষ্টে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে গৌরীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বসিল, গৌরী অবাক হইয়া গিরির মুখপানে চাহিতেই দেখে—গিরির চোখে জল, সে ছোট হাতখানি দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া কহে—"কাঁদছ না?"

গিরি কথা কয় না, তাহার অশ্রুধারার বেগ বাড়িয়া যায়!

সহসা গৌরী কহে—"মা,—ওদের টাকা ফিরে দিয়ে আসব না?"

গিরি তবুও নীরব, চিন্তাকুল স্তিমিত নেত্রে অন্তহীন ভাবনা সে ভাবিয়া যায়, কতবার তাহার চিন্তা ধারণার সীমা পার হইয়া অর্থহীন হইয়া পড়ে, সচকিত হইয়া আবার সজাগ হইয়া সে ভাবিতে বসে।

গৌরী সেই মুখ পানে চাহিয়া, তাহার পরনির্ভর শিশু-চিত্ত খানি সশঙ্ক আগ্রহে ওই চিন্তাকুলার মুখপানে চাহিয়া

থাকে, সে এটুকু বোঝে যে ভাবনার কেন্দ্র সে-ই, তাহাকে লইয়াই একটা কিছু ঘটিতে বসিয়াছে।

সহসা গিরি যেন সহজ ভাবে নড়িয়া চড়িয়া বসে, বোধ হয় সে একটা কূল পাইয়াছে,—গৌরীর হাতটা ধরিয়া উজ্জ্বল নেত্রে সে বলে—"খবরদার যাবি না তুই, ও-ই মাতাল্ তোর বাপ, যদি নিয়ে যেতে চায় তোকে—খবরদার যাবি না তুই।"

গৌরীর কেমন শঙ্কা হয়, ওই মানুষটাকে দেখিলে তাহারও যে ভয় হয়, ও গিরির কথার প্রতিবাদ করিবে সে কেমন করিয়া? সে শঙ্কিত কণ্ঠে কহে—"যদি ধ'রে নিয়ে যায় মা জোর ক'রে!"

গিরি কহে—"আমার জোর নাই? আমি যে তোকে এত বড় করলাম, আমার জোর নাই?"

গৌরী কহে—"মামা এলে ওকে তাড়িয়ে দিতে ব'ল মা, দিক লাঠীর বাড়ী।"

সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমন্ত কোদাল হাতে আসিয়া খিড়কীর দরজায় বাড়ী ঢোকে, সে বাহির হইতেই গৌরীর কথাটা শুনিয়াছিল, হাসিতে হাসিতে সে কহিল—"কাকে মারতে হবে মামণি?"

শ্রীমন্তকে দেখিয়া গৌরীর বুকখানা সাহসে ফুলিয়া ওঠে, সে ঝঙ্কার দিয়া কহে—"ওই মুখপোড়া মাতালকে, তোমাদেরই ওই লক্ষীছাড়া জামাইকে গো।"

মেয়ের পিতৃ-ভক্তির ঘটা দেখিয়া শ্রীমন্ত হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠে। গিরির কিন্তু তাহা ভাল লাগে না, তাহার চিন্তা-পীড়িত ক্ষুব্ধ অন্তর অতি মাত্রায় বিরক্ত হইয়া উঠে, সে তীব্র কণ্ঠে আত্মহারার মত বলিয়া উঠে—"আমি মাথা-মুড় খুঁড়ে ম'রব ব'লছি।"

শ্রীমন্তের প্রাণখোলা হাসি অর্দ্ধ পথেই থামিয়া গেল, সে হতভম্বের মত তাল হারাইয়া গিরির মুখপানে চাহিয়া রহিল।

গিরি উঠিয়া শ্রীমন্তের পায়ে সত্যই মাথা কুটিতে কুটিতে কহিল—"বল, বল, তুমি এর বিহিত ক'রবে কিনা বল।"

তাড়াতাড়ি শ্রীমন্ত তাহাকে ধরিয়া তুলিতে তুলিতেই সান্ত্বনা দিল—"ক'রবো, ক'রবো, ক'রবো, তিন সত্যি ক'রছি, থাম গিরি-বৌ থাম।"

গিরি সজল নেত্রে তাহার মুখ পানে তাকাইয়া কহিল—"তা যদি হয় তা হ'লে ম'রে যাব আমি।"

অন্ধকারে দিক্‌হারার মতই ব্যাকুল ভাবে শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করিল—"কি, হ'ল কি?"

গিরি কি যেন বলিতে গিয়া গৌরীর মুখপানে চাহিয়া, থামিয়া গিয়া কহিল,—"ব'লব এর পরে।"

তারপর গৌরীর হাত ধরিয়া টানিয়া রান্নাঘরে লইয়া যাইতে যাইতে কহিল—"মেয়ের চোখে ঘুম নাই মা. রাত দু'পহর পর্য্যন্ত চোখ চেয়ে বসে আছেন। আয়, খেয়ে ঘুমোবি আয়।"

শ্রীমন্ত একটা উদ্বেগ লইয়াই তামাক সাজিতে বসিল, এমন সময় বাহির হইতে ডাক আসিল—"আরে ছি-মন্ত নাকি? বহুৎ আচ্ছা রে ময়না, একদম্‌সে পিঁজরাকে ভিতর যাকে বৈঠো! পঢ়ো আত্মারাম 'রাধা-কিষণ' সীত্তা রাম।" তারপর হা-হা করিয়া উচ্চ হাসি।

শ্রীমন্ত কলিকাটা হাতে করিয়া উঠিয়া আপন মনেই কহিল—"হরিলাল না কি? এল কখন?"

সহসা গিরি ঘরের মধ্য হইতে আগ্নেয় গিরির মতই অগ্ন্যুদ্গার করিল—"দেখ আমি কিছু দানছত্র খুলি নাই।"

শ্রীমন্ত আন্দাজেই তাল মারিল—"নিশ্চয়ই।"

গিরি বলে—"তাই বল তোমার ভগ্নীপোতকে,—নিজে ষোল আনা বাঁধবেন, আমার অন্নধ্বংস করবেন, আর আমারই সব্বনাশের চেষ্টা—ব'লে দাও ব'লছি ভাত আমার নাই।"

শ্রীমন্ত কিন্তু এটা পারে না, যতই ঘৃণা সে হরিলালকে করুক কিন্তু একমুঠা ভাত—, না—তাহা সে মুখ দিয়া বাহির করিবে কি করিয়া? সে মৃদু স্বরে ক্ষীণ ভাবে কহিল, —"তুমিই ব'লে দিয়ো।"

"তোমার আক্কেল ত' খুব, আমি ওর সঙ্গে কথা কই যে কথা কইব!"

শ্রীমন্ত বিব্রত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহে, "সে শুনতে পেয়েছে ঠিক, আর ব'লতে হবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে বেশ অধিকারভরা কণ্ঠে ডাকও আসিল, হরিলাল হাঁকিল—"গৌরী, গৌরী, চ'লে আয় ব'লছি, চ'লে আয়।"

গৌরী ভয়ে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে, তাহার সেই নিজের কথাটাই বোধ করি মনে পড়িয়া যায় "যদি জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যায় মা।" আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গারী মুখও বন্ধ হইয়া যায়; চিরন্তন চলিত সমাজ-বিধান অনুসারে সন্তানের উপর পিতার অধিকার, তা সে পিতা যেমনই হউক না কেন, সে বিধান অমান্য করিবার মত জোর ওই নারীর নাই।

হরিলাল কিন্তু নিবৃত্ত হয় না, সে বাড়ীর ভিতর পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিয়া দাবীভরা কণ্ঠে ডাকে—"গৌরী!"

শ্রীমন্ত ঘটনাটার মোড় ফিরাইয়া দিতে হাসিমুখে আপ্যায়ন করে—"আরে ওস্তাদ যে, এলে কখন? তোমার ডাক শুনেই তামাক নিয়ে—"

হরিলাল ও প্রচ্ছন্ন অনুনয় গায়ে মাখেনা, সে বেশ গম্ভীর কণ্ঠেই কহে—"ছি-মন্তে, গৌরীকে দে দেখি।"

আজ হরিলালের সম্মুখেও গিরির চাপা গলা শোনা যায়,—সে গৌরীর জন্য দুধে ভাতে মাখিতে মাখিতে কহে—"বল না সে ঘুমিয়েছে।"

শ্রীমন্তকে আর কথাটা হরিলালের কানে তুলিয়া দিতে হয় না, সে নিজেই শুনিতে পায়, উত্তরে সে কহে—"বুমোক্, আমার মেয়ে আমায় দাও, ঢের হয়েছে, ঢের ভাত দিয়েছ, আর না।"

এমন গম্ভীর ভাবে কথা কওয়া হরিলালের পক্ষে অস্বাভাবিক, এই অস্বাভাবিকতাতেই গিরি বেশী দমিয়া গেল হরিলাল বকিয়াই যায়—"ভাত, আরে ভাত দেখলাতা হামকো? ভাত? ভাত তো ঘাসকা বীচ, কেয়া দাম উস্‌কো? আর দেখ্‌লাতা কিনা একঠো আওরং। আরে তুল্‌সী দাস কেয়া বোলা জানতা,—

'শিরবা তাজ, মরদকা মান,
জুত্তি আওর জরু দুঁহি সমান।'

পাঁওকা পঁয়জার তুম শিরমে উঠায়া?"

কথাটা শ্রীমন্তকে বড় লাগে, তাহার জিহ্বাগ্রে একটা কটু উত্তর আসিয়া পড়িয়াছিল—"হাঁ। পরিবারকে যে খুন করতে পারে তার কাছে পরিবার 'জুত্তি' বই আর কি?"

কিন্তু সন্তানকাঙালী মানুষটীরও যে নারীর মতই দুর্ব্বলতা আছে, কাজেই অন্তরের বিদ্রোহ অন্তরেই চাপিয়া তোষামোদ তাহাকে করিতে হয়। মহাজন আর খাতক এদের মধ্যে খাতকের যে ওই ছাড়া উপায় নাই।—

শ্রীমন্ত কষ্টহাসি হাসিয়া কহে—"আরে ভাই ওস্তাদ, আওরৎকি বাত্ ধরতে আছে, এস, এস তৈরী তামাক, তোমার সে বাত্‌টা কি হে—'তৈয়ার তাম্‌কুল, বিছাওনা, খানা, মৎ ছোড়না'—না কি?"

হরিলাল কহে—"গৌরীকে এনে দাও।"

গিরি পুনরায় ঘর হইতে কহে "বলনা, রাত্রে কাঁদবে।"

—"কাঁদুক, কাঁদবে ব'লে ত হতচ্ছেদ্দায় মেয়েটাকে ফেলে রাখতে পারি না।"

হতচ্ছেদ্দা! অকৃত্রিম স্নেহের এত বড় অপমান গিরির সহ্য হয় না, সে লজ্জা সরম ভুলিয়া অতি তীব্র কণ্ঠে কহে—"এত কাল ত' এই হতচ্ছেদ্দায় কাটল, আজ হঠাৎ বাপের স্নেহরস উথ্‌লে উঠল।"

বলিয়া মেয়েটার হাত ধরিয়া হিড্‌হিড়্ করিয়া টানিয়া হরিলালের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়া কহিল—"নাও, মেয়ে বিক্রী করগে যাও। তোমার এ স্নেহ-রস কেন উথলে উঠল, জানি না মনে করছ? সব জানি।"

গিরির মাথায় ঘোমটা নাই, কণ্ঠস্বরে লজ্জার মৃদুতা নাই, সে বোধ করি তখন আত্মহারা।

এবার হরিলাল চুপ হইয়া গেল;—সংসারে অতি বড় পাষণ্ডেরও বিবেক বোধ হয় নিঃশেষে মরিয়া যায় না, তাই সে যে-অন্যায়, যে-পাপ পূর্ব্বে করে নাই, সে-পাপ করিবার পূর্ব্বে ধরা পড়িলে লজ্জা তাহার হয়-ই হয়। ওই লজ্জাই ত' সংসারে অন্যায়-বোধ, আর সে লজ্জা অনুভব করে মানুষের বিবেক।

শ্রীমন্ত চকিত হইয়া গিরির মুখপানে চায়, সে কথাটা বেশ বুঝিতে পারে না,—গিরি স্বামীকেই বলিয়া যায় "তখন গৌরী ছিল ব'লে ব'লতে পারি নাই আমি, যে কথা পর, হাঁ। পরই ত' আমি, পর হ'য়েও আমি মেয়ের সামনে মুখে আনতে পারিনি, সেই কাজ ও বাপ হ'য়ে ক'রবে ঠিক ক'রেছে। মেয়ে বিক্রী ক'রবে, কোথায় কোন বুড়ো খোঁড়া বর ঠিক করেছে, আজ একজন দেখতেও এসেছে। এই দেখ, একটা টাকাও সে দিয়েছে গৌরীকে।"

বলিয়া গৌরীর হাত হইতে টাকাটা লইয়া হরিলালের দিকেই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

শ্রীমন্তের ভাবে ভঙ্গীতে একটা পরিবর্ত্তন খেলিয়া যায়, সে কঠোর দৃষ্টিতে হরিলালের পানে চাহিতে চাহিতে দৃঢ় ভঙ্গীতে গৌরীকে আপনার কোলের কাছে টানিয়া লইল।

সে দৃষ্টির ধিক্কারে এবং কঠোরতায় হরিলাল এতটুকু হইয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি একটা কৈফিয়ৎ না দিয়া পারিল না, লজ্জাও হইতেছিল, আর আশঙ্কারও সীমা ছিল না, শ্রীমন্তের ঐ চিম্‌ড়ে দেহ রক্ত-মাংসের ত' নয়, পাথর-লোহার; সে কহিল—"মেয়ের ত' বিয়ে দিতে হবে, ভাল ঘর বর ত' অমনি হয় না, টাকা চাই।"

গিরি গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"টাকার পুঁটুলী বুকে চাপিয়ে যাবেন, জমি র'য়েচে—"

হরিলাল ব্যঙ্গ করিয়া কহে—"জমিন্ কেন, জমিদারী হায়, ওহিঠো বেচেঙ্গে—"

অপব্যয়ে, উচ্ছৃঙ্খলতায় সমস্ত খোয়াইয়া পথের ভিখারী হইয়াও যে মানুষ এমন নির্লজ্জ, সপ্রতিভ আস্ফালন করিতে পারে এ ধারণা গিরির ছিল না, কিন্তু শ্রীমন্তের ছিল, সে হরিলালকে চিনিত।

বিস্ময় তাহার হইল না কিন্তু ঘৃণাভরেই সে কহিল—"আচ্ছা, আচ্ছা, টাকা তোমার লাগবে না। যা খরচ হবে আমার,—বিয়ে আমি দেখে শুনে দেব।"

তবু হরিলাল একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করে—"কুল, টুল দেখতে হবে, আমার কুল ভেঙে দেবে তোমরা,—"

গিরির অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, সে বোধ করি ওই লোকটার অন্তস্থল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছিল, সে কহিল—"বুঝতে পারছ না ও চামারের চালাকী, ওই সব আবোল-তাবোল ক'রে নিজে মেয়ের বিয়ে দেবার নাম ক'রে মেয়ে বেচবে।"

হরিলাল এবার একটু সবল ভাবেই প্রতিবাদ করে, কিন্তু গিরির কথার উত্তরে সে কথাটা একান্ত অবান্তর বোধ হয়। সে মনে মনে যুক্তি-সবল প্রতিবাদই খুঁজিতেছিল, সে কহিল,—"আর আমার মেয়ের বিয়ে তোমাদের টাকাতেই বা দিতে দেব কেন? আমার মান নাই,—"

গিরি ঝঙ্কার দিয়া উঠে, অতি শ্লেষতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের জ্বালায় ভরা—"ও—রে আমার মানী লোক, বলে—

> সেই মানভূমের, মানকুণ্ডুর, মানসিংহী মহারাজ,
> মানের গোড়ায় ছাইএর গাদায় বসে বসে সদাই লাজ।

সেই বিত্তান্ত—"

শ্রীমন্ত বেশ গম্ভীর ভাবেই বলে—"দেখ হরিলাল, ওসব মতলব ছাড়, গৌরীকে জলে ফেলে দিতে আমি দেব না।"

গাম্ভীর্য্যের মধ্যে উত্তেজনা থাকে না, হরিলাল শ্রীমন্তের এই উত্তেজনাহীন গাম্ভীর্য্যকে ভ্রম করিল মৃদুতা বলিয়া, সঙ্গে সঙ্গে তাহার রোষ হইয়া উঠিল প্রবল, আর ক্রমশঃ সে ধৈর্য্যও হারাইয়া ফেলিতেছিল, সে কহিয়া উঠিল—"আমার মেয়ে আমি যদি জলে ফেলে দি—" বলিয়া সে আগাইয়া আসিয়া গৌরীর হাত ধরিয়া শ্রীমন্তের সন্নিকট হইতে টানিয়া লইতে চাহিল।

গৌরী শ্রীমন্তের মুখের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তে শ্রীমন্তের কঠোর দেহ খানা হইয়া উঠে সুকঠোর, প্রত্যেকটি পেশী যেন দৃঢ় ভাবে নড়িয়া চড়িয়া বসে, মুখ চোখ ঘৃণায়, ক্রোধে হইয়া উঠে বীভৎস ভীষণ, সে একদৃষ্টে হরিলালের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অনুত্তেজিত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল—"খুন ক'রে ফেলব।"

সংসারে উচ্ছ্বসিত ক্রোধকে মানুষ তত ভয় করে না, কিন্তু এই শান্ত ক্রোধ সত্যই ভীতির বস্তু; উচ্ছ্বসিত ক্রোধ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কঠোর প্রবল তিরস্কারেরই নামান্তর, ইহার প্রকাশ প্রায়ই বাক্যে আবদ্ধ, কিন্তু এই শান্ত ক্রোধ প্রতিহিংসারই রূপান্তর, ইহার প্রকাশ প্রায়ই কর্ম্মে; বাহ্যতঃ নিরীহ বন্দুকের গুলীর মত, যে কোন মুহূর্ত্তে ফাটিয়া জীবন সংশয় করিতে পারে। মানুষ ইহাকে ভয়ও করে বেশী, সব সময়ে এটা বিশ্লেষণ করিয়া না বুঝিলেও, মানুষের অন্তর এটা অনুভব করে; হরিলালও ভয় পাইল, সে গৌরীকে ছাড়িয়া দশ হাত পিছাইয়া গিয়া শ্রীমন্তের পানে চাহিয়া কহিল—"আচ্ছা থাক্, কাল—"

সহসা তাহার নজরে, গিরির ফেলিয়া-দেওয়া টাকাটা ঠেকিল, সে চট্ করিয়া টাকাটা কুড়াইয়া লইয়া কথাটা শেষ করিল—"পুলিশ এনে মেয়ে দখল ক'রব।"

বাক্যশেষের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পা দরজার ওপারে পড়িল, এবং এক মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল, বোধ হয় আড়ালে সে ছুটিতেই সুরু করিয়াছিল।

গৌরী বাপের এই পলায়ন-ভঙ্গীতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, গিরিও হাসিল, কিন্তু শ্রীমন্ত নীরব হইয়াই রহিল।

গিরি গৌরীকে টানিয়া লইয়া রান্নাঘরের মুখে পা বাড়াইয়া আবার ফিরিয়া কহিল—"আমাদেরও আর দেরী করা নয়, শীগ্রি পাত্র দেখ।"

শ্রীমন্ত ঘরের দাওয়ার উপরে বসিতে বসিতে শুধু কহিল, "হুঁ।"

গিরি কহিল—"কি ভাবছ বল দেখি?"

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীমন্ত কহিল—"ভাবছি সেই কথাটা, বলে যে সেই,

পরের সোণা প'রোনা কানে
ছিঁড়ে নেবে হ্যাচ্‌কা টানে

নিজের একটা হ'ল না—"

আর তাহার বলা হইল না, গিরি দ্রুত পদক্ষেপে রান্নাঘরের ভিতর চলিয়া যাওয়াতেই কথাটা অসমাপ্ত রহিয়া গেল, শ্রোতার অভাবে, না—ঐ নারীটীর দ্রুত পদক্ষেপের ইঙ্গিতে তাহার মনের তুফানের পরিচয় পাইয়া, কে জানে।

(ক্রমশঃ)

ফোটোগ্রাফি

শ্রীপরিমল গোস্বামী

সূচনা

যাঁহারা বর্ত্তমান ফোটোগ্রাফি বা আলোকাঙ্কনের পথ এরূপ সুগম এবং সহজ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা কত অল্প পাথেয় লইয়াই না যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্বলের মধ্যে ছিল কেবলমাত্র ব্যাকুল আগ্রহ আর অধ্যবসায়। ইহারই ফলে আজ যে বস্তু আমরা লাভ করিয়াছি, তাহা দুর্লভ এবং অমূল্য। বর্ত্তমান প্রগতির প্রতি পদে, বিজ্ঞানের বহুমুখী উদ্ভাবনীর অঙ্গে অঙ্গে, ইহার অপরিহার্য্যতা এবং সাহায্যকারিতার ইতিহাস বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন প্রায় দেখা যায়, কত বড় বড় আবিষ্কার কোনো একজন ব্যক্তির চেষ্টা বা অধ্যবসায়ে হয় নাই। বহুদিনের বহু অখ্যাত লোকের হাস্যকর ব্যর্থ প্রচেষ্টা হঠাৎ একজনের হাতে আসিয়া খানিকটা সফল হইল,—আবার আর একজন সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া জিনিসটি আরো খানিকটা অগ্রসর করিয়া দিলেন। এমনি করিয়া কত যুগের সাধনার ভিত্তিতে এক একটা সফলতা গড়িয়া উঠে।

কোনো দৃশ্য বা প্রতিকৃতি আঁকিবার পরিশ্রম হইতে হাতকে মুক্ত করিয়া, সেই জায়গায় সূর্য্যের আলোক-রশ্মিকে নিযুক্ত করিবেন, এই কল্পনার উদয় যাঁহার মনে প্রথম হইয়াছিল, তিনি আমাদের নমস্য। ক্যামেরার ব্যবহার ইহার

টম্ ওয়েজউড

পূর্ব্ব হইতেই ছিল, কিন্তু অন্য ভাবে। অন্ধকার ঘরে যদি সিকি পরিমাণ কিংবা আরো কম কোনো ছিদ্র থাকে এ

বাহিরে খুব আলো থাকে, তবে সেই ছিদ্রপথে বাহিরের সমস্ত দৃশ্য তাহার স্বাভাবিক বর্ণসমেত সেই ঘরের ভিতরে

নীয়েপসে

প্রতিফলিত হয়। দৃশ্য বা কোনো লোকের ছবি বাহির হইতে প্রতিফলিত করিবার জন্য যে ক্যামেরা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার নাম ক্যামেরা অবস্‌কিউরা। এই ক্যামেরার সাহায্যে প্রতিফলিত চিত্রের স্থানে কাগজ রাখিয়া চিত্রের অবয়ব ট্রেস্ করিয়া আঁকিবার রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু দেখিয়া
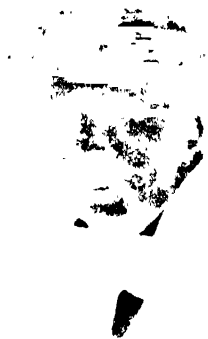
টালবট

আঁকার চেয়ে ট্রেস করিয়া আঁকা অনেক সহজ এবং কাজেই নির্ভুল হইত। বর্তমানে আলোকাঙ্কনের মূলে রহিয়াছে এই ক্যামেরা অবস্‌ক্যুরা।

ইহার পর কত বৎসর ধরিয়া কত একাগ্র সাধনা করিয়া কত না ব্যক্তির মিলিত পরিশ্রমের ফলে ফোটোগ্রাফি বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শুল্‌সে, নীপ্‌স, ওয়েজ উডের সাহায্য লইয়া দাগুয়ার টালবট নীপ্‌সে একদিকে এবং অ্যারিস্‌টটল্‌, কেপলার হার্শেল প্রভৃতি পদার্থবিৎ এবং

হার্শেল

রাসায়নিক অন্যদিকে—এই উভয় শ্রেণীর সমস্ত আবিষ্কার একত্র মিলিয়া বর্তমান ফোটোগ্রাফি সম্ভব হইয়াছে।

ক্যামেরা

ক্যামেরা মোটামুটি দুই প্রকার। স্ট্যাণ্ড ক্যামেরা ও হ্যাণ্ড ক্যামেরা। প্রথমটি ট্রিপড (বা ত্রিপদ) এর উপর রাখিয়া ব্যবহার করিতে হয়, দ্বিতীয়টির ব্যবহার হাতে ধরিয়াই চলে। হ্যাণ্ড ক্যামেরাও ট্রিপডে স্থাপন করিয়া ব্যবহার করা যায়। এই দুই প্রকার ক্যামেরার আকৃতিতে বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উহারা মূলে একই।
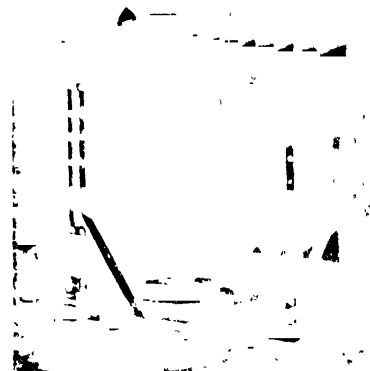
কোনিক্যাল বেলোজযুক্ত হ্যাণ্ড ক্যামেরা

ক্যামেরার প্রধানতঃ দুইটি অংশ। প্রথম, ক্যামেরা-দেহ, দ্বিতীয়, লেন্স। স্ট্যাণ্ড ক্যামেরার সঙ্গে লেন্স পৃথক

হইতেই সংযুক্ত করা থাকে না, কিনিবার সময় নিজের পছন্দ মত লেন্স উহাতে সংযুক্ত করাইয়া লইতে হয়। হাণ্ড-ক্যামেরা নানারূপ লেন্স-সংযুক্ত অবস্থাতেই বাজারে পাওয়া যায়।
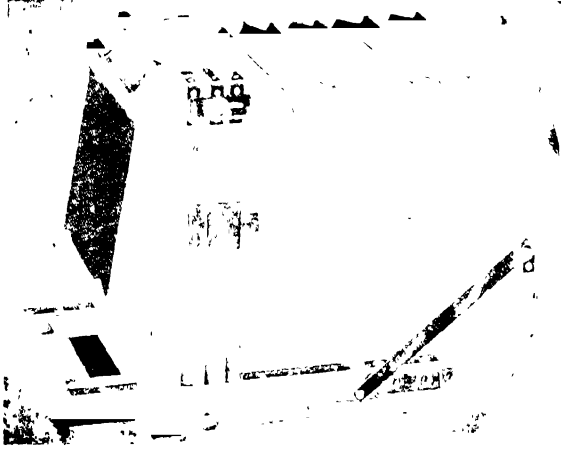
স্কয়ার বা চতুষ্কোণ বেলোজযুক্ত ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরা

ক্যামেরার কাজ তিনটি। প্রথম, লেন্সকে ধারণ করা, দ্বিতীয়, প্লেট বা ফিল্ম যাহার উপর ছবি উঠিবে তাহাকে ধারণ করা, তৃতীয়, লেন্সের ভিতর দিয়া যে আলো ক্যামেরার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে তাহা ছাড়া অন্য আলোকে প্রবেশ করিতে না দেওয়া।
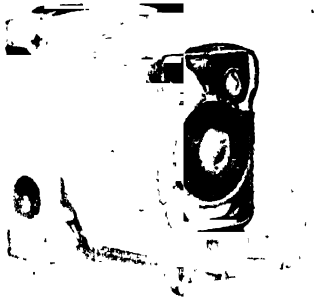
হ্যাণ্ড-ক্যামেরা (প্লেট)
(সাইস-ইকন্)

যে দিকে লেন্স থাকে সেই দিক ক্যামেরার ফ্রন্ট বা সম্মুখ, যে দিকে ফোকাসিং করে সেইদিক ক্যামেরার 'ব্যাক' বা পশ্চাৎদিক। এই পশ্চাৎ দিকে প্লেট অথবা ফিল্ম্ পরাইয়া ছবি তুলিতে হয়। প্লেট বা ফিল্ম, আলোর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কাঠ, ইবনাইট অথবা ধাতু-নির্ম্মিত হোল্ডার বা শ্লাইডের ভিতরে পুরিয়া রাখা হয়। সাধারণত এই হোল্ডারের দুই দিকে দুইখানি প্লেট বা ফিল্ম রাখিবার বন্দোবস্ত আছে। স্ট্যাণ্ড-কামেরার শ্লাইড পুস্তকের মত খুলিয়া দুইদিকে দুইখানি প্লেট পরাইতে হয়। আবার জার্ম্মানীর

হ্যাণ্ড-ক্যামেরা-রোলফিল্ম
(কোডাক)

প্রস্তুত অনেক শ্লাইড এরকম নহে। উহার দুই দিকের দুইটি আবরণ বা শ্লাইডিং দরজা উপরের দিকে টানিয়া খুলিতে হয় এবং নীচের দিকে ঠেলিয়া বন্ধ করিতে হয়। অবশ্য পুস্তকাকার শ্লাইডেও প্লেট পরাইবার এবং খুলিবার সময় ছাড়া, অন্য সময় অর্থাৎ ফোটো তুলিবার সময়, তাহার শ্লাইডিং দরজা টানিয়া খুলিতে হয় এবং ঠেলিয়া বন্ধ করিতে হয়। সকল ক্যামেরাই একই কার্য্যকরী ধারা বা রীতি অনুযায়ী প্রস্তুত, তবে কমবেশি সুবিধা ও বিভিন্ন প্রস্তুত-কারকের বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী অঙ্গের গঠনে নানা রূপ বৈচিত্র দেখা যায়। কার্য্যের বিভিন্নতা হিসাবেও চেহারা এবং গঠনের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। ক্যামেরার ব্যবহার আয়ত্ত করিয়া লইতে অতি অল্প সময়ই লাগে। অনেকের ধারণা ক্যামেরা যত বেশী দামের হইবে ছবিও তত ভাল হইবে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। সাধারণ কাজে, যেমন মানুষের প্রতিকৃতি বা নিসর্গ দৃশ্য তুলিতে, অর্থাৎ শুদ্ধ মাত্র অবিকল, অবিকৃত-ভাবে মানুষের বা কোনো দৃশ্যের ছবি তুলিতে দুই শত এবং দুই হাজার টাকা মূল্যের ক্যামেরার মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যাইবে না। তবে চিত্রকরের সুবিধা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ক্যামেরা এবং লেন্স প্রস্তুত হয়। তাহার মূল্যের পার্থক্যও প্রচুর। যিনি চলন্ত গাড়ি, উড়ন্ত এরোপ্লেন্

দুরন্ত শিশু, ক্রীড়া-কৌতুক, দৌড়ঝাঁপের ছবি তুলিতে চান, তাঁহার পক্ষে এমন একটি ক্যামেরা চাই যাহা সহজে বহন করা যায়, হাতে ধরিয়া কাজ করা যায়, যাহার শাটারে (shutter)এ ১/১০০ সেকেণ্ড বা আরো দ্রুত এক্‌স্‌পোজার বা আলোক ছাপ দেওয়া যায়। এবং তাহার লেন্স এরূপ প্রশস্ত হওয়া চাই যাহাতে অত দ্রুত এবং কম এক্‌স্‌পোজার দিলেও সেই ছবির পক্ষে তাহা কম হইবে না। অর্থাৎ আণ্ডার এক্‌স্‌পোজার হইবে না। এইরূপ দ্রুত এবং কম এক্‌স্‌পোজারে কাজ করা যায়, এরূপ শাটার এবং লেন্সের দাম বেশি। প্রশস্ত লেন্সে এক্‌স্‌পোজার কম লাগে, অপ্রশস্ত লেন্সে বেশি লাগে। ধরিয়া লওয়া যাক একটি ছবি তুলিতে অপ্রশস্ত লেন্সে এক সেকেণ্ড এক্‌স্‌পোজার লাগিবে এবং প্রশস্ত লেন্সে সেই ছবি তুলিতে ১/২ সেকেণ্ড লাগিবে। ছবি তোলা হইয়া গেলে দেখা যাইবে দুইটি ছবিই এক রকম হইয়াছে, যদিও প্রশস্ত লেন্সের মূল্য ঐ অপ্রশস্ত লেন্স হইতে তিন গুণ বেশি। বরঞ্চ অনেক সময় প্রশস্ত লেন্সের ছবিই তুলনায় কিছু খারাপ দেখায়। কিন্তু ইহা ছবির স্বভাবের উপর নির্ভর করে।

আবার যাঁহারা কেবল সৌধ-ইমারত কলকব্জা অথবা অল্পপরিসর জায়গায় জনতা অথবা অন্দর (indoor) স্থিত আসবাব পত্রের অথবা কোনো কারখানা-ঘরের ছবি তুলিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে প্রশস্ত-কোণ (wide angle) লেন্স আবশ্যক। ইহার কোণের পরিসর যত বেশি হইবে ততই অল্পপরিসর স্থানে উপর নীচ এবং আশপাশের সমস্ত দৃশ্যটি তুলিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। উপর হইতে লেন্স পর্যন্ত একটি সরল-রেখা এবং লেন্স হইতে নীচের দিকে আর একটি সরল-রেখা টানিলে লেন্সে আসিয়া একটি কোণ সৃষ্টি হইল। লেন্সের দৃষ্টিশক্তি এই কোণের হিসাবে স্থির করা হয়। কোণ বড় হইলে দৃষ্টিক্ষেত্র বেশি বিস্তৃত হয় এবং সঙ্কীর্ণ হইলে দৃষ্টিক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। ঘরের ভিতরের সমস্ত দৃশ্য তুলিতে হইলে লেন্সের দৃষ্টিক্ষেত্র প্রশস্ত হওয়া চাই, না হইলে উপরে এবং নীচের অনেক জিনিস ছবিতে বাদ পড়িয়া যায়। সুতরাং এরূপ ছবির পক্ষে প্রশস্ত-কোণ বা "ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল্" লেন্স চাই। প্রশস্ত লেন্স ও প্রশস্ত-কোণ লেন্সের পার্থক্য মনে রাখিতে হইবে। লেন্স যত প্রশস্ত কোণ বা "ওয়াইড্-অ্যাঙ্গেল্" হইবে ততই লেন্সের প্রশস্ততা কমিয়া যাইবে। অবশ্য প্রশস্ত লেন্স ৪ ডায়াফ্রাম পর্য্যন্ত কিছু পরিমাণ "ওয়াইড্-আঙ্গেল্" করিতে পারা গিয়াছে। ইহার মূল্যও বেশি এবং কোণের পরিমাণ ৮০ ডিগ্রী। সাধারণ "ওয়াইড্-অ্যাঙ্গেল্" বা প্রশস্ত-কোণ লেন্সের মূল্য কম, কিন্তু ঐ জাতীয় ছবি তুলিবার পক্ষে এই কমমূল্যের লেন্স অপরিহার্য্য।

উপরের এই দুইটি উদাহরণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি,—চিত্রকরের নিজের প্রয়োজনের খাতিরেই কম বা বেশি দামের লেন্স সংযুক্ত ক্যামেরা চাই। ভাল ফোটো তুলিবার মূলে রহিয়াছে নির্ভুল এক্‌স্‌পোজার। অর্থাৎ কি রকম আলোতে কি রকম সাব্‌জেক্ট বা বিষয়-বস্তুতে লেন্সের মুখ কতক্ষণ খুলিয়া প্লেটে সেই সাব্‌জেক্টের আলোকছাপ লাগাইতে হইবে। ছবির উৎকৃষ্টতা আরো অনেক জিনিষের উপর নির্ভর করে, কিন্তু সকলের মূলে রহিয়াছে নির্ভুল এক্‌স্‌পোজার। ক্যামেরার মূল্যের উপর ইহা নির্ভর করে না। নির্ভর করে চিত্রকরের প্রয়োগ-কৌশল, নিপুণতা বা অভিজ্ঞতার উপরে। মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির উপরে ছবির ভালমন্দ যেটুকু নির্ভর করে, তাহার একটা সীমা আছে। বক্স-ক্যামেরা এবং যে ক্যামেরা-বেলোজের বিস্তৃতি অল্প (single extension বা একক-বিস্তৃতিযুক্ত বেলোজ) তাহার দম কম। এই ক্যামেরাতে সাব্‌জেক্টের খুব কাছে আসিয়া বড় ছবি তোলা চলে না। সুতরাং শুধু মুখেই ছবি বড় করিয়া তুলিতে গেলে বক্স-ক্যামেরা বা সিঙ্গল এক্‌সটেনশন ক্যামেরায় যাহা উঠিবে, বেশিদামের দ্বিগুণ বিস্তৃত বেলোজযুক্ত (double extension) ক্যামেরাতে নিশ্চিতই তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল হইবে। বেশীদামের ও কমদামের ক্যামেরার পার্থক্যের ইহাই সীমা।　　(ক্রমশঃ)

ব্রড্‌-কাষ্টিং

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন

বাঙ্গালা দেশে রেডিও যেমন দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে তাহাতে মনে হয় বাঙ্গালী ক্রমশঃ ইহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইতেছেন। কলিকাতার পথে-ঘাটে সন্ধ্যা-বেলায় দোকান-পাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বহুলোক রেডিওতে গান শুনিয়া সমস্ত দিনের একঘেয়ে কাজের অবসাদ দূর করেন। তা' ছাড়া প্রায় সকল অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতেই রেডিও সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। যদিও দূর পল্লী-অঞ্চলে পশ্চিম দেশের মত আমাদের দেশে রেডিও আজও তেমন বিস্তৃতি লাভ করে নাই, তথাপি বাঙ্গালায় যেমন ইহা দ্রুত প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে তাহাতে আশা করা যায় ক্রমে পাড়া-গাঁয়েও ইহার বিস্তৃতি হইবে; ঘরে ঘরে লোকজন ইহার আনন্দ উপভোগ করিবে। তাই বিজ্ঞানের দিক দিয়া রেডিও সম্বন্ধে দু'-চারিটী কথা বলিলে এখন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না এবং অনুসন্ধিৎসু কিছু তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি।

রেডিও যন্ত্রের সম্পর্কে কোন কথা আরম্ভ করিবার আগে শব্দ সম্বন্ধে প্রাথমিক কয়েকটি কথা বলিয়া লওয়া দরকার।

শব্দের প্রধানতঃ তিনটি বিশেষত্ব আছে :—ক্ষেপ[১] বা পৌনঃপুন্য[২], উচ্চতা[৩], বা বিস্তৃতি[৪], সুর[৫], বা রকম[৬]।

উপরোক্ত বিশেষত্ব কয়টির সহিত প্রত্যেকেই অল্প-বিস্তর পরিচিত আছেন; কাজেই ঐগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখন কথা হইল, পাশে পাশে যে শব্দ উচ্চারিত হয় তাহা লোকে সাধারণ অবস্থায় কি করিয়া শুনিতে পায়?

কথা বলিবার সময় আশে-পাশের বায়ুর উপরে শব্দ-তরঙ্গ উত্থিত হয়। এই তরঙ্গগুলির চাপের পার্থক্য[৭] অনুসারে নিকটস্থ ব্যক্তির কর্ণ-পটাহে[৮] মূল কম্পন পুনঃ-সঞ্জাত হয়। এই পুনঃ-সঞ্জাত বা প্রতিধ্বনিত শব্দের সাহায্যেই আমরা অপরের কথা শুনিতে পাই। কোন ব্যক্তির বাঙ্‌নিষ্পত্তির ফলে যে তরঙ্গ উত্থিত হয়, যদি তাহাকে কর্ণপটাহের অনুরূপ কোন ঝিল্লিতে[৯] আঘাত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ঝিল্লিতেও ঐরূপ আঘাতের ফলে মূল তরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গ উত্থিত হইবে। ব্রড-কাষ্টিংএ এই সুযোগটুকুই বিশেষভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

রেডিও ব্রড-কাষ্টিংএর প্রথমতম ও প্রধানতম কার্য্যই হইল শব্দ-তরঙ্গকে[১০] বৈদ্যুতিক তরঙ্গে পরিবর্ত্তিত করা। এই পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত সূক্ষ্ম-ধ্বনি-বিবর্দ্ধক[১১] নামক একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম-ধ্বনিবিবর্দ্ধক নানা প্রকারের যন্ত্র এ' পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঝিল্লির ব্যবহার অথবা অনুরূপ কার্য্যকরী কোন উপায় প্রত্যেক প্রকারের যন্ত্রে-ই অবলম্বিত হইয়াছে। নির্ম্মাণের বৈষম্যে আকৃতির রকমভেদ হইলেও আসল দিকের কোনই প্রভেদ নাই। তবে শব্দ-তরঙ্গকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে পরিবর্ত্তনের প্রথা অবশ্য নানা যন্ত্রে বিভিন্ন-ভাবে অবলম্বন করা হইয়াছে।

কোন শব্দ দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরণ করিতে হইলে সর্ব্বোপরি দ্রষ্টব্য বিষয় হইল যাহাতে সরল এবং মিশ্র উভয় শব্দ-কম্পনই[১২] যথাযথ উপায়ে সুন্দর ও সুস্পষ্ট ভাবে প্রেরণ করা যায়। কেন না ব্রড-কাষ্টিংএর বক্তৃতা-সঙ্গীত ইত্যাদি সমস্ত-ই তো প্রেরিতব্য। যে ব্যক্তি কথা বলিবেন বা গান করিবেন তাঁহার স্বরের ওঠা-পড়া ও তাহা সরু-মোটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং হইয়াও থাকে। অতএব এই সকল ধ্বনি যদি পূর্ণাঙ্গে প্রতিধ্বনিত না হয় তাহা হইলে সে সঙ্গীত বা বক্তৃতা সুশ্রাব্য ও আনন্দদায়ক হইতে পারে না। তাহা হইলে ব্রড্‌-কাষ্টিং-এর সমস্ত উদ্যোগ-উৎসাহই অর্থহীন এবং নিষ্ফল হইয়া পড়িবে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যাহাতে বক্তা বা গায়কের স্বর[১৩] ও সুরের[১৪] সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন[১৫] সংসাধিত হয়, তৎ-প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

অতি পূর্ব্বে যে সকল ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্রের* প্রচলন ছিল সেইগুলি এই দিক দিয়া খুবই অসম্পূর্ণ; কারণ তাহাতে কোন কোন বাদ্য-যন্ত্রাদির শব্দ যথাযথ ভাবে প্রেরণ করা যাইত না এবং শ্রোতা অনেক সূক্ষ্ম আনন্দদায়ক বাদ্য শ্রবণে

(১) pitch, (২) frequency, (৩) loudness (৪) amplitude, (৫) tone, (৬) quality. (৭) pressure gradient, (৮) ear-drum, (৯) membrane, (১০) stand wave, (১১) microphone, (১২) vibration, (১৩) tone (১৪) timbre, (১৫) mutation

* ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্র সূক্ষ্মধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্র বা microphone অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বঞ্চিত হইতেন। কিন্তু ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্রের ঐ ত্রুটী ক্রমোন্নতি দ্বারা দূরীভূত হইয়াছে এখন যে সকল ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্র প্রেরণ-স্থানে[১] ব্যবহৃত হয় সেগুলি সমস্তই এই দিক দিয়া সম্পূর্ণ এবং নিখুঁত।

এখন ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্রের কথা। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রাহাম বেলের পরীক্ষাগারে প্রথম ইহা আবিষ্কৃত হয়, এই যন্ত্রের নাম দেওয়া হয় বেল্ মাইক্রোফোন্। ইহার নির্ম্মাণ প্রণালী অনেকটা আমাদের কাণের মত। কিন্তু ইহাতে সেই ঝিল্লির পরিবর্ত্তে রীডের ব্যবহার হইত। তখন ইহা লাইন টেলিফোনে + ব্যবহৃত হইত এবং শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণ উভয় কার্য্যই ইহা দ্বারা চলিত। বক্তা তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়া ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্রের মুখে (orifice) কর্ণ স্থাপন করিয়া অপরের উত্তর শুনিয়া লইতেন। অবশ্য ইহাতে শব্দ শোনা যাইত অতি ক্ষীণভাবে। সকল প্রকার দোষত্রুটী সত্ত্বেও এই বেল্ মাইক্রোফোন-ই ছিল তখনকার দিনে একটা অভিনব আবিষ্কার। পরে হিউজ কারবন্ প্রেরণ-যন্ত্র (Hughes carbon transmitter) আবিষ্কৃত হইলে ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্রের এক নূতন জীবনের সূত্রপাত হয়।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক হিউজ কারবন্ ট্রান্সমিটার আবিষ্কার করেন। নিম্নে ইহার সামান্য বিবরণ দেওয়া গেল।

একখানা কাঠের বোর্ডের প্রান্তে দুইটী অঙ্গারযষ্ঠি (carbon rod), এবং এই দুইটী যষ্ঠির মধ্যস্থলে আর একটি অঙ্গারযষ্ঠি আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত। ইহাই হইল হিউজ কারবন্ ট্রান্সমিটারের নির্ম্মাণ-প্রণালী।

কারবন্ ট্রান্সমিটারের প্রথমোক্ত যষ্ঠি দুইটীতে সোজাসুজি তড়িত-প্রবাহ সঞ্চারিত করা হয়। কোন ব্যক্তি সম্মুখে কথা কহিলে তাহার কথায় উত্থিত শব্দ-তরঙ্গের আঘাতে মধ্যবর্ত্তী যষ্ঠিখণ্ড কম্পিত হইতে থাকে। এই কম্পনে পূর্ব্বোক্ত তড়িত-প্রবাহধারার বৈষম্য ঘটে। এই ওঠা-পড়া (variation) বৈদ্যুতিক স্রোত-ই আবার বেল্ গ্রহণ-যন্ত্রে শব্দাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া শুনিবার পক্ষে সাহায্য করে। এই গেল কারবন্ ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্রের মূল কথা। অবশ্য মূল বিষয় বজায় রাখিয়া নানা ভাবে নানা আকারে বহু প্রকার যন্ত্রই এযাবত প্রস্তুত করা হইয়াছে।

ব্রড-কাষ্টিংএর ইতিহাস ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্রের ইতিহাসের সহিত সমসূত্রে গ্রথিত। এ' কথা যে কতখানি সত্য ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্রের ইতিহাসের আরও দুই চারিটী কথা বলিলে প্রত্যেকেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বাস্তবিকই ব্রড-কাষ্টিং সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায় যে ব্রড-কাষ্টিংএর যুগ-বিবর্ত্তনের পূর্ব্বে এই ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্রের সংস্কার ও উন্নতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ কিছু-ই চিন্তা করেন নাই বা ইহার নির্ম্মাণ-পদ্ধতির সংশোধন করিয়া সকল প্রকারের শব্দ-ধ্বনির উপযোগী করিয়া তোলেন নাই।

প্রথমে ফেসেনডেন্ (Fessenden) এই দিক দিয়া অনেকটা অগ্রসর হন। তিনি-ই সর্ব্বপ্রথম রেডিওতে বক্তৃতা ইত্যাদি সম্ভবপর করিয়া তোলেন। তিনি যতটুকু উন্নতি সাধন করিলেন তাহাতে মাত্র এক মাইল দূরে শব্দ-প্রেরণ সম্ভব হয়।

পরে কয়েক বৎসর ধরিয়া শব্দ-প্রেরক যন্ত্রের উন্নতি সাধনার্থে চেষ্টা চলিতে থাকে। নানা পরীক্ষার ফলে দেখা গেল দূরবর্ত্তী স্থানে শব্দ-প্রেরণের পক্ষে একমাত্র অন্তরায় হইল অনুন্নত ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্র। কারণ এই যন্ত্রটি এরিয়েল সারকিটে (aerial circuit) সংযুক্ত থাকে; অথচ ইহাতে যে সামান্য পরিমাণে তড়িত প্রবাহ উৎপাদন করিতে পারে, তাহাতে এরিয়েল সারকিটে যতটুকু তড়িত গ্রহণ করিতে পায়, তাহা বহুদূরে শব্দ প্রেরণের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

মানুষ একবার একটা কিছুর সন্ধান পাইলে তাহা সম্পূর্ণভাবে আত্ম-প্রয়োজনে নিয়োগ করিতে না পারা পর্য্যন্ত স্থির থাকিতে পারে না। রেডিও ব্রড-কাষ্টিং সম্বন্ধে সকলে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং সমস্যা দূর করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। নানা গবেষণার ফলে পরে মেগোরেণা মাইক্রোফোন আবিষ্কৃত হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে চারিশত মাইল দূরে শব্দ প্রেরণ সম্ভবপর

(১) transmitting station.

+ তার-যোগে নিৰ্ম্মিত টেলিফোন।

হইয়া দাঁড়াইল। এই যন্ত্রটির নির্ম্মাণ-কৌশল এবং কার্য্য-পরিচালন সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা নাই। ক্রমোন্নতি দ্বারা বর্ত্তমানে যন্ত্রটি যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার পূর্ব্বে ইহা লইয়া এত বেশী আলোচনা হইয়াছে যে সেই সম্বন্ধে সকল কথা বলিতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত বড় হইয়া পড়িবে। আর অত খুঁটিনাটি সাধারণের পক্ষে জটিল এবং নিষ্প্রয়োজন।

বহু বিবর্ত্তন-পরিবর্ত্তনের পরে যখন গ্রিড মডিউলেশন[১] আবিষ্কৃত হইল তখন ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্রটি স্থানান্তরিত করিয়া শব্দ-পরিবর্দ্ধক[২] যন্ত্রের মধ্যবর্ত্তিতায় উক্ত পরিবর্ত্তনকারক[৩] ভাল্‌ভের* সহিত সংযুক্ত করিবার ব্যবস্থার প্রচলন আরম্ভ হয়।

কিছুদিন এইরূপেই ব্রড-কাষ্টিং চলিতে থাকে। পরে ওয়েষ্টার্ণ ইলেক্‌ট্রিক্‌ কোম্পানী একটী উন্নততর শব্দ-প্রেরক যন্ত্র[৪] আবিষ্কার করেন। তখন এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্রটি-ই পূর্ব্বের যন্ত্রের স্থান অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু তখনও দূরবর্ত্তী শ্রোতা সঙ্গীত ইত্যাদি তেমন সুস্পষ্ট শুনিতে পাইতেন না। কাজে-ই শ্রোতাদের পক্ষে রেডিও তখনও তেমন উপভোগ্যও হয় নাই।

কিন্তু মানুষ যত অগ্রসর হইয়া পড়ে ততই তাহার আর-ও অগ্রসর হইয়া চলিবার প্রবৃত্তি প্রবলতর হইয়া উঠে। যাহা নিছক বৈজ্ঞানিক, সাধারণের যাহাতে বিশেষ কিছু উৎসাহ থাকিবার কারণ নাই এমন বিষয় লইয়াই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ প্রবল অনুসন্ধিৎসানিবারণের নিমিত্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান,—আর এ' তো সম্ভোগের জিনিষ, সাধারণের আনন্দ উপভোগের-ই ব্যাপার। কাজেই মনীষিগণ উপায় উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ করিলেন। সময়ও বেশী লাগিল না, অচিরেই অভাব দূর হইল। মারকনী সাইক্‌স্‌ রাউণ্ড মাইক্রোফোন আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বহুদিনের সমস্যা দূরীভূত হইল। জনগণ তখন রেডিও সঙ্গীতে আনন্দের পূর্ণ আস্বাদ পাইতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে মারকনী কোম্পানী আরও উন্নততর একটি নূতন ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্রের প্রচলন করেন। ইহা মার্‌কনী-রিজ মাইক্রোফোন নামে পরিচিত। এই যন্ত্রে শব্দের কোন রূপ বিকৃতি ঘটে না। ইহা দ্বারা শব্দের পৌনঃপুন্য এমন সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছুরিত হয় যে উৎকৃষ্টতর যন্ত্র নিকট ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবে কিনা সন্দেহ।

কলিকাতা এবং বোম্বাই ব্রড-কাষ্টিং ষ্টেশনে এই মারকনী রিজ মাইক্রোফোন-ই ব্যবহৃত হইতেছে।

এই গেল শব্দ-বিবর্দ্ধক যন্ত্র সম্বন্ধে মোটামুটি কথা। এখন শব্দ পরিবর্ত্তন[৫] ইত্যাদি সম্বন্ধে সহজ ও সরলভাবে আলোচনা করিব।

২

আগেই বলিয়াছি যে শব্দ-তরঙ্গ সাহায্যে যে তড়িত-প্রবাহের সৃষ্টি করা হয় তাহা ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্র হইতে পরিবর্দ্ধক[৬] যন্ত্রে পরিচালিত করা হয়। এই যন্ত্রে সেই বৈদ্যুতিক তরঙ্গের পৌনঃপুন্য এমন ভাবে বৃদ্ধি করা হয় যেন তাহা বহুদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া যাইতে পারে এবং দূরবর্ত্তী শ্রোতার শুনিবার পক্ষে যেন যথেষ্ট হয়। পরিবর্দ্ধক যন্ত্রটির নির্ম্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া বৃথা; কারণ তাহা হইলে অনেক বৈজ্ঞানিক স্বতন্ত্রতার কথা আসিয়া পড়িবে এবং সাধারণের পক্ষে তাহা বুঝিয়া উঠা কষ্টকর। অবশ্য এইটুকু জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, যে মারকনী মাইক্রোফোনের কথা বলিয়াছি তাহাতে যথার্থ পক্ষে দুইটী এ্যাম্‌প্লিফায়ার রহিয়াছে।

অতঃপর পরিবর্ত্তক যন্ত্রে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহাই হইল শব্দ-প্রেরণের অন্যতম মূল কাজ। এই সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিবার আগে দুই চারিটি কথা আরও বলিয়া লওয়া দরকার।

এই যে এত ব্যাপার ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্রে সংঘটিত হইল ইহার আসল কথাটা কি? আসল কথা শব্দ-তরঙ্গকে বাহক তরঙ্গে[৭] পরিবর্ত্তিত করা। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে শব্দ তরঙ্গই বা কি আর বাহক তরঙ্গই বা কাহাকে বলে?

(১) Grid modulation—সুর প্রকারান্তর করিবার যন্ত্রবিশেষ। (২) amplifier, (৩) modulator, (৪) transmitter,

* Valve— কোন কিছুর গতিনিয়ন্ত্রণের যন্ত্র বিশেষ।

(৫) modulation, (৬) amplifier, (৭) carrier wave,

গোড়ার দিকে একটু চিন্তা করিলেই এই দুইটী তরঙ্গ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিতে পারিবেন। যাহা হউক, আমি এই সম্বন্ধে মোটামুটি কথাটুকু বলিব।

শব্দ-তরঙ্গ:—পর পর কতগুলি তন্ত্র বা আঁশের মত জিনিষ (fibre) আমাদের কণ্ঠনালীর মধ্যে সাজানো রহিয়াছে। এই গুলিকে বাক্‌তন্ত্রী[১] বলে। এই বাক্‌তন্ত্রীই বলিতে গেলে আমাদের শব্দ-তরঙ্গের উৎপাদক। যখন আমরা কোন ধ্বনি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করি তখন কণ্ঠনালীর বাক্‌তন্ত্রীগুলি কম্পিত হইতে থাকে; এই কম্পন আবার মুখ-গহ্বরে প্রতি-কম্পিত হয়। মুখ-গহ্বরের ঐ কম্পনের পৌনঃপুন্য অত্যন্ত অল্প। অবশ্য তদ্ভূত শব্দের উচ্চতা নির্ভর করে মানুষের বয়স এবং কণ্ঠ সাধনার উপর। ঐ মুখ গহ্বর নিঃসৃত তরঙ্গকেই শব্দ-তরঙ্গ কহে।

বাহক তরঙ্গ:—বৈদ্যুতিক প্রথায় শব্দ-প্রেরণের নিমিত্ত যে তরঙ্গ উৎপাদন করা হয় তাহাকে বাহক তরঙ্গ কহে। ইহার পৌনঃপুন্য খুব বেশী। কাজেই ইহা বহুদূর পর্যন্ত সঞ্চালিত হইতে পারে এবং লোকে তৎসাহায্যে বেশ পরিষ্কার রূপে সঙ্গীত, বক্তৃতা ইত্যাদি শুনিয়া উপভোগ করিতে পারে। এই বাহক-তরঙ্গ উৎপাদন হয় পরিবর্ত্তক যন্ত্রে যাওয়ার পথে অসিলেটার (oscillator) নামক যন্ত্রাংশে। বাহক-তরঙ্গকে ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিক্ ওয়েভও বলা হয়।

এই গেল শব্দ তরঙ্গ এবং বাহক তরঙ্গের কথা। কিন্তু বাহক-তরঙ্গকে তো আর এমনি ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। ইহাকে এমন ভাবে পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিতে হয় যেন সে তরঙ্গ দূরবর্ত্তী গ্রহণ-যন্ত্রে পরিশোধনের (rectification) পরে প্রেরক যন্ত্রের মাইক্রোফোনের সম্মুখে উচ্চারিত শব্দের সম্পূর্ণ প্রতিধ্বনি করিতে পারে। এই পরিবর্ত্তনের নিমিত্তই পরিবর্ত্তন যন্ত্রের (modulator) আবশ্যক। উক্ত যন্ত্রে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহা সাধারণের পক্ষে বোঝা সহজ এবং জ্ঞাতব্য। তরঙ্গগুলির কয়েকটি চিত্র হইতে পাঠকের পক্ষে ব্যাপারটা বুঝা সহজ হইবে।

ক - ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্রের শব্দ-তরঙ্গের প্রতিলিপি।

খ - বাহক তরঙ্গ।

গ—শব্দ-প্রেরক এরিয়েল হইতে যে সংশোধিত তরঙ্গ প্রেরিত হয় তাহার প্রতিচ্ছবি। ইহা 'ক' ও 'খ'এর সংযুক্ত অবস্থার অনুরূপ। এই সংযোগেরই নাম পরিবর্ত্ত।
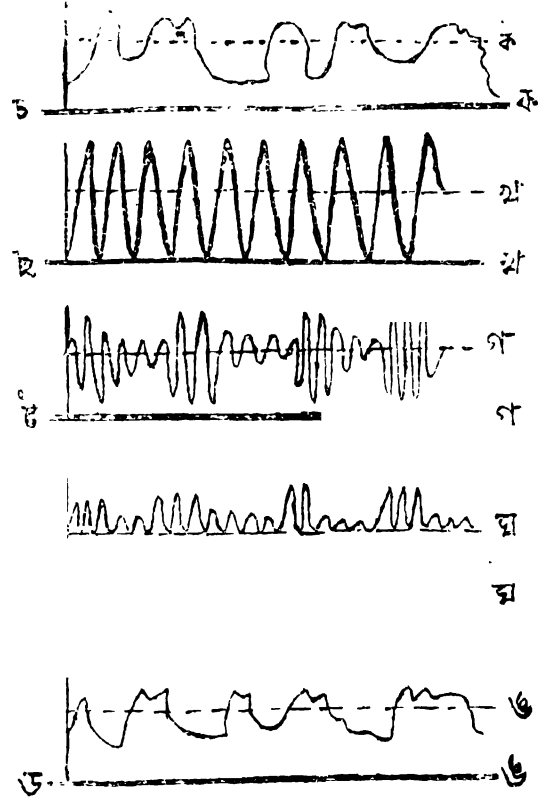
৬নং চিত্র

ঘ - গ্রহণ-যন্ত্রে পরিশোধনের পরে পূর্ব্বোক্ত সংশোধিত তরঙ্গের অবস্থা।

ঙ লাউড স্পীকার হইতে যে শব্দ-তরঙ্গ উৎপাদিত হয়। ইহা 'ক'-য়ের হুবহু প্রতিকৃতি।

এখন পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বলিলে খুবই সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

বক্তার মুখনিঃসৃত শব্দ দ্বারা যে তরঙ্গ উৎপাদিত তাহাই 'ক' তরঙ্গমালার অনুরূপ। আর 'খ' হইল বাহক তরঙ্গের আকৃতি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই বাহক তরঙ্গ উৎপাদিত হয় অসিলেটার যন্ত্রাংশ হইতে। এখন পরিবর্ত্তক যন্ত্রের প্রধানতম কার্য্য হইল এই বাহক তরঙ্গের সংশোধন

(১) vocal chord.

করা। এইরূপ পরিবর্তিত তরঙ্গমালাই 'গ' দ্বারা দেখানো হইতেছে। উহা 'ক' ও 'খ'-এর মিশ্রিত অবস্থা নয় কি? একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিতেই বুঝা যাইবে যে উহা যথার্থ-ই পূর্ব্বের দুইটী তরঙ্গের (ক ও খ) সংমিশ্রণে উৎপাদিত। এই পরিবর্ত্তিত তরঙ্গই (গ) এরিয়েল হইতে অপর স্থানে প্রেরিত হয়—দূরে।

ঐ পরিবর্ত্তিত তরঙ্গ আবার গ্রহণ-যন্ত্রে পরিশোধন করিয়া শব্দ-তরঙ্গে পরিবর্ত্তিত করা হইবে। 'ঘ' এইরূপ পরিশোধিত তরঙ্গ এবং 'ঙ' হইল আমরা গ্রহণ-যন্ত্র হইতে যে শব্দ শুনিতে পাই তাহারই তরঙ্গভঙ্গিমা।

একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে "ক" ও "ঙ" এই উভয়ের আকৃতি এক প্রকার। কাজেই প্রেরক যন্ত্র এবং গ্রহণ-যন্ত্রেরও বেশ সৌসাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন।

এই গেল এদিককার কথা। পরবর্ত্তী অংশে শব্দ সঞ্চারণের (propagation) কথা বলিব।

(ক্রমশঃ)

ওটাওয়া বৈঠক

—শ্রীকুলেন্দ্রচন্দ্র পাল

আগামী জুলাই মাসে কেনাডার রাজধানী ওটাওয়া (Ottawa) সহরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক বৈঠক বসিবে; বহুদিন হইতেই তাহার আয়োজন চলিতেছে। বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ সমূহের মধ্যে পরস্পরের সুবিধাজনক বাণিজ্য-ব্যবস্থার আলোচনা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এই বৈঠক কিছুমাত্র নূতন ব্যাপার নয় কারণ অনুরূপ উদ্দেশ্য লইয়া পূর্ব্বে বহুবার এইরূপ বৈঠক বসিয়াছে। কিন্তু নানা কারণে বর্ত্তমান বৈঠকের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে তাহা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা দরকার।

সাম্রাজ্যানুকূল্যের সূচনা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ সমূহের উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্পজাতকে সাম্রাজ্যের বাজারসমূহে সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব প্রথমে বাস্তব রূপ ধারণ করে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, যখন সেই বৎসর কেনাডা কতকটা উদার শুল্কনীতিরই ফলে ইংলণ্ডের পণ্যের উপর আমদানী শুল্ক কমাইয়া দেয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ঔপনিবেশিক বৈঠকের সম্মুখে এই সাম্রাজ্যিক বাণিজ্যানুকূল্যের (Imperial Preference) প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে বৈঠক নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করে :—

(১) এই সভা স্বীকার করে যে যুক্তরাজ্য (ইংলণ্ড) ও ডমিনিয়ন সমূহের মধ্যে বাণিজ্যানুকূল্যের নীতি পরস্পরের বাণিজ্য সম্পর্কের প্রসার বিধান করিবে এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সম্পদ ও শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিবে।

(২) এই সভা স্বীকার করে যে উপনিবেশ সমূহের বর্ত্তমান অবস্থায় মাতৃভূমি ও ডমিনিয়ন সমূহের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্যের কোন সাধারণ ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভবপর নহে।

(৩) কিন্তু সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রসারের জন্য ইহা বাঞ্ছনীয় যে, যে-সব উপনিবেশ এখনও এই নীতি অবলম্বন করে নাই তাহারা অবিলম্বে নিজ নিজ সাধ্যানুসারে যুক্তরাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্পজাতকে বিশেষ ভাবে আনুকূল্য দেখাইবে।

(৪) যুক্তরাজ্যে উপনিবেশ সমূহের উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্পজাতের উপর আমদানী শুল্ক রহিত করিয়া বা কমাইয়া দিয়া তাহাদের প্রতি পক্ষপাতমূলক ব্যবহারের উপযোগিতা সম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্য উপনিবেশ সমূহের প্রধান মন্ত্রিগণ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

(৫) উপনিবেশ সমূহের যে সব প্রধান মন্ত্রী বর্ত্তমান সভায় উপস্থিত আছেন তাঁহারা এই প্রস্তাবের মূলনীতি অবিলম্বে নিজ নিজ গভর্ণমেণ্টের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া ইহাকে কার্য্যকরী করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বনের অনুরোধ জানাইবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছেন।

ইংলণ্ডের স্বার্থ বুদ্ধি

এই প্রস্তাব অনুসারে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে নিউজিলাণ্ড ও সাউথ আফ্রিকা এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডকে সুবিধা প্রদান করিয়া শুল্ক প্রবর্ত্তন করে। কিন্তু ইংলণ্ড এই ব্যাপারে কিছু মাত্র সাড়া দিল না। ইংলণ্ড প্রধানতঃ খাদ্য দ্রব্য ও কাঁচা মালই শুধু আমদানী করে। কাজেই এই সব দ্রব্যের আমদানীর উপর শুল্ক বসাইয়াই কেবল সে উপনিবেশ সমূহের উপকারের প্রতিদান করিতে পারিত। কিন্তু এইরূপ শুল্কস্থাপনের অর্থ খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচা মালকে ইংলণ্ডের বাজারে দুর্ম্মূল্য করা ছাড়া আর কিছুই নয়; সে নীতি ইংলণ্ড বহু পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছিল। কাজেই ডমিনিয়ন সমূহের অনুরোধে সে কর্ণপাত করিল না।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ঔপনিবেশিক বৈঠকে এই প্রস্তাব আবার বিশেষ করিয়া উত্থাপিত হইল। ডমিনিয়ন সমূহের প্রতিনিধি-গণ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যবিস্তারে এই ব্যবস্থার উপযোগিতা ও এই ব্যাপারে ইংলণ্ডের সাহায্যের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে ইংলণ্ডের তদানীন্তন অবস্থায় এই নীতি অবলম্বন সম্পূর্ণই অসম্ভব। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রস্তাবটি এই বৈঠকে পুনর্গৃহীত হইল; শুধু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করিলেন না যে তাঁহাদের শুল্ক ব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন বা উপযোগিতা আছে। কিন্তু এই বৈঠকের প্রধান বিশেষত্ব এই যে বৈঠক সর্ব্বসম্মতিক্রমে "ঔপনিবেশিক বৈঠক" নাম বদলাইয়া "সাম্রাজ্য বৈঠক" নাম গ্রহণ করিল। স্থির হইল যে এই বৈঠক ইংলণ্ড ও স্বায়ত্বশাসনাধিকারপ্রাপ্ত ডমিনিয়ন সমূহের মন্ত্রিগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে; ভোট দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থির হইবে এবং প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের একটি করিয়া ভোট দেওয়ার অধিকার থাকিবে। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষ এই বৈঠকে স্থান পাইল না, কারণ তাহার শাসন-যন্ত্র ইংলণ্ড কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত; কাজেই তাহাকে ভোটাধিকার দেওয়ার অর্থ ইংলণ্ডের ভোট দ্বিগুণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মহাযুদ্ধের শিক্ষা

যাহা হউক গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যানুকূল্য বিষয়ে ইংলণ্ডের মনোভাবের কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। কিন্তু মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর সে সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের সঙ্গে স্বীয় বাণিজ্য-সম্পর্ক দৃঢ়তর করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিল এবং তখন হইতে সাম্রাজ্যিক বাণিজ্যানুকূল্যের প্রস্তাবের আবার নূতন করিয়া আলোচনা চলিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে মিত্র-শক্তিদের বৈঠকে কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য যাহাতে শত্রুপক্ষের মুখাপেক্ষী না থাকিতে হয় অবিলম্বে সে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে অর্থ-নৈতিক বিষয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করিবার প্রশ্নও আবার নূতন অর্থ নিয়া দেখা দিল। এ উদ্দেশ্যে কিরূপ বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ডমিনিয়ন সমূহ ও ভারতবর্ষকে লইয়া এক সভা ডাকা হইবে স্থির হইল। কিন্তু নানা কারণে সে সভা কখনও বসে নাই। যাহা হউক ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের সাম্রাজ্য-বৈঠক নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিল:—

সাম্রাজ্যের সম্পদবৃদ্ধির জন্য—বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্য, কাঁচা মাল ও প্রয়োজনীয় শিল্প সম্বন্ধে তাহাকে স্বাধীন করিবার জন্য—সর্ব্ব প্রকার সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে সভা নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুমোদন করিতেছে:—

(১) আমাদের মিত্রগণের স্বার্থ অগ্রাহ্য না করিয়া সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশ অন্যান্য অংশের উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্পজাতকে যথাসম্ভব সুবিধা প্রদান করিবে।

(২) ইংলণ্ড হইতে যাহারা বিদেশে যাইয়া বসবাস করিতে চায় তাহাদিগকে সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়া সাম্রাজ্যিক বাণিজ্যানুকূল্য নীতি অবলম্বন করে এবং স্বীয় শুল্ক নীতির কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ সমূহের আমদানীকে শুল্ক বিষয়ে কতকটা সুবিধা প্রদান করে। ইংলণ্ড তখনও মুক্ত বাণিজ্যনীতির উপাসক; কাজেই এই আনুকূল্য বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। কিন্তু আজ সে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়া সাম্রাজ্যের পণ্যকে উপযুক্ত আনুকূল্য প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। বর্ত্তমান ওটাওয়া বৈঠকের ইহা একটি প্রধান বিশেষত্ব।

মত-পরিবর্ত্তন

এই ব্যাপারে সব চেয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয় ইংলণ্ডের আমূল মত পরিবর্ত্তন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে যে ইংলণ্ড সাম্রাজ্যের পণ্যকে সামান্য মাত্র আনুকূল্য প্রদর্শনও তাহার মুক্ত বাণিজ্য নীতির পরিপন্থী বলিয়া উপনিবেশ সমূহের সমবেত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে দ্বিধা করে নাই, সেই ইংলণ্ডই আজ মুক্ত-বাণিজ্য নীতি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য এত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে কেন? এর উত্তর খুবই সহজ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের যান্ত্রিক উন্নতি শিল্পজগতে যে বিপ্লব আনয়ন করে—তাহার সুবিধা প্রায় সবটাই লাভ করিয়াছিল সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ড। তার ফলে শিল্পজাত দ্রব্যে সে একরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। কিন্তু কাঁচা মাল ও খাদ্যদ্রব্যের জন্য সে বিশেষ ভাবেই পরমুখাপেক্ষী। বহির্ব্বাণিজ্যে ইংলণ্ডের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য মুক্ত বাণিজ্যের সাহায্যেই শুধু তাহার শিল্পপ্রাধান্য বজায় রাখা সম্ভবপর। কাজেই তখন হইতে ইংলণ্ড সেই নীতি অবলম্বন করিয়া তাহার গুণগানে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল—যদিও তাহার শিল্প-জীবনের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছিল সংরক্ষণ-নীতিরই আওতায় এবং ল্যাঙ্কাসায়ারের বস্ত্রশিল্পকে তাহার শৈশবে কয়েক বৎসরের জন্য রক্ষা করা হইয়াছিল মূল্যের উপর শতকরা ৬৫২ টাকা আমদানী-শুল্ক বসাইয়া ও প্রতিযোগী বিদেশী বস্ত্র-পরিধান বে-আইনী করিয়া দিয়া। এই মুক্ত বাণিজ্য কেবল ইংলণ্ডের বিশেষ অবস্থার উপযোগী হইলেও তাহার প্রচার-কার্য্য একেবারে ব্যর্থ হইল না। ইংলণ্ডের সমৃদ্ধিকে তাহার মুক্ত বাণিজ্য নীতিরই ফল বলিয়া অনেকেই ভুল করিল এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ইঙ্গ-ফরাসী বাণিজ্য-সন্ধির পর সমগ্র ইউরোপেই মুক্ত বাণিজ্য-নীতির স্বপক্ষে একটা আন্দোলন আরম্ভ হইল। কিন্তু এই আন্দোলন বেশী দিন স্থায়ী হইল না; কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া সূচিত হইল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মানী সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করে এবং তাহার সাহায্যে যুদ্ধের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত শিল্প-জগতে বিরাট উন্নতি করে। ফরাসীর জনসাধারণ কোন দিনই মুক্ত বাণিজ্য নীতির অনুমোদন করে নাই, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সেও সে নীতি ত্যাগ করিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জাপান বৈদেশিক সন্ধি-সর্ত্তের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া সংরক্ষণ-শুল্ক অবলম্বন করিল এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তাহা বেশ বেশী করিয়াই বাড়াইয়া দিল। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র অন্তর্ব্বিপ্লবের সময় হইতেই উচ্চ শুল্ক-প্রাচীর অবলম্বন করিয়াছিল, মহাযুদ্ধের পর তাহা আরও উচ্চতর করিয়া দিয়াছে। ব্রিটিশ ডমিনিয়নসমূহও এ বিষয়ে কাহারো পশ্চাতে থাকে নাই। তাহারাও সকলেই শুল্ক-নীতিনির্দ্ধারণে নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করিয়া আপন আপন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের রক্ষার্থে উচ্চ আমদানী-শুল্ক প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

ব্যর্থ ষড়যন্ত্র

কিন্তু এই সব সত্ত্বেও যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিল্প-জগতে ইংলণ্ড নিজেকে একরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বীই মনে করিয়াছে। উৎপন্ন দ্রব্যবিক্রয়ে বা কাঁচামালসংগ্রহে তখন পর্য্যন্ত তাহাকে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় নাই। কাজেই এই সব বিষয়ে ডমিনিয়ন সমূহের সাহায্য সে উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছে। ইংলণ্ডের চক্ষু ফুটিল জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময়ে। তখনই প্রথম সে ডমিনিয়ন সমূহের সহায়তার মূল্য উপলব্ধি করিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যের রক্ষার্থে ডমিনিয়ন সমূহের অকপট উদ্যম ও সহায়তার ইংলণ্ড একটা ভুল অর্থ করিল। সে মনে করিল ইহা তাহাদের সাম্রাজ্যিক যুক্তরাষ্ট্রাদর্শ (Ideal of Imperial Federation)-প্রীতিরই লক্ষণ। এই সুযোগে

ইংলণ্ডের একদল সাম্রাজ্যপন্থী সাম্রাজ্যিক ঐক্যের মহিমা কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল। তাহারা প্রস্তাব করিল যে সাম্রাজ্যের রক্ষা ও বৈদেশিক ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগতভাবে করিতে হইবে। ডমিনিয়ন সমূহের প্রধান মন্ত্রিগণ তখন লণ্ডনে ইংলণ্ডের মন্ত্রিবৃন্দের সঙ্গে নিয়মিত ভাবেই যুদ্ধের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন এবং এই মন্ত্রণা-সভার নাম দেওয়া হইয়াছিল Imperial War Cabinet বা সাম্রাজ্যিক সমর-পরিষদ। সাম্রাজ্যবাদিগণ প্রস্তাব করিল এই পরিষদকে স্থায়ী করিয়া সমগ্র সাম্রাজ্যের জন্য একটি যুক্ত ব্যবস্থাপক সভা (Federal Parliament) গঠন করিতে হইবে ; পরিষদ এই ব্যবস্থাপক সভার নিকট তাঁহাদের কার্য্যের জন্য দায়ী থাকিবেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ঐক্য-বিধানের প্রস্তাবও সাম্রাজ্যবাদীদের এই আন্দোলনেরই ফল।

প্রতিক্রিয়া

কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই ব্যাপারে ইংলণ্ড একটা প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছিল। ডমিনিয়ন সমূহ ও ভারতবর্ষের যে স্বতঃপ্রণোদিত উদ্যমকে সে সাম্রাজিক যুক্ত রাষ্ট্রাদর্শ-প্রীতির লক্ষণ বলিয়া ভ্রম করিল, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ছিল ঠিক বিপরীত ভাবের নির্দ্দেশক ; যে নবজাগ্রত আত্মবোধ স্বাধীনতাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ মনে করে এ লক্ষণ তাহারই প্রমাণ। এই কথা স্পষ্ট করিয়াই বুঝা গেল ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের সাম্রাজ্য-বৈঠকে। ডমিনিয়ন সমূহ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া যে-প্রস্তাব গ্রহণ করিল তাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোন সম্ভাবনাই আর রহিল না। এই ব্যর্থ প্রয়াসের প্রতিক্রিয়া ইংলণ্ডের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হইল। ডমিনিয়ন সমূহের স্বাতন্ত্র্যকামিগণ—বিশেষভাবে কেনাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরাজেতর জাতি সমূহ—ইংলণ্ডের এই সাম্রাজ্যাধিপত্য পুনরধিকারের ষড়যন্ত্রে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ফলে জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইলে ডমিনিয়ন সমূহ স্বতন্ত্রভাবে তাহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া প্রকারান্তরে সাম্রাজ্যের ঐক্যই অস্বীকার করিল।

ভাঙনির মুখে

কিন্তু এখানেই এই প্রতিক্রিয়ার শেষ নয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আইরিশ ফ্রি ষ্টেট সাম্রাজ্য-বৈঠকে যোগদান করার সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকের কার্য্যাবলী নূতন ধারা অবলম্বন করিল। এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সাম্রাজ্য-বৈঠকই ডমিনিয়ন সমূহের স্বাধীনতার পরিসর বাড়াইয়া দিলেও বৈঠক সরলভাবেই স্বীকার করিয়াছে যে তাহার প্রধান লক্ষ্য সাধারণ উদ্দেশ্যে স্বাধীন সহযোগিতা দ্বারা সাম্রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধির উপায়নির্দ্ধারণ। এক মহাযুদ্ধের সময় ব্যতীত এই দিক দিয়া যে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন কাজই হয় নাই তাহার প্রধান কারণ সাম্রাজ্যিক বাণিজ্যানুকূল্যের প্রস্তাবে ইংলণ্ডের নিকট হইতে উৎসাহের অভাব। কিন্তু আইরিশ ফ্রি ষ্টেট সাম্রাজ্য-বৈঠকে যোগদান করিবার কালে সাম্রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধির ইচ্ছার বা নিজের অবশিষ্ট বন্ধন-মোচন ব্যতীত অপর কোন উদ্দেশ্যের ভাণই করিল না। এই ব্যাপারে তাহার প্রধান সহায় হইলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হার্টজগ এবং কিয়ৎ পরিমাণে কেনাডার প্রধান মন্ত্রী মিঃ মেকেঞ্জি কিং। ইতিপূর্ব্বে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্য-বৈঠকে এই মর্ম্মের একটা আলোচনা হইয়াছিল যে ডমিনিয়ন সমূহের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্ক বৈঠক নিজের প্রস্তাব দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে। বলা বাহুল্য ইহা ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদীদের আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ারই ফল। যাহা হউক প্রধানতঃ মিঃ বোনার লর চেষ্টায় সে-যাত্রা এই প্রশ্ন চাপা পড়িল। কিন্তু আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের প্রবেশের পর ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের সাম্রাজ্য-বৈঠকে এ দাবী আর নির্ব্বিঘ্নে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর রহিল না। তখন এই বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য লর্ড বেলফোরের অধীনে এক কমিটি নিযুক্ত হইল। কমিটি "গ্রেটব্রিটেন ও ডমিনিয়ন সমূহ লইয়া গঠিত দেশসমষ্টি"র যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলেন তাহা এই :—

শেষ চেষ্টা

"ইহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সমমর্য্যাদাবিশিষ্ট স্বতন্ত্র দেশ—আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক ব্যাপারের কোন ক্ষেত্রেই ইহারা কেহ কাহারও অধীন নহে, যদিও একই রাজানুগত্যের ফলে ইহারা একতাবদ্ধ (united by a common allegiance to the Crown) এবং ব্রিটিশ জাতিসঙ্ঘের সভ্যরূপে স্বেচ্ছায় সম্মিলিত।"

সম্প্রতি Statute of Westminster দ্বারা ইংলণ্ড এই কথাকেই আইনতঃ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ডমিনিয়ন

পার্লামেণ্টসমূহের উপর এখন হইতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আর কোনরূপ আধিপত্যই রহিল না। কিন্তু ইহার ফলে ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ডমিনিয়নসমূহের সন্দেহ দূরীভূত হওয়ায় ভবিষ্যৎ সহযোগিতা দ্বারা সাম্রাজ্যকে দৃঢ়তর করার পথ কতকটা মুক্ত হইল। এই আইন প্রণয়নের পূর্ব্বেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ডমিনিয়ন সমূহের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করে নাই। ফলে ইংলণ্ডের প্রভুত্ব শুধু কথার কথায়ই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। অথচ এই মিথ্যা প্রভুত্বেরই জন্য ডমিনিয়নসমূহ ও ইংলণ্ডের মধ্যে অন্তরের ব্যবধান দিনদিনই বিস্তৃততর হইয়া উঠিতেছিল। ওটাওয়া বৈঠকের পূর্ব্বাহ্নে ইংলণ্ডের এই বন্ধুতার নিদর্শন ব্যর্থ হইবে না বলিয়াই সে আশা করে।

সমস্যার স্বরূপ

কিন্তু ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের পর গত ২৫ বৎসরে জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই ডমিনিয়ন সমূহের উপর দিয়া বিরাট পরিবর্ত্তনের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে এখন আর তাহারা ইংলণ্ডের অনুগ্রহ-প্রত্যাশী নয়। তা'ছাড়া গত মহাযুদ্ধের পরে জাতীয়তা ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের নূতন আদর্শ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ডমিনিয়নসমূহকেও সমভাবেই অনুপ্রাণিত করিয়াছে। কাজেই রাজনৈতিক ব্যাপারের ন্যায় আর্থিক জীবনেও তাহারা আপনাদিগকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করিয়া গঠিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই।

এই ব্যাপারে অন্যান্য দেশের ন্যায় তাহারাও সুউচ্চ শুল্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং স্বয়ং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধেও তাহা প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করে নাই। শুধু তাই নয় প্রায় সব ডমিনিয়নই ইংলণ্ডের সম্মতিক্রমে বা সে সম্মতি না লইয়াই বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের মত এবং স্বার্থ অগ্রাহ্য করিয়াই তাহা করিয়াছে।

অপর পক্ষে ইংলণ্ডের বাণিজ্য-প্রাধান্য এই কয় বৎসরে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছে। শিল্প-জগতে সে আর পূর্ব্বের ন্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী তো নয়ই—বহুক্ষেত্রে সে জার্ম্মানী, আমেরিকা ও জাপানের প্রতিযোগিতা সহ্য করিতে পারিতেছে না। ইহার অন্যতম কারণ এই যে ইংলণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনের ফলে সেখানে শ্রমিকদিগকে যে হারে বেতনাদি দিতে হয় জার্ম্মানী ও জাপানে তদপেক্ষা বহু কম হারে দিলেই চলে। কাজেই জার্ম্মানী বা জাপান যত সস্তা দরে বিক্রয় করিতে পারে ইংলণ্ড তত সস্তা দরে বিক্রয় করিতে পারে না। তা'ছাড়া যুদ্ধের পূর্ব্বে যে সব দেশ কৃষিমাত্র-সম্বল ছিল তাহাদিগকে শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য প্রধানতঃ ইংলণ্ডের উপর নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু যুদ্ধের পর প্রায় কোন দেশই আর শুধু কৃষির উপর নির্ভর করিয়া নাই; সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজন বহু পরিমাণে নবপ্রতিষ্ঠিত স্বদেশী শিল্পের সাহায্যেই পূরণ করিতেছে এবং এই শিল্পকে বিদেশের প্রতিযোগিতা হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়াছে। কাজেই এ দিক দিয়াও ইংলণ্ডের বৈদেশিক বাজার অনেক সঙ্কোচিত হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবসায়-মন্দা (যাহা অনেকাংশে এই শুল্ক-দ্বন্দ্বেরই ফল) এই প্রতিযোগিতাকে আরও সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে। ফলে অন্যান্য দেশের ন্যায় ইংলণ্ডকেও স্বীয় শিল্প-জাতের জন্য প্রধানতঃ স্বদেশের বাজারের উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে এবং সে বাজারকে বিদেশী সস্তা দ্রব্যের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য মুক্ত-বাণিজ্য-নীতি ত্যাগ করিয়া সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের বিপুল শিল্পজাতের জন্য স্বদেশের বাজারই যথেষ্ট নয়। কাজেই তাহার বর্ত্তমান শিল্প-প্রাধান্য কিছু পরিমাণেও বজায় রাখিতে হইলে তাহাকে বিদেশে যেখানেই হউক এই সব পণ্যবিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ওটাওয়া বৈঠকের বৈশিষ্ট্য

বলা বাহুল্য এ বিষয়ে ইংলণ্ডের প্রধান ভরসাস্থল সাম্রাজ্যের বাজারসমূহ। এই সব বাজারকে মোটামুটি তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়:—

(১) ডমিনিয়নসমূহ

(২) ভারতবর্ষ

(৩) উপনিবেশ সমূহ (Crown Colonies)

তন্মধ্যে ডমিনিয়নসমূহ শুল্কনীতি-নিয়ন্ত্রণে বহুদিন হইতেই স্বাধীন; ভারতবর্ষ স্বাধীন না হইলেও ভারতগভর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর হইতে শুল্কনীতি-নির্দ্ধারণে কিয়ৎ পরিমাণে জনমত

গ্রাহ্য করিতেছেন এবং উপনিবেশ সমূহের শুল্কনীতি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ইংলণ্ড কর্ত্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ডমিনিয়ন সমূহ তাহাদের এই স্বাধীনতার ফলে পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করিয়া শিল্পজগতে অনেকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষও সামান্য কয়েক বৎসরের জন্য সে নীতির আংশিক সাহায্য মাত্র পাইলেও কতকটা তাহার স্বদেশী আন্দোলন এবং কতকটা কাঁচামাল ও শ্রম সম্বন্ধীয় সুবিধার ফলে আজ আর শুধু কৃষির উপরই নির্ভরশীল নহে; শিল্পজগতেও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু উপনিবেশ সমূহকে ইংলণ্ডের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য কেবল কাঁচামাল সরবরাহ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এ অবস্থায় অন্যান্য দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের উপর উচ্চ আমদানী-শুল্ক স্থাপন করিয়া উপনিবেশ সমূহের বাজার প্রায় সম্পূর্ণরূপেই নিজের করায়ত্ত করিয়া লইলেও ইংলণ্ডকে আজ ডমিনিয়ন সমূহ ও ভারতবর্ষ, এই উভয় বাজারেই বেশ বেগ পাইতে হইতেছে। তার কারণ শুধু স্বদেশী দ্রব্যের প্রতিযোগিতাই নয়—সাম্রাজ্যের বাহিরের দেশের প্রতিযোগিতাও বটে। এই প্রতিযোগিতার ফলে এই সব বাজার দিন দিনই ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত হইয়া যাইতেছে। তা'ছাড়া বর্ত্তমান ব্যবসায়মন্দার ফলে উপনিবেশ সমূহ কাঁচামাল লইয়া মুস্কিলে পড়ায় তাহাদের আয় বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে এবং সে জন্য এ ক্ষেত্রেও ইংলণ্ড আশানুরূপ সুবিধা পাইতেছে না। সাম্রাজ্যের বাজারে ইংলণ্ডের এই নষ্ট বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার অসম্ভব নয় বলিয়াই সে মনে করে। কারণ ডমিনিয়ন সমূহ এখনও শিল্পজাত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়—ভারতবর্ষ তো নয়-ই; এবং উভয়কেই কৃষিজাত দ্রব্য ও কাঁচামাল বহু পরিমাণে বিদেশের বাজারে বিক্রয় করিতে হয়। অপর পক্ষে ইংলণ্ডের সমস্ত বাণিজ্য-সমৃদ্ধিই যেমন নির্ভর করে একদিক দিয়া তাহার শিল্পজাতের বৈদেশিক চাহিদার উপর, তেমনি অপর দিক দিয়া খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের জন্য সে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই পরমুখাপেক্ষী। তাহা ছাড়া ডমিনিয়ন সমূহে উৎপন্ন হয় না এমন কতকগুলি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (যেমন তুলা, রবার, তামাক ইত্যাদি) লইয়া উপনিবেশ সমূহকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে। এই অবস্থায় ইংলণ্ড, ডমিনিয়ন সমূহ, ভারতবর্ষ ও উপনিবেশ সমূহের পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্যবিস্তারের অসীম সম্ভাবনা রহিয়াছে। ডমিনিয়ন সমূহ ও ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে যে সব শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করে তাহা যদি শুধু ইংলণ্ড হইতেই লয় তাহা হইলে অতি সহজেই ইংলণ্ডের সমস্যার সমাধান হইতে পারে। প্রতিদানে ইংলণ্ড শুধু সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহ হইতেই কাঁচামাল ও খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিবে। কিন্তু সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত বিশেষ কোন বাণিজ্য-ব্যবস্থার দ্বারাই এইরূপ আদানপ্রদান সম্ভবপর। ইংলণ্ডের দিক হইতে ওটাওয়া বৈঠকের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিশেষত্ব।

উপায়

বিটিশ গভর্ণমেণ্ট ওটাওয়া বৈঠকে ঠিক কি প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন তাহা এখনও স্পষ্ট জানা যায় নাই। কিন্তু নানারূপ আলাপ আলোচনা হইতে ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যের বেশ পরিষ্কার আভাসই পাওয়া যাইতেছে। এখন পর্য্যন্ত তাহার পক্ষ হইতে যে সব প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাদিগকে, গুরুত্ব অনুসারে তিন স্তরে ফেলা যায়:—

(১) সাম্রাজ্যিক অবাধ বাণিজ্য।
(২) সাম্রাজ্যিক বাণিজ্যানুকূল্য।
(৩) চুক্তিমূলক (reciprocal) শুল্কানুকূল্য।

সাম্রাজ্যিক অবাধ বাণিজ্য ইংলণ্ডের চরমপন্থী সাম্রাজ্যবাদীদেরই আদর্শ। এই প্রস্তাবের অর্থ এই যে সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চলিবে বা অপর কথায় আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে বিটিশ সাম্রাজ্যকে একই দেশ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সুতরাং সাম্রাজ্যের শিল্পসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য সংরক্ষণনীতি অবলম্বিত হইলেও সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে কোনরূপ সংরক্ষণ শুল্ক ব্যবহৃত হইবে না।

সাম্রাজ্যিক বাণিজ্যানুকূল্যের প্রস্তাব এতটা সুদূরগামী নয়। ইহা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করে না। এ ব্যবস্থায় প্রত্যেকেরই সংরক্ষণনীতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে কিন্তু সকলেই সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ সমূহকে শুল্ক বিষয়ে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা যথেষ্ট সুবিধা দিবে। এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্য জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া সাম্রাজ্যিক বাণিজ্যের প্রসারবিধান এবং যতদূর সম্ভব সাম্রাজ্যের বাজার সমূহকে সাম্রাজ্যের পণ্যের জন্য সংরক্ষণ।

সাম্রাজ্যবাদীর স্বপ্ন

ইংলণ্ডের তৃতীয় প্রস্তাব শুল্ক সম্বন্ধে চুক্তিপূর্ব্বক সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের পরস্পরকে বাণিজ্য-সুবিধা-প্রদান। এই প্রস্তাবের বিশেষত্ব এই যে শুধু সাম্রাজ্যান্তর্গত বলিয়াই কোন দেশ অপর কোন দেশের নিকট বাণিজ্য-সুবিধা পাইবে না; সে সুবিধা পাইতে হইলে তাহাকেও অনুরূপ সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

এক ইংলণ্ডের পক্ষ হইতেই এতগুলি প্রস্তাবের উত্থাপন অর্থহীন নয়। ওটাওয়া বৈঠকের সাফল্য শুধু ইংলণ্ডের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে না। কাজেই সেখানে এরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে হইবে যাহা ডমিনিয়ন সমূহেরও অনুমোদন লাভ করিবে। কিন্তু ডমিনিয়ন সমূহ এ ব্যাপারে কতদূর অগ্রসর হইতে প্রস্তুত আছে সে সম্বন্ধে কেহই স্থিরনিশ্চিত নহে। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা হইতেই ইংলণ্ডের বিভিন্ন প্রস্তাবের উৎপত্তি। শুধু ইংলণ্ডের স্বার্থের দিক হইতে দেখিলে সাম্রাজ্যিক অবাধ বাণিজ্যনীতিই অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত নীতি। কারণ এ ব্যবস্থায় একদিকে ইংলণ্ডের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ সাম্রাজ্যের বাজারে প্রবেশাধিকার পাইবে না এবং অপরদিকে সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা চলিবে। ফলে ইংলণ্ড তাহার সুনিয়ন্ত্রিত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের সাহায্যে সাম্রাজ্যের বাজারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবে। কিন্তু ঠিক এই কারণেই ডমিনিয়ন সমূহ এ ব্যবস্থা কিছুতেই মানিয়া লইবে না। কারণ, ইংলণ্ডের এইরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইবার অর্থ তাহাদের নিজেদের অপরিণত শিল্পসমূহের ধ্বংসেরই নামান্তর মাত্র। অবশ্য ইংলণ্ড এ ব্যাপারটাকে যতদূর সম্ভব মোলায়েম করিবার চেষ্টায় আছে। এ বিষয়ে তাহার প্রধান প্রস্তাব—ব্রিটিশ শিল্পসভার (Federation of British Industries) অভিমত হইতে যতদূর বুঝা যায়—সাম্রাজ্যিক সহযোগিতা ও সাম্রাজ্য ভিত্তিতে শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহের পুনর্গঠন (rationalisation)। ইহার লক্ষ্য হইবে ক্ষতিকর (uneconomic) উৎপাদনকে কোনরূপ উৎসাহ না দিয়া সক্ষম (efficient) শিল্প সমূহের সংরক্ষণ, তার অর্থ এই যে দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ও অর্থ-নৈতিক উন্নতির স্তর—যে সব শিল্পের উপযোগী নয় সে সব শিল্প পরিপোষণের চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইবে। ফলে স্বাভাবিক সুবিধা অনুসারে ও অন্যান্য কারণে সাম্রাজ্যের যে অংশে যে শিল্পের অবস্থিতি অধিকতর লাভজনক সে অংশকে সেই শিল্পে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সাহায্য করা হইবে। একই শিল্পেও সেইরূপ ডমিনিয়ন সমূহ ও ইংলণ্ডের শিল্পীদের মধ্যে সহযোগিতা চলিবে। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের মধ্যে আলোচনা দ্বারা স্থির করা হইবে কোন্ কোন্ দ্রব্য কোন্ দেশে উৎপাদন অধিকতর সুবিধাজনক এবং সেই অনুসারে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কর্ম্ম বিভাগের বন্দোবস্ত হইবে। সাম্রাজ্যের জনবল, অর্থবল, প্রাকৃতিক সম্পদ সবই অতুলনীয়। এই সকলের সহিত ইংলণ্ডের শিল্প-প্রতিভার সংযোগে সাম্রাজ্যের যে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইবে তাহার ফল তাহার প্রত্যেক অংশই লাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। আদর্শের দিক দিয়া ডমিনিয়ন সমূহের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই বলিবার থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান শুল্কদ্বন্দ্বের ফলে যখন আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্পূর্ণ বিকল হইতে চলিয়াছে তখন এইরূপ প্রস্তাবের বেশই একটা মোহ আছে। কিন্তু আদর্শ ও বাস্তব এক কথা নয়। তা'ছাড়া প্রথমতঃ প্রবল ও দুর্ব্বলের বন্ধুতায় দুর্ব্বলের যে বিপদের সম্ভাবনা ডমিনিয়ন সমূহ সে বিষয়ে অন্ধ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের আদর্শ ডমিনিয়ন সমূহের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের আদর্শের পরিপন্থী। তৃতীয়তঃ, যে ব্যাপারে ইংলণ্ডের এত স্বার্থ ও নিজেদের এত ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে সেখানে ডমিনিয়ন সমূহের ইংলণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার যথেষ্ট হেতু আছে। চতুর্থতঃ, এ ব্যবস্থার ভবিষ্যতের চিত্র যতই বর্ণাঢ্য হউক না কেন, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জ্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই উহা শিল্প ও বাণিজ্যে যে-বিপর্য্যয় আনয়ন করিবে তাহাতে বর্ত্তমান ও নিকট ভবিষ্যতের চিত্র মোটেই প্রীতিকর নহে। তদুপরি ডমিনিয়ন সমূহের সর্ব্বপ্রধান আপত্তির কারণ হইবে এরূপ কেন্দ্রগত ভাবে সাম্রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যনীতিনিয়ন্ত্রণে ইংলণ্ডের সুনিশ্চিত আধিপত্য। কাজেই সবদিক বিবেচনায় ইংলণ্ডের এই প্রস্তাবে ডমিনিয়ন সমূহের সম্মত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

স্বার্থের সংঘাত

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় প্রস্তাবেও ডমিনিয়ন সমূহের পক্ষে আপত্তি করিবার কারণ আছে। অবশ্য এখনও তাহার

ব্রিটিশপণ্যকে শুল্ক সম্বন্ধে সুবিধা দিয়া থাকে। কিন্তু তাহা ইংলণ্ডের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ইংলণ্ডের প্রয়োজন সেই পরিমাণ শুল্কানুকূল্যের যাহার সাহায্যে সে প্রতিযোগী বিদেশী পণ্যকে সাম্রাজ্যের বাজার হইতে বিদূরিত করিতে পারিবে। ইংলণ্ডের এই দাবী স্বীকার করিতে হইলে হয় ডমিনিয়ন সমূহকে সাম্রাজ্যেতর দেশের পণ্যের উপর তাহাদের আরও বহু পরিমাণে সংরক্ষণ-শুল্ক বাড়াইয়া দিতে হইবে না হয় বর্ত্তমান শুল্কের পরিমাণ সাম্রাজ্যের পণ্যের অনুকূলে কমাইয়া দিতে হইবে। শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিলে বিলাতী পণ্যের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় স্বদেশী শুল্ক উপযুক্ত সংরক্ষণ পাইবে না। কাজেই ডমিনিয়ন সমূহকে পূর্ব্বোক্ত পন্থাই অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু আমদানীর উপর শুল্কস্থাপনের অর্থ ব্যবহারকারিদের উপর কর-স্থাপনেরই নামান্তর। বলা বাহুল্য এই ব্যাপারে ডমিনিয়ন সমূহের যে ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন তাহা তাহারা নিজেদের পণ্য সম্বন্ধে ইংলণ্ডের বাজারে অনুরূপ সুবিধা পাইলেই কেবল স্বীকার করিতে পারে। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের প্রধান প্রস্তাব সাম্রাজ্যের গম সম্বন্ধে বর্ত্তমান ব্যবসায়-মন্দার একটা প্রধান লক্ষণ অতিমাত্রায় গমের মূল্য-পতন। কাজেই কথা উঠিয়াছে যে, ডমিনিয়ন সমূহ ইংলণ্ডের শিল্পজাত ক্রয় করিয়া তাহার যে উপকার করিবে ইংলণ্ড তাহার প্রতিদান করিবে সাম্রাজ্যজাত গম ক্রয় করিয়া। ইংলণ্ডের এই প্রস্তাবের একটা বিশেষ অর্থ আছে। কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে মোট যে পরিমাণ গম রপ্তানী হইয়া থাকে একা ইংলণ্ডই আমদানী করিয়া থাকে তাহার শতকরা ২৭ ভাগ। অপর দিকে মোট রপ্তানী গমের শতকরা ৩৫ ভাগ আসিয়া থাকে কেনাডা হইতে এবং শতকরা ১০ ভাগ আসিয়া থাকে অষ্ট্রেলিয়া হইতে। কিন্তু সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার এক মন্ত্রী (Minister of Markets) বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে সাম্রাজ্যজাত গম ও উলের পরিমাণ সাম্রাজ্যের বাজারসমূহের চাহিদা অপেক্ষা ঢের বেশী ; কাজেই তাহা বহু পরিমাণে বিদেশের বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে। ইংলণ্ড যে ভাবে ইংরেজ ক্রেতাদের নিকট মূল্য না বাড়াইয়া গমের আমদানী করিতে চায় তাহাতে উহা কৃষকদিগের কোন উপকার না করিয়া শুধু ডমিনিয়ন সমূহের কষ্টার্জ্জিত বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধেরই ক্ষতি করিবে। এ অবস্থায় অষ্ট্রেলিয়া ওটাওয়া বৈঠকে গমের জন্য কোনরূপ শুল্কানুকূল্য না চাহিয়া মাংস ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির জন্য সে সুবিধা দাবী করিবে। এই ব্যাপারে কেনাডার ব্যবসায়ী ও কৃষকদের অভিমতও অনুরূপ। তাহারাও বলে যে শুল্কানুকূল্য বা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ গমক্রয়ের অঙ্গীকার কিছুতেই গমের আন্তর্জ্জাতিক মূল্যবৃদ্ধি করিবে না ; অথচ প্রতিযোগিতার বাজারে এই আন্তর্জ্জাতিক মূল্যেই তাহাদিগকে বিক্রয় করিতে হইবে। এ অবস্থায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে শুল্কানুকূল্যের ব্যাপারেও ইংলণ্ড ও ডমিনিয়ন সমূহের পরস্পরের স্বার্থের সামঞ্জস্য-বিধান খুবই দুরূহ এবং ফলে তাহার সাধারণ প্রয়োগের সম্ভাবনাও তেমনি সামান্য।

কাজেই শেষ পর্য্যন্ত হয়ত ইংলণ্ডকে তাহার শেষ প্রস্তাবের আশ্রয়ই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সে প্রস্তাবের অর্থ যদি এই হয় যে এরূপ চুক্তির ফলে উভয় পক্ষের কাহারো অপর কোনও দেশের সঙ্গে অনুরূপ চুক্তির স্বাধীনতা থাকিবে না তবে সেই দিক দিয়াও নিশ্চয়ই প্রবল মতভেদ ঘটিবে।

ইংলণ্ড এইসব বিঘ্ন সম্বন্ধে খুবই সচেতন। সেই জন্য সে ওটাওয়া বৈঠকের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে সাম্রাজ্যের বাহিরের বহু দেশের সঙ্গেই বাণিজ্য-সম্বন্ধস্থাপনের আলোচনা চালাইতেছে—যদিও ওটাওয়া বৈঠকের ফল না দেখিয়া সে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে না—এবং অপর দিকে বর্ত্তমান শুল্কদ্বন্দ্বের অবসানের উদ্দেশ্যে আন্তর্জ্জাতিক চেষ্টারও ক্রটি করিতেছে না। বলা বাহুল্য ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যিক ঐক্যাদর্শ ও সাম্রাজ্যিক মুক্ত বাণিজ্য নীতির প্রস্তাবের সঙ্গে এই দুই প্রচেষ্টার সামঞ্জস্যবিধান অসম্ভব।

তাহার এই সব প্রচেষ্টার অর্থ এই যে ওটাওয়া বৈঠকের সাফল্য সম্বন্ধে ইংলণ্ডের নিজেরও যথেষ্ট সন্দেহ আছে ; যদিও অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধস্থাপনের প্রস্তাব ডমিনিয়ন সমূহকে ভয় দেখাইয়া স্বমতে আনিবার জন্যও কতকটা বটে। এই সূত্রে আর্জ্জেণ্টাইনের সঙ্গে তাহার বাণিজ্যালাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ আর্জ্জেণ্টাইন কেনাডার পরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গম-রপ্তানীকারক এবং তাহার রপ্তানীর পরিমাণ মোট রপ্তানীর শতকরা ২২ ভাগ। ডমিনিয়ন সমূহকে ভয় দেখাইবার ইংলণ্ডের আর একটী অস্ত্র হইতেছে তাহার বর্ত্তমান শুল্কনীতি। এই নীতি অনুসারে ভারতবর্ষ ও ডমিনিয়ন সমূহের পণ্য আপাততঃ তাহার

আমদানী-শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। কিন্তু আগামী ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে ইংলণ্ডের সঙ্গে তাহাদের কোন অনুকূল বাণিজ্য-বন্দোবস্ত না হইলে তার পর হইতে এ সুবিধা দেওয়া হইবে না। অবশ্য ইহাতে ডমিনিয়ন সমূহের ভয় পাইবার বিশেষ কোন কারণ নাই, কারণ এ পর্যান্ত ইংলণ্ড যে-সব পণ্যের উপর আমদানী-শুল্ক স্থাপন করিয়াছে, ডমিনিয়ন সমূহ তাহার খুব কমই রপ্তানী করিয়া থাকে।

ত্রিকৌণিক বাণিজ্যানুকূল্য

এই প্রসঙ্গে আমেরিকান প্রফেসার মিঃ ষ্টিফেন লিককের অভিমত উল্লেখযোগ্য। প্রফেসার মহাশয় ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অর্থ-নৈতিক ঐক্যের (economic integration) একজন বিশিষ্ট সমর্থক। সম্প্রতি তিনি 'Back to Prosperity' নামক তাঁহার নূতন পুস্তকে সেই ঐক্য কি ভাবে সম্ভবপর তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে শিল্পজাত দ্রব্য বিষয়ে ডমিনিয়ন সমূহের বাজারকে সম্পূর্ণরূপেই তাহাদের নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে। কিন্তু ডমিনিয়ন সমূহে উৎপন্ন হয় না এমন কতকগুলি কাঁচা মাল—যেমন তুলা, রবার ও তামাক—তাহারা উপনিবেশ সমূহ (Crown Colonies) হইতে অধিকতর পরিমাণে আমদানী করিতে রাজী হইবে। এদিকে উপনিবেশ সমূহের বাজার শুধু ইংলণ্ডের শিল্পজাতের জন্যই সংরক্ষিত থাকার প্রতিদানে সে কেবল ডমিনিয়ন সমূহ হইতেই তাহার কাঁচা মাল আমদানী করিবে। এই ত্রিকৌণিক বাণিজ্যানুকূল্যের ("triangular preference") প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ করা হইবে সাম্রাজ্যকে ঘেরিয়া সুউচ্চ শুল্ক-প্রাচীরস্থাপন পূর্ব্বক এবং নির্দ্ধারিত অংশ ক্রয় (quota buying) ও বাধা মূল্যের বিস্তৃত ব্যবস্থা দ্বারা। এই শেষোক্ত প্রস্তাবের অর্থ এই যে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক দেশ অপর দেশ সমূহ হইতে কোন্ পণ্য কি পরিমাণে ক্রয় করিবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে এবং প্রত্যেক পণ্যের মূল্যের হারও সেইরূপ বাঁধিয়া দেওয়া হইবে।

বলা বাহুল্য ইংলণ্ডে যাহারা আজ সাম্রাজিক অবাধ বাণিজ্যের স্বপ্ন দেখিতেছেন প্রফেসার মহাশয়ের প্রস্তাবে তাহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিবেন না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ভারতীয় কাগজ প্রস্তুতকরণ শিল্প
ও তাহার সংরক্ষণ আইন

—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ইদানীং ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বাণিজ্যসম্পর্কীয় যে সকল আইনের আলোচনা হইয়াছে, তন্মধ্যে কাগজ-প্রস্তুতকরণ-শিল্পের সংরক্ষণ-আইন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আইনটী একেবারে নূতন নহে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের কাগজের কারখানাগুলি যখন সস্তা বিদেশী কাগজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আর আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, তখন দেশীয় কারখানাগুলি বিদেশী কাগজের উপর সংরক্ষণ-মূলক শুল্ক ধার্য্য করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট দাবী পেশ করিতে থাকে। ফলে গভর্ণমেণ্ট ট্যারিফ বোর্ডের উপর এ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার ভার দেন। বিদেশী মালের সহিত প্রতিযোগিতায় সহায়তা করিবার জন্যই যে গভর্ণমেণ্ট নির্ব্বিচারে শুল্ক ধার্য্য করিয়া দিয়া থাকেন,— এমন নয়। এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ভারতীয় ফিস্ক্যাল্ (শুল্ক নির্দ্ধারক) কমিশন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহাদের রিপোর্টে কতকগুলি বিধি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইহার অন্যতম এবং সর্ব্বপ্রধান অনুশাসন হইল এই যে, যে-শিল্পের সংরক্ষণের জন্য আমদানী মালের উপর শুল্ক ধার্য্য করা হইবে, তাহাকে অনতিকাল মধ্যেই আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে। নতুবা স্থায়ী ভাবে শুল্ক ধার্য্য করিলে শিল্প বিশেষের সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার দরুণ দর চড়িয়া যাইবার ফলে দেশবাসীর উপর অযথা লোকসানের দায় ন্যস্ত হইয়া থাকে। শিল্প-বিশেষের মালিকের লাভ অর্জ্জন করিবার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা সঙ্গত হইতে পারে না।

ভারতবর্ষে কাগজ প্রস্তুতকরণ শিল্পের পক্ষে আত্ম-নির্ভরশীল হওয়া সম্ভবপর, ইহাই সাব্যস্ত করিয়া ট্যারিফ-বোর্ড সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহারা যে যুক্তি দর্শাইয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই:— ভারতবর্ষে কাগজ তৈয়ারী করিতে যে মালমশলা প্রয়োজন হয়, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইল 'সাবাই' ঘাস ও বাঁশ। 'সাবাই' ঘাসের যোগান যথেষ্ট না থাকিলেও কাগজ প্রস্তুতকরণোপযোগী বাঁশ ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করা চলিতে পারে। কাগজ তৈয়ারী করিবার জন্য শিল্পী ও মজুর সংগ্রহের ব্যাপারেও তুলনামূলক ভাবে ভারতীয় কারখানা মালিকের কোন অসুবিধা হইবার কথা নয়। তারপর বাজারে মাল সরবরাহ করিতেও

বিদেশী আমদানী কাগজের তুলনায় দেশী কাগজ বিক্রয় করিতে যথেষ্ট ব্যয়-সংক্ষেপ হইবে। এই সকল যুক্তি দিয়াই ট্যারিফ-বোর্ড আমদানী-শুল্কের সমর্থন করিয়াছিলেন।

তারপর দীর্ঘ সাত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই কয় বৎসরে সংরক্ষণ-শুল্ক ধার্য্য করিবার দরুণ দেশী-বিদেশী কাগজের জন্য চড়াদর দিয়া ভারতবাসীকে যে লোকসানের দায় সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহার পরিমাণ প্রায় ৪ কোটী টাকা হইবে। কিন্তু দেশবাসীর উপর এই বিপুল লোকসানের দায় চাপাইয়াও কাগজের কারখানাগুলি আত্ম-নির্ভরশীল হইতে পারে নাই। তাই এই বৎসরের মার্চ্চ মাসে পূর্ব্বতন ধার্য্য সংরক্ষণ-শুল্কের মেয়াদ ফুরাইবার প্রারম্ভেই ভারতীয় কারখানাগুলি এক তুমুল আন্দোলন সুরু করিয়া দেয় যে আর কিছুকাল সংরক্ষণ-শুল্কের মেয়াদ বৃদ্ধি না করিলে তাহারা কিছুতেই আমদানী কাগজের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না।

এই আত্ম নির্ভরশীলতার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ করা দরকার। গোড়ায় যখন আমদানী কাগজের উপর শুল্ক বসানো হইয়াছিল, তখন গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণের এই আশা ছিল যে, সংরক্ষণ-শুল্কের সুবিধা পাইয়া ভারতীয় কারখানাগুলি কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য সমধিক পরিমাণে দেশীয় মালমশলা ব্যবহার করিবে। কাগজ প্রস্তুত করিতে সর্ব্ব প্রধান যে মশলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা কাঠ, বাঁশ কিংবা ঘাস থেঁৎলাইয়া রাসায়ণিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়। ইংরাজীতে বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই পিষ্ট পদার্থের নাম হইল "পল্প"।

ভারতবর্ষে কেবল বাঁশ এবং ঘাস হইতেই 'পল্প' প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু যে প্রধান ঘাস (সাবাই ঘাস) হইতে 'পল্প' তৈয়ারী হয়, তাহার পরিমাণ যথেষ্ট না থাকায়, যদি 'পল্প' সরবরাহে ভারতীয় কারখানাগুলিকে আমদানী মালের মুখাপেক্ষী না হইতে হয়, তাহা হইলে বংশ-নির্ম্মিত 'পল্পের' উপরই তাহাকে নির্ভর করিতে হইবে। ট্যারিফ-বোর্ড এ সম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি করিয়া গিয়াছেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সংরক্ষণ-শুল্ক ধার্য্য করা পর্য্যন্ত ভারতীয় কারখানাগুলি প্রায় আমদানী 'পল্প' ব্যবহার করিয়াই স্ব স্ব কাগজ প্রস্তুত করিয়াছে,—কারণ বংশ-নির্ম্মিত 'পল্প' অপেক্ষা আমদানী কাষ্ঠনির্ম্মিত 'পল্প' তুলনা-মূলক ভাবে সস্তা। অথচ ভারতীয় কারখানাগুলি যতদিন না দেশীয় 'পল্প' ব্যবহার করিবে, ততদিন এ দেশের কাগজ-প্রস্তুতকরণ শিল্প ঠিক আত্ম-নির্ভরশীল হইয়াছে, একথাও বলা চলিবে না। আর তাহাই যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আমদানী মালের উপর শুল্ক ধার্য্য করিবার পক্ষেও কোন যুক্তি থাকিবে না।

এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিবার পর ট্যারিফ বোর্ড যখন সংরক্ষণ-শুল্কের অনুমোদন করিয়া অভিমত প্রকাশ করেন, তখন তাঁহারা ইহাও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সংরক্ষণ-শুল্কের সুযোগে যাহাতে প্রয়োজনীয় 'পল্প'এর পরিমাণ এ দেশেই বাঁশ হইতে তৈয়ারী হইতে পারে, সে দিকে ভারতীয় কারখানাগুলিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ, তাহার ফলে দেশের কৃষিজীবিরাও প্রয়োজন মত বাঁশ সরবরাহ করিয়া লাভবান হইতে পারিবে। ট্যারিফবোর্ড ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বংশনির্ম্মিত 'পল্প'এর প্রস্তুত প্রণালী যথাযোগ্য বিস্তার লাভ করিলে ক্রমশঃ তাহা প্রস্তুত করিবার খরচ এরূপ কমিতে থাকিবে যে, শেষ পর্য্যন্ত আমদানী 'পল্প' ব্যবহার করিবার আর কোনই প্রয়োজন থাকিবে না; কারণ গুণ-হিসাবে বংশনির্ম্মিত 'পল্প' কাষ্ঠ নির্ম্মিত 'পল্প' অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। গভর্ণমেণ্ট এই সকল যুক্তি ও প্রস্তাবে সায় দিয়াছেন, এবং তাহার ফলেই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের শুল্ক-আইন পাশ হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল এই যে, এ বৎসরও যখন এই কারখানাগুলি শুল্কের মেয়াদ-বৃদ্ধির জন্য তাহাদের দাবী পেশ করিয়াছে, তখন তাহারা মূল শুল্ক-আইনের প্রত্যাশা অনুযায়ী কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারিয়াছে কি? ট্যারিফ-বোর্ড কিছুকাল পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া এক পৃথক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ইহা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারতীয় কারখানাগুলি এ যাবৎ বংশনির্ম্মিত 'পল্প' তৈয়ারীর সমধিক বিস্তারের জন্য কোন প্রচেষ্টাই করে নাই। এমন কি, ১৯২৫—২৬ খৃষ্টাব্দে এ দেশের কারখানাগুলিতে যে স্বল্প পরিমাণ বংশনির্ম্মিত 'পল্প' ব্যবহৃত হইয়াছে, ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দের ব্যবহৃত পরিমাণ তাহা অপেক্ষাও কম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ট্যারিফ-বোর্ড এবং গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যে প্রত্যাশা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহার মর্য্যাদা রাখিবার জন্য কারখানাগুলি সামান্য পরিমাণ টাকা খরচ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা নিতান্তই তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ট্যারিফ-

বোর্ডের শেষ রিপোর্টে এই প্রকার খরচের পরিমাণ মাত্র ১৩ লক্ষ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, অথচ শুল্ক বাড়াইবার ফলে দেশবাসীর উপর যে লোকসানের দায় চাপানো হইয়াছে, ৭ বৎসরে তাহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৪ কোটি টাকা।

এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের জন্য ভারতীয় কারখানাগুলি নানা প্রকার কৈফিয়ৎ দিতে ত্রুটি করে নাই। তাহাদের সর্ব্বপ্রধান যুক্তির মর্ম্ম এই যে, উল্লিখিত বিপরীত ব্যাপারের জন্য গভর্ণমেণ্টই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। গভর্ণমেণ্ট যখন আমদানী কাগজের উপর শুল্ক বসাইবার ব্যবস্থা করেন, তখন আমদানী 'পল্প'এর উপর কোন প্রকার শুল্ক ধার্য্য করিবার আয়োজন করেন নাই। অথচ ঠিক সেই সময় হইতেই আমদানী 'পল্প'এর দাম ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। এমতাবস্থায় আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার দরুণ কোন কারখানার পক্ষেই সস্তা বিদেশী 'পল্প' ত্যাগ করিয়া বেশী খরচে বাঁশের 'পল্প' তৈয়ারী করিয়া কাগজ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে আমদানী 'পল্প'এর উপরেও শুল্ক ধার্য্য করিতে হইবে, এবং তাহা করিতে গেলেই আমদানী কাগজের উপরেও ধার্য্য শুল্ক অব্যাহত রাখিতে হইবে। নতুবা চড়াদরে দেশী 'পল্প' ব্যবহার করিয়া ভারতীয় কারখানাগুলি আমদানী কাগজের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না। এ বৎসরের শুল্ক মেয়াদ বৃদ্ধির ইহাই হইল স্থূল পরিচয়।

কিন্তু এই কৈফিয়তের সারবত্তা একেবারে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লওয়া কঠিন। বিগত সাত বৎসর এ দেশে বংশনির্ম্মিত 'পল্প'এর ব্যবহার একেবারে ছিল না, এ কথা বলা চলে না। কেবল মাত্র লোকসানের দায় এড়াইবার জন্যই তাহারা আমদানী বিদেশী 'পল্প' ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছে,—এ কথাও সত্য নহে। সুযোগ পাইয়া, সস্তা বিদেশী কাঁচা মাল কিনিয়া চড়াদরে প্রস্তুত মাল বেচিবার লোভই তাহাদের এই ব্যবহারের কারণ। বিগত কয়েক বৎসরে এদেশের বড় বড় কাগজের কারখানাগুলি যে পরিমাণ 'ম্যানেজিং এজেন্সী'র কমিশন ও অংশীদারের প্রাপ্য লাভ বণ্টন করিয়াছে, তাহাতে এই প্রকার সমালোচনার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। বস্তুতঃ গত বৎসরে কোন কোন কারখানা এমন কি শতকরা চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত 'ডিভিডেণ্ড' ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু তাহার দরুণ লোকসানের দায় বহন করিতে হইয়াছে কাগজ-ক্রেতা সমগ্র দেশবাসীকে।

সে যাহা হউক, অতীতে এই কারখানাগুলির ব্যবহার অমার্জ্জনীয় হইলেও ব্যবস্থা-পরিষদ সংরক্ষণ-শুল্কের মেয়াদ-বৃদ্ধির স্বপক্ষেই রায় দিয়াছেন। এই শুল্কের পরিমাণ হইল প্রতি টনে ১৪০৲ টাকা। শুধু তাই নয়, ব্যবস্থা-পরিষদ এবার আমদানী 'পল্প'এর উপরেও প্রতি টনে ৪৫৲ টাকা শুল্ক ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। দেশীয় 'পল্প' ব্যবহারের বৃদ্ধির জন্যই শেষোক্ত শুল্ক বসানো হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় কাগজ সংরক্ষণ-সংশ্লিষ্ট কতকগুলি মূল সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয় নাই। ট্যারিফ-বোর্ডের রিপোর্ট পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, কাগজ প্রস্তুত করিতে বিদেশী কারখানার তুলনায় ভারতীয় কারখানাগুলিতে অত্যন্ত ব্যয়াধিক্য হইতেছে। ইহার কতকগুলি কারণ আছে, কিন্তু সেগুলি অনিবার্য্য নহে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে স্বল্প-সংখ্যকমাত্র কাগজের কারখানা রহিয়াছে। ইহার মধ্যে বৃহত্তম কারখানাগুলি অ ভারতীয় কোম্পানীর 'ম্যানেজিং এজেন্সী' দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, এবং ফলতঃ উচ্চ কর্ম্মচারীর মধ্যে অ ভারতীয়ের সংখ্যাধিক্য প্রবল রহিয়াছে। ইহাদের মূল কমিশন ও বেতন যোগাইবার জন্যই ভারতীয় কারখানাগুলির খরচ অত্যন্ত বেশী পড়িতেছে। এ বিষয়ে ব্যয়-সংক্ষেপ না করিলে ভারতীয় কারখানাগুলি শুল্কের সহায়তা ব্যতীত কখনই বিদেশী কাগজের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না ; অথচ দীর্ঘ কাল সংরক্ষণ-শুল্ক বসাইয়া রাখাও যুক্তিসঙ্গত হইবে না। এমতাবস্থায় দেশীয় কারখানাগুলি যাহাতে স্ব স্ব ব্যয় সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়, সে বিষয়ে বাধ্যতা-মূলক ব্যবস্থা করা অবশ্য প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। ব্যবস্থা পরিষদ শুল্কের মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কোন বিধি নির্দ্দেশ করেন নাই। দেশবাসীর পক্ষে এ ব্যবস্থায় যথেষ্ট আশঙ্কা এবং ক্ষোভের কারণ রহিয়া গিয়াছে।

বিপিনচন্দ্র পাল

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

দার্জ্জিলিং সহরে চৌরাস্তায় বসিয়া যখন স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বিপিনচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইলাম তখন প্রথমে অতর্কিত আঘাতে হৃদয় ব্যথিত হইল। দীর্ঘ ৩৫ বৎসরের পরিচয় আর ২৭ বৎসরের বন্ধুত্ব-বন্ধন আজ ছিন্ন হইল। তাহার পর বিজ্ঞবর গেটের কথা মনে পড়িল। একদিন গেটে ও একারম্যান জীবনের শেষ দশায় কবি বায়রণের দুঃখদুর্দ্দশার বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। আলোচনাপ্রসঙ্গে গেটে বলেন—"আমার মনে হয়, মানুষকে পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গিয়া পুনর্গঠনের জন্য উপকরণস্তূপে ফেলিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক অসাধারণ মানবেরই বিশেষ কিছু করণীয় থাকে। তাঁহার সেই কায শেষ হইলেই সে রূপে তাঁহার স্থিতির আর কোন প্রয়োজন থাকে না এবং বিধাতা তাঁহাকে অন্য কাযের জন্য ব্যবহার করেন। কিন্তু পৃথিবীতে সবই স্বাভাবিক নিয়মে নিষ্পন্ন হয় এবং সেই জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পতনের পর বিনষ্ট হইতে হয়। নেপোলিয়ন প্রভৃতি অনেকের ইহাই হইয়াছিল। ৩৬ বৎসর বয়সে মোৎসার্টের মৃত্যু হয়—র‍্যাফেলও প্রায় সেই বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। বায়রণ তদপেক্ষা কিছু অধিক দিন জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কায সম্পূর্ণরূপে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন; সুতরাং নশ্বরকালস্থায়ী এই পৃথিবীতে তাঁহাদিগের থাকিবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না—তাঁহারা অপরকে কাযক্ষেত্রে কাযের অবসর দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।"

দেশে যে নবভাব-প্রচার বিপিনচন্দ্রের জীবনের ব্রত ও উদ্দেশ্য ছিল তিনি সে ভাব-প্রচার-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন তাঁহার জীবনের সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ দেখিয়া তিনি সফল সাধন অবসায় জরাজীর্ণ দেহ রক্ষা করিয়া ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার কার্য্যবহুল জীবনের কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়াছেন।

আজ যখন সমগ্র দেশ, মতভেদ বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার জন্য অশ্রুপাত করিতেছে, তখন তাঁহার চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করা তাঁহার বন্ধুত্বগর্ব্বে গর্ব্বিত ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে।

তাঁহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের আরম্ভ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে—ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশনে। সে সম্মিলনে সভাপতি—কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—গুরুপ্রসাদ সেন। তখন তিনি গৈরিক বাস-পরিহিত। তাহার বহুদিন পূর্ব্বেই তিনি বাঙ্গলার সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ আরম্ভ করিয়াছেন, ইংরাজী বক্তৃরূপে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন এবং কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন। তিনি যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অল্প দিনের মধ্যেই তাহাতে দেশবাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 'মাদ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড' পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক পরমেশ্বরণ পিলাই যখন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসকে ভারতবাসীর রাজনীতিক আশা ও আকাঙ্ক্ষাবাহী অশ্বযানের সহিত তুলিত করিয়াছিলেন, তখন তিনি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সে যানের সারথী এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও বিপিনচন্দ্র পাল এই দুই জনকে অশ্বপাল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

এই দুই জনের জীবনের তুলনা করিলে উভয়ের প্রভেদ ও উভয়ের কার্য্যের বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হইবে। পণ্ডিত মদনমোহনের বিরাট কীর্ত্তি—বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়; তাহা তাঁহার প্রতিভার গৃহিণীপনার ও তাঁহার গঠননৈপুণ্যের পরিচায়ক। বিপিনচন্দ্রের সেরূপ কোন কীর্ত্তির নিদর্শন উত্তরকালে তাঁহার দেশবাসী দেখিতে পাইবে না এবং হয়ত সেই জন্য তাঁহার কৃত কাযও ভুলিয়া যাইবে। তাঁহার কীর্ত্তি—দেশকে জাতীয় ভাবে ও দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করা। সে কার্য্যে তিনি কি অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিরা সকলেই অবগত আছেন এবং সেই ভাবই তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

ভাবের জন্য তিনি অভাবকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন এবং ভাবপ্রবণতাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বিষয়ে তাঁহার

বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গালার জাতীয় সঙ্গীত "বন্দে মাতরম" ভাবের খনি। তাহাতে বিদ্বেষ নাই, উগ্রতা নাই। বাঙ্গালীর এই ভাবপ্রবণতার জন্যই ভবানন্দ যখন বলিয়াছিলেন—"আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী; আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা শস্যশ্যামলা (জন্মভূমি)" আর তাহার পর "বন্দে মাতরম" গানে গগন পবন মুখরিত করিয়াছিলেন, তখন "মহেন্দ্র দেখিল, দস্যু গায়িতে গায়িতে কাঁদিতে লাগিল।" ভাবপ্রবণতার জন্যই বিপিনচন্দ্র ভাবোদ্বেল বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুরক্ত ও বৈষ্ণব সাধনা-পদ্ধতির অনুরাগী ছিলেন। যে স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া সমগ্র ভারতে নবভাব ব্যাপ্ত করিয়াছিল—বাঙ্গলার গোমুখী-মুখ-নির্গত সেই আন্দোলন ভাবের আন্দোলন ছিল বলিয়াই তাহা বিপিনচন্দ্রকে আকৃষ্ট করিয়াছিল—তাঁহার নিহিত শক্তি স্ফুরিত করিয়াছিল। আর সেই জন্যই তিনি সে আন্দোলনকে পরবর্ত্তী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অপেক্ষা উচ্চ স্থান প্রদান করিতেন।

এই ভাবপ্রবণতাই তাঁহার জীবনে কার্য্যের উৎসমুখ মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। ইহাই তাঁহার বিদ্রোহপ্রবণতা পুষ্ট করিয়াছিল, ইহাই তাঁহাকে তাঁহার সময়ের পূর্ব্বগামী করিয়াছিল। আর ইহাই তাঁহাকে কখন বিষয়বুদ্ধির ব্যবহারে তৎপর করে নাই—সাংসারিক হিসাবে বুদ্ধিমান হইতে দেয় নাই। 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল'এর কবি ঘনরাম বলিয়াছেন—

> "যে বাগেতে পড়ে ঢল সেই দিকে ছাত
> ধরি বুদ্ধিমান লোক রক্ষা করে মাথা।"

কিন্তু মাথা রক্ষা করিবার জন্য মাথা নত করা বা মতভ্রষ্ট হওয়া অথবা মত গোপন করা বিপিনচন্দ্রের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। সেই জন্যই তিনি প্রায় সমস্ত জীবন প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, তবুও কখন মতের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই।

ভাবপ্রবণতা তাঁহার অল্প বয়সেই তাঁহাকে বিদ্রোহী করিয়াছিল। সে বিদ্রোহের প্রথম অভিব্যক্তি পারিবারিক জীবনে। তিনি শ্রীহট্ট হইতে শিক্ষার্থী হইয়া কলিকাতায় আসিয়া কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ সংস্কারকদিগের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া প্রচলিত হিন্দু সংস্কার বর্জ্জন করেন। ফলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে তাজ্য পুত্র করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়াই—অসীম জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা অন্য উপায়ে পরিতৃপ্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া তাঁহাকে অর্থার্জ্জনের উপায় করিতে হয়। ব্রাহ্মসমাজেও তিনি বার বার বিদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন।

তিনি যে কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন, তথায়ও তিনি বার বার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি যখন কংগ্রেসে যোগ দেন, তখন কংগ্রেস তাহার প্রবর্ত্তক হিউম ও পরিচালক উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নৌরোজী প্রভৃতির কর্ত্তৃত্বাধীন। তাহার উদ্দেশ্য কত সঙ্কীর্ণ তাহা কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। যিনি উত্তরকালে এ দেশের লোকের রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছিলেন—"বাহিরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন", তিনি যদি কংগ্রেসের তৎকালীন উদ্দেশ্যে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে—বঙ্গভঙ্গজনিত আন্দোলনের পূর্ব্বে—বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতির অভিভাষণে আশুতোষ চৌধুরী বলেন—"পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই।" এই উক্তি তৎকালে বিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। এই উক্তি যে বিপিনচন্দ্রের মতপ্রসূত তাহা অনেকেই জানেন না।

"বাহিরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বায়ত্ত-শাসন" আমাদিগের কাম্য, এই উক্তি যখন বিপিনচন্দ্রের কম্বু কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া সমগ্র ভারতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, তখন সে আদর্শ সর্ব্বতোভাবে নূতন। "সুশাসনও স্বায়ত্ত-শাসনের পরিবর্ত্তে গৃহীত হইতে পারে না"—ইংরাজ রাজনীতিকের এই উক্তি ইহার পরবর্ত্তী। যাহারা বলেন, বিপিনচন্দ্র বর্ত্তমান অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শ গ্রহণ করিবার মত যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, তাঁহারা ভ্রান্ত। অহিংসায় তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস কখন বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। এ দেশে যখন প্রথম বোমার ব্যবহার হয়, তখনই তিনি তাহাতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালায় অসহযোগ নীতির

পেট্রিয়ট বিপিনচন্দ্র পাল

অন্যতম প্রচারক। অসহযোগ কাহাকে বলে ও কিরূপে তাহা ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বাঙ্গালাই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে দেখাইয়াছিল। যাঁহারা এই বঙ্গদেশে নীলকরদিগের বিরুদ্ধে জনসাধারণের আন্দোলনের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এ কথা আর নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। সেই আন্দোলনে বাঙ্গালী প্রতিপন্ন করিয়াছিল, বাঙ্গালার জনগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দৃঢ়তা সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে জানে এবং তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইলে কোন শক্তি তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারে না।

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া যখন জাতির মুক্তিকামনা আত্মপ্রকাশ করে, তখন বাঙ্গালায় অসহযোগের দ্বিতীয় পর্ব্ব। আর এই আন্দোলনই প্রথম দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ও জনগণের মধ্যে ব্যবধান বিনষ্ট করিয়া জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি করে।

সেই আন্দোলনে বিপিনচন্দ্রের ভাবপ্রবণ হৃদয়ের সকল শক্তি নিযুক্ত হইয়াছিল। যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বরেণ্য নেতৃগণ বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থার পরিবর্তন জন্য আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন বিপিনচন্দ্র সেই আন্দোলনকে স্বায়ত্ত-শাসনলাভের আন্দোলনে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি "নুন, চিনি বয়কটের" সমর্থক [illegible]। তিনি পরবশ্যতা বর্জ্জনপ্রয়াসী ছিলেন।

[illegible] সময়েই তাঁহার সহিত পুরাতনপন্থী নেতৃগণের [illegible]। অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের সহিত কখন এক পথে [illegible] তিনি তাঁহার সহিত এক ভাবের ভাবুকদিগের [illegible] এই মত রচনায় লিপিবদ্ধ করিতেন, কখন বা [illegible] জ্বালাময়ী ভাষায় তাহা প্রচার করিতেন। তখন [illegible] যে অসাধারণ শক্তি লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা বিস্ময়-[illegible]। 'বন্দে মাতরম' পত্র প্রকাশিত হইলে এক এক দিন [illegible] সহকর্মীদিগের অনুমতি লইয়া তাহার সম্পাদকীয় [illegible] প্রভৃতি সবই একক লিখিতেন কখন কখন নির্দিষ্ট [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] দাস মহাশয়ের গৃহ হইতে [illegible] 'বন্দে মাতরম' কার্য্যালয়ে মুদ্রণ জন্য প্রেরণ পর্য্যন্ত [illegible] নূতন প্রবন্ধ লিখিতেন। তখন তাঁহার ভাবের [illegible] তাঁহাকে পরিচালিত করিতেছিল।

অতি সামান্য বিষয়ে মতান্তর হেতু তিনি 'বন্দে মাতরম'এর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন; কিন্তু যে কায 'বন্দে মাতরমের' মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইতেছিল, তাহা হইতে এক দিনের জন্যও বিচলিত হয়েন নাই। যখন অরবিন্দকে 'বন্দে মাতরম' পত্রের সম্পাদক প্রমাণ করিবার জন্য সরকার পক্ষ তাঁহাকে সাক্ষী মানিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা বিপিনচন্দ্রের প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বিপিনচন্দ্র সাক্ষ্য দানে অস্বীকৃত হইয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন। বিচারক তাঁহাকে আইন অনুসারে কঠোরতম দণ্ডে দণ্ডিত করেন। বোমার কারখানা আবিষ্কার সম্পর্কে অরবিন্দ পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইলে তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া পুনরায় 'বন্দে মাতরম'এর সম্পাদকীয় কার্য্যে শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও বর্ত্তমান লেখকের সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিয়া তিনি যখন কারাবরণ করেন, তখন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার উদ্বেল তরঙ্গ বাঙ্গালার সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সে জন্য যে সভা হয়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাতে সভাপতিত্ব করেন এবং ৯ই মার্চ্চ (১৯০৮) তিনি কারামুক্ত হইয়া ১০ই তারিখে কলিকাতায় আসিলে মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত করা হয়।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ অঞ্চলে বক্তৃতার দ্বারা জাতীয় ভাবের প্রচার করিতে থাকেন। "স্বরাজ," "স্বদেশী," "বয়কট" এই সকলই তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইত এবং তাঁহার মতই গ্রহণ করিত। রৌলাট কমিটীর সদস্যরা মাদ্রাজে তাঁহার প্রচার-কার্য্যের ফল উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, লিখিয়াছেন:—

(১) তিনি রাজমহেন্দ্রীতে উপস্থিত হইলে সরকারী কলেজে ছাত্রদিগের ধর্ম্মঘট হয়।

(২) মাদ্রাজে তাঁহার গমনের ফলে রাজদ্রোহজনক ভাব পরিলক্ষিত হয়।

মাদ্রাজে সুব্রহ্মণ্য শিব ও চিদাম্বরম পিল্লাই যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে বিপিনচন্দ্রকে "স্বরাজ-সিংহ" বলা হইয়াছিল।

বিপিনচন্দ্রের সে যুগের বক্তৃতা সিংহের গর্জ্জনের সহিতই উপমিত হইবার উপযুক্ত।

কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশনে সভাপতি দাদাভাই নৌরোজী "স্বরাজ" ভারতের কাম্য বলিয়া "স্বরাজ্য"এর স্বরূপ বর্ণনায় বলেন—তাহা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন, সেই অধিবেশনে বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্বে ও লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির সাহায্যে বাঙ্গালার জাতীয় দল, পুরাতনপন্থী নেতৃগণের সহিত শক্তি-পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সেই অধিবেশনে তিলককে সভাপতি করাই সে দলের অভিপ্রেত ছিল। বিপিনচন্দ্র সেই মতাবলম্বী ছিলেন। বাস্তবিক তিলকের সহিত নানা বিষয়ে বিপিনচন্দ্রের মতের ঐক্য ছিল এবং তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধার বন্ধন ছিল। যখন "হোম রুল লীগ" প্রতিষ্ঠার পর উভয়ে তাহাতে একযোগে কায করিয়াছিলেন, তখনও সেই বন্ধনের পরিচয় প্রকট হইয়াছিল।

দুই দলে শক্তিপরীক্ষা—বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত বর্জ্জনের সমর্থন লইয়া। বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে বাঙ্গালী প্রতিনিধিদিগের চেষ্টায় তাহা সমর্থিত হইয়াছিল। কিন্তু বোম্বাইয়ের সার ফিরোজশা মেটা প্রভৃতি বিলাতী বর্জ্জনের সমর্থন করিতে পারেন নাই এবং যাহাতে কলিকাতার অধিবেশনে সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়, সে চেষ্টাও করিয়াছিলেন। বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে সেই প্রস্তাব লইয়া তুমুল তর্ক হয়। মঞ্চের উপর মেটা, কৃষ্ণস্বামী, গোখলে, মদনমোহন প্রভৃতি পুরাতন নেতৃগণ; আর নিম্নে সাংবাদিকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট টেবলের উপর দণ্ডায়মান—বিপিনচন্দ্র। তিনি পুরাতনপন্থীদিগের যুক্তি খণ্ডন করিলেও যখন তাঁহারা তাহা স্বীকার করিলেন না, তখন জাতীয় দল মণ্ডপ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু দেশের লোকমত তখন অকুণ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেই জন্য কংগ্রেসে বয়কট সঙ্গত স্বীকার করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং জাতীয় দলের পক্ষ হইতে বিপিনচন্দ্র সেই প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় মডারেট নেতারা শঙ্কিত হইলেন এবং গোবিন্দরাঘব আয়ার, গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও মদন-মোহন মালব্য তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিপিনচন্দ্র সে দিন যে জয়ধ্বনির মধ্যে আসন গ্রহণ করেন, তাহাতেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল—দেশ তাঁহার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছে—তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছে।

কলিকাতাতেই তিনি আর একবার কংগ্রেসে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের পর তিনি দ্বিতীয় বার বিলাতে গমন করেন এবং ফিরিয়া আসিয়া, কংগ্রেসে পুনরায় জাতীয়দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাতে যোগ দেন। তাহার পর মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে লালা লজপত রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অতিরিক্ত অধিবেশন হয়, তাহাতে মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাব করেন—"সেন্ট্রাল খিলাফৎ কমিটী যে ক্রমবর্দ্ধনশীল সহযোগিতা-বর্জ্জন নীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, কংগ্রেসকে তাহাই গ্রাহ্য করিতে হইবে।"

বিপিনচন্দ্র ইহাতে এক সংশোধিত প্রস্তাব করেন। তাহার মূল কথা—

(১) বিলাতের প্রধান মন্ত্রীকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর কয়জন প্রতিনিধির দৌত্যস্বীকার করিতে অনুরোধ করা হউক এবং তিনি তাহাতে সম্মত হইলে প্রতিনিধিরা তাঁহাকে ভারতের কথা অবগত করাইয়া অচিরে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের দাবি উপস্থাপিত করুন।

(২) ইতিমধ্যে কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর সহযোগ বর্জ্জনের কায্য ধীরভাবে বিচার করিয়া শেষে গ্রহণের ব্যবস্থা করুন।

মহাত্মাজীর প্রস্তাবের পক্ষে ১৮৫২ ও বিপিনচন্দ্রের প্রস্তাবের পক্ষে ৮৮৩ ভোট হয়।

বিপিনচন্দ্র তখন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রবর্ত্তিত 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রের সম্পাদক। তিনি সেই পত্রে কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন, বলেন। পণ্ডিত মতিলাল এবং বিপিনচন্দ্রের অনুরক্ত শিষ্যস্থানীয় চিত্তরঞ্জন দাশও কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বহুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করিয়া কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশনে অসহযোগ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব-বর্জ্জনের চেষ্টা করিবেন, স্থির করেন। মতভেদহেতু বিপিনচন্দ্র কংগ্রেস মণ্ডপেই পত্রের সম্পাদক-পদ ত্যাগ করেন; পণ্ডিতজী তাঁহাকে পরে—বিবেচনা করিয়া কায করিতে বলিলে

তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এই কার্য্যফলে তিনি যে কেবল তাঁহার আর্থিক স্বচ্ছলতাই অনায়াসে ত্যাগ করিলেন, তাহা নহে; পরন্তু তাঁহার প্রচার-বেদীও বর্জ্জন করিয়া আসিলেন। তাঁহাকে স্রোতের শৈবালের মত অবস্থায় পতিত হইতে হইল। চিত্তরঞ্জন নাগপুরের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীকে পরাভূত করিতে না পারিয়া কংগ্রেসের বহু-মতানুবর্ত্তী হইলেন বটে, কিন্তু গয়ায় সভাপতি হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং কতকগুলি সর্ত্তে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। স্বরাজ্য দল গঠিত হইল। তাহার পর দিল্লীতে কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশনে যে উপায়ে স্থির হয়—"ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশে যে সকল কংগ্রেসকর্ম্মীর ধর্ম্মগত বা বিবেকগত বাধা নাই, তাঁহারা আগামী সদস্য-নির্ব্বাচনে ভোট দিতে বা নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে পারেন"—তাহা কাহারও অবিদিত নাই। চিত্তরঞ্জন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও পণ্ডিত মতিলাল ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন এবং মতিলাল ভারতে সামরিক শিক্ষাব্যবস্থা কমিটীর সভাও হইয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা কার্য্যতঃ সেই মতানুসারেই কায করিয়াছিলেন। কিন্তু বিপিনচন্দ্র সেই কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগের নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন! ইহাকে অদৃষ্টের উপহাস ব্যতীত আর কি বলা যায়?

বিপিনচন্দ্র একবার ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তথায় তাঁহার যুক্তি ও বক্তৃতাশক্তি সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিল।

তিনি বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু বহুমতের সমালোচনা করিবার সাহস হেতু তিনি তাঁহার অভিভাষণের জন্য অসহযোগীদিগের অপ্রীতি অর্জ্জন করেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের গুরুস্থানীয় ছিলেন এবং তাঁহারই প্রভাবে চিত্তরঞ্জনের রাজনীতিক মত গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু বিপিনচন্দ্র স্বরাজ্য দলের কার্য্য-পদ্ধতির বিরোধী হওয়ায় উভয়ে মতান্তর ঘটে। সেই জন্যই 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সহিত তাঁহার লেখক-সম্বন্ধও বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। শেষে তিনি 'ইংলিসম্যান' পত্রে নিজ মত সপ্তাহে সপ্তাহে ব্যক্ত করিতেন।

জীবনে তাঁহাকে বহু অপবাদ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, সমস্ত জীবন প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। অপবাদ ও লাঞ্ছনা যে তাঁহাকে ব্যথিত করে নাই, ইহা মনে করিতে পারি না; কিন্তু সে সকল কখন তাঁহাকে অভিভূত করিতে বা তাঁহার অদম্য ইচ্ছা-শক্তিকে দমিত করিতে পারে নাই।

ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল এবং উভয় ভাষাতেই তিনি জনমনমোহন বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তাঁহার রচনাশক্তি ও বাগ্মিতা উভয়ই অসাধারণ ছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব শক্তি লীন না হইয়া অনুশীলনফলে প্রবলই হইয়াছিল। তিনি সাংবাদিকরূপেও অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বহুদিন 'বেঙ্গলী' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। 'বন্দেমাতরম' পত্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি সম্পাদকের পদত্যাগ করার পর 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' আর পূর্ব্বগৌরব লাভ করিতে পারে নাই। তিনি আপনিও একাধিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং সেই সকলের মধ্যে 'নিউ ইণ্ডিয়া' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিলাতে প্রবাসবাসকালেও তিনি পত্র-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সকল রচনাতেই তাঁহার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রকট হইত এবং সে সকলই সুখপাঠ্য হইত।

বিপিনচন্দ্র সদালাপী ও মধুরস্বভাব ছিলেন—মতান্তরকে তিনি মনান্তরে করিতে জানিতেন না। দারিদ্র্য তাঁহার মতে পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই। যদিও রাজনীতিক মতে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির অগ্রগামী ছিলেন, তথাপি এই সকল নেতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা কখন ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

শেষ বয়সে তিনি আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের জীবন-চরিত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে বসু মহাশয়ের সময়ের সকল অনুষ্ঠানের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তিনি আপনার স্মৃতিকথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তকদ্বয় প্রকাশিত হইলে এ দেশের রাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে, সন্দেহ নাই।

যৌবনে তিনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র যেমন এসিয়াটিক সোসাইটীর কর্ম্মচারী হইয়া সেই প্রতিষ্ঠানের পুস্তকাগারে জ্ঞানার্জ্জনের সুবিধা পাইয়াছিলেন, বিপিনচন্দ্র তেমনই পাবলিক লাইব্রেরীতে কায পাইয়া তথায় জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই জ্ঞানের পরিচয় তাঁহার জীবনের পরবর্ত্তী কার্য্যে সপ্রকাশ হইয়াছিল। রাজনীতিক ইতিহাস দর্শন, ধর্ম্মতত্ব ও বৈষ্ণব সাহিত্য তাঁহার বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল এবং তাঁহার রচনায় ও বক্তৃতায় সে সকলের প্রভাব পরিলক্ষিত হইত।

আজ মৃত্যু তাঁহার কম্বুকণ্ঠ নীরব ও তাঁহার লেখনী নিশ্চল করিয়াছে। আজ তাঁহার অভাব আমরা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি কি না, সন্দেহ; কিন্তু একদিন যে তাঁহার দেশবাসী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার কৃত কার্য্যের বিবরণ স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বাঙ্গালার যে ভক্ত সন্তান দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীকাল অজস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কখন মাতৃমন্দিরে অর্ঘ্যদানে বিরত হয়েন নাই; যিনি দেশসেবাকে ধর্ম্মের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার প্রতিভা দেশবাসীর সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসবান হইয়া যিনি মনে করিতেন—ভারতের রাজনীতিক নেতৃত্বে বাঙ্গালীরই অধিকার; যিনি তাঁহার রচনা ও বক্তৃতার দ্বারা দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া—রাজনীতিক আদর্শের পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন; যিনি সরল ও নির্ম্মল জীবনই কাম্য মনে করিতেন, আজ তাঁহার বিয়োগবেদনা-কাতর হৃদয়ে তাঁহার উদ্দেশে আমরা আমাদিগের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। যিনি লোকমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সাহস দেখাইয়াছেন এবং নিজ মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; যাঁহার সহিত বহুদিন একসঙ্গে কায করিবার সৌভাগ্য আমরা লাভ করিয়াছিলাম, তিনি আজ পরলোকে। তিনি যে আদর্শের ভক্ত ছিলেন, সে আদর্শ তিনি দেশে সর্ব্বত্র গৃহীত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু সেই আদর্শই যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবাসীর আদর্শ হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সেই কথা মনে করিয়া আমরা তাঁহার ও আমাদিগের পরলোকগত বন্ধু অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের কথায় বলি—

"তাই তোর তরে [illegible]
কলসে কলসে [illegible]
[illegible]
মর জনমের [illegible]।
এই লও, বন্ধু, মরণ [illegible]
[illegible]।"

"বৃদ্ধস্য—"

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

মেয়েটি তন্বী, তরুণী এবং সুন্দরী।

গল্পলেখকদিগের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ প্রায়ই আনীত হয়, গল্পের নায়িকামাত্রকেই তাঁহারা সুন্দরী, তরুণী এবং তন্বী করিয়া অঙ্কিত করেন। অভিযোগ গুরুতর কিন্তু খণ্ডনযোগ্য। বেচারা গল্পলেখকদের অপরাধ কি বা কতটুকু বলুন! যাঁহারা নায়ক, নায়িকাদের সঙ্গে যাঁহাদের কাজ কারবার, তাঁহারাই নির্ব্বাচনের মালিক, গল্পলেখকরা ইতিহাসকার বই ত নয়!

এই যে মেয়েটি পুরীর সমুদ্রতীরে প্রত্যহ অপরাহ্ণে রূপের আভা ছড়াইয়া, সুবাস বিতরণ করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইত,—এমন ত কতই বেড়ায়,—সে যদি না সুন্দর হইত, সে যদি না তন্বী এবং তরুণী হইত,—সে কি কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে পারিত?

বলিয়াছি সে সুন্দরী! তাহার সৌন্দর্য্য দর্শকের চক্ষুকেই শুদ্ধ মুগ্ধ করে না, চক্ষু হইতে অনেকখানি দূরে যে বক্ষখানি আছে, তাহাতেও দস্তুরমত আলোড়ন জাগায়। তাহার রূপ দেখিবার মত, তাহার মুখখানি চিন্তা করিবার মত, সর্ব্বশুদ্ধ তাহাকে ভাবিতে হয়, ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়! অন্ততঃ নায়কের হইয়াছিল।

এইবার গল্প আরম্ভ করি। নায়কই গল্পটি বলিতেছেন, আমি লিপিকার মাত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেই সুন্দর মেয়েটিকে আমরা রোজ দেখিতাম। তাহার সঙ্গে থাকিতেন একটি পক্ককেশ, স্থূলকায় বৃদ্ধ। মেয়েটির হাতে থাকিত একটি মহিষের শিঙের কালো-কুচ্-কুচে পল্-তোলা ছড়ি, আর বৃদ্ধের হাতে থাকিত, একটি মস্তবড় পাণের ডিবা। আধুনিক বাঙ্গালীর মেয়ে অনেক দেখিয়াছি, বি-এ, এম্-এ পাস্ করা, জজ-গৃহিণী, ব্যারিষ্টার-বিনোদিনী, ম্যাজিষ্ট্রর-মোহিনীও অনেক দেখিয়াছি, জুতার হিল সিমলা-হিলের মত সুউচ্চ হইতেও দেখিয়াছি কিন্তু ছড়ি হাতে—সমতল ভূমিতে 'ছড়ি হস্তেন' কোন নারীকে বিচরণ করিতে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না।

আমরা তিনজনে বেলাভূমিতে চেয়ার পাতিয়া বসিতাম। ফেণিল জলরাশি কখনও কখনও আমাদের পা ধুইয়া দিয়া চলিয়া যাইত। ব্লটিং কাগজের মত বেলাভূমিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া কর্কটশিশুরা লুকোচুরি খেলিত। ঝিনুক, শঙ্খ, জেলি ফিস্ জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া অচল হইয়া পড়িয়া থাকিত। আমাদের পিছন দিক দিয়া বায়ুসেবী-(!)র দল একে একে, দুইয়ে দুইয়ে, চারে চারে চলিয়া যাইত। আমাদের সম্মুখ দিয়া কেহ বড় যাইত না, আমাদের 'নবাবী'টা হয়ত তাহারা ভালচক্ষে দেখিত না কিন্তু 'নবাবী' ও ক্ষিপ্ত জলরাশির মধ্যে যেটুকু স্থান, সেটুকু দিয়া হাঁটিবার দুঃসাহস কাহারও হইত না, কেননা, কাপড় ভিজিবার সম্ভাবনা ছিল প্রবল।

হঠাৎ একদিন ছড়ি হাতে সুন্দরী আমাদের সম্মুখ দিয়া, আমাদের প্রশংসমান দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া দ্রুত পদে চলিয়া গেল, আমরা তিনজনেই চাহিয়া রহিলাম। সিল্কের শুভ্র শাড়ীর নিম্নভাগ অনেকখানি সিক্ত, চাঁপা ফুলের পাতার মত পা দুখানির উপরে সূক্ষ্মস্তরে বালু জমিয়া বালুকা-জন্ম ধন্য করিয়াছে, চশমা-উজ্জ্বল চোখে অসামান্য ঔজ্জ্বল্য, ললাটে সুগোল একটি সিন্দূর বিন্দু, হাতে ছড়ি—বাম হস্তের মণিবন্ধে কালো রেশমতাবে বাঁধা রিষ্ট ওয়াচ।

বৃদ্ধটাকে আগে দেখি নাই, সুন্দরীকে অনুসরণ করিতে গিয়া চোখে পড়িল, বৃদ্ধ ধীর মন্থর গমনকে 'মরি-বাঁচি' করিয়া আমাদের পিছন দিয়া সুন্দরীর সঙ্গ গ্রহণ করিলেন। সুন্দরী দাঁড়াইলেন, হাসিয়া কি বলিলেন, বৃদ্ধ ডিবা খুলিতেই গোটা কত পান লইয়া মুখে ফেলিয়া কথা কহিতে কহিতে চলিতে লাগিলেন।

মলিক্ সাহেব নব্য ব্যারিষ্টার, অবিবাহিত, কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে মলিক সাহেবের নাম এবং দাম, দুইই আছে। কারণ অবশ্য সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন! তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—কে রে বাবা মিসেস্ ডোণ্ট্-কেয়ার! ছড়ি

হাতে বেড়ায় এ ত বড় আশ্চর্য্যি! দেখেছি বলে মনে ত হয় না।

মিষ্টার বসু ডেপুটী, তিনি মফঃস্বলে থাকেন, কলিকাতার সেকেলে এক ধনীগৃহে বিবাহ করিয়া সজীব ও নির্জ্জীব মাল-মাটরাগুলি লইয়া সাত ঘাটের জল ভক্ষণ করিয়া থাকেন, এরিষ্টোক্রেসীর খবর-টবর বড় রাখেন না; চিনিবার চেষ্টা না করিয়াই কহিলেন—ডোণ্ট্-কেয়ারই বটে বাবা! কি রকম করে গেল, বাপ!

আমি বলিলাম—"বৃদ্ধস্য—"

কথাটা যে আমি উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলাম, তা নয়; কিন্তু তরুণী এই সময়েই একবার এদিকে চাহিলেন। খানিকটা দূরও বটে আর তাঁহার চোখ চশমাবৃতও বটে, মুখের বা চোখের ভাষা পড়িতে পরিলাম না; তবু নিজের মনে একটু লজ্জাই অনুভব করিলাম।

মলিক্ সাহেব তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—বৃদ্ধস্য গৃহিণী বিষম্! ঠিক।

তিনি বলিতেন, বিলাতে সিভিল সার্ব্বিশ পরীক্ষায় দেব-ভাষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আমরা প্রতিবাদ করি না। সংস্কৃতে তাঁহার অপার অধিকারের অধিকতর পরিচয় সর্ব্বদাই পাওয়া যায়।

বলিলাম, বৃদ্ধের গৃহিণীটি বিষম তাহা না হয় বুঝিলাম;

মলিক্ সাহেব মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—কস্তং? কলকাতার সমাজের নয়, সে আমি দিব্বি ক'রে বলতে পারি। কোন্ পাড়াগাঁয়ে মাড়াকান্ত জমিদার ফমিদার হ'বে। কালিদাসে আছে না—"বানরের গলায় মোতিম হারঃ!"

মিষ্টার বসু বলিলেন—কালিদাস কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় শব্দযোজনা একটি ছত্রও করেননি মলিক! ওটা বোধ করি আসলে এই রকম আছে—বানরম গলংমে মোতিম হারঃ! কি বল!

মলিক (যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করিলে উচ্চারণের সুবিধা হয় বলিয়া বন্ধুরা মল্লিকের স্থলে মলিক্ বলিয়া থাকেন) সাহেব অপ্রস্তুত হইবার লোক নহেন, কহিলেন, ওটা তর্জ্জমা ক'রেই বলেছি হে বোস্! কিন্তু মোতিম হারটি ত বেশ, ও কস্তং?

বোস্ বলিলেন—পাষণ্ডং, দুরাচারং, ইথে সন্দেহো নাস্তিং!

সূর্য্য অস্ত যায়-যায়! নোণা জলে রবিকরের বোধ করি বড়ই অরুচি, ছায়া পাত পর্য্যন্ত করেন না, সিক্ত বেলাভূমি রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। আর তাহারই উপর সেই রাঙা পা দু'খানি ফেলিয়া মোতিম হারটি আবার আমাদের মুগ্ধ ও লুব্ধ দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। মিষ্টার বসু পত্নীব্রত স্বামী, চকিতে দেখিয়া লইয়া অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইলেন।

আমি মলিকের বাম বাহু টিপিয়া ধরিলাম। মলিক কহিলেন—কাল আলাপ করছি, দাড়াও না।

তাঁহার দেবভাষার পাণ্ডিত্যে আমরা সন্দিহান থাকিলেও, এ বিষয়ে তিনি যে র‍্যাংলার বা প্রেমচাদ রায়চাদ স্কলার তাহাতে আমাদের তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবু বলিলাম—কার সঙ্গে আলাপ করবে? বুড়োটির সঙ্গে, না—

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া মলিক বলিলেন—ননসেন্স! ওটা ত একটা গাধাবোট, পাইলট লঞ্চ যে ভাবে যেখানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, চলেছে—ওর মূল্য কি!

কথাটা ঠিক। বুড়াটা গাধাবোটই বটে!

মলিক আবার বলিলেন—মেয়েটি যদি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করেন, বিনা ফিসে আমি ওর মামলা চালাব এ আমি এখনই অঙ্গীকার করে রাখছি।

মিষ্টার বসু বলিলেন—শুধুই বিনা ফিসে—ষ্ট্যাম্প, কোর্টফি এ গুলোও দেবে না?

মলিক উদারতার সহিত কহিলেন—তাহলেও আমি দুঃখিত হবো না। দরকার হলে আরও কিছু

বসু সহাস্যে কহিলেন—দিতে প্রস্তুত! তা বেশ। আপাততঃ পরস্ত্রীচচ্চা বন্ধ রেখে বাসায় যেতে হয়। সন্ধ্যা হোল।

ততক্ষণে অন্ধকার জমিয়া আসিয়াছে। সাগরের কালো জলে থাকিয়া থাকিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে, এখন আর তুষারশুভ্র ফেণা নয়, নীলাম্বু যেন আগুন ছোড়াছুড়ি করিতেছে। আমরা উঠিয়া পড়িলাম। আমাদের বাসার

বেহারা ঘোড়াগুলা লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া অল্প দূরে দাঁড়াইয়া আছে।

ধীরে ধীরে বাসার দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। মলিক বলিলেন, বড় ঝোড়ো হওয়া, বৃদ্ধস্য গৃহিণীর সম্মানে আজ দু'একটা পেগ বেশী চড়াতে হবে। কি বল হে মিত্তির?

মিত্তির, অর্থাৎ আমি কহিলাম—লং লিভ্ বৃদ্ধস্য তরুণী!

মলিক হ্যাটটা হাওয়ায় ছুড়িয়া আবার লুফিয়া বলিয়া উঠিলেন, হিপ্ হিপ্ হুররে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের ঠিক সামনে দেখা—একেবারে চোখোচোখি! চোখে বিদ্যুৎ খেলে, কেতাবে এ কথা অনেক-বার পড়িয়াছি কিন্তু ভাল ভাল কেতাবের ভাল ভাল কথার সন্ধান বাস্তবে যেমন পাওয়া যায় না, এই বিদ্যুদ্দামও তেমনই কখনও চাক্ষুষ করি নাই—এইবার করিলাম। বিজলীলতা আকাশের বুক চিরিয়া ফুঁড়িয়া অদৃশ্য হয়, এই তড়িল্লতাও একখানা আকাশকে চিরিয়া চিরিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া চলিয়া গেল। পার্থক্য এই, প্রথম-আকাশটার হয়ত কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, শেষের আকাশটার সর্বাঙ্গ দিয়া যেন বেদনা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কিন্তু বেদনা কেন? বেদনা নয়? হায় হায়! ঐ যে বৃদ্ধটী গাড়ী হইতে অতিকষ্টে নামিতেছে, যাহার মাথার একটি চুলও সাদা নাই, যাহার মুখগহবরে নকল দাঁতের সজ্জিত সারি, সর্বাঙ্গে বটের ঝুরির মত মাংস যাহার ঝুলিয়া পড়িতেছে, সে কি ঐ নবনীতকোমল করপল্লবের স্পর্শ লভিবার যোগ্য! তরুণ অঙ্গে লাবণ্য যাহার ভরা গঙ্গার মত, প্রস্ফুটিত উদ্যানের মত, বসন্তের চাঁদিনী রজনীর মত, টল টল করিতেছে, সৌন্দর্য্য যাহার অঙ্গে আশ্রয় লাভ করিয়া সহকার-অঙ্গে লতিকার মত ধন্য জ্ঞান করিয়াছে, জীবন যাহার একটী অসম্পূর্ণ সুখস্বপ্নসম, কবি যাদুর অলিখিত কাব্যের মত, আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা যাহার নীল সাগরের মত অসীম, অনন্ত, উত্তাল, উদ্বেলিত, হায়! হায়! এ যদি তাহার আত্মহত্যা, অনুকপহত্যা না হয়, তবে কি? বেদনা নয় আবার!

বন্ধুরা মণিহারী দোকানে কয়েকটি জিনিষ কিনিতেছিলেন, আমি ট্যাক্সির সন্ধানে পথের দিকে চাহিতেই চক্ষু দুইটা জলিয়া গেল;—জুড়াইয়া গেল।

বুড়াটার হাত ধরিয়া নামাইয়া, এক পলকে আমাকে দগ্ধাইয়া দিয়া, মেয়েটী আমারই পাশ দিয়া বাজারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মিথ্যা কথা বলিব না, বলিবার দরকারও নাই, শুধু সেই চঞ্চল চক্ষু দু'টাতেই নয়, তাহার আধ-লাল-আধ-গোলাপী পাতলা দু'খানা ঠোঁটে যাহা শোভিত ছিল, দেখিলাম, তাহা তাম্বুল-রাগ নয়, রুজ নয়, রঙ নয়, কৃত্রিম নয়—অকৃত্রিম খানিকটা হাসি! হইতে পারে অবজ্ঞার হাসি, উপেক্ষার হাসি, কিন্তু সে যে হাসি, হাসি ছাড়া আর কিছু নয়, তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

ফিরিয়া চাহিলাম, জুতার ফাঁক দিয়া দুইটা গৌর গোড়ালির কিয়দংশ, একটি শিথিল কবরী ও লাল পাড় গরদের শাড়ীর লীলাই শুধু দেখিতে পাইলাম। বার বার চাহিলাম, সে আর ফিরিয়াও চাহিল না। তরুণীরা হয়ত পুরুষমাত্রকেই কীটপতঙ্গ জ্ঞান করে, অবহেলে দলিত পিষ্ট করিয়া যায়, একবার করুণা নয়নে চাহিয়াও দেখে না; কিন্তু বৃদ্ধস্য তরুণীরাও কি তাহাই করে?—কে জানে? মলিক থাকিলে সম্ভবতঃ সংস্কৃত রচনাবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া দিত।

মলিক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিলেন—মিত্তির, আর কয়েকটা মুরগী কিন্তে হচ্ছেবে! বোস্ রণে ভঙ্গ দিয়েছে, পরস্ত্রীর মুখদর্শন করতে তার ভার্য্যা সূর্য্যনন্দিনী···

আমি ভ্রম সংশোধন করিয়া কহিলাম, সূর্য্যনন্দিনী নয়, সূর্য্যমুখী!

মলিক্ কহিলেন, ও একই কথা! সূর্য্যমুখীর নিষেধ; সে ঐ মুসলমানের চাযের দোকানে ঢুকে বসে পড়েছে। মুরগী কিন্তে চাস্ ত চল্!

পক্ককেশ বৃদ্ধ নীরবে শুদ্ধ 'শোণ বন'টি নাড়িতেছিলেন, দরদাম যাহা-কিছু ছড়ি-হাতে মেয়েটিই করিতেছিলেন, টাকায় ৩ টার কমে লওয়া যে যায় না, ইহাই ছিল, তাঁহার বক্তব্য।

মলিক্ কতকটা তাঁহাকে, কতকটা বিক্রেতাকে উদ্দেশ করিয়া খুব জোর গলায় বলিয়া উঠিলেন—বাছা জগড়নাথঃ, কাল আমাদের তুমি দু'টাকায় সাতটা দিয়াছ, আজ হঠাৎ দাম চড়াও কেন বাপু? সামনে রথও নাই, স্নানযাত্রাও নাই

যে যাত্রী বাড়িয়াছে বলিয়া দামও বাড়িয়াছে ! কেন বাপু মিছা ভোগাও, দাও আমাকেও সাতটা দাও।

বলা বাহুল্য, গতকল্য সে ব্যক্তি দু'টাকায় সাতটা কুক্কুট অথবা কুক্কুট-শাবক আমাদিগকে দেয় নাই, হয়ত বা কাহাকেও দেয় নাই কিন্তু মলিকের কথার ভঙ্গীতে ভড়কাইয়া গিয়া, ঝুড়ির মধ্য হইতে একটা পক্ষী টানিয়া বাহির করিয়া জীবটার পেট, গলা, পাখা, পা টিপিয়া সকলকে দেখাইতে দেখাইতে বলিল—সে কি এত বড ছিল হুজুর ?

মলিক্ তাহার হাত হইতে পাখীটাকে লইয়া বারকতক টিপিয়া টাপিয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—কি বলছ জগড়নাথ, কালকের পাখী এর চেয়ে অনেক বড় আর ইয়া মোটা ছিল।

ছাড়া পাইয়া পাখীটা একটু দূরে চলিয়া গিয়াছিল, লোকটা ছুটিয়া গিয়া সেটাকে ধরিয়া আনিয়া ঝুড়িবদ্ধ করিয়া কহিল—পাঁচটা দোব হুজুর ; তার বেশী পারব না।

মলিক্ একসঙ্গে ডিগ্রী ডিস্‌মিস্ করিয়া কহিলেন—যাক্‌গে, তোরও কথা থাক্, আমারও কথা থাক্, দে ছ'টা দে !—বলিয়াই সে প্রফুল্ল বদনে তরুণীকে প্রশ্ন করিলেন—আপনারা ক'টাকার নেবেন ?

তরুণী তাচ্ছিল্যের স্বরে জবাব দিলেন, দু'টাকার নেওয়া যাক্। বলিয়া তিনি বৃদ্ধের পানে চাহিলেন।

বৃদ্ধটি 'মোষ্ট ওবিডিএন্ট সার্ভেন্ট,' ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই নাও।

আমাদেরও দুই টাকায় ছ'টা পক্ষী ক্রয় করা হইল। বাজার হইতে বাহির হইবার সময়ে মলিক তাঁহাদের উদ্দেশে কহিলেন— আপনারা কোথায় আছেন ?

তরুণী বলিলেন—ম্যান্স সোসি। বলিয়া দ্রুতপদে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন আমাদের সঙ্গ আশু পরিত্যাগই যে দ্রুত গমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। তাঁহারা দৃষ্টির অন্তরাল হইলে, মলিক্ রাগতঃস্বরে বলিলেন—No education, no training একেবারে upstart, আর বুড়ো ত একেবারে "প্রিয়ে মম শিরসি মণ্ডনং, চারুশীলে, মানময়ী দানম। দেহি পদ পল্লবং।"

মেয়েটির ব্যবহারে সত্য কথা বলিতে কি, আমিও দুঃখিত হইয়াছিলাম। সেই দুঃখের সময়েও মলিক সাহেবের জয়দেব-ভক্তির প্রাবল্য দর্শনে না হাসিয়া পারিলাম না। মলিকের একটা ক্ষমতা ছিল। নিজে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত সমাজের লোক বলিয়া শিক্ষিত ও ভদ্র সম্ভ্রান্ত সমাজের যে কোন বয়সের পুরুষ ও নারীর সহিত মিশিবার, বন্ধুত্ব করিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহার অসাধারণ। এখানে তাহার ব্যতিক্রম ঘটায়, বেচারা হুতাশনবৎ জ্বলিয়া উঠিয়া সারাটা পথ কথ্য এবং অকথ্য, শ্রাব্য ও অশ্রাব্য ভাষায় মেয়েটির, তাহার-সেই-দেহি-পদ-পল্লবং-এর চতুর্দ্দশ পুরুষান্ত করিতে করিতে চলিল। প্রতিবাদ করিবার কেহ ছিল না—কারণ, প্রতিবাদ করিতে পারিতাম আমিই ; কিন্তু মেয়েটি রূপসী যতই হোন, আমার চোখে যত ভালই তিনি লাগিয়া থাকুন, তাঁহার আচরণে আমিও ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। আর কে প্রতিবাদ করিবে ? মলিক যখন হিন্দী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও মাঝে মাঝে ফ্রেঞ্চ ভাষার সংমিশ্রণে তাহাদের সম্বন্ধে ভাল ভাল বচনগুলি আওড়াইতে-ছিল, তখন গাড়ীতে আর যে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন, আমাদের সেই ডেপুটী বাবুটি তিনি কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করিয়া চক্ষু মুদিয়া উপবিষ্ট ! তাঁহার 'দুর্গানন্দিনী'র কড়া আদেশ, পরস্ত্রী দেখিবে না, পরস্ত্রীর কথা শুনিবে না। তিনিও যে দেহি পদ পল্লবং (আমাদের জ্ঞানে পল্লব মুদাবস)!

সেদিনও অপরাহ্নে ছড়ি হাতে মেয়েটি আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। দূর হইতে তাহাকে আসিতে দেখিয়া আমরা (ডেপুটীজনে,—ডেপুটী বাবু ত' দেখিবেন না জানা কথাই) পরামর্শ করিয়াছিলাম, উহার দিকে চাহিব না। মলিকের ভাষায় 'উহাকে importance দিব না ; দিলামও না।' বৃদ্ধটি লোক ভাল, পাশ দিয়া যাইবার সময় একটু হাসিয়া বলিয়া গেলেন, 'এই যে, আপনারা বসে আছেন'।

মলিক্ উত্তর দিলেন না, ডেপুটী বাবুর দুর্গানন্দিনীর আদেশ ছিল বোধ করি, পরস্ত্রীর স্বামীর কথাও কানে তুলিবে না, তিনি অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধ্যাননিরত, আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, আজ্ঞে হাঁ !

বৃদ্ধ চলিয়া যাইতেই, মলিক দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন - ষ্টুপিড ডাকাত, কৌড়লি ক'রে কথা কইবার আর লোক পেলে না, না ?

আমি বলিলাম—বৃদ্ধ যখন জিজ্ঞেস করলেন, সাড়া না দেওয়াটা অভদ্রতা নয় কি ?

মলিক্ 'রায়' দিলেন, কাল থেকে আমরা এখানে আর বসবো না। কি বল হে বোস্?

বোস্ বলিলেন, বেশ। তাঁহার 'সূর্য্যনন্দিনী'র আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছেন ভাবিয়া তিনি পরম নিরুদ্বিগ্ন।

আমি বলিলাম, তাহ'লে বসাটা হ'বে কোথায়?

সোণার গৌরাঙ্গের সামনে।

সমুদ্দ‍ুর কোথায়?

সমুদ্রের দরকারই কি? পরস্ত্রী না দেখলেও চল্‌তে পারে।

বলিতে গেলাম, এ ব্যবস্থাটা যেন অন্নের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাওয়ার মত! মলিক্ কড়া হাকিমের মত বলিয়া উঠিলেন—রাস্কেল, একেবারে গোল্লায় গেছ? দেখছ বোস্?

বোস্ কি দেখিলেন কে জানে কিন্তু হুকুম নড়িল না। পরদিন সোণার গৌরাঙ্গের মন্দিরের সামনে খোলা জায়গায় মোড়া পড়িল এবং কঠিন হৃদয়ে গুরু মহাশয়ের সামনে ছাত্রকুল যে ভাবে বসিয়া থাকে, সেই ভাবেই আমরা (এখানে গৌরবে বহুবচন, কেননা, আমার পর্য্যায়ে পড়িবার আর কেহ নাই, বোস্ ত 'সূর্য্যনন্দিনীর' শ্রীচরণে দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছেন!) বসিয়া রহিলাম। স্যার রাজেন্দ্র মুখুজ্জের বাড়ীর ফাঁক দিয়া বেলাভূমি দেখা যাইতেছিল, আমি সেই ফাঁকটুকুকেই আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের ধ্যানের ধন করিয়া লইতেছি বুঝিয়া মলিক্ মোড়াগুলা আর একটু করিয়া সরাইয়া দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক'দিন তাঁহাদের দেখি নাই, ও-প্রসঙ্গও আর আমাদের মজলিশে উঠে না, 'সূর্য্যনন্দিনী'র নামও ত তুলিবেনই না, মলিক্ হাড়ে চটিয়াছে, আর একা আমি, আউট-ভোটেড হইয়া মেজরিটির নির্দ্দেশই মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছি। এখন এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিই যে, যাক্ এ একরকম ভালই হইল। বুড়াই হোক আর যাহাই হোক, সে ব্যক্তি স্বামী এবং সুন্দরীই হোক আর তরুণীই হোক সে পরস্ত্রী, ড্রুপ্‌সীন পড়িয়া যাওয়াই ভাল।

কলিকাতায় আমার একটি রোগী ছিল, আমি যখন পুরী আসি, তখন সে ভালই ছিল, আজ ভোরে তাহার একখানা টেলিগ্রাম পাইলাম, অসুখটা বৃদ্ধি পাইয়াছে, নূতন দু'তিনটা উপসর্গও দেখা দিয়াছে। আমি ফিরিতে পারিব, কিম্বা তাহারা অন্য ডাক্তারের শরণ লইবে তাহাই জানিতে চাহিয়াছে: প্রাতরাশ শেষ করিয়া নিজেই তারের জবাব দিতে ষ্টেশনে চলিলাম। মলিক্ 'তার' লিখিয়া দিয়াছেন, "দুঃখিত; আমার যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।" লিখিয়া দিয়া মলিক আর একবার শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কাল রাত্রে মাত্রাধিক্য ঘটিয়াছিল, প্রায় একটি বোতল! বোস্ সাহেব রাইটিং প্যাড ও ফাউণ্টেন পেন হস্তে সংস্থিত—রয়াল মেলের জবাব পাঠাইতে হইবে। একাই বাহির হইলাম, মনটা বড়ই অপ্রসন্ন। যখন বড় ডাক্তার হইব, তখন মনের ভাব কি হইবে জানি না, এখন পয়সা যত পাই না পাই, রোগীদের উপর কেমন একটা যেন মায়া পড়িয়া যায়; ছাড়িতে যেন কষ্ট হয়। আর পুরীও আমার কাছে বড়ই একঘেয়ে, বৈচিত্র্য-বিহীন ঠেকিতেছে, চলিয়া যাইতে পারিলে বাঁচিতাম কিন্তু সংখ্যা-গরিষ্ঠের নির্দ্ধারণ না মানিয়া এই গণতন্ত্রের যুগে উপায়ই বা কি!

ষ্টেশনের ফটকের সামনে—অন্যায় নীতিবিরুদ্ধ সব মানি, মলিকের কড়া শাসন তাও মানি—কিন্তু দিনরাত আমার চক্ষু, আমার মন যাহাকে দেখিতে চায়, হয়ত বা কামনাও করে—সেই মেয়েটি! হাতে সেই ছড়ি, সঙ্গে সেই বৃদ্ধ! মুখে সেই ঈষৎ হাসির রেখা!

বৃদ্ধ আমাকে দেখিবামাত্র সু-প্রভাত জ্ঞাপন করিয়া তরুণীর পিছনে পিছনে বাহির হইয়া গেলেন, আমি সেই ফটক দিয়াই ষ্টেশনে ঢুকিলাম। জানি না কেন, হঠাৎ মনে হইল, উহারা ষ্টেশনে বার্থ রিজার্ভ করিতে আসিয়াছিলেন! এ-এস্-এম্-এর ঘরে ঢুকিলাম। এ-এস্-এমটি হয় মাদ্রাজী, না হয় উড়িষ্যা-নন্দন। কাহারও মাথায় হাট দেখিলেই চেয়ার ছাড়িতে অভ্যস্ত। আমি ইংরাজীতে বলিলাম, এই মাত্র আমার একটি বন্ধু ও তাঁহার স্ত্রী আজকের ট্রেনে বার্থ রিজার্ভ করিয়া গিয়াছেন না?

এ-এস্ এম্ তখনই খাতা খুলিয়া দেখাইয়া দিলেন, মিষ্টার সিরকার (Sirkar) টু ফার্ষ্ট ক্লাস লোয়ার বার্থ টু হাওড়া।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ ভিড় কেমন?

খুব বেশী নয় বটে, তবে নিতান্ত কমও নয় মহাশয়।

ঐ কম্পার্টমেণ্টে ক'টা বার্থ?

না, মহাশয়।

।। আমার বন্ধুরা দুইটা লইয়াছেন, আমার জন্য আর একটা লোয়ার বার্থ বুক্ করুন।

খাতা খুলিয়া নামটি লিখিয়া লইয়া, এ-এস্-এম্ বলিলেন, খুরদায় আপনার ডিনার চাই কি মহাশয়?

তা চাই বৈ কি! বলিয়া আট আনা পয়সা জমা দিয়া, বাহিরে আসিয়া, মলিকের লিখিত তারখানা ছিঁড়িয়া, আর দুইখানা তারের ফরম্ চাহিয়া লিখিলাম—তার পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। আজই রওনা হইতেছি। আর একখানা 'গৃহহীন' গৃহে করিলাম, ষ্টেশনে মোটর পাঠাইবার জন্য।

তারের নকল দেখিয়া মলিক্ চটিয়া লাল্। ভবিষ্যতে আমি যে একটি অর্থগৃধ্নু সাইলক্ হইব সে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেও তিনি দ্বিধা করিলেন না। বোস্ সাহেবেরও আর ভাল লাগিতেছে না, তাঁহারও ফিরিতে ইচ্ছা কিন্তু অনিবার্য্য কারণে 'সূর্য্যনন্দিনী'র পিত্রালয় ত্যাগ করিতে তখনও দশ বার দিন দেরী বলিয়া মনের ইচ্ছা হৃদিলীয়ন্তে।

মলিক যে আমাকে বিদায় দিতে ষ্টেশনে আসিবে এবং আমার সহযাত্রিদিগকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইবে না তাহা বুঝিয়া মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, আমি একটু দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে যখন পড়িতাম, তখন কতিপয় তরুণী নার্স বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের কোন-একটি অনুকরণে আমার একটা নামকরণ করিয়া ফেলিয়াছিল; বিলাতে থাকিতে—যাক্, সে লাঞ্ছনার কথা না হয় আর নাই বলিলাম! এইটুকু কেবল বলি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কেতাব সেখানকার কোন লোক হয় ত পড়ে নাই কিন্তু দেখিলাম, দ্বিতীয় ভাগের গোপালকে তাহারাও চিনে। সে কথা যাক্, ট্রেনের সময় যতই নিকট হইতে লাগিল, ততই অস্বস্তি বাড়িতে ছিল, প্রায় দেড়ঘণ্টা আগে আমি রওনা হইবার উদ্যোগ করিলাম।

মলিক বড়ই বদমেজাজী, ইহাতেও তাহার রাগের অন্ত নাই। তাহার বিশ্বাস, আগে গিয়া ষ্টেশনে গাড়ী প্রভৃতি ঝাড়, দিয়া লইবার ভার আমিই পাইয়াছি।

বলিলাম, তা নয় হে, তা নয়। আজ শুনিয়াছি ভারী ভিড়, একটু আগে যাওয়াই ভাল, বার্থ ফার্থ আবার গোল না হয়ে যায়।

শুনিয়া, মলিক্ ও বোস্ও প্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। আমার ইচ্ছা ছিল, একা আগে গিয়া অন্য কোন কামরায় একটা বার্থ সন্ধান করিয়া লইব, একসঙ্গে গেলে তাহা করিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, আমি এবার গড়িমাসী করিতে লাগিলাম। মলিকের কিন্তু তখন আর তর সহে না।

আমরা যখন ষ্টেশনে পৌছিলাম, তখন স' ছটা; এক্সপ্রেস ছাড়ে প্রায় স' সাতটায়, একঘণ্টা দেরী ছিল। থার্ড ক্লাসের যাত্রীরা আসিতে আরম্ভ করিয়াছে বটে, উচ্চ শ্রেণীর আরোহী কেহই আসেন নাই। প্ল্যাটফরমে ঢুকিতেই সেই সদা-টুপি-obliging এ-এস্ এম সু-সন্ধ্যা জ্ঞাপন করিয়া জানাইলেন যে বার্থ লইয়া খুব কাড়াকাড়ি হইলেও তিনি বহুকষ্টে আমাদের কামরায় আর কাহাকেও বার্থ দেন নাই, সুতরাং আমি ও আমার আত্মীয়বর্গ নিরুপদ্রব্যেই যাইতে পারিব।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যে হয়, বৎস এ-এস-এম্ 'বাধিত' করিবার আর সময় পাইল না! মলিক্ ত্রস্তে বার্থ-সংলগ্ন টিকিটগুলা পড়িয়া লইয়া জিজ্ঞাসিলেন—মিষ্টার সিরকারটি আবার কে-হে?

মলিকের মাথাতেও টুপি, উপরন্তু তাঁহার বেশবাস বিশেষ মলায়েম, এ-এস-এম তাঁহাকে oblige করিতে তৎপর ত হইবেই, সহাস্যে কহিলেন-- মিষ্টার সিরকার, স্যার, ডক্টর মিত্রের আত্মীয় ও তাহার--

ভগবান সে যাত্রা রক্ষা করিলেন, মলিক্ ধমক্ দেওয়ার মত করিয়া বলিয়া উঠিলেন-- ননসেন্স, মিত্তিরের আত্মীয়, আমি জানিনে? কি হে মিত্তির, কিষ্কিন্ধ্যায় এসে আত্মীয় জোটালে কাকে আবার?

এ-এস-এম ধমক খাইয়া প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, মলিক আর তাহাকে audience দিতে নারাজ! সঙ্গে করিয়া কহিল - That's alright. এখন তুমি দয়া করিয়া তোমাদের রিফ্রেশমেণ্ট রুমের বয়কে তিনটা হুইস্কী সোডা আনিতে বলিয়া দিতে পার কি?

এখানে ত মহাশয় রুমস্ নাই, অবশ্য আমাদের ষ্টোরে হুইস্কী আছে, তাহাই পাঠাইতে পারি, কিন্তু খুচরা পাইবেন না; পুরা বোতল লইতে হইবে।

O. K. তাহাই পাঠাও।—সে ব্যক্তি চলিয়া গেল।

ভয়ে ভয়ে ইংরাজীতেই বলিলাম, মলিক, চল না ভাই, ষ্টোরেই যাই।

কেন, এখানে—গাড়ীতে দোষটা কি ?

দোষের কথা এখন না হয় কিছু নাই কিন্তু কে ঐ সিরকার সাহেব আসিতেছেন, তিনি পছন্দ না করিতেও পারেন।

তখনকার কথা তখন হইবে।

এ-এস্-এম্‌টি বুদ্ধিমান্ লোক, যুদ্ধি খরচ করিয়া হুইস্কীর বোতল সোডা, গ্লাস মায় কর্কস্ক্রু পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিয়াছে, মলিক সাহেব সন্তুষ্টচিত্তে সোডা ফাটাইতে লাগিলেন। যত বড় পেগই ঢালা যাক্ এবং যত শীঘ্রই উদরস্থ করা যাক্, একটা পুরা চব্বিশ আউন্সের বোতল শেষ করিতে তিনজন লোকের যথেষ্ট সময় লাগে। বোস সাহেব আবার দুই পেগের বেশী খান্ না, সে বিষয়েও 'সূর্য্যনন্দিনীর' নির্দ্দেশ আছে। আমি খুব তাড়াতাড়ি দুইটা ছ' আউন্সের পেগ গিলিয়া লইলাম, ভাবিয়াছিলাম, মলিক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে কিন্তু সে পুরা দস্তুর আমিরী চালে একটা পেগই চাখিতে লাগিল। তৃতীয় তিন আউন্স গ্লাসে ঢালিয়াছি মাত্র, ছড়ি হস্তে····· !

কামরায় আমাদিগকে দেখিয়া তিনি যে প্রফুল্ল হন্ নাই তাহা বুঝিবার মত সহজ-দৃষ্টি তখনও আমাদের ছিল।

আমি চুপে-চুপে মলিক্‌কে বলিলাম, চল আমরা বাহিরে যাই।

বোস্ পরস্ত্রী-দর্শন মাত্রেই বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন। মলিক্ দ্বিরুক্তি না করিয়া আমার সঙ্গেই বাহির হইয়া আসিলেন; আমি নিজেই বোতল গ্লাসগুলা বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছিলাম, বয় খালি সোডার বোতলগুলা লইয়া আসিল।

মলিক্ বলিলেন—রাস্কেল, তুমি রোগী দেখতে যাচ্ছ, না রোগী হ'তে যাচ্ছ ?

বলিলাম, পৃথিবীতে accident বলিয়া যে একটা কথা আছে তা' কি জান না ?

মলিক বলিলেন—ষ্টেশন মাষ্টার সেই accident-এর কথাই বলছিল, না ?

পরমুহূর্ত্তেই হাসিয়া বলিলেন—However, I wish you success.

বোস্ সাহেব রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—What nonsense do you mean by success ?

মলিক কহিলেন—মানে কি তা মিত্তির বুঝছে, আর আমি জানি। ওসব বোঝা কুন্দমুখী সূর্য্যনন্দিনীর কাজ নয়।

প্রথম ঘণ্টা পড়িল, আমরা কামরার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কামরার ভিতরে, এ ধারের বেঞ্চের উপরে বৃদ্ধ ও তন্বী তরুণীকে বসিয়া থাকিতে দেখা গেল। মলিক আমার গা টিপিয়া কহিলেন—বুড়োটার বরাত ভাল তা' বলতেই হ'বে কিন্তু।

আমি বলিলাম, মেয়েটার বরাত সেই পরিমাণ মন্দ, তা'ও অস্বীকার করা যায় না।

দেখা গেল, বোস সাহেব আমাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছেন।

ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিতেই আমি বন্ধুদ্বয়ের সহিত করমর্দ্দন করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। বৃদ্ধের সঙ্গে এতক্ষণ চাক্ষুষ হয় নাই, তিনি আমাকে দেখিয়া বোধ করি একটু আনন্দিত হইলেন; বলিলেন, ওঃ আপনি আছেন আমাদের সঙ্গে ! আমি ভাবছিলাম কে ডাক্তার মিত্র না কে ডাক্তার মিত্র ! ভালই হয়েছে, বসুন।

তরুণী আমার দিক হইতে সম্পূর্ণ ঘুরিয়া নির্লিপ্তের মত বসিয়াছিলেন, আমিও তাঁহার মুখ দেখিতে পাইতেছিলাম না, তিনিও আমাকে দেখিতে পাইতেছিলেন না।

উঠিয়া পাখা তিনখানা তিন দিকে চালনা করিতেছি, বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন—ও একটা খুব শক্ত আর্ট, ডক্টর মিত্র, কোন মতেই আয়ত্ত করা যায় না। রেলের পাখার এমনই মজা যে যে-রকম করেই ঘুরিয়ে দিন না, হাওয়া মনের মত কিছুতেই পাবেন না।

কথাটা মিথ্যা নয়, আবার উঠিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলাম, কতক-বা হইল, কতক-বা হইল না, শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িলাম।

পুরী হইতে খুরদা প্রায় একঘণ্টার 'রাস্তা' ! আশ্চর্য্য, তরুণী সেই যে ওপাশে, বাহিরে মুখ রাখিয়া বসিয়া রহিলেন, একটি বারের জন্য মুখ ফিরাইলেন না। বৃদ্ধও তাঁহাকে ডাকিলেন না, সদ্য-ক্রীত একখানা 'এডগার ওয়ালেস' খুলিয়া তন্ময়ভাবে পাঠ করিতে লাগিলেন। সুটকেস্ খুলিয়া আমিও অনেক-

জন্য টাইমস্' 'পিয়ার্সন' 'ষ্ট্রাণ্ড' 'রেড' বাহির করিয়া পাতা উল্টাইতে বসিলাম।

খুরদায় থামিতেই, তরুণী বৃদ্ধকে বলিলেন, খাবার দিই তোমায়?

দাও।

এই সময়ে তাঁহাদের ভৃত্য আসিয়া জলের কুঁজা টানিয়া, টিফিন-কেরিয়ার বাহির করিল, তরুণী পরম যত্ন সহকারে কেরিয়ার খুলিয়া বৃদ্ধের সামনে একখানা কাঁচের প্লেট পাতিয়া খাবার সাজাইতে লাগিলেন। আমি রেলের খানা-ঘরের উদ্দেশ্যে পদচালনা করিলাম। খানা-কামরায় বুভুক্ষু বড় কেহ ছিলেন না, এক কোণে একটি ফিরিঙ্গি বসিয়া 'রম্য' পান করিতেছিলেন, অপর প্রান্তে আমি! শুভ্রশ্মশ্রুশোভিত-মুখমণ্ডল শ্রীমান বয় আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সার্ভ করিতেছিলেন। ভাগ্য সেই বৃদ্ধের! পাশে বসিয়া তেমন যত্ন করিয়া কেহ আমাকে খাওয়ায় নাই। সেই খাওয়ানোর মধ্যে কত সুখ, কত তৃপ্তি, আর না-খাওয়ানের ভিতর যে কত দুঃখ, কত অতৃপ্তি, আজিকার পূর্ব্বে এমন করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কখনো করি নাই!

অন্যমনস্ক ছিলাম বলিয়াই বোধ করি গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত খানা শেষ করিতে পারি নাই। হুইসিল্ দিতেই চমক ভাঙ্গিল, বিলে কত লেখা ছিল, না দেখিয়াই পাঁচ টাকার একখানা নোট্ প্লেটের উপর রাখিয়া দিয়া চলন্ত গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। গাড়ীতে উঠিয়া দেখি, কুরুক্ষেত্র ব্যাপার! কর্ত্তাটি বিছানায় পড়িয়া কাটা কৈ মাছের মত ছটফট করিতেছে, কাতরাইতেছে, আর তরুণী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুইহাতে তাহাকে চাপিয়া ধরিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। বৃদ্ধের চক্ষু দুইটা যন্ত্রণার চোটে যেন ঠিক্‌রাইয়া আসিয়া পড়িতেছে, আর ভয়ে-ভাবনায় উদ্বেগে-আশঙ্কায় তরুণীর রক্তিম কপোল অধিকতর রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, ললাটে, ওষ্ঠে স্বেদবিন্দু সমূহ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, বুঝি বা চোখের কোণও বাষ্পে ভরিয়া গিয়াছে।

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমি তরুণীর ঠিক পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে ওঁর?

বৃদ্ধ আমাকে দেখিয়া যেন অনেকখানি ভরসা পাইয়া শয্যা হইতে একটুখানি উঠিবার চেষ্টা করিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন; তারপর বুকের একটা অংশ ও নাসারন্ধ্র দেখাইয়া অতিকষ্টে এইটুকু শুধু বুঝাইতে পারিলেন যে বড় যন্ত্রণা, নিঃশ্বাস ফেলিতেও কষ্ট হইতেছে, প্রাণ বুঝি বাহির হইয়া যায়।

তরুণী নিঃশব্দে বৃদ্ধকে ধরিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ রকম 'পেন্' ওঁর কি আগেও হয়েছে?

তরুণী কথা কহিলেন না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হ্যাঁ।

বলিলাম—মাঝে মাঝে হয় নাকি?

এইবার বীণা বাজিল। এই বিপদের সময়ও তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বরটাই আমার বেশী করিয়া কাণে বাজিল; মরমেও পশিল-বা।

তরুণী কহিলেন, আগে খুবই হোত; পুরীতে এই মাস দুই কিছু হয় নি।

যন্ত্রণাতিশয্যে বৃদ্ধের গোঙানি আরও বৃদ্ধি পাইল; প্রশ্নোত্তরমালার সংখ্যাবৃদ্ধি না করিয়া বলিলাম—আমি একবার দেখতে পারি?

তরুণীর বোধ করি এই 'অনধিকার চর্চ্চায়' সম্মতি ছিল না, তিনি কোনরূপ সাড়াশব্দ করিলেন না। বৃদ্ধ দু'টি হাত বাড়াইয়া আহ্বান করিলেন। কোন্ জায়গাটায় ব্যথা জানিয়া লইয়া, ওধারের বেঞ্চের তল হইতে ব্যাগটা বাহির করিয়া বুক-পরীক্ষার যন্ত্রটি আনিয়া বৃদ্ধের বক্ষ পরীক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যদি আপত্তি না থাকে, একটা ইঞ্জেকসান দিই?

বৃদ্ধ তরুণীর পানে চাহিলেন; তরুণী কোন কথা কহিলেন না। আমি তাহার মনোভাব বুঝিলাম। কিন্তু বৃদ্ধের কাতরানী অসহ্য বোধ হইতেছিল, পুনশ্চ বলিলাম—আপনি ভয় পাবেন না, আমি একটু আধটু ডাক্তারি ক'রে থাকি। বলিয়া ভেষ্টের পকেট হইতে কার্ডকেসটি বাহির করিয়া একখানি কার্ড তাঁহার দিকে প্রসারিত করিয়া ধরিলাম। নিষ্প্রাণ কার্ড, তাই সেই চম্পকাঙ্গুলীধৃত হইয়াও যে প্রাণহীন, সেই প্রাণহীন!

বলিলাম, কি বলেন, দোব?

তরুণীর মুখে একটুখানি হাসি দেখা গেল। খুব ভোরে আকাশের কোণে যেমন একটুখানি আলো দেখা যায়, এই হাসিও তেমনই একটুখানি; তেমনই স্নিগ্ধ, তেমনই মধুর।

ইঞ্জেকসান দিয়া, যন্ত্রপাতিগুলা গুছাইয়া আমার বেঞ্চে গিয়া বসিলাম। বৃদ্ধের চক্ষুদ্বয়টি তখন নিদ্রায় মুদিত হইয়া আসিতেছে।

বলিলাম, তিন চার ঘণ্টার মধ্যে সম্ভবতঃ ঘুম ভাঙ্গবে না; তারপরে একটা ওষুধ দিতে হ'বে।

আশ্চর্য্য এই নারী! ক্ষুদ্র একটি 'ও' বলিয়া বৃদ্ধের মাথার ভিতরে আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। একটি কৃতজ্ঞতার কথা বা একটি ধন্যবাদসম্বলিত চাহনি, তাহা বিতরণেও কি কার্পণ্য! যাক্, আমি ধন্যবাদের আশায় ডাক্তারী করি নাই, মনটা একটু বিষণ্ণ হইলেও তাহা লইয়া আন্দোলন করিয়া মস্তিষ্ক উষ্ণ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। ভাবিলাম, শুইয়া পড়ি: আবার ভাবিলাম, আমার কর্ত্তব্য করিতে আমি কুণ্ঠিত হই কেন? বলিলাম, আপনি নির্ভয়ে শুয়ে পড়ুন উনি তিন চার ঘণ্টা বেশ ঘুমিয়ে নিতে পারবেন। যদি অসুবিধা হয় বলুন, আমি উপরের বাঙ্কে গিয়ে শুই।

নারী কহিলেন—না, অসুবিধে আর কি হ'বে? আমি ত শোব না।

ইহার পরে তাঁহাকে কোন কথা বলার সাহস আমার হইল না। আমি ওদিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ছাই ঘুম কি আসে?

ঘণ্টাখানেক পরে মুখ ফিরাইয়া দেখি, তরুণী ঠিক সেই ভাবে বসিয়া বৃদ্ধের পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। উঠিয়া, স্নান-কামরায় গিয়া মুখে, মাথায়, ঘাড়ে জল দিয়া আসিয়া, আবার চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিলাম কিন্তু সেই যে একটা বুড়া, অপর্ব্ব, অশক্ত, মরণোন্মুখ বৃদ্ধের জন্য এক স্ফুট-যৌবনা নারী সারারাত্রি জাগিয়া অক্লান্ত সেবা করিতেছে তাহারই বিসদৃশ দৃশ্যটা চোখে মনে এমনই জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল যে নিদ্রা সে পথ স্পর্শও করিল না।

রাত্রি বোধ হয় ১টা, তরুণী তখনও বসিয়া। ধীরে ধীরে বুড়ার বুকে হাত বুলাইয়া তাহার রোগ বালাই আপদ বিপদ সব যেন মুছিয়া লইতেছে। বৃদ্ধ অঘোরে নিদ্রিত। হায় বৃদ্ধ, যে চম্পকাঙ্গুলি গুলি ফুলমালা গাঁথিবার জন্য সৃষ্ট, তুমি তাহার কি শোচনীয় ব্যবস্থা করিয়াছ? যে তরুণ হৃদয় শ্রাবণের মেঘভারানত আকাশের মত প্রেমভারে অবনত থাকিবার কথা, তোমার নিদারুণ নিষ্ঠুরতায়, স্বার্থপরতায় তাহার কি অবস্থা? এ পদ্মের মৃণালের মত হাত দুখানি কি তোমার রোগে সেবা করিবার, তোমাকে ঔষধ গিলাইবার জন্য রচিত হইয়াছিল? হিন্দুনারী এমন করিয়া আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, সে দৃষ্টান্ত ভারতে—বাঙলায় বিরল নহে; কিন্তু তুমি, বৃদ্ধ, তুমি কি করিয়াছ? তুমি এ কুসুমকলি বৃন্তচ্যুত করিয়া কিছুকাল পরে ধরিত্রীর অভিশাপের মত ফেলিয়া রাখিতে, এ কি করিয়াছ?

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল; বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, তিনি বলিলেন—নীলা, ডক্টর মিত্র কি ঘুমিয়েছেন?

আমি জাগিয়াই ছিলাম, কিন্তু সাড়া দিলাম না। বড় লোভ হইল, তরুণী একবার মধুর কণ্ঠে নাম ধরিয়া ডাকেন।

উত্তর হইল, বোধ হয় ঘুমুচ্ছেন। তুমি কেমন আছ?

ভালই; কিন্তু তিনি যে কি ওষুধ দেবেন বলেছিলেন নীলা।

নীলা বলিলেন—ভাল যখন আছ, ওষুধে আর দরকার কি?

পাছে ডাকিতে হয়, আত্মীয়তা করিতে হয়, নীলা কথাটা চাপা দিয়া দিল; বলিল—একটু নেবুর রস দোব, খাবে?

দাও।

একটা ঔষধ দেওয়ার দরকার ছিল, বিনা আহ্বানেই নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়া বসিয়া, চোখ রগড়াইয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কেমন, এখন আর যন্ত্রণা নেই ত?

আজ্ঞে না, বেশ ঘুমিয়েছি।

আর একটা ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে ফেলুন, সম্ভবতঃ কিছুদিন ভালই থাক্‌বেন।

ওষুধটা দিয়া, বলিলাম, লেবুর রসটা একটু পরে খাবেন, অন্ততঃ পনেরো মিনিট পরে।

যিনি লেবুর রস করিতেছিলেন, তিনি বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত নেত্রে আমার পানে চাহিলেন। মনসিজ নহি, অথবা আগেই মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছি, সে দৃষ্টি-বাণ সহাস্যে সহ্য করিলাম। হাসির উত্তর যে হাসিতেই দিতে হয়, তরুণী তাহা জানেন দেখিলাম। তৃপ্তিতে বুকটা ভরিয়া গেল—নীলা যে দেবী নয় পাষাণী নয়, সেও যে মানুষ, রক্তমাংসে, আশায় আকাঙ্ক্ষায় গড়া মানুষ, এইটুকুই ভাবিয়াই মন যেন পুরী এ প্রেমের মত মানবী [illegible] যেন করিয়া

চলিতে লাগিল। তাহারও পথের বিঘ্ন স্বরূপ ষ্টেশন আছে, সিগন্যাল আছে, গার্ডের রক্ত-পতাকা আছে, সে-যে পরস্ত্রী মুহূর্তের জন্ম তাহা ভুলিয়া গিয়া বলিলাম—ও রসটা আর পাবেন না। যখন উনি খাবেন, আবার তৈরী করে দিতে হ'বে। স্বরটা নিজের কাণেও অপরিচিতের মত ঠেকিল; বুঝিলাম, বড় বেশী মধুর করিতে গিয়া ঐরূপ হইয়া গিয়াছে. একটু লজ্জা হইল।

নীলা এবার সোজা চাহিয়া, তেমনি মধুর হাসিয়া বলিলেন—আবার ক'রে দোব'খন।

ইহার পরে আর কোন কথা হয় নাই, আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, ঘুম যখন ভাঙ্গিল, রামরাজাতলা। গাড়ী থামিয়াছে, টিকিট লইতে লোক উঠিয়াছে। চক্ষু মুদিয়াই টিকিট খানা দিলাম। তারপর চক্ষু মেলিলাম—সুপ্রভাত! সুপ্রভাতই বটে! তরুণী স্নিগ্ধোজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমারই পানে চাহিয়া!

বলিলাম সু-প্রভাত!

বৃদ্ধকে নমস্কার করিলাম। তোয়ালে ব্রাস প্রভৃতি লইয়া স্নান-কামরায় প্রবেশ করিলাম।

হাওড়ার ডিষ্ট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে গাড়ী আবার থামিল, আমি বাহিরে আসিতেই তরুণী বৃদ্ধের উদ্দেশে বলিলেন—ডক্টর মিত্রের ফি-টা, ওষুধের দামটা··

বলিলেন—এখানে কেন নীলা, ডক্টর মিত্র কি আমাদের বাড়ীতে একদিন আসবেন না? ··

তারপর, আমার পানে চাহিয়া, বৃদ্ধ কতকটা কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন—ডক্টর, আপনার ফি-টা···

ফি কিসের? আমি ত ডাক্তারী করি নি।

নীলা কহিলেন—না করেছেন, না করেছেন। আপনার ঠিকানাটা কি বলুন তো?

আমার কার্ডে—

কোথায় গেল কার্ডটা! এই যে! কার্ডখানা হতাদরে মেঝের ধূলাকাদা মাথিয়া পড়িয়াছিল। যে তাহাকে অযত্নে অনাদৃত করিয়াছিল, সেই তাহাকে তুলিয়া সযত্নে বক্ষঃবাসে মুছিয়া পাঠ করিয়া কহিল, এই ত ঠিকানাও আছে, ফোন নম্বরও আছে, তাহাই হয়েছে। বলিয়া কার্ডখানি সে বুকের আমার ভিতরে ফেলিয়া দিল। মুখে সেই হাসি, অধরে সেই নবীনতা, চক্ষে সেই চঞ্চলতা।

গাড়ী আর ছাড়ে না। হাওড়া ষ্টেশনের সঙ্গে বি-এন-আরের গাড়ীর যেন সতীন সম্পর্ক! অবশ্য, আমার পক্ষে গাড়ী এইখানে জন্ম জন্ম থামিয়া থাকিলেও মঙ্গল।

বৃদ্ধ বাথরুমে যাইতেই নীলা বলিল—আপনি আমাদের বাড়ী আসবেন, না আমরা যাব, ফি-টা দিয়ে আসতে? আমাদের ঠিকানা, নিউ পার্ক ষ্ট্রীট, দশ নম্বর।

আমি সাহসে ভর করিয়া কহিলাম—ফি-টা কি নিতেই হ'বে বলে মনে করেন?

নীলা রাগতভাবে কহিল—না নেবেন কেন? আপনি কিছু চ্যারিটেবল হস্‌পিটাল নন্, আর আমরাও আউটডোর পেসেণ্ট নই! টাকা আপনাকে নিতেই হবে।

আমি কুণ্ঠিত স্বরে কহিলাম—আমি কিন্তু একটি ধন্যবাদেই সন্তুষ্ট। সেটা এখনো পাই নি।

নীলা হাসিয়া বলিলেন—সে ত পাবেনই! ক'বে আসবেন বলুন? আজই বিকালে আসুন না। আমরা বাড়ীতেই থাকবো।

বেশ, আসবো।

নীলা তখনই মুখটি অন্যদিকে ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সেই মুর্গী-কেনা বন্ধুটি কোথায় গেলেন? ক'দিন কি পেছুই নিয়েছিলেন আপনারা! জ্বালাতন করে তুলেছিলেন আর কি! সমুদ্রের ধারে বীচ্‌টি জোড়া ক'রে বসবেন সাহেবরা, বাজারে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবেন সাহেবরা, আবার এক সঙ্গে মুর্গীও কিনবেন সাহেবরা!

হাত জোড় করিয়া কহিলাম, ক্ষমা ··

নীলা হাসিয়া কহিল—আচ্ছা, আসবেন ত বিকালে, তখন দেখা যাবে।

বলিলাম, ক্ষমা করবেন অভয় দেন যদি···

বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল; নীলা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া লইয়া কহিলেন—সিগন্যাল ডাউন···

আমি বলিলাম, অর্থাৎ গাড়ী যেতে পারে। আমাদের অপরাধের সিগন্যালটা ডাউন হ'লে আমিও যেতে পারি।

যে হাসিতে ভুবন ক্রয় করা যায়, যে কটাক্ষে ত্রিভুবনেশ্বর মহাদেবের পাষাণ অঙ্গও বিচলিত হয়, যে স্বরে মৃত জীবিত হইয়া উঠে, সেই হাসিতে, সেই কটাক্ষে, সেই স্বরে নীলা বলিলেন—ডাউন, ডাউন, অতো ভাবতে হ'বে না আর। আসবেন, ঠিক পাঁচটায়, ঐখানেই চা খাবেন।

"শুধু চা কেন, ডক্টর মিত্র আজ আমাদের ওখানেই ডাইন করবেন বলে দাও না!" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ বাথ-রুম হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

হাওড়ার প্ল্যাটফর্মে বেয়ারা আসিয়া জিনিষপত্র নামাইয়া লইতেছিল, নীলার সেই প্রসিদ্ধ ছড়িটা তাহার কুক্ষিগত দেখিয়া, মৃদুস্বরে কহিলাম—ছড়িটা—

নীলা বুঝিলেন, কথাটা শেষ না হইতেই বলিলেন, ওটা বিদেশের জন্য। যেখানে মন্দ মিনসেরা লোকের চলাফেরার পথ আটকে বীচ্ জুড়ে বসেন, সেখানকার জন্যে।

তাঁহাদের মোটরে তুলিয়া দিলাম; নীলা বলিলেন—পাঁচটায় আসছেন ত?

মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম; দেখিলাম, বৃদ্ধ নীরব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ডেনমার্কের যুবরাজ ভাবিয়াছিল To be or not to be, আমি ভাবিতে লাগিলাম, To go or not to go! ব্যাপারটা যে জমিয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বোধ হয় সেই জন্যই বিদায়কালে বৃদ্ধের মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, যাইব না। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা হওয়ায় নীলার যত কষ্টই হোক, তাহার উপশম করিবার জন্য আমার ডাক্তারিতে কাজ নাই!

কিন্তু ঘড়ির চারটা আমাকে যে চারিদিক হইতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে তাহা ত জানিতাম না। শেভ্ করিয়া, ধুতি চাদরে সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

বৃদ্ধ ড্রয়িং রুমে ছিলেন, অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া, অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন, নীলা!

কেন বাবা!

মনে হইল ভুল শুনিয়াছি; উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল।

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন—ডক্টর মিত্র এসেছেন।—বলিতে বলিতে নীলা ঘরে ঢুকিলেন।

নমস্কার করিয়া, সেটিতে বসিয়া কহিলেন, পাঁচটা বেজে গেল দেখে বাবা বলছিলেন, আপনি বোধ হয় আর এলেন না। আমি কিন্তু বলেছিলুম…

বেয়ারা আসিয়া বৃদ্ধের হাতে একখানি কার্ড দিতেই, বৃদ্ধ 'এক মিনিট, আসছি', বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আমি উঠিয়া নীলার সেটিতে, নীলার পার্শ্বে বসিয়া বলিলাম, তুমি কি বলছিলে যে আমি আসবই—কেমন?

নীলা হাসিয়া বলিল—নিশ্চয়ই! কথা দিয়েছেন যে!

শুধু কি সেই জন্যেই?

তা কি জানি?

নীলার হাতটা ধরিয়া ফেলিলাম; বলিলাম, জান না হ'তে পারে; কিন্তু বুঝতেও কি পার না, নীলা?

নীলা মুখ নীচু করিল।

* * * *

বিবাহটা ব্রাহ্মমতে হইল বটে, বাসরটা মলিক্ একেবারে সেকেলে পাড়াগেঁয়ে বাসর করিয়া ফেলিয়াছিল। আর তাহার সংস্কৃত ছড়ার কি ছটা! এক আধবার "বৃদ্ধস্য—" টাও বলিয়া জিভ্ কাটিয়া, ক্ষমা চাহিয়া বাঁচিয়াছে।

ললাটে সিন্দুরবিন্দু ও সীঁথির সিন্দুররেখা যে একই পদার্থ নহে এ সত্যটা আমাদের জানা ছিল না। এখন জানিয়াছি, এখন কুমারী মেয়েদের কপালেও সিন্দুরবিন্দু দেখি, আর ভুল হয় না।

মলিক্ কহেন, অমন ভুল করিতে তিনি জন্ম জন্ম প্রস্তুত।

বোস্ কিছু বলেন না, তাঁহার সূর্য্যানন্দিনী বড় কড়া হাকিম।

আমি বলি, অমন ভুল আর যেন কখনও করিতে না হয়।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

সাহিত্যের আদর্শ লইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যাতে একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিতে আরো কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

সাহিত্যের আদর্শ যদি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও রস-সৃষ্টি হয়—তবে মানব কল্যাণের দিক দিয়া তাহার সার্থকতা কতখানি?

আদর্শের পূর্ণতার জন্য আরো কিছুর প্রয়োজন। সৌন্দর্য্যবোধে—আনন্দবোধ, আনন্দবোধে সত্যানুভূতি। সত্যানুসরণে মানব কল্যাণের সূচনা সাহিত্যকে নব রসে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে। নতুবা অতীন্দ্রিয় (idealistic) সাহিত্যই হউক আর একেবারে রক্তমাংসের (flesh & blood) বস্তুতান্ত্রিক (realistic) সাহিত্যই হউক আদর্শের মূল তত্ত্বের সঙ্গে যোগ না থাকিলে তাহা বাঁচিবে না—বাঁচিতে পারে না।

সাহিত্যের স্বরূপ, আদর্শ ও সীমারেখার বিচার-বিতর্ক, যতদিন সাহিত্যের প্রাণ-শক্তি থাকিবে ততদিন চলিবে—চলাটাই জীবনের লক্ষণ—অগ্রসরের মধ্যপথে অতিবুদ্ধিমানের মত শেষ এবং স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলে সাহিত্যের সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করা হইবে। তর্কবিতর্ক চলুক—সৃষ্টির কাজ তাহাতে কখনই বাধা পাইবে না। সমস্ত তর্কযুক্তির বাহিরে, প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির উপরে, মতান্তর ও মনান্তরের সংক্রামক স্পর্শ হইতে মুক্ত এমন সত্যকার সাহিত্য-রস আপনার মধ্যে পরিপূর্ণ হইয়া আছে: সেই রসোপলব্ধির জন্যই আমরা কৃতসঙ্কল্প হইয়া সাধনায় অবহিত হইব।

কর্ম্ম-ব্যর্থ তরুণ সাহিত্যিক জীবনের মধ্যে যে Nomesis আজ কাল দেখা দিয়াছে তাহার বর্ত্তমান যেমন নৈরাশ্যব্যঞ্জক পরিণাম তেমনি ভয়াবহ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য তাহাদের যাহারা মাসিকপত্র চালাইয়া ব্যবসাদার বণিতে চায় না, সাধারণের বিকৃত রুচির খোরাক যোগাইতে প্রস্তুত নহে; সত্যকার সাহিত্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মধ্যে যাহারা নির্লোভ সাহিত্য জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় সর্ব্বাপেক্ষা বিড়ম্বনা হইয়াছে তাহাদেরি। আদর্শের পথে প্রতিবন্ধকও দেখা যাইতেছে অনেক:—

(১) অর্থাভাব অথবা অর্থের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তাহার অপব্যয় (২) সাধারণ পাঠক পাঠিকার সহানুভূতি ও সাহায্যের অপ্রতুলতা (৩) অসাহিত্যিকগণের পত্রিকা-পরিচালনের বিরুদ্ধ আন্দোলন (৪) সাহিত্যে স্বকীয়তার অভাব—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধক। শেষ প্রতিবন্ধকটি আজকাল কাব্যে উপন্যাসে কবিতায় ও প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। মুগ্ধ হইবার মত, প্রেরণা অনুভব করিবার মত, সম্পূর্ণ নবীন ভাব ও দ্যোতনায় সঞ্জীবিত হইবার মত উপকরণ আজ সাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিতেছে। গতানুগতিক পথ দিয়া পরিচিত স্থানে যাওয়া চলে—মামুলি দেখাশুনা ও কুশল প্রশ্নের পর, কথা আর নূতন দিকে অগ্রসর হয় না—ক্লান্তি আসে,—বহু চেষ্টায় কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিতে হয়। রস-পিপাসু হৃদয় নৈরাশ্যে ভরিয়া উঠে—

'কোনও দিন আর গোপন খবর নূতন মিলেনা কিছু।'

অপরিচয়ের পথে চলিবার উৎসাহ ও উত্তেজনা জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে একান্ত প্রয়োজন। অদেখা, অচেনা জনের সহিত—দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশার পর যে পরিচয়—তাহার মধ্যে আনন্দ আছে—উৎসাহ আছে—প্রেরণা আছে—নব-জাগ্রত অন্তরের অন্তরালে দীর্ঘ দিন যাহার গোপন অন্বেষণ চলিয়াছে—তাহার দেখা পাইয়া বিস্মিত হই—মুগ্ধ হই—অননুভূত আনন্দে সর্ব্ব দেহ মন ভরিয়া উঠে।

বর্ত্তমান সাহিত্যে স্বকীয়তা বিলুপ্তপ্রায় বলিয়া প্রতিদিনকার অভ্যস্ত পথে বারবার পরিচিত জনেরই দেখা পাইয়া হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; অতৃপ্তিতে বিরক্তি ও অস্বস্তি বোধ হয়। সাহিত্যের অনাবিল স্রোতে আজ ভাঁটা পড়িয়াছে—মাঝে মাঝে জোয়ারের জল আসিয়া বদ্ধ স্রোতে আঘাত করিতেছে কিন্তু পুঞ্জিভূত আবর্জ্জনা নিঃসরণের পথ অবরোধ করিয়া আছে। বিপুল বল ও অকুণ্ঠ সাহসে সে আবর্জ্জনা বিদূরিত করিতে হইবে।

পূর্ব্বাশা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত 'পূর্ব্বাশা'র প্রথম বর্ষ ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ) পাঠ করিয়া আমরা নানা আনন্দলাভ করিলাম। প্রথম আনন্দ—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'পূর্ব্বাশা'য় একটী গল্প লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় আনন্দ—গল্পের নাম "যৌবন"। তৃতীয় আনন্দ—এই গল্পের মধ্যস্থ অচিন্ত্যকুমারের 'পিসেমশাই'। আর শেষ আনন্দ—'পিসেমশায়ের' 'তানপুরা বাজানো'। এই তানপুরার ওস্তাদ পিসেমশায়ের পরিচয় নিরানব্বই মুখেও প্রকাশ করা সম্ভব নহে, তথাপি যথাসম্ভব সে চেষ্টা না করিলে পূর্ব্বাশার প্রতি অন্যায় করা হইবে, কারণ স্বয়ং সম্পাদকই বলিয়াছেন—

এই সংখ্যায় আছে :—

১। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
'যৌবন'।

সমাজ-বিরুদ্ধ অথচ আইন-সঙ্গত বিবাহে সদ্য-বিবাহিতা up to date তরুণী 'করুণা' বাবা-জ্যেঠা-কাকা-দাদার দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া তাহার পত্নী-প্রাণ ধনবান 'বাবাজী' স্বামীকে (অন্য নামও কোথাও মিলিল না) লইয়া কলিকাতা হইতে যখন সুদূর-পল্লীবাসী পূর্ব্ববঙ্গীয় ছেষট্টি বৎসর বয়স্ক বিপত্নীক পিসেমশায়ের বাড়ীতে 'মধুচন্দ্র' করিতে গেল, তখন পিসেমশায় তাহাদের দুজনকে অর্দ্ধচন্দ্রের পরিবর্ত্তে এক পাল্কীতে উঠাইয়া 'বাবাজীর' কানের কাছে মুখ আনিয়া চাপা গলায় কি বলিলেন? বলিলেন,—

—'ট্রেণে, ষ্টিমারে, পাল্কির মত প্রেম জমে না, বাবাজী—সেখানে অনেক যাত্রী, অনেক জায়গা। গায়ে গা না লাগিয়ে এখানে (পাল্কীতে) বস্‌তে যাওয়াই বিপদ—বুঝলে, এমন সুবিধা আর পাবে না।'

এ-পক্ষে 'বাবাজী' বৃদ্ধ পিসেমশায়ের লাঠি ধরিবার ভঙ্গির কঠিন তেজ ইত্যাদি দেখিয়া ভড়কাইয়া গেলেন না, বরং ভাবিলেন :—

'করুণাকে যে আমি কতো ভালবাসি তাহা এতদিনে এই পিসেমশায়কে দেখিয়া বুঝিলাম।'

তাহার পর ছেষট্টি বৎসরের সেই পিসেমশাই ৫ সের দুধের পায়েস সহ অন্নব্যঞ্জনাদি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সেই রাত্রিতে পুকুরে নামিয়া ডুব দিয়া ফিরিয়া আসিলেন ও খাওয়া দাওয়ার পর উঠানে পাটি বিছাইয়া তানপুরা লইয়া বসিলেন। যাঁহারা কালে কস্মিনেও তানপুরা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ভাবিতেছেন এইবার পিসেমশায়ের গান হইবে। কিন্তু সে আশা অসঙ্গত। তিনি এমন তানপুরা বাজাইতে লাগিলেন যে,—

'দেখিতে দেখিতে চারিদিকের অটল স্তব্ধতা সুরের ঝঙ্কারে গলিয়া পড়িতে লাগিল। সেই সুর এমন করুণ ও উদাস যে মনে হইল দূরের নদী, পাট-ক্ষেত, মাঠ-ঘাট সব যেন কাঁদিতেছে।‥ ……তানপুরা বাজাইয়া পিসেমশাই কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন। সুরের আগুনে ছুরির ফলার মত দুই চোখ তাঁহার তখনো চক্‌চক্ করিতেছিল।'

যদি কোন সেকেলে সাধারণ পাঠক ভাবেন যে গানের কথাটা উল্লেখ করিতে লেখকের হয়ত ভুল হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য পুনরায় নৌকাভ্রমণ উপলক্ষে করুণা কহিল,—'তুমি তোমার তানপুরা নিয়ে বস্‌বে, ঢেউয়ের শব্দের সঙ্গে মিশিয়ে আমরা তোমার বাজনা শুন্‌বো।'

এ হেন তানপুরা বাজিয়ে পিসেমশাই নৌকাডুবি হইয়া যখন মারা গেলেন, তখন তিনি কি বলিয়া গেলেন? অচিন্ত্য-কুমার বলিতেছেন :—"অশ্রু-আচ্ছন্ন চোখে আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি তিনি আমার দিকে চাহিয়া তেমনি হাসিয়া বলিতেছেন :—সাবাস্ বাবাজী, জীতা রহো।"

পিসেমশাইএর আশীর্ব্বাদ সফল হইতেছে। তাঁহার তানপুরাটিও যে কোথায়—তাহা আমরা বুঝিয়াছি। তোমার আমার তানপুরা কেবল একঘেয়ে 'ম্যাঁও ম্যাঁও' করে, কিন্তু পিসেমশায়-প্রদত্ত তানপুরার সুর যেমন করুণ, তেমনি উদাস। তাহার ঝঙ্কারে বাংলা-সাহিত্যের চারিদিকে অটল স্তব্ধতা গলিয়া পড়িতেছে, তাহার সুরের আগুনে দেশের নদী, পাট-ক্ষেত, মাঠ-ঘাট সব যেন কাঁদিয়া উঠিতেছে!

আমাদের একজন 'কম্পোজিটর্' সেদিন আর একজনকে বলিতেছিল—পিসেমশাইএর স্থানে দাদামশাই ও তানপুরার স্থানে সেতার বসাইয়া দিলেই ত গল্পটী বেশ মনোহারী হইত। কুমিল্লার সিংহ-প্রেসে ভাল কম্পোজিটর্ থাকিলে সে-ই এই সামান্য ত্রুটী শুধ্‌রাইয়া লইতে পারিত। অপর জন

করিল—দূর মূর্খ, তাহা হইলে বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর সমাজ, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ও অনভিজ্ঞতা যে প্রতিভার খোরাক যোগাইতেছে সেই অচিন্ত্য-প্রতিভাকেই খর্ব করা হইত।

সাহিত্যিক বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই সব বিশ্বাস-ঘাতক ডেঁপো কম্পোজিটরদের আমরা বরখাস্ত করিয়াছি।

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

প্রথমেই শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শান্ত' কবিতা।

"বিদ্রুপবাণ উদ্যত করি
এসেছিল সংসার,
নাগাল পেল না তার।"

একথা আংশিক সত্য, কারণ মাঝে মাঝে নাগাল যে পায় তাহার পরিচয় লোকে পাইয়াছে। তথাপি সুখের বিষয় এই যে—

"আপনার মাঝে আছে সে অনেক দূরে।
শান্তমনের গুরুগহনে
ধ্যানের বীণার সুরে
রেখেছে তাহারে ঘিরি।"

তাহার পর পত্রধারার পদাবলীতে, গল্পে, ভূমিকায়, সমালোচনে, বক্তৃতায়, উপন্যাসে, ইতিহাসে, ভূগোলে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, অলঙ্কৃত নানা পৃষ্ঠা অতিক্রম করিয়া আমরা আসিয়া ঠেকিলাম শ্রীগোপাল লাল দে লিখিত কবিতা 'মেঝেরি'তে। প্রথমে ভাবিলাম, কবি বিনয়বশতঃ স্বীয় কবিতার নামকরণ করিয়াছিলেন 'মাঝারি'; ছাপার দোষে 'মেঝেরি' হইয়া গিয়াছে। তাহার পরই বুঝিলাম প্রবাসীতে এ প্রকার ভুল হওয়া সম্ভব নহে, আর কবিতার আরম্ভেই কবি এই দুরূহ কথাটির অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছেন—

মাঝের ছিড়,
দুইপাশে ক্ষেত দু হাজার বিঘে
মাঝেতে একাকী তরুর শির।

সুতরাং 'মেঝেরি' অর্থে 'মাঝের হিড়'। এখনও যদি কাহারও অর্থবোধ না হইয়া থাকে তবে তিনি আজিও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রখানি পড়িবার উপযুক্ত হন নাই।

তাহার পর পুনরায় অনেকগুলি বহুমূল্য পৃষ্ঠা সমুত্তীর্ণ হইয়া দেখি সম্পাদকীয় বিজ্ঞাপন :—

আষাঢ় সংখ্যায় রহস্যপূর্ণ উপন্যাস আরম্ভ। আষাঢ়ের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত একটি রহস্যপূর্ণ উপন্যাসের মুদ্রণ আরম্ভ হইবে। তাহার প্রথম পরিচ্ছেদের গোড়াটি এইরূপ :—

আমি কে?

প্রশস্ত রাজপথ।..... ....

মৃতা না মূর্চ্ছিতা?

প্রবাসী কি আর বিক্রয় হইতেছে না? তাই অমন অদ্বিতীয় বিজ্ঞ ও গম্ভীর সম্পাদককেও শেষে পাঠকগণের সহিত রহস্য আরম্ভ করিতে হইল!

ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

এবারকার ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য—তাহার প্রথম প্রবন্ধ 'নূতন মনোবিদ্যা' ও মধ্যের বিবিধ প্রসঙ্গ—'স্বপ্নরহস্য, কামমূলক মনোভাব'। দুটিই ফ্রয়েড্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা॥ এ তত্ত্বের আলোচনা যত হয় ততই ভারতবর্ষের সুবিধা।

উপাসনা—বৈশাখ, ১৩৩৯

আমাদের বৈশাখ মাসের উপাসনা আমরা বার বার পড়িলাম। বৈশাখের অনেক কাগজই ত' পড়িয়াছি, কিন্তু এমন কাগজ আর চোখে পড়িল না। একথা কেবলমাত্র আমরাই বলিতেছি তাহা নহে। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক সাহিত্য-পত্রিকা 'নবশক্তি'ও তাহাই বলিয়াছেন। কবিতা ও প্রবন্ধ সমূহের অকুণ্ঠিত প্রশংসান্তে নবশক্তি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পটি যে-কোনও মাসিকপত্রের পক্ষে গৌরবজনক হইত। আমাদের কেবল ক্ষোভ হইতেছে যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পটি (পরাভব) বৈশাখ সংখ্যায় 'ক্রমশঃ' না করিয়া যদি 'সমাপ্ত' করিতে পারিতাম তাহা হইলে সহযোগী 'নবশক্তি'কে কত আনন্দই না দিতে পারিতাম! আমাদেরই অদৃষ্ট!

সাময়িক প্রসঙ্গ

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ভোটাধিকার-ব্যবস্থা

নবপ্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার কি রূপ ধারণ করিবে, তাহা এখনও স্থির নাই। দেশীয় রাজ্যগুলির সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা স্থির না হওয়াই ইহার কারণ। রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হইলে যদি রাজন্যবর্গের প্রস্তাবিত সর্ত্তে দেশীয় রাজ্যগুলিকেও তাহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে তাহার ফল ভাল হইবে কি না, সে বিষয়েও মতভেদ আছে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, নিরবচ্ছিন্ন স্বৈর ব্যবস্থার সহিত নিরবচ্ছিন্ন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্মিলন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘ-গঠনই হয়, তবে বহু প্রস্তাবের পরিবর্ত্তন হইবে বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে বর্ত্তমানে বৃটিশশাসিত ভারতে অধিবাসিগণের ভোটাধিকার-ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া সঙ্গত তাহা বিবেচনা করিয়া মত প্রকাশের জন্য এক সমিতি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। লর্ড লোথিয়ান তাহার সভাপতি ছিলেন। সেই সমিতির নির্দ্ধারণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মূল কথা—

(১) বর্ত্তমানে যে স্থানে ৭০ লক্ষ লোক ভোটাধিকার সম্ভোগ করিতেছে, সেই স্থানে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ লোক সেই অধিকার লাভ করিবে। অর্থাৎ বর্ত্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগের শতকরা ৫ জন মাত্র যে অধিকার পাইয়াছে, ভবিষ্যতে ২৭ জন তাহা পাইবে।

(২) প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের নির্ব্বাচনকারীদিগের এক-পঞ্চমাংশ স্ত্রীলোক হইবেন। যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্ত্রীলোক ব্যবস্থাপরিষদে নির্ব্বাচিত হয়েন, তাহারও ব্যবস্থা থাকিবে।

(৩) ভোটাধিকার লাভের জন্য অপরের যেরূপ যোগ্যতা প্রয়োজন হইবে, শ্রমিকদিগের সেরূপ যোগ্যতা প্রয়োজন হইবে না।

(৪) শিল্প, ব্যবসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়—এই চারি শ্রেণীর বর্ত্তমান অধিকার থাকিবে।

(৫) যাহাতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ ভোটাধিকার লাভ করে, সে ব্যবস্থা হইবে।

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি—পুরুষ ও স্ত্রীলোক—সকলেই ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে ভোটাধিকারী, এই ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। সমিতি মত প্রকাশ করিয়াছেন—বর্ত্তমানে সে ব্যবস্থা গৃহীত হইতে পারে না; কেন না, তাহাতে ভোটাধিকারীদিগের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া দাঁড়াইবে; তবে [illegible] সংখ্যা কিরূপ হিসাবে বর্দ্ধিত করা হইবে, তাহা ব্যবস্থাপক সভাই স্থির করিবেন।

মধ্যে মনে হইয়াছিল, প্রত্যক্ষভাবে ভোট দিবার অধিকার অস্বীকার করিয়া দলবদ্ধভাবে অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ভোট দিবার অধিকারই প্রদত্ত হইবে। তাহা যে হয় নাই, ইহা সুখের বিষয়, সন্দেহ নাই।

কি পরিমাণ সম্পত্তি থাকিলে লোক ভোটাধিকার পাইতে পারিবে, তাহা, বোধ হয়, প্রাদেশিক অবস্থানুসারে স্থির করিতে হইবে।

যে সব পুরুষ উচ্চ প্রাথমিক আদর্শ পর্য্যন্ত বিদ্যার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা শিক্ষিত পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া ভোটাধিকার লাভ করিবেন এবং মহিলারা পড়িতে ও লিখিতে জানিলেই সে অধিকার সম্ভোগ করিতে পারিবেন।

এই নির্দ্ধারণ কার্য্যে পরিণত হইলে বাঙ্গালার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে আমরা সংক্ষেপে তাহাই বিবৃত করিব—

(১) বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় ১৩ লক্ষ পুরুষ ও প্রায় ৪২ হাজার স্ত্রীলোক ভোটাধিকার পাইয়াছেন। ভবিষ্যতে পুরুষ ভোটদাতার সংখ্যা ৬৫ লক্ষ ও স্ত্রীলোক ভোটদাতার সংখ্যা ১৫ লক্ষ হইবে।

(২) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ২৫০ জন সদস্য থাকিবেন।

(৩) নূতন ব্যবস্থাপক সভায় য়ুরোপীয়, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়েরও প্রতিনিধি থাকিবেন।

(৪) ব্যবসায়ীদিগের জন্য ১৫টি, জমিদারদিগের জন্য ৫টি ও বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের জন্য ২টি পদ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় এই ব্যবস্থা থাকিবে।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে (সেনেট) ১২০ জন ও ব্যবস্থা পরিষদে ৩০০ জন সদস্য থাকিবেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক

ব্যবস্থাপক সভা হইতে সদস্য-নির্ব্বাচন হইবে। তবে যাঁহারা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নহেন, তাঁহারাও সদস্য হইতে পারিবেন। এই ১২০ জনের মধ্যে বাঙ্গালা হইতে ১৭ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন। আর ব্যবস্থা পরিষদে বৃটিশ-শাসিত ভারত হইতে নির্ব্বাচিত ৩০০ সদস্যের মধ্যে বাঙ্গালা হইতে ৪৮ জন থাকিবেন। এই ৩০০ সদস্যের মধ্যে ব্যবসায়ীদিগের ৮ জন, শ্রমিকদিগের ৮ জন ও ভূম্যাধিকারীদিগের ৭ জন প্রতিনিধি থাকিবেন।

লর্ড লোথিয়ানের সভাপতিত্বে যে সমিতি কার্য্য শেষ করিয়াছেন, সে সমিতি বৃটিশ-শাসিত ভারত সম্বন্ধে ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, কেবল তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহারা কোন প্রস্তাব করেন নাই। তাহা তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের মধ্যে ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হইলে সেই সকল রাজ্য হইতে কিরূপে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন এবং প্রতিনিধিদের সংখ্যাই বা কিরূপ হইবে, তাহা স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত শেষ ব্যবস্থা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা সমীচীন হইবে না।

আরও একটা কথা আছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান ভারতে হইল না। হয়ত বা যাহাতে সমস্যার সমাধান না হয় সেই জন্যই সময় বুঝিয়া চক্রীরা বোম্বাই সহরে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ইন্ধন প্রজ্জ্বালিত করিয়াছে। এখন বিলাতের প্রধান মন্ত্রী যেরূপে সে সমস্যার সমাধান করিবেন, তাহাই এ দেশের লোককে গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার নির্দ্ধারণ এখনও জানিতে পারা যায় নাই। সুতরাং সেই নির্দ্ধারণফলে লোথিয়ান সমিতির নির্দ্ধারণ কিরূপে প্রভাবিত বা পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহাও বলা যায় না। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠিত হইবে, কি সাধারণ নির্ব্বাচনেই সম্প্রদায় হিসাবে সদস্য-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইবে, অথবা নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা থাকিবে না—তাহা জানিবার কোন উপায় এখনও হয় নাই। কেবল তাহাও নহে; বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্ধারণানুসারে লোথিয়ান সমিতির নির্দ্ধারণের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন কে করিবে?

গোল টেবিল বৈঠকে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি তাঁহার নির্দ্ধারণে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অথচ ইহা মনে করিবার বিশেষ কারণ আছে যে, ব্যবস্থাপক সভা হইতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠানে যদি সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা অস্বীকৃত হয়, তবে অল্পদিনের মধ্যেই ভারতের জাতীয় জীবন হইতে এই কলঙ্কলেপের অবসান হইবে। কারণ, দেখা গিয়াছে, লর্ড মিণ্টো ইহা স্বীকার করিবার পর হইতেই ইহা ঘৃতাহুতিপুষ্ট পাবকের ন্যায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং জাতীয়তার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহা যে জাতীয়তার বিরোধী তাহা স্বীকার করিয়াও যে সকল ইংরাজ রাজনীতিক ভারতের শাসন-ব্যবস্থায়—এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও—ইহা স্থায়ী করেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের কিরূপ বন্ধু তাহা জিজ্ঞাসা করিতে কৌতূহল হয়।

একান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, লক্ষ্ণৌ সহরে কংগ্রেসে ও মসলেম লীগে যে চুক্তি হয়, তাহাতে এই সাম্প্রদায়িকতা স্বীকৃত হইয়াছিল এবং তদবধি—ইহার কুফল প্রত্যক্ষ করিয়াও—কংগ্রেস ইহা অস্বীকার করিবার সাহস দেখাইতে পারেন নাই। কংগ্রেস যখন জাতির প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান তখন কংগ্রেসের পক্ষ হইতেই ইহা অস্বীকার করিবার জন্য সমগ্র জাতিকে অনুরোধ করা আমরা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু দেখিতেছি, তাহাতে কংগ্রেস এখনও অনবহিত!

ব্যয়-সঙ্কোচে বোম্বাই ও বাঙ্গালা সরকার

অন্যত্র বাঙ্গালা সরকারের ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটীর বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

বোম্বাই সরকার ব্যয়-সঙ্কোচের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অন্যান্য প্রদেশে অনুকৃত হইতে দেখিলে আমরা আনন্দ লাভ করিব। বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া তথায় গভর্ণর তাঁহার শাসন পরিষদের সদস্যসংখ্যা ও মন্ত্রীর সংখ্যা হ্রাস করিয়াছেন। তিনি তাঁহার শাসন পরিষদের ২ জন সদস্যের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং ১ জন মন্ত্রীকেও বিদায় দিয়াছেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা সরকার যে ব্যয়-সঙ্কোচ সমিতি গঠিত করিয়াছিলেন, তাহার সদস্যরা বলিয়াছিলেন—শাসন পরিষদে ৪ জন সভ্য ও ৩ জন মন্ত্রী রাখার কোন উপযোগিতা নাই।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে গভর্ণর ৩ জন মাত্র শাসন পরিষদের সভ্য লইয়া কায চালাইতেন এবং ব্যবস্থাপক সভার বিস্তারহেতু কায বাড়িলেও ৩ জনের স্থানে ৭ জন কর্ম্মচারীর প্রয়োজন স্বীকৃত হইতে পারে না। এই উক্তির উত্তরে বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে কোন যুক্তি না দেখাইয়া বলা হয়—

"শাসন পরিষদের সভ্য-সংখ্যা কিরূপ হইবে আইনানুসারে তাহা স্থির করিবার অধিকার ভারত সচিবের আর মন্ত্রীর সংখ্যা স্থির করিবার অধিকার গভর্ণরের।"

ইহাতে বুঝায়, বাঙ্গালা সরকার এ বিষয়ে আলোচনা করিতে ইচ্ছুক নহেন।

ব্যয়-সঙ্কোচ সমিতি যে সময়ের কথা বলিয়াছিলেন, তাহারও পূর্ব্বে অর্থাৎ বাঙ্গালায় গভর্ণর নিয়োগের পূর্ব্বে—একজন ছোটলাট একজন মাত্র সেক্রেটারী লইয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন কার্য্য পরিচালিত করিতেন। তখন ছোটলাটরা মহকুমাতেও যাইয়া কার্য্য পরিদর্শন করিতেন, দেখা গিয়াছে।

যখন বর্ত্তমান ভারত শাসন আইনের পাণ্ডুলিপি পার্লামেন্টের জয়েণ্ট কমিটী কর্তৃক আলোচিত হয়, তখন সেই কমিটী মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—

কোন প্রদেশে ২ জনের কম মন্ত্রী নিয়োগ হইবে না, কোন কোন প্রদেশে মন্ত্রীর সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক করা প্রয়োজন হইতে পারে।

বাঙ্গালায় বার বার স্বরাজ্য দলের চেষ্টায় মন্ত্রিমণ্ডল নষ্ট হইয়াছে এবং নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত—সময় সময় কয় মাস কাল শাসন পরিষদের সভ্যচতুষ্টয়ই সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত উভয় বিভাগের কার্য্য পরিচালিত করিয়াছেন। এই অবস্থায় অবশ্যই বলা যাইতে পারে—বাঙ্গালা সরকারের কার্য্যের জন্য ৪ জন কর্ম্মচারীই যথেষ্ট। যদি পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট কমিটীর নির্দ্ধারণ মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালায় শাসন পরিষদে ২ জন সভ্যকে ও মন্ত্রিত্রয়ের মধ্যে ১ জনকে বিদায় দিলেই চলে।

এই ব্যবস্থায় সরকারী দপ্তরে অন্যান্য কর্ম্মচারীর সংখ্যাও হ্রাস করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালা হইতে বিহার বাহির হইয়া যাওয়ায় বাঙ্গালার খনিজ সম্পদের বিশেষ হ্রাস হইয়াছে এবং বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত বহাল থাকায় বাঙ্গালার সরকারের আয়-বৃদ্ধির পথও সঙ্কীর্ণ। সে অবস্থায় যখন আবশ্যক অর্থের অভাবে সরকারকে বিব্রত হইতে হইতেছে, তখন বাঙ্গালা সরকার কি বোম্বাই সরকারের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া শাসন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ও মন্ত্রীর সংখ্যা হ্রাস করিবেন?

এই সকল রাজকর্ম্মচারীর বেতন যে দেশের লোকের অবস্থার তুলনায় এবং অনেক কর্ম্মচারীর যোগ্যতার তুলনায় অত্যধিক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সে কথাও দেশের লোক বলিয়া আসিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এই আর্থিক দুরবস্থার সময় যদি এই দরিদ্র দেশে রাজকর্ম্মচারীদিগের বেতনের হার হ্রাসের স্থায়ী ব্যবস্থা হয়, তবে তাহা যে দেশের লোকের ও সরকারের পক্ষে কল্যাণকরই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

একান্ত পরিতাপের বিষয়, যে কারণেই কেন হউক না, আজও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ভারতবর্ষের নানাস্থানে উদ্ভূত হইতেছে। বোম্বাইয়ে যাহা হইয়াছে, তাহাতে ব্যথিত হইবার বিশেষ কারণ আছে। বোম্বাইয়ের এই হাঙ্গামায় সরকারী বিবরণানুসারে, প্রায় ২ শত লোক প্রাণ হারাইয়াছে ও প্রায় ২ হাজার লোক আহত হইয়াছে। হতাহতের সংখ্যা সম্বন্ধে সরকারী হিসাব অধিকাংশক্ষেত্রেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য হয় না; তাহার কারণ, অনেক হতাহতকে তাহাদিগের স্বজনগণ গৃহে লইয়া যায়। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে, হতাহতের সংখ্যা আরও অধিক।

অথচ এই হাঙ্গামার কারণ এখনও রহস্যাচ্ছন্ন—বোধ হয়, কখন তাহা জানা যাইবে না। প্রকাশ, কয়জন মুসলমান হিন্দুর নিকট চাঁদা চাহিতে যাইয়া তিরস্কৃত হয় এবং ফলে দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ইহাই যদি দাঙ্গা আরম্ভের কারণ হয়, তবে বুঝিতে হইবে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, সে সব পূর্ব্বেই সঞ্চিত ছিল; কারণ, দাহ্য পদার্থ না থাকিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গপাতে বহ্নির উদ্রেক হয় না। এখন কেহ কেহ বলিতেছেন বটে, কতকগুলি চক্রীর

চৌরা এই ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং তাহারাই পশ্চাতে থাকিয় বিবাদ বাধাইয়াছে ও প্রবল করিয়া তুলিয়াছে ; কিন্তু ইহার কাহারা ? ইহাদিগকে আবিষ্কার করিবার জন্য সরকার বি চেষ্টা করিয়াছেন বা করিতেছেন ? কলিকাতায় কয় বৎসর পূর্ব্বে যখন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার উদ্ভব হইয়াছিল, তখনও দেখা গিয়াছিল, চক্রীদিগের সন্ধান করা যায় নাই এবং লালবাজার পুলিস অফিস হইতে যে মীনা পেশোয়ারী অনায়াসে পলায়ন করিয়াছিল, আজও তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না ! ইহার কারণ কি ?

এবার মহরমের সময় কলিকাতায় যে সামান্য হাঙ্গাম হইয়াছিল, তাহা যে ব্যাপ্তিলাভ করে নাই, ইহা আমর সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কলিকাতায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার মুখপত্র হাঙ্গামার বিবরণে ইহা সাম্প্রদায়িক নহে স্বীকার করিয়াও সম্পাদকীয় মন্তব্যে ইহাকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া অভিহিত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই !

এরূপ ব্যাপারে যে উভয় সম্প্রদায়েরই বিশেষ অনিষ্ট অনিবার্য্য তাহা বুঝিয়া যদি উভয় সম্প্রদায়ের প্রকৃত নেতারা ইহার উদ্ভব অসম্ভব করেন, তবেই উপযুক্ত কায হয়।

কলিকাতায়, ঢাকায়, কানপুরে, বোম্বাইয়ে লোকের ধনপ্রাণ কিরূপভাবে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু কেবল সেই অনিষ্টই অনিষ্ট নহে ; পরন্তু এই সব ব্যাপার জাতীয়তার যে অনিষ্ট সাধন করে, তাহার গুরুত্ব অসাধারণ। বোম্বাইয়ের ব্যাপার যে শোচনীয় তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারতের সকল স্থানেই হিন্দু ও মুসলমান বাস করে। হিন্দু যেমন হিন্দুস্থান হইতে মুসলমানকে বিতাড়িত করিবার কল্পনাও করিতে পারে না, মুসলমানও তেমনই ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুকে বিতাড়িত করিবার কল্পনা করিতে পারে না। এদেশে এক সম্প্রদায়ের কল্যাণে অপর সম্প্রদায়ের কল্যাণ এবং পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া পরস্পরের কোন বৃহৎ অনুষ্ঠানে সাফল্যলাভ করাও অসম্ভব। দেশের অজ্ঞ জনগণকে ইহাই বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং তাহারা একবার ইহা বুঝিলে আর কখন এদেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার উদ্ভব হইবে না।

বাটা কোম্পানীর জুতার ভয়াবহ প্রসার

বাজারে সকল ব্যবসায়ই যখন মন্দা চলিতেছে বিশেষতঃ দেশীয় চামড়া ও জুতার বাজার ক্রমেই যখন নামিয়া চলিয়াছে তখন কলিকাতার প্রত্যেক অংশে এমন কি অন্যান্য বিভিন্ন সহরেও জেকোশ্লোভাকিয়া হইতে আমদানী "বাটা" কোম্পানীর জুতার দোকানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আমরা শঙ্কিত না হইয়া থাকিতে পারিতেছি না। বিগত কয়েকবৎসরে বিদেশজাত জুতার আমদানী অন্যান্য দেশ হইতে কমিয়া গেলেও জেকোশ্লোভাকিয়ার আমদানী বাড়িয়াই চলিয়াছে। সম্প্রতি এরূপও শোনা যাইতেছে যে বাটা সাহেব এবার ভারতবর্ষেই কারখানা তৈয়ারী করার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই পৃথিব্যাপী জুতা-ব্যবসায়ী বাটা সাহেবের কার্য্যতৎপরতা ও ব্যবসায়-বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না ; তথাপি শক্তিমান্ বিদেশী কারখানাওয়ালাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিরূপে ভারতের বিভিন্ন শিল্প বিশেষতঃ কুটীর-শিল্পগুলি নষ্ট হইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ দেশবাসী কি ভাবে নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়িয়াছে তাহার ইতিহাস সকলেই বিদিত আছেন। সুতরাং "বাটা" কোম্পানীর এই নূতন প্রসার হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য ভারতীয় মাত্রেরই এখন হইতে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্

মাসখানেক হইল কোন্নগরে শ্রীদুর্গা কটন মিল্সের ভিত্তি পত্তন হইয়াছে। বাংলায় যত নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে ততই আনন্দের বিষয়। এই কলের কর্ম্মকর্ত্তা কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী এবং ১৪।২ ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীটের বরেন্দ্রকৃষ্ণ শিল্প সমিতি ইহার ম্যানেজিং এজেণ্টস্। আমরা সাফল্য কামনা করিতেছি।

বাংলার লোন আফিস
ও তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থা

—শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস

বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী অর্থ-সঙ্কটের কবল হইতে বাংলা-দেশের সুদূর পল্লীগ্রামবাসীরাও যে রেহাই পায় নাই, তাহা সকলেই জানেন। দেশে এবং বিদেশে লোকের ক্রয়শক্তি কমিয়া যাওয়ার দরুণ এবং অন্যান্য কতকগুলি কারণে, কি সহরে, কি মফঃস্বলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং চাষীদের আর্থিক অবস্থার চরম দুর্গতি ঘটিয়াছে; এবং প্রধানতঃ এই কারণে বাংলার অন্যান্য লোন আফিসের কর্ম্মপদ্ধতি তাহাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য যে অনেকাংশে দায়ী নয়, তাহা বলা যায় না। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা যে খুবই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার ফলে আবার মধ্যবিত্ত চাষী সম্প্রদায়েরও আর্থিক অবস্থা যে আরও খারাপ হইয়া উঠিতেছে, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। আমাদের মত গরীব দেশেও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঞ্চিত প্রায় এককোটি টাকা বিভিন্ন লোন আফিসে খাটিতেছে; বর্ত্তমান সঙ্কটের ফলে প্রায় এই সমস্ত টাকাই যে আটকা পড়িয়াছে, তাহা খুবই চিন্তার বিষয়; কাজেই যাহাতে লোন আফিসগুলির অবস্থার একটু উন্নতি হয়, দেশের প্রত্যেক হিতকামী ব্যক্তির তাহা প্রণিধান যোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটী দুইটী ইতিমধ্যে লোন আফিস গুলির ভবিষ্যত উন্নতির উদ্দেশ্যে যে সব মত প্রকাশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে এতদিনও দেশের লোকের দৃষ্টি পড়ে নাই। এই অবস্থায় লোন আফিস গুলির বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাহার প্রতিকারের জন্য এ পর্য্যন্ত যে সব সমাধানের প্রস্তাব হইয়াছে, সেই সব বিষয়ে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

লোন আফিসের উৎপত্তি—

লোন আফিসগুলির ভবিষ্যতের সহিত বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ যে বিশেষভাবে জড়িত আছে, তাহা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে; কিন্তু অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন জমিদারেরাও যে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে পারেন তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের কতকগুলি অসুবিধা দূর করিবার জন্যই প্রথমে বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে লোন আফিসের উদ্ভব হয়। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে মহাজনী ব্যবসায়ের খুবই প্রচার ছিল। কতকগুলি কারণে যখন এই ব্যবসাতে মন্দা পড়িতে লাগিল, সেই সময় প্রধানতঃ জমিদারদিগকে টাকা ধার দেওয়ার উদ্দেশ্যে ক'য়েকটী লোন আফিসের প্রতিষ্ঠা হয়। দুইটী কারণে এই সময় লোন আফিস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। প্রথমতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির দাম চড়িয়া যাওয়াতে জমি বন্ধক দিয়া টাকা ধার লওয়ার পক্ষে বেশ সুবিধা হইল; দ্বিতীয়তঃ ১৮৬০ সালে যৌথব্যবসায়ে অংশীদারগণের দায় সীমাবদ্ধ করিয়া একটী আইন পাশ হওয়াতে সম্মিলিতভাবে ব্যবসায় করার পক্ষে যে বাধা ছিল, তাহাও দূর হইয়া গেল; এবং ফলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা লোন আফিসের মূলধন জোগাইতে এবং তাহাতে আমানতি টাকা রাখিতে ভয় পাইবার আর বিশেষ কারণ থাকিল না।

এইরূপে ১৮৬৫ সালে বাংলাদেশে প্রথম লোন আফিস স্থাপিত হয়। পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে আরও পাঁচটী লোন আফিসের প্রতিষ্ঠা হয়। ক্রমে ক্রমে এই সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনার ফলে আরও অনেকগুলি লোন আফিসের উদ্ভব হয়। গত ৫।৬ বৎসরের মধ্যেও বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৪০০ লোন আফিসের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এইরূপে বাড়িতে বাড়িতে বর্ত্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে লোন আফিসের সংখ্যা ৭৮২তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

লোন আফিসগুলির আর্থিক সঙ্গতি—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে এই ৭৮২টী লোন আফিসে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৯

কোটি টাকা খাটিতেছে। কিন্তু ইহা হইতে তাহাদের অবস্থা সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে না। কারণ এই ৯ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ৮ কোটি টাকার কারবার মাত্র ৩৮১টি লোন আফিসের হাতে—অর্থাৎ বাকী ৪০০ লোন আফিসে মূলধন, রিজার্ভ ফাণ্ড এবং আমানতি টাকা সমস্ত মিলাইয় এক কোটি টাকার বেশী হইবে না। অধিকাংশ লোন আফিসেরই যে জীবনীশক্তি খুব বেশী প্রবল নয়, তাহা ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায়। নিম্নলিখিত তালিকাটি হইতে এই সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার ধারণা হইবে।

	সংগৃহীত মূলধন	সংগৃহীত মূলধন এবং রিজার্ভফা[ণ্ড]
যে সব লোন আফিসের ২৫,০০০ টাকার বেশী এবং ৫০,০০০ টাকার কম আছে, তাহাদের সংখ্যা—	[illegible]	[illegible]
যে সব লোন আফিসের ৫০,০০০ টাকার বেশী ১ লক্ষ টাকার কম আছে, তাহাদের সংখ্যা—	[illegible]	[illegible]
যে সব লোন আফিসের ১ লক্ষ টাকার বেশী আছে, তাহাদের সংখ্যা—	[illegible]	[illegible]
যে সব লোন আফিসের ২৫,০০০ টাকার বেশী আছে, তাহাদের মোট সংখ্যা—	[illegible]	[illegible]

১৯২৮ সালে ব্যবস্থা-পরিষদে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল পেশ করা হইয়াছিল, সেই বিলে প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, যে সব ব্যাঙ্কের সংগৃহীত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণ অন্ততঃ পক্ষে ৩ লক্ষ টাকা হইবে, সেই সব ব্যাঙ্ককে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইবে। অর্থাৎ যাহাদের সংগৃহীত মূলধন ও সঞ্চিত টাকার পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকার কম, প্রকারান্তরে তাহাদিগের ব্যাঙ্কস্বরূপ অস্বীকার করা হইয়াছিল। এই মাপকাঠি অনুসারে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বাংলাদেশের ৭৮২টী লোন আফিসের মধ্যে মাত্র ৭টী প্রতিষ্ঠানকে সেই হিসাবে প্রকৃত ব্যাঙ্ক বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশের পক্ষে ইহা যে খুব গৌরবজনক নহে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস—

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা যাইতে পারে। উপরে আমাদের লোন আফিসের আয়তনের মাপকাঠিতে বিচার করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে, ইহাদের কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধেও আলোচনা করিলে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। সাধারণতঃ ব্যবসায় জগতে ব্যাঙ্ক বলিতে "কমার্সিয়াল" বা বাণিজ্যসহায়ক ব্যাঙ্কই বুঝায়। কিন্তু প্রায় আটশত লোন আফিসের মধ্যে অধিকাংশেরই কর্ম্মপদ্ধতির সহিত কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের যাহা প্রধান কর্ত্তব্য—অর্থাৎ অল্প সুদে অল্পকালের জন্য ব্যবসায়ীদিগকে টাকা ধার দেওয়া—তাহার সহিত কোনও সম্পর্ক নাই। ইহাদের প্রায় সকলেই চাষী, মধ্যবিত্ত এবং জমিদার সম্প্রদায়ের নানাপ্রকার অভাব মিটাইবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে টাকা ধার দেয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণের মেয়াদ দীর্ঘকালব্যাপী থাকে বলিয়া সুদের হারও স্বভাবতঃই কিছু বেশী হইয়া থাকে। খুব অল্প লোন আফিসেই চলতি হিসাবে (current acc unt) টাকা জমা রাখিবার ব্যবস্থা আছে। কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদিগকে কোম্পানীর কাগজ, ট্রেড বিল, মেয়াদী হুণ্ডী প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেয় এবং কোনও কারণে দেনদারগণ যদি সময় মত ঋণ শোধ করিতে না পারে, তাহা হইলে বন্ধকী কাগজ বাজারে বিক্রয় করিয়া কিম্বা অন্য উপায়ে সহজেই তাহাদের টাকা আদায় করিতে পারে; পক্ষান্তরে লোন আফিসগুলির কর্ম্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সাধারণতঃ তাহারা জমি, কিম্বা ভবিষ্যতে যে শস্য উৎপন্ন হইবে তাহা বন্ধক নিয়া, অথবা দেনাদারদিগকে ব্যক্তিগত জামিনে টাকা ধার দিয়া থাকে এবং যথাসময়ে তাহাদের পাওনা টাকা না পাইলে শীঘ্র করিয়া জমি বিক্রয় করিয়া কিম্বা অন্য সহজ উপায়ে টাকা আদায় করিতে পারে না।

ব্যবসায়ের অভাব এবং লোন আফিসের গতি—

এই সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্ব্বে বাংলাদেশের প্রায় আটশত লোন আফিস কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের যাহা প্রধান কাজ তাহা কেন করে না, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা যাহ অল্পদিন ব্যবসা-বাণিজ্যে যোগ দিয়াছেন;

বেশীর ভাগ লোকেরই চাকুরী এবং অল্প বিস্তর জমিজমা জীবিকার প্রধান উপায় ছিল। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা ধার দেওয়ার কোনও তাগিদ না থাকাতে লোন আফিসগুলি সেইদিকে মন না দিয়া যে উদ্দেশ্যে প্রথম লোন আফিসের উদ্ভব হইয়াছিল—অর্থাৎ চাষী ও জমিদারদিগকে টাকা ধার দেওয়া—সেই কাজেই তাহাদের টাকা খাটাইতে লাগিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরও ইহাতে কোনও ক্ষতি হইল না, কারণ তাঁহারাও লোন আফিস হইতে প্রয়োজনীয় টাকা ধার পাইতে লাগিলেন। অবশ্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্যবসায় করিতেন না বলিয়া যে আমাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনও চল ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু "ভদ্রলোকেরা" ব্যবসায় করিতেন না বলিয়া ভদ্রলোক-পরিচালিত লোন আফিসগুলিরও ব্যবসায়ের প্রতি কোনও সহানুভূতি আসিল না। এই কারণে এবং ব্যবস বাণিজ্যের ব্যাপারে লোন আফিসগুলির পরিচালকদে কোনওরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকাতে তাঁহারা যথাসম্ভ এই পথটা এড়াইয়া চলাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিলেন।

জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস—

সুতরাং কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের কাজের সহিত লোন আফিস-গুলির কাজের যে যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোনও কারণ নাই। এবং এই উভয় প্রক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই পার্থক্য থাকার দরুন লোন আফি গুলিকে "ব্যাঙ্ক" না বলারও কোনও কারণ নাই। কেন অন্যান্য সভ্যদেশেও কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্য অনেক প্রকার ব্যাঙ্ক আছে। উদাহরণস্বরূপ "শিল্প-সহায়ক" ব্যাঙ্ক (Industrial Bank) এবং "জমি-বন্ধকী" ব্যাঙ্ক (Land mor gage Bank) এর নাম করা যাইতে পারে। আমাদের লোন আফিসগুলিও এক হিসাবে এই শেষোক্ত প্রকার প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কতকগুলি ব্যাপারে লোন আফিসগুলির কর্ম্মপদ্ধতির সহিত জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের কর্ম্মপদ্ধতির পার্থক্য রহিয়াছে এবং তাহাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য এই ব্যবস্থার দায়িত্ব কম নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের পক্ষে পাওনা টাকা আদায় করা যত সহজ, লোন আফিসগুলির পক্ষে তত নহে কিন্তু এই অবস্থায়ও তাহাদের কোনও অসুবিধা হইত না যদি অন্যান্য দেশে "জমি-বন্ধকী" ব্যাঙ্কগুলি যে পন্থা অবলম্বন করে আমাদের দেশের লোন আফিসগুলিও সেই পথ অনুসরণ করিত। প্রথমতঃ অন্যান্য দেশে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি যেমন দীর্ঘকালের জন্য টাকা ধার দেয়, তেমনি তাহাদের আমানতি টাকার মেয়াদও যথেষ্ট পরিমাণে দীর্ঘ করিয়া লয়, এবং সেই জন্য তাহাদের নিজেদের পাওনাদারগণের দাবী মিটাইতে তাহাদিগকে খুব বেশী বেগ পাইতে হয় না। কারণ, তাহারা পূর্ব্বে যে টাকা ধার দিয়াছিল, ইতিমধ্যে তাহা সাধারণতঃ আদায় হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা কেবলমাত্র জমির বন্ধকের উপরেই টাকা ধার সম্বন্ধেও কতকগুলি ধরাবাঁধা নিয়ম মানিয়া চলে বলিয়া পাওনা টাকা দেওয়া যথাসময়ে আদায় করিতে তাহাদের কোনও বেগ পাইতে হয় না। তৃতীয়তঃ, তাহারা কাহারও ব্যক্তিগত কিম্বা সাংসারিক খরচ মিটাইবার উদ্দেশ্যে টাকা ধার দেয় না। কেবলমাত্র চাষের উন্নতি এবং অন্য প্রকার লাভজনক কাজের খরচ মিটাইবার জন্যই তাহাদের নিকট ঋণ পাওয়া যায়। কারণ ধার করা টাকার সাহায্যে যদি কোনও লাভজনক কাজ করা যায়, তাহাহইলে দেনাদারের পক্ষে ঋণ শোধ করা সহজ হয়। অন্যথা, যদি এই টাকা ব্যক্তিগত কিম্বা সাংসারিক কাজে ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে ধার শোধ করিবার সময় দেনাদারে নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় খরচের বহর কমাইয়া টাকা শোধ করিতে হয় এবং অনেক সময়ই সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা করা সম্ভব হয় না।

আমাদের দেশের লোন আফিসগুলি জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের এই কর্ম্মপদ্ধতি মানিয়া চলে না। প্রায় সকল লোন আফিসেই ঋণের টাকার মেয়াদ আমানতি টাকার মেয়াদ অপেক্ষা বেশী; অধিকাংশ লোন আফিস কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জামিন কিম্বা ভবিষ্যতে উৎপন্ন শস্য বন্ধক নিয়া টাকা ধার দিয়া থাকে; এবং কি প্রকারে এই ঋণের টাকা খরচ করা হইতেছে, সে সম্বন্ধে তাহারা মাথা ঘামায় না। ফলে অনেক সময়েই দেখা যায় যে, দেনাদারগণ তাহাদের ঋণ শোধ করিতে পারেন না।

লোন অফিসের বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ

উপরে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা হইতে লোন অফিস-

গুলির বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হইবে। কিন্তু তাহারা যে বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী অর্থ-সঙ্কটের কবল হইতে রেহাই পায় নাই, তাহার কারণ হিসাবে আরও দুই একটা ব্যাপারের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। লোন অফিসগুলির আর্থিক শক্তির অল্পতা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ৭৮২টী লোন অফিসের মধ্যে মাত্র ১১২টী প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড ২৫ হাজার টাকার বেশী। ইহা হইতেই তাহাদের আর্থিক অসঙ্গতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, এমনও কয়েকটী লোন অফিস আছে, যাহাদের রিজার্ভ ফাণ্ডে সঞ্চিত টাকার পরিমাণ খুবই কম। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে ভাল ভাল অনেক লোন অফিসের খুব বড় রিজার্ভ ফাণ্ড আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ৩৮১টী লোন অফিসের কার্য্যকরী মূলধন প্রায় ৮ কোটি টাকা আছে; এই ৩৮১টী কোম্পানীর গড়পড়তা রিজার্ভ ফাণ্ড তাহাদের সংগৃহীত মূলধনের শতকরা ৬১ ভাগ। এমনও অনেক কোম্পানী আছে যাহাদের রিজার্ভফাণ্ড তাহাদের সংগৃহীত মূলধনের সওয়াচার গুণ বেশী। কিন্তু এমনও কোম্পানী আছে যাহাদের রিজার্ভফাণ্ডে সঞ্চিত টাকা তাহাদের মূলধনের শতকরা মাত্র ৫ ভাগ। কতকগুলি লোন অফিস অংশীদারদিগকে ডিভিডেণ্ড দেওয়ার জন্য প্রতি বছরের মোট লাভ হইতে রিজার্ভফাণ্ডে যে পরিমাণ টাকা রাখা উচিত তাহা না রাখিয়া লাভের টাকা সমস্তই ডিভিডেণ্ড হিসাবে অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া আসিয়াছে। অথচ যে কোন যৌথ কোম্পানীর. বিশেষতঃ লোন অফিসের মত ঋণদান সমিতির পক্ষে, মোটা রিজার্ভ ফাণ্ড যে কত দরকার তাহা সহজেই অনুমিত হয়। আমাদের লোন অফিসের পরিচালকগণ ব্যবসায়ের এই মূলনীতি ভুলিয়া গিয়া তাহাদের ঘাড়ে কি বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছেন তাহার গুরুত্ব বুঝিতে হইলে জানা দরকার যে বর্ত্তমানে অনেক লোন অফিসই তাহাদের পাওনাদারগণের দাবী মিটাইতে পারিতেছে না।

রিজার্ভফাণ্ডের এই স্বল্পতার জন্যই লোন অফিসগুলির দুরবস্থা এতটা শোচনীয় হইত না যদি তাহাদের পরিচালকেরা আর একটী মূলনীতি অগ্রাহ্য না করিতেন। যে কোনও ঋণদান সমিতির নিজস্ব টাকা অর্থাৎ সংগৃহীত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ডের সমষ্টির তুলনায় আমানতি টাকার পরিমাণ সাধারণতঃ সকল দেশেই প্রায় দশগুণ হইয়া থাকে। আমাদের দেশের লোন আফিসগুলির আমানতি টাকা গড়পড়তা তাহাদের নিজস্ব টাকার মাত্র ৫ গুণ বেশী। কিন্তু অনেক লোন আফিস আছে যাহাদের বেলায় এই নিয়ম খাটে না, এবং যাহাদের আমানতি টাকা তাহাদের নিজস্ব টাকার ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৫০ এমন কি ১০০ গুণও বেশী। অর্থাৎ তাহারা তাহাদের ঘাড়ে যত দায়িত্ব নেয় সেই দায়িত্ব বহিবার মত শক্তি তাহাদের নাই, এবং বিপদের সময় পাওনাদার-দিগের টাকা মিটাইতে পারে না। এই সম্বন্ধে অনেকে বলিয়া থাকেন যে লোন আফিসগুলি তাহাদের নিজস্ব টাকার তুলনায় যে অনেক বেশী আমানতি টাকার দায়িত্ব নেয় তাহাদের পরিচালকদের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করিয়া। কাজেই এই ব্যাপারে তাহাদিগকে খুব বেশী দোষ দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু পরিচালকদের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার ভিত্তি কত ক্ষীণ তাহা বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কটের সময় স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে।

লোন আফিসগুলির বর্ত্তমান অবস্থা কি কি কারণে এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, আমরা উপরে তাহার আলোচনা করিয়াছি। আগামী সংখ্যায় তাহাদের এই দুরবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা করিব।

আর্থিক প্রসঙ্গ

ফেডারাল ফিনান্স কমিটীর রিপোর্ট

লণ্ডন গোলটেবিল সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানকারী যে সকল বিশেষ কমিটী সংগঠিত হইয়াছিল লর্ড পার্সীর নেতৃত্বে ফেডারাল ফিনান্স কমিটী তাহার অন্যতম। গত মাসে তাহার রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ ফেডারাল গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট গুলির নূতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হইলে আর্থিক অবস্থা কিরূপ হইবার সম্ভাবনা তাহারই বিচার এই কমিটী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কমিটী দুইটী প্রধান বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, যথা ফেডারেশনের প্রথম অবস্থায় কেন্দ্রীয় যুক্ত গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট গুলির আয় ব্যয়ের পরিমান কিরূপ হইবার সম্ভাবনা; এবং ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট গুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। নানা কারণে বর্ত্তমান সময়ে কোনও বিচার যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলেও কমিটী যথাসাধ্য সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত [illegible]

১৯৩১ সালের ট্যাক্সের হার মানিয়া লইয়া লর্ড পার্সী কমিটী হিসাব করিয়াছেন যে ফেডারেশন হইলে যুক্ত রাষ্ট্রের আয়ের পরিমাণ ব্যয়ের অপেক্ষা সাড়ে চারি কোটি টাকা বেশী হইবে; যথা—

মোট আয়—

১।	কাষ্টম্‌স্—	
২।	লবণ—	৫·
৩।	আফিম—	·
৪।	রেলওয়ে--	৫·
৫।	কারেন্সি ও মিণ্ট	৩
৬।	বিবিধ—	১·
৭।	আয়কর—	১৭

ব্যয়—

১।	কর্জ্জ শোধ ও সুদ—	১৭·৭৫	কোটি
২।	মিলিটারি বজেট—	৪৭·০০	"
৩।	সীমান্ত রক্ষার্থ—	১·৭০	"
৪।	সিভিল ডিপার্টমেণ্ট—	৫০·৮৫	"
৫।	পেন্সন্‌স্—	২·৬৫	"
৬।	উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে দেয়—	১·০০	"
৭।	সরকারী গৃহ ও রাস্তাদি নির্ম্মাণ—	১·৬০	"
৮।	চীফ কমিশনারের প্রদেশ সমূহের জন্য	২·৮৬	"

মোট ব্যয়— ৮০·১০ কোটি
উদ্বৃত্ত আয়— ৪·৫০ কোটি

বর্ম্মা পৃথক হইয়া যাইবে এইরূপ অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট গুলির আর্থিক অবস্থা কিরূপ হইবার আশা করা যায় তাহার হিসাব কমিটী নিম্নলিখিত মত দিয়াছেন, যথা:—

	প্রদেশ	উদ্বৃত্ত টাকা	ঘাটা
১।	মাদ্রাজ—	×	২০ ল
২।	বোম্বাই—	×	
৩।	বাংলা —	×	২,
৪।	যুক্তপ্রদেশ	২৫ লক্ষ	
৫।	পাঞ্জাব—	৩০ "	
৬।	বিহার ও উড়িষ্যা—	×	
৭।	মধ্য-প্রদেশ	×	
৮।	আসাম—	×	

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের উদ্বৃত্ত আয়ের তুলনায় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট গুলির আর্থিক অসঙ্গতি এরূপ সামঞ্জস্যবিহীন হওয়ার প্রধান কারণ ইহাই নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে প্রাদেশিক আয়ের বিষয়গুলি অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক এবং সেজন্য বর্ত্তমান আর্থিক অনাটন কাটিয়া গেলেও সেগুলি হইতে উপযুক্ত আয় জন্মাইতে কিছু বেশী সময় লাগিবে।

ইহা যদি সত্য হয় যে প্রাদেশিক আয়ের প্রস্রবণ গুলি কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম ফলপ্রসূ এবং ভবিষ্যতে সেগুলি হইতে আবশ্যক মত অধিক আয়ের সম্ভাবনা নাই তাহা হইলে বুঝিতে হইবে না কি যে আয়ের বিভিন্ন বিষয় নির্দ্ধারণে বিশেষ গলদ্ রহিয়া গিয়াছে ?

এতদ্ভিন্ন পার্সী কমিটির আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে তাঁহাদের ব্যবস্থায় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলি, বিশেষতঃ বাংলা দেশ সুবিচার পায় নাই। বলাই বাহুল্য যে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাংলা দেশ হইতেই ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থাগম হইয়া থাকে তথাপি কমিটীর ব্যবস্থায় এই তিন প্রদেশই দেউলিয়া হইয়া নূতন শাসন পদ্ধতিতে জীবন আরম্ভ করিবে।

বাংলা দেশের অবস্থা বিশেষ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে যদিও চিরকাল এই প্রদেশ হইতে সরকারী আয় হইয়াছে সব চেয়ে বেশী এবং এমন কি ভারতবর্ষের ও তাহার বাহিরের যুদ্ধবিগ্রহও কখনও কখনও বাংলার টাকায় পরিচালিত হইয়াছে, তথাপি নূতন ব্যবস্থায় বাংলার স্বচ্ছল অবস্থা কখনই হইতে পারিবে না। বাংলার পাটের রপ্তানি শুল্ক কিম্বা এখানে যে আয়কর আদায় হইয়া থাকে তাহার কিয়দংশ বাংলাকে দিলেই তাহাকে আর কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হইত না। মেষ্টন ব্যবস্থার অবিচারের বিরুদ্ধে বহুদিন হইতেই বাংলার সকল শ্রেণীর লোকে প্রতিবাদ জানাইয়া আসিয়াছে। পার্সী কমিটী সেই অবিচার দূর না করিয়া বরং তাহা চিরস্থায়ী করিবারই সূচনা করিয়াছেন। বাংলা দেশ এ ব্যবস্থা মানিয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লইয়া কি করিবে ?

চটকলের বিবাদ অবসান

চটকল সঙ্ঘ ও কয়েকটী তাহার বাহিরের ভারতীয় চটকলের মালিকদের মধ্যে কত ঘণ্টা কল চালাইতে হইবে তাহা লইয়া যে বিবাদ চলিতেছিল গত মাসের মাঝামাঝি তাহার মীমাংসা হইয়াছে। পাটের বাজার ও বাংলার সকল শ্রেণীর লোকের স্বাচ্ছন্দ্য প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করে চটকলগুলির কাজের ব্যবস্থার উপর। তাই তাহাদের ঝগড়া মিটাইবার জন্য স্বয়ং বাংলার গভর্ণর সাহেবকে দার্জ্জিলিং পাহাড় হইতে কলিকাতায় নামিতে হইয়াছিল। তাঁহারই প্রাসাদে আহূত কন্‌ফারেন্সে পরিশেষে বিবদমান উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তিনামা স্থির করা সম্ভব হইল। সংক্ষেপে এই মীমাংসার সর্ত্ত হইয়াছে মোটামুটি তিনটী, যথা :—জুটমিল্‌স্ এসোসিয়েশনের বাহিরে তিনটী মিল,—আগড়পাড়া, গগলভাই, ও আদমজী—কাজ করিবে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা এবং তাঁহাদের কোন তাঁতই বন্ধ থাকিবে না; কিন্তু এসোসিয়েশনের মিলগুলি সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা মাত্র কল চালাইবে এবং শতকরা ১৫টি তাঁত বন্ধ করিয়া রাখিবে। দ্বিতীয়তঃ, এই সন্ধি এখন এক বৎসর কাল বলবৎ থাকিবে; এবং তৃতীয়তঃ ইতঃপূর্ব্বে আদমজী মিলের যে ৬০,০০০ টাকা চুক্তি ভঙ্গের অজুহাতে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। লাটসাহেবের বাড়ীর কন্‌ফারেন্সের পর যথা সময়ে উভয় পক্ষ চুক্তিনামা পাকা করিয়া দিয়াছেন।

আমরা ভাবিয়াছিলাম এই চুক্তির ফলে চট ও পাটের বাজার কিছু তেজ হইবে এবং বাংলার চাষী ও পল্লীর লোকের সুবিধা হইবে। এখনও কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আমাদের ভয় হইতেছে যে ইউরোপীয় পরিচালিত মিলগুলি এখন চেষ্টা করিতেছেন শ্রমিকদের মাহিনা কমাইবার। তাহারই জন্য বাজার দমাইয়া রাখা হইতেছে। লক্ষ লক্ষ নরনারীর এমন কি সমস্ত বাংলা দেশেরই ভাল মন্দ এরূপভাবে কয়েকটী বিদেশী বণিকের করায়ত্ত থাকা কখনও সমীচীন নহে।

ভারত সরকারের নূতন ঋণ

৬ই জুন হইতে ১৮ই জুন ১৯৩২ তারিখ পর্য্যন্ত অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধার করিবার অভিপ্রায়ে ভারত সরকার এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন। এই ঋণের মোটামুটি সর্ত্ত যথা

১। প্রতি শতকরা ঋণের বাবদ ৯৮৲ টাকা মাত্র দিতে হইবে।

২। ঋণের দরুণ সুদ দেওয়া হইবে শতকরা ৫৷৷০ টাকা।

৩। ১৯৩৮ সালের পূর্ব্বে ঋণশোধ করা যাইবে না এবং পূর্ব্বে পরিশোধ না হইলে গভর্ণমেণ্ট ১৯৪০ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে ঋণ শোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন

৪। এই ঋণের টাকা ভারতবর্ষের মধ্যেই তোলা হইবে
৫। এবং ১৯৩২ সালে পরিশোধ্য অন্যান্য ঋণের পরিবর্ত্তে এই ঋণের দলিল দেওয়া হইবে।

ইহার পূর্ব্বে ভারত সরকার শতকরা ৬ টাকা ও ৬৷৷০ টাকা সুদে টাকা লইয়াছেন এবং "ট্রেজারী বিলে" ৭ টাকা সুদও পাওয়া গিয়াছে। সে হিসাবে এই ঋণের সুদের হার অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও এখন বিলাতের টাকার বাজার যেরূপ তাহাতে এই হার অল্প বলা যায় না। বর্ত্তমান ব্যবসা মন্দার সময় অনেক ধনীই শিল্প প্রতিষ্ঠায় বা ব্যবসা বাণিজ্যে টাকা খাটাইতে ভয় পাইতেছেন। তাঁহারা সরকারী ঋণেই টাকা দিতে আগ্রহশীল। সে অবস্থায় শতকরা আরও ৷৷০ আনা কম সুদ পাইলেও তাঁহারা টাকা দিতেন বলিয়া মনে হয়। ৮ই জুন তারিখের মধ্যেই ৯ কোটি টাকা সরকার এই ঋণ বাবদ পাইয়াছেন। আরও সুদ শতকরা ৷৷০ আনা কমিলে তাহাতে করদাতাদের মোট লাভ অল্প হইত না। এখন যাহা হইল, তাহাতে সরকার আয়করমুক্ত শতকরা ৬ টাকা সুদের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে পারিবেন এবং তাহাতে মোট প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা বার্ষিক লাভ হইবে।

ইহাতে যাঁহারা মনে করেন, ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা ভাল, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে এক সময় সরকার শতকরা ৩ টাকা সুদেও ভারতের বাজারে টাকা ধার পাইয়াছেন এবং বিলাতে এখন ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের সুদের হার ২৷৷০ টাকা মাত্র। বলা বাহুল্য, যে সময় ভারত সরকার শতকরা ৩ টাকা সুদে টাকা ধার করিয়াছিলেন, তাহার পর সমগ্র জগতের আর্থিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু যখন বিলাতে সরকারী ঋণের সুদ শতকরা ৪৲ টাকা, মাত্র এবং যখন ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের সুদের হার মাত্র ২৷৷০ টাকা তখন ভারতে সুদের হার পাঁচ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইলে অসঙ্গত হইত বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ, গত কয়েকমাসে ভারতসরকার বেশী টাকা বাজারে চালাইয়া এক্স্চেঞ্জের দর রক্ষা করিবার ফলে টাকার দর কমিয়া গিয়াছে। সরকারী ঋণের সুদের হার যখন বাজারে সাধারণ ঋণের সুদের হার নিয়ন্ত্রিত করে, তখন সরকারী সুদের হার চড়া হইলে বাজারে শিল্প ও ব্যবসার জন্য সুলভে মূলধন পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। ঋণের সুদের হার স্থির করিবার সময় সরকারকে ইহা বিশেষ ভাবেই বিবেচনা করিতে হয়।

পরন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় যাহাতে সরকারের সাধারণ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ না করিতে হয়, অর্থাৎ ব্যয় সঙ্কোচ দ্বারা সেজন্য আবশ্যক অর্থ পাওয়া যায়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা সরকারের কর্ত্তব্য।

ইহা ছাড়া কিছুদিন পূর্ব্বেই ভারত সরকার বিলাতে বহু টাকা ধার লইয়াছেন। আমরা জানিতে পারি কি যে এই সকল ঋণের কত অংশ পূর্ব্বতন ধার শোধ করিতে কিম্বা প্রকৃত লাভকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে এবং কতপরিমাণ টাকা কেবলমাত্র "শান্তি ও শৃঙ্খলা" রক্ষার খাতে যাইবে? দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দানহীন নিরন্ন ভারতবাসী আর কত ভার সহ্য করিবে?

বস্ত্র-শিল্প সংরক্ষণ শুল্কের পুনর্বিচার

আমাদের বস্ত্রশিল্পের রক্ষাকল্পে যে নূতন শুল্ক ১৯৩০ সাল হইতে আদায় করা হইতেছে, সে সম্বন্ধে পুনর্বিচার করিবার আদেশ দিয়া গত ৯ই এপ্রিল ভারত সরকার ট্যারিফ বোর্ডের নিকট এক প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। অটাওয়াতে সাম্রাজ্যানুগ শুল্ক নীতির আলোচনার প্রাক্কালে এই নির্দ্দেশের পশ্চাতে বিশেষ গূঢ় অভিসন্ধি নিহিত রহিয়াছে বলিয়া অনেকেই সন্দেহ করিতেছেন, এবং মনে করিতেছেন যে ইংলণ্ডের বস্ত্রের কারখানা গুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া নূতন শুল্ক বসাইবার আয়োজন চলিতেছে। ভারতবর্ষে শীঘ্রই শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা। এ অবস্থায় তাড়াতাড়ি ব্রিটিশ জাতির স্বার্থ সুরক্ষিত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা স্বাভাবিক। তাই লোকের সন্দেহ বেশী হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পের উচ্ছেদ ও ক্রমোন্নতির ইতিহাসের সহিত জাতির অধঃপতন এবং পুনর্জাগরণ যেন অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। ল্যাঙ্কাসায়ারের বস্ত্রের অবৈধ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্প প্রায় ম্রিয়মান হইয়া গিয়াছিল। বহু আন্দোলনের ফলে এদেশীয় কাপড়ের কলগুলি যখন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আভ্যন্তরীন শুল্কের (Excise Duty) হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল তখন পুনরায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের নবজীবন লাভের সূচনা হইলেও

দেখা গেল যে উপযুক্ত রক্ষণ শুল্ক না হইলে বিদেশী শক্তিমান্ কলওয়ালাদের সহিত ভারতীয় কলগুলির প্রতিযোগিতা করা সম্ভব নয়। তাই ১৯৩০ সালে বস্ত্রশিল্প-সংরক্ষণ কল্পে আমদানী কাপড়ের উপর তিন বৎসরের জন্য নূতন শুল্ক বসান হইয়াছিল। তাহাতে ইংলণ্ড হইতে আমদানী কাপড়ের উপর শুল্কের হার অন্যান্য বিদেশীদের তুলনায় কিছু কম ছিল। ভারত সরকারের আয় বাড়াইবার জন্য ইহার পর দুই দফায় উক্ত আমদানীশুল্কের হার বাড়ান হইয়াছে কিন্তু মোটামুটি নীতি একই রাখা হইয়াছে। এক্ষণে এই শুল্কনীতির ফলাফল বিচার করিয়া দেখার জন্য ট্যারিফ-বোর্ড অনুরুদ্ধ হইলেন।

বলা বাহুল্য যে গত তিন বৎসরের সংরক্ষণ-নীতির ফলে ভারতীয় বস্ত্র শিল্প বিশেষ পুষ্ট হইয়াছে। ১৯২৫-২৬ সাল হইতে ১৯২৯-৩০সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে গড়ে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি প্রস্তুত করিত বৎসরে ২.৮ কোটি গজ কাপড়, ১৯৩০-৩১ সালে হইয়াছিল ২৫৬ কোটি এবং ১৯৩১-৩২ সালে প্রস্তুত হইয়াছে প্রায় ২৯৫ কোটি গজ। সূতা প্রস্তুতও অনেক বাড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ হইতে আমদানী বস্ত্রের পরিমাণও বেশ কমিয়াছে।

ভারতে প্রস্তুত বস্ত্রাদির সূক্ষ্মতা ও গুণও ইতিমধ্যে বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমাদের বস্ত্রশিল্প এখনও সে অবস্থায় পৌঁছে নাই যে বিদেশীয়দের সহিত সমান প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে। সেজন্য এই সংরক্ষণনীতি এখনও আরও কিছুদিন বলবতী রাখা কর্ত্তব্য হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে ভারতীয় বস্ত্রসংরক্ষণ নীতি সকল বিদেশীকে একই চক্ষে দেখিবে না সাম্রাজ্যানুকুল ব্যবস্থা মানিয়া লইবে। এ বিষয়ে সমস্ত ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাংলার ব্যবসায় সম্প্রদায় একবাক্যে বলিতেছেন যে আমদানী শুল্ক আদায়ে কোন পক্ষপাতিত্ব রাখা আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না। ভারতবর্ষকে সত্য সত্যই যদি সকল প্রকার বস্ত্র ব্যবহারে স্বাধীন ও সন্তুষ্ট হইতে হয় তাহা হইলে আমাদের বস্ত্রশিল্পের সরু ও মোটা সকল প্রকার বিভাগেই উপযুক্ত সংরক্ষণ প্রয়োজন হইবে। সুতরাং জাপানের হাত হইতে রক্ষা পাওয়াও যেমন দরকার ল্যাঙ্কাসায়ারের প্রতিযোগিতা এড়ানও তেমনিই প্রয়োজন। তাহা ছাড়া বর্ত্তমানে ব্রিটিশ-জাতির সহিত আমাদের ব্যবসা অনেক কমিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ আমাদের রপ্তানি মাল অধিকাংশই অ-ব্রিটীশজাতিই লইয়া থাকেন। এ অবস্থায় তাঁহাদের সহিত বিবাদের সূত্রপাত সৃষ্টি করা কখনই সমীচীন হইবে না।

বেঙ্গল ন্যাশনাল বণিক সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশন

গত ৮ই জুন তারিখে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব-কমার্সের ত্রৈমাসিক সাধারণ সভা মাননীয় কুমার সুরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের সভানেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় সেই উপলক্ষে সরকারকে এবং বণিক সম্প্রদায়কে অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের মধ্যে প্রধান কথা ছিল এই :—

১। ইহা দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান আর্থিক অনাটন এবং পৃথিবী ব্যাপী ব্যবসায় মন্দা হইবার প্রধান কারণ রাজনৈতিক অশান্তি ও অনিশ্চয়তা। জার্ম্মানীর নিকট হইতে অন্যান্য জাতি যুদ্ধের দরুণ যে খেসারতি আদায় করিতেছেন তাহার অবসান না হইলে ইউরোপের আর্থিক উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়েরও স্বচ্ছন্দগতির আশা কম।

২। আমাদের টাকা ইংলণ্ডের মুদ্রার সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করার ফলে আমাদের বহির্ব্বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি ভিন্ন লাভ হয় নাই।

৩। ইংলণ্ডের তথা ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের সহিত পক্ষপাতিত্ব মূলক বাণিজ্য সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ভারতবর্ষের নাই, এ কথা অটাওয়া সভায় ভারতীয় সদস্যদের বলা কর্ত্তব্য।

৪। বাংলার সম্পদ পাট। চটকলগুলির ভাল মন্দের প্রতি একমাত্র লক্ষ্য করিলেই পাটের সমস্যা সমাধান হইবে না। সরকারের এখন কর্ত্তব্য চাষীদের সাহায্যকল্পে সরকারী তত্ত্বাবধানে কিম্বা সাহায্যে পাট ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।

৫। বাংলার আর একটী প্রধান সমস্যা হইয়াছে কি উপায়ে মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক ও লোন অফিসগুলিকে পুনরায় কার্য্যোপযোগী করা যায়। দেশবাসীর এখন কর্ত্তব্য কিছু

ত্যাগ স্বীকার করিয়া আটক জমা টাকাগুলির ব্যবস্থা করিয়া ব্যাঙ্কগুলিকে আবার সচল করা।

লবণ-শিল্পীদের কন্‌ফারেন্স

গত ২৫শে মে তারিখে ভারত গভর্ণমেণ্ট শিমলায় ভারতীয় লবণ-শিল্পীদিগকে একটী কন্‌ফারেন্সে আহূত করিয়াছিলেন। স্যর জজ শুষ্টার সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া বলেন যে এদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে লবণ উৎপন্ন হইতেছে তাহার প্রত্যেকটীর জন্য বিভিন্ন বিক্রয়ের বাজার নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। শোনা যাইতেছে যে গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত যে সকল লবণের কারখানা পশ্চিম ও উত্তর ভারতে রহিয়াছে তাহার মাল উপযুক্ত মূল্যে বাংলা ও বিহার প্রদেশে বিক্রয় করা সম্ভব হইতেছে না। সেজন্য সরকারী কারখানাগুলির অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। তাই গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে বাংলার বাজারে প্রবেশের সুবিধা করিয়া লন। সম্প্রতি জাহাজের ভাড়া কমিয়া যাওয়ায় এডেনের লবণের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় লবণ পারিয়া উঠিতেছে না। বাংলা গভর্ণমেণ্টের সদস্যগণ প্রস্তাবিত "Quota" (ভাগ) নির্দ্ধারণ সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে বাংলার জনসাধারণের উপর লবণের দাম বৃদ্ধিজনিত আর কোন ভার চাপান যুক্তি-যুক্ত হইবে না।

ভারতীয় শিল্পের উন্নতি হয় ইহা আমাদের সকলেরই পরম কাম্য, কিন্তু তাহার জন্য ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার কি কেবল বাংলাই করিয়া যাইবে? লবণ শুল্ক বসাইবার সময় বাংলায় লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠাকল্পে যে টাকা খরচ করিবার প্রতিশ্রুতি গভর্ণমেণ্ট দিয়াছিলেন তাহার কি হইল?

বাংলা সরকারের ব্যয় সঙ্কোচ

গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলা সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাবে বহু টাকা ঘাটতি পড়িতেছে একথা সকলেই জানেন। এই ঘাটতি বর্ত্তমানে বাৎসরিক প্রায় দুই কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কি উপায়ে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া এই ঘাটতি মিটান যায় তাহা বিচার করিবার জন্য সম্প্রতি একটী ব্যয় সঙ্কোচ কমিটি সংগঠিত হইয়াছে।

সত্যই এতদিনে গভর্ণমেণ্টের সুমতি হইল কিনা বলা কঠিন। কারণ এই কমিটি যেরূপে গঠিত হইয়াছে ও তাহার পরেই বিভিন্ন সরকারী বিভাগে তাড়াতাড়ি নূতন লোক লাগানর যেরূপ ধূম পড়িয়া গিয়াছে তাহাতে খুব আশান্বিত হওয়া যাইতেছে না।

ব্যয় সঙ্কোচ কমিটি বাংলার নানাস্থান ও প্রতিষ্ঠান হইতে প্রস্তাব সংগ্রহ করিতেছেন। যে কয়েকটী বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

১। লাট সাহেবের মাহিয়ানা ও তাঁহার গৃহস্থালীর খরচ বাবদ মোট এক লক্ষ টাকার বেশী ব্যয়ভার বাংলাদেশের পক্ষে বহন করা অসম্ভব।

২। সরকারী সমস্ত কর্ম্মচারীর, বিশেষতঃ উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের মাহিনা ও রাহাখরচ, দারবরদারি প্রভৃতির খরচ বিশেষ কমান উচিত।

৩। উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারী ও মন্ত্রীদের বেতন মাসিক ২০০০৲ টাকার অধিক হওয়া কর্ত্তব্য নহে, এবং ইংরাজ কর্ম্মচারীদের যে সকল বিশেষ প্রাপ্যের ব্যবস্থা "লী" কমিশন করিয়া গিয়াছেন সে সব এখন কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

৪। দার্জ্জিলিঙ্গে দুইবার গভর্ণমেণ্টের যাতায়াত একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলা দরকার।

৫। চারিজন লাট সাহেবের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার ও তিনজন মন্ত্রীর স্থানে দুইজন করিয়া মোট চারিজন দ্বারা কাজ চালান উচিত।

৬। সেক্রেটারিয়াটের খরচা বিশেষ কমাইয়া ফেলা প্রয়োজন এবং এতদুদ্দেশ্যে রেভিনিউ বোর্ড, ডিভিসনাল কমিশনার, সেক্রেটারী এডুকেশন বিভাগ প্রভৃতি পদ উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

৭। আইন আদালতে জজদের মাহিয়ানা ও এডভোকেট জেনারেল এবং সরকারী সলিসিটরের মাহিয়ানা বিশেষ কমান উচিত।

৮। পুলিশ বিভাগের ব্যয় অর্দ্ধেক কাটিয়া দেওয়া উচিত এবং আবশ্যকমত বেসরকারী সমিতির সাহায্য গ্রহণ করিয়া সাধারণ শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

৯। বেসরকারী অবৈতনিক মুন্সেফ ও হাকিম দ্বারা ছোট খাট বিচারের কাজ চালাইয়া লওয়া উচিত।

১০। এবং সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান শাসননীতির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তন দ্বারা দেশবাসীর সহিত বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের সংঘর্ষের অবসান শীঘ্রই করা প্রয়োজন।

সকলে একবাক্যে চাহিলেও এই সকল একান্ত প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে বাংলা গভর্ণমেণ্ট প্রস্তুত হইবেন কি?

বীমা-প্রসঙ্গ

সহযোগী 'পুষ্পপাত্র' বীমাপ্রসঙ্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রলাল রায়, এম, এ মহাশয়ের একটী সুলিখিত প্রবন্ধ "জীবন বীমা কোম্পানীর তহবিল ও কোম্পানীর কাগজের মূল্য হ্রাস" পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় এই প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে সমস্ত কোম্পানীর অধিকাংশ অর্থই কোম্পানীর কাগজে নিযুক্ত আছে, তাহারা বর্ত্তমান সঙ্কটে পূর্ব্বের মত বোনাস দিতে না পারিলেও তাহাদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বই মন্দ নহে। উপযুক্ত অবস্থা প্রত্যাবর্ত্তনের সহিত তাহাদের উদ্বৃত্তের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং ফলে সকলেই লাভবান হইবেন। আমরা এই যুক্তির কতকাংশ অনুমোদন করি। এই সমস্ত কোম্পানীগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাধারণকে সন্দিহান করিয়া তুলিতেছেন। রায় মহাশয়ের এই প্রবন্ধটী এ বিষয়ের অন্য দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এই প্রসঙ্গে রায় মহাশয় আরও একটী সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তিনি এই সমস্ত কোম্পানীকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন বোনাসের পরিমাণ স্থির রাখিবার লোভে ভ্যালুয়েশনের মূল সূত্রগুলিকে শিথিল না করেন। আমরাও বিশ্বাস করি যে এই অর্থ-সঙ্কটের সময় যদি পুরাতন কোম্পানীগুলি ক্রমবর্দ্ধমান বোনাস প্রদানের লোভ পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের ভিত্তিগুলি সুদৃঢ় করেন, তাহা হইলে ভারতীয় বীমার অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। পরন্তু সুধীন্দ্রবাবু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সমস্ত কোম্পানীর বীমা তহবিল কোম্পানীর কাগজে খাটিতেছে, তাঁহাদের বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কটে যে ক্ষণিক অসুবিধা তদপেক্ষা যাঁহাদের অর্থ অন্যবিধ কার্য্যে খাটান হইতেছে, তাহাদের বাস্তবিক অসুবিধা হয়তো অনেক অধিক এবং যদিও বাহ্যতঃ তাহা প্রকাশ না হওয়ায় সেই কোম্পানিগুলি বর্ত্তমান ভ্যালুয়েশনে দৃশ্যতঃ সুবিধা পাইতে পারে তথাপি তাহাদের ভিত্তি কোন কোন ক্ষেত্রে উপরোক্ত কোম্পানীদের ভিত্তির মত সুদৃঢ় হইতে পারে।

Indian Insurance Instituteএর দ্বিতীয় বার্ষিক সভার অধিবেশন ৭ই মে হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা ও জেনারেল সেক্রেটারী মহাশয়ের কার্য্যবিবরণী হইতে প্রকাশ যে, গত দুই বৎসরকাল এই প্রতিষ্ঠানটি স্বদেশী বীমার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছেন। সমগ্র স্বদেশী বীমা-কোম্পানীর পক্ষ হইতে সাধারণভাবে প্রচারকার্য্য ছাড়া, এই প্রতিষ্ঠান গত বৎসরের ইন্সিওরেন্স এডুকেশন বোর্ড সংগঠিত করিয়া নানা ইন্সিওরেন্স বিষয়ে যে বক্তৃতা ও শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। এ প্রতিষ্ঠানটী সত্যই আমাদের বীমাক্ষেত্রে নূতন প্রাণ আনিয়াছে। ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক।

খবরের কাগজে প্রকাশ যে পাঞ্জাবে কয়েকটী জুয়াচোর মিলিয়া তিনটী স্বদেশী বীমা কোম্পানীকে প্রতারণা করিবার জন্য একটী কাল্পনিক লোকের নামে পলিশি করাইয়া এবং তাহার কাল্পনিক মৃত্যু প্রমাণ করিয়া বহু সহস্র টাকা বাহির করিয়া লয়। পরে ধরা পড়িয়া আদালতের বিচারে সকলেরই সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। আজকাল বীমা কোম্পানীগুলি ক্রমাগত নূতন বীমা কার্য্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় এজেণ্ট ও ডাক্তার প্রভৃতি নিয়োগে যথোপযুক্ত দৃষ্টি রাখিতে পারিতেছেন না। এ বিষয় ভারতীয় বীমা কোম্পানীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। একশত বীমার দরখাস্ত সংগ্রহ করিতে যদি একটী প্রতারণা মূলক দরখাস্ত আসিয়া যায়, তাহাতে কোম্পানীর যে ক্ষতি হয়, ঐ একশত স্থলে মাত্র ১০টী উপযুক্ত বীমার দরখাস্ত পাইলেও তাহা হয় না। আমরা শুনিতে পাইতেছি বাঙ্গলায় কয়েকটী পুরাতন বীমা কোম্পানী এবং একটী বিদেশীয় বীমা কোম্পানীতে এইরূপ একটী ব্যাপার হইয়াছে। বিষয়টী এখনও তদন্তের অধীন বলিয়া আমরা বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি না; প্রয়োজন হইলে পরে প্রকাশ করিব। সময় থাকিতে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি এ বিষয়ে অবহিত হউন। কার্য্যের পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ষতা সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখাও বিশেষ প্রয়োজন। —জাবালি

াঙ্গালায় চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা

—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বিগত অধিবেশনে ভারতে আমদানী চিনির উপর প্রতি হন্দর ৭।০ হারে এক সংরক্ষণ মূলক শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে। এই শুল্ক দীর্ঘ ১৫ বৎসর কালের জন্য স্থায়ী থাকিবে। উক্ত শুল্ক নির্দ্ধারিত হইবার অব্যবহিত পর হইতেই বাঙ্গালায় চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এক আন্দোলন সুরু হইয়াছে। বাঙ্গালায় বিস্তৃত ভাবে চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে এদেশের শিল্প সম্পদ যে অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সে জন্য এবিষয় লইয়া যথেষ্ট আন্দোলন আলোচনা ইত্যাদি হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু এই আন্দোলনের মূলে বিজ্ঞান-সম্মত শক্ত কোন বনিয়াদ আছে কিনা, তাহা স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

বাঙ্গালায় এ যাবৎ চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য উল্লেখযোগ্য কোন কারখানা গড়িয়া উঠে নাই। অথচ এই শিল্প ভারতেরই অন্যান্য প্রদেশে দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে টারিফ বোর্ড ভারতীয় চিনি-শিল্প-সংরক্ষণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহার শেষভাগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সংস্থিত চিনির কারখানার এক তালিকা সংযুক্ত করা হইয়াছে। ভারতে চিনি শিল্পের বিস্তৃতি সম্বন্ধে তুলনা-মূলক ধারণা করিয়া লইবার জন্য নিম্নে সেই তালিকার সারাংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

চিনি তৈয়ারী ও চিনি শুদ্ধির কারখানা
(১৯৩০-৩১)

মধ্যপ্রদেশ—	১৯
বিহার ও উড়িষ্যা—	১৩
মান্দ্রাজ—	৬
বোম্বাই—	২
পাঞ্জাব —	২

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে চিনির কারখানা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—অথচ বাঙ্গালায় উল্লেখ-যোগ্য একটি কারখানাও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই কেন, তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমেই প্রশ্ন উঠিবে—"বাঙ্গলায় যে এ পর্য্যন্ত চিনি শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইল না—তাহার কোন স্বাভাবিক কারণ আছে কি ?—বাঙ্গালার জল, মাটি, আব-হাওয়া কি এই শিল্প প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনুকূল নহে ? তাহাই যদি হয়, তবে বর্ত্তমান আন্দোলনের তাৎপর্য্য কি থাকিতে পারে ?"

বলা বাহুল্য যে এরূপ কোন স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক থাকিলে বর্ত্তমান আন্দোলনকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হইত। সে জন্য প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, বাঙ্গালায় চিনির কারখানার অভাবের মূলে কোন স্বাভাবিক হেতু বর্ত্তমান নাই। বাঙ্গালার মাটির গুণ, জল-বাতাস সবই চিনির কারখানার প্রধান কাঁচামাল 'আখ' চাষের পক্ষে অনুকূল। বাঙ্গালার সন্নিহিত উড়িষ্যা প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত কোন কোন অঞ্চলে এ বিষয়ে অধিকতর সুবিধা রহিয়াছে। বস্তুতঃ এখনও বাঙ্গালায় অনেক স্থলে বিস্তৃতভাবে আখের চাষ হইতেছে। নিম্নে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে পরিমাণ মাটিতে আখের আবাদ হইয়া থাকে, তাহার আয়তন সম্বন্ধে এক তালিকা সন্নিবেশ করা হইল :—

১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে আখের চাষ

মধ্যপ্রদেশ —	১৩,৫৭,০০০	একর	ভূমি
পাঞ্জাব—	৪,১১,০০০	„	„
বিহার ও উড়িষ্যা—	২,৭৮,০০০	„	„
বাঙ্গালা—	১,৯৬,০০০	„	„

শুধু চাষের আয়তন হইতেই চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের সুবিধা অসুবিধা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। সেজন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রতি 'একর' ভূমিতে কি পরিমাণ আখের ফসল হইয়া থাকে,—তাহাও নির্দ্ধারণ করিয়া দেখা দরকার। কারণ তাহার উপরেই কারখানা কি দরে কাঁচামাল কিনিতে সক্ষম হইবে, তাহা নির্ভর করিবে। এ বিষয়ে বাঙ্গালা দেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় পশ্চাৎপদ হইয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট কৃষি বিভাগের

নির্দ্ধারণ অনুসারে বাঙ্গালায় প্রতি 'একর' ভূমিতে যে আখের চাষ হয়, তাহার পরিমাণ মাত্র ১৩ 'টন'। এই হিসাবে ন্যূনকল্পে প্রতি মণ আখের জন্য ।৶০ দাম না পাইলে চাষীর পড়্তা পোষায় না। অথচ এই অনুপাতে দাম দিয়া বাঙ্গালায় চিনির কারখানার পক্ষে লাভবান হওয়াও সম্ভব নয়, কারণ তাহার অর্দ্ধেকমাত্র খরচেই যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকেরা আখের চাষ করিতে সক্ষম হয়। এজন্য প্রথমেই মনে হইবে যে, বাঙ্গালায় চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা শেষপর্য্যন্ত ব্যর্থ প্রচেষ্টাতেই পর্য্যবসিত হইবে।

বস্তুতঃ, এ বিষয়ে নিরুৎসাহ হইবার কারণ নাই। গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ যে হিসাব দিয়াছেন,—তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোন তুলনা মূলক হিসাব করিলে, তাহা ভ্রমাত্মক হইবে। অন্যান্য প্রদেশে প্রতি 'একর' ভূমিতে যে সমধিক পরিমাণ আখের চাষ হইতেছে, তাহা দীর্ঘকালব্যাপী অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে সম্ভব হইয়াছে। বাঙ্গালায় সেরূপ প্রচেষ্টা এখনও হয় নাই। এদেশে সচরাচর যে জাতের আখ আবাদ হয়, তাহার স্থলে 'কোয়েম্বাটোর' নামীয় উৎকৃষ্ট জাতের চারা বুনিয়া আখের চাষ করিলে, ফসলের পরিমাণ অনেকাংশে বাড়িয়া যাইতে পারে। ইহা একেবারে নিছক কল্পনা নহে। চিনি বিষয়ে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে, উৎকৃষ্টতর ইক্ষু বপন করিলে বাঙ্গালা দেশেও প্রতি একর ভূমি হইতে ২৫ টন অবধি ফসল আদায় করিয়া লওয়া খুবই সম্ভব। সেরূপ ক্ষেত্রে প্রতিমণ আখের আবাদী খরচ ।০ আনারও কম পড়িবে ও কাঁচামাল বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালার কারখানাগুলির আর কোন অসুবিধা থাকিবে না। বরং কোন কোন বিষয়ে বাঙ্গালার সুবিধাই থাকিবে। বাঙ্গালায় আখ চাষের জন্য জল-সেচ বাবদ কোন খরচ বহন করিতে হইবে না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এজন্য যে শ্রম এবং ব্যয় স্বীকার করিতে হয় তাহাতে এই সুবিধা উপেক্ষণীয় নয়। তারপর বাঙ্গালায় উৎপন্ন আখের মধ্যে যে পরিমাণ চিনির সারাংশ পাওয়া যায়, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সে বিষয়েও বাঙ্গালার কারখানাগুলির সমধিক সুবিধা বর্ত্তমান থাকিবে।

এখন প্রশ্ন উঠিবে এই যে, এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এতদিন বাঙ্গালাদেশে চিনির কারখানা সু-প্রতিষ্ঠিত হয় নাই কেন? তাহার অন্যতম কারণ এই যে, এ পর্য্যন্ত বিদেশী প্রতিযোগিতার সংঘাত মুখ্যভাবে বাঙ্গালা দেশকেই সহ্য করিতে হইয়াছে। দেশীয় চিনির একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী জাভার নিকটতম ভারতীয় বন্দর হইল কলিকাতা। বিগত কয়েক বৎসর এদেশে জাভার চিনি যেরূপ সস্তাদরে আমদানী হইয়াছে তাহাতে ইহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বাঙ্গালায় চিনির কারখানা গড়িয়া তুলিতে কেহই ভরসা পায় নাই। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই তখন জাভার সস্তা চিনি বিকাইয়াছে। কিন্তু বিহার যুক্তপ্রদেশ সংস্থিত কারখানাগুলির এজন্য বিশেষ ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হয় নাই। কারণ, এই কারখানাগুলির উৎপন্ন মাল প্রধানতঃ সন্নিকটস্থ হাট বাজারেই বিক্রয় হইয়া থাকে; তথায় কলিকাতা হইতে রেলভাড়া দিয়া জাভার চিনির পক্ষে প্রতিযোগিতা করা সহজ-সাধ্য হয় নাই।

বর্ত্তমানে আমদানী-শুল্ক বসাইবার ফলে বাঙ্গালাদেশে জাভা-চিনির প্রতিযোগীতার ভীতি অপসারিত হইয়াছে। এখন বাঙ্গালাদেশের ধনী এবং ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়ের চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তৎপর হওয়া উচিৎ। নতুবা বাঙ্গালায় চিনি শিল্প প্রতিষ্ঠার আশা একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সম্প্রতি আমদানী শুল্ক ধার্য্য হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানের চিনির কারখানাগুলি তাহাদের উৎপাদিকাশক্তি বাড়াইবার জন্য উত্তরোত্তর চেষ্টা করিতেছে। অনেকগুলি নূতন কারখানাও ইতিমধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার ফলে অন্যান্য প্রদেশের উৎপন্ন মালের পরিমাণই যে কেবল বৃদ্ধি পাইবে, তাহা নহে, ক্রমশঃ ইহাদের গড়্পড়্তা খরচও হ্রাস পাইতে থাকিবে। উৎপন্ন মালের পরিমাণ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলে তথাকার কারখানাগুলি যে ক্রমশঃ বাঙ্গালার বাজার দখল করিয়া লইবার চেষ্টা করিবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সেরূপ অবস্থায় বাঙ্গালার শিল্প ধুরন্ধরবর্গ চিনির কারখানা গড়িয়া তুলিতে আর ভরসা পাইবেন না। জাভার প্রতিযোগিতার স্থলে তখন আভ্যন্তরীন প্রতিযোগিতাই বিভীষিকা সৃষ্টি করিতে থাকিবে।

আর একটা কারণে এখন বাঙ্গালা দেশে চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালায় যে আখ উৎপন্ন হয়, বর্ত্তমানে তাহার দ্বারা কেবল গুড়ই তৈয়ারী হইতেছে। ইহাতে অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালা দেশের

সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এখন আখের চাষ যেরূপ দ্রুতগতি বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে অনুমান হয় যে, অনতিকাল মধ্যে বাঙ্গালার বাজারে ভিন্ন প্রদেশ হইতে গুড়ের আমদানীও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ফলে গুড়ের এবং সেই সঙ্গে আখের দামও অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। এমতাবস্থায় কৃষক-সম্প্রদায়ের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় আখ চাষের লাভালাভ যে কিরূপ গুরুতর বিষয় হইয়া পড়িয়াছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক। বাঙ্গলার পাট চাষের সঙ্কোচ-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই এক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে যে, যে সকল জমিতে পাটের চাষ স্থগিত থাকিবে, তথায় কৃষক আর কোন্ ফসলের আবাদ করিবে। এই সমস্যা পূরণের পক্ষে আখ সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। কিন্তু ইহার দামও যাহাতে পাটের মত হ্রাস-প্রাপ্ত না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এই বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই বাঙ্গালায় চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহাতে ইক্ষুচাষের প্রসার অব্যাহত থাকিবে, অথচ মূল্যহ্রাসের বিপদ থাকিবে না।

ইহার পর আর আশঙ্কা করিবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না যে, বাঙ্গালায় চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করা মোটেই বিপজ্জনক নহে। বরং নানা কারণে এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া অত্যাবশ্যক বলিয়াই প্রতীতি হওয়া উচিৎ। বস্তুতঃ এ বিষয়ে সমস্যা রহিয়াছে কেবল কারখানার আয়তন এবং কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে। বাঙ্গালায় ঠিক বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের আদর্শ অনুসরণ করিয়া কারখানা প্রতিষ্ঠা করিলে চলিবে না। এই সকল প্রদেশের কারখানা-সংলগ্ন বা কারখানার সন্নিহিত স্থানগুলিতে বিস্তৃতভাবে আখের চাষ হইয়া থাকে। কাজেই ইক্ষু সরবরাহ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠে না। এই কারণে তথায় বহু ব্যয়-সাধ্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে ইক্ষুর চাষ অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এজন্য এখানে কোন বৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা কাঁচামাল সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না। তা ছাড়া বাঙ্গালার জনসাধারণের আর্থিক অবস্থাও বৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনুকূল নহে। এই জন্যই এমন কোন উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে যাহাতে স্বল্প ব্যয়ে অথচ লাভজনক ব্যবসায়িক প্রণালীতে এদেশে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা গড়িয়া উঠিতে পারে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ এ বিষয়ে অবহিত হইয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহারা বিশেষজ্ঞের সাহায্যে গবেষণা চালাইয়া বাঙ্গালার উপযোগী করিয়া চিনির কারখানার আয়-ব্যয়, কল-কব্জা ইত্যাদি সম্বন্ধে এরূপ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, যাহাতে এই শিল্প শীঘ্রই বাঙ্গালা দেশে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। বাঙ্গালা দেশে চিনি উৎপাদনের উৎকৃষ্ট স্থান মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, মৈমনসিংহ, পাবনা এবং রাজসাহী। প্রত্যেক জেলার স্থানীয় ব্যবসায়ী-বৃন্দ ও সমগ্র বাঙ্গালার পুঁজিপতিরা এ বিষয়ে অনুসন্ধান-তৎপর হইয়া কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেই বাঙ্গালার এই শিল্প-প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ হইতে পারে।

বিশ্ববাণী

ব্যাধিগ্রস্ত উপন্যাস

ভারত-সম্রাটের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র সেদিন লণ্ডনের 'বুক ট্রেড প্রভিডেন্ট সোসাইটি'র এক বৈঠকে বলিয়াছেন, 'আজ যদি ডাঃ জনসন্ বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে আমারই মতো তাঁহারও বর্ত্তমানের এই কামগন্ধী উপন্যাসের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিত। ইহাদের যে কোনও খানির দুই তৃতীয়াংশ পড়িবার পর এমন একটা স্থানে উপনীত হইতে হয়, যেখানে পচা ঘায়ের দুর্গন্ধ, অস্ত্র না করিলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন।' ইহারই উপর লিখিতে গিয়া 'নিউজ ক্রনিকেল' কাগজে বলা হইয়াছে, এই কর্দ্দম স্রোতের স্বপক্ষে কিছুই বলিবার নাই। জীবনের অনেকখানি জুড়িয়া হইতো মানুষের রতি রহিয়াছে—কিন্তু সারও তো মানুষের জীবনের অনেকখানি, তাই বলিয়া বৈঠকখানায়, লাইব্রেরিতে, খাওয়ার ঘরে সর্ব্বত্র সার ছড়াইবার প্রয়োজনীয়তা কি?" 'দি ডেলীমেল' পত্রিকায় উপন্যাসিক স্যর ম্যাক্স জেম্বার্টন লিখিয়াছেন, এই ধরণের উপন্যাসিক জোর গলায় চীৎকার করিয়া বলে,--"আমাকে গ্রেপ্তার করিলে তো বাঁচিয়া যাই। আমার বই দুর্নীতিমূলক বলিয়া বন্ধ করিলেই আমি আজ লক্ষপতি হইয়া উঠিব। লম্বা লম্বা চুল, কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ, এই গ্রন্থকারের দল নিজেদের স্বপক্ষে এই যুক্তি দিয়া চলাফেরা করিতেছে। চশমা পরা তরুণীর দল বলিতেছেন 'জীবন তো এই। নরকের সমস্ত পঙ্কিলতা ইহারা আলোয় তুলিয়া ধরিয়াছে। দুর্গন্ধে জীবন রক্ষাই দায় হইয়া উঠিল।" রাজপুত্রের এই বিতৃষ্ণার হেতু নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লণ্ডনের 'দি ডেলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় লেখা হইয়াছে, সম্প্রতি রাজকুমার জেন অষ্টেন পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রাচীন ইংলণ্ডের গ্রাম্য গাথার সহিত তিনি অচ্ছেদ্য বন্ধনে নিজেকে জড়াইয়া বাঁচিয়াছিলেন।

আমরা তাঁহার ভাগ্যকে ঈর্ষা করি। বর্ত্তমান বাংলা উপন্যাসের পঙ্কিল ক্ষেত্রে যদি কেহ প্রাচীন বাংলার পল্লীশ্রীকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারিত, তবে বাংলার পাঠক পাঠিকা আজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাচিত।

নারীর স্বর্গ

আমাদের দেশে নারীপ্রগতির একটা জোয়ার আসিয়াছে। কাগজে কাগজে তাহার নিত্য নূতন পরিচয় পাওয়া যায়। যে দেশ হইতে ইহার উদ্যম-উৎসাহ আমরা আজ নিতে চেষ্টা করিতেছি, সেই দেশেরই একটি নারী গত এপ্রিল মাসের 'ফোরাম' কাগজে এই সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশ নীচে দিলাম। লেখিকা শ্রীমতী জেন অ্যালেন, বয়ঃক্রম ২৮। বর্ত্তমানে ক্যালিফোর্ণিয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বে নিউইয়র্ক ও কলোরেডোতে বাস করিয়া আসিয়াছেন। একজন সাংবাদিকের স্ত্রী। একটি পুত্রের জননী।

আগে আমার জীবনের মূল নীতি ছিল, মেয়েরা যদি জীবিকার্জ্জনের জন্য পরিশ্রমই না করে, তবে কোনও দাবীতেই তাহারা পুরুষের সমকক্ষতা পাইতে পারে না—সে নীতি বর্ত্তমানে আমি পরিহার করিয়াছি।

বিবাহের পরও পুরা সাত বৎসর আমি কাজ করিয়াছি, শুধু খোকা হইবার সময়ে কয়েক মাসের ছুটি নিয়াছিলাম। নিতান্ত খেলো চাকরি করি নাই, মাহিনা দিব্য ছিল এবং যে কাজ করিতে হইত তাহা মন্দও লাগিত না। তখন ভাবিতাম, ঘরণী হইয়া পুত্রকন্যার জননীর জীবনযাপন দুর্ভাগ্য, সত্যকার শিক্ষিতা ও গুণী মেয়ে উহাতে কিছুমাত্র তৃপ্তি পাইতে পারে না।

বছর দুয়েক আগে একটি বান্ধবীর সহিত দেখা হইয়াছিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে দেখিলাম। এক সময়ে সে আর আমি এক কলেজে পড়িতাম। এখন সে পুরাদস্তুর আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ে লাগিয়া পড়িয়াছে। আগে সে স্ফূর্ত্তিবাজ, মজলিসী, দিলদরিয়া ছিল। তারপর দশ বৎসর কাটিয়াছে। দেখিলাম এখন সে কঠিন হিম হইয়া গিয়াছে। কেবল চুক্তিকরণ চুক্তিপূরণ নিয়াই তাহার বর্ত্তমান জীবন। সে-জীবনে গান নাই, উল্লাস নাই। মাধুর্য্য, মিষ্ট স্বভাব তাহার সব কিছুই ব্যবসায়ে খাইয়াছে। অবসর-বিনোদনের সঙ্গীহিসাবে তাহার জুড়ি ছিল না, এখন তাহার কাছে প্রত্যেকটি ঘণ্টা টাকার মূল্য কসিয়া কাটে—সময়ের আর কোনও অর্থই নাই তার কাছে।

সেইদিন হইতে আমি ভাবিতে সুরু করি। তাহাকে দেখিয়া নিজের অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ আন্দাজ করিতে পারিয়াছিলাম। সেদিন হইতে ঠিক করি যে অর্থ উপার্জ্জন ছাড়াও জীবনযাপনের অন্য যে উপায়, তাহাই অবলম্বন করিব এবং ইহার কিছুদিন পরেই কাজে ইস্তফা দিয়া দিলাম। অবশ্য ব্যাপারটায় গোলযোগ বিস্তর ছিল তবু শেষ অবধি সবই মিটিয়া গেল।

আজও আমি বেকার বসিয়া নাই। কিন্তু কি করি?

চাকরি ছাড়িবার আগেই ঠিক করিয়াছিলাম যে অবসর পাইলে আমার স্বভাবের সামাজিকতার দিকটা একটু বিস্তৃত করিব। আজ আমার বাড়িতে অতিথি অভ্যাগতেরা আসিয়া খুশী হয়, কেহ কেহ দিন চার পাঁচ হয়ত থাকিয়াই যায়। অবশ্য টাকাকড়ির টানাটানি একটু ভোগ করিতে হয়ই। কিন্তু অতিথির তাহা বুঝিবার জো নাই।

পড়িবার সময়ের আজ আমার অভাব নাই। মোলিয়ারি, রেসিন, জিন ক্রিষ্টকার, টমাস হার্ডি, ডষ্টয়েভস্কি – সকলের সব বই আমি ইহারই মধ্যে পড়িয়া ফেলিয়াছি। পত্রিকা কয়খানি পড়িয়া স্বামীকে শুনাইবার মত হইলে খসড়া করিয়া রাখি, সকালে চা খাইবার সময় সে সব নিয়া আলোচনা হয়। অবশ্য জ্ঞান অর্জ্জন করিবার মহতী স্পৃহা হইতে এগুলি করি না,—ভালো লাগে বলিয়াই করি।

আয় কমিয়া যাওয়াতে সহরের বাহিরে বাসা নিতে হইয়াছে—আরও দু'একটা ব্যয়ের ছাঁটকাট করিতে হইয়াছে। কিন্তু মনে হইতেছে নিজেকে নিজে ফিরিয়া পাইয়াছি। আগে মেয়েরা যে সেলায়ের কাজ করে, লেস বুনে, আচার তৈয়ারি করে, শাকসব্জীর তদারক করে—এ সব বিষয়ে আমার অসীম অবজ্ঞা ছিল, এখন ভালো লাগে—এ কাজের সৃষ্টির দিকটা তখন নজরে পড়িত না, এখন পড়ে।

আমার বাগানে তরিতরকারি হয়--ফুল হয়, এসবের জন্য আমাকে কৃষিবিষয়ক পত্রিকা পড়িতে হয়। ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে বাগানের কাজে একটা স্বতন্ত্র আনন্দও আছে, কুঁড়ি হইতে ফুল আর ফলের পরিণতি-প্রতীক্ষার মধ্যে। খাওয়ার সময়ে বাগানে জন্মানো তরিতরকারির যেন বিশেষ একটা স্বাদ পাই।

আগে মনে হইত রন্ধনবিদ্যা আর খাদ্যতত্ত্ব নিকৃষ্ট মস্তিষ্কের ভাবনার ব্যাপার—কিন্তু এখন এই সবেই আনন্দের আমার সীমা নাই। রন্ধনশালায় যে-মেয়েরা কেবল হেঁসেলের কাজ বলিয়া অবজ্ঞায় হাড়ি ঠেলে, তাহারা তো কষ্ট পাইবেই। কিন্তু পড়িয়া শিখিয়া, নিত্যকার রন্ধনকার্য্যকেও মনোমুগ্ধকর শিল্প হিসাবে সুরুচি ও কল্পনার খোরাক করা যাইতে পারে।

সব কাজেই আনন্দ সমান—প্যাঁচার মতো মুখ করিয়া কাজ করা আর উৎসাহী শিক্ষার্থীর মতো কাজ করা, দুইটা আলাদা ব্যাপার। এক রকমে সব কাজ খারাপ লাগে, আর এক রকমে সব কাজই ভালো লাগে। বাগান-সংক্রান্ত কাজকর্ম্মের জন্য যেমন, তেমনই রন্ধনকার্য্যের জন্যও আমি ছোট খাট একটি লাইব্রেরী গড়িয়া তুলিয়াছি। পত্রিকায় কোনও কিছু জ্ঞাতব্য পাইলে, তখনই তা কাটিয়া রাখি। এই সব সম্বন্ধে আবার ইহার উহার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নিই, ঠিক কিনা—আগে হয়ত যাহাদের সহিত কথাই কহিতাম না, তাহাদের কাছে এই জন্যই ছুটিতে হয়। কথাবার্ত্তায় বুঝিয়াছি ইঁহাদের জ্ঞান এদিক দিয়া খুব বেশী।

আগে গুরুজন বলিতে বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করিতাম না। বরং তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্যই করিতাম। এখন দেখিতেছি ইঁহাদের অভিজ্ঞতা আর কাণ্ডজ্ঞান এ দুয়ের মতো মূল্যবান স্বর্ণখনি আমাদের জীবনে কদাচ মিলিবে। হয়তো এ পরিচয় আমি জীবনে পাইতাম না, চাকরি না ছাড়িলে এ সৌভাগ্য আমার হইত না।

তারপর ছেলেরা—আমার অনবত্নের সাক্ষ্য তো ইহারাই। ভাবুকতা বলিয়া হাসিয়া উড়াইবার কথা নয় ইহা। ছেলেকে আমি খুবই ভালো বাসি—নির্ব্বোধের মত নয় অবশ্য। কিন্তু এই ভালবাসার মধ্যে আমার একটু স্বার্থপরতা আছে, আমার জীবনের সার্থকতার সমাপ্তি আমি তাহার মধ্যে দেখিতে চাই, আমার ব্যর্থতা হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দিতে চাই—আমার সকল সাধ আশা স্বপ্ন কামনা সম্পূর্ণ করিয়া সে আমার জীবনকে, স্বপ্নকে ভবিষ্যতে ব্যাপ্ত করুক্।

ছেলে মানুষ করার মতো কঠিন কাজ আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অমর হইবার সাধনা সহজ সাধনা নহে। মনে হয়, ছেলেকে বুঝিতে দিতে নাই যে, তাহারই জন্য আমার সব চিন্তা। জমি তৈয়ারী করাই আসল—বেড়া দিয়া ঘেরিয়া, নিড়ানি দিয়া চাঁচিয়া, সার দিতে দিতে, জল টানিতে টানিতে হয়রাণ হইয়া যাইতে হয়—তারপর বীজ-বপন।

আমার এই ক্ষুদ্র নীড়ে আমি বৃহৎ জগতের সন্ধান পাইয়াছি। আদিম নারীর প্রবৃত্তিকে সভ্যতার নলে পুরিয়া চুয়াইতে চুয়াইতে নিশ্চিহ্ন করিবার আজ আর আমি পক্ষপাতিনী নই।

অবশ্য বিবাহ করিয়া ভারবাহী বলদের মতো জীবনযাপনের মধ্যেই স্বর্গ আছে, এ কথা বলি না। সে স্বর্গ খুঁজিয়া নিতে পরিশ্রম করিতে হয়—ভোজবাজীর মত চাক্ষুস হয় না। স্বামী যদি নিতান্ত অবুঝ ও মূর্খ না হয়, যদি তাহার সঙ্গে রুচির পার্থক্য না থাকে—তাহা হইলে একটু বুঝিয়া সুঝিয়া ধীর ও বিচক্ষণভাবে চলিলেই জীবনে স্বর্গের সন্ধান মিলিতে পারে। আমি বিশ্বাস করি যে বিবাহিত জীবনে পুরুষ অপেক্ষা নারীর দায়িত্ব অধিকতর।

র‍্যাল্‌ফ বর্সোদি বলিতেছেন, "জীবন্ত সামগ্রী নিয়া গৃহিণীর কারবার, স্বামী, ছেলেমেয়ে, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন; আবার জড়জগতের মধ্যেও বহু জিনিষেই তাহার প্রয়োজন—খাওয়াপরা, ঘরদ্বার ইত্যাদি। তাছাড়া অদৃশ্য জগতেরও খানিকটা আছে—মনুষ্য সভ্যতার সব কিছু—যেমন, সমাজ, ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প—ইহারাও বাদ পড়ে না। এই সব নিয়া গৃহিণীকে ছেলেমেয়ের জন্য সুখ-নীড় গড়িয়া তুলিতে হয়, নিজের জন্য, স্বামীর জন্য—বহির্বিশ্বের অনেক লোকের জন্যও।"

শিশু-শিক্ষা

শ্রীযুক্ত ওয়াল্টার বি, পিট্‌কিন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্ণালিজমের অধ্যাপক। গত মার্চ্চ মাসের 'দি পেরেণ্টস্ ম্যাগাজিন' পত্রিকায় 'শিশু-শিক্ষায় সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা' নিয়া তিনি যে-প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহারই মোটামুটি কথাগুলি বাংলা করিয়া দিলাম—

ছেলেমেয়েদের সংবাদ পত্র পড়া উচিত কি?

হাঁ, যদি তাহাদের বাপ-মায়ে পড়িতে জানেন, তবেই। কিন্তু ক'জন বাপ-মা কাগজ কেমন করিয়া পড়িতে হয়, তাহা জানেন? হয়ত' এক শ'র মধ্যে একজন। ছেলেমেয়েদের সংবাদ-পত্র পড়াইবার পূর্ব্বে, বাপমায়ের আগে শেখা উচিত, কেমন করিয়া কাগজ পড়িতে হয়। মূলতঃ সমস্যা হইতেছে বাপমা'দের নিয়াই।

কয়জনই বা তেমন করিয়া সংবাদ-পত্র পড়িয়া বুদ্ধি বিবেচনা দিয়া মত পোষণ করার মশলা সংগ্রহ করেন! নিউইয়র্কে আমার নিজস্ব পরীক্ষা ও চিকাগোতে আমার জনৈক সহযোগীর পরীক্ষার ফলে দেখিয়াছি যে, সুশিক্ষিত লোক কাগজ উল্টাইয়া পড়িতে চব্বিশ ঘণ্টার পোনেরো মিনিট কাল ক্ষেপণ করেন, আর মোটামুটি শিক্ষিত লোক গড়পড়তায় আধ ঘণ্টা কাল কাগজ পড়েন—এঁরা অপেক্ষাকৃত ধীরে পড়েন, সংবাদ-বাছাইশক্তিও ইঁহাদের কম এবং প্রায় সব সংবাদেই ইঁহারা চোখ বুলাইয়া যান্। আরও কম বুদ্ধি

যাঁহাদের, তাঁহাদের সময় লাগে আরও বেশী এবং কাগজ পড়িয়া তাঁহারাই সব চাইতে বেশী বিচলিত হন।—কিন্তু সত্যকার দরকারী সংবাদ প্রায়ই ইঁহাদের নজরে পড়ে না। যদি কেউ তাঁর ছেলেমেয়ের সংবাদপত্র পাঠশিক্ষার ভার গ্রহণ করেন, তবে তাঁর প্রথম মুস্কিল হইতেছে নিজের পঠনাভ্যাস, দ্বিতীয় মুস্কিল সংবাদ-পত্রের জগাখিচুড়ী মাল মশলা। কয়েকটি নাম-করা কাগজ ছাড়া সব কাগজই বাজে। হয়তো খুব বড়ো বড়ো করিয়া যাহা লেখা হইয়াছে কিংবা যে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহার পাশে ছোট একটু স্থানে অতি খুদে অক্ষরে ছাপানো সেদিনকার সব চাইতে মূল্যবান সংবাদটি পাওয়া গেল। এই মূল্যবান সংবাদ বাছাই করিয়া নিবার বিদ্যাই আসল বিদ্যা, খোসা বাদ দিয়া শাঁস সংগ্রহ করিতে হইবে।

ছেলেদেরকে যেমন কখনোই খবরের কাগজ পড়িতে বারণ করা উচিত না, তেমনই জোর করিয়া তাহাদেরকে কাগজ পড়িতে দেওয়াও ঠিক না। প্রথমটায় খবরের কাগজ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা খারাপ হইয়া যাইবে, দ্বিতীয়টায় উহা পাঠে আনন্দই নষ্ট হইবে।

হাসির বই-কাগজে হাত দিলেই যে ছেলেরা তরলচিত্ত হইবে, এমন ভাবা ভুল। ৫ হইতে ১২ বৎসরের বয়সের ছেলেরা মজার গল্প, ছবি পড়িতে, দেখিতে ভালবাসে। পরীর গল্পের মতোই উহারা অবাস্তব ও অসম্ভব। সুতরাং ছেলেমেয়েদেরকে অনিষ্ট উহারা করে না। তাই বলিয়া হাসির গান, গল্প পড়িতে যদি তাহাদেরকে জোর করা যায়, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই তাহাদের হাসিবার শক্তি লোপ পাইবে।

কাগজে-কাগজে নিত্য নিত্য খুন-জখম, আত্মহত্যা, অবৈধ প্রণয়ের যে সব কাহিনা প্রকাশ হয়, সেগুলি পড়িতে নিষেধ করাও ঠিক নয়। ঐ সব সংবাদ গুলিকে কাটিয়া-কুটিয়া ছেলেদের হাতে কাগজ পড়িতে দিলে আরও সর্বনাশ। মোটের ওপর এই পৃথিবীটাকে ঘসিয়া-মাজিয়া-ধুইয়া নিতান্ত ছেলের হাতের মোয়া করিয়াই ছেলেমেয়ের সহিত পৃথিবীর পরিচয় ঘটাইয়া লাভ বিশেষ নাই।

বয়স্কদের মতোই ছেলেরাও কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাটাই আগে উল্টাইয়া দেখে। বড়ো বড়ো হরফে সেখানে যাহা লেখা থাকে, সেগুলি সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া পরে অন্য খবরের সন্ধান করে। এ এক রকম নিশ্চিতই বলা যায় যে নোংরা খবর ছেলেকে বেশী ছাপ দিতে পারে না; অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ খবরের সব কিছু সে ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু যদি তাহাকে ইহা পড়িতে নিষেধ করা হয়, তাহা হইলে স্বতঃই তাহার মনে এ সম্বন্ধে একটা ঔৎসুক্য জাগে।

সুতরাং পৃথিবীর নোংরামির সম্পর্কে মৌন থাকাই ভালো। যদি ছেলেরা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বলাই ভালো—এমন করিয়া বলিতে হয়, যাহাতে অন্যায় আর অপরাধ সম্বন্ধে তাহাদের মনে একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আসে।

আসল মুস্কিল হইতেছে ১২ বৎসরের বেশী বয়সের ছেলেদের নিয়া। পড়িতে উৎসাহ দিবার সহিত একথাও ইঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে ইহাতে তাহার বিচার ও বিবেচনাশক্তি জাগে। গল্প করিবার ছলে আধুনিক জগতের সমস্ত সংবাদের আলোচনা করিয়া তাহাকে পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার সম্বন্ধে উৎসুক করিয়া তুলিতে হইবে। কোনও রকমেই যেন তাহাকে বুঝিতে না দেওয়া হয় যে ইহা তাহার পাঠেরই সামিল—তাহা হইলেই আর এদিক দিয়া তাহার মন ঘেঁসিতে চাহিবে না।

কি করিয়া ছেলেদের ঔৎসুক্য জাগানো যায়?

আজিকার কাগজে দেখিতেছি, আমেরিকার ২৫,০০০,০০০ পরিমাণ গমের সহিত ব্রেজিলের ১,০৫০,০০০ পরিমাণ কফির বিনিময়-ব্যবস্থা হইতেছে। একটি কাগজে এ বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখিতেছি আমরা এই বিনিময়ে ১,৩৫০,০০৫,০০০ রুটির পরিবর্তে ৪,০৪২,৫০০,০০০ কাপ কফি নিলাম। এখন ছেলেদেরকে ইহার ভিতরকার কথাটি বলিবার আগে রুটি আর কফি নিয়া বেশ আলোচনা সুরু করা যায়—এ দেশের ক'টা পরিবারে এই ব্যবস্থা দ্বারা রুটি আর কফির ব্যবস্থা রহিল? এবং এমনই করিয়া বিনিময়-প্রণালীর গোড়ার কথা বলিয়া যাইতে পারা যায়—আগেকার দিনে পয়সার পরিবর্তে লোকজন কি রকম জিনিসে-জিনিসে বিনিময় করিত ইত্যাদি। এই একটি সংবাদকে ভিত্তি করিয়াই বহু কথা বলা যাইতে পারে।

আসল কথা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়া পড়িলে পত্রিকাদিতে পড়িবার মতো অনেক রসদ পাওয়া যাইতে পারে। ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষা দিতে হইলে ইহা করা দরকার। কাগজ হইতে দরকারী সংবাদ কাটিয়া কেমন করিয়া রাখিতে হয়, তাহাও এই প্রসঙ্গে শিখানো যায়।

এরোপ্লেনের কথাই ধরা যাক। আজিকার দিনে এমন কোনও ছেলে নাই যে এরোপ্লেনে চড়িবার কিংবা এরোপ্লেন সম্পর্কে পড়িবার, কথা কহিবার, ভাবিবার সুযোগ পাইলে স্বর্গসুখ পায় না। মাত্র সংবাদ-পত্র হইতে যে-কোনও শিশুকে এরোপ্লেন-চালন বিদ্যায় হাতে খড়ি দেওয়া যায়। এই সম্পর্কে যাহা কিছু ছবি, সংবাদ, তথ্য কাগজ হইতে কাটিয়া নিয়া দিনের পর দিন এদিককার সকল প্রগতি ইহার নজরে রাখিলেই হইল।

ভূগোল সম্বন্ধে উৎসুক শিশুকে এমনই করিয়া হাতে খড়ি দেওয়া যায়। অবশ্য একটি ছেলে একটি কি বড়জোর দুইটি বিষয়ে খবর রাখিতে পারে, তার বেশী নয়। একটি হইলেই ভালো, তাহা হইলে জ্ঞান একেবারে নিখুঁৎ হয়।

এই কাটিং-সমেত খাতাগুলিকে সংবাদপত্র হইতে মাল-মশলা নিয়া ভরাইয়া তুলিয়াই ছেলেরা ক্ষান্ত হয় না—দিন দিন আরও অনেক বই পত্রিকা হইতে জ্ঞাতব্য পুঁথিপত্র হইতে নিজেরা স্ব-ইচ্ছায় বহু সংবাদ বহন করিয়া আনিবে।

একটি পরিবারের কথা জানি। প্রতি শুক্রবার রাত্রে বাবা ছেলেদের নিয়া 'আধুনিক খবরাখবর' খেলা খেলেন। বাবা প্রত্যেক ছেলে-মেয়েকে গত সপ্তাহের পাঁচটি বিশেষ সংবাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। পারিলে ৫ নম্বর, না পারিলে গোল্লা। যে ফার্ষ্ট হয়, তাহাকে একটি প্রাইজ দেওয়া হয়। শুক্রবার রাত্রি এই বাড়ীর ছেলেমেয়েদের আনন্দের অবধি থাকে না।

এমন করিয়াই ছেলেরা প্রত্যেক সংবাদের যেটুকু জানিবার, বুঝিবার তাহা শিক্ষা করে। সুতরাং বড়ো হইবার আগেই পত্রিকা পড়ায় তাহাদের মন একেবারে রপ্ত হইয়া উঠে।

ছেলেদের যে জ্ঞানগম্য কিছু হয় না, ইহার দোষ ছেলের বাপ-মার আর শিক্ষকের। পড়িয়া যাইতেছে তো যাইতেছেই, কেহ দেখিবার শুনিবার নাই। কি করিয়া মন দিতে হয়, কি করিয়া ঠিক যেটুকু জানিবার সেটুকু জানিতে হয় ইহা বলিবার মতোও কেহ নাই—এমন করিয়াই ছেলেদের স্বাভাবিক বুদ্ধি-বৃত্তি কমিয়া যায়।

ছেলেকে মানুষ করিবার পন্থাহিসাবে চিরকাল ইস্কুলের দিকে চাহিয়া থাকিলে চলে না। এদিক ওদিক হইতে খবরের কাগজ ইত্যাদি হইতে সাহায্য নেওয়া খুবই দরকার।

মাস-কাবারী

১লা জ্যৈষ্ঠ—অদ্য অপরাহ্নে মুসলমান পল্লী নাগদেবীতে হিন্দু কুম্ভকারগণ হঠাৎ মুসলমান জনতাকর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ফলে ২১জন আহত হইয়াছে। আমেরিকায় লিণ্ডবার্গ শিশুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। জার্ম্মাণীর সমর-সচিবের পদত্যাগ সংবাদ পাওয়া গেল।

২রা জ্যৈষ্ঠ—বোম্বাইয়ের দাঙ্গায় প্রায় ২৩জন হত ও ২৫০জন আহত হইয়াছে। দেউলী ক্যাম্প জেলে বাঙ্গালী রাজবন্দীদের ব্যবস্থা সম্পর্কে এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। জাপানের প্রধান মন্ত্রী রিভল্‌ভারের গুলীতে গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন।

৩রা জ্যৈষ্ঠ—বোম্বাইয়ের দাঙ্গা এখনও চলিতেছে। আরও ছয়জন নিহত ও ১৮৩ জন আহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতায় মহরমের মিছিলের সময় গোলযোগ হওয়ায় পুলিশ গুলীবর্ষণ করে। তাহাতে ৯জন আহত হইয়াছে। আততায়ীর গুলীতে আহত জাপানের প্রধান মন্ত্রী ইনুকাইয়ের মৃত্যু হইয়াছে।

জাপানের মন্ত্রী সভা পদত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু সম্রাট তাঁহাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণে সাময়িকভাবে অসম্মত হইয়াছেন। রাজনৈতিক অবস্থার জন্য টোকিও-ওসাকা, কোবের শেয়ার ও চাউলের বাজারে ক্রয় বিক্রয় বন্ধ রাখা হইয়াছে।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ—বোম্বাইয়ের দাঙ্গা এখনও থামে নাই। গতকল্য রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত ৬৬জন নিহত ও ৭৭৩জন আহত হইয়াছে।

৫ই জ্যৈষ্ঠ—বোম্বাই দাঙ্গায় এ পর্য্যন্ত ১০০শত জন নিহত ও ১০০০জন আহত হইয়াছে।

৬ই জ্যৈষ্ঠ—দেশনেতা মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল অদ্য বেলা ১॥০ টার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। কেওড়াতলার ঘাটে তাঁহার নশ্বরদেহ ভস্মীভূত হয়। "ডেলে" শপথ বর্জ্জন বিল সম্পর্কে শেষবারের আলোচনায় ডি, ভ্যালেরা দলের জয়লাভ ঘটিয়াছে।

৭ই জ্যৈষ্ঠ—গয়ায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখা দিয়াছে। এডেন উপসাগরে শোচনীয় জাহাজ দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ ফরাসী জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে ৯১জন নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা করা যাইতেছে।

৮ই জ্যৈষ্ঠ—বোম্বাইয়ের অবস্থা অনেকটা শান্ত। প্রায় ১২০০শত দুর্ব্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এপর্য্যন্ত ১৫০জন নিহত ও ১৬০০শত আহত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ পারস্যত্যাগ করিয়া ইরাক অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

১০ই জ্যৈষ্ঠ—দাঙ্গা সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশ করায় বোম্বাই ক্রনিকেলের মুদ্রাকরের নিকট ৬০০০৲ হাজার টাকা জামিন তলব করা হইয়াছে।

স্পেনে বিপ্লবীদল প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা ও বিদ্রোহ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। পুলিশ উহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। প্রায় সিকিটন ডিনামাইট ও ১০০টি বোমা পাওয়া গিয়াছে। ষড়যন্ত্রের নেতাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে

ইংলণ্ডের বহুস্থান জলপ্লাবিত হইয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে জনসাধারণের জন্য নৌকাযোগে খাদ্য প্রেরণ করিতে হইয়াছে।

সাংহাইস্থিত বৃটিস ভাইস কন্সাল আততায়ীর গুলীর আঘাতে গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন।

চীনের বৈদেশিকগণের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য জাপান টোকিও সহরে এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করিতেছেন।

প্রুশিয়ার নির্ব্বাচনে নাৎসী দলের সাফল্যের ফলে তথাকার মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন।

১১ই জ্যৈষ্ঠ—দ্বারভাঙ্গাবিল্ডিং-এ স্যার আশুতোষের ৮ম বার্ষিকী স্মৃতি পূজা হইল। বোম্বাইয়ের হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দুগণের মনে এখনও আতঙ্ক রহিয়াছে। ফলে অনেক হিন্দু এখনও দোকান খোলে নাই।

—কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর সদল বলে বোগদাদে পৌঁছিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। ১৫ই তাঁহার রাজা ফৈজুলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা।

জাপানের প্রধান সেনাপতি শিরাকাওয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি সম্রাটের জন্মদিবস উৎসবে সাংহাইয়ে বোমা বিস্ফোরণে আহত হইয়াছিলেন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ—বোম্বাইয়ে পুনরায় নূতন করিয়া দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। ডগ্‌লাস হত্যা সম্পর্কে ধৃত ফণীন্দ্র দাসের উপর পুলিশের অত্যাচার সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হইয়াছিল তাহার তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে। রুশসীমান্ত অভিমুখে জাপানী সৈন্যদল অভিযান করিয়াছে ফলে সোভিয়েট জাপান যুদ্ধ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ—কলিকাতা হইতে দেউলীতে অদ্য পর্য্যন্ত ৫২ জন বাঙ্গালী রাজবন্দী স্থানান্তরিত হইয়াছে। ফণীন্দ্র দাসের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত আজও চলিয়াছে।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ—ফণীন্দ্র দাসের অভিযোগ সত্য নহে, হিষ্টিরিয়ার ফলে সে আহত হইয়াছিল—এই মর্ম্মে বিচারক তাঁহার রিপোর্ট মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পেশ করিয়াছেন। স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনার্থ আলবার্ট হলে জনসভা হইয়াছে।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ—বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় বড়লাটকর্ত্তৃক উহার পুনঃপ্রবর্ত্তন হইল।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ—বোম্বাইএ পুনরায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফলে এ পর্য্যন্ত ৫জন নিহত ও ২১ জন আহত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বোগদাদ হইতে ওলন্দাজ বিমানপোতযোগে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী সমভিব্যাহারে ইরাক হইতে বিমানপোতযোগে করাচীতে আগমন করিলে তাঁহাকে বিরাট সম্বর্দ্ধনা দান করা হয়। বোম্বাইয়ে আবার সান্ধ্য আইন জারী। শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসুকে চিকিৎসার্থ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সহ জব্বলপুর

জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। গত কল্য রাত্রির মধ্যে বোম্বায়ে একজন নিহত ও ১৩ জন আহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ—৫৷৷০ টাকা সুদ হারে ভারতগভর্ণমেন্টের নূতন ঋণ গ্রহণের ঘোষণা। এই ঋণের কোনো নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় রবীন্দ্রনাথের কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন। আমেরিকা হইতে বারজন ভারতীয় ছাত্র অর্থাভাবে বিতাড়িত হইয়াছে বলিয়া ডাঃ সুধীন্দ্র বসুর নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গেল।

২০শে জ্যৈষ্ঠ লোথিয়ান কমিটীর (ভারতীয় ভোটাধিকার কমিটী) রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। ইহাতে শতকরা ৪৩'৪ জন পুরুষ ১০'৫ জন নারীকে ভোট দিবার ক্ষমতা দান করা হইয়াছে। অদ্য প্রাতে জার্ম্মেণীর এক স্বাস্থ্যনিবাসে স্যার দোরাব টাটা পরলোক গমন করিয়াছেন।

২১শে জ্যৈষ্ঠ—আইরিশ সিনেট সভায় শপথ বিলোপ বিলের দ্বিতীয় আলোচনা ২১-৮ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

২২শে জ্যৈষ্ঠ—স্বর্গীয় বিপিন পালের শ্রাদ্ধক্রিয়া তাঁহার কলিকাতার বালীগঞ্জস্থিত বাসাবাড়ীতে সম্পন্ন হইল। মসিয় হেরিয়'কে লইয়া ফ্রান্সের নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইল।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ—বোম্বাইয়ে স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস জনৈক মুসলমান শিক্ষক কর্ত্তৃক ছাতি দ্বারা প্রহৃত হন। মেক্সিকোতে ভূমিকম্পে ৬৪ জনের মৃত্যু।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ—মেক্সিকোতে বন্যা ও আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের ফলে প্রায় ৪ সহস্র লোক হত ও আহত হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকায় চিলীদেশে বিপ্লবীদল শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিয়াছে।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ— এলাহাবাদের 'পাইওনিয়া'র নামক সংবাদ-পত্র হস্তান্তরিত হইয়াছে। দক্ষিণ চিলিতে পাল্টা বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। মিঃ ডি, ভ্যালেরার আমন্ত্রণে শপথ-বিল আলোচনা-প্রসঙ্গে ব্রিটিশ উপনিবেশ সচিব মিঃ টমাস ডাবলিন যাত্রা করিয়াছেন।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ শান্তি স্থাপনে মিঃ এণ্ডরুজের দৌত্য এবং মিঃ ডি, ভ্যালেরার সহিত মিঃ টমাসের দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ—ইঙ্গ আইরিশ সন্ধি আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ ডি, ভ্যালেরার লণ্ডনে আগমন।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ—ইঙ্গআইরিশ আলোচনা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ ইঙ্গ-আইরিশ মিলনের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। মিঃ ডি ভ্যালেরা লণ্ডন হইতে বিদায় লইয়া সহকর্ম্মীগণ সহ ডাবলিন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ—ফরিদপুরে বহু গৃহে খানাতল্লাসী—ফরিদপুর জেল হইতে কয়েকজন রাজবন্দীর মুক্তি। যশোহর জেলা সম্মিলন পুলিশ ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে ও অনেকে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তমলুকে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে অদ্য ৫জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করিয়া আবার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। উত্তর বঙ্গে কৃষক সম্মিলনের হুকুম দিয়া আবার গাইবান্ধার মহকুমা হাকিম ১৪৪ ধারা জারী করিয়া সম্মিলন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আসামের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ইংরাজি বিদ্যালয় সমূহে বাঙ্গলা ভাষায় ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া ইস্তাহার দিয়াছেন।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ—হাই কমিশনারের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারীর রিপোর্টে প্রকাশ—১৯৩০ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৩১ সালে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৮০০। এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেসিয়া ৫৩১, কানাডা ও নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডে ২১২, অষ্ট্রেলিয়ায় ১৯০ এবং নিউজীল্যাণ্ডে ১২৪ জন ছাত্র ছিল। ভারতীয় ক্রিকেট দল—বিলাতে ছয়টি খেলায় জয় লাভ করিয়াছে।

পুস্তক-পরিচয়

বিস্মৃতি—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত; ৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ডি এম্ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অঙ্কের বাংলা কবিতায় তর্জ্জমা ক'রেছেন। অনুবাদে অনেকসময় মূলের সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হয়। মৌলিকত্ব দেখাতে গিয়ে অনেকে মূল ভাববস্তুকে বিকৃত ক'রে ফেলেন, সতীশচন্দ্র তা করেন নি। তিনি মূলকেই অনুসরণ ক'রে যথাসাধ্য বাংলা কবিতার ছন্দে তাকে রূপ দিয়েছেন। তাঁর ভাষা স্বচ্ছ—কোথাও দুর্বোধ্য জটিল কিছু নেই। যাঁরা সংস্কৃত জানেন না, তাঁরা এই মধুর অনুবাদ কাব্যখানি প'ড়ে আনন্দ পা'বেন। কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্র শকুন্তলার দুর্ভাগ্যের কাহিনী এই পঞ্চম অঙ্কেই খুব করুণভাবে চিত্রিত হ'য়েছে—যা'র থেকে এর নাম হ'য়েছে বিস্মৃতি। শ্রীঅমিতাভ মৈত্র

নিবেদিতা—সচিত্র উপন্যাস। লেখক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়। প্রকাশক—দেব-সাহিত্য কুটীর, ৫৪।৭, কলেজ ষ্ট্রীট। মূল্য এক টাকা।

নবীন লেখকের লেখা হইলেও বইখানি সুলিখিত। তাঁহার লিখনভঙ্গী মন্দ নহে। উপন্যাসখানি পড়িয়া পাঠক হতাশ হইবেন না বলিয়াই মনে হয়। প্রকাশক এই পুস্তকে প্রকাশিত ছবিগুলিই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাঁহাদের সব উপন্যাসগুলিতেই ব্যবহার করিয়া থাকেন—ইহাতে লেখকের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখান হয় বলিয়া মনে হয় না।

পদ্মপাদ

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd., 56, Dharamtala Street, Calcutta.

দক্ষিণ-কালী

দক্ষিণ-কালী—হিন্দুজাতির নমস্য, সাধকগণের আরাধ্য মহাশক্তির মূর্ত্তি। কুণ্ডলায়িত নাগকেশ এবং সহস্র-জিহ্ব অগ্নিশিখা এই দেবীমূর্ত্তির প্রভা-আবরণ নির্ম্মাণ করিয়াছে। অন্যান্য লক্ষণ, আসন এবং আধার বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই দুর্লভ চিত্রটি সুপ্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন কর্ত্তৃক নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

২৫শ বর্ষ　　শ্রাবণ, ১৩৩৯　　৩য় সংখ্যা

স্বপ্নদূত

—শ্রীকালিদাস রায়

এই স্বপ্নশিশুগুলি, যাদেরে করেছি রূপদান,
যাহারা আমারে ঘেরি' তুলে আজি হর্ষ-কলতান,
যখনই ভাবিয়া দেখি মরণের সাথে সাথে মম
এরাও মরিবে হায় ছিন্নশাখে পুষ্পদলসম,
তখনই গুমরি' উঠে এই বক্ষ দারুণ ব্যথায়,
সৃষ্টির উল্লাসটুকু তার মাঝে কোথা ডুবে যায়।

এরা হায় জানেনাক ইহাদের আয়ুর সংবাদ,
এদেরে করেছে তাই নিরুদ্বেগ অবুঝ আহ্লাদ,
অনিচ্ছায় লজ্জা দেয় আমারেই মূঢ় দর্পভরে
জানে না বেদনা মোর তাই তা'রা কুণ্ঠায় গুমরে

চাহিতে এদের পানে চিত্ত গলি' নেত্রে ধারা বয়
গোপনে লুকায়ে অশ্রু করি আমি তৃপ্তি-অভিনয়।
সর্ব্বাঙ্গে বুলাই পাণি স্নেহভরে, ইহাদেরই লাগি
দুর্ব্বহ হ'লেও এই জীবনের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি মাগি।

আশা বড় কুহকিনী,—হায় তার যাদুমন্ত্র বিনা
দুর্বিষহ এ জীবনে হ'য়ে যেত নিদারুণ ঘৃণা।
সান্ত্বনার লাগি ভাবি, হয়ত বা মৃত্যু হ'লে মম
এদের দুর্গতি হেরি মাতৃহারা শাবকের সম
দরদী বান্ধব কোন' কৃপাভরে বক্ষে দিয়া ঠাঁই
বাঁচায়ে রাখিতে পারে। মোহভরে ভাবি আমি তাই

হয়ত এদের মাঝে একজনও বহিয়া বারতা
যুগ হ'তে যুগান্তরে চলে যাবে। হায়রে মমতা!
স্বপ্নের লাগিয়া স্বপ্ন এর চেয়ে কিবা মায়াময়।
আশা কুহকিনী বলে,—'না-না তাও অসম্ভব নয়।'

ওরে স্বপ্নশিশুগুলি, কোন' শক্তি মহিমা বিভূতি
তোদেরে পারেনি দিতে এ অক্ষম স্রষ্টার আকূতি।
স্নেহাতুর হৃদয়ের আর্ত্তি শুধু গলি' আঁখিজলে,
তোদের মালিন্য দৈন্য দূরিবারে চাহে পলে পলে।
এই আশীর্ব্বাদ থাক্ মায়া হ'য়ে অই ম্লান মুখে
তোদেরে করুণাভরে কেহ যেন লয় তুলে বুকে।

অনির্দ্দিষ্ট স্বপ্নশিশু, যার কথা ভাবি আশাভরে
চ'লে যাবে যুগ হ'তে দীর্ঘ পথে দূর যুগান্তরে,
আমার একটি বার্ত্তা তুমি যেন করিও বহন,
যুগান্তের কর্ণে শুধু জানাইবে এই নিবেদন,
"—একটি অখ্যাতনামা কবি, তার নামে কাজ নাই,
তাহার বাঁশরী হ'তে জন্মেছিনু মোরা ক'টি ভাই,
সবগুলি পথে হারা একে একে পাথারে ঝঞ্ঝায়,
একা আমি দীর্ঘ পথে চলিয়াছি দীন অসহায়,
কবির গভীর মর্ম্মবেদনার বার্ত্তাখানি বুকে,
যাব অনন্তের পানে পথ রুধে র'য়োনা সম্মুখে।"

সর্ব্বযুগ সর্ব্বদেশ দেয় জানি ব্যথার মর্য্যাদা,
দূতেরে কখন কেহ যাত্রাপথে দেয়নাক বাধা,
বাধা পায় দর্পারূঢ়, বাধা পায় দিগ্বিজয়ী রথী,
মহানদও পায় বাধা—মেঘদূত অবারিত-গতি।
কল্পনায় হেরিতেছি—অনামক স্বপ্নদূত মম
অনন্ত পথের যাত্রী তত্ত্বান্বেষী নচিকেতা সম,
দুরন্ত প্রান্তরপারে ঊর্দ্ধে চাহি চলেছে একাকী,
গগনে জলদঘটা চপলা চমকে থাকি' থাকি'—
কখনো হারায়ে যায় ঘূর্ণাবর্ত্ত ঝঞ্ঝার ধূলায়,
কখনো বা মরুপথে মরীচিকা আলেয়া ভুলায়,
কোথাও আতিথ্য লভে মমতার, কোথাও না পায়,
কভু বা অশ্বত্থতলে—শ্রান্ত দেহ নিশ্চিন্ত ঘুমায়,
পল্লী-রাখালের দলে চলে কভু হর্ষে গাহি গান,
পুরপথ-জনতায় কভু তার মিলেনা সন্ধান,
কভু বা বেদের দলে মিশে চলে দূর দিগন্তরে,
দুরারোহ শৈলপথে উঠে কষ্টে কভু যষ্টিভরে,
কৃপায় পাটনী কভু মহানদী ক'রে দেয় পার,
কভু বা সন্তরি তরে দুস্তর সে ক্ষুব্ধ পারাবার।
আমার সে স্বপ্নদূত—মোর বার্ত্তা শিরোধার্য্য করি'
চলেছে অনন্ত পানে অবিরাম দীর্ঘ পথ ধরি'।
এ কল্পনা জাগে যবে স্নেহ মোর শিহরিয়া উঠে
নির্ব্বিচারে সবারেই বুকে টানি ঢাকি পক্ষপুটে।

হিন্দু-সৌধ

—স্বামী বাসুদেবানন্দ

প্রায় সাত হাজার বছরেরও পূর্ব্বে বৈদিক যুগের আর্য্য-শিশুর হৃদয়ে ধর্ম্ম প্রতিভাত হোল প্রকৃতির রুদ্রমধুর লীলা-ভঙ্গীতে অবাক হয়ে; কোটি-সূর্য্য-প্রতিভাত হীরক-কিরীট-গর্ব্বিত হিমরাজ, শঙ্খবলয় অযুতবাহু সিন্ধুর নীল কান্তি, পুলক-কণ্টকিত গভীর স্তব্ধ নীলিমা, শ্রাবণের আঁখিধারা, শরতের দূর চক্রবালে গম্ভীর নিঃস্বন, বজ্রের প্রচণ্ড স্ফোট, উষার মধুরিমা সবিতা-সোম-দিক এরা কারা! মুগ্ধতা রূপ নিলে ঋক্ ছন্দে—ভাবের দ্যোতনা দেবতায় মূর্ত্ত হ'য়ে উঠলো—বরুণ, ইন্দ্র, সাবিত্রী, সরস্বতী, রুদ্র, বিষ্ণু রূপে। ক্রমে তার বুদ্ধি, প্রগতি আরও ঊর্দ্ধে উঠে দেখলে প্রকৃতির অন্তরালে র'য়েছেন তার গোপন দেবতা—জীবন ও বল যা থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে প'ড়চে। দিব্যধামবাসীরা যাঁকে সম্মান করেন, অমরত্ব ও মৃত্যু যাঁর ছায়া, সৃষ্টির পদ্ম যাঁর কোমল করসম্পাতে অলস আঁখি উন্মীলন ক'রে ধীরে বিকশিত হ'য়ে উঠচে।

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ—যা হ'চ্চে অনাদি, অনন্ত জ্ঞানরাশি, ঋষিরা তার দ্রষ্টা বা আবিষ্কর্ত্তা। ঋষিত্ব কোন জাতি, কুল, দেশ, কাল, পাত্র বা লিঙ্গের একাধিপত্যকে অপেক্ষা করে না। বেদ মানব জাতির সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মেতিহাস—এই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব জাতির ভেতরই ঋষির আবির্ভাব হ'য়ে গ্যাছে এবং ভবিষ্যতেও এই ঋষিত্ব সর্ব্ব ব্যক্তির ভেতর আবির্ভূত হবে। অতীতে বহু নারী ও শূদ্র ঋষি ছিলেন, এখনও আছেন, এবং ভবিষ্যতেও হবেন—বেদ ব'লচেন। হিন্দুধর্ম্ম কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভর করে না; যুক্তি-মার্জ্জিত শাশ্বত বেদের ওপর হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। মন্ত্র-ঋষিরা সত্যের দ্রষ্টা বা আবিষ্কারক। অন্তর্নিহিত ভাব-প্রেরণা থেকেই তাঁরা সত্য উপলব্ধি ক'রেচেন, বাইরে থেকে এসে সে জ্ঞান কেউ তাঁদের মুখস্থ করিয়ে দিয়ে যান নি। অন্তর ও বহির্জ্জগৎ-পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি দ্বারাই তাঁরা আধ্যাত্মিক সত্য-রাশি স্বায়ত্ত করেছেন। এই ঋষিদের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞানিত; কেউ কেউ রাজা ছিলেন এবং অনেকেই নারী। *

কিন্তু এতবড় উদার বেদ-বেদান্তের দেশে এত হৃদয়-হীনতা, দুর্ব্বলের প্রতি এত ঘৃণা, এত বিখণ্ডিত সাম্প্রদায়িকতা, ধীরে ধীরে বিধর্ম্মের অতি সহজে আমাদের ভেতর আত্ম-প্রভাব-বিস্তার—এমন সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মজ্ঞানী জাতির ভেতর কেন, কী রূপে এলো? এলো প্রাচুর্য্য থেকে। প্রাচুর্য্য থেকে বিলাস, বিলাস থেকে আলস্য, আলস্য থেকে জড়ত্ব। এই জড়ত্ব মানবের উদ্ভাবনী শক্তি ও কর্ম্মকুশলতার স্থলে বৃথা আভিজাত্য-গর্ব্ব ও আরাম-প্রিয়তাকে প্রতিষ্ঠা করে। এই আরামপ্রিয়তা যেখানেই ঢুকবে—তা সে যত বড়ই জাতি, সমাজ, সংঘ বা ব্যক্তি হোক না কেন তাকেই তামসিক শূদ্রে পরিণত ক'রবে। পল্লীগ্রামে যখন জগতের সর্ব্বপ্রথম দর্শন-বিজ্ঞানের আবিষ্কারক ব্রাহ্মণ বংশধরগণকে দেখি, তখনি একথার যাথার্থ্য প্রমাণ হ'য়ে যায়—অন্নবস্ত্রহীন, বিদ্যাহীন, অধ্যাত্ম-শ্রীহীন, ক্ষুৎক্ষাম, কোটরগতচক্ষু।

সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাত-সূর্য্যের উত্তরাধিকারীরা পিতৃ-পিতামহগণসঞ্চিত ধনরাশি নিঃশেষিত ক'রে যখন চেয়ে দেখলেন, তখন জগৎ অনেক এগিয়ে গ্যাছে—তাঁরা আছেন 'যাত্রিদলের সবার পিছে পড়ে'। তাঁদের অকর্ম্মণ্যতার

* রাণী ঘোষা ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন (ঋগ্বেদ, ১।১১৭, ১০।৩৯,৪০); লোপামুদ্রা ঋষি (ঋগ্বেদ, ১।১৭৯); মমতা (ঋ,বে, ৬।১০, ২); অপলা (ঋ,বে, ৮।৯১); সূর্য্যা (ঋ,বে, ১৪।৮৫); ইন্দ্রাণী (ঋ,বে, ১০।১৪৫); শচী (ঋ,বে, ১০।১৫৯); সপরাজ্ঞী (ঋ,বে, ১০।১৮৯); বিশ্ববরা (ঋ,বে, ৫।২৮)—ইনি যজ্ঞে পৌরহিত্যও করেন (ঋ,বে ৫।২৮, ১), অপলাও ইন্দ্রকে সোম নিবেদন করেন (ঋ,বে, ৮।৮১, ৪); রাজা মেনের রাণী বিশপলা যুদ্ধ ক'রতে গিয়ে পা নষ্ট হওয়ায় লৌহ-পদ গ্রহণ করেন (ঋ,বে, ১।১১২, ১০; ১১৬।১৫; ১১৭।১১; ১১৮।৮; ১০।৩৯।৮)। ঋষি মুদ্গলের সহধর্ম্মিণী ইন্দ্রসেনা স্বামীকে পরাজিত দে'খে দস্যুদের সঙ্গে নিজে তাঁর তীরধনুক গ্রহণ ক'রে যুদ্ধ ক'রে তাহাদিগকে পরাজিত করেন। তিনি যুদ্ধে স্বামীর সারথ্য কর্ম্ম ক'রতেন (ঋ,বে, ১০।১০২)।

অবসরে, অন্যান্য কর্ম্মঠ সহিষ্ণু জাতি, তাঁদের অধিকারের ভেতর ধীরে ধীরে নিজেদের ধর্ম্ম, ভাষা ও আচার প্রসারিত ক'রে, বেশ একটা স্থান সীমানা নির্দ্দেশ ক'রে নিয়েচে—এখন তাই এই বিরাট সভ্যতা, ধর্ম্ম, ভাষার জন্মভূমিকে বহুধা বিখণ্ডিত ক'রে, কেউ বলচে এ অংশটা এদের দেশ, এই অংশটা আমাদের উপনিবেশ।

রাজনৈতিক একতার প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে—কিন্তু আমাদের অন্তর্জ্জীবন যদি বিভিন্ন বিজাতীয় বাহ্য ভাব প্রেরণার দ্বারা নিয়মিত হয়, তা হ'লে সে ঐক্য জীবনের মধ্যে নিরন্তর একটা মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা ও বিসংবাদই সৃষ্টি ক'রে রাখবে। কারণ এ বৈচিত্র্য ত' একতার মূল, সূত্রাত্মা মহাপ্রাণের বিচিত্র বিকাশ নয়—এ ত' একই বৃক্ষপ্রাণের কাণ্ড, ত্বক, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফলের মত স্বাভাবিক বৃদ্ধি বৈচিত্র্য নয়—এ সব কেবল পুরুভুজের মত মূল বৃক্ষে স্বীয় সৌন্দর্য্যের মেখলাবিস্তার।

তবে বাহিরেরও প্রয়োজন আছে। বৃক্ষ যেমন বাহিরের জল, বায়ু, মৃত্তিকা, আকাশ, উত্তাপ নিয়ে আত্মশক্তিতে বর্দ্ধিত হয়, বাহিরের উপকরণগুলো, অপ্রয়োজনীয় অংশের বর্জ্জন কোরে, সে এমন ভাবে স্বায়ত্ত বা আত্মস্থ করে নিয়েচে যে সেগুলোকে আর বাহিরের বস্তু ব'লেই বোধ হয় না—সেগুলো কেবল গৌণ হ'য়ে থেকে, বৃক্ষের প্রাণকেই মুখ্যরূপে লোকসমক্ষে পরিচিত ক'রে দেয়—ঠিক তেমনি ভাবে বাহিরের প্রয়োজন। নইলে বাহিরের ছিমে মস্তিষ্কের দাসত্ব এমন জমাট বেঁধে উঠবে যে তার উদ্ভাবনী শক্তির রাস্তাগুলো একেবারে অবরুদ্ধ হ'য়েই যাবে। এই বিরাট জাতির মূল বনিয়াদ যা ধর্ম্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেটাকে ধ্বংস ক'রে যদি পাশ্চাত্য সংস্কারের ওপর আবার নতুন ক'রে তাকে গ'ড়ে তুলতে হয়, তা হ'লে সেটা একেবারে পাশ্চাত্যই হ'য়ে পড়বে—তাতে ভারতীয় ব'লে কিছুই থাকবে না। তারপর, কতকগুলো লোক যদি নিজেদের মতবাদগুলো বলপূর্ব্বক অপরের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাতে চায়—তাতে কেবল প্রাচীন দাসত্ব প্রথারই পুনরভিনয় মাত্র হবে—এক অত্যাচারের পরিবর্ত্তে আর এক অত্যাচারকে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসাই সার হবে—কাঞ্চনকৌলীন্যের পরিবর্ত্তে মস্তিষ্ক বা পেশীকৌলীন্যের আবির্ভাব দেখতে হবে। ফলে যে যা চায়না তাকে বলপূর্ব্বক তা নেওয়াতে গেলেই বিপ্লবের পুনরাবর্ত্তন—কাঞ্চনের বিরুদ্ধে দারিদ্র্যের, মস্তিষ্কের বিরুদ্ধে অশিক্ষিতের, পেশীর বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের অসহযোগ নবীনাকারে সৃষ্টি হবেই।

তারপর এই শতধা ভাববিখণ্ডিত ভারতের সমন্বয়ের মূল সূত্র কোথায় আগে সেইটে জানা বিশেষ দরকার। মন-ত্রিভুজের তিনটে দিক্—বিচার, ভাবুকতা এবং কর্ম্মেচ্ছা। এগুলি সমভাবে সকলের ভেতর পরিস্ফুট নহে, সর্ব্বত্রই একটি প্রধান হ'য়ে দেখা দেয়। যার মস্তিষ্ক বিচার-প্রধান সে হয় জ্ঞানী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক - তার প্রকৃতি বিশ্লেষণাত্মক; যার মনে ভাবুকতা অধিক সে হয় ভক্ত, কবি, সুরজ্ঞ, শিল্পী—তার প্রকৃতি সমষ্টি-সৌন্দর্য্যপ্রিয়। আর কর্ম্মেচ্ছা যার প্রবল সে হয় কর্ম্মী,—বিচার বা ভাবের আদর্শ তার কম - সে হয় ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ-কুশল—তাই জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ। ধর্ম্মের স্তরও বিভাগ স্বীকার করায়, হিন্দুর ধর্ম্ম তাই এখন সার্ব্বজনীন। এই দেহ ও মনের বিকাশের অনুযায়ী অধিকারবাদ হিন্দু ধর্ম্মে প্রচলিত হওয়া বিশেষ দরকার। জন্মগত অধিকার-বাদের দার্শনিকতার কর্ম্মফলকে স্বীকার ক'রে আজ বিরাট হিন্দু জন-সমুদ্র আর অপেক্ষা ক'রতে প্রস্তুত নয়।

সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য হ'চ্ছে আত্মার স্বরূপ-সন্ধান, অনুভূতি এবং আধ্যাত্মিক প্রগতির স্তরভেদে সাধনা ও সাধ্যও বিভিন্ন। আধ্যাত্মিক কিণ্ডারগার্টেনের উপযোগী ছাত্রদের জন্য ভারতবর্ষ সত্য প্রতীক অসংখ্য দেবদেবীর সৃষ্টি ক'রেচে, কারণ অতি সূক্ষ্ম চিন্তা ও ধারণার দুর্বিষহতা তাদের তিতিক্ষাকে অতিক্রম করে বোলে। আচার্য্যেরা বলেন, প্রতিমা যদি ঈশ্বরলাভের সহায় হয়, তা' হ'লে যে কোনও প্রতীকই গ্রহণ করা যেতে পারে—তা সে ঘুঘু, মেষ, গাভী, ক্রুশ, ত্রিশূল স্বস্তিক, মন্দির, কাক, চিত্র, কবচ, মূর্ত্তি বা শব্দই হোক, প্রতীকটা বিষয় নয়—প্রতীকের পশ্চাতে যে ভাবরাশি সেইটাই হ'চ্ছে বিবেচ্য। প্রতীকালম্বনে ভারত-ভারতী ভগবানকে পরমাত্মীয়ের ন্যায় উপভোগ ক'রে, তাই প্রতিমাকে খাওয়াতে হয়, পরাতে হয়, বাতাস ক'রতে হয়, শয়ন দিতে হয়। তাই দলবদ্ধ উপাসনা ভারতে সপ্রচলিত—সাধনা ব্যক্তিগত। হিন্দুর নিকট প্রতিমা জীবন্ত, তাই বাইরে

থেকে উদ্দেশ ক'রে নমস্কার ক'রে চ'লে গেলেও, তার বিশ্বাস এমন দৃঢ় যে, যে-ভক্তি সে ভগবানকে জানাচ্ছে তা সে লক্ষ্যেই হোক বা অলক্ষেই হোক, সর্ব্বান্তর্য্যামীর নিকট পৌঁছুবেই। কৃষকেরা ক্ষেতে চাষ ক'রতে যাচ্ছে, স্ত্রীলোকেরা কলসী কাঁখে জল আনতে চ'লেচে, বালকেরা খেলতে বেরিয়েচে—কিন্তু যাই দেব-শিলা দেখা তা তাতে কোনও লক্ষণ থাকুক, বা না থাকুক, তাতে তখনই স্মরণ করিয়ে দেয় - অভ্রভেদী হিমাদ্রীর অটল শৃঙ্গ—যেখানে দৃশ্যের পরিবর্ত্তন রুদ্ধ হ'য়ে নির্ম্মল আকাশ নিজের মহিমায় বিস্ফারিত, সেই কৈলাস-প্রতীক। সে তার কমণ্ডলুর ক্ষীণ জলধারা অর্পণ ক'রে পবিত্র গঙ্গোত্রীর শীতল ধারাই কল্পনা করে।

দর্শন-রসিক হিন্দু কেবল স্রষ্টার একত্ব অনুভবে তৃপ্ত হয় নি—সে নির্ভীক ভাবে প্রচার ক'রলে স্রষ্টাই সৃষ্টি হ'য়ে রয়েচেন। তবে এই বৈচিত্র্যের খেলায়, এই বহুত্বের সংঘর্ষে সে একত্ব কোথায়!—কার্য্যের মধ্যে ত' কেবলই কারণের বিরূপই দেখচি স্বরূপ ত' কিছু দেখচি না! উত্তর এল কারণ সচ্চিদানন্দ সর্ব্বভূতে অস্তি, ভাতি, প্রীতিরূপে বর্ত্তমান—তাঁর অভাবে কোন বৈচিত্র্যই রূপ নিতে পারে না। এই সচ্চিদানন্দ সাগর, এই ভূমা—সর্ব্বক্ষণব্যাপী, সর্ব্বকালব্যাপী, সর্ব্বদিকব্যাপী, সর্ব্বদেশব্যাপী, সর্ব্বকারণব্যাপী, সর্ব্বকার্য্য-ব্যাপী - ইনি সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে অস্তিত্বরূপে বর্ত্তমান, সর্ব্ব অস্তিত্বের জ্ঞানরূপে বর্ত্তমান, সর্ব্বজ্ঞানের আনন্দ ফলরূপে বর্ত্তমান। কিন্তু প্রত্যক্ষ এই যে দ্রষ্টা ও দৃশ্য, আমি ও তুমি এই যে পরিণাম—দেশ, কাল, নাম, রূপ, সংযোগ, বিয়োগ, সমবায়, বহুত্ব, বৈচিত্র্য—এদের অস্বীকার করি কিরূপে?—উত্তর এলো বিবর্ত্ত—অধ্যাস। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে, ত্যাগে ভোগে নিরন্তর এই আত্মারই অনুসন্ধান চ'লেছে—এই সত্যের ছায়া প্রাণ, চিত্তের ছায়া বিজ্ঞান, আনন্দের ছায়া শিল্প-কলা। প্রতি জীবে সত্য-জ্ঞান-আনন্দ পরিপূর্ণ হ'য়ে রয়েছে—বুদ্ধও জীবাণুতে তারতম্য কেবল অভিব্যক্তির। হিন্দুর ধর্ম্ম একটা সম্প্রদায় নয়, একটা নীতি শাস্ত্র নয়, জগতের কেবল একটা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নয়, নশ্বর জীবনকে ধরে রাখবার কোনও একটা কৌশল নয়—এ হোল আত্মার অনুসন্ধান, আনুমানিক নয়, অ-পরোক্ষানুভূতি—যা সকল সত্যের সত্য—যাতে সকলের সমান অধিকার।

তারপর এই বিরাট হিন্দু-সৌধের প্রবেশ ও বহির্দ্বার পুনর্জ্জন্মবাদ। বহুমুখী সংসার অনিত্য হোলেও, তার অনিত্যতা বুঝতে গেলে তার ভেতর দিয়ে বুঝতে হবে। সংসার হোল অভিজ্ঞতার পাঠশালা। দুঃখ, কষ্ট, যাতনা, ব্যাধি, পাপ, মৃত্যু, বিরহ এরাই কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা, কোনটা সহজ কোনটা জটিল, কোনটা সরল, আর কোনটা কপট—মানুষকে বুঝিয়ে দেয়। দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক আঘাতই আধ্যাত্মিকতার চিরাবরুদ্ধ অর্গলের পর অর্গল মুক্ত ক'রে জীবকে প্রগতির ঊর্দ্ধ পথে নিয়ে চ'লেচে। হিন্দুর দুঃখবাদটা হোল একটা আপাতকৃষ্ণ যবনিকা—এর পেছনে রয়েছে এক বিপুল সুখাস্থবাদ—এ ধরিত্রীর প্রত্যক্ষ রস-বেদনা নয়—অমরার পারিজাত, কণ্ঠ-কিঙ্কিনী বা সুধা নয়—বেহেস্তের নিষ্ঠুর সিংহাসনে নিম্নদেশে কৃতাঞ্জলি কুঞ্চিতপদে উপবেশন নয়—এ অভয়, অজর, অমর, অমূর্ত্ত আনন্দস্বরূপ হওয়া। অপর তিতিক্ষা সহায়ে, গোলাপের কুঁড়িটির মত কত বেলা, কত তিথি, কত দীর্ঘ বরষ বার মাস কত যুগযুগান্তর হয়ত অতীতের কোন সাগরে চ'লে পড়বে, কিন্তু কোন এক অজানিত কল্পান্তের অবসানে চেতনা পরিপূর্ণ রূপে ফুটে উঠবেই।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ব'লতে বোঝে যে সকল ব্যক্তিকেই অন্তর ও বহির্জ্জগতে অভিব্যক্ত হবার জন্য সমান সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে হবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন সুশাসিত হবে যে সকলেই আত্মশক্তির সুব্যবহার করে বৃদ্ধি লাভ ক'রতে পারবে। কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টি অন্য রূপ; বস্তুর জীবনে দেখা যায় সকলকে সমান সুযোগ দিলেও দেহ ও মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্তর থাকবেই, কারণ সকলে সমান 'শ্রদ্ধা' নিয়ে জন্মায় না এবং একটা স্থাপিত মানের (standard) ওপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা সমাজকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে সকল ব্যক্তির অভাব অভিযোগ কখনও পরিপূর্ণ ক'রতে পারা যায় না। বুদ্ধি ও দেহের তারতম্যে একটা ক্ষুদ্র জীবন-সীমানায় মানুষ তার আকাঙ্ক্ষিত আদর্শকে খুব কমই পেতে পারে। দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্য ও চিরচলন্ত আবেষ্টনীর কম্পাস দিয়ে একটা জীবনবৃত্ত কতদূরই বা প্রসারিত হ'তে পারে? তাই বংশানুক্রমিক প্রগতি দেহের দিক থেকে স্বীকার ক'রলেও অন্তরের দিক থেকে স্বীকার

করা চলে না—কর্ম্মফল মানতে হয়। প্রভু যীশুর, 'বীজ বপনএর বা বৃক্ষানুযায়ী ফলের উদাহরণ শুধু একটা জীবনের পুরস্কার স্বরূপ নয়, অনন্ত জীবন সম্বন্ধে ঐ কথাই খাটে। ব্যর্থ জীবনের পুনর্জ্জন্মবাদ যেমন সান্ত্বনা দিতে পারে, এমন আর কোনও বাদই পারে না—এ জীবনটা নয় গেল, কিন্তু তার সামনে যে অনন্ত জীবন তাকে আহ্বান ক'রচে! এ জীবনে হোক, যুগান্তরে হোক, কল্পের অবসানে হোক, একদিন না একদিন সে নিজের আদর্শ খুঁজে পাবেই।

কর্ম্মবাদ প্রত্যেক হিন্দু সম্প্রদায়ই মানে এবং জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক জীব তার অবশ্যম্ভাবী স্বরূপ যে নির্ব্বাণ, তা লাভ ক'রবেই। অনন্ত নিরয় বা অনন্ত স্বর্গ হিন্দু দুই মানে না, কারণ উৎপত্তি আছে ব'লে তাদের নাশও আছে। হিন্দু বলে, মুক্তিই জীবনের শেষ প্রগতি। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে গতি আছে, কিন্তু গতির শেষ নাই। এই মুক্তিতে সবারই সমান অধিকার—মুক্তির চিহ্নিত ভক্ত কেউ নেই, সে ঈশ্বর ইচ্ছামত কাউকে নরকে পাঠাবেন আর কাউকে তুলে দেবেন স্বর্গে। মুক্তি হোল আত্মার স্বরূপ স্বর্গ নরক ভ্রান্তি সকলেই স্ব স্ব রূপে ফিরে যেতে বাধ্য—নিজের স্বভাবকে অস্বীকার ক'রে, কত কাল জীব স্বপ্ন-খেলায় তৃপ্ত থাকবে বল। এ রাস্তা খাড়া চড়াই—'ক্ষুরধার'। এর অন্য কোন জাগতিক ফল নেই—উচ্চ জীবনই হ'চ্চে উচ্চ চিন্তার একমাত্র ফল—যার অভিব্যক্তি এক অনন্ত শান্তি, যাকে কোনও দুঃখই বিদ্ধ ক'রতে পারে না। এ তত্ত্ব না জানলে কর্ম্মের শান্তি অবরুদ্ধ থাকে। নিষ্কাম কর্ম্ম মানে অযাচিত উপদেশ নয় - বেগার দেওয়া নয়—খবরের কাগজে নাম লেখান নয়—মর্য্যাদা রক্ষা নয়—হাততালির উত্তেজনা নয় · গুপ্ত অভিসন্ধির সিদ্ধি নয়—দাসের কর্ম্মনিষ্ঠা নয় - উন্নত জীবনের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম বা দৈবী সম্পদের উৎকর্ষ-সাধন। মিথ্যার সাহায্য নিয়ে যে সত্য লাভ ক'রতে হয়, তা যত বড়ই নিষ্কাম কর্ম্ম হোক, সে সত্য সত্যরূপী সয়তান। রামকৃষ্ণের আগমনে 'চালাকী'র যুগের অবসান হ'য়েচে। এতটুকুও অসত্য আচরণ তাঁর দেহ স্পর্শ ক'রলে যেন তাঁর মাথায় করাত বসিয়ে দিত, সত্য আচরণকে ভিত্তি ক'রেই—কর্ম্মতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, আনন্দতত্ত্ব।

"অধঃপতনের কাল প্রকৃত সঙ্কটকাল নয়; কিন্তু অভ্যুদয়ের কালই প্রকৃত সঙ্কটকাল। আমরা একদিন না একদিন অবশ্যই উঠিব, জগতের জনসমাজের মধ্যে দশ জনের একজন হইয়া উঠিব। কিন্তু কেমন হইয়া উঠিব? আমরা কি দৈত্য দানবের মত ক্ষমাশূন্য, সীমাশূন্য বাহুবল লইয়া বসুন্ধরা হইতে সকল সভ্যতা, সকল শৃঙ্খলা, সকল উন্নতি চিরপদবিদলিত করিতে করিতে, প্রচণ্ড তাণ্ডবে জলস্থল কম্পান্বিত করিয়া উঠিব? অথবা জগতের সম্মুখে মানবতার মহান্ আদর্শ সুসংস্থাপিত করিবার জন্য ধর্ম্মের নামে, পবিত্রতার নামে, মনুষ্যত্বের নামে, দেবত্বের নামে,—প্রসন্ন নয়নে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিব? আমরা কোন্ আদর্শের অনুগামী হইব, তাহার উপরই তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিবে।—তাই বলিয়াছি,—অভ্যুদয়ের কালই প্রকৃত সঙ্কট কাল।

বাঙ্গালীর আদর্শ—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বাঙ্গলা দেশের প্রাচীনত্ব

—শ্রীগুরুদাস রায়

এ পর্য্যন্ত বাংলার ইতিহাস বাহির করিবার জন্য বা বাংলার প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণের জন্য বিশেষ কিছুই চেষ্টা হয় নাই। প্রাচীন ইতিহাস-বেত্তা সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, কুমার শরৎকুমার রায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি কয়েকজন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বাংলার প্রাচীনত্ব ও ইতিহাস নির্দ্ধারণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতির অভাবে তাঁহারা যুক্তি ও প্রমাণ দিয়া তাঁহাদের মত সর্ব্বসাধারণের দ্বারা স্বীকার করাইয়া লইতে পারেন নাই বলিয়াই আজও আমরা বিদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের কথা প্রামাণ্য বলিয়া মানিয়া লইয়া নিজেদের লজ্জাকর ও শোচনীয় অবস্থার পরিচয় দিতেছি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে এখনও ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন যে বাংলা মিশর, নিনেভা, বাবিলন কিংবা চীন হইতে প্রাচীন অথবা নূতন। যখন আর্য্যেরা মধ্য এশিয়া পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চনদের তীরভূমে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তখনও বাংলা তাঁহার মতে সভ্যদেশ ছিল। তারপর ক্রমশঃ আর্য্যগণ যখন ক্রমবর্দ্ধমান জাতিরূপে কৌশাম্বী বা এলাহাবাদের উপকণ্ঠে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন তাঁহারা বাংলার সভ্যতার প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া বাঙ্গালীকে পক্ষী প্রভৃতি আখ্যা দিয়া নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। যখন লোকে লোহার ব্যবহার জানিত না, বেতে বাঁধা নৌকায় চড়িয়া বাঙ্গালীরা যখন দেশ হইতে দেশান্তরে ধান্য চাউল প্রভৃতি বিক্রয় করিত তখন তাহারা যে নৌকায় করিয়া যাইত সেই নৌকার নাম বালাম নৌকা থাকায় তাহার মধ্যে যে ধান্য বা চাউল থাকিত তাহাকে বালাম চাউল বলা হইত। অশোকের সময় এমন কি বুদ্ধের সময়ও তমলোক বা তাম্রলিপ্ত বাংলার সর্ব্বপ্রধান বন্দর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

বাংলা দেশ পলিমাটীর দেশ। ভারতের তুলনায় ইহার বয়স অল্প, কিন্তু ইহার উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে অতি প্রাচীন ভূমি আছে। এই সমস্ত প্রদেশে প্রত্ন-প্রস্তর যোগে পাষাণনির্ম্মিত অস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে কতকগুলি পাষাণাস্ত্র খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে এ পর্য্যন্ত দুইটী প্রত্ন-প্রস্তরযোগে শিলানির্ম্মিত আয়ুধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বাংলার ইতিহাস'এ লিখিয়াছেন যে এই জাতীয় আর একটী অস্ত্র প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সমতল ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ভিন্সেণ্ট বল্ হুগলি জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের ১১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কুনকুনে গ্রামে একটি হরিতাভ প্রস্তরনির্ম্মিত কুঠার-ফলক আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই সময়ে রাণীগঞ্জের নিকট চবাকারের কয়লার খনিতে আর একটী কুঠার-ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল।[১]

ইহার দুই বৎসর পরে ঝরিয়ার কয়লার খনিতে আর একটী কুঠার-ফলক আবিষ্কৃত হয়।[২] ইহাই এখন কলিকাতা মিউ-জিয়ামে দেখিতে পাওয়া যায় এবং পূর্ব্বোক্ত অস্ত্রগুলি বোধ হয় ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উত্তরাপথের পূর্ব্ব খণ্ডে আরো চারটি শিলানির্ম্মিত প্রাচীন অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই চারিটী অস্ত্র উড়িষ্যা প্রদেশের চেঁকানাল আঙ্গুল তালচের ও সম্বলপুরে আবিষ্কৃত হয়। ভূতত্ত্ববিদ বল অনুমান করেন যে আদিম মানবগণ প্রত্ন-প্রস্তর যুগে এই সকল প্রাচীন অস্ত্র দক্ষিণাপথ হইতে উত্তরাপথের পূর্ব্ব খণ্ডে আনয়ন করিয়া-

১। V. Ball—Stone implements found in Bengal, 1865, p p. 127—28.

২। V. Ball—Stone implements found in Bengal, Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1867, p. 143, Catalogue Raisonne of the Pre-Historic Antiquities in the Indian Museum by C. J. Coggin Brown, F. G. S p. 8006.

ছিলেন।[৩] ইহা ছাড়া চট্টগ্রাম ও আরো অন্যান্য স্থানে অসংখ্য প্রাচীন অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ইহার পর তাম্র যুগেরও আরো কয়েকখানি অস্ত্র এই বাংলা হইতে বাহির হইয়াছে। হাজারিবাগ জেলায় পচম্বা মহকুমার একটী পাহাড়ের উপরে কতকগুলি অসম্পূর্ণ কুঠার বা পরশু-ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল।[৪] ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশে তামাজুরি গ্রামেও একখানি কুঠার-ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল।[৫] Dr. Saiseও কয়েকখানি তাম্র-নির্ম্মিত প্রাচীন অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

তারপর অথর্ব্ববেদ সংহিতার পঞ্চম কাণ্ডে অঙ্গ ও মগধ দেশের নাম আছে, সুতরাং ইহা হইতে এই নির্দ্ধারণ করা যায় যে ঐ সুপ্রাচীন সময়েও অঙ্গ ও মগধ দেশ আর্য্যদের নিকট পরিচিত ছিল।[৬] ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ও মানবধর্ম্ম শাস্ত্রে পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে।[৭] মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের অদর্শনে যে সকল ক্ষত্রিয় জাতির বৃষলত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল তাহাদিগের নামের মধ্যে পুণ্ড্রগণের নাম আছে।[৮] সুতরাং ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন পুণ্ড্রগণের রাজধানী হইলে উত্তর বঙ্গের নাম নিশ্চয়ই আর্য্যাদিগের নিকট পরিচিত ছিল। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ শব্দের সর্ব্ব প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে।[৯] ঐতরেয় আরণ্যক রচনাকালে বঙ্গ, মগধ ও চের দেশবাসীগণকে আর্য্যরা পক্ষীবৎ জ্ঞান করিতেন। বঙ্গ বাঙ্গলা দেশের নাম, মগধ খুব সম্ভব মগধের নাম কিংবা মুদ্রালিপিকরপ্রমাদও হইতে পারে; এবং চের দেশ অশোকের সময়ের কেরল দেশ বলিয়া কথিত হয়। বৈদিক সাহিত্যে এই সময় উল্লেখ হইতে প্রমাণ হয় যে সেই সময়ে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ প্রভৃতি উত্তরাপথের পূর্ব্ব সীমান্তস্থিত পর্ব্বত সমূহ সম্ভবতঃ আর্য্য জাতির নিকট নিশ্চয়ই পরিচিত ছিল, তবে হয়ত তাহাদের অধিকারভুক্ত ছিল না।

আর্য্য উপনিবেশের পূর্ব্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত নিজের অধিকার বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহারাই বোধ হয় ঋগ্বেদের দস্যু এবং খুব সম্ভব তাহারাই ঐতরেয় আরণ্যকে বিজেতৃগণ কর্ত্তৃক পক্ষী আখ্যায় অভিহিত হইত। এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতি বঙ্গ ও মগধের আদিম অধিবাসী। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা আধুনিক বাঙ্গালীর নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া অনুমান করেন যে, তাহারা দ্রাবিড় ও মোঙ্গলিয় জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গবাসীগণকে জাতিনির্ব্বিশেষে দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বলা যাইতে পারে। ইহা ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ আর্য্যগণ কর্ত্তৃক বিজিত হওয়ার পরেও মগধ ও বাংলা দেশ স্বাধীন ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে মিথিলার আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হইলেও বাংলা তখনও আর্য্যজাতির নিকট মস্তক অবনত করে নাই, আর্য্যাবর্ত্তের সীমাভুক্তও হয় নাই। তাই প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ দেশে তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য কোন কারণে গমন করিলে নাকি পাতিত্যদোষ স্পর্শ করিত এবং তজ্জন্য সংস্কারের প্রয়োজন হইত। বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌবীর প্রভৃতি দেশে গমন করিলে যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান করিয়া তবে শুদ্ধি লাভ করিতে হইত।

এই সমস্ত প্রাচীন সাহিত্য হইতে দেখা যায় যে বাংলাকে আমরা যত নূতন বলিয়া উপেক্ষা করি, বাংলা তত নূতন নয়। মহাভারত বা রামায়ণে বাসুদেব, চন্দ্রসেন প্রভৃতি পৌনর জাতি ও বঙ্গ দেশীয় রাজগণের উল্লেখ আছে। অধ্যাপক হল তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থে প্রাচীন সুমেরিয় জাতি ও দাক্ষিণাত্যবাসী দ্রাবিড় জাতির পূর্ব্ব পুরুষগণের সম্বন্ধ নির্ণয়

৩। Proceedings of the Royal Irish Academy, second series Vol. I. p. 194.

৪। Proceedings of the Asiatic Society of Bengal 1871 p.p. 232—4.

৫। Catalogue and hand-Book of the Archaeological collections in the Indian Museum, part II. P. 485

৬। গন্ধারিভ্যো মুজবদ্ভ্যোঽঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ—অথর্ব্ব সংহিতা ৫।২২।১৪।

৭। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ,—সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী ৩৪—৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ, ৫৭৯ পৃঃ।

৮। মানবধর্ম্ম শাস্ত্র ১০।—৪৩—৪৪।

৯। ইমা প্রজাস্তিস্রঃ অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসী বঙ্গাবগধাশ্চেরঃ—পাদাস্তস্থা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি স্থিতি।—ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১।

করিয়াছেন। বাংলার বর্ত্তমান অধিবাসীগণের সহিত দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাভাষী অধিবাসীগণের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। প্রাচীন দ্রাবিড় সাহিত্যে পাওয়া যায় যে নাগপূজক কয়েকটী জাতি বাংলা হইতে এবং ভারতের উত্তরাঞ্চল হইতে তামিলকম দেশে যায়।

একজন বাঙ্গালী বীর খৃষ্টপূর্ব্ব ৭ম শতকে আনাম রাজ্যে গমন করেন, তাঁহার নাম ল্যাকলঙ এবং তাঁহার মাতৃকুল নাগবংশীয় ছিলেন। ল্যাকলঙ্ এই নাম যে জাতীয় বা যেখানকার নামই হউক না কেন সুপণ্ডিত জেরিলি প্রমুখ পণ্ডিতগণ যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতে তিনি যে বঙ্গ দেশ হইতেই আনামে গিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই।

কবে বা কোন সময় আর্য্যগণ বঙ্গ অধিকার করিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা একপ্রকার অসম্ভব। সিংহলের ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে বিজয়সিংহ নামক কোন বঙ্গদেশীয় রাজপুত্র সিংহলে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। বিজয়সিংহ নাম হইতে দেখা যায় যে অনার্য্য নাম নহে। সুতরাং ইহা হইতে এই প্রমাণই হয় যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ আর্য্য অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। কিংবা আর্য্যজাতির আচার, ব্যবহার, ভাব, ভাষা, ধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিল।

"ভোগের সঙ্গে ত্যাগের,—ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে অস্খলিত পরসেবাপরায়ণতার—বীর্য্যের সঙ্গে ক্ষমার সমন্বয় সাধন করাইয়া, যে আদর্শ বাঙ্গালীকে মানব-শক্তির মূল প্রস্রবণের সন্ধান প্রদান করিত, তাহার ফলে সেকালের বাঙ্গালী স্বয়ং সমুন্নত হইয়া অগণ্য অনুন্নত মানব সমাজকে সমুন্নত করিয়াছে; যাহার সভ্যতা ছিল না, তাহাকে সভ্যতা দান করিয়াছে: যাহার সমাজশৃঙ্খলা ছিল না, তাহাকে সমাজশৃঙ্খলা দান করিয়াছে; যাহার শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম্ম-নীতি ছিল না, তাহাকে শিল্প সাহিত্য ধর্ম্ম-নীতি দিয়া, মনুষ্যত্বের সঙ্গে দেবত্ব দান করিয়াছে,—ভারতবর্ষের বাহিরে এক বৃহত্তর ভারতবর্ষের সীমা বিস্তার করিয়া, জলে স্থলে ভারতবর্ষের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।"

বাঙ্গালীর আদর্শ—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

চৌধুরী-চক্র

—শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

বিধাতার মনের ইচ্ছা কি ছিল কে জানে? চৌধুরীর সহিত সাক্ষাৎটা কিন্তু অকস্মাৎই ঘটিয়া গেল।

হ্যারিসন্ রোড দিয়া শিয়াল-দা ষ্টেশনে চলিয়াছি। ছটা পঁয়ত্রিশে গাড়ী। চলিয়াছি একটু তাড়াতাড়িই—পাছে ট্রেণ ফেল করিয়া বসি। গ্রীষ্মকাল—রাস্তা তাতিয়া আগুণ। ডান হাতে ক্যাম্বিসের একটি ছোট্ট ব্যাগ, আর বাঁ হাতে খবরের কাগজে-মোড়া নূতন স্যাণ্ডেল জোড়াটি।

গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে সার্কুলার রোডটি পার হইতে যাইতেছি,—এমন সময় কোথা হইতে আসিয়া এক হ্যাটকোট-পরা বাবু আমার বাঁ হাতের কব্জী চাপিয়া ধরিল। প্রথমটা ত হকচকাইয়া গেলাম—তারপর সোজা দাঁড়াইয়া বাবুটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেই বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। এ যে আমাদের চৌধুরী।

হাসিয়া বলিলাম—'হঠাৎ কোত্থেকে হে—'

'—কোত্থেকে—তুমি কোত্থেকে শুনি?' মাথার হ্যাটটা বগলে পূরিয়া চৌধুরী পা দু'টি একটু ফাঁক করিয়া দাঁড়াইল।

'—আর কে থেকে,—গিয়েছিলাম একটু বাড়ুজ্জে বাগানে,—শালির বিয়ের জন্যে,—কিন্তু কপালের ফের হে—আরে দেখত একবার 'টাইমটা,—'

শ্যেন পক্ষীর ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চৌধুরী আমার ব্যাগটির দিকে চাহিয়াছিল—হঠাৎ সেটি ছোঁ মারিয়া লইয়া বলিল,—'আর দেখে কাজ নেই,—চল বাসায় চল—'

'—আরে সে কি চৌধুরী—আমার যে আর—'

'—তবে যাও—' ব্যাগ হাতেই চৌধুরী চলিতে সুরু করিল। ভাল পাল্লায় পড়িয়াছি। কিন্তু উপায় কি? অনিচ্ছা-ভরে চৌধুরীর পিছন-পিছনই চলিতে হইল।

হ্যারিসন্ রোড হইতে চৌধুরী মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে নামিয়া পড়িল। বলিলাম—'মির্জ্জাপুরেই থাক বুঝি?'

'হাঁ,—তোমার শালীর বিয়ের ঠিক হ'লনা?

'—হ'ল আর কই? বড় ঘরের বড় হাঁক—'

'—হেঁকেছে কত?'

'—তা খুব, পাঁচ হাজার—'

'কেন তোমার শ্বশুরের অবস্থা কি—' চৌধুরী ব্যাগটা এবার ডান হাত হইতে বাঁ হাতে লইল।

'—এখনকার অবস্থা বড় শোচনীয় হে,—গেল বছর জুটে চার চারটে হাজার টাকা লোকসান দিয়ে একেবারে মুষড়ে পড়েছেন—'

'অ—' চৌধুরী এবার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ধরিল। বাসা কতদূরে কে জানে? চলিয়াছে ত' চলিয়াছেই। ফের জিজ্ঞাসা করিতে যাইব,—চৌধুরীর হঠাৎ মুখ খুলিল,—

'—শালা বিল্টুল—শালা কি কম পাজী হে,—খানা খাইয়ে শালা চৌধুরীকে আনতে চায় বশে—কিন্তু চৌধুরী যে কতখানি ধড়িবাজ'—বলিয়াই ঠোঁট বাঁকাইয়া চৌধুরী আমার মুখের উপর একটু হাসিল।

কথাটাতে কাণ না দিয়া আপন মনেই চলিতে লাগিলাম, কিন্তু চৌধুরী চুপ করিল না।

'চিনিতে পারলে না বিল্টুলকে; কাত্যায়নী কটন মিলের ম্যানেজার, বাঙ্গালী কোম্পানীতে শালা সাহেব এসে জুটেছে হে,—বাঙ্গালীকে ম্যানেজার ক'রে ভরসা হ'লনা বাবুদের—'

'কেন বিল্টুল তোমার করল কি?'

'আমার—?' চৌধুরী চোখদুটি একটু বড় করিয়া বলিল—'আমার আবার করবে কি? ব্যাটার সঙ্গে রাতদিন শুধু ঠুকোঠুকি, জুৎ পাচ্ছেনা ব্যাটা—তাই চৌধুরীকে বশে রাখবার ফন্দী, এই তো খানা খেয়ে আসছি,—খুব খাওয়াও না বাবা—সেটি হ'চ্ছেনা তা'র'লে,—এ চৌধুরী যে-সে ছেলে নয়, একেবারে ন'দের ভূত—'

'—সাহেবের নীচেই তোমার পোষ্ট বুঝি?'

চৌধুরী এতে উষ্ণ হইয়া উঠিল,—বলিল—'আরে তা'তে কি—বোঝে কি ব্যাটা',—কাজের মধ্যে শুধু হুমকি—আর নাম সই ক'রে মাইনে।

'—কত পায়—?'

'কমই বা কি—পাঁচশো—'

'তুমি—'

'—আমার কথা ছেড়ে দাও—মাইনের টাকায় চৌধুরী ভ্রূক্ষেপও করে না,—চৌধুরী জানে, দাঁও বসাতে হয় কি ক'রে—ও ব্যাটার শিখতে এখনও ঢের দেরী'—বলিতে বলিতে চৌধুরী আসিয়া একটি দোতালা বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

'—এইটেই বাসা বুঝি?'

'—হাঁ,—উঠে এস '

দোতালায় লম্বা তিনটি ঘর—পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার হরেক রকমের আসবাবপত্রে উহারা ঝলমল করিতেছে। মধ্যকার ঘরটির প্রবেশ-পথে একখানা পর্দ্দা লটকানো—বুঝিলাম চৌধুরীর এটি খাস্ কামরা।

বাহিরের ঘরটিতে আমাকে বসাইয়া রাখিয়া চৌধুরী পর্দ্দা ঠেলিয়া খাস-কামরায় প্রবেশ করিল এবং বৃষভনিন্দিত কণ্ঠে ঘন ঘন ডাকিতে লাগিল,—'ওগো, ও গিন্নী, ও নয়ন, এদিকে এস না একবার,—কে এসেছে দেখে যাও ওগো—'

গৃহিণী কিন্তু সম্মুখে আসিতে নারাজ—ভিতর হইতে কঠিন চাপা কণ্ঠে চৌধুরীকে বেশ একটু তর্জ্জন করিলেন—বুঝিলাম। কিন্তু চৌধুরী সে ছেলেই নয়। গৃহিণীকে একেবারে দুই হাতে জাপটাইয়া ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া আমার টেবিলের সম্মুখে আনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—'বুড়ো বয়সেও সরম গেলনা তোমার, বলি একে চিন্‌তে পার? দেখ দিকি ভাল ক'রে, পার্‌লে না? কেন, আমার বিয়ের সময় শ্যামপুরে যে আমাদের বাড়ীতে এসে ভাঁড়ারী হ'য়েছিল, মনে নেই? নাম নিশীথ—আমি নিশে ব'লে ডাক্‌তাম—'

গৃহিণী একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন,—চিনিয়াছিলেন কিনা জানি না। আমি কিন্তু মৃদু হাসিয়া বলিলাম—'তাই কি আর মনে থাকে চৌধুরী, এক আধ দিন ত' আর নয় একেবারে পুরো আট বছর—'

'হ'লই বা—'চৌধুরী চড়িয়া উঠিয়া বলিল—'বিশ বছর আগে শিবকালী যাকে একবার চ'খে দেখেছে, তা'কেই মনে রেখেছে বাবা, চ'খের মার চাই ভায়া, চ'খের মার—'

গৃহিণী লজ্জায় মাথা নীচু করিলেন; কিন্তু চৌধুরী লোকটি সহজ নয়। ভিতরের কথাটাও অতঃপর গোপন রাখিল না।

বলিল—'আট বছর ত' নয়, একেবারে আট্‌টা যুগ, কত পয়সা 'কম্‌নে' গেল, কিছু ফল হ'লনা ভায়া—'

'কা'র কথা বল্‌ছ?'

'কার আবার, নয়নের, ছেলে পুলে ত' আর হ'লনা?'

গৃহিণী লজ্জায় এবার সত্য সত্যই ঘামিয়া উঠিলেন। চৌধুরী ওঁর ব্লাউজের মার্জ্জিন্ চাপিয়া ধরিয়াছিল। গৃহিণী রাঙা হইয়া বলিলেন—'ছেড়ে দাও, ভাল হবে না বল্‌ছি—'

'ছেড়ে দেব বৈকি··· ধ'রে আর কে রাখ্‌বে তোমাকে; যাও, বেশ 'ষ্ট্রং' ক'রে দু-কাপ চা বানিয়ে দাও। 'গেষ্ট'কে কেমন ক'রে 'এন্‌টারটেন্' করতে হয়, তাও ত' আর শিখ্‌লে না। হাঁ—রেধো গেল কোথায়—রেধো·· ?'

'জানিনে,' গৃহিণী হাঁফ ছাড়িয়া পর্দ্দার আড়ালে অদৃশ্য হইলেন।

চৌধুরী ধড়াচূড়া ছাড়িতে লাগিল—আমি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম।

শ্যামপুরের সেই শিবকালী চৌধুরী, ছোট বেলায় এক সঙ্গেই দুজনে পড়িয়াছি। শ্যামপুর হইতে পদব্রজে শিবকালী আসিত, আমাদের দুলালনগরে পড়িতে। দুখানি গ্রামের ভিতর মাত্র এক ক্রোশ রাস্তা ব্যবধান।

পিঠে ঝুলানো চামড়ার ব্যাগের ভিতর বই, নাক দিয়া কফ্ ঝরিতেছে। পকেট হইতে খেজুর গুড়ের পাটালি বাহির করিয়া নিঃসৃত কফের সহিত চৌধুরী তাহা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করিতে করিতে চলিয়াছে। ক্লাসে আসিয়া সবার অলক্ষ্যে শিবকালী বসিত পিছনের বেঞ্চে, ব্যাগের বই ব্যাগেই থাকিত বন্দী। কিন্তু তাহাতে কি হয়। ফেলের ধার শিবকালী কখনও ধারে নাই। পরীক্ষা গৃহে বসিয়া শিক্ষক মহাশয়দের চোখে ধূলা দিয়া কি করিয়া পরীক্ষা দিতে হয়,—চৌধুরী তাহা ভাল ভাবেই জানিত এবং জানিত বলিয়া প্রতিবৎসর ক্লাশ-প্রমোশনও তার আটকাইত না। কিন্তু এ হেন বুদ্ধিমন্ত চৌধুরীর মগজে সেবার এক অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধি গজাইয়া উঠিল। সংস্কৃত পণ্ডিত গদাই ভট্‌চাজ্। লোকটি ছিল একটু তিরিক্ষে মেজাজের। ক্লাশের পড়া না পারার জন্য গদাই সেদিন চৌধুরীর পিঠে সরাসরি একখানি বেত ভাঙিয়া বসিল। প্রত্যুত্তরে চৌধুরী কিছু বলিল না, কেবল উঠিয়া দাঁড়াইয়া গদাই-এর মাথার টিকিটা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ক্লাশ হইতে উধাও হইল। এবং সেই যে গেল, আজ পর্য্যন্ত কেহ ওকে দুলালনগরের ত্রিসীমানায় দেখিল না।

একটু হাসিয়া বলিলাম—'চৌধুরী, গদাই-এর কথা মনে পড়ে ?' গরম চায়ের কাপ দু'টি টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে চৌধুরী বলিল—'গদাই এর ? খুব পড়ে, তা যাই বলনা তুমি, গদাই-এর কিন্তু আশীর্ব্বাদ ছিল ভাই।'

'একশোবার'—মৃদু হাসিয়া চায়ে চুমুক দিলাম।

মিনিট দুয়ের মধ্যে চৌধুরী তার কাপের চা নিঃশেষ করিয়া ফেলিল এবং আঙুল দিয়া প্লেটের গায়ে এক প্রকার শব্দ করিতে করিতে বলিল—'কিহে, অত আস্তে কেন ? আমি হ'লে ত এতক্ষণ পাঁচ কাপ শেষ ক'রেই তবে আর কাজ।'

'আরে তোমার কথা আলাদা; তোমার হ'ল গে চব্বিশ ঘণ্টা সাব সুব নিয়ে কারবার, চা খেতে খেতে জিভের চামড়ায় গেছে কড়া পড়ে।'

কথাটা শুনিয়া চৌধুরী একটু হাসিল—বুঝিলাম কথাটায় চৌধুরীর নেশা ধরিয়াছে।

বলিল—'ঠিক ব'লেছ হে, এক বিল্টুলের বাড়ীতেই দুবেলা কম্‌সেকম্ আমি দশ কাপ্ ক'রে উজোড়্ করি, এ ছাড়া ত আছেই এখানে; নয়ন কিন্তু এতে বেজায় চটা হে বলে চা-খোর না গাঁজাখোর। আমিও পিছোই কেন? বলি চা না খেলে এ মাথায় বুদ্ধি গজাবে কেমন ক'রে, তুলো আর ঐ কাপড়ের গাঁটই বা এখানে চালান হ'য়ে আসবে কি ক'রে?' তারপর হাসিতে হাসিতে বলিল—'বিল্টুলের চোখের সুমুখ দিয়ে গাঁটসে গাঁট কাপড়, বড় সোজা নয় হে; কিন্তু সাধ্যি কি শালা কথা কয়, মেরে ভূত ছাড়িয়ে দেবো না?'

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—'কোন দিন যদি প্রোপ্রাইটারের চোখে পড়ে ?'

চৌধুরী আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসিয়া বলিল—'প্রোপ্রাইটারের ? ঢের দেরী' বুঝিলাম—কেল্লাফতে;—চৌধুরীকে আজ পায় কে!

সিঁড়ির নীচে দুপ্ দুপ্ করিয়া শব্দ হইল! অপরিচিত মুখ, সে মুখের শ্রীর কথা না বলাই ভাল। মাথার উপরে টাক্ পড়িয়া আসিতেছে। লোকটি একবার আমার দিকে তাকাইয়াই খাস্ কামরায় গিয়া ঢুকিল।

চৌধুরী পিছন ফিরিয়া বলিল—'রেধো নাকি রে ?'

'হাঁ—'

'গিয়েছিলি কোথায়—?'

'উল্ আন্‌তে—'

'ওঃ, যা দিগে,...ওর নাম রাধেশ, আমি রেধো ব'লেই ডাকি, মাসতুতো ভাই কিনা'—বলিয়া চৌধুরী একটু থামিল, তারপর ঝাঁ করিয়া বলিল—'এক কাজ হে, তোমার শালীর সঙ্গে রেধোর বিয়েই ঠিক ক'রে ফেলনা; টাকাকড়ি চাইনে আমরা। মেয়েটা দেখ্‌তে শুন্‌তে কেমন? ভাল বোধ হয়'

চৌধুরীর প্রস্তাব শুনিয়া মাথাটা আমার ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল,—রাগে নয়, দুঃখেই। কথাটার কোন উত্তর করিলাম না।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া ভালই হইল। রাধেশের দুই চারিটি গুণের কথা চৌধুরী ইতিমধ্যে উল্লেখ করিয়াছে। ষাট টাকা মাহিনায় কোন মার্চেণ্ট অফিসে রাধেশ চাকরী করিত,—দশ ঘণ্টা হাড়ভাঙা খাটুনী, বরদাস্ত হয় না—তাই স্বেচ্ছায় চাকরীটি সে ছাড়িয়া দিয়াছে। চৌধুরীর ইচ্ছা—এবার সে কাত্যায়নী কটন মিলে ঢুকিয়া পড়ে,—কিন্তু রাধেশ চাকরী করিতে নারাজ। মনের মত একটি বৌ না পাইলে চাকরী সে করিবে না ইত্যাদি।

সকালে চা-পানান্তে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় চৌধুরী বলিল—'বেরোচ্ছ তা'হলে আচ্ছা কিন্তু কথাটা যেন ভুলোনা হে গিয়েই লিখো কিন্তু, বুঝ্‌লে ত? আর হাঁ, রেধোকে ত দেখেই গেলে, আর বোধ হয় তা আস্‌ছে সপ্তাহে তোমার ওখানে আমি নিজেই ত' যাচ্ছি, রেধো ও না হয় একবার ঐ সঙ্গে কি বল?'

ব্যাগ্ হাতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম।

বাড়ী পৌছিলাম বটে; কিন্তু হাঁফ ছাড়িতে পারিলাম না। রাধেশকে সঙ্গে লইয়া চৌধুরী কখন বুঝি বা স্বশরীরে আসিয়া উপস্থিত হয়।

সঙ্কট আসন্ন। মুখোমুখি একটা জবাব না দিয়া কাজটা তখন বড় ভুল করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু উপায় ত একটা চাই-ই।

পত্রে লিখিলাম :—

—ভাই চৌধুরী, রমার বিবাহ ঠিক হইয়া গেছে। আগামী মাসেই বিবাহ। আমার হাত নাই। ত্রুটি মার্জ্জনা করিও। আশা করি ভাল আছ। ইতি—

নিশীথ।

ইহার পর এক এক করিয়া তিনটি মাস কাটিয়া গেছে। চৌধুরীর আবির্ভাব ত' দূরের কথা, একখানি পত্র পর্য্যন্ত পাই নাই।

সেদিন দুপুর বেলায় একটি চাক্‌রীর উমেদারীতে বাহির হইয়াছি। আষাঢ় মাস, রাস্তায় নামিতেই ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি। ঘণ্টা দুই পরে বাড়ী ফিরিয়া যাহা দেখিলাম,—তাহাতে বিস্ময়ের চেয়ে আতঙ্কই হইল বেশী। চৌধুরী আমার বাহিরের ঘরের বিছানার উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে আর আমার ছোট্ট ছেলেটি দরজার পাশে দাঁড়াইয়া সভয়ে এই আগন্তুক লোকটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছে।

ঘরে ঢুকিতেই চৌধুরী বিছানা হইতে তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল, এবং এক আশ্চর্য্য ভঙ্গীতে চক্ষু দুইটি কুঞ্চিত করিয়া বলিল—'বাঃ বেশ লোক কিন্তু; দু ঘণ্টা ধ'রে ব'সে আছি, আর এখন পর্য্যন্ত ওনার টিকিটি দেখবার উপায় নেই। কোথায় যাওয়া হ'য়েছিল?'

চৌধুরীকে দেখিয়াই আমার বুকের ভিতর কাঁপুনি ধরিয়াছিল। ধীরে ধীরে বিছানায় বসিয়া বলিলাম, 'কোথায় আর যাই বল? এম্‌নি একটু বেরিয়েছিলাম, তুমি এলে কবে?'

'সে খবরও আবার চাও নাকি? এসেছি মাসখানেক কি আরও বেশী। পরের চাক্‌রী, কাঁহাতক আর বরদাস্ত হয় বল ত? খতম ক'রে এলাম এবার'

চৌধুরী বলে কি? কিন্তু গুণের পরিচয় ত সেদিন চৌধুরীর নিজের মুখেই শুনিয়া আসিয়াছি, খতম যে হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

জিজ্ঞাসা করিলাম—'এখন আর কি করবে?'

'এখন'?—চৌধুরী বিস্ময়ের কণ্ঠে বলিল—'পুকুর, আম কাটালের বাগান, জমিজমা, তেজারতি কোন্‌টার অভাব? এ সব থাক্‌তে চল্‌বেনা চৌধুরীর? আরে পাখা আছে হে? দাও ত চটপট্ এ গরমে এখানে থাক কি ক'রে?'

অন্দরে প্রবেশ করিলাম। গৃহিণী প্রসাধনে বসিয়াছিল আমাকে দেখিয়া চোখে মুখে আগুন ছুটাইয়া বলিল,'ও মিন্‌সে কে গা? বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে ঘরে এসে হাজির'

'চুপ্ চুপ্ শ্যামপুরের শিবকালী চৌধুরী, নাম শোননি? কাত্যায়নী কটন্ মিলের ম্যানেজার, মস্তলোক; কই দাও দেখি তাল পাখাটা!'

গৃহিণী পাখা আনিয়া দিয়া বলিল—'হ'লেই বা ম্যানেজার, ও সব আমি ভাল বাসিনে বাপু?'

হাসিয়া বলিলাম—'বন্ধুলোক কিনা তাই, কেন অন্দরে এসে ঢুকেছিল নাকি?'

'ছিলই ত

কথাটায় কান না দিয়া বলিলাম—'যাক্, এতে মনে কিছু ক'রনা, চৌধুরী হালফ্যাসানের লোক কিনা, তাই সাহেবী কেতায় চলে। সেদিন কল্‌কাতায় ওর বাসায় যেতে ওর গিন্নী কী খুসী! এক টেবিলে ব'সে চা খেল আমার সঙ্গে, হাসি গল্প সে আর বল্‌বার নয়গো। কেন নয়নতারার গল্প বুঝি করিনি তোমার কাছে?'

গৃহিণী নিশ্চুপ! একটু সাহস পাইয়া বলিলাম—'যাক্ দুখানা লুচি ক'রে দাও, আমি ব'সে একটু গল্প করিগে।' বলিয়াই পিঠটান দিলাম। বৈঠকখানায় ফিরিতেই দেখি, চৌধুরী গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছে। তাল পাখাটা হাতে দিতেই বলিল—'তুমি ত আমার বাসায় থেকে চ'লে এলে, তারপর কি দুর্ঘটনা ঘ'টল বলি শোন:—রেধোকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌ব, এমন সময় শুন্‌লাম, রেধো নাকি শাল্‌কের এক ডেপুটির মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা ক'রে ফেলেছে, আমি ত অবাক: তারপর আচ্ছা করে বক্‌লাম ছোঁড়াকে, নিশীথকে কথা দিয়েছি, তুই কার হুকুমে বাপু বিয়ে ফাঁদাস্। আমার বকুনি শুনে ত রেধোর চক্ষুস্থির—মুখে কথাটি নেই, হাজার হ'ক ভাই ত। পরে অবিশ্যি যা শুন্‌লাম, তাতে আর ছোঁড়াকে দোষ দিতে পারিনে। আমাদের বিল্টুলের সঙ্গে ডেপুটির ছিল ভাব। শিবকালীর গুণাবলী ডেপুটি নাকি বিল্টুলের মুখে ভাল ক'রেই শুনেছিল। তাই তার ভাইটাকে হাতাবার জন্যে এই কারসাজী। বুঝ্‌লে কিনা'—" তাল পাখাটা বিছানার একপাশে রাখিয়া দিয়া চৌধুরী কাৎ হইয়া শুইল।

'—সে বিয়ে হ'ল কবে—'

'হ'ল আর কৈ, বিয়ের আগের দিন বার দুত্তিন বমি ক'রেই ত রেধো চলে গেল—'

'বল কি—'

চৌধুরী একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল 'আর বল কি অদৃষ্ট হে, নইলে আর অমন হয়'

'তা' ঠিক—'

কিন্তু মনে মনে অনেকখানি স্বস্তি পাইলাম। চৌধুরীর গ্রাস হইতে যে মুক্তি পাইয়াছি, ইহাই আমার সৌভাগ্য!

একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলাম—'তাহ'লে তুমি ত' আর চাক্‌রীবাক্‌রীতে ঢুকছনা চৌধুরী, তোমার বিল্টুলকে ধ'রে আমার একটা বিহিত ক'রে দাওনা হে'

'বিল্টুল' কথাটা শুনিয়া চৌধুরী একেবারে মারমূর্ত্তি হইয়া উঠিল, হাতের পাখাটা সজোরে মাটিতে ঠুকিয়া বলিল—'বিল্টুলের কাছে উমেদারী করতে যাবে চৌধুরী? হাসালে বাপু, বিল্টুলকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে এই চৌধুরী একশোগণ্ডা সাহেবের সঙ্গে ওঠাবসা আছে, জেনে রেখো। কালই চলনা কল্‌কাতায়, চাকরী তোমার না ক'রে দিতে পারি ত আমার নাম শিবকালীই নয়'

চৌধুরী আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় আমার পুত্র আসিয়া জানাইল—জলখাবার প্রস্তুত।

চৌধুরী প্রস্তুতই ছিল,—আহ্বান মাত্র আমার সহিত অন্দরে আসিয়া ঢুকিল।

খাইতে খাইতে চৌধুরী বলিল-ঠিক আট বছর পরে এখানে আস্‌ছি নয় হে? তোমার উঠানের জামগাছটা কোথায় গেল? কেটে ফেলেছ বুঝি? ওঃ কত জামই না খেয়েছি একদিন'

হাসিয়া বলিলাম—'জামগাছ ত ছিল না ছিল আমগাছ।'

হাঁ হাঁ আমগাছই বটে বাপ্‌রে এতদিনের কথা কি আর মনে থাকে লুচিগুলো বেশ হ'য়েছে হে

দেখিলাম চৌধুরীর পাতের লুচিগুলি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। গৃহিণী আত্ম-প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, আমাকে কিছু আর বলিতে হইল না। দরজার আড়াল হইতে নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া চৌধুরীর পাতে কয়েকখানা লুচি ও খানিকটা ডাল্‌না দিয়া গেল।

'খাসা বৌ হে, আমাদের নয়ন হ'লে কিন্তু সুমুখে বেরোতে পারত না,—দেখলে ত সে দিন,—মুখ তুলে তোমার দিকে চাইতে পারলে না—'

আমার মুখখানি অমনি বিবর্ণ হইয়া উঠিল, গৃহিণী কি মনে করিল জানি না—মাথা গুঁজিয়া খাইতে লাগিলাম।

চৌধুরী তবু নিরস্ত হইল না, বলিতে লাগিল—'সত্যি, আজকালকার মেয়েদের 'ফর্‌ওয়ার্ড' না হ'লে চলে না বাপু, কাগজে ত দেখ্‌ছ যুগটা চল্‌ছে মেয়েদেরই আর দুদিন পরে মেয়েরাই কর্‌বে সব হে, ট্রাম বাস অফিস আদালত মেয়েরাই নেবে দখল ক'রে। আমাদের পরেশবাবুকে ত দেখনি তুমি, দিব্যি কপাল ভদ্রলোকের, বৌ প্রফেসারী করে, আর উনি পায়ের ওপর পা দিয়ে গ্যাঁট্‌ হ'য়ে খান্‌ আর একটু জল দাও বৌদি—'

গৃহিণী আসিয়া গেলাসে জল গড়াইয়া দিল। চৌধুরী ঢক্‌ ঢক্‌ শব্দে নিমেষে সমস্ত জলটুকু নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

আহারান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া খানিকটা বিশ্রাম করিয়া চৌধুরী উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল—'পাচটা হবে, না হে? আচ্ছা উঠি এখন। একবার তোমাদের সাবডেপুটির কাছে যেতে হবে,—ভদ্রলোক চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন—কাল বাড়ীতে ওঁর সত্যনারায়ণের পুজো—শত খানেক ডাব আমাকে দিতে হবে। নইলে ভদ্রলোকের মুস্কিল, ভদ্রলোক লোক মারফতে আবার টাকাও পাঠিয়েছেন—টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে আসি, ভারী ক'টা ডাবের জন্যে চৌধুরী নেবে টাকা—অমন চামার নয় সে—আচ্ছা তা হ'লে একদিন আমার ওখানে, বুঝ্‌লে কিনা—

চৌধুরী পথে নামিল।

কয়েক পা আগাইয়া আবার ঝাঁ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'ভাল কথা মনে পড়েছে হে,—পাচটা টাকা আমাকে দাও দেখি; পুরানো ষ্টোভটায় আর কাজ চল্‌ছে না—এসেছি যখন, নূতন একটা নিয়েই যাই,—'

আপত্তি তুলিতে কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ হইল। উঠিয়া গিয়া পাচটি টাকা আনিয়া চৌধুরীর হাতে দিলাম।

৩

একটি মাসের পর—

বাড়ীতে গৃহিণীর সহিত ঝগড়া করিয়া সেদিন শ্যামপুরে রওনা হইলাম। বেলা আন্দাজ আটটা। গ্রামের শেষ

প্রান্তে চৌধুরীর বাড়ী—সেকেলে ইমারত; ভাঙিয়া চুরিয়া ধ্বসিয়া পড়ার উপক্রম। বাড়ীর নীচে পুষ্করিণী—কলমীলতা ও কচুরীপানায় সমস্ত জলটা আচ্ছন্ন হইয়া আছে। যখন ইস্কুলে পড়িতাম তখন মাঝে মাঝে আসিয়া চৌধুরীর সহিত পাল্লা দিয়া পুকুরে মাছ ধরিতাম।

বাড়ীর নিকট আসিয়া ভাবিলাম, চৌধুরীর যদি সাক্ষাৎ না পাই, তবে এতটা রাস্তা হাঁটিয়া আসাই সার। বিশেষ চাকরীর একটা সুরাহা করিতে না পারিলে, আজ গৃহিণীর কাছে আমার মুখ দেখাইবার উপায় নাই।

দরজায় একটি লোক দাঁড়াইয়াছিল,—লোকটি যে চৌধুরীরই দর্শনপ্রার্থী এটুক বুঝিতে দেরী হইল না। মনে মনে কিন্তু আশ্বস্ত হইলাম।

'কাকে খুঁজছ হে,—শিবকালী বাবুকে?'

'আজ্ঞে—হাঁ—'

'বাড়ী আছে বলতে পার?'

লোকটি আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিল, তার'পর বলিল—'আছে বৈ কি, নইলে আর দাঁড়িয়ে কেন বলুন?'

নিঃসঙ্কোচে চৌধুরীর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

'—চৌধুরী আছ নাকি হে?—চৌধুরী—ঘন ঘন দুই তিন বার ডাক। কিন্তু চৌধুরীর সাড়া নাই। ও পাশের রকের উপর হইতে চৌধুরী গৃহিণী, আমাকে দেখিয়াই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রাঙ্গণের উপর দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় দেখিলাম,—পায়খানার আড়ালে দাঁড়াইয়া চৌধুরী আমাকে হাত নাড়িয়া ইসারা করিতেছে। তাজ্জব ব্যাপার!

একটু আগাইয়া আসিতেই চৌধুরী বলিল—ব'লে দাও ত হে লোকটাকে—চৌধুরীর বিষম জ্বর, এখন যেতে পারবে না—দু দিন পরে আসে যেন,—যাও—

হাসিয়া বলিলাম—'কেন ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার পরে শুনো,—লোকটাকে আগে ভাগিয়ে দিয়ে এস ত, যাও না—'

তথাস্তু,—বাহিরে আসিয়া লোকটিকে চৌধুরীর শারীরিক অবস্থার কথা জানাইতেই—সে বড় বড় করিয়া যে কথাগুলি উচ্চারণ করিল তাহা শুনিয়া কিছুক্ষণের জন্য আমাকে কাণে আঙুল দিতে হইল! কোন জবাব দিতে পারিলাম না।

লোকটি প্রস্থান করিলে চৌধুরীর নিকট ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিলাম। চৌধুরী তখন পায়খানার পাশ হইতে অঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাকে দেখিয়া বলিল 'খুব সামলে গেছি হে, আর একটা কথা মুখ থেকে বার করলে শালাকে আমি ঠুকে দিতাম; মনে করেছে—টাকা সহজে দেব—নাজেহাল না 'ক'রে নয়—চৌধুরীর সঙ্গে ফচ্কুনি,—এস ঘরে এস—'

চৌধুরী আমাকে ঘরে লইয়া গেল!

ঘরের অবস্থা দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য গা'টা আমার ছাঁৎ করিয়া উঠিল; মাথার উপরে ছাদের বরগাগুলি নামিয়া আসিয়াছে—একস্থানে কয়েকখানি টালি খসিয়া পড়ার উপক্রম। মেঝেটা স্যাঁৎসেতে ও নোংরা। আরশুলা ও গিরগিটি নির্ভয়ে ইহার উপর বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

চৌধুরী বলিল—বিদেশে চাকরী করার কি ফল দেখছ ত হে, বাড়ীখানা ঠিক শ্যাল কুকুরের আস্তানা হ'য়ে উঠেছে—দু'টি হাজার টাকা খরচ না ক'রলে আর বাস করা চলছে না—হাঁ, তুমি কি ঠিক করলে? চাকরীতে ঢুকবে নাকি, আমি ত কালই কলকাতায় রওনা দিচ্ছি—

চৌধুরী যে আমার চাকরীর কথাটি ভোলে নাই,—ইহাই আশ্চর্য্য। বলিলাম—'হাঁ, চাকরী ছাড়া আর উপায় কি বল ত? বৌ চাকরী চাকরী ক'রে বাড়ীতে তিষ্ঠুতে দিচ্ছে না।

'তাই নাকি? তা' কালই চল'—তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতর পায়চারী করিতে করিতে বলিল—'সুরেশবাবুর মাথা ত' এবার দেনায় বিকিয়ে গেল—চারহাজার টাকার জমিদারী নিলামে উঠেছে—'

'তারপর'—

চৌধুরী হাসিয়া বলিল, তারপর আবার কি, চৌধুরীই এখন লাট চালাবে! চাকরীর কথা ব'লছ, ও ফ্যাসাদ ছাড়লাম কি আর সাধে, এই লোভেই ত। আরে এক মজার কথা শোন। সেদিন ভোরে ক্ষুদিরাম গাঙ্গুলী এসে হাজির। জান ত ব্যাটা কৃপণের যাশু—সকালে নাম ক'রলে কেউ খেতে পায় না। ব্যাটা এসে বলে কিনা চৌধুরী, তুমি ত বাপু বিদেশে

প’ড়ে থাক,—পুকুর আর বাগানটার ওপর বাবভূতের অত্যাচার চ’ল্‌ছে, একটা কিছু নিয়ে ও দুটো বাপু ছেড়ে দাও—

কাণের কাছে বহুক্ষণ হইতে একটি মশক গুঞ্জন করিতেছিল, সেটিকে ধ্বংস করিয়া বলিলাম, ‘কি বল্‌লে তুমি ?’

‘বল্‌লাম, ছেড়ে দিতে ত আপত্তি নেই, কিছু দেবার কথা বল্‌ছ, বেশ পাঁচটা হাজার দাওনা, কালই লেখাপড়া হ’য়ে যাক্।’

‘তারপর’

‘তারপর সরাসরি চম্পট, হাত দিয়ে যাঁর জল গলেনা—সে নেবে বাগান পুকুর—হাঁ হে ?’

ঠিক এই সময়ে আঙিনা হইতে ডাক পড়িল—‘শিব দা আছ নাকি—শিবু দা—’

চৌধুরীর কাণ দু’টি খাড়া হইয়া উঠিল,—বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল—‘কে ভোলা ? কি খবর রে—?

‘খবর ভালই, ক্ষুদিরামবাবু এসেছেন,—দু’শোতেই রাজী—ডেকে নিয়ে আসি ?’

‘থাক্ থাক্, আমিই যাচ্ছি চল্’—বলিয়া চৌধুরী একবার আমার মুখের দিকে চাহিল ! তার’পর বেশ সপ্রতিভ ভাবে বাহির হইয়া গেল।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে চৌধুরী ফিরিয়া আসিয়া বলিল—‘দুনিয়ায় শুধু টাকা আর টাকা হে···, টাকা ছাড়া কথা নেই, ক্ষুদিরাম বাবুর বাগান পুকুর কেনা মাথায় উঠেছে, এখন বৌ’র গহনা বন্ধক রেখে চৌধুরীর কাছে নিতে এসেছেন টাকা···যেন গাছের ফল,··আরে তোমাকে যে বসিয়েই রেখেছি শুধু, নাও এই বর্ম্মা চুরুটটা ধরিয়ে ফেল দিকি ’ ‘আমি একটু চায়ের যোগাড় দেখে আসি ’

‘থাক থাক, চায়ে আর আমার রুচি নেই চৌধুরী, আজ শুধু চাকরীর জন্যেই তোমার কাছে এসেছি। তুমি যখন কাল কল্‌কাতায় যাচ্ছ, তখন ত আমার ভাবনাই নেই। কাল দুপুরের খাওয়াটা আমার ওখানেই সেরে নিও · কি বল ?’

চৌধুরী পাশের ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—‘কাপবোনা নেই, চাক্‌রী তোমাকে না ক’রে দিয়ে এখন আর কোন কথা বল্‌ছিনে · ওগো ও নয়ন চট্‌পট্ রান্না চড়িয়ে দাও দিকি··· আজ আর রুই পাওয়া গেল না, চৌবাচ্চায় মাগুর আছে ত··· বাঃ, তবে ত কোন কথাই নেই, ওহে, চাটুর্গা মেলের টাইম বদ্‌লেছে, ২২টেয় ছিল, এখন হ’য়েছে ১-১০এ, রান্নাটা কাল যাতে সকাল সকাল···’

‘আরে সে আর তোমাকে ব’ল্‌তে হবে না চৌধুরী—’

পরদিন দুপুরের পূর্ব্বে সত্য সত্যই চৌধুরী আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে লট-বহর কিছু নাই, শুধু ছোট্ট একটি সুটকেস।

আহারাদি সারিয়া চৌধুরী ‘প্রোগ্রাম’ করিতে বসিল। আহিরীটোলার নিধিরাম গুঁইএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাওনা হাজার টাকার একটা কড়া তাগিদ দিবে,—বাগ্‌বাজারের শ্রীমন্ত সন্ন্যাসের কাঠের কারবার কি রকম চলিতেছে তাহার একটু খোঁজ লওয়ার প্রয়োজন। কমলাঘাটে ভজহরি কুণ্ডুর রেশমী সূতার কিরূপ চাহিদা। বালীগঞ্জের অবনী বাবু মেসোপটেমিয়া হইতে ফিরিলেন কিনা। গ্রীনফিল্ডের বিলাত যাত্রার বিলম্ব কি ইত্যাদি !

প্রোগ্রাম সারিয়া চৌধুরী বলিল—‘ঠিক মিঃ গর্ডনের কাছেই তোমাকে নিয়ে যাব হে; রয়েল ব্যাঙ্কের ‘চীফ-সেক্রেটারী; ক্লার্কের কাজ ত তোমার বাধ্‌বে না। ’

‘না,···মিঃ গর্ডন তোমার ফ্রেণ্ড বুঝি ?’

চৌধুরী চক্ষু দুইটি বড় করিয়া বলিল—‘ফ্রেণ্ড ব’লে ফ্রেণ্ড;- দুজনে একেবারে ‘হ্যাণ্ড য্যাণ্ড-গ্লাভ্’। মেয়ের বিয়েয় সেবার আমায় ‘ইনভাইট্’ করল। কি করি শুধু হাতে ত যাওয়া চলে না। পাঁচশো টাকার ‘প্রেমায়ার’ কোম্পানীর এক রিষ্ট ওয়াচ্ তাই ক’রতে হল প্রেজেণ্ট ·· ও কি গাড়ী এল না কি ?’

পথের উপর ঘোড়ার গাড়ীর ঠকর্ ঠকর শব্দ। বলিলাম- ‘হাঁ’—

রিষ্টওয়াচটির দিকে একবার দৃষ্টি দিয়াই চৌধুরী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—‘তবে আর কি চলা যাক্ · ’

সুটকেস হাতে চৌধুরী গাড়ীতে গিয়া উঠিল। আমি একবার ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

গৃহিণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিতেছি, এমন সময় দেখিলাম,—গাড়ী হইতে চৌধুরী নামিয়া আসিতেছে।

আমাকে দেখিয়া বলিল—'দাঁড়াও, বাধা প'ড়ে গেল আবার,···চাকরী-বাকরীর কথা বলাও যায় না,—কখন কি হয়···কাছে সম্বল থাকাই ভাল। এক কাজ কর দিকি,··· সঙ্গে কিছু টাকা নাও। বেশী নয়,—শ'খানেক হ'লেই চল্‌বে···লাগেই যদি, কা'র গায়ে আবার তেল বুলোতে যাবে বাপু। নাও, আর দেরী ক'র না,···একটা বাজে প্রায়—' চৌধুরী গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

গৃহিণী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল। চ'োচ'থি হইতেই হাসিয়া উঠিলাম—'শুন্‌লে ত?'···

'শুনেছি, কি খারাপ বললেন শুনি, আজকালকার দিনে টাকা দিয়েও কি চাকরী মিল্‌ছে? গাঁট থেকে খসাতে যদি দরদ হয়, আমার কাছেই নাও না, না তা'তেও···'

'আরে তাই কি বল্‌ছি—'

রাত্রি আট্‌টায় চৌধুরীর সহিত বৌবাজারের ছোট একটি মেসে আসিয়া উঠিলাম।

সকালে ঘুম ভাঙিতেই দেখি, চৌধুরী বাহির হইয়া গেছে। মিঃ গর্ডনের সহিত সকালে তাহার সাক্ষাৎ করার কথা। গর্ডনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার চাকরীর বিহিত না করিয়া সে মেসে ফিরিবে না। মনে মনে একটু আশ্বস্ত হইলাম—এরূপ লোকের অসাধ্য সাধন ত আশ্চর্য্য নয়।

দুপুরে খাওয়া শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় বিদ্যুৎ গতিতে চৌধুরী আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

'বাস, চাকরী তোমার হ'য়ে গেল হে, কুচ্‌পরোয়া নেই। আমার নিজের হ'লে কোন কথা ছিল না, তোমার কিনা—তাই ছোট সাহেবকে ঐ টাকাটা গুঁজতে হ'চ্ছে। তা' একশ' টাকা আর এমন কি, দুমাসেই উঠে যাবে! দেখ, তখনই না ব'লেছিলাম, সঙ্গে সম্বল থাকা ভাল'—তারপর একটু হাসিয়া গায়ের জামাটা খুলিতে খুলিতে বলিল—'তোমার খাওয়া ত শেষ, নাকে-মুখে আমি দুটো গুঁজে নিই, এখনই আবার বেরোতে হবে তোমাকে নিয়ে—'

'কোথায় বেরোবে?

চৌধুরী একটু রূক্ষ হইয়া বলিল—'কোথায় আবার গর্ডনের কাছে' এবং তিল মাত্র না দাঁড়াইয়া চটপট্ কল্‌তলার দিকেই সে অগ্রসর হইল।

—ক্লাইভ ষ্ট্রীটে গর্ডন সাহেবের অফিস। বৌবাজারে দুজনে ট্যাক্সিতে চাপিলাম। বেলা ২টা বাজিতে দেরী নাই। ডালহৌসি স্কোয়ারে আসিয়া চৌধুরী সোফারকে মোটর থামাইতে বলিল। মোটর হইতে ঝপ করিয়া নামিয়া বলিল—'ভাল কথা মনে পড়ল হে, গর্ডনের কাছে অন্য কেউ থাকলে ত সুবিধে হবে না। আমি আগে একবার দেখে আসি বুঝ্‌লে? তা'রপর এসে তোমাকে নিয়ে যাব। তুমি এখানে 'ওয়েট' কর দিকি। অন্য কোথাও যেওনা কিন্তু···আর হাঁ, ঐ টাকাটা?'

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম—'এখনই লাগ্‌বে নাকি?'

'হাঁ হাঁ···লাগে ত বাপু এখনই, আর না লাগে ত কথাই নেই, বার কর চট্‌পট্‌···'

একশ' টাকার নোটখানি পকেটেই ছিল,—কালবিলম্ব না করিয়া সেখানি চৌধুরীর হাতে গুঁজিয়া দিলাম।

চৌধুরীর মোটর বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিয়া চলিল।

বেলা একটা দুইটা করিয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিল। চৌধুরীর তল্লাস নাই। ট্যাক্সির পর ট্যাক্সি চলিয়াছে, চৌধুরী ফিরিল না। টলিতে টলিতে মেসে ফিরিলাম।

সকাল হইতেই আবার মেস হইতে বাহির হইলাম। উদ্দেশ্যহীন যাত্রা, চলিতে চলিতে কোথাও কি চৌধুরীর সাক্ষাৎ পাইব না?

হঠাৎ আমার কাঁধের উপর একটি চাপটি আসিয়া পড়িল। পিছন ফিরিতেই দেখিলাম—চৌধুরী। চৌধুরীর পরণে কোট-প্যাণ্ট, মাথায় টুপী।

আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—'আরে এদিকে কোথায়? তোমার কাছেই যাচ্ছি যে। শোন ব্যাপার। কাল মোটর থেকে নেমে গর্ডনের কাছে যাচ্ছি এমন সময় কোথা থেকে বিণ্টুল এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। ওঃ—সে কী দৃশ্য,··বল্‌বার নয় হে। বিণ্টুলের দু'চ'খ বেয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়্‌ছে, মুখে কথাটি নেই। আমাকে ত' ওখান থেকে একেবারে সিধে নিয়ে চল্‌ল কাত্যায়নী কটন মিলে। আমি চাকরী না ক'র্‌লে সে চাকরী করবে না; মিলের ক্ষতি, প্রোপ্রাইটারের মনোকষ্ট···এই সব বুঝিয়ে

চাকরীতে আবার যুতে দিল, কি করি উপায়, কি বল? কিন্তু সত্যি বলছি, চাক্‌রী আর আমার ভাল লাগে না বাপু—। বলিয়াই সে একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। তারপর পিছনের দিকে একটু হেলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল 'হাঁ,—আর ব্যাঙ্কে ঢুকে দরকার কি তোমার? আমি যখন মিলে এলাম, তখন তোমাকেও আমি ঢুকিয়ে নিচ্ছি ··বেশী নয়, এক হপ্তা সবুর কর দিকি। আরে টাকাটাও তোমার খরচ ক'রে ফেল্‌লাম যে।···তা' ভাবনা কি; এক হপ্তা পর যখন মিলের চাক্‌রীর জন্যে কল্‌কাতায় ফির্‌বে তখনই ওটা · কি বল? —তা'হ'লে আজই বাড়ী যাচ্ছ?'

চৌধুরীর কথাটার আর উত্তর দিলাম না। ফুট্‌পাতের জন-সমুদ্রের মধ্যে ধীরে ধীরে মিশিয়া গেলাম।

সকালের রৌদ্রে গৃহিণী ঘরের দালানে বসিয়া এক মনে আনাজ কুটিতেছিল,—স্যুট্‌কেস হাতে ত্রস্তপদে আঙিনায় পা দিতেই গৃহিণী মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

'ঠিক হ'ল?'

'হ'ল'

গৃহিণীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। 'তখনই না ব'লেছি, ···না হ'য়ে যাবে কোথা? সকাল থেকে বাঁ চ'খটাও তাই নাচ্‌ছে। ওরে ও নেতু শীগ্‌গির জলখাবার কিনে আন্‌ দিকি, মুখখানা একেবারে শুখিয়ে উঠেছে দেখ্‌ছি, তা'···রাতের গাড়ীতে না চাপ্‌লেই ত পার্‌তে বাপু, কবে 'জয়েন' কর্‌ছ হ্যাঁ গা···?

অবসন্ন দেহটা বিছানার উপরেই এলাইয়া দিয়াছিলাম। অতিকষ্টে মুখের উপর একটু হাসি টানিয়া বলিলাম—'আর এক হপ্তা পর—'

"কেবল বড় লইয়া বাঙ্গালী নয়,—ছোট বড় লইয়াই বাঙ্গালী। কেবল ধনী লইয়া বাঙ্গালী নয়, ধনী দরিদ্র লইয়াই বাঙ্গালী। কেবল শিক্ষিত লইয়াই বাঙ্গালী নয়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লইয়াই বাঙ্গালী।"

বাঙ্গালীর আদর্শ—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

জাগো

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নির্ব্বাপিত হোমবহ্নি, সূচিভেদ্য নৈশ অন্ধকার ;
বিকলাঙ্গ ইন্দ্রসেনা, নিস্তরঙ্গ অংশুমতী তীরে ;
অধিকার নাহি যা'র অগ্নিহোত্র সাজে না তাহার,
অবিমৃশ্য অনার্য্যের উপদ্রব বাড়িতেছে ধীরে।

ঋঙ্মন্ত্র-উপাসক ! বিস্মৃত মণ্ডল-অন্ধকারে
কর যজ্ঞ-অধিষ্ঠাতৃ অগ্নি-ঋত্বিকের উদ্বোধন,
মধুচ্ছন্দা, স্তুতি কর সোমপায়ী বায়ু-দেবতারে
নির্ব্বাপিত বেদীমূলে ইন্দ্রদেবে কর আবাহন।

জাগো ইন্দ্র, অর্ণজয়ী, বজ্রপাণি অন্তরীক্ষ-পতি
দাও ঋদ্ধি লব্ধকাম, শত্রুজয়ক্ষম উচ্চ শির,
আর্য্য-বর্ণ রক্ষাকল্পে—বিশ্বামিত্র জানাও প্রণতি
বৃত্র সংহারিতে নাও সুপবিত্র অস্থি দধীচির।

জাগো নারী বিশ্ববারা, জ্বালো অগ্নি হে ব্রহ্মবাদিনী,
হবিপাত্র করে বহি' যজ্ঞবেদী কর পরিক্রম,
আপস্তম্ভ নিদ্রা যায়, মৃতপ্রায় নৈষ্কর্ম্ম্যে মেদিনী ;
প্রজাপতি, অগ্নিষ্টোমে মৃত্যুভয় কর অতিক্রম।

মন্ত্ররূপে জাগো ঋষি, হোতারূপে জাগহে ব্রাহ্মণ,
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য তব করায়ত্ত হে বৈদিক কবি,
অনূপ গায়ত্রীছন্দে বসুন্ধরা করহে পাবন,
কল্যাণের বসুধারা দিবে ঢালি' হুতাবহ হবি।

পাঁচালীকার কবি ব্রজমোহন রায়

—শ্রীমনমোহন নরসুন্দর

জাতি যখন জাগে তখন তাহার প্রতিভা সকল দিকেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। আমাদের বাঙলা সাহিত্যেও এই চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যকে আমরা চিনিতে শিখিয়াছি: তাহাকে বিচার করিবার, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার অনেকের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে।

"বাঙলার চিরন্তন সাহিত্য-ধারা ছড়া গান ও কবিতায়। ঐ লইয়াই দেশ মশগুল ছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে ও প্রাবল্যে সেই একঘেয়ে সুর কতক থামিল, নূতন উপদ্রবও সঙ্গে সঙ্গে সুরু হইল অথবা বাড়িল। বাঙালীর প্রেতাত্মা হয়ত এখনও কবিতা রচনা করে—কে জানে! আর নূতন আমদানী গল্প, নাটক-নাটিকা ও উপন্যাসের প্লাবনে দেশ ত' ডুবুডুবু, ভাসিয়া না যায় এই আতঙ্ক।" বর্ত্তমান যুগের রুচিদুষ্ট শিক্ষাভিমানী আমরা তাই প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিতে গিয়া আমাদিগকে ভ্রমে পতিত হইতে হয়। অংশ-বিশেষের রুচিদুষ্টতা ও অশ্লীলতা দেখিয়া আমাদের অনেকেরই সমগ্রকে আলোচনা বা বিচার করিবার ধৈর্য্য বা অবসর থাকে না। 'রস-গ্রন্থাবলী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আমার মনে হয়, দাশরথিকে বুঝিতে গিয়া ঐ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।[১] তিনি উপসংহারে লিখিয়াছেন—"দাশরথি রায় ও মধু কানের গীত সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই। ভাবুকতা তাঁহাদের একজনেরও নাই। তবে শব্দব্যবহারে মুন্সীগিরির কথা—তা সে প্রকার ভাবশূন্য মুন্সীগিরিতে যদি কেহ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন, তাঁহার সে সুখে হন্তারক হইতে ইচ্ছা করি না। অতএব ইহাদের সম্বন্ধে আমি কোন কিছুই বলিব না।" চন্দ্রশেখর বাবু যদি বিশেষ বিবেচনা ও বিচার করিতেন তাহা হইলে তাঁহার মন্তব্য এরূপ নির্ম্মম ও কঠোর হইত না বলিয়াই আমি মনে করি। তারপর তিনি যেগুলিকে তাঁহার পুস্তকে স্থান দিয়াছেন—তন্মধ্যে কয়েকটী গান বাদ দিলে বাকী সবই পল্লী-আসরের প্রহসন মাত্র। 'বঙ্গবাসী'-অফিস হইতে প্রকাশিত দাশরথি রায়ের সমগ্র পাঁচালী দেখিলে তাঁহার ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে। দীনেশবাবু দাশরথি সম্বন্ধে তাঁহার উপসংহারে বলিয়াছেন—"দাশুর পাচালী সম্বন্ধে আমরা যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করি না কেন, তাঁহার রচিত শ্যামা-সঙ্গীতগুলির প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিব। এখানে বাক্যচপল অসার আমোদপ্রিয় শব্দকুশল দাশু সহসা ধর্ম্মগম্ভীর গুরুত্ব দ্বারা স্বীয় গানগুলিতে এক আশ্চর্য্য বৈরাগ্য ও ভক্তিপূত কাতরতা ঢালিয়া দিয়াছেন। 'দোষ কারও নয়গো মা' প্রভৃতি গান প্রকৃত বৈরাগ্য ও অনুশোচনার অশ্রুতে পবিত্র। এই ভাবের গান দাশরথির অনেক আছে। বৈষ্ণব বিষয়ক সঙ্গীতে দাশু রাধাকৃষ্ণের রূপকের সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন।"[২] কবিগীতির সরল আবেগবর্ণনাস্থলে তিনি বলিয়াছেন—'ভারতচন্দ্রের এই অশ্লীল সাহিত্য যখন রাজানুগ্রহে পুষ্ট হইতেছিল—তখন বঙ্গের দূর পল্লীতে সরল ভক্তি ও প্রেমাশ্রুবিধৌত সঙ্গীত পুনশ্চ আরব্ধ হইয়া শ্রোতার প্রাণের কামনা পরিতৃপ্ত করিতেছিল। অনুপ্রাসপ্রিয়তা ও কোমল ভাষা ব্যতীত সেই সব সঙ্গীত কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের অন্য কোন ঋণ বহন করে না। তাহারা সামান্য কবিওয়ালার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া অশিক্ষিত সমাজকেই বেশী আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু বোধ হয় কালে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবে।"

কবিগীতি সম্বন্ধে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেও তিনি দাশরথির পাচালী সমালোচনা করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির সমীচীন হয় নাই। ইহাতে দাশরথির উপর অবিচার করা হইয়াছে। তিনি যেটুকুর আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, তাহাও আবার পাচালীরচনার সাধারণ ধারা নয়, অশিক্ষিত পল্লী-আসরের শ্রোতার মনস্তুষ্টিকরণ মাত্র। এই যুগের অন্যতম কবি ঈশ্বর গুপ্তও অশ্লীলতা-দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কাব্যের সৌন্দর্য্য যাহা সাধারণের

(১) বসুমতী সংস্করণ।

(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

অধিগম্য নয়, তাহা তিনি দেখান নাই। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর যে সকল রচনার তিনি প্রশংসা করিয়াছেন, দাশরথির ওরূপ রচনা অনেক থাকা সত্ত্বেও তিনি তাহাদের কথা বলেন নাই। তাঁহার এই মন্তব্যের ফলে সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের দাশরথির উপর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে যাঁহারা বাঙলা সাহিত্যের ধারা নূতন পথে পরিচালনা করিয়াছিলেন, সেই সকল সাহিত্য রথীদের মত উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন—"যিনি বাঙলা ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হইতে ইচ্ছা করেন তিনি যত্নপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত দাশুরায়ের পাঁচালী পাঠ করুন।" সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলিতেন—"যাঁহারা দাশরথিকে কবি বলিতে চাহেন না, তাঁহারা হয় কাব্যের রসাস্বাদনে অক্ষম নচেৎ দাশরথির রচনা বিষয়ে অজ্ঞ।" *

কবির সৃষ্টি আলোচনা করিতে গেলে তাঁহার জীবন ও সেই যুগকে বাদ দিলে চলিবে না। বিচার করিয়া সেই ক্ষণকালের সাহিত্যে যাহা চিরন্তন কালের, যাহা আমাদের মজ্জাগত বাঙলা মায়ের খাঁটী জিনিষ, তাহাকে বাহির করিতে হইবে। শিক্ষিত সমাজে অনেকেই পাঁচালী সাহিত্য সম্বন্ধে মনে মনে ঘৃণা পোষণ করেন। এই জন্যই একজন পাঁচালীকারের জীবন-আলোচনার ভূমিকা-স্বরূপ এত কথার অবতারণা করিলাম, আশা করি কেহই ইহাকে অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞান করিবেন না।

লৌকিক শাখার মধ্যে ধরিলে—উনবিংশ শতকের শেষ অর্দ্ধশতাব্দীর প্রথম তিন দশককে বাঙলা সাহিত্যে পাঁচালীর যুগ বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যের আদি যুগ এই উনবিংশ শতক, কিন্তু তাহা ফলোপধায়ক হইয়াছিল শেষের দিকে। বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যে আর প্রাচীন পদাবলী সাহিত্যে এই দুইয়ের মধ্যে ইহাদের স্থান। ভূতপূর্ব্ব অনুসন্ধান সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সমালোচনায় লিখিয়াছেন—"রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি রচনার যুগ এক্ষণে অতীতের অন্ধকারে বিলীনপ্রায়। সেই অতীত ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে প্রোথিত রাখিয়া, যদি একবার বর্ত্তমান যুগের আলোক-রেখার পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই পূর্ব্বে পাঁচালীর প্রোজ্জ্বল প্রভায় বঙ্গ-সাহিত্য কিরূপ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। দেখিতে পাই;—একদিকে দাশরথি রায়, একদিকে রসিকমোহন রায়, একদিকে ব্রজমোহন রায়, পাঁচালীর রাজত্বে তিনজন তিন দিক্‌পালরূপে বিরাজমান ছিলেন।"

এই তিনজন সমসাময়িক পাঁচালীকারই সমধিক প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। আধুনিক কালের শিক্ষিত সমাজের কাছে ইঁহারা মোটেই পরিচিত নন কিন্তু তখনকার দিনে পশ্চিম বাঙলার কোন বৃদ্ধের কাছে ইঁহাদের নাম করিলে তিনি ইঁহাদের সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিতে পারিতেন। দাশরথির নাম অনেকেই জানেন কিন্তু অপর দুই জনের নাম হয়ত অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই জানেন না।

দাশরথিকে লইয়া কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে রসিক রায় সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিয়াছি, বর্ত্তমানে ব্রজমোহন রায় সম্বন্ধে আলোচনা করিব। দাশরথিকে বাঙলা সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম পাঁচালীকার বলা যাইতে পারে। রসিক রায় তাঁহার অপেক্ষা বয়সে পনের বছরের ছোট ছিলেন। ব্রজমোহন রসিক রায় অপেক্ষা এগার বছরের ছোট।

ইঁহাদের জীবিত কাল—

দাশরথি রায়—১২১২ সন—১২৬৪

রসিক রায়—১২২৭ সন—১৩০০

ব্রজমোহন রায়—১২৩৮ সন—১২৮৩

আধুনিক যুগের শিক্ষা, সভ্যতা ও ভাবধারার সঙ্গে ইঁহাদের কোন পরিচয় ছিল না। এই প্রভাব তাঁহাদের মনের উপর কোন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। সেই হিসাবে ইঁহাদের রচনাকে খাঁটী বাঙলার শেষ রচনা বলা যাইতে পারে।

কবি ব্রজমোহন হুগলী জেলার অন্তর্গত বলাগড় ষ্টেশনের এক মাইল পূর্ব্ব দিকে তেঁতুলিয়া গ্রামে ১২৩৮ সনে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম-তারিখ লইয়া 'বঙ্গবাসী' একটু গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। জন্ম-তারিখের বেলায় ১২৩৮ শক লিখিয়াছেন এবং মৃত্যুতারিখের বেলায় ১২৮৩ সন লিখিয়াছেন। ইহাতে স্বতঃই দুইটী প্রশ্নের হয়,—প্রথমটী সন, না দ্বিতীয়টীও শক? তাঁহার

* পুরাতন 'সাহিত্য' পত্রিকা।

পাঁচালীর মধ্যে ৭১ সালের ঝড়ের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় তিনি তখন জীবিত ছিলেন। মনে হয় উহা অনবধানতাবশতঃই হইয়াছে ; অথবা ব্রজমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীমোহন ভুলক্রমে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাকে তলাইয়া দেখা হয় নাই, অবিকল ছাপানো

রামলোচন রায়ের তিন পুত্র—মধুসূদন, ব্রজমোহন ও গোপীমোহন। ব্রজমোহন মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন। ৬ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে সংসারের যাবতীয় ভার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধুসূদনের উপর পতিত হয়। মধুসূদন ছোট ভাইদের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত যথেষ্ট যত্ন করিতেন। প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদের চরিত্রে কিছু অসাধারণত্ব বাল্যকাল হইতেই দেখা যায়। ব্রজমোহনের চরিত্রও কোন অংশেই সেই চিরন্তনী রীতিকে উল্লঙ্ঘন করে নাই। ৭।৮ বৎসর বয়সে ব্রজমোহন তানলয়যোগে মধুর কণ্ঠে গান গাহিতে পারিতেন। এই গানের জন্য পল্লীর সকল নরনারীই তাঁহাকে ভালবাসিত। বাড়ীর গৃহিণীরা মিষ্টান্নের লোভ দেখাইয়া বালক ব্রজমোহনের গান শুনিত। ছেলেমহলেও ব্রজমোহনের খাতির কম ছিল না। তাহারা সকলে মিলিয়া ব্রজমোহনকে ঘিরিয়া আব্দার করিয়া বলিত, "ব্রজদা', একটা গান গাও, তোমার গান শুনিতে বড় ভাল লাগে।"

বার বৎসর বয়সের সময় জ্যেষ্ঠ মধুসূদনের মৃত্যু হইলে বালক ব্রজমোহনের উপর সংসারের সমস্ত গুরুভার পতিত হয়। জীবনের এই প্রথম প্রভাতে শিক্ষাদীক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়া সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহার্থে তিনি মালদহ জেলার ইংরাজ বাজারে এক মহাজনের গদীতে মুহুরীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। সেকালের পাঠশালার জ্ঞানেই তাঁহার শিক্ষার শেষ। সঙ্গীতের উপর তাঁহার বড় টান ছিল, তাই এ দুঃসময়ে সংসারের গুরু নিপীড়নে নিপীড়িত হইয়াও অবসর সময়ে সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তিনি সঙ্গীত-শিক্ষা করিতেন। সংসারের বাধাবিঘ্ন মায়ামোহ তাঁহার কবি-জীবনের অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সেকালে 'খেয়াল' সঙ্গীতে তাঁহার খুব নাম ছিল।

কাব্য-জীবনের সহিত সঙ্গীতের সংযোগ হওয়ার ফলেই বোধ হয়, তিনি পাঁচালীর প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিছুদিন মহুরীর কার্য্য করিয়া ব্রজমোহন আবগারী বিভাগে নাজীরের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এইখানেই তাঁহার কাব্য-জীবনের সুরু হয়। পাঁচালীমাত্রই পৌরাণিক উপাখ্যানমূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে জ্ঞানের চর্চ্চাও করিতে হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের উপর তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, ফলে তিনি কিছু কিছু সংস্কৃত কাব্যও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঋতুসংহারের পালাগান কালিদাসের ঋতুসংহারেরই ছায়া। বাঙ্‌লা সাহিত্যে ঋতুর গান—বিশ্বপ্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য—মানব-মনের উপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাহার পাঁচালী বোধ হয় এই প্রথম। রবীন্দ্রনাথের অমরলেখনী হইতে ইহার গভীর নিগূঢ় তত্ত্বটী নূতন অভিব্যক্তি লইয়া আজ বাঙ্‌লা সাহিত্যের দরবারে হাজির হইয়াছে। পাঁচালী সাহিত্য পড়িতে বসিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কথা একেবারে না ভুলিয়া গেলে চলে না—সাধারণতঃ আমরা তাহা ভুলিতে পারি না বলিয়াই পাঁচালীর নিজস্ব রস উপভোগ করিতে অক্ষম হই।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া কবি ব্রজমোহন তাঁহার ঋতুসংহারের বর্ষা বর্ণনা উপসংহারে লিখিয়াছেন—

ওহে নিত্য নিরঞ্জন, সত্য সনাতন
ধ্যানের ধন পুরুষ।
তুমি করেছ এ বিশ্বমাঝে কি খেলা প্রকাশ।
খেল হে আশ্চর্য্য বড়, একবার ভাঙ একবার গড়
কিন্তু কখন অনন্ত তোমার হয় না খেলার শেষ॥
আমরা যে পদার্থ প্রতি সঁপি হে নয়ন
তোমার প্রতিরূপ করি হে দর্শন।
অসম্ভব শিল্প তব পান না ভেবে বিধি ভব
জ্ঞানহীন ব্রজমোহন কি তার জানে কি বিশেষ॥

তাঁহার চাকরী জীবনের রচিত পাঁচালীগুলি দেখিয়া তৎকালীন অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরা তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। তাঁহার বলে ব্রজমোহনের ভ্রাতা গোপীমোহন কবির রচিত পালাগুলি লইয়া একটা পাঁচালীর দলের সৃষ্টি করেন। গোপীমোহনের সঙ্গীত-আবৃত্তিভঙ্গী সবই ব্রজমোহনের কাছ হইতে শেখা। তখন হইতে ব্রজমোহনের কাব্যানুশীলন অপ্রতিহত ভাবে চলিতে থাকে। তিনি চাকরী পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গোপীমোহনের এক বৎসর পাঁচালী গাহিবার কালেই হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান

জেলায় অনেক জায়গায় তাঁহার খুব নাম হইয়া গেল। তখন কবি নিজেই পাঁচালীর আসরে নামিতে আরম্ভ করিলেন। দশ বৎসর কাল এইরূপে সুখ্যাতির সহিত পাঁচালী গাহিয়া ব্রজমোহন পশ্চিম বাঙলার সর্ব্বত্র সুপরিচিত হন। যেই তাঁহার পাঁচালী শুনিয়াছে সেই প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। তাঁহার পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি গাহিবার সময় বৃদ্ধ শ্রোতাদের চোখ দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু বিগলিত হইত। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি তেত্রিশখণ্ড পাঁচালী ও অনেক গীত রচনা করেন। পরে পাঁচালীর পালায় শ্লেষ গাহিবার রীতি হওয়াতে বিশুদ্ধ ভাবে লোকশিক্ষার জন্য ১২৭৯ সালে যাত্রাদলের সৃষ্টি করেন। জনসাধারণের এই খেউর-প্রীতিই দাশরথি রায়ের অশ্লীলতাদোষদুষ্ট হওয়ার কারণ।

এখন হইতে ব্রজমোহন পাঁচালী রচনা ছাড়িয়া নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম প্রথম দুই একটী পালা অপরের দ্বারা রচনা করাইয়া তাহার স্বত্বস্বামিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাত্রার আসরে তিনি নিজের রচিত পালাই গাহিতেন। তাঁহার নামে রচিত প্রকাশিত নাটকগুলির মধ্যে অপরের রচিত নাটক প্রক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। কোন শ্রদ্ধাসম্পন্ন পাঠক তাঁহার নাট্য সাহিত্য লইয়া নাড়াচাড়া করিলে হয়ত সেগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন। চারি বৎসর কাল এই যাত্রার দল উন্নতির সহিত পরিচালনা করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় ৪৫ বৎসর বয়সে ব্রজমোহন রক্তাতিসার পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। এই চারি বৎসরের মধ্যে তিনি অভিমন্যুবধ, রামাভিষেক, সাবিত্রী-সত্যবান, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, লক্ষ্মণবর্জ্জন প্রভৃতি নয়খানি নাটক রচনা করেন। এই হিসাবে তাঁহার কাব্য দুই ভাগে বিভক্ত। তাঁহার যাত্রাগানও পাঁচালীর মতই সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ, ভাটপাড়া ও নদীয়ার অধ্যাপকগণ ব্রজমোহনের গানে (শ্রবণ করিয়া) ভাবের সহিত রসের সামঞ্জস্য ও প্রকাশভঙ্গী দেখিয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তখনকার নাট্যসাহিত্যে মানুষের জীবনের বৈচিত্র্যের ছাপ পড়ে নাই কিন্তু সেই যুগে কথাসাহিত্যকে প্রাধান্য দিয়া যিনি প্রকাশভঙ্গীর নূতন পথের সন্ধান দেন তাঁহার খোঁজ আজ কয়জন রাখে! উপাখ্যানগুলি অধিকাংশই পৌরাণিক। তখনকার দিনে যুগের প্রভাবকে অতিক্রম করা সহজ ছিল না, আজও নয়। ব্রজমোহনও তাহা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার রচনা খাঁটী বাঙলার প্রাণের কথা। বাহিরের কোন দেশের বা জাতির ছায়া ইহার উপর পড়ে নাই; বাঙালী যদি নিজের স্বরূপ জানিতে চায় কিংবা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সহিত পরিচয়-লাভের ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সে এই রচনাগুলির মধ্যে অনেক নূতন বস্তুর সন্ধান লাভ করিবে।

কবিরা সুন্দরের পূজারী, তাই কবি ও তাঁহার কবিতা অমর। বিশ্বের বিচিত্র ছন্দের মধ্যে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিলীলা। যাহা নিয়তই চলিয়াছে—কবি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা অনুভূতি ও দৃষ্টিশক্তির প্রভাবে তাহাকে যুগে যুগে রূপ দিয়া আসিতেছেন। এই অনুভূতি ও অভিব্যক্তি একদিকে যেমন বিশ্বমানবের কল্যাণকর, অপরদিকে তেমনি কবিরও জীবনপথের পরিচালক। প্রকৃত কবি যিনি, প্রকৃত রসস্রষ্টা যিনি, তিনি 'রসো বৈ সঃ' 'তিনিই সকল রসের আধার', এই মন্ত্রের উপাসনায় সকল সৌন্দর্য্যের আধার পরমরস ও পরমসুন্দরের পথের পথিক।

ব্রজমোহনের পাচালীর পালা-গান ও স্বতন্ত্র গানগুলির মধ্যে সুন্দর-পিয়াসীর একটা ইঙ্গিত আছে। তাঁহার সমগ্র গানগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্য জীবনের আগাগোড়া তাঁহার একটা প্রবল বাসনা ছিল; তাহার ফলে তিনি যাহা গাহিতেন প্রাণের সহিত গাহিতেন।

জীবনের এই উন্মুখ হৃদয়বৃত্তির জন্যই ব্রজমোহন পাচালীর ছড়া ও গানগুলির মধ্যে সর্ব্বত্র অনুভূতিরসসিক্ত ভক্তিপ্লুত কাতরতা ঢালিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। কবিত্ব হিসাবে পাচালীর ছড়াগুলি যেমন ছন্দের সুষ্ঠুতা ও পারিপাট্য লাভ করিয়াছিল, গানগুলি তেমন সুসংবদ্ধ নয়। তবুও এগুলি মধুর ও শ্রুতিসুখকর। একেবারে মর্ম্মে গিয়া আঘাত করে, সংসার-বিমুগ্ধ, অসৎ কর্ম্মে নিরত মনকে ক্ষণকালের জন্য সচেতন করিয়া দিতে চেষ্টা করে। এগুলি যেন মায়ের কাছে ছেলের আত্মনিবেদন।

কবি-রচিত বিভিন্ন গানগুলির মধ্যে এই ভাবধারা ছড়াইয়া আছে। অনুসন্ধান করিলে উহার মধ্যে কবিমনে মানবাত্মার

যে ক্রমবিকাশের ধারা তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি বিষয়বাসনালিপ্ত পথহারা ভ্রান্ত মনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

আমার মানস মধুকর
বিষয়বিপিনে ভ্রমে, কেন ভ্রম নিরন্তর।
হরিপদারবিন্দে মকরন্দ পান কর।
এ কাননে তুমি যে সব পুষ্প দেখ
সে সব মধুহীন কেতকী চম্পক।
সেই সরোজ-মধুপানে মত্ত থাক
অনিত্য ক্ষুধানিবার।
দিবানিশি তোমার গুন্ গুন্ নিজরবে
গুণময় হরির গানে মগ্ন রবে,
ব্রজমোহন তোমার দাসত্ব লয়
তবে তোমায় জানি গুণাকর।

*

কেন মত্ত অনিত্য ধনে
একবার গিয়ে জ্ঞানচক্ষে
দেখ মোক্ষদাতা ধনে।
যাবে মনের অন্ধকার
নিলে শরণ রামপদে, সম্পদ তোমার
বিপদজ্ঞান হবে এ সব বিপদ রবেনা মনে।

ভবে আর কি আশা, যে ফল আশা
সে আশায় সরস কর মন
কেন মায়াতে উত্তপ্ত ত্যজে পরমার্থ
কর তত্ত্ব গুরু-তত্ত্ব ধন॥
না হ'লে সজ্জন। ভজন বিসর্জ্জন
দিয়ে কর বিষয়বিষ অর্জ্জন,
হলে কণ্ঠরোধ এসে সে কাল কণ্টক
করিবে তব কণ্ঠধারণ।
কেন এত স্নেহ, এ অনিত্য দেহ ইহাতে সন্দেহ
প্রতিক্ষণ দেহে থাকিতে জীবন!
জানকীজীবন ভজরে দ্বিজ ব্রজমোহন॥

*

মজরে মজরে মন আমার,
রামপদ কমলে বিষম চরম কালে
কর সে অভয় পদ সার।
জাননা পামর মন অসার সংসার
দারাসুত ধনজন কে তব আপন মন
সকলি স্বপন-পরিবার।
এ দেহ কদিন রবে আছ কি গৌরবে
ভাব হরি পদাম্বুজ ভবার্ণবে হবে পার॥

*

কেন কুভারতী সদানন্দ অধরে।
জাননা অজ্ঞান জীব গোবিন্দ কি নিধি ভবে॥
হয়ে দ্বিজকুলোদ্ভব, এ কি তব কু-স্বভাব
কুমতি প্রভাবে কেন বৈরীভাবে ভাব তাঁরে।
কি ছার বিষয়বাসনা কর সতত উদরকামনা
পদার্থবিহীন সংসারে।
পতিত হয়েছ আজি, পতিত কলুষহ্রদে
বিনে পতিতপাবন ব্রজমোহনে কেবা নিস্তারে

অসৎ কর্ম্মে নিরত মনের চেতনা জাগ্রত হইয়াছে তাই অনুতাপভরে বলিতেছেন—

দিনান্তে কালী নাম জপনা মানসে মন
কোরনারে আর অনর্থ ভ্রমণ।
কর করিতে শপথ ভবে মুক্তি-পথ অন্বেষণ।
কাল এসে ধরলে কেশে কালী বলা হবে না
হলে যে দেহ শব এ উৎসব রবে না।
কালী পদ ভাবনা, যাবে কাল ভাবনা
যতনে জয় কালী ব'লে কররে কাল হরণ।
তোরে বলিরে নিতান্ত গেল দিন ত
কেন ভ্রান্ত এত
দেহ মূঢ়মতি কুমতি বিসর্জ্জন।
মজে মায়া সরোবরে বিফলে কাটালে কাল
ধরিতে জীবন-মীন ধীবর পেতেছে জাল;
এখনি বধিবে প্রাণ কিসে পাবে পরিত্রাণ
একবার বদনে কালী কালী বলরে ব্রজমোহন॥

*

শিবে আর কত দিন দিবে দীনে দুর্গতি
নাই গতির সঙ্গতি।
দাও যদি মা চরণতরী এ ভব দুস্তরে তরি
মাম্প্রতি কটাক্ষ করে' সম্প্রতি।
আসি এ সংসারে আশীলক্ষ বার
হয়েছে মা কত পুণ্যে মানবজন্ম আমার।
জঠরের প্রতিজ্ঞে ভঙ্গ করি সব
হলনা এ জন্ম জীবনে গৌরব।
সুপথ ত্যজে অনায়াসে ভজনবাদী দুর্জ্জন বশে
অতীত দিন আছে মা অল্প অতি॥

জেনেছি মা বিশেষ রূপে যে সুখ এ সংসারে
আশাপূর্ণ, আসিতে আর ত না চাই
আসার আশা যায় যাতে মা কর তাই।

সৎসঙ্গের প্রভাব মানুষের জীবনে কত বড় তারই বর্ণনায় কবি বলিতেছেন—

জীবের কুপথ সে নয়
সে পথে হয় সতের সদাগতি।
যে জন তার মর্ম্ম জেনে কর্ম্ম করে
তার হবে দুর্গতি।
সাধুর পন্থাবলে পরকালে হয় গতির সঙ্গতি॥
মহৎপথে এগুণ ধরে পরশ সতে পরশ করে
অসৎ লোহার হীনত্ব হরে
দেখ সৎ অনলে অঙ্গারদিলে অঙ্গার জ্যোতিঃ॥

অনুতাপ ক্রমে ক্রমে মানবহৃদয়কে স্থায়ী অনুভূতি দান করে, মানুষ তখন পথের সন্ধান পায়। কবি হৃদয়ে এই অনুভূতির বিকাশ—

হলরে মন কাল গত কালী কালী বল।
তুমি ভুলোনা ভুলোনা মন শিওরে শক্ত শমন
সন্নিকটে সুপথ এখন কালীপুরে চল।
গেলিনা সুপথে, হলিনা দাস কালিকার
অন্য যে ভাবনা কর কেন চিন্তা কালিকার॥
আজি দিন গেল গৌরবে না জানি কাল কোথা রবে
কালি যে বলিবে কালী এ যুক্তি অতি বিফল।
এবার নিতান্ত বুঝতে মতি মন্দালি-ব্রজমোহন
কালবশে বৃথারসে কাল গেল।
দেহ রথে আপনি রথী হ'য়ে তুমি একবার
বুদ্ধিরে কর সারথি অশ্ব দশেন্দ্রিয় তার।
কালভয় পরিহরি ভক্তিরূপ কোদণ্ড ধরি
ব্রহ্ম অস্ত্র কালীনাম সন্ধানে রিপুদলে দল।

*

কবে হবেরে মন যোগী।
পরমার্থ ধন সাধনেতে হ'য়ে মনোযোগী।
কামাদি দুর্জ্জন ছয়জনে দমন
কররে হ'য়ে উদ্যোগী।
শুনোনারে ভ্রান্ত যা বলিবে তারা
মুখে সদা বল তারা তারা,
থাকে যেন তোমার জ্ঞাননেত্র তারা
তারাচরণে সংযোগী।

পবিত্র মানবক্ষেত্র আছে নিজ
তাতে বপন কর গুরুদত্ত বীজ
অঙ্কুরিত হলে মনরে
অঙ্কুরিত হলে ব্রজমোহন হয় যদি তার ফলভাগী।

ভগবানের কৃপাব্যতীত মানুষ মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ব্রজমোহন এই কৃপাবাদকে বিশ্বাস করিতেন তাই প্রার্থনা করিয়াছেন—

কেন হে কর বঞ্চন পুরাইবে অকিঞ্চনের আকিঞ্চন
হরি দিয়ে আজি সামান্য ধন।
আমি ভজনবিহীন জঘন্য দীন
কর স্বগুণে, নিগুণে কৃপা কর কৃপা বিতরণ।
আমি নই অভিলাষী ধনপ্রয়াসী
যদি দিবে ধন দাও অমূল্য ধন শ্রীচরণ।
এ ধনে হলে বাঞ্ছিত নিতান্ত হব বঞ্চিত
ধনলোভে এ ভবে আজি তোমাধন।
একবার হের অপাঙ্গে এই পাপাঙ্গে
মরে আতঙ্গে পড়িয়ে ভবতরঙ্গে ব্রজমোহন।

সাধনার পথ দুর্গম। সুদীর্ঘ দিন উপাসনা সাধনায় যখন এতটুকুও কৃপালাভ হয় না তখন মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। কবি তাই অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন—

জয়তি জয় জয় রঘুপতি রাম
যোগীন্দ্রবন্দিত অনন্ত গুণধাম
নব দূর্ব্বাদল শ্যাম।
কমলাকান্ত হরি কৃতান্তবারণ,
দুঃখান্তকারী ভবভ্রান্ত কারণ,
এ বিশ্বতারণ কলুষসংহারণ
ভবরোগ ঔষধি তব নাম।
ত্রিলোক-তিলক ত্রিলোকপালক
নিরানন্দহারী আনন্দদায়ক
ত্রিতাপহারক ত্রিগুণধারক
কেন হে ব্রজমোহনে বাম।

প্রকৃতিস্থ মন যখন নিজ দৌর্ব্বল্য বুঝিতে পারে তখন সে আত্মস্থ হইয়া চিত্তের দৃঢ়তা-সম্পাদনে পরমাত্মার কাছে আবদার করে। ব্রজমোহনে এই অনুভূতির বিকাশ—

যদি স্বগুণে চরণ করিলে বিতরণ
দীনের এই সুদিনে।
যেন করনা ওগো জননি
পাপাঙ্গে আবার বঞ্চিত চরণে॥

তবে এসে কুপথগামী, সুপথ চিনিনে আমি
এ দুর্ম্মতি তমহর তুমি জ্ঞানাক্ষি প্রদক্ষণে ॥
কর ক্ষমা ক্ষেমঙ্করী অপরাধ আমার
করেছি মা কত শ্রী অঙ্গে প্রহার
কিন্তু এমন অপরাধী না হই তোমার শত্রু যদি
তবে সাধে কি স্থান দিবে পদে এ ব্রজমোহনে।

তারপর মানুষের ঊর্দ্ধমুখী সাধনার স্তর—যেখানে মানুষ চিত্তকে সর্ব্বদা উন্মুখ করিয়া রাখে। ব্রজমোহনও সেই স্তরে তান ধরিলেন—

জাগো গো কুলকুণ্ডলিনি।
মা আমার অন্তরে।
তোমার অন্তরেতে রাখি নিয়ত নিরখি
অন্তর না করি দিবারজনী ॥
ভক্তিপুষ্প করি শ্রদ্ধাসচন্দন
অঞ্জলি করি চরণে অর্পণ
নেত্র মুদে মনসাধে কালীরূপ করি দরশন।
কামাদি ছয়বলি দিব গো করালী
বিবেক অসি করে ধারণ করি,
পরে জ্ঞানাগ্নি জ্বালিব হিংসাহুতি দিব
তবে ব্রজের শিব ঘটে শিবানী।

সাধনার ক্রমবিকাশের ফলে সন্তান শেষের দিনে সম্পূর্ণ রূপে নিজের স্বরূপ অবগত হয় এবং জীবনের পরম ঐশ্বর্য্যস্বরূপ সত্য-শিব-সুন্দরের উপর সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করে। ব্রজমোহনও তাই শেষের গান গাহিয়াছেন—

আয় মা শঙ্কটে শিবরমণী
কাতরে বিতর কৃপা জগদ্বন্দিনী।
শমন নিকট হল শিবে
কি হবে গতি কি হবে
ভেবে সারাদিন সারা হল দীন
কেবল ভরসা ভানুজ ভয়বারিনী তারিণী।
সংসার-সাগর ঘোর তরঙ্গে
ভাসিছে আমার ক্ষুদ্র দেহতরণী।
আকুল ভাবিয়ে কূল আর দেখি নে
এইবার নিজ সন্তানে ব্রজমোহনে,
অভয় চরণে রাখ পতিত
পতিত বলে পতিতপাবনী ॥

তাঁহার সমগ্র পাঁচালীগুলিতে লোকশিক্ষার একটা সাবলীল তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছিল। ইঁহার রচনাগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে অনুমান হয় যে, ইঁহার নূতন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা বড় ছিল না। রামায়ণ ভাগবত পুরাণের আখ্যানাদি উপজীব্য করিয়া কল্পনার সাহায্যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি পূর্ব্বক পালাগান রচনা করাই কাব্য-জীবনের মূলধারা ছিল। ব্রজমোহনের প্রেমের প্রতিভা ছিল না। তিনি ছিলেন রাজপুতনার চারণ বা মধ্যযুগের ইউরোপের Trouba-dourদের মত। তাহাদের মত বীর-গাথা গাহিয়া বেড়াইতেন না—গাহিতেন ধর্ম্মের গাথা। জীবনে মহত্তর কিছু আবিষ্কার করিতে পারেন নাই বটে, তবু নীলকণ্ঠ, রামপ্রসাদ এবং বাউল কবিদের মত বলিয়া গিয়াছেন, মন কেন মত্ত অনিত্য ধনে। নিত্য বস্তুর সন্ধান লও, নিবিষ্ট হও।

তখনকার কালে অশ্লীলতার আভাস আধুনিক কালের মত দূষণীয় ছিল না। প্রেমের কবিতা লিখিতে কবির যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান, সাত্ত্বিকতা ও সংযমের প্রয়োজন কোন পাঁচালীকারদেরই তাহা ছিল না। তাই ব্রজমোহনের বিরহ আখ্যান পাঠ্য হয় নাই তবে ঐরূপ খণ্ডকাব্য তাঁহার দুই তিনটীর বেশী নাই। পল্লীআসরে পাঁচালীর শেষে ওগুলি শ্রোতার চিত্তবিনোদনের জন্য আবৃত্তি করা হইত। তবে সেকালের লোকে উহাকে বড় অপছন্দ করিত না। এখনকার দিনেও পাড়াগাঁয়ের শিক্ষিত প্রবীণ ভদ্রলোকদের ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরপ্রীতির মধ্য দিয়া সেকালের রুচির কিছু আঁচ পাওয়া যায়। উহাতে স্থানে স্থানে গ্রাম্যতা-দোষ আছে এবং পরিহাস অনেকটা নিম্ন ধরণের হইয়াছে।

অধিকাংশ পাঁচালীগুলিই দূর অতীত কালের ঘটনা লইয়া লিখিত হইলেও ব্রজমোহনের লেখার মধ্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও তৎকালীন ঘটনাসমূহের ছায়াপাত হয় নাই তাহা বলা যায় না। তখনকার দিনে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্পর্শে শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় দেশীয় শিক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশীয় আচার ব্যবহার বেশী ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তা ছাড়া সমাজে নানা প্রকার অনাচারও ছিল। কুলীনের কীর্ত্তি, ইয়ং বেঙ্গল, ইনকাম ট্যাক্স, প্লেগ প্রভৃতি পালা একদিকে যেমন অনাচারের বিরুদ্ধে লেখা, রাণীর বর্ণনাও তেমনি অপর দিকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পত্নীর দানশীলতা ও সদ্‌গুণের প্রশংসা। বিধবা বিবাহের পক্ষে কোন পাঁচালীকারই কিছুই বলেন নাই বরং তাহার বিরুদ্ধে প্রত্যেকেই কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন।

ইহা রক্ষণশীল মনেরই পরিচায়ক। তা ছাড়া তাহাদের মত শিক্ষিত লোকদের বহুদিনের সংস্কার মুক্ত হওয়া সহজ ছিল না।

তাঁর পাঁচালীর নানা স্থান পড়িলে দেখা যায় কর্কশ শব্দের প্রয়োগ বেশী। ছন্দের গতি অব্যাহত নয়—তবে কবিতার প্রাণময়ী যে প্রবাহ তাহা নষ্ট হয় নাই। গানে এই ছন্দের দৈন্য আরও বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে কবিতা ও গান এক জিনিষ নয়-গানে কবিতার ছন্দের দৈন্য সুরে পূরণ করিয়া দেয়। তা ছাড়া পাচালী পাঠ করার একটা নিজস্ব ভঙ্গী আছে, সাধারণ কবিতাপাঠের মত তাহা পাঠ করিলে উহার সরসতা উপলব্ধি হয় না; আর গানও পাচালীকাররা নিজেরাই গাহিতেন সুতরাং যে দৈন্য সহসা আমাদের চোখে ধরা পড়ে কার্য্যক্ষেত্রে তাহা ঘটিত না।

উপসংহারে বলা যায় ব্রজমোহনের রচনায় একটা সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতি আছে। আধুনিক যুগের মাপকাঠিতে সর্ব্বত্র মার্জ্জিত ভাব না থাকিলেও তাহা সরল, অনাড়ম্বর ও বেগবান; সঙ্গে সঙ্গে অনুপ্রাসের সংযোগও আছে। এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যাঁহারা বাঙ্‌লার পুরাতন সাহিত্যের প্রতি মনোনিবেশ করিবেন তাঁহারা কবিপ্রতিভার পরিচয়লাভে বঞ্চিত হইবেন না। কবিকঙ্কণ ও রায়গুণাকরের মতই পাচালীকারদের লেখাতেও খাঁটী বাঙ্‌লার প্রাণের কথা শুনিতে পাইবেন। *

"দেবতার অপকীর্ত্তি অন্যায়ের দিতেছে প্রশ্রয়
অবিচারে মানি' পরাজয়,
প্রতিকারে শক্তিহীন ধরাতলে অনাসৃষ্টি করি'
পূজার নৈবেদ্য শুধু ছলনায় লইতেছে হরি'
লোকান্তরে থাকি অন্তরালে।
আজি তাই' দিকচক্রবালে
শ্মশানের চিতাবহ্নি ঊর্দ্ধমুখী জ্বলে নিরন্তর।
এ দুর্দ্দৈব মাঝে তবু দেবতায় একান্ত নির্ভর,
যা'রা আজি গাহে 'আগমনী'
তা'দেরি-কঙ্কালে বাজে রণবাদ্য অস্ত্রের ঝনঝনি"

* বিগত হুগলী জেলা শিক্ষক-সম্মেলনের সাহিত্যশাখায় পঠিত।

এই প্রবন্ধ আলোচনায় বীরভূমের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত গৌরীহর মিত্রের নিকট নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

বঙ্কিম-তর্পণ

—শ্রীজগৎমোহন সেন

আইনষ্টাইনের theory of relativityর প্রতিবাদ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় এবং সে ধৃষ্টতা লেখকের নাই। তবুও প্রথমেই ব'লে রাখতে হ'চ্ছে যে মানুষের মধ্যে মানুষ যেটুকু,—স্থানকালের পরিবর্ত্তনের স্রোতে গা ভাসান তার কর্ম্ম নয়। স্থানকালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাত্রও ব'দলে যায় হয়ত, কিন্তু স্থানই বলি আর কালই বলি উভয়েরই একটা অন্তর্নিহিত শাশ্বত ভাব আছে। তেমনই আছে পাত্রের,—বিশেষতঃ সে পাত্র যদি মানুষ হ'য়ে থাকে। পরিবর্ত্তনটা বহিরঙ্গের ব্যাপার এবং এই পরিবর্ত্তনশীল খোলসের মধ্যে যার বাস। সে হ'চ্ছে শাশ্বত এবং অপরিবর্ত্তনশীল। কথাটার মধ্যে utopiaর গন্ধ খুব বেশী ক'রেই আছে ব'লে মনে হওয়া সম্ভব, কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে এটা অনেকটা নিরস অপল্লবিত সত্য। স্রোতের মুখে নিশ্চেষ্টভাবে ভেসে যেতে অচেতন জড়পদার্থই পারে, সচেতন প্রাণী পারে না। সে স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবেই, নিজেকে বাঁচাবার জন্য। আঘাতের প্রতিঘাত করা, যুদ্ধ করা তার সহজাত বৃত্তি, তার জীবনের ভিত্তি। নিজেকে সজীব ব'লে প্রমাণ করা তার ধর্ম্ম এবং এইখানেই তার সার্থকতা। জীবনের যথার্থ বিকাশ সেখানেই, যেখানে জীব তার পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবার জন্য কোমর বাধে। এই যুদ্ধ কর'বার স্পর্দ্ধা ও শক্তি সব চেয়ে বেশী ক'রে রাখে ব'লেই মানুষ সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার ক'রে ব'সেছে। তার নবজাত শিশুও তার শারীরিক গঠনের অপূর্ণতাকে এবং বাক্‌শক্তির সমস্ত দীনতাকে তুচ্ছ ক'রে অস্পষ্ট কান্নার ভেতর দিয়ে এ কথার প্রমাণ দিতে চায়। তাই মানুষ রাজা; বিদ্যুৎ তার দাসত্ব করে; বজ্র তার অঙ্গুলী ইঙ্গিতের অপেক্ষা করে, কুবের তার শরণাপন্ন হয়।

এ কথা বাস্তব জগতে যেমন সত্য, অন্তর্জ্জগতেও তেমনি। পরমহংস দেবের কথা মনে পড়ে,—"মানুষ, না মন হুঁস্।" প্রকৃতি যেন ঠিক সেই কথাই ব'লতে চায়। প্রকৃতির রাজ্যে যে জীব যত বেশী এবং যত সঠিক সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তার স্থান তত উচ্চে। ছোট জাতের প্রাণীর মধ্যে এই সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ; জীববিজ্ঞান যাকে responses to stimuli বলে, সে সমস্ত যেন তার মধ্যে registered। যেভাবে আঘাত করা হোক না কেন তারা ঘুরে ফিরে ঐ একই ভাবে প্রতিঘাত ক'রবে। কিন্তু মানুষের সহজাত বৃত্তি এবং unregistered re-actions ছাড়াও অন্য কিছু আছে, সেটা তার বুদ্ধি এবং বিবেক। তাই তার সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা অসীম। সুতরাং মানুষকে জানতে হ'লে তার মনকে ভাল ক'রে জানা চাই এবং সেই জন্যই সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের আদর।

যার কথাসাহিত্য নিয়ে বা সাহিত্য-সৃষ্টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা ক'রতে যাচ্ছি তার একটু অস্পষ্টতার দুর্নাম আছে। কিন্তু প্রকৃতই তার সাহিত্য-সৃষ্টি অস্পষ্ট কি না জানতে হ'লে, ক'টি কথা ভেবে দেখতে হ'বে। প্রথমতঃ নূতন-সৃষ্টির একটা মোহময় আনন্দ আছে এবং হয়ত সেই আনন্দের ঘোরেই আদি যুগে নারায়ণের "নাভি-প্ররূঢ় অম্বুরুহাসন প্রথম ধাতা" যে হাতে দেবতা আর মানুষ সৃষ্টি ক'রেছিলেন, সেই হাতেই অসুর সৃষ্টি ক'রেছিলেন। তারপর তার বরেই যখন তারকাসুরের মত কেউ কেউ দুর্জ্জয় হ'য়ে উঠে তার সৃষ্টি নাশ ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিল তখন ক্ষুব্ধ হ'য়েও তিনি প্রতিকার ক'রতে পারেননি; কারণ, "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ংছেত্তুমসাম্প্রতম্।" কিন্তু সৃষ্টির সময় বা বরদানের সময় এ দিকে একটু লক্ষ্য রাখলেই ভাল ছিল। প্রকৃতিকেও নিজের সৃষ্টির ভুল সংশোধন ক'রতে হয়, তাই অধুনালুপ্ত জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কালে পৃথিবী স্তরে স্তরে কবর দিয়ে রেখেছে। সে সমস্ত প্রকৃতির ভুলের সাক্ষী।

জাতীয় জীবনের ওপর কথা-সাহিত্যের প্রভাব কতখানি তা' বিস্তৃত ভাবে ব'লবার প্রয়োজন নেই। কেবল প্রাচীন গ্রীসের একজন সঙ্গীতজ্ঞের উক্তি উদ্ধৃত ক'রলেই হবে,—"There cannot be any change in art, music and literature without a corresponding

change in the national life." সাহিত্য জাতির সভ্যতার প্রতীকই শুধু নয়, জাতীয় জীবনের পথ-প্রদর্শকও বটে।

সাহিত্যিক পথপ্রদর্শক হিসেবে যেমন জাতির কৃতজ্ঞতা-ভাজন, অন্য দিকে দেখতে গেলে জাতির কাছে, সমাজের কাছে তার ঋণও কম নয়। তাঁর ভেতরকার শিল্পীকে প্রেরণা দিয়ে জাগিয়ে তোলাতে তাঁর জাতিরও কিছু হাত আছে। শিল্পীকে তাঁর শিল্পের উপাদান নিজের সমাজের মধ্যেই সাধারণতঃ খুঁজে নিতে হয়। তাই জাতির কল্যাণ-চিন্তাও তাঁর অন্যতম কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক জাতীয় জীবনেরই এক একটা বিশিষ্ট সুর আছে। কারও আছে স্বদেশপ্রেম, কারও আছে সাম্যবাদ, আবার কারও আছে অর্থলিপ্সা, কারও বিজিগীষা। আমাদের সুর ত্যাগের। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ব'লে মনে প'ড়ছে, কথাগুলো ঠিক মনে নেই, তবে ভাবটা এই, Illiad এর অ্যাকিলিস্ হেক্টর বধের পর, হেক্টরের মৃতদেহকে ঘোড়ার পায়ে বেঁধে বিজয়গর্ব্বে অবরুদ্ধ নগরের চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। তাঁর প্রতিহিংসাবৃত্তি এতই প্রবল যে, নিহত প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃতদেহকে তাঁর শোকাতুর পরিজনের সামনে অবমানিত ক'রতে তিনি কুণ্ঠিত হ'ন নি। কিন্তু রাম মুমূর্ষু রাবণকে ক্ষমা ক'রতে দ্বিধা করেন নি। রাম রাবণকে দু'বার জয় ক'রেছেন। একবার বধ ক'রে, আর একবার ক্ষমা ক'রে। শেষের জয়টাই বড় জয়। আবার পাণ্ডবেরাও কবির হাতে প'ড়ে যুদ্ধজয়ের পর রাজ্যভোগ ক'রতে পান নি। এখানেও সেই ত্যাগ। ত্যাগ এ দেশের সাধনা। বঙ্কিমের বীণাও অনেকটা এই সুরেই বেজেছে। এ সুরকে যদি নতুন ব'লে নাও স্বীকার করি, তা' হলেও মানতে হ'বে যে এ সুর বিশিষ্ট এবং জোরালো।

দেবী চৌধুরাণীর শিক্ষাদীক্ষা ত্যাগের মাঝখান দিয়েই আরম্ভ হ'য়েছিল। আবার ত্যাগেই দেবী চৌধুরাণীর চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ। ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধা জননেত্রী দেবী চৌধুরাণীকে প্রফুল্ল ক'রে শিল্পী বাসন মাজিয়েছেন। আনন্দমঠের সত্যানন্দকে মহাপুরুষ জয়লাভের পরমুহূর্ত্তেই হিমালয়ের কন্দরে তপস্যা করবার জন্য টেনে নিয়ে গেছেন। শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের ভালবাসাকে দেহাকাঙ্ক্ষা কলুষিত করেনি, তবুও তার পরিসমাপ্তি ত্যাগে—প্রতাপের আত্ম-বিসর্জ্জনে, আয়েষার ভালবাসা—সেখানেও ত্যাগ। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট অধিকাংশ চরিত্রের মধ্যেই এ দেশের সনাতন ত্যাগের আদর্শ মূর্ত্ত হ'য়ে উঠতে চেয়েছে।

হয়ত মনে হবে এ সমস্ত অবাস্তব, অসত্য—a mere bundle of impracticable Utopia। কিন্তু তাই কি? আমাদের মনের কাছে, আমাদের অভিজ্ঞতায় যা অসম্ভব মনে হ'বে তাকে অসত্য ব'লে মনে ক'রবার কোন যথার্থ কারণ নেই। মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই অপূর্ণ, তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কাণ নির্দ্দিষ্ট সীমার নীচের বা ওপরের সুর শুনতে পায় না, চোখ নির্দ্দিষ্ট সীমার বাইরের রঙ দেখতে অক্ষম, তাই ব'লে ঐ সমস্ত সুর এবং রঙ অসত্য, অসম্ভব নয়। মনের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই মনে রাখতে হবে। মন মানতে চায় না ব'লেই যে অসাধারণ মহৎ ব্যবহার অসম্ভব বা অবাস্তব একথা ভাববার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

দ্বিতীয়তঃ শিল্পী সুন্দরের পূজারী। খালি শিল্পী কেন, সব মানুষেই সৌন্দর্য্য ভালবাসে। মহৎ কিছু করবার ক্ষমতা না থাকতে পারে, কিন্তু মহৎ যা তার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি ক'রতে পারে না, একথা ব'ললে মানুষকে অনেকখানি নামিয়ে দেওয়া হয়। বিজিত শত্রুর উপর অ্যাকিলিসের ব্যবহার হয়ত খুবই বাস্তব, এবং অতখানি দুঃখ সহ্য করার পরেও রামের পক্ষে রাবণকে ক্ষমা করা হয়ত অসম্ভব, কিন্তু রামের ব্যবহারের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য আছে সেটুকু উপভোগ করা মানুষের পক্ষে একটা অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নয়। এ সৌন্দর্য্য আমাদের মুগ্ধ করে, আমাদের পূজার অঞ্জলি জোর ক'রে কেড়ে নেয়। ঠিক তেমনই হয় দেবী চৌধুরাণী, সত্যানন্দ, প্রতাপ বা আয়েষার বেলা। একজন বন্ধু একবার ব'লেছিলেন যে আয়েষার নিঃস্বার্থ ভালবাসা তিনি বোঝেন না। যাকে ভালবাসা যায় তাকেই যদি ত্যাগ ক'রতে হ'ল, তা'হলে তার মধ্যে সত্যিকারের ভালবাসার স্থান কোথায়? পরে তাঁর মুখে অন্য কথা শুনেছি। তিনি প্রথমে সম্ভবতঃ ভুলে গিয়েছিলেন যে আয়েষার ত্যাগ তাঁর প্রেমাস্পদের সুখের জন্য, তিনি নিজের সুখের দিকে মোটেই দৃষ্টি দেন নি। আয়েষার প্রতি নিরপেক্ষ থাকা জগৎ সিংহের অন্যায় হ'তে পারে, কিন্তু আয়েষার চরিত্রে এই ত্যাগের মাধুর্য্য অতুলনীয়।

মানুষের মন অপূর্ণ। সে পূর্ণতার সন্ধান করে নানা দিক দিয়ে। ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতা সে পুষিয়ে নিতে চায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্যে, কিংবা হৃদয় ধর্ম্মের প্রশস্ততার দিক্ দিয়ে প্রকৃতি তাকে তেমনি ক'রেই গড়েছে। পশুর মধ্যে এই পূর্ণতার তৃষ্ণা নেই ব'ললে চলে। ধনে, জনে, সুখে, সম্ভোগে কিছুতেই মানুষ তৃপ্ত হ'তে পারে না, যদি না তার ঈপ্সিত পূর্ণতা লাভ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র মানবমনের এই চিরন্তন তৃষ্ণার সন্ধান রাখতেন। সেই জন্যই তাঁর লেখা আধুনিক যুগেও,—যখন স্পষ্টতার দোহাই দিয়ে ছাগধর্ম্মী মনস্তত্ব সাহিত্যের বাজার ছেয়ে ফেলছে তখনও—আদর পাবার অধিকার রাখে। তিনি মানুষকে মানুষ রূপেই দেখেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন। মানুষের ভেতরকার পশুকে কোথাও তিনি মঞ্চের উপর এনে বাহবা দেবার চেষ্টা করেন নি। পাপকে তিনি কোনো খানেই ক্ষমা করেন নি। যা' কিছু অসুন্দর তাকে তিনি তাঁর লেখার মধ্যে কোথাও বড় আসন দেন নি। সামান্য মনশ্চাঞ্চল্যের জন্য ভবানন্দকে মৃত্যু বরণ ক'রতে হয়েছে, অসংযমী গোবিন্দলালকে নিগ্রহ ভোগ ক'রতে হয়েছে।

লবঙ্গলতা এবং অমরনাথের সম্প্রীতির মধ্যে যে সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে মানব মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে তার তুলনা হয় না। লবঙ্গলতার মনস্তত্ত্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্যেরভিতর দিয়ে যেমন ভাবে দেখান হয়েছে সে কেবল পাকা হাতেই সম্ভব। অস্পষ্টতা তার মাঝে নেই। শুধু তার মাঝে কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট কোনো চরিত্রই অস্পষ্ট নয়। হ'তে পারে, তার মধ্যে Freudian মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ নেই, কিন্তু যা আছে, তা যে মানুষের পক্ষে অসম্ভব বা অবাস্তব একথা জোর ক'রে বলা যায় না। মানব মনের দুর্ব্বলতাকে বড় ক'রে দেখানতেই প্রকৃত রস-সৃষ্টি হয় না, কিংবা ঐ দুর্ব্বলতাই মানব-মনের সার সত্য নয়। তা' যদি হ'ত, তবে প্রকৃতি মানব মনের একাংশকে ঐ ভাবে নির্জ্ঞান-রূপে চাপা দিয়ে রাখত না। পরিপূর্ণ জীবন-সৃষ্টির প্রচেষ্টায় প্রকৃতি অনেক ভুল করেছে এবং সে সমস্ত নানা ভাবে সংশোধন ক'রতে চেয়েছে। নির্জ্ঞান তারই একটা প্রমাণ। নির্জ্ঞানই মানব মনের সার এবং একমাত্র সত্য নয়। মানুষ মানুষই, সে তার নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মেছে। তার মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বের প্রবৃত্তি, তার হৃদয়-ধর্ম্মের আভিজাত্য, তার সংযম, তার বুদ্ধি, তার চিন্তাশীলতা এ সমস্ত কথার কথা নয়; এ সব তার উচ্চতর জীবন-স্পন্দনের লক্ষণ। এ সব তার স্বাতন্ত্র্য। পাপের সঙ্গে যুদ্ধ অস্পষ্টতার লক্ষণ নয়, সেটা মানুষের স্পষ্টতারই পরিচয়।

হ'তে পারে, পশুমনের ভিত্তির উপর মানুষের মন গড়া, তাই ব'লে পশুটাই সত্য এবং স্পষ্ট আর মানুষটা মিথ্যা, অস্পষ্ট এমন কথা বলা চলে না। "অ আ" পড়ুয়ার ভিত্তিভূমির উপর—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র গড়া, তাই ব'লে ঐ "অ আ" শিক্ষার্থীটুকুই সত্য আর রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মিথ্যা এ হ'তে পারে না। বরং বেশী ক'রে সত্য রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র এবং জগদীশচন্দ্র।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে বঙ্কিম সাহিত্যের অন্তরঙ্গের একটা দিক যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা ক'রে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। বহিরঙ্গের দিক দিয়েও তাঁর শিল্প কম সুন্দর নয়। তাঁর উপন্যাসে নাটকীয় উপাদান যথেষ্ট আছে এবং সেই জন্যই তাঁর বই বাংলা রঙ্গমঞ্চের খোরাক অনেক দিন ধ'রে যুগিয়েছে, চলচ্চিত্রের শিশু প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখনও যোগাচ্ছে। কিন্তু সে কথার বিস্তৃত আলোচনা এখন আমরা ক'রব না। মাত্র একটি কথা ব'লে এ প্রবন্ধের উপসংহার ক'রব।

বঙ্কিমচন্দ্র স্রষ্টা, কিন্তু সৃষ্টির নেশা তাঁকে বিহ্বল ক'রতে পারে নি। তাঁর জাতি তাঁর কাছে চিরদিনই সুপথের ইঙ্গিত পেয়েছে। তাই জাতির জীবন-যজ্ঞে একটি প্রধান যজ্ঞভাগ তাঁরই প্রাপ্য। *

* কটক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বঙ্কিম-শ্রদ্ধাধিবেশনে পঠিত।

যোগ-বিয়োগ

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাত

রাত্রে গৌরীকে শোয়াইয়া দপ্ করিয়া আলোটা নিভাইয়া দিয়া গিরি শুইয়া পড়িল। শ্রীমন্ত পাশে শুইয়া; গৌরী নিদ্রিতা, কিন্তু জাগ্রত দুটী প্রাণীও নীরব, অনেকক্ষণ পরে শ্রীমন্তই কথা কহিল—"ঠিক বলেছ তুমি, আর দেরী করা নয়, যত শীগ্রি হয় বিয়ে দিতে হবে।"

গিরি কোন উত্তর দিল না, শ্রীমন্ত পাশ ফিরিয়া গিরির পিঠের উপর হাত রাখিয়া কহিল,—"রাগ করেছ গিরি-বৌ?"

পিঠে হাত রাখিয়া শ্রীমন্ত অনুভব করিল গিরির দেহখানি ঘন ঘন কম্পিত হইয়া উঠিতেছে, সে কহিল—"সত্যি আমার দোষ হয়েছে, কেঁদনা গিরি,—"

গিরি তবুও মুখ তুলিল না, শ্রীমন্ত এবার আরও একটু সরিয়া গিয়া গিরির মুখখানি তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—"আমায় মাপ কর গিরি;—করবে না?"

গিরি এবার আর থাকিতে পারিল না, সে উঠিয়া স্বামীর পা দুইটার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কহিল—"ওগো আর আমার লজ্জার বোঝা বাড়িয়ো না গো, আমি যে এতেই তোমায় মুখ দেখাতে পারছি নে।"

শ্রীমন্ত বুঝিল এ বঞ্চনার বেদনা। তাহারও এ বঞ্চনার বেদনা ছিল, কিন্তু এই নারীটা যে বঞ্চনার জন্য নিজেকেই দায়ী করিয়া অহরহ বুকের মধ্যে কত ক্ষোভ কত শোচনা পোষণ করে তাহা সে এতদিন বুঝিতে পারে নাই, আজ তাহার আভাস পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। পরম দুঃখের মুহূর্তে আত্মহারা হইয়া যে আঘাত আজ সে আপন অজ্ঞাতে দিয়া ফেলিয়াছে, তাহার জন্য গ্লানির আর পরিসীমা রহিল না, তাহার মুখে সান্ত্বনার কোন বাণী ফুটিতে পারিল না, বোধ করি মনেও জোগায় নাই। সে পরম স্নেহ-ভরে প্রিয়তমার এলাইয়া-পড়া কেশের উপর হস্তের পরশ বুলাইয়া নীরব সান্ত্বনা দিতে চাহিল।

গিরি আবার কহিল—"আমি ত জানি, এর জন্যে কত বড় দুঃখ তোমার মনে;—সেই লজ্জাতেই যে আমি ম'রে যাই। আমার মনে হয় কি জান, মনে হয় ছুরী দিয়ে আমার এ দেহখানাকে ফেড়ে ফেড়ে দেখি,—"

শ্রীমন্ত আর এ উচ্ছ্বসিত দুঃখের আঘাত সহ্য করিতে পারিতেছিল না, সে কৃত্রিম আনন্দের ভাণ করিয়া, লঘু হাস্য-পরিহাসে বঞ্চনার বেদনার সত্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া গিরিকে ভুলাইতে চাহিল, সে কহিল—"দূর, দূর, মিছেমিছি মাথা খারাপ করা দেখ, যত সব বাজে ভাবনা! হাঃ, ছেলের জন্যে ত দুঃখে মরে গেলাম; ছেলে অভাবে ত রাজ্য-পাট ভেসে যাচ্ছে—তাই ছেলে! ছেলে না হয়েছে ভালই হয়েছে, হাঙ্গাম কত, খাবে কি?"

কিন্তু ফল হইল বিপরীত, গিরি স্বামীর পা ছাড়িয়া দিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, সে কণ্ঠস্বর অতি দীনতায় ভরা, প্রচ্ছন্ন আক্ষেপের তাহাতে সীমা নাই, ভিক্ষুককে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিলে যে দীনতা যে আত্ম-ধিক্কারের সুর তাহার ধীর পদক্ষেপে, চাহনীতে ফোটে, গিরির কণ্ঠেও ঠিক সেই সুর, সে কহিল—"এত বড় কথাটা তুমি আমাকে বল্লে!"

শ্রীমন্ত বুঝিল না এ কথায় গিরি বেদনা পাইল কেমন করিয়া! কিন্তু গিরি বেদনা পাইয়াছিল, সে ত' সন্তানের আশা আজও ছাড়িতে পারে নাই, তাহার মনোমন্দিরে তাহার অন্তরের নারীটা অহরহ যে কল্পিত একটী শিশু-দেবতার পরিচর্যায় ব্যস্ত; সত্য সন্তানের মাতাকে যদি পরম অভাবেও স্বামী এমন কথা বলে, তাহাতে যে বেদনা সে পায়, সেই বেদনা সে পাইয়াছিল।

তারপর সব নীরব। শ্রীমন্ত শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল এমন কথা সে কি বলিল যাহাতে গিরি বেদনা পাইল।

আর ঐ নারীটা কি যে ভাবিতেছিল সেই জানে।

বহুক্ষণ পরে গিরিই শ্রীমন্তের কাছে সরিয়া আসিয়া গায়ে হাত দিয়া কহিল—"ঘুমোলে?"

শ্রীমন্ত বেশী কথা কহিতে সাহস করিল না, সে সংক্ষেপে সাড়া দিল—"উঁ!"

গিরি বাহুপাশে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিল—"আমার একটী কথা রাখবে তুমি, বল ?"

শ্রীমন্তের ভয় হইতেছিল, কি কথায় হয়ত কি হইয়া যাইবে, সে শঙ্কাভরেই কহিল—"কি কথা বল।"

"আগে বল, রাখবে ?"

এবার শ্রীমন্ত গিরির দেহ বেষ্টন করিয়া সাদরে কহিল—"তোমার কোন্ কথা রাখিনে বল ?"

"তা নয়, তিন সত্যি করতে হবে।"

শ্রীমন্তের মনে কি হইল কে জানে, সে কহিল—"না আগে বল কথাটা কি, শুনি, তারপর।"

"তুমি আবার বিয়ে কর।"

শ্রীমন্ত কথাটা শুনিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না, বহুক্ষণ পরে মাত্র একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

স্বামীর এ নীরবতার অর্থ গিরি বুঝিয়াছিল, কিন্তু বিচিত্র নারীর মন, আর বিচিত্র সম্বন্ধ নর ও নারীর মধ্যে। এ অনুরোধ হেলা করায়, বিশেষ, স্বামী এই প্রস্তাবে বেদনা পাওয়ায় গিরির যেন একটু আনন্দই হইল; সে স্বামীকে আপনার দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়া কহিল—"রাগ হ'ল বুঝি ? শোন, শোন,।"

শ্রীমন্ত ফিরিয়া কহিল, "এ সংসারে আজ ছ'সাত বছর একসঙ্গে ঘর করছি, তুমি আমার সব চেয়ে বড়, এ কি তুমি জান না ?"

নারীটীর অন্তর পুরুষের সোহাগে পুলকে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে, গিরি চটুল ভাবে কণ্ঠে বিস্ময়ের স্বর টানিয়া কহে, "তাই নাকি ? কত বড় গো, তোমার ওই তেল পাকা কালো হুঁকোটার চেয়েও বড় ?"

শ্রীমন্ত এবার স্ত্রীর গালে সোহাগের চড় মারিয়া কহিল—"ভাগ্ !"

উত্তরে গিরি পরম সোহাগে স্বামীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তা জানি ব'লেই ত' এত দুঃখ এত লজ্জা আমার যে তোমার মনের খেদ মেটাতে পারলাম না।"

শ্রীমন্ত তিরস্কার করিয়া কহিল "ফের ঐ কথা ? তা হ'লে কিন্তু আমি উঠে যাব।"

"আচ্ছা থাক্, থাক্, এই মুখ বন্ধ করছি।" বলিয়া সে স্বামীর অধরে আপন অধর আবদ্ধ করিয়া দিল। অতি পুলকে গিরি, স্বামীর নিকট হইতে প্রেম নিবেদন পাইবার আগেই মুখ ফুটিয়া পাইবার স্ত্রীর যে একটা মর্য্যাদা ও সলজ্জ রীতি আছে, তাহা আজ লঙ্ঘন করিয়া ফেলিল।

সহসা গৌরী ঘুমের ঘোরে শব্দ করিয়া নড়িয়া-চড়িয়া ওঠায় গিরি গৌরীর দিকে ফিরিয়া তাহার পিঠে ঘুমপাড়ানী চাপড় মারিতে মারিতে কহিল—"সত্যি আর দেরী ক'রো না, ওই ত বাপের ইচ্ছে, আর এদিকেও গৌরী যেটের কোলে ন' দশ বছরের হ'ল।"

শ্রীমন্ত কহিল, "পাত্র যে মনের মত মিলছে না, আমি কি বসে আছি ভাবছ ? দু-তিন জন ঘটককে বলেছি, কত বন্ধু-জনকে বলেছি। যার তার হাতে ত গৌরীকে দিতে পারব না।"

"বাছা টুকটুকে ছেলেটী চাই বাপু, হর-গৌরীর মত মানান' চাই

—"একলম লেখাপড়া জানা চাই, যে চাষাকে সেই চাষা, আমাদের মত হ'লে চলবে না, অন্ততঃ ছাত্রবিত্তি মাইনর।"

"শ্বশুর শাশুড়ী ভাল চাই:—সে যে কষ্ট দেবে তা হবে না। বরং শ্বশুর শাশুড়ী না থাকে সে ভাল। গৌরীই ত ধর বাপের যা আছে তা পাবে।

—"বাপের আছে ছাই, তবে হা আমার ক্ষুদকুঁড়ো যা আছে সে টুকত পাবেই।"

গিরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া থাকে, ক্ষণ পরে কহে, "তার চেয়ে দেখেশুনে দেওয়াই ভাল, সম্পত্তি কিছু দিয়ো, সব দিয়ো না, সময় গিয়েও ও মানুষের ছেলেপেলে হয়।"

শ্রীমন্ত কহে—"চল গিরি, এবার বদ্যিনাথ যাই, ধন্না দিলে বাবার কি দয়া হবে না !"

গিরি কহে—"তাই চল, গৌরীর বিয়েটা হয়ে যাক।"

আট

শ্রাবণের মাঝামাঝি, কয়দিন হইতে তাহার উপর বাদলা করিয়াছে; আকাশ ভরিয়া জলভরা মেঘের দাপাদাপি; ভরন্ত বর্ষণে মানুষ ঘরের বাহির হইতে পারে না।

শ্রীমন্ত সেই বর্ষা মাথায় করিয়া গিয়াছিল মহাজনের বাড়ী।

গৌরীর পাত্র মিলিয়াছে, যেমন ঘর, তেমনি বর। যেমনটী শ্রীমন্ত চাহিয়াছিল তেমনটী, মেলেনাই শুধু শশুর-শাশুড়ীর কথাটা, দুইই মজুত, তবে তাহাতে কিছু আসে যায় না—তাহারা লোক খুব ভাল। এদিকে সুবিধাও খুব, তাহারা চায় মাত্র দুশো টাকা, তা এমন পাত্রের তুলনায় সে আর এমন বেশী কি?

কিন্তু পাত্রটীর মূল্য হিসাবে দুশো টাকা হয় ত কিছু নয় কারণ সমাজের হাটে তাহার কদর আছে, চাহিদা আছে, কিন্তু ক্রেতার সংস্থানের ঘরটী যে শূন্য, তাহার কাছে দুশো টাকা যে অনেক, নিঃশেষে রক্তহীন জনের কাছে দু'টী বিন্দু রক্ত!

কিন্তু কাঙ্গালের কি সাধ হয় না! আর সে সাধের জন্য যদি সে জীবন পণ করিয়া বসে!

শ্রীমন্ত গিরিকে কহিল—"দেখ এক কাজ করা যাক্, গৌরীকে ত' কিছু জমি দোবই ঠিক করছি, তা ওই জমিটুকু বেচে কেনে গৌরীর বিয়েটা দিয়ে দি;—কি বল?"

গিরিও ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল, "সেই ভাল, তবে জমিটা যদি ওরাই নিয়ে মেয়েটা নিত তবে ভাল হ'ত। গৌরীর ছেলে মেয়েরা নাম কর্ত্ত, মায়ের মামামামীর দেওয়া আমাদের। নইলে যতই কর ততই কর—গৌরীর ছেলেরা আমাদের চিনবে না, শুভ কর্ম্ম হবে,—আভ্যুদয়িক দেবে সেই মাতামহ পাবে।"

শ্রীমন্ত উৎসাহভরে কহে "তা না হয় 'দো'য়ের যে চারটুক্‌রো ছোট কেটে বাকুড়ি করেছি, সে বিঘে খানেক গৌরীকে দান করব, লিখে দোব 'কেনারামের জমির পশ্চিম, পূর্ণচন্দ্রের 'দো'এর উত্তর ও পূর্ব্ব, কালিকেষ্টর বাকুড়ির দক্ষিণ ইতিমধ্যে দোয়েম জমি—নাম গিরি বাকুড়ি, বুঝলে, নাম দিয়ে দোব গিরি বাকুড়ি, বাস্—আখ হবে, কলাই হবে, গম হবে, গৌরীর ছেলেমেয়েরা খাবে আর বলবে 'গিরি বাকুড়ির ফসল।' গিরি কে—না মায়ের মামী।"

গিরি ঈষৎ লজ্জাভরে কহে—"তোমার নামটাও জুড়ে দাও আগে, দুজনেরই নাম থাকবে।"

একটু চিন্তা করিয়া শ্রীমন্ত প্রবল উৎসাহে ঘাড় দোলাইয়া কহিল—"তাই হবে, নাম দিয়ে দোব 'শ্রীগিরি বাকুড়ি', কেমন?"

শ্রীমন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

সেদিন শ্রীমন্ত গিয়াছিল সেই দুশো টাকার জোগাড়ে, মহাজন জমি কিনিল না, শ্রীমন্তের সমস্ত ভূ-লক্ষ্মীটুকুকে বাঁধা লইয়া আড়াই শত টাকা শ্রীমন্তকে দিল, মাত্র গৌরীকে দিবার জন্য হাতে পায়ে ধরিয়া ওই 'শ্রীগিরি-বাকুড়ি'টুক্ বাদ রহিল।

শ্রীমন্তও খুসী হইল, তাহার ভরসা তাহার সমর্থ দেহ, এই দেহে খাটিয়া সে একদিন ঋণ শোধ করিয়া তাহার ভূমি-লক্ষ্মী মাকে পূর্ণাঙ্গ রাখিয়াই পূজা করিতে পাইবে।

মহাজনের আশা—সুদের রজ্জু বয়ন করিয়া যেদিন খুসী শ্রীমন্তের সমগ্র জমিটুক্ টানিয়া লইতে পারিবে।

যাক্, শ্রীমন্ত যখন টাকা লইয়া বাড়ী ফিরিল তখন সন্ধ্যা হয় হয়, কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ছায়ায় গাঢ় অন্ধকার চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছিল, যেন কোন বিরাটপক্ষ নিকষ-কালো পাখী ধরণীর কেন্দ্র-দণ্ডের শীর্ষে বসিয়া অণ্ডের মত ধরণীকে বুকে ধরিয়া আছে, কিন্তু তাহার পক্ষতলে উত্তাপ নাই—আছে শুধু হিমানী স্পর্শ, তাহার সে পক্ষে ঝরে জল, আর সে পক্ষের আন্দোলনে জাগিয়া উঠে হিম বায়ু-প্রবাহ, সে বর্ষণে আর বায়ু-প্রবাহে ধরণী শীতার্ত্তা; সিক্ত দেহে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীমন্ত বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। ঘরে আলো নাই, বাড়ীতে মানুষের সাড়া নাই, শ্রীমন্ত পরম বিরক্তি ভরে কহিল—

"বলি সব মরেছে, না কি?"

অন্ধকারের মাঝে শ্বেত বস্ত্রাবৃত একটী মূর্ত্তি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, শ্রীমন্ত বুঝিল গিরি।

শ্রীমন্ত কহিল—"দিন ঠিক করে ফেল কাল, কালই খোলায় খই দাও। খুব ভাল ব্যবস্থা হয়ে গেল - বুঝলে!"

গিরি তবু কোন কথা কয় না।

গিরি কথা কহিল আর না কহিল তাহাতে শ্রীমন্তের কিছু আসিয়া যায় না, সে দাওয়ার উপর বসিয়া কলিকা খুঁজিতে খুঁজিতে গোটা বিবাহের ফর্দ্দটা মুখে মুখে করিয়া গেল—

"ভদ্দরলোকের সঙ্গে করণকর্ম্ম, ভদ্দরলোকই আসবে সব, রাত্তিরে লুচি করতেই হবে, তা ঘরের গম-ময়দা পিষে নাও, আর ছোলার ডাল তাও ঘরে আছে, আর গুড় তা হোক, এবার আমার যা গুড় হয়েছে চিনি ফেলে তা খেতে হবে; না হয় চিনি কিছু আনা যাবে। কথা বিশ্বাস না হয়

বিয়ের রাত্তিরেই পরখ করিয়ে দোব তোমাকে, তারা শুড়ই যদি না চায়—"

এতক্ষণে গিরি অতি মৃদুভাবে দুটী কথা কয়—"কার বিয়ে?"

—"কার বিয়ে? বলে যে সেই সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতে রামের কে? যাঃ গেল, ঘরে আলো কি হ'ল, কয়লা ধরাব যে, দেশলাইটা দাও ত। বলে কার বিয়ে? আমার নানার বিয়ে—কেন গৌরীর বিয়ে!"

গিরি কাঁদিয়া উঠে, কহে—"তাই ত বলছি গো, কার বিয়ে দেবে? গৌরীকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছে!"

"কেড়ে নিয়ে গিয়েছে? কে? কেন?"

"যার মেয়ে, সেই মাতাল বদমাস: আজ তার বিয়ে দেবে। পাত্তরটীর দুচোখ কানা, বিয়ে দিয়ে টাকা পাবে। তাছাড়া তিনকুলে সে পাত্তরের এক বোন আর বোনাই ছাড়া কেউ নাই, বিষয়সম্পত্তি আছে ভাল।"

শ্রীমন্ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

গিরিও কাঁদে, রোদন-ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই সে কহে—"তুমিও গেলে, তার দণ্ড দুই পরেই সে এসে হাজির, সঙ্গে চার পাচ জনা লোক; বল্লে 'ভালোয় ভালোয় মেয়ে দেবে ত দাও নইলে খুঁটীতে তোমাকে বেঁধে জুতো মেরে মেয়ে নিয়ে যাব।' গাঁয়ের দুচার জন এল, তাদের কি সব বল্লে, তারা বল্লে, 'তা ওর নিজের মেয়ে ও নিয়ে যাবে তাতে কে কি বলবে বাপু, এতদিন তোমাদের কাছে রেখেছে এই'—"

সহসা শ্রীমন্ত উঠিয়া গা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া কহে—"কোথায় বিয়ে?"

"মাহাদেবপুর।"

মহাদেবপুর এখান হইতে ক্রোশ তিনেক পথ।

শ্রীমন্ত রান্না-ঘরের মাচায় তোলা একগাছা লাঠী টানিয়া লইয়া কহিল—"চল্লাম।"

গিরি চমকিয়া উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহে—"সেকি কোথা যাবে?"

"দিয়ে আসি সেই শালা হ'বের মাথাটা চেলিয়ে।"

"সেকি, তার মেয়ে!"

"তার বাবার মেয়ে"—বলিয়া গিরির হাতটা সজোরে ছাড়াইয়া লইয়া সেই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে শ্রীমন্ত বাহির হইয়া গেল।

গিরি বাহিরের দুয়ার পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিয়া ব্যাকুলভাবে ডাকে—"ওগো, ওগো!"

কোথায় কে?

সে দুয়ারের দুইপাশের বাজু দুইটা আশ্রয় করিয়া বাহির-পানে চাহিয়া রহিল।

আঁকা-বাঁকা পল্লী-পথখানি হাত দশ বারো দূরে গভীর অন্ধকারের মাঝে লীন হইয়া গেছে।

বর্ষণ ও বায়ুতে গাছে গাছে, ঘরের চালে চালে একটা শব্দ-প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছে।

পাশের বড় গাছটায় কয়টা পক্ষীশাবক আর্ত্তভাবে চিঁ-চিঁ করিয়া ডাকিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার পক্ষ-প্রসারণ ও সঙ্কোচনের শব্দ পাওয়া যায়, তাহারা বুঝি শাবককয়টাকে বুকে টানিয়া লইল।

বিপুল অন্ধকার! দিকে, দিগন্তে, উর্দ্ধে—কোন দিকে আলোক-রশ্মির এতটুকু রেখা ভ্রমেও জাগে না—শুধু মাঝে মাঝে কালো আকাশের বুক চিরিয়া আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের রেখা ঝলক্‌ দিয়া যায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গিরি ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া একটী কোণে চুপ করিয়া বসে।

তাহার মনের যত রোষ গিয়া পড়ে আজ ওই ভাগ্য-হতা মেয়েটা, ওই গৌরীর উপর,—কি একটা কুগ্রহের মত তাহার অদৃষ্টাকাশে সে আসিয়া জুটিয়াছিল, সমস্ত সংসারটা তাহার একদিনে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া কর্ম্মশেষে সে চলিয়া গেল। আর রোষ পড়ে তাহার নিজের উপর, তাহার নিজের একটা হইলে ত আজ—,

একটা সুগভীর দীর্ঘ-শ্বাস তাহার বুক চিরিয়া ঝরিয়া পড়ে। সহসা সে, কে জানে কেন, আপন যৌবন-পরিপুষ্ট দেহখানা কঠিন ভাবে নিপীড়ন করে—বুঝি সে বুঝিতে চায় কোথায় সে অঙ্গহীনা।

(ক্রমশঃ)

পদ্মিনীর ঐতিহাসিকতা

—শ্রীসুবিমলচন্দ্র দত্ত

গত ১৩৩৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যার প্রবাসীতে অধ্যাপক শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ, পি-এইচ-ডি, মহাশয় 'পদ্মিনী উপাখ্যান ও তাহার ঐতিহাসিকতা' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহার কিছুদিন পূর্ব্বে, রায় বাহাদুর গৌরীশঙ্কর হীরাচন্দ ওঝা কর্ত্তৃক হিন্দী ভাষায় লিখিত 'রাজপুতানেক ইতিহাস'এর দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হয়। উক্ত গ্রন্থে ওঝা মহোদয় মেবাড়ের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া পদ্মিনী কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। কানুনগো মহাশয় সম্পূর্ণ ভাবে এই হিন্দী গ্রন্থের প্রমাণাদির উপর নির্ভর করিলেও পদ্মিনী সম্বন্ধে ওঝার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। অল্প কথায় বলিতে গেলে, ওঝার মতে পদ্মিনী ঐতিহাসিক, কিন্তু কানুনগো উহাকে কবির কল্পনামাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সম্প্রতি আবার পূজনীয় শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় ১৩৩৮ সালের চৈত্রের প্রবাসীতে 'পদ্মাবতীর ঐতিহাসিকতা' সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া পদ্মিনীকে ঐতিহাসিক বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার প্রত্যুত্তর বৈশাখের প্রবাসীতে উক্ত কানুনগো মহাশয় দিয়াছেন। এই শেষোক্ত প্রবন্ধের নামকরণ—'পদ্মিনীর অনৈতিহাসিকতা' হইতেই বুঝা যাইবে যে লেখক তাঁহার পূর্ব্ব মতেরই সমর্থন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান লেখকের বিশ্বাস, রায় বাহাদুর গৌরীশঙ্কর ওঝা মহাশয়ের মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় হইলেও, তিনি এই সম্বন্ধীয় প্রামাণিক গ্রন্থ এবং শিলালেখ ইত্যাদির যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র সমীচীন নহে। পক্ষান্তরে, উক্ত প্রমাণাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে অধ্যাপক কানুনগো মহাশয়ের প্রধান প্রতিপাদ্য আদৌ গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। রায় বাহাদুর ওঝা এবং তৎপরে কানুনগো মহাশয় অনেক ক্ষেত্রে মূল প্রমাণাদির যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

মূল প্রমাণাদির কথা বলিতেই প্রশ্ন উঠে—আলোচ্য বিষয়ে উক্ত প্রমাণাদি কি? মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে দুইজন সমসাময়িক লেখক আলাউদ্দিন খিলজীর চিতোড় অভিযানের (যাহার সহিত পদ্মিনী-কাহিনী সংশ্লিষ্ট) উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দু-দিক্ হইতে সমসাময়িক কোনও প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তদভাবে ১৪৬০ খৃষ্টাব্দের কুম্ভলগড় প্রশস্তিই সর্ব্ব প্রথম হিন্দু প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সমসাময়িক বলিয়া মুসলমান ইতিহাস-কারদ্বয়ের বিবরণই প্রথম আলোচনা করা উচিত। উক্ত লেখকদ্বয়ের নাম আমীর খসরু এবং জীয়াউদ্দীন বারণী। বারণী উল্লিখিত ঘটনার পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক পরে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তারিখ-ই-ফিরোজশাহী রচনা করেন। তিনি আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক চিতোড় অধিকারের উল্লেখ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু, ইহাতে পদ্মিনীর নাম তো পাওয়াই যায় না, এমন কি পদ্মিনীসংক্রান্ত ব্যাপারের ইঙ্গিতও ইহাতে নাই। কিন্তু, কেবলমাত্র ইহা হইতেই পদ্মিনীর অনৈতি-হাসিকতা সপ্রমাণ হয় না। **Argumentum ex silentio** কে কোনও ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতই নিঃসন্দেহ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন না।

জীয়াউদ্দীন বারণীর গ্রন্থে উল্লেখ না থাকিলেও অন্যতম সমসাময়িক এবং জীয়াউদ্দীন অপেক্ষাও অধিকতর প্রামাণিক গ্রন্থে পদ্মিনীর ঐতিহাসিকতার সমর্থনসূচক বর্ণনা রহিয়াছে। এই গ্রন্থ—আমীর খসরু বিরচিত তারিখ-ই-আলাই। চিতোড়জয়ের ৭।৮ বৎসর পরে এবং অনধিক ২০ বৎসরের মধ্যেই ইহা লিখিত হইয়াছিল এবং গ্রন্থকার নিজে এই অভিযানে আলাউদ্দীনের সহিত চিতোড় গিয়াছিলেন। পণ্ডিত ওঝা অথবা কানুনগো মহাশয়ের লেখা পড়িলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উঁহারা Elliotএর *History of India* পুস্তকে উক্ত তারিখ-ই-আলাইয়ের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহাই দেখিয়াছেন—মূল গ্রন্থে কি আছে তাহা দেখেন নাই। মূল পারসী গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ *Journal of Indian History*তে প্রকাশিত হইয়াছে। (১) উক্ত

(১) Journal of Indian History—December 1929, pp. 369-372.

*Journal*এর পূর্ণ চারি পৃষ্ঠা ব্যাপী (ফুটনোট লইয়া) চিতোড়-অভিযানের বিবরণ ; অথচ, Elliot উহা প্রায় অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় সারিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে, মূল গ্রন্থ এবং (১) Elliot প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় মিলাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে যে, Elliot কেবল সারাংশমাত্র দিয়াছেন এবং তাহাও অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ।

মূল তারিখ-ই-আলাই গ্রন্থে চিতোড়-অভিযান সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই :—

সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী হিজরী ৭০২ সনের ৮ই জমাদিওস্‌সানি (১৩০৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী) দিল্লী হইতে সসৈন্য যাত্রা করিয়া চিতোড় দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। সুলতান প্রথম মনে করিলেন দুর্গটী সরাসরি আক্রমণ করিয়াই অধিকার করিয়া লইবেন—অবরোধের প্রয়োজন হইবে না। তদনুসারে প্রথম দুই মাস কাল মুসলমান সৈন্য পুনঃ পুনঃ অসিহস্তে নানা দিক হইতে দুর্গটি আক্রমণ করিল, কিন্তু, দুর্গস্থ রাজপুতগণের চেষ্টায় তাহাদের সমস্ত আক্রমণই ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন সুলতান দুর্গটি রীতিমত অবরোধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সেই উদ্দেশ্যে দুর্গের চারিদিকে কতকগুলি মঞ্চ নির্ম্মিত হইল এবং ইহার উপর হইতে আক্রমণ চলিতে লাগিল। এই অভিনব আক্রমণ-প্রণালী দেখিয়া চিতোড়-অধিপতি রায়ের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি অবিলম্বে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া সম্রাটের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। এই প্রকারে আত্ম-সমর্পণ করিবার পর যুদ্ধ স্থগিত হইল এবং সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

আমীর খসরুর গ্রন্থে প্রস্তাবিত সন্ধির সর্ত্তগুলির কোনও পরিষ্কার বিবরণ পাওয়া যায় না ; কিন্তু তাহার বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয় সন্ধির চেষ্টা বিফল হইল এবং মুসলমান সৈন্যগণ পুনর্ব্বার আক্রমণ করিতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"সলোমনের সৈন্য দুর্গটীকে আক্রমণ করিল—যে দুর্গ উহাদিগকে সেবার কথা স্মরণ করাইয়া দিল"।

এস্থলে বলা দরকার, আমীর খসরুর পুস্তকের সর্ব্বত্র উপমার বাহুল্য। কোনও কিছু বুঝাইতে হইলেই, তিনি উপমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই বুঝিতে হইবে, উদ্ধৃত বাক্যদ্বারা তিনি, চিতোড়াধিপতির আত্মসমর্পণের পরেও আলাউদ্দিনের সৈন্যকর্ত্তৃক চিতোর আক্রমণের সলো-মনের সেবা-আক্রমণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন উঠিতেছে মুসলমান-ইতিহাসে শতসহস্র বিজয়কাহিনীর উল্লেখ থাকিলেও সলোমনের সেবা-আক্রমণের সহিতই আলাউদ্দীনের চিতোড় আক্রমণের উপমা আমীর খসরু কেন দিয়াছেন ? এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পারসীক সাহিত্যে আমীর খসরুর স্থান অতি উচ্চে এবং তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত লেখক অতি বিরল। ইঁহার মত বিদ্বান্ ও যশস্বী লেখক, যে দুইটী ঘটনার পরস্পরের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে উপমার বিষয়-বস্তু কিছু না থাকিলে উভয়ের তুলনা করিবেন—ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য। কাজেই বুঝিতে হইবে উভয় ঘটনার মধ্যে নিশ্চয়ই মূলগত কোনও সাদৃশ্য ছিল। সেই সাদৃশ্য কোথায় জানিতে হইলে সলোমনের সেবা-আক্রমণ সম্বন্ধে প্রচলিত উপকথার আলোচনা আবশ্যক। প্রবাদ এই যে, সলোমন এক সময় তাঁহার সমস্ত সৈন্য-সামন্ত লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন এবং কোনও মরুপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সেবা-নামক একটী রাজ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। ঐ রাজ্যের অধীশ্বরী বল্কীস্-নাম্নী একজন সূর্য্যোপাসনাপরায়ণা সুন্দরী রমণী। এই সংবাদ পাইবা মাত্র সলোমন উক্ত রমণীকে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণ না করিয়া নানাপ্রকার উপঢৌকন পাঠাইয়া সলোমনকে সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইলেন। সলোমন উহাতে প্রীত না হইয়া সেবা আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। (২)

উপরিলিখিত কাহিনী হইতে দেখা যাইতেছে সেবা উপাখ্যানের মূল বিষয়-বস্তু এই যে উক্ত রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন একজন সুন্দরী রমণী ; তিনি সলোমনের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না বলিয়াই সলোমন সেবা অধিকার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সেবা অভি-যানের সহিত অপর অভিযানের উপমা কেবল মাত্র উক্ত বিষয়েই চলিতে পারে। অর্থাৎ, সেবার যেমন বল্কীস ছিলেন এবং তাঁহার আত্মসমর্পণ না করিবার জন্যই যেমন সলোমন

(১) Elliot—History of India, Vol. III, pp. 76-77.

(২) Hughes—Dictionary of Islam. pp. 602-3.

উক্ত স্থান অধিকার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, সেইরূপ, চিতোড়েও সুন্দরী পদ্মিনী রাণী ছিলেন এবং তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন না বলিয়াই আলাউদ্দীন চিতোড় জয় করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন—সেবার সহিত চিতোড়ের উপমাদ্বারা আমীর খসরু ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। (১) এতদ্ভিন্ন অন্যকোনও প্রকারেই সেবার সহিত চিতোড় অবরোধের তুলনা চলিতে পারে না। এই সম্পর্কে Elliot তারিখ-ই সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও প্রণিধান যোগ্য—"পুস্তকের রচনাকৌশল—সর্ব্বত্রই তুলনামূলক বলিয়া—বেশীর ভাগই দুর্ব্বোধ্য। তাহা হইলেও আনন্দের বিষয় এই যে ইহা হইতে অতি মূল্যবান সংবাদ আহরণ করা যায়।" (২)

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে পদ্মিনীর নাম আমীর খসরু প্রকাশ্যতঃ উল্লেখ করিলেন না কেন? ইহার মুখ্য কারণ—উক্ত গ্রন্থের রচনাভঙ্গী। প্রকাশ্যতঃ কিছু না বলিয়া ইঙ্গিত উপমা দ্বারা বিষয়-বস্তুটী বুঝাইয়া দিবার চেষ্টাই ইহার বিশেষত্ব। ইহাও দ্রষ্টব্য যে, আমীর খসরু চিতোড়-অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলেও তাঁহার গ্রন্থের কোথাও তাৎকালিক চিতোড়াধিপতি রত্নসিংহের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু ইহা হইতেই কি এই অভিমত প্রকাশ করিতে হইবে যে ঐ সময়ে রত্নসিংহ চিতোড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন না? সেই প্রকার, পদ্মিনীর নাম প্রকাশ্য ভাবে নাই বলিয়াই যে তাঁহার অস্তিত্বই ছিল না এবম্বিধ যুক্তির অবতারণা অত্যন্ত অনুচিত হইবে। বস্তুতঃ, প্রকাশ্যতঃ নামোল্লেখের কথা ছাড়িয়া দিলে, উপরিলিখিত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে, যে, পদ্মিনীর অস্তিত্বের বিষয় আমীর খসরু স্বীকার করিয়াই লইয়াছেন।

কেবল তারিখ-ই-আলাই গ্রন্থেই যে পদ্মিনীর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, হিন্দু-দিক্ হইতে আলাউদ্দীন খিলজীর চিতোড়-অভিযানের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাই মহারাণা কুম্ভকর্ণের সময়ে রচিত ১৪৬০ খৃষ্টাব্দের প্রশস্তিতে উক্ত প্রশস্তির ১৭৭ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত আছে—

"তিনি [রত্নসিংহ] চলিয়া গেলে, খুমান বংশীয় লক্ষ্ম[ণ] সিংহ [সেই] দুর্গশ্রেষ্ঠকে [চিতোড়] রক্ষা করিয়াছিলেন। [কেননা], কুলগৌরব, কাপুরুষগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে[ও], ধীর পুরুষগণ ত্যাগ করেন না"। এ স্থলে প্রশস্তিকার রত্নসিংহ-সম্বন্ধে 'কাপুরুষ' কুলগৌরব (লক্ষ্মী)ত্যাগী ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে বোধ হইতে পারে যে, শত্রুর নিকট রত্নসিংহের আত্মসমর্পণ রাজপুতগণের দৃষ্টিতে ভীরুতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, এবং সেই কারণেই উঁহার সম্বন্ধে এই অপভাষার প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু, রাজপুত চরিত্রের সহিত যাঁহাদের বিন্দুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন, বীরত্ব এবং বংশ-মর্য্যাদা-অভিমানী রাজপুতগণ 'কাপুরুষ' ও 'কুলগৌরব-ত্যাগী' অপেক্ষা ঘৃণ্যতর অপবাদ কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। এই সমস্ত বিষয় ভাবিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, কেবলমাত্র প্রবলতর শত্রুর সহিত যুদ্ধ-আরম্ভ বিবেচনায় আত্মসমর্পণ করিবার জন্যই রত্নসিংহ উক্ত প্রকার নিন্দাভাজন হয়েন নাই। বাস্তবিক পক্ষে, তিনি আরও এমন কিছু কার্য্য করিয়াছিলেন যাহাতে চিরদিনের জন্য নিজ বংশীয় উত্তরাধিকারিগণের দৃষ্টিতেও তিনি অতি হীন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। এখন কথা হইতেছে, রত্নসিংহকৃত কোনও এমন হীন কার্য্যের পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় কি?

ইহার প্রকৃষ্ট উত্তর ফিরিশ্‌তাহ তাঁহার গ্রন্থে বিশদ ভাবেই দিয়াছেন। তিনি বলেন—রত্নসিংহের আত্মসমর্পণ করিবার কিছুদিন পরে সুলতান অবগত হইলেন যে উক্ত রাজার স্ত্রীদের মধ্যে এক সুন্দরী মহিলা আছেন। সম্রাট রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে উঁহাকে সমর্পণ করিলেই তিনি মুক্তি-

(১) ইহা হইতে কেহ যেন অনুমান না করেন, পদ্মিনীকে হস্তগত করাই আলাউদ্দিনের চিতোড়-অভিযানের মূল কারণ। বাস্তবিক পক্ষে, দিগ্বিজয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কারণপ্রণোদিত হইয়াই সুলতান চিতোড়ের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন। কতকদিন উক্ত স্থান অবরোধ করিবার পর যখন রত্নসিংহ আত্মসমর্পণ করেন এবং সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে, তখন আলাউদ্দীন পদ্মিনীকে সমর্পণের প্রস্তাব সন্ধির অন্যতম সর্ত্তস্বরূপ, উপস্থিত করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে পদ্মিনীর ঘটনা মূল বিষয়ের একটী গৌণ ঘটনা মাত্র। পরবর্ত্তী লেখকদের হস্তে ইহাই সর্ব্বপ্রধান স্থান লাভ করিয়া অভিযানের মুখ্য কারণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। Indian Historical Quarterly. 1931, pp. 287 ff.

(২) Elliot's History of India, Vol. III, pp. 67-68.

লাভ করিবেন। রাজা সম্মত হইলেন এবং এই মর্ম্মে দুর্গ-মধ্যে সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু দুর্গস্থ রাজার আত্মীয়গণ ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তীব্র ভাষায় নিন্দা করিবার পর উহার নিকট বিষমিশ্রিত খাদ্য পাঠাইবার যুক্তি স্থির করিলেন। ভাবিলেন, পরলোকে গমন করিলে পর আর রাজাকে চির কলঙ্কের ভাগী হইতে হইবে না। (১)

কুম্ভলগড় প্রশস্তির সহিত ফিরিশ্‌তাহের উপরি উদ্ধৃত বিবরণ মিলাইয়া দেখা যাইতেছে যে প্রশস্তির মতের পরি-পোষকতা ফিরিশ্‌তাহ্ অতি সুন্দর ভাবে এবং যুক্তির সহিত করিতেছেন। প্রশস্তিকার যাহা প্রচ্ছন্ন ভাবে বলিতেছেন, ফিরিশ্‌তাহ তাহাই পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। কোনও সুপ্রসিদ্ধ ঘটনার সবিস্তার বিবরণ সমসাময়িক লোকের অথবা যাঁহারা ইহার সহিত সুপরিচিত, তাঁহাদের নিকট উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু যখন কালক্রমে উক্ত বিষয়ের জ্ঞান স্বল্প হইতে স্বল্পতর হইয়া আসে, তখনই অনুসন্ধিৎসু লোক উহার সবিশেষ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন।

চিতোড়-অভিযান সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রমাণাদি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কেবলমাত্র জীয়াউদ্দিন বারণীর গ্রন্থ ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী গ্রন্থে এবং শিলা-লিপিতে পদ্মিনীর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। আর বারণীও তাঁহার গ্রন্থে এমন কিছুই বলেন নাই যাহাতে পদ্মিনীর অস্তিত্ব কল্পনা করিলে ইতিহাসের দিক্ হইতে কোনও অসঙ্গতি দোষ আসিতে পারে।

পদ্মিনী প্রসঙ্গে আর একটী বিষয়েব অবতারণা করা প্রয়োজন। পণ্ডিত ওঝা তাঁহার পুস্তকে পদ্মিনী পরিচয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—চিতোড়ের রাজা রত্নসেনের পক্ষে সিংহল দ্বীপের গন্ধর্ব্বসেনের কন্যা পদ্মিনীকে বিবাহ করার কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য—কেননা উক্ত সময়ে সিংহলে গন্ধর্ব্বসেন নামে কোনও রাজাই ছিলেন না। অধিকন্তু, শিলা লেখাদিতে পাওয়া যায় রত্নসিংহ এক বৎসর কালও রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। এই অবস্থায় উঁহার পক্ষে সিংহল দ্বীপে যাইয়া উক্ত রাজ্যের রাজকুমারীকে বিবাহ করা কি প্রকারেই বা সম্ভব হইতে পারে? কানুনগো মহাশয় অবশ্য এই যুক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে, সিংহল দ্বীপের সহিত পদ্মিনীর সম্পর্কের কথা কেমন করিয়া আসিল বলা সুকঠিন। কিন্তু পদ্মিনী-পরিচয় সম্বন্ধে আর একটী প্রবাদের (?) উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পুস্তকালয়ে 'উদয়পুর রাজ-বংশাবলী' নামে একখানা হস্তলিখিত পুঁথি আছে। ইহা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মজঃফরপুর জিলা হইতে সংগৃহীত হয়। প্রাচীনকাল হইতে মহারাণা জবানসিংহের (১৮২৮-৩৮) সময় পর্য্যন্ত সমস্ত মেবাড়ের রাজাদের নাম এবং স্থানে স্থানে অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। এই পুঁথির ১১শ পত্রে রত্নসিংহ সম্বন্ধে লেখা আছে—"সমলদীপ পাটণ-সহরমে চোহাণ রাজসংঘ রাজ করতো হো জঠ জাইনে রাজরী বেটী পদমণী নেঁ পরনী" ইত্যাদি। ইহাতে আমরা পদ্মিনীর পরিচয় এই পাই যে, পাটনের (অনহিলবাড়া পাটন) অন্তর্গত সমলদীপে চৌহাণ বংশীয় রাজসিংহ নামক এক রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহারই কন্যা পদ্মিনী। রত্নসিংহ উক্ত স্থানে যাইয়া এই পদ্মিনীকেই বিবাহ করেন। সমলদীপ অর্থে কোন স্থান বুঝায়, সে সম্বন্ধে আলোচনার বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োজন নাই, ইহা মনে রাখিলেই হইবে যে ঐ সমলদীপ পাটন বা গুজরাত রাজ্যের অন্তর্গত এবং উহার অধিপতি রাজসিংহ চৌহান বংশীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই 'সমল-দীপ'এর সহিত সুদূর সিংহলের কোনও সম্পর্ক নাই। 'উদয়পুর রাজ বংশাবলী'তে প্রদত্ত এই পরিচয়টী সত্য হইলে সমস্ত দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইহাই পদ্মাবতে লিখিত পদ্মিনীর পরিচয় অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বসনীয় বলিয়া মনে হয়—সিংহল দ্বীপে রত্নসিংহের সময়ে গন্ধর্ব্বসেন নামক কোনও

(১) Tarikh-i-Firishtah, translated in J. I. H. 1929, p. 372 f. n কাহারও কাহারও মতে ফিরিশ্‌তাহের গ্রন্থ আদৌ প্রামাণিক নহে। ইঁহাদিগকে তারিখ-ই-আলাই গ্রন্থে লিখিত চিতোড় জয়ের বিবরণের সহিত ফিরিশ্‌তাহের লিখিত বিবরণ মিলাইয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। করিলে দেখিবেন যে, অন্য বিষয়ে যাহাই হউক না কেন আলোচ্য বিষয়ে ফিরিশ্‌তাহ আমীর খসরুর অনুসরণ করিয়াছেন। Indian Historical Quarterly, 1931, p. 300.

রাজা রাজত্ব করিতেন কিনা এবং রত্নসিংহের পক্ষে উক্ত স্থানে যাইয়া পদ্মিনীকে বিবাহ করা সম্ভবপর ছিল কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন নিতান্ত অবান্তর হইয়া পড়ে।

পরিশেষে বক্তব্য এই, অধুনা প্রচলিত পদ্মিনী কাহিনীর কতটুকু সত্য এবং কতটুকু মিথ্যা সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। পদ্মিনীকে সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার যে প্রচেষ্টা সম্প্রতি প্রবাসীর পৃষ্ঠায় চলিতেছে তাহা সফল হয় নাই, বরং প্রামাণিক গ্রন্থে এবং শিলালেখাদিপাঠে পদ্মিনীর ঐতিহাসিকতাই সাব্যস্ত হয়, ইহাই প্রবন্ধকারের অভিমত। (১)

ভূমিকা

(রিচার্ড অ্যালডিংটন হইতে)

—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

সাধ হয় আরো বেশী ভালোবাসিবার !
যে চিরসুন্দরে আমি এতদিন বাসিয়াছি ভালো,
তা'রে ভুলে যেতে পারি,
তোমার গভীর প্রেম যদি আমি পারি চিনে নিতে।

হায়, হেথা প্রেমিকের কত ক্ষুদ্র দানের পরিধি,—
কিন্তু আমি দিতে পারি মোর দেহ, যত শক্তি মোর,
আর আমি দিতে পারি জীবনের তুচ্ছ দিনগুলি
আর দিতে পারি ভাষা—অনুরাগ-বেদন-আতুর,
যে ভাষা গুঞ্জরে নর-নারীদের কপোল-ছায়ায়
সৃষ্টির প্রথম দিন হ'তে !

আমি যে ভাবিতে চাই একটি সে দান,—
কেহ যা'রে পায় নাই সারা ধরণীতে :

আমি ভাবি : যদি ঐ শান্ত স্থির দেবতার দল,
সহিত' প্রেমের তাপ আমার মতন,
তারা কি তোমারে দিতে পারে নাক' একটি তারকা?
—যে তারা তোমার দেহে জ্বালি' দিবে যৌবন-অনল
চিরস্থায়ী !
আমি যা' পারি না দিতে, তা'রা কি তা' দিতে
পারিত না ?

দেবতারে কেন তুমি ভালোবাস' নাই ?
আমি ধূলিকণা—
তবু জানি, এত ভালোবাসে নাই কখনও দেবতা,
যত ভালোবাসে তোমা' এই দীন ব্যর্থ ধূলিকণা !

(১) আলাউদ্দীন খিলজী কর্ত্তৃক চিতোড়-অভিযানের সবিশেষ বিবরণ ১৯৩১ সালের Indian Historical Quarterlyতে The first Saka of Citod নামক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রড-

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন

৩

শব্দ-সঞ্চালন বলিতে গেলে প্রথমেই উঠে মধ্যস্থ বা অবলম্বনের কথা। শব্দ-সঞ্চালন দ্বারা আমি বলিতে চাই প্রেরণ-স্থান হইতে যে সঙ্গীত, বক্তৃতা ইত্যাদি ব্রড্‌কাষ্ট করা হয় তাহার-ই কথা। সকলেই জানেন যে এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাইতে হইলে শব্দের কোন রকম একটা অবলম্বন প্রয়োজন হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাহক তরঙ্গ বা ইলেকট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক্ ওয়েভ প্রেরক-যন্ত্রসংযুক্ত এরিয়েল পরিত্যাগ করিয়া দিকে দিকে গ্রহণ-স্থান সমূহে যাইয়া পৌছে এবং সেখানে পরিশোধনের পরে মূল শব্দের পুনরাবৃত্তি হয়। সকলের-ই জানা আছে যে কোন গাছ বা অন্য কিছুর সহিত বাতাস গতির মুখে বাধা পাইলে সাধারণতঃ ফিরিয়া যায়। অথচ কত গাছ-গাছড়া, বন-জঙ্গল অতিক্রম করিয়া দূরে বসিয়াও তো লোক রেডিও সঙ্গীত হইতে বঞ্চিত হয় না। কাজেই সাধারণের পক্ষে ব্যাপারটা একটু জটিল বটে; কেন না দেখা যাইতেছে বাতাস অবলম্বনে শব্দ-প্রেরণ সম্ভবপর নহে।

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে একখণ্ড কাঠের ভিতরটাতে বোলতার চাক বা মৌচাকের মত অতি সূক্ষ্ম প্রকোষ্ঠ আছে। জগতের সূক্ষ্মতম দ্রব্যও দেখিতে পাওয়া যায় এমন অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিতে পারিলে লৌহ প্রভৃতি ধাতব পদার্থ এবং প্রস্তর ইত্যাদিতেও মৌচাকের বা কাপড়ের মত ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যাইত। অবশ্য এমন অনুবীক্ষণ যন্ত্র এখনও পর্য্যন্ত মানুষ নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই; তবে সকল পদার্থের মধ্যে-ই ঐরূপ ছিদ্রের কল্পনা মানুষ সহজেই করিতে পারিয়াছে; কেন না আমরা জানি জগতের যে কোন পদার্থ-ই কতকগুলি ক্ষুদ্র অণুর সমষ্টি মাত্র এবং এই সকল অণুর প্রতিটির মধ্যেই অবকাশ (intermolecular space) রহিয়াছে।

এই সকল ক্ষুদ্রতম ছিদ্রপথে কিন্তু বায়ু কখনও প্রবেশ করিতে পারে না। কাজেই এমন একটি পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন, যাহা এই সকল ছিদ্রপথে অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে; সেই পদার্থটি ইথার। ইথার অপ্রতিহত গতিতে সমস্ত সৌর-জগতময় বিচরণ করিয়া থাকে। এই ইথার-ই আমাদের শব্দ-তরঙ্গের চলন-অবলম্বন।

প্রেরণ-স্থানের এরিয়েল হইতে উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ ইথার অবলম্বনে দুইটি পথে সঞ্চারিত হয়। পৃথিবীর কিছু উপর দিয়া সঞ্চরণকারী ইথার একটি পথ এবং অপর পথ হইল শূন্যের দিকে উর্দ্ধে। ভূমিসংলগ্ন পথের তরঙ্গকে ভূমিবদ্ধ (১) বা ডিরেক্ট্ ওয়েভ্ কহে এবং এই তরঙ্গই ব্রড্‌কাষ্টের পক্ষে কার্য্যকরী। শূন্য পথে সঞ্চারিত তরঙ্গকে ইন্‌ডিরেক্ট্ ওয়েভ্ বলে।

এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য এই যে ডিরেক্ট্ ওয়েভ্ সাধারণ ভাবে মাত্র দুই শত মাইল দূর পর্য্যন্ত শব্দ বহন করিতে পারে। ইন্‌ডিরেক্ট্ ওয়েভ্ বহু দূর পর্য্যন্ত শব্দ বহন করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা এত ক্ষীণ এবং অবস্থাবিশেষে এমন অস্পষ্ট হইয়া পড়ে যে কেবল সাঙ্কেতিক শব্দ-ই মাত্র তৎসাহায্যে বুঝিতে পারা যায়, কথাবার্ত্তা বেশীর ভাগই অস্পষ্ট, জড়িত ও বিকৃত হইয়া পড়ে। কাজেই গৌণ তরঙ্গ (২) লইয়া আলোচনায় বৃথা সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই। ব্রড্‌কাষ্টিং-এর পক্ষে মুখ্য তরঙ্গ-ই (৩) প্রয়োজনীয় এবং লোকে সাধারণতঃ স্থানীয় সঙ্গীত ইত্যাদি শুনিতেই ইচ্ছুক; আমাদের দেশের ব্রড্-কাষ্টিং-এ মুখ্য তরঙ্গ-পথে-ই শব্দ প্রেরিত হয়।

ইথারের সাহায্যে তো ধ্বনি চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া দেওয়া হইল; সেও তরঙ্গে তরঙ্গে নানা দিকে প্রসারিত হইয়া পড়িল। কিন্তু সে শব্দ তো তরঙ্গমালা হইতে আপনি উত্থিত হইয়া সকলের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইবে না। কাজেই কি করিয়া ইথারের মধ্য হইতে সে' শব্দ-তরঙ্গ কুড়াইয়া লওয়া যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা এখন প্রয়োজন। বায়ুমণ্ডলের ইথার হইতে ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্‌নেটিক্ ওয়েভ্ বা বাহক তরঙ্গগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য গ্রহণ-স্থানেও এরিয়েল ব্যবহৃত হয়। যে এরিয়েল প্রেরণ-স্থান হইতে তরঙ্গকে যাত্রাপথে বিদায় দিল,

(১) earth bound, (২) indirect wave, (৩) direct wave.

ঠিক সেই এরিয়েল-ই আবার ইথার হইতে সে' তরঙ্গকে সযত্নে সংগ্রহ করিয়া লইবে। তা'রপরে অবশ্য আরও নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে প্রেরণ-স্থানের এরিয়েল হইতে রওনা হওয়ার আগে বহু পরিবর্ত্তন-আবর্ত্তনের পরে তরঙ্গকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আর যে তরঙ্গ ইথার-পথে বিচ্ছুরিত হয় সে তরঙ্গগুলি সোজাসুজি শব্দ-তরঙ্গ নহে, উহারা শব্দ-তরঙ্গের রূপান্তরিত অবস্থা—বৈদ্যুতিক তরঙ্গ। অতএব সহজেই অনুমান করা যায় যে, গ্রহণ-স্থানের এরিয়েল কর্ত্তৃক সংগৃহীত বৈদ্যুতিক তরঙ্গও পরিশোধন ও পরিবর্ত্তনের পরে-ই মাত্র মূল শব্দের প্রতিধ্বনিরূপে শুনিতে পাওয়া যাইবে। এখন সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব।

এরিয়েল সংস্থাপন করিবার সময় প্রধানতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উহা যত উচ্চ হইবে ততই শ্রোতার পক্ষে শব্দ বা সঙ্গীত সুস্পষ্ট শুনিবার সুযোগ ঘটিবে। সাধারণ ভাবে দেখা যায় যে, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ ফুট উচ্চ এরিয়েল হইতে কুড়ি-পচিশ ফুট উচ্চ এরিয়েল অপেক্ষা প্রায় চার গুণ উচ্চ ধ্বনি উত্থিত হয়।

যে তরঙ্গ এরিয়েলে সংগৃহীত হইল তাহাকে কি উপায়ে আহরণ করিতে পারা যায় সেই সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

যে দুটি খুঁটির মাথায় এরিয়েলের তার বাধা হয়, সেই স্থান দুইটিতে তিন চারিটি ইন্সুলেটর* ব্যবহার করা প্রয়োজন। এই এরিয়েল্ হইতে লাউড্-স্পীকার পর্য্যন্ত তার সংযোগ করিবার সময়ও লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন, যেন সে তার অত্যধিক লম্বা না হয় বা ঘরের দেয়ালের কোন স্থানে লাগিয়া না যায়। তাহা হইলে সেই সামান্য বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-প্রবাহ বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে এবং শব্দও তাহাতে বিকৃত ও ক্ষীণ হইবার সম্ভাবনা।

আমরা আগেই দেখিয়াছি যে, প্রেরণ-স্থান হইতে নানা দিকে তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়; সে তরঙ্গের আকৃতির সহিতও পাঠক পরিচিত। এই তরঙ্গসংঘাতে গ্রহণ-স্থানের এরিয়েলে অনুরূপ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-প্রবাহ উত্থিত হয়। কিন্তু অন্যান্য নানা কারণেও (যেমন, বজ্রপাত ইত্যাদি) এরিয়েলে তাড়িত-প্রবাহ সমুৎপন্ন হইতে পারে; এবং ঐগুলি উৎপাদক তাড়িতের শক্তি অনুসারে প্রবল ও ক্ষীণ হয়। কাজেই এখন সমস্যা এই যে, যে-প্রবাহটুকু মাত্র আমাদের প্রয়োজন তাহা বাছিয়া লইব কি উপায়ে?

বিভিন্ন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন। প্রেরণ-স্থান হইতে নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সম্পন্ন তরঙ্গ প্রেরণ করা হয়। এখন গ্রহণ-স্থানের যন্ত্রটিকে যদি এমন ভাবে প্রস্তুত রাখা যায় যে কেবল ঐ নির্দ্দিষ্ট দীর্ঘ তরঙ্গই মাত্র সংগৃহীত হইবে, তাহা হইলেই সকল সমস্যা মিটিয়া গেল, এবং যথার্থ পক্ষে করাও হয় তাহাই। কি উপায়ে করা হয় তৎ-সম্বন্ধে আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে।

তবে এইটুকু জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে বিভিন্ন প্রেরণ-স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দৈর্ঘের তরঙ্গ প্রেরিত হয়। কাজেই যে প্রেরণ-স্থানের সঙ্গীত শুনিবার ইচ্ছা তাহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (১) অনুসারে গ্রহণ-স্থানের যন্ত্রের সুর-সঙ্গত (২) করিয়া লইতে হইবে।

এরিয়েলের সহিত শুনিবার যন্ত্রের সংযোগ হওয়া মাত্র এরিয়েল্ হইতে ভূমি পর্য্যন্ত একটা ক্ষীণ তাড়িত-প্রবাহ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গমনাগমন করিতে থাকে। এই প্রবাহকেই পরিবর্ত্তিত করিয়া আমাদের শ্রবণোপযোগী করিয়া লইতে হয়। অতএব পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন।

উক্ত পরিবর্ত্তনকে পরিশোধন (৩) বলিব। এই পরিবর্ত্তন দুই উপায়ে করা হয়—ক্রিষ্টালের সাহায্যে অথবা থার্মো আয়োনিক্ ভাল্‌ভের সহায়তায়।

ক্রিষ্টাল নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, স্ফটিক (crystal) পদার্থ* এই যন্ত্রের একটি বিশেষ অঙ্গ। এই স্থানে ক্রিষ্টাল গ্রাহক যন্ত্রের একটি মোটামুটি চিত্র দেওয়া গেল ; ইহার সাহায্যে আলোচ্য বিষয় সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

* যে পদার্থ তাড়িতের প্রবাহ আটকাইয়া রাখে তাহাকে ইন্সুলেটর (Insulator) কহে; যেমন, কাঠ, রবার, ইবোনাইট্ ইত্যাদি।

(১) wavelengh, (২) tune, (৩) rectification.

* গেলেনা, করবোরেন্‌ডাম্ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ ইত্যাদি ইহাতে ব্যবহৃত হয়।

এরিয়েল্ হইতে তাড়িত-প্রবাহ 'য' চিহ্নিত স্থানে আসিয়া পৌছিলে উহা দুই পথে বিভক্ত হইয়া দুইটি ধারায় চলিতে থাকে। একটি ধারা ক্রিষ্টাল্ এবং ফোন বা ধ্বনিপরিবর্দ্ধক যন্ত্র হইয়া ভূমিতে চলিয়া যায়; আর অপরটি চিত্রে প্রদর্শিত পথে ভূমিতে প্রবেশ করে
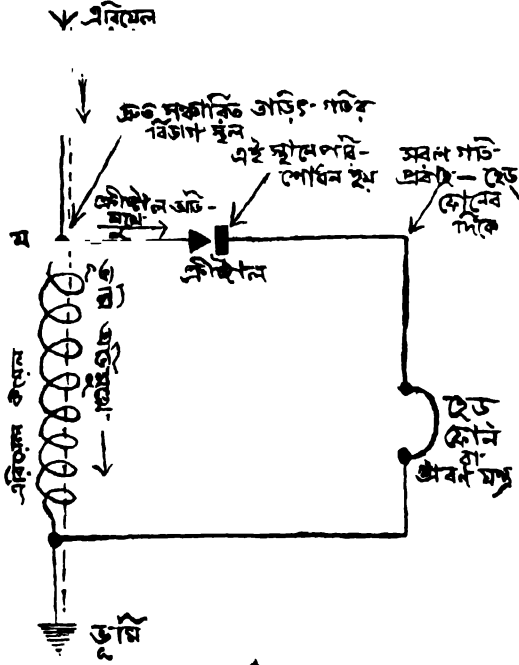
২নং চিত্র

ঐ ধ্বনি-পরিবর্দ্ধক যন্ত্র এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, এক ধাবায় সরল প্রবাহসম্পন্ন তাড়িত (১) ছাড়া উহা কার্য্যকরী হয় না। কাজেই মূল তরঙ্গ-প্রবাহের এইটুকু পরিবর্ত্তন অবশ্য প্রয়োজন; এই পরিবর্ত্তনই পূর্ব্বোক্ত ক্রিষ্টাল দ্বারা সাধিত হয়।

এখন ইচ্ছানুরূপ স্পষ্ট সঙ্গীত শুনিতে হইলে সংযোগ-স্থলগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, যেন ঐগুলি খুব ভাল ভাবে সংযুক্ত হয়। আরও দেখা দরকার যেন ক্রিষ্টালটিতে ধূলাবালি পড়িয়া কার্য্যের অনুপোযোগী করিয়া না ফেলে। ধূলাবালি হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ক্রিষ্টাল যন্ত্রটিকে একটি কাচের আবরণে ঢাকিয়া রাখা বাঞ্ছনীয়।

তা'ছাড়া অনেক সময়ে নিয়ত ব্যবহারের ফলে ক্রিষ্টালটি কার্য্য-ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। তখন উহার বহির্ভাগ একটু চাঁচিয়া ফেলিলে উহার কর্ম্মশক্তি পুনরুদ্দীপিত হয়। সামান্য পরিমাণ এ্যাল্‌কহল্ বা মদে ডুবাইয়া রাখিলেও উহার কর্ম্ম-শক্তি ফিরিয়া পাওয়া যাইতে পারে। ক্রিষ্টাল্‌টি নাড়া-চাড়া করিতেও সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক যেন হাতের তৈলাক্ত পদার্থ বা কোন রকম ময়লা উহার গায়ে না লাগিয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন, এরিয়েলের ক্ষীণ প্রবাহ হইতে সু-উচ্চ ধ্বনি কি উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে? এতদুদ্দেশ্যে স্ক্রিন্‌ড্ গ্রিড্ এ্যাম্‌প্লিফায়ার খুব কার্য্যকরী। অবশ্য এই যন্ত্রটি ক্রিষ্টালের সহিত ব্যবহারে যতটা কার্য্যকরী হয় থার্মো-আয়নিক ভাল্‌ভের যোগে তাহা অপেক্ষা অধিকতর সুফল দান করিয়া থাকে। অতএব থার্মো-আয়নিক ভাল্‌ভ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব।

থার্মো-আয়নিক ভাল্‌ভের বৈজ্ঞানিক দিকটা একটু বলিলেই গ্রহণ-যন্ত্রে ইহার প্রয়োগের উপযোগিতা সহজে উপলব্ধ হইবে।

কোন ফিলামেণ্টকে * একটি ধাতব আবরণ দিয়া সেই ফিলামেণ্টের ভিতর তাড়িত সঞ্চালন করিলে দেখা যায় যে, কোনও কৃত্রিম অবলম্বন ব্যতীতও ফিলামেণ্ট হইতে ধাতব আবরণ পর্য্যন্ত একটি তাড়িত প্রবাহ চলিতে থাকে। এই প্রবাহ কেবল একাভিমুখে সঞ্চালিত হয়। অতএব সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে একাভিমুখে গতি নির্দ্দেশকারী ক্রিষ্টালের পরিবর্ত্তে ইহা (অর্থাৎ এই ভালভ্) ব্যবহার করা যাইতে পারে। ১৯০৪ খৃঃ লি-ডি ফরেষ্ট (Lede Forest) থার্মো-আয়নিক ভাল্‌ভের উন্নতি সাধন করিয়া ইহাকে খুবই কর্ম্মকুশল করিয়া তোলেন। ইহার জটিল নির্ম্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে: বিশেষতঃ এতৎ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও নহে। কেবল ব্রডকাষ্টিং সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু বলিবার জন্যই এই প্রবন্ধের সূচনা। সে উদ্দেশ্য সফল হইয়া থাকিলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

(১) current flowing in one direction

* অতি সূক্ষ্ম তারবিশেষ।

কিংকর্ত্তব্য

গোলটেবিল বৈঠক হইতে সদ্যপ্রত্যাগত, মুসলমান, অ-মুসলমান ও অতি-মুসলমান, এই ত্রিতাপে তাপিত মহাত্মার দেহ-মন তাঁহার আত্মার অজ্ঞাতসারেই যখন বিশ্রামের অবসর খুঁজিতেছিল, তখন মহামান্য ভারত গবর্ণমেণ্ট যে কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহার আব্-হাওয়া পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, সেজন্য ভাবী ভারত ইংরাজ-রাজের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিবে। এ ব্যবস্থায় বিলম্ব ঘটিলে মহাত্মাজীর দেহমুক্ত মহান্ আত্মাটি অবশিষ্ট থাকিত, আর সেই আত্মা ভাঙাইয়া ভারতের সংসারখরচ কত দিন চলিতে পারিত তাহা অনুমান করা অসম্ভব নহে। মহাত্মার পিছু পিছু যে সব শ্রান্ত নেতৃবৃন্দ অশ্রান্ত গতিতে কারানিবাস পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, তাঁহাদের আত্মীয়েরাও গবর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ আছেন বলিয়া মনে হয়। দীর্ঘ দিন বাহ্বাস্ফোটনের পর কংগ্রেস ও ভারত গবর্ণমেণ্ট পুনরায় যেদিন সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যত লোক স্বেচ্ছাকারাসুখ ভোগ করিতেছে, সেই রবাহূতের দল অর্দ্ধ লক্ষ বা পূর্ণ লক্ষের কাছাকাছি গিয়াছে কিনা সে বিতণ্ডায় আজ প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু এই অশ্রুতপূর্ব্ব শান্তিসমরে যাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কাল কাটাইতে লাগিল, তাহাদের মর্ম্মকথা আলোচনা করা যাইতে পারে।

কংগ্রেস বলিল—পিকেট্ কর; গবর্ণমেণ্ট বলিল—পিকেটার ধরাইয়া দাও। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের দল কিছুই করিতে পারিল না, কেবল ভিতরে ভিতরে ঘন ঘন দুঃখিত ও লজ্জিত হইতে লাগিল। খদ্দর পরে, অথচ পিকেট্ করিতে পারে না; রায় বাহাদুরী করে, অথচ পিকেটার ধরাইয়া দিতে সক্ষম নহে;—উভয় বিমূঢ়ই সমান দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই 'কিংকর্ত্তব্য' বা 'কি-করি-দের' পক্ষ হইতে কি কিছুই বলিবার নাই?

অনেকে বলিবেন—এই 'কি-করি'-র দল ভীরু। 'কি-করি'-র দল যদি বলে—মহাত্মাও পরিদুঃখমোচনকারী, আর মোহনবাগান দলের উপযুক্ত centre forward না থাকায় বাংলা দেশের দুঃখও বড় কম নহে, তথাপি মহাত্মা যখন অনুরুদ্ধ হইলেও উক্ত দলের centre forward খেলিতে রাজী হইবেন না, তখন তিনিও ভীরু! এ যুক্তি যতই অযৌক্তিক হউক, ইহা হইতে যে-সত্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে তাহা এই, যে সকলের দ্বারা সকল কাজ সম্পন্ন হয় না এবং সকল কাজে সে-কাজ যতই ভাল বা নির্দ্দোষ হউক, সকলের প্রয়োজনও থাকিতে পারে না।

অবশ্যই কথা উঠিবে দেশের কাজ ও অন্য কাজ কি এক? এক নহে সত্য; কিন্তু, কিয়ৎসংখ্যক বিশ্বাসঘাতকের কথা বাদ দিলে, এই 'কি-করি'-র দল কোন দিন মহাত্মাকে বলিয়া আসে নাই—'আপনি লাগিয়া যান, আমরা আছি!' সুতরাং এই অহিংস শান্তিসমরে তাহাদের লজ্জা দিবার কিছু নাই।

বুঝা যাইতেছে যুক্তি তেমন প্রবল হইতেছে না এবং কাহারও মনঃপূতও হইতেছে না। কারণ ইহার মধ্যে আরও বড় কথা রহিয়াছে এই যে 'কি-করি'-র দল স্বার্থপর, আর 'পিকেট করি'-র দল স্বাধীনতাপ্রিয় স্বেচ্ছাসৈনিক। অতএব বিচার করিতে হইবে স্বার্থ ও স্বাধীনতা কাহাকে বলে।

'স্বার্থ' শব্দের গোড়ায় 'স্ব' শেষে 'অর্থ'। পিকেট-করি-র' দল স্বার্থ চাহে না, চাহে স্বাধীনতা। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় 'স্বাধীনতা' শব্দটিরও গোড়ায় 'স্ব' ও শেষে 'অধীনতা'। স্বার্থ ও স্বাধীনতা এই উভয় শব্দ হইতে 'স্ব' এই সাধারণ উপসর্গটি বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে—এক পক্ষে 'অর্থ' অন্য পক্ষে 'অধীনতা'। আমরা যে স্তরে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছি সেখানে 'অর্থ' ও 'অধীনতা' দুইই হেয়। তথাপি যদি কেহ অর্থ ফেলিয়া অধীনতা বাছিয়া লয়, তবে তাহাকে সকলেই একবাক্যে মূর্খ বলিয়া গালি দিবে। সুতরাং শব্দ-বিচারে দেখা গেল উভয় শব্দই স্বপূর্ব্বক বলিয়া সমগোত্রীয়; বরং অন্ত্যশব্দাংশের সাহায্যে বংশবিচার করিলে দেখা যায় পূর্ব্বোক্ত দলদ্বয়ের মধ্যে 'কি-করি'-র দলই বুদ্ধিমান সুতরাং শ্রেষ্ঠ।

মানুষ জানে, অন্ততঃ ভারতবর্ষে একথা সকলেই জানিত, যে-অধীনতা তাহার জন্মজন্মান্তরগত অধিকার, তাহা হইতে চিরবঞ্চিত করিবার সাধ্য কাহারও নাই। সেই জন্যই

এদেশে freedom, liberty প্রভৃতির প্রতিশব্দ স্বাধীনতা। অর্থাৎ, অধীন যখন তোমায় হইতেই হইবে তখন পরের অধীন না হইয়া স্ব-এর অধীন হও। মনের অগোচর পাপ নাই, স্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ কাহারও বড় একটা থাকে না। এই জন্যই হয়ত নিকৃষ্ট স্ব-অধীনতা অপেক্ষা যাহাকে সকলে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানি এমন কোন রামের রাজত্বই সেকালে আরামজনক ছিল। যাহা হউক স্বাধীনতা স্বীকার করিবার পূর্ব্বে স্ব-কে যাচাই করিতে গিয়া 'আত্মানং বিদ্ধি' এই মন্ত্রের জপ করিতে করিতে ভারতীয় দর্শনে যে অপূর্ব্বসুন্দর জটিলতার উদ্ভব হইল, তাহাতে ভারত তন্ময় হইয়া পড়িল: স্ব-এর সাধনা শেষ করিয়া স্বাধীনতার সাধনপথে সে আর অগ্রসর হইতেই পারিল না, ফলে স্বাধীনতা হারাইল। তাই ভারতের নরনারায়ণ স্বাধীনতার সমরক্ষেত্রে উভয় সেনার মধ্যে দাঁড়াইয়া দেশকাল পাত্র ভুলিয়া স্ব-এর সাধনার চরম কথা আলোচনা করিয়া গেলেন।

পশ্চিম স্বাধীনতা চাহে না, চাহে freedom অর্থাৎ ধনী দরিদ্র, বিদ্বান-মূর্খ, সৎ-অসৎ, ত্যাগী-ভোগী, সংযমী-লম্পট, সাধু ও চোর সকলে, সম্ভব হইলে একমত হইয়া নচেৎ বহু মত গ্রহণ পূর্ব্বক, আপন দেশকে যথেচ্ছ শাসনপালন করিবার নির্ব্বিরোধ অধিকার। স্বার্থসংঘাতে বাহিরের সহিত সন্ধি-বিগ্রহ যখন অনিবার্য্য হইয়া উঠে, তখন আবার সেই চোর ও সাধু, সংযমী ও লম্পট সকলের ভাণ্ডার হইতে ভোটের মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিয়াই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করে। ইহা স্বরাজ বা স্বাধীনতা নহে, democracy ও liberty. এই democracy ও libertyর সাধনায় মিথ্যাবাদীর বা অন্যায়কারীরও সমান ভোট আছে, সুতরাং সেখানে সত্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় নহে, ন্যায় অপরিহার্য্য হইতে পারে না। প্রত্যেক স্ব-কে কলুষমুক্ত করিয়া দেশকে তাহার অধীন করা liberty-ভক্ত পশ্চিমের সাধনা নহে। আত্মনির্দ্দিষ্ট সাধনায় পশ্চিম জয়যুক্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই; সে বিগত-স্ব হইয়াও বিশ্বজিৎ হইয়াছে, ব্যষ্টিকে বলি দিয়া সে সমষ্টিকে অভ্রভেদী করিয়া তুলিয়াছে। তথাপি বলিতে হয়—ভারত যে স্বাধীনতার অন্বেষণ করিয়াছিল পশ্চিম তাহা এখনও পায় নাই, বা সে স্বাধীনতা পাইবার পথেও তাহার গতি নহে।

ইংরাজশাসিত নব্য ভারতের বড়ই দুঃখ ছিল প্রাক্-মহম্মদীয় ভারত তাহার জন্য স্বাধীনতার এমন কোন মন্ত্র রাখিয়া যায় নাই যাহার সাধনায় সে ইষ্ট লাভ করিতে পারে। তাই প্রতীচ্যের নিকট সে করযোড়ে বলিল—অন্ততঃ এবিষয়ে "শিষ্যস্তেঽহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" পশ্চিমা গুরুর দ্বারে নব্য ভারত libertyর মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সম্পদে বিপদে, অনুকূল প্রতিকূল অবস্থায় তাহারই সাধন করিতে করিতে যেখানে উত্তীর্ণ হইল, সেখানে দেখা যায় সাধকদল দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সেখানে একদল লইয়াছেন ভক্তিপথ, অপর দল হইয়াছেন ব্যোম্ পন্থী। ভক্তের প্রধান লক্ষণ হইতেছে তাহার মর্ম্মান্তিক বিশ্বাস—

> "ডাকার মতো ডাক দেখি মন,
> কেমন শ্যামা থাক্‌তে পারে।"

শ্যামা যে সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত যথেষ্ট বরদান করিতেছেন না, তাহার একমাত্র কারণ আমরা এখনও 'ডাকার মতো' ডাকিতে সক্ষম হই নাই। ডাকো, আবার ডাকো, ভালো করিয়া constitutionally ডাকো, যতবার বিফল হইবে ততবার, পুরুষানুক্রমে, ডাকিতে থাকো,—শেষ পর্য্যন্ত শ্যামা কখনই থাকিতে পারিবে না। এ দলকে মডারেট, উদারনৈতিক যাহাই বল, সাধনমার্গে ইহাদেরই নাম ভক্ত।

অপরপক্ষে বাংলার জন কয়েক হঠযোগী যুবক লইল ব্যোম্-পন্থা; যাহার ফল আজ আচটল-অমৃতসর ভারত ভোগ করিতেছে। পশ্চিমের নিকট ভারত libertyর যে দীক্ষা গ্রহণ করিল এই দুই দলই তাহার অনিবার্য্য পরিণতি।

ভারত যদি ভারত না হইয়া অন্য কোন দেশ হইত, অথবা দীর্ঘ জরাভোগ-নিবন্ধন সে যদি নিতান্তই স্বকীয়তা হারাইত, তবে এই দুই দলের জয়-পরাজয়ের দ্বারাই তাহার ভবিষ্যৎ নির্দ্দিষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু এই উভয় দলের কোনটিই তাহার মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারে নাই। যে তপস্যা ভারতকে চিরোদ্বেল মৃত্যুসাগরের মধ্যে যুগে যুগে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, সেই একই তপস্যা তাহাকে নূতন করিয়া পুরাতন পথে পরিচালিত করিল। এবারও ভারত যাহার কণ্ঠে আত্মবাণী প্রচার করিল তাহার দেহ নগ্ন ও তপঃশীর্ণ, তাহার আত্মা দীপ্ত ও সমাহিত। ভারত আবার বলিল—liberty নহে, freedom নহে; স্বাধীনতা ও স্বরাজ; অথবা তাহাও নহে, 'স্ব'ই আমার সাধ্য। 'স্ব'কে,

আত্মাকে, নূতন পদ্ধতিতে শুদ্ধ না করিয়া যে স্বাধীনতা তাহা অধীনতারই নামান্তর। এই বাণী পশ্চিম বুঝিতে পারিল না বা অবিশ্বাস করিল। ইহা শুনিয়া ভারত যেভাবে উঠিয়া বসিল তাহা শবসাধনার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার যোগ্য। ভারতের হিন্দু ভাবিল—এ ত সেই কথা; ভারতের মুসলমান বুঝিল, এতদিনে ভারত তাহার ব্রহ্মাস্ত্র লইয়া মুসলমান আক্রমণের প্রত্যাক্রমণ করিয়াছে, ভারতের আত্মা মুস্লিম কৃষ্টিকে আত্মসাৎ, আত্মীয় না করিয়া ছাড়িবে না, এই কৃষ্টি-সংগ্রামে পশ্চিম-সীমান্তস্থিত মুসলিম্ দুর্গের এক কোণ যখন ধ্বসিয়া পড়িল, তখন সে বিহ্বল ভাবে ইংরাজ-দরবারে বারবার প্রার্থনা করিতে লাগিল—বর্ম্ম দাও, কবচ দাও, শিরস্ত্রাণ দাও। নচেৎ ভারত আমাকে গ্রাস করিবে!

কিন্তু এসব কথার বিস্তৃত বিশ্লেষ এ প্রবন্ধের বিষয় নহে। তবে 'কিংকর্ত্তব্য'এর দলের ওকালতনামা গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমায় বলিতেই হইবে যে তাহারা যদি স্বাধীনতার ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে তবে 'পিকেট-করি'-র দলের নিকট লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। স্ব-কে বড় না করিয়া স্বাধীনতার প্রয়াস ভারতবর্ষে পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বনায় পর্য্যবসিত হইবে। যে স্বার্থপরতার কলঙ্ক দিয়া 'পিকেট-করি'-রা তোমাকে অশ্রদ্ধা করিতেছে, তাহার সহিত পশ্চিমী স্বাধীনতার রক্তসম্বন্ধ রহিয়াছে। এ স্বাধীনতার মূলে পরম নহে, চরম স্বার্থই আত্মগোপন করিয়া আছে। বংশপরম্পরায় সর্ব্ববিধ সুখভোগকে সনাতন করিবার নির্লজ্জ গোপন লিপ্সা হইতেই ইহার জন্ম: ইহারই মেঘমসীলিপ্ত আকাশে মধ্যে মধ্যে যে ত্যাগের বিদ্যুৎ আমাদিগকে সচকিত করিয়া তুলে, মোহমুক্ত দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যাইবে যে তাহাও অপরকে বজ্রাঘাতে ধ্বস্ত করিবার গূঢ় স্বার্থ হইতেই উদ্ভূত। ভারতের ইতিহাসে স্বাধীনতা-সংগ্রাম নাই, ইহাতে লজ্জিত হইবার কারণ দেখি না; যেহেতু সে চিরদিন আত্মার মধ্যে সংগ্রাম চালাইয়াছে। তাহার যুদ্ধ-সঙ্গীত হইতেছে—"আয় মা সাধন সমরে।" জীবনের ক্ষেত্রে সত্যের স্থান স্বাধীনতার বহু ঊর্দ্ধে, একথা ভুলিলে চলিবে না। ইতিহাসের পৃষ্ঠা সাক্ষ্য দিবে যে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, এসব যুগধর্ম্ম মাত্র, সভ্যতার বিশাল ল্যাবরেটরিতে মানবের এক একটি ছোটখাটো পরীক্ষামাত্র। কিন্তু সত্য মানবের সর্ব্বপরীক্ষোত্তীর্ণ সনাতন ধর্ম্ম। সত্যকে মুক্ত রাখিবার কোন প্রবল বাধা ঘটিয়াছে বলিয়াই হয়ত মানব এ যুগে স্বাধীনতাকে ওই বাধা অপসারণের সাময়িক অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেছে। ভারতবর্ষ শুধু স্বাধীনতা হারায় নাই, সত্যকেও হারাইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও তেমন ক্ষতি হয় নাই, যতটা আশঙ্কা করি সে যদি স্বাধীনতার লোভে তাহার সত্যের বিশিষ্ট আদর্শ পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে। সে যদি ভাবে সব চুলায় যাউক, স্বাধীনতা আসুক্। যদি বাহির হইতে কেহ ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়—উপায় নাই; কিন্তু সে-স্বাধীনতা যেন আমাদের প্রাণের কাম্য না হইয়া উঠে যাহার আশ্রয়ে মিথ্যাচারী, চরিত্রহীন, কুটিল ও হিংস্র মানবক মাত্র ভোটের জোরে ভারতের কর্ণধারণ করিবে। বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুরকে গ্রহণ করা যদি শ্লাঘার বিষয় হয়, তাহাতে ক্ষতি দেখি না, কারণ কুকুর মাত্রই সত্য সত্যই কুকুর। কিন্তু বিদেশী খাঁটি bull dog ফেলিয়া স্বদেশী মেকি ঠাকুরের প্রতি পক্ষপাতিত্বে কোন কল্যাণই হইবে না।

বুঝিতেছি, এখনও এ্যাড্‌ভোকেসির মধ্যে অনেক ফাঁক রহিয়া গেল। প্রমাণ করা হইল না 'পিকেট-করি' মাত্রই আত্মশুদ্ধিসিদ্ধ সত্যাগ্রহী নহে। অনুমান করা হইল 'কিংকর্ত্তব্য'-এর অনেকে ভারতের বিশিষ্ট আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন। উভয় প্রতিপাদ্যসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত করা অসম্ভব না হইলেও আমার দিক হইতে ঠিক এইখানেই বড় ফাঁকি দিবার একান্ত প্রয়োজন।

মহাত্মাজির উপর আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভিযোগ এই যে তিনি আমাদের অন্তরের দৈন্য দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণ বুঝিয়াও তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে নানা ভাল ভাল কথা আমাদের মুখ দিয়া বলাইয়া লন, এবং পরে বলেন, 'তোমরা যখন একবার বলিয়াছ তখন ইহা পালন করিতেই হইবে।' বলিলেই পালন করিতে হইবে? স্ত্রী পুত্র প্রভু, কাহারও মুখ চাহিতে পারিব না? দশরথ-রামের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত জাহ্নবীখাতে যে কত জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল মহাত্মা তাহার খোঁজ রাখিলেন না। যেহেতু তিনি কংগ্রেসকে বলাইয়া লইয়াছেন—প্রয়োজন হইলে আমরা মার খাইবই, অথচ মারিবনা বরং মারণদারকে ভাল বাসিব—সুতরাং তিনি আইন করিয়া গেলেন, যে-কেহ কংগ্রেস-পিকেটার হইবে

সে-ই প্রতিনিয়ত দেশী-বিলাতী-নির্ব্বিশেষে পাহারাওয়ালাদের সহিত প্রেম করিতে বাধ্য থাকিবে। বাল্যবিবাহের একান্ত বিরোধী হইলেও তিনি শেষে কংগ্রেসরূপ বালিকাবধূটিকে পুলিশবরের হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন। তাঁহার জীবনে বাল্যবিবাহের পরিণতি সুখকর হইয়াছে বলিয়া তিনি আশা রাখিতে পারেন—এই বিবাহেও অবশেষে পরম শুভফলই ফলিবে। কিন্তু এ বিষয়ে সমস্ত 'পিকেট-করি'দের দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিবার ফলে যদি বা মধ্যে মধ্যে দাম্পত্য কলহ কারান্তঃপুর অতিক্রম করিয়া বাহিরের কর্ণপটহ ভেদ করে, তবে সবদোষ বেচারী 'পিকেটকরি'দেরও ত' দেওয়া চলে না।

অপরপক্ষে 'কিংকর্ত্তব্য'-দলের বিপদও ত কম নহে। বুদ্ধিমান তাহারা, মহাত্মার ভাবগতিক দেখিয়া বহুকাল হইতেই আন্দাজ করিয়াছিল—এ ব্যক্তি পরিশেষে নানা অনর্থ ঘটাইবে। তখন হইতেই তাহারা সকল দিক বজায় রাখিবার জন্য সাবধান হইয়াই ছিল। সেই মহাত্মার কৃত কর্ম্ম আজ আশঙ্কাতিরিক্ত ফল ফলাইয়াছে বলিয়া এই কিংকর্ত্তব্যদেরই বা দায়ী করা যায় কোন যুক্তিতে ?

অতএব সর্ব্ব বিরোধের সুমীমাংসা করিতে হইলে বলিতেই হইবে—আজ ভারতে যে গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী গবর্ণমেণ্ট নহে, কি-করির দল নহে, পিকেট-করির দলও নহে। সর্ব্বকষ্টের মূল হইতেছেন সেই গান্ধী যিনি গবর্ণমেণ্টের কারাশ্রমে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্রামসুখ ভোগ করিতেছেন। আর পুত্রকলত্রভারপীড়িত, নিয়তদাসত্ব-মোচনশঙ্কিত, হয় ত বা অর্থাগমের সর্ব্বসম্ভাবনাবিমুক্ত আমরা কিংকর্ত্তব্যের দল গবর্ণমেণ্ট ও স্বদেশভক্ত এই উভশৃঙ্গের মধ্যে নিপতিত হইয়া নিরন্তর ধিক্কৃত হইতেছি !

তথাপি মনে হয় পিকেট না করিয়া বা পিকেটার ধরাইয়া না দিয়াও সকলেই ভারতীয় মতে স্বাধীনতার সাধনা করিতে পারে। সত্যের সাধনা, স্ব-এর উন্নতি, বাক্যে ও মনে মিথ্যাচার বর্জ্জন, পুত্রকন্যাকে ভক্তিপথ ও ব্যোমপন্থা হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মশুদ্ধির মন্ত্র দেওয়া, আজও ভারতীয়ের প্রধান সাধনা হইতে পারে। এই সাধনায় যে দুঃখ আসিবে তাহা সহ্যের সীমা অতিক্রম করিবে বলিয়া মনে হয়না। সর্ব্ব বিপদের মূল সেই গুজরাটীর কথা মানা বেআইনি হইলেও একজন বাঙ্গালীর কথা মনে রাখিতে পারি :—

"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত—'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর'।"

যে পুণ্যফলে ভারতের বাণী কীটভ্রষ্ট পুঁথির পাতা পরিত্যাগ করিয়া যুগে যুগে মূর্ত্তিগ্রহণ করিতেছে সেই পুণ্যই ভারতকে পশ্চিমী libertyর উন্মার্গ হইতে রক্ষা করিবে—যতদিন পর্য্যন্ত সে স্বকীয় স্বাধীনতালাভের উপযুক্ত না হইয়া উঠে।

—জনৈক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়

শেষ-শয্যায় শাজাহান

-শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

"জাহানারা, জাহানারা,
দিবসের আলো সাঁঝের আঁধারে হ'য়ে এল কি মা হারা ?"
"না বাবা এখনও নেবেনি আলোক ;—এই ত এখনি সবে
দুর্গে বাজিল তৃতীয় প্রহর, এখনি সন্ধ্যা হবে।"
"হয়নি সন্ধ্যা ? তবে কেন মোর নয়নে ঘনায় কালো,
নিবিয়া আসিছে তবে কি আমার আপন আঁখির আলো ?
তাই যদি মাগো, তাই যদি তবে কেন বিলম্ব আর,
স্নেহ-ক্রোড়ে তোর জীর্ণ এ দেহ তুলে ধর্ একবার ;
ক্ষণ পরে ঘন মরণ-আঁধারে ডুবে যাবে আয়ু-রবি ;
জীবন-শোণিতে শিলাপটে লেখা রূপের স্বপ্নছবি—
দেখে নি' বারেক জনমের মত ! স্মরণে না আসে আজ
কত না বর্ষ—কত যুগ সে যে নয়নে হেরিনি তাজ !
কত বরষার নব মেঘভার সজল শ্যামল স্নেহে
হিম বারিধার ঢালিল তাহার নিদাঘতপ্ত দেহে ;
কত শরতের পূর্ণিমা চাঁদ হাসিয়া অমিয় হাসি
বরষাধৌত তাজ-দর্পণে নেহারিল রূপরাশি।
কত ফাগুনের অস্ত-সূর্য্য ফাগুয়ার রঙ মাখি'
তাজের তুষার শুভ্রতা দিল অভ্র-আবিরে ঢাকি।
কত ষড়ঋতু নব নব বেশে এল গেল বারে বারে—
সাজায়ে তাজের তনুর তনিমা নব রূপ-সম্ভারে—
কিছু নাহি জানি, কিছু না হেরিনু জাহানারা, জাহানারা,
আমারই পুত্র আমার প্রাসাদে রচিল আমারই কারা !
না, না জাহানারা, মিছে এই রোষ, নহে তার অপরাধ,
মরণ-পথের এই পথিকের মিটায়েছে শেষ সাধ।
সন্তান মোর, সম্রাট মোর, মোর মহীয়ান প্রভু,
মরণের তীরে চির-বিরহীরে করুণা করিয়া তবু
দিয়েছে আদেশ দেখিবারে তাজ ! এই দয়া বাদশাহ
বক্ষ-বিদাহী লক্ষ ক্ষতের জুড়াইয়া দিল দাহ।
জয় হোক্ মহারাজ,
অবশ হস্ত আশিস্ বহিয়া শয্যায় লুটে আজ॥"

"মমতাজ, মমতাজ,
লোক মুখে শুনি প্রেমের ব্যাখ্যা বুকে হানে যেন বাজ।
নিঃস্ব করিয়া রাজৈশ্বর্য্য ওই যে পাষাণ-স্তূপ
রচিনু বিশ্বে মহা বিস্ময় অতুলন অপরূপ ;
সে নাকি সুদ্ধ তোমার প্রেমের স্মৃতি-পূজা লাগি প্রিয়া ;
হায়রে প্রেমের বৃথা পরিমাপ হেম মাণিক্য দিয়া !
প্রেম সে জীবন-মথিত অমৃত নিভৃত মর্ম্মপুটে,
মর্ম্মের যাহা গোপন মাধুরী মর্ম্মরে তাকি ফুটে !
হৃদয়-দেউলে দিবানিশি মোর প্রেমের আরতি জ্বলে,
রূপ-পূজারীর মন্দির তাজ ফলিত যমুনা জলে।
কাননে কুসুম ফুটিত যাহার আননে ফুটিলে হাসি,
নয়ন-লোভন হর্ম্ম্য-শোভন অতুলন রূপরাশি
লভিবে যেথায় শেষ বিশ্রাম................. ...
একি এ বিদায়-বেলা,—
তোমার প্রতিমা প্রিয়তমা কেন খেলিছে নিঠুর খেলা !"

"মমতাজ, মমতাজ,
নয়নের আগে স্বপনের মত মিলায়ে যেয়োনা আজ !
শান্ত আমার স্মরণ-সায়রে মরণ দিয়াছে দোল,
ছল ছল জল কাঁপে চঞ্চল উচ্ছল উতরোল।
ধেয়ান-বাপীর উদ্বেল বুকে তব রূপ-ছবি প্রিয়া
নাহি রহে থির, যেন বিজলীর রেখা ফিরে চমকিয়া।
নিবিড় হইয়া ঘনাইয়া আসে মরণের অমানিশা,
তিমির পাথারে পরাণ সাঁতারে খুঁজিয়া না পায় দিশা।
জীবন-আকাশে চির উজ্জ্বল অচপল ধ্রুবতারা,
কালের করালে তমসা-গর্ভে তুমি যদি হবে হারা,
বল, বল তবে বল প্রিয়তমে, কার মুখপানে চাহি
চলিব একাকী অচিন দেশের দুর্গম পথ বাহি ?
আজি এ বিদায়-ক্ষণে
বিরাজ আমার নয়নের আগে বিহর আমার মনে।"

শিক্ষার বাহন

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

গত বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার নিয়ম ও পদ্ধতি বিচার করিবার জন্য এক সমিতি গঠিত করিয়াছিলেন। সেই সমিতি মত প্রকাশ করিয়াছেন—

ইংরাজী ব্যতীত আর সকল বিষয়ের পরীক্ষা, পরীক্ষার্থীর মাতৃভাষায় (বাঙ্গালা, উর্দ্দু, আসামী বা হিন্দী) গৃহীত হইবে।

এই নির্দ্ধারণ কার্য্যে পরিণত হইলে যে বহুদিনের অভাব দূর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনাবধি—এই প্রায় ৭৫ বৎসর কাল শিক্ষার বাহনরূপে ইংরাজীকে যে অকারণ ও অতিরিক্ত প্রাধান্য প্রদান করা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত হইলেও সে প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে যে সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে হয়, তাহা সুপ্রযুক্ত হইলে যে শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিক্ষালাভের পথ সুগম হয়, তাহাতে মতভেদ নাই। তবুও যে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষাকে তাহার শিক্ষার বাহন না করিয়া বিদেশী ভাষার সাহায্যে তাহাকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার কারণ প্রধানতঃ দ্বিবিধ :—

(১) প্রচলিত প্রথা

(২) এ দেশের ভাষার প্রতি অবজ্ঞা।

প্রচলিত প্রথার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এ দেশে ব্যবসা করিতে আসিয়া ইংরাজ যখন শাসনদণ্ড লাভ করেন, তখন ইংরাজের পক্ষে ব্যবসার জন্য যেমন, রাজকার্য্য পরিচালনা করিবার জন্যও তেমনই—হয়ত বা আরও অধিক পরিমাণে—ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই জন্যই এ দেশে কেরাণী সৃষ্টি করিবার জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন অনিবার্য্য হয়। প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা প্রত্যেক শ্রেণীর লোককে তাহাদিগের কার্য্যে দক্ষ করিতে প্রয়াস করে। কিন্তু ইংরাজ এ দেশে যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহাতে শিক্ষার্থীদিগকে কেবল সরকারী বা সওদাগরী আফিসে চাকরীলাভের উপযুক্ত করা হইত। আজ সে সব চাকরীতে এবং অন্যান্য ব্যবসায়েও স্থানাভাব ঘটিয়াছে। তাহা ঘটা অনিবার্য্য। কেবল তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে ইংরাজীর আসনও টলিয়াছে। সেই জন্য পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বিশেষ-ভাবে অনুভূত হইতেছে।

যাঁহারা এ দেশে শিক্ষা-পদ্ধতির রূপ স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিদেশী। ইংরাজ তাহার দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতাহেতু ইংরাজীকে যত উচ্চ স্থান দান করে, এ দেশের ভাষাকে তত উচ্চে—এমন কি তাহার নিকটেও স্থান দিতে অসম্মত। বিশেষ ভারতবর্ষ মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ দেশে বহু ভাষা প্রচলিত, ৬টি পরিবারভুক্ত প্রায় ১ শত ৩০টি ভাষায় এ দেশের ৩২ কোটি অধিবাসী মনোভাব ব্যক্ত করে। সেই জন্যও হয়ত ইংরাজ এ দেশে ইংরাজীকে শিক্ষার বাহন করিয়া শিক্ষার বাহন-সমস্যার সমাধান সরল করিলেন—মনে করিয়াছিলেন।

ফলে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল এ দেশে ইংরাজী ভাষার শিক্ষা অত্যধিক আদর পাইয়াছিল। তাহার কারণও যেমন—তাহার কুফলও যে তেমনই, অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'এর "পত্রসূচনায়" তাহা বুঝাইয়াছিলেন। ইংরাজীর অত্যধিক আদর সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজী একে রাজভাষা, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহু বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের একমাত্র সোপান; এবং বাঙ্গালীরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ ইংরাজীতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মানমর্য্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মানমর্য্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, অথবা থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন; ইংরাজ যাহা না দেখিল, তাহা ভস্মে ঘৃত।"

কিন্তু :—

"যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজীতে হয়, তাহা কয় জন বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারে? যদি কেহ এমন মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত।

সমগ্র বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজী বুঝে না, কস্মিন কালে বুঝিবে এমত প্রত্যাশা করা যায় না। কস্মিন কালে কোন বিদেশীয় রাজা দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্যভাষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র দত্তকে বাঙ্গালা রচনা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন—তাঁহার পিতৃব্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইয়াছিলেন —বাঙ্গালীর ইংরাজী রচনা স্থায়িত্বলাভ করিবে, এ আশা দুরাশা মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অবদানে বাঙ্গালী পুষ্টিলাভ করিতে থাকে। কিন্তু তাঁহাদিগের মনীষা সকলের থাকে না—থাকিতে পারেও না। সাধারণ শিক্ষিতদিগের শক্তি বিদেশী ভাষার ব্যূহ ভেদ করিতেই নিঃশেষ হইয়া যাইত; জয়ের ফল তাঁহারা দেশবাসীকে দিতে পারিতেন না—আপনারাও সম্যক সম্ভোগ করিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ।

১২৭৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, বিংশ বর্ষ পরে (১২৯৯ সালে) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই কথা বলেন। সেই বৎসর তিনি রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশনে "শিক্ষার হের-ফের" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধে তিনি এ দেশে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—

"ছেলেদের এমন করিয়া বাঙ্গলা শেখান হয় না যাহাতে তাহারা আপন ইচ্ছায় ঘরে বসিয়া কোন বাঙ্গালা কাব্যের যথার্থ স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। আবার দুর্ভাগারা ইংরাজিও এতটা জানে না যাহাতে ইংরাজি বাল্যগন্থের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। বিশেষতঃ শিশুপাঠ্য ইংরাজি গ্রন্থ এরূপ খাস ইংরাজি, তাহাতে এত ঘরের গল্প ঘরের কথা যে বড় বড় বি-এ এম-এদের পক্ষেও তাহা সকল সময় সম্পূর্ণরূপ আয়ত্তগম্য হয় না।"

তিনি বলেন, শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই "সর্ব্বপ্রধান মনোযোগের বিষয়" এবং কি উপায়ে তাহা সম্ভব হয়, তাহাই বিবেচ্য। তিনি স্পষ্টই বলেন, এই সামঞ্জস্য সাধন করিবার ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী—"বাঙ্গলা ভাষা, বাঙ্গলা সাহিত্য।" বর্ত্তমানে যে বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করা হইতেছে না, তাহাই শিক্ষার হের-ফেরের কারণ এবং সেই হের-ফের যত দিন দূর না হইবে, ততদিন শিক্ষা আনন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে ও সেই জন্যই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না।

বিদেশী ভাষা আমাদিগের শিক্ষার বাহন হওয়ায় শিক্ষা যে স্থানে কেবল ভার রহিতেছে না, সে স্থানে তাহা কেবল অর্থকরী হইয়াই আপনাকে সার্থক মনে করিতেছে। শিক্ষা আমাদিগের জীবনের সহিত মিশিয়া যাইতেছে না।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি যে দেশের বহু লোকেরই মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের সমর্থন করিয়া প্রবন্ধলেখককে পত্র লিখিয়াছিলেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের কৃত কার্য্যের তুলনায় অপর দুই জনের স্থায়ী কার্য্য যেমনই বিবেচিত হউক না কেন, তাঁহারা কোবিদ বলিয়া প্রসিদ্ধ ও শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—

"প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেক বার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

এই পত্রের শেষাংশ প্রকাশিত হয় নাই। তবে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তাহার স্বরূপ অনুমান করা যাইতে পারে: -

"কেন যে তাঁহার 'ক্ষীণস্বর' কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই এবং সেনেট হৌসের মহতী সভা 'অসংখ্য বালকবলিদানরূপ মহাপুণ্যবলে' কিরূপ চরম সদ্গতির অধিকারী হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর মত আমরা অপ্রকাশ রাখিলাম। কারণ, পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, বঙ্কিম বাবুর ক্ষীণস্বর যদি বা কোন কর্ণভেদ করিতে না পারে তাঁহার তীক্ষবাক্য উক্ত কর্ণ ছেদ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।"

এ বিষয়ে ছেদিতকর্ণদ্বয় ব্যক্তির নগরের মধ্য দিয়া গমন সম্বন্ধে যে পরিচিত প্রবাদ আছে, বিশ্ববিদ্যালয় তাহারই যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়া পথের পরিবর্ত্তনে বহুদিন বিরত ছিলেন। গুরুদাস বাবু এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন:—

"আমার কথানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন সভ্য বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদর্শনার্থে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা গৃহীত হয় নাই।"

গুরুদাস বাবু যে দুর্ভাগ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কিরূপ দুঃখজনক তাহা আনন্দমোহন বাবুর পত্র হইতে বুঝা যাইবে :—

"আলোচ্য প্রদর্শিত অনিষ্টের প্রতিকারের উপায় কি? বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ভাষা এবং নিয়মাদি সম্বন্ধে কতক কতক পরিবর্ত্তন করিলে উপকার হইতে পারে কিন্তু এই বিষয়ের আমি যখনই অবতারণা করিয়াছি তখনই আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে পাব্লিক অপিনিয়ান অনেকটা পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। আমি সময়ে সময়ে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে আনিব মনে করিয়াছি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত এই পরিবর্ত্তন সাধিত না হয় কিছুই করা যাইতে পারিবে না বলিয়া নিরস্ত হইয়াছি।"

আনন্দমোহন বাবুর যে "স্বদেশীয়"রা তাঁহার প্রস্তাবে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পরিচয় জানিবার চেষ্টা আমরা করিব না। আমরা দেখিয়াছি, ইহার পরেও বাঙ্গালায় প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এইরূপ আপত্তির উত্থাপক পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের সাহায্য ব্যতীত চিকিৎসা-বিষয়ক শিক্ষা-প্রদান-ব্যবস্থায় বাঙ্গালা সরকার কখনই বাঙ্গালাকে তাহার অধিকারে বঞ্চিত করিতে পারিতেন না।

চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য—রোগ হইতে রোগীকে আরোগ্য করা। বাঙ্গালীর ছেলে কেন যে বিদেশী ভাষায় সেই বিদ্যাও শিখিতে বাধ্য হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অথচ তাহাই হইয়াছে। এ দেশের ছাত্রদিগকে য়ুরোপীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি শিখাইবার জন্য যখন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহা দুই বিভাগে বিভক্ত ছিল—একটিতে বাঙ্গালায় পঠনপাঠন হইত। ঢাকায়, পাটনায় ও কটকে যে সব মেডিক্যাল স্কুল হয়, সেগুলিতেও শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হইত। মাতলায় (পোর্ট ক্যানিং) যে নগর রচনার কল্পনা হইয়াছিল, তাহারই জন্য রচিত বাজারের বাড়ীটি কিনিয়া সরকার পরে তথায় ডাক্তারী শিক্ষার বাঙ্গালা বিভাগ স্থানান্তরিত করেন। বর্ত্তমানে তাহাই ক্যাম্পবেল স্কুল নামে পরিচিত।

বাঙ্গালায় পঠনপাঠন হইত বলিয়াই বাঙ্গালায় ডাক্তারী শিক্ষার জন্য পুস্তক রচিত হইতে থাকে। দুর্গাদাস করের 'মেটিরিয়া মেডিকা' ও জহিরুদ্দীন আহম্মদের 'সার্জ্জারী' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। এখন বাঙ্গালায় ডাক্তারী স্কুলের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে—বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে এবং কলিকাতাতেও সেরূপ বিদ্যালয় হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বাঙ্গালায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পদ্ধতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড রোণাল্ড্‌শের সহিত এক সময়ে আমাদিগের কিছু আলোচনা হইয়াছিল। তিনি মত প্রকাশ করেন, পরীক্ষালব্ধ নূতন নূতন আবিষ্কারের ফল ইংরাজী ভাষায় পরিচালিত চিকিৎসা পত্রাদিকেই প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা থাকায় যেমন বাঙ্গালায় চিকিৎসাগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তেমনই সে ব্যবস্থা থাকিলে যে বাঙ্গালায় চিকিৎসাপত্রাদিও প্রকাশিত হইবে—ইহা আমরা তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তিনি সে কথার যাথার্থ্য স্বীকারও করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি বাঙ্গালা মেডিক্যাল স্কুলে বর্জ্জিত হইয়াছে।

যখন এ দেশে জাতীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদান আরম্ভ হয়, তখন বর্ণবোধ হইতে ভূবিদ্যা, পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তক রচিত হইয়াছিল এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি মনীষীরা সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করায় সে কার্য্যও সুসম্পন্ন হইয়াছিল। চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছিল এবং পরিভাষা রচিত হইয়াছিল। এই সময় বাঙ্গালায় শিক্ষার ব্যবস্থায় উৎসাহ প্রদান না করিয়া—বাঙ্গালাকে নির্ব্বাসিত করিয়া সরকার যে বাঙ্গালীর বিশেষ অপকার সাধনই করিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

যাঁহারা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে "ছাত্র বৃত্তি" (ইহার সহিত ইংরাজী সংযুক্ত হইলে তাহা "মাইনর"-"মিড্‌ল ইংলিশ" নামে পরিচিত হইত) পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের তালিকা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ঐ পরীক্ষায় ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'সীতার বনবাস' বা ঐরূপ কোন পুস্তক এবং যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'পদ্যপাঠ' পাঠ করিতে হইত। আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় পাটিগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, স্বাস্থ্যরক্ষা, ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষা করিতে হইত। মাতৃ-ভাষায় শিখিতে হইত বলিয়া শিক্ষা যেমন স্বল্পশ্রমসাধ্য তেমনই সুবোধ্য হইত। যে সকল ছাত্র ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিত, তাহারা অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস

ও ভূগোলে অন্য ছাত্রদিগকে সহজেই পরাভূত করিতে পারিত এবং সাহিত্যও সহজে আয়ত্ত করিতে পারিত। তাহারা সেই বিদ্যা লইয়া মেডিকাল স্কুলে প্রবেশ করিতে পারিত এবং মোক্তার হইয়া ব্যবহারজীবীর কায করিতেও পারিত। এখন সেই দুই পথেই ইংরাজীর বেড়া দেওয়া হইয়াছে ইহাতে বিষয়গুলি দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় যে বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বও বুঝান যায়, তাহা অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট পদার্থবিদ্যা বাঙ্গালায় শিক্ষা দিতেন। শিক্ষক যদি স্বয়ং বিষয়টি আয়ত্ত করিতে পারেন, তবে তাঁহার পক্ষে মাতৃভাষায় তাহা বুঝান অসম্ভব হইতে পারে না, বরং শিক্ষকের আপনার অজ্ঞতা গোপন করিবার কার্য্যে ইংরাজী সহায় হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ যখন "শিক্ষার হের-ফের" লইয়া আলোচনা করেন, তখন বাঙ্গালায় সে বিষয়ে আরও আলোচনা হয়। আলোচনাকারীদিগের মধ্যে লোকেন্দ্রনাথ পালিত ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন।

পালিত মহাশয় অল্প বয়সে শিক্ষালাভার্থ বিলাতে প্রেরিত হইয়া সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন। তিনি তথায় ইংরাজীতে শিক্ষালাভ করেন ও সে দেশের প্রচলিত শিক্ষাদান-পদ্ধতির সহিত বিশেষ পরিচিত হয়েন। তিনি এ দেশের শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন ('সাধনা'—দ্বিতীয় বর্ষ—প্রথম ভাগ):—

"যে বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার ও আয়ত্ত করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়াই উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রণালীর উচিত উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে সুবিধা করিয়া দেওয়া দূরে থাক, বরং যতদূর সম্ভব অসুবিধা ঘটাইবারই বিশেষ চেষ্টা লক্ষিত হয়। ভূগোল, ইতিহাস, বিশেষতঃ অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি যে স্বভাবতঃ আপনা হইতেই আমাদের মস্তিষ্কের আয়ত্তে আসিয়া পড়ে তা' নয়। বরং সে জন্য বিশেষ প্রয়াসেরই আবশ্যক। কিন্তু এ সকল বিষয় শিক্ষা দিবার কি প্রণালী অবলম্বিত হয়? না, যে ভাষা নিতান্ত বিজাতীয়, যে ভাষায় বিন্দুবিসর্গমাত্র দখল নাই, সেই ভাষায় এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়। মনে কর, কোন লোককে কোন বস্তুর আকৃতি পরিস্ফুটরূপে দেখান আবশ্যক, সে স্থলে তাহার চোখে কালো ঝাপ্‌সা চসমা আঁটিয়া দেওয়া কিম্বা কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া সেই বস্তু দেখান যে ঠিক যুক্তি-সঙ্গত নয় এ কথা আমরা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারি। অথচ আমরা জ্যামিতির সত্য ও যুক্তিগুলিকে অপরিচিত বিজাতীয় ভাষাকুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া দেখাইয়া বালককে জ্যামিতি শিখাইবার উচিত উপায় মনে করি।"

বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা লাভ করিয়া সেই ভাষাতেই যে পরীক্ষার সময় উত্তর লিখিতে হয়, ইহাতে—"এক মাসে যে ইতিহাস শিক্ষা হইতে পারিত, তাহা দুই তিন বৎসরেও হয় না।" পালিত মহাশয় বলিয়াছিলেন:—

"ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া এবং বাঙ্গলা ভাষায় পরীক্ষা করা। তাহা হইলে মুখস্থ করিবার প্রয়োজন থাকে না, আর বিষয়গুলি যথার্থ শিক্ষা দিবার দিকে মনোযোগ দিতে পারা যায়।"

উপসংহারে তিনি বলেন:—

"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যদি বাঙ্গালায় শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী প্রচলিত করেন, আর সেই সঙ্গে যদি টেক্সটবুক পরীক্ষা করিবার প্রণালী উঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রণালীর দুইটি প্রধান দোষ দূর করা হয়।"

কিন্তু যখন এই সকল আলোচনা হইতেছিল, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালীর এখন যেটুকু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাও ছিল না। তখন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচান্সেলার মনোনীত করিবার নিয়মের একবারও ব্যতিক্রম হয় নাই এবং ইংরাজরাই শিক্ষার পদ্ধতি ও পরীক্ষার প্রণালী স্থির করিতেন। সেই জন্যই রমেশচন্দ্র মিত্র যখন অস্থায়ী ভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারক হইয়াছিলেন, তখন যেমন তাহা কবি হেমচন্দ্রের 'জয়মঙ্গল' রচনার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল এবং তিনি রমেশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"তোমার কল্যাণে ভারত-বিপিনে
উদিল চন্দ্রিকাজাল।"

তেমনই হাইকোর্টের জজ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়কে যখন প্রথম ভারতীয় ভাইসচান্সেলার মনোনীত করা হয়, তখন তাহাই অসাধারণ অনুগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ বা বিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্রলাল সরকার —কেহই সে পদে মনোনীত হয়েন নাই। কিন্তু ভাইসচান্সেলার বাঙ্গালী হইলেও তিনি একক—সুতরাং তাঁহার সংস্কার করিবার ক্ষমতাও সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ।

বিশ্ববিদ্যালয় যখন কোন কোন পরীক্ষায় বাঙ্গালাকে অতিরিক্ত পাঠ্য বিষয় বলিয়া গ্রহণ করেন—অর্থাৎ ছাত্ররা ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালার পরীক্ষাও দিতে পারিবে, স্থির করেন, তখন তাহাকে বাঙ্গালার প্রতি শ্রদ্ধা ও শিক্ষা-পদ্ধতির আবশ্যক

সংস্কারসাধন বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন কারণ বাঙ্গালী পায় নাই।

ইহার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকার কতক পরিবর্ত্তন হয় এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন ভাইস-চান্সেলার নিযুক্ত হয়েন, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থারও কতকটা পরিবর্ত্তন-হইয়াছে। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাবেশিক ও অন্য কয়টি পরীক্ষায় বাঙ্গালী শিক্ষার্থীর পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা অবশ্য পাঠ্য বিষয়ের তালিকাভুক্ত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বেদীগাত্রে লিখিত আছে—তাঁহার বিরাট কার্য্য—বিমাতার গৃহে মাতার স্থান-নির্দ্ধারণ। এই উক্তি লইয়া আশুতোষ চৌধুরী যে বিদ্রূপোক্তি করিয়াছিলেন, তাহাও অনেকে জানেন। চৌধুরী মহাশয় বিমাতার গৃহে মাতার একটু স্থানের ব্যবস্থা করা বিরাট কার্য্য বা কীর্ত্তি বলিয়া বিবেচনা করিতে সম্মত হয়েন নাই; মাতার গৃহে বিমাতাকে স্থান দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু বেদীগাত্রে যাহা উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা যে ভাবেই কেন লিখিত হইয়া থাকুক না, তাহাতে যে প্রকৃত অবস্থাই ব্যক্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। কারণ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সে সময়েও বাঙ্গালাকে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা তাহার প্রাপ্য অধিকার ও মর্য্যাদা প্রদান করেন নাই। বিদেশী ভাষাটিকে পূর্ব্ববৎ শিক্ষার বাহন রাখিয়া তাঁহারা কেবল বাঙ্গালাকে অবশ্যপাঠ্য অতিরিক্ত ভাষা করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালায় যেটুকু ব্যুৎপত্তিই পরীক্ষায় সাফল্যলাভের জন্য যথেষ্ট বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক কলেজে বাঙ্গালা পড়াইবার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

বি-এ পরীক্ষায়ও প্রায় তিনিখানি মাত্র পুস্তক পাঠ্য করিয়া নির্দ্ধারিত হয়—তাহার মধ্যে একখানি উপন্যাসও থাকে। যাঁহারা বাঙ্গালায় পরীক্ষার্থীদিগের উত্তরপত্র পরীক্ষার বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহারাই মনে করেন—শিক্ষার্থীদিগের শতকরা প্রায় পচাত্তর জন পাঠ্যপুস্তক-ত্রয় পাঠও করে না—পূর্ব্বে যে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে বাঙ্গালায় যে ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন হইত, বর্ত্তমানে বি-এ পরীক্ষাতেও তাহা প্রয়োজন হয় না; অথচ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ছাত্ররা ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর উপরে স্থান পাইত না।

সুতরাং বলা যাইতে পারে, বিমাতার গৃহে জননী বঙ্গভাষা যে স্থান পাইয়াছেন—সেই দয়াদত্ত স্থানে তাঁহাকে নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবেই বাস করিতে হইতেছে; তাহাতে তাঁহার পক্ষে যেমন কোনরূপ স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ লাভ অসম্ভব, বাঙ্গালী ছাত্রের পক্ষেও তেমনই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কখনই নাই।

এই অবস্থায় বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা হইয়া থাকিতে পারে, ভাষার ও সাহিত্যের প্রকৃত পুষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় নাই—যাইতে পারেও না। শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা যতদিন শিক্ষার বাহন না হইবে, ততদিন শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ এবং আনন্দের সহিত শিক্ষালাভও ঘটিবে না।

বাঙ্গালা দেশে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা যদি আংশিক-রূপেও ফলবতী হইত, তাহা হইলে, বোধ হয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে, আত্মরক্ষার জন্যও, শিক্ষার্থীকে তাহার মাতৃ-ভাষায় শিক্ষাপ্রদানরূপ আবশ্যক ব্যবস্থায় অবহিত হইতে হইত। কিন্তু বাঙ্গালার নেতৃগণ সে দিকে আবশ্যক মনোযোগ প্রদান করেন নাই; বিদেশি-শাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ও আপনার প্রচলিত পদ্ধতিতেই অবিচলিত রহিয়া গিয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে এ বিষয়ে কোনরূপ সাহায্য-লাভের আশা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার প্রধান কারণ, এই বিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান এসিয়াটিক সোসাইটীর অনুকরণ করিয়া চলিয়াছেন। বর্ত্তমানে থাকিয়াও পরিষদের দৃষ্টি অতীতে নিবদ্ধ। ঈশপের গল্পে আছে—

> কোন জ্যোতির্বিদ প্রতিরাত্রিতে নক্ষত্র লক্ষ্য করিবার জন্য গৃহের বাহিরে যাইতেন। এক রাত্রিতে তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া নগরের বাহিরে যাইতে যাইতে কূপে পতিত হইয়াছিলেন। তাহার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া এক জন লোক তথায় উপনীত হইয়া সব শুনিয়া বলেন, "আপনি আকাশের রহস্য ভেদ করিতে ব্যস্ত, কিন্তু পদতলে যে-সব সাধারণ দ্রব্য রহিয়াছে, সে সকল লক্ষ্য করেন না।"

পরিষদের কার্য্য সম্বন্ধে আমরা তাহা বলি না এবং পরিষৎ যে সকল উপকরণ সংগ্রহ ও যে গবেষণা উৎসাহিত করিতেছেন, তাহার গুরুত্বও অস্বীকার করি না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য আন্দোলন যদি পরিষদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে তাহা ঐ প্রতিষ্ঠানের

উদ্দেশ্যবহির্ভূত হইবে না এবং তাহাতে বাঙ্গালীর শিক্ষারও সুবিধা হইবে।

বাঙ্গালা যদি শিক্ষার বাহন হয়, তবে বাঙ্গালী শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের উপায় সরল এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে। তাহা যেমন অসামান্য লাভ, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে যে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য পুষ্টি লাভ করিবে, তাহাও সামান্য লাভ হইবে না।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে আমরা একবার বলিয়াছিলাম, তিনি ও তাঁহার ন্যায় মৌলিক গবেষণাকারী বাঙ্গালীরা যদি তাঁহাদিগের গবেষণাফল বাঙ্গালায় লিপিবদ্ধ করেন, তবে বিদেশের বৈজ্ঞানিকরা বাঙ্গালা শিখিতে বাধ্য হইবেন। তাঁহারা যে অনায়াসে গবেষণাফল বাঙ্গালায় লিপিবদ্ধ করিতে পারেন, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহমাত্র নাই।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইংরাজী আর ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া বিবেচিত হইবে কি না, সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্র এক দিন লিখিয়াছিলেন :—

"এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে. সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজীতে না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি, এক মত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম কেবল ইংরাজীর দ্বারা সাধনীয়; কেন না, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজী ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।"

কিন্তু এই কার্য্যে ইংরাজীর যে উপযোগিতা ছিল, তাহা, বোধ হয় শেষ হইয়াছে। এখন রাষ্ট্রীয় সভায় হিন্দীর ব্যবহার-চেষ্টা চলিতেছে এবং যে বঙ্গদেশে নানা স্থান হইতে হিন্দী ভাষাভাষীরা ব্যবসাব্যপদেশে বাস করিতেছেন, সেই বঙ্গদেশেও হিন্দী-সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে। এই সময় ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া বিবেচিত হইবার যে অধিকার বাঙ্গালার আছে, তাহা যেন উপেক্ষিত না হয়। বাঙ্গালা ভাষা যে বহুদিনের, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাহার পর বাঙ্গালা সাহিত্য যেরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোন সাহিত্য সেরূপ পুষ্টি ও সমৃদ্ধি লাভ করে নাই। বিদেশী সাহিত্যের সহিত পরিচয়ফলেও বাঙ্গালার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং তাহাতেই বাঙ্গালার শক্তির পরিচয় পরিস্ফুট হয়। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের মতানুবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালার এই অধিকার ত্যাগ করিবার কোন সঙ্গত কারণ আমরা পাই না। বাঙ্গালায় বাঙ্গালা ভাষা যদি শিক্ষার বাহন হয়, তবে তাহাও বাঙ্গালার এই অধিকার-প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবে, সন্দেহ নাই।

মানুষের উৎপত্তি ও ক্রমাভিব্যক্তি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

নর-বানরের আদিপুরুষস্থানীয় primate জীব :—

১। Dryopithecus বানর, যার দেহে মানুষের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। (miocene যুগের)

২। Pithecanthropus Erectus (pliocene যুগের)

৩। Sinanthropus (আদি-pleistocene)

৪। Piltdown subman (মধ্য-pleistocene)

৫। Homo Heidelbergensis ,,

৬। Homo Neanderthalensis (শেষ-pleistocene)

৭। Homo Rhodensiensis.

৮। Cro magnards (আসল খাঁটী মানুষ, আবির্ভাব-কাল উর্দ্ধপক্ষে ৪০০০০ বৎসর)

Dryopithecus নামক বানরে মনুষ্যদেহসাদৃশ্য প্রথম পরিস্ফুট হ'তে আরম্ভ হয়, তার পর ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করতে করতে রোডেশীয় মানুষে বানরাকৃতি খুব কমে আসে। তার-পর cro magnard মানুষে বানর-চিহ্ন সব মুছে যায় এবং এই cro-magnard মানুষ হতেই প্রথম true man আরম্ভ হয়। সুতরাং আসল খাঁটী মানুষের বয়স উর্দ্ধপক্ষে ৪০০০০ বৎসর।

মানুষ যে অন্যান্য সৃষ্ট জীবের সঙ্গে রক্তের সংযোগে সংবদ্ধ, অভিব্যক্তির বিধিবলে ইতর অন্য জীব হ'তে রূপান্তর লাভ করে' বর্ত্তমান মূর্ত্তি সে লাভ করেছে এবং বানর বংশের ভিতর দিয়েই যে তার অভিব্যক্তি ঘটেছে, তার এক রকম প্রমাণ ভূস্তর হতে লুপ্ত-জীবের fossil হতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকারের প্রমাণ মানুষের দেহেই পাওয়া যায়।

এক ভাবে মানুষের দেহটা বাতিল দেহ-যন্ত্রের (vestigal organs) museum স্বরূপ। মানবদেহে এমন সব যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ আছে, যেগুলার এখন আর কোনো ব্যবহার নাই, কোনো কাজেই লাগে না, কিন্তু এক কালে খুব কাজে লাগতো। এইসব বাতিল শরীরযন্ত্রের কতকগুলা আমাদের আদিম বানরত্বের পরিচয় দেয়, বাকীগুলা আরো আদিম কালের ইতর জীবদের সঙ্গে এক-বংশত্বের খবর জানিয়ে দেয়।

জনৈক পাশ্চাত্য anatomist বলেন যে, আমাদের দেহে কমপক্ষে ১৮০টা vestigal organ, বাতিল অকেজো যন্ত্র আছে। ঈশ্বর-সৃষ্টিবাদীদের পক্ষে সব-সে-সেরা সৃষ্ট জীব-দেহে এইরূপ বাজে দেহ-যন্ত্র-বোঝার মর্ম্ম বোঝানো খুব কঠিন। একমাত্র evolution মতের দ্বারাই এদের অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

মানুষের দেহে এই যে হাজার হাজার চুল এদের আর কোনো সার্থকতা নাই। মানুষ যখন আর ঠাণ্ডা রক্তের জীব নয়, তখন শরীরের উত্তাপরক্ষার জন্য এত চুলের দরকার নাই। প্রত্যেক চুলটীকে খাড়া করে তোলবার জন্য একটা করে পেশীর প্রয়োজন হয়েছিল, এখনও তাকে অকারণ হাজার অকেজো পেশী বহন করতে হচ্ছে। কোনো কোনো ভাগ্যবান পুরুষ কাণের পাতাটা নাড়তে পারে; কিন্তু মানুষ এখন তা পারে না; অথচ তার চতুষ্পদ পূর্ব্বপুরুষরা কাণ নাড়তে পারতো; বনেজঙ্গলে বিপদসঙ্কুল জীবন নির্ব্বাহ করতে সন্দেহজনক শব্দ হলেই চতুষ্পদকে কান খাড়া করে দিক নির্ণয় করতে হতো। চোখের কোণে একটা লাল বর্ণের পাতলা পেশী আছে; এটীকে এখন আর বার করে এনে চোখ ঢাকবার ক্ষমতা আমাদের নাই; কিন্তু চতুষ্পদদের মধ্যে এটা ছিল third eyelid, চোখের তৃতীয় পরদা; বেড়ালরা এইটে দিয়ে আলোর প্রবেশ কম-বেশী করতে পারে। বানর-দের চোখে এটা আমাদেরই মত অকেজো যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। আক্কেল-দাঁতটা একটী অকেজো দেহ-যন্ত্র; কাজের মধ্যে এখন তার যাতনার ঠেলায় আক্কেল জন্মায়।

ভ্রূণাবস্থায় মানবশিশুকে নয় মাস গর্ভবাস-কালের মধ্যেই অভিব্যক্তির পূর্ব্ব ইতিহাসটা একবার আউড়ে নিতে হয়। জীবাণু, মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, চতুষ্পদ বানব এই কয় জাতীয় জীবের দেহ-লক্ষণ ভ্রূণ-দেহে পর পর দেখা দেয় এবং অল্পকাল থেকে অদৃশ্য হয়, শেষে মানুষ রূপটাই দাঁড়িয়ে যায়। Gill-cleft (কানাচি), লোম, ল্যাজ প্রভৃতি সব চিহ্নই ভ্রূণ-দেহে

পর পর ফুটে উঠে। বানরের পায়ের বুড়া আঙ্গুলটী opposable, অর্থাৎ অন্য আঙ্গুলের সঙ্গে তাকে ঠেকানো যায়, যেমন হাতের বুড়া আঙ্গুলটীকে পারা যায়। নবজাত শিশুর পায়ের বুড়া আঙ্গুলটীর ভঙ্গী বানরেরই মত ভঙ্গীযুক্ত, বয়স হলে থাকে না। শিশুর হাতের ও কব্জীর ধারণ-শক্তি grasping power অসম্ভব বেশী। একটা কিছু (যেমন rod) ধরিয়ে ছেড়ে দিলে বেশ ঝুলতে পারে। বানরের arboreal life এর স্মৃতিস্বরূপ এই ব্যাপারটা পূর্ণগঠিত নরদেহে এই সব vestigal যন্ত্র ও ভ্রূণাবস্থায় ইতর জীবের দৈহিক ধর্ম্মের পুনরাভিনয় হতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মানুষের উৎপত্তি অন্যান্য জীবের মতই evolution বিধিবলে নিম্ন জীব হতেই হয়েছে। নিতান্ত গর্ব্বান্ধতা ও মিথ্যা ধর্ম্মগত কুসংস্কার ছাড়া মানুষ এত বড় সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না।

মানুষের সঙ্গে বনমানুষের রক্তের নিকট সংযোগের আর একটা খুব জবর রকমের প্রমাণ সম্প্রতি বার হয়েছে। প্রমাণটা রক্ত-পরীক্ষার (blood test) উপর নির্ভর করছে। Dr. Nuttal এই পদ্ধতির আবিষ্কর্ত্তা। কোনো এক species জীবের রক্তে একটী দ্রব্যবিশেষ মেশালে এক-প্রকার প্রতিক্রিয়া হয়; একই জাতীয় দুই জীবের রক্তে একই প্রতিক্রিয়া হবে; জীবদুটীর বংশ-সম্বন্ধ যত নিকট হবে রক্তে প্রতিক্রিয়া ততই এক রকম হবে; কিন্তু বংশ-সংযোগ দুইজীবের যত দূর হবে অর্থাৎ জীবদুটা যতই ভিন্নগোত্র হবে, রক্তে প্রতি-ক্রিয়া ততই তফাৎ হবে। মানুষের ও বনমানুষের রক্তে প্রতিক্রিয়া প্রায় সম-সমান।

বিশেষ বিশেষ রোগসম্বন্ধেও বানরের ও নরের দেহে রোগপ্রবণতা ও রোগলক্ষণ একই।

এই সব প্রমাণের দ্বারাই পণ্ডিত সমাজে এই সিদ্ধ গৃহীত হয়েছে যে মানুষ ও বনমানুষ সম্বন্ধে খুড়তুতো জ্যেঠতুতো ভাইএর মত। উভয়েই এক আদিম আধা-নর আধা-বানর জীব হতে উৎপন্ন। এর পরে জিজ্ঞাস্য হতে পারে যে এই আদিম বানর-জীব (ancestral ape) পূর্ব্বগামী কোন্ শাখা হতে উৎপন্ন। বানর (ape) ও হনুমান এ দুয়ের সম্বন্ধ খুবই নিকট। হনুমান (tailed monkey) দুই শ্রেণীর, old world বা এশিয়ার হনুমান ও new-world বা আমেরিকার হনুমান; এর মধ্যে old world হনুমানই বানরের সঙ্গে নিকটতর সম্বন্ধ যুক্ত। নরবানরের পূর্ব্বপুরুষ ও হনুমান বংশ আরো এক সুদূরবর্ত্তী জীববংশ হতে উৎপন্ন। জীববিদ্যাবিদ্‌রা বলেন যে primate শাখার সব নীচের আদিম জীব হচ্ছে lemuroids অর্থাৎ লেমুরী জানোয়ার: lemur এক শ্রেণীর শাখাবিহারী জীব; দেখতে আধা-হনুমানের মত; এই জন্যই লেমুরকে primate বা প্রধান স্তন্যপ বংশভুক্ত করা হয়েছে।

Lemur হনুমান হতে গড়নে, আয়তনে ও বুদ্ধিশক্তিতে অনেক কম; তা হলেও দেহের গঠনের plan বিচার করে lemurকে সবাই একমত হয়ে primate শ্রেণীতে ফেলেছেন। আসলে lemur বর্গীয় জীব হতেই যে হনুমান বংশ উৎপন্ন তার ভুল নাই।

স্তন্যপায়ী জীববংশ যখন প্রাধান্য লাভ করতে থাকে তখন নানা রূপ ও মূর্ত্তি নিয়ে বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়। এই সব শাখাপ্রশাখাকে বিজ্ঞানের ভাষায় order (বর্গ) ও genus (গণ) বলে। সর্ব্বপ্রথম যে কয়টা 'বর্গ' দেখা যায় তার মধ্যে insectivore বা কীটভুক বলে একটা 'বর্গ' উৎপন্ন হয়। এই কীটভুকদের মধ্যে ছুঁচো ধরণের এক রকম চতুষ্পদ জীব দেখা যায়; এদের বলা হয় shrew; এই সব shrew বৃক্ষবাসী; এই shrew দেরই মত এক শ্রেণীর জীব হতে lemur দলের জীব দেখা দেয়; lemur বর্গীয় আধ-বানুরে জীব অনেক রকমের; এদের মধ্যে spectral tarsier নামক এক জীবজাতি ছিল; tarsier এক আশ্চর্য্যজনক জীব; lemur দলভুক্ত হলেও এরা lemur হতে অনেক অংশে ভিন্ন লক্ষণযুক্ত। লেমুরী জীব চোখের চেয়ে ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের উপর বেশী নির্ভর করতো, tarsierএর দর্শনেন্দ্রিয় হল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের চেয়ে প্রবল ও বেশী কার্য্যকরী। লেমুরী জীব মুখ দিয়ে খাবার তুলে খায়, tarsier হাতের (fore limb) সাহায্যে খাবার খায়। Tarsier এপাশ ও পাশ দেখতে হলে ঘাড় ফেরাতে পারে, লেমুররা তা পারে না।

Tarsierদের stereocopic দর্শন-শক্তি জেগেছে। এ একটা অভিব্যক্তির উর্দ্ধমার্গের মস্ত ধাপ্। দুই চোখের দুই রেটিনার ছাপ হতে একটা বস্তুর দৃষ্টিজ্ঞান হওয়াকে stereoscopic জ্ঞান লাভ করা বলে। চোখের রেটীনায়

(অক্ষিপটে) yellow spot গড়ে ওঠা মানুষ, বানর, হনুমান ও এই tarsier ছাড়া অন্য জীবে এখনো হয় নি। Yellow spot না থাকলে কোনো বস্তুর ছাপ রেটিনাতে স্পষ্ট রূপ ধরে না, কোনো জিনিস স্পষ্টভাবে দেখা যায় না; বস্তুটা ঝাপসা ঝাপ্‌সা দেখায়। Yellow spot যে-জীবের retinaতে দেখা দিয়েছে তার ভাল করে দেখবার শক্তি বেড়েছে, এবং তারা স্পষ্ট করে দেখতে পায় বলে বস্তুতে মনঃসংযোগপূর্ব্বক দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার আগ্রহ তাদের বৃদ্ধি পায়।

প্রাণীরাজ্যে যে জীবের চক্ষুযন্ত্র প্রধান জ্ঞানেন্দ্রিয় হল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, fore limb পায়ের কাজ ছেড়ে 'হাতে' পরিণত হল, stereoscopic দৃষ্টিজ্ঞান লাভ করলো, ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে শিখলো, ক্রমোন্নতির পথে তার স্থান কত উচ্চে তা সহজেই বোঝা যায়।

মাথার কাজ বাড়লেই মস্তিষ্ক বাড়ে। বৃক্ষবাসী জীবদের জীবন-যুদ্ধের প্রতিযোগিতায় কত বিবিধ গুণ ও শক্তি লাভ করতে হয়—ক্ষিপ্রতা, সাবধানতা, দ্রুতগতি, অগ্রপ্রত্যঙ্গ বা হাতে ধরবার শক্তি, আঙ্গুলগুলার সূক্ষ্ম ব্যবহার, এই সব নানা গুণ ও শক্তির ক্রমিক অনুশীলনে স্বভাবতঃই মস্তিষ্কের grey matter বাড়ে, আয়তনও বাড়ে; তার উপর যদি চোখের পূর্ব্বোক্ত দুই নূতন গুণ (yellow spot ও stereoscopic দৃষ্টি) যোগ হয় এবং হাত prehensile (ধারণ) যন্ত্র হয় তা হলে মস্তিষ্কের পুষ্টি ও বৃদ্ধি কত দ্রুত হয়। Tarsier দেখতে আধবান্দরে বা নেউল ধরণের ক্ষুদ্রজীব হলেও মস্তিষ্কের বিকাশে higher primateদের সুদূর পূর্ব্বপুরুষ স্থানীয় হবে তার আশ্চর্য্য কি? নর ও বানর (ape) দুয়েরই পূর্ব্বপুরুষ বানরবৎ জীব তার ভুল নাই; কিন্তু শাখাবিহারী বানরবৎ কি করে, কি অবস্থায় পড়ে দ্বিপদ বুদ্ধিমান আধামানুষ (subman) ও পুরা মানুষে অভিব্যক্ত হল? পণ্ডিতরা যুক্তিসাহায্যে অনুমান করেন যে উভয়ের পূর্ব্বপুরুষ স্থানীয় আদি বানর (ancestral apes) এক সঙ্গে অরণ্যেই বাস করতো, তখন তাদের জীবন-প্রণালী ছিল বর্ত্তমান বনমানুষদেরই মত।

প্রতিকূল অবস্থায় পড়লে জীব পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চললে তবেই বাঁচে; যারা পারেনা তারা হয় লোপ পায়, না হলে পালিয়ে গিয়ে পূর্ব্ববৎ অবস্থাতেই যায়, না হয় তার অধোগতি হয় (reprogression)।

নব মহাযুগের অন্তর্গত oligocene গর্ভযুগের মাঝামাঝি সময়ে বানর ও নর এই দুই শাখা দু' দিক দিয়ে দু' পথে চলে যায়।

Eocene গর্ভযুগ হতেই পৃথিবীর জল-বাতাস একটু একটু করে ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ হয়েছে, miocene ও pliocene যুগ ধরে এই শীতবৃদ্ধি বাড়তে থাকে। Pleistocene বা ice age, হিম যুগ এলে এই শীত অতি মাত্রায় বাড়ে ও সমস্ত ভূখণ্ডের উত্তরার্দ্ধ প্রায় সমস্তটা গভীর তুষার আবরণে ঢাকা পড়ে যায়।

এই শীতের প্রভাববৃদ্ধির একটা ফল হল পৃথিবীর পৃষ্ঠে অরণ্যের কমৃতি ঘটা। রসা ইষতুষ্ণ জল-বাতাসেই গাছপালা বাড়ে বেশী। শুষ্ক ঠাণ্ডা জল-বাতাস উদ্ভিদবৃদ্ধির বিঘ্নকর। ভূপৃষ্ঠে যখন বনজঙ্গলের প্রসার ও বাহুল্য কমে আসতে লাগলো তখন বৃক্ষবাসী বানরদের স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনে বাধা পড়লো। অনেক বানরদলকে বাধ্য হয়ে মাটীতে খোলা মাঠে বাস করতে বাধ্য হতে হলো। অর্থাৎ জীবন-যাপনের জন্য নূতন করে নূতন নূতন অভ্যাস গড়ে তুলতে হলো; শরীর ও মনের উপর বেশী করে উপায় উদ্ভাবনের ঝাঁকি পড়লো। অবস্থায় পড়ে ব্যবস্থা করতে হয়; ব্যবস্থা করতে গেলে বুদ্ধির দরকার হয়, পুরাণো অভ্যাস বদলাতে হয়, নূতন অভ্যাস অর্জ্জন করতে হয়। যে-সব বানর শীতের প্রকোপ হতে উদ্ধার পাবার জন্য অরণ্যবিরল দেশ ছেড়ে দক্ষিণ ভাগে অরণ্য-বহুল স্থান খুঁজতে বার হলো সেই সব ভিন্নদেশ-প্রবাসী বানরদের বংশাবলী হচ্ছে—বর্ত্তমান বনমানুষরা। আর যে সব বানর পৈতৃক ভূমিতেই বৃক্ষবাস ছেড়ে ভূমিবাস গ্রহণ করলে তাদেরই বংশধররা পরবর্ত্তী কালে ape men ও submen, বানর-মানুষে বা আধা-মানুষে রূপান্তরিত হ'ল।

উপযুক্ত খোলা প্রান্তরে বাস করা গৃহহীন, বৃক্ষবাসে অভ্যস্ত জীবের পক্ষে একটা নূতন কঠিন পরীক্ষা। শাখা ধরে লাফালাফিতে অভ্যস্ত বানরকে চলা-ফেরা ও দৌড়াদৌড়ি করা শিখতে হল; বাঁকা-পা সোজা করতে হল; হাতকে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পটু করে তুলতে হল; সুলভ ফল-ভোজন ব্যবস্থা ছেড়ে সর্ব্বভুক হতে হলো; হিংস্র জন্তু হ'তে আত্মরক্ষা

করবার জন্য ঘরের সন্ধানে বুদ্ধি খাটাতে হলো ; খাদ্যসংগ্রহের জন্য শীকারী হতে হল ; শত্রুবিজয়ের জন্য যন্ত্র-গঠন-কৌশল আবিষ্কার করতে হলো ; এই সব বিবিধ আশু প্রয়োজন-সাধনের জন্য মাথা চালাতে থাকায় বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ ও দৈহিক গঠনের রূপান্তর ঘটতে থাকলো। এই সব অবস্থায় পড়ে আদিম বানরদের যারা যে-পরিমাণে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কৃতকার্য্য হল তারা ততই মনুষ্যত্বলাভের দিকে অগ্রসর হল। ভিন্ন ভিন্ন বানরেরা ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় উন্নতি লাভ করতে লাগলো ; ফলে এক আদিম বানর জাতি হতে বহু জাতীয় উপমানুষ (tentative man—hominoid) দেখা দিল।

যবদ্বীপীয় pithe canthropus (বানর-নর) pilt-down উপমানুষ ; heidelberg অর্দ্ধ মানুষ ; neander-thal প্রায়-মানুষ প্রভৃতি নানা 'নরগণ' (genus) ও নর জাতি (species) দেখা দিল।

এই সব আদিম উপমানুষের আরণ্য ও প্রান্তর জীবন, জীবন-যুদ্ধের কাহিনী কি ভয়ানক ও কি অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় ছিল, তার পরিচয় যদি কেউ পেতে চান তা হলে প্রসিদ্ধ কাহিনী লেখক Jack কর্ত্তৃক Before Adam গ্রন্থ পড়বেন ; যদিও চিত্রটা কাল্পনিক তা হলেও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লেখা।

কোথায় প্রথম বনমানুষ অবস্থা হতে খাঁটী মানুষের উৎপত্তি-ব্যাপার ঘটে ? Old world এর প্রাচ্য ভূখণ্ডেই বনমানুষ ও হনুমানদের বাসস্থান ; এই কারণ ব্যতীত অন্যান্য কারণে নৃতত্ত্ববিদরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে মধ্য আশিয়ার উচ্চ ভূমিতেই প্রথম বনমানুষ ও মানুষের দুই শাখাভেদ হয়। কেউ কেউ আফ্রিকাকে মানবজাতির জন্মভূমি বলে।

মায়োসীন গর্ভযুগ আরম্ভ হয় প্রায় ২ কোটী বৎসর আগে। প্লিয়োসীন গর্ভযুগ আরম্ভ হয় ১ কোটী বৎসর পূর্ব্বে। হিমযুগ (pleistocene) আরম্ভ হয় ৫ লক্ষ বৎসর আগে। মানুষের ও বনমানুষদের দুই প্রশাখা আদিশাখা হতে বার হয়ে যায় মায়োসীন কালের শেষ দিকে। Pithecanthropus নামক অর্দ্ধ নর-বানর (যাকে misssng link বলে) দেখা দেয় pliocene যুগের শেষ দিকে অন্ততঃ দশ লক্ষ, মতান্তরে ছয় লক্ষ বৎসর আগে।

বানর হতে মানুষ হওয়ার মাঝামাঝি অবস্থার জীব হচ্ছে pithecanthropus (বানর-নর) ; তারই উদ্ভবকাল যদি ছয় সাত লক্ষ বৎসর হয়, তা হলে পূর্ব্বোক্ত সব উপমানুষ, আধা-মানুষ এদের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সমস্তই ঘটেছে সমগ্র pleistocene বা হিম যুগের মধ্যেই। খাঁটী মানুষ homo sapiensএর বয়স জোর ২০ হাজার বছর। অর্থাৎ হিম যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই উপ বা অর্দ্ধ মানুষদের (ten-tative men) জীবলীলা শেষ হয়ে গেল ; বাল্য অন্তে যেমন যৌবনের উদ্গম, তেমনি উপমনুষ্যত্ব হতে খাঁটী মনুষ্যত্ব (biological অর্থে) homo sapiens-ত্ব লাভ হল।

পৃথিবীর বয়সের তুলনায় প্রাণীজাতির বয়স প্রায় অর্দ্ধেক মাত্র ; প্রাণীজাতির বয়সের তুলনায় মানবজাতির বয়স 'মুহূর্ত্ত' মাত্র !

পৃথিবীর জন্ম অনুমান ২০০ কোটী বৎসর আগে।

প্রথম প্রাণীর আবির্ভাব অন্ততঃ ১০০ কোটী বৎসর আগে।

প্রথম মৎস্যের আবির্ভাব প্রায় ৩০ কোটী বৎসর আগে।

প্রথম পাখীর উৎপত্তি প্রায় ১২ কোটী বৎসর আগে।

প্রথম স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব অন্ততঃ ৯ কোটী বৎসর আগে।

উচ্চবংশীয় স্তন্যপ দেখা দেয় অন্ততঃ দেড় কোটী বৎসর আগে।

আসল খাঁটী মানুষের আরম্ভ হয় ২০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে।

যতগুলা মূল জীবনবংশ আজ ধরিত্রীর বুক ভরে আছে মানুষ তাদের সব চেয়ে কনিষ্ঠ ভাই, মানুষ-জীব এখনো তার সূতিকা-ঘর ছেড়েই বার হয় নি ! কিন্তু এই কয় দিনের মধ্যেই সে জ্ঞানে, গুণে, বিদ্যাবুদ্ধিতে এতটা উৎকর্ষ লাভ করেছে। এখনো তার সম্মুখে কোটী কোটী বৎসরের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে বিস্তৃত রয়েছে।

প্রাণীতত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখলে নবজাত মানুষের দেহে এখনো তার পশুজন্মের ছাপ স্পষ্ট হ'য়ে রয়েছে কিন্তু পশুমার্কা দেহের ভিতর যে দেবতা জেগে আছে তার অপূর্ব্ব আভাষ ইতিমধ্যেই আশ্চর্য্য করে তুলছে। নিদ্রিত নারায়ণ যুগের পর যুগ ধরে মৎস্য (fish) কূর্ম্ম (reptiles) বরাহ (mammal quad-ruped) বামন (ape man) পরশুরাম (sub-man) প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ক্রমবিকশিত হয়ে শেষে রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধত্বে উপনীত হয়েছে। মোটে মহৎ ব্রহ্মের ১ পাদ প্রকট, এখনো তিন পাদ অপ্রকট।

বিজ্ঞানের বাণী আশা ও আশ্বাসের বাণী। দেহটা সাপ ব্যাং বানরের হউক, তার আত্মাটা স্বয়ং পরব্রহ্ম।

ভারতে জাতীয় আন্দোলন

বাঙ্গালীর নেতৃত্ব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

হিন্দুমেলার সহিত কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ঠাকুর পরিবারের জাতীয় আচার ব্যবহার ও বেশ সম্বন্ধে অনুরক্তি সকলেই অবগত আছেন। ঠাকুর পরিবারের ক্রিয়াকর্ম্ম ব্রাহ্মমতে পরিচালিত হইলেও তাহাতে যথাসম্ভব জাতীয় প্রথা থাকিত; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাহা লইয়াই কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির মতভেদ হয় এবং মতভেদফলে ব্রাহ্মদিগের নূতন সমাজ—নববিধান গঠিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের "জয় ভারতের জয়" মেলায় গীত হয় এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই মেলায় জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা রচনা করিয়া পাঠ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দুইখানি নাটকও জাতীয় ভাবাপ্লুত।

হিন্দুমেলা সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, তিনি মেদিনীপুরে থাকিবার সময় যে জাতীয় গৌরবেচ্ছাসঞ্চারিণী-সভার প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার অনুষ্ঠান-পত্র পাঠ করিয়া নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের মনে হিন্দুমেলার কল্পনা সমুদিত হয়। তবে মেলার কল্পনা মিত্র মহাশয়ের। জাতীয় গৌরবেচ্ছাসঞ্চারিণী-সভা সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন:-

> "হাইকোর্টের জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, যদি উক্ত সভা সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে তিনি তাহার সভাপতি হইবেন। এই পুস্তিকা (সভার অনুষ্ঠানপত্র---Prospectus of a Society for the promotion of National Feeling among the educated natives of Bengal) হইতে বান্ধববর নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার ভাব পান। তিনি ঐ মেলা ও তৎপরে জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন।"

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ সিপাহী বিপ্লবের দশ বৎসর পরে, প্রথম হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান হয়। সিপাহী বিপ্লবকে স্থানীয় ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান মাত্র বলা যায় না; তাহা দেশে বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাহার মূলে চক্রীদিগের বিরাট চেষ্টা ছিল। তবে তাহা জাতীয়ভাবোদ্ভূত দেশবাসীর স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা বলা যায় না; কারণ, তখন সে ভাবের যেমন অভাব ছিল—মুক্তির ধারণাও তেমনই সুস্পষ্ট ছিল না। কিন্তু সেই বহ্নি নির্ব্বাপিত হইবার এত অল্পদিন পরেই যে বঙ্গদেশে হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতেই ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে পরিপুষ্ট জাতীয় ভাবের দ্রুত গতি বুঝিতে পারা যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মেলার যে অধিবেশন হয়, রাজনারায়ণ বাবু তাহাতে সভাপতি হইয়াছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'আমার বাল্য-কথা' পুস্তকে লিখিয়াছেন:—

> "আমি বোম্বায়ে কার্য্যারম্ভ করবার কিছু পরে কলিকাতায় এক 'স্বদেশী' মেলা প্রবর্ত্তিত হয়। বড়দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা (গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর) তাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হ'ল। কলিকাতার প্রান্ত-বর্ত্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসরে বৎসরে তিন চারি দিন ধ'রে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিষের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত, বক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করা হ'ত। এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন, আর সেই মেলাই আমার ভারত-সঙ্গীতের জন্মদাতা:—
>
> মিলে সব ভারত-সন্তান
>
> একতান মনপ্রাণ,
>
> গাও ভারতের যশোগান।"

রাজনারায়ণ বাবুর সংক্ষিপ্ত উক্তিতে বুঝিতে পারা যায়, হিন্দুমেলা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন দেশে জাতীয় ভাবোদ্দীপন-চেষ্টা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং তাহার অনুকূল অবস্থাও সৃষ্ট হইয়াছিল। হিন্দুমেলা বিচ্ছিন্ন ও বিস্ময়কর অনুষ্ঠান মাত্র নহে; পরন্তু তাহাই পরবর্ত্তী রাষ্ট্রীয় মহাসভার আরম্ভ বলা যায়। আবার সত্যেন্দ্রনাথের উক্তিতে বুঝা যায়, এই মেলা দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে বিশেষরূপ আকৃষ্ট করিয়াছিল। যাঁহারা বঙ্গদেশে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, কংগ্রেসের মত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের কার্য্যও প্রথমে ইংরাজীতে পরিচালিত হইত। যাহাতে বিদেশী শাসকগণ তাহার কার্য্যবিবরণ পাঠ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই কার্য্য পরিচালিত হইত। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে

কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতেই প্রথম বাঙ্গালায় বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোমোহন ঘোষ বলেন, ইংরাজ যতদিন না বুঝিবে যে, দেশের জনসাধারণ আমাদিগের সঙ্গে আছে, ততদিন তাহারা আমাদিগকে রাজনীতিক অধিকার প্রদান করিবে না—সুতরাং জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য প্রত্যেক প্রস্তাবে এক জন বক্তা বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিবেন। দেশের ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রাজনীতিচর্চ্চা তখনও কেবল "আবেদন আর নিবেদন থালা" বহন করা—আত্মশক্তির অনুশীলন দ্বারা জাতির জন্মগত অধিকারলাভের কথা তখনও তাঁহাদিগের চিত্তে স্থান পায় নাই। ইংরাজ এ দেশে রাজ্যলাভ করিয়া প্রথমে ভূস্বামি-সম্প্রদায়ের সহিত সংযোগ দ্বারা দেশে প্রভুত্ব করিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পরে দেশের ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত সখ্য-স্থাপন-চেষ্টা করেন। যদিও কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউম লিখিয়াছিলেন, "আপনাদিগের চেষ্টায় অর্থাৎ লোকের আত্মচেষ্টায় জাতি গঠিত হয়"—তথাপি জাতিগঠনকার্য্যের স্বরূপ তখনও ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট প্রতিভাত হয় নাই এবং তাঁহারা স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য ব্যাকুলতাও প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদিগের দৃষ্টি ইংরাজের দপ্তরের দিকেই নিবদ্ধ থাকিত এবং দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের ও জনগণের মধ্যে প্রভেদ দূর না হইয়া ঘটনাচক্রে বিবর্দ্ধিতই হইতেছিল।

এই বিষয়ে হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠাতৃগণ কংগ্রেসের পরিচালকদিগের অগ্রগামী ছিলেন। তাঁহারা দেশের যে প্রতিষ্ঠানে যুগযুগান্তর হইতে শিক্ষিতে ও অশিক্ষিতে ভাববিনিময় হইয়া আসিয়াছে, সেই মেলার সাহায্যে দেশের সকল সম্প্রদায়কে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উল্লেখিত পুস্তকে সত্যেন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"তিনি (নবগোপাল বাবু) হিন্দুস্কুলে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, স্কুল ছেড়ে আমাদের সহকর্ম্মী হ'লেন ; আমাদের মধ্যে প্রণয় ও ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়ল, তিনি সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করতে লাগলেন। তিনি ভারি চালাক চতুর, খুব একজন কাজের লোক ছিলেন। তিনি একটা অশ্বশালা খুলেছিলেন, তাকে সবাই বলত নবগোপালের Circus, তাতে আমরা কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়া শিখতে যেতুম। 'Indian Mirror' পত্র যখন আমার পিতৃদেবের হাত হ'তে হস্তান্তর হ'ল, সেই পত্রের প্রতিযোগী 'National Paper' বলে একটা ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র আমাদের বাড়ী থেকে বেরুতে লাগল, নবগোপাল বাবু তার সম্পাদক হয়েছিলেন। * * * * তখনকার কালে নবগোপাল ন্যাশনাল দলের দলপতি ছিলেন। তাঁ'রি নেতৃত্বে জাতীয় মেলা সফলতা লাভ করেছিল ; দুঃখের বিষয়, সে উৎসাহ অধিক দিন স্থায়ী হ'ল না, শীঘ্রই নিবে গেল।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিরূপ খাঁটি স্বদেশী ছিলেন, তাহা যাঁহারা তাঁহার নানা রচনায় মেকী স্বদেশীর প্রতি আক্রমণ পাঠ করিয়াছেন এবং রাজনীতিকদিগের ধূলা লইয়া আবির খেলার প্রতি বিদ্রূপ দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। নবগোপাল মিত্রের ত কথাই নাই। এইরূপ লোকের আন্তরিক চেষ্টাও যে কেন তখন ফলবতী হয় নাই, তাহা বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। তাহার প্রকৃত কারণ—দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ে তখন পরবশ্যতার দুঃখ ও বিপদ অনুভূত হইলেও আত্মশক্তির অনুশীলন দ্বারা স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা তখনও প্রবল হয় নাই।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজরূপে ভারতে আগমন করেন, তখন নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছিলেন :—

"হায়! রাজপুত্র, কি দেখিতে হায়।
পতিতা ভারতে তব আগমন?
ভারতের কীর্ত্তি এবে স্বপ্নপ্রায়,
আসমুদ্র গিরি তোমার স্বজন।"

"তোমার সাহিত্য, তোমার সঙ্গীত,
তোমারই শিল্প, তোমার আচার,
তব সভ্যতায় ভারত প্লাবিত,
ভারতের আহা! কি রয়েছে আর!
ভারতের তন্ত্র নীরব সকল,
দুঃখিনীর লজ্জা রক্ষে মেনচেষ্টার,
লবণাম্বুরাশিবেষ্টিত যে স্থল
জন্মে লিবরপুলে লবণ তাহার!"

ভারতবর্ষ যে আপনার চেষ্টায় এই অবস্থার প্রতীকার করিবে, তাহার কথা কিছুই নাই—

"যাও তুমি আজি ছাড়িয়া ভারত,
কালি বিবসনা বসিয়া দুঃখিনী
নিরশনে, যেন শবোত্থিতবৎ!
হাহাকার শব্দে ফাটিবে মেদিনী।

শাসন যন্ত্র হইবে বিকল,
সভ্যতার যন্ত্র চলিবে না আর,
যন্ত্রীর বিহনে, সকলি অচল !
ঝটিকার পূর্ব্বে যেন পারাবার।"

"পশ্চিম হইতে গরজি গম্ভীরে
বিপ্লব-ঝটিকা করিবে প্রবেশ :
নিরস্ত্র ভারত অরক্ত শরীরে
ভীম উৎপীড়নে হইবে নিঃশেষ।"

তিনি "রাজ-পরশনে" ভারতের "ভস্মমাঝে জীবন সঞ্চার"-এর আশা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, তাহা হইলে

"আসুক রুসিয়া আসুক প্রসিয়া,
আসুক সমগ্র নৃপতি-মণ্ডল,
বৃটিশ পতাকা গগনে তুলিয়া
একাকী ভারত যুঝিবে সকল।"

যে সময় দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশের মনে ইহাই জাতীয় ভাব, সেই সময় যাঁহারা জাতীয়তার প্রচারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দূরদর্শিতা ও দেশ-প্রেম কিরূপ প্রশংসনীয়, তাহা বলা বাহুল্য। ইংরাজীশিক্ষার ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জাতীয় জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের অভাবই প্রধানতঃ সেই উৎসাহ অধিক দিন স্থায়ী না হইবার কারণ। কিন্তু তাঁহারা যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা নষ্ট হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে তাহাই বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার ফলের আস্বাদ দেশবাসীকে জন্মগত অধিকার-লাভের জন্য সর্ব্ববিধ ত্যাগ-স্বীকারের প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছে।

মেলার দ্বারা জনসাধারণের মনে জাতীয় ভাব উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষও করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে তিনি ঝিকারগাছায় (যশোহর) যে অনুষ্ঠান করেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে শিশির বাবুকে বলিয়াছিলেন, বড়লাট লর্ড ডাফরিন অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ঐ মেলার উদ্দেশ্য অতি মহৎ ছিল, কিন্তু দেশের লোকের অবজ্ঞায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। এই অবজ্ঞার প্রধান কারণ, তখন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি ভারতের রাজনীতিক ব্যাপারে নবোদিত জ্যোতিষ্কের মত কংগ্রেসে নিবদ্ধ, তাঁহারা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের ও অনুষ্ঠানের অসাধারণ উপযোগিতা ভুলিয়া গিয়াছিলেন—জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠতার বিষয় বিবেচনা করেন নাই।

কিন্তু এই অবস্থায় যে এক শ্রেণীর লোক জাতীয় ভাবের ভাবুক হইয়াছিলেন, তাহা হিন্দু-মেলাপ্রতিষ্ঠায় প্রতিপন্ন হয়। আর সেই ভাব বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আত্ম-প্রকাশের উপায় সন্ধান করিয়া লইতেছিল। সেই ভাব-বিস্তারের গৌরব বাঙ্গালা ভাষার। সেই সময় পশ্চিম বঙ্গে ও পূর্ব্ব বঙ্গে বহু কবির রচনায় জাতীয় ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছিল। যদি পশ্চিম বঙ্গের এক জন ও পূর্ব্ব বঙ্গের এক জন জাতীয় ভাব প্রকাশক কবির নাম করিতে হয়, তবে আমরা নিঃসঙ্কোচে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও গোবিন্দচন্দ্র রায়ের নাম করিব।

রঙ্গলালের রচনায় সেই—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল, বল, কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায় !
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়।"

কোন্ পাঠক ভুলিতে পারেন ? ইহার উদ্দীপনাও অসাধারণ। রঙ্গলালের এই কবিতার রচনাকাল ১২৫৯ বঙ্গাব্দ। উদ্ধৃত কয় ছত্রে ইংরাজ কর্ত্তৃক বিজিত আয়ার্লণ্ডের কবি মুরের একটি কবিতার ছায়াপাত পরিলক্ষিত হয়—

"From life without freedom, say, who would not fly ?
For one day of freedom, oh ! who would not die ?"

কিন্তু তিনি যে ভাবের ভাবুক হইয়া তাঁহার কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা মুক্তির উপাসক ব্যতীত অন্যের হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে না। এই ভাব কত দিন হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিয়াছে, তাহা রঙ্গলালের কবিতাপাঠে সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

গোবিন্দচন্দ্র নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া ১৮৬৭ কি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় যাইয়া স্থায়ী ভাবে বাস করেন এবং তথায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি পিতার অপ্রীতি অর্জ্জন করিয়া

বাঙ্গলা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—সেই জন্যই কি তাঁহার মাতৃভক্তি দেশমাতৃকার চরণেই অর্ঘ্যরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল? তাঁহার সহোদর ঢাকার প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবী আনন্দচন্দ্র রায় আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সকল কবিতাই জাতীয় ভাবে ওতঃপ্রোত; ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা-দুঃখের অভিব্যক্তি। তাঁহার 'ভারত-বিলাপ' মোগল-সাম্রাজ্যের স্মৃতিশ্মশান আগ্রায় রচিত হয়। এক দিন তাঁহার 'ভারত-বিলাপ' বাঙ্গালার পল্লীপথেও গীত হইতে শুনা যাইত :—

"কত কাল পরে বল, ভারত রে,
দুঃখ-সাগর সাঁতারি পার হ'বে?"

হায় জননী জন্মভূমি, আজ তোমার কি দুর্দ্দশা! তুমি—

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে;
পর দাসখতে সমুদায় দিলে!"

আর—

"পরহাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে,
বহ লৌহবিনির্ম্মিত হার বুকে।"

চারিদিকে যে আলোক লক্ষিত হইতেছে, তাহা যেন তোমার দুর্দ্দশার অন্ধকার আরও গাঢ় করিয়া তুলিতেছে। কারণ, আজ—

"পর দীপশিখা নগরে নগরে;
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

এই গান যে সুদূর আগ্রা হইতে বাঙ্গালায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতেই বুঝা যায়—ইহা বাঙ্গালীর মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিল।

বাঙ্গলা সাহিত্য নূতন রূপ ধারণ করিয়াই জাতীয় ভাবের বাহন হইয়াছিল। মধুসূদন দত্ত দেশান্তরে থাকিয়া চতুর্দ্দশপদী কবিতায় "আমরা" কি হইয়াছি, তাহাই বলিয়াছিলেন :—

"আকাশ-পরশী গিরি দমি' গুণবলে,
নির্ম্মিল মন্দির যাঁ'রা সুন্দর ভারতে,
তাঁ'দের সন্তান কি হে আমরা সকলে?
আমরা—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে—
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে।
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি মরকতে?
ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে? কে ক'বে মোরে? জানিব কি মতে?
বামন দানবকুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল, কি পাপে মোরা কে ক'বে আমারে?
রে কাল পুরিবি কি রে পুনঃ নবরসে
রসশূন্য দেহ তুই? অমৃত আসারে
চেতাইবি মৃতকল্পে? পুনঃ কি হরষে
শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে?"

স্বাধীনতার ধারণা তখনও কল্পনালোক হইতে বাস্তবের রাজ্যে উপনীত হয় নাই। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে যে সব দায়িত্ব অবশ্যই গ্রহণ করিতে হয়, সে সকল বিচারবিবেচনা কবির কার্য্যমধ্যে নহে—তাহা রাজনীতিকের অধিকারভুক্ত। স্বাধীনতা ও শাসন-পদ্ধতি এক নহে—কেবল ইহারা পরস্পরাপেক্ষী। তবে বর্ত্তমান যুগের কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজ রাজনীতিক বলিয়াছেন, সুশাসনও কখন স্বায়ত্ত-শাসনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। আর ইংরাজ যে বলিয়াছেন, এ দেশে দায়িত্বমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্য, তাহাতেও স্বায়ত্ত-শাসনে সকল জাতির জন্মগত অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

বাঙ্গালার কবিরা অন্যান্য দেশের কবির মত আদর্শ বর্ণনা করিয়াছেন। মধুসূদনের পর হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের ও নবীনচন্দ্র সেনের কবিতায় পূর্ব্বোক্ত ভাব দেখা যায়; তবে হেমচন্দ্রের কবিতায় তাহা বিদ্যুতের শিখার ন্যায় সমুজ্জ্বল। তিনি জাতীয়তার "শিখরে দাঁড়ায়ে" দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধরশিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে
স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হও।"

তিনি জাতির দুর্দ্দশায় জীবন্মৃত জাতির মৃত্যু কামনাও করিয়াছিলেন। জীবন্মৃতের জীবনে লাভ কি? পূর্ব্বগৌরবের নিদর্শন কেবল বেদনারই কারণ :—

"মম ভাগ্যদোষে মম জেতৃগণ
কক্ষ বক্ষ ভালে পদাঙ্ক স্থাপন
করিয়া আমার, দুর্গ নিকেতন,
রাখিল মহীতে কলঙ্ক-মণ্ডিত;
কাশী গয়াক্ষেত্র চণ্ডাল-ঘৃণিত,
(শরীরে কালিমা দীনতা প্রতিমা)
ধরণীর অঙ্গে যেন গাঁথিল।"

(ক্রমশঃ)

শিশু-মঙ্গল

লাকুমার মজুমদার

সেদিন সুইজার্লাণ্ডের লেইজিনস্থ ডাঃ লুইস্ ভয়টিয়ের সুপ্রসিদ্ধ যক্ষা-চিকিৎসা-গবেষণার 'স্যানিটোরিয়াম ইউনিভার্সি-টেয়ার'এর এক বিবরণী পড়িতে পড়িতে দেখিতেছিলাম—**"Dr. Vautier's wife showed me their own little son, about two and half years old, without a particle of clothing, playing with his toys in the sunshine on the balcony, where he passes most of his young life Nothing could be of more benefit to a child, starting life in perfect health than to have this continual influence of the Sun to assure his later physical being."**

লিখিতেছেন একটি ইউরোপীয় মহিলা।

আমাদের দেশের বহুবর্ষ-প্রচলিত শিশু-পরিচর্য্যার মূল নীতিকে উহারা আজ মাত্র আবিষ্কার করিয়াছে। এবং আমরা উহাদের বর্জ্জিত নীতির অনুসরণ করিয়া আজ আমাদের ছেলেমেয়েকে জামা কাপড় পরাইয়া মানুষ করিতে সুরু করিয়াছি। এই সব দেখিয়া কয়েক বৎসরের চিকিৎসা-অভিজ্ঞতায় শিশুর ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার সম্পর্কে যে ধারণা আমার জন্মিয়াছে, নীচে তাহাই লিখিতেছি।

শিশু জাতির প্রাণ এবং শিশুমঙ্গলই জাতির মঙ্গল। জাতির ভবিষ্যত শিশু, তাই শিশুর স্বাস্থ্য যাহাতে অটুট থাকে তাহার জন্য সকলেরই বিশেষ যত্ন লওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা-দীক্ষার চেয়েও স্বাস্থ্য বড় জিনিষ। যাহাদের শরীর সুস্থ ও সবল না থাকে তাহারা ব্যক্তিগত কি সমাজগত কোন হিত-সাধনই করিতে পারে না।

শিশুর জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দেহকে প্রকৃতির সঙ্গে সহমত কিছু কিছু মিলাইয়া চালান ভাল, কেন না, প্রকৃতিকে বাদ দিয়া যাহারা শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে চায় তাহাদের আশা দুরাশা মাত্র। প্রকৃতির বাতাস, জল, আলো ক্রমান্বয়ে শরীরে সহ্য করিতে দিতে হয়, তাহা না হইলে সামান্য বাতাসে সর্দ্দি, সামান্য উত্তাপে অসুখ এবং অস্থিরতা এবং সামান্য জলের সংস্পর্শে আসিলে সর্দ্দিগর্ম্মী হয়। স্বাস্থ্যের কৃত্রিমতা শহরেই বেশী পরিলক্ষিত হয়। অধুনা দেখি শিশুরা প্রায় সব সময়েই জামা-আটা থাকে, ফলে অফিসের কেরাণী-গিরি ছাড়া বড় হইয়া হাটিয়া খাটিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিতে তাহারা অক্ষম হয়। হিসাব নিলে দেখা যাইবে শহরের তুলনায় গ্রামের শিশুদের স্বাস্থ্য অনেক ভাল। তাহাদের সহজে ব্যারাম জন্মিতে পারে না। শহরের শিশুদের কৃত্রিম স্বাস্থ্য-নীতির জন্য সব সময়ই কোন না কোন অসুখ লাগিয়াই থাকে।

মায়ের দুগ্ধই শিশুর পক্ষে সব চেয়ে উপকারী, তারপর গো-দুগ্ধ এবং ছাগ-দুগ্ধ। কিন্তু বিলাতী দুগ্ধ আদৌ ইহাদের কাছে গুণে টেকে না; যদিও বড়লোক, বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষিত-দের ঘরে ইহার চল্তি বেশী। বিলাতী দুধে অস্থিনির্ম্মাণকারক [ভিটামিন - ডি (D)] জিনিষ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় শিশুর অস্থি বৃদ্ধি হয় না, ফলে শিশু ক্রমান্বয়ে রোগা হইয়া যায়। এই রকম অবস্থায় গো-দুগ্ধ অথবা ছাগ-দুগ্ধই প্রশস্ত, যদিও মাতৃ স্তন্যের সহিত কোনটারই তুলনা হয় না। শিশুকে ছোটবেলা থেকেই খাদ্যাখাদ্যের বিশেষ বিচার করিয়া খাওয়ান উচিত। নচেৎ নানা রোগ হইতে পারে। শরীরে কোন রকম সংক্রামক ব্যাধি প্রবেশ না করিতে পারে সেজন্য বিশেষ যত্ন লওয়া উচিত। পিতামাতার নিকট হইতেও শিশু অনেক রকমে রোগাক্রান্ত হইতে পারে, সেইজন্য শিশুর পেটে আসার পূর্ব্ব থেকেই পিতামাতার স্বাস্থ্য খুব ভাল রাখা প্রয়োজন।

মোটামুটি দেখা যায় যে শিশু তিন রকম ভাবে রোগাক্রান্ত হইতে পাবে। প্রথমতঃ পিতামাতা হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক রোগ পাইয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ খাদ্যাখাদ্যের দোষে অনেক রোগ জন্মে এবং তৃতীয়তঃ সংক্রামক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। পিতামাতার উপদংশ অথবা ঔপসর্গিক প্রমেহ থাকিলে শিশুরাও রুগ্ন হয়। উপদংশ থাকার দরুণ শরীর কৃশ, অঙ্গহানি, পেটের গোলমাল

ইত্যাদি হইতে পারে। অতিরিক্তভাবে এই রোগ থাকিলে অনেক সময় শিশুর মৃত্যু হয়, চাকা-চাকা ঘা নিয়াই জন্ম গ্রহণ করে। ঔপসর্গিক প্রমেহ থাকার দরুণ শিশুর চোখে ব্যারাম হয়, এমন কি অন্ধ হইয়া যায়। সাধারণতঃ মাতার ঔপসর্গিক প্রমেহজনিত পুঁজ জরায়ুমুখে থাকে এবং সেই পুঁজ শিশুর চোখে লাগিয়াই চক্ষু অন্ধ হয়। এইজন্য গর্ভিনীদের পরীক্ষা-গার থাকা উচিত, কারণ মাতা রোগমুক্ত থাকিলে অনেক রোগ হইতে শিশু অব্যাহতি পায়।

খাদ্যের দোষে কিম্বা অভাবে শিশুর রোগ জন্মে। মাতৃ-স্তন্যই শিশুর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ খাদ্য। মাতৃস্তন্যের অভাবে গোদুগ্ধ অথবা ছাগদুগ্ধ ব্যবস্থা করা উচিত। বিলাতী দুগ্ধ আদৌ ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ উহাতে শিশুর অস্থি বৃদ্ধি পায় না ইহা আগেই বলিয়াছি। এই অস্থি বৃদ্ধি না হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজীর্ণ বমি অরুচি ইত্যাদিও হয় এবং অনেক সময় মিথ্যা ক্ষুধাও হয়। আমাদের দেশে শিশুদের সরিষার তেল মাখাইয়া রৌদ্রে রাখে, ইহাতে অস্থি ও চর্ম্ম হয়। সাধারণতঃ রসুন তেলই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিশুকে ক্রমান্বয় বাইরে খোলামাঠে নিয়া বেড়ান উচিত এবং যে ঘরে শিশু থাকে সেই ঘর বেশ খোলা থাকা দরকার। মাতৃস্তন্য অনেক সময় খারাপ হইয়া যায়। ইহা গর্ভ হওয়ার জন্য অথবা অন্যান্য রোগ জনিত হইতে পারে। এই দূষিত দুগ্ধ খাওয়ার জন্য শিশুর পেটের অসুখ, বমি, পেটফাপা ইত্যাদি হয়। এমত অবস্থায় শিশুকে মাতৃস্তন্য খাওয়ান অনুচিত। শিশুকে গোদুগ্ধ অথবা ছাগদুগ্ধ পরিমিত জল মিশাইয়া খাওয়ান উচিত। কেননা মাতৃস্তন্যে এবং ছাগদুগ্ধ এবং গোদুগ্ধে শর্করা জাতীয় জিনিষ চর্ব্বি ও ছানা জাতীয় জিনিষ সমান পরিমাণে নাই। ইহার সঙ্গে এক ঝিনুক চুনের জল দিলেও ভাল। শিশুকে অতিরিক্ত খাওয়ান'র ফলে অজীর্ণাদি হয়। এই জন্য নিয়মিত সময়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। অবস্থা বুঝিয়া শিশুকে ফলের রস ও একটু আধটুকু খাওয়ান যাইতে পারে। কিন্তু দুধই সবচেয়ে প্রশস্ত।

সংক্রামক ব্যাধি যাহাতে না হইতে পারে সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। শিশুর শরীর এত নরম যে অনেক সংক্রামকব্যাধি আছে যাহা তাহাদের হইলে তাহারা চিররুগ্ন হয়, এমন কি, মরিয়া যাইতে পারে। ডাক্তাররা এই সব ক্ষেত্রে ভেক্সিন দেন। রোগ-প্রতিষেধক ঔষধ ইহাদের খাওয়াইতে হয়। কোন লোকের কাছে রাখিতে হইলে তাহাকে একটু ভাল করিয়া দেখা উচিত তাহার কোন রোগ আছে কিনা। শিশুর জন্য চাকর বা আয়া রাখিতে হইলে পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত কেননা ইহাদের হইতেই অনেক সময় ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া থাকে।

শিশুর স্বাস্থ্য মাতৃজাতির শিক্ষাদীক্ষার উপর নির্ভর করে। কি রকমভাবে শিশুকে লালনপালন করিতে হয় তাহা না জানার দরুণ অনেক সময় শিশুরা রোগাক্রান্ত থাকে। সামান্য সামান্য স্বাস্থ্যনীতি যাহা দৈনন্দিন লাগিয়া থাকে তাহা সকলেরই জানা উচিত, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির, যাহাদের উপর জাতির ভবিষ্যৎ ন্যস্ত। সেইজন্য সাধারণ কথায় বলিয়া থাকে,—যেখানে স্ত্রীজাতি উন্নত সেখানে জাতিও উন্নত।

শিশু মৃত্যু

এক বৎসরের কম বয়স্ক—আড়াই লক্ষ
হাজারকরা পুংশিশুর মৃত্যুহার ১৮৫
স্ত্রী-শিশু ১৭৪·৩
এক হইতে পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশু-মৃত্যু
গড়ে হাজারকরা ৩৩·৭ জন। "সঙ্কল্প"

লর্ড ইঞ্চকেপ

গত ২০শে মে, ৯ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার তারিখে বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী ও বণিক্‌সম্রাট্ লর্ড ইঞ্চকেপ পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৮০ বৎসর। সেজন্য দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু লর্ড ইঞ্চকেপের পরলোক-গমনে সমগ্র পৃথিবীর বিশেষতঃ ব্রিটিশ বাণিজ্যক্ষেত্রের যে অভাব ঘটিল তাহা হয়তো কখনও পূরণ হইবার নহে।

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইঙ্গ-ভারতীয় ব্যবসায়ে যাঁহারা অসামান্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে লর্ড ইঞ্চকেপ এবং স্যর ডেভিড ইউল ছিলেন সর্ব্বাগ্রগণ্য। অতি সামান্য অবস্থা হইতে উভয়েই জগদ্ব্যাপী ব্যবসায়জাল বিস্তার করিয়া প্রভূত ধনের অধিকারী এবং বণিক্‌দিগের মধ্যে বরেণ্য হইয়াছিলেন। দুই জনেরই জীবনী হইতে সকল দেশের ও সকল সমাজের কর্ম্মী ও যুবকদিগের অনেক শিখিবার রহিয়াছে। সে হিসাবে লর্ড ইঞ্চকেপের জীবনীর সহিত আমাদের কিছু পরিচয় হওয়া উচিত।

স্যর ডেভিড ইউল এবং লর্ড ইঞ্চকেপ উভয়েই ছিলেন অসামান্য কর্ম্মনিষ্ঠ, এবং শোনা যায় যে জীবনে কখনও নাকি পাঁচ মিনিট কালও ইহাঁদের কেহ অযথা অপব্যয় করিতে দেখে নাই। বুদ্ধির প্রখরতা এবং শিক্ষার উৎকর্ষ অপেক্ষা উভয়েরই জীবনের সাফল্যের মূলে ছিল তিনটী প্রধান গুণ—অধ্যবসায়, পরিশ্রম এবং মানুষ চিনিবার ক্ষমতা। সাধুতা ও পরিশ্রমের পুরস্কার এ জগতে যে কতদূর অপরিসীম হইতে পারে এই দুই পরিশ্রমী পুরুষ তাহার প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। আর তার সঙ্গে লর্ড ইঞ্চকেপ দেখাইয়া গিয়াছেন, অসামান্য স্বদেশপ্রীতি এবং স্বীয় সমাজের ও রাষ্ট্রের সেবা-পরায়ণতা। স্যর ডেভিড ইউল আপন ব্যবসায় লইয়াই একান্ত ভাবে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, আর লর্ড ইঞ্চকেপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে যখনই ডাক পড়িয়াছে তখনই ব্রিটীশ জাতির সেবার জন্য যথাসাধ্য সময় ও অর্থব্যয় করিয়াছেন। এজন্য, কোন কোন হিসাবে বড় হইলেও স্যর ডেভিড ইউল অপেক্ষা লর্ড ইঞ্চকেপ ছিলেন ইংরাজ জাতির অধিক আদরের ও শ্রদ্ধার পাত্র। লর্ড ইঞ্চকেপের বিয়োগে ব্রিটীশ জাতির সত্যই ব্যথিত হইবার কারণ রহিয়াছে।

লর্ড ইঞ্চকেপের উপাধি পাইবার পূর্ব্বে নাম ছিল জেম্‌স্ ল্যায়াল ম্যাকে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে স্কটলাণ্ডে ফরফার সায়ার জেলায় নিতান্ত সাধারণ ঘরে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালেই জেম্‌স্ ম্যাকে যে ভবিষ্যতে কর্ম্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু হইবেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং ১৮৭৪ সালে, মাত্র ২২ বৎসর বয়সে কলিকাতায় মেসার্স ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোম্পানির সাধারণ কর্ম্মচারী হিসাবে কলিকাতায় আসেন।

লর্ড ইঞ্চকেপ

অধিকদিন জেম্‌স্ ম্যাকে সাহেবকে নিম্নতর কর্ম্মচারী হিসাবে কার্য্য করিতে হয় নাই এবং স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি বৎসর দশেকের মধ্যেই আফিসের মধ্যে অন্যতম প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া উঠেন। ক্রমে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ম্যাকে সাহেব ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানির নেতৃত্বের ভার প্রাপ্ত হন।

এই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে মিষ্টার ম্যাকের ব্যবসায়ী হিসাবে খ্যাতি প্রচারিত হয় এবং ১৮৯১ হইতে ১৮৯৩ পর্য্যন্ত তিনি বড়লাট সাহেবের তদানীন্তন কাউন্সিলের সভ্য মনোনীত হন। প্রায় এই সময়েই তিনি কলিকাতাস্থ ইউরোপীয়গণের বণিক্‌সভা দি বেঙ্গল চেম্বর অব কমার্সের এবং ক্যালেডনিয়ান সভার সভাপতির পদে বৃত হন।

১৮৯০ হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রচলিত টাকার মূল্যনিরূপণ ও এদেশের অর্থমান-নির্দ্ধারণ সমস্যা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলে, এবং ভারত সরকারের অর্থ-সচিবকে মিষ্টার ম্যাকে নূতন অর্থমান প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়তা করেন। সেই সম্পর্কেই প্রথম জেম্‌স্ ম্যাকে সাহেব ইংরাজ ও স্কচ্ বণিক্‌দিগের বাৎসরিক মিলনোৎসব সেণ্ট এণ্ড্রুজ্ ডিনারের সময় সমাজ-নৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক নানা আবশ্যকীয় বিষয়ে আলোচনা, বিশেষতঃ মতামত প্রকাশের রীতি প্রবর্ত্তিত করেন। এ যাবৎ এই রীতি যথাসম্ভব প্রতি-পালিত হইয়া আসিতেছে এবং সেণ্ট এণ্ড্রুজ ডিনারের সময় সভাপতি ও উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিগণ প্রতি বৎসর নূতন কথা কি বলিতেছেন তাহা শুনিবার জন্য সকলে ব্যগ্র হইয়া থাকেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে কার্য্য করিবার সময় মিষ্টার ম্যাকে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন এবং অত্যদ্ভুত অধ্যবসায়ের বলে এই কোম্পানিটীকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাহাজের কারবারে উন্নীত করিয়া তোলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে পার্লামেন্টের ভারতসচিবের মন্ত্রণা-সভায় তাঁহাকে সদস্য মনোনীত করা হয় এবং তাঁহার ভারতীয় অভিজ্ঞতা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিয়োজিত করিবার বিশেষ সুযোগ হয়।

বিটীশ গভর্ণমেণ্টকে ভারতীয় শাসন ব্যাপারে এবং বিশেষতঃ টাকার মান-নির্দ্ধারণে যে সাহায্য করেন তাহার জন্য ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ম্যাকে সাহেবকে কে, সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তখন হইতে বরাবরই আবশ্যক মত গভর্ণমেণ্টের আহ্বানে তিনি রাষ্ট্রের নানা ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য দান করিতে থাকেন। ১৮৯৭ হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত স্যর জেম্‌স্ ম্যাকে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে কার্য্য করেন, এবং ১৯০৭ সালে ইণ্ডিয়া আফিসের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সে যোগদান করেন। ইতিপূর্ব্বে ১৮৯৮-৯৯ এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দুইটী সরকারী কমিটীতে সদস্য মনোনীত হন ও ইংলণ্ডের ভিতরে ও বাহিরে বাণিজ্যের অনুকূল কি কি সংবাদ সংগ্রহ করা প্রয়োজন তাহা নির্দ্ধারণে বিশেষ সাহায্য করেন।

স্যর জেম্‌স্ ম্যাকের কৃতিত্বের জন্য অনেক বারই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিম্নে আলোচিত কয়েকটী। যথা—

১৯০১ সালে স্যর জেম্‌স্ এল্ ম্যাকে ব্রিটিশ জাতির সহিত চীনাদের একটা বাণিজ্যপ্রসারক সন্ধিসংস্থাপন মানসে চীনদেশে গমন করেন, এবং তাহার জন্য এক বৎসর কাল সেখানে অবস্থান করেন। এতদ্ভিন্ন স্যর জেম্‌স্ ম্যাকে কুপার্স হিল বিদ্যালয় রাখা কর্ত্তব্য কিনা, মেক্সিকো ও চীনদেশে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার উপায়, ইংলণ্ডের বোর্ড অব ট্রেড্ ও লোকাল গভর্ণমেণ্ট বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্য্য প্রণালী কি হওয়া উচিত, ব্রিটিশ সরকার পরিচালিত যন্ত্র-মেরামতি কারখানাগুলির সুব্যবস্থা, ব্রিটিশ রেলওয়ে গুলির মালের ভাড়ার হার হইতে পরোক্ষভাবে বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যাদির প্রতি পক্ষ-পাতিত্ব দেখান হইতেছে কি না, ভারতবর্ষে যে সকল বিটিশ সৈনিক আসে তাহাদের পরিবারের জন্য কিরূপ পেন্সনের ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য প্রভৃতি নানা ছোট বড় সমস্যার সমাধানে গভর্ণমেণ্টের বিশেষ সহায়তা করেন। ১৯০৫-৭ সালে ভারতীয় রেল সমূহের তেমন প্রসার ও সুব্যবস্থা হইতেছে না বলিয়া সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়া থাকে। সেই সম্পর্কে এবং তৎসঙ্গে এদেশের রেলের আর্থিক ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত তাহা বিচার করিবার জন্য একটী পার্লামেণ্ট-নির্দ্ধারিত কমিটী নিযুক্ত হয়। স্যর জেম্‌স্ ম্যাকে সেই কমিটীর সভাপতিত্বে বৃত হন এবং অসামান্য স্থৈর্য্য ও নির্ভীকতার সহিত তিনি সরকারের বিরুদ্ধে ইংরাজ বণিকগণ যে অভিযোগ আনিয়াছিলেন তাহা খণ্ডন করেন। পুনরায় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সেক্রেটারী অব ষ্টেটের অনুরোধে ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড ও কয়েকটী রেলওয়ে-পরিচালক ইংরাজ কোম্পানির মধ্যে বিবাদ মিটাইবার জন্য ম্যাকে সাহেবকে ভারতবর্ষে আসিতে হয়। ইহার পরেই তিনি ব্যারন ইঞ্চকেপ উপাধি প্রাপ্ত হন।

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় লর্ড ইঞ্চকেপ তাঁহার ব্যবসায়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়াও জাতির সেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে ক্রটী করেন নাই। ১৯১৪ হইতে ১৯১৯ পর্য্যন্ত ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট যে সকল জাহাজ যুদ্ধের মাল সরবরাহের জন্য ভাড়া করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায্য ভাড়ার হার নির্দ্ধারণ করিতে সহায়তা করেন, এবং যাহাতে ব্রিটীশ বন্দর গুলিতে যথাসম্ভব জাহাজের মাল খালাস হয় তাহার ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করেন। ১৯১৭ সালে লর্ড ইঞ্চকেপ সাম্রাজ্য-সংরক্ষণ কমিটির সদস্য হন এবং ১৯১৮ সালে কান্‌লিফ কমিটীর সদস্য হিসাবে ব্রিটীশ মুদ্রামানের সমস্যা বিচার করেন। ঠিক সেই সময়ে বিটীশ ব্যাঙ্কগুলিকে সংঘবদ্ধ করিয়া তোলার কথা হইতেছিল। পাচ বৎসর কাল লর্ড ইঞ্চকেপ এই বিষয়ের ভার লইয়া আরও একটী সরকারী কমিটীতে কাজ করেন। যুদ্ধের অবসানে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের সমুদায় ষ্টাণ্ডার্ড জাহাজগুলি বিক্রয় করিয়া দিবার ভার লর্ড ইঞ্চকেপের উপর ন্যস্ত হয়। ইহাতে তাহাকে বিশেষ ব্যবসায়-কৌশল সহকারে কার্য্য করিতে হয়, এবং তিনি নামমাত্র ৮৫০ পাউণ্ড খরচায় সরকারের জাহাজ বিক্রয় করিয়া দিয়া ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড সরকারী তহবিলে জমা দেন। পরে ১৯২০-২১ সালে শত্রু পক্ষীয় ৪১৮ খানি জাহাজ বিক্রয় করিয়া দিয়া আরও দুই কোটি পাউণ্ড, এবং মেসপটেমিয়ার যুদ্ধ জাহাজ বিক্রয় সম্পন্ন করিয়া ১১ লক্ষ পাউণ্ড ব্রিটিশ সরকারের হাতে দেন। এ সকল কাজের জন্য লর্ড ইঞ্চকেপ নিজে কোন পারিশ্রমিক বা কমিশন গ্রহণ করেন নাই। বণিক্ সম্রাট্‌দিগের মধ্যে স্বদেশপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন লর্ড ইঞ্চকেপ।

আয়ব্যয় সম্বন্ধে বিশেষ হিসাবী বলিয়া সকল স্কচেরই খ্যাতি আছে। লর্ড ইঞ্চকেপ সে বিষয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। সে জন্যই বোধ হয় বারম্বার সরকারী ব্যয়-সঙ্কোচের পরামর্শের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হয়। ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের ১৯২১-২২ সালের এবং ভারত সরকারের ১৯২২-২৩ সালের ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটীতে সদস্য ও সভাপতি হিসাবে লর্ড ইঞ্চকেপ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন এবং এই সকল সমাজ ও রাষ্ট্রসেবার পুরস্কার হিসাবে গভর্ণমেণ্টের শ্রেষ্ঠ উপাধিতে তাঁহাকে ভূষিত করা হয় ও যথা ক্রমে কে, সি, এস্, আই; জি, সি, এস্, আই; ভাইকাউণ্ট ও পরিশেষে ১৯২৯ সালে তিনি "আর্ল" পর্য্যন্ত উন্নীত হন। এতদ্ভিন্ন সেণ্ট এণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে এল্, এল্, ডি উপাধিও দেওয়া হয়।

এই গেল লর্ড ইঞ্চকেপের জীবনের একটী দিকের পরিচয়। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে গত ৫০।৬০ বৎসর গ্রেট ব্রিটেনে ও ভারতবর্ষে এমন খুব কমই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে যেখানে লর্ড-ইঞ্চকেপের প্রেরণা অথবা অর্থানুকূল্য ছিল না। ১৯১৪ সালে বিখ্যাত পি এণ্ড ও কোম্পানির সহিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানি মিলিত হইয়া যায় এবং এক বৎসর যাইতে না যাইতেই এই সম্মিলিত জাহাজের কারবারের ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতিত্বে লর্ড ইঞ্চকেপ নির্ব্বাচিত হন। প্রায় সেই সময়েই সুবিখ্যাত ওরিয়েণ্টাল ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানিও এই দুই সম্মিলিত কোম্পানির সহিত মিলিয়া যায় এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাহাজের কারবার গড়িয়া উঠে এই তিনটীর মিলনে। লর্ড ইঞ্চকেপই ছিলেন তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ও কর্ণধার। বর্ত্তমানে এই সম্মিলিত কোম্পানিত্রয় প্রায় ২৪০ খানি জাহাজের মালিক এবং তাহাদের জাহাজে অন্যূন ১৬ লক্ষ টন মাল সরবরাহ হইতে পারে। এই বিপুল বাণিজ্য-পোতের ব্যবস্থা করা বড় কম কথা নহে। ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি ও পি এণ্ড ও কোম্পানির প্রধান অংশীদার হওয়া ছাড়া যে সকল বৃহৎ ব্যবসায়ের ফার্ম্মের সহিত লর্ড ইঞ্চকেপ প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহাদের তালিকা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। তাহাদের নাম যথা—ম্যাক্‌নিল কোম্পানি, কলিকাতা; ম্যাক্‌ডোনাল্ড হ্যামিল্টন কোম্পানি, সিডনি, মেলবোর্ণ, ফ্রিম্যাণ্টল্, ও ব্রিসবেন; গ্রে ডস্ এণ্ড কোম্পানি; ডান্‌কান্ ম্যাকনিল এণ্ড কোং ও জে, বি, ব্যারি এণ্ড সন্স্ লণ্ডন। উপরন্তু তিনি সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানির সহ-সভাপতি, এবং এট্‌লাস্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি, পি এণ্ড ও ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কের প্রধান ডিরেক্টর ছিলেন। বস্তুতঃ একটী মানুষের পক্ষে যতদুর সম্ভব তাহা, কি ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কি রাষ্ট্রের সেবায়, লর্ড ইঞ্চকেপ তাহা করিয়া গিয়াছেন। জীবনকে সর্ব্বভাবে বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে পূরাপূরি সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে আর কেহ এমন পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

অনেকে এমন থাকেন যে বাণিজ্যে অসামান্য কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করেন বটে কিন্তু কি সমাজসেবা, কি অন্য ক্ষেত্র হইতে তাঁহারা সযত্নে দূরে থাকার চেষ্টা করেন। লর্ড ইঞ্চকেপ আদৌ সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার প্রতিভা ছিল সর্ব্ব প্রসারী। তাই যেমন তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহার পরিচালিত ব্যবসায়গুলিকে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন তেমনই নানা সাময়িক সমস্যার বিষয় আলোচনা করিতে এবং নির্ভীকভাবে নিজ মত ব্যক্ত করিতে কখনও ক্রটী করেন নাই। প্রতি বৎসর পি এণ্ড ও কোম্পানির সেয়ার-হোল্ডার-দের বাৎসরিক সভায় তিনি শুদ্ধ কোম্পানির কার্য্যকলাপ ভিন্নও নানা সাময়িক প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেন এবং অনেক সময়ে তাঁহার তেজোদ্দীপ্ত বক্তৃতার ভিতর দিয়া বিশেষ বাগ্‌বিতণ্ডারও সুচনা করিতে ছাড়িতেন না।

ব্যয়সঙ্কোচ ও কর্ম্মিষ্ঠতা-বৃদ্ধি এই দুইটী ছিল তাহার মূল মন্ত্র এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। এই হিসাবে প্রধানতঃ লর্ড ইঞ্চকেপ ছিলেন বহির্ব্বাণিজ্যে সমানাধিকারবাদী। প্রথমতঃ ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলভুক্ত হইলেও ক্রমে এই জন্যই তিনি লিবারল দলের সহিত সাম্য সংস্থাপন করেন।

গত কয়েক বৎসর হইল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আলোচিত হাজি বিল অর্থাৎ স্বদেশী পোতে ভারতোপকূলের বাণিজ্য সরবরাহ করিবার যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল এবং সে সম্পর্কে ব্রিটীশ ব্যবসায়ীদের এদেশে কি অধিকার দেওয়া সঙ্গত এ আলোচনা লর্ড ইঞ্চকেপ স্বীয় ও স্বদেশীয়-গণের পক্ষে যথেষ্ট আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। গত গোলটেবিল বৈঠকে ব্যবসায়ে সমানাধিকারের দাবী লইয়া যে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছে তাহাতেও লর্ড ইঞ্চকেপের বিশেষ উৎসাহ ছিল। আমাদের দেশের পক্ষ হইতে আমরা যাহাই ভাবি না কেন লর্ড ইঞ্চকেপ স্বদেশপ্রীতি উদ্বুদ্ধ হইয়া যে ভাবে ব্রিটীশ জাতির স্বার্থ সুরক্ষিত রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আমাদের কয়জন বড়লোকের এরূপ স্বাদেশিকতা আছে?

লর্ড ইঞ্চকেপ আজ আর ইহজগতে নাই। কিন্তু তিনি কর্ম্মকুশলতার ও দেশপ্রীতির যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন বহু বর্ষ ধরিয়া পৃথিবীর সকল জাতির ব্যবসায়ী ও যুবক সম্প্রদায়কে সে আদর্শ অনুপ্রাণিত করিবে। পরলোকে গিয়াও লর্ড ইঞ্চকেপ সে হিসাবে অমর হইয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই।

পুস্তক-পরিচয়

ভারতে পরদেশী ব্যাঙ্কের বনিয়াদ:—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, এম-এ, বি-এল প্রণীত। ১২০ পৃষ্ঠা।

নয়া বাংলার গোড়াপত্তন: (প্রথম ভাগ) মূল্য আড়াই টাকা। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রণীত।

পুস্তক দুইখানি আমরা কয়েকদিন হয় পাইয়াছি। ইহাতে পড়িবার বিষয় অনেক আছে। আগামী বারে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করিব।

সতীশচন্দ্র

—শ্রীকালিদাস রায়

আমাদের পরম বন্ধু, সুখদুঃখের সহচর, সারস্বত পথের সহযাত্রী, সুবিখ্যাত সাহিত্যিক সতীশচন্দ্র অকালে প্রস্থান করিলেন অর্থাৎ বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবকগণ সাধারণতঃ যে বয়সে ব্রত অনুদ্‌যাপিত রাখিয়া চলিয়া যান সেই বয়সেই চলিয়া গেলেন।

একসঙ্গে যাঁহাদের সহযোগিতায় এবং যাঁহাদের অগ্রজোচিত স্নেহোৎসাহ লাভ করিয়া এই অতৃপ্ত সন্তপ্ত জীবনে সান্ত্বনা লাভের আশায় সাহিত্যসেবা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাঁহাদের অনেকেই একে একে অকালেই চলিয়া গেলেন। সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ, মণিলাল, শশাঙ্কমোহন, অজিতকুমার, রমণীমোহন, রাখালদাস, কিরণধন—সকলেই অকালে প্রস্থান করিয়াছেন। প্রভাতকুমার ছিলেন সর্ব্বাগ্রজ, তিনিও অল্পদিন হইল চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। তাঁহার শোকাশ্রু শুকাইতে না শুকাইতে সতীশচন্দ্রের চিতাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

সতীশচন্দ্র সারাজীবন আমাদিগকে হাসাইয়াছেন—আজ আমাদের দেহ মনের চক্ষুর নিকট হইতে তাহার সমস্ত মূল্য আদায় করিয়া বিদায় লইলেন। যিনি সমস্ত জীবন হাস্যতরঙ্গে আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়াছেন আজ তাঁহাকে আঁখিজলে অকালে বিদায় দিতে কি যে দারুণ বেদনা, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

সত্যই আজ কি তাঁহাকে অশ্রুজলেই বিদায় দিতে হইবে? আর যে কাঁদিবে কাঁদুক—আমাদের কাঁদিবার আর অবসর কই? তাসের ঘরে যখন একে একে তাসগুলি খসিয়া পড়ে তখন বাকী তাসগুলির ভরসা কতটুকু? যাহারা এ জগতে বহুদিন থাকিবার ভরসা রাখে, তাহারা কাঁদুক—আমরা দিন গণিতেই ব্যস্ত।

সতীশচন্দ্রের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত তাঁহারা সকলেই তাঁহার প্রতিভার গভীরতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই জানেন, তাঁহার প্রতিভা সম্যক্‌রূপ স্ফুরণ লাভের অবকাশ, অবসর, সুযোগ ও সুবিধা পায় নাই। বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার প্রতিভার যতটুকু অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল, তিনি তাহার যোগ্য সমাদরও লাভ করেন নাই। সমাদর করিয়া প্রচার ও সর্ব্বজনের অধিগম্য করিয়া তুলিবার ভার যাঁহাদের হাতে,—তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেও পারেন নাই। তাহা ছাড়া, এদেশে যেটুকু আগ্রহ, চেষ্টা ও উদ্‌গ্রীবতা থাকিলে আপনার রচনাকে সর্ব্বজনপরিচিত করিয়া তোলা যায় বা সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করা যায়—সতীশচন্দ্রের তাহার বিন্দুমাত্রও ছিল না।
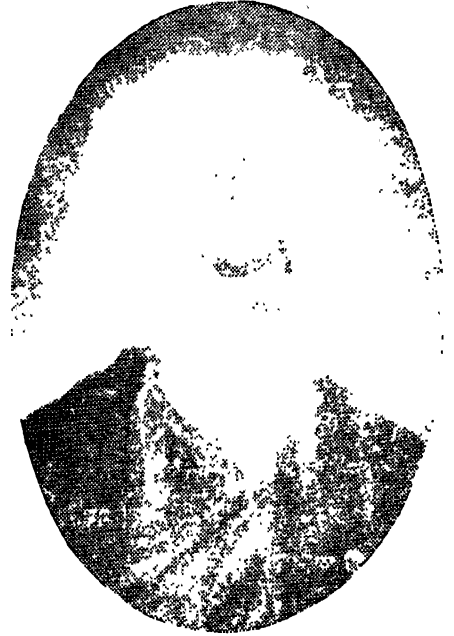
সতীশচন্দ্র

যাঁহারা সতীশচন্দ্রের মত তন্ময় ও তদ্‌গত হইয়া সারস্বত সাধনা করেন, বাহিরের স্তুতিনিন্দার দিকে তাঁহারা যেমন উৎকর্ণ হইয়া থাকিতে পারেন না—সাহিত্যব্যবসায়ী বা গ্রন্থবণিকদের গতিবিধির দিকেও তেমনি তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে না। এক হিসাবে সতীশচন্দ্রের জন্য এই দিক হইতে কোন ক্ষোভের কারণ নাই। কারণ, সারস্বত সাধনার শ্রেষ্ঠ লাভ যাহা, তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত হ'ন নাই। তন্ময় হইয়া সারস্বত সেবায় যে আনন্দ, সে আনন্দ তিনি মধুপানমগ্ন ভ্রমরের মতই উপভোগ করিয়া গিয়াছেন।

সতীশচন্দ্রের স্থায় মহাপ্রাজ্ঞ ও প্রথম শ্রেণীর রসজ্ঞ ব্যক্তির সহিত মৈত্রীময় ঘনিষ্ঠ পরিচয়কে আমরা পরম সৌভাগ্যই মনে করি। আমরা জীবনে এই শ্রেণীর গুণীব্যক্তির সন্ধান খুব বেশি পাই নাই। দর্শনশাস্ত্রে তিনি এম-এ পাশ করিয়াছিলেন, সেটা তাঁহার পক্ষে বড় কথা নয়। বহুবিধ জ্ঞানশাখাতেই তাঁহার সমান অধিকার ছিল। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, অলঙ্কারশাস্ত্র, ইতিহাস, সঙ্গীতশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, সমাজতত্ত্ব,—কিসে যে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন না—তাহা ভাবিয়া পাই না। যাঁহারা তাঁহার সাহচর্য্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার কাছে কত যে শিখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা তাঁহার সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে কত নূতন তত্ত্বের, কত নব নব রস-প্রেরণার সন্ধান যে পাইয়াছি, কত সমস্যার যে সমাধান-সূত্র লাভ করিয়াছি তাহার বিবৃতি করা আজ সম্ভব নয়। আমাদের মানস জীবনেরই অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে সেগুলি।

প্রশ্ন হইতে পারে,—এত শিক্ষা দীক্ষা লইয়া তিনি করিলেন কি? বঙ্গ-সাহিত্যকে দিয়া গেলেন কি? কি দিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিবার আগে বলি—তাঁহার যে শক্তি, সামর্থ্য ও সম্বল ছিল তদনুরূপ এমন কিছু তিনি দিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার কারণ আছে। নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় সাহিত্যসৃষ্টি করিবার পথে কতকগুলি বাধা ছিল। প্রথমতঃ, দারুণ জীবন-সংগ্রামে তাঁহার অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল। অথচ কোন দিনই অর্থ-সঙ্কট ঘুচে নাই। দ্বিতীয়তঃ,—সৃষ্টি অপেক্ষা উপভোগের দিকে তাঁহার ঝোঁক ছিল বেশি। সৎসাহিত্যের গ্রন্থ পাইলে তিনি সাহিত্য-সৃষ্টির লোভ অনায়াসে সম্বরণ করিতেন। আর এক বুলি ছিল—"রবীন্দ্রনাথের পর আর চেষ্টা নিষ্ফল।" অতিরিক্ত রবীন্দ্র-ভক্তিও তাঁহার পক্ষে সাহিত্য-সৃষ্টির একটা বাধা হইয়া উঠিয়াছিল। তৃতীয়তঃ—সঙ্গীত, সাহিত্য ও অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচনাতেই তাঁহার অবসরকাল ব্যয়িত হইয়া যাইত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত—আহার নিদ্রা ভুলিয়া তন্ময় হইয়া জ্ঞানালোচনায় বা রসানুশীলনে মগ্ন থাকিতেন। এ কথা ভবানীপুরের প্রত্যেক জ্ঞানানুরাগী ও রসজ্ঞ ব্যক্তিই জানেন।

প্রথম যৌবনে তিনি যাহা কিছু রচনা করিয়াছিলেন—তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ কোন শ্রদ্ধা ছিল না,—আত্মশক্তিতেও তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। সবুজ পত্রের উন্মেষের সময় সতীশচন্দ্র প্রমথবাবুর সহিত পরিচিত হ'ন। প্রমথবাবু অল্প দিনের মধ্যেই সতীশচন্দ্রের শক্তির পরিচয় পান। তাঁহার প্রণোদনা ও উৎসাহে সতীশচন্দ্র সবুজপত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রমথ বাবুর সংসর্গে আসিয়াই আত্মবিস্মৃত সতীশ-চন্দ্র সর্ব্ব প্রথম আপনাকে চিনিতে পারিলেন,—তখন হইতেই তাঁহার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হইল অর্থাৎ নিজের রচনার প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার উদয় হইল।

খাঁটি বাংলা ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টি ও জ্ঞানের সর্ব্ববিধ শাখায় ঐ ভাষাকে প্রয়োগ করিবার চেষ্টাই প্রমথবাবুর সর্ব্বপ্রধান সাহিত্যিক চেষ্টা। কিন্তু প্রমথবাবু খাঁটী 'সংস্কৃত-ছুট' বাংলা কোন দিনই স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারেন নাই। তাঁহার সহ-যোগিগণের মধ্যে এক সতীশচন্দ্রই তাহা পারিতেন। একথা প্রমথবাবু নিজেই একটি প্রবন্ধে স্বাকার করিয়াছেন। সতীশচন্দ্রের একখানি উদ্ভিদ্-বিদ্যার পুস্তক 'গাছের কথা' নামে সবুজ পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তক খানিই তাহার প্রমাণ। বিজ্ঞানের কথা কত সরস সরল স্বচ্ছ খাঁটি বাংলা ভাষায় স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে যে বিবৃত করা যাইতে পারে—তাহা 'গাছের কথা' পড়িয়া আমরা জানিতে পারিলাম। বিজ্ঞানকে সাহিত্যে পরিণত করিবার শক্তি এযুগে একমাত্র সতীশচন্দ্রেরই ছিল।

সতীশচন্দ্র ছোট গল্প রচনায় অনেকটা মোপাসাঁর অনুবর্ত্তী ছিলেন। সতীশচন্দ্রের ছোট গল্প বড় বড় মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। সেজন্য অনেকে সেগুলির পরিচয় পান নাই। কোন' দিন কোন পত্রিকায় যাচিয়া তিনি লেখা পাঠান নাই। যাঁহারা তাঁহার কাছ হইতে লেখা লইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পত্রিকা, যত অল্পায়ু বা নিঃসম্বল হউক, সেই পত্রিকাতেই তাঁহার চমৎকার রচনাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। সেজন্য পাক্ষিক পত্র সম্মিলনীতেও তাঁহার অনেক উৎকৃষ্ট রচনা কুণ্ঠিতভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার ছোট গল্পগুলি এক একটি লিরিকের মত,—অতি চমৎকার সরস ভঙ্গিতে লিখিত, রসে ভরপুর। গল্পগুলিকে প্রথম শ্রেণীর বলিয়া দাবি করিলে আমার কতকটা অনধিকার চর্চ্চা হইবে। তবে সেগুলির মধ্যে একাধিক প্রথম শ্রেণীর গল্পের যে সন্ধান পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। তাঁহার দুইখানি গল্পের বই প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্যিকদের মধ্যে কে-বা বই দুইখানিকে পড়িয়াছে? যাহারা

কথাসাহিত্যের রসজ্ঞ, তাঁহারা যদি পড়িয়া দেখেন, তবে সতীশচন্দ্রের রসসৃষ্টির পরিচয় পাইয়া, বিস্মিত না হউন, মুগ্ধ হইবেন।

সতীশচন্দ্র ইদানীং নাট্যরচনায় অবহিত হইয়াছিলেন। বহুদিন হইতেই তাঁহার নাট্যরচনার অভ্যাস ছিল। নাটক অভিনীত না হইলে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় না। নবীন নাট্যকারের পক্ষে এদেশের রঙ্গালয়ে প্রবেশের পথ কত দুর্গম সকলেই জানেন। সতীশচন্দ্রের রচিত সাহিত্যাংশে উৎকৃষ্ট নাটকগুলি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশাধিকার পায় নাই, প্রকাশিতও হয় নাই। অভাবের তাড়নায় শেষে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সতীশচন্দ্র নাট্যরচনায় রসাদর্শ খর্ব্ব করিলেন। যে সকল নাটিকা রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তারা চাহেন, অর্থাৎ জনসাধারণ যে শ্রেণীর নাটিকার অভিনয়ে আনন্দলাভ করে—সতীশচন্দ্র সেই শ্রেণীর নাটিকা লিখিয়া রঙ্গালয়ে দীনবেশে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। বলা বাহুল্য, এই নাটিকাগুলি সাহিত্যাংশে খুব উচ্চ শ্রেণীর নয়—তবু প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যিকের রচনা, বাম হস্তে লিখিত হইলেও সাধারণ প্রহসনশ্রেণীর নাটিকাগুলি হইতে উচ্চতর স্তরের সামগ্রী। সতীশচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল, তিনি প্রহসন নাটিকার সাহায্যে, অমর্য্যাদা স্বীকার করিয়াও, একবার রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবেন, পরে তাঁহার সাহিত্যাংশে উৎকৃষ্ট উচ্চ শ্রেণীর নাটকগুলির সদ্‌গতি করিবেন।

রসপ্রবন্ধ-রচনায় সতীশচন্দ্র ছিলেন অদ্বিতীয়। এই প্রবন্ধগুলি ব্যঙ্গকৌতুকে ঋদ্ধ, অনাবিল হাস্যরসে স্নিগ্ধ। তাঁহার হাস্য কৌতুক সম্পূর্ণ মার্জ্জিত, নির্ম্মল ও শুচিসংযত। কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষকে বিন্দুমাত্র আঘাত না করিয়া সতীশচন্দ্র এইগুলিতে রঙ্গ-ব্যঙ্গের অন্তরালে গভীর সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'রঙ্গ ও ব্যঙ্গ' নামক গ্রন্থে এই শ্রেণীর কতকগুলি প্রবন্ধ সংগৃহীত আছে। কতকগুলি মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় এখনও অজ্ঞাত বাস করিতেছে।

সতীশচন্দ্রের সাহিত্যিক খ্যাতি কিন্তু রঙ্গকবিতা ও লালিকা রচনায়। তাঁহার 'ঋলক' নামক কবিতাগ্রন্থ রঙ্গকবিতার সংগ্রহ। দ্বিজেন্দ্রলালের পর হাসির কবিতা ও হাসির গান রচনায় সতীশচন্দ্রেরই স্থান। লালিকা-রচনায় সতীশচন্দ্রের সমকক্ষ বাংলাদেশে কেহ নাই। সতীশবাবুর 'আমার জন্মভূমি'র প্যারডি 'আমার কর্ম্মভূমি' 'সোনারতরীর' প্যারডি 'সোনার ঘড়ি'র তুলনা নাই।

বাংলা ভাষায় প্রথম প্যারডি ৺দ্বারকানাথ গুপ্তের ছুছুন্দর বধকাব্য। মেঘনাদ বধের ভাষা, ছন্দ ও ভঙ্গিকে ব্যঙ্গ করিয়া এই প্যারডি রচিত হয়। পংক্তিতে পংক্তিতে অক্ষরে অক্ষরে বৃহৎকাব্যের প্যারডি হইতে পারে না। সুর, ছন্দ ও ভাষা ভঙ্গিরই প্যারডি সম্ভব। গীতিকাব্যের দুই শ্রেণীর প্যারডি হইতে পারে। সেই প্যারডিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যাহা কেবল ভঙ্গির নয়, প্রত্যেক শব্দেরও প্যারডি। এই শ্রেণীর প্যারডি-গুলি একটু কষ্টসাধ্য এবং কষ্টসাধ্য বলিয়াই স্বচ্ছন্দ ও প্রাঞ্জল হইয়া উঠে না, স্থলে স্থলে দুষ্পাঠ্যও হইয়া পড়ে। সতীশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য—তিনি ভাষাছন্দের স্বচ্ছতা, স্বচ্ছন্দতা ও প্রাঞ্জলতা রক্ষা করিয়া কয়েকটি গীতি কবিতার সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষরিক প্যারডি করিতে পারিয়াছিলেন।

যে কবিতা বা যে গানের প্যারডি করিতে হইবে, তাহা পাঠকের সম্পূর্ণ পরিচিত, এমন কি পাঠকের মুখস্থ না থাকিলে প্যারডির রসসম্ভোগ কিছুতেই সম্ভব নয়। সে জন্য মুখে মুখে যে গান বা কবিতা চলিতেছে, তাহারই প্যারডি করিতে হয়। এ বিষয়েও সতীশচন্দ্রের সতর্কতা ছিল। সতীশচন্দ্র যে সকল গানের প্যারডি করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই সাধারণ পাঠকের মুখস্থ। পাঠক সাধারণ মূল কবিতা বা গানের প্রত্যেক শব্দটির সহিত তাহার প্যারডির তদনুবর্ত্তী শব্দটিকে মিলাইয়া দেখিতে পারেন তাঁহার রচনায় কিরূপ আক্ষরিক সংযোজনার কৃতিত্ব এবং এই কৃতিত্ব রস-সম্পাতে কতটা সহায়তা করিতেছে।

প্যারডি উচ্চ শ্রেণীর কাব্য নহে—উহা শব্দশিল্পমাত্র, এই শব্দশিল্প সম্পূর্ণ শব্দালঙ্কারের ও কাব্যের বাচিক বাহ্যরঙ্গের গণ্ডীর মধ্যেই পড়ে। উহার অর্থে ব্যঞ্জনা থাকিতে পারে—কোন অনির্ব্বচনীয়তা থাকে না। তবু ইহা এক প্রকার রসের সৃষ্টি করে, ইহা কাব্যের ঘনীভূত রস নয় বটে, কিন্তু বোধানন্দ প্রসূত কৌতুক-রস।

উচ্চ শ্রেণীর কাব্য না হইলেও উৎকৃষ্ট প্যারডি রচনা বড়ই কঠিন। ইহাতে যে কৃতিত্বের, যে কলা-কৌশলের, যে সামঞ্জস্য-বোধের প্রয়োগ করিতে হয়, তাহারও মূল্য সামান্য নয়। প্যারডির হাস্যরস Wit শ্রেণীর বোধানন্দদায়ক হাস্য

রস। সে জন্য এই রসের সৃষ্টি করিতে হইলে লেখককে একাধারে পণ্ডিত, রসিক ও রসজ্ঞ হইতে হয়—নিখিল শব্দ-ভাণ্ডারের অধিকারী হইতে হয়—অন্যান্য উপকরণের জন্য প্রথম শ্রেণীর Versifier ও হইতে হয়। সতীশচন্দ্রে এই সমস্তেরই শুভসম্মিলন ঘটিয়াছিল বলিয়া আমরা তাঁহার লেখনী হইতে চমৎকার প্যারডিগুলি পাইয়াছি। বঙ্গসাহিত্যে এক সত্যেন্দ্রনাথ ও শরদিন্দু উচ্চশ্রেণীর প্যারডি লিখিতে পারিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্রের পর আজকাল সজনীকান্ত প্যারডি-রচনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

সতীশচন্দ্র অন্যান্য রসের কবিতাও যথেষ্ট লিখিয়াছেন—কিন্তু সে গুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকার লাভ করে নাই। সে গুলিও উচ্চ শ্রেণীর গীতি-কবিতা। তিনি কেবল কৌতুক প্রবন্ধই রচনা করেন নাই, যুক্তিমূলক প্রবন্ধও যথেষ্ট লিখিয়াছেন। তাঁহার 'ভাষা সম্বন্ধে রচিত প্রবন্ধগুলি'র সুধীসমাজে যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে কেদারবাবু সতীশচন্দ্রের ভাষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ হইতে বহুস্থলে উৎকলন করিয়া আত্মমত সমর্থন করিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্রের রচিত অলঙ্কারশাস্ত্রের পুস্তক অসমাপ্তই থাকিল—এমন আরো অনেক গ্রন্থই অসমাপ্ত থাকিয়া গিয়াছে। জীবনের মধ্যাহ্নে সহসা ডাক পড়িলে সকলেরই ব্রত অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। সতীশচন্দ্রের সাহিত্য-চেষ্টা ছিল বহুমুখী, সে জন্য তাঁহার বহু সমারব্ধ প্রয়াসই আজ অসমাপ্তির বেদনায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

নানা বাধার জন্য সতীশচন্দ্রের প্রতিভা সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভের অবসর পায় নাই, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার রচনা-গুলির মধ্যে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী অপ্রকাশিত হইয়াই আছে। যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রচনাই অপ্রকাশিত হইয়া পড়িয়া আছে। অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট রচনার প্রকাশক জুটে, উৎকৃষ্ট রচনার প্রকাশক সব সময় ত জুটে না। অপ্রকাশিত রচনার মধ্যে সমাপ্তের তুলনায় আবার অসমাপ্তের পরিমাণই বেশি। দেশের লোক যে এই প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যিকটির সম্যক পরিচয় পান নাই—তাহার অনেক কারণ।

আর একটি কথা। সতীশচন্দ্রের যতটুকু শক্তি সারস্বত ব্রতে অভিব্যক্তিলাভের অবসর পাইয়াছিল—তাহাও সাহিত্যের কোন একটি শাখায় কেন্দ্রীভূত হইয়া সম্পূর্ণ ফল প্রসব করিতে পায় নাই। ঐ শক্তি বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল বহু শাখায়—সঙ্গীতে, কথাসাহিত্যে, নাট্য সাহিত্যে—প্রবন্ধে—নক্সায়—কবিতায়—প্যারডিতে ছাত্রপাঠ্য বৈজ্ঞানিক রচনায় ও অধ্যাপনায়।

আমি আজ সতীশচন্দ্রের সারস্বত জীবনটির পরিচয় মাত্র দিলাম—বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার দানের বিস্তৃত পরিচয় ইহা নয়। নাট্যকার সতীশচন্দ্রের নিজের জীবনটাই একটা মস্ত বড় ট্র্যাজেডি। তাঁহার জীবন নাট্যের কারুণ্যময় দৃশ্যপটগুলির কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। আর আজ কেবলই মনে হয় -

আজি শুধু ভাবি তাই কত কলি তব কল্পবনে
ফুটিতে পারিত হায়, শুকাইল অকাল দহনে।
ছুটিতে পারিত হায়, দিকে দিকে কত মনোরথ
পদাঙ্ক-গৌরবে তব ধন্য হ'তো কত নব পথ।
কত সৃষ্টি অনুৎকীর্ণ র'য়ে গেল তব শিল্পাগারে
অপূর্ব্ব কল্পনা কত রসস্ফূর্ত্ত হলো না আকারে।
কত আদ্রু এঁকে শেষে রঙ দিয়ে পারনি ভরিতে,
ধ্যান-গূঢ় কত সত্যে ছন্দোময় পারনি করিতে।
কত অকথিত বাণী, অঝঙ্কৃত কত ছন্দোগান,
অগ্রথিত কত মাল্য, সমারব্ধ কত অভিযান,
কত দ্বিতীয়ার চাঁদ বিশালের কতই অঙ্কুর,
নিয়ে তুমি গেছ চলি, তাই আজি ভাবি শোকাতুর।

সম্পাদক ভায়া,

তোমার প্রেরিত দাগ-দেওয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের 'শনিবারের চিঠি' পাইলাম। 'বৈশাখ' কবিতাটি শুনিয়া তুমি পছন্দ করিয়াছিলে, কিন্তু তখনই আমি বলিয়াছিলাম যে ওটি তোমরা লইও না; শনিবারের চিঠিতে আমি মধ্যে মধ্যে লিখি, উঁহাদের জন্যই কবিতাটি লিখিয়া রাখিয়াছি। তুমি না বুঝিয়াই বলিলে, এ ত' একটি সাধারণ কবিতা, আমাদের উপাসনাতেই দিন্; ইহাতে এমন কি আছে যাহাতে লালাগ্রীট লালায়িত হইবে? কবিতার বক্তব্য ত' এই—'অন্ধকার রাত্রে কালিন্দীর জলে মৃত বৎসর ভাসিয়া যাইতেছে; ব্যোমের প্রহরীস্বরূপ পুঞ্জনক্ষত্র 'কালপুরুষ' যেন বৈঠাহাতে তরী বাহিয়া চলিয়াছে, আর নির্নিমেষ নেত্রে সেই মৃত বৎসরের পানে চাহিয়া আছে; এমন সময় পূর্ব্বতটের সূতিকাকুটীরে শঙ্খরবের মধ্যে বুঝি নব বৎসর জন্মলাভ করিল; কালপুরুষ তখনও তাহার তরী বাহিয়া চলিয়াছে।' এ চিত্র ত মাসিকপত্রীয় বর্ষারম্ভের সেই মামুলী চিত্রই,—ইহার মধ্যে শনিবারের চিঠির খোরাক কই?

তুমি শুনিলে না, কিন্তু আমি তখনই নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলাম—ও কবিতার বাহিরটা মামুলী বটে, কিন্তু ভিতরের কথাটি হয়ত ভালো নয়, তোমাদের কাগজে চলিবে না। তবে কবিতাটি যেখানেই প্রকাশিত হউক, ওই যে কালপুরুষের 'বৈঠা' দেখিতেছ, উহা নির্ঘাৎ যথাস্থানেই পৌঁছিবে; তদুপরি যখন একই কবিতার মধ্যে 'বৈঠা' ও 'জন্মলাভে'র যোগাযোগ করিয়াছি এবং আবাহন করিয়াছি 'বালবৈশাখ'কে, তখন ওসব যাহাদের জন্য লিখিয়াছি শেষ পর্য্যন্ত তাহারাই টানিয়া লইবে। একথায় শিহরিয়া উঠিয়া তুমি বলিলে—উহা হইতে অমন কদর্য্য অর্থ অতি-বড় ইতরেও বাহির করিতে পারিবে না; বিশেষতঃ যেখানে শঙ্খধ্বনির মধ্যে সূতিকাগৃহে নবজাত কুমারের অবতারণা করা হইয়াছে, সেখানে কোন্ পশু জন্মদানকালের সম্ভোগাত্মক ইঙ্গিত স্মরণ করিবে? 'শনিবারের চিঠি'ও ত' মানুষে চালায়? আমি বলিয়াছিলাম বৃথা উত্তেজিত হইয়া আমাদের গালিগালাজ করিও না। ইতর-ভদ্র পশু-মানুষের কথা ত' হইতেছে না, হইতেছে কবিতার কথা, রসের কথা! ব্যবসায়সূত্রে আমিও হইলাম একরূপ ঐদলের লোক, ড্রেন-পর্য্যবেক্ষণের সময় আমাদের সতত দেখা সাক্ষাৎ হয়। আমরা দল বাঁধিয়া বালখিল্যদের হাসাইবার জন্য কবিতার কোন্ পংক্তির কি ব্যঞ্জনা দিব ও গ্রহণ করিব তাহা তোমরা কি বুঝিবে?

তুমি যাহা বুঝিতে চাহিলে না, শনি তাহা কেমন চমৎকার বুঝিল! অবশ্য সহজাত বিনয়বশতঃ স্বীকার করিয়াছে,—"একা কোনও হদিস্ না পাইয়া দল বাঁধিয়া বসিলাম। 'বালবৈশাখ' শুনিয়া বালখিল্যের দল হাসিয়া উঠিল!" কিন্তু দল বাঁধিবামাত্র সব পরিষ্কার হইয়া গেল। যেখানে আছে,—

'কালপুরুষের বৈঠা চলে,
মৌননাদিনী কালিন্দীবুকে
আঘাতে আঘাতে
তারকা ঝলে—'

সেই স্থান উদ্ধৃত করিয়া 'চিঠি' অতি সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিয়াছে—'কালপুরুষের বৈঠাও থামে না, সন্তানজন্মও রোধ হয় না!'

'চিঠি'র অনুগ্রহে এখন আমার কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিলে ত? বুঝিয়াছ ত কোন্ কথার কোথায় কি অর্থ হয়? 'বৈঠা' শব্দের মানে কি? 'বালবৈশাখ' কোন্ সমাস? তর্কের মুখে প্রশ্ন করিয়া বসিও না—যে-কালিন্দীর তীরে 'কাশীমিত্রের ঘাট', যাহার জলে বিগত বৎসরের শবদেহ ভাসিয়া যাইতেছে, কবিতার কোনও স্থানে উল্লেখ না থাকিলেও সেই কালিন্দীকে কেন নব বৎসরের 'প্রসূতি' করা হইল এবং জলপুলিশ বেচারী কালপুরুষই বা কি কারণে জনক হইয়া উঠিল? কারণ আর কিছুই নহে, একে অন্ধকার রাত্রি, তাহে কালপুরুষের ছিল বৈঠা, আর 'কালিন্দী' অপেক্ষা সুশ্রী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সমগ্র কবিতার মধ্যে দ্বিতীয় ছিল না। পুনরায় যদি প্রশ্ন কর,—একদিকে ভাসমান শবদেহ, অন্যদিকে নবজাত কুমার, এতদুভয়ের প্রত্যক্ষ উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কিম্বিধ চিত্তে বৈঠার এবম্বিধ অর্থান্তর-প্রাপ্তি ঘটিতে পারে?—তবে সে কথা তোমাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া লাভ দেখি না। অলঙ্কার-শাস্ত্র, ফ্রয়েড্তত্ত্ব ও বস্তি-সাহিত্য এই তিন বিষয়ে সমান্

ব্যুৎপত্তি থাকিলে বুঝিতে পারিতে কাহাকে বলে কবিতার ব্যঞ্জনা! যখন তোমাদেরই পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম—পাঠক-চিত্তকে বাদ দিয়া কাব্যমধ্যস্থ কবিচিত্ত বুঝা যাইতে পারে না, তখন তোমরা সে কথা হাসিয়া উড়াইয়াছিলে। 'বাসনা'র তারতম্যে কবিতার অর্থভেদ ঘটে, আমার এ কথাও সেদিন মানিতে চাহ নাই, এখন ত' বুঝিলে ভদ্রলোকে যে অর্থ করে তাহাই কবিতার একমাত্র অর্থ নহে? আবার 'নানা জনে লয় তার নানা অর্থ টানি', কিন্তু খাঁটি 'টানিয়ে'র কাছে সব কবিতার সেই একই বৈঠামুখী অর্থ!

'চিঠি' যেখানে প্রশ্ন করিয়াছে—'মগ্নচন্দ্রা কালিন্দী, কালের ভগিনী কালিন্দী, নাগকালীয়ের পরমা সখী কালিন্দী, এই কালিন্দী কে? কালের ভগিনীও বটে আবার তাহার সন্তানের জননীও বটে?'—সেখানে তুমিও ক্রুদ্ধভাবে ডবল জিজ্ঞাসা-চিহ্ন দাগিয়া পাশে লিখিয়াছ—'কালের দুই রূপ, স্থিতি ও গতি; এই গতিরূপকেই 'কালিন্দী' বলা হইয়াছে। কাল ও কালপুরুষ এ কবিতায় এক ব্যক্তি নহে।' ওরেঃ বাপ্‌রে, এত কথা কি আমরা বুঝি, না সর্ব্বদা বালখিল্য-বেষ্টিত হইয়া বুঝিবার সময় রাখি? আমরা বুঝি সেই কালিন্দী, যে কালিন্দী বঙ্কিমতে দিনে কালের ভগিনী, আর রাতে কালের 'ইয়ে'!

আমার কথায় বিশ্বাস না করিয়া কবিতাটি পত্রস্থ করিয়াছিলে; এখন হয়ত আমার জন্যই চিন্তিত হইয়াছ। চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু শনিমণ্ডলের সহিত আমার বন্ধুত্বের অবসান হইবার নিতান্তই হেত্বাভাব; কারণ তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কোনদিন আমার নিকট বেতন গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই, অথবা আমার যশঃ এখনও তাঁহাদের কাহারও যশকে অতিক্রম করিবার উদ্যোগ করে নাই। বন্ধুত্ব যে প্রকৃত ও গভীর তাহার প্রমাণ জ্যৈষ্ঠের চিঠিতেই পাইয়াছ। চিঠি তোমাদের অনেককে অকরুণ গালিগালাজ করিয়াছে; কিন্তু আমার কথা বলিতে গিয়া কেবলমাত্র মরীচিকা, মরুশিখা ও মরুমায়ার সশ্রদ্ধ প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারে নাই; 'বৈশাখ' কবিতাটির সহিত হিমালয়ের উপমা দিয়া পুরাতন বন্ধুর প্রতি বহু মান প্রদর্শন করিয়াছে। 'বৈশাখ' কবিতার সমালোচন-সম্পর্কে বন্ধুবর প্রারম্ভেই বলিয়াছেন :—

"তারপরেই গোড়া ঘেঁসিয়া হিমালয় পর্ব্বতের গৌরীশঙ্কর-চূড়া একেবারে নিরেট পাহাড়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত "বৈশাখ!" মাথা খুঁড়িয়া, ডিনামাইট মারিয়াও এক ফোঁটা রস বাহির করিতে পারিলাম না। আকণ্ঠ তৃষ্ণা অপরিতৃপ্ত রহিয়া গেল!"

নানালেখার মধ্যে কোন' লেখাকে হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর চূড়া বলিলে কি বলা হয়, তাহাও কি দুইবার বলিতে হইবে? যে হিমালয় শত নদনদীধারায় রসপরিবেশন করিয়া সমগ্র ভারতকে যুগে যুগে সরস-শ্যামল রাখিয়াছে, যাহার আকাশ ও বাতাস কোটি নির্ঝরের কুলুকুলুনাদে সতত মুখরিত (হায়, হায়, কি কবিতাই লিখিয়া ফেলিয়াছি!) সেই হিমালয়ে রস পাওয়া গেল না বলিলেই কি প্রকৃত তৃষাতুরবৃন্দ গেলাস-হাতে ফিরিয়া আসিবেন? অবশ্য বলিতে পার—'নিরেট' কথাটি আসিল কেন? ও কথা আমরা বন্ধুত্বস্থলে পরস্পর ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। যে মাথার পুনঃ পুনঃ আঘাতে নিরেট পাহাড় ফাটিয়া রস বাহির হইতে বা না হইতে পারে, সে মাথা ত' দুরমুস্‌ অপেক্ষা অধিক ফাঁপা হইলে চলিতে পারে না! আবার শনিমণ্ডলের যদি প্রকৃতই আকণ্ঠ তৃষ্ণা উপস্থিত হইত, তবে হিমালয়ের দ্বারে জল পাইবার জন্য বাছিয়া বাছিয়া 'ডিনামাইট'টিকে পাঠাইবে কেন? প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে—এসব অলঙ্কার শাস্ত্রের কাকু-বক্রোক্তি-ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি জটিল অর্থান্তরপ্রয়োগ, তোমাদের বোঝা কঠিন।

একথা আর থাক্‌, কারণ, বুঝিতে পারিতেছি, বন্ধুর হাতের দান হইলেও উক্ত স্তুতিবাদ পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করা আমার পক্ষে অশোভন। কিন্তু তোমরা ত' বুঝিলে শনিমণ্ডল কেমন অনায়াসে শত্রুমিত্র দুইদল বজায় রাখিতে পারে!

ইহার পর তোমরা আমার আরও স্তুতিবাদের জন্য প্রস্তুত থাকিও। যদি বুঝিতে না পার, এবারের মত দাগ দিয়া 'চিঠি' পাঠাইয়া দিও; পারি ত' বুঝাইয়া দিব। আর যদি নিজেও না বুঝিতে পারি, স্তব্ধ হইয়া থাকিব—তথাপি বন্ধুত্ব-বিচ্ছেদ ঘটিতে দিব না। এই 'বৈশাখ'এই যখন 'মরীচিকা-মরুশিখা-মরুমায়া' এই তিন পুরুষের 'পিণ্ডদান' একত্রে সারিয়া লইয়াছি, তখন ভূতের ভয় আমার কাটিয়াছে। তবে 'কাব্যপরিমিতি' ঘাড়ে চাপিতে পারে। কিন্তু তোমরা যাহাই বল, আমি জানি আর শনি জানে—ওখানি ব্যঙ্গরচনা! নচেৎ ওই নাম আর অমন ছবি দিব কেন? সে সময় শনিবারের চিঠির দেহান্তর না ঘটিলে অমন রস-রচনা কি আর অন্য কাগজে দিতাম?

দেখিলে ত, বন্ধুর সহযোগিতায় কেমন সুকৌশলে দুখানি নামজাদা কাগজে ক'খানি বই-এর ডবলপেজি বিজ্ঞাপন সারিয়া লইলাম—বিনাব্যয়ে?

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ব্যয় ও অপব্যয়

এই দরিদ্র দেশে বিলাত হইতে অধিক বেতন দিয়া চাকরীয়া আমদানী করায় যখনই আপত্তি উত্থাপিত হয়, তখনই আমাদিগকে বলা হয়, ইংরাজ কর্ম্মচারী বর্জ্জন করিলে এ দেশের শাসনাদি সকল বিভাগের "বৃটিশ চরিত্র" আর থাকিবে না। এই "বৃটিশ চরিত্র" কি তাহা সহজে বুঝিবার উপায় নাই; কারণ, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা ইতিহাসেও পাওয়া যায় না। কিন্তু ইংরাজ যে ভাবে উহার উল্লেখ করেন, তাহাতে মনে হয়—ইহাও রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই কথার মত—

"ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে 'হিং টিং ছট্'।"

ইংরাজের মতে এই "ত্রয়ী শক্তি", কর্ম্ম-ক্ষমতা, পরিদর্শন-ক্ষমতা ও সাধুতা। কিন্তু এই গুণত্রয়ের বা ইহাদিগের যে-কোনটির অভাব যে ইংরাজের পরিদর্শনাধীন বিভাগেও বিশেষ রূপ পরিলক্ষিত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ যদি পাওয়া যায়, তবে ইংরাজ কর্ম্মচারীর জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাহা যে অপব্যয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সম্প্রতি সরকারের রেল বিভাগে এই অভাবের দুইটি অতি উজ্জ্বল ও প্রবল দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। আমরা সংক্ষেপে সেই দুইটির উল্লেখ করিতেছি—

এবার দিল্লীতে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে কোন সদস্য বলিয়াছেন—রেলওয়ে বোর্ডের অধীনে চীফ মাইনিং এঞ্জিনিয়ার যে ভাবে রেল প্রভৃতির জন্য কয়লা ক্রয় করেন, তাহাতে এবং রেলের নিজস্ব কয়লার খনি রাখায় অর্থের যথেষ্ট অপব্যবহার হয় এবং সেই দুই বাবদে বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়সঙ্কোচ হইতে পারে। তাঁহার অভিযোগ যে ভাবে কয়লা ক্রয় করা হয়, তাহাতে চীফ মাইনিং এঞ্জিনিয়ারের প্রিয়পাত্রদিগের কয়লাই অধিক মূল্যে ক্রীত হয় এবং অন্য লোক তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কয়লা অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে দিতে চাহিলেও তাঁহাদিগের নিকট হইতে কয়লা ক্রয় করা হয় না।

তিনি দেখান, ঝরিয়ার যে কয়লা ৪ টাকা ৪ আনা টন হিসাবে পাওয়া যায়, তাহাই ৪ টাকা ১২ আনা দিয়া ক্রয় করা হইয়াছে এবং এই বাবদে ১৮ হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে। ঝরিয়ার যে কয়লা ১ লক্ষ ২৮ হাজার টন ক্রয় করা হইয়াছে, তাহাতেও ৬৩ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা ব্যয়-সঙ্কোচ হইতে পারিত। ঝরিয়ার এক প্রকার কয়লায় ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ব্যয় হ্রাস করা যাইত। রাণীগঞ্জের কয়লা ক্রয়েও ঐরূপ ব্যবস্থার পরিচয় তিনি দিয়াছিলেন। ব্রহ্মের রেলের জন্য যে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টন কয়লা মাইনিং এঞ্জিনিয়ারের মাতব্বরীতে ক্রয় করা হইয়াছে তাহাতে অনায়াসে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হ্রাস করা যাইত।

ব্যবস্থা-পরিষদের যে সদস্য এই সব অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তিনি এই সকল অভিযোগ সম্বন্ধে উপযুক্ত অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু আজও তাহা হয় নাই। তাহাতে মনে করা যাইতে পারে, সরকার এ সব অভিযোগের গুরুত্ব স্বীকার করেন না।

আমরা যে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব, তাহাতে মনে হয়, চীফ্ মাইনিং এঞ্জিনিয়ার তাঁহার সম্বন্ধে উপস্থাপিত অভিযোগ বিষয়ে হয়ত ব্রজগোপীদিগের মতই বলিবেন—

"কে না যায় মথুরায় কে না যায় মথুরায়—
মাথে লয়ে দধির পশরা?
তোমার ও চাঁদ বদন কে না করে দরশন?
সবে ভাল, কলঙ্কিনী মোরা!"

কিন্তু রেলওয়ে বোর্ডের সদস্যরা এ সম্বন্ধে কি বলিবেন?

রেলের হিসাব-পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, পরিদর্শনের ত্রুটি, চুক্তির দোষ প্রভৃতি কারণে রেলে লক্ষ লক্ষ টাকা লোকশান হইয়া গিয়াছে। ভাণ্ডারের হিসাব রাখিবার অব্যবস্থায় ২টি রেলে প্রায় ১লক্ষ ১০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। আসাম বেঙ্গল রেলে এক জন বুকিং ক্লার্ক হিসাব-আফিসের এক জন কর্ম্মচারীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ২ বৎসরে ৫৩ হাজার ২ শত ২ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে।

চাফ এঞ্জিনিয়ার মুখের কথায় কোন ঠিকাদারকে একটি সেতু নির্ম্মাণ করিতে দেন। ৩ মাসে কায সম্পন্ন হইবে বলিয়া তিনি অতিরিক্ত পারিশ্রমিকও দিতে স্বীকৃত হয়েন; কিন্তু ১২ মাসের পূর্ব্বে কায শেষ হয় নাই। অথচ অতিরিক্ত পরিশ্রমিক হিসাবে ১১ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার একটি কাযের ঠিকা বিলি করিবার পর কাযে পরিবর্ত্তন করা হয় এবং ফলে ঠিকাদার অতিরিক্ত ৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯০ টাকা দাবি করে।

ঠিকাদার ঠিকার চুক্তিপত্রে সর্ত্ত পরিবর্ত্তিত করিয়াছে এবং কর্ম্মচারীরা তাহাও দেখেন নাই, এমনও দেখা গিয়াছে।

বিনা প্রয়োজনে জমী ক্রয় করায় মূল্যের টাকার সুদেই ৬ লক্ষ টাকার অধিক লোকশান হইয়াছে, ইহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

একদিকে কেরাণীর সংখ্যা হ্রাস করিয়া শত শত টাকা ব্যয়হ্রাসের চেষ্টা, আর একদিকে এইরূপে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয়! ইহাকেই বলে—"কড়ায় কড়া, কাহনে কাণা।"

একটি মাত্র বিভাগে যখন এইরূপ দেখা যাইতেছে, তখন অন্যান্য বিভাগেই বা কি হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে?

ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা

গত ২৭শে জুন তারিখে পার্লামেণ্টে ভারত-সচিব বলিয়াছেন, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে বৃটিশ সরকার "অনেক চিন্তার পর" স্থির করিয়াছেন:—

(১) বৃটিশ সরকারের নির্দ্ধারণ আইনের দ্বারা কার্য্যে পরিণত করা হইবে এবং তাহাতেই প্রদেশসমূহে স্বায়ত্ত-শাসন ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ-গঠনের ব্যবস্থা থাকিবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু সে জন্য প্রদেশসমূহে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রবর্ত্তনে বিলম্ব করা হইবে না। তবে যথসাম্ভব শীঘ্র রাষ্ট্রসঙ্ঘও গঠিত করা হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমানে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অতিরিক্ত কিছুই লাভ করিবার আশা নাই এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত ও তাহার পরে প্রদেশসমূহের সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্বন্ধ কিরূপ হইবে, তাহারও কোন আভাস পাওয়া গেল না। যতদিন রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত না হয়, ততদিন যদি কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ত্তমান অবস্থাই থাকে, তবে প্রদেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন হইতে পারিবে কি না, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ আছে। তবেই বলিতে হয়, এখনও সমস্ত ব্যবস্থাই অস্পষ্ট রহিয়া গেল।

(২) বিলাতের সরকার ভারতের লোকমত পরামর্শ দ্বারা জানিবার ও জনমতের সহযোগের প্রয়োজন অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বিশ্বাস, বর্ত্তমানে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে মীমাংসায় আর বিলম্ব করা সমীচীন হইবে না এবং যদি গোলটেবিল বৈঠক বা রাষ্ট্ররূপ-নির্দ্ধারণ-সমিতির মত জনবহুল প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন করা হয়, তবে মীমাংসা কেবল বিলম্বিতই হইবে।

অর্থাৎ বৈঠক বসাইয়া আর ভারতের জনমত জানা হইবে না—বিলাতী সরকার তাঁহাদিগের মতানুসারে জনমত জ্ঞাত হইবার চেষ্টা করিবেন।

(৩) বিলাতের সরকার ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা-সমাধানের উপায় বিচার করিতেছেন এবং কিছু দিন পরে তাঁহাদিগের নির্দ্ধারণ প্রকাশ করিবেন।

এই বিষয়ে বিলাতী সরকার হিন্দু ও মুসলমান, হিন্দুস্থানের এই সম্প্রদায়দ্বয়ের আপনাদিগের মধ্যে মীমাংসার জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। কিন্তু সে মীমাংসা হয় নাই। এ বিষয়ে যে সম্প্রদায় এইরূপে অপরের নির্দ্ধারণ অনিবার্য্য করিয়াছেন এবং জাতিসঙ্ঘের মত নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতাতেও সম্মত হয়েন নাই, সে সম্প্রদায়ের ব্যবহারে সেই পুরাতন কথাই মনে পড়ে:—

> "অগাধ জলের মকর যেমন
> বুঝে না মিঠ কি তিত;
> সুরস পায়স চিনি পরিহরি
> চিটাতে আদর এত!"

যে নির্দ্ধারণ বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয় তাহা কি স্বেচ্ছায় কৃত নির্দ্ধারণ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ হইতে পারে?

(৪) সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে বিলাতের সরকারের নির্দ্ধারণ প্রকাশিত হইলে পরামর্শ-সমিতির অধিবেশন হইবে।

(৫) যাহাতে দেশীয় রাজ্য অর্থাৎ সামন্ত রাজ্য সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান শীঘ্র হয়, বিলাতের সরকার তাহার উপায় চিন্তা করিবেন।

(৬) পরামর্শ-সমিতির কার্য্যফলে মীমাংসার জন্য আর অধিক ব্যাপার অবশিষ্ট থাকিবে না, ইহাই বিলাতী সরকারের আশা। সেই জন্য তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, পরামর্শ-সমিতির কার্য্যশেষে তাঁহারা—আইন পেশ করিবার পূর্ব্বে—আইন-প্রণয়নের জন্য কতকগুলি বিষয়ে ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য পার্লামেণ্টের উভয় বিভাগ হইতে প্রতিনিধি লইয়া এক যৌথ সমিতি গঠিত করিবেন।

ভারত সরকারই ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি মনোনয়ন করিবেন কি কংগ্রেসকে সে কার্য্যভার প্রদান করা হইবে, তাহা অবশ্য প্রকাশ নাই।

(৭) যদি দেখা যায়, পরামর্শ-সমিতির কার্য্যফলে কতকগুলি মূল প্রস্তাব স্থির করা সম্ভব হয় নাই, তবে সরকার পুনরায় ব্যাপকভাবে পরামর্শ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

বিলাতের সরকারের বিশ্বাস, এই ব্যবস্থায় শীঘ্রই কার্য্য শেষ করা যাইবে এবং এক দিকে যেমন বিলাতের ও ভারতের প্রতিনিধিদিগের মধ্যে সহযোগ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হইবে, অপর-দিকে তেমনই বিলাতের রাজনীতিক দলত্রয়ের পক্ষেও এক-যোগে কায করা সম্ভব হইবে।

যখন আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের শাসন-পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হয়, তখন সার জন সাইমনই বলিয়াছিলেন, তিনি যে সেই নির্দ্ধারণ সানন্দে সমর্থন করিতেছেন, তাহার কারণ—তাহা আইরিশরা রচিত করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের সম্বন্ধে সে নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইতেছে। কেবল তাহাই নহে—বিলাতী সরকারই আপনাদিগের ইচ্ছামত শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতেছেন; তাহা ভারতবর্ষের অবস্থার ও ভারতবাসীর নবজাগ্রত জাতীয় আত্মসম্মানজ্ঞানের উপযোগী কি না, তাহা বিচার করিবার ভার তাঁহারাই লইয়াছেন। তবে কি ভারত-বাসীর সম্মতি অসম্মতি বিবেচনা না করিয়া বিলাতে বিলাতী বিবেচনায় রচিত শাসনপদ্ধতিই ভারতবাসীকে প্রদান করিয়া তাহাই গ্রহণ করিতে তাহাকে বাধ্য করিবার চেষ্টা হইবে?

ঢাকায় হত্যা

কামাখ্যাপ্রসাদ সেন ঢাকা জিলায় মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কায করিতেছিলেন। তিনি ঢাকায় আসিয়া তথায় মহকুমা হাকিমের আতিথ্য স্বীকার করিয়া-ছিলেন। গত ২৬শে জুন রাত্রিকালে আহারের পর তিনি যাইয়া শয়ন করেন। পরদিন প্রত্যূষে—প্রায় ৪টার সময়, গৃহস্থ ব্যক্তিরা বন্দুকের আওয়াজে জাগরিত হইয়া যাইয়া দেখেন—কে বা কাহারা মুক্ত বাতায়নপথে কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে গুলী করিয়া চলিয়া গিয়াছে—তাঁহার প্রাণহীন দেহ শয্যায় পড়িয়া আছে।

ঢাকায় ইহার পূর্ব্বে পুলিশের ২ জন কর্ম্মচারী ও ১ জন ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলী করা হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই য়ুরোপীয়। কামাখ্যা বাবুর পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী ম্যাজিষ্ট্রেট গুলীতে নিহত হয়েন নাই। কামাখ্যা বাবুকে মারিবার কারণ কি, তাহা জানা যায় নাই। কারণ যাহাই কেন হউক না, এই হত্যা-ব্যাপার যে শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না এবং কারণ যদি রাজনীতিক হয়, তবে তাহা আরও শোচনীয়। কেন না, এ দেশের রাজনীতিক নেতারা বুঝিয়া-ছেন ও বুঝাইয়াছেন, হিংসার পথে মুক্তিলাভ করা যায় না। হিংসা এ দেশের লোকের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সত্য বটে য়ুরোপে নানা দেশে বিভীষিকা-পন্থীরা রাজনীতিক কারণে হিংসার পথ গ্রহণ করে এবং আয়ার্লণ্ডে সরকার যখন দমন-নীতি পরিচালিত করেন, তখন আইরিশ নেতা পার্ণেল বলিয়া-ছিলেন, তাহার ফলে অনাচারীরাই প্রবল হইয়া উঠিবে (his place would be taken by Captain Moonlight), কিন্তু এ দেশের লোক কখনই অনাচারের সাফল্যে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তথাপি আজ আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এ দেশে বিভীষিকা-পন্থীদিগের আবির্ভাব হইয়াছে এবং পুলিসের সতর্কতা ব্যর্থ করিয়া তাহারা অস্ত্রাদিও সংগ্রহ করিতেছে।

তাহাদিগের চেষ্টায় কেবল যে সরকারী কর্মচারীদিগের জীবনই বিপন্ন হইতেছে, তাহা নহে, পরন্তু সমাজেরও অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে।

বিভীষিকা-পন্থীরা যে রাজনীতিক উদ্দেশ্যেই কায করে, এমনও না হইতে পারে। তবে সমাজে যখন কোন না কোন কারণে অসন্তোষ থাকে, তখন তাহারা তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাতে পুষ্টিলাভও করে। সেই সব কারণ দূর করাই দেশের শাসকদিগের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

কেবল দমন নীতির দ্বারা ঈপ্সিত ফললাভ সম্ভব হয় না। আয়ার্লণ্ডে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। লর্ড সলসবেরী প্রমুখ ইংরাজ রাজনীতিকরা স্থির করিয়াছিলেন, চণ্ডনীতির দ্বারাই আয়ার্লণ্ড শান্ত হইবে এবং ইংরাজের কর্ম্মচারীরা সেই নীতি-পরিচালনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু সে নীতিতে সুফল ফলে নাই—বিভীষিকাবাদ উন্মূলিত হয় নাই।

যাহাতে দেশ হইতে অসন্তোষ দূর হয়, তাহারই জন্য সরকারকে আবশ্যকমত ব্যবস্থা করিতে হইবে। আয়ার্লণ্ডের দৃষ্টান্তে যদি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের ও ভারত সরকারের নীতি পরিবর্ত্তিত হয়, তবে যে সুফল ফলিবে, তাহা আশা করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই।

লজান বৈঠক

যুরোপের অর্থনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন-সাধনের জন্য যে বৈঠক বসিতেছে, মনে হয়, তাহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—

(১) যুরোপের অর্থনীতিক পুনর্গঠন।

(২) আমেরিকাকে বুঝাইয়া জার্ম্মান যুদ্ধজনিত ঋণ ও ক্ষতিপূরণ মুছিয়া ফেলা।

কারণ, যুরোপ গত কয় বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা না হইলে সমগ্র জগতের বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির অবসান হইবে না। ইংলণ্ড জার্ম্মানীর নিকট ক্ষতিপূরণবাবদে প্রাপ্য টাকা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহা হইলে তাহাকে নিজ তহবিল হইতে কিছুকাল বার্ষিক প্রায় ৫২ কোটি টাকা আমেরিকাকে ঋণশোধহেতু দিতে হইবে। কাযেই মার্কিণকে ঋণের প্রাপ্য ত্যাগ করিতে সম্মত করান বিশেষ প্রয়োজন। মার্কিনও যে তাহাতে অসম্মত হইবে, এমন মনে হয় না। কারণ, ইংলণ্ডের মত মার্কিনও বুঝিতেছে, যতদিন যুরোপের বুকের উপর এই পাথর চাপা থাকিবে, ততদিন পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্য জীবিত থাকিলেও জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিবে। ফ্রান্স কেবল পূর্ব্বশত্রুতা ভুলিতে পারিতেছে না। কিন্তু জার্ম্মানী স্পষ্টই বলিতেছে—সে ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে পারিবে না, ইহা তাহার সাধ্যাতীত।

জার্ম্মানীর এরূপ বলিবার কারণ যে নাই, এমনও বলা যায় না। কোন দেশের যদি সঞ্চিত স্বর্ণ না থাকে, তবে সে আমদানী পণ্যের জন্য যে টাকা দেয়, তদপেক্ষা অধিক মূল্যের পণ্য রপ্তানী করিয়া অতিরিক্ত টাকা পাইলে কেবল তাহাই ক্ষতিপূরণ বাবদে দিতে পারে। যুদ্ধের ব্যয়ের পর জার্ম্মাণীতে যে স্বর্ণ আছে তাহা কেবল তাহার নোট চালাইবার পক্ষে যথেষ্ট। এমন কি যে-ফ্রান্স কিছুতেই জার্ম্মানীকে ঋণ হইতে অব্যাহতি দিতে সম্মত নহে, সেই ফ্রান্সও স্বীকার করিতেছে, জার্ম্মানী হইতে এখন স্বর্ণ লইবার উপায় নাই। তাহার স্বর্ণ মজুদ নাই। ফ্রান্স ইহাও স্বীকার করিতেছে যে, বর্ত্তমানে জার্ম্মানী ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে অক্ষম। তবে ফ্রান্স দাবি ত্যাগ করিতে সম্মত নহে, যখন জার্ম্মানীর অবস্থার উন্নতি হইবে, তখন প্রাপ্য আদায় করা হইবে। জার্ম্মানী ইহাতে সম্মত নহে—সে ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নবোদ্যমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্ম্মানীর নিকট হইতে যাহা পারিয়াছে, লইয়াছে। সে টাকার পরিমাণ যাহাই কেন হউক না, জার্ম্মানী বলিতেছে, সে আর দিতে পারে না। অনুসন্ধানেও তাহাই জানা যায়।

যখন ঋণের পরিমাণ অত্যধিক হয়, তখন সামান্য পরিমাণ সঞ্চিত স্বর্ণ দিয়া তাহা পরিশোধ করা যায় না। এই সত্য উপেক্ষিত হওয়াতেই পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুরবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। পণ্য দিয়া ঋণ শোধ করা যায়। কিন্তু জার্ম্মানী যদি ঋণ শোধ করিবার মত সমৃদ্ধ হয়, তবে সে তখন ঋণ দিতে অস্বীকার করিবার মত বলশালীও হইবে। এ পর্য্যন্ত সে ঋণ বাবদ যাহা দিয়াছে, তাহা আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের নিকট ঋণ করিয়া দিয়াছে। সে আর ঋণ পাইতেছে না বলিয়াই ক্ষতিপূরণের টাকাও দিতে পারিতেছে না। আবার অন্যান্য দেশ জার্ম্মাণ পণ্যের উপর আমদানী-শুল্ক বৃদ্ধি করায় জার্ম্মানীর পণ্যে ঋণ শোধ করিবার পথও বন্ধ হইয়াছে। জার্ম্মানী যদি অন্যান্য দেশে অধিক পণ্যবিক্রয়ের চেষ্টা করে, তবে সে সকল দেশও জার্ম্মান পণ্যের উপর আমদানী-শুল্ক বৃদ্ধি করিবে।

এই অবস্থায় ঋণ ও ক্ষতিপূরণের টাকা মুছিয়া ফেলা ব্যতীত আর উপায় কি?

আমেরিকা এই সুযোগে যুরোপের সকল দেশকে সমর-সজ্জা হ্রাস করিতে বলিতেছে। ঋণের ব্যাপারে আমেরিকা

যেরূপ প্রবল পক্ষ তাহাতে তাহার জিদ সকলকেই বজায় রাখিতে হয়। সুতরাং আমেরিকা যদি আন্তরিকতা সহকারে জিদ করে, তবে য়ুরোপের রণ-সজ্জা কমিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনাও হ্রাস হইবে। কিন্তু জাপান ইহাতে সম্মত হইবে কি? আর জাপান অসম্মত হইলে য়ুরোপের অনেক দেশও সম্মত হইতে ইতস্ততঃ করিবে। আজকাল আন্তর্জ্জাতিক ঈর্ষ্যা ও সন্দেহ এত প্রবল ও সমস্যা এত জটিল যে, সহজে কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হওয়া অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার স্থিতিকাল গভর্ণরের ইচ্ছায় আরও এক বৎসর বর্দ্ধিত হইল। সরকার হয় মনে করেন, বর্ত্তমান সময় পুনরায় নির্ব্বাচনের অনুকূল নহে, নহে ত তাঁহাদিগের বিশ্বাস—এই এক বৎসরের মধ্যেই নূতন শাসন-ব্যবস্থা হইবে, সুতরাং এক বৎসর পরেই নূতন ব্যবস্থায় নূতন নির্ব্বাচন হইবে—ততদিন এই সভার দ্বারাই কাজ চালাইয়া লওয়া হউক। এই সভার সদস্যরা ইহার স্থিতি-কালমধ্যে উল্লেখযোগ্য এমন কোন কাযই করেন নাই যে, সে জন্য দেশের লোক তাঁহাদিগকে আরও এক বৎসর প্রতিনিধি রাখিতে আগ্রহশীল হইতে পারে। বরং মনে করা যাইতে পারে, তাঁহারা আশানুরূপ কায করিতে পারেন নাই। তাহার একাধিক কারণ থাকিতে পারে; কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধভাবে কায করিবার যোগ্যতার অভাবই যে তাহার সর্ব্বপ্রথম কারণ, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে অতিরিক্ত এক বৎসর তাঁহারাই সদস্য থাকিবেন, সে সময়েও কি তাঁহারা এই ভাবে কায চালাইবেন? এই সময়ের মধ্যে বঙ্গীয় ব্যয়সঙ্কোচ-সমিতির নির্দ্ধারণ তাঁহাদিগের নিকট বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে এবং শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুযোগও তাঁহারা পাইবেন। এই দুই ব্যাপারে তাঁহারা কি যথাবুদ্ধি দেশের কল্যাণকর কায করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারিবেন? অর্থের অভাব-হেতু জাতিগঠনমূলক কায উপেক্ষিত হইতেছে বটে, কিন্তু পুলিশের ব্যয় বাড়িতেছে। রাজকর্ম্মচারীদিগের শৈলবাস-বিলাসও বর্জ্জিত হইতেছে না। শাসন-পরিষদের সদস্য ও মন্ত্রীর সংখ্যাহ্রাসেও গভর্ণরকে মনোযোগী দেখা যাইতেছে না। এই সকল বিষয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা অবহিত হইবেন কি?

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

কলিকাতায় ও বঙ্গদেশে ব্যায়ামচেষ্টায় অনুরাগী, বিশেষ মোহনবাগান ক্লাবের সেক্রেটারী বলিয়া পরিচিত দ্বিজেন্দ্র-নাথ বসু ৫৩ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি মজঃফরপুরের প্রসিদ্ধ উকীল ত্রৈলোক্যনাথ বসু মহাশয়ের মধ্যম পুত্র ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। ব্যারিষ্টার হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু খেলার ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রসিদ্ধি। যৌবনে তিনি স্বয়ং ফুটবল খেলায় যশ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার পর মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত—খেলার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তিনি মিতভাষী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বিভিন্ন খেলোয়াড় দলে বিবাদবিরোধের অবসান হইত; কারণ, তাঁহার নিরপেক্ষতায় সকলেরই বিশ্বাস ছিল। বাঙ্গালী বালকরা যাহাতে ব্যায়ামে অনুরাগী ও বলিষ্ঠ হয়, সে দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে তাঁহার মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনগণকে আমাদিগের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

টেক্‌ষ্ট বুক কমিটী

এদেশে সংবাদপত্র-পরিচালনের অনেক বিপদ আছে—মানহানির জন্য আদালতে অভিযুক্ত হওয়া তাহার অন্যতম। সম্প্রতি 'বাঙলা'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার এই বিপদে পড়িয়াছিলেন। আদালতের বিচারে তিনি বিপন্মুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 'বাঙলা' কিছুদিন হইতে টেক্‌ষ্টবুক কমিটীর কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন; যে-সব পুস্তক কমিটীর বিজ্ঞ সভ্যদিগের মতে ছাত্রদিগের পাঠ্য হইবার উপযুক্ত, সে-সব পুস্তক কিরূপ ভ্রমপূর্ণ তাহা দেখাইয়া সহযোগী বাঙ্গালার ছাত্রদিগের উপকার-সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। সেই প্রসঙ্গে সহযোগী ডাক্তার বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের রচিত বলিয়া প্রচারিত 'শরীর পালন'

পুস্তকের আলোচনা করিয়া তাহার ত্রুটি দেখান এবং বলেন,—জানা গিয়াছে, উহা অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির লিখিত। ইহাতে বিশ্বেশ্বর তাঁহার মানহানি হইয়াছে বলেন নাই বটে, কিন্তু অবনীভূষণ মানহানির দাবীতে নালিশ রুজু করেন। বিচারকালে অনেক রহস্য প্রকাশ হইয়াছে। আমরা অবনীভূষণের এ সম্বন্ধীয় কথা তুচ্ছ বলিয়া তাহার আলোচনায় বিরত রহিলাম। কিন্তু বিচারক যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক-ব্যবসায়ী ভিন্ন ভিন্ন নামে পুস্তক ছাপাইয়া কোন কৌশলে সেগুলি কমিটীর দ্বারা পাঠ্যপুস্তক-তালিকা ভুক্ত করিয়া লয়। এইরূপে তাহারা ভালরূপ ব্যবসা চালাইয়া লাভবান হইতেছে। বিচারক এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া অনাচারের মূলোৎপাটন করিবার জন্য কমিটীতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। এখন কমিটী তাহা করেন কি না, তাহা দেখিবার জন্য বাঙ্গালার শিক্ষার্থীদিগের অভিভাবকদিগের কৌতূহল অবশ্যই স্বাভাবিক। কেননা, অনাচারের অভিযোগ সাধারণ বলিয়া উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা যায় না।

ছাত্রদের প্রতি নিবেদন

উপাসনার মারফৎ কলেজের নতুন ছাত্রদের আমি **খান কয়েক ভাল বই** পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। বইগুলি আমার খুবই ভাল লাগিয়াছে।

The Work, Wealth and Happiness of mankind—by H. G. Wells.—10/6 net.

সমগ্র সভ্যতার সামাজিক ও আর্থিক ইতিহাস এত মনোরম ভাবে আর কোথাও পাওয়া যায় না। এ বইখানি না পড়িলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না। বইখানি এত সরলভাবে লেখা যে ম্যাট্রিকুলেশন-পাস ছাত্র মাত্রই বুঝিতে পারিবে।

An Outline of Modern Knowledge—Edited by Dr. William Rose. 8/6 (?)

প্রত্যেক বি-এ, বি-এস-সি, এম-এ, ও এম-এস-সি ছাত্রকে এ বইখানি কিনিতে অনুরোধ করি। সব অধ্যায়গুলিই শ্রেষ্ঠ মনীষিদের দ্বারা লেখান হইয়াছে। যাঁহারা Competitive পরীক্ষা দিবেন তাঁহাদের General Knowledge এবং Everyday Scienceএর পক্ষে এই বইখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

Recovery.—Sir Arther Salper. 10/6d—

বি-এ এবং এম-এ তে যাঁহারা Economics ও Politics লইয়াছেন, তাঁহাদের এই বই খানি পড়িতেই হইবে। যুদ্ধের পর য়ুরোপের অবস্থা ঠিক কি হইয়াছিল, কি হইতেছে ও কি হইতে পারে, এই হইল বইটার আলোচ্য বিষয়। এ সম্বন্ধে অনেক বই লেখা হইয়াছে, কিন্তু সবই প্রায় এক-তরফা। এমন চমৎকার ভাষায় এমন নিরপেক্ষ বিচার এ পর্য্যন্ত চোখে পড়ে নাই।

The Fountain.—Charles Morgan 7/6d

হয়ত সস্তা সংস্করণ বাহির হইবে। বই খানি নভেল এবং সত্যকারের ভাল নভেল।

[যাঁহারা বইগুলি কিনিতে পারেন তাঁহারা যেন কলেজে প্রবেশ করিয়াই হাতে টাকা থাকিতে থাকিতেই কিনিয়া ফেলেন। নচেৎ কলেজের লাইব্রেরী হইতে পড়িবেন। সেখানে যদি না থাকে, অধ্যক্ষকে ও লাইব্রেরিয়ানকে আনাইতে অনুরোধ করিবেন। *]

—শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

* লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়—ছাত্রদের লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত বই কয়খানি কিনিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। অধ্যাপক মহাশয়ের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের ছাত্রগণ উপকৃত হইবেন এ ভরসা আমাদের আছে। —উঃ সঃ

আমাদের বাণিজ্য-সম্পদ

—শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

ভারতের অর্থনৈতিক ভাগ্য-পরিবর্ত্তন তাহার বাণিজ্যের মধ্য দিয়া যে পরিমাণে পরিস্ফুট দেখা যায় তেমন বোধ হয় আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন যুগে আর্থিক ভারতের পরিচয় লইতে হইলে ভারতবর্ষের এই বাণিজ্যের রূপ ও গতি পর্য্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। দেশের শিল্প, কৃষি এবং খনির উৎপাদনী শক্তি এক বাণিজ্যের মধ্য দিয়াই প্রতিফলিত হয়।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষ তাহার বাণিজ্য-সম্পদের জন্য দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য

ভারতবর্ষের বাণিজ্যের মধ্য দিয়া তাহার ঐশ্বর্য্যের আভাষ পাইয়াই বারম্বার বিদেশী দস্যু ও পরাক্রান্ত রাজশক্তি এই সোনার ভারত করায়ত্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। কত পুরাতন যুগ হইতে অর্থনৈতিক হিসাবে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় সভ্যতার উচ্চ স্তরে উপনীত হইয়াছিল তাহার বিশদ ইতিহাস এখন পাওয়া যায় না। তবে ইহা জানা গিয়াছে যে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩০০ বর্ষেও মিশর, ব্যাবিলন, পারস্য প্রভৃতি স্থানে বহুল পরিমাণে ভারতীয় দ্রব্যসম্ভার, বিশেষতঃ বহুমূল্য বস্ত্রাদি ও ইস্পাতের জিনিষ রপ্তানি হইত এবং ভারতীয় জাহাজে ভারতীয় বণিক্ একদিকে সুদূর গ্রীস ও রোম এবং অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে এমন কি তাহারও পূর্ব্বে দক্ষিণ আমেরিকাখণ্ডে নিজেদের বাণিজ্যের প্রসার সাধন করিয়াছিলেন। ভারতীয় মস্‌লিনের কাপড়ে দুই হাজার বৎসরের পুরাতন মিশরীয় "মামি"র প্রচ্ছাদন এখনও দেখিতে পাওয়া যায় এবং নানা প্রকার উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য এদেশে যে প্রস্তুত হইত তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ঢাকার মস্‌লিনকে গ্রীকেরা বলিতেন 'গ্যাঞ্জেটিকা' এবং গ্রীসে ও রোমে প্রচুর পরিমাণে সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি ও বহুমূল্য শিল্পজাত দ্রব্য এদেশ হইতে রপ্তানি হইত। ইহা ছাড়া চীন, পারস্য ও আরব দেশের সঙ্গেও আমাদের অনেক বাণিজ্যগত সম্বন্ধ ছিল।

এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, বর্ত্তমান কালে বহির্বাণিজ্য যে ভাবে যে সকল অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া হইয়া থাকে প্রাচীন কালে তাহা ছিল না। সেকালের রাস্তাঘাট ও যানবাহনাদি তেমন সুগম ও সুবিধাজনক না থাকায় অল্প মূল্যের পণ্য বহুদূর লইয়া যাওয়া লাভজনক হইত না। সুতরাং যে সকল পণ্য এদেশ হইতে রপ্তানি হইত তাহার মধ্যে প্রধান সামগ্রী ছিল রেশম ও সুতার নানাবিধ কারুকার্য্যসম্বলিত বহুমূল্য বস্ত্রাদি, লোহা, ইস্পাত, পিত্তল ও কাঁসার জিনিষ-পত্র, হস্তীদন্তনির্ম্মিত পণ্য, আতর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য, বিবিধ প্রকার রং এবং মশলা প্রভৃতি। এই সকল পণ্যের পরিবর্ত্তে বিদেশ হইতে আমদানি হইত প্রধানতঃ পিত্তল, সীসা, টিন, রৌপ্য ও স্বর্ণ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য, বহুমূল্য সুরা, এবং অশ্বাদি পশু। প্রথম হইতেই ভারতবর্ষের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ ছিল অধিক। সে জন্য পুরাকাল হইতেই বিদেশ হইতে স্বর্ণ আকৃষ্ট হইয়া এদেশে আসিতে থাকে। নানা পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও আমাদের বহির্বাণিজ্যের এই ধারা এখনও চলিয়া আসিতেছে।

এদেশে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ভিন্ন নিকটস্থ কোন কোন বিদেশজাত পণ্যেও বহুদিন হইতে ভারতীয় বণিকেরা বাণিজ্য করিতেন। যেমন চীনের রেশম ও চীনা মাটির দ্রব্যাদি, সিংহলের মুক্তা, এবং ভারতমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের মূল্যবান প্রস্তরাদি। তদানীন্তন ভারতীয় বণিক্‌দিগের সমুদ্রবিচরণোপযোগিতা ও ভারতীয় জাহাজের বাণিজ্যকুশলতার ইহাই শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

বলা বাহুল্য যে ভারতীয় বাণিজ্যের প্রসারের প্রথম অবস্থায় বহির্বাণিজ্য অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক বেশী ছিল। হিন্দুকুশ হইতে কুমারিকা এবং দ্বারকা হইতে ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত নানা স্থানের বিভিন্ন শিল্পের

সেকালের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

পরিচয় পৌরাণিক আখ্যানে এবং ঐতিহাসিকের বর্ণনায় পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন বড় বড় নদীর সঙ্গমে এবং বহুদূরপ্রসারী রাস্তার মাঝে মাঝে যে সমৃদ্ধশালী নগর ও গঞ্জের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা হইতেও দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিপুল বিস্তারের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন কালের সৌখীন ক্রেতাগণ প্রায়ই রাজধানীর নিকট সমবেত হইতেন এবং সেখানে রাজপুরুষ ও তাঁহাদের সভাসদ্‌বৃন্দের প্রয়োজন মিটাই-

বার জন্যই অনেক চারুশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইত। সেজন্য অনেক শিল্পই ভারতের প্রাচীন রাজধানীর নিকটই সংবর্দ্ধিত হইত। তথাপি বহুমূল্যের দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় সুদূর নগরী-তেও যথেষ্ট পরিমাণে হইত, তাহার প্রমাণ আছে। দেশীয় চাহিদার পরিমাণে উৎপন্ন পণ্য উদ্বৃত্ত হইলেই বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হইত।

মুসলমান রাজত্বের প্রথমে ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুইটী প্রধান প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ পূর্ব্বতন হিন্দু রাজত্বের সময় দেশের মধ্যে যে শান্তি বিরাজ করিত তাহা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ায় বাণিজ্যের প্রসার সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, এবং দ্বিতীয়তঃ পশ্চিম সীমান্তের বাণিজ্য-পথগুলি অধিকতর ভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। তাহার ফলে দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগের বাণিজ্যের বিস্তার কিছু কমিয়া যায় এবং কাবুল ও কান্দাহারের পথে পারস্য ও মধ্য এশিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। এই সময়ে পেশোয়ার, লাহোর, মুলতান, অমৃতসহর, দিল্লী ও আগ্রা প্রভৃতি স্থানের শিল্প ও বাণিজ্য বৃদ্ধিলাভ করে এবং উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে সমুদ্রপথের বাণিজ্য কতকাংশে উপেক্ষিত হয়।

মুসলমান রাজত্বের আমলে ভারতীয় বাণিজ্য

মুসলমান রাজত্বের যুগে, বিশেষতঃ মোগল সম্রাট্‌দিগের আমলে, আরও একটী কারণে ভারতীয় বাণিজ্যের কিঞ্চিৎ রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। একথা বলিলে বিশেষ অন্যায় হইবে না যে হিন্দু রাজাদিগের আমলে সমগ্র ভারতবর্ষকে একই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া বিভিন্ন প্রদেশে গতায়াতের সুবিধার জন্য সুগম রাস্তাঘাট প্রস্তুত করিবার তেমন চেষ্টা হয় নাই। দুই একটা বহুদূরপ্রসারী পথ ছিল বটে কিন্তু সেগুলি প্রায়ই সেনা-চলাচলের জন্য প্রস্তুত হইত এবং শান্তির সময় আর তাহার উপর দৃষ্টি পড়িত না। সেজন্য বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে পরস্পরের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় চলিত প্রধানতঃ জল-পথে। সুতরাং যে সকল স্থানে নৌকা-পরিচালনার উপযোগী নদনদী ছিল না, সেখানে বাণিজ্য বিশেষ বিস্তার লাভ করে নাই। মুসলমান রাজত্বের সময়ে এরূপ অবস্থা কতক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিলেও স্থল-পথে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়। ইহার ফলে আমাদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রসার কিয়দংশ বৃদ্ধি পায়। যে সকল দ্রব্য ক্রমে আমাদের সুদূরব্যাপী বাণিজ্যে স্থান পায় তাহার মধ্যে প্রধান, সুতি ও রেশমের বস্ত্রাদি, বাসনপত্র, লৌহ, ইস্পাত ও পিত্তল প্রভৃতি ধাতব যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, নীল ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ রং, আতর ও নানারূপ সুগন্ধি নির্য্যাস, তামাক, চিনি, লবণ, গালা ও কাঁচের অলঙ্কার এবং সুপারি, লবঙ্গ, এলাচ, প্রভৃতি পানের ও রন্ধনোপযোগী মশলা। এক হিসাবে দেখিতে গেলে পূর্ব্বতন হিন্দু আমলে বাণিজ্যের সাধারণ যে রূপ ছিল মুসলমান রাজত্বের সময়েও প্রায় সেই রীতিই চলিয়া আসিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের দ্রব্যাদি বিশেষতঃ মানুষ ও পশুর খাদ্যের জিনিষ এবং নানাবিধ কাঁচা মাল দূর হইতে সরবরাহ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা তখনও হয় নাই। সেজন্য কোন এক স্থানে অজন্মা হইলে সেখানে দুর্ভিক্ষের তাড়না অনিবার্য্য হইয়া উঠিত। সমুদ্রপথে বহির্ব্বাণিজ্যের প্রতি মুসলমান রাজাগণ তেমন উৎসাহ না দেখাইলেও সমুদ্রতীরবাসী ভারতীয়েরা, বিশেষতঃ মালাবার ও করোমণ্ডল অঞ্চলের অধিবাসী মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ ক্রমে সিংহল, সুমাত্রা ও জাভা এবং অন্যান্য ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে নিজেদের ব্যবসায় বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে পশ্চিম ইউরোপীয় বণিকগণ উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া আগমন করেন এবং তখন হইতে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন হয়। পর্ত্তুগীজ নাবিকেরা প্রথমে মালাবার উপকূলে এবং ক্রমে অন্যান্য অংশে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এজন্য বিদেশ হইতে নানা প্রকার স্বল্পমূল্যের খেলেনা ও কাঁচের দ্রব্যাদি ভারতবর্ষে আসিতে থাকে।

ইউরোপীয় বণিকগণের আগমন

পর্ত্তুগীজ বণিক্‌দিগের সাফল্যে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে ডাচ, ফরাসী ও ইংরাজ নাবিকগণও উত্তমাশার পথে এদেশে আসিতে আরম্ভ করেন এবং ভারতবর্ষের সমুদ্র-পথের বহির্ব্বাণিজ্য পুনরায় বৃদ্ধিলাভ করিতে থাকে। মোগল সম্রাটেরা কখনই এই বাণিজ্যবিস্তারের ফলাফল বিচার করিয়া দেখেন নাই এবং যখন যে বিদেশী বণিক্ সুবিধা করিতে পারিয়াছেন তদানীন্তন বাদশাহ ও তাঁহার প্রতিনিধি-

গণকে তুষ্ট করিয়া এদেশে অবাধ বাণিজ্যবিস্তারের, এমন কি একচেটিয়া ব্যবসায়েরও অধিকার তিনি আদায় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

মোগল রাজত্বের শেষ ভাগে ভারতের শাসন-প্রণালী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় নানা স্থানে অরাজকতার লক্ষণ দেখা দেয়। তাহা ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজা ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ কেন্দ্রীয় সম্রাটের অধিকার অমান্য করিয়া প্রায় স্ব স্ব-প্রধান হইয়া পড়েন। তাহার ফলে রাস্তাঘাটে মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া চলাচল বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠে। সংস্কারের অভাবে রাস্তাঘাট দুর্গম হইয়া যায় এজন্য ক্রমশঃ ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের প্রসার সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে, এবং পূর্ব্বতন শিল্পগুলি ক্রমে উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে ভারতবর্ষের অর্থ-নৈতিক জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে এবং কৃষি ও শিল্পের পরিসর কমিয়া যায়।

অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের কুটীর-শিল্পগুলিও গ্রাম অথবা নগরীর ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। কৃষি ও শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যাদি দেশদেশান্তরে বিক্রীত হইত। ক্রমশঃ রাজনৈতিক অশান্তি ও শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যও সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। হিন্দু রাজাদিগের আমলে ভারতীয় বণিকেরা বহুদুর পর্য্যন্ত বাণিজ্যের বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন এবং এরূপ শোনা যায় যে, তৎকালে ভারতীয়েরা ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন জাতি সমুদ্রপথে বহুদূর-গমনোপযোগী জাহাজ প্রস্তুত ও চালনা-কৌশল জানিত না। মুসলমান রাজত্বকালে ক্রমে বহির্ব্বাণিজ্যের উপর দৃষ্টি কমিয়া যায় এবং দেশীয় শিল্পগুলিও স্বল্প গণ্ডীর সঙ্কীর্ণ চাহিদা মিটাইবার উপযোগী হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ভারতীয় অর্থ-নৈতিক জীবন চিরদিনই আত্মপরিতুষ্ট অথবা **self-sufficiency**র উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ইহা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগেরই পরিণতি। গত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পুনরায় ইহার রূপ পরিবর্ত্তন ও আর্থিক জীবনের বিস্তৃতি এবং পরস্পরের সাপেক্ষতা (interdependent economy) আরম্ভ হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারত মহাসাগরে প্রথম পর্ত্তুগীজ জাহাজ প্রবেশ করে এবং তাহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই সমুদ্রপথ সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়া একচেটিয়া ব্যবসায় চালাইবার সঙ্কল্প লইয়া পর্ত্তুগীজ বণিকগণ ভারতীয় সম্রাট ও রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধি সংস্থাপন আরম্ভ করেন। ইহার কিছুদিনের মধ্যেই ইউরোপে স্পেন ও হল্যাণ্ডের মধ্যে যে সংগ্রাম আরম্ভ হয় তাহার ফলে ডাচ্ নাবিকগণ বিভিন্ন পথে ভারতবর্ষে ও সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য বিস্তার করিতে যত্নবান্ হন এবং শীঘ্রই পর্ত্তুগীজ শক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ান। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে জাভাদ্বীপের প্রবেশপথে পর্ত্তুগীজ ও ডাচ্‌দের মধ্যে ভীষণ নৌযুদ্ধ হয় ও তাহাতে পর্ত্তুগীজদিগকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া ডাচ্‌গণ বৃহত্তর ভারতের বাণিজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করেন। এই অবস্থায় ইউরোপীয় অন্যান্য বণিক্‌দের সাফল্য ও অর্থাগম দেখিয়া ইংরাজ বণিকগণ প্রাচ্যে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য বিশেষ সচেষ্ট হন ও লণ্ডন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষ ও জাভাদ্বীপসমূহে বাণিজ্য অভিযান প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন।

ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সূত্র সংস্থাপন অপেক্ষা প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্যে একাধিপত্য লাভ করিবার বাসনাই তখন ইংরাজ বণিকগণকে অধিক প্রলুব্ধ করিয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বেই ডাচ্ বণিকেরা সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি স্থানে আপনাদের বাণিজ্যজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, সুতরাং ইংরাজদিগের প্রথম সমস্যাই হইল ডাচ্‌দিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ডাচ-জাতি তখন সমুদ্রপথে প্রবল পরাক্রান্ত। তাঁহাদের একান্ত উচ্ছেদ-সাধন ইংরাজদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ায় ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য লণ্ডন কোম্পানি ভারতবর্ষের পণ্যের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইলেন এবং শীঘ্রই নৌপথে পর্ত্তুগীজদিগকে পরাভূত করিয়া ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত বাণিজ্য-বিস্তারক সন্ধি সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন। ভারতীয় বাণিজ্যক্ষেত্রে ইংরাজের প্রবেশ এইরূপে সংসাধিত হইয়াছিল।

লণ্ডন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম প্রাচ্য অভিযানের সময় তাঁহারা ইংলণ্ডে প্রস্তুত লৌহ, টিন, সীসা ও উলের কয়েকপ্রকার পণ্য ও স্বর্ণ রৌপ্য লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের দ্রব্যাদি অপেক্ষা

ভারতসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদির আদর অনেক অধিক এবং বৃহত্তর ভারতের মসলাদি পণ্যের সরবরাহে তাঁহাদের লাভের সম্ভাবনাও বেশী। সুতরাং শীঘ্রই তাঁহারা ব্যবসায়ের ধারা বদলাইয়া ইংলণ্ড হইতে আনীত স্বর্ণ, রৌপ্য ও কাঁচের দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তে ভারতীয় বস্ত্র, লৌহ ও অন্যান্য ধাতব দ্রব্যাদি লইতে লাগিলেন এবং তাহার বিনিময়ে প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জের মশলা লঙ্কা প্রভৃতি পণ্য লইয়া ইউরোপের বাজারে প্রভূত লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ভারতীয় সূক্ষ্ম দ্রব্যাদির আদর ও চাহিদা পশ্চিমে বাড়িতে লাগিল এবং ইউরোপের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ বাণিজ্যেরও প্রসার হইতে থাকিল।

ইংরাজ বণিক্‌গণ ১৬১২ খৃষ্টাব্দে প্রথমে সুরাট বন্দরে তাঁহাদের বাণিজ্যোপনিবেশ ও দুর্গ-সংস্থাপন করিলেন এবং ক্রমে ভারতের অন্যান্য স্থানে ছড়াইয়া পড়িলেন। ইংরাজদিগের এই বাণিজ্য-প্রসারের মূলে ছিল তাঁহাদের নৌবল, চক্রান্তনীতি ও চাটুকারিতা। ইহার বলে প্রথমে তাঁহারা পর্ত্তুগীজ ও ডাচ্ এবং পরে ফরাসীদিগের শক্তি ক্ষুণ্ণ করিয়া আপনাদের প্রাধান্য সংস্থাপন করেন এবং মোগল সম্রাট্ ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের নিকট হইতে অবাধ বাণিজ্যের অথবা অপেক্ষাকৃত অল্প শুল্কে মাল-সরবরাহের অধিকার এবং অন্যান্য অনেক প্রকার ন্যায্য ও অন্যায় সুযোগ লাভ করিতে সমর্থ হন।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুরাট বন্দরই ছিল ইংরাজদিগের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। ক্রমে তাঁহারা পশ্চিম ও পূর্ব্ব উপকূলে তালিকট, পেট্রপলি, মসুলিপটম্, আর্মাগন, মাদ্রাজপটম্, বালেশ্বর, ও হুগলী প্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। নানা শক্তির সহিত সংঘর্ষে সকল কেন্দ্রই শেষ পর্য্যন্ত তাদৃশ লাভজনক হয় নাই, এবং অবশেষে মান্দ্রাজ ও কলিকাতাতে ইংরাজগণ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্ব ভাবতে স্বকীয় শক্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিলেন। ইহাই ইংরাজ রাজশক্তির ভারতাধিকারের প্রথম সোপান।

[ক্রমশঃ]

ওটাওয়া বৈঠক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীকুলেন্দ্রচন্দ্র পাল

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্য বৈঠকের সভ্য নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাহাকে ওটাওয়া বৈঠকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ভারত-সচিবের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিও নিযুক্ত করিয়াছেন। বৈঠকে এই সব প্রতিনিধির কি স্থান হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই, কিন্তু যে স্থানই হউক না কেন তাঁহারা ভারত গভর্ণমেণ্টেরই প্রতিনিধি, ভারতবর্ষের নয়। অবশ্য ডমিনিয়ন সমূহের প্রতিনিধিও তাহাদের গভর্ণমেণ্টই নিযুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু সে সব দেশে দায়িত্বমূলক শাসন প্রণালী প্রচলিত, কাজেই গভর্ণমেণ্ট সেখানে জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন প্রতিনিধি লইয়াই গঠিত। ভারতবর্ষে সেরূপতো নয়ই বরং ভারত গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধস্তন শাসন-বিভাগবিশেষ বলিয়াই সুপরিচিত। কাজেই এক্ষেত্রে নিমন্ত্রণকারী ও নিমন্ত্রিত অভিন্ন এবং এই নিমন্ত্রণ-সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারটাই একটা লোক-দেখান' প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

একথা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে প্রতিনিধি-নিয়োগে ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্যবহার দ্বারা। এ ব্যাপারে তাঁহারা ভারতের জনমত-গ্রহণের চেষ্টা মাত্র করেন নাই। অথচ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভা তখন নিয়মিত ভাবেই বসিতে-ছিল এবং ইচ্ছা করিলেই গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিতেন। শুধু তাই নয়, নিযুক্ত প্রতিনিধিগণের মধ্যে সার পদমজি জিনওয়ালা সাম্রাজ্যানুকল্যের সমর্থক বলিয়া সুপরিচিত, সার জর্জ্জ রেইনি ও সার অতুল চাটার্জ্জি বহুদিনের সিভিলিয়ান, এবং মিঃ সন্মুখম চেট্টি ব্যতীত অপর দুইজন জন সাধারণের নিকট একরূপ অপরিচিত। মিঃ চেট্টি একা এরূপ প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই বলিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায় না এবং বলিলেও তাঁহার একার কথা অগ্রাহ্যই হইবে। কাজেই "ভারতীয়" প্রতিনিধিগণ পদে পদেই ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের কথায় সায় দিয়া চলিবেন এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

সার জর্জ্জ রেইনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদকে আশ্বাস দিয়াছেন যে ওটাওয়া বৈঠকের আলোচনার ফলে কোন বাণিজ্য-চুক্তি সম্ভবপর হইলে শুল্ক-ব্যবস্থার যে-পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে তাহা যথা সময়ে পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে এবং সে-পরিবর্ত্তন ভারতের স্বার্থের অনুকূল বলিয়া পরিষদ সাব্যস্ত না করিলে গভর্ণমেণ্টের তাহা কার্য্যকরী করার কোন অভিসন্ধি নাই। কিন্তু ভারতবাসী গভর্ণমেণ্টের এই আশ্বাস-বাক্যে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, কারণ গভর্ণমেণ্ট যে ওটাওয়া সিদ্ধান্তকে সমস্ত শক্তি দিয়া সমর্থন করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। এ অবস্থায় বর্ত্তমান ব্যবস্থা-পরিষদ তাহা নাকচ করিতে সমর্থ হইবে কি? গভর্ণমেণ্ট যদি বলিতেন যে এ ব্যাপারে শুধু জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণেরই কেবল ভোট দেওয়ার অধিকার থাকিবে তবে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন আশ্বাসই দেন নাই; এ অবস্থায় তাঁহারা যে মনোনীত ও গভর্ণমেণ্ট সদস্যগণের সাহায্যে ভারতের জনমত ও স্বার্থকে পদদলিত করিবেন না তাহার কি স্থিরতা আছে?

ওটাওয়া বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ-সমূহের পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্য-সম্বন্ধস্থাপনের আলোচনা একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে এই আলোচনা করিবার জন্য যে ইংলণ্ডের নূতন শুল্কনীতি-বিবেচনায় উভয়ের মধ্যে পরস্পরের ব্যবসায়ের সুবিধাজনক কোন প্রতিদানমূলক বাণিজ্য-চুক্তি উচিত হইবে কিনা। বলা বাহুল্য এই নিমন্ত্রণপত্রানুযায়ী পরামর্শ চলিলে ওটাওয়ায় ভারতবর্ষসংক্রান্ত আলোচনা শুধু ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের বাণিজ্য-সম্বন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। তার অর্থ এই যে বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের কোন সম্পর্কই থাকিবে না। কিন্তু তাহা হইলে ভারতবর্ষকে এই বৈঠকে নিমন্ত্রণ করার কোন সার্থকতাই থাকে না। কাজেই ওটাওয়া বৈঠকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট নয় এবং হয়ত ইংলণ্ডের নিজেরও এ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। এ অনুমান যে ভিত্তিহীন নয় তাহা

নিমন্ত্রণের পরবর্ত্তী নানা রূপ আলাপ আলোচনা হইতে বেশ বুঝা যায়। কারণ এ আলোচনায় প্রায় সর্ব্বত্রই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে ভারতবর্ষের ওটাওয়া বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্য তাহার নিজের ও সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের প্রসার সাম্রাজ্য" দ্বারা যদি কেবল "ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট"ই না বুঝায় তবে এ কথার একমাত্র অর্থ এই যে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যানুকূল্য-নীতি শুধু ইংলণ্ডেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, সাম্রাজ্যান্তর্গত অন্যান্য দেশও নীতির অন্তর্গত থাকিবে। অপর কথায় সাম্রাজ্যের নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ডমিনিয়ন সমূহের যে স্থান ভারতবর্ষেরও সেই স্থানই হইবে।

এ ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের দিক হইতে কি কি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে এবং ডমিনিয়ন সমূহ সেগুলিকে কি ভাবে গ্রহণ করিতেছে তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই সব প্রস্তাবে ডমিনিয়ন সমূহের যে-সব আপত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে ভারতবর্ষের দিক হইতেও তাহার সমস্ত গুলিই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু ডমিনিয়ন সমূহের আপত্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই শুধু অর্থ-নৈতিক; ভারতবর্ষের আপত্তি কেবল তাহাই নয়, রাজনৈতিকও বটে। ডমিনিয়ন সমূহ শুল্কনীতি-নিয়ন্ত্রণে বহুদিন হইতেই স্বাধীন এবং Statute of West Minster এর ফলে আজ তাহারা সর্ব্বব্যাপারেই ইংলণ্ডের সহিত সমমর্য্যাদাবিশিষ্ট। ভারতবর্ষ এই ডমিনিয়ন পদ পাইবে কিনা এবং পাইলেও কবে পাইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই; এমন কি শুল্কনীতি-নিয়ন্ত্রণেও আজ পর্য্যন্ত তাহার পরাধীনতা ঘুচে নাই। ফলে পরাধীন ভারতবাসী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সাধারণ নাগরিকের অধিকার এবং বহুক্ষেত্রে মানুষের অধিকার হইতেও বঞ্চিত। তা' ছাড়া ডমিনিয়ন সমূহের সকলেরই ইংলণ্ডের সহিত ও পরস্পরের সঙ্গে অল্প বিস্তর রক্তের সম্পর্ক রহিয়াছে; ভারতবর্ষের সঙ্গে তাহার এরূপ কোন সম্পর্কই নাই। এ অবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৌরব করিবার হেতু এবং তাহার সমৃদ্ধির জন্য ত্যাগ-স্বীকার করিবার প্রেরণা ডমিনিয়ন সমূহের হয়ত থাকিতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের দিক হইতে তাহার অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। কাজেই ভারতের জনমত শুধু রাজনৈতিক কারণেই কিছুতেই সাম্রাজ্যানুকূল্য-নীতির সমর্থন করিতে পারে না।

কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে ভারতবর্ষ ডমিনিয়ন পদ লাভ করিলে তাহার সাম্রাজ্যিক বাণিজ্যানুকূল্যের প্রস্তাবে আপত্তি করিবার কিছুই থাকিবে না। ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের প্রকৃতিই এইরূপ যে তাহাতে সাম্রাজ্যানুকূল্য-নীতি দ্বারা তাহার কিছু মাত্র লাভবান হইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ নানা দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সুনিশ্চিত কারণ রহিয়াছে। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের সামান্য মাত্র আলোচনা হইতেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধ হইবে। সকলেই জানেন ভারতবর্ষ আমদানী করিয়া থাকে প্রধানতঃ শিল্পজাত দ্রব্য এবং রপ্তানী করিয়া থাকে খাদ্য-দ্রব্য ও কাঁচা মাল। যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এরূপ শিল্পজাতের আমদানীর পরিমাণ ছিল গড়ে মোট আমদানীর শতকরা ৭৬ ভাগ। তাহা কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৭১ ভাগে এবং ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৬৬ ভাগে। অপর পক্ষে ভারতবর্ষের মোট রপ্তানীর শতকরা ৭১ ভাগই কাঁচা মাল ও খাদ্য দ্রব্য। বলা বাহুল্য এই আমদানীর বেশীর ভাগই আসে ইংলণ্ড হইতে যদিও তাহার পরিমাণ দিন দিনই কমিয়া যাইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের আমদানীর পরিমাণ ছিল গড়ে তাহার মোট আমদানীর শতকরা ৬২ ভাগ; ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে তাহা কমিয়া দাঁড়ায় শতকরা ৪২ ভাগে এবং ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে আরও কমিয়া দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৩৭ ভাগে। ভারতবর্ষ এত বিপুল পরিমাণে ইংলণ্ড হইতে আমদানী করিলেও ইংলণ্ডে রপ্তানী করিয়া থাকে গড়ে তাহার মোট রপ্তানীর মাত্র এক চতুর্থাংশ বা তদপেক্ষাও কম।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ সমূহ হইতে যে পরিমাণ দ্রব্য আমদানী করিয়া থাকে সে সব দেশে রপ্তানী করিয়া থাকে তদপেক্ষা ঢের কম। যুদ্ধের পূর্ব্বে সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ সমূহ হইতে ভারতবর্ষের আমদানীর পরিমাণ ছিল গড়ে তাহার মোট আমদানীর শতকরা ৬৯ ভাগ। ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে তাহা দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৫১ ভাগে এবং ১৯৩০-৩১

খৃষ্টাব্দে শতকরা ৪৬ ভাগে। সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল গড়ে তাহার মোট রপ্তানীর শতকরা ৪১ ভাগ ; ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে তাহা কমিয়া দাঁড়াইয়াছে মাত্র শতকরা ৩৬ ভাগে এবং ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৩৯ ভাগে।

ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের মূল্যের অঙ্কে দৃষ্টিপাতমাত্রে দেখা যাইবে যে এক ইংলণ্ড ছাড়া আর সকল দেশের বেলায়ই তাহার রপ্তানীর মূল্য আমদানীর মূল্য অপেক্ষা অধিক। কিন্তু ইংলণ্ডের বেলায় এক ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দ ছাড়া প্রতি বৎসরই রপ্তানী অপেক্ষা আমদানীর মূল্য অধিক হইয়াছে।

ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে আমদানী করিয়া থাকে প্রধানতঃ তুলাজাত দ্রব্য, মটর কার, মটর সাইকেল ইত্যাদি, যন্ত্রপাতি (instruments), লৌহ ও ইস্পাত, কলকব্জা (machinery), লৌহ দ্রব্য (hardware), মদ, কাগজ ইত্যাদি এবং ইংলণ্ডে রপ্তানী করিয়া থাকে প্রধানতঃ চা, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তুলা, তৈলবীজ (oil seeds), শস্য ও চামড়া। ১৯২৯-৩০ ও ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ এই প্রথম শ্রেণীর প্রত্যেক দ্রব্যের মোট আমদানীর শতকরা কত ভাগ ইংলণ্ড হইতে আনিয়াছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্যেক দ্রব্যের মোট রপ্তানীর শতকরা কত ভাগ ইংলণ্ড পাঠাইয়াছে নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে :—

আমদানী (ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে)

	বৎসর ১৯২৯-৩০	বৎসর ১৯৩০-৩১
তুলাজাত দ্রব্য ...	৬৩	৫৮
মটর কার, মটর সাইকেল ইত্যাদি	২০	২৩
যন্ত্রপাতি ...	৫৬	৫৩
লৌহ ও ইস্পাত ...	৫৯	৫২
কলকব্জা ...	৭৫	৭৪
লৌহ দ্রব্য (hardware)	৩৫	৩৬
মদ	৫৮	৫৯
কাগজ ...	৩২	৩১

রপ্তানী (ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড)

	বৎসর ১৯২৯-৩০	বৎসর ১৯৩০-৩১
চা	৮৫	৮৪
পাট	২০	১৭
পাটজাত দ্রব্য ...	৬	৫
তুলা	৬.৬	৬.৫
তৈল বীজ (oil seeds)	১৬	১৫
খাদ্য শস্য ...	২	৯
চামড়া ...	৪৬	৫২

১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে মোট ২০ কোটী টাকার চা, ৬ কোটী টাকার চামড়া, ৪ কোটী টাকার পাট ও পাটজাত দ্রব্য, ৩ কোটী টাকার তুলা, ৩ কোটি টাকার তৈলবীজ (seeds), ৩ কোটি টাকার খাদ্য শস্য এবং ২ কোটি টাকার উল ইংলণ্ডে রপ্তানী হইয়াছে। সে বৎসর ইংলণ্ডে ভারতের রপ্তানী শতকরা ৭৯ ভাগই হইয়াছে এই কয়টি দ্রব্য লইয়া। অপর পক্ষে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের আমদানীর প্রায় সমস্তই শিল্পজাত দ্রব্য।

ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের এই বৈশিষ্ট্যের ফলে শুল্কানুকূল্য হইতে তাহার বিশেষ কিছু লাভ করিবার নাই। কারণ শিল্পজাত দ্রব্য শুল্কানুকূল্যের যতটা প্রয়োজনীয়তা বোধ করে কাঁচা মাল ততটা করে না। শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশের বাজারে প্রায় সর্ব্বদাই প্রবল প্রতিযোগিতা লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতের রপ্তানী কাঁচা মাল ও খাদ্য দ্রব্যের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কেননা বিদেশের বাজারে সাধারণতঃ তাহারা কোন প্রকার শুল্ক প্রদান না করিয়াই প্রবেশাধিকার পায়—কাজেই সে ক্ষেত্রে তাহাদের জন্য কোনরূপ শুল্কানুকূল্যের সম্ভাবনাই নাই। সকলেই জানেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি মূল্যের উপর শতকরা দশ টাকা হারে সাধারণ আমদানী শুল্ক স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু কয়েকটি দ্রব্যকে এই সাধারণ আমদানী শুল্ক হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের তালিকায় নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির নামও আছে :- চা, তুলা, উল, জীবজন্তুর চুল, চামড়া, রবার। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইংলণ্ডে ভারতের রপ্তানীর প্রধান অঙ্গই এই সব দ্রব্য। কাজেই ইহাদিগকে শুল্কমুক্ত করিয়া দেওয়ায় ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে

ইংলণ্ড হইতে শুল্কানুকূল্য পাওয়ার সম্ভাবনাই আর প্রায় রহিল না। অবশ্য ইংলণ্ড সাম্রাজ্যজাত চায়ের উপর প্রতি পাউণ্ডে দুই পেন্স এবং সাম্রাজ্যের বাহিরের দেশের চায়ের উপর প্রতি পাউণ্ডে চার পেন্স আমদানী শুল্ক বসাইয়া সাম্রাজ্যজাত চা'য়ে কতকটা শুল্কানুকূল্য দেখাইয়াছে এবং অন্যান্য দ্রব্যের উপরও সামান্য পরিমাণে শুল্ক স্থাপন করিয়া অনুরূপ শুল্কানুকূল্য দেখাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ শুল্কানুকূল্য হইতে ভারতবর্ষের লাভ করিবার বিশেষ কিছুই নাই। কারণ সে সাধারণতঃ যে সব প্রয়োজনীয় দ্রব্য রপ্তানী করিয়া থাকে তাহা তাহার নিকট হইতে না লইয়া উপায়ন্তর নাই এবং পাট ও সেইরূপ কয়েকটি দ্রব্য তাহার এমনি একচেটিয়া যে তাহাকে এই সব দ্রব্যে কোনরূপ শুল্কানুকূল্য দেখানই সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া বিস্তর ক্ষতি স্বীকার না করিয়া ইংলণ্ড এই সব দ্রব্যে ভারতবর্ষকে বেশী পরিমাণে শুল্কানুকূল্য দেখাইতে পারে না এবং সে ক্ষতি ইংলণ্ড স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবে বলিয়া আশা করা দুরাশা মাত্র।

অপর দিকে আমদানী বাণিজ্যে ইংলণ্ডকে শুল্কানুকূল্য দেখাইতে গেলে ভারতবর্ষের সমূহ ক্ষতি অনিবার্য্য। এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের স্বার্থকে প্রধানতঃ তিন দিক হইতে বিচার করিতে হইবে। প্রথমতঃ তাহার স্বদেশী শিল্প সমূহের দিক হইতে, দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত স্বার্থের দিক হইতে এবং তৃতীয়তঃ ভারতবর্ষের রাজস্বের দিক হইতে। বলা বাহুল্য সাধারণতঃ এই তিনদিকের কোন দিক হইতেও ক্ষতি স্বীকার না করিয়া কোন দেশের পক্ষেই অপর কোন দেশকে শুল্কানুকূল্য প্রদর্শন করা সম্ভবপর নয়। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে শুল্কানুকূল্য দেখাইতে পারে দুই প্রকারে:—হয় (১) ইংলণ্ডেতর দেশের পণ্যের উপর আমদানী শুল্ক বাড়াইয়া দিয়া, না হয় (২) ইংলণ্ডের পণ্যের উপর আমদানী শুল্ক উঠাইয়া বা কমাইয়া দিয়া। প্রথমোক্ত ব্যবস্থার ফলে আমদানীর মূল্য বাড়িয়া যাইবে এবং ভারতীয় ক্রেতাদিগকে এই বর্দ্ধিত মূল্যে এই সব দ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় রাজস্বও অবশ্য কতকটা বাড়িবে কিন্তু ইংলণ্ডের পণ্য বর্দ্ধিত শুল্ক হইতে রেহাই পাওয়ায় এই রাজস্ববৃদ্ধির পরিমাণ ক্রেতাদের ক্ষতির তুলনায় যথেষ্ট হইবে না। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় আমদানীর মূল্য কমিবার ও সেই সঙ্গে ক্রেতাদের সুবিধার সম্ভাবনা আছে কিন্তু উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে স্বদেশী শিল্পের স্বার্থহানি এবং হয়ত ধ্বংসও সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী। তা ছাড়া রাজস্বহানি তো হইবেই। সার জর্জ্জ রেইনি ব্যবস্থা-পরিষদের আলোচনাপ্রসঙ্গে আশ্বাস দিয়াছেন যে এই ব্যাপারে ভারতীয় শিল্পের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই আশ্বাস সত্য হইলে শেষোক্ত পন্থা অবলম্বিত হইতে পারে না অর্থাৎ ইংলণ্ডের পণ্যকে শুল্কানুকূল্য দেখাইবার একমাত্র উপায় হইবে সাম্রাজ্যেতর দেশের পণ্যের উপর আমদানী শুল্ক বাড়াইয়া দেওয়া। তার অর্থ এই যে ভারতবাসীকে সস্তা জাপানী, জার্ম্মাণ, আমেরিকান প্রভৃতি দ্রব্যের পরিবর্ত্তে বেশী দামের বিলাতী দ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে। বলা বাহুল্য ভারতবাসীর এই ত্যাগের ফলে কোন দিক হইতেই ভারতবর্ষের কোন উপকার হইবে না বরং এই অন্যায় সাহায্যপুষ্ট বিলাতী শিল্প ভারতের বাজারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মূল্য বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে পারে এবং পরিণামে অন্যায় প্রতিযোগিতায় স্বদেশী শিল্প সমূহকেও বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে। অথচ পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে ইংলণ্ডের বাজারে ভারতীয় পণ্যের অনুরূপ সুবিধা পাইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

এই আলোচনা পূর্ব্বেও বহুবার হইয়া গিয়াছে এবং স্বয়ং ভারত গভর্ণমেণ্টও এই সত্য অস্বীকার করেন নাই। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যিক শুল্কানুকূল্য সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইলে ভারত গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন যে—"শুধু অর্থ-নৈতিক দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতবর্ষ এই শুল্কানুকূল্য দ্বারা সাম্রাজ্যকে কতকটা সুবিধা দিতে পারে বটে কিন্তু তাহা খুব বেশী নয়; অপর পক্ষে প্রতিদানে ভারতবর্ষের লাভ করিবার কিছুই নাই বরং তাহাতে তাহার যথেষ্ট ক্ষতি হইবে বা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিবে।" গত ২৭ বৎসর ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের বহু পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও ভারতবর্ষের স্বার্থের দিক হইতে ভারত-গভর্ণমেণ্টের ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের উক্তির সত্যতা আজও পূর্ব্ববৎই অক্ষুণ্ণ আছে। অবশ্য ভারতের বাজারে ইংলণ্ডের পূর্ব্ব প্রাধান্য আজ বহু দিক হইতেই আক্রান্ত হইয়াছে এবং কোনরূপ বিশেষ সুবিধা না পাইলে সে প্রাধান্য আর বেশী

দিন থাকিবেও না। কাজেই ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের নিকট হইতে ইংলণ্ডের কোনরূপ শুল্কানুকূল্যের প্রয়োজন না থাকিলেও আজ তাহা তাহার পক্ষে একরূপ জীবন মরণ সমস্যাতে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের মত আজও ভারতবর্ষ কোনরূপ সাম্রাজ্যানুকূল্যের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না এবং করিলেই তাহা যথেষ্ট পরিমাণে পাইবার তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অপর পক্ষে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যানুকূল্য-নীতি অবলম্বনের ফলে তাহার যে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল আজ তাহার নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পসমূহের স্বার্থ-বিবেচনায় তাহা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষতি শুধু এই দিক দিয়াই হইবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের এক চতুর্থাংশেরও কম ইংলণ্ডের সঙ্গে। অর্থাৎ ইংলণ্ডেতর দেশ সমূহই ভারতের কাঁচামাল ও খাদ্য দ্রব্যের প্রধান খরিদদার। সম্প্রতি তাহার আমদানী বাণিজ্যেও এই সব দেশ (বিশেষভাবে আমেরিকা ও জাপান) ইংলণ্ডের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে এবং ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের মোট আমদানীর শতকরা ৬১ ভাগই আসিয়াছে ইংলণ্ডেতর দেশসমূহ হইতে। এই সব দেশের পণ্যের উপর উচ্চ আমদানী-শুল্ক স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে ভারতের বাজার হইতে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিলে তাহারা ভারতের রপ্তানী সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকিবে এইরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র। অবশ্য ভারতের রপ্তানী প্রধানতঃ অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকটি দ্রব্য তাহার এমনি একচেটিয়া যে সাধারণ অবস্থায় তাহাদের উপর শুল্ক স্থাপন করিয়া কেহই নিজের ক্ষতি করিতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহার সমস্ত রপ্তানী সম্বন্ধেই এরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী নয়; তদুপরি বর্ত্তমান ব্যবসায়-মন্দার ফলে সকল দেশকেই শিল্পজাত দ্রব্যের ন্যায় কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য লইয়াও বেগ পাইতে হইতেছে। কাজেই এ ব্যাপারে ভারতবর্ষকে নির্ব্বিঘ্ন মনে করা মারাত্মক ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়। তা ছাড়া আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের একটি গোড়ার কথাই এই যে রপ্তানীর দ্বারা আমদানীর মূল্য প্রদান করা হয়। কাজেই ইংলণ্ডেতর দেশসমূহ তাহাদের পণ্য ভারতবর্ষে রপ্তানী করিতে না পারিলে ভারতের পণ্যও তাহারা আমদানী করিতে পারিবে না। অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলা চলে যে ইংলণ্ড যে পরিমাণে ভারতবর্ষে বেশী রপ্তানী করিবে সেই পরিমাণে সে ভারতবর্ষ হইতে আমদানীও বেশী করিবে। কিন্তু এ যুক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। কারণ দেখা গিয়াছে যে যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের মোট আমদানীর শতকরা গড়ে ৬২ ভাগই যখন আসিত ইংলণ্ড হইতে তখনও ইংলণ্ডে তাহার মোট রপ্তানীর শতকরা ২৫ ভাগের বেশী যাইত না। তা ছাড়া বহির্ব্বাণিজ্য এত শীঘ্রই গতি পরিবর্ত্তন করে না এবং ইংলণ্ডেতর দেশের বাজারে ভারতের যে সব দ্রব্যের যে পরিমাণ চাহিদা আছে ইংলণ্ড বা সাম্রাজ্যের বাজারেও যে সে-সব দ্রব্যের সেই পরিমাণ চাহিদা আছে বা হইবে তাহা প্রমাণসাপেক্ষ।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের এই বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া বাংলার ইংরেজ বণিক-সভা (Bengal Chamber of Commerce) সাম্রাজ্যানুকূল্যের এক অভিনব প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। সভা ধরিয়া লইয়াছেন যে ওটাওয়া বৈঠকে ইংলণ্ডের ন্যায় সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্কের আলোচনা হইবে। তাঁহারা আরও ধরিয়া লইয়াছেন যে বৈঠকের একটি প্রধান কাজ হইবে এমন কোন ব্যবস্থার উদ্ভাবন যাহাতে সাম্রাজ্যের 'ক' দেশ 'খ' দেশকে কোন কোন বিষয়ে শুল্কানুকূল্য দেখাইতে পারে যার প্রতিদানে "খ" দেশ "গ" দেশকে কোন কোন বিষয়ে সুবিধা প্রদান কবিবে, যার প্রতিদানে "গ" দেশ "ঘ" দেশকে কোন কোন বিষয়ে সুবিধা প্রদান করিবে, যার প্রতিদানে "ঘ" দেশ "ক" দেশকে কোন কোন বিষয়ে সুবিধা প্রদান করিবে। ভারতের বিলাতী বস্ত্র আমদানীর উল্লেখ করিয়া সভা বলেন যে ওটাওয়া বৈঠকে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের কিংবা ভারতবর্ষ ও ডমিনিয়ন সমূহের বাণিজ্য ব্যাপারে ভারতবর্ষের পক্ষে লাভজনক এমন কোন ব্যবস্থা বাহির করা যাইতে পারে যার প্রতিদানে বিলাতী বস্ত্রকে ভারতবর্ষ কতকটা শুল্কানুকূল্য দেখাইতে আপত্তি করিবে না। এ সম্বন্ধে ইংরেজ বণিকদের আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক। কারণ ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের মোট আমদানী বস্ত্রের শতকরা ৯০ ভাগই আসিয়াছে ইংলণ্ড হইতে, সে ক্ষেত্রে তাহা দাঁড়াইয়াছে

১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৬৩ ভাগে এবং ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৫৮ ভাগে। এই ব্যাপারে ল্যাঙ্কাশায়ার মিল ও ভারতীয় মিলের প্রতিযোগিতার কোন কথা নাই ; কারণ এই হিসাব শুধু আমদানী সম্বন্ধে। কাজেই ইংলণ্ড এই আমদানীতে তাহার পূর্ব্বপ্রাধান্য ফিরিয়া পাইলে ভারতবর্ষের কোনও ক্ষতি নাই অথচ ইংলণ্ডের তাহাতে যথেষ্ট লাভ। এ প্রসঙ্গে উক্ত বণিক সভার একটী প্রস্তাব উপনিবেশ সমূহে (Crown Colonies) শুল্কানুকূল্যের দ্বারা ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানীর সাহায্য করা। সহজ কথায় এই প্রস্তাবের অর্থ এই যে ভারতবর্ষ সস্তা জাপানী কাপড়ের পরিবর্ত্তে বেশী দামের বিলাতী কাপড় আমদানী করিয়া ইংলণ্ডের যে উপকার করিবে সেই উপকারের প্রতিদান সে পাইবে উপনিবেশ সমূহে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানী করিয়া। কিন্তু সে প্রতিদান যে যথেষ্ট নয় তাহা শুধু একথা হইতেই বুঝা যাইবে যে তাহা হইলে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের বাজারে তাহার বস্ত্রের জন্য শুল্কানুকূল্য না চাহিয়া উপনিবেশ সমূহের বাজারেই তাহা রপ্তানী করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত।

তাহা হইলেও ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের স্বার্থের দিক হইতে এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে হয়ত কিছু বলিবার থাকিতে পারে এবং ইংলণ্ডের দাবী যদি শুধু বস্ত্র সম্বন্ধে শুল্কানুকূল্যই হইত তবে হয়ত এই উপায়ে ও অন্য প্রকারে সাম্রাজ্যের পক্ষ হইতে তাহাকে তাহার ক্ষতির উপযুক্ত প্রত্যুপকার করা অসম্ভব হইত না। কিন্তু ইংলণ্ডের দাবী শুধু বস্ত্র সম্বন্ধে শুল্কানুকূল্যই নয় ; তাহার দাবী সাধারণ শুল্কানুকূল্যেরই দাবী এবং সে দাবী সে সমর্থন করে তাহার নিজের বর্ত্তমান শুল্কনীতিরই উল্লেখ করিয়া। রব উঠিয়াছে যে সে শুল্কনীতির ফলে ভারতবর্ষ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে স্বয়ং ইংলণ্ডের বাজারে পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে প্রবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে সে দিন কমন্স সভায় এক সভ্য বলেন যে, ওয়েল্‌স্ ও স্কট্‌লণ্ডে ভারতীয় pig iron স্থানীয় উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষাও সস্তাদরে বিক্রীত হইতেছে এবং সে প্রতিযোগিতার ফলে অনেক চাপর (furnace) বন্ধ করিতে হইয়াছে। এ উক্তির মধ্যে কতটুকু সত্য আছে তাহা জানিবার সুযোগ এখনও হয় নাই। কিন্তু এ কথা সত্য হইলেও তা লইয়া ইংলণ্ড যতটা কলরব তুলিয়াছে ততটা কলরবের কারণ নিশ্চয়ই ঘটে নাই। তা'ছাড়া ভারতীয় ব্যবহারকারীর স্বার্থের মিথ্যা দোহাই দিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই ইংলণ্ডকে বস্ত্র ও ইস্পাত-জাত দ্রব্যের রপ্তানীতে যে শুল্কানুকূল্য দেখাইতেছেন ইংলণ্ডের বর্ত্তমান শুল্কানুকূল্য তাহার যথেষ্ট প্রতিদান কিনা তাহাও হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু ইংলণ্ড সে হিসাবনিকাশের কোন প্রয়োজনীয়তাই বোধ করে না। তাই কথা উঠিয়াছে যে ভারতবর্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত সম্ভবপর না হইলে ইংলণ্ড অপর কোনও দেশের সঙ্গে সে বন্দোবস্ত করিবে। ভারতবর্ষের সঙ্গে এই দিক দিয়া কি বন্দোবস্ত হইতে পারে তাহার কতকটা আভাষও পাওয়া গিয়াছে ; তাহা এই যে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে তাহার প্রয়োজনীয় সমস্ত pig iron ও অর্দ্ধ-সমাপ্ত (semi-finished) ইস্পাত আমদানী করিবে ; প্রতিদানে ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে তাহার প্রয়োজনীয় সমস্ত ইস্পাত আমদানী করিবে। এই ব্যবস্থার সমর্থকগণের যুক্তি এই যে ভারতবর্ষ এখনও কিছুকালের জন্যে যথেষ্ট কম দরে ইস্পাত প্রস্তুত করিতে পারে না এবং অপর পক্ষে pig iron সম্বন্ধে ইংলণ্ডের অবস্থাও তাই। এ বন্দোবস্তের ফলে ভারতবর্ষের লাভ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক না হইলে ইহার বিরুদ্ধে অবশ্যই বিশেষ কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু সে হিসাব করিবার কালে অন্য কোন দেশের সঙ্গে তদপেক্ষা অধিকতর লাভজনক অপর কোন বন্দোবস্ত সম্ভবপর কিনা তাহাও বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট এরূপ হিসাবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন বলিয়া মনে করিবার হেতুও এখন পর্য্যন্ত ঘটে নাই। অথচ পুনঃ পুনঃ দেখা গিয়াছে সে দিক দিয়া ইংলণ্ডের হিসাবের কড়াক্রান্তি ভুল হইবারও উপায় নাই। তা সত্ত্বেও যখন সার সেমুয়েল হোর বলিতে চাহেন যে তিনি ওটাওয়া বৈঠকের ব্যাপারে ভারত গভর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে মত ও কর্ম্মের পূর্ণ স্বাধীনতা দিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং তিনি ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করেন যে তাঁহারা ভারতের স্বার্থকেই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য মনে করিবেন, তখন ভারতবাসী তাঁহার আশ্বাসের কি মূল্য দিবে ?

বাংলার লোন-অফিস ও তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থা প্রতিকারের উপায়

—শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস

পূর্ব্বের আলোচনা হইতে লোন-আফিসগুলির বর্ত্তমান দুরবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। এখন সমস্যা হইল এই অবস্থার প্রতিকার কি প্রকারে সম্ভব ? বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং কমিটি এই বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়া প্রতিকারের কতকগুলি পন্থা নির্দ্দেশ করেন। নিম্নে তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করা গেল।

(১) অন্ততঃ পক্ষে ২৫,০০০ টাকার সংগৃহীত মূলধন যোগাড় না করিতে পারিলে কোনও লোনআফিস কাজ আরম্ভ করিতে পারিবে না। এবং এই সংগৃহীত মূলধন তাহাদের বিজ্ঞাপিত (authorised) মূলধনের এক চতুর্থাংশের কম হইতে পারিবে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং কমিটী তাঁহাদের রিপোর্টে শেষোক্ত ব্যবস্থার একটু পরিবর্ত্তন করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন; তাঁহাদের মতে সংগৃহীত মূলধন বিজ্ঞাপিত মূলধনের অন্ততঃ পক্ষে অর্দ্ধেক না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও লোন-আফিসকে কাজ আরম্ভ করিতে দেওয়া উচিত নহে।

(২) রিজার্ভ ফাণ্ড সংগৃহীত মূলধনের সমান না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক লোন-আফিসকেই প্রতিবছর মোট লাভের অন্ততঃ পক্ষে এক চতুর্থাংশ রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা রাখিতে হইবে। এ বিষয়েও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং কমিটী একটু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রতি বছর মোটলাভের শতকরা দশ ভাগ রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা রাখিলেই যথেষ্ট; কিন্তু এই জমা রাখার ব্যবস্থার সঙ্গে রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণের কোনও সম্বন্ধ থাকা উচিত নহে; রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণ সংগৃহীত মূলধন অপেক্ষা বেশী হইলেও প্রতি বছরই মোট লাভের শতকরা দশভাগ রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা রাখিতে হইবে। তাহা ছাড়া কোনও বছর মোট লাভের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা না রাখিলে কোনও লোন আফিস অংশীদারগণকে শতকরা দশের বেশী লভ্যাংশ দিতে পারিবে না—কেন্দ্রীয় কমিটীর মতে এইরূপ আইন করা উচিত।

(৩) অনেক লোন-আফিস তাহাদের প্রধান ব্যবসা অর্থাৎ আমানতি টাকা ধার দেওয়ার সঙ্গে অন্য প্রকার ব্যবসাও করিয়া থাকে, ফলে আনুষঙ্গিক ব্যবসার কোনও ক্ষতি হইলে আমানতকারীদের টাকার সাহায্য নিতে হয়; এবং অনেক সময় তাহাতেও না কুলাইলে সমস্ত ব্যবসা—প্রধান এবং আনুষঙ্গিক—তুলিয়া দিতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত ইহার জন্য আমানতকারীদের যথেষ্ট অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য প্রাদেশিক কমিটী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যে-সমস্ত লোন-আফিসের আনুষঙ্গিক ব্যবসা আছে—তাহাদিগকে তাহাদের প্রধান ব্যবসা এবং আনুষঙ্গিক ব্যবসা—উভয়ের হিসাব সম্পূর্ণ আলাদা রাখিতে হইবে এবং উভয়ের উদ্বর্ত্ত-পত্র (Balance Sheet) এবং লাভ ক্ষতির হিসাব আলাদা আলাদা তৈয়ার করিতে হইবে। তাহা ছাড়া তাহারা বর্ত্তমানে তাহাদের উদ্বর্ত্ত-পত্রে যে-সব হিসাব দেয়, তাহা হইতে তাহাদের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ তাহা অনেক সময়েই বুঝা কঠিন এবং এই জন্য এখন হইতে তাহাদিগকে উদ্বর্ত্ত-পত্রে আরও অনেক বিষয়ের হিসাব দিতে হইবে।

(৪) উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি এবং আরও কয়েকটি ছোটখাট প্রস্তাব সম্বলিত করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব "বেঙ্গল লোন আফিস য়্যাক্ট" নামে একটী আইন প্রণয়ন করিবার প্রস্তাবও প্রাদেশিক কমিটী করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সঙ্কটের প্রতিকার কি ?

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি যে খুবই সমীচীন হইয়াছে—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাদেশিক কমিটী যে সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছেন—কেন্দ্রীয় কমিটীও তাহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন; কেবলমাত্র প্রথমোক্ত দুইটী বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটী প্রাদেশিক কমিটীর প্রস্তাবের কিছু অদল-বদল করিয়াছেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা মোটা-মুটিভাবে এই প্রস্তাবগুলি মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে লোন-আফিসগুলি বর্ত্তমানে যে

সঙ্কটের ভিতর পড়িয়াছে—তাহাতে এই প্রস্তাবগুলি হইতে বিশেষ কোনও উপকার পাওয়া যাইবে না। তাহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করা ব্যাপারেই এই প্রস্তাবগুলির সার্থকতা। কিন্তু তাহাদের বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? দুঃখের বিষয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং কমিটী এই বিষয়ে কোনও আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই; এবং কেন্দ্রীয় কমিটীও ইহার কোনও প্রতি-কার উদ্ভাবনা করিতে পারেন না। কিন্তু শেষোক্ত কমিটীর অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় এই সম্বন্ধে তাঁহার মতামত উক্ত কমিটীর রিপোর্টের ক্রোড়পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—এবং কমিটী সমগ্রভাবে তাহা গ্রহণ না করিলেও এই মতামতগুলির প্রতি গভর্ণমেণ্টের এবং দেশ-বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা

বর্ত্তমান সঙ্কটের ফলে লোন-আফিসগুলির যে টাকা আদায় না হওয়াতে তাহারা তাহাদের পাওনাদারদিগের টাকা শোধ করিতে পারিতেছে না, যতদিন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও চাষীদের অবস্থা ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত এই টাকা আদায়ের কোনও ব্যবস্থা না হইতেছে—অন্ততঃ পক্ষে ততদিনের জন্য তাহাদিগকে এই টাকা সরবরাহ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সরকার একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Financing Corporation) প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। অন্যূন ৫ লক্ষ টাকার সংগৃহীত মূলধন নিয়া এই ফিন্যান্সিং করপোরেশন কার্য্য আরম্ভ করিবে; এই ৫ লক্ষ টাকা প্রধানতঃ লোন-আফিস-গুলি চাঁদা করিয়া দিবে; তাহা ছাড়া সকল লোন-আফিসের মিলিত দায়িত্বে মোট সংগৃহীত মূলধনের ২০ গুণ ডিবেঞ্চার তুলিবার অধিকার কর্পোরেশনকে দেওয়া হইবে; প্রতি লোন আফিসকে যত টাকা ধার দেওয়া হইবে—তাহাদের নিকট হইতে সেই পরিমাণের শতকরা ৫ টাকা কর্পোরেশনের অতিরিক্ত মূলধন হিসাবে আদায় করা হইবে; এবং এই অতিরিক্ত মূলধনের উপর ভিত্তি করিয়া তাহার ২০ গুণ নূতন ডিবেঞ্চার তোলা যাইবে; এইরূপে ক্রমশঃ কর্পোরে-শনের আর্থিক সঙ্গতি বাড়াইলে ক্রমশঃ অধিকতর লোন-আফিস ইহার সাহায্যে তাহাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতে অনেক পরিমাণে রেহাই পাইবে, শ্রীযুক্ত সরকার এইরূপ আশা করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইল, এত টাকা কোথা হইতে আসিবে? প্রথমেই যে ৫ লক্ষ টাকা মূলধনের কথা বলা হইয়াছে, বড় বড় লোন-আফিসগুলি সকলে মিলিয়া এই টাকা অনায়াসেই তুলিতে পারিবে; কিন্তু তাহা যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে লোন-আফিসগুলি তাহাদের মক্কেলদের নিকট হইতেও কিছু টাকা তুলিতে পারিবে—ইহা নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়। ডিবেঞ্চারের টাকা তুলিতেও বিশেষ কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়; কারণ শতকরা ৭৲ টাকা কিম্বা ৭৷৹ টাকা সুদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে এই টাকা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী এবং এমন কি বড় বড় দেশী ব্যাঙ্কের নিকট হইতেও যে আদায় হইবে—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এই ফিন্যান্সিং কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রথমে গভর্ণমেণ্টকেই উদ্যোগী হইতে হইবে। ডিবেঞ্চারের সাহায্যে টাকা তুলিবার সময় কর্পোরেশন ভবিষ্যতে এই টাকা শোধ দেওয়ার কি ব্যবস্থা করিয়াছে—গভর্ণমেণ্টকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—কেন না তাহা না হইলে, সাধারণ লোকে বিশ্বাস করিয়া ডিবেঞ্চার নাও কিনিতে পারে; প্রয়োজন হইলে গভর্ণমেণ্টকেও কতক পরিমাণ ডিবেঞ্চার কিনিতে হইবে। এইরূপে নানাভাবে গভর্ণমেণ্ট ফিন্যান্সিং কর্পোরেশন ও প্রকারান্তরে লোন আফিসগুলির সাহায্য করিতে পারেন।

অন্যান্য দেশের উদাহরণ

মোটামুটি ভাবে শ্রীযুক্ত সরকারের প্রস্তাবের সারমর্ম্ম উপরে দেওয়া হইল; কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে প্রায় একবৎসর হইল কেন্দ্রীয় কমিটীর রিপোর্ট বাহির হওয়া সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের কোনও দৃষ্টি পড়ে নাই। কিম্বা এমনও হইতে পারে যে, তাঁহারা এই প্রস্তাবের কার্য্য-কারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, আমেরিকার অনেক ছোটখাট ব্যাঙ্কের গত বৎসরের শেষভাগে ঠিক আমাদের লোন

আফিসগুলির মতই দুরবস্থা ঘটার দরুন গত ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেসিডেণ্ট হুভারের উদ্যোগে একটি রিকন্‌ষ্ট্রাক্‌শন্ ফিন্যান্সিং কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই অল্প কয়দিনেই তাহার কাজের ফলে সেই দেশের ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। ইটালীতেও একই প্রকার অবস্থা; গত নভেম্বর মাসে সিনর মুসলোনীর চেষ্টায় এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং তাহার ফলে সেখানকার ব্যাঙ্কগুলিও আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে। অন্যান্য সকল দেশে যদি শ্রীযুক্ত সরকার কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ফিন্যান্সিং কর্পোরেশনের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বিপন্ন ব্যাঙ্কগুলি রক্ষা পাইয়া থাকে, তবে আমাদের দেশেই বা তাহা হইবে না কেন বুঝা কঠিন।

লোন আফিসের পরিচালকগণের দায়িত্ব

এই ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য খুবই দুঃখের বিষয়। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের অসংখ্য লোন আফিসের কর্ত্তৃপক্ষের দায়িত্বও কম নহে। আমানতকারীদের টাকা যথাসময়ে শোধ দিতে না পারার মত লজ্জার বিষয় আর কি আছে? এবং এক হিসাবে জোর করিয়াই বলা যায় যে তাঁহারা যদি সর্ব্ববাদী-সম্মত বিশুদ্ধ কার্য্যপ্রণালী মানিয়া চলিতেন—তাহা হইলে লোন-আফিসগুলির অবস্থা বর্ত্তমানে এত খারাপ হইত না। অন্যান্য দেশের আমানতকারীরা প্রয়োজনমত ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের উপর চাপ দিতে কসুর করেন না—নেহাৎ আমাদের দেশের গোবেচারী আমানতকারীরা লোন-আফিসের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ভদ্রব্যবহার করিতেছেন বলিয়াই এইগুলি এখনও চলিতেছে; তাহা না হইলে আরও অনেক আগেই তাহাদের কারবার একেবারেই বন্ধ করিয়া দিতে হইত। এই বিষয়ে তাঁহাদের ঔদাসীন্য কোনও কারণেই মার্জ্জনা করা যায় না। তাঁহাদের উচিত ছিল—গভর্ণমেণ্টকে চাপ দিয়া একটা কিছু ব্যবস্থা করা, যাহার ফলে লোন-আফিসগুলি পাওনাদারদের সমস্ত পাওনা মিটাইয়া ফেলিতে পারে। আশা করি এখন হইতে তাঁহারা এদিকে একটু দৃষ্টি দিবেন।

লোন-আফিসগুলির সহিত বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ ওতঃপ্রোতঃ ভাবে জড়িত আছে। এবং এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে—লোন আফিসের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট এ বিষয় কি কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করেন—তাহার উপর।

বীমা-প্রসঙ্গ

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর এই বীমাকোম্পানি নানা ভাঙ্গন গড়নের পর এখন যেরূপ উন্নতির পথে চলিয়াছে তাহা দেখিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই বিশেষ গৌরব করিবার কথা। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গেল যে ১৯৩১-৩২ সালে উক্ত কোম্পানির নূতন কাজের পরিমাণ হইয়াছে প্রায় এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা। দেশের আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও এ পরিমাণ বীমার কাজ সংগ্রহ করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কাজের পরিমাণ ২৭ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে, এবং নূতন কাজের হিসাবে এবারেও হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স সোসাইটী সমগ্র ভারতীয় কোম্পানির মধ্যে দ্বিতীয়স্থান রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। "হিন্দুস্থানের" উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক, ইহা সকল বাঙ্গালীরই কামনা হওয়া উচিত।

এলায়ান্স ষ্ট্রুটগার্টার কোম্পানিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা

বীমার প্রসার যেমন বাড়িতেছে বীমাকোম্পানিগুলির প্রতিযোগিতাও তেমনি তীক্ষ্ণতর হইতেছে এবং তাহার সুযোগ লইয়া কোম্পানিগুলিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা, এমন কি জুয়াচুরীরও বহর বাড়িয়াই যাইতেছে। এ বিষয়ে বীমা কোম্পানিগুলির সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একটা না একটা বীমার প্রতারণা অথবা চুরীর কথা শোনা যাইতেছে। চুঁচুড়ায় ও বালীতে ন্যাশানাল ইন্সিওরেন্সকে ফাঁকি দেবার চেষ্টার কথা অন্যত্র বলা হইয়াছে। প্রভাত ইন্সিওরেন্স কোম্পানির কর্ত্তারা তাঁহাদের জনৈক অর্গানাইজারের নামে প্রতারণার জন্য নালিশ করিয়াছেন। এবং সেদিন দেখা গেল যে ফাঁকি দিয়া জার্ম্মান কোম্পানি এলায়ান্স ও ষ্টুট গার্টারের নিকট হইতে দশ হাজার টাকা বাহির করিয়া লইবার উদ্যোগ হইয়াছিল। সুখের বিষয় হাইকোর্টের বিচারে কোম্পানির জয় হইয়াছে এবং বাদী পক্ষ তাহার দাবী উঠাইয়া লইয়াছে। আরও কত যে কাণ্ড হইতেছে কে জানে? সব কথা বিচারালয় পর্য্যন্ত তো পৌঁছেনা।

ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিমিটেড

আমরা ওরিয়েণ্টালের ১৯৩১ সালের একখণ্ড রিপোর্ট, হিসাবপত্র ও চেয়ারম্যানের বক্তৃতা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি।

ওরিয়েণ্টাল ভারতের, শুধু ভারতের কেন, প্রাচ্যের সর্ব্ববৃহৎ ও অতিশয় পুরাতন জীবন বীমা আফিস। দীর্ঘ ৫৭ বৎসরকাল জীবন বীমার মূলসূত্রগুলি মানিয়া অতিশয় সন্তর্পণে বীমাকারিদের অর্থ সংরক্ষণ করিয়া ওরিয়েণ্টাল আজ তাহার হীরক জুবিলীর দ্বারদেশে বিজয় গৌরবে জনসাধারণকে নিজ পতাকা তলে সমবেত হইতে আহ্বান করিতেছে—এ আহ্বান উপেক্ষা করিবার নহে।

আলোচ্যবর্ষে ওরিয়েণ্টালের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সোরাবজী ই ওয়ার্ডেন জে, পি মহাশয়ের বক্তৃতা একটী সারগর্ভ বীমাবিষয়ক সন্দর্ভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বক্তৃতায় তিনি কোম্পানীর অর্থ খাটাইবার প্রথাকে সমর্থন করিয়া বিরুদ্ধ সমালোচনাকারীদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সকলেই জানেন যে ওরিয়েণ্টাল প্রথম অবস্থা হইতেই উদ্বৃত্ত অর্থ কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে নিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। অতিরিক্ত সুদের আশায় এমন কোনরূপ বিষয়ে অর্থ নিয়োগ করেন নাই যাহাতে ভবিষ্যতে মূলধনের কোন হানি হইতে পারে। বর্ত্তমান জগৎব্যাপী অর্থসঙ্কটে কোম্পানীর কাগজের মূল্য অসম্ভব রূপে হ্রাস হওয়ায় অনেক অর্থনীতিবিদ ওরিয়েণ্টালের এই প্রথাকে অবিবেচনার কার্য্য বলিয়া মত দিয়াছিলেন। চেয়ারম্যান মহাশয় দেখাইয়াছেন যে দীর্ঘ ৫৭ বৎসরকাল নানারূপ অর্থসঙ্কটের মধ্যেও ওরিয়েণ্টাল প্রতি ভ্যালুয়েশনেই আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি দেখাইয়া তাহার উদ্বৃত্ত অর্থ নিয়োগনীতির সফলতা প্রমাণ করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে সেই নীতি হইতে বিচ্যুত হইবার কোন কারণই দেখা যায় না।

আলোচ্যবর্ষে ওরিয়েণ্টাল ২৬৮৮৩ খানি পলিশিতে মোট ৫,৩৪,৫০,০০০৲ টাকার নূতন জীবন বীমা কার্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন। যদিও ইহা কোম্পানীর ১৯২৯ সালের ৬,৫০,০০,০০০৲ অঙ্ক অপেক্ষা কম তথাপি এই জগৎব্যাপী অর্থসঙ্কটের মধ্যে এইরূপ বিরাট নূতন বীমাকার্য্য সংগ্রহ করা কম কৃতিত্বের বিষয় নহে। গত বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষের নূতন পলিশির সংখ্যা বেশী হইলেও সাধারণের অর্থকৃচ্ছতার দরুণ মোট নূতন বীমার অঙ্ক ৯,৫০,০০০৲ টাকা কমই হইয়াছে। চেয়ারম্যান মহাশয় জানাইয়াছেন যে বর্ত্তমানে কোম্পানীর নূতন বীমার অঙ্ক কিছু কমিয়া যাওয়ায় কোম্পানীর প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। ইহাতে কোম্পানী পুনরায় নূতন বল সংগ্রহ করিবার সময় পাইবে এবং উপযুক্ত অবস্থা হিসাবে সগৌরবে নূতন কার্য্য সংগ্রহের প্রসারে মনোযোগ দিতে পারিবে। আমরা চেয়ারম্যান মহাশয়ের এই উক্তি সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করি। ক্রমাগত অধিক নূতন বীমা কার্য্য সংগ্রহ করা অপেক্ষা ব্যয়ের হার হ্রাস, সুদের হার বৃদ্ধি ও মৃত্যুর হার কম করিবার গৌরব কম নহে। আলোচ্য বর্ষে ওরিয়েণ্টাল এই তিনটী বিষয়েই সফলতা লাভ করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ওরিয়েণ্টালের সুদের হার শতকরা ৫·৬২ হইয়াছে। ১৯৩০ সালে ৫·৫৩ ও ১৯২৯ সনে ৫·৩৭ ছিল। ব্যয়ের হার ২১·৪ হইয়াছে। ১৯৩০ সালে ছিল ২২·৪। দীর্ঘ ৫৭ বৎসরের মধ্যে এত কম মৃত্যুর হার আর কখনও হয় নাই। এই সমস্তই ক্রমাগত বর্দ্ধনশীল নূতন বীমা কার্য্য সংগ্রহ করা অপেক্ষা অনেকাংশে মূল্যবান ও বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্যবর্ষে ওরিয়েণ্টালের বিশাল বীমা তহবিলে আরও ৯৫ লক্ষ টাকা যোগ হইয়া ১১,২৫,০০,০০০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহা ভারতের অন্যান্য সমস্ত জীবন বীমা কোম্পানীর মিলিত তহবিল অপেক্ষা কম নহে।

বাৎসরিক রিপোর্টের ৫ম পৃষ্ঠায় কোম্পানী আলোচ্যবর্ষের মৃত্যু তালিকার কারণ অনুযায়ী একটী হিসাব দিয়াছেন তাহা আবার হিন্দু, ইউরোপিয়ান, পার্শী ও মুসলমান এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখান হইয়াছে। এই তালিকাটি ভারতীয় বীমাবিদগণের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কোম্পানীর মৃত্যুবিষয়ক অনুসন্ধানের ফল ইতিপূর্ব্বে

প্রকাশ করিয়া ওরিয়েণ্টাল ভারতীয় বীমাজগতের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কোম্পানীর এ বিষয়ে নূতন নূতন তথ্যানুসন্ধান বিশেষ প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বর্ষের দাবীর পরিমাণ মৃত্যুজনিত ৪৫,০৬,৯৮৬৷৵০ ও মেয়াদী ৪৪,৯৫,৬৩৭৷৴২। এই বিরাট অঙ্কগুলি সত্বেও কোম্পানীর অপরিশোধিত দাবীর পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় দাবী মিটাইবার জন্য কোম্পানী যথেষ্ট তৎপরতা দেখাইয়া থাকেন।

আলোচ্যবর্ষে কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকারে আয় মোট ২,৪৫,৭৫৭৵২ এবং মোট ব্যয় ও দাবীর টাকা ১,৮৬,৭৬,৬৬২৷৵০, উদ্বৃত্ত ৯৪,৯৪,৪৫২৷৴৯। আলোচ্য বর্ষের মোট পলিশির সংখ্যা ১,৯০,৭১৩, পরিমাণ ৪১,৪৮,৭৪,০৩৮৲। ইহার মধ্যে মাত্র ২১,৪০,০৪০৲ টাকা পরিমাণের পলিশি অন্যান্য কোম্পানিতে reinsure অর্থাৎ পুনর্বীমা করা আছে।

সেয়ারহোল্ডারগণ গত বৎসরে প্রতি সেয়ারে ৭৫৲ হিসাবে মুনাফা পাইয়াছেন। সেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে মেসার্স এস্ বি, বিলিমোরিয়া এণ্ড কোঃ ও পলিশিহোল্ডারদের পক্ষে মেসার্স চাঁদভাই ভানুভাই কোম্পানীর অডিটার নিযুক্ত হইয়াছেন। পলিশিহোল্ডারদের তরফে পৃথক অডিটার নিযুক্ত করা সেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানীতে আর দেখা যায় না।

ওরিয়েণ্টাল ভারতের গৌরবের সামগ্রী। তাহার গৌরবময় জীবনের আর একটী বৎসর অতিশয় শৃঙ্খলার সহিত অতিবাহিত হইল। ওরিয়েণ্টালের এই অনন্যসাধারণ উন্নতির জন্য আমরা কোম্পানীর কর্ণধারদিগকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স লিঃ

আমরা হিন্দু মিউচুয়ালের ১৯৩১ সালের একখণ্ড বার্ষিক রিপোর্ট ও আয়ব্যয়ের হিসাব সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। হিন্দু মিউচুয়াল ভারতবর্ষের মধ্যে একটী অতি পুরাতন ও বাঙ্গলার সর্ব্বপুরাতন বীমা কোম্পানী। ইহার চাঁদার হারও খুব কম, তথাপি এই কোম্পানী কেন যে বীমাকারীদের দৃষ্টি উপযুক্তরূপে আকর্ষণ করে না তাহা আমরা জানি না। অতিশয় রক্ষণশীল কার্য্যপ্রণালীই কি ইহার কারণ নয় ?

আলোচ্য বর্ষে হিন্দু মিউচুয়াল মাত্র ৬৮৯ খানি পলিশিতে ৫,০৫,০০০৲ টাকার নূতন বীমাকার্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন। গত বৎসর ও তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এই অঙ্ক কিছু কম। ফলতঃ কোম্পানী মাত্র ৫,০০,০০০৲ হইতে ৭,০০,০০০৲ পর্য্যন্ত নূতন কার্য্যেই সন্তুষ্ট থাকেন। যদিও আমরা অধিক অর্থব্যয়ে অত্যধিক নূতন বীমা সংগ্রহ করা কোন কোম্পানীর পক্ষেই মঙ্গলজনক মনে করি না, তথাপি আমাদের বিশ্বাস যে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ আরও একটু যত্ন করিয়া এই অঙ্কটি যদি দ্বিগুণ করিতে পারিলে তাহা কোম্পানীর পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক হইত।

ইহা অতীব আনন্দের বিষয় যে এই কোম্পানীর পরিচালকবর্গের ব্যয়ের অঙ্কের উপর বিশেষ দৃষ্টি আছে। আলোচ্য বর্ষে প্রিমিয়াম আয় মাত্র ১,২৯,৭০০৲ হইলেও ব্যয়ের হার শত করা ৩০৲ টাকা মাত্র। ভারতীয় বীমা অফিসের মধ্যে ৪।৫টী ব্যতীত এত অল্প ব্যয়ে কোন বৃহৎ কোম্পানীও পরিচালিত হয় না।

বর্ত্তমান বর্ষেও হিন্দু মিউচুয়াল তৎপরতা সহকারে দাবীর টাকা মিটাইবার সুনাম রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বৎসরের দাবীর পরিমাণ ৬৬০০০৲ হইলেও অপরিশোধিত দাবীর পরিমাণ মাত্র ৩১০০০৲। এই অনুপাত অনেক বৃহত্তর কোম্পানীরও অনুকরণ যোগ্য।

এই পুরাতন অফিসের বীমা তহবীলের অধিকাংশই কোম্পানীর কাগজে গচ্ছিত থাকায় এবং ইহার পঞ্চম বার্ষিক ভ্যালুয়েশন ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে (ঐ তারিখে কোম্পানীর কাগজের বাজার দর সর্ব্বনিম্ন ছিল) হওয়ায় কোম্পানীর ডিরেক্টারবর্গও ভ্যালুয়েশনের ফলাফল সম্বন্ধে ভীত হইয়াছিলেন। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে পরিচালকবর্গ একচুয়ারীর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে এ ভেলুয়ে-

সনেও কোম্পানীর উদ্বৃত্ত অর্থ (Surplus) দেখা গিয়াছে। ৩১শে ডিসেম্বরের পর হইতে আজ পর্যন্ত কোম্পানীর কাগজের দর যথেষ্ট বৃদ্ধি হওয়ায় বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত Surplus অনেক অধিক হইবে। ডিরেক্টরগণের রিপোর্টের এই মন্তব্য আমরাও অনুমোদন করি। কোম্পানীর সুদের হার গত ভ্যালুয়েশনে শতকরা ৪৷৷০ টাকা মাত্র ছিল। আলোচ্য বৎসরে তাহা বাড়িয়া প্রায় ৬৲ দাঁড়াইয়াছে। ইহা একটি বিশেষ সুলক্ষণ বলিতে হইবে।

আমরা বাঙ্গলার এই সর্ব্বপুরাতন পলিশিহোল্ডারগণ পরিচালিত কোম্পানীটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোঃ লিঃ

বিগত ২৯শে এপ্রিল শুক্রবার তারিখে মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। এই কোম্পানী সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গলার এবং বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত। দেশের বর্ত্তমান দারুণ অর্থসঙ্কট ও রাষ্ট্রীয় অশান্তি সত্ত্বেও কোম্পানী প্রথম বৎসরে মোট ৫৫ লক্ষ টাকার বীমার প্রস্তাব সংগ্রহ এবং তন্মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার প্রস্তাব কার্য্যতঃ পলিসীতে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। ভারতবর্ষে বীমা কোম্পানী সমূহ প্রথম বৎসরে যে পরিমাণ টাকার কাজ ইতঃপূর্ব্বে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, এই কোম্পানী তাহাদের প্রত্যেকটী অপেক্ষা অধিক কাজ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বতন যে কোম্পানী এই দিক দিয়া সর্ব্বোচ্চ এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন এই কোম্পানী তাহাদের অপেক্ষা যথাক্রমে শতকরা ১৫ এবং ৬৬ ভাগ বেশী কাজ করিয়াছেন। অথচ ব্যয়ের অঙ্ক সর্ব্বসাকুল্যে শতকরা ৭৫.৯ মাত্র। ভারতীয় জীবন বীমার ইতিহাসে এ প্রকার সাফল্যের তুলনা নাই।

প্রথম বৎসরে ২০০০ টাকা করিয়া মাত্র দুইটী পলিসীর দাবী উপস্থিত হইয়াছে তন্মধ্যে একটীর টাকা মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর একটী মঞ্জুরীর অপেক্ষায় আছে।

পলিসিগুলি প্রায় সবই উচ্চ শ্রেণীর এবং বাতিল পলিসির সংখ্যাও খুব কম—শতকরা ১৪ ভাগের বেশী হইবে না। কোম্পানীর আর একটী প্রশংসার কথা এই যে তাহার প্রাথমিক অবস্থাতেই আলোচ্য বর্ষের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে ৩৭,১১৬ টাকার একটী লাইফ ফাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। ইহাতে যে বীমাকারিগণের স্বার্থ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা হইল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কোম্পানী যে ভাবে টাকা খাটাইতেছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আইন অনুসারে কোম্পানীর কাগজে উপযুক্ত অর্থ ত' খাটান হইতেছেই, তদুপরি প্রায় ৬০,০০০ টাকা কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টসদের কাছে শতকরা ৬৲ টাকা সুদে আমানত আছে। এই দেশহিতৈষী ম্যানেজিং এজেন্টস বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই আমানত সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমরা জানিতে পারিয়াছি এই টাকা বাঙ্গলার কোনও শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। কোম্পানীর কাগজ বা ট্রাষ্ট সিকিউরিটীর দর দিনের পর দিন অনিশ্চিতভাবে ওঠা নামা করিতেছে এক্ষেত্রে টাকাগুলি একস্থানে আবদ্ধ না রাখিয়া লাভজনক স্বদেশী শিল্পের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিবার সংকল্প করা সৎসাহস ও সুবুদ্ধির পরিচায়ক। সূচনা দেখিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হয় এই কোম্পানী উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করিবে।

আর্থিক প্রসঙ্গ

বি, আই, এস্, এন্ কোম্পানীর সহিত ডাক-বহনের চুক্তি

বর্ত্তমানে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে ব্রহ্মদেশ অন্তর্গত রেঙ্গুন প্রভৃতি বন্দরে ডাক বহন করিবার জন্য ভারতীয় ডাক বিভাগ বৃটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন্ কোম্পানীর সহিত চুক্তি-বদ্ধ রহিয়াছে। এই চুক্তি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে। তৎপর চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট এখন হইতেই সাধারণের মতামত যাচাই করিয়া দেখিতেছেন। বিষয়টীর গুরুত্ব যথাযথ উপলব্ধি করিতে হইলে কয়েকটী কথা মনে রাখা আবশ্যক। ভারতীয় ডাক-বহনের চুক্তির দরুণ বি, আই, এস্, এন্ কোম্পানী বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়া লইতেছে। এই কোম্পানী সর্ব্বতোভাবে একটী বিলাতী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের এই কোম্পানীর উপর বিশেষ কোন শাসন-ক্ষমতা নাই। সর্ব্বসাধারণ পূর্ব্বাপর এই কোম্পানীর আচরণ সম্বন্ধে প্রতিকূল মত প্রকাশ করিতেছে। ইহার অন্যায় প্রতিযোগিতায় কোন কোন দেশীয় নেভিগেশন কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, এই প্রকার অভিযোগও গভর্ণমেণ্টের নিকট একাধিকবার উত্থাপিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় বি, আই, এস্, এন্ কোম্পানীকে ডাক-বহনের চুক্তি প্রদান করিয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষে পরোক্ষভাবে ইহার সহায়তা করা উচিত হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিবে।

প্রথম যখন এই কোম্পানীর সহিত চুক্তি করা হয়, তখন হয়ত আপত্তির কারণ থাকিলেও উপায়ান্তর ছিল না। ডাক-বহনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা চলিতে পারে, এমন কোন দেশীয় জাহাজ কোম্পানী তখন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। বি, আই, এস্, এন্ কোম্পানীর মত বিলাতী কোম্পানীর স্থলে অপর কোন বিদেশী কোম্পানীকে কম টাকায় ডাক-বহনের চুক্তি প্রদান করা চলিতে পারে কিনা, সে বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিবার মত আবহাওয়ারও তখন সৃষ্টি হয় নাই। কোন না কোন বিলাতী কোম্পানীর পক্ষেই তখন এই প্রকার চুক্তির সুযোগ লাভ করা স্বাভাবিক ছিল না বলিতে হইবে।

বর্ত্তমানে এই সকল অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কাজেই নির্ব্বিবাদে বি, আই, এস্, এন্ কোম্পানীর সহিত ডাক-বহনের চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে হইবে, এরূপ মনে করিবারও কোন কারণ নাই। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যে না হউক, অন্ততঃ তাহার অন্তর্ব্বাণিজ্য এবং উপকূল বাণিজ্যের জন্য কতকগুলি জাহাজ কোম্পানী স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে এই সকল কোম্পানী এখনও সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ অবস্থা লাভ করিয়াছে, এ কথা বলা চলেনা। ইহাদের মধ্যে কোন কোম্পানীকে ডাক-বহনের চুক্তি প্রদান করিয়া তাহার পুষ্টিসাধন করা চলিতে পারে কিনা, সে বিষয়ে অনুসন্ধানতৎপর হওয়া উচিত। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে কিঞ্চিৎ ব্যয়-বাহুল্য হইলেও গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণ লোকসান হইলেও গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এরূপ সহায়তা করিয়া জাতীয় নৌ-শিল্পের পোষকতা করা এখন রাষ্ট্রনীতির অন্যতম মুখ্য অনুশাসন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

যদি কোন কারণে এই দায়িত্ব কোন ভারতীয় কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত করা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলেই যে বি, আই, এস্, এন্ কোম্পানীর সহিত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে হইবে, এমন নহে। বর্ত্তমানে ইতালি, জাপান প্রভৃতি দেশের নৌ শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে সমৃদ্ধি ও শক্তি লাভ করিয়াছে। তুলনামূলক ভাবে এই সকল দেশের কোন কোন কোম্পানী বি, আই, এস্, এন্ কোম্পানী অপেক্ষা কম খরচে ডাকবহনের দায়িত্ব লইবার জন্য স্বীকৃত হইতে পারে। সেরূপ সম্ভব হইলে কেবলমাত্র বৃটীশ কোম্পানী বলিয়াই বি, আই, এস্, এন্ কোম্পানীর সহিত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া দেশবাসীর অর্থের অপচয় করা সমীচীন হইবে না। এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

অপর কোন বিদেশী কোম্পানী এ বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অপারগ হইলে বি, আই, এস্, এন্ কোম্পানীর

সহিতই চুক্তির মেয়াদ বাড়াইতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেই যে পূর্ব্ব ব্যবস্থা বহাল রাখিতে হইবে, এমন নয়। এজন্য পূর্ব্ব চুক্তির সর্ত্তগুলি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে হইবে। বর্ত্তমানে ব্যবসা-মন্দা ও বাজার-দরের পড়্তি ঘটিবার জন্য জাহাজ-পরিচালনের খরচ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কাজেই বি, আই, এস্, এন্ কোম্পানীরও এখন পূর্ব্বাপেক্ষা কম টাকার চুক্তিতে ডাক-বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। নতুবা এই কোম্পানীর একচেটিয়া ক্ষমতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, বলিতে হইবে। সে যাহা হউক, উল্লিখিত ডাকবহনের চুক্তির মেয়াদবৃদ্ধির প্রস্তাব যে বিশেষ অনুসন্ধানসাপেক্ষ ব্যাপার, তাহা বর্ত্তমান আলোচনা হইতেই প্রকটিত হইবে।

ভারত গভর্ণমেণ্টের নূতন ঋণের আদায়

ভারত গভর্ণমেণ্টের অধুনাতম ঋণ-গ্রহণ ও তাহার ব্যবস্থা, সর্ত্ত ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা উপাসনার পূর্ব্ব সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। এই ঋণ ঘোষণের পর হইতে ৫ই জুলাই তারিখ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ টাকা আদায় হইয়াছে নিম্নে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যাইতেছে :—

নগদ ..	১৩'৭০	কোটি
ট্রেজারি বিল	১'৮১	
১৯৩২ খৃষ্টাব্দে		
আদায় সাপেক্ষ বণ্ড ...	৩'৭২	
মোট	১৯'২৩	কোটি

উপরের অঙ্কপাত হইতে দেখা যাইবে যে, ঋণ-গ্রহণে গভর্ণমেণ্টের নগদ টাকা সংগ্রহ আশানুরূপ হয় নাই। ট্রেজারি বিল বা বণ্ড বাবদ যাহা আদায় হইয়াছে তাহা গভর্ণমেণ্টের পূর্ব্বতন ঋণের দেহান্তর গ্রহণ করার সূচনা করিতেছে মাত্র। বর্ত্তমান ঋণ-গ্রহণের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আদায়ের পরিমাণে তাহা সাফল্যলাভ করে নাই। এবার ঋণ ঘোষণার সময় গভর্ণমেণ্ট কোন পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দেন নাই। তাহার কারণ, এই ঋণের আদায়ের পরিমাণ হইতে গভর্ণমেণ্ট এই বৎসরের অক্টোবর মাসে পরিশোধনীয় ১৪॥০ কোটি টাকা ঋণের দাবী মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত আরও কিছু পরিমাণে টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বর্ত্তমান বৎসরের ৭ই মার্চ্চ তারিখে ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব-সচিব বজেট পেশ করিবার সময় এই প্রকার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পরিশোধনীয় ঋণের টাকা আদায় হইয়াছে সত্য কিন্তু নূতন ঋণের জন্য যেরূপ উচ্চহারে সুদ ধার্য্য করা হইয়াছে তাহাতে উদ্বৃত্ত টাকার পরিমাণ যথেষ্ট হয় নাই বলিতে হইবে। বর্ত্তমান ঋণ-গ্রহণে ৩'৭২ কোটি টাকা মূল্যের ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে (অক্টোবর মাসে) আদায়ী বণ্ড পাওয়া গিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের পরিশোধনীয় ঋণের ভার এই পরিমাণ লঘু হইয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহার উপর ১৪॥০ কোটির মধ্যে আরও যে প্রায় ১১ কোটি টাকা পরিশোধনীয় থাকিবে, তাহার দাবী নগদ আদায় ১৩'৭০ কোটি হইতে মিটাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। কিন্তু উদ্বৃত্ত টাকার পরিমাণ হইবে মাত্র কিঞ্চিদধিক ২॥০ কোটি টাকা যেরূপ আশা করিয়া গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান ঋণের জন্য ৫॥০ টাকা হারে সুদ ধার্য্য করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার অনুপাতে ২॥০ কোটি টাকা যৎসামান্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে। গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সুদের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে বর্ত্তমানে তিনমাস কাল স্থায়ী ট্রেজারি বিলএর উপর যে সুদ দেওয়া হইতেছে তাহার পরিমাণ সাড়ে তিন টাকারও কম। ব্যাঙ্ক-মহলে দাবীমাত্র আদায়ী কর্জ্জের উপর ধার্য্য সুদ এখন শতকরা দেড়টাকা হারে আসিয়া জমিয়াছে। এমতাবস্থায় ৫॥০ টাকা সুদ অত্যধিক বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্টের ঋণ-গ্রহণ ব্যাপারে এই সুদের পরিমাণ যথেষ্ট ধার্য্য করা হয় নাই। ইহার কারণ কেহ বলিতেছেন দেশবাসীর অর্থাভাব; কেহ কেহ বলিতেছেন যে গভর্ণমেণ্ট তাহার ঋণ-সূচক বণ্ডের বাজার-দর সংরক্ষণের জন্য ক্রয়-বিক্রয়মূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিতেছেন না বলিয়া ইহার উপর কোন কোন লোকের আস্থা নষ্ট হইয়াছে; আবার কেহ কেহ এরূপ মন্তব্যও প্রকাশ করিতেছেন যে দীর্ঘকাল-স্থায়ী ঋণের উপর জন-সাধারণের বিমুখতাই বর্ত্তমান ঋণের বিফলতার কারণ।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি যে সাহিত্যে আজ স্বকীয়তার অভাব হইয়াছে, পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করিবার মত মৌলিক রচনার একান্তই অভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

—মামুলি গল্প ও উপন্যাস, নিরর্থক কবিতা ও প্রবন্ধে মাসিক সাহিত্যের নৈবেদ্য সাজান হইতেছে।

যাহারা তথাকথিত বহু-বিজ্ঞাপিত যুগধর্ম্মের সঙ্গে পা ফেলিয়া 'প্রগতি'র পথে অগ্রসর হইতে চায়—সেই লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটা unholy alliance হইয়াছে।—বিকৃত রুচি ও আদিম প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগাইয়া গল্প উপন্যাস লিখিয়া পয়সা ও নাম—এ দুই-ই সহজলভ্য হইয়া পড়িয়াছে।—কবিতা বস্তুতান্ত্রিক বা বস্তীতান্ত্রিক করিয়া লিখিতে পারিলে সংবাদপত্রের মারফতে প্রশংসাপত্র করায়ত্ব হইতে পারে—এ দুর্দ্দিনে বেকার-সমস্যার কতকটা সমাধানও হয়ত হয় কিন্তু সাহিত্যের জাতি-বিচার করিলে দেখিতে পাই—জন্মমৃত বা জীবনমৃত সাহিত্য জাতির প্রাণশক্তি নিঃশেষে হরণ করিয়া লইতেছে।—

এই জন্যই বলিয়াছিলাম—যাহাদের সত্যকার কিছু বলিবার নাই,—জাতির এই দুর্দ্দিনে যাহারা দিবার মত কিছু দিতে পারিবে না—তাহারা অন্ততঃ নীরব হইয়া থাকুক।—জাতির নিত্য নূতন সমস্যার প্রতি যাহারা উদাসীন তাহারা দীর্ঘদিনের নিস্তব্ধ অধ্যবসায়ে অন্ততঃ অনুভব করিতে শিক্ষা করুক—মানুষের কাছে সহজ ও সুলভ বস্তুর মূল্য ক্ষণস্থায়ী—সাধনায় যাহা লাভ করিতে হয়—মর্য্যাদার মূল্যে যাহাকে ঘরে তুলিতে হয়—তাহার আদর চিরকালের, মূল্যও তাহার চিরস্থায়ী।

আজ দেশের সাহিত্য যদি না দেশের সহিত যোগ রাখিতে পারিল তবে বলিব বঙ্গ-ভারতীর বিসর্জ্জনের আর বিলম্ব নাই।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে আশ্রয় করিয়া আজ যে রাষ্ট্রিক "অক্টোপাস"টি তাহার অসংখ্য বাহু প্রসারণ করিয়া সবলে জাতির কণ্ঠরোধ করিতেছে—বহুদিনের সযত্ন-লালিত সে দুরবস্থার প্রতিকারের পথ নির্দ্দেশ করিতে আমাদের কোন্ সাহিত্যিকের লেখনী আজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে?

—বহুদিন পূর্ব্বে একজন সূক্ষ্মদর্শী খাঁটী বাঙ্গালী সাহিত্যিকের কথা মনে পড়িতেছে—

"সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য-সেবার উদ্দেশ্যই 'অগ্রসর' হওয়া—অর্থাৎ ব্যক্তির ও জাতির উন্নতিসাধন করা। * * * গ্রন্থ লিখিতেছি কেন?—দেশের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রায় কেহই লিখিতেছি না। দেশ নিরন্ন হইল; মধ্যশ্রেণীর লোকের সংসার চলাই কঠিন। উচ্চশ্রেণীর লোক ডুবিতে বসিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ লোক দেনায় বিব্রত; * * জ্বরে ও নানাবিধ পীড়ায় লোক মরিতেছে এবং অসংখ্য আধমরা হইয়া আছে। যেরূপ জ্ঞানবিস্তারে এই অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, সেরূপ গ্রন্থ লিখিতেছি না ত। কৃষি-শিল্প ইত্যাদিতে অল্পব্যয়ে অধিক লাভবান হইতে পারা যায় কিসে? অল্পব্যয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়, গ্রামের উন্নতি করা যায় কিসে? অপরিমিত ব্যয়ের—সুতরাং ঋণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা যায় কিসে? এ সকল জ্ঞানের বিস্তার করা প্রায় কোনও গ্রন্থেরই উদ্দেশ্য নহে। উপন্যাসাদি সুকুমার সাহিত্য এই সকল বিষয় কত উপকার করিতে পারে, তাহার সীমাই নাই। * * * জনসাধারণের বোধগম্য সাহিত্য কৈ? * *" "হিতকারী-গ্রন্থ না লেখা এক দোষ। সুকুমার সাহিত্য লোক-শিক্ষার পরম সহায় হইতে পারে।"

যাঁহারা 'আর্টবাদী' তাঁহারা হয়ত অতিবিজ্ঞের হাসি হাসিবেন, কিন্তু গানে, কবিতায়, গাথায় সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সাহিত্য যে জাতীয় অভ্যুত্থানে কতখানি সাহায্য করিয়াছে—তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

প্রশ্ন উঠিবে—অর্ডিন্যান্সের কথাটি ভুলিলে চলিবে কেন? —কিন্তু আজিকার এই রাজনৈতিক সঙ্কটকাল রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ উপস্থিত হয় নাই।—দেশের বিভিন্ন

তরুণ লেখকের কবিতায় পাই—"মলয়ার হাওয়া, বুলবুলির বুলি - মহুয়ার মদ, হাসনুহানার হাতছানি, ঠোঁটের গোলাপী সারাব, চাঁদের জোছনা, উতলা রজনীর আকুতি, কাজল

চোখের পাগলকরা চাহনি"—আরো কত কি ছাই ভস্ম, এসব জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতেছে—এখনকার 'মেয়েলি' কবিতা পড়িয়া মনে হয় তরুণ জীবনে উহা কলঙ্কের ছাপ মারিয়া রাখিয়াছে। "যাহাতে হৃদয়ে উৎসাহ দেয়, প্রাণে মঙ্গলময় আবেগ জাগাইয়া তুলে, স্নায়ুমণ্ডলে ও মস্তিষ্কে বল সঞ্চার করে, মনে উদ্যম ও প্রতিজ্ঞা অঙ্কিত করিয়া মানুষকে কল্যাণের পথে লইয়া যায়; অন্যদিকে স্বভাবের কোমল বৃত্তিসকলকে ধ্বংস করে না, বরং তাহাদিগকে উত্তরোত্তর পবিত্র করিয়া দেশ-কালোপযোগী মনুষ্যত্বের আদর্শের সৃষ্টি করে, সেরূপ কবিতা প্রায়ই দেখিতে পাই না।"

বহুদিন পূর্ব্বে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বন্ধু বিগড়াইয়াছিলেন—আর্টবাদী বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই। জাতীয় জীবনে যদি এই প্রকার অবসাদ ও ঔদাসীন্যই না আসিবে তাহা হইলে দেশের আশা ভরসার স্থল তরুণ লেখকদের হাতের কলমে আজ এমন করিয়া ঘুণ ধরিবে কেন?

সাহিত্যে জীবনের লক্ষণ দেখিতেছি না। জাতির সহিত সাহিত্যের যোগসাধনের কোনও চেষ্টাই যে হইতেছে না—তাহাতে কখনও জাতীয় জীবনের দুঃখগ্লানি অবসাদ ও অপমান, আশা আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা,—কোনও ছায়াপাত করিতে পারে না। যে সাহিত্য জাতির ভাববিলাসিতার উপকরণ হইল—কিন্তু দেশ-দেবতার নৈবেদ্য আহরণে কোনও সাহায্যই করিল না—তাহা কখনও জাতীয় সাহিত্য হইতে পারে না।

—ফরাসী সমালোচক ও সাহিত্য-রসিক মসিয়ে ফাঞ্জে (**M. Faguot**) বলিয়াছেন, যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির মেদমজ্জার সহিত জড়িত;—তাহা জাতির সকল স্তরে সঞ্চারিত,—উচ্চতম হইতে নিম্নতম পর্য্যন্ত সকল লোকেই পরিব্যাপ্ত।

যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির অতীত পারম্পর্য্যের সহিত সংবদ্ধ—মালাগ্রথিত পুষ্পশ্রেণী তুল্য।

যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির সমাজ-ধর্ম্ম বর্জ্জিত হইতে পারে না; তাহা জাতির ভাবানিহিত ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না।—

এই অমূল্য কথাগুলি আমাদের শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে হইবে—দুর্দ্দিনের অন্ধকারে পথ দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু অগ্রসর হইবার আগ্রহ থাকিলে—পায়ে পায়ে পথের নিশানা আপনা হইতেই জাগিয়া উঠিবে।

কাম-কলার সুচারু অনুশীলনে কোনও সাহিত্য বড় হইতে পারে না;—মানব-প্রবৃত্তির দুর্ব্বলতাকে কেন্দ্র করিয়া অধুনাতন যে-সব সাহিত্যরথী রসমন্থনে লেখনী-দণ্ড সশব্দে ঘুরাইতেছেন তাঁহারা কখনই অমৃতরসের সন্ধান পাইবেন না—মন্থন শেষ না হইতেই দেখা যাইবে ফেনায়িত হলাহল সমাজের অঙ্গে দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করিতেছে, ইহা একান্ত প্রণিধানযোগ্য। নীতি-বাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও শিক্ষিত ও সভ্য মানুষের জীবনে যে সাধারণ আদর্শ যুগ যুগ ব্যাপী কল্যাণ-চিন্তা ও মঙ্গল-কর্ম্মের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে শুধু বিবর্ত্তন বা revolutionএর অজুহাতে তাহাকে উপেক্ষা করা আত্মঘাতীর মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

পূর্ব্বকালে চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই সাহিত্য সেবা করা হইত—তখন সাহিত্য অর্থে কাব্যনাট্যকেই বুঝাইত। এখন সাহিত্যের অর্থ ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এখন সাহিত্য বলিতে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানকেই বুঝিয়া থাকি।—সাহিত্যের আভিজাত্য যেমন সভ্যতার আদর্শে বাড়িয়াছে তেমনি তাহার বিষয়গত দায়িত্বও সীমাবদ্ধ হয় নাই—অপিচ নানা বিষয়ে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

জাতীয় অভ্যুত্থানের দিনে তাই ইতিহাসকে আমরা প্রতিদিনকার পঠনীয় বিষয় বলিয়া মনে করি। আধুনিক সাহিত্যে সেই ইতিহাসের মৌলিক প্রবন্ধ দূরের কথা, তাহার চিন্তা, অনুশীলন, উদ্দীপন-চেষ্টাও দেখা যায় না।

বিভিন্ন জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস, সমাজের সংস্কার ও বিবর্ত্তনের ধারা, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে মানবসম্প্রদায়ের অর্থনীতি-চর্চ্চা, বিদ্যানুশীলন পদ্ধতি, গণ-তন্ত্রের ক্রমাভিব্যক্তি প্রভৃতি নানাবিধ শিক্ষণীয় বিষয়ের ঐতিহাসিক গবেষণা হওয়া আধুনিক যুগে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে—সাহিত্য সেবকদের মধ্যে সে চেষ্টার কোনও লক্ষণই ত দেখা যাইতেছে না। যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইলে সাহিত্যসৃষ্টির মূলে এই সব

আদর্শের কথা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে—এখনকার দিনে সেই ভাবেরই একান্ত অভাব দেখিতেছি। সম্মুখে বিস্তৃত ক্ষেত্র—তাহার উৎকর্ষ সাধনের প্রেরণা নাই, শ্রমস্বীকারের সংকল্প নাই। ইহার একমাত্র কারণ হইতেছে ভাবের মৌলিকতা ও সেই ভাব-সাধনার স্বকীয়তার অভাব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মূকের যুগও যেমন চাহি না— বাচালের যুগও তেমনি চাহি না,—চাই মুখরের যুগ। চাই—অপরূপ ছন্দে গাথায় মহামানবের ইতিহাসকে, কৃষ্টিকে, তাহার দুই হাজার বৎসরের সভ্যতা ও শিক্ষাকে যুগোপযোগী আধারে লোকচক্ষে ধরিয়া দেওয়া কিন্তু মূলে যে প্রেরণার অভাব তাহা অধ্যবসায় বা অনুচিকীর্ষায় আসিবে না—চাই ঐকান্তিক অনুশোচনায় একান্তমনে সাহিত্যের অনুধ্যান।

পরলোকে স্বর্ণকুমারী দেবী

গত ১৯শে আষাঢ় রবিবার বেলা আন্দাজ দশটা পনর মিনিটের সময় স্বর্ণকুমারী দেবী কলিকাতার ৩নং সানি পার্কের বাড়ীতে পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৮৫৭ সালে (বাংলা ১২৬৪ সালের ভাদ্র মাসে) স্বর্ণকুমারীর জন্ম হয়। ইনি স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা। বাল্যকালে তিনি পিতৃগৃহে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। বিখ্যাত কংগ্রেস-সেবী স্বর্গীয় জানকীনাথ ঘোষালের (ব্যারিষ্টার) সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি স্বামীর নিকট হইতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন।

স্বর্ণকুমারীই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী লেখিকাগণের মধ্যে উপন্যাস-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস "দীপনির্ব্বাণ"। তাঁহার লিখিত "ফুলের মালা" ও "কাহাকে" নামক পুস্তক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

স্বর্ণকুমারী ১২৯১ সাল হইতে ১৩০২ সাল পর্য্যন্ত "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। অতঃপর তাঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী ভারতীর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে কন্যার হাত হইতে তিনি পুনরায় ভারতীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করতঃ বাংলা ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত সুচারুরূপে 'ভারতী'-সম্পাদনে নিযুক্ত থাকেন।

১৯১৩ সালের ২রা মে তিনি বিধবা হন। সাহিত্য-সাধনায় স্বর্ণকুমারীর ক্লান্তি ছিল না; বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে তাঁহার দান অসামান্য। তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন—

দীপ নির্ব্বাণ, ছিন্নমুকুল, কুমার ভীম সিংহ, ক্ষত্রিয় রমণী, ক্ষত্রিয়ের অশ্ব-তরবারী, সন্ন্যাসিনী, প্রতিশোধ, যমুনা, কেন? আমার জীবন, লজ্জাবতী, নূতন বালা, চাবি চুরি, রক্তপিপাসু, পূরবী, স্নেহলতা (১ম), বিদ্রোহ, সমুদ্রে, প্রভাত সঙ্গীত, মধ্যাহ্ন সঙ্গীত, সন্ধ্যা সঙ্গীত, সঙ্গীত শতক, নিশীথ সঙ্গীত, সেকেলে কথা, মিলন রাত্রি, বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী, বিজয়ার আশীর্ব্বাদ, স্বপ্ন না কি, নব ডাকাতের ডায়েরী, গল্প প্রবন্ধ মঞ্জুষা, কবিতা পারিজাতহার, স্নেহলতা (২), জাতীয় সঙ্গীত, ধর্ম্ম সঙ্গীত, প্রেম পারিজাত, যুগান্ত কাব্যনাট্য, নিবেদিতা, হাসি, জীবনী, হুগলীর ইমামবাড়ী, দেব কৌতুক, ফুলের মালা, বসন্ত উৎসব, মিবার রাজ, পাকচক্র, নব কবিতাবলী, প্রবন্ধ রত্নাবলী, পূজার তত্ত্ব, পত্রাবলী, দার্জ্জিলিং, কাহাকে? মালতী, প্রেমে প্রীতি, মিউটিনি, অমর গুচ্ছ, বিবিধ কথা, কনে বদল, কৌতুক নাট্য, গাথা, টালিসম্যান, রাজকন্যা।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি "সাহিত্য স্রোত" নামক একখানি পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড রচনায় ব্যাপৃত থাকিবার সময়ই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। ইদানীং তিনি স্বহস্তে লিখিতে পারিতেন না বলিয়া মুখে বলিয়া যাইতেন এবং অন্য একজন লেখক লিখিয়া লইত।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার এক পুত্র এবং এক কন্যা বর্ত্তমান। পুত্রের নাম শ্রীযুত জ্যোৎস্না ঘোষাল। ইনি আই-সি-এস। ১৯৩০ সালে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদের সদস্যরূপে তিনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীই তাঁহার একমাত্র কন্যা। স্বর্ণকুমারীর মৃত্যুতে বঙ্গভারতীর মুকুটমণি খসিয়া পড়িল।

বাঙ্গালী যুবকের হাতের কাজের ব্যবস্থা

—শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

হাজারে হাজারে প্রতি বৎসর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে ম্যাট্রিকুলেট, আণ্ডার গ্রাজুয়েট ও গ্রাজুয়েট উৎপন্ন হইতেছেন এবং চাকরীর বাজারে সকলেই ব্যর্থ হন্যা দিয়া বেড়াইতেছেন। হতাশায় জীর্ণ, আত্মসম্মান-বোধ-হীন, উন্মত্ত প্রায় বেকার যুবক সম্প্রদায়ের প্রতি চাহিয়া দেখিলে কার না হৃদয় ব্যথায়, লজ্জায় ও সমবেদনায় ভরিয়া ওঠে? কারই বা না মনে হয় যে সমস্ত আন্দোলন দূরে রাখিয়া অন্ন চিন্তায় ব্যাকুল জাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসা এই যুবক শ্রেণীর হাতে কাজ যাহাতে আসে তাহার জন্য প্রাণপাত করি?

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার মরশুম কাটিয়া গেল। যাঁহারা পাশ করিয়াছেন এবং যাঁহারা পাশ করিবার আশায় আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছেন না সকলেই আকুল হইয়া ভাবিতেছেন, এখন কি করা যায়। আমাদের মনে হয় যে বাঙ্গালীর ছেলের আর নিরর্থক প্রচলিত পন্থায় আই-এ, বি-এ, এম্-এ, ও ল পড়িয়া কোনমতে সময় কাটান এবং বেকার বলিয়া পরিচিত হইবার হাত হইতে সাময়িক ভাবে উদ্ধার পাইবার ব্যবস্থা করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়। যাহাতে কোন শিল্প শিখিয়া শীঘ্র হাতের কাজে রোজগার করা সম্ভব হয় সেইরূপ শিক্ষার প্রতিই বাঙ্গালী যুবকের মন দেওয়া কর্ত্তব্য।

বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের উদ্যোগে কয়েক মাস পূর্ব্বে একটী পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে যাহাতে বাংলার যাবতীয় শিল্প ও কলা বিদ্যাশিখাইবার প্রতিষ্ঠান গুলির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সেদিকে বাংলার যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে।

বাংলার ছেলেদের হাতের কাজ শিখাইবার যে সকল ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার মধ্যে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অর্দ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ছেলেদের জন্য, কতকগুলি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ও ফেল ছাত্রদের জন্য এবং আরও কতকগুলি আই, এ আই, এস্-সি এবং তাহারও বেশী যাহারা পড়িয়াছে, তাহাদের জন্য প্রধানতঃ নির্দ্দিষ্ট। যে শ্রেণীর শিক্ষার্থীই হউক একথা জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে হাতের কাজ করিয়া যাঁহারা রোজগার করিতে চাহেন তাঁহারা যত অল্প বয়সে কাজে নিয়োজিত হইতে পারেন ততই মঙ্গল।

শিল্প ও কলকারখানার কাজের মধ্যে এইরূপ ছোট ও বড় চাকুরীর যে সুযোগ রহিয়াছে তাহার মূলে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা বর্ত্তমান, যথা:—কলকব্জার ইঞ্জিনিয়ারী, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারী ও স্থপতি বিদ্যা। শিল্পজ্ঞান হীন সাধারণ শ্রমিক যেখানে মাসিক গড়ে ১৫৲ টাকা রোজগার করে সেখানে সামান্য শিল্পের সহিত পরিচিত নিম্নতম শ্রমিক গড়ে মাসিক ২৫৲ হইতে ৩০৲ টাকার কম পায় না। আবার একজন গ্রাজুয়েট সারাদিন পরিশ্রম করিয়া ৩০৲।৩৫৲ টাকার বেশী রোজগার করিতে পারে না, অথচ একটু বুদ্ধি ও কর্ম্ম কুশলতা যাহার রহিয়াছে, সামান্য ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত শিক্ষা থাকিলেও কারখানার কাজে তাহারা অনায়াসে ৬০৲।৬৫৲ টাকা মাসে পাইতে পারে।

যে সকল যুবক কোন শিক্ষা পাইবার সুযোগ পায় নাই তাহারা কামারের, ছুতারের, এবং তাঁতির কাজে মন দিলে ভাল হয়। চির প্রচলিত গ্রাম্য কামার ও ছুতারের এবং তাঁতির কাছে শিক্ষানবিশীর যদি তেমন সুবিধা না হয় তাহা হইলে কলিকাতা ও তাহার আশে পাশে যে প্রচুর ছোট ও বড় কারখানা রহিয়াছে তাহাতে ঢুকিয়া অপেক্ষাকৃত নূতন প্রণালীর কাজ শিখিয়া লওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমা কামার, বাসনের কারিগর ও চীনা ছুতারে বাংলা দেশ ছাইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর ছেলেদের কি এই সকল হাতের কাজে তৎপরতা কমিয়া যাইতেছে?

ইহা ছাড়া গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে শ্রীরামপুর, বহরমপুর, ঢাকা, মৈমনসিং, কুমিল্লা, ফরিদপুর, পাবনা, রংপুর, রাজসাহী, বর্দ্ধমান, বিষ্ণুপুর, বরিশাল ও খুলনা সহরে তাঁতের কাজ ও ছোট খাট কল কারখানার কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ছয় মাস হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত এই সকল উইভিং ও টেক্‌নিকাল স্কুলে কাজ করিতে হয়, এবং দরিদ্র বালকদের সাহায্যের জন্য অনেক স্থানে সামান্য বৃত্তিরও

ব্যবস্থা আছে। আপন কর্ম্ম কুশলতা অনুসারে এই সকল স্কুল হইতে শিক্ষা লইয়া যাহারা বাহির হয় তাহারা অনায়াসে ৫০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা মাসে রোজগার করিতে পারে।

এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে দেশের আবহাওয়া হিসাবে যে যে শিল্প ও কারবারের ক্রমোন্নতি দেখা যাইতেছে ও যে সকল জিনিষের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে অথবা বাড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে একটু বিবেচনা করিয়া বালকদের সেই সেই কারবারের সংশ্লিষ্ট কলকারখানার কাজে তৈয়ারী হইয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। বর্ত্তমানে মোটরের কল ও লরী ও বাস গাড়ী তৈয়ারী ও মেরামতের কাজে অনেক বাঙ্গালীর ছেলের ভরণ পোষণ হইতে পারে, এবং মনে হয় শীঘ্রই মফঃস্বলের সহরে ও গ্রামগুলিতে ইলেক্‌ট্রিক, মোটর ও হস্ত পরিচালিত পাম্প, কলের লাঙ্গল ও অন্যান্য কৃষির উপযোগী ছোট বড় কলের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যুবকদেরও কিছু হাতের কাজ বাড়িবে। তাহার জন্য এখন হইতে প্রস্তুত হইয়া লওয়া ভাল। এ বিষয়ে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ আশা পোষণ করেন তাঁহারা শিবপুরের কিম্বা যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কিম্বা নব-প্রতিষ্ঠিত বালিগঞ্জ কলেজ এর ইঞ্জিনিয়ারিং এর নিম্নতম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া কিছুদিন শিক্ষালাভ করিলে ভাল হয়।

যাঁহারা কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছেন তাঁহাদের উচ্চতর আশা থাকা স্বাভাবিক। তাঁহাদের জন্যও উপরোক্ত বিদ্যালয় সমূহে ভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কারখানার হেড মিস্ত্রী, ফোরম্যান, এমন কি ছোট এঞ্জিনিয়ার পর্য্যন্ত এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার পর কোন ভাল কারখানায় ঢুকিয়া হাতের কাজ শিখিয়া লইলে হইতে পারা যায়। এই সব কাজের জন্য সাধারণতঃ তিন হইতে চারি বৎসর শিক্ষানবিশী করিতে হয়।

স্কুলে ও কলকারখানায় মেকানিকাল্ ও সামান্য ইলেক্‌ট্রিকাল এঞ্জিনিয়ারিং কাজ শেখা ছাড়া কলিকাতা টেক্‌নিকাল ইনস্‌টিটুটে চামড়ার জিনিষ প্রস্তুত প্রণালী ও অন্যান্য ছোট খাট কারবারের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ইশাপুর রাইফল্ ফ্যাক্টরীর সংশ্লিষ্ট টেক্‌নিকাল স্কুলে, কাঁচড়াপাড়া ও খড়গপুর রেলওয়ে টেক্‌নিকাল স্কুলে, ও টাটানগর টেক্‌নিকাল ইনস্‌টিটুটে নানা শ্রেণীর ছাত্র ও শিক্ষানবিশদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বাহিরে বিশেষ আদর হইয়া থাকে, কারণ হাতের কাজ শেখানর ব্যবস্থা এই সব কারখানা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ভবনে খুব ভাল।

গভর্ণমেণ্ট অথবা রেলওয়ে পরিচালিত এই সব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেশে অনেক বেসরকারী ছোট ও বড় কারখানা আছে যেখানে বেশ ভালই হাতের কাজ শেখা যায়। তাহার মধ্যে বার্ণ ও বার্ড কোম্পানির এবং জেসপ, মার্শাল ও হুকুমচাঁদের কারখানা গুলিই শ্রেষ্ঠ। বেঙ্গল টেলিফোন, কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক্ সাপ্লাই, ও অন্যান্য সকল কারখানাতেও অল্প বিস্তর শিক্ষানবিশ গ্রহণ করার ব্যবস্থা আছে। সেগুলিতে যাহারা প্রবেশলাভ করিতে পারে তাহাদের ভবিষ্যৎ প্রায়ই খুব ভাল হয়। কয়লার খনির কাজ শেখানর জন্যও কয়েকটী স্থানে সুব্যবস্থা রহিয়াছে। বর্ত্তমানে কয়লার ব্যবসায় খুব মন্দা। তাই অনেকে সেখানে বেকার হইয়া পড়িয়াছেন। তবু এমন সময় আবার আসিবেই যখন কয়লার খনির কাজে পারদর্শী ব্যক্তির আবার আদর হইবে।

কলকারখানার কাজ ছাড়া বাড়ী ঘর ও রাস্তাঘাট তৈয়ারী এবং মাঠ ও জমি জরিপের কাজে সাহায্য করিয়াও অনেক বাঙ্গালী যুবক বেশ রোজগার করিতে পারে। তাহার জন্য শিবপুর ও কলিকাতা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এবং ময়নামতী, ঢাকা, বর্দ্ধমান, রংপুর, পাবনা ও রাজসাহীতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে।

এ সকল ছাড়া সম্প্রতি বেতার ও টেলিগ্রাফের কাজ শেখাইবার জন্য এবং রেলওয়ের কারবারের শিক্ষা দেবার জন্য কলিকাতায় কয়েকটী প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। এগুলি এখনও তেমন ভাল করিয়া গড়িয়া ওঠে নাই, তবে উপযুক্ত সময়ে গড়িয়া উঠিবে আশা করা যাইতেছে।

তবে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা কিছু কিছু রহিয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান মন্দিরের এবং যাদবপুর কলেজের ফলিত রসায়ণ বিভাগে। রসায়ণ বিজ্ঞানে যাঁহাদের ব্যুৎপত্তি রহিয়াছে তাঁহারা চাকুরীর বাজারে ঘুরিয়া না মরিয়া যদি এইখানে কিছু শিক্ষা লইয়া সাবান, কালি, পালিশ, বিশুদ্ধ তৈল, মোমবাতি, দেশলাই, চিনি

প্রভৃতি ছোট বড় জিনিষ তৈয়ারীর দিকে মন দেন তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হয়। বর্ত্তমানে অনেক বাঙ্গালী যুবক নানা দেশ হইতে বিভিন্ন শিল্পের সংবাদ ও শিক্ষা লইয়া আসিয়াও উপযুক্ত হাতের কাজ পাইতেছেন না। তাহার জন্য কতকাংশে দায়ী আমাদের ধনিকমহল বটে কিন্তু অধিকক্ষেত্রেই এই সকল ছাত্রদের ব্যবসায় বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় দেখা যায় না। একটু হিসাব করিয়া সস্তায় প্রকৃত ভাল জিনিষ তৈয়ারী করিতে পারিলে ধনিকদের সাহায্যের অভাব হইবে না এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস্ কলেজে ভর্ত্তি হইয়া গতানুগতিক ভাবে জীবন কাটানর ব্যবস্থা করার পূর্ব্বে এই সকল নূতন পথের সন্ধান লইতে বাঙ্গালী যুবকমাত্রকেই আমরা অনুরোধ করিতেছি।

পুস্তক-পরিচয়

নজরুল-গীতিকা (দ্বিতীয় সংস্করণ)—নজরুল ইস্‌লাম। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্‌স্, ২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন। মূল্য দেড় টাকা। সুন্দর অ্যান্টিক কাগজে ছাপা, দেড় শতাধিক পৃষ্ঠা। ছাপা, বাঁধাই মনোরম।

কবি হিসাবে নজরুল যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, সে খ্যাতি সামান্য নয়—গীতিকার-গায়ক হিসাবে তিনি সে-খ্যাতিকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। কবিতাও তিনি যেমন বহু লিখিয়াছেন, গানও তেমনই লিখিতেছেন,—অত্যন্ত ভালো, অত্যন্ত মন্দ, না ভালো, না-মন্দে মিলিয়া মিশিয়া ইহারা অগণন, সুতরাং সমালোচনার বেড় দিয়া ইহাদিগকে ধরিতে যাওয়া মিথ্যা। কবিতা করিয়া বলিতে গেলে, বলা যায়, নজরুল আমাদের বাংলা-সাহিত্যের বিস্তৃত সমতল ভূমিতে কোথা হইতে একটি দুর্দ্দান্ত পাহাড়িয়া নদীকে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহার স্রোত কোথাও চঞ্চল, স্ফীত—আবার কোথাও ক্ষীণ—এই মুহূর্ত্তে বিপুলোচ্ছ্বাস, পরমুহূর্ত্তে একেবারে স্থির। কবিতা করিয়া না বলিলে বলা যায় যে, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকের দ্বিতীয় সংস্করণের বই সমালোচনার অপেক্ষা রাখে না। ইহার জনপ্রিয়তা মাসিক পত্রিকার পাঠক-রাজ্যের পরিধিকে অতিক্রান্ত করে। বইখানিতে কবির 'জাতীয় সঙ্গীত' 'ঠুংরী' 'হাসির গান' 'গজল' 'ধ্রুপদ' 'কীর্ত্তন' 'বাউল-ভাটিয়ালী' 'টপ্পা' 'খেয়াল'—সমস্ত প্রকার গানই আছে, সুতরাং এটি তাঁহার গানের গ্রন্থাবলী। এমন সুর নাই যাহা অমিশ্র বা মিশ্র হিসাবে এ গানগুলিতে পাওয়া যাইবে না।—আমরা একটি গান তুলিয়া দিলাম।

টোড়ি—তেওড়া

আমি ছন্দ ভুল চির-সুন্দরের নাটনৃত্যে গো।
আমি অপ্সরা-মায়া ধ্যানভঙ্গের, যোগী মহেন্দ্রের চিত্তে গো॥
আমি পঞ্চশর-তূণে রক্তমাখা শর,
অমৃত-পাত্রে গো স্মর-গরল খর,
আমি উর্ব্বশীর চল-চরণ নূপুর, উদাসিনী দেব-বিত্তে গো॥

যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের ইহা পড়িয়া 'টোড়ি'র ধ্যান মনে পড়িবে। 'নজরুল-গীতিকা' নামটি শ্রুতি-সুখকর নয়।

শ্রীকিরণকুমার রায়

সুরহারা—শ্রীযুক্ত অজিতকুমার সেন এম-এ প্রণীত কবিতার বই। ইলাবাস, হিন্দুস্থান পার্ক, বালীগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বাগচী কর্ত্তৃক প্রকাশিত; ডবল ক্রাউন ষোলপেজী, ৮৭ পৃষ্ঠা, ছাপা ও কাগজ প্রভৃতি বেশবিন্যাস সুরুচিসঙ্গত; দাম, বারো আনা।

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার সেন পাঠ্যাবস্থা থেকেই কবিতা লিখে আসছেন, এ কথা তাঁর বইখানির ভূমিকায় পাওয়া গেল। পাঠ্যাবস্থা থেকেই যাঁর কাব্য-চর্চ্চার দিকে ঝোঁক, পরিণত বয়সে তাঁর হাত থেকে একখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্য আশা করা যেতে পারত। সে আশা যদিও আমাদের পূর্ণ হয় নি, তথাপি আমরা এই কবির কাব্যচেষ্টাকে শ্রদ্ধা করছি। কারণ এই সাহিত্যিক দম্ভের যুগে কবি তাঁর সীমাবদ্ধ শক্তিসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। এ কথার প্রমাণ বইখানির নামকরণে ও অনেকগুলি কবিতায় পরিস্ফুট হয়েছে। কবিমাত্রের জীবনে মাঝে মাঝে মনের মধ্যে একটি অপূর্ব্ব আনন্দময় অনুভূতি সুরের গুঞ্জন তুলে, সেই ক্ষণস্থায়ী অবস্থাকে ছন্দে ফেলাই কবির কাজ। আলোচ্য পুস্তকের কবি মধ্যে মধ্যে সেই অপূর্ব্ব অনুভূতি লাভ করেছেন এর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু জীবনের বাস্তবতার নিষ্করুণ স্পর্শে সেই অনুভূতির স্মৃতি কবিমনে যে কত ক্ষীণ হয়ে এসেছে তা অজিত বাবু তাঁর অনেকগুলি কবিতাতে স্বীকারও করেছেন, যেমন—

(১). খেয়ালে লিখেছি বসে যত কটি কবিতা,—
ব্যর্থ হয়েছে নাকি আজ শুনি সবি তা'!
নাই নাকি ভাব-গুণ,—নাই যতি-ছন্দ,—
কথার প্রলাপ শুধু, নাই প্রাণ-স্পন্দ!

(২) শুধু নিমেষ তরে
শুধু কৌতূহলে,
যারা ভিড়িল পাশে
সবে গিয়েছে চলে'।
হের কেহ ত নাহি
তব আসর-তলে।

আজকাল কাব্যে আসর জমানো যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার, রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী প্রত্যেক কবি নিশ্চয়ই তা' স্মরণ করবেন।

শ্রীঅমিতাভ মৈত্র

মার্কিনের স্বপ্ন

অ্যামেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েসন্ হইতে ১৯৩১ সনে প্রকাশিত যে-কয়খানি পুস্তককে বিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, জেম্‌স্ ট্রাস্‌লো অ্যাডাম্‌সের 'দি এপিক অব অ্যামেরিকা', সেই তালিকার একটি নাম-করা বই। আধুনিক অ্যামেরিকার কাহিনী ও স্বপ্নকে বুঝিতে হইলে বইখানি পড়া দরকার। অবশ্য বলাই বাহুল্য, গ্রন্থকার নিজে অ্যামেরিকান, সুতরাং স্বদেশকে যথাসম্ভব স্বদেশীর চোখ দিয়াই দেখিয়াছেন। কিন্তু শুধু সেই চোখ দিয়া দেখিলে আমরা এ ব'য়ের উল্লেখ প্রয়োজন মনে করিতাম না, মন ও মস্তিষ্ক দিয়া তিনি অ্যামেরিকাকে বিচার বিশ্লেষণও করিয়াছেন। বইখানির প্রথম দিকে তিনি বিশ্ব-সভ্যতায় অ্যামেরিকার যাহা দান, সেই প্রসঙ্গে লিখিতে গিয়া বলিতেছেন—কিছু আগেও এ দেশ পাঁচ লক্ষ অসভ্যের বাসভূমি ছিল, এখন পৃথিবীর যে-কোন জাতিরই মত সুসভ্য, কর্ম্মনিষ্ঠ—তাহার আড়াই শত গুণ অধিবাসীকে, এই দেশ আশ্রয় ও আহার জোগাইতেছে। মানব-সভ্যতায় অ্যামেরিকার নিজস্ব বাণী একটি দিবার আছে। প্রত্যেক মানুষ এখানে নিজের শক্তি সামর্থ্যের অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা পাইয়া নিজের জীবনকে পূর্ণতর, সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিতে পারে—মার্কিণ সভ্যতার স্বপ্ন ইহাই। মোটরকার কিংবা ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন ইহা নহে,—যে সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেক নরনারী নিজেদের ক্ষমতায় পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে পারে, মার্কিণ সেই সমাজ-ব্যবস্থার স্বপ্ন রচনা করিয়াছে। মাত্র প্রাচুর্য্যের মোহে অন্ধ হইবার জন্যই দেশ-বিদেশ হইতে লক্ষ-লক্ষ লোক আসিয়া আজ অ্যামেরিকায় নীড় বাঁধে নাই,—প্রাচীন কোন সভ্যতায় যে-সব কৃত্রিম সমাজ বন্ধন মানুষকে মানুষ হইবার পথে সহস্র বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই সব বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই মানুষ অ্যামেরিকায় আজ ছুটিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু ততঃ কিম্? দেশ ও দেশবাসীর কাছে তিনি এ জিজ্ঞাসা আনিয়াছেন। জাতীয় সম্পদের গর্ব্বে মার্কিণ আজ উদ্ধত, কিন্তু মাথা-পিছু মার্কিনবাসীর যে-আয়, তাহার সহিত কোনও বিশেষ ব্যক্তির আয়ের তুলনা করিতে গেলে এদেশে যে-পার্থক্য নজরে পড়ে, তাহার মত ভয়াবহ আর কি হইতে পারে? কেন অর্থের দিক দিয়া ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এত ব্যবধান? সমাজের সুবিধার জন্যই ব্যক্তিবিশেষের নিকট পুঞ্জীভূত অর্থকে আজ দেশের মধ্যে আবও ছড়াইয়া দিবার প্রয়োজন।

ইহার পর তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, মনুষ্যজীবনের অর্থ কি? সকল মানুষের জন্য সুন্দর স্বচ্ছন্দ জীবন কাহাকে বলিব? মার্কিনের স্বপ্ন সার্থক করিতে হইলে এই প্রশ্নের আগে সমাধান হওয়া চাই। বলিতেছেন –

"মোড় ফিরিবার সময় আমাদের আসিয়াছে। ধন জন-মান-যশকে আর কৃতকার্য্যতার পরিমাপ বলিয়া স্বীকার করা চলেনা। আমরা অর্থ সঞ্চয় করিয়া দেখিয়াছি, ব্যবসায়-বাণিজ্যের শেষ দেখিয়াছি, ঐহিক সুখকে চরম নীতি বলিয়া মানিয়াছি। জীবনের অকৃতকার্য্যতাকে অগ্রাহ্য করিয়া সুস্থ সবল দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের প্রত্যাশা করিয়াছি। নিন্দা ও সমালোচনা তুচ্ছ করিয়াছি। বাধাবিঘ্নকে স্বীকার করা বর্ব্বরত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি। শিক্ষাকে উপকারসাপেক্ষ করিয়া উদ্দেশ্যহীন করিয়াছি—সংখ্যায় ও অবয়বে বাড়িয়া সত্যকে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি। এমনই ভাবে বাঁচিবার উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া বাঁচিবার আনন্দই আমরা ভুলিয়াছি। কিন্তু তবু ভরসা আছে। আরও কিছুর আকাঙ্ক্ষা আজ আমাদিগকে যে তীব্র ভাবে বিদ্ধ করিয়াছে, পূর্ব্বাকাশে তাহার অরুণরাগ দেখিতেছি।"

মার্কিনের ব্যর্থতা

মার্কিন সভ্যতার একটা দিক শিশু লিণ্ডবার্গের হত্যায় একেবারে নগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রসঙ্গে নিউইয়র্কের মিঃ এম্. ই. ট্রেসি 'ওয়ার্ড টেলিগ্রাম'এ যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য—

'আমাদের এই সব ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মূলে রহিয়াছে একটি ভুল—এই ভুল যে, মানুষ নিজের ইচ্ছামত কোন বিষয়ে সরল আর কোন বিষয়ে কুটিল হইবার সামর্থ্য রাখে,—যে, চরিত্রবলের চাইতে আর কোন প্রবল অস্ত্র আছে,—যে, চালাকি সত্যনিষ্ঠার চাইতে অধিকতর লাভজনক—যে, টাকা ছাড়া আর এ পৃথিবীতে কৃতকার্য্যতার পরিমাপ কিছু নাই।

শিশু চার্লসের এই হত্যার উদ্দেশ্য ভগবান জানেন, কিন্তু এই অনর্থক,

নির্ম্মম, অমানুষিক হত্যার জন্য মূলতঃ দায়ী এই যুগ, এই কপট, মিথ্যামুগ্ধ, অতিবুদ্ধি, ভ্রান্ত যুগ ও তাহার বিশ্বাস—যে-যুগে আমরা আইন হইতে বাঁচিবার জন্য গুণ্ডাকে প্রশ্রয় দিতেছি, চতুর রাজনীতিক বলিয়া কতকগুলি ধুরবাজকে ভোট দিয়া বড় করিতেছি, আইন করিয়া যে মাল দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছি, তাহারই চোরাই-মাল দেড়া-মাশুলে কিনিতে লজ্জা বোধ করিতেছি না, আর চোরাই মালের উপর লাভের বখরা হিসাবে ইনকাম ট্যাক্স আদায় করিতে না পারিয়া ক্ষেপিয়া মরিতেছি—এই যুগই শিশুহত্যার জন্য দায়ী।'

চিকাগোর 'ট্রাইবিউন' পত্রিকা এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—

'এ অপরাধ আকস্মিক নয়, অ্যামেরিকার জলহাওয়ায় ইহার কারণ ছড়াইয়া আছে।'

সেনেটর রস্কো সি প্যাটারসন্ এই প্রসঙ্গে আইনের খসড়া পেশ করিয়াছেন। 'লিবার্টি' পত্রিকায় এই অপরাধের ইতিহাস বিবৃতি করিয়া তিনি বলিতেছেন—

'গত তিন বৎসরের মধ্যে ২৮৫টি শিশুহরণকাহিনীর সংবাদ পুলিশে পেশ হইয়াছে। ১৩টি হৃত শিশু দুর্বৃত্তেরা মারিয়া ফেলিয়াছে। মাত্র ৪৭টি অপরাধীর সন্ধান মিলিয়াছে।'

মিয়ামির 'নিউজ' পত্রিকা বলিতেছেন—

'প্রতিকারের জন্য আইন প্রণয়ন করিয়া কি হইবে? নিজেদের হৃদয় খুঁজিয়া দেখিলে, প্রতিকারের উপায় হইতে পারে।'

মার্কিনের আইন

এই শিশুহত্যার কথা ভাবিলে মনে হইবে যে, অ্যামেরিকায় বুঝি আইন ও শৃঙ্খলার ব্যাপার তুচ্ছ-তা করিয়াই চলে।—কেননা, কড়া পুলিশের ব্যবস্থা থাকিলে, এমনটি ঘটে কেন? কেন ঘটে তাহা বলা কঠিন। কিন্তু তাই বলিয়া অ্যামেরিকায় পুলিশ নিতান্ত অগ্রাহ্য করিবার মত নয়। ও দেশের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুলিশের কার্য্যকলাপ যিনি নখদর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীযুক্ত ই, জে, হপ্‌কিন্স,—'আওয়ার ললেস পুলিশ'এ লিখিতেছেন—

১৯৩০ সনের প্রথম তিন মাসে এক ডালাসেই সন্দেহ করিয়া ১৮০০ জন লোককে পুলিশ গ্রেফ্‌তার করে অর্থাৎ গ্রেফ্‌তার করিয়া তারপর তাহাদের কি দোষ সেই সন্ধান সুরু করে। ১৯২৯ সনে ঐ ডালাসে ঐ সন্দেহের জন্যই পুলিশ ৮৫০০ ব্যক্তিকে বিনা কারণে আটক রাখে। ইহাদের শতকরা ৫ জনের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন কেসের অছিলাও আনিতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া অ্যামেরিকারই নিজস্ব এই এক বিশ্বাস—সাধারণ যে কাহারও চাইতে সরকার পক্ষের যে-কেহ অধিক শক্তিশালী।"

অথচ ইহাদেরই 'ডিমোক্রাসি'র গর্ব্বের অন্ত নাই!

সোভিয়েট সংবাদ

কম্যুনিষ্টবাদী বলিবেন, ধনিক তন্ত্রে ইহার চাইতে বেশী কিছু আশা করা যায় না। রাশিয়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতার এ সব দোষ খুঁজিয়া-পাতিয়া মিলিবে না।

কিন্তু রাশিয়ায় কি সত্যই স্বর্গ-রচনা সম্ভব হইয়াছে? জুন সংখ্যার 'কারেণ্ট হিষ্ট্রী' পত্রিকায় ইয়েল ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট স্কুলের ডান শ্রীযুক্ত এড্‌গার এস্, ফার্নিস লিখিতেছেন।

নিজ্‌নি নভগরডে ১১৯,০০০ ডলার ব্যয়ে বিরাট এক মোটর-কারখানার গোড়াপত্তন করা হয়। কথা হয়, বৎসরে ১৪৪,০০০ খানি গাড়ি তৈয়ারি হইবে। গত ১লা জানুয়ারী হইতে ১লা এপ্রিলের মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ হইবার কথা। ১লা এপ্রিলের পর সংবাদ পাওয়া গেল, কারখানার কাজকর্ম্ম কিছুই হইতেছে না, আর যে-রকম ভাবে উহার কাজকর্ম্ম চলিতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতেও কিছু আশা করা যায় না। তাহারই কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে, ম্যানেজারকে প্রতি কথায় যদি সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, তবে ব্যবসায় চলে না, কেননা, স্বাধীনতা হারাইয়া ম্যানেজার দায়িত্বও পরিহার করিতে চায়। রাজনীতির চাপে পড়িয়া বাণিজ্যনীতি ভাবগতি ও দায়িত্ব হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া আরও যে একটি কারণ ধরা পড়িয়াছে তাহা সোভিয়েট ভিত্তির মূলে গিয়া আঘাত করিবে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সঙ্ঘের হওয়ার দোষ এই যে কথায় কথায় শ্রমিকরা নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিতে কার্য্যকরী বিভাগের বিপক্ষতা করে ফলে কাজকর্ম্ম কিছুই হয় না। সুতরাং শ্রমিকের স্বাধীনতায় হাত দিতে হয়। তিন বৎসর আগে যে-নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে শ্রমিক সঙ্ঘগুলির ব্যবসায়-বাণিজ্যের হস্তক্ষেপ করিবার সুবিধা ছিল, কিন্তু শ্রমিকসঙ্ঘের এইসব সুবিধা থাকা মূলতঃ দেশ ও দেশবাসীর অসুবিধা বিবেচিত হওয়ায়, আইন পরিবর্ত্তনের প্রথা উঠিয়াছে।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের যে সব সুখ-সুবিধার কথা আমরা কাগজে-কলমে পাই তাহার অন্তরালে ব্যক্তি-রুশ আর রুশের সংঘর্ষ আজ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

মাসকাবারী

স্বদেশ

রাজনৈতিক সন্ধি :—

১৩ই জুন সভ্যদের অনুরোধে ভারতীয় Consultative Committeeর অধিবেশন স্থগিত আছে বটে, কিন্তু যথাসম্ভব শীঘ্র তাহার পুনরধিবেশন হইবে।

ভোটাধিকার-নির্ণয়-সমিতির রিপোর্ট লইয়া ইংলণ্ডের রক্ষণশীল ভারতীয় কমিটিতে আলোচনা।

বাংলা গবর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ী জেলা কংগ্রেস কমিটিকে তাহাদের আটকান মাল প্রত্যর্পণ।

১৭ই জুন—কিছুদিন পূর্ব্বে ইঙ্গভারত মিলনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে 'নিবেদন' প্রচারিত করিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধী তাহার মূল কথাগুলি সমর্থনযোগ্য মনে করিয়া ইণ্ডিয়া আফিসের মারফত তাহার মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যতদিন পর্য্যন্ত ভূতপূর্ব্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি স্বাধীনভাবে এ বিষয়ের আলোচনার সুযোগ না পায়, ততদিন তিনি মিলনের পথে কোন কার্য্যোপযোগী প্রস্তাব করিতে সমর্থ নহেন।

১৮ই জুন সাপ্রু ও জয়াকর সিমলায় বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। মন্ত্রীসভার ৩ জন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। আসন্ন শাসন সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে।

১৯শে জুন সাপ্রু বলিয়াছেন আমি আইন অমান্য আন্দোলনের ঘোর বিরোধী তথাপি উপস্থিত ক্ষেত্রে অর্ডিন্যান্স ব্যতীত যে ভারত শাসন অসম্ভব এরূপ মনে করি না।

বাঁকুড়ার 'আদর্শ হোটেল', 'অমরকানন আশ্রম' ও কংগ্রেস কমিটির আটকান মালপত্র গবর্ণমেণ্ট প্রত্যর্পণ করিলেন।

২১শে জুন—Consultative Committee ও অন্যান্য সরকারী কাজের চাপে বড়লাট এ বৎসর বর্ষাকালীন সফর বন্ধ রাখিলেন।

বিলাতে ও সিমলায় জোর গুজব যে গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন আর হইবে না, আগামী জানুয়ারী মাসে ভারত-শাসনসংস্কারের নূতন বিল পার্লামেণ্টে পেশ করা হইবে।

মডারেট-নেতা স্যর সিতলবাদ সাবধান করিয়া দিতেছেন যে সাম্প্রদায়িক নেতাদের অদূরদর্শী চেষ্টার ফলে গবর্ণমেণ্ট যেন ভারতের অনিষ্টকর সংস্কারে মত না দেন।

ভারতসচিব স্যামুয়েল হোর পার্লিয়ামেণ্টে বলিয়াছেন যে ভারতের সামরিক খরচা সম্পর্কে কোন কোন বিষয়ের মীমাংসার জন্য তিনি একটি ট্রিবিউন্যাল গঠিত করিতে ইচ্ছা করেন। এতদুপলক্ষে লণ্ডনের বিখ্যাত পত্রিকা 'Financial Times' স্বীকার করিতেছেন যে এই খরচার অনেকাংশ ভারতের পরিবর্ত্তে ইংলণ্ডের বা সমগ্র সাম্রাজ্যের বহন করা উচিত।

২৬শে জুন—গান্ধিজী রবীন্দ্রনাথের 'নিবেদন' সম্পর্কে যে পত্র দিয়াছেন তাহা 'টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েকজন শান্তিপ্রিয় বিশিষ্ট ইংরাজ এই সুযোগে গবর্ণমেণ্টকে কংগ্রেসের সহিত মিটমাট করিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

২৮শে জুন—শুনা যাইতেছে সাম্প্রদায়িক মীমাংসা সম্পর্কে ভারত-গবর্ণমেণ্ট বিটিশ গবর্ণমেণ্টে মত প্রেরণ করিয়াছেন। সে মত মুসলমানদের ১৪ দফা সর্ত্তের সম্পূর্ণ অনুকূল। বড়লাটের মন্ত্রীসভার দুইজন হিন্দু সদস্য, রামস্বামী আয়ঙ্গার ও ব্রজেন্দ্র মিত্র, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ভারতসচিব স্যামুয়েল হোর চেষ্টা করিতেছেন যে আর গোলটেবিল বৈঠক না বসাইয়া ভারতীয় Consultative Committeeর সহিত পরামর্শ করিয়াই ভারত-সংস্কার-আইন পার্লামেণ্টে পাকা করা হউক।

প্রধান মন্ত্রী আগামী জুলাই মাসের মধ্যেই ভারতীয় সাম্প্রদায়িক মীমাংসা সম্বন্ধে শেষ রায় দিবেন।

২৫শে জুন—পশ্চিম ভারতীয় ন্যাশন্যাল লিবারেল্ লিগ্ স্যর সিতলবাদের সভাপতিত্বে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তাহার মর্ম্ম হইতেছে,—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতসংস্কার বিধির প্রবর্ত্তনে ভারতীয়দের সহিত কনফারেন্স-পন্থা পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে সহযোগিতা করা আর সম্ভব না হইতে পারে। এই প্রস্তাব প্রধান মন্ত্রীর নিকট তারযোগে প্রেরিত হইয়াছে।

২৬শে জুন—বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের হোমমেম্বর জেলে শ্রীমতী নাইডুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

২৭শে জুন—সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বর্ত্তমান দেশের অবস্থার আলোচনা করিয়া বলিতেছেন অর্ডিন্যান্সের পুনঃপ্রবর্ত্তন বন্ধ করিয়া, সমস্ত কংগ্রেসবন্দীদের মুক্তি দিয়া মিটমাটের চেষ্টা না করিলে, কোন শাসন-সংস্কারে দেশে শান্তি ফিরিবে না।

২৮শে জুন—পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশনে স্যর স্যামুয়েল ভাবী ভারত শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার বক্তৃতায় প্রকাশ পায়—

(১) গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন আর হইবে না।

(২) এই গ্রীষ্মকালের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক বিরোধ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী তাহার মতামত প্রকাশ করিবেন।

(৩) তাহার পর Consultative Committeeর বৈঠক হইবে।

(৪) তদন্তরে পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচিত একটি Joint Committeeর নিকট সমস্ত বিষয়ের শেষ শুনানি হইবে।

(৫) পরে গবর্ণমেণ্ট একটি প্রাদেশিক ও ফেডারেল শাসনসংস্কার বিল পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিবেন। তবে প্রাদেশিক সংস্কারের পরে ফেডারেল সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবে।

বাংলার গবর্ণর বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভার জীবনকাল আর এক বৎসরের জন্ম বাড়াইয়া দিলেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম্ লীগ্ কয়েকজন বেনামী মুসলমান প্রদত্ত বিবৃতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন, জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী কোন প্রস্তাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রকৃত লাভ হইতে পারে না।

৩০শে জুন—স্যর সেটলা, স্যর আব্দার রহিম, স্যর সাপ্রু, মিঃ জয়াকর, মিঃ কেলকার, মিঃ চিন্তামণি, মিঃ শাস্ত্রী প্রভৃতি নেতাগণ স্যর স্যামুয়েল হোরের বক্তৃতার সমালোচনা করিয়া জানাইয়াছেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহা দ্বারা পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন। এরূপ শাসন সংস্কারের প্রস্তাবে তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত সহযোগিতা করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া লীগ জর্জ্জ ল্যান্সবেরীর সভাপতিত্বে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের ভারত-শাসন-সংস্কার-নীতির প্রতিবাদ করিয়াছেন ও স্থির করিয়াছেন, ভারতের আধুনিক অবস্থা জানিবার জন্ম তাঁহারা একটি প্রতিনিধি-সঙ্ঘ প্রেরণ করিবেন।

রাজনৈতিক বিগ্রহ :—

১৫ই জুন—বে-আইনিভাবে ঢাকায় জেলা কনফারেন্স বসাইবার চেষ্টা করায় যে ৭৫ জন স্ত্রী-পুরুষ গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৭১ জনের মুক্তি।

কটকে বে-আইনিভাবে প্রাদেশিক কনফারেন্স বসাইবার চেষ্টার ফলে ১৩১ জন স্ত্রীপুরুষ গ্রেপ্তার।

সিলেটে গান্ধীদিবস পালন করিবার চেষ্টাপরাধে ধৃত ২০ জন স্বেচ্ছা-সেবকের ৬ মাস করিয়া কারাদণ্ড।

চট্টগ্রামের পাথিয়া গ্রামে কয়েকজন পলাতক বিপ্লবীকে ধরিতে গিয়া গুর্খা সেনানায়ক কাপ্তেন কেমরুণ বিপ্লবীর গুলিতে প্রাণ হারাইয়াছেন। ২ জন বিপ্লবীও হত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একজনকে বিপ্লবীদলের অন্যতম নেতা নির্ম্মল সেন বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে।

১৬ই জুন—দেশবন্ধুর মৃত্যুদিবস। পুলিশের আদেশে কলিকাতার সমস্ত পার্ক বন্ধ। গত রাত্রিতে সহরের বহুস্থানে খানাতল্লাস ও ৩৬ জন স্ত্রীপুরুষের গ্রেপ্তার, তন্মধ্যে কর্পোরেশনের শিক্ষানায়ক একজন। উর্ম্মিলা দেবী প্রমুখ অনেকের উপর নোটিশ জারী।

বে-আইনিভাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স বসাইবার চেষ্টা করায় কলিকাতায় ৮৪ জন স্ত্রীপুরুষ ধৃত।

বে-আইনিভাবে গুজরাট কনফারেন্স বসাইবার চেষ্টার ফলে আমেদাবাদে ৩০০ জন স্ত্রীপুরুষ গ্রেপ্তার

যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস আন্দোলনের বিপক্ষে গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারীদের প্রচার-কার্য্য।

১৭ই জুন—অন্ধ্র কনফারেন্সে ধৃত ১০০ বন্দীকে মুক্তি দান।

উত্তর মালাবার রাষ্ট্রীয় কনফারেন্স বসাইবার চেষ্টা করায় ৮৪ জন স্ত্রীপুরুষ গ্রেপ্তার। নাসিকের নেতা দেশপাণ্ডে ধৃত।

বোম্বাই-এর অহিংসসঙ্ঘের নায়ক আলি বাহাদুর খাঁর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

১৮ই জুন—উৎকল কনফারেন্স উপলক্ষে ধৃত ১৩৮ জন আইন অমান্য-কারীদের মধ্যে ৫৮ জনকে মুক্তিদান।

গত বৃহস্পতিবারে কলিকাতায় ধৃত ৮৪ জন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ১৫ জন ব্যতীত সকলকে মুক্তিদান।

১৯শে জুন—সিন্ধু প্রাদেশিক কনফারেন্স ও মিরাট কনফারেন্স বসাইবার চেষ্টাজনিত অপরাধে উভয়স্থানে ৮৩ ব্যক্তি গ্রেপ্তার।

২১শে জুন—জেলার সমগ্র পুলিশবাহিনীর সতর্কতা এবং সর্ব্বপ্রকার যাতায়াত-পথ রুদ্ধ করা সত্বেও নদীয়ার তেহাট্টা গ্রামে বে-আইনিভাবে জেলা কনফারেন্স বসাইবার চেষ্টা। ফলে ৩ সহস্র জনতার সহিত পুলিশের সংঘর্ষ। পুলিশ লাঠি, সঙ্গীন ও গুলি চালাইতে বাধ্য। সাবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট ও অপর কয়জন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী উত্তেজিত জনতা কর্ত্তৃক আহত এবং অপর পক্ষে ১ জন লোক গুলিতে হত ও অনেকগুলি আহত। শতাধিক লোক গ্রেপ্তার- তন্মধ্যে ২৫ জন স্ত্রীলোক।

২২শে জুন—নাটোর ও নোয়াখালিতে জেলা কনফারেন্স, প্রথমোক্ত স্থানে পুলিশ বাধা দেয় নাই। নোয়াখালিতে কয়েকজন গ্রেপ্তার।

আগ্রা জেলা কনফারেন্স উপলক্ষে ৪৫০ জন গ্রেপ্তার।

২৩শে জুন মেদিনীপুরে ২০০ পাঠান পিউনিটিভ পুলিশের আগমন।

২৫শে—বিহারের নেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদ মুক্তি লাভ করিলেন। ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি গঙ্গাধর দেশপাণ্ডে বেলগাঁওতে গ্রেপ্তার।

ফরিদপুর সম্মিলন সম্পর্কে কয়েকজন গ্রেপ্তার।

২৬শে—মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগ্‌লাসের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত প্রদ্যোতকুমারের বিচার শেষ। স্পেশ্যাল ট্রিবিউন্যালের দুইজন তাঁহার ফাঁসির হুকুম দিয়াছেন, কিন্তু তৃতীয় কমিশনার মিঃ জ্ঞানাঙ্কুর দে মনে করেন যখন প্রদ্যোতের পিস্তলের গুলীতে ডগ্‌লাস হত হন নাই এবং আসামীর বয়স যখন মাত্র ১৮ বৎসর তখন ফাঁসির পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরেব ব্যবস্থাই বিধিসঙ্গত। প্রদ্যোৎ হাইকোর্টে আপীল করিতে পারে

২৭শে—ডাক্তার কিচলু দেশপাণ্ডের স্থানে কংগ্রেস সভাপতি হইলেন।

মুন্সীগঞ্জের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট কামাখ্যাপ্রসাদ সেন ঢাকার সবডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে গত রাত্রিতে অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে হত হইয়াছেন।

২৮শে—স্যর স্যামুয়েল পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন আগামী ৩রা জুলাই তারিখে সমস্ত অর্ডিনান্সের প্রধান বিষয়গুলিকে সংহত করিয়া একটি নূতন অর্ডিনান্স জারী করা হইবে, তবে কোন্ কোন্ প্রদেশে বা জেলায় তাহার প্রয়োগ হইবে সে বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট বিচার করিবেন। ৪ঠা জুলাই তারিখে সমস্ত অর্ডিনান্স শেষ হইবার তারিখ ছিল।

মাদ্রাসে বে-আইনি জেলা কনফারেন্স পুলিশ লাঠি চালাইয়া ছত্রভঙ্গ করিয়াছে।

বোম্বাইএ মাসিক 'পতাকা সম্বৰ্দ্ধনা' উপলক্ষে ২০ জন কংগ্রেস-সেনা গ্রেপ্তার।

বিক্রমপুর কনফারেন্স উপলক্ষে ৭৮ জন নরনারী গ্রেপ্তার, পরে অধিকাংশকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

২৮শে জুন—নেত্রকোণা বে-আইনি শোভাযাত্রা করার জন্য ৩৪ জন গ্রেপ্তার।

৭০০ প্রতিনিধি একত্রিত হইয়া জোড়াহাটে রাজনৈতিক কনফারেন্স করিয়াছে, আসাম পুলিশ তাহাতে কোন বাধা দেয় নাই। পরে মাত্র ২ জন ডিরেক্টরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অন্য স্থানের পুলিশের আচরণের সহিত এ স্থানের আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন দেখা যায়।

উর্ম্মিলা দেবীর (চিত্তরঞ্জনের ভগ্নী) ৬ মাস কারাদণ্ড হইল।

২৯শে জুন—পার্লিয়ামেণ্টে প্রশ্নোত্তরকালে স্যর সামুয়েল স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন যে কংগ্রেস পরাজয় স্বীকার করিয়া যতদিন civil disobedience প্রত্যাহার না করিতেছে ততদিন কোন মিটমাটের কথা উত্থাপিত হইতে পারে না।

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শ্রমিকদলের নেতা মেনার ব্রকওয়ে বলিয়াছেন—বর্ত্তমানে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মতলব ভাল বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না। ভারতের উন্নতি এখন ভারতীয়দের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

৩০শে জুন—দোহাদ কনফারেন্স উপলক্ষে ৭০ জন গ্রেপ্তার। চট্টগ্রামের ২টি গ্রামে ও বিহারের ১টি গ্রামে পিউনিটিভ ট্যাক্স বসান হইল।

দুর্বৃত্তা ও তৎসম্পর্কে :—

১৬ই জুন—গিরিবালা দাসীকে হরণ করার অপরাধে অভিযুক্ত ৬ই জন আসামী যশোহর সেসন জজের আদালতে মুক্তি পায়, যেহেতু ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশানুযায়ী গভর্ণমেণ্ট পক্ষীয় উকিল এই মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়াছিলেন। ইহার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইয়াছিল—তাহার শেষ বিচারে জষ্টিস মন্মথ মুখোপাধ্যায় রায় প্রকাশ করিয়াছেন—ঐরূপ ভাবে মামলা প্রত্যাহার করা অবৈধ ও অন্যায় হইয়াছে, সেসন কোর্টে উহার পুনরায় শুনানী হইবে। গিরিবালা নিজ বিবৃতিতে কয়েকটি পুলিশ কর্ম্মচারীর উপরও দোষারোপ করিয়াছিল।

১৭ই জুন—সেকেন্দরাবাদের একদল কৃষক গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারীদের আক্রমণ করিয়া সরকারী অর্থ কাড়িয়া লইয়াছে।

হিন্দুমিশনের কর্ম্মী অনলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী কিছুদিন হইতে উত্তর বঙ্গে কয়েকটি নারীহরণ মামলা সম্পর্কে তদন্ত ও তদ্বির করিতেছিলেন। তিনি ফুলছড়িতে কতিপয় গুণ্ডাদ্বারা সাংঘাতিকভাবে প্রহৃত হইয়াছেন।

১৮ই জুন—চাঁদপুর, হাওড়া, আখাউড়া, মুন্সীগঞ্জ ও বাঁকুড়া হইতে ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে।

১৯শে জুন—চট্টগ্রাম, নোয়াপাড়ার মর্ণীন্দ্রের যুবতী স্ত্রী চারুবালার উপর অকথ্য অত্যাচার করার অপরাধে দুইজন সামরিক পুলিশ কনেষ্টবলের ৩ বৎসর ও ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। অপরাধের তুলনায় এই শাস্তি অত্যন্ত লঘু হইয়াছে, এই কারণে পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিয়া ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী গভর্ণরের নিকট তার করিয়াছেন। গভীর রাত্রিতে নিদ্রিত স্বামী স্ত্রীকে জাগাইয়া, বলপূর্ব্বক স্বামীকে স্থানান্তরিত করিয়া, নিদ্রিত শিশুপুত্রকে মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইয়া, শান্তিরক্ষার্থে নিয়োজিত সশস্ত্র দুর্বৃত্তগণ অসহায়া চারুবালার উপর অত্যাচার করিয়াছিল।

২২শে—যশোরে ফুলমণি হরণ মামলার প্রাথমিক শুনানী আরম্ভ। ফুলমণির বিবৃতিতে ভীষণ পাশবিকতার সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে।

২৩শে জুন—গত ৩ দিনের মধ্যে বোম্বাইএ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে কোন ব্যক্তি হতাহত হয় নাই। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এরূপ ঘটনা এই প্রথম।

২৭শে জুন—কুমিল্লা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী ও কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোক ও জমিদার গ্রেপ্তার হইলেন।

২৮শে জুন—রংপুরের এক জমিদারের গৃহ হইতে ৫টি রাইফেল, ৮টি বন্দুক ও অনেক গুলি বারুদ চুরি গিয়াছে।

৩০শে জুন—বোম্বাইএ আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। পুলিশকে কয়েকবার গুলি করিতে হইয়াছিল, ফলে ১ জন হত হইয়াছে।

দুর্ঘটনা :—

১৮ই জুন—ঢাকা ট্রেণ-ডাকাতি অপরাধে ধৃত, ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর নিখিলনাথ রায়ের পৌত্র অনিলকুমার (M. Sc) ঢাকা জেলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। পুলিশকর্ত্তৃক প্রহৃত হওয়ার গুজব শুনিয়া তাঁহার মাতা জজের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার শুনানী হইবার পূর্ব্বেই সংবাদ আসে যে অনিলকুমারের মৃত্যু ঘটিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দেন অনিলের শবব্যবচ্ছেদ কালে তাহার মাতাকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত একজন বাহিরের ডাক্তার উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। সেই আদেশানুযায়ী একজন ডাক্তার জেলখানায় গিয়া শুনেন যে সিভিল সার্জ্জনের তত্ত্বাবধানে পূর্ব্বেই শবব্যবচ্ছেদ-ক্রিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর শবদেহ আত্মীয়দের হস্তে অর্পণ করা হয়।

২১শে জুন—ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট বিবৃতি বাহির করিয়াছেন—অনিলকুমার পুলিশের হেপাজতে থাকিবার কালে কোনরূপ প্রহৃত হয় নাই। জেলে তাহার মাথা খারাপের লক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং জানা যায় তাহার পিতাও উন্মাদ ছিলেন। সহসা মস্তিষ্কে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাইয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। শবব্যবচ্ছেদে ইহাই ধরা পড়িয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাহিরের ডাক্তার না আসায় সিভিল সার্জ্জন ব্যবচ্ছেদকার্য্য শেষ করিয়াছিলেন।

কানপুর, লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে অতিরিক্ত উত্তাপজনিত সর্দ্দিগর্ম্মিতে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এক লক্ষ্ণৌতে ৭৪ জন লোক মরিয়াছে, তন্মধ্যে ২ জন সৈনিক।

৩০শে জুন—মুন্সীগঞ্জের নাসানপুর গ্রামে একব্যক্তি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ তাহার পূর্ব্বে সে ৩ দিন অনাহারে ছিল এবং দারিদ্র্যই তাহার আত্মহত্যার কারণ।

স্বদেশ ও বিদেশ

ক্রীড়াকৌতুক ঃ—

১৫ই জুন—কলিকাতার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগ খেলায় চিরদিন দেখা যায় উপরের দিকে বিলাতী দল ও নীচের দিকে দেশী দল। এবার পাশা উল্টাইয়া গিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত দেশী ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। আর সর্ব্বনিম্নে ডালহৌসী।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সহিত ল্যাঙ্কাশায়ার দলের খেলায় ড্র হইল। ল্যাঙ্কাশায়ার দল বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। তাহাদের বিরুদ্ধে নাইডু ও অমর সিং যথাক্রমে ১২৫ ও ১৩১ রান করিয়াছেন।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার হবস আর একবার জগতের 'রেকর্ড' ভাঙ্গিলেন। উপর্য্যুপরি দুই ইনিংস এ শতসংখ্যক রান করা বাহাদুরীর বিষয়। ইতঃপূর্ব্বে সি, বি, ফ্রাই এই কাজ ৫ বার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, হবস্ তাহা ৬ বার করিলেন।

১৮ই জুন—ইয়র্কের ক্রিকেটার সুটক্লিফ হোলমস-এর সহিত একযোগে খেলা আরম্ভ করিয়া এসেক্স দলের বিরুদ্ধে ৫৫৫ রাণ করিয়াছেন। ইহা এখন এইরূপ খেলায় জগতের 'রেকর্ড' হইয়া রহিল।

২১শে জুন ভারতীয় অলিম্পিক হকি খেলোয়াড় দল আমেরিকা যাইবার পথে সম্মিলিত জাপানী দলকে ১১ গোলে হারাইয়া দিয়াছে। জাপানী জনসঙ্ঘ ভারতীয় দলকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছে।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সহিত ২৫শে, ২৭শে ও ২৮শে জুন এই ৩ দিন টেষ্ট ম্যাচ খেলিবার জন্য ইংলণ্ডীয় ক্রিকেট দল নির্ব্বাচিত হইয়াছে। জার্ডিন তাহার ক্যাপ্টেন।

২৪শে জুন—নাইডুকে ইংলণ্ডে বলা হইতেছে তিনি জগতের মধ্যে ৪ জন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের একজন। আর ৩ জন হইতেছেন ব্রাড্‌ম্যান্, হেড্‌লি ও হব্‌স্।

উইম্বলডনস্থ আন্তর্জ্জাতিক টেনিস-প্রতিযোগিতায় জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ফ্রান্সনিবাসী কোচে ইংলণ্ডের কলিন্সের নিকট পরাজিত হইয়াছেন।

উক্ত প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধি চিরঞ্জীব ও লাল অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিদের নিকট হারিয়া গিয়াছেন।

২৮শে জুন—আমেরিকায় অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যাইবার পথে ভারত অলিম্পিক হকি দল মালয়ের সম্মিলিত দলকে ৭ গোলে পরাস্ত করিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত এই দল ভারতে, লঙ্কায়, মালয়ে ও জাপানে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৫টি গোল দিয়াছে ও ১২টি খাইয়াছে। একা ধ্যানচাঁদ ৩১টি গোল দিয়াছে।

২৯শে জুন—গত শনি, সোম ও মঙ্গলবারে ইংলণ্ডের সহিত ভারতের টেষ্ট ক্রিকেট খেলা হইয়া গেল। ভারতকে এই সম্মান প্রথম দেওয়া হইল ভারতীয়েরা ১৫৮ রাণে পরাজিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু এই খেলা জিতিতে ইংলণ্ডের বিখ্যাত খেলোয়াড়গণকে আশাতীতরূপ বেগ পাইতে হইয়াছিল। বল দেওয়া ও ফিল্ডিং এ ভারতীয়েরা চরম কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। সুটক্লিফ, হোল্‌ম্‌স, য়ুলি, হ্যামণ্ড প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত খেলোয়াড়গণ, যাঁহারা কথায় কথায় শত সংখ্যক রাণ করেন, তাঁহারা অতি কষ্টে অল্পসংখ্যক রাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুটক্লিফ ও হোল্‌ম্‌স ১ম ইনিংসএ মাত্র ৯ রাণ করিয়াছিলেন। দুই ইনিংসএ ইংলণ্ড করিয়াছিল ৫৩৪ রাণ ও ভারতীয়েরা ৩৭৬ রাণ। প্রথম দিন খেলার সময় সম্রাট উপস্থিত থাকিয়া উভয় খেলোয়াড়দের সহিত করমর্দ্দন করিয়াছেন। খেলার সময় নাইডু, নাজির আলি ও পালিয়া ৩ জনে আহত না হইলে খেলার ফল কি হইত ঠিক বলা যায় না।

৩০শে জুন—ভারতীয় ক্রিকেট দল টেষ্ট খেলা ছাড়া ইংলণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫টি ম্যাচ খেলিয়াছেন, তন্মধ্যে ৮টিতে জিতিয়াছেন, ২টিতে হারিয়াছেন ও ৫টিতে সমান খেলিয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ যে দল ইংলণ্ডে গিয়াছিল, তাহারা প্রত্যেক ম্যাচে হারিয়াছিল। এই ১৫টি খেলায় ওয়াজির আলি, নাইডু, ঘনশ্যামজি, মার্শাল, নাজির আলি ও অমরসিং সর্ব্বশুদ্ধ ৮ বার শতসংখ্যাধিক রাণ করিয়াছেন।

বিবিধ ঃ—

১৫ই জুন—স্যর ডোরাবজি টাটার শবদেহ লণ্ডন—ব্রুকউডে সমাহিত হইল।

মাদারিপুর লোকাল ব্যাঙ্কের কেরাণী নানা অসদুপায়ে ব্যাঙ্কের ২৯০০০৲ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহার ২ বৎসর জেল ও ১ টাকা অর্থদণ্ড হইল।

২২শে জুন—স্যর বি, এল, মিত্র বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন।

পারস্য গবর্ণমেন্ট রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে পারসিক কৃষ্টির অধ্যাপন জন্য একটি বৃত্তি দিয়াছেন।

আয়র্লণ্ডে সর্ব্বজাতীয় ধর্ম্মসভার অধিবেশন মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সমস্ত ডব্‌লিন সহরে রাত্রিতে কেহ নিদ্রা যায় নাই এবং নগরে এত আলো প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল যে, কখন প্রভাত হইল বুঝা যায় নাই। ধর্ম্ম লইয়া এত আগ্রহ এযুগে অভিনব ব্যাপার।

২৭শে জুন—বহুদিন পূর্ব্বে প্রভূত স্বর্ণসম্ভার লইয়া 'ইজিপ্ট' নামক যে জাহাজখানি সমুদ্রে ডুবিয়াছিল, ইতালির আর্তিগ্লিও নামক জাহাজ তাহার সন্ধান করিয়া সেই সমস্ত স্বর্ণ বহু কষ্টে উদ্ধার করিতেছে। প্রাপ্ত স্বর্ণের বখ্‌রা লইয়া ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যাইতেছে।

২৯শে জুন - ইংলণ্ডের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শ্রমিক দল সাধারণ শ্রমিক দল হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইবার মনস্থ করিয়াছেন।

৩০শে জুন—রুশিয়ায় কয়েকটি রাষ্ট্রীয় দোকানের ডিরেক্টর অর্থ ও মান আত্মসাৎ করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ৫ জনকে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট মৃত্যুদণ্ড দিয়াছেন।

বিদেশ

বিভিন্ন রাষ্ট্রসম্পর্কে :—

চিলি (দক্ষিণ আমেরিকা)

১৬ই জুন—চিলি গবর্ণমেণ্ট সহসা বিপ্লবীদের হস্তগত হওয়ায় তাহারা সোসিয়ালিজম্ মতানুযায়ী রাজ্যগঠন করিতে গিয়া রাজ্যস্থ সমস্ত পোদ্দারের দোকান ও ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে মজুত স্বর্ণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল। তাহার ফলে ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার্থ কয়েকটি বৃটিশ রণতরী চিলি অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

১৮ই জুন—চিলির সামরিক দল সহসা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদ দখল করিয়াছে। উপস্থিত চিলি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তা, ডাভিলা।

১৯শে জুন—সামরিক দল সমগ্র চিলি দখল করিয়া বিপ্লবী সোসিয়ালিষ্টদের নিকট হইতে দেশ রক্ষা করিয়াছে।

২২শে জুন—ডাভিলা গবর্ণমেণ্টের সহিত সোসিয়ালিষ্টদের দেশব্যাপী সংঘর্ষে বহু হতাহত হইয়াছে।

জার্ম্মানী

১৫ই জুন—প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গের প্রতিদ্বন্দ্বী হের্ হিট্‌লারের 'নাজি ঝটিকা বাহিনী' এতদিন বে-আইনি বলিয়া গণ্য ছিল। বর্ত্তমানে হিণ্ডেনবার্গ একরূপ জার্ম্মানির ডিরেক্টর। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে চ্যান্সেলার ভন্ প্যাপেন অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন—উক্ত 'ঝটিকা বাহিনী' এখন হইতে বে-আইনি রহিল না।

২০শে জুন—নাজি ঝটিকা বাহিনীর সহিত স্থানে স্থানে কম্যুনিষ্ট দলের পুনরায় সংঘর্ষ হইতেছে। বেডেন ও ব্যাভেরিয়া প্রদেশদ্বয় এ বিষয়ে প্যাপেনের অনুজ্ঞা অমান্য করিবে বলিয়াছে।

২৩শে জুন—বেডেন প্রভৃতি ৩টি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে আদেশ দেওয়া হইল যে তাহারা যদি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞা না মানেন, তাহা হইলে ঐ তিন প্রদেশ শাসন করিবার জন্য সামরিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবে।

শ্যাম

২৪শে জুন—শ্যাম দেশের সৈন্যদল সহসা বিপ্লব বাধাইয়া রাজপ্রাসাদে রাজা, রাজপরিবার ও প্রধান সামন্তবর্গকে ঘেরাও করিয়াছে। প্রধান সেনাপতি বাধা দেওয়ায় গুলিবিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। এরূপ ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

২৭শে জুন—বিপ্লবীদের সর্ত্তমত রাজা শ্যামদেশে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে রাজী হইলে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। তিনি Constitutional রাজা হইয়া থাকিবেন। শ্যামদেশে ইহাতে আনন্দের স্রোত বহিয়াছে।

২৮শে জুন—রাজা ও রাণী ব্যাঙ্ককে আসিয়া সম্যক অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। কিন্তু নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে পূর্ণভাবে মুক্তি দেওয়া হইবে না।

আন্তর্জ্জাতিক :—

লজান ও জেনেভা সম্মিলন সম্পর্কে—

১৫ই জুন—সমরঋণ ও ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে ইঙ্গ-ফরাসী আলোচনায় বেশ সন্তোষজনক ফল লাভ হয় নাই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিকট সকল দেশই ঋণী। অথচ যুক্তরাষ্ট্র বলিতেছে সে তাহার প্রাপ্যের এক কপর্দ্দকও ছাড়িতে পারে না, যেহেতু ঋণভার হইতে মুক্তিলাভ করিলে ইউরোপ যে তাহার সমর উপকরণ বাড়াইয়া চলিবে না তাহার প্রমাণ নাই। ফ্রান্স বলিতেছে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে, ততক্ষণ সে জার্ম্মানীর নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের দাবী ছাড়িতে পারে না।

১৭ই জুন-১৮ই জুন, ২রা আষাঢ় তারিখে ফ্রান্সের মঃ হেরিয় এর প্রস্তাবে ও ইটালীর মিঃ গ্রাণ্ডির সমর্থনে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ড লজান সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। এই সম্মিলনের উদ্বোধন উপলক্ষে ম্যাকডোন্যাল্ড বলিয়াছেন—যখন সমস্ত জাতির আভ্যন্তরিক অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সকলেই ধ্বংসপথে পা বাড়াইয়াছে, তখন আজ ফ্রান্স, ইতালী, জার্ম্মানী, অ্যামেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশ আছে একথা ভুলিয়া আমরা যেন কেবল সমগ্র জগতের কথাই ভাবিতে সমর্থ হই।

১৮ই জুন—জার্ম্মানে চ্যান্সেলার ভন প্যাপেন মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ও মঃ হেরিয়-র সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছেন যে ৩০শে জুন তারিখে ঋণ পরিশোধ বিরতির সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে সত্য, কিন্তু জার্ম্মানির পক্ষে তাহার পরও ঋণ বা ক্ষতিপূরণের কোন অংশ শোধ করা একেবারেই অসম্ভব।

ইংলণ্ড অগ্রণী হইয়া প্রস্তাব করিয়াছেন অধমণ দেশসমূহের নিকট জুলাই মাসের ঋণকিস্তী লজান সম্মিলনের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ড লইবে না। ফ্রান্স ইতালী, বেলজিয়ম ও জাপান এই চারি উত্তমর্ণ দেশও অনুরূপ প্রস্তাবে রাজী হইয়াছে। ইহাতে জার্ম্মানী উপস্থিত নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইল।

ইংলণ্ডের মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের বক্তৃতার সারার্থ এই যে যদিও ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থা মোটেই সচ্ছল নহে, তথাপি যদি অপর সমস্ত দেশ অনুরূপ ব্যবস্থায় সম্মত হয়, তাহা হইলে সে তাহার সমস্ত দেনদারকে চির-নিষ্কৃতি দিতেও প্রস্তুত আছে।

১৯শে জুন ফ্রান্সের পক্ষে মঃ হেরিয় বলিয়াছেন যে উপস্থিত অবস্থায় ক্ষতিপূরণের দাবী সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিয়া দিলে কখনই জগতে শান্তি ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসিতে পারে না। অর্থাৎ ফ্রান্স চেম্বারলেনের প্রস্তাবে সম্মতি দিল না।

অষ্ট্রেলিয়ার মিঃ লাদাম্, মিঃ চেম্বারলেনের মতের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

২১শে জুন—সম্মিলন মুলতুবি রহিল। সাইমন, গ্রাণ্ডী ও ম্যাকডোন্যাল্ড জেনেভায় (নিরস্ত্রীকরণ সম্মিলনে) গেলেন। মঃ হেরিয় প্যারিসে ফিরিয়া আসিলেন।

ফরাসী মন্ত্রীসভা সর্ব্বসম্মতিক্রমে হেরিয়'র মত সমর্থন করিয়াছেন।

২২শে জুন—জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মিলনের আমেরিকান প্রতিনিধি মিঃ গিবসন মঃ হেরিয়'কে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে ইউরোপ যদি সামরিক ব্যয় অন্ততঃ শতকরা ১০ টাকা হারেও না কমায় তাহা হইলে আমেরিকা তাহার প্রাপ্য ১ পয়সাও ছাড়িবে না। হেরিয়' ইহাতে সম্মত হইতে পারেন নাই।

২৩শে জুন—নিরস্ত্রীকরণ ও সমর ঋণপরিশোধ একসঙ্গে আলোচিত হইতে চলিয়াছে। মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের সহিত মিঃ গিবসন একমত হইয়াছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হুভারের প্রস্তাব সম্মিলনে আলোচিত হইতেছে। হুভার প্রস্তাব করিয়াছেন, জলে ও স্থলে জগতের সৈন্যসম্ভার এক তৃতীয়াংশ কমাইতে হইবে, তদুপরি সামরিক 'ট্যাঙ্ক', আকাশ হইতে বোমা-নিক্ষেপ, প্রাণনাশক গ্যাসের ব্যবহার ইত্যাদি একেবারে বন্ধ করিতে হইবে।

২৪শে জুন—হুভারের নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব উক্ত সম্মিলনীর নিকট বজ্রাঘাতের ন্যায় অনুভূত হইতেছে। ইংলণ্ড ও জাপান আমতা আমতা করিতেছে, ফ্রান্স স্পষ্টই বিরোধিতা করিতেছে এবং বলিতেছে যে এ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইলে পৃথক ভাবে আন্তর্জ্জাতিক সৈন্যদল গঠন করা হউক। রুশিয়া উত্তর দিয়াছে—আমরা নিরস্ত্রীকরণ সম্মিলনে আসিয়াছি, বাহিনী গঠন করিতে আসি নাই, ইহা ভুলিলে চলিবে না। ইতালীর পক্ষে মিঃ গাণ্ডী বলিয়াছেন হুভারের প্রস্তাব আমরা বিনা সর্ত্তে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছি। জার্ম্মানী বলিতেছে ইহাও যথেষ্ট মনে হইতেছে না। সুতরাং অবস্থা জটিল।

৩০শে জুন—লজান কনফারেন্স 'চালমাৎ' অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে; হয়ত ভাঙ্গিয়া যাইবে।

আয়র্ল্যাণ্ডের শপথ-বিল-বিলোপ সম্পর্কে—

১৬ই জুন—প্রতি বৎসর ১৫ই জুনের মধ্যে আয়র্ল্যাণ্ড ইংলণ্ডকে জমির বাৎসরিক কর হিসাবে ১॥০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়া আসিতেছে, এবার ১৫ই জুন অতিক্রান্ত হইয়া গেল, তথাপি সে টাকা ইংলণ্ডে পৌঁছে নাই। তবে ৩০শে জুন এই টাকা দিবার শেষ দিন।

১৭ই জুন—শপথবিলোপ বিল গত ১লা আষাঢ় তারিখে আইরিশ সেনেট পুনরালোচিত হইয়াছে। গত সপ্তাহে বিলটিকে যে ভাবে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছিল এবারও সেই পরিবর্ত্তনের স্বপক্ষে ২০৯টি ভোট ও বিপক্ষে ১৭৬ ভোট হওয়ায় পরিবর্ত্তিত বিলটাই গৃহীত হইল। ১৯শে জুন তারিখে সিনেটে এই বিলের শেষ আলোচনা হইবে। দেখা যাইতেছে ডি, ভ্যালেরার বিপক্ষবাদী দল সিনেটে বিশেষ প্রবল।

১৮ই জুন—৩রা আষাঢ় তারিখে পার্লিয়ামেন্টে ইঙ্গ-আইরিশ মতান্তর বিষয় আলোচিত হইল। মিঃ টমাস বলিয়াছেন,—ডাবলিনে সাক্ষাৎকার কালে ডি ভ্যালেরা প্রস্তাব করিয়াছিলেন উত্তর (অলষ্টার) ও দক্ষিণ আয়র্লণ্ডকে যুক্ত করিয়া সমগ্র আয়র্ল্যাণ্ডকে একটি গণতান্ত্রিক দেশ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, তাহা হইলে আয়র্ল্যাণ্ড ইংলণ্ডের রাজাকে একটি গণতান্ত্রিক দেশসঙ্ঘের নায়ক হিসাবে স্বীকার করিতে পারে। ডি ভ্যালেরাকে তাঁহারা স্পষ্ট ভাবে জানাইয়াছেন যে অলষ্টার যতদিন স্বেচ্ছায় স্বীকৃত না হয় ততদিন এরূপ প্রস্তাবে বর্ত্তমান বা ভাবী কোন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টই রাজী হইতে পারেন না।

তদনন্তর লণ্ডনে আসিয়া ডি ভ্যালেরা প্রস্তাব করিয়াছিলেন শপথ ও জমির কর সম্পর্কে পুনরালোচনা হউক, কারণ সন্ধির মধ্যে এমন কোন কথা নাই যাহাতে আয়র্ল্যাণ্ড এই দুইটি বিষয় পালন করিতে বাধ্য। তাঁহাকে উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে ইংলণ্ডের মত ইহার বিপরীত, তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে একটি সালিশী কমিটি স্থির করিয়া এবিষয়ের আলোচনায় ইংলণ্ড রাজী আছে। ডি ভ্যালেরা উত্তর দিয়াছিলেন এরূপ সাম্রাজ্য-সালিশী কমিটি নিরপেক্ষ হইবে না তিনি এইরূপই আশঙ্কা করেন। তাহার পর ডি ভ্যালেরা যে লিখিত প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন মিঃ টমাস্ তাহা পাঠ করিয়া বলেন, ইহাতে ডি ভ্যালেরা কতকগুলি সর্ত্তে সাম্রাজ্য-সালিশ কমিটিতে স্বীকৃত হইয়াছেন বটে, কিন্তু যে যে বিষয় সালিশ মীমাংসার অন্তর্গত হইবে তাহার মধ্যে 'শপথে'র উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। এরূপ সর্ত্তে ইংলণ্ড রাজী হইতে অক্ষম। আইরিশ ষ্টেটের মনোভাব যদি ইতিমধ্যে পরিবর্ত্তিত না হয় তবে ১৫ই নভেম্বরের পর তাহাকে আর সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহকে বাণিজ্য বিষয়ে যে সুবিধা দেওয়া হয়, তাহা দেওয়া হইবে না।

১৯শে জুন—ডি ভ্যালেরাও আইরিশ ডেলে ইঙ্গ আইরিশ মতান্তর সম্পর্কে আলোচনাকালে বলিয়াছেন মিঃ টমাস যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে আয়র্ল্যাণ্ড ইংলণ্ডকে চুক্তিমত আবসের মাংস (pound of flesh) দিতে বাধ্য। আইরিশ প্রস্তাব ইংলণ্ড গ্রহণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু আয়র্লণ্ডের করিবার বা বলিবার আর কিছুই নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই, যে মুহূর্ত্তে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লজানে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন এই সব আন্তর্জ্জাতিক দেনাপাওনার ভারে সমগ্র ইউরোপ ধ্বংসমুখে নিপতিত, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাঁহারই আর একজন সহযোগী ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বলিতেছেন, আয়র্লণ্ড জমির মূল্য বাবদ ইংলণ্ডকে বাৎসরিক কর না দিলে তাহার বিধি ব্যবস্থা করা হইবে। যাহা হউক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ কোন সালিশের সম্মুখে ইংলণ্ড যতক্ষণ পর্য্যন্ত না প্রমাণ করিতে পারিতেছেন যে এই কর ইংলণ্ডের অবশ্যদেয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা এই কর দিবেন না।

২০শে জুন—সর্ব্ব জাতীয় একটি ধর্ম্ম সম্মেলন উপলক্ষে ডবলিন সেলবোর্ণ হোটেলে সকল জাতীয় পতাকা উড়িতেছিল। তন্মধ্যে আইরিশ রিপাবলিকান সৈন্যদলের কতিপয় লোক জোরপূর্ব্বক ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক নামাইয়া দিয়াছে।

২৮শে জুন—ফ্রিষ্টেট গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছে যে তাহাদের প্রস্তাবিত শালিস ট্রিবিউনালে আয়র্লণ্ড সম্মত নহে। ৩০শে জুনের মধ্যে দেয় জমির কর এবার আয়র্লণ্ড পাঠাইবে না।

৩০শে জুন—আইরিশ সিনেটে শপথবিলোপবিল যে ভাবে পাস হইল তাহাতে ডিঃ ভ্যালেরার উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে। সেজন্য বিল পুনঃ 'ডেলে' পুনঃস্থাপিত হইবে। এই ঘরোয়া সঙ্কটকালে ডিঃ ভ্যালেরা অটোয়া কনফারেন্সে যাইতে পারিবেন না।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd., 56, Dharamtala Street, Calcutta.

দিন-মজুরী

[শিল্পী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু

২৫শ বর্ষ ভাদ্র, ১৩৩৯ ৪র্থ সংখ্যা

মানুষের কবি

জানি জানি আমি—মানব-মনের বিক্ষোভ-জ্বালা জানি,—
ক্ষুধিত পাষাণ ফেটে চৌচির তারি ব্যথা বুকে টানি;
লেখনীরে মোর করেছে মুখর পুত্রহীনার কথা,
বাল-বিধবার মূক বেদনার অনন্ত ব্যাকুলতা;
বন্ধ্যা নারীর অবুঝ অধীর সে কি দুঃসহ জ্বালা,
ক্ষুদ্র শিশুর স্নেহ-শোকাতুর কাঁদে অভাগিনী বালা!
নিখিল মায়ের মনের মাধুরী আমার ছন্দে জাগে
রহস্যময়ী নারী-প্রকৃতির স্নেহ-প্রেম-অনুরাগে।

দেহ বেচে করে রূপের ব্যাসাতি, হাসি দিয়ে যারা কাঁদে,
হৃদয়ে রাখিয়া চির-উপবাসী, মিথ্যা প্রেমের ফাঁদে
বাঁধি' উদ্দাম প্রণয়-পাগল, ছল করি বুকে টানে;
আর যারা করে রূপার বন্যা রূপসীর জয়গানে;

তারা ত জানে না কি সে মমতায় নয়নের জল ঢালি'
লালসা-পঙ্ক ধুয়ে মুছে দিই ঘুচায়ে মনের কালি!
মানুষেরে আমি বড় বলে জানি, রূপের আড়ালে নারী,
মহা মহিমায় কঠিন ধরায় তৃষায় স্নিগ্ধ বারি!
অন্তরে তা'র জ্বলে অনিবার শোধন-বহ্নি-শিখা
ধরণী মায়ের স্নেহের দুলালী কন্যা সে ললাটিকা!
লহ নারী মোর স্বস্তি-বাচন, বন্দনা লহ নারী!
যে তোমারে ছাড়ি গড়িছে দেউল, ধিক্ সে মিথ্যাচারী!

আমি নির্ভয়, জয় তব জয়—হে মোর মানুষ ভাই,
দেবতা-পূজার মন্দিরতলে তোমার আমার ঠাঁই!
পূজা-পুষ্পের কন্টকঘায় হাতের রক্তরেখা,
আমি কবি মোর চিরসাধনার সেই ত' ভাগ্য-লেখা!
পেটের জ্বালায় কাঁদে উভরায় পথের কাঙাল শত,
ষোড়শোপচারে পূজা যোগাইতে করে অনশন ব্রত;
পাঁজরের হাড় হাতে গোণা যায়, অন্ধ নয়ন ঝরে,
ধুঁকিয়া মরিছে হা-ভাতের দল লক্ষ্মী-মায়ের ঘরে!
পরভোজী পথ-কুকুরের দল তা'দেরি দংশি' যায়,
অন্তরে মোর কাঙাল ঠাকুর হাসি মুখে ফিরে চায়!

দুর্গম-পথে তাইত আঘাতে পথের নিশানা জাগে,
দুর্য্যোগ-নিশি পোহাইয়া দেখি দাঁড়াইয়া পুরোভাগে—
জনমানবের প্রিয় হ'তে প্রিয় পূজিবার বিগ্রহ,
তা'রি ইঙ্গিতে সহিছে মানুষ মানুষের নিগ্রহ!
আজি দেবতার মুখর কণ্ঠ শাসন-বাক্যে রুধি'
অন্ধ আবেগে ফেনাইয়া তোলে হলাহল-অম্বুধি,
সত্য-ভাষণ করিতে শাসন—স্পর্দ্ধিত পদতলে,
মিথ্যার গ্লানি তাই বেড়ে চলে জনতার কোলাহলে।
সেই বেদনায় অনল শিখায় জ্বলে গীত-মূর্চ্ছনা,
ছন্দে গাথায় নমি দেবতায় আমি করি অর্চ্চনা।
সুরসপ্তকে আমি গীতকার অনাহত মোর বীণ্;
মানুষের কবি, শাশ্বত রবি, আমি যে মৃত্যুহীন।

ঋষি লাওৎজের জীবনী ও বাণী

—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ঋষি লাওৎজে চীনদেশের প্রাচীনতম ঋষি ও দার্শনিক। বৌদ্ধধর্ম্ম ও কংফুচের ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও লাওৎজে প্রচারিত 'তাও'ধর্ম্ম চীনদেশের উপর অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ১ম শতাব্দীতে ভারত হইতে চীনে যায়; কিন্তু লাওৎজে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। কনফুসিয়াস্ তাঁহার সমসাময়িক হইলেও লাওৎজে কনফুসিয়াস অপেক্ষা ৫৩ বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। উভয়ের সহিত দেখা ও কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল—এইরূপ জানা যায়। এই সময়ে এশিয়া মহাদেশে এক প্রবল আধ্যাত্মিক বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল; কারণ অল্প অগ্রপশ্চাৎ তখন পারস্যদেশে জরথুষ্ট্র ও ভারতে ভগবান বুদ্ধ (৫ম শঃ) আবির্ভূত হন।

খ্রীঃ পূঃ ৬০৪ অব্দে চু ষ্টেটের কু প্রদেশে (বর্ত্তমানে হোনান্ রাজ্যের পূর্ব্বভাগে) লি জেলার চুঘ্নে্ন গ্রামে চো রাজবংশীয় সম্রাট টিংওয়াংএর রাজত্বকালে লাওৎজে জন্মগ্রহণ করেন। ৫৮৬খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ওয়ানতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত তাঁহার জন্মভূমিতে স্মৃতিমন্দিরের শিলালিপিতে এই প্রবাদ পাওয়া যায় যে, লাওৎজে এক শুভমুহূর্ত্তে একটি কুলগাছের তলায় ভূমিষ্ট হন। চীন ভাষায় কুলগাছকে 'লি' বলে তাই তাঁহার নামের প্রথমাংশ 'লাও'। শুকদেবের মত তিনি মাতৃগর্ভে বহুকাল ছিলেন এবং যখন ভূমিষ্ট হন তখন তাঁহার মাথার কেশ নাকি শুভ্র হইয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহার নাম লাওৎজে অর্থাৎ বৃদ্ধ-বালক বা শিশু দার্শনিক। লাওৎজে আজন্ম দার্শনিক ও আমৃত্যু শিশু ছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি লাওৎজের বংশদত্ত নাম ছিল 'লি'। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল কর্ণ (শ্রোত্র) পোয়াং অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা। মৃত্যুর পরে তাঁহাকে সকলে 'টান্' অর্থাৎ বৃহৎ কর্ণ বলিত কারণ লাওৎজের কান্ স্কন্ধ-প্রসারী ছিল। এইরূপ কর্ণ গভীর প্রজ্ঞার লক্ষণ। অনেকে তাঁহাকে 'লাওচুন' বলিয়া ডাকিত। 'লাওচুন'এর অর্থ মহাপুরুষ। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে 'টাই শাং' অর্থাৎ প্রাজ্ঞ মুনিও বলিত। হিন্দুগণ সত্যদ্রষ্টাকে ঋষি বা মুনি, বৌদ্ধগণ তথাগত বা বুদ্ধ, জৈনগণ 'জিন', ইহুদীগণ 'ক্রাইষ্ট' (anointed), গ্রীকগণ 'সফিষ্ট', আলেকজান্দ্রিয়াবাসীগণ 'জ্ঞ্যষ্টিক,' মুসলমানগণ 'সুফী' এবং চীনগণ 'লাওৎজে' বলে। চীনের বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ শেমাচিয়েন তাঁহার 'শি-ফি' নামক গ্রন্থে খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে লেখেন যে, লাওৎজে জীবনের অধিকাংশভাগ চো-রাজ্যের রাজদরবারে প্রধান ঐতিহাসিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চোরাজ্যের পতন নিকটবর্ত্তী জানিয়া তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহন করেন। প্রয়াণকালে সহকর্ম্মী 'যিন-হি' তাঁহাকে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি ৫০০০ শব্দপূর্ণ একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার নাম 'তাও-তে কিং'। উহা দুইভাগে বিভক্ত ও ৮১টী উপদেশে সম্পূর্ণ।

লাওৎজে মহাজ্ঞানী ও ত্যাগী ছিলেন। কোথায় তিনি দেহত্যাগ করেন কেহ বলিতে পারেনা। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত তাওধর্ম্ম আজ ২৬ শত বৎসর ধরিয়া চীনদেশে জীবিত আছে। লাওৎজে সমস্ত জীবন জ্ঞান ও সত্যসাধনায় অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি বিবিক্ত দেশসেবী ছিলেন এবং ভারতের ঋষি মুনিদের মত অজ্ঞাত, অপরিচিত ও গুপ্ত থাকিতে ভাল বাসিতেন।

লাওৎজের জীবনী সম্বন্ধে আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁহার গ্রন্থেও কোন উল্লেখ নাই। তাঁহার একমাত্র গ্রন্থ 'তাও-তে-কিং' প্রাচীন চীনের বেদ। লাই-জে, চোয়াং-জে, লুই-য়ান, এবং জে মে চিয়েন প্রভৃতি পরবর্ত্তী লেখকগণের পুস্তকাবলীতে 'তাও-তে-কিং'এর বহু উদ্ধৃতাংশ পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাঁহারা লাওৎজের কোন জীবনী লেখেন নাই। 'তাও' অর্থে জ্ঞান, 'তে' অর্থে ধর্ম্ম আর 'কিং' অর্থে শাস্ত্র। খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে হান রাজবংশের সম্রাট চিং এই রাজাদেশ জারী করেন যে, লাওৎজের 'তাও তে' নামক গ্রন্থ 'কিং' রূপে সর্ব্বত্র পঠিত হইবে। তখন হইতে লাওৎজের গ্রন্থ জনপ্রিয় ও সমাদৃত হয় এবং 'তাও-তে-কিং' নামে অভিহিত হয়।

চিন্তাজগতে 'তাও-তে-কিং'এর স্থান অতি উচ্চে। ইহুদীদের কাবালা, তালমুদ ও টেষ্টামেণ্ট, খ্রীষ্টানদের বাইবেল, বৌদ্ধদের ত্রিপিটক, হিন্দুদের বেদ, পার্শীদের জেন্দা-ভেস্তা, আরবদের কোরাণ ও শিখদের গ্রন্থসাহেবের মত উহা অমূল্য

ও পবিত্র গ্রন্থ। তুলনামূলক ধর্ম্ম ও দর্শন অধ্যয়নে উহা বিশেষ আবশ্যকীয়, এমন কি অনিবার্য্য। পাশ্চাত্য বিদ্বানগণ উহাকে উচ্চ-চিন্তার এক আকর জানিয়া উহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। চাও-হং বলেন যে, 'তাও-তে-কিং'এর ৬৪ প্রকার সংস্করণ আছে এবং ২০ জন তাওধর্ম্মী, ৭ জন বৌদ্ধ, ও ৩৪ জন লেখক উহার উপরে টীকা ও ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। টীকাকারদের মধ্যে ওয়াংপি, শু-চে ও নিশিমুরা প্রসিদ্ধ। প্রথমে জনৈক রোমান কাথলিক পাদ্‌রী উহা লাটিনে অনুবাদ করেন; পরে অধ্যাপক ষ্টানিস্‌লাশ জুলিয়েন ও সি, ডি হারলেজ ফ্রেঞ্চে, চালমার ও মেজর-জেনারেল জি, জি, আলেকজাণ্ডার ইংরাজীতে এবং রেনহোল্ড ভন্ প্ল্যাঙ্কনার ও ভিক্‌টর ভন্ ষ্ট্রাশ জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। অধ্যাপক মোক্ষমুলার সম্পাদিত 'Sacred Books of the East' গ্রন্থাবলীর উনচল্লিশ খণ্ডে 'তাও-তে-কিং' এর যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা জেমস্ লেগে কর্ত্তৃক অনূদিত। চিকাগোর বিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার পল কেরাশের 'তাও-তে-কিং'এর ইংরাজি অনুবাদ অতি সুন্দর —উহার সহিত মূল চীনও আছে। মহামতি টলষ্টয় উক্ত গ্রন্থের অতিশয় অনুরাগী ছিলেন, তিনি উহার একটী অনুবাদ রুশভাষায় করিতে ইচ্ছাও করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান পৃথিবীর সমস্ত কথিত ভাষাগুলি অন্য অন্য ভাষার চিন্তারাশি অনুবাদ করিয়া ধনী ও উন্নত হইতেছে—কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা এখনও এই পথ অনুসরণ করে নাই। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষাকে বিশ্ব-সমাজে বরেণ্য করিয়াছেন সত্য কিন্তু ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিতে হইলে উক্ত পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। দেশের হিতৈষী যুবকগণের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হউক।

তাওধর্ম্ম লাওৎজের বহুপূর্ব্বেও ছিল 'তাও-তে-কিং' হইতে উহা জানা যায়। লাওৎজে প্রাচীন তাওধর্ম্মীগণের বচন ও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তথাপি লাওৎজে তাওধর্ম্মীগণ কর্ত্তৃক ঈশ্বররূপে পূজিত হন। কারণ তিনি নূতনভাবে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন তাওধর্ম্ম ও বর্ত্তমান তাওধর্ম্মে অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে। যেমন ভারতবর্ষে প্রাচীন বেদবিদ্যার বর্ত্তমান অনাদর তেমনি চীন দেশেও। নব্যচীনের সর্ব্বত্র তাওধর্ম্মের মন্দির আছে। তথায় তাওধর্ম্মী পুরোহিতগণ বাস করেন। পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে তাঁহারা শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হন। রোমের পোপের ন্যায় তাঁহারা বিশাল প্রাসাদে বাস করেন ও রাজাদের মত পারষদ ও সভ্য পরিবৃত থাকেন। পৌরহিত্য উত্তরাধিকারে পরিণত হইলে যাহা হয় তাই। তাওধর্ম্মের সহিত হিন্দু বেদান্তের ঘনিষ্ট সাদৃশ্য আছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব চীন ভাষার অধ্যাপক রবার্ট কে, ডগলাশ সাহেব তাঁহার "Society in China" নামক পুস্তকে বলেন যে লাওৎজের বাণীর মধ্যে হিন্দুদর্শনের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। চীন রাজ্যের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত প্রদেশে লাওৎজের জন্ম; এবং উক্ত অংশের সহিত প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই ভারতের যোগাযোগ ছিল। নগাধিরাজ হিমালয় ভারতের উত্তর সীমায় আকাশ-স্পর্শী শিখর উত্তোলন করিলেও উহা তিব্বত ও ভারতের রাজপথরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই হিমালয়ের পথেই ভারতের চিন্তাস্রোত একাধিকবার পূর্ব্ব এশিয়ায় প্রবাহিত হইয়াছে। জাপানী লেখক ওকাকুরা তাঁহার "Ideals of the East" নামক পুস্তকে বলেন যে, লাওৎজে নাকি একবার ভারতেও আসিয়াছিলেন এই প্রবাদ চীনে আছে। সার জন উড্রফ্ তাঁহার "শক্তি ও শাক্ত" নামক পুস্তকে উল্লেখ করেন যে, জনৈক ফরাসী মিশনরী ফরাসী ভাষায় একখানি পুস্তকে প্রমাণ করিয়াছেন যে, উপনিষদ-চিন্তারাশির একটী শাখাস্রোত এই তাওধর্ম্ম। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে কথাগুলি সত্য বলিয়া অনুমিত হয়। ডগলাস সাহেব বলেন যে, ঔপনিষদিক ব্রহ্ম ও লাওৎজের 'তাও' একই। আমরা লাওৎজে ও তাঁহার পদানুগ পণ্ডিতগণের পুস্তক হইতে 'তাও'এর বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিব উহার সহিত বেদবর্ণিত ব্রহ্মের কোন সাদৃশ্য আছে কিনা।

লাওৎজের 'তাও', বেদান্তের ব্রহ্ম, বৌদ্ধদের বোধি, খ্রীষ্টানদের লোগ্‌শ, মিশরীদের নশিশ, প্রাচীন ইহুদীদের 'এইনসফ্', বেদের বাক্ ও লাটিন ভক্স একার্থবোধক। পার্শীরাও বলেন যে, তাঁহাদের ঈশ্বর আহুরমাজ্‌দা 'অহুন বৌরা, হনোবার' অর্থাৎ অনাদি শব্দ দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন।

বস্তুতঃ অনন্তের ধারণা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব শাস্ত্রে একই। হিন্দু দর্শনের প্রজ্ঞা বা চিৎ ও তাও শব্দের অর্থ একই। তাওকে চীনে 'লাইয়াও', বা 'চি' বলে অর্থাৎ অশব্দ বা শূন্য। 'তাও'

সদসদাতীত রূপ ও অরূপের পারে অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব, উভয়ের পারে। উহা সমস্ত আকার বা চিন্তার অতীত। কোরাণের 'আল্লা'র বর্ণনাও ঠিক এই রূপ। লাওৎজে বলেন যে, দুই প্রকার তাও আছে—প্রথম প্রকার ; অনন্ত, অব্যয়, সর্ব্বত্রগ, দক্ষিণ ও উত্তর ব্যাপী, অশরীরী, অজড় ও ইন্দ্রিয়াতীত এবং দ্বিতীয় প্রকার তাও, যাহা প্রত্যেক প্রাণীতে ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। উপনিষদও বলেন যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মা ব্রহ্মের এই দুইরূপ। তিনি আরও বলেন যে, 'তাও' অনামী, অজ, যাহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি ও যাহাতে বিশ্বের প্রলয় হয়। চোয়াংজে তাঁহার 'তাও-তে-কিং'এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, 'চাং তাও' (সমষ্টি ব্রহ্ম) এবং 'রেন তাও' (ব্যষ্টি ব্রহ্ম) উভয়ই এক। নৈষ্কর্ম্ম্য অভ্যাস করিলে মানুষ 'চাং তাও' লাভ করিতে পারে। তাও এক বটে তবু ইহা বহুও হন। বহুত্বে একত্বরূপে এই তাও প্রকাশিত ও বিরাজিত। তাও সর্ব্বব্যাপী কিন্তু বিশ্ব নাশ হইলেও উহা নাশ হয় না। যদি এই সৃষ্টি হইতে নাম ও রূপ মুছিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে 'তাও' মাত্র থাকে। বেদান্তেও বলে যে, সৎ চিৎ আনন্দ নাম রূপ লইয়া ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্বা। প্রথম তিনটী ব্রহ্ম, শেষের দুইটী জগৎ। 'তাও' কে তৎ বলে যেমন ব্রহ্মকে বেদে 'তৎ' অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য বলে। 'তাও' ঈশ্বরের স্রষ্টা যেমন বেদান্তে ব্রহ্ম ঈশ্বরের উপরে। কারণ ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ, ঈশ্বর সগুণ ও সবিশেষ।

'তাও-তে-কিং'এর টীকাকার চোয়াংজে বলেন যে, তাও অকর্ত্তা ও দেহহীন। পণ্ডিতগণ উহা তর্কের দ্বারা লাভ করিতে পারেন না (উপনিষদে যেমন আছে—'নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া') কারণ উহা মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত। জ্ঞানীগণের নিকট হইতে 'তাও' শিক্ষা করিতে হয়। তাও স্বস্থ ও স্বমূল। তাও কোন রূপ নহে উহা সত্বা মাত্র। লাওৎজে বলেন যে, "তাও জগৎপ্রসবিনী জননী যিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাও 'অপাপবিদ্ধ' ও শুভ্র (উপনিষদেও ব্রহ্মের ঠিক এই বিশেষণ)। সমস্ত স্বাতন্ত্র্য, শরীর মন তাওতে অর্পণ করিলে তাঁহাকে লাভ করা যায়। তাও এর অনুসরণ করাই ধর্ম্ম, তাওকে অনুসরণ করা মানে তাহাতে সমস্ত বিসর্জ্জন দেওয়া।" লাওৎজে গীতার উপদেশের ন্যায় অকর্ম্মের খুব পক্ষপাতী ছিলেন। কর্ম্মাতীত হইলে তাও লাভ করা যায়। চোয়াংজে বলেন যে, নৈষ্কর্ম্ম্য দ্বারা মানব সর্ব্ব মহিমার প্রভু ও সর্ব্বজ্ঞ হয়। তাওজ্ঞ কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মফল তাহাকে স্পর্শ করে না। কারণ তাহার মন অমল দর্পণের মত পবিত্র। গীতা ও উপনিষদে যেমন ব্রহ্মকে শাশ্বতী শান্তি রূপে বর্ণনা করিয়াছে। তেমনি 'তাও' অনন্ত প্রশান্তিস্বরূপ, উহাকে লাভ করা অর্থ উহার সহিত একত্বানুভূতি। লাওৎজের নৈতিক আদর্শ অতি উচ্চ ও মহৎ। তিনি বলেন নীতি ও ধর্ম্ম অর্থে আদি মূলে প্রত্যাবর্ত্তন, ইহাই তাও-এর গতি। হিন্দু-ধর্ম্মে যেমন আছে ঈশ্বর লাভ করিলে পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘন করে, মূকও বাচাল হয়—তদ্রূপ লাওৎজে বলেন যে, তাওজ্ঞ হইলে কুব্জ মানুষ সোজা হয়, অপূর্ণ পূর্ণ হয়, ও মূর্খ জ্ঞানী হয়। তাওজ্ঞ শিশুর মত সরল হয়, তাহার নিজের কোন ইচ্ছা নাই, তাও-এর অনন্ত ইচ্ছায় তাহা একীভূত হইয়াছে। বেদান্তীর ন্যায় লাওৎজে বলেন যে, মানুষ পারমার্থিক রূপে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত, কেবল অজ্ঞানান্ধকারে এই অসীমতা, অজ্ঞানতা, বন্ধন প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছে—যখন সে জানিবে যে তাহার পারমার্থিক স্বরূপ তাও, তখনই সে মুক্ত ও জ্ঞানী। চোয়াংজে বলেন তাওজ্ঞ মানুষ সত্যস্বরূপ। যিনি মানুষের অন্তরে দেবত্বরূপে বিরাজিত তাও কে জানেন, তিনি 'তাও' স্বরূপ হইয়া যান। তাঁহার আত্মা উর্দ্ধে স্বর্গ, অধঃ পৃথিবী সর্ব্বদিকে অসীমভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। বৃহদারণ্যকভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞ জাগ্রতে ও স্বপ্নে দ্বৈত দর্শন করেন না বলিয়া নিদ্রায় স্বপ্ন দর্শন করেন না। তেমনি চোয়াংজে বলেন যে, তাওজ্ঞের নিদ্রায় স্বপ্ন নাই, জাগ্রতে চিন্তা নাই, তিনি আহারের জন্য ভাবেন না—তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর ও ধীর। ঠিক হিন্দু যোগীদের এই অবস্থা হয়—যোগ শাস্ত্রে এইরূপ আছে।

লাওৎজে বলেন তাওজ্ঞ ব্যক্তির জীবনে আসক্তি নাই বা মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা নাই। জলে তাঁহাকে ক্লেদযুক্ত বা বধ করিতে পারে না, অগ্নি তাঁহাকে দাহন করিতে পারে না। তিনি শীতোষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বাতীত। হিংস্র জন্তুর প্রতিও তাঁহাদের কোন ভয় নাই। পাঠক নিশ্চয়ই জানেন—গীতায় আত্মজ্ঞ ব্যক্তির বর্ণনা হুবহু এইরূপ। আর উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞের 'অভীঃ' সর্ব্বত্র গীত হইয়াছে। আত্মজ্ঞ ভয় ও সন্দেহের অতীত হন। চোয়াংজে বলেন যে তাওজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয়ী,

জগজ্জয়ী হন। তিনি সর্ব্ব ভেদ ও পরিবর্ত্তনের অতীত। তাওজ্ঞ ও তাও একই। আমাদের উপনিষদেও আছে 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'। অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ ব্রহ্ম হইয়া যান। চোয়াংজে বলেন যে, তাও কি তাহা মুখে বলা যায় না—যাহা বর্ণনা করা যায় তাহা তাও নহে। না-জানাই উহাকে প্রকৃতরূপে জানা—উহাকে জানাই—না জানা। কেন উপনিষদে ঠিক এইরূপ আছে ব্রহ্ম—"তৎ বিদিতাৎ অন্য, অবিদিতাৎ অধি।……অবিজ্ঞাতং বিজানতাম বিজ্ঞাতং অবিজানতাম্।"

বেদান্তের ব্রহ্ম শব্দের মত তাও শব্দের ভাবান্তরে কোন প্রতিশব্দ দেওয়া সম্ভব নয়। লাওৎজে বলেন যে, "তাও এক অনাদি, অনামী, দেশকালনিমিত্তাতীত, অচিন্ত্য, বিশ্বব্যাপী, অশব্দ্য। উহাকে দেখা যায় না বা শোনা যায় না। উহা অপ্রকাশ্য কিন্তু অনভবগম্য। তাওজ্ঞের শ্বাস-প্রশ্বাস যেন পায়ের গোড়ালী থেকে আসে—যদিও সাধারণ লোক কণ্ঠ হইতে গ্রহণ বা ত্যাগ করে।" যোগশাস্ত্রেও সমাধির এইরূপ বর্ণনা আছে।

লাওৎজে ও তাঁহার শিষ্যগণ হিন্দু যোগীদের মত বনে, গিরি-গুহায় ও নির্জ্জন কান্তারে বাস করিয়া 'তাও' অভ্যাস করিতেন। তাও সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী বহু আছে। বর্ত্তমানেও চীন-দেশের পর্ব্বত ও অরণ্যে কুটীর বা গুহাতলবাসী বহু তাও সাধু আছে। তাহাদের বড় বড় নখ ও জটাজূট হইয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ নাকি ১০০।২০০ শত বৎসর জীবিত আছেন। তাও-ধর্ম্মীগণ আত্মার অমরত্বে পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন জীবন ও জগৎ উভয়ই স্বপ্ন ও অনিত্য, একমাত্র তাওই নিত্য ও সত্য। ইঁহারা প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান যোগী ছিলেন।

লাওৎজের 'তাও-তে-কিং'এর প্রসিদ্ধ টীকাকার চোয়াংজে একজন বিখ্যাত তাওধর্ম্মীসাধু ছিলেন। তিনি তপস্যা দ্বারা তাওজ্ঞ হইয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে শোকাতুর আত্মীয়বর্গকে তাঁহার মৃতদেহ কবরস্থ করিতে নিষেধ করেন। তিনি বলিলেন—"স্বর্গ ও মর্ত্ত্য আমার কবরের ভূমি। আমি যে মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিব—চন্দ্র সূর্য্য তাহার আলোক—সমস্ত বিশ্ব আমার মৃত্যু স্মরণ করিবে।" পাঠকগণকে ঋষি লাওৎজের অমূল্য উপদেশরাজির যৎকিঞ্চিত উপহার দিয়া এই প্রবন্ধ উপসংহার করিব।

যিনি বাসনামুক্ত তিনি জগতের মূল সত্য দর্শন করিবেন। কিন্তু যিনি বাসনাবদ্ধ তিনি এই জগতে জড়বস্তুই দর্শন করেন।

জগৎ দ্বন্দ্বপূর্ণ ; হওয়া, না-হওয়া ; শক্ত-সহজ ; বড়-ছোট ; উচ্চ-নীচ ও পূর্ব্ব-পর সর্ব্বদা একত্র থাকে। কোন একটি গ্রহণ করিলে অপরটীও আসিবে। তাই সাধু মৌন হইয়া থাকেন ও শিক্ষা দেন।

রথ-চক্র-নাভির শূন্য প্রদেশে বহু অরা নির্ভর করে। মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রের মধ্যস্থ শূন্যস্থানই উহার উপকারিতা। গৃহের দরজা ও জানালার শূন্য গর্ভেই গৃহের সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য আছে। তদ্রূপ এই দৃশ্য জগৎ এক অদৃশ্য বস্তুর উপর স্থায়ী আছে। তাই জ্ঞানী অদৃশ্যকে গ্রহণ করেন ও দৃশ্য ত্যাগ করেন।

তাওর সাহায্যে আমরা শুনি ও দেখি—কিন্তু তাঁহাকে দেখা বা শুনা যায় না। কারণ উহা অবর্ণ ও অদেহী। তাঁহার আদি-অন্ত জানা যায় না। তাওকে আয়ত্ত করিলে ভূত ও ভবিষ্যত উভয়ই জানা যায়।

জ্ঞানীগণ শীত-প্রপীড়িত ব্যক্তির ন্যায় জগতে অতি সাবধানে বাস করেন। শত্রু-প্রতিবেশীপরিবৃত গৃহবাসীর ন্যায় তাঁহারা সংসারে অনিচ্ছুক হইয়া জীবন যাপন করেন। তাঁহারা এ জগতে অতিথি, জলের মত অস্থায়ী, গলিত বরফের ন্যায় কোমল।

অনন্তকে জানাই আলোক। অসীমকে না জানিলে ইন্দ্রিয় প্রবল হয় এবং ইহাই মহতি বিনষ্টি।

সমস্ত লাভের আশা ত্যাগ কর, সমস্ত সঙ্কল্প বিসর্জ্জন দাও। তাহা হইলে জগতে দস্যু বিরল হইবে। জগতের অধিকাংশ ব্যক্তি খুব সুখী মনে হয়—যেন কোন বসন্তোৎসবে যোগ দিয়াছে। হায়! আমি একাই নিঃসঙ্গ ও নিস্তব্ধ! কোন শান্তির আলোক পাইতেছি না। আমি একটী শিশুর মত, যে কখনও হাসে নাই। আমি সর্ব্বত্যক্ত, আমার বাসের কোন স্থান নাই। সকল লোকের সর্ব্ব বিষয়ে প্রাচুর্য্য, কেবল আমিই রিক্তহস্ত!

জ্ঞানের অনুসরণ করার অর্থ জ্ঞানের সহিত একত্ব অনুভব করা ও জ্ঞানী হওয়া নহে ; জ্ঞানস্বরূপ হওয়া।

'তাও' অনন্ত সৎ—সর্ব্বাশ্রয় ; স্বর্গ-মর্ত্ত্যের জনক। তিনি অশরীরী। তাঁহার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু পরিবর্ত্তন নাই। উহার নাম দেওয়া যায় না—কেবল উহাকে মহৎ বলিতে পারি। তিনি শান্ত ও মুক্ত। ইহার ব্যবহারিক সত্ত্বার নাম রূপ আছে কিন্তু পরমার্থ সত্ত্বায় নামরূপাতীত।

যিনি অপরকে জানেন তিনি বুদ্ধিমান ; কিন্তু যিনি নিজেকে জানেন তিনি জ্ঞানী। যিনি অপরকে পরাজয় করেন তিনি শক্তিশালী, কিন্তু যিনি নিজেকে জয় করেন তিনি শ্রেষ্ঠজয়ী। যিনি দেহত্যাগ করিলে মৃত নন্ তিনিই প্রকৃত অমর। তাওকে জানিলে মানুষ সর্ব্বত্র বাস করিতে পারে, এক সময়ে চতুর্দ্দিকে বাস করিতে, দেখিতে ও জানিতে সক্ষম হয়।

অব্যক্তকে জানিলে মানব কামমুক্ত হয়—আর কামশূন্য হৃদয়ে চির-শান্তি বিরাজ করে।

একত্বেই স্বর্গ পবিত্র ও ধরা স্থায়ী। একত্ব লাভ করিলে মন আত্মাকে জানিতে পারে।

অসৎ (অনির্ব্বচনীয় অদৃশ্য বস্তু) হইতে সৎ-এর সৃষ্টি। জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত মানব অন্ধকারের ন্যায় অভেদ ও উপত্যকার ন্যায় সমতল। যেমন বৃহত্তম পাত্র এখনও সৃষ্ট হয় নাই, বৃহত্তম আকার নিরাকার তেমনই তাও-এর কোন রূপ বা আকার নাই।

সদসৎ মিশ্রিত এই জগৎ। যেমন সর্ব্বোচ্চ পূর্ণতা অপূর্ণ প্রতীত হয় ; বৃহত্তম সরল রেখা জ্যার মতন দেখায়। তেমন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠও প্রবর্ত্তকের মত ব্যবহার করেন। জ্ঞানীর কোন নির্দ্দিষ্ট হৃদয় নাই, সহস্র লোকের হৃদয় তাঁর হৃদয়ে আছে। জ্ঞানী মৃত্যুরাজ্যের পারে। তাঁকে বিষধর সর্পও দংশন করে না ; হিংস্র জন্তুতে আঘাত করে না ; শিকারী পশুও আক্রমণ করে না। তিনি স্ত্রী-পুরুষের মিলন জানেন না বা দেখেন না। তিনি মিত্রতা শত্রুতা ও লাভালাভের বাহিরে।

যিনি তাওকে জানেন বলেন তিনি জানেন না—যিনি জানেন না বলেন—তিনি প্রকৃত পক্ষে জানেন। দুঃখের সঙ্গেই সুখ আবার সুখের পশ্চাতেই দুঃখ।

মহত্বের দ্বারা ঘৃণা জয় কর। অস্বাদকে আস্বাদন কর ও অকর্ম্ম অভ্যাস কর। জ্ঞানী হও, কিন্তু পণ্ডিত হইও না। তাওকে জানাই জ্ঞান—অন্য সব জ্ঞান অজ্ঞান।

সত্য কচিৎ প্রিয় হয় ; ও প্রিয় কদাচিৎ সত্য হয়।

বেড়া-লতা

—শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

নাম জানিনা ছোট্ট লতা আওতা বেড়ার গায়—
অন্তঃপুরের বউটি লাজে মুখ তু'লে না চায়!
ছোট্ট মতন ফুলটি কোলে
ছোট্ট শিশু হাওয়ায় দোলে
ভোম্‌রা গাহে ঝুমুর ঝুমুর ঘুমুর বাজে পায়!

পরশটুকু সয়না আহা চম্‌কে উঠে বুক্
বাতাস লেগে শরীর কাঁপে রৌদ্রে শুকায় মুখ।
জোছ্‌না ঢালা নীরব রাতে
নীল গগনের চাঁদের সাথে
সরম-নতা কয় সে কথা চোখের ইসারায়।

বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন

—কাজী মোতাহার হোসেন

মোটামুটি ধরিতে গেলে মানুষের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার মাত্রকেই সামাজিক ব্যবহার বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে হাটবাজারে বা পথে ঘাটে কেনা-বেচা করা বা কথাবার্ত্তা বলাকেও সামাজিকতার অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতে হয়। কিন্তু আমাদের নির্ব্বাচনশীল প্রকৃতি স্বভাবতই এগুলিকে সামাজিক আচরণ বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয়। সমাজের ভিতর অন্যকে টানিয়া আনিয়া তাহার পরিসর বৃদ্ধি করার চেয়ে, সমাজ হইতে সরাইয়া রাখিয়া তাহার আভিজাত্য বা শুচিতা রক্ষা করার দিকেই আমাদের স্বাভাবিক ঝোঁক। মানুষের প্রকৃতিই এই যে অন্য হইতে নিজের শ্রেষ্ঠতা কল্পনা করা যদি নিতান্তই অসম্ভব হয়, তবে অন্য হইতে নিজের স্বাতন্ত্র্য বা অবিমিশ্রতা কল্পনা করাও সুখদায়ক বলিয়া মনে হয়। এরূপ অবস্থায় অবিমিশ্রতা সহজেই পবিত্রতার গৌরবে ভূষিত হইয়া উঠে।

কেহই নিজকে সর্ব্বোতোভাবে অন্য দশ জনের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া বিশেষত্ব হারাইতে চায় না। আর প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা পারাও যায় না। এই বিশেষত্ব বাহ্যতঃ পোষাক-পরিচ্ছদে, ভাবভঙ্গীতে, কথাবার্ত্তায়, আচার-ব্যবহারে প্রকাশ পায়। এইগুলিই সামাজিক রীতি বা সামাজিক আচরণ। কিন্তু প্রত্যেকেই আমরা আপন বিশেষত্বগুলি সগর্ব্বে প্রচার করিবার জন্য ব্যগ্র হইলে যে-গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়, তাহাতে পৃথিবীর কারবার চলা কঠিন হইয়া পড়ে। তাই সমাজে এমন একটা সংযতি শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, যাহার ফলে সমাজ উদগ্র না হইয়া অনেকাংশে মোলায়েম এবং উপভোগ্য হইয়াছে। অন্যের মুখের দিকে চাহিয়া অনেক আচরণ করিতে হয়। অনেক সময় অপরের মনঃকষ্ট হইবে ভাবিয়া অপ্রিয় সত্য গোপন করিতে কিম্বা অকঠোর করিয়া বলিতে হয়। আপাততঃ এগুলিকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং ব্যক্তিত্বের দাবীর পক্ষে অবমাননাজনক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে যে মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার মূল্য অনেক বেশী। নিজেকে খানিকটা ঊর্দ্ধে অথবা দূরে সরাইয়া না রাখিলে সহজ ভাবে ভদ্রতা আসে না। অনেকে বলেন ইহাতে সমাজে কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়। একথা কতকটা সত্য বটে তবু পরিমিত মাত্রায় হইলে এরূপ ভদ্রতা শুধু সহনীয় তাহা নহে বরং বাঞ্ছনীয় ও উপভোগ্য।

যাহাদের লইয়া সমাজ গঠিত হইবে, তাহাদের মধ্যে দৃঢ় যোগসূত্র চাই। জীবন-যাত্রা যত জটিল ও ব্যাপক হইবে অপরের সঙ্গে সংযোগের উপলক্ষও তত অধিক জুটিবে। কর্ম্ম-সূত্রে, ভাবনা-সূত্রে, রক্তের টানে বা দৈবযোগে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হয়। ট্রামের কন্‌ডাক্‌টর, কারখানার কুলি, অফিসের কেরাণী, কলেজের ছাত্র বা অধ্যাপক, হাসপাতালের রোগী, জেলের কয়েদী, জমিদার সম্প্রদায় এরা কোন না কোন সূত্রে আপন দলের অন্য সকলের সহিত যুক্ত। এইরূপ স্বভাবতঃই লোকের রুচি, অবস্থা, মনোবৃত্তি, কালচার প্রভৃতি নানাভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সমাজ গঠিত হইয়া উঠে। কখনও বা সমাজে সমাজে সংঘর্ষও বাধিয়া যায়। যাহা হউক, নানা কৃত্রিম উপায়ে সমাজ গড়িয়া তোলা যখন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং উহাই সভ্যতার অঙ্গ, তখন তাহা লইয়া বাদানুবাদ না করিয়া এই অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লওয়াই ভাল। 'মানুষ সবাই সমান এবং পরস্পর ভাই ভাই, এ সমস্ত আপ্ত বাক্য কল্পনা ও ভাবজগতে খাটিতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক জীবনে এ সব কথার মূল্য নাই।

এবার বাঙ্গালীর বর্ত্তমান সামাজিক জীবনের কয়েকটী বিশেষ প্রবণতা ও অবস্থার বিষয় আলোচনা করা যাউক। প্রথমেই চোখে পড়ে বাংলার বহু বিভক্ত জাতি। ঘোস, বোস, ভটাচার্য্য, দাশ, সেন, সাহা, কৈবর্ত্ত এ সমস্ত ত আছেই তাহার উপর আবার খৃষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম, য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি উপসর্গ জুটিয়াছে। অবশ্য শ্রেণীগত বা পংক্তিগত সামাজিকতা সবদেশেই চিরকাল হইতেই আছে। ইহা কতকাংশে কল্যাণকর বটে। কারণ নিম্নতর সমাজের সামনে উচ্চতর সমাজের একটা আদর্শ বর্ত্তমান থাকাতে উন্নত হইবার জন্য সমাজে একটা কর্ম্ম-স্পৃহা জাগিতে পারে। কিন্তু যে সমাজ চিরকাল ধরিয়া বিশেষ বিশেষ শ্রেণীকে দৃঢ় ভাবে সেই সেই শ্রেণীতেই আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা দেয়, সে

সমাজের প্রত্যেকে আপন ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে যোগ্যতানুসারে উচ্চ স্থান অধিকার করিবার সুযোগ পাইলেও, সম্প্রদায়কে অতিক্রম করিয়া মানুষের অধিকার লাভ করিয়া অবাধ উন্নতির সুযোগ পায় না। হিন্দু সমাজে বর্ত্তমানে কোন কোন বিষয়ে অনুন্নত জাতিরা উন্নত জাতিগণের সমান অধিকার লাভ করিয়াছেন বটে, তবু তাহাদিগকে সামাজিক ভাবে উন্নত জাতির সমকক্ষ বলা যাইতে পারে না।

হিন্দু মুসলমান প্রশ্ন কিছুদিন হইতে বাঙ্গালী জীবনে ভয়ানক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। এ সমস্তের মূলে ধর্ম্মান্ধতা যে একেবারে নাই, তাহা নহে। সাধারণ মুসলমান বাল্যকালে এই শিক্ষা পায় যে একমাত্র তাহারাই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবার অধিকারী; হিন্দুরা বিধর্ম্মী কাফের, দোজখের আগুনই তাহাদের সমুচিত শাস্তি; তাহাদের সংসর্গ ত্যাগ করা যদি অসম্ভব হয়, তবে তাহাদের সহিত অগত্যা আদান-প্রদান করিতেই হইবে; কিন্তু তাহাদের সহিত বন্ধুতা করিলে শেষ বিচারের দিন, সেই সব বন্ধুর পংক্তিতে স্থান লইয়া নরকবাসের পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। আবার হিন্দু বালক বাল্যকালে এই শিক্ষা পায় যে গো-খাদক, অপবিত্র যবনেরা আসিয়া ঋষি-অধ্যুষিত ভারতভূমি কলঙ্কিত করিয়াছে, দেবদেবীর অসম্মান করিয়াছে, তাহাদের নারীর মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছে এবং আত্মীয় স্বজনকে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়াছে। উহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য, না পারিলে অগত্যা উহাদের প্রতি শত্রুভাব পোষণ করিয়া সুযোগমত নির্য্যাতিত করিতে পারিলেও কতকটা আর্য্যগৌরব রক্ষা পায়। প্রকৃত-পক্ষে সাধারণ মুসলমান যে চেহারা লইয়া অর্থাৎ যে শিক্ষা ও সংস্কার লইয়া হিন্দুর সামনে সচরাচর প্রতিভাত হয়, তাহাতে তাহারা যে অন্য সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে নাই, এমন কি মুসলমান ও ভদ্রলোক যে বিপরীতার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অধিক আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। তবে দুঃখের বিষয় বাংলা ইতিহাস ও সাহিত্য পর্য্যন্ত এই ধারণা প্রধূমিত করিতে সহায়তা করে। কোন শাস্ত্রের কথা বলিতেছি না; ব্যবহারিক ধর্ম্ম সত্য সত্যই লোককে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ না করিয়া তাহাদের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বিচ্ছেদের বহ্নিই প্রজ্জলিত করিয়া রাখিয়াছে। বাল্যকালের এই সমস্ত ধারণা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাটিয়া গেলেও মনের অতল তল হইতে শেষ কালিমাটুকু মুছিয়া ফেলা সাধারণ লোকের কর্ম্ম নয়।

কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে কতকগুলি সহরে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার, মূলে ধর্ম্মবিদ্বেষ হয়ত সামান্যই আছে। মূল কারণ কতকগুলি তথাকথিত সমাজনেতার সাময়িক স্বার্থসিদ্ধিমূলক উত্তেজনা এবং নিরন্ন লোকের আহার-সংগ্রহের জন্য আত্মপোষণমূলক অন্ধ প্রচেষ্টা। বাহ্যিক এই সমস্ত মুখ্য কারণ, ভিতরের ধর্ম্মবিদ্বেষকে জাগ্রত করিয়া দিয়া মানুষকে কতদূর পশুভাবাপন্ন করিতে পারে, আমরা তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

অনেকে বলেন কিছুদিন পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমানে বেশ সদ্ভাব ছিল; এমন কি তাহাদের মধ্যে খুড়া, জেঠা, চাচা, দাদা, প্রভৃতি স্নেহ-সম্বোধন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। আমার বিশ্বাস পরম প্রীতি হইতে স্বতঃ উৎসারিত যে সম্ভাষণ, এ সম্ভাষণ সেরূপ ছিল না। বাঙ্গলা দেশে কৃষিজীবী মুসলমান অতিশয় দরিদ্র ও অশিক্ষিত। তাহারা উদরান্নের জন্য ধনীর বাড়ীতে মজুর খাটিতে বা ধনী মহাজনের বাড়ীতে ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকিতে বাধ্য। শিক্ষায় বা অর্থে তাহারা হিন্দুর সমকক্ষ নয়। এজন্য সম্মানজনক বন্ধুত্ব-ভাব ইহাদের মধ্যে আসিতেই পারে না। যেখানে একপক্ষে কৃপা, অন্য পক্ষে দীনতাস্বীকার, সেরূপ স্থলে স্থায়ী হৃদয়তার আশা করা যায় না। বর্ত্তমানে মুসলমানের ভিতর শিক্ষা বিষয়ে একটু চেতনার সঞ্চার হওয়াতে তাহারা ক্রমশঃ নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছে, এবং যেখানে প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক, সেখানে 'করিম'এর স্থলে "করিম চাচা"র সম্মান পাইয়া অতিরিক্ত উল্লসিত হইয়া উঠিতেছে না। এখনকার কাল ধর্ম্মেই স্বাতন্ত্র্য-বোধ প্রবল করিয়া দিতেছে। হিন্দু মুসলমানের ভিতর প্রকৃত স্থায়ী মনের মিল তখনই হইবে, যখন পরস্পরের বন্ধুত্বে ইহারা গৌরব বোধ করিতে পারিবে।

বাঙালীর সমাজে উৎসব-আনন্দে, তীর্থে, পূজাপার্ব্বণে হিন্দু-নারীর স্থান চিরদিনই ছিল। এখন শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সর্ব্ববিষয়েই পুরুষের সমকক্ষতা করিতেছেন। তাঁহারা শুধু গৃহে আনন্দ বিতরণ নয়, বাহিরে শুধু পুরুষকে উৎসাহ দান নয়, নিজেরাই সমস্ত কর্ম্মে পুরুষের সহকর্ম্মিণী ও সমস্ত ধর্ম্মে পুরুষের সহধর্ম্মিণী হইতেছেন। এ বিষয় বাঙ্গালী

মুসলমান-মহিলারা এখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। শিক্ষার চাঞ্চল্যে পর্দার কুহক কাটাইয়া উঠিতে না পারিলে তাঁহাদের সত্বর মুক্তি নাই। অবশ্য মুক্তি অর্থে উচ্ছৃঙ্খলার কথা বলিতেছি না; তাহাদের বিকাশ ও পরিণতির কথাই বলিতেছি। হিন্দু-সমাজে নারী-শিক্ষা ও কথঞ্চিত নারী স্বাধীনতার ফলে, ছেলেরা সুশিক্ষা পায় ও তাহাদের মধ্যে একটা সহজ সু-রুচি জন্মে। নারী-সমাজের এই স্বাস্থ্যকর প্রভাব হইতে বঞ্চিত থাকা মুসলমান ছেলেদের পক্ষে (যুবক ও বৃদ্ধের পক্ষেও) সামান্য দুর্ভাগ্যের কথা নহে। মুসলমান সমাজে এক পরিবারের সঙ্গে অন্য পরিবারের ঘনিষ্ট বন্ধুতার অর্থ, উক্ত দুই পরিবারের পুরুষেরা পরস্পরের সহিত পরিচিত হইবে, মেয়েরাও মেয়েদের মধ্যে পরিচিত হইবে; কিন্তু মেয়েদের ও পুরুষদের মধ্যে যে দেওয়াল, তাহা উত্তুঙ্গ হইয়াই থাকিবে। সমাজকে এইরূপে আধাআধি ভাগ করিবার ফলে, ইহার সংহতি ও শক্তি স্বভাবতঃই অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান প্রণালীর স্ত্রী-শিক্ষা বাঙালী সমাজে নূতন আমদানী। এই জন্য উহা কিরূপ হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তাহা এখনও বুঝিতে পারা যায় নাই। ইতিমধ্যেই কতকগুলি সমস্যা দেখা গিয়াছে। তাহার প্রথমটী হইতেছে—বিদুষী মহিলাদের অনেকের বিবাহবিমুখতা। এইরূপ অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি-নিরোধ সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের পক্ষেই হানিকর। বর্ত্তমান প্রণালীর শিক্ষাদ্বারা যে ছাত্র ও ছাত্রীদের সংযম শক্তি ও ব্রহ্মচর্য্যবৃত্তি অতিরিক্ত পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, এ কথা মনে করিবার সম্ভবতঃ কোন হেতু নাই। তবে শিক্ষায় কতকটা দারিদ্র্যবোধ উদ্বুদ্ধ করে বটে; তাহার ফলে পুরুষেরা উপযুক্তরূপ উপার্জ্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ-বন্ধন স্বীকার করিতে চায় না। আজকাল শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা সকলেরই অনেক চাল বাড়িয়া গিয়াছে, অথচ সংস্থান তদনুরূপ হইতেছে না। এই অর্থ-নৈতিক কারণে যাঁহারা সন্তান পালনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত, সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহের ও সন্তান-জন্মের হার অনেক কমিয়া গিয়াছে। মনে হয়, বিবাহ-বিমুখতার একটি কারণ উপযুক্ত বরের অভাব (উপযুক্ত বর বলিতে, কন্যা-অপেক্ষা উচ্চ-শিক্ষিত, ধনবান বা প্রচুর উপার্জ্জনক্ষম, নিটোল স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ বুঝায়, যাহার উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়।) আর একটি কারণ, শিক্ষিত পুরুষের আত্মপরায়ণতা, আর শিক্ষিতা মহিলার নবোন্মেষিত আত্মজাগরণ ও স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি। নারী এখন কতকটা নিজের শক্তি বুঝিতে পারিয়া পুরুষের অধীনতায় আত্ম-বিক্রয় করিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। অত কাল ধরিয়া যে নারী নির্য্যাতিত ও অবমানিত হইয়া আসিয়াছে, এখন তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ভবিষ্যতে নারী ও পুরুষ কাহাকেও যদি অর্থ-নৈতিক ভাবে পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে না হয়, তবে সমাজের বা পারিবারিক জীবনের বর্ত্তমান রূপ একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে। এ সমস্ত কোমলস্পর্শ-বিষয়ক আলোচনা বিস্তারিত ভাবে না করিয়া সাধারণ ভাবে বর্ত্তমান শিক্ষার আরও দুই একটা প্রভাবের কথা উল্লেখ করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কালচারের সমতা সমাজ-বন্ধনের একটী প্রধান উপকরণ। কাল্‌চার জিনিষটা মানুষের মজ্জাগত;—কতকটা সংস্কার, কতকটা শিক্ষালভ্য। চেহারার লাবণ্য যেমন, জীবন-যাত্রা প্রণালীতে কালচারও তেমনি; প্রত্যেক কাজে প্রকাশ পায়, কিন্তু ঠিক বলা যায় না, কিসে তার বিশেষত্ব। সংস্কারগত কালচারই শিক্ষার দ্বারা মার্জ্জিত হইলে ভব্য হইয়া উঠে। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক শিক্ষাহীন হওয়াতে এই ভব্যতার মূল্য অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিতদের নিকট অশিক্ষিতেরা একরূপ অপাংক্তেয়। তাহারা যে শুধু অবজ্ঞেয়, তাহা নহে; অনেক স্থলে দেখা যায়, তাঁহারা শিক্ষিতদের স্বার্থসিদ্ধির কামধেনুরূপে ব্যবহৃত হয়। অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষাটা যদি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বাধ্যতামূলক হয়, তবেই এ অবস্থা হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে, নতুবা নয়। শিক্ষিতের স্বার্থপরতা ও আত্মানুবর্ত্তিতা অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত মুসলমান সমাজেই উৎকট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষিজীবী পিতা হয়ত অতি কষ্টে পুত্রের লেখা-পড়া ও বিলাস-সামগ্রীর ব্যয় বহন করিতেছেন, আর পুত্র উৎকৃষ্টতম আহারে শরীর পুষ্ট করিয়া পিতা, পিতৃব্য ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের উপর উদ্ধত ভাবে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে এবং অবসর সময়েও সংসারের কাজকর্ম্মে একটু সহায়তা করিবার ইঙ্গিত মাত্রেও নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, এরূপ দৃশ্য খুব বিরল নহে। বাঙালী

সমাজে শিক্ষিতেরা শুধু মস্তিষ্ক বা কলম চালনা করিবে, আর অশিক্ষিতেরাই কেবল হস্ত চালনা বা পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবে এই সনাতন রীতি। শিক্ষার প্রসার হইতেছে বটে, কিন্তু এই নীতির নড়চড় হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। শিক্ষিত সমাজের এই অপ্রেম ও নির্লিপ্ততা, সমুদয় সমাজের উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাহির হইতে টানিয়া তুলিতে গেলে, যাহারা নীচে পড়িয়া আছে, তাহাদের জড়ত্ব দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়: কারণ সহজ ভাবে উন্নতির ডাকে সাড়া না দিয়া তাহারা স্বভাবতঃই মনে করে ইহার ভিতর নিশ্চয় তাহাদের বুদ্ধির অগম্য কোন সর্ব্বনাশজনক অভিসন্ধি রহিয়াছে। সমাজ-সেবার অন্যান্য নানাপ্রকার বিপদের মধ্যে এটাও একটি বিশেষ বিঘ্ন। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে, শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রগুলি সহর হইতে সরাইয়া পল্লীগ্রামে স্থাপন করা প্রয়োজন; তাহা হইলে দ্রুত গতিতে শিক্ষাবিস্তার হইয়া শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ঘনিষ্ঠতর সমাবেশের ফলে পল্লীশ্রী বর্দ্ধিত হইবে। শুনিতে পাই, জার্ম্মাণীতে এই নীতি অনুসৃত হইয়া আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালীর সমাজ-ব্যবস্থায় একান্নভুক্ত পরিবার একটি বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। এখন সে ব্যবস্থা একটু শিথিল হইয়াছে বটে, তবু যেটুকু আছে, তাহা সামান্য নহে। পুত্র বয়োপ্রাপ্ত হইয়া পিতার সংসারের সহিত সম্পর্ক এখন পর্য্যন্ত একদম চুকাইয়া দেয় নাই। এক পরিবারে একজন একটু অক্ষম হইলে আর পাঁচজন তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয় না, বরং সকলে মিলিয়া তাহাকে চালাইয়া লইবার চেষ্টা করে। ইহার ভিতর যে প্রীতি ও সহানুভূতি আছে, তাহা অধিক কাল টিকিবে কিনা কে বলিতে পারে? ক্রমশঃ লোকের অভাব এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ করাই সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এরূপ অবস্থায় নিকট আত্মীয়রাও বাধ্য হইয়া পর হইয়া যাইতেছে। বৃদ্ধদের মুখে শুনিতে পাই তখনকার লোকে দল বাধিয়া কুটুম্ববাড়ী যাত্রা করিত। আর সমস্ত কুটুম্বের আদর-আপ্যায়ন স্বীকার করিয়া বাড়ী ফিরিতে প্রায় পাঁচ ছয় মাস সময় লাগিত। ঘরে তখন যথেষ্ট পরিমাণে খাবার থাকিত, আর এখনকার মত বিলাসজাত কৃত্রিম অভাবও ছিল না; কাজেই লোকে তখন অতিথিকে দুধে-মাছে বা ডালে-ভাতে খাওয়াইয়াই তৃপ্তি অনুভব করিত। কিন্তু এখন লোকের বাড়ীতে অতিথি আসিয়া দুই দিনের স্থলে তিনদিন থাকিলেই অনেকের পক্ষে সত্য সত্যই দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। দেশের অর্থকষ্ট যেরূপ দিন দিন ঘোরতর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে সক্ষম অক্ষম সকলেরই নিজের শক্তির উপর নির্ভর করা প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। প্রয়োজনের অঙ্কুশ-তাড়নায় কতলোক জর্জ্জরিত হইয়া অন্যের সহানুভূতি-হারা হইয়া একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে; আবার কেহ কেহ জীবনরক্ষার জন্য পূর্ণ শক্তির প্রয়োগ করিতে গিয়া আত্মশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতেছেন। এই আত্মশক্তিতে বিশ্বাসসম্পন্ন লোকেরাই সমাজের ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্থল।

অর্থের যে প্রকার অনটন হইয়া পড়িয়াছে, জীবনযাত্রা-প্রণালীতে সেই প্রকার ব্যয়সঙ্কোচ না করিতে পারিলে কেমন করিয়া চলিবে? বাধ্য হইয়া আমাদিগকে অনেক আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া সহজ-সরল ভাবে চলিতে হইবে। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত মহার্ঘ্য খাদ্য ও পানীয়ের পরিবর্ত্তে, অনায়াসলভ্য সস্তা খাঁটি ও পুষ্টিকর জিনিষ ব্যবহার করিতে হইবে। শুধু আহার সম্বন্ধে কেন, আচ্ছাদন ও অন্যান্য আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও যথাসম্ভব সহজ হওয়া দরকার। বিশেষতঃ বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি উপলক্ষে গরীবের প্রতি যে সমাজ-সম্মত বোঝা চাপাইবার নিয়ম চলিয়া আসিতেছে তাহা তুলিয়া দিতে হইবে; এই সঙ্গে সমগ্র সমাজের মনোবৃত্তি এমন হওয়া আবশ্যক, যে প্রচলিত ব্যয়বহুল প্রথার অন্যথা-চরণ করিতে গিয়া দরিদ্রকে যেন কোন প্রকার দীনতা বা অবমাননা সহ্য করিতে না হয়।

সমাজে ক্ষুদ্র, বৃহৎ কত সমস্যা রহিয়াছে, তাহা বর্ণনাদ্বারা শেষ করা দূরের কথা কল্পনায়ও ধারণা করা অসম্ভব। তাই বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের আর একটী মাত্র লক্ষণের বিষয় উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। এ বিষয়টী সাধারণ ধর্ম্মবোধ। লোকের প্রকৃত ধর্ম্মবোধ হৃদয়ে অবস্থান করে, পুস্তকে নয়। জাতির বর্ত্তমান অবস্থাই তাহার ধর্ম্মবোধের প্রকৃষ্ট পরিমাপক। আমরা যদি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকি, তবে বুঝিতে হইবে, কার্য্যতঃ আমাদের ধর্ম্মবোধ বা সুনীতিপরায়ণতা অতি সামান্য। ধার্ম্মিক মুসলমান আখেরের আশায় নমাজরোজা করিতেছে। ধার্ম্মিক হিন্দু প্রাচীন আর্য্য-কীর্ত্তি-গৌরব-কাহিনী প্রচার করিয়া লুপ্ত-পুরাতন-গরিমা উদ্ধারের চেষ্টায় মনোনিবেশ

হইয়াছে। ঠিক অন্তরের জিনিষ হইলে ইহাতে অন্ততঃ কিছু না কিছু কাজ হইত। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কথা ছাড়িয়া দিয়া গোটা সমাজের কথা বলিতে গেলে দেখা যায়ঃ—অনুষ্ঠানপ্রীতি হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের ভিতর কিছু বেশী আছে, ঈশ্বরচিন্তা হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যেই বিরল, আর পাপভীতি কেবলমাত্র সাংসারিক লাভ-লোকসান বা সুযোগ-সুবিধার উপর নির্ভর করে। অভাবের তাড়নায় ও পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে সমাজকে ছাড়াইয়া ব্যক্তির জয়ধ্বজা উড়িয়াছে অর্থাৎ আত্মানুগ বুদ্ধি অতি মাত্রায় সজাগ হইয়াছে; আর সনাতন নীতির অটল সৌধ এখন টলমলায়মান হইয়া উঠিয়াছে। আগেকার দর্শন নিত্য পদার্থের অন্বেষণ করিত, নিত্য-সুখের নিকট পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সুখ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হইত। এখনকার দিনে আর অনিত্য তুচ্ছ নাই; ক্ষণিক আনন্দ মুহূর্ত্তের নিবিড়তার জন্যই মহা মূল্যবান। ভবিষ্যতের বিভীষিকা দেখিয়া যে দূর-দৃষ্টি বর্ত্তমানের আনন্দ উপেক্ষা করে, সেই বৃদ্ধ দূরদৃষ্টি এখন উপহাসের সামগ্রী। দূর ভবিষ্যতের ভয় বা আশার স্থলে, নিকট বর্ত্তমানের আকাঙ্ক্ষার বেদী প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, সমাজের সংযম ও শৃঙ্খলা বোধ অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাতেও তেমন ভীত হইবার কোন কারণ নাই। এতকাল ধরিয়া আমরা সত্যের একটা দিক লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, আর একদিক তেমন উজ্জ্বলভাবে দেখি নাই। এখন সেই দিকটায়ই এ সুযোগে দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহাতে আগেকার মেকিটুকু যেমন ধরা পড়িবে এখনকার বাহুল্যটুকুও তেমনি পরিমার্জ্জিত হইয়া সমাজ পূর্ণতর পরিণতি লাভ করিবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে শিক্ষা, রুচি, দক্ষতা প্রভৃতি বিষয়ে মানুষে মানুষে ভেদ চিরকালই থাকিবে। চিরকালই সমাজে শাসক ও শাসিত, চালক ও চালিত এই দুই শ্রেণীর লোক থাকিবে, কিন্তু একটি জাতির প্রকৃষ্টতম উন্নতির পক্ষে, তাহার প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণতম সহযোগিতা আবশ্যক। তজ্জন্য পরস্পরের প্রীতি-বন্ধন দৃঢ় হওয়া চাই; আর সকলের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদানে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার অবসান হওয়া চাই। কালচারের বিভিন্নতা বা মনুষ্যত্বের পার্থক্যই বোধ হয় মানুষে মানুষে সত্যকার পার্থক্য। আমরা বিষয়-সম্পদ, জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণহিসাবে যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছি তাহা কাল্পনিক। এই শিক্ষা যখন আমাদের মনের ভিতর সহজ হইবে, তখনই আমরা সমগ্র সমাজকে একদেহ বলিয়া অনুভব করিতে পারিব, আর তখনকার সেই প্রীতি-বন্ধনের ভিতরই আমরা নিজেদের অন্তর্নিহিত মহাশক্তির উদ্বোধন করিতে পারিব।

"সমাজমধ্যে ধনলোভ এবং ঈর্ষা বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি লোকের ঘৃণা কম হইয়া পড়াতেই এদেশে সমাজের শাসন ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে এবং দলাদলিরও প্রাদুর্ভাব বাড়িতেছে। অপরাধীর পক্ষ গ্রহণ করিতে কাহারও আর লজ্জাবোধ বা সঙ্কোচ হইতেছে না। সমাজের মধ্যে যাঁহারা প্রধান তাঁহারা আর তত পরকালের ভয় করেন না। দূরদর্শন অভাবে সমাজে নৈতিক শাসনের জন্যও তাঁহারা আর তত একত্র নহেন। সুতরাং সমাজের এক অংশ দুষ্টের দমন ইচ্ছা করিলে অপর এক অংশ আগ্রহসহকারে অপরাধীর সাহায্যে প্রবৃত্ত হয়।"

—'দলাদলি'—৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়

যোগ-বিয়োগ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়

অন্ধকার!

হাত দিয়া সে অন্ধকার স্পর্শ করা যায় বোধ হয়।

তাহার উপর অজস্র বর্ষণ, এলো-মেলো বাতাস বর্ষণের শৈত্যকে অসহ, তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে, সে শৈত্যে ধরণী পর্য্যন্ত আর্ত্ত হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া নিথর অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহার বুকের আবরণ মাটী শিথিল, গলিত হইয়া গেছে।

সেই বর্ষণ আর সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিয়াছে শ্রীমন্ত। উন্মত্ত যে, সেও যদি এই বর্ষণ-মুখর অন্ধকারের মধ্যে চলে, তবে সে'ও দেহের যাতনায় অস্থির হইয়া উঠে।

কিন্তু শ্রীমন্ত চলিয়াছে একটা দিক লক্ষ্য করিয়া, মুখ দিয়া ঘন ঘন পড়ে দ্রুত-গমন-হেতু গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস, হাতে দীর্ঘ লাঠি, মাথায় জড়ান একখানা চাদর।

জলকাদায় পথে-বিপথে ঘুরিয়া সে শেষে মহাদেবপুরে আসিয়া উঠিল: খোঁজ করিয়া সে রামদাস ঘোষ, পাত্রের ভগ্নীপতির বাড়ীতে আসিয়া উঠিল—।

যাক্, তথনও বিবাহ হয় নাই, শেষ রাত্রে লগ্ন।

বাহিরে একটা লণ্ঠনের আলো জ্বলিতেছিল, সেই আলোয় একটা কম্বলের উপর আসর জমাইয়া বসিয়া আছে হরিলাল স্বয়ং।

শ্রীমন্ত আসিয়া হরিলালের মাথা ফাটাইয়া দিল না, সে একেবারে তাহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া কহিল—

"ওস্তাদ, গৌরীর পানে তাকাও, না হয় তার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল।"

হরিলালও এ আকস্মিক আর্ত্তভিক্ষায় কেমন হইয়া গেল; তাহার মুখে আজ হিন্দি-বাত ফুটিল না, সে কহিল,—

—তাই ত টাকা নিয়েছি যে—

—কত টাকা নিয়েছ? ফেরৎ দাও টাকা—

—সে টাকা কি আর আছে? দেনা ছিল, বডি-ওয়ারেণ্ট ধরিয়েছিল, তাই—

শ্রীমন্তের মনে পড়িল মহাজনের বাড়ী যে-চাদর সে ঘাড়ে করিয়া গিয়াছিল সে-চাদর তাহার মাথায় বাঁধা, আর তারই খুঁটেই আড়াই শ' টাকা বাঁধা আছে।

সে হরিলালের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কহিল—"কত টাকা? আমি এখুনি দিচ্ছি, কত টাকা?"

হরিলাল তখন ঘোরটা কাটাইয়া উঠিয়াছে, সে তখন নিজের জন্য সম্ভবমত লাভ যোগ দিয়া অঙ্ক স্থির করিতেছিল, হিসাব করিয়া নিজের জন্য গোটা ত্রিশ টাকা রাখিয়া সে কহিল—"দেড় শো টাকা।"

শ্রীমন্ত সঙ্গে সঙ্গে বলিল—"আমি দিচ্ছি, দাও ভাই গৌরীকে আমাকে দাও, আমি দেখে শুনে ওর বিয়ে দোব, ভিক্ষে চাইছি আমি—"

বলিয়া সে মাথার চাদর খুলিয়া টাকা-বাঁধা খুঁটটা বাহির করে।

শ্রীমন্তের চোখ দুইটা লোলুপতায় জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠে, আফশোষ হয় কেন সে বেশী করিয়া বলিল না;—মুহূর্ত্তে একটী মতলব ভাঁজিয়া তাড়াতাড়ি কহিল—"কিন্তু এরা,—আবার কি বলে দেখি—"

বলিয়া চলিয়া যায়, পাত্রের অভিভাবক ভগ্নীপতি রামদাসের উদ্দেশে।

অল্পক্ষণ পরেই রামদাস নিজে আসিয়া শ্রীমন্তকে অভ্যর্থনা করে—"তা বেশ, তাতে আর আমাদের আপত্তি কি? উনি নেহাৎ ধরেছিলেন তাই, নইলে ধরুন গিয়ে কন্তে আমাদের গেরামেই ঠিক রয়েছে, আজই রাত্রে আমরা বিবাহ দিতে পারব; তা আমাদের টাকাটা আর খরচা, ধরুন গোটা পঞ্চাশেক, টাকাটা পেলেই, হেঁঃ—হেঁঃ—"

বলিয়া পরম বিকশিত হাসি দিয়া শ্রীমন্তকে মুগ্ধ করিয়া দিল। নাঃ—এরা সত্যই ভদ্রলোক! কিন্তু উপায় নাই, পাত্রটী যে কাণা—অন্ধ!

শ্রীমন্ত কহিল—"তাই দোব আমি, গৌরীকে নিয়ে এস, টাকা গুনে নাও।"

রামদাস উঠিয়া গেল, আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হরিলালের সঙ্গে ফিরিয়া আসিল, হরিলালের কোলে ঘুমন্ত গৌরী। চেলী-পরা ঘুমন্ত গৌরীর মাথাটা এলাইয়া পড়িয়াছে, হরিলাল শ্রীমন্তের কোলে তাহাকে তুলিয়া দিল; শ্রীমন্ত ডাকিল—"মা মণি!"

—"উঁ!"

ঘুমন্ত কাণেও তার এ ডাক ব্যর্থ হইয়া ফেরে না। গৌরী ঘুমঘোরেও মামার ডাকে সাড়া দিল, "উঁ"।"

এমনি ঘুমঘোরে সাড়া দেওয়া তাহার অভ্যাস ছিল, প্রায়ই রাত্রে খাবার সময় গৌরী ঘুমাইয়া পড়িলে গিরি যখন ঝঙ্কার দিত, শ্রীমন্ত তখন এমনি করিয়াই তাহাকে ডাকিত—"মা মণি!"

গৌরী সাড়া দিত—"উঁ!"

শ্রীমন্ত তখন সুরু করিত—"শোন তারপর, সেই যে সেই রাজপুত্তুর।"

হরিলাল কহিল—"টাকাটা দে ছিমন্ত! এদের আবার বিয়ের যোগাড় আছে।"

হাঁটু দিয়া ঘুমন্ত গৌরীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া শ্রীমন্ত গণিয়া দুশো টাকা দিয়া, বাকী টাকাটা খুঁটে বাঁধিয়া আবার গৌরীকে ডাকে—"মা মণি, একবার উঠত মণি।"

হরিলাল কহে—"হাম কো ত কুছ্ মিল না চাহি ভাই, গাঁজা ভাঙ পিয়েগা, দেখো, হামারা সন্তান—"

শ্রীমন্ত হাসিয়া কহে—"ভাগ্,—চল তুমি আমার সাথে চল, আমার বাড়ীতে তোমার কায়েমী বন্দোবস্ত, যা চাই তোমার।"

হরিলাল কহে—"নেহি ভাই, নগদ মূল যেৎনা মিলে ওহি লাভ; আর যে রায় বাঘিনী তোর ঘরে বাবা!"

মোট কথা হরিলাল ছাড়ে না, আর পাঁচটা টাকা সে আদায় করিয়া লয়।

শ্রীমন্ত টাকা দিয়া গৌরীকে বুকে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহে—"তবে আমি চল্লাম—"

রামদাস প্রবল আপত্তি তুলিয়া কহে—"সে কি হয়? না, সে হ'তে পারে না, এই দুর্য্যোগ, ওই দুধের মেয়ে মরে যাবে যে; তা ছাড়া ধরুন আমার বাড়ীতে একটা কাজ আজ; আমাদের অপর কনে ত' ঠিকই আছে।"

হরিলাল কহে—"জরুর মর যায়েগা, শালা—বন্ বন্ হাওয়া কন্ কন্ হাড়—ইসমে লেড়কী মর যায়গা।"

শ্রীমন্ত বিপন্ন ভাবে কহে—"তবে—?"

রামদাস কথাটা পরিষ্কার করিয়া কহিল—"অবিশ্বাস হচ্ছে কি আমাদের ওপর?"

এ কথার উত্তরে 'হ্যাঁ অবিশ্বাস হইতেছে' বলা যায় না। শ্রীমন্তকে কাজেই লজ্জিত ভাবে অস্বীকার করিতে হইল—"না—না—তা নয়।"

রামদাস বলে—"ধরুন, আমরা যদি মেয়ে না ছাড়তাম, তবে কি করতেন আপনি? আইনেও কিছু করতে পারতেন না, জোরেও কিছু করতে পারতেন না—গাঁ তো আমাদের।"

—"তা তো বটেই, তবে কিনা গৌরীর মামী—"

হরিলাল কহে—"কাঁদবে। তা কাঁদুক, এক রজনী তোমার ছিমতী বিরহে কাঁদুক্ ছিমন্ত কাঁদুক্।"

শ্রীমন্ত হাসিয়া ধমক দিয়া কহে—"ভাগ্, ফক্কর কোথাকার।"

রামদাস কহিল—"তা উনি সে কথা বলতে পারেন বৈকি, ধরুন উনি হলেন আপনার তেনার নন্দাই। রাইএর কত রস-কথা সব হল ননদের সঙ্গে; গানই আছে—ননদিনী ব-লো নাগরে। হেঁঃ—হেঁঃ—বলতে উনি পারেন বৈকি।"

অগত্যা গৌরীকে পাশে শোয়াইয়া শ্রীমন্ত তাহার পাশে বসিল।

রামদাস এবার জোড় হাত করিয়া কহিল—"তা হলে অনুমতি করুন একটুকুন জল-সেবা হোক। আর কাপড় একখানা ছাড়ুন।"

সত্য, এ দুইটার প্রয়োজন একান্ত ভাবে শ্রীমন্ত অনুভব করিতেছিল, সারাটা দিনের ও এই প্রহরখানেক রাত্রের সমস্ত দুর্য্যোগটা মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, আর পরিশ্রম—পরিশ্রম ইহাকে বলা চলে না, ইহাকে বলে শরীরের উপর অত্যাচার, দারুণ অত্যাচার—সমস্ত দেহখানা যেন লতার মত এলাইয়া এলাইয়া পড়িতেছিল, তাহার উপর ক্ষুধা আর এই হিমানী-মাখানো সিক্ত বস্ত্রখানা।

শ্রীমন্ত কৃতার্থ হইয়া গেল—সে ভদ্রতা রক্ষা করিতে পর্য্যন্ত একবার 'না' করিল না, সঙ্গে সঙ্গে কহিল—"আজ্ঞে বড় ভাল হয় কিন্তু।"

—"দেখুন দেখি, দেখুন দেখি, বিলম্ব আমারই অন্যায়।" বলিতে বলিতে রামদাস উঠিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে হরিলালও গেল।

নীরবতা ঘনাইয়া আসে, সঙ্গে সঙ্গে দেহখানা ভাঙিয়া আসে—চোখ দুইটাও টানিয়া কে যেন জুড়িয়া দিতে চায়।

"গা তুলুন।"

শ্রীমন্ত চাহিয়া দেখিল রামদাস, হাতে খাবারের পাত্র; এ কাঁধে কাপড়, ও-কাঁধে একখানা আসন।

শ্রীমন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল।

ভিজে কাপড়খানা ছাড়িতে শুষ্ক বস্ত্রের সুখস্পর্শে সমস্ত দেহখানা যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, শুষ্কতায় যে উষ্ণতাটুকু সঞ্চিত থাকে সেই উষ্ণতাটুকুর স্পর্শে দেহে যেন রক্তধারায় প্রবাহ ধরিল, গায়ের চামড়ার অসাড়তা ঘুচিতে লাগিল। তারপর আহার—মুড়ী, মুড়কী, চিঁড়ে, দই, সন্দেশ, কয় কোষ সুমিষ্ট কাঠাল, তাহার উপরেও সদ্যতপ্ত কয়খানা লুচি।— বিলাসের আহার, সে শুধু পঞ্চরস-পরীক্ষাহেতু, কিন্তু দেহ-যন্ত্রের প্রয়োজনে অন্তরাত্মা যখন চীৎকার করে তখন সে ক্ষুধা, সে ক্ষুধার আহার সত্যকার আহার, সে আহার দেখিবার বস্তু, সে রস বাছে না, সে চায় বস্তু, সে আহারের তৃপ্তিতেই ধরণীর শস্যসৃষ্টি সার্থক, গৃহস্থের আতিথেয়তা পুণ্যযুক্ত হইয়া উঠে। বোধ করি শ্রীমন্তের সেই অন্তরাত্মার ক্ষুধা পাইয়াছিল, সে পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া যখন উঠিল তখন দেখিল কিছু গুরু ভোজন হইয়া গেছে, ক্ষুধার তাড়নায় মাত্রা বজায় থাকে নাই।

রামদাস কহিল "এই ঘরে আপনি নেয়ে নিয়ে গা গড়ান, আমি একটু আগুণ আনি।"

শ্রীমন্ত গৌরীকে তুলিয়া কম্বলটা লইয়া ঘরে পাতিয়াই গড়াইয়া পড়ে। পরিশ্রমের পর পরিচর্য্যায় মানুষের অবসাদ ঘন আসন্ন হইয়া উঠে।

রামদাস আসিয়া হুকাটা আগাইয়া দিয়া কহে, "টানুন।"

তারপর সে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে অপর হাতখানি বাহির করিয়া কহে—"দেখুন, সেবা করেন? শরীরটা একটু গরম হবে।"

শ্রীমন্ত চাহিয়া দেখে গাঁজা, সে এবার বেশ সজাগ হইয়া উঠে, রামদাস গাঁজার কলিকাটা মাটীতে বসাইয়া আধ-তৈয়ারী গাঁজাটা শ্রীমন্তের হাতে দিয়া টিকা ধরাইতে বসে।

শ্রীমন্ত এবার ভক্তিমন্ত হইয়া উঠে,—এই জিনিষটুকুর সত্যই তাহার পরম প্রয়োজন ছিল।

কলিকায় গাঁজা জড়াইয়া শ্রীমন্ত রামদাসের দিকে আগাইয়া দিতেই সে জোড়হাত করিয়া কহিল—

"মার্জ্জনা করবেন, আমি ও পান করি না। আপনি সেবা করুন।"

শ্রীমন্তের চোখ দুটা বড় হইয়া উঠে, সে কহে—"তবে"। রামদাস হাত কচলাইতে কচলাইতে পরম বৈষ্ণব বিনয় সহকারে কহে—"আজ্ঞে ওস্তাদের মুখে শুনলাম কিনা যে নিয়মিত পান আপনার অভ্যাস—তাই।"

শ্রীমন্ত কলিকাটায় টান মারিতে মারিতে বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে শোনে; সত্যই রীতিমত ভক্তির পাত্র রামদাস, প্রায় দাতাকর্ণের সমতুল্য।

রামদাস কহে—"ওস্তাদ আপনার একবার আমাদের হয়েই ওপাড়া গেলেন সেই কন্যাটীর বাড়ী, বেশ বক্তা লোক, ধরুন এই রাতেই ত বিয়ে ঠিক করতে হবে।

শ্রীমন্ত একটা পুরা দম লইয়া পরম তৃপ্তির সহিত ঢুলিতে ঢুলিতে রহিয়া রহিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

রামদাস হাসিয়া কহিল—"ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস—তাই হয়েছে আমার;—নইলে দেবদুল্লভ দ্রব্য।"

শ্রীমন্তের আনন্দটা বেশ ঘনীভূত হইয়া উঠে, সে পরম আনন্দে গান ধরিয়া ফেলে—

ও গাঁজা তোর পাতায় পাতায় রস
গাঁজা খেয়ে পাগলা ভোলা কালিমায়ের বশ।

পুনরায় সে একটা প্রাণ ভরিয়া দম দিল। রামদাস কি বলিয়া যায়, সে কথাগুলা আর তাহার কানে ভাল যায় না, দেহের অবসাদও যেন বড় আসন্ন হইয়া হইয়া উঠে, সে চোখ মুছিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে একহাতে বিছানা হাতড়াইতে লাগিল আর আপন মনেই বিড়বিড় করিয়া কহিল— "গৌরী, গৌরী, বালিশটা দেত মা, বা-বালিশ।"

রামদাস হাঁ হাঁ করিয়া ঠোঁটে তালুতে আক্ষেপের চুক্ চুক্ করিয়া শ্রীমন্তকে সজাগ করিয়া কহে—"চু, চু, জিনিষটা মাটী হ'ল, আছে আছে আরও একটান দিব্যি হবে।"

শ্রীমন্ত চকিত হইয়া কলিকাটা বাগাইয়া ধরিয়া টান দিতে দিতে কহিল—"এসা বিয়ে এবার দোব গৌরী-মার—, সেই

গৌরী বেটী কনে, শিবে বেটা বর, ঝুম কুড়া কুড়"—বাকিটা মুখেই রহিয়া গেল. শ্রীমন্ত কলিকা হাতেই ঘরের মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িল।

রামদাস কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ঈষৎ একটু হাসিয়া গাঁজার কলিকা আগুণ, সাবধান করিয়া দরজাটা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই হরিলাল পাশ হইতে বাঁকা বকের মত গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে—"ফেলাট হো গিয়া ?

রামদাস কহে—"হবে না ? ছুটী ইয়া বড় সুপক্ক ধুত্‌রার বীজ মিশ্রিত করে দিয়েছি। কাল সূর্য্যাস্তর পূর্ব্বে বোধ হয় আর চৈতন্য—বলিয়া বেশ মৃদু গম্ভীর ভাবে 'না' র ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া কথা শেষ করিল।

হরিলাল কহিল—"এইবার তা হ'লে মেয়েটাকে—"

রামদাস কহে—"হ্যাঁ।"

* * * *

শেষ রাত্রে একটা প্রবল গর্জ্জনে শ্রীমন্ত চমকিয়া জাগিয়া উঠিল ;—মাথার ভিতরটা কেমন ঝিম ঝিম করে, বাহিরের বর্ষণ-শব্দ, বাতাসের হু হু রব কানের মধ্যে আসে, কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে সে শব্দের অনুভূতি যেন তন্দ্রা-ঘোরে ;—তন্দ্রাটা আবার ধীরে ধীরে গভীর হইয়া আসে, সে পাশ ফিরিয়া আরাম করিয়া শোয়।

সহসা বর্ষণ-বাতাসের শব্দ ছাপাইয়া একটা উচ্চ সুডৌল তীক্ষ্ণ শব্দ ভাসিয়া উঠে, শঙ্খ-ধ্বনি ! আবার, আবার !

সঙ্গে সঙ্গে নারী-কণ্ঠের হুলুধ্বনি। সমবেত শব্দে আচ্ছন্ন মস্তিষ্ক সজাগ হইয়া উঠে, শ্রীমন্তের এবার সব মনে পড়িয়া যায় ; ওঃ, এদের বিবাহ তাহা হইলে হইতেছে ; সে তাড়াতাড়ি গৌরীকে কোলের কাছে টানিয়া লইতে হাত বাড়ায়, হাত পড়ে মাটীতে ; এ পাশ, ও পাশ, এযে সকল পাশই খালি, গৌরী নাই !

মুহূর্ত্তে একটা সন্দেহ তাহার অবসাদ-আচ্ছন্ন মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যুতের মত চিড় খাইয়া জাগিয়া উঠে, সে-বিদ্যুতের আগুনে, তাহার মস্তিষ্কের উপর আচ্ছন্নতার যে একখানি আবরণ ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। সে লাফ দিয়া উঠিয়া গিয়া দরজাটা সবলে টানে ; বাহির হইতে দরজা বন্ধ !

নির্ম্মম নিষ্ঠুর বঞ্চনার ক্ষোভে মানুষের জাগে উন্মত্ত প্রতিহিংসা, সে-প্রতিহিংসায় মানুষের ভিতরের সকল আবরণ ঝাড়িয়া ফেলিয়া পশুত্ব যে দুর্নিবার ক্রোধে ও উন্মত্ত-আত্মহারা শক্তিতে জাগিয়া উঠে, সে ক্রোধের সময় সমস্ত ভুলিয়া, এমন কি নিজের জীবনের উপরে পর্য্যন্ত মানুষের মমতা থাকে না, তখনকার শক্তি মানুষের বিস্ময়ের বস্তু !

সেই শক্তি তখন শ্রীমন্তের পাথরের-মত দেহে ক্রিয়া করিতেছিল, তাহার কাছে ঐ পল্‌কা দরজা জোড়াটা কতক্ষণ ! বিপুল শক্তিতে চাড় খাইয়া দরজার কপাট শিকলের গোড়ায় ফাটিয়া গেল, আর এক আকর্ষণে কপাটখানা হইয়া গেল দুভাগ, আর শিকলটাও খসিয়া গেল।

আপন লাঠী-গাছটা কুড়াইয়া লইয়া শ্রীমন্ত চলিল ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়া—দ্রুত, দৃঢ়, অথচ নিঃশব্দ পদ-ক্ষেপে।

এক পাশে একটা আলোকের ধারা দেখা যায়, শব্দগুলাও ঠিক ঐ দিকে, শ্রীমন্ত দেখিল সেইটাই বাড়ীর ভিতরের বাহির দরজা, ঐখান হইতে সমস্তই দেখা যাইতেছিল,—

সম্মুখেই উঠানের উপর ঘরের বারান্দায় বিবাহের মণ্ডপ : ওপাশে বসিয়া বর, সম্মুখের আলো পড়িয়াছে তাহার মুখের উপর, কালো কদাকার চেহারা,—কি বীভৎস, চক্ষুদুটীর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, আছে শুধু জলসিক্ত দুটী পঙ্কিল গহ্বর, তাহাতে অনর্গল মৃদু জলধারা গড়ায় ; আর ঐ যে তাহারই পাশে বসিয়া লাল-চেলীতে মোড়া ঘুমন্ত গৌরী, তাহার ছোট হাতখানি ওই অন্ধের হাতের উপর ধরিয়া আছে হরিলাল ; শীর্ণ ক্রুর মুখে তাহার হাসির রেখা, বোধ হয় ওপাশের কুটুম্বগণের সঙ্গে পরিহাস চলিতেছিল।

শ্রীমন্তের স্তম্ভিত কণ্ঠ হইতে বাহির হইল একটা অদ্ভুত শব্দ, রোষ ও রোদনে জড়িত একটা অভিব্যক্তি, ঠিক যেন আঘাতে মরণোন্মুখ দুর্দ্দান্ত পশুর ক্রোধ ও যাতনার গর্জ্জন !

ঐ শব্দে হরিলাল চমকিয়া কন্যার হাত ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; অভিপ্রায় ছিল তাহার পলাইবার।

কিন্তু সম্মুখেই তখন শ্রীমন্ত, সে তাহার হাতের লাঠী ওই নিষ্ঠুর হৃদয় হীন পিতার মাথায় নির্ম্মম ভাবেই বসাইয়া দিল।

চারিদিক হইতে একটা কলরোল উঠিল……

শ্রীমন্ত তখন আবার লাঠী উঠাইয়াছে ওই কদাকার, চক্ষুহীন, নিরীহ জীবটীর উপর ; গৌরী সে কলরোলে জাগিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"মামা-গো

আর ঐ কদাকার চক্ষুহীন ছেলেটা চঞ্চল অবস্থায় অসহায়ের মত দৃষ্টিহীন চক্ষু লইয়া চারিদিকে চাহিল।

শ্রীমন্তের হাতের লাঠি অবশ হইয়া গেল, গৌরী বিধবা হইবে! হায় আর ঐ অসহায় জীবটারই বা কি দোষ!

*　　*　　*　　*

গিরি সেই দাওয়াতেই বসিয়াছিল।

সকল ভাবনা তাহার ডুবিয়া গিয়াছে, সে ভাবিতেছিল শুধু, তাহার যাহা আছে তাও কি যাইবে? ওই দুর্দ্দান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকটিকে তাহার চেয়ে ত কেউ বেশী চেনে না; সে ত জানে ঐ লোকটির কি শক্তি; তাহারই প্রাণের আবরণে না হয় সে দুর্দ্দান্ত শান্ত হইয়া আছে, কিন্তু আজ যখন তাহারই হাত ছাড়াইয়া তাহার মমতার সকল আবরণ ছিন্ন করিয়া উন্মত্তের মত সে ছুটিয়াছে, তখন যে সে কি করিয়া ঘর ফিরিবে, সে ত গিরির চোখের উপরেই ভাসিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া যাইতেছিল:—হয় খুন করিয়া ফিরিবে, নয় খুন হইয়া থাকিবে, রক্তাক্ত শ্রীমন্ত তাহার চোখের উপর বিভীষিকার মত নাচিতেছিল।

ভোরের আলো তখন ফুটি ফুটি করিতেছে—

গিরির সারা রজনীর জাগ্রত স্বপ্ন বাস্তব হইয়া ঘরে ফিরিল। রক্তাক্ত দেহে শ্রীমন্ত আসিয়া লাঠীগাছটা ফেলিয়া দিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া কহিল—"খুন করেছি চণ্ডালকে।"

গিরির মুখে বাক্য সরিল না, কপালে করাঘাত করিতে তাহার হাত উঠিল না, তাহার কণ্ঠ হইয়া গেছে মূক, অঙ্গ হইয়া গেছে অসাড়, মাটীর মূর্ত্তির মত বসিয়া সে ভাবিতেছিল একটা কথা—

—তারপর!

শ্রীমন্তই কথা কহিয়া যাইতেছিল, এবার তাহার কণ্ঠ ভাঙিয়া গেল, চোখে জল;—"সোনার প্রতিমেকে আমার মরণের হাতে তুলে দিলে গিরি, দেখনি তুমি, সে পাত্র ত নয় যেন জ্যান্ত মরণ। সব অন্ধকার তার।"

আবার ক্ষণেক পরে আক্রোশ-ভরা কণ্ঠে কহে—"মেয়ে বেচে টাকা নেওয়ার সাধ তার মিটিয়ে দিয়ে এসেছি।"

এতক্ষণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সকরুণ তিরস্কারের সুরে গিরি কহিল—"তারপর?"

এখনও তার পরের ভাবনা শ্রীমন্তের মনে জাগে নাই, সে কহে—"তারপর আবার কি? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—"

গিরি কহে—"সে ফল ত তুমি ভোগ করবে ফাঁসীকাঠে, আর আমি—"

সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শ্রীমন্ত গুম্ হইয়া গেল, এতক্ষণ পরে 'তারপরে'র ভাবনাটা বুঝি সে ভাবিতে বসিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গিরি উঠিয়া কাপড়, গামছা, ঘটীতে জল লইয়া কাছে দাঁড়াইয়া কহিল—"নাও, হাত মুখ ধোও, কাপড় ছাড়—"

শ্রীমন্তও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"থুই, ছাড়ি।" শিথিল হস্তে গিরির হাত হইতে ঘটীটা লইতে লইতে শ্রীমন্ত আবার কহিল—"আচ্ছা ওই কানার হাতেই যদি পড়বে, তবে ভগবান আমার গৌরী-মাকে এমন সুন্দর ক'রে কেন গড়েছিল বল দেখি?"—বলিয়া সে গিরির মুখের পানে চাহিল।

গিরি রুদ্ধকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"ব'লো না, ব'লো না, তার নাম আমার কাছে ক'রো না, তার বিচার নাই, বিচার নাই।"

*　　*　　*　　*

গিরির ভোরের কল্পনাও সফল হইল—

বৈকালের দিকে থানাপুলিশে ঘর ভরিয়া গেল, সঙ্গে রামদাস, আর মাথায় ফেটা-বাঁধা হরিলাল।

শ্রীমন্তের হাতে দড়ি পড়িল, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ 'হত্যার চেষ্টা, কন্যা রাহাজানির চেষ্টা, চুরি, আরও তিন চারিটা,' ফৌজদারী ধারার ধারা আর শেষ হয় না। অভিযোগের ফিরিস্তি শুনিয়া শ্রীমন্ত অবাক হইয়া উপরের পানে চায়। অনন্ত শূন্যতায় ভরা আকাশ, কিন্তু ঐখানেই মানুষের প্রাণ-ঢালা অহেতুকী বিশ্বাস, দুঃখে ঐখানে চোখ রাখিয়া সে বেদনা জানায়, আশ্বাস চায়, মর্ম্মদাহী শোকে ঐ আকাশপানে উদাস মনে চাহিয়া সান্ত্বনা চায়, সবলের অত্যাচারে দুর্ব্বল ঐ আকাশপানে চাহিয়া প্রতিকার চায়, ভক্তি জানায়, মার্জ্জনা চায়, কিছু পায় কি না কে জানে কিন্তু মানুষ চিরদিন ঐ শূন্যতার মাঝে পূর্ণ কাহাকেও খোঁজে; আজও খোঁজে, বিশ্বাসীও খোঁজে, অবিশ্বাসীও দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আকাশপানেই চায়।

হরিলাল ফেটা-বাঁধা মাথাটাই দোলাইয়া কহিল "কেয়া চাঁদ, ঘুঘু দেখা হ্যায়, লেকিন ফাঁদ দেখা নেই; আব দেখো ফাঁদ সোনার চাঁদ।"

গিরি কিন্তু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, হরিলাল মরে নাই।

দশ

তারপর নবযুগের ন্যায়পর্ব্ব বা মামলা অধ্যায়।

এই পর্ব্বে উচ্ছ্বাস নাই, হাস্য-পরিহাস নাই, আছে শুধু হিমশীতল মস্তিষ্কের কূট কৌশল, চিন্তাকুল দৃষ্টি, আর একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য। আর আছে ন্যায়প্রার্থীর একটা উদ্বেগপূর্ণ উত্তেজনা, পরাজয়ে হ্রাস পায় না, জয়ে আশা মেটে না। আর দেখা যায় এখানে অর্থের শক্তি, বোঝা যায় বাক্য ব্রহ্ম—সে সত্যই হৌক আর মিথ্যাই হৌক, সুসংলগ্ন দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করিলেই এ পর্ব্বে জয়। শ্রীমন্ত মোক্তারের বাক্যের শক্তিতে তখনকার মত জামিনে খালাস হইয়া ফিরিল।

তারপর দিনের পর দিন পড়ে, সদরে উকীল মোক্তারের ঘটা বাড়ে, আর বাড়ীতে ঘড়া, ঘটী, তৈজসপত্র, গিরির গায়ের রূপা, কাঁসা, পিতল একে একে নিঃশেষ হইয়া যায়।

দিনের পর দিন শ্রীমন্ত বাড়ী ফিরিয়া আসে একটা উদ্বেগ-পূর্ণ উত্তেজনা লইয়া, মামলায় জয় অনিবার্য্য, তবে খরচ করা চাই, আর সাক্ষী তৈয়ারী করা চাই; উকীল বলিয়াছে, ন্যায়ের বিধানে লেখা আছে। হায়রে ন্যায়! সে ওই কথা ভাবে, ঐ সে স্বপ্ন দেখে, তাহার কথার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া ওই বস্তুটুকু।

উদ্বিগ্না গিরি হাত পা ধুইবার জল দিয়া জিজ্ঞাসা করে, "কি হ'ল আজ?"

—"দিন প'ড়ল, ফের পনর দিন পর।"

—"আবার দিন প'ড়ল।" উদ্বেগে গিরি মরিয়া যাইতেছিল, —তার ভবিষ্যৎ ত' নাই, বর্ত্তমানও বুঝি অতলে তলাইয়া যায়।

শ্রীমন্ত কহে—"আরে একি ভাতের গেরাস, যে মুখে হয়ে গেল, বাস, একটা একটা কথা ধরে এর জেরা কত, তকরার কত? আজ শালাদের সাক্ষী একটাকে, বুঝেছ, যা নাজেহাল করেছে উকীল, হা, হা, হা, বেটা কিন্তু সত্যি কথা বলেছিল, আমি তাকে শুধিয়েছিলাম রামদাস ঘোষের বাড়ীটা কোথা হে, শুদোন আমার বটে। আমার উকীল ধরলে টুটী চেপে, তুমি নেশা কর? বেটার দুর্ম্মতি, বেটা বলে 'না'; অঃ—আমার উকীলের চোখ কি খর, বল্লে দেখি তোমার হাত, হাঁ হাঁ বাঁ হাত, ব্যাস হাত পাততেই যায় কোথা, হাতের তেলো হলদে; অমনি ধরে শুঁকে বল্লে, এঃ এখনো গাঁজার গন্ধ বেরুচ্ছে, আর তুমি বলছ, না, দেখুন হুজুর দেখুন, আর বুঝলে কিনা কোর্ট শুদ্ধ একেবারে কে কার গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাকিম মুখে রুমাল দিয়ে হাসে।"

গিরির বোধ করি ভাল লাগে না, সে বুঝিতে পারে না ঐ ব্যক্তিটীর গাঁজা খাওয়ার জন্য স্বামীর অপরাধ লঘু হইল কেমন করিয়া, সে কহে—"ভাত দিই খাও।"

পা মুছিতে মুছিতে শ্রীমন্ত কহে—"দাও।"

খাইতে খাইতে শ্রীমন্ত আপন মনেই কহে—"কিচ্ছু হবে না, মামলায় কিছু নাই, আর ওদের সাক্ষীগুলো সব গোবর গুলছে, আর এক বেটাকে, বুঝেছ, সে বেটা আমার সেই চাদর খানা, যে খানা ফেলে এসেছিলাম সেই খানা দেখে বল্লে, হ্যাঁ এই চাদর গায়ে দিয়ে আসামী ঘোষের বাড়ী এসেছিল, আমি দেখেছিলাম, আমার উকীল উঠেই তাকে ধরলে—তুমি কি খোঁড়া?

—"আজ্ঞে না—"

—"তবে তুমি খোঁড়াচ্ছ কেন?"

—"আজ্ঞে পা কেটেছে।"

—কিসে, জুতোতে বুঝি?

সে আর কথা কয় না, উকীলও ছাড়ে না, জেরা কল্লে, "নতুন জুতায় পা কেটেছে বুঝি?"

সে কথা কয় না, তখন উকীল কসে এক ধমক, তখন বলে—"হ্যাঁ, আজই নতুন কিনেছি আমি।"

উকীল ধল্লে—"হরিলাল দিয়েছে, না রাম ঘোষ?"

লোকটা যা হোক চালাক, বল্লে, "আমার শ্বশুর দিয়েছে।"

যাক্, শেষটা লোকটা সেরে নিয়েছে।

গিরির একটা ঘৃণা ধরিয়া যায়, ইহার কোথায় কৌতুক, আস্ফালনের ইহাতে কি আছে তাহার সরল নারী-মন খুঁজিয়া পায় না। ইহাই ত শুধু নয়, ইহার পর আরও আছে অর্থের ব্যবস্থা। সম্বল ত' আর কিছু নাই, শ্রী-গিরি বাকুড়ি বেচাইয়া গেছে, মহাজন সমগ্র জমিতে ক্রোক গাড়িয়া বসিয়া

আছে, ঘরের তৈজস গেছে, আছে পরের অনুগ্রহের উপর ধার, দেহে খাটিয়া শোধ দিতে হইবে, তাও লোকে দেয় না; আর আছে বঞ্চনায় লওয়া বা লইয়া বঞ্চনা করা। সাদা স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে যাহা চুরি বা পরস্ব আত্মসাতের প্রবৃত্তি।

ওটা বোধ করি দুনিয়াশুদ্ধ মানুষের মনে থাকে, নতুবা মানুষের আশ মেটে না কেন? মানুষত বোঝে, অপরের না লইলে তাহার ভাগ মোটা হইবে না, তবু লালসা তাহার মেটে না কেন? এই লালসাই ঐ চুরি বল পরস্ব আত্মসাৎ বল ঐ প্রবৃত্তিটার উপাদান। লালসা যার আছে, ঐ ইচ্ছাও তার আছে, তবে শিক্ষায়, সংযমে, স্বচ্ছলতায় মানুষ তাহার উপর একটা কঠিন আবরণ রচনা করিয়া ওগুলাকে সমাধিস্থ করিয়া দেয়। কিন্তু ক্ষুধার আগুণ যখন প্রচণ্ড রূপে জ্বলিতে সুরু করে, তখন অধিকাংশ লোকেরই সে অগ্নিশিখায় ঐ আবরণ একদিক হইতে ছাই হইতে থাকে আর প্রবৃত্তিও ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, তাই অভাবে স্বভাব নষ্ট, তাই দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।"

তাহার উপর পূর্ব্ব-পুরুষের প্রকৃতির ধারা নাকি রক্তের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। শ্রীমন্তের বাপের এ প্রবৃত্তি ছিল, হরিলালের গুরুগিরিতে দিয়াছিল ছেলেকে এই বিদ্যা খানিকটা শিখিতে। তখন শ্রীমন্ত পারে নাই, পারিল আজ, চারিদিক হইতে চাপিয়া ধরিয়া দুনিয়া তাহাকে এ বিদ্যা বেশ ভাল করিয়াই শিখাইল, চর্চ্চায় চর্চ্চায় কয়েক মাসের মধ্যেই শ্রীমন্ত বাপ গুরুর উপরে চলিতে সুরু করিল।

কিন্তু প্রথম যেদিন সে প্রতিশ্রুতি দিয়া বঞ্চনা করিয়া আসে, সে দিন সে সত্যকার হাসিমুখে পারে নাই, তবু ঠোঁটে হাসি মাখিতে হইয়াছিল, কেমন করিয়া যে হাসি আসিয়াছিল তাও সে জানে না, তবে আসিয়াছিল।

বিপিন শ্রীমন্তের প্রতিবেশী, বাল্যসাথী, এক সঙ্গে হরিলালের আড্ডায় গাঁজা খাইতে শিখিয়াছিল, মামলার দিন শ্রীমন্ত তাহাকে গিয়া ধরিল—"বিপিন দাদা, আজ ভাই আমাকে রাখতেই হবে, দশটা টাকা আজ দিতেই হবে।"

বিপিন কহিল—"তাই ত শ্রীমন্ত, আমার কাছে ত নাই।"
শ্রীমন্ত বিপিনের পা দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দোহাই দাদা!"

ভগবানের কৃপায় বিপিনের স্বচ্ছলতা ছিল বেশ, লোকটাও ছিল মন্দ নয়, সে বাল্যসাথীর এই পায়ে ধরায় তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিল না, দশটা টাকা সে শ্রীমন্তের হাতে দিয়া কহিল—"দেখিস্ ভাই।"

শ্রীমন্ত তাহাকে অধিক কথা কহিতে দিল না, তাহার বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই, তাহার বক্তব্য দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল; আপনি কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়া গেল জিহ্বায়—"দেখো তুমি দাদা, এই দিন চার পাঁচ, পাঁচদিনের বেশী হয়ত তুমি আমাকে ব'লো, আর এক মাঘে ত শীত পালায় না দাদা। না দিই ত জুতো মেরো তুমি রাস্তায় ধরে, ব'লো তোর জাতের ঠিক নাই।"

প্রতিশ্রুতি পালন করিবার অভিপ্রায়ও তাহার ছিল। কিন্তু গরীবের ইচ্ছায় সংসার চলে না, পাঁচ দিনের দিন বহু চেষ্টাতেও কোথাও কিছু মিলিল না।

সে সন্ধ্যায় বিপিন আর আসিল না; শ্রীমন্ত হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। পরদিন ভোরে শ্রীমন্তের মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিতে বিপিনের সহিত দেখা হইয়া গেল, লজ্জিত মন অতি লজ্জা পাইবার আশঙ্কায় বিপিন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই আবার মিথ্যা কথা কহিয়া বসিল—"এই যে দাদা, কাল ফিরতে বড় রাত হ'য়ে গেল—হেঁঃ—হেঁঃ—বলিয়া দাঁত মেলিয়া দিল।"

কেমন করিয়া যে সে হাসিল নিজেই বুঝিল না।
বিপিন ভদ্রতা করিয়া কহিল—"তা বেশ তা বেশ।"

কয় পা আসিয়া তবে শ্রীমন্তের বুকের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিল, সেদিনও বিপিন আসিল না, পরদিন সুশৃঙ্খলে সুকৌশলে সে বিপিনকে এড়াইয়া চলিল, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় বিপিন নিজে আসিয়া শ্রীমন্তের দরজায় হাঁক দিল—"শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত!" শ্রীমন্ত ঘরের মাঝে লুকাইয়া বসিয়া রহিল, সাড়া দিল না;—

গিরি কহিল—"সাড়া দাও না—"
শ্রীমন্তের মাথার বোধ করি ঠিক ছিল না, সে ঝাঁঝিয়া উঠিল—"টাকা দিবি তুই? সাড়া দাও না, এ্যাঁ—"

গিরি ব্যথিত বিস্ময়ে স্বামীর পানে তাকাইয়া দেখিল।

অন্ধকার গৃহকোণে বসিয়া শ্রীমন্ত কি ভাবিতেছিল কে জানে, কিন্তু চোখ দুইটা অস্বাভাবিক দীপ্ত, জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল, বোধ হয় তীব্র দৃষ্টি হানিয়া ধরণীর বক্ষ ভেদিয়া খুঁজিতেছিল, কোথায় ধনরত্ন লুকান আছে, আঃ, কাল যদি সে মাটী খুঁড়িয়া টাকা পায়, লাখ লাখ টাকা, রাশি রাশি ধন, আঃ! দরিদ্রের বুভুক্ষা এমনি উদগ্র আর এমনি অক্ষমই বটে!

(ক্রমশঃ)

গ্যেটে শতবার্ষিকী

—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ্চ গোটে ভাইমারের বাসভবনে বিশ্রাম-কেদারায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর অন্তিমের একমাত্র কথা "আলো আরো আলো" আজ দেশ-বিদেশের লোকে জানে। এই উক্তিটিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন-ভাবে ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে—কেউ ব'লছেন একথা গোটে নিতান্ত সাধারণ ভাবেই ব'লেছেন, আর পাঁচজনের মতো আসন্ন মৃত্যুর মুখে তাঁরও হয়ত আসন্ন অন্ধকার দেখে অধিকতর আলোকের প্রয়োজন হ'য়েছিল; কেউ ব'লেছেন গোটের মত মনস্বী অবশ্যই একথা কোন তাত্ত্বিক অর্থে ব্যবহার ক'রে থাকবেন—এ আলো সাত্ত্বিক পূর্ণতা অথবা তজ্জাতীয় কোন পদার্থ হওয়াই স্বাভাবিক। সুদীর্ঘ পার্থিব জীবনের পর নূতনতর লোকে যাত্রার পথে একটি সুন্দর সমাহিত আলো তাঁর প্রয়োজন হ'য়েছিল কিনা কে বল্‌তে পারে?

বস্তুতঃ এ কথার তাৎপর্য্য নিয়ে মতভেদ যাই থাক্, গোটের প্রতি সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা যে আজও অটুট্ র'য়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর শতবার্ষিক স্মৃতি-দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সম্মিলিত শ্রদ্ধা-নিবেদনে। এক কথায় গোটে ছিলেন সার্ব্বভৌম ধরণের মানুষ—তাই শুধু কবি বা সাহিত্যসেবী নয়, যে কোন অবস্থায় যে কোন উপজীবিকার লোকই তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের জন্য সমবেত হ'য়েছেন। এই খানেই কবির এবং কাব্যসৃষ্টির সত্যকার সার্থকতা—সেই সার্থকতা গোটের ছিল; তাই জার্ম্মানীর সঙ্কীর্ণ সীমারেখা তাঁকে একান্ত ভাবে আত্মসাৎ ক'রে নিতে পারেনি।

কবি ও দার্শনিক গোটে

রস-দৃষ্টি এবং দার্শনিক-দৃষ্টি উভয়ের মূলেই প্রগাঢ় অনুভূতি থাক্‌লেও প্রকারভেদে এরা বিভিন্ন—কদাচিৎ এই দুই বিরুদ্ধ দৃষ্টির একত্র সমাবেশ দেখা যায়, এবং দেখা গেলেও উভয় শাখারই সমান প্রাধান্য প্রায়ই থাকে না। কিন্তু গোটের ক্ষেত্রে এই অদ্ভুত যোগাযোগ ঘ'টেছিল—তিনি যত বড় দার্শনিক ছিলেন কবি হিসাবে তার চেয়ে কম ছিলেন না এবং এই দুইটি ধারাই তাঁর জীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে কোনটার থেকে কোনটাকে পৃথক ক'রে দেখা যায় না। তাঁর একটা অতি সরল অনাড়ম্বর গীতি-কবিতার মধ্যেও প্রগাঢ় দার্শনিক চিন্তার ছাপ প'ড়েছে, আবার নীরস দার্শনিক তত্ত্ব-কথাকেও তিনি শিল্পনৈপুণ্যে অপরূপ ক'রে তুলেছেন।

যে পৃথিবীর বুকে তিনি জন্মেছিলেন সমগ্র ভাবে তার স্বরূপকে হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌বার মতো মানসিক শক্তি গোটের ছিল। এদিক দিয়ে এরিষ্টটলের সঙ্গে তাঁর মিল দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু উভয়ের অবলম্বিত পথের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। ন্যায়শাস্ত্রের ধরাবাঁধা পথে গোটে কোন দিন হাঁটেন নি—তাঁর অন্তরের সুতীব্র অনুভূতি দিয়েই তিনি দুনিয়াকে দেখেছেন। এই জন্য দর্শন শাস্ত্রের নিরূপিত গণ্ডী দিয়ে তাঁকে বাঁধা অসম্ভব। তিনি স্পিনোজা, লাইবিনিজ, সেলিং বা কাণ্টের দর্শন পাঠ করেন নি তা নয়, কিন্তু দার্শনিক জ্ঞান অর্জ্জন ক'র্‌বার বাসনাতেই দর্শনের অনুশীলন তিনি করেন নি—তিনি স্বভাবতই দার্শনিক দৃষ্টি নিয়ে জন্মেছিলেন। তাঁর এই যুগপৎ কবি ও দার্শনিক দৃষ্টি সম্পর্কে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কোয়েনিস্‌বরোর এক সভায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হেলম্‌হোট্‌স্ বলেছিলেন,—"a man whose remarkable mental endowments or whose singular capacity for seeing through whatever obscures reality, the world has had occasion to recognise not only in poetry, but also in the descriptive poets of natural sciences"

গ্রীক্ আদর্শে গোটে

সর্ব্বতোমুখী জ্ঞানে, চিন্তার প্রগাঢ়তায়, জাগতিক ব্যাপারের অভিজ্ঞতায় সর্ব্বোপরি সৌন্দর্য্য-প্রীতিতে গোটে অনেকটা প্রাচীন গ্রীক্‌দের অনুগামী ছিলেন। অবশ্য তাঁর সৌন্দর্য্য-প্রীতি কেবল গ্রীক্ শিল্প বা রেনেসাঁসের শিল্পেই নিবদ্ধ ছিল না – লাইপ্‌জিগের সপ্তদশ বর্ষীয় তরুণ ছাত্র রূপে ক্যাথেন্ কোল্‌-

কেপ্‌কে ভালবাসা থেকে শুরু ক'রে পূর্ণ একাত্তর বৎসর বয়সে উল্‌রিক্ ভন্ হেডেট্‌জোকে ভালবাসার মধ্যে পর্য্যন্ত আমরা তাঁর এই সৌন্দর্য্য-প্রীতিরই পরিচয় পাই। তাঁর চরিত্রের এই অসাধারণ মনুষ্যত্বই তাঁকে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের কাছে এতটা শ্রদ্ধার্হ ক'রেছে ব'লে মনে হয়, সার্‌লটি ভন্ ষ্টেনের উদ্দেশ্যে যিনি অমন অপূর্ব্ব প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্র লিখতে পেরেছিলেন, বার্দ্ধক্যের প্রান্ত সীমায় উপনীত হ'য়ে পর্য্যন্ত যিনি মুরেনী ভন্ উইলেমরকে প্রেম-কাব্য নিবেদন ক'র্‌তে পেরেছিলেন, তাঁকে মানুষ হিসেবে মানুষ চিরদিন ভাল না বেসে পারে না—তাঁর সৌন্দর্য্য-বোধ শুধু অন্তর্জ্জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মনে প্রাণে তিনি ছিলেন সৌন্দর্য্যের পূজারী, কবি। তাই বাহিরের সৌন্দর্য্যকেও তিনি উপেক্ষা ক'র্‌তে পারেন নি। নারী এবং শিশুর সৌন্দর্য্য তাই তাঁকে যুগপৎ মুগ্ধ ক'রেছে।

গ্যেটে ও ফাউষ্ট্

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" গ্যেটের এই ছিল জীবনের মূল মন্ত্র। সুতরাং তাঁর প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান 'ফাউষ্ট' নাটকে যে মানব-জীবনের প্রত্যেকটি স্তর এমন সুন্দর রূপে চিত্রিত হ'য়েছে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। গ্রেচীনের চরিত্রে তাই আমরা কেবল একটি জার্ম্মান বালিকার সাক্ষাৎ পাই নে—চিরন্তন নারীর একটি বিশিষ্ট বিকাশকে কেন্দ্র ক'রেই চরিত্রটি ফুটে উঠেছে। এই মহা নাটকের শেষ দৃশ্যে তাই আমরা দেখি গ্রেচীন্ সর্ব্বজয়ী প্রেমের মহনীয় প্রভাবেই যত কিছু দোষ, ত্রুটি, মালিন্য মুক্ত হ'য়ে সার্থক হ'তে পেরেছে।

গ্যেটের সমালোচকরা অনেকেই অভিযোগ এনেছেন যে গ্যেটে নাটকের সূচনায় যে মতবাদ নিয়ে আরম্ভ ক'রেছিলেন পরিণতির মুখে তা গ্যেটের হাতের বাইরে চ'লে গেছে—তিনি তাঁর অবলম্বিত পথ ছেড়ে ক্রমে নাকি ক্রিশ্চিয়ান্ ধর্ম্মশাস্ত্রের দিকে ঢ'লে পড়ছিলেন। কারণস্বরূপ তাঁরা অনুমান ক'রেছেন এর মূলে হয়ত ইটালীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব কিংবা হয়ত বা নাটকের একটি সুশৃঙ্খল উপসংহার দেবার অদম্য লোভ এমনি কিছু থেকে থাকবে! মেফীষ্টোফিলিসের প্রতি কবির সহানুভূতি বরাবর থেকে গেছে, যাতে মনে হয় শেষ পর্য্যন্ত যেন জয় হ'ল তারই। এই সম্পর্কে এক্কারম্যান্‌কে লেখা গ্যেটের একখানি চিঠি থেকে জানা যায়, গ্যেটে এই কাব্যে কোন 'থিওরি' বা মতবাদকে প্রাধান্য দিতে চেষ্টা করেন নি—রসসৃষ্টিই ছিল তাঁর আসল লক্ষ্য। তাই রস-সৃষ্টির অনুকূল অলঙ্কার ও উপমার আশ্রয় তাঁকে নিতে হ'য়েছে। জার্ম্মানীতে 'ফাউষ্ট' কাব্যের যে সমস্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা হ'য়েছিল তার উল্লেখ ক'রে স্বয়ং গ্যেটে লিখেছেন—জার্ম্মান একটা অদ্ভুত জাতি। এরা যে-কোন জিনিসের ভেতর থেকেই একটা গূঢ় গভীর কিছু টেনে আন্‌তে চায়, তাই সহজ ভাবে কোন জিনিষের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা তাদের সাধ্যাতীত; এ দ্বারা এরা জীবনকে কেবল পঙ্গুই ক'রে ফেল্‌ছে।"

গ্যেটে ও বেটোভেনের মিলন

গ্যেটে ও বেটোভেনের মতো দুটি বিরাট প্রতিভার মিলন হ'য়েছিল কি ক'রে তা জানবার কৌতূহল অনেকেরই থাকা স্বাভাবিক। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ব্যাপারটা ঘ'টেছিল ঠিক সরস বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে নয়, একটু রেষারেষির মধ্য দিয়েই। বেটোভেন্ তাঁর স্বরচিত একটি Symphony পিয়ানোতে বাজাচ্ছিলেন, সুরের লীলায়িত ভঙ্গী, তার সকরুণ মূর্চ্ছনা, গ্যেটেকে এতদূর অভিভূত ক'রে ফেলে যে তিনি অশ্রু সম্বরণ ক'র্‌তে অপারগ হন্। গ্যেটের জীবনে অশ্রুমোচন ক'র্‌বার এই একটী মাত্র নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় সুতরাং কম শক্তিশালী কোন শিল্পী যদি গ্যেটের মতো বৃহৎ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষকে এমনভাবে কাঁদাতে পার্‌তেন তাহ'লে নিজেকে ভাগ্যবান ব'লেই তাঁর মনে হ'ত। কিন্তু বেটোভেন্‌ও ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া—যিনি সঙ্গীতের রাজ্যে Ninth Symphony সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাছে এই সুলভ কারুণ্যের মূল্য কি? বেঠোভেন্ গ্যেটেকে এক পত্র লিখে জানালেন, "ভাববিলাসী জার্ম্মান শ্রোতার পক্ষে এই আচরণ অসঙ্গতও হ'ত না, অস্বাভাবিকও হ'ত না, কিন্তু তোমার এ সাজেনা গ্যেটে।" এই যে অসাধারণ ব্যক্তির সাধারণ মনুষ্যোচিত হৃদয়াবেগ ও দুর্ব্বলতা, এই গ্যেটেকে আমাদের কাছে এতটা প্রিয় ক'রে তুলেছে।

সমগ্র জগতের কাছে জার্ম্মানী আজ একটা তীর্থস্থান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই দেশের বিভিন্ন অংশে গ্যেটে তাঁর সুদীর্ঘ

জীবন কাটিয়ে গেছেন। তার মধ্যে ভাইমার সব চেয়ে প্রসিদ্ধ, এখানে একাদিক্রমে তিনি ৫৬ বৎসর অমিত শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে অতিবাহিত ক'রেছেন; সহরের কল-কোলাহল হ'তে দূরে প্রকৃতির কোলে এস্থানটী তাঁর মতো কবিরই উপযুক্ত বাসস্থান! এ ছাড়া ইল্‌মেনোয়া, ওয়েট্‌জলার, জেনা, ডর্ণবার্গ, গটিঞ্জেন্ প্রভৃতিও গোটের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত; ফাউষ্ট নাটকের *Wulpurgis Night* দৃশ্যটির পরিকল্পনা কবির মনে জেগেছিল ব্রকেনের পাহাড়চূড়া দেখে, আর ইল্‌সেনোয়ার নিকটবর্ত্তী কিক্‌ল্‌হান্‌কে তিনি অমর ক'রে গেছেন সারলটি ভন্ ষ্টেনের উদ্দেশে লিখা প্রেমকাব্যে!

কবির জীবন ক্বচিৎ ঘটনা-বহুল হ'য়ে থাকে—কিন্তু গোটের সমস্ত জীবন ছিল একটানা কাজের চাকায় বাঁধা। কেবল একটী জিনিষকে তিনি জীবনে কোন দিন আমল দেন্‌নি, সে হ'চ্ছে রাজনীতি। শোনা যায় অতবড় ফরাসী বিপ্লব হ'য়ে যাওয়া পর্য্যন্ত গোটে তার কিছু বিন্দুবিসর্গ জান্‌তে পারেন নি—তিনি তখন কি একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। একদিন তাঁর এক বন্ধু ঐ বিপ্লব সম্বন্ধে গোটের মতামত জান্‌বার জন্যে বলেন, "What do you think of the great event?" গোটে অম্লান বদনে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে ব'স্‌লেন, "Do you mean the reading of that famous paper in the French Academy?" অবশ্য গোটের সত্যকার স্বরূপ এই কিনা ব'ল্‌তে সাহস হয় না।

স্মৃতির কুসুম

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

সে কথা দু'জনা জানি, আর জানে আকাশের তারা,
আর জানে ধরণীর ফুল।
দু'জনার সে উৎসব দু'জনার মাঝে হ'ল সারা—
স্মৃতিশেষ অশ্রুসমাকুল।
অশ্রু রুধি বার বার চেয়ে থাকি আকাশের পানে
বর্ষ যায় বর্ষ ফিরে আসে;
মোদের উৎসব-স্মৃতি সুদূরের তারকার গানে
ভেসে আসে দখিণা বাতাসে।

*   *   *   *

তোমারে বাসিয়া ভালো অপরাধ করে থাকি যদি
করিতেছি প্রায়শ্চিত্ত তার—
মরুভূমি সঞ্জীবিয়া শুখাইয়া গেছে যেই নদী
তারি তীরে তপস্যা আমার!
তব পদস্পর্শপূত উৎসবের আঙ্গিনার ধূলি
মুঠা মুঠা তাই শিরে মাখি,
কল্পনায় গাঁথি' মালা স্মৃতি হ'তে ফুলদল তুলি
হে অনিন্দ্যা, তব পায়ে রাখি।

রাজমহলের পাহাড়ী জাতি

—শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার

প্রকৃতির সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য সর্ব্বত্রই। বিভিন্ন মনুষ্যের দেহে, আকারে, অবয়বে বনের বিভিন্ন পশু, পক্ষী, লতা, পাতা, কীট-পতঙ্গ প্রত্যেকটীতে সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের এক একটী

১নং চিত্র। সাউরিয়া পুরুষ।

নিদর্শন রহিয়াছে। আজ এই সভ্য জগতের সভ্য মানবের সহিত অসভ্য বন্য আদিম মানবদের কোথায় সামঞ্জস্য, কোথায় ত্রুটী, কোথায় কিসের পার্থক্য এই সকল আলোচনা নৃতত্ত্ব-বিদ্‌দের বিশেষ সচেষ্ট করিয়াছে। তাঁহারা ইতিমধ্যে বহু আদিম মানবের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন—আজ ইহাদের মধ্যে অনেকে একেবারে সবংশে লুপ্ত হইয়াছে, কেহ বা অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। আধুনিক সভ্যতার সংস্রব আদিম মানবের উপর তীব্র বিষের ন্যায় ক্রিয়া করে। টাস্‌মানিয়াবাসীদের মত অসভ্য বর্ব্বর জাতিকে বিধ্বস্ত করিতে উনবিংশ শতাব্দীর সুসভ্য য়ুরোপীয়ানদের ছয় বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের প্রয়োজন হইয়াছিল (১৮২৬-১৮৩১)। ইহার মাত্র ৪৬ বৎসর পরে (১৮৭৭ খৃঃ) টাস্‌মানিয়ান জাতির শেষ বংশধর ট্রুগানিনির মৃত্যুর সহিত এই জাতি পৃথিবীর ক্রোড় হইতে চিরতরে লুপ্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের অবস্থাও আজ এইরূপ হইয়া আসিতেছে। এই প্রবন্ধে আমরা এইরূপ একটী ধ্বংসোন্মুখ জাতির সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইহাদের নাম (চিত্র নং ১—২) সাউরিয়া পাহাড়িয়া বা মালে। ইহারা সাঁওতাল পরগণার মধ্যে রাজমহল পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে বাস করে। পূর্ব্বে ইহারা সকলেই পর্ব্বতগাত্রে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিত; আজকাল কেহ কেহ সমতল স্থানে আসিয়া বাস করিতেছে। রাজমহলের উত্তরাংশে সাউরিয়া বাস করে আর দক্ষিণে মালপাহাড়িয়া নামে আর একটী জাতির বাস। মাল-পাহাড়িয়া ও সাউরিয়া উভয়ই যে এক সময়ে একই জাতির

২নং চিত্র। সাউরিয়া স্ত্রী।

অন্তর্ভুক্ত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি মালপাহাড়িয়া সমতলবাসী সভ্যতর লোকদের সহিত মেলা-

মেশার ফলে কৃষ্টির পথে সাউরিয়া অপেক্ষা অনেক অগ্রসর হইয়াছে। ফলে আদমসুমারীতে মালপাহাড়িদের বাঙ্গালীদের মধ্যে গণনা করা হয় অথচ ইহারা স্পষ্ট বাঙ্গলা ভাষা কহিতে পারে না। আজ এই একই জাতি যে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে ইহা কেবল মাত্র রাজনৈতিক শাসনের ফলে। কিছুকাল পূর্ব্বে দুমকায় ডেপুটী কমিশনার মিঃ হর্ণেলের সহিত আলোচনার ফলে বুঝিতে পারি যে তিনিও এই একই জাতির দুইটী বিভিন্ন শাখাকে দুইটী বিভিন্ন জাতি বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহার মতে সাউরিয়া এই রাজমহল পর্ব্বতের আদিম অধিবাসী এবং মালপাহাড়িয়া অন্য দেশ হইতে এখানে আসিয়াছে। মিঃ হর্ণেলের এই সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই এবং তাঁহারই পরামর্শে এই সম্বন্ধে তথ্যের অনুসন্ধান করিতে বাহির হই। দেখা গেল, পূর্ব্বে পাকুড় হইতে পশ্চিমে গোড্ডা পর্য্যন্ত স্থানে এই দুইটী জাতির মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে কৃষ্টির সংঘর্ষ হইয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে সাউরিয়া ও মালপাহাড়িয়াদের মধ্যে কতকগুলি বিবাহের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। ৩নং চিত্রে মালপাহাড়িয়া পুরুষটী তাহার সাউরিয়া স্ত্রীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। এই দম্পতী একটী মালপাহাড়িয়া গ্রামে বাস করে।

সাউরিয়াদের সম্বন্ধে একটী প্রবাদ উদ্ধৃত করিলাম। ছোটনাগপুরের উপত্যকায় ওরাঁও নামক একটী জাতি অধুনা বাস করে: পূর্ব্বে এই ওরাঁওদের এবং সাউরিয়াদের পূর্ব্ব পুরুষ একত্রে প্রসিদ্ধ রোটাস্ দুর্গে বাস করিত, পরে ঐ স্থান হইতে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একদল ওরাঁও নামে পরিচিত হইয়া ছোটনাগপুরের উপত্যকায় বাস করিতেছে, অপর দল গঙ্গার উপকূল দিয়া আসিয়া রাজমহল পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ওরাঁওদের সহিত এই সাউরিয়াদের নাকি অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এতটা মানিয়া না লইলেও সাউরিয়াদের সহিত ওরাঁওদের কতক কতক সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। ওরাঁওদের সহিত সাউরিয়াদের প্রধান পার্থক্য দেখিতে পাই গোত্রে। ওরাঁও জাতি বহু গোত্রে বিভক্ত কিন্তু সাউরিয়াদের মধ্যে একটীও গোত্র নাই। গোত্র নাই অথচ বিবাহ কিরূপে হয় শুনিলেই আমাদের প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হইতে হয়; কিন্তু এই সাউরিয়াদের মধ্যে আমার চারি বৎসরের অনুসন্ধানের ফলে তাহাদের সমাজে নিকট আত্মীয় আত্মীয়াদের মধ্যে একটী মাত্র বিবাহের দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। ইহারা নিজেদের কোন প্রকারের ভাই ভগিনীর মধ্যে বিবাহ করে না। গত বৎসর একটী গ্রামে বংশতালিকা সংগ্রহ করিতে গিয়া আমি জনৈক ২৫ বৎসরের যুবককে তিন সন্তানের জননী বিধবাকে বিবাহ করিতে দেখি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মরিয়া যাইবার পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যখন সেই বিধবাকে বিবাহ করে তখনই কেবল মাত্র এই প্রকার বয়সের পার্থক্য হইয়া থাকে জানিতাম। এটী ঐরূপ নহে বলিয়া বিস্তৃত বিবরণ লইতে গিয়া অনুসন্ধানে
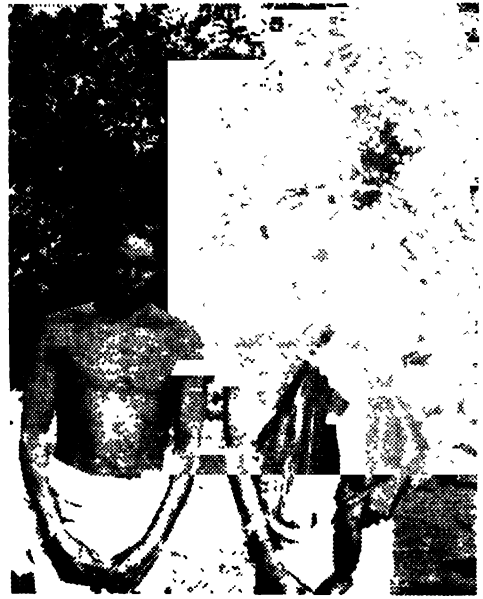
৩নং চিত্র। দম্পতি—মালপাহাড়িয়া (পুং)। সাউরিয়া (স্ত্রী)

জানিতে পারিলাম যে যুবকটী তাহার মাতুলানীকে বিবাহ করিয়াছে; আপন মাতুলানী নহে, যুবকটীর মাতার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতার স্ত্রী। এইরূপ নিকট সম্বন্ধে যে বিবাহ হইয়াছে ইহা উভয়েরই অজ্ঞাতসারে। আমিই প্রথম ইহাদের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বিবাহটী ঘটিয়াছে বহু কারণে; প্রথমতঃ যুবকটীর পিতা এবং তাহার ভ্রাতারা এক গ্রামে বাস করিত না; দ্বিতীয়তঃ ইহাদের বিবাহের সময় পণস্বরূপ বহু অর্থ কন্যাপক্ষকে দান করিতে হয়, বিধবাদের অনেক ক্ষেত্রে অল্প অর্থে বিবাহ করিতে পারা যায়, বিশেষতঃ ছোট ছোট

সন্তানসন্ততি যাহাদের থাকে; তৃতীয়তঃ এই নিরক্ষর পাহাড়ীদের পুরাতন সম্পর্কের কথা সকল ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা সম্ভব হইয়া উঠে না। ইহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আপনার প্রপিতামহের নাম বলিতে পারে; বিবাহের পরই যে যেখানে সুবিধা পায় পৃথক হইয়া সেই স্থানে আপনার কুটীর নির্ম্মাণ করে। চার পাঁচ জন ভ্রাতা একই গ্রামে বাস করে ইহা অতি বিরল। একই গ্রামের স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে বিবাহ অতি অল্পই হইয়া থাকে; আর অন্যান্য গ্রামে বিবাহের জন্য পাত্রপাত্রী অন্বেষণের সময় দুই একটী আপন আপন দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পুরুষের কুটুম্বের সহিত বিবাহ হওয়া অসম্ভব নহে। আমাদের মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও পিতামহের জ্যেষ্ঠতাত কিংবা খুল্লতাত ভ্রাতা ভগিনীদের পৌত্র পৌত্রীদের সহিত আত্মীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখা নিতান্ত সহজ নহে। সাউরিয়ারা তিন পুরুষ পর্য্যন্ত আপনার বংশের ঠিকানা রাখিতে পারে।

গোত্র সম্বন্ধে আর একটী মত এই যে উপস্থিত ইহাদের মধ্যে কোন গোত্র নাই বলিয়া যে কখনও ছিল না এমন নহে। গোত্রের প্রথা অন্যান্য কোন কোন প্রথার মত লোপ পাইয়াছে। রীতিনীতির পরিবর্ত্তন ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট হইতে দেখিয়াছি সত্য, তথাপি যে গোত্র অবলম্বন করিয়া বিবাহের মত একটী অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত সেই গোত্র-প্রথা ত্যাগ করিয়া অন্য প্রথায় সেই বিবাহ সম্পন্ন হইতেছে এরূপ অনুমান করা কঠিন। ওরাঁও-দের মধ্যে প্রায় ৬৪টী বিভিন্ন গোত্র আছে, ইহাদের মধ্যে কি তাহাদের মধ্যে একটীর নামও প্রচলিত থাকিতে পারে নাই। গোত্র নাই অথচ গোত্র সম্বন্ধে তথ্য আবিস্কার করিতে হইবে, ইহা লইয়া প্রথমে খুবই বিব্রত হইতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ গোত্র কি তাহাই ইহাদের বুঝান দুঃসাধ্য। বাংলার গোত্র কিংবা ইংরাজীর clan ইহার কোনটীও ইহারা বুঝিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে অনেকে খুব ভাল সাঁওতাল ভাষা জানে। সাঁওতালেরা গোত্রকে 'পারিস্' বলে; অগত্যা এই 'পারিস্' শব্দ লইয়াই কথাবার্ত্তা চলিল। সকলেই বলিল, "এই সাউরিয়াই আমাদের পারিস্—আমাদের ওদের মত আলাদা আলাদা পারিস্ নাই।" গোত্রভেদে অশৌচভেদ হয়, সুতরাং অশৌচ-প্রথার তথ্যে আসিয়া পড়িলাম। অশৌচের প্রথাও অভিনব। যদি একটী পাহাড়ীর চারিটী পুত্র থাকে এবং চারিটী পুত্রই যদি বিভিন্ন গ্রামে বাস করে ও সেই পাহাড়ী যদি তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের গৃহে ও গ্রামে মারা যায় তাহা হইলে কেবল মাত্র সেই পুত্রের মৃতাশৌচ হইবে, অন্য কোন পুত্রের হইবে না। মৃত্যুকালে গৃহমধ্যে যে যে বর্ত্তমান থাকিবে তাহাদের সকলেরই অশৌচ হইবে। স্ত্রীলোকের পিতৃকুল কিংবা শ্বশুরকুল বলিয়া কোন কিছু ভিন্ন নাই। পিতা ও শ্বশুর উভয়েরই মৃত্যুতে পাঁচদিন অশৌচ হইবে। এই পাঁচদিন মাংস ও হলুদ খাওয়া নিষেধ।

ইহাদের সংসার হইল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। স্বামী, স্ত্রী আর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র কন্যা লইয়া ইহারা ঘর-সংসার করিয়া থাকে। পুত্রের বিবাহ হইবার পরই তাহাকে পৃথক গৃহ বাঁধিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অপোগণ্ড ভ্রাতুষ্পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রীরাও খুল্লতাতের সংসারে স্থান পাইয়া থাকে। জ্যেষ্ঠ পুত্রই অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার গৃহখানি পাইয়া থাকে। মাতা যতদিন জীবিত থাকে ততদিন অবশ্য পুত্রের সংসারে স্থান পায়। অধিকাংশ স্থলে মাতাও পুনর্ব্বার বিবাহ করে। আমি চল্লিশ বৎসরের বিধবারও বিবাহ হইতে দেখিয়াছি। 'ঘরজামাই' প্রথা কতকটা প্রচলিত থাকিলেও বাঙ্গলা দেশের গৃহপালিত জামাতাদের ন্যায় কোন অপবাদ শুনি নাই।

সাউরিয়াদের মধ্যে বেশ সুশৃঙ্খল শাসননীতির ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক গ্রামে একজন করিয়া মাঝি বা মোড়ল থাকে। এই ভাবের ১৬ হইতে ২০টী গ্রাম লইয়া একটী করিয়া নায়েব থাকে, নায়েবের উপর সদ্দার। এক একটী সদ্দার প্রায় ৮০ হইতে ১০০ গ্রামের মালিক। সাউরিয়াদের মধ্যে কোন কোন ধনী সদ্দার চৌকিদারের ব্যবস্থা করিয়াছে। এই চৌকিদারেরা চুরি, ডাকাতি, গ্রামের জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির হিসাব রাখে। সাউরিয়াদের এই শাসননীতির উপর আজ-কাল ইংরাজ সরকারের অনেক প্রভুত্ব চলিতেছে। ছোট ছোট চুরি ডাকাতির ঘটনা সদ্দারই প্রায় বিচার করিয়া থাকে, কিন্তু খুন আত্মহত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের দণ্ডবিধান ইংরাজ সরকারের কর্ম্মচারীরা করিয়া থাকেন। সরকারী কর্ম্মের মধ্যে গ্রামের মোড়লের কর্ত্তব্যই অধিক. তাহাকে জমির কর, শুল্কাদি আদায় করিয়া ইংরাজ সরকারের

আদালতে জমা দিতে হয়। আজকাল সাউরিয়াদের মধ্যে মাঝি, নায়েব ও সর্দ্দার সকলেই ইংরাজ সরকারের বেতনভোগী হইয়া আছে। সর্দ্দারের মাসিক দশ টাকা ও নায়েব মাসিক তিন টাকা এই হারে বেতন পাইয়া থাকে। গ্রামের মাঝি সমগ্র কর আদায়ের উপর টাকায় দুই আনা হারে দস্তুরি পাইয়া থাকে।

বিবাহ ঃ—সাউরিয়াদের মধ্যে বিবাহ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। অর্থাভাবে ৩০।৩৫ বৎসর বয়স্ক বহু যুবককে অবিবাহিত থাকিতে দেখিয়াছি। স্ত্রীলোকের বিবাহের কোন বয়স ধার্য্য করা নাই—সাধারণতঃ ১৬।১৭ বৎসরেই বিবাহ হইয়া থাকে, ২২।২৩ বৎসরে বিবাহও বিরল নহে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতাই অধিকাংশ স্থলে জ্যেষ্ঠের স্ত্রীকে বিবাহ করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাধারণতঃ কোনরূপ আত্মীয় আত্মীয়াদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না। যে ঘটকেরা ইহাদের বিবাহের কথাবার্ত্তা চালাইয়া থাকে, সাউরিয়া ভাষায় তাহাদের 'সিটুদার' বা 'সিটু' বলে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একজন করিয়া 'সিটুদার' থাকে। বর ও বধূ উভয়ে প্রথমে নিজেদের মধ্যে মনস্থির করিয়া লইলে পরে সিটুদারকে জানান হয়। এই যুবক যুবতীর অবাধ মিলনস্থল হইল কোন উৎসবের নৃত্যাদি। পরে সিটুদারই তাহাদের অভিভাবকদের নিকট পরস্পরের পছন্দের কথাবার্ত্তা বহন করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত প্রকাশ্যেও বিবাহের পূর্ব্বে বর ও বধূর উভয়ের সম্মতির প্রয়োজন হয়।

সিটুদারকে জানান হইবার পর সিটুদার প্রথমে স্বীয় গ্রামের যুবক বা যুবতীর অভিভাবকের মতানুসারে অন্য গ্রামের ভাবী বৈবাহিকের গৃহে গমন করে। দেনা পাওনা ও দিন স্থির করিয়া সিটুদার আপন গ্রামে ফিরিয়া আসে। পরদিন সিটুদার পাত্রকে লইয়া পাত্রীগৃহে আগমন করে; এই সময় পাত্রের কোন নিজ আত্মীয়কে আসিতে হয়। পাত্র পাত্রী-গৃহে আসিয়া পাত্রীর আত্মীয় আত্মীয়াদের সমক্ষে পাত্রীকে কিছু উপহার প্রদান করে। উপহারস্বরূপে কখনও বা একটী টাকা, কখনও একটী কাঁচের পুঁতির হার প্রভৃতি দেওয়া হইয়া থাকে। পাত্রী যদি সর্ব্বসমক্ষে এই উপহার গ্রহণ করে তাহা হইলে বুঝা যায় যে পাত্রী পাত্রকে বিবাহ করিতে রাজী আছে। পাত্রী এই উপহার অস্বীকার করিলে ইহারা তাহা বিশেষ অপমানসূচক মনে করে। এই অনুষ্ঠানের পর পাত্র আপন গৃহে চলিয়া যায়। এই উপহার প্রদানের পাঁচ দিন পরে সাধারণতঃ বিবাহ হইয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট দিবসে পাত্র আপনার গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ আত্মীয় আত্মীয়া, বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি লইয়া পাত্রীগৃহে আগমন করে। বিবাহের অনুষ্ঠান রাত্রিকালেই হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে পাত্রপক্ষকে আসিবার সময় একটী বড় ছাগ লইয়া আসিতে হইত। এই ছাগটীকেই কাটিয়া তাহার মাংস রাত্রে আহার করা হইত। আজকাল এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে; পাত্রীপক্ষ তাহার পরিবর্ত্তে ছাগমূল্য আদায় করিয়া নিজেরাই সুবিধামত মাংসভোজের আয়োজন করে। পাত্রীগৃহে আসিয়া পৌছিলে পাত্রকে গৃহমধ্যে লইয়া যাওয়া হয়, আত্মীয়-বন্ধুরা তখন বাহিরে নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদে মত্ত হইয়া থাকে।

বিবাহের অনুষ্ঠান খুব জটিল নহে। উভয় পক্ষের সিটু-দারের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পাত্রীর পিতা পাত্রীকে লইয়া আসিয়া পাত্রের সম্মুখে বসাইয়া দেয় এবং কন্যার গুণকীর্ত্তন করে ও জামাতাকে তাহার কন্যার প্রতি সদয় এবং সপ্রেম ব্যবহার করিতে অনুরোধ করে। তাহার পর উভয় সিটুদার বর ও কন্যার বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা তাহাদের পরস্পরের কপালে সিন্দূর লাগাইয়া দেয়। পাত্রীপক্ষের সিটুদার এই সময়ে পাচটি আম্রপত্রের খিলি করিয়া পাত্রীর চুলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। এই আম্রপত্রের খিলি দিবার উদ্দেশ্য নাকি পুত্রকামনা। তাহার পর পাত্র-পাত্রী ব্যতীত সকলে গৃহের বাহিরে আসে এবং উভয়কে এক পাত্রে ভুট্টার ভাত খাইতে দেওয়া হয়। যে পাত্রে খাইতে দেওয়া হয় সেই পাত্রটি পাত্রের গৃহে যাইবার সময় পাত্রী সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। এই পাত্রটি ভাবী দৌহিত্রের জন্য দেওয়া হইয়া থাকে। বিবাহের পরদিন পাত্রী শ্বশুর-গৃহে গমন করে। সেখানে পাচদিন থাকিয়া কন্যা স্বামীর সহিত আপন গৃহে ফিরিয়া আসে। এই সময়ও জামাতাকে একটি ছাগ লইয়া আসিতে হয়। কন্যাকে তাহার পিতৃগৃহে রাখিয়া পরদিন জামাতা স্বস্থানে প্রস্থান করে ও পাঁচদিন পরে পুনরায় আসিয়া স্ত্রীকে লইয়া যায়। এইরূপে স্ত্রী বেচারী চিরদিনের মত আপনার পিতৃগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

পাকুড়ের নিকট সমতলবাসী পাহাড়িয়াদের মধ্যে কিয়ৎ-পরিমাণে বাহিরের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে বিবাহের পরদিন শ্বশুরগৃহে আসিয়া কন্যা পাঁচদিন পরে আপন গৃহে ফিরিয়া আসে কিন্তু সমতলবাসী পাহাড়িয়াদের মধ্যে শুনিলাম আট দিন পরে আসে। এখানে ইহারা ইহাকে 'আটমঙ্গলা' কহে। এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে 'আটমঙ্গলা' নামটির সবটুকুই বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে অনুরূপ প্রথা বিদ্যমান আছে। সাউরিয়ারা অবশ্য এই প্রথাটী প্রত্যক্ষভাবে মালপাহাড়িয়াদের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বরপক্ষ কন্যাপক্ষের গৃহে যাইবার পূর্ব্বে গ্রাম-দেবতার পূজা করিয়া যায়। পাকুড়ে ও অন্যান্য দুই একটী স্থলে দেখিলাম কন্যা শ্বশুরগৃহে আসিবার পর ঐ পূজা হয়।

সমাধি :—সাউরিয়ারা সাধারণতঃ মৃতদেহ পুঁতিয়া রাখে। এই ক্ষুদ্র জাতি-টির মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আচারেও নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সাউরিয়া এবং মালপাহাড়িয়া কৃষ্টিদ্বয়ের সংঘর্ষ-স্থলে দেখা যায় যে কেহ কেহ মৃতদেহ পুঁতিয়া রাখে, কেহ বা দাহও করিয়া থাকে। রোগ-ভেদে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত স্থলে বসন্ত রোগীর মৃতদেহ পোড়ান হয় না, পুঁতিয়া রাখা হয়। ঐ স্থান ব্যতীত সর্ব্বত্রই বসন্ত রোগীর মৃতদেহ পশুপক্ষীর আহারের জন্য গভীর বনের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই সকল আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে তিনটী বিভিন্ন কৃষ্টির প্রভাব এই সাউরিয়াদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সাউরিয়াদের মৃতদেহ পুঁতিয়া রাখিবার জন্য গ্রাম হইতে কিছু দূরে বনের মধ্যে খানিকটা স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে। মৃতদেহ লইয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে কেহ সে স্থানে যায় না। স্ত্রীলোক-দিগের কিন্তু সকল সময়েই সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ আছে রাজমহলে এবং নিকটবর্ত্তী প্রদেশে মৃতদেহ দক্ষিণে মাথা রাখিয়া প্রোথিত হয়। অন্যান্য স্থানে কিন্তু কি পুতিবার কি পোড়াই-বার সময় মৃতদেহ সর্ব্বদাই পূর্ব্বপশ্চিমে রাখা হয়; মাথাটী থাকে পশ্চিম দিকে। গোড্ডা মহকুমায় একেবারে রাজমহলের বিপরীত পদ্ধতি দেখিলাম; এখানে মাথা থাকে উত্তরে। মৃত-দেহ পুতিবার সময় একটী দীর্ঘ সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। সুড়ঙ্গ-গর্ভে প্রথমে কিয়ৎপরিমাণে শুষ্কপত্রাদি বিছাইয়া দেওয়া হয়। তাহার উপর কেহ কেহ কতকগুলি দেহের আকারানুযায়ী দীর্ঘ তক্তা পাতিয়া দেয়—তাহারই উপর মৃতদেহ শোয়াইয়া দেওয়া হয় এবং চারিপাশে একটী শবাধারের মত করিয়া তক্তা পাতিয়া দিয়া থাকে। উপরের তক্তা দিবার পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তির সমস্ত আসবাবপত্র কবরে রাখিয়া দেয়। শেষ পর্য্যন্ত মৃত-ব্যক্তির খাটিয়াখানিও কবরের উপর ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় (চিত্র নং ৪)। উপরের তক্তাগুলি পাতিয়া দিবার পর তদুপরি কিয়ৎপরিমাণে ভুট্টার ভাত ছড়াইয়া দেওয়ার প্রথা আছে। সর্ব্বশেষে কবরটীর উপরে মাটী নিক্ষিপ্ত হয়। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দিয়া কবরটী ঢাকিয়া দেওয়া হয়। ইহা কেবলমাত্র হিংস্র পশুদিগের অত্যাচার হইতে মৃতদেহটীকে রক্ষা করিবার জন্য দেওয়া হইয়া থাকে।

৪নং চিত্র। সাউরিয়া কবর

মৃতদেহের সৎকারশেষে শোকার্ত্তদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি (chief mourner) সমাধির উপর একটী কুক্কুট বলি দিয়া পূজা করে। পাঁচ দিন পরে মৃত ব্যক্তির গৃহদেবতার সম্মুখে একটী গাভী কিংবা শূকর বলি দিয়া পূজা করা হয়। পূর্ব্বেই

বলিয়াছি যে অশৌচ কেবলমাত্র পাঁচ দিন থাকে, এইরূপে ঐ দিনে অশৌচের নিয়ম-ভঙ্গ করা হইয়া থাকে। নিয়ম-ভঙ্গের পর এক বৎসর অতীত হইলে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতির জন্য একটী বিরাট উৎসব হয়। মৃত ব্যক্তির গ্রামে যতগুলি পরিবার বাস করে তাহাদের সকলেরই প্রত্যেক আত্মীয় কুটুম্বকে নিমন্ত্রণ করা হয়। পালে পালে শূকর বলি দেওয়া হয়; ধান্যমদ্যও প্রচুর পরিমাণে পান করা হয়। রাত্রে নৃত্যগীতাদির অবসরে সামাজিক রীতি ও সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা হয়। বহু যুবক যুবতী এই দিনে আপন আপন সাথী নির্ব্বাচন করিয়া ফেলে। এই উৎসব উপলক্ষে বিধবা স্ত্রীলোক বা মৃতদার পুরুষ তাহাদের মৃত সাথীটীর স্থলে অন্য সাথী নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। এই উৎসব অনুষ্ঠিত না হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধবা বা মৃতদার কেহই বিবাহ করিতে পারে না। এক ব্যক্তির সাথী-নির্ব্বাচনের উৎসবে অন্যান্য বহু স্ত্রী-পুরুষের সমাগম হয় এবং সেই সঙ্গে বিবাহার্থী নরনারীরা অনেকেই আপন আপন মনের মানুষ খুঁজিয়া লয়।

প্রায়ই শোনা যায় এইরূপ অসভ্য জাতি বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে সুরার উন্মত্ততায় আপনাদের সামাজিক বন্ধন, রীতি নীতি প্রভৃতি সমস্তই ভুলিয়া যায়। অথচ এই এক দিনের ব্যভিচার তাহাদের সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট করে না। এরূপ ব্যাপার আমাদের মত সভ্য লোকের আদর্শের প্রতিকূল ও বীভৎস বলিয়া মনে হয়—তাই Malinowski, Levy Bruhl প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আদিম মানবের যৌন আচারের সুনীতিপরায়ণতা এবং চিন্তার বৈশিষ্ট্য লইয়া নানা গবেষণা করিতেছেন।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি

—শ্রীপ্রতিভারঞ্জন রায়

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দু যখন আচারে ব্যবহারে, ভাবে ধর্ম্মে একেবারে বিদেশী হইয়া যাইতেছিল, যখন নিজের গৌরবের সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়া পরের অনুকরণে মত্ত হইয়াছিল, ফেরঙ্গ সভ্যতা ও খৃষ্টানী আচার জাতীয় জীবন বিকাশের একমাত্র সহায়ক বলিয়া যখন শিক্ষিত বাঙালীগণ কর্ত্তৃক দেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন পণ্ডিত শশধর দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহার গভীর জ্ঞান, অপূর্ব্ব বিচার-পদ্ধতি, অসাধারণ বাগ্মিতা, নিষ্ঠা, সংযম এবং আধ্যাত্মিকতার সাহায্যে তখনকার হিন্দুদের মনে হিন্দুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইতেছিলেন। Cultural conquestএর কথা আজ যাহা আমরা শুনি সেই Cultural conquestএর ভয়াবহ পরিণামের কথা তূর্য্যনিনাদে তিনিই প্রথম ধ্বনিত করিয়া দেশাত্মবোধের বীজ বপন করেন।

ফরিদপুর জেলায় প্রাণপুর গ্রামে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশে শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সুবিখ্যাত মধুসূদন সরস্বতীর ভ্রাতা যাদবানন্দের বংশধর, তাঁহার পিতার নাম হলধর বিদ্যামণি। তিনি বাল্যকালে ব্যাকরণ কাব্যাদি অধ্যয়ন করিয়া ন্যায়শাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করেন। তাহার পর অন্যান্য দর্শন শাস্ত্র, উপনিষদ, সংহিতাদি পাঠ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানে যাহার পর নাই বুৎপন্ন হন। তাঁহার অপরিসীম শাস্ত্র-জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও ব্রাহ্মণ্য নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া কাশিমবাজারের জমিদার রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর তাঁহাকে আপন সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন।

রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুরের সহিত এই সময় মুঙ্গেরে পণ্ডিত শশধর অনেক সময় অবস্থিতি করিতেন। সমাজ ও ধর্ম্মের পূর্ব্বোক্তরূপ গ্লানি দেখিয়া তাঁহার মনে হিন্দু ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের সত্য প্রচার করিতে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। সেই সময় সুবিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, যিনি পরে কৃষ্ণানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, মুঙ্গেরে আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী নামে একটী সভা স্থাপিত করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করেন। চূড়ামণি মহাশয়ের গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তাঁহাকে তাঁহার সহিত প্রচার-কার্য্যে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। দেশের আহ্বান পাইয়া চূড়ামণি মহাশয় তখন শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সহিত ধর্ম্মপ্রচারে ব্যাপৃত হন। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রথমে বালকদিগকে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান না করিলে বিশেষ কোন লাভ হইবে না, কারণ সে সময়ে প্রৌঢ় ও যুবকগণ বিপথগামী হইয়া পড়িতেছিলেন, তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনা কষ্টকরই হইবে একথাও তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যদিও সে বিষয়ে তাঁহারা ত্রুটী করেন নাই। প্রথমে বালকদিগকে স্বধর্ম্মে আস্থাবান করাই উচিত বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বাঙলা ও বিহারের স্থানে স্থানে সুনীতিসঞ্চারিণী নামে সভা স্থাপন করিয়া তাঁহারা

বালকদিগের ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ওদিকে প্রচার-কার্য্যের দ্বারা প্রৌঢ় ও যুবকদিগকে স্বধর্ম্মে আকৃষ্ট করার জন্য সচেষ্ট হন। তাঁহাদের অদম্য অধ্যবসায়ে প্রৌঢ় ও যুবকগণ দলে দলে স্বধর্ম্মে আস্থাবান হইতে লাগিল। বালকগণও আপনাদের ধর্ম্মে অনুরক্ত হইতে লাগিল। এইরূপ কিছুকাল চেষ্টার পর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কৃষ্ণানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করিয়া মুঙ্গের হইতে কাশীধামে আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা লইয়া যান। চূড়ামণি মহাশয়ও তাঁহার সহিত কাশী গমন করেন। কাশী গমনের ফলে চূড়ামণি মহাশয় শ্রীমৎবিশুদ্ধানন্দ স্বামীর গুরু, পরম দার্শনিক ও মহাপুরুষ, দণ্ডী, শ্রীমৎ বিশ্বরূপ স্বামীর কৃপালাভ এবং কিছুদিন তাঁহার নিকট উপদেশাদি গ্রহণ করেন। তাঁহার পক্ষে এই মহাপুরুষের অনুকম্পা ও আশীর্ব্বাদ জয়-টীকার মত হইল, তিনি পূর্ণ উদ্যমে নিরুদ্বেগ চিত্তে ধর্ম্ম-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন।

চূড়ামণি মহাশয় কাশীতে গমন করিলে স্বর্গীয় ভূধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। বঙ্গদেশে তাঁহার প্রচার কার্য্যের বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া ভূধরচন্দ্র তাঁহাকে বাঙলায় আসিতে অনুরোধ করেন। ভূধবচন্দ্রের অনুরোধ-ক্রমে ও আরও কোন কোন কারণে তিনি কাশী পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা দেশে আসিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কাশী পরিত্যাগ করিয়া তিনি প্রথমে বীরভূমে উপস্থিত হন। সেখানে প্রচার কার্য্য করিয়া তিনি বর্দ্ধমানে আগমন করেন। তথায় স্বর্গগত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হইলে, তিনি তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। ইন্দ্রনাথ কলিকাতায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, শিশিরকুমার ঘোষ, দীননাথ সান্যাল প্রভৃতির সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিলে, তাঁহাদের উদ্যোগে চূড়ামণি মহাশয় কলিকাতায় ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা অভ্যাস না করিলে দোষ কি, পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও তাহার সাকারত্বাব প্রমাণ কি, উপাসনা কাহাকে বলে, তাহার আবশ্যকতাই বা কি, ব্রত, উপবাস, শ্রাদ্ধাদির দ্বারা কি হয়, দেবতা কাহাকে বলে, তাহার সত্যতার প্রমাণ কি, জাতিভেদের সত্যতার প্রমাণ কি, সকল বর্ণের পরস্পর আহার ব্যবহারে দোষ কি, আহারাদির সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্পর্ক কি, পুনর্জ্জন্মের প্রমাণ কি ইত্যাদি প্রধান প্রধান অনেকগুলি বিষয় প্রাঞ্জল ভাবে ও অভিনব প্রণালীতে ব্যাখ্যা করিয়া সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন এবং এই সকল বিষয়ে এত গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহাও তাঁহারা এই প্রথম জানিতে পারিলেন। এ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিতেছি—"ইংরেজীতে দেখিতাম, ইংরেজের মুখে শুনিতাম Religion কেবল ঈশ্বর লইয়া, আর কিছু লইয়া নয়। ভাবিতাম তবে ঈশ্বর ছাড়া এই যে এত বহু ব্যাপার রহিয়াছে, ইহাদের সহিত তবে কি মানুষের কোন ধর্ম্মমূলক সম্বন্ধ নাই! বঙ্কিম বাবুর বাসায় প্রতি রবিবার আমরা এই সকল আলোচনা করিতাম। সেই সময় পূজনীয় শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণির নাম শুনা গেল। ইন্দ্র-নাথকে বলিয়া বঙ্কিম বাবু চূড়ামণিকে এক দিন আপন বাসায় আনাইলেন। চূড়ামণি মহাশয় ধর্ম্মকথা কহিলেন। তিনি যেমন বলিলেন ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম্ম, অর্থাৎ যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম্ম; অমনি আমার সকল সংশয় দূর হইল। বিশ্বের যাহা কিছু আছে, বিশ্বনাথ হইতে তাহা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে, বিশ্বনাথকে পাওয়া যায় না বুঝিলাম। কারণ বিশ্ব তাহা হইলে আমাদিগকে রক্ষা না করিয়া বিনাশই করে। যাহা এত অন্বেষণে পাই নাই তাহা পাইলাম। আমার আনন্দের সীমা রহিল না। পূর্ব্বে যখন দেবদেবীতে বিশ্বাস ছিল না, ইংরেজী ভাবাপন্ন ছিলাম, তখন আমাদের সবই মন্দ মনে হইত। ঠিক মনে নাই, বোধ হয় ১৮৭৭ সালে Bethune Society সভায় High Education in India নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমাদের জাতিভেদ প্রণালীর নিন্দা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর শাস্ত্রের কথা শুনিয়া এবং সামাজিক জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঐ প্রণালীর যৌক্তিকতা বুঝিয়াছিলাম। বুঝিয়া অক্ষয়চন্দ্রের "নব জীবনে" "জাতীয় চরিত্র এবং বর্ণভেদ প্রণালী" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। ইহা পড়িয়া বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন, "আমিও জাতিভেদটিকে অতি জঘন্য জিনিষ মনে করিতাম কিন্তু তোমার প্রবন্ধ পড়িয়া আমার মত উল্টাইয়া গিয়াছে।"

ধর্ম্ম শব্দে 'যাহা ধারণ করিয়া রাখে' এই ব্যাখ্যায় বঙ্কিম চন্দ্র প্রভৃতি একটী নূতন আলোক প্রাপ্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা নামক গ্রন্থে তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ধর্ম্মব্যাখ্যা গ্রন্থ-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য চলিতে থাকে। কলিকাতায় অবস্থান-কালে তথাকার অনেক প্রধান ব্যক্তি চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এমন কি, সাধকপ্রবর মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবও তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। পরমহংস ও চূড়ামণি প্রসঙ্গে নানারূপ কথার রটনা হইয়াছে। 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' প্রণেতা লিখিয়াছেন যে পরমহংস দেব চূড়ামণি মহাশয়কে দেখিতে আসিয়া নাকি তাঁহাকে বলিয়া-ছিলেন "তুমি যে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছ, তাহাতে তোমার কিরূপ চাপরাস আছে দেখি?" এইরূপ ভাবের আরও কোন কোন কথা রটনা করা হইয়াছে। এ সকল কথার প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "সাহিত্য" পত্রে অনেক লেখালেখি করিয়াছিলেন। তিনি চূড়ামণি মহাশয়কে এ বিষয়ে পত্র লেখায় চূড়ামণি মহাশয় যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাও ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে জানা যায় যে পরমহংস দেব তাঁহাকে ওরূপ ভাবের কোন কথা বলেন নাই। সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমরাও তাঁহার নিকট হইতে জানিয়াছি যে পরমহংস দেব ধর্ম্মপ্রচারে তাঁহার কি চাপরাশ আছে একথা কখনও বলেন নাই। ভূধর বাবুর কলেজ ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে পরমহংস দেব চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। পরমহংস দেব আসিয়া চূড়ামণি মহাশয়কে বলেন 'চূড়ামণি, মা বলিলেন, চূড়ামণির কাছে যাও, তাই তোমাকে দেখিতে আসিলাম।" এই বলিয়া তিনি সমাধিস্থ হন। সমাধি ভঙ্গ হইলে, পরমহংস দেব বলিলেন, "চূড়ামণি, বেশ ভেজেছে—বেশ ভেজেছে, একবার রসে ডুব, রসও প্রস্তুত।" এই উক্তির সহিত 'কথামৃত' এর উল্লিখিত উক্তির সহিত আকাশ-পাতাল ভেদ, তাহা অবশ্য সকলে বুঝিতে পারেন। প্রথম সাক্ষাতের পর চূড়ামণি মহাশয় মধ্যে মধ্যে পরমহংস দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন।

এই সময় 'সহবাস সম্মতি আইন' এর প্রতিবাদকল্পে এক বিরাট আন্দোলনের উদ্যোগ হইয়াছিল। চূড়ামণি মহাশয় হইতেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত। প্রধান আন্দোলন সভা মনুমেণ্টের নীচে গড়ের মাঠে হয়। শুনিয়াছি সেরূপ সভা নাকি কলিকাতায় আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। এত জনতা হইয়া-ছিল যে সাতটী উচ্চ মঞ্চ হইতে বক্তৃতা দিবার আয়োজন করিতে হইয়াছিল। এই আন্দোলনে চূড়ামণি মহাশয়ের খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল।

তাঁহার কলিকাতায় ধর্ম্মপ্রচারের সময় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বেদকে কৃষকের গান বলিতে চেষ্টা করেন। চূড়ামণি মহাশয় তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বঙ্গবাসীতে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। পরে সেই সকল প্রবন্ধ পুস্তকা-কারে প্রকাশিত হইয়াছিল। চূড়ামণি মহাশয় অল্প বয়স হইতেই প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। কাশিমবাজার অবস্থানকালে শ্রাদ্ধান্ন লইয়া সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাধর সেনের সহিত বিচারে তিনি জয়লাভ করিয়া 'শ্রাদ্ধান্ন বিবেক' নামে সংস্কৃত ভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাতে চারি-দিকে তাঁহার যশঃসৌরভ বিকীর্ণ হয়।

কলিকাতার কার্য্য শেষ করিয়া চূড়ামণি মহাশয় কিছুদিন স্বগ্রামে অবস্থিতি করেন। তাঁহার গভীর জ্ঞান ও চিন্তাপ্রসূত ধর্ম্মের নূতন তথ্যসমূহ জনসমাজে প্রচারিত হইয়া যাহাতে সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে বর্ত্তমান লেখকের পিতৃদেব মোহিনীমোহন রায় চূড়ামণি মহাশয়কে তাঁহার গ্রাম হইতে বহরমপুর আনার ব্যবস্থা করেন। এই প্রচেষ্টার প্রধান সহায়ক ছিলেন কাশিমবাজারের ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র।' তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে চূড়ামণি মহাশয়ের দীর্ঘ দিনের গবেষণা ও সাধনালব্ধ ধর্ম্মমত ও ব্যাখ্যান সাধারণের মধ্যে বিশদ্‌ভাবে প্রচার করিতে না পারিলে সনাতন হিন্দুধর্ম্মরক্ষাকল্পে তাঁহার আজীবন প্রচেষ্টার কোন স্থায়ী ফল লাভ হইবে না। এ যাবত তিনি যে-বক্তৃতা এবং উপদেশ প্রচারকার্য্যব্যপদেশে নানা সভা-সমিতিতে দিয়া-ছিলেন ও বিভিন্ন পত্রিকায় যে প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন এবং হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করিয়াছিলেন তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য আমার পিতাঠাকুর মহাশয় আগ্রহান্বিত হন। এ বিষয়ে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের উৎসাহ পাইয়া তিনি চূড়ামণি মহাশয়কে বহরমপুরে নিজগৃহে লইয়া

আসেন। প্রিয় শিষ্য মোহিনীমোহনের আগ্রহাতিশয্যে চূড়ামণি মহাশয় বহরমপুরে স্থায়ী ভাবে বাস করিয়া বাকী জীবন গঙ্গাতীরে এবং গ্রন্থপ্রণয়ন কার্য্যে কাটাইবার সঙ্কল্প করেন। আমাদের গৃহেই চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রথম পরিচয় ঘটে। চূড়ামণি মহাশয়ের উপদেশাদি শুনিবার জন্য মহারাজ সে সময়ে প্রায়শই আমাদের বাড়ীতে আসিতেন এবং তাঁহার অমৃতসম উপদেশাবলী শুনিয়া তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র হন। কলিকাতায় অবস্থানকালে প্রচার কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে 'ধর্ম্মব্যাখ্যা' নামক একখানি গ্রন্থ চূড়ামণি মহাশয় লেখেন। এবং মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের অভিপ্রায়ে তিনি এই ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা গ্রন্থখানি নূতন আকারে লিখিতে আরম্ভ করেন এবং মহারাজের অর্থসাহায্যেই উহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বে 'বেদব্যাস' পত্রিকায় তাঁহার যে সকল বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নূতন আকারে লিখিত হইয়া 'সাধন-প্রদীপ' নামে প্রকাশিত হয়। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের অর্থসাহায্যেই ইহা মুদ্রিত হয়। 'ভবৌষধ' গ্রন্থখানিও নূতন আকারে লিখেন এবং মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্রের উদ্ধারকল্পে মহারাজ চূড়ামণি মহাশয়ের সাহায্য ভিক্ষা করেন এবং এজন্য একটী চতুষ্পাঠী খুলিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এই সময়ে আমার পিতৃদেবের মৃত্যু ঘটায় মহারাজার উক্ত সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। প্রিয় শিষ্য মোহিনীমোহনের অকাল মৃত্যুতে চূড়ামণি মহাশয় সাতিশয় সন্তপ্ত হয়েন এবং প্রধান উদ্যোগীর অভাব ঘটায় তাঁহার গ্রন্থ-প্রচারকার্য্যে বিঘ্ন ঘটে। বন্ধুবিয়োগ হেতু এবিষয়ে মহারাজারও উৎসাহ কমিয়া আসে, তবে চূড়ামণি মহাশয় অধ্যাত্ম দর্শন সম্বন্ধে সুবৃহৎ গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহা সত্বর যাহাতে প্রকাশিত হয় এজন্য তিনি চূড়ামণি মহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ করিতেন এবং বৃদ্ধ বয়সে লেখার কাজ তাড়াতাড়ি হইবে না, এই আশঙ্কায় তিনি মাসিক মাহিনায় একজন লেখক নিযুক্ত করিয়া দেন। একাদিক্রমে দশ বৎসরের পরিশ্রমেও চূড়ামণি মহাশয় তাঁহার সুবৃহৎ 'চূড়ামণি দর্শন' গ্রন্থ সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা লেখা হইয়াছে তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইলে বিশাল গ্রন্থই হইবে এবং বলা বাহুল্য দর্শন শাস্ত্রে ইহা অমূল্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই গ্রন্থে চূড়ামণি মহাশয় যে মনীষা, পাণ্ডিত্য ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা পরিমাপ করিতে যাওয়া আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। দুঃখ এই, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন কিন্তু তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভব হয় নাই। দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

চূড়ামণি মহাশয়ের প্রতি মহারাজের শ্রদ্ধা অবিচল ছিল। চূড়ামণি মহাশয়ের পরলোক-গমনের সংবাদ শুনিবা মাত্র, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রেও মহারাজ শ্মশানে উপস্থিত হইলেন এবং যতক্ষণ দাহন-কার্য্য সমাধা না হইল ততক্ষণ তিনি রৌদ্রে অনাবৃত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই মহাপুরুষের স্বর্গগত আত্মার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের শ্রাদ্ধ-বাসরে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের মূর্ত্তিখানি এখনও চিত্তপটে সজাগ রহিয়াছে—কখন তিনি বিদেশাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গের আদর অভ্যর্থনায় ব্যস্ত, কখন বা ব্রতী আচার্য্যগণের কার্য্যকলাপসন্দর্শনে বিভোর, আবার কখনও বা ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত যুবকের উৎসাহে সমাগত দরিদ্র নারায়ণের সেবা নিজ হস্তে করিয়া শ্রাদ্ধের সকল কার্য্য সমাধা হইলে পর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের পবিত্র স্মৃতিতে যে মহারাজের এই অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা-নিবেদন তাঁহাকে আমি আমার প্রণতি জানাই।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল কথা

-শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

শাক্য মুনি যখন প্রথম বুদ্ধত্ব লাভ ক'রে সত্য ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন তখন কি ভারতবর্ষে ধর্ম্মই ছিল না? যদি ছিল তা হ'লে কি সে ধর্ম্ম? কেনই বা আবার নূতন ধর্ম্মের প্রয়োজন হ'ল? এই সব কথার উত্তর বুদ্ধদেবের উপদেশ-বাণী হতেই পাওয়া যায়।

বুদ্ধ ভগবান যখন নূতন ধর্ম্মের সন্ধান পেয়ে জগৎকে সেই ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতে মনস্থ করেন তখন তিনি তাঁর পুরাতন পাঁচজন তপস্বী সঙ্গীর সন্ধানে বার হন। সন্ধান করতে করতে তিনি কাশী বারাণসীর নিকটবর্ত্তী মৃগদাব নামক স্থানে উপস্থিত হন। মৃগদাব বা Deerpark, এর আধুনিক নাম সারনাথ। এইখানে তিনি সেই পাঁচজন তপস্বী বন্ধুর সাক্ষাৎ পান। অবিলম্বে তিনি তাঁদের আহ্বান করে নিজের আবিষ্কৃত ধর্ম্মের সন্ধান দান করেন।

এই প্রথম ধর্ম্ম উপদেশদানকে বৌদ্ধশাস্ত্রে ধর্ম্ম-চক্রপ্রবর্ত্তন বলে; ইংরাজী গ্রন্থে এর অনুবাদ করা হয়েছে Sermon at Benares।

এ ছাড়া আরো অনেক উপদেশ-বাণী হতে তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা পাঠকদের অবগতির জন্য এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনসূত্র ও অন্যান্য দু' একটী সূত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলাম। পাঠক এই বিবরণ হতে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন গুলার উত্তর পাবেন। ধর্ম্ম-চক্রপ্রবর্ত্তন সূত্রের মর্ম্ম:—

সম্যক সম্বুদ্ধ শাক্যমুনিকে অদূরে আসতে দেখে পাঁচজন তপস্বী বন্ধু স্থির করলেন যে কেউই তাঁকে নমস্কার করবেন না ও গুরুদেব বলে সম্বোধনও করবেন না। কারণ তিনি অনাহার ব্রত ভঙ্গ করে আহার করেছিলেন, সুতরাং তাঁর ধর্ম্মচ্যুতি ঘটেছিল; তিনি আর ধর্ম্মপিপাসু ভিক্ষু নন; তিনি সংসারীর মত স্বেচ্ছাহারী ও স্বেচ্ছাবিহারী হয়েছেন।

কিন্তু তথাগত যখন ধীর গম্ভীর ভাবে তাঁদের কাছে এসে পড়লেন তখন তাঁর মহিমময় পুণ্যজ্যোতিবিভাসিত মুখকান্তি দেখে পঞ্চতপস্বী আর না উঠে দাঁড়িয়ে এবং সসম্মানে অভিবাদন না করে থাকতেই পারলেন না। তবু তাঁরা তাঁকে নাম ধরে ও বন্ধু বলে সম্ভাষণ করতে ছাড়লেন না।

এইরূপে সম্ভাষিত হওয়াতে বুদ্ধদেব তাঁদের বল্লেন—"যিনি বুদ্ধত্ব লাভ করে তথাগত হয়েছেন তাঁকে নাম ধরে বন্ধু বলে সম্বোধন করা উচিত নয়। বুদ্ধ সম্যক দৃষ্টিতে সর্ব্বজীবকে দেখেন; সমভাবে সবাইকে ভালবাসেন ও সবার শুভ কামনা করেন; এ জন্য বুদ্ধ মাত্রেই সর্ব্বজীবগুরু; সর্ব্বজীবগুরুকে সম্মান করতে হয়।

তথাগত বলতে থাক্‌লেন, "নানারূপ কষ্টকর অভ্যাস ও কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা মুক্তি সন্ধান করেন না বলেই যে তথাগত সংসার-সুখবিলাসী তা নন। তথাগতরা মধ্যপন্থার সাধক।

"মাছ মাংস না খেয়ে, উলঙ্গ থেকে, মাথা কামিয়ে, জটাধারণ করে বা লোমবস্ত্র পরে বা ছাইমাটী মেখে বা আগুণে ঘৃত মাংস আহুতি দিয়ে চিত্তশুদ্ধি লাভ করা যায় না; যে সাধকের মন মোহ ভ্রম ও প্রমাদ হতে মুক্ত তারই কেবল চিত্তশুদ্ধি ঘটে—

"চারিবেদ পাঠ; পুরোহিতদের দক্ষিণাদান, দেবতাদের তৃপ্তিসাধন উদ্দেশ্যে পশু হিংসা করে যাগযজ্ঞসাধন; শীতে উত্তাপে দেহকে নানারূপ ক্লেশ দিয়ে কৃচ্ছ্রসাধন ও উগ্র তপস্যাকরণ, স্বর্গে অমর হয়ে সুখভোগ করবার জন্য এই যে সব বিবিধ সাধনা, এতে অহং-মোহগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিত্তশুদ্ধি ঘটে না—

"ক্রোধ, মদ ভাঙ্ প্রভৃতির ব্যবহারে নেশাজনিত মত্ততা; একগুঁয়েমি বা একরোখামি; ধর্ম্মান্ধতা, গোঁড়ামি, ছল চাতুরী হিংসা দ্বেষ, আত্ম প্রশংসা; আত্ম তোষামোদ, পরনিন্দা, হীনতা, পরের অনিষ্টসাধনের মতি ও সংকল্প—এই সব ঘৃণিত পাপ প্রবৃত্তিই চিত্তকে অশুদ্ধ ও অপবিত্র করে; মাংস খেলেই যে মানুষ অশুদ্ধ হয় তা নয়—

"চরম সুখভোগ ও চরম ভোগত্যাগ, আসক্তি ও বৈরাগ্য দুই-ই চরম মাত্রায় অভ্যাস করা নিন্দনীয়; এই দুই-এর মাঝামাঝি একটা পথ আছে; তাকে বলে মধ্যপন্থা (middle path)। হে ভিক্ষুগণ, এস, আমি তোমাদের এই মধ্যপন্থার সন্ধান দিই।

"অনাহারে থেকে, কৃচ্ছ্রসাধন করে দেহকে বিবিধ উপায়ে নির্য্যাতন করে লাভ এই হয় যে মাথা খারাপ হয়ে যায়, মন ও

মতি দুই-ই দুর্ব্বল ও মোহগ্রস্ত হয়। কৃচ্ছ্রসাধন ও উগ্র তপস্যায় ইন্দ্রিয়জয়তো দূরের কথা লৌকিক, সাংসরিক বুদ্ধিও জন্মায়না।

"যে প্রদীপে জল দিয়ে পলতে জ্বালে তার দীপে শিখা হয় না; আঁধার নষ্টও হয় না। যে পচাকাঠে আগুন জ্বালে তার আগুনই জলে না।"

"কঠোর তপস্যা কষ্টকর, বৃথা ও মিথ্যা। বিষয়ভোগ-বাসনা যে জয় করতে পারে নি সে কেমন করে দুঃখকর দেহ-নির্য্যাতন দিয়ে আত্মজয় করবে?

"অহঙ্কার, অভিমান, 'আমি-আমার বোধ' যার মনে প্রবল এবং 'আমি'বোধে যে-সুখের পিছনে ছোটে তার সমস্ত কৃচ্ছ্রসাধনা ও কঠোর তপস্যা বৃথা হয়। কেবল সেই-ই বাসনামুক্ত যার অহংবোধ ঘুচেছে। এ হেন অহংজ্ঞানহীন ব্যক্তি স্বর্গও চায় না, ঐহিক সুখভোগও চায় না এবং এরূপ অহংমুক্ত জীব দেহের স্বাভাবিক অভাব পূর্ণ করলে অপবিত্র, অশুদ্ধ হন না। ক্ষুধা তৃষ্ণা পেলে নিশ্চয়ই তিনি খাদ্য পানীয় ভোগ করবেন। তাতে তাঁর চিত্তে কলুষ স্পর্শ করবে না। পদ্ম পঙ্কিল জলস্পর্শেও ভেজে না।

"কিন্তু ইন্দ্রিয়পরায়ণতা মানুষকে দুর্ব্বল করে দেহে ও ও মনে। বিষয়ভোগী রিপুর দাস হয়; ভোগলালসা দেহ মনের অবসাদ ও অশুদ্ধি ঘটায়।

"কিন্তু জীবনধারণের জন্য যেটুকু বিষয়-সংস্পর্শ দরকার তা কর্ত্তব্য। মনের সাহায্যে জীব জ্ঞানলাভ করে; দেহের স্বাস্থ্যেই মনের তেজ ও শক্তি স্ফূর্ত্তি পায়; এই জন্য দেহের স্বাস্থ্য ও শক্তিরক্ষার জন্য যা বিষয়ভোগ দরকার তা অবশ্য-কর্ত্তব্য। তা না করাই অধর্ম্ম।

"হে ভিক্ষুগণ, এই হ'ল আমার আবিষ্কৃত 'মধ্যপন্থা' এই পন্থার সাধক পথিক ত্যাগ ও ভোগের অতি বাড়াবাড়ি হতে রক্ষা পেয়ে মুক্তিপথে দ্রুত অগ্রসর হয়।"

তথাগত সেই পাঁচজন তপস্বী শ্রোতাকে সদয় ভাবে উপদেশ দিলেন। করুণাসিক্ত চিত্তে তাঁদের ভুলভ্রান্তি দূর করলেন। তাঁরা যে পথে চ'লেছিলেন সেই পথের ব্যর্থতা বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর অতি মহান প্রেমময় হৃদয়ের মৃদু উত্তাপে তাঁদের অভিমান ও বিরক্তি গলে উবে গেল।

তথাগত যখন বুঝলেন যে তাঁর শ্রোতাদের চিত্তক্ষেত্র উপদেশবীজগ্রহণের যোগ্য হয়েছে, সব বিরক্তি ও বাধার ভাব কেটে গেছে; নব ধর্ম্মরহস্য জানবার জন্য চিত্ত আগ্রহ ও ঔৎসুক্যপূর্ণ হয়েছে তখন তিনি ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হলেন। শিষ্যদের নির্ব্বাণের পরমা শান্তির আস্বাদ দিতে অগ্রসর হলেন।

তথাগত বলতে আরম্ভ করলেন;—

"আমি যে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করতে চাই তার কেন্দ্র যোজক (spoke) হচ্ছে সাধুচরিত্রের নিয়মাবলী। ন্যায় বিচার তাদের দৈর্ঘ্যের সমান মাত্রা। জ্ঞান হচ্ছে এই চাকার বহির্গোলক (tyre) নম্রতা ও চিন্তাশীলতায় এর নাভিকেন্দ্র (axle) গাঁথা আছে। সোজা কথায় সাধু চরিত্রের নিয়মাবলী, ন্যায়ব্যবহার, ধীরতা, অভিমানশূন্যতা, চিন্তাশীলতা এই সব গুণের উপর আমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম স্থাপিত।

"যিনি চারটী আর্য্যসত্যের মর্ম্ম গ্রহণ করেছেন তিনিই ঠিক পথে পা দিয়েছেন। কি কি সেই চাতুরার্য্যসত্য? এই জ্ঞান যে (১) দুঃখ আছে (২) দুঃখের হেতু (উৎপত্তির কারণ) আছে, (৩) দুঃখের প্রতিকার করা যায় (৪) প্রতিকারের যে ফল 'শান্তি' তা পাওয়া যায়।

"এই চার সত্য জেনে যে মুমুক্ষু ধর্ম্মপথে পা দিয়েছেন, তাঁর সাধনের সহায় আটটি উপায়:—

"প্রথম সম্যক দৃষ্টি, ঠিকভাবে যথাযথ তত্ত্ব-বিচার হচ্ছে এই আঁধার পথের বাতি; দ্বিতীয়, সম্যক লক্ষ্য (aim) তাঁর পথ-প্রদর্শক; তৃতীয়, সম্যক বাক্য হবে তাঁর পথের আশ্রয়; চতুর্থ, সম্যক ব্যবহার হবে সোজা পথ; পঞ্চম সম্যক আজীব, লোক-যাত্রানির্ব্বাহের জন্য সাধু ভাবে জীবিকা অর্জ্জন হবে তাঁর আরাম-বিরাম। ষষ্ঠ, সম্যক চেষ্টা হবে উচ্চ পথের সিঁড়ির ধাপ; সপ্তম, সম্যক ভাবনা হবে তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস; অষ্টম, সম্যক সমাধি হবে তাঁর শান্তির ভিত্তি। (সোজা কথায় দুঃখনাশক মুক্তি-পথে চলতে আরম্ভ করলে সাধককে কোন পূজা অর্চ্চনা, তপজপ, যাগযজ্ঞ, যোগযাগ কিছুই করতে হবে না, হবে শুধু আট রকম সাধু অনুষ্ঠান করতে—কি কি? সম্যক ভাবে ঘটনার বা অবস্থার বিচার করে চলতে হবে; লক্ষ্য থাকবে সাধুকার্য্য, কথার ঠিক থাকবে, মিথ্যাকথা ছাড়তে হবে; সাধু ব্যবহার সবার সঙ্গে করতে হবে। জীবিকা উপার্জ্জন করবে সাধু-উপায়ে; সমস্ত চেষ্টা ও উদ্যমের মূলে থাকবে সততা ও

সাধুত্ব; ঠকানো বা ফাঁকি দেওয়া ধর্ম্মপথে চলবেনা; সর্ব্বদা সাধুচিন্তা পোষণ করতে হবে। সমাধি যে বিষয়ে হবে তা সাধু হওয়া উচিত এইরূপ ভাবে সাধন পথে চললে চরম লাভ, পরমা শান্তি, মুক্তি বা নির্ব্বাণ হবে।

অতঃপর তথাগত আত্মার অনিত্যতা সম্বন্ধে শিক্ষা দেন।

তিনি বল্লেন—"যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসংযোগ দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে তারই বিনাশ আছে; এই দেহ-চৈতন্য যাকে জীব 'আত্মা' বলে, তা পাঁচ রকম যৌগিক পদার্থে (স্কন্ধ) যোগাযোগে উৎপন্ন হয়েছে; দেহনাশে এরও নাশ হয়ে যায়; সুতরাং আত্মার জন্য এত ব্যস্ততা, ব্যাকুলতা সব বৃথা; মরুভূমে মরীচিকা যেমন মায়ামাত্র, জীবদেহে চেতন আত্মার তেমনই স্বাধীন, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। যখন আত্মাই নাই, কেউ যে ভোগ করবে তারই অভাব তখন সুখ দুঃখের ভাবনা মিথ্যা; এই সব ঘুচে যাবে যখন মানুষ এ কথার সত্যতা বুঝবে। ঘুমন্ত লোক জেগে উঠলে যেমন তার দৃষ্ট স্বপ্ন মিথ্যা বলে বুঝতে পারে তেমনি অজ্ঞানী মানুষের জ্ঞান হলে বুঝবে স্বতন্ত্র আত্মার স্বপ্নটাও মিথ্যা।

"যার মোহনিদ্রা কেটেছে তার ভয়ও ঘুচেছে; সে তখন 'বুদ্ধ' বা 'জাগ্রত' (awakened) হয়। তিনি তখন পার্থিব জীবনের ভাবনাচিন্তা, আশাআকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ সব মিথ্যা বলে বোঝেন।

প্রায়ই এমন ঘটতে দেখা যায় যে মানুষ যখন নদীতে স্নান করতে করতে একটা ভিজে দড়িতে পা দিয়ে ভ্রম করে সাপের কামড়ের পরিনাম ভেবে কিরূপ কল্পনায় যন্ত্রনা পায়, ভয়ে সারা হয়! কিন্তু যখন দেখে বুঝতে পারে যে এটা 'দড়ি' 'সাপ' নয়; তখন তার কী শান্তি, কী তৃপ্তি, কী আরাম! এতক্ষণ যে দুঃখটা মনে পেল তা শুধু বৃথা ভয়ের কল্পনা করে; তা শুধু মিথ্যা জ্ঞান হতেই সে পেল! সংসারী অজ্ঞানমুগ্ধ 'আত্ম-বিশ্বাসী' লোকেরও এইরূপ অবস্থা। 'আত্মা' কল্পনা করেই মৃত্যু, দৈন্য ও ব্যাধিভয়; যখন বোঝে এরূপ আত্মার নিত্যত্ব নেই, তখন সে সকল ভয় হতেই মুক্ত হয়।

"হে ভিক্ষুগণ, সেই ব্যক্তিই ভাগ্যবান যিনি এই মিথ্যা আত্ম-অভিমানে মুগ্ধ নন; যিনি এইরূপ মিথ্যা আত্মবোধ হতে মুক্ত তিনিই শান্তি পেয়েছেন। সেই ভাগ্যবান যিনি সত্যকে পেয়েছেন।

"সত্যই একমাত্র পরম মধুর বস্তু, সত্যই অমঙ্গল হতে উদ্ধার পাবার একমাত্র ঔষধ। সত্যই এ জগতে একমাত্র মুক্তিদাতা।

"এই সত্যের শরণ নাও; সত্যকে পরমবন্ধু বলে স্বীকার কর। সত্যের উপর আশা ও ভরসা রাখ, যদিও সত্যের পরম রূপ ধারণার অতীত, উগ্র ও ভয়ঙ্কর, যদিও সত্যের আস্বাদ প্রথম প্রথম খুব তিক্ত ও কটু, যদিও প্রথম দর্শনে সত্য উগ্রদর্শন তবু সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা রাখ, বিশ্বাস রাখ এই সত্যই একমাত্র ভবব্যাধির পরম ঔষধ।

"সত্য তার স্বরূপেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সত্যের নিজস্ব রূপকে কেউ 'আরো মনোহর' করতে পারে না; সত্যকে কেউ বদলাতে পারে না। এই সত্যে স্থিতি লাভ কর; এই সত্যের শরণ নাও।

"ভ্রমজ্ঞান কুপথে নিয়ে যায়; মোহ হতে দুঃখ জন্মে। ভ্রম ও মোহ উত্তেজক, বুদ্ধিবিনাশক মাদকদ্রব্যের সমান। আপাতঃমনোহর হলেও এই মিথ্যা মোহ মানুষকে আরো হীন ও জঘন্য করে দেয়।

"অহংবোধ, আত্মাভিমান জ্বরের মতই উত্তাপজনক। ক্ষণিকের মোহ ও স্বপ্ন এই 'আমি আমি' জ্ঞান; কিন্তু সত্যই স্বাস্থ্যকর, মহান ও শাশ্বত, সত্য ছাড়া অমৃত আর অন্য কিছু নাই। সত্যই সর্ব্বজয়ী।"

তথাগতের অমৃত কথা শেষ হলে পাঁচ শিষ্যের মধ্যে একমাত্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কৌণ্ডিন্যই জ্ঞাননেত্রে বুদ্ধিবলে বুদ্ধদেবের উপদেশের গভীর মর্ম্ম বুঝতে পারলেন। তিনি বলে উঠলেন, "হে তথাগত, সত্যই আপনি একমাত্র মহান মুক্তি-মার্গের সন্ধান পেয়েছেন!

ভগবান বুদ্ধ এই পঞ্চশিষ্যকে একত্র ও একব্রতধারী করে তার প্রবর্ত্তিত বিশ্ববিখ্যাত সঙ্ঘের ভিত্তিস্থাপন করেন।

বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের গোড়ার কথা হচ্ছে দুঃখ হতে আত্মাকে মুক্তি দেওয়াই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। জীব যে দুঃখ পায় তা তার নিজ কৃতকর্ম্মের ফল। কোনো দেব-দেবতা মানুষের দুঃখের জন্য দায়ী নন এবং জীবের এই দুঃখ দূর করার শক্তি দেব-দেবতাদের নাই। 'আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু' এই হচ্ছে বুদ্ধব্যাখ্যা ও ধর্ম্মের মূল সূত্র। পূর্ব্ববর্ণিত সূত্রের পরিচয়ভাগে পাঠক জেনেছেন যে বুদ্ধদেব চারটী

আর্য্যসত্যের উল্লেখ করেন ; দুঃখ আছে ; দুঃখের উত্তেজক কারণ আছে ; দুঃখের নিরোধ হ'তে পারে ; নিরোধের পন্থা আছে। কিন্তু এই আর্য্য সত্য চতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা করা হয়নি।

আমরা অন্য এক সূত্র (উপদেশ-বাণী) হ'তে এই আর্য্য-সত্য চারটী ও দশ অকুশল বা অমঙ্গলের (evil) বর্ণনা দেব।

তথাগত বললেন—"হে ভিক্ষুগণ অমঙ্গল কি ?

"জীবহত্যা, চুরি, ইন্দ্রিয়সেবা, ব্যভিচার, মিথ্যা-কথন, পর-নিন্দা, পর-কুৎসা, বাজে কথা বলা ; হিংসা, ঘৃণা ; মিথ্যাগত বা ধর্ম্মে আসক্তি এই সব হ'ল অমঙ্গল।

"কি হ'তে এই সব অমঙ্গল ঘটে ? অশুভের মূল কিসে ?

"ভোগ-বাসনা, ঘৃণা, ভ্রান্তি ও মোহ এই তিন হ'তে অমঙ্গল দেখা দেয়।

"শুভ কি ? মঙ্গল কিসে ?

"পূর্ব্বোক্ত অমঙ্গলগুলির অনুষ্ঠান না করা অর্থাৎ ঐ সব পাপ না করাতেই শুভ।

"শুভ বা মঙ্গলের মূল কিসে ?

"বাসনা বা কামজয়, ঘৃণা দ্বেষ মোহ হ'তে বিরতি ; এই হ'ল মঙ্গলের মূল।

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ কি, দুঃখের হেতু কি, দুঃখের নিরোধ হয় কিসে ?

"জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোকতাপ, নিরাশা, অপ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া, প্রিয় হ'তে বিচ্ছিন্ন হওয়া ; আকাঙ্ক্ষার বস্তু না পাওয়া, এই গুলোকেই দুঃখ বলে।

"এই সব দুঃখের হেতু কি ?

"কাম, আসক্তি, ভোগ-পিপাসা, ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জীবজন্ম পাবার আকাঙ্ক্ষা, এই সব হ'ল দুঃখের উৎপাদক কারণ।

"দুঃখের নিরোধ হয় কিসে ?

"এই ভোগবাসনাকে, এই তৃষ্ণাকে, এই পুনঃ পুনঃ সুখভোগার্থে মানব-জন্ম পাবার ইচ্ছাকে সমূলে নষ্ট করাতেই দুঃখের নাশ হয়।

"কোন্ পন্থা ধরে চল্লে জীব দুঃখের হাত হ'তে মুক্তি পায় ?

"আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গই দুঃখ-নিরোধের একমাত্র পন্থা ; অর্থাৎ সম্যক দৃষ্টি, সম্যক লক্ষ্য বা সম্যক বিচার, সম্যক বাক, সম্যক কার্য্য, সম্যক জীবিকার্জ্জন, সম্যক উদ্যম, সম্যক ভাবনা ও সম্যক সমাধির অভ্যাসেই দুঃখ-নিরোধ হয়।"

অন্য এক সূত্রে ভগবান বুদ্ধ দশ অকুশল (evils) ব্যাখ্যা করেছেন :—

"হে ভিক্ষুগণ মানুষ যত রকম কাজ করে তা ভাল মন্দ ভেদে দশ প্রকার ; এবং এই দশ প্রকার কাজকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—

কায়িক ; বাচনিক ; মানসিক।

(১) কায়িক মন্দ কাজ (অকুশল) হচ্ছে তিনটী, যথা :—খুন, চুরি, ব্যভিচার। এইগুলি না করাই হচ্ছে কায়িক কুশল অনুষ্ঠান (ভাল করা)।

(২) বাচনিক মন্দ কাজ হচ্ছে মিথ্যা বলা, কুৎসা করা, গালি দেওয়া, বৃথা বাজে কথা বলা, এইগুলি না করা বাচনিক কুশল অনুষ্ঠান।

(৩) মানসিক মন্দ কাজ হচ্ছে তিনটী, যথা :—লোভ, ঘৃণা করা, ভ্রমভ্রান্তিতে পড়া ; এদের বিপরীত যা তাই হল মানসিক কুশল। অতএব প্রত্যেক মুক্তিকামী সৎধর্ম্মানুরাগীর কর্ত্তব্য হচ্ছে :—

১। জীব হত্যা না করা ; প্রাণীর প্রাণের প্রতি দরদ রাখা।

২। পরের দ্রব্য চুরি না করে তাকে তার শ্রমলব্ধ অর্থ বা দ্রব্য ভোগ করতে দেওয়া।

৩। ব্যভিচার বা ইন্দ্রিয়-সেবা না করা, দেহ-মনের পবিত্রতা রক্ষা করা।

৪। মিথ্যা কথা না বলে বিচারপূর্ব্বক নির্ভয়ে সদয় ভাবে সত্য কথা বলা।

৫। পরের যশ ও মানহানিকর কোনো কথা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে না বলা, পরের দোষ দর্শন বা প্রদর্শন না করা।

৬। শপথ না করা, অভদ্র অকথ্য কথা না বলা, গালাগালি না-দেওয়া।

৭। অকারণ বাজে কথা বলে সময় নষ্ট না করা,—হয় কাজের কথা কও না হয় চুপ করে থাক।

৮। পরের ভাল দেখে ঈর্ষা না করা, পরের দ্রব্যে লোভ না করা

৯। অপরের প্রতি হিংসা বা ঘৃণা ভাব না রাখা, শত্রু-মিত্র-অভেদে প্রেম করা।

১০। মনে অজ্ঞানের লেশ না রাখা; অন্ধ সংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা। সর্ব্বদা সত্যের অনুসরণ করা। সদ্ধর্ম্মে সন্দেহ পোষণ না করা; ন্যায় বা অন্যায় যে কি তার সম্বন্ধে ভ্রমবুদ্ধি না রাখা।

যে কয়টী মূল শাস্ত্র-গ্রন্থ নিয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্র তা সবই বুদ্ধদেবের উপদেশ-বাণী সংগ্রহ করেই তৈরী হয়। বহু সহস্র উপদেশ-বাণী বুদ্ধদেব রেখে যান। সমস্ত উপদেশই হয় সংঘের শিষ্যদের না হয় ধর্ম্ম-গ্রহণেচ্ছু অন্য লোকের কাছে দেওয়া। সব ক্ষেত্রেই একই কথা:—সাধু হও, সুশীল হও, জীবের প্রতি প্রেম ও করুণা দেখাও, ভোগাসক্তি ত্যাগ কর, আসক্তি ত্যাগ করে সংসারে থাক, লোক ব্যবহার কর, ষড়রিপুর দাসত্ব ক'রোনা। মিথ্যা অহংমমত্ব বোধ রেখনা; স্বার্থের বশীভূত হয়ে আত্মসুখের সেবা ক'রোনা। জীব যে দুঃখ পায় কেবল অহংবুদ্ধির চরিতার্থতার জন্য ভোগবাসনার বশীভূত হয় ব'লে; নিজের অজ্ঞতায় নিজের শত্রুতা করে। ঈশ্বর বা দেব-দেবতা এ জন্য দায়ী নন। কাজেই পশুহিংসা ক'রে যাগযজ্ঞাদির দ্বারা তাদের তৃপ্তিসাধন ও অনুগ্রহলাভের চেষ্টা একেবারেই মিথ্যা। বাহ্য অনুষ্ঠানে, কৃচ্ছ্রসাধনে, জপতপে চিত্তশুদ্ধি হয় না; চিত্তশুদ্ধি হয় বাসনানাশে, শীল-অভ্যাসে, সাধু জীবন-যাপনে, প্রেম, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা এই চারগুণ অভ্যাসে। প্রেম কিনা জীবমাত্রেই আত্মবোধে ভালবাসা; মুদিতা কিনা অপরের সুখ-সৌভাগ্য দেখে হর্ষ প্রকাশ করা, করুণা কিনা অপরের দুঃখ কষ্ট দেখে দুঃখ কষ্ট পাওয়া; উপেক্ষা কিনা নিজ সৌভাগ্যে, দুর্ভাগ্যে, সম্পদে, বিপদে, হর্ষ বা শোকপ্রকাশ না করা।

এইরূপ চরিত্র বিকাশ দ্বারাই, সাধুতা লাভ করে, অহঙ্কার নষ্ট করে, নিজের ছোট-আমিকে বিসর্জ্জন দিয়ে সমস্ত বিশ্বকে আমি বোধ করে উন্নত ধর্ম্ম-জীবন লাভ ক'রলেই মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ করা যায়। নির্ব্বাণ লাভ মানে চিত্ত হ'তে রাগ দ্বেষ মোহ দূর করে দিয়ে বিশুদ্ধিলাভ করা; ছোট-আমিকে নষ্ট করে বিশ্ব আমিত্বে পৌছানো।

বুদ্ধের এবম্বিধ নীতিমূলক ধর্ম্মে পূজা, জপতপ, উপাসনা বা অন্যবিধ বাহ্য ক্রিয়াকলাপ দ্বারা দেবদেবতার কৃপাভিক্ষার কোনো অনুষ্ঠান নাই; শুষ্ক দার্শনিক আলোচনা ও বাদ-বিসম্বাদের স্থান নাই; অকারণ কৃচ্ছ্রসাধন ও উগ্র তপস্যা দ্বারা দেহ-নির্যাতনের ব্যবস্থা নাই; যোগাভ্যাস দ্বারা সিদ্ধি বা ঐশ্বর্য্যলাভেরও নির্দেশ নাই!

আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে যা নিয়ে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র টি'কে আছে বা থাকে; ঈশ্বর, স্বর্গ-নরক, আত্মার অমরত্ব, এর কিছুরই স্থান নাই বুদ্ধ-প্রচারিত সদ্ধর্ম্মে! তথাপি এই ধর্ম্ম বুদ্ধের জীবনকালেই হু হু করে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এবং তাঁর পরিনির্ব্বাণের দেড় শত বৎসর মধ্যে বহু দূরদুরান্তের দেশ-বিদেশেও দাবানলের মত বিস্তৃতি লাভ করে।

আত্মজয় দ্বারা মনুষ্যত্বলাভেই ধর্ম্ম, বাহ্য অনুষ্ঠানে ধর্ম্ম নয় এ কথাতো তার পূর্ব্বে উপনিষদের ঋষিরাও বলেছেন; জীবাত্মার মিথ্যাত্ব ও বৈদিক যাগযজ্ঞাদির ব্যর্থতা, এ কথাও উপনিষদের মধ্যে দেখা যায়—তার সমসাময়িক জৈনধর্ম্ম-প্রচারকর্ত্তা জিনরাজ মহীবীরেরও অনুমোদিত মত; তবু দেখা যায় বুদ্ধদেবের ধর্ম্মই সারা পৃথিবীর অর্দ্ধ ভাগকে দখল ক'রে ব'সে। এর কারণ কি? কারণ ভগবান বুদ্ধদেবের personality, ব্যক্তিত্ব। তাঁর অপার দয়া, প্রেম, করুণা, অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, চরিত্রমহিমা, অসীম জ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাবার আশ্চর্য্য কৌশল, শিক্ষা দিবার অতুলনীয় পদ্ধতি; এই সব মহৎ গুণই তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সত্বর বিস্তৃতির ও প্রভাব-বৃদ্ধির মূল হেতু।

তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম হ'তে স্বতন্ত্র ধর্ম্ম ছিল না। তাঁর সময়ে দেশের প্রবল জাতীয় ধর্ম্ম ছিল হিংসামূলক যজ্ঞ-ধর্ম্ম। চরিত্রানুশীলন দ্বারা মুক্তিলাভ অপেক্ষা যাগযজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গলাভই ছিল বৈদিক ধর্ম্মের মূল কথা। ভাবুক, চিন্তাশীল, ধর্ম্মপ্রাণ বহু ব্যক্তিরই এই হিংসামূলক ধর্ম্মের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানও সেকালে এমনি শ্রম ও ব্যয়বহুল জটিল হয়ে এসেছিল যে সাধারণ লোকের স্বর্গলাভের আশা ক্রমেই ক্ষীণ হ'য়ে আসছিল; বুদ্ধিমান অনেকে বৈদিক যজ্ঞধর্ম্মের আশ্রয় ছেড়ে দার্শনিক আলোচনা দ্বারা তত্ত্ব বিচার ক'রে অন্য পন্থানির্ণয়ে অগ্রসর হন। অনেকে তপস্যা ও ধ্যান-মার্গকে অবলম্বন করেন। কিন্তু সাধারণ সংসারী জীব পড়লো কঠিন সমস্যায়, কে এমন পথ দেখাতে পারেন যে পথে চ'লে দু'দিক বজায় থাকে? সহজে পুণ্য লাভ হয়? সংসার ও স্বর্গ দুইই সহজ হয়ে ওঠে? কে এমন ধর্ম্মের সন্ধান দিতে পারেন যে ধর্ম্মের পথে চললে ঐহিক ও পারত্রিক

কল্যাণ সহজলভ্য হয়; ধর্ম্ম সহজসাধ্য হয়; সংসারে বার বার জন্মানো বন্ধ হয় ও দুঃখের নিরোধ হয়? মানুষ সেই লোকের সন্ধান পায় কপিলা-বাস্তর শাক্য সিংহে এবং শান্তি পায় তাঁর প্রবর্ত্তিত কল্যাণ ধর্ম্মে।

অতঃপর একটা গোলমেলে কথার মীমাংসা ক'রে প্রবন্ধ শেষ করি।

বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম যদি এই-ই হয়; অহিংসা, ব্রতপালন, জীবের কল্যাণসাধন, আত্মচরিত্রের উৎকর্ষসাধন এই যদি বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূল কথা হয়, তবে এতে এমন দোষের কথা কি আছে যাতে ক'রে ভগবান বুদ্ধ তাৎকালিক বৈদিকযজ্ঞ-ধর্ম্মবাদীদের এত বিরাগভাজন হন? কেনই বা বেদবাদীরা বুদ্ধ ধর্ম্মকে অবৈদিক, সুতরাং হেয় ও বর্জ্জনীয় ধর্ম্ম ব'লে প্রচার করেন? বেদগোঁড়া ব্রাহ্মণদের মনের কথা যাই থাক বাইরে তাঁরা বুদ্ধদেবের নামে এই অপবাদ দিতেন যে (১) তিনি বেদের নিন্দা করতেন। (২) তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সাধারণের হেয় করেন। (৩) তিনি জপতপকৃচ্ছ্রসাধনের বিরোধী ছিলেন। (৪) তিনি নাস্তিক ছিলেন। (৫) তিনি আত্মা মানতেন না।

যাঁরা বুদ্ধদেরের উপদেশ বাক্যগুলির সঙ্গে ভালরূপ পরিচিত তাঁরা জানেন এই সব অপবাদের অধিকাংশই মিথ্যা।

দু' একটা নালিশ যদি বা সত্য হয় তার জন্য তাঁকে হিন্দু-সমাজের বহিভূ'ত করার কোনো হেতু নাই। এই অপবাদ-গুলার বিচার করা যাক—

১। বুদ্ধ বেদের নিন্দা না করুন, বৈদিক যাগযজ্ঞাদির কোনো সার্থকতা স্বীকার করেন নাই। হিংসামূলক ক্রিয়া-কলাপে যে স্বর্গলাভ বা আত্মার কল্যাণ সাধন হয় এ কথা তিনি স্বীকার করেন নাই; এবং উপনিষদের ব্রহ্মবাদী ঋষিরাও স্বীকার করেন নি; স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতাতে বৈদিক পন্থার সকাম উপাসনাকেও নিন্দা করেছেন। মুণ্ডক উপনিষদের ঋষিতো স্পষ্ট বাক্যেই বলেছেন।

(প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য মুণ্ডক ১।২।৭) ঋষিতো তাদের মূঢ় ও মূর্খ বলেছেন। বুদ্ধদেব অতদূরও যান নি।

২। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তিনি হেয় করবার চেষ্টা করেন নি, তবে মুক্তির জন্য সন্ন্যাসগ্রহণের বয়স ও কালবিচার তিনি করতেন না। যে কোনো অবস্থায় যে কোনো লোক সংসার ও ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগ করতে পারবে এই ছিল তাঁর বিধি। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য বৈদান্তিক ও কাপিল সন্ন্যাসীদেরও এই মত ছিল।

৩। জপতপ কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যর্থতা তিনি প্রচার করতেন। উচ্চদরের ব্রহ্মজ্ঞ বৈদান্তিকরাও জপতপসাধন অজ্ঞ অধম অধিকারীদের কর্ত্তব্য ব'লে প্রচার করতেন।

৪। বুদ্ধদেব নাস্তিক ছিলেন, তার মানে ঈশ্বর ও দেব-দেবতা মানতেন না। কপিলমুনিও ঘোর নিরীশ্বরবাদী ছিলেন; কুমারিল ভট্টের মতে মীমাংসকরাও ঈশ্বর মানতেন না; অদ্বয়বাদী ইশ্বরকে ব্রহ্মের মায়িক মূর্ত্তি বলতেন; অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যবহারিক ভাবে সত্য, পরমার্থতঃ নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য। বুদ্ধদেবও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবদেবতাদের অস্তিত্ব মানতেন; তবে ব্রহ্মাদি দেবগণ মনুষ্যাদির ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর সৃষ্টজীব মাত্র, এই ছিল তাঁর মত।

৫। বুদ্ধদেব আত্মা মানতেন না। একভাবে একথা সত্য। বৈদান্তিক নির্গুণ ব্রহ্মবাদীও বলেন 'জীব মিথ্যা', অর্থাৎ জীবের মধ্যে একটা দেহপরিমিত substantial নিত্য আত্মা থাকার কথাটা মিথ্যা। Unreal, phenomenal; যেমন মহাকাশ সত্য, ঘটাকাশ appearance মাত্র, মায়া মাত্র, তেমনি ব্রহ্ম as a cosmic principle সত্য; as a personal being মিথ্যা; ব্রহ্মের দেহযোগে জীবাত্মা হওয়াটাও তেমনি মিথ্যা। বুদ্ধদেবেরও এই মত। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যেও এই মত। জীবাত্মার ব্যবহারিক সত্যতা তিনি মানতেন। যদি এই হয় তবে শঙ্করাচার্য্য এবং যাজ্ঞবল্ক্য ও কপিল প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞেরাও হিন্দু সমাজের ভিতর হ'তে বহিষ্কৃত হবার যোগ্য।

কিন্তু আসল কথা তা নয়। বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত পুণ্য-চরিত্র প্রভাবে সত্যধর্ম্ম-পিপাসু সহস্র সহস্র লোক তাঁর ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

শীঘ্রই বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রাবল্যে বৈদিক ব্রাহ্মণদের ধর্ম্ম-ব্যবসায়ে ভাটা পড়ে; আপাতঃ রমণীয় আশ্বাসবাক্য দ্বারা 'বেদবাদরত' যাজ্ঞিকরা বেশ দু' পয়সা ক'রে খাচ্ছিলেন; রাজারাজড়া ধনী-মানী ব্যক্তিদের যজমান ক'রে ব্রাহ্মণরা ইন্দ্রাদি দেবতাদের কাছ হ'তে ধন-ধান্য পুত্র-কলত্র প্রভৃতি লাভ ক'রে বেশ দিন-

পাত করছিলেন ; হঠাৎ বুদ্ধদেবের কল্যাণধর্ম্ম দেশকে প্লাবিত ক'রে ফেল্‌লে। ব্রাহ্মণদের ব্যবসা-জগতে depression এল ; কাজেই আত্মস্বার্থরক্ষার্থে ভাল-মন্দ নানারূপ চেষ্টা হ'তে লাগলো।

মন্দ চেষ্টা হ'চ্ছে :—বুদ্ধদেবকে গালমন্দ দিয়ে হীন ও ছোট করা ; বুদ্ধশিষ্যদের সাধারণের কাছে হেয় করা ; বুদ্ধধর্ম্মকে গ্লানিকর ভাষায় চিত্রিত ক'রে দেখানো। রামায়ণে কে একজন মুনি বুদ্ধদেবকে চোর, ভণ্ড ও নাস্তিক ব'লে রামের কাছে বক্তৃতা দিয়েছেন।

ভাল চেষ্টার দৃষ্টান্ত ভগবদ্‌গীতা, যোগবাশিষ্ট, শান্তিগীতা প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্ররত্ন। এই সব গ্রন্থের রচয়িতা বুদ্ধিমান, ভাবুক, সত্যগ্রাহী, দূরদর্শী ব্যক্তি। তাঁরা বৈদিক যজ্ঞধর্ম্মের মন্দ অংশটা বর্জ্জন ক'রে বুদ্ধদেবের পবিত্র নীতিধর্ম্ম ও নির্ব্বাণ তত্ত্বকে গ্রহণ করলেন ; অথচ বৌদ্ধধর্ম্মের 'অকালে সংসার ত্যাগ' ও 'স্বধর্ম্মপালনে বিরক্তি' ও কর্ম্মত্যাগকে সমাজের মঙ্গল পক্ষে নিন্দনীয় বুঝে উভয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠাংশ মিশিয়ে এক নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার ক'রলেন। এতে সংসারবন্ধনজনক তৃষ্ণাকে (সকাম কামনা) দূষণীয় ব'লে বুঝানো হ'ল ; অথচ নিষ্কাম চিত্তে জগতের কল্যাণের জন্যই যজ্ঞাদি ধর্ম্ম সাধন ক'রলে ব্রহ্মনির্ব্বাণলাভ খুব সহজেই হয় এইটী প্রচার করাও হ'ল।

এঁদেরই অপূর্ব্ব প্রতিভার গুণে আজ ভারতবর্ষে আর্য্য সন্তান বৈদিক ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মের মন্দাংশ বর্জ্জন ক'রে উভয়ের শ্রেষ্ঠাংশ নিয়ে যে আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম শঙ্করাচার্য্যাদির কাল হ'তে উৎপন্ন হয়েছে তারই অমৃত ফল সেবন ক'রছে। বৈদিক ধর্ম্মও একেবারে মরে নি ; বুদ্ধপ্রচলিত নীতিধর্ম্মও একেবারে দেশছাড়া হয় নি ; দুই-ই আছে দুই-ই পুটপাক-শোধিত হ'য়ে জ্ঞানধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে আধুনিক হিন্দুধর্ম্মে পরিণত হ'য়েছে।

ফুটবল ম্যাচ

—শ্রীদিবাকর শর্ম্মা

বহুদিনের অনাবৃষ্টির পর শ্রাবণের ধারার মত অতিবাঞ্ছিত অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত একটী মনিঅর্ডার পাইলাম। অবিলম্বে টাকা কয়টি পকেটে ফেলিয়া ছাতি হাতে বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে বরাবর ধর্ম্মতলায় গিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কোথায় যাই! বন্ধুমহলে যাইবার ভরসা ছিলনা, পকেটে টাকা আছে জানিলে সিনেমায় না ঢুকিয়া রক্ষা নাই। এদিকে আকাশে আষাঢ়ের মেঘ সেনা সাজাইতেছে, ধারা-বৃষ্টি সুরু হইল বলিয়া! বিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছি, এমন সময় পিছন হইতে প্রশ্ন শুনিলাম—কোন্ মাঠে যাচ্ছেন? মুখ না ফিরাইয়াই অভ্যাসমত জবাব দিলাম—ধাপার। আবার প্রশ্ন আসিল—সেখানে কি খেলা আবার?

কহিলাম—মৃত্যুর!

উত্তর দিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি আমাদের পাড়ারই গিরিশ। থার্ড ক্লাশে পড়ে—সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইয়াছে। আমার কথা শুনিয়া গিরিশ কহিল—আমি ফুটবল খেলার কথা বল্‌ছিলাম।

কহিলাম—ওঃ! যাইনে অনেক দিন। কোন্ মাঠে চলেছ তুমি? !

গিরিশ কণ্ঠস্বর মুদারা ও তারার মাঝামাঝি জায়গায় তুলিয়া সগর্ব্বে কহিল,—ডাল-হাওসী! সেখানেই আজ ভাগ্য-পরীক্ষা—কে, আর, আর—ইষ্টবেঙ্গল! যাবেন?

চট্ করিয়া সম্মতি না দিয়া ভাবিতে লাগিলাম। এদিকে পর পর তিনখানি তিন নম্বরের বাস্ আসিয়া পড়িল।

মহা কোলাহল। কোলাহলের দুই একটি শব্দ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, 'দেবে দুখানা!' 'তিনখানাও হ'তে পারে!' 'উল্‌টে ঘাড়ে এক গণ্ডা না চাপে' 'ট্রেটার' 'চোপ্‌রও', 'লাগাও', 'মারো'!

সে বাসখানি চলিয়া গেল। আর কিছু শুনিতে পাইলাম না।

আর এক বাস্! আবার সেই কোলাহল 'জিত্‌তে হবেই আজ!' 'লীগ্ চ্যাম্পিয়ন' 'বাঙ্গালীর জীবন মরণ'! চমকিয়া উঠিলাম, শরীরে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, গিরিশ হাত ধরিয়া অত্যন্ত করুণ মিনতির স্বরে কহিল, 'চলুন না দাদা এই একটা দিন বৈত নয়! একজনের হাততালিতেও অনেকটা—'

দেখিলাম গিরিশের চোখ ছলছল করিতেছে। সকলের উৎসাহের ছোঁয়াচ লাগিয়া নিজেও কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কহিলাম—চল!

গিরিশ পরম উৎসাহে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বাসে তুলিল।

*　　　*　　　*

ধর্ম্মতলার মোড় ঘুরিতেই আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি আসিল। আমি তাড়াতাড়ি নামিয়া লেডল'র দোকানের গাড়ী-বারান্দার নীচে আশ্রয় লইলাম।

গিরিশ কহিল,—দাঁড়ালেন যে!

'বৃষ্টি ধরুক!' বলিয়া একটা থামে হেলান দিয়া বিড়ি ধরাইলাম।

গিরিশ আমার মুখের দিকে চাহিয়া তীব্রস্বরে কহিল,—বাঙ্গালী হ'য়ে আজ বৃষ্টিকে ভয় কচ্ছেন আপনি?

অতি সহজ ভাবে কহিলাম,—নিউমোনিয়া বাঙ্গালী ইংরেজ বাছেনা। তুমি যাও! আমি পার্ব্বনা।

গিরিশ আমার কথার জবাব দিল না; ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার ফিরিয়া চাহিয়া এক লাফে চৌরঙ্গীর রাস্তায় নামিল, তাহার পর একখানি চলন্ত মোটর-গাড়ীর সম্মুখ দিয়া অকুতোভয়ে রাস্তা পার হইয়া গেল।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, কিন্তু কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই, ধারা-বর্ষণকে সদম্ভে উপেক্ষা করিয়া দলে দলে বালবৃদ্ধযুবা খেলার মাঠের দিকে চলিতেছে। কাহারও নিউমোনিয়ার ভয় নাই। তবে কি একমাত্র আমার জীবনই মূল্যবান্! ভাবিতে ভাবিতে নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মিবার উপক্রম হইতেছিল, এমন সময় একটি তন্বী, তরুণী শ্বেতাঙ্গিনী সিল্ক স্কার্টে ছপ্ ছপ্ করিয়া আসিয়া আমার কাছে দাঁড়াইলেন। অলক্ষ্যে দেখিয়া লইয়া বুঝিলাম দারুণ বৃষ্টি ঠাকুরাণীকে কাহিল করিয়া ফেলিয়াছে। নবাগতা আমার ছাতিটার দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া কহিলেন—বাবু গোয়িং? নির্ব্বিকার-চিত্তে বিড়িতে লম্বা টান দিয়া নাসারন্ধ্রপথে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কহিলাম—নট গোয়িং। হেভী রেন্।

শ্বেতাঙ্গিনী পুনরায় আমার ছাতির দিকে চাহিয়া কহিলেন, নট ভেরী ফার্—কাম অন্।

ছাতিটাকে মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিলাম—নো। সিওর ফ্লু।

মেমসাহেব দাঁত খিঁচাইয়া কহিলেন, ও দি কাউয়ার্ড—তাহার পরক্ষণেই একটি ফৌজী সিপাহীভর্ত্তি বাসের দিকে চাহিয়া চেঁচাইয়া কহিয়া উঠিলেন—'দে আর গোয়িং! দি ড্রামস্! বলিয়াই আমার দিকে আর না চাহিয়া দ্রুতপদে চৌরঙ্গীর রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন।

কাওয়ার্ড! মেমসাহেবের কথাটি কাঁটার মত মর্ম্মে বিঁধিতে লাগিল। সত্যইতো এই অসংখ্য প্রাণী, ইহারা যদি মৃত্যুকে এড়াইতে না চাহে তবে আর আমি একা যমরাজকে ফাঁকি দিয়া মর্ত্তভূমে বাস করিয়া কি করিব? ভাবিতেছি এমন সময় মাঠের দিক হইতে ভীষণ চীৎকার শুনিলাম 'গোল!' সম্মুখ দিয়া একটা ফিটন গাড়ী যাইতেছিল, শব্দ শুনিয়া বুড়া কোচম্যান ঘোড়ার রাশ পা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া দুই হাতে তালি দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, 'গোল!' তাহার ছোক্‌রাটি হুড় চাপড়াইতে লাগিল। দেখিয়া শরীরের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। ছাতি না খুলিয়াই রাস্তায় নামিয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলাম।

*　　　*　　　*　　　*

খেলার মাঠের সেই বিশাল জনতারণ্যের পশ্চাতে যখন আসিয়া পৌছিলাম তখন মাত্র একপায়ে এক পাটি জুতা অবশিষ্ট আর একখানি পথে কোন্ কর্দ্দম-বিবরে আত্মগোপন করিয়াছে উৎসাহের আতিশয্যে তাহা লক্ষ্য করি নাই। নূতন জুতা—একটু মমতা হইতে লাগিল, কিন্তু খুঁজিবার প্রবৃত্তি জাগিবার পূর্ব্বেই ক্ষিপ্তপ্রায় জনসঙ্ঘ সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—'গোলে মার ভাই!' তাহার পরই সব নিস্তব্ধ, শুধু একদল সাহেব আর মেম করতালি দিতে লাগিল। ঘাড় উঁচু করিয়া করিয়া দেখিলাম বল আউট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আবার চীৎকার আরম্ভ হইল—ভাল করিয়া কিছু দেখিতে না পাইলেও আমিও সকলের সঙ্গে চীৎকার করিতে

লাগিলাম। স্বপ্ন নয় প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আমার আপন ভাইরা গোরা পল্টনের সঙ্গে লড়িতেছে! শরীর মুহুর্ম্মুহু রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, স্থান কাল ভুলিয়া গেলাম, প্রবল বৃষ্টিতে পকেটের বিড়ির বাণ্ডিল ভিজিয়া কাদা হইয়া যাইতেছে বুঝিতে পারিতেছিলাম, কিন্তু পকেটে হাত দিয়া সেটিকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করিল না। এমন সময় আমার ছাতাটা টান দিয়া কে কহিল, 'ছাতাটা খোল না একবার!'

বিষম রাগ হইল, কহিলাম, বিরক্ত কর্ব্বেন না বলছি।

বক্তা কোনো উত্তর না দিয়া ছাতাটা আমার হাত হইতে একরূপ কাড়িয়াই লইলেন। মাঠের দিক হইতে অতি কষ্টে চোখ ফিরাইয়া রোষরক্ত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়াই চমকিয়া উঠিলাম! রক্ত ও কর্দ্দমে বিচর্চ্চিত-দেহ স্বয়ং কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী। মুহূর্ত্তের মধ্যে খেলার কথা ভুলিয়া গিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম—আপনি! এ রকম অবস্থায়—

কমলাকান্ত হাসিয়া কহিলেন- সওয়ার পুলিশের ঘোড়ার নীচে পড়িয়াছিলাম।

বড় দুঃখ বোধ হইল। কহিলাম, বুড়ো মানুষ—এলেন কেন?

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখ গম্ভীর হইল, কহিলেন—নেশায়। প্রসন্ন সকালে পোস্তায় ল্যাংড়া আম কিনিতে নামিয়াছিল, ফিরিয়া গিয়া কহিল—আজকার ড্যালহৌসী মাঠের যুদ্ধে বাঙ্গালীর ভাগ্য-পরীক্ষা হইবে। পোস্তার আমের বাজারে বিষম আন্দোলন চলিতেছে। ভাবিলাম কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর দিবস-গণনা বুঝি শেষ হইল, তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়াছি—আফিমের কৌটাটা শুদ্ধ ভুলিয়া আনিতে পারি নাই। পথে আসিতে ভগবানের কাছে কত যে নিবেদন জানাইয়াছি তা আর কি বলিব? পীড়িত মুমূর্ষু সন্তানের শিয়রে বসিয়া জননী যখন ইষ্টদেবতার কাছে নির্ব্বাক্ প্রার্থনা জানায় সে দৃশ্য কি দেখিয়াছ? আসিবার পথে আমাকে দেখিলে সে দৃশ্য কিছু অনুমান করিতে পারিতে। এখন দেখিতেছি—না থাক্—

শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসা করিলাম—কি দেখ্ছেন?

কমলাকান্ত কহিলেন শ্মশান। অশুভ শব্দ উচ্চারণ করিলাম, রাগ করিও না। চন্দ্রশেখরের শ্মশানের বর্ণনা মনে আছে? মিলাইয়া দেখ মিলে কিনা। এখানে আসিলে সকলেই সমান হয়। ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, শত্রু-মিত্র, সাহেব-বাঙ্গালী সকলেই সমান। পূর্ব্বের গ্যালারী [illegible]র পশ্চিমের চেয়ার কোনও পার্থক্য নাই—কেহ জুতা ছুড়িতেছে, কেহ টুপী লুফিতেছে। সকলেই একভাবে বিভোর। কিন্তু আনন্দের হেতুটা অনুমান করিতে ঠিক্ পারিতেছি না। রাগ হইল রুক্ষস্বরে কহিলাম,--আনন্দ হবে না বাঙ্গালী লড়্ছে গোরার সঙ্গে, জাতের গৌরব—

বক্তৃতাটা সমাপ্ত করিতে পারিলাম না, চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটি অতি গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বুকে হাত দিয়া চক্ষু মুদিলেন। মনে হইল বৃদ্ধের কোথাও আঘাত লাগিল

কহিলাম, লেগেছে?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় চক্ষু না মেলিয়াই কহিলেন, না। সম্ভবতঃ আমিই ভুল বুঝিয়াছি। কিন্তু আফিং খাইতে খাইতে এমনই কদর্য্য অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে দুধের তৃষ্ণা ঘোলে আর মিটিতে চাহে না। প্রেমের পিপাসা গণিকাবিলাসে, দেশ-ভ্রমণের ক্ষুধা টাইমটেবিল-পাঠে আর নায়ক হইবার লালসা বায়স্কোপের ছবি দেখিয়া কাহারও কাহারও মিটিয়া থাকে—কিন্তু কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর মিটে নাই। ভগবান্ দরিদ্র ব্রাহ্মণের হৃদয়ে দুর্নিবার দুরাকাঙ্ক্ষা কেন দিয়াছেন জানি না। যাক্ আমি যাই, তোমরা খেলা দেখ, আবার কবে আসিব জানি না, আসিব কিনা তাহাও জানি না। প্রসন্নর উপর বড় রাগ হইতেছে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় নীরব হইলেন।

কহিলাম—অবশ্য আস্বেন। সামনের শনিবার ইণ্টারন্যাশনাল—ক্যালকাট্টা গ্রাউণ্ড—

এমন সময় ময়দান বীর রবে প্রকম্পিত করিয়া দশ হাজার কণ্ঠ গর্জ্জন করিল—গোল! তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মাথার উপরে দুর্য্যোগের বজ্র কড়্ কড়্ শব্দ করিয়া উঠিল। চমকিয়া উঠিলাম। পাশে চাহিয়া দেখি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী নাই—সেখানে একটি বছর দশ বয়সের মুণ্ডিত-শির কৃষ্ণবর্ণ বালক ছাতা ধরিবার পারিশ্রমিক চাহিতেছে—'খেল্ হো গিয়া, একঠো পয়সা দিজিয়ে বাবু!'

দৃষ্টিভ্রমে পরম কৌতুক অনুভব করিয়া হো হো হাসিয়া উঠিলাম।

সম্ভবামি যুগে যুগে
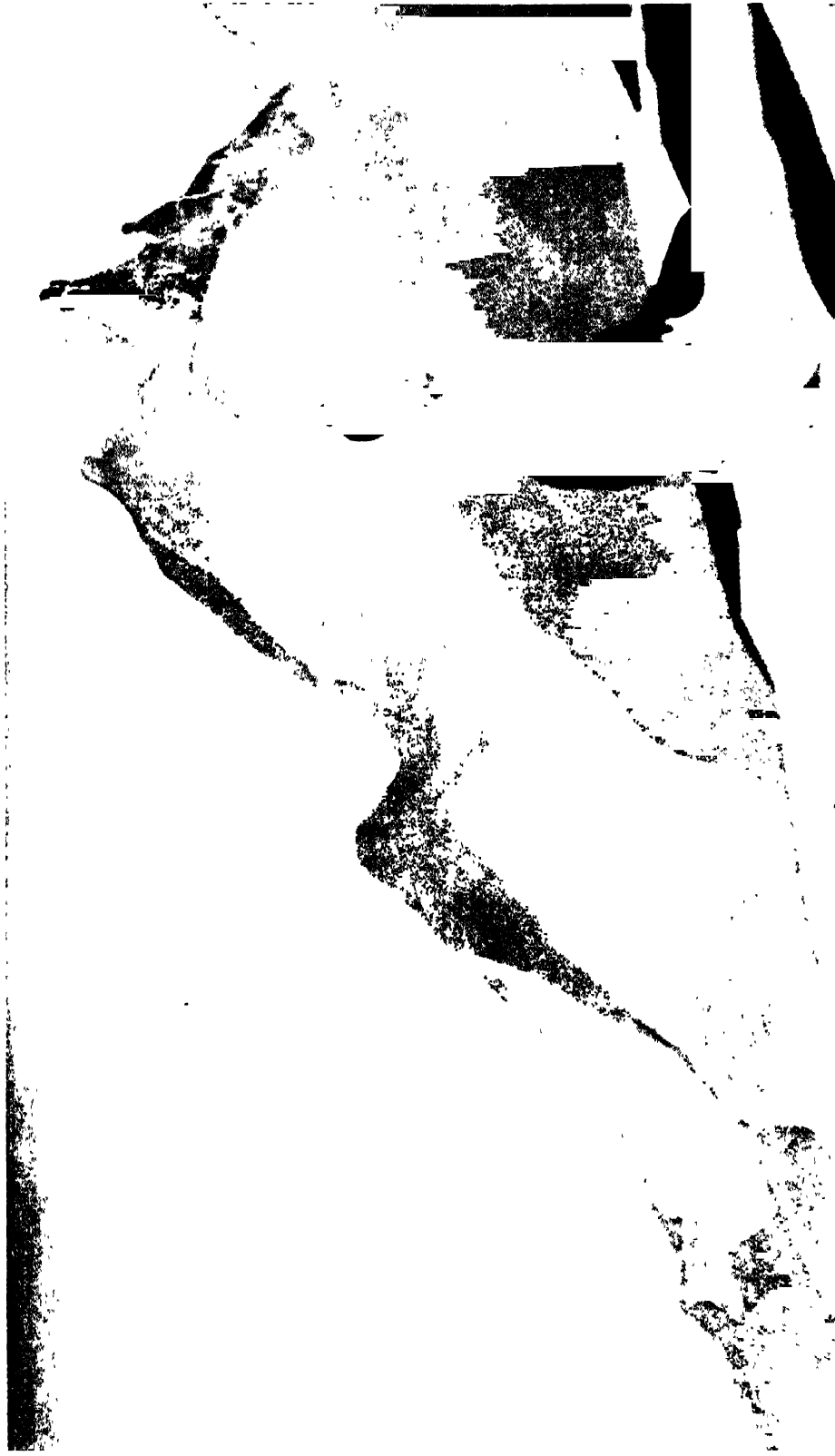
নীলরুদ্র

—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জাগৃহি নীলরুদ্র জয়তু গর্জ্জদ্ ভীমভঙ্গে,
নীল অম্বরে বাজাইয়া শিঙ্গা নাচো তাণ্ডব রঙ্গে !
মেঘে মেঘে গুরু গর্জ্জনে এস বজ্র বাজায়ে ঝঞ্চন,
বিদ্যুদ্দোলা-হিন্দোলে কর বৈকালী-লীলা রঞ্জন ।
গগনে পবনে আগুনের শিখা বনে বনে জ্বালো খাণ্ডব,
যুগরঙ্গের সমরাঙ্গণে এস ল'য়ে নীল তাণ্ডব ।
মোর সব তাল করিয়া বেতাল হও তুমি শ্যাম-শঙ্কর,
জীবনের পথে অগ্নির ধূলি ক'রে দাও ঘোর কঙ্কর ।
ডম্বরু করে অম্বরে নাচো ব্যোম্‌ভোলা ঘোর ছন্দে,
গরজি' উঠুক্ প্রলয়-মন্দ্র সৃষ্টির যুগানন্দে ।
সৃষ্টি-স্থিতি মথিয়া মথিয়া উঠুক্ তোমারি নর্ত্তন,
কলুষিত এই নরকের হৃদি নখে নখে কর কর্ত্তন ।
ভণ্ডের জয়ে মণ্ডিত ধরা মিথ্যা হাঁকিছে জয়গান,
মিথ্যার শত দুর্গ-প্রাচীরে ভেঙ্গে কর আজ খান্‌খান্ ।
চক্রে চক্রে কর চুরমার দম্ভের পূজা-মন্দির,
ডিম্ ডিম্‌ডিম্ বাজুক ডমরু আজি এই যুগ-সন্ধির ।
নাগপাশ-বিষ-বন্ধনঘেরা সংসার করে ক্রন্দন,
সংসার-লীলা-গ্রন্থির আজি ছিঁড়ে দাও লাখ বন্ধন ।
কংসের চির ধ্বংসের লাগি' ফিরে ফিরে কর নৃত্য,
ভৈরব তব নৃত্যের সাথে নাচিবে এ খ্যাপা ভৃত্য ।
দাম্ভিক তব মন্দিরে আজি বসিতে করে না শঙ্কা,
তব নামে আজি আপনার গানে বাজাইছে জয়-ডঙ্কা ।
ভ্রাতায় ভ্রাতায় ওঠে সংগ্রাম গর্জ্জে কুরুক্ষেত্র,
মর্ম্মভাঙ্গা সে ধর্ম্ম যে আজি মুদেছেন তিনি নেত্র ।
গর্জ্জিয়া তুমি ওঠো আজ শিব ধর্ম্মের ভাঙ্গা মর্ম্মে,
রুদ্র হইয়া ঝঙ্কারি' ওঠো বিশ্বের প্রতি কর্ম্মে ।
দম্ভের শত বুক চিরে চিরে ধ্বংসের লীলারঙ্গে,
এস প্রলয়ের নীলভৈরব গর্জ্জদ্‌জলভঙ্গে ।
চুরমার হোক্ জীর্ণ এ ধরা পদতলে তব ক্ষুদ্র,
তাথৈঃ তাথৈঃ নবসৃষ্টিতে নাচো আজি নীলরুদ্র ।

—শ্রীপরিমল গোস্বামী

অনুপমা যখন ছাত্রী পড়িয়ে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে দেশে চলে যায় তখন তার ছাত্রী পড়াবার ভার পড়ে আমার উপর। আমি বহুদিন হ'ল ফিলজফিতে এম·এ পাস্ ক'রে জার্ম্মানি থেকে পেটেণ্ট ঔষধ আনিয়ে ব্যবসা করচি। ছাত্রী পড়াবার পক্ষে এটা আমার একটা বড় গুণ নয়, কিন্তু তবু আমার উপর এ কাজের ভার পড়ল কেন তার ইতিহাসও কিছু নেই। ছাত্রী আমার আত্মীয়া, এবং তাদের বাড়ির পাশেই আমি থাকি, সুতরাং—।

অনেক দিন হ'ল এ সবও চুকে গেচে।—কিন্তু সন্ধ্যাটা আমি জীবন থেকে চিরদিনের জন্যে হারিয়েচি।

অনুপমার সঙ্গে ছাত্রীগৃহে কয়েকদিনের মাত্র পরিচয়, কিন্তু এরই ফলে আমার যা হবার তা হ'য়ে গেচে, এখন বসে ব'সে মোহমুদ্গরের ব্যাখ্যা করচি। লোকে বলে চামড়া যদি প্রথম শ্রেণীর হয় তা' হ'লেই মেয়ে হয় সুন্দরী, এবং সুন্দরী মেয়ে না হ'লে পুরুষকে আকৃষ্ট করতে পারে না।

কিন্তু আমার বিশ্বাস হ'য়েচে চামড়াটা নিতান্তই একটা আবরণ—এ'র বেশি মূল্য তার প্রাপ্য নয়।

যারা আবরণের বেশি আর কিছু দেখতে চায় না তাদের জন্যে আমার লেশমাত্র দুর্ভাবনা নেই। আমি ভাবচি—আমি যে তার কণ্ঠস্বরে উতলা হ'য়ে উঠেছিলাম—আমিই কি খুব পণ্ডিত?

ছাত্রী-গৃহ হ'তে সে যে দিন শেষ বিদায় নিয়ে যায় সে দিন তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠেছিল, অন্তত আমার কাছে তার উচ্চারণের ভঙ্গীটি এমন একটা অর্থ প্রকাশ ক'রেছিল যার প্রভাব কাটাতে আমি সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েচি।

কথাটা সামান্য। শুদ্ধমাত্র আলাপ করার ছলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি এর পরে কি করবেন?

অনু কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বল্লে—"আ-মি জা-নি-না।"

এর প্রত্যেকটি অক্ষর সে পৃথক ভাবে এমন একটা করুণ ধ্বনির সঙ্গে উচ্চারণ করেছিল যে আমি বিস্মিত না হ'য়ে পারি নি।

মনে হ'ল সে যেন স্বপ্নে কথা কইচে। তার বলবার ভঙ্গীতে বাস্তবতার আভাস মাত্র ছিল না। তার গলার স্বর সহজেই এমন স্বচ্ছ, নির্ম্মল,—সে স্বরের এমন একটা রূপ আছে যে তা'কে অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই। তার স্বাতন্ত্র্য শ্রোতার সমস্ত শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতাকে সচকিত ক'রে মুগ্ধ করে। সে আমাকেও উতলা ক'রে তুলল।- সেই দিন আমি সেই ধ্বনিকে ভালবেসেছিলাম।

আমি ঘোর বৈষয়িক সেজে নিজেকে জিজ্ঞাসা করেচি,—বলেচি, ওরে মূর্খ, কথার সুরে, আকাশের চাঁদে, পাখীর গানে কি পেট ভরে?—এ'র কোনো জবাব দিতে পরি না।

আমি ঘোর বৈষ্ণব সেজে নিজেকে জিজ্ঞাসা করেচি—হে ভক্ত, তা'র কণ্ঠস্বরে কি ভাব জাগল?—তখন বলি একেবারে দাস্য ভাব, পায়ে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে।—অর্থাৎ এমনি ব্যাপার যে সাধারণ লোকের কাছে তার কোনো অর্থ হয় না,—অর্থ আছে ব'লে প্রস্তুত হ'য়ে থাকলে কিছু মেলে।

কিন্তু যাক্ সে কথা। তার সঙ্গে কতদিন দেখা হয় নি। সে চ'লে যাবার পরে গ্রামার ট্র্যান্‌স্লেশান ও পেটেণ্ট ওষুধের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম,—কিন্তু মনে যে চিহ্ন প'ড়ে গেচে। থেকে থেকে সেই কথাটি কানে এসে বাজে—"কিছু জানি না।"

এই কথা দুটো যেন কত ইতিহাস, কত রহস্যের পট-ভূমিতে মূর্ত্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছিল,—তার দেহে এমন একটা বেদনার সৌরভ মাখানো ছিল যার মাদকতা সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেচে।

কিন্তু পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী হয় না। কিছুদিন পরে এত বড় স্মৃতিটাও ক্ষীণ হ'য়ে এল—তখন মনে হ'ল আমি সামান্য ব্যাপারটাকে দার্শনিকের মত অত্যন্ত বড় ক'রে দেখেছিলাম। ক্রমে "কি-ছু-জা-নি-না" একথাটার অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট আকার ধরতে লাগল,—শেষে দেখলাম ওর অর্থ করতে বার্গ্‌সঁর সাহায্য না নিয়ে বাংলা অভিধান খুললেই

আরো দু'দিন পরে ওর আর কোনো অর্থ রইল না,—একদিন কোনো অর্থ ছিল মনে হ'য়েছিল ব'লে হাসি পেল।

কাজের চাকায় বাঁধা প'লে কোথায় থাকে দর্শন আর কোথায় থাকে সেন্টিমেণ্ট। যে হতভাগোরা বোঝাই-করা নৌকাগুলো গুণ টেনে উজিয়ে নিয়ে চলে তাদের নিয়ে জাতির ইতিহাস গ'ড়ে ওঠে, দার্শনিক তাদের নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন, শিল্পী ছবি আঁকেন,—কেবল সেই হতভাগোরা দিনের পর দিন গুণ টেনে জীবনের পথ বেয়ে চলে।

আমার কাজের কোনো ফাঁক রইল না। দেশের অবস্থা এমন খারাপ হ'য়ে উঠল যে আট ঘণ্টার জায়গায় ষোলো ঘণ্টা পরিশ্রম ক'রেও কোনো কিনারা হয় না। এমনি অবস্থায় ব্যবসার উন্নতির জন্যে ক্যান্‌ভাসিং-এ বেরিয়ে পড়লাম।

চলেছি পশ্চিমের দিকে। গাড়ির অবস্থা দেখে বোঝা গেল ঘুমাবার উপায় নেই, সারা রাত ব'সে কাটাতে হবে। এরূপ দুর্ঘটনার প্রতিবিধান স্বরূপ কিছু কিছু গল্পের বই সর্ব্বদা সঙ্গে রাখি। আমি যে দর্শন শাস্ত্রে এম-এ তার নিদর্শন হিসাবে সে জাতীয় বইও দু'একখানা থাকে।

রাত্রি-জাগরণের পক্ষে গল্পগুচ্ছখানা কিছু সাহায্য করবে জেনে ঐ খানাই বে'র ক'রে পড়তে সুরু করলাম। তিনটি গল্প শেষ হ'তে একটি ঘণ্টা কেটে গেল, দেখলাম ব'সে রাত কাটাতে গুরুতর কষ্ট নাও হ'তে পারে।

আমার সামনে কত যাত্রী উঠেচে নেমেচে কারু দিকে নজর দেবার সময় পাই নি।

'অপরিচিতা' গল্পটি সবে শেষ ক'রেচি। কানের ভিতর গল্পের রেশটুকু সঙ্গীতের সুরের মত ঝঙ্কৃত হ'চ্ছে—"জায়গা আছে জায়গা আছে, ওগো এই যে জায়গা আছে।"

এরি সঙ্গে অতীতের একটি ক্ষীণ স্মৃতি বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে হঠাৎ মনের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠল। শ্রীমতী অনুর উচ্চারিত সেই বেদনাসিক্ত দুটো শব্দ, "আ-মি জা-নি-না।"

ভীড়ের কোলাহল, গাড়ীর শব্দ সব লুপ্ত হ'লে গেল—কেবল কানের মধ্যে অবিরাম ধ্বনিত হ'তে লাগ্‌ল—"আমি জানি না।"

এ দুটো কথার মূল্য কি আর কেউ বুঝবে?—আমারি কাছে কি এর কোনো মূল্য আছে?—এ যে গম্ভীর নিশীথের গাওয়া বেহাগের সুর, এ'কে সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেই এ'র মূল্য।

আমি স্বভাবতঃ দুঃখবাদী নই, কিন্তু আমার হঠাৎ মনে হ'ল পৃথিবীটা অনন্ত দুঃখের বোঝা বহন ক'রে যুগযুগান্ত ধ'রে কেবলি ঘুরে মরচে, এই দুঃখই এর সৌন্দর্য্য, এর সম্পদ।

এই পরম মুহূর্ত্তে আমার কাছে একটি বৃহৎ সত্য তার সকল রহস্য অনাবৃত ক'রে দিল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম সৃষ্টির আদি থেকে আমরা এক অখণ্ড আত্মার প্রবাহকে বহন ক'রে এগিয়ে নিয়ে চলেচি। যে ম'রে গেল সে তার আত্মাকে জীবিতদের মধ্যে রেখে গেল, শূন্যে কোথাও ফেলে গেল না।

কিন্তু কথায় কথায় ভাবুকতা ত' ভাল নয়। মনকে হাল্কা করতেই হ'বে—নইলে ব'সে থাকাও যে অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌চে। মনে করলাম সামনে যাঁরা ব'সে আছেন ওঁদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলতে পারলে সময়টাও সহজে কাটবে মনটাও হাল্কা হ'বে।

হঠাৎ চেয়ে দেখি অনুপমা সামনে ব'সে!

এ কি স্বপ্ন? কতক্ষণ সে আমার সামনে ব'সে আছে অথচ আমাকে সে একটি কথা ব'লেও বিরক্ত করতে সাহস করে নি।

তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হ'তেই সে আর চুপ ক'রে থাকতে পারল না,—নমস্কার ক'রে বল্লে—এই যে প্রিয় দা' আপনি কোথায় চলেছেন?

এরি কথার প্রতিধ্বনি নিয়ে আমি দার্শনিকতা করছিলাম।

আমি হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলাম না, তার মুখে কখনো দাদা সম্বোধন শুনি নি।—আর কোথায় তার সেই সঙ্কোচ—কোথায় সেই বেদনা-ভরা স্বর, যা নিয়ে আমার জীবন ভারী হ'য়ে উঠ্‌ছিল।

তার এই নিঃসঙ্কোচ মুক্ত ভাবটি আমার মনের কোন্ অজ্ঞাত জায়গায় যেন একটু বিঁধল।

সামান্য জিনিসকে বাড়িয়ে তোলা এই আমার একটা স্বভাব, কিন্তু স্বভাব বুদ্ধিকে গ্রাহ্য করে না। আমি গম্ভীর ভাবে বল্লাম,—আমার কোথাও যাওয়া না যাওয়া পৃথিবীর একটি অতি তুচ্ছ ঘটনা, এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ওঠে না

সহজ ভাবে কথা বল্‌তে গিয়ে দার্শনিকতা এসে পড়ে

অনু এরকম জবাবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, সে জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি নিজেকে সংশোধন ক'রে বল্লাম আপনি যখন জানতে চাইলেন তখন বল্‌তেই হয়, কিন্তু না বল্লেও ক্ষতি ছিল না—যাচ্ছি ক্যান্‌ভাসিং-এ। এইবার আপনার পালা। বলুন, আপনি কোথায় চলেছেন?

অনু একটু হেসে বল্লে—একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা।

আমি যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবেই বল্লাম,—প্রশ্নের জবাব দিতে আমাকে অনুকরণ করবার দরকার নেই, কারণ, দেখতে চাইলে রেলের লোককে ত একখানা টিকিট দেখাতেই হবে।

আশে পাশে হিন্দুস্থানী নরনারী ব'সে ব'সে ঢুলছে—অনু তাদের দিকে একবার চেয়ে বল্লে,—টিকিট একখানা আছে প্রিয়দা' কিন্তু কোথায় চলেচি—তা কিছু জানি না।

আমি এক মুহূর্ত্তে নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌লাম। করুণায় হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে এল। আমার কাছে আবার তার সেই অসহায় ভাবটি অত্যন্ত প্রখর ভাবে ফুটে উঠল।

ঐ একটি কথায় একদিন সে আমাকে তার দিকে বেগে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু কেন তার মুখে আবার ঐ কথাটি শুনলাম।

মনে হ'ল সমস্ত অসহায় নারী জাতির প্রতিনিধি হ'য়ে অনু আমাকে তাদের আবেদন জানাচ্চে—জানি না—জানি না—কিছু জানি না। গর্ব্বে মন ভ'রে উঠল—মনে মনেই বল্লাম—আমি পুরুষ, তোমাদের পথ দেখিয়ে দেব, আমরা যে অনেক জানি, তোমরা কিছু জাননা ব'লেই কি চিরদিন পথের ধারে পড়ে থাকবে?

একটা বড় জাংশনে দুঘণ্টা থামতে হ'ল। আমরা একই সঙ্গে নেমেচি, রাত তখন তিনটে।

ভয়ানক গরম। বিশ্রামশালায় না ঢুকে বাইরে একধারে বিছানাটা পেতে নেওয়া গেল।

অনু মেয়েদের কামরায় গেল।

এই গভীর রাত্রির অন্ধকারে, কেবল সে আর আমি—আমাদের সঙ্গী আর কেউ ছিল না।

এমন মুহূর্ত্তে সে যদি আমার বিছানার একধারে এসে বস্‌ত, তাহ'লে এ পৃথিবীতে কার কি ক্ষতি হ'ত। খুব ইচ্ছা হচ্ছিল সে আমার কাছে এসে বসুক। যেটুকু রাত বাকী আছে—সেইটুকু সময় আমার কাছে তার সকল দুঃখের বোঝা নিঃশেষ করে নামিয়ে দিক।

আমার শক্তি কিছুই নেই, তবু মনে হচ্ছিল আমি আমার সকল ত্যাগ ক'রেও যদি পারি তাঁ'র দুঃখকে আমার ক'রে নিই।

দুঃখের পটভূমিতেই তার মূর্ত্তিকে আমি দেখেচি—এ বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না।

কত কি ভাবতে ভাবতে দুঘণ্টা কেটে গেল। অনু মেয়ে-কামরা থেকে একবারও বেরোয়নি।

গাড়ি এল—আমি একটা গাড়ির দরজা খুলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। ঘণ্টা বেজে গেল, গাড়ি ছেড়ে দিলে।

পূর্ব্বাকাশে উষার আভাস জেগেচে, হুস্ হুস্ ক'রে গাড়ি ছুটে চলেচে। কিছুতে মন নেই। প্রচুর জায়গা খালি প'ড়ে আছে,—সামনের খালি বেঞ্চখানার দিকে মাঝে মাঝে চোখ পড়চে, আর একটা তীব্র ব্যথা মনকে আঘাত ক'রে ক'রে ফিরচে।

ভোরের শীতল হাওয়া উত্তেজিত মস্তিষ্ককে শীতল করতে পারল না। আমি হেলান দিয়ে সামনের বেঞ্চির উপর পা তুলে বাইরে চেয়ে রইলাম। আকাশের গভীর রং তরল হ'য়ে তরুণ রবির হাসিতে পূর্ব্ব দিক ঝলমল ক'রে উঠল।

এক মাস কেটে গেচে। পশ্চিম ভ্রমণ শেষ ক'রে ফিরচি। মনটা আজো ভারী হ'য়ে আছে।

ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করবার জন্যে ফেরবার পথে গিরিডিতে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে কয়েক দিনের জন্যে অতিথি হওয়া গেল।

বেশ আরামেই আছি। সঙ্গীত এবং কাব্য চর্চ্চার ভিতর দিয়ে বন্ধু-পরিবার জীবনটাকে বেশ সরস ক'রে রেখেছেন। তাদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে দস্তুর মত আয়াস করতে হ'য়েছিল। বন্ধুর ন' বছরের মেয়ে আর ছ' বছরের ছেলেটি আমাকে তাদের খেলার সাথী ক'রে তুল্‌ল, আমিও বেঁচে গেলাম।

একদিন ওরা ধ'রে বস্‌ল উশ্রী প্রপাতে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ রাজি। উচ্ছল স্রোতের মত প্রবহমান এই দুটো ছেলে মেয়ে আমার বন্ধ মনের দুয়ার খুলে দিয়েচে।

সঙ্গে হিন্দুস্থানী ভৃত্য, আমি ও এরা দুজনে বেলা দুটোয় রওনা হ'লাম। যখন অরণ্য-পথ উত্তীর্ণ হ'য়ে উস্ত্রীতে পৌছলাম তখন বেলা তিনটে।

অরণ্যের আবরণ থেকে সহসা এই উদার আকাশের নীচে উস্ত্রীর ধারে মুক্তি পাওয়ার আনন্দ হৃদয়কে অভিভূত ক'রে ফেলে। মনে হয় এই মুক্তিকে অনন্তকাল সবলে বুকে ধ'রে রাখি। ছেলে মেয়ের কলরব জলের গর্জ্জনের সঙ্গে মিশে একাকার হ'য়ে গেল। আনন্দের এমন প্রাচুর্য্য যে আমার পক্ষে সহ্য করাই দায়।

সহসা জলপ্রপাতের গর্জ্জনের উর্দ্ধে একটি সঙ্গীতের সুর আমার কানে এসে বাজল। স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না, মাঝে মাঝে মনে হয় যেন কেউ করুণ সুরে গান গাইচে। কৌতূহল হ'ল। ভৃত্যের তত্ত্বাবধানে ছেলে মেয়েদের রেখে একটু দূরে বড় একটা পাথরের ওধারে যেতেই গান স্পষ্ট হ'য়ে কানে এল।

ওয়ার্ডসোয়ার্থের সঙ্গীহীন কৃষক-বালিকার গানের কথা মনে পড়ল। কে জানে কি তার দুঃখ।

—"তোমার লগন যায় যে কখন মালা গেঁথে আমি রই একা।"

আর একটু যেতে সঙ্কোচ হ'ল। কোনো তরুণ-তরুণী হয়ত এখানে এসে পরস্পরের কাছে তাদের হৃদয় উন্মুক্ত ক'রে ধরেচে—তাদের স্বপ্নমাখা রঙীন আবেষ্টনীতে আমি অনধিকার প্রবেশ করব না।

আমি সেখানেই ব'সে পড়লাম। গান শেষ হ'ল, কিন্তু তার সুরটুকু সমস্ত আকাশ বাতাসে ব্যাপ্ত হ'য়ে গেল। "কুসুমে কুসুমে চরণ-চিহ্ন এঁকে যাও, শেষে যাও মুছে—ওহে চঞ্চল।"

আমি হঠাৎ দার্শনিকতায় ডুবে যাচ্ছিলাম এমন সময় চমকে চেয়ে দেখি—সামনে অনু দাঁড়িয়ে!

গভীর রজনীর অন্ধকারে যাকে একান্ত প্রার্থনা ক'রে পাইনি,—দিনের উদার আলোতে সেকি আপনি এসেচে ধরা দিতে? কিন্তু এ কি স্বপ্ন?

অনুর মুখে সে লাবণ্য নেই—একমাসের মধ্যে চেহারা কি হ'য়ে গেচে—মলিন মুখে উজ্জ্বল চোখ দুটো নিয়ে বিস্মিত ভাবে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমিও বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে পৌছে বল্লাম—রহস্য ভেদ করি এমন সাধ্য আমার নেই, কাজেই জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হচ্চি,—এই জনহীন অরণ্যের মাঝখানে আপনার আবির্ভাব সম্ভব হ'ল কি ক'রে, এবং এই অসম্ভব অভাবিত ব্যাপারের মূলে কোন্ আনন্দ বা কোন্ বেদনা রয়েছে,—খুব ইচ্ছা যে সেটা আমি শুনি।

অনু খুব সহজ ভাবে আমার কাছে ব'সে বল্লে,—প্রিয়দা' 'আপনি' সম্বোধনের যোগ্য আমি নই।

আমি বল্লাম, ওতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু সময় অত্যন্ত অল্প, আমার প্রশ্নের উত্তর চাই।

অনু বল্লে—সে কথা জানলে আপনি আমাকে ঘৃণা করবেন।

আমি ক্ষুব্ধ হ'য়ে বল্লাম,—দেখ তোমার যদি অনুভব করবার ক্ষমতা থাকে তবে বুঝতে পেরেচ যে আমি তোমাকে ঘৃণা করতে পারি না।

অনু বল্লে,—আপনার সময় কম, না? তারপর এদিক ওদিক চেয়ে আস্তে আস্তে বলতে লাগল, মনের মধ্যে যে অস্থিরতা নিয়ে এতকাল কাটিয়েছিলাম, আমার কথায় বা ব্যবহারে তার কিছু প্রকাশ হ'য়ে থাকবে নিশ্চয়।

কিন্তু এখন আমি শান্ত হয়েচি, অন্তত জীবনের লক্ষ্য নিয়ে মনের মধ্যে আর দ্বন্দ্ব নেই।

'এই দেখুন প্রিয়দা', ব'লে অনু কাপড়ের ভিতর থেকে একটা রিভলভার বের ক'রে আমাকে দেখাল।

আমি চমকে উঠলাম।

অনু বল্লে—দেশের কাজে লেগেচি।

আমি বিস্মিতভাবে বল্লাম,—কিন্তু দেশের কাজে রিভলভার কেন?

অনু অনুযোগের সুরে বল্লে, আপনি কি জানেন না কেন? আপনি নিশ্চয় জানেন। তারপর একটু থেমে বল্লে,—আমার সঙ্গী আছেন চারজন, কে কে বলবার দরকার নেই, আমরা সকলে প্রাকটিস্ করতে এখানে এসেচি। তারা গভীর জঙ্গলে আছে, আমি এইখানকার দৃশ্যে আকৃষ্ট হ'য়ে একটু এদিকে এসেছিলাম।

তারপর উদাস দৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—প্রিয়দা' আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমি এইদিকে

একটা সার্থকতার পথ খুঁজে পেয়েচি। যে মুহূর্ত্তে এইটি বুঝেচি সেই মুহূর্ত্ত থেকে দেশের লোক আমার একান্ত আপনার হ'য়ে উঠেচে। নইলে আপনাকে হঠাৎ দাদা ব'লে ডাকতে আমার সঙ্কোচ কোনো দিন যেত না।

অনুর কথায় আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। তার সম্বন্ধে যেটা আমার কাছে রহস্য ছিল তার অন্তরালে আমি একি দেখলাম?

আমার সেন্টিমেণ্ট জেগে উঠল। হঠাৎ তার হাত দু'খানা চেপে ধ'রে বল্লাম—অনু, বোন্, আমি তোমাদের এ পথের সন্ধান কথনো রাখিনি, তবু তোমার সম্বন্ধে আমি একটি সত্য এই মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ করতে পারচি।

এ পথ তো তোমাদের জন্যে নয় বোন্।

তোমাদের সম্বন্ধে আমার আজন্মের ধারণাকে গুরুতর আঘাতে ভেঙে দিওনা। এ পথ সার্থকতার পথ কথনো হ'তে পারে না।

যে মার খায় সে সেই দণ্ডে তার প্রতিশোধ নেয়, সেটা হঠাৎ উত্তেজনার ফলে হয়, তার একটা অর্থ করা যায়। কিন্তু এই যে দিনের পর দিন প্ল্যান ক'রে, ষড়যন্ত্র ক'রে গুপ্ত ভাবে অতর্কিতে মানুষ মানুষের প্রাণ সংহার করবে, এর বীভৎসতা যে কি ভয়ানক অমানুষিক, তুমি তোমার সমস্ত নারী-হৃদয় দিয়ে সেটা অনুভব করতে চেষ্টা কর।

অনু চঞ্চল হ'য়ে উঠতে লাগল। আমি তার হাত আরো জোরে চেপে ধরলাম। আমার মন এমন উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল, তাকে বল্‌তে লাগলাম,—

সার্থকতার সরল পথ তোমার সামনে কি কথনও দেথনি বোন? তুমি ফিরে এস, এ পথে আর এক পা নয়। আমি আজ তোমাকে সমস্ত গ্লানি থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাই।

অনুর হাত আমার হাতের মধ্যে শিথিল হ'য়ে এল, তার মনের দৃঢ়তা যেন আল্‌গা হ'য়ে আস্‌চে। আমি বলতে লাগলাম,—আমাকে আঘাত দিওনা, সামনের এই ঝরণার মত মুক্ত আকাশের নীচে এমনি আনন্দ-কলোচ্ছ্বাসে জীবনটাকে বইয়ে দাও—আজকের দিনে এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আর আমার নাই।

আমার নিজের চোথের জল চেপে রাখা দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়ল। অনুর হাতের উপর ঝর-ঝর ক'রে ঝ'রে পড়তে লাগল,—সমস্ত ভুবন আমার কাছে একটা ব্যথার সুরে ভ'রে উঠল।

অনু কি যেন বলতে যেয়ে থমকে গেল, তার গলাটা ধ'রে এল। আমি লক্ষ্য করলাম, তার চোথ ছলছল ক'রে এসেচে।

কিন্তু সে জোর ক'রে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়ল। কোনো কথা বল্‌তে পারল না, আঁচলে চোথ মুছে দ্রুত ছুটে চ'লে গেল।

আমি তথন ভাষাহীন, মূক।

কিছুক্ষণ পরে তাকে ডেকেছিলাম কিন্তু কোনো সাড়া পাইনি।

—ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমার সঙ্গে ছেলে মেয়েরা আছে। পাষাণ আসন থেকে উঠে দেখি ভৃত্যের সঙ্গে তারা আমার দিকেই আসচে—তারা বন থেকে নানা রকম ফুল সংগ্রহ ক'রে দুহাত ভর্ত্তি ক'রেচে।

আমাকে ডেকে বল্লে, কাকাবাবু, দেখচেন না সন্ধ্যা হ'য়ে এল,—এইবার ফিরে না গেলে বাঘের হাতে পড়তে হবে।

মনটাকে প্রফুল্ল করবার জন্যে হেসে বল্‌লাম,—বাঘের তো হাত নেই, চারখানাই পা, সুতরাং হাতে পড়বার ভয় নেই। নেহাৎ পড়ি তো পায়েই পড়ব, কিন্তু তথন যেন ঠাট্টা কোরো না যে কাকাবাবু বাঘের পায়ে পড়েছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যার আকাশ রঙীন হ'য়ে ওঠে, কিন্তু সে রং সঙ্গে-সঙ্গে মিলিয়ে যায়।

অনুর কথা চিন্তা ক'রে দেখেছি, সেও আমার জীবনকে বারবার সন্ধ্যার আকাশের মতই রঙীন ক'রে দিয়ে মিলিয়ে গেচে।

তারপর কত বছর কেটে গেল। যে-আমি এত সেন্টিমেণ্টাল ছিলাম সে-আমিকে আর আমার মধ্যে খুঁজে পাওয়াই দায়। আমি খুব ক'ষে কাজে লেগেচি। বাঙালী জাতির দেহ থেকে চুনের অভাব দূর করতে চুনঘটিত একটি ঔষধ খুব প্রচার করচি। ভাইটামিন 'এ'র অভাবেই বা দেহের কি ক্ষতি হয় 'ডি'এর অভাবেই বা কি ক্ষতি হয়; কড-লিভারের বিশুদ্ধ তেল খেলেই বা কি উপকার হয়, ইমাল্‌শান খেলেই বা কি উপকার হয়, এ সব বিস্তারিত ক'রে

বাংলায় লিখচি এবং ঐ সঙ্গে আমার আমদানি-করা জার্মান ওষুধের উপকারিতা মিলিয়ে দেখাচ্চি।

বিবাহ করিনি। তার প্রবৃত্তিও নেই। জীবনে এই প্রথম একজনের সঙ্গে ঘনিষ্টতা করতে যেয়ে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেচি যে ভাবুকতায় নারীকে সৃষ্টি করা যায় কিন্তু তাকে ধ'রে রাখা যায় না। যেখানে আকুল হ'য়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ধ'রতে গিয়েচি সেখানেই সে বহুদূরে স'রে গেচে। ওরা যদি রহস্যময়ী তবে সে রহস্যের মধ্যে বারো আনাই নিষ্ঠুরতা। কাজ কি আমার রহস্যের পিছনে ছুটে?

অবসর সময়ে জার্মান এবং ফরাসী ভাষা শিখে নিয়েচি। এ'তে ক'রে দর্শন এবং সাহিত্য উভয়ের পিপাসাই মূল বই প'ড়ে মেটাতে পারচি।

ব্যবসার দিকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে উন্নতি লাভ ক'রেচে। এমন কি জার্মানির এক ল্যাবরেটরি আমাকে সেখানে যেতে অনুরোধ ক'রেচেন—তাঁদের খরচে। কাগজে কাগজে আমার ব্যবসার সফলতা এবং জার্মানি-যাত্রার কথা প্রচারিত হ'য়েচে।

আমি যাবার উদ্যোগ করচি, এমন সময় প্রলয়ের ঝড় দেখা দিল।

যাবার সময় সে সব চূর্ণ ক'রে রেখে গেচে।

অনুপমা তার সুদীর্ঘ বারো বছরের প্রচ্ছন্ন-বাসের পর আমাকে আজ স্মরণ ক'রেচে।

সে এতদিন শহরেই আছে। আমি তা'কে চিন্‌তে পারব কিনা সে আশঙ্কার উল্লেখ ক'রে লিখেচে আমি যেন তা'র সঙ্গে দেখা করি। তার সাধ্য থাকলে নাকি সে নিজেই আস্‌ত।

—সংসার তার আত্মীয়তার কেন্দ্র থেকে আমাকে কখনো আকর্ষণ করেনি, আমি উদাসীন পুরুষ। সংসারের বাইরে আমার কর্ম্ম-ক্ষেত্র।

তবু মাঝে মাঝে যখন ডাক পড়েছে ছুটে গিয়েছি কিন্তু পৌছতে পারি নি।

আজ আবার ডাক পড়ল।

নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় অনুপমা নামক একটি নারী-কঙ্কালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। অনু বিছানা থেকে একটু মাথাটা তুল্‌তে চেষ্টা ক'রে বল্‌লে—প্রিয় দা, আমিই অনুপমা সে বিষয়ে সন্দেহ করবেন না—আপনি বসুন।

আমি বিস্মিত ভাবে শুধু 'না' এই কথাটি ব'লে তার দিকে চেয়ে রইলাম।—দেখলাম হাত পা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেচে—সমস্ত দেহের মধ্যে কেবল মাত্র চোখদুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা নিয়ে জ্বল্ জ্বল্ করচে।

অনু ধীরে ধীরে বল্‌তে লাগল,—আপনার সে দিনের অশ্রু আমি ভুলতে পারি নি—আমি তো মানুষ।—এতদিন কেবল মাত্র আপনার স্মৃতিকে বহন ক'রেই বেঁচে আছি।—আপনার চোখের জলের অপমান আমি কি ক'রে করব!

তারপর একটু থেমে বল্‌তে লাগল—সার্থকতার পথ খুঁজে নিতেই হ'য়েচে। নারী-জীবনের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হই এমন ক্ষমতা কি আমার ছিল?

আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে সংসারে ফিরে এসেচি। বারো বছর হ'ল বিয়ে হ'য়েচে। তিনটি সন্তানকে জন্ম দিয়েচি, চতুর্থবারে আর সইতে পারলাম না।

—সেই থেকে ক্ষয় রোগে ধ'রেচে—ডাক্তারে বল্‌চে থাইসিস্।

স্বামী আমার কাছ থেকে দূরে থাকেন,—আর কেনই বা তাঁকে কাছে থাকতে বলব? ছেলেদেরও তিনি সরিয়ে নিয়ে গেচেন—আহা তারা বাঁচুক, তারা ভাল থাক।

এটা তাদেরই একটা বাড়ি। আমি একাই থাকি, অবশ্য নার্স আছে, আর আছে আমার একমাত্র বন্ধু এই কাল-ব্যাধি।

—আপনাকে একবার দেখব ব'লে অনেক দিন থেকেই মনে হচ্ছিল।—আপনাকে কষ্ট দিলাম ক্ষমা করবেন।

তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বল্‌লে—প্রিয় দা' শুধু অসীম স্নেহ থাকলেই কি সত্যকে দেখা যায়?

আমার মাথা তখন ঘুরচে। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আমার সেই সে দিনের কথায় হিংসার পথ ছেড়েছিলে?

অনু ঘাড় একদিকে হেলিয়ে বল্‌লে, হ্যাঁ।

আমি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলে উঠলাম, বল কি অনু, এ কথা আমি আগে জানতে পারি নি কেন?

এক মুহূর্ত্তে সংসার আমার চোখের সামনে রঙীন আলোয় ভ'রে উঠল। আমার সামনে এই যে নারী মরণের দুয়ারে

দাঁড়িয়ে, সে একদিন আমার একটি মাত্র কথায় তার সমস্ত বিশ্বাস এবং প্রবৃত্তিকে সংযত ক'রে সংসারের কাছে আপনাকে বলি দিয়েচে, আমার জীবনে এটা যে একটা পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, বল কি অনু, এই কথাটি কি আমি নিঃসঙ্কোচে হৃদয়ে গেঁথে রাখব যে তুমি একদিন আমাকে মেনেছিলে?

অনু তেমনি ঘাড়টি বাঁকিয়ে সহজ ভাবে বল্লে, হাঁ।

আমার চমক ভাঙল। অনুকে তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্চি। আজ এ মরণের মুখে, কিন্তু ওর পরিণাম ওর হাতে থাকলে আমার কি ক্ষতি ছিল।

একটা ভয়ঙ্কর পরিণতির হাত থেকে ওকে বাঁচাতে গিয়ে আর একটা ভয়ঙ্করতর অবস্থায় ওকে এনে ফেলেচি।—লজ্জায় আমার মাথা নত হ'য়ে পড়ল।

অনু একটু হেসে বল্লে—প্রিয় দা' ভাবচেন? আমার জন্যে আপনার কিছুই ভাববার নেই,—আমি নিজেই কিছু ভাবি না।

যে এমন কঠিন সংসারের মুখোমুখী হ'য়ে এখনো বেঁচে আছে, তার পক্ষে নির্দ্দয় হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নয়, কিন্তু এর চেয়েও নির্ম্মমতা আমার প্রাপ্য ছিল।

অনু ধীরে ধীরে উঠে এসে হঠাৎ আমার পায়ের ধূলো নিলে।—এ ব্যাপারটা আচম্বিতে না হ'লে পায়ের ধূলো দিতাম না, অন্তত এইটুকু আত্মগ্লানির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতাম।

তারপর?—তারপর সব চুকে গেচে।

আমি যখন ভারতবর্ষ থেকে যক্ষ্মা রোগ দূর করবার চেষ্টা ক'রে বড় লোক হচ্ছিলাম, অনু তখন থেকে এই কাল ব্যাধির হাতে নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষিত করছিল।

কিন্তু অনু তার মুখের কথা আমার হৃদয়ে রেখে গেচে—"আমি জানি না, কিছুই জানি না।"

এই কথাটাই তো একমাত্র সত্য। এ সংসারে কতটুকু জানি? একটা জীবন গেল তবু সত্যকে দেখা গেল না। "প্রিয় দা' অসীম স্নেহ থাকলেই কি সত্যকে দেখা যায়?—" এই কথাটা আমার বুকে চিরকাল শেলের মত বিঁধে রইল।

প্রতিদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে কে যেন কানের কাছে চীৎকার ক'রে বল্‌তে থাকে,—"জানি না, জানি না, কিছু জানি না।"

আমি অস্থির হ'য়ে পথে বেরিয়ে পড়ি।

দিনের পর দিন এমনি চলেচে।

অনুর কথা মনে হওয়া মাত্র অন্তর হাহাকার ক'রে ওঠে, মনে হয়,—

কত কি একসঙ্গে মনে হয় তা' আমি ঠিক ক'রে কাউকে বলতে পারি না।

মনে হয়, আরো আগে যদি তার সন্ধান পেতাম—

মনে হয়, আজ যদি সে বেঁচে থাকত,—

মনে হয়,—

কিন্তু ঐ যে আবার সেই চীৎকার—

আমি আর ব'সে থাকতে পারচি না।
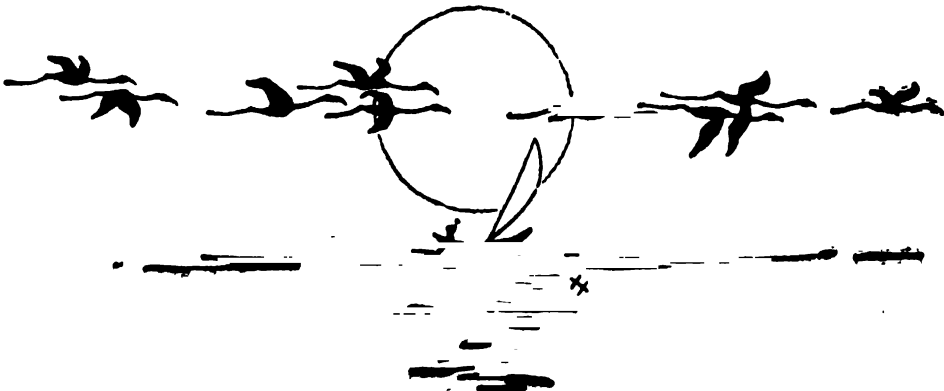
ভারতে জাতীয় আন্দোলন

বাঙ্গালীর নেতৃত্ব

(প্রথম পরিচ্ছেদ— পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ভারতের দুঃখদুর্দ্দশায় হেমচন্দ্র দারুণ বেদনায় রোদন করিতেন :—

"আজি এ ভারতে হায়, কেন হাহাধ্বনি ;
কলঙ্ক লিখিতে যার কাঁদিছে লেখনী ?
তরঙ্গে তরঙ্গে নত পদ্মমৃণালের মত
পড়িয়া পরের পায় লুটায় ধরণী ?
আজি এ ভারতে হায়, কেন হাহাধ্বনি ?"

তবুও তিনি নির্ভয়ে মনের কথাও ব্যথা ব্যক্ত করিতে পারেন নাই—

"ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর ?
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার,
বাজিত গরজে উথলি আবার
উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ।"

হেমচন্দ্রের রচনার উৎস দেশপ্রেম। সেই উৎসমুক্ত বারিধারা সমগ্র বঙ্গদেশে জাতীয় ভাব ব্যাপ্ত করিয়াছিল এবং তখন তাঁহার অনুকরণে অনেক কবিতা রচিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের কবিতার উচ্ছ্বাস যেমন তীব্র তেমনই চিত্তাকর্ষক।

নবীনচন্দ্র তাঁহার 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে লিখিয়াছিলেন :—

"পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস, অথবা নির্ভীক
স্বাধীন ভিক্ষুক ওই তরুতলে বসি,
অধীন ভূপতি হতে সুখী সমধিক।
চাহি না স্বর্গের সুখ – নন্দন-কানন,
মুহূর্ত্তেক যদি পাই স্বাধীন জীবন।"

এইরূপে বাঙ্গালা সাহিত্য জাতীয় ভাবপ্রচারে সহায় হইয়াছে। বক্তৃতায় ও রচনায় প্রভেদ এই যে, পুস্তক পাঠকালে পাঠক একাকী ; বক্তৃতা শুনিবার সময় শ্রোতা বহুলোকের মধ্যে এক জন—বৃহৎ জনসঙ্ঘের উত্তেজনা বা আবেগ তাঁহাতে সংক্রমিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, রচনাপাঠে পাঠকের মনে যে ভাব সঞ্চারিত হয়, তাহা শ্রোতার মনে বক্তৃতাশ্রবণের ফলে সঞ্চারিত ভাব অপেক্ষা স্থায়ী হয়।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের পরবর্ত্তী যুগে যাঁহারা রচনার দ্বারা জাতীয় সাহিত্য বিশেষরূপে পরিপুষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই দুই জনের নামোল্লেখ সর্ব্বাগ্রে করিতে হয় এবং তাঁহাদিগের পরেই রজনীকান্ত সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের বহু জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে দুইটি কংগ্রেসের দুইটি অধিবেশন উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল। যখন প্রথম কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন যুবক রবীন্দ্রনাথ সভার উদ্বোধনে স্বরচিত একটি গান গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন :—

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক
মুখ তুলে আজি চাহ রে।

দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি,
প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহ রে।

বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশ দিক সুখে হাসিবে।

সে দিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী—এ নহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে।

আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।

সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্ব্বাদ,
না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা প্রকাশে।"

দ্বিতীয় সঙ্গীতটি মাতৃবন্দনা—

"অয়ি ভুবন মনোমোহিনী !
অয়ি নির্ম্মলসূর্য্যকরোজ্জ্বলধরণী—
জনকজননীজননী।

নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল,
অনিলবিকম্পিতশ্যামলঅঞ্চল,
অম্বরচুম্বিতভালহিমাচল-
শুভ্রতুষারকিরীটিনী ;

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে—
জ্ঞান ধর্ম্ম কত কাব্য কাহিনী।

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন :
জাহ্নবী যমুনা—বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী।"

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা এ দেশের নানা জাতীয় অনুষ্ঠানে সাহায্য করিয়াছে এবং তাঁহার কবিতায় জাতীয় ভাব আবদ্ধ হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া যে জাতীয় আন্দোলন সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া এ দেশে যুগান্তর প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, সেই আন্দোলনে তাঁহার কার্য্য দেশবাসী চিরদিন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করিবে। তাঁহার প্রবন্ধে, তাঁহার কবিতায়, তাঁহার গানে সে আন্দোলন যে হিমাচলের বিগলিত-তুষারসৃষ্ট জলধারায় জাহ্নবী যেমন পুষ্টি ও গতি লাভ করে, তেমনই পুষ্টি ও গতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার হৃদয় হইতে জাতীয় ভাব যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার দেশবাসীকে প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন এবং তিনি বলিয়াছিলেন :—"বাঙ্গালার মাটি বাঙ্গালার জল"—ধন্য হউক। রাখী-বন্ধনের মন্ত্র তাঁহার রচনা।

কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে জাতীয় ভাবের প্রথম বিকাশ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রথম প্রচলন-যুগের লোক। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"ঈশ্বরচন্দ্রের এই মহৎ গুণ ছিল যে, তিনি খাঁটি জিনিষ বড় ভালবাসিতেন, মেকির বড় শত্রু।" ঈশ্বরচন্দ্রের দেশবাৎসল্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"বাৎসল্য পরম ধর্ম্ম ; কিন্তু এ ধর্ম্ম অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কি না, বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি বা আপন আপন ধর্ম্মকে ভালবাসিত ; ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বরগুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষা তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিম্নের কয় ছত্র পদ্য, ভরসা করি, সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন—

'ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥'

তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার কয় জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয় জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের কথায় যা, কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়া আদর করিতেন। মাতৃভাষা সম্বন্ধে (তাঁহার) যে কবিতাটি আছে, পাঠককে তাহা পড়িতে বলি। 'মাতৃসম মাতৃভাষা' সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেকে বুঝিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া এ কথা বলে? 'বাঙ্গালা বুঝিতে পারি', এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত। আজিও নাকি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে, যে তাহার অনুশীলন করে তাহাকেও ঘৃণা করে এবং আপনাকে মাতৃভাষার অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরাজীনবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনার গৌরববৃদ্ধির চেষ্টা পায়। যখন এ মহাত্মারা সমাজে আদৃত, তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দেশবাৎসল্য যে রামগোপাল ঘোষের ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দেশবাৎসল্যের মত ফলপ্রদ হয় নাই, তাহার বিশুদ্ধিই তাহার কারণ। আমরা রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির দেশবাৎসল্যকে অবিশুদ্ধ বলিয়া তাঁহাদিগের মর্য্যাদাহানি করিবার অভিপ্রায় হৃদয়ে পোষণ করি না। তাঁহারা বাঙ্গালীর বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের দেশবাৎসল্য, কবির দেশবাৎসল্য—তাহা অন্তরে অনুভব ও ধারণ করিবার জন্য ; রামগোপাল প্রভৃতির দেশবাৎসল্য রাজনীতিক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবার জন্য। তাহা বিশুদ্ধ আদর্শমাত্র নহে, পরন্তু তাহা স্থানকালপাত্রভেদে প্রয়োগসুযোগ সন্ধান না করিয়া পারে না।

বাঙ্গালা সাহিত্য জাতীয় ভাববিস্তারে যে সাহায্য করিয়াছে, তাহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ উপলক্ষ্য করিয়া প্রবর্ত্তিত আন্দোলন প্রতিভাদীপ্তিপ্রোজ্জ্বল ছিল। সেই আন্দোলনের সময় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটকে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে ও সঙ্গীতে এবং রজনীকান্ত সেনপ্রমুখ কবিদিগের গানে দেশে জাতীয়ভাবব্যাপ্তির বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের রচনার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যখন সেই আন্দোলনের প্রকৃত ও বিস্তৃত ইতিহাস রচিত হইবে, তখন তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের কার্য্য প্রতিভাত হইবে।

দেশে যখন নবভাবের আবির্ভাব মাত্র হইতেছে, তখনই দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় জাতীয় সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আজ যে জাতীয় ভাব সমগ্র ভারতের অধিবাসীদিগকে এক জাতিতে পরিণত করিয়া স্বাবলম্বনের পথে মুক্তির সন্ধানে উৎসাহশীল করিতেছে, এই বঙ্গদেশেই তাহার উদ্ভব। বাঙ্গালার গোমুখী হইতে তাহার ধারা প্রবাহিত হইয়াছে এবং গঙ্গা যখন সগরসন্তানদিগের উদ্ধারসাধনের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তখন যেমন মহাদেব তাঁহার জটাজালমধ্যে তাঁহাকে ধারণ করিয়াছিলেন, তেমনই বঙ্গদেশ সেই নবভাবের প্রথম আবির্ভাব ধারণ করিয়া, হরজটাজালমধ্যে জাহ্নবীধারার মত, তাহার চাঞ্চল্যাতিশয্য প্রশমিত করিয়া দিয়াছিল। যখন রামমোহন রায় ও তাঁহার পরে রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ দেশে নবভাবে রাজনীতিচর্চ্চার সূত্রপাত করেন, তখন ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে তাহার অরুণ-কিরণ-বিকাশ-সূচনা চতুর্দ্দিকব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে লক্ষিত হয় নাই।

কেন বঙ্গদেশেই এই নবভাবের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালার সংক্ষেত্রে সে বীজ পতিত হইয়াছিল বলিয়াই তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য ঃ—যে রাজনীতিক আন্দোলন আজ ভারতবাসীকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল করিয়াছে, তাহা কেন বাঙ্গালাতেই উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিতে হয়—বাঙ্গালার ইতিহাস তাহার পরিচয় প্রদান করে। ভল্টেয়ার দেখাইয়া গিয়াছেন—রাজার বা শাসকের ইতিহাস—যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস, অর্থাৎ বহু দিন লোক যাহাকে ইতিহাসের গৌরব প্রদান করিয়া আসিয়াছে তাহা, ইতিহাস নহে; প্রজাপুঞ্জের ইতিহাসই প্রকৃত ইতিহাস। কেন না রাজার আবির্ভাব—উত্থানপতন অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলও হইতে পারে—প্রজারাই স্থায়ী

আবার শাসন-পদ্ধতি ত্রিবিধ প্রকারে শাসিতের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে :—

১। শাসক সম্প্রদায়ের যে সব চেষ্টা প্রজার অপরাধদ্যোতক কার্য্য দমিত করে অর্থাৎ বিচার প্রভৃতি।

২। রাজস্বের প্রকৃতি ও রাজস্ব-সংগ্রহের উপায়।

৩। প্রজার কল্যাণকর কার্য্য।

যে সময় গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়, তখন বাঙ্গালার উপকণ্ঠে যে বিহার বহুকাল বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই বিহারে—প্রজাশক্তি প্রবল ছিল।

কৌটিল্য বলিয়াছেন, হিন্দুস্থানে নৃপতি জনগণের সেবক বলিয়া বিবেচিত হইতেন; তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া তাঁহাকে শস্য ও পণ্যের যে অংশ প্রদত্ত হইত, তাহা তাঁহার কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক বলিয়া বিবেচিত হইত। অবশ্য ইহাতে বুঝা যায়, সমাজের নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য রাজা থাকিতেন। কিন্তু কোন কোন স্থানে রাজাই থাকিতেন না, প্রজারা গণতন্ত্র স্থাপিত করিয়া, আপনাদিগের নির্ব্বাচিত মণ্ডলদিগের দ্বারা আপনাদিগের শাসন বিচার প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এই গ্রাম্য-মণ্ডলী ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বুদ্ধের আবির্ভাবকালে বাঙ্গালার উপকণ্ঠে যে গণতন্ত্রশাসিত স্থান ছিল, বৌদ্ধ-সাহিত্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তথাগত যে কুশীনগরে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষত্রিয় মল্লদিগের রাজধানী। এই মল্লগণ গণতন্ত্র শাসনাধীন ছিলেন—আপনাদিগের প্রতিনিধিদিগের দ্বারা শাসিত হইতেন। যে সময় শালতরুতলে শিষ্যবৃন্দবেষ্টিত তথাগত তাঁহার শেষ উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, মল্লগণ তখন তাঁহাদিগের সঙ্ঘগৃহে

শাসন-ব্যাপারের আলোচনা করিতেছিলেন। সহসা তথায় সন্ন্যাসী আনন্দের আবির্ভাবে সকলে আলোচনাবিরত হইলেন। সাধু আনন্দ কোশল, মগধ ও অবন্তী প্রভৃতি স্থানে সুপরিচিত ছিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তথাগত মরণাহত জানিয়া সকলে তাঁহাকে দেখিতে গমন করিলেন। তাহার পর চিতায় তথাগতের দেহ ভস্মীভূত করিয়া সকলে গন্ধদ্রব্যসুরভিত সলিলে চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া অস্থিখণ্ডগুলি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইয়া আলোচনা-গৃহে—তীরধনুতে রচিত বৃতিবেষ্টিত করিয়া রক্ষা করিলেন। সেই সংবাদ প্রচারিত হইলে অন্যান্য স্থানের প্রধানগণও বলিলেন, "তথাগত ক্ষত্রিয় ছিলেন—আমরাও তাহাই। আমরাও তাঁহার দেহাবশেষের একাংশ পাইবার অধিকারী।" তখন অস্থি ও ভস্ম কয় ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রার্থীদিগকে প্রদান করা হইল এবং যে আধারে তাহা রক্ষিত হইল, তাহার উপর স্তূপ নির্ম্মিত হইল। অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি স্থানে পর্ব্বতে, গুহামন্দিরে ও কক্ষমধ্যে এইরূপ স্তূপ লক্ষিত হয়। বৌদ্ধ বিহারের সঙ্ঘগৃহ যেমন গণতন্ত্র-শাসিত সমাজের আলোচনাগৃহের স্মৃতি রক্ষা করিয়াছে, তেমনই বৌদ্ধ সঙ্ঘের কার্য্য-পদ্ধতি ঐরূপ সমাজের সঙ্ঘের পদ্ধতি হইতে গৃহীত। বুদ্ধ স্বয়ংও এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া লর্ড রোনাল্ডসে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সে সময়ের লোকেরা সম্মিলিত হইয়া কার্য্য-পরিচালন-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছিল।

বাঙ্গালার প্রজারা যে বাঙ্গালার উপকণ্ঠের অধিবাসীদিগের ভাবেই অনুপ্রাণিত ছিল, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। তাহার বিশেষ কারণ এই যে, বাঙ্গালার প্রজা-শক্তি দেশের প্রাকৃতিক অবস্থায় পরিপুষ্ট হইবার সুযোগও লাভ করিয়াছিল। এই নদীমাতৃক প্রদেশে বহু খণ্ডরাজ্য উদ্ভূত হইয়াছিল এবং সকল রাজ্যই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য উদগ্রীব ছিল। এই অবস্থা যে এ দেশে মুসলমান অধিকার বিস্তারের সময় পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বাঙ্গালার নৃপতিরা বাঙ্গালী সৈনিক লইয়া অন্যান্য রাজ্য জয় করিতেও অগ্রসর হইতেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া আমরা আজ বাঙ্গালার বীর পুত্রদিগের দ্বারা সিংহল-বিজয়-কাহিনীকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিতে পারি না বটে, কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, কিম্বদন্তীর ফেণপুঞ্জের নিম্নে অনেক সময় সত্যের শীর্ণ ধারা লুক্কায়িত থাকে। বিশেষ যে সময়ের ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য সে সময়ের ঘটনা যদি কিম্বদন্তীতে রক্ষিত হয়, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। বাঙ্গালী যে বাঙ্গালার বন্দর হইতে নৌকায় তরঙ্গসঙ্কুল সাগর লঙ্ঘন করিয়া জয় ও অর্থ আহরণ করিয়া আনিত, তাহাও ঐতিহাসিক সত্য। বাঙ্গালী যে হিমাচলের তুষারপ্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে, তাহার প্রমাণও আছে। দেবপালের (মুঙ্গেরে প্রাপ্ত) তাম্রশাসনে প্রশস্তিকারলিখিত নিম্নলিখিত বিবরণে তাহার পরিণতি পরিলক্ষিত হয়—

"একদিকে হিমাচল, অপর দিকে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিচিহ্ন সেতুবন্ধ, এক দিকে বরুণালয় (সমুদ্র), অপর দিকে লক্ষ্মীর জন্মনিকেতন (অপার সমুদ্র) এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূমণ্ডল সেই রাজা নিঃসপত্নভাবে উপভোগ করিতেছেন।"

'গৌড়রাজমালা'র গ্রন্থকার রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ যথার্থই লিখিয়াছেন—

"এ কথা কবিকল্পিত হইলেও ইহার অভ্যন্তরে গৌড়াধিপ ও গৌড়জনের অন্তর্নিহিত উচ্চাভিলাষের ছায়া প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এবং দেবপাল এই অভিলাষ পূরণে সমর্থ না হইলেও, উহার উদ্যোগ করিতে গিয়া তিনি যে তৎকালীন ভারতীয় নরপতিসমাজে বাহুবলে স্বীয় শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।"

এই জয়পালের বংশপতি গোপালের রাজদণ্ড লাভ বাঙ্গালায় প্রজাশক্তির বিকাশের পরিচয় প্রদান করে। গোপালের রাজ্যলাভের পূর্ব্বে বাঙ্গালার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। লামা তারানাথের তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিকরা সেই অবস্থার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, এই সময় উড়িষ্যা, বাঙ্গালা ও পূর্ব্বাঞ্চলের আর কয়টি প্রদেশে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নিকটবর্ত্তী স্থানে আপনার প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা (চেষ্টা) করিয়াছিলেন; দেশে কোন রাজা ছিলেন না। তৎকালে বঙ্গদেশকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা হইত—

(১) বরেন্দ্র (ইহার পশ্চিমে মহনন্দা নদী, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে গঙ্গা ও উত্তরে কুচবিহার।)

(২) বঙ্গ (ইহার পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে গঙ্গা, পূর্ব্বে মেঘনা ও উত্তরে খাসিয়া গিরিশ্রেণী ।)

(৩) রাঢ় (ইহার পশ্চিমে রাজমহলের পর্ব্বতমালা, উত্তরে গঙ্গা, পূর্ব্বে জলঙ্গী নদী, দক্ষিণ সীমা অজ্ঞাত ।)

(৪) বাগড়ী (ইহা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী বদ্বীপ ।)

'রাজতরঙ্গিনী'তে প্রকাশ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে বরেন্দ্রে (গৌড়ে) ৬ জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতি ছিলেন।

তারানাথ লিখিয়াছেন—ইঁহাদিগের মধ্যে একজনের বিধবা প্রতি রাত্রিতে নির্ব্বাচিত রাজাকে হত্যা করিতেন এবং শেষে প্রজাগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত নৃপতি গোপাল তাঁহার প্রভাবমুক্ত হইয়া রাজ্যলাভ করেন।

গোপালের পুত্র ধর্ম্মপালের খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্র-শাসনে লিখিত আছে —

"মাৎস্য-ন্যায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে জনগণ (প্রকৃতিভিঃ) বপ্যটত নয় গোপালকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়াছিলেন।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই সময়ে বাঙ্গালার জনগণ "মাৎস্য-ন্যায়" অর্থাৎ অরাজক অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের জন্য রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। গণতন্ত্রের প্রভাব আর কিসে অধিক প্রতিভাত হইতে পারে ?

যে জনগণ আপনাদিগের শাসন জন্য রাজা নির্ব্বাচিত করিতে পারে, তাহারা যে অনাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। 'রাম চরিত' নামক সন্ধ্যাকর নন্দীর যে কাব্য নেপাল হইতে আনীত হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালায় প্রজা-বিদ্রোহের বিবরণ বিবৃত আছে

তৃতীয় বিগ্রহপাল পরলোকগত হইলে দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসন লাভ করিয়া ডুষ্কার্য্যরত (অনীতিকারম্ভরত) হইয়াছিলেন এবং কনিষ্ঠ শূরপালকে ও রামপালকে লৌহ-নিগড়-বদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তখন কৈবর্ত্ত জাতীয় দিব্য বা দিব্বোক যুদ্ধে মহীপালকে নিহত করিয়া "জনকভু" বা পালরাজগণের জন্মভূমি বরেন্দ্র অধিকার করিয়াছিলেন। যাঁহারা ইংলণ্ডের ইতিহাসে রাজা প্রথম চার্লসের পরিণাম বিবেচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, তথায় রাজশক্তি অপেক্ষা প্রজাশক্তি প্রবল ছিল এবং রাজার অধিকার প্রজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়— তাঁহাদিগকে বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রজাদিগের দ্বারা গোপালকে নৃপতি নির্ব্বাচন ও পরে অনাচারী নৃপতির বিরুদ্ধে দিব্বোকের বিদ্রোহ স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। মুসলমান-প্রাধান্যকালেও বাঙ্গালীর স্বাধীনতা-সম্ভোগ-প্রয়াসের বহু পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ভূস্বামীদিগকে পরাভূত করিয়া সমগ্র প্রদেশ শাসনাধীন করিতে মোগল ও পাঠান যোদ্ধৃগণকে কত দিন কত চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার বিবরণ রক্ষা করিয়াছে। বাঙ্গালার ভূস্বামী প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমান সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া প্রাণ দিয়াছিলেন। যে সামরিক প্রতিভাবলে ছত্রপতি শিবাজী ঔরঙ্গজেবকে অনায়াসে উপেক্ষা করিতে সাহস করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার এই ভূস্বামীরা যে সেই প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালার জনগণ স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল বলিয়াই, তাঁহারা অনায়াসে সৈনিক ও সেনাপতি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন।

মুসলমান রাজত্বের শেষ দশায়ও বাঙ্গালায় প্রজা-বিদ্রোহ হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে এ দেশে ইংরাজ শাসনের প্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন ঐতিহাসিক লেখক সিরাজদ্দৌলাকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু অন্ধকূপ হত্যা ব্যাপারের দায়িত্ব সিরাজদ্দৌলার স্কন্ধে ন্যস্ত করা অসঙ্গত হইলেও সিরাজদ্দৌলার দারুণ অনাচারের বিষয় এ দেশে কিম্বদন্তী হইয়া আছে। সিরাজদ্দৌলা ইংরাজের প্রতি বিরূপ ছিলেন সত্য, কিন্তু ফরাসীদিগের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল এবং তখন ভারতের বাণিজ্য-ব্যাপারে ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতাহেতু ফরাসীরা ইংরাজের প্রতি বিরক্ত সিরাজদ্দৌলাকে তুষ্ট রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। সিরাজদ্দৌলা যখন বাঙ্গালার মসনদে উপবেশন করেন, তখন ল কাশিমবাজারে ফরাসী কুঠীর কর্ত্তা। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"সিরাজদ্দৌলা চব্বিশ বা পঁচিশ বৎসরের যুবক, দেখিতে অতি সাধারণ। আলীবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলার চরিত্র অতি নিকৃষ্ট বলিয়াই লোকে জানিত। সিরাজদ্দৌলা যে কেবল সর্ব্ববিধ লাম্পট্যের জন্য জনসাধারণে

পরিচিত ছিল তাহাই নহে, পরন্তু সে ঘৃণাকরজনক নিষ্ঠুরতারও পরিচয় দিয়াছিল। হিন্দু নারীরা গঙ্গায় স্নান করিয়া থাকেন। সিরাজদ্দৌলার চররা স্নানার্থিনীদিগের মধ্যে সুন্দরী থাকিলে তাহাকে সে সন্ধান প্রদান করিত এবং তাহার লোকরা ছদ্মবেশে নৌকায় যাইয়া সেই সুন্দরী নারীদিগকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিত। এককালে শত শত বিপন্ন নর নারী ও শিশু কিরূপ ব্যবহার করে, তাহাই লক্ষ্য করিবার নিষ্ঠুর আনন্দ লাভের জন্য সে বর্ষায় বারিপুষ্ট নদীতে খেয়ার নৌকা ডুবাইয়া দিত। বলা বাহুল্য, ইহাতে বহু লোক প্রাণ হারাইত। যখন কোন ক্ষমতাবান্ লোককে হত্যা করা স্থির হইত, তখন সিরাজদ্দৌলাই সে কার্য্যে অগ্রণী হইত—যাহাদিগকে নিহত করা হইবে যাহাতে তাহাদিগের আর্ত্তস্বর শুনিতে না হয় সেই জন্য আলীবর্দ্দীরাও স্বয়ং কোন উদ্যান-বাটিকায় গমন করিতেন।"

কাশিমবাজারে ইংরাজ কুঠীর প্রধান কর্ম্মচারী ওয়াটস ও অন্য অনেকে মনে করিয়াছিলেন, আলীবর্দ্দীর পর লোক কখনই সিরাজদ্দৌলার শাসন সহ্য করিবে না। তাঁহারা যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছিল—বাঙ্গালার লোক অত্যাচারী নবাবকে মসনদে থাকিতে দেয় নাই।

অবশ্য অন্য প্রজাবিদ্রোহে আর এই প্রজাবিদ্রোহে বিশেষ প্রভেদ ছিল। এ ক্ষেত্রে প্রজাসাধারণ বিদ্রোহী হয় নাই; পরন্তু ধনী জগৎশেঠপরিবারের লোক ভূস্বামী প্রভৃতি ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র মহারাণী ভবানীর মুখে যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয় সন্দেহ নাই—

"এ চক্রান্ত
কৃষ্ণনগরাধিপের উপযুক্ত নয়।"

কিন্তু যাঁহারা অনাচারী সিরাজদ্দৌলাকে মসনদ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রজাশক্তির সমর্থন লাভ করিলেও প্রজাশক্তির সাহায্য গ্রাহ্য করেন নাই; করিলে বিদ্রোহ ভিন্ন রূপ ধারণ করিত। প্রজারা যে তাঁহাদিগের কার্য্যের সমর্থক ছিল, তাহার প্রমাণ—তাঁহারা এই জন্য প্রজাদিগের অপ্রীতি অর্জ্জন করেন নাই।

বাঙ্গালার প্রজাসাধারণ যতই শিষ্টস্বভাব হউক না, তাহারা যে আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন ও অনাচারবিরোধী ছিল, তাহা সিরাজদ্দৌলার সময়ের বাঙ্গালার প্রজাদিগের অবস্থার সহিত ঐ সময়ের আয়র্লণ্ডের প্রজাদিগের অবস্থার তুলনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে। আর্থার ইয়ং আয়ার্লণ্ড ভ্রমণের বিবরণে লিখিয়াছিলেন :—

"আয়ার্লণ্ডে ভূস্বামী যে আদেশই কেন করুন না—কোন ভৃত্য, শ্রমিক বা কৃষক তাহা পালনপরাঙ্মুখ হইতে পারে না। * * * ভূস্বামীর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব বা বিনয়ের অভাব দেখিলে ভূস্বামী অনায়াসে বেত্রাঘাত বা অশ্বচালন প্রত্যোদের দ্বারা তাহার সমুচিত দণ্ড দিতে পারেন—তাহাতে তাঁহার শঙ্কার কোন কারণ থাকে না। কোন দরিদ্র ব্যক্তি যদি আত্মরক্ষা-কল্পে হস্ত উত্তোলন করে, তবে তাহার অস্থি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। * * * সম্রান্ত ভূস্বামীরা আমাকে বলিয়াছেন, প্রভুরা শয্যাসঙ্গিনী করিবার জন্য তাহার স্ত্রী বা কন্যাকে পাঠাইতে বলিলে কৃষকরা তাহা সম্মানজনক বলিয়া বিবেচনা করে। লোক কিরূপ অত্যাচার ভোগ করে, ইহাতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।"

বাঙ্গালার প্রজাসাধারণের পক্ষে এইরূপ অপমান সহ্য করা কল্পনাতীত ছিল। তাহার কারণ, তাহারা আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্যরক্ষাতৎপর ছিল এবং তাহাদিগের সামাজিক ব্যবস্থা তাহাদিগের আত্মসম্মান রক্ষার অনুকূল ছিল।

আরও এক কথা এই যে, আয়ার্লণ্ডের প্রজাদিগের এই অবস্থার প্রতীকার করিবার জন্য নেতৃগণের আগ্রহে আন্তরিকতা ছিল না। বাঙ্গালার সমৃদ্ধ সম্প্রদায় সে আগ্রহের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে কেহ কেহ অসাধারণ ত্যাগস্বীকার করিতে বাধ্যও হইয়াছিলেন। অনাচারী শাসককে আসনচ্যুত করায় যে তাঁহাদিগের সকলেরই ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল, এমন কথা বলা যায় না।

দীর্ঘকাল অত্যাচারভোগ আয়ার্লণ্ডের প্রজাদিগের যে অবস্থার উদ্ভব করিয়াছিল, বাঙ্গালার প্রজারা যে সেই অবস্থায় উপনীত হয় নাই, বাঙ্গালার হিন্দুদিগের সামাজিক ব্যবস্থাও তাহার অন্যতম কারণ বলিয়া বিবচনা করিতে হইবে। যাহাকে সাধারণতঃ "জাতিভেদ" বলা হয়, তাহার সম্বন্ধে প্রতীচীর লেখকদিগের মতই অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। এই লেখকগণের দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতবাসীর চরিত্রগত দোষ ত্রুটির জন্য জাতিভেদ-প্রথাই দায়ী। কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই—এই যে প্রথাহেতু মানুষ তাহার জন্মজ কার্য্যক্ষেত্রেই কায করে, তাহা বিশেষ কারণে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল যে কারণের প্রয়োজন অনুভূত হয়, তাহাতে উদ্ভূত সকল প্রথাতেই ভাল ও মন্দ মিশ্রিত থাকে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের অ্যাংলিক্যান ধর্ম্মযাজকরা বিলাতের ধর্ম্মযাজকদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই :—

"ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথাই সমাজের বন্ধন এবং তাহার দ্বারাই মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হয়। মানুষের চরিত্রে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ মূলতঃ তাহার বিরোধী হইলেও এই প্রথা বিরাট জনসঙ্ঘকে সম্মিলিত করিয়া রাখিয়াছে এবং যে শৃঙ্খলার সংস্থাপন করিয়াছে, তাহার অধীনে শাসন পরিচালিত হইয়াছে, ব্যবসাবাণিজ্য সমৃদ্ধি পাইয়াছে, দরিদ্র রক্ষা পাইয়াছে এবং পারিবারিক গুণসমূহের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে।"

যে সমাজে বিরাট জনসঙ্ঘ সম্মিলিত হইয়া—পরস্পরের স্বার্থবিরোধী কার্য্য ত্যাগ করিয়া বাস করে, সে সমাজে জনগণের মধ্যে পরস্পরের সহিত সহানুভূতির উদ্ভব স্বাভাবিক নিয়মে হইয়া থাকে। বাঙ্গালার প্রজাদিগের মধ্যেও তাহাই হইয়াছিল এবং সেই জন্যই তাহারা দেশের ও জাতির স্বার্থরক্ষার্থ একযোগে কায করিতে পারিত। (ক্রমশঃ)

কস্মৈ দেবায় ?

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

লোক্যাল ট্রেণে যাহারা যাতায়াত করে তাহাদের গোটা-কতক অসুবিধা ও উপদ্রব গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে। রেল কোম্পানীর ঔদাসিন্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া লাভ নাই তাহারা জানে। দিনের পর দিন সেই ট্রেণের কামরায় স্থানাভাব, ছারপোকায় ভর্ত্তি বেঞ্চি ও কামরার জঞ্জাল তাহারা বরদাস্ত করিয়া আসিয়াছে। এখন আর তাহা বোধ হয় চোখেই পড়ে না। কিন্তু তাই বলিয়া সকল উপদ্রবের সেরা উপদ্রব ট্রেণের ভাড়াটে ক্যানভ্যাসারদের বক্তৃতাও তাহাদের সহিয়া গিয়াছে বলিলে ডেলী প্যাসেঞ্জারদের বোধ হয় অপমান করা হয়।

সমস্ত দিন সহরে হাড়ভাঙা খাটুনির পর ট্রেণে ঠাসাঠাসি করিয়া শক্ত কাঠের বেঞ্চে কোন রকমে একটু বসিয়া পাঞ্জাবের বিখ্যাত কোন গুলির হজম করাইবার শক্তি সম্বন্ধে দীর্ঘ একটানা সুরে বক্তৃতা শ্রবণ করার মত ধৈর্য্য বুঝি বাঙ্গালী কেরাণীদেরও দুর্লভ। কিন্তু পৃথিবীর অন্য অনেক উৎপীড়নের মত ইহারও প্রতিকার নাই। মারিয়া না তাড়াইলে এ সমস্ত পেশাদার ফেরিওয়ালাদের মুখ বন্ধ করা অসম্ভব। সে উৎসাহ আর কার সাত ঘণ্টা কলম পিষিবার পর থাকে!

শুধু 'হজমিগুলি' একা হইলেও বা রক্ষা ছিল। রাবণের গুষ্টির মত ইহাদের আর শেষ নাই। 'হজমিগুলি' এক ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে না যাইতেই, চুলওঠা, মাথাধরা হইতে দেহের যাবতীয় ব্যাধির ধন্বন্তরী-প্রদত্ত তৈল লইয়া নিঃস্বার্থ পরোপকার-ব্রতধারী আর এক মহাপুরুষ তাঁহার শূন্য স্থান দখল করেন এবং পরের ষ্টেশনে তাঁহার যে উত্তরাধিকারীকে সিংহাসন অর্পণ করিয়া যান তিনি কৈলাস পর্ব্বতের গহন-গুহাবাসী সিদ্ধসন্ন্যাসীর আদেশে ধরাধামে রোগ, শোক, দারিদ্র্য, মোকদ্দমায় পরাজয় প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পার্থিব দুঃখ-নিবারক আশ্চর্য্য মাদুলি বিতরণ করিতে বাহির হইয়াছেন। মাদুলির মূল্য নাই কিন্তু বলা বাহুল্য মনস্কাম পূর্ণ হইলে পূজা দিবার জন্য পাঁচ সিকা নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় প্রেরিতব্য। বক্তৃতার ভঙ্গি ভাষা সকলেরই বিভিন্ন, কিন্তু দিনের পর দিন একঘেয়ে ভাবে তাহা শুনিয়া শুনিয়া যাত্রীদের সবগুলিই মুখস্থ হইয়া গেছে বলিলেই হয়। 'হজমিগুলি' কোন্ রসিকতার পর হাসিবে ও 'মাদুলি' কোন কথার পর কাশিবে তাহাও তাহারা জানে।

এ উপদ্রব তাহাদের গা-সওয়া সত্যিই হয় নাই, তবে বিধাতা বাঙ্গালী কেরাণীর শাস্তির জন্য মশা, ম্যালেরিয়া ও বড় বাবুর মেজাজের সঙ্গে ট্রেণের পেশাদার ফেরিওয়ালারূপ এই চতুর্থ নিগ্রহটিও জুড়িয়া দিয়াছেন এই দার্শনিক চিন্তা দ্বারাই তাহারা বোধ হয় কোন রকমে ক্ষিপ্ততা হইতে নিজেদের রক্ষা করে।

কিন্তু এই বহু অত্যাচারিত ডেলী প্যাসেঞ্জারের দলও সচকিত হইয়া যখন একাগ্র মনে নড়িয়া চড়িয়া বসে তখন বিস্ময় লাগিবার কথা।

যাহার জন্য এত বড় একটা অসম্ভব ব্যাপার ঘটিয়া যায় সেও পেশাদার ট্রেণের বক্তা—কিন্তু কোথায় পার্থক্য আছে। পার্থক্যও একটু নয়, অনেক খানি।

প্রথমেই অবাক করিয়া দেয় তাহার কণ্ঠ। পিতা পিতা-মহের জীর্ণ জীবনের পুঁথিতে দিনের পর দিন দাগা বুলাইয়া যাহাদের ক্লান্ত মন অসাড় হইয়া আসিয়াছে তাহাদের কাছেও সে কণ্ঠের স্নিগ্ধ মাধুর্য্য কি যেন নূতন রহস্য বহন করিয়া আনে। ক্লান্তি ও তন্দ্রার গভীর আচ্ছাদন ভেদ করিয়া সে কণ্ঠ তাহাদের মনের গোপন দ্বারে গিয়া ঘা দেয়। মানুষের কণ্ঠ বুঝি বিধাতা এমনি অপরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন; প্রতিদিনের সঙ্কীর্ণ জীবন-যাত্রার তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর কথায় তাহাকে ব্যবহার করিয়া তাহার সমস্ত মাধুর্য্য আমরা যেন খোয়াইয়া ফেলিয়াছি।

তাহার পর তাহার তরুণ সুকুমার মূর্ত্তিটির দিকে চোখ পড়ে। কাষায় বস্ত্রে এই কিশোর গৌরতনু সন্ন্যাসীটিকে কি সুন্দরই না মানাইয়াছে! দীর্ঘ ঋজু দেহ, যৌবনের পূর্ণতা এখনও আসে নাই, তবু সৌষ্ঠব আছে। আর আছে দীর্ঘায়ত দুটি নারীর মত কোমল, দীর্ঘ পক্ষ্মছায়াচ্ছাদিত চোখে অনির্ব্বচনীয় মায়া।

অতিশয়োক্তি নয়, দেখিতে দেখিতে সত্যই মনে হয় বহু শতাব্দী আগে সমস্ত পৃথিবীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া যে

তরুণ রাজপুত্র একদিন পথে বাহির হইয়াছিলেন তাঁহাকে বুঝি কাষায় বস্ত্রে এমনি মানাইয়াছিল।

বিংশ শতাব্দীর কিশোর সন্ন্যাসী সমস্ত পৃথিবীকে জরা মৃত্যু শোক তাপ হইতে মুক্তি দিতে বাহির হয় নাই। একটি অনাথ-আশ্রমের অসহায় শিশুদের জন্য ভিক্ষাসংগ্রহই তাহার কাজ।

গত তিন মাস ধরিয়া এই দিক্‌কার লোকাল ট্রেণে তাহাকে দেখা যাইতেছে; তবে আর সকলের মত প্রত্যহই সে আসে না, সপ্তাহে মাত্র একবার করিয়া ভিক্ষা করিয়া যায়। তাহার বক্তৃতাতেও বিশেষত্ব আছে, বাঁধা মুখস্থ গদ এক নিশ্বাসে আওড়াইয়া যাইতে তাহাকে শোনা যায় নাই। তাহার প্রতিবারের আবেদনে দুর্লভ আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়—তাহার কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া সমস্ত অসহায় শিশুর কাতর প্রার্থনা সে কেমন করিয়া যেন পূর্ণ করিয়া তোলে।

নিজেদের সঙ্কীর্ণ জীবনের বাহিরে আর কিছু লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর বা উৎসাহ কিছুই যাহাদের নাই, সেই ক্লান্ত কেরাণীদেরও কত জন এই রাজপুত্রের মত সুন্দর, সুকুমার, কিশোর সন্ন্যাসী সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

উত্তরে সে শুধু মৃদুমধুর একটু হাসিয়া বলিয়াছে—"ব্রহ্মচারীর কি পরিচয় হয়? আমার নাম অমৃতানন্দ।"

কথাগুলি বড় পাকা পাকা, কিন্তু কেন বলা যায় না তাহার মুখ হইতে মোটেই অশোভন শোনায় না। তাহার সমস্ত ভাবভঙ্গী মুখচোখ যেন একথার সাক্ষ্য দেয়।

এই কিশোর বয়সে এই সুন্দর ছেলেটি কেন যে এমন হইয়াছে এ রহস্যের মীমাংসা এখনও কেহ করিতে পারে নাই।

কিন্তু ব্রহ্মচারী অমৃতানন্দের সত্যই অন্য পরিচয় আছে, অমৃতানন্দও তাহার আসল নাম নয়।

অমৃতানন্দের ভবিষ্যৎ লইয়া আমাদের কাহিনী কিন্তু সেইজন্যই তাহার অতীত আমাদের জানিতে হইবে।

অমৃতানন্দ সে সব দিনের কথা সত্যই ভুলিতে চায় কিন্তু ভোলা সহজ নয়।

ছেলেবেলার কথা ভাবিলে প্রথম তাহার মনে পড়ে একটি ছোট সঙ্কীর্ণ ঘর, ভালো আলো আসে না। একদিকে ইটের উপর বসান একটা পুরাতন খাট ঘরের অর্দ্ধেকের বেশী জুড়িয়া আছে। আর একদিকে আলনার উপর এক-গাদা ময়লা পুরাতন কাপড়। আলনার বিপরীত দিকে পরের পর কাঠের একটা সিন্দুক, একটা বড় তোরঙ্গ, দুইটা টিনের সুটকেশ স্তূপাকার করিয়া সাজান।

এই সমস্ত আসবাব-পত্র ঘরের সমস্তই দখল করিয়া সামান্য একটু স্থান মানুষের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছে। একটি ছোট ছেলে সেই সঙ্কীর্ণ স্থানে একটি মাদুরের উপর ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ জাগিয়া ওঠে। হাতটা বাড়াইয়া দেখে মা তাহার কাছে বসিয়া আছে। ঘরের এককোণে কেরাসিনের ঝুল-পড়া লণ্ঠনটা জ্বলিতেছে।

ছেলেটি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করে—"বাবা এখনো আসেন নি মা?"

মা পুরাতন একটা ছেঁড়া জামা সেলাই করিতেছিলেন। ছেলেকে উঠিতে দেখিয়া ছুঁচটি জামার গায়ে বিঁধিয়া রাখিয়া জামাটি একধারে সরাইয়া বলেন,—"তোর ক্ষিদে পেয়েছে?"

ক্ষুধা তাহার সত্যই পাইয়াছে, তবু বিনু বলে—"না মা, বাবা এলে খাব।"

কিন্তু তাহার মা সবই বোধ হয় বুঝিতে পারেন। বলেন, "না, এখনই খেয়ে নে, ওঁর আসতে অনেক দেরী হবে।"

এ কথা সে রোজই শুনিয়া আসিতেছে। বাবার উপর তাহার রাগ হয়। কেন তিনি সকাল সকাল আসিতে পারেন না? তাহাদের যে একলা বাড়িতে রাত্রে থাকিতে ভয় করে তাহা কি তিনি জানেন না?

এক এক দিন বিনুর বাবা হঠাৎ সকাল সকাল বাড়ি আসেন। সে দিন বিনুর ভারী ভাল লাগে। মাকে বিনু ভালবাসে কিন্তু বাবার কাছে থাকিতেই তাহার বেশী ভালো লাগে। বাবা সকাল সকাল আসিলে কত রকম মজাই যে হয়—বাবার মত আমোদ করিতে কেহ পারে না। বাবার ফূর্ত্তির ছোঁয়াচ সমস্ত বাড়িতে লাগে; মা মুখে বলেন বটে, "আঃ ছেলেমানুষী করতে লজ্জা করে না!" কিন্তু না হাসিয়াও পারেন না।

কিন্তু এক একদিন আবার বাবার যেন কি হয়। রাত্রে হঠাৎ চেঁচামেচি শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া বাবার চেহারা দেখিয়া বিনুর ভয় করিতে থাকে। বাবা আসিয়া কাহারও সহিত

কথা ক'ন না। সটান জামাজোড়া গায় দিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়েন। বিনুর মা উত্তেজিত কণ্ঠে কি যেন বলিতে থাকেন। বিনু সব কথা বুঝিতে পারে না তবু তাহার কেমন অস্বস্তি বোধ হয়। কি একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে তাহার বুক ধুক্ ধুক্ করিতে থাকে।

কথা কহিতে কহিতে কাঁদিয়া ফেলিয়া বিনুর মা আঁচলে চোখ মোছেন। বিনু বিছানা হইতে আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া মায়ের একটি হাত ধরিয়া ডাকে—"মা

সে ডাকের অনেক কিছু মানে আছে, সেই ডাকে সে মাকে সান্ত্বনা দিতে চায়, নিজের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিতে চায়,—সেই ডাকে তাহার অসহায় একটী জিজ্ঞাসাও ধ্বনিত হয়।

মা হঠাৎ চোখ মুছিয়া সহজ কণ্ঠে বলেন—"কি বাবা? ঘুমোও।" তাহার পর শুনিতে পায় তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মা তাহার বাবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—"ছিঃ, আমাকে না হয় একটা মানুষ বলেই গণ্য কর না, আমি তোমার কেউ নই। কিন্তু বিনুর মুখের দিকে চেয়েও কি চৈতন্য হয়না, লজ্জা করেনা তোমার!"

বিনু হঠাৎ অবাক হইয়া যায়—তাহার বাবাও কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোন বয়স্ক লোক যে এ রকম করিয়া কাঁদিতে পারে তাহা বিনুর জানা ছিল না। সে বিস্মিত হইয়া মায়ের মুখের দিকে তাকায়। তাহার বাবা হঠাৎ এক হাত দিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া জোরে জোরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলেন—"আমি মানুষ নই লীলা আমি মানুষ নই—তোমার মত দেবীর আমি যোগ্য নই—মাইরি বলছি আমি পশু,—পাষণ্ড।"

বাবার স্বাভাবিক গলা এ নয়। কথা গুলাও কেমন যেন জড়াইয়া যাইতেছে। বিনু বাবার সবল বাহুবন্ধনের মধ্যে হাঁফাইয়া ওঠে। কি রকম যেন একটা গন্ধ বাবার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বাহির হইতেছে বিনুর তাহা অসহ্য লাগে।

কাঁদিতে কাঁদিতে বাবার উৎসাহ বাড়িয়া যায়। বিনুকে ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিতে আরম্ভ করেন—"আমি পাষণ্ড, জান লীলা? তোমার সমস্ত জীবন আমি নষ্ট করে দিচ্ছি—আমি কি বুঝতে পারি না ভেবেছ?"

মা হঠাৎ গম্ভীর মুখে বলেন—"চুপ করে শোও এখন—আমার জীবন নষ্ট করেছ তা আমি বলি নি, তোমার নিজের জীবন কি করে তুলছ তা ভেবেছ!"

"হ্যাঁ আমার আবার জীবন, আমি একটা পাষণ্ড জান লীলা, তোমার জীবন, বিনুর জীবন সব আমি নষ্ট করে দিচ্ছি। কিন্তু এই আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করছি লীলা—"

বিনুর মা হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলেন—"থাক্, প্রতিজ্ঞা করো না—এ পর্য্যন্ত কতবার প্রতিজ্ঞা করেছ জান?"

"জানি আমি পাষণ্ড, আমি ত বলছি আমি পাষণ্ড, কেমন আমি নিজেকে পাষণ্ড বলি নি—তবু পাষণ্ডকেও আর একবার সময় দিতে হবে ত লীলা। তোমার পাষণ্ড স্বামীকে আর একবার ক্ষমা করতে পার না লীলা—আর একবার!"

বিনুর বাবা বসিয়া থাকিতে থাকিতে আবার ঢুলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়েন।

মা বাবার মাথায় বাতাস করিতে করিতে বিনুর দিকে একবার মুখ ফিরাইতেই বিনু কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—"বাবার কি হয়েছে মা!"

"ওঁর অসুখ করেছে বাবা, তুমি ঘুমোও।" বলিয়া বিনুর মাথাটা মা কোলের কাছে টানিয়া ল'ন। কিন্তু বাবা আবার হাত বাড়াইয়া বিনুকে কোলের কাছে টানিয়া স্পষ্ট করিয়া বলেন—"তোর বাবা পাষণ্ড! জানিস্ বিনু!"

তাহার পর কয়েকদিন বিনুর বড় সুখেই কাটে। বাবা রোজ সকাল সকাল বাড়ি ফেরেন। কোন দিন বা তাহাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হন, কোন দিন বা ঘরে বসিয়া গল্প করেন। মায়ের মুখ আর আগের মত অন্ধকার নাই। লুকাইয়া লুকাইয়া মা আর কাঁদেনা। বাবা আজকাল রোজ তাহার ও মায়ের জন্য কত কি কিনিয়া আনে।

তাছাড়া বাবা যে কত রকম মজা করিতে পারে তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না।

গলির ভিতর তাহাদের বাড়ি। বিকাল বেলা বাহিরে আসিয়া পিয়ন ডাকে—"মোনি অর্ডার আছে, মোনি-অর্ডার, লীলাবোতি ঘোষ কে আছে এ বাড়ীতে—'

মা তাড়াতাড়ি বিনুকে ডাকিয়া বলেন—"ওমা, আমার নামে মণি-অর্ডার আবার কোথা থেকে এল? দেখত বিনু দরজা খুলে, আমাদের বাড়ি না পাশের বাড়িতে ডাকছে।"

বিনু আজকাল কিছু দিন হইল আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া কোন রকমে বাহিরের দরজার খিলটা উঠাইয়া ফেলিতে পারে। দরজা খুলিবার ফরমাসে তাই তাহার আনন্দের অবধি থাকে না। তাড়াতাড়ি সে ছুটিয়া যায়।

বিনুর মা চৌবাচ্চা পরিষ্কার করিতে করিতে দরজা খোলার শব্দ শুনিতে পান কিন্তু তাহার পর আর বিনুর সাড়া-শব্দ না পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া ডাকেন—"ও বিনু, পিয়ন কি বল্লে?"

তবুও বিনুর সাড়া পাওয়া যায় না। পিয়ন সেই একবার ডাক দিয়া নীরব হইয়াছে।

বিনুর মা অকস্মাৎ ভীত হইয়া ভিজা কাপড়েই দরজার কাছে আগাইয়া যায়। দরজা হাট করিয়া খোলা, সেখানে বিনু বা পিয়ন কাহাকেও দেখা যায়না। অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বিনুর মা দরজা হইতে সন্তর্পণে মুখ বাহির করিয়া এদিক ওদিক খুঁজিয়া দেখিতেই হঠাৎ পিছন হইতে হাসির শব্দ শোনা যায়। বিনু আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। বিনুর মা ফিরিয়া দেখেন বিনু তাহার বাবার কোলে বসিয়া হাসিতেছে। তাঁহার কলতলা হইতে বাহির হইবার আগেই কখন তাহারা ঘরে ঢুকিয়া লুকাইয়াছে তাহা তিনি টেরই পান নাই।

হাঁফ ছাড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলেন—"মাগো অমনি করে ভয় দেখায়! আমি ত অবাক্! আমার নামে মনি-অর্ডার কোথা থেকে আসবে তাইত ভেবে পাইনা। তার ওপর ডাক দিয়ে বিনুর সাড়াশব্দ না পেয়ে বুকটা একেবারে ধড়াস্ করে উঠেছিল! কলকেতার সহরে কিনা হতে পারে বাপু!"

তারপর স্বামীকে মৃদু একটু ভর্ৎসনা করিয়া বলেন,—"দিন দিন কচি খোকাটি হ'চ্ছ, না?"

বিনুর বাবা মুখ গম্ভীর করিয়া বলেন—"কচি খোকাটি কি রকম? তোমার নামে মনি-অর্ডার আসেনি মনে করছ! পিয়ন বেটা যে আমার হাতে দিয়ে গেল।"

"হ্যাঁ গেল—কই দেখি!" বলিয়া বিনুর মা হাসিতে থাকেন।

বিনুর বাবা পকেট হইতে ব্যাগটা বাহির করিয়া তাহাতে একবার আঙ্গুল দিয়া আঘাত করে। ভিতরে টাকার শব্দ শোনা যায়। বলেন—"শুনলে ত?"

মা বলেন—"বেশ, কিন্তু ও আমার মনি-অর্ডার যদি হয়, তুমি ওতে আর হাত দিতে পারবে না বলে রাখলাম।"

মার হাতে ব্যাগটা দিয়া বিনুর বাবা গম্ভীর মুখে বলেন,—"আমি আবার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গব আমায় এত অমানুষ ভাব লীলা!"

বিনুর মার চোখ ছলছল করিয়া ওঠে। বলেন,—"আমি কি সেইজন্যে ও কথা বল্লাম তুমি মনে কর?"

বিনুর বাবা তবুও গম্ভীর মুখে বলেন,—"তোমার দোষ নেই লীলা, আমি তোমার বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিনি। এতবার আমি কথার খেলাপ করেছি যে তোমার পক্ষে আমাকে বিশ্বাস করাই শক্ত।"

বিনুর মা তাড়াতাড়ি ব্যাগটা স্বামীর পকেটে ফেলিয়া দিয়া বলেন,—"তুমি যদি ওরকম করে কথা বল তাহলে এ-টাকা আমি ছুঁতে চাই না। তোমায় বিশ্বাস না করে যেন আমার বড় সুখ।"

বিনুর বাবা এবার তাহার মায়ের হাত ধরিয়া বলেন,—"রাগ কোরো না লক্ষীটী! আমার নিজের অনুশোচনা করবারও কি অধিকার নেই?"

তাহার পর খানিক বাদেই মিটমাট হইয়া যায়। বিনুর বাবা খবরের কাগজ কাটিয়া বিনুর ঘুড়ি তৈয়ারী করিতে ব্যস্ত হন এবং বিনু বড় হইলে ঘুড়ি ওড়াইবার জন্য একটা প্রকাণ্ড ছাদ-ওয়ালা বাড়ি কোথায় কেনা হইবে তাহারই গল্প করেন।

বিনুদের এ বাড়ীতে ছাদ আছে কিন্তু তাহাতে উঠিবার সিঁড়ি পাশের ভাড়াটেদের অধিকারে। (ক্রমশঃ)

ফোটগ্রাফি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপরিমল গোস্বামী

এক্স্পোজার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ যেমন বহুব্যর্থতা এবং অদম্য অধ্যবসায়ের অপেক্ষা রাখে, তেমনি একথাও সত্য যে বর্ত্তমানে এক্স্পোজারের পরিমাণ ঠিক করিবার জন্য বহু প্রকার মন্ত্র এবং যন্ত্র আবিষ্কার হইয়াছে। মন্ত্র মুখস্থ রাখিয়া অথবা মন্ত্র-লেখা পুঁথি (exposure chart) সঙ্গে রাখিয়া সেই অনুসারে কাজ করিলে অনেকটা দুশ্চিন্তার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এক্স্পোজারের পরিমাণ মাপার জন্য যন্ত্রও কিনিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রথম অবস্থায় যথেষ্ট সাহায্য করে। তবে ফোটগ্রাফি সাধনায় গুরু খুঁজিয়া পাইলে যে সব চেয়ে ভাল হয় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। উপযুক্ত গুরু দুর্ল্লভ, কিন্তু যাহার নিজের উপর বিশ্বাস আছে, এবং কিছু বুদ্ধি চালনা করিতে যিনি ইতস্তত করেন না, তাঁহার পক্ষে কোনো পথই দুর্গম থাকে না।

যাহা হউক, যাঁহারা সাধারণ ব্যবসায়ী-ফোটোগ্রাফার, অর্থাৎ যাঁহাদের কাজ অধিকাংশই ঘরের বাহিরে লোকের চেহারা তোলাতেই সীমাবদ্ধ, তাঁহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত লেন্সই ভাল। বেশি দামের প্রশস্ত লেন্স (প্রশস্ত-কোণ নহে)-ইহার ব্যবহার কদাচিৎ আবশ্যক হয়। আলোর জোর অত্যন্ত কমিয়া গেলেও যেখানে দ্রুত এক্স্পোজারে ছবি তুলিতে হইবে, অথবা অন্দরে যেখানে স্বভাবতই আলো অত্যন্ত কম, সেখানে ব্যবহারের জন্য প্রশস্ত লেন্স দরকার হয়। কিন্তু এই প্রশস্ত লেন্সের কিছু অসুবিধাও আছে। প্রশস্ত লেন্সে এত বেশি আলো প্রবেশ করে যে এক্স্পোজার স্বভাবতই কম দরকার হয়, এবং আমাদের প্রখর আলোর দেশে ঘরের বাহিরে এইরূপ লেন্সে কোনো ছবি তুলিতে গেলে এত কম এক্স্পোজার দিতে হয় যে অনেক সময়, অত কম এক্স্পোজার দিতে গেলে যেরূপ দামী শাটার প্রয়োজন হয়, তাহা অধিকাংশ ব্যবসায়ী-ফোটোগ্রাফারই কিনিতে পারেন না। একটি লোকের ছবি তুলিতে যখন এক সেকেণ্ড এক্স্পোজার দিলে সে-লোকের কোন অসুবিধা হয় না, এবং তাহাতে ছবিও খারাপ হয় না, তখন শুদ্ধ মাত্র দ্রুত এক্স্পোজারে ছবি তুলিয়া বাহাদুরী করিবার জন্যই বহু-মূল্য প্রশস্ত লেন্স এবং শাটার রাখিবার আবশ্যকতা কি? বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই "অ্যানাস্টিগম্যাট" লেন্সের ব্যবহার চলিয়াছে। অপ্রশস্ত অ্যানাস্টিগম্যাট লেন্স ৬·৮ অথবা ৭·৭ ডায়াফ্রাম বা ষ্টপ বিশিষ্ট, এবং প্রশস্ত লেন্স ১·৫, ২·৫, ৩·৫ অথবা ৪·৫ ডায়াফ্রামবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ১·৫, ২·৫ বিশেষ করিয়া ছোট ক্যামেরাতে ব্যবহৃত হয়। ৩·৫ এবং ৪·৫ ডায়াফ্রাম-যুক্ত লেন্স ষ্টুডিও-ক্যামেরার পক্ষে এবং হ্যাণ্ড-ক্যামেরার পক্ষে উপযোগী। ঘরের বাহিরে লোকের চেহারা তুলিবার কাজে ৭·৭ হইলেই চলিয়া যায়। কিনিবার ক্ষমতা থাকিলে একাধিক লেন্স রাখা ভাল, এবং অন্য জিনিস সম্বন্ধে যেমন, লেন্স সম্বন্ধেও একথা বলা চলে যে নিজের সামর্থ্য বুঝিয়া, এবং কাজের বিশিষ্টতা বুঝিয়া যতদূর ভাল এবং মূল্যবান জিনিস কেনা যায় ততই ভাল। তবে ইহারও একটা সীমা আছে। ফোটোগ্রাফি যখন নিজের নিপুণতা এবং প্রয়োগ-কৌশলের উপরে অনেকখানি নির্ভর করে তখন যিনি অপেক্ষাকৃত অল্প আড়ম্বরে এবং অল্প খরচে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাজ করিতে পারেন তাঁহারই কৃতিত্ব বেশি।

অধিক প্রশস্ত লেন্সে আরো অসুবিধা আছে। ক্যামেরার গঠন এইরূপ যে তাহার ভিতরে, যে-জিনিসের ফোটো উঠিতেছে তাহার প্রতিফলিত আলো ছাড়া অন্য কোনোরূপ আলো প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ তাহা হইলে ফোটোর যে-ঔজ্জ্বল্য এবং স্বাভাবিক আলো-ছায়া মিলিয়া যে সৌন্দর্য্য চোখকে পরিতৃপ্ত করে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ছবি ধোঁয়াটে দেখায়। প্রশস্ত লেন্সে যাহার ফোটো উঠিতেছে অর্থাৎ সেই সাবজেক্টের প্রতিচ্ছবির সঙ্গে সঙ্গে লেন্সের প্রশস্ততার দরুণ এত আলো ক্যামেরার ভিতরে প্রবেশ করে যে সেই আলো বেলোজে লাগিয়া সেখান হইতে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, এবং তাহা প্লেটে গিয়া লাগে। ইহাতে ছবির জোর কমিয়া যায়। ক্যামেরা-বেলোজ ক্রমাগত পরিষ্কার না রাখিলে ভিতরে যে ধূলা জমে, তাহাতে আলো লাগিয়াও ক্যামেরার ভিতরে অবাঞ্ছনীয় রূপে আলোর পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে। প্রশস্ত লেন্সে ইহা বেশি হয়। বেলোজের ভিতর

গভীর কালো রং লাগানো থাকে শুধু এই অবান্তর আলোর ক্রিয়া নষ্ট করিতে, কিন্তু তাহা সত্বেও উহার ক্রিয়া সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না।

তবে ইহাও সত্য যে প্রশস্তমুখ লেন্সের ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। কেননা হাজার অসুবিধা সত্বেও যে সমস্ত দুঃসাধ্য কাজ ইহা হইতে পাওয়া যায় তাহা অন্য লেন্স হইতে পাওয়া সম্ভব নহে। এই কারণে যে প্রস্তুত-কারক নিখুঁৎভাবে যত প্রশস্ত-মুখ লেন্স বাহির করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার খ্যাতি তত বেশি হইয়াছে। সিনেমা বা চলচ্চিত্রের জন্য যে লেন্স ব্যবহৃত হয়, তাহা সব চেয়ে প্রশস্ত-মুখ। এরূপ লেন্স না হইলে বর্ত্তমান সিনেম্যাটোগ্রাফি সম্ভব হইত না।

বেলোজ

ফোল্ডিং ক্যামেরা অর্থাৎ যে ক্যামেরা ভাঁজ করিয়া, মুড়িয়া রাখা যায় তাহার সম্মুখ এবং পশ্চাৎ ভাগ বেলোজ দ্বারা যুক্ত থাকে। বেলোজ চামড়া এবং কাপড়ের হইয়া থাকে। এই বেলোজই ক্যামেরার দেহ। ইহা এরূপ বহু ভাঁজে প্রস্তুত যে ফোকাসিংএর সময় ইচ্ছামত গ্রাউণ্ড-গ্লাস হইতে লেন্সের দূরত্ব খুব সহজে কমাইতে এবং বাড়াইতে পারা যায়। বেলোজের বহির্ভাগে লাল অথবা কালো এবং ভিতরে সব সময়েই কালো রং মাখানো থাকে। বেলোজ খুব যত্নে রাখিতে হয়, অন্যথায় পোকায় কাটিয়া ফেলে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অন্ধকার ঘরে ছোট ছিদ্র থাকিলে সেই ছিদ্রপথে উজ্জ্বল-আলোকিত বাহিরের সমস্ত দৃশ্য তাহার স্বাভাবিক বর্ণ সমেত ঘরের ভিতরের দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়। ক্যামেরাও একটা অন্ধকার ঘর। ইহার লেন্সের ছিদ্রপথে বাহিরে অবস্থিত সাবজেক্টের প্রতিফলিত আলো আসিয়া প্লেটে লাগে এবং প্লেট তাহার ছাপ গ্রহণ করে। কিছুকাল পূর্ব্বে রয়্যাল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটীতে তুষারাবৃত হিমালয়ের একটী ফোটো প্রদর্শিত হয়। ঐ ফোটোতে হিমালয়ের দৃশ্যের মধ্যে কতকগুলি ভৌতিক মূর্ত্তির ছাপ ছিল, অথচ ফোটো তুলিবার সময় ক্যামেরার সম্মুখে কোনো ভূত বা মানুষ ছিল না। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ স্থির করিলেন যে হিমালয়ে যখন সাধু যোগীরা বাস করেন তখন সেখানে যে ভৌতিক দেহ থাকিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু আসল ব্যাপার পরে বুঝা গেল। ঐ ক্যামেরার বেলোজে পিন-খোঁচা ছিদ্রের মত ছিদ্র ছিল। প্লেটে আলোক-ছাপ লাগাইবার পূর্ব্বে হোল্ডার হইতে তাহার স্লাইডিং-দরজা টানিয়া খুলিয়া দিয়া, পরে লেন্সমুখ খুলিতে হয়। স্লাইড খুলিবার পরে অথচ এক্সপোজার দিবার পূর্ব্বে ক্যামেরার পাশে দুই জন কুলী ছিল, তাহাদের মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব ঐ পিন-খোঁচা ছিদ্রপথে প্লেটের গায়ে গিয়া লাগিয়াছে। চিত্রকর ইহা জানিতেন না, তিনি তাঁহার সাবজেক্টে এক্স-পোজার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে প্লেট ডেভেলপ করিয়া দেখেন, প্লেটে ভূতের আমদানী ঘটিয়াছে। ক্যামেরা-বেলোজে ছিদ্র থাকিলে এইরূপ ভূতের ছবি উঠা আশ্চর্য্য নহে, সুতরাং বেলোজ এমন হওয়া উচিত যাহাতে একটিও ছিদ্র না থাকে। ক্যামেরা অযত্নে ফেলিয়া রাখিলে বেলোজ পোকায় কাটে এবং ঐরূপ ছিদ্র হয়।

ক্যামেরার সম্মুখ ভাগ উঁচু নীচু করিবার ব্যবস্থা

অল্প দামের বক্স-ক্যামেরার সম্মুখ ভাগ এবং লেন্স এইরূপ আটকানো থাকে যাহাতে সকল সময়েই তাহার লেন্স পশ্চাতের প্লেটের বা ফিল্মের ঠিক কেন্দ্রের সোজাসুজি থাকে। অর্থাৎ সম্মুখ ভাগ উঁচু করিবার দরকার হইলে পশ্চাৎ ভাগের অবস্থান ঠিক রাখিয়া করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে উহা নীচু করিতে হয়। তাহা ছাড়া অন্যান্য ফোল্ডিং ক্যামেরা মাত্রেই এবং সমুদয় ষ্ট্যাণ্ড-ক্যামেরার সঙ্গে এই "রাইজিং এবং ফলিং"এর ব্যবস্থা আছে।
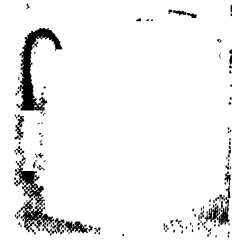
বক্স ক্যামেরা
ইহাতে "রাইজিং-ফলিং"এর ব্যবস্থা নাই।

ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কোনো একটা উঁচু বাড়ি বা

ইমারতের ফোটো তুলিবার জন্য ক্যামেরা ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড় করাইয়া পশ্চাতের ফোকাসিং গ্লাসে তাকাইলে দেখা যাইবে ঐ বাড়ি বা ইমারতের পুরোভূমিই (fore ground) প্লেটের অর্দ্ধেকের বেশি স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং ইমারতের শীর্ষদেশ ফোকাসিং গ্লাসের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় লেন্স উঁচু দিকে তুলিয়া সমস্ত ইমারতটি ফোকাসিং-এর ভিতরে আনিতে যদি সমস্ত ক্যামেরাটী উঁচু করিতে হয় তাহা হইলে ছবিতে ইমারতটি বিকৃত দেখাইবে। অনেকটা পিরামিডের মত হইয়া যাইবে। সুতরাং ক্যামেরাটি উঁচু না করিয়া যদি লেন্সটি প্লেট অথবা ফোকাসিং গ্লাসের কেন্দ্র হইতে উঁচুতে তোলা যায়, তাহা হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ ইহাতে সমগ্র ইমারতটি ফোকাসে আসে এবং অবাঞ্ছনীয় পুরোভূমি সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায়।

রাইজিং-ফ্রন্টের চিত্র

সম্মুখ ভাগ উঁচু করিবার প্রণালী ক্যামেরা-বিশেষে ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে

ছবি কখনো খাড়া ভাবে (vertical) কখনো আড়াআড়ি ভাবে (horizontal) তুলিতে হয়। শেষোক্ত প্রকার ছবির জন্য অধিকাংশ হ্যাণ্ডক্যামেরা আড়াআড়ি ভাবে ষ্টাণ্ডে বা ট্রিপডে বসাইতে হয়। বড় ক্যামেরার পক্ষে ইহা বড়ই অসুবিধাজনক। সেইজন্য বড় ক্যামেরা মাত্রেই পশ্চাতের সংযোগ-ভাগ খুলিয়া অতি সহজেই আড়াআড়ি ভাবে লাগাইয়া লওয়া যায়। অনেক ক্যামেরাতে আবার ঐ সংযোগ-ভাগ না খুলিয়া ঠেলিয়া দিলেই ঘুরিয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে পশ্চাৎ ভাগ সমচতুর্ভুজ হওয়া চাই। রিফ্লেক্স ক্যামেরায় সাধারণত এইরূপ বন্দোবস্ত থাকে। ইহাকে রিভলভিং ব্যাক (revolving back) বলা হয়। রিভল্ভ্ অর্থ ঘোরা, পশ্চাৎ ভাগ ঘুরাইয়া হোরিজন্টাল বা আড় করিয়া লওয়া যায় বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে।

রিভল্ভিং-ব্যাকের চিত্র

'সিনক্লেয়ার' ক্যামেরার পশ্চাৎ ভাগ ঠেলিয়া ঘুরাইয়া দেওয়া হইতেছে।

হ্যাণ্ড ক্যামেরায় তাড়াতাড়ি কাজ করিবার পক্ষে এরূপ বন্দোবস্ত খুব সুবিধাজনক। দামী ক্যামেরা না হইলে রিভল্ভিং ব্যাক পাওয়া যায় না।

ফ্ল্যাঞ্জ

ক্যামেরায় ফোকাসিং-এর বন্দোবস্ত সর্ব্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। ক্যামেরার পশ্চাৎভাগ হইতে লেন্সের যে দূরত্ব তাহা কমাইয়া এবং বাড়াইয়া ফোকাস করিতে হয়। তৎসঙ্গে একটি লেন্স বদলাইয়া অল্প সময়ে আর একটী লেন্স সেই স্থানে বসাইবার বন্দোবস্ত থাকাও কম প্রয়োজনীয় নহে। যে স্ক্রু-প্যাচের ভিতর লেন্স বসাইতে হয় তাহা রিং-এর মত বৃত্তাকার। ইহার নাম ফ্ল্যাঞ্জ। প্রত্যেক ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরার লেন্সের সঙ্গে একটি করিয়া ফ্ল্যাঞ্জ দেওয়া থাকে। ক্যামেরার সম্মুখ দিকে এই ফ্ল্যাঞ্জ স্ক্রু দ্বারা আঁটা থাকে। লেন্স ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া উহাতে লাগাইতে হয়, এবং খুলিতে হয়। ষ্ট্যাণ্ড-ক্যামেরা ভাঁজ করিয়া রাখিবার সময় লেন্স, ফ্ল্যাঞ্জ হইতে খুলিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু পৃথক লেন্স ব্যবহার করিতে হইলে একই ফ্ল্যাঞ্জে ফিট করিবে না। পৃথক লেন্স ব্যবহারের প্রয়োজন হইলে স্ক্রু-ড্রাইভারের সাহায্যে ফ্ল্যাঞ্জ খুলিয়া ফেলিয়া নূতন ফ্ল্যাঞ্জ আটকাইয়া লইয়া তবে সে লেন্স ব্যবহার করিতে

হইবে। ইহাতে অনেক সময় ব্যয় হয়। সাধারণ ব্যবসায়ী ফোটোচিত্রকর একটির বেশি লেন্স রাখেন না, সুতরাং এ সব বিষয়ে তাঁহাকে চিন্তা করিতেও হয় না। কিন্তু যিনি প্রথম শ্রেণীর কাজ করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত এবং যিনি নিজের বৈশিষ্ট্য ছবির মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে চান, তাঁহার পক্ষে কোন একটিমাত্র লেন্স কিংবা ক্যামেরার অধীন হইয়া পড়িয়া থাকা সম্ভব নহে। একাধিক লেন্স থাকিলে একই ক্যামেরায় বার বার ব্যবহার করিবার জন্য এক রকম ফ্ল্যাঞ্জ পাওয়া যায় যাহা স্থায়ীভাবে ক্যামেরার সঙ্গে আটকাইয়া লইলে যে-কোন লেন্স তাহা হইতে মুহূর্ত্তের মধ্যে খুলিয়া ফেলিয়া যে-কোন পৃথক লেন্স তাহাতে বসান যায়। ইহার নাম য়ুনিভার্সাল ফ্ল্যাঞ্জ। ইহা বাজারে পাওয়া যায়, দামও খুব বেশি নহে।

য়ুনিভার্সাল ফ্ল্যাঞ্জ
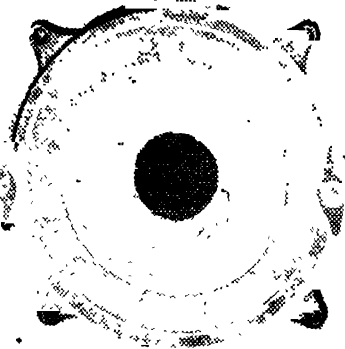
র‍্যাক-পিনিয়ান

ফোকাসিং করিবার সময় ক্যামেরার তলভূমির (base board) উপর দিয়া ক্যামেরার পুরোভাগ সম্মুখের দিকে এবং পশ্চাৎ ভাগ পশ্চাৎ দিকে টানিয়া অথবা উভয় দিক এক-সঙ্গে ব্যবহার করিয়া ফোকাস করিতে হয়। তলভূমি বা বেস্-বোর্ডের সঙ্গে যে রেল পাতা থাকে তাহা দাঁতের মত কাটা, তাহারই সঙ্গে দাঁত-কাটা চাকা-লাগানো বড় স্ক্রু থাকে। এই স্ক্রু ঘুরাইলে ক্যামেরার সম্মুখ অথবা পশ্চাৎভাগ সামনে পিছনে বাড়ানো কমানো যায়। এই র‍্যাক-পিনিয়ান বন্দো-বস্ত নানা প্রকারের আছে। ক্যামেরা হইতে একবার দেখিয়া লইলেই ইহার ব্যবহার শিখিতে পারা যায়। অল্প দামের হ্যাণ্ড-ক্যামেরা যাহার বিস্তৃতি ক্যামেরার বেস্-বোর্ডের মাপের বেশি নহে, তাহাকে সিংগ্‌ল-এক্সটেনশান ক্যামেরা কহে। সিংগ্‌ল-এক্সটেনশান ক্যামেরাতে র‍্যাক-পিনিয়ান কদাচিৎ থাকে। ডবল কিংবা তিনগুণ এক্সটেনশান-যুক্ত ক্যামেরাতে ইহা অপরিহার্য্য। ষ্টুডিও ক্যামেরা আকারে বড় এবং তাহার লেন্স অত্যন্ত ভারী বলিয়া এই ক্যামেরার শুধু পশ্চাৎ দিক হইতে ফোকাস্ করিতে হয়। পোর্টেট লেন্স অর্থাৎ যে লেন্স শুদ্ধ মাত্র উচ্চ শ্রেণীর প্রতিকৃতি তুলিবার জন্য ষ্টুডিওতে ব্যবহৃত হয় তাহাও সাধারণতঃ এরূপ টিউবের মধ্যে মাউণ্ট করা থাকে যাহার মধ্যে ঐরূপ র‍্যাক-পিনিয়ানের বন্দোবস্ত আছে। সুতরাং ক্যামেরায় মোটামুটি ফোকাস্ করিয়া লইয়া শেষে লেন্স মাউণ্টের ভিতরের দিকে অথবা বাহিরের দিকে সরাইয়া সরাইয়া সূক্ষ্ম ফোকাস্ করিতে হয়।

কতক হ্যাণ্ড-ক্যামেরায় কেবল মাত্র লেন্সের সঙ্গেই ফোকাসিংএর বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু অধিকাংশ হ্যাণ্ড-ক্যামেরায় কেবল মাত্র সম্মুখের দিক হইতে ফোকাস্ করিতে হয়। যে বন্দোবস্তই থাক, তাহা খুব সহজ এবং সরল হওয়া চাই, না হইলে কাজ করিতে প্রচুর অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, এবং এজন্য অনেক সময় কাজ করাই হয় না।

(ক্রমশঃ)

প্রত্যাবর্ত্তন

—শ্রীকিরণকুমার রায়

পাশের বাড়ীতে আজ আবার সুরু হইয়াছে। জানালা বন্ধ করা ছাড়া উপায় নাই। বন্ধ করিতে উঠিয়া দেখি, বাড়ীর অন্দরে নয়, গলির মধ্যেই মোহিত বাবু দাঁড়াইয়া চীৎকার সুরু করিয়াছেন। একটি রিক্‌শ-ওলা তাঁহার কথার কি প্রতিবাদ করিতেছে, সে-ই জানে। দু'একটি কথা কানে আসিল মাত্র। মোহিত বাবুর সন্দেহ হইয়াছে, যে-বাড়ীতে রিক্‌শ-ওলা তাঁহাকে নিয়া আসিয়াছে, সে-বাড়ীটা তাঁহার নয়। রিক্‌শ-ওলা বোধ করি মোহিত বাবুকে জানে। সে মৃদু হাসিতেছে। হঠাৎ মোহিত বাবু ছুটিয়া তাহাকে মারিতে রুখিলেন।

জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম।

সন্ধ্যাবেলায় যে-করুণতায় মনটা ভরিয়া আসিয়াছিল, সেটুকু বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইলাম।

বৎসর চার-পাঁচ আগে মোহিত বাবুরা যেদিন এই বাড়ীটায় আসেন, সে দিনটা মনে আছে। সবল ও সুশ্রী চেহারা, কলেজ হইতে বাহির হইয়াছেন সবে, চাকরি নূতন পাইয়াছেন। লক্ষ্মী প্রতিমার মতো স্ত্রী। আসিয়াই ও-বাড়ীর ঘরগুলিকে দুইজনে মিলিয়া একটা নূতন শ্রী দিয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়িতেছে। নূতন-কেনা আসবাব-পত্রে ঘর ক'খানি সাজানো হইল। শয়ন-ঘরে পালঙ্ক, একটা ড্রেসিং টেব্‌ল, একখানি রকিং চেয়ার, বেডসুইচ্‌টা পর্য্যন্ত। মোহিত বাবু বাজারে গিয়া জিনিষপত্র কিনিয়া আনিতেছেন আর তাঁহার স্ত্রী তদারক করিয়া সেগুলিতে নীড় সাজাইতেছেন। ঠাকুরাণীর কোলে শিশুপুত্র।

'ধনুয়া, হুয়া নেই তুমারা আভি?' 'আরে এই, টিপয়টা এখানে রাখ্‌' 'ওই তস্‌বিরঠো লে আও' সুমিষ্ট কণ্ঠোচ্চারিত ছিন্নবিচ্ছিন্ন কথা কয়টি আজও মনে পড়িতেছে।

আমার বাড়ী হইতে উহাদের বাড়ীর সমস্তখানি দেখা যায়। নীড় সাজানো হইল। দিব্য সংসার গুছাইয়া নিয়াছেন মোহিত বাবু। ইহার মধ্যে দুই চারিদিন ভদ্রলোকের সহিত আলাপ-পরিচয়ও হইয়াছে। অমায়িক, সুজন, শিক্ষিত। পি-এম্‌-জি আফিসে চাকরি করেন।

মোহিত বাবুর স্ত্রীর সহিত আমার ইঁহার জানাশোনা হইয়াছে। একটি মনের মত প্রতিবেশী পাইয়া বেশ খুশীই আছি। যদিও ইনি সন্দেহ করেন, প্রতিবেশী অপেক্ষা প্রতিবেশিনীর সান্নিধ্যতেই আমার পুলক বেশী। তা মিথ্যা বলিবনা, সন্দেহ অমূলক নয়।

খুব যে বেশী সুন্দরী মোহিত বাবুর স্ত্রী, তা নয়। রঙ তো শ্যামলই, জলপাইয়ের মতো। কিন্তু চোখ-মুখ যেন পাথর হইতে কুঁদিয়া গড়া হইয়াছে। আর আলুলায়িত কুন্তল যেন লক্ষ সর্পিনীর শান্ত-আলিঙ্গন। স্নান করিয়া সিন্দূরের টিপ পরিয়া, দু'গাছি বেণীতে গ্রন্থি দিয়া যখন রন্ধন-শালায় ঢোকেন, তখন—কিন্তু শুধু তখনই বা কেন? যখনই দেখি তখনই মনে হয় অপূর্ব্ব। স্ত্রী আসিয়া বলেন, 'কি গো? দূতীগিরি করবো নাকি?' বলিয়া পাশের বাড়ীর দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ লক্ষ্য করেন। বলি, 'করোনা, তবুতো বুঝি জীবনে একটা উপকারও করলে।'

'আর কোন উপকারই আমার দ্বারা হয়নি, না?' ঈষৎ অভিমানে পুরন্ত গণ্ডে টোল পড়ে। হাসিয়া একটি চিমটি কাটিয়া দিই।

'বারে' বলিয়া কুটিপাটি করিয়া গড়াইয়া পড়েন। তারপর বলেন, 'কিন্তু সত্যিই, আমিতো মেয়েমানুষ, তবু যেন দেখে আশ্তি মেটেনা। এমন রূপ কখনও দেখিনি।'

'কার? মোহিত বাবুর তো? তা তাঁকে একটা চিঠি—'

'চোপ্‌রও' বলিয়া তর্জ্জনী তুলেন।

* * *

একদিন আফিস হইতে ফিরিয়া জলযোগ করিতেছি। গার্জ্জেন কাছেই বসিয়া আছেন। কি-একটা কথায় মোহিত বাবুদের দাম্পত্য-প্রেমের বিবরণ উঠিয়া পড়িল। অভিভাবিকা বলিলেন,—'জানো, ওদের প্রেমে প'ড়ে বিয়ে হয়েছে।'

'নাকি?—ভাগ্যবান এই মোহিতবাবু।'

'ওঁর সঙ্গে আলাপে বুঝ্‌লাম সব।' তারপর ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিলেন, 'স্বভাব ভাল ছিলনা ভদ্রলোকের। একটু-

আধটু পানাভ্যাসও ছিল। শপথ ক'রে তা ছেড়ে দিয়েছেন। বিয়ের আগে নাকি এঁকে বলেছিলেন, 'একমাত্র তুমি ছাড়া আমাকে এ অধঃপতন হ'তে কেউ'—'

জল খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। মুখ ধুইয়া শিশুকন্যাকে কোলে নিয়া ঈজি-চেয়ারে বসিয়াছিলাম। পর্দার ফাঁক দিয়া নজরে পড়িল, মোহিত বাবু আফিস হইতে ফিরিয়াছেন, স্ত্রী জুতা খুলিয়া দিতেছেন। দুইজনে কি কথা হইতেছে। হাসিতে দুইজনের মুখচোখ উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে।

সত্যই স্বর্গ। মনে-মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। অন্ততঃ একটি লোকও পাপের পথ হইতে প্রেমের জন্য নিজেকে ফিরিয়া পাইয়াছে। এইখানে বলিয়া রাখি যে আমি পূরা চারিটি বছর একটি খ্রীশ্চান কলেজে চাকরি করিতেছি। সুতরাং কথায়-বার্ত্তায় একটু 'স্বর্গীয়' ছিটেফোঁটা দেখিলে, আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

ইহার পর দুই তিন বছর বেশ কাটিল। উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে আমার ইনি একবার আঁতুড়ে ঢুকিয়াছিলেন। মোহিত বাবুর উনিও। দুই পরিবারে এখন বেশ জানা-শোনা হইয়াছে। মোহিত বাবুর স্ত্রী প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসেন। অন্তরঙ্গতা হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভদ্র-মহিলা সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা না কমিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। আমার স্ত্রীতো 'রণুর মা' বলিতে অজ্ঞান (জ্ঞান অবশ্য তাঁহার কদাচিৎ দেখিয়াছি)—কিন্তু মেয়েরা যে বন্ধু বলিয়া এমন ক্ষেপিয়া উঠে তাহা আমার পূর্ব্বে জানা ছিলনা। একদিন আসিয়া বলেন, 'জান, জ্যোতি এমন সুন্দর এস্রাজ বাজায়—আমার রুন্নাকে (বড় মেয়ে) আমি ওর কাছে বাজনা শিখতে দোবো।'

অপর একদিন আসিয়া বলেন,—

'মোটা-মোটা ইংরিজী বইগুলি তোমার সব যে ও গো-গ্রাসে গিল্‌তে সুরু করেছে গো। তুমি কলেজে গেলেই আস্‌বে চলে, আর তোমার আল্‌মারি থেকে একখানা বই নিয়ে বস্‌বে এখানে। চল্‌ল সন্ধ্যাবেলা পর্য্যন্ত—'

একটু আশ্চর্য্য হইলাম। বলিলাম, 'সে কি? দেখিতো কি কি বই পড়েছেন উনি।'

'বলি, বাড়িতে নিয়ে যাও। নেবেনা, যদি তুমি টের পাও—এই দেখ—' বলিয়া তিনি আল্‌মারি খুলিয়া খান-কয়েক বই দেখাইলেন, হোম ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির সিরিজ। একটু হক্‌চকাইয়া গেলাম—একবার সন্দেহও হইল, চাল নয়তো?

সহধর্ম্মিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কতদূর পড়েছেন উনি?'

'আই-এ নাকি পড়তো। তারপর বিয়ে হয়। ছোট বেলার থেকেই পড়ার ঝোঁক। আর কিসের ঝোঁকই বা ওর কম। সেলাই করতে, আচার তৈরিতে—এত কি উৎসাহও আছে ওর। বয়স তো আমারই সমান। আমার নয় তিনটি—ওরও তো দুটি হয়েছে। কিন্তু কচিখুকীর মতো উদ্যম—'

বলিলাম,—'তা দেখ। সত্যিই বুঝি পরকীয়া—'

'আবার—' বলিয়া চোখ রাঙাইলেন।

* * *

তারপর একদিন।

মোহিতবাবুর স্ত্রী দিনকয়েকের জন্য বাপের বাড়ী গিয়া-ছিলেন। কয়দিন ধরিয়া ভদ্রলোকের দুর্দ্দশার অন্ত নাই—আফিস হইতে ফিরিয়া হাঁ করিয়া কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া চোখ ক্ষয় করিয়া ফেলিলেন।

সেদিন সকাল বেলার দিকে খুকুর মা আসিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া বলিলেন, 'ওগো, শুনছো—ওঠ তো একবার, দেখ একটা জিনিষ—জল্‌দি।' ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। স্ত্রী জানালা দিয়া পাশের বাড়ীর দিকে চাহিতে বলিয়া নিজে সরিয়া গেলেন। চাহিয়া দেখি একটি রিক্‌শা দাঁড়াইয়া। একটু পরে নার্স গোছের একটি স্ত্রীলোক আসিয়া রিক্‌শাতে চাপিল। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কি, মোহিতবাবুর অসুখ করেছে নাকি?'

'হুঁ্যা অসুখই' বলিয়া একটু ম্লান মুখে হাসিলেন—'কাল রাত্তির এগারোটা বারোটায় ঐ মাগীকে নিয়ে বাড়ী ফিরে-ছিলেন।'

'কিন্তু মাগীটা কি—'

মুখের কথা মুখেই রহিল। ব্যাপারটা বুঝিয়া নিলাম। পত্নী বলিলেন,—'জ্যোতির কপাল বুঝি পুড়লো।'

সত্যই জ্যোতির কপাল পুড়িল। আর সে এমন দ্রুত বেগে যে আমি অবাক্ হইয়া গেলাম।—

কয়েক দিন পরে জ্যোতি বাপের বাড়ী হইতে ফিরিলেন। আমার স্ত্রীকে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিছু বলিতে। তাঁহাকে বলিতে হইল না,—দু'একদিন পরেই গভীর রাত্রে মোহিত বাবুর মত্ত কণ্ঠে গলি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তারপর হইতে সপ্তাহে দুই চারিদিন করিয়া।—

মাঝে মাঝে একটু কম পড়িত—আবার সুরু হইত। দুই চারি সপ্তাহ চক্ষুলজ্জা ছিল। সেটুকু কাটিয়া গেলে, এক রবিবারে দিন-দুপুরেই মোহিতবাবু মাতাল হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। এবং সেই দিন হইতে আরম্ভ হইল, স্ত্রীকে প্রহার। পত্নী আসিয়া সজল চক্ষে বলেন,—

'ওগো, একটা কিছু ব্যবস্থা কর। পোড়ারমুখীকে যে খুন ক'রে ফেল্‌লে।'

কি ব্যবস্থা করিব ?—

তারপর হইতে আজ বৎসরখানেক চলিয়াছে। জ্যোতি ঠাকুরাণীকে দেখিলে আর চেনা যাইবে না। শ্রী সুন্দর বাড়ীখানির সর্ব্বত্র যে লক্ষ্মীর পায়ের আলিম্পন ছিল, তা আর নাই। কুৎসিত দারিদ্র্যের চিহ্ন এখানে-ওখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এ ইতিহাস কাহার অজানা আছে ? এই দুর্ভাগ্য দেশের প্রত্যেক অলিতে-গলিতে খুঁজিলে ইহার নিদর্শন পাওয়া যাইবে। দুইটি প্রাণী যত্ন করিয়া একটি নীড় রচনা করে, একজন বাহির হইতে তৃণের কুটা সংগ্রহ করিয়া আনে, আর একজন চঞ্চুতে তাই তুলিয়া ধরিয়া নীড়খানিকে মনোহর করিয়া গড়িয়া তুলে! তারপর ভাগ্যাকাশের ঈশান কোণে মেঘ উঠে, ঝটিকা আসে, নীড় ভাঙিয়া-চুরিয়া ঝরিয়া পড়ে।

একদিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম—

কিন্তু এমন কতদিনের কথা বলিব ? হাণ্টার দিয়া জ্যোতির মতো মেয়েকে যে পাষণ্ড মারিয়া নিঃসাড় করিয়া দিল, তাহাকে কে ক্ষমা করিবে ? নিঃশব্দে ও সমস্ত হজম করিয়া গেল। এবং তাহার কিছুক্ষণ পরেই দেখিলাম, বমন-রত স্বামীর মুখের কাছে 'স্পিটুন' টি এক হাতে ধরিয়া অন্য হাতে পাখা চালাইতেছে—

আশ্চর্য্য !

এই মেয়ে জাতটার কথা ভাবিলে কে না আশ্চর্য্য হইবে ?

* * * *

আজ সন্ধ্যায় খুকুর জন্ম-দিনে ইনি জ্যোতিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। পারত-পক্ষে সে আমার সম্মুখে আর এই এক বৎসরের মধ্যে আসে নাই। আজ আসিয়াছিল আমার খুকুকে কোলে করিয়া। আমি হন্ত-দন্ত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আমার স্ত্রীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলাম—এই মাত্র যে তিনি কাঁদিতেছিলেন, হাজার চেষ্টা করিয়াও চোখ হইতে তাহার নিদর্শন মুছিতে পারেন নাই। কি ব্যাপার ?

জ্যোতি ঠাকুরাণীর দিকে চাহিয়া দেখি, তিনি নির্ব্বিকার। আমাকে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে দেখিয়া হাসিয়া মেজের উপরই বসিয়া বলিলেন, 'বসুন, আপনার সঙ্গে আমার দুটো সাংসারিক কথা আছে।' বলিয়া আবার হাসিলেন।

চেয়ারে বসিলে বলিলেন,—'কয়দিন হলো ওঁর চাকরিটা গেছে।' ইদানীং বড়ো কামাই করছিলেন, দু'তিনবার ওয়ার্নিংএও কোন ফল হয় নি ব'লে, ডিস্‌মিস্যাল নোটীশ পেয়েছেন—'

অদূরে আমার স্ত্রী আবার চোখে কাপড় দিলেন।

একটু থামিয়া জ্যোতি ঠাকুরাণী আবার বলিলেন—

'নিজের জন্য ভাবিনে। কিন্তু ছেলে-মেয়ের মুখে দুটো আহার জোগাতেই হবে। তাই—'

এইবারে ঠাকুরাণীর স্বর ভঙ্গ হইল। আমি ঠায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম। গলাটা একটু সাফ করিয়া ভদ্রমহিলা কহিলেন—'আপনাকে আমায় একটা কাজ খুঁজে দিতে হবে। ইস্কুলের মাষ্টারি কি কিছু একটা—'

বুঝিয়য়াছিলাম। কোন সান্ত্বনার কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না—শুধু বলিলাম,

'যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করবো—'

সে-দিন রাত্রে আবার মোহিতবাবু মাতাল হইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

* * *

একটা চাকরি মিলিয়াছে। পাড়ারই মেয়ে-স্কুলের মাষ্টারি। যা দিবে তাহাতে কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে। এ ছাড়া বাসাভাড়া আছে। স্কুলের কাছেই একটা বাড়ীতে দু'খানি ঘর পাওয়া গেল। আজ তাহারা সেখানে উঠিয়া যাইবে। আসবাবপত্র সব দেনার দায়ে কিছু-কিছু বিক্রয়

হইয়া গিয়াছিল। কয়েকখানি এখন বিক্রয় করিতে হইল, নহিলে বাড়ী বদ্‌লাইবার খরচ জোটে না। আমার স্ত্রীর সহস্র অনুরোধ সত্ত্বেও দশটি টাকার সাহায্য নিতেও ভদ্রকন্যা কিছুতে স্বীকার করিলেন না। বলিলেন,—'দিন তো আছে। এখন থাক্। হাতের পাঁচ খোয়াতে নেই।'

গত কয়দিন মোহিতবাবু বাড়ী ফেরেননাই। ফিরিলে তাঁহাকে নূতন ঠিকানা যেন জানানো হয়, একথা জ্যোতি গাড়ীতে উঠিবার সময় আমার স্ত্রীকে বারবার বলিয়া গেলেন।

তার পর দেখিলাম, অবলা সরলার কাণ্ডখানা। এই কঠিন ভাগ্যবিপর্য্যয়ে এতটুকু না দমিয়া এমনই জোরের সঙ্গে ইনি দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে আমার নভেল-পড়া মনও বিমূঢ় হইয়া গেল। সারাদিন ইস্কুলের কাজ করিয়া রাত্রি জাগিয়া সেলায়ের কাজ আরম্ভ করিলেন। ছোট ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় তৈয়ারি করিয়া সেগুলি পাড়ার ভিতর বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ইহাতে বাসা-ভাড়াটা উঠিত। নিজের ছেলেকে দিয়াই জামা-কাপড় বাড়ীতে বাড়ীতে দিয়া পাঠাইতেন।

একদিন কলেজ হইতে ফিরিবার পথে দেখি, রণেন জামা-কাপড়ের ঝুড়ি রাস্তায় ফেলিয়া কাঁদিতে বসিয়া গিয়াছে। পাড়ার দু'একটি ছেলে তাহার পিছনে লাগিয়াছিল। সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে আনিলাম। গা-হাত-পা ধোয়াইয়া জলখাবার খাওয়াইয়া, তাহাকে একটু শান্ত করিয়া আমার স্ত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'তোমাকে কি বলেছিল ওরা?'

'—বাবাকে মাতাল বদ্‌মায়েস ব'লেছিল ব'লে—আচ্ছা মাসীমা, বাবা কি আর ফিরবে না?—'

'ফিরবে বই কি বাবা—।' বলিয়া আদর করিয়া খুকুর মা তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

রণুর এখন বয়স সাত। সে অনেকখানি ব্যাপারটা বোঝে। মায়ের জন্য তাহার সমবেদনার শেষ নাই। তাহার বাপ যে আসিয়া এখনও মাঝেমাঝে মাকে মারিয়া ধরিয়া টাকাকড়ি কাড়িয়া নিয়া যায়, একথা তাহার কাছেই শুনিলাম। এই কচি ছেলের ভাগ্যেও কি এত দুঃখ ছিল, সেদিন এই কথা ভাবিয়াছিলাম।

* * *

ইহার দিনকয়েক পরে সন্ধ্যার দিকে বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছি, দেখি একটা রাস্তার মোড়ে একটা ভিড়। উৎসুক হইয়া ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখি, দুটি লোককে ঘেরিয়া কি একটা গোলমাল বাধিয়াছে—আরও একটু আগাইয়া গেলাম।—ইহাদের একজন মোহিত বাবু। অত্যাচারে অত্যাচারে শরীর ভাঙ্গিয়া কুঁজা হইয়া গিয়াছে, মাথার চুলগুলি উড়িতেছে, কতদিন সেখানে তেল-জল পড়ে নাই। হাত ধরিয়া তাঁহাকে ভিড়ের বাহিরে আনিয়া একটা গাড়ী ডাকিয়া উঠিয়া বসিলাম। ভদ্রলোকের তখন আপত্তি করিবারও শক্তি ছিল না।

সেদিন জ্যোতি ঠাকুরাণীর জিম্মা করিয়া তাঁহাকে রাখিয়া আসিলাম। পরদিন সকালে খোঁজ নিতে গিয়া দেখি—প্রবল জ্বরে ভদ্রলোক ধুঁকিতেছেন। ডাক্তার ডাকিয়া আনিলাম, ডাক্তার বুক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, নিউমোনিয়া।

তারপর আবার দেখিলাম,—অসহ্য অত্যাচারের প্রতি-হিংসার সাধ জ্যোতি কেমন করিয়া মিটাইল।

রাতের পর রাত ঐ রুগ্ন স্বামীর শিয়রে বসিয়া কাটাইয়া দিল, একটু উঠিল না। ইস্কুল হইতে ছুটি নিয়াছিল। হাতের শেষ রুলিজোড়া পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িল।

উনত্রিশ দিনের দিন মোহিত বাবু চোখ মেলিয়া চাহিলেন, আমি ঘরে ছিলাম—জ্যোতি শিয়রে বসিয়া। ভদ্রলোক একবার আমার দিকে, একবার তাহার দিকে চাহিলেন। আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

মোহিত বাবু সারিয়া উঠিলেন।—এবং ইহারও বছর তিনেক পরে জ্যোতিরা একদিন আবার আমাদের পাশের বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। ইতিমধ্যে মোহিত বাবু একটি চাকরি জোগাড় করিয়াছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম, খুকুর মা আসিয়া ডাকিলেন,

'ওগো শোন—এদিকটায়—'

তাঁহার সঙ্গে গেলাম। শয়ন-ঘরের পর্দা একটু ফাঁক করিয়া তিনি ওবাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিতে বলিলেন। উঁকি মারিয়া দেখি, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, খাটে শুইয়া মোহিতবাবু, মেঝের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহারই মাথার বালিশে চিবুক রাখিয়া জ্যোতি কি যেন তাঁহাকে বলিতেছে, মোহিত বাবু মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। কি একটা কথায় জ্যোতি হাসিয়া উঠিতেই, মোহিতবাবু তাহার হাত ধরিতে গেলেন—

পর্দা হইতে মুখ সরাইয়া বলিলাম,—'প্যারাডাইস্ রিগেন্‌ড—'

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গৃহিণী বলিলেন,—'সে আবার কি?'

হাসিয়া বলিলাম -'তোমার মতো মুখ্যুকে নিয়ে সারাটা জীবন জ্বলে পুড়ে ম'লাম, একটা কথাও বোঝনা। প্যারাডাইস্ রিগেন্‌ড হচ্ছে - তা আর তোমাকে কি বুঝিয়ে হবে। কাল তোমার বন্ধুকে বল্‌বো, তিনি বুঝবেন।'

'আচ্ছা, আচ্ছা—তা ওকে নিয়েই—' বলিয়া রাগিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ভাল জ্বালা দেখি।

কার্পাস শিল্প-সংরক্ষণ

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ভারতবর্ষের কার্পাস শিল্প কত দিনের, তাহা স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই; কারণ, তাহা প্রাগৈতিহাসিক যুগের। ইহার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা বর্ত্তমানে আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। এই শিল্প এ দেশে এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, বিলাতে আইন করিয়া সে দেশে এ দেশের কার্পাস পণ্যের আমদানী বন্ধ করিয়া তবে সে দেশে এই শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল। নহিলে—কলকজার সাহায্যেও বিলাত এ দেশের হস্তচালিত বয়ন শিল্প বিনষ্ট করিতে পারিত না। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে বিলাতে এই আইন প্রবর্ত্তিত হয়। ইংরাজ ঐতিহাসিক স্বীকার করিয়াছেন, এইরূপ ব্যবস্থা না হইলে বিলাতে বয়ন শিল্প উন্নতি করিতে পারিত না। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হইত, তবে বিলাত হইতে আমদানী বস্ত্রের উপর শুল্ক সংস্থাপিত করিয়া আপনার শিল্প রক্ষা করিতে পারিত বটে, কিন্তু তাহা হয় নাই। কেন না, বিদেশীরা এ দেশে যেরূপ ইচ্ছা ব্যবস্থা করিতে পারে এবং,—

"The foreign manufacturer employed the arm of political injustice to keep down and ultimately strangle a competitor with whom she could not have contended on equal terms."

এ দেশ হইতে বিদেশে যে বস্ত্র রপ্তানী হইত, তাহাতে বাঙ্গালার অংশ অল্প ছিল না। ঢাকার প্রসিদ্ধ মসলিনের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই—১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মালদহের শেখ ভিক নামক এক ব্যক্তি পারস্যোপসাগরের পথে ৩ জাহাজ মালদাহী কাপড় রুসিয়ায় রপ্তানী করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার ফলে যখন এ দেশের বস্ত্র-শিল্প বিনষ্টপ্রায় হয় এবং বিদেশ হইতে এ দেশে বস্ত্র আমদানী হইতে থাকে, তখন এ দেশে (বোম্বাই প্রদেশে) কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। রাজস্বের জন্য ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমদানী বস্ত্রের উপর যে সামান্য শুল্ক আদায় করা হইত, তাহাও লুপ্ত করা হয়। ঐ সময় বৃটিশ পার্লামেণ্ট নির্দ্ধারণ করেন—ভারতে যে বিলাতী বস্ত্র যাইবে, তাহার উপর কোনরূপ শুল্ক আদায় করা হইবে না। কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই ভারত সরকারের ভাণ্ডারের শূন্যতা পুনরায় আমদানী বস্ত্রের উপর শুল্ক সংস্থাপন অনিবার্য্য করিয়া তুলে। কিন্তু তাহাতেও বিলাতের বস্ত্রোৎপাদনকারীরা আপত্তি করেন। তখন বিলাতের মন্ত্রিমণ্ডল ম্যাঞ্চেষ্টারের ভোটদাতৃগণকে তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আমদানী শুল্ক বর্জ্জন প্রস্তাবই বহাল রাখেন। শেষে স্থির হয়, বিলাত হইতে আমদানী বস্ত্রের উপর যেমন শুল্ক আদায় করা হইবে, ভারতবর্ষে কাপড়ের কলে প্রস্তুত কাপড়ের উপরও তেমনই শতকরা ৩।০ টাকা হিসাবে দেশজ শুল্ক আদায় করা হইবে। এই ব্যবস্থা যে অসঙ্গত ও ভারতে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার প্রতিকূল তাহা বলাই বাহুল্য। লর্ড ল্যান্সডাউন বড়লাটরূপে এই ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"There has never been a moment when it was more necessary to counteract the impression that our financial policy in India is dictated by selfish considerations."

২০ বৎসর কাল ভারতের বয়ন শিল্পকে এই অনাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাহার পর যখন জার্ম্মাণ যুদ্ধ হয়, তখন (১৯১৭ খৃষ্টাব্দে) ভারতবর্ষ হইতে বিলাতের সাহায্যার্থ ১৫০ কোটি টাকা প্রদানের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সেই টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য বিদেশী কাপড়ের উপর আমদানী শুল্ক শত করা ৩।০ টাকা হইতে ৭।০ টাকা করা হয়।

ম্যাঞ্চেষ্টার ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ তারিখে ভারত-সচিবের নিকট প্রতিনিধিদিগকে পাঠাইয়া ইহার প্রতিবাদ করে। কিন্তু ভারত-সচিব চেম্বার্লেন সে প্রতিবাদে বিচলিত হয়েন নাই।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে যখন আমদানী শুল্ক শতকরা ১১ টাকা করা হয়, তখনও ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্রোৎপাদনকারীরা ঐরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত-সচিব মণ্টেগু বলেন, ভারতের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিলে আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি অনিবার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, সে বার ভারত সরকারের বাজেটে আয় অপেক্ষা ব্যয় ৩৪ কোটি টাকা অধিক ছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ মিষ্টার মণ্টেগু এই কথা বলেন। ইহার পরবৎসরও (২২শে মার্চ্চ)

ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রতিনিধিরা ভারত-সচিবের সহকারী লর্ড উইণ্টার্টনের নিকট প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন।

কিন্তু ভারতে যে আর্থিক কমিশন (ফিশক্যাল কমিশন) গঠিত হয়, তাহার সদস্যরা এদেশে উৎপন্ন কার্পাস পণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত শুল্ক লোপ করিতে বলেন। সেই সময় এ দেশের কাপড়ের কলের পক্ষ হইতে জাপানের প্রবল প্রতিযোগিতার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়। জাপান ভারতবর্ষ হইতে তুলা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইয়া কাপড়ের উপর শত করা ১১ টাকা হিসাবে আমদানী শুল্ক দিয়াও যে এ দেশের বাজারে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারে, তাহার কারণ :—

১। জাপানে কারখানায় অল্প পারিশ্রমিকে স্ত্রীলোকদিগকে কায করান হয় ;

২। তথায় কলে অধিক সময় কায চলে ;

৩। সে দেশের শিল্পে সরকারী সাহায্য ;

৪। তথায় ভাড়ার হারের অল্পতা ;

৫। জাপানী কলে ট্যাক্সের পরিমাণ অল্প

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এ দেশে উৎপন্ন কার্পাস পণ্যের উপর শুল্ক লোপের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর হইতে ঐ শুল্ক অস্থায়ীভাবে বর্জ্জিত হইয়া ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের বাজেটে পরিত্যক্ত হয়।

কিন্তু ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের কার্পাস পণ্যোৎপাদক কলের অবস্থা শোচনীয় হইয়া আসিয়াছিল। এই শিল্পের বিষয় বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে ভারত সরকার টারিফ বোর্ডকে ভার প্রদান করেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে টারিফ বোর্ড মত প্রকাশ করেন—

"আমাদিগের মত এই যে, বর্ত্তমানে আমদানী সূতার উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে ও আমদানী কাপড়ের উপর শতকরা ১১৲ টাকা হারে যে শুল্ক আছে, যতদিন জাপানে শ্রমিকদিগের সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ভারতের তুলনায় নিকৃষ্ট থাকিবে, ততদিন তদ্ভিন্ন ভারতীয় শিল্পে কিছু সাহায্য প্রদান করা প্রয়োজন।"

এই নির্দ্ধারণ অনুসারে ভারতীয় শিল্পে সাহায্য প্রদত্ত হয়। কিন্তু টারিফ বোর্ড এ দেশে (বিশেষ বোম্বাইয়ে) কাপড়ের কলের পরিচালন সম্বন্ধে কতকগুলি ত্রুটির উল্লেখ করেন এবং ইহাও বলেন যে,

১। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির মূলধন আবশ্যকাতিরিক্ত করা হইয়াছে এবং

২। যখন লাভের পরিমাণ অধিক হইয়া যায় তখন সঞ্চয়ের তুলনায় অত্যধিক পরিমাণে লাভের অংশ বণ্টন করা হইয়াছে।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের কার্পাস-শিল্প সংরক্ষণ আইনের দ্বারা ভারতীয় শিল্পকে বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ৩ বৎসরের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়। ইহাতে বৃটিশ পণ্যের উপর অন্যান্য দেশের আমদানী পণ্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প শুল্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ এই আইনের আয়ুঃশেষ হইবে। তাহার পূর্ব্বে যে অতিরিক্ত শিল্পের কল ও ভারতে শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইবে, ইহাও বলা হইয়াছিল সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে নূতন অনুসন্ধান হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য :—

১। ভারতীয় কার্পাস শিল্পে রক্ষা শুল্কের সাহায্য প্রদান সমর্থনযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে কি না, তাহা দেখা।

২। যদি তাহা প্রতিপন্ন হয়, তবে কিরূপে সাহায্য প্রদান করা যায় স্থির করা।

৩। সাহায্যের প্রকার ভেদ।

কার্পাস শিল্পে সাহায্য প্রদানের জন্য আইন বিধিবদ্ধ হইবার পরে ৩টি বিষয়ে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেগুলি বিবেচ্য :-

১। দুইবারে আমদানী বস্ত্রের উপর শুল্কের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, সুতরাং আইন প্রণয়নকালে শিল্পের সাহায্যার্থ শুল্ক যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, শুল্কের পরিমাণ এখন তদপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

২। কৃত্রিম রেশমী কাপড়ের আমদানী বাড়িয়াছে।

৩। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড বাণিজ্য-ব্যাপারে—শুল্ক সম্বন্ধে কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিবে কি না, অটাওয়া বৈঠকে তাহার আলোচনা হইবে।

যাহাতে এই শিল্পে আরও কিছুদিন সাহায্য প্রদত্ত হয়, সে জন্য বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালাদিগের সমিতি ইতি-

মধ্যেই টারিফ বোর্ডের নিকট এক বিস্তৃত বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছেন। বলা বহুল্য তাঁহারা এই সাহায্য চাহিতেছেন।

অর্থনীতির প্রথম কথা – যে শিল্প দেশে সর্ব্ববিধ সুবিধা থাকায় সহজেই অর্থাৎ একবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই, বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে সেই শিল্পেই তাহার আরম্ভে সংরক্ষণনীতি প্রয়োগ করা সঙ্গত এবং যদি দেশে তাহার উন্নতিসাধনজন্য যথাসম্ভব চেষ্টা হয় তবেই সে নীতি প্রচলিত রাখা কর্ত্তব্য—নহিলে নহে।

ভারতবর্ষে কার্পাসপণ্যোৎপাদনের যে বিশেষ সুবিধা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, বিলাতকে মার্কিণ ও মিশর হইতে তুলা আমদানী করিয়া তাহার বয়ন শিল্পের উপকরণ যোগাইতে হয়; জাপান ভারতবর্ষ হইতে তুলা ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। ভারতবর্ষে তুলা উৎপন্ন হয়। বিলাতকে ও জাপানকে যে স্থলে কাপড় বিক্রয় জন্য ভারতে পাঠাইতে হয়, সে স্থলে ভারতের পণ্য ভারতের বাজারেই বিক্রীত হইয়া যায়। ইহার মধ্যেই এ দেশে এই শিল্প যে সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহাতেই ভারতে ইহার প্রতিষ্ঠা-সুবিধা বুঝিতে পারা যায়। এ বিষয়ে বাঙ্গালার কাপড়ের কলগুলির সাফল্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হয়। বাঙ্গালার কলগুলিকে কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। যথা—

১। বাঙ্গালায় তুলার চাষ অতি অল্পই হয় বলিয়া বাঙ্গালাকে অন্যান্য প্রদেশ হইতে তুলা আমদানী করিতে হয়। পঞ্জাব হইতে আমদানী তুলার রেলভাড়া অত্যন্ত অধিক।

২। আফ্রিকা হইতে যে তুলা আমদানী করা হয়, তাহাতেও "কাণ্ডী" প্রতি কলিকাতা বন্দরে ভাড়া বোম্বাই অপেক্ষা ১৫টাকা অধিক। কারণ, মোম্বাসা হইতে কোন জাহাজ সরাসরি কলিকাতায় আইসে না।

৩। কলিকাতা বন্দরে মার্কিণের আমদানী তুলা শোধন করিয়া লইবার ব্যবস্থা না থাকায় বোম্বাই বন্দরে তাহা শোধন করিয়া কলিকাতায় আনিতে হয়। ইহাতেও "কাণ্ডী" প্রতি ১৫ টাকা অধিক ভাড়া লাগে।

৪। তুলায় ও বস্ত্রে ভাড়ার বৈষম্যহেতু বোম্বাই হইতে যে তুলা কলিকাতায় আমদানী হয়, তাহার ভাড়া টন প্রতি ১৪ টাকা আর ঐ পরিমাণ কাপড়ের ভাড়া ৭ টাকা ৮ আনা মাত্র। ইহাতে বোম্বাই হইতে তুলা না আনিয়া কাপড় আনিলে দরে সুবিধা হয়। মিশর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ষ্টীমার ভাড়া অপেক্ষা বোম্বাই হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ষ্টীমার ভাড়া শত করা প্রায় ৫০ টাকা অধিক।

এই সকল অসাধারণ অসুবিধা ভোগ করিয়াও যে বাঙ্গালার কলগুলি ভালই চলিতেছে, তাহাতে বলা যাইতে পারে, এ দেশে কাপড়ের কল চালাইবার বিশেষ সুবিধা বিদ্যমান।

ইহার উপর পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচালকদিগের দ্বারা বহু অর্থ নষ্ট হইবার পরও বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলের বর্ত্তমান পরিচালকরা যে ভাবে কল চালাইয়া লাভ দেখাইতে পারিতেছেন, তাহা যে কেবল তাঁহাদিগের কর্ম্মশক্তির পরিচায়ক তাহাই নহে, পরন্তু তাহাতে এ দেশে বয়ন শিল্পের সুবিধাও প্রতিপন্ন হয়।

বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা তাঁহাদিগের বিস্তৃত বিবৃতিতে এ বিষয়ের অধিক আলোচনা করা বাহুল্য বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, ভারতের শিল্পকে এখনও প্রবল প্রতিযোগিতা ভোগ করিতে হইতেছে। জাপানই বর্ত্তমানে ভারতের প্রবল প্রতিযোগী। ভারত সরকার ভারতীয় শিল্পকে যে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তাহার ফলে ইতিমধ্যেই জাপান হইতে কয় প্রকার কাপড়ের আমদানী কমিয়াছে বা বন্ধ হইয়াছে। কোরা কাপড়ের হিসাবে দেখা যায়—যে স্থলে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে ৪৪ কোটি ১০ লক্ষ গজ ও জাপান হইতে ৪ কোটি ৯০ লক্ষ গজ কাপড় ভারতে আমদানী হইয়াছিল, সে স্থলে গত বৎসর বিলাত হইতে ২ কোটি ৮০ লক্ষ গজ মাত্র কাপড় আমদানী হইলেও জাপানের আমদানী কাপড়ের পরিমাণ গত ৩ বৎসরে ১ কোটি গজ বাড়িয়া ৫ কোটি ৯০ লক্ষ গজে দাঁড়াইয়াছে। জাপানী কাপড় তত ভাল না হইলেও তাহার আমদানী যেরূপ দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে শঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। আগামী কয় মাসে জাপানী কাপড়ের আমদানী আরও বাড়িবার সম্ভাবনা।

জাপানের এই প্রতিযোগিতা অসম কি না, তাহাই বিবেচ্য। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালাদিগের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, ইহা অসম; তাহার কারণ, জাপানী শিল্প বহু পরিমাণে সরকারী সাহায্য লাভ করে। তথায়—

১। বয়ন শিল্পে ব্যয়ের জন্য আবশ্যক অর্থ পাইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়।

২। বিদেশে মাল রপ্তানী করিলে যে বিপদের সম্ভাবনা থাকে তাহার জন্য অল্প হারে বীমার ব্যবস্থা আছে।

৩। বিক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।

৪। বিদেশে সে দেশের রাজদূতরা শিল্পের সাহায্য করেন।

৫। শ্রমিকের পারিশ্রমিকের হারও অল্প।

জাপানের প্রত্যেক বয়নকারী যে পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন করিতে পারে ভারতে প্রত্যেক বয়নকারী তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উৎপন্ন করে। ইহার জন্য বোম্বাইয়ের কলওয়ালা-দিগকেই দায়ী করা যায় না। ভিন্ন প্রকার সামাজিক অবস্থা প্রভৃতিই ইহার প্রধান কারণ।

বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা বলেন, তাঁহারা যে সাহায্য পাইয়াছেন, দেশবাসীকে তাহার উপযুক্তরূপ উপকার দিয়াছেন। কলগুলিতে বহুলোক কায পাইতেছে এবং ভারতে উৎপন্ন তুলা প্রভূত পরিমাণে বিক্রয় হইয়াছে। উৎপন্ন পণ্যেও অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে এবং টারিফ বোর্ড যে সকল ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকলের সংশোধনও অল্প হয় নাই। উৎপাদনব্যয় হ্রাস ও বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতি-সাধন হইয়াছে।

তথাপি যদি শিল্পের বিপদের অবসান না হইয়া থাকে, তবে সে—অসম প্রতিযোগিতা, টাকা পাইবার অসুবিধা ও ট্যাক্সের আধিক্য প্রভৃতি কারণে।

টারিফ বোর্ড অবশ্যই এ সকল বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালাদিগের যে নানা ত্রুটি আছে, তাহা আমরা জানি। কিন্তু অশনের পরই বসনের প্রয়োজন মানুষের পক্ষে প্রবল। সে বিষয়ে স্বাবলম্বী হইবার বাসনা যে কোন দেশের ও জাতির পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষ ভারতবর্ষে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত করিবার কত সুবিধা আছে, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এই সকল বিবেচনা করিলে স্বীকার করিতেই হইবে, যদি আরও কিছুদিন সাহায্য পাইলে এ দেশের বয়ন শিল্প বিদেশী প্রতিযোগিতা প্রহত করিতে পারে, তবে সরকারের পক্ষে সে সাহায্য প্রদান করা সঙ্গত।

এই প্রসঙ্গে আমরা দুইটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি—

১। অন্যান্য প্রদেশে যাহাই হউক, বাঙ্গালায় কৃষিবিভাগ তুলার চাষের উন্নতি সাধনের কোন চেষ্টাই করিতেছেন না। কিন্তু বাঙ্গালায় তুলার চাষ হইতে পারে, বাঙ্গালার জমী তাহার উপযোগী। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ঘরে ঘরে চরকা ও গ্রামে গ্রামে তাঁত ছিল। ডাক্তার বুকাননের বিবরণ পাঠ করিলে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন বাঙ্গালায় ঢাকাই মসলিনের মত কাপড়ের তুলাও উৎপন্ন করা হইত। সরকারী কৃষি বিভাগের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

২। বাঙ্গালী বাঙ্গালার কলের কাপড় পাইলে যেন অন্য প্রদেশের কলের কাপড় ব্যবহার না করেন। যে স্বদেশী আন্দোলন বাঙ্গালার সেই আন্দোলনের সময় নেতৃগণের চেষ্টায় বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাকে বাঙ্গালী বাঙ্গালার সম্পদ বিবেচনা করিয়া আসিয়াছে। মোহিনী মিল আকারে ক্ষুদ্র ছিল—কিন্তু ইহাও বাঙ্গালীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত এবং বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত। তাহার পর বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর চেষ্টায় কয়টি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে সকলের মধ্যে ঢাকার ঢাকেশ্বরী প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালার এই সকল কলে যে সব বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, আমরা সে সকলের উল্লেখ করিয়াছি। সেই সব অসুবিধা থাকিলেও বাঙ্গালার কলগুলি বোম্বাইয়ের কলের মত আন্দোলন না করিয়া ধীরভাবে কায করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালীর আনন্দের বিষয়। বাঙ্গালা যখন বস্ত্র বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারে, তখন বাঙ্গালী কেন বাঙ্গালার কাপড় পাইলে বোম্বাইয়ের কাপড় ব্যবহার করিবে? প্রত্যেক প্রদেশেরই স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

আমাদের বাণিজ্য-সম্পদ

দ্বিতীয় পর্য্যায়

শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের প্রধান উপাদান ছিল ভারতীয় রেশম ও সূতার সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি ও নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার। ক্রমে ক্রমে নৌযানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের দ্রব্যাদি এবং কৃষিজাত কাঁচা মালের রপ্তানিও এদেশ হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যে শিল্পজাত দ্রব্যেরই আধিক্য লক্ষিত হইত।

ইংরাজের বাণিজ্যনীতি ও ভারতীয় শিল্পব্যবসায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংলণ্ডের শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্ত্তন বা "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রেভল্যুশন" আরম্ভ হয় এবং তখন হইতে কি উপায়ে স্বদেশী শিল্পের প্রসার ও নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় সে বিষয়ে ইংরাজেরা যত্নবান্ হন। কিরূপে একদিকে শিল্পের উন্নতি ও অপর দিকে সংরক্ষণ শুল্কের ব্যবস্থা দ্বারা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একশত বৎসর ধরিয়া বহু সাধনার ফলে ইংলণ্ড শিল্পজগতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা পর্য্যালোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইংরাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংঘর্ষে ভারতীয় বহু শিল্প বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া ব্রিটীশজাতির এই একশত বৎসরের ইতিহাসে যে অসাধারণ ঐক্য, স্বদেশ-প্রেম ও কর্ম্ম-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বিমুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না।

মধ্যযুগ অর্থাৎ পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরাজ ব্যবসায়ী ও ধনিকদের বিশ্বাস ছিল যে জাতির আর্থিক উৎকর্ষের মূল প্রধানতঃ তাহার বহির্ব্বাণিজ্য। তখন ছিল "মার্কেণ্টাইল" মতাবলম্বীদের যুগ। তাহার ফলে শিল্পের উন্নতি অপেক্ষা বাণিজ্যের প্রসারের প্রতিই সকলের অধিক লক্ষ্য পড়িয়াছিল। এই বাণিজ্যের ফলে বিদেশ হইতে যে জাতি যত অধিক স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানী করিতে পারিত সে জাতি তত উন্নতিশীল বলিয়া পরিগণিত হইত। বাণিজ্যের প্রসার যতই অধিক হইতে লাগিল ততই এ ধারণার ভিত্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে ইংলণ্ডের কৃষির কার্য্য মন্দা পড়ায় শিল্পের প্রতি মনোনিবেশ করা ইংরাজ জাতির একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

ইংরাজের সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়ে প্রাচ্য বাণিজ্য-ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে তাঁহাদের বণিকেরা বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং নানা উপায়ে লব্ধ স্বর্ণ ও রৌপ্য ভারে ভারে এক ভারতবর্ষ হইতেই ইংলণ্ডে তখন হইতেই আমদানি হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং শিল্পের প্রতিষ্ঠায় যে অর্থের প্রয়োজন ছিল তাহাও প্রচুর পরিমাণে ঐ সময়ে ইংলণ্ডের হাতে আসিতে থাকে। ঐতিহাসিকগণ তাই বলিয়াছেন যে পলাশীর যুদ্ধের পর ভারত হইতে লুণ্ঠিত ধনরাশির বলেই ইংলণ্ড তাহার শিল্পসমূহ গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হয় এবং তাহারই ফলে একে একে ভারতীয় শিল্পের বিনাশ ঘটে। খৃষ্টাব্দ ১৭৬০ হইতে ১৮২৫ সাল পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা নির্ম্মমভাবে চলিতে থাকে এবং তাহার পরেও ১৮৬০ পর্য্যন্ত এই পদ্ধতিই ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যের মূলে কার্য্য করিতে থাকে। ইংরাজ জাতি জ্ঞানতঃ এদেশের শিল্পের উচ্ছেদসাধন করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু ঘটনাচক্রে একের পর একটী করিয়া আমাদের পুরাতন বস্ত্রশিল্প, রেশম শিল্প, লৌহ, ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতব দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কাজ, লবণ-শিল্প প্রভৃতি যে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং এককালে যে-ভারত পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে আপন শিল্পজাত পণ্য সরবরাহ করিয়া সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল সেই ভারতবর্ষ যে ক্রমে মাত্র কৃষিজাত পণ্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে, এ বিষয়ে কোন মতভেদ থাকিতে পারেনা। ইহার ইতিহাস স্মরণ করিলে কোন্ ভারতীয়ের না মন ব্যথায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে? ইংরাজ জাতি কি উপায়ে তাহার শিল্প-সংরক্ষণ করিয়াছিল এইবারে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতে পারে।

"রেষ্টরেশন" অর্থাৎ "ক্রমওয়েল"-প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের পর পুনরায় রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর হইতেই, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই, ইংলণ্ডে জাতীয় শিল্প সংরক্ষণমূলক বাণিজ্য-শুল্কনীতি অনুসরণের চেষ্টা পরিলক্ষিত

হয়। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এই নীতি প্রবলভাবে অনুসৃত হইতে থাকে এবং আমদানী পণ্যের উপর শুল্ক আদায় করা ভিন্ন অন্যান্য উপায়েও স্বদেশী শিল্পের সহায়তা করার ব্যবস্থা হয়। তাহার মধ্যে প্রধানতঃ রপ্তানি-শিল্পজাত পণ্যের উৎসাহমূলক অর্থানুকূল্যের এবং স্বদেশজাত দ্রব্যাদির আভ্যন্তরীণ কর-হ্রাসের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। ব্রিটীশ শিল্পের মধ্যে পশম, রেশম ও সূতার কাপড়ের কারখানাগুলির প্রতি সর্ব্বপ্রথম হইতেই জাতির অধিক লক্ষ্য পড়ে।

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে স্থানীয় পশমের কারখানাশিল্পের সহায়তার জন্য কাঁচা পশমের রপ্তানি আইনের বলে বন্ধ করা হয়। এই আইন ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বলবতী ছিল। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে বিদেশজাত রেশম ও ভেলভেটের দ্রব্যাদির আমদানি একেবারে বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এক আইন প্রবর্ত্তিত হয় এবং সেই সঙ্গে ইংলণ্ডের দোকানে ঐ সকল বিদেশী পণ্য বিক্রয়ার্থ রাখাও দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষিত হয়। এইরূপে স্বদেশজাত রেশম শিল্পের সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা রেশমের আমদানির উপর শুল্ক কিছু কমাইয়া দেওয়া হয় এবং প্রতি ১৬ আউন্স বা অর্দ্ধসের রেশমের উপর দশ পেনি এবং পশমের উপর ৬ পেনি শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়, এই বাণিজ্যনীতির ফলে ভারতীয় রেশমশিল্প বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এতদ্ভিন্ন ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে পারস্য, চীন ও ভারতবর্ষ-জাত রঙ্গীন ও ছাপান সূক্ষ্ম সূতার ও রেশমের বস্ত্র আমদানির উপর শতকরা ৫ পাউণ্ড হিসাবে বিশেষ শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং ১৭৭৯ ও ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে ঐ শুল্কের পরিমাণ দশ ও পনের পাউণ্ড বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে নানা প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতে থাকে এবং রেশম ও পশমের দ্রব্যাদি ভিন্ন সূতার কাপড়ের শিল্পের প্রতিষ্ঠার প্রতিও ইংরাজ জাতির অধিক মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ফ্লাইংশাটল্ অর্থাৎ স্বচ্ছন্দগামী "মাকু"র ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং কাঠের জ্বালানির পরিবর্ত্তে কয়লার আগুনে কারখানা চালাইবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ওয়াট সাহেব বাষ্পীয় শক্তিতে রেলের এঞ্জিন চালনার উদ্ভাবন সম্পূর্ণ করেন, ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে হার্‌গ্রীভস্ সাহেব কাপড় বুনাইবার "জেনি" উদ্ভাবন করেন এবং ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কার্টরাইট সাহেব বাষ্পীয় শক্তিতে তাঁত চালাইবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেন।

এইরূপে দেখা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসরে বৃটীশ বস্ত্রশিল্পের অভাবনীয় উন্নতি সংসাধিত হয়। ১৭৭৫ হইতে ১৭৮৫ পর্য্যন্ত কলে সূতা প্রস্তুত করাই ইংরাজ বস্ত্রশিল্পীর প্রধান লক্ষ্য ছিল। ক্রমে ১৭৯০ হইতে কলের তাঁতে কাপড় বুনানিও আরম্ভ হইল। হস্ত-পরিচালিত চরকা ও তাঁতের উপর নির্ভরশীল ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের এককালীন বিনাশের সূচনা সেই সময় হইতে আরম্ভ হয়।

ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক যখন ইংরাজ শিল্পীগণ নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনে রত সেই সময়েই ইংরাজ বণিকগণ এদেশে বাণিজ্য-জালের সঙ্গে সঙ্গে রাজত্ব বিস্তার করিতে উদ্যোগী হইলেন। মোগল রাজশক্তি তখন প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবে প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসক দুর্ব্বল ও পরস্পর হিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই সুবর্ণ সুযোগ লইয়া মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাহায্যে ও কূট রাজনীতির বলে ইংরাজ অপ্রতিহত ভাবে তাহার ভারত-বিজয়-অভিযান চালাইতে লাগিল ও ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ভারত হইতে লুণ্ঠিত ধনরাশি ইংরাজ জাতিকে অভাবনীয় সমৃদ্ধিলাভের সুযোগ আনিয়া দিল। এই প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্রুক্‌স্ এডাম্‌স্ নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বাংলার লুণ্ঠিত ধনরাশি লণ্ডনে আসিতে আরম্ভ করিল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডের শিল্পক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আরব্ধ হইয়া গেল। ১৭৬০ হইতে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নানা যন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়া বস্ত্রশিল্পের আমূল সংস্কারের ব্যবস্থা হইয়াছিল সত্য কিন্তু একথা মানিতেই হইবে যে শিল্পীর যন্ত্র উদ্ভাবন যতই সুন্দর হউক না কেন ধনিকের প্রেরণা তাহার পশ্চাতে না থাকিলে কোন শিল্পই গড়িয়া উঠিতে পারে না। ভারতবর্ষ হইতে লব্ধ ধনরাশি ইংরাজকে শিল্প প্রতিষ্ঠায় সেই প্রেরণা দিয়াছিল এবং সেই টাকা খাটাইয়া ইংরাজ জাতি যে পরিমাণ লাভবান হইল পৃথিবীতে কখনও কোন ধনিকজাতি সেরূপ লাভের কল্পনাও করিতে পারে নাই। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও এই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন এবং দেখাইয়া গিয়াছেন যে ইংরাজের সংস্পর্শে ভারতবর্ষের শিল্পের দুই প্রকারে ক্ষতি হইয়াছিল। প্রথমতঃ কারখানা-শিল্পের সংঘর্ষে ভারতীয় কুটীর-শিল্পের

উচ্ছেদসাধনে এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতের অর্থেই ইংরাজের এই কারখানা-শিল্পের প্রতিষ্ঠায় ও ভারতীয় বাজারে বাধাহীন ভাবে বিলাতী মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া সেই শিল্পের উন্নতিবিধানে।

শুধু তাহাই নহে। ইংরাজ তাহার স্বদেশী বস্ত্র-শিল্প-সংরক্ষণকল্পে যে সকল শুল্ক বসাইয়াছিল ও যেরূপ বিদেশী পণ্য-বহিষ্কার-নীতি চালাইয়াছিল তাহারও বোধ হয় তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নানা প্রকার উৎসাহমূলক অর্থ সাহায্য দ্বারা বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। তৎপরে ১৭৯৯ হইতে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতীয় ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশজাত দ্রব্যাদির বিরুদ্ধে প্রবল শুল্ক-নীতির প্রচলন হয়। নিম্নে এই অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সাদা মস্‌লিন এবং ফুলদার পাৎলা কাপড়ের আমদানির উপর ইংলণ্ডে শতকরা ১৮ পাউণ্ড শুল্ক আদায় করা হইত। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে উক্ত শুল্কের হার বাড়াইয়া ৩০ পাউণ্ড এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৩৭॥০ পাউণ্ড ধার্য্য করা হইয়াছিল। কোন কোন শ্রেণীর সূতি কাপড়ের উপর শুল্ক ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে শতকরা ৪০ পাউণ্ড ছিল। এই শুল্ক যথাক্রমে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ৬০ পাউণ্ড ও ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৮৫ পাউণ্ডের উপরও বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ৬৭॥০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত নামাইয়া আনা হয়। বস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য অনেক ভারতীয় পণ্যের উপরেও এই সময়ে মূল্যানুপাতে শতকরা ৬২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত শুল্ক চাপান হইয়াছিল। ঐতিহাসিক মিষ্টার মণ্টগোমারি মার্টিন ও রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইংরাজের তৎকালীন বাণিজ্য-সংরক্ষণ-নীতি আলোচনা করিয়া ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের জন্য উহা যে বহুল পরিমাণে দায়ী তাহা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। এবং ভারতে শিল্প সমূহ কি ভাবে ক্রমে নষ্ট হইল তাহা উল্লেখ করিয়া সহৃদয় লেখক মিষ্টার হোরেস হেম্যান উইল্‌সন বলিয়া গিয়াছেন যে ইংরাজ জাতি তৎকালে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় শিল্পীগণের সহিত পারিয়া উঠিতেছিলেন না বলিয়া অন্যায় ভাবে সম্বলব্ধ রাজশক্তির প্রয়োগ করিয়া ভারতীয় শিল্পের উচ্ছেদ ও ব্রিটীশ শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে কিরূপে বহির্ব্বাণিজ্য চলিয়াছিল তাহার কিছু হিসাব এখন দেওয়া যাক্। এই সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। ভারতবর্ষে অর্জ্জিত বহু ইংরাজের ধন-সম্পত্তির রপ্তানির ব্যবস্থার জন্য তখন লণ্ডনের উপর বিল্ অব এক্‌স্‌চেঞ্জ বিক্রয় করা হইত। সেগুলিকে ভারতীয় রপ্তানির হিসাবের মধ্যে ধরা কর্ত্তব্য কিনা তাহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিজ খাতে ইংরাজ ব্যবসায়িক, কর্ম্মচারী ও সৈনিকদের প্রেরিত আট কোটি পাউণ্ড পরিমাণ টাকা ইংলণ্ডে চালান যায়। সে যাহা হৌক বর্ত্তমান আলোচনায় কেবল মাত্র দ্রব্যাদি আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ দেখিলেই চলিবে।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৩ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের রপ্তানি গড়ে বাৎসরিক একলক্ষ পাউণ্ড হইতে ৩॥০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায়, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত ইংলণ্ড হইতে ভারতে অধিক দ্রব্যাদি আমদানি হইতে আরম্ভ করে নাই। ক্রমে ১৭৯১ হইতে ১৮০০ পর্য্যন্ত বৎসরে ইংলণ্ড হইতে গড়ে ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার পাউণ্ড, ১৮০১ হইতে ১৮১০ পর্য্যন্ত গড়ে ৮ লক্ষ ১৭ হাজার পাউণ্ড এবং ১৮১৯ নাগাদ তিন কোটি পাউণ্ডেরও অধিক পণ্য গড়ে রপ্তানি হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও ইংরাজ বণিকগণের নিজ নামে প্রাচ্য দেশ হইতে ইংলণ্ডে আমদানি পণ্যের পরিমাণ ("চা" ভিন্ন) ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিল গড়ে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড এবং ক্রমে উহা বাড়িয়া ১৭৬৬ হইতে ১৭৯০ পর্য্যন্ত হয় বাৎসরিক গড়ে ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৭৯০ হইতে ১৮১০ পর্য্যন্ত হয় অন্যূন ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ইঙ্গ-ভারতীয় ব্যবসায় সহসা খুব বাড়িয়া উঠিতে থাকে। এই বৃদ্ধির প্রভাবে ভারতীয় শিল্প সমূহের উন্নতি হইলে আমাদের ক্ষোভের কোনই কারণ থাকিত না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সময়ের বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতিযোগিতা এরূপ ভাবে প্রসার পাইতে থাকিল যে শীঘ্রই ভারতবর্ষ তাহার শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি ভুলিয়া গিয়া কাঁচা মাল সরবরাহ করিয়া বিদেশী শিল্পজাত পণ্যের মূল্য গণিতে আরম্ভ করিল এবং এককালে যে-ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে শিল্পের উৎকর্ষের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল সেই ভারতের শিল্পীর অন্ন ঘুচিয়া গেল এবং সমগ্র দেশবাসী উপজীবিকার জন্য কেবল

মাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়া পড়িল। একমাত্র ভারতীয় সূক্ষ্ম বস্ত্রাদির ইংলণ্ডে রপ্তানির পরিমাণ পর্য্যালোচনা করিলেই ভারতীয় বাণিজ্যের নিদারুণ পরিণতির ইতিহাস সুস্পষ্ট হইবে।

খৃষ্টীয় ১৭৭৮ সন পর্য্যন্ত বৎসরে গড়ে কেবল মাত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত দিয়াই ১১ লক্ষ ৬২ হাজার থানা সুতি কাপড়ের থান ইংলণ্ডে আমদানি হওয়ার প্রমাণ পাওয়া পাওয়া যায়। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ এই আমদানি কমিয়া সাড়ে চারি লক্ষের কাছাকাছি নামিয়া যায় এবং ১৭৮৪ পর্য্যন্ত এইরূপ মন্দাই চলে। ১৭৮৫ হইতে ১৭৯৩ পর্য্যন্ত ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানির কিছু উন্নতি দেখা যায় বটে কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভিন্ন অন্যান্য অনেক ব্যবসায়ী বস্ত্র চালান দিতে থাকিলেও পূর্ব্বের ন্যায় উন্নতি কোন দিনই আর হয় নাই। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কথঞ্চিৎ উন্নতি বজায় থাকে এবং তাহার পরই ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে পণ্য রপ্তানি হঠাৎ কমিয়া গিয়া ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ নাগাদ একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। ভারতীয় অন্যান্য শিল্পেরও এই সময়ের ইতিহাসে প্রায় একই প্রমাণ দেখা যায়।

ইংলণ্ডের বাণিজ্য-সংরক্ষণ নীতি ও বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের ব্যবস্থা উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত নির্ম্মমভাবে চলিয়াছিল। ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে এই নীতি ও ব্যবস্থা বিশেষ রূপে কার্য্য করে এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমাদের বহির্ব্বাণিজ্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম লক্ষীভূত হয় যে ভারতবর্ষ ক্রমে তাহার শিল্পজাত পণ্য রপ্তাণি ভুলিয়া কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল।

রবারের রোম্যান্স

চারশ বছর আগেকার কথা। ১৫১৯ সনে মেক্সিকো-সম্রাট স্পেনের বীর-সন্তান কোর্টেজকে সদলে নিমন্ত্রণ করেছেন। কিছুদিন আগে স্পেনের হ'য়ে কোর্টেজ মন্তেজুমা জয় ক'রেছেন, উপলক্ষ্য এই। মেক্সিকো-সুন্দরীদের বলনৃত্য নয় বলক্রীড়া চলেছে, তখনও বলনৃত্যের চল হয়নি। কোর্টেজ লক্ষ্য করলেন, বলগুলো মেজেয় প'ড়ে আবার লাফিয়ে উঠে। এমন বল তিনি দেখেননি। কি উপাদানে বলগুলি তৈরী পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। এদেশে এসে অবধি এই উপাদান তাঁদের নজরে পড়েছে—ধূসর-কৃষ্ণবর্ণ, টান্‌লে বাড়ে, আঠা-আঠা। নৌকার গায়ে ওরা লাগায়, নিজেদের কোর্ত্তা-তেও ব্যবহার করে। শুনলেন একটা বিশেষ বৃক্ষের রস হ'তে এই উপাদান সংগৃহীত। বোতল ইত্যাদি নানাপ্রকার পাত্র ওরা এ দিয়ে তৈরি করে।

তারপর যখন বিভিন্ন ইউরোপীয়ান ঔপনিবেশিকের অভি-যানে নূতন পৃথিবী অ্যামেরিকা ছেয়ে গেল তখন যে-গাছ হ'তে এই রস সংগৃহীত হয় সে-গাছ এরা চিন্‌ল। ফরাসীরা এই গাছের রসের নাম দিলে, কাউচুক্। আমরা আজও এই নামই জানি।

এই কাউচুকই রবারের জননী। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক পরিব্রাজক দেলাকন্দামাইন দশ বছর ধরে দক্ষিণ অ্যামেরিকার ভৌগলিক পর্য্যভিযান সাঙ্গ ক'রে, কাউচুকের আরও বিস্তৃত সংবাদ নিয়ে আসেন। 'হেভি' গাছের রস এ, বোটানিতে এ গাছকে বলা হয়েছে হিভিয়া ব্রাসিলিয়েন্‌সিস্। কিন্তু তখনও রবারকে মাত্র অদ্ভুত জিনিস, কিউরিয়ো হিসেবেই লোকে দেখ্‌ছে।

হঠাৎ ১৭৭০ সনে ইংরেজ রাসায়ণিক প্রিষ্ট্‌লে আবিষ্কার ক'র্‌লেন, এই রবার দিয়ে পেন্সিলের দাগ ঘস্‌লে মুছে যায়।

তারপর দিনের পর দিন রবার নিয়ে রাসায়ণিকদের গবেষণা সুরু হ'লো। আজ রবারের বোতলে অক্সিজেন ভ'রে বেলুন ক'রে কেউ আকাশে উড়োচ্ছে, কাল আরও একটা কিছু। রবার গলিয়ে তরল করার উদ্দেশ্যে ১৭৭৮ সনে হেরিসান্ট আর ম্যাকোয়ের একটু কৃতকার্য্য হ'লেন।

তারপর এই গলিত রবার নিয়ে বর্ষাতি কাপড় তৈরির মরসুম লাগ্‌ল। ১৭৯১ সনে ইংলণ্ডে স্যামুয়েল পীল আর তার দশ বছর পরে জার্মানিতে রুডল্‌ফ অ্যাকারম্যান্—এই বর্ষাতির পেটেন্ট নিলেন।

কিন্তু আজকের বর্ষাতির সঙ্গে সে-বর্ষাতির তফাৎ বহু। তখন এ তৈরি ক'রতে যেমন অসম্ভব বিলম্ব হতো, তৈরি জিনিসও হতো তেম্‌নি অপূর্ব্ব, গায়ে জড়িয়ে লাগে, চিট্‌চিটে। ১৮২২ সনে হ্যানকক্‌ রবার গুঁড়ো করার এক উপায় আবিষ্কার ক'রলেন। ১৮২৩এ ম্যাকিণ্টশ সাহেব রবারকে ব্যবহার্য্য ক'রবার উপায় বা'র ক'র্‌লেন। আজও আমরা রেনকোটকে ম্যাকিণ্টশ বলি।

কিন্তু তবু সে চিট্‌চিটে ভাব যায় না। ঠাণ্ডা কি গরম লাগলেই বর্ষাতির কাজ সারা। সহস্র গবেষণা ব্যর্থ হ'লো। ১৮৩২ সনে জার্মানিতে ডাঃ লয়ডার্সডর্ফ বহু খেটেখুটে আবিষ্কার ক'র্‌লেন, গন্ধকে রবারকে এদিক দিয়ে কিছু বাগ মানানো যেতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোক বহু পরিশ্রম ক'রে যে-বইখানি লিখে গেলেন, লোকজনের তা নজরেও প'ড়্‌লো না। এরই কয় বৎসর পরে অ্যামেরিকার হেওয়ার্ডও এই পন্থাই আবিষ্কার করেন।

এই হেওয়ার্ডেরই একজন সতীর্থ 'ভালক্যানিজেসন্'এর পন্থা আকস্মিক উপায়ে সম্পূর্ণ করেন। ১৮৪৩ সনে টমাস হ্যানকক্‌ 'ভ্যালকানিজেসন্' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। পার্কেস ব'লে আর একজন ১৮৪৬ সনে সাল্‌ফারের সাহায্য না নিয়ে ক্লোরাইড অব লাইমে ডুবিয়ে ভালক্যানিজেসনের আর এক নূতন উপায় আবিষ্কার করেন। এই 'ভাল্‌কানি-জেসন্' সম্ভব হ'বার পর ব্যবসায়ের দিক দিয়ে রবারের অসীম সম্ভাবনা লোকজনের দৃষ্টিতে প'ড়্‌তে আর দেরী হ'লো না। অসংখ্য নামে সংখ্যাহীন লোক দেশে-বিদেশে রবারের পেটেন্ট নিল। গাড়ীর চাকায় রবার যোজনা ক'রে নিঃশব্দ ভ্রমণের মৎলব এল। সঙ্গে এল টায়ার আর টিউব। ১৮৪৪ সনে অ্যামেরিকার উইলিয়ম টম্‌সন প্রথম পাম্প-করা চাকার যান চালান্। অতঃপর ব্যারন ভন্ ড্রেয়েজের অস্থিচূর্ণকারী প্রথম দ্বিচক্রযান ক্রমে ক্রমে এ যুগের বাইসিক্লে রূপান্তরিত হ'লো—সুতরাং টায়ার আর টিউবেরও প্রচলন হ'লো।

বর্ত্তমান জগতে খুব কম ক'রেও নব্বই লক্ষ এমন যান-বাহন চলাচল করে, যার রবারের চাকা, এদের এক মোটরকারের সংখ্যাই হ'চ্ছে ত্রিশ লক্ষ।

সুদূর অ্যাল্‌সের পার্ব্বত্যপথ হ'তে সুরু ক'রে আমাদের নিকটতম পথে পৃথিবীর এই গতি-রঙ্গীদের ভিড়। এমন যদি হয়, হঠাৎ রবারের আমদানি বন্ধ হ'য়ে গেল, তবে এই লক্ষ-লক্ষ যান অতি অল্পদিনের মধ্যেই মনুষ্য-সভ্যতাকে অকস্মাৎ স্থাণু করে একেবারে নিশ্চল হ'য়ে যাবে।

বহু পূর্ব্বে এ আশঙ্কার কথা মানুষের মাথায় এসেছিল। তখন দিনের পর দিন ব্রেজিল হ'তে রবারের চাগান আস্‌ছে, পৃথিবীর আর কোথাও হিভি গাছ নেই। ব্রেজিলের হিভি-বাহিনী নিঃশেষে ফুরিয়ে যেতে আর কতদিন। এই ভাব্‌নার সূত্রে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-ইতিহাসের বহু প্রাচীন একটি চৌর্য্য সংঘটিত হয়। ১৮৭০ সনে ইংরেজ প্ল্যাণ্টার স্যর হেন্‌রি উইকহ্যাম ব্রেজিল সরকারের চোখে ধূলি দিয়ে সহস্রাধিক হিভির বীজ সাগর পার ক'রে ইংলণ্ডে আনেন্। ফলে ব্রেজিলের এত বড় একচেটিয়া একটা ব্যবসা নষ্ট হ'লো। দিন কয়েকের মধ্যে এই সব বীজ হ'তে ইংলণ্ডের মাটিতে চারা গজাল। কিন্তু ইংলণ্ডের জল-হাওয়ায় এ গাছ হয় না। সুতরাং সেই বছরেই দুহাজার চারা গাছ জাহাজে ক'রে সিংহলে এল। এবং ত্রিশ বছরের মধ্যে হিভি গাছ সিংহলের বুকে বিস্তৃত স্থান অধিকার ক'রে ব'স্‌ল।

এক স্থান হ'তে রবারের এই চাষ-আবাদের স্থানান্তরীকরণ ব্যাপার পরিশ্রমসাপেক্ষ হ'লেও বেশ কৌতূহলজনক। বৃহৎ বনজঙ্গল কেটে নির্ম্মূল ক'রে ফেল্‌তে হবে-এক টুক্‌রো কিছু সেখানে থাক্‌লে চল্‌বে না। অতি সন্তর্পণে চারা গাছগুলি সেখানে রোপণ ক'রে পূরো সাত বৎসর ধ'রে সেগুলিকে শিশুর আদরে পাল্‌তে হবে। তবে এরা ব্যবসায়ে ব্যবহারযোগ্য হবে—এদের বুকে তবেই কুঠারাঘাত সইবে।

এই কুঠারাঘাত ক'রে বৃক্ষকাণ্ড হ'তে রস-নিষ্কাশন প্রণালীরও বৈশিষ্ট্য আছে।

একশ' বছর আগে আমেরিকার 'সেরিংগুয়েরিয়ো'রা (রবারের কাজ যারা করে) যে প্রণালীতে হিভি বৃক্ষ হ'তে রস নিষ্কাশিত ক'র্‌ত, আজও মূলতঃ সেই প্রণালীই অনুসৃত হচ্ছে। সেরিংগুয়েরিয়োরা প্রায়ই সস্ত্রীক গিয়ে বনে নীড়

বেঁধে রবারের কাজ সুরু ক'র্‌তো—সহরে থেকে ঠিকেদার তাদের কাজ নিয়ন্ত্রিত ক'র্‌তো। নীড় হ'তে কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে গাছ কেটে প্রথমে তারা পথ সৃষ্টি করতো, এই পথ হিবির বনে গিয়ে পড়েছে। চারি পাশে অন্যান্য অনেক গাছের জঙ্গলের মধ্যে হয়ত এক স্থানে হিবির গাছ। এই বন-জঙ্গল ভেদ ক'রে হিবি বৃক্ষে উপনীত হ'তে হবে। এম্‌নি ক'রে একটা একটা ক'রে গাছ বেছে হয়তো একশো গাছ নিয়ে নীড় হ'তে বনের গহন অভ্যন্তর পর্য্যন্ত এক ক্রোশ-ব্যাপী পথ নিয়ে সেরিংগুয়েরিয়োর কর্ম্মক্ষেত্র—গাছের পর গাছের আশপাশ সাফ করে কাজ সুরু ক'র্‌তে হবে। তারপর বৃক্ষকাণ্ড পরিষ্করনান্তে গাছের বুকে কুঠারের ঘা দিয়ে রস-নিষ্কাশন। এই রস তলদেশে রক্ষিত পাত্রে সঞ্চিত হয়। অনেকটা আমাদের দেশের খেজুর গাছ কাটার মতো ব্যাপার। তাতারসির মতেই ভোর না হতে বাল্‌তি হাতে এদেরও রস-সংগ্রহ আরম্ভ হয়।

রস-সংগ্রহ হইলে পর সব চাইতে কঠিন কাজ—রস জ্বাল দিয়ে রবার তৈরির মশলা তৈরি করা। এই মশলায় তৈরি গোলাকার পিণ্ডের মত কাঁচা রবার ঠিকেদারের কাছে এসে পৌঁছোয়। ঠিকেদার সেগুলো কেটে দুই ফাঁক ক'রে দেখে—ফাঁকি জোচ্চুরি আছে কি না।

মোটরকার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবারের ব্যবসায়ে যুগান্তর সূচিত হয়। ইংরেজ ওলন্দাজ সবাই মিলে হুড়োহুড়ি ক'রে রবারের চাষে তখন মন দেয়। অ্যামেরিকা আজ পৃথিবীর সমগ্র রবারের দুই-তৃতীয়াংশের খরিদ্দার।

সেদিন পর্য্যন্ত রবার নিয়ে ইংলণ্ড আর অ্যামেরিকায় বিবাদ চলেছে। অ্যামেরিকার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিতান্ত নিরুপায় হ'য়েই, ১৯২৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে বাল্‌ডুইনকে ইংলণ্ডে রবার-রক্ষণ আইন নাকচ ক'র্‌তে হয়েছে।

নীচে কয় বছরের রবার উৎপাদনের হিসাব দেওয়া হ'ল। এই তালিকা থেকে বোঝা যাবে, দিনের পর দিন রবার ব্যবসায় কি পরিমাণে উন্নত হ'চ্ছে।

১৯০৫	...	৬২,১৪৫ টন	১৯২০	...	৩,৪৩,৭৩০ টন
১৯০৮	...	৬৫,৪০০ „	১৯২৩	..	৪,১২,৮৭০ „
১৯১০	...	৭০,৫০০ „	১৯২৫	...	৫,১৬,০৭০ „
১৯১১	...	১,০৮,৪৪০ „	১৯২৬	...	৬,১৪,৭৭০ „
১৯১৪	..	১,২০,৩৮০ „	১৯২৮	...	৬,৫৩,০০০ „
১৯১৯	..	৩,২৬,৮৬০ „			

এই রবারের সঙ্গেই হাত ধরাধরি ক'রে আরও কত ব্যবসায় গড়ে উঠেছে। যেমন টায়ার টিউবের ব্যবসা। এক একটা টায়ার টিউবের কারখানার ইতিহাসও কম নয়। আজ কন্টিনেন্টাল কাউচুক্ আণ্ড গাট্টাপার্চ্চা কোম্পানীর নাম জগদ্বিখ্যাত। ১৮৬০।৬৫ সনে এই কোম্পানীর গোড়াপত্তনি হয়, তখন এরা শুধু রবারের চেরুণের কারবার করত। তারপর কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই কারখানার শতাধিক বৎসর কেটে গেছে—১৮৯৩ সনে যে কারখানায় ৬০০ লোক কাজ ক'রত, ১৯২৫ সনে সেই কারখানায় ১৮০০০ লোক কাজ ক'রেছে।

এম্‌নি একটা একটা ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। কত সামান্য সূচনার মধ্যে কি বিপুল সম্ভাবনা যে লুকিয়ে আছে কে জানে। হয়ত একটি মাত্র লোক তার কল্পনা ও কর্ম্ম-ক্ষমতা দিয়ে যে-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সেই প্রতিষ্ঠান জাতির গৌরব হ'য়ে ওঠে। তার ইতিহাস পড়্‌লে মনে হয়, এর চাইতে বড় রোমান্স কেউ এ অবধি লেখেনি, এমন নাটকের উপাদানও বুঝি আর কিছুতে নেই।

সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও, আমাদের দেশের রবারের অসীম ব্যবসায়-সম্ভাবনাকে আমরা আজও কাজে লাগাইনি।—অন্য জাত এসে আমাদের যা-কিছু সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে গেছে, এই অভিযোগ ক'রতেই আমাদের আয়ু নিঃশেষ হ'লো। অথচ এখনও যে-সব দিকে কাজ ক'রে আমরা নিজেদেরকে সার্থক করতে পারি সেদিকটা অবজ্ঞাতই হয়ে রয়েছে।—

আর্থিক প্রসঙ্গ

জাপানী 'ইয়েন'এর মূল্যহ্রাস ও ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পে বিপত্তি

বিগত ডিসেম্বর মাসে জাপান স্বর্ণ-মান বর্জ্জন করিবার অব্যবহিত পর হইতেই জাপানী 'চলৎসিক্কা' ইয়েনের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে। ফলে জাপানী মাল এখন খুব সস্তাদরে রপ্তানী হইতেছে। কেবল স্বর্ণ-মানরক্ষী দেশের মুদ্রার তুলনায়ই যে ইয়েনের মূল্য কমিয়া গিয়াছে, এমন নহে। ইংলণ্ড তথা ভারতবর্ষের মত দেশ, যেখানে জাপানের মতই স্বর্ণ-মান বর্জ্জিত হইয়াছে,—তাহাদের তুলনায়ও জাপানী ইয়েনের পরিবর্ত্ত মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। ভারতীয় টাকার সহিত ইয়েনের স্বাভাবিক সম্বন্ধ অনুসারে প্রতি একশত ইয়েনের মূল্য ১৩৭৲ হওয়া উচিত। ইয়েনের মূল্যে বিপর্য্যয় ঘটিবার ফলে একশত ইয়েনের মূল্য ইতিমধ্যে মাত্র ৯৮৲ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; এখন তাহা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়া ১০৬৲ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—অর্থাৎ টাকার সহিত তুলনায় ইয়েনের মূল্য শতকরা প্রায় ৩৫৲ কমিয়া গিয়াছে। জাপানী মাল এই পরিমাণে সস্তা হইবার দরুণ ভারতীয় কটন-মিলগুলি বিশেষ আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অবহিত হইয়া আমদানী বস্ত্রের উপর ধার্য্য শুল্ক বাড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ট্যারিফ বোর্ডের উপর অনুসন্ধান করিবার ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। শীঘ্রই ট্যারিফ বোর্ডের মন্তব্য প্রকাশিত হইবে।

গবর্ণমেণ্ট যে সূত্রে ট্যারিফ বোর্ডের উপর অনুসন্ধান করিবার ভার ন্যস্ত করিয়াছেন, আমরা সর্ব্বতোভাবে তাহার সমর্থন করিতে পারিতেছি না। বর্ত্তমান অনুসন্ধানে গবর্ণমেণ্টের যে অনুশাসন রহিয়াছে, তাহাতে ইংলণ্ড ব্যতীত অপর কোন দেশ হইতে আমদানী বস্ত্র তদ্দেশীয় আর্থিক ব্যবস্থার সহায়তায় ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের পক্ষে কোন প্রকার মারাত্মক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিতেছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া বর্ত্তমান দেশীয় বস্ত্র-শিল্প-সংরক্ষণমূলক শুল্ক বাড়াইয়া দেওয়া উচিত হইবে কি না,—কেবল তাহাই বিচার করিবার ও প্রস্তাবিত অতিরিক্ত শুল্কের স্থিতিকাল নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা ট্যারিফ বোর্ডকে দেওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের শুল্ক নিয়ামক আইনের ৩(৫) ধারা অনুসারে তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছেন। উক্ত আইন অনুসারে আর্থিক বিপর্য্যয়ের সহায়তামূলক প্রতিযোগিতার বিপত্তি রোধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন মত ব্যবস্থা করিতে পারেন বটে, কিন্তু এ আইন কেবল পূর্ব্বতন সংরক্ষিত শিল্পসম্বন্ধেই প্রযোজ্য; তা' ছাড়া ইহা কেবল ইংলণ্ড ব্যতীত অপর কোন দেশ সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা চলিতে পারে। গবর্ণমেণ্ট এই বিশেষ আইনের শরণাপন্ন হইবার দরুণ অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, বর্ত্তমান সমস্যায় জাপানী বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক বাড়াইয়া দেওয়া সম্ভব হইলেও জাপানী অন্য কোন প্রকার মাল বা এমন কি গেঞ্জি, মোজা বা নিকৃষ্ট রেশমের বস্ত্রের উপর এরূপ কোন প্রতিযোগিতা-রোধক শুল্ক বসানো সম্ভব হইবে না, যেহেতু এই সকল দ্রব্য ভারতবর্ষে এখনও সংরক্ষিত শিল্পের পর্য্যায়-ভুক্ত হয় নাই। অথচ ইয়েনের মূল্যে হ্রাস ঘটিবার দরুণ, এই সকল জিনিষের আমদানী প্রতিযোগিতাসূত্রে ভারতীয় শিল্পের পক্ষে সমান ভাবেই ক্ষতিকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। তা' ছাড়া এরূপ ব্যবস্থার ফলে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের জন্য পক্ষপাতমূলক সুবিধা করিয়া দিতেছে, এরূপ কটাক্ষপাতও হয় ত কেহ কেহ করিতে ছাড়িবে না। গবর্ণমেণ্ট অযথা এই আইনের আশ্রয় লইয়াছেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁহাদের ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ আইনের শরণাপন্ন হওয়া সমীচীন হইত। এই আইন অনুসারেও গবর্ণমেণ্ট প্রতিযোগিতা-নিরোধক শুল্ক বৃদ্ধি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা দেশ বা মাল নির্দ্ধারণ বিষয়ে সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা-বর্জ্জিত হইতে পারিত।

* * * *

সে যাহা হউক, আলোচ্য ব্যাপারে ট্যারিফ বোর্ড কিরূপ বিধি নির্দ্দেশ করিবেন, তাহাও যথেষ্ট সমস্যাপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আজ কয়েকদিন পূর্ব্বে জাপানী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-বর্গ শিমলায় অভিযান করিয়া বড়লাটের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির বাণিজ্য-সচিবের নিকট তাঁহাদের স্বদেশী শিল্পের পক্ষে যেরূপ ওকালতী করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে এইরূপই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। জাপানের স্বর্ণ-মান বর্জ্জন ইচ্ছাকৃত

ব্যাপার নয়, তথাকার মিলওয়ালারা এখনও লোকসান দিয়া মাল বেচিতেছে না, জাপান হইতে ভারতে রপ্তানী মালের দামের চেয়ে—ভারত হইতে জাপানে আমদানী মালের দাম অনেক বেশী, স্বর্ণ-মান বর্জ্জন ভারত এবং জাপানের পক্ষে তুল্য অপরাধ, এই সকল কথাই তাঁহাদের ওকালতীর স্থূল মর্ম্ম। জাপানী তন্তুবায়ের বয়ন-কুশলতা ও অধুনাতম যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্যই জাপানী বস্ত্র সস্তায় বিক্রয় করা সম্ভব হইতেছে, এরূপ ইঙ্গিত করিতেও তাঁহারা ছাড়েন নাই।

আমাদের নিকট এই সকল কৈফিয়ৎ নিতান্তই আজগুবি বলিয়া মনে হইয়াছে। বর্ত্তমান সমস্যায় এই সকল কৈফিয়তের মধ্যে অনেকগুলিই অবান্তর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। জাপানী বস্ত্রের মূল্য-হ্রাস সম্বন্ধে একটি মাত্র প্রণিধানযোগ্য কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তাহা জাপানের বস্ত্র-শিল্পে অভিনব যন্ত্রশক্তির ব্যবহার ও জাপানী শিল্পীর কর্ম্ম-কুশলতা। কিন্তু এরূপ কৈফিয়তের উপরও আস্থা রক্ষা করা কঠিন। এরূপ কারণ নির্দ্দেশের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান না হইয়াও, ইহাকে বর্ত্তমান সমস্যার মুখ্য কারণ বলিয়া মানিয়া লওয়া সম্ভব নহে। দেশনির্ব্বিশেষে বস্ত্র নির্ম্মাণে এই সকল দফায় যে খরচ হয়, তাহা সমষ্টি ব্যয়ের মাত্র ১৮।১৯ ভাগ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে যথাসাধ্য ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াও বস্ত্রের বিক্রয়-মূল্যে শতকরা ৩০৲।৩৫৲ কমাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, ইয়েনের মূল্য কমাইয়া দিয়াই বা জাপানের পক্ষে সস্তায় মাল দেওয়া সম্ভবপর হয় কি করিয়া?—কারণ ইহার ফলে তাহাকে বস্ত্রের প্রধান কাঁচামাল তুলা ত চড়া দরেই কিনিতে হইবে? এরূপ কৈফিয়ৎও সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। তুলা কিনিবার ব্যাপারে চড়াদাম দিতে হইলেও একথা ভুলিলে চলিবে কেন যে, তুলার জন্য বস্ত্র-নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ের অর্দ্ধেক মাত্র খরচ হইয়া থাকে। তাহার উপর ইয়েনের মূল্য-পতনজনিত কোন প্রকার সুবিধালাভ করা সম্ভব না হইলেও, উদ্বৃত্ত অর্দ্ধ-পরিমাণ খরচের উপর এরূপ সুবিধা পাওয়া অসম্ভব হইবে কেন? জাপানী বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক বাড়াইয়া দিবার পক্ষে এই সুবিধাই যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

বিলাতী 'ওয়ার'-লোনের চুক্তি-বদল ও সিকিউরিটি বাজারে মূল্য-বৃদ্ধি

সম্প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের ইউরোপীয় মহাসমরকালীন গৃহীত ওয়ার-লোনের চুক্তি-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের সিকিউরিটি বাজারে এক অপ্রত্যাশিত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ওয়ার-লোনের সমষ্টি-পরিমাণ ছিল দুই শত কোটি পাউণ্ড; ইহার উপর শতকরা ৫ পাউণ্ড হারে সুদ নির্দ্ধারিত ছিল। ইদানীং আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা মন্দা, ইত্যাদি কারণে সর্ব্বত্রই সুদের হার কমিয়া গিয়াছে। এই সুযোগে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাদের ওয়ার-লোনের উপর ধার্য্য সুদের পরিমাণ কমাইবার জন্য উক্ত লোনের সর্ত্ত পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করেন। এই সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের চ্যান্সেলর মিঃ চেম্বারলেন যে ঘোষণা করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নরূপ; গবর্ণমেন্টের ওয়ার-লোনের পরিশোধের জন্য আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কেহ দাবী করিলে গভর্ণমেণ্ট ১লা ডিসেম্বর তারিখে তাহা মিটাইয়া দিবেন। তবে লোনদাতাগণ সিকিউরিটি পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাদের প্রদত্ত কর্জ্জের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। নূতন সিকিউরিটিতে গৃহীত কর্জ্জের উপর সুদের পরিমাণ শতকরা ৫ পাউণ্ডের স্থলে ৩½ পাউণ্ড ধার্য্য করা হইবে। নূতন সিকিউরিটি বাবদ গৃহীত কর্জ্জের নাম-করণ হইবে '৩½% ওয়ার লোন'। যাহারা ৩১শে জুলাই তারিখের মধ্যে এরূপ সিকিউরিটি পরিবর্ত্তন করিবার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে শতকরা ১ পাউণ্ড হারে 'বোনাস' প্রদান করিবেন।

এই ব্যবস্থার ফলে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের কর্জ্জ বাবদ দেয় সুদের পরিমাণ প্রতি বৎসর ৩ কোটি পাউণ্ড কমিয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইন্‌কমট্যাক্স রেহাই বাবদ ৭০ লক্ষ পাউণ্ড বাদ দিয়া বৃটিশ সরকারের এ জন্য ব্যয়-সংক্ষেপ হইবে ২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড।

বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 'ওয়ার'লোনের উপর ধার্য্য সুদ কমাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটী বাজারে এক চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বতন কর্জ্জসূচক সিউরিটিগুলির অপ্রত্যাশিত ভাবে মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। এরূপ মূল্য-বৃদ্ধি যে কেবল ইংলণ্ডের সিকিউরিটি-বাজারেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা নহে। ভারতবর্ষেও তাহার ঢেউ আসিয়া পৌছিয়াছে। ইংলণ্ডে সুদের আদায়ে পতন ঘটিবার জন্য সেখানকার অনেক টাকা এখন ভারতবর্ষে লগ্নী করিবার জন্য প্রেরিত হইতেছে। ফলে ভারতবর্ষের বাজারেও সিকিউরিটির মূল্য অনেক পরিমাণে

বাড়িয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ৩০শে জুন মিঃ চেম্বারলেনের ঘোষণার অব্যবহিত পূর্ব্বে ৩½% সুদ আদায়ী যে কোম্পানীর কাগজের দাম ছিল ৬৩।০, ঘোষণার পরেই তাহার মূল্য ৬৭৲ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬০-৭০ খৃষ্টাব্দে পরিশোধনীয় ৪% সুদ আদায়ী কোম্পানীর কাগজের মূল্যও ৭০৲ টাকা হইতে ৭৫৲ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি এই সকল সিকিউরিটির মূল্য যথাক্রমে ৬৯।০টাকা ও ৭৯।০ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বাজার-চল্‌তি সিকিউরিটির উপর ধার্য্য সুদ অপেক্ষা নিম্নতর হারে ঋণ-গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া যে সৎসাহস দেখাইয়াছেন, সে জন্য তাহাকে অকপটচিত্তে প্রশংসা করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাদের অধুনাতম ঋণের উপর ৫॥০% সুদ ধার্য্য করিয়া দিয়া যে বিপরীত কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দিকে স্বভাবতঃই মনযোগ আকর্ষিত হইবে।

ভবিষ্যৎ রাজস্ব-বণ্টনে বৃহত্তর বাঙ্গালার দাবী

ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-সঙ্ঘে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মধ্যে রাজস্ব-বণ্টনের ব্যবস্থা দিয়া ফেডারেল ফাইন্যান্স কমিটি কিছুদিন পূর্ব্বে যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার ভাগ্যে প্রতিবৎসর দুই কোটি টাকা বাজেট-ঘাট্‌তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ফাইন্যান্স কমিটি ইহার জন্য এক ক্ষতি-পূরক পথ বাত্‌লাইয়াছেন যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার রাজস্বের আদায় হইতে বাঙ্গার সরকারের ঘাট্‌তি-পূরণের জন্য প্রতি বৎসর দুই কোটি টাকা প্রদান করিবেন।—অর্থাৎ মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড প্রণোদিত রাষ্ট্র-সংস্কারের ফলে বাঙ্গালার দশবৎসর যাবৎ যে দারুণ অর্থাভাব চলিতেছে, এবং আনুসঙ্গিক ফলাফলরূপে বাঙ্গালার কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতি সাধন বিষয়ে বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট যেরূপ নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিয়াছেন,—ফাইন্যান্স কমিটির প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাহারই মেয়াদ বৃদ্ধি পাইবে মাত্র।

বাঙ্গালার অধিবাসী মাত্রের পক্ষেই এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা কঠিন। বিগত ১৫ই জুলাই তারিখে টাউন হলে আহূত এক জনসাধারণের সভায় এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। পাট-রপ্তানী শুল্ক আদায়ে বাঙ্গালার প্রতি পক্ষপাতমূলক অন্যায় ব্যবহার, ইন্‌কম ট্যাক্সের আদায়ে বাঙ্গালার সরকারের দাবী—এই সকল বিষয় তথায় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আমাদের নিকট এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের অবতারণা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইয়াছে। বাঙ্গালার সীমা-নির্দ্ধারণের সমস্যা এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে। বাঙ্গালার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-সংস্থানের আনুকূল্য সাধন করিবার জন্যই এই সমস্যার যথাযথ সমাধান করা যে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইবে। এ সমস্যা লইয়া এতদিন যেরূপ আলোচনা গবেষণা হইয়াছে, তাহাতে ইহার স্বরূপ কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গালার সহিত ভাষা, শিক্ষা, সংস্কার ও সভ্যতার সাম্য এবং অতীত ইতিহাসের প্রমাণ দিয়া বাঙ্গালার অধিবাসী ক্রমাগতই তাহাদের দাবী পেশ করিয়াছে যে, বিহার উড়িষ্যার অন্তর্গত ভাগলপুর, মানভূম এবং বীরভূম এবং আসাম অন্তর্গত গোয়ালপাড়া, সিলেট প্রভৃতি জেলা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-সংস্কারে বাঙ্গালা প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হওয়া উচিত। ইহা ছাড়াও এই বৃহত্তর বাঙ্গালা সৃষ্টি করিবার আন্দোলনের মূলে একটি গুরুতর আর্থিক কারণ নিহিত রহিয়াছে। বিহার অন্তর্গত মানভূম, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে বহুমূল্য কয়লার খনি সকল সংস্থিত রহিয়াছে। আসাম অন্তর্ভুক্ত গোয়ালপাড়া, সিলেটের ন্যায় স্থানেও বিস্তৃত চা-বাগানের ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। যে সকল কোম্পানীর তাঁবে এই সকল কয়লার খনি এবং চা বাগান পরিচালিত হইতেছে, অনেক স্থলেই তাহাদের হেড্ অফিস কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সকল কোম্পানীর উপরে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্যের অতিরিক্ত ইনকম্ প্রভৃতি ট্যাক্স ধার্য্য করিবার ক্ষমতা ভবিষ্যতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হইলে, বাঙ্গালার আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার একটি প্রশস্ত পথ রুদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকিবে, সে বিষয়ে এখনই অবহিত হওয়া উচিত।—কারণ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে এরূপ ক্ষমতা দিলে উল্লিখিত কয়লার খনি এবং চা-বাগান হইতে প্রাপ্য ট্যাক্সের পরিমাণ যথাক্রমে বিহার-উড়িষ্যা এবং আসামের গবর্ণমেণ্টই আদায় করিয়া লইবে। সে জন্য প্রয়োজন হইলে কোম্পানীর হেড অফিস

স্ব স্ব এলাকাধীনে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিতেও তাহারা ত্রুটি করিবে না। বাঙ্গালার পক্ষে এই দুইটী প্রধান শিল্প হারাইবার আসন্ন বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া তাহার আর্থিক সংস্থানকে পুষ্ট করিয়া তুলিবার একমাত্র পথ রহিয়াছে বাঙ্গালার স্বাভাবিক সীমানা পুনরুদ্ধার করিয়া পূর্ব্বোক্ত জেলা গুলির উপর স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাসানাল চেম্বার অফ্ কমার্স এক আবেদন পত্রে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ এই বিষয়ে আকর্ষণ করিয়া বাঙ্গালার অধিবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ভারতীয় লৌহ-ইস্পাত কারখানার সঙ্কট

সম্প্রতি 'টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী' ও 'ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী'র অংশীদারবর্গের বার্ষিক সভায় উক্ত কোম্পানীদ্বয়ের চেয়ারম্যান ভারতীয় কারখানাগুলির লৌহ এবং ইস্পাত নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে সকল সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে শঙ্কিত হইতে হয়। টাটা কোম্পানীর বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণ পেশ করিয়া চেয়ারম্যান মিঃ এন্, বি, সাকলাতওয়ালা বলিয়াছেন যে, বিগত বৎসরে ব্যবসা-মন্দার দরুণ ভারতে লৌহ-ইস্পাত ব্যবহারের সমষ্টির পরিমাণ শতকরা চল্লিশ ভাগ কমিয়া গেলেও ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দের তুলনায় টাটা কোম্পানীর তৈয়ারী ইস্পাতের ব্যবহার সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে ইহার পরিমাণ ভারতে ব্যবহৃত ইস্পাতের সমষ্টি পরিমাণের শতকরা মাত্র ২০ ভাগ ছিল; ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে টাটা কোম্পানীর ইস্পাতের পরিমাণ শতকরা ৬২ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও টাটা কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের অবস্থা উন্নতিলাভ করে নাই। ইহার আর্থিক অবস্থায় বিগত বৎসর বরং অবনতিই ঘটিয়াছে, বলিতে হইবে; এবং সে জন্য উক্ত কোম্পানী কেবল তাহার 'প্রেফারেন্স শেয়ার'এর উপরই লভ্যাংশ প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছে।

এরূপ বিপরীত ফলের কারণ হইল আমদানী ইস্পাতের অস্বাভাবিক মূল্য-পতন ও বিদেশী কারখানা-মালিকদের মারাত্মক প্রতিযোগিতা। মিঃ সাকলাতওয়ালা এ বিষয়ে যে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, ইউরোপীয় লৌহকারখানার মালিকেরা এখন যে দামে ইস্পাত ভারতে রপ্তানী করিতেছে, তাহাতে তাহাদের খরচ পোষাইবারও কথা নহে। ভারতীয় বাজার দখল করিয়া লইবার অভিপ্রায়েই তাহারা এরূপ অস্বাভাবিক ভাবে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এই মূল্য-পতনের গুরুত্ব শুধু একটী ব্যাপার হইতেই উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে যে, ষ্টারলিং-এর সহিত টাকার পরিবর্ত্ত-মূল্য কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও দেশী ইস্পাত আমদানী ইউরোপীয় ইস্পাতের সহিত টক্কর দিতে পারিতেছে না। এমন কি, বিগত সেপ্টেম্বর মাসে ধার্য্য অতিরিক্ত ২৫% আমদানী শুল্কও এ বিষয়ে দেশী কোম্পানীগুলির যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারিতেছে না। এজন্য মিঃ সাকলাতওয়ালা অন্যায় প্রতিযোগিতামূলক আমদানী বন্ধ করিবার জন্য প্রতিরোধমূলক আমদানী শুল্ক ধার্য্য করিবার পক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। মিঃ সাকলাতওয়ালার এই দাবী অনুসন্ধানসাপেক্ষ ব্যাপার।

সে যাহা হউক, ভারতীয় লৌহ-ইস্পাত-কারখানাগুলির বর্ত্তমান সঙ্কটের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। এই কারখানাগুলি মুখ্য ভাবে 'পিগ্ আয়রণ' বা কাঁচা লোহার নির্ম্মাণ এবং রপ্তানীর উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে ভারতীয় কারখানার তুলনামূলকভাবে বিশেষ কতকগুলি সুবিধা আছে বলিয়াই সাধারণের ধারণা আছে। কিন্তু ইদানীং বিদেশী প্রতিযোগিতা ইহাতেও বাদ সাধিয়াছে। "ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী"র বাৎসরিক সভায় চেয়ারম্যান স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুতর কারণ দর্শাইয়াছেন। ইউরোপে বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি কয়েকটি দেশে পিগ্ আয়রণ এখন 'বাই-প্রডাক্ট' বা উদ্বৃত্ত মাল হিসাবে তৈয়ার হইতেছে। কাজেই নির্ম্মাণ-ব্যয়ের উপর হিসাব করিয়া ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয় না। ফলে এই সকল দেশের কারখানা-মালিকেরা চরম সস্তা দরে এখন এই মাল বিদেশে রপ্তানী করিতে পারিতেছে। ভারতীয় 'পিগ আয়রণের' বাজার ইহার ফলে স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। ইহার উপর ভারতীয় লৌহের সর্ব্বাপেক্ষা বড় খরিদ্দার জাপান সম্প্রতি আমদানী লৌহের উপর শতকরা ৬ ইয়েন (অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ৮৲) হারে শুল্ক ধার্য্য করিয়া দিয়া ভারতীয় লৌহ-কারখানার ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারময় করিয়া তুলিয়াছে। এমতাবস্থায় ভারত-গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মতৎপর হইয়া যথাযথ ব্যবস্থা না করিলে লৌহ

কারখানাগুলি যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহাতে ইহার স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ভবিষ্যতে দুরূহ হইয়া উঠিবে।

"বেঙ্গল বোর্ড অফ্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্"
(বঙ্গীয় শিল্প-সহায়ক বোর্ড)

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় শিল্পোন্নতির সহায়তা করিবার জন্য যে আইন পাশ হইয়াছিল, তাহার ৩ ধারা অনুসারে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এক বোর্ড গঠন করিবার কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। উক্ত আইন অনুসারে 'বোর্ড'এর গঠনরীতি হইবে এই :

(ক) দুইজন মেম্বর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন,—কিন্তু তাহারা সরকারী কর্ম্মচারী হইতে পারিবে না ;

(খ) ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের একজন কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন ;

(গ) প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত দুই জন,—ইঁহারা কেহ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত মেম্বর হইতে পারিবেন না ;

(ঘ) 'বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স' কর্ত্তৃক মনোনীত একজন ;

(ঙ) 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অফ্ কমার্স' কর্ত্তৃক মনোনীত একজন ;

(চ) 'মাড়োয়ারী এসোসিয়েশন'এর প্রতিনিধি একজন ;

(ছ) 'ক্যালকাটা ট্রেড্স্ এসোসিয়েশন'এর প্রতিনিধি একজন ;

(জ) 'ডিরেক্টর অফ্ ইনডাষ্ট্রিজ্' (মেম্বর এবং সেক্রেটারী)।

উপরোক্ত বোর্ডের উদ্দেশ্য হইবে বাঙ্গালার বিবিধ শিল্পের জন্য কর্জ্জ দিবার সুবিধা করিয়া দিয়া তাহাদের সহায়তা করা। এজন্য বোর্ডের হাতে যে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইবে, তাহার মর্ম্ম নিম্নরূপ :—

(১) টাকা কর্জ্জ দেওয়া : এ বিষয়ে কারখানাবিশেষের সম্পত্তির নিট্ সমষ্টিমূল্যের অৰ্দ্ধপরিমাণ পর্য্যন্ত টাকা বোর্ড কর্জ্জ দিতে পারিবে, তাহার বেশী নহে। কর্জ্জের মেয়াদ ১০ বৎসরের অনতিদীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে,—তবে ভূ-সম্পত্তি বা দালানকোঠা বন্ধক দিলে মেয়াদের কাল ২০ বৎসর পর্য্যন্ত মঞ্জুর করা চলিবে। এ বিষয়ে কোন সমস্যার সমাধান করা বা কর্জ্জের চুক্তি—স্থান-কাল-পাত্রবিশেষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন ব্যাপার থাকিবে।

(২) ব্যাঙ্ক হইতে 'ওভার ড্রাফ্ট' বাবদ গৃহীত কর্জ্জে গ্যারাণ্টি দেওয়া।

(৩) শেয়ার গ্রহণ করা বা ডিবেঞ্চার খরিদ করিয়া কর্জ্জ দেওয়া (উল্লিখিত আইনে এ বিষয়ে পরিমাণ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে)।

(৪) ডিবেঞ্চার বা 'প্রেফারেন্স সেয়ারের' উপর গ্যারাণ্টি দেওয়া।

(৫) কোম্পানীর গৃহীত মূলধনের উপর নিম্নতম হারে লাভ বণ্টন করিবার গ্যারাণ্টি প্রদান।

(৬) সুবিধাদরে জমি, কাঁচামাল, জ্বালানি কাঠ বা জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া।

(৭) শিল্পসম্বন্ধীয় অনুসন্ধান, গবেষণা বা কলকব্জা খরিদ করিবার জন্য সাহায্য প্রদান।

(৮) দফাচুক্তিতে মূল্য-পরিশোধের সুবিধা দিয়া কলকব্জা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া।

বোর্ড কর্ত্তৃক ঋণ-পরিশোধ সম্বন্ধেও বিস্তারিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উল্লিখিত ঋণ-ব্যবস্থার সুবিধা যে কেবল বর্ত্তমান শিল্প-প্রতিষ্ঠানকেই দেওয়া হইবে, এমন নয়। কোন নূতন শিল্পের গোড়াপত্তন করিতে হইলে বা স্থান বিশেষে কোন শিল্প নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টায়ও প্রস্তাবিত বোর্ড সহায়তা করিতে পারিবে। কুটির-শিল্পকেও এই সুবিধা হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই।

বাঙ্গালার শিল্পের উন্নতিকামী এই আইন ও বোর্ডের গঠন-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিবার কিছু না থাকিলেও ইহাদের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে খুব আশান্বিত হওয়া কঠিন। ইহাদের কার্য্যকারীতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে টাকার সংস্থানের উপর। বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্টের যেরূপ আর্থিক অবস্থা চলিতেছে, তাহাতে সমস্ত প্রদেশের শিল্পোন্নতি করা সম্ভব হইতে পারে, এরূপ অর্থ সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই মনে করিতে হইবে। বস্তুতঃ চটকল, কটনমিল প্রভৃতি সুবৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য বর্ত্তমান আইনের দ্বারা কোন কালেই বিশেষ সহায়তা করা সম্ভব হইবে কিনা,

তাহাতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশে এরূপ আইন ইতিপূর্ব্বেই পাশ হইয়াছে, কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গালার তথা ভারতের বিবিধ শিল্পের কর্জ্জ-সমস্যা পূরণ করিতে হইলে শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বর্ত্তমান আইনে যে ব্যবস্থা করা সম্ভব, তাহাতে কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা নাতিবৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আংশিক রূপে সহায়তা করা সম্ভব হইতে পারে মাত্র।—তবে একথা ঠিক যে, বর্ত্তমানে শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্কের অভাব থাকা কালীন এই আইনের দ্বারা যতটুকু সহায়তা করা সম্ভব হইবে, তাহাও তুচ্ছ নহে।

অটোয়া-বৈঠকে স্যর অতুলের উক্তি

অটোয়া-সম্মিলনের অধিবেশনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পক্ষপাতমূলক ব্যবহারনীতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষসমর্থন করিয়া উক্ত সম্মিলনে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের নেতা হাই কমিশনর স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা প্রনিধানযোগ্য। স্যর অতুল ভারত সচিবের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে নেতা নির্ব্বাচন করিবার জন্য আত্মপ্রসাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ যে ক্রমশঃই স্বরাজের দিকে অগ্রসর হইতেছে, বর্ত্তমান নির্ব্বাচন তাহারই অন্যতম প্রমাণ। অনেকের নিকট স্যর অতুলের এই উক্তি হাস্যোদ্দীপক বলিয়া মনে হইবে। কোন সাম্রাজ্যবিষয়ক বা আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে ভারতের পক্ষে ইংরেজ প্রতিনিধি নিয়োগ না করিয়া, কোন ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীকে নির্ব্বাচন করিলে, তাহা ভারতীয়দিগের স্বাধীন নির্ব্বাচনেরই সামিল হইবে, তাহা আর কেহ বিশ্বাস করুক, স্যর অতুলের স্বদেশবাসীর নিকট তাহা কখনও স্বীকৃত হইবে না। সে যাহা হউক, স্যর অতুল যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কতকগুলির যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। স্যর অতুল বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ তাহার শিল্পোন্নতির সহায়তা করিবার জন্য সংরক্ষণমূলক শুল্কনীতি গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। এই নীতি এ পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পের পক্ষে যে বিশেষ সহায়ক হইয়াছেন, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এমতাবস্থায় সাম্রাজ্য-পক্ষপাতমূলকনীতি অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষে ধার্য্য আমদানী শুল্ক সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। স্বদেশী শিল্প-সংরক্ষণ-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিয়া এই নীতি অবলম্বন করিবার তাৎপর্য্য হইবে সাম্রাজ্যের বহির্ভূক্ত দেশের বিপক্ষে আমদানী-শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া, আর কিছু নহে। ভারতগবর্ণমেণ্টের রাজস্বের আদায় আমদানী-রপ্তানী শুল্কের উপর যেরূপ নির্ভরশীল, তাহাতে এই পথ ভারতের পক্ষে যে সুগম হইবে না, স্যর অতুল সে সম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন। পরিশেষে স্যর অতুল বলিয়াছেন যে, শুল্ক-নীতি-বিষয়ে ভারতগবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে, আসন্ন রাষ্ট্র-সংস্কারের পূর্ব্বে তাহাতে কোন প্রকার গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটন করা সমীচীন হইবে না। ভবিষ্যৎ ভারত-গবর্ণমেণ্টের এই প্রকার বিষয়ে স্বীয় কর্ম্ম-পদ্ধতি বাছিয়া লইবার স্বাধীন ক্ষমতা থাকা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। আমরা স্যর অতুলের এই অভিমত সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

ভারতে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের প্রসার

—শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস

ব্যবসায় জগতে "কমার্সিয়াল" ব্যাঙ্কের স্থান কত উচ্চে তাহা সকলেই জানেন। অল্পসুদে অল্পকালের জন্য টাকা ধার নিয়া ব্যবসাবাণিজ্যে যাঁরা লিপ্ত আছেন তাঁহাদিগকে সাহায্য করা হইল এই সব ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। পণ্যদ্রব্য তৈয়ারী করার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল ক্রয় করা, এবং শিল্পজাত দ্রব্য দেশে ও বিদেশে বিক্রয় করিবার জন্য যে পরিমাণ মূলধনের দরকার হয় একমাত্র কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাহা সরবরাহ করা একপ্রকার দুঃসাধ্য। এই কারণে কোনও দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি সেই দেশের কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের প্রসার ও সম্পদের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কাজেই ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণ ভারতীয় পরিচালিত কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক না থাকার দরুণ ব্যবসাবাণিজ্যে দেশীয় লোকেরা খুব বেশী প্রাধান্য এবং সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই।

দেশীয় ব্যাঙ্কের প্রসার ও সম্পদ

আমাদের দেশে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের প্রসার যে এ যাবৎ খুবই কম হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত দুই একটী তথ্য হইতে বুঝা যাইবে। ভারতবর্ষে যৌথনীতি অনুসারে গঠিত এবং পরিচালিত যে সব ব্যাঙ্ক আছে, তাহাদিগকে মোটামুটি হিসাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়; যথা: ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক, (প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাত্র একটা হইলেও ইহাকে একটী শ্রেণী হিসাবে গণনা করা যায়), প্রধানতঃ আঠারটি বহির্বাণিজ্য-সহায়ক বিদেশী ব্যাঙ্ক (এক্স্চেঞ্জ ব্যাঙ্ক), ভারতবর্ষে সমিতিবদ্ধ ৭৮টি কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক। ১৯২৯ সালে সর্ব্বশুদ্ধ এই ৯৭টি ব্যাঙ্কে আমানতকারীদের মোট ২১২ কোটি টাকা জমা ছিল। এই টাকার মধ্যে মাত্র ৬৬ কোটি টাকা জমা ছিল উপরোক্ত ৭৮টী কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কে; ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কে জমার পরিমাণ ছিল ৭৯ কোটি টাকা এবং ১৮টী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কে ৬৭ কোটি টাকা জমা ছিল।

অর্থাৎ গড়পড়তা প্রতি "দেশীয়" কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের জমার পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকা অপেক্ষাও অনেক কম। কিন্তু ইহাতেও ইহাদের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে না; কারণ এই ৭৮টী ব্যাঙ্কের মধ্যে এমন ৯টী ব্যাঙ্ক আছে, যাহাদের প্রত্যেকের জমার পরিমাণ এক কোটি টাকার বেশী, এবং এই শেষোক্ত ৯টী ব্যাঙ্কের মধ্যে ৫টি ব্যাঙ্কের প্রত্যেকের পাঁচ কোটি টাকার বেশী জমা আছে। অর্থাৎ বাকী ৬৯টী ব্যাঙ্কের মোট জমার পরিমাণ ৩৬ কোটি টাকারও কম।

এই সব ব্যাঙ্কে কত মূলধন খাটিতেছে ও তাহাদের রিজার্ভ ফাণ্ডে কত টাকা আছে—সে দিক দিয়া বিচার করিলেও আমাদের দৈন্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। ৭৮টী কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের মোট মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ডের পরিমাণ ১৯২৯ সনে ছিল মাত্র ১২ কোটি ৬৯ লক্ষ। এবং অন্যূন ৫ লক্ষ টাকা মূলধনও রিজার্ভ আছে এমন ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৩; বাকী ৪৫টী ব্যাঙ্কের মোট মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ১৯২৯ সালে ছিল ১ কোটি ১৫ লক্ষ।

আমানতি টাকার স্বল্প পরিমাণ হইতেই আমাদের দেশে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের সঙ্কীর্ণ প্রসারের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু ইহাই একমাত্র প্রমাণ নহে। ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ২৩০০টী সহর আছে, তন্মধ্যে মাত্র ৩৯৪টী সহর ছাড়া আর অন্য কোথাও কোনও যৌথ ব্যাঙ্ক কিম্বা তাহার শাখা কিছুই নাই; এবং এই ৩৯৪টী সহরের প্রত্যেকগুলিতেই যে একটী কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক কিম্বা তাহার শাখা আছে এমনও নহে। কারণ এমন অনেক সহর আছে যেখানে মাত্র ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের একটী শাখা কিম্বা নিদেন পক্ষে একটী এজেন্সী আছে; এবং অনেক সহরেই বাংলা দেশের ছোটখাট লোন আফিসের মতন প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনও "ব্যাঙ্ক" নাই।

প্রসার কিম্বা সম্পদ যে দিক দিয়াই ব্যাপারটীর আলোচনা করা যায় কোনও দিক হইতেই আমাদের গৌরব করিবার কিছু নাই। আমাদের দেশে বিদেশী যে সব ব্যাঙ্ক আছে, আয়তন কিম্বা মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড কিম্বা আমানতি টাকার পরিমাণ যে-কোনও হিসাবে আমাদের অধিকাংশ ব্যাঙ্ক

তাহাদের তুলনায় নগণ্য—বিদেশের বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির কথা না হয় নাই ধরিলাম।

মহাজনী ব্যবসায় ও কমার্শিয়্যাল ব্যাঙ্ক

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে ভারতবর্ষে ৩৯৪টী সহর ছাড়া অন্যস্থানে ব্যবসায়িগণের পক্ষে তাঁহাদের ব্যবসায় চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা পাওয়ার কোনও উপায় নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে। কমার্সিয়্যাল ব্যাঙ্কের যাহা প্রধান কাজ আমাদের দেশে বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই মহাজনেরা সেই সব কাজ করিয়া আসিতেছেন। ব্যবসায়ীরা এই সব মহাজনদের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া তাঁহাদের ব্যবসায় চালাইয়াছেন। কিন্তু ইংরাজী আমলের পর হইতে নানা কারণে ইহাঁদের কার্য্যের গণ্ডী ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই পরিমাণে যে-সব যৌথ-প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কের কাজ আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র বাড়িয়া চলিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় সাধারণ লোকেরা মহাজনদের নিকট তাহাদের সঞ্চিত টাকা গচ্ছিত রাখিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় ইঁহাদের পক্ষে ব্যবসায়িদিগকে টাকা ধার দেওয়া কতক পরিমাণে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে; এবং অনেক সময় কমার্সিয়্যাল ব্যাঙ্ক, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক প্রভৃতির সহিত প্রতিযোগিতায় ইঁহারা হটিয়া যাইতেছেন। অবশ্য ভারতবর্ষের ৩৯৪টী সহর ছাড়া অন্য সকল স্থানেই ইঁহাদের প্রতিপত্তি এখনও যথেষ্ট আছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বলা যায় যে বর্ত্তমান যুগের বিরাট ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় টাকা ধার দেওয়ার ক্ষমতা ইঁহাদের নাই, এবং ভবিষ্যতেও যে কোনও কালে থাকিবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কাজেই যদিও বর্ত্তমানে আমাদের দেশের অনেক ব্যবসাদার একান্ত বাধ্য হইয়াই মহাজনদের শরণাপন্ন হইতেছেন, তথাপি ভবিষ্যতে তাঁহাদের ব্যবসায়ের প্রসার বাড়াইতে হইলে সমগ্র দেশের মধ্যে আধুনিক প্রথায় পরিচালিত অসংখ্য কমার্সিয়্যাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বস্তুতঃ ইহা এখন আমাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহার সমাধান হইতে পারে তাহা বুঝিতে হইলে এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে কমার্সিয়্যাল ব্যাঙ্কের প্রসার আশানুরূপ হইল না কেন তাহার আলোচনা করা দরকার।

বিদেশী "এক্স্চেঞ্জ ব্যাঙ্ক"এর সহিত প্রতিযোগিতা

এই সম্বন্ধে প্রথমেই ভারতবর্ষে যে-সব বিদেশী ব্যাঙ্ক কারবার করে তাহাদের সহিত দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির প্রতিযোগিতার কথা বলা যায়। সকল দেশেই কমার্সিয়্যাল ব্যাঙ্কগুলি আভ্যন্তরিক ব্যাবসা-বাণিজ্যের সাহায্যের জন্য যেমন টাকা ধার দেয়, তেমনি আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যেরও সাহায্য করে। কিন্তু আমাদের দেশে ঘটনাক্রমে এই শেষোক্ত ব্যাপারটী সম্পূর্ণ ভাবে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিরই একচেটিয়া কারবার হইয়া গিয়াছে। এই কারণে চলিত ভাষায় ইহাদিগকে এক্স্চেঞ্জ ব্যাঙ্ক বলা হয়। আয়তন ও সম্পদে এই বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির প্রায় সকলেরই অবস্থা আমাদের দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি অপেক্ষা ভাল, এবং এদেশে তাহারা কারবারও করিতেছে অনেক দিন হইতে। এই সমস্ত কারণে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপারে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির কোনও হাতই নাই। কিন্তু বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি যে কেবল আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য হইতেই দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিকে সরাইয়া রাখিয়াছে, তাহা নহে—আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও ক্রমশঃ তাহারা হস্তক্ষেপ করিতেছে; এবং অনেকক্ষেত্রে তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি হারিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে ব্যবসায়িগণকে টাকা ধার দিয়া সুদ বা ডিস্কাউণ্ট বাবত ব্যাঙ্কের যে লাভ হয়, তাহার অধিকাংশই এই সমস্ত বিদেশী ব্যাঙ্কের হাতে চলিয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া কেবল যে টাকা ধার দেওয়ার ব্যাপারেই দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় পারিতেছে না, তাহা নহে; আমানতি টাকার পরিমাণ হিসাব করিলেও এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ১৯২৯ সালে ভারতবর্ষে সকল প্রকার ব্যাঙ্কের মোট আমানতি ২১২ কোটি টাকার মধ্যে ৭৮টী "দেশীয়" অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় আইন দ্বারা শাসিত কমার্সিয়্যাল ব্যাঙ্কের মোট অংশ ছিল ৬৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা এবং বিদেশী এক্স্চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির অংশ ছিল ৬৬ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু ইহা হইতে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির প্রকৃত অবস্থা জানা যাইবে না। কারণ উপরোক্ত ৭৮টী ব্যাঙ্কের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যাঙ্ক—এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক—দেশীয় ব্যাঙ্ক নহে। ইহার মূলধন প্রায় সমস্তই বিদেশীদের হাতে; বস্তুতঃ ইহা অন্যতম এক্স্চেঞ্জ ব্যাঙ্ক "পি য়্যাণ্ড ও ব্যাঙ্কিং

কর্পোরেশনের" শাখা মাত্র ; এবং ইহার পরিচালকবর্গ এবং প্রধান কর্ম্মচারীগণ সকলেই বিদেশী। কাজেই ইহাকে যদি একটী বিদেশী ব্যাঙ্ক বলা যায় তাহা হইলে কিছুমাত্র অন্যায় করা হয় না। এই হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে ১৯২৯ সালে ১৯টী "বিদেশী" ব্যাঙ্কের ৭৮ কোটি আমানতি টাকার তুলনায় ৭৮টী দেশীয় ব্যাঙ্কের আমানতি টাকার পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ আমাদের দেশের লোকের আমানতি টাকার যত অংশ দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির হাতে আসিয়াছে, বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির হাতে আসিয়াছে তাহার দেড় গুণেরও বেশী, যদিও দেশীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা বিদেশী ব্যাঙ্কের সংখ্যার চার গুণেরও বেশী !

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত প্রতিযোগিতা

দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির প্রসার যে কেবল শক্তিশালী বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির সহিত প্রতিযোগিতার ফলেই ব্যাহত হইয়াছে তাহা নহে, ইহার জন্য ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের দায়িত্বও কম নহে। ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ককে প্রকৃতপক্ষে দেশীয় ব্যাঙ্ক বলা যায় না; কারণ ইহা আমাদের দেশীয় আইন দ্বারা শাসিত হইলেও ইহার অংশীদারগণ অধিকাংশই বিদেশী, এবং পরিচালক সভায় কিম্বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের মধ্যে দেশীয় ব্যক্তি খুবই কম আছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা একটী আধা সরকারী ব্যাঙ্ক। অন্যান্য দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কতকগুলি কাজ ইহাকে করিতে হয় বটে, কিন্তু সেই তুলনায় ইহাকে যে সমস্ত সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহা কোনও দেশে খাঁটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছাড়া আর কাহাকেও দেওয়া হয় না। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সংগৃহীত রাজস্ব সবই ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে বিনা সুদে জমা রাখা হয়। অথচ অন্যান্য দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে যেমন সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়া হয় না, আমাদের দেশে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের বেলায় সেরূপ কোনও নিয়ম করা হয় নাই। ফলে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক অবাধে বেসরকারী দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ, এই তিনটী সহর ছাড়া ভারতবর্ষের আরও ১৬০টি সহরে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা রহিয়াছে এবং প্রতিযোগিতায় দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছে। ফলে ১৯২৯ সালে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির মোট ৫৫ কোটি টাকা আমানতির তুলনায় ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক ৭৯ কোটি টাকা আমানত পাইয়াছিল; ইহা হইতে গভর্ণমেণ্টের জমা ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বাদ দিলে সাধারণ লোক এবং ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ৭১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়।

দেশীয় লোকের "বিজাতীয়" মনোভাব

বিদেশী ও ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত এইরূপ প্রতিযোগিতার ফলে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি যে বিশেষ উন্নতি করিতে পারে নাই তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির এই স্বল্প পরিমাণ উন্নতির কারণ আরও আছে। তন্মধ্যে এই সব ব্যাঙ্কের প্রতি আমাদের দেশের লোকদের মনোভাবের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের অনেক লোকের ধারণা যে যা কিছু দেশী তার সবই মন্দ এবং যা কিছু বিদেশী তা' সবই ভাল। দেশী ব্যাঙ্কে টাকা রাখিলে তাহা খোয়া যাইবে এই আশঙ্কা করিয়া অনেকেই তাঁহাদের টাকা বিদেশী ব্যাঙ্কে রাখেন। এইরূপ মনোভাব যে আমাদের জাতীয় উন্নতির বিশেষ পরিপন্থী এবং এই আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক তাহা বলা বাহুল্য। অবশ্য আমাদের দেশে যে কোনও ব্যাঙ্ক কোনও দিন "ফেল" পড়ে নাই, তাহা নহে। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের দুর্গতি ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালীর পক্ষে খুবই লজ্জাজনক এবং এই বিষয়ে ব্যাঙ্কের বাঙ্গালী পরিচালকগণের দায়িত্বও কম নহে। কিন্তু এই সম্পর্কে এই কথা বলা যায় যে একটা জাতির ইতিহাসে এইরূপ একটী মাত্র ব্যাঙ্কের পতন কিছুই নহে ; ইংলণ্ডে ও অন্যান্য সব দেশেই ব্যাঙ্ক-গঠনের প্রথম অবস্থায় এইরূপ কত ব্যাঙ্ক যে "ফেল" হইয়াছে, তাহার ইয়ত্বা নাই। এমন কি, অন্যতম সভ্যদেশ আমেরিকাতে বর্ত্তমান সময়েও অসংখ্য ব্যাঙ্কের পতন হইতেছে ; কাজেই ইহাতে নিরুৎসাহ হইবার কোনও কারণ নাই। দ্বিতীয়তঃ এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে যে সব ব্যাঙ্ক কিম্বা অন্য কোনও যৌথ-প্রতিষ্ঠানের পতন ঘটিয়াছে, তাহার জন্য দেশীয় অংশীদারেরাও কম দায়ী নহেন। কারণ অংশীদারেরাই যৌথ প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত মালিক, এবং তাঁহাদের চোখে ধুলা দিয়া যদি কোনও প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও কর্ম্মচারীগণ অর্থের অযথা

অপব্যয় করেন তাহা হইলে তাঁহাদের দায়িত্ব কম থাকে না। আমাদের দেশে এই কারণেই এখন পর্য্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাঙ্কগঠন প্রভৃতি ব্যাপারে খুব বেশী উন্নতি হয় নাই।

দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করা উচিত কেন ?

কিন্তু সে যাহাই হউক, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং কমিটী আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক-নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন। আশা করা যায় যে এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইলে পর দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের কর্ত্তব্যে আর কোনও রূপ অবহেলা করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাই বলিয়া যে এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হওয়ার পূর্ব্বে দেশীয় ব্যাঙ্কের উপর আমানতকারীদের আস্থা থাকিবে না এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। প্রথমতঃ বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির প্রকৃত অবস্থা যে কি তাহা আমাদের পক্ষে এখান হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা খুবই কঠিন। তাহা ছাড়া তাহাদের উদ্বর্ত্তপত্রে (Balance Sheet) যে সমস্ত তথ্য থাকে তাহাও যথেষ্ট নহে। সেই তুলনায় আমাদের এখানকার ব্যাঙ্কগুলি সম্বন্ধে আমরা এখানে থাকিয়া অনেক কিছুই জানিতে পারি; ব্যাঙ্কের পরিচালক ও কর্ম্মচারীগণ সকলেই দেশীয় ব্যক্তি এবং তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ আলাপ করিয়া এবং বহু তথ্যসম্বলিত উদ্বর্ত্তপত্র হইতে আমাদের পক্ষে ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবার যথেষ্ট সুবিধা আছে। এই অবস্থায় আমাদের দেশের লোকেরা কেন যে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিতে তাঁহাদের সঞ্চিত টাকা রাখেন তাহা বুঝা কঠিন। সকলেরই বুঝা উচিত যে আমাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি অনেক পরিমাণেই নির্ভর করে দেশীয় ব্যাঙ্কের উন্নতির উপর। কারণ যদিও বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি কতক-পরিমাণে আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যবসাবাণিজ্যের সাহায্যের জন্য টাকা ধার দেয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা তাহাদের সমস্ত টাকা বহির্ব্বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যবসায়ীগণকেই ধার দিয়া থাকে এবং সেই হিসাবেও আমাদের খুব সুবিধা নাই; কারণ যে সমস্ত দেশীয় ব্যবসায়ী বহির্ব্বাণিজ্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা অনেক সময়ই বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি হইতে কোনওরূপ সাহায্য পান না। অথচ দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিতে যদি আমরা আমাদের সঞ্চিত টাকা জমা রাখিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করি তাহা হইলে পরোক্ষভাবে আমাদের ব্যবসাবাণিজ্যেরই সাহায্য করিব। এই কথা মনে রাখিয়া আমাদের দেশের লোকেরা ক্রমে ক্রমে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি হইতে তাঁহাদের জমা টাকা তুলিয়া নিয়া তাহা দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিতে রাখিবেন। বর্ত্তমান জাতীয় আত্মচেতনার দিনে তাহা আশা করা কি একেবারেই অসঙ্গত ?

বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক প্রচেষ্টা

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশের ব্যাঙ্কগুলি বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় খুব বেশী উন্নতি করিতে না পারিলেও ক'য়েকটী দেশীয় ব্যাঙ্কের অবস্থা নিতান্ত খারাপ নহে। উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে অন্ততঃ ৯টী ব্যাঙ্কের প্রত্যেকের আমানতি টাকার পরিমাণ ১ কোটি টাকার বেশী এবং ৫টী ব্যাঙ্কের প্রত্যেকের আমানতি টাকার পরিমাণ ৫ কোটি টাকার বেশী। কিন্তু নিতান্ত লজ্জার বিষয় যে এই ৯টী ব্যাঙ্কের একটীও বাঙ্গালী-পরিচালিত নহে। সকল ব্যবসায়ের ন্যায় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়েও বাঙ্গালী যে এখন পর্য্যন্ত খুবই পিছনে পড়িয়া আছে ইহা তাহারই আর একটী পরিচয়। বাঙ্গালী যদি এখনও এই বিষয়ে অবহিত না হয়—তাহা হইলে আমরা যে ব্যবসাবাণিজ্যে কেবল বিদেশের তুলনাতেই পশ্চাৎপদ থাকিব তাহা নহে; ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরাও আমাদিগকে অনেক পিছনে রাখিয়া অগ্রসর হইয়া যাইবে। এই বিষয়ে এখন হইতেই আমাদের দেশের নেতাদের দৃষ্টি পড়া উচিত।

বীমা-প্রসঙ্গ

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ও প্রুডেন্সিয়াল এসিওরেন্স কোং লিঃ

মাস দুই হইল বোম্বাইএর অন্যতম উন্নতিশীল বীমা কোম্পানি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ও প্রুডেন্সিয়ালের গত ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩১ পর্য্যন্ত এক বৎসর কালের কার্য্য-বিবরণী ও হিসাবপত্র শেয়ার-হোল্ডারদের সাধারণ সভায় গৃহীত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের দারুণ অর্থসঙ্কটের মধ্যেও কোম্পানি যেরূপ সাফল্য বজায় রাখিতে পারিয়াছে তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

সাধারণ বিভাগে ১৯৩১ সালে ৬০ লক্ষ ২৮ হাজার টাকার জন্য ২৭২২টী বীমার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে ২৪০৬টী প্রস্তাবে ৫০ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকার বীমার পলিসি হয় ও অবশিষ্ট নামঞ্জুর অথবা বিবেচনাধীন থাকে। গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানির মোট চল্‌তি বীমার পরিমাণ ছিল ২ কোটি ১২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭০ টাকার এবং পলিসির সংখ্যা হইয়াছিল ১০,৪০০ খানা।

আলোচ্য বর্ষে সাধারণ বিভাগে মৃত্যুর জন্য এবং বীমার চুক্তির মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কোম্পানিকে ২ লক্ষ ৮৭ হাজার ১০৫ টাকার ১৬৮টী বীমার দাবী বিচার করিতে হয়, এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল বিভাগে ২০৯২ টাকার মাত্র ৯টী দাবী সংঘটিত হয়। এই সকল দাবী মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা শীঘ্রই মিটাইয়া দেওয়া যাইবে।

কোম্পানির আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে জীবন বীমার ফণ্ড পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ২৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৬৪ টাকা হইতে ২৯ লক্ষ ২৫ হাজার ২৬২ টাকায় সংবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং ইহা ছাড়া কোম্পানির রিজার্ভ ফণ্ডে রহিয়াছে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৮৬৬ টাকা ও আমানতি টাকার মূল্য হ্রাস বৃদ্ধির দরুণ প্রায় ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ১৪০ টাকা রাখা হইয়াছে। কোম্পানির বীমার দায়িত্ব হিসাবে এই গচ্ছিত টাকার পরিমাণ যথেষ্ট বলিয়া মানিতেই হইবে। কোম্পানির কাগজ ও সিকিউরিটির মূল্য ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে অসম্ভাবিতরূপ নামিয়া গিয়াছিল বলিয়া উহার ক্রয়ের মূল্য ধরিয়া কোম্পানির স্থিতির পরিমাণ ধরা হইয়াছে। এরূপ ভাবে স্থিতির মূল্য ধরা আইনতঃ সামান্য দূষনীয় হইলেও এবারে ইহা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। বিশেষতঃ পরবর্ত্তী কয়েক মাসে এই সকল সিকিউরিটীর মূল্য যথেষ্ট বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং ক্রয়ের মূল্য ধরিয়াও কোম্পানির বেশ উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

ইন্সিওরেন্স কোম্পানির সিকিউরিটির মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি লইয়া যথেষ্ট আলোচনা ও মতভেদ চলিতেছে। এ সম্বন্ধে আমরা বলিতে চাই যে এই সকল বহুকাল স্থায়ী আমানতের সাময়িক মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি দেখিয়া চঞ্চল হইবার কোন কারণ নাই। আসল দ্রষ্টব্য হইতেছে কোম্পানির হস্তস্থিত অর্থের দরুণ বাৎসরিক সুদ অথবা লাভের হার ঠিক আছে কিনা এবং উহার নিরাপত্তা সম্পূর্ণ রহিয়াছে কিনা। দুই হিসাবেই এই কোম্পানির আমানতি টাকা ভাল ভাবেই রহিয়াছে।

কোম্পানির আয় ব্যয়ের হিসাব হইতে দেখা যায় যে মোট আয়ের তুলনায় পরিচালনার খরচ হইয়াছে শতকরা ২৯.৫ অংশ। ইহা ভালই বলিতে হইবে। কিন্তু প্রথম বৎসরের আয়ের তুলনায় প্রথম বৎসরের কাজের দরুণ যে খরচ হইয়াছে তাহা শতকরা একশত টাকারও বেশী হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ এদিকে একটু মনোযোগ দিলে বোধ হয় ভাল হয়। যাহাই হোক্ গত বৎসরের কাজের লভ্যাংশ হইতে শেয়ার হোল্ডারদিগকে শতকরা ৬।০ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় কোম্পানির মধ্যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্রুডেন্সিয়াল খুবই উন্নতিশীল সন্দেহ নাই। ইহার ডিরেক্টর বোর্ড যেরূপ তাহাতে কোম্পানি যে সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যলাভ করিবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বীমাবিষয়ক প্রতারণা

সম্প্রতি সুসভ্য ফরাসী দেশ হইতে জীবনবীমা কোম্পানীকে প্রতারণা করিবার একটী অদ্ভুত উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। লুই দুরান্দ্ নামক এক ব্যক্তি কোন বীমা-কোম্পানীতে অনেক টাকার জন্য জীবনবীমা করেন। কিছুদিন পরে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কোন ঔষধের সাহায্যে তিনি মৃতবৎ হইয়া থাকেন।

মাদাম দুরান্দ্ স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট প্রচার করিয়া শোক প্রকাশ করিতে থাকেন এবং সমবেত ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে স্বামীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন করেন। এদিকে দুরান্দ্ সাহেব জ্ঞানলাভ করিয়া আনিত কফিনের মধ্যে মৃত্তিকা বোঝাই করিয়া তাহা বন্ধ করেন এবং নিজে লুক্কায়িত অবস্থায় থাকেন। ভদ্রাভদ্র বহু ব্যক্তির সমক্ষে মৃত্তিকাপূর্ণ কফিনটিকে কবরস্থ করা হয়। শোকসন্তপ্তা শ্রীমতী দুরান্দ এদিকে বীমা-কোম্পানী হইতে দাবীকৃত অর্থ সংগ্রহ করিয়া লুক্কায়িত স্বামীর সহিত মিলিত হয়েন। ফরাসী-দম্পতি বহুদূরস্থ একটী গ্রামে একটি ক্ষুদ্র বাটি ক্রয় করিয়া নূতন নাম গ্রহণ করিয়া আনন্দে কালযাপন করিতে থাকেন। ধর্ম্মের গতি নাকি সূক্ষ্ম তাই অল্পদিনের মধ্যেই দৈবাৎ একটী পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুবরের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি রহস্য উদ্ভেদের জন্য পুলিশে খবর প্রেরণ করিলেন। ফলে স্বামী-স্ত্রী ধৃত হইয়া আদালতের বিচারে যথাক্রমে ৪ ও ২ বৎসরের জন্য শ্রীঘর-বাসের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বেও আমাদের দেশের কয়েকটী প্রতারণা-মূলক জীবনবীমার বিষয় পাঠকদিগকে জানাইয়াছি। বর্ত্তমানে এই প্রকারের প্রতারণার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। বীমাকোম্পানীগুলির ক্রমাগত নূতন বীমাকার্য্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা যে এইরূপ প্রতারণামূলক বীমার একটী কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে বীমা-আফিসগুলির সম্মিলিত চেষ্টা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের কয়েকটী কোম্পানীতে বর্ত্তমানে এইরূপ একটী সন্দেহজনক দাবী আসিয়াছে এবং সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইতেছে আমরা এরূপ সংবাদ অবগত হইয়াছি।

পরলোকগত মিঃ জর্জ্জ কিং

গত ২রা জুলাই ৮৫ বৎসর বয়সে সুবিখ্যাত একচুয়ারী (Actuary) Mr. George King F.I.A., F.F.A.H. মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। মিঃ কিং প্রথমে লণ্ডনে Alliance Assurance কোম্পানীর হেড্ অফিসে একটী সাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। ১৯০১ সালে তিনি সে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে একচুয়ারী ব্যবসা পরিচালনা আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা, অমায়িকতা প্রভৃতি গুণে উত্তরকালে তিনি সমস্ত পৃথিবীতে নিজ-খ্যাতি বিস্তার করিয়াছিলেন। লণ্ডনের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান Institute of Actuariesএর সহিত তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হইলেন এবং পরে Vice-Presidentএর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বীমা-জগতে যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে।

প্রেসিডেণ্ট ডি, ভেলেরা ও জীবনবীমা

আয়র্ল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের মধ্যে বর্ত্তমান শুল্ক-যুদ্ধ ক্রমে সমস্ত ব্যবসায়েই সংক্রামিত হইয়া উঠিতেছে। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজ কোম্পানীদিগকে আয়র্লণ্ডে বীমার পলিশি প্রদান করিতে প্রতি ১০০ পাউণ্ডে ১ শিলিং ষ্টাম্প দিতে হইত। বর্ত্তমানে প্রেসিডেণ্ট মহোদয় তাহা বৃদ্ধি করিয়া ৪ শিলিং করিয়াছেন। ইহা কি বর্ত্তমান tariff warএর অংশ অথবা স্বদেশী বীমা-কোম্পানীগুলিকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা তাহা কিছুদিন পরেই বুঝা যাইবে।

ভারতীয় ডাক বিভাগের জীবন-বীমার মূল্য-পরিমাণ বৃদ্ধি

ভারতীয় ডাক বিভাগে জীবন বীমা-সম্পাদনের ব্যবস্থা আছে। ডাক-বিভাগের কর্ম্মীদের জন্যই বিশেষ করিয়া এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ যাবৎ এই প্রকার বীমার সহিত সাধারণ জীবন-বীমা কোম্পানীর কোন প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় নাই, কারণ ব্যক্তিবিশেষের জীবনের উপর ডাক-বিভাগে সম্পাদিত বীমার এরূপ পরিমাণ নির্দ্দেশ ছিল, যাহার ফলে সাধারণ বীমা কোম্পানীগুলির কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। বিশেষতঃ এ পর্য্যন্ত স্বল্প-সংখ্যক লোক মাত্রই ডাক-বিভাগে জীবন-বীমা সম্পাদন করিয়াছে।

সে যাহা হউক, এখন এই প্রকার গভর্ণমেণ্ট-পরিচালিত বীমা-ব্যবস্থা সাধারণ জীবন-বীমা কোম্পানীর পক্ষে আশঙ্কা জনক হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট এই ইস্তাহার জারী করিয়া এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, এখন হইতে ডাক-বিভাগে যে কোন ব্যক্তি ২০,০০০৲ মূল্যের জীবন-বীমা-সম্পাদন করিতে পারিবে। এই প্রকারে ডাক-বিভাগে সম্পাদিত জীবন-বীমার মূল্য বৃদ্ধি করিবার ফলে ডাক-

বিভাগের সহিত সাধারণ জীবন-বীমা কোম্পানীর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিয়া বিগত ২২শে জুন তারিখে ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইন্‌স্টিটিউটের সভাপতি স্যর নীলরতন সরকার মহাশয় উক্ত ইন্‌স্টিটিউটের পক্ষ হইতে গভর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট-পোষিত কোন বিভাগের সাধারণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা করা যে সঙ্গত নহে, উক্ত আবেদনে এই আপত্তিই বিশেষ করিয়া উত্থাপন করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে অপর কয়েকটী দেশের সরকারী বীমা-ব্যবস্থার সহিত ভারতীয় ডাক-বিভাগের জীবন-বীমা-সম্পাদনের ব্যবস্থা তুলনা করা হইয়াছে। ইংলণ্ডে গভর্ণমেণ্ট জীবন-বীমা-সম্পাদনের ব্যবস্থা করিতে গিয়া স্বল্প-কাল মধ্যেই এই প্রচেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছেন। জাপানে ডাক-বিভাগের নিয়ন্ত্রণে বীমা-সম্পাদনের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু এই প্রকার বীমার সুযোগ কেবল মাত্র তদ্দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিই পাইয়া থাকে। সর্ব্ব-সাধারণের জন্য এই প্রকার গভর্ণমেণ্ট-পরিচালিত জীবন-বীমার ব্যবস্থা জাপানে এখনও প্রচলিত হয় নাই। অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণমেণ্ট বীমা-সম্পাদনের ব্যবস্থা করিয়াছে সত্য, কিন্তু সেখানেও জীবন-বীমার উপর গভর্ণমেণ্ট এখনও হস্তক্ষেপ করে নাই। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্যর নীলরতন গভর্ণমেণ্টের নিকট ইস্তাহার রদ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছেন। আমরা ইন্সিওরেন্স ইনসটিটিউটের আবেদনের সঙ্গতি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতেছি। ভারতবর্ষে জীবন-বীমার প্রসার অন্যান্য দেশের তুলনায় সামান্য মাত্র হইয়াছে, বলিতে হইবে। এখনও ইহার বহুল প্রসার আবশ্যক। এমতাবস্থায় গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সাধারণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তাহাদের ব্যবসায়ে নিরুদ্যম ও ক্ষতির কারণ সৃষ্টি করা কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না।

পলিসি সর্ত্ত মূলে দাবী

সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টে পলিসি মূলে দাবী বিষয়ক একটী মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গিয়াছে। বাদী শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন Allianz Und Stuttgarter নামক জার্ম্মান বীমা কোম্পানীর নামে একটী বীমা পলিসির assignee হিসাবে ১০,০০০৲ টাকার দাবী উপস্থিত করেন। পলিসিটী কোন মহিলার নামে হইয়াছিল। ১৯৩০ সনের ১০ই জুন বাদী এই পলিসির assignment গ্রহণ করেন। উক্ত সনের ১২ই অক্টোবর তারিখে উক্ত মহিলার মৃত্যু হওয়ায় সেন মহাশয় পলিসির টাকা দাবী করেন। কোম্পানী কিছু দিন পর পত্র লেখেন যে তাঁহারা দাবী স্বীকার করেন না কারণ মৃতের বয়স ও অন্যান্য বিষয়ে অসত্য বিবরণের উপর এই পলিসি প্রদান হইয়াছিল। বাদীর পক্ষের কৌসুলী বলেন যে পলিসি লইবার পূর্ব্বে মৃত মহিলা একটী টিউমার হইয়া ভুগিতেছিলেন কিন্তু কিছুদিন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য হইয়াছিলেন, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত টিউমার সম্বন্ধে কোন কথা বীমার প্রস্তাবে উল্লেখ করেন নাই। বাদী স্বীকার করেন না যে প্রস্তাবে মৃতার বয়সও কম করিয়া লেখা হইয়াছিল। প্রতিবাদীর পক্ষ হইতে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া দেখান হয় যে মৃতা প্রস্তাবের সময় জীবন হানিকর টিউমার রোগে ভুগিতেছিলেন। বিচারপতি মহোদয় মত প্রকাশ করেন যে পলিসির সর্ত্ত মত প্রস্তাবকারী তাঁহার বয়স ও শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে সমস্ত সত্য কথা বলিতে বাধ্য। তাহার পর বাদী পক্ষ আর মোকদ্দমা চালাইতে প্রস্তুত না থাকায় মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়াছে। উপরোক্ত মোকদ্দমার প্রতি আমরা সাধারণ বীমাকারী ও এজেণ্টদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আজকাল অনেক এজেণ্ট ও বীমাকারী বীমা প্রস্তাব পত্রের গুরুত্ব একেবারেই ভুলিয়া যান, ফলে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা বীমা প্রস্তাবে থাকিয়া যায়। ইহার ফল যে কত দূর গুরুতর তাহা এজেণ্টদিগেরও বীমা প্রস্তাবকারীকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

কোম্পানীর কাগজের মূল্য হ্রাস ও বীমা কোম্পানী

ইতিপূর্ব্বে আমরা এই গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি এবং পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি যে কতকগুলি বৃহৎ ও পুরাতন বীমা কোম্পানী এ বিষয়ে ভারত সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে ভারত সরকার বীমা কোম্পানীগুলিকে গত ৫ বৎসরের গড়পড়তায় কোম্পানীর কাগজের দর ধরিয়া ভ্যালুয়েশন করিতে অনুমতি দেন নাই। কিন্তু তাঁহারা অনুমতি দিয়াছেন যে, যে সময়ে ভ্যালুয়েশন করা হইতেছে সেই সময়ের

বাজার দর কোম্পানীগুলি গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু এই জন্য যদি কোন উদ্বৃত্ত হয় তাহা বোনাস রূপে বিতরণ করিতে পারিবেন না। সরকারের এই সহানুভূতি ২।১টী দুর্ব্বল কোম্পানীকে হয়তো কোনরূপে রক্ষা পাইবার সুযোগ দিবে কিন্তু আমরা ইহার অনিশ্চিয়তার বিষয়ে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মনে করুন তিনটী কোম্পানীর Valuationএর তারিখ ৩১-১২-৩১। একটী সরকারের হুকুমের আশায় দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া ঐ তারিখে কাগজের যে দর ছিল তাহার উপর নির্ভর করিয়াই Valuation করিয়া ফেলিয়াছে। আর একটি ৩১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের কাগজের দর গ্রহণ করিয়াছে আর বাকীটি বর্ত্তমানে অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দরে কাগজের দর ধরিয়াছে। এক যাত্রায় এই পৃথক ফল ন্যায্য বলিয়া বোধ হয় না। তাহা অপেক্ষা সরকার যদি একটা বিশেষ তারিখের দর ধরিয়া দিতেন অথবা ৫ বৎসরের গড়পড়তার দর ধরিতে দিতেন তাহা হইলে এ অসুবিধা হইত না। যাহা হউক মন্দের ভাল বলিতে হইবে।

জাপানে পোষ্ট-আফিস জীবন-বীমা

Post Magazineএ ১৯৩০-৩১ সালে জাপানের পোষ্ট আফিস জীবন-বীমার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় লোকসংখ্যার শতকরা ২২ জন পোষ্ট আফিসের পলিশি গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিরাট বীমা-তহবিল Master of Communicationsএর নিকট গচ্ছিত থাকে এবং কমিটির পরামর্শমত তিনি তাহা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করিয়া থাকেন। এই বীমা-বিভাগের কর্ত্তৃত্বে বীমাকারীদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বহুল পরিমাণে প্রচারকার্য্য করা হইয়া থাকে। প্রধান প্রধান সহরে বীমাকারীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ও রোগনির্ণয় করিবার জন্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত আছে। বেতনভোগী শুশ্রূষাকারিণীর প্রয়োজনমত বীমাকারীদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য বীমাকারীকে প্রিমিয়াম ব্যতীত আর কিছুই অতিরিক্ত দিতে হয় না। জাপানের এই Postal Insurance বিভাগের সহিত ভারতবর্ষের Fostal Insuranceএর তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে আমাদের গভর্ণমেণ্ট এখনও এ বিষয়ে কত নীচে আছেন। সাধারণ বীমা-কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট যদি জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেন তাহা হইলে বীমাকারীদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইত এবং সাধারণ বীমা-কোম্পানীগুলিও বীমাকারীদের উপকারের জন্য অবহিত হইতে বাধ্য হইত।

বীমার চাঁদামূলে ভারতের ধনক্ষয়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কোন বীমা কোম্পানীকে এক পত্রে লেখেন "প্রতি বৎসর বীমার চাঁদামূলে বিদেশী বীমা-কোম্পানীর প্রায় ৫ কোটী টাকা লইয়া যাইতেছেন, সুতরাং আমরা যত বীমা কোম্পানী স্থাপন করিতে পারি ততই আমাদের মঙ্গল হইবে।" Statesman পত্রিকায় বীমা-প্রসঙ্গ-লেখক মহাশয় আচার্য্য রায়ের এই উক্তিতে আশ্চর্য্য হইয়াছেন। তাঁহার মতে যদিও বিদেশী কোম্পানীগুলি ৫ কোটী টাকার অধিক বার্ষিক বীমার চাঁদা ভারত হইতে সংগ্রহ করেন, তাহা ভারতেই ভারতবর্ষের মঙ্গলজনক কার্য্যে নিযুক্ত হয়। আমরা যদিও স্বীকার করি না যে যত বেশী বীমা-কোম্পানী স্থাপন করা যাইবে ততই দেশের মঙ্গল হইবে তথাপি আমরা Statesmanএর লেখক মহাশয়ের মন্তব্য সমর্থন করিতে পারি না। বিদেশী কোম্পানীগুলি তাহাদের ভারতীয় কার্য্যের উদ্বৃত্ত অর্থ ভারতে কতক পরিমাণে খাটাইলেও তাহা যে ভারতের মঙ্গলজনক কার্য্যে নিয়োজিত হয় এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ভারত-গভর্ণমেণ্ট যদি এ সম্বন্ধে Year Bookএ বিস্তৃত বিবরণ প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে অনেক পরিমাণে এ তর্কের কারণগুলি চলিয়া যায়। আমরা বলি ভারতে বর্ত্তমানে যথেষ্ট স্বদেশী বীমা-প্রতিষ্ঠান আছে। আর নূতন কোম্পানী স্থাপন না করিয়া সেইগুলিরই উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে। দেশবাসী যদি সুপরিচালিত স্বদেশী কোম্পানীগুলিতে বীমা করিতে বদ্ধপরিকর হয়েন তাহা হইলে বিদেশী কোম্পানী ও অযোগ্য স্বদেশী কোম্পানী উভয়েরই কবল হইতে দরিদ্র বীমাকারীগণ রক্ষা পাইতে পারেন।

'জাবালি'

বাঙ্গালী যুবকের হাতের কাজের ব্যবস্থা

দ্বিতীয় পর্য্যায়

—শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

গত সংখ্যায় এই বিষয়ে সাধারণ ভাবে বিবৃত করা হইয়াছিল। বাংলা তথা ভারতের অর্থনীতি-ক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা দেশের শিক্ষিত কর্ম্মঠ যুব-সম্প্রদায়ের বৃত্তিহীনতা। আমাদের বর্ত্তমান আর যত কিছু আন্দোলন—কি সমাজনৈতিক, কি রাজনৈতিক—সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশবাসীর হাতে কাজ, মুখে অন্ন সংস্থান না হওয়ার দারুণ সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জাতীয় জীবনের অনেক প্রশ্নই নির্ভর করিতেছে এই অন্ন-সমস্যা ও বেকার-সমস্যার সমাধানের উপর। সেই কথা স্মরণ করিয়া আমরা বিশদ ভাবে বাঙ্গালী যুবকের হাতের কাজের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাই।

বাংলা সরকারের "ডিপার্টমেণ্ট অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ" বা শিল্প-বিভাগ বলিয়া একটী শাখা আছে। অনেক দিন দেশবাসীর অভাব অভিযোগের প্রতি এই বিভাগের তেমন মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে দেখা যায় নাই। সম্প্রতি গত দুই তিন বৎসর হইতে, বাঙ্গালী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত এস্, সি, মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে দেশের উপযোগী বহু ছোট বড় শিল্পের প্রতি ডিপার্টমেণ্ট অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ মন দিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য দলের আমল হইতে সরকারের স্থানীয় শিল্পের প্রতি অনুরাগ দেখা গিয়াছিল। বর্ত্তমান কাউন্সিলেরও কয়েকজন সদস্যের এ বিষয়ে নিরন্তর চেষ্টার ত্রুটী নাই।

শিল্প-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ফারোকি সাহেবও শিল্পো-ন্নতিকল্পে সরকারী সাহায্যে পথ পরিস্কৃত করিয়া আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। বাংলা সরকারের শিল্প-বিভাগ ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বসুপ্রমুখ ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান সভ্যগণ সম্মিলিত হইয়া বাংলার যুবকদিগের জন্য নিম্নলিখিত হাতের কাজগুলির সম্ভাবনা বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে এমন অনেক ছোটখাট শিল্প আমাদের দেশে রহিয়াছে যাহার ব্যবস্থা ও যন্ত্র-পাতির সামান্য উন্নতি বিধান করিতে পারিলে অনায়াসেই অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্র যুবকের তাহাতে উপযুক্ত জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ হইতে পারে। এ বিষয়ে তথ্য-সংগ্রহ ও সত্য-প্রচারের জন্য শীঘ্রই নিয়মিত ব্যবস্থা হওয়া উচিত। মোটামুটি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় দেখাইয়াছেন যে নিম্নলিখিত শিল্পগুলিতে অল্প মূলধনে কাজ করিয়া কিংবা অধিক দিন ব্যাপী বিশেষ শিক্ষা না পাইয়াও আমাদের অনেক যুবক কেরাণী-জীবনের অপেক্ষা অধিক রোজগার ও সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। শিল্পের নাম যথা:—

কাঁসা ও পিতলের কারখানা

মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মালদহ ও দিনাজপুর জেলার স্থানে স্থানে এখনও বহুলোক এই শিল্পে নিযুক্ত আছে। কিন্তু উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে ও এলুমিনিয়াম এবং এনামেলের বাসনের প্রতিযোগিতায় কাঁসা ও পিতলের কারবার খুব মন্দা হইয়া আসিতেছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত উপায়ে বাংলার অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত যুবকগণ এই শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে পারিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রবসু মহাশয়ের হিসাবে ছোট একটী কাঁসার কিম্বা পিতলের কারখানা করিতে হইলে মাত্র ৫০০৲ টাকা মূলধন লাগে ও মাসচারেক শিল্পে শিক্ষানবিশী করা প্রয়োজন হয়। গড়ে এই কারবার হইতে মাসিক ১২০৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত আয় হইতে পারে।

কাপড়-কাচা ও গায়ে-মাখা সাবান প্রস্তুত

দেশে যেরূপ সাবানের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যে ভাবে প্রায় দুই কোটি টাকার সাবান বৎসরে বিদেশ হইতে আমদানি হইতেছে তাহাতে ইহা নিশ্চয় বলা যায় যে বহু বাঙ্গালী যুবক এই শিল্পে হাত দিলে স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান যুবকের সাবানের প্রস্তুত প্রণালী শিখিতে দুই তিন মাসের অধিক লাগা উচিত নয়। বিশেষতঃ কাপড়-কাচা সাবান প্রস্তুত করা সহজ এবং বাংলার পল্লীগ্রামেও ক্রমে উহার ব্যবহার বাড়িতেছে। সুতরাং এ দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। অনধিক ৪০০৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকার মূলধন লইয়াই ছোট সাবানের কারখানা আরম্ভ করা যায়। ইহাতে মাসে গড়ে ১০০৲ টাকা আয় হওয়ার সম্ভাবনা।

ছুরি, কাঁচি, ও লোহার ছোট অস্ত্রাদি প্রস্তুতের কারখানা

বাংলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই কামারের দোকান আছে। কিন্তু কামারের অস্ত্রাদির প্রাচীন প্রস্তুত প্রণালী উন্নত না করায় নানা বিদেশী সস্তা যন্ত্রপাতিতে দেশ ছাইয়া যাইতেছে। বৰ্দ্ধমান বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় কোন কোন স্থানে ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্র কুটীর-শিল্পে প্রস্তুত করিয়া শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত শিল্পপটু কারিগরগণ এই সকল দ্রব্যের বাজার পাইয়াছেন। সুতরাং আমাদের মনে হয় উন্নত ও আধুনিকতম যন্ত্রের সাহায্য লইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকেরা কাজ আরম্ভ করিলে অনায়াসেই ছোটখাট লৌহ ও ইস্পাতের অস্ত্রাদি তৈয়ারী করিয়া লাভবান্ হইতে পারে। ইহার জন্য মাত্র ৭০০৲।৮০০৲ টাকার মূলধন লাগিতে পারে এবং ৩।৪ মাসের শিক্ষাই কাজ আরম্ভ করার পক্ষে যথেষ্ট। মাসিক ১৩০৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা প্রত্যেক কারখানা হইতে অনায়াসে লাভ হইতে পারে।

পটারি অর্থাৎ মাটি ও চিনামাটির বাসন প্রস্তুত

সকলেই জানেন যে নানা ধাতুর বাসন আমদানি হইলেও আমাদের দরিদ্র দেশে মাটির বাসনের, বিশেষতঃ হাঁড়ি, কলসী, গেলাস' ভাঁড় প্রভৃতির ব্যবহার চলিবেই। ইহা ছাড়া চিনা-মাটির কাপ, প্লেট, বয়েম প্রভৃতির আদর উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। যদিও উপযুক্ত চিনামাটির কারখানা কুটীর-শিল্প হিসাবে চালান সম্ভব নয়, কিন্তু সাধারণ মাটির বাসন-পত্র গৃহে তৈয়ারী করিয়া অনেকেই প্রতিপালিত হইতে পারে। ন্যূনাধিক ৫০০৲।৬০০৲ টাকা লাগাইয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত "চাকী" ও ছাঁচ ব্যবহার করিয়া কাজ করিতে পারিলে এই কারবার হইতেই মাসে গড়ে ১২৫৲ টাকা হইতে ২৪০৲ টাকা রোজগার করা যায়। এই কাজের জন্য প্রায় চারি মাসের মাত্র শিক্ষার প্রয়োজন।

ধান-ভানা

বাংলার পল্লীর প্রায় প্রতি ঘরেই পূর্ব্বে ঢেঁকিতে ধান ভানিয়া লওয়ার ব্যবস্থা ছিল। চা'লের কল প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্থানে ঢেঁকির কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া ঢেঁকির পরিশ্রম করিতেও গ্রামবাসীগণ যেন ক্রমে নারাজ হইয়া উঠিতেছে। এ জন্য যদি সনাতন ঢেঁকির স্থলে ছোট ছোট গৃহ-শিল্পের উপযোগী হাতে চাকা ঘোরান চা'লের কলের ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে অনেক মধ্যবিত্তশ্রেণীর বাঙ্গালী যুবক এই কাজে অনায়াসে ব্রতী হইতে পারে। বাংলার সরকারী শিল্পবিভাগের এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত এস্, সি, মিত্র মহাশয় কয়েকটী ছোট হাত-কল প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে মাসখানেক শিক্ষানবিসী করিয়া মাত্র ৩০০৲ টাকা মূলধনে একজন যুবক মাসিক গড়ে ৯০৲ হইতে ১০০৲ টাকা আয় করিতে পারিবে।

ছাতা তৈয়ারীর কারবার

দেশে সহস্র সহস্র বেকার যুবক অন্নাভাবে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে অথচ আমরা পরম তৃপ্তি সহকারে নানা বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারে মত্ত রহিয়াছি, ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। ছাতা ব্যবহার ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সুদূর পল্লীতেও সনাতন মাথালের পরিবর্ত্তে এখন চাষীরা ছাতা ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে। অতএব এ দেশেই যাহাতে সস্তা ছাতা তৈয়ারী হইতে পারে তাহার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া শ্রীযুক্ত এস্, সি, মিত্র মহাশয় আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার হিসাবে অনধিক ৫০০৲ টাকা মূলধন লইয়া মাস ৩।৪ শিক্ষার ফলেই যে কোন কর্ম্মঠ যুবক মাসিক ১১০৲ হইতে ১৩০৲ টাকা রোজগার করিতে পারিবে।

শাখার কারবার

বাংলার তথা ভারতে নারীর শ্রেষ্ঠ ও সমাদৃত অলঙ্কার 'শাঁখা'। ইহার আদর ও চাহিদা থাকিবেই। বর্ত্তমানে ইহার প্রস্তুত প্রণালীর উন্নতি করার নানারূপ চেষ্টা চলিতেছে এবং শঙ্খের তৈয়ারী অন্যান্য দ্রব্যাদির দিকেও মন দেওয়া হইতেছে। মাত্র ৫০০ টাকা মূলধন থাকিলে ২।৩ মাসের শিক্ষার পর একজন যুবক এই শাঁখার কারবারে মাসিক প্রায় ১৫০৲ টাকা রোজগার করিতে পারিবে।

মোজা ও গেঞ্জির কারখানা

বাংলার নানাস্থানে বহু যুবক এই কাজে লিপ্ত হইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে এবং এখনও এই কারবারের যথেষ্ট বিস্তৃতির ক্ষেত্র রহিয়াছে। ৫০০৲।৬০০৲ টাকা মূলধন ও ৪।৫ মাসের শিক্ষা হইলে মাসে গেঞ্জি ও মোজার কারখানা হইতে মাসিক ১১৫৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা রোজগার হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

বহুবাণী

যদি খ্রাইষ্ট ফিরিতেন—

নীচের সংবাদ হইতে পাশ্চাত্যের আধুনিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা হইবে—

'হার্ষ্টস্ ইণ্টারন্যাসনাল কসমোপলিটান ম্যাগাজিন' হইতে কিছুদিন আগে একটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল—'যদি আজ খ্রাইষ্ট ফিরিয়া আসেন, তবে কি হয়?' ইহার উত্তরে বহু মজার কথা বহুজন লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। একজন বলিয়াছেন, খ্রাইষ্টকে বিপ্লবী বলিয়া অ্যামেরিকায় ঢুকিতেই দেওয়া হইত না। একজন বলিতেছেন, পাগল হিসাবে তাঁহাকে পাগলা-গারদে পাঠাইয়া দেওয়া হইত, ইত্যাদি ইত্যাদি। খ্যাতনামা ধর্ম্ম-যাজক ডীন ইঞ্জ বলিয়াছেন, 'খ্রাইষ্ট ফিরিলে আর যাই হন, সোস্যালিষ্ট, সমাজতন্ত্রবাদী হইতেন না। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি নিজেকে কিছুতেই জড়াইতেন না। ধনিক আর শ্রমিক দুই দলকে বলিতেন, তোমরা ভুল করিতেছ। এ পৃথিবীতে ভগবানের রাজ্য-স্থাপনের জন্য তিনি এই দুই দলকেই অনুরোধ করিতেন।' ডাঃ হেনরি ভ্যান ডাইকও অনেকটা এই কথাই বলিয়াছেন। সুসাহিত্যিক চেষ্টারটন্ বলিয়াছেন, 'খ্রাইষ্ট পুলিশেও চাকরি নিতেন না, মদ্য-পান-নিবারণী সভার সদস্যও হইতেন না।' হেনড্রিক ভ্যান্ লুন বলিতেছেন, 'এলিস্ আইল্যাণ্ডে খ্রাইষ্টকে নির্ব্বাসিত করা হইত।' ডাঃ শেলড্‌ন্ বলিতেছেন, 'যে সব মানুষ আজ মনুষ্যহত্যার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, তাহাদের তিনি একবার নিতেন। যুদ্ধ থামাইয়া তবে তাঁর অন্য কাজ।' লিউইস্ ব্রাউন্ বলিতেছেন, "যাহাকে তিনি ইতিপূর্ব্বে শেষ-গণনার-দিন আখ্যা দিয়াছিলেন, ফিরিয়া দেখিতেন তাহাকেই আজ লোকে 'বিপ্লব' বলিতেছে আর ভগবানের রাজ্যকে বলিতেছে 'শ্রমিকতন্ত্র'।" হ্যাল্‌ডেন বলিয়াছেন, "খ্রাইষ্ট আসিলেই পুলিশের তাড়া খাইতেন, কম্যুনিষ্টরা ত' তাঁহাকে ধরিয়া মার দিত।" মার্গারেট স্যাংগার বলিতেছেন, "তিনি আসিয়া পৃথিবীর প্রচলিত ধারণাকে ঝাঁটাইয়া উড়াইতেন—ঐশ্বর্য্য, জাতীয়ত্ব, দেশাত্ম-বোধ, অর্থনৈতিক শক্তিসমৃদ্ধি, কৃষ্টি আর এই পুঞ্জীভূত স্বার্থপরতা। পৃথিবীর দুঃখার্ত্ত মানবকে তিনি নূতন স্বর্গের সন্ধান দিতেন। আর তাঁহার যে প্রেমকে মানুষ আজ ক্লিন্ন করিয়াছে, অগণিত নরনারীকে নরকের দ্বারে টানিয়া আনিতেছে, সেই প্রেমের সত্য ব্যাখ্যা তিনি দিতেন।' অ্যাল্ডোস হাক্‌সলে বলিয়াছেন—'দ্বিতীয় খ্রাইষ্টকে মানব-প্রেমমূলক দর্শনবাদের সৃষ্টি করিয়া নিজের প্রচারকার্য্য সুরু করিতে হইত। কেননা ঈশ্বরকে মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে।'

নিরীশ্বরবাদ—

রুশিয়ায়ও আজ সকলের চাইতে বড়ো কথা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান। 'কম্যুনিষ্ট লাইফ' নিয়া দুই এক মাস আগে 'ফরচুন' পত্রিকায় যে-নিবন্ধ বাহির হইয়াছিল, নীচে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, কি করিয়া রুশিয়া এই নূতন শিক্ষার বনিয়াদ গড়িতেছে।

রুশ সরকার ধর্ম্মকে নাকচ করিয়াছে। কম্যুনিষ্ট দলভুক্ত হইলে তাহাকে নাস্তিক্যবাদ স্বীকার করিতে হইবে—অবশ্য আজও রুশিয়াতে ১২০০০ গির্জ্জা আছে। সরকার ধর্ম্মে বিশ্বাস করে না, সুতরাং অন্য দেশে যেমন সিগারেট কিংবা মোটরকার কিনিবার বিজ্ঞাপন দেওয়ালে লটকানো হয়, এদেশে তেমনই সরকার হইতে খ্রাইষ্ট, বুদ্ধ ও মহম্মদকে তাচ্ছিল্য করিবার জন্যই প্রাচীরে লিখিত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সংবাদ-পত্রে, থিয়েটারে, পোষ্টারে, রেডিয়োতে, স্কুল-কলেজে সর্ব্বত্র ধর্ম্মবিশ্বাসকে গালি-গালাজ দেওয়া হইতেছে। আগামী রুশিয়ার মানুষ ধর্ম্মবিশ্বাসকে যাহাতে পাপ বলিয়া ভাবিতে পারে, সর্ব্বত্র সেই চেষ্টা। নীতি-হিসাবে সোভিয়েট সরকার মানুষের পরিবার-বৃদ্ধিকে বিতাড়িত করিবার পথ ধরিয়াছে। ছেলে-মেয়ের ভালো করিয়া কথা ফুটিবার আগেই, তাহাকে নিয়া পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের সেনানী করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তারপর চার বৎসর স্কুলে কাটে। সমস্ত শিক্ষার মূল কথা হইতেছে এই যে,—পৃথিবীর অতি সামান্য স্থান দখল করিয়া থাকিলেও, মানুষই সেরা জীব, সুতরাং নিজেকে বড়ো করিয়া দেখিতে শেখ, দাম্ভিক হও, পিতৃপুরুষকে অগ্রাহ্য কর, ভগবান্ নামে কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়ো না।

মিশ্র বিবাহ—

কিছুদিন আগে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টে বিবাহ নিয়া পোপ কর্ত্তৃক একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই সম্পর্কে আমেরিকার কাগজ-পত্রিকায় অত্যন্ত তীব্র সমা-লোচনা প্রকাশিত হওয়ায় 'অ্যামেরিকা' নামে ক্যাথলিক সাপ্তাহিকে ডব্লিউ, আই, লনারগ্যান যা লিখিয়াছেন তাহার সারাংশ নীচে দিতেছি—এ রকম বিবাহ ধর্ম্ম-সঙ্গত নয়, কেননা যেখানে বিবাহার্থী স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্মবিশ্বাস এক নয়, সেখানে দুইজনে মনোমালিন্য হইবেই। অন্ততঃ এ অবস্থায় দুই জনে যে সম্পূর্ণ মিলন হওয়া অসম্ভব ইহা নিশ্চয়ই। বিশেষ করিয়া, এ বিবাহে যে ক্যাথলিক তাহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, ইহাদের ছেলেমেয়েরা সত্যকার ক্যাথলিক হইয়া না উঠিতে পারে—সুতরাং গির্জ্জা হইতে এ ধরণের বিবাহে অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়, যদি না বিবাহের

পূর্ব্বে এই চুক্তি হয় যে, ক্যাথলিক নারী কি পুরুষের স্বীয় ধর্ম্ম-বিশ্বাসে অপর পক্ষ হস্তক্ষেপ করিবে না, এবং সকল সন্তান-সন্ততিকে ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইবে। যদি নন্-ক্যাথলিক পাণিপ্রার্থীকে ক্যাথলিক করা যায়, তবে তো কথাই নাই। চুক্তি যাহাতে মুখের কথায় পর্য্যবসিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোন কোন প্রোটেষ্ট্যাণ্ট-শাসিত দেশেও তো এ নিয়ম আছে যে জনক-জননীর ধর্ম্মেই ছেলে-মেয়েকে দীক্ষিত করিতে হইবে। বাবা ক্যাথলিক হইলে ছেলেরা ক্যাথলিক, মা নন-ক্যাথলিক হইলে মেয়েরা তাই হইবে। কাগজে কাগজে লেখা হইয়াছে, ইহাতে বর ও কন্যা বিবাহকালীন ইচ্ছাকে যদি পরবর্ত্তী কালে পরিহার করিতে বাধ্য হয়, তবে কি সে বিবাহ নাকচ্ হইবে? এ প্রশ্ন করার হেতু নাই, কেননা বিবাহকালে যাহাতে তাহারা নিজেদের কাছে নিজেরা ফাঁকি না দেয়, এই আইন সেই জন্যই। যদি বিবাহকালেই এ চুক্তি যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ না হয় তবে সে বিবাহ অগ্রাহ্য হইবে, আমাদের আইনে মাত্র সেই কথার উল্লেখ আছে।

এই বিষয়ে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট পত্রিকা 'ক্রীশ্চান সেঞ্চুরি' লিখিতেছেন—মিশ্র বিবাহ নিয়া রোমান ক্যাথলিকরা যা বলিয়াছে, এই বিবাহজাত সন্তানকে ক্যাথলিক ধর্ম্মেই দীক্ষিত করিতে হইবে, নচেৎ বিবাহ বেআইনী ঘোষিত হইতে পারে, ইহা খ্রীষ্টধর্ম্ম-বিরোধী। এ বিষয়ে পোপ ও প্রোটেষ্ট্যাণ্টের মত একেবারেই পৃথক। পোপের কথায় মনে হয় যে তিনি বলিতে চান্ রোম্যান ক্যাথলিক ছাড়া আর কোনও ধর্ম্মমতই খ্রীষ্টীয় নয় সুতরাং এ সম্পর্কে চুপ করিয়া যাওয়াই শ্রেয়।

আমাদের শুধু জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে কি আলোক-প্রাপ্ত অ্যামেরিকাও বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে 'সামান্য সামান্য' সংস্কারকে বড় করিয়া দেখিতে চায়? আমাদের দেশের পাশ্চাত্য-বাদীরা তবে কি করিবেন?

চিরকুমারী-কারখানা—

মে মাসের 'ফোরাম' পত্রিকায় মিঃ উইলিস্ ব্যালিঞ্জার লিখিতেছেন,—বর্ত্তমানে আমাদের মেয়ে-কলেজগুলি বিবাহের কালো দিকটাকে মেয়েদের চোখে স্পষ্ট করিয়া তুলিতেছে—ফলে পড়ুয়া মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহে নিরুৎসাহিনী হইয়া পড়িতেছে। যখন আমাদের মেয়ে-কলেজগুলি বিবাহকে সম্পূর্ণ মূল্য ও মর্য্যাদা দিয়া, ছাত্রীদিগের বিদ্যা ও জ্ঞানবৃদ্ধির অর্জ্জনকে বিবাহ-বিমুখতায় রূপান্তরিত না করিবে, তখন মেয়েরা সত্যকার শিক্ষা পাইবে, তৎপূর্ব্বে নয়। কেন উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা বিবাহ করেনা? যে-শিক্ষা তাহারা পায়, তাহাতে ভাবিতে শেখে মস্তিষ্ক-চর্চ্চাই একমাত্র সুখের আকর, দেহবৃত্তিকে তাহারা অন্যায় রকমে দমিত করে, ফলে গৃহিণীর জীবন তাহাদের কাছে ভয়াবহ লাগে। এই জন্যই শিক্ষিতা মেয়েরা সচরাচর রমণীজাতি-সুলভ মাধুর্য্য হারাইয়া ফেলে।

কিন্তু ইহাকে সত্য আদর্শ বলা চলেনা। শিক্ষা যদি নর-নারীকে সত্যকার সুখের সন্ধানই না দিল, সে শিক্ষায় লাভ কি? বর্ত্তমানে যে প্রণালীতে মেয়েরা শিক্ষিত হইতেছে তাহা উল্টাইয়া যাহাতে মেয়েরা গার্হস্থ্য জীবনকে সার্থক করিতে শেখে, সেই শিক্ষা মেয়েদের কলেজগুলিতে চালানো উচিত।

আমাদের স্ত্রীশিক্ষা-পরিচালনায় ইহাদের এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইলে আমরা লাভবান হইব।

শান্তিকামী ফ্যাসিষ্ট—

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডব্লিউ, ওয়াই, এলিয়ট লিখিতেছেন—

মুসোলিনী ও তাঁহার বৈদেশিক সচিব সিনর গ্রাণ্ডি ব্রডকাষ্ট করিয়া নিখিল-বিশ্বের নরনারীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন, শান্তি বিহগের সাহায্যে আকাশ-বিহার ছাড়া তাঁহার বর্ত্তমানে আর কোন কামনা নাই। কয়েক বৎসর আগে তিনি কিন্তু কথায়-কথায় আকাশ-অন্ধকার-করা কামান বন্দুকের গর্জ্জন ছাড়া বক্তৃতার আর কোন প্রসঙ্গই খুঁজিয়া পান নাই। কম্পাসের কাঁটা এমন করিয়া উল্টাইল কেন? ইহা কি অন্তরের কথা নয়, মাত্র রাজনীতিক চাল? ১৯২২ সনে মুসোলিনী মস্কোর প্রধান শত্রু হিসাবে কম্যুনিষ্ট উচ্ছেদকারীর প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন; ১৯২৫ হইতে রুশের সহিত ফিস্‌ফাস্ সুরু হয়, আজ ১৯২২এ রুশিয়া আর ইতালিতে একেবারে গলাগলি। ১৯২৩ সনে মুসোলিনী জার্ম্মানির নিকট হইতে সমর ঋণ আদায় করা ব্যাপারে ফরাসী-মন্ত্রী পঁয়কারের প্রধান ভরসা ছিলেন, আজ তিনি ইউরোপের শ্লেট হইতে সমরঋণের কলঙ্ক-অঙ্ক মুছিয়া ফেলিতে চান্। তাই মনে হয় মুসোলিনীর এই শান্তি সাধনা শুধুই ইতালির অর্থকোষের দিকে চাহিয়া। বাহিরে আর ধার মিলিতেছে না, ভিতর একেবারে ফাঁকা। সুতরাং ব্যয়সঙ্কোচের কথা উঠিয়াছে। কিন্তু সঙ্কোচ করিতে গেলে, প্রথমেই নজরে পড়ে রাজস্বের মোটা খরচ সৈন্য-বিভাগে। গ্রেট ব্রিটেনে যেখানে ১৫,

আমেরিকার যেখানে ১৭, ফ্রান্সে যেখানে ২৩, ইতালিতে সেখানে এই বিভাগের ব্যয় ২৫। ফ্যাসিষ্ট ইতালি আজ বুঝিয়াছে রোমক সাম্রাজ্যের জাঁকজমক বজায় রাখা তাহার ক্ষমতার বাহিরে। সুতরাং ইতালির ঈশ্বরদত্ত যে-শক্তি, যে শক্তির জন্য তাহার সাম্রাজ্যবিস্তার—তাহার কথা এখন থাক্! ওদিকে পুরানো জাতির পাত্রে নূতন জাতীয়তার মাদক ঢালিবার প্রতিক্রিয়াও সুরু হইয়াছে। সুতরাং মুসোলিনিকে যাঁহারা চিনিয়াছেন, তাঁহারা জানেন শান্তির এই কথার মূল কোথায়। ফ্যাসিষ্টবাদই যে পশু শক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—বৃহত্তর ইতালির চাইতে বড়ো স্বপ্ন তাহার আর নাই, সবল সৈনিকের সাহায্যে পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়ার বড়ো কল্পনা তার নাই। পোপ আর মুসোলিনীর সাক্ষাতের হেতু আছে।

তাই মুসোলিনীর মুখে শান্তির কথা শুনিলে কানে বেসুরা বাজে। দেশের সকলকেই সামরিক করিয়া তুলিবার আয়োজন একেবারে উদ্দেশ্যহীন নয়… ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য—

কিন্তু এই রাজনৈতিক কুটিলতার ঘূর্ণী হইতে বহুদূরে নিরালায় যে-বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরিতে বসিয়া ইউরোপের স্বপ্ন-প্রতিমাকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিতেছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার সে-দিক পানে চাহিয়া দৃষ্টি পীড়িত হয় না, সেখানে পুরাতন প্রাচ্য-সভ্যতা পাশ্চাত্য-সভ্যতাকে মানবীয় আদর্শের গৌরব-পতাকাখানি দিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটারির দুইটি তরুণ বৈজ্ঞানিক, ডাঃ জে, ডি, কক্‌রফট্ ও ডাঃ ই, টি, এস ওয়াণ্টন বর্ত্তমানে 'অ্যাটম'কে ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতন এক প্রকার পরমাণুর আবিষ্কারে ব্যস্ত আছেন। লর্ড রাদারফোর্ড এই গবেষণাকে 'বিপুল সম্ভাবনাময়' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িবে যে লর্ড রাদারফোর্ডই বর্ত্তমান ফিজিক্সের 'থিয়োরি অব অ্যাটমস'এর অন্যতম প্রবর্ত্তক। ডাঃ ওয়াণ্টন বলিতেছেন,—

'অ্যাটমকে চূর্ণ করিয়া ক্ষুদ্রতর অণুর সন্ধান পাইলে, এ পৃথিবীর জড়-জগত-বিজ্ঞানে বিপ্লব আসিবে।'

স্যর ফ্রান্সিস্ অ্যাস্‌টন ইতিপূর্ব্বে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এক গ্লাস জলে মরিটেনিয়ার মতো জাহাজকে আটলাণ্টিক পাড়ি দেওয়াইবার মতো 'এনার্জি' আছে।—স্যর আর্থার এডিংটনও এমনিতরো কথা বলিয়াছিলেন। বর্ত্তমান গবেষণা সম্পর্কে ইহাদের এই কথা মনে পড়িবে।

যে কর্ণেল লিণ্ডবার্গের শিশু-হত্যা সমগ্র সভ্য জগৎকে বিচলিত করিয়াছে, তাঁহার এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মাস দুই আগে রকফেলার ইনষ্টিটিউটে তিনি রক্তবীজাণু-ধবনের নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্ত

গত ৩০শে জুন তারিখে বিলাতের পার্লামেণ্টে স্থির হইয়াছে, জার্ম্মান যুদ্ধের সময় ভারতের যে সেনাবল বিদেশে সাম্রাজ্যের কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার জন্য সাধারণ ব্যয় ব্যতীত যে ২০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে, বিলাতের সরকার তাহা ভারতের রাজস্ব হইতে নির্ব্বাহিত হওয়ায় সম্মত হইয়াছেন।

জার্ম্মান যুদ্ধকালে ভারতবর্ষ হইতে এককালীন ১৫ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য প্রদান করার পর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় অর্থ-সচিব এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন যে, যুদ্ধ যখন এখনও চলিতেছে, তখন এ দেশে যে সেনাবল সংগৃহীত হইয়াছে বা হইবে তাহার সম্বন্ধীয় ব্যয়ও অতিরিক্ত ব্যয়রূপে ভারত সরকার বহন করিলে তাহা অসঙ্গত হইবে না। তখন নিয়ম ছিল, কেবল বেসরকারী সদস্যরাই ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে পারিতেন। এই প্রস্তাব কিন্তু সরকারের পক্ষ হইতে অর্থ-সচিব উপস্থাপিত করেন এবং সরকারী কর্ম্মচারীরা ইহার সমর্থনে বক্তৃতা করিবার পর বলেন, তাঁহারা এই প্রস্তাবে ভোট দিবেন না—বেসরকারী সদস্যদিগের ভোটেই ইহা গৃহীত বা পরিত্যক্ত হইবে। তাহাতে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলেন—"আমরা যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করি, তবে আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিলেও অদূর ভবিষ্যতে যে দায়িত্বশীল সরকার ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাকে আর্থিক হিসাবে বিব্রত করিব; কারণ, শিক্ষা-বিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতিকর কার্য্য প্রভৃতির জন্য তাহার অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইবে।"

তথাপি নিম্নলিখিত ৫ জন সদস্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন:—

পণ্ডিত মদনমোহন, মালব্য, শ্রীযুক্ত গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খপর্দ্দে, শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পেটেল, শ্রীযুক্ত (এখন সার) বীর নরসিংহ শর্ম্মা, কে, ভি, আয়াঙ্গার।

যে সময় বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয় তখনই অর্থ সচিব বলিয়াছিবেন, জার্মান যুদ্ধে ভারতবর্ষকে ১৫ কোটি টাকা বিলাতকে প্রদান ব্যতীত আরও ব্যয় করিতে হইয়াছে। তিনি বলেন, ১৯১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষকে নিম্নলিখিত বাবদে নিম্নলিখিত টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে :—

পেন্সনের জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা, সেনাবলের সাধারণ ব্যয় বাবদে—১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, ভারতীয় সেনা-লাইনের জন্য—৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, ভারতীয় ডিফেন্স ফোর্সের য়ুরোপীয় সেনাবলের জন্য—৩০ লক্ষ টাকা ইত্যাদি।

ইহা ব্যতীত ভারতের সীমান্ত ও সীমান্তের বাহিরে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাহাও সামান্য নহে।

এইরূপ প্রত্যক্ষ ব্যয় ব্যতীত, ভারতবর্ষকে পরোক্ষভাবে যে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ হইতে যে সব জিনিষ বিলাতের ও বিলাতের মিত্রদেশসমূহে সরবরাহ করা হইয়াছিল সে সকল সাধারণ মূল্য অপেক্ষা অল্প মূল্যে দেওয়া হয়। যথা—

(১) ৩ কোটি ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের যে ১৫ হাজার টন উলফ্রাম সরবরাহ করা হয়, তাহা নির্দ্দিষ্ট এবং অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অল্প মূল্যে দিতে হইয়াছিল

(২) ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে যে ৫০ হাজার হন্দর লাক্ষ প্রেরিত হয়, তাহা তৎকালপ্রচলিত মূল্যের অর্দ্ধ মূল্যে ক্রয় করা হয়।

(৩) যে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার অভ্র ভারতবর্ষ হইতে পাঠান হয়, তাহার মূল্য তখন তিন গুণ হইতে পাঁচ গুণ।

(৪) ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যে যে সোরা ভারত হইতে সরবরাহ করা হয়, তাহা তখন তদপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছিল।

(৫) যুদ্ধের সময় পাটের জন্য ভারতবর্ষ ২০৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল। কিন্তু যে সময় এই পাট সরবরাহ করা হইয়াছিল, তখন পাটের মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক হইলেও ভারতের এই পণ্যের মূল্য ৩ বৎসরে বাড়ান হয় নাই।

(৬) ভারত হইতে প্রেরিত চামড়াও অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

(৭) তখন ভারতবর্ষ হইতে যে ৬৪ কোটি কয় লক্ষ টাকার খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া পাঠান হয়, তাহাও তৎকাল-প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা অল্প মূল্য ক্রীত হইয়াছিল।

এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্য-ভয়ে ও স্থানাভাব হেতু আমরা ফর্দ্দ আর বাড়াইলাম না। যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল হইতেই পাঠক ভারতবর্ষের পরোক্ষ ক্ষতির পরিমাণ অনুমান করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সেনাদল বিদেশে পাঠান হইয়াছিল, তাহার ব্যয় যে ভারত সরকারকেই দিতে হইয়াছিল, তাহা জানিয়াও তৎকালীন অর্থ-সচিব সার জেমস্ (এখন লর্ড) মেষ্টন তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন। কারণ, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী যখন ব্যবস্থাপক সভায় বলেন, "ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশকে ইরাকে ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় বিলাতের যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনে বাধ্য করা অসঙ্গত", তখন অর্থ-সচিব বলেন, "মহারাজার এই উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, সরকারের সামরিক ব্যয়ের বিবরণ পাঠ করিলেই তিনি দেখিতে পাবিবেন, ইরাকে ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় যুদ্ধের জন্য যে ব্যয় হইয়াছে বৃটিশ রাজস্ব হইতেই তাহা নির্ব্বাহ করা হইয়াছে।" অথচ ১৪ বৎসর পরে যখন ভারতবর্ষকে নূতন করিয়া ২০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ভার বহন করিতে হইল—তখন দেখা গেল, সে ব্যয় ভারতের রাজস্ব হইতেই নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।

সংপ্রতি সরকার যে হিসাব প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের ঋণের পরিমাণ ৯০৭ কোটি ২ লক্ষ টাকা ছিল এবং বর্ত্তমানে তাহা বাড়িয়া ১২৬২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার পরিণত হইয়াছে। যে কোন দেশের সরকারী ঋণের কথায় বিচার করিয়া দেখিতে হয়, সে দেশ সহজে ও স্বচ্ছন্দে সে ঋণ ক্রমশঃ পরিশোধ করিতে পারে কি না। যে দেশের ঋণ কেবলই বাড়িয়া যাইতেছে, সে দেশ যে সহজে ও স্বচ্ছন্দে ঋণ শোধ করিতে পারে, ইহা কিরূপে মনে করা যাইতে পারে?

এই অবস্থায় বিলাতের সরকার যদি ভারতবর্ষকে ঐ ২০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা প্রত্যর্পণ করিতেন তবে ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা সুদের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিত।

আবশ্যক অর্থের অভাবে যে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করা, দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা সম্ভব হইতেছে না, সে দেশের পক্ষে ২০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া সম্রাজ্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা যে অসমর্থনীয় বিলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবাসী যে অধিকার সম্ভোগ করিতেছে, তাহাতে তাহার পক্ষে এই টাকা দিতে অস্বীকার করিবার উপায়ও নাই। সুতরাং তাহাকে এই অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করিতেই হইবে।

কিন্তু ধনী বিলাত যদি দরিদ্র ভারতবর্ষকে এই ব্যয় হইতে অব্যাহতি দিতেন, তবে যে রাজনীতিক হিসাবেও তাহাতে বিশেষ সুফল ফলিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নূতন আইন

বাঙ্গালা সরকার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান অধিবেশনেই উহার ভাগ্যনির্ণয় হইবে অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভা হয় উহাতে সম্মতি দিবেন, নচেৎ উহা বর্জ্জন করিবেন। বিপ্লবাত্মক কায চলিতেছে—হত্যা পর্য্যন্ত হইতেছে, তাহারই নিবারণ জন্য এই আইন প্রবর্ত্তিত হইতেছে—ইহাই সরকারপক্ষের কথা। ইতঃপূর্ব্বে "অর্ডিনান্স"এর দ্বারা যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল, এখন আইনের দ্বারা তাহাই স্থায়ী করিয়া লইবার চেষ্টা হইতেছে।

দেশের লোক অকুণ্ঠ কণ্ঠে বিভীষিকা-পন্থীদিগের কার্য্যের নিন্দা করিয়াছে ও করিতেছে; কেননা, সেরূপ কার্য্য সমাজের ও দেশের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট সাধন করিতে পারে না। কলিকাতা কর্পোরেশন কোন বিভীষিকাপন্থীর প্রাণদণ্ডাদেশে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বিভীষিকা নীতির প্রতি তাঁহাদিগের বিরক্তি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে কংগ্রেস অহিংসাই দেশবাসীর কাম্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

এইরূপ অবস্থায় সরকার যদি দেশে বিভীষিকাত্মক কার্য্য দলিত করিবার চেষ্টা করেন, তবে দেশের লোক তাহাতে আপত্তি করিতে পারে না; কারণ লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ রাখাই সরকারের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

কিন্তু সরকার যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রকৃত উপায় কিনা এবং তাহাতে কর্ম্মচারীদিগকে যে ক্ষমতা প্রদান করা হইবে তাহার অপব্যবহারের সম্ভাবনা কিরূপ, তাহাই বিশেষভাবে বিবেচ্য।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই বিভীষিকানীতির সহিত দেশের অর্থনীতিক অবস্থার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং অর্থনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ব্যতীত ইহার বিলোপ-সাধনের আশা নাই। কিন্তু অন্য কেহ কেহ সে কথা স্বীকার না করিয়া বলিয়াছেন, ইহা স্বতন্ত্র ব্যাধি এবং ইহার নিদান নির্ণয় করিয়া ইহার জন্য স্বতন্ত্র ভেষজ ব্যবহার করিতে হইবে।

যদি অর্থনীতিক অবস্থাই ইহার একমাত্র বা প্রধান কারণ হয়, তবে বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী ও দেশের অর্থনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন যে সহজে হইবে, এমন মনে করা যায় না। তবে এ দেশের—বিশেষ এই প্রদেশের অর্থনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন জন্য সরকার অবশ্যই বিশেষ চেষ্টা করিতে পারেন। যাহাতে এদেশে কৃষির উন্নতি সাধিত হয় এবং উটজ ও বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠার ফলে দেশে বেকারের সংখ্যা হ্রাস হয়, সরকার সে চেষ্টা করিলে তাহাতে দেশের যে উপকার হয়, তাহার ফল লক্ষ্য করা প্রয়োজন। বর্ত্তমান কৃষি ও শিল্প-বিভাগের গবেষণা-ফল যে অনেক স্থলেই লোকের ব্যবহারে আসে না, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সরকারকে যে সাধারণ আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা চাহিতে হইতেছে, ইহাই আমরা দুঃখের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করি।

সরকার এতদিন আপনাদিগের স্বৈর-ক্ষমতাবলে "অর্ডিনান্স" দ্বারা যে ক্ষমতা পরিচালিত করিতেছিলেন, এখন যে তাহার জন্য ব্যবস্থাপক সভার অনুমতি চাহিতেছেন, ইহা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাদ্যোতক বলিয়া বিবেচিত হইলেওপ্রচলিত আইনের কঠোরতা এই বিভীষিকানীতি দমন করিতে সমর্থ কিনা তাহাও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।

সাহিত্য-সন্দেশ

প্রবাসী—আষাঢ়। ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ পারস্য হইতে ফিরিয়া আসা অবধি, আমরা প্রবাসী পত্রিকাখানি পারস্য-মতে পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। অর্থাৎ প্রবাসীর 'বিবিধ প্রসঙ্গ' হইতে পিছু হাঁটিয়া ক্রমে টাইটেল পেজের দিকে আসিতে থাকি। ভারতীয় ও পারসিক কৃষ্টির মহামিলনের যজ্ঞপান-শালায় ক্ষুদ্রশক্তি আমাদের ইহাই যথাসাধ্য অবদান!

উক্ত উপায়ে আমরা আষাঢ়ের প্রবাসীর উপান্ত আন্ত পাঠ করিলাম। দেখিলাম—প্রতিবারের ন্যায় এবারও বিবিধ প্রসঙ্গ মনোজ্ঞ হইয়াছে। তাহার ভাষা সুষ্ঠু, ভাব সরল, যুক্তি তীক্ষ্ণ, ভঙ্গী সরস। সুদূর মারবারের দেওলী জেলে মৃণালকান্তি রায় চৌধুরী নামে একজন বাঙ্গালী ডেটেনু উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করায় সম্পাদক ক্ষুব্ধ হইয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা সমস্ত বাঙ্গালীর প্রাণের কথা।

অন্যত্র দেওলী জেল প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখিতেছেন—"দেওলী জেলের ডেটেনুরা কি কি খবরের কাগজ ও মাসিক কাগজ পড়িতে পারিবে, নিয়মাবলীর শেষে তাহার একটি তালিকা দেওয়া আছে।...বাংলা সচিত্র বড় মাসিক কাগজগুলির মধ্যে 'প্রবাসী' সকলের চেয়ে পুরাতন। তালিকায় উহার নাম নাই, অপেক্ষাকৃত নূতন বড় সচিত্র মাসিকগুলির নাম আছে।"

কিন্তু ইহাতেও তত দুঃখ ছিল না, অপেক্ষাকৃত নূতন সচিত্র বড় মাসিক কাগজের পাঠ্য-তালিকায় 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' আছে তথাপি 'প্রবাসী' নাই! এই ত্রুটি ধরিয়া সম্পাদক প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের চরেরা অপদার্থ এবং রহস্য করিয়া বলিয়াছেন—'যদি কোন ডেটেনু তালিকাদৃষ্টে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পড়িতে চায় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে স্পিরিচুয়্যালিজ্‌মের সাহায্যে খবর লইতে হইবে যে উহা পরলোকে বাহির হইতেছে কি না এবং সেখান হইতে ইহলোকে আনাইবার কোন ব্যবস্থা হইতে পারে কি না!' পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা হইতে পুলিশ-ফাঁড়ি পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানেই পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হইয়াছে যে অধুনা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের কোন ভুলভ্রান্তি হইতেছে না। তৎসত্ত্বেও যে সম্পাদক উক্ত চরেদের কর্ম্মকুশলতায় আস্থা রাখিতে পারেন না, তাঁহার কাগজ ঘরের পয়সা খরচ করিয়া কোন্ গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিবে? সে আস্থা যদি থাকিত এবং স্বসম্পাদিত কাগজের প্রতি অতি-স্নেহে বুদ্ধি যদি আচ্ছন্ন না হইত তবে বিজ্ঞ সম্পাদক অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন, পরলোকগত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ভুলক্রমে তালিকাভুক্ত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট পরলোকগত ডেটেনুদের জন্য মাত্র এক খানি বাংলা পুরাতন সচিত্র বড় মাসিক পত্র রাখিয়াছেন সর্ব্বভূতে সমদর্শী প্রবাসী সম্পাদক কি ইহাতেও আপত্তি করিবেন? তাঁহার মতে পাঠ্য-তালিকা প্রস্তুত হইলে ৺ডেটেনু মৃণালকান্তি চৌধুরী যদি 'প্রবাসী' চাহিয়া পাঠান তখন কি হইবে?

মুকুন্দদাসের যাত্রার মত রবীন্দ্রনাথের 'পারস্য-যাত্রা'ও শেষের দিকে জমিয়া উঠিয়াছে। পালা ছিল 'উড়োজাহাজ'। কিন্তু 'কানু ছাড়া গীত নাই'; রবীন্দ্রনাথ যাত্রাশেষে বলিয়াছেন—"ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তার দৃষ্টি হ'তে আমরা বহু দূরে, তাই আমাদের পক্ষে শাসন যত অজস্র সুলভ, অশন তত নয়।"

কিন্তু এই যাত্রার মধ্যেও যেখানে নারদমুনির পরিবর্ত্তে বগ্‌দাদের কোন্ শেখদের গ্রামে বোমানিক্ষেপকারী বৃটিশ আকাশফৌজের খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক আসিয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট বাণী চাহিলেন সে স্থান প্রকৃতই কৌতুকপ্রদ। আমাদের বিশ্বাস সেকালেও আকাশফৌজ ছিল, এবং নারদই ছিলেন তাহাদের ধর্ম্মযাজক। তিনি ঢেঁকিতে চড়িয়া আকাশমার্গে যথেচ্ছ গমনাগমন করিতেন ও মাঝে মাঝে বৈকুণ্ঠ হইতে বাণী সংগ্রহ করিতেন, বেদে-পুরাণে ইহার অনেক প্রমাণ আছে। যাঁহারা ঢেঁকি দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন নারদের ঢেঁকিই এখনকার উড়োজাহাজ। সেকালে নারদমুনির যে কাজ ছিল, একালের খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণও তাহাই করেন—হরিবোল

হরিবোল বলিতে বলিতে বিশ্বের মধ্যে কেবল কলহ বাধাইয়া তুলেন।

রবীন্দ্রনাথ সেই আকাশ হইতে বোমানিক্ষেপকারী খৃষ্টান ধর্ম্মযাজককে ইংরাজীতে যে বাণী পাঠাইলেন তাহার মর্ম্মার্থ এই :—

"আদিযুগ হইতেই মানুষ কল্পনা করিয়া আসিতেছে— ভগবানের বাস উর্দ্ধলোকে, যেথান হইতে আলো নামিয়া আসে, যেথানে সর্ব্বপ্রাণীর কল্যাণপ্রদ প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয়। সেই আকাশের উষার শান্তি, সূর্য্যাস্তকালের বর্ণচ্ছটা ও তারকাখচিত রজনীর গাঢ় নিস্তব্ধতা যুগে যুগে কত মানবের চিত্তকে ধূলিপঙ্কিল এই মর্ত্ত্যের চিন্তা হইতে অসীমের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। আজ মানুষের ভ্রাতৃদ্রোহকর হিংসা তাহার কৃষ্ণপক্ষ বিস্তার করিয়া যদি সেই শান্তিপূর্ণ আকাশ-লোককেও আক্রমণ করে তবে অবিলম্বে ঈশ্বরের অভিশাপ তাহার উপর বর্ষিত হইবে সন্দেহ নাই।"

এই বাণী পাইয়া খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজক অবশ্যই উৎফুল্ল হইয়া থাকিবেন। কারণ তাঁহার হাত দিয়াই যে ঈশ্বর ভ্রাতৃদ্রোহী হিংস্রক শেখেদের উপর শান্তিপূর্ণ উর্দ্ধলোক হইতে অভিশাপ বর্ষণ করিতেছেন ইহাতে তাঁহার সন্দেহ থাকিতে পারে না, আমাদেরও নাই। ভগবানের অভিশাপও ত একজনকে নিমিত্ত করিয়াই নামিয়া আসিবে।

কিন্তু আকাশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহাই কি একমাত্র সত্য? আমাদের পল্লীনিবাসের সম্মুখে একটি মাদার গাছ ছিল। আম নহে, জাম নহে; শাল, তাল, তমাল, পিয়ালের কোনটাই নহে—বেচারী মাদার গাছ। বিশ্ব-কবির মতে যে আকাশে আদিযুগ হইতে কেবল আলো ও প্রাণের লীলা, সেই আকাশ হইতেই পরশ্ব তারিখে একটি বজ্রপাত হইয়া বেচারী মাদারগাছটিকে শুকাইয়া দিয়া গিয়াছে। মানুষের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা আদিকাল হইতে বজ্রপাতের সহিত উপমিত হইয়া আসিতেছে, যে-বজ্র কোন খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকের উপদেশানুবর্ত্তী বিমানফৌজের অদৃশ্য 'উড়োজাহাজ' হইতেই যুগে যুগে মানবশিরে বর্ষিত হইয়া থাকে। মর্ত্ত্য শেখেরা যে এখনও নির্ম্মূল হয় নাই, আকাশচারী সেই অদৃশ্য খৃষ্টান-ধর্ম্মযাজকের অনুকম্পাই তাহার একমাত্র কারণ না হইতেও পারে।

ভারতবর্ষ—আষাঢ়। ১৩৩৯

ভারতবর্ষ বিশ বছরে পড়িল। আমরা তাহাকে অভি-নন্দিত করিতেছি।

এই সংখ্যায় শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ আর-ই-এস্ 'মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়' লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ রাজকৃষ্ণের জীবনী লেখা হইবে, এই প্রবন্ধে তাহার উপক্রমণিকা আরম্ভ হইল। উপক্রমণিকায় 'প্রথম বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র' হইতে 'জেনারেল এসেমব্লি কলেজ' পর্য্যন্ত ১৭ দফা ফটো আছে; কেবল 'রাজকৃষ্ণের' কোন ছবি খুঁজিয়া পাইলাম না।

কিন্তু রাজকৃষ্ণের ছবি না পাইয়া আমরা পাছে দুঃখ করি, সেজন্য প্রবন্ধকারের হইয়া বোধ হয় সম্পাদক দাদাই ভূদেব মুখোপাধ্যায়, নবীন সেন, গিরীশ ঘোষ, মহেন্দ্রলাল সরকার, রামগোপাল ঘোষ, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রমেশ দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু, সারদাচরণ মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি খ্যাতনামা দশজনের ফটো দিয়াছেন, যাঁহাদের উল্লেখ প্রবন্ধ মধ্যে কোথাও চোখে পড়িল না! ভারতবর্ষ একখানি বাংলা পুরাতন সচিত্র বড় মাসিক; মামুলি কতকগুলি ফটো না দিলে 'সচিত্র'ও হয় না, বড়ও দেখায় না। আর সম্পাদক দাদা হয়ত ভাবেন অত হিসাব করিয়া যাহারা মাসিক পড়িবে, তাহারা ভারতবর্ষ পড়িবে না।

ঐ প্রবন্ধ পুনরায় পাঠ করিয়া দেখিলাম, প্রবন্ধ মধ্যে এমন অনেকগুলি নাম আছে যাহাদের ফটো ভারতবর্ষের দপ্তরে থাকা সম্ভব নহে বলিয়াই সম্পাদক 'বদল' দিয়া কাজ সারিতে বাধ্য হইয়াছেন। যেমন—প্রবন্ধে নিধুবাবুর উল্লেখ আছে, তাঁহার পরিবর্ত্তে মহেন্দ্রলাল সরকারের ফটো দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ সারজন্ বাড্ ফিয়ারের পরিবর্ত্তে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের, লোহারাম শিরোরত্নের পরিবর্ত্তে নবীন সেনের ও সাধ্বী সুশীলা ক্ষান্তমণি দেবীর পরিবর্ত্তে চন্দ্রনাথ বসুর ফটো সন্নিবেশিত হইয়াছে মনে হইল।

শরৎচন্দ্রের 'শেষের পরিচয়' শেষ হইলে পড়িব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু ধৈর্য্য রাখিতে পারিলাম না। গল্প ত লিখিতে না লিখিতেই জমিয়া গিয়াছে। তবে ব্যথার কারণও

শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন—"এদিকে যাত্রার আয়োজন তাহার সম্পূর্ণ। দাড়ি গোঁফ বার দুই কামাইয়া বার চারেক হিমানী লাগানো শেষ করিয়া······।" 'ভারতবর্ষের' cover page এ হিমানীর বিজ্ঞাপন, আবার ভিতরে শরৎচন্দ্রের মারফৎ যদি অন্য স্নো ফেলিয়া হিমানী স্নোর নামটাই ঘোষিত হয় তবে অনেকের প্রতি অবিচার করা হয় না কি? আমরা আরও দু' একটা দেশী স্নোর নাম জানি যাহা গুণে হিমানী অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে এবং যাহা ব্যবহার করিয়া অনেক সাহিত্যসেবী সুফল লাভ করিতেছেন। শরৎচন্দ্র হয়ত এসব খবরই রাখেন না।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতা "প্রাচীনার প্রলাপ" এবার ভারতবর্ষের অলঙ্কার। অশীতিপরা পুত্রহারা বিধবার হৃদয়ের খুঁটিনাটির এমন দরদভরা স্বচ্ছ সহজ বিশ্লেষণ ও তাহার নিপুণ বর্ণনাভঙ্গী যতীন্দ্রমোহন ছাড়া অন্য কাহাতেও বোধ হয় সম্ভব হইত না। সুতরাং 'সন্দেশের' মাছির পক্ষে এমন কবিতার লোভ সম্বরণ করাও সম্ভব হইল না। প্রাচীনা প্রথমেই নিজের বয়স সম্বন্ধে বলিতেছে—

'চারকুড়ি তো বয়েস হ'ল, একটা বছর বাকী'

আবার কবিতার অন্য স্থানে মৃত স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—

গেলেন যদি, আমায় কেন নিলেন নাক' সাথে?
আশী বছর এক সাথে ঘর—সত্য হ'ল ধাতে?

যতীন্দ্রমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ কিরূপে সম্ভব হইল? উনয়াশি বছরের প্রাচীনা কি উপায়ে আশী বছর স্বামীর সহিত ঘর করিল? নিরঙ্কুশ কবি বারেক গম্ভীর হইয়া ক্ষণ পরেই হাসিয়া উত্তর দিলেন—প্রাচীনা প্রলাপ বকিতেছে, ভীমরতি হইয়াছে, দেখিতেছ না? বুঝিলাম ইহাতে কাব্যের সৌন্দর্য্যহানি ঘটে নাই; আরও বুঝিলাম—নিরঙ্কুশ অর্থে যাঁহারা অঙ্কের বাঁধন কাটাইয়াছেন।

বিচিত্রা—আষাঢ়। ১৩৩৯

বিচিত্রার 'ছন্দের দ্বন্দ্ব' দেখিতে দেখিতে পাকিয়া উঠিল। একই সংখ্যায় এ সম্বন্ধে ৩টি নিবন্ধ দেখিতেছি—'ছন্দের দ্বন্দ্ব', 'ছন্দ ধন্দ' এবং 'ছন্দের দ্বন্দ্ব ও শনিবারের চিঠি'। প্রথমোক্ত নিবন্ধে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর-এস্ নানা প্রয়োজনীয় কথা আলোচনা করিয়া প্রসঙ্গক্রমে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন।

প্রশ্নটি হইতেছে—"বাংলায় পাঁচ মাত্রা ও চার মাত্রা মিলাইয়া অর্থাৎ নয় মাত্রা লইয়া পর্ব্ব রচনা করা যায় কি? বাংলায় চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট ও দশ মাত্রার পর্ব্ব আছে, নয় মাত্রার ব্যবহার চলে কিনা পরীক্ষা করা উচিত।" এ ধাঁধাঁর একমাত্র অর্থ আমরা এই বুঝিয়াছি যে কিছুতেই পড়িতে পারা যাইবে না, এমন বাংলা ছন্দ কেহ কি লিখিতে পারেন? চেষ্টা করিয়াও আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। কিন্তু অমূল্য বাবুকে অনুরোধ করি তিনি আষাঢ়ের ভারতবর্ষে কবি শ্রীগিরিজাকুমার বসু লিখিত 'অনুরোধ' কবিতাটি যেন পড়িয়া দেখেন। তিনি যাহা চাহিয়াছেন গিরিজা বাবু সেই বস্তুই যেন লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন মনে হইল।

"তনু দেহ যার পরাগ-পেলব নিশীথিনী কালো অলকে,
দক্ষিণে বামে যুগল বেণীর শোভা মন হরে পলকে,
অলি বার বার ফুল্ ভ্রমে যার চুমিবারে আসে শ্রীমুখে,
তাহারে না দেখি মানব জীবন না জানি যাপিছ কি সুখে!
ধন্য হইবে, কথা রেখো,
পারস্যকে দেখো।"

শেষের লাইন দুটিতে কি অমূল্যবাবুর ঈপ্সিত ছন্দ পাওয়া যায় না? একটিতে আবার নয়টি অক্ষরই আছে দেখিতেছি।

"অলি বার বার ফুল্ ভ্রমে যার চুমিবারে আসে শ্রীমুখে,
তাহার না দেখি মানব জীবন না জানি যাপিছ কি সুখে?"

সমস্ত কবিতার সংবেদনটি এই খানে মূর্ত্তি পাইয়া আমাদের মুখের উপর যখন এত বড় প্রশ্ন করিয়া বসিল, তখন আমাদের প্রকৃতই মনে হইয়াছিল 'পারস্য' যখন আমাদের পরিচিত নহে তখন আর এ মানবজীবন যাপিব না, প্রেতযোনী প্রাপ্তির

সম্ভাবনা সত্ত্বেও আত্মহত্যাই করিব। কিন্তু দেখিলাম পরমায়ু থাকিতে মরা যায় না, কারণ সহসা 'ফুল্ ভ্রমে'র হসন্তটির উপর নজর পড়িল। বুঝিলাম ওটি ইংরাজী শব্দ, সেই তথ্যটি বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্যই লেখক হসন্ত দিয়াছেন। ইহার পর মরা বৃথা ; জীবন যাপিব ঠিক করিলাম।

বিচিত্রা জানিয়েছেন—"ওমার খৈয়াম"এর কবি শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ ছ'মাসের ছুটি নিয়ে বিলাত যাচ্ছেন। তিনি এখন 'মেঘদূতের' ছন্দ-অনুবাদে নিযুক্ত আছেন। তাহার নমুনাস্বরূপ উত্তরমেঘের ৬টি শ্লোকের ছন্দ-অনুবাদ এবারকার বিচিত্রায় প্রকাশিত হইল।

উত্তরমেঘের অনুবাদের নমুনা পড়িয়া আমরা প্রকৃতই উৎসুক হইয়া রহিলাম। মেঘদূতের মূল শ্লোক বা অন্যান্য অনুবাদের সহিত মিলাইয়া পড়িবার সময় না পাইলেও ছন্দের ও প্রকাশের গতি বেশ শ্রুতিসুখকর বলিয়াই বোধ হইল। কিন্তু আশঙ্কা হইল যে, গবর্ণমেণ্ট যদি হঠাৎ একটা নূতন অর্ডিনান্স জারি করিয়া বাংলাভাষা হইতে 'ভায়' এই শব্দটি proscribe করিয়া দেন তাহা হইলে আমরা একখানি উচ্চাঙ্গের অনুবাদসম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইব। কারণ :—

প্রথম শ্লোকে প্রথম লাইনে দেখি—

"দেখিবে অলকায় সৌধশ্রেণী ভায় অভ্রভেদী শির তোমারি প্রায়"

দ্বিতীয় শ্লোকে দ্বিতীয় লাইনে দেখি—

"কুন্দকেশে ভায় লোধ্ররেণুকায় পাণ্ডুমুখশোভা সুনির্ম্মিত।"

তৃতীয় শ্লোকে দ্বিতীয় (তৃতীয় নয়) লাইনে দেখি—

"চিরায়ু নলিনীরে সায়রে সেথা ঘিরে হংসশ্রেণীরচা মেখলা ভায়"

চতুর্থ শ্লোকে চতুর্থ লাইনে দেখি—

"অমর তনুমন সুচির যৌবন, সেথায় নাহি ভায় জরার ভীতি।"

চিত্র-পরিচয়

ভগবান হিমালয়ের তুঙ্গশিখর হইতে "ওঁ" এর নিদর্শন আনিতেছেন। হরিদ্রাভ অঙ্গাবরণ বায়ুভরে উড়িতেছে—হিমকণা তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতেছে। মানুষের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখের সন্ধান দিতে তিনি অগ্রসর হইতেছেন। বাত্যাবিক্ষুব্ধ মেঘমালা মানুষের সুখ দুঃখ ও বিপর্য্যয়ের সঙ্কেত করিতেছে। কিন্তু পুণ্যাত্মার মস্তকের চারিপাশে প্রভামণ্ডল প্রদীপ্ত রহিয়াছে এবং তিনি দিক-নির্দ্দেশনী আকাশ-প্রদীপের ন্যায় আপনার মহান উদ্দেশ্য বহন করিয়া চলিয়াছেন।

'দিনমঞ্জরী' ছবিখানি বোম্বাই-প্রবাসী শিল্পী শ্রীমান রবীন্দ্র দত্তের অঙ্কিত। রবীন্দ্র দত্ত বোম্বাইএর কোনও একটি শিল্প-বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এই তরুণ শিল্পীর বহু চিত্র, আর্ট সমালোচকদের নিকট প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ইনি বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক আমাদের উপাসনার নিয়মিত লেখক শ্রীযুত অতুলচন্দ্র দত্তের তৃতীয় পুত্র ; অতুলচন্দ্রের প্রথম পুত্র পুলিনবিহারী ও দ্বিতীয় পুত্র অরবিন্দ—বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলিয়া পরিচিত।

শোক-সংবাদ

পরলোকে পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী

১২৬৫ সালে বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত, পূর্ব্বস্থলী থানার অধীন চক্‌বামনগড়িয়া গ্রামে পণ্ডিত দুর্গাদাসের জন্ম হয়।

১২৯৪ সালের ১৩ই শ্রাবণ তাঁহার প্রসিদ্ধ 'অনুসন্ধান' পত্র প্রকাশিত হয়। তখন উহা ছিল পাক্ষিক। তাহার তাহার পর 'অনুসন্ধান'এর মাসিক, সপ্তাহিক, দৈনিক প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'দ্বাদশ নারী', 'নির্ব্বাণ জীবন', 'ভারতে দুর্গোৎসব', 'চুরি জুয়াচুরি', 'জাল ও খুন' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৩১০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় ২ বৎসরকাল তিনি 'বঙ্গবাসী'র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার 'স্বাধীনতার ইতিহাস', 'রাণীভবাণী', 'বাঙ্গালীর গান' প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি 'বঙ্গবাসী' পরিত্যাগ করেন। ঐ বৎসরই হাওড়ায় তাঁহার 'পৃথিবীর ইতিহাস' কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাস-প্রণয়নকালে বেদের আলোচনা আবশ্যক হয়। তাহার পর প্রায় সপ্তদশ বর্ষ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া পণ্ডিত দুর্গাদাস ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনীসহ চারিবেদ—(ঋক্ যজু, সাম ও অথর্ব্ব—)প্রকাশ করিয়া বঙ্গের এক প্রধান অভাব দূর করেন। তাঁহার রচিত 'সাধনা সৎপ্রসঙ্গ', 'রাজা রামকৃষ্ণ', লক্ষ্মণ সেন', 'সুবর্ণবলয়', 'সুখ শান্তি', 'মর্ত্তে ভগবান' প্রভৃতি গ্রন্থ একাধারে সুশিক্ষা ও দার্শনিক তত্ত্বে পূর্ণ। তাঁহার সম্পাদিত 'নবরত্ন', 'পঞ্চানন্দের পঞ্চরং', 'মণি', 'নিত্যপাঠ্য বেদ-মন্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থের লক্ষ্যও লোকশিক্ষা ও সদুপদেশ প্রদান। ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসনের এনক-আর্ডেন গ্রন্থের যে অনুবাদ তিনি করিয়াছেন, ইংরাজী গ্রন্থের সেরূপ প্রাঞ্জল অনুবাদ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ফলতঃ সাহিত্যের সকল বিভাগেই তাঁহার অশেষ কৃতিত্ব ছিল।

পণ্ডিত দুর্গাদাস, ইংরাজী, হিন্দী, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা চারি ভাষায় ব্যাখ্যাদিসহ বেদের এক সার্ব্বজনীন সংস্করণ প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হন কিন্তু তাঁহার এ উদ্যম সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। এই সংস্করণের মাত্র একটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

গত ১লা আষাঢ় কলিকাতায় আলবার্ট হলে 'কালিদাস সমিতি'র সভায় মেঘদূত-উৎসবে বক্তৃতা করিয়া আসিবার পরদিন হইতেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। কয়দিন শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকিয়া ৭৪ বৎসর বয়সে গত ৬ই আগষ্ট শনিবার বেলা সওয়া চারিটার সময় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

পরলোকে ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

গত ৭ই আগষ্ট সন্ধ্যা ৬।০ টায় আমাদের বহু দুঃখ সুখের সঙ্গী ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত আকস্মিক সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হইয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৮ হইয়াছিল।

১৯১৯ সনের শেষ দিকেই হইবে, ধীরেন্দ্রনাথ উপাসনার কর্ম্ম-কর্ত্তা নিযুক্ত হন্। ১১ কলেজ স্কোয়ারে তখন 'উপাসনা'র কার্য্যালয়। তখনও উপাসনা প্রেস হয় নাই। ১৯২১ সালে কাশিমবাজার হইতে একটি হ্যাণ্ড-মেশিন ও বাক্সকয়েক টাইপ আনিয়া ১৪-এ শরৎ ঘোষ ষ্ট্রীটে উপাসনা প্রেসের গোঁড়া-পত্তন হয়। মনে পড়িতেছে কাশিমবাজার হইতে এই সব মাল ধীরেন্দ্রনাথই আনিয়াছিলেন। অল্পে অল্পে এই হ্যাণ্ড মেশিনের সহিত উপাসনা প্রেসে দুইটি ট্রেড্‌ল ও একটি ফ্ল্যাটের সংযোজনা হয়। এই উন্নতির সম্পূর্ণ কালটা ধীরেন্দ্র নাথ প্রেসের ম্যানেজার ছিলেন। গত বৎসর শরৎ ঘোষ ষ্ট্রীট হইতে উপাসনা প্রেস ২নং ওয়েলিংটন লেনে স্থানান্তরিত হয়। কিছুদিন পরে উপাসনা প্রেস মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউজে রূপান্তরিত হইলে ধীরেন্দ্রনাথ ইহার প্রেস-বিভাগের অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হন্।

স্মরণাতীত কাল হইতে মৃত্যুর পর মৃতকে মানুষ আবিষ্কার করিয়া আসিতেছে—সুতরাং প্রচলিত প্রথায় ধীরেন্দ্রনাথের উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করে না—করিবও না। তাঁহার বৃদ্ধা মাতাকে ও তিনটী শিশু কন্যা ও একমাত্র পুত্রসন্তানকে এবং তাহাদের জননীকে আমাদের সমবেদনাই বা লিখিয়া কি জানাইব?

অমরলোকে

হৃদয় লুটায়ে আজিকে তোমারে প্রণাম করি'
অমরলোকের মন্দার মালা তোমার গলে,
মর-জগতের সুধার পাত্র তুলিলে ভরি'
রিক্ত করিয়া আপনারে সখা কত না ছলে!

এ ধরায় তুমি এসেছিলে শুধু পরের তরে
অশনে বসনে সুখ-ভুঞ্জনে বিরাগী মনে,
চিরদিন তুমি নিজেরে রাখিলে আড়াল করে'
জীবন বিলালে পরসেবাব্রত-উদ্‌যাপনে।

নির্ব্বাণমুখ জীবন-দীপের স্তিমিত শিখা
আমার এ ঘরে বাঁচায়ে তুলিলে আপন হাতে,
কেমনে জানিব এমনি নিঠুর ভাগ্যলিখা
শ্মশান-চিতায় শেষ-দেখা হবে তোমার সাথে।

এ হতভাগার দুঃখসুখের নিত্যসাথী
আমারে না বলে শেষ-যাত্রায় বাহির হ'লে,
দিবসের আলো নিবায়ে ঘনাল সন্ধ্যারাতি
লহগো বন্ধু, বিদায়-আরতি নয়নজলে!

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
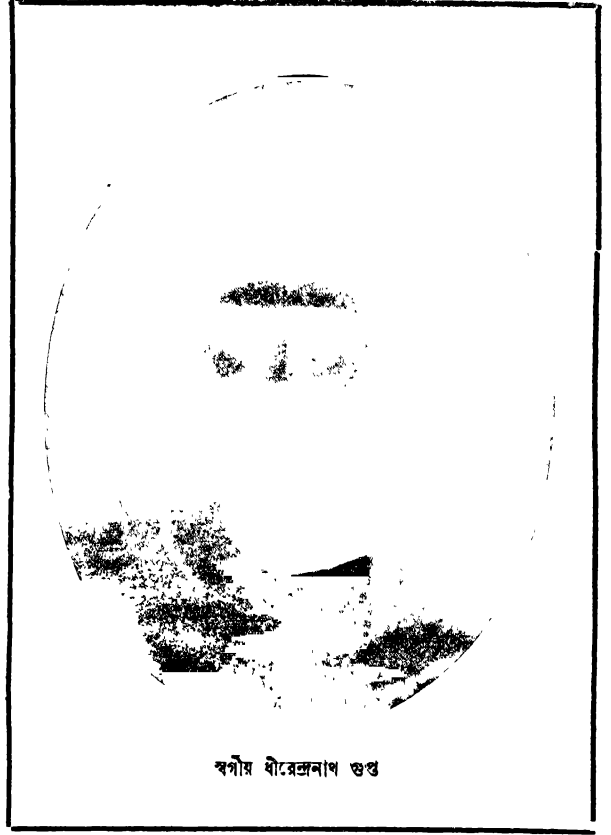
স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পুস্তক-পরিচয়

নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন—অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত। ৪৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৷৷০ টাকা।

বইখানি গত মাসেই আমাদের হাতে আসিয়াছিল, কিন্তু প্রথম ঝোঁকে ইহা ভাল কি মন্দ বিচার করিয়া উঠিতে পারি নাই। একটু বিশেষ যত্ন করিয়া পড়িয়া দেখিতে হইল।

বিনয় বাবুর ভাষা এতদিন ছিল গুরু-চাণ্ডালী, এখন প্রায় চাণ্ডালীতে দাঁড়াইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় বোধ হয় তাহাতে সুখীই হইয়াছেন, কারণ তিনি বলিয়াছেন "এখন চেষ্টায় আছি ভাষাকে ষোল আনা চাণ্ডালীতে পরিণত করিতে পারি কি না তা দেখিতে।"

বইখানিতে ভাবিবার কথা অনেক আছে এবং কথাগুলি সব "নয়া" না হলেও নানা বিদেশী অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয় নবীন বাংলাকে নূতন চিন্তাধারায় অভিষিক্ত করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

বইখানির শুধু গোড়াপত্তন কেন, দেওয়াল, ছাদ, দরজা, জানালা সবই বিভিন্ন যুবক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে লেখকের পূর্ব্বতন বক্তৃতা ও লেখা দিয়া প্রস্তুত। আলোচ্য বিষয়গুলির সমাবেশ তাই যেন খাপছাড়া হইয়া পড়িয়াছে এবং সব সময়ে যেন যুক্তিপূর্ণ হয় নাই। এখানেও লেখক মহাশয় পুরাপুরি চাণ্ডালী না হইলেও গুরু-চাণ্ডালীর প্রমাণ দিয়াছেন। একদিকে যেমন "ব্যাঙ্ক-গঠন ও দেশোন্নতি" এবং "ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা" সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে রহিয়াছে "বিদেশফের্ত্তার অত্যাচার" ও "তাঁদড়ের দর্শন"।

সে যাই হোক্, বইখানিতে মাদকতা আছে খুবই। কিন্তু প্রথম সত্তর পৃষ্ঠায় লেখক মহাশয়ের পরিচয় দিতে গিয়া প্রকাশক মহাশয় অযথা বইখানিকে ভারী ও খরচসাপেক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন। অধ্যাপক বিনয়কুমারের এ বিজ্ঞাপন না দিলেই শোভন হইত।

ভারতে পরদেশী ব্যাঙ্কের বনিয়াদ—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম্, এ, বি, এল্, প্রণীত। ১২০ পৃষ্ঠা

বাঙ্গালী এখন নিছক কাব্য ও সাহিত্যের আলোচনা ছাড়া অর্থের সন্ধানে মন দিয়াছে। এ সময়ে সহজ ও সরল বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের নানা প্রশ্নের আলোচনা হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার কয়েকজন ছাত্র ও গবেষককে এই কাজে ব্রতী করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্তবাদার্হ হইয়াছেন। জিতেন বাবু ছিলেন ধনবিজ্ঞান পরিষদের অন্ততম গবেষক। তাঁহার প্রথম পুস্তক "দেশ বিদেশের ব্যাঙ্ক" খানিতে কথোপকথনের মধ্যে ব্যাঙ্কিং-এর অনেক কঠিন প্রশ্ন আলোচনা দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছিলাম। দ্বিতীয় বইখানিও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও সময়োপযোগী হইয়াছে।

বইখানিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া জিতেন বাবু প্রথমতঃ এক্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত কয়েকটী মূল সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে প্রচলিত ইংরাজী কথাগুলির সহিত পরিচিত করিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাগে আমাদের দেশের সমস্তাগুলি আলোচিত হইয়াছে এবং এই সকল সমস্তার সমাধান কিরূপে হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তৃতীয় ভাগে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট বাহির হইবার বহু পূর্ব্বেই বইখানি বাহির হইয়াছিল। লেখকের পরিশ্রম ও গবেষণার গভীরতা দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। বেঙ্গল ন্তাশনাল চেম্বারের ছোটখাট সাময়িক প্রসঙ্গের আলোচনা কমাইয়া লেখক যদি বাংলাভাষায় ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সহিত বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় করাইতে যত্নবান্ হন তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ করা হইবে। এই সম্পর্কে আমাদের একটী অনুরোধ এই যে বাংলা ভাষাকে যথেচ্ছভাবে কথ্য এবং অকথ্য ভাষার সহিত মিশাইয়া "গুরু চাণ্ডালী" না করিয়া ফেলিলে আমরা সুখী হইব।

ভাগ্যলক্ষ্মী—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত। ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য পাঁচসিকা।

"ভারতের নারীজাতি—মা, ভগ্নী, পত্নী, কন্তা—কি ছিল, কি হইয়াছে, কি হইবে তাহারই আলেখ্য অখণ্ড দৃশ্যপটে আঁকিবার প্রয়াস মাত্র।"—দশখানি ছবি আছে। ভারতের কয়েকজন মহিয়সী নারীর জীবন-পরিচয়ে—নারীজাতির অতুলনীয় সম্ভাবনার আভাষ দেওয়া হইয়াছে। ছত্রে ছত্রে ভাষার গৌরব। বিষয়বিন্তাসে লিপি-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। দরদ দিয়া লেখা—এ যুগের একান্ত উপযোগী—এই পুস্তকখানি লিখিয়া লেখক সমাজের পরম উপকার করিলেন। 'ভারতলক্ষ্মী' গৃহলক্ষ্মীদের গৃহে গৃহে সমাদর লাভ করিবে আশা করি।

বেদুইন্—কবিতা পুস্তক, শ্রীপীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় বান্ধব পুস্তকালয়, হাওড়া—মূল্য ১৲ টাকা।

আজকাল সাধারণতঃ যে ধরণের কবিতার প্রচলন খুব বেশী, বেদুইনের সুর তাহা হইতে একটু স্বতন্ত্র, এই স্বাতন্ত্র্যের জন্ত যে ধন্তবাদ তাঁহার প্রাপ্য, তাহা আমরা তাহাকে দিতেছি।

কিন্তু সাহস ভাল জিনিস হইলেও বে-পরোয়ামি প্রশংসনীয় নয়। "শ্মশানেও কভু মৃতারে দেখায়ে যিনি বুকে দেন্ কাম"—অথবা, "আমি ম'রে গেলে আমার বিয়হে কেঁদোনাক' তুমি প্রিয়ে, নিঃসঙ্কোচে হেসে কথা ক'য়ো মাথায় সিঁদুর দিয়ে" প্রভৃতি অংশ সেই পর্য্যায়ে পড়ে; নূতনত্বের মোহে স্থানে স্থানে অনেক অসংযমও প্রকাশ পাইয়াছে, যেমন—"দেহে দেহ দিও সৃষ্টি করার আগে"। করুণ রসও এক আধ জায়গায় হাস্তরসে পর্য্যবসিত হইয়াছে—যেমন, "নাম তার গিরিবালা, অদ্ভুত নারী, বৃদ্ধ বয়সে আমারে পরাল' মালা!"

সমসাময়িক কবির ছাপ ছন্দের দোষ মাঝে মাঝে আছে। লেখকের ভবিষ্যত আছে বলিয়াই কয়েকটী ক । বলার প্রয়োজন হইল।

ছেলেদের গান—স্বামী চণ্ডিকানন্দ প্রণীত। শ্রীরামকৃষ্ণমঠ, উয়ারি, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৵০ তিন আনা।

মায়াতরু—কবিতার বই। শ্রীসরোজনী দেবী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মুক্তা-পাড়া, ঢাকা।

কিশোরী—কিশোরীদের সচিত্র বার্ষিক, শ্রীসুধা দেবী বি-এ, বি-টি, এল-টি-ডি (লণ্ডন) সম্পাদিত। ষ্টুডেণ্টস এম্পোরিয়াম, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্—মূল্য ২৲ দুই টাকা।

যাহারা ছোটও নয় অথচ বয়স্কের এলাকাতেও আসিয়া পড়েনি তাহাদের পড়ার উপযুক্ত বই বা কাগজ বাংলা ভাষায় দুর্লভ। এই কিশোর বয়সটি পুরুষের পক্ষে খুব বেশী লক্ষ্য করিবার বিষয় না হইলেও মেয়ের পক্ষে জীবনের এই স্তরটিই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়—কারণ এই বয়সের শিক্ষা দীক্ষা এবং অনুশীলনের দ্বারাই তাহাকে অদূর ভবিষ্যতের পত্নী ও জননী হইয়া উঠিতে হইবে। আনন্দের বিষয় এই বয়সের মেয়েদের জন্ত এমন এক খানি বার্ষিক প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বইটিতে বাংলার প্রসিদ্ধ লেখক-লেখিকারা প্রায় সকলেই লিখিয়াছেন। নানা বিষয়ক জ্ঞাতব্য প্রবন্ধ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে—যেমন জার্ম্মেনীতে যুব-আন্দোলন, লাইব্রেরির ইতি-কথা, সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ ইত্যাদি রচনা বিশেষজ্ঞরাই লিখিয়াছেন। শ্রীমতী দীপ্তি দেবীর গল্প আমাদের ভাল লাগিয়াছে। কবিশেখর কালিদাস রায়, গিরিজা বসু, হরিপ্রসন্ন দাস-গুপ্ত, নিরুপমা দেবী প্রভৃতি কবিতা লিখিয়াছেন, এই গল্প-কবিতাগুলি হইতে একটা জিনিস বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলাম। মহিলা লেখিকারা প্রায় সকলেই এই বয়সের মেয়েদের মনোবৃত্তির ধারাটি ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন তাই উঁহাদের

লেখাগুলি ঠিক বিষয়ানুযায়ী হইয়াছে—পুরুষ লেখকেরা হয় খুব ছোটদের মত লিখিয়াছেন, নয় বড়দের মত করিয়া ফেলিয়াছেন—পুরুষের পক্ষে মেয়েদের জন্য লিখিতে যাওয়ায় হয়ত এই রকমই স্বাভাবিক।

আমরা 'কিশোরী'র বহুলপ্রচার এবং স্থায়িত্ব কামনা করি।

পোর্ট আর্থারের ক্ষুধা—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা। দাম ১৲ টাকা। দেড়শতাধিক পৃষ্ঠা। সুন্দর ছাপা-বাঁধাই। উল্লেখযোগ্য প্রচ্ছদপট।

প্রাচীন বাঙালী কি ছিল জানি না, বর্ত্তমানে আমরা সামরিক জাতি নহি। পৌরাণিক যুদ্ধ ছাড়া আমাদের সাহিত্যে সমর-কাহিনী একেবারেই নাই। কিন্তু 'গ্রেট ওয়ার'এর পর হইতে ইংরাজী সাহিত্যের মারফৎ আমরা বহুতর সমর-রচনা—উপন্যাস, কাহিনী, কবিতা পাঠ করিয়া করিয়া, যুদ্ধের রোম্যান্স ও বীভৎসতা সম্পর্কে একটা 'বাসনা' সঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছি।—এই 'বাসনা'র প্রবলতা ইহার কৃত্রিমতার বাঁধ ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং সামরিক জাতি না হইয়াও আমরা বর্ত্তমানে সমর-সাহিত্যের সম্পূর্ণ রস উপলব্ধি করিতে পারি। আলোচ্য বইখানি না পড়া পর্য্যন্ত একথা হয়তো এত জোর করিয়া বলিতে পারিতাম না। কেননা এ অবধি আমাদের কাছে সকল সমর-রচনার বাহন ছিল ইংরাজী ভাষা। ভাষার আবহাওয়ায় অনেকখানি নিজেদেরকে ভুলিয়াই সেগুলির রস উপভোগ করিয়াছি। বর্ত্তমান পুস্তকে সে সুযোগ ঘটে নাই। তবু ইহার রসবোধে এতটুকু কমতি হয় নাই। অনুবাদককে এজন্য ধন্যবাদ দিতেছি, তাঁহার ভাষার বাহাদুরি আছে। মূল বইখানি লেফটেন্যাণ্ট সাকুরায়ের লেখা। পোর্ট-আর্থারের সমরক্ষেত্রে, 'ডান হাতখানি যুদ্ধে বিসর্জ্জন দিয়া বাঁ হাতে তাঁর প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেন।' সুতরাং ইহার ঐতিহাসিক মূল্যের কথা ভুলিলে চলিবে না। কিন্তু ইতিহাসকে বহু পিছনে রাখিয়া যে সুর মানব-সত্তাকে গতি-পথে অগ্রসর করে, এ ধরণের বইয়ের মূল রস তাহাই। এই রস বইখানির প্রতি কাহিনীতে পর্য্যাপ্ত। ভাষার মাধুর্য্য ইহার দার্শনিকতাকে রসাল করিয়াছে। প্রমাণার্থে নীচে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"এখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে—ঝড় কমিয়াছে। এই শান্তি আসিল অযুত যোদ্ধার রুধিরের স্রোত বাহিয়া। অনাগত যুগে হয়ত এমন সময় আসিবে যখন পোর্ট-আর্থারের সুকঠিন গিরিশ্রেণী ধূলার সঙ্গে মিশিবে, যখন লিয়াও-তুংএর নদী শুকাইয়া যাইবে। কিন্তু দেশভক্ত লক্ষ লক্ষ সেনা, যারা সম্রাট ও দেশের জন্য প্রাণ দিল, তাদেরও নাম বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিবে—এমন সময় কখনো আসিতে পারে না। তাদের সে-নামের সৌরভ যুগযুগান্তে ছড়াইয়া পড়িবে, অনাগত জাপানী চিরদিন তাদের গুণগরিমা কৃতজ্ঞ অন্তরে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।"

কবি-প্রশস্তি (রবীন্দ্র-জয়ন্তী)—ছাত্রছাত্রী উৎসব-পরিষদ প্রকাশ-বিভাগ পক্ষে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। মনোরম ছাপা বাঁধাই।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসবে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ হইতে যে রচনাগুলি কবির উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল, এখানি তাহারই উৎকলন। সচরাচর প্রকাশিত পুস্তক হইতে তাই ইহা বিভিন্ন। বিলাতী 'ইয়ার-বুক' কিংবা ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির কংগ্রেসে পঠিত রচনা ইত্যাদি লইয়া যে সব বই বৎসর বৎসর প্রকাশিত হইতেছে, এখানি তাহাদেরই মতো। এই ধরণের বই জাতির চিন্তাপ্রগতির নির্দ্দেশক। ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা প্রকাশিত হইলেও, এ পুস্তকে কয়েকটি রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কিত সুপাঠ্য নিবন্ধ আছে।

জয়ন্তী—শ্রীপ্রতাপ সেন, বি-এস-সি। প্রকাশক—শ্রীবিমলাচরণ রায়চৌধুরী, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস, কটক। মূল্য ৷৷০ আট আনা, কবিতার বই।

শ্রদ্ধেয় কালিদাস রায় মহাশয় 'পরিচারিকা'য় লিখিয়াছেন—'রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে···শ্রীমান্ প্রতাপের মাথায় নূতন বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। প্রতাপ কেবল একটি কবিতা রচনা করিয়াই আপনার কর্ত্তব্য সমাধা করিতেছে না. সে এই সঙ্গে তাহার কল্পলতার প্রথম পুষ্পটিই কবিগুরুর শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছে।···কবিগুরু এই তরুণ ভক্তের স্বপ্নজীবনের মুকুলিত আকিঞ্চনটুকু যদি স্নেহ-ভরে গ্রহণ করিয়া স্নিগ্ধ প্রসন্ন আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন, তাহা হইলে তাহার স্বপ্ন-জীবন চরিতার্থ হইবে—আমরাও ধন্য হইব।"

শিশুর দিনচর্য্যা—পণ্ডিত শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক—শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড সন্স, কটন লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য ৵০ দুই আনা।

বালকবালিকাদের দৈনিক কাজগুলির বর্ণনা করাই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য। শয্যাত্যাগ হইতে নিদ্রাকাল অবধি শিশুর কি কি কর্ত্তব্য অভিজ্ঞ গ্রন্থকার তাহা নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মাসকাবারি

স্বদেশ—

রাজনৈতিক সন্ধি :—

১লা জুলাই—নিখিল ভারত জামীয়াৎ উলেমা নামক মুসলমান-সঙ্ঘ এক বিবৃতি বাহির করিয়া জানাইতেছেন সিমলা হইতে স্বার্থান্বেষী কয়েকজন মুসলমান নেতা আগামী ভারত-শাসন সংস্কার ও সাম্প্রদায়িক মীমাংসা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা ভারতের জাতীয় ভাবের পরিপন্থী ও সমগ্র মুসলমান সমাজের অপমানকর। কংগ্রেস ও জামীয়াৎ উলেমা সঙ্ঘভুক্ত জাতীয়তাবাদী মুসলমানের সংখ্যা তথাকথিত সাম্প্রদায়িক মুসলমান অপেক্ষা অনেক বেশী।

২রা জুলাই—যুক্তপ্রদেশের উদার-নৈতিক দলের কমিটি স্থির করিয়াছেন যে স্যার সামুয়েল হোরের ভারত সংস্কার প্রস্তাবের দ্বারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন। লর্ড উইলিংডন ভারতীয় সামন্ত-নৃপতিগণের সহিত ভারত সংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছেন। উদার নৈতিকদল শেষ পর্য্যন্ত কি স্থির করেন সেজন্য সিমলার কর্ত্তৃপক্ষ সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন।

৫ই জুলাই—স্যর সিতলবাদ ভূতপূর্ব্ব গোলটেবিল বৈঠকের সমস্ত উদারনৈতিক সদস্যগণকে বোম্বাইএ ৯ই তারিখে মিলিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বোম্বাই আসিতেছেন। কিন্তু তিনি গবর্ণমেণ্টকে জানাইতেছেন যে স্বাস্থ্যের জন্য ভারতীয় Consultative Committeeতে তাঁহার যোগ দেওয়া সম্ভব হইবে না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে নিখিল ভারতীয় মুস্‌লিম্ কনফারেন্সের অধিবেশন স্থগিত রাখার জন্য সভ্যগণের মধ্যে বিরোধ বাধিয়াছে। বন্ধ করার কর্ত্তা স্যর ইকবাল্।

৯ই জুলাই—স্যর স্যমুয়েল সেণ্ট্রাল এসিয়া সোসাইটিতে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছেন যে ভারতশাসন সংস্কার যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র বিধিবদ্ধ হয় তাহার জন্যই তিনি পদ্ধতির ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু ভারতে কেহ কেহ বলিতেছেন যে গবর্ণমেণ্টের মতলব ভাল নহে।

স্যর সাপ্রু ও জয়াকর ভারতীয় Consultative Committeeর সভ্য ছিলেন; গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শাসন সংস্কার আলোচনার নীতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তাঁহারা বড় লাটের নিকট ইস্তফা-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। অসুস্থতাপ্রযুক্ত স্যর সাপ্রু অদ্যকার বোম্বাই লিবারেল কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিতে পারিবেন না।

১০ই জুলাই—Consultative কমিটির অন্যতম সদস্য মিঃ যোশী ঐ সদস্য-পদ ত্যাগ করিলেন।

গত কল্য বোম্বাইএ গোলটেবিল বৈঠকের উদারনৈতিক সদস্যবৃন্দের পরামর্শ-সভায় স্থির হইয়াছে যে অতঃপর ভারত-শাসন-সংস্কারকার্য্যে সহযোগিতা করা অসম্ভব।

লণ্ডনে মিঃ জিন্না বলিয়াছেন যে ইণ্ডিয়া অফিস এখন আর সহযোগিতা-কামী ভারতীয়দের মত লওয়া প্রয়োজন মনে করেন না।

নিখিল ভারত মুসলিম কন্‌ফারেন্সের দুই দলের মধ্যে এক দলের অগ্রণী মৌলানা হাস্‌রাত মোহানি একটি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দল গঠন করিতেছেন, যাহাতে হিন্দুরাও সভ্য হইতে পারিবেন। ৫জন কংগ্রেসসভাবলম্বী সদস্য লইয়া একটি বোর্ড গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা চান পূর্ণবয়স্ক ভারতীয় মাত্রেরই ভোটাধিকার।

কলিকাতায় মিঃ গজনভির সভাপতিত্বে বঙ্গীয় মুসলিম কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া সভায় গোলমাল ও হাতাহাতি হয়; ফলে ফজলাল হক্ ও কয়েকজন জাতীয়তাবাদী সভ্য সভা ত্যাগ করেন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট ইস্তাহার জারী করিয়াছেন যে স্থলসৈন্য ও আকাশসৈন্য বিভাগে ভারতীয়দের অফিসর নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা শেষ হইয়াছে এবং এই বৎসর যাঁহারা ডেরাডুন্ ও ক্রান্‌ওয়ালে শিক্ষিত হইবার জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদের যথাক্রমে ৩০০্ ও ৩৮৫্ বেতন দেওয়া হইবে।

১১ই জুলাই—গোলটেবিল বৈঠকের সদস্যরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিলেন—গোলটেবিল বৈঠকের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা বজায় না রাখিলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সহিত শাসন সংস্কারসম্বন্ধীয় খসড়া প্রস্তুত বিষয়ে অসহযোগিতা করিবেন।

নিখিল ভারত উদারনৈতিক সঙ্ঘের কার্য্যকরী সভায় গৃহীত হইল—গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া নীতি পরিবর্ত্তিত করায় শাসনসম্পর্কিত ভবিষ্যৎ আলোচনায় তাঁহারা আর সহযোগিতা করিবেন না। ঐ সভা নূতন অর্ডিনান্স-জারীর তীব্র প্রতিবাদও করিয়াছেন।

বোম্বাই-এ নিখিল ভারত অনুন্নত সম্মিলনের অধিবেশন হইল। মিঃ রাজা তাহার সভাপতি। অধিবেশনের পূর্ব্বে আম্বেদকারী দলের সহিত স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্ঘর্ষ হয়, ফলে ৪৫ জন স্বেচ্ছাসেবক জখম হইয়াছে। পুলিশ শান্তি প্রতিষ্ঠিত করে। সভায় মিঃ রাজা বলেন সমগ্র হিন্দুজাতির উন্নতি অবনতির সহিত অনুন্নত জাতির ভাগ্য নির্ভর করিতেছে।

[illegible]ই জুলাই—সার সামুয়েল পার্লিয়ামেণ্টে পুনরায় বলিয়াছেন যে গোলটেবিল বৈঠক বাতিল করার মধ্যে তাঁহার কোন মন্দ উদ্দেশ্য নাই। সার সাপ্রু প্রভৃতি লিবারেল নেতাগণ অসহযোগ করায় তিনি দুঃখিত, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতির স্বপক্ষে অনেক বিশিষ্ট ভারতীয় নেতা আছেন, যাঁহাদের নাম উপস্থিত প্রকাশ করা হইবে না।

সার আবদার রহিম বলিতেছেন—গোলটেবিল বৈঠকে কোন লাভ হয় নাই এবং সার সাপ্রু প্রভৃতি নেতারা উপস্থিত অবস্থায় Consultative Committee বর্জ্জন করিয়া ঠিক কাজই করিয়াছেন।

১৫ই জুলাই—মিঃ গজনভি বলিলেন—সার সামুয়েলের বক্তৃতায় লিবারেল দলের মত পরিবর্ত্তন করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

মিঃ ল্যান্সবেরি বলিয়াছেন—এই সঙ্কটকালে ভারতের বড়লাট যদি এখনো গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপোষের ব্যবস্থা করিতে পারেন তবে সকল দিক রক্ষা পায়।

১৬ই জুলাই—সাপ্রু, জয়াকর, সিতলবাদ, সেট্‌না, পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস, প্রভৃতি নেতারা বলিয়াছেন—হোরের তৃতীয় বক্তৃতাতে এমন নূতন কিছুই নাই যাহাতে তাঁহারা সহযোগিতা করিতে পারেন।

১৭ই জুলাই—ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের মাদ্রাজ-শাখা কেন্দ্রী এসোসিয়েশনে তার করিয়াছেন যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে গোলটেবিল নীতির পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতের লিবারেল দলকে সহযোগিতা করিতে সুযোগ দেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করা হউক।

১৯শে জুলাই—পঞ্জাবের গবর্ণর অসুস্থতানিবন্ধন ছুটি লইতেছেন। তাহার স্থানে বর্ত্তমান রেভিনিউ মেম্বর কাপ্তেন সিকান্দর হায়েৎ খাঁ অস্থায়ী ভাবে গবর্ণরের কার্য্য করিবেন।

২০শে জুলাই—ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডেন পত্রিকা বলিয়াছেন—ভারতের কোন দল ত স্যর সামুয়েলের শাসনসংস্কার পন্থার অনুমোদন করিল না। তবে স্যর সামুয়েল প্রদত্ত সংস্কার গ্রহণ করিবে কে?

২৩শে জুলাই—স্যর রবার্ট গ্যারানের সভাপতিত্বে ভারতের ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয়ভারের কত অংশ ইংলণ্ডের বহন করা উচিত এই সম্বন্ধে যে ট্রিবিউন্যালের অধিবেশন হইবে তাহাতে লাহোরের চিফ্ জাষ্টিশ স্যর মার্কিনাল একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

ভারতবর্ষের উপস্থিত অবস্থায় ভারতীয় ও ইংরাজগণের মধ্যে শেষ মিলন চেষ্টার সময় আসন্ন হইয়াছে এই সর্ত্তে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় এক আবেদন পত্রস্থ করিয়াছেন।

দিল্লীর চিফ কমিশনার অর্ডিনান্সের পুনঃ প্রবর্ত্তন সম্পর্কে দেশের মতামত জানিবার জন্য ৮ জন বিশিষ্ট অ্যাড্‌ভোকেটকে আহ্বান করিয়াছেন।

২৭শে জুলাই—বোম্বাই হাইকোর্ট সুরাট ম্যাজিষ্ট্রেটের জনৈক ডাক্তারকে বে-আইনি সমিতিকে সাহায্যের অভিযোগহেতু দণ্ডের নাকচ্ করিলেন।

২৮শে জুলাই—ভারতীয় স্বাধীন-রাজ্য-(আর্থিক) সন্ধান-সমিতির বিবরণীতে ব্রিটিশ ভারতের সহিত এই সব রাজ্যের আর্থিক সম্পর্ক বিবেচিত ও ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ।

২৯শে জুলাই—বোম্বাই হাইকোর্ট কর্ত্তৃক আমেদনগর ম্যাজিষ্ট্রেটের গান্ধী-দিবসোপলক্ষে ধৃত দিগম্বর গণেশ মাগারকার ও তাহার ভায়ের দণ্ড নাকচ।

৩০শে জুলাই—ব্যয়-সঙ্কোচ-সমিতির বিশেষ উদ্দেশ্য-সংঘ-বিভাগ হইতে ভারত সরকারের বৈদেশিক ও রাষ্ট্রীয় বিভাগের শতকরা ২০ টাকা সঙ্কোচ-প্রস্তাব। রিপোর্টে ভারতীয়কে এই বিভাগে বেশী চাকুরি দিবার নির্দ্দেশের সহিত অকারণ কতকগুলি সমগ্র সাম্রাজ্য-শুভমূলক ব্যাপারের ভারতীয়কে অনুপযুক্ত ভাবে ধার্য্য করার প্রতি ইঙ্গিত আছে।

রাজনৈতিক বিগ্রহ—

১লা জুলাই—বিভিন্ন অর্ডিন্যান্সকে সংহত করিয়া একটি নূতন অর্ডিন্যান্স জারী হইল। তাহার নাম ১৯৩২ সালের Special Powers অর্ডিন্যান্স।

বাংলাদেশে দার্জ্জিলিং, মালদা, বগুড়া, ফরিদপুর, ময়মনসিং, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, খুলনা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম (পার্ব্বত্য) এই কয়টি জেলা ভিন্ন অন্য সমস্ত জেলা উক্ত অর্ডিন্যান্সের কবলে আসিল। পরে প্রয়োজন হইলে ঐ সমস্ত জেলাতেও ইহা জারী করা চলিবে।

যুক্তপ্রদেশে ২৬টি, পাঞ্জাবে ১৭টি, মধ্য প্রদেশে ৬টি জেলা অর্ডিন্যান্সের আংশিক প্রয়োগ হইতে মুক্ত রহিল। বোম্বাই ও নবনির্ম্মিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মাত্র এক একটি জেলায় এই অর্ডিন্যান্সের প্রয়োগ হইবে।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-ক্ষুণ্ণকারী সর্ত্তগুলি নূতন অর্ডিন্যান্সে আছে।

ইংলণ্ডের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শ্রমিক সঙ্ঘ, কংগ্রেস লিগ্ ও গান্ধী সমিতির পক্ষ হইতে ফেনার ব্রকওয়ে প্রমুখ ইংরাজগণ এক বিবৃতি বাহির করিয়া জানাইতেছেন—অর্ডিন্যান্সের পুনঃ প্রবর্ত্তন দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে বর্ত্তমান ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেস ও ভারতের মুক্তিকামী অন্যান্য সমস্ত দলের চেষ্টা বিফল করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এখন হইতে ভারত যেন সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করিয়াই তাহার স্বাধীনতা অর্জ্জন করে।

ডগ্‌লাস্ হত্যাপরাধে ফাঁসীর দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী প্রদ্যোৎকুমার হাইকোর্টে আপীল করিল।

বে-আইনি ভাবে জেলা কন্‌ফারেন্স (আমেদাবাদ) বসাইবার চেষ্টা করায় ৭০০ পুরুষ ও ৩০০ স্ত্রীলোক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বোম্বাইএর মুলজী জেঠা বাজার হইতে বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসায়ীগণ উঠিয়া গেলেন। স্থানান্তরিত বস্ত্রের মূল্য ১০ লক্ষ টাকা।

দেউলি (আজমীর) ডেটেনু জেলে ৪ জন আগন্তুক যুবকের সহিত জেল-রক্ষকদের গুলি চালাচালি হইয়াছিল। যুবকদের কাহাকেও ধরিতে পারা যায় নাই।

৫ই জুলাই—আমেদাবাদে ও বোম্বাইএ কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে প্রায় ২৫০ লোক গ্রেপ্তার।

৬ই জুলাই—নানাস্থানে কংগ্রেসীরা ৪ঠা জুলাই বন্দীদিবস পালন করিয়াছে। এই উপলক্ষে এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ট্রেনের শিকল টানিয়া অধিকাংশ দ্রুতগামী গাড়ী বন্ধ করা হইয়াছিল।

বন্দীদিবস পালন উপলক্ষে মেদিনীপুরের মানপুরী গ্রামে কংগ্রেসওলাদের সহিত পুলিশের সংঘর্ষ হয়। ফলে পুলিশের গুলিতে ২ জন হত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে।

ডক্টর আনসারী ৬ই তারিখে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। শরীর অসুস্থ বলিয়া তিনি আগষ্ট মাসে ইউরোপ যাত্রা করিবেন।

ডাক্তার কিচ্‌লু কাশীতে আসিয়া মালবাজী, জামিয়াৎ উলেমার কর্ত্তৃপক্ষ ও অন্যান্য নেতার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া দিল্লী ফিরিলেন।

৯ই জুলাই—গত বৎসরের অসহযোগ আন্দোলনের সময় শোলাপুরে সামরিক আইন জারি করিতে হইয়াছিল; তৎসম্পর্কে উক্ত স্থানের হিন্দু অধিবাসীদের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট প্রায় ২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করিতেছেন।

১০ই জুলাই—মেদিনীপুরের কয়েকটি গ্রামে ট্যাক্স বন্ধ করার জন্য স্থানীয় ইউনিয়ন-প্রেসিডেণ্ট চৌকিদার দফাদার ও পিউনিটি পুলিশ কয়েকজনের বাড়ীতে হানা দিয়া জোরপূর্ব্বক ট্যাক্স আদায়ের চেষ্টা করিয়াছে।

কাশীতে ডাক্তার কিচ্লু ও অন্যান্য কংগ্রেস-নেতার মধ্যে পরামর্শে আধুনিক রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনা।

১১ই জুলাই—ডেরাডুন জেলে আসার পর পণ্ডিত জহরলালের শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ; কিন্তু এখনও তাঁহার প্রতি সন্ধ্যায় জ্বর হইতেছে।

১৫ই জুলাই—কাশীতে কংগ্রেস-নেতাদের মধ্যে যে প্রয়োজনীয় কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারিত হইয়াছে কিচ্লু তাহা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। তবে তিনি বলিয়াছেন যে দেশ যেন নূতন কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। দিল্লী ফিরিবার পথে কিচ্লু স্যর সাপ্রুর সহিত বহুক্ষণ রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনা করিয়াছেন।

১৬ই জুলাই—মেদিনীপুরের একটি গ্রামে চৌকিদারী টেক্স আদায় সম্পর্কে পুলিশের সহিত স্থানীয় লোকের সংঘর্ষ হয় এবং পুলিশের গুলিতে কয়েকজন আহত হইয়াছে।

পাটনা ও দিল্লীর পুলিশ-অধিকৃত কংগ্রেস আফিস পুনরধিকার করিবার চেষ্টার ফলে প্রায় ৭০ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

স্যর সামুয়েল বলিয়াছেন রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্য হইতে ১০০ জনকে আন্দামানে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হইবে। জেল কমিটির তদন্তের ফলে ১৯২০।২১ সালে গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছিলেন যে আন্দামানে আর কোন বন্দী প্রেরণ করা হইবে না।

১৯শে জুলাই—সুভাষ বাবু জব্বলপুর জেলে অসুস্থ হইয়াছিলেন ও তাঁহার দেহের ওজন ২১ সের কমিয়া গিয়াছে। তাঁহাকে X' Ray চিকিৎসার জন্য মাদ্রাজে আনা হইয়াছে।

পণ্ডিত জহরলালের শরীর কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ। তাঁহাকে শীঘ্রই বোধ হয় মুসৌরীতে আনিয়া X' Ray পরীক্ষা করা হইবে।

শ্রীযুত অভয়ঙ্কর জেলে অগ্নিমান্দ্য ও অনিদ্রারোগে কষ্ট পাইতেছেন।

বোম্বায়ের বিখ্যাত তুলার দালাল বাপুলাল লালুভাইএর গ্রেপ্তার।

মহিষাদল রাজার রথের উপর কংগ্রেসপতাকা উড্ডীন থাকায় পুলিশ আপত্তি করে। সেজন্য উল্টা রথ আর টানা হয় নাই—বিগ্রহ গোপালকে বিনা রথে রাজপুরীতে নেওয়া হইয়াছে।

২০শে জুলাই—পাটনা ও অন্যান্য কয়টি স্থানে কংগ্রেস-ভলাণ্টিয়ার কর্তৃক ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসগৃহটি পুলিশের হস্ত হইতে পুনরাধিকারের চেষ্টা চলিতেছে। ফলে অনেক লোক গ্রেপ্তার হইতেছে।

২৩শে জুলাই—শুনা যায় ডাক্তার আলম্ লাহোর জেলে সহসা অজ্ঞান হইয়া যান, ও জ্ঞান হইতে ৩ ঘণ্টা লাগে। তাঁহার দেহের ওজন ২৫ সের কমিয়া গিয়াছে ও তিনি হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইতেছেন বলিয়াও সংবাদ আসিয়াছে।

বোম্বাই হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে অর্ডিন্যান্সে নিষেধ থাকিলেও দেশের সর্ব্ববিধ বিচার-পরিচালন-কার্য্যেই হাইকোর্টের প্রাথমিক ক্ষমতা অপ্রতিহত আছে—এবং অর্ডিন্যান্সসংযুক্ত আইন সম্পর্কেও একথা খাটিবে।

২৪শে জুলাই—শিমলার সিংহসভাহলের বিরাট শিখ-সভায় পাঞ্জাব-কাউন্সিলে মুসলমানের সংখ্যা-প্রাধান্য আশঙ্কায় বিরুদ্ধে প্রস্তাব-গ্রহণ।

নাগপুরে অলইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট রুইকারের রাজদ্রোহপরাধে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

বোম্বায়ে ইণ্ডিয়ান মার্চ্যাণ্টস্ চেম্বারের প্রেসিডেণ্ট করঞ্জিয়া কর্তৃক স্যামুয়েল হোরের বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা।

যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর ম্যালকম্ হেলির বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কংগ্রেসকে কটূক্তি।

পলাতক রাজদ্রোহী ধর্ম্মপাল দিল্লীতে গ্রেফতার।

বোম্বায়ের ফ্রিপ্রেস জার্নালের আমানতি ৬০০০৲ টাকা প্রেস অ্যাক্ট অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত।

২৫শে জুলাই—এলাহাবাদে 'স্বরাজভবন'-প্রবেশার্থী ২৭জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক গ্রেফতার। ঐ প্রদেশে স্থানে স্থানে কংগ্রেসের পুনরভ্যুত্থান।

বোম্বায়ে কংগ্রেস-হাউজ প্রবেশার্থী ৫৫ জন গ্রেফতার।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্কুলের ছাত্র ইন্দ্র চক্রবর্ত্তী অর্ডিনান্সে গ্রেফতার।

মুন্সিগঞ্জে কংগ্রেসকর্ম্মী কামাখ্যা ভট্টশালীর ১০ বছরের জেল—আরও জনকয়েক নর-নারীর ছয় মাস জেল।

বাঁকুড়ায় ৭ জন কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবক গ্রেফতার।

চৌকিদারী ট্যাক্স না দিতে পারায় মেদিনীপুরের দাঁতন ইউনিয়নবোর্ডের প্রজার উপর তাগিদ।

তমলুকে সুবোধবালা কুঠির ১০ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০৲ টাকা জরিমানা।

নেলোরে ১৪৪ ধারা।

২৬শে জুলাই—বেনারসে মালব্যজীর সভাপতিত্বে উদার ও মধ্যপন্থীদের সভায় স্যর স্যামুয়েল হোরের বক্তৃতার প্রতিবাদ।

নাগপুরের হাইকোর্ট হইতে শ্রীযুক্ত অ্যানে ও ডাম্লের আইন-ব্যবসায় করার নিষেধাজ্ঞা।

নিখিল ভারত বন্দীদিবস উপলক্ষে ঢাকায় কতিপয় গ্রেফতার।

বোম্বায়ে বাপুভাই দেশাই (ভূতপূর্ব্ব অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল) ও মঙ্গলদাস থেকাস গ্রেফতার।

মেদিনীপুরে কতিপয় ভদ্রলোকের উপর পিউনিটিভ পুলিশের আশ্রয়কল্পে বসতবাটি হইতে সপরিবারে বহির্গমন-নির্দ্দেশ।

২৭শে জুলাই—এলাহাবাদে স্বরাজভবন-প্রবেশার্থী ৬৩ জনের ১৬ জন গ্রেফতার।

চট্টগ্রামের ধালঘাট ও অপর একটি গ্রাম হইতে পিউনিটিভ ট্যাক্স বাবদ ৫০০০৲ টাকা উঠাইবার ইস্তাহার।

২৯শে জুলাই—সিকান্দ্রাবাদে কেন্দ্রীয় সরকারনিরপেক্ষ প্রস্তাবিত ব্রিটিশ সামরিক ছাউনি ভারতবর্ষে দ্বিতীয় 'অলষ্টার'এর সূচনা করিবে, শিমলা রাজনীতিক মহলে এই আশঙ্কা।

বোম্বাই পুলিশের কমিশনারের স্বর্ণতাল-ব্যবসায়ীদের সহিত পিকেট-বন্ধের পরামর্শ।

বাগেরহাট দেশবন্ধু লাইব্রেরি, কংগ্রেস অফিস ও কতিপয় ভদ্রলোকের বাড়ি পুলিশ কর্তৃক হানা।

৩০শে জুলাই—'ফ্রিপ্রেস জার্ণাল'এর নূতন আমানত হেতু সরকারের ১০০০০৲ টাকা দাবী।

আইন অমান্যের সহিত জড়িত থাকায় লক্ষ্ণৌএ কতিপয় ব্যক্তির পেন্সন ও কয়েকজনকে সতর্কীকরণ।

৩১শে জুলাই—'নিউজ ক্রনিকেল' নামে বিলাতী কাগজের খবর, মহাত্মাজীর শীঘ্র মুক্তির গুজবের ভিত্তি নাই। প্রধান মন্ত্রী বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণ নিয়াই ব্যস্ত আছেন।

স্বদেশ ও বিদেশ

ক্রীড়াকৌতুক

১লা জুলাই—এবার কলিকাতা ফুটবল লীগের প্রথম স্থান কোন বাঙ্গালী দল পাইবে বলিয়া সকলেই আশা করিতেছিল। ইষ্টবেঙ্গল দলই এতদিন প্রথম ছিল। গত কল্য K. R. R. গোরা দলের সহিত খেলায় পরাজিত হওয়ায় তাহাদের লিগ্ পাইবার সম্ভাবনা নষ্ট হইল। ডারহাম্ গোরা দলই প্রথম হইল। তাহারাই গত বৎসর লীগে প্রথম হইয়াছিল। এবার ডালহৌসী সর্ব্বনিম্নে আছে।

২রা জুলাই—প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও কলিকাতার সম্মিলিত ভারতীয় দলের সহিত সম্মিলিত ইউরোপীয় দলের ফুটবল খেলা হইয়া গেল। ভারতীয়েরা অতি সুন্দর খেলা খেলিয়া ৫ গোলে জিতিয়াছে, ইউরোপীয়েরা ১টি গোলও দিতে পারে নাই। ফুটবল খেলায় এরূপ কৃতিত্ব আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় কোন দল দেখাইতে পারে নাই।

৩রা জুলাই—উইম্বল্‌ডন্ টেনিস্ প্রতিযোগীতায় ইংলণ্ডের শেষ আশাস্থল অষ্টিন্ আমেরিকার নূতন খেলোয়াড় ভাইনের কাছে শেষ খেলায় পরাজিত হইলেন। ভাইন্ এত দ্রুতগতিতে খেলা চালাইয়াছিল যে তাহার সহিত অষ্টিন্ তাল রাখিতেই পারেন নাই।

যুগ্ম টেনিস্ খেলায় উক্ত প্রতিযোগীতায় ফরাসী খেলোয়াড় বোরোট্রা ও ব্রুনন্ পেরি ও হিউজকে হারাইয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন ইংলণ্ড জগতের টেনিসে এবারও স্থান পাইলেন না।

৫ই জুলাই—কলিকাতা ২য় ডিভিসন ফুটবল লীগ্ খেলায় ভবানীপুরকে হারাইয়া কালীঘাট দল প্রথম স্থান অধিকার করিল। আগামী বৎসর তাহারা ১ম ডিভিসনে খেলিতে পাইবে।

১০ই জুলাই—কলিকাতা ফুটবল সিল্ড্ খেলা চলিতেছে। লীগ্ প্রতিযোগিতায় যাহারা প্রথম হইয়াছিল সেই ডারহাম্‌স্ দল সিফোর্থ হাই-ল্যাণ্ডারের নিকট ৩ গোলে পরাজিত হইয়াছেন।

ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত ক্রিকেটার সুটক্লিফ শতবার শতসংখ্যাধিক রাণ করিলেন।

ডেভিস্ কাপ্ টেনিস্ প্রতিযোগীতায় ইংলণ্ডের অষ্টিন্ একজন জার্ম্মানের নিকট পরাজিত হইলেন।

১৬ই জুলাই—কলিকাতা সিল্ড্ ফুটবল প্রতিযোগীতায় মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল, ভবানীপুর, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, কালীঘাট প্রভৃতি উচ্চ স্তরের বাঙ্গালী দলগুলি মিলিটারী দল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে। কেবল এরিয়ান ও নেপিয়ার দল তৃতীয় রাউণ্ডে উত্তীর্ণ হইল।

জাপানে দুটি খেলায় ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল জয়লাভ করিয়াছে; প্রথম খেলায় তাহারা ২২টি ও দ্বিতীয়টিতে ১৬টি গোল দিয়াছে। তন্মধ্যে ধ্যানচাঁদ ১০টি ও তাঁহার ভাই রূপসিং ১৪টি গোল দেয়। জার্ম্মানী দল ১টি গোলও দিতে পারে নাই।

আন্তর্জ্জাতিক দাবা-খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড় সুলতান খাঁ দ্বিতীয় রাউণ্ডে সুইজারল্যাণ্ডের পলজোনারকে হারাইয়া দিয়াছেন।

২৪শে জুলাই—ডাণ্ডিতে স্কটল্যাণ্ড ও ভারতীয় টিমে ক্রিকেট ম্যাচ আরম্ভ। ভারতীয় টিমের প্রথম ইনিংসে ১৪৬ রান।

আই-এফ এর ফুটবল ম্যাচে লিভারপুল রেজিমেন্ট দল ক্যামেরাণ হাই-ল্যাণ্ডাসের নিকট পরাজিত।

২৫শে জুলাই—স্কটল্যাণ্ড দলের ৮১ রান। ভারতীয় টিমের দ্বিতীয় ইনিংস্ আরম্ভ।

২৬শে জুলাই—দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় টিমের ২৪৪ রান।

আই-এফ-এতে ক্যামেরন্স্ এসেক্সের কাছে দুই গোলে পরাজিত।

২৭শে জুলাই—আই-এফ-এ সেমি-ফাইন্যালে এচ্-এল্-আইএর সিফোর্থ-দের কাছে ২ গোলে হার।

ডাণ্ডি ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংসে স্কটল্যাণ্ডের ২১০ রান। ভারতীয়ের জিত্।

২৮শে জুলাই—ভারতীয় ও নরদাম্বারল্যাণ্ড দলের ক্রিকেট ম্যাচে ভারতীয় টিম দল প্রথম ইনিংসে মাত্র ৬৮ রান করিয়াছেন।

২৯শে জুলাই—ভারতীয় নরদাম্বারল্যাণ্ডে ম্যাচ ড্র।

৩১শে জুলাই—অপ্রত্যাশিত ভাবে সীফোর্থ দলকে দুই গোলে হারাইয়া এসেক্স দল কলিকাতার আই-এফ-এ শিল্ড জিতিয়াছে।

বিবিধ—

১লা জুলাই—আসামের ডেপুটি পোঃ মাষ্টার জেনারেলের আফিস উঠিয়া গেল। কলিকাতার বড় অফিস হইতে সেখানকার কাজ চলিবে।

২রা জুলাই—পর্টুগালের ভূতপূর্ব্ব রাজার মৃত্যু হইয়াছে।

৭ই জুলাই—বিগত মহাযুদ্ধের ব্যয়বাবদ ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে ১৩০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়াছে এই মর্ম্মে ভারত গভর্ণমেণ্ট একটি বিবৃতি বাহির করিয়াছেন।

কাশ্মীরের মহারাজা বিগত বিপ্লবের সময় যে সমস্ত গৃহ ধ্বংস হইয়াছিল তাহার পুনঃনির্ম্মাণকল্পে সর্ব্বশুদ্ধ ১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

শ্যামের রাজা জনমতানুযায়ী প্রথম শাসন-পরিষদ ও ক্যাবিনেট গঠন করিলেন।

৯ই জুলাই—মৌলানা সৌকতআলি ফ্রি প্রেস জর্নালের সম্পাদক ও প্রিণ্টারের নামে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা সম্পর্কে যে মানহানির দাবী আনিয়াছেন, তাহার শুনানি আরম্ভ হইয়াছে।

১১ই জুলাই—দিল্লী ক্যাম্পজেলে কয়েদী ও ওয়ার্ডারগণের মধ্যে দাঙ্গার ফলে ৯ জন কয়েদী ও ১১ জন মেট আহত হইয়াছে।

১৩ই জুলাই—ওটোয়া কনফারেন্সের ৬ জন ব্রিটিশ সদস্য ক্যানেডা যাত্রা করিলেন।

১৫ই জুলাই—দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহে অন্তর্বিপ্লবের ঝড় চলিতেছে। ১ মাসের মধ্যে ব্রাজিল, পেরু ও চিলিতে বিপ্লব হইয়াছে, পুনরায় একোয়াদারে বিপ্লব আরম্ভ হইল।

নবপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সামরিক কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য ১০৪ জন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতেছে।

১৬ই জুলাই—নব দিল্লীর ভিক্টোরিয়া জেনানা হাঁসপাতালে অস্ত্রোপচার-সাহায্যে একটি বালিকার স্বাভাবিক সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; প্রসূতির বয়স [মাত্র ৭ বৎসর।

১৭ জুলাই—শিক্ষা-বিভাগের সভাপতিপদে নিয়োগ পাইয়া লর্ড আরুইন ব্রিটিশ ক্যাবিনেটে প্রবেশ করিলেন। একজন লিবারেলকে ঐ পদ না দেওয়ায় লিবারেল মহলে অসন্তোষ প্রকাশ পাইয়াছে।

ভারত হইতে স্বর্ণ-রপ্তানি সমান বেগে চলিতেছে। গত সপ্তাহে প্রায় ২ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে গেল।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হুভার স্বেচ্ছায় নিজের বেতন ১৫০০০ ডলার কমাইলেন। ক্যাবিনেটের মেম্বরদেরও বেতন কমিয়াছে।

১৯শে জুলাই—নাজি-বাহিনী ও কম্যুনিষ্টদের মধ্যে সংঘর্ষে জার্ম্মানির এ্যালটোনা সহরে ১২ জন হত ও ৫০ জন আহত হইয়াছে।

২০শে জুলাই—শুনা যাইতেছে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি রবীন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্যের আচার্য্যপদে বরণ করিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথও তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে ইউনিভার্সিটি তাঁহাকে বৎসরে ৫০০০৲ দিবে।

২২শে জুলাই—প্রুসিয়াতে সমস্ত সাধারণ শাসন রহিত করিয়া সামরিক ডিক্টেটর নিযুক্ত হইয়াছে। সমস্ত মন্ত্রী ও অনেক সাধারণ কর্ম্মচারীদিগকে বরখাস্ত করা হইল। পুলিসের কর্ত্তা ও অনেক কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রজাসাধারণের স্বাভাবিক অধিকার অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট দলের অরাজকতা নিবারণ করিবার জন্য প্রুসিয়ান গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছিলেন বলিয়াই এই চরম ব্যবস্থা।

ইতালি মন্ত্রী-সভার অধিকাংশ সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন। মিঃ গ্রাণ্ডী তাহার মধ্যে একজন।

২৩শে জুলাই—সামরিক ডিক্টেটর জেনেরাল রুণ্‌স্টেটের কর্ত্তৃত্বে প্রুসিয়ায় সোসিয়ালিষ্ট দলন নির্বিঘ্নে চলিতেছে।

২৪শে জুলাই—কবি রবীন্দ্রনাথকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের বার্ষিক ৫০০০৲ টাকা দক্ষিণায় অধ্যাপকত্বে গ্রহণ।

অন্ততঃ শতকরা ১০০৲ টাকার ট্যাক্স বিদেশী দ্রব্যের উপর বসাইবার জন্য স্বদেশী অ্যাসোসিয়েসনের ট্যারিফ বোর্ডকে অনুরোধ।

ল্যাঙ্কাশায়ারের বার্ণলে কটন মিলের ২০ হাজার কুলির ধর্ম্মঘট করার আশঙ্কা।

২৮ দিন ধর্ম্মঘটের পর জামডোবা কোলিয়ারীর কুলিদের কাজে যোগদান।

লণ্ডনের পরিচিত শিশুর দলকে মহাত্মাজির লিখিত পত্র প্রকাশ।

২৫শে জুলাই—ব্যয়সংকুলানার্থে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ লক্ষ টাকার ঋণের প্রস্তাব।

ডাঃ আনসারি ডাঃ মামুদের বিবৃতির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, তিনি কোন দিনই স্বতন্ত্রবাদের সপক্ষে ছিলেন না। বরাবরই তিনি মিশ্র-নির্ব্বাচন-পন্থী।

২৬শে জুলাই—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চত্বারিংশ জন্মতিথি অনুষ্ঠান।

গবর্ণমেণ্টের পত্রের কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক তীব্র আলোচনা।

সরকারের বাংলার পাট-ব্যবসায়-সংসদ স্থাপন-প্রস্তাব, প্রতিমণ পাটের উপর দুই আনা তোলার সঙ্কল্প।

লক্ষ্ণৌ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলের মুসলমানগণের জনসভায় ইস্লামের অন্য-জাতি সম্পর্কে শ্রদ্ধা-প্রকাশ।

জেহানাবাদ জেলার ঘোষা গ্রামে প্রাচীন ভারতবর্ষের কতিপয় মুদ্রা আবিষ্কার।

বোম্বাই মিল-অধিকারীদের ব্রিটিশ ছাড়া অন্য দেশজাত কার্পাসজ বস্ত্রের প্রতি শুল্ক নির্দ্ধারণের জন্য সরকারকে নিবেদন।

২৭শে জুলাই—সরকারের চিঠির উত্তরপ্রসঙ্গে কলিকাতার মেয়োর ডাঃ বিধান রায়ের কঠোর মন্তব্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনভোকেসনে বাংলার লাট সাহেবের বক্তৃতা।

ল্যাঙ্কাশায়ার বার্ণলের ৫০টি মিলের কাজ বন্ধ।

প্রেসিডেন্ট ডুমার হত্যাকারীর বিচার আরম্ভ।

মাদ্রাজে সুভাষচন্দ্রের এক্সরে পরীক্ষা।

শিমলায় জাপানী ব্যবসায়ীদের সহিত কমার্স-মেম্বারের কথাবার্ত্তা।

অমৃতসর উইভিং ইন্‌ষ্টিটুটের বাঙালী প্রিন্সিপ্যাল কর্ত্তৃক 'ডবল প্রোডাক-সন্ লুম' আবিষ্কার।

২৮শে জুলাই—কলিকাতার এক সভায় বেশ্যাবৃত্তিনিরোধক বিল সম্পর্কে আলোচনা।

ঢাকা পুলিশ প্যারেডে বাংলার লাটের বক্তৃতা।

কর্পোরেশন চিঠিপ্রসঙ্গে কাউন্সিলার সন্তোষ বসুর সরকারকে তীব্র সমালোচনা।

২৯শে জুলাই—বার্ণলের ৬০টি মিল বন্ধ, ২০০০০ শ্রমিকের ধর্ম্মঘট।

ডুমা-হত্যাকারী ডাঃ গরগুলফ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত।

ইউরোপ নিরস্ত্রীকরণে হাত না দিলে আমেরিকার সমরঋণ মকুবে বিরত থাকিবার সংবাদ।

লণ্ডনে নওয়ানগরের জাম সাহেব কর্ত্তৃক ইন্দো-ব্রিটিশ ব্যবসায়-সহযোগিতার বক্তৃতা।

অ্যালবার্ট হলে বিপুল জনসঙ্ঘে স্বতন্ত্রবাদের অশুভ সম্পর্কে তীব্র আলোচনা।

৩০শে জুলাই—ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটুটে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-বার্ষিকী।

ইণ্ডিয়ান মাইনিং ও জিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতীয় কয়লা ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা।

মুন্সিগঞ্জে বাংলার লাটের বক্তৃতায় বিপ্লববাদের ক্ষণস্থায়িত্বের উল্লেখ।

ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রসম্পর্কে—

১লা জুলাই—ক্ষেত্র-কর দিবার শেষ দিন, ৩০শে জুন অতিক্রান্ত হইল, আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডকে দেয় কর দিবে না জানাইয়াছে। মিঃ টমাস জানাইয়াছেন ইহার প্রতিবিধানকল্পে একটি জরুরী বিল পার্লিয়ামেণ্টে পেশ করা হইবে।

মিঃ টমাস্ যে বিল পেশ করিবেন তাহাতে আয়র্লণ্ড হইতে রপ্তানি মালের কতকগুলির উপর দ্বিগুণ শুল্ক ধার্য্য করিবার সর্ত্ত থাকিবে।

পার্লামেণ্টের লিবারেল ও শ্রমিক সভ্যগণ একটি পরামর্শ-সভায় স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা মিঃ টমাসের বিল সমর্থন না করিয়া অটোয়া বৈঠকের উপর শালিশ দিবার প্রস্তাব করিবেন।

আইরিশ শ্রমিকদলের নেতা লণ্ডনে আসিতেছেন। ইঁহার মত, ইংলণ্ড যদি ক্ষেত্রকর সমস্যা শালিসে না দিয়া অর্থ নৈতিক জবরদস্তি দ্বারা সমাধান করিতে চেষ্টা করেন তবে আয়র্লণ্ডও সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার প্রতিরোধ করিবে।

৬ই জুলাই—বিটলদাস প্যাটেলকে ডিঃ ভ্যালেরা আয়র্লণ্ডে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। মিঃ প্যাটেল লণ্ডন হইতে ডবলিন্ গিয়াছেন ; কারণ

৭ই জুলাই—ইংলণ্ডকে দেয় ক্ষেত্রকর আয়র্লণ্ড পৃথকভাবে জমা রাখিয়া শালিসবিচারে দেয় হইলে অতঃপর তাহা দিবে। ইংলণ্ড পুনরায় আয়র্লণ্ডকে পত্র দিয়াছেন—সাম্রাজ্য সালিশ-কমিটিতে রাজী হইবার জন্ত।

১০ই জুলাই—পার্লামেণ্টে আইরিস রপ্তানির উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করিবার বিলের তৃতীয় আলোচনা শেষ হইল। মিঃ টমাস্ বলিয়াছেন ডি ভ্যালেরা যদি এখনও সাম্রাজ্য-শালিসে রাজী হ'ন তবে বিল অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে না।

১১ই জুলাই—আয়র্লণ্ডের সাধারণতন্ত্রী-বাহিনী অলষ্টারবাসীদিগকে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ আয়র্লণ্ড গঠন করিবার জন্ত আহ্বান করিয়াছেন।

১৪ই জুলাই—সিনেট কর্ত্তৃক সংশোধিত শপথবিলোপ বিল আইরিশ ডেলে পুনরালোচিত হইয়া সিনেটের সমস্ত সংশোধক সর্ত্তগুলি পরিত্যক্ত হইল। ইহা পুনরায় সিনেটে প্রেরিত হইবে। সিনেট যদি তাহা গ্রহণ করে তবেই মঙ্গল ; নচেৎ রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইবে।

আয়র্লণ্ডের গবর্ণর-জেনারালের সহিত ডি ভ্যালেরার মন্ত্রীসভার ব্যবহার লইয়া নূতন রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

আইরিশ পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করিবার বিলে সম্রাট শেষ সম্মতি দিলেন। তাহা ১২ই হইতে কার্য্যকরী হইল।

১৫ই জুলাই—ডিঃ ভ্যালেরা ডেলে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের সহানুভূতি ভিক্ষা করে না, পরন্তু ন্যায়-বিচার চাহে।

আইরিশ পণ্যের উপর ইংলণ্ড অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। এই সর্ত্তে আইরিশ ডেলে এক বিল পাকা হইল।

১৬ই জুলাই—অ্যাংলো-আইরিশ অর্থনৈতিক সংগ্রামে সহসা শান্তির আশা দেখা গিয়াছে। আয়র্লণ্ডের শ্রমিক নেতা মিঃ নর্টন লণ্ডনে ম্যাকডোন্যাল্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ; ফলে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড পুনরায় ডি ভ্যালেরাকে সমস্ত বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্ত লণ্ডনে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

১৭ই জুলাই—ডিঃ ভ্যালেরা-ম্যাকডোন্যাল্ড সাক্ষাৎকার শেষ হইয়াছে, উভয়ের কেহই নিজ নিজ মত পরিবর্ত্তিত না করায় কোন মীমাংসাই হইল না।

১৯শে জুলাই 'বিলাতী বর্জ্জন কর' ইত্যাদি বিজ্ঞাপনে ডবলিন সহর ছাইয়া গিয়াছে। দেওয়ালে আটকানো প্ল্যাকার্ডগুলি পুলিশ উঠাইয়া ফেলিতেছে।

ডিঃ ভ্যালেরা চেষ্টা করিতেছেন, আইরিশ পণ্য যাহাতে ইংলণ্ড ব্যতীত অন্যান্য দেশে অধিকতর পরিমাণে কাটে।

২২শে জুলাই—শপথ-বিলোপ বিল সিনেটে পুনস্থাপিত হইয়াছিল। সিনেট পুরাতন সংশোধক প্রস্তাবগুলি পুনরায় বাহাল করায় গভর্ণমেণ্ট তাহার প্রচলন করিতে পারিলেন না। ঐ বিলের প্রচলন এখন ফ্রিষ্টেটের রীতি অনুযায়ী ১৮ মাস স্থগিত থাকিবে।

ইংলিশ পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক সম্বন্ধীয় বিল সিনেটে আলোচিত হইল। গবর্ণমেণ্ট পক্ষের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও সিনেট তাহাতে কয়েকটি সত্বের সংশোধন করিয়াছেন। এই আলোচনাকালে যে সব বক্তৃতা হয় তাহাতে বুঝা যায় যে ইংলণ্ডের সহিত আয়র্লণ্ডের যেন যুদ্ধের অবস্থা চলিতেছে।

২৪শে জুলাই—নিউইয়র্কের আইরিশরা ব্রিটিশ দ্রব্যবর্জ্জনে বদ্ধপরিকর। ডাবলিনে ডেল কর্ত্তৃক ইমার্জ্জেন্সি ডিউটি বিল আইন হিসাবে গৃহীত। ৪০০,০০০ হাজার নির্ব্বাচকের দলপতি কসগ্রেভ কর্ত্তৃক গ্রেটব্রিটেনের সহিত আয়ার্ল্যাণ্ডের এই আর্থিক সংঘর্ষের প্রবল প্রতিবাদ।

বার্লিনের পুলিশ পাওয়ার গ্রেপ্তার। কম্যুনিষ্টদের 'রেডফ্ল্যাগ' পত্রিকা পাঁচ দিনের জন্ত বন্ধ রাখিবার নির্দ্দেশ।

ব্রিটেন নৌবিভাগ কর্ত্তৃক নূতন জাহাজ, সাবমেরিন ইত্যাদি তৈয়ারি সুরু।

২৫শে জুলাই—ষ্টাটগার্ট বৈঠকে প্যাপেন বলিয়াছেন প্রাদেশিক সরকারের অধিকারে রয়ক্ হস্তক্ষেপ করিবে না। যে-সব পরিবর্ত্তন প্রাসিয়ায় সাধিত হইয়াছে, তাহা নিতান্তই সাময়িক ভাবে।

সরকার কর্ত্তৃক চিকাগোর বোর্ড অব ট্রেড ৬০ দিনের জন্ত বন্ধ রাখিবার নির্দ্দেশ।

২৭শে জুলাই—দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া ও পেরাগুয়ে যুযুৎসু। সীমান্ত নিয়াই এই গণ্ডগোল।

ফ্রিষ্টেট-ইমার্জ্জেন্সি ডিউটির তালিকা প্রকাশ। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অর্থ-সচিবের সহকারীর ডাবলিন হইতে লণ্ডন আগমন।

বার্লিন ও ব্রাণ্ডেনবার্গে সামরিক আইন স্থগিত। প্যাপেন ডিক্টেটর আছেন।

২৮শে জুলাই—জার্ম্মানিতে রাজনৈতিক দলাদলিতে রাস্তায় মারামারির ফলে একটি স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষ আহত।

বলিভিয়া পেরাগুয়েতে যুদ্ধ ৬ই আগষ্ট বাধিবে বলিয়া প্রকাশ।

হেলসিংফোর্স হাইকোর্টে দমিত 'নাপুয়া' বিদ্রোহের ২০০ শত নায়কের বিচার আরম্ভ।

২৯শে জুলাই—আগামী ৩১শের নির্ব্বাচন ব্যাপারে জার্ম্মানিতে বিপুল উত্তেজনা, নাজি দলের অবশ্যম্ভাবী প্রাধান্য ঘোষণা।

চীন ও মাঞ্চুরিয়ার ডাক বন্ধের কথা লীগকে জ্ঞাত করা হইল।

৩০শে জুলাই—সিংহলের লাট ও মন্ত্রী সভায় চাউলশুল্ক সম্পর্কে মতান্তর হেতু মন্ত্রী সভার পদত্যাগ গুজব।

ওয়াশিংটনে বেকার সৈন্যদলে ও পুলিশে সংঘর্ষ।

৩১শে জুলাই—ডাবলিনে ১০ হাজার লোকের সভায় ডি ভ্যালেরার উৎসাহজনক বক্তৃতা।

কাষ্টমস্ শুল্ক বৃদ্ধি দ্বারা চীন সরকার মাঞ্চুরিয়ার মাঞ্চুকো অবরোধের উত্তর দিবে।

হিণ্ডেনবার্গ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচনের পর দশ দিন মিটিং বন্ধ করিবার নূতন আদেশে বিপদের সম্ভাবনা।

আন্তর্জ্জাতিক—

১লা জুলাই—লজান-কনফারেন্স গত মাসে প্রায় ভাঙ্গিয়া যাইবার মুখে দাঁড়াইয়াছিল। সংবাদ আসিল, জার্ম্মাণি অবশেষে নাকি আর ১ কিস্তী মাত্র ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হইয়াছে, তবে সে কিস্তী তাহার অবস্থার উন্নতি হইলে দিবে।

ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি ৫টি শক্তি একযোগে ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে জার্ম্মাণিকে ১টি সর্ত্ত দিতেছেন।

৫ই জুলাই—মিলিত পঞ্চ-শক্তি জার্ম্মানিকে যে নূতন ক্ষতিপূরণ প্রস্তাব দিয়াছেন, জার্ম্মানি তাহার কয়টি সর্ত্তে আপত্তি জানাইয়াছে।

৭ই জুলাই—ফ্রান্স জার্ম্মানির নিকট যত টাকা ক্ষতিপূরণ চাহিতেছে, জার্ম্মানি তাহার দশ আনা আন্দাজ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। ইংলণ্ড ও ইটালির চেষ্টাস্বত্বেও ইহার মীমাংসা হইতেছে না। অবস্থা আশাপ্রদ নহে।

৯ই জুলাই—শেষ মুহূর্ত্তে লজানে মিটমাট হইল। জার্ম্মানিকে সবশুদ্ধ ২৭০ কোটি ফ্র্যাঙ্ক দিতে হইবে। অন্যান্য বিষয়ে স্থির হইল—গতস্য শোচনা নাস্তি। মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌ গৃহে ফিরিতেছেন।

১০ই জুলাই—৯ই জুলাই বেলা ১১॥০ টার সময় লজান ক্ষতিপূরণ ও যুদ্ধ ঋণ বৈঠক শেষ হইল। মীমাংসা-পত্রে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি, বেলজিয়াম, জার্ম্মান, জাপান, পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষর করিলেন। ক্ষুদ্রতর কয়েকটি দেশ পরে স্বাক্ষর করিবেন।

এই মীমাংসা-পত্রে যে কয়টি সর্ত্ত আছে তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে—(১) ইউরোপের পুনর্গঠনকল্পে জার্ম্মানি শতকরা ৯০ হারে ৫ ০ সুদে ৩০০ কোটি ফ্রাঙ্ক ঋণ তুলিবেন। (২) সর্ব্বপ্রথম অষ্ট্রিয়া ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ সমূহকে পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা হইবে। (৩) আর একটি কনফারেন্স হইবে, তাহাতে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশকে নিমন্ত্রণ করা হইবে।

লজান বৈঠক শেষ হওয়ার পর জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ-বৈঠকের কাজ নূতন উদ্যমে আরম্ভ হইয়াছে। হুভার নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবের পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন।

১৬ই জুলাই—লজান মীমাংসার জন্য ম্যাক্‌ডোনাল্ড সর্ব্বত্র সম্মানিত হইতেছেন। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট কিন্তু বলিতেছেন লজান ব্যবস্থা আমেরিকার মত লওয়া হয় নাই এবং এই চুক্তিদ্বারা আমেরিকা মোটেই বাধ্য নহে। মনে হয় আমেরিকা তাহার প্রাপ্যের শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত আদায় করিতে এখনও দৃঢ়সংকল্প।

২১শে জুলাই—অটোয়া (কানাডা) সাম্রাজ্য অর্থনৈতিক কনফারেন্স আরম্ভ হইল। প্রথমেই কানাডার গভর্ণর-জেনেরাল সম্রাটের বাণী পাঠ করেন। ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে বলড্‌উইন বলেন যে সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র সাম্রাজ্যের মধ্যে আবদ্ধ। ইংলণ্ড, উপনিবেশ, ডোমিনিয়ন ও ভারতবর্ষের মধ্যে অন্তর্বাণিজ্যের বাধা যাহাতে যথাসম্ভব অপসারিত হয় এইরূপ সাম্রাজ্যিক শুল্কানুকূল্য প্রবর্ত্তন করা ইংলণ্ডের ইচ্ছা।

২২শে জুলাই—নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ ও ফ্রিষ্টেটের প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিলেন। আয়ারলণ্ড বলিয়াছে—ফ্রিষ্টেটের অধিবাসীর সুবিধা যাহাতে হয় কেবল সেইরূপ শুল্কানুকূল্যে তাহাদের মত আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা শুল্কানুকূল্যে বিশেষ অনুকূল মত প্রকাশ করিল না। ভারতবর্ষের স্যর অতুল বলিয়াছেন শুল্ক বিষয়ে ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতাই পাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়া নিউজিলাণ্ড অনেকটা ইংলণ্ডের অনুকূল ছিল।

২৪শে জুলাই—ভি, জে প্যাটেলের ডাবলিন যাত্রার ফলে তথায় ইণ্ডিয়ান আইরিশ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লিগের স্থাপন।

আবিসিনিয়ার সিংহাসনচ্যুত সম্রাট হায়্যারে নির্ব্বাসিত।

অটোয়াতে মিঃ ব্রুসের মারফৎ অষ্ট্রেলিয়া বলিয়াছেন:—এই কল্পে যথাসাধ্য আমরা করিব, আশা করি ব্রিটেনও তাহাই করিবে।

আন্তর্জ্জাতিক নিরস্ত্রীকরণের বৈঠকের ফলে স্যর জন সাইমন লিখিত দীর্ঘ প্রস্তাব জেনারেল কমিটি কর্ত্তৃক গৃহীত।

জেনেভায় ইণ্টার পার্লামেণ্টারি ইউনিয়ন কনফারেন্সে ইটালির প্রতিনিধির সহিত ফরাসী সোসালিষ্ট প্রতিনিধির মত-বিরোধের ফলে প্রায় হাতাহাতির সংবাদ।

২৫শে জুলাই আমেরিকার সেনেট বৈদেশিক নীতির চেয়ারম্যান সেনেটর বোরার যুদ্ধঋণ মকুবার্থে নিখিল বিশ্ব-বৈঠকের প্রস্তাব।

অটোয়া বৈঠকে কানাডা ব্রিটেন হইতে যে-ইস্পাত নিতে রাজী হইয়াছে, তাহার ফলে আমেরিকার বার্ষিক ৪ কোটি ডলার টাকার ইস্পাতের বাজার নষ্ট।

ইটালির প্রতিনিধিদের জেনেভা ইউনিয়ান কনফারেন্স হইতে প্রতিবাদ-মূলক বহির্গমন।

আন্তর্জ্জাতিক তৈল-বৈঠক পৃথিবীর পেট্রোল সম্পর্কে এক দফা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, রুশিয়া এই বৈঠকে যোগ দেয় নাই

২৬শে জুলাই—স্যর পুরুষোত্তম অটোয়ায় স্যর অতুল চ্যাটার্জ্জীকে তার করিয়াছেন যে ভারতীয়দের পক্ষে ব্যবসার্থ দেশান্তর-গমন সম্পর্কে অপমানজনক বাধা আছে, তাহা সাম্রাজ্যানুকূল আর্থিক সহযোগের অন্তরায়।

২৮শে জুলাই অটোয়াতে বলড্‌উইনের উপনিবেশ সম্পর্কে ব্রিটেনের বহু-কালব্যাপী উদার ব্যবস্থার বিবৃতি—পরিবর্ত্তে উপনিবেশ সমূহ কোনও প্রতিদান দেয় নাই।

লণ্ডনে ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তিতে গ্রীস ও হাঙ্গারির সম্মতিসূচক সহযোগ।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd., 56, Dharamtala Street, Calcutta.

কুরুক্ষেত্র

২৫শ বর্ষ আশ্বিন, ১৩৩৯ ৫ম সংখ্যা

কর্ণ

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

সহোদর মোর—কুন্তী আমার মাতা ?
কর্ণের ভালে এ কি পরিহাস লিখিয়াছ হে বিধাতা !
পৌরুষে শুধু সেবি' নিশিদিন
যে কর্ণ চিরসঙ্কোচহীন,
ভীষ্মসেবিত দুর্য্যোধনের শত্রুভয়ত্রাতা—
সেই শত্রু—সে সহোদর মোর, শত্রুজননী মাতা !

নহে, কভু নহে—মানেনা কর্ণ গুপ্ত সে অধিকার,—
কর্ণ পুরুষ, পৌরুষে শুধু স্বীয় ইতিহাস তার ;
কোথা তার পিতা ? মাতা তার নাহি ;
একা সে চলেছে সম্মুখে চাহি'—
খড়্গ-খোদিত দুর্গম পথে বীর্য্যের অভিসার ;
ধিক্‌কৃত কোনো দৈব অতীত কর্ণ মানেনা তার।

ইন্দ্রের তেজ, শিবের শক্তি, কৃষ্ণের মন্ত্রণা—
ধনঞ্জয়ের ধার-করা ধনে গণে সে আবর্জ্জনা !
অর্জ্জনই তার একক বিত্ত,
কৈতবহীন স্বাধীন চিত্ত,
নিজ ভুজবলে করে সে নিত্য শক্তির আরাধনা ;
ধনঞ্জয়ের ধার-করা ধনে গণে সে আবর্জ্জনা !

বসুন্ধরার বীর্য্য-শুল্কে শুধু তার প্রত্যয়,
বাহু ছাড়া তাই কোনো বিক্রমে নাহি তার পরিচয় ;
কৌশলে তার চিরধিক্কার,
কারো কাছে কিছু নাহি ভিক্ষার,
কুণ্ডলসম সহজাত তার শক্তির সঞ্চয়,
অক্ষয় তার কবচের মতো অক্ষত প্রত্যয় !

পূর্ব্বতোরণে দামামা বাজিল—আসিছে দুর্য্যোধন,
কল্য সমরে সেনাপতি মোরে বরিবে, করেছে মন ;
নাহি সে ভীষ্ম, নাহি আচার্য্য,—
মোরই রক্ষিত রাজা ও রাজ্য,
সানন্দে তাই করিব গ্রাহ্য বন্ধুর আবেদন ;
পূর্ব্বতোরণে ডঙ্কা পড়িল, আসিছে দুর্য্যোধন ।

বীর অর্জ্জুন—বীর বটে মানি, বুঝি মোরি সহোদর ;
জীবনের ভার সঁপি' গেল তার মাতা যে আমারি পর ;
সেই সে কুন্তী—আমারো জননী,
জ্যেষ্ঠ পুত্রে শ্রেষ্ঠ সে গণি'
পার্থের প্রাণ ভিক্ষা যাচিল জোড় করি' দুটি কর,
হোক্ বীর, তবু গাণ্ডীবী মোরই কনিষ্ঠ সহোদর ।

মনে-মনে মাতা অর্জ্জুনে জানি' দুর্ব্বল মোর কাছে,
দূর করি' তার রাণীর গর্ব্ব তবে তো সে আসিয়াছে !
যা' চেয়ে নারীর নাহি কলঙ্ক,
যার বেশী তার নাহি আতঙ্ক—
মাতা হয়ে হায় ! প্রকাশিয়া তাই, কৃপা মোর যাচিয়াছে,
দুর্ব্বলতার সব কথা কহি' সুতপুত্রের কাছে !

হায়রে বিধাতা, কি দারুণ লিপি লিখিলি কর্ণভালে,
সুহৃদরে কেবা কোথা পড়িয়াছে হেন সঙ্কটজালে !
একদিকে কাঁদে মায়ের মিনতি,
আর দিকে বাঁধে বন্ধু-বিনতি—
যে বন্ধু মোর অনন্যগতি আশ্রয় ইহকালে ;
ভাগ্যবিধাতা, এ কি সঙ্কট লিখিলি কর্ণভালে !

প্রভাতিলা নিশি কুরুক্ষেত্রে, পূর্ব্বতোরণ পারে.
যুদ্ধের কাড়া ফিরে' দিল সাড়া মিশি' নব হাহাকারে !
সারা রজনীর অনিদ্রাশেষে
ভীষণ ভ্রূকুটি ভরি' ভালদেশে
নমিলা কর্ণ সূর্য্যোদ্দেশে চাহি' পূর্ব্বাশা দ্বারে,
প্রভাতিলা নিশি কুরুক্ষেত্রে পূর্ব্বশিবিরপারে ।

হে জবাকুসুমসঙ্কাশদ্যুতি, হে সবিতা লহ নতি,
এ চিত্তভার নাশো আজিকার হানি' ও বরজ্যোতি।
পার্থকীর্ত্তি করিব বিজয়—
তব কাছে আজি প্রার্থনা নয়,
কর্ণের বাহু রক্ষিতে জানে আপনার সদ্‌গতি ;
এ আঁধারে শুধু পন্থা দেখাও, চরণে জানাই নতি।

কুন্তী জননী, পার্থ সোদর—করিনু অস্বীকার ;
মোরি পরে আজি অনন্যোপায় দুর্য্যোধনের ভার।
রাজ্য ও মান যে-বা দিল দীনে,
তারে ছাড়ি' যাব হেন দুর্দ্দিনে,
কৃতজ্ঞতার প্রতীকার ভুলি' দাতা হবে দুরাচার—
দুর্য্যোধনের আশ্রয় সে কি করিবে অস্বীকার ?

না না—তা' হবে না, পাণ্ডবে মোরে বধিতেই আজি হবে
ভুবনে সে মোর প্রতিদ্বন্দ্বী—ত্রিলোকে জানে তা সবে !
দুর্ম্মদ তার জয়ের গর্ব্ব
আজিকার রণে করিব খর্ব্ব,
পার্থকীর্ত্তি লুপ্ত করিয়া ফিরিব সগৌরবে,
অর্জ্জুন-বধে দুর্জ্জয় খ্যাতি অর্জ্জিতে আজি হবে।

আজি মনে পড়ে—রাজসভাতলে কৃষ্ণা-স্বয়ম্বর ;
পার্থের সেই অপমানে আজো জর্জ্জর অন্তর !
কৌশলে জিনি' মৎস্যচক্র,
মোর পানে চাহি' হাসিয়া বক্র
ভুবনধন্য পাঞ্চালীধনে বরিল সে বর্ব্বর,
আজি পড়ে মনে সেই বঞ্চনা, কৃষ্ণা-স্বয়ম্বর।

—সেই বঞ্চক—গাণ্ডীব-বলে, ভাগ্যের ফলে তার,
কৃষ্ণ-সারথী, দেখায় কর্ণে বীর্য্য-অহঙ্কার !
না থাক্ ভাগ্য, বীর্য্যেরই বলে
পাড়িব পার্থে এই পদতলে,—
প্রতিজ্ঞা মোর এ ভূমণ্ডলে রোধিবে সাধ্য কা'র ?
পার্থভাগ্য ব্যর্থ করিয়া প্রতিশোধ ল'ব তার।

—তবু, তবু মন বড় উচাটন মায়ের নয়ন-জলে,—
মাতা হয়ে সুতে ভিক্ষা মাগিল পড়িয়া চরণতলে !
যে কর্ণ কাছে কারো কোনো দিন
কোনো প্রার্থনা নহে ফলহীন,—
পুত্র হয়ে সে জননীর ঋণ শুধিবে কি বাহুবলে !
বীর্য্য তাহার কিসে পাবে পার মায়ের চোখের জলে ?

অস্ত্রগৃহে প্রবেশিলা বীর করিতে যুদ্ধসাজ ;
যুদ্ধশেষের শেষ-সেনাপতি আজি সে অঙ্গরাজ।
সহজাত দুটি হেম-কুণ্ডলে
সহজ কবচে রবিকর জ্বলে,
বাছি' বাছি' লহে সহস্র শর ভরি' শরাসনে আজ ;
হস্তে বিজয়, ললাটে দীপ্তি—সূর্য্যেরই মতো সাজ।

—একি ! কা'র ছায়া উঠিল ফুটিয়া সমুখে মুকুরপরে ?
কর্ণ-জননী কুন্তী যে দেখি—নয়নে অশ্রু ঝরে !
পশ্চাতে ফিরি' হেরিলা চকিতে,—
কেহ তো কোথাও নাহি চারিভিতে !
এ কি মোহময় মহাবিস্ময় ! শিহরিলা ক্ষণতরে ;
মুকুরের মাঝে মিলাইলা ছায়া আপন মুখের পরে।

—নয়, কভু নয়, এ হেন সময় নাহি চিন্তার ঠাঁই ;
বীর্য্যবৃত্তি কর্ণের মনে করুণার ক্লেদ নাই !
সতেজ স্বাধীন চির-নির্ভয়,
কিণাঙ্কী কর জপে শুধু জয়,—
বিশ্বভুবনে পার্থ-গরিমা নির্জ্জিত আজি চাই—
বীর্য্যবৃত্তি কর্ণ-চিত্তে করুণার নাহি ঠাঁই !

দুর্ম্মদ বেগে বাহিরিলা বীর পশিতে দীপ্ত রথে,
—কে রে ভিক্ষুক, আসিয়া দাঁড়ালি' আগলি' মধ্য-পথে ?
—"হে বিশ্বজিৎ, হে দাতা কর্ণ
কৃপার্থী কর চাহে সুবর্ণ
কুণ্ডল আর কবচ তোমার, দেহ দান গৃহাগতে।"
অজানা ভিখারী, ভাগ্যের মতো আসিয়া দাঁড়াল পথে !

থমকি' থামিল কর্ণ—শুনি' সে অদ্ভুত প্রার্থনা ;
হায়রে দৈব, এই শেষ দিনে—এ কিরে বিড়ম্বনা !
প্রতিজ্ঞা ছিল ভিক্ষা-পূরণ,
সে মহাসত্য জানে ত্রিভুবন,
সেই অপরাধে ভাগ্য কখন করিল এ মন্ত্রণা—
পার্থ-বিজয় ব্যর্থ করিবে—হায় রে বিড়ম্বনা !

ভিক্ষুকবেশী ব্রাহ্মণ পুনঃ কহে মিনতির স্বরে—
'কর্ণ কি তবে সত্যে হানিবে আপন ধনুঃশরে ?
প্রার্থনা মোর ফিরিয়া জানাই,
পূর্ণ না করো, বলো ফিরে যাই,
দাতাকর্ণের মিথ্যা বড়াই বুঝি লয়ে অন্তরে,—
ব্রাহ্মণবেশী ভিক্ষুক পুনঃ কহিল তীক্ষ্ণ স্বরে।

কবচের সাথে কুণ্ডল বীর ছিঁড়িতে কঠিন হাতে
আকর্ণ ভরি' অদ্ভুত হাসি দেখা দিলা অজ্ঞাতে !
মনে-মনে ভাবে—এই তো সুযোগ,
স্বর্গে মর্ত্তে যেথা অভিযোগ,
শক্তি সেখানে শুধু দুর্ভোগ অমোঘ ভাগ্য-হাতে ;
কর্ণের মুখে অদ্ভুত হাসি দেখা দিলা অজ্ঞাতে !

এই তো—এই তো সূর্য্যালোকিত মোরি প্রার্থিত পথ,
ভাগ্যের বরে সার্থক হোক্ কুন্তীর মনোরথ !
বাঁচুক পার্থ—জ্যেষ্ঠ তো আমি,
শোণিতের সাথে কল্যাণকামী,
যে স্নেহনির্ঝর অন্তরগামী, রোধে না তা পর্ব্বত !
সম্মুখে মোর এই তো পেয়েছি শান্তির মহাপথ।

জননি কুন্তি, পুত্রের হাতে লহ প্রার্থিত দান—
বঞ্চিত যে-বা মাতৃস্বর্গে,—সে আজি ত্যজিবে প্রাণ।
আদেশ তোমার—বাঁচুক পার্থ—
তাই হবে মাতা ; কর কৃতার্থ
ভাগ্য-নিহত সুতপুত্রের বীর্য্যের অভিমান ;
জননি কুন্তি, পাণ্ডবমাতা, লহ তার শেষদান।

—চালাও শল্য, ত্বরা লহ রথ, যেথা সে পার্থ আছে,
শেষ প্রণিপাত লহ দিননাথ আজি কর্ণের কাছে।
সবই তো সমান—জয় পরাজয়
অর্জ্জুনবধ—আত্মবিলয়—
ভাগ্যের হাতে সবই অভিনয়—কর্ণ তা বুঝিয়াছে !
—চালাও শল্য—দ্রুত, দ্রুততর—পার্থ যেথায় আছে।

নির্গুণবাদের কল্পিত অর্থ

—বিপিনচন্দ্র পাল

অনেক লোকে হিন্দু-জাতিকে নির্গুণবাদী বলিয়া ভাবে। এই নির্গুণবাদ বস্তুটা কি? ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয়, এই নির্গুণ কথার অর্থ কি? নির্গুণের সহজ অর্থ গুণহীন। কিন্তু এই অর্থে কেহই ব্রহ্মকে নির্গুণ বলে না। নিতান্ত নির্গুণবাদীও ব্রহ্মকে সত্যং জ্ঞানমনন্তং, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ বলিয়া থাকেন। আর এসকলও এক প্রকারের গুণ ত। তবে ব্রহ্মের কোন গুণ নাই, এ কথা কেমন হইল? কিন্তু কোনও বস্তুর কোনও গুণ আছে, এই কথা বলিলে তাহার একটা বিচার, একটা ওজন, একটা পরিমাণ করা হয় না কি? এই বস্তু ভাল, এই কথা বলিলেই ভাল বলিয়া একটা গুণ বা আদর্শ আছে, আর তার দ্বারা এই বস্তুকে ওজন বা পরিমাণ করিয়া ইহাকে ভাল বলিতেছি, এটা বোঝায় না কি? আর যার দ্বারা কোনও বস্তুর ওজন বা মাপ করা যায়, সেটা সেই বস্তুর সমান বা সেই বস্তু অপেক্ষা বড়ও ত হওয়া চাই, নহিলে তার ওজন বা মাপ হয় না। কোনও লোককে যখন ভাল বলি, তখন এই ভালটা তার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু তার বাহিরেও আছে, এইটা সর্ব্বদাই বোঝায়। সুতরাং গুণের আরোপ করাতে গুণী গুণ অপেক্ষা ছোট হইয়া পড়েন। কিন্তু ব্রহ্মবস্তু ত সকলের বড়—বৃংহ ধাতুর অর্থই তাই। ব্রহ্মের সমানও কিছু নাই, ব্রহ্ম অপেক্ষা বড়ও কিছু নাই। এ বস্তুর ওজন হয় না, পরিমাণ হয় না, তার কোনও তুলনা সম্ভবে না। আর এই জন্যই প্রকৃতপক্ষে তাহাতে কোনও প্রকারের গুণ আরোপ করাও যায় না। এইজন্যই ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয়।

এই নির্গুণের আর একটা অর্থও হইতে পারে। গুণমাত্রেই গুণীকে আশ্রয় করিয়া থাকে ও গুণীর মধ্যেই প্রকাশিত হয়। আর এইভাবে আশ্রয় করিতে যাইয়াই গুণ-গুণীর মধ্যে একটা সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়। আর যেখানে পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়, সেখানেই উভয়ে উভয়ের উপরে অপেক্ষা করেন, পরস্পরে পরস্পরের অধীন হইয়া পড়েন। একের অধিকারকে অপরে মানিয়া চলেন। না মানিলে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। ব্রহ্মেতে গুণ আরোপ করিলে, তাঁহার মধ্যেও গুণ-গুণীর সম্বন্ধ আছে, এটা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে ব্রহ্ম আর স্বতন্ত্র রহিলেন না, গুণতন্ত্র হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহা অসম্ভব। সুতরাং ব্রহ্মবস্তু সকল সম্বন্ধের অতীত—unrelated এবং unconditioned বলিয়াই তাঁহাকে নির্গুণ বলিতে হয়।

আমাদের দেশের অনেক দর্শনে গুণ বলিতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ বোঝায়। এই যে দৃশ্যমান জগত আর যে অদৃশ্য প্রকৃতি হইতে এই জগতের ক্রমবিকাশ হইতেছে তাহাকে ত্রিগুণাত্মিকা বলে। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণই জগতের যাবতীয় বস্তুর মূল উপাদান। সাংখ্য দর্শনে এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি বলে। এই সাম্য ভাঙিয়া গেলেই সৃষ্টির আরম্ভ হয়। এই দিক দিয়া দেখিলে নির্গুণ শব্দে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ যাহাতে নাই কিম্বা এই তিনগুণের অতীত যাহা তাহাই বোঝায়। এই তিনগুণ লইয়াই যখন এই সৃষ্টি-প্রবাহের উৎপত্তি ও স্থিতি তখন নির্গুণ বলিতে এই সৃষ্টি-প্রবাহের অতীত যাহা তাহাই বোঝায়। ইংরাজীতে এ বস্তুকে বা তত্ত্বকে transcendental বলে। নির্গুণ বলিতে transcendental বুঝাইয়া থাকে।

ইহাই নির্গুণ শব্দের সত্য অর্থ। এই অর্থে সকল দেশের, সকল দর্শনের এবং সকল ধর্ম্মের সিদ্ধান্তই বিশ্বের পরমতত্ত্বকে নির্গুণ বলিয়াছে। আমরা জগতের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধসকলকে জানিতে যাইয়াই এসকল সম্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই সকল সম্বন্ধের অতীত যে একটা তত্ত্ব আছে, ইহা জানিতে পাই। Relationএর ভিতরেই unrelatedকে, conditionsএর মধ্যেই unconditionedকে ধরিয়া থাকি। এই unrelated এবং unconditioned ছাড়া আমাদের কোনও relations বা conditionsএর জ্ঞান হয় না বা হইতে পারে না। সগুণ জগতকে জানিতে যাইয়াই, এইজন্য আমরা নিয়ত নির্গুণ ব্রহ্মকে মানিয়া লই। এই জন্যই আমাদের প্রাচীন ব্রহ্মবাদীগণ দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট, সসীম এবং অসীম, সগুণ এবং নির্গুণ, বিশ্ব এবং ব্রহ্মের সম্বন্ধকে ছায়াতপের মতন বলিয়াছেন।

ছায়াকে জানিতে গিয়াই আমরা আতপকেও জানি। যেখানে আতপ সেখানেই ছায়ার সম্ভাবনা হয়, আতপ ছাড়া ছায়া জানি না, কল্পনাতেও আনিতে পারি না। অতএব নির্গুণ জগতের অতীত হইয়াও জগতের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছেন। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও প্রামাণ্য জ্ঞানেতে সগুণ আর নির্গুণ, জগত আর ব্রহ্ম, ইহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক করা যায় না। ইহাই প্রকৃত হিন্দু সিদ্ধান্ত। হিন্দুর ইতিহাস এবং হিন্দুর দর্শন বস্তুতঃ এই সত্য সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য বা বর্জ্জন করে নাই। অথচ অনেক লোকে মনে করেন যে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য হিন্দু এই প্রত্যক্ষ জগতকে আর এই জগতের সাক্ষাৎকারে মানুষ যে সকল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে,—এ সকলের সত্যতাকে অস্বীকার করিয়াছে। বিদেশের প্রায় সকল পণ্ডিতলোকই মনে করেন যে হিন্দু এই সংসারকে কোনও দিন সত্য বলিয়া ভাবে নাই এবং মুক্তির সন্ধানে যাইয়া এই জগতের এবং মানবসমাজের সকল প্রকারের অভিজ্ঞতা ও সম্বন্ধকে মায়িক ও অলীক বলিয়া প্রাণপণে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে। চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল যে রূপরসাদির জ্ঞান লাভ করে, তার কোন সত্যতা প্রকৃতপক্ষে নাই। এসকলে কেবল সত্য অভেদবস্তু যাহা, তাহাতেই নানাবিধ ভেদবিরোধ কল্পনা করিয়া একত্ব জ্ঞানের ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। এই ভেদকে নষ্ট করিতে যাইয়া হিন্দু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করিয়াছে। আর এই প্রত্যক্ষকে হীনবল করিবার জন্য সর্ব্বদাই এই ইন্দ্রিয়গুলাকে আপন আপন বিষয় হইতে বঞ্চিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই ভাবে, এই পথে, এই বৈরাগ্যের সাধন করিয়া যারা জীবনের সার্থকতা অন্বেষণ করিতে যায়, এই জগতটা তাদের ভোগের বিষয়ও হয় না, তাদের কর্ম্মের ক্ষেত্রও হয় না। জগতটাকে যারা ভোগের বিষয় করিতে চাহে, সেই ভোগের জন্যই তাহাদিগকে এই জগতকে আয়ত্ত, উন্নত, শোধিত, সংস্কৃত করিতে হয়। এই জগতে ভোগের উপযোগী যেমন অনেক বস্তু আছে, আবার ভোগের ব্যাঘাত করে এমনও বিস্তর বস্তু আছে। সুতরাং ভোগকে পূর্ণ করিবার জন্য, জগতে যাহা ক্লেশকর, নিরানন্দকর, তাহাকে ছাড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়, আর যাহা আনন্দকর ও সুখকর তাহাকেই বাড়াইয়া তুলিতে হয়।

জগতের উন্নতিসাধন, যাহা মানুষের কাজে আসে নাই তাহাকে তার কাজে আনা, যাহা অব্যবহার্য্য হইয়া নিষ্ফলভাবে পড়িয়া আছে, তাহাকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া সফল করিয়া তোলা, যে দুর্ব্বল তাহাকে সবল করা, যে অজ্ঞ তাহাকে বিজ্ঞ করা, যে অপটু তাহাকে কর্ম্মক্ষম ও সুনিপুণ করা,—এক কথায় মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতিসাধন করা ইহাদের পক্ষে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠে। বাহিরের জগতকে মানুষের শ্রেষ্ঠতম ও শুদ্ধতম ভোগের উপযোগী করিতে হইলেই, বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া এই জগতের দ্রব্যগুণ ও গতি ও স্থিতির নিয়ম কি ইহা আগে জানিতে হয়; আর এই সকল নিয়ম জানিয়া এই সকল নিয়ম প্রয়োগে এই জগতকে মানুষের সুখ-সুবিধাসাধনে লাগাইতে হয়। এই ভাবেই বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হয়। এই পথে মানুষ ক্রমেই বাহিরের বিষয়-রাজ্যের উপরে আপনার অধিকার ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই রাজ্যটাকেও বাড়াইয়া তোলে, আপনিও তার সঙ্গে ক্রমে বড় হইয়া উঠে। আর এই পথেই সে আপনার শক্তিসাধ্যকে বাড়াইয়া তুলিয়া নিজের উচ্চতম মনুষ্যত্ব-লাভে সমর্থ হয়। এ পথ বিরোধের পথ হইলেও ইহাই বিজয়ের পথও বটে। সংগ্রামের ভিতর দিয়াই বিজয় অন্বেষণ ও লাভ করে। ভেদের ভিতর দিয়াই ক্ষুদ্রকে বর্জ্জন করিয়া মহৎকে; নিকৃষ্টকে দমন করিয়া উৎকৃষ্টকে, মন্দকে পরিহার ও নিরস্ত করিয়া ভালকে প্রতিষ্ঠিত ও বর্দ্ধিত করিতে হয়। এই পথে যে চলে তার জ্ঞান ও রস, তার সাধন ও সাধ্য, সকলই প্রত্যক্ষের উপরে গড়িয়া উঠে, স্বপ্নের উপরে গড়ে না। এই পথেই য়ুরোপ গিয়াছে ও যাইতেছে। এই প্রত্যক্ষের পথে যাইয়া য়ুরোপ যে বিরাট বস্তুতন্ত্র সভ্যতা ও সাধনাকে গড়িয়া তুলিয়াছে, সে সভ্যতা ও সাধনা একদিকে এই প্রত্যক্ষ জড়জগত ও অন্যদিকে এই প্রতিদ্বন্দ্বী জীবজগত, এই উভয়ের উপরে ক্রমাগতই আপনার প্রভুত্বকে বিস্তৃত ও দৃঢ় করিয়া তুলিতেছে। এবং এইভাবে য়ুরোপ আপনার সভ্যতা ও সাধনাকে যে উন্নত সোপানে নিয়া তুলিয়াছে, ভারতবর্ষ কোনও দিন সে পথে চলে নাই, সে উন্নত পদ পাইবারও এখন আর তার কোনও সম্ভাবনা নাই। জাপান সে পথে চলিতে পারে, চলিতেছে। চীন সে পথে চলিয়াছে ও চলিতেছে। য়ুরোপ যেখানে গিয়া উঠিয়াছে, জাপান ও চীন সেখানে ক্রমে যাইতে

পারে, হয়ত যাইবে। কিন্তু ভারতের সে আশা নাই। আধুনিক বিশ্বমানবসমাজে ভারতবর্ষ একঘরিয়া হইয়া আছে চিরদিনই এরূপ অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া থাকিয়া যাইবে। য়ুরোপের অনেক চিন্তাশীল লোক, এমন কি অনেক পণ্ডিত লোক পর্য্যন্ত এই ভাবেই ভারতবর্ষের ভাগ্য গণনা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ তাঁদের চক্ষে একটা অজানা অতীত কালের একটা বিরাট অবোধ্য সমস্যার মতন বোধ হয়। আমরা তাঁদের বিস্ময় ও কুতূহলের উদ্রেক করি বটে, কিন্তু সত্য শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে পারি না। আর য়ুরোপের যে সকল সামান্য-সংখ্যক লোক আমাদিগের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি ভক্তি দেখাইয়া থাকেন, তাঁরাও আমাদিগকে বৈরাগী ও সন্ন্যাসী, মায়াবাদী শুদ্ধ অদ্বৈত তত্ত্বের উপাসক বলিয়াই এভাবে ভক্তি করিয়া থাকেন। ইহাঁরা আধুনিক য়ুরোপের অত্যধিক বিষয়প্রবণতা দেখিয়া ভয় পাইয়াছেন। য়ুরোপ আজ যে পথ ধরিয়া চলিয়াছে, সে পথে যে জীবন-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা বা জীবন-চেষ্টার সত্য সার্থকতা লাভ সম্ভব, ইহাঁরা তাহা মনে করিতে পারেন না। তাঁরা একদিকে দেখেন যে নিজেদের সভ্যতা ও সাধনা পাগলের মতন বিষয়ের পথে ছুটিয়াছে, মৃগ যেমন তৃষ্ণায় কাতর হইয়া মৃগতৃষ্ণিকা দেখিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া হায়রাণ হয়, য়ুরোপ সেইরূপ জগতের অনিত্য রূপরসাদির পশ্চাতে ছুটিয়া ছুটিয়া কেবলই হায়রাণ হইয়া পড়িতেছে। কোনও দিকেই কোনও সমস্যার একটা মীমাংসার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। আর অন্যদিকে য়ুরোপ যাহা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিতেছে ও যার পশ্চাতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া ছুটিতেছে, ভারতবর্ষ অবলীলাক্রমে তাহাকে চিরদিন হেয় ভাবিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছে। যে ভাবে একান্ত বিষয়লোলুপ ভোগী ব্যক্তিরা নিতান্ত নির্লোভ ও ত্যাগী বৈরাগীদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হন এবং আপনাদিগকে হীন মনে করেন; কতকটা এই ভাবেই য়ুরোপের কোনও কোনও লোকে আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে একটা অদ্ভুত বৈরাগ্য ও নির্লোভ ও নির্লিপ্ততা দেখিয়া বিস্মিত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া থাকেন।

কিন্তু এই ভাবে যাঁরা আমাদের নিন্দা করেন, আর যাঁরা আমাদের স্তুতি করেন, তাঁদের উভয় দলই আমাদের সভ্যতা ও সাধনাকে একই চক্ষে দেখেন। উভয় দলই মনে করেন হিন্দু তত্ত্বজ্ঞানের অন্বেষণে যাইয়া চিরদিনই এই বহির্জ্জগতের এবং মানবের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সত্যতাকে অস্বীকার করিয়া চলিয়াছে। আমরা নিজেরাও এইরূপই ভাবিয়া থাকি। অনেক দিন হইতে এই ভাবেই নিজেদের সভ্যতা ও সাধনাকে দেখিয়া আসিয়াছি। হিন্দু বুঝি জীবনের সর্ব্ববিধ সম্বন্ধকে, এমন কি ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশাল পার্থক্যকে পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে 'অবিদ্যাবদ্বিষয়ানি' বলিয়া উড়াইয়া দিয়া কেবল একটা সূক্ষ্ম, বস্তুহীন আন্তরিক নির্গুণ ভাবের উপরে আপনার উন্নততম ধর্ম্ম ও সাধনকে গড়িয়া তুলিয়াছে,—এইরূপ বিশ্বাস আমাদের মধ্যেও খুবই আছে। এই ধারণাটা বহুবিস্তৃত হইলেও নিতান্ত ভুল। আর নির্গুণ ব্রহ্মবাদের একটা কল্পিত অর্থকে আশ্রয় করিয়াই এই ভ্রান্তিটা জন্মিয়াছে।

প্রাচ্যের মাতৃমূর্ত্তি

—শ্রীযামিনীকান্ত সেন

রূপকলার বিশ্বময় ব্যঞ্জনার ভিতর এমন কয়েকটা রসসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে যা' যুগে যুগে মানুষকে আনন্দ দান করে এসেছে। সে আনন্দ অজস্র ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে চিরকাল মানুষকে বিহ্বল ও আত্মহারা করেছে। মাতৃমূর্ত্তি এই প্রকার সৃষ্টির অন্যতম।

এই শ্রেণীর মাতৃমূর্ত্তি বলতে কোন বিশিষ্ট নারীর মূর্ত্তি বোঝায় না। বিশ্বজননী বা madonna নামই এই শ্রেণীর মাতৃমূর্ত্তির নামের সার্থকতা প্রকাশ করে। বিশ্বময় মাতৃশক্তির মাধুর্য্য ও দৃঢ়তা সকল দেশে ও কালে নারীজাতিতে সঞ্চারিত হ'য়ে তাঁদের নমস্ত করে' তুলেছে। এবং অনাদিকাল থেকে এই রহস্যময় শক্তির আধার হয়ে মাতৃজাতি জগতের শরণ্য হ'য়েছে। এই অসীম শক্তির সুপ্রকাশ করা হয় বিশ্বজননীমূর্ত্তি রচনা করে'—যাতে সীমা ও অসীমের এক অফুরন্ত ও অনির্ব্বচনীয় যোগ ঘটে। এই মিলনে জটিলতা নেই, প্রলয়-কাণ্ড নেই—স্নিগ্ধ কারুণ্য, অনাবিল স্নেহ ও ত্যাগের অসীম আবেশ এই যুগ্ম স্পর্শে কলিত হয়ে জগতের বন্দনীয় হয়েছে।

বিশ্বজননীমূর্ত্তির সম্বন্ধে উরোপের রূপকলার কয়েকটা সার্থক দান আছে এবং উরোপ সে-সব রচনা নিয়ে একটা বিশ্বময় খ্যাতিও অর্জ্জন করেছে। প্রাচ্যদেশ অনেকটা ভুলেই গেছে যে 'মা' জিনিষটা সকল দেশের এবং মাতৃমূর্ত্তিও হয়ত সকল দেশে প্রকাশের একটা প্রধান বিষয় ছিল। পশ্চিমদেশীয় সাহিত্যে পশ্চিমের এই সমস্ত মাতৃমূর্ত্তি সম্বন্ধে অসামান্য ও অস্বাভাবিক স্তুতি আছে। ইতালীয় চিত্রকলার মাতৃমূর্ত্তিগুলি সকল দেশের চিত্তহরণ করেছে। র‍্যাফেলের মাতৃমূর্ত্তিগুলি প্রাচ্য অঞ্চলে বিশেষ সুপরিচিত। শিশু যীশুকে ক্রোড়ে ধারণ করে' সুশোভিত মাবীমূর্ত্তি রূপলালিত্যে এদেশের অনেকের প্রীতি আকর্ষণ করেছে। বলা প্রয়োজন র‍্যাফেলের মূর্ত্তিতে নিগূঢ় অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা সামান্যই আছে, কারণ Renaissance-এর শিল্পীরা ইন্দ্রিয়গত মাংসজ সৌন্দর্য্যব্যঞ্জনায় নিপুণ ছিলেন। কোন আধুনিক সমালোচক বলেছেন, Fra Angelicoর দেবদূতের একখানি মুখে যতটা অধ্যাত্মব্যঞ্জনা আছে র‍্যাফেলের কোন জায়গায় তা'র ছায়াও নেই।

বলা বাহুল্য মাতৃমূর্ত্তি-রচনা সকল দেশকেই লুব্ধ করেছে। পাশ্চাত্য-জগতেও এই ভাবাবেশ খুব ব্যাপকভাবেই ছিল। কিন্তু আমাদের দেশে মাতৃত্বের প্রতি নিষ্ঠা সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। মাতাকে দেবী ব'লে এদেশ ধন্য হয়েছে। মাতৃবন্দনায় এ দেশের সকল যুগ মুখরিত হয়েছে। এমন কি আধুনিক যুগে পশ্চিম হ'তে যে সমস্ত ভাবসম্পদ্ ও কলা-সংগ্রহ এদেশকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে—যে-সব নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পজগৎ আন্দোলিত হয়েছিল, তাদের ভিতর ইতালীয় Renaissanceএর মাতৃমূর্ত্তি এদেশের উপর যতটা প্রভাব বিস্তার করেছে অন্য কোন চিত্রসঙ্গতি বা ভাবসম্পদ সেরূপ করেছে কি না সন্দেহ।

সকল দেশের পক্ষেই সকল কালে জননীমূর্ত্তির ব্যঞ্জনা এবং অসীম মাতৃত্বের রূপকথা উদ্ঘাটন একটা লোভনীয় বস্তু ছিল ও আছে। নানা প্রদেশের কলাসম্ভারেই দেখতে পাওয়া যায় কি করে' এই ভাবটিকে মর্ম্মরে কি বর্ণে প্রতিফলিত করবার একটা উদ্দাম ও বহুমুখী চেষ্টা হয়েছে। সৃষ্টি ও স্থিতির প্রতীকস্বরূপ এই মূর্ত্তির বিশ্বরূপ সকল দেশে ও কালে নানা ভাবে উন্মুক্ত হয়েছে। 'মা' বিশ্বের জননী মাতৃশক্তিই আদ্যাশক্তি, মাতৃ-অঙ্কেই বিশ্ব লালিত—এই বিরাট স্রোতেই অসীম জগৎ শিশুর ন্যায় বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়েছে। এরূপ অবস্থায় madonnaর চিত্র শুধু বিশেষ কোন জাতিরই ব্যাপার মাত্র—অন্য দেশের নয়, এরূপ একটা সুলভ ধারণা একেবারে ভ্রমসঙ্কুল। বরং দেখতে পাওয়া যায় উরোপীয় সভ্যতাসৃষ্টির বহু পূর্ব্বেও মাতৃমূর্ত্তির পরিকল্পনা অতি গভীর ও বিস্তৃতভাবে ব্যাপ্ত ছিল।

মিশরের অতি প্রাচীন ইতিহাসে মাতৃত্বের পরিকল্পনা Isis ও Horus মূর্ত্তিতে প্রকাশ হয়েছে। Isis ও Horusএর ভাস্কর্য্যে মিশরীয় সভ্যতা মাতৃত্বকে বিপুলভাবে উদ্ঘাটিত করেছে। এই মূর্ত্তি গ্রীক্ সভ্যতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আদিম সভ্যতার ভিতর মিশর অতি প্রাচীন। মিশরের মৃত্যুঞ্জয়ী চেষ্টার যত সম্ভার সমস্তই জগতের বিস্ময় উৎপাদন করেছে। কিন্তু মিশরীয় সভ্যতার অন্তর বিচার ক'রলে দেখি যে Pyramidএর গগনস্পর্শী

বিরাটত্বে মিশর যতটা সফল হয়নি, অসংখ্য মমী-রক্ষায় যতটা অভিজ্ঞতা দেখায়নি, ততটা হয়েছে এই মাতৃ-মূর্ত্তি রচনায়—মিশরকে জগতের চোখে এই মূর্ত্তি এক নূতন মহিমা দান করেছে। মিশর মাতৃত্বের সেবা ও ধ্যান করে' জগতের সকল জাতির সহিত একাত্ম হ'তে পেরেছে এবং আজ মিশরীয় সভ্যতা লুপ্ত হ'লেও সে-সভ্যতার সঙ্গে জগতের সকল সভ্যতা এইরকম একটা বিরাট সমানভূমি পেয়ে মিশরকে এরা একটা উদ্ভট জাতি মনে করেনি, বরং নিজেদের পরম আত্মীয় কল্পনা করে' আশ্বস্ত ও প্রীত হয়েছে।

এসিয়ায় মাতৃত্ব এক অসীম ঐশী ব্যাপার বলে অনুভূত হয়েছে। এদেশে ভগবানকেও মাতৃরূপে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এমন কি শক্তিবাদ মাতৃত্বকে পিতৃত্বের উপরে স্থান দান করেছে। মাতৃশক্তি ও বিশ্বমাতা পিতৃশক্তি অপেক্ষা অধিক মহিমান্বিত, এই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যে-সমস্ত দেবী কল্পিত হয়েছে তা' জগতের ইতিহাসে এক অপরূপ সম্পদ্। এমন কি এদেশের পাঠকেরা কালীমূর্ত্তিকে মহাদেবের বক্ষের উপর স্থাপন কর্‌তেও ইতস্ততঃ করেনি, কারণ এই মহাশক্তিকে এক বিরাট দেবতা ছাড়া আর কেউ ধারণ করতে সক্ষম নয়। এইভাবে বিশ্বমাতৃত্বের যে বোধন হয়েছে তা' পরবর্ত্তী কালে তান্ত্রিক সাধনায় এক মহান্ মাতৃচক্র সৃষ্টি করেছে। সকল দেবতাকে এই মহামাতৃত্বের স্পর্শে উজ্জ্বলতর ও গভীরতর করা হয়েছে।

ভারতবর্ষে নানাভাবে এই মাতৃমূর্ত্তির পরিকল্পনা করা হয়েছে। দুর্গামূর্ত্তিকে গণেশজননীরূপে ধ্যান করা এদেশের অতি প্রিয় ব্যাপার। বাংলা দেশের অনেক প্রাচীনপটে এই মূর্ত্তি পাওয়া যায়। কৃষ্ণক্রোড়ে যশোদা ও দেবকী, এশ্রেণীর আর একটি মূর্ত্তি। গার্হস্থ্য জীবনে এই সমগ্র চিত্র ও মূর্ত্তি সকলেরই চিত্তবিনোদন করে। স্নেহের যে বোঝাটি দুনিয়ার সকল মাকে বহন করতে হয় বিশ্বজননী ও ধাত্রী সেই দ্বন্দ্ব বোঝাই স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এ দৃশ্য ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় জগতের ভিতরে একটা সূক্ষ্ম সম্বন্ধ স্থাপন করে। দেবতাও আমাদের ব্যথার ব্যথী, এ দৃশ্য দেখলে আমাদের পীড়াও লাঘব হয়, আমরা বিশ্বচক্রের ভিতর একটা পবিত্র কৃত্যে নিজকে অর্পিত দেখে ধন্য হই। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর পরিকল্পনা কোন বিশেষ দেশের বা কালের নয় এ কল্পনা চিরন্তন ও চিরনবীন। মানবজাতি যতকাল পৃথিবীতে থাক্‌বে ততকাল এই সমস্ত সৃষ্টি সমগ্র জগৎকে একটা ভাবের ঐক্য দান করবে। নিগ্রো ও কাফ্রী, জাপ ও চীন, ভারতীয় ও পারস্য, পেরুভীয় ও পাশ্চাত্য সর্ব্বত্র এই মাতৃমন্ত্র ধ্বনিত—মাতৃক্রোড়ে শিশু এই পরম দৃশ্যের পুলকে সকলে শিহরিত—দেবতারাও সর্ব্বত্র এই বিশ্বনাট্যের অভিনয় করে' মানবজাতির হৃদয়ের অন্তরতম স্থানে নিজেদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ভারতবর্ষের কল্পনামুখর চিত্তপটে এই মাতৃমূর্ত্তির সৃষ্টি নানাভাবেই হয়েছে এ কথা আগে বলেছি। এদেশের অষ্টমাতৃকামূর্ত্তি নানাভাবে মাতৃত্বের নানা রসসঞ্চয় উন্মুক্ত করেছে। এই শ্রেণীর মূর্ত্তি শুধু এক জায়গায় নয়, ভারতের নানাস্থানে পাওয়া যায়। এলোরা, কুম্ভকোনম্, বেলুড়, ময়ূরভঞ্জ ও নেপালে অর্থাৎ পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সর্ব্বত্র মাতৃকামূর্ত্তি রচনা করে' শিল্পীরা ধন্য হয়েছে। বস্তুতঃ এই পরিকল্পনা অবলম্বন করে' ভারতবর্ষে একটা সৌন্দর্য্যের আন্দোলন উপস্থিত করা হয়েছিল। মাতার মাতৃত্ব ভারতে পূজিত হয়ে' ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রূপচর্চ্চা সম্ভব করে' তুলেছে। এদেশের মাতৃমূর্ত্তির বৈচিত্র্য সমগ্র জগতে দুর্লভ।

পূর্ব্বাঞ্চলের মাতৃমূর্ত্তি বহুকালের দান। প্রায় দু'হাজার বছর পূর্ব্বেকার শিশুক্রোড়ে হারিতী দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া যায়। Yi Sing যে বিবরণ রেখে গেছেন তাতে আছে, ভারতীয় সকল মঠেরই ভোজনাগারে এই মূর্ত্তি রক্ষিত হ'ত এবং শিশুর জন্মদানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে পূজিত হ'ত। Yi Sing বলেন এই মূর্ত্তিতে একটি শিশু মাতার অঙ্কে এবং আরও কয়েকটি পাদদেশে অবস্থিত এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হ'ত। এই দেবতা ভারতের একটি প্রিয়তম সৃষ্টি। কখনও হারিতী দেবীর অঙ্কে শিশুকে আসীন কিংবা মাতার কণ্ঠহার লইয়া ক্রীড়া-চঞ্চল—কখনও মাতৃস্তন্যে আকৃষ্ট ও লীলামত্ত অবস্থায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়। হারিতী দেবীকে কখনও বা দণ্ডায়মান অবস্থায়, তদবস্থায় শিশু মাতাকে আঁকড়ে' ধরে আছে এমন একটি সুশোভন ভঙ্গীতে উৎকীর্ণ অবস্থায়ও মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কখনও কখনও দণ্ডায়মান মাতার ক্রোড়ে আধুনিক ভারতীয় নারীরা যেভাবে শিশুকে অঙ্কে ধারণ করেন সেভাবে হারিতীর মূর্ত্তিকে রচিত করা হয়েছে দেখ্‌তে পাওয়া

যায়। এই মূর্ত্তি নানাস্থানে আছে—পেশোয়ার, মথুরা, অজন্তা-গুহায় এই চমৎকার পরিকল্পনার সৃষ্টি দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে যে হারিতী মূর্ত্তি দেওয়া হল তাতে শিশুর চিরন্তন ক্রীড়ার একটা উপাখ্যানকে নির্ম্মুক্ত করা হয়েছে মনে হয়। দু' হাজার বছর পর্য্যন্ত যে মূর্ত্তি কল্পিত হয়েছে

ভারতীয় হারিতী মূর্ত্তি
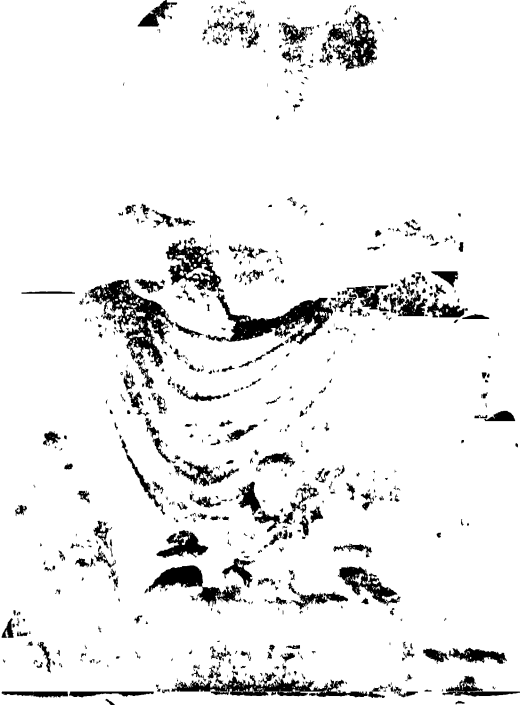
ভাব ধারা প্রাচ্য অঞ্চলে লুপ্ত হয়ে যায় নি। পূর্ব্বাঞ্চলের এই মূর্ত্তি অতি মনোহর। শিশু ক্রোড়ে শায়িত, মাতৃবক্ষে দৃষ্টার্পণ ক'রে পুলকিত। শিশুর নিকট মাতৃমূর্ত্তিই ত বিশ্বের প্রতীক, মাতা সালঙ্কারা সুশোভিতা ও স্থিরা। লেশ-মাত্র কোথাও কুণ্ঠা বা ক্লেশের চিহ্ন নাই। শিশু-রক্ষার একটা পরম গৌরবের তিনি যেন একটা অধিকারিণী। মাতা ত' তপস্বিনী নিশ্চয়ই, কিন্তু সে তপস্যায় উগ্রতা, কৃত্রিম চেষ্টা বা একটা কষ্টকর অভিনয় নেই। মার চরণতলে শিশুর দল একটা আনন্দ-বাজারের প্রতিষ্ঠা করেছে। মহত্বের সঙ্গে ক্ষুদ্রের কি আশ্চর্য্য মিলনই হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে কে মহৎ কে ক্ষুদ্র? মাতা ক্ষুদ্র কি শিশু ক্ষুদ্র? মাতা মহৎ কি শিশু মহৎ? এই ক্ষুদ্র জগৎটি সৌর-লোকের মতই বিরাট সৃষ্টির প্রতিকূল। সমগ্র মানবত্বকে এই পথে অগ্রসর হ'তে হয়—মাতৃ-অঙ্গে আশ্রয় পেয়ে জগত বিকশিত হয়ে উঠ্‌ছে। সে অঙ্ক স্নিগ্ধ ও মধুর অথচ অপার ও অসীম। বিশ্বকে এই স্নিগ্ধধারা দান করে' মাতার কর্ত্তব্য পূর্ণ হয়।

এই সমস্ত মূর্ত্তিতে শুধু শিশুকে রক্ষা বা পোষণ করার ভাব যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা' নয়। এই মূর্ত্তি অবলম্বন করে সকল দেশেই সৃষ্টির লীলাচক্রের নানা সূক্ষ্ম বার্ত্তা কল্পিত করা হয়েছে এবং উরোপীয় শিল্পও শুধু দু'একটা বার্ত্তাকে উদ্ঘাটন করে নি। Rubens-এর একটা চিত্রে শিশু যীশুকে মাতৃক্রোড়ে অঙ্কিত করে' একটা আপেল ফল দিয়ে লুব্ধ করার একটা অবস্থা রচিত হয়েছে। একদিকে মাতৃক্রোড়—বিশ্বমাতার অসীম আকর্ষণ, অন্যদিকে পরিপক্ক লোহিত আপেলের টান্, একদিকে অতিন্দ্রীয়ের, অন্যদিকে ইন্দ্রিয়ের এই ভাব-দ্বৈতের একটা সফল সৃষ্টি করা হয়েছে। চিত্র দেখে মনে হয় শিশু এক সমস্যায় পড়েছে—একবার আপেলের দিকে চোখ ফিরিয়ে অসীমের ডাককে ভোলা আবার অসীমকে পেয়ে সীমার লালিত্যকে তুচ্ছ করা এমনি একটি চিরন্তন ব্যাপারের বিপরীত আকর্ষণে পড়ে' সে অধীর হয়ে উঠছে। একথা ভুললে চল্‌বে না এই শিশুত্ব মানব কখনও অতিক্রম করতে পারে নি—অসীম জন্ম-মৃত্যুর পরিক্রমার ভিতর কখনও রূপরসের আকর্ষণ কখনও বা রূপ ও রসাতীত পরমার্থ বস্তুর ভাব সে শুনেছে ও অনুভব করেছে। সে সমস্যার মানুষ কখনও সুষ্ঠু মীমাংসা করতে পারে নি।

প্রাচ্য চিত্র ও মূর্ত্তি-বাহুল্যের ভিতর, গণেশজননী, যশোদা গোপাল, ষষ্ঠী ও অষ্টমাতৃকা মূর্ত্তিচয়ের ভিতর এমনি ভাবে প্রাচ্য হৃদয়বত্তার অনেক সূক্ষ্ম-স্পর্শ আছে যা'তে করে এই সমস্ত সৃষ্টি জাতির হৃদয়ে অধিক শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করে আছে। বৈচিত্র্য হিসাবে এই সমস্ত প্রাচ্য মূর্ত্তি অতুলনীয়।

ভারতীয় সভ্যতার ভাবপুষ্ট সুদূর যবদ্বীপের বিপুল সৃষ্টির ভিতর কি এই মূর্ত্তি স্থান পেয়েছে? যদি না পেত তবে ব্যাপারটি বিস্ময়কর হত। অনেক ঐশ্বর্য্যবান দেবতা সেখানে রচিত হয়েছে,

নেপালের মাতৃমূর্ত্তি- কি-সি-ম সিন
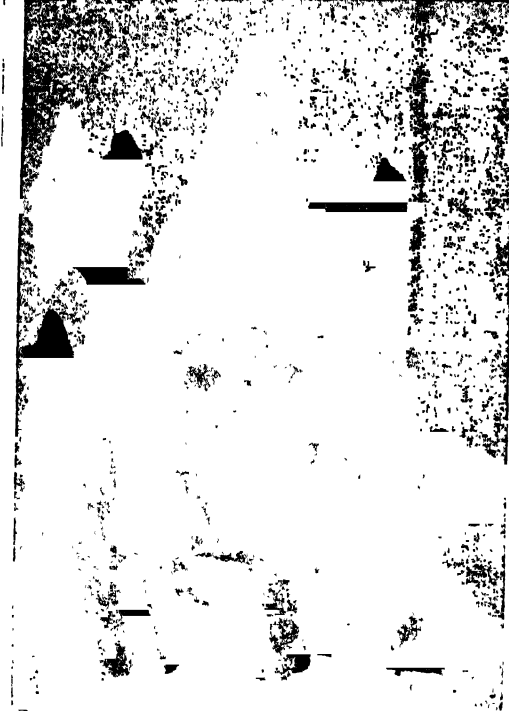
সেখানকার বিরাট হর্ম্ম্যসংগ্রহ জগতের বিস্ময় উৎপন্ন করছে। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য-সম্ভারের বিরাট বিপণিতে মাতৃমূর্ত্তিকে শিল্পী বা ধর্ম্মসাধকগণ ভুলতে পারেন নি। কোন্ জাতি 'মা'কে ভুলতে পারে? যবদ্বীপ প্রদক্ষিণ করে পর্য্যটক ক্লান্ত হলেও এখানকার মাতৃমূর্ত্তি একবার দেখতেই হবে—সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত রূপে নয়—অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার রূপে। চণ্ডী-মেণ্ডুল মন্দিরের প্রবেশ-পথের বামদিকে শিশুদল-বেষ্টিত এই মাতৃমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিকে রচনা করে যবদ্বীপের পরিশীলতা ধন্য হয়েছে।

মধ্য এশিয়া ও তুরফানেও মাতৃমূর্ত্তির ব্যঞ্জনা হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে শিশু-বেষ্টিতা একটি মাতৃমূর্ত্তির চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই চিত্র দেখে মনে হয় ভারতে মাতৃমূর্ত্তি সম্পর্কে যে শ্রদ্ধার হোমাগ্নি প্রজ্জলিত করা হয়েছিল সুদূর মধ্য এশিয়াও সেই আলো হতে বঞ্চিত হয় নি। বিশ্ব-জননীর রূপশিখার একটা বাত্যা এ অঞ্চলেও প্রবাহিত হয়েছে।

চীন দেশেও মাতৃত্বের দ্যোতক এই দুর্ল্লভ পরিকল্পনা অতি শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হয়েছে। সপ্তম শতাব্দী হ'তে এই ভাবের একটা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়। চীন দেশে

চৈনিক মাতৃমূর্ত্তি--কুয়ান্-ইয়ান্

এই মূর্ত্তি Kuan-yan নামে পরিচিত। চীন-জগৎ এই মূর্ত্তির সাধক। চৈনিক-মূর্ত্তিতে একটি পরম সফলতা লক্ষিত

হয়। মাতৃমূর্ত্তি স্নিগ্ধকারুণ্যে ভরপুর ঋজুভাবে সমাসীন সমগ্র দেহের লঘুতায় কোন ভারাক্রান্ত অবসন্নতা নেই। সম্রাজ্ঞীর মত এই দেবী স্মিতহাস্যে সুপ্রতিষ্ঠিতা। একটি প্রস্তরাসনে দেবী উপবিষ্টা—দু'টি dragon দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত এবং চারিদিক পদ্মফুলে পরিপূর্ণ। তাঁর বাম হাতে একটা গ্রন্থ। অঙ্কে উপবিষ্ট শিশুর আনন্দ একটা দেখবার জিনিষ। সমস্ত জুড়ে সৃষ্টিটির একটা কালজয়ী ঐশ্বর্য্য পরিস্ফুট হয়েছে। একটা বিরাট পরিকল্পনাকে শরীরী করে চৈনিক সভ্যতা এমনি করে' ধন্য হয়েছে। আমরা এই চৈনিক সৃষ্টি দেখে বুঝি চীনদেশ আমাদের কত আত্মীয়। যে মাতৃত্ব এ দেশে বন্দনীয় হয়েছে চীনও তা'কে শিরোধার্য্য করে' বিশ্বের দরবারে উপস্থিত হয়েছে। এ সব মূর্ত্তিতে পশ্চিমের শিল্পসঙ্করের লঘুতা নেই—মাংসজ লালিত্য-সৃষ্টির কোন গূঢ় উৎসাহ নেই—সত্যকার মাতৃসম্পর্ককে উদ্ঘাটন করবার একটা পরম সাধনা কিভাবে ধীরে ধীরে সফল হয়ে একটা সার্থক ও প্রামাণ্য মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে তা দেখে' বিস্মিত হ'তে হয়।

প্রাচ্য মাতৃমূর্ত্তি পরিক্রমার পথে একবার জাপানের দিকে চোখ ফেরাতে হয়। জাপানের সফলতাও এ ক্ষেত্রে সামান্য নয়। বীর জাপান বীরের মতই মাতৃপূজা ও মাতৃকল্পনা করে এসেছে। জাপানে মাতৃমূর্ত্তিকে Kwanon বলা হয়। জাপানের শিল্পী সূক্ষ্ম নিপুণতায় এই মূর্ত্তিকে একটা বিশিষ্টতা দান করেছে। Ki si-mo-sin মূর্ত্তিতে, আমরা বিশ্ব-মাতৃত্বের এক চমৎকার সৃষ্টি দেখতে পাই। মাতৃত্বের অসীম দায়িত্ব ও গৌরবের ভাবে এই মূর্ত্তি শোভিত। অসীম মাতৃস্নেহ কোথাও কোন লঘুতাকে আশ্রয় করেনি। দেশ-কালের অসীম শিশু মাতৃক্রোড়ে অনাদিকালের শিশুত্বের প্রতিভূ রূপে উপবিষ্ট। এ মূর্ত্তি ভুবনেশ্বরীরূপিনী,—চৈনিক মূর্ত্তি কমলারূপিনী। মাতৃত্বের পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য্য এ মূর্ত্তিতে লগ্ন করা হয়েছে—জাপান সব সময় লঘু নয়—জাপানের অন্তরে যে অসীম সাধনা ও সঙ্কল্পের বীজ নিহিত তা' এই মাতৃমূর্ত্তির কল্পনায় প্রস্ফুট হয়েছে। এইরূপ মাতৃক্রোড়েই জাপানের বীরশিশুর জন্ম। সমগ্র জগৎকে জাপান বীরত্ব, ধৈর্য্য ও ত্যাগে মুগ্ধ করেছে—জাপানের বিশ্বমাতা সমগ্র মাতৃত্বের অন্তরালে এর একটা বিরাট ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সঞ্চার করেছেন। মাতৃত্বের এক

ক আনন্দ-স্বপ্নে ভরপুর—অন্য দিকে ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও সীম বেদনার ভাব গ্রহণ করবার সঙ্কল্পে তা' পরিপূর্ণ।

যবদ্বীপের হারিতী মূর্ত্তি

মাতৃত্বের বীরত্ব সকল বীরত্বকে হার মানায়। জাপানের রূপকলায় এই গুরুতর দিকটাই বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করছি। এক দিকে মাতার অসীম ঐশ্বর্য্য অন্য দিকে লোকরঞ্জক ভাবসম্পুট ভারতীয় সৃষ্টিপরম্পরায় প্রকাশিত হয়েছে। ইউরোপের ম্যাডোনায় বৈপরীত্যের কোন সুষ্ঠু প্রতিফলন নেই এজন্য মাতৃত্বের চিত্রাদি অনেকটা লঘু ও একঘেয়ে। দশপ্রহরণধারিণী দুর্গাকে মত্ত অসুরসংহার কার্য্য হ'তে সংহরণ করে' গণেশজননীরূপে কল্পনা করার ভিতর একটা মাদকতা আছে—একটা গুন্ঠিত গুরুত্ব আছে। শক্তি শুধু সংহারে ব্যয়িত হয় না—সৃষ্টি ও পুষ্টিতেও শক্তির অভিব্যঞ্জনা সম্ভব। দানব দলন করা শুধু শক্তির কাজ নয়, জগতের বিকাশমূলক প্রাণকোরককে সযত্নে রক্ষা করা ও শক্তির বিরাট কাজ গণেশজননী সেই স্থিতিরূপিনী সাধনার মহাযজ্ঞে ব্যাপৃত। তাঁকে সংহার-কার্য্যে না দেখলে এ যজ্ঞও যে তাঁর কাছে তদপেক্ষা গুরুতর এ কথা প্রত্যয় হ'ত না। এজন্যই গণেশজননীর কল্যাণমূর্ত্তিতে প্রতি গৃহে আনন্দ সঞ্চারিত

হয়—মাতার শ্রমের লাঘব হয় কারণ দেবীও ত' এই ধ্যানে মগ্না—এই কার্য্যে আত্মভোলা। গৃহজননীরা তাই এই দেবীত্বের অংশ গ্রহণ করে' পরম তপস্যায় মগ্ন ভারতের প্রতি পর্ণকুটিরে এই বাণী নিঃশব্দে ধ্বনিত ও অনুভূত করেছেন।

অন্যদিকে গোপালমূর্ত্তি আর একটা ভাবলোক উদ্ঘাটন করেছে। চিরন্তন শিশু (eternal child) মানব-জীবনের অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার—এই শিশু-লীলার প্রতিফলনের জন্য মাতৃদর্পণ প্রয়োজন—সে দর্পণ হচ্ছে যশোদা। এ মাতা বাল-সখ্যে বিভোর, শিশুর কলগুঞ্জন ও নর্ত্তন-লীলায় আত্মহারা। মাতৃত্বের অনির্ব্বচনীয় অঙ্গাঙ্গিত্বের—'অসীম' শিশুতে লীলাপ্রাচুর্য্যের পোষক এই 'মা' কোন গৃহে নেই? তা'কে রূপকলা উদ্ঘাটন করতে চিরকালই ব্যাকুল। যশোদা-গোপাল রচনা করে' এমনি ভাবে রূপশিল্প ধন্য হয়েছে।

এই সমস্ত সৃষ্টির দুটি দিক্ আছে, একটা হচ্ছে লৌকিক, যাতে করে প্রতি মাতা ও শিশুর ভিতর আমরা যশোদা ও গোপালের লীলা দেখ্‌তে পাই। মাতৃজাতি পুলকিত হয়েই এজন্য ছেলের নাম কখনও বা গোপাল রেখে তৃপ্ত হয়। অন্যদিক হ'ল অলৌকিক, তা'কেই দেবতা-কল্পনার দিক্ বলা যেতে পারে। বিশ্বমাতা ও বিশ্বশিশুর এদুটি বিরাট দেবত্বের ক্রীড়া আমরা দেখতে পাই কল্পনালোকে। যেখানে কল্পনাকে ব্যঞ্জনার নানা ছন্দে একটা অবিশিষ্ট পাদপীঠে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে, সেখানেই সে মূর্ত্তি বা চিত্র অবিনশ্বর হয়ে গেছে এবং অসীম রসের উৎসরূপে দীপ্যমান হয়েছে। সকল দেশের শিল্পীসাধনা জটিল ভাবসম্পুটকে মার্জ্জিত আকার দিতে পারেনি। সার্থক রূপ দান করতে পারলেই শিল্পসম্পদ চির নবীন হয়ে' থাকে—যুগযুগান্তেও সে সমস্তের আকর্ষণ নিঃশেষ হয় না। প্রাচ্য অঞ্চলে এজন্য হাজার বছরের পুরাণ চিত্রাদিও এখনও ভাব-শূন্য হয়ে পড়েনি। Lawrence Binyon Ku-kai chia কোন চিত্র সম্বন্ধে বলেছেন যে কুড়ি বছর পর্য্যন্ত তিনি সে ছবি দেখে এসেছেন—যতই প্রাচীন হচ্ছে ততই যেন নূতন বস্তু ও নূতন রূপসম্ভার তাঁর চোখে পরিস্ফুট হচ্ছে। এজন্য প্রাচ্য রূপশিল্পের মূর্ত্তি ও চিত্রাদির আকর্ষণ কাপড়চোপড়ের ফ্যাসানের মত ক্ষণস্থায়ী না হয়ে' চিরন্তন হয়ে উঠে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে মাতৃমূর্ত্তি বা madonna কল্পনাটি পাশ্চাত্য ব্যাপার নয়। এসিয়াতেও বিশ্বমাতার মূর্ত্তি ও চিত্রাদি বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত রচিত ও আদৃত হয়ে আছে এবং প্রতিগৃহে রক্ষিত হ'য়ে সমগ্র সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

"ক্ষুধার অন্ন জোটে না যা'দের দারুণ তৃষায় মেলে না জল,
ষোড়শোপচারে কেমনে তাহারা তোরে আজ মাগো পূজিবে বল?
বাঙ্গলার পথে কণ্টকেয়ারী সারা বাচ্‌ড়ায় আগাছা ভরে',
চণ্ডীর ঘরে আজি কুস্বরে দিবসে শেয়াল খেয়াল ধরে;
সারা বাঙ্গলার সকল খামার দাগা বুকে নিয়ে রয়েছে পড়ে;
ডেকে চলে শুধু এলোমেলো বায়ু পাঁজরার হাড় ওঠে যে নড়ে!
মারী-রাক্ষস মরা বুকে করে' তাথিয়া তাথিয়া নাচিছে ঘরে!
দুর্ভিক্ষের বিষ-নিঃশ্বাসে বাঙ্গলার গ্রাম উঠেছে ভরে'।
ওগো মহামায়া! আশ্বিনে আজ মহাদুর্দ্দিন এসেছে ফিরে
মহা-উৎসব কে করিবে মাগো! বাঙ্গলার মরা-গাঙের তীরে!"

ফোটোগ্রাফি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপরিমল গোস্বামী

ক্যামেরা-পৃষ্ঠ হেলাইবার কৌশল

ফোকাসিংএর সময় আরো একটি জিনিস বিশেষ প্রয়োজনীয়। দেখিতে হইবে ক্যামেরার ব্যাক, তলভূমির (base board) সঙ্গে একত্র জোড়া না থাকে। কেননা অনেক সময় ক্যামেরা-পৃষ্ঠকে সম্মুখে এবং পশ্চাতে হেলাইবার দরকার হয়। অপেক্ষাকৃত নিকট হইতে যদি বড় ইমারতের ছবি তুলিতে হয় তবে ক্যামেরা সমগ্রভাবে সামনে উঁচু না করিয়া ক্যামেরা-ফ্রণ্ট মাত্র উঁচু করিবার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহাতে সমগ্র ইমারতটি ফোকাসে আসিয়া ইমারতের সামনের ভূমি বা ফোর-গ্রাউণ্ড কমিয়া যাইবার কথা। কিন্তু লেন্স শেষ পর্য্যন্ত উঁচু করিয়াও যদি এই উদ্দেশ্য সাধিত না হয়, তবে সমগ্র ক্যামেরাটাই একটু উঁচু করিবার দরকার হইবে। এ ক্ষেত্রে নির্ভুল ফোকাসিংএর জন্য ক্যামেরা-পৃষ্ঠের একদিক লেন্সের দিকে এবং অন্যদিক লেন্স হইতে দূরে হেলাইয়া আটকাইয়া দিতে হয়। কাছে এবং দূরের জিনিস একই সঙ্গে ফোকাস করিতেও কখনো কখনো স্যুইং ব্যাক দরকার হয়। ষ্টুডিওতে ফোটো তুলিবার সময়ও এইরূপ স্যুইংব্যাক্ বা ইচ্ছামত হেলান যায় এমন ক্যামেরা-পৃষ্ঠ আবশ্যক হয়। সাব্জেক্টের মস্তক যেখানে আছে, সামনা-সামনি বসিলে পা যদি তাহা হইতে একটু বেশি সম্মুখে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে মাথা এবং পায়ের মধ্যে যে ব্যবধান হইল তাহা একসঙ্গে সংশোধন করিয়া ফোকাস্ করিতে হইলে ক্যামেরা-পৃষ্ঠ একটু হেলাইয়া উভয়ের সামঞ্জস্যবিধান করিয়া লইতে হয়। সাধারণ হ্যাণ্ড-ক্যামেরায় স্যুইং ব্যাক নাই, কিন্তু ষ্ট্যাণ্ড-ক্যামেরা মাত্রেই ইহা আছে।

গ্রাউণ্ড গ্লাস ও প্লেট হোল্ডার

ক্যামেরাপৃষ্ঠে ফোকাসিংএর জন্য যে ঘসা কাঁচ বা গ্রাউণ্ড গ্লাস ব্যবহৃত হয় তাহা খুব প্লেন এবং সূক্ষ্ম দানাবিশিষ্ট হওয়া চাই। অনেক ক্যামেরার সঙ্গে এমন মোটা দানাযুক্ত গ্রাউণ্ড গ্লাস থাকে যাহাতে সূক্ষ্ম ফোকাসিং সম্ভব হয় না। এরূপ হইলে সেই কাঁচখানি ফেলিয়া দিয়া সূক্ষ্ম দানাবিশিষ্ট আর একখানি গ্রাউণ্ড গ্লাস লাগাইয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এরূপ কাঁচের দাম বেশী নহে এবং সকল দোকানেই পাওয়া যায়।

ইংলিশ ষ্ট্যাণ্ড-ক্যামেরার মূল্য যাহা তালিকায় লেখা থাকে তাহাতে ঐ ক্যামেরার সঙ্গে একটি ষ্ট্যাণ্ড ও একখানি মাত্র ডবলপ্লেটহোল্ডার পাওয়া যায়। ষ্ট্যাণ্ড একটিরই প্রয়োজন, কিন্তু প্লেটহোল্ডার তিনখানির কমে কাজ চলে না। সুতরাং ষ্ট্যাণ্ড-ক্যামেরা কিনিবার সময় অতিরিক্ত দুইখানি ডবল-প্লেট-হোল্ডারের দাম দিতে হইবে। অনেক জার্ম্মান-ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরার সঙ্গেও তিনখানি ডবল প্লেটহোল্ডার পাওয়া যায়। ইহা বিশেষ সুবিধার কথা, কেননা উহার মূল্য কম নহে। ষ্ট্যাণ্ড-ক্যামেরায় তিনখানি ডবল স্লাইড বা প্লেটহোল্ডারে ভালই কাজ চলিয়া যায়, কিন্তু হ্যাণ্ড-ক্যামেরায় অন্ততঃ ছয়খানি দরকার। তবে যিনি হ্যাণ্ড-ক্যামেরায় প্লেটের পরিবর্ত্তে ফিল্ম ব্যবহার করিবেন, তাঁহার পক্ষে একটি ফিল্ম প্যাক্ অ্যাডাপ্টার হইলেই চলে, কারণ এই অ্যাডাপ্টারে একত্র বারোখানি ফিল্ম ধরে। রোলফিল্ম হইলে কিছুই দরকার নাই।

অনেকে প্লেটের পরিবর্ত্তে ফিল্ম পছন্দ করেন, কারণ নিরাপদে বহন করিবার পক্ষে ইহার তুল্য আর কিছু নাই। বড় ক্যামেরাতে ব্যবহারের জন্যও বাজারে কাটা ফিল্ম পাওয়া যায়। সাধারণ প্লেটহোল্ডারের সঙ্গে পৃথক ফিল্ম-কেরিয়ার (carrier) কিনিয়া লাগাইয়া লইতে হয়। ফোটোর উৎকৃষ্টতা প্লেট এবং ফিল্মে সমানই হয়।

কেরিয়ার ও ক্যামেরার সাইজ

কেরিয়ার (carrier) অর্থ বাহক। বড় প্লেটহোল্ডারে ছোট প্লেট ব্যবহার করিতে হইলে কেরিয়ার আবশ্যক। এই কেরিয়ার না হইলে ছোট প্লেট বড় হোল্ডারের কেন্দ্রস্থলে থাকিতে পারে না—এধারে ওধারে সরিয়া যায় এবং তাহাতে কাজ হয় না। বড় হোল্ডারে ছোট প্লেট বহন করে বলিয়া ইহাকে কেরিয়ার বলা হয়।

১৫ × ১২ সাইজ হইতে ১২ × ১০, ১২ × ১০ হইতে ১০ × ৮, ১০ × ৮ হইতে ৮½ × ৬½, ৮½ × ৬½ হইতে ৬½ × ৪¾, ৬½ × ৪¾ হইতে ৫½ × ৩½ অথবা ৪¼ × ৩¼, ৪¼ × ৩¼ হইতে ৩½ × ২½ পর্য্যন্ত কেরিয়ার পাওয়া যায়।

ব্যবসায়ীগণ সাধারণতঃ ৮½ × ৬½ সাইজ ক্যামেরা ব্যবহার করেন। ইহাকে ফুল-সাইজ (full-size) বলা হয়, এবং লিখিবার সময় ১/১ এই ভাবে লিখিতে হয়। ইহাকে ফুল-সাইজ অর্থাৎ পুর্ণ-সাইজ ধরিয়া ইহার তুলনায় ½ হাফ্ বা অর্দ্ধ-সাইজ (ইহাকে ক্যাবিনেট সাইজও বলে) ইত্যাদি ধরা হইয়াছে। জার্ম্মান-ক্যামেরাগুলির সাইজ ইহা হইতে কিছু কিছু বড়, কিন্তু সেরকম প্লেট এ দেশে না মেলায় সেই ক্যামেরার প্লেটহোল্ডারগুলিতে কেরিয়ার বসাইয়া ইংলিশ সাইজ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জার্ম্মানির একটি সাইজ খুব জন-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ইংলিশ ¼ কোয়াটার সাইজ সৌখিন চিত্রকরদের একটি প্রিয় সাইজ। অনুরূপ জার্ম্মান সাইজকে ৯ × ১২ সেন্টিমিটার সাইজ বলে। ইংলিশ ¼ হইতে ইহা কিছু বড়। সৌখিন বা অ্যামেচার ফোটো-

রিফ্লেক্স-ক্যামেরা (সোপো)
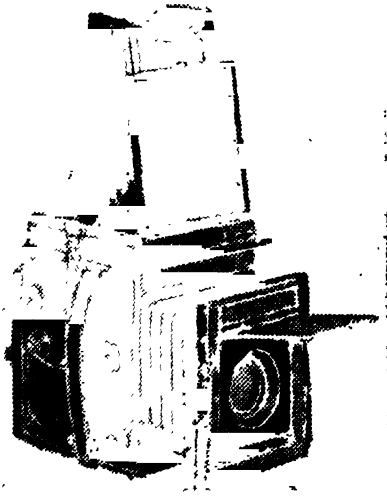
গ্রাফারগণ নিজের নিজের রুচি ও প্রয়োজন হিসাবে কেহ পোষ্টকার্ড, কেহ কোয়াটার, কেহ বা কার্ড অর্থাৎ ৩½ × ২½ (প্লেট) অথবা ৩¼ × ২¼ (ফিল্ম) সাইজ ব্যবহার করেন। এই ছোট সাইজগুলি ব্যবহারের পক্ষে খুব সুবিধা জনক, কিন্তু ইহা ছাড়া আর কোনো সুবিধা নাই। প্রকৃত ভাল কাজ শিখিতে, এবং করিতে হইলে অন্তত একটি ½ সাইজ ক্যামেরা থাকা উচিত ইহার সঙ্গে ছোট ক্যামেরা থাকিলে ক্ষতি নাই। কতকগুলি কাজের জন্য ছোট ক্যামেরা অপরিহার্য্য। খেলা-

স্পোর্ট বা প্রেস-ক্যামেরা (ইহাগে)
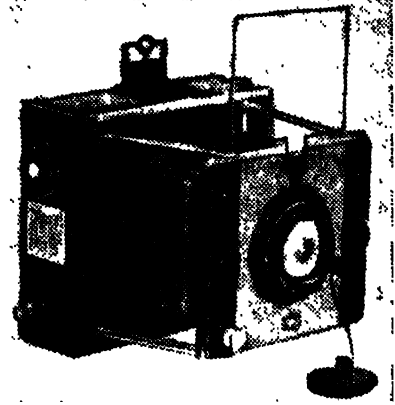
ধুলা অথবা অন্য কোনো দ্রুতগামী বিষয়ের ছবি, এবং খবরের কাগজের জন্য সংবাদ হিসাবে ছবি তুলিবার জন্য যে ক্যামেরা ব্যবহৃত হয় তাহা ছোট না হইলে কাজ চলে না। প্রথম জাতীয় কাজের জন্য যে ক্যামেরা ব্যবহৃত হয় তাহার নাম রিফ্লেক্স ক্যামেরা এবং দ্বিতীয়টির নাম প্রেস ক্যামেরা। এই দুই জাতীয় ক্যামেরাই ঐ দুই জাতীয় কাজের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

ব্যবসায়ী ফোটোগ্রাফারের কম পক্ষে দুইটি ক্যামেরা এবং তিনটি লেন্স থাকা উচিত। একটি ক্যামেরা ১২ × ১০ সাইজ (বড় গ্রুপ তুলিবার জন্য অথবা ঐ সাইজ পোর্ট্রেট তুলিবার জন্য) আর একটি ৮½ × ৬½ সাইজ। একটি লেন্স ১২ × ১০ এর জন্য একটি ১/১ সাইজের জন্য, আর একটি ১/২ সাইজের জন্য। ১২ × ১০ ক্যামেরায় য়ুনিভার্সাল ফ্ল্যাঞ্জ লাগানো থাকিলে তিনটি লেন্সই ঐ এক ক্যামেরাতেই ব্যবহার করা যাইবে। কিন্তু সব সময়ে ব্যবহারের জন্য ১২ × ১০ সাইজ অসুবিধা জনক বলিয়া ১/১ ফুল সাইজ ক্যামেরা একটি রাখা ভাল।

ইহা ছাড়া ফোকাল প্লেন শাটার সহ একটি রিফ্লেক্স ক্যামেরা থাকিলে ভাল হয়।

প্লেট-হোল্ডার বা স্লাইডের ব্যবহার

ফোকাস করিবার সময় লেন্সের শাটার খুলিয়া গ্রাউণ্ড-গ্লাসে ফোকাস্ করা হইয়া গেলে শাটার বন্ধ করিয়া ক্যামেরা-পৃষ্ঠ হইতে গ্রাউণ্ড গ্লাস সরাইয়া দিয়া সেই স্থানে প্লেট-হোল্ডার বসাইয়া দিতে হয়। তারপর সেই প্লেট হোল্ডারের দরজা উপর হইতে টানিয়া খুলিলে হোল্ডারের ভিতরকার প্লেট ক্যামেরার ভিতরে আবরণ মুক্ত অবস্থায় লেন্সের দিকে চাহিয়া থাকে। তখন লেন্সের শাটার খুলিয়া দিয়া ঐ প্লেটে আলোক ছাপ বা এক্‌সপোজার দিতে হয়। এই এক্‌স্‌পোজার দিবার পূর্ব্বে বা পরে প্লেটে কোনো উপায়েই কোনো আলো লাগা একেবারে নিষেধ। এক্‌স্-পোজার দেওয়া হইয়া গেলে প্লেট হোল্ডারের দরজা নীচের দিকে ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া ক্যামেরা হইতে উহা খুলিয়া লইতে হয়।

এক্‌স্‌পোজার এবং ফোকাসিংএর রীতি

এক্‌সপোজার এবং ফোকাসিং সম্বন্ধে পরে পৃথক অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হইবে। এখানে চেহারা তুলিবার সময় কি করিতে হয় তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

কোনো লোকের চেহারা ফোকাস্ করা হইয়া গেলে, লেন্সমুখ বন্ধ করিয়া যতক্ষণ প্লেট-হোল্ডার ক্যামেরায় পরাইতে হয় ততক্ষণ সেই সাবজেক্টের মুখের ভাব কিংবা দেহের অবস্থান পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; কেননা শক্ত হইয়া একভাবে পাঁচ সাত মিনিট বসিয়া থাকা মানুষের পক্ষে কষ্টকর, এবং এরূপ থাকিলে মুখের উজ্জ্বল প্রকাশভঙ্গী স্বভাবতঃই ম্লান হইয়া পড়ে। সেই জন্য ফোকাসিংএর সময় চোখের চাহনী এবং মুখের কোনো ভাব প্রকাশের দিকে জোর দিবার আবশ্যকতা নাই। ফোকাসিং হইয়া গেলে এক্‌স্‌পোজার দিবার মুহূর্ত্তে মনের মত করিয়া চাহনী ঠিক করিয়া দিলে ভাল হয়। অবশ্য যাহার ছবি তুলিতে হইবে তাহার বসিবার অথবা দাঁড়াইবার ভঙ্গীটি এবং মুখের বিশিষ্ট ভাবটি যাহা ফোটোতে সব চেয়ে ভাল দেখিতে হইবে, সেই অবস্থাটা ফোকাসিং এর সময় লক্ষ্য করিয়া লইতে হইবে। তারপর প্লেট-হোল্ডার ক্যামেরায় পরাইবার সময় তাহাকে একটু নড়িবার স্বাধীনতা দিয়া এক্‌স্‌পোজার দিবার সময় পুনরায় পূর্ব্বের সেই ভঙ্গীটি ঠিক করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু স্বভাবতই চঞ্চল ছোট ছেলে মেয়ে কিংবা শিশুদের পক্ষে এই নিয়ম খাটে না। তাহাদের যে অবস্থাটা ফোকাস্ করা হইল পুনরায় সে অবস্থায় ফিরাইয়া আনা দুঃসাধ্য। যদি ফোকাস্ করা মাত্রই এক্‌স্‌পোজার দিবার ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে সুবিধা হইত, কেননা ফোকাস্ করিয়া পরে প্লেট-হোল্ডার লাগাইতে খানিকটা সময় লাগে এবং যাহাদের এক সেকেণ্ডের মধ্যে মুখের ভাব দশবার পরিবর্ত্তিত হয় তাহাদের বেলায় খানিকটা সময় গেলে চলে না। সেই জন্যই রিফ্লেক্স ক্যামেরার প্রয়োজন। এই ক্যামেরার সুবিধা এই যে এক্সপোজার দিবার পূর্ব্বে মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ফোকাস্ দেখা যায়। ক্যামেরার ভিতরে প্লেট আবরণ-মুক্ত হইয়া আলোকছাপ পাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। চিত্রকরের চোখ হুডের (hood) এর ভিতর দিয়া ফোকাসিং গ্লাসে নিবদ্ধ আছে, তাহার একহাত শাটার রিলীজে (Shutter release বা knob ইহা টিপিয়া এক্‌স্‌পোজার দিতে হয়) এবং অন্য হাত ফোকাসিং স্ক্রুতে। সাব্‌জেক্ট কিছু সরিয়া গেল, তৎক্ষণাৎ নূতন করিয়া ফোকাস্ করা হইল—এমনি করিতে করিতে যখন দেখা গেল ফোটো তুলিবার পক্ষে চাহনী এবং মুখের প্রকাশ ভঙ্গী সন্তোষজনক হইয়াছে তৎক্ষণাৎ রিলীজ টিপিয়া দিলেই প্লেটে এক্‌স্‌পোজার লাগিল।

এই ক্যামেরার শাটার অন্যান্য ক্যামেরার মত লেন্সের সঙ্গে বা কাছে থাকে না, প্লেট-হোল্ডারের দরজার কাছে থাকে। কাজেই লেন্সের মুখ সর্ব্বদা খোলা থাকিলেও প্লেটের গায়ে কোনো আলো লাগিতে পার না। এই শাটারের নাম ফোকাল-প্লেন শাটার,—ইহা প্রেস-ক্যামেরা এবং রিফ্লেক্স ক্যামেরার সঙ্গে থাকে। দ্রুত কাজের জন্য অন্য ক্যামেরাতেও এই শাটার থাকিতে পারে—এবং এই জন্যই তাহাদিগকে ফোকাল প্লেন ক্যামেরা বলা হয়।

রিফ্লেক্স ক্যামেরার ভিতর কোণাকুণি ভাবে একখানি আয়না থাকে, এই আয়নার প্রতিফলিত ছবি গ্রাউণ্ড গ্লাসে গিয়া পড়ে। গ্রাউণ্ড গ্লাস থাকে ক্যামেরার উপরে—পশ্চাতে থাকে না। পাশেও থাকিতে পারে। সুতরাং ফোকাসিং এর পরে প্লেট-হোল্ডার ক্যামেরায় পরাইবার সময় গ্রাউণ্ড-গ্লাস সরাইতে হয় না। লেন্সের ভিতর দিয়া যে প্রতিচ্ছবি সোজা প্লেটে গিয়া লাগা উচিত, মাঝখানে আয়না থাকাতে তাহা প্লেটে না গিয়া আয়নায় গিয়া পড়ে, এবং সেখান হইতে

সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গ্রাউণ্ড গ্লাসে ফুটিয়া উঠে। শাটার রিলীজ টিপিবা মাত্র আয়নাটা সরিয়া যায়, এবং তখন লেন্সের ভিতর দিয়া যে প্রতিচ্ছবি আয়নায় লাগিতেছিল এখন সেখানে আয়না না থাকায় প্লেটে গিয়া লাগে। প্লেটে যতক্ষণ আলোক ছাপ লাগিবে ঠিক ততক্ষণ আলোকছাপ লাগাইবার জন্য তাহার কাছেই ফোকাল-প্লেন-শাটার হাজির আছে। সে তাহার কাজ শেষ করিয়া প্লেটকে আবৃত করিয়া রাখে। এতগুলি ক্রিয়া রিলীজ টিপিবা মাত্র আপনা আপনি হয়।

শাটারের ব্যবহার

পূর্ব্বে ফোটো তুলিবার সময় ক্যামেরাকে কোনো ভারি জিনিসের উপর বসাইয়া কাজ করিতে হইত—ইহা ছাড়া অন্য উপায় ছিলনা। কারণ তখন পর্য্যন্ত এক্‌স্‌পোজার দিবার জন্য লেন্সের মুখ খুলিতে বা বন্ধ করিতে ক্যাপ শাটার ব্যবহার করিতে হইত। ক্যামেরা হাতে ধরিয়া রাখিলে উহা যে পরিমাণে নড়ে তাহার কুফল নষ্ট করিয়া ছবি তুলিতে হইলে খুব বেশি করিয়াও ১/২০ সেকেণ্ডের বেশি এক্‌স্‌পোজার দেওয়া চলেনা। কিন্তু ক্যাপে এই পরিমাণ এক্‌স্‌পোজার দেওয়া যায় না। আপনা আপনি ১ সেকেণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া
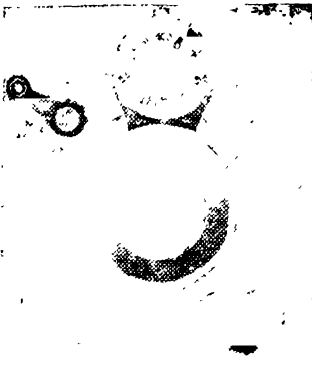
ভেরিও-শাটার

১/১০০০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত এক্‌স্‌পোজার দিবার কৌশল যে দিন হইতে আবিষ্কার হইয়াছে সেই দিন হইতে ক্যামেরা হাতে ধরিয়া ফোটো তুলিবার প্রথাও প্রচলিত হইয়াছে। ১ সেকেণ্ড হইতে ১/১০০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত এক্‌স্‌পোজার দিবার জন্য হ্যাণ্ড ক্যামেরায় ধাতুনির্ম্মিত শাটার ব্যবহৃত হয়। ইহা নানা প্রকার,—কাহারো দ্বারা সব চেয়ে কম ১/৫০, কাহারো ১/২৫০, কাহারো ১/৫০০ এইরূপ এক্‌স্‌পোজার দিবার ব্যবস্থা আছে। উপরে যে দুইটী শাটারের ছবি দেওয়া হইল তাহার
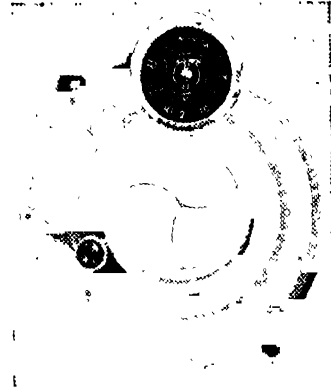
ইব্‌সর শাটার

প্রথমটির নাম 'ভেরিও' এবং দ্বিতীয়টির নাম 'ইব্‌সর'। দুইটি শাটার প্রায় একই রীতিতে প্রস্তুত। ভেরিও শাটারের উপর যে বৃত্তটি আছে তাহার উপরে T. B. 100, 50, 25 এইগুলি লেখা আছে। বৃত্তের শীর্ষে ১০০ নম্বরের উপরে একটি কাঁটা দেওয়া আছে, ঐ কাঁটাটি ১০০ এর উপর রাখিয়া শাটারের পাশে যে হাতল আছে উহা টিপিয়া দিলে ১/১০০ সেকেণ্ড এক্‌স্‌পোজার দেওয়া হয়। এইরূপে ৫০এর উপর কাঁটাটি স্থাপন করিয়া হাতল টিপিলে ১/৫০ সেকেণ্ড এক্‌স্‌পোজার হয়। T মানে টাইম অর্থাৎ এখানে ঐ কাঁটাটি রাখিয়া হাতল টিপিয়া দিলে শাটার খুলিয়াই থাকে, বন্ধ হয় না। ফোকাস্ করিবার জন্য এইরূপ খুলিয়া রাখা প্রয়োজন হয়। বন্ধ করিতে হইলে দ্বিতীয়বার টিপিয়া দিতে হয়। Bএর উপরে কাঁটা রাখিয়া যতক্ষণ হাতল টিপিয়া যায় ততক্ষণ লেন্স-মুখ খোলা থাকে, ছাড়িয়া দিলেই বন্ধ হইয়া যায়। এক সেকেণ্ডের বেশি এক্‌স্‌পোজার দিতে হইলে কাঁটা B এর উপর রাখিতে হয়। ইব্‌সর শাটারে ১ সেকেণ্ড হইতে ১/২৫০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত আছে। এই শাটারে ভেরিওর মত কাঁটা সরাইতে হয় না। যে বৃত্তের উপর নম্বর লেখা আছে তাহার পিছনে একটি চাকতি আছে। উহাতে একটি চিহ্ন দেওয়া আছে। উপরের বৃত্তটি ঘুরাইয়া

যত এক্‌স্‌পোজার দিতে হইবে তত সংখ্যা ঐ চিহ্নের উপর রাখিয়া হাতল টিপিয়া দিলে তত এক্‌স্‌পোজার দেওয়া হইবে।

কম্পুর শাটার ধাতুনির্ম্মিত শাটারগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নূতন কম্পুর শাটারে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে নিজের ফোটো নিজে তোলা যাইবে। ২৫ সংখ্যার পিছনে যে দাঁতের মত চিহ্ন দেখা যাইতেছে ঐ চিহ্নের উপরে শাটারের বাহিরের বৃত্তটি ঘুরাইয়া যত এক্‌স্‌পোজার দিতে

নূতন কম্পুর শাটার

হইবে তত সংখ্যা স্থাপন করিয়া উপরের তীর ফলক চিহ্নিত হাতলটি ২৫০ সংখ্যার সঙ্গে যে কাঁটাটি আছে উহার সঙ্গে আটকাইয়া দিতে হয়। তারপর নীচের তীর ফলক চিহ্নিত হাতলটি টিপিয়া দিলে ২০ সেকেণ্ড অতিবাহিত হইবার পর এক্‌স্‌পোজার হয়। হাতলটি টিপিয়া কুড়ি সেকেণ্ডের মধ্যে নিজেকে ক্যামেরার সামনে স্থাপন করিতে কোনো অসুবিধা হয় না। গ্রুপ ফোটো তুলিবার সময় ফোকাস্‌ করিয়া নিজের জন্য একটি আসন খালি রাখিয়া দিতে হয় এবং সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ করিয়া আসনে আসিয়া নিরাপদে বসা যায়। এই সুবিধার জন্য নূতন কম্পুর শাটার খুব জনপ্রিয় হইয়াছে।

রিফ্লেক্স ক্যামেরা, প্রেস্‌-ক্যামেরা প্রভৃতিতে দ্রুত এবং কম এক্‌স্‌পোজার দিবার জন্য যে ফোকাল প্লেন শাটার ব্যবহৃত হয় তাহা কালো পর্দ্দায় নির্ম্মিত। ইহা প্লেটের খুব কাছে থাকে। এই পর্দ্দার অ্যাপার্চার আছে। এক্‌স্‌পোজার যত দ্রুত এবং কম দিবার দরকার হইবে শাটারের অ্যাপার্চার ততই কমাইতে হইবে। দ্রুত এবং কম এক্‌স্‌পোজারে লেন্সের অ্যাপার্চার বা প্রশস্ততা কিন্তু বাড়াইতে হইবে। সাব্‌জেক্ট যত দ্রুত গতি বিশিষ্ট হইবে সেই গতির ছাপ প্লেটে লাগাইতে হইতে শাটারের স্লিট বা অ্যাপার্চার তত কমাইয়া লইতে হয়। এই পর্দ্দার শাটারে অনেকগুলি দরজা বা opening কাটা থাকে। ইহার মাপ প্লেটের মাপ যত তত বড় হইতে $\frac{1}{8}$ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সবচেয়ে ছোট দরজাটা যদি সবচেয়ে বেগে প্লেটের একধার হইতে অন্যধার পর্য্যন্ত চলিয়া যায় তাহা হইলে $\frac{1}{1000}$ সেকেণ্ড এক্‌স্‌পোজার দিবার কাজ হয়।

ধাতু নির্ম্মিত শাটার লেন্সের মাঝখানে থাকে। অনেক ক্যামেরায় আবার এই দুই রকম শাটারই থাকে। ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরায় যে কালো পর্দ্দার শাটার ব্যবহৃত হয় তাহা লেন্সের পশ্চাতে অথবা সম্মুখে থাকে। ইহার নাম রোলার ব্লাইণ্ড শাটার। অতিরিক্ত মূল্য দিয়া এই শাটার না কিনিয়া অনেকে স্ট্যাণ্ড ক্যামেরায় এখনো শুদ্ধমাত্র ক্যাপ শাটারই ব্যবহার করেন। রোলার-ব্লাইণ্ড শাটারে ধাতু নির্ম্মিত শাটারের মতই কম এক্‌স্‌ পোজার দেওয়া যায়, কিন্তু এই শাটার সকল সময়ে নির্ভর যোগ্য নহে এ জন্য বড় ভুগিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

থ্রিলার

—শ্রীসুনীলকুমার ধর

সাহিত্য ও তথাকথিত অসাহিত্যের মাঝে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা-রেখা এঁকে দেওয়া হয় নি বা দেখে জোর কোরে বলা চলে এ সাহিত্য এবং ও সাহিত্য নয় অর্থাৎ অসাহিত্য। সাহিত্যের সংস্কার নেই এ কথা বলা চলে এবং আরো বলা চলে তাকে সীমাবদ্ধ না করাই ভাল। কিন্তু সাহিত্যের কথা থাক্। 'সাহিত্য' বোলতে বাধে অথচ জোর কোরে 'অসাহিত্য' বলা চলে না, এমনি 'সাহিত্য' বিষয়ে দু একটি কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য।

নিছক সাহিত্য ছাড়া মাঝে মাঝে আমরা এমন কতকগুলো বিদেশী বই হাতে পাই যা পড়তে আরম্ভ কোরলে নিজের সমস্ত চিন্তা ও বিচার-শক্তির আড়ালে মন এমন অভিভূত হ'য়ে পড়ে যে বইখানা শেষ না কোরে উঠ্‌তে পারি নে; অথচ অতখানি সময় ও একাগ্রতা দিয়ে যে বই পড়লাম, মনের প্রগাঢ় তৃপ্তি ছাড়া চিন্তাশক্তির কোন খোরাকই তা থেকে পাই নে, এমন কি দুদিনেই বইখানার অনেকখানি ভুলে যেতে হয়। এ শ্রেণীর বইকে ও দেশে বলে থ্রিলার। একজন বৈজ্ঞানিককে দুজন উদীয়মান লেখকের কবিতার বই ও থ্রিলার প'ড়তে দিয়ে দেখা গেছে—কবিতার বইএর মলাট উল্টে কবির নাম দেখেই বইখানা বন্ধ কোরে রাখলেন এবং থ্রিলারের নাম না দেখে তিনি এক একখানা কোরে পাতা উল্টে যেতে লাগলেন। এই রকমে দুচার পাতা উল্টাবার পর কোন এক পাতার এমন দুটি ছোট কথায় তিনি আকৃষ্ট হ'য়ে গেলেন যে সেখানে বসে বইখানা আগাগোড়া পড়ে ফেল্লেন—অবশ্য এমনি থ্রিলারের পড়া শেষ হওয়ার পর তাঁরই মুখে শোনা গেল—'একেবারে আষাঢ়ে'! অধিকাংশ পাঠককেই প্রায়ই বই শেষ কোরে বোলতে শোনা যায়—'সময়টা একেবারে বাজে গেল'! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বইখানি পড়বার মাঝামাঝি এ কথা একবারও মনে পড়ে না।

সত্যিকারের ভাল থ্রিলার হাতের কাছে পেয়ে সময়াভাবের দোহাই দিয়ে উপেক্ষা করতে আজ পর্যান্ত খুব কম লোককেই দেখা গেছে। এই যে মানুষের ইচ্ছা-বিরুদ্ধে নেশা, এর একমাত্র এবং প্রধান কারণ হ'চ্ছে যে, প্রত্যেক মানুষই কিছু সাহিত্যিক নয়, সাহিত্য-রসিকও নয়—মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণও বোঝে না, কিন্তু মানুষ মাত্রেরই thrilled হবার মত instinct ও আগ্রহ অল্প-বিস্তর আছেই। এ মানুষের জন্মগত। বৈজ্ঞানিক মতে যাদের থ্রিল্ ভাল লাগে না, তারা হয় "perverted" না হয় "emasculated in its true sense," এই জন্যে সত্যিকার থ্রিল সৃষ্টি করবার মত সাহস ও ক্ষমতা মেয়েদের না থাক্‌লেও অনেক জায়গায় দেখা গেছে অন্য গল্পের চেয়ে (এমন কি প্রেমেরও) তারা এই সব গল্প পড়বার ও শোনবার জন্য বেশী আগ্রহান্বিতা "ভয়ে ভয়ে"ও।

মনের আকাশে যতই ঝড় উঠুক না কেন, বেদনায় কাতর হ'য়ে যে শয্যাশায়ী—শোকে, দুঃখে মর্ম্মাহত হ'য়ে যে লোক-সমাজের দৃষ্টির আড়ালে আত্মগোপন কোরে আছে—তার পক্ষে আত্মবিস্মৃতির এমন সহজ উপায় আর নেই! থ্রিলারের নায়ক-নায়িকা, ঘটনাস্থল এবং ঘটনার ধারা পাঠককে এমন অভিভূত কোরে ফেলে যে বই শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাদের ছাড়িয়ে অন্য কোন বিষয়ে চিন্তা করা অসম্ভব। আমি অবশ্য এ কথা বলিনে যে সত্যিকারের ভাল ভাল বই ফেলে থ্রিলারই পড়তে হবে। ভারী ভারী বই-এর বড় বড় কথায় মন যখন ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে, কল্পনার পাখা যখন ক্লান্ত হ'য়ে এতটুকু আশ্রয়ের জন্যে ব্যাকুল হয় কিম্বা সারাদিনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ক্লান্তিতে সর্ব্ব দেহ মন যখন অবসন্ন তখন, রোগশয্যায় এবং নিদ্রাহীন রাত্রে কিংবা সঙ্গীহীন ট্রেণের পথে থ্রিলারের মত এমন সাথী আর নেই! আর এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো অভিশাপই হ'চ্ছে মানুষের মনে শান্তি নেই!

কাব্য, সাহিত্য ও উপন্যাসের অভাব আজ হয়ত আমাদের খুব বেশী নয়, কিন্তু বাংলাভাষায় থ্রিলার নেই বল্লেও হয়। এ দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন বিদেশী বই এবং অনুবাদ, অনুকরণ ও অনুসরণ কোরে কয়েকখানা বই লিখেছেন বটে কিন্তু সেগুলোকে ঠিক থ্রিলার বলা চলে না, তা ছাড়া বই হিসাবে সেগুলির দাম এত বেশী যে সে দামে সত্যিকারের ভালো বই কেনা যায় এবং একথা স্বীকার কোরতেই হবে ভাল বইএর দামে থ্রিলার কিনে পড়া খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেবল এই জন্যেই আমাদের দেশে থ্রিলার উপযুক্ত সমাদর পেল না। অথচ ওদের দেশে প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত লোকেরই খানিকটা সময় থ্রিলার পাঠের জন্যে নির্দ্দিষ্ট করা আছে।

থ্রিলারের শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যাবে মোটামুটিভাবে থ্রিলার পাঁচ রকমের—

থ্রিলার

১। রহস্যজনক হত্যা-কাহিনী
   - (ক) হত্যামূলক কাহিনী
   - (খ) রহস্যপূর্ণ কাহিনী (হত্যা এখানে গৌণ)

২। রোমাঞ্চকর (অসম্ভব) অভিযানের গল্প।

৩। সম্ভবপর ও সত্যিকার অভিযানের গল্প।

৪। হত্যাকাহিনী।

৫। ডাকাতি ও যুদ্ধসংক্রান্ত রোমাঞ্চকর কাহিনী।

রহস্যজনক হত্যাকাহিনী

(ক) কোন একটি রহস্যজনক হত্যাকাহিনীকে প্লট কোরে যে-সব বই লেখা তাদের এই শ্রেণীতে ফেলা যায়। এ শ্রেণীর উপন্যাসে হত্যা-রহস্যোদ্ঘাটনের কোন চেষ্টা নেই। গল্পের খাতিরে হত্যার উল্লেখ করা হয় মাত্র। Anthony Birkely, S. S. Van Dine ও G. D. Sternএর শেষ বয়সের উপন্যাস এই শ্রেণীর।

(খ) ভাল থ্রিলারের অধিকাংশকেই এই শ্রেণীভুক্ত ধরা যায়। এ শ্রেণীর উপন্যাসে সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটি রহস্যের জাল বোনা। অনেক সময় সত্যিকারের কোন খুন, ডিটেকটিভ্ বা রোমাঞ্চকর কোন ঘটনাই নেই অথচ উপন্যাসের নায়ক নায়িকাকে ঘিরে একটি মধুর রহস্য আছে। The Cask নামে প্রসিদ্ধ থ্রিলার খানিকে এই শ্রেণীর বলা চলে। রচনানৈপুণ্যে, ঘটনা-সংস্থাপনের কৌশলে একে অদ্বিতীয় বল্লেও বেশী বলা হয় না R. L. Stevensonএর The Strange Case of Dr. Jekyl and Mr. Hyde বিশ্ব-সাহিত্যে একখানি নাম-করা বই। বইখানির ব্যঞ্জনা সৎ-সাহিত্যের স্তরের কিন্তু লিখনরীতিতে এখানি সত্যিকার 'থ্রিলার'। কিছুদিন আগে 'উপাসনা'র পৃষ্ঠায় এই বইখানির বাংলা রূপান্তর বেরিয়েছিল। বাংলা-সাহিত্যকে এ শ্রেণীর পুস্তক ঋদ্ধ করে।

রোমাঞ্চকর (অসম্ভব) অভিযানের গল্প

সাধারণতঃ ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্যে যে-সব গল্প লেখা হয় সে গুলো এ শ্রেণীর। এ শ্রেণীর গল্পের নায়ক-নায়িকারা সত্যিকারের নায়ক-নায়িকা, অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার যত প্রকার গুণ থাকার দরকার তা সবই এদের আছে এবং কোন বিষয়ে এবং কারও কাছে পরাজিত হয় না। অর্থাৎ এদের কাছে অসম্ভব ব'লে কোন জিনিষ নেই। যেমন, গল্পের নায়কের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে সুন্দরী বন্দিনী নায়িকাকে উদ্ধার করা এবং এর জন্যে নায়ককে অনেক বিপদের সম্মুখীন হ'তে হলেও কোন বাধা-বিপদই তার পথরোধ কোরতে পারবে না। কোন না কোন অদ্ভুত উপায়ে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম কোরে নায়িকা বন্দিনীকে নায়ক উদ্ধার কোরবেই। এ শ্রেণীর গল্পে সাধারণতঃ এমনি সব ঘটনা সন্নিবেশ করা হয় যা সাধারণ মানুষের ক্ষমতাতীত। Sapper এ শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

সম্ভবপর ও সত্যিকার অভিযানের গল্প

এ শ্রেণীর গল্পে সত্যিকার ও সম্ভবপর অভিযানের কথা লেখা হয়—যেমন মেরু ও মরু-অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী।

হত্যাকাহিনী

হত্যা ও হত্যাকারীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে এই শ্রেণীর গল্প লেখা হয়। হত্যাকারী কেন হত্যা কোরলে, কি কোরে হত্যা কোরলে—ঐ হত্যাকারীর পূর্ব্ব কার্য্যকলাপে এমন কোন লক্ষণ দেখা গেছে কিনা যাতে তাকে born murderer বলে বিশ্বাস করা চলে। এ ধরণের গল্পে হত্যা নিয়ে কোন রহস্য থাকেনা—রহস্য হত্যাকারীকে নিয়ে। এ শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই হ'চ্ছে—Francois Ile'sএর Malice Aforethought, এ বইখানিতে ডষ্টয়েভিস্কির Crime and Punishmentএর কথা মনে করিয়ে দেয়।

ডাকাতি ও যুদ্ধসংক্রান্ত রোমাঞ্চকর কাহিনী

প্রকাশ্য ডাকাতি ও যুদ্ধসংক্রান্ত ঘটনা নিয়ে যে-সব বই লেখা হয় তাদের এই শ্রেণীভুক্ত করা চলে। একের বেদনায় অপরে ব্যথা পায়, একের দুঃখে অন্যে মর্ম্মাহত হ'লেও পৃথিবীতে অকারণ বীভৎস হত্যাকাহিনীর পাঠক-পাঠিকার সংখ্যাই বেশী! এই সব কাহিনীর দু একটি নায়কনায়িকা চিরদিনের জন্যে আমাদের মনের আকাশে ধূমকেতুর মত বিরাজ করে, যেমন—On the Spotএর নায়ক Tony Perelli, যত বড়ো অপরাধীই সে হোক্ না তাকে আমরা ভুলতে পারব না।

এই পাঁচরকম ছাড়া আরও অনেক প্রকার থ্রিলার আছে মূলতঃ তারা এই পাঁচশ্রেণীর কোন একটিতে পড়েই।

অনেকে বলেন সভ্যতার অধিকতর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে থ্রিলারের প্রয়োজন কোমবে একথা আংশিকভাবে সত্য হ'লেও মানুষ যতদিন না একেবারে পুরো যান্ত্রিক হ'য়ে উঠ্ছে ততদিন কাব্য ও নাট্য-সাহিত্যের মত থ্রিলারের আদর থাকবেই।

যোগ-বিয়োগ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এগার

ইহার পর হইতে সে বিপিনকে এড়াইয়া চলিতে সুরু করিল, শুধু বিপিনকে কেন, গ্রামের প্রায় সকলকেই এড়াইয়া চলিতে হইল—

কারণ, প্রবৃত্তির মুখের সংযম বা সঙ্কোচের বাঁধ একবার ভাঙ্গিলে ত আর রক্ষা নাই, মানুষ তখন আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। শ্রীমন্ত একে একে সকলেরই কাছে এমনি করিয়া হাত পাতিল, কাহারও কাছে দুটো টাকা, একটা টাকা, কাহারও কাছে বা একটা সিকি, পাঁচসের চাল —এমনি করিয়া ক্ষুদ্রতারও আর সীমা-পরিসীমা রহিল না।

গিরির লাঞ্ছনারও অন্ত নাই। শ্রীমন্ত ত বাড়ী হইতে পলাইয়া বাঁচে, কিন্তু বন্দিনী নারী ঘরে বসিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত তাগাদার কটুবাণী নীরবে সহিয়া যায়, আবার শূন্য হস্তে পরের দুয়ারে দুই মুঠা চালের জন্য যাইতে হয়—অন্তরের দাহ অন্তরে লুকাইয়া কপট তোষামোদের হাসি মুখে মাখিয়া;—গিরি ভাবে, হায়, এত অপমান সে সয় কি করিয়া? সে যেমন হইয়াছে. সত্যই কি মানুষ এমন হইতে পারে?

শুধু সান্ত্বনা তাহার মেলে যখন সে মনোমন্দিরে আপনার একান্ত কামনার শিশু-দেবতাটীকে অর্চ্চনা করে,—এখনও সে আশা ছাড়ে নাই, এখনও তাহার আশা, তাহার সকল শূন্যতা পূর্ণ করিয়া বুক জুড়িয়া সে আসিবে, সেই তাহার ভবিষ্যতের ভরসা—সেই তাহার দুঃখ ঘুচাইবে,—আত্ম-ভোলা নির্জ্জন মুহূর্ত্তে আশা-বিভোরা নারী-কণ্ঠ গুণ গুণ করিয়া গুঞ্জনও করিয়া উঠে—

> এই যে আমার ভাঙ্গা বাড়ী, এই আ-গাছার বন,
> আমার সোণার যাদু এসে হেথা রচবে সিংহাসন!

আত্মস্থ হইয়া যদি কখনও এ গান তাহার নিজের কানেই পশিত, তবে হয়ত নিজেই সে বিদ্রূপের হাসি না হাসিয়া থাকিতে পারিত না।

এমনি করিয়াই দিন যায়।

শ্রীমন্ত খাবার সময় চুপি চুপি আসিয়া ঢুকে, খাইয়া-দাইয়া আবার সরিয়া পড়ে, সে আড্ডা গাড়িয়াছে গিয়া বাগ্দী-পাড়ায়।

দারিদ্র্যের লজ্জায় সমাজ-বিচ্যুতের মত সে ওদের দলে গিয়া ভিড়িল, ওদের লাগিয়াছিল ভাল,—ওরা লজ্জা দেয় না, লজ্জা পায় না, ধার লওয়াই ওদের স্বভাব, শোধ দেওয়া অভ্যাস নাই, সেটাও স্বভাব, সে শক্তিও নাই, তুমি পাইবে পাইবে,—তাহার জন্য গালি দাও সে সহ্য করিবার শক্তি ওদের আছে, শুধু সহ্য করা নয়, হাসিতে হাসিতে সহ্য করিতে পারে, নির্যাতন তাও সহ্য করিতে পারে; এরাই বুঝি সত্য দারিদ্র্যকে ভালবাসে। শ্রীমন্ত ইহাদেরই মধ্যে গিয়া ইহাদের পানে চাহিয়া থাকিত, অন্তরে অন্তরে কিন্তু সে ইহাদিগকে ঘৃণা করিত। সে দারিদ্র্যকে ভালবাসিতে পারে নাই—দারিদ্র্যকে সে ঘৃণা করে।

সেদিন শ্রীমন্ত খাইবার জন্য সবে চুপে চুপে গিয়া বাড়ীতে পা দিয়াছে; এমন সময় এ দুয়ার হইতে বিপিন হাঁকিল—

শ্রীমন্ত,—শ্রীমন্ত-!

শ্রীমন্তের অঙ্গ হিম হইয়া গেল, ঘরের দুয়ারে তালা বন্ধ, ঘরে ঢুকিয়া যে খিল দিবে তাহার উপায় নাই,—সমস্ত কাপুরুষ ক্রোধ গিয়া পড়িল তাহার গিরির উপর, সে থাকিলে ত এ অবস্থায় তাহাকে পড়িতে হইত না!

রোজ রোজ, তাহার ষষ্ঠীতলা যাওয়া আজ ঘুচাইতে হইবে; ছেলের অভাবে ত রাজ্য-পাট ভাসিয়া গেল,—তাই রাজকুমারের কামনায় রাণীর ষষ্ঠীতলায় পূজা,—গলায় বোঝাখানেক মাদুলী—!

কথাটার মধ্যে আবার একটু স্বপ্ন-কল্পনার খেলা ছিল;—

পূজার সামর্থ্য গিরির ছিল না, রাস্তায় বাহির হইবার মত প্রকৃতি বা সাহসও ছিল না, সে মনোমন্দিরেই শিশু-দেবতার অর্চ্চনা করিত আর ওই গলায় ধারণ-করা মাদুলীগুলির ধোয়া জল খাইয়াই ব্রত পালন করিত।

কিন্তু নারী-বক্ষে যে উগ্র গোপন ক্ষুধা অহরহ জাগে, সারা মস্তিকে সে ক্ষুধাতৃপ্তির কল্পনা নিত্য কত আকাশ-কুসুম

রচনা করে। সেই কখন তন্দ্রাঘোরে বঙ্কিতা নাম্নীটীর সহিত পরিহাস করিয়া গিয়াছিল।

সেদিন্ গিরি স্বপ্ন দেখিয়াছে—সে যেন ষষ্ঠীতলা পূজা করিতে গিয়াছে, কোথা হইতে একটী দামাল শিশু, মুখে অজস্র লালা গড়াইয়াছে, গায়ে ধূলা—হামা দিয়া আসিয়া ওর আঁচল ধরিয়া খিল্ খিল্ হাসিয়া কহিল—"মা—ম্—মা—ম্" গিরি ব্যাকুল আগ্রহে হাত পাতিয়া তাহাকে ডাকিল—

ছেলেটীর কি থল্‌থল্ হাসি;—সেও বাহু বাড়াইয়া গিরির বুকে ধরা দিল; তাহাকে বুকে ধরিতেই গিরির বুক যেন জুড়াইয়া গেল—ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখে শূন্য শয্যায় সে মাথার বালিশটীকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে।

সেই অবধি সে নিত্য ষষ্ঠীতলা যায়,—নিজের হাতে পোঁতা রক্তকরবী গাছটীর ফুল, কাজল-দীঘির একটু জল, দুটীখানি আতপ চাল – তার উপর এক ফোঁটা গুড়! চাল কয়টী সে বামুন-বাড়ীতে সংগ্রহ করিয়াছে - পোয়াখানেক আতপচাল, তাহাতেই আজও চলিয়াছে, আর খানিকটা গুড় তাও ভিক্ষায় লব্ধ।

গিরি সেই ষষ্ঠীতলা গিয়াছিল।

কিন্তু উত্তর না পাইয়া বিপিন আজ ফিরিয়া গেল না, সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া শ্রীমন্তকে দেখিয়া কহিল—

"এই যে, আচ্ছা জয়োচ্চোর ত বে তুই শ্রীমন্ত!—"

শ্রীমন্ত উত্তর দিতে পারিল না; আর কি-ই বা উত্তর দিবে?

বিপিনের জিহ্বা দিয়া যে কটু বিস ঝরিল, বিষধরেরও বোধ করি তত বিষ সঞ্চিত থাকে না—

সে কহিল—"কথা ক'স্ না যে?"

শ্রীমন্তের নীরব সহিষ্ণুতাও তাহার সহ্য হয় না।

শ্রীমন্ত অতি কষ্টে কহিল—"কি বলব দাদা—"

—"টাকা দিবি কিনা?"

—"দোব।"

—"দে, তবে দে, এখুনি দে।"

—"এখুনি কোথায় পাব?"

বিপিন কহিল—"কোথায় পাবি তা আমি কি জানি রে শালা—ঘটী বাটী বেচ্, না থাকে পরিবার বাঁধা দে—"

এক মুহূর্ত্তে শ্রীমন্তের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। মানুষ একেবারে মরিয়া যায় না, ইজ্জতের উপর ঘা পড়িলে মানুষের তা সয় না—এখানে সে মরিয়া হইয়া উঠে, এটা পশুরও আছে—শ্রীমন্ত ত' মানুষ! নত মাথাটা শ্রীমন্তের এক মুহূর্ত্তে খাড়া হইয়া উঠিল, শক্তির দন্তে যে হাঁক সে দিল তাহাতেই বিপিনের হইয়া গেল; শ্রীমন্তের দেহের শক্তির কথাও তাহার না-জানা নয়। তাহার পা দুইটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া মুখ চোখ কেমন হইয়া গেল, বেচারী এক পা, এক পা করিয়া পিছাইয়া কোন ক্রমে শ্রীমন্তের দরজাটা পার হইয়া রাস্তার উপর পড়িয়াই আপন ঘরমুখে দৌড় মারিল, আপন বাড়ীর দুয়ারে গিয়া তবে সে পিছন ফিরিয়া দেখিল, শ্রীমন্ত কত দূরে?

সেই খানেই দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কি কতকগুলা বলিয়া তবে সে ঘর ঢুকিল।

শ্রীমন্ত খানিকটা হাসিল, তবুও মনটা কেমন করিতেছিল। সামান্য খানিকটা অস্বস্তি, এত বড় কথাটা বলিয়া গেল। বসিয়া থাকিতে থাকিতেই আবার একটা পরিবর্ত্তন দরিদ্রের মনে ঘটিয়া যায়,—শ্রীমন্ত ধীরে ধীরে বিপিনের দুয়ারে গিয়া উঠিল, সেই নত ভঙ্গী, বিনীত ভাব; যেন শৃঙ্খলিত একটা পশু আত্মবিস্মৃত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য হুঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শৃঙ্খলের নির্ম্মম নিস্পেষণে স্নায়ু, তন্ত্রী, অস্থি, চর্ম্ম, মাংস টন্ টন্ করিয়া উঠায় দারুণ যাতনায় কুণ্ডলী পাকাইয়া আবার পদলেহন করিতে জিভ বাহির করিয়া হা হা করিতেছে।

বিপিনের দুয়ারে গিয়া বিনীত কণ্ঠে সে হাঁকিল—"বিপিন দাদা, বিপিন দাদা—"

বিপিন বন্ধ ঘরের খোলা জানালাটা দিয়া শাসাইল—"কাল ফৌজদারীতে নালিশ করব আমি, চিটিং কেস—"

শ্রীমন্ত কাকুতিতে কদর্য্য তোষামোদের হাসি হাসিয়া কহিল,—"রাগ করোনা দাদা, তুমি রাগ করলে, পায়ে ধরচি দাদা।"

বিপিন চুপ করিয়া থাকে, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের দুর্দ্দান্ত শত্রুর পদলেহন মন্দ ঠেকেনা, বেশ মুখরোচকই বোধ হয়।

বিপিনের নীরবতায় শ্রীমন্ত সাহস পাইয়া একটু মুখর হইয়া অনর্গল চাটুবাক্য উদ্গার করিয়া যায়; বিপিনও আর প্রসন্ন না হইয়া পারেনা, সে দরজাটা খুলিয়া কহিল—"আয় ভেতরে এসে বোস, অনেকদিন একসঙ্গে খাই নাই, চান করবার আগে—নে তৈরী কর।"

সে গাঁজার সরঞ্জাম পাড়িয়া আনিল। শ্রীমন্ত গাঁজা টিপিতে টিপিতে বলিল—"তোমাদের সেই লাল বলদটা মনে পড়ে বিপিন দা, ওঃ অমন বলদ গাঁয়ে কারু ছিলনা বাপু।"

—"তার চেয়েও ভাল বলদ করেছি আমি এখন একটা সাদা আর একটা কাল।"

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্ত কহিল—"বটে বটে, সেদিন দেখলাম মাঠে চরছিল, তা ভাবলাম ভিন্‌গাঁয়ের কারও, তা সে গরু তোমার? এ তল্লাটে অমনটি কারও নেই।

বিপিন গাঁজা খাইতে খাইতে কহিল—"তুই আসিস না কেন? এত খেতেই হয়, আমার কাছে এলেই হয়।"

শ্রীমন্ত কেমন করিয়া বিপিনকে আপ্যায়িত করিবে খুঁজিয়াই পায় না, শেষে কহিল—"আচ্ছা তুমি আমার বাড়ী ঢোক না কেন? বার থেকেই ছি-মস্তে বলে চলে এস। বেরিয়ে আসতে আসতে দেখি চ'লে গিয়েছ। ও, বৌ বুঝি বেরোয় না, বৌটা ভারী পাজী, দাদা বল্লেই বুঝি দাদা হয়, বড়লোক তুমি, যেয়োত তুমি কেমন না বেরোয় দেখব আমি। বলে—গাঁসুবাদে মুচীমিন্সে মামা; যেয়োত, যেয়োত দাদা আমার দিব্যি।"

শ্রীমন্ত চলিয়া যাইতেছিল, বিপিন কহিল—"ওরে শ্রীমন্ত দাঁড়া, একটা লাউ নিয়ে যা, মেলা লাউ হয়েছে আমার।"

শ্রীমন্ত দাঁড়াইয়া বিপিনের সুন্দর পরিপাটী ঘর-দুয়ারের পানে চাহিয়া দেখে। চারিদিকে শ্রী যেন ঝলমল করিতেছে, এদিকে কয়টা ধানের গোলা ওদিকে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গী শান্তদৃষ্টি কয়টী গাভী; শ্রীমন্তের বুক দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ঝরিয়া পড়ে। বিপিন তাহাকে শুধু একটা লাউ নয় আরও কতকগুলা তরকারী দিল।

যাইতে যাইতে আবার নিজে ফিরিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "বলতে লজ্জা হচ্ছে দাদা, আট আনা পয়সা দিতে যদি আর শলি খানেক চাল,—"

বিপিন কহিল—"বোস্।"

* * *

ঘরে ফিরিয়া শ্রীমন্ত পয়সা চাল তরকারী নাড়িতে নাড়িতে বেশ মৃদু মৃদু হাসিল, ক্রূর নিষ্ঠুর, হিম-শীতল হাসি। বোধ করি অবস্থাপন্ন বাল্যবন্ধু বিপিনকে বঞ্চনা করিয়াই এ হাসিটুকু ও পাইয়াছে; ইহারই মধ্যে দরিদ্র শ্রীমন্ত ধনীকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে, ধনকে ভালবাসিয়াছে।

এই সময় ও দরজা দিয়া প্রবেশ করিল গিরি। গিরির উপর তখন আর তার ক্রোধ ছিলনা, তাহার চকিত দৃষ্টি পড়িল আপন শ্রীহীন ঘরের উপর, ঘরখানায় মূর্ত্তিমন্ত দৈন্য যেন বাসা গড়িয়াছে, সর্ব্ব অঙ্গ তাহার ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিল।

গিরি ঘরে ঢুকিয়াই স্বামীকে দেখিয়াই কহিল—"পুরুষ জাতের মুখে ঝাঁটা, ঘেন্না ধরে গেল, টাকার জন্যে এরা না পারে কি, মা গো মা!"

শ্রীমন্ত কোন উত্তর করিল না, শুধু গিরির মুখপানে চাহিল,—

গিরি বলিয়াই গেল,—"শুধু আমাদের হরিলালের দোষ কি, ওপাড়ার হরিশ পাল গো, গিয়েছিলাম ষষ্ঠীতলা, শুনে এলাম মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে একজনা কুষ্ঠব্যাধি হয়েছে তার সঙ্গে, টাকা পাবে নাকি অনেক।"

শ্রীমন্ত চকিত হইয়া কহে—"কত টাকা পাচ্ছে?"—

"আড়াই শো টাকা।"

শ্রীমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

গিরি কহিল—"কলির চারপো পুরো হ'ল।" বলিয়া ষষ্ঠীর প্রসাদ একটা আতপকণা তুলিতে ব্যস্ত হইল।

সহসা শ্রীমন্ত কটুকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"যেমন কপাল আমার বিয়ে করলাম তা বাঁজা, একটা মেয়ে থাকলে ত আজ এ আড়াই শো টাকা ঘরে আসত।"

গিরির নখের কোনে তোলা আতপকণাটী খসিয়া পড়িয়া গেল, সে বজ্রাহতার মত স্বামীর মুখপানে চাহিল, সহজ স্বাভাবিক মুখভঙ্গী স্বামীর, কোথাও এতটুকু একটা রেখার বিকৃতির মাঝে প্রচ্ছন্ন ব্যথার কোন রেশ নাই। অতি সরল ভাবেই সহজ কথাটী সে কহিয়াছে।

খানিকটা গিরির কোন বাক্য সরিল না, দেহখানা নড়িল না, সে ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। বহুক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তাহার সম্বিত ফিরিয়া আসিতেই সে কোন কথা না কহিয়া আপন গলার মাদুলীর গোছাটা পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, সদ্য পূজা-করা ষষ্ঠীর কৌটা-

বাটা' নির্মাল্য, সব লইয়া খিড়কীর ঘাটে বাহির হইয়া গেল।

বার

এতখানি বিয়োগান্ত করিয়া যদি দুঃখী দুটী নর-নারীর জীবনের জমা-খরচের পাতার শেষে সেই অদৃশ্য হিসাবী দাঁড়ি টানিয়া হিসাবটা শেষ করিয়া দিতেন—তবে বোধ হয় ছিল ভাল। কিন্তু এই খানেই শেষ হইল না।

গিরিকেও জীবনের জের টানিতে হইল,—শ্রীমন্তকেও—।

শ্রীমন্ত খাইয়া দাইয়া সন্ধ্যায় ভাবিতেছিল মামলার কথা। কাল মামলার শেষ দিন, বিপিন আসিয়া ডাকিল—"শ্রীমন্ত!"

শ্রীমন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ডাকিল—"এস, এস,—দাদা এস।"

বিপিন আসিল—হাতে এক ঠোঙা ভাল খাবার।

এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে চক্ষুর অগোচরে একটা ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে—

ঘটনাটা ঘটিয়াছিল দু' পহর বেলাতেই, গিরি যখন ষষ্ঠীর কৌটা-বাটা লইয়া খিড়কীর ঘাটে গেল তখনই, আর ঘটিল অই ঘাটেই, ছোট এঁদো ডোবা, ওখানে বাসনই মাজা হয়, মেয়েরা স্নান কেহ বড় করে না; গিরি ঘাটে গিয়াই হাতের সেই ছেঁড়া মাদুলীগুলি আর ষষ্ঠীর কৌটা-বাটা মুহূর্ত্ত দ্বিধা না করিয়া জলে ফেলিয়া দিল। শ্রীমন্তের ওই কথার পর বোধ করি কোন মাতাই এ ছাড়া আর কিছু করিতে পারিত না—গিরিও পারিল না—।

কয় ফোঁটা জলও সেথ দিয়া ওই ডোবার জলে ঝরিয়া পড়িল। গিরি হাত-পা ধুইয়া ফিরিতেছিল, কিন্তু মনে হইল যদি দেবতার কোন প্রসাদ তাহার এই অভাগা অঙ্গে কোথাও আজ লাগিয়া থাকে, যদি তাহারই জন্য কোন ভাগ্যহীন শিশু-দেবতাকে তাহার মন্দিরে আসিতে হয়,—আর এই কামনা, কামনা করিতে হয় যেমন স্নান করিয়া—ত্যাগও হয় ত করিতে হয় তেমনি স্নান করিয়া—; এমনি একটা বিপর্য্যস্ত বিহ্বল মন লইয়া সে ওই ডোবার জলে নামিয়া পড়িল। গায়ের কাপড় খানা পূর্ণ ভাবে মুক্ত করিয়া, ওই ক্লেদাক্ত জলে দেহটা সিক্ত করিয়া, সন্তান-বিয়োগের অশুচি অঙ্গে মাখিয়াই যেন সে ঘরে ফিরিল।

ডোবাটার চারি পাশে ঘন অতি নিবিড় বাঁশের ঝাড়, তাহারই ফাঁকে ফাঁকে ঘাটগুলি,—ঘাটের গোড়ায় নামিলে বড় কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না, কিন্তু অন্ধকার বাঁশের ঝাড়ের ফাঁক দিয়া ডোবাটার মধ্যস্থল বেশ দেখা যায়। শ্রীমন্তের ঘাটের পাশেই বিপিনের ঘাট; বিপিন নামিয়াছিল ঘাটে; আর গিরি আবক্ষ জলের গভীরতায় ডোবাটার প্রায় মধ্যস্থলে অটুট যৌবন-সম্ভার মুক্ত করিয়া তখন সেই মুক্তি-কামনায় পঙ্কস্নান করিতেছিল।

বিপিনের চোখে পড়িল সেই রূপ এলানো দীর্ঘ কেশ-ভার, মাজা রংএ নিটোল পরিপূর্ণ যৌবন সুসন্নিবিষ্ট সুদৃঢ় প্রতি অঙ্গটী, পুরুষকে চঞ্চল করিবার মত বটে; বিপিন মরিয়া গেল, বাকী বেলাটায় সে দশবার পথে নামিয়াছে শ্রীমন্তের বাড়ী আসিবার জন্য, আবার দশবার ফিরিয়াছে।—আসিলে শ্রীমন্ত কিছু মনে করিত না, কিন্তু দুর্ব্বল মন বলিয়া বিপিনের কেবলই মনে হইয়াছে, শ্রীমন্ত ধরিয়া ফেলিবে হয় তো। শেষ সন্ধ্যার সময় শ্রীমন্তের নিমন্ত্রণ আশ্রয় করিয়াই সে আসিল—আসিতে আসিতে আবার ফিরিয়া এই খাবার কিনিয়া আনিল; সে খাইলেও বিপিনের তৃপ্তি, শ্রীমন্ত যা খাওয়ায় সে ত জানে, হয়ত সব দিন দুই বেলা খাইতেই পায় না।

ঠোঙাটা শ্রীমন্তের হাতে দিয়া কহিল—

"নে—নিয়ে এলাম!"

শ্রীমন্তও বিস্মিত হইয়া গেল, সে কহিল "খাবার?"

কৈফিয়ৎ দেওয়া কঠিন, বিশেষ ওই উগ্র পশুটার বিবরে বসিয়া,—

বিপিন একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—"মাস খেয়ে খাব, নে রাখ্ না।"

শ্রীমন্ত পাশেই ঠোঙাটা রাখিয়া দিল;—বিপিন চটিয়া গেল, হতভাগা রাক্ষস সত্যই হয় ত সবই গিলিয়া ফেলিবে,—সে কহিল—

"কিন্তু কি আবাগু রে তুই, সে ছি-মন্ত এখনো আছিস্?—খাবারটা দিয়ে আয়, একটা বসবার কিছু নিয়ে আয়,—আলো আন, জমিয়ে বসা যাক্ একটু, না-কি? এই বুঝি তোর আসতে বলা!"

শ্রীমন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল, বিশ্বের পরে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা দিন দিন সে হারাইয়া ফেলিতেছিল—কিন্তু আজ বাল্যসাথীর এ

ব্যবহারে মুগ্ধ না হইয়া সে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া খাবারের ঠোঙাটা লইয়া গিরিকে ডাকিল—"রাখত, বাল্যকালের বন্ধু। হাজার হোক,—দেখছ ত,—"

গিরি উনানে আগুন দিতেছিল, মন ভাল ছিল না, সারাক্ষণ বুকের ভিতর বিসর্জ্জনের বৈরাগী সুর বাজিতেছিল। কিন্তু ঘরে আজ বিপিনের দেওয়া চাল ছিল, তরকারী ছিল; আর তাছাড়া তাহার মনের অবস্থায় মানুষ কিছুই প্রত্যাখান করে না, কোন কিছু অমান্যও করে না। এ অবস্থায় আপনাকে কষ্ট দিয়াও প্রত্যেক কার্য্যটী নীরবে করিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক, এমন অবস্থা মানুষের আসে, এটা বোধ হয় অভিমান- শীতল অভিমান!

গিরি বিনা বাক্যব্যয়ে ঠোঙাটী হাতে লইয়া কহিল—"কি করব?"

"দুটো কিছুতে কতক সাজিয়া দাও—আর দুটো গেলাসে, গেলাস বুঝি মোটে একটা আছে—তা ঘটিতে করে জল আর গেলাসটা ধুয়ে দাও,—কতক গুলো রেখে দাও।—"

শেষ কথাটা সে চাপিয়া বলিল।

ওদিক হইতে বিপিন কহিল—"আমাকে ভাই অতি অল্প দিও—গুণে চটী—অম্বলে মরে যাচ্ছি—খবরদার চটীর বেশী নয়।"

শ্রীমন্ত বলে—"তবে এক কাজ কর, অল্প অল্প দুটো জায়গায় দিয়ে বাকী রেখে দাও, আর এক কাজ কর দেখি, একটু জল চড়িয়ে দাও,—চা হোক, বিপিন দা—চা খাবে ত চা?—"

বিপিন কহিল—"তা মন্দ কি –"

শ্রীমন্ত বলিল—"তুমি জল চড়িয়ে দাও আমি চা আনি।"

"হ্যাঁ একটা কিছু দাও দেখি, বসতে ঐ চট-টা—তাই বেশ হবে—একটা আলো—আলো বুঝি আর নাই,—তাইত,—তা ওইটাই দাও।"

আলোটা বসাইয়া চটটা পাড়িয়া শ্রীমন্ত কহিল—"তুমি দুমিনিট বস ত ভাই, মালটাল বের কর, আমি চা আর চিনি নিয়ে আসি।"

বিপিন আপত্তি করিল না, নির্জ্জন মুহূর্ত্ত তাহার অন্তরও কামনা করিতেছিল—যদি একটা কথা কহিবার সুযোগ পাওয়া যায়!

শ্রীমন্ত চলিয়া গেল, বিপিন গাঁজা বাহির করিতে পকেটে হাত দিয়াই ভাবিতে লাগিল—একটা কথা, একটা কথা যা ঐ সুন্দরীর মনস্তুষ্টি করিয়া শোভন ভাবে কওয়া যায়!

গিরি উনান জ্বালিয়া জল গরম করিতেছিল, আলো ছিল না, ঐ উনানের বহ্নি-শিখাতেই গিরির মুখের একপাশ দেখা যাইতেছিল, ব্যথিত ম্লান দৃষ্টি, চুল তখনও এলানো, কয়টা চুলের গোছা কপালের উপর পড়িয়াছিল, সে গুলা ওই আগুনের শিখাতাড়নে তপ্ত বায়ু-প্রবাহে নাচিতেছিল।

বিপিন সহসা কহিল—"আলোটা নিয়ে যাও, অসুবিধা হচ্ছে—কোন দরকার নাই আমাদের—নিয়ে যাও।"

কিন্তু লইয়া কেহ গেল না। বিপিন আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

শ্রীমন্ত ফিরিয়া কহিল—"দেরী বেশী হয় নি আমার, আমি দৌড়ে এসেচি।" কই মাল বের করনি এখনও?"

"এই যে"—বলিয়া বিপিন সব সরঞ্জাম বাহির করিয়া বসিল।

শ্রীমন্ত চা চিনি দিয়া গিরিকে কহিল—"চা কর।"

চা করিতে করিতে অন্ধকারে খানিকটা চা নিজের হাতের উপর ফেলিয়া গিরি "উঃ!" করিয়া উঠিল—

শ্রীমন্ত ধমক দিয়া কহিল—"আচ্ছা অকর্ম্মা তুমি, চা-টা ফেলে—উঃ।" বলিয়া শেষটায় ভ্যাঙাইয়া উঠিল।

বিপিন ব্যস্ত হইয়া কহিল—"হাত বোধ হয় পুড়ে গিয়েছে আহা! তুই একটা জানোয়ার রে! একটু নারকেল তেল চুণের জলে কিংবা আলুবেটে—"

শ্রীমন্ত কহিল—"কিছু করতে হবে না দাদা, গরম চা মুখে সয় তা হাতে সইবে না।"

যাই হোক চা খাইয়া, গাঁজা টানিয়া, আড্ডা জমাইয়া বিপিন উঠিল, কহিল,—"তা হ'লে উঠি, কালকে মামলার দিন নয়, আচ্ছা সন্ধ্যেয় এসে শুনব কি হয়।"

বিপিন বাহির হইয়াও গেল না, রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিল, একটা কথা শোভনভাবে মনস্তুষ্টি করিয়া বলিতে পারে নাই সে।

গিরি তখন শ্রীমন্তকে কহিতেছিল—"কালই কি মামলা শেষ হবে?"

শ্রীমন্ত কহিল—"হ্যাঁ"।

—"কি হবে ?" বিপদের উদ্বেগে অভিমান কোথায় গেছে তাহার।

শ্রীমন্ত কহিল—"কি হবে, সেত ভগবান জানেন, কিন্তু খরচ নাই, কাল যদি আর উকীল না দিতে পারি তবে যে সব মিছে।"

—"একবার ওকে বলে দেখলে না কেন ?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শ্রীমন্ত কহিল—"তা হ'তো।"

বাহিরে বিপিনের মন নাচিয়া উঠিল, গিরির মনস্তুষ্টি সে করিতে পারে, সে পুনরায় হাঁকিল—"শ্রীমন্ত !"

—"কে দাদা ?"

—"হাঁ রে, ফিরে এলাম আবার, একটা কথা শুদোব, কিছু মনে করিস্ না ভাই, কাল মামলার খরচপাতি—"

শ্রীমন্ত উচ্ছ্বাসভরে কহিল—"কোথায় পাব ভাই ?"

—"আচ্ছা কাল সকাল আমার কাছ হয়ে যাস্, বুঝলি, মামলা জিতে কিন্তু সন্দেশ আনতে হবে।"

বিপিন হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

গিরি কহিল—"বড় ভাল লোক বাপু।"

বাহিরে বিপিনের বুকটা নাচিয়া উঠিল, সে সেই আনন্দটুকু সম্বল করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

শ্রীমন্ত খাইয়া উঠিলে গিরি সমস্ত সামলাইয়া ফেলিল। শ্রীমন্ত কহিল—"তুমি খাবে না ?"

—"না।"

—"ও—আজ বুঝি ষষ্ঠী পূজো করেছ, তা এক কাজ কর ওইত মেলা খাবার রয়েছে খাও।"

গিরির চোখের জল আর বাঁধ মানিতেছিল না, সে মুখ ফিরাইয়া কোমলরূপে কহিল—"না।"

শ্রীমন্ত গিরির হাত ধরিয়া কহিল—"রাগ করেছ ?"

গিরি একবার হাতটা টানিয়া তারপর স্থির ভাবেই শ্রীমন্তের মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল মাত্র। সে যে কি হাসি তাহা শ্রীমন্ত বুঝিল না, সে গিরির হাত ছাড়িয়া দিল। তাহার মনে হইল এর চেয়ে গিরি কাঁদিলে ভাল হইত, সান্ত্বনা দিয়া অভিমানটা ভাঙান যাইত। (ক্রমশঃ)

"অন্নহীন বঞ্চিত জীবনে
মরণাহতের ব্যথা মৃত্যুমুখী শ্বসে ক্ষণে ক্ষণে।
বিষদিগ্ধ দেহময় বিষধর দংশনের জ্বালা,
তিক্ততায় ভরি' ওঠে শ্রমলব্ধ ভিক্ষান্নের থালা;
দাসের বন্ধন ছিঁড়ি' প্রাণপাখী উড়ে যেতে চায়
সম্মুখে ক্ষুধার্তমুখ অশ্রুজলে পথ আগুলায়।"

দাদার পত্র

কল্যাণবরেষু—

অনেকগুলি পত্র তুমি আমাকে লিখিয়াছ যাহাতে তুমি আমাকে তোমাদের বর্ত্তমান সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছ এবং ঐ বিষয়ে আমার অভিমত জানিতে চাহিয়াছ। বাস্তবিক এ বিষয়ে তোমাকে কোন কথা লিখিবার পূর্ব্বে আমার মনে হয়, বর্ত্তমান সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে যে সকল সাহিত্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষ যত্ন সহকারে পাঠ করিয়া, বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তোমরা তাহা করিয়াছ বলিয়া আমার মনে হয় না। কেহ কেহ হয়ত এ বিষয় লইয়া নাড়া-চাড়া কর কিন্তু কার্লমার্ক্স্ বা লেনিন যে ভাবে তপস্যা করিয়াছিলেন, যে আগ্রহের সহিত এ বিষয়ে ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন, নিজেদের জীবনে এ বিষয়টী যে প্রকার উপলব্ধি করিয়াছিলেন তেমন করিয়া কি কেহ করিতেছ? সমগ্র বিশ্বের রিক্তদের হৃদয়ের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সঞ্চিত দুঃখ এবং স্বচ্ছল ধনীদের অশান্তি নিজের অন্তরে, মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি না করিলে এই সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ কেহ কি বুঝিতে পারে! সখের সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ এক আর সত্যই যে এই ভীষণ অসাম্যে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সাম্যবাদ ভিন্ন।

তোমরা পুরাতনের বিরুদ্ধে ধ্বজা উড়াইয়াছ! কিন্তু পুরাতন সম্বন্ধে তোমরা আজ যে ধারণা করিয়াছ তাহা ঠিক নহে। পুরাতন একদিন তখনকার লোকের কাছে এমনই আকর্ষণের বিষয় ছিল, তখনকার যুগে উহাও এমনি সুন্দর এমনই চমৎকার বোধ হইত, নতুবা সমাজ স্বীকার করিবে কেন? অবশ্য যাহাদের পুরাতন বলিয়া কিছু আছে, তাহারা কেমন করিয়া তাহা ভুলিবে বা তাহার অসম্মান করিবে কেমন করিয়া? কিন্তু তুমি কি বুঝিতে পারনা যে পুরাতনই পরিবর্ত্তিত হওয়ায় নূতন বলিয়া মনে হয়? সেই পরিবর্ত্তন অহরহই চলিতেছে। অবশ্য পুরাতনকে সরাইয়া নূতনের আবাহন ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই যৌবনের লক্ষণ। এ নূতনের প্রতিষ্ঠায় একটা প্রসাদ আছে সত্য কিন্তু আমাদের বয়সে, যৌবনের উৎসাহ থাকা ত সম্ভব নহে। সেই জন্যই বোধ হয় তোমাদের মত এই নূতন সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ সম্পূর্ণ স্বীকার করিতে আজ পর্য্যন্ত পারিলাম না। তবে যাঁহারা বলেন যে নূতন কিছুই নহে, পুরাতন যাহা কিছু সবই ভাল আবার পুরাতনে ফিরিয়া যাইতে হইবে, আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন নহি।

সংস্কারই মানুষের ধর্ম্ম হইয়া যায়, সেইজন্য ধর্ম্মপ্রবণ ভারত সমাজ এতই সংস্কারের পক্ষপাতী। দশবিধ সংস্কার লইয়াই ভারত-সমাজ গঠিত। সেইরূপই ইসলাম সমাজ, খৃষ্টসমাজ—সকল সমাজেই সংস্কারকেই ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার আছে বলিয়াই ধর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে নতুবা মানুষ মাত্রেরই এক সমাজ এবং এক ধর্ম্ম হওয়াই ত' সহজ ও সঙ্গত। সেই সকল প্রাচীন সংস্কার মানুষের জীবনের সহিত এমনি মিশিয়া গিয়াছে যে মানুষ তাহার বাহিরে যাইতে ভয় পায় এবং যে যায় তাহাকে অধার্ম্মিক এবং সমাজদ্রোহী বলে। নূতনের আবির্ভাবে মানুষ চমৎকৃত হয়, ভীত হয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে অজ্ঞাতসারে সব পুরাতন সংস্কারই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে এবং যাওয়াই স্বাভাবিক। যেমন, কোন ফাঁক দিয়া বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, জরা শনৈঃ শনৈঃ না বলিয়া কহিয়া চলিয়া যায় এবং তাহাদের ধর্ম্মাচরণ স্বতঃই করাইয়া লয়, মানুষ বুঝিতেই পারেনা, তেমনই অজ্ঞাতসারে নিত্যই মানুষের সংস্কার বদলাইয়া যায় ও যাইতেছে মানুষ যেন বুঝিতেই পারেনা। অনন্ত কালপ্রবাহের কোন ফাঁক দিয়া কি যে পরিবর্ত্তন কে ঘটায় কিছুই জানা যায় না, পরে মানুষ যখন কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে বসে এবং ইতিহাস লিখিতে বসে, তখন ইতিহাস-রচয়িতাদের জীবন-চরিত আবিষ্কৃত হয়। তাই আজ তোমরা রুসের অসম্ভব পরিবর্ত্তনের ইতিহাস পড়িতে বসিয়া কার্লমার্ক্স্ ও লেনিনাদির জীবন-চরিত পাঠ করিতেছ। মনু, পরাশর, ভৃগু নারদাদি ঋষিদের কথায় আজ আর কেহ কর্ণপাত করিতে চাহেনা কারণ তাহাদের সহিত তোমাদের তথা জগতের যোগসূত্র ছিন্নপ্রায়। যুগে যুগে নূতন তত্ত্বকথা আসিয়া পুরাতনকে যেন বিস্মৃতির গর্ভে লুকাইয়া ফেলে। আজ রুসো-ভল্টেয়ার কার্লাইলকেও কেহ চাহেনা। নূতন মহাত্মারাই আজ তোমাদের মন জয় করিয়া বসিয়াছেন। এই রূপেই যুগে যুগে

কর্ম্মবীরগণের আবির্ভাবে এক এক যুগ-প্রবর্ত্তকের নাম স্মরণীয় হইয়া যায়। তোমরা শুধু নবীনকেই দেখিতে পাও, আমি কিন্তু এই নবীনের মধ্যে সেই প্রবীণদের অস্তিত্বও দেখিতে পাই, তাই তোমাদের মত তাহাদের পরিবর্জ্জন করিতে পারিনা। আমার এই প্রাচীন দেহের মধ্যে যে চিরন্তন শিশুকে দেখিতে পাই, তাইত' প্রাচীনকেও আমি ভুলিতে পারিনা। সেই প্রাচীন শিশু যে ঊষা দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া স্তুতি করিয়াছিল, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ বলিয়া গায়ত্রীর উপাসনা করিয়াছিল, সেই প্রাচীন শিশু যে অমর, তাহারই নানারূপ নানা নাম দেখিয়াই আমি মুগ্ধ। তোমরা শুধু বর্ত্তমানই দেখিতে পাও তাই সেই চিরন্তন শিশুকে দেখিতে পাওনা।

জগতে আজ যেমন চারিদিকে হাহাকার, অশান্তি এমনই পূর্ব্বপূর্ব্ব যুগে এইরূপ হাহাকার অশান্তিই হইয়াছিল, ইহাই কালের নিয়ম। সেই জন্যইত আমাদের ভগবানকে স্বর্গ ছাড়িয়া মর্ত্তলোকে মানবজন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, তাইত গীতায় আমরা ভগবদ্বাণী শুনিয়া উৎফুল্ল হই

> যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

জীবের তথা মানবের অভ্যুদয় নিশ্রেয়সঃ সিদ্ধির সম্যগমুখ্যোয় কর্ম্মের বিঘ্ন নির্ব্বিশেষ বিবৃত্তি যখনই যখনই হয় তখনই সকল অনর্থের কারণ সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়, তখনই আমি আপনার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তির দ্বারা সেই অধর্ম্মের বিনাশ ও ধর্ম্মের স্থাপনার্থ শক্তিমান মনুষ্য সৃষ্টি করি বা স্বয়ং মনুষ্য হইয়া মর্ত্তে অবতীর্ণ হই। তোমরা ভগবান-টগবান স্বীকার করনা, কারণ তোমাদের যথেচ্ছাচারিতায় তাহাতে হয়ত বিঘ্ন হয়। আমি কিন্তু ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করি, বিশ্বাস করি! তাই মনে করি যেমন প্রাচীন যুগে ধর্ম্মগ্লানি দূর করিবার জন্য অবতার পুরুষ নিজে কর্ম্ম করিয়া জগতকে শিক্ষা দিতেন আজও তাহাই ঘটিতেছে।

তাই তোমরা যেমন ভগবৎ সত্বা অস্বীকার করিয়া কার্ল মার্ক্স ও লেনিন প্রভৃতি মহাত্মাদের বাণীতে মুগ্ধ, আমি তেমনি আমাদের প্রাচীন ঋষিদের বাণী ও ভগবানের বাণীতে বিশ্বাস করিয়া আধুনিক যুগ-প্রবর্ত্তক উপরোক্ত মহাত্মাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান! তোমরা সাম্যবাদ যেন নূতন শুনিতেছ। আমি কিন্তু তাহা শুনি না। আমার যেন মনে হয়, এ সাম্যবাদ বহু পুরাতন কথা, আজ নূতন রূপ লইয়া বর্ত্তমান জগতে দেখা দিয়াছে।

যে সাম্যবাদ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে বহু যুগ পূর্ব্বে মানবের কল্যাণের জন্য জগতকে দান করিয়াছিলেন, যে সাম্যবাদ বুদ্ধদেব বহুকাল পূর্ব্বে মানবের মঙ্গলার্থে জগতকে দান করিয়াছিলেন, যে সাম্যবাদ পয়গম্বর মহম্মদ জগতের কল্যাণের জন্য দান করিয়াছিলেন, কালপ্রভাবে সে সাম্যবাদের কথা বিস্মৃত হইয়া স্ব স্ব সংস্কার-ধর্ম্মানুরাগে আজ সাম্প্রদায়িক অসাম্যে দ্বন্দ্ব-কলহে বিব্রত। আজ সেই গ্লানি দূর করিতেই হয়ত মহাত্মা কার্লমার্কস লেনিনের আবির্ভাব! তোমরা তাহাদের কালোপযোগী সাম্যবাদ স্বীকার করিয়া চলিতে চাহ! ভাল কথা!

জগতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ধর্ম্ম-দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তদুপরি ধনী-নির্ধনের দ্বন্দ্ব, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের দ্বন্দ্ব, যুক্ত ও রিক্তের দ্বন্দ্ব, কুলীন অকুলীনের দ্বন্দ্ব, এমনই প্রচণ্ডভাবে চলিতেছে যে মানুষ সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করিতে না পারিলে জগতে শান্তির সম্ভাবনা নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সেই শান্তির উপায় তোমরা রুসক্ষেত্রে কার্লমার্ক্সের ও লেনিনের আবিষ্কৃত সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রেই দেখিতে পাইতেছ। তোমরা সকল মানুষকেই সমান করিয়া দেখিতে চাহ। ইহাপেক্ষা ভাল কথা কি হইতে পারে। কিন্তু এ সাম্যের ভিত্তি কোথায়? তোমরা অসাম্য দেখ ধনে, বিদ্যায়, জাতে বা বর্ণে, এই না? তোমরা বলিতে চাহ কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র থাকিবে কেন? কেহ শিক্ষিত বিদ্বান কেহ অশিক্ষিত মূর্খ থাকিবে কেন? তোমরা বলিতে চাহ সমাজে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি বর্ণভেদ ও এইরূপ নানা জাতিভেদ থাকিবে কেন? তোমরা চাহ সব সমান করিয়া দিতে! কেহ নিয়োক্তা, কেহ নিযুক্ত হইবে না। তোমাদের অভিধানে দুইটী শব্দ শুনিতে পাই ক্যাপিটালিষ্ট আর প্রলিট্যারিয়েট, সম্পত্তিবান এবং সম্পত্তিহীন ইহার অর্থ! যুক্ত ও রিক্ত, পরস্বাপহারক ধনী, হৃতসর্ব্বস্ব দরিদ্র শ্রমিক! আরও একটি শব্দ তোমরা ব্যবহার কর শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের প্রতি উল্লেখ করিয়া যাহাদের তোমরা ক্ষুদ্র অল্প ধনী বা সম্পত্তিবান বল! বুর্জোয়া! তোমরা বল যে এতকাল ধরিয়া ধনীরা রাজত্ব

করিয়াছে, আজ সম্পত্তিহীন শ্রমিকদের রাজত্ব হইবে। তাহারাই অধিকাংশ তাহারা এতদিন লাঞ্ছিত, পদদলিত, হেয় হইয়া আসিয়াছে, আজ তাহাদের নিজেদের মর্য্যাদার জ্ঞান উদ্ভূত হইয়াছে, তাহারাই তাহাদের প্রকৃত স্থান অধিকার করিবে এবং মুষ্টিমেয় ধনী ও বিদ্বানগণ যে অন্যায় এতকাল আচরণ করিয়াছে তাহার অবসান করিবে এই দীনদরিদ্র শ্রমিকের দল। কিন্তু তাহাতে সাম্য স্থাপন কি হইবে? যদি দলাদলিই রহিয়া যায়, বঞ্চিতেরা অপরকে বঞ্চিত করিবার জন্য ব্যস্ত হয় তাহা হইলে শান্তি কোথা হইতে হইবে—সাম্যই বা হইল কোথা? কর্ত্তৃত্ব যেখানেই থাকিবে সেই খানেই অহঙ্কার—অহঙ্কার অজ্ঞানতার অপর মূর্ত্তি এবং অজ্ঞানতা যেখানে সেখানে অত্যাচার অনাচার—সে ধনীর পক্ষেও যেমন, নির্ধনের পক্ষেও তেমনি।

তোমরা ধনী ও বুদ্ধিমানদের অত্যাচারে অধীর হইয়া নির্ধন ও অল্প-বুদ্ধিমানদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া শ্রেণী দ্বন্দ্ব চালাইতে ব্যাকুল হইয়াছ। কিন্তু তাহাতে শান্তি শৃঙ্খলা এবং সাম্য, যাহা প্রতিষ্ঠার জন্যই তোমাদের এই আয়াস তাহা কি ঘটিবে! এতাবৎ বঞ্চিত যাহারা তাহাদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই তোমাদের সমাজতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য এবং ইহাই তোমাদের সাম্যবাদ - এই না? অবশ্য "সাম্য" শব্দের একটা আকর্ষণ আছে—সেই জন্যই মানুষ সকল ভেদের মধ্যে একটা সাম্য দেখিতে চেষ্টা করে—কিন্তু তুমি কি মনে কর জোর করিয়া তোমরা যে সম্পত্তিবানদের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া এক শ্রেণীর লোকের কর্ত্তৃত্বাধীন করিয়া সমাজ চালাইবে সেই সম্পত্তি-বঞ্চিতের দল—নিঃশেষ হইয়া তোমাদের এই সাম্যে মুগ্ধ হইবে? তাহারা বেশ শান্তশিষ্ট ছেলেদের মতই থাকিবে, তাহারা কোন বিরোধ করিবে না? ইহার পর আর অসাম্যের সৃষ্টি হইবে না এ কথা জোর করিয়া বলিতে পার? ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকিলেই জগতে আর কোন দ্বন্দ্বই থাকিবে না—প্রতিযোগিতা থাকিবে না—প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিবে না—এ কথা তোমরা কেহ জোর করিয়া বলিতে পার? মানুষ পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেই আর পরিধেয় ও মাথা রাখিবার স্থান পাইলেই একেবারে শান্তশিষ্ট ধার্ম্মিক হইয়া বিশ্বপ্রেমিক হয়, এ কথা কোথাও শুনিয়াছ? আমরা ত শুনিয়াছি যে "Man does not live by bread alone" অর্থাৎ মানুষ রুটি ভিন্ন আরও অনেক কিছু চায়! পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেই সুখী হয় না—তাহার আরও অনেক কিছু চাহিবার ও পাইবার থাকে।

তোমরা কার্লমার্কস্ ও লেনিনাদির কথা সব বেশ বুঝিয়াছ কি না জানি না। তোমাদের বয়সে অসামঞ্জস্য দেখিয়া মানুষ ধৈর্য্যসহকারে কোন কথা বিচার করিয়া করিতে চাহেনা, পারেও না। তোমরা সাম্য বলিতে যাহা কিছু বুঝিয়াছ তাহা এতাবৎ জগতে কোথাও ছিল বলিয়া মনে হয় না। সমাজ গঠনের প্রারম্ভে কাহারও নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, কারণ ভূমি ছিল মানুষ জন্মাইবার পূর্ব্বেই এবং মানুষ ভূমি কর্ষণ করিতে শিখিয়া ক্রমশঃ ভূমির মালিক হইয়াছে। কিন্তু মানুষ সমাজ গঠন করিতে যাইয়া যাহা কিছু তদুপোযোগী তাহাই করিয়াছে, যাহা প্রয়োজন তাহাই করিয়াছে। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাহা আরম্ভে ছিল না—পরে স্বভাবতই হইয়াছিল। বিনা প্রয়োজনে মানব-সমাজ কি কোন দিন কিছু করিয়াছে? বাস্তবিক কেহ রাজা হইয়া জন্মায় নাই। সুতরাং কেহ প্রজা হইয়াও জন্মায় নাই! সকল রাজার রাজা এই দুনিয়ার স্রষ্টা, তিনি সকল বিশ্বার মালিক হইয়াও মালিকানাসত্ব দাবী করেন না, কারণ তাঁহার প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য কিছুই নাই! মানুষ আপনার সমাজের সুখ-সুবিধা শৃঙ্খলার জন্য রাজা-প্রজা সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সেই রাজা-প্রজা সম্বন্ধ যতকাল মধুর থাকে ততকাল দ্বেষদ্বন্দ্ব কলহাদি ঘটে না এবং পরে এমন হইয়া দাঁড়ায় যে দ্বেষদ্বন্দ্ব কলহ-বিগ্রহাদিই যেন স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। মানুষ তাহারই মধ্যে সুখানুসন্ধান করে। কিন্তু মানুষ ত জগতে শান্তি-শৃঙ্খল-সুখ স্থায়ী করিতে পারে নাই। সর্ব্বদাই মানুষের সেই চেষ্টা থাকে এবং তাই যুগে যুগে নূতন নূতন ভাবনা জগতে আসিয়াছে এবং কালে কালে গিয়াছে। তোমরা আজ কার্লমার্কস্ লেনিন প্রভৃতি মহাত্মাদের প্রচারিত সাম্যবাদ এবং সমাজ-তন্ত্রের বাণীতে মুগ্ধ হইয়া, জগতের শান্তির উপায়স্বরূপ উহাই অবলম্বন করিতে চাও। ভাল কথা! জগতে শান্তি-স্থাপনের উপায়ই সাম্য-স্থাপন। তোমাদের মনে এই সাম্য-প্রতিষ্ঠার চাহিদা জাগিয়াছে ইহাই আমাদের আশা ভরসার স্থল।

কিন্তু সতর্ক থাকিয়ো যেন আত্মপ্রবঞ্চনায় না পড়! এই যে ভেদজাত অশান্তির উচ্ছেদ-সাধনের প্রবৃত্তি, এই যে দেশকালপাত্রভেদ মুছিয়া দিয়া সমগ্র জগৎকে এক সাম্যের বন্ধনে বাঁধিবার সদিচ্ছা হইয়াছে, ইহাই সত্যযুগ আবাহনের পূর্ব্বলক্ষণ! তোমাদের এ সদিচ্ছা জয়যুক্ত হউক, তোমাদের ইচ্ছাস্বরূপ চেষ্টা হউক, ইহাই আমার ভগবানের কাছে নিবেদন।

তোমরা আমাদের দেশীয় শাস্ত্রকার দার্শনিক ঋষিদের কথা শুনিয়াছ বা পড়িয়াছ কিনা জানিনা, কারণ, সে সকল জানিতে শুনিতে হইলে সংস্কৃত ভাষা জানিতে হয়। বোধহয় শুনিয়াছ যে মানুষ মাত্রই গুণত্রয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয়ের যাহার মধ্যে যেটি প্রবল সে সেই গুণের দ্বারাই অধিকমাত্রায় পরিচালিত হয়। এ অবশ্য পাশ্চাত্য দর্শনের কথা নহে। যাহা প্রাচ্যের তাহা জানই না, যাহা পাশ্চাত্য বলেনা বা জানেনা তাহা তোমরা স্বীকার করিতে চাহ না। আমি কিন্তু এ বিষয়ে প্রাচ্যদের স্বীকার করি তাই তাহাদের বাণী তোমাদের কিছু শুনাইতে চাহি! এই গুণানুযায়ী শ্রদ্ধা হয়।

> ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
> সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥

একে তথাকথিত মাতৃভাষা সংস্কৃত, তদুপরি গীতার কথা! গীতার নাম শুনিয়াই হয়ত হাঁফাইয়া উঠিবে। কিন্তু সত্যই যে সুন্দর "সত্য সনাতন সুন্দর শিব"—ইংরাজীতে বলিলেই বুঝিবে "A thing of beauty is joy for ever—Truth is beauty and beauty is truth." কেমন, সেই সত্যই এই গীতার বাণী! সত্য সেই বলিতে পারে যে কর্ম্মজ্ঞ—সেই কর্ম্মজ্ঞ যে আত্মজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান সর্ব্বজ্ঞ—স্বয়ং পরমাত্মা—তাই তাঁহার বাণীই চিরসত্য, চিরশিব, চিরসুন্দর। তোমরা আবার ঈশ্বর-টীশ্বর স্বীকার না করিতে অভ্যাস করিতেছ কারণ, রুশের ঋষিরা বলিয়াছেন যে ভগবান বা ঈশ্বর মানুষের আবিষ্কৃত পদার্থ! সত্যই ত, কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, আর মানুষ ঈশ্বর আবিষ্কার করিয়া চিরস্মরণীয় হইবে না, তাহাতে দোষ কি? এখন কার্য্যের আগে কারণ না কারণের আগে কার্য্য, বীজের পূর্ব্বে বৃক্ষ না বৃক্ষের পূর্ব্বে বীজ, এই অনুসন্ধানই ত চলিতেছে, সুতরাং ভগবান আছেন কি না আছেন, এ তর্কের প্রয়োজন নাই! মার্কস এবং তস্য শিষ্য লেনিন মানুষের এই ভগবানকে লইয়া ব্যবসায় পণ্য করায় বোধ হয় ক্রুদ্ধ বা ক্ষুব্ধ হইয়া ভগবানকে অস্বীকার করিতে বলিয়াছেন বা ভগবানের নামে ধর্ম্মের নামে যে সকল অনাচার অত্যাচার চলিয়াছে তাহাতে বিরক্ত হইয়া ভগবানকে, ধর্ম্মকে অস্বীকার করিতে বলিয়াছেন। যে জগতের দুঃখে কাতর হয়, যে কার্য্যের সন্ধানে ফিরে, সে কি ধর্ম্ম বা ভগবানকে অস্বীকার করিতে পারে? ভগবান বা ঈশ্বরকে বাদ দিয়া কার্য্যের প্রতিষ্ঠার কল্পনা উন্মত্ততা ভিন্ন কিছুই নহে। যে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছে, এ জগতে ভাগবৎ সত্তাই একমাত্র সত্ত্ব—ইহার পৃথক সত্তাই নাই, সেই সমগ্র বিশ্বকে আপনাতে দেখিতে পায়, আপনাকে সমগ্র বিশ্বে দেখিতে পায়—সেই কার্য্য-মন্ত্রের দীক্ষা দিবার যোগ্য গুরু। আমার মনে হয় যেমন বেদ যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহাদের বেদে অধিকার প্রদত্ত হয় নাই, তেমনি কার্ল মার্কস্ বা লেনিন মহোদয় এই ভেদবাদী সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি মানব-সমাজের ঈশ্বর ভাবনা সম্ভাবনা নাই দেখিয়াই বলিয়াছেন, ভগবান বা ধর্ম্ম স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। উদরান্নের জন্য উন্মাদ কখনও ভগবান বা ধর্ম্ম বিষয় ভাবিতে পারে? তাই এই মহাত্মারা উদরান্নের সহজ ও সরল সাম্য-প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ করিয়াছেন। তুমি ভ্রম ক্রমেও ভাবিয়োনা যে তাঁহারা ঈশ্বরদ্বেষী নাস্তিক! যাহাই হউক যে দেশে গীতা বাইবেল নাই, সে দেশে কি সাম্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও হইতে পারে না? রুশে এই চেষ্টা জোরে চলিতেছে—সে চেষ্টা সার্থক হউক! আমি তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। হাঁ, আমি বলিতেছিলাম যে গুণানুসারে ত্রিবিধ শ্রদ্ধা হয়। একই বিষয়ে শ্রদ্ধানুসারে তিন প্রকারের লোক তিন দৃষ্টিতে দেখিবে। সাম্য সম্বন্ধেও তাহাই। সাত্ত্বিক জ্ঞানেচ্ছু যে ভাবে সাম্যের বিষয় ভাবে, তাহা তোমাকে জানাইতে চেষ্টা করিব।

> বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
> শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
> ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
> নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

'অহং' অর্থাৎ 'আমি কর্ত্তা' বুদ্ধি থাকিতে কি সাম্য হয়? কর্ত্তৃত্ব ভাবই ত অসাম্যের মূলভিত্তি—তাই 'যোগী' হইতে হইবে। যোগী বলিলেই হয়ত মনে হইবে, খুব লম্বা দাড়ী গোঁফযুক্ত জটাজুটধারী আসন প্রাণায়ামরত কোন তপস্বী! তাহা নহে! সর্ব্বদা আত্মার বা ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া থাকার নাম 'যোগী' হওয়া। সর্ব্বদা যে অভ্যাস যোগের দ্বারা এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে, কখনও তাহার বিপরীত বুদ্ধি হয় না, সেই প্রকৃত সাম্যের মর্য্যাদা ও মূল্য জানে। সে যে শরীর ও আত্মার, তথা জীবের ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ জানিয়া সর্ব্বদা যোগযুক্ত থাকে।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥

সাম্যে স্থিত হইলে তবে ত' শান্তি হইবে, শান্তি হইলে তবে ত সুখ বা আনন্দ হইবে। সেই জন্য অযুক্তরা যত বড়ই বুদ্ধিমান হউন না কেন, সাম্যে স্থিত হন না, শান্তিও পান না, সুখীও হন না। যে অযুক্ত সে সর্ব্বদা অনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহার মন সর্ব্বদাই সুখ দুঃখে বিচলিত থাকে। তাই মানুষকে প্রথমেই ঈশ্বরের সহিত নিজের, স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ জানিয়া তাহাতে মিলিত থাকিতে হইবে—ব্যক্তিত্বকে সেই মহান আত্মাতে বিলাইয়া দিতে হইবে। যোগযুক্তাত্মার দর্শন কেমন শুনিবে—?

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

যে আপনাকে সমস্ত জীবের মধ্যে দেখে এবং সমস্ত জীবকে আপনার মধ্যে দেখে—এমন যে যোগযুক্তাত্মা সেই শুধু সমদর্শী হইতে পারে, ইহাই সাম্যের প্রতিষ্ঠা। সকল সম্পত্তিবান ধনী যেমন সমান পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হয় না—সকল সম্পত্তিহীন শ্রমিকও সমান পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেই তেমনই সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে না! আপনার উপমায় যে সকলের সুখ দুঃখ ভাবনা করিতে পারে সেই যোগীই সাম্যে স্থিত হয়। গীতায় তাই দেখিতে পাই—

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

সমবুদ্ধি না হইলে সাম্য হয় না। সে সমবুদ্ধি কাহার হয়? জ্ঞান-বিজ্ঞানতৃপ্তাত্মার হয়। গীতায় আমরা তাই দেখিতে পাই—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥

তুমি বলিবে যে বর্ত্তমানে ভেদের যে তাণ্ডবনৃত্য জগতকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, ঐ একজন বা দুইজন মহাত্মাদের প্রদর্শিত মার্গে, বহুজনকে যত পরিমাণে পরিচালিত করা যায় ততটাই করিবার প্রচেষ্টাই প্রয়োজন। সমস্ত মানব সমাজ ঐ ভাবে যোগযুক্ত কোন কালে হয় নাই, হইবেও না। সুতরাং গীতার সাম্যবাদ আজ আমরা শুনিব না—আমরা ঐ রুশের ঋষিদের প্রচারিত বাণী ও স্বীকৃত মার্গ অবলম্বন করিয়া ঐ সত্যের প্রচার ও সত্যের বিরোধী দলের দণ্ড দিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠাই করিব! তদুত্তরে বলিব, তুমি কাঁচা মিস্ত্রী বা ভণ্ড! সাম্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা না করিয়া সাম্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টার কারণ কিছুকাল পাইতে পার, স্থায়ী হইবে না! এ ত' সাধারণ জ্ঞানের কথা, গৃহের ভিত্তি ঠিক না করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিলে কিছুদিন সে গৃহে দাঁড়াইয়া থাকিতে পাবে, বহুদিন পারে না—ঝড় ঝাপ্টাও সহ্য করিতে পারে না।

রুশে আজ যাহারা সাম্যবাদের প্রবর্ত্তক, তাহাদের মধ্যেও কত দ্বেষ দ্বন্দ্ব চলিতেছে। দেখিতেছ—সকলের মত হয়ত একই কিন্তু পথ হয়ত বিভিন্ন, তাই প্রত্যেকের কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্রত্যেকের মধ্যে এই ভেদ বর্ত্তমান। একজন অপরের জীবন লইতে প্রস্তুত! তদ্ব্যতীত হিন্দু-শাস্ত্রের দণ্ডবিধানের ফলে হিন্দু-সমাজে যেমন শাস্ত্র চলে নাই, সমাজ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তেমনি দণ্ডভয় দেখাইয়া সাম্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও ব্যর্থ হইতে বাধ্য! অহঙ্কারবুদ্ধিযুক্ত মানুষ কেহ কাহারও ত্রুটি সহ্য করিতে পারে না—আপনার মনের মত কথা বা কার্য্য না হইলেই মানুষ মানুষের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

ইহা ছাড়া এই দণ্ড দিয়া বা পাপ পুণ্যের স্বর্গনরকের ভয় দেখাইয়া বহু অবতার-পুরুষ যে দল গঠন করিয়া গিয়াছিলেন, কালে তাহাদের সেই দল একটা উপহাস্য বিষয় হইয়াছে—

বৌদ্ধ জৈন, বৈষ্ণব দেখ না তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ। কার্ল-মার্কস বা লেনিন যে প্রাণ লইয়া, যে জ্ঞান লইয়া আজ জগতের চিরবঞ্চিতদের সঞ্চিত বেদনা দূর করিতে আত্মদান করিয়াছেন, তাঁহাদের দলভুক্ত ভক্তগণ কি ঠিক সেই প্রাণ, সেই জ্ঞান লইয়া সেই সর্ব্বস্ব দান করিয়া ঐ পথেই চলিবে?

তাই বলিতেছি সাম্যের ভিত্তি ঠিক কর। মনে যদি সাম্য ঠিক না থাকে, সাম্য বাহিরে কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে? মিথ্যাচার দ্বারা যদি কোন সত্যের প্রতিষ্ঠা হইত তাহা হইলে মিথ্যাচার ত নিন্দার্হ হইত না। অহঙ্কারের সহিত অহঙ্কারের সংঘাতে যে অগ্নি উৎপাদিত হইবে, সেই জ্বালাময়ী অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিবার যোগ্য আত্মজ্ঞান বারি কোথা? সেই জন্যই বার বার বলিতেছি হৃদয়ে সাম্যরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর, আত্মস্থ হও! তুমি এখন হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে যে এই যে রুশে সাম্যবাদ এবং সমাজতন্ত্র প্রচারিত হইতেছে, প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে ইহার কি ভিত্তি নাই, ইহা কি চলিবেনা? চলিবে বই কি, ভিত্তি আছে নিশ্চয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি তোমার শ্রদ্ধা ত্রিবিধ! যাহারা অধ্যাত্মবাদ বিষয়ে উদাসী যাহারা আত্মা বা ঈশ্বর বিষয়ে অজ্ঞ, ঐ বিষয় কোন তত্ত্বই জানা প্রয়োজন মনে করে না, তাহারা জড়বাদী অথবা প্রত্যক্ষবাদী! যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে বা জানা যাইতেছে, তাহার পশ্চাতে বা বাহিরে আরও কিছু আছে কিনা আছে—সে চিন্তা পর্য্যন্ত যাহারা করে না বা করিতে চাহে না বা তাহাতে প্রবৃত্তি নাই—তাহারা জড়বাদী! হয় ত তাহারা এই জড়ের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ কি, তাহাও জানিতে চাহে না। তাই জগতের এই প্রচণ্ড অসামঞ্জস্য দেখিয়া তাহারা বহু-লোকহিতায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রত্যক্ষ দুঃখ দূর করিবার অভিপ্রায়ে কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দেয়। তাহারা প্রাণবান্ লোক, প্রাণের লীলার কেন্দ্র তাহারা! তাহাদের আমি বার বার নমস্কার করি। কার্লমার্কস্ বা লেনিনের দিনও বেশ ভালই যাইত যদি সাধারণ মানুষের মত উপার্জ্জন করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যত বংশধরদিগের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া দরিদ্র শ্রমিকদের উপার্জ্জিত অর্থে বিলাসবাসনা-শক্তি চরিতার্থ করিত। তাহা করে নাই কেন? কারণ আজ এই সাম্যবাদের প্রবর্ত্তনের জন্য ভগবান তাহাদেরই নিমিত্তরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। যেমন গীতার সাম্যবাদ-প্রচারের জন্য অর্জ্জুনকে ভগবান নিমিত্ত নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। এই প্রেরণা ভগবৎ প্রেরণা, ইহাকে যে উপেক্ষা করিবে, সে ভগবানের উপদেশ, উদ্দেশ্য ও কার্য্যই উপেক্ষা করিবে।

এ যুগে অধ্যাত্মবাদ চলিবে না, কারণ বর্ত্তমান জগতে অর্থনৈতিক বৈষম্যই মানবসমাজকে দুঃস্থ করিয়াছে। আজ সকল দুঃখের কারণই এই সঙ্কীর্ণ পরিচয়ের বা পরিধির মধ্যে আবদ্ধ। অল্প লোকের মধ্যে সঞ্চিত অর্থ, সম্পত্তি উৎপাদনের উপকরণাদি এবং পরিশ্রমের সময় বহু লোককে বঞ্চিত করিয়া জগত দুঃখ দারিদ্র্যের কারণ হইয়াছে। সেই সঞ্চিত অর্থের উৎপাদনের উপকরণ ও সময়ের সম্যক বণ্টনের ব্যবস্থা নাই, তাই সর্ব্বত্র শ্রেণী-দ্বন্দ্ব চলিতে বাধা, দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে তাই আজ দ্বন্দ্ব চলিতেছে।

সমাজে রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, নিয়োক্তা নিযুক্তের মধ্যে যে অর্থনৈতিক ভেদ স্থাপিত হইয়াছে, সেই ভেদই এক পক্ষে অতিপুষ্টি অন্য পক্ষে অপুষ্টি, একপক্ষে অতি সুখ অপর পক্ষে অতি দুঃখ। একপক্ষে অতি সাচ্ছল্য অপর পক্ষে অত্যাচার। এই অসামঞ্জস্য দূর করিবার উপায় প্রাচীন ভারতে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল আজ তাহাই রুশ ক্ষেত্রে নূতন রূপে আবিষ্কৃত হইয়া পরীক্ষিত হইতেছে। যুবা দেশের কল্যাণের জন্য আত্মদান করিয়াছে—তাই এই নূতন সাম্যের বাণীতে তোমরা উৎফুল্ল, আশান্বিত হইয়াছ। মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত প্রাণবান মাত্রই এ বাণীতে উৎসাহিত হইবেই। তোমাদের কামনা, আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক, চেষ্টা ফলবতী হউক। পরদুঃখকাতর প্রাণ তোমরা, সর্ব্বহারাদের চিরবঞ্চিতদের সকল সুখের অধিকারী কর। মানুষের ক্রমবিকাশের চরম পরিণতিই তাই—পশুত্বকে জয় করিয়া মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ দেবত্বে বা ঐশীত্বে পরিণতি! ইহাই ধর্ম্ম। তোমরা আজ এই অর্থনৈতিক সমস্যা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক চরম জ্ঞানে উপনীত হও ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। প্রকৃত সাম্যের গঠনই তাই! মানুষের এই অস্থায়ী সুখ দুঃখ লইয়া ত বাস্তবিক মানুষ ব্যস্ত হইলে চলে না—অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা এই সুখ দুঃখকে বর্দ্ধিতাকারে দেখিয়াই এত চঞ্চল

হয়। বাস্তব দুঃখ অজ্ঞানতা—আত্মজ্ঞান লাভ না করা। তোমাদের এই অর্থনৈতিক সাম্যের সমাধি হয় যেন ঐ অধ্যাত্মজ্ঞানে, তপস্বীদের সাম্যবাদের পরিণতি যোগীতার সাম্যবাদেই হয়। মানুষও শুধু খাইয়া পরিয়াই তৃপ্ত হয় না, তাহার তৃপ্তির শান্তির বাস্তব উপকরণ জ্ঞানে -

তাইত গীতায় জ্ঞানের এত আদর জানাইয়াছেন

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥

পরদুঃখকাতর হইয়া জগতের দুঃখ দূর করিবার তীব্র আবেগ, বাসনা বড়ই প্রশংসার্হ প্রবৃত্তি, কিন্তু বাস্তবিক জগতের দুঃখের কি নিরতি হইবে? অহঙ্কারে অহঙ্কারের বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিতেই থাকিবে। মানুষ পেট ভরিয়া খাইতে পাইলে, সুখে শুইতে পাইলে, নানা সুখদ পরিধেয় ব্যবহার করিলেই কি সন্তুষ্ট থাকিবে? তাহার রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শাদি বিষয়াসঙ্গ যতকাল থাকিবে, ততকালই সে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যাদির কবলীভূত থাকিবে। তাহার বাসনার কি শেষ আছে—লালসার কি তৃপ্তি আছে—প্রকৃতির দাস মানুষ প্রকৃতি কড়ায় গণ্ডায় তাহার ঋণ শোধ করাইয়া লইবে। যদি প্রকৃতিকে জয় করিতে চাও, আত্মস্থ হও, জ্ঞানী হও! তার পর দেখিবে - সাম্যের স্বরূপ কি।

হয়ত এত দীর্ঘ পত্র পড়িবারও তোমার ধৈর্য্য থাকিবে না—তদুপরি আবার মৃতভাষা সংস্কৃতের বুকনী, গীতার বাণী, ভগবানের আত্মার কথা এসব তোমাদের মাথায় স্থান ত পাইবে না। কিন্তু 'দাদা' যে 'দাদা'—তার ত প্রাচীন সংস্কার যায় নাই। কিন্তু তোমরা যেমন রুশীয় ঋষিদের বাণীতে অন্ধবিশ্বাসী হইয়া প্রাচীন ঋষিদের বাণী অবহেলা কর, দাদা কিন্তু রুশীয় ঋষিদের বাণীর নূতন রূপ নাম করিয়া যুগোপযোগী নূতন মন্ত্র মনে করিয়া তাহাকে অবহেলা ত করেই না—বরঞ্চ তোমাদের তুল্যই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। এক্ষণে তোমাদের কল্যাণ কামনা করিয়া বিদায় লইতেছি—তোমাদের এই নবীন সাম্য বা সমাজতন্ত্র-বিষয় আমি কি ভাবিয়াছি তাহা পর পর বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

তুমি গ্রামে থাকিয়া গ্রামবাসীদের হৃদয়ে সেবা শ্রদ্ধাদ্বারা মানুষের চাহিদা জাগাইয়া তুল! যদি তাহা না পার—থাকাই বৃথা হইবে।

সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবিষয় বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তিদের গবেষণা-গঠন পঠন করিয়া আমি এবিষয় পর পর পত্রে লিখিব। কোন্ কোন্ গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিব, পত্র-সমাপ্তির পর জানাইব।

তোমায় আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুস্থ-শরীরে, তোমার ব্রহ্মচর্য্য অটুট রাখিয়া পরদুঃখকাতর প্রাণকে জ্যোতিতে উদ্ভাসিত কর—অহঙ্কারবুদ্ধি যেন তোমাকে পথভ্রষ্ট না করে। সর্ব্বদা ভগবৎসত্তায় নিজেকে সন্তাপিত করিতে অভ্যস্ত হও।

ইতি—শুভানুধ্যায়ী
'দাদা'

অস্তাচলে

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

আমাদের হিন্দু সমাজের যে গঠন, তাহাতে এরূপ ঘটনা ঘটা উচিত ছিল না। তবে কথা এই যে, উচিত অনুচিত বিবেচনা করিয়া ঘটনা প্রায়ই ঘটে না ; ঘটিলে অবশ্যই ভালো হইত !

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে নয়, মাঝামাঝি একটা তারিখে আকাশে ভারি ঘন ঘটা—পৃথিবী যেন রসাতলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দুর্য্যোগ ভীষণ, কলিকাতার রাজপথগুলি প্রায় জনশূন্য ; গাড়ী-ঘোড়াও দেখা যাইতেছে না, ফুটপাথের আলোগুলা বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়া ঘোলা চোখে চাহিয়া আছে মাত্র। পথের ধারের দোকানীরা সন্ধ্যার পরেই দোকানপাট বন্ধ করিয়া যে যার ঘরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বাহিরে যখন এই ব্যাপার, ভবানীপুরের এক ধনবান গৃহস্থের বাড়ীতে তখন ব্যাপার আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের আসর হইতে ক'নে উঠিয়া গিয়া একটা ঘরের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়াছে। আত্মীয় আত্মীয়া, বন্ধু-বান্ধব, ভাই-বোন, পিসী-মাসী, খুড়ী-জেঠাই-মা ডাকাডাকি করিয়া, সাধ্য সাধনা করিয়া, কাকুতি মিনতি করিয়া হয়রাণ হইয়া গিয়াছেন, মেয়ে দ্বার খুলে নাই ; অপিচ শাসাইয়াছে, যদি অধিকমাত্রায় পীড়ন করা হয়, তাহা হইলে অর্গলবদ্ধাবস্থায় সে আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার অবসান করিবে।

মেয়ের মা মেয়েকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিলেন, তাই কর, তুই তাই কর্। অমন মেয়ে থাকার চেয়ে যাওয়াই ভালো। বলিয়া তিনি মেয়ের পিতার উদ্দেশে ধাবমানা হইলেন ; খুড়ী-জেঠাই, মাসী-পিসি প্রভৃতি তখনও হাল ছাড়িলেন না।

মেয়ের বাবা না-সদর-না-অন্দর এমন একটি নির্জ্জন স্থান নির্ব্বাচন করিয়া নির্ব্বাপিত কলিকাসংলগ্ন গড়গড়ায় ধূমপান-নিরত ছিলেন, গৃহিণী অগ্নিশর্ম্মা হইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; ঘূর্ণিত লোচনে কহিলেন, ব'সে ব'সে তামাক টেনে আর আশ মিটছে না ? বলি, আদরের মেয়েকে বের করবে না কি ? মেয়ে আবদার ধরলেন কালো বরের মুখ দেখবেন না, পিঁড়ি থেকে উঠে গিয়ে গোসা-ঘরে খিল্ দিলেন, এক বাড়ী লোক, বর ব'সে, বরযাত্রী-সব ব'সে, না খাওয়া না দাওয়া আর তুমি নিশ্চিন্তি মনে তামাক টানছ ? যাও, চুলের ঝুঁটি ধ'রে বের ক'রে আন। ছিঃ ছিঃ, আমার যে লোকলজ্জায় মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে গো ! এমন অলক্ষুণে মেয়েও পেটে ধরেছিলুম মা, মা-গো ! গৃহিণীর নাকের বৃহৎ নথটি বারম্বার বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সাধারণতঃ রাগের সময় নথ একটু বেশী মাত্রায় নড়ে। এই শ্রেণীর নথ নাড়াকে ভয় বা সমীহ না করিতেন, সংসারে তেমন লোক সে কালে বিরল ছিল।

কর্ত্তা রামরতন ঘোষ মহাশয় বলিলেন—কিন্তু আমি ভাবছি কি—

গৃহিণী ঝঙ্কারসহযোগে বলিয়া উঠিলেন—ভেবো তুমি পরে, আগে মেয়েকে টেনে নিয়ে এস। দরজা ভাঙ্গ, চুলের মুঠি ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জামাইয়ের পায়ের তলায় এনে ফেলে দাও, তবে আর কথা।

রামরতন বলিলেন—কিন্তু, আমি ভাবছি কি জান, যে একরোখা মেয়ে, দরজা ভাঙ্গাভাঙ্গি করতে গেলে যদি আত্মহত্যাই ক'রে ফেলে। বৃদ্ধ সাধাসিধা গোছের লোক, কথাগুলা বলিবার সময় তাঁহার মুখে সত্য সত্যই একটা ভয়-উদ্বেগ-আশঙ্কার ছায়াপাত হইল।

গৃহিণী অধিকতর রুষ্ট হইলেন ; বলিলেন, ইঃ ! আত্মহত্যে করলেই হ'ল আর কি ! আত্মহত্যে রাস্তায় পড়ে আছে আর কি ! আর, করেই যদি, করুক। সেই মড়া এনে জামাইয়ের কাছে ফেলে দোব, হাঁটু ধরে কন্যাদান করেছি, আমরা ধর্ম্মে পতিত হব না।

রামরতনকে তথাপি নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া গৃহিণী এবার একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বলিলেন, আর না হয়, বলো, আমি গোয়ালে ঢুকে গলায় দড়ি দিই, তুমি থাকো তোমার সোহাগের মেয়ে নিয়ে। আমার মরণ হ'লে আমিও বাঁচি, তোমরাও বাঁচো। তাই হোক, আমি যাচ্ছি—তাঁহার কথাগুলা শেষ হইতে পাইল না ; গলদশ্রু আসিয়া তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল।

রামরতন ইহার পরে আর নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারিলেন না। গড়গড়ার নল ফেলিয়া দিয়া, চটি জুতাটা পায়ে গলাইতে গলাইতে বলিলেন—কোন্ ঘরে আছে সে?

সরোজের পড়বার ঘরে।—বস্ত্রাচ্ছাদিত-আনন গৃহিণী অতিকষ্টে কথা কয়টি কহিলেন।

ইস্! সে ঘরে যে সরোজের যত রাজ্যের ওষুধ বিষুধ রয়েছে! দেখি—বলিয়া দ্রুতপদে রামরতন প্রস্থান করিলেন। সরোজ রামরতনের জ্যেষ্ঠ পুত্র; এম্-এস্-সি পড়ে

দ্বারের বাহিরে যাঁহারা দাঁড়াইয়া জটলা, তথা দগ্ধ-বদনা ইন্দুর পারলৌকিক সদ্গতির ব্যবস্থা করিতেছিলেন, কর্ত্তাকে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রামরতন তাঁহাদিগকে সেস্থান হইতে চলিয়া যাইতে বলায় নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে তাঁহারা অদৃশ্য হইলেন। মানিনী কন্যার মানভঞ্জনের পালাটা অনাস্বাদিত রহিয়া যায় দেখিয়া তাঁহারা যে সন্তুষ্ট হইলেন না, তাহা বোধ করি আমার পাঠিকা-বৃন্দ সহজেই অনুমান করিতে পারিতেছেন।

পিতা শব্দ করিলেন না, আস্তে আস্তে দ্বারের কপাটে এক-খানি হাত রাখিয়া ডাকিলেন—মা ইন্দু! স্বরে ক্ষোভ নাই, তিরস্কার নাই, জ্বালা নাই, উত্তাপ নাই, অগাধ স্নেহ, অসীম মমতা চিরদিন যেমন উদ্বেলিত থাকিত, তেমনই উদ্বেলিত হইল।

সাড়া না পাইয়া, আবার ডাকিলেন—ইন্দু মা, দোর খোল মা। আর কেউ নেই, দোর খোল।

দ্বার খুলিয়া গেল। পিতা ঘরে ঢুকিতেই, কন্যা দ্বারটি পুনরায় অর্গলবদ্ধ করিয়া, বাপের বুকের উপর মুখ রাখিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন-বেগ দমন করিতে করিতে বলিল—তুমি আমায় কোন কথা বোল না বাবা। আমি পারবো না, তোমার কথাও আমি রাখতে পারবো না। আমরণ বিধবা হয়ে থাকতে হয়, তা'ও ভালো, তবু আমি যাব না, যাব না, কিছুতেই যাব না।

রামরতন কন্যাকে ধরিয়া, আস্তে আস্তে একটা কোচে বসিয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সস্নেহে বলিলেন—ছিঃ মা, অবুঝ হ'তে আছে কি? পুরুষের রূপ · তার বিদ্যা, তার গুণ, তার ঐশ্বর্য্য, তার হৃদয়। অবিনাশ রূপবান ন'ন সত্য, কিন্তু পরম গুণবান, বিদ্বান, ধনবান। শুনেছ ত মা, এণ্ট্রেন্স থেকে এম্'এ পর্য্যন্ত বরাবর ফার্ষ্ট হ'য়েছে; পাশ করতে না করতে অত বড় চাকরী পেয়েছে। এখনি পাঁচ শ' টাকা মাইনে পাচ্ছে, কালে দু'তিন হাজার হবে। তার বাপও যথেষ্ট অর্থ সম্পত্তি—

মেয়ে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—তাই বলে—? না বাবা না, আমি পারব না, পারব না, পারব না, এই তোমায় বলে দিলুম। মানুষের কি অমন চেহারা হয়!—উঃ!—দুই হাতে মুখ চাপিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ইন্দু ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

রামরতন আস্তে আস্তে, সান্ত্বনার স্বরে বলিতে লাগিলেন—মা ইন্দু, তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের মুখে এ কথা শুনব এ ত আমি আশা করি নি মা। লেখা পড়া শিখেছ, বি-এ পাশ দিয়েছ, তোমার মত মেয়েও যদি পুরুষের বিদ্যা, গুণ, ঐশ্বর্য্য উপেক্ষা ক'রে—ছাই রূপ যাচাই ক'রতে চায়, তাহ'লে, তার চেয়ে লজ্জার কথা আর কি হ'তে পারে বলতো মা?

কিন্তু বাবা, এর চেয়ে যে বনমানুষও ভাল!

ওকথা বলতে নেই মা!

দ্বারে করাঘাত শ্রুত হইল। রামরতন নিম্নকণ্ঠে কহিলেন, তোমার মা এসেছেন। ইন্দু, বড় মুখ ক'রে সকলের সামনে বলে এসেছি, আমি আমার মা'কে নিয়ে আসছি। আমার মুখ কি তুমি রাখবে না মা? তোর বাবার এতটুকু কষ্ট যে তোর বুকে শেলের মত বাজে ইন্দু! দুনিয়াসুদ্ধ লোক তোর বাবাকে উপহাস করবে, ধিক্কার দেবে, তুই তা সহ্য করতে পারবি মা আমার?

ইন্দু অশ্রুভারনত কণ্ঠে কহিল—বাবা, আমি যদি তোমার বাড়ীতে না থাকি, অন্য কোথাও চলে যাই?

পিতা বলিলেন—তাহ'লে দু'দুটো কলঙ্কের বোঝা বয়ে তোমার বাবাকে পৃথিবীসুদ্ধ লোকের ঘৃণার পাত্র হ'য়ে বেড়াতে হ'বে।

কিন্তু বাবা—বলিয়াই সে আবার আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দ্বারে পুনঃপুনঃ করাঘাত হইতেছিল: এক্ষণে রুক্ষ ও কর্কশ কণ্ঠও শ্রুত হইল—দরজা খুলবে না কি?

রামরতন ইন্দুর মুখখানি তুলিয়া ধরিতে ধরিতে বলিলেন—বল মা, দোর খুলে দিই?

না বাবা না—সে আমি কিছুতেই পারব না।

তবে আর কি বলবো মা! আজ আমার বাড়ীতে এই ঘটনা ঘট্‌লে তোমার অন্য বোনেদের কি অবস্থা হ'বে তা বোধ হয় তুমিও বুঝতে পারছো! এ বাড়ীর মেয়ে কেউ ঘরে তুলবে না; সকলেই বল্‌বে, ঐ রামরতন ঘোষের মেয়েগুলো—বাবা!

রামরতন নিঃশব্দে কন্যার পানে চাহিয়া রহিলেন। ইন্দু কিছু বলিতে চাহিল; কিন্তু পারিল না। রামরতন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, তোমার গর্ভধারিণী গলায় দড়ি দিয়ে মরবেন প্রতিজ্ঞা করেছেন; আমি বুড়ো মানুষ, আত্মহত্যা ক'রে পরকালটাও নষ্ট করতে পারবো না, লোকালয় ছেড়ে, সংসার ছেড়ে যেখানে হোক্ একদিকে চলে যেতেই হ'বে। সন্তানের জন্ম দিয়েছি, তোদের গলা টিপে মারতেও ত পারব না, তোরা যা ভাল বুঝিস্ করিস্, আমাকে বিদায় দে।

বাপের কথাগুলার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েও ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল, বাপ যখন কথা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ইন্দুও উঠিল, কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল—দাঁড়াও বাবা।

পিতা দাঁড়াইলেন।

ইন্দু বলিল—আমি যাব; তুমি একটু বোস বাবা, আমি আস্‌ছি—বলিয়া সে কক্ষসংলগ্ন স্নান-কামরায় চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তুমি চলো বাবা, আমি আসছি। না, তুমি একটু পরে এসো, আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেয়ো। কি থাক্, তার দরকার নেই, তুমি চলো বাবা।

কন্যা পিতার হাত ধরিল, উভয়ে ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। দ্বারের বাহিরে কন্যার মাতা ও অন্যান্য বহু আত্মীয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া কোন দিকে না চাহিয়া, ক্ষিতিতলন্যস্তনেত্রে পিতা ও পুত্রী বিবাহ-আসরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

বহির্বাটীতে পা দিতেই, সরোজ ম্লান মুখে কহিল, তারা চলে গেছে।

বৃদ্ধের পা দু'টি কাঁপিল কিম্বা ধরিত্রী কাঁপিয়া উঠিলেন বলিতে পারি না, বৃদ্ধ কন্যার হাত ছাড়িয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িলেন। ইন্দু একবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পানে, একবার পিতার পানে চাহিয়া, তখনই ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া আবার সেই ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া পড়িল। পাপিষ্ঠা এবার আর কাঁদিল না, যেন অব্যাহতি লাভ করিয়াছে এই ভাবে পরম নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

তাহার পরে যাহা ঘটিল, তাহা প্রকাশ করিবার বাসনা আমাদের নাই এবং তাহার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াও আমরা মনে করি না।

তবে বরের পলায়নের কথাটা অর্থাৎ 'পলায়ন-পর্ব্ব'টা সংক্ষেপে বলিতে পারি। বেচারা বরটির বিবাহ করিতে ইচ্ছা কোন কালেই ছিল না। সে হিন্দু আইন ঘাঁটিয়া তাহারই বিশেষজ্ঞ হইবার চেষ্টায় সমাহিত ছিল। দেবাদিদেব মহাদেবের তপোভঙ্গ করিবার জন্য যেমন লোকাভাব হয় নাই, এই ক্ষুদ্র-মনুষ্য বেচারার সমাধিভঙ্গের জন্যও তেমনই লোকাভাব ছিল না। তাঁহারাই 'ধ'রে-ভদ্রে' এই কাণ্ডটি ঘটাইলেন। তাহার পর, চারি চক্ষু মিলিত হইবার পর-মুহূর্ত্তেই বধূ যে-ভাবে কাজললতা দিয়া গাঁটছড়া কাটিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, বেচারা তাহাও দেখিয়াছিল এবং অন্তঃপুরে যে-ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে দূতমুখে তাহাও শুনিয়াছিল। তবুও 'আশে রেখেছি রে প্রাণ, সে আসিবে ফিরে' বলিয়া সে হয়ত বসিয়াছিল, কিন্তু যখন শুনিল, বাধ্য হইয়া এখানে আসিতে হইলে, তাহার পূর্ব্বেই পোটেসিয়াম সায়ানাইড খাইয়া কন্যা ইহলীলা সম্বরণ করিতে বদ্ধপরিকর, তখন সে আর কোন মতেই নিজেকে বসাইয়া রখিতে পারিল না। সেই দারুণ দুর্যোগের মধ্যেও, আহারাদি সারিয়া, তারস্বরে দুর্গানাম করিতে করিতে বরযাত্রীরা প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছিল, নিতান্ত আত্মীয় দুই একজন বিবাহ শেষ না হইলে যাওয়া চলেনা বলিয়া ভাঙ্গা আসরে তাকিয়া মাথায় দিয়া কড়িকাষ্ঠ গণনা করিতেছিল অথবা প্রাকৃতিক ও অ-প্রাকৃতিক দুর্দ্দৈবের বিষয় চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ হইতেছিল। বর তাহাদের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া, চেলী ছাড়িয়া, তাহাদেরই দুইখানা চাদরে দেহাচ্ছাদিত করিয়া কন্যার গৃহের সকলের অজ্ঞাতে রাস্তার হাঁটুজল, মাথার উপরে মুষল-ধারা ও বজ্রপাত অগ্রাহ্য করিয়া, যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেই-খানেই ফিরিয়া গেল।

বেচারা!

পর বৎসর হিন্দু-আইনের 'ডক্টর' হইয়া, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে হিন্দু-আইনের ব্যাখ্যা করিতে "এস্, এস্, ভাইস্‌রয় অফ্ ইণ্ডিয়া"য় চড়িয়া বিলাত যাত্রা করিল। দেশে ফিরিতে যে ইচ্ছা নাই, সুবিধা হইলে যে সেখানেই থাকিয়া যাইবে, এ সদিচ্ছাও আত্মীয় বন্ধুজনের অজ্ঞাত রহিল না। বন্ধুরা কেহ-কেহ সেই দেশেই একটি বিয়ে-থা করিয়া ফেলিতে পরামর্শও যে না দিল, তাহা নহে।

বলিল, বাপ, এদেশের তাম্রবর্ণারাও যাহাকে বিবাহবাসরে তালাক্ দেয়, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া শ্বেতদ্বীপবাসিনী শ্বেতাঙ্গিনী-সমাজের Beauty and the Beastএর গল্প অলিখিত থাকাই শ্রেয়ঃ।

বেচারা !!

এদিকে, এক বৎসরে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে ; আমরা ধীরে ধীরে সে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ইন্দু সধবা অথবা কুমারী কিম্বা বিধবা, সে সমস্যার সমাধান করিয়া লইবার জন্য স্বগৃহে-পরগৃহে যখন তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন দেখিয়া ইন্দু একটি শিক্ষয়িত্রীর কাজ যোগাড় করিয়া ফেলিল ; পিতা নিয়োগ পত্র দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন ; মাতা হুতাশনবৎ জলিয়া উঠিয়া, কলিকাল, ইংরেজী লেখাপড়া, মুখপোড়া কলেজ ও কলেজের দগ্ধবদন মাষ্টারবর্গের আদ্যকৃত্য করিতে লাগিলেন। কন্যা নিজের কাপড়-চোপড়, পুঁথিপত্র গুছাইয়া লইয়া যখন অজানা অচেনা সেই জায়গায় চাকরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল, মাতার দুর্নিবার ক্রোধ তখনও শান্ত হইল না ; কন্যা জননীর চরণ স্পর্শ করিল, মাতা সেদিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

পিতা ঘোড়ার গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, অশ্রু-গদগদকণ্ঠে কহিলেন—চিঠি লিখিস্ মা।

ইন্দু এতাবৎ যথেষ্ট দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছিল, আর পারিল না ; কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—লিখ্‌বো, বাবা।

পিতা হাত বাড়াইয়া কন্যার মস্তক স্পর্শ করিলেন।

কন্যা কহিল, আমি লিখলে তুমি এসো বাবা, আমার কাছে।

সে চাকরী বেশীদিন করিতে হয় নাই।

স্কুলের যিনি সেক্রেটারী, তিনি হঠাৎ স্কুলের প্রতি অতি মাত্রায় অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। সময়ে ও অসময়ে, কাজে এবং অকাজে তাঁহাকে ঘন ঘন স্কুলে আসিতে হইতেছিল এবং বিশেষ করিয়া নবাগতা শিক্ষয়িত্রীটির সঙ্গে তাঁহার যত সলা পরামর্শ। স্কুলটিকে উন্নত ও সংস্কৃত করিবার জন্য তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে যে-সমস্ত নব-নব প্ল্যান পল্লবিত হইতে সুরু করিতেছিল, জল সিঞ্চন করিয়া সেগুলিকে বিরাট ও বিশাল মহীরুহে পরিণত করিতে একমাত্র ইন্দুই পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া, নিজের ও স্কুলের ভবিষ্যৎ একেবারে ভাগীরথীগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া সে সেখান হইতে বাস উঠাইল। ইতিমধ্যে কয়েক জায়গায় দরখাস্ত পাঠাইয়া রাখিয়াছিল, তাহারই মধ্য হইতে একটি স্কুলে সহঃ-প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদে তাহার আহ্বান আসিল।

এখানে আসিয়া সে বাঁচিয়া গেল। সেক্রেটারী বৃদ্ধ ভদ্রলোক, প্রথম দর্শনেই তাহাকে কন্যা সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন এবং সকালে একঘণ্টা ও সন্ধ্যায় একঘণ্টা স্বীয় কন্যা ও পুত্রবধূকে পড়াইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। স্কুলের মাহিনা বাদে আরও পচিশটি টাকা পাওয়া যাইবে শুনিয়া ইন্দুও আনন্দিত হইল। প্রাইভেটে এম-এ দিতে পারিবে ভাবিয়া, সে অধিকতর খুশী হইল।

স্কুলের খাতায় নাম লেখা ছিল, মিস্ ইন্দু ঘোষ। সকলেই তাহাকে মিস্ ঘোষ বলিয়াই জানে। তাহার উপর দিয়া কত বড় দুর্যোগ যে চলিয়া গিয়াছে কে তাহার খবর রাখে ! সেক্রেটারী বাবুর গৃহিণী 'মেয়ে'টির একটি বিবাহ দিবার জন্য কর্ত্তাকে প্রায়ই ধরিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, তোমার স্কুলের মাষ্টারণীগুলোকে ত দেখিছি, মাগো, কেউ যেন রক্কেকালীর ছানা, কেউ হাড়গিলের ননদ, কেউ বা শ্যাওড়া-তলার পরী ! এই মেয়েটিই সৃষ্টিছাড়া, গোত্রছাড়া ! যেমন সুন্দর মানানসই চেহারা, তেমনই শান্ত স্বভাব। এ মেয়েকে, বাপু, ভগবান মাষ্টারী করবার জন্যে তৈরী করেন নি, এ আমি তোমায় বলে রাখছি।

কর্ত্তা কাণ দিতেছেন না তাই রক্ষা, নহিলে ইন্দুকে বিপন্ন হইতে হইত। কর্ত্তা বলেন, বিয়ে করবে না ব'লেই শিক্ষা-

বিভাগে চাকরী নিয়েছে; প্রাইভেটে এম্-এ দেবে, খুব পড়াশোনাও করে। কেন বেচারাকে জ্বালাতন করো!

গৃহিণী জ্বালাতন করিতে সাহস করেন না বটে, তবে এমন একটা সুন্দরীর নারী-জীবনটা ব্যর্থ হইয়া যায়, ইহাও তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। কর্ত্তার কাছে আর কথা পাড়েন না সত্য, কিন্তু দৈবাৎ ইন্দু কোন দিন তাঁহাদের বাড়ীর মধ্যে আসিয়া পড়িলে, তাহার গায়ে, মাথায়, মুখে, বুকে ঘন ঘন হাত বুলাইয়া দিতে দিতে নানারূপ সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ ও হাস্য-কলরবমুখরিত এমন একটী গৃহচ্ছবি অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হ'ন যে বেচারী মাষ্টারণীর আপাদমস্তক শিহরিতে থাকে।

ইহার পরে ইন্দু সেক্রেটারীবাবুর বাড়ীর কাজ দু'টা ছাড়িয়া দিল। কৈফিয়তে বলিল, নিজের পড়াটা ভাল হয় না তাই ছাড়ছি।

সেক্রেটারীবাবু আসল কথা বুঝিলেন, তস্য গৃহিণীও বুঝিলেন, তবে উভয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্য বশতঃ জিনিষটা উভয়েই ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিলেন। কর্ত্তা ভাবিলেন, মন্দ কি! এম-এ পাশ করিয়া অনায়াসে একটা সরকারী চাকরী লইয়া সুখে জীবনাতিবাহিত করিতে পারিবে, আর যে বিদ্যার মোহে নারীকে সংসার বিদ্বেষী, সন্তান-কামনাবিমুখ করে, সেই অবিদ্যার মুখমণ্ডলে গৃহিণী গণিয়া সাত থাংবা ও প্রজ্বলিত নুড়ার ব্যবস্থা করিলেন।

আসল কথাটা বলা হয় নাই. গৃহিণীর একটি অবিবাহিত ভ্রাতা ছিলেন, তিনি একটী বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। উচ্চশিক্ষিতা এবং সুন্দরী মহিলা সুপ্রাপ্য না হওয়ায় তিনি আজও বিবাহ করেন নাই এবং পরেও করিবেন না ইহাই সঙ্কল্প। ইন্দু উচ্চশিক্ষিতা এবং সুন্দরী—এমন সংযোগ, মণি-কাঞ্চন সংযোগ বড় হয় না। গৃহিণীর ধারণা, কুরূপা মেয়েরাই লেখা-পড়া করে অথবা বেশী লেখা-পড়া করিলেই কুরূপা হইয়া যায়। নজীরস্বরূপ তিনি বলিয়া থাকেন, তাঁহার কর্ত্তাটী বিশ বৎসরকাল ঐ মেয়ে স্কুলটার সেক্রেটারী, কত বি-এ, এম এ পাশ করা মাষ্টারণী আসিল গেল, একটারও হাড়ের উপরে মাংস তিনি দেখেন নাই, আবার যদি বা মাংস দেখিয়াছেন, তাহারও এত আধিক্য দেখিয়াছেন যে মনে হইয়াছে সাতটি শার্দ্দুলাদি হিংস্র জীবে সাতদিন চেষ্টা করিলেও সে দেহের বিশেষ কিছু ক্ষতি করিয়া উঠিতে পারিবে না। ইন্দুকে দেখিয়া গৃহিণীর মনে ধরিয়াছে এবং তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া পিতৃপিতামহের বংশের নাম রক্ষা করিবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন।

গ্রীষ্মাবকাশে কলেজ বন্ধ হইলে, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পুনঃ পুনঃ আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অধ্যাপক পঙ্কজ মিত্র মহাশয় আসিয়া দেখা দিলেন। কর্ত্তা প্রকাশ্যে কিছু না জানিলেও, অনুমানে সবই জানিতেন; একটু হাসিলেন মাত্র; গৃহিণী পরম পুলকিত।

গৃহিণী লোকটি সেকেলে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! একালেও তিনি misfit বা বেমানান্ নহেন। একদিন রাত্রে তিনি ইন্দুকে ও সেই সঙ্গে আর দুই তিনটি শিক্ষয়িত্রীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ইচ্ছা ছিল, একা ইন্দুকেই খাইতে বলেন, কিন্তু পাছে কোন ছুতায় না আসে, তাই দুই তিন জনকে নিমন্ত্রণ করিলেন। শুনিয়া কর্ত্তা মহাশয় আবার ঈষৎ হাস্য করিলেন। সদর হইতে ইনস্পেক্টার বা কোন পদস্থ কর্ম্মচারী আসিলে টেবিল-চেয়ারে খানা হইত, অন্য সময়ে টেবিলখানার কাষ্ঠ-অঙ্গ ধূলি-মলিন অবস্থায় উঠানে পড়িয়াই থাকিত, আজ সে টেবিল-চেয়ার গৃহিণীর শুভেচ্ছায় চক্‌চকে হইয়া উঠিল। টেবিল শুভ্র বাস পরিধান করিল। কাচের ডিস্, প্লেট, কাঁটা, চামচ, ছুরী প্রভৃতি অজ্ঞাতবাস হইতে আত্মপ্রকাশ করিল। কর্ত্তার আদালতের পেয়াদা (কর্ত্তা সরকারী উকীল) কোমরে সাদা ন্যাপকিন জড়াইয়া ওয়েটার রূপ পরিগ্রহ করিল। কর্ত্তাকে সকাল সকাল খাওয়াইয়া গড়গড়া ও আইন-পুস্তকাদিসহ উপরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল; কর্ত্তা আপত্তি করিলেন না, সকলের অলক্ষ্যে একটুখানি হাসিলেন মাত্র। স্থির হইল, পঙ্কজ ও শিক্ষয়িত্রী তিনটি টেবিলে বসিয়া খানা খাইবে, গৃহিণী খাইবেন না তিনি ও-সব ছাই পাঁশ খান্ না—বসিয়া খাওয়াইবেন। কি ভাবে ইন্দুকে পরিচিত করাইবেন, ভ্রাতৃবরের মেডেলগুলা, থীসিস্-এর কাগজগুলা একটির পর একটি ইন্দুবালার প্রশংসমান দৃষ্টির সম্মুখে ধরিয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া দিবেন, গৃহিণী দুই দিন যাবৎ তাহারই মহল্লা দিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু, সেই যে ইংরাজী প্রবাদ আছে, কাপে ও লিপে সম্মেলনে অনেক অন্তরায়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। মাষ্টারণীরা সেক্রেটারীণী গৃহিণীকে ধন্য করিতে আসিলেন বটে, কিন্তু ইন্দু আসিল না।

সে নাকি তাহার পিতৃবিয়োগের সংবাদ পাইয়া বিকালের গাড়ীতেই কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। ছুটী লইয়া যাইতে পারে নাই, সেখান হইতে চিঠি লিখিবে বলিয়া গিয়াছে।

আর্দালী-ওয়েটারকে ইঁহাদের খাওয়াইতে বলিয়া গৃহিণী কর্ত্তার দ্বারস্থ হইলেন; বলিলেন—যদি কোন মাষ্টারণী তোমার কাছ থেকে ছুটী না নিয়ে চলে যায়, তার চাকরী থাকে, না যায়?

কর্ত্তা কোন উত্তর না দিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া শুইয়া রহিলেন।

গৃহিণী পুনরপি জিজ্ঞাসিল—বল না, চাকরী থাকে, না যায়?

যাবারই কথা; তবে যদি হেড মিষ্ট্রেসের কাছে ছুটী নিয়ে থাকে, তা' হলে—

তা'ও যদি না নেয়?—তা হলে?

কর্ত্তা সহাস্তে কহিলেন—যাওয়াই উচিত। কিন্তু আসল কথাটা কি, তাই বল? নতুন মাষ্টারণী ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছে বুঝি? পালিয়েছে?

আর যায় কোথায়? গৃহিণী সেইখানেই ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া একেবারে হাউমাউ শব্দে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন—ষড়যন্ত্র করবো আমি! ষড়যন্ত্র করবার লোক আমি! আর ষড়যন্ত্রই বা কিসের। তার ভালোর জন্যই না আমি—

কর্ত্তা বলিলেন—সবাই কি ভালো বুঝে নিতে পারে গা!

গৃহিণী এ কথার সদর্থ করিতে না পারিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—তোমা হ'তেই ত হোল এই সব। সেই সময় তুমি যদি একটু বলতে, মাগী তোমার কথা ঠেলতে পারতো না। পঙ্কজ যে আমার ভাই, তার জন্যে তুমি চেষ্টা করবে কেন? হোত নিজের ভাই, দেখতুম কর কি-না!—বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ফোঁস ফোঁস শব্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ভৃত্য কলিকা বদলাইয়া দিতে আসিয়াছিল, কর্ত্তা তাহাকে বলিলেন, নীচে যাঁহারা খাইতেছেন, তাঁহারা যেন দেখা করিয়া যান্।

সিঁড়িতে পদশব্দ হইতেই গৃহিণী অন্যত্র চলিয়া গেলেন, তিনি যেন আর কাহাকেও সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। এমন কি, ভ্রাতা পঙ্কজও অনেক খোঁজাখুজি করিয়া সে রাত্রে দিদির দর্শন লাভ করিতে পারিল না।

কর্ত্তা শিক্ষয়িত্রীদের নিকট সব কথা শুনিয়া ইন্দুর ছুটী মঞ্জুর (দরখাস্ত না আসিতেই) ত করিলেনই, উপরন্তু তাহার ঠিকানা জানা থাকিলে মাহিনা-তারিখে তাহার প্রাপ্য অর্থ মণিঅর্ডারে পাঠাইয়া দিতেও আদেশ দিলেন; বলিলেন, এ রকম বিপদের সময় হাতে টাকাকড়ি না থাকিলে বিপদ শত গুণ বর্দ্ধিত হয়।

শুনিয়া গৃহিণী দুপ্‌দাপ্ করিতে করিতে বারান্দা দিয়া ওদিকের একটা ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন।

সে রাত্রে ভৃত্য হরিচরণের হাত দুখানা তামাক সাজিতে সাজিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এ খবর পরদিন প্রভাতে সে বাড়ীর, তাই বা কেন, সে পাড়ার লোকেরও অগোচর রহিল না। এতটা বয়স পর্য্যন্ত একলা শোয়ার বদভ্যাস না থাকায় ঘুম হইল না এবং ঘুম না হইলে ক্রমাগত কলিকা বদলাইতে হয়—দুনিয়ায় বোধ করি এই নিয়ম।

৪

পিতৃশ্রাদ্ধের সময়টাও ইন্দু মা, ভাই, বোনদের সঙ্গে থাকিতে সাহস করিল না। কি জানি কোন দিক দিয়া কি একটা কথা উঠিয়া পড়িবে, সে বড়ই বিশ্রী হইবে—শ্রাদ্ধের দুই দিন পূর্ব্বে সে একটা ছাত্রী-আবাসে গিয়া উঠিল এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। চাকরীতে সে ইস্তফা দিয়াছে, সেই সঙ্গে সেক্রেটারী বাবুকে ও তস্য গৃহিণীকে অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া বিদায় চাহিয়া লইয়াছে।

ইন্দু এম্-এ পাশ করিয়াছে; সরকারী শিক্ষা-বিভাগে চাকরী লইয়া নানাদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বোনদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ভাইটি বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছেন, ছেলে-পুলে হইয়াছে, মা সম্প্রতি কাশীবাস করিতে গিয়াছেন, মা'র চিঠিতেই ইন্দু এ সকল খবর পাইয়াছে, কিন্তু আর বাড়ীতে যায় নাই। এক সময়ে কিছুদিন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় থাকিতে হইয়াছিল, তখনও বাড়ীতে উঠে নাই, একটা ছাত্রী নিবাসেই ছিল। ভাই আসিয়া দিন দুই তিন দেখা করিয়া গিয়াছিলেন।

তারপর দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে ; এই দশ বৎসর ইন্দুর কোন খবর কেহ পায় নাই—তাহার মা'র নামে মাসে মাসে সে কিছু টাকা পাঠাইত, বৎসরখানেক তাহাও বন্ধ হইয়াছে, মা'র কাশী-প্রাপ্তি হইয়াছে।

সম্প্রতি সে কলিকাতার কাছেই হুগলীতে বদলী হইয়া আসিয়াছে। সরোজ গেজেট দেখিয়া, হুগলীর ঠিকানায় একখানা পত্র দিল ; তাহার উত্তর পাইবামাত্র, একদিন সপরিবারে হুগলীতে ইন্দুর বাসায় আসিয়া উঠিল।

সরোজের দু'বছরের ছেলে রমি 'পিতি'কে পাইয়া বসিল। সকলেই অবাক। ইন্দু সাধারণতঃ গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তাহার চেহারাতেও একটা বিভিন্নতা সর্ব্বদা পরিস্ফুট থাকিত, ছোট ছেলেমেয়ে তাহার কাছেও ঘেঁসিত না, কিন্তু এই ছেলেটা 'পিতি' বলিতে অজ্ঞান। 'পিতি' তাহাকে দুধ খাওয়াইবে, 'পিতি' "নাজকন্যের দপপো" বলিবে, 'পিতি'র খাটে না হইলে মুখপোড়া ছেলে শুইবে না, এমনই সব উপদ্রব আরম্ভ করিল। প্রথমটা ইন্দুর কাছে এসব কি খারাপই লাগিত—কেমন করিয়া, ভুলাইয়া, রাজকন্যার গল্প বলিয়া দুধ খাওয়াইতে হয়, তা সে জানিবে কোথা হইতে ? রাত্রে ছেলেটাকে তুলিয়া মাঝে মাঝে একটা কাজ করাইতে হয়, নহিলে যে শয্যা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, এ জ্ঞানই বা তাহার জন্মিবে কিরূপে ? প্রথম কয়দিন ভারী অসুবিধা হইয়াছিল কিন্তু মায়াবী ছেলেটা ক্রমেই তাহার মায়াজালখানি এমনই নিপুণতার সহিত বিস্তার করিতেছিল যে ইদানীং ইন্দু তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতেই পারিত না। স্কুলে যাইবার সময় রমির হাতে সিকি, আধুলী, টাকা দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়া যাইত। আর ফিরিবার সময় মনোহারী দোকান হইতে রোজই দু'একটা খেল্‌না, পুতুল আনিয়া তাহার হাতে দিয়া, অনুপস্থিতি-জনিত অপরাধের মার্জ্জনা চাহিয়া লইত।

সরোজের ফিরিবার সময় উপস্থিত হইলে, রমিকে লইয়াই সকলের ভাবনা। রমি ও রমির 'পিতি'র ইচ্ছা, রমি এখানেই থাকে। রমির মায়েরও যে অনুরূপ ইচ্ছা তাহা নহে—তবে তাহার ইচ্ছার মূলে একটি বিশেষ কারণ ছিল যাহা রমি, রমির পিতা ও রমির 'পিতি'র ইচ্ছা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ! তাহার বিশ্বাস, রমির 'পিতি' বরাবর বড় বড় চাকুরী করিয়াছে, হাতে অনেক পয়সাকড়ি জমিয়াছে, একটা ছেলে 'আত্মি-সুয়ো' হইয়া থাকিলে আখেরে ভালই হইবে—কিন্তু কোলের ছেলেটিকে ছাড়িয়া প্রাণ ধরিয়া থাকাও ত সহজ নয়।—তাই অনেক চিন্তার পর স্থির হইল, আপাততঃ রমি ফিরিয়াই চলুক, প্রতি শনিবার-রবিবার তাহাকে তাহার 'পিতি'র কাছে আনিয়া দেখাইয়া লইয়া যাওয়া চলিবে। তারপর, আর কয়েক মাস পরেই, রমির একটি ভাই বা বোন্ যাহা হোক্ একটা হইলে তখন গৃহিণী রমিকে হুগলীতে 'পিতি'র কাছে অবশ্যই রাখিয়া দিতে পারিবেন। যাইবার সময় রমির সে কি কান্না ! ইন্দুর চোখ দু'টাও ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, যদি না ঠিক সেই সময়ে তাহাদের মিশন স্কুলের মেম আসিয়া পড়িতেন, সেও হয় ত রমির মতই আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া কাঁদিয়া ভাসাইত।

সেই রাত্রেই সে বদলীর দরখাস্ত করিল, তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, দুইদিন না কাটিতেই তারযোগে ময়মনসিংহের বালিকা বিদ্যালয়ের অস্থায়ী প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদ পাইয়া ময়মনসিংহ চলিয়া গেল। শনিবারে পিতার ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া রমি আসিয়া 'পিতি'র বাড়ী খালি দেখিয়া ফিরিয়া গেল। রমির মাতা ঠাকুরাণী ভবিষ্যদ্বেত্তার মত বলিলেন—আমি সেই কালেই জানি, ওরা সব লোক সুবিধের নয়। নেহাৎ তোমরা ওপর-পড়া হ'য়ে গিয়ে পড়েছিলে, তাড়াতে ত আর পারে না, তাই মুখে আদর যত্ন দেখিয়েছিল। ওরা সব ছাড়া গরু, ঘরের ভাবনায় মন উঠবে কেন ? নইলে, মাগো, বিয়ের রাত্রে মেয়েমানুষ নাকি আবার ··

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা অল্প লোকেই সহিতে পারে, সরোজও পারিল না ; প্রতিবাদ করিবার সাহসও অল্প লোকেরই থাকে, সরোজও সাহসী নহে ; সে অন্যত্র চলিয়া গেল। চাকরী ব্যাপদেশে হঠাৎ দেশ-বিদেশে যাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু খবর একটা দিয়া যাওয়াই ত উচিত ছিল ; কেন যে তাহাও দিল না, তাহাও সরোজ কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। ইন্দু হঠাৎ, না বলা না কহা, অন্তর্দ্ধান করিল কেন, এ সমস্যা আজও তাহার নিকটে অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে।

তা থাক্, তাহাতে কাহারও কিছু আসে যায় না—ইন্দুকে লইয়াই আমাদের গল্প, আমরা তাহার কথাতেই ফিরিয়া আসি।

স্কুলটি বড়, অনেক মেয়ে পড়ে, সংলগ্ন বোর্ডিঙে থাকে; কাজ যথেষ্ট, অবসর কম, ইন্দু কাজের মধ্যে ডুবিয়া যেন বাঁচিয়া গেল। কিন্তু তবুও মুস্কিল! কোন একটি সুন্দর শিশু দেখিলে তাহার হাত দুইখানি যেন আপনা হইতেই প্রসারিত হইতে থাকে; কজ্জলচিত্রিত-আঁখি কোন শিশুকে কাছে পাইলে তাহার চিরশুষ্ক নারী-হৃদয় সাগর-তরঙ্গের মত লাফালাফি করিতে থাকে; গৌরসুন্দর দুইটি পুষ্ট অধরোষ্ঠ দেখিবামাত্র তাহার রসহীন পাণ্ডুর অধরোষ্ঠ যেন পিপাসায় ফাটিয়া মরে! সুপ্ত শীতল বক্ষ কাহার উষ্ণ-পেলব-স্পর্শে বারবার শিহরিয়া উঠে! কণ্ঠসংলগ্ন শিশু নিদ্রাঘোরে যখন তাহাকে চাপিতে থাকে, তখন ইন্দু যেন শত বাহু মেলিয়া, শত উত্তাল বক্ষের মধু উজাড় করিয়া তাহাকে অন্তরের অন্তরতম দেশে আকর্ষণ করিয়া করিয়া মরে! কোথা হইতে আসিল তাহার বক্ষে এত মধু, স্বপ্নের শিশু সমস্ত রাত টানিয়াও যেন শেষ করিতে পারে না! এ কি উপদ্রব! এ কি ব্যাধি—মহাব্যাধি! এ পাপ চিন্তা ত কোন কালে ছিল না, থাকার সম্ভাবনাও ছিল না, তথাপি এ চিন্তা সরীসৃপের মত সকল অঙ্গে নিঃশঙ্কে বিচরণ করে, যায় না, যায় না—কিছুতেই তাহাকে ছাড়ে না। স্কুলের সময়টা বেশ কাটে, সকালে রাত্রে বোর্ডিঙের মেয়েদের পড়াশুনার তদারক করিতেও ভাল লাগে, কিন্তু বিপদ, পথে বা সহরে বেড়াইতে বাহির হইলে। ইন্দু বোর্ডিঙের বাহির হওয়া ছাড়িয়া দিল। সহকর্ম্মিণীরা অনেক ডাকাডাকি করিতেন, উচ্চশ্রেণীর মেয়েরাও অনুরোধ উপরোধ করিত, ইন্দু হাসিয়া উড়াইয়া দিত।

এমনই চলিতেছিল। ক্রমে, কাজের ভার বৃদ্ধি পাওয়াতে অন্য চিন্তার অবসর রহিল না—ইন্দু এবার সত্য-সত্যই বাঁচিয়া গেল। স্কুলের যিনি সেক্রেটারী, তিনি এক অদ্ভুত লোক। স্কুলে আসা, কাজকর্ম্ম দেখা, খাতাপত্র পরীক্ষা করা ত দূরের কথা, কোন একটা ব্যাপারে তাঁহার একটি সহি আদায় করিতে স্কুলের দরোয়ানগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। তিনি স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ, শুনা যায়, সেখানেও ঐ অবস্থা। একজন সহকারী সেক্রেটারী আছেন, বালিকা বিদ্যালয়ের কাগজপত্র মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে যায়, অধিকাংশ ব্যাপার প্রধানা শিক্ষয়িত্রীই করিয়া দেন। তাহাতে কাজের কোনরূপ বিঘ্ন ত হয়ই না, উপরন্তু বেশ সুশৃঙ্খলাতেই চলিয়া যায়।

ইন্দু কাজ চায়, কাজেই সে ভাল থাকে। যে কাজ কামনা করে, সে কাজ পায়ও।

৫

চৈত্র মাস, প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভ হইতে বেশী দেরী নাই, এমন সময়ে বিসূচিকা মহামারীরূপে শহরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বিদ্যালয়ের বোর্ডিঙে একদিনে পাঁচ সাতটি মেয়ে আক্রান্ত হইল—তিনটি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা গেল। তখন আর মেয়েদের কিছুতেই রাখা গেল না। তাহারা এবং অধিকাংশ শিক্ষয়িত্রী একযোগে শহর ছাড়িয়া যাইতে চায়। ইন্দু সেক্রেটারীকে ব্যাপারটা লিখিয়া পাঠাইল, দরোয়ান ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, সেক্রেটারী সাহেবের ভি ব্যামো! তাঁহার চাকর বাকর সব পালাইয়াছে, একা তিনি ঘরের মধ্যে পড়িয়া আছেন, মেথরটা পালায় নাই, সে-ই শুধু কাছে আছে। তাঁহারও বোধ হয় আর বেশী দেরী নাই।

দরোয়ান আরও খবর দিল, বাজারে দশ পনেরোটা শব পড়িয়া আছে, সে নিজে দেখিয়া আসিয়াছে, সৎকার করিবার লোক জুটিতেছে না।

বিদ্যালয়ের বোর্ডিঙের পাচিকার অবস্থাও খুব খারাপ। যাহারা-যাহারা যাইতে চায়, ইন্দু তাহাদিগকে অনুমতি দিল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বোর্ডিঙের দ্বিতলে সে এবং একতলে সেই দরোয়ান ছাড়া আর কাহাকেও দেখা গেল না—পাচিকাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। একটী ছোট্ট মেয়েকে ইন্দু নিজের কাছে রাখিতে চাহিয়াছিল, সে মেয়েটির নাকি কেহ নাই। ইন্দুর মাতৃত্ব এই দারুণ দুঃসময়ে সেই মেয়েটিকে বুকে লইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতেছিল, কিন্তু মেয়েটা থাকিতে চাহিল না। তাহার এক দূর সম্পর্কের মাসী আছে, ইন্দুর মাতৃত্বের চেয়ে তাহাকেই সে আপন বলিয়া বুঝিল।

সহকর্ম্মিণীরা তাহাকেও স্থানত্যাগ করিতে সকাতর অনুরোধ করিয়াছিল, ইন্দু নড়িল না। কেন যাইবে? কোথায় যাইবে? তাহার আত্মীয়স্বজন দুই চারিজন থাকিলেও থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহার প্রাণের জন্য চিন্তা করিবে, এমন আত্মীয় ত কোথাও কেহ নাই। সে সত্যই নিশ্চিন্ত। এই নিশ্চিন্ততার মাঝে একখানি ছোট মুখ, দুইটি লাল-লাল কচি অধর, দুইখানি ক্ষুদ্র বাহু সমেত একটি গৌর শিশু তাহার চিত্তপট ভেদিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই মরুভূমিতে পান্থপাদপের মত ইন্দুর নিষ্করুণ নেত্রও ক্ষণেকের তরে সিক্ত হইয়া উঠিল। তখন সে স্কুলের আফিস-ঘরে ঢুকিয়া তাহার পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতা, তাহার যাহা-কিছু-সমস্ত একত্রিত করিয়া একখানা কাগজের উপর লিখিল :—

"আমার মৃত্যুর পরে আমার যা-কিছু ছিল বা আছে, সমস্তই আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সরোজকুমার ঘোষের পুত্র আড়াই বছরের রমিকে যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়।"

নাম স্বাক্ষর করিয়া, তারিখ দিয়া এবং সরোজের ঠিকানা লিখিয়া খামে ভরিয়া খামের উপর "যিনি খুলিবেন তাঁহার নিকট সবিনয় অনুরোধ" জ্ঞাপন করিয়া স্কুলের ক্যাশ-বাক্সে রাখিয়া বাহির হইয়া আসিল।

বিদ্যালয়-গৃহের সম্মুখেই চৌমাথা—একটি রাস্তা আদালতের দিকে, আর একটি কলেজের দিকে, একটি বাজারের দিকে, অন্যটি নানা পল্লীগ্রাম, মহকুমা ভেদ করিয়া আসামের দিকে গিয়াছে। এই চৌমাথাটা সকল সময়েই পথিক-সমাকীর্ণ থাকিত; আজ তাহা একেবারে জনশূন্য।

এই খাঁচার ভিতরে আবদ্ধ থাকিতে ইন্দুর যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। এখানকার কোন লোককে সে চিনে না, আসিয়া অবধি কাহারও সঙ্গে আলাপও করে নাই, এখানে হাসপাতালে রোগীর সেবা করিবার জন্য বাহিরের লোক লয় কিনা তাহাও সে জানে না। জানিলে, এখনই হাসপাতালে গিয়া আকর্ষণহীন, আকাঙ্ক্ষাহীন এই জীবনখানি আর্ত্তের সেবায় উৎসৃষ্ট করিয়া দিত। হঠাৎ মনে পড়িল, স্কুলের সেক্রেটারীর যে অবস্থা শুনিয়াছে, তাঁহার ত সেবার বিশেষ প্রয়োজন। সাক্ষাৎ-সূত্রে আলাপ না থাকিলেও সেখানে সে অনায়াসেই যাইতে পারে; এবং অযাচিত সেবা করিয়া জীবন ধন্য করিতেও পারে।

দরোয়ানকে সঙ্গে লইয়া সে সেক্রেটারীর গৃহের উদ্দেশে চলিল। তাহারা যখন তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে পৌছিল, তখন একজন ইংরাজ সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া অশ্বে আরোহণোদ্যত হইয়াছিলেন; ইন্দু দ্রুতপদে চলিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতেই ইংরাজটাই প্রথমে তাহাকে 'শুভ-প্রভাত' জ্ঞাপন করিলেন।

ইন্দু জিজ্ঞাসিল, আমি বোধ হয় ডাক্তার সাহেবের সহিত কথা কহিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতেছি?

হাঁ, আমি এখানকার সিভিল সার্জ্জন। আপনি কি ডক্টর গুহের আত্মীয়া?

মিষ্টার গুহ আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী, আমি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। কিন্তু আপনি কি উঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন?

ইন্দু জিজ্ঞাসিল—কেমন দেখিলেন?

সাহেব একটু ভাবিয়া বলিলেন—বলা শক্ত। আরও মুস্কিল কি জানেন? এমন একটি লোক নাই যে ভদ্রলোকের একটু সেবা করে, দেখা শুনা করে। হাসপাতালের একটি কম্পাউণ্ডার ছিল, কিছুক্ষণ হইল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে-ও সরিয়া পড়িয়াছে। দেখি যদি পারি কাহাকেও পাঠাইতে! হাসপাতালে যে স্থান নাই, নহিলে উঁহাকে—

আমি তাঁহার সেবা করিতে পারি?

পারিবেন? পারিলে ত খুবই ভাল হয়।

আমি সেই জন্যই আসিয়াছি।

সব জানিয়া শুনিয়া?

সব জানিয়া শুনিয়াই আসিয়াছি।

সাহেব একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—পবিত্রা রমণী! জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন। আপনি আসুন, আমি আপনাকে সব বুঝাইয়া দিই।

সাহেব অশ্বরশ্মি পুনরায় বৃক্ষকাণ্ডে বন্ধন করিলেন, তারপর ইন্দুকে সঙ্গে লইয়া গৃহের ঘরে ঢুকিলেন। নির্জ্জন নিশীথে অতর্কিতে বনপথে বাঘ দেখিলে লোকে যেমন চীৎকার করিয়া উঠে, ঘরে ঢুকিয়াই ইন্দুও তেমনই চীৎকার করিয়া উঠিল। সাহেব দুই হাতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন—আপনি ভয় পাইয়াছেন দেখিতেছি। রোগীর চেহারা বিকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু আপনি যে পরিমাণ ভয় পাইয়াছেন, সেরূপ খারাপ দেখাইতেছে না। আপনার স্নায়ুসমূহ খুব দৃঢ় নয়, মাপ করিবেন, আপনাকে এখানে থাকিতে দেওয়া অসম্ভব।

ইন্দু বলিল—কিন্তু আমি থাকিবই।

সাহেব সবিস্ময়ে দেখিলেন, সে ভয়ার্ত্ত মূর্ত্তি আর নাই। তথাপি বলিলেন—আপনি আবার ভয় পাইবেন না, নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন কি?

আমি ভয় পাই নাই সাহেব।

আপনি চীৎকার করেন নাই, তাই বলিতে চা'ন?

আমিই চীৎকার করিয়াছি—কিন্তু ভয়ে নহে।

মেথর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতেছিল, ইন্দু তাহার হাত হইতে পাখা চাহিয়া লইল। সাহেব বলিলেন, আপনার কথার উপর বিশ্বাস করিয়াই আপনাকে রাখিয়া গেলাম। ভগবান আপনাকে শক্তি দিন। কি কি করিতে হইবে, কখন কি ঔষধ দিতে হইবে, বুঝাইয়া দিয়া, আবার রাত্রে আসিবেন আশ্বাস দিয়া সাহেব চলিয়া গেলেন।

ভগবানের দয়া—সাহেব ডাক্তারের চিকিৎসা—প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সেবাযত্ন—ডক্টর অবিনাশ গুহ কৃতান্তের দক্ষিণ দুয়ার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৬

ঈষৎ সুস্থ হইয়া, ডক্টর গুহ বলিলেন—মেথরটা বল্‌ছিল আপনি আমাদের মেয়ে স্কুলের হেড মিষ্ট্রেস। স্কুলের খবর কি বলুন? সেখানে কারও—

স্কুল বন্ধ।

বন্ধ! মেয়েরা?

যে যার দেশে চলে গেছে ; অন্য মিষ্ট্রেসরাও চলে গেছেন। আপনি যান্ নি ?

ইন্দু চুপ করিয়া রহিল।

আপনি আমাকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। কর্ণেল ক্যানিংও তাই বল্‌ছিলেন, মেথরটাও তাই বলে। আপনার ঋণ আমি কখনও শোধ ক'রতে পারব না।—একটু থামিয়া আবার বলিলেন—আপনি এ স্কুলে কত দিন এসেছেন ? বেশী দিন নয় বোধ হয়। কেননা ইদানীং বছরখানেক স্কুলে আমি যেতে পারি নি, নানা ঝঞ্ঝাটে,—তার আগে—

আমি বেশী দিন আসি নি।

আপনি ত অস্থায়ীভাবে এসেছেন, না ? আচ্ছা, যাতে আপনি এখানে স্থায়ী হ'ন, তা আমি করব। আপনি কত'র গ্রেডে আছেন এখন ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ইন্দুর ঘৃণা-বোধ হইল ; সে কথা বলিল না। সে যে সেবা বিক্রয় করে নাই, এই কথাটা কেমন করিয়া এই লোকটাকে সে বুঝাইবে !

ডক্টর গুহ তাহার মনের ভাব বুঝিলেন কিনা বলিতে পারি না, ও সম্বন্ধে তিনি আর কিছু বলিলেন না। একটু পরে বলিলেন—আমার দ্বারা কখনও কোনও উপকারের সম্ভাবনা থাকলে আমাকে জানাবেন।

ইন্দু এইবার একটু তেজের সহিত বলিল—আপনি ওসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি উপকারের আশায় সেবা করি নি।

না—না—আমি তা বল্‌ছি নে, আপনি আমায় মাপ করবেন। কিন্তু—

আপনার ওষুধ খাবার সময় হোল—বলিয়া ইন্দু ঔষধ ঢালিয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দিল।

সন্ধ্যার পর, ডক্টর গুহ বলিলেন—আমি ত ভাল আছি, আপনি আর কষ্ট করবেন না, বোর্ডিংএ গিয়ে বিশ্রাম করুন গে। আমার ত আর কোনই কষ্ট নেই - দেখতেই পাচ্ছেন।

ইন্দু বলিল – ডাক্তার সাহেব না বল্লে—

আমি বলছি, আমার কোন দরকার নেই, আপনি থাকলে আমি কষ্টই পাব।

কিন্তু ডাক্তার সাহেব বলেন, এই সময়টাই বেশী সতর্ক থাকতে হয় ; এই সময়ে কাছে কাছে থাকা আত্মীয়স্বজনের পক্ষে খুব দরকার।

গুহ হাসিলেন, বলিলেন, ডাক্তারদের কথা ছেড়ে দিন। আর আত্মীয়স্বজন—চিরদিন আমার আত্মীয়স্বজন যারা তারা তো কাছে থাকবেই !—অদূরে দণ্ডায়মান মেথরটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—বেহারা এসেছে রে ?

জী !

তবে আর নয়, মিস ঘোষ, আর আপনি কষ্ট পাবেন না। এমনই আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন, কে কার জন্যে এত করে বলুন তো—জানা নেই, শুনো নেই, আত্মীয় নয়, বন্ধু নয়—আপনি যা করেছেন, কোন স্ত্রীও তার স্বামীর জন্যে এত করে কিনা সন্দেহ ! কর্ণেল ক্যানিং-এর কাছে ত শুনেছি, আপনার সেবার জোরেই এ যাত্রা যমরাজ দরজা থেকেই ফিরে গেছেন। কিন্তু আর নয়, আর ঋণ বাড়াতে আমি আপনাকে দোব না।

ইন্দু তাঁহার পায়ের কাছে একটা চেয়ারে বসিয়াছিল. হঠাৎ কাঁদিয়া বিছানায় আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল--তুমি আমায় তাড়িয়ে দিলেও আমি যাব না, যাব না—এখান থেকে যাব না।

অবিনাশ গুহের চিন্তার তার ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, চোখে ঝাপসা দেখিতেছিলেন, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, বলিলেন—তুমি আমাকে তুমি বলে ডাক্‌ছ, কে তুমি, কে তুমি ? বল, বল, কে তুমি ? যেন মনে পড়ছে, দেখিনি, দেখতে পাইনি, সে আমাকে দেখতে দেয়নি, তবু যেন – মনে হয়, কিন্তু সে নয়—সে হ'তেই পারে না।

ইন্দু রোগীর পা দু'টা সবলে মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—হ'তে পারে, খুব হ'তে পারে। বিশ্বাস কর, সেই, সেই হতভাগীই তোমার পা ধরে ক্ষমা চাইছে।

* * * *

ডক্টর গুহের খাট উত্তীর্ণ, ইন্দুরও চারের কোঠা ডিঙ্গাইতে দেরী নাই—তবও—তবুও—হাঁ, লাজ-লজ্জার মাথাটা খাইয়া বলিয়াই ফেলি—একদিন 'কুলশয্যা' হইয়া গেল !

ডক্টর গুহ রসিক লোক ; চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন—বিলেত থেকে এসে রংটা আমার একটু ফর্সা হয়েছে, নাগো ?

ইন্দু বলিল —হয়েছেই তো !

রমির মাতার ভবিষ্যদ্বাণী বিফল করিয়া দিয়া, ইন্দু একদিন নিজে গিয়া, রমিকে লইয়া চলিয়া আসিল।

এই দারুণ স্বদেশীর যুগ, ইন্দু কত বলে, কত রাগ করে—দেশী কত সাবান—ভাল ভাল সাবানই ত বাহির হইয়াছে, তবু, ডক্টর গুহ গায়ে বাক্স বাক্স 'পেয়ার্স গ্লিসারিণ' ক্ষয়িত করিতেছেন ; 'পেয়ার্স' না হইলে তাঁহার মনই উঠে না ;—অর্থাৎ বুড়া মনের আনন্দে সাবান মাখিতেছেন। ইন্দু দাঁতে মিশি দিতেছে কিনা জানি না, ডি, এল, রায় মহাশয় জীবিত থাকিলে বলিতে পারিতেন !

প্রেততত্ত্বে বিজ্ঞানের প্রবেশ

—শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

প্রেততত্ত্বের আলোচনায় আজকাল অনেক নামজাদা বৈজ্ঞানিক হস্তক্ষেপ করেছেন। এখন এ দুঃসাহস প্রদর্শন খুব যে মারাত্মক ব্যাপার তা নয়। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন এই সব আলোচনায় যোগ দেওয়া সত্য সত্যই বৈজ্ঞানিকের পক্ষে খুব বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল; কেননা এই proscribed বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে গেলেই বৈজ্ঞানিককে পণ্ডিত-সমাজে 'একঘরে' হতে হতো। তাঁর জীবন-ব্যাপী অর্জ্জিত যশোরাশি কলঙ্কের কালিতে এক মুহূর্ত্তে কালো হয়ে যেতো।

কিন্তু তা-সত্ত্বেও নামজাদা বড় বড় দু-চার জন বৈজ্ঞানিক শুধু সত্যের খাতিরেই এই সব আলোচনায় নির্ভীক চিত্তে যোগ দেন।

স্বনামধন্য সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ দার্শনিক Swedenborg এর কথা আলাদা। তিনি স্বভাবে ও সংস্কারে জন্ম-mystic, অতি-তত্ত্ববাদী।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগটা জড়-বিজ্ঞানের জয় জয়াকারের কাল। Materialism এর বিজয়পতাকা বহনের ভার তখন অপ্রতিহত-প্রভাব আচার্য্য Huxley র হাতে; ডারুইন-প্রচারিত 'জাতান্তর-পরিণতিবাদ' (Origin of Species) প্রায় সমস্ত সুধীজনই ভয়ে হোক নির্ভয়ে হোক, প্রকাশ্যে হোক, লুকিয়ে হোক মেনে নিয়েছেন। জার্ম্মানিতে Huxley র সমকর্ম্মী ও সমধর্ম্মী Haeckel এর প্রতিভালোকে বিদ্বদ্‌সমাজ চকিত ও চমকিত; এ-হেন সময়ে ও যুগে 'ভূত-প্রেতের' টেবিল-চালাচালি বিদ্যায় একজন পয়লা নম্বরের physicist, chemist, ও biologist এর প্রকাশ্যে যোগদান বড় কম দুঃসাহসের কীর্ত্তি নয়।

প্রায় ৬২ বছর আগে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সে সময়ের স্বনামধন্য পদার্থবিদ্ পণ্ডিত Prof. Crookes (পরে Sir, Will. Crookes) প্রেততত্ত্বের আলোচনায় যোগ দেন। এমন কয়েকটী ঘটনা তাঁর জ্ঞানের গোচরে ঘটে, যাতে তিনি আর কেবল দুর্নামের ভয়েই চোখ বুঁজে বসে থাকতে পারেন্ নি। জ্ঞানান্বেষণ যাঁদের জীবনের নেশা, সত্যের সেবা যাঁদের জীবন-ব্রত; সেরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি লোকনিন্দা বা উপহাসের ভয় রাখে না। অজ্ঞানীদের মধ্যেও যেমন কুসংস্কারের বন্ধন আছে; পণ্ডিতদের মধ্যেও তেমনি আছে। পণ্ডিতদের পণ্ডিতী কুসংস্কার। ঐ সময়ের জড়-বৈজ্ঞানিকদের অনেকেরই এই কুসংস্কার বদ্ধমূল হয়েছিল যে বিজ্ঞান বল্‌তেই বুঝতে হবে জড় পরমাণু ও জড় শক্তির রহস্যভেদ-বিদ্যা;—তাঁদের ধারণা হয়েছিল পরকাল বিষয়ক কোনো কথাই বা দেহাতীত আত্মচৈতন্যের পরিণামবিষয়ক কোনো আলোচনাই বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হতে পারে না। তাঁদের ধারণা ছিল যা যন্ত্রাগারের মধ্যে test tube, ছুরী কাঁচি কি অনুবীক্ষণের সীমানার মধ্যে ধরা দেয় না তার বৈজ্ঞানিক মূল্যই নাই; তাঁরা আগে হতেই 'বিশ্ব-রহস্যের' একটী তালিকা ঠিক করে ফেলেন। Dubois-Raymond বিজ্ঞানের ক্ষমতার বাইরে কি কি 'অমীমাংসিত তত্ত্ব' রয়ে গেল, তার একটা তালিকা ঠিক করে ফেলেছিলেন।

কিন্তু আর এক ধরণের বিজ্ঞান-সেবক আছেন যাঁদের মনের attitude বা প্রকৃতি অনেকটা নম্র ও উদার; বিশ্বের তুলনায় মানুষের সসীম জ্ঞানবুদ্ধি যে কত কম সে বিষয়ে তাঁরা সর্ব্বদা সচেতন। Hamlet এর কথায় তাঁদের জ্ঞানসাধনার motto হচ্ছে There are more things in Heaven & Earth ইত্যাদি। Faraday বলতেন, এ জগতে সবই সম্ভব, কিছুই অসম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এই attitude জ্ঞান বৃদ্ধির পক্ষে খুবই সুফলপ্রদ; নূতন জ্ঞানের পথ যাঁরা খোঁজেন ও আবিষ্কার করেন তাঁদের সবারই এই মনোবৃত্তি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে দুইজন বৈজ্ঞানিক এইরূপ মনোবৃত্তি নিয়ে প্রেততত্ত্বালোচনায় অগ্রসর হন; এক হচ্ছেন Sir Alfred Russel Wallace, ডারুইনের সঙ্গে যিনি একই সময়ে অথচ স্বাধীনভাবে 'natural selection' বিধি আবিষ্কার করেন; দ্বিতীয় হচ্ছেন এই Sir William Crookes.

ইনি যখন স্বহস্তে মিডিয়ম পরীক্ষা করে স্বচক্ষে অলৌকিক ঘটনা শুনে ও দেখে নেবার জন্য প্রকাশ্যভাবে কার্য্যক্ষেত্রে নামলেন তখন গোঁড়া বৈজ্ঞানিক সমাজে একটা রীতিমত জয়ধ্বনি উঠলো। কারণ এই সময়ে Spiritualism, প্রেততত্ত্ব-চর্চ্চার সর্ব্বত্র একটা খুব তুফান ওঠে। বহু প্রেত-বৈঠকে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার প্রত্যক্ষ ক'রে অনেক নামজাদা লোক খুব প্রভাবযুক্ত হন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ D. D. Home ও Miss Cook, এই দুই মিডিয়মের অলৌকিক কীর্ত্তিতে শিক্ষিত সমাজ ও অনেক বৈজ্ঞানিক পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ করতে আরম্ভ করেন। মিডিয়মদের এই সব কীর্ত্তি যখন শিক্ষিত লোকেরাও সত্য বলে সমর্থন করতে লাগলেন, তখন বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটা উত্তেজনা দেখা দিল। শিক্ষিত সমাজে লুপ্তপ্রায় কুসংস্কার আবার জোর ধরে জেগে উঠছে এতে বিজ্ঞান-জগৎ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। আরো ক্ষুব্ধ হবার কারণ এই সব বৈঠকে নামজাদা কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক যাতায়াত করতেন এবং সহানুভূতিও কেউ কেউ প্রকাশ করতেন—দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় Crookesএর কথা—তৎকালের নামজাদা তিনজন medium, Florence Cook, Miss Kate Fox ও D. D. Home, এদের সবারই seanceএ তিনি দর্শক হিসাবে যোগ দিয়ে ফলাফলে বেশ একটু আকৃষ্ট হন; তবু তাদের প্রদর্শিত অলৌকিক ব্যাপারে যে ফাঁকি চালাকি বা শঠতার লেশ নাই এ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। নিজেই স্বীকার করেছেন যে মিডিয়মদের কৃত বা ঘটিত ব্যাপারের মূলে হয়তো কোথাও trick 'চালাকি' আছে এ সন্দেহ তাঁর হয় এবং এই সন্দেহ মেটাবার জন্যই তিনি স্বহস্তে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক গুরু-ভ্রাতারা এতে খুব খুশী হন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসাহ দেন। পণ্ডিতদের মধ্য খুবই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ার শব্দ শোনা গেল; সবাই নিশ্চিন্ত হলেন যে একজন উপযুক্ত, দক্ষ, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি একাজে অগ্রসর হলেন।

প্রেততত্ত্বের নামে জ্বলে যেতেন যে-সব বৈজ্ঞানিক তাঁদের মনোগত আশা হয়েছিল যে এত দিনের পর একজন 'ওস্তাদের' হাতে 'ভুতুড়েদের' উচিতমত শিক্ষা হবে; তাদের জুয়োচুরি শঠতা ধরা পড়বে। Crookesএর মনোভাব ছিল অন্যরকম। তিনি বলেছিলেন যে, 'এইসব অলৌকিক ব্যাপারের মূ'ল যদি সত্যই কিছু থাকে তা হলে এই সত্যটা কি, শুধু সেইটে জানবার জন্যই আমি ব্যাকুল। প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে বাধে বলেই যে এই একটা নূতন রহস্য-লোকের সন্ধান হতে পিছপাও হবো সে আমার স্বভাব নয়। 'যদি ঘটনা সব সত্যই হয় তা হ'লে প্রকৃতিরাজ্যে অ-লৌকিক বা supernatural বলে কিছু নাই, সবই natural বা লৌকিক তাই জানবো।'

প্রেততত্ত্বের যে সব বৈঠক হতো তাতে দুই শ্রেণীর ঘটনার আবির্ভাব হতো, physical 'কায়িক' ও mental 'মানসিক'। মিডিয়মের ভিতর দিয়ে 'প্রেতাত্মা' একটা অজ্ঞাত তত্ত্ব জানিয়ে দিলে (প্রামণিক ভাবে), এই হ'ল mental phenomena; অথবা একটা বই table হ'তে বিনা জড়সংযোগে উপরে উঠে এক দর্শকের হাতে এল, এই হ'ল physical ঘটনা। Crookes 'মানসিক' ঘটনা-গুলির সত্যতা সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। কায়িক (physical) ঘটনাগুলাই একটু তাঁর মনে খটকা লাগিয়েছিল।

Crookesএর প্রধান পরীক্ষাগুলা সব Miss Cookকে মিডিয়ম করেই হয়। তখন Miss Cook পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা মাত্র। Volckman নামে একটা লোক কুমারী কুকের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে মিথ্যাপবাদ দেয়, তাতে কুমারী কুক অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে ক্রুক্স-পত্নীকে এসে ধরে যে আচার্য্য ক্রুক্স যেন তাকে নিজে পরীক্ষা ক'রে তার সম্মান রক্ষা করেন। আচার্য্য তখনি সম্মত হন, এবং নিজেরও সত্যানুসন্ধিৎসা বশতঃ আগ্রহের সহিত পরীক্ষা আরম্ভ করেন। Miss Cook পয়সার প্রত্যাশা রাখেন নি। বিজ্ঞানের সেবার জন্য এবং নিজের অলৌকিক শক্তির রহস্যটা কি তাও জানবার জন্য নিজেকে পরীক্ষা-যন্ত্ররূপে ছেড়ে দেন।

সে সময়ের Quaterley Journal of Scienceএ তিনি তাঁর পরীক্ষা-পদ্ধতি সমস্তই সাধারণকে জানিয়ে দেন।

তাঁর নিজ বাসভবনের রাসায়নিক পরীক্ষাগারের পাশের ঘরেই এই সব experiment চলেছে। অন্য একটা ঘরে couchএর উপর Miss Cook মোহমুগ্ধ হয়ে (i

trance) পড়ে আছেন। বাহিরের কামরায় অল্পদীপালোকে বসে আছেন Crooks এবং দু'চার জন তাঁর নিমন্ত্রিত বিশেষ বন্ধু। মিনিট কুড়ি বা ঘণ্টাখানেক মধ্যেই কুমারী কুকের দেহ হতে একরূপ বাষ্পপদার্থ (ectoplasm) বার হয়ে তাই হতে একটী মুর্ত্তি গড়ে উঠেছে। এই মূর্ত্তি পরদা ঠেলে বেরিয়ে এসে আচার্য্য Crookes ও অন্যান্য দর্শকদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে চলাফেরা করছে, কথা কইছে, সর্ব্ব বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র সচেতন জীবের মত। প্রেতমূর্ত্তি নিজেকে Katie King বলে পরিচয় দেয়।

Katie যখন পরীক্ষকের সঙ্গে বাক্যালাপে নিযুক্ত mediumএর দেহ তখন sofaতে মোহনিদ্রাহত। উভয়েব দেহের দৈর্ঘ্য, বর্ণ ইত্যাদি অনেক ভিন্ন।

ঘটনা এই। সন্দেহবাদীরা বলতেন যে কুমারী কুকই খুব দক্ষতার সঙ্গে Katieর অভিনয় করতো। যাঁরা প্রমাণ চান তাঁরা অবশ্য এ আপত্তি তুলতে পারেন। কথা হচ্ছে—কুকই যে Katieর অভিনয় করছেন এর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আচার্য্য Crookes নিজে কি দেন?

প্রমাণ দেখিয়ে আচার্য্য বলেন—"কেটীর দৈর্ঘ্য কমে ও বাড়ে। আমার নিজ বাড়ীতে তাকে (medium) কুক হতে একবার ছয়-ইঞ্চি বড় দেখি। গত রাত্রে কুক হতে সে ৪।।০ ইঞ্চি বড় ছিল। কেটীর গলদেশ বেশ মসৃণ, শুভ্র, গলা আ-ঢাকা ছিল, কুকের গলা ঢাকা ছিল। কুকের গলায় একটা বড় blister ছিল। কুকের ত্বক খস্‌খসে। কেটী শুভ্রবর্ণা, কুক ঘোর লাল। কেটীর আঙ্গুল কুকের চেয়ে সরু ও বড়। চাল-চলনে, বাহ্য ব্যবহারে ও মুখভাবে দুজনে খুব ভিন্ন।

অন্য এক প্রবন্ধে (report) Crookes লিখছেন—"কুকের চুল প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, কেটীব চুল উজ্জ্বল সোনালী। * * * এক সন্ধ্যায় Katieর pulse beat গণে পাই ৭৫ কুকের normal সংখ্যা ৯০ (beat)। Katieর বুকে কান দিয়ে বুকের শব্দ পরীক্ষা করি—Miss Cookএর চেয়ে pulse more steady। * * * Katieর চুলের এক কোঁথা (lock) আমি কেটে রেখেছি, এ চুল যে তার মাথার scalp হতে গজিয়েছে সে বিষয়ে আগে নিঃসন্দেহ হই।"

Crookes Katie Kingএর ৪৪ খানা photo তুলেছিলেন। কয়েকটা photoতে Crookes ও Katie King এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন হাত ধরাধরি করে, এই চিত্র আছে।

একবার প্রতিবাদী দল আপত্তি তুলে এই বলে যে Crookes কখনো কেটীকে ও কুককে যুগপৎ একস্থানে এক নজরে দেখেছেন কিনা? তদুত্তরে তিনি Spiritualist পত্রিকায় (July 17, 1874, page 29) লিখেন :—

"আমি Phospherous lamp সাহায্যে Katie ও Miss Cook উভয়কে একস্থানে এক সঙ্গে দেখেছি; দুই মুখ কয়েক ফিট তফাতে ছিল, আলো তুলে একবার এর মুখ পরক্ষণে ওর মুখ বার বার করে দেখি। এর পরে আমার বাড়ীতে আমি ও আমার আর আটজন সঙ্গী এক সঙ্গেই Katie ও Cook কে দেখি।" অন্যত্র Crookes লিখছেন—"আর একবার আমি একটা photo তোলাই তাতে আমি ও Katie একটা বিশেষ pose করে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর দ্বিতীয় একটা photo তোলাই, তাতে Katieর স্থানে Cookকে একই পোষাক পরিয়ে দাঁড় করাই; দু জনেরই pose পূর্ব্বেরই মত। পরে এই দুই photo উপর-উপর সংলগ্ন করি, তাতে আমার চিত্র দুটাই ঠিক ঠিক সব রকমে মিলে গেল, কিন্তু Katieর ছবি আয়তনে কুকের ছবি হতে প্রায় ৫।৬ আঙ্গুল বড় হ'ল।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চে লেখা এক পত্রে Crookes বলছেন—"কেটী ও মিস্ কুক (medium) যে একই ব্যক্তি নয় এর যে অভ্রান্ত চূড়ান্ত প্রমাণ আমি চাইছিলাম তা এতদিনে পেয়েছি; ২রা মার্চ্চের বৈঠকে (আমার নিজ বাড়ীতে) প্রেতমূর্ত্তি কেটী আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে যখন curtainএর পিছনে চলে গেল (যেখানে medium trance অবস্থায় থাকে) তার একটু পরেই কেটীর কণ্ঠস্বরে শুন্‌লাম আমাকেই কেটি ডেকে বলছে—'ঘেরা-ঘরের ভিতর শীঘ্র আসুন, আমার মিডিয়মের মাথাটা একটু সোজা করে দিয়ে যান।' গিয়ে দেখ্‌লাম কেটী তার শুভ্র পোষাক পরে মাথায় turban পাগ্‌ড়ী (?) জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি কুকের কাছে এগিয়ে যেতে কেটী পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালো। দেখলাম দুজনকেই; দুই ভিন্ন মূর্ত্তি, কেটীর

সাদা পোষাক ; কুকের কালো ভেলভেটের পোষাক ; কুক হতচেতন হ'য়ে sofaতে পড়ে, কেটী সম্মুখে দাঁড়িয়ে।' Medium মিস্ কুক যে কৌশলে বা চালাকিযোগে Katieর মূর্ত্তি ধরে পরীক্ষকদের ঠকায় নি তার প্রমাণ এর চেয়ে চূড়ান্ত আর কি হতে পারে ?"

যত রকমে সম্ভব তত রকমেই Prof. Crookes প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে Katie ও Miss Cook ভিন্ন ব্যক্তি।

Miss Cookএর ব্যক্তিগত গুণাগুণ সম্বন্ধে Crookes লিখছেন—"আজ ত তিন বছর যাবৎ প্রায় প্রত্যহ কুককে নিয়ে পরীক্ষা করছি—পরীক্ষার কাঠিন্যে ও পরিশ্রমে বালিকার দেহ ভেঙ্গে পড়ার মত হয়েছে ; তবু তার মুখে ব্যাজার, বিরক্তি বা অনিচ্ছার চিহ্ন নাই। সর্ব্ব রকমে পরীক্ষাকে সার্থক করবার জন্য যা সাহায্য করা উচিত তা সে যথোচিত ভাবে করেছে। যে-সব খুব কঠিন কঠিন সর্ত্ত condition আরোপ করেছি—সবেতেই সে হাসি মুখে রাজী হয়েছে। বালিকা এত সংস্বভাবা যে ঠকাবার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি তার মনে হয় নি। তা ছাড়া কোনো রূপ trick করে আমার চোখে ধূলা দেবার মত তার শিক্ষাও ছিল না, শক্তিও ছিল না। একটী ১৫ বছরের বালিকার পক্ষে সব রকম বিঘ্নকর rigorous conditionএ রাজী হয়েও একজন তীক্ষ্ণদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তিকে সমানে তিন বছর ধরে ঠকিয়ে আসবে অথচ ধরা পড়বে না, এ ধারণাই হয় না!—তার ফাঁকি চালাকী ধরবার জন্য সহস্র কুটীল কৌশল করা সত্ত্বেও এই 'innocent school-girl of fifteen' এত বড় একটা 'gigantic imposture' তিন বছর ধরে চালিয়ে আসবে এই বিশ্বাস যে করতে পারে সে 'does⋯⋯ violence to one's reason and common sense !'

এই পরলোকগত আত্মা, যে নিজেকে Katie King বলে পরিচয় দিলে, আসলে সে কে ? তার কথা মানতে গেলে সে ছিল John King নামক এক ব্যক্তির কন্যা। এই ব্যক্তি Charles IIএর সময় বেঁচে ছিল।

সে যেই হোক তার সাময়িক ব্যক্তিত্বটী (personality) বড় মনোরম ছিল। যতদিন তার প্রেতাত্মা কুক্‌স্-ভবনে যাতায়াত করতো ততদিন পরিবারের ছেলেমেয়ে সবার সঙ্গে তার বড় সুন্দর সম্বন্ধ ছিল। আচার্য্য-পত্নী (Mrs. Crookes) লিখছেন যে Katie Kingকে নিয়ে যখন তাঁর স্বামীর পরীক্ষা চলছে তখন তাঁদের কনিষ্ঠা কন্যা জন্মায়। শিশুর যখন বয়স তিন সপ্তাহ, তখন Katie সেই নবজাত কন্যাকে দেখার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করে ; তার ইচ্ছানুসারে শিশুকে এনে তার হাতে দিই ; সে শিশুকে কোলে করে আদর সোহাগ করে পরে ফিরিয়ে দেয়।"

এই যে সব আশ্চর্য্য ফলপ্রদ পরীক্ষা যা বিশ্বাস করতে লোক সহজে চাইবে না তা সমস্তই আচার্য্য তাঁর সম্পাদিত Quarterly Journal of Scienceএ প্রকাশ করেন।

এই সব বিবরণ প্রচারিত হলে বৈজ্ঞানিক মহলে একটা হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড ঘটে যায়। বৈজ্ঞানিকবৃন্দ দুই দলে ভাগ হয়ে গেল ; Crookesএর স্বপক্ষদল ও বিরোধী বিপক্ষ-দল।—সমর্থক দলে ছিলেন Russel Wallace, Lord Rayleigh William Barret, Cromwell Varley এবং আরো কয়েকজন। এঁরা Crookesএর পরীক্ষার ফলে উৎসাহিত হয়ে নূতন পথের পথিক হলেন। বিরোধীদলের নায়ক হলেন physiologist Carpenter ; ইনি Crookes-এর উপর এতই চটে ও ক্ষেপে গেলেন যে তাঁকে উন্মাদ, প্রবঞ্চক, শঠ প্রভৃতি সুললিত আখ্যায় আখ্যায়িত করতে ছাড়লেন না। সে সময়ের Royal Societyর সভাপতি Stokes ; Crookesকে সবিনয়ে অনুরোধ করে পত্র লিখলেন—'আপনি আমার পরীক্ষাগারে এসে স্বচক্ষে দেখে যান আমি মিথ্যা না সত্য বলছি।' Stokes সে অনুরোধ রাখা অবৈজ্ঞানিক ভাবলেন !

Galileo যখন বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহ দূরবীণযোগে আবিষ্কার করেন তখন ধর্ম্মরাজ্যের মধ্যমণিগণ যে Cardinals of Rome তাঁরা খুব Galileoর উপর চটে গেলেন—এরূপ অধার্ম্মিক কথা কেন তিনি প্রচার করেন! বাইবেলে যখন এ কথা লেখা নাই তখন মিথ্যা-রটনার দ্বারা ধর্ম্ম-নাশের অপরাধে Galileo অপরাধী। Galileo গললগ্নী-কৃতবাসে বললেন 'হে ধর্ম্মরাজগণ, আপনারা একবার এসে মদীয় দূরবীণে চর্ম্মচক্ষুটা লাগিয়ে দেখুন আমি সত্য বলছি কি না!' কিন্তু কার্ডিনাল প্রভুরা এই মহাপাপের প্রশ্রয় দিলেন না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের অনেকেই মধ্য-যুগের শাস্ত্র-পাগলামির সমতুল্য পাগলামি-কলঙ্ক হতে মুক্ত হতে পারেন নি। এই [illegible]তেও এমন কয়েকটী বিজ্ঞানগোঁড়া আছেন যাঁরা Sir Oliver Lodgeকে দূর হতে গাল দেন, কিন্তু তাঁর পরীক্ষাগারে গিয়ে অন্নক্ষণের জন্ম চক্ষু ও কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে রাজী নন। এর পরে, D. D. Home ও Miss Fox, এই দুই Medium নিয়ে Prof. Crookes আরো বহু পরীক্ষা করেন। এসব পরীক্ষাতেও খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

এই সব পরীক্ষাকালেও Crookes বিজ্ঞান-রাজ্যের কর্তৃপক্ষস্থানীয় দুই চারজন ধুরন্ধরকে সবিনয়ে আহ্বান করেন ফলাফল স্বচক্ষে দেখতে। Spectroscope-নির্ম্মাতা বিখ্যাত Dr. Huggins ছাড়া আর কেহ এ নিমন্ত্রণে যোগ দেন নি।

D. D. Homeএর সঙ্গে পরীক্ষাকালে Crookes বহু physical ঘটনার চূড়ান্ত প্রমাণ পান।

(১) বিনা হাত লাগিয়ে accordion বাজনা বাজানো, (২) বিনা সংস্পর্শে দ্রব্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে সরানো, (৩) ভারী দ্রব্যকে লঘু করা, (৪) লঘু দ্রব্যকে ভারী করা প্রভৃতি নানা অলৌকিক 'কায়িক' ঘটনার (physical phenomena) প্রমাণ পাওয়া যায়। বিখ্যাত মিডিয়ম Homeকে অবলম্বন করে এই সব বাহ্য ঘটনাই বেশী দেখা দিত। Homeএর মিডিয়মত্বের বিশেষত্বই এইটা। Crookesএর পরীক্ষাধীনে আসবার আগে London Dialectical Society, Sir John Lubbockএর সভাপতিত্বের সহায়ে Homeকে নিয়ে বহু পরীক্ষা করেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত হয় এই :—

(১) কোনরূপ কায়িক দ্রব্যের সহযোগ ও কোন জীবিত ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত গৃহের নানা আসবাবপত্র হতে নানা শব্দ যে অলৌকিক ভাবে উৎপন্ন হয় এ কথা সত্য।

(২) কোনো বাহ্য জড়-যন্ত্রের সাহায্য বা কোনো জীবিত ব্যক্তির সহায়তাব্যতীত ভারী ভারী জড়-বস্তু এখান হতে ওখানে স্থানান্তরিত হয় একথা সত্য।

(৩) তেরজন বিশ্বস্ত সাক্ষীর প্রকাশ্য উক্তি এই যে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র হতে হস্ত বা অন্য দ্রব্য-সংযোগ ব্যতীত সুমধুর বাজনার সুর হয়।

(৪) চৌদ্দজন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেন যে কোন জানিত ব্যক্তির নয় এমন মুখ হাত পা জীবন্ত ও সচেতন অবস্থায় দেখা গেছে।

এই বিদ্বজ্জন সভার সভ্যরা সবাই ঘোর সন্দেহবাদী; তবু তাঁরা পরীক্ষাশেষে একবাক্যে এই report দেন যে আমাদের অজানিত এমন এক অজ্ঞেয় আশ্চর্য্য শক্তি আছে যা জড়দ্রব্য সংযোগব্যতীতও জড়ে নানারূপ গতি ও শব্দ উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু এই শক্তিক্রিয়া মিডিয়মধর্ম্মী মানুষের উপস্থিতিতে ঘটে।

তথাপি সন্দেহভঞ্জনার্থ Crookes নিজ বাড়ীতে Homeকে এনে বিধিমত পরীক্ষা করেন। এই সবের ফলাফল তিনি তাঁর Researches in the Phenomena of Spiritualism গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। Crookesএর পরীক্ষা-ফল পূর্ব্বোক্ত সভার reportকে আরো দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। যে সব অলৌকিক ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেন তা বিস্ময়কর, এ প্রবন্ধে তা সবিশেষ বলা সম্ভব নয়।

Crookesএর এই সব পরীক্ষা ১৮৭০ হতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলে। এই সবের প্রভাব তৎকালীন বৈজ্ঞানিকদের উপর কতটুকু বিস্তৃত হয়েছিল? একেবারে নগণ্য। বৈজ্ঞানিকদের চিত্তক্ষেত্র তখনো অপক্ষপাত ভাবে নূতন অথচ বিজাতীয় সত্য গ্রহণ করবার মত উদারতা লাভ করেনি। নাস্তিক-বুদ্ধিবিকৃত জড়-বিজ্ঞান বিস্তার তখন অনুরূপ আবহাওয়া। একদিকে শত্রুপক্ষের ভীষণ বিরুদ্ধাচরণ, অপরদিকে তার প্রতি সহানুভূতিযুক্ত তাঁর বন্ধুবর্গ, তদীয় পরীক্ষাফলে বিশ্বাসবান হলেও যশোহানির ভয়ে তাঁরা Crookesকে প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করতে বা উৎসাহ দিতে পিছপাও হলেন। নানা দিক দিয়ে তাঁর বিজ্ঞানবিত্তালব্ধ যশোক্ষয় ও সম্মানহানির সূচনা দেখা দিলে। তিনিও তাতে একটু সন্ত্রস্ত হলেন; কাজেই এর পর হতে তিনি এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করতে নিবৃত্ত হলেন। একরূপ সমস্ত সম্বন্ধ রহিতই করলেন। শত্রুপক্ষের কেউ কেউ এই দেখে প্রচার করতে দ্বিধা করলেন না যে Crookes

তাঁর অলৌকিকে বিশ্বাস হারিয়েছেন এবং যা কিছু বে ছিলেন তা প্রত্যাহার করেছেন।

[illegible] কথা ঘোর মিথ্যা। কেননা এ সম্বন্ধে কেউ [illegible] প্রশ্ন করলে তিনি কথাচ্ছলে বলতেন, "এইটুকু আমি স্বীকার করতাম ও এখনো করি যে এমন সব অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মদেহী সত্তা আছে যারা বলে যে তারা মৃত ব্যক্তিদের পরলোকবাসী আত্মা। তারা যে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মশরীর সচেতন সত্তা তাতে আমার সন্দেহ নাই; কিন্তু তারা যে কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মা এর প্রমাণ আমি পাইনি, কাজেই এ বিশ্বাস এখনো আমার হয়নি। আমার কোনো কোনো বন্ধু বলেন তাঁরা এ প্রমাণ পেয়েছেন; আমারও অনেক সময় মনে হয়েছে যেন আমিও এরূপ প্রমাণ পেয়েছি।"

শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে তাঁর মতামত কি ছিল? ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে Bristol নগরীতে British Association-এর সভাপতি হয়ে যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাতে তিনি ঐ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাষায় দিয়েছেন:—

"একটা বিষয়ে আমি এখনো কিছু বলিনি; এ বিষয়টা আমার কাছে weightiest (গুরুতর) এবং সব চেয়ে farthest reaching (দূরপ্রসারী); ৩০ বছর আগে আমি প্রেততত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ লাভ করবার জন্য চার বৎসর ব্যাপী পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ চালাই। তার ফলে আমার ধারণা হয় যে আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সীমার বাইরে এমন এক শ্রেণীর অশরীরী সচেতন শক্তি সত্তা আছে যা সাধারণ সদেহ-চৈতন্য হ'তে স্বতন্ত্র। সে শক্তি বুদ্ধিপূর্ব্বক কাজ করে অথচ অদৃশ্যদেহী। এখনো আমি এরূপ সত্তার অস্তিত্ব মানি; আমি পূর্ব্ব মত ত্যাগ করিনি; পূর্ব্বের প্রচারিত কোনো কথা বা মত প্রত্যাহার করিনাই।"

২০ বছর পরে একজনের সঙ্গে কথোপকথনকালে Crookes বলেন "আমি এ পর্য্যন্ত spirit সম্বন্ধে মত বদলাইনি; বরং উত্তরোত্তর আমার এ সংস্কার দৃঢ়তর হয়েছে। আমার স্থির বিশ্বাস ইহলোক ও পরলোক উভয়ের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপন হয়েছে।"

তাঁকে এই সময় প্রশ্ন করা হয় "আপনি কি ভাবেন না যে প্রেততত্ত্ব আলোচনা ও তৎপরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত জড় নাস্তিক্যবাদকে ধ্বংস করেছে? তিনি বলেন "আমিতো তাই মনে করি; অনেক লোকের ধারণা হয়েছে যে মরণেই সব শেষ হয়না; পরলোক বলে একটা আছে কিছু।"

আজ যে ক্ষেত্রে বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নির্ভয় চিত্তে সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত ৬০ বৎসর আগে সেই দুষ্প্রবেশ্য নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে সব রকম অপযশ-অপবাদ বাধা-বিড়ম্বনা অগ্রাহ্য করে যে জ্ঞানবীর শুধু সত্যের অনুসরণ করবার জন্যই ক্ষীণরশ্মি কম্পমান, ক্ষুদ্র এক জ্ঞানবর্ত্তিকা হাতে একা অসহায় ভাবে প্রবেশ করেছিলেন তাঁর অম্লান ও অপরিমেয় কীর্ত্তি নষ্ট হবার নয়। আজ বহু নব্য অল্প-সাহসী কর্ম্মী তাঁর দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে, তাঁরই কাছে প্রেরণা পেয়ে এই নূতন জ্ঞানক্ষেত্রে নব নব কীর্ত্তি অর্জ্জন করছেন। তাঁর শ্রমলব্ধ পরীক্ষাফলে তখনকার গর্ব্বান্ধ পণ্ডিতদের সুমতি না হোক, ভবিষ্যতে তাঁর দৃষ্টান্ত সত্যানুসন্ধী জড়-বৈজ্ঞানিকদের মনে এই নিষিদ্ধ বিষয়ে আলোচনা করবার সাহস সঞ্চার করে গিয়েছে। এইটেই তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্ত্তি।

কল্পে দেবার ?

(পূর্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

কিন্তু বিনুর জগৎ আবার অন্ধকার হইয়া আসে।

তাহার ওইটুকু শিশু-মনেও নিষ্ঠুর নির্ব্বিকার ভাগ্য গভীর ভাবে দাগ রাখিয়া যায়। আট বছরের ছোট ছেলে, কিন্তু সেও বুঝিতে পারে তাহাদের জীবনে কোথায় যেন একটা মস্ত গ্লানি আছে। সমস্ত পৃথিবী ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে পদে পদে সে গ্লানি যেন দেখাইয়া দেয়।

বিনু আজকাল স্কুলে যায়। বিনুর স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রখর; তাহার মনের অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য ও সজীবতা একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই ধরা পড়ে। কিন্তু নারীসুলভ একটি লজ্জা ও সঙ্কোচে কিছুই সে ভাল ভাবে করিতে পারে না। অনেক লোকের মাঝে পড়িলেই কোথা হইতে সব কাজে তাহার আড়ষ্টতা দেখা যায়। তাহার ফুলের মত সুন্দর মুখ খানি লইয়াও বিনু কেমন করিয়া সকলের আড়ালে পড়িয়া থাকে।

স্কুল তাহার ভাল লাগে না, বেঞ্চিতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে কখন সে অন্যমনস্ক হইয়া যায়, মাষ্টার মহাশয় কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন শুনিতে পায় না, ছেলেরা হাসিয়া উঠিলে সেই হাসির শব্দে সচেতন হইয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠে।

কোন কোন মাষ্টারের এমনি নিরীহ শীকারকে উৎপীড়ন করায় বোধ হয় অসীম আনন্দ আছে। মাথার চুল ধরিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে নিজের টেবিলের কাছে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া আনিয়া মাষ্টার মহাশয় বলেন—"কি ভাবছিলে গোরাচাঁদ? ইস্কুলটা কি মামার বাড়ি!"

ছেলেরা মাষ্টার মহাশয়ের উৎসাহ আছে কিনা ভালো করিয়া বুঝিতে না পারিয়া সাবধানে একটু হাসে। কিন্তু মাষ্টার মহাশয় অভিপ্রায় গোপন রাখেন না। ছেলেদের স্পষ্ট উৎসাহ দিয়া তিনি বলেন—"মাকাল ফল দেখেছো গো, মাকাল ফল, ওপরে টুকটুকে ভেতরটি পচা, এই দেখো আমাদের মাকাল ফল।" সঙ্গে সঙ্গে মাথার চুলে আরো জোরে টান পড়ে। হতভম্বের মত সে টানে মাথা তুলিয়া কাতর দুটি অসহায় চোখে বিনু মাষ্টার মহাশয়ের মুখের পানে তাকায়।

ক্লাশের ছেলেরা মাষ্টার মহাশয়ের উৎসাহ পাইয়া জোরে জোরে হাসিতে থাকে।

মাষ্টার মহাশয় চুল ছাড়িয়া এবার তাহার কাণ ধরিয়া বলেন, "আমি কি জিজ্ঞেস করেছিলাম বলত বাবু?"

বিনু কিছুই বলিতে পারে না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মাষ্টার মহাশয় অদ্ভুত মুখভঙ্গি করিয়া বলেন—"বলছিলাম এখন একটু ডাংগুলি খেললে হয় না! কিম্বা একটু মার্ব্বেল?"

ছেলেরা সশব্দে হাসিয়া উঠে, বিনু সকলের সামনে অপদস্থ হইয়া লজ্জায় অপমানে মাটিতে একেবারে মিশাইয়া যাইতে চায়।

কিন্তু তাহার লাঞ্ছনা তখনও শেষ হয় নাই। হঠাৎ খপ্ করিয়া তাহার কাপড়ের কোঁচাটা তুলিয়া ধরিয়া মাষ্টার মহাশয় ঘৃণায় নাক সিটকাইয়া বলেন—তাই ভাবি এত দুর্গন্ধ আসে কোথা থেকে! ঈস্ চিম্‌টি কাটলে যে ময়লা উঠে রে! জন্মে অবধি আর সাবান জল পড়েনি, নারে!"

সত্যই বিনুর কাপড় অত্যন্ত নোংরা, শুধু নোংরা নয় বহুদিন ব্যবহারে তাহা একেবারে শতছিন্ন হইয়া গিয়াছে। হাঁটুর কাছে একটা মস্ত বড় গেরো; সেখানে বোধ হয় সেলাই করিবার সুযোগ মেলে নাই। মাষ্টার মহাশয় মুখ ভঙ্গি করিয়া সেই গেরোটি তুলিয়া ধরেন।

ছেলেদের হাসি এবার তুমুল হইয়া উঠে। মাষ্টার মহাশয় হাঁক দিয়া বলেন—"চুপ চুপ", কিন্তু তাঁহার চোখ দেখিয়া বোঝা যায় বিশেষ অসন্তুষ্ট তিনি এ হাসিতে হন নাই।

এইবার বিনুকে এক ঠেলা দিয়া তিনি সরাইয়া দিয়া বলেন—"যা বাপু যা; বাবাকে একটা কাপড় কিনে দিতে বলিস্, না হলে মাকে বলিস্ কাপড়টা একবার কেচে দিতে, ঈস, গন্ধের চোটে ভূত পালায়!"

বিনু কোন রকমে মাথা হেঁট করিয়া গিয়া বেঞ্চিতে বসে। দারিদ্র্যের লজ্জার অনুভূতি তাহার এই প্রথম। বিনুর মনের কাঠাম সাধারণ ছেলেদের হইতে একটু পৃথক। অনেক ছেলে এই বয়সেই বাহিরের অনেক কিছু লক্ষ্য করিতে শেখে

কিন্তু বিনুর মন অন্তর্মুখী, মাষ্টার মহাশয় ব্যঙ্গ করিবার আগে কখনও সে কাপড়চোপড়ের কথা ভাবে নাই। কাপড় পরিতে [illegible]ই, কিন্তু অন্যের সহিত তুলনা করিবার কথা [illegible]ও তাহার মনেই আসে নাই। তাহার অপরিচ্ছন্নতা সে নিজেও এই প্রথম আবিষ্কার করে। আবিষ্কার করিয়া লজ্জায় মরিয়া যায়।

বাহিরের এই সমস্ত দুঃখ, বেদনা, লাঞ্ছনা ভুলিবার আশ্রয় ছিল তাহার বাড়ি। কিন্তু বাড়িতেও কি যেন আবার আজকাল হইয়াছে। বিনু অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করে সেখানে সমস্ত বাড়িতে যেন আগুন লাগিয়াছে—চারিধারে অস্বস্তিকর

আজকাল এক একদিন তাহার বাবা মোটেই বাড়ি আসেন না। সকাল বেলা ঠিক চোরের মত ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"তোর মা কোথায় বিনু?"

স্কুলের হাতের লেখা লিখিতে লিখিতে মুখ তুলিয়া বাবার চেহারার দিকে চাহিয়া বিনু অবাক হইয়া যায়। উস্কোখুস্কো চুল, জামার হাতার খানিকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কাপড়ে কাদার দাগ। ধীরে ধীরে সে বলে—"মা! মা ত' রান্নাঘরে।"

সেই মুহূর্ত্তেই মা আসিয়া ঘরে ঢোকেন। বিনুর ভয় হয় আজও বুঝি মা রাগিয়া উঠিবে। অনেক দিনের এমনি অনেক কুৎসিত দৃশ্যের অভিজ্ঞতা তাহার আছে। কিন্তু মা আজ কোন দিকে চাহিয়া পর্য্যন্ত দেখেন না। মুখের চেহারা শুধু তাঁহার কঠিন হইয়া উঠে। একটি মাত্রও কথা না বলিয়া মা খাটের তলা হইতে একটা কাঁসি বাহির করিয়া লইয়া আবার বাহিরে চলিয়া যান। বাবা যে আসিয়াছে তাহা যেন মা লক্ষ্যও করেন নাই।

বিনুর বাবা বোধ হয় আসন্ন বাক্যবাণের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, স্ত্রী চলিয়া যাইবার পর ক্লান্ত ভাবে বিছানার ধারে বসিয়া পড়িয়া লজ্জিত ভাবে মাথার চুলের ভিতর আঙুল চালাইতে থাকেন।

বিনু সসঙ্কোচে বলে—"আমার একটা খাতা কিনে দেবে বাবা? এ খাতাটায় আর পাতা নেই।"

হঠাৎ যেন সচেতন হইয়া বিনুর বাবা বলেন—"[illegible]? খাতা সেদিন কিনে দিলাম না?"

"সেটা ফুরিয়ে গেছে বাবা।"

বিনুর বাবা বিছানা হইতে নামিয়া আসিয়া হঠাৎ সস্নেহে বিনুর মাথায় হাত বুলাইয়া বলেন—"দেখি তুই কেমন লিখতে শিখেছিস, বাঃ এযে খাসা লেখারে বিনু?"

বিনুর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বাবা হঠাৎ পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বিনুর হাতে দিয়া বলেন—"স্কুলে তোদের খাবার বিক্রী হয় না বিনু?"

বিনু মৃদু কণ্ঠে বলে—"হয় বাবা, আমি খাই না।"

"আচ্ছা খাতা কিনে যা থাকবে তাতে তুই খাবার খাস্ কেমন?"

বিনু টাকাটা হাতে করিয়া অবাক হইয়া বলে—"এক টাকার বাবা!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ এক টাকার।"

তাহার পর বিনুর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে তাহার বাবা হঠাৎ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যান।

খানিকটা বাদেই মা আসিয়া আবার ঘরে ঢোকেন। এদিক ওদিক চাহিয়া বাবাকেই মা খুঁজিতেছেন তাহা বিনু বুঝিতে পারে। মাকে সে নিজে হইতেই এইবার জানায়—"বাবা বেরিয়ে গেলেন মা।"

মার মুখের চেহারা বিস্মিত ব্যথিত হইয়া উঠে এটুকু বিনু টের পায়, কিন্তু মা তাচ্ছিল্যের ভান করিয়া বলেন—"যাক্‌গে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া যে জন্য ঘরে আসিয়াছিলেন সেই কথাই বোধ হয় স্মরণ করিয়া মা বলেন—"এক পয়সার লঙ্কা এনে দিতে পারিস, বিনু। গলি থেকে বেরিয়েই দোকান—খুব সাবধানে যাবি, বুঝেছিস্।"

মা বিনুর সহিত কথা বলিতে বলিতে বাক্স খুলিয়া পয়সা বাহির করিতেছিলেন। পয়সা রাখিবার কৌটাটা কিন্তু উপুড় করিয়া ফেলিয়াও গোটাকতক কড়ি, ক'টা বোতাম, দুটি মাথার কাঁটা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না।

বাক্সের তলাটা বৃথা হাতড়াইয়া দেখিয়া মা বলেন, "থাক্‌গে আর লঙ্কা আনতে হবে নারে।"

[illegible] পয়সার অভাবেই মা [illegible] লঙ্কা আনিতে দিতে পারিতেছে না এটুকু বিনুর অগোচর থাকে না। এমন অনেক দিন তাহাদের হইয়াছে। সে একগাল হাসিয়া বলে—"আমি লঙ্কা এনে দিতে পারি মা!"

মা মেয়ের হাসি হাসিয়া বলেন—"বিনা পয়সায় তোকে জিনিষ দেবে কেন রে পাগলা!"

বিনু হঠাৎ হাতের মুঠা হইতে টাকাটা বাহির করিয়া মাকে দেখাইয়া বলে—"বাবা আমায় খাতা কিনতে আর খাবার খেতে দিয়ে গেল মা! এইটে ভাঙিয়ে আনি মা কেমন!"

মার মুখ আবার অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া যায়—খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলেন—"না বাবা তুমি ওতে খাবার খেয়ো। লঙ্কা এবেলা না হলেও চলবে।"

কিন্তু ওবেলাও যে মার পয়সা কোথা থেকে আসিবে তাহা বিনু ভাবিয়া পায় না, বাবা যে অনেকদিন রোজগার করিয়া আনিয়া মাকে কিছু দেয় নাই একথা বিনু জানে, এই কয়দিন আগেই বাবার সঙ্গে মায়ের এই ব্যাপার লইয়া ঝগড়া সে শুনিয়াছে। স্কুলে এক এক দিন খাবার খাইতে তাহার ইচ্ছা করে কিন্তু বাড়ীতে যখন মায়ের হাতে একটি পয়সা নাই—সেই সময় এক টাকায় খাবার খাওয়ার কথা সে ভাবিতে পারে না।

আর একবার সে অনুরোধ করিয়া বলে—"আমি ত এত খাবার খেতে পারব না মা! আনি না মা এক পয়সার লঙ্কা।"

বিনুর সমস্ত উৎসাহ ম্লান করিয়া দিয়া মা যেন এবার একটু বিরক্ত হইয়াই বলেন—"না না এটাকে তুই রেখে দে।"

স্বামীর উপর রাগে তাঁহার সর্ব্বশরীর তখন জ্বলিতেছে। স্ত্রীপুত্র দুবেলা দুমুঠো ভাত খাইতে পায় কি না এটুকুও দেখিবার কর্ত্তব্যজ্ঞান যাহার নাই, হঠাৎ একদিন ছেলেকে একটাকার খাবার খাইতে দিয়া বাহাদুরী করা তাহার কেন?

* * * * *

বিনু স্কুলে যাইবার খানিক পরে মা ঘরে আসিয়া অবাক হইয়া দেখেন বাসনের চৌকির একধারে বিনু টাকাটি রাখিয়া গিয়াছে।

নিজের সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গেও বিনু ভাল করিয়া মিশিতে পারে না। আজকাল বিকালে বা সন্ধ্যার বাবার [illegible] যায় না। [illegible] থাকেন। একলা একলা ঘরে থাকিতে বিনুর ভাল লাগে না। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিবার লোভে সে বাহির হইয়া যায় কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভাল করিয়া নিজেকে খাপ খাওয়াইতে, কেন বলা যায় না, সে পারে না। এইটুকু বয়সের ছেলেদের পক্ষে যাহা অত্যন্ত ক্ষতিকর তাহাই কেমন করিয়া বিনুর মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। বিনু নিতান্ত আত্ম-সচেতন। তাহার উপর স্কুল-মাষ্টারের রসিকতাটা তাহার কোন সহপাঠি পাড়ায় আসিয়া প্রচার করিয়া দিয়াছে। ছেলেরা কারণে অকারণে তাহাকে 'মাকাল ফল' বলিয়া ক্ষেপায়।

এ সমস্তও সে সহ্য করিতে পারিত কিন্তু সেদিন পাড়ার ছেলেরা একটা ব্যাপারে তাহার জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

পাড়ার একটি ছেলের প্রতি বিনুর নীরব শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। সে শ্রদ্ধার সঙ্গে হয়ত একটু ঈর্ষ্যাও মিশ্রিত ছিল। বিনু মনে মনে তাহারই মত দুরন্ত প্রাণবন্ত হইতে ইচ্ছা করে। সে যেমন সহজে সব খেলায় সব কাজে সকলকে ছাড়াইয়া যায়, সকল ছেলের নেতৃত্ব অনায়াসে অধিকার করে বিনুর তাহাতে লোভ হয়। বিনুর শিশুমনের জগতে সেই প্রথম আদর্শ।

বিনুর জগতের এই দেবতার নিকট হইতেই আঘাতটা প্রথম আসে বলিয়াই বুঝি এত বেশী বাজে।

বিনু সেদিন একটী অসাধ্য সাধন করিয়া ফেলিয়াছিল। চোর চোর খেলায় রবিকে ধরা এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। তাহার সহিত দৌড়াইয়া কেহ পারে না। কিন্তু সেদিন কেমন করিয়া বিনুর কাছ হইতে পাশ কাটাইতে গিয়া সে পড়িয়া গেল এবং তাহার পর বিনু ছুঁইয়া ফেলায় অকারণে তাহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। দৌড়াইতে গিয়া পড়িয়া গেলে সেই অবস্থায় ছোঁয়া 'সই' কি না তাহা লইয়া প্রথম তর্ক করিতে ছাড়িল না। কিন্তু পূর্ব্বের নানা নজির থাকায় সে তর্কে জয় লাভ করিতে না পারিয়া সমস্ত আক্রোশ তাহার বিনুর উপর গিয়া পড়িল।

রবিকে ছুঁইয়া ফেলায় বিনু মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, রবির বিরাগভাজন সে কোন মতেই হইতে চায় না। কিন্তু তাহার পর রবির আক্রোশের পরিচয়ে সে

[illegible] রবি চোর হইয়া [illegible] [illegible] সে খুব দুঃখিত হয় নাই, ভাবিয়াছিল [illegible] ইহাতেই শান্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু রবি যখন [illegible] সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকেই বার বার চোর [illegible] চেষ্টা করিতে লাগিল তখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া সে খেলিতে অস্বীকার করিয়া বসিল।

কিন্তু ছেলেরা ছাড়িবে কেন? না খেলার জন্য অপমান [illegible] তাহার সীমা রহিল না। হঠাৎ ইহারই ভিতর রবি বলিয়া বসিল—"তোর বাবা ত মাতাল, মদ খেয়ে নর্দামায় পড়ে থাকে।"

এটা কত বড় অপমানের কথা ভাল করিয়া না বুঝিলেও বিনু প্রবলভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"কখ্‌খনও না।"

রবি ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—"কখ্‌খন না বই কি? সেদিন [illegible] পাহারাওয়ালা ধরে মারতে মারতে নিয়ে গেছল—দেখেছিলি!"

একটা ছেলে এই অবসরে তাহার বাবা কি ভাবে মদ খাইয়া টলিতে টলিতে চলে তাহাও দেখাইয়া দিল।

এবার আর বিনুর ধৈর্য্য রহিল না। অপমানে ক্ষোভে উন্মত্তের মত সেই ছেলেটার ঘাড়ের উপর পড়িয়া সে মারিয়া আঁচড়াইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু সে একা। রবির নেতৃত্বে সবাই মিলিয়া তাহাকে মারধর করিয়া যখন ছাড়িয়া দিল তখন তাহার কপাল কাটিয়া গিয়াছে, ছেঁড়া কাপড় জামার আর কিছু অবশিষ্ট নাই বলিলেই হয়।

পৃথিবীর অন্যায় অর্থহীন অবিচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে নিষ্ফল ক্ষোভ লইয়া বিনু বাড়ি ফিরিল। কাহাকেও এ অপমানের ও দুঃখের কথা সে জানাইল না। তাহার মা তাহার অবস্থা দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু খেলিতে খেলিতে পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া সেই যে বিনু চুপ করিয়া রহিল, আর তাহার কাছ হইতে কোন কথা মা বাহির করিতে পারিলেন না।

রাত্রে মায়ের কোলের কাছে শুইয়া সে শুধু একবার বলিল—"বাবাকে বলে এখান থেকে চলে যাবে মা; অনেক দূরে—খুব দূরের একটা বাড়ীতে?"

মা চিন্তিত হইয়া সস্নেহে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া [illegible]—"কেন বাবা?"

কিন্তু কেন তাহা বিনু ভাল করিয়া বলিতে পারে না। [illegible] বুঝি অসহায় দুর্বল মানুষের দুঃখশোক হইতে [illegible] ব্যর্থ আশা তাহাকেও প্রথম স্পর্শ করিয়াছে।

বিনুদের একদিন সত্যই বাড়ি ছাড়িতে হয়। বিনুর বাবার চাকরী গিয়াছে, অনেক দিনের বাড়িভাড়া বাকী। বাড়িওয়ালারা আর তাহাদের থাকিতে দিবে না।

দুপুর পর্য্যন্ত সমস্ত জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদার জন্য পরিশ্রম করিয়া তাহার বাবাকে ক্লান্ত দেখায়, তাহার মায়ের মুখ ম্লান, কিন্তু বিনুর ভারী ভালো লাগে, এ বাড়ি ছাড়িতে মার কেন যে এত কষ্ট হইতেছে সে বুঝিতে পারে না।

মার ও বাবার কথাবার্ত্তা সে শুনিয়াছে, শুনিয়াও তাহাদের দুঃখের কারণ ভালো করিয়া বুঝিতে পারে নাই। মা বলিয়াছেন—"এগার বছর এ বাড়িতে ছিলাম, বাড়িটা যেন আপনার হ'য়ে গেছল।"

বাবা একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছেন,—"শুধু ভাড়াটা মাসে মাসে দিতে হ'ত এই যা'।"

"তুমি ঠাট্টা কোরো না—আমার ভালো লাগে না।" বলিয়া মা মুখ ফিরাইয়া লইয়াছেন এবং তাহার পর আবার বলিয়াছেন—"এখানে ভদ্র-পাড়ার ভেতর ছিলাম, রাতবিরেতে একলা থাকতে তত ভয় করত না। সেখানে অজানা অচেনা পাড়ায় একলা ঐ ছেলেটুকুকে নিয়ে কোন্ ভরসায় থাকব বলত!"

বাবা আবার একটু হাসিয়া বলিয়াছেন—"আমাকে একেবারে বাতিল করে যদি একলা থাকার ব্যবস্থা কর তাহলে আর কি বলব!"

মা রাগের স্বরে বলিয়াছেন—"হাঁ। তোমাকে আমিই ত বাতিল করে দিচ্ছি। চিরদিন কি করে এসেছি জান না!"

বিনুর বাবার মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। মা হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছেন—"এ বাড়ি যখন ছাড়তে হচ্ছে তখন আমার ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে আমি জানি। সংসার নিয়ে আমার কত আশাই ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গাছ-তলাতেও আমাদের আশ্রয় জুটবেনা। কেন তুমি এমন হলে!"

বিনুর বাবার চোখও সজল হইয়া উঠিয়াছে। মায়ের একটা হাত হঠাৎ ধরিয়া ফেলিয়া বাবা বলিয়াছেন—"কেঁদোনা লীলা, তোমার চোখের জল আমি সহ্য করতে পারি না! তোমাদের এই অবস্থায় এনে ফেলে আমার যন্ত্রণা কি কম হচ্ছে মনে কর!"

তার পর মুখ ফিরাইয়া ভারী গলায় বাবা আবার বলিয়াছেন—"লজ্জায় গ্লানিতে আমার এক এক সময়ে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে! আমার স্বভাব কি কিছুতেই বদলাতে পারব না! তুমি ত জান লীলা, আমি এমন অমানুষ ছিলাম না!"

মা চোখের জল মুছিয়া বলিয়াছেন—"এখনো তুমি আগের মত হ'তে পার।"

বাবা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছেন—"আমার আর আশা করতে সাহস হয় না লীলা! কিন্তু এখনো যদি পারি ত তোমার জোরেই পারব।"

মার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, বলিয়াছেন—"ও কথা বোলো না, তুমি চেষ্টা করলে সব পার আমি জানি।"

* * *

বিনুর জীবনে এমন মজা খুব কমই হইয়াছে। সমস্ত বাড়িঘর ওলটপালট করিয়া গরুর গাড়িতে জিনিষপত্র বোঝাই করা কি কম আনন্দের ব্যাপার। কয়েকটা জিনিষ সে ত নিজেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। কাঠের সিন্দুকের তলায় একটা অমন সুন্দর পেন্সিল পড়িয়াছিল কে জানিত। খাটের উপর পাতা মাদুরের নীচে তাহার ছেলেবেলার এক-জোড়া মোজা পাইয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। খুব ছোট বেলায় তাহার জন্য বাবা নাকি এটা কিনিয়া আনিয়াছিলেন।

গরুর গাড়ির উপর তাহার যথাসর্বস্ব খুঁজিয়া-পাতিয়া বোঝাই করিতে সে ভোলে নাই। পাশের বাড়ির মেনি-বেড়ালটাকেও [illegible] বাক্সবন্দী করিয়া লইয়া যাইবার তাহার ইচ্ছা ছিল। মা বারণ করায় সেটা আর হইয়া উঠিল না।

গলির মোড় হইতে গরুর গাড়ির সঙ্গে বাবা ও মায়ের হাত ধরিয়া চলিতে তাহার ভারী ভালো লাগিতেছিল। আজ পাড়ার ছেলেদের সহিত দেখা হইলেও সে কথা বলিবে না। সে এখন তাহাদের ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়াছে—পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে মিশিবার আর তাহার দরকার নাই। ছেলেরা অবাক হইয়া নিশ্চয় তাহাদের যাওয়া দেখিবে, হয়ত জিজ্ঞাসাও করিবে কোথায় যাইতেছে—কিন্তু সে আর উত্তর দিবে না।

গলির মোড় ছাড়াইয়া একটুখানি যাইতেই কিন্তু তাহার সমস্ত সঙ্কল্প সে ভুলিয়া গেল। কয়েকটি ছেলে সেখানে দাঁড়াইয়া সত্যই তাহাদের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া ছিল।

একজন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাচ্ছিস্ রে বিনু?"

বিনু পরম উৎসাহে চীৎকার করিয়া জানাইল—"আমরা অনেক দূরে চলে যাচ্ছি—আমাদের নতুন বাড়ি ভাড়া হয়েছে কিনা!"

ছেলের দল এবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিল—"আর আসবি না?"

আর আসবি না! এক মুহূর্তে নূতন জায়গায় যাইবার সমস্ত উৎসাহ বিনুর ম্লান হইয়া গেল। চলিয়া যাওয়ার এ অর্থ সে ত আগে উপলব্ধি করিতে পারে নাই! অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবে সে বলিল—"না।"

ছেলেদের দল অনেকদূর পর্য্যন্ত তাহাদের আগাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল। যে বাড়ি হইতে একদিন সে নিজেই চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিল, যে ছেলেদের হাতে একদিন সে মার খাইয়াছে ও অপমানিত হইয়াছে, তাহাদের জন্যই তখন বিনুর মন কাতর হইয়া উঠিয়াছে। (ক্রমশঃ)

মায়া

—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

মায়াবাদ হিন্দু-দর্শনের চরম সিদ্ধান্ত। পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ে হিন্দুঋষিগণের মায়াবাদই শেষ কথা। কিন্তু তথাকথিত নব্য বেদান্তবাগীশগণ কিম্ভুতকিমাকার গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন, মায়াবাদের জন্ম বেদে উপনিষদে নহে উহা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আমদানি। আর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, দেশের ও বিদেশের অধিকাংশ বিখ্যাত স্কলারগণ উহার বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব মায়াবাদের বীজ প্রাচীন ঋগ্বেদেই অঙ্কুরিত হইয়া গৌড়পাদ ও সশিষ্য শঙ্করে পল্লবিত ও প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মায়াশব্দ সর্ব্বপ্রথম মায়া (মিথ্যা) অর্থে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দৃষ্ট হইলেও মায়াবাদ বেদের মতই প্রাচীন।

মায়াশব্দ হিন্দু-অভিধানের একটী কঠিন অর্থ। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি উহা বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন সংস্কৃত শব্দ বোধহয় এত অর্থবহুল নহে। বথলিঙ্ক উইলসন লাজউইপ্, রোসেন্ রথ, গেল্ডনার, উলেনবেক, গ্রাসমান, মনিয়ার উইলিয়ম প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ উহার প্রকৃত অর্থ ধরিতে পারেন নাই। নিঘণ্টুকার ও নিঘণ্টুর বিখ্যাত টীকাকার যাস্ক 'প্রজ্ঞা'র একাদশ নামের অন্যতম নামরূপে মায়া শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বিখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ প্রভুদত্ত শাস্ত্রী তাঁহার "The Doctrine of Maya" নামক সারগর্ভ পুস্তকে হিন্দু-শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে মায়াশব্দ কতবার কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার একটী তালিকা দিয়াছেন। ঋগ্বেদে 'মায়াঃ' (১মা ও ২য়া বহু) শব্দ ৭৪ বার পাওয়া যায়, মায়য়া (তৃতীয়া) ১৯ বার, মায়িনঃ (২য়া বহু, ও ৬ষ্ঠী এক) ১৫ বার, মায়াভিঃ (তৃতীয়া-বহু) ১৩ বার, মায়িনং (২য়া, ১ব) ১০ বার, মায়াশব্দ ৩ বার, মায়াং, মায়ী ও মায়ীনাম্ শব্দ প্রত্যেকে ৩ বার, মায়িনী ২ বার ও মায়িনা ১ বার ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মায়িনী, মায়াবিনা, মায়াবান্, মায়াবান্ এবং মায়াবিনাঃ এই যুক্তশব্দ কয়েকটীও দৃষ্ট হয়।

ঋগ্বেদে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫টী সূক্ত আছে—যেখানে মায়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৫টী ইন্দ্রের প্রতি, ৮টী অগ্নির প্রতি, ৪টী মরুৎ ও অশ্বিনের প্রতি, ৩টী বিশ্বদেবের প্রতি, ২টী বরুণের প্রতি, ২টী সোমের প্রতি, ২টী মিত্রাবরুণৌএর প্রতি, ২টী দ্যাবাপৃথিব্যৌ এর প্রতি, এবং উষস্, সরস্বতী, আদিত্য, পূষন্, অত্রি, জ্ঞানং, ঋভু, ইন্দ্রাবরুণৌ, সোমারুদ্রৌ, মায়াভেদ, ইন্দ্রাবিষ্ণু, প্রজাপতি-বৈশ্বামিত্র ও সূর্য্য-বৈশ্বানরৌ-এর প্রতি এক একটী। প্রসিদ্ধ বেদ-ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য মায়াকে কোথায় শক্তি (প্রজ্ঞা) এবং কোথায়ও কপট (বঞ্চনা) অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। শক্তি অর্থে শারীরিক শক্তি নহে, উহা অনেক রূপগ্রহণসামর্থ্য সঙ্কল্প শক্তি। যেমন ঋগ্বেদে আছে যে, ইন্দ্র বহু রূপগ্রহণের ইচ্ছা করিলেন। ঋগ্বেদ সাম ও যজুর্ব্বেদদ্বয়ের প্রধান উৎস বলিয়া উক্ত বেদদ্বয়ে মায়াশব্দ এত বেশী পাওয়া যায় না।

ত্রয়ী বিদ্যার অনেক পরে অথর্ব্ববেদের জন্ম। কিন্তু অথর্ব্ববেদেও মায়াশব্দ ২০ বার ১৬টী সূক্তে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মায়া ১ বার, মায়য়া ৮ বার, মায়িনাঃ ৩ বার, মায়াম্ ২ বার, মায়াঃ ২ বার, এবং মায়ে, মায়ায়াঃ, মায়ী ও মায়াভিঃ এক একবার। অথর্ব্ববেদে মায়া শব্দ যাদু বা মিথ্যা অর্থে প্রযুক্ত।

'পর্য্যাপ্তো হি একঃ পুলকঃ স্থাল্যা নিদর্শনায়।' অর্থাৎ ভাতের হাঁড়ীর একটী ভাত টিপিলেই হাঁড়ীর সমস্ত ভাত সিদ্ধ কি অসিদ্ধ বোঝা যায়। বেদের সংহিতাংশ আলোচনান্তে ব্রাহ্মণাংশ আলোচনা করিয়া দেখিব মায়া শব্দ তথায় কিভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। বাজসনেয়ী সংহিতাতে মায়া, মায়াং, মায়য়া, মায়ায়াং, শব্দগুলি প্রজ্ঞা (শক্তি) অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মায়য়া, মায়াং, মায়াবস্তু, মায়াবত্তরঃ শব্দগুলি বহু অর্থে প্রযুক্ত। তৈত্তীরিয় ব্রাহ্মণে, পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ ও শতপথ ব্রাহ্মণে মায়াশব্দ অঘটন-ঘটন পটীয়সী শব্দে ব্যবহৃত। সায়ণাচার্য্য বলেন মায়া অঘটিত ঘটন-শক্তি বা পরম ব্যামোহকারিণী শক্তি। টীকাকার মহীধরাচার্য্য বলেন, 'মীয়তে জ্ঞায়তে অনয়া' ইতি মায়া।

এখন আমরা উপনিষদ অন্বেষণ করিব। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মায়াভিঃ শব্দ পাওয়া যায়। প্রশ্ন উপনিষদে মায়াশব্দ পাওয়া যায়, তথায় উহার অর্থ মিথ্যাচাররূপ দোষ; জিহ্মম্ বা অনৃত অর্থে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে মায়া, মায়াং, ও মায়িনম্ শব্দ দৃষ্ট হয়। তথায় উহার অর্থ বিশ্ব-ভ্রান্তি। শঙ্কর উক্ত শব্দগুলির ভাষ্যে বলেন, সুখদুঃখ-মোহাত্মক অশেষ প্রপঞ্চরূপ মায়া। সাংখ্যের প্রকৃতিকেও মায়া বলা হইয়াছে - আর ঈশ্বর মায়ী, যথা মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, মায়িনং তু মহেশ্বরম্। নৃসিংহতাপনীয়, কুলিক প্রভৃতি উপনিষদে মায়া শব্দ অনেকবার পাওয়া যায়। এই সকল উপনিষদে মায়াকে অনাত্ম সৃষ্টি, নারসিংহী, তমোরূপানুভূতি, বিকারজননী, অবিদ্যা, শক্তি, ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত।

সর্ব্বোপনিষৎসারে আছে—"অনাদিঃ অন্তবর্ত্তী, প্রমাণা-প্রমাণসাধারণা ন সতি, নাসতী, ন সদসতী, স্বয়ং অবিকারাৎ বিকারহেতৌ নিরূপ্যমাণে অসতী, অনিরূপ্যমাণে সতি লক্ষণশূন্যা সা মায়া ইতি উচ্যতে।" কৃষ্ণ উপনিষদে আছে—"মায়া অজয্যা বৈষ্ণবী শক্তি।" মৈত্রী উপনিষদে আছে "মায়া ইন্দ্রজাল।" উপরি উক্ত সমস্ত স্থানেই মায়া-শব্দ 'মিথ্যা' অর্থে ব্যবহৃত। মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকায় গৌড়পাদাচার্য্য বলেন "স্বপ্ন মায়া স্বরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈঃ বিকল্পিতে"। 'মায়া মাত্রম্ ইদম্ দ্বৈতং অদ্বৈতং পর-মার্থতঃ"। সার কথা এই যে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা স্বপ্নবৎ। গৌড়পাদাচার্য্য বলেন, জগৎ মায়া, অর্থাৎ মায়াকে তিনি গন্ধর্ব্বনগর ও মায়াহস্তীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন

মহাভারতেও দেখা যায়—মায়া শব্দ, মোহিনী, অপ্সরা ও দেবকন্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। গীতাতেও মায়াকে প্রকৃতি, দুরত্যয়া দৈবী, গুণময়ী বলা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রেও মায়াশব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে মোহিনী শক্তি এই অর্থে। শারীরক ভাষ্যে মায়া শব্দ ১৫ বার একই অর্থে ব্যবহৃত। সায়ণ কোথাও কোথাও মায়া শব্দ কর্ম্ম ও কর্ম্মজ্ঞান এই অর্থে ব্যবহার করিলেও তাহার বেদ-ভাষ্যে মায়াঅর্থ মিথ্যা ঠিক আছে। মা-য়া অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব নাই অথচ দৃশ্য হয়, তাহাই মায়া। অর্থাৎ মাতি (স্বাত্মানং) দর্শয়তি ইতি মায়া, অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ প্রপঞ্চ তাহাই মায়া। উপরোক্ত বিশ্লেষণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি মায়া হিন্দু-শাস্ত্রের সর্ব্বত্র কেবলমাত্র দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রথম সৃজন-শক্তি বা কারণ, আর দ্বিতীয় সৃষ্টি বা কার্য্য। উভয়ার্থেই মায়ার মুখ্যার্থ বজায় আছে।

সুতরাং আমরা দেখিলাম মায়া শব্দ অপেক্ষা মায়ার অর্থ অনেক প্রাচীন। ঋগ্বেদেই আছে 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' বৈদিক দেবদেবীগণ এক সত্যেরই বিভিন্ন শক্তি। বহুত্বে একত্ব মায়াই অর্থ বেদেও দেখা যায় না। বহু মিথ্যা একই সৎ—মায়াবাদের এই চরম সত্য অতি প্রাচীন। বেদের নাসদীয় সূক্তে যে সৃষ্টির বর্ণনা আছে তাহাতেও মায়াবাদ স্পষ্টই পাওয়া যায়। নাসদীয় সূক্ত (১০ম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত) বিশেষ পরিচিত। মায়াবাদের মূল সত্য শুধু হিন্দু দর্শনে নহে গ্রীক দর্শনের জেনো ফেনিস্, ও পার্মিনাইডসের দর্শনেও পাওয়া যায়। মায়াবাদ শুধু হিন্দু দর্শনের কেন জগতের সমস্ত দর্শনের চরম আবিষ্কার। আজ কাল পাশ্চাত্যের কোন কোন দার্শনিকও স্বীকার না করিয়া পারিতেছেন না। ঋগ্বেদে প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা, ব্রহ্মণস্পতিঃ সৃষ্টিকর্ত্তার পরম পুরুষের নাম দশম মণ্ডলে আছে—যখন দেবতাগণ সৃষ্টি হন নাই তখন ব্রহ্মণস্পতি কারিগরের ন্যায় সৎ হইতে অসৎ (প্রথমত) সৃষ্টি করিলেন।

দেবী বা শক্তির আরাধনার সময় বাংলার ঘরে ঘরে যে 'চণ্ডী'র সহিত 'দেবীসূক্ত' পাঠ হয় তাহা ঋগ্বেদে ১০ম মণ্ডলে আছে। অম্ভৃণনামা মহর্ষির দুহিতা বাক্-নাম্নী ব্রহ্মবিদুষী এই সূক্তের দ্রষ্ট্রী। সূক্তটী এই :—ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভি-শ্চরাম্যহম্ আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্ম্যহম্ ইন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ ১ অহম্ সোমমাহনসং বিভর্ম্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্। অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥ ২ অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্। তাং মাং দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥ ৩ ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি যঃ শৃণোত্যুক্তম্। অমন্তবো মান্ত উপক্ষীয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত! শ্রদ্ধিবন্তে বদামি॥ ৪ অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তং ঋষিং তং সুমেধাং॥ ৫ অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ। অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ হ॥ ৬ অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্ মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে। ততো বিতিষ্ঠে ভুবনা নু বিশ্বা উতামূন্দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি॥ ৭ অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা। পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিমা সংবভূব॥ ৮

দেবীসূক্ত অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের চূড়ান্ত বৈদিক উদাহরণ। ঋষি দীর্ঘতামস অগ্নিকে স্তব করিতে করিতে যে বলেছিলেন "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" উহাও মায়াবাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এইরূপে অন্য বেদত্রয় হইতে বহু সূক্ত উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, প্রজাপতি, মাতরিশ্বন্, যম, অদিতি, অগ্নি, মিত্র, ইন্দ্র, ও বরুণপ্রভৃতি দেবগণ এক ব্রহ্ম সত্যেরই বিভিন্ন প্রকাশ। আবার এক এক দেবতা ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মের সহিত উন্নীত ও মিলিত

। প্রথমে যে দেবতা ॥

পরে তিনি বিশ্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, ব্রহ্মপদবাচ্য হইয়াছেন। ইহাকে পণ্ডিত মোক্ষমূলর Henotheism বলিয়াছেন। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন—জগৎ মিথ্যা। মিথ্যা অর্থে জগৎ নাই এমন নহে, জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই কেবল মাত্র ব্যাবহারিক (pragmatic) সত্তা আছে। বহু (Relative) দৃষ্টি অজ্ঞানপ্রসূত এক দৃষ্টি (Absolute) জ্ঞানজ। দ্বৈত বা বহুর অস্তিত্ব হইতেছে 'ইব' (as it were) বা যেন বস্তুতঃ নহে। দুন্দুভি, শঙ্খ, ও বীণাবাদ্য সংযত করিতে হইলে শব্দ ধরিতে চেষ্টা করিলে বৃথা হয়, বাদ্য-যন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। তদ্রূপ এক বিদিত হইলে সর্ব্ববিদিত হয়। "স যথা দুন্দুর্ভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায়, দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।" একত্বজ্ঞানে নানাত্ব (মায়া) অন্তর্হিত হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে যেমন স্বর্ণকার একখণ্ড স্বর্ণ হইতে বিবিধ অলঙ্কার তৈরী করে তদ্রূপ ব্রহ্ম মায়াসহায়ে পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, দেবগণ, প্রজাপতিপ্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার এই মায়ার আশ্রয় মানুষের মন, বাইরে নহে। বহির্জ্জগতে ঈশ্বরান্বেষণ বৃথা, কারণ তিনি হৃদয়-মন্দিরে সদাবিরজিত, কেবল মায়ার আবরণের জন্য আমরা তাঁকে জানিতে পারি না। একটা পাঞ্জাবী প্রবাদ আছে—'কুচ্ছদ্ কুদি সহর ধন্দোরা।' একজনের ছেলে তার স্কন্ধে ছিল কিন্তু সেই ব্যক্তি তাহা ভুলিয়া যায়, তাই শহরের সর্ব্বত্র চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে আমার ছেলে হারিয়ে গেছে ইত্যাদি। একজন যখন তাহার নিজ স্কন্ধে পুত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিল—তখন তাহার চেতনা হইল। তদ্রূপ সাধনান্তে সমস্ত বিশ্ব অন্বেষণ করার পর আমরা জানিব আমাদের আত্মাই ব্রহ্ম। মায়া অর্থে নানাত্ব। নানাত্ব মিথ্যা। অজ্ঞানাবরণ অপসৃত হইলে মানুষ জানিবে যে, এক সত্য নানা মিথ্যা। ইহাই বিবর্ত্তবাদ। বিবর্ত্তবাদ আত্মার ভূমি হইতে সত্য। পরিণামবাদ (অনেক পরিমাণ হেগেল দর্শনের মত) মন-ভূমি হইতে সত্য আর আরম্ভবাদ—শরীর ভূমি হইতে সত্য। মন যখন নিম্ন হইতে উচ্চে, উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করে,—তখন একই জগৎ এই ভাবে অনুভূত হয়, গন্যের [illegible] ভূমিতে।

আত্ম-দর্শন হয় মায়া অপসৃত হইলে। ব্রহ্ম-আত্মা-অধস্তাৎ, আত্মা উপরিষ্টাৎ, আত্মা পুরস্তাৎ, আত্মা পশ্চাৎ।' আত্মা বিশ্বরূপ। অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ যেমন বহির্গত হয়, মাকড়সা হইতে যেমন জাল বহির্গত হয় তদ্রূপ এক আত্মা হইতে এই 'নানা' সৃষ্টি হইয়াছে। মায়ার জন্য একই নানারূপে প্রতিভাত হইতেছে। গৌড়পাদ তাঁহার কারিকাতে জগতের চৈতন্য প্রমাণান্তর অদ্বৈত সিদ্ধি করিয়াছেন। তিনি বলেন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি মায়া-রাজ্যের অন্তর্গত, তৎপর তুরীয় রাজ্যে মায়ার প্রবেশ নিষেধ, তথায় অদ্বৈত বিরাজমান। দ্বৈত-ব্যবহারে অদ্বৈত প্রকাশ করিতে হয় বলিয়া এইরূপ ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। নচেৎ মায়া সৃষ্টও হয় নাই, নাশও হয় নাই। ব্রহ্মই আছেন মাত্র। দৃশ্যমানত্ব মায়া-জন্য। দর্পণে প্রতিবিম্ব যেমন মিথ্যা, ব্রহ্মে জগৎভ্রান্তি বা মায়াদর্শন তদ্রূপ মিথ্যা। রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয় অন্ধকারে, মরুভূমিতে যেমন মরীচিকা দর্শন হয় ব্রহ্মে জগৎদর্শন তদ্রূপ। দেশ, কাল নিমিত্তরূপ উপচক্ষুতে এক ব্রহ্মে নানারূপ মায়া দৃষ্টিগোচর হয়। জ্বলন্ত-যষ্টি চক্রাকারে ঘূর্ণিত হইলে যেমন অগ্নিবৃত্ত বা অলাত দর্শন হয় মায়া গতিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই এই ত্রিতয়ানুভূতি। প্রকৃত পক্ষে একই 'যেন' তিন হইয়াছে। নৈসর্গিক মায়া দূর হইলে বস্তুস্বরূপ (Being in itself, not Kant's thing in itself) জানা যায়। মায়া অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধি। মায়া মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্ত। মায়া মিথ্যা প্রত্যয়রূপ। যেমন স্বপ্নের দৃষ্টবস্তু জাগ্রদবধি সত্য প্রতীয়মান হয় তদ্রূপ জাগ্রৎ দৃষ্ট এই জগৎ প্রপঞ্চ তুরীয় জ্ঞানাবধি সত্য মনে হয়।

শঙ্করের বিরুদ্ধে রামানুজ, মাধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি হিন্দু দর্শনাচার্য্যগণ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্য বেদান্তকেশরী শঙ্কর তাঁদের এই উত্তর দেন যে, আপনারা যাহা যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য কিন্তু দর্শন-রাজ্যে আরও অগ্রসর হইলে মায়োপহিত জগৎ মিথ্যা অনুভূত হইবে। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, বা শুদ্ধাদ্বৈত মিথ্যা নহে—তৎতৎ ভূমি হইতে সত্য পরন্তু সাধন-জগতের চরমানুভূতি এই সকল নহে তাহা অদ্বৈত। সাধক রামপ্রসাদের ভাষায়—"যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়।" "চিদাকাশে যার যা ভাসে তাই তাদের বোধের সীমানা।"

—শ্রী হৃষিকেশ মৌলিক

মিনির নামটি 'ত্রিস্রোতা' গ্রামের গৃহে গৃহে ধ্বনিত হয়, সকাল থেকে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত, যতক্ষণ না ছেলেপিলেরা ঘুমায়। ত্রিস্রোতা-গ্রামের মেয়েরা কোন ছেলেপিলে দুষ্টামি করিলেই মিনির সঙ্গে দিতেন তাহার তুলনা—দ্বিতীয় মিনি বলিয়া ধমকাইয়া দিতেন না হয় দিতেন দুটো চড়।

মিনি দুষ্ট, ভয়ানক রকমের। গ্রামের সবাই তাহা জানে, মিনি নিজেও। কিন্তু মিনি তাহাতে দুঃখিত নহে, মোটেই না। 'দুষ্টামিতে সবার উপর' 'এক নম্বরের দুষ্টু মেয়ে' 'এমন মেয়ে ভূভারতে দেখিনি' বলিয়া গ্রামের সবাই রায় দিয়াছে। কিন্তু মিনি মনে করে এগুলি ওর 'টাইটেল'। ও শুনিয়া হাসে।

এমন কিছু দোষের নয়—মিনি হয় ত পুকুরপাড়ে সাদা ধবধবে একটা হাঁস ধরিয়া তাহার পালক তুলিয়া তুলিয়া অন্য একটি মেয়ের হাতে দেয়, সে তার ছোট্ট আঁচলটিতে তুলিয়া রাখে। এমন সময় ওর মা আসেন উগ্রচণ্ডী হইয়া। পালকগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া মেয়েকে দুটো চড় দিয়া মিনির লম্বা-লম্বা 'টাইটেল'গুলি মধুর ভাবে উচ্চারণ করিয়া মেয়েকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যান, অতি দ্রুতপদে। বিখ্যাত লোকেরা নিজেদের প্রশংসার কীর্ত্তন শুনিয়া যেমন আত্মপ্রসাদে হাসেন, মিনি তেমনই হাসে।

মিনির মা ওকে নিয়া ত্যক্ত হইয়া ওঠেন, ওর পিসীমাও। সকালবেলা উঠিয়া বই'এর পাতা বার দুই উল্টাইয়া সেই যে মিনি চলিয়া যায়, আর ফিরে দুপুরবেলা খাইতে। দুপুরের পর ব্যস্, আর মিনির দেখা নাই। আবার উপস্থিত ঠিক সন্ধ্যাবেলা।

খাওয়া বন্ধ করিয়া লাভ হয় নাই, সারাদিন মিনি বাড়ীই আসে না। খায় কোন সখীর বাড়ীতে হয়তো। সখীর মা ক্ষুধার্ত্ত মিনিকে খাইতে না দিয়া পারেন না। অবশ্য মিনি চাহিয়াও খায় না। সে-মেয়ে মিনি নয়।

সকালবেলা পড়িতে না বসিলে—মানে বই লইয়া নাড়াচাড়া না করিলে, মা যদি মিনির মুড়িমুড়কি বন্ধ করিয়া দেন, ও পাড়ায় বাহির হইয়া পড়ে শীকারের সন্ধানে। সারাদিন পাড়ায় ছেলেমেয়েদের নালিশের পর নালিশে মিনির মা উদ্ব্যস্ত হইয়া ওঠেন। মিনির ছায়াটি বাড়ীতে নাই, তাই ওর অস্তিত্ব সম্বন্ধে মা-পিসিমাকে সর্ব্বদা সচেতন রাখিবার জন্যই যেন ওর বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ আসে। তাঁহারা ওর জন্য নানা কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা মনে মনে ঠিক করিয়া রাখেন; বাড়ি ফিরিলেই হয়। কিন্তু দুপুরবেলা তাড়াতাড়ি স্নানটি সারিয়া ও যখন রান্নাঘরে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া শুষ্কমুখে বলে—মা ভাত! শুক্‌নো একটি গোলাপফুলের মত ওর সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া মা ভুলিয়া যান ওকে তিরস্কার করিতে। সারাদিনকার শাস্তির ব্যবস্থা কোথায় পড়িয়া থাকে! সন্ধ্যাকালে বাড়ী ফিরিয়া আসিলে সমস্ত অপরাহ্নের নালিশের শাস্তিস্বরূপ মিনি যখন ভাত চাহিয়া ব্যর্থমনোরথ হয়, ও গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া অমনি ঘুমাইয়া পড়ে, প্রতিবাদ করে না। পিসিমা ওর ঘুমাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠেন। সব ভুলিয়া বৌমাকে তিরস্কার করিয়া মিনিকে ডাকিতে যান। তারপর দুজনে মিলিয়া একটি প্রদীপ হাতে নিয়া ওকে ডাকিতে যান। কিন্তু মিনির মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ক্ষণকালের জন্য কাহারো মুখ হইতে শব্দ বাহির হয় না। প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোক মিনির মুখে পড়িয়া চমৎকার দেখায়। কপালের ঠিক উপরকারের চুলগুলি চিক্ চিক্ করে, কানের দুটি দুলও। সেই দুষ্ট, সদাচঞ্চল-মুখে কেমন একটা প্রশান্ত ভাব: যেন তরঙ্গাঘাতে সদা কলকলায়মান একটি নদী হঠাৎ ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কতক্ষণ পরে মুখ ফোটে।

মা বলেন—মিনি ওঠ্ খা এসে।

পিসীমা বলেন—মিনুমা ওঠোতো লক্ষ্মী।

ও চোখ মেলিয়া চায়। শাস্তির কথা ওর মনে পড়ে। চোখ রগড়াইয়া অভিমানে বলে—কেন ডাকছ, না আমি খাব না। তারপর অনেক সাধা-সাধনা আদর-অভ্যর্থনায়—মিনি খাইতে যায়। মা তাড়াতাড়ি করিয়া ঠাঁই করিয়া ভাত বাড়িয়া দেন। পিসীমা বাটীতে করিয়া তাঁহার ঘরের সমস্ত ব্যঞ্জন সাজাইয়া ধরেন। ঘরের তোলা খাবার আনিয়া দেন। বিশিষ্ট অতিথি-সৎকার আর কি!

এসব দেখিয়া শুনিয়া মিনির দেড় বছরের বড় হিমুদা রাগিয়া ওঠে।

খুব, বেশ,-পিসীমা বেশ। দুষ্টুমিও করবে, তোমাদের আদিয়ে পুড়িয়েও মারবে, আর পুরস্কারও দেবে তাকেই, বেশ।

মিনি রাগিয়া বলে—আমি খাবনা বলছি।

মা পিসীমা বলেন—হিমু, তুই বাপু এখন এখান থেকে যা তো। খেতে বসেছে থাক্।

হিমু আর মিনিতে আড়াআড়ি, অনেকটা রেষারেষি। হিমু মিনির উপর অভিভাবকত্বের দাবী করিয়া বলে—এই মিনি লক্ষীছাড়া মেয়ে। তুই আমার কথা শুনবি নে? আমি তোর দাদা জানিস্? তোর চেয়ে দে-ড় বছরের বড় জানিস্? তারপর আদেশের স্বরে—আমার কথায় উঠবি, বসবি। সকাল বেলা পড়া সেরে আমার কাছে পড়া দিয়ে তবে যাবি, জানিস্!

মিনি মুখে একটা প্রচণ্ড অবহেলার ভাব আনিয়া একটু ভ্যাংচাইয়া বলে—জানিস্! খুব জানি। তোমার কাছে আমি পড়া দেবনা। আমার চেয়ে তুমি বেশী জান? নিয়ে এসতো আঁকের বইটা। ২৪ উদাহরণের ১২ নম্বরের আঁকটা কষ দেখি?

হিমুর মুখ ক্ষণকালের জন্ম অন্ধকার হইয়া আসে। সত্যি ওই ধরণের আঁক হিমু পারে না। মিনির কিন্তু ওই সবেই মাথা খেলে চমৎকার। পটাপট সব কষিয়া দেয়। অন্যান্য সব বিষয়ে অবশ্য হিমু মিনির চেয়ে বেশীই জানে।

মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব আনিয়া হিমু বলে—যাঃ, যাঃ, ওসব প্রশ্নের অঙ্ক ভদ্রলোকে কষে? আমরা পড়ি সব ইংরাজী, ইতিহাস ভূগোল। আঁক কে কষে! তা সে যাহোক্ আমি যখন তোর বড়, আমাকে তখন তোর মানতেই হবে। বাবার কাছে সব লিখে দেব।

মিনি আবার মুখ ভ্যাংচায়।

কিন্তু হিমু সেদিকে মনোযোগ না দিয়া ওর তিন বছরের বোনকে টানিয়া আনিয়া বলে—এই রেণু, তুই এই হতচ্ছাড়া মিনিটার কথা শুনবি, না আমার! বলিয়া চোখ টিপিয়া ও নিজের দিকে ইঙ্গিত করে।

রেণু একবার মুখ উঁচু করিয়া উভয়ের দিকে চায়, মিনি মুখটি বাড়াইয়া হাসিতেছে। চঞ্চল চোখে ইঙ্গিত। 'দি-দ-দি' বলিয়া রেণুকে জড়াইয়াই ধরে। মিনি ওকে কোলে তুলিয়া আদর করিয়া চুমু খায়।

হিমু রাগিয়া ওঠে, ট্রেচারাস্ (কারণ হিমুই প্রায় রেণুকে পুতুল উপহার দেয়; হতচ্ছাড়া মেয়ে, যে তোকে সারাদিনে একবার ডেকেও জিজ্ঞেস করে না; এক পয়সার জিনিষ তোকে দেয় না, তোর খাবার কেড়ে নিয়ে যায়। তার কথা তুই শুনবি! হতভাগা মেয়ে! রাগে হিমু চলিয়া যায়।

পিছন হইতে মিনি হাসিয়া ডাকে, ও দাদা যাচ্ছ কেন, শুনে যাও, হিমু ফিরিয়া আসিয়া মিনির বেণীটিতে একটা প্রচণ্ড টান মারে।

উঃ, বলিয়া মিনি আবার হাসে।

কিন্তু সত্যি মিনি ওর ছোট বোনকে ডাকিয়াও একবার আদর করে না। একটু আদর-যত্ন, ওর সঙ্গে দুটো কথা কওয়া কিছুরই ও ধার ধারে না। ওর দিন কাটে খেলা আর দুষ্টামি নিয়া। আট মাসের একটী ভাই, কাঁদিয়া মরিলেও মিনি গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া নেয় না। সব কিছু সম্বন্ধে ও নির্ব্বিকার। মা পিসীমা ইহার জন্ম মিনিকে বকিয়া হায়রাণ। ওরি সমানবয়সী গ্রামের অন্যান্য ভাল মেয়েদের সৎ দৃষ্টান্ত শুনিতে শুনিতে মিনিও হায়রাণ হয়। তারা তাদের ছোট ভাই বোনকে খাওয়ায়, নাওয়ায়, যত্ন করে। মা'র রান্নাবান্নার সাহায্য করে। এমন কি সময়ে সময়ে রাঁধেও। আর মিনি। বিস্ময়ে সবাই 'অবাক' হইয়া যান।

মিনি সুন্দর। খুবই সুশ্রী মেয়ে। দিব্য পরিষ্কার রং, চমৎকার নাক মুখ। ঘন কৃষ্ণ চুল। গ্রামে আর দ্বিতীয়টী নাই। তাই মা ও পিসীমা ওর বিবাহ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ততা প্রকাশ করেন। হিমুর মনঃপূত হয় না। বলে, দেখো বিয়ের সময়! কি রকম মুস্কিলে পড়তে হয়। দেখতে ভাল হলে কি হয়, স্বভাবটি ভাল চাইতো! ও মাকাল ফল, পুজোয় লাগে না।

মা ও পিসীমা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন, পরে বিরক্তি প্রকাশ করেন।

বাড়ীতে নূতন কেউ আসিয়া মিনির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যদি বলেন—বাঃ খাসা মেয়েটাতো। কোন ভাগ্যবানের ঘরের বউ হবে গো! হিমু কাছে থাকিলে ফিক্ করিয়া

আধ-বোজা একটু হাসে। হাতের ইশারায় একটা ইঙ্গিত করে,—মানে হাতও থাকিলেই টের পাইবেন কেমন খাসা মেয়ে।

হিমু যদি দেখিতে পায় যে মিনি আয়না সামনে করিয়া মুখ দেখিতেছে, তবে আর রক্ষা নাই। বলে—বেশ, বেশ, মুখখানা ভাল করে দেখে নাও। লোকের কথা শুনে বড্ড অহঙ্কার, নয়। চব্বিশ ঘণ্টা আয়না নিয়ে।

আয়নায় ওর নিজের ছবি দেখিয়া মনে হইল, লোকের কথা সত্যিই। তাই মন ওর খুসীতে ভরিয়া উঠে। হিমুর কথায় উত্তর দেয় না। হিমু ইহাতে আরো রাগিয়া যায়। ওর বেণীটা টানিয়া দিয়া আয়নাটা কাড়িয়া নিয়া পলাইয়া যায়।

মা বলেন—না বাবা এমন হাড়জ্বালানো মেয়ে নিয়ে আর পারি না। কোন একটু ভাল মন্দ জিনিষ করে কোথাও রাখবার যো নেই। এতাক সেতাক খুঁজে সমস্ত পরিষ্কার করে খেয়ে রাখবেন। কেবল নিজের রাক্ষুসে পেটে দিতে পারলেই হ'ল। এমন মেয়ে, একটুকু ভাবে না যে, আমি যে সব সাবাড় করে রাখছি, অন্যে খাবে কি। দাদা আছে, ছোট বোনটি আছে, কারুর জন্য যদি এতটুকু মায়া-মমতা থাকে। এমন মেয়ে বড় হলে কি হবে গো, বলিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে পিসীমার দিকে চাহেন। পিসীমাও কম বিরক্ত ন'ন। তাঁর ঘরের জিনিষ খেতেও মিনি কসুর করে না। পিসীমা তাই বলেন—

আমিও পারিনে বাবা। হাড় জ্বালিয়ে খেলে! সে দিন ও পাড়ার খুকীর জন্য একবাটী পায়েস ঢেকে রেখেছিলাম, দেখি নেই! কখন শ্রীমতী এসে খেয়ে গেছেন। নিজেকে যে একবাটী খাওয়ালাম তাতে হ'ল না। অন্যেরটাও নিজের উদরে দেওয়া চাই। এবার আসুক সতীশ, আমি কাশী যাব চলে। মা বলেন- হ্যাঁ এবার আসুন উনি। ওঁর সঙ্গে নিশ্চয় মিনিকে পাঠিয়ে দেব। নইলে এই মেয়ের বজ্জাতি আর ঘুচবে না।

মিনুরাণী যে শুধু এ-তাকের সে-তাকের এবং বাটী ঢাকা জিনিষ খেয়েই সন্তুষ্ট থাকেন, তা নয়। আলমারী খুলে তার ভিতরকার আমসত্ব আচার নাড়ু, কোনটাই খেতে বাদ রাখেন না। আচারের বৈয়মকে বৈয়ম নিয়া বাগানে বসিয়া সখী-দিগের সঙ্গে সেগুলির সদ্ব্যবহার করেন। অবশ্য মিনির মা চাবির ছড়াটা তাঁর আঁচলে শক্ত করিয়াই বাঁধিয়া রাখেন। কিন্তু মিনি অতি সুকৌশলে এবং নিপুণভাবে মা'র আঁচল হইতে চাবি নিয়া আলমারী খুলিয়া খাবার নিয়া দৌড়াইয়া পলায়। মিনির মা হয়তো চুলটি ছাড়িয়া দিয়া পা মেলিয়া বসিয়া থালের খই বাছিতেছেন, নয় তো একখানা বই পড়িতেছেন, মিনি আসিয়া অতি শান্ত ভাবে বলে, মা এস তোমার চুলটা আঁচড়ে দিই।

মিনি চুল আঁচড়াইতে একেবারে আনাড়ি। চিরুণীর সঙ্গে অর্দ্ধেক চুল তুলিয়া আনে। মা, তাই মাথার উপর কাপড়টা টানিয়া দিয়া বিরক্ত হইয়া বলেন—না যা তুই। তোর আর মাথা আঁচড়াতে হবে না। বাড়ীর কথা মনে পড়েছে। কেন ডাং ডাং করে বাড়ী বাড়ী ঘুরতে পার নি।

মিনি ওর ছোট্ট দেহটি একটু বাঁকাইয়া, ঘাড়টি দোলাইয়া একটু করুণ সুরে বলে—না মা, তুমি এবার দেখ। একটি চুল যদি চিরুণীর সঙ্গে উঠে আসে—

বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া চুল আঁচড়াইতে যায়। তারপর একথা সেকথা পাড়িয়া কখন যে চাবিটী আঁচল হইতে খুলিয়া ফেলে, মা টেরও পান না। তারপর বলে, দাঁড়াও দেখি মা, খোকা কাঁদছে না?

বলিয়া চাবিটী নিয়া উঠিয়া যায়। মা খোকার উপর হঠাৎ ওর এই অহেতুক দরদ দেখিয়া হাসেন। ও গিয়া আলমারী খুলিয়া জিনিষটি একটি নিভৃত যায়গায় লুকাইয়া রাখে। আলমারিটী বন্ধ করিয়া ফের আসিয়া চুল আঁচড়াইতে বসে। আবার চাবিটী মার অজ্ঞাতসারে তাঁর আঁচলে বাঁধিয়া রাখে। কিছুক্ষণ মায়ের কাছে থাকিয়া ও জিনিষটি নিয়া চলিয়া যায়, সখীদের কাছে। তারপর সবাই মিলিয়া ভাগ করিয়া খায়। নিজে খায় সবচেয়ে কম। জিনিষ চুরী করিয়া আনিতে এবং সবাইকে খাওয়াইতেই ওর আমোদ।

দু তিন দিনের ভিতর মা কিছু টের পান না, কিন্তু একদিন কাহাকেও আচার দিতে যাইয়া যখন দেখেন বৈয়মের অর্দ্ধেক উধাও, নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারেন মিনিরই কাণ্ড। মিনি কিন্তু পরমাশ্চর্য্যের ভাব করিয়া বলে, সে কি? আচার রইল আলমারীর ভিতর বন্ধ, চাবী রইল তোমার কাছে, আমি খাব কি করে?

[illegible] মেয়েকে ফেলিয়া [illegible] বলেন, সেগুলি [illegible] তোমার [illegible] কিছু আছে? এ [illegible] এই [illegible] প্রাণে পড়ে। থাক্, এবার আমি [illegible] তুলছি না। থাক্ যার খুসী। আমরাও [illegible] ছোট ছিলাম। কিন্তু এমন আবদারী খুলে জিনিষ খাওয়া, স্বপ্নেরও অগোচর, স্বপ্নেরও অগোচর—বলিয়া রাগিয়া তিনি চলিয়া যান।

হিমু বৈয়মটা হাতে তুলিয়া নিয়া বলে, দাঁড়াও মা, আচার কে খেয়েছে আমি বার কর্‌ছি।

তারপর একদিন হিমু মিনিকে কানে ধরিয়া টানিয়া বাড়ী নিয়া আসে। ব্যথায় ওর কান ছিঁড়িয়া পড়ে। মুখে রক্ত উঠিয়া ওর ছুটি গাল হয় লাল। চোখ বসিয়া যায়, আর বেদনায় তাহা সজল হইয়া উঠে। মিনি তবু চুপ। মা ঘর হইতে ব্যাকুল ভাবে বলেন, আরে একি? মেরে ফেলবি যে!

পিসীমা একেবারে উঠানে নামিয়া আসিয়া মেয়েকে ছাড়াইয়া নেন। এইবার মিনি পিসীমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। পিসীমা ওর কেশ সমাচ্ছন্ন পিঠটিতে হাত বুলাইয়া দেন।

হিমু প্রথমটা থতমত খাইয়া যায়। পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলে, বেশ, সেদিন আচার নিয়ে হাহাকার করছিলে না? চোর ধরে নিয়ে এলাম আর এখন তার সঙ্গে সোহাগ, আমার বকুনি! এই তো রাণু বল্লে যে মিনি ওদের পর্শু আচার খাইয়েছে। তাই তো ধরে বাড়ী নিয়ে এলাম। নইলে আমার কি? তোমাদের কুলের আচার যে খুসী খাক্—বলিয়া ও রাগে চলিয়া যায়।

সকাল বেলা উঠিয়া মিনি ফুল তুলিতে যায়। এ ও-বাড়ী ঘুরিয়া বন্ধুদের জাগাইয়া সাথী করিয়া নেয়। সেই কোন ভোরে যে উঠিয়া মিনি চলিয়া যায়। মা টেরও পান না। মা পিসীমা তাই বকেন দস্যি মেয়ে! এতটুকু ভয় ডর নেই। রাত থাকতে উঠে রোজ ফুল তুলতে যাওয়া চাই। কেন, একটু বেলায় গেলে হয় না?

পিসীমা কত বলেন - এ সময় মিনি বার হ'স নি, এ সময় বা'র হ'স নি, ভর সন্ধ্যের সময় আর এই পিত্যুষে ভূত প্রেত চলাফেরা করে। কোন দিন ঘাড় মটকে ফেলে রাখবে।

কিন্তু মিনি কোন [illegible] হিমু [illegible] কান রাখবা। মিনি অবজ্ঞার ভরে ঠোঁট উল্টাইয়া [illegible] রেখো, আমার কি? ঠাকুর পূজো, শিব পূজো কর্‌তে ফুল পাবেনা তোমরাই, বলিয়া পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

এ-বাগান সে-বাগান এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরিয়া ওরা ফুল কুড়ায়। এক বুড়ীর বাড়ী মেলাই গোলাপ ফুলের গাছ। কিন্তু জমিদার বাড়ী ছাড়া তার একটিও [illegible] দিবেনা। তাই রাত থাকিতে উঠিয়া দাওয়ায় বসিয়া বুড়ী ফুলগাছ পাহারা দেয়। কিন্তু শ্রীমতী মিনি অনেক গবেষণার পর এক উপায় ঠাওরায়। ভোর বেলা উঠিয়া ওরা প্রথমেই যায় বুড়ীর বাড়ী। তখন একটু একটু রাত থাকে, দূরের জিনিষ ভাল করিয়া দেখা যায় না। বুড়ীও চোখে খাট। তবুও বুড়ী টের পায়।

বুড়ী বিরক্ত হইয়া বলে রোজ তোমাদের বলি বাছা আমি ফুল দিতে পারবনা, পারবনা। তবু রোজ এলে ঘ্যানোর ঘ্যানোর করা চাই, কেন?

মেয়েদের কোঁচড় তখন ফুলে ভরা।

পিছন ফিরিয়া মিনি রোজই বলে কাল থেকে আর আসবনা বুড়ী। তারপর রাস্তায় নামিয়া সে কী হাসি!

দেয়াল টপ্‌কাইতে, ফুলগাছে উঠিতেও মিনি কম যানমা। কোমরে ছোট্ট আঁচলটি জড়াইয়া ও অবলীলাক্রমে দেয়াল টপকায়, গাছে ওঠে। ওর সাথীরা প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে। এ পর্য্যন্ত যায় ভালই, কিন্তু তারপরে ফুল ভাগ নিয়াই হয় মুস্কিল। মিনির সাজিতে সবার চাইতে বেশী এবং ভাল ভাল ফুল থাকা চাই। তাই হয় ঝগড়া। মিনি যদিও খাবার জিনিষ ভাগের বেলা নিজের চাইতে সখীদেরই বেশী দেয়, কিন্তু ফুলের বেলা ও চায় রোজ পিসীমাকে আশ্চর্য্য করিয়া দিতে, ফুলের প্রাচুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে।

ছোট্ট বেণীটি দোলাইয়া ও যখন ফুলের সাজিটী হাতে করিয়া প্রভাতে রৌদ্র-ছায়ামাখা আঁকাবাকা ছোট্ট পথটি ধরিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়, পিসীমা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন। মিনি কারণটা একটু একটু বোঝে তাই হাসিয়া মুখটি নামায়। তারপর ফুলে ফুলে নিজেকে ভারী করিয়া এক দৌড়ে বাড়ীর উঠানে আসিয়া ওঠে, বলে, পিসীমা এই দেখ কত সুন্দর সুন্দর ফুল এনেছি। [illegible]

মুখ ভরিয়া যায়। ভগবানের মত পিতামাতা ভুলিয়া যান যে মিনি তাঁহাদের অবাধ্য; পাঁচ মিনিট পরেই হয়তো একটি মেয়ে আসিয়া বলিবে যে মিনি ওর চুল কাড়িয়া আনিয়াছে।

না, হতভাগা মেয়েটার জালায় আর পারা গেলনা। হাড় জালিয়ে পুড়িয়ে খেলে, বলিয়া মা ঘরের বাহির হইয়া ডাকেন, মিনি, ও মিনি! ও পোড়ারমুখী মেয়ে। পিসীমা ওঘর হইতে বাহির হইয়া বলেন—কিগো বৌ, কেন ডাকছ মিনিকে?

ধোপানীকে দেওয়ার জন্য একটা টাকা বালিশের নীচে পর্শু রেখেছিলাম। আজ বিকালে টাকাটা দিতে হবে, খুঁজে দেখি নাই,—মা বলেন।

পিসীমা হাত নাড়িয়া ঠোঁট উল্টাইয়া বলেন—জান মিনির স্বভাব, তবু টাকা বালিশের নীচেই বা রাখতে যাও কেন? বাক্সে, ট্রাঙ্কে দেখি ঘর ধরেনা।

বধূর ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস প্রভৃতি আধুনিক অপরিচিত জিনিসের প্রাচুর্য্য দেখিয়া পিসীমাতা ঠাকুরাণী একটু ক্ষুণ্ণ। মা গজর গজর করিয়া মিনিকে শাসাইতে শাসাইতে চলিয়া যান। বাড়ী ফিরিয়া আসিলে মিনির রক্ষা থাকিবেনা, নিশ্চিত।

এদিকে টাকাটি আত্মসাৎ করিয়া মিনি বাহির হইয়া পড়ে, পাড়ায়। আঁচলের কোনায় টাকাটা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ও সখীদের এক এক করিয়া জুটায়। চাল চলন দস্তরমত রাশভারী লোকের। একটা টাকা নিজের অধিকারে পাইয়া ও যেন বয়সে অনেক বড় হইয়া গিয়াছে। তাই ঐ রকম চাল-চলন। বলে, সবাইকে অবাক করিয়া দিবে।

এই চক্চকে রূপার টাকাটা ওর নিজের। স-ম-স্ত টাকাটা। এই টাকাটা দিয়া ও যা খুসী করিতে পারে, এ্যাঁ। ভাবিতেও আনন্দে মিনির গা থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া ওঠে।

একটা পোড়ো বাড়ীর ঘনপল্লবাচ্ছন্ন আম গাছের ছায়ায় উহারা জোটে। রাণী, হাসি, চুণি, পান্না, নন্দ সব হাজির, কেউ বাদ নাই। সবাই বসিলে মিনি আঁচল হইতে টাকাটা খুলিয়া উহাদের সামনে উঁচু করিয়া ধরে, বলে, আজ আমরা এ টাকাটা দিয়ে যা-খুসী খাব। তোমরা কি কি খাবে বল?

আনন্দে এতগুলি ঠোঁট একসঙ্গে নড়িয়া উঠে। রসগোল্লা, সিঙ্গাড়া, অমনি বলিয়া গোলমাল আরম্ভ করিয়া দেয়।

নেতার ভঙ্গীতে মিনি বলে—চুপ্ চুপ্। গোলমাল করিস্নে। সব আনব, সব। শোন সব, আমি আর রাণু মিঠাই নিয়ে আস্ছি। আর টুনি তুই এদের দেখিস্তো গণ্ডগোল যেন করে না, বলিয়া রাণুকে টানিয়া নিয়া দৃপ্ত ভঙ্গীতে ও চলিয়া যায়।

নবীন ময়রার দোকানে গিয়ে বলে—দাওতো ময়রা একসের রসগোল্লা আর আট আনার সিঙ্গাড়া কচুরি। তাড়াতাড়ি, মা বসে আছেন।

পাল্লার উপর 'সের'টা ফেলিয়া নবীন বলে—তোমাদের বাড়ী কেউ এলো নাকি মিনুরাণী?

মিনি রাণুকে টিপিয়া দুষ্টু হাসি হাসিয়া বলে—হ্যাঁ। চট্ করিয়া আস্ত টাকাটা ফেলিয়া দিতে মিনির একটুও কষ্ট হয়না। পথে ওরা মেয়ের সংখ্যা আর রসগোল্লার সংখ্যা গুণিতে গুণিতে আসে। দুটো করিয়া রসগোল্লা আর ছোট্ট মুঠি ভরিয়া সিঙ্গাড়া কচুরি পাইয়া মেয়েদের কী ফূর্ত্তি! আনন্দে ওরা কলরব জুড়িয়া দেয়। নিস্তব্ধ দুপুরের ঘুঘুর ডাক ডুবিয়া যায়। আকাশের উড়ো মেঘ বারেক থামিয়া, নীচের দিকে চাহিয়া আবার চলে।

মিনি রসগোল্লার মালসাটা হাতে করিয়া বলে—এই চুপ্ চুপ্! চুপ করে খা। কেউ শব্দ শুনে আসলে আর রক্ষে থাক্বেনা।

ওর মুখে পরিতৃপ্তির একটি হাসি।

মিনিও রাজনৈতিক নেতাদের মত বোঝে যে ওর প্রতি দলের অবিচলিত আনুগত্য রাখিতে হইলে দলকে মাঝে মাঝে খাওয়াইয়া, এটা সেটা দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। ও করিয়াছেও তাই। দু'আনা চা'র আনা যখনি যা পাইয়াছে তাই দিয়া ওর ছোট্ট দলটির মনস্তুষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এমন প্রচুর আর কোন দিন হয় নাই। কোথায় পাড়ায় পাড়ায় ফাঁকে ফাঁকে আমসত্ত্ব লুকাইয়া আনিয়া ও সবাইকে খাওয়াইয়াছে। মুঠো ভরিয়া কুলের আচার, নাড়ু। পাঁপরও যে জড় জোটে [illegible], কিন্তু মিনি তাহাতে দমিয়া যায় নাই। সবাইকে

খাওয়াইয়া মিনির মন খুসীতে পরিপূর্ণ। এমন খুসী যে ওর ভাগের মিঠাই ও খাইলইনা। তাও বিলাইয়া দিতে চায়।

কিন্তু রাণু বলে—মিনি তুমি, না হয় নাই খেলে। রেণুতো আসেনি রেণুর জন্য নিয়ে যাও।

তখন ও নিয়া আসে।

বিকেল বেলা হিমু স্কুল হইতে আসিয়া বলে—মা কই? কাউকে দেখছি না তো। তবে যে নবীন ময়রা পথে বল্লে—দেখুন গিয়ে, আপনাদের বাড়ীতে কে অতিথ এসেছে। মিনি ঠা'ন এক টাকার খাবার নিয়ে গেল।

মা'র বুঝিতে বাকী থাকে না। 'গজর' 'গজর' করিয়া মিনির দীর্ঘ 'টাইটেল'গুলি আওড়াইতে থাকেন। পিসীমা শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া যান। কিন্তু এবার আর মিনিকে শাস্তি দিতে হিমুর উৎসাহ থাকেনা। কে আবার বকুনি খাইবে?

সন্ধ্যাবেলা মিনি বাড়ী আসে। রেণুকে চুপি চুপি রান্না-ঘরের পিছনে ডাকিয়া নিয়া বলে—খা দিকি, মাকে বলিসনি যেন—বলিয়া আঁচলের নীচে হইতে খাবারের ছোট্ট ঠোঙ্গাটি বাহির করিয়া দেয়।

রেণুকে চুপি চুপি ডাকিতে মার সন্দেহ হয়। নিঃশব্দে পিছনে পিছনে আসিয়া দেখেন—এই কাণ্ড। ছোট বোনের প্রতি মিনির টান দেখিয়া রাগ অনেকটা জল হইয়া আসে। তবু সেদিনকার রাত্রিবের খাবার বন্ধ করিয়া দেন। মিনির তাতে রাগ হয় না মোটে। দুঃখও হয় না, কারণ সেদিন ওর মন খুসীতে পরিপূর্ণ।

একদিন দুপুরে মিনি সেই পোড়ো বাড়ীটার উঠানে ঘাসের উপর হইয়া শুইয়া আছে। কচি কোমল ঘাস, ওর ভারী ভাল লাগিতেছিল, তাহার উপর শুইয়া থাকিতে। ঘন-পল্লবাচ্ছন্ন আম গাছের ছায়ায় মিনি ওর পিঠের উপর ভ্রমর কৃষ্ণ চুলগুলি ছড়াইয়া দিয়া শুইয়া আছে। ঝির্ ঝির্ করিয়া বাতাস দেয়, সড়্ সড়্ করিয়া গাছের পাতা কাঁপিয়া ওঠে। শালিকের দল এখানে সেখানে উড়িয়া আসিয়া বসে, আবার ফরফর করিয়া উড়িয়া চলিয়া যায়। কী একটা পাখী ডাকিতেছে, দূরে, মিঠে সুরে। মিনি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না, কী পাখী সেটা। কি করিয়া আচার চুরি করিয়া আনিতে হইবে, রাণীকে তাহা শিখাইয়া দিয়া ও সেখানে শুইয়া আছে। রাণী আসে না। ডান হাতের চুড়িদুটী ও বাঁহাত দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখে। দূরে আকাশে একটা চিল ডাকিয়া যায়। আয়ত চোখ দুটি উপরে তুলিয়া বহিয়া ও তাই দেখে—আকাশের কোণে কালো একটি ফোঁটা হইয়া চিলটি মিশিয়া গেল। ওর সরু সোণার হারটি ঘাসের উপর লুটায়। ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে হারটি লুকাইয়া যায়। হারটি তুলিয়া মিনি ওর ছোট্ট আঙ্গুলে জড়ায়। ওই গাছের আড়াল দিয়া কে আসে না?

মিনি ডাকে রা—

কিন্তু রাণী ত' নয়, বই হাতে একটি ছেলে যে! মিনিকে দেখিয়া ছেলেটীর মনে হইল রৌদ্রছায়ামাখা সবুজ ঘাসের উপর কতকগুলি শেফালী ফুল দিয়া কে একটি মেয়ের মতন গড়িয়া রাখিয়াছে। ওর বুঝি চোখে পলক পড়ে না, মিনিরও না। কিন্তু মিনির আজ কি হইল—কোথায় মুখ ভ্যাংচাইয়া সে ছেলেটিকে অভ্যর্থনা করিবে, তা না এমন লজ্জা তাহার কেন করে? অজ্ঞাতসারেই মিনি আঁচলটা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া উঠিয়া বসে। মুখটী নামাইয়া একটু হাসে ছেলেটী আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া চলিয়া যায়।

মাথাটী দুই হাঁটুর ভিতর লুকাইয়া মাটির দিকে মিনু তাকায়, ভাবিতে থাকে কে ছেলেটী? আর কোন দিন দেখেছি বলে ত মনে হয় না। কিছুক্ষণ আবও ভাবে, তার পরে মনে পড়িয়া যায় ওঃ, ওপাড়ার রমেশ কাকার ছেলে বুঝি? মনু যে এদ্দিন চাটগাঁ থাকত। এখানকার স্কুলে এসে ভর্ত্তি হয়েছে বুঝি? মনু—বাঃ বেশ মিল তো, ওর নামওতো মিনু, ও হাসে।

পিছন হইতে রাণী বলে—একি হাস্‌ছিস যে বড়। আমি দূর থেকে দেখি তুই মাথা গুঁজে বসে আছিস্। তাই চুপি চুপি এলাম তোকে চমকে দেবার জন্য।

তার পরে রাণী একদলা আচার দেখাইয়া তাহার চুরির বৃত্তান্ত আরম্ভ করে। মিনু সেদিকে মনোযোগ দেয় না। আচার হাতে নিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে খাইতে আরম্ভ করিয়া দেয়। তার পর, উঃ বড় ঝাল- বলিয়া ফেলিয়া দেয়।

রাণী রাগিয়া বলে—ঝাল কোথায়? ফেলে দিলি কেন? আমাকে দিলেই পারতিস্।

মিনি বলে—চল্ বাড়ী যাই।

রাণী বলে—কাল দুপুরে আবার এখানে আসবি তো? নারে, বলিয়া মিনু অন্যমনস্কভাবে চলিয়া যায়। কিন্তু মিনি আসে, পরদিন দুপুরে মাথাটি ভাল করিয়া আঁচড়াইয়া ফর্সা একখানা শাড়ী পরিয়া বাহির হইয়া পড়ে। বেশ-বিন্যাসের প্রতি হঠাৎ ওর এই মনোযোগ দেখিয়া মা একটু আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া থাকেন।

তারপর বুঝি ঠিক সেইখানে গিয়া বসিয়া মিনি যেন কার প্রতীক্ষা করে। ছেলেটীও হঠাৎ আসে আবার ওকে দেখিয়াই চলিয়া যায়। কাছ দিয়া যায় কিন্তু আসিয়া কিছু বলে না।

যায় এমনি দুতিন দিন। একদিন শেষে ছেলেটী ওর কাছে আসিয়া বসে। ওর হাতটিই ধরিয়া বলে—তুমি হিমুর বোন, নয়?

মিনির সমস্ত শরীর কেমন করিয়া ওঠে। ছেলেটীর মুখের দিকে তাকাইতে পারে না। মুখ নীচু করিয়া মাথা নাড়িয়া উত্তর জানায় সলজ্জ নববধূর মত।

মিনু জিজ্ঞাসা করে—তোমার নামটি কি?

মিনি এবার একটু মাথা উঠাইয়া বলে—মিনু। ছেলেটি হাসিয়া বলে—বা, তোমার নামে আমার নামে ভারী মিল তো?

অকারণ লজ্জায় মিনি রাঙিয়া ওঠে। ও নিজেও তো তাই ভাবিয়াছে।

মনু আবার জিজ্ঞাসা করে—তুমি কী কী বই পড়!

মিনি ধীরে ধীরে বইগুলির নাম বলিয়া যায়।

শুনিয়া ছেলেটি বলে—বাঃ তুমি তো খুব শক্ত শক্ত বই পড় দেখছি। কে পড়ায়? কালী মাষ্টার বুঝি?

মিনি ঘাড় নাড়িয়া জানায়, হ্যাঁ।

আবার এস এই খানে। তোমার জন্য আমি ছবির বই নিয়ে আসব। ছবির বই তুমি ভালবাস, নয়? বলিয়া মনু বই গুছাইয়া নিয়া চলিয়া যায়। ছেলেটিকে মিনি দৃষ্টি দিয়া অনুসরণ করে, যতক্ষণ না ও গাছের আড়ালে পথের বাঁকে মিলাইয়া যায়। তারপর বুকের তলা হইতে একটা কি যেন দীর্ঘশ্বাসই বুঝি উঠিয়া আসে, এমনি।

মণি চলিয়া গেলে ওর ফেলিয়া-যাওয়া পেন্সিলটা বুকের কাছে সেমিজের ফাঁকে রাখিয়া মিনি বাড়ী ফিরিয়া আসে।

তারপর—কাল আর পরশু দিনের পর দীর্ঘতর এক একটা দিন যেন অলক্ষ্য তুলির মত মিনির জীবনের পাতায় নব-পর্য্যায়ের রেখা টানিয়া দিয়া চলিয়া যায়। নিজের সম্বন্ধে মিনি সজাগ হইয়া উঠে। এমনি যেন কতকাল!

মা ও পিসীমা হঠাৎ একদিন মণির স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া একেবারে থ বনিয়া গিয়াছেন। মিনি এখনও সেই রাত থাকিতে উঠিয়া ফুল কুড়াইতে যায় বটে, কিন্তু আসিয়া সেই যে পড়িতে বসে বেলা দশটার বাহিরে এক মিনিট আগেও আর উঠিবার নাম করে না। পড়ায় সে কি মনোযোগ! দাদার সঙ্গে ঝগড়া ভুলিয়া ইংরাজী ইতিহাস ভাল করিয়া শিখিবার জন্যও এখন হিমুর খোসামোদ করে। হিমুকে তাই ও 'দাদা' বলিয়া ডাকে।

হিমু মুচকি হাসিয়া বলে—হুঁ, তবু ভাল। তা বেশ পড়বি আমার কাছে সকালে এক ঘণ্টা করে।

মিনি এখন আর এপাড়া-সেপাড়া ঘুরিয়া বেড়ায় না। চুলের কাপড়ের যত্ন নেয়। মার কাছে সাবান চায়। খাইতে বসিয়া আগে যে দুবেলা এত গণ্ডগোল করিত তাহাও আর করে না। রেণুকে আদর করে। ওর মাথা আঁচড়াইয়া দেয়, স্নান করায়, জামা পরায়। কেন তাহা কেহ ঠিক করিতে পারে না। খোকা কাঁদিয়া উঠিলে আজকাল মিনি গিয়া তাকে কোলে করে, খেলা দেয়, ঘুম পাড়ায়, পিসীমা তো অবাক্, মা তদপেক্ষা বেশী।

এই তাঁহার সেই দুষ্ট চঞ্চল মিনি! একদিন রান্নাঘরে আসিয়া মিনি মাকে বলে—মা দাও, আমি রান্না শিখব, আমাকে শিখাও।

লোজান সিদ্ধান্ত ও ইউরোপ

—শ্রীকুলেন্দ্রচন্দ্র পাল

লোজান বৈঠকে শক্তিবর্গ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাতে ইউরোপে নাকি শান্তি-পর্ব্বের স্থচনা হইয়াছে। বৈঠকের শেষ সভায় ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ মেক্‌ডোনাল্ড বলেন তাঁহাদের কাজ ইতিহাসে এক নূতন পৃষ্ঠার সংযোগ বিধান করিয়াছে; তাহাতে কোন পরিচ্ছেদ-বিশেষ শেষ হয় নাই এক নূতন পুস্তকেরই আরম্ভ হইয়াছে। বৈঠকে মিঃ মেক্‌ডোনাল্ডের এই উক্তি এবং ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি নিজে যে বিপুল সংবর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন তাহাতে অনেকেরই মনে হইয়াছিল যে এতদিন পরে বুঝি বাস্তবিকই ইউরোপের শক্তিবর্গের সুবুদ্ধি দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই আশা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। সম্প্রতি লোজান বৈঠক সংক্রান্ত যে সব গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে শক্তিবর্গের সিদ্ধান্তের বাস্তবিকই কোন মূল্য আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ দেখা যায়।

সকলেই জানেন লোজান বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ—প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য, জার্ম্মানীর ক্ষতিপূরণের মীমাংসা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ডেন্যুব অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের (অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া ও জেকোশ্লভেকিয়া) সমস্যার সমাধান। এই দুই সমস্যা দৃশ্যতঃ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও ইউরোপের আর্থিক দুর্গতির কারণরূপে ইহাদের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র রহিয়াছে। তাছাড়া ক্ষতিপূরণ-সমস্যার সমাধানের জন্য প্রধানতঃ যে-সব রাষ্ট্রের সহযোগিতার প্রয়োজন, ডেন্যুব সমস্যার সমাধানের জন্যও ঠিক তাহাদেরই সহায়তা দরকার। এই দুই সমস্যার প্রত্যেকটীর সঙ্গে এই সকল রাষ্ট্রের প্রত্যেকটীর স্বার্থ সমান ভাবে জড়িত নহে; অথচ প্রত্যেকেরই ভাগ্য একটী না একটীর সঙ্গে বিশেষভাবেই সংশ্লিষ্ট। কাজেই ইহাদের স্বতন্ত্র সমাধান অপেক্ষা সম্মিলিত সমাধান অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য।

কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইলে এই দুই সমস্যার একটু আলোচনা দরকার। জার্ম্মানীর ক্ষতি-পূরণ সমস্যার সঙ্গে ইউরোপের চারিটী প্রধান রাষ্ট্রের স্বার্থ বিশেষ ভাবে জড়িত—ফরাসী, ইংলণ্ড, ইটালী ও বেলজিয়াম। ইহারা সকলেই জার্ম্মানীর নিকট ক্ষতিপূরণ পাইয়া থাকে, কিন্তু সকলের স্বার্থ সমান নয়। জার্ম্মানীর বার্ষিক দেয় ৫০ কোটী ডলারের মধ্যে ফরাসীর প্রাপ্য শতকরা ৫২ ভাগ, ইংলণ্ডের ২২ ভাগ, ইটালীর ১০ ভাগ, বেলজিয়ামের ৮ ভাগ, এবং অন্যান্য মিত্রশক্তির বাকী ৮ ভাগ। কাজেই জার্ম্মানীকে ক্ষতিপূরণ হইতে সম্পূর্ণ রেহাই দিতে হইলে ফরাসীকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, যদি না সেই সঙ্গে তাহাকেও সমর-ঋণ হইতে রেহাই দেওয়া হয়। অথচ জার্ম্মানী ক্ষতিপূরণ হইতে রেহাই পাওয়ার ফলে তাহার যে আর্থিক অভ্যুত্থান ঘটিবে তজ্জন্য সুবিধা ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লাভ করিবে ইংলণ্ড; কারণ গত কয় বৎসরে জার্ম্মানী বিদেশ হইতে যে বিপুল পরিমাণে অল্প-মেয়াদ বাণিজ্য-ঋণ লইয়াছে তাহার প্রায় সবটাই আসিয়াছে ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে এবং জার্ম্মানীর বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি যতদিন চলিবে ততদিন সে টাকা বা তার সুদ কিছুই পাওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ক্ষতি-পূরণের দায় হইতে মুক্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর আর্থিক উন্নতি অসম্ভব, কাজেই সেসমস্যার সমাধানে ইংলণ্ডের আগ্রহের কারণ সুস্পষ্ট।

অপরদিকে ডেন্যুব অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের অদৃষ্টের সঙ্গে ফরাসীর স্বার্থও তেমনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জড়িত, কারণ এ সব দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাহার বহু টাকা খাটিতেছে। কিন্তু জার্ম্মানী, ইটালী ও ইংলণ্ডের সহায়তা ব্যতীত এসব দেশকে আর্থিক ধ্বংস হইতে রক্ষা করা অসম্ভব। এবং সে সহায়তা যে সহজে পাওয়া যাইবে না তাহা গত ডেন্যুব বৈঠকে বেশ স্পষ্ট করিয়াই বুঝা গিয়াছে।

সে বৈঠকে ইংলণ্ড ও ফরাসীর প্রধান প্রস্তাব ছিল এই যে এই সব রাষ্ট্রকে একটি অর্থনৈতিক মণ্ডলীতে (economic federation) পরিণত করিতে হইবে, যার ফলে ইহারা পরস্পরকে শুল্ক-বিষয়ে সুবিধা প্রদান করিবে; ইটালী ও জার্ম্মানী এই মণ্ডলীস্থাপনে সহায়তা করিবে এবং এই ব্যবস্থার ফলে এই সব দেশের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার ঘটিলে ইংলণ্ড ও ফরাসী তাহাদিগকে বর্ত্তমান প্রয়োজন মিটাইবার মত ঋণ প্রদান করিবে; ফলে তাহাদিগকে পূর্ব্ব ঋণ অস্বীকার করিতে

হইবে না এবং এইরূপ অস্বীকারের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম আর্থিক বিপর্য্যয় হইতে সমগ্র ইউরোপ রক্ষা পাইবে। কিন্তু এ ব্যবস্থায় জার্ম্মানী ও ইটালীর যথেষ্ট আপত্তির কারণ আছে। কারণ এরূপ অর্থনৈতিক মণ্ডলীগঠনের অন্যতম অর্থ এই যে তাহারা মণ্ডলীর বাহিরের দেশ বলিয়া ইহাদের নিকট বর্ত্তমানে যে বাণিজ্য-সুবিধা (most favoured nation treatment) পাইতেছে তাহা আর পাইবে না; অথচ সমগ্র ইউরোপের মধ্যে প্রথমতঃ জার্ম্মানী ও তারপর ইটালী এই মণ্ডলীর অন্তর্গত দেশসমূহের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান খরিদ্দার, যদিও জার্ম্মানীর মোট বাণিজ্যের অংশ এইসব দেশের সঙ্গে সামান্য মাত্র। এরূপ মণ্ডলীগঠনের বিরুদ্ধে অবশ্য আরও আপত্তি আছে,—তাহা এই যে ইহার উপকার মণ্ডলীর অন্তর্গত সকল দেশ সমান ভাবে পাইবে না। কিন্তু এসব দেশের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা অর্থের। শীঘ্র বিদেশ হইতে কোনরূপ সাহায্য না পাইলে তাহাদের আর্থিক ব্যবস্থার ধ্বংস অনিবার্য্য। কাজেই যথেষ্ট আপত্তির কারণ থাকা সত্ত্বেও সেই সাহায্যের বিনিময়ে তাহারা যে কোন ব্যবস্থায়ই রাজি হইতে পারে। কিন্তু প্রথমতঃ জার্ম্মানী ও ইটালীর সম্মতি ও সাহায্য ব্যতীত এরূপ কোন ব্যবস্থাই সফল হইতে পারে না এবং দ্বিতীয়তঃ সে সাহায্য ও সম্মতি পাইলেও তাহাতে ইংলণ্ডের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন। লোজান বৈঠকে ক্ষতিপূরণ ও ডেন্যুব সমস্যার সম্মিলিত সমাধানের চেষ্টার মূলে এই অর্থ-নৈতিক সত্যটি বিশেষভাবেই বিদ্যমান এবং বৈঠকের তথাকথিত সাফল্যের জন্য ইহাও কম দায়ী নয়। বৈঠকের আলাপ আলোচনা ও শক্তিবৃন্দের বিভিন্ন প্রস্তাব ও দাবীর তালিকা হইতে এ কথা বেশ স্পষ্ট করিয়াই বুঝা যায়।

বৈঠক প্রথম হইতেই একটি সত্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল—জার্ম্মানীর বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় তাহার পক্ষে এখন বা অন্ততঃ তিন বৎসরের মধ্যে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ-প্রদান সম্পূর্ণই অসম্ভব। তাছাড়া সকলেই মনে মনে স্পষ্ট করিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে জার্ম্মানী হইতে ক্ষতিপূরণলাভের আর কিছুমাত্র আশা নাই। কিন্তু একথা কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়া লইতে প্রত্যেকেরই অন্যবিস্তর আপত্তি আছে। কারণ এ পর্য্যন্ত সমর-ঋণ শোধ করিবার জন্য সকলেই নির্ভর করিয়াছে ক্ষতিপূরণের টাকার উপর। এখন সে ঋণ হইতে রেহাই পাইবার কোনরূপ (পাইয়া ক্ষতিপূরণের দাবী ছাড়িয়া দিলে নিজেদের পকেট হইতেই তাহা মিটাইতে হইবে। এদিকে সমরঋণের প্রধান পাওনাদার আমেরিকা ও ক্ষতিপূরণ-প্রদানকারী জার্ম্মানী কেহই সমরঋণের সঙ্গে ক্ষতিপূরণের কোনরূপ সম্পর্ক স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। আমেরিকা স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছে যে শুধু এক সর্ত্তে সে সমরঋণের দাবী কিছু পরিমাণে কমাইতে প্রস্তুত আছে; তাহা এই যে ইউরোপের শক্তিবৃন্দ তাহাদের যুদ্ধোপকরণ অন্ততঃ শতকরা দশভাগ কমাইবে। সমরঋণের অন্যতম পাওনাদার ইংলণ্ড সমরঋণ ও ক্ষতিপূরণ উভয়ই মুছিয়া ফেলিতে আগ্রহান্বিত হইলেও তাহার এই "ত্যাগ-স্বীকার" আমেরিকার ত্যাগস্বীকারসাপেক্ষ বলিয়া এদিক দিয়াও সমস্যাসমাধানের কিছুমাত্র সহায়তা হয় নাই। শক্তি-বর্গের পরস্পরের সমরঋণ ও ক্ষতিপূরণসংক্রান্ত দেনাপাওনার নিম্নলিখিত হিসাব হইতে একথা স্পষ্ট করিয়াই বুঝা যাইবে :—

	ইংলণ্ডের নিকট মোট ঋণ (পাউণ্ড)	আমেরিকার নিকট মোট ঋণ (পাউণ্ড)	জার্ম্মানীর নিকট মোট প্রাপ্য (পাউণ্ড)
ফরাসী —	৭৫ কোটি ৯০ লক্ষ	৮২ কোটি ৭০ লক্ষ	১৫৪ কোটি
ইংলণ্ড —		৯৪ কোটি ৫০ লক্ষ	৫৯ কোটি ৫০ লক্ষ
ইটালী —	২৫ কোটি ৪০ লক্ষ	৪১ কোটি ৯০ লক্ষ	৩১ কোটি ৫০ লক্ষ
বেলজিয়ম —		৮ কোটি ৫০ লক্ষ	১৬ কোটি ৭০ লক্ষ
মোট (অন্যান্য দেশের দেনা-পাওনার হিসাব ধরিয়া) —	১১২ কোটি	২৩৭ কোটি	২৮০ কোটি

এ অবস্থায় লোজান বৈঠকের সাফল্য সম্বন্ধে প্রথম হইতেই সকলেই সন্দিহান ছিলেন এবং ক্ষতিপূরণের মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়া ছাড়া বৈঠক বিশেষ কিছু করিতে পারিবে বলিয়া কেহই আশা করেন নাই। কিন্তু এরূপ মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়ার অর্থ সমস্যাকে ঠেকাইয়া রাখা ছাড়া আর কিছুই নয়—অথচ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই অনিশ্চয়তার ফল সব দেশের—বিশেষতঃ জার্ম্মানীর—আর্থিক অবস্থার পক্ষেই মারাত্মক। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকার সাহায্য পাওয়া যাইবে (বা সে সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা হইবে) বলিয়া ধরিয়া লইয়া শক্তিবর্গ নিজেদের মধ্যে একটা মিটমাটের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সহজ দৃষ্টিতে এরূপ মিটমাটের বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকই অবশ্য দেখা যায় না; কারণ উপরের তালিকা হইতে স্পষ্টই

বুঝা যাইতেছে যে সমরঋণ ও ক্ষতিপূরণ উভয়ই সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিলে ফরাসী ও ইটালী লাভবানই হইবে, বেলজিয়ামের কতকটা ক্ষতি হইলেও তাহা উল্লেখযোগ্য নয় এবং ইংলণ্ডের যে ক্ষতি হইবে তাহা স্বীকার করিতে সে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত আছে। কিন্তু তাহা হইলেও ফরাসী এ ব্যবস্থা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইল না, কারণ তাহার নিকট ক্ষতিপূরণের অর্থ শুধু নিজের আর্থিক লাভই নয়, সেই সঙ্গে জার্ম্মানীকে জব্দ করাও বটে। অপর কথায় ফরাসী চায় ক্ষতিপূরণের বিপুল ভারে জার্ম্মানীকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করিয়া রাখিতে। তাহার ভয় এই যে ক্ষতিপূরণের দায় হইতে রেহাই পাইলে জার্ম্মানী শীঘ্রই শিল্পজগতে অপ্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠিবে এবং তখন সে যুদ্ধের পরের সমস্ত অত্যাচারের প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবে না। কাজেই সে প্রস্তাব করিল :—

(১) তিন বৎসরের জন্য ক্ষতিপূরণ-প্রদান স্থগিত থাকিবে, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে জিনিষপত্রদ্বারা (in kind) ক্ষতিপূরণ প্রদান চলিতে পারিবে।

(২) এই তিন বৎসর পর জার্ম্মানীকে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতে রাজী হইতে হইবে; এই টাকা আমেরিকা ও অন্যান্য পাওনাদারদের মধ্যে তাহাদের প্রাপ্যের অনুপাতে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

এই সঙ্গে ফরাসী ক্ষতিপূরণের পরিমাণ একতৃতীয়াংশ কমাইয়া দিতে প্রস্তুত হইল, কিন্তু দাবী করিল যে বাকী দুই-তৃতীয়াংশের জন্য জার্ম্মানীকে রেলওয়ে-বণ্ড গচ্ছিত রাখিতে হইবে।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জার্ম্মানীকে পঙ্গু করিয়া রাখা ফরাসীর যেরূপ ঈপ্সিত, তাহার অর্থ-নৈতিক পুনরভ্যুদয় ইংলণ্ডের ঠিক তেমনি কাম্য। সে প্রস্তাব করিল :—

(১) ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে বৈঠককে স্থায়ী ও শেষ মীমাংসায় উপনীত হইতে হইবে এবং সে মীমাংসা পৃথিবীর বিশ্বাস পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে এরূপ হইবে।

(২) বর্ত্তমানে বা বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি শেষ হইবার পূর্ব্বে জার্ম্মানীকে ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হইবে না।

(৩) যদি কখনও জার্ম্মানীকে কিছু দিতে হয় তবে তাহা যাহাতে তাহার আর্থিক অবস্থা বিপন্ন না করে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারের বিঘ্ন না ঘটায় তাহা দেখিতে হইবে।

(৪) ক্ষতিপূরণ-প্রদান পুনরারব্ধ হইলে তাহা যাহাতে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বিপর্য্যয় না ঘটায় সেই ভাবে তাহা প্রদানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ইটালী জানাইল :—

(১) ক্ষতিপূরণ ও সমরঋণ উভয়ের কর্ত্তনই (cancellation) বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়-মন্দা সংশোধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

(২) ক্ষতিপূরণ যদি সম্পূর্ণ কর্ত্তন না করা হয় তবে ইটালীও তাহার প্রাপ্য অংশ দাবী করিবে।

(৩) ইউরোপের—বিশেষতঃ ডেন্যুব অঞ্চলের রাষ্ট্র সমূহের—পুনর্গঠনই ইটালীর বিবেচনায় সর্ব্বাগ্রে চিন্তনীয় এবং জার্ম্মানীর সহযোগিতা ব্যতীত তাহা সম্ভব বলিয়া সে বিশ্বাস করে না।

জার্ম্মানী ক্ষতিপূরণ-প্রদানের অক্ষমতা জানাইয়া বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যা সমাধানে আন্তর্জ্জাতিক সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করিল। সে আরও বলিল যে এখন হইতে দশ বৎসর ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থা ভাল থাকিবে বলিয়া ধরিয়া লইলেও জার্ম্মানীর পক্ষে ক্ষতিপূরণ-প্রদান সম্ভবপর হইবে না এবং ভবিষ্যতে তাহাকে আবার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে, এই সম্ভাবনা মাত্রও তাহার আর্থিক পুনরভ্যুদয়ের পক্ষে বিরাট অন্তরায় স্বরূপ হইবে; কারণ তাহা হইলে কেহই জার্ম্মানীর আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহে টাকা খাটাইতে বা তাহাকে টাকা ধার দিতে প্রস্তুত হইবে না।

এ অবস্থায় সকলেই বুঝিলেন যে শুধু দুই উপায়ে বৈঠককে ব্যর্থতা হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে।—

(১) যদি ক্ষতিপূরণের পরিবর্ত্তে জার্ম্মানী একসঙ্গে পাওনাদারদিগকে মোটা কিছু টাকা দিতে প্রস্তুত হয়। (জার্ম্মানী এ পর্য্যন্ত নীতির (principle) দিক দিয়া ক্ষতিপূরণ-প্রদানে অসম্মতি জানায় নাই; কাজেই ইহা অসম্ভব নয় বলিয়া অনেকেই মনে করিল)।

(২) অথবা যদি সে পূর্ব্ব সীমান্ত (Upper Sibesia ও Danzig Corridor) সম্বন্ধে সকল প্রকার দাবী ও আন্দোলন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। জার্ম্মানীর এই দুই ভূভাগ ভারসাই সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারে Polandএর ভাগে পড়িয়াছে। ভবিষ্যতে ভারসাই সন্ধির এই অবিচার লইয়াই

ফরাসীর সঙ্গে তাহার বিরোধ বাধিবে বলিয়া সকলেই আশঙ্কা করেন।

বৈঠকের ভাগ্য লইয়া যখন এরূপ জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে তখন জার্ম্মানীর প্রধান মন্ত্রী কয়েক জন সাংবাদিককে বলিলেন যে জার্ম্মানী ক্ষতিপূরণ দিতে অক্ষম এবং দিবেও না এবং ক্ষতিপূরণের পরিবর্ত্তে এক সঙ্গে কিছু দিতেও প্রস্তুত নয়। কিন্তু তাহা হইলেও জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট ইউরোপের আর্থিক পুনরুত্থানে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক এবং সে উদ্দেশ্যে ইউরোপের দুস্থ দেশসমূহকে সাহায্য করিবার জন্য যদি কোন আন্তর্জ্জাতিক তহবিল খোলা হয় তবে জার্ম্মানী তাহার অবস্থার উন্নতি ঘটিলে তাহাতে উপযুক্ত সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছে।

কিন্তু ফরাসী ক্ষতিপূরণের দাবী সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল না। সে প্রস্তাব করিল যে জার্ম্মানী তাহার রেলওয়ে সমূহের লাভের একটা মোট অংশের অধিকার পাওনাদারদিগকে ছাড়িয়া দিক। সেই অধিকার বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যাইবে তাহার দুই-তৃতীয়াংশ আমেরিকা ইউরোপের নিকট তাহার প্রাপ্য সমর-ঋণের পরিবর্ত্তে পাইবে এবং বাকি এক তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণের পাওনাদারদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

অপর পক্ষে জার্ম্মান প্রধান মন্ত্রী মিঃ মেকডোনাল্ডকে [illegible]লেন—ভারসাই সন্ধিপত্রে জার্ম্মানীর প্রতি স্বতন্ত্র ব্যবহারের discrimination) ব্যবস্থা করিয়া যে অবিচার করা হইয়াছে বিজেতা শক্তিবৃন্দ যদি তাহার নিরাকরণ করিতে রাজি হয় তবেই শুধু পৃথিবীতে বিশ্বাস পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তিনি আরও বলেন জার্ম্মানীকে যদি অন্যান্য শক্তির সমান অধিকার দেওয়া হয় তবে সে পৃথিবীর আর্থিক পুনর্গঠনের সমবেত চেষ্টায় তাহার দেয় আর্থিক অংশ প্রদান করিতে রাজি হইতে পারে। এই সঙ্গে তিনি ফরাসীর প্রধান মন্ত্রীর নিকট (১) জার্ম্মানীর পূর্ব্ব সীমান্ত ও Danzig Corridor সম্বন্ধে ভারসাই সন্ধিপত্র সংশোধনের এবং (২) এই সন্ধিপত্র অনুসারে জার্ম্মানী যতটা সমর সরঞ্জাম রাখিতে পারে ফরাসীর সমর-সরঞ্জামও কমাইয়া সেই স্তরে আনিবার প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করেন। একথার সুস্পষ্ট অর্থ অবশ্যই এই যে জার্ম্মানী যুদ্ধের দায়িত্ব স্বীকার করে না, রণ-সম্ভার সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের তুল্য অধিকার (military equality) দাবী করে এবং শুধু অক্ষমতার জন্য নয়, নৈতিক কারণেও ক্ষতিপূরণ-প্রদানে অসম্মত; এবং তাহার এসব দাবী স্বীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তির আশা করা বৃথা।

জার্ম্মানী ও ফরাসীর মতভেদ যখন এইরূপে দুর্ল্লঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল তখন এ বিষয়ে মীমাংসা করিবার জন্য ইংলণ্ড, ফরাসী, ইটালী, বেলজিয়াম, জাপান ও জার্ম্মানীর প্রতিনিধি লইয়া একটী কমিটি গঠিত হইল। কমিটির সভাপতি হইলেন মিঃ মেকডোনাল্ড। এরূপ কমিটি গঠন করার উদ্দেশ্য এই যে সামান্য কারণে তাহার সিদ্ধান্ত অমান্য করিতে কেহই সাহস করিবে না, কারণ তাহা হইলে বৈঠকের ব্যর্থতার সমস্ত দোষ তাহারই ঘাড়ে পড়িবে।

কমিটির সম্মুখে ফরাসী ও জার্ম্মানীর মতভেদ ছাড়াও একটি মস্ত বড় সমস্যা দেখা দিল—তাহা এই সম্বন্ধে যে আমেরিকা সমরঋণের দাবী ছাড়িতে প্রস্তুত না হইলে পাওনাদারদের অবস্থা কি হইবে। ইংলণ্ড ও ফরাসী প্রস্তাব করিল যে চুক্তিপত্রে সেই দিক বাঁচাইয়া একটি সর্ত্ত (safe guarding clause) থাকিবে। কিন্তু জার্ম্মানী এইরূপ সর্ত্তযুক্ত কোনরূপ চুক্তি মানিয়া লইতে সম্মত হইল না, কারণ সে ক্ষতিপূরণ ও সমরঋণের কোনরূপ সম্পর্ক স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। ইটালী প্রস্তাব করিল ইউরোপের শক্তিবৃন্দের মধ্যে সমরঋণের দাবী কাটিয়া ফেলা হইক কিন্তু আমেরিকা

তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে কি করিবে তাহার কিছুই নিশ্চয়তা না থাকায় ইংলণ্ড তাহাতে রাজি হইল না।

লোজান সিদ্ধান্তের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে শক্তিবর্গের—বিশেষতঃ ফরাসী ও জার্ম্মানীর—এই মতভেদের কথা মনে রাখিতে হইবে। কারণ সে সিদ্ধান্তে এই মতভেদের সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে এবং যেখানে তাহা সম্ভবপর হয় নাই সেখানে কথার ফাঁকে আসল বিরোধ ঢাকা দেওয়া হইয়াছে।

বৈঠকের চুক্তিপত্র পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে তাহাতে ভারসাই সন্ধি-পত্রে জার্ম্মানীর প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে তাহার সংশোধনের চেষ্টা মাত্র করা হয় নাই। এর একমাত্র কারণ অবশ্যই ফরাসীর আপত্তি। কারণ, বৈঠক শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্ব দিনেও শোনা গিয়াছিল যে লোজান চুক্তির একটি প্রধান সর্ত্ত হইবে ভারসাই সন্ধিপত্রের ক্ষতি-পূরণ ও যুদ্ধের দায়িত্ব (war guilt) সংক্রান্ত অংশ সমূহের নিরাকরণ। তার পরিবর্ত্তে বৈঠকের চুক্তি-পত্রে রাজনীতি ও অর্থনীতি উভয়ক্ষেত্রে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার আরম্ভরূপে ক্ষতিপূরণ নাকচ করিয়া এবং শক্তিবর্গের পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ-মীমাংসার জন্যই অস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে না, এই প্রতিশ্রুতি দিয়া এক রাজনৈতিক ঘোষণা করা হইয়াছে। এই ঘোষণার পর বৈঠক নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিয়াছে :—

(১) জার্ম্মানী ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য আন্তর্জ্জাতিক তহবিলে (European Reconstruction Fund) কয়েক বৎসরে মোট ১৫ কোটি পাউণ্ড প্রদান করিবে। কখন কি ভাবে এই টাকা উঠাইতে হইবে তিন বৎসর পরে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক (Bank of International Settlement) তাহা ঠিক করিবে। এ তিন বৎসর জার্ম্মানীকে কিছুই দিতে হইবে না।

(২) চুক্তি-পত্র প্রতিনিধিবর্গের গভর্ণমেণ্ট সমূহ কর্ত্তৃক গৃহীত (ratified) না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণের মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

(৩) পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের পুনর্গঠনের প্রথম সোপানরূপে অষ্ট্রিয়াকে আর্থিক সাহায্য করা হইবে।

(৪) সমগ্র ইউরোপকে একটি অর্থনৈতিক মণ্ডলীতে পরিণত করার সম্ভাবনার আলোচনার জন্য একটি প্রাথমিক কমিটি (Preparatory Committee) গঠিত হইল।

(৫) আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক বৈঠকের (World Economic Conference) আলোচ্য বিষয়ের বিবেচনার জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি গঠনের বন্দোবস্ত করা হইল। এই বৈঠকে আমেরিকাকেও নিমন্ত্রণ করা হইবে।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে এ প্রস্তাবে জার্ম্মানী ও ফরাসী উভয়েই কতক পরিমাণে পূর্ব্ব মত ত্যাগ করিয়াছে। জার্ম্মানী "ক্ষতিপূরণের পরিবর্ত্তে" কিছুই দিবে না বলিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাই দিতে স্বীকৃত হইয়াছে, যদিও সে-টাকার পরিমাণ ফরাসীর দাবী অপেক্ষা অনেক কম এবং সে-টাকা পাওনাদারগণ না পাইয়া ইউরোপের পুনর্গঠনে ব্যয়িত হইবে। ফরাসী এ টাকা নিজের জন্যই চাহিয়াছিল; সে দাবী তাহাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছে। অবশ্য জার্ম্মানীর প্রদত্ত যে টাকা ইউরোপের (অর্থাৎ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের) পুনর্গঠনে ব্যয়িত হইবে তাহার ফল বেশীর ভাগ ফরাসীর পকেটেই যাইবে কারণ সে-ই এই সব দেশের প্রধান পাওনাদার। তাছাড়া জার্ম্মানীকে ক্ষতিপূরণের ভারে জব্দ করিয়া রাখার অভিপ্রায়ও এ ব্যবস্থায় কতকটা সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে এই রফা হইলেও এই দুই দেশের রাজনৈতিক বিরোধের কোন নিষ্পত্তিই হয় নাই।

তা ছাড়া চুক্তি-পত্রে আমেরিকার উল্লেখ মাত্র নাই। সে সম্বন্ধে ক্ষতিপূরণের পাওনাদারগণ নিজেদের মধ্যে একটি গোপন বন্দোবস্ত ("gentlemen's agreement") করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে পাওনাদার গভর্ণমেণ্টগণ লোজান চুক্তি গ্রহণ (ratify) না করা পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যকরী হইবে না এবং এই সব গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেকে তাহাদের নিজেদের পাওনাদারদের (অর্থাৎ আমেরিকার) সঙ্গে কোন সুবন্দোবস্ত না করা পর্য্যন্ত এই চুক্তি গৃহীতও হইবে না। সে বন্দোবস্ত সম্ভবপর না হইলে লোজান-চুক্তি নাকচ হইবে। সে অবস্থায় শক্তিবৃন্দ একত্র পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবেন এবং আইনতঃ প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের অবস্থা হুভার-মেয়াদের পূর্ব্বাবস্থার অনুরূপ হইবে।

এই গোপন চুক্তির মহৎ অর্থ এই যে লোজান সিদ্ধান্তের কিছুমাত্র মূল্য নাই, যদি না আমেরিকা সমরঋণের দাবী ত্যাগ করিতে বা অধমর্ণদের ইচ্ছামত কমাইয়া দিতে প্রস্তুত হয়। সুতরাং আমেরিকা যদি তাহার বর্ত্তমান মত বজায় রাখে তাহা হইলে এই চুক্তির একমাত্র ফল ক্ষতিপূরণের মেয়াদকে আরও কিছু দিনের জন্য বাড়াইয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। ইতি মধ্যে ইংলণ্ডও অবশ্য ফরাসী ও ইটালীর নিকট তাহার প্রাপ্য সমরঋণের মেয়াদ সেইরূপ বাড়াইয়া দিয়াছে।

কিন্তু নানা দিক হইতে এই গোপন চুক্তির অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে :—

(১) প্রথমতঃ, এই চুক্তিতে হুভার গভর্ণমেণ্টের সায় আছে অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকা সমরঋণের দাবী ত্যাগ করিবে এরূপ আশ্বাস তাঁহাদের নিকট পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু আগামী প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে তাঁহারা একথা প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে চাহেন না। বিলাতে কমন্স সভার বক্তৃতায় মিঃ চেম্বারলেনও এরূপ ইঙ্গিত করেন। কিন্তু আমেরিকার দিক হইতে একথা অস্বীকার করিয়া তীব্র প্রতিবাদ আসিয়াছে এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে স্পষ্টাক্ষরেই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে আমেরিকার সঙ্গে এ বিষয়ে কোন কথাই হয় নাই যদিও তৎসত্ত্বেও তাঁহারা এখনও আমেরিকার সুবিবেচনায় আস্থাবান।

(২) এ চুক্তির দ্বিতীয় ব্যাখ্যা খুবই গুরুতর। তাহা এই যে আমেরিকা সমরঋণ সম্বন্ধে অধমর্ণদের সঙ্গে কোনরূপ সুবন্দোবস্ত করিতে স্বীকৃত না হইলে তাহারা একযোগে সমরঋণ অস্বীকার (repudiate) করিবে। সকলেই জানেন এ কথা মোটেই নূতন নয়। বেস্লে রিপোর্ট (Basle Report) বাহির হওয়ার পর জার্ম্মানী ক্ষতিপূরণ-প্রদানে অক্ষমতা ও অনিচ্ছা জানাইলে ফরাসী বলিয়াছিল জার্ম্মানী হইতে ক্ষতিপূরণ না পাইলে সেও আমেরিকাকে সমরঋণ প্রদান করিবে না এবং সে পক্ষে সে ইংলণ্ডের সহযোগিতা ও কামনা করিয়াছিল। কাজেই এ ব্যাখ্যা ভিত্তিহীন নয় বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে—যদিও ইংলণ্ড এরূপ অভিপ্রায় অস্বীকার করে। লোজান বৈঠকের পর ফরাসী ও ইংলণ্ডের মিতালীর যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহা এ সম্ভাবনাকে দৃঢ়তরই করিয়াছে। এ মিতালীর উদ্দেশ্য এই যে এখন হইতে ইংলণ্ড ও ফরাসী ইউরোপের সমস্যা সমাধানে একযোগে কাজ করিবে এবং এই দুই দেশের মধ্যে কোনও বাণিজ্য-সন্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত বাণিজ্য ব্যাপারে কেহই অপরের প্রতি অন্য কোন বিদেশ অপেক্ষা খারাপ ব্যবহার (discrimination) করিবে না। ইউরোপের অন্যান্য দেশকেও এই মিতালীতে যোগদান করিতে আহ্বান করা হইয়াছে এবং অনেকে যোগদান করিয়াছেও বটে। কিন্তু ফরাসীর প্রধান মন্ত্রী এ মিতালীর এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া খবর আসিয়াছিল যে এখন হইতে ইংলণ্ড ফরাসীর সম্মতি ব্যতীত আমেরিকাকে সমরঋণ প্রদান করিতে পারিবে না। অবশ্য ইংলণ্ড এ ব্যাখ্যা সত্য বলিয়া স্বীকার করে নাই এবং মঁসে হেরিয়টও জানাইয়াছেন যে তিনি এমন কোন কথা বলেন নাই—খবরের কাগজওয়ালারা তাঁহার উক্তির ভুল রিপোর্ট করিয়াছে। কিন্তু আমেরিকার অনেকেই পূর্ব্বোক্ত গোপন বন্দোবস্তের ও পরবর্ত্তী ইঙ্গ-ফরাসী মিতালীর এই দ্বিতীয় অর্থই করেন এবং প্রেসিডেণ্ট হুভার বলিয়াছেন—ইউরোপের শক্তিবর্গের অভিপ্রায় যদি ইহাই হইয়া থাকে তবে তাহারা ভুল করিয়াছে, কারণ এইরূপ জোর জবরদস্তি করিয়া আমেরিকা হইতে কোনরূপ সুবিধাই পাওয়া যাইবে না।

(৩) জার্ম্মানী এ ব্যাপার সম্বন্ধে যে আশঙ্কা করে তাহা আরও গুরুতর। সে জানাইয়াছে যদি এ বন্দোবস্তের অর্থ এই হয় যে এতদ্বারা আমেরিকা বা সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে তবে ইহার সঙ্গে তাহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। কাজেই ইউরোপের শক্তিবর্গের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিবার কথা আবার অন্ততঃ নূতন করিয়া উঠিয়াছে এবং হয়তো লোজান-সিদ্ধান্তে যে সহযোগিতার কথা বলা হইয়াছে এ বিরুদ্ধাচরণের সঙ্গে তাহা একেবারে সম্পর্ক-হীন নয়। ইউরোপের বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সমূহ সোভিয়েট রাশিয়াকে যে প্রীতির চক্ষে দেখে না তার পরিচয় বহুদিন হইতেই পাওয়া গিয়াছে। রাশিয়া তাহার নূতন আর্থিক ব্যবস্থার সাহায্যে গত কয় বৎসরে শিল্প-বাণিজ্যে যে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান বাণিজ্য-মন্দা ও আর্থিক বিপর্য্যয়ের ঝড়ঝঞ্ঝা হইতে যে ভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছে তাহাতে শক্তিবৃন্দের আক্রোশ হইবারই কথা। এ আক্রোশের প্রধান কারণ দুইটি ; প্রথমতঃ রাশিয়ার সস্তা

[illegible] বণিক-সমাজের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান ব্যবসায়-মন্দার দুর্গতির ফলে পৃথিবীর শ্রমিক সমাজ দিন দিনই ধন-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছে এবং সোভিয়েট সমাজ-ব্যবস্থাকেই এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল কি তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। কাজেই ইউরোপের শক্তিবৃন্দ ভবিষ্যৎ দুর্য্যোগের জন্য এখন হইতেই প্রস্তুত হইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। অনেকে মনে করেন তাহারা এখন একযোগে সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট জারের আমলের ঋণ (Tsarist debts) দাবী করিবে এবং অস্ত্রের সাহায্যে না হইলেও অর্থনৈতিক চাপের সাহায্যে তাহাকে সে দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিবে। তাছাড়া ইউরোপের শক্তিবৃন্দের উৎসাহ পাইয়া মাঞ্চুরিয়ায় জাপান রাশিয়ার শক্তি খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইবে।

কাজেই এই ব্যাপারে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ও শক্তিবৃন্দের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন তাঁহাদের প্রচেষ্টায় পৃথিবীর শান্তির পথ পরিষ্কৃত হয় নাই ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড আশা করেন লোজান আলোচনার ফলে ইংলণ্ড, ফরাসী ও জার্ম্মানী পরস্পরের নিকটতর হইয়াছে। এ দাবী হয়ত কতকটা সত্য কিন্তু প্রথমতঃ তাহা বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং দ্বিতীয়তঃ সেই সঙ্গে একদিকে আমেরিকা ও ইউরোপের এবং অপর দিকে রাশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য শক্তিবৃন্দের সম্পর্ক যে-ভাবে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা কোন প্রকার আন্তর্জ্জাতিক প্রচেষ্টারই অনুকূল নয়। তাছাড়া জার্ম্মানী সম্বন্ধে কিছুই জোর করিয়া বলা যায় না। বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় যে কোন মুহূর্ত্তে হিটলার জার্ম্মানীর সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে পারেন। যদি তাহাই হয় তবে লোজান সিদ্ধান্তের কি গতি হইবে তা বলা খুব শক্ত নয়। কারণ তিনি যে ব্যবস্থামত ১৫ কোটি পাউণ্ডের এক কপর্দ্দকও দিবেন না একথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শক্তিবৃন্দ যুদ্ধোপকরণ কমাইতে রাজি হইলে আমেরিকা সমরঋণ সম্বন্ধে কতকটা ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে। আমেরিকার যুক্তি এই যে ইউরোপ যুদ্ধোপকরণের জন্য প্রতি বৎসর যাহা খরচ করে সমরঋণ বাবদ দেয় টাকা অপেক্ষা তাহার পরিমাণ ঢের বেশী এবং ইহার একমাত্র কারণ তাহাদের অস্ত্র-প্রতিযোগিতা। এ অবস্থায় সে আশঙ্কা করে যে সমরঋণ হইতে মুক্তি পাইলে ইউরোপের যে টাকা বাঁচিবে তাহা সে যুদ্ধোপকরণ-বৃদ্ধির জন্যই ব্যয় করিবে এবং ফলে আমেরিকাকেও আত্মরক্ষার জন্য সমর-বিভাগের খরচ বাড়াইতে হইবে; অর্থাৎ সমরঋণের টাকা না পাওয়ায় আমেরিকার বাজেটের যে ঘাটতি হইবে আমেরিকাবাসীকে যে শুধু সে টাকাই যোগাইতে হইবে তা নয় পরন্তু তদুপরি সমর-বিভাগের জন্যও পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী টাকা খরচ করিতে হইবে। অপর পক্ষে ইউরোপ যদি যুদ্ধোপকরণ কমাইতে প্রস্তুত হয় তবে আমেরিকাকেও কম যুদ্ধোপকরণ রাখিলে চলিবে এবং তার ফলে তাহার যে টাকা বাঁচিবে সে পরিমাণ টাকা সে অনায়াসেই ইউরোপের নিকট প্রাপ্য সমরঋণের টাকা হইতে ছাড়িয়া দিতে পারে। কাজেই ক্ষতিপূরণ-সমস্যার নির্ব্বিরোধ সমাধান এখন সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করিতেছে জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ-বৈঠকের সাফল্যের উপর। কিন্তু সে বৈঠকে প্রেসিডেণ্ট হুভার রণসজ্জা কমাইবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন ফরাসী তাহাতে তীব্র আপত্তি জানাইয়াছে এবং ইংলণ্ড ও জাপান তাহার পূর্ণ সমর্থন করে নাই। বলা বাহুল্য ফরাসীর আপত্তির প্রধান কারণ তাহার জার্ম্মান-ভীতি এবং সে ভীতির মূলে রহিয়াছে ভারসাই সন্ধির অবিচার। সে অবিচার যতদিন নিরাকৃত না হইবে ততদিন জার্ম্মানীর মনের ক্ষত মিলাইবে না এবং ফরাসীর আতঙ্কের কারণও ততদিন রহিয়া যাইবে। কাজেই ভারসাই সন্ধি-পত্রের সংশোধনের পূর্ব্বে কোন নিরস্ত্রীকরণ-বৈঠকের সাফল্যই সম্ভবপর নয়। লোজান বৈঠক এইদিক দিয়া যে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তদুপরি সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে শক্তিবৃন্দের অভিসন্ধির কথা যদি অংশতঃও সত্য হয় তবে বর্ত্তমানে নিরস্ত্রীকরণের কোন কথাই উঠিতে পারেনা। সুতরাং জেনেভা বৈঠকের সাফল্যের সঙ্গে লোজান সিদ্ধান্তের সাফল্যের শেষ আশাও একরূপ দুরাশা মাত্র।

ভারতে জাতীয় আন্দোলন

বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ- পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

হিন্দুদিগের ও মুসলমানদিগের শাসনকালে বাঙ্গালার প্রকৃতিপুঞ্জের যে বৈশিষ্ট্য পুনঃপুনঃ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, ইংরাজ শাসনে, পরিবর্ত্তিত অবস্থাতেও তাহা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা এই পরবর্ত্তী কালে সঙ্ঘটিত একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিব। তাহা নীলকরদিগের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর প্রতিবাদকালে দেখা গিয়াছিল। সে-ও প্রজা-বিদ্রোহ। তবে সে বিদ্রোহ রাজশক্তির বিরুদ্ধে নহে—অত্যাচারী ইংরাজ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। যাঁহারা নীলকরদিগের অত্যাচারের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করেন, আমরা তাঁহাদিগকে দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত 'নীলদর্পণ' নাটক পাঠ করিতে বলিব। নীলকররা একে শক্তিশালী, তাহাতে ইংরাজ। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সহিত মফঃস্বলে এই নীলকরদিগের বিশেষ সম্প্রীতি থাকায় প্রজার আশঙ্কার কারণ আরও অধিক ছিল। তথাপি বাঙ্গালার প্রজারা সমবেত চেষ্টায় নীলকরদিগের অত্যাচারের মূলোৎপাটন করিয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার প্রজা-বিদ্রোহ সম্বন্ধে বড়লাট লর্ড ক্যানিং লিখিয়াছিলেন—

"প্রায় সপ্তাহ কাল আমি যেরূপ উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়াছি, (সিপাহী বিপ্লবের সময়) দিল্লীর ব্যাপারের পর আমি আর কখন তদপেক্ষা অধিক উৎকণ্ঠা ভোগ করি নাই" কারণ, "আমি বুঝিয়াছিলাম, যদি কোন অবিবেচক নীলকর ভয়ে বা ক্রোধ হেতু কোথাও একটি গুলী চালায় তবে তাহার ফলে নিম্ন বঙ্গে সকল নীলকুঠীতেই অনলশিখা দেখা দিতে পারে।"

তখন বাঙ্গালায় উৎপন্ন নীলের পরিমাণ বড় অল্প ছিল না। বাঙ্গালার কোন্ কোন্ জিলায় সাধারণতঃ কিরূপ নীল উৎপন্ন হইত নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল—

জিলা			মণ
রাজসাহী	...	...	৩,৫১২
মালদহ	...	...	২,৭৭৭
মুর্শিদাবাদ	...	.	৪,৯১২
নদীয়া	...	...	৮,০২৩
যশোহর	...	...	৮,৬৩৫
ফরিদপুর	...	...	১,৪৮৮

বাঙ্গালায় মোট প্রায় ৪০ হাজার মণ নীল উৎপন্ন হইত বটে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম (যুক্ত প্রদেশ) প্রদেশেও প্রায় ২১ হাজার মণ ও বিহারে প্রায় ৩২ হাজার মণ নীল উৎপন্ন হইত। কিন্তু কেবল বাঙ্গালার আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন প্রজারাই নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল।

বাঙ্গালার প্রজারা কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালার ছোটলাট সার জন পিটার গ্রাণ্ট তাঁহার ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে লিপিবদ্ধ বিবৃতিতে উল্লেখ করিয়াছিলেন—

"আমি সম্প্রতি সিরাজগঞ্জে সফর হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছি। ঢাকা রেল সম্পর্কে আমি নদীপথে তথায় গমন করিয়াছিলাম এবং আমার গমনের সহিত নীল সংক্রান্ত ব্যাপারের কোন সম্পর্ক ছিল না। আমি মাথাভাঙ্গার (চূর্ণীর) পথে গঙ্গা দিয়া যাইব মনে করিয়াছিলাম ; কিন্তু কুমার নদ পর্য্যন্ত আসিয়া অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব পথ আছে দেখিয়া কুমার ও কালীগঙ্গার পথে গমন করি। এই নদীদ্বয় নদীয়া ও যশোহর জিলাদ্বয় এবং পাবনা জিলার গঙ্গার দক্ষিণ দিকস্থ অংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

"নানা স্থানে প্রজারা দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদিগের প্রার্থনা—সরকার আদেশ করুন, তাহারা আর নীল বুনিবে না। ঐ দুই নদীপথে আমার প্রত্যাবর্ত্তনকালে প্রত্যূষ হইতে প্রদোস পর্য্যন্ত আমি যে ৬০ বা ৭০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম, তাহার উভয় কূলই বিচারপ্রার্থী জনগণে পূর্ণ ছিল বলিলেও বলা যায়। এমন কি গ্রামের স্ত্রীলোকরাও স্বতন্ত্র দলে সমবেত হইয়াছিল। যে সব পুরুষ নদীতীরবর্ত্তী গ্রামে বা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সমবেত হইয়াছিল, তাহারা যে নদীর উভয় কূলের বহু দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতেও আসিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভারতে আর কোন রাজকর্ম্মচারী কখন ১৪ ঘণ্টা কাল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত অবিচ্ছিন্ন ও বিচারপ্রার্থী জনগণের মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করিয়াছেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। সকলেই শ্রদ্ধাশীল ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ; কিন্তু সকলেই উদ্দেশ্য-সাধনবিষয়ে আন্তরিক চেষ্টায় চেষ্টিত। লক্ষ লক্ষ নর, নারী ও শিশুর এই ব্যবহারের যে বিশেষ গুরুত্ব আছে, তাহাতে সন্দেহ করা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইবে। বহুদূরবিস্তৃত স্থানে জনতার এইরূপ ব্যবহার যে এক-যোগে কায করিবার ক্ষমতার পরিচায়ক তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়।"

বাঙ্গালার প্রজারা যে নীলকর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মিলিত শক্তিতে সেই সম্প্রদায়কে পরাভূত করিয়াছিল, সেই নীলকর সম্প্রদায় কিরূপ প্রবল বলশালী ছিল, তাহা সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত নীল কমিশনের বিবরণে লিখিত আছে এবং তাহাদিগের অসাধারণ সমৃদ্ধির পরিচয় কোল্‌সওয়ার্দী গ্রাণ্ট প্রণীত বাঙ্গালার পল্লীজীবন সম্বন্ধীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার প্রজারা দুর্ব্বল হইলেও যে এই অসম দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিয়াছিল তাহা তাহাদিগের বৈশিষ্ট্যহেতু। বাঙ্গালার প্রাকৃতিক অবস্থা যেমন বাঙ্গালীকে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ও স্বাধীনতা-প্রয়াসী করিয়াছিল—বাঙ্গালার ব্যবস্থা তেমনই বাঙ্গালীকে আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন ও গণতন্ত্রপ্রিয় করিয়াছিল। এই সকল ভাব বাঙ্গালীর ধাতুগত হইয়াছিল বলিয়াই বাঙ্গালায় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও প্রজা-বিদ্রোহ স্বাভাবিক নিয়মে দেখা গিয়াছিল। বাঙ্গালায় যে সকল ধর্ম্মমত জনগণের মধ্যে আদর লাভ করিয়াছিল সে সকল ধর্ম্মমতও যে গণতন্ত্রপ্রিয়তার পরিপুষ্টিসাধনে সাহায্য করিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা একটি বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করিব—নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহঘোষণাকারী বাঙ্গালার প্রজাবৃন্দ যে ভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তাহা সার জন পিটার গ্রাণ্টের বিবৃতিতে আমরা দেখিয়াছি। তিনি নদীর উভয় কূলে সমবেত জনতা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"সকলেই শ্রদ্ধাশীল ও শৃঙ্খলাবদ্ধ।"

অর্দ্ধ শতাব্দারও অধিককাল পরে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাগত য়ুরোপে শিক্ষিত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যখন এ দেশে জনগণের আন্দোলনরূপে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করেন, তখন বাঙ্গালায় নীলকরদিগের বিরুদ্ধে ঘোষিত বাঙ্গালী প্রজার বিদ্রোহের স্বরূপ বাঙ্গালীও ভুলিয়া গিয়াছিল। অথচ বাঙ্গালার সেই আন্দোলন বাঙ্গালার মাটীতে উৎপন্ন, বাঙ্গালার জলে পুষ্ট। সে আন্দোলনে যাঁহারা নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত নহেন এবং বিদেশের কোন আন্দোলনের ইতিহাসের সহিত তাঁহাদিগের পরিচয় ছিল কি না সন্দেহ। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, সে আন্দোলন খাঁটি বাঙ্গালার—বাঙ্গালীর প্রকৃতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য ছিল এবং তাহা স্বতঃই উৎসারিত হইয়াছিল।

অহিংস অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বাঙ্গালার জনগণের নিকট নূতন নহে। নীলকরের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম—তাহাতে বাঙ্গালী প্রজা হিংসার পথ গ্রহণ করে নাই; কেবল আপনাদিগের উদ্দেশ্য সাধু জানিয়া সেই উদ্দেশ্য-সাধনজন্য ত্যাগের পথ অবলম্বন করিয়াছিল। ইংরাজীতে সুশিক্ষিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংবাদপত্রে ও দীনবন্ধু মিত্র নাটকে প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং খৃষ্টধর্ম্মযাজক লং 'নীলদর্পণ'এর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশজন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন—বাঙ্গালার পল্লীপ্রান্তরে গানও শুনা যাইত—

> "নীল বাঁদরে সোণার বাঙ্গলা করলে ছারে খার।
> অসময়ে হরিশ ম'ল, লং-এর হ'ল কারাগার।
> প্রজার এবার প্রাণ বাঁচান ভার।"

কিন্তু যে প্রজারা অনাচার-পীড়িত হইয়াছিল, তাহারা শিক্ষিতদিগের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই; আপনারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্য হইতেই তাহাদিগের নেতার উদ্ভব হইয়াছিল। তাহারা সেই পুরাতন কথা—সেই উপদেশ স্মরণ করিয়াছিল—"সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্ সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।"

বাঙ্গালার সামাজিক ব্যবস্থা, বাঙ্গালার ধর্ম্মধারা তাহাদিগকে সেই সনাতন সত্য বিস্মৃত হইতে দেয় নাই। বিস্মৃতি আসিয়াছিল—এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারসাধনফলে। কারণ, এই শিক্ষাই দেশের জনগণের সহিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ও পরস্পরের নির্ভরশীলতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল—দেশের সংস্কার মাত্রকেই কুসংস্কার বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। দেশে যে নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিল সেই সম্প্রদায় সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—তাঁহারা ইস্তক বিলাতী কুক্কুর লাগায়েৎ বিলাতী পণ্ডিত বিলাতী সকলেরই ভক্ত। সেই ভক্তিই তাঁহাদিগকে দেশের জনগণ হইতে আপনাদিগকে স্বতন্ত্র মনে করিতে শিখাইয়াছিল এবং তাহারই ফলে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষা জনগণের সহানুভূতি ও সাহায্য না পাইয়া নিষ্ফল আবেদন-নিবেদনে পর্য্যবসিত হইয়া যাইতেছিল।

বাঙ্গালী যদি কিছুদিনের জন্য তাহার ভাবধারার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া বিদেশীর ভাবধারার সন্ধানে রাজনীতিক মরু-

ভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকাকৃষ্ট না হইত, তবে বাঙ্গালার রাজনীতিক আন্দোলন—ভারতবর্ষের রাজনীতিক আন্দোলন কখনই স্রোতশূন্য নদীর দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইত না।

হিন্দুসমাজের বন্ধন, ধর্ম্মবিশ্বাস। এই বন্ধন বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর সমাজে প্রবল ছিল। হিন্দুধর্ম্ম নানারূপে অভিব্যক্ত হয়। সে সকলের মধ্যে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব মত বা রূপই সর্ব্বপ্রধান বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালায় হিন্দুদিগের মধ্যে এই তিন মতাবলম্বীই ছিলেন ও আছেন। বৈষ্ণব মতের গণতান্ত্রিক ভাব সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালায় শৈব ও শাক্তদিগের মধ্যেও গণতান্ত্রিক ভাবের অভাব ছিল না। আজ আমরা দেশে স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যভেদের কথা শুনিতে পাই; সেই ভেদ এখন ধর্ম্মের ক্ষেত্র হইতে রাজনীতির ক্ষেত্রেই প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষে জাতীয়ভাব প্রচারে ও জাতীয়তার সম্প্রসারণে বাধা দিতেছে। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও ধর্ম্মের ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব প্রায় অনুভূত হইত না। বাঙ্গালার লোক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিভাগে বিভক্ত ছিল - ইহা বুঝিতে পারা যাইত না। কিন্তু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশায়ক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 'জাতির' মধ্যে আহারের স্পৃশ্যতা না থাকিলেও তাহাদিগের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ছিল না। হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানে চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেরই নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। তখন যাহারা পদ্ম সংগ্রহ করিয়া না আনিলে দশভূজার পূজায় অঙ্গহানি হইত, যাহারা বাদ্যকর ছিল—আজ তাহারাই প্রতীচীর মতে "অনুন্নত সম্প্রদায়"—তাহাদিগের রাজনীতিক স্বার্থও সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থ হইতে ভিন্ন। কুম্ভকার প্রতিমা গঠিত না করিলে, মালাকর প্রতিমার সজ্জা না করিলে, কর্ম্মকার বলির পশু বধ না করিলে যেমন ব্রাহ্মণের মন্ত্রপাঠের অবসর ঘটিত না, তেমনই এই "অনুন্নত সম্প্রদায়"এর লোকরা পূজার অন্যান্য আয়োজন করিয়া দিত। দুর্গোৎসব বাঙ্গালার নিজস্ব বলিলেও বলা যায়। এই দুর্গোৎসবে যে "কাদামাটীর" অনুষ্ঠান হইত (আজও হয়) তাহাতে ভেদ থাকে না। বলির পর যূপকাষ্ঠ তুলিয়া ফেলিয়া তথায় গর্ত্ত করিয়া তাহাতে কলসে কলসে জল ঢালিয়া দেওয়া হইত। কর্দ্দমাক্ত ভূমিতে মল্লযুদ্ধ হইত—সকলে আনন্দে মত্ত হইত। গৃহস্বামী ব্রাহ্মণই হউন আর অন্য কোন বর্ণেরই হউন, তাঁহাকেও সেই কর্দ্দম-ক্রীড়ায় হীনতম জাতির লোকের সহিত যোগ দিতে হইত। ইহার পরও কি বলা যায়, বাঙ্গালায় অস্পৃশ্যতার প্রাবল্য ছিল! আবার দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া সকলে ফিরিয়া আসিয়া শূন্য মণ্ডপে পরস্পরকে প্রণাম, আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গন করা রীতি।

বৈষ্ণবদিগের ত কথাই নাই। নবদ্বীপের চৈতন্যদেব যে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া নীলাচলে নীলাম্বুবিস্তারে নীলমণিময় দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া সেই সলিলমধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, সে ধর্ম্মে জাতিগত ভেদজ্ঞান ছিল না। সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিংশ বর্ষাধিক কাল চৈতন্য কাবেরীর তট হইতে যমুনার কূল পর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রেম প্রচার করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। তিনি দক্ষিণে রামেশ্বর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন এবং মাধুর্য্যের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মে মসলমানও দীক্ষালাভের অধিকার পাইয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত বৌদ্ধধর্ম্মমতের রূপান্তর; কারণ, সে ধর্ম্মমতেও বৌদ্ধধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের মত সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্য ছিলেন এবং বুদ্ধদেব হিন্দুদিগের দশাবতারের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য-প্রচারিত হিন্দুধর্ম্মমত হিন্দুধর্ম্ম হইতেই উদ্ভূত। চৈতন্য-প্রচারিত মত যে বঙ্গদেশেই উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার কারণ, বাঙ্গালায় বাঙ্গালী-সমাজে বর্ণবিভাগ মনুষ্যত্বের উদার ক্ষেত্রকে বহুভাগে বিভক্ত করিতে পারে নাই এবং বাঙ্গালায় হিন্দু সমাজে নানা-বর্ণের লোক শান্তিতে ও সানন্দে অবস্থান করিয়া সমবেত ভাবে যে সমাজের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা তাহাদিগের সকলের।

বাঙ্গালার তন্ত্রশাসিত ধর্ম্মমতও বেদবিরোধী ছিল এবং "ধর্ম্মপূজা"য় যে সমাজের নিম্নস্তরের লোকের অধিকার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালার মুসলমানরাও যে হিন্দুদিগের উৎসবানন্দে যোগ দিতেন, তাহার কারণ—বিরাট হিন্দু-সমাজের সকল স্তরের লোক যে উৎসবে এক হইত সে উৎসব সহজেই সকলকে আকৃষ্ট করিত। যে ঔরঙ্গজেব গোঁড়ামীর আতিশয্যেই ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ হইয়াছিলেন, তাঁহারই পৌত্র

ঢাকায় হিন্দুদিগের দোলের উৎসবে যোগ দিয়া সম্রাট কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।

হিন্দু-সমাজে বর্ণবিভাগ থাকিলেও সাম্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কাঞ্চনকৌলিন্য সে সমাজে প্রাধান্যলাভ করে নাই। সামাজিক নিমন্ত্রণে অতি দরিদ্রের আসিতে বিলম্ব হইলে আর সকলকেই আহারে বসিবার জন্য তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে হইত।

বাঙ্গালার সমাজের এই বৈশিষ্ট্য ভুলিলে বা উপেক্ষা করিলে কেন বাঙ্গালাতেই নব-ভারতের জাতীয় ভাব প্রথম সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছিল এবং জাতীয় আন্দোলন কেন বাঙ্গালা দেশেই আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

কংগ্রেস যখন প্রথম কল্পিত হয়, তখন যে প্রথম অধিবেশনের সভাপতির সন্ধানে সমগ্র ভারতের নেতৃগণকে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল এবং বাঙ্গালী উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রথম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। সে কারণ এই যে—তখন সমগ্র ভারত বাঙ্গালার আদর্শ গ্রহণ করিত, বাঙ্গালার চিন্তাধারা সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইত।

বাঙ্গালাই প্রথম প্রতীচীর জাতীয় ভাব গ্রহণ করিয়া তাহা আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিল এবং বাঙ্গালায় প্রথম জাতীয় ভাবের ভাবুক উদ্ভূত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় যখন তাঁহার রচনায় সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তখন ভারতের অন্য কোন প্রদেশে সে ভাবের আবির্ভাব হয় নাই, হওয়া সম্ভব ছিল না। রামমোহন রায়ের পর তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর কিরূপে এ দেশে য়ুরোপীয় প্রথার রাজনীতিক আন্দোলন পরিচালিত করিবার শিক্ষাপ্রদানের অভিপ্রায়ে বিলাত হইতে শিক্ষক আনিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। বাঙ্গালী যে সে শিক্ষা সহজেই সফল করিতে পারিয়াছিল. তাহার কারণ, তাহার সহিত বাঙ্গালীর প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য ছিল। যে ভাব তাহার ধাতুতে ছিল, তাহাই প্রতীচ্য শিক্ষায় স্ফূর্ত্তি পাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

যাঁহারা এ দেশে ইংরাজী-শিক্ষা-প্রবর্ত্তন যুগের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইহা আর নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। প্রতীচীর সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালীর গণতন্ত্রানুরক্তি বহু দিন নিরুদ্ধ থাকিয়া এমনই প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল যে, তাহা বাধামুক্ত স্রোতের মত সমাজের অনেক প্রথাও ভাসাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু বাঙ্গালীর স্বাভাবিক দেশপ্রেমই অল্প দিনের মধ্যে সেই স্রোতের বেগ সংযত করিয়া তাহা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল—বাঙ্গালী আবার কেন্দ্রস্থ হইয়াছিল। বিজ্ঞবর রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আত্মচরিত পাঠ করিলে আমরা হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের ব্যবহারের পরিচয় পাই। তখন মনে হইয়াছিল, বুঝি সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে—হিন্দু নাম মুছিয়া যাইবে—বাঙ্গালার ইতিহাসে কেবল বিদেশীর প্রভাবই লক্ষিত হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। হিন্দু কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিত ভূদেব মুখোপাধ্যায় সমাজের কল্যাণ যে সমাজের শাসন মানিয়া চলিলেই সাধিত হয়, তাহা বুঝাইয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুই ইংরাজী নববর্ষে তাঁহাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করায় বর্ত্তমান লেখককে তিরস্কার করিয়া লিখিয়াছিলেন যদি তত দিন বাচিয়া থাকেন, তবে ১লা বৈশাখ আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিবেন। আর ইংরাজীতে কৃতবিদ্য বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন।—

"গিলটী পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা কুৎসিতা বন্য নারী জীবন-যাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালা স্পৃহনীয়।"

তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ফলে দেশের—সমাজের পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে; দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত জনসাধারণের যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তাহা নষ্ট হইতেছে—সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। এক দিকে সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণ, অপর দিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়—উভয়েই জনগণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান" প্রবন্ধে সে কালের বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছিল। 'আলালের ঘরের দুলাল'এর ভাষা আদর্শ ভাষা না হইলেও তিনি ইহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহাতেই প্রথম বাঙ্গলা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত ও প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়।" এই প্রবন্ধে তিনি লিখেন:—

"যে দেশের সাহিত্যে সাধারণ বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মঙ্গলপ্রদ হয়। মহাপ্রতিভাশালী কবিগণ তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ উন্নত ভাব সকল তদুপযোগী উচ্চ ভাষা ব্যতীত ব্যক্ত করিতে পারেন না; এই জন্য অনেক সময়ে মহাকবিগণ দুরূহ ভাষার আশ্রয় লইতে বাধ্য হন এবং সেই সকল উন্নত ভাবের অলঙ্কারস্বরূপ পদ্যে সে সকলকে বিভূষিত করেন। কিন্তু গদ্যের এরূপ কোন প্রয়োজন নাই। গদ্য যত সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে সাহিত্যের পাঁচ সাতজন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।

"প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যই হইত। গদ্য রচনা যে ছিল না, এমন বলা যায় না; কেননা হস্তলিখিত গদ্য গ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই; সুতরাং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধু ভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃতব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না, 'খদির' বলিতেন, কদাচ 'চিনি' বলিতেন না, 'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহার রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিত কেহ 'ঘৃত' নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না,—'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না - 'রম্ভা' হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' ডাকিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, এক জন অধ্যাপক এক দিন 'শিশুমার' শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ 'শিশুমার' অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া বড় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যখন এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত, কেন না, কেহ তাহা পড়িত না।"

ইহার অন্যতম কারণ এই যে, যাঁহারা ইংরাজী শিখিতেন, তাঁহারা ইংরাজী রচনারই আদর করিতেন বলিয়া, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ও জনসাধারণের মধ্যে ভেদ বাড়িয়া যাইতেছিল। বাঙ্গালী অল্প দিনের মধ্যেই উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ইংরাজীতে উপন্যাস রচনা করেন। মধুসূদন দত্ত ইংরাজীতে কাব্য রচনা করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী ভাষায় রচনার নিষ্ফলতা বুঝিয়া 'বঙ্গদর্শন'এ লিখিয়াছিলেন—"যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের হৃদয় সম্বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুসরণ করিব।"

তদবধি বাঙ্গালী এক দিকে সাহিত্যের ও অপর দিকে মেলা প্রভৃতির দ্বারা দেশে জাতীয় ভাব প্রচারের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। এ দেশে পূর্ব্বে যাহা হইত যাত্রা প্রভৃতি লোকশিক্ষার উপায়মধ্যে বাঙ্গালীই প্রথম সেই সব উপায় দেশাত্মবোধ-প্রচারের জন্য অবলম্বন করে। মনোমোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক যাত্রায় অভিনীত হইত এবং তাহাতেই তাঁহার হিন্দু-মেলার জন্য রচিত গান সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তদবধি সেই সকল উপায় উপেক্ষিত না হইয়া আদৃত হইয়া আসিতেছে। মহারাষ্ট্রে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় গণপতি উৎসব প্রবর্ত্তিত করিবার বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বারোয়ারীতে সকলে সমবেত হইয়া পূজাপ্রাঙ্গণে কথকতায় রামচন্দ্রের দেশ-ভক্তির কথা ও যাত্রায় দেশের জন্য মমত্বের গান শুনিতেন।

বাঙ্গালায় যে ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ প্রচলন হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। এই বাঙ্গালা হইতে বাঙ্গালীরা সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া ইংলণ্ডেও গমন করিতে থাকেন এবং ইংরাজীতে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা রাজকার্য্যে ইংরাজের সহায় হইয়া উঠেন।

যখন সমাজের উচ্চ স্তরে এইরূপে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল, তখনই সেই শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগের শিক্ষার ফল দেশের জনগণকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। যে সকল উপায়ে তাঁহারা তাহা করিয়াছিলেন, সে সকলের উল্লেখ আমরা উপরে করিয়াছি।

বর্ত্তমান জাতীয়ভাব যে ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠতায় ইংরাজী শিক্ষার ও ইংরাজী আদর্শের ফলে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং যে বাঙ্গালা প্রথম সে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল ও সে আদর্শের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিল, সেই বাঙ্গালায় প্রথম জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব যে স্বাভাবিক নিয়মে হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে।

এই জাতীয় ভাব যে জাতীয় রীতিতে পরিচালিত না হইলে ফলোপধায়ী হইবে না, তাহাও বাঙ্গলার মনীষীরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং দেশের শিক্ষিত জনগণকে তাহা বুঝাইয়া-ছিলেন।

ধীরে ধীরে দেশের লোক তাহা বুঝিয়াছিল এবং দেশের সকল স্তরে জাতীয় ভাব ফল্গুর ধারার মত প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই জন্যই বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গলায় যে রাজনীতিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়া ক্রমে সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে—বঙ্গদেশেই তাহার উদ্ভব সম্ভব হয়। সেই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য মহারাষ্ট্রের নেতা বালগঙ্গাধর তিলক, পঞ্জাবের নেতা লালা লজপত রায় প্রভৃতি দূরদর্শী নেতৃগণকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়াছিল।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বাঙ্গালী তাহার বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে এবং ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর সেই বৈশিষ্ট্যের প্রভাব আজ সে আন্দোলনে সকলেই লক্ষ্য করিতে পারেন। বাঙ্গালী দেশাত্মবোধ-প্রচারের জন্য ব্যাকুলতাবশে সকল সময়েই ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছে এবং অন্যান্য প্রদেশকে তাহার সেই ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। (ক্রমশঃ)

বিশ্ববাণী

কৃষিবাহিনী

'সাউথ অ্যাটলাণ্টিক কোয়ার্টার্লি' পত্রিকায় ম্যালকল্ম ম্যাকডারমট লিখিতেছেন—

'গতবার গরমের সময় দক্ষিণের একটি শহরে একটি মানুষ রাত্রের অন্ধকারে বন্দুক দেখিয়ে একটি মুদীখানার গাড়ী থামিয়ে, এক রাশ খাবার জিনিষ লুঠ করেছিল। লুঠ-করা জিনিসপত্র নিয়ে সে পাশের বাড়ীতেই ঢোকে। সুতরাং শকট-চালককে থানায় খবর দিয়ে তার সন্ধান বার করতে বেশী বেগ পেতে হয়নি। পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করলে সে দোষ স্বীকার ক'রে অপরাধের কৈফিয়ৎ হিসাবে পাশের ঘরে পুলিশ কর্ম্মচারীদের ঢুকতে বলে। সে ঘরে আজ তিন দিন তার স্ত্রী আর দুটি শিশু পুত্র অনাহারে শুকিয়েছে আর এই তিন দিন ধরে সে ক্রমাগত কাজের জন্য খোঁজ করেছে, কাজ পায়নি। পুলিশ কর্ম্মচারীরা ব্যাপারগতিক দেখে থানায় ফিরে গিয়ে বললে, অপরাধীর সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু এই এই ঘটনা।'

এ ঘটনায় বিচলিত হইবার সামর্থ্য আমরা হারাইয়াছি, কেননা আমাদের দেশে নিত্য ইহা ঘটিতেছে—বেকার-সংখ্যার সঙ্গে দেশের অপরাধও বাড়িয়া চলিতেছে। সেদিনও বাংলা কাউন্সিলে রীড সাহেব ২৯, ৩০, ৩১ সনের ডাকাতির ক্রমবিকাশ-সংখ্যা পেশ করিয়াছেন। এবং তাহারও কিছুদিন পরে বেকারের সঠিক সংখ্যা পেশ করিতে পারেন নাই। অনাহারে শুকাইয়া আত্মহত্যা করিবার এমন কি স্ত্রী-পুত্রকে হত্যা করিবার সংবাদও আমরা আর অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করি না। সুতরাং সেকথা বাদ দিয়া ম্যাল্‌কল্‌ম্ ম্যাকডারমট্ ইহার পরে যাহা লিখিতেছেন, তাহাই বিবেচনা করি। তিনি লিখিতেছেন—

'চারপাশের এই অনাহার, দুর্ভিক্ষের দরুণ লোকজনের দুঃখকষ্টের কথা শুনে উর্ব্বর প্রকৃতির সুবিপুল সম্ভারের দিকে চেয়ে হতবাক্ হয়ে যেতে হয়। শহরে কাজ করে যারা, তাদের দৃষ্টি শহরের বাইরে যায় না—তারা শুধু ভাবে যে-কাজ তাদের গেছে, সেই কাজই তাদের ফিরে পাওয়া চাই। ওদিকে মাটি-মা তাঁর বিস্তৃত বুকে শত সহস্র সন্তানের খাদ্য-সঞ্চয় নিয়ে দিগন্ত অবধি অপেক্ষা ক'রে আছেন। সে বুক কর্ষণ করলেই আহার সংগ্রহ হয়। সুতরাং সমস্যা দাঁড়ায় শুধু এই, কর্ম্মহীন ব্যক্তির ও পতিত জমির মিলন সম্ভব কি না?

বেকারের দলকে 'দেশে ফিরে গিয়ে চাষবাস কর' বলা আর তাদেরকে বিমান-পোতে কাজ খুঁজে নেবার চেষ্টার কথা বলা প্রায় একই ব্যাপার দাঁড়ায়—কেননা চাষবাসের জ্ঞান বিন্দুবিসর্গও এদের নেই। কিন্তু একথা সত্যি যে এই বৃত্তিহীন দলের প্রচুর পরিশ্রমের সঙ্গে সুপ্রচুর অনাবাদী জমির ফসল-সম্ভাবনা যুক্ত হ'লে বেকার-সমস্যার একটা সমাধান হ'তে পারে।'

সুতরাং ম্যাকডারমট বলিতেছেন—

'এই বেকারের দলকে অভিজ্ঞ, নিয়ন্ত্রিত ও দলবদ্ধ করতে পারলে একটা কিছু করা যায়। এ করতে হ'লে আমাদের চাই সৈন্য-বাহিনীর মতোই একটি কৃষি-বাহিনী, যেখানে যে কোন পুরুষ কি নারী যখন তখন কাজ পাবে। যতদিন না সে অন্যত্র লাভজনক আর কিছু কাজ জোগাড় করে নিতে পারে, ততদিন তাকে এখানে কাজ করতে দেওয়া হবে। এই বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে কৃষি-বিজ্ঞান তো জানতেই হবে, অধিকন্তু তার নিয়ন্ত্রণ-সামর্থ্য থাকা দরকার। সরকার থেকে এই ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া উচিত। কৃষিকার্য্য দ্বারাই আহার্য্য বস্ত্রের সঙ্কুলান এই বাহিনীর চল্‌বে। পরিবার নিয়ে বাসব্যবস্থা থাকা দরকার, তা হ'লে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী সুন্দর হবে। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে থাকতে পারে। এবং কৃষিকার্য্যকে কেন্দ্র ক'রে অন্য সব শ্রম-জাত শিল্পপ্রতিষ্ঠানও কালে গড়ে উঠতে পারে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যদি কুটিরে বাস ক'রে হাতে-তৈরি কাপড় পরে গম পিষে, কাঠ ভেঙ্গে জীবন যাপন করে গিয়ে থাকতে পারেন, আমরাও তা পারবো। আগেকার দিনে যা কঠিন ছিল আজ তা আরও সহজ হয়েছে।'

অতঃপর প্রবন্ধে এই কৃষিবাহিনীর আর সব দিক বিচার করিয়া প্রবন্ধকার বলিতেছেন—

'এই বাহিনীর কেউই এ কথা মনে করবে না যে অপরের দয়ার উপর নির্ভর ক'রে আমার জীবন-যাত্রা চলছে। কেননা

এখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজেকে নিজের পেটের ভাত সংগ্রহ করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।'

মনে হয়, যে দেশের লোক এ কথা লিখিয়াছেন, তদপেক্ষা এ প্রতিষ্ঠান বহু অংশে আমাদের দেশে সম্ভব ও প্রয়োজন।

হিন্দু বিবাহ

অপরের মনোদর্পণে আমরা কেমন প্রতিবিম্বিত হই, তাহারই নিদর্শন স্বরূপ নীচে শ্রীমতী ইভা উইলিস্ লিখিত হিন্দুর বিবাহ সম্পর্কে জুন সংখ্যার 'চেম্বার্স জার্নাল' পত্রিকার এক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

'বিবাহ-সভায় বর ও বধূ তুইজনা তুইজনাকে প্রথম দেখিবে, তৎপূর্ব্বে নয়। বেদীর(?) সামনে দাঁড়াইয়া তুইটি তরুণ তরুণী, এ উহার হাত ধরিয়া আছে। মেয়ের পরিধানে লাল টকটকে শাড়ী, চওড়া কল্কা পাড়, আর ছেলেটির পরণে জরি-পাড়ের শাদা-রেশমের ধুতি। শাড়ীর আঁচল দিয়া বধূর মুখের উপর ঘোমটা টানা রহিয়াছে, তার আপাদমস্তক উড়নী দিয়া ঢাকা। পুরোহিতের নির্দ্দেশ মতো, তুধলা শাদা একটি রেশমী চাদরে দম্পতিকে আবরণ দিয়া জনতা হইতে অন্তরাল করা হইল, যেমন আমাদের কন্যাযাত্রীরা বধূর মুখাবরণ সরাইয়া তাহাকে বরের নিকট পরিচিত করে, অনেকটা তেমনই—অতি সূক্ষ্ম অথচ সম্পূর্ণ আবরণান্তরালে বর ও বধূর এই প্রথম শুভ-দৃষ্টি, পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই পৃথিবীরই একটি নর ও নারীর।—ঠিক এই সময়ে পুরাঙ্গণাদের মঙ্গল-শঙ্খধ্বনি বিবাহ-সভা মুখর করিয়া বাজিয়া উঠিল ও অদূরে শানাইয়ে রাগিণী আলাপ সুরু হইল

প্রবন্ধটি সুবৃহৎ, মাঝে মাঝে অজ্ঞতা-দোষও দৃষ্টিতে পড়ে কিন্তু আগাগোড়া শ্রদ্ধাসহকারে লেখা। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যে দেশের মিস্ মেয়ো ও পেট্রিসিয়া কেণ্ডা[illegible] সভ্যতাকে এমন কুশ্রী করিয়া স্বদেশবাসীদের কাছে [illegible] করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যাপৃত, শ্রীমতী ইভা উই[illegible] সেই দেশেরই, কিন্তু অণুমাত্র সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার অনুষ্ঠানটি দেখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার রচনা পীড়িত করে না, আনন্দই দেয়। বোধ করি পাশ্চাত্যের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাই সর্ব্বাপেক্ষা সেতু।

বিবাহিত জীবন

আর একজন অনামিকা মহিলা গত জানুয়ারী সংখ্যার 'স্ক্রিবনার্স ম্যাগাজিন'এ দম্পতি-জীবনযাপনের খুঁটিনাটি নিয়া একটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—

'খুব কম লোকেই বিবাহকে কেবল সুখস্বপ্ন ছাড়া আর কোন দৃষ্টি দিয়া দেখিয়া থাকে। যে লতাটিকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে লালিত করিতে হয়,— ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয় কখন ইহার কোথায় মচ্‌কাইল,— তাহার সম্পর্কে বিবাহিত নরনারীর ঔদাসীন্যও কম না। আমার বিবাহিত জীবনের পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি। বিবাহের পরে আমার স্বামীর প্রথম যে কু-অভ্যাস দৃষ্টিতে পড়িয়াছিল তাহার কথা মনে পড়ে, টুথপেষ্টের টিউবের মুখটি তিনি সর্ব্বদা দিতে ভুলিতেন—খুবই সামান্য ত্রুটি, অথচ আমার ইহাতে এমনই অস্বস্তি লাগিত যে একদিন ব্যাপারটা তাঁহাকে বলিয়াই ফেলিলাম। তার পর হইতে তিনি এ পর্য্যন্ত আজ ৫ বছর এ কাজটি সযত্নে করিয়া আসিতেছেন। এই সামান্য ঘটনাটি মাত্র নমুনা। ছোট বড় বহু ঘটনাতেই আমরা তুজনা তুজনার ইচ্ছাকে এ যাবৎ সম্মান করিয়া আসিয়াছি—ফলে আমাদের বিবাহিত জীবন সুখেই কাটিয়াছে

বহুদিন যাবৎ আমাদের দেশে বিবাহিত দম্পতীর ব্যবহারিক জীবনের সুখ-সুবিধা এই একটি মাত্র নীতিকে কেন্দ্র করিয়াই সম্ভব হইয়া আসিয়াছে। এমন কি এই নীতিকেই একটু প্রশস্ত করিয়া আমাদের সদর ও অন্দরে তুইটি বিভাগ হইয়াছিল। স্বামীর দায়িত্ব সদরে, স্ত্রীর দায়িত্ব অন্দরে। কোথাও কোন জটিলতা ছিল না—অতি সহজে জীবন-তরী বাহিয়া চলিয়াছিল। অকস্মাৎ পশ্চিম হইতে ঝটিকা আসিল, নারী-স্বাতন্ত্র্যের নাম করিয়া সে ঝটিকা আমাদের গৃহ-জীবনের তরণী খানিকে ক্রমাগতই আজ বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছে। ইহার শেষ কোথায় কে জানে!

হিটলার-রাজ

আমরা যখন লিখিতেছি তখন জার্ম্মানিতে হিট্‌লারের প্রাধান্য প্রায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্র-দলের সাহায্যে নাজি-দল জার্ম্মানির বর্ত্তমান পার্লামেণ্টকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। গত জুন মাসের 'রিভিউ

অব রিভিউজ' পত্রিকায়, ঐ পত্রিকার বৈদেশিক বিভাগ সম্পাদক ফ্র্যাঙ্ক এচ্‌. সাইমণ্ডস্‌ 'যদি হিটলার জার্ম্মানির কর্ণধার হন' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, নীচে আমরা তাহার কিয়দংশ দিতেছি—

'হিটলার-রাজ মানে কি? যুক্তপ্রদেশ আমেরিকা ও বৃটেনের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ইতালির কাহিনী আবার এই জার্ম্মানিতে পুনরাবৃত্তি হইবে—মুসোলিনির মতো হিট্‌লারও কথার আতসবাজি যতই ছুটান, কাজে-কর্ম্মে সংযতই হবেন। কিন্তু মুসোলিনীর কেবল গৃহ-বিবাদই মিটাইতে হইয়াছিল, বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে পরাজিত, সন্ধি-সূত্রাবদ্ধ বর্ত্তমান জার্ম্মানির সহিত ইতালির উপমা খাটে না। তাছাড়া মুসোলিনী সত্যই বিশিষ্ট একজন দেশনায়ক, হিটলারকে মাত্র আন্দোলনকারী হিসাবে সার্থক বলা যায়।

হিটলার যে জার্ম্মাণির কর্ণধার হইবেন, সে-জার্ম্মাণির অবস্থা চরম। প্রায় ৬০ লক্ষ লোক আজ জার্ম্মানিতে বেকার—বজেটকে ঠিক রাখিতে জার্ম্মানি বর্ত্তমানে যে ট্যাক্সের কবলে পড়িয়াছে, ইতিহাসে তাহার জোড়া মিলিবে না। দেশবাসীর উপর যতদূর সম্ভব চাপ, তাহা দেওয়া হইয়াছে। জার্ম্মানির স্বর্ণমান আজ সামান্য ক্ষীণ বন্ধনভারে ঝুলিতেছে—এই তো জার্ম্মাণ ধনকোষের অবস্থা।

হিটলার এই জার্ম্মাণির কি করিবেন? রাজনীতি ক্ষেত্রে 'দল' বলিতে যাহা বোঝায়, হিট্‌লারের 'দল' তেমন নয়, তাঁর দলে কেবল মাত্র ঈর্ষ্যাতুষ্ট ও ক্রোধান্ধ মানবকেরা ভিড় বাধাইয়াছে। তিনি যে বেদীতে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দেন তাহার চারিপাশে যে কথাবার্ত্তার ঝটিকা শোনা যায়, পৃথিবীতে তদপেক্ষা অর্থবিহীন কোন কথা আর শোনা যায় নাই। তাঁর দলের লোকজনের মধ্যে মাত্র বর্ত্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহবাদই একমাত্র ইউনিফর্ম্ম, ধনিক ও শ্রমিক, রাজতন্ত্রী ও সাধারণতন্ত্রী সকলে মিলিয়া সেখানে হৈ-চৈ করিতেছে।

·· হিটলার বলিয়াছেন, তাঁহাকে ভোট দিলে পোল্যাণ্ডের করিডর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে কিন্তু পোলরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকার পাত্র নয়, তদুপরি ফরাসীরা তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। হিট্‌লার বলিয়াছেন, তিনি জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়ার মিলন সাধন করিবেন কিন্তু জেকোস্লোভেকিয়া তাহাতে রাজী হইবে না, ফ্রান্সের সাহায্যে সেও লড়িবে।

* * এমন করিয়া বিচার করিলে দেখিব যে যদি হিট্‌লার প্রুশিয়া কিংবা রায়কের কর্ণধার হন্‌ তবে জার্ম্মানীর সীমান্ত যেখানে পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স কি জেকোস্লোভেকিয়ায় মিশিয়াছে সেখানে যুদ্ধ আসন্ন। * * * না, হিট্‌লার জার্ম্মানির কোন উপকার করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। তারপর তিনি যদি অকৃতকার্য্য হন্‌, তবে? কম্যুনিষ্ট প্রাধান্য জার্ম্মানির স্কন্ধোপরি বিলম্বিত রহিয়াছে। বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিব যে বর্ত্তমানে হিট্‌লারের এই জয়ের মধ্যে ভবিষ্যতে কমুনিষ্টদের প্রাধান্যের আশঙ্কা গোপন আছে। * * এ ছাড়া সর্ব্বাপেক্ষা যা ভাবনার বিষয় তা এই যে হিট্‌লারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা তিরোহিত হইবে—আর সে কত কালের জন্য কেহ বলিতে পারে না।—হিট্‌লারের জার্ম্মাণির চারিদিকে কেবলই সৈন্য-বাহিনীর সঙীন খাড়া থাকিবে আর জার্ম্মাণিকে অপর সমস্ত দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদেরই কুচকাওয়াজের শব্দ ক্রমাগত জার্ম্মাণির সীমান্ত হইতে দিগন্তে ধ্বনিত হইতে থাকিবে।'

এক কণা ধূলি

শ্রীযুক্ত পল গ্রিজোল্ড হাওয়েজ্‌ 'বেটার হোম্‌স এণ্ড গার্ডেন্স' পত্রিকায় লিখিতেছেন—

এক কণা রঙিণ ধূলা ফুলের গোছা হইতে টেবিলের উপর ঝরিয়া পড়িয়াছে, কারক হইতে হাতে লাগিয়াছে। ফুলের রেণু আর কি—অনুবীক্ষণ দিয়া দেখেন বুঝি। এই রেণুরই বুকে হাজার হাজার সূক্ষ্ম সুন্দর অবয়বের আলিম্পন কোন বিশ্বকার এমন করিয়া আঁকিল? মৌমাছি ইহাকে জানে, এই রেণু, উদ্ভিদের যে-প্রাণ, ভবিষ্যৎ বংশের যে বীজ। বাগানের চারিপাশ হইতে মৌমাছিরা এই পরাগরেণুর জন্য পাগল হইয়া আসে—পিছনের পায়ের কাটায় পুরিয়া, রোমে মাখিয়া নীড়ে ফিরিয়া, মধু মাখিয়া তাহার খোকাকে খাওয়ায়,—ভাগ্যবান ছেলেমেয়েরা কিন্তু!—এই লুণ্ঠতরাজের পর, পরাগ ফুলের বুকে থাকে তাহা সুপ্রচুর—পুংকেশর হইতে পুষ্প যোনি গতায়াত-জন্য মৌমাছিকে চাই ”

তারপর চলিল বিশ্বসৃষ্টির মূলের কথা, উদ্ভিদবিদ্যার অতিসূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ,—ভাষার মাধুর্য্যে বিজ্ঞানের গবেষণা গল্পের মতো পড়িতে লাগে। ধূলিকণার জন্য এই ঔৎসুক্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে এক রাখীতে বাঁধিয়াছে। মনে হয় 'লক্ষ্মী'র আদর্শ দুই জাতির বিভিন্ন হইলেও, দুই জাতি একই 'সরস্বতী'র অর্চ্চনা করে—সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই আদর্শের মিলন শুধু সম্ভব নয় অবশ্যম্ভাবী।

বিচিত্র জগৎ

—শ্রীচিত্রগুপ্ত

এ যুগের গুহাবাসী মানুষ—

দারুণ অর্থকষ্টে পীড়িত হ'য়ে বিলেতের অনেক লোক বাধ্য হ'য়ে বর্ত্তমানে পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করেছে। বাড়ী-ভাড়ার খরচ অত্যন্ত বেশী বলে স্কটল্যাণ্ডের অনেকেই সহর ছেড়ে দূর পল্লীগ্রামে বা সমুদ্রোপকূলে পাহাড়ের গুহায় গিয়ে নিখরচায় বাস করছে। দু' একজন নয়, বর্ত্তমানে সেখানে অনেকেই এই উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। কেউ কেউ আবার সেখানে গিয়েও আরামে বাস করিবার খানিক খানিক বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছে।

রোমের গৌরব-বৃদ্ধির প্রচেষ্টা—

"রোমনগর একদিনে তৈরি হয় নি" ব'লে ইংরাজীতে যে প্রবাদ-বাক্যটি প্রচলিত আছে সেটি রোমের অতুলনীয় স্থাপত্য সম্পদ-সমূহের বিরাটত্বকে লক্ষ্য করেই রচিত হয়েছিল। এর অর্থ হচ্ছে, রোমের মতন অমন একটা বিরাট নগর এমন সৌষ্ঠব-সম্পন্ন হর্ম্ম্য-রাজিতে সুশোভিত হ'য়ে উঠ্‌তে সময়টা যে বড় কম লাগেনি সেইটে বুঝিয়ে দেওয়া।

কিন্তু ইটালীর বর্ত্তমান হর্ত্তাকর্ত্তা মিঃ মুসোলিনী বোধ হয় মনে করেন যে রোমের মতন একটা সহর তৈরী করার কাজটা সত্যিই এমন একটা কিছু শক্ত ব্যাপার নয়, যা'র জন্যে একটা দীর্ঘরকম সময়ের দরকার হ'তে পারে। তাই তিনি সম্প্রতি এই আদেশ দিয়েছেন যে মাত্র পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে রোম সহরটিকে এমন ভাবে নতুন ক'রে গড়্‌তে হবে যাতে সারা জগতের লোক নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে এর দিকে চেয়ে থাকে! এই জন্যে নতুন যে প্ল্যান্ তৈরী হয়েছে তার নক্সা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। মুসোলিনী স্থাপত্যবিদ্‌দের মাত্র ছ'মাসের সময় দিয়েছিলেন এটি তৈরী করবার জন্যে, এবং সেই অনুসারে তাঁরাও যথাসময়ে তা' প্রস্তুত ক'রে দিয়েছেন। রোমকে এইভাবে নতুন ক'রে গড়্‌তে আদেশ দেবার সময় তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে বিরাটত্বে, সৌষ্ঠবে, শক্তি প্রভৃতিতে সর্ব্বরকমে রোম যা'তে তার সর্ব্বপ্রথম উন্নতির দিনের মতই গৌরবান্বিত হ'য়ে ওঠে সকলকে প্রাণপণে সেই চেষ্টা ক'রতে। তিনি বলেছেন যে এ জন্যে রোমের যা' কিছু জীর্ণ হয়েছে ব'লে দেখতে পাওয়া যাবে তা'কেই একেবারে ধ্বংস ক'রে ফেলে নতুন ক'রে তৈরী করতে হবে।

তিনি চান পৃথিবীর যা কিছু ভাল, কবি কার্দ্দুসীর কথামত তাই যেন রোম্যান ব'লে আখ্যাত হ'তে পারে। মুসোলিনীর এই দেশাত্মিকতার প্রমাণ নীচের কাহিনী হ'তেও পাওয়া যাবে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে এরোপ্লেন-চালনার রেকর্ড রেখেচেন – Schneider Trophy রেস-বিজয়ী ইংরেজ বিমানবীর Captain Stainforth. তিনি গড়ে ৪০৬ মাইল বেগে এরোপ্লেন চালিয়ে ঐ রেকর্ড স্থাপন ক'রেছিলেন। যদিও মধ্যে তাঁর এরোপ্লেন ঘণ্টায় ৪১৫ মাইল বেগেও চ'লেছিলো।

ব্রিটেনের এই গৌরবে ইটালীর শ্রীযুত মুসোলিনী একটু চঞ্চল হ'য়ে পড়েছেন। অবশ্য তার কারণও আছে। ইতি পূর্ব্বে উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ধ'রে এরোপ্লেন-চালনায় ইটালীই দ্রুতগতির রেকর্ড রেখেছিলেন। সুতরাং এবার ইংল্যাণ্ডের এই জয়লাভে জগতের কাছে ইটালীর অনেকখানি মান গেল। তার ওপর এর আগে ইটালীর এই গৌরবের জন্য জগতের ব্যবসায়-ক্ষেত্রেও এরোপ্লেন প্রভৃতি মেশিন বিক্রী ক'রে তার যে যথেষ্ট অর্থাগম হতো, Schneider Trophy রেসে ইংলণ্ডের তিনটি জয়লাভের ফলে সেটা এখন যাচ্ছে ইংল্যাণ্ডে। কারণ এই জয়ের ফলে বাজারে ইংল্যাণ্ডে তৈরী মেশিনের কদরই এখন সবচেয়ে বেশী হয়েছে।

দুনিয়ার বাজারে ইংলণ্ডের তৈরী বিমান-পোতের এই প্রতিপত্তিকে খর্ব্ব করবার জন্য শ্রীযুত মুসোলিনী ভারী ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। তাঁর আদেশ অনুসারে এই উদ্দেশ্যে একখানি নতুন বিমানপোত ইটালীতে তৈরী হয়েছে। প্রকাশ যে এই এরোপ্লেনখানি নাকি ঘণ্টায় ৪২০ মাইল বেগে চল্‌তে পারে। অল্পদিনের মধ্যেই ইটালীর বিমানবীর Lieut. Neri এই বিমান পোতের সাহায্যে Flight Lieut.

Stainforth এর স্থাপিত রেকর্ড ভাঙ্গতে চেষ্টা করবেন। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়ে রেকর্ড রাখবার গৌরব এবং তার আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক সুবিধা-লাভ যে কোন দেশের অদৃষ্টে আছে তা' বলা চলে না।

নরে বানরে প্রতিযোগিতা—

Dr. Kellogg ও Mrs. Kellogg নামে Indiana বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বৈজ্ঞানিক মানুষ ও বানরের মস্তিষ্ক-শক্তি নিয়ে কিছুদিন পূর্ব্বে যে একটা পরীক্ষা ক'রেছিলেন তা' বড়ই কৌতুকাবহ। তাঁরা এই উদ্দেশ্যে তাঁদের শিশু পুত্রের সঙ্গে তারই সমান পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তারই সমবয়স্ক একটা বানর-শাবককেও পুষতে আরম্ভ করেন। ফলে বানরটা তাঁদের পুত্রের সমান-সুবিধা সর্ব্ব ক্ষেত্রেই পেয়ে বড় হ'তে থাকে। তারপর এই ভাবে ন'মাস কেটে যাওয়ার পর তাদের পরীক্ষা করে দেখে তাঁরা বর্ত্তমানে Midwestern Psychological Associationএ যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে ব'লেছেন যে তাঁদের লালিত ঐ শিম্পাঞ্জী-শাবকটী প্রতিটী পরীক্ষায় তাঁদের নিজেদের পুত্রের চেয়ে অনেক বেশী মস্তিষ্ক শক্তির পরিচয় দিয়েছে। তাঁরা বলেছেন যে বানরটী শিক্ষার তৎপরতা, স্মরণশক্তির প্রাখর্য্য, শব্দ ও বাক্যের অর্থগ্রহণ শক্তি, বাধ্যতা এবং সহযোগীতা প্রভৃতি সব কয়টী বিষয়েই তাঁদের পুত্রের চেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছে। একটা বানরশাবকের কাছে পুত্রের এই লজ্জায় হয়তো তাঁদের পুত্রগৌরব একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিন্তু এই নতুন ধরণের বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কারে তাঁরা আনন্দিত বড় কম হন নি।

বেতারে এরোপ্লেন ও জাহাজ চালানো—

মিঃ চার্লস্ কীলিং নামে একজন ইংরাজ রেডিও-এঞ্জিনিয়ার জানাচ্ছেন যে তিনি সম্প্রতি রেডিও সম্পর্কে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার ক'রেছেন। তবে যে সমস্ত কৌশল তিনি আবিষ্কার ক'রেছেন সেগুলি এখন খুব গোপনে রেখেছেন কারণ তাঁর এই অদ্ভুত আবিষ্কার তিনি এখনো পেটেণ্ট করিয়ে নেন নি। তবে তাঁর এই সমস্ত আবিষ্কার নাকি একেবারে নতুন। তিনি বলেন যে তাঁর আবিষ্কারের সাহায্যে দুজন লোক একখানি এরোপ্লেনে চেপে শত শত মণ মালবাহী আরও দুজন খানেক এরোপ্লেনকে মানুষের স্পর্শমাত্র-ব্যতীরেকে শুধু বেতারের সাহায্যেই চালাতে সক্ষম হবে। এই সব এরোপ্লেনকে নিয়ন্ত্রিত করবে ওর মধ্যস্থিত এক একটি Robot বা যন্ত্রমানুষ। যন্ত্রমানুষ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার আলোচনা হয়ে গেছে। তবে এই সমস্ত বেতারচালিত এরোপ্লেনকে নিয়ন্ত্রিত করবে যে যন্ত্রমানুষগুলি, সেগুলি নাকি নতুনতর। এই নতুনধরণের যন্ত্রমানুষের আবিষ্কার ক'রেছেন বিলেতের Air Ministry। এই যন্ত্রমানবের আবিষ্কারতত্ত্বও অতি সংগোপনে রাখা হয়েছে। সাধারণে এর সম্বন্ধেও এখনো কিছু জানে না। কেবল মাত্র ঐ কীলিং সাহেব তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে এ বিষয়ে আলোচনা করতে পেরেছেন।

যাই হোক তিনি বলেন যে ঐ ভাবে তাঁর আবিষ্কারের সাহায্যে শুধু যে বেতারে এরোপ্লেনই চালানো যাবে তা' নয়। অনেকগুলি জলযান-সমন্বিত এক প্রকাণ্ড নৌবহরকেও নাকি ঐ ভাবেই বেতারের সাহায্যে এরূপর চালানো যাবে। চালক একখানি প্রধান জাহাজে চেপে কিম্বা একেবারে জলের সংস্পর্শে নিজে না গিয়েও কেবল তীর থেকেই ঐ জাহাজগুলিকে চালাতে সক্ষম হবেন। এবং এতগুলি জাহাজের জন্য সামান্য একদল খালাসী পর্য্যন্ত তাঁর দরকার হবে না। জাহাজ চালানোর সমস্ত কাজই যন্ত্র-সাহায্যে বেতারে সম্পন্ন হবে। তাছাড়া ব্যবসা সংক্রান্ত সুবিধের দিকে চেয়ে তিনি আর একটি খুব মূল্যবান আবিষ্কার ক'রেছেন! এর সাহায্যে এবার ব্যবসাদারবা বেতারের সাহায্যে অসম্ভবরকম দ্রুতভাবে এবং সম্পূর্ণ গোপনে কাগজে ছাপা ব্যবসা-সংক্রান্ত খবরাখবর পেতে পারবেন।

উত্তর মেরুতে ২৫ বছর—

পিটার ফ্রুসেন্ সাহেব চিরতুহিনাচ্ছন্ন উত্তর মেরুতে ২৫ বছর কাটিয়ে এসেছেন। তিনি ভবঘুরের মত সেখানে বেড়াতেন, নির্জ্জন প্রদেশে কুঁড়ে বেঁধে থাকতেন, সেইখানেই বিবাহ করেছিলেন এবং একরকম উত্তর মেরু প্রদেশের অধিবাসীদের সামিলই হ'য়ে গিয়েছিলেন। এখন তিনি ফিরে এসেছেন। সভ্য সমাজের বাইরে থেকে থেকে তাঁর মনের ভাব যা দাঁড়িয়েছে এবং সেখানে তিনি যে রকমভাবে জীবন যাপন ক'রেছিলেন তার বিবৃতি, বর্ত্তমানে কোন এক সাংবাদিকের কাছে তিনি প্রকাশ ক'রেছেন। তাঁর সারা জীবনে বহুবিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। ৪৫ বছর বয়স

পর্য্যন্ত তিনি নাবিকের কাজ, বৈজ্ঞানিকের কাজ প্রভৃতি নানা কার্য্য ক'রে এসেছেন। তা'ছাড়া গ্রন্থকার, কৃষিজীবী, সম্পাদক প্রভৃতির কার্য্য, জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করা অবধি সকল রকম কাজেই তিনি লিপ্ত ছিলেন। বাকি ছিল ভ্রমণ করা—তারও চূড়ান্ত ক'রে এলেন। তিনি যা বিবৃতি দান ক'রেছেন সংক্ষেপে আপনাদের কাছে তা' ব'লছি।

তিনি বলেন, সভ্য-সমাজে এসে এই বাঁধা ধরা, রুটিন মাফিক্ ব্যবস্থা আমার মোটে ভাল লাগেনা। যখন আফিস-গুলো ও তার আশপাশের দেয়ালগুলো দেখি তখন আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। প্রতিদিন ওর মধ্যে ৯টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত কয়েদীর মত কেরাণীর দল যেরকম খাট্‌ছে তা' ভাবতে গেলে আমার হৃৎকম্প হয়। ভাবি—এখান থেকে আমি পালিয়ে গিয়েছিলুন সে ঢের ভাল হ'য়েছিল। কোথায় সেই তুহিনাচ্ছন্ন প্রদেশের রাজত্ব—একেবারে তুলনাই চলেনা। আমি উত্তর মেরুপ্রদেশের সম্রাটের মত ছিলুম—আমি যা ভাবতুম তাই করতুম আমারই কথা ছিল সেখানকার আইন। যদিও আমাকে সেখানে প্রকৃতির হাতে ভীষণ নির্য্যাতন সইতে হ'য়েছিল। কিন্তু তবুও সে নিষ্ঠুরতা বরণ ক'রে নিতে আমার বাধেনি। এই উত্তর মেরুর কঠিন বরফের মধ্যে আমাকে একখানি পা চিরতরে রেখে আসতে হয়েছে। কেমন ক'রে, তা' আপনারা শুনলে চম্‌কে উঠ্‌বেন। আমি গিয়েছিলুম একদল অভিযানকারীর সঙ্গে। তারপর এক নিশীথরাত্রে তাদের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ! পথহারা হ'য়ে বরফের মধ্য দিয়ে আমি হাঁটতে লাগলুম, শীতে আমার গা হাত পা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসতে লাগলো—মনে হ'ল আজকে আমার মৃত্যু অনিবার্য। চারিধারে অজস্র বরফপাত হ'তে লাগলো—আমি একটা বরফের গুহার ভেতর অতিকষ্টে ঢুকে পড়লুম। গায়ের কাপড়-চোপড় সাদা হ'য়ে গিয়েছে, ভাব্‌লুম যাক্ আজ রাতটা কোনক্রমে এখানে কাটিয়ে দিই; ক্লান্তিতে আমার দেহ অবসন্ন হ'য়ে প'ড়েছিল সেইখানেই শুয়ে পড়লুম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানিনা, যখন জেগে উঠ্‌লুম তখন দেখি চতুর্দ্দিকে এত বরফ পড়েছে যে আর কোথাও এতটুকু বাতাস যাবার আসবার পথ বোধ হয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে থাকবে না—এবং আমাকে এই বরফের রাজ্যেই চির-সমাধিস্থ হ'য়ে যেতে হবে। উঠবার চেষ্টা করি, পারিনা—মাথার চুল এবং মুখের দাড়ি বরফের মধ্যে এঁটে গিয়েছে। যত টানাটানি করি তত কষ্ট হয় অথচ কোনমতে ওঠবার উপায় নেই! সে যে কী দারুণ বিপদ, আপনারা তা' অনুমান ক'রতে পারছেন নিশ্চয়, অথচ আর বেশীক্ষণ থাক্‌লেই বরফের মধ্যে আমাকে জমে যেতে হবে। ইতিমধ্যে আমার ঠোঁট দুটি বরফের মধ্যে জমে গেল। তখন প্রাণপণে নিঃশ্বাস গ্রহণ ক'রে আমি জোর ক'রে সেই নিঃশ্বাস মুখ দিয়ে বার করবার চেষ্টা করলুম এবং তার ফলে বরফের আবরণটা সরে গেল বটে কিন্তু আমার দুটি ঠোঁট ছিঁড়ে অজস্রধারে রক্ত বেরুতে লাগলো। এত চেষ্টা করেও কিন্তু সারা দেহের ওপরকার বরফের আবরণটা ঠেলে নিজেকে মুক্ত ক'রতে পারলুম না। আমার মাথার কাছে একটা ভালুকের চামড়া ছিল, বরফের সংস্পর্শে সেটা পাথরের মত শক্ত হ'য়ে গিয়েছিল সেটাকে টেনে বার ক'রে তাই দিয়ে বরফের ওপর ঘা মারতে লাগলুম। এই রকম এগার ঘণ্টা আমায় বরফের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'ল, ফলে আমার দেহের সব অংশটাই বেরিয়ে এল কিন্তু বাঁ পাটা আর কিছুতেই সেই জমাট পাথরের মত বরফ থেকে মুক্ত ক'রতে পারলুম না। আবার চেষ্টা ক'রে খানিকটা বার ক'রলুন কিন্তু পায়ের আঙ্গুলগুলো আর বার ক'রে আনা গেলনা—শেষে কয়েকজন অধিবাসী সেখানে এসে পড়ে আমার আঙ্গুলগুলিকে কেটে ফেলে অতিকষ্টে আমাকে মুক্ত করলো। সে যে কী ভীষণ যন্ত্রণা তা' বর্ণনা ক'রতে পারবো না। সারা পা ফুলে উঠ্‌লো। তারপর ডাক্তারেরা সেই পা একদম কেটে বাদ দিয়েছেন। আমি আজও পর্য্যন্ত সেই খোঁড়া পা নিয়ে আছি বটে, কিন্তু এটা ঠিক যে পায়ের ওপর মনের সুখ নির্ভর করে না। আমি সেখানেই বিয়ে ক'রে বহুদিন সুখে বাস করেছি। আমার সে পরিবার মারা গিয়েছে কিন্তু তার একটি ছেলে আছে—তাকে আমি লেখাপড়া মোটেই শেখাই নি, প্রকৃতির দুলাল হ'য়েই সে আছে। আমি মনে করি সে চিরকাল শান্তিতেই থাকবে। সভ্য সমাজে শান্তি নেই এটা আমি বেশ বুঝেছি। সভ্যতার অর্থ অসন্তোষ। আমি আমার বংশধরকে এই অসন্তোষের রাজ্যে এনে অসুখী ক'রতে চাইনা।

ব্রিটেনের কুকুর দৌড়—

আমাদের এখানে সকলে ঘোড়-দৌড়ের সঙ্গেই বেশী পরিচিত। কুকুর-দৌড়ের কথা এদেশে খুব বেশী শোনা যায়

না। বিলেতের লোকেরা কিন্তু এই কুকুরের দৌড় নিয়ে আজকাল ঠিক ঘোড়-দৌড়ের মতই মাতামাতি করছে। লাখ লাখ টাকার বাজী রেখে কেউ সেখানে সর্ব্বস্বান্ত হ'চ্ছে, কেউ হঠাৎ রাজা হ'য়ে উঠ্‌ছে। এ বছরে, ভাল দৌড়তে পারে এমনি কুকুরদের পরিরক্ষণ করতে ওদের খরচ প'ড়েছে ষাট লক্ষ পাউণ্ড। যেখানে যেখানে কুকুরের দৌড় হয় সেই সব স্থানের মালিকরা সবশুদ্ধ সাত কোটী টাকা কেবল লাইসেন্স দিয়েছেন। ওখানে প্রতি বছর এ বিষয়ে উৎসাহী লোক এত বেশী ক'রে বাড়্‌ছে, যে প্রত্যেক মাসে একটী ক'রে নতুন খেলবার জায়গা তৈরী হ'চ্ছে। আপনাদের কাছে এক জায়গার খবর বল্‌চি। সেখানে ১৯২৮—১৯৩১ সাল এই চার বছরের লাভের পরিমাণ দেওয়া গেল।

১৯২৮ সাল	...	৮৯৮ পাউণ্ড
১৯২৯ "	...	২০৩০০ "
১৯৩০ "	...	৩০৮০০ "
১৯৩১ "	...	৪২৯০০ "

১৯২৭ সালে ইংলণ্ডে কুকুরের দৌড় দেখ্‌তে লোক জমায়েৎ হ'য়েছিলো ছাপ্পান্ন লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার ছ'শো ছিয়াশি জন। ১৯৩১ সালে সবশুদ্ধ লোক হয়েছিলো এক-কোটী আশি হাজার! এ বছর এর ওপর শতকরা পঞ্চাশ-জন ক'রে লোক বাড়্‌বে ব'লে সকলেই মনে করছেন। এ রকম বাজীর সূত্রপাত যে এদেশে এখনও হয় নি, তা' আমাদের সৌভাগ্য ব'লতে হবে কারণ এর দ্বারা কতকগুলো কুকুরের খুব যত্ন-আদর হ'লেও, যারা কুকুরের চেয়ে ঢের উঁচু তাদের অবস্থা পথের কুকুরের চেয়েও যে দুঃখময় হ'য়ে উঠ্‌বে তাতে সন্দেহ নেই।

মৃত্যুদণ্ডবিভ্রাট—

আমেরিকার এক সুবিখ্যাত দস্যুদলের নেত্রী আইরিণ্ শ্রেডারকে (Irene Shrader) মিথ্যা নরহত্যার অপবাদ দিয়ে বিচারকেরা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন ব'লে বর্ত্তমানে একটী আন্দোলন উঠেছে। সত্যিকার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে যে আইরিণ যে-হত্যার ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত হয়, সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। একটি পুলিশ কর্ম্মচারীকে সে হত্যা ক'রেছে ব'লে সে এবং তার এক সঙ্গী আদালতে অভিযুক্ত হয়। কিন্তু বাস্তবিক তারা দুজনেই নিরপরাধ ছিল। নিজেদের নিরপরাধ ব'লে প্রমাণিত করতে গিয়ে যখন তারা পেরে উঠ্‌লো না তখন তারা দেশবাসীকে এবং বিচারপতিকে নিদারুণ অভিশাপ দিয়ে গেল। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তারা ব'লেছে যে 'আমরা সত্য হত্যাকারী নই এবং আজ আমরা যে অপবাদ নিয়ে মরছি তা অচিরেই মিথ্যা ব'লে প্রমাণিত হবে এবং তখন আর তোমাদের অনুতাপের সীমা থাক্‌বে না। দেশে মড়ক, বেকার-সমস্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি করাল-মূর্ত্তিতে দেখা দেবে এবং সকলে তার জ্বালায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌বে!'

পেনসিল্‌ভেনিয়া ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশের সম্বন্ধে তাদের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফল্‌ছে এবং তাদের নির্দ্দোষিতা বর্ত্তমানে এমন ভাবে প্রমাণিত হ'য়েছে যে তা দেখে বিচারকেরা পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হ'য়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এ ভ্রম সংশোধনের আর কোন উপায়ই এখন নেই।

(খ) North Carolinaর একটি সংবাদে প্রকাশ যে আজ প্রায় ৮ মাস আগে সেখানকার 'State Prison' রাজকীয় কারাগারের একান্তে Willie Rector ব'লে ১৯ বৎসর বয়স্ক একটী মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত যুবককে রাখা হয়। তার মৃত্যুদণ্ডের দিন ছিল বিগত ১৯৩১ সালের ২রা অক্টোবর।

কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর হতভাগ্য যুবক দিনের পর দিন উৎকণ্ঠিত চিত্তে তার করাল মৃত্যুর ভয়াবহ মুহূর্ত্তটীর প্রতীক্ষা করতে লাগলো! শেষে একদিন রাত্রিশেষের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত সেই শেষের দিনটী সমাগত হোল। সে নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য মনে মনে প্রস্তুত হ'য়ে রইলো কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে সারাদিন কেটে গেল কেউ তাকে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যেতে এলো না। ক্রমে রাত্রি কাট্‌লো তার পরদিনও কেটে গেল তবু কেউ এলো না। এই ভাবে একদিন দু'দিন ক'রে প্রত্যহই সে নতুন ক'রে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয় অথচ কেউই তাকে নিতে আসে না। ক্রমশঃ নিত্যই শঙ্কিত প্রতীক্ষার ফলে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিল।

তারপর আজ এতদিন পরে প্রকাশ পেল যে লোকটীর মৃত্যুদণ্ডের আদেশসম্বলিত কাগজ-পত্রের গোলমাল হওয়ার ফলেই এই বিভ্রাটের সৃষ্টি হ'য়েছিলো।

সাময়িক প্রসঙ্গ

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সাম্প্রদায়িক সমস্যা

এ দেশে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে সম্প্রদায়ভেদে প্রতিনিধির সংখ্যা কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে বিলাতের সরকারের নির্দ্ধারণ প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় ও পঞ্জাবে মুসলমান অধিবাসীদিগের সংখ্যা অধিক। এই দুই প্রদেশে ব্যবস্থা নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—

বঙ্গদেশে

মুসলমান (শতকরা ৪৮·৪ জন)	·	১১৯ জন
হিন্দু (শতকরা ৩৯·২ জন)	...	৮০ "
ভারতীয় খৃষ্টান ...	..	২ "
ফিরিঙ্গী ...	...	৪ "
য়ুরোপীয় ...	...	১১ "
ব্যবসায়ী ·	...	১৯ "
জমীদার ..	..	৫ "
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে	...	২ "
শ্রমিক ·		৮ "
	মোট ...	২৫০ জন

১১৯জন মুসলমানের মধ্যে ২ জন স্ত্রীলোক, ৮০ জন হিন্দুর মধ্যে ২ জন স্ত্রীলোক ও ৪ জন ফিরিঙ্গীর মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক থাকিবেন।

পঞ্জাবে

মুসলমান (জমীদার ৩ জন লইয়া শতকরা ৫১ জন)	...	৮৬ জন
হিন্দু (শতকরা ২৭ জন) ...	...	৪৩ "
শিখ (শতকরা ১৮·৮ জন) ...	...	৩২ "
ভারতীয় খৃষ্টান ...	..	২ "
ফিরিঙ্গী ..	..	১ "
য়ুরোপীয় ...	...	১ "
ব্যবসায়ী ...	...	১ "
জমীদার ...		৫ "
বিশ্ববিদ্যালয় ...	...	১ "
শ্রমিক ...	...	৩ "
মোট	...	১৭৫ "

৮৬ জন মুসলমানের মধ্যে ২ জন স্ত্রীলোক ও ৪৩ জন হিন্দুর মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক থাকিবেন।

যাঁহাদিগকে বর্ত্তমানে "অনুন্নত" সম্প্রদায় বলা হয়, তাঁহারা হিন্দুদিগের সহিতই ভোট দিবেন—তবে কোন কোন প্রদেশে তাঁহাদিগের সদস্যসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

বাঙ্গালায় য়ুরোপীয়রা পাইবেন—

সাধারণ হিসাবে ১১ জন প্রতিনিধি এবং
ব্যবসায়ী হিসাবে ১৪ জন প্রতিনিধি

অর্থাৎ মোট ২৫ জন প্রতিনিধি।

অথচ বোম্বাইয়ে তাঁহারা পাইবেন—

সাধারণ হিসাবে ৪ জন প্রতিনিধি এবং
ব্যবসায়ী হিসাবে ৫ জন প্রতিনিধি

অর্থাৎ ৯ জন প্রতিনিধি, অথচ বাঙ্গালায় মোট প্রতিনিধি সংখ্যা ২৫০ আর বোম্বাইয়ে ২ শত। এই বৈষম্যের কারণ কি?

বাঙ্গালার হিন্দুদিগের এক দিকে য়ুরোপীয়দিগের এই অকারণ অধিক অধিকার, আর এক দিকে মুসলমানদিগের সংখ্যাধিক্য।

দেশীয় খৃষ্টানরা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার না চাহিয়াই পাইয়াছেন।

যে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক নহে, সে দেশে জনপ্রতি ভোট প্রদানের অধিকার ব্যবস্থাসঙ্গত কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে এবং থাকিবেই। যে দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, সে দেশে শিক্ষার বা প্রদত্ত করের পরিমাণের বা উভয়ের গুরুত্ব উপেক্ষা করা সঙ্গত বলিয়া অনেকে মনে করেন না। বাঙ্গালায় হিন্দুরা ও পঞ্জাবে শিখরা যে এই নির্দ্ধারণে আপত্তি করিতেছেন, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু সে আপত্তিতে কোন ফল হইবে কি না সন্দেহ।

একান্ত পরিতাপের বিষয়—আমরা ভারতবাসীরা আপনারা কিছুতেই এই সমস্যার সমাধান করিতে পারি নাই। সে জন্য অপরকে যত দোষই কেন প্রদান করি না, আমাদিগের এই অক্ষমতা যে আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা এ দেশে গত ২৫ বৎসরেরও অধিক কাল হইতে প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছে এবং এই সময়ের

মধ্যে রাজনীতিক আন্দোলনের প্রাবল্যও আমাদিগকে জাতীয়তার স্থানে সাম্প্রদায়িকতার আদরদানের অনিষ্ট বুঝাইয়া দিতে পারে নাই! কংগ্রেস যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখনই এক দল মুসলমান কংগ্রেসে যোগ দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। কারণ, মুসলমানরা তখন মনে করিয়াছিলেন, ইংরাজী শিক্ষায় তাঁহারা হিন্দুদিগের সমকক্ষ নহেন বলিয়া এ দেশের লোক যে রাজনীতিক অধিকার লাভ করিবে, তাহা হিন্দুরাই হস্তগত করিবেন। বিশেষ—ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া হিন্দুরা সরকারী চাকরীতে যেমন অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত হইতেছিলেন, তেমনই ওকালতী ডাক্তারী প্রভৃতি কাযেও অগ্রণী হইতেছিলেন; আবার সিপাহী বিপ্লবের পর হইতে ইংরাজ শাসকরা মুসলমানদিগকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছিলেন।

কংগ্রেস কিছুদিন পরিচালিত হইবার পরে, তাহাতে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

এই সময় য়ুরোপে ও এসিয়ায় মুসলমানদিগের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা হয় এবং সেই চেষ্টা প্যান-ইস্লামিক আন্দোলন নামে পরিচিত হয়। তাহার প্রভাব ভারতবর্ষেও পতিত হয় এবং মুসলমানদিগের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান—মসলেম লীগ্ সৃষ্ট হয়। তদবধি মুসলমানরা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসাবেই অধিকারবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

মর্লি-মিণ্টো শাসনসংস্কারে যেমন তাঁহাদিগের সেই অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল, কংগ্রেসও তেমনই তাঁহাদিগের সেই অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ সহরে কংগ্রেস ও মসলেম লীগ একযোগে শাসন-সংস্কারের যে দাবি পেশ করেন, তাহাতেই প্রথম কংগ্রেসে মুসলমানদিগের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার স্বীকৃত হয়। তাহার পর মণ্টেগু চেমস-ফোর্ড শাসন-সংস্কারেও তাহা মানিয়া লইতে হইয়াছিল।

ইহার পরও কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কখন স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনাধিকার ত্যাগের কথা নাই। কংগ্রেস কেবলই "প্যাক্ট" বা চুক্তি করিয়া একটা অস্থায়ী মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে সর্ব্ব দলের সমিতি গঠিত হয়, তাহাতেও প্রথমতঃ ১০ বৎসরের জন্য মুসলমান-দিগের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনাধিকার প্রস্তাবিত হইয়াছিল।

ফলে মুসলমানরা কিছুতেই লব্ধ অধিকার ত্যাগ করিয়া জাতীয়তার অনুকূল ব্যবস্থায় সম্মত হয়েন নাই। সঙ্গে সঙ্গে "অনুন্নত" সম্প্রদায়ও স্বতন্ত্র অধিকার চাহিতে থাকেন। মিষ্টার জিন্না প্রমুখ যে সকল মুসলমান প্রথমে বলিয়াছিলেন, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা জাতীয়তার বিরোধী হইলেও মুসলমানদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কিছু দিনের জন্য তাঁহাদিগকে সে ব্যবস্থার সুযোগ দান করা কর্ত্তব্য, তাঁহারাও আর সে অধিকার ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। এমন কি মিষ্টার জিন্না প্রস্তাব করিলেন, যে সকল প্রদেশে মুসলমানদিগের সংখ্যা অধিক সে সকল প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাল্প হইয়া দাঁড়াইবেন, পরেও কখন এমন ভাবে সে সব প্রদেশ গঠিত করা চলিবে না।

এই অবস্থায় বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকের অনুষ্ঠান হইল। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকল্পে যে সমিতি গঠিত হইল, তাহাতে কোনরূপ মীমাংসা হইল না। বৈঠকের শেষে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন, তিনি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে একযোগে এই সমস্যার সমাধান করিতে অনুরোধ করিতেছেন; এ সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা বিলাতের সরকারের নাই কেন না, ইহা ভারতবাসীর "ঘরোয়া ব্যাপার"।

প্রতিনিধিরা এ দেশে আসিয়াও এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেন না।

তাহার পর বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন। কংগ্রেসের পক্ষে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বড়লাট কর্ত্তৃক কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বৈঠকে প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তাবে বলিয়াছিলেন, যদি প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়, প্রতিনিধিরা বৈঠকে স্বরাজ ভারতের শাসনপদ্ধতি রচনা করিতে পারিবেন, তবেই কংগ্রেস সে প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন। বড়লাট তাহাতে সম্মত না হওয়ায় কংগ্রেস বৈঠক বর্জ্জন করেন। দ্বিতীয় বৈঠকে মহাত্মাজী কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। সংখ্যাল্প সমিতির অধিবেশন স্থগিত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া তিনি ৭ দিন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদিগের সহিত আলোচনা করিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেও বিলাতের প্রধান মন্ত্রী বলেন, তাঁহার এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা নাই।

শেষে তিনি বলেন, যদি ভারতবাসীরা কোনরূপে এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারেন, তবে হয়ত তাঁহাকে বাধ্য হইয়া একটা অস্থায়ী নির্দ্ধারণ করিতে হইবে; কিন্তু সে নির্দ্ধারণ কখন দেশের লোকের সম্মিলিত নির্দ্ধারণের স্থান অধিকার করিতে পারে না। আর সেরূপ নির্দ্ধারণের ফলে যে শাসন-পদ্ধতি রচিত হইবে, তাহা কখনও অন্যান্য দেশের দেশবাসী রচিত শাসনপদ্ধতির সহিত একাসনে স্থাপিত হইতে পারিবে না।

একান্ত পরিতাপের বিষয়, এই কথার পরও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আপনাদিগের এই সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই এবং শেষে ইহার জন্য শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তন বিলম্বিত করা সঙ্গত নহে, এই কথা বলিয়া বিলাতের সরকার তাঁহাদিগের ইচ্ছানুরূপ নির্দ্ধারণ প্রদান করিয়াছেন।

ভারতবাসীদিগের সমস্যা সমাধানে অক্ষমতার যদি কোন গুপ্ত কারণ থাকিয়া থাকে—যদি কোন বা কোন কোন সম্প্রদায়ের নেতারা সূত্রাকৃষ্ট পুত্তলিকার মত চালিত হইয়া থাকেন, যদি কোন প্রবল পক্ষের প্রভাবেই এমন হইয়া থাকে, তথাপি বলিতে হয়—এ দেশের লোকের এই অক্ষমতা নিতান্তই দুঃখের ও লজ্জার কারণ।

নির্দ্ধারণ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার নির্দ্ধারণ ভারত শাসন আইনের অঙ্গীভূত হইয়া বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যদি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় একমত হইয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিতে পারেন, তবে বিলাতের সরকার সেই সমাধানই গ্রহণ করিবেন।

নির্দ্ধারণ যে সন্তোষজনক হয় নাই এবং ইহা যে সাম্প্রদায়িকতাকে জাতীয়তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপযোগী, তাহাতে যখন সন্দেহ নাই এবং নির্দ্ধারণ যে সকল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবে না সে সকল সম্প্রদায়ও যখন সে জন্য ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করিবেন না, তখন শাসন-পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষে কোন নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে একমত হইয়া আপনাদিগের সমস্যার সমাধানে আপনাদিগের অক্ষমতার অপনোদন কলঙ্ক-কালিমা আপনাদিগের ললাটে অঙ্কিত হইতে না দেওয়াই অবশ্য কর্ত্তব্য।

তাহা না হইলে ভারতবাসীকে বিলাতী সরকারের নির্দ্ধারণই মানিয়া লইতে হইবে। পরের রচিত শাসনপদ্ধতি যাঁহারা অপমানজনক বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা কিরূপে পরের নির্দ্ধারণ মানিয়া লইবেন?

এখনও সময় আছে। সুতরাং সমগ্র সভ্য জগতে আপনাদিগের অক্ষমতার পরিচয় প্রকাশ না করিয়া ভারত-বাসীর পক্ষে এখনই আপনাদিগের এই সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যে সমাধানে সকল সম্প্রদায়ের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিবে, কেবল সেই সমাধানই সকল পক্ষের গ্রহণযোগ্য হইবে মনে করিয়া সকল সম্প্রদায়েরই পরস্পরের দাবি বিবেচনা করা ও সে দাবি শ্রদ্ধা সহকারে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ভারতবাসীরা জাতীয়তার প্রসারকল্পে কি তাহা করিতে পারিবেন না?

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য—

গত ১৩ই আগষ্ট শনিবারে প্রায় ৯২ বৎসর বয়সে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে তাঁহার মত আয়ু প্রাপ্তি প্রায় দেখা যায় না এবং যাঁহারা এই বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন, তাঁহাদের প্রায় কাহারও মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দেহ জরাজীর্ণ হইলেও তাঁহার মানসিক শক্তি বিন্দুমাত্র বিকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুও অতর্কিত ভাবে আসিয়াছিল; তিনি আহারে বসিয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ারোধ হয়।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পিতার পৈত্রিক বাস মালদহ জিলায়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রামজয়ের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার পুত্র রামকমল ও কৃষ্ণকমল বালক—জ্যেষ্ঠের বয়স ১০ বা ১২ বৎসর মাত্র। যিনি পরবর্ত্তী কালে কাশ্মীর রাজ্যের কার্য্যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা রামজয়ের গৃহে বাস করিতেন। রামজয়ের গৃহে টোলে প্রায় ২০ জন ছাত্র শিক্ষা পাইত। দুই ভ্রাতা পিতার মৃত্যুতে আর্থিক দুরবস্থায় পতিত হইলেন বটে, কিন্তু এই ব্রাহ্মণ বালকদ্বয় সিমলার প্রসিদ্ধ বসাক পরিবারের "ভিক্ষা-পুত্র" ছিলেন বলিয়া রাধানাথ বসাক অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের অভাব মোচন করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট বালকদ্বয় শিক্ষা লাভ করিতেন এবং তাঁহাদিগের প্রতিভার প্রখরতায় মুগ্ধ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদিগকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনিই বালক কৃষ্ণকমলকে সংস্কৃত কলেজের স্কুল বিভাগে প্রবেশ করান এবং কৃষ্ণকমল তথায় অধ্যয়ন করিয়া ১৯ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। রামকমলের প্রতিভায় উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল এবং অপেক্ষা-কৃত অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে চিকিৎসক করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু বিদ্যানুরাগী কৃষ্ণকমল কোন ব্যবসায়ের জন্য শিক্ষা লাভে আগ্রহশীল ছিলেন না। ২২ বৎসর বয়সে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কোন বিষয়ে মতভেদ হেতু সে পদ ত্যাগ করিয়া তিনি হাওড়ার আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। সেই অবস্থায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের "ঠাকুর আইন অধ্যাপক" নিযুক্ত হইয়া হিন্দু একান্নবর্ত্তিপরিবার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া ১০ হাজার টাকা পারিশ্রমিক লাভ করেন। তাঁহার বক্তৃতা নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতা ব্যারিষ্টার ঋষিবর মুখোপাধ্যায় লিখিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি হাইকোর্টেও ওকালতী করিয়া যশঃ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কার্য্যে তাঁহার আগ্রহ ছিল না।

তিনি কিছুদিন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর অন্যতম কমিশনারও ছিলেন। কিন্তু তিনি স্থির করিয়াছিলেন, সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত না হইলে কমিশনার হইবেন না।

রিপন কলেজের ব্যবস্থায় ত্রুটির বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচিত হইলে অধ্যক্ষ ত্রিগুণাচরণ সেনের পদত্যাগের পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে কৃষ্ণকমল রিপন কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহুদিন সেই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার সহিত কায করিয়াছিলেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষায় পরীক্ষক থাকিতেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ফেলো নির্ব্বাচিত করিয়া সমাদর করেন। তিনি সংস্কৃত দর্শন ও আইন বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন। সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার শ্রাদ্ধে ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাভারতের বিরাট পর্ব্ব পাঠ করিয়াছিলেন। সার রাসবিহারী ঘোষ যখন স্বগ্রামে পিতার আত্মার তৃপ্তিকামনায় শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তখন, তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমসাময়িক কৃতীদিগের মধ্যে ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার সতীর্থ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কয় বৎসর হইল পরলোকগত হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব সার তারকনাথ পালিত, 'সারদা মঙ্গলের' কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী সকলেই লোকান্তরিত। যাঁহার সহিত তিনি নিবিষ্টচিত্তে কোমতের দর্শনের আলোচনা করিতেন, তাঁহার সেই পরম সুহৃদ ও সমমতাবলম্বী হাইকোর্টের বিচারক কুশাগ্রবুদ্ধি দ্বারকানাথ মিত্র বহুদিন পূর্ব্বেই দেহ রক্ষা করিয়াছেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠন যুগে যাঁহারা অসাধারণ শক্তি পরিচালনা করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাদিগের অন্যতম। যাঁহারা 'অবোধ বন্ধু' পত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোমতের ভক্ত ছিলেন এবং সেই জন্য এ দেশের নানা সামাজিক প্রথায় ও নৈতিক মতে তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি মতানুযায়ী কায করিতে কখন কুণ্ঠা বা দ্বিধা অনুভব করিতেন না।

তিনি পরিণত বয়সে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্তের নিকট তাঁহার স্মৃতিকথা বিবৃত করিয়াছিলেন। সেই সকল মনোজ্ঞ স্মৃতি 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রে প্রকাশিত হয়। সেগুলিকে বাঙ্গালার নব যুগের আরম্ভকাল সম্বন্ধীয় সংবাদের খনি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রবন্ধগুলি পরে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলি পাঠ করিলে তাঁহার বিমল বুদ্ধির ও অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যে কোন বিষয় তাঁহার প্রতিভার সীমামধ্যে আসিত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত পণ্ডিতের আবির্ভাব যে কোন দেশের ও সমাজের পক্ষে সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। তাঁহার প্রতিভা একদিন বাঙ্গালার জ্ঞানরাজ্য উজ্জ্বল করিয়াছিল। তাঁহার মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি যে দেশবাসীকে আরও সম্পদ প্রদান করেন নাই, ইহা আমাদিগের দুর্ভাগ্য।

আবার বৈঠক

গত ৫ই সেপ্টেম্বর সিমলায় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনের আরম্ভে বড়লাট ঘোষণা করিয়াছেন,—

আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে লণ্ডনে অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন গোলটেবিল বৈঠক বসিবে।

গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনের পর তাহার কার্য্য পরিচালিত করিবার জন্য এক পরামর্শ সমিতি গঠিত করা হইয়াছিল। সে সমিতি এ দেশে কাজ করিতেছিলেন। এখন তাহার স্থানে এই নূতন বৈঠক বসান হইবে।

ইহা স্বল্পায়তন হইবে। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠকে প্রতিনিধি-সংখ্যা যত অধিক ছিল, ইহাতে প্রতিনিধি-সংখ্যা তত অধিক হইবে না।

বৈঠকের নির্দ্ধারণ অনুসারে যে সব শাখা সমিতি গঠিত হইয়াছিল, সে সকলের নির্দ্ধারণ প্রকাশিত হইয়াছে। এ দিকে সম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার নির্দ্ধারণ প্রকাশ করিয়াছেন। এখন এই সকল বিবেচনা করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি নির্দ্ধারিত ও রচিত হইবে। কিন্তু দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। সুতরাং এখন যে ব্যবস্থা হইবে, তাহা সামন্ত রাজ্যগুলির পক্ষেও প্রযোজ্য হইবে কি না, বলিতে পারা যায় না।

প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্ধারণ যে কোন সম্প্রদায়ের পক্ষেই সন্তোষজনক হয় নাই, তাহা দেখা গিয়াছে।

এই অবস্থায় বৈঠকের সাফল্য যে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে ভাবে বৈঠক সম্বন্ধে ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তন করা হইল, তাহা যে কেহ কেহ প্রতিশ্রুতিভঙ্গ বলিয়াও অভিহিত করিতেছেন, তাহা বিলাতের ও এ দেশের সরকার অবশ্যই অবগত আছেন।

আমাদের বাণিজ্য-সম্পদ

তৃতীয় পর্য্যায়

—শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

ভারতের বহির্বাণিজ্যের রূপান্তর হইবার সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, এবং এ বিষয়েও ইংরাজ বণিক্‌দের ব্যবসায়-নীতি, ভারতবর্ষের বাণিজ্যের এবং এদেশীয় বণিক্ সম্প্রদায়ের কম ক্ষতি করে নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নানা উপায়ে স্থানীয় রাজাদের এবং মোগল সম্রাটের তুষ্টি সাধন করিয়া এদেশে কম শুল্কে পণ্য আমদানী করা এবং অবাধে আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন স্থান হইতে বন্দরে মাল সংগ্রহ করিবার অধিকার লাভ করা ইংরাজ বণিকদের ভারতীয় ব্যবসায়ে প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল। সেই নীতি অনুসরণ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মোগল সম্রাটের নিকট হইতে বাংলায় ও অন্যান্য কোন কোন স্থানে বিনা শুল্কে ব্যবসায় চালাইবার অধিকার লাভ করে। এই অধিকার দিবার সময় স্থানীয় রাজপুরুষেরা প্রথমে ভাবিয়া দেখেন নাই যে ইহার শেষ দাঁড়াইবে কোথায়। কিন্তু ক্রমেই ইহার বিষময় ফল ফলিতে লাগিল। যে সকল পণ্য তখন ভারতের বাণিজ্যের প্রধান উপাদান ছিল তাহার মধ্যে এই গুলি উল্লেখ-যোগ্য, যথা: শুপারি, তামাক, চিনি, লবণ, তৈল, চাউল, রবিশস্য, রেশম এবং লৌহ পিত্তলের দ্রব্যাদি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ক্রমে দেশের সর্ব্বত্র বিনা শুল্কে অবাধে বাণিজ্য চালাইবার অধিকার অর্জ্জন করে। এই অধিকারের বলে শুধু যে কোম্পানির ব্যবসায়ই নিষ্কর হইয়া বাড়িতে লাগিল তাহা নহে, কোম্পানির কর্ম্মচারী ও অন্যান্য বাহিরের ইংরাজেরাও নিজ নিজ নামে স্বতন্ত্র ব্যবসায়ের জাল বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং সকলেই বিনাশুল্কে বাণিজ্যের সুবিধা আদায় করিতে থাকিলেন। দেশীয় ব্যবসায়ীগণের উপরে শুল্কের চাপ ক্রমেই বাড়িতে থাকিল। ফলে একে একে আমাদের বর্দ্ধিষ্ণু স্বাধীন ব্যবসায়ী ও মহাজনগণ নিজ নামে ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে লাগিলেন এবং ইংরাজ দিগের দালালি করা ছাড়া তাঁহাদের আর গত্যন্তর রহিল না। আত্মসম্মান রাখিয়া যাঁহারা ঠিক ইংরাজের দালালি করিতে পারিলেন না তাঁহারা ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া চাষ বাস কিম্বা জমিদারীব দিকে মনোনিবেশ করিলেন। বাংলার বাণিজ্য-ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর দীনতার ইহা অন্যতম প্রধান কারণ।

বাংলার শেষ প্রকৃত নবাব মীরকাশিম দেশীয় বাণিজ্যের এই নিদারুণ অবস্থা প্রণিধান করিয়া তাহার প্রতিকারের জন্য বহু চেষ্টা করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাহার ফলে ইংরাজের চক্রান্তে তাঁহাকে সিংহাসন পর্য্যন্ত হারাইতে হইল। দেশীয় ব্যবসায়ি-দের উপর যে অবিচার করা হইতেছিল তাহাতে ব্যথিত হইয়া নবাব মীরকাশিম ইংলণ্ডের রাজার নিকট ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ তারিখে এক দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "ইংরাজ বণিকগণ ও তাহাদের গোমস্তা ও অন্যান্য চাকরেরা প্রত্যেক জেলা, গঞ্জ, পরগণা ও গ্রামে তৈল, মাছ, খড়, বাঁশ. চাউল, ধান, শুপারি, ও অন্যান্য জিনিষের ব্যবসায় অবাধে চালাইতে থাকে এবং কোম্পানির দস্তক হাতে লইয়া যে কোন ব্যক্তি আপনাকে কোম্পানির সমান অধিকারে স্বত্ববান্ জ্ঞান করে।" ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্থানীয় অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী মিষ্টার ভেরেলষ্ট ও লিখিয়াছিলেন, "বিনাশুল্কে এই সকল ব্যক্তি বাংলায় বাণিজ্য করিতে থাকেন এবং তাঁহাদের বাণিজ্যের প্রসারের জন্য দেশবাসীর উপর অশেষ অত্যাচার করা হয়"। তদানীন্তন স্থানীয় শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া মিষ্টার উইলিয়াম বোল্ট মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন :—

"সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ না করিয়া একথা বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমানে যে ভাবে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় চালান হইতেছে এবং বিশেষতঃ যে ভাবে "কোম্পানি" বিলাতে টাকা পাঠানর ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা নিরন্তর প্রবহমান অত্যাচারের স্রোত বাড়ান ছাড়া আর কিছুই করিবে না। এদেশে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহাতে যেন কোম্পানির কর্ম্মচারিদের একচেটিয়া অধিকার। ইংরাজ বণিকেরা এবং তাঁহাদের বেনিয়ান, গোমস্তা ও চাকরেরা জিনিষের যে দাম স্থির করিয়া দিবেন ও যখন যে ভাবে যত

পরিমাণ সরবরাহ করার হুকুম দিবেন দেশীয় শিল্পীদের তাহা অম্লান বদনে মানিয়া লইতে হইবে।" বাংলার তাঁতীদের কুটীর-শিল্প তখন ভারতীয় শিল্পসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। এই তাঁতীদের উপর যে ভাবে কোম্পানির লোকেরা স্ব স্ব স্বার্থের পরিতুষ্টির জন্য উত্তরোত্তর অত্যাচারের চাপ বাড়াইতে থাকে তাহাতে অনেকেই পরিশেষে তাঁতের কারবার বন্ধ করিয়া গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। "এরূপ দৃষ্টান্তের কথাও জানা গিয়াছে যে কোম্পানির কর্ম্মচারিদের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ও যাহাতে রেশম কাটিতে বাধ্য না হইতে হয় তাহার জন্য অনেক তাঁতী নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলে।"

এই সময়ে সাধারণতঃ বাজারে যে দাম পাওয়া যাইত তাহার তুলনায় কোম্পানির কর্ম্মচারিদিগকে নিয়মিত ভাবে শতকরা ১৫৲ হইতে ৪০৲ টাকা কম মূল্যে জিনিষ সরবরাহ করিতে দেশীয় শিল্পী, বিশেষতঃ তাঁতীদের, বাধ্য করা হইত।

বোল্ট সাহেব লিখিত "কনসিডারেশনস্"

খৃষ্টীয় ১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেস্লি ডাক্তার ফ্রান্সিস বুকানন সাহেবকে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ আর্থিক অবস্থা ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে নিযুক্ত করেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে বুকানন সাহেবের ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। ইংরাজ রাজত্বে ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে ইহাই সর্ব্বপ্রথম বিশদ ইতিহাস।

ভারতের বাণিজ্যের অবস্থা এবং ডাক্তার বুকাননের বিবৃতি।

বুকানন সাহেবের দৈনিক পঞ্জী হইতে জানা যায় যে মাদ্রাজ সহরের সন্নিকটে তখন প্রায় কোনই পতিত জমি ছিল না এবং ঐ সব জমি হইতে ভালই ফসল হইত। অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ যে সকল স্থানে অধিক হইত হিন্দু রাজাগণ সে সকল প্রদেশে মুক্ত হস্তে জলাশয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি মাদ্রাজ অঞ্চলে ভারতবাসীর যে বিশেষ আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল তাহা নহে। কারণ 'কোম্পানির' ব্যবসায়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে নানারূপ বিরোধের সৃষ্টি হইতে লাগিল ও যুদ্ধবিগ্রহের জন্য স্থানীয় রাজাগণ এমন বিব্রত হইয়া উঠিলেন যে দেশবাসীর আর্থিক উন্নতির প্রতি মনোযোগ দিবার অবকাশও আর তাঁহাদের থাকিল না।

যে সকল শিল্প তখন দক্ষিণ ভারতে বিশেষ প্রসার পাইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রধান এই কয়টি: লৌহ ও ইস্পাত, বস্ত্র, কাঁচের দ্রব্যাদি, চিনি, চন্দন ও গালা।

স্থানীয় এই সকল পণ্য লইয়া ব্যবসায়ীগণ বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যবসা চালাইতেন এবং কাশ্মীরী শাল ও কাপড়, জাফ্রাণ ও কস্তূরী, সুরাট হইতে আনীত মুক্তা, বুরানপুরের সোণারূপার জরি, হায়দ্রাবাদের ফুলদার ও বুটিদার কাপড় এবং বিদেশ হইতে আনীত টিন, সীসা, তামা প্রভৃতির কারবার বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল।

বৃটিশ-ব্যবসায়ীদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দেশীয় মহাজনের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল এবং যদিও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা হইল তথাপি দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা ভাল হইবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার বুকাননকে উত্তর ভারতের আর্থিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। উত্তর ভারত বলিতে ইংরাজদিগের সম্পর্ক তখন প্রধানতঃ বাংলা ও বিহার প্রদেশের সহিত সংস্থাপিত হয়। ডাক্তার বুকাননের বিবৃতি হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ১৫।২০ বৎসরে উত্তর ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

দিনাজপুর, পাটনা ও উত্তর বিহার অঞ্চলে চাষ, বিশেষতঃ ধান্য উৎপাদনই ছিল সাধারণ লোকের প্রধান উপজীবিকা। ধান্যের দর ছিল তখন গড়ে টাকায় ৭০ সের। ধান্যের পরই গম ও যবের চাষের প্রচলন ছিল, এবং প্রচুর পরিমাণে রবিশস্য, বিশেষতঃ ছোলা, মটর, খেঁসারি, মশুরি, অড়হর, মুগ, কলাই ও তিল প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। কোন কোন স্থানে পোস্ত, তামাক ও পান এবং নীলের চাষেরও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

দেশের অধিকাংশ লোক তখনও কৃষিজীবী। কিন্তু বস্ত্রশিল্পের প্রসারও নিতান্ত কম ছিলনা। এই শিল্পে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে নিয়োজিত হইত এবং সেজন্য উপর্য্যুপরি অজন্মা না হইলে সাধারণ গৃহস্থের ঘরে অন্ন ও বস্ত্রের নিদারুণ অভাব হইত না। স্ত্রীলোকেরা

সধারণতঃ চরখায় সরু সুতা প্রস্তুত এবং কাপড়ের উপর নানা সূক্ষ্ম কাজে ব্যাপৃত হইয়া বেশ রোজগার করিত। তাঁতীরা গড়ে বাৎসরিক ৩০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা থরচপত্র বাদে জমাইতে পরিত।

এতদ্ভিন্ন উত্তর ভারতে যে সকল শিল্পের প্রচলন ছিল তাহার মধ্যে প্রধান এই কয়টীর নাম করা যাইতে পারে যথা :—কাগজ, চামড়া, সুগন্ধি তৈল ও আতর, লোহা, পিত্তল, কাঁসা ও তামার যন্ত্র ও বাসনপত্র, পাথরের খোদাইয়ের কাজ, কুমারের শিল্প, চুন ও নানা প্রকার কারুকার্য্যসম্বলিত ইষ্টকাদি, কম্বল ও পশমী কাপড় প্রস্তুত, এবং সোনারূপার অলঙ্কার ও জরির কাজ ইত্যাদি।

আভ্যন্তরীণ অনেক স্থানে সঙ্কীর্ণ ও অপ্রশস্ত হইয়া পড়িলেও দূর দূরান্তরে পণ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সাধারণতঃ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের কিম্বা নিকটস্থ বাণিজ্য কেন্দ্রের সহিত গ্রামের ব্যবসায় "বলদিয়া ব্যাপারী"গণ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত, এবং অপেক্ষাকৃত দূরে মাল সরবরাহ কবার জন্য গাড়ী ও নৌকা ব্যবহারের প্রচলন ছিল। এইরূপে একশত মণ মাল পাটনা হইতে কলিকাতায় নৌকাযোগে আনিতে হইলে তখন খরচ হইত ১২৲ হইতে ১৫৲ টাকা এবং পাটনা হইতে গয়া পর্য্যন্ত মাল-বোঝাই গরুর গাড়ীর ভাড়া লাগিত প্রায় তিন টাকা

সচরাচর মহাজনদের কেনাবেচা হইত সাপ্তাহিক বাজারে বা হাটে। স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সহরে রূপার টাকা ও তামার মুদ্রা, এবং গ্রামে পয়সা, এমন কি 'কড়ি'তেও আদান প্রদান চলিত।

গোরক্ষপুরের পশ্চিমে ধান্যের পরিবর্ত্তে গম ও ইক্ষুর চাষের ব্যবস্থা ছিল এবং অন্যান্য হিসাবে শিল্পবাণিজ্যের রূপ প্রায় একই প্রকার ছিল

পূর্ব্বে দিনাজপুর ও মালদহে প্রচুর পরিমাণে ধান ও ও অন্যান্য শস্য হইত, এবং মালদহে রেশমের কারবার সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। রেশম ও সুতি বস্ত্র-বয়ন ভিন্ন ঐ সকল বস্ত্রাদি রং ও তাহার উপর নানা চারু-শিল্পের কাজে অনেক হিন্দু ও মুসলমান রমণী নিযুক্ত হইয়া পরিবারের আয় বৃদ্ধি করিতে পারিত। সেজন্য সাধারণ চাষীদের অবস্থা তাদৃশ খারাপ হইয়া পড়ে নাই।

ডাক্তার বুকানন কিন্তু লক্ষ্য করেন যে ক্রমে দেশের অর্থকরী সমস্ত ব্যবসায়ই ভারতীয় মহাজনদের হাত হইতে ইংরাজদের হাতে চলিয়া যাইতেছিল। বড় বড় দেশী সওদাগরের সংখ্যা বিরল হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহাদের পরিবর্ত্তে যে সকল ছোট দেশী ব্যবসায়ী কাজ করিতে আরম্ভ করেন তাঁহারা প্রায়ই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং অন্যান্য ইংরাজ সওদাগরের গোমস্তা ও দালালির কাজ গ্রহণ করিতেন। নতুবা অবাধে ব্যবসা করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইত।

ডাক্তার বুকাননের এই বিবৃতি হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ বৎসরে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়। সর্ব্বত্রই সেই একই পরিচয়—দেশীয় শিল্পী ও বণিক্‌দের স্থলে বিদেশী শিল্পী ও বণিকের প্রতিষ্ঠা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায় ত্যাগ ও ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের গতি

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাচ্যে বাণিজ্যের অধিকার বিষয়ক আইন সংশোধিত হয়, এবং পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক নূতন সনন্দ দিবার সময় একচ্ছত্র বাণিজ্যের অধিকার উঠাইয়া লওয়া হয়। তখন হইতে ভারতবর্ষে রাজত্ব বিস্তারের এবং প্রজা সাধারণের আর্থিক ও অন্যান্য ব্যবস্থার প্রতি ব্রিটীশ পার্লামেণ্টের অধিকতর লক্ষ্য নিবদ্ধ হয়। 'কোম্পানি'র একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একদল স্বতন্ত্র ইংরাজ বণিকের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করে এবং বেনামীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এমন কি সৈনিক বিভাগের অনেক ইংরাজ কর্ম্মচারী কারবার চালাইতে থাকেন। ইহাতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিল। কারণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর কোন কোন ক্ষেত্রে দাবী চলিত, কোম্পানির কর্ম্মচারীদের নিতান্ত অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে আবেদন চলিত। স্বতন্ত্র ইংরাজ বণিকদের বিরুদ্ধে আর কিছু করা সম্ভব রহিল না

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দের মিয়াদ ফুরাইয়া আসিলে পার্লামেণ্ট স্থির করিলেন যে রাজ্য-শাসনের ভার ও ব্যবসায়-পরিচালনা একই হস্তে ন্যস্ত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। তদনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষে ব্যবসায়ের অধিকার সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হইল। তখন হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিভিডেণ্ড ভারতীয় রাজস্ব হইতে দেওয়ার বন্দোবস্ত হইল।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে পার্লামেন্ট কর্ত্তৃক ভারতীয় শিল্পের তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটীর সিদ্ধান্ত হইতে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

১৮৩০-৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শিল্পের অবস্থা

তুলার প্রচুর উৎপাদনের ব্যবস্থা ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ছিল, কিন্তু আমেরিকান তুলার তুলনায় ইহা কিছু নিকৃষ্ট জাতীয়। অপেক্ষাকৃত মোটা কাপড় প্রস্তুতের জন্য এবং পশমের সহিত মিলাইয়া গরম কাপড় প্রস্তুতেও এই তুলা ব্যবহৃত হইত। ১৮২৫-৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশে সকল তুলাই হাতে কাটিয়া সূতা প্রস্তুত করা হইত। সাধারণতঃ বাংলাদেশে তুলার চাষ ছিলনা, তবে ঢাকার নিকটে ও চট্টগ্রামের চতুঃপার্শ্বে একরূপ উচ্চ শ্রেণীর তুলা হইত যাহা হইতে সূক্ষ্ম কাপড় প্রস্তুত সম্ভব হইত। গুজরাট অঞ্চলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তুলার চাষ ছিল।

রেশমের শিল্প প্রধানতঃ বাংলাদেশেই সন্নিবদ্ধ ছিল এবং বহু পল্লীর ও পরিবারের প্রধান উপজীবিকা ছিল রেশম প্রস্তুত ও তাহার সংক্ষিপ্ত কারবার।

বাংলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ১২টী রেশমের কুঠী ছিল। এই সকল কুঠী বা কারখানায় রেশমের গুটি হইতে সূতা বাহির করা হইত মাত্র, এবং তাহাদের নিকট অগ্রিম দিয়া তাহাদের কুটীরেই কাপড় প্রস্তুত করান'র ব্যবস্থা ছিল। কোম্পানির কুঠী ভিন্ন কয়েকজন ইংরাজ ব্যবসায়ীরও স্বতন্ত্র কুটী বা কারখানা ছিল। ভারতীয় রেশমের মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রেশম ইতালীর উৎকৃষ্ট রেশম অপেক্ষা সস্তা ও আদরের ছিল বটে কিন্তু সাধারণতঃ ভারতীয় বিলাতী ও ইতালীয় রেশম অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। তুঁতের চাষ ও গুটীপোকা লালন করার কাজে বাংলার অনেক চাষী সে সময় ব্যস্ত থাকিত এবং কোম্পানির লোকেরা অগ্রিম দাদন দিয়া চাষীদের নিকট হইতে রেশমের গুটি ক্রয় করিত। এইরূপে ইংরাজ বণিকদের মধ্যস্থতায় ১৮:৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮:০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলার রেশমের রপ্তানি বেশ বাড়িয়া যায়।

ভারতীয় বস্ত্র ও রেশম শিল্পের গতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। মোটের উপর ব্যবসায়ের প্রসার ও পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বাধীন কুটীর-শিল্পী ও দেশীয় মহাজন ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল ও তাহাদের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইল বিদেশী বণিক ও বিদেশীয় শিল্প প্রণালী।

দেশের নানাস্থানে তখন চিনি-প্রস্তুতের বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল এবং বাংলায় অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইক্ষুর চাষ হইত। কিন্তু বাংলায় চিনি-প্রস্তুতের খরচ অপেক্ষাকৃত বেশী পড়িত বলিয়া দেশী চিনির কারবার বাংলা অঞ্চলে সবিশেষ বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই

১৮৩০-৩৫ খৃষ্টাব্দে নীলের চাষ ও নীলের কারবারে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাংলার, বহু লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, এবং সহস্রাধিক ইংরাজ ব্যবসায়ী ঢাকা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানে নীলের কুঠীর পরিচালনা-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। এই সকল বিদেশী বণিক সচরাচর এদেশেরই টাকায় কারবার চালাইতেন এবং প্রভূত লাভবান হইতেন। এক বাংলাদেশেই ন্যূন চারিশত নীলকুঠি ছিল ও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে পর কয়েক বৎসর গড়ে ১,২৫,০০০ মণ 'নীল' ভারতের বাহিরে রপ্তানি হইত!

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিল্পের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের কাফি ও লৌহ, বর্দ্ধমানের কয়লারখনি, ও উত্তর ভারতের তামাক, গালা, লবণ ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

আর্থিক প্রসঙ্গ

আমদানী বস্ত্র-শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি—

বিগত কয়েক মাস হইতে জাপানী মুদ্রা 'ইয়েন' এর মূল্য হ্রাসের দরুণ ভারতে আমদানী জাপানী বস্ত্রের মূল্য অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।—ফলে যে অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়, তাহাতে দেশীয় কটন মিলগুলির অবস্থা আশঙ্কা জনক হইয়া পড়ে, এবং তাহারা গভর্ণমেন্টএর নিকট আমদানী বস্ত্রের উপর ধার্য্য বর্ত্তমান সংরক্ষণ-মূলক শুল্কের হার যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া দিবার জন্য দাবী করিতে থাকিলে গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার ভার ট্যারিফ্ বোর্ডের উপর ন্যস্ত করেন। 'উপাসনার' ভাদ্র সংখ্যায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার পর টারিফ বোর্ড যথারীতি অনুসন্ধান গবেষণা করিয়া তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট বিগত ৩০শে আগষ্ট তারিখে বর্ত্তমান শুল্কের হার বাড়াইয়া দিয়া এক ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন। ইহাতে ভারতীয় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের অষ্টম আইনের ৩ ধারায় শুল্ক নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা আছে, সেই অনুসারে ইংলণ্ড বাদে অন্যান্য সকল দেশ হইতেই ভারতে আমদানী কোরা বস্ত্রের উপর মূল্যানুসারে শতকরা ৫০৲ বা প্রতি পাউণ্ড ওজনের উপর ।৵৫ যাহাই অতিরিক্ত প্রতিপন্ন হইবে, সেই অনুসারে শুল্ক নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'কোরা' ব্যতীত অন্যান্য প্রকার বস্ত্রের উপর কেবল মূল্যানুসারে শতকরা ৫০৲ হারে শুল্ক বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যবস্থা হইয়াছে যে, উক্ত শুল্ক-বৃদ্ধি অচিরাৎ কার্য্যকরী হইবে এবং ইহা আগামী বৎসরের ৩১শে মার্চ্চ অবধি প্রবল থাকিবে।

বর্ত্তমান শুল্ক বৃদ্ধির তাৎপর্য্য এই: ইতিপূর্ব্বে কোরা-কাপড়ের উপর নির্দ্ধারিত সংরক্ষণ-মূলক শুল্কের পরিমাণ মূল্য হিসাবে ২০৲ বা ওজন হিসাবে প্রতিপাউণ্ডে ৵১০ ছিল। এই স্থূল সংরক্ষণ শুল্কের অতিরিক্ত আরও শুল্ক এই প্রকার আমদানী বস্ত্রের উপর ধার্য্য ছিল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ভারত সরকারের রাজস্বের আদায় বাড়াইবার জন্য এই প্রকার বস্ত্রের উপর শতকরা ৫৲ হিসাবে অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করা হয়। তৎপর বিগত বৎসরের অসাধারণ বজেট অধিবেশনে সকল প্রকার সংরক্ষণ বা রাজস্বের আদায় নীতি-মূলক শুল্কের ২৫% হারে বৃদ্ধি করিয়া দিবার ফলে বস্তুতঃ আমদানী কোরা-কাপড়ের উপর কার্য্যকরী শুল্কের পরিমাণ ছিল বস্ত্রের মূল্যের উপর শতকরা ৩১।০। 'কোরা' বাদ দিয়া অন্যান্য প্রকার বস্ত্রের উপর মূল্যানুসারে শতকরা ২৫৲ শুল্ক প্রবল ছিল। গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান ইস্তাহারে এই সকল শুল্কের পরিমাণ বাড়াইয়া শতকরা ৫০৲ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।—অর্থাৎ কোরা কাপড়ের আমদানীর উপর ধার্য্য আমদানী শুল্কের পরিমাণ শতকরা ১৮৸০ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের অষ্টম আইন অনুসারে এই ব্যবস্থা করিবার ফলে এই শুল্ক বৃদ্ধি কেবল জাপান নহে, ইংলণ্ড ব্যতীত অন্য যে কোন দেশ হইতে আমদানী বস্ত্রের উপর প্রযোজ্য হইবে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জাপানের সহিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যে ব্যবসা-সন্ধি করা হইয়াছিল, তাহাতে কেবলমাত্র জাপানের বিরুদ্ধে পক্ষপাত-মূলক শুল্ক বৃদ্ধি করিলে উক্ত সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ হইবে বলিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের আইনের আশ্রয় লইয়া পরোক্ষ ভাবে জাপানী বস্ত্রের প্রতিযোগিতা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত আইনে এই ব্যবস্থা ছিল যে, বর্ত্তমান সংরক্ষণ-মূলক শুল্কগুলি যদি কোন সময় বিদেশী মুদ্রার অস্বাভাবিক মূল্য-হ্রাসের ফলে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্পের যথেষ্ট সহায়তা করিবার জন্য এই উদ্দেশ্যে কোন পৃথক আইন পাশ না করিয়া স্বীয় কর্ত্তৃত্বে প্রয়োজন অনুযায়ী এক ইংলণ্ড বাদে অপর সকল দেশ হইতেই আমদানী বস্ত্রের উপর নির্দ্ধারিত শুল্ক বাড়াইয়া দিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য যে, এই আইনের প্রয়োগ ব্যাপক হইলেও ইহার সহায়তায় গভর্ণমেণ্ট যে ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ভারতীয় বাণিজ্যের অবস্থা বিশেষে ইহা কার্য্যতঃ কেবলমাত্র জাপানী বস্ত্রের আমদানীর উপরই প্রযোজ্য হইবে।—কারণ ইংলণ্ড বাদে এক জাপান হইতেই ভারতে প্রতি বৎসর বিপুল পরিমাণে বস্ত্র আমদানী হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন এই: গভর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থা ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের কতদূর সহায়তা করিবে? এ বিষয়ে আমরা খুব আশ্বস্ত বোধ করিতে পারিতেছি না। ট্যারিফবোর্ড একমাস পূর্ব্বে যে সাময়িক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শুল্ক বৃদ্ধির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তখন 'ইয়েন' এবং টাকার পরস্পর বিনিময়-সম্বন্ধ ছিল প্রতি একশত ইয়েনে ১০৬৲। এই বিনিময় সম্বন্ধের অনুপাতেই তাঁহারা বর্ত্তমান শুল্কের উপর শতকরা ১৮৸০ অতিরিক্ত শুল্ক নির্দ্ধারণের প্রস্তাব করিয়াছেন, এবং তাহাই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু তাহার পর এ যাবৎ 'ইয়েন' এর ক্রমাগত আরও মূল্য হ্রাস ঘটিতেছে এবং বর্ত্তমানে 'ইয়েন' এবং টাকার বিনিময় সম্বন্ধ প্রতি একশত ইয়েনে মাত্র ৮৬৲ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—অর্থাৎ ট্যারিফ বোর্ড যে বিনিময়-সম্বন্ধের উপর লক্ষ্য রাখিয়া অতিরিক্ত শুল্কের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহার পর ইয়েনের মূল্য ২০% হারে হ্রাস পাইয়াছে। শতকরা ১৮৸০ শুল্ক-বৃদ্ধি শতকরা ২০৲ মূল্য-হ্রাসের প্রতিযোগিতা নিরোধ করিবে কি করিয়া? এই শুল্ক-বৃদ্ধি যাহাতে দেশীয় কটন-মিলগুলির পক্ষে প্রকৃতই বিদেশী প্রতিযোগিতা নিরোধক হইতে পারে, সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া ইহার পরিমাণ যথেষ্ট বাড়াইয়া না দিলে এরূপ সন্দেহের যথেষ্ট কারণ থাকিবে যে, বর্ত্তমান শুল্ক-বৃদ্ধির প্রস্তাব ভারতীয় কটন-মিলগুলির স্বার্থের দ্বারাই প্রণোদিত হয় নাই; ইংলণ্ডের বস্ত্র-শিল্পকে জাপানের বিরুদ্ধে পক্ষপাত-মূলক সুবিধা দিবার উদ্দেশ্যই ইহার মুখ্য কারণ,—ভারতীয় কটন-মিলের স্বার্থ-সংরক্ষণ ইহার গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের সংরক্ষণের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কোন বিশেষ আইন পাশ করিয়াও যাহাতে জাপানী তথা অপর কোন দেশের মুদ্রার ক্রমাগত মূল্য-হ্রাসের দরুণ প্রতিযোগিতার সঙ্কট নিরোধ করা যাইতে পারে,—সেজন্য গভর্ণমেণ্টকে ক্রমাগত শুল্ক-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিতে হইবে,—নতুবা অতিরিক্ত শুল্ক কার্য্যকরী হইবে না। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিতে হয়। ইয়েনের মূল্য-হ্রাসের বিপর্য্যয় যে কোন ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের ক্ষতি সাধন করিতেছে, এমন নয়। ইহা সমভাবেই ভারতীয় কাঁচ, মৃৎপাত্র প্রভৃতি শিল্পকেও আক্রমণ করিয়াছে। এমন কি, বস্ত্রের উপর অতিরিক্ত শুল্ক নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট ইহারই অনুরূপ জাপানী প্রতিযোগিতায় বিধ্বস্ত গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য কোন উদ্যোগ করেন নাই। ইয়েনের মূল্য-হ্রাসের দরুণ যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে,—তাহাতে ইহার সমাধান যে ব্যাপক ভাবেই করিতে হইবে, যে সম্বন্ধে বিস্তারিত যুক্তি অনাবশ্যক।

ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য-চুক্তির প্রস্তাব----

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে পক্ষপাত-মূলক বাণিজ্য-নীতি প্রচলনের প্রচেষ্টায় অটোয়া সহরে এই সকল দেশের প্রতিনিধি-বর্গের যে সভা আহুত হইয়াছিল, তাহার অধিবেশন বিগত ২০শে আগষ্ট তারিখে সমাপ্ত হইয়াছে। ভারতবাসী ইহাতে তাহাদের কোন স্বার্থ সিদ্ধ হইবে না বলিয়া চিরকালই এই প্রকার ব্যবসা-নীতির বিরুদ্ধ-বাদ করিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান বৈঠক সম্বন্ধেও তাহারা এই প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছে যে, ইহাতে ভারতবর্ষের পক্ষে কোন লাভ হইবে না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের নিকট হইতে ইংলণ্ড তাহার ষোল আনা সুবিধা আদায় করিয়া লইবে। বস্তুতঃ উক্ত বৈঠকে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে, এই আশঙ্কাই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিতে হয়। তাহার অন্যতম প্রমাণ এই যে, ইংলণ্ড বাদে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ডোমিনিয়ন এবং ভারতবর্ষের পরস্পর ব্যবসা-সম্বন্ধ কি হইবে তাহা বিচার করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত সময় এই বৈঠকের হয় নাই। কেবলমাত্র ইংলণ্ডের সহিত বিভিন্ন 'ডোমিনিয়ন', 'কলোনি' এবং ভারতবর্ষের ব্যবসা-সম্বন্ধ কি হইবে, তাহা স্থির করিতেই এই বৈঠকের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের সহিত ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ যে পক্ষপাত-মূলক বাণিজ্য-সর্ত্তে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিবার জন্য নিম্নে তাহার সারাংশ বিবৃত করা যাইতেছে।

এই সর্ত্ত অনুসারে ইংলণ্ডের আমদানী বাণিজ্যে ভারতবর্ষ উল্লিখিত সুবিধাগুলি লাভ করিবে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে কতকগুলি কাঁচামাল এবং খাদ্য সামগ্রী বাদে অন্যসকল প্রকার আমদানী জিনিষের উপর সরাসরি ১০% হারে শুল্ক-নির্দ্ধারণ

করিয়া যে আইন পাশ হইয়াছিল, অটোয়া বৈঠকের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় এ যাবৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশ-গুলির উপর এই আইনের ব্যবস্থা প্রয়োগ স্থগিত রাখা হইয়াছিল। আলোচ্য সর্ত্তানুসারে স্থির হইয়াছে যে, এই শুল্কের দায় হইতে ভারতীয় রপ্তানীমাল স্থায়ীভাবে রেহাই পাইবে।—অর্থাৎ ইংলণ্ডের আমদানী-বাণিজ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভুক্ত অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ শুল্কের দায় সম্বন্ধে শতকরা ১০% হারে পক্ষপাত-মূলক সুবিধা লাভ করিবে। যে সকল জিনিষের উপর ইংলণ্ডের রাজস্ব-আদায়ের স্বার্থে শুল্ক রেহাই দেওয়া সমীচীন বিবেচিত হইবে না, সে সম্বন্ধেও যাহাতে ভারতবর্ষ উক্তপ্রকার তুলনা-মূলক সুবিধা লাভ করিতে সমর্থ হয়, সে জন্য অন্যান্য বিদেশী মালের উপর বর্ত্তমান ধার্য্য শুল্কের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থায় যে যে জিনিষ বাবদ ভারতবর্ষের সুবিধা হইবে তাহার নিম্ন-প্রকার ফিরিস্তি দেওয়া হইয়াছে : যথা—কার্পাসবস্ত্র, কাঁচা বা পাকা চামড়া, বীজ তৈল, খইল, চালের গুঁড়া, বাদাম, কফি, তামাক, চা, মশলা, ক্যাষ্টর বীজ, কাঠ, শিশা, ম্যাগ্নেসাইট, ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড, ইত্যাদি। ভারতীয় পিগ্-আয়রণ (লৌহ) বা অৰ্দ্ধ-নির্ম্মাণ সমাপ্ত ইস্পাতও এই প্রকার সুবিধা পাইবে কি না, তাহা বিচার-সাপেক্ষ করিয়া রাখা হইয়াছে। তা' ছাড়া বার্লি, মটর ও অন্যান্য ডাল, মাটির সার, ছাগ-চর্ম্ম, এ্যাস্বেষ্টস্ প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষ সম্বন্ধেও ভারতবর্ষ সুবিধা পাইবে কিনা, তাহাও ইংলণ্ডের সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশের সহিত কি সর্ত্ত স্থির হয়, সে সম্বন্ধে আপেক্ষিক করিয়া রাখা হইয়াছে। ভারতীয় তুলা রপ্তানিকেও কোন প্রকার পক্ষপাত-মূলক সুযোগ দেওয়া বিষয়ে সর্ত্তে কোন প্রতিশ্রুতি নাই। এ বিষয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের কটন-মিলওয়ালাদের সমধিক পরিমাণে ভারতীয় তুলা ব্যবহার করিবার জন্য উৎসাহিত করিবেন, এরূপ আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

ইহার পরিবর্ত্তে ইংলণ্ড ভারতীয় আমদানী-বাণিজ্যে যে পক্ষপাতমূলক সুবিধা লাভ করিবে, তাহার পরিচয় নিম্নরূপ :—ইংলণ্ড হইতে আমদানী বিষয়ে শুল্ক বাবদ উক্ত দেশকে মোটর-যানে শতকরা ৭।।০ ও সর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য জিনিষে শতকরা ১০্ সুবিধা দেওয়া হইবে। এই প্রকার সুবিধার জন্য দ্রব্যবিশেষে বিলাতী মালের উপর শুল্ক রেহাই বা অন্যান্য দেশ হইতে আমদানী তুল্য মালের উপর বর্ত্তমান ধার্য্য শুল্কের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।—কিংবা প্রয়োজনমত এই দুই পদ্ধতির যোগাযোগেও উক্ত প্রকার সুবিধা দিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থায় ইংলণ্ড ভারতবর্ষে নিম্ন-লিখিত মালগুলি রপ্তানি করিবার পক্ষে বৈষম্য-মূলক সুবিধা লাভ করিবে, যথা :—গৃহনির্ম্মাণের মাল-মসলা, ঔষধাদি রাসায়নিক পদার্থ; চিনামাটির পাত্র; কাষ্ঠনির্ম্মিত আসবাব-পত্র; লোহা-লক্কড়; যন্ত্রপাতি; বিদ্যুৎ-সরবরাহ, বাদ্য, ফটোগ্রাফি ও অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম; চামড়া নির্ম্মিত দ্রব্যাদি; এলুমিনিয়াম, তাম্র, শিশা, জার্ম্মান সিলভার, কাঁসা প্রভৃতি ধাতু, রং ও আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি, কাগজ প্রভৃতি অফিস ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য-সামগ্রী; রবার নির্ম্মিত টায়ার এবং মোটর ব্যতীত অন্যান্য যান-বাহন।

এই প্রকার দ্রব্য-নির্ব্বাচন বিষয়ে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে সকল শিল্পের সহায়তা করিবার জন্য সংরক্ষণ-মূলক শুল্ক ধার্য্য আছে, সেই সকল শিল্প যে মাল উৎপন্ন করিয়া থাকে, তাহার আমদানী বিষয়ে ইংলণ্ডকে পক্ষপাত-মূলক সুবিধা দেওয়া হইবে না। তা' ছাড়া বর্ত্তমানে প্রয়োজন বোধে যে সকল জিনিষের উপর সম্পূর্ণ শুল্ক রেহাই দেওয়া আছে বা জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য খুব অল্প হারে শুল্ক ধার্য্য আছে, সে সম্বন্ধেও উক্ত প্রকার কোন ব্যবস্থা করা হইবে না। এই সকল বাদ দিয়া পূর্ব্বে যে সকল প্রধান প্রধান আমদানী মালের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া আরও বিবিধ সামগ্রীর আমদানীতেও ইংলণ্ড শুল্ক বাবদ ১০% সুবিধা লাভ করিবে। এই প্রকার কতকগুলি জিনিষের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা :—এ্যাস্বেষ্টসের তৈয়ারী মাল, জুতো, বুরুস, ধাতুনির্ম্মিত বোতাম, দড়ি, কাঁটা-চামচ, আঁটা, কৃত্রিম চামড়া, ধূমপানের আসবাব, গায়ে মাখিবার সাবান, খেলনা, ক্রীড়া-সরঞ্জাম, ছাতা ও ছাতা নির্ম্মাণের সরঞ্জাম, অয়েলক্লথ, সুগন্ধি, নিকৃষ্ট মদ এবং বিয়ার, কোকো এবং চোকোলেট, টিনে সংরক্ষিত মাছ, সংরক্ষিত ফল, জমাট দুধ, রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত তৈল, যন্ত্রাদিতে ব্যবহার করিবার এবং রং গলাইবার তৈল, ইত্যাদি।

লৌহ এবং ইস্পাত বা এই সকল ধাতুনির্ম্মিত যন্ত্রাদির আমদানী বিষয়ে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে এই পর্য্যায়ভুক্ত যে সকল জিনিষের উপর সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য্য আছে বা ভারতীয় শিল্প বা কৃষির হিতকল্পে যে সকল জিনিষের উপর সম্পূর্ণ আমদানী শুল্ক রেহাই দেওয়া আছে কিংবা অস্থায়ীরূপে মাত্র ১০% হারে শুল্ক নির্দ্ধারিত আছে তাহা বাদে, আর সকল প্রকার লৌহ বা ইস্পাতনির্ম্মিত যন্ত্রপাতি বিষয়ে ইংলণ্ড বৈষম্য-মূলক সুবিধা ভোগ করিবে। বস্ত্র-আমদানীবিষয়ে পোষাক-পরিচ্ছদ টুপি ইত্যাদি জিনিষ, কৃত্রিম রেশম এবং রেশম নির্ম্মিত দ্রব্যাদি বিষয়ে ইংলণ্ডকে প্রস্তাবিত ১০% হারে পক্ষপাত-মূলক সুবিধা দিবার সর্ত্ত করা হইয়াছে।

সর্ত্তের স্থিতিকাল সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, ইংলণ্ড বা ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্টের মধ্যে যে কোন পক্ষ ছয় মাসের নোটিশ দিয়া সর্ত্তের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। অবস্থানুসারে ইহার মধ্যে শুল্কনিয়ন্ত্রণের তারতম্য করিতে হইলে প্রথমে একপক্ষ অপর পক্ষকে ইহার প্রয়োজন জ্ঞাপন করিবে এবং তাহার মতামত গ্রহণ করিবে। যদি এ বিষয়ে ছয় মাসের মধ্যেও উভয় পক্ষের মতে ঐক্য না ঘটে, তবে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে নোটিশ দিয়া ছয় মাস পরে প্রস্তাবিত শুল্ক পরিবর্ত্তন কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিতে পারিবে

আলোচ্য সর্ত্তানুসারে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের আমদানী-বাণিজ্যে যথেষ্ট লাভবান হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে ভারতবর্ষকে যে সুবিধা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা অনেকাংশেই অলীক বা অবাস্তর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। পাট, লাক্ষা প্রভৃতি জিনিষে ভারতবর্ষের এরূপ একচেটিয়া দখল আছে যে, এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে ইংলণ্ডের নিকট হইতে কোন পক্ষপাত-মূলক সুবিধা প্রত্যাশা করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই মনে করিতে হইবে। বস্তুতঃ যে কয়েকটি প্রধান সামগ্রীর আমদানী বিষয়ে ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে তুলনা-মূলক সুবিধা দিতে পারিত, সে সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত মীমাংসাই এই সর্ত্তে করা হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'পিগ আয়রণ' (লৌহ) এবং তুলার কথা বলা যাইতে পারে। বস্ত্র-আমদানী বিষয়ে ভারতবর্ষ ইতিপূর্ব্বেই ইংলণ্ডকে পক্ষপাত-মূলক সুবিধা দিবার ফলে ভারতীয় তুলার প্রধান খরিদ্দার জাপান এরূপ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে যে, অতঃপর জাপানে ভারতীয় তুলা বিক্রয়ের পরিমাণ ক্রমশঃই কমিয়া যাইবার বিশেষ আশঙ্কা রহিয়াছে। এমতাবস্থায় অটোয়া বৈঠকে ইংলণ্ডকে আরও ব্যাপকভাবে পক্ষপাত-মূলক সুবিধা দিবার জন্য যে সর্ত্ত করা হইয়াছে, তাহাতে বিলাতী-বাজারে ভারতীয় তুলার কাটতি বাড়াইবার জন্য প্রস্তাবিত ১০% হারে শুল্কের সুবিধা দেওয়া অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচনা করা উচিৎ ছিল। কিন্তু তাহাতে বিলাতী কটনমিলগুলির অসুবিধা সৃষ্টি হইবে বলিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কেবল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া ও ভবিষ্যতে ইহার জন্য প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিবেন এরূপ ভরসা দিয়াই তাঁহাদের দায়ীত্ব শেষ করিয়াছেন। 'পিগ আয়রণ'এর উপর শুল্ক-নির্দ্ধারণ বিষয়েও ভারতীয় মাল বিলাতী বাজারে কোনরূপ সুবিধা পাইবে কি না,—তাহা যেরূপ আপেক্ষিক ব্যাপার করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতে অটোয়া বৈঠকের সর্ত্তে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের স্বার্থে সমন্বয় রক্ষা করা হইয়াছে,—এ কথা বলা চলে না। বস্তুতঃ উক্ত সর্ত্তে স্বার্থ-সমন্বয়ের যে যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে সে সম্বন্ধে ব্যবসা-ধুরন্ধর মিঃ জি, ডি, বিরলা এ বিষয়ে তাঁহার অভিমত জ্ঞাপন করিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। মিঃ বিরলা বলিয়াছেন যে, পাট, লাক্ষা প্রভৃতি ভারতবর্ষের একচেটিয়া জিনিষ এবং সেই সঙ্গে চা (যাহার উৎপাদনে মুখ্যতঃ ইংরেজ অংশীদারবর্গই লাভবান হইয়া থাকে) বাদ দিলে প্রকৃতপক্ষে যে সকল জিনিষ অটোয়ার সর্ত্তানুসারে ইংলণ্ডে রপ্তানী করিবার জন্য ভারতবর্ষ পক্ষপাত-মূলক সুবিধা পাইবে,—তাহার সমষ্টিমূল্যের পরিমাণ ১৪ কোটি টাকার খুব বেশী নহে। ইহার পরিবর্ত্তে ইংলণ্ড ভারতীয় বাজারে যে মাল বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ সুবিধা পাইবে, তাহার মূল্য প্রায় ৩৫ কোটি টাকা হইবে।

আলোচ্য সর্ত্তের অন্যায়ের ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই সর্ত্ত কার্য্যকরী হইবে কি না, তাহা ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের সম্মতির উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে সম্মতি দিবার পূর্ব্বে আমরা যে সকল সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়াছি, ব্যবস্থা-পরিষদকে তাহার যথাযথ সমাধান করিয়া দেশবাসীর স্বার্থ এবং আস্থা দুইই রক্ষা করিতে হইবে।

বাংলার কুটীর-শিল্প

—শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস

ভারতে শিল্পের প্রসার—

শিল্পোন্নতির ব্যাপারে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে যে কত পিছনে পড়িয়া আছে, এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশে এই বিষয়ে যে কত কম উন্নতি হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। মানুষের জীবনে যে সমস্ত জিনিষ নিতান্ত প্রয়োজনীয় আমাদিগকে এখনও তাহার জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল জিনিষ তৈয়ারী করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ কাঁচা মাল আমাদের দেশে রহিয়াছে এবং লোক-বলেরও অভাব নাই। ভারতে তথা বাংলাদেশে কৃষিজাত বাণিজ্য দ্রব্যের পরিমাণ নেহাৎ কম নহে এবং দেশে যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পপ্রতিষ্ঠান না থাকার দরুণ এই সকল কাঁচামাল আমাদিগকে বিদেশে রপ্তানী করিয়া তাহার বিনিময়ে তৈয়ারী মাল কিনিয়া আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় অভাব মিটাইতে হয়। অপর পক্ষে চাষের আয়ের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, অথচ কৃষিকার্য্যে বিরত লোকের সংখ্যাও আমাদের দেশে নেহাৎ কম নহে। কিন্তু পুরাতন সংস্কারে আচ্ছন্ন এই সকল লোকের অধিক মাত্রায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মজুর হিসাবে খাটিতে অনিচ্ছা, ভদ্র মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্যম ও সাহসের অভাব, শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অভাব এবং বিদেশী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা প্রভৃতি কারণে এই পর্য্যন্ত আমাদের দেশে আশানুরূপ শিল্পোন্নতি হয় নাই। তবে সুখের বিষয় যে সম্প্রতি আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দের এবং গভর্ণমেন্টের মনোযোগ এই বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে আমাদের দেশে শিল্পের প্রসার অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতেই হইবে।

কুটীর-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা—

কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অদূরভবিষ্যতে যে যন্ত্র-শিল্পের ব্যাপারে আমরা খুব বেশী উন্নতি করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা খুবই কম। যে সকল অবস্থা সংযোজনার উপর শিল্প-প্রসার নির্ভর করে, একদিনেই তাহা সংঘটিত হইবার আশা করা যায় না এবং এই কারণে আমাদিগকে এখনও দীর্ঘকাল বিদেশ হইতে বহুপরিমাণে তৈয়ারী মাল আমদানী করিয়া আমাদের অভাব মিটাইতে হইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা বলা যায় যে যদি আমরা আমাদের দেশে কুটীর-শিল্পের উন্নতির দিকে মন দেই, তাহা হইলে অন্ততঃ কতকপরিমাণে আমরা স্বাবলম্বী হইতে পারিব। কুটীর-শিল্প এবং যন্ত্রশিল্পের আপেক্ষিক সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে; কিন্তু সেই সকল যুক্তি-তর্কের অবতারণা না করিয়াও এবং অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় শেষ পর্য্যন্ত কুটীর-শিল্প টিঁকিতে পারিবে না, ইহা স্বীকার করিয়াও নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই কুটীর-শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিবার পক্ষে যন্ত্র-শিল্পের খুব বেশী সুবিধা করিবার উপায় নাই। যে সকল বিদেশে আমাদের দেশের অপেক্ষা শিল্পের প্রসার অনেক বেশী হইয়াছে, এবং যে সকল দেশে আমরা আমাদের কাঁচামাল রপ্তানী করিয়া তাহাদের প্রস্তুত তৈয়ারী মাল আমদানী করি, সেই সকল দেশেও বর্ত্তমান সময়ে কুটীর-শিল্পের বহুল প্রচলন রহিয়াছে। তাহার কারণ এই যে এমন অনেক জিনিস আছে যাহার চাহিদার পরিমাণ এত কম যে যন্ত্র-শিল্পের সাহায্যে তাহা তৈয়ার করিলে তাহা বহু ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে; এমনও অনেক জিনিষ আছে যাহাতে এত সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্য থাকে যাহা যন্ত্রশিল্পে করা সম্ভব নহে। কাজেই আমাদের দেশেও যে কুটীর-শিল্পের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ কোনও নাই।

কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের দেশে কুটীর-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অন্য কারণেও ঘটিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের দেশে জমির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা খুবই বেশী; ইহার ফলে কৃষিজীবিদের গড়পড়তা আয়ের পরিমাণও যে খুব কম হইয়া পড়ে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটী হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে বাংলার চাষীদের জনপ্রতি বাৎসরিক আয়

গড়ে মাত্র ৮৪৲ টাকা ; তাঁহারা ইহাও দেখাইয়াছেন যে খুব কম করিয়া ধরিলেও তাঁহাদের বাৎসরিক ব্যয় গড়ে ৮৪৲ টাকায় বেশী দাঁড়ায় না। এই খরচের হিসাবে, তাহাদের গড়পড়তা ৩১৲ দেনার আসল কিম্বা সুদ বাদে দেয় টাকার পরিমাণ ধরা হয় নাই। কমপক্ষে শতকরা ১৮৲ টাকা সুদ যদি ধরা যায় তাহা হইলে কেবলমাত্র সুদ বাবদ তাহাদের দেয় টাকার পরিমাণ প্রায় ৬৲ টাকা হয়। অর্থাৎ ৮৪৲ টাকা আয় ধরিয়া লইলে প্রতিবৎসর চাষীদের হিসাবে জন-প্রতি গড়ে ৬৲ টাকা ঘাটতি পড়ে, এবং যদি ধরিয়াও নেওয়া যায় যে তাহারা প্রতি বৎসর ৬৲ টাকা করিয়া ধার করিয়াই চলিবে, তাহা হইলেও যে তাহারা খুব বেশী স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করিতে পারিবে, তাহাও নহে ; কারণ ইহা সহজেই বুঝা যায় যে বাৎসরিক ৮৪৲ টাকায় একজন লোকের পক্ষে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করা খুবই কষ্টসাধ্য। ব্যাঙ্কিং কমিটীও এই খরচের যে ফর্দ্দ দিয়াছেন তাহা হইতেও ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাহা ছাড়া বন্যা, অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি উপদ্রব ত বাংলার চাষীর নিত্য সহচর।

কৃষির উন্নতি করিতে পারিলে যে এই বিষয়ে চাষীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অবসর সময়ে যাহাতে তাহারা অতিরিক্ত কিছু রোজগার করিয়া তাহাদের আয় বাড়াইতে পারে, তাহার জন্যও চেষ্টা করা দরকার। অনেক চাষীই তাহাদের নিয়মিত কৃষিকার্য্য করিয়াও অনেক অবসর পায়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাহারা তাহাদের এই অবসরের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতে পারে না।

বাংলায় কুটীর-শিল্পের প্রগতি

অবশ্য বাংলাদেশে চাষীরা বরাবরই কুটীর-শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে, এবং সেই হিসাবে তাহারা যে কতক পরিমাণে অতিরিক্ত রোজগার করে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। ঢাকা, শান্তিপুর, টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানের তাঁতের কাপড়, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি স্থানের পিতল কাঁসার বাসন, মুর্শিদাবাদের রেশমের কাপড়, কৃষ্ণনগরের পুতুল ইত্যাদির কথা সকলেই জানেন। বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক জেলা এবং মহকুমাতে নানা প্রকারের কুটীর-শিল্পজাত জিনিষপত্র তৈয়ারী হয়, এবং অন্ততঃ সেই পরিমাণে আমরা এই সকল জিনিষ সম্বন্ধে বিদেশের আমদানী-নিরপেক্ষ হইতে পারিয়াছি। কিন্তু কতকগুলি কারণে আমাদের কুটীর-শিল্পেও আমরা বৈদেশিক প্রতিযোগিতার ফলে হটিয়া যাইতেছি। যাহাতে পুনরায় আমরা এই বিষয়ে আমাদের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া পাইতে পারি, সে দিকে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি দেওয়ার সময় আসিয়াছে।

কুটীর-শিল্পের অবনতির কারণ—

এই স্থলে কি কি কারণে আমাদের দেশের কুটীর-শিল্পের এই অবনতি ঘটিয়াছে তাহার আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় টাকার অভাবের কথা বাদ দিলে দেখা যায় যে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্যই আমাদের দেশে কুটীর-শিল্প আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

১। সস্তা দরের চাকচিক্যময় অথচ অপেক্ষাকৃত বাজে বিদেশী জিনিসের সহিত প্রতিযোগিতা।

২। দুনিয়ার হাল-ফ্যাশানের সহিত যোগাযোগের অভাব এবং প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রস্তুত কুটীর-শিল্পজাত জিনিসপত্রের প্রতি সাধারণ লোকের বিরূপ ভাব।

৩। সস্তায় তৈয়ারী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অপেক্ষাকৃত মূল্যবান যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করা এবং উন্নত প্রণালীতে জিনিসপত্র তৈয়ারী করিবার জন্য উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব।

৪। তৈয়ারী জিনিস বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবসায় বুদ্ধির অভাব এবং সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বিক্রয় করিবার চেষ্টা না করা ইত্যাদি।

গুরুত্ব হিসাবে এই চারিটী কারণের কোনওটীও অন্যটী অপেক্ষা কম নহে, এবং ভবিষ্যতে কুটীর-শিল্পের উন্নতিকল্পে এই সকল বিষয়েই বিশেষ আলোচনা করা দরকার। বিদেশে আজকাল চাকচিক্যময় কিম্বা অন্যপ্রকার সুবিধাজনক নানা-প্রকার জিনিস এত সস্তায় তৈয়ারী হইতেছে, এবং আমাদের দেশে আমদানী হইয়া তাহা এত সস্তায় বিকাইতেছে যে, এইগুলি বেশীদিন স্থায়ী হইবে না ইহা জানা সত্বেও লোকে দেশী জিনিস ফেলিয়া এই সকল জিনিষ কিনিতে আরম্ভ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ পিতল কাঁসার বাসনের সহিত বিদেশী এলুমিনিয়মের বাসনের প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করা যায়।

অনেক সময় দেখা যে সাধারণ লোক এবং রাজা মহারাজা প্রভৃতি যাঁহারা পূর্ব্বে কুটীর-শিল্প-জাত নানা প্রকার জিনিষের সমাদর করিতেন, ফ্যাসানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এই সকল জিনিষ ত্যাগ করিয়া নূতন ধরণের বিদেশী জিনিষ কিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রেশম শিল্পের দুর্গতির অন্যতম কারণ ইহাই।

. তৃতীয় কারণের দৃষ্টান্তস্বরূপ কার্পেট বয়নের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা ছাড়াও অনেক জিনিষ আছে যাহার তৈয়ারী ব্যাপারে কারিকরেরা উন্নত প্রণালী ব্যবহার করিলে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে সস্তায় সুন্দর জিনিষ তৈয়ারী করিতে পারিত।

কুটীর-শিল্পজাত অনেক জিনিষ অনেক সময় বিদেশী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় যে পারে না, উপরোক্ত কারণ-গুলি ছাড়া ও তাহার অন্য কারণ আছে। তৈয়ারী জিনিষ বাজারে বিক্রয় করিবার মত ব্যবসায়-বুদ্ধি অনেক কারি-করেরই নাই, এবং বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ইহাদের কোনও বিক্রয়সঙ্ঘ (marketing organisation) না থাকাতে অনেক সময় অনেক ভাল জিনিষ বাজারে চলতি হয় না।

প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য—

এই সকল কারণে আমাদের দেশে সম্প্রতি কুটীরশিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সকলের অপেক্ষা যাহা বড় কারণ, তাহা হইতেছে এই যে, কারিকরেরা তাহাদের কাজ চালাইবার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই সুবিধাজনক সর্ত্তে এবং অল্পসুদে টাকা ধার পায় না। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য সকল কাজের জন্যই টাকা ধার করার দরকার হয়, এবং কারিকরেরাও তাহাদের কাজ চালাইবার জন্য নিজেদের স্বল্প-পুঁজির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। কাঁচামাল খরিদ করা, তাহা হইতে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য তৈয়ারী করা, এবং তৈয়ারী হইবার পর হইতে তাহা বিক্রয় করিয়া টাকা পাওয়া পর্য্যন্ত দীর্ঘকালের খরচ চালান, প্রধানতঃ এই সকল উদ্দেশ্যেই কারিকরদের ধার করার প্রয়োজন হয়; কিন্তু বর্ত্তমানে দেশে এই জন্য প্রয়োজনীয় টাকা সরবরাহ করিতে পারে এমন অর্থ-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিতান্ত কম, এবং যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদেরও এমন বিশেষ কিছু সম্পদ নাই, যাহা দ্বারা তাহারা কুটীর শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সকল টাকাই যোগাইতে পারে।

ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক ও কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বর্ত্তমানে এই বিষয়ে কোনও সাহায্যই পাওয়া যায় না। সমবায় শিল্প-সমিতিরও প্রসার যথেষ্ট হয় নাই, কাজেই প্রয়োজনীয় টাকার অতি অল্প অংশই ইহারা সরবরাহ করিতে পারে। এই অবস্থায় কারিকরদিগকে তাহাদের দরকারী টাকার বেশীর ভাগ জোগাড় করিতে হয়। মহাজনদিগের এবং যে সকল ব্যবসায়ীর অধীনে তাহারা কাজ করে তাহাদের নিকট হইতে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই টাকার জন্য অত্যধিক হারে সুদ দিতে হয়; ইহাতেও খুব বেশী অসুবিধা হইত না, যদি না তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল মহাজন ও ব্যবসায়িগণের নিকটই তাহাদের তৈয়ারী মাল বিক্রয় করিতে হইত। সময়মত সুদ দিতে না পারার দরুণ এবং অন্যান্য নানা কারণে অনেক সময়ই তাহারা ইহাদিগের নিকট হইতে তাহাদের জিনিষের উচিত মূল্য পায় না।

পূর্ব্বে কুটীর-শিল্পের অবনতির যে সকল কারণের কথা বলা হইয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপযুক্ত পরিমাণ অর্থবল থাকিলে এই সকল অসুবিধা দূর হইয়া যাওয়া সম্ভব; এবং এক হিসাবে এই অর্থাভাবকেই কুটীর-শিল্পের এই অবনতির মূল কারণ বলা যাইতে পারে। কাজেই যাহাতে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে প্রথমেই সেই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ব্যাপক ভাবে সমবায় শিল্প-সমিতির প্রতিষ্ঠা করা ইহার অন্যতম প্রধান উপায়। বাংলা দেশের লোন আফিস-গুলিও এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য—

এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যও নিতান্ত কম নহে। দেশের মধ্যে অধিক সংখ্যায় সমবায় শিল্প-সমিতির প্রতিষ্ঠা তাঁহাদিগকেই করিতে হইবে, এবং অন্যান্য নানা ভাবে কুটীর-শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। বর্ত্তমানে তাঁহারাও কারিকরদিগকে টাকা ধার দেন বটে, কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় তাহা নিতান্তই কম, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে এই বিষয়ে আরও বেশী উৎসাহ প্রকাশ করিতে হইবে, এবং যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ টাকার অভাবে কুটীর-শিল্পের অবনতি না ঘটে সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে।

কিন্তু কেবলমাত্র টাকা ধার দেওয়াতেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল, এইরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। বর্ত্তমানে দেশের প্রায় কোনও স্থানেই কুটীর-শিল্পে তৈয়ারী মাল মজুত করিয়া রাখিবার খুব বিশেষ সুবিধা নাই। ক'একস্থানে সমবায় সমিতির গোলা এবং আড়ৎ আছে, কিন্তু তাহা সংখ্যায় এত কম যে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। যাহাতে নানা স্থানে গভর্ণমেণ্টের লাইসেন্স-প্রাপ্ত আড়ৎ প্রতিষ্ঠিত হয় যে বিষয়েও গভর্ণমেণ্টকে অগ্রণী হইতে হইবে। এবং এই সকল আড়তে বিক্রয়ের আগে পর্য্যন্ত তৈয়ারী মালগুলি রাখিয়া রসিদ গুলির বিনিময়ে যাহাতে কারিকরেরা টাকা পায় সে ব্যবস্থাও গভর্ণমেণ্টকেই করিতে হইবে।

গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এইরূপ ভাবে দেশের কুটীর-শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা খুব একটা অসাধারণ ব্যাপার নহে। এবং এইভাবে চেষ্টা করার ফলে যে অনেক সময় অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায় অন্য দেশের উদাহরণ হইতে তাহা দেখা যায়। জার্ম্মানীতে কুটীর-শিল্পের উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ফলে সেখানে মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশী নানা প্রকার কুটীর-শিল্পে নিযুক্ত থাকিয়া তাহাদের অবসর সময়ে অতিরিক্ত রোজগার করিবার সুযোগ পাইয়াছে। কিন্তু পুরাতন কুটীর-শিল্পের উন্নতি করিয়াই গভর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত হন নাই; অনেক ক্ষেত্রে একেবারে সম্পূর্ণ নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াও তাঁহারা দেশের অর্থসম্পদ বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ স্বাক্সনীর ঘড়ি-শিল্প এবং ব্যাভেরিয়ার পেনসিল-শিল্পের কথা বলা যায়। য়ুরোপের অন্যান্য দেশেও এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই অবস্থায় আমাদের দেশেও ইহার অন্যথা করিবার কোনও কারণ ঘটে নাই।

বারান্তরে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার কুটীর-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাহার উন্নতি করিবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বীমা-প্রসঙ্গ

বীমায় জুয়াচুরী

হাইকোর্টে দায়রার বিচারে বালী মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট সুরেশচন্দ্র পাল ও কুমার কৃষ্ণ ঘোষ বীমাকোম্পানিকে প্রতারণা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র, জাল দলীল প্রকৃত বলিয়া চালাইবার চেষ্টা প্রভৃতি অভিযোগে যথাক্রমে ৬ বৎসর ও ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় খালাস পাইয়াছেন। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে ঐ তিন ব্যক্তি কলিকাতায় প্রসিদ্ধ National Insurance কোম্পানিতে প্রথমে শৈলেন্দ্রনাথ পাল নামক এক কল্পিত লোকের নামে ৫০০০৲ টাকার একটী বীমা করেন এবং কিছুদিন পর তাহার মৃত্যু প্রমাণ করিয়া তাহার স্ত্রীর নামে দয়খাস্ত করিয়া দাবীর টাকা আদায় করিয়া আত্মসাৎ করেন। এই ব্যাপারে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদ্বয় বহু জাল দলীলের সৃষ্টি করেন এবং বালী মিউনিসিপালিটির মৃত্যু-রেজেষ্ট্রী-বহিতেও উক্ত কল্পিত ব্যক্তির নাম লিখিয়া রাখেন।

এই ব্যাপারে সাহস প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা কুমারকৃষ্ণ ঘোষের নামে উক্ত কোম্পানীর ২০,০০০৲ টাকার এক পলিশি গ্রহণ করেন এবং মাত্র একটী প্রিমিয়াম দিয়াই তাঁহার মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ প্রদান করিয়া মৃতের স্ত্রীর নামে উক্ত টাকা দাবী করেন। এবারেও তাহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জাল দলীলাদির সাহায্যে মৃত্যু প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। কোম্পানীর সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ-তদন্তে প্রতারণা প্রকাশ হওয়ায় উক্তরূপে আসামীদের শাস্তি হইতেছে।

উপরোক্ত ঘটনা হইতে আমরা দেখিতেছি বর্ত্তমানে বীমা কোম্পানীদের সমূহ বিপদ উপস্থিত। বীমা কোম্পানী মৃত্যু প্রমাণ বাবদ যে সমস্ত দলীল অভ্রান্ত বলিয়া নির্ভর করেন তাহা

যদি এইরূপে জাল হওয়া সম্ভব হয় এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট বা সেইরূপ সম্মানজনক কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গকেও যদি বিশ্বাস করিতে না পারা যায় তাহা হইলে বীমা-কোম্পানীগণ কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া দাবী স্বীকার করিবেন তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। অতএব এই সমস্ত প্রমাণ সত্বেও কোন কোম্পানী যদি সন্দেহবশতঃ দাবীর টাকা দিতে ইতস্ততঃ করেন তাহা হইলে চারিদিক হইতে সাধারণে তাহার অখ্যাতি প্রচার করিতে থাকেন। কলিকাতা কিম্বা বোম্বাইএ যে কোম্পানীর হেড-অফিস অবস্থিত তাহার পক্ষে তিনিভেলি কিম্বা ডিব্রুগড়ে মৃত্যুর বিষয় প্রতিনিধি পাঠাইয়া অনুসন্ধানান্তে দাবীর টাকা মিটাইবার চেষ্টা যে কষ্টসাধ্য তাহা কাহাকেও বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। বীমা কোম্পানীর প্রিমিয়ামের হার প্রস্তুত করিতে ধরিয়া লওয়া হয় যে যাঁহাকে পলিশি দেওয়া হইবে তিনি শারীরিক স্বাস্থ্যবান, ইহার মধ্যে প্রতারণামূলক বীমার জন্য কোন margin থাকে না, সুতরাং এইরূপ দাবীর পরিমাণ সামান্য রূপ বৃদ্ধি হইলে বীমা কোম্পানী গুলি ভবিষ্যতে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। যে কোন প্রকারে কার্য্যবৃদ্ধির জন্য যাহাকে তাহাকে এজেণ্ট ও ডাক্তার নিয়োগ করা হয়, এইরূপ প্রতারণামূলক বীমার একটা কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিষয়টী এত গুরুতর যে এ বিষয়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানিগুলি ও Indian Life Offices Association কে আমরা সময় থাকিতে অবহিত হইতে বলি।

বীমার সরকারী রিপোর্ট কোথায় ?

এ বৎসর আজ পর্য্যন্তও Insurance Year Book এর দর্শন নাই। ভারত গবর্ণমেণ্টের এই পুস্তক খানি বীমা ব্যবসায়ীরা Statistics এর জন্য অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করেন ও বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু উহা যদি কোম্পানীগুলির ২ বৎসরের পুরাতন হিসাব বাহির করে তবে উহার প্রয়োজনীয়তা কি ? ভারত সরকারের নূতন Actuary শ্রীযুক্ত মুখার্জ্জী মহাশয়ের আমলে পুস্তক খানির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। মুখার্জ্জী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া পুস্তকখানি সময়মত বাহির করিয়া ইহার উপযোগিতা বৃদ্ধি করিবেন আমরা আশা করিতে পারি কি ?

সম্পাদকের দায়ীত্ব

বর্ত্তমান সংখ্যা Insurance Heraldএ কলিকাতার কোন বড় বীমা কোম্পানীকে (নাম উল্লেখ নাই) লক্ষ্য করিয়া ডিরেক্টরদিগকে অযথা কাজের অজুহাতে অর্থ দিয়া বশীভূত রাখার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অভিযোগ অতিশয় গুরুতর। আমাদের বিশ্বাস কোম্পানীর নাম উল্লেখ না করিয়া এরূপ গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করায়—সম্পাদক মহাশয় সর্ব্বসাধারণকে ভারতীয় বীমা কোম্পানীর পরিচালনা বিষয়ে সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছেন। যদি তাঁহার অভিযোগের ভিত্তি থাকে তবে সাধারণের উপকারার্থে কোম্পানীর নাম ও অভিযোগের বিবরণ ও সে বিষয় কোম্পানীর বক্তব্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

বীমার ক্ষেত্রে শিক্ষিতের প্রসার

এতদিন ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে বীমা বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অভাব ছিল। বর্ত্তমান যুগে প্রথমে শিক্ষিত ভারতবাসীরা বীমাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ক্রমে বীমা-বিষয়ে বিশিষ্ট হইতেছেন ইহা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। বাঙ্গলায় ২।৩টী কোম্পানী হইতে কোন কোন কর্ম্মী সম্প্রতি Chartered Insurance Institute এর পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন। ২।১ জন বিদেশ হইতে বীমা বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াও আসিতেছেন। বীমা বিষয়ক এক খানি পত্রিকায় কোন বীমা-কর্ম্মী এজেণ্টদের শিক্ষার জন্য একটী রীতিমত কলেজ-স্থাপনের প্রস্তাব পর্য্যন্ত উত্থাপন করিয়াছেন। এ সমস্তই ভারতীয় বীমার পক্ষে বিশেষ সুকঠিন বলিতে হইবে। কর্ম্মিদের মধ্যে বীমার বিজ্ঞান-সম্মত সূত্রগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রচার হইলে সাধারণেও এ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাইবে এবং তাহাতে কোম্পানীগুলির কার্য্য-পদ্ধতিও সুপরিচালিত হইবে।

ভারতে বীমার কাজের প্রসার—

ভারতীয় বীমা কোম্পানীদের গত বর্ষের নূতন কার্য্যের হিসাবে দেখা যায় যে মোট ভারতীয় বীমার কার্য্য পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। দেশের আর্থিক অবস্থা বর্ত্তমানে

যেরূপ তাহাতে এই বীমায় কার্য্য বৃদ্ধি আশ্চর্য্যজনক বোধ হয়। অনেকে এরূপ মতও প্রকাশ করিয়াছেন নূতন বীমা কোম্পানীগুলি অত্যন্ত অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া যে কাজ সংগ্রহ করিতেছেন তাহা প্রকৃত নহে। ইহার মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেও একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ভারতের বিরাট লোক সংখ্যার অনুপাতে অতি সামান্য পরিমাণই জীবন বীমা করিয়াছেন। ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেবল বিদেশী কোম্পানীগুলি শিক্ষিত ও সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে সামান্যরূপ প্রচার-কার্য্য চালাইতেন তাহাও সহরের মধ্যে সীমবদ্ধ থাকিত। যখন স্বদেশী কোম্পানীগুলি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল তখন তাহারা প্রথমে প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীর কার্য্যক্ষেত্র ছাড়িয়া ছোট ছোট সহর ও গ্রামে প্রচার-কার্য্য চালাইয়া কার্য্য-সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন। তাহার পর নব যুগের উন্মেষে স্বদেশী দ্রব্যের উপর ভারতবাসীর মমত্ব বৃদ্ধি হওয়ার সুযোগে পাঞ্জাবে 'লক্ষ্মী' বাঙ্গলায় 'মেট্রোপলিটান' প্রমুখ নূতন বীমা কোম্পানীগুলি অখণ্ড পরিশ্রমে দেশের গ্রামে গ্রামে বীমার জ্ঞান বিস্তার করিবার চেষ্টায় বহু লোক জীবন-বীমার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। এইরূপ দেশব্যাপী আন্দোলন ও আলোচনার ফলে বর্ত্তমানে অনেক অধিক লোক অধিক পরিমাণে টাকার জন্য বীমা করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছেন, সুতরাং এই দারুণ আর্থিক সমস্যার মধ্যে নূতন বীমা-কার্য্যের পরিমাণবৃদ্ধির জন্য আশ্চর্য্য হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। পূর্ব্বে যাহারা কেবল বিদেশী বীমা-কোম্পানীতেই বীমা করিতেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে আধুনিক বা সম্পূর্ণ বীমা দেশীয় বীমা কোম্পানীকে প্রদান করিতেছেন। আমাদের বিশ্বাস যে দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইলে ভারতীয় বীমা কোম্পানী গুলি উত্তরোত্তর বেশী পরিমান বীমার কার্য্য পাইতে থাকিবেন।

কিন্তু এই ব্যাপারের একটী প্রতিবন্ধক দেখা যাইতেছে। গড়ে প্রতি মাসে এক বাঙ্গলা দেশেই একটী করিয়া জীবন বীমা কোম্পানী ও ৩।৪টা করিয়া প্রভিডেণ্ট কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইতেছে। ইহার অনেকগুলিই অনুপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিচালিত এবং উপযুক্ত মূলধন শূন্য। এই সমস্ত কোম্পানী প্রতিযোগিতায় বাজারে কখনও পুরাতন বা নূতন সুপরিচালিত কোম্পানীদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না ফলে অনেকগুলিই হয়ত অকালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। সেই সময় ভারতীয় সমস্ত বীমা কোম্পানীর অতিশয় দুঃসময়। কারণ ১০।২০টী ভারতীয় বীমা কোম্পানী ধ্বংস হইলে তাহার ফলে সাধারণের মনে ভারতীয় সমস্ত বীমা প্রতিষ্ঠানের উপরই সন্দেহ আসিয়া যাইবে এবং পুনরায় লোক বিদেশী কোম্পানীগুলির প্রতি আকৃষ্ট হইবে। ভারতীয় কোম্পানীদের সময় থাকিতে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। শুধু স্বদেশী বীমার প্রচার করিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। তাহার মধ্যে ভাল মন্দের বিচার বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উটিয়াছে।

প্রুডেন্সিয়াল কোম্পানির দান—

অল্পদিন হইল বিখ্যাত **Prudential Assurance Co.** **London School of Hygiene and Tropical Medicine**এ প্রতিবৎসর ১৫০০ পাউণ্ড করিয়া ৭ বৎসরের জন্য দানের বন্দোবস্ত করিয়াছে। এই অর্থ হইতে রোগ নিবারণ সম্বন্ধে আবিষ্কারাদি কার্য্য পরিচালনা হইবে। রোগ নিবারণ ও মৃত্যুর হার কম করা বীমা কোম্পানী মাত্রেরই পক্ষে যে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলকর এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্রও নাই। আমেরিকার কোন কোন কোম্পানী তাঁহাদের পলিসি-হোল্ডারদের মধ্যে সুস্থ শরীরে নিয়ম কানুন প্রচার ও রোগে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। ভারতীয় বীমা কোম্পানিগুলি এখনও এবিষয়ে কোন প্রচেষ্টা করেন নাই। এ বিষয়ে সম্মিলিত চেষ্টা বর্ত্তমানে সম্ভবপর না হইলেও, বৃহত্তর কোম্পানীগুলি **Prudential** এর এই আদর্শের অনুসরণ করিলে সাধারণের পক্ষে উপকার হইতে পারে এবং কোম্পানীগুলিও পরোক্ষভাবে লাভবান হয়।

জাবালি

পিচ্ছিলক বা লুব্রিক্যাণ্ট অয়েল

শিল্প ও বাণিজ্য-প্রধান সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এমন অনেক কথা আমাদের ব্যবহার করিতে হইতেছে, যাহার বাংলা সমার্থবোধক শব্দ নাই। যেমন ইংরাজী power কথাটি। পরিভাষা করিয়া ইহাকে 'শক্তি' বলা হইয়াছে, যেমন electric powerকে বলি তাড়িৎ শক্তি। কিন্তু ইংরাজী কথা না জানা থাকিলে 'শক্তি' বলিতে এই অর্থে power বোঝা কঠিন। ঠিক এমনই ধরণের কথা হইতেছে, 'lubricant', যা নিয়া আজ আমরা আলোচনা করিব। Lubricantএর কোন পরিভাষা আজও অবধি বাংলায় সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানিনা। 'পিচ্ছিলক' কথাটি বোধ করি চলিতে পারে, কেননা lubricantএর ধর্ম্ম হইতেছে, দুইটি কঠিন পদার্থের সংঘর্ষে যে তাপের উদ্ভব হয়, সেই তাপকে জমিতে না দিবার উদ্দেশ্যে সংঘর্ষনকে পিচ্ছিল করা। যাহা দ্বারা ইহা সম্ভব, তাহাই পিচ্ছিলক।

ভাবিয়া দেখিলে বুঝিব যে বর্ত্তমান যুগোপযোগী সভ্যতায় কোনও দেশকে গঠন করিতে হইলে, 'শক্তি'র পরেই সর্ব্বাপেক্ষা দরকারী বস্তু এই পিচ্ছিলক। ছোট বড় সকল রকম শিল্প-বাণিজ্যেই ইহার প্রয়োজন, কেননা 'শক্তি'র অযথা অপচয় এই পিচ্ছিলকই রক্ষা করে। রেল, মোটরকার, সাইকেল ইত্যাদি যে-কোন প্রকার যান-বাহন, পশুচালিত কি হাতে ঠেলা গাড়ী ও যন্ত্রপাতি, সমস্তই এই পিচ্ছিলক-সাহায্যে পরিচালিত। ঘড়ীকে 'oil' করিবার কথা কে না শুনিয়াছে? এই 'oil' করাই হইতেছে পিচ্ছিলক-প্রয়োগ। সামান্য গৃহ কি উটজ-শিল্প, চরকা ইত্যাদিতেও পিচ্ছিলকের প্রয়োজন। চলমান বস্তু কেবল নয়, বোতলের ছিপি ও ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতিকে ব্যবহার্য্য রাখিতে পিচ্ছিলকের সমূহ প্রয়োজন। এমন কি পাট কিম্বা তুলাজাত দ্রব্যসমূহকে শিল্পোপযোগী করিয়া তুলিতেও ইহার প্রয়োজন আছে। পাট ও তুলা চাপিয়া অল্প-পরিসর করিবার উপায় এই। সুতরাং একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে বর্ত্তমান সভ্যতার অনেকখানি জুড়িয়া 'পিচ্ছিলক'এর স্থান।

সব রকম যন্ত্রই কিছু এক শ্রেণীর পিচ্ছিলক সাহায্যে চলে না। যন্ত্রের রকমফেরে ইহারও তারতম্য আছে। মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে 'পিচ্ছিলক'এ আমরা কয়েকটি গুণ পাইতে চাই—

দেখিতে হইবে ইহাতে এমন কোন খনিজ কি জৈবক্ষার থাকিলে চলিবে না, যাহা ধাতুকে ক্ষয় করে।

বায়ুস্পর্শে যাহাতে ইহা অক্সজন (oxygen) সংগ্রহ করিয়া যন্ত্রপাতিতে 'মর্চ্চে' কিম্বা 'তিলে' পড়িতে সাহায্য না করে সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

যন্ত্রের যে সব স্থানে উহা প্রযুক্ত হইবে সেখানে সংঘর্ষের ফলে উহা যাহাতে নিজেই দগ্ধীভূত না হয়, তাহা দেখা দরকার, কিংবা সংঘর্ষজনিত তাপে উহা জমিয়া অথবা গলিয়া না যায়, তাহাও দেখা দরকার।

আজকাল বৃহৎ যন্ত্রপাতিতে মাঝে-মাঝে খনিজ দ্রব্যজাত 'পিচ্ছিলক' ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। খানিকটা পেট্রোলের সঙ্গে কোন কিছুর চর্ব্বি কি বেড়ীর তেল অথবা অভ্রের (talc, mica) ও কৃষ্ণশীশের (graphite) সংমিশ্রণে এই শ্রেণীর পিচ্ছিলক তৈয়ারি। বিশেষ যন্ত্রের বিশেষ চাহিদা অনুসারে পিচ্ছিলক গাঢ় কি তরল হয়।

গাঢ় পিচ্ছিলক বহু প্রকার প্রস্তুত হইতে পারে। অনেক দিন আগে চর্ব্বির সহিত palm oil এর সাবান মিশাইয়া এক প্রকার 'গ্রীজ' ব্যবহার করা হইত—এখন উহা প্রায়ই ব্যবহার করা হয় না। সোডা কি লাইমের সহিত চর্ব্বি-মিশ্রিত সাবানে 'ট্যাল্‌ক' কি 'গ্র্যাফাইট' মিশাইয়াও কাজ চালানো হয়। রজন ও চুণের সহিত খনিজ তৈলের মিশ্রণে আলকাতরা, (tar) 'ট্যাল্‌ক' কি 'মাইকা' দিয়াও ইহার ব্যবহার হয়। এইরূপ নানা বৈজ্ঞানিক মাল-মশলায় ইহা তৈয়ারি হইতে পারে।

এমনই নানা প্রকারে তরল পিচ্ছিলকও তৈয়ারি হয়। হয়তো কোনটা বেশী আঠা-আঠা কোনটা কম। যে আবহাওয়ায় যেমন দরকার, তেমনটি হওয়া চাই। এক এক সময় এক একটি স্বাভাবিক জিনিষও সুন্দর পিচ্ছিলকের কাজ করে। সমুদ্রের নোনা জল জাহাজের প্রোপেলারকে পিচ্ছিল রাখে।

সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির জন্যই তরল পিচ্ছিলকের প্রয়োজন, যেমন গেঞ্জি-মোজা কাপড়ের কলের টেকোর জন্য কি ঘড়ীর কীলকের জন্য। বরফের কলের জন্যও এই শ্রেণীর পিচ্ছিলক দরকার। Spindle oil, turbine oil, transformer oil, neutral oil ইত্যাদি বহুবিধ রকমের তরল পিচ্ছিলক বাজারে চলে। Stainless oil বলিয়া এক প্রকার জিনিষ বহুমূল্য বস্ত্রাদি প্রস্তুতের কলে ব্যবহৃত হয়—সাধারণ চর্ব্বির পিচ্ছিলককে অতিমাত্রায় পরিষ্কার করিয়া ইহা তৈয়ারি। ঘড়ীর কলকব্জার জন্য যে পিচ্ছিলক ব্যবহৃত হয়, তাহা সামুদ্রিক 'ডল্‌ফিণ' ইত্যাদি মাছের তৈল হইতে প্রস্তুত।

রেড়ীর তেলের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে ইহার পরিবর্ত্তন হয় না, সুতরাং ব্যোমযান, বিমানপোতে castor oilই পিচ্ছিলক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশ শিল্প-বাণিজ্যে যে দ্রুত উন্নতির পথে চলিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে এই দেশের ভিতরেই পিচ্ছিলকের বিপুল ব্যবসায়-সম্ভাবনা রহিয়াছে। গত কয় বৎসর আমরা বিদেশ হইতে যে পরিমাণ পিচ্ছিলক আমদানি করিয়াছি, তাহার অঙ্ক দেওয়া হইল—

	২৭।২৮	২৮।২৯	২৯।৩০	৩০।৩১
গ্যালন	১,১০,০২,১২৭	১,০৭,৩৮,৭৩১	১,০৬,৪৫,১৫৩	১,১৯,০৯,১৫৩
টাকায় মূল্য	১,৪১,৩২,৪৮৪	১,৩২,৯৩,৭৬৬	১,৩০,৪৪,২৯৬	১,২৯,৯২,৯০৭

এ হিসাব শুধু যানবাহন ও যন্ত্রাদির কলকব্জার ব্যবহার্থে আমদানির। এ ছাড়া বার্ষিক প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার batching oil পাট বা তূলা চাপিবার জন্য আমদানি হয়।

দেশে এখন সমস্ত দিক দিয়া দেশজাত দ্রব্যের ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে। এ সময়ে প্রতি বৎসর এতগুলি টাকা বিদেশের হাতে তুলিয়া দিবার পূর্ব্বে আমাদের একবার ধীরভাবে ভাবিতে হইবে, কোন উপায়ে এ দেশে পিচ্ছিলক তৈয়ারী সম্ভব কি না।

ভারতবর্ষে প্রচুর এরণ্ড বৃক্ষ আছে। ইহা আমরা দেখিয়াছি যে ব্যোমযানের পক্ষে এরণ্ডজাত তৈল, যাহাকে বলি রেড়ীর তেল, প্রশস্ত পিচ্ছিলক, এবং রেড়ীর তেল হইতেই সূক্ষ্ম যন্ত্রাদিতে ব্যবহার্থে উৎকৃষ্ট পিচ্ছিলক তৈয়ারী হইতে পারে।

গত কয়েক বৎসর হইতে ভারতবর্ষে এখানে ওখানে এ বিষয়ে কিছু গবেষণাও হইয়াছে। রেড়ীর তেলের চিটচিটে অংশকে ও অপরাপর হানিজনক উপাদানকে বাদ দিয়া ইহাকে উৎকৃষ্ট পিচ্ছিলকের উপাদান হিসাবে রূপান্তরিত করিবার পন্থা একজন বাঙ্গালী রাসায়নিক আবিষ্কার করিয়াছেন। বহুবিধ এঞ্জিনে ও যানবাহনে তৎকৃত উপাদান ব্যবহার করিয়া সন্তোষজনক কাজ পাওয়া গিয়াছে। এবং এই উপাদান বাজারে চালাইবার জন্য 'ডিগাম্‌ড ক্যাষ্টর অয়েল ম্যানুং কোং' (Degummed Castor Oil Manufacturing Co.) বলিয়া একটি কারবার খোলা হইয়াছে। এখনও সেখান হইতে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী জিনিসের জোগান দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কারণ অর্থাভাব। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে কোনও বিত্তশালীর সহানুভূতি অর্জ্জন করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি সত্বরই কৃতকার্য্য হইবে।

এ পর্য্যন্ত আমরা জানিতাম, খনিজ কোন তৈলের সহিত রেড়ীর তেলের মিশ্রণ সম্ভব নয়। কাণপুরের হারকোর্ট বাট্‌লার টেক্‌নলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এই মিশ্রণপন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। ফলে নূতন ধরণের একটি পিচ্ছিলক আমরা শীঘ্রই বাজারে দেখিবার আশা রাখি।

ব্যবসায়ের দিক দিয়া ইহার যে প্রচুর ভবিষ্যৎ আছে, সে তুলনায় ইহার কারবার করিতে গেলে যে টাকা প্রয়োজন তাহা খুবই অল্প। একটি যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে ২০ হাজারের বেশী টাকা লাগে না। মোট ৫০ কি ৬০ হাজার টাকা হইলেই একটি লাভবান কারবার খোলা সম্ভব। ব্যবসায়ে ন্যস্ত মূলধনের শতকরা ২৫৲ টাকা আয় তো ফেলিয়া-ছাড়িয়া হইতে পারে।

মাসকাবারী

স্বদেশ :—

রাজনৈতিক সন্ধি—

১লা আগষ্ট—বাংলার ব্যবস্থাপক সভার নিদাঘ-বৈঠক আরম্ভ। মরসুম-সফরে লাট সাহেব বাইরে আছেন, ফলে সূচনায় তাঁর বক্তৃতা নেই। এ বৈঠক বিলম্বিত হবে।

২রা আগষ্ট—বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় কাউন্সিল ও লেজিস্লেটিভ দল সম্পূর্ণ পৃথক করার কথা।

৩রা আগষ্ট—বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় স্বতন্ত্রবাদের পরিবর্ত্তে মিলিতবাদই দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে স্থান পাওয়া উচিত, এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত।

৪ঠা আগষ্ট - নরেন্দ্র বসুর বাংলাভাষাভাষী অনুযায়ী বাংলার সীমানির্দ্দেশ সম্পর্কিত প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

হোয়াইটহলে মডারেটপন্থীদের সরিয়ে রাউণ্ডটেবল কমিটিতে আসেম্বলির তরুণ নায়কদের আনার কথা উঠেছে।

৫ই আগষ্ট - গত কাল সকালে ক্যাবিনেটের ইণ্ডিয়া কমিটি ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণ নিয়ে প্রথমদফা বৈঠকে বসেছিলেন।

বাংলা কাউন্সিলে বেশ্যাবৃত্তিনিরোধক আইনের তর্কবিতর্ক সুরু হয়েছে। নরেন্দ্র বসু যতীন্দ্র বসুর প্রতিবাদ করেছেন।

৬ই আগষ্ট - বেশ্যাবৃত্তি-নিরোধক বিল সিলেক্ট কমিটিতে ন্যস্ত হয়েছে।

৯ই আগষ্ট -গত কাল বাংলা কাউন্সিলে জেল সম্পর্কে টাকা পাশ করার বিল নিয়ে ডাঃ নরেশ সেন দমদম জেলের কয়েদীদের দুরবস্থার কথা উত্থাপন করেন।

১০ই আগষ্ট --গত কাল বাংলা কাউন্সিলে বিপ্লবীদমন বিল সিলেক্ট কমিটির হাতে গেছে।

কয়েকজন ইংরাজ, উদারনৈতিক দল ও সরকারের মনোমালিন্য দূর করার চেষ্টা করচেন।

১১ই আগষ্ট—গত কাল বাংলা কাউন্সিলে ফিডারাল ফিনান্স কমিটির রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে—মৈত্রী ব্যবস্থার মন্দটাই এতে বাড়বে, মিঃ উড্‌হেড তাই বলেছেন। বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল বিলের প্রথম দফা পাঠও কাল সাঙ্গ হয়েছে।

কাউন্সিলে বাংলা মিউনিসিপ্যালিটিতে মনোনয়ন পদ্ধতির উচ্ছেদ চেষ্টা ব্যর্থ।

১৬ই আগষ্ট—গত কাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল বিলের সংশোধিত প্রস্তাব গৃহীত। এই প্রস্তাবানুযায়ী মিউনিসিপ্যালিটিতে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের জন্য মোট লোকসংখ্যার সঙ্গে তাঁদের অনুপাত অনুযায়ী স্বতন্ত্র সদস্যপদের ব্যবস্থাসহ মিশ্রনির্ব্বাচন-ব্যবস্থা হ'য়েছে।

১৭ই আগষ্ট—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় চট্টগ্রামের গত বৎসরের লুঠতরাজ সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র-সচিব রীড বিবৃতিতে জানিয়েছেন, দোষী কর্ম্মচারীদের দণ্ডবিধান করা হয়েছে।

১৮ই আগষ্ট—'ইণ্ডিয়া লীগ'এর প্রতিনিধিগণ, পালামেন্টের ভূতপূর্ব্ব সদস্যা মিস্ উইলকিন্সন্, মিস্ মণিকাহুইটলে, মিঃ লিওনার্ড ম্যাটার্স, লীগের সম্পাদক মিঃ কৃষ্ণ মেনন্ গত কাল বোম্বায়ে পৌঁছেছেন। নেতৃবৃন্দ ও সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁরা প্রকৃত অবস্থা জেনে বিলাতে ভারতের বিষয় প্রচারের সঙ্কল্প করেছেন।

১৯শে আগষ্ট—১৭ই আগষ্ট ক্যালোডেন বক্তৃতায় লর্ড লোদিয়ানের উক্তি, ভারতীয় আর বৃটিশের সহযোগিতার বাধা দুটি—(১) চার্চ্চিলপ্রমুখের গোঁড়াবাদ (২) ভারতীয়ের আইন-অমান্য বৃদ্ধি।

গত কাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বৈপ্লবিক অপরাধ দমন আইন সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটি রিপোর্ট পেশ করেছেন। সিলেক্ট কমিটির অভিমত, বিলের এমন কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয়নি, যেজন্য পুনর্প্রচার আবশ্যক।

২০শে আগষ্ট—মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ কর্ত্তৃক শপথ-গ্রহণ সম্পর্কে বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল বিলের ধারা-সংশোধন-প্রস্তাব বাংলা কাউন্সিলে অগ্রাহ্য।

২১শে আগষ্ট—লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ যে পুনরায় কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাটের আলোচনা করা হবে। কার্য্যপদ্ধতির পুনর্ব্বিবেচনার জন্য মহাত্মা-জীকে আবার সুযোগ দেওয়া হবে। ভারতীয় মডারেটগণের সুব্যবস্থার জন্য আর একটি ছোটখাটো গোলটেবিল বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কেউ কেউ গোলটেবিলের সদস্য হ'তে রাজী হয়েছিলেন—তাঁদের কথাও আলোচিত হ'চ্ছে।

২২শে আগষ্ট—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মোটরের উপর ট্যাক্স সংশোধন বিল সিলেক্ট কমিটিতে অর্পিত।

পুণাতে ভারতলীগের প্রতিনিধিমণ্ডলী বোম্বায়ের গবর্ণরের সঙ্গে একঘণ্টা কাল ঘরোয়া আলোচনা করেছেন। কৃষ্ণ মেনন ব'লেছেন, তাঁরা কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নন্। তাঁদের মণ্ডলীর কর্ণধার মিঃ বার্টাণ্ড রাসেল।

২৩শে আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক রায়ের নিন্দা ক'রে নরেন্দ্র বসু যে মুলতুবী প্রস্তাব আনেন, দুই ঘণ্টা কাল বিতর্কে সে প্রস্তাব আলোচনায় পর্য্যবসিত হয়েছে।

২৫শে আগষ্ট—স্যার স্যামুয়েল হোর নিজের ত্রুটী সংশোধনার্থ ছোট একটি গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করেছেন। এই রকমে মডারেট আর লিবারেলদের সমর্থন লাভ করার আশা রাখেন। উক্ত ছোট গোলটেবিলে যাঁরা আমন্ত্রিত হবেন তাঁদের নাম বাছাই হ'চ্ছে।

২৬শে আগষ্ট—পার্লামেন্টের জনৈক সদস্য মিঃ এইচ্ কে হেল্‌স্ 'মান্দ্রাজ মেল'এর প্রতিনিধির নিকট বলেছেন—তিনি ভারতের সব গোলযোগ অবসান করতে এসেছেন।

ভারতলীগের প্রতিনিধিবৃন্দ মান্দ্রাজে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

২৭শে আগষ্ট—বড়লাটের জরুরী তার অনুযায়ী সাপ্রুর দেরাদুন যাত্রা। নবপরিকল্পিত গোলটেবিল বৈঠক এবং সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা হবে।

২৮শে আগষ্ট—ভারত গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য-সচিব স্যর সি, পি, রামস্বামী আয়ার বোম্বায়ের জনৈক প্রেস-প্রতিনিধিকে বলেছেন—গবর্ণমেণ্ট ও উদারনৈতিকগণের মধ্যে মতবিরোধ দূর এবং উদারনৈতিকগণের সহযোগিতালাভের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য তিনি চেষ্টা করছেন।

২৯শে আগষ্ট—গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় পর্ব্ব নবেম্বরের মাঝামাঝি হবে ব'লে প্রকাশ। এবারে আগে কার্য্যপদ্ধতি ঘোষণা ক'রে সদস্যনির্ব্বাচন করা হবে—মোট ২৫জন সদস্যের কথা হ য়েছে।

সিমলার এক খবরে জানা যায় বড়লাট ও বোম্বায়ের দুই জন বিশিষ্ট নেতার—'বিদ্রোহী' মডারেটদের সঙ্গে শান্তির কথাবার্ত্তার জন্য সাক্ষাৎ হয়েছে।

৩০শে আগষ্ট—গত কাল দেরাদুনে সাপ্রুর সঙ্গে বড়লাটের এক ঘণ্টা কথাবার্ত্তা—প্রেস প্রতিনিধিকে সাপ্রু কিছু বলেন নি।

রাষ্ট্রনৈতিক বিগ্রহ

৩রা আগষ্ট—অজ্ঞাত কারণে গত পুরো সপ্তাহ ধ'রে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ অনেকে প্রায়োপবেশন করেছেন বলে প্রকাশ।

৫ই আগষ্ট—আন্দামান-প্রেরণার্থ ১০০ জন বাঙ্গালী রাজবন্দীর তালিকা সরকারের বিবেচনাধীন আছে ব'লে হিন্দু-পত্রিকায় জনৈক পত্রপ্রেরক জানিয়েছেন।

১০ই আগষ্ট—বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যা কুমারী মণিবেন কারার মে-ডে উপলক্ষে শ্রমিক সভায় বক্তৃতার অভিযোগে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০০৲ টাকা জরিমানা।

১১ই আগষ্ট—বাংলা কাউন্সিলের প্রশ্নোত্তরে জানা গেছে গত ৫ মাস আইন অমান্য আন্দোলনে বাংলা থেকে ১০০০০ এরও বেশী লোক গ্রেপ্তার হয়েছে, তার মধ্যে ৯,৫৪৩ জন দণ্ডিত হয়েছেন।

১২ই আগষ্ট—আন্দামানে বাঙ্গালী রাজনৈতিক বন্দীদের প্রেরণ সম্পর্কে সরকার এখন কৃতসিদ্ধান্ত, একথা কাউন্সিলে জানানো হ'য়েছে।

১৩ই আগষ্ট—সর্দ্দার প্যাটেলের কন্যা কুমারী মণিবেন প্যাটেলের উপর নোটিশজারি ও তৎপরে গ্রেফ্তার।

১৪ই আগষ্ট—তোরের বিবৃতির প্রতিবাদে মডারেট নেতৃবৃন্দের ইস্তাহারে আরও কতিপয় বিশিষ্ট নেতার স্বাক্ষর।

পরামর্শসমিতির জনৈক ভূতপূর্ব্ব সদস্য বলেছেন, বৃটিশ বন্ধুগণের চিঠিতে তাঁদের অসহযোগের সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত হবে না।

কাণপুরে বিপ্লববাদীর গুলিতে পুলিশ সব-ইনস্পেক্টার আহত।

প্রকাশ, ইণ্ডিয়া আফিসের নির্দ্দেশে ভারতের রাজনৈতিক বন্দীদের জরিমানার পরিবর্ত্তে কারাবরণ চলবে না।

মণিবেন কারার দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল।

মণিবেন প্যাটেলের ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

১৫ই—প্রকাশ, দুই একদিনের মধ্যে ২৪ জন রাজনৈতিক বাঙ্গালী আসামীকে আন্দামানে প্রেরণ করা হবে, তাঁদের আত্মীয়-স্বজনকে সাক্ষাতের জন্য আহবান করা হয়েছিল। প্রথম দল নাকি গত কালই প্রেরিত হয়েছে।

বাংলার গবর্ণর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে হিন্দুদের স্বপক্ষে ডেস্প্যাচ পাঠিয়েছেন ব'লে প্রকাশ। পাটনায় দ্বারভাঙ্গা মহারাজের দলপতিত্বে একটি কংগ্রেস বিরোধীদল গঠিত হয়েছে।

সালকিয়া রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনে ৫০ জন গ্রেফ্তার।

গাইবান্ধার এক বিবাহ-সভা হ'তে বর সুশীল চক্রবর্ত্তীকে রংপুর বন্দুক চুরির অভিযোগে অডিন্যান্স অনুযায়ী গ্রেফ্তার করা হয়েছে।

মণিবেন কারার জরিমানাস্বরূপ ৬০০৲ তাঁর পিতার নিকট হ'তে আদায়।

১৬ই আগষ্ট—গতকাল সকালে 'মহারাজা' জাহাজে ২৫ জন রাজনৈতিক বন্দী বাংলা থেকে আন্দামানে প্রেরিত হ'য়েছেন।

লাহোরে শিখদের সমবেত সভায় ঘোষিত হ'য়েছে যে কোন সর্ত্তেই শিখগণ শাসনতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ-নির্দ্দিষ্ট সদস্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থা মানবেন না। এই সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধতার বিপক্ষে পাঞ্জাব কর্তৃপক্ষের স্পেশ্যাল অর্ডিনান্স-জারির সঙ্কল্প। শিখরা 'নিকৃষ্টতর কোন শাসন-সংস্কার আমরা চাই না' ব'লে প্রধান মন্ত্রীকে এক তার পাঠিয়েছেন।

তেহট্ট গুলিচালান মামলার সওয়াল জবাবে মিঃ শাসমল ব'লেছেন, 'লাঠিচালান শুধু অত্যাচার নয় উত্তেজনার কারণ হ'য়েছিল।' ২৫শে আগষ্ট রায় প্রকাশ হবে।

ডগলাস হত্যাপরাধে ফাঁসীদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রদ্যোৎকুমারের আপীল শুনানি আজ হাইকোর্টে আরম্ভ।

সালকিয়ার গ্রেফ্তারকৃত ১৫ জনের ৬ মাস ক'রে সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। বাকী সব খালাস।

কামাখ্যা সেনকে গুলি মারার অপরাধে যে ২৭ জন গ্রেফ্তার হয়েছিল তার ২০ জনকে ঢাকার সদর মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট মুক্তি দিয়েছেন।

এম, এন্ রায় হাইকোর্টে আপীল করেছেন।

প্রায় ৫ মাইল ব্যাপী এক শোভাযাত্রা ক'রে লণ্ডনবাসী অনেকে ভারতবর্ষের পরাধীনতার সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

১৭ই আগষ্ট—সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণ :—

প্রদেশ	সাধারণ কেন্দ্র	মুসলমান	অনুন্নত
বাংলা	৮০ (স্ত্রী ২)	১১৯ (স্ত্রী ২)	×
মান্দ্রাজ	১৩৪ (" ৬)	২৯ (" ১)	১৮
বোম্বে (সিন্ধু সহ)	৯৭ (" ৫)	৬৩ (" ১)	১০
যুক্ত প্রদেশ	১৩২ (" ৮)	৬৬ (" ২)	১২
পাঞ্জাব	৪৩ (" ১)	৮৬ (" ২)	×
বিহার উড়িষ্যা	৯৯ (" ৩)	৪২ (" ১)	৭

প্রদেশ	সাধারণ কেন্দ্র	মুসলমান	
মধ্য প্রঃ (বেরার সহ)	৭৭ (" ৩)	১৪——	১০
আসাম	৪৪ (" ১)	৩৪ ---	
সীমান্ত	৯—	৩৬——	
বোম্বে (সিন্ধু বাদ)	১০৯ (" ৫)	৩০ (" ১)	
সিন্ধু	১৯ (" ১)	৩৪ (" ১)	

প্রদেশ	শিল্পবাণিজ্য	ভূম্যধিকারী	অন্যান্য	মোট
বাংলা			২৭	২৫০
মান্দ্রাজ			২২	২১৫
বোম্বে (সিন্ধু সহ)		৩	১৯	২০৫
যুক্ত প্রদেশ		৬	৯	২২৮
পাঞ্জাব		৫ (শিখ ১২ + অপঃ ৮)	৪০	১৭৫
বিহার উড়িষ্যা	৪	৫	১৮	১৭৫
মধ্য প্রঃ (বেরার সহ)	২	৩	৬	১১২
আসাম	১১	×	১৫	১০৮
সীমান্ত	×	২	৩	৫০
বোম্বে (সিন্ধু বাদ)	৭	২	১৭	১৭৫
সিন্ধু	২	২		

বাংলার অনুন্নত সংখ্যা সাধারণ কেন্দ্রের মধ্যেই, এখনও সংখ্যা নির্দ্ধারিত হয়নি। বাংলার অন্যান্যের মধ্যে ইউরোপীয় ১১, এংলো ইণ্ডিয়ান ৪, খৃষ্টান ২, বিশ্ববিদ্যালয় ২, শ্রমিক ৮।

মীরাট মামলার সওয়াল জবাব শেষ। এসেসরদের অভিমতে সব সম্মতি-ক্রমে অপরাধী ১৭ জন, স্প্র্যাট, ব্র্যাড্লে, ঘাটে, মীর্জ্জাকার, যোগলেকার, নিম্বকার, ডাঙ্গে, ওসমানি, অধিকারী, মোজাফর আহম্মদ, গোস্বামী, চক্রবর্ত্তী, মজুমদার, অযোধ্যাপ্রসাদ, সোহনসিং যোশী, আবদুল মজিদ ও যোশী।

হাচিনসন, হুদা, মিত্র, ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ও কদমকে, চার জন এসেসর নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেছেন।

ঝাবওয়ালা, আলওয়ে, কাস্লে, ব্যানার্জ্জী, সাইগল, দেশাই ও মুখার্জীকে এসেসর তিন জন এসেসর নির্দ্দোষ এবং একজন দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

১৮ই আগষ্ট—সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি ডাঃ কিচলুর মত, 'আমি মনে করি না যে এই সিদ্ধান্ত ভারতের কোন সম্প্রদায়কে এমন কি মুসলমানগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গোঁড়ার দলকেও সন্তুষ্ট করতে পারবে।'

এলাহাবাদের ডাঃ সাফৎ আমেদ খাঁর মত, 'আমরা এখন মুস্লিম ভারত প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কর্ম্মসূচী রচনা করতে সক্ষম হব।'

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য সর্দ্দার শার্দ্দুলসিংহ নোটিশ দিয়েছেন, সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনার জন্য তিনি আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর (সেসনের উদ্বোধন দিবস) ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন মুলতুবীর প্রস্তাব করবেন।

সর্ব্বত্রই বিক্ষোভ দেখা যায়, শুধু ভেদবাদীরা উল্লসিত হয়েছে।

বোম্বায়ে নিষেধাজ্ঞা অমান্যের জন্য মীরাবেণ (স্লেড্) গ্রেপ্তার হয়েছেন।

গত ১৬ই কলিকাতায় বঙ্গীয় ছাত্র-সম্মেলনের অধিবেশনে বহু স্থান হ'তে বহু ছাত্র-ছাত্রী গ্রেপ্তার হয়েছে।

১৯শে আগষ্ট—বাংলার গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনানুসারে ভারত গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক আগামী শীত ঋতুর প্রারম্ভে বাংলায় ছয়টি ভারতীয় সৈন্য বাহিনী এবং একটি গোরাবাহিনী প্রেরণের বন্দোবস্ত। গোরাবাহিনী ঢাকায় এবং চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, মৈমনসিং, সৈয়দপুর, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় এক একটি ভারতীয় বাহিনীর ছাউনি থাক্‌বে। সুতরাং ৮০০ ক'রে ৭টি দলে সব শুদ্ধ ৫৬০০ সৈন্য বাংলায় মোতায়েন থাক্‌বে।

১লা ডিসেম্বর মীরাট মামলার রায় প্রদত্ত হবে।

পাঞ্জাব প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য ডাঃ কিচ্লুর গত রাত্রে লায়ালপুর যাত্রা—গ্রেপ্তার সম্ভাবনায় সঙ্গে জেলের জিনিস আছে।

বোম্বাই হাইকোর্টের রায়ে মণিবেণ কারার কারাদণ্ড নাকচ, অর্থদণ্ড বাহাল—৩০০্ টাকা প্রত্যর্পিত।

মান্দ্রাজ থেকে টি প্রকাশম তার করেছেন ডাঃ স্কীনার ও গুরুস্বামী মুদালিয়ারের পরীক্ষায় সুভাষচন্দ্রের ক্ষয়রোগ-আশঙ্কা।

১৯শে আগষ্ট—সাপ্রু সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণের নিন্দা করতে রাজী নন্। তিনি বলেছেন, আমরা যখন নিজেদের মধ্যে কোন রফা করতে পারিনি, তখন তৃতীয় ব্যক্তির রফার ভুল ধরা আমাদের উচিত নয়। তাছাড়া ভবিষ্যতে এ ব্যবস্থা সংশোধনের সম্ভাবনা আছে।

এম সি রাজার বিশ্লেষণ—অনুন্নত শ্রেণীদের মাথায় বাড়ি দিয়ে মুসলিম ও ইউরোপীয়ানদের সুবিধা। প্যাটেল বলেছেন—গণতন্ত্রের শিরশ্ছেদ করা হয়েছে।

কাঁথীর শিবপ্রসাদ গুপ্ত শোভাযাত্রায় গ্রেপ্তার।

২০শে আগষ্ট—গোলটেবিল বৈঠকের শিখ প্রতিনিধি সর্দ্দার উজ্জ্বলসিং ও সম্পূরণসিং বড়লাটকে চিঠি দিয়েছেন নবপ্রবর্ত্তিত শাসনতন্ত্র বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অপেক্ষাও অপকৃষ্ট হবে।

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের পরিণাম সম্বন্ধে ভারতের নেতৃবৃন্দ সকলেই নিরাশ হয়েছেন। বিহারের সচ্চিদানন্দ সিংহ বলেছেন—দায়িত্বশীল শাসনের মূলে কুঠারাঘাত। সি, সি, রায় বলেছেন—রক্ষণশীল দলের অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরিচালিত।

লিবার্টি সম্পাদক সত্যরঞ্জন বক্সী বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে ধৃত।

লায়লপুরে ডাঃ কিচলুর বিপুল অভ্যর্থনা।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ রীডের বিবৃতি—বক্সা, হিজলী, বহরমপুর ও দেওলীর বন্দীবাসে যথাক্রমে ১৬২, ২৭৫, ২৬২, ৯২ জন আটক আছেন। জানুয়ারী থেকে জুলাই পর্য্যন্ত জনতা-ছত্রভঙ্গে ১৬ বার গুলি বর্ষণ, ১০ নিহত ৭৬ আহত।

কলিকাতা এলবার্ট হলে হিন্দুদের বিরাট সভায় সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত নিন্দিত।

২১শে আগষ্ট—মিঃ চিন্তামণির তারের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে লিখছেন—নিরর্থক অভিযোগেও ঘৃণা বোধ করি। প্রতীকার-পথ নেতৃবৃন্দের হাতে।

গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি রাজা নরেন্দ্রনাথ বড়লাটকে চিঠি দিয়ে শাসন-পদ্ধতিরচনায় যোগদানে অসম্মতি জানিয়েছেন।

২২শে আগষ্ট—বরিশালে চরমুগারিয়া ডাকলুঠ মামলায় আসামী ২২ বছরের যুবক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের আজ সকালে ফাঁসী।

ঢাকায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গ্রাস্‌বির প্রতি গুলি। অন্যতম আততায়ী হিসাবে এক পঁচিশ বছরের যুবক গ্রেফ্‌তার। উপর্য্যুপরি কয়েকটি গুলিতে যুবকটির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। মিঃ গ্রাসবীর অবস্থা নিরাপদ।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক-মুস্লিম লীগ অত্যন্ত তীব্রভাবে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার স্বতন্ত্র দলের নেতা মল্লিক খোদাবক্স বলেছেন—সিদ্ধান্তের ফলে ভারতের পরাধীনতা আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে। বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদী মুসলিম দলেরও তীব্র প্রতিবাদ। মিসেস্ সুব্বারায়াণ বলছেন—'নারীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা কেন?'

চুগলাদ হত্যা মামলার আসামী প্রদ্যোতের প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল হাইকোর্ট কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য।

২৩শে আগষ্ট—গত কাল অমৃতসরে ডাঃ কিচ্‌লুকে বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেফ্‌তার করা হয়েছে।

২৪শে আগষ্ট—মিঃ গ্রাস্‌বীর অবস্থা সন্তোষজনক। ধৃত যুবক বিনয়ভূষণ আরোগ্যের পথে। এই সম্পর্কে ১৬ জন গ্রেপ্তার।

২৬শে আগষ্ট—অমৃতসর সাব জেলে ১৯৩২ সালের জরুরি অর্ডিন্যান্সের ১৭ ধারা অনুসারে ডাঃ কিচ্‌লুর বিরুদ্ধে চার্জ্জ-গঠন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তরে জানা গেছে ১৯৩২ এর জানুয়ারী থেকে জুলাই পর্য্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলনে ৬১৮ জন স্ত্রীলোক গ্রেপ্তার হন, তন্মধ্যে ৬০০ জন দণ্ডিত হয়েছেন। ২০শে জুলাই তারিখে ২১২ জন কারাবন্দী ছিলেন।

অটোয়ার চুক্তি প্রভৃতি আলোচনার জন্য নবেম্বরের মাঝামাঝি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের এক অধিবেশন হবে ব'লে প্রকাশ। জরুরী অর্ডিন্যান্স গুলিকে আইনে পরিণত করার উদ্দেশ্যও আছে ব'লে জানা যায়।

তেহট্ট গুলিমারা মামলায় রায়ে ১৪ জনের ১০ জন বেকসুর খালাস, এক জনের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড, ৩ জনের জামিন মুচলেখা।

২৭শে আগষ্ট—ডাঃ কিচ্‌লুর দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও দুইশত টাকা জরিমানা।

ডায়মণ্ড হারবারে২৪ পরগণার ছাত্রসম্মেলনোপলক্ষে ১৪৪ ধারাভঙ্গে প্রায় ১০০ জন গ্রেফ্তার, পরে সবাই মুক্ত।

২৯শে আগষ্ট—প্রিভি কাউন্সিলের আবেদনার্থে প্রদ্যোতের ফাঁসী বর্ত্তমানে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত।

৩০শে আগষ্ট—মেদিনীপুর সহরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের খরচ একমাত্র হিন্দুদের নিকট থেকেই আদায় করবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় মিঃ রীড বলেছেন, হিন্দুরাই বিপ্লবী অত্যাচারের সঙ্গে প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট।

অমৃতসর ব্যারিষ্টার সমিতির পক্ষ থেকে বেআইনী ও কঠোর দণ্ড বিধানের জন্য ডাঃ কিচ্‌লুর পুনর্ব্বিচার প্রস্তাব।

৩১শে আগষ্ট—ভারতীয় খৃষ্টানদের কলিকাতা-সভায় সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের তীব্রনিন্দা।

দুর্ব্বৃত্ততা ও তৎসম্পর্কে

১লা আগষ্ট - এলাহাবাদে 'পাওনিয়ার'এর জনৈক ইংরাজ সাংবাদিক গত কাল দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক আহত।

২রা আগষ্ট—বাঁকুড়ায় মাতৃহত্যার অভিযোগে যুগলকিশোর শীল অভিযুক্ত।

৩রা আগষ্ট—লাহোরের কাছে একটি গাঁয়ে দুই দলের গোলমালের ফলে, শিখ পরিবারে সাত জন খুন।

৬ই আগষ্ট—গত কাল বেলা সাড়ে তিনটায় 'ষ্টেট্‌সম্যান' সম্পাদক ওয়াটসনকে গুলি মারা হয়—আততায়ী অতুল সেন (২১ বছর) বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

১২ই আগষ্ট - বাগেরহাট, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম ও চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে ক্রমাগত ডাকাতি হচ্ছে।

১৩ই আগষ্ট—মুন্সিগঞ্জের জনকয়েক ছুতার নেপালে কাজ করতে গিয়ে গৃহস্বামীকে হত্যা ক'রে পালিয়েছিল—মুন্সিগঞ্জে সেই মামলার শুনানী আরম্ভ।

১৪ই আগষ্ট—সীমন্তের পুলিশ ও দস্যুদলের সংঘর্ষে তিন জন দস্যু নিহত, ৪ জন দস্যু আহত, এক জন কনষ্টেবল সামান্য আহত।

যশোরের ঘোলাডাঙ্গায় গোলজান বিবির প্রতি ৪ জন মুসলমানের পাশবিক অত্যাচার। পরিমলবালা হরণের অভিযোগে রংপুরের উকিল শশীভূষণ দাসের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা দায়রায় সোপর্দ্দ হয়েছে।

১৫ই আগষ্ট—রেঙ্গুনে সশস্ত্র ডাকাত কর্ত্তৃক লক্ষ টাকার অলঙ্কার অপহৃত। ফেণীতে নিজকুঞ্জরা গ্রামে জনৈক মহাজনের বাড়ীতে ডাকাতি, ২০০০ টাকা লুণ্ঠিত।

১৬ই আগষ্ট—গত পরশু ঢাকায় এক ট্রেণে জনৈক ব্রাহ্মণবাড়ীর পোদ্দারের কাছ হ'তে রিভলভার দেখিয়ে ৫টি যুবক ৮০০০ টাকা লুট ক'রে পালিয়েছে। কিছুদিন আগে এমনি ভাবেই এখানে ৩০০০০ টাকা লুণ্ঠিত হয়।

মাদারিপুর চরমগুরিয়ায় গতরাত্রি প্রায় ১০টার সময় ৫টি যুবক রিভলভার ছুরি ইত্যাদি নিয়ে ডাকাতি ক'রে বহু টাকা সমেত উধাও হয়েছে। আজ সকালে ৪ জন গ্রেফ্‌তার হয়েছে।

১৮ই আগষ্ট—বগুড়ায় প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতির চেষ্টা আরামবাগ থানার গোঘাট গ্রামে ডাকাতি।

কাটোয়ায় হিন্দু কর্ত্তৃক বিধবা অপহরণ।

২২শে আগষ্ট—পাঁচগাঁও তিন খুন মামলার আসামী অনন্ত সরকার ও আসরফ আলীকে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে দায়রা সোপর্দ্দ করা হয়েছে।

২৩শে আগষ্ট—ষড়যন্ত্র ও ট্রেণলাইনচ্যুত করবার অভিযোগে দণ্ডিত ভগবান, সকলদীপ ও রামপ্রতাপ পাটনার দায়রা জজ কর্ত্তৃক ক্রমান্বয়ে দুইজন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও ১ জন ৭ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

২৪শে—শ্রীরামপুরে জনৈক গৃহস্থের স্ত্রী ও কন্যার গা থেকে ডাকাতেরা অলঙ্কার লুণ্ঠন করেছে।

২৫শে আগষ্ট—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কিশোরীমোহন চৌধুরীর উত্তরে মিঃ রীডের বিবৃতি—১৯২৬ থেকে ৩১ সন পর্য্যন্ত বাংলায় যথাক্রমে ৮০০, ৮৯৮, ৯৭৬, ১০৫৭, ৯৯১ ও ৯৩১টি নারী হরণ হয়েছে। নিগৃহীতা হিন্দুনারীর সংখ্যা ৩০০ থেকে ৩১০র মধ্যে—মুসলমান কর্ত্তৃক নিগৃহীতা ১২৫ থেকে ২৫০ এর মধ্যে। মুসলমানকর্ত্তৃক মুসলমানী নিগৃহীতার সংখ্যা কোন বৎসরই ৫০০র কম নয়—৫৭৫ পর্য্যন্ত আছে। হিন্দু কর্ত্তৃক নিগৃহীতা মুসলমানীর সংখ্যা কোন বৎসরই ৯এর ঊর্দ্ধে ওঠেনি।

২৭শে আগষ্ট—পোষ্টাফিসকে ২০০০০ হাজার টাকা প্রতারণা ক'রবার অভিযোগে যে ৮ জনকে পাটনার সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে চার্জ্জশিট-গঠন।

নোয়াখালির বাঙ্গ্যানগরের পোষ্ট মাষ্টারকে ৬০০ টাকা ঠকানোর অভিযোগে গোলাম রহমনের ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

২৮শে আগষ্ট—টাঙ্গাইল চ পাড়া ডাকাতি মামলায় সত্যরঞ্জন ঘোষের ৭ বৎসর ও শশী ভট্টাচার্য্যের ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হ'য়েছে। রাজসাক্ষী নরেশ চক্রবর্ত্তী খালাস। (ডাকাতি বিগত ১৩ই ফেব্রুয়ারি হয়)

২৯শে আগষ্ট—ব্যবস্থাপক সভায় রীডের বিবৃতি—১৯২৯এ বাংলার বিভিন্ন জেলায় ৬৯৩টি ডাকাতি হয়, তন্মধ্যে ১০৮টির অপরাধীদের শাস্তি হয়, ১৯৩০এ মোট ১১০৩টি ডাকাতির ৯৩টির আসামীদের শাস্তি হয়। ১৯৩১এ ১৯২৯টির ১৪৮টি মামলার অপরাধীদের শাস্তি হয়েছে।

৩০শে আগষ্ট—মেসার্স জেনারেল ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশন, (ইণ্ডিয়া)র ডিরেক্টর মিঃ বেন্ধ ৯০০০০, টাকা প্রতারণার অভিযোগে ধৃত। প্রকাশ আসামীরা ৫০০০, টাকা থেকে ১০০০০, টাকা পর্য্যন্ত জামিন নিয়ে ক্যাশিয়ার প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে সর্ব্বসমেত ১৯ জনকে প্রতারিত করেছে। ১০ই সেপ্টেম্বর মামলা হবে।

লাহোরে প্রহরী পুলিশ খুন ক'রে জনকয়েক কয়েদী উধাও হয়েছিল। পরে দুইজন গ্রেপ্তার।

দুর্ঘটনা

২রা আগষ্ট—মান্দ্রাজ থেকে সুভাষবাবু চিঠি দিয়েছেন, তাঁর জ্বর আজও হচ্ছে।

৩রা আগষ্ট—নোয়াখালিতে ফেরী নৌকা ডুবে ২১৬ জন মারা গেছে।

৪ঠা আগষ্ট—ক্যানানোর জেলে জনৈক কয়েদীকে বেত-মারার ফলে যে-দাঙ্গা বাধে, তাতে ত্রিশজন কয়েদী আহত হ'য়েছে।

৬ই আগষ্ট—গত কাল সন্ধ্যা ৭ টায় কুমিল্লার আহত পুলিশ সাহেব এলিসন্ ঢাকা মিটফোর্ড হস্পিটালে মারা গেছেন।

১২ই আগষ্ট—সিন্ধু নদীর বন্যা ভীষণ আকার নিয়েছে—কোয়েটা হয়ত বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়তে পারে।

রেঙ্গুনের খবরে প্রকাশ পেগু জেলার সর্ব্বত্র অত্যধিক বৃষ্টিপাতে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে।

১৩ই আগষ্ট—হাজারিবাগ জেলে পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস ও জগৎনারায়ণ লাল পীড়িত। দেবদাস গান্ধীর কাশীতে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা হচ্ছে।

১৪ই আগষ্ট—কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ—গত সপ্তাহে ১৫ জন মৃত।

সুক্কুরের বাঁধ ভঙ্গ—ফলে মারাত্মক প্লাবন।

১৬ই আগষ্ট—কোলাপুরের কাছে খেয়ানৌকার মধ্যে সর্প-পতনজনিত ভয়ে শতাধিক লোকের সলিল-সমাধি।

বাংলার বিভিন্ন স্থান হ'তে ভূমিকম্প-বার্ত্তা সময় ১৪ই আগষ্ট সকাল।

১৮ই আগষ্ট সুভাষচন্দ্রের মান্দ্রাজ হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে।

হায়দ্রাবাদ অন্তর্গত পুণা নামক স্থানে শোভাযাত্রায় হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা পুলিশের গুলি চালনায় দাঙ্গার নিবৃত্তি।

বিবিধ

২রা আগষ্ট—হায়দ্রাবাদ কোর্টে জনৈক চাষী দুইটি অশোকানুশাসন পেয়েছে।

৩রা আগষ্ট—কলিকাতা কর্পোরেশন থেকে সরকারের দ্বিতীয় চিঠির উত্তর না দেওয়ার সঙ্কল্প।

হাওড়ায় গ্যাঞ্জেস জুট মিলে ৮০০ তাঁতীর ধর্ম্মঘট।

৪ঠা আগষ্ট জাপানি ইয়েনের মূল্যহ্রাসের ফলাফল নির্দ্ধারণ করতে নিযুক্ত ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ডের বোম্বায়ের অনুসন্ধান শেষ হ'য়েছে—৭ই সেপ্টেম্বর নাগাদ বোর্ড কলিকাতা আসছেন।

৫ই আগষ্ট হাওড়া মিল-পাড়ায় ছ'টা মিলের প্রায় ২৫০০ লোকের ধর্ম্মঘটে যোগদান—কারণ বেতন হ্রাস।

৬ই—জব্বলপুরের ক্রোড়পতি শেঠ গোবিন্দদাস পিতার সঙ্গে রাজনৈতিক মত-বিভিন্নতার জন্য ক্রোড়াধিক মুদ্রার পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার ত্যাগ করেছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন সরকারের দুখানি চিঠির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তৃতীয় চিঠির মাত্র উত্তর দেওয়া হবে।

৭ই আগষ্ট—গতকাল কলিকাতার আলবার্ট হলে স্যর সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষাসভায় সভাপতি স্যার প্রভাস জাতীয়-পতাকাদর্শনে সভাত্যাগ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে গত কাল সংবর্দ্ধনা করেছেন।

৯ই আগষ্ট—ঢাকার জেলাম্যাজিষ্ট্রেট সহরের শান্তি-শৃঙ্খলারক্ষার্থে সকল বেসরকারী লোককে রিভলভার বন্দুক সরকারের জিম্মায় রাখবার নোটিশ দিয়েছেন।

১০ই আগষ্ট সহিদ সুরাবর্দ্দী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত।

ভারত সরকারের শতকরা ৫ টাকা সুদের নূতন ঋণগ্রহণ-জারি।

১২ই আগষ্ট - কাষ্টমস্ বিভাগের রিপোর্টে জানা যায় গত ৬৩ বৎসরের যে কোন বৎসরের চাইতে বাংলার ব্যবসায় এ বৎসর খারাপ।

কলিকাতা কর্পোরেশনে বি, এন, দেকে চিফ ইঞ্জিনীয়ার করার প্রস্তাব নামঞ্জুর হয়েছে।

১৪ই আগষ্ট যুক্ত প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডাইরেক্টর মিঃ কে, পি, কিসলুর ঐ প্রদেশের শিক্ষার জন্য ১৮০০০৲ টাকা দান।

রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বেলা ১টার ৯৫ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেছেন।

হাওড়া পাটকলে ধর্ম্মঘটের ফলে সহরে ১৪৪ ধারা বেতন-হ্রাস প্রতিবাদে ২৫ হাজার শ্রমিক বেকার।

১৫ই আগষ্ট—ডিব্রুগড়ে গত কাল ভীষণ ভূমিকম্পে বহু ক্ষতি হয়েছে, কলিকাতাতেও সামান্য কম্পন।

আগামী সেপ্টেম্বরে মালদহে সপ্তদশ অষ্টাদশ হিন্দুসম্মেলনের অধিবেশন হবে।

রেভারেণ্ড জাষ্টিন ৪০ বৎসর মহারাষ্ট্রে ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন। ১০২১ সালে তিনি আমেরিকায় ফেরেন। তাঁর উইলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তিনি বহু অর্থ দান করে গেছেন, পুণার ভারত ইতিহাস সংশোধক মণ্ডলকে ১ লক্ষেরও বেশী টাকা দিয়ে গেছেন।

১৭ই আগষ্ট—স্যর নীলরতনের সপ্ততিতম বর্ষে কলিকাতা-কর্পোরেশনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৫৭তম জন্মতিথি উৎসবে শরৎ-সম্বর্দ্ধনাসমিতি গঠিত হয়েছে।

২৩শে আগষ্ট—প্রকাশ্য রাজপথে উলঙ্গাবস্থায় ভ্রমণাপরাধে রুশিয়ার "দুখোবর"। স্বাধীনতার সন্তান। দলের ৩১ জন স্ত্রী ও ১৮ জন পুরুষকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

২৪শে আগষ্ট—স্যর সি, সি, ঘোষের অস্থায়ীভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান-বিচারক-পদপ্রাপ্তি।

রেঙ্গুনের জনৈক চীনা নারী পীড়িত স্বামীর রোগমুক্তির জন্য নিজ বক্ষ-মাংসের তরকারী রেঁধে স্বামীকে আহারার্থে দিয়েছেন।

২৫শে আগষ্ট—নেপালের কম্যাণ্ডিং জেনারেল রাণা ধর্ম্ম শমসের জংএর কলিকাতায় মৃত্যু। শোক-প্রকাশার্থ ফোর্ট উইলিয়মে ১৭টি তোপধ্বনি—সরকারী কার্য্যালয়গুলির পতাকাও অর্দ্ধ-অবনমিত করা হয়।

২৭শে আগষ্ট—ডাকবিভাগের ঘাটতিপূরণের পন্থাহিসাবে প্রেস-তারের মাশুলবৃদ্ধির সম্ভাবনায় সংবাদপত্রমহলে চাঞ্চল্য।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগকে যে পত্র দিয়েছিলেন, তার উত্তরের খসড়া স্পেশাল কমিটি পেশ করেছেন- উত্তরের মোটামুটি বক্তব্য, রাজনৈতিক প্রচারকার্য্য বা সভাসমিতির উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য কর্পোরেশন স্কুলের বিল্ডিংস কখনও ছাড়া হয় নি; নিয়মানুবর্ত্তিতারক্ষার্থে সম্ভবপর সকল ব্যবস্থা কর্পোরেশন অবলম্বন করেছেন; যে সকল শিক্ষক নৈতিক অপরাধ সম্পর্কে দণ্ডিত হন নি, কর্পোরেশনের নিয়মানুযায়ী তাঁদের বিষয় বিবেচিত হয়েছে।

২৮শে আগষ্ট—কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরিতে বিশেষ সমারোহে বাংলার জনপ্রিয় প্রবীণতম সাহিত্যিক জলধর সেনের সংবর্দ্ধনা।

স্বদেশী সঙ্ঘের উদ্যোগে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট সভায় মালব্যজীর বক্তৃতা।

৩০শে আগষ্ট - শিমলায় অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশ, বৃটিশকলে প্রস্তুত নয় এমন কোন কোন বস্ত্রের উপর ২০৲ টাকা থেকে শতকরা ৫০৲ টাকা শুল্ক ধার্য্য করা হলো। এই নীতি ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বলবতী থাকবে।

বিদেশ (বিভিন্ন রাষ্ট্রসম্পর্কে)

১লা আগষ্ট—ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ও লেবার পার্টীতে মতান্তর হেতু সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ।

২রা আগষ্ট—জার্ম্মানির নির্ব্বাচনযুদ্ধের ফল, নাজিদল - ২২৯, সোশ্যালিষ্ট ১৩৩, কম্যুনিষ্ট ৮৯, সেণ্টার—৭৩, ন্যাশনালিষ্ট ৩৭, অন্যান্য—৩৬। হের্ হিটলার রয়কস্ট্যাগে ঢুকবেন না, বাইরে হ'তে কাজ করবেন। কিন্তু বর্ত্তমানে রয়কে পাপেনই প্রধান রইলেন, কেননা নাজিদের 'absolute majority' হবে না।

৪ঠা আগষ্ট—প্যাপেন বলেছেন, কোনও দলবিশেষের হাতে জার্ম্মানির ভাগ্য তুলে দেবার তিনি পক্ষপাতী নন। দেশের ভালোর জন্য নাজিদলের উচিত বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রকে সাহায্য করা।

ডি-ভ্যালেরা 'ইমার্জেন্সি-ফাণ্ড'এর জন্য ২ মিলিয়ন ষ্টার্লিং দেশবাসীর কাছ হতে চেয়েছেন।

৭ই আগষ্ট - 'ডেল'এ ডি-ভ্যালেরার দুই মিলিয়ন ষ্টার্লিং-এর নিবেদন গ্রাহ্য হয়েছে।

১১ই আগষ্ট—স্পেনে রাজপক্ষের দলের ছোটখাটো একটা বিগ্রহে ৫০ জন গ্রেপ্তার, ৩ জন আহত।

১৩ই আগষ্ট—রাজতন্ত্রবাদীদের বিদ্রোহদমনের পর স্পেনে কম্যুনিষ্টদলের পাল্টা আন্দোলন।

জার্ম্মান গণতন্ত্রের ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন - নাজিদলের বাধাপ্রদান-সংকল্প ব্যর্থ।

১৫ই আগষ্ট—জার্ম্মানিতে হিট্‌লার চ্যান্সেলার হ'লেন না। বর্ত্তমান মন্ত্রী-সভাই বাহাল রইল।

১৬ই আগষ্ট—আয়ার্ল্যাণ্ডের ঊর্দ্ধতন পরিষদ সিনেট-সভা শপথ বিলোপ বিলে বাধা দিয়ে জাতির স্বার্থ-বিরোধী কাজ করেছেন ব'লে ডি-ভ্যালেরার

সিনেট-সভা-ভঙ্গের সঙ্কল্প। প্রতিদ্বন্দ্বীদল নূতন সেনাবাহিনী গঠন করে ফ্রিষ্টেট গবর্ণমেণ্টকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করেছেন। সরকারী ফ্রিষ্টেট সেনা ও আইরিশ গণতন্ত্রবাহিনীর পর এই প্রতিষ্ঠানটি ফ্রিষ্টেটের তৃতীয় সেনাবাহিনী। ডি-ভ্যালেরা এদের সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। ওদিকে সহস্র সহস্র একর জমিতে চাষবাসের জন্য ফ্রিষ্টেট শাসন পরিষদ বিশেষরূপে মনোযোগী হয়েছেন।

বাণিজ্যের পুনরুত্থানকল্পে প্রেসিডেণ্ট হুভার যুক্তরাষ্ট্রের ১২টি রিজার্ভ জেলার ব্যবসায়িগণকে সম্মেলনে আহ্বান করেছেন।

১৮ই আগষ্ট—হিট্‌লার বলেছেন, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট নাজিদলকে সমর্থন করলে আমরাও গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করবো।

২২শে আগষ্ট—ডি-ভ্যালেরা বলেছেন ভূমিকর হিসাবে দেয় টাকা আপোষ-মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কাঁচা হিসাবে রেখেছি। সালিসী আদালতের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেছেন।

২৩শে আগষ্ট—বিপ্লবীদমন-হুকুমনামা অনুযায়ী নাজি-ঝটিকাবাহিনীর পাঁচজন সদস্যকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করায় বার্লিনে ভীষণ চাঞ্চল্য।

২৪শে আগষ্ট নাজি-পঞ্চকের প্রাণদণ্ডে জার্ম্মানির রাজনৈতিক গগনে বিপ্লবের ঘনঘটার পূর্ব্বলক্ষণ।

জেনেভা জাতি-সঙ্ঘের কাউন্সিল-সভাপতির পদ আগামী সেপ্টেম্বরে আইরিশ ফ্রী-ষ্টেট পাবে।

২৫শে আগষ্ট জাপান পররাষ্ট্রসচিব কাউণ্ট উচিদা জাপান পার্লামেণ্টে বক্তৃতায় বলেছেন - যথাসম্ভব মাঞ্চুরিয়াকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করা হবে। শান্তিভঙ্গের অভিযোগ জাপান অস্বীকার করে। তাঁর মতে চীনের বর্ত্তমান অরাজকতায় শান্তিভঙ্গের কথাই উঠতে পারে না।

মাদ্রিদে সেভিল-বিদ্রোহীর নেতা স্যানজুর্জ্জোর প্রাণদণ্ডাদেশ।

২৬শে আগষ্ট --প্রেসিডেণ্ট জ্যামোরার নির্দ্দেশে স্যানজুর্জ্জোর প্রাণদণ্ডাদেশ মকুব। তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠানো হবে।

২৭শে আগষ্ট—বেতন হ্রাসের প্রতিবাদ ও কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ ব্যাপদেশে ল্যাঙ্কাশায়ারের বয়ন-বিভাগের দুই লক্ষ শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট অদ্য দুপুরে সুরু।

২৮শে আগষ্ট—সাংহাইএ আবার জাপানী সৈন্যের কুচকাওয়াজ সুরু হয়েছে।

২৯শে আগষ্ট—মুকডেনে একদল চীনা কর্ত্তৃক বিমানপোতাগার, অস্ত্রাগার ও বেতার আক্রান্ত হওয়ায় জাপানী সৈন্যদল আহুত।

২৯শে আগষ্ট--অটোয়া সম্বন্ধে মিঃ ওকেলী বলেছেন---আলোচনার ফলে উভয় দেশের (বৃটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ড) মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটেছে এবং মৈত্রীভাবের সৃষ্টি হয়েছে।

৩০শে আগষ্ট- লণ্ডনের সংবাদে জানা যায় ল্যাঙ্কাশায়ারে ধর্ম্মঘট-প্রসারের আশঙ্কা এখনও প্রবল।

টোকিওর গতকালকার সংবাদ, মুকডেনে চীন-জাপান সংগ্রাম মোটেই ভারীরকমের কিছু নয়।

নাজি ও কেন্দ্র দলের মিতালির ফলে অন্যতম নাজি-নেতা (হারম্যান গোয়েরিং) ৩৬৭-২১৬ ভোটে জার্ম্মান-পার্লামেণ্টের সভাপতি নির্ব্বাচিত। প্যাপেন পার্লামেণ্ট-ভঙ্গের পূর্ণ ক্ষমতা ইতিপূর্ব্বেই প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গের কাছ থেকে নিয়ে রেখেছেন। পার্লামেণ্টের উদ্বোধনী বক্তৃতায় ক্লারা জেটকিন বলেছেন, জার্ম্মান রাষ্ট্রতন্ত্রের নিয়মভঙ্গের অপরাধে হিণ্ডেনবার্গ ও মন্ত্রিসভাকে আদালতে অভিযুক্ত করা উচিত।

আন্তর্জ্জাতিক

১লা আগষ্ট—ডাবলিনে ভারতীয়-আইরিশ জাতীয় কন্‌ফারেন্সে যোগদানকল্পে আগষ্টের শেষে দলবল নিয়ে প্যাটেল লণ্ডন হ'তে সেখানে যাবেন ব'লে প্রকাশ।

৩রা আগষ্ট---ইতালির জেনারেল বাল্‌বো রোমে বক্তৃতা দিয়েছেন, লীগ্ অব নেশনস্ ইংলণ্ড, ফ্রান্স আর খানিকটা আমেরিকার ম্যানেজিং এজেন্সীতে নিয়ন্ত্রিত একটা লিমিটেড কোম্পানি মাত্র।

৫ই আগষ্ট—দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া প্যারাগুয়ে সংঘর্ষ মারাত্মক হয়ে উঠেছে। মেয়েরা পর্য্যন্ত পতাকার তলে এসে দাঁড়িয়েছে।

৬ই আগষ্ট—ষ্ট্রীগের নির্দ্দেশানুযায়ী বলিভিয়া প্যারাগুয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বে সালিশী মানতে স্বীকৃত হয়েছে, প্যারাগুয়েও। কিন্তু এদিকে দুই দেশেই যুদ্ধের খুব সাজসরঞ্জাম লেগেছে।

৭ই আগষ্ট—বলিভিয়া প্যারাগুয়ের নদীপথে সমুদ্রে বেরুবার জোর দাবী জানিয়েছে।

১০ই আগষ্ট—আন্তর্জ্জাতিক তুলা-ব্যবসায়ী-সঙ্ঘের বিবৃতিতে পৃথিবীর তুলা ব্যবসায়ের দুরবস্থার উল্লেখ।

১০ই আগষ্ট—বলিভিয়াকে বৃটিশ ফ্যাসিষ্ট দল সৈন্য-সাহায্যের প্রস্তাব করেছে।

১১ই আগষ্ট—ডাবলিনে মাদাম মার্কিভিচের স্মৃতিসভায় প্যাটেল গান্ধী-টুপি প'রে উপস্থিত ছিলেন।

১৪ই আগষ্ট—প্রেসিডেণ্ট হুভারের বক্তৃতা—ইউরোপকে অস্ত্রহ্রাসের মধ্য দিয়েই মুক্তির চেষ্টা করতে হবে।

অটোয়া বৈঠকসম্পর্কে ইংলণ্ডের রাজস্ব-সচিব মিঃ চেম্বারলেনের বিবৃতি—পৃথিবীর আর্থিক দুরবস্থা-নিরাকরণের উপায় নির্দ্ধারণকল্পে পণ্যের মূল্য-বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং মূল্য হ্রাসের কারণ নাশ করার নির্দ্দেশ।

১৬ই আগষ্ট—অটোয়াতে 'মনিটারি কমিটি'র সূচনায় মিঃ চেম্বারলেনের বক্তৃতা হ'তে বোঝা যায় বাজারের চাহিদা অনুসারে পণ্যদ্রব্যাদির আমদানী-রপ্তানির ব্যবস্থা করা হবে। গত বৎসর যে সব কারণে স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হয়েছিল, সে সবের প্রতিবিধান সম্ভাবনা না হ'লে বৃটেনের স্বর্ণমানে ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই।

১৮ই আগষ্ট—লণ্ডনে নিখিলবিশ্ব-অর্থনৈতিক সম্মেলনে আটটা বৃহৎ রাজ্য যোগদান করবেন। নূতন বছরের আগে অধিবেশন হবে না। সেপ্টেম্বরের শেষভাগে প্রাথমিক বৈঠক হবে।

১৯শে আগষ্ট—অটোয়ায় বৃটেন এবং অন্যান্য উপনিবেশসমূহের মীমাংসার বাধা-বিঘ্ন অপসৃত। চুক্তিপত্র প্রস্তুত হয়েছে, প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর হওয়া শুধু বাকী।

২০শে আগষ্ট—অটোয়া-সম্মেলন শেষ। সর্ব্বসম্মত ১২টি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত। ৭টিতে গ্রেটবৃটেনের স্বাক্ষর—অন্যান্য কয়টির কানাডার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার আইরিশ ফ্রিষ্টেটের ও রোডেসিয়ার তিনটি, আর দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে নিউজিল্যাণ্ড ও আইরিশ ফ্রিষ্টেটের দুইটি।

প্রকাশ, ইঙ্গ-আইরিশ মীমাংসার ফলে গ্রেটবৃটেন ও ফ্রীষ্টেটের শুল্ক-সংগ্রামের অবসান হলেও হ'তে পারে।

বৃটিশ ভারতগবর্ণমেণ্টের মধ্যে চুক্তি ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে অনুমোদনার্থে উপস্থাপিত হবে। অনুমোদিত হ'লে আবশ্যকীয় আইন পাশ হবে। চুক্তিপরিহারের নোটিশ যে কোনও পক্ষকে ছ'মাস আগে দিতে হ'বে। সিমলা সরকারের ইস্তাহারের সারাংশ—বৃটেনে ১৯৩২ সালের আইন অনুযায়ী শুল্ক অটোয়া চুক্তির ফলে ভারতকে আর দিতে হবে না। বৃটেনে কতিপয় বিদেশী মালের শুল্ক-পরিমাণ বৃদ্ধি ক'রে তদনুপাতে ভারতীয় কতিপয় আমদানীকে অধিকতর শুল্ক-সুবিধা দেওয়া হবে। অনান্য রাজ্যগুলির সহিত রফার পর বার্লী ইত্যাদির উপর শুল্ক-সুবিধা প্রসারিত করা হবে। ভারতের আমদানী তিসি বীজকে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হবে। ভারতের তুলা ও তুলাজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে ভারতীয় ও বৃটেনের ব্যবসায়ীগণের ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্ট সহযোগিতা করবেন। ভারতকেও বৃটেনের বিশেষ কতকগুলি মোটরের উপর শতকরা ৭॥০ টাকা হারে শুল্ক সুবিধা দিতে হবে। অন্যান্য দ্রব্যের উপর সর্ত্তানুযায়ী শতকরা ১০৲ হারে শুল্ক-সুবিধা দিতে হবে। বিদেশের আমদানীর উপর অতিরিক্ত শুল্ক-স্থাপন কিংবা বৃটেনের আমদানীর উপর শুল্ক-হ্রাস দ্বারা এই ব্যবস্থা করতে হবে। ঔপনিবেশিক রাজ্যসমূহের সঙ্গেও ভারতের এমনই আদান-প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। এ সম্বন্ধে আলোচনা পরে হবে।

ইতিমধ্যেই অটোয়ায় গৃহীত নীতি শ্রমিকদলের মিঃ ল্যান্সবেরি কর্ত্তৃক লণ্ডনে নিন্দিত হয়েছে।

২৩শে আগষ্ট—অটোয়া চুক্তিসম্পর্কে ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘের সহ-সভাপতি নলিনীরঞ্জন সরকারের মত—ভারতীয় দিক হ'তে অর্থনৈতিক মূঢ়তার পরাকাষ্ঠা। এ চুক্তিতে ভারতের ক্ষতি হবে।

চুক্তি সম্বন্ধে জি, ডি, বিরলার বিবৃতি—চুক্তির ফলে ভারতবর্ষ বৃটিশ বাজারে প্রায় ১৪ কোটি টাকার দ্রব্য সম্বন্ধে সুবিধা পেয়েছে, কিন্তু ভারতীয় বাজারে বৃটিশকে ৩২ কোটি টাকা মালের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের লোকসানের মাত্রাই বেশী।

স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরের বিবৃতি—ভারতের কৃষকদের পক্ষে সমূহ ক্ষতির কারণ হবে।

২৩শে আগষ্ট—আগামী ২৭শে আগষ্ট হল্যাণ্ডে যুদ্ধ বিরোধী কংগ্রেসে যোগদানার্থে ভি, জে, প্যাটেল ২৩শে ড্রেসডেন হ'তে আমষ্টার্ডামে যাত্রা করবেন বলে জানা গেছে।

২৭শে আগষ্ট—রয়টারের সংবাদে জানা যায় আমষ্টার্ডামে আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধবিরোধী কংগ্রেসের উদ্বোধনে বিঠল ভাই প্যাটেল মিলিত প্রতিনিধি সকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

২৯শে আগষ্ট—আমষ্টার্ডামে যুদ্ধ বিরোধী কংগ্রেসে ইতালীর জনৈক নাবিক ফ্যাসিস্টদের তীব্র নিন্দা করে বক্তৃতা দেবার সময়ে মুখোস পরেছিলেন—দেশে ফিরে পাছে নির্য্যাতন সহ্য করতে হয় এই ভয়। মিঃ প্যাটেল কোন বক্তৃতা প্রদান করেন নাই। যুদ্ধ বিগ্রহের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলন চালাবার জন্য প্যারিসে এঁদের হেডকোয়ার্টার্স স্থাপিত হবে।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd., 56, Dharamtala Street. Calcutta.

উপাসনা।

নীলভারা

২৫শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৩৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ব্যর্থ পূজা

মাগো ! এত ফুল সবই বৃথা যাবে ?
চরণ সরায়ে নিলি অভিমানে রাতুল চরণ,
মাটিতে পড়িল ফুল—শুকায়ে ঝরিল বেদনায়,
পূজার ফুলের ব্যথা তুই যদি না বুঝিবি মাগো,
প্রাণের আকুতি তবে কার কাছে বল্ মা জানাই ?

দিনের অম্লান আলো, রাত্রির মলিন অন্ধকার,
প্রভাতের শুকতারা, সন্ধ্যার স্তিমিত দীপশিখা,
সকলি সমান যার জীবনের যুগসন্ধি-ক্ষণে,
প্রচণ্ড আবেগে সে ত' চলিবেই মরণের পথে !

যুগ যুগান্তের ব্যথা, সে ব্যথায় রক্তে রাঙা ফুল
চরণে আশ্রয় মাগে কি গভীর অসহ্য ব্যথায় ;
সহে না মা অবহেলা, ভ্রূকুঞ্চন রুষ্ট বাঁকা হাসি,
ফুলের এ আত্মহত্যা অভিমানে অধৈর্য্য আবেগে !

তোমারে শুধাই মাগো,—কোন পাপে অপমৃত্যু ত'ার,
অর্চ্চনার অবকাশে কোথা তার ঘটিল বিচ্যুতি ?
দলোদ্ভিন্ন কোরকের প্রাণমূলে কীটের দংশন
গন্ধ মধু নিঃশেষিত, ক্লেদপঙ্কে দলিত কুসুম।

কেন ফুল ফুটাইলি, দিলি রঙ গন্ধ মধু তারে,
ফুলের যৌবনে কেন অবরুদ্ধ এ প্রাণের জ্বালা ?
উন্মুক্ত আকাশ চাহি', যে ফুল ফুটিল ঊর্দ্ধমুখী
ধরার কঠিন ধূলা সেথা তার অনন্ত সমাধি ?

হায় মাগো মহাদেবী, শরতের এ মহা-উৎসবে
বোধনে মঙ্গলঘট কে ভাঙ্গিল নির্ম্মম হেলায়,
ফুলের জীবন হেথা পূজার লজ্জায় হতমান,
নখাঘাতে ছিন্নভিন্ন, তোরই পায়ে জানায় প্রণতি !

কত ফুল নিবি মাগো, হৃদয়-শোণিতে রাঙা ফুল
কত আর পায়ে ঠেলি' ফুলের সে অর্ঘ্য-উপচার,
ললাটে হু'কর হানি কত রক্ত বহাবি জননী,
ফুলের শ্মশানে নৃত্য তোরে আর সাজে না করালী !

বৈষ্ণব কবিতার রসগ্রহণ

—বিপিনচন্দ্র পাল

বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা আর কোনও কবিতায় এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই। প্রথমতঃ এগুলি অত্যন্ত বস্তুতন্ত্রী। বৈষ্ণব কবিকুলগুরুগণ যে সকল রসের ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কল্পিত নয়, প্রত্যক্ষ। তাঁরা যাহা অন্তরে অপরোক্ষ ভাবে অনুভব করিয়াছেন, তাহাই ভাষায় গাথিয়া অপরের আস্বাদনের জন্য অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কোনও প্রকারের কষ্টকল্পনার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। এইজন্য এই কবিতাগুলি সত্য, বাস্তব,—কল্পিত বা মায়িক নহে।

বিদ্যাপতি ঠাকুরের ভণিতায় লক্ষ্মীদেবীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই লক্ষ্মীদেবী মানুষ ছিলেন, বিদ্যাপতি ঠাকুর তাঁর রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে তাঁহাকেই সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে এই লক্ষ্মীদেবীকে না দেখিতে পাইলে বিদ্যাপতি ঠাকুরের কবিতা কিছুতেই স্ফুরিত হইত না। ইঁহারই মধ্যে তিনি শ্রীমতীকে উপলব্ধি করিয়া, আপন ভাবাবেশে, কৃষ্ণভাবভাবিত হইয়া, তাঁর অদ্ভুত পদাবলীসকল রচনা করিয়াছিলেন। হাওয়ার উপরে এগুলি গড়িয়া উঠে নাই। আর চণ্ডীদাস আপনার গভীর উদার পদাবলীর জন্য রজকিনী রামীর নিকট কতটা পরিমাণে যে ঋণী ছিলেন, তাহা তিনি নিজেই অত্যন্ত অকুণ্ঠার সঙ্গে জগতে জাহির করিয়া গিয়াছেন।

এক নিবেদন করি পুনঃ পুনঃ
শুন রজকিনী রামী।
যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইলাম আমি॥
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন করে উচাটন
দেখিলে নয়ন জুড়ায়॥
তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃপিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তোমা বিনা মোর সকল আঁধার
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।
যেদিন না দেখি ও চাঁদ বদন
মরমে মরিয়া থাকি॥
ও রূপ-মাধুরী পাশরিতে নারি
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র তুমি সে মন্ত্র
তুমি উপাসনা রস॥
ভেবে দেখ মনে এ তিন ভুবনে
কে আছে আমার আর।
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
ধোপানী চরণ সার॥

চণ্ডীদাস কোথা হইতে যে তাঁর বিচিত্র পদাবলীর নিগূঢ় রসটী আহরণ করিয়াছিলেন, এই সকল পদে তার সন্ধান পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণ-প্রেম চণ্ডীদাসের প্রাণের বস্তু, আন্তরিক সাধন-লব্ধ প্রত্যক্ষ ধন। এই বস্তু তিনি ভাগবত পড়িয়া লাভ করেন নাই। রাধা-কৃষ্ণের মানস-ধ্যান করিয়াও পান নাই। রজকিনী রামমণির শীতল চরণ ভজনা করিয়া রজকিনীর চাক্ষুষ রূপগুণে নিঃশেষে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াই তাঁর এই প্রেম লাভ হইয়াছিল। এই জন্যই ইহা বস্তু, কল্পনা নহে। ইহা সত্য, মায়া নহে। প্রাচীন মহাজনেরা সকলেই মানুষেতে এই অমানুষী প্রেমের সাধনা করিয়া তার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির যেমন লক্ষ্মী বাই, চণ্ডীদাসের যেমন রজকিনী রামী, জয়দেব ঠাকুরের সেইরূপ পদ্মাবতী ছিলেন। তাঁর পদাবলীর ভণিতায় সর্ব্বদাই পদ্মাবতীর নাম সংযুক্ত থাকে।

এই অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা গুণেই মহাজন পদাবলী একই সঙ্গে এমন সহজ ও এতটা গভীর হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রেম মানুষ জানে না। সাধকেরা দীর্ঘ সাধনা করিয়াও এই ধন লাভ করিতে পারেন না। যাঁরা বহু ভাগ্যবলে লাভ করেন, তাঁরাও গভীর ধ্যানযোগে, সগুণে-নির্গুণে মিশামিশি করিয়াই ইহার রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। অথচ সাধক না হইয়াও সাধারণ লোকেও এই মহাজন পদাবলীর রস আপন আপন

অধিকার অনুযায়ী আস্বাদন করিতে পারে। এই সকল পদাবলীর এই অনন্যসাধারণ বস্তুতন্ত্রতাই ইহার প্রধান কারণ। এই বস্তুতন্ত্রতাগুণেই আমরাও প্রথম যৌবনে কৃষ্ণতত্ত্বের বিন্দুমাত্র সন্ধান না পাইয়াও এই অদ্ভুত বিচিত্র কাব্যরস আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলাম।

এই সকল পদাবলী একদিকে যেমন নিগূঢ়তম অধ্যাত্মতত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত, অন্যদিকে সেইরূপ অতি সাধারণ ও সার্ব্বজনীন ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের সঙ্গেও যুক্ত রহিয়াছে। এই পদাবলী এই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের সঙ্গেও যুক্ত ও তারই উপরে আপাততঃ প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমরা প্রথম যৌবনে এগুলিতে এমন করিয়া মজিয়া গিয়াছিলাম। সেকালে এই কটা ইন্দ্রিয়ই আমাদের যথাসর্ব্বস্ব ছিল। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অনুভূতি তখন ভাল করিয়া জাগে নাই। ঈশ্বরতত্ত্ব তখন কেবলমাত্র স্মৃতি ও শ্রুতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। পিতৃপুরুষানুক্রমিক বিশ্বাসবলেই তখন ধর্ম্মে যা কিছু শ্রদ্ধা ছিল। মা-বাবা ঠাকুর-দেবতার কথা বলিতেন, ত্রিসন্ধ্যা আপন আপন ইষ্টদেবতার ভজনা করিতেন, পুরোহিত আসিয়া বাড়ীতে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ করিয়া যাইতেন, ঠাকুর-ঘরে শালগ্রাম, কালীবাড়ীতে কালীপ্রতিমা, বৈষ্ণব আখড়ায় রাধাকৃষ্ণ, বালগোপাল প্রভৃতি বিগ্রহ দেখিতাম। আপনার বাড়ীতেও পূজার সময়ে কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর মূর্ত্তি দেখিতাম। কুটুম্ব-বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা হইত, সেখানে যাইয়া জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিও দেখিতাম। এইরূপে আমার শৈশবের ধর্ম্মেতে দেখা-ও-না-দেখার, দৃষ্ট-ও-অদৃষ্টের, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-ও-অতীন্দ্রিয়ানুভূতির মাখামাখি হইয়া গিয়া একটা কোমল শ্রদ্ধার ও ধর্ম্মভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। দেবতা যে একান্ত অতীন্দ্রিয়, তখনও এ কল্পনার উদয় হয় নাই। দেবতা যে একান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই মোহও কদাপি অভিভূত করিতে পারে নাই। যে দেবতাকে তিন দিন এমন শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া চতুর্থ দিনে জলে ভাসাইয়া দিতে হয়, পূজার সময় অতি পবিত্র, শুদ্ধাচারী, সংযমী অভুক্ত ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহ যাঁর ঘরে প্রবেশ করিতে পারেনা, আবার পূজা অন্তে যাঁহাকে যে সে ছুঁইতে ধরিতে পারে, সেই দেবতা যে এই চাক্ষুষ প্রতিমা নহেন, এ ধারণা আপনা হইতেই জন্মিয়া যায়। আবার অন্যদিকে তাঁর যদি সত্য সত্যই মানুষের মত হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় না থাকে, তিনি যদি একান্তই অশরীরী ও অতীন্দ্রিয় হন, তবে তাঁর এই সকল প্রতিমারই বা প্রতিষ্ঠা হয় কিসে ও কোথা হইতে? অলক্ষিতে এই প্রশ্নটা যে জাগে না, তাহাও নহে। আর এইরূপ আলোচনা আন্দোলন হইতে মনের অজ্ঞাত নিরালা রাজ্যে দেবতা যে যুগপৎই শরীরী ও অশরীরী, ইন্দ্রিয়শালী ও অতীন্দ্রিয়, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, এইরূপ একটা ভাব জাগিয়া রহে। এটা হিন্দুরই হয়। মুসলমান বা খৃষ্টিয়ানের হয় না। তাঁরা নিতান্ত নিরাকারবাদী। তাঁদের শাস্ত্র-সাধনাতে দেবতার শরীর আরোপ মহাপাতক মধ্যে গণ্য। যারা দেবতার রূপ কল্পনা করে, তারা ভূতপরস্ত, কাফের, অবিশ্বাসী, আইডোলেটার—স্বর্গ তাদের জন্য নহে। তারা অসত্যের উপাসনা করিয়া অসত্যকেই প্রাপ্ত হয়, সত্যকে ও ঈশ্বরকে কদাপি পায় না। মুসলমানের বা খৃষ্টীয়ানের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অতীন্দ্রিয়ের, জড়ের মধ্যে অজড়ের, জীবের মধ্যে শিবের, এই রক্তমাংসপিণ্ড যে মানুষ তার এই রক্তমাংসের মধ্যেই ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করা অসম্ভব। কল্পনা করাও পাপ। হিন্দুর পক্ষে তাহা সম্ভব। হিন্দুর ইহাই সাধ্য। এটা না হইলে হিন্দুর সিদ্ধিলাভ হয় না। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রভাবে যখন গতানুগতিক হিন্দুধর্ম্মের বন্ধন টুটিয়া গেল, প্রতিমার দেবতাজ্ঞান যখন অসাধ্য হইয়া পড়িল, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" এই কথাটাই যখন একমাত্র সত্য তত্ত্ব বলিয়া বোধ হইল, তখনও এই পুরুষপরম্পরাগত ভাবটা একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল না। আর মতে অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবাদী হইয়াও সাধনার দ্বারা যে এই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে প্রতিষ্ঠালাভ করিলাম না, এটা পরম সৌভাগ্যের কথাই মনে করি। আমরা ব্রাহ্মই হইলাম মাত্র, বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদী যে হইলাম না বা হইতে পারিলাম না, ইহার জন্য ক্ষোভ করা দূরে থাকুক, বরং ভগবানের নিকটে বিশেষ কৃতজ্ঞতাই অনুভব করিতেছি। কারণ প্রকৃত বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষা আমাদের এই আধুনিক ব্রহ্মবাদ যুগপ্রয়োজনের দিক দিয়া দেখিলে বহু গুণে শ্রেয়স্কর বলিয়াই বোধ হয়। মধ্যযুগের বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানে জগতকে ও জীবকে মিথ্যা পর্য্যায়ভুক্ত করে। জগতের সম্বন্ধ সকলকে ক্ষণিক ও মায়িক বলিয়া উপেক্ষা করে। ভগবদারাধনাকে পর্য্যন্ত কেবল নিম্নতর অধিকারীর জন্যই বিহিত বলিয়া প্রচার

করে। চরমে কৈবল্যপ্রাপ্তি একমাত্র সাধ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করে। এ পথ জীবনের পথ নহে। এ পথ মৃত্যুরই পথ। এ পথ সত্যের পথ নহে; অসত্যের মায়ার পথ। জীবের জীবত্বই যদি নষ্ট হইয়া গেল তবে ঈশ্বরত্বই বা থাকে কোথায়? যিনি জীবকে ও জগতকে নিয়ত আপনার শক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেন তিনিই ত ঈশ্বর। আর নিয়ন্ত্রিত করিবার কিছু যতক্ষণ আছে, নিয়ন্ত্রিতের ও নিয়ন্তার ততক্ষণই অস্তিত্ব সম্ভব হয়। এই জন্যই বলি জীবের জীবত্ব আত্যন্তিক ভাবে যদি লুপ্ত হইয়া যায় তবে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বও আর থাকে না। এই জন্য বেদান্ত সিদ্ধান্তে শুদ্ধ ভক্তির ও নিত্য ভজনারই বা অবসর কোথায়? আমার এই ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ অহংভাবের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমার যে একটা বৃহত্তর বিশ্বজনীন বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হইয়াও তাহা হইতে ভিন্ন ও বিশিষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন আমিত্ব আছে, 'আমি'র সম্বন্ধে বিশ্বাত্মা নারায়ণ আমার প্রভু ও আমি তাঁর দাস, তিনি আমার উপাস্য আমি তাঁর উপাসক, তিনি আমার পিতা আমি তাঁব পুত্র, তিনি আমার সখা, আমি তাঁর সখা, তিনি আবার আমার পুত্রকন্যা, আমি তাঁর পিতা, তিনি আমার পতি, আমি তাঁর সেবিকা,—এই যে আমার বৃহত্তর আমিত্ব, তাহাও যদি তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে মুক্তি আর বিনাশ তো একই কথা হইয়া দাঁড়ায়। সংসার যায়, জগত যায়, মানুষ যায়, দেবতা যায়, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রেম, জীবনের অমৃতময় সম্বন্ধ সকল,—সমুদয়ই নষ্ট হইয়া যায়। মধ্যযুগের এই নিরাকার বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনায় যে প্রবৃত্ত হই নাই, ব্রাহ্ম হইয়াও এই ঝাঁঝের ও এই ছাঁচের ব্রহ্মজ্ঞানী যে হই নাই বা হইতে পারি নাই, ইহা পরম সৌভাগ্যের কথাই মনে করি। এই দিক দিয়া বিচার করিয়া যাঁরা ব্রাহ্ম সমাজের সাধনাকে নিষ্ফল হইয়াছে বলেন তাঁদের এই নিষ্ফলতাই আমার চক্ষে ব্রাহ্ম সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সফলতা বলিয়া বোধ হয়। এই নিষ্ফলতা লাভ না করিলে ব্রাহ্ম সমাজ আবার মধ্যযুগের অলীক ও আত্মঘাতী বৈদান্তিক ব্রহ্ম জ্ঞানকেই এদেশে জাগাইয়া তুলিত। তাহাতে ভারতীয় ধর্ম্মজীবনের বিবর্ত্তনধারা অপ্রতিহত থাকিত না, কিন্তু বিপরীত পথে যাইয়া অবরুদ্ধ হইয়াই পড়িত। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে ভক্তিবীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন তাহা ফুটিয়া উঠিবার অবসর পাইত না। আর মহাপ্রভুর ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে ব্রাহ্ম সমাজকে এদেশের ধর্ম্মবিধানের অঙ্গীভূত করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ দেবতার বিশ্বাসকেই ভাঙ্গিয়া দিল, কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতির সত্যতাকেও নষ্ট করিল না এবং এই ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যেই যে একটা অতীন্দ্রিয় সঙ্কেত নিয়ত জাগিয়া রহে, তাহাকেও উড়াইয়া দিতে পারিল না। আর মহাজন পদাবলীতেই আমরা সর্ব্বপ্রথমে এই ইন্দ্রিয়ের ও অতীন্দ্রিয়ের মাখামাখি দেখিতে পাইলাম। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি কবিতা তো অনেক পড়িয়াছিলাম ও পড়িতেছিলাম, কিন্তু একমাত্র ভবভূতির দু'একটী কবিতা ছাড়া আর কোথাও এমন উজ্জ্বল ও পরিষ্কার রূপে ইন্দ্রিয়ের ভিতরের অতীন্দ্রিয় সঙ্কেতটী দেখিতে পাই নাই। বৈষ্ণব মহাজনদিগের পরিচয় পাইবার পূর্ব্বেই ভবভূতির পরিচয় পাইয়াছিলাম। আর সর্ব্বপ্রথমে তাঁর

সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা

শ্লোকেই কেমন করিয়া ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়াই আমরা অনায়াসে রসাবেশে অতীন্দ্রিয়ে চলিয়া যাই, তাহার সন্ধান পাইলাম।

তব স্পর্শে স্পর্শে মমহি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণঃ
বিকারশৈতন্যং ভ্রাময়তি সমুন্মীলয়তি চ

এইখানে এই স্থূল স্পর্শ ব্যাপারটা যে কত পরিমাণে অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক ইহা বুঝিলাম। সখ্যরতিতেও তো এটী হয়। সে স্পর্শও তো শরীরকে ছাড়াইয়া যায়। এই অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়া এই সকল রসচিত্র উজ্জ্বল বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিল।

ভবভূতির পরিচয়-লাভের পরে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সঙ্গে পরিচয় হয়। সুতরাং স্পর্শমাত্র যেন কি অদ্ভুত যাদুপ্রভাবে এই দুই বৈষ্ণব মহাজনের রসভাণ্ডারের দ্বার আমাদের মানস চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া গেল। ভবভূতির প্রেমচিত্র বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, সম্পূর্ণরূপেই লৌকিক আচার ও সমাজধর্ম্মসম্মত। এই সকল চিত্রের অনুশীলনে কোথাও কোন বাধা ছিল না। আর ভবভূতির কৃপায় জীবনে সর্ব্বপ্রথমে কাব্যের মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়াছিলাম বলিয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতায় একেবারে দ্বিধাশূন্য হইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে ডুবিয়া যাইতে লাগিলাম। সেখানে রামসীতার মধ্যে যে প্রেম দেখিয়াছিলাম, এখানে

রাধাকৃষ্ণের মধ্যেও সেই প্রেমই দেখিতে পাইলাম। উভয় ক্ষেত্রেই দেখিলাম এ রস দেহকে আশ্রয় করিয়াই জাগে। আবার এই দেহকেই ছাড়াইয়া যায়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দরে প্রেমের দেহাশ্রয়তাই দেখিয়াছিলাম। ভবভূতিতে দেখিলাম আর এক উন্নততর ছবি। এখানেও দেহাশ্রয় আছে বটে কিন্তু যে প্রেম দেহকে ধরিয়া জাগে সেই আবার এই দেহাশ্রয়কে ছাড়াইয়া গিয়াই কেবল আপনার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ভবভূতিতে এটা দেখিতে পাইলাম। ভারতচন্দ্রের আদি রস এমিলি জোলার প্রথম বয়সের রচিত চিত্রাবলীর মত, দেহসর্ব্বস্ব, নিতান্ত realistic, একান্ত ইন্দ্রিয়বদ্ধ। অতীন্দ্রিয়ের সঙ্কেত এখানে দেহের ও ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম প্রবাহে অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। ভবভূতির আদি রস ইন্দ্রিয়জাত হইয়াও অতীন্দ্রিয়, দেহাশ্রিত হইয়াও আধ্যাত্মিক, আত্মময়, realistic হইয়াও idealistic—বস্তুতন্ত্র হইয়াও চিন্ময়। ভবভূতির চিত্রই সত্যভাবে বস্তুতন্ত্র। ভারতচন্দ্রের আদি রসকে সত্য অর্থে বস্তুতন্ত্র বলা যায় না। তাহা বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত মাত্র নহে, বস্তুতেই আবদ্ধ, আর সেই জন্যই অসত্য ও বিকৃত। ভারতচন্দ্রের প্রেমচিত্রে ইন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তি তং পাই না, যত ইন্দ্রিয়ের বিকার দেখিয়া থাকি। এচিত্র প্রকৃত পক্ষে আনন্দ-চিত্রও নহে। ইহাতে প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ না বাড়িয়া অশ্রদ্ধা ও বীতরাগই জন্মিয়া থাকে। ফলতঃ আদিরসের প্রতি জনগণের বীতরাগ জন্মানই হয়ত ভারতচন্দ্রের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। ভারতচন্দ্র শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত, তন্ত্রানুগত, কালী-উপাসক ছিলেন। অন্নদা-মঙ্গলে তার পরিচয় পাওয়া যায়। আর বৌদ্ধ সাধনায় এবং তান্ত্রিক সাধনায় উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়ভোগে বিরতি জন্মাইবার জন্য ইন্দ্রিয়সুখবিলাসকে বীভৎস ভাবে কল্পনা করিবার উপদেশ আছে। বৌদ্ধশিল্পে বিশেষতঃ বৌদ্ধ মন্দিরাদির প্রাচীর-চিত্রাদিতে এইরূপ বীভৎস ভাবোদ্দীপক জঘন্য কামাচারের বিস্তর প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের বীভৎস চিত্রগুলিও যে মূলে এই উদ্দেশ্যেই রচিত হয় নাই, ইহা বলা কঠিন। যিনি অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, তিনিই আবার কিরূপে বিদ্যাসুন্দরের এই জঘন্য চিত্রসকল অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন, আমার মনে হয়, এইখানেই এই সমস্যার একটা সঙ্গত মীমাংসা পাওয়া যায়।

ভারতচন্দ্রের আদি রসে বিরক্তির সঞ্চার করে, নিতান্ত পশুবৃত্তিতে যারা লিপ্ত নহে, তাহাদের পক্ষে এ রস আস্বাদন বা সম্ভোগ করা সম্ভব নহে। কামের প্রতি বিরক্তিসঞ্চারই ভারতচন্দ্রের সাধনার লক্ষ্যও ছিল। কিন্তু বৈষ্ণব সাধকেরা কামকে অন্য চক্ষে দেখিতেন। তাঁহাদের উপাস্য মদনারি মহাদেব নহেন, মদনমোহন নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবান। সুতরাং তাঁরা কামকে বিশুদ্ধ করিয়া রমণকে আত্মারামে উন্নীত করিয়াই আদিরসের অপূর্ব্ব চিত্রাবলী অঙ্কিত করিয়াছেন। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস দেহের রূপলাবণ্যের কথা, নায়ক-নায়িকার শরীরগঠনের ও ইন্দ্রিয়চেষ্টার কথা কহিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষের দেহলাবণ্যের বর্ণনায় তাঁরা কখনও কোনও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। আর সঙ্কোচ বোধ করেন নাই এই জন্য যে এই দেহে তাঁদের গভীর, প্রত্যক্ষ দেববুদ্ধি জন্মিয়া গিয়াছিল। ভারতচন্দ্র বিদ্যাকে কেবলমাত্র একজন প্রাকৃত রমণী বলিয়াই দেখিয়াছেন, সুন্দরকে একজন প্রাকৃত নায়করূপেই চিন্তা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা প্রাকৃত রমণী নহেন, কিন্তু দেবতা—সকল দেবতার পরম দেবতা। শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তির নিত্য, জীবন্ত বিগ্রহ। তিনি জগদারাধ্যা, জগন্মাতা। দেবতার রূপধ্যানে ভক্তিই কেবল উদ্রিক্ত হয়, কামভাব কদাপি জাগিতে পারে না। মায়ের অনাবৃত বক্ষে পীন পয়োধরদর্শনে বয়স্ক সন্তানের চিত্তে শৈশবের সেই পীযূষধারাপানের স্মৃতিই ভাসিয়া উঠে। মাতৃস্নেহের ভাবনাতেই তার প্রাণকে আপ্লুত ও আকুল করে, অন্যভাবের উদয় হয় না, হইতেই পারে না। সেইরূপ বৈষ্ণব কবিকুলগুরুগণের শ্রীরাধিকার দেহলাবণ্য-বর্ণনাতে কোনও কামগন্ধ থাকিতেই পারে না। তাঁরা হয় কৃষ্ণসখা সুবলাদির ভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীরাধিকার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, না হয় রাধার সখী বিশাখাদির ভাবভাবিত হইয়া সেই রূপ সম্ভোগ করিয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা আত্মসুখ-কল্পনা বর্জ্জন করিয়া সেই অনুপম রূপমাধুরী অন্তরে প্রত্যক্ষ ও আত্মাতে আস্বাদন করিয়া পরে আপন আপন ললিত পদাবলীতে সেই ধ্যানমূর্ত্তিকে অনূদিত করিয়াছেন। আর কবির প্রাণগত ভাব সর্ব্বদাই অধিকারী পাঠককে অধিকার করিয়া তাহাকে তার কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদনে সমর্থ করে। এই জন্যই বৈষ্ণব কবিগুরুদিগের আদি রসের বর্ণনাপাঠে, যাহাদের কিঞ্চিন্মাত্র

প্রকৃত কাব্যরসাস্বাদনের শক্তি ফুটিয়াছে, তাহাদের চিত্তে একান্ত ভাবে কোনও পশুবৃত্তিকে জাগাইয়া তোলে না। যারা প্রকৃতপক্ষে এগুলি পড়িবার অধিকারীও নহে, তাহাদের চিত্তের ইন্দ্রিয়-সুখের কল্পনার মধ্যেই একটা নিগূঢ় অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক রসের সঞ্চার করিয়া দেয়। এই জন্যই অতি অল্প বয়সেও ভারতচন্দ্র পড়া আর বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস পড়া কখনওই বোধ হয় সমান ফল উৎপাদন করে না। একেতে কেবল কামকেই প্রদীপ্ত করে, অন্যেতে কামের সঙ্গে সঙ্গেই অপরিহার্য্য রূপে প্রেমকেও উদ্রেক করিয়া থাকে। কাম ইন্দ্রিয়েতেই জন্মে, আর ইন্দ্রিয়েতেই আবদ্ধ হইয়া রহে। প্রেম ইন্দ্রিয়েতে জন্মিয়াও ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া বিশুদ্ধ রসরাজ্যে যাইয়া পড়ে। পঙ্কজ যেমন পঙ্কে জন্মে বলিয়া সেই পঙ্কেতেই পড়িয়া গড়াগড়ি যায় না, কিন্তু জন্মিবা মাত্রই সেই পঙ্ককে ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধে নির্ম্মল, সুনীল, সূর্য্যকিরণমণ্ডিত অনন্ত আকাশের পানে বাড়িতে আরম্ভ করে, সেইরূপ প্রেমও ইন্দ্রিয়-বিকারেই উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু জন্মিয়াই এই বস্তু নিয়ত এই ইন্দ্রিয়ের বন্ধনকে ছাড়াইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। ইন্দ্রিয় কিছুতেই তাহাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তিদান করিতে পারে না, অথচ ইন্দ্রিয় এই প্রেমরসপানে আপনি অমনি লুব্ধ হইয়া যায় যে তাহাকে সহজে ছাড়িয়াও দিতে পারে না। বৈষ্ণব মহাজন দিগের কবিতায় কামে-প্রেমে ইন্দ্রিয়ে অতীন্দ্রিয়ে এই সংগ্রাম ও হুড়াহুড়ি প্রত্যক্ষ করি। এমন ভাবে আর কোনও কবিতায় realism এবং idealismএর, জড় ও চৈতন্যের, শরীর ও আত্মার এমন মাখামাখি, এমন আঙ্গাঙ্গী ভাব, এমন নিবিড় আলিঙ্গন, এমন সংগ্রাম ও হুড়াহুড়ি দেখিতে পাই না। এইখানে দেখি প্রেমিক জন যতই একদিকে ইন্দ্রিয়কে আঁকড়াইয়া ধরেন ততই আবার অন্যদিকে এই ইন্দ্রিয়ের সীমাকে ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য তেমনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন। যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধরা যায় না, ইন্দ্রিয় তাহাকেই ধরিবার জন্য আকুল হইয়া উঠে, আর এই ইন্দ্রিয়ের ও অতীন্দ্রিয়ের মল্লযুদ্ধ হইতেই স্বেদ, কম্প, পুলক, অশ্রু, বিবর্ণ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি সাত্বিকী ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

বৈষ্ণব কবিতার সম্যক রস গ্রহণ করিতে হইলে এই ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় সঙ্কেতটী ধরিতে হইবে, realism এবং idealismএর চিরন্তন বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে হইবে। যাহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ তারই মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় সত্য নিত্য বিরাজ করে, যাহাকে লোকে ইন্দ্রিয়রস বা বিষয়রস বলে তারই মধ্যে যে নিখিলরসামৃতমূর্ত্তির রসধারা নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, জীবের আনন্দমাত্রেই যে ব্রহ্মানন্দ ও চিদানন্দ এই তত্ত্বটী বুঝিতে হইবে। এই পথেই আমরা প্রথম যৌবনে মহাজন-পদাবলীর কাব্যরস মাত্র আস্বাদন করিয়া ক্রমে গুরুকৃপায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলারসের যৎকিঞ্চিত সন্ধান পাইয়াছি।

ভাস্কর্য্যে বিরাটের সৃষ্টি

—শ্রীযামিনীকান্ত সেন

ভারতের রূপ-কল্পনায় একটা অপরিসীম সাহসিকতা লক্ষ্য করা যায়। এই সাহসিকতা প্রতিফলিত হয়েছে শিল্প-সমারোহের দুর্লভ ঐশ্বর্য্যের ভিতর: বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যের যুগ্ম প্রকাশে জগতে এই রূপসমুচ্চয় অজেয় হয়ে আছে।

উপনিষদ ভগবানের রূপ-কল্পনায় বলেছে তিনি অনু হ'তে অনু, মহৎ হ'তে মহীয়ান। এই ক্ষুদ্র উক্তির ভিতর সুপ্ত একটা কল্পনার ক্রীড়া রয়েছে। বাস্তবিকই ভারতের শিল্পী অনুর পথে ও মহতের পথে অগ্রসর হ'য়ে বিস্ময়কর রূপসৃষ্টি করেছে। প্রাচীন শিল্পবিদ্ Vincent Smith বলেছেন যে এশিয়ার বৃহত্তম দণ্ডায়মান মূর্ত্তি হচ্ছে ভারতবর্ষে, "the longest free standing statue of Asia is in India". বস্তুতঃ একথাটি শুধু এশিয়ার নয় সমগ্র জগতের তুলনায় প্রযোজ্য। অসামান্য সুষমা-সম্পন্ন ভারতীয় অতিকায় মূর্ত্তির সমকক্ষ কিছু জগতে নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। এই মূর্ত্তি অতি নিপুণ ভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে, ভাবাবেশে ইহা একান্ত ভাবে ভরপুর, এবং আকারে সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর সকল মূর্ত্তিকেই পরাজিত করেছে।

জৈন ধর্ম্মই জগৎকে এই বিরাট মূর্ত্তি দান করেছে। জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষাও অনেক প্রাচীন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে ভারতের মূর্ত্তিকলা নানা অপরূপ মূর্ত্তি-সঞ্চয়ে পরিপুষ্ট হয়েছিল—কিন্তু জৈন ধর্ম্মের দানও এ ক্ষেত্রে সামান্য নয়। বলতে গেলে জৈনপ্রভাব কলাক্ষেত্রে আশ্চর্য্য ভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। জৈনতত্ত্ব জগতে যেমন একটা দুর্লভ বস্তু, জৈনকলাও তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাজেয় হয়ে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করছে। জগতের সুন্দরতম কলার অন্যতম হিসাবে জৈনকলা সকলেরই মনোরঞ্জন ক'রে ধন্য হয়েছে।

যারা আবু পাহাড়ে দিলওয়ারা মন্দির দেখেছে তারা জৈন শিল্পীর সাহসিকতা দেখে মুগ্ধ হয়েছে। Col. Erskine এর মতে জগতের সব কিছুকেই ইহা অতিক্রম করেছে, "surpasses everything seen elsewhere". অতি ক্ষুদ্র, সূক্ষ্ম ও সুকুমার খোদাই কাজে জগতে জৈনশিল্পের তুলনা পাওয়া যায় না। কোন ইউরোপীয় বলেন—"unsurpassed by any similar example found anywhere else." যখন জৈনকলা বিরাটের ও মহতের ধ্যান করেছে তখন সে এমনি জিনিষ রচনা করেছে যার তুলনা পাওয়া কঠিন। বিরাটের ব্যঞ্জনা অতি দুরূহ, কারণ বিরাটকে মর্ম্মরীভূত করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। লৌকিক মানুষের শরীর সম্বন্ধে একটা প্রকৃষ্ট ধারণা করা যায় কারণ মানুষের শরীরের পরিমাপ অতি ক্ষুদ্র। সমগ্র শিল্পচেষ্টাকে চোখের সামনে রেখে ধীরে ধীরে পাথরে উৎকীর্ণ করার ভিতর বিশেষ কৃতিত্ব নেই, কিন্তু প্রকাণ্ড, দুর্লক্ষ্য ও দুরধিগম্য, অলৌকিক মূর্ত্তি রচনা করা একটা অতিমানবিক ব্যাপার, তার ভিতর লালিত্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা একটা কঠিন সমস্যা। আশ্চর্য্যের বিষয় ভারতবর্ষে এই সমস্ত বিরাট সমুচ্চ অতিকায় মূর্ত্তিকে পরিপূর্ণ শ্রী ও দুর্লভ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করা অসম্ভব হয়নি। কোন ইংরেজ লেখক জৈন শিল্পের সৌকুমার্য্য সম্বন্ধে বলেন—"the Gothic architects look coarse and clumsy in comparison in what they have done in Henry the Seventh's chapel at Westminister or at Oxford." জৈন মন্দিরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এবং নিপুণ তক্ষণ-চেষ্টা মর্ম্মরের সঙ্গীতস্থানীয় হয়েছে—তার যেমন তুলনা পাওয়া কঠিন তেমনই জৈন মূর্ত্তির তুলনায় মিশর ও অন্যান্য দেশের অতিকায় মূর্ত্তির ব্যঞ্জনা দুর্বল ও প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। জৈন ধর্ম্মের আন্তর তত্ত্বই এই সাফল্যের উৎস বলতে হয়। সে তত্ত্ব ক্ষুদ্রকে বিরাট রূপে দেখেছে এবং বিরাটকে সামান্য রূপে কল্পনা করতে দুঃসাহস করেছে।

জগতের সকল মূর্ত্তি অপেক্ষা বৃহত্তর মূর্ত্তিরচনার ঝোঁক এমনি করে জৈন সাধকের চিত্তে এসে পড়ে। ক্ষুদ্রের ভিতর বিরাটকে লক্ষ্য করতে গিয়ে দিলওয়ারা মন্দিরের নক্সা জগতে অপরাজেয় হয়েছে। জৈনদের অন্যতম কীর্ত্তি কাণপুর মন্দিরের ground-plan বা আয়তন পৃথিবীর সকল মন্দির অপেক্ষা বড়—ইহাও জৈন স্থপতির অতুল কীর্ত্তি। স্থাপত্যে বিরাটকে উৎকীর্ণ ও ফলিত করার বিরাট চেষ্টা এমনি ভাবে এই আশ্চর্য্য

গোমতেশ্বর মূর্তি—উচ্চতা ৬০ ফিট

মন্দিরখানি রচনায় সফল হয়েছে। বিরাটের দিক্ হ'তে এই মন্দিরখানি যেমন জগতে অপরাজেয় হয়ে আছে তেমনি জৈন মহাপুরুষ বা তীর্থঙ্করদের সাধনায় মহত্তের যে উদ্ঘাটন হয়েছে তাও এই বিরাট মন্দিরের মতই দুঃসাধ্য ও কল্পনাতীত ব্যাপার। স্থাপত্যে কাণপুর মন্দির "মহতো মহীয়ান"এর প্রতীক-স্থানীয়। ভাস্কর্য্যে দক্ষিণ ভারতবর্ষের তীর্থঙ্কর মূর্ত্তিও এই মহত্তের সমুচ্চ প্রকাশ।

মানুষ বিরাটের ভাবকে অন্তরে উপলব্ধি ক'রে ও আঁকড়ে' ধরে তৃপ্ত হয়। তাকে মর্ম্মরিত ও ধ্বনিত করেই সে আশ্বস্ত হয়। যা' সে পায় জগৎকে সেই অমৃতের টুক্‌রো দিতে না পারলে সে বাঁচেনা। জৈন তীর্থঙ্করের বিরাট কল্পনার নিকট নীট্‌সের অতিমানব-কল্পনা হার মেনেছে। অজানার অসীম পরিধি মহত্তের ভিতর দিয়েই উদ্ঘাটন করতে হয়। পর্ব্বত-প্রমাণ মূর্ত্তি শুধু সেই অন্তর-বার্ত্তাকেই প্রকাশ করেছে যা'র কাছে মানুষের খর্ব্বতা, ক্ষুদ্রতা চিরকালের মত তীর্থঙ্কর-কল্পনায় তুচ্ছ হয়ে' গেছে। পশ্চিমের পর্য্যটকেরা তীর্থঙ্করের বিরাট মূর্ত্তিতে কেবল বিরাটত্ব দেখেনি, তারা দেখেছে "the wonderful contemplative expression touched with a faint smile" যে মূর্ত্তি বহুদূর থেকে না দেখ্‌লে ধারণা করাই অসম্ভব যে তা'র ভিতর উৎকীর্ণ করে' এরূপ দুরূহ ও সূক্ষ্ম ভাব সঞ্চার করা কি কঠিন।

দক্ষিণ ভারতে শ্রাবণ বেলগোলা পল্লীতে তীর্থঙ্করের যে মূর্ত্তিটি পাওয়া যায় তা একটা অসাধারণ সৃষ্টি। এই মূর্ত্তিটির নাম হচ্ছে গোমতেশ্বর। দৈব শক্তি দ্বারা এ তৈরী হয়েছে এরূপ মনে করা অস্বাভাবিক নয়। মূর্ত্তিটি তৈরী সম্বন্ধেও অনেক কিম্বদন্তী আছে। বহুদূর হ'তে না দেখ্‌লে ৬০ ফুট অপেক্ষাও দীর্ঘ এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে একটা ধারণাও করা যায় না। শিল্পীদের চোখের সামনে সব মূর্ত্তিটি কখনও পড়েনি, এক একটা অংশকে তৈরী করে' উচ্চ হ'তে উচ্চতর মঞ্চে উঠে প্রকাণ্ড পাথরের পাহাড়কে খোদাই কর্‌তে হয়েছে।

কথিত আছে ডিউক অব ওয়েলিংটন এই মূর্ত্তি দেখে একেবারে অবাক্ হয়েছিলেন। মিশরের র‍্যামেশিস্ মূর্ত্তি এ মূর্ত্তির তুলনায় ছোট - শুধু তা নয়, মূর্ত্তিটি অতি সমুচ্চ হ'লেও একে দেখা মাত্র জীবন্ত ব'লে মনে হয়। এরকম প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা এশ্রেণীর মূর্ত্তি সম্পর্কে দুঃসাধ্য। প্রকাণ্ড প্রস্তর-স্তূপের বন্ধন হ'তে এই প্রাণসম্পর্ক মূর্ত্তটিকে মুক্ত করেছে। এই জন্যই ডিউক অব ওয়েলিংটনের বিস্ময় শুধু একটা
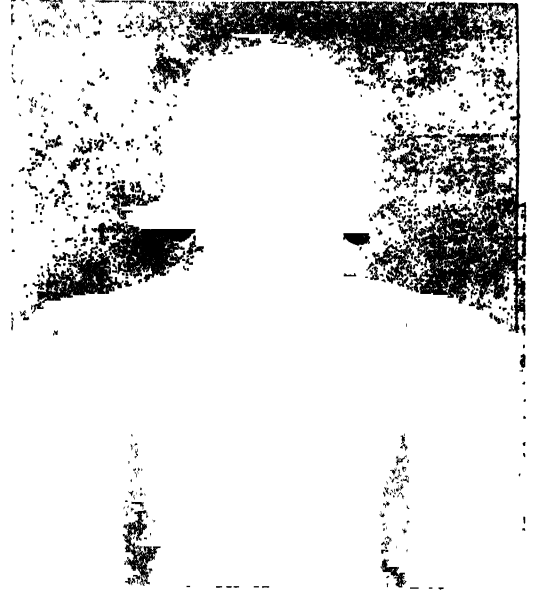
দক্ষিণ ভারতের গোমতেশ্বর—ঊর্দ্ধ অংশ।

অলীক ব্যাপার নয়। যখন এই ইংরাজ সেনাপতি সেরিঙ্গাপতম্ অবরোধের সময় একটা বিরাট বাহিনী নিয়ে আসেন, তখন এই মূর্ত্তিটি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। তাঁর বিষয় উল্লেখ ক'রে কোন লেখক বলেন —"he was astonished at the amount of labour such a work must have entailed and was puzzled to know whether it was a part of the hill or had been moved to the spot where it now stands."

বলা বাহুল্য জৈনধর্ম্ম ও তত্ত্ব না জান্‌লে এই শ্রেণীর মূর্ত্তির অন্তর-বার্ত্তা বোঝা যাবেনা। জৈনেরা চতুর্বিংশতি "জিন" বা অবতারকে বিশ্বাস করে। এই 'জিন'দেরই তীর্থঙ্কর বলা হয়। তার মানে হচ্ছে দুঃখপূর্ণ নদীপ্রবাহের মত জন্মজন্মান্তর তাঁরা পার হয়েছেন। জিনদের নানাবর্ণে আঁকা হয়—ষোলটি মূর্ত্তিকে পীতবর্ণে, দু'টি লাল, দু'টি শ্বেত, দু'টি নীল ও দু'টি কৃষ্ণবর্ণে আঁকা হয়। কথিত আছে প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ ২,৭৫০ গজ উচ্চ ছিলেন। সর্ব্বশেষ

তীর্থঙ্করদের নাম পার্শ্বনাথ ও মহাবীর। মহাবীর লোকালয় ত্যাগ ক'রে অরণ্যে প্রস্থান করেন। দ্বাদশ বর্ষ সাধনার পর তিনি সাধুত্ব প্রাপ্ত হন্। তিনি নগ্ন ভাবেই অরণ্যে বিহার করেন এজন্য তাঁর অনুচরেরা দু'ভাগে বিভক্ত হ'য়ে পড়ে—দিগম্বর অর্থাৎ যাঁরা বস্ত্র পরিধান করেন এবং শ্বেতাম্বর, যাঁরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন। এই সমস্ত অতিকায় মূর্ত্তি দিগম্বর-পন্থীদের দেবতা—এজন্য নগ্ন ও বস্ত্রহীন।

জিন শব্দের অর্থ হচ্ছে জয়ী। বার বার জন্মগ্রহণকে যাঁরা নিরোধ করতে পেরেছেন তাঁরাই হলেন জিন। প্রথম জিন ৮৪,০০,০০০ বছর বেঁচে ছিলেন। দ্বিতীয় জিন প্রথম অপেক্ষা আকারে ছোট ছিলেন এবং ৭২,০০,০০০ বছর জীবিত ছিলেন। ক্রমশঃ জিনদের শরীরের দীর্ঘতা খর্ব্ব ও আয়ু সামান্য হয়ে' পড়ে। শেষ তীর্থঙ্কর দু'জন মানুষের আকারই পেয়েছিলেন এবং মানুষ অপেক্ষা বেশী দিন বাঁচেন নি। মহাবীর জিনত্ব লাভ করেন শারীরিক ক্লেশ-চর্চ্চার ভিতর দিয়ে, বুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন গভীর চিন্তার ফলে। এ দুটি ধর্ম্মের এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করতে হবে।

জিনতত্ত্ব বাহুল্যের ও বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী। এজন্যই সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব-জন্তুকেও মর্য্যাদা দেওয়া হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলঙ্করণও জৈনের পক্ষে অবহেলার ব্যাপার নয়। আত্মার বহুত্ব যে ধর্ম্ম অনুমোদন করে সে ধর্ম্ম কোন জীবকেই তুচ্ছ করতে পারে না। পরেশনাথ পাহাড়, আবু পাহাড় ও শত্রুঞ্জয় পাহাড় প্রভৃতি জৈনদের পবিত্র তীর্থস্থান।

দক্ষিণ ভারতে এক সময় জৈনদের প্রাধান্য ছিল। এই জায়গাতেই অতি-কায় মূর্ত্তিগুলি রচিত হয়। জৈনচিত্ত কখনও ভাবেনি যে এই মূর্ত্তিগুলি জগতের পক্ষে আশ্চর্য্য ব্যাপার হবে। গভীর নিষ্ঠায় উৎসাহিত হয়ে পাহাড় কেটে একটা মূর্ত্তি করতে যাওয়া যে কিরূপ ব্যয়সাধ্য ও দুঃসাহসের ব্যাপার তা' হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। এটা বলতেই হবে অন্যত্রও বিরাটের রচনাবিষয়ে দুঃসাহস দেখতে পাওয়া যায়। Pyramid ও Sphinx রচনা করতে এক লক্ষ লোকের ঊনত্রিশ বছর প্রয়োজন হয়েছে; অথচ স্বীকার করতে হয় এরূপ সুশ্রী সুগঠিত ভগবান মূর্ত্তি রচনা করা মিশরের পক্ষে অসাধ্য হয়েছে। এজন্য ডিউক অব ওয়েলিংটনের পক্ষে এ সমস্ত মূর্ত্তি বিস্ময়ের ব্যাপার হয়েছিল—তিনি এরকম একটা মূর্ত্তি রচনায় কি অসাধারণ ব্যয় হ'তে পারে তা' ধারণাও করতে পারেন নি।

মিশরের র‍্যামেশিস মূর্ত্তি—উচ্চতা ৩৭ ফিট্

মিশরের আবু-সিম্বেল মন্দিরের মূর্ত্তির প্রশ্ন সহজেই উঠে। বৃহতের সাধক মিশর জগতে আশ্চর্য্য সম্ভার রেখে গেছে। নিউবিয়াতে পাহাড় কেটে এ মন্দিরটি রচিত হয়। প্রথম এ মন্দিরখানিকে ভূ-প্রোথিত অবস্থায় দেখতে পান Burctbardt. নীল নদী হতে একশ ফুট উপরে একটা পাথরের পাহাড়ের নীচে ইহা স্থাপিত। এই মন্দিরে চারটি বিরাট মূর্ত্তি আছে। এর এক একখানি দরজাও সামান্য নয়। একখানি উঁচুতে ৩৮ ফিট, অন্যটি ৪৮ ফিট। এই সব মূর্ত্তিগুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দীর্ঘতা দেখলে তাক্ লেগে যায়। স্কন্ধদেশ হ'তে কনুই পর্যান্ত পনের ফিট ছয় ইঞ্চি, কানগুলি তিন ফিট ছয় ইঞ্চি। মুখ হচ্ছে সাত ফিট, স্কন্ধদেশ পচিশ ফিট চার ইঞ্চি, মূর্ত্তিগুলির উচ্চতা ৩৪ ফিট। কিন্তু এই বিরাট মূর্ত্তিগুলি জৈন মূর্ত্তি অপেক্ষা ছোট।

লঙ্কা দ্বীপের বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি—উচ্চতা ৪৬ ফিট্।

মন্দিরের ভিতরকার আবেষ্টনের অঙ্কে এরূপ মূর্ত্তি রাখলে 'তা' ব্যর্থ হয়, কারণ মূর্ত্তিটিকে চারিদিকের দিগ্‌মণ্ডল হ'তে লক্ষ্য করার সুযোগ ঘটে না। গোমতেশ্বরের মূর্ত্তি একটা বড় রকমের প্রাণহীন কাঠের পুতুলের মত ব্যাপার নয়। এই মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী আছে।

এ মূর্ত্তিটি ছাড়া আরও দুটি মূর্ত্তিও এ অঞ্চলে আছে। একটি ক্যাটকোলার কাছে, এটির উচ্চতা হচ্ছে ৪১ ফিট ৫ ইঞ্চি। আর একটি মূর্ত্তির উচ্চতা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ ফিট মাত্র, কাজেই সব কয়টি মূর্ত্তিই আবু-সিম্বেলের মূর্ত্তিগুলি অপেক্ষা উচ্চতর। আবু-সিম্বেলের মূর্ত্তির উচ্চতা চৌত্রিশ ফিট মাত্র। লঙ্কাদ্বীপেই বোধ করি বুদ্ধদেবের সর্ব্বোচ্চ মূর্ত্তি আছে। সে মূর্ত্তির উচ্চতা হচ্ছে ৪৬ ফিট, কাজেই শ্রাবণ বেলগোলার মূর্ত্তিকে পরাজিত করা এ মূর্ত্তিটির পক্ষেও সম্ভব হয়নি।

শ্রাবণ বেলগোলা গ্রামের গোমতেশ্বরের মূর্ত্তি এজন্য জগতের এক আশ্চর্য্য বস্তুরূপে পরিগণিত হয়েছে। একটা বিরাট ও উন্মুক্ত জায়গা গোমতেশ্বরের সামনে রয়েছে। মিশরের মূর্ত্তির মত এই বিরাট রচনার background ক্ষুদ্র ব্যাপার নয়।

প্রায় ৪০০ ফুট উচু পাহাড় কেটে গোমতেশ্বরের মূর্ত্তি রচিত হয়। ভাস্কর যখন এ মূর্ত্তিটি খোদিত করে তখন এক-সঙ্গে সব অংশ দেখতেও পায় নি। কোন লেখক বলেন—it is not possible for a sculptor who does not

get a full view of the subject to work out a unity consistent with the demands of art and far less any expressional fineness. That this could be acheived in a statue 60 ft. high is what makes this image a marvel for all times.

উত্তর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে গোমতেশ্বরের মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। মুখখানি অতি শান্ত, চুলগুলি মাথার সব জায়গায় কোঁকড়ান, কানগুলি দীর্ঘ ও বড়। হাঁটুর জায়গায় ভার রাখ্‌বার কোন আধার নেই। বহু মাইল পর্য্যন্ত এই মূর্ত্তিটি পর্য্যটকদের দৃষ্টিগোচর হয়। দু'টি পা লতাবেষ্টিত। গোমতেশ্বর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দুনিয়ার সকল আবেষ্টনের প্রতি উদাসীন, এরকম একটা ভাবকে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। স্থির নেত্রে এই মূর্ত্তিটি বিশ্বের রহস্য সম্বন্ধে চিন্তামগ্ন এরূপ মনে হয়। তাঁর স্কন্ধগুলি সোজা, হাতদুটি সবল ভাবে নীচের দিকে পড়ে আছে। চারিদিকের বেষ্টনীর ঊর্দ্ধে শরীরের ঊর্দ্ধাংশ আছে। গ্রানাইট পাথর থেকে এ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। তা অতি সূক্ষ্ম অনুসম্পন্ন (finegrained), একটু হাল্‌কা রকমের ছাই রঙের। মূর্ত্তিটি দেখে মনে হয় যেন কাল মাত্র খোদাই করা হয়েছে। কোন লেখক বলেন—the figure stands as fresh to day as when it came out of the chisel of the sculptor for it has not been spoiled or broken by the violence of weather or otherwise. গোমতেশ্বর এম্‌নি করে' কালজয়ী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

এ মূর্ত্তিটির নানা মাপ নেওয়া হয়েছে। Mr. Bowring এর মতে মূর্ত্তিটির উচ্চতা ৫৭ ফিট ; Duke of Wellington এর মতে ৬০ ফিট তিন ইঞ্চি, Mr. Buchanan মনে করেন ৭০ ফিট তিন ইঞ্চি। নানা অবয়বের পরিমাপও কৌতূহলজনক। মাথার উপর হ'তে কান পর্য্যন্ত ১৬ ফিট ; আঙ্গুলের মাপ হচ্ছে—তর্জ্জনী তিন ফিট ৬ ইঞ্চি, মধ্যমা ৫ ফিট ৩ ইঞ্চি। এই বিরাট নগ্ন মূর্ত্তিতে কোন অশোভনতা নেই। কত রাজার উত্থান ও পতন, কত সৈন্য সমারোহের আগমন ও প্রস্থান গোমতেশ্বর দেখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। প্রায় হাজার বছর পূর্ব্বে এমূর্ত্তি রচিত হয়েছে, এই হাজার বছরে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে কত বিপ্লব হয়ে গেছে ইয়ত্তা নেই। মহাযোগীর চোখে সবই পড়েছে। অবিচলিত ভাবে ভারতের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন দেখেও এ মূর্ত্তি আজও স্থির ও ধীর।

১১৮০ খ্রীষ্টাব্দে জৈন কবি বোপ্পানা রচিত একটি inscriptionএ গোমতেশ্বর সম্বন্ধে একটি কৌতূহলকর বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি প্রথম তীর্থঙ্কর পুরুদেবের সন্তান। তাঁর এক অগ্রজকে তিনি পরাজিত করেন। কিন্তু তিনি ভাইয়ের হাতে রাজ্যভার দিয়ে অরণ্যে চলে' যান। ভারত রাজ্যভার গ্রহণ করে' অগ্রজের এক বিরাট মূর্ত্তি স্থাপন করেন। ক্রমশঃ স্থানটি জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে' যায় এবং নানা জীবের আবাসস্থল হয়ে পড়ে। এজন্য মূর্ত্তিটি কুক্কুটেশ্বর নামে পরিচিত হয়। ক্রমশঃ মূর্ত্তিটিকে আর দেখ্‌তে পাওয়া যায়না। চামুণ্ডা রায় এ বিবরণ শুনতে পেয়ে মূর্ত্তিটির খোঁজ নিতে চেষ্টা করেন। তিনি জঙ্গলে পরিপূর্ণ সে অঞ্চলে যাওয়া সম্ভব মনে না করে নিজেই একটা প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

কথিত আছে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সময় একটা রহস্যময় ঘটনা ঘটে। মূর্ত্তিকে আপাদমস্তক দুধ দিয়ে স্নান করান হচ্ছে চিরন্তন রীতি। কিন্তু গোমতেশ্বরের মূর্ত্তিটি এত প্রকাণ্ড যে দুধ ঢেলে দেওয়াতে উরুদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছে—তার বেশী সম্ভব হয়নি। চামুণ্ডা রায়ের গুরু এক অলৌকিক উপায় আশ্রয় করে' এই বিফলতা নিবারণ করেছিলেন। একটা বৃদ্ধা নারী সামান্য একটা বেগুনের আধারে যেটুকু দুধ অর্ঘ্য দিতে এনেছিল তাই গ্রহণ করবার তিনি হুকুম দিলেন এই রহস্যময় দুধটুকু মাথার উপর দেওয়া হল এবং দেখ্‌তে পাওয়া গেল তা' ক্রমশঃ বন্যার মত মূর্ত্তিটিকে ভিজিয়ে ফেল্‌ল। বাস্তবিকই মূর্ত্তিটি যেমন অলৌকিক তেমনি এ বিবরণটিও তা'র যোগ্য বটে।

একটা বিরাট প্রাণস্পর্শ না পেলে এরকমের মূর্ত্তি রচনা করা যায় না। ধর্ম্মগুরু, রাজ্যশাসক, শিল্পী সকলে মিলে অসীম সাধনা করেছে বলেই এ রকমের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। কত সময় লেগেছে বা কত মুদ্রা ব্যয়িত হয়েছে সে খবর কেউ রাখেনা—আমরা একেবারে কালের সকল বিবরণ হ'তে নির্ম্মুক্ত, সকল আবেষ্টন হ'তে স্খলিত এই মূর্ত্তিটিকে বিশ্বের একটা অদ্ভুত প্রকাশ বলে' দেখ্‌তে পাই। ভাব্‌বারই সময় পাওয়া যায় না—ইহার সৃষ্টির ইতিহাস কত সাধনা, অনিদ্র রজনী, কঙ্কণসংগ্রহ এবং সর্ব্বোপরি অসীম নিষ্ঠাতে এ রকমের মনোহর বিরাটের মূর্ত্তি রচিত হ'তে পারে। এ যুগের অবিশ্বাসী চিত্ত কোন ধারণাই করতে পারে না। কেজো জগতের ভিতর এমন একটা অকোজা(?) সৃষ্টি সেকালের রাজন্যেরা কেন করলেন এ প্রশ্ন করে' আর লাভ নেই। শত সহস্র দর্শক ভারত-পরিক্রমা ব্যাপারে এ মূর্ত্তির নিকট মাথা নত করে' ধন্য হচ্ছে। Duke of Wellington মাত্র নয়, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকলেরই কাছে এ মূর্ত্তিটি একান্ত বিস্ময়ের বস্তু। একটা বিরাট চিত্তের আধাররূপে কল্পনা করে' গোমতেশ্বর-রচনায় শিল্পীরা যে সফলতা লাভ করেছেন তাতে সমগ্র ভারত ধন্য হয়েছে। আজ বোঝা যায় অনু হ'তে অনু, মহৎ হ'তে মহৎ কি তা ভারতের হৃদয়ে চিরকাল জাগরূক ছিল।

অনিশ্চিত

—শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

ঠিক গ্রামও নয়, অথচ ঠিক সহরও বলা চলে না। সহরের সমারোহ আসিতে সুরু করিয়াছে, কিন্তু তার গ্লানি এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। লোকগুলিকে এখনও পল্লীবাসী বলিয়া পরিচিত করা যায়। কিন্তু এই পল্লী-জনতার সবাইকে লইয়া আমাদের কাজ নাই, ভিড়ের ভিতর হইতে মাত্র দুইটী প্রাণীকে বাছিয়া লইলেই আমাদের চলিবে।

তাহাদের নাম জীবন ও বিজয়া।

তাহাদের দুইজনকে লইয়াই আমার এই গল্পের সুরু এবং তাহাদের লইয়াই শেষ।

বুড়ো শিব-মন্দিরের পিছনটায় কতকগুলি শিরীষ ও আমলকীর গাছ যেখানটায় ভিড় করিয়া আছে, সেইখানটায় জীবন ও বিজয়া তাহাদের নীড় রচনা করিয়াছে। ছোট বাড়ী—একতলা; কিন্তু বিজয়া সেই ক্ষুদ্রতাকে এমন একটি পরিচ্ছন্ন রূপ দিয়াছে যে সেখানে আর ছোট বড়র কথা উঠিবার প্রয়োজনই হয় না। উঠানটী এমনি ঝক্‌ঝকে যে রাত্রিতেও সেখান হইতে সামান্য একটা স্ঁচ খুঁজিয়া লওয়া যাইতে পারে। দক্ষিণ দিকটায় শান-বাঁধান একটী কূপ এবং তাহার একটু দূরে বন-মল্লিকা, রজনী-গন্ধা পর্য্যন্ত! পাঁচিলের কোণ ঘেঁষিয়া কলাব যে চারাগুলি ক্রমেই বড় হইতেছে, তাহাদের শ্যামলতা মধ্যাহ্নের কুৎসিত তীব্রতাকে অনেকখানি স্নিগ্ধ করিয়া রাখে।

তাহাদের দু'জনার পৃথিবীর নীড়ের বাহিরের পরিচয় অল্প কথায় এইটুকুই।

কিন্তু এইটুকুই সব নয়।

জীবন ও বিজয়ার শোবার ঘরটীতে পা দিলে মনে হইবে যেন একটা তীর্থলোকে পা দিলাম। কবি-কল্পনার অতিশয্য নয়, সত্যিই ঠিক এই কথাই মনে হইবে। অথচ, কিছুক্ষণ সেই ঘরটীর মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, এমন কিছুই সেখানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যাহার কথা বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিতে পারি। সামান্য সংসারের শুইবার ঘর,—বালিস, বিছানা, মশারী, একটা ওয়াল-ক্লক্‌, ছোট একটি টেব্‌লের উপর আর্শী, চিরুণী, বিজয়ার চুল বাঁধিবার সরঞ্জাম, গোটা দুই এসেন্সের শিশি, পাউডারের কৌটা, ফুলদানীতে গোটাকত টাটকা ফুল, এ সব সেখানে থাকিবারই কথা এবং তাহাতে বৈচিত্র্যই বা এমন কি আছে! কিন্তু এই কয়টা জিনিষকেই বিজয়া এমন পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজাইয়াছে যে ঘরের মধ্যে ঢুকিতে গেলেই ভয় হয়—এখনই বুঝি সেগুলির শ্রী আর সৌন্দর্য্যের হানি ঘটিয়া যাইবে।

বাড়ীটিতে ঘর আরও দুইটী আছে, কিন্তু ইহার সমগোত্র কেউ নয়। এই ঘরেই বিজয়া আর জীবন পরস্পর পরস্পরকে চিনিয়াছে, পরস্পরকে লইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছে এবং দেখিতেছে।

বিজয়া এবং জীবনকে ছাড়িয়া দিলে এ সংসারে আর শুধু দুইজন,—জীবনের মা এবং ছোট একটি বোন। কিন্তু জীবন ও বিজয়ার আড়ালে ইহারা শুধু গল্পে নয়, জীবনেও অত্যন্ত তুচ্ছ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই দুইজনের কথা বলিতে গিয়া বাকী দুইজনের কথা যদি কিছুই বলিতে না পারি, তাহা হইলে সে দোষ আমার গল্পের নায়ক-নায়িকার।

মা আছেন ঘরকরণা, পূজা অর্চ্চনা লইয়া, পাড়া-প্রতিবেশীদের লইয়া। জীবনের ছোট বোন উমা—সে আছে তার ছেঁড়া দুই চারিখানি বই, পাঠশালার দুই চারিজন দুরন্ত বন্ধু এবং এখানে সেখানে ছুটাছুটি লইয়া। আর জীবন আর বিজয়া আছে তাহাদেব লইয়া। তাহাদের পৃথিবীর অধিবাসী-সংখ্যা দুইজন, একজন নারী আর একজন পুরুষ। পৃথিবীকে দার্শনিক হিসাবেও মোটামুটি হয়ত এইভাবে ভাগ করা যায়, কিন্তু জীবন আর বিজয়া যে দার্শনিক নহে এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। কবিত্ব তাহাদের মধ্যে খানিকটা থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু সে নিতান্তই কাঁচা হাতের পরিচয়। কঠোর সমালোচকের ভাষায় বলিতে পারি যে জীবনে তাহারা ক্রমান্বয়ে যে কবিতা রচনা করিয়া চলিয়াছে তাহার ভাবগুলি কিছু অস্পষ্ট, এখনও রসঘন হয় নাই। কিন্তু নাই বা রসঘন হইল, তাহার জন্য ইহারা আদৌ দুঃখিত নয়; তাহাদের রচনার পাঠকও যে মাত্র দুই জন।

তাহাদের পৃথিবীতে প্রতিদিন যে রাত্রি আসে তাহা কেবল মিলনসম্ভাবনায় মধুর নয়, তাহার মধ্য দিয়া তাহারা নিজেদের নিত্য নূতন করিয়া অনুভব করে—অনুভূতি তাহাদের যতই দুর্ব্বল হউক না কেন। তামসী রাত্রির প্রত্যেকটী তারা তাহাদের বুকের রক্তে নূতন রোমাঞ্চ জাগাইয়া দেয়। কতদিন মাঝ-রাতে উঠিয়া তাহারা ফুলগন্ধ-ব্যাকুল, নির্জ্জন, প্রশস্ত উঠানটীতে পাশাপাশি নিঃশব্দে চলিয়া বেড়াইয়াছে এবং দুইজনেই মনে মনে বলিয়াছে, আমরা বাচিয়া আছি, পৃথিবীর বাতাসের মত দুরন্ত আবেগ লইয়া আমরা বাঁচিয়া আছি। প্রতি রাত্রির শেষে সমারোহময় সূর্য্যোদয় দেখিয়া তাহারা বলিয়াছে, আবার কয়েক ঘণ্টা পরেই রাত্রি নামিবে। রাত্রির শেষ প্রহরটীতে তাহারা দুই জনে প্রায়ই জাগিয়া থাকে। বাহিরের অন্ধকার আস্তে আস্তে অস্পষ্ট হইয়া আসে, ঘরের মধ্যে আধ-অন্ধকারের ভিতর ঘড়ির টুকটাক শব্দের সহিত দু'জনের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করিতে পারা যায় এবং দিবারাত্রির অতীত সেই স্বল্প মুহূর্ত্ত কয়টী তাহাদের কী ভালই যে লাগে!

কিন্তু এত কথা বলিবার আগে জীবন ও বিজয়ার পরিচয় একটু দেওয়া উচিত ছিল। এইখানেই সেই ত্রুটটা সারিয়া রাখি।

জীবনের বিধবা মায়ের হাতে কিছু টাকা ছিল এবং সেই টাকার অনেক কিছু খরচ করিয়া জীবনকে তিনি ডাক্তারী পাশ করাইয়াছেন। খুব বেশী দিন নয়, বড় জোর দুই বৎসর আগে জীবন পাশ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। বাড়ী ফিরিয়াই জীবন শুনিল তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহের বয়স এবং প্রয়োজন দুই-ই হইয়াছিল, সুতরাং জীবনকে আর মায়ের অবাধ্য হইতে হয় নাই। মেয়ে যে সুন্দরী এ সংবাদ সে পাড়ায় পা দিয়াই পাইয়াছিল।

বিবাহের পর প্রায় দুই বৎসর কাটিয়াছে।

কিন্তু এই দুই বৎসর কি করিয়া কাটিয়াছে তার হিসাব চাহিলে জীবন সাদা কথায় একটি কথাও বলিতে পারিবে না। বিজয়কেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লাভ নাই।

বিজয়ার বাপ পশ্চিমের এক ছোটখাট সহরের উকীল। বসবাস এককালে তাঁহাদের বাংলার এই অঞ্চলেই ছিল, কিন্তু আজ দেশ বলিয়া তাঁহার কিছু আর নাই। মাথায় টিকি রাখিয়া এবং দুই বেলা ভাতের সহিত রুটী খাইয়া তিনি পুরাদস্তুর বনেদী হিন্দুস্থানী বনিয়া গেছেন। মেয়েদের বিবাহের পর একবার তিনি এদিকে আসিয়াছিলেন এবং মাসকয়েকের জন্য বিজয়াকে নিজের সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত জীবন ও বিজয়া নিরবকাশ প্রণয়-গুঞ্জনের ভিতর কাটাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু প্রেম-গুঞ্জনের মধ্যেও বৈচিত্র্য চাই, নহিলে অবসাদ আসে। জীবনের আর্থিক অবস্থাও এমন কিছু নয় যে চমৎকার একটি কাব্য-পুস্তকের মত জীবনটাকে তাহারা আরাম-কেদারায় বসিয়া এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষ করিয়া দিবে।

তাই এক অবসন্ন দিনের শেষে বিজয়াকে ডাকিয়া বলিতে হইল, আর নয়, এইবার জীবন-সংগ্রামে নামব। কালই কলকাতায় ষ্টেটসম্যানের গ্রাহক হ'তে পত্র লিখচি।

পত্র শেষ হইল এবং কয়েকদিনের মধ্যে নিয়মিত ভাবে কাগজও আসিতে সুরু করিল। না, এই সাহেব-পরিচালিত কাগজখানা অত্যন্ত ব্যবসাদার, টাকা পাইতে না পাইতে কাগজ পাঠাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে; দুই চারিদিন দেরী করিলে সে যেন অভিযোগ করিতে যাইত! কিন্তু আসিয়াই যখন পড়িল তখন আর কালক্ষয় করিয়া লাভ কি, কর্ম্ম-খালির বিজ্ঞাপনগুলির উপর প্রত্যহ একবার চোখ বুলাইয়া যাইতে হয়, কিন্তু ডাক্তার চাই বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রায়ই চোখে পড়ে না, যদিই বা চোখে পড়ে—সে হয় বেসিনে নয় জম্মুতে! জম্মুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রসিদ্ধি ভূগোলে পাঠ করা গিয়াছে বটে, কিন্তু ভৌগলিক বর্ণনার সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য অতদূর যাইবার মত উৎসাহ তাহার কোথায়?

কিন্তু এই কাগজের পাতায় পৃথিবীর সঙ্গে জীবনের যেন নূতন করিয়া পরিচয় হইতে লাগিল। কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন গুলি পড়িয়াই কত লোক চাকরীর জন্যও বিজ্ঞাপন দিয়াছে। ফার্ষ্ট ক্লাস এম, এস, সি—কুড়ি টাকার বিনিময়ে বি, এস, সি ক্লাসের কোন ছাত্রকে প্রত্যহ ঘণ্টা তিন চার পড়াইতে রাজী আছে। তাহাদের সঙ্গে পড়িত সুধীন্দ্র, পরীক্ষায় কোন বার সে অসম্মানের সঙ্গে পাশ করে নাই; সেদিন সে এক গানের স্কুল খুলিয়াছে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছে—ছাত্র জুটিতেছে না নিশ্চয়! গান অবশ্য সে ভালই গায়, কিন্তু লেখা পড়া তাহার

চেয়ে সে ভাল ভাবেই করিয়াছিল। আই, সি, এস-এ দাঁড়াইলে একদিন সে একটা মহকুমা-শাসনের ভার পাইতে পারিত! গায়ক হিসাবে কেই বা তাহাকে চেনে এবং কেই বা আসিবে তাহার শিক্ষত্ব লইতে! তবু এইটাকেই আজ সে জীবিকার উপায় করিয়া তুলিতে চায়। সুধীন্দ্র স্বপ্ন দেখিয়াছে একদিন তাহার সঙ্গীত-তরঙ্গ বাংলার প্লীহা যকৃত-কুৎসিত নর-নারীকে সুধাস্রোতে ভাসাইয়া দিবে।

তবু জীবনের চাকুরী একটা চাই

এখানে একটা ছোট ঘরে কাঠের ফলক টাঙাইয়া ডিস্পেনসারি খুলিলেও চলিত; কিন্তু ভিজিট দিয়া তাহাকে ডাকিবে কে! সহসা আত্মীয়তার এমনি ধূ ধূ পড়িয়া যাইবে যে দর্শনী আদায় করিবার কথা লজ্জায় সে মুখেই আনিতে পারিবে না। ঔষধ লইয়া গেলে, পয়সার বদলে কেউ কেউ হয়ত গোটাকয়েক ছাঁচি-কুমড়া পাঠাইয়া দিবে, কেউ পুকুরের মাছ! তা ছাড়া, মাসে মাসে ঔষধ পত্র আনিবার জন্য কলিকাতাতেই বা ছুটিবে কে? কলিকাতায় গিয়া একটা ডিস্পেনসারী জাঁকাইয়া বসিলেও চলিত, কিন্তু শুনা যায়, সেখানেও আজ কাল পয়সাওয়ালা রোগীর চেয়ে ডাক্তারের সংখ্যা কিছু বেশী। সুতরাং তাহাকে চাকরীই করিতে হইবে। বিজয়াকে সে নিশ্চয় সঙ্গে লইয়া যাইবে, মা যদি আপত্তি করেন তবুও। বিজয়া তাহাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্ত বাঁচিবে না।

মাস তিনেক কাটিবার পর একটা চাকরির সংবাদ পাওয়া গেল। কর্ম্মস্থলটা ঠিক ঘরের পাশেই নয় বটে, কিন্তু নিতান্ত দূরেও নয়। আসানসোলের একটা কয়লা-খনিতে ডাক্তার চাই। চাকরিতে যোগ দিতে হইবে মাস দুই পরে, কিন্তু আবেদন কর্ত্তাদের নিকট পৌঁছান চাই সাত দিনের মধ্যে।

জীবন চাকরির জন্য দরখাস্ত করিয়া দিল।

দরখাস্ত করিবার পর সাত দিন কাটিয়া গেছে। জীবনের দরখাস্তখানি খনির কর্ম্মকর্ত্তাদের হাতে এতক্ষণে নিশ্চয়ই পড়িয়াছে। আরও বহু ব্যক্তি অবশ্য তাহারই মত দরখাস্ত করিয়াছে, কিন্তু সেই বহুর মধ্যে তাহার আবেদন-ভঙ্গীটি হয়ত তাহাদের হঠাৎ ভাল লাগিয়া যাইবে! সুতরাং মনে মনে বিজয়া ও জীবন আসানসোলের প্রান্তসীমায় বাংলো ধাঁচের একটা নিরালা, ছোট নীড়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

তিনখানি ঘর হলেই চলে যাবে, কি বলো বিজয়া? একটা ঘর আমাদের দু'জনের, একটা সকলের অর্থাৎ বাইরে থেকে যারা দেখা-সাক্ষাতের জন্যে আসবে। বিজ্ঞাপনে ওরা লিখেছে যে প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করা চলে।

আর একটা?—বিজয়া জিজ্ঞাসা করে।

সেটাও আমাদের দু'জনের। একটা ছ' মাসের জন্যে, আর একটাতে ছ' মাস। নইলে বৈচিত্র্য আসবে কেন? একটা ঘর অবশ্য সব সময় খালি থাকবে, কিন্তু ধরো, মা যদি হঠাৎ কিছু দিনের জন্যে যেতে চান, তখন ওটা কাজে লাগবে।

ঘরগুলি কেমন করিয়া সাজানো হইবে সে কল্পনাও তাহারা দুইজনে একাধিক বার করিয়াছে এবং এমনি কল্পনা করিতে করিতে কোথা দিয়া এবং কেমন করিয়া জানি না, তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়া গেল যে, আসানসোল তাহাদের যাইতে হইবেই। সকাল বেলার রৌদ্র যেমন অনায়াস অধিকার লইয়া ঘরের খোলা দ্বারে প্রবেশ করে, এ বিশ্বাসও তাহাদের যেন তেমনি করিয়া জন্মিয়াছে।

বসিবার ঘরটাতে আসবাবপত্রের বাহুল্য থাকিবে না। একটা ছোট সেক্রেটেরিয়েট টেবল—উপরটা তাহার আগাগোড়া কাঁচ দিয়া ঢাকা, কয়েকটা বেতের চেয়ার। দক্ষিণ দিকে যদি কোন জানালা থাকে তবে ঠিক তাহারই সামনে, সেগুলি পাতা হইবে। টেবিলের উপর কি রাখা যায়? লিখিবার সাজসরঞ্জাম অবশ্য থাকিবেই, জীবনের নামযুক্ত কয়েকখানি প্যাড; ষ্টেথস্কোপটাও টেবলের উপর পড়িয়া থাকিতে পারে। কালো ব্রোঞ্জের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি সমেত একটা পেপারওয়েট এবং বাদামী রঙের ঝালরে ঢাকা একটা টেবল ল্যাম্পও সে কলিকাতা হইতে লইয়া যাইতে ভুলিবে না। ঘরে কয়েকখানি ছবি থাকিবে—সব কয়টি বিদেশী ল্যাণ্ডস্কেপ হওয়া চাই। হয় সীন নদীর উপর সন্ধ্যা নামিয়াছে, কিম্বা স্কটল্যাণ্ডের শস্যসুরভিত মাঠের উপর জ্যোৎস্নালোকে একটী মেয়ে একলা দাঁড়াইয়া আছে; আল্পস্ পাহাড়ের উপর উদ্ধত অভিযানকারীদের আক্রমণের ছবিও চলিতে পারে। টেবিলের নিকট একটা রিভল্‌ভিং র‍্যাক রাখা যায়, কিন্তু সেখানে Gynaecology বা Differential Diagnosisএর কোন বই থাকিবে না। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ, শেলীর জীবন-চরিত,

'শেষের কবিতা'—এই জাতীয় কতকগুলি বই সে র‍্যাক ভর্ত্তি করিবার জন্ম কিনিয়া আনিবে। মেডিকাল কলেজে ঢুকিবার আগে সে একবার দেশের প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রবন্ধের বিষয় ছিল তিন রকম—বঙ্কিমচন্দ্র ও জাতিগঠন, পল্লী-সংস্কার এবং রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিক কবিতা। জীবন যে প্রতিযোগিতারূপ সমুদ্র পার হইবার জন্য শেষের বিষয়টী অবলম্বন করিয়াছিল, সেটা সহজে অনুমান করা যায়।

টেবলের উপরকার আলোটী জলিতে থাকিবে, জানালার বাহিরে দেখা যাইবে—অনেক দূরে খনির চিমনিগুলি দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে; কোনদিন হয়ত চারিদিক অন্ধকার করিয়া বৃষ্টি নামিল, কোনদিন হয়ত বিবর্ণ জ্যোৎস্নায় চারিদিক অদ্ভুত! জীবন 'শেষের কবিতা' খুলিয়া পড়িল—

তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কথনো কহিনি,
প্রিয়তম, আমি বিরহিণী
পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে।

বিজয়ার চোখে যে বচনাতীত বিস্ময় ফুটিয়া উঠিবে, সে শুধু অনুভব করিবার। দুইজনের সেই নির্জ্জন বাংলোটীতে প্রতিমুহূর্ত্তে তাহারা নিজেদের নূতনতর করিয়া আবিষ্কার করিবে,—হাস্যে, কৌতুকে, কলহ ও অশ্রুতে, ক্ষণিক বিরহ ও গাঢ়তর মিলনে! তাহারাও যে এখনও নিজেদের সম্পূর্ণ করিয়া চিনে নাই, তাই ত প্রতিদিন পরস্পরকে লইয়া তাহাদের এত বিস্ময়, নিবিড়তম স্বার্থের মধ্যেও অপরিতৃপ্তির বেদনা! তাহারা যেন সূর্য্য-চন্দ্র-তারায় ভরা দুইখানি আকাশ, কিম্বা দুইটী পৃথিবী—এ উহার দিকে তাকাইয়া স্তব্ধ হইয়া গেছে!

চাকরিতে যোগ দিবার পূর্ব্বে একবার বিজয়কে জিনিষপত্র খরিদের জন্য কলিকাতায় না গেলে চলিবে না। যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে, হইতে পারে এবং যাহার প্রয়োজন হইতে পারে না—এমনি বহু জিনিষ লইয়া বিজয়া একটী ফর্দও ইতিমধ্যে করিয়া ফেলিয়াছে।

প্রাথমিক প্রয়োজন-নির্ব্বাহের জন্য সায়া, সেমিজ, শাড়ী, কোট-প্যান্ট, হ্যাট ও টাই কয়েক ডজন করিয়া লইতেই হইবে—বার বার কলিকাতায় আসা জীবনের পক্ষে যে সম্ভব হইবে না, এ কথা বিজয়া ভাল করিয়াই জানে। জীবন নিজে দেখিয়া তার শাড়ী না আনিলে বিজয়ার দেহের শ্যামলতার সহিত সেগুলি মানাইবেনা নিশ্চয়। চুলের ফিতা, কাঁটা, কয়েক শিশি ক্যান্থারাইডিন, স্নো, ক্রিম এ সব থাকিবেই। শেষের জিনিষগুলি বিলাসিতার পরিচয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এইটুকু অমিতব্যয়িতা মার্জ্জনা করিবার মত ঔদার্য্য তাহাদের দুই জনেরই আছে। বিলাতী সাবান ও সেন্টের নাম বিজয়ার ঢের জানা আছে, কিন্তু আজকাল সেইগুলি ব্যবহার করিবার প্রথা নাই। সে 'চন্দন' ও গুগগুলের নির্য্যাস দিয়াই কাজ চালাইয়া নিবে। ধূপের কাঠীও অনেকগুলি সঙ্গে রাখা দরকার, মশার দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য চীনা কয়েলও, লেটার-প্যাড ও খাম কিছু চাই। এখন হইতে মা ও বাবাকে বিজয়া প্রায়ই চিঠি লিখিবে। ছোট ভাইগুলি প্রায়ই তাহার চিঠি প্রত্যাশা করিয়া থাকে—এ পর্য্যন্ত খুব কমই সে তাহাদের উদ্বেগ দূর করিয়াছে; এবার তাহাদেরও মধ্যে মধ্যে সে স্মরণ করিবে। একটা সেলাইয়ের কল জীবনকে সে আনিতে বলিবে; অবসর সময়ে বালিশের ওয়াড় এবং টেবল-ক্লথের ঢাকনাগুলি বিজয়া নিজেই তাহা হইলে সেলাই করিতে পারে, টেবল-ক্লথ কিনিবার মত বিলাসিতাকে তাহারা না হয় প্রশ্রয় নাই দিল। পোর্টেবল গ্রামোফোন একটা থাকিলে নির্জ্জন বাংলোর নিঃসঙ্গতা খানিকটা দূর হইতে পারে। কিন্তু গ্রামোফোন কিনিবার প্রস্তাবে জীবন হঠাৎ একটু ক্ষুণ্ণ হইতে পারে—রাগ অবশ্য সে করিবে না, কিন্তু স্বাচ্ছল্য ইদানিং তাহাদের অনেকখানি কমিয়া আসিয়াছে কিনা। তবু একবার কথাটা সে বলিয়া দেখিবে।

এমনি করিয়া কল্পনায় একখানি বাংলো সাজাইতে এবং সাজাইবার আয়োজন করিতে অনেকগুলি দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু চিঠির উত্তর আসিল না, প্রাপ্তি-সংবাদ পর্য্যন্ত নয়। তবু একদিন বিজয়া মধ্যাহ্ন বেলায় তার মা, তা'র দুরন্ত দু'টি ছোট ভাই মন্টু ও সন্তুকে স্মরণ করিয়া লিখিল—

খুব সম্ভব এক মাসের মধ্যে আমরা আসানসোলে যাচ্ছি। উনি সেখানে যাবার জন্যে দরখাস্ত করেছেন। আমি সেদিন স্বপ্ন দেখেছি যে তাঁর দরখাস্ত তারা মঞ্জুর করেছে। বিনা ভাড়ায় তারা থাকবার জন্যে একটা বাড়ীও দেবে। মা আপনি সন্তু ও মন্টুকে নিয়ে একবার সেখানে আসবেন। আপনাদের অনেকদিন দেখি নি, সন্তু ও মন্টু ভাই দু'টীর জন্যে মন কেমন করে। তারা মস্ত বড় হয়ে উঠেছে, নয়?

বাবার বোধ হয় আমাকে মনে পড়ে না; অনেক দিন তাঁর চিঠি পাই নি। আসানসোলে পৌঁছে, বাসার ঠিকানা দিয়ে চিঠি দেব। এবারে আমার হাতে একটা গোটা সংসারের ভার পড়বে এ কথা ভাবতে আমার যে কি আনন্দ হচ্চে মা, তোমায় এই চিঠিতে তা খুলে লিখতে পারচি না। কি করে যে আমি চারিদিকের কাজ সামলাব মনে করতে আমার ভয়ও হচ্চে, আবার মাঝে মাঝে হাসিও আসচে।

চিঠির উত্তর তুমি খুব শিগ্‌গির দিয়ো—মণ্টু ও সন্তু যেন আমাকে চিঠি লেখে। উনিও বাবার জন্তে খুব উৎসাহ বোধ করচেন এবং ভাল আছেন।

গিরিবালা এখন কোথায়? বেচারীর জন্তে বড় দুঃখ হয়, এই বয়সেই তাকে যে দুঃখ পেতে হ'ল, ভগবান যেন তা থেকে তাকে শান্তি দেন। সে আমাকে চিঠি লিখবে বলেছিল, কেন লেখেনি জানিনে। তাকে মনে করিয়ে দিও।

আমার প্রণাম নেবে ও বাবাকে জানাবে। ভাই দুটীকে দিদির আশীর্ব্বাদ—ইতি তোমাদের বুড়ী।

চিঠি চলিয়া গেল এবং মার নিকট হইতে একদিন জবাবও আসিয়া পৌঁছিল। মা তাহাদের এই নূতন জীবন-প্রারম্ভে আশীর্ব্বাদ করিয়া জানাইয়াছেন যে তাহাদের আসানসোলের বাটীতে যাইবার জন্য তিনি খুবই চেষ্টা করিবেন। সন্তু ও মণ্টু ত এখন হইতেই টাইম-টেবল খুলিয়া গোরখপুর হইতে আসানসোল কয় মাইল তাহারই হিসাব সুরু করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু আবেদন-পত্র প্রেরণের পর দুই মাস হইতে আর বিলম্ব নাই। আসানসোলের বাংলো কল্পনার স্বর্গ হইতে কোনদিন মাটির পৃথিবীতে নামিয়া আসিবে কি না সে সম্বন্ধে এখন সংশয় উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু যাহারা এই গল্পের নায়ক-নায়িকা তাহাদের নৈরাশ্যবাদী হইবার কারণ ঘটিয়াছে কদাচিৎ; তাই আশা খানিকটা সঙ্কুচিত হইয়া গেলেও আশ্বস্ত বোধ করিতে তাহারা ভুলিল না। হয়ত কোন কারণে উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইতে তাঁহাদের দেরী হইতেছে; কোম্পানির ডিরেক্টারদের কাহারও হঠাৎ অসুখ হইয়া পড়িতে পারে, কিম্বা এত বেশী দরখাস্ত তাহাদের ঠিকানায় গিয়া পড়িয়াছে যে কাহাকে রাখিয়া কাহার কথা বিবেচনা করিব ভাবিতেই তাঁহাদের সময় [illegible] না। সত্যি, এ দেশে ডাক্তারদের মধ্যেও আজ বেকার ও অর্দ্ধ-বেকারের সংখ্যা ত অল্প নয়। একদিনে একটা কাজের জন্য হাজার দেড়েক আবেদনপত্র পৌঁছিবার কথাও সে শুনিয়াছে।

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে; চাকুরীপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আর নাই। এখন আর খনির মালিকদের অসুস্থতার অজুহাত কল্পনা করিয়া নিজেদের সান্ত্বনা প্রদান করা চলে না। কিন্তু এ যেন ভালই হইল, জীবন এর জন্য একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এই মাত্র। যাক্‌, আরও কিছুদিন ষ্টেট্‌সম্যান কিনিতে হইবে এবং তাহার অর্থ আরও কিছুদিন জীবন-সংগ্রাম হইতে অব্যাহতি। সান্ত্বনার কথা এই যে, আলস্যবিমুখ হইবার চেষ্টা সে করিয়াছিল, কিন্তু আলস্য তাহার প্রতি বিমুখ হইল কই!

না, জীবন প্র্যাকটিস করিবে না। বিধাতা তাহার প্রতি যে অবিচার করিলেন, সে কেন তাহা সংশোধন করিতে যাইবে? তাহাদের সামান্য জমিজমা এখনও এখানে সেখানে কিছু কিছু ছড়ান আছে। আদায়পত্র কয়েক বৎসর হয় নাই, চেষ্টাও কেহ করে নাই। অনেক জমি প্রজারা খাস করিয়া লইয়াছে। অনেক জমি কোথায় যে আছে দলিলের বাহিরে তা সে জানেও না। এইবার সেইগুলি উদ্ধার ও আবিষ্কার করিতে হইবে। চোখ বুজিয়া জীবন কল্পনা করিয়া লইল, রৌদ্রপাণ্ডুর মাঠের পথ দিয়া, দুই পাশের ঘন সবুজ শস্যস্তরের মাঝে সরু একটী পথে সাইকেলে করিয়া সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তার চিকিৎসা-বিদ্যার পরিচয় পাইয়া প্রজাদের অনেকেই বোধ হয় শ্রদ্ধা-মিশান আতঙ্কের সহিত দুই একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবে। টোকা মাথায়, রোগ-জীর্ণ, পেট-মোটা লোকগুলির মধ্যে তাহাকে নিশ্চয়ই বিস্ময়কর দেখাইবে। খাজনা মিটাইয়া দিলে সে তাহাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে কুণ্ঠাবোধ করিবে না।

হ্যাঁ, এবার আর অলস কল্পনা-বিলাস নয়, জীবন সত্যই কাজে নামিল। বহুদিনের অব্যবহৃত সাইকেলখানার ধূলা ঝাড়িয়া, চাকায় হাওয়া ভরিয়া, কীট-দষ্ট দলিলগুলি বগলে করিয়া জীবন একদিন সত্য সত্যই তাহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জমিদারী দেখিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল।

এবং তাহার পর প্রায়ই তাহাকে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়।

বাড়ী ফিরিয়া আসিলে বিজয়া আঁচল দিয়া তাহার কপালের এবং ঠোঁটের ঘামের বিন্দুগুলি মুছিয়া দেয়, তারপর নিজের হাতে তৈরী-করা রেশমী সূতার পাখাখানি আনিয়া স্বামীকে বাতাস করে।

জীবন বলে, কাজ নেই আমার আসানসোলের বাংলায়, এখানে আমার উপস্থিত খুব খারাপ লাগচে না। বাকী খাজনা গুলো যদি সব আদায় করতে পারি, তা' হ'লে ডিস্পেন্সারী একটা এই খানেই খুলে বসব, আর তোমার গ্রামোফোন আর সেলাইয়ের কলও বাদ যাবে না। হলুদ রং-এর ঝালর-ঢাকা টেবল-ল্যাম্প নাই বা রইল

কিন্তু ডিসপেনসারী জীবনকে খুলিতে হইল না।

একদিন বেলা দুইটার পর বাড়ী ফিরিয়া—কিসে যে কি হইল জানি না, জীবন বমি সুরু করিয়া দিল। হরিপুরের এক প্রজার ছোট ছেলের কলেরা হইয়াছে, সে দিন সে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল, এই পর্য্যন্ত। তা'দের ওখানে একটু জল পর্য্যন্ত সে খায় নাই। ফিরিবার পথে, মাঠ অতিক্রম করিয়া নৌকায় নদী পার হইবার সময় আঁজলা ভরিয়া একটু জল সে খাইয়াছিল, এ ছাড়া আর কোন অত্যাচারই সে করে নাই। তবু শেষ পর্য্যন্ত যে ব্যাধির বীজ অতর্কিতে তার শরীরে প্রবেশ করিল, সেটাকে কলেরা না বলিলে উপায় নাই। দুইটার সময় সুস্থ মানুষের মত সে বাড়ী ফিরিয়াছে কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইবার পূর্ব্বে তাহার চোখের পৃথিবীর আলো যেন অপর্য্যাপ্ত এবং বাতাস যেন অপ্রচুর বলিয়া মনে হইতে লাগল। তাহার সমস্ত শরীরও স্নায়ু কেমন ধীরে ধীরে শিথিল ও শ্রান্ত হইয়া আসিতেছে---জীবন নিজেই সেটা বুঝিতে পারিল। জীবন শুইয়া আছে, কিন্তু এখন আর ইচ্ছা করিলেই দাঁড়াইয়া উঠিবার ক্ষমতা তাহার নাই; শরীর ও শক্তিতে আজ অসহযোগ সুরু হইয়া গেছে।

ডাক্তার এই অঞ্চলে নাই বলিলেই হয় শুধু হারাধন ভট্টচায ছাড়া। পূর্ব্বে তিনি ডিষ্ট্রিক বোর্ডের হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার ছিলেন; তারপর বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ও পদটা যথেষ্ট গৌরবজনক নয় মনে করিয়া, গ্রামে আসিয়া ডাক্তার হইয়া বসিয়াছেন।

তাও এখান হইতে তাঁহার বাড়ী আধ ক্রোশের এদিকে নয়। তবু সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে উমাই একটা লণ্ঠন লইয়া ছুটিতে ছুটিতে তাহাকে ডাকিতে গেল। উমা যখন সেখানে পৌঁছিয়াছে হারাধন তখন বাড়ী ছিলেন না। তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিতে উমা আটটা বাজাইয়া ফেলিয়াছে।

বোকা উমা, ছোট উমা—আর মিনিট পনের আগে আসিতে পারিলে, দাদার শিয়রে বসিয়া সে যদি দুই একটা অর্থহীন কথা বলিত, তবে তার উত্তর দেওয়া জীবনের পক্ষে বুঝি অসম্ভব হইত না। কিন্তু উমা এত দেরী করিয়া আসিয়াছে যে কথা কাণে গেলেও জীবন এখন তাহার প্রশ্নের উত্তর দিবে না। তাহার জিব অসাড় হইয়া আসিয়াছে—

হারাধন দেরীর জন্য আক্ষেপ করিয়া ইঞ্জেকশান একটা দিয়া গেলেন।

সত্যি দেরী হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এত দেরী হইতে পারে এ কথা কে ভাবিয়াছিল!

মা বসিয়া আছেন জীবনের শিয়রে। জীবনের অবসন্ন একটা হাত তাঁহার হাতের মুঠির মধ্যে—মায়ের মুঠির মধ্যে ছেলের হাতের উত্তাপ আস্তে আস্তে নিভিয়া আসিতেছে। মা ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। ছেলেকে এক এক দিন কর্ম্মবিমুখতার জন্য শক্ত কথা বলিয়াছিলেন, অনুতাপের সঙ্গে সেই কথাটাই বুঝি তিনি চিন্তা করিতেছেন। তবে এ কথা ঠিক যে, জীবন সারিয়া উঠিলে আর তিনি কখনও ঘরে বসিয়া থাকিলে তাহাকে কঠিন কথা শুনাইবেন না,—দেবতার নামে শপথ করিয়া তিনি এ কথা আজ মনে মনে বলিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু মায়ের কাছে বিধাতা আজ নিঃসন্তান।

পায়ের কাছে বিজয়া—মাথার ঘোমটা তাহার খসিয়া গিয়াছে। দুইহাত দিয়া সে জীবনের ঈষদুষ্ণ পা দুটি স্পর্শ করিয়া আছে – কিন্তু সে স্পর্শ যেন ক্রমেই চেতনাহীন হইয়া আসে। বিজয়া স্বামীর মুখের দিকে ভাল করিয়া দেখিতে পারিতেছে না, মা তাঁহার ব্যাকুল দুইটী দৃষ্টি যেখানে নিবদ্ধ করিয়া আছেন। তবু যেটুকু দেখিতেছে তাহাতেই বিজয়া বেশ কল্পনা করিতে পারে যে বুদ্ধির প্রখরতায় প্রদীপ্ত মুখখানি প্রদোষের মত বিবর্ণ হইয়া আসিতেছে এবং সেই বর্ণহীনতায়

মধ্যে একান্ত নিঃশব্দে যে তাহার অধিকার বিস্তার করিতেছে সে মৃত্যু! মৃত্যু বিজয়া অনেক দেখিয়াছে—কাকার, ঠাকুরমার, পিসিমার এবং আরও কত লোকের! কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া সমস্ত চেতনা দিয়া, এতখানি ঘনিষ্ঠ ভাবে মৃত্যুকে সে কোন দিন অনুভব করে নাই,—স্বামীর মৃত্যু, ছেলের মৃত্যু, ভাইয়ের মৃত্যু।

ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলিতেছে তাহারই ম্লান আলোকে দেখা যায়, দশটা বাজিয়া গিয়াছে। ঘড়ির টুকটাক শব্দটা আজ বিজয়ার কাছে কী ভীষণ। ঘণ্টা দুই পরে হারাধন আবার ফুঁড়িতে আসিবেন, বলিয়া গিয়াছেন। ঘণ্টা দুই কাটিতে এখনও অনেক দেরী—কিন্তু না, তাঁর আসিবার প্রয়োজন আর হইবে না। তার আগেই ঘরের কোণের ওই অস্পষ্ট প্রদীপ-শিখা আরও ম্লান হইয়া যাইবে—হয়ত হঠাৎ একটা দমকা বাতাস আসিয়া সেটাকে নিভাইয়া দিবে এবং সেই অন্ধকারের আবরণে জীবন যেখানে সরিয়া পড়িবে সেখানে মা নাই, বোন নাই, প্রিয়া নাই।

প্রদীপ নিভেনাই, কিন্তু তার জন্যে জীবনের যাইবার কোন অসুবিধা হয় নাই; মৃত্যু দীপালোক দেখিয়া চক্ষুলজ্জা বোধ করে না। মৃত্যু মানুষের চেয়ে আধুনিক আর নিষ্ঠুর।

জীবন চলিয়া গেছে—আসানসোলের বাংলো ছাড়াইয়া অনেক দূরে। আর তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। একদিন, দু' দিন—দশ দিন—জীবন চলিয়া গেছে। মৃত্যুর মহাসমুদ্রে আর একটী আয়ুর তৃণ কত দূরে ভাসিয়া গেল!

বাড়ীটিতে একটী বিস্তীর্ণ শূন্যতা, অসহ্য শূন্যতা। এত স্তব্ধতা যে কান পাতিলে বুঝি তার হৃদ্‌স্পন্দন শোনা যায়!

সন্ধ্যার সময় গাড়ী—বিজয়া আজ যাইবে। আসান্‌-সোলে নয়, গোরখপুরে। যে বাড়ীতে একদিন তার চৌদ্দটী বৎসর কাটিয়াছে, সেইখানে। বাবা তাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন।

উদ্যোগের ছিলই বা কি আর হইবে বা কি!

এয়োস্ত্রী-কালের জিনিষগুলি বাক্স বোঝাই করিয়া লইয়া যাওয়ার মানে স্মৃতিকে আরও দুর্ব্বহ করিয়া তোলা। বিজয়া তাই জীবনের একখানি ছবি ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে রাখিবে না। পৃথিবীতে বিজয় আজ একা নিরাভরণা।

বিজয়ার বাবা বাইরের ঘরে বসিয়া, পাঁজি দেখিয়া, যাত্রার সময় স্থির করিতেছিলেন। চৈত্রের উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে চোখে তাঁর ঘুম আসে নাই।

দ্বারের বাহিরে একটা সাইকেল থামিল—

জীবনের নামে টেলিগ্রাম।

কিন্তু সই করিবে কে?

সে টেলিগ্রাম বিজয়ার বাবা সই করিয়া নেন নাই। খামের মধ্যে হয়ত আসানসোলের ছাপ ছিল,—কিন্তু কল্পনার স্বর্গে সেখানকার বাংলোয় আজ আগুণ লাগিয়া গিয়াছে।

বিজয়া আজ বাপের বাড়ী যাইবে।

ধরণীর বুকে

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

ধরণীর বুকে,
ধূলায় লভেছি জন্ম, দেবত্বের নাহি অহমিকা—
সর্ব্ব অঙ্গে মাখি ধূলি, আঁকি ভালে পঙ্ক-জয়টীকা
পথ বাহি চলি গর্ব্ব-সুখে,
স্বর্গ পানে তুলি শির অশ্রুসিক্ত সমুজ্জ্বল মুখে !

দম্ভভরে খর-দৃষ্টি হানে
যাহারা দাঁড়ায়ে দূরে নাহি চাহি তাহাদের পানে,—
দাঁড়ায়ে মাটির পরে স্বরগের করে অভিনয়—
তারা মোর নয়, কেহ নয় !

ভূমিতলে পড়েছে ঝরিয়া
শুষ্ক শীর্ণ যে কুসুম মধ্যাহ্নের খর-রবিকরে,
ছিন্নদল লুটাইছে বাত্যাবেগে পথধূলিপরে—
তাই দিয়ে সাজি মোর ভরি,
তাই নিয়ে গাঁথি মালা, সেই মালা গলে তুলি পরি ।
এই অলঙ্কার,
এই মোর রাজ-মাল্য, এই ঋদ্ধি, এই অহঙ্কার !

ধরণীর জন্মতিথি হ'তে
মানুষ ভাসিয়া চলে দুঃখ-জ্বালা-বেদনার স্রোতে,
শঙ্কা ও সংশয় দ্বিধা লজ্জাভয় সংঘাতে ফেনিল
নিখিলের ঘূর্ণী জলতলে
ফুটিছে টুটিছে নিত্য জীবন-বুদ্বুদ পলে পলে !
তরঙ্গের মন্দ্রিত ভাষণে
যত বেদনার হাহা ডুবে যায় কেহ নাহি শোনে,
আমি কাণ পাতি
সুর খুঁজি তারি মাঝে, তাই দিয়ে গান মোর গাঁথি ।

মানুষেরে মানুষ করিয়া—
রক্ত দিয়া, অস্থি দিয়া ভ্রান্তি দিয়া তুলেছ গড়িয়া,
অতি ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্রতম সুখোৎসব মাঝে
মৃত্যুরে বসায়ে দেছ মর্ম্মহীন প্রহরীর সাজে !
বুকে দিলে তৃষ্ণা-ক্ষুধা নিত্যকার দাবানলশিখা,
সুধাপাত্র নাহি দিলে ! অবিশ্রান্ত চল-মরীচিকা—
তাহারি পশ্চাতে ছুটে তৃষ্ণাহত অসংখ্য পথিক,
না মানে বন্ধন বাধা, নাহি জানে কোথা দিক্ বিদিক্ ;

উড়িছে খেলিছে ধূলি রবিতপ্ত মরুভূর বুকে
তারি মাঝে খোঁজে পথ অন্ধআঁখি শুষ্ক শীর্ণ মুখে—
তাহাদেরি সাথে
যাত্রা করিয়াছি আমি হাত বাঁধি তাহাদেরি হাতে।

কোনোদিন শুনি নাই গান!
আনন্দ কোথায় আছে মিলে নাই তাহার সন্ধান!
কোন্ গুপ্ত সুরপুরে চিরশ্যাম পারিজাত-মূলে
দেবভোগ্যা নিত্যধারা অনাবর্ত্ত মন্দাকিনী কূলে
লক্ষ সুরপ্রহরীর কবচের লৌহের প্রাকার;
তারি আবরণ তলে দেবতার চলে নিত্যকার
আনন্দ-অমৃত পান—নাহি জানি তাহার আস্বাদ!
বাঁটিয়া দিয়াছ যাহা—ত্রুটি চ্যুতি ভ্রম পরমাদ,
অণু পরিমাণ আশা ঘন মেঘে বিজলীর পারা,
অশ্রুর জোয়ারে স্ফীতা বহমান মৃত্যুস্রোতধারা—
তারি তরে অঞ্জলি বিথারি
বিমূঢ় উদ্‌ভ্রান্তগতি ছুটে চলি কোটি নর নারী!

যা দিয়েছ—মুঠা ভরি তাই তুলি করেছি সঞ্চয়—
উৎসুক অধর হ'তে অমৃতের লভি' পরিচয়
ক্ষুদ্র এক ক্ষণ তরে, ছন্দে গাহি নিত্য তার জয়।
পলে পলে বক্ষ হ'তে মৃত্যু যারে কাড়ি ল'য়ে যায়
তাহারে বাঁচাতে চাহি মরমের স্মৃতি-অমরায়,
দুই কর যোড় করি তারে দিই অশ্রু-উপহার—
ইতিহাস প্রতিদিনকার!

যুগশেষে আসে যুগ, বহি আনে সেই এক ভাষা—
অপূর্ণ অতৃপ্ত সাধ আশা!
প্রবঞ্চিত পিপাসার হাহাকারে দিক্ ওঠে ভরি,
কম্পমান কর হ'তে পানপাত্র খসি যায় পড়ি—
করি আর্ত্তনাদ
জল মানি বালুরাশি মুঠা মুঠা খুঁড়িছে উন্মাদ!
আর্ত্তস্বর এই ঐক্যতান
তারি তালে ছন্দ গাঁথি, তারি সুরে রচি মোর গান।
নিরাশা সংশয় ভয় তৃষ্ণা ক্ষুধা দুর্ব্বলতা দিয়া
নিত্য নব ভুবন সৃজিয়া,
গতিভ্রষ্ট নক্ষত্রের দলে
মুঠি মুঠি কুড়াইয়া সৌধ গড়ি' নীলাকাশ তলে।

জোয়ার

—শ্রীদিবাকর শর্ম্মা

যে বয়সে কাক ডাকিলেও কোকিল বলিয়া ভ্রম হয় সেই দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে বেচারাম বাবু লবঙ্গমঞ্জরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তখন ভবিষ্যৎ কেহই বিচার করেন নাই; বর, বধূ এবং তাঁহার আত্মীয় পরিজনের দৃষ্টি বর্ত্তমানেই একান্ত ভাবে নিবদ্ধ ছিল। বেচারাম বাবু দেখিয়াছিলেন এক জোড়া পটল-চেরা চক্ষু, মুক্তার নোলক ও তাম্বূলচর্ব্বণে ঈষৎ আরক্ত দুই পাটি দুগ্ধধবল দন্ত। বধূ দেখিয়াছিলেন ঘৃত-ছানাসেবনে নধরায়িত দেহ, স্ফীতগণ্ড একটি নবীন জলধরশ্যামল দেবমূর্ত্তি। লবঙ্গমঞ্জরীর মাতা দেখিয়াছিলেন একটি গোবেচারী ধরণের বালক, চাহিয়া খাইতে জানে না এবং তাঁহার পিতা দেখিয়াছিলেন বেচারাম বাবুর পিতা কেনারাম বাবুর কলিকাতার তিন খানা ভাড়াটিয়া বাড়ী এবং সুন্দরবনের তিন শত বিঘা আবাদী জমি। বিবাহ সাড়ম্বরেই হইয়াছিল—সেদিনের কথা মনে হইলেই আজও বেচারাম বাবু গ্রামোফোনে দম এবং তাহাতে পিলু রাগিণীর সানাইয়ের রেকর্ড জুড়িয়া দিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতেন ও লবঙ্গমঞ্জরী ভাঁড়ার-ঘরের বারান্দায় বসিয়া বেগুণ কাটিতে আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিতেন।

নদীর জোয়ারের জল শুখাইয়াছে আর তার দুই তীরে ভগ্ন ইষ্টকের পঞ্জর প্রকট করিয়া জরাজীর্ণ ঘাটের সোপানগুলি ক্রমে ক্রমে জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু এমন কেন হইল?

তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই কাহিনীর প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আভাস দিলে এই পার্থিব নশ্বর জগতের নশ্বরতর প্রেম-মরীচিকা সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাগণ সচেতন হইয়া সাবধান হইতে পারিবেন সেই জন্যই বলিতেছি।

ফুলশয্যার রাত্রি হইতেই আরম্ভ করা যাক্! জ্যোৎস্না রাত্রি। বাড়ীর আঙিনায় নিমগাছটিতে একটি রাত্রিচর পেচক পক্ষি-ভাষায় তাহার সখীর নাম ধরিয়া চীৎকার করিতেছিল। বেচারাম বাবুর পিসীমাতা বারান্দায় দাঁড়াইয়া 'দূর দূর' বলিয়া তাহাকে তাড়াইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, ছাতের চিলেকোঠায় ফুলের বিছানায় শুইয়া পিঠ্ চুলকাইতে চুলকাইতে বেচারাম বাবু নববধূর আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সিঁড়িতে চাপাহাসি, সতর্ক পদশব্দ ও চাবির গোছার ঝনৎকার শোনা যাইতেছিল, ক্রমে সমস্ত শব্দ ক্ষান্ত হইল এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যে সিঁড়ির দরজার পাশে কাহার চুড়ির টুং টুং শোনা গেল এবং তাহার পরই হাতে একটা বেলফুলের মালা লইয়া নববধূ লবঙ্গমঞ্জরী কক্ষে প্রবেশ করিলেন, চক্ষের পলকে বেচারাম বাবু নিদ্রিত হইয়া নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। বধূ লবঙ্গমঞ্জরী দেখিল স্বামী ঘুমাইতেছেন তৎক্ষণাৎ সে বাতি নিভাইয়া দিল। বেচারাম বাবু শশব্যস্তে কহিলেন—"ওকি, বাতি নিভিয়ে দিলে যে!"

লবঙ্গমঞ্জরী কহিল—"তুমি যে ঘুমুচ্ছ?" বেচারাম বাবু বিপদে পড়িয়া কহিলেন—ঘুম নয়, তন্দ্রা। বাতি জ্বেলে দাও, তোমাকে দেখি একটু!"

লবঙ্গমঞ্জরীর বয়স তখন সতেরো বৎসর, ল্যাম্বস্ টেলস্ ফ্রম সেকসপীয়ার পড়িয়া শেষ করিয়াছে, একটু হাসিয়া কহিল, "কি দেখবে আবার? দিনভোরতো জানালা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলে?" বেচারাম বাবু কহিলেন—"আবার দেখব!"

"দ্যাখো" বলিয়া লবঙ্গমঞ্জরী সুইচ টিপিল এবং সেই দীপালোকিত কক্ষে পুষ্প-শয্যায় বসিয়া উভয়ে উভয়কে জানাইল যে জগতে আর কিছু না থাকিলেও তাহারা দুই জন দুই জনকে ভালবাসিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। গৃহ না থাকিলে বনে গিয়া এবং অন্ন না থাকিলে ফল মূল খাইয়া জীবন ধারণ করিবে, তোয়ালে না থাকিলে কেশরাশি দিয়া লবঙ্গমঞ্জরী বেচারামের পা মুছাইবে এবং আলতার অভাব হইলে বেচারাম নিজের বুকের রক্ত দিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর পেলব চরণ রাঙাইবে; কেবল মাত্র এম্-এ পরীক্ষাটা পাশ করা আবশ্যক নতুবা পিতা গালাগালি দিবেন। লবঙ্গমঞ্জরীও জানাইল যে বেচারামকে দান করিয়াই তাহার নারীজীবন সার্থক হইয়াছে এখন একমাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিতে পারিলেই জীবনের কোনও সাধ আর অপূর্ণ থাকিবে না।

কিন্তু যেমন গাছের সব আম পাকে না তেমনি জীবনের সকল সাধ পূর্ণ হয় না। বেচারাম ও লবঙ্গমঞ্জরীর সাধেও ভগবান বাদ সাধিলেন। ঠিক্ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পনেরো দিন পূর্ব্বে বেচারামের পিসীমাতা ঠাকুরাণী ভ্রাতুষ্পুত্রের

মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে মরলোক ত্যাগ করিলেন। পিতৃ-গৃহে জিওমেট্রির প্রবলেম করিতে কষিতে এই সংবাদ পাইয়া লবঙ্গমঞ্জরী কাঁদিয়া উঠিল। পরদিন তাহার শ্বশুর কেনারাম বাবু স্বয়ং তাহাকে লইতে আসিলেন লবঙ্গমঞ্জরী কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার বহিগুলি বাক্সে গুছাইয়া তুলিয়া পিস্‌খাশুড়ীর শূন্য স্থান অধিকার করিতে পতিগৃহে যাত্রা করিল। শ্রাদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ-ভোজন, তৎপর দিবস কাঙ্গালী-বিদায় এবং শেষ দিন কুটুম্বিনীগণের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ সমাপ্ত করিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর মনে পড়িল যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা সে বৎসরের মত শেষ হইয়া গেছে। ঘরে গিয়া চেয়ারে বসিয়া সে কাঁদিতে লাগিল, পিছন হইতে বেচারাম বাবু আসিয়া অতিরিক্ত আগ্রহে চেয়ারশুদ্ধ লবঙ্গমঞ্জরীকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন—"কেঁদোনা তুমি, আমি তোমাকে নিজে পড়িয়ে আস্‌ছে বছর নিশ্চয় পাশ করাব।" লবঙ্গমঞ্জরী চোখের জল মুছিয়া কহিলেন "এবার আমি স্কলারসিপ পেতাম যে!"

বেচারাম কহিলেন, "আস্‌ছে বছর মেডেল পাবে!"

স্বামীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া লবঙ্গমঞ্জরী তখনকার মত পরীক্ষার কথা ভুলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য পাঠের নানারূপ প্রতিবন্ধকতা বশতঃ বেচারাম বাবুও পাশ করিতে পারিলেন না।

পরীক্ষার খবর যেদিন বাহির হইল, সেদিন বেচারাম বাবু পিতার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া রিক্সা চাপিয়া বাগবাজারে লবঙ্গমঞ্জরীর পিতৃ-গৃহে গমন করিলেন। লবঙ্গমঞ্জরী তখন ছাদে রেলিং ভর দিয়া দাঁড়াইয়া পাশের বাড়ীর বাতায়ন লক্ষ্য করিয়া কাহাকে যেন কি বলিতেছিলেন, স্বামীর পদশব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"ফল বেরিয়েছে?"

বেচারাম বাবু কহিলেন, "ফেল করেছি।"

লবঙ্গমঞ্জরীর মুখ শুকাইয়া গেল। কহিলেন "যে বিপদ্ আপদ্ গেল তা নৈলে তোমার মত ছেলে—

বেচারাম বাবু কহিলেন, "সেজন্যে নয়। তুমি পরীক্ষে দিতে পার্‌লে না আর আমি তোমার অভিন্নহৃদয় স্বামী হ'য়ে কেমন ক'রে পাশ কর্ব্ব? সেই জন্যে—" লবঙ্গমঞ্জরী স্বামীর অপূর্ব্ব পত্নীপ্রেমে আবিষ্ট হইলেন এবং চকিত দৃষ্টিতে একবার পাশের সমস্তগুলি বাড়ীর ছাদ দেখিয়া লইয়া বেচারাম বাবুর বুকে মুখ লুকাইলেন। তাহার পর ছাদে বসিয়া দুইজনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে এবার উভয়কেই পাশ করিতে হইবে। তাহার জন্য যদি কালীঘাটে তিন জোড়া পাঁঠা দিতে হয় তাহাও স্বীকার। লবঙ্গমঞ্জরী তাঁহার মাসিক হাত-খরচের টাকা হইতে জমাইয়া সে পাঁঠা কিনিয়া দিবেন।

পরীক্ষার খবর শুনিয়া কেনারাম বাবু পুত্রকে কিছু বলিলেন না, পুত্রবধূকে ডাকিয়া কহিলেন, "তুমি একটু শাসনে রেখো বৌমা! তেতলার চিলে কোঠায় ও পড়্‌বে আর তুমি দোতলার বারান্দায় ব'সে কাজকর্ম্ম সব দেখবে আর পাহারা দেবে, বুঝলে?" লবঙ্গমঞ্জরী দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া হাস্য রোধ করিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

অতএব বেচারাম বাবুকে গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসী সাজিতে হইল। তিনি তেতলার চিলেকোঠা ঘরে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অধ্যয়নে ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু স্বভাব-দোষ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। এক পাতা পড়িয়াই সিঁড়ির দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিতেন, "ওগো! শুন্‌ছ?"

লবঙ্গমঞ্জরী দোতলা হইতে জবাব দিতেন—"শুনছি।"

"আমার পায়ের তলাটায় একটু সুড়্‌সুড়ি দিয়ে যাও তো, বড় ঘুম পাচ্ছে।"

লবঙ্গমঞ্জরী কহিতেন—"ঠাকুর কিন্তু বাড়ীতেই আছেন!"

পিতা বাড়ীতে আছেন শুনিয়াই বেচারাম বাবুর নিদ্রার আবেশ ছুটিয়া যাইত, তিনি তার স্বরে আবার পড়িতে আরম্ভ করিতেন এবং দশ মিনিট পড়িয়াই আবার ডাকিতেন, "ওগো শুন্‌ছ, বাবা বেরিয়ে গেছেন?"

স্বামীর নিকট বারবার মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ কাজেই লবঙ্গমঞ্জরী কহিতেন "হ্যাঁ, কেন?"

"ছাদে একটা কাক বড্ড ডাক্‌ছে, তাড়িয়ে দিয়ে যাও তো লক্ষ্মী!"

বেচারাম বাবুর লক্ষ্মী দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়াই কাল্পনিক কাকের উদ্দেশ্যে 'হুস্ হুস্' শব্দ করিতেন। বেচারাম বাবু খানিকক্ষণ কাণ পাতিয়া থাকিয়া আবার ডাকিতেন, "ওগো জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যাওতো!"

লবঙ্গমঞ্জরী কহিতেন, "পার্ব্ব না। হিষ্ট্রী পড়ছি এখন!"

বেচারাম বাবু আর কথা কহিতেন না, বালিশ বুকে টানিয়া চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতেন আর এদিকে লবঙ্গ-

মঞ্জরী তাঁহার দক্ষিণ কর্ণ একতলায় কেনারাম বাবুর বৈঠকখানার দিকে ও বাম কর্ণ বেচারাম বাবুর তেতলার সিঁড়ি-ঘরের দিকে উৎকর্ণ করিয়া দোতলায় বারান্দায় বসিয়া সিপাহী বিদ্রোহের কারণাবলী কণ্ঠস্থ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেন। শেষে রাগিয়া 'ম্যাট্রিকুলেশন হিষ্ট্রী অফ্ ইণ্ডিয়া' খানা পানের বাটার উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেন ও একতলার সিঁড়ি-দরজার শিকল লাগাইয়া তেতলায় গিয়া উপস্থিত হইতেন। তারপর বেচারাম বাবুর মাথায় হাত দিয়া কহিতেন—"হঁ্যা গা, রাগ কর্লে ?"

বেচারাম বাবু মুখ না তুলিয়া গাঢ়স্বরে কহিতেন—"যাও, যাও হিষ্ট্রী পড়—মরা মানুষের নাম মুখস্থ করগে !"

লবঙ্গমঞ্জরী বেচারাম বাবুর ছোট বালিশটাতে নিজের মাথা রাখিবার একটু স্থান করিয়া লইয়া কহিতেন, "আর কোর্বনা ! এই বারের মত মাফ কর !" অগত্যা বেচারাম বাবু ক্ষমা করিতেন এবং তাহার পর উভয়ের মধ্যে অর্দ্ধ প্রহর ধরিয়া যে কথাবার্ত্তা হইত তাহার সহিত ডকট্রিন অফ্ ল্যাপ্স অথবা কেবাল মিনিষ্ট্রির কোনও সম্পর্ক থাকিত না। কথা না ফুরাইতেই একতলায় সিঁড়ির শিকল ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিত, মৃদুকণ্ঠে আহ্বান আসিত—"বৌমা !" লবঙ্গমঞ্জরী তাড়াতাড়ি নামিয়া হাতের কাছে যাহা পাইতেন—সুঁচ সুতা, পানের বাটা অথবা তেলের বোতল, তাহা বাম হাতে লইয়া ডান হাতে শিকল খুলিতেন। কেনারাম বাবু স্মিতমুখে প্রশ্ন করিতেন, "বেচু পড়্ছে তো ?" লবঙ্গমঞ্জরী কহিতেন, "হুঁ"।

কেনারাম বাবু কহিতেন "আচ্ছা, এইবার নেয়ে খেয়ে নিক ! বেশী পড়াও ভাল নয় আবার ! যাও, ডেকে দাও গে।"

লবঙ্গমঞ্জরী বেচারাম বাবুকে ডাকিয়া দিতেন। বেচারাম বাবু ললাটের শিরা টিপিতে টিপিতে নামিয়া আসিতেন, কেনারাম বাবু কহিতেন, "কপাল তো টন্‌টন্ কর্ব্বেই। এক সঙ্গে বেশী পড়াতে মাথায় ঝাঁকানি লাগে। খানিকটা পড়্‌বে আর খানিকটা ঘুরবে—ছাদে—"

বেচারাম বাবু "আজ্ঞে আচ্ছা" বলিয়া স্নানের ঘরে প্রবেশ করিতেন।

* * *

মার্চ্চ মাসে ম্যাট্রিকুলেশন, জুলাইতে এম্-এ। হঠাৎ একদিন ডিসেম্বর মাসে মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ করিয়া লবঙ্গমঞ্জরী বেচারাম বাবুকে কহিলেন—"এবারও পরীক্ষা দেওয়া হোলনা !" বেচারাম বাবু মুষড়িয়া গিয়া কহিলেন, "তাখো যদি কোনও মতে পার !" লবঙ্গমঞ্জরী আঙ্গুলের কর গণিয়া কাঁদো কাঁদো হইয়া কহিলেন, "কোনোমতেই হয় না আর ! বেচারাম বাবু শুষ্ক কহিলেন, "তাইতো !" তাহার পরই মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে পেন্সিল কিনিতে বাহির হইয়া গেলেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার কয়েকদিন লবঙ্গমঞ্জরীকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকিতে হইল। পরীক্ষার দিন কয়েক পর একদিন বেচারাম বাবু অত্যন্ত করুণা-মধুর স্বরে লবঙ্গমঞ্জরীকে কহিলেন, "এবার পরীক্ষা দিলে তুমি নিশ্চয় মেডেল পেতে।"

লবঙ্গমঞ্জরী হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্রখণ্ডে বিজড়িত শিশুকন্যাটিকে বেচারাম বাবুর দিকে তুলিয়া ধরিয়া তীক্ষ্ণস্বরে কহিলেন, "এইযে মেডেল দিয়েছে !" বেচারাম বাবু অত্যন্ত অপরাধীর মত মুখ নীচু করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছুকাল আর পরীক্ষার প্রসঙ্গ হইল না। মাসছয় পর একদিন বেচারাম বাবু হাসিতে হাসিতে আসিয়া লবঙ্গমঞ্জরীকে বলিলেন, "আমি সেকেন ক্লাস পেয়েছি।" লবঙ্গমঞ্জরী প্রথমে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, পরক্ষণেই তাঁহার পতিভক্তিতে আঘাত লাগিল, মনে হইল বেচারামবাবু প্রতারক, স্বার্থপর—লবঙ্গমঞ্জরীকে নারীজন্ম সার্থক করিবার কাজে নিযুক্ত রাখিয়া নিজে স্বচ্ছন্দে পরীক্ষা দিয়া পাশ করিয়া গিয়াছেন !

লবঙ্গমঞ্জরীর প্রাণে সেই প্রথম ঈর্ষ্যার আঁচড় লাগিল। পর বৎসর ট্রাম হইতে পড়িয়া ঠিক্ মার্চ্চমাসে কেনারাম বাবু পঞ্চত্ব পাইলে লবঙ্গমঞ্জরীর প্রাণের এই আঁচড়টি সূক্ষ্মরেখা হইতে একটি দাগে পরিণত হইল। তৎপর বৎসর লবঙ্গমঞ্জরী ঠিক মার্চ্চ মাসেই পুনরায় প্রথম বৎসরের মত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। বেচারাম বাবু পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর দিবসেই শ্বাশুড়ীর তত্ত্বাবধানে তদীয় কন্যাকে সমর্পণ করিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর ভয়ে পুরী যাত্রা করিলেন। চতুর্থ বৎসরে মার্চ্চমাসে খুকীর ইনফ্লুয়েঞ্জা ও পঞ্চম বৎসরে ঠিক্ মার্চ্চ মাসেই আবার খোকার টায়ফায়েড্ হইল। এইরূপে লবঙ্গমঞ্জরীর বিবাহিত জীবনের চতুর্দ্দশটি মার্চ্চ মাস কাটিয়াছে এবং প্রাণের সেই আঁচড়ের দাগটি ক্রমে ক্রমে একটি চৌদ্দ ইঞ্চি প্রস্থ বিশিষ্ট অস্ত্রক্ষতে পরিণত হইয়াছে। লবঙ্গমঞ্জরীর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া

হয় নাই তবে তাঁহার কন্যা খুকী বই খাতা হাওব্যাগে ভরিয়া প্রতিদিবস ব্রাক্ষ গার্লস স্কুলে যাতায়াত করিতেছে।

* * *

জীবন-নদীর ভাটার টানের এমনই একটা দিনে আমাদের কাহিনীর ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল।

তখন বড়দিন। সিমলা, বোম্বাই, ওয়ালটেয়ার, দিল্লী, কাণপুর প্রভৃতি স্থান হইতে লবঙ্গমঞ্জরীর বাল্যসখীরা তাঁহাদের স্বামীদের বেতনের আয়তন অনুযায়ী কলেবর লইয়া কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় সে বৎসর নিখিল ভারত-শিল্প-প্রদর্শনী। প্রথম শ্রেণীর সমস্ত হোটেল বারান্দায় স্থানাভাবের নোটীশ লট্‌কাইয়া দিয়াছে ও কলিকাতার বাজারে মুর্শিদাবাদ শিল্কের শাড়ীর দাম টাকায় দুই আনা হিসাবে চড়িয়া গিয়াছে।

উক্ত শিল্প-প্রদর্শনীতে একদিন সন্ধ্যাকালে লবঙ্গমঞ্জরী সকন্যা ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহারই সমান বয়সী একটি মহিলা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁ ভাই, তুমি লবঙ্গ না ?" লবঙ্গমঞ্জরী আগন্তুকার পায়ের জরি-বসানো নাগরা ও পরণের পার্শীশাড়ীর ঘাগরাবৎ ঢেউ দেখিয়া ভাবিলেন, বাইজী— পরক্ষণেই স্মৃতি-গহ্বরে একটি আবছায়া মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল কিন্তু সে অতীব শীর্ণকায়া এবং সম্মুখবর্ত্তিনী একেবারে বরনারী, কাজেই কি বলিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। আগন্তুকা হাসিয়া কহিলেন— "চিন্‌তে পাল্লে না ভাই— আমি পঙ্কজ !" লবঙ্গমঞ্জরী হাসিয়া কহিলেন, "যে মুটিয়ে গিয়েছ ভাই !" পঙ্কজিনী কহিলেন, "উনিও তাই বলেন, কি করি বল্ দেখি ভাই ?" বলিয়া পঙ্কজিনী দেবী একখানি বার বর্গগজ প্রমাণ রুমাল পাতিয়া তদুপরি তৃণ-শয্যায় উপবেশন করিলেন। সেখানে বসিয়াই উভয় সখীতে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পঙ্কজিনীর বেলফুল, কমলিনী, কমলিনীর গঙ্গাজল নির্ঝরিণী, নির্ঝরিণীর দেখনহাসি পূজারিণী, পূজারিণীর ফাগ-সুভাষিণী ইত্যাদি সখীত্বসূত্রে গ্রথিত অর্দ্ধডজন নারী একটি পুষ্পমালার মত লবঙ্গমঞ্জরীকে বেষ্টন করিলেন, তাঁহাদের স্বামীরা দূরে বটগাছের তলে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধনেত্রে গাছের ডালের সংখ্যা নির্ণয় করিতে করিতে সভাভঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন অর্দ্ধপ্রহর পরে কলহাস্যধ্বনিসহ সভাভঙ্গ হইল। একমাত্র তিনিই কলিকাতাবাসিনী বলিয়া আগামী দিবস অপরাহ্নে তাঁহার গৃহে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া লবঙ্গমঞ্জরী বিদায় লইলেন।

পথে আসিতে আসিতে লবঙ্গমঞ্জরী আপনার অবস্থা একবার চিন্তা করিলেন, বুঝিলেন যে তিনি নিতান্তই অভাগিনী। সকলের স্বামীরা তাঁহাদের পত্নীকে সঙ্গে লইয়া প্রদর্শনী-ভ্রমণে আসিয়াছেন আর তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে জগু কোচ্‌ম্যান্, মহাদেও বরকন্দাজ আর মাধাই সহিস্ ! লবঙ্গমঞ্জরীর মানসিক বিলাপ শেষ হইবার পূর্ব্বেই গাড়ী ফটকে প্রবেশ করিল। বেচারাম বাবু অস্থির হইয়া তখন এঘর ওঘর করিতেছিলেন এবং ক্ষেমী ঝি কেন লবঙ্গমঞ্জরীর সঙ্গে যায় নাই, এইজন্য তাহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন। লবঙ্গ-মঞ্জরীকে দেখিয়া বেচারাম বাবু সহর্ষে কহিলেন, "যা হোক্, এলে ?" লবঙ্গমঞ্জরী নিজের দুর্ভাগ্যের কথা তখনও ভুলিতে পারেন নাই, কহিলেন, "না এলেই ভালো হ'ত !" বেচারাম বাবু সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না, খুকীকে ডাকিয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর মা টাকা নিয়ে যায় নি বুঝি, না ?" খুকী 'জানি নে' বলিয়া চলিয়া গেল। তখন বেচারাম বাবু নীচে নামিলেন এবং সহিসকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে পথে ঘোড়া দুষ্টামি করে নাই। তবে সহসা লবঙ্গমঞ্জরীর এরূপ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণের কারণ কি ? কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি আহার সমাপ্ত করিয়া বেচারাম শয়ন করিলেন। পরদিন লবঙ্গমঞ্জরীর রুদ্ররূপের হেতু বেচারাম বাবুর চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের মতই প্রত্যক্ষ হইল।

বেচারামবাবু তখন আহারান্তে নিদ্রিত। অকস্মাৎ সিঁড়িতে অনেকগুলি পদশব্দ, চুড়ীকঙ্কণের ঝণৎকার, গরদের শাড়ীর খস্‌খসানি ও কলহাস্য শুনিয়া তিনি চমকিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। পরক্ষণেই, "এসো ভাই !" "মাইরি, কি মানিয়েছে !" "ওটা ক'ভরির !" "মজুরী কি নিলে ?" "পান্না খানা ক'রতি ?" "আস্‌তে দিলে তো ?" এই প্রকার বিচিত্র প্রশ্ন শুনিয়া বুঝিলেন যে লবঙ্গমঞ্জরীর কক্ষে সখী-সমাগম হইয়াছে। বাহিরে যাইতে হইলে লবঙ্গ-মঞ্জরীর কক্ষ তিনখানির সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়- কিন্তু বেচারামবাবু গত পাঁচ দিন সময়াভাবে ক্ষৌর-কার্য্য করেন নাই, কাজেই কক্ষত্যাগ করিতে না পারিয়া বিছানায় মুদ্রিত নেত্রে

শুইয়া পার্শ্বের কক্ষের স্বামীগৃহ, সন্তান এবং বিবাহতান্ত্রিক আলোচনা শুনিতে লাগিলেন।

শুনিতে শুনিতে বেচারামবাবু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, সহসা লবঙ্গমঞ্জরীর উচ্চ কণ্ঠস্বরে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, লবঙ্গমঞ্জরী কহিতেছেন, "তোদের স্বামী ঘরে মাষ্টার রেখে পড়িয়ে পাশ করিয়েছে—ভাগ্যি ভাল। আমার স্বামীর মত মানুষের হাতে পড়লে ফার্ষ্ট বুকেই শেষ হ'ত। আমি আবার পাশ দেব!" বেচারামবাবুর আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিল। রাগও হইল, কিন্তু ক্রোধের উদ্রেক হইলেই তিনি গ্রীক্ নীতি-উপদেষ্টার উপদেশ অনুসারে মনকে বিক্ষিপ্ত করিবার জন্য এক হইতে একশ পর্য্যন্ত গণিতেন, আজও সেই পন্থাই অবলম্বন করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে হাজার পর্য্যন্ত গণিয়াও ক্রোধের শান্তি হইল না, তখন ছাদে গিয়া পাদ-চারণা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, লবঙ্গমঞ্জরীর অতিথিরা যূথবদ্ধ হইয়া—মোটর-আরোহণে প্রস্থান করিলেন, ছাদ হইতে রক্তনেত্র বেচারামবাবু তাহা দেখিলেন। তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিলেন। লবঙ্গমঞ্জরী প্রশ্ন করিলেন, "ড'খানা লুচি মুখে দেবে?"

বেচারামবাবু কহিলেন, "না।" তারপর নীচে নামিয়া গিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া ক্ষেমী ঝির হাতে দিয়া লবঙ্গ-মঞ্জরীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। লবঙ্গমঞ্জরী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পাঠ করিলেন —

"তুমি আমার অপমান করিয়াছ। আমি তোমাকে মাষ্টার রাখিয়া পড়াইয়া পাশ করাই নাই এই কথা ভদ্র-মহিলাদের নিকট রটাইয়াছ। কালই এই কথা তাঁহাদের স্বামীর নিকট এবং স্বামীদের মুখ হইতে তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবেরা শুনিবেন। প্রথমে কলিকাতা সহরে, তাহার পর দিল্লী আগ্রা দেরাদুন সিমলা কাণপুর বোম্বাই মাদ্রাজে এই অখ্যাতি প্রচার হইয়া যাইবে। লোকে মনে করিবে আমি স্ত্রীকে যন্ত্রণা দিই এবং তাঁহাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বর্ব্বর করিয়া রাখিয়াছি। এ ক্ষেত্রে আমি তোমার স্বামী হইবার উপযুক্ত নহি, কাজেই অদ্য হইতে আমি বৈঠকখানায় শুইব এবং নীচের ঘরেই আহারাদি করিব। ইতি শ্রীবেচারাম।"

লবঙ্গমঞ্জরীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, কহিলেন "বেশ!"

আহারান্তে বৈঠকখানার ঘরে ছারপোকার দংশনে অতিষ্ঠ হইয়া বেচারামবাবু ছট্ ফট্ করিতেছিলেন এমন সময় ক্ষেমীঝি একখানি পত্র লইয়া উপস্থিত হইল, বেচারামবাবু পড়িলেন।

"তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম। তোমার ছেলে মেয়েদের খাওয়াইতে পরাইতে আমার জীবন ব্যর্থ হইল, আবার তুমিই রাগ করিতেছ! আমি কল্য হইতে তোমার সংশ্রবে থাকিব না, অশান্ত ছেলে মেয়ে কেমন করিয়া সামলাও তাহা দেখিব। লোকে দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝেনা। ইতি—শ্রীমতী লবঙ্গমঞ্জরী দেবী।"

প্রথমে বেচারামবাবুর মাথা ঘুরিয়া উঠিল কিন্তু তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া ক্ষেমী ঝিকে কহিলেন বেশ!"

* * * *

সমস্ত রাত্রি নানা দুর্ভাবনা ও নির্ম্মম ছারপোকা-দংশনের ফলে গতনিদ্র হইয়া রাত্রিশেষে বেচারামবাবু ঘুমাইয়া পড়িয়া-ছিলেন—ঘুম ভাঙ্গিল ছোট খোকার চীৎকারে। সে আসিয়া বেচারামবাবুর হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "খিদে পেয়েছে বাবা!" তন্দ্রাবিজড়িত নেত্র ঈষদুন্মীলিত করিয়া বেচারামবাবু কহিলেন—"বিরক্ত কোরোনা খোকা, তোমার মার কাছে যাও!" খোকা কহিল—"মা যে নেই।" সর্পদষ্টবৎ চমকিত হইয়া বেচারামবাবু শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন, গত দিবসের যাবতীয় ঘটনা মনে পড়িল। তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠিয়া দেখিলেন দোতলা শূন্য—কেবল বড় খুকী ছবি আঁকিতেছে এবং বড় খোকা ও ছোট খুকী দুই জনে পিতার পরিত্যক্ত ছেঁড়া চটিগুলি সংগ্রহ করিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর রজত শুভ্র প্রশস্ত শয্যার উপর একটি ছিন্ন পাদুকার মনুমেণ্ট প্রস্তুত করিতেছে। বেচারামবাবুকে দেখিয়াই বড়খুকী কহিল,—"আজ আমার স্কুলের মাইনের দিন বাবা, টাকা দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিও। বার বার চাইতে পার্ব্বনা।"

বেচারামবাবু প্রশ্ন করিলেন—"তোমার মা"—

বড়খুকী কহিল—"মা দিয়ে যায়নি, ব'লে গেল যে সব তোমার কাছ থেকে নিতে হবে। এই তোমার ভাঙা বাক্সটার চাবী রেখে গেছে।" বলিয়া একটা চাবী পিতার হাতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বেচারামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় গেছেন?"

বড় খোকা কহিল—"বাগবাজার! আর বলেছে তুমি যদি ও-মুখো হও—" বড়খুকী তাহাকে ধমক্ দিয়া কহিল, "চুপ্ কর, খোকা, বাপের সঙ্গে বুঝি ও রকম ক'রে কথা কইতে হয়। শোন বাবা, মা বলেছে যে যদি তুমি বাগবাজারের দিকে যাও তা হ'লে মা দুঃখিত হবেন, তারপর, কলকাতা ছেড়ে চলে যাবেন—কাশীও যেতে পারেন, কাটোয়ায়ও যেতে পারেন।" ছোট খুকী কহিল—"মা বলেছে—যে সে আর আমাদের মা নয়, নতুন মা আস্‌বে। হ্যাঁ বাবা কবে আস্‌বে?"

বেচারামবাবু কহিলেন—"হুম! আচ্ছা!"

তাহার পর একখানি চাদর গায়ে ফেলিয়া বাহির হইবার জন্য কেবল ঘরের বাহির হইবেন এমন সময় বড় খোকা কহিল, "আমাদের খাবার আনিয়ে দাও বাবা। আমার কচুরী, ছোট খুকীর বার্লির বিস্কুট!"

বড় খুকী ও ছোট খোকা সমস্বরে কহিল—"আমাদের গরম বেগুনী।"

বেচারামবাবু একটু ভীত হইলেন তারপর কহিলেন—"ক্ষেমীকে ডাক!"

"সে তো নেই বাবা!" বড় খুকী কহিল।

"কোথায়?"

"সে আজ সকালে মার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে মার গাড়ীতেই চ'লে গেছে।"

বেচারামবাবু বুঝিলেন যে ষড়যন্ত্র, কহিলেন—"হুম্! বেশ দেখ্‌ব! ঠাকুর—" গণপতি ঠাকুর আসিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল যে সজিনার চচ্চড়িতে লঙ্কা বাঁটা দিতে হইবে কি না।

বেচারামবাবু কহিলেন, "না। তুমি খোকা খুকীদের খাবার আনিয়ে দাও।"

গণপতি কহিল—"এখন আবার কি খাবে বাবু! দশটা বাজে। একবার তো খেয়েছে!"

বেচারামবাবু বুভুক্ষু চতুষ্টয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিয়া কহিলেন—"খেয়েছিস্?"

বড় খুকী কহিল—"অল্প।"

বেচারামবাবু কহিলেন,—"এখন থাক্ তবে বিকেলে বেশী ক'রে খাস্!"

সে দিন বেচারামবাবু গৃহস্থালীতে মনোযোগ দিলেন, সমস্ত গুছাইয়া খোকাখুকীদের আহারের নিয়ম ও পরিমাণ একখানি কাগজে লিখিয়া রান্নাঘরের দরজায় সাঁটিয়া দিলেন এবং ঠাকুর ও চাকরকে জানাইলেন যে সমস্ত কাজ নিয়মমত হওয়া চাই। মাইজী নাই বলিয়া চালাকী করা চলিবেনা।

রাত্রে বেচারামবাবুর তন্দ্রাকর্ষণ হইবার উপক্রম হইতেছিল; ছোট খোকা আসিয়া কহিল—"বাবা আমার লাল জামাটা পরিয়ে দাও না—"

বেচারামবাবুর তন্দ্রা টুটিল—"রাত্রে কি হবে জামা?"

ছোট খোকা কহিল—"নৈলে ঘুম পাচ্ছে না আমার!"

বেচারাম বাবু হাঁকিলেন—"বড় খুকী!"

বড়খুকী জবাব দিল—"আমার বড্ড কাণ কট্ কট্ কচ্ছে বাবা!"

বেচারামবাবু কহিলেন—"আচ্ছা।"

প্রভাতে বৈঠকখানায় বসিতেই জগু কোচম্যান আসিয়া জানাইল ঘোড়া দানা খাইতেছে না।

বেচারামবাবু কহিলেন—"ডাক্তার দেখাও।"

জগু চলিয়া গেল এবং সন্ধ্যার সময় আসিয়া জানাইল যে ঘোড়া ছট্ ফট্ করিতেছে।

বেচারামবাবু ধোপার কাপড় হিসাব করিতেছিলেন। নির্ব্বিকার চিত্তে হুকুম দিলেন, ঘোড়াকে পিঁজরা-পোলে পাঠাইয়া দেওয়া হোক্!

দুপুর বেলা বেচারামবাবু ঘুমাইতেছিলেন, এমন সময় একটি কন্‌ষ্টেবল দুই হাতে ছোটখোকা ও ছোটখুকীর হাত ধরিয়া আনিয়া হাজির করিয়া জানাইল যে বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া দুই জন কাঁদিতে কাঁদিতে বাগবাজারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। বেচারামবাবু কনষ্টেবলকে একটি সিকি বখশিস্ দিয়া বিদায় করিলেন, কিন্তু বুঝিতে পারিলেন কলিকাতার গাড়ীঘোড়াসঙ্কুল সহরে এইসব অশান্ত ছেলে মেয়ে লইয়া বাস করা নিতান্তই বিপদ্‌জনক। তৎক্ষণাৎ বরকন্দাজ ডাকিয়া টাইমটেবিল কিনিতে হাওড়ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন।

টাইমটেবিলের পাতা উল্টাইয়া আইন কানুন দেখিয়া বেচারাম বাবু মনে মনে কি স্থির করিলেন তাহা তিনিই জানেন। সন্ধ্যাকালে এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, এক ঝুড়ি কমলা লেবু ও হোমিওপাথি-চিকিৎসাবিজ্ঞান নামক

একখানি বহির এগারো ভল্যুম কিনিয়া বাড়িতে পৌঁছিয়াই দেখিলেন দোতালায় হৈ চৈ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এক গামলা রসগোল্লা সম্মুখে লইয়া তাঁহার দুই খোকা ও দুই খুকী মহা সমারোহে ভোজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বেচারামবাবু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন এবং অতিরিক্ত রসগোল্লাভোজনে উদরাময় হইলে নক্স কিংবা পাল্‌সেটিলা দিতে হইবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় দাদার সহিত পাল্লা দিতে গিয়া ছোট খোকা এক সঙ্গে দুইটি রসগোল্লা গালে দিয়া ফেলিয়া চক্ষু কপালে তুলিল। বড়খুকী তাড়াতাড়ি চেঁচাইয়া উঠিল—"ওরে মর্ব্বি যে—বমি কর্!" ছোট খোকা সেই অবস্থাতেই মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াই চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। বড়খুকী কাঁদিয়া উঠিল এবং ঠিক্ সেই সময় ঘরের দরজার আড়াল হইতে ক্ষেমীঝি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ছোট খোকাকে কোলে লইয়া তাহার মাথায় জল ঢালিয়া বাতাস করিতে বসিল। বেচারামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এখানে কেন?"

ক্ষেমী কহিল—"গিন্নিমা খোকাখুকীদের রসগোল্লা পাঠিয়েছিলেন। তাই—"

বেচারামবাবু কহিলেন—"হুম্! ফিরিয়ে নিয়ে যাও!"

রসগোল্লা ফিরাইয়া লইবার কথায় ছোট খোকা উঠিয়া বসিয়া কহিল—"উঁহু! ও আমার!" বলিয়া আড়াই সের রসগোল্লার অবশিষ্ট তিনটি খপ্ করিয়া মুঠা করিয়া লইয়া সে একতলার সিঁড়ি ধরিল। বেচারামবাবু আঙ্গুল তুলিয়া ক্ষেমীঝিকে কহিলেন—"গামলাটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও!"

ক্ষেমীঝি চলিয়া গেল।

সারারাত্রি ধরিয়া বেচারামবাবু নানাপ্রকার যুক্তিতর্কসমন্বিত চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে কলিকাতায় লবঙ্গমঞ্জরীর এবম্বিধ ঔদরিক অশান্ত সন্তানাদি লইয়া বাস করিলে আশু বিপৎপাত অবশ্যম্ভাবী। ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে চার টুক্‌রা পেষ্টবোর্ডে তাঁহার চারিটি সন্তানের নাম পরিচয়সহ লিখিয়া দুই খোকা ও দুই খুকীর গলায় ঝুলাইয়া দিয়া বেচারামবাবু হাঁকিলেন—"মহাদেও, ট্যাক্সি নিয়ে এস।"

বড়খুকী জিজ্ঞাসা করিল—"গলায় টিকিট দিলে কেন বাবা?"

বেচারামবাবু কহিলেন—"বেড়াতে যাচ্ছি। পরে যদি কেউ হারিয়ে যাস্ তবে এই টিকিট দেখালে কল্‌কাতায় এই বাড়ীতে পৌঁছে দেবে। যদি গাড়ীতে কলিশন হয়, আর তাতে যদি আমি——বুঝ্‌লি, তবে তোদের গলায় এই টিকিট দেখে রেলের লোক তোদের খবর জানতে পার্ব্বে। বুঝ্‌লি?" বড়খুকী বুদ্ধিমতী সমস্তই বুঝিল। বেড়াইতে যাইবার আশায় অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া সে হাতের কাছে জামা-কাপড় যাহা পাইল গুছাইয়া লইল! বেচারামবাবু জগুর সাহায্যে ছয়খানা লেপ ও সাতখানা তোষকের একটা প্রকাণ্ড বিছানার বাণ্ডিল করিয়া স্বতন্ত্র ট্যাক্সিতে অন্যান্য দ্রব্যাদি সহ জগুকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া নিজের ঘরে কুলুপ দিয়া ও লবঙ্গমঞ্জরীর ঘরগুলি খোলা রাখিয়া মহাদেও বরকন্দাজের প্রতি গৃহরক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। তাহার পর সিদ্ধিদাতা গণেশের নাম জপিতে জপিতে ছেলেমেয়ের হাত ধরিয়া ট্যাক্সিতে গিয়া উঠিলেন।

বেচারামবাবু টিকিট কিনিয়াছিলেন মথুরার। কিন্তু বর্দ্ধমানে গাড়ী পৌঁছিলেই হঠাৎ হাতের খবরের কাগজখানা মুঠা করিয়া কহিলেন—"বড়খুকী! তোরা সব নেমে পড়্।"

ছোট খোকা কহিল—"দাদা নাম্, বাবা সীতাভোগ খাওয়াবে!"

বড়খুকী কহিল—"নাম্‌বে কেন বাবা?"

বেচারামবাবু খবরের কাগজখানা বড়খুকীর গায়ে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—"ত্যাখ্ না পড়ে মথুরার কাছে কেবলই ইঁদুর মর্চ্ছে—প্লেগে মর্ব্বি নাকি সবশুদ্ধ? নাম্ নাম্—" ছোটখোকা পূর্ব্বেই নামিয়া সীতাভোগওয়ালাকে ডাকিতেছিল, বেচারামবাবু বাকী তিনটিকে সঙ্গে করিয়া নামিয়া পড়িলেন। প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেন যে কাছে স্বাস্থ্যকর স্থানের মধ্যে আছে উত্তরপাড়া—সেখানে গঙ্গার ধারে তাঁহার স্বর্গীয় পিতা কেনারামবাবুর বাগানবাড়ীও আছে। ভাবিতে ভাবিতে একখানি ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণ আসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি এক সের সীতাভোগ কিনিয়া সেই গাড়ীতেই উঠিয়া বসিলেন এবং যথাকালে উত্তরপাড়ায় অবতরণ করিয়া জঙ্গলাকীর্ণ 'কেনারাম-উদ্যানে' স্থান গ্রহণ করিলেন।

* * * *

জগু প্রভুভক্ত কোচম্যান। প্রভুর গাড়ী যখন ডিস্‌ট্যান্ট

গিয়া প্রভুপত্নীকে জানাইল যে বাবু অন্য প্রাতে পুত্রকন্যাসহ মথুরা যাত্রা করিয়াছেন। লবঙ্গমঞ্জরীর হাত হইতে প্রাতঃ-কালীন গরম সিঙ্গাড়ার ঠোঙাটি পড়িয়া গেল। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না, বিচিত্র দুর্ভাবনায় বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। মথুরার পাণ্ডারা নাকি ডাকাত এই কথা ছেলেবেলায় তাঁহার ঠাকুরমার নিকট শুনিয়াছিলেন। মনে হইতে লাগিল এতক্ষণ মারিয়া ধরিয়া পাণ্ডারা খুকীর গলার হার, ছোটখুকীর কোমরপেটী সমস্ত কাড়িয়া লইয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে আতঙ্কে তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন—"তোরা কেন যাস্‌নি সঙ্গে?"

জগু কহিল—"বাবু নিলেনা কি করি? তা নৈলে বুড়া-কালে মথুরাজী দর্শন—"

লবঙ্গমঞ্জরীর মাতা আসিয়া সমস্ত শুনিয়া তাঁহার পুত্রকে কহিলেন—"তুই যা হরু। দস্যি ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে ঘাটে একা মানুষ"—হরুর দেশ ভ্রমণের দারুণ সখ ছিল,—পয়সার অভাবে কোথাও যাইতে পারে নাই বটে কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্ত রেলওয়ে কোম্পানীর টাইমটেবিল পড়িতে পড়িতে একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। মাতার প্রস্তাব শুনিয়াই সোৎসাহে ক'হিল—"এ তো অতি অবিশ্যি কথা—"

"ওদের সঙ্গে দেখা হ'লেই আমাকে একখানা তার ক'রে দিবি বুঝ্‌লি?" বলিয়া লবঙ্গমঞ্জরী একশ টাকার একটা পুঁটুলী হরুর হাতে গুঁজিয়া দিলেন। হরু হাতে সুটকেস্ ঝুলাইয়া বাহির হইয়াই বাসে চড়িল।

এমন সময় বাহিরের দরজার কাছে এক ভিখারী আসিয়া গান ধরিল—

আর তো ব্রজে যাব না ভাই
যেতে প্রাণ আর নাহি চায়।
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে
তাই এসেছি মথুরায়!

শুনিয়া লবঙ্গমঞ্জরী শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন—"কি অলুক্ষুণে গানরে বাপু! দূর করে দে জগু হতভাগাকে!" ভিখারী বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল, তথাপি কীর্ত্তনের শেষ চরণটি লবঙ্গমঞ্জরীর মনের মধ্যে ক্রমাগত হাতুড়ীর আঘাত করিতে লাগিল। শেষে অতিষ্ঠ হইয়া ক্ষেমীঝিকে সঙ্গে লইয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে লবঙ্গমঞ্জরী ট্যাক্সি আরোহণে পতিগৃহে অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর দুশ্চিন্তা তিনগুণ বাড়িয়া গেল। দেখিলেন যে বেচারামবাবু গরম ওভার কোট লইয়া যান নাই। খোকাখুকীদের চল্লিশ জোড়া পশমী মোজা ঘর ও বারান্দায় ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। লবঙ্গমঞ্জরী কাঁদিয়া ক্ষেমীকে কহিলেন—"কি শাস্তি হ'ল আমার ক্ষেমী। এই শীতের দিন গরম জামা মোজাসব ফেলে উনি চ'লে গেলেন।"

ক্ষেমী সান্ত্বনা দিয়া কহিল—"সে তুমি ভেবোনা সঙ্গে টাকা পয়সা আছে—কিনে নেবেন।"

লবঙ্গমঞ্জরী কহিলেন—"সে কি কল্‌কাতার সহর ক্ষেমী যে পয়সা দিলেই জিনিষ মিল্‌বে? রাগ ক'রে কি ছাই খেয়েছি আমি!" বলিয়াই লবঙ্গমঞ্জরী শয্যা গ্রহণ করিলেন—ক্ষেমী তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

* * * *

উত্তরপাড়ার বাগান-বাড়ীর সম্মুখে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া বেচারাম বাবু তাঁহার সংসারের কথা ভাবিতেছিলেন। দারুণ দুঃখময় বিশৃঙ্খল সংসার। প্রাণাধিকা পত্নী—যাঁহার সহিত কত গভীর রাত্রে দশবৎসর পূর্ব্বে এই গঙ্গার এই ঘাটেই সাঁতার কাটিয়াছেন, সুরে সুর মিলাইয়া রবিঠাকুরের প্রেমের গান গাহিয়াছেন—সে পত্নী বিমুখ; বড় খুকী রাঁধিতে গেলেই ঘুমাইয়া পড়ে, বড় খোকা বাগানবাড়ীর মালী সহদেব গোয়ালার যন্ত্রপাতি সুবিধা পাইলেই গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দেয়—ছোট খোকার দুই আনা মূল্যের পাঁউরুটি ও পোয়াদেড়েক ঝোলাগুড় ব্যতীত প্রাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, ছোটখুকী জোনাকী দেখিলেই ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে। বাগানে মশা এবং কট্‌কটে ব্যাং সমানে সমস্ত রাত্রি শব্দ করে—সহদেব মালী তাহার গৃহাবাসিনী প্রণয়িনীর নাম ধরিয়া ঘুমের ঘোরে উড়িয়া ভাষায় নিদারুণ চীৎকার করিতে থাকে—বেচারাম বাবুর ঘুম ভাঙিয়া যায়। এই প্রকার বিচিত্র উৎপাত বেচারাম বাবুকে মুহ্যমান করিয়া তুলিতেছিল। নিঃসঙ্গ জীবন কিছুতেই আর ভাল লাগিতেছে না। মনে হইল ষ্টীমারযোগে একবার তাঁহার সুন্দরবনের প্রজাদের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলে হয় তো অনেকটা শান্তি লাভ হইতে পারে। ভাবিয়া ভাবিয়া সঙ্কল্প অনেকটা স্থির করিয়া

আসিতেছিলেন এমন সময় কে কহিল"—বেচুবাবু যে! নমস্কার!"

বেচারাম বাবু মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—তালতলার বিপিন চৌধুরী। আগে শিয়ালদয় টিকেট কালেক্টার ছিলেন তারপর পুরাণো রিটার্ণ টিকিট বিক্রয় করিয়া চাকুরী হারাইয়া উত্তরপাড়ায় ভূষির আড়ত খুলিয়াছেন। পরিচয় ছিল—বেচারাম বাবু কহিলেন"—হ্যাঁ।"

বিপিন কহিল"—বেশ! বেশ! অনেক কাল পর দেখা হ'ল। বাগানে এসেছেন বুঝি? সপরিবারে? বেচারাম বাবু মুখ বিমর্ষ হইলেন, বলিলেন—"পরিবার নেই।"

বিপিন কহিল"—পরিবার নেই কি মশাই? জানতুম না তো! বড় দুঃখের কথা।"

বেচারাম দার্শনিকের মত গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন"—দুঃখ আর কি? জগতে মিলন বিরহ দিন রাত সবইতো আছে। সবই তো সৈতে হয়?"

বিপিন একটু দম লইয়া কহিল,—"তা' যদি মনে না করেন। আমার শালীর বয়স একুশ। রং আমার স্ত্রীর মত ফর্সা চোখ অত টানা নয় তবে এদিকে বুঝ ছেন—ভারী ডাগর। গরীব ব্রাহ্মণ। যদি অনুমতি করেন তা হলে—"

গঙ্গার দিকে চাহিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর সন্তরণ-চঞ্চল দেহের স্মৃতি বেচারাম বাবুর অন্তরে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছিল। বিপিনের কথা তাঁহার কাণে গেলনা, অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, "দেখব।"

বিপিন বাড়ীতে ফিরিয়াই প্রথমে তাহার স্ত্রী, তৎপর তাহার শাশুড়ী তাহার পর তাহার শ্বশুর মালগুদামের কেরাণী জলধর বাবুকে জানাইল যে সে বড় শীকার গাঁথিয়াছে। সেই সঙ্গে তাহার শ্যালিকা বৃন্দারাণীর থুৎনিতে চিমটি কাটিয়া দুই অক্ষরের একটা রসিকতা করিতেও ছাড়িল না। বেচারামের দ্বিতীয়পক্ষ হইলে কি হয়—তাহার অবস্থা ইত্যাদি বলিয়া বিপিন কন্যাভার-কাতর জলধর বাবুকে ও তাঁহার পত্নীর অন্তরাত্মাকে লোলুপ করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিলেন না, তৎপর দিবস সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বেই জলধর বাবুর পত্নী স্বামীকে বেচারাম বাবুর সম্বন্ধে সাক্ষাৎ-সন্ধান আনিতে ভোরের গাড়ীতেই কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

* * *

কয়েক দিন হরুর টেলিগ্রামের প্রতীক্ষায় পিওনের পথ-পানে চাহিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর চক্ষের দীপ্তি নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছিল। বেচারাম বাবুর মথুরাযাত্রার দিবস হইতেই নিদ্রা ঘুচিয়াছে হরুর টেলিগ্রাম না পাইয়া আহারও ঘুচিল। তিনি কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন। সে দিনও দ্বিপ্রহরে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন, এমন সময় দরজার বাহিরে কে একজন ডাকিল—"এটা কি বেচারাম বাবুর বাড়ী!" লবঙ্গমঞ্জরী নিদ্রিতা ক্ষেমীঝির চুল ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া বলিলেন—"ক্ষেমী দেখ তো টেলিগ্রাম এলো বুঝি—"

ক্ষেমী উঠিয়া একতলা ঘুরিয়া আসিয়া কহিল—"ভদ্দর লোক। বুড়ো।" স্বামীর সংবাদ পাইবে ভাবিয়া লবঙ্গ-মঞ্জরী ক্ষেমীকে সঙ্গে করিয়া নীচে নামিলেন। ভদ্রলোককে বৈঠকখানায় বসাইয়া প্রশ্ন করিলেন—কোত্থেকে আসছেন?"

জলধর বাবু কহিলেন—"ওতোরপাড়া থেকে। এটা বেচারাম বাবুর নিজ বাড়ী? পৈতৃক?"

লবঙ্গমঞ্জরী কহিলেন—হুঁ।

"পথ ভুলে কালিঘাট গিয়ে পড়ে' ছিলুম তা, বেশ!" বলিয়া জলধর বাবু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বহু পারিবারিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন যে বেচারাম বাবুর হাতে পড়িলে তাঁহার আদরিণী কন্যা রাণীর হালে থাকিবে। যাইবার সময় অনুচ্চ স্বরে জলধর বাবু কহিলেন—"এখন প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।"

কথাটি লবঙ্গমঞ্জরীর কাণে গেল—কহিলেন—"কি বল্লেন?

জলধর বাবু কহিলেন, "কি বলব আর মা, একটা বয়স্থা মেয়েকে নিয়ে বিপদে পড়েছি। আমার জামাই বিপিন—বেচারামের বন্ধু, বল্লে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ করবার ইচ্ছে।"

ক্ষেমী ঝি বিস্ময়ে হাঁ করিয়া ফেলিল, লবঙ্গমঞ্জরীর নিষ্প্রভ চক্ষুতে দীপ্তি ফিরিয়া আসিল—তিনি প্রশ্ন করিলেন—"তিনি কোথায়?"

"ওতোর পাড়াতেই আছেন"—শুভকর্ম্ম শেষ হইল বলিয়া কন্যার রাজরাণী হইবার সম্ভাবনায় উল্লসিত হইয়া জলধর বাবু লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

বেচারামবাবু মথুরা যাইবার ভাণ করিয়া উত্তরপাড়ায় গিয়া গোপনে বিবাহ করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন! লবঙ্গমঞ্জরীর

মগজে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। মনে হইল বেচারামবাবুই একটি মূর্ত্তিমান ষড়যন্ত্র! নানাপ্রকারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হইতে বিরত রাখিয়া আজ পর্য্যন্ত লবঙ্গমঞ্জরীর সহিত তিনি যতপ্রকার ব্যবহার করিয়াছেন সমস্তই ষড়যন্ত্রমূলক। কি করিবেন কিছুই লবঙ্গমঞ্জরী স্থির করিতে পারিলেন না। ক্ষেমী ঝি এই সময় কহিল—"ভেবে আর কি কর্ব্বে মা? এখনও সময় আছে—তোমাকে দেখলেই——"

"আমি তাঁকে চাইনে। আমার ছেলেমেয়ে নিয়েই সংসার। মহাদেও!"

হুকুম পাইয়া মহাদেও ট্যাক্সী লইয়া আসিল।

* * * *

শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। বাগানবাড়ীর এক-তলায় ইজিচেয়ারে বালাপোষ গায়ে জড়াইয়া বেচারামবাবু বিবর্ণমুখে বসিয়াছিলেন। সম্মুখের চেয়ারে বিপিন চৌধুরী বসিয়া কহিতেছিল—"এ কি রকম কথা মশাই, অনর্থক বুড়ো ভদ্রলোকের চৌদ্দ আনা গাড়ীভাড়া খসিয়ে এখন বল্ছেন—"

বেচারাম বাবু কহিলেন—"ভুল শুনেছেন। আমি সে সব বলিনি।"

বিপিন কহিল—"ভুল শুনব আমি মশাই, ভূমির দালালী ক'রে খাই—কড়াক্রান্তির পাওনাগণ্ডা মনে থাকে, আর আমি শুনব ভুল! স্পষ্ট বলুন না, বিয়ে কর্বেন কিনা?"

বেচারামবাবু মাথা টিপিয়া ধরিয়া কহিলেন—"মশাই বিরক্ত কর্বেন না! আর ভাল লাগছে না। আমার স্ত্রী আছেন—বাপের বাড়ীতে। কাজেই বলেছিলুম পরিবার নেই। আর তিনি না থাক্লেও—আমি বিয়ে কর্ত্তাম না জানেন? তাঁকে ছাড়া অচেনা কাউকে বিয়ে কর্ত্তে পারিনে—তাঁর সঙ্গে চৌদ্দ বছরের পরিচয়—বুঝ্ছেন?"

বিপিন কহিল,—"স্ত্রীলোক আবার অচেনা কি? একবার দেখেই তো নাড়ীনক্ষত্র চেনা যায়! দেখ্ছি ফাঁকিবাজী আপনার! স্ত্রী একটা থাকল ত' হ'ল কি? আর একটা বিয়ে ক'রে এখানে রেখে যান—মাস মাস খোরাকীর টাকা দেবেন।"

বেচারামবাবু বিব্রত হইয়া কহিলেন—"বল্ছি যে মশাই মাথা টন্ টন্ কর্চ্ছে—কথা কইতে পার্চ্ছিনে"—

এতক্ষণ দরজার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া লবঙ্গমঞ্জরী স্বামীর কথা শুনিতে শুনিতে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছিলেন। এইবার প্রবেশ করিয়া বিপিনের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বেচারামবাবু—"তুমি!" বলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াই ইজি-চেয়ারে পুনরায় শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিলেন! বিপিন অবস্থা বুঝিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল—চৌদ্দআনা আদায় করিতে পারিল না। ক্ষেমীঝির মুখে সংবাদ পাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ভাতের থালা ফেলিয়া খোকাখুকু চতুষ্টয় আসিয়া রুগ্নমানা মাতাকে ঘিরিয়া ফেলিল। লবঙ্গমঞ্জরী কাঁদিতে কাঁদিতে সব ক'টিকে একসঙ্গে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ইজি-চেয়ারে শয়ান বেচারামবাবুর বিবর্ণ ওষ্ঠাধরের দিকে বারবার সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

* * * *

দু'জনে চোখোচোখী হইল অনেকবারই। কিন্তু কথা কে আগে কহিবে তাহা স্থির হইল না। লুচী-পরিবেশনের ফাঁকে—"আর দু'খানা দিই"—বলিয়া আলাপ আরম্ভ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে কিন্তু মানের হানি হইবে না ভাবিয়া লবঙ্গমঞ্জরী রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল পর লুচীর থালা হাতে লইয়া আসিয়া দেখিলেন, ইজিচেয়ার শূন্য, বেচারাম নাই। আশঙ্কায় লবঙ্গমঞ্জরীর হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে লাগিল।

* * * *

গঙ্গার ঘাটে বেচারামবাবু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন। বাস্—কোনও উৎপাত নাই—সংসার এখন স্বচ্ছন্দে রসাতলে যাইতে পারে ভাবিতেছিলেন, এমন সময় মৃদুপদক্ষেপে কে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে নীরবে বসিল। দেখিলেন লবঙ্গমঞ্জরী! তাঁহার দেহে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হইল, তথাপি বেচারাম নির্ব্বাক্। লবঙ্গমঞ্জরীর গায়ে সেমিজ ও ব্লাউজ ছিল না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া তিনি পৌষের দারুণ শীতে কাঁপিতে লাগিলেন। বেচারামবাবু আড়চোখে অর্দ্ধাঙ্গিনীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বালাপোষখানি একটু উন্মোচন করিলেন এবং লবঙ্গমঞ্জরীর কম্পমান দেহখানি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাহার পর তাঁহার বাম স্কন্ধে লবঙ্গমঞ্জরীর মস্তক ও দক্ষিণ স্কন্ধে লবঙ্গমঞ্জরীর দক্ষিণ বাহু অবাধে স্থানলাভ করিল।

গঙ্গায় তখন জোয়ার আসিয়াছে। জোয়ারের টানে নৌকা ভাসাইয়া জনকয়েক মাঝি পূর্ব্ববঙ্গের ভাটিয়ালের টানাসুরে কোরাস গাহিয়া চলিয়াছে—

দক্ষিণ হাওয়ায় নৌকার পাল ছিঁড়্যাছে
ওরে ও মাঁঝি খবরদার!
দণ্ডে দণ্ডে প্রেমের নদী হয় সাঁতার!

শুনিয়া তীরস্থ দুইটি নির্ব্বাক প্রাণী—মৃদু হাস্য করিলেন। কথা ফুটিল। এক জন অশ্রুগদগদকণ্ঠে ডাকিলেন—লবং! অন্য জন ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে জবাব দিলেন—বেচারা!

বিজয়া

—শ্রী [illegible] নরসুন্দর

আজ বাংলা-সাহিত্যের প্রগতির যুগ। সে সঙ্কীর্ণ ধারা আর নাই আজ তাহা পরিপূর্ণ রসধারা লইয়া উচ্ছ্বসিত প্রবাহে সাগরসঙ্গমে মিশিতে চলিয়াছে, বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে সুর মিলাইয়া তালে তালে পা ফেলিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। মানুষের রুচি আজ বদলাইয়া গিয়াছে। আনন্দবোধের নূতন উপকরণও যেমন যথেষ্ট আমদানি হইয়াছে সেই সঙ্গে তাহার আবর্ত্তে পড়িয়া বাঙলার জনসাধারণের অনেক সম্পদও অন্তর্হিত হইয়াছে। জাতির পক্ষে ক্রমবিবর্ত্তনশীল জাতীয় সাহিত্য-সম্পদ-সংরক্ষণেরও একটা প্রয়োজন আছে ভাবিয়া বিগত যুগের পল্লীবাসী অনাড়ম্বর কৃষক সম্প্রদায়ের বাৎসল্যরসে পরিপুষ্ট আনন্দময়ীর বিদায়ব্যথিত জাতীয় প্রকৃতির লীলাময় আত্ম-প্রকাশ বিজয়াগানের একটা আভাষ প্রদান করিব।

বাঙলাদেশে বহুকাল হইতে দশভূজা মা ভবানীর পূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহা যেমন একদিকে বাঙালীর শক্তি-সাধনার কাহিনী অপর দিকে তেমনি জনকজননীর স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের নিভৃত অন্তরের সুকুমার বাৎসল্য ভাবের অত্যুন্নত পরিণতির পরিচয়; মানুষী ভাবের শ্রেষ্ঠ অবদান।

বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যের যখন নবজাগরণের যুগ, যখন এই প্রগতির মুখ ফিরিয়াছে মাত্র, সেই সময়ে বাঙলাদেশের পল্লীগুলি পূজার পূর্ব্ব হইতেই (বোধনের দিন হইতে) শেষ পর্য্যন্ত কয়েকদিন আগমনী ও বিজয়াগানে মুখরিত হইয়া উঠিত। পল্লীকবিরাই রচয়িতা ছিলেন। অনেক সময়ে দুই দলে এই লইয়া পাল্লাও চলিত। একদল হইত গিরিরাজ অপর দল হইত মেনকা। কন্যা উমাকে জামাতা-বাড়ী হইতে আনিতে যাইবার কথা লইয়াই যত গোলমাল। স্নেহাভিভূত মাতৃ-হৃদয় দীর্ঘকাল নিজের নাড়ী-ছেঁড়া ধন কন্যাকে দেখিতে না পাইয়া কি মর্ম্মান্তিক দুর্ব্বিষহ যাতনা অনুভব করে, উহার অন্তরে কিরূপ মরুভূমির উত্তপ্ত বাতাস বহিয়া যায় সেই বিয়োগ-ব্যথিত কাহিনীগুলি ফুটিয়া উঠিত মেনকার মুখে। কবি-প্রতিভাসম্পন্ন পল্লীবাসী নিজ অন্তরের অনুভূতি দিয়া উহা ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিত। অপর জন পিতৃহৃদয়ের জ্ঞানালোক-উদ্ভাসিত পুরুষ-ভাব লইয়া কবিতার মধ্য দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিত—রাণী, ও তোমার ভ্রম, কন্যা আমার জামাতালয়েই সুখে আছে; বিশ্বপূজ্য শঙ্করের সে গৃহিণী, তার স্বামীর পার্শ্বে থাকিয়াই অধিকতর সুখ। মনকে সান্ত্বনা দাও, অত অধীর হইও না, ও তোমার দুর্ব্বলতা; তোমার রাজৈশ্বর্য্যপুষ্ট অবিবাহিতা উমার সঙ্গে বিবাহিতা কন্যা তুচ্ছ দীন বাহ্যসম্পদবর্জ্জিত উমার তুলনা করিও না। কোমলে কঠোরে, জ্ঞানে অজ্ঞানে, স্থৈর্য্যে ও অধীরতায়, বাৎসল্যাভিভূত অন্তরে আর স্নেহপ্রবণ জ্ঞান গভীর হৃদয়ে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এগুলি যেন তারই কাহিনী। সন্তান-সৃষ্টিতে, তাহার জীবন-রচনায় পিতা অপেক্ষা মায়ের প্রভাব বেশী তাই স্নেহ-প্রবণ মাতৃহৃদয়ের অশ্রুবিধৌত আকুল আকুতিগুলি আমাদের বেশী ভাল লাগে।

প্রাচীন পল্লী-কবিদের অগণিত রচনাগুলি সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। আর পূর্ব্বকালে কেহই তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন না, প্রতি বৎসর নূতন করিয়া রচিত হইত। কিন্তু অপেক্ষাকৃত প্রতিভাবান পাঁচালীকার কবিরা তাহাকে যে রূপ দান করিয়াছিলেন খোঁজ করিলে তাহা কিছু কিছু পাওয়া যায়। আমি হুগলী জেলায় অবস্থানকালে দাশরথির সম-সাময়িক পাঁচালীকার সাধক রসিক রায়ের কীটদষ্ট পাণ্ডুলিপি-গুলি খোঁজ করিতে করিতে আগমনী ও বিজয়া গানের সন্ধান পাই। এগুলি পূর্ব্বে শ্রীরামপুরের পল্লী-অঞ্চলে গীত হইত। গত বৎসর 'অর্চ্চনা'র পূজার সংখ্যায় আগমনীর ছড়া ও গান গুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। এবার বিজয়া লইয়া বাঙালী মনের ও মাতৃহৃদয়ের ভাব-বৈচিত্র্যের আলোচনা করিতেছি।

বাঙালীর দুর্গোৎসব তাহার জীবনে এক বিরাট স্থান জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে, আজও তাহা ক্ষান্ত হয় নাই। বাঙলার ভক্তিমতী নারী বিশ্বজননী মাকে নিবিড় করিয়া ধরিয়াছেন। মা যশোদার মত বাৎসল্য-রসে অভিভূত হইয়া মা ভবানীকে তাঁহারা নিজেদের মেয়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবে ছাড়িয়াছেন। দীর্ঘ একটী বৎসর পরে মা যখন এই মর্ত্তে আগমন করেন তখন তাঁহারা মাকে ঠিক সুদীর্ঘ

দিনের পর বাপের বাড়ীতে আগমনকালে কন্যা-বরণের মতই চোখের জল ফেলিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বরণ করিয়া লন আবার বিজয়া-দশমীতে প্রতিমা-বিসর্জ্জনের সময় মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ীতে পাঠাইবার সময় যেরূপ দুঃখের অশ্রু ফেলিয়া বুক ভাসাইয়া থাকেন তেমনি করিয়াই চোখের জল ফেলেন। আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি সাধারণতঃ এই মনোভাব লইয়াই রচিত।

মেয়েদের জন্য জননী সব সময়ে একটা গভীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করেন। ছেলে সব সময়ে কাছে থাকে কিন্তু মেয়েকে পরের বাড়ীতে পাঠাইতে হয়, ইহাই বোধ হয় তাহার প্রধান কারণ। মেয়ের সুখ দুঃখ মা নিজ চোখে দেখিতে পান না তাই তিনি ভাবেন তাঁহার নাড়ী-ছেঁড়া ধনকে অপরে কি তাহার মত করিয়া দেখিবে? স্বামী যদিও সবচেয়ে আপনার তবুও তাহার মেয়েকে দেখিবার জামায়ের সুযোগ কোথায়? কাজেই শ্বশুর-বাড়ীতে মেয়ের দুঃখের কথাটাই মা সব সময়ে ভাবেন। এইজন্য মেয়ে দীর্ঘ দিনের পর যখন মায়ের কাছে আসে, মাতা তখন অভিনব আনন্দ অনুভব করেন, কিছুতেই কাছ-ছাড়া করিতে চান না। আবার জামাতা মেয়েকে লইতে আসিলে তিনি একেবারে অধীর হইয়া পড়েন—অতীত দিনের কথাগুলি তাঁহার মনে পড়িয়া যায়। নবমীর নিশি অতীত হইয়াছে, দশমী আসিয়াছে, উমাকে এবার বিদায় দিতে হইবে, তাই মেনকা অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছেন—

পোহাল নবমী নিশি অস্ত হবেন উমাশশী
গিরিপুরে সবে নিরানন্দ
মেনকা কাঁদিয়ে কয় এ দুঃখ কি প্রাণে সয়
আজ নাহি সুখের সম্বন্ধ।
কি করি ওহে গিরি কোন প্রাণে প্রাণকুমারী
উমাধনে করিব বিদায়।
কি কাল বিজয়া এল উমা আমার এলোথেলো
রাহুগ্রস্ত শশধর প্রায়।
মায়ের নয়নে বারি এ দুঃখ কিসে নিবারি
চক্ষের জল বক্ষেতে পড়িল।
উমাচাঁদ মলিন ঐ মা হ'য়ে কেমনে সই
খেদে আজি জীবন দহিল।

এত সাধের উমাধন যাকে দিব বিসর্জ্জন
দেখ গিরি সোণার প্রতিমা
চেয়ে উমা মুখপানে ছিলাম যেন সুধাপানে
কোথা যাবে এত সাধের উমা।

কোন প্রাণে উমাধনে, বিদায় দিব ওহে গিরি
নিরানন্দ করে যাবে আনন্দময়ী কুমারী।
গিরিরাজ হে, উমাচাঁদে,
নিরখিয়ে প্রাণ কাঁদে;
পড়েছি আজ কি প্রমাদে
দুনয়নে বহে বারি।
পুরী হবে অন্ধকার
মুখপানে চাব কার?
উমা বিনে হাহাকার আর কত করি।
ওহে গিরি হলো কি দায়
কেমনে দিব বিদায়
উমা আমার আজ কোথা যায়
সইতে নারি আমি নারী।

বাপের বাড়ীর উপর মেয়েদের এমন একটা টান থাকে যে সে হাজার স্বামী-সুখে গরবিণী হইলেও মায়ের কাছছাড়া হইবার সময় চোখের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারে না। মায়ের নিবিড় স্নেহের আবেষ্টনের মধ্যে যেন স্বামী-সুখ ভুলিয়া যায়। বিধাতার দুর্ল্লঙ্ঘ্য বিধানে নারীকে পুরুষের সহিত মিলিত হইতে হয়, তাহারি সহিত তাহারি গৃহে যাবজ্জীবন অবস্থান করিতে হয়, তাহাতে ভাই-ভগ্নী আত্মীয়-স্বজনের সহিত তাহার নাড়ীর যে যোগাযোগ ছিল তাহা যেন ছিন্ন হইয়া যায়। বাপের বাড়ীতে আসিলে সেই সকলের যোগসূত্র পুনরায় তাহাকে নূতন করিয়া বাঁধিয়া ফেলে, সেই পুরাতন দিনগুলি আবার ফিরিয়া আসে, তাই বিদায় লইয়া শ্বশুর-বাড়ীতে যাইবার কালে সে চোখের জল কিছুতেই রোধ করিতে পারে না। উমার চোখে জল দেখিয়া রাণীর অধীরতা বাড়িয়া গিয়াছে সেই জন্য তিনি গিরিরাজকে আর দুদিন রাখিবার জন্য শিবের কাছে অনুরোধ করিতে বলিতেছেন। মেনকা ভাবিতেছেন সেখানে শ্মশানবাসী শিবের কাছে গিয়া মেয়ে আবার সেই দুঃখের দিন যাপন করিবে, যতদিন এখানে থাকে সেই লাভ, দু'দিন পরে আবার তো শ্বশুর-বাড়ীতে যাইতে হইবেই।

শঙ্কর এসেছে নিতে কি দায় হ'ল বিদায় দিতে
প্রমাদ ঘটিল মম পক্ষে
ভিখারী হরের ঘরে বিদায় দিব কেমন করে
আর যে ধরেনা জল চক্ষে।
জামাতার কিছু নাই তৈল বিনে মাখে ছাই
শুনেছি গরল খায় হর
সিদ্ধিতে নিপুণ ভোলা সদা হ'য়ে আছে ভোলা
বসনবিহনে দিগম্বর।
শ্মশানে মশানে রয় নাম ধরে মৃত্যুঞ্জয়
শঙ্করের নাহিক বসতি
কোথা যাবে দাঁড়াবে উমা দশভুজা প্রতিমা
অন্নপূর্ণা আমার হৈমবতী।
অতএব ওহে গিরি শঙ্করের কর ধরি
বুঝাইয়ে কর হে বিদায়,
না হয় দুদিন পরে যাবে উমা তার ঘরে
শঙ্করের তাতে কিবা যায়।

আর কি বিলম্ব গিরি ধর হরের কর
আশুতোষে আশু তুষে বুঝায়ে বিস্তর।
বল তারে মৈনাক ডুবেছে আমার জলে
উমাধনে বিদায় দিতে জীবন যে জ্বলে।
কন্যা আমার কেঁদে সারা হইয়াছে উমা
আজ আমার দুঃখের নাহিক পরিসীমা।
মা হ'য়ে মেয়ের দুঃখ দেখিতে কি পারি
বিবর্ণ হইল মায়ের সুবর্ণ মাধুরী।

রসিকচন্দ্র মানুষের মনস্তত্ত্ব বুঝিতেন তাই তাঁহার মেনকা নিজ মাতৃহৃদয়ের খাঁটী অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া শিবের কাছে অনুরোধ জানাইতেছেন এই হিসাবে মৈনাকের অবতারণাটুকু সুন্দর হইয়াছে।

পাষাণ স্বামী ও নাছোড়বান্দা জামাতার নিকট যখন এত অনুনয় বিনয় ব্যর্থ হইল তখন মেনকা আসন্ন বিদায়-ব্যথায় ব্যথিত হইয়া কন্যাকে আর একবার আলিঙ্গন করিয়া গিরিরাজকে মাত্র একদিন মেয়েকে রাখিবার জন্য জামতাকে অনুরোধ করিতে বলিলেন। মেয়ের উপর ত কোন দাবী নাই তাই মেনকার অনুযোগ—

তুমি হে পাষাণ গিরি পাষাণহৃদয়
মমতা নাহিক, তাতে জামাতা নিদয়;
কার কাছে গিরি আমি এ দুঃখ জানাই
উমাধন তুল্য আর ধন আমার নাই।
এ ধনে পেয়েছি আমি সাধনার জন্যে
এক বার গিরিরাজ ধর বক্ষস্থলে।
উমাধন হয় যার হৃদয়ে উদয়
কদাচ তাহার মনে দুঃখ নাহি রয়।
উদরে ধরেছি আমি এমন উমাধন
মা হ'য়ে কি দিতে পারি এ ধন বিসর্জন।
কেন বা নবমীর নিশি প্রভাত হইল
কেন বা বিজয়া আমায় গ্রাসিতে আসিল।

কি বলিব শিরে যেন পড়ে বাজ
উমার যাবার কথা শুনে'
অস্থির হ'তেছে প্রাণ এ বিপদে কর ত্রাণ
দুটো কথা বলে ত্রিলোচনে।
ভেবে উমা হল কালি
না হয় পাঠাব কা'লি
চিরকাল কি রবে মম বাসে
ফিরে যাক্ কৃত্তিবাস জামাতার শ্মশানে বাস
সে বাসে কি মন ভালবাসে।
আশুতোষে আশুতোষ বুঝায়ে বিস্তর গিরি
মায়ের মমতা তাকি নাহি জানেন ত্রিপুরারি।
কন্যা দৈন্যা হলে পরে মায়ের মনে দুঃখ ভারি
সম্বৎসর পরে তাতে এনেছ এই প্রাণকুমারী।
উমাশশী অস্ত যাবে তাও কি সহিতে পারি
নয়নে দুঃখের বারি কি দিয়ে বল নিবারি।

স্বামীর কাছে অনুরোধ করিয়া যখন টিকিলনা তখন মেনকা মেয়ের উপর অনুযোগ করিয়া কহিলেন—'মা উমা চিরকাল ত স্বামীর ঘরেই থাকিবি তাই বলিয়া মায়ের কি কোন দাবী নাই! কিছুদিন তোকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব এ যে বড় সাধ ছিল। তোকে দেখিয়া আমি পুত্র মৈনাকের শোক ভুলিয়াছিলাম, আমার সমগ্র হৃদয়ে আনন্দ আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, বিদগ্ধ মার অন্তরে শান্তির সলিল বহিয়াছিল; তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে অনুভব করিতে না দিয়াই চলিয়া যাইবি। এলিই যদি মা তবে ত্রিলোচনকে সঙ্গে নিয়া এলি কেন? দুঃখিনী শোক-সন্তপ্তা জননীকে দীর্ঘদিন পরে যদি মনেই পড়িয়াছিল তবে সে আশায় সহসা এমন করিয়া বজ্র নিক্ষেপ করিতেছিস কেন! পাষাণ বাপের পাষাণী মেয়ে ত্রিলোচনকে ফিরাইয়া দেনা।' স্বামীর কাছে স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষিত হইতে পারে সেই আশায় মেনকা মেয়ের নিকটও অনুরোধ জানাইলেন।

কন্যাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার সংস্পর্শ ও বিচ্ছেদে বিশ্বের জননী-প্রকৃতির গভীর অন্তস্থলে যে সুখ-দুঃখের ছায়াপাত হয় কবি মেনকার ভিতর দিয়া তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। মেনকা তচ্ছেন—

ওমা উমে কোথা যাবি কেন মা কাঁদায়ে কাঁদাবি
মা আমার আর কি আছে ধন
তুই কি উমে আমার পর এলি সম্বৎসর
সঙ্গে সঙ্গে কেন ত্রিলোচন।
শিবের ঘরে বারো মাস তিনদিন আমার বাস
এসেছিলে প্রাণকুমারী উমে
মা ব'লে পড়েছে মনে তাই দেখা শুভক্ষণে
কোথা যাবি সুবর্ণ প্রতিমে।
পুরী হবে অন্ধকার আমি করিব হাহাকার
মায়ের কষ্ট ভাব দেখি মা উমে
যাইতে কৈলাস বাসে বিদায় কর কৃত্তিবাসে
কিছুদিন দেখিমা নয়নে।
আনন্দময়ীর আগমন আনন্দময় এ ভবন
নিরানন্দ করিবি কি জন্যে।

কেন মা তোর চক্ষে জল সাধের নন্দিনী
অঞ্চলে মুছাই আয় চন্দ্রবদন খানি।
মলিন ও মুখচন্দ্র আহা মরি মরি
কেমনে থাকিব মা তোরে বিদায় করি।
হাজার দুঃখে থাকি যদি সংসার ভিতরে
সব দুঃখ যায় তোর চন্দ্রবদন হেরে।
তোর গুণ জানে গো মা ভূলোক দেবলোক
তোরে পেয়ে ভুলে গেছি মৈনাকের শোক।
আজ আমার সব শোক উথলিল আসি
কোন প্রাণে লয়ে যাবে শঙ্কর সন্ন্যাসী।
পরের মত পরের ঘরে এলি তিনদিন
ওমা উমে তোর কি মা পরাণ কঠিন।
ভোলাকে ভুলায়ে মাগো পাঠায়ে দে অন্ত
নৈলে আমার বিদীর্ণ হতেছে হৃদি-পদ্ম।

মা কেবল নিজের বেদনার কথা উল্লেখ করিয়া ছাড়িলেন না, কন্যার সহচরী বা সখীদের দুঃখের কথা বর্ণনা করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থের বাহিরে আরও যে বহুনারীর প্রাণে আঘাত লাগিবে তাহাই প্রকাশ করিলেন। ইহা একদিকে যেমন মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বাহিরে বৃহত্তর মহত্তর কর্মক্ষেত্রের, বিশ্বের সকলের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনের প্রতি ইঙ্গিত অপর দিকে তেমনি কন্যা-স্নেহকে কেন্দ্র করিয়া তাহাকে বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া যে নারীর কঠোর কর্ত্তব্য তাহারই আভাষ।

উমার সখীরা নিজেদের বিচ্ছেদ-দুঃখ অনুভব করিয়া উমার জননীর অনুভূতির গভীরতার কথা স্মরণ করিয়া মাতৃতুল্যা মেনকার কাছে আসিয়া বলিতেছে—

উমা বিনে আমাদের প্রাণ যায়
মা হ'য়ে কেমনে তুমি দিবে গো বিদায়।
কর্ণেতে যাবার কথা করিয়ে শ্রবণ
মলিন হইল উমা শশীর বদন।
দুনয়নে বহিতেছে শত শত ধারা
অন্ধকার ক'রে যাবে তোর নয়নের তারা।
আমরা তোর উমা ছেড়ে থাকিব কেমনে
কি প্রমাদ হলো আজি হেমন্ত ভবনে।
যাবেন আনন্দময়ী নিরানন্দ করি-
পুনঃ কি আসিবে তোর সাধের শঙ্করী।
এক বৎসর পরে এসেছিলেন উমাধন
কেমন ক'রে এমন ধনে দিবি বিসর্জ্জন।
পাষাণি! পাষাণ হ'য়ে থাকিবি কেমনে
কেমনে ধৈরজ মাগো দিবি তোর মনে।
উমা চাঁদ আলো করি আছে হিমালয়
দেখ দেখি পুরী তোর কি আনন্দময়।
এ আনন্দ হরে লয়ে যাবে উমাশশী
বিপদ ঘটালে শিব শ্মশাননিবাসী।

নিজের বেদনা তাহার সঙ্গে কন্যাপ্রতিমা উমার সহচরী-দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগ লইয়া মেনকা কন্যাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—

ওমা তারা তোর যত সঙ্গিনী তারা
ঐ দেখ করিছে রোদন
সবাকার চক্ষে জল কেমনে থাকিব বল
না হেরে তোমার ঐ চন্দ্রবদন।
চারিদিক দেখি শূন্য উমা আমার অন্নপূর্ণ
যেওনা যেওনা হরবাসে।
আয় মা তোরে কোলে করি তুই যে আমার শুভঙ্করী
সর্ব্বশুভকারিণী শঙ্করী।

জীবন-সর্ব্বস্ব প্রাণের প্রাণ স্বামী নিতে আসিয়াছেন, তাহাকে ফিরাইয়া দিবার উপায় নাই, এদিকে জননী ও সহচরীদের মনের দুঃখ, তাহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধকে উপেক্ষা

করিতে হইবে। উমা বিষম সমস্যায় পড়িল। বাঙালী মেয়েদের কাছে—সবার উপরে স্বামীর সত্য তাহার উপর নাই।

সেই জন্ত সকলের অনুরোধকে প্রত্যাখান করিয়া মেয়েদের শ্বশুর-বাড়ী যাইতে হয়। মা মেয়ের বিবাহ দিয়া কন্যা সম্বন্ধে একেবারে নিঃস্ব হইয়া থাকেন, তাঁহার মেয়ের উপর এতটুকু জোর থাকে না। উমা আর কি করেন স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া মাকে সান্ত্বনা দিবার জন্ত বলিলেন—

শুনে জগজ্জননী— বলে 'ওগো জননী
কেনমা রোদন কর আর
শঙ্কর এসেছেন নিতে কি করিব হলো যেতে
ত্বরায় আসিব পুনর্ব্বার।'

ছেলেমেয়ে কাছছাড়া হইলেই জননীর প্রাণ আর ঠিক থাকে না। কেবলই তাহার অমঙ্গলের আশঙ্কা হয়, পাছে কিছু হয় এই ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকেন; তাই ছেলেমেয়েকে বিদায় দিবার সময় মুখ ফুটাইয়া বিদায়বাক্য উচ্চারণ করিতে পারেন না। মেনকাও তাই উমার কথা শুনিয়া বলিলেন—

রাণী বলেন— 'গো তারিণী সর্ব্বদুঃখহারিণী
বুক ফাটে চন্দ্রমুখ দেখে
সুধামাখা বাক্য শুনে শেল যেন বিঁধে প্রাণে
কোন প্রাণে বিদায় দিব তোকে।'

মেয়ের অদর্শনে মায়ের প্রাণে যে বিচ্ছেদ-বেদনা সর্ব্বদা সজাগ থাকে, কিছুদিনের জন্ত মেয়েকে কাছে পাইলে তাহা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয় কিন্তু মেয়েকে বিদায় দিবার সময় আবার সেই পুরাতন অবস্থাই ফিরিয়া আসে। পুনর্দর্শনের আশা আকাঙ্ক্ষায় মায়ের মনকে উদ্দীপিত করিয়া তাঁহার বিচ্ছেদ-বেদনাকে চাপা দিবার জন্ত উমা আবার আসিবার কথা উল্লেখ করিলেন। এদিকে বিদায়ের কাল আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন মেনকা অগত্যা শেষবার সকলকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইয়া হৃদয়ের শূন্যতাকে বহুদিনের জন্ত ভরিয়া দিবার কামনায় নূতন অনুভূতি সঞ্চয় করিয়া লইতেছেন, দৌহিত্রকে উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

সিদ্ধিদাতা গণেশ ভাই কোলে করি আয়রে
তোদের বদন দেখে বুক ফেটে যায়রে।
আইলি দিদির বাসে কতদিন পর
প্রমাদ ঘটায়ে কোথা যাবি অতঃপর।'
এরূপে মেনকা রাণী করেন রোদন
উমা লয়ে যান শিব কৈলাস ভবন।

গান

(ভৈরবী)

ভোরের পাখী ডাকিল নাকি
নাও তুলে নাও বাসর-শয়ন
উষার আলো ঘুম ভাঙ্গালো
দাও খুলে দাও সব বাতায়ন।

স্বপন-পরী দিনের খেয়ায়
ঢেউ তুলে ওই পার হয়ে যায়
নীল পাথারের বালু-বেলায়
ছড়িয়ে চলে অরূপ রতন

রবির কিরণ সোহাগ লেগে,
কমল-বালা উঠ্‌ল জেগে
গন্ধ ছুটে' বন্ধ টুটে
হাওয়ায় লাগে করে পরশন।

যোগ-বিয়োগ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তের

পরদিন শ্রীমন্ত সদরে গেল, গিরি উদ্বেগ-রুদ্ধ বুকে বসিয়া রহিল, হাঁড়ির ভাত হাঁড়িতে রহিল, খাওয়া হইল না, ক্ষুধা ছিল, আগের দিনটাও উপবাসে গিয়াছে, ক্ষুধা নির্ম্মম ভাবে পাকস্থলীকে পীড়ন করিতেছিল কিন্তু মুখে তাহার কিছু রুচিল না। এক ঘটী জল ঢক্ ঢক্ শব্দে মুখে ঢালিয়া পেটের আগুণে যেন সে জল দিতে চাহিল।

কিন্তু জলের বুকের মাঝেও যে আগুণ জলে। বুকের মাঝে অসুস্থতার চেয়েও অসুস্থ একটা অস্থিরতায় জীবন যেন তাহার কণ্ঠনালীতে ঠেলিয়া উঠিয়া আসিয়াছে, হাত পা অনর্গল ঘামিয়া ঘামিয়া ঠাণ্ডা হিম হইয়া গিয়াছে, পেটের মধ্যে আগুণ। একটা আশার কথা বলিবার কেহ নাই, পাড়ার লোকে, দিনের পর দিন পড়ায় শ্রীমন্তের মামলার দিনের হিসাব রাখা ছাড়িয়াই দিয়াছিল, তাহারা মামলা অন্তে শ্রীমন্তের মুখে জয়-বার্ত্তা বা গিরির করুণ আর্ত্তনাদে তাহার বন্ধন-দশার কথা জানিবার প্রত্যাশায় ছিল।

আসিল একজন,—বিপিন। বেলা দুই প্রহরের সময় সে 'শ্রীমন্ত' বলিয়া একেবারে বাড়ীর ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল,—গিরি খুঁটীতে ঠেস দিয়া বসিয়া ছিল,—অঙ্গ-বাস খানি বেশ ভাল ভাবেই জড়ান ছিল কিন্তু অনবগুণ্ঠিত মুখ,—বিপিনকে দেখিয়া সে নড়িবার চেষ্টা করিল—কিন্তু পারিল না,—অনাহারের দুর্ব্বলতা, না মনের পঙ্গুত্বের জন্য কে জানে।

বিপিনেরই লজ্জা হইল, সে আসিয়াছিল শ্রীমন্ত নাই জানিয়াই, আর এমনি অতর্কিত মুহূর্ত্তে হয়ত গিরির একটী অসম্বৃত অবস্থা দেখিতে পাইবে আশা করিয়াই। কিন্তু তাহার কল্পনায় ছিল—গিরি তাহাকে দেখিয়া আপন অসম্বৃত অবস্থা সংযত সম্বৃত করিতে বেশ একটু সলজ্জ চঞ্চল হইয়া উঠিবে, হয়তো বা একটু খানি জিভ কাটিয়া ফেলিবে, আর সেই সুসংবদ্ধ ছোট ছোট দাঁত গুলির শ্রেণী বহিয়া ঠোঁটের কোণ দুটী পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী লজ্জার হাসির রেখাও চকিতের মধ্যে চপলার মত দেখা যাইবে। কিন্তু তা কিছুই গেল না—গেল শুধু তাহার অসম্বৃত অবস্থাই দেখা, সে অবস্থা অচঞ্চল, তাহার মধ্যে একটা পীড়িত ভাব, সে ভাবে মানুষ কখনও সুখী হইতে পারে না।

বিপিন চলিয়া গেল।

আবার ঘণ্টা দুই পরে। এবার সে বেশ করিয়া সাড়া দিয়া আসিল, গিরি যাহাতে চকিত হইয়া উঠে। কিন্তু এবারও দেখিল সেই ভাবে গিরি বসিয়া। বিপিন অবাক হইয়া গেল, পর-ক্ষণেই মনে হইল, সত্যই অসুস্থ নয় ত? কিন্তু অসুস্থ হইলেও নারী লজ্জার সংজ্ঞা হারায় না! চেতনা আছে ত? বিপিন ওদিকের দাওয়া হইতে উঠানে নামিয়া আসিল, বার দুই গলাটা পরিস্কার করিবার ভাণে বেশ জোর সাড়া দিল,—কিন্তু গিরি সেই বসিয়াই থাকিল।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে একটা তন্ময় অবস্থা গিরির আসিয়াছিল, সকল মানুষেরই আসে, উপবাসের দুর্ব্বলতা,—মনের দুঃখের গভীরতায় অবসাদগ্রস্ত চিত্ত কোন একটা কিছু আশ্রয় করিতে পারিলেই সেইটা লইয়াই তন্ময় হইতে হইতে অমনি অবস্থায় আসিয়া পৌছে, তন্ময়তাও যে নিদ্রার মত বস্তু; সকল চিন্তা, অস্থিরতা লুপ্ত হইয়া যায়, মন চলিয়া যায় ধ্যানের বস্তুর পানে,—বাস্তব জগত হইতে দূরে; ঠিক নিদ্রারই মত।

বিপিন নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—তবুও সেই অবস্থা!

এবার বিপিনের ভয় হইল, সে চোখের পানে চাহিয়া দেখিল—গিরি চোখ চাহিয়া আছে, কিন্তু দেখিতেছে না কিছু—; বিপিনের পা দুইটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে ছিল, বুকের মধ্যটায় হৃদপিণ্ড অসম্ভব জোরে চলিতেছিল।

সে হাটুর উপর দুটী হাত দিয়া হেঁট হইয়া একটু দূর হইতে ভাল করিয়া চোখের দৃষ্টির অবস্থা পরীক্ষা করিতে চাহিল; ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই একটা হনুমান বিপুল শব্দে ঘর খানার মাথায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। ওই বিপুল শব্দটা ধ্যানস্থার সুদূরগত মনকে যেন ডাকিয়া ফিরাইল। গিরি চমকিয়া উঠিয়া ঐ অবস্থায় বিপিনকে দেখিয়া, পায়ের গোড়ায় সাপ দেখিলে লোকে যেমন চমকিয়া পিছাইয়া যায় তেমনি ভাবেই—

পানে চাহিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

এমন অবস্থায় যে কেহ আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হয়তো বলিয়া উঠিত, "আঃ বাঁচলাম!"

কিন্তু বিপিন কিছুতেই বলিতে পারিল না, সে এস্ত পদে পলাইয়া বাঁচিল। বিপিন আসিয়া দাওয়াতে বসিয়া আপনাকে ধিক্কার দিল, হায় করিলাম কি, মনের পাপেই মরিলাম!—শ্রীমন্ত আসিলেই তো গিরি বলিয়া দিবে।—বিপিনের বুকখানা গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল—দুর্দ্দান্ত শ্রীমন্ত সেদিন একটা কথাতেই খুন করিতে উঠিয়াছিল—আজ! তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, বেচারী বিনা কাজে অবেলায় মাঠ-পানে চলিল।

মাঠে মাঠে ঘুরিয়া নদীর ধারে এক স্থানে বসিয়া একবার গাঁজা খাইয়া সে যখন বাড়ী ফিরিল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আপন দাওয়াতে পা দিয়াই শুনিল শ্রীমন্তের বাড়ীতে কতকগুলি লোকের গলা শুনা যাইতেছে। বিপিনের কিঞ্চিৎ সুস্থ প্রাণ আবার কণ্ঠাগত হইয়া উঠিল, তবে ত শ্রীমন্ত ফিরিয়া গিরির মুখে সব শুনিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছে, আর লোকজনে বোধ হয় শান্ত করিতেছে,—হ্যাঁ শান্ত করিতেছে না তাহার মাথা খাইতেছে,—বোধ হয় তাহারই বিরুদ্ধে চুকলামী করিয়া জানোয়ারটাকে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিতেছে।

সে ধীরে ধীরে মৃদু পদক্ষেপে আপন গৃহে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, সবে পা-টী উঠাইয়াছে, এমন সময় রাস্তা হইতে কে কহিল—"এই যে, বিপিন না—?"

"কে?" বিপিন অকারণে অসম্ভব রকম চমকিয়া উঠিয়া কহিল—"কে?" লোকটা এত গ্রাহ্য করিল না, সে কহিল "শুনেছ?"

বিপিনের শঙ্কা বাড়িয়া গেল, সে অসম্ভব রকমের বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল—"ও সব শুনাশুনি কি? যত সব মিছে—"

লোকটী কহিল—"মিছে কি রকম? আমি শ্রীমন্তের বাড়ীতে শুনলাম"—বিপিন খিঁচাইয়া উঠিল—"শুন্‌লে তা কি হবে কি? তাই বিশ্বাস করে বসে থাক—"

লোকটী বিস্মিত হইয়া কহিল,—"আরে তোমার হ'ল কি?" ধরেছে।"

—"তা হলেও তোমার যাওয়া উচিত, সবাই তোমায় খুঁজছিল।"

—"কি আমার উচিত দেখাও হে কটাহরি, আর সবারই বা কি ধার ধারি আমি? কে আমার কি—"

—"আরে তুমি এত চটছ কেন? সে যাবার সময় তোমার কথাই দশবার করে বলে গিয়েছে, বিপিন দাকে বলো, বিপিন দাকে বলো—তা এতে—"

বিপিনের কানে সংবাদের সুর ফিরিয়া গেল। সে তাহার মুখের কথা লুকিয়া লইয়া কহিল—"কি ব্যাপারটা বল দেখি?"

—"শ্রীমন্তের পাঁচ বছর জেল হয়েছে—"

—"এঁ্যা বলো কি? হরি, হরি, হরি—"

বিপিন রাস্তায় নামিয়া পড়িয়া শ্রীমন্তের বাড়ীপানে পথ ধরিল। বক্তা কটাহরি বেশ একটু বিস্মিত হইয়াই আপন পথে চলিয়া গেল। শ্রীমন্তের বাড়ীতে তখনও গোলযোগ মেটে নাই।—শ্রীমন্তের সঙ্গে গিয়াছিল বেহারী বাগ্দী, ওস্তাদের ভাইপো পাঁচু, সেই আসিয়া খবর দিয়াছে। সে বর্ণনা করিতে-ছিল আর পাঁচ সাত জন শুনিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিল।

পাঁচু বলিতেছিল—"তা মরদ বলতে হবে ছিমন্তকে, একফোঁটা জল মাটীতে ফেলে নাই সে, যেমন লাঠী ধরে মরদের কাজ করেছে তেমনি মরদের মতই জেলে গিয়েচে সে—। একবার শুধু ওপর পানে হাত দেখিয়ে বল্লে—'ও বিচার ত এখানে হ'ল না—হঁবে ওইখানে,—মানুষের বিচার মানুষে কি করতে পারে?'—তা সে হাকিমের মুখের ছামুতেই।"

একজন কহিল—"নাঃ—মরদ বটে শ্রীমন্ত,—সে গায়ের সামথ্যোই কি আর কলিজেই বা কি?"

পাঁচুর কথা তখনও ফুরায় নাই, সে ছোট জাত। তাহাদের ভালবাসাটা বড় তীক্ষ্ণ—গাঢ়। তাহারা শ্রীমন্তকে ভালবাসিয়া-ছিল, তাই তাহার কথার সবগুলি না কহিয়া বোধকরি তাহার আশা মিটিতেছিল না—, সে কহিল—"আর বল্লে গোটাকত কথা নিজের উকীলকে,—উকীল বল্লে কি না—'কি আর করব বাপু, এ জানা কথা,—মামলা তোমার বড় দুর্ব্বল ছিল—তা সাত বছর না হয়ে পাঁচ বছর করেছি এই ঢের।'

তাতেই ছি-মন্ত একটুকুন হাসলে,—সে হাসি যদি দেখতে, বুঝলে, সেই হাসিতেই উকীলের মাথা হেঁট হয়ে গেল; —হেসে ছি-মন্ত বল্লে—'তাই সাত বছরই আমি খাটতে রাজী আছি উকীল বাবু, ফিচ্ কটা ফিরিয়ে দেন দেখি। কেন মিছে আমার সর্ব্বনাশটা কল্লেন বলুন ত?' তারপর আবার হেসে বল্লে—'মিছেই বলা তা জানি, তবু বল্লাম, তা বেশ হয়েছে। কিছু থাকলে ত আর পরিবারটা না খেয়ে মরত না। তা আনা চার পয়সা দেন কেনে, জেল-ফটকে জমা থাকবে বেরিয়ে দড়ি কিনে গলায় দোব।' বলে আবার সেই হাসি।"

একজন কহিল—"আ-হা ঘা-টা বড্ড লেগেছে কিনা। মেয়েটাকে মানুষ কল্লে, তার মেমতা তো সোজা নয়, সেই মেয়ে ধর কেনে পেটের অধিক, তাকে বাঁচাতে গিয়ে—"

একজন কহিল—"ওই মেয়েটাই অলুক্ষণে হে, দেখেছ—কটা কটা রং, প্যাজের পাতার মত চুলগোলা শুদ্ধ কটা ছিল, উ তা-রী খারাপ, রাহুগ্গস্ত না কি বলে বাপু, আমাদের ঐ যে চণ্ডীদাসপুরের রামের মেয়েটা ঠিক অমনি, হ'ল আর বাপকে খেলে, তারপর তোমার জমিজোরাত—পিটিলী গুল্‌তে এক কাঠা রইল না।"

বিপিন পাঁচুকে কহিল—"বাড়ীতে কিছু বলে দেয় নাই?" সে তাহার নিজের কথাটা শুনিতে চাহিতেছিল।

পাঁচু কহিল—"তোমার কথা ত দশবার বলে দিয়েছে, বল্লে, 'পাঁচু কি আর বলে যাব ভাই, দেখিস তোরা বৌটা রইল যেন না খেয়ে মরে না' আবার হেসে বল্লে—'তোরাই পাসনা খেতে ত পরের ভার কেনে দিই, তোরা বিপদে আপদে দেখিস, আর বিপিন দাদাকে বলিস—পারে ত ধান টান ভানিয়ে দুমুঠো খেতে যাতে পায় বৌটা তাই যেন করে।' আবার একবার বল্লে—'বিপিন দাকে বলিস—যদি বেঁচে থাকি আর জেল থেকে বেরিয়ে যদি দিন পাই তবে তার দেনা আমি শোধ করব, তার টাকা আমি মারব না—আর বল্লে 'গাঁয়ে সবাই কিছু কিছু পাবে—তা বলিস যেন আমাকে শাপ শাপান্ত করেই মাপ দেয়, বৌটাকে আর কেউ কিছু না বলে।' আমি বল্লাম 'বৌকে কিছু বলবে?' বল্লে 'কি বলব? বলিস তার অদেষ্ট আর আমার অদেষ্ট। আর তাকে কিছু বলব না, খেতেও ত সুখ কখনও দিতে পারি নাই, তবে সে আমাকে দুখও কখন দেয় নাই।'

সহসা নারী-কণ্ঠের মর্ম্মফাটা কান্নার একটুখানি ধ্বনি মুহূর্ত্তের জন্ত ধ্বনিয়াই নীরব হইয়া গেল। সকলের দৃষ্টি পড়িল ও ঘরের দাওয়ার উপর—গিরি উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, আপাদমস্তক আবৃত, দেহখানা ঘনঘন কম্পিত হইতেছে। সকলেই বুঝিল হতভাগীর বুক ফাটিয়া যাইতেছে, একমুহূর্ত্তের জন্ত নারীধৈর্য্যের সীমা টুটিয়া মুখও ফুটিয়াছিল।

পাঁচু কহিল—"না না আর নয়, চল সব, একটুকুন কাঁদুক ও ডাক ছেড়ে, কি বল মোটা মোড়ল?" বলিয়া সে বিপিনের মুখপানে চাহিল। বিপিনও তাড়াতাড়ি কহিল—"হঁ্যা হঁ্যা চল সব চল; আ-হা-হা অবলা। পাঁচু, বলে দে দোর টোরগুলো দিতে।"

পাঁচু কহিল—"না, মাকে আমার পাঠিয়ে দোব, সে দিয়ে শোবে। একা কি থাকতে পারে বৌ মানুষ!"

বিপিনের কেমন কথাটা মনোমত হইল না—"তা আবার পারবে না কি হয়েছে, নিজেরই ঘর—কতজনা বলে—"

পাঁচু কহিল—"তা নয়, বলি আজ কি একা থাকতে পারে. না থাকতে দিতে আছে? বলি মনের বিবাগীতে ত কত রকম করতে পারে; ধর, ঘরে দড়িও আছে পুকুরে জলও আছে।"

বিপিন শিহরিয়া কহিল—"হঁ্যা—তা পারে!" তাহার চক্ষের উপর স্বামীপরায়ণা বধূটীর ধ্যান-মগ্না ছবিটী ভাসিতেছিল।

চৌদ্দ

পরদিন প্রাতে পাঁচুর মা যাইবার সময় কহিল—"বৌ, তা হ'লে আমি আসি, যদি কিছু কাজ থাকে ত' বল ক'রে দিয়ে যাই।"

কাজ! গিরির হাসি আসিল, কাজ করিয়া দিবে! দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়িয়া তাহার কপাল ফিরিয়া গেল যে, কাজ এখন কত লোকের দুয়ারে তাহাকেই করিতে হইবে। সে ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—"না।"

পাঁচুর মা গিরির ওই ম্লান হাসিতে বোধ করি তাহার মনের কথা বুঝিয়াছিল, সে কহিল—"সে কাজের কথা বলি

নাই মা, বলি দোকানে আনতে নিতে যদি কিছু হয়, এই আর কি।"

—"কি আনবে?"

—"এই নুন, তেল, খেতে ত হবে মা, পেট ত অভর, পেট ত মানবে না মা; আর না খাবেই বা কেনে, লোক বিধবা হচ্ছে, বেটা মরছে তাও ত বেঁচে আছে, আর তোমার ত এ পাঁচ বছর, দেখতে দেখতে চলে যাবে। ওই ত আট বছর পরে আমাদের পাড়ার 'ইন্দি' ফিরে এল, আট বছর, তাও কালাপাণি জাহাজে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, পাথরের জেল, বিচিতির পাতা তুলতে হয়, হাত ফুলে উঠে, আর এ ত তোমার দেশের জেহাল, এখানে ত রাজার হাল।"

গিরি কহিল "সে আমি ভাবি নাই পাঁচুর মা—"

"না, ভাবনা হয় বৈকি, তবে মা কি করবে বল—রাজার ওপরে হাত ত নাই, বলে যে সেই 'রাজাতে কাটিবে শির, কি করিবে কোন বীর।'

গিরি আর উত্তর করে না, সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া থাকে।

পাঁচুর মাও একটু নীরব থাকিয়া বলে—

"তা তোমার একটু কষ্ট বেশী হবে, পেটের একটা নাই যে দুঃখের সময়- "

গিরি চমকিত হইয়া কহে—"ও কথা ব'লোনা পাঁচুর মা, ওতে কাজ নাই আমার, ওযে হয় নাই সে দেবতার অনেক দয়া আমার উপর,—"

"ছিঃ—মা, সধবা নারী ও কথা বলতে নাই, কেন, কিসের জন্যে এমন কথা বলছ তুমি—?"

গিরি কথাটা বলিয়াই বুঝিয়াছিল যে কথাটা বলা ভাল হয় নাই, এ প্রশ্নের উত্তরে যে ইতিহাস তাহাকে বলিতে হয়—সে ত শুধু দুঃখের নয়—অত বড় মর্ম্মান্তিক ভাগ্যহীনতার অপমান নারীর আর হয় না। সে কথাটা একটু ঘুরাইয়া কহিল—

"আজ কি হ'ত মা,—আজ যে সে আমার পেটের শত্রু হয়ে দাঁড়াত।"

পাঁচুর মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নীরব রহিল,—সেও বিচার করিয়া দেখিল, বৌ কথাটা সত্যই বলিয়াছে—দরিদ্রের সন্তান শত্রু-ই বটে!

পাঁচুর মা এবার পা বাড়াইয়া কহিল—"তা হ'লে আমি মা আসি, তুমি রান্না কর; কি করব বল মা ছোট জাত আমরা, নিজের জাত হলে কি তোমাকে রেঁধে খেতে হয়—"

গিরি হাসিয়া কহিল—"জাতের আর কি আছে বল পাঁচুর মা, সত্যি জাত থাকলে তো? আসলে ওসব মিছে,—জাত ত এখন দু'টী, বড় লোক আর গরীব লোক,—যারা বড়লোক তারাই উঁচু জাত আর যারা গরীব তারাই ছোট জাত।"

পাঁচুর মার যাওয়া হইল না, দরিদ্রের সন্তান ওরা, একথায় মন ওর একান্তভাবে সায় দিল, সে কহিল—"ই কথাটী তুমি সত্যি বলেছ মা—"

বাহির হইতে একটা ডাক শোনা গেল—"পাঁচুর মা রৈছ না কি?"

পাঁচুর মা কহিল—"কে গো, মোটা মোড়ল না কি, এস, এস।"

বিপিনকে গ্রামে মোটা মোড়ল বলিত;—দেহের স্থূলতা অবশ্য ছিল তাহার, কিন্তু সে জন্য নয়, জমিদারের সেরেস্তায় বিপিনের অঙ্ক মোটা, তাই জমিদার তরফ হইতে এ নাম-করণ হইয়াছে, বিপিন ইহাতে বেশ গৌরব অনুভবই করে,—এ তাহার সরকারী খেতাব

গিরি চকিত হইয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখ ফুটিবার পূর্ব্বেই বিপিন আসিয়া ও ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইল, কাজেই কথাটা তাহার বলা হইল না, সে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল।

বিপিন কহিল—"তাইত পাঁচুর মা, কি ঘটনাটাই ঘটে গেল,—বিধির নির্ব্বন্ধ আর কি; ছোঁড়া লোক বড় ভালই ছিল, আমার সঙ্গে প্রণয়টা বড়ই ছিল, সে নিজের ভাইএর তুল্যই মনে করত আমাকে, আমিও তাই, জিগ্যেস কর। ওই বউকে, টাকা নিয়েছে সে, কখনও চাই নাই আমি। বলি আহা সময়টা খারাপ পড়েছে, দেবে, দিন হলেই দেবে,—আবার তার ওপর না চাইতে নিজে এসে দিয়ে গিয়েছি আমি। এইত সে কাল, বলি আহা খরচ নাই মামলার, তা চায় নাই, নিজেই দিইছি আমি, বুঝলে কি না,—"

পাঁচুর মা কহিল—"সে একশবার, তা ছি-মন্তের কথাও বলতে হবে বাপু, সেত আমাদের পাড়া হামেশাই যেত, তা সে নাম করত তোমার,—বলত, হ্যাঁ মানুষের মত মানুষ

আমাদের মোটা মোড়ল, সে নেমখারাম ছিল না, তুমি ভাল-বাসতে—তোমার নাম করতো। তা ধর কেন বাবার সময় সব পাঁচুকেই ত আমার বলে গিয়েছে, দশবার তোমার নাম করেছে—বলেছে, 'পাঁচু বৌ রইল মোটা মোড়লকে দেখতে বলিস'—"

বিপিন তাহার মুখের কথা লুকাইয়া কহিল—"বৌ রইল—বিপিনদাকে দেখতে বলিস,—তা দেখব বৈ কি ;—ধরগা যেয়ে পাঁচুর মা—চৌপর রাত্তি আমার কাল ঘুম হয় নাই, ভাবনায় ঘুম হয় নাই, বলি একা বৌটা সোমথ বয়সে—আমাকে রা কাড়ে না—এ আমি করব কি ?"

পাঁচুর মা কহিল—"তাত বটেই, ভাবনার কথা বটেই ত, —বৌ মানুষ, সোমথ বয়েস—রা-ই বা কাড়ে কি ক'রে ?"

বিপিন কহে—"তা অবিশ্যি আসতে যেতে হলে—অনেকটা সরল হবে বৈ কি,—আর ধরগা যেয়ে, সম্পক্ক যা তাত গাঁ সম্পক্ক,—"

পাঁচুর মা কহে—"তা বৈ কি—গাঁ সম্পক্কে মুচী মিন্সে মামা হয়, সেও ত ধর ফেল্‌না নয় ; তবে হ্যাঁ এলে গেলেই সরল হবে বৈ কি, বলে ভাসুরকে রা কেড়েই ; আজ কাল হুর ধুর করচে—।"

বিপিনের কথাটা বড়ই মনোমত হইল,—"এই হুর ধুর করচে, আমিও ত তাই বলচি গাঁ সম্পক্ক তো,—আসা যাওয়া যখন—"

অধিক আসা-যাওয়ার অভ্যাস—কথা কওয়ার পথ আর সরল করিতে হইল না, গিরির কণ্ঠস্বর শোনা গেল—। সে বেশ স্ফুট কণ্ঠেই কহিল—"পাঁচুর মা, আসা যাওয়া করতে ওঁকে হবে না, আমিই দরকার হ'লে দিদিকে সব জানিয়ে আসব।"

বিপিন হতভম্ব হইয়া গেল, তাহার বুকখানা ধড়াস করিয়া উঠিল। তাহার মনের আগুনের আঁচ এ মেয়েটি পাইল কি করিয়া ?

মানুষ বোঝে না—তাহার যে মন, সে মন সৃষ্টি করিয়াছে সর্ব্বান্তর্য্যামী যে সেই। আর সৃষ্টি করিয়াছে সে আপন সর্ব্বান্তর্য্যামী মনেরই খানিকটা লইয়া, তাহার সেই সর্ব্বজানা শক্তি-ই মানুষের মনের অনুমান-শক্তি, তাহাকেই মানুষ বলে দূর দৃষ্টি, তাই হেলায় খেলায় মানুষ যাহা অনুমান করে—তাহা ব্যর্থ হয় বটে, কিন্তু অন্তর সমর্পণ করিয়া যে অনুমান, সে হয় সত্য—প্রত্যক্ষ !

পাঁচুর মা কহিল—"সেই ভাল মোটা মোড়ল, বৌমা আমার বলেছে খুব ভাল। কাজ কি আসা যাওয়ার, দরকার হবে তোমাদের বাড়ীতে বলে আসবে।"

বিপিন কহিল—"তা বেশ—তা বেশ— তবে কি জান পাঁচুর মা, ধরগা যেয়ে, মেয়ে মানুষ, দেওয়া-থোওয়া বড় দেখতে পারে না।"

গিরি এবার বেশ সুস্পষ্ট কণ্ঠে কহিল—

"দেওয়া-থোয়ার ত কিছু দরকার নাই পাঁচুর মা, দেহ আছে, খেটে খাব আমি।"

বিপিন শশব্যস্তে কহিয়া উঠিল—"হ্যাঁ হ্যাঁ তাত বটেই—"

গিরি আবার কহিল—"অনেক বেলা হয়েছে পাঁচুর মা, ওঁকে তুমি যেতে বল,—আমি বেরুতে পাচ্ছি না।"

গিরির সর্ব্বাঙ্গ যেন রি-রি করিতেছিল।

বিপিন ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

গিরি বাহির হইয়া আসিয়া মৃদু ভৎসনা করিয়া পাঁচুর মাকে কহিল—

"দেখছ আমি বেরুতে পাচ্ছি না, তোমার কথা আর শেষ হয় না।"

পাঁচুর মা কহিল—"কি করব মা এত বড় লোকটা—"

গিরি মুখ ফিরাইয়া কহিল—"বড়লোক আমার ত দরকার নাই পাঁচুর মা, আমি গরীব, বড়লোক আমার দু'চক্ষের বিষ।"

কণ্ঠস্বরে তাহার ঘৃণা যেন উপছিয়া পড়িতেছিল। সারা মুখখানি তাহার ঘৃণার রেখায় নাসারন্ধ্র স্ফীত, চোখ দুইটী ঈষৎ ছোট হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু দৃষ্টি তাহার অতি তীব্র—তীক্ষ্ণ, সে চোখের পানে চাহিয়া মুখরা পাঁচুর মায়েরও আর মুখ ফুটিল না। (ক্রমশঃ)

মহামৌনী

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বা

ক্ষান্ত হও, আজি আর নহে কোনো কথা !
অপ্রমত্ত এই মৌন, এই নিস্তব্ধতা,
ভাঙিও না নিরর্থক শব্দের আঘাতে ;
নিশীথের ধ্যানযোগ প্রগল্‌ভ স্পর্দ্ধাতে
চেয়োনা করিতে ব্যর্থ দীপালোক হানি'—
শান্তি-তপোবনে বহি' বিদ্রোহের বাণী ।

যোগমগ্ন মহাকাল—বসি' ব্যোমাসনে
জপিছেন ইষ্টমন্ত্র । সংযত শাসনে
হের মুগ্ধ চরাচর । গম্ভীরা রজনী
রুধি' তার চিত্তবৃত্তি, আচ্ছাদি' অবনী
সমাধির আচ্ছাদনে, স্তব্ধ মহিমায়,
জড়ে জীবে তুল্য করি' মগ্ন তপস্যায় ।

কি কথা কহিবে মূঢ় ?—কি নূতন বাণী
শোনাবে সৃষ্টির কর্ণে কোন্ মন্ত্রে হানি' ?
বিশ্বপ্রেম ?—প্রেম কভু নহে সে মুখর !
যার প্রেমে বিশ্ব মূর্ত্ত. সেই সে ভাস্কর
নিঃশব্দে ফুটায় নিত্য বিচিত্র পৃথ্বীরে,
নড়েনা পল্লব পত্র অশ্বত্থের শিরে ।

লোকহিত ?—কর্ম্ম সে তো বাক্যের অতীত ;
চিত্তের নীরব সেবা হস্তে সঞ্চলিত !
গোপনে জ্ঞানের সৃষ্টি প্রকৃতি-জঠরে ;
বৃহৎ বৃক্ষের বীজ মৃত্তিকা-অন্তরে
নিঃশব্দে অঙ্কুরি' উঠে ; বিনা শব্দাভাস
অজ্ঞাত বাসের রাজ্যে বীর্য্যের বিকাশ ।

ত্যাগধর্ম্ম ?—কে বা কোথা করেছে কথায় !
ফলে না অমৃত ফল আলোকলতায় ।
রাজপুত্র ছাড়িয়াছে সর্ব্বৈশ্বর্য্য আশা
নীরবে নিশীথরাত্রে—কোথা ছিল ভাষা ?
খুঁজিয়া পেয়েছে বিশ্ব সেই সন্ন্যাসীরে—
নগরমন্দিরে নহে, নৈরঞ্জনাতীরে !

বাক্য শুধু বাক্য মাত্র ; শ্রেষ্ঠ যারে কহি,—
তারা স্বরে শ্রান্তি আনে ; চিত্তে ক্লান্তি বহি'
সঙ্গীতেরও শেষ খুঁজি দণ্ড দুই পরে !
—চেয়ে দেখ, ঊর্দ্ধে ঐ নিস্তব্ধ অন্তরে
ধ্যানের স্তিমিত মূর্ত্তি ;—শোনো প্রাণ পাতি'—
কি অনন্ত বাণী বহে শব্দহীন রাতি !

আশীর্বাদ

—শ্রীফণীন্দ্র পাল

ক্ষীণ কণ্ঠে শোনা গেল, রাজেন আমি এলাম।

রাজেন তাহার সম্মুখের বইখানি হইতে চমকাইয়া মুখ তুলিল। বিস্মিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তুমি সঞ্জয়!

সঞ্জয়ের রুগ্ন পাণ্ডুর মুখে ম্লান ছোট একটু হাসি। বেশী কথা কহিবার সামর্থ্য বোধ হয় তাহার তখন ছিল না, অবসাদে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। যে মেয়েটির কাঁধে ভর রাখিয়া সে আসিয়াছে সেই মেয়েটি এইবার কথা বলিল। বলিল, এঁকে অনেক দূর থেকে নিয়ে আসছি, ট্রেণ আর গরুর গাড়ীর ঝাঁকুনিতে ভয়ঙ্কর দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন, এখুনি শোয়ানো দরকার; কোথায় শোয়াবো বলে দিন রাজেন্ বাবু।

রাজেন বিস্ময়-বিহ্বলে হইয়া দেখিতেছিল এতদিন পরে অসুস্থ অবস্থায় সঞ্জয় তাহার নিকট আসিয়াছে—বাল্যবন্ধু দুরন্ত সঞ্জয়, রক্ত-সম্পর্কহীন হইলেও এ পৃথিবীতে তাহার একমাত্র আত্মীয়। সঞ্জয় আসিলে যে এমনি হঠাৎ আসিবে হয়তো বা এমনি অবস্থায় আসিবে রাজেন সেকথা মনে মনে অবশ্যই জানিত, কারণ সঞ্জয়ের স্বভাবই এমন।

কিন্তু যে মেয়েটি সঞ্জয়ের সঙ্গে আসিয়াছে বা সঞ্জয়কে লইয়া যে মেয়েটি হঠাৎ আসিল তাহাকে যে সে আজও ভোলে নাই, হয়তো বড় বেশীই চেনে। দু'বছর পূর্ব্বে, আরতি—

না থাক্। সঞ্জয় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত—ওকে এখনি শোয়াইয়া না দিলে হয়তো অজ্ঞান হইয়া পড়িবে। রাজেন আসিয়া তাহার রোগশীর্ণ বন্ধুটিকে সন্তর্পণে ও সযত্নে ধরিয়া পাশের ঘরে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিতে চলিল এবং সঞ্জয়কে শোয়াইয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া ডাকিল, মথুর, মথুর শুনে যা।

গ্রাম্য একটী ছেলে—বয়স কতই বা হইবে, বোধ হয় তেরো হইতে চোদ্দর মধ্যে। মথুর রাজেনেরই পাঠশালার একটি হতভাগ্য ছাত্র। এই গ্রামটি হইতে চার ক্রোশ দূরে তাহার বাড়ী। বাড়ী আছে বটে কিন্তু মা বাপ কেহই বাঁচিয়া নাই। আছে এক কাকা ও তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। সেই কাকার সংসার হইতে মথুর পলাইয়া আসিয়াছে। সেখানে তাহাকে অনাদর সহিতে হইত কম নয়। মধ্যে মধ্যে আহার জুটিত না কিন্তু প্রহার মিলিত প্রচুর। শীতের রাত্রে আদুল গায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বরষার অজস্র ধারায় ভিজিয়া, প্রখর চৈত্রের রৌদ্রে তেরো বছরের ছেলেটির উদয়াস্ত কাজের বিশ্রাম থাকিত না। কোথাও ত্রুটি খুঁজিয়া না পাইলেও তাহার তিরস্কার এবং শাস্তির পরিমাপ ছিল না। বেচারী মথুর পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় পাইয়াছে রাজেনের নিকট। রাজেনের সে শিষ্য, ভৃত্য ও নির্জ্জন জীবনের বাক্যালাপের সঙ্গী।

মথুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে রাজেন জিজ্ঞাসা করিল, দুধ আছে রে মথুর? মথুর ঘাড় নাড়িল।

বিরক্ত হইয়া রাজেন বলিল, নেই। কেন? বেড়ালে খেয়ে গেছে বুঝি হতভাগা, কতবার করে বলে দিয়েছি সব সময়ে সব মজুত রাখবি, কখন কি দরকার পড়ে যেতে পারে। যদি আমারই দরকার পড়ত তাহলে কি করতিস! এসব যদি খেয়ালই তোর থাকবে তাহলে কাকার কাছ হতে পালিয়ে আসতেই বা তোকে হবে কেন।

মথুর কিছু বলিল না, চলিয়া যাইতে পা বাড়াইল। মাষ্টার মশায়ের স্বভাব সে অত্যন্ত ভাল করিয়া জানে, যখন যে জিনিষ হঠাৎ প্রয়োজন হইয়া পড়ে তখন সেটির জন্য ব্যস্ততার সীমা থাকে না এবং হঠাৎ প্রয়োজন বোধ না করিলে কোন কিছুই তাঁহার মনে থাকে না। রাজেন তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বলিল, কোথায় যাচ্ছিস্?

—দুধ আন্‌তে।

—হ্যাঁ শীগ্‌গির করে আসবি। অল্প একটু গরম করে আনবি, বুঝলি?

মথুর চলিয়া গেল, কিন্তু রাজেন নিঃশব্দে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সেইখানটিতে দাঁড়াইয়া রহিল, ভিতরে রোগকাতর সঞ্জয়ের কাছে যাইবার কথা তাহার মনে হইল না। অতীত জবনের কয়েকটি দিন অকস্মাৎ ঝড়ের দুরন্ত আবেগে তাহাকে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে চায়; ঐ

আরতি মেয়েটির সহিত তাহার পূর্ব্ব-পরিচয়ের কয়েকটি দিনের কথা। এবং সেই সব মনে পড়ায় ভিতরে সঞ্জয়ের পাশে গিয়া দাঁড়াইতে রাজেনের কেমন যেন ভয় ও সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। আরতির সহিত তাহার আগে হইতে আলাপ আছে তাহা জানিলে যদি সঞ্জয় কিছু ভাবে!

ইতিমধ্যে মথুর দুধ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মথুরের ডাকে রাজেনের যেন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ছি ছি, এতক্ষণ সে যে ভিতরে গেল না সে জন্য সঞ্জয় হয়তো কি ভাবিতেছে এবং আরতিও—

দূর ছাই, আরতি তাহার সম্বন্ধে যদি কিছু খারাপই ভাবে সেজন্য রাজেনের কি এমন আসে যায়।—দে তো দুধের বাটিটা আমার হাতে। আর দেখ্ আজ বিকেলে কোথাও যেন বেরিয়ে যাস নে। হঠাৎ দরকার হতে পারে।—বলিয়া রাজেন মথুরের হাত হইতে দুধের বাটিটি লইয়া তাহার রুগ্ন বন্ধুর কাছে চলিল।

সঞ্জয়ের পাশে গিয়া দাঁড়াইতে সে বলিল, তোমাকে বোধ হয় অত্যন্ত কষ্টে ফেলে দিয়েছি, কেমন?

হাসিয়া রাজেন বলিল, এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম সে জন্য এসব কথা মনে এল বুঝি। কিন্তু তোমাকে যে আর চেনা যায় না সঞ্জয়—স্বাস্থ্য হারালে গুণ্ডামি চলবে কি করে?

ঈষৎ হাসিয়া সঞ্জয় উত্তর দিল, গুণ্ডামি, তাই বোধ হয়। তাহার পর কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে বলিতে লাগিল। এতদিন ধরে কি যে করলাম, এখন মরি যদি তাহলে কত বড় একটা অস্বস্তি নিয়ে মরব তা' বোঝবার উপায়ও থাকবে না। জীবনের তৃপ্তিকে আত্মহত্যা করিয়েছি। বাঁচলেও আমার মুক্তি নেই—জীবন আমায় ছুটি দেবে না। তার এই মিথ্যা যাত্রা থেকে চিরকালের ছুটি—কি যেন উদ্বেল ক্ষুব্ধতায় সঞ্জয়ের পরিশ্রান্ত ক্ষীণ কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল এবং ক্লান্ত একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস থামিয়া থামিয়া তাহার অন্তর্নিহিত কথাগুলিকে গভীর বেদনার আবরণে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

রাজেন বলিল, ট্রেনে এসে রোগের যন্ত্রণায় বড় বেশী কাতর হয়ে পড়েছ, দুধটুকু খেয়ে ফেল দিকি।

খাওয়ার পর মনে হইল সঞ্জয় যেন কিছু শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। সেই ধরণের ছেলে সঞ্জয়, জাগিয়া থাকিলে যাহার চিন্তাধারা নীরব থাকে না এবং সামর্থ্য থাকিলে আলস্য যাহার নিকট অত্যন্ত নিম্নস্তরের বিলাসিতা—বিশ্রামের প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় কাজ করিবার আনন্দ যাহার বেশী।

সুতরাং এ সময়েও রোগের যন্ত্রণা ও পথের ক্লান্তি তাহাকে চুপ করাইয়া রাখিতে পারিল না। উপরন্তু এতদিন পরে রাজেনকে সে নিকটে পাইয়াছে—যে বন্ধুটি তাহাকে এত বেশী বোঝে যে অন্যের নিকট নিজেকে ততখানি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা সঞ্জয়ের নাই, এমন কি হয়ত রাজেনের নিজের নিকটেও নয়। রাজেনের একটি হাত ধরিয়া সঞ্জয় বলিল, বস না এখানে, আচ্ছা, এতদিন পরে দেখা হল আমাদের, প্রশ্ন ত কত কি জমা হয়ে রয়েছে, কিন্তু তুমি ত কিছুই জিজ্ঞাসা করলে না রাজেন!

রাজেন বন্ধুর রোগশয্যার পাশে বসিতে বসিতে মৃদু একটু হাসির সহিত বলিল, এই কি জিজ্ঞাসার সময়, তুমি আগে সেরে ওঠ।

একটুখানি হতাশার হাসি সঞ্জয়ের মুখে ফুটিয়া উঠিল এবং বলিল, সেরে আর আমার উঠতে হবে না বোধ হয়। সুস্থির বলে কথাটার মর্য্যাদা বজায় রাখবার সুযোগ কখনো পাই নি। আমার জীবনে কোথা থেকে এবং কত দিক দিয়ে কাজ এসে পড়েছে তা আমি নিজেও অনেক সময় বুঝতে পারি নি। এখন মরবার এসেছে তাগিদ—মৃত্যু ও আমার মরবার অনিচ্ছা এই দুয়ের বিবাদ আমাকে বিশেষ শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। মরলে মন্দ হয় না। কিন্তু আমার অনেক কিছু বলবার আছে, করবার আছে যা' শুধু আমিই জানি। যাক্ এসব শেষ বিদায়ের করুণ বিলাপ। আরতির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। আরতি, এই হচ্ছেন আমার বন্ধু রাজেন, যাকে আমি সমস্ত অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও আপনার বলে আজ সাতাশটি বছর ধরে জেনে এসেছি। কি বল রাজেন, আমাদের পরিচয় সাতাশ বছরে পৌছয়নি? তোমার কত বয়স হ'ল রাজেন?

রাজেনের মন তখন আবার দুইটি বছর পিছনে ফিরিয়া গেছে। সঞ্জয় তাহাকে আরতির সহিত পরিচয় করাইয়া দিল, নূতন করিয়া। একদিন যাহার সান্নিধ্য-তৃষ্ণাকে অতিক্রম করিয়া রাজেনের কল্পনা বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই, মনের মাধবী-কুঞ্জে যাহার চপল হাসি, কণিকের দৃষ্টি লইয়া

প্রতি দিনরাত্রির মুহূর্ত্তগুলিকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহার পরিচয় সঞ্জয় কি দিবে! পরিচয়ের মধ্যে নূতন শুধু এইটুকু যে আরতি বর্ত্তমানে সঞ্জয়ের কার্য্যব্যস্ত জীবনের প্রেরণা —প্রণয়ের প্রদীপ লইয়া আরতি চলিয়াছে সঞ্জয়ের বন্ধুর রুক্ষ পথে দুরন্ত চলার সঙ্গে; শুধু এইটুকু। কিন্তু আরতি কেন বলিতে পারিল না যে রাজেনকে সে জানে—দুই বৎসর পূর্ব্বের পুরাতন পরিচয়কে কিসের লজ্জায়, কোন ভয়ে সে স্মরণে আনিল না! আত্মগ্লানিতে রাজেনের মন ভরিয়া গেল। সঞ্জয়ের কাছে নিজেও ত সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে নাই, আরতিকে আমি চিনি।

কিন্তু প্রশ্নের জবাব না দিয়া বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে সঞ্জয় অত্যন্ত সহজে অভিমান করিয়া বসে। একটু অন্যমনস্ক ভাবে রাজেন বলিল, সাতাশ বছর হবে বোধ হয়—

সঞ্জয় বলিল, কিন্তু তোমাকে দেখলে মনে হয় রাজেন, তোমার যেন আরও কত বেশী বয়স হয়েছে। গম্ভীর হয়ে থাকার অসুবিধাটুকু শুধু ওইখানে। যাই হোক, আরতির কথাই সম্পূর্ণভাবে তোমাকে জানাই। কারণ একদিন হয় তো তোমাকেই আরতির জন্যে সবচেয়ে বেশী চিন্তা করতে হবে। যখন কারো সম্বন্ধেই চিন্তা করবার জন্যে আমি বেঁচে থাকব না।

আরতি এতক্ষণ শিয়রের কাছে বসিয়া নীরবে সঞ্জয়ের চুলগুলির ভিতর আঙুল চালাইতেছিল। অল্প একটু হাসিয়া সে বলিল, তোমার সঙ্গে এতদিন যে কি করে আমার বনিবনা রইল তাই ভেবে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। এত দুর্ব্বল তুমি, এত ভীরু! মরতে তোমার এত ভয় অথচ জীবনে তোমার যে ব্রত ছিল তার প্রথম ও প্রধান সর্ত্ত হচ্ছে মরার ভয় ও শঙ্কা মন থেকে মুছে ফেলা। বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই তোমার দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্ত ও কারণগুলি আমার সামনে নির্ব্বাক হয়ে ছিল। তা ছাড়া আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে তোমার এত উৎসাহ কেন, বাঁচতে তোমার আপত্তি কিসের? তোমাকে এ রকম কোমল হ'তে দেখলে আমার অত্যন্ত হাসি আসে, দুঃখও হয়।

আরতির যে হাতের আঙুলগুলি সঞ্জয়ের চুলের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিতেছিল সেই হাতটি নিজের শীর্ণ দুটি করতলের মধ্যে ধরিয়া, মাথাটা ঈষৎ উপর দিকে তুলিয়া কাতর চোখে আরতির দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সঞ্জয় বলিল, আজও তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করবে আরতি! তোমাকে আজ কেমন করে বোঝাব, মৃত্যুভয় প্রত্যেকের জীবনে কতখানি আসে। যাকে এমনি করে মরতে হয়, ধীরে ধীরে বিনা প্রতিবাদে, সেই শুধু বুঝবে আমি কেন নিজের সম্বন্ধে এতখানি হতাশ হয়েছি। হঠাৎ আত্মহত্যা করা সহজ আরতি, শত্রুর উপলক্ষ করে যে মৃত্যু আসে তাতেও বিশেষ কাতর হবার অবসর থাকেনা, কিন্তু যখন মৃত্যু আসে স্বয়ং একাকী, তখন ব্যাধিক্লান্ত নিশ্চেষ্ট জীবনের হতাশ হওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে জানিনা। কিন্তু আজ এসব তর্ক থাক, আমরা পরস্পরকে পেয়েছি এবং সে পাওয়াকে কোনদিন আমরা অপমান করিনি, অবহেলা করিনি এ কথা শুনলে রাজেন কত আনন্দিত হবে। জীবনের আমার সমস্ত উদ্যমের প্রতিটি আবেগ সত্য কিন্তু তার চেয়েও সত্য রাজেন আমার এই আরতিকে প্রাপ্তি—।

রাজেন তখন ভাবিতেছিল যে আরতির কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই। আজও সে তেমনই আছে—তেমনি দৃপ্ত, দাম্ভিক, শান্ত স্বভাবকে তেমনই সে বিদ্রূপ করিতে ভালবাসে, ক্লান্তি তাহাকে স্পর্শ করেনা, আগুণের শিখার মত শিহরণ তাহার প্রতি মুহূর্ত্তটিকে মাতাইয়া রাখিয়াছে। হতভাগ্য সঞ্জয়, আরতি তাহার হৃদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়াছে হয়ত, কিন্তু সে শুধু সমুদ্র ও ঝড়ের উদ্দাম কল্পনা-কলরোলের সঙ্গিনী, বসন্তের বিধুর সন্ধ্যায় ছায়ানিবিড় কোমল মাধুর্য্যে সে সঞ্জয়ের জীবনে নারী হইয়া আসে নাই।

সত্যই আরতি এত নিষ্ঠুর যে তাহাকে বুঝিতে কষ্ট হয়। মেয়েটির স্বভাব যে কত বিপরীত তাহা বিশ্বাস করিতে হইলে নিজেকেই হইতে হয় মর্ম্মাহত। আরতি একটুখানি হাসিয়া বলিল, একি তোমারে পক্ষে খুব গৌরবের কথা সঞ্জয়। রাজেনবাবু যে আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতার কথা শুনলে আনন্দিত হবেন তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তোমার দুর্জ্জয় সাহসকে আড়াল করে দাঁড়ানোর লজ্জায় আজ পর্য্যন্ত আমার সঙ্কোচের সীমা নেই। তোমায় আমায় যখন সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন ভেবেছিলাম—না থাক্, তুমি বড় কাতর হ'য়ে পড়ছ।

কাতর যে সঞ্জয় হইতেছিল, একথা সত্য। তবু ম্লান শীর্ণ একটু হাসির সঙ্গে সে বলিল, তুমি বলে যাও আরতি,

তোমার সব বক্তব্য আমি শুনতে প্রস্তুত হয়েছি। আমার শেষ দিনের দিনে তোমাকে চুপ করিয়ে দিতে চাইনা—তোমার মনের অশান্তি জেনে যাবার দুঃখ হয়তো অনেক, কিন্তু জানবার কৌতূহল আমার তার চেয়েও বেশী। রাজেনের সামনেও কোনো কুণ্ঠার প্রয়োজন নেই আরতি, তুমি বল।

আরতি যেন এই অনুরোধের প্রতীক্ষাই করিতেছিল। বলিল, তোমার সঙ্গে যখন দেখা হ'ল তখন মনে করেছিলাম, বিদ্যুতে বিদ্যুতে যে মিলন হয় তার ফলে পৃথিবীতে নেমে আসে প্রলয়—যে প্রলয়ের সূচনা আমাদের দুজনেরই মনে প্রবলতর প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে শক্তির সঙ্গে শক্তির বন্ধুত্বে দুজনের মনের তীব্রতা গেছে কমে। অন্ততঃ তারা ভিন্নপথে চলে এসেছে, মানুষের চিরাচরিত বাসনার মাঝখানে।

রাজেন বোধ করি এতক্ষণ অর্দ্ধবিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া তাহাদের দুইজনের এই অত্যন্ত রূঢ় তর্ক উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। এইবার সে কথা বলিল। আরতির দিকে চাহিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিল, চুপ কর আরতি, এতদিন পরে এ সব কথা নিয়ে বোঝাপড়া করবার সময় যে এ নয় সে জ্ঞান তোমার থাকা উচিত ছিল। মানুষের জীবনের চেয়ে তর্কের যুক্তি বড় নয়। অন্ততঃ সঞ্জয় যখন আমার এখানে এ অবস্থায় এসে পড়েছে তখন তা আমি কিছুতেই হতে দেব না।

রাজেন যে হঠাৎ এতখানি কঠোর হইতে পারে সে অভিজ্ঞতা না ছিল সঞ্জয়ের, না ছিল আরতির। আরতির তার্কিক কণ্ঠ তৎক্ষণাৎ বিস্ময়ে এবং বোধ করি লজ্জায় স্তব্ধ হইয়া গেল। সঞ্জয় কিছুক্ষণ রাজেনের মুখের দিকে চাহিয়া মিনতি-কাতর কণ্ঠে বলিল, ওর ওপর রাগ কোরোনা রাজেন, ও এমনি স্পষ্ট।

রাজেন তখন উঠিয়া পড়িয়াছে। দরজার দিকে যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া সে বলিল, তুমি এখন স্থির হয়ে একটু শোও, আমি যাই একবার ডাক্তারের কাছে। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তারের বাড়ী হইতে রাজেন যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যার অনতিগাঢ় অন্ধকার গ্রাম্য আকাশটি ঢাকিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। শুধু পশ্চিম দিকের আকাশে তখনও অস্তোন্মুখ শেষ-রশ্মির আভা একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। রাজেন ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সঞ্জয় চোখ বুজিয়া শয্যায় পড়িয়া আছে, ঘুমাইতেছে বোধ হয় এবং তাহার শিয়রের নিকট অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় বাহুশিথানে মাথা রাখিয়া আরতিও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার নিদ্রার ভঙ্গীতে যেন গভীর ক্লান্তির একটি নিঃসহায় ভাব। রুক্ষ, কুঞ্চিত কেশগুলি ঈষৎ অসংযত। উন্মুক্ত বাতায়নপথে অস্তায়মান রক্তরশ্মির প্রতিচ্ছায়া আসিয়া সেই নিদ্রাবিহ্বলা নারীতনুটির উপর কি যেন অপরিমেয় রহস্যের সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া দিয়াছে।

রাজেন দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া একবার ভাবিল, আরতিকে ডাকিয়া বলে, শুতে তোমার কষ্ট হচ্ছে, ভাল করে শোবার ব্যবস্থা করে দিই এবং সেই সঙ্গে আর একটি কথা যোগ করিয়া দিতে তাহার ইচ্ছা হয়—কিন্তু সর্ব্বসময়ে মেয়েদের সন্তুষ্টি ভিক্ষা করিয়া দুর্ব্বলচিত্ততার পরিচয় দিতে যাহারা কুণ্ঠা বোধ করে রাজেন সে দলের লোক। রাজেন শুধু যে ক্ষমা করিতে জানে তাহাই নয়—জীবনে সে ঈর্ষা করিতে শেখে নাই, প্রতিশোধের প্রীতি সে অনুভব করিতে জানেনা। চিরদিন সে অত্যন্ত সরল কিন্তু গভীর; তাহার সাধারণ ব্যবহার বোঝা যেমন সহজ, তাহার সমস্ত সত্তাটিকে আবিষ্কার করা তেমনি কঠিন।

ডাক্তারের নিকট হইতে ফিরিবার পথে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নিজের হঠাৎ উত্তেজনার জন্য অনুশোচনার তাহার অন্ত ছিল না। রাজেনের মনে পড়িল, আরতির প্রতি তাহার রূক্ষ কথাগুলি সঞ্জয়কেও বেদনা দিয়াছে এবং ইহাও সত্য যে-কারণে সে রূঢ় হইয়াছিল সেই নিষেধের জন্য কণ্ঠের ও ভাষার অগ্ন্যুৎপাতের কোন প্রয়োজনই তাহার ছিল না। আরতির নিকট হইতে অমনি দৃপ্ত ভঙ্গীর ভাষাই বোধ করি সঞ্জয় শুনিতে ভালবাসে।

রাজেন ভাবিয়াছিল আরতিকে ডাকিয়া তাহার শুইবার সুব্যবস্থা করিয়া দিবে। কিন্তু আসন্ন সন্ধ্যার এই অস্পষ্ট স্বর্ণালোকে পথশ্রান্ত নিদ্রাকাতর আরতিকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় লাগিল। মনে হইল, জীবনে যেন এ মেয়েটি কোনদিন উদ্দাম ছিল না। সে যেন এখনকার মত চিরদিন কত অসহায়, কত নির্ভরশীল, বিকালের সাদা মেঘের মতই স্নিগ্ধ। আরতির ঘুম ভাঙিয়া দিতে তাহার আর ইচ্ছা হইল না। আরতির ঠিক এমন রূপটি রাজেনের ভাল লাগে, এ যেন তার

শেষ রাত্রির সুন্দর স্বপ্ন। রাজেন জানে, আরতির ঘুম ভাঙানোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বপ্নও ভাঙিয়া যাইবে; এই মেয়েটীর জাগ্রত রূপকে তাহার ভয় হয়।

আরতিকে না ডাকিয়া সে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া বসিল এবং বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল দুই বৎসর পূর্ব্বের পুরাতন জীবন।

তাহারা দুইজনে বাল্যবন্ধু, সে ও সঞ্জয়। বন্ধু বলিলে বোধ হয় তাহাদের সৌহৃদ্যের অমর্য্যাদা করা হইবে—যাহারা দুইজন দশ বছর বয়স হইতে, একত্রে খাইয়া, শুইয়া এত বড়টি হইল, তাহারা অনেক স্বজনের চেয়ে বেশী আপনার। রাজেনের যখন অত্যন্ত অল্প বয়স তখন তার মা যান মারা। একই গ্রামে পাশাপাশি দুইজনের বাড়ী। সঞ্জয়ের জননী সমান ভাগে আপনার পুত্রটিকে ও সেই মাতৃহারা পরের ছেলেটিকে মানুষ করিতে আরম্ভ করেন। তাহার পর একদিন চিরাচরিত ভাবে তাঁহাকে এ পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হইল। রাজেন ও সঞ্জয় তখন বড় হইয়াছে।

সঞ্জয়ের মাতার মৃত্যুর পর তাহাদের সত্যকার স্বজন বলিতে আর কেহ রহিল না। বহুদূর সম্পর্কের আত্মীয়দের সহিত আত্মীয়তা জমাইবার প্রয়োজন না ছিল রাজেন ও সঞ্জয়ের, না ছিল তাঁহাদের। গ্রামের সম্পত্তি ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া দিয়া দুইজনে আসিয়া কলিকাতায় বসবাস করিতেছিল। এমন সময়ে দেশের উন্নতি-প্রেরণায় অকস্মাৎ এক প্রভাতে সঞ্জয় করিল অন্তর্ধান। যাইবার সময় সে রাজেনকে একটি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল,—সঞ্জয়ের সে চিঠির শেষ কয়টি লাইন রাজেনের আজও মনে আছে—'একদিন-না-একদিন তোমার কাছে ফিরে আসবই। আমাকে ক্ষমা কোরো।' ইতি—

সেই সেদিন সঞ্জয় তাহার সহিত দেখা না করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ দুই বৎসর পরে আবার সে কঠিন পীড়া লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সঞ্জয়ের চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরেই রাজেনের জীবনেও আসিয়াছিল এক নূতন অধ্যায়; সেই অধ্যায়ের নায়িকা হইতেছে এই আরতি—যে-আরতি আজ সঞ্জয়ের সহিত আসিয়াছে।

কেন, কি করিয়া, এ প্রশ্ন আরতিকে যাহারা জানে না, তাহারাই করুক—রাজেনের কাছে সে প্রশ্ন একবারও আসিল না। সে শুধু ভাবিল, সেদিনকার সেই আরতির সহিত আজিকার এই মেয়েটির কোন পরিবর্তনই লক্ষ্য করা যায় না। আরতি তাহার কাছে চিরকালই এমনি বিস্ময়কর। সে যেন প্রবল বন্যা, প্রখর সূর্য্যালোকের মত উদ্দাম, সঞ্চারিণী অগ্নিশিখার মত তীরগতি।

এমনি স্বতন্ত্র ধরণের সেই মেয়েটির প্রতি রাজেনের উন্মত্ত অনুরাগ পড়িয়াছিল। এবং একদিন কি জানি কি মন্ত্রস্পর্শে স্বল্পভাষী ভীরু রাজেনও তাহার প্রণয়াবেগ আরতির নিকট লুকাইয়া রাখিতে পারিল না। তাহার যে উত্তর আরতি দিয়াছিল তাহা নির্ম্মম ও স্পষ্ট। সে বলিয়াছিল, আপনার মত নিরীহ লোকের সঙ্গে মন নিয়ে ছেলেখেলা করবার মোহ আমার নেই। আমাদের দুজনেরই স্বভাব অত্যন্ত স্বতন্ত্র, আমার সমস্ত মন ও শরীর যখন ছুটতে চায় তখন আপনি ভাবেন, একটু বসি। আমার মধ্যে আছে বৃহৎ মুক্তির স্বপ্ন, আপনি চান নীড়ের বন্ধন, আমাদের মিলন হ'তে পারে না।

রাজেন কোনমতেই ইহার উত্তরে বলিতে পারিল না, আরতি তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে, সম্পূর্ণ ভুল আরতি বুঝিয়াছে। রাজেনের ভিতর উচ্ছ্বাস নাই, প্রাণ নাই, শক্তি নাই—এক কথায় সে অকর্ম্মণ্য। নিজের সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রচার করার নির্লজ্জ প্রবৃত্তি রাজেনের ছিল না। সে কেবল ভাবিল, এতদিন ধরিয়া যে তাহাকে নিজ হইতে বুঝিতে পারে নাই, কথার যুক্তি-তর্ক দিয়া তাহার কাছে নিজের স্বরূপ বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা মিথ্যা।

সুতরাং রাজেনকে বিদায় নিতে হইল। সেই বিদায়ের দিনে আরতি বলিল, জানি, আমার কাছ থেকে গভীর ব্যথা পেয়ে আপনাকে যেতে হচ্ছে। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না। আপনাকে শীগ্‌গির একটি ঘরোয়া মেয়েকে বিয়ে করতে দেখলে অত্যন্ত আনন্দিত হব।

কিন্তু আরতির এ শুভ ইচ্ছা সত্ত্বেও যে-নীড় বাঁধিবার ইচ্ছা প্রথম প্রত্যাখ্যানের দীর্ঘশ্বাসে উড়িয়া গিয়াছিল তাহাকে রাজেন এখনও ধরিয়া আনিতে পারে নাই। এবং সেইদিন হইতে আরতিকে ভুলিতে গিয়া সে বোধ হয় নিজেকেও ভুলিয়া গিয়াছিল।

—হঠাৎ ভিতর হইতে সঞ্জয়ের কাশির শব্দ ভাসিয়া আসিয়া তাহার চিন্তাকে ছিন্ন করিয়া দিল। ঘরের ভিতর এখনও আলো জ্বালা হয় নাই। তাড়াতাড়ি গিয়া আলো জ্বালিয়া রাজেন দেখিল, কাশির শব্দে আরতির ঘুম ভাঙিয়া গেছে, সঞ্জয়ের যেন কাশিতে কাশিতে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে এমনি অবস্থা; তাহার কাশির ধমকের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে রক্ত উঠিতেছে এবং আরতি নিজের আঁচলে সেই রক্তধারা থামাইবার চেষ্টা করিতেছে।

পাশাপাশি তিন চারিটি গ্রামের একটিমাত্র ডাক্তার। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে রাজেন তাঁহাকে ডাকিতে গিয়া দেখা পায় নাই। তিনি গিয়াছিলেন অন্য গ্রামের একটি রুগী দেখিতে। কিন্তু সঞ্জয়ের অবস্থায় সে বিলম্ব সহ্য করা যায় না। রাজেন মথুরকে ডাক্তারের কাছে পাঠাইয়া দিল।

মথুর চলিয়া গেলে আরতি সঞ্জয়কে প্রশ্ন করিল, এখানকার ডাক্তার ভাল তো?

সঞ্জয়ের কাশির ধমক তখন থামিয়া গেছে। আরতির স্বরে হয়ত একটু ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছিল। সঞ্জয়ের মৃত্যুবিবর্ণ মুখে শীর্ণ একটু হাসি ফুটিতে দেখা গেল। অতি ধীর ও মৃদু শ্রান্ত কণ্ঠে সে বলিল, বিধাতার বিরুদ্ধে ডাক্তারের বিধান টেঁকে না আরতি। ডাক্তার তো বিধাতারই সৃষ্টি, আমাকে যেতেই হবে।—কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই প্রাণান্তকর কাশির বেগ। সে কাশি থামিবার পর সঞ্জয়কে দেখিয়া মনে হইল, তাহার আত্মা বুঝি সেই প্রবল ঝাঁকুনি সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে।

সেই রাত্রেই সঞ্জয় এই পৃথিবীর আলো অন্ধকার, তুচ্ছ বেদনা ও আনন্দকে ছাড়াইয়া কতদূর চলিয়া গেল তাহা সে-ই জানে! আর তাহার মৃত্যুর শিয়রে নিশ্চল-মূর্ত্তির মত বসিয়া থাকিল আরতি—দুঃখ যাহাকে স্পর্শ করে না, ঝড় যাহার জীবনের আদর্শ, নিজে যে অগ্নিশিখা!

* * * *

শোকে সময়ের গতি মন্থর হয় কিন্তু একেবারে থামিয়া যায় না। রাজেন ও আরতির দিনও চলিতে লাগিল। রাজেন তাহার ঘরে বসিয়া ভাবে, সঞ্জয় এইবার আর ফিরিয়া আসিবে না, সঞ্জয় গিয়াছে কিন্তু তাহার জন্য দুঃখ করিবার নিরবচ্ছিন্ন অবসর সে তাহাকে দিয়া যায় নাই। আরতির সমস্ত জীবনের ভার সে তাহার উপর দিয়া গিয়াছে। এই তাহার বিপদ। আরতিকে সে কোন্ পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে!

আর আরতি—পৃথিবীর বর্ণ তাহার দৃষ্টিতে হঠাৎ যেন হারাইয়া গিয়াছে। সঞ্জয়ের মৃত্যুর সঙ্গে তার সমস্ত চিন্তা, সকল স্বপ্নেরও বুঝি অবসান হইয়াছে। ভবিষ্যৎ ভাবিবার শক্তি বুঝি আর নাই। এতদিন তাহার জীবন লইয়া সে কি করিল, এখন সে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে কিছুই সে ভাবিতে পারে না। সঞ্জয়কে যে তাহার কত বেশী প্রয়োজন ছিল সে কথা বুঝি সঞ্জয় মরিয়া তাহাকে দেখাইল।

নির্জ্জন গ্রামের চারিপাশের বনানীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া আরতির দিন কাটিতে লাগিল।

কথা নাই, হাসি নাই, কাজ নাই এমন করিয়া আর কতদিন চলে! তাই একদিন দেখা গেল রাজেনের পাঠশালা আবার জমিয়া উঠিয়াছে এবং আরতি রাজেনের অলক্ষিতেই তাহার গ্রাম্য সংসারের সমস্ত ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে।

পাঠশালার দুঃস্থ ছাত্রগুলি দ্বিপ্রহরে পড়িতে আসিয়া তাহাদের সরল আব্দারে আরতিকে বিব্রত করিয়া তোলে। মথুর তো দিদিমণি বলিতে অজ্ঞান।

আরতির ভিতর কি যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না। আশ্চর্য্য এই গ্রাম্য ছেলেগুলি, অদ্ভুত এই তেরো বছরের বালক মথুর, কত সহজে তাহারা মানুষকে কত আপনার করিয়া লইতে পারে। ইহাদের আব্দার, অভিমান, সামান্য পাওয়ার আনন্দ আরতিকে যেন এক নূতন জগতে টানিয়া আনিয়াছে।

রাজেন তাহার ছাত্রগুলির সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া মাঝে মাঝে আরতিকে বলে, এদের তুমি মানুষ করে দিও আরতি।

আরতি মৃদু হাসিয়া উত্তর দেয়, না এদের অমানুষ করব, সেটা আরও সহজ।

মনে হয়, এই অনাবিল সংসারের মধ্যে সঞ্জয়কে কেহ বুঝি মনে করিয়া রাখে নাই। আরতির মন দুর্জ্জের কিন্তু আর একজন প্রতিদিন সুষুপ্ত নিস্তব্ধ রাত্রে জাগিয়া জাগিয়া সঞ্জয়কে বারম্বার স্মরণ করে।

আরতির নিকট হইতে সকল সময়ে তাহাকে দূরে থাকিতে হয়। মনের সঙ্গোপনে যে কামনাটি আজও মরে নাই তাহাকে আরও কতদিন সে ঘুম পাড়াইয়া রাখিবে! তাই প্রতি রাত্রে রুদ্ধকণ্ঠে রাজেন বলে, তোমাকে আমার সমস্ত কথা বলবার অবকাশও দিলেনা অথচ আর কতদিন আরতির সামনে এমনি করে অভিনয়ের মুখোস পরে আমি বেড়াব? তুমি তো জাননা কিন্তু আর যে আমি পারছি না সঞ্জয়! আমাকে তুমি ক্ষমা কর, দ্বন্দ্ব থেকে নিষ্কৃতি দাও।

এমনি ভাবে যখন দিন কাটিতেছিল তখন সেখানে হঠাৎ একদিন আবার একটি লোকের আবির্ভাব হইল। রাজেন তাহাকে চেনে না কিন্তু আরতি তাহাকে জানে। সঞ্জয়ের দলের লোক সে, অনিল।

সে যেন তর্কের আতসবাজি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার তর্কের জোরে আরতিকে স্বীকার করিতে হইল, না, এতদিন সে নিশ্চেষ্ট জীবন ভোগ করিয়া ভুল করিয়াছে।

অনিল বলিয়াছে, এ তুমি কি করছ আরতি! এমনি করে যে তুমি সঞ্জয়দাকেও ভুলে যেতে বসেছ!

সত্যই তো, সঞ্জয়ের নিকট সে যে দীক্ষা পাইয়াছে সে কি এমনি ভাবে ভুলিয়া যাইবার জন্য? আরতি স্থির করিয়া ফেলিল, এখান হইতে সে যাইবেই। অনিলকে সে বলিল, যান, রাজেন বাবুকে বলে আসুন আমরা চলে যাচ্ছি। ইতি-মধ্যে আমি সমস্ত গুছিয়ে নিই। আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই আমাদের যেতে হবে।

গ্রাম হইতে ষ্টেশন তিন মাইল দূরে। গরুর গাড়ীতেই যাতায়াত করিতে হয়। কিন্তু আরতি হাঁটিয়া যাইবে। সে রুগ্ন নয়, পঙ্গু নয়।

সন্ধ্যার গাড়ী ধরিতে হইলে আর বেশী দেরী করা চলে না। এইবার রাজেনের কাছে বিদায় লইতে হইবে। একবার আরতির মনে হইল, এই পল্লব-ঘন নির্জ্জন শান্ত গ্রাম, এই বনমর্ম্মর, এই স্বচ্ছ আকাশ ছাড়িয়া সে কোথায় চলিয়াছে! আর বৈরাগী রাজেন যাহাকে কেহ দেখিবার নাই ও স্নেহাকাঙ্ক্ষী মথুর তাহাদের ফেলিয়া সে কোথায় যাইবে! সঞ্জয়ের মৃত্যুতীর্থ হইতে সরিয়া যাইবার এ আকাঙ্ক্ষাই বা তাহার কেন!

আবার ভাবিল, এই সঙ্কীর্ণ গ্রামের মধ্যে নিজের বিস্মৃতি ও অপমৃত্যু সে ঘটিতে দিবে না। রাজেনের ঘরে আসিয়া আরতি বলিল, আমি যাচ্ছি।

আরতির এই অকস্মাৎ চলিয়া যাওয়ার প্রতিবাদ রাজেন করে নাই। কারণ সে জানিত আরতির মনে এক এক সময়ে এমন একটি কঠোর দৃঢ়তা আসে যখন প্রতিবাদ সে সহ্য করিতে পারে না। তবু রাজেন আরতির দিকে মুখ না তুলিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, একান্তই কি তোমাকে যেতে হবে?

মৃদু কণ্ঠে আরতির নিকট হইতে উত্তর আসিল, হাঁ, তার পর হঠাৎ রাজেনের পায়ের নিকট নত হইয়া সে প্রণাম করিল। প্রণাম করিবার পর বলিল, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

তেমনি ভাবে বসিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে রাজেন একটু পরে বলিল, বেশ তাই হোক, যদি কোনদিন ক্লান্তি বোধ হয় তাহলে আবার এইখানেই ফিরে এসো। কিন্তু আশীর্ব্বাদ করি জীবনে যেন তোমার কোনদিন শ্রান্তি না আসে।

দ্বিপ্রহরে মথুর তাহার সঙ্গীদের সহিত খেলিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়া সে রাজেনের নিকট শুনিল, তাহার দিদিমণি চলিয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যার ট্রেণ আসিতে তখনও প্রায় এক ঘণ্টা সময় আছে। মথুর মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল জোরে ছুটিয়া গেলে বোধ হয় দিদিমণির সহিত দেখা হইতে পারে। এবং একবার দেখা পাইলে সে তাঁহাকে নিশ্চয়ই ফিরাইয়া আনিতে পারিবে। তের বছরের স্নেহকাঙাল ছেলেটি তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে ষ্টেশনের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

ছুটিতে ছুটিতে যখন সে ষ্টেশনে পৌছিল তখন তাহার নিশ্বাস টানিতে কষ্ট বোধ হইতেছে, কোথায়—ওই যে তাহার দিদিমণি ট্রেণের কামরার একটি জানালার নিকট বসিয়া আছেন কিন্তু ট্রেণ যে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেমন করিয়া এখন সে বলিবে, দিদিমণি তুমি যেওনা, ফিরে চল—

মথুর কিছুই বলিতে পারিল না, শুধু কিছুক্ষণ সে আরতির দিকে চাহিয়া রহিল, চোখে তাহার জল। তাহার পর হঠাৎ যেন তাহার মনে পড়িয়া গেল, দিদিমণি চলিয়া যাইতেছেন তাঁহাকে এখনো প্রণাম করা হয় নাই। মনে পড়িতেই, স্নেহ-ভিক্ষুক এই গ্রাম্য কিশোরটি সন্ধ্যার সেই অনতিগাঢ় অন্ধকারে ছোট ষ্টেশনটির মাঝখানে আভূমি নত হইয়া তাহার দিদিমণির উদ্দেশে প্রণাম করিল।

সেইদিন গভীর রাত্রি অবধি রাজেনের মনকে কত বিভিন্ন ধরণের অদ্ভুত চিন্তা আসিয়া আক্রমণ করিতে লাগিল। একবার মনে হইল, এ ভালই হইয়াছে, একটি গভীর সংশয় হইতে আজ তাহার বিশ্রাম। পরক্ষণে আবার মনে পড়িল, সঞ্জয়ের বিশ্বাসকে সে হত্যা করিয়াছে। এমন ভাবে আরতিকে পুরাণো পথে প্রত্যাবর্ত্তনের সুযোগ দিবার জন্য সঞ্জয় আরতির সমস্ত ভার তাহার উপর রাখিয়া যায় নাই। তাহার আক্ষেপ হইতে লাগিল, কেন বিধাতা তাহাকে এই পৃথিবীতে এমনি স্তিমিতশক্তি করিয়া পাঠাইলেন—কেন সে সঞ্জয়ের মত, অনিলের মত মানুষ হইয়া জন্মে নাই—আরতির সহিত দ্রুততালে সমানে চলিবার গতি ও দুঃসাহস কেন সে পাইল না! এই সকল উন্মত্ত চিন্তার ঘোরে রাজেন যেন দেখিতে পাইল তাহার সুমুখ দিয়া একটি ট্রেণ চলিতেছে, তাহার একটি কামরার জানালার নিকট আরতি বসিয়া। সে যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে, আপনার আশীর্ব্বাদ মাথা পাতিয়া লইলাম, জীবনের শ্রান্তিকে অবজ্ঞা করার শক্তি আপনিই আমায় দিলেন।

প্রত্যাবর্তন

—শ্রীকালিদাস রায়

জননি গো ফিরিনু আবার,
হোক ভুল ভ্রান্তি শত হোক অপরাধ যত
মা'র কাছে লজ্জা কি-বা আর ?
চিনিবে কি ছেলেটিরে ? সব ভোল গেছে ফিরে
দ্বিধা যে হতেছে মনে তাই,
জননী সন্তান চেনে শত বরষেরো পরে,
বৃথা আমি এ কথা শুধাই।

কোথা ছিনু এতকাল ? ব্যথা বাজে বলিতে মা
মা'-রও কাছে লাজে হই নত,
মায়ের ভাণ্ডার ভরা, ছন্নছাড়া ঘুরিয়াছি,
দেশে দেশে ভিখারীর মত।
উজ্জয়িনী বারাণসী বৈশালী, মথুরা, পুরী,
দ্বারাবতী, বিদিশা, কোশল,
কত নগরীর পথে ঘুরিয়া এলাম, হাতে
বীণাখানি করিয়া সম্বল।
কত মঠ চতুষ্পাঠী, কত দুর্গ, বৃক্ষবাটী
রাজসভা, প্রাসাদ, মন্দির,
হেরিলাম কত স্তূপ, সমারোহ অপরূপ
রথ গজ সৈন্য সেনানীর।
সামগান-মুখরিত হোমানলে উদ্ভাসিত
সরস্বতী-শতদ্রুর তীরে
অতিথি হ'লাম কত ছায়াচ্ছন্ন পর্ণায়ত
বটতলে আশ্রম-কুটীরে।

যশোলোভে রসলোভে কল্পলোকে স্বপ্নলোকে
রাখিনি কোথায় যেতে বাকী।
কোথাও ত মিলিল না, চিত্তের প্রসাদকণা,
জুড়াল না কোথাও এ আঁখি।
কত গান গাহিলাম, শুনাইতে চাহিলাম
ভারতের গৌরব-কাহিনী,
সবে চ'লে গেল হায় উপহাসে উপেক্ষায়
কেহ তাত' শুনিতে চাহে নি।

ভাঙা বাঁশী জোড়া দিয়ে   বীণা ফেলে তাই নিয়ে,
জননি গো ফিরিয়া এলাম।
বহু অপরাধ জমা   স্নেহভরে কর ক্ষমা,—
সন্তানের লহ মা প্রণাম।

পুত্র তব প্রত্যাগত,   সেই আগেকার মত
মুছাবে না এ মুখ অঞ্চলে?
পৌরপথ ধূলি ধূমে   এ তনু মলিন, দেখ
ললাট ভরেছে স্বেদ-জলে।
এ দগ্ধ হৃদয় মোর   স্নিগ্ধ করি দিক্ তব
মুগ্ধ ঘনচ্ছায়ার প্রসাদ।
পাখীর ডানার বায়ে   বকুল ঝরুক গায়ে—
অভাজনে কর আশীর্ব্বাদ।
ললাট চুমিয়া মোর   ঘুচাও দম্ভের ঘোর,
স্নেহে কর সর্ব্ব তৃষা দূর,
গ্রন্থ ভার-ক্লিষ্ট শিরে   বুলাও ও পাণিটিরে,
বাঁশী মোর ফিরে পাক্ সুর।
অঞ্চলে মুছায়ে লও   এ ভাষার ছটাঘটা—
সমারোহ যাক ধীরে ধীরে,
শিশুকালে তব কোলে   শিখেছিনু যেই বোলে
সেই বোল দাও মোরে ফিরে।

পুরসভা মঞ্চটিরে   তেয়াগি এলাম ফিরে,
পুন তব দোলমঞ্চপাশে,
চিনিয়া ফেলেছে বুঝি,   দেখ মাগো মোরে হেরি
মালঞ্চের ফুলগুলি হাসে।
তুলসীছায়ায় শুচি   লক্ষ্মীর চরণ আঁকা
এ অঙ্গনে তৃণের কুটীরে,
বেণুকুঞ্জে দীঘিজলে   ধেনুধন্য গোষ্ঠে তব,
নদীটির তৃণাঙ্কিত তীরে

আবার ফিরিনু বুকে, প্রীতি-সুখে স্মৃতি-সুখে
অঙ্গে মোর জাগে শিহরণ,
বাল্য-স্মৃতি দিয়ে গড়া প্রথম প্রণয়ে ভরা
চারিদিকে সকলি মোহন ;
নগরের বেশভূষা, ত্যজেছি এ নগ্ন বুকে
পরাও মা কুমুদের মালা,
নগ্ন বাহুতটে পুন অপরাজিতার শ্যাম
লতা দিয়ে গড়ে দাও বালা।
তেমনি কি ফোটে হাঁ মা কাজলা-দীঘির জলে
সাঁজে ভোরে কুমুদকমল,
দেশের পাখীরা এসে সেই নাদা বট গাছে
তেমনি কি খায় বটফল ?
তেমনি ফাগুন মাসে মৌমাছির গুঞ্জরণে
ভ'রে উঠে আমের বাগান ?
তেমনি তোমার মাঠে পৌষে সরিষার ফুলে
আসে মাগো হলুদের বান ?
কাশ ফুলে যায় ভ'রে ডহর তেমনি ক'রে ?
তালগাছ ভরে তাল-শাসে ?
তেমনি সুরভি বায়ে শিহরণ জাগে গায়ে ?
তেমনি বাতাবি বন হাসে ?
এখনো আখের ক্ষেতে দাশুর পাঁচালী গেয়ে
আখ বাঁধে তরুণ কৃষাণ ?
এখনো কি দোল-তলে গায় লোক দলে দলে
কবিগান মনসা-ভাসান ?
কতকাল দেখি নাই কুল গাছে দোয়েলের
তাল গাছে বাবুয়ের বাসা,
কতদিন শুনি নাই দীঘি-জলে কলসীর
কাঁকণে কণিত কলভাষা।
করবীর বন-ছায়ে তেমনি ছেলেরা আজো
বিকালে কি পাতে খেলা পাতি ?
ঝাজলে ঝুলনে রাসে তেমনি কি তারা হাসে
নাচে গায় করে মাতামাতি ?
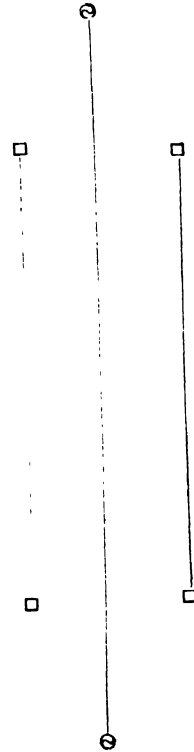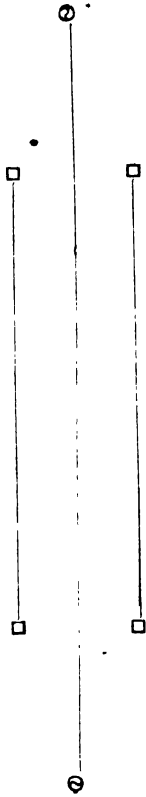
আমারে চিনিবে-ত' মা—? করিবে আমারে ক্ষমা—
যদিই চিনিতে পার মোরে ?
কত দিন ছাড়াছাড়ি, গিঁঠ বেঁধে দাও মাগো—
ছিন্ন এই বাঁধনের ডোরে।
ঢুকিতে গাঁয়ের বাটে পা' ধুলাম যেই ঘাটে
মনে হলো মোরে সে ভুলেনি,
ছিল ঘাটে হাঁস কটি মোরে দেখি ঝটপটি,
পলাইতে পাখা ত খুলেনি।
আসিতে বটের তলে লাগিল যে ছায়া গায়ে
মমতা মাখানো হলো মনে,
সহসা শাখায় তার বিহগেরা কলরোল
করিল মা কোন প্রয়োজনে ?
চিনিতে হবে মা দেরি, একে একে সকলেরি
ভাঙাবো স্নেহের অভিমান,
দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে মিলনে মধুরই করে
চির দিন প্রেমের বিধান।
তোমার দীঘিটি হেরি মনে হয় নেমে পড়ি,
জুড়াইতে প্রবাসের জ্বালা,
তোমার প্রান্তর দেখি মনে হয় ছুটি পুন
নাহি মেনে খানা-ডোবা-নালা।
তব শ্যামাঞ্চল পাতা সাধ যায় মাগো হোথা
শিশু হয়ে সোহাগে ঘুমাই,
তোমার বকুলশাখা ডাকে মোরে দুলে দুলে,
সাধ যায় পুন দোল খাই।
জননী, আমার শিরে তুলসী-সুগন্ধভরা
পাণিপর্ণ আবার বুলাও,
ত্রিশ বছরের মোর সব দুঃস্বপন-ঘোর
হেসে হেসে ভুলাও ভুলাও।
কিশোর প্রাণের বেণু যেখানে সাধিয়াছিনু
মুদি যেন সেখানে নয়ন,
শেষের কয়টা দিন বাজায়ে এ ভাঙা বীণ
'মধুরেণ হোক সমাপন'।

অন্তর ব

—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

বৌবাজারের দিকে বাসা করার পর থেকে বন্ধুবান্ধব কারো সঙ্গে দেখা করা বড় একটা হ'য়ে ওঠে না। ওকালতির ঝঞ্ঝাট তো বড় কম নয়। সকালে সিনিয়ারের বাড়ী একবার হাজিরা দিতে যেতেই হয়। মাঝে মাঝে—(কথাটা চেপে যাওয়াই উচিত ছিল)—মাঝে মাঝে তাঁর ছেলে মেয়েদের হোয়াইট-এওয়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে জামা-কাপড়ও কিনে দিতে হয়। দুপুরে কোর্ট আছে এবং বিকালের দিকে প্রায়ই কোনো-না-কোনো মক্কেলের বাড়ী যেতে হয়। সুতরাং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেবার সময়ও নেই, উৎসাহও নেই।

এমন সময় একদিন অজয়ের চিঠি পেলাম—সে মৃত্যুশয্যায়, আমাকে একবার দেখতে চায়। লেখা অজয়ের নিজের নয়, তার একটি পিস্‌তুতো বোন তারই বাড়ীতে থেকে মানুষ হচ্ছে, বোধ হয় তারই,—অর্থাৎ মেয়েলি হাতের লেখা। এক একটি মেয়ে দেখা যায়, বয়সের হিসাবে যাদের কৈশোর শেষ হ'য়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু যায় না। অকারণে ক্ষণে ক্ষণে উঁচু হাসি, লঘু চঞ্চল গতি এবং একটি অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিক নির্লজ্জতা তথাপি টিঁকে থাকে। তেমনি একটি তন্বী সুন্দরী, কিশোরী মেয়ে এই লোটন।

আমি বুঝতে পারছি, তোমার চোখ পড়েছে এই লোটনের ওপর। এবং এর পরে যদি আমি কেবল লোটনের কথাই ব'লে যাই তুমি খুসীই হবে। কিন্তু আমি অজয়ের কথা বলতে চাই।

তুমি বন্ধুত্ব বিশ্বাস করো? করো না? তবু রোজ সকালে চা খেতে তো এসো এবং টাকা ধার নিয়ে শোধ দিতেও ভুলে যাও। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি। ওই অজয়ের সঙ্গে আমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব,—আজকের নয়, যখন আমাদের দুজনেরই বয়স কুড়ির নীচে ছিল, যখন একজন আর একজনকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে পারতো, সেই সময়কার। ও যে বেশীদিন বাঁচবে না সে আমি জানতাম। কলেজে পড়বার সময়ই ওর কাণের ওপরটা এবং আঙুলের ডগায় মাংস কুঁচকে যেতে আরম্ভ করে; রোগের সূত্রপাত সেই সময় থেকেই। কিন্তু তাতে ও এতটুকু দমে নি;—সমানে পড়ে গেছে এবং লিখে গেছে। বাংলাদেশের সাহিত্য-পত্রিকাগুলি আজও ওর প্রশংসায় মুখর। বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসেই ওর অসুখ বাড়তে আরম্ভ করে। তার আগে ভালো বোঝাই যেত না।

আমি যখন অজয়ের ওখানে গেলাম, সে তখন গলা পর্য্যন্ত একটা পুরু চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল। তখন সন্ধ্যের বেশী বাকী ছিল না। ও সুমুখের খোলা জানালা দিয়ে পশ্চিম-গগনের বিচিত্র বর্ণচ্ছটার পানে একদৃষ্টে চেয়েছিল। লোটন শিয়রের দিকে একটা টিপয়ের পাশে ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে কি কতকগুলো ওষুধের শিশি সাজাচ্ছিল।

আমি অতি সন্তর্পণেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। কিন্তু যেভাবে লোটন আমাকে কলকণ্ঠে স্বাগত জানালে, তাতে মনে হ'ল এত সন্তর্পণে আসবার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। আশ্চর্য্য মেয়ে এই লোটন! মুমূর্ষু ভায়ের পাশে দাঁড়িয়েও সে তেমনি চঞ্চল, তেমনি উচ্ছ্বল, তেমনি মুখর।

লোটন বললে,—এই মাত্র আপনার কথা হচ্ছিল মৃণালবাবু!

অজয় যে আজ সন্ধ্যায় আমার প্রতীক্ষা করবে এতো জানা কথা। তবু বললাম,—তাই নাকি?

লোটন যেন দিগ্বিজয় করেছে এমনি ভাবে বললে,—দেখলে দাদা, আমি বললাম, তিনি নিশ্চয় আসবেন। তুমি বিশ্বাস করতে চাও নি।

অজয়ের চোখ একটা পুরু নীল চশমায় ঢাকা ছিল,—দেখা যাচ্ছিল না। ওর মুখ একেবারে বীভৎস দেখাচ্ছিল,—নাক এবং ঠোঁট অসম্ভব রকম ফুলে উঠেছিল। লোটনের কথায় ও শুধু একটু ক্ষীণ হাসলো।

চেয়ারটা আরও সরিয়ে নিয়ে জিগ্যেস করলাম,—এখন কেমন বোধ হচ্ছে?

এ কথারও অজয় কোনো জবাব দিলে না। বললে,—তোমার খবর কি?

দেবার মতো খবর আমার অনেকই ছিল। আমার ছোট নীড়খানির খুঁটি নাটি অনেক খবরই জমেছে। আমি জানি, সে কথায় ও আনন্দ পায়। কোর্টের খবরও ওর কম প্রিয় নয়। একটা ছোট ঘটনাকে আইন-ব্যবসায়ী সত্যমিথ্যায় কেমন জটিল ক'রে তোলে, কি আশ্চর্য্য নিপুণতায় একটা মামলার গতি ফিরিয়ে দেয়, সে কাহিনী শুনতে শুনতে ও উৎ-ফুল্ল হয়ে উঠে, অধীর হয়ে উঠে। কিন্তু ওকে দেখে সেদিন আমার মনটাই দমে গেল। বেশী কথা বলতে ইচ্ছেই হোল না। আমি শুধু ঘাড় নেড়ে জানালাম, ভালো।

—সবাই ভালো আছে?

আমি এবারও ঘাড় নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ।

ও যেন আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। আপন মনে অস্ফুট কণ্ঠে কি যেন বললে। ও বিশ্বাস করতে পারছিল না, একা ও-ই অসুস্থ, আর সবাই ভালো আছে। খানিক পরে বললে,—

—আচ্ছা, আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, লোটি?

—একটু খানি।

—তাই হবে। চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।

অসুস্থ শরীর,—একটু তন্দ্রা এলে সকলেই অমন কত স্বপ্ন দেখে। কিন্তু অজয়ের সবেতেই লোটনের আগ্রহ অপরিসীম। ও অজয়ের মুখের ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়ে বললে,—কি স্বপ্ন বলো না?

অজয় একটু হেসে বললে,—থাক্‌গে। সে শুনে তুই হাসবি।

—না, হাসবো না। তুমি বলো না।

অজয় আস্তে আস্তে বললে,—স্বপ্ন দেখছিলাম, আমি যেন যুদ্ধে গেছি। মস্ত বড় একটা প্রান্তর। চারিদিক ধূ ধূ করছে। কোথাও একটা গাছ পর্য্যন্ত নজরে পড়ে না। যুদ্ধ করতে গেছি, কিন্তু আমি একা। আমার গায়ে একটা চুম্‌কী-করা মখমলের পোষাক, কোমরে তলোয়ার। কার সঙ্গে যুদ্ধ করছি জানি নে, কিন্তু আমি কেবল চ্যাঁচাচ্ছি, আর প্রাণ পণে তলোয়ার ঘুরোচ্ছি;—এতো ঘুরোচ্ছি যে গা দিয়ে প্রচুর ঘাম ঝরতে লাগ্‌লো।

অজয় চুপ করলো।

লোটন যে ওর গল্প খুব মন দিয়ে শুনছিল তা বোধ হ'ল না। কিন্তু অজয় চুপ করতেই বললে,—তারপর?

—তার পর আর নেই। আচ্ছা মৃণাল, মানুষ স্বপ্ন দেখে কেন জানো?

অন্যমনস্ক ভাবে বললাম,—না।

লোটন বললে,—তুমি নিশ্চয় আজকে যুদ্ধের কথা ভেবেছ।

অজয় সবিস্ময়ে বললে,—আমি? যুদ্ধের কথা?

লোটন আবার বললে,—আজ না হোক, এর মধ্যে কোনো দিন ভেবেছ নিশ্চয়।

এবারে অজয়ের যেন কি কথা মনে পড়ে গেল। বললে, —তা হতে পারে। যুদ্ধ নয়, কিন্তু এই শীর্ণ হাত খানা যখন দেখি, তখন মনে মনে ভাবি আমি যদি বলবান হ'তাম! বেশী না, এমনি সাধারণ মানুষের মতো ও যদি হতাম!

লোটন এমন অদ্ভুত কথা যেন কখনও শোনেনি, এমনি ভাবে হেসে লুটিয়ে পড়বার মতো হোল।

বললে,—তাহোলে কি করতে? আমরাই বা কি করি? চুরি করি, না ডাকাতি করি, না খুন করি?

অজয় স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ লোটনের পানে চেয়ে রইল। তার পরে ধীরে ধীরে বললে,—আমি খুনও করতে পারি। মাঝে মাঝে আমার ভয়ানক খুন করার ইচ্ছে হয়। কিন্তু তাও নয় লোটি, আমি শুধু বেঁচে থাকতে চাই,—শুধু সবারই মতো রাস্তা দিয়ে চলতে চাই,—স্ত্রী পুত্রের জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে চাই। আর কিছু নয়।

অজয়ের গলার স্বর ভারী হয়ে এল। কিন্তু সে স্বরে ক্লান্ত বিষণ্ণতা নেই, আছে একটা অতি তিক্ত ক্ষোভ। আমি সইতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম, কথার ধারা এবার বদলাতে হবে।

কিন্তু লোটন বললে,—তোমার তো রাস্তা দিয়ে চলার দরকার নেই দাদা,—স্ত্রী-পুত্রের জন্যে রোজগার করারও না। তোমার তো টাকার অভাব নেই।

উত্তেজনায় অজয় উঠে বসল। টান দিয়ে চশমাটা খুলে ফেলে বললে,—সমস্ত দিয়ে দিতে পারি লোটি,—আমার বাড়ী, আমার ব্যাঙ্কের টাকা সব, যদি একটি দিনের জন্যেও কেউ আমাকে ভালো করে দিতে পারে। এই জীবনে আমি অন্তত একদিনও সুস্থ দেহে বেঁচে থাকতে পেলে ধন্য মানব।

চোখ ফেটে যেন রক্ত ঝরছে এমনি লাল ওর চোখ। আর সওয়া গেল না। আমি তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করলাম,—তোমার বৃন্দাবন কেমন লাগলো?

অজয় বিরক্তভাবে বললে,—ছাই লাগলো।

—তোমার নাটকখানি শেষ হয়েছে?

অজয় আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে,—ও সব আর ভালো লাগে না,—বুঝেছ মৃণাল, সাহিত্য-চর্চাও আর ভালো লাগে না।

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু সে লোটনের সামনে নয়।

লোটনকে বললাম,—আমি বরাবর কোর্টের ফেরৎ আসছি কি না সে কথাটি তো একবারও জানতে চাইলে না?

লোটন আমার কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারলে না। বললে,—সে তো আমি জানিই।

—জানো যদি, তবে চা খাওয়ানোর উৎসাহ তো দেখছি নে?

লোটন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বললে,—ভারী ভুল হয়ে গেছে মৃণালবাবু, আমি এক্ষুণি আসছি।

লোটন চলে গেল। আমি চেয়ারখানি অজয়ের বিছানার দিকে আরও সরিয়ে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি জিগ্যেস করলাম,—আর তোমার সেই বৈষ্ণবী, তার খবর কি?

এবারে অজয়ের মুখে হাসি ফুটলো। বললে, তার কথা কি তোমাকে লিখেছিলাম?

—লেখো নি? তারই কথাই তো কেবল লিখতে, তোমার কথা আর ক'টা থাকতো!

গভীর তৃপ্তির সঙ্গে হাসতে হাসতে অজয় বললে,—তাই বটে। তারই তো কথা, আমার আর নতুন কথা কিই বা ছিলো। কিন্তু তুমি কি লোটিকে তাড়ালে এই জন্যে?

হেসে বললাম,—এই জন্যে। আমি তোমার কাছ থেকে সকল কথা শুনতে চাই।

—তা শোনো। কিন্তু লোটিকে সরাবার দরকার ছিল না। ও সবই জানে। বিস্মিত হচ্ছ? কিন্তু দোষটা কি শুনি? তোমার স্ত্রীকে তুমি ভালোবাসো এ কথা সবাই জানে। সে বুঝি না দোষের হয়—

আমি তাড়াতাড়ি বললাম,—না দোষ কিছুই নয়। তুমি বলো।

অজয় বললে,—

—ওরা বলে কুঞ্জ। বৃন্দাবনে পৌঁছুবার আগে পর্য্যন্ত জানিনে কোথায় গিয়ে উঠ্‌ব, কি ক'রে বা থাকবো। কিন্তু ট্রেণ থেকে নেমে কিছুই আমাকে ভাবতে হোল না। কোথা থেকে কে এসে যে বাক্স-বিছানা সমেত আমাকে একটা কুঞ্জে নিয়ে গিয়ে ফেললে সে আজ আর মনে করতে পারিনে। কেবল মনে আছে, কুঞ্জে গিয়ে যে দৃশ্যটি দেখলাম সেই কথা। সুমুখেই দাওয়ায় ব'সে একটা ঘোরতর কালো, বেঁটে স্থূলকায় ব্যক্তিকে পাঁচ-ছ'টি মেয়ে পরম যত্নে তেল মাখাচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম, একেই বলে ভাগ্যবান। বাবাজি স্মিত হাস্যে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। অতি মিষ্টি ধীর কণ্ঠে বললেন, আজ তেল মাখানো থাক্ রাধা, আগে বাবুর ঘরটি ঠিক করে দিয়ে এসো!

রাধার বয়স চব্বিশ-পঁচিশের কম নয়। দীঘল তনুদেহ ছাড়া গর্ব্ব করবার ওর কিছুই ছিল না।

আমি কিছুই ভুলিনি। বললাম,—আর ওর হাসি? শীর্ণ, উদাস হাসি?

অজয় হেসে ফেললে। বললে, হ্যাঁ, ওর হাসিটি বেশ মিষ্টি। তুমি কিছুই ভোল নি দেখছি। প্রথম প্রথম আমি থাকলে আমার ঘরের মধ্যে আসতে ও সঙ্কোচ বোধ করত। কিন্তু ক'দিনেই ও বুঝলে, আমার মতো দুর্ব্বল, ব্যাধিগ্রস্ত নিরীহ লোকের কাছ থেকে ওর ভয় করবার কিছু নেই। ক্রমেই ওর সাহস বাড়তে লাগলো।

অজয় একটু ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ জিগ্যেস করলে, আচ্ছা তুমি জীবন কাকে বলো?

আমি হেসে বললাম—বেঁচে থেকে ওকালতি করাকে।

কিন্তু উত্তরের প্রত্যাশা ক'রে অজয় প্রশ্ন করে নি। আমার কথা ওর বোধ হয় কানেই গেল না। ও আপন মনেই বলতে লাগলো,—

—সেই প্রথম দেখলাম জীবনের রূপ। স্বর্গের নন্দনবনের বাইরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধদ্বারের ছিদ্র-পথ দিয়া শুধু একবার একটুখানি দেখতে পেলাম—অফুরন্ত জীবনের স্রোত বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় ব'য়ে চলেছে—তীরে পড়ে আছে কত মেখলা, কত মণিমঞ্জীর, কত আমীলিত নীলাকমল, তাই ছুঁয়ে ছুঁয়ে

বয়ে চলেছে অফুরন্ত জীবনের খরস্রোতা। শুধু দেখলাম, ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি তো নেই।

অজয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

—রোজ সন্ধ্যায় ওখানে কীর্ত্তন হতো। ঘরে শুয়ে শুয়ে আমি শুনতাম, অভিসারিকার নিগূঢ় মর্ম্মকথা, অবরুদ্ধ অশ্রুর অস্ফুট গুঞ্জন। জানালা দিয়ে দেখতে পেতাম দূরের বনগুলি। পরিপূর্ণ চাঁদের আলোয় রহস্যলোকের মতো মনে হ'ত। ছায়াচ্ছন্ন বনবীথির পানে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতাম, কেমন যেন মনে হ'ত, এখুনি দেখা যাবে সুনীল বসনে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে চির-অভিসারিকা ওই পথে চলেছে, চরণে মঞ্জীর নাই, নিঃশব্দ সে চলা।

অকস্মাৎ চমকে উঠলাম। কে যেন ফিস্ ফিস্ করে জিগ্যেস করলে, ঘুমুলে ?

আমার মাথার চুলে কার যেন মৃদু স্পর্শ পেলাম। বাড় যে কোথায় ছিল, চাঁদের আলোয়, না দূরের নিঝুম বনপ্রান্তে, না নারীর মৃদুকণ্ঠে জানি নে। আমিও ফিস্ ফিস্ ক'রে জবাব দিলাম,—না।

আবার তেমনি ফিস্ ফিস্ ক'রে কে বললে—আজকে ঘুমিও না, বুঝলে ?

—আচ্ছা।

—দরজা খুলেই রাখ তো ?

—রাখি।

আবার মাথার চুলে মৃদু স্পর্শ··· শাড়ীর খস্-খস্ শব্দ··· দ্বারের শিকলটি একবার নড়ে উঠলো···বুঝলাম, ও চলে গেল।

সেই চির-অভিসারিকা···চরণে মঞ্জীর নাই···

জীবনে যে এত আনন্দও আছে এ আমি কোনোদিন ভাবি নি মৃণাল। আমি শুধু আলোর শিখার মতো কাঁপতে লাগলাম।

অজয় ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করলে।

আমি জিগ্যেস করলাম, কিন্তু সে কি রাত্রে এসেছিল ?

—এসেছিল। কিন্তু আমি যেমন করে চেয়েছিলাম, তেমন ক'রে তো এল না। আমি একবার অত্যন্ত ঝড়ের রাত্রে একটী মেয়েকে দেখেছিলাম। তার পরণে ছিল রক্তের মতো টকটকে লাল একখানা শাড়ী। তাই আড়াল দিয়ে সে একটি প্রদীপ বুকের মধ্যে নিয়ে অতি সন্তর্পণে উঠে আসছিল। কিন্তু ও তো তেমন ক'রে এল না। ও এল কখন ? ওর প্রতীক্ষায় চেয়ে-চেয়ে আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছি তখন। হঠাৎ জেগে উঠে দেখি, সাপের মতো ও যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে-জড়িয়ে বেষ্টন ক'রে আছে। কী উষ্ণ ওর স্পর্শ। বললাম, জানলাটা ভাল ক'রে খুলে দেবে ? আমি তখন উঠে বসেছি। বিছানার ওপর অনেকখানি চাঁদের আলো এসে পড়্‌ল। সেই আলোতে আমি ওর বুভুক্ষু চোখের পানে চাইতেই ও চোখ নামিয়ে নিলে। ও যেন বিষ খেয়েছে এমনি ক'রে আমার কোলের উপর ঢ'লে পড়্‌ল। আমার আজও সংশয় যায় নি, মৃণাল, আমার মধ্যে ও কি পেয়েছিল যার জন্যে এমন করে আত্মসমর্পণ করেছিল। এই কথাটা একদিন ওকে আমি জিগ্যেসও করেছিলাম। কথাটার ও সোজা উত্তর দেয় নি, বলেছিল,—আমিও তো সুন্দরী নই, তবু তুমি কি ক'রে ভালোবাসতে পারলে ? আমিও বলেছিলাম—কিন্তু আমি তো তোমায় ভালবাসি নি। ও সে কথায় হেসেছিল, বিশ্বাস করে নি।

আমি অজয়কে জিগ্যেস করলাম,—কিন্তু তুমি তো ওকে সত্যিই ভালোবেসেছিলে ?

এ কথার অজয় চট্ করে উত্তর দিতে পারলে না। ও যেন মনে-মনে কি একটা খুঁজতে লাগ্‌ল। তারপর বললে, দেখ মৃণাল, ও যে আমার জীবনে একটি বিশেষ মুহূর্ত্ত এনেছিল, সে কথা কিছুতে ভুলতে পারি না। কিন্তু তারপরে কি করলে জানো ? কিছুতে আমার সঙ্গ ছাড়ে না। বিকেলে হয় তো একা-একাই বাগানে বেড়াচ্ছি, ও হঠাৎ এসে উপস্থিত। কথা দিয়ে, হাসি দিয়ে, চাউনি দিয়ে আমাকে জয় করবার সে কী দুরন্ত চেষ্টা! শেষে এমন হ'ল যে, ওকে দেখলে আমি অস্বস্তিতে হাঁপিয়ে উঠতে লাগলাম। ঘরে একা একটু বিশ্রাম করার উপায় নেই, চিলের মতো শোঁ ক'রে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাগানে বেড়ানোর উপায় নেই। এমন কি যমুনায় স্নান করতে গিয়ে দেখি, কলসী কাঁখে নিয়ে ও কখন এসে উপস্থিত হয়েছে। আমার উপেক্ষা ওর বুঝতে দেরী হয় নি। একদিন হঠাৎ এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে বললে,—তুমি আমাকে দেখে অমন ক'রে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িও না। আমি মনে করি, তোমার কাছে আসব না। কিন্তু পারি না, কিছুতে মনকে আটকাতে পারি না। তার সে কি কান্না!

এমন সময় লোটন চা আর খাবার নিয়ে উপস্থিত হ'ল। একটা টিপয়ের ওপর সেগুলো রাখতে-রাখতে সে বললে,—কার, দাদা?

অজয় আবার চোখ বন্ধ করলে। তার গাল বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়্‌ল। একটুখানি থেমে সে বললে,—আমার ভয়ানক কষ্ট হ'ল। ওর মাথার চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে বললাম,—আমি যে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াই, সে কথা তোমায় কে বল্‌লে? ও বললে,—আর মিথ্যে কৈফিয়ৎ দিও না। আমি সব বুঝতে পারি। ও আমার কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল। আমার বলবার কিই বা ছিল? আমি চুপ ক'রে বসে রইলাম।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে অজয় ব্যগ্র কণ্ঠে বললে,—একদিন একটি বিশেষ ক্ষণে যে আমাকে অসীম আনন্দ দিলে কি ক'রে সে ফুরিয়ে গেল বলতে পারো? ওকে আমি কেন সইতে পারতাম না, বল তো?

এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা খুবই সামান্য। সুতরাং চুপ ক'রে রইলাম। লোটনের পানে চেয়ে দেখি, সে মুখ ফিরিয়ে মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসছে।

সে বললে,—আমি বল্‌ব?

—বল্‌ তো।

—তোমার রাধা একটি সাধারণ মেয়ে। তোমার মন যাদের ঘিরে তরঙ্গ তোলে ও তাদের বাইরে। কিন্তু একটি বিশেষ ক্ষণে তোমার মনে জোয়ার এসেছিল। তোমার তরঙ্গের পরিধি গিয়েছিল বেড়ে। সেই ক্ষণটিতে তোমার চোখে ও যে অসাধারণ হয়ে ফুটে উঠেছিল, সে ওর গুণে নয়, তোমার গুণে।

আমার দিকে চেয়ে অজয় বললে,—তাই?

এ বিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান নেই। আমি যাঁকে নিয়ে ঘর করি, তাঁর ভয়ে বাড়ীতে কাক-পক্ষী বসতে পায় না। তিনি যে কখন সাধারণ এবং কখন অসাধারণ সে দেবতারা বলতে পারেন,—আমি নয়।

অজয় বলতে লাগ্‌ল,—দেহ, দেহ, দেহ,—কেবল একখানি দেহ, এবং একটি পিপাসার্ত্ত হৃদয়। তুই বোধ হয় ঠিকই বলেছিস্‌ লোটি, আমাকে ক্লান্ত করেছিল ওর অতি সাধারণ পিপাসা,—ওর অতি সাধারণ পিপাসা। কিন্তু—

অজয় লোটনের দিকে চেয়ে অনুনয়ের সুরে বললে,—আচ্ছা, ওকে আসতে লিখলে কি ও আসবে না? তুই কি মনে করিস?

—ওকে আসতে লিখে দিয়েছি তো।

—দিয়েছিস? বেশ করেছিস। কিন্তু—

অজয় খুব অস্ফুটস্বরে বললে,—কিছু টাকাও বোধ করি···

—তাও পাঠিয়ে দিয়েছি।

লোটন মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে নিলে।

অজয় বললে,—দেখতে ইচ্ছা হয় বই কি! আর ক'টা দিনই বা আছে? জীবনের পথে যাদের যাদের পেয়েছি সবাইকে মৃত্যুশয্যার পাশে জড় করতে ইচ্ছা হয়।

* * *

রাধাকে আমি দেখেছি। একখানি শাদা, সরুপাড় ধুতি প'রে প্রায় শেষ মুহূর্ত্তে সে এসে পৌঁছেছিল। ভদ্রঘরের মেয়ে ব'লেই তাকে মনে হ'ল না। লোটনের হাসির মানে বোঝা গেল। সে সসঙ্কোচে দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

লোটন বললে,—দাদা, রাধা এসেছে যে।

রাধা কাছে স'রে এল।

অজয় একবার চোখ মেলে চাইলে,—শুধু একবার। তারপরে চোখ বন্ধ করলে।

অজয়ের সে চাওয়া আমি আজও ভুলতে পারি নি,—সে যেন অস্তরবি, চাঁদের দিকে একখানি হাত বাড়িয়ে দিলে।

অ্যাটোক্র্যাসি ও ভক্তিযোগ

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

প্রকৃত শক্তিমানের মুখ হইতে যখন স্নেহ, সখ্য বা স্বার্থ-প্রেরিত বাণী নির্গত হয়—মামেকং শরণং ব্রজ—তখনই অ্যাটোক্র্যাসির গোড়াপত্তন ঘটে। 'একতন্ত্র' এই অ্যাটোক্র্যাসির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে চলিতে পারে; কিন্তু অ্যাটোক্র্যাটের খাঁটি প্রতিশব্দ হইতেছে—'কর্ত্তা', যাঁহার ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ম্ম সাধিত হয়; কারণ ইচ্ছাময়ের একতন্ত্রের মধ্যে কর্ম্মের সংজ্ঞাই হইতেছে 'কর্ত্তার ইচ্ছা'।

অপর পক্ষে অশক্তের মুখ হইতে যখন ভয়, নৈরাশ্য বা শ্রদ্ধাবিহ্বল আন্তরিক আর্ত্তি ফুটিয়া উঠে—

'তুমি হে ভরসা মম
অকূল পাথারে'—

তখনই আমরা বুঝি ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ ঘটিতেছে। অ্যাটোক্র্যাসি ও ভক্তিযোগের মূলে একই চিন্তাধারা পরস্পর বিপরীতমুখে ক্রিয়া করিতেছে, একই চুম্বকের বিভিন্ন pole বা মেরু, অবস্থানবিচারে তাহাদের দূরত্ব সমধিক, কিন্তু ধর্ম্ম হইতেছে পরস্পরের মধ্যে ঐকান্তিক আকর্ষণ। চুম্বকের উত্তরমেরু দক্ষিণমেরুকেই টানে, উত্তরমেরুর সহিত তাহার বিকর্ষণের সম্বন্ধ।

বিজ্ঞান জানিয়াছে এই পৃথিবী একটি বৃহৎ চুম্বক মাত্র। সমগ্র জগৎটাই যে চুম্বকধর্ম্মী সে ইঙ্গিতও নাকি বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত পাইতেছে। এই সুবৃহৎ জগৎ-চুম্বকের উত্তরমেরুর আকাশে আছেন ভগবান্, আর দক্ষিণমেরুর পাতালে প্রেরিত হইয়াছেন ভক্ত। ভগবান্ জানেন একমাত্র আমিই সকলের শরণ, ভক্ত জানে একমাত্র তিনিই আমাদের ভরসা। দ্বিধা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, প্রশ্ন নাই, উত্তর নাই, ভিতরে ভিতরে কেবলই আকর্ষণ চলিতেছে। তথাপি যে মিলন হয় না তাহার কারণ, বিজ্ঞান বলে বিপরীতধর্ম্মী চুম্বকাস্তদ্বয়ের পরস্পর মিলনে চুম্বকধর্ম্মের লোপ ঘটে, ভক্তিযোগ কহে—চিনি হইলেই সুখের শেষ বলিয়া চিনি নিয়ত লেহ; ভগবান জানেন—মিলনেই লীলার অবসান বা মহাপ্রলয়! ভগবান্ ও ভক্ত লইয়া সুগঠিত এই বিশ্ব-অ্যাটোক্র্যাসি তাই সৃষ্টির আদি হইতে সুনিয়ন্ত্রিত। এ জগতের দক্ষিণমেরুতে ভক্তপ্রধান চন্দ্রতপন তাঁহাকে নিত্য আরতি করিয়া ফিরে; বিন্ধ্য-হিমাচল তাঁহাকে দেখিবার জন্য গ্রীবা উচ্চ করিয়াই জীবন সফল করে; ছুটিয়া ছুটিয়া নদ নদী ধায়; গোপনরসসঞ্চারে তরুলতায় মহোৎসব জমিয়া উঠে; নিতান্ত নিষ্কারণে উল্লসিত পশু-পক্ষী প্রভাতে প্রদোষে নৃত্যগীতোৎসবে মগ্ন হইয়া যায়। অপর প্রান্তে, উত্তর-মেরুতে—যেখানে অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতি—সেখানে আসীন আছেন—অনিমেষমূরতি বিশ্বশরণ ভগবান। আর মধ্যের অ্যাটোক্র্যাসির সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে—আলো-আঁধারের সুশৃঙ্খল বিধিনিষেধ, শিশির-বসন্তের সুচিন্তিত শাসনপালন, বজ্রঝঞ্ঝার অচিন্তিত অর্ডিন্যান্স। অ্যাটোক্র্যাসি চলিতেছে, সুন্দর জগৎ ঘুরিতেছে, শব্দ নাই—নিঃশব্দ! কেবল কান পাতিলে নিস্তব্ধ রজনীতে ঝিল্লীধ্বনির ন্যায় শোনা যায় অনন্তের একতন্ত্রীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিতেছে—মামেকং শরণং ব্রজ—তুমি হে ভরসা মম!

জড়জীবোদ্ভিদময় এই শান্তিপূর্ণ বিশ্ব-অ্যাটোক্র্যাসির মধ্যে কেবল মানুষ বলিয়া গোটাকত জীব চাহিয়া বসিল—ডেমোক্র্যাসি! লক্ষ বাধার মধ্যেও সে বলিতে সাহস করিল—একতন্ত্রে আমাদের আস্থা নাই, বহু তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিব।

কোন্ আদিযুগে একথা প্রথম উচ্চারিত হইল বলা কঠিন। কিন্তু মনে হয় যেদিন মনুষ্যসৃষ্টি হইয়াছে সেই দিনই বা এই বিদ্রোহের সূত্রপাত। এমন পিতৃস্নেহসিক্ত অ্যাটোক্র্যাসির মধ্যে জন্মলাভ করিয়াও সে আইন-ভঙ্গ আন্দোলন সুরু করিয়া দিল; নিষেধ ছিল বলিয়াই প্রথমে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়া বসিল; স্বীয় প্রকৃতির প্ররোচনায় ভক্তি ভুলিয়া দুরূহ জ্ঞানের পথে পা বাড়াইল। পুরাণে বলে—সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তার অভিশাপও তাহার শিরে বর্ষিত হইয়াছিল—'ভক্তি ছাড়িয়া যখন জ্ঞান ধরিলি তখন কর্ম্মের কবল হইতেও মুক্তি পাইবি না। তোদের আজীবন সশ্রম কারাবাসের ব্যবস্থা করিলাম।' তথাপি অভিশপ্ত বিদ্রোহী ক্ষান্ত হইতে পারিল না। অথণ্ড এককে ভাঙ্গিয়া সে তেত্রিশকোটির বহুতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিল; বেদে বেদে, পুরাণে পুরাণে একবার উষাকে একবার ইন্দ্রকে, কখনও রুদ্রকে কখনও বিবস্বানকে, এ যুগে যুপিটারকে, অন্য যুগে

মার্সকে আজ বিষ্ণুকে কাল গণপতিকে সেই ডেমোক্র্যাসির প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করা হইয়াছে, কিন্তু শক্তির অভাবে তাহা বেশী দিন প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারে নাই; কারণ এক-কারণ জগতে একতন্ত্রই সত্য, আর বহুতন্ত্র—বিদ্রোহী মানবের মর্ত্ত্য মানসপুত্র মাত্র।

এই ডেমোক্র্যাসি বা বহুতন্ত্রের মূলচিন্তা হইতেছে—কোন স্বনিয়োজিত কর্ত্তার কর্তৃত্ব মানিব না, শক্তি তাহার যতই থাকুক। কিন্তু শক্তিমানই কর্ত্তা হয়, আর কর্ত্তা মাত্রই শক্তিমান্, সুতরাং কর্ত্তাকে না মানিলে নিস্তার কই? মানুষ তাই আরম্ভ করিল শক্তির সাধনা। কখনও পাথর ঘষিয়া সে তীরের ফলা প্রস্তুত করিয়াছে, কখনও উদুম্বরের শাখা কাটিয়া দর্ব্বী বানাইয়াছে; কখনও বা তড়িৎজাল পাতিয়া রঞ্জনরশ্মি ধরিবার আয়োজন করিয়াছে। বৃহস্পতিপুত্র কচের ন্যায় যখন সে সহস্রবৎসর ধরিয়া কর্ত্তার ঐকান্তিক সেবাই করিয়াছে, তখনও সে ভুলে নাই—সেবা তাহার গৌণ, প্রেম তাহার পরোক্ষ, মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে সেই মন্ত্রশিক্ষা, যাহাতে মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া কর্ত্তার সমকক্ষ হইতে পারে, আত্মীয়মাত্রকে তাহার সমকক্ষ করিতে পারে। নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার উচ্চাভিলাষে বিশ্বামিত্রের উগ্র তপস্যা যুগযুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে—যদিও শেষপর্যন্ত তাহাকে হয়ত মাত্র ব্রাহ্মণ হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। মানবের সাধনা যুগে যুগে ব্যর্থ হইয়া যায়, কারণ কর্ত্তার শক্তির তুলনায় তাহার শক্তি নগণ্য; তথাপি ক্ষান্ত হইবার উপায়ও তাহার নাই, কারণ এতবড় বিদ্রোহী সে, যে বলে আমরা জনে জনে 'সে-ই'। এ কথা যে সত্য নহে, বিদ্রোহীর বড়াই মাত্র, তাহা ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যায়।

অ্যাটোক্র্যাসির সহিত ডেমোক্র্যাসির এই বিদ্রোহের ইতিহাস বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক। এই বিদ্রোহ মধ্যে মধ্যে এমন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে যে কখনও চর, কখনও ফৌজ পাঠাইয়া, কখনও বা স্বয়ং আসিয়া কর্ত্তাকে সে বিদ্রোহ দমন করিতে হয়। ভক্তকে আশ্বাস দিয়া যাইতে হয় মদ্ভক্তা ন প্রণশ্যতি, ভয় নাই, সম্ভবামি যুগে যুগে। কিন্তু এমন বিচিত্র-সুন্দর অ্যাটোক্র্যাসির মধ্যে জন্মলাভ করিয়া, তাহারই আবহাওয়ায় হৃষ্টপুষ্ট হইয়া মানবের এই বিদ্রোহ কেন? তাহার দুঃখ আছে সত্য, কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলে সুখওত অল্প নহে। শৃঙ্খলার গণ্ডী অতিক্রম না করিলে তাহার শৃঙ্খল ত বাজিয়া উঠে না। তাহার জন্যই বসুন্ধরার মৃণ্ময় পাত্রে অদৃশ্যহস্তের ফলশস্যসজ্জা, পূর্ণতোয়া স্রোতস্বিনীর অবিরাম সলিল-পরিবেশন, ঊর্দ্ধের আকাশে আলোক ও বাতাসের স্বচ্ছন্দ সঞ্চলন। এই আকাশের পানে চাহিয়াই কি তাহার মনে আদি বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিয়াছিল? অসীমের দিকে উন্মুক্ত দিক্চক্রবলয়িত ওই নীলগবাক্ষটির ভিতর দিয়া দৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়াই কি সে প্রথম অনুভব করিল—একের কারাগারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত মৃত্যু-মুহূর্ত্তাপেক্ষী বন্দী সে? কল্পনা করিল, না অনুভব করিল—তাহারাও ত জনে জনে অমৃতের পুত্র! এই মৃত্যু-ঝঞ্ঝার মধ্যেই প্রত্যেক মানবাত্মার দীপশিখাটি জ্বালাইয়া লইয়া পূর্ণ মানবত্বের লক্ষবর্ত্তী দীপাধারটিকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতে হইবে, একের আরতি করিবার জন্য নহে,—ডেমোক্র্যাসির অভ্রভেদী মন্দিরের দীপালি উৎসব সম্পন্ন করিতে হইবে।

চুম্বকায়িত অ্যাটোক্র্যাসির রাজ্যে, উত্তরমেরুর সহিত দক্ষিণমেরুর, ভগবানের সহিত ভক্তের, কর্ত্তার সহিত করণের যে সুশৃঙ্খল আকর্ষণক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকিল নব নব মানবাত্মার ক্ষুদ্র বৃহৎ উত্তরমেরু। ফলে আকর্ষণ বিকর্ষণের সংঘর্ষে যে নবতড়িৎ-ঝঞ্ঝার উদ্ভব হইল তাহাই অ্যাটোক্র্যাসির মধ্যে মানবাত্মার বিদ্রোহ।

কিন্তু জ্ঞানে ও কর্ম্মে শক্তিসঞ্চয়ী সেই বিদ্রোহীদলের মধ্যেও দেখিতে দেখিতে গড়িয়া উঠিল নিখিলমানবভক্তসঙ্ঘ। ভক্ত চিরজীবী, তাহাকে রক্ষা করেন স্বয়ং ভগবান। বিদ্রোহী-মানব, জ্ঞানীমানব, কর্ম্মীমানব মানবত্বের লক্ষবর্ত্তী দীপাধারে যেখানে যখন দীপ জ্বালে কর্ত্তার ভ্রুকুটিঝড়ে তাহা নিবিয়া যায়। মধ্যে রহিয়া ভক্ত বলে—

> আমি যত দীপ জ্বালি ওগো নাথ
> জ্বালা আর শুধু কালী,
> আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে
> তোমারই কিরণ ঢালো!

কর্ত্তা তখন প্রসন্ন হন, আকাশ হইতে তাঁহার স্বহস্তজ্বালিত দীপের কিরণ আমাদের পাতালঘরের দুয়ারে শিয়রে পাঠাইয়া

দেন। মূঢ় বিদ্রোহী ডেমোক্র্যাট্ তাহা ফুঁ দিয়া নিবাইতে যায়। ব্যর্থতা দেখিয়া উৎফুল্ল ভক্ত গাহিয়া উঠে,—

"তোমারি গেহে পালিত স্নেহে,
তুমিই ধন্য ধন্য হে!"

এইরূপে বিশ্বঅ্যাটোক্র্যাসির মধ্যে ডেমোক্র্যাসির যে অন্তর্বিপ্লব চলিয়া আসিতেছে তাহা মানবের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় ঘটে তখন, যখন সঙ্ঘের প্রধানভক্ত আসিয়া ডেমোক্র্যাসির নেতৃত্বভার গ্রহণ করে এবং ভজন-পূজন-কীর্ত্তনসহযোগে বিদ্রোহ-পরিচালনকালে মুহুর্মুহুঃ রটনা করে—অ্যাটোক্র্যাসি অসহ্য, যেহেতু ডেমোক্র্যাসি হইতেছে মানবের ভগবৎপ্রদত্ত পবিত্র অধিকার! বিস্মিত হইতে হয় তখন—যখন অপ্রত্যাশিত নবরিক্রুট্ লাভের আনন্দাতিশয্যে বিদ্রোহীদল জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া যায়—'হে ভক্ত, ডেমোক্র্যাসির ধ্বজায় আজ যাঁহার নাম লিখিলে, সেই ভগবৎরাষ্ট্রে তোমাদের কয়টি ভোট আছে? যদি না থাকে, তবে বৃহত্তর অ্যাটোক্র্যাসি যাহার ধমনীতে নিয়ত আনন্দলহরী প্রবাহিত করিতেছে, ছোটখাটো পার্থিব অ্যাটোক্র্যাসি তাহার নিকট এমন অসহ্য হইল কবে ও কিরূপে? অন্ধকমুনির পুত্রের উপর যে অর্ডিন্যান্স্ জারী করিবার ভার দশরথ দারোগার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল, তদপেক্ষা নিষ্ঠুরতর অর্ডিন্যান্স ধরণীর কোন্ নরপতি আজ পর্য্যন্ত জারী করিতে পারিয়াছে? বিশ্বকর্ত্তার অর্ডিন্যান্স্ হজম করা ছাড়া গত্যন্তর নাই, এ কথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না; কিন্তু কেবলমাত্র কোনপ্রকারে হজম নহে, ভক্তিসুধানু-পানে উহা যাহার চিত্তের নিত্য-পথ্য হইয়া উঠিল, সেই ব্যক্তি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থিব অর্ডিন্যান্স্ কোনমতে সহ্যই করিতে পারিতেছে না, একথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করি?'

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় মাত্রই অবিশ্বাস্য নহে। যদি প্রত্যক্ষ করা যায়, দলে দলে লোক ভক্তের অনুগামী হইয়াই অ্যাটো-ক্র্যাসির বিপক্ষে মানবের চিরন্তন অভিযানে যাত্রা করিয়াছে, তবে বুঝিতে হইবে বহুবার-ব্যর্থ মানবাত্মা নূতন পথে তাহার পুরাতন ইষ্টের সন্ধান করিতেছে। হয়ত বৃহত্তর অ্যাটোক্র্যাসির সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া সে ক্ষুদ্রতর অ্যাটোক্র্যাসির নিবারণ কল্পে তাহার সাময়িক সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে। হয়ত বা বৃহত্তম কর্ত্তার কর্ম্মের অনিবার্য্যতাকে ভক্তিযোগে নিরন্তর স্মৃতিপথে জাগরুক রাখিবার প্রয়োজন হইয়াছে, নচেৎ ক্ষুদ্রতর কর্ত্তার কর্ম্মকে নিবারণ করিবার যথেষ্ট প্রেরণা আসিতেছে না। ডেমোক্র্যাসি-প্রতিষ্ঠাকল্পী মানবসঙ্ঘ যখন ভক্তের হাতে নেতৃত্বভার তুলিয়া দেয়, তখন জানিতে হইবে মানুষ একটা নূতন রফায় রাজী হইয়াছে। সে ভক্তের মারফৎ ভগবানকে জানাইতে চাহে—হে ভগবান, হে জগদীশ্বর, তুমি এই মানুষের মধ্য হইতে যদি তোমার সর্ব্বভগবত্তা, সর্ব্বঐশ্বর্য্য সংহরণ করিয়া তোমার পার্থিব প্রতিনিধিগুলিকে বক্ষে টানিয়া লও, তবে এই ধূলার ধরণীতে আমরা একবার মানবত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ পাই। হে নারায়ণ, তোমার আদি আকারটি সম্বরণ না করিলে যে আমরা নরায়ণের সাক্ষাৎকার পাইতেছি না।

তারপর

—শ্রীমতী নৃসিংহদাসী দেবী

"মঞ্জুরাণি!"

পূবদুয়ারী রান্না-ঘরের ভিতর হইতে ইন্দুমতী ডাক দিল। গোলাপ ফুলের মতই ফুটফুটে মেয়েটী,—পিঠভরা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের রাশি লইয়া মৃদু পদে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল,—বলিল, "আমায় ডাকছিলে বৌদি! আমি যূথির কাছে ছিলাম যে।"

"যূথিতো দোলনায় ঘুমুচ্ছে, তুই একা একা কি করছিলি?"

অপরিণত বুদ্ধিতে উত্তর আসিল না—বলিল, "এমনিই বসে, বসে ছিলাম।"

ভাজা আলুগুলি কাঁসিতে তুলিতে তুলিতে ইন্দুমতী একবার তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"চোখ দুটো যে রাঙা করেছিস, দিন রাত্তির কাঁদবি? তোকে যে বলি মন খারাপ হলে আমার কাছে আসিস্।"

মঞ্জুরাণী কিছুই না বলিয়া শূন্য দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পাখীর ডাকের দেশে তাহার জন্ম, মায়ের আঁচলের তলে সাত বৎসরের হইয়াছে; মাত্র পনের দিন এ সংসারে আসিয়াই সেই মায়ের স্মৃতি সে ভুলিতে পারে নাই। তার ছোট বুকের ভিতর যে কি রকম করে!

ভাল রকম ভাবেই ইন্দুমতী তাহা বুঝিত,—অবনীশ মঞ্জুকে তাহার নিকট আনিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে,—পিসিমা স্বর্গারোহণে শান্তি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু সে ইহাকে কি ভাবে শান্ত করিবে কেবল এইটাই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। উপরন্তু তিনি এমন একটা জটিলতার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, যাহার মীমাংসা সুদূর ভবিষ্যতের ভিতরে ও গভীর অন্ধকারে রহস্যাবৃত। সহজ দৃষ্টি সেখানে পঙ্গু অচল। ইন্দুমতীর ললাটে কয়টী চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল!

"রাধাচরণ চিঠি দিয়েছে ইন্দু" বলিতে বলিতে অবনীশ এই সময়ে বারান্দায় উঠিয়া আসিল।

"কি লিখেছে, খবর কি"—সশব্দে খুন্তিখানা কাঁশির উপর রাখিয়া ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া ইন্দুমতী প্রশ্ন করিল।

"সে সন্ধান দিতে পারে নি,—শুধু এইটুকু জানিয়েছে যে —দেড় বছর আগে দুই বিধবার যুক্তিতে পরস্পর আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হ'বার প্রলোভন নিয়ে তাঁরা এই পুতুল খেলা খেলেছিলেন"—অবনীশ এই সময় যেন কি ভাবিয়া একটু থামিল, কয়েক মিনিট বাদে পুনরায় বলিল—"কিন্তু ভাগ্য-দেবতার উপহাস মানুষে এড়াতে পারে না, তাই তিনি পিসিমার আগেই বছর না ঘুরতেই মারা যান—"

অবনীশ নীরব হইল।

ইন্দুমতী সহসা কোন উত্তর দিল না, কিছুক্ষণ কি যেন নীরবে ভাবিতে লাগিল, পরে বলিল, "তার কোন সন্ধানই হল না?"

"না, মা মারা যাওয়ার পর সে যে কোথায় গিয়েছে কেউ জানে না, পিসিমা যাবার বেলায় কিছুই বলতে পারলেন না।" অবনীশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তিত মুখেই কথা কয়টী শেষ করিল।

আকস্মিক ভাবেই ইন্দুমতী এই সময়ে মঞ্জুরাণীকে প্রশ্ন করিল—"বল দেখি মঞ্জু, তোর শ্বশুর-বাড়ী কেমন?"

মঞ্জুরাণী বলিল—"ওই যে তাদের বাড়ী গো! একটা ফুল-গাছ আছে, দুটো পায়রা আছে, আর সেই মেনি বেড়ালটা কি সাদা বৌদিদি, তুমি তেমন একটাও দেখনি।"

ইহাদ্বারা মীমাংসা হয় না। উভয়েই বালিকার মুখের দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। যে দুনিয়ার আবহাওয়ার কোন গতিই বোঝে না তাহাকে এমন বাঁধনেও বাঁধে! অবনীশ মনে মনে স্বর্গগতার উপর বিরক্ত হইতেছিল,—আজ যদি তিনি সম্মুখে থাকিতেন তাহা হইলে হয় ত সহজে অব্যাহতি পাইতেন না কিন্তু তিনি আজ দূরে, বহুদূরে; মানুষের ক্ষমতার অতীত জায়গায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। সে বিষণ্ণ মুখেই বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। মানুষ যেখানে নিরুপায়, সেখানে স্তব্ধতা ভিন্ন উপায়ই বা কি আছে!

অথচ মনের ভিতর সারাদিন ধরিয়া কি যেন অস্বস্তি ভরিয়া রহিল। সেই জন্য রাত্রিতে ইন্দু নিকটে আসিতেই অবনীশ তাহাকে প্রশ্ন করিল—"এখন কি করা যাবে?"

ইন্দুমতী সহজ কণ্ঠেই বলিল—"আমরা ত আছি, আমাদের কাছে থাকবে।"

"তারপর? ভবিষ্যতের—" কথা শেষ না করিয়াই অবনীশ থামিল। শান্ত কণ্ঠে ইন্দুমতী বলিল—"ভবিষ্যৎ—সে ভবিষ্যৎই,—পিসিমা ভবিষ্যতের অনেকভাবে কল্পনা করেছিলেন। তারপর সে চিরদিনই তারপর।"

তারপর ছোট যূথিকা বড় হইয়া উঠিয়াছে, তার স্বচ্ছন্দ গতি, সরল হাসি, সলীল ভঙ্গী কিছুই অবনীশের চোখ এড়াইত না। তার উপর বসন্তপুর গ্রামে তাহাদের বেশ বিশিষ্টতাও ছিল। কণ্ট্রাক্টরীতে সে যা উপায় করিত—তাহা অনেকের অপেক্ষা অধিক—তথাপি সে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে উদাসীনের মত অবস্থান করিতেছিল দেখিয়া গ্রামের লোকে অনেকখানি আশ্চর্য্য হইয়া যাইত।

কিন্তু 'কেন এমন হয়' এ তথ্যটা শুধু জানিত অবনীশ। মঞ্জরীর মুখের দিকে চাহিলেই সে যেন কেমন হইয়া পড়িত—যদিও মঞ্জরীর স্বভাব-সরল মুখের দিকে চাহিলে এমন কিছু গ্লানির রেখা পাওয়া যাইত না, অনাবিল উদার স্নিগ্ধতার মাধুর্য্যেই তাহা ভরিয়া থাকিত, তথাপি অবনীশের বুকটা যূথিকার পানে চাহিলেই কেমন যেন করিত।

তবুও একদিন ব্যাগপাইপ-এর মুখর রবে সমস্ত পাড়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ঘটনাটা ঘটিয়া গেল অনেকখানি আকস্মিক। উপস্থিত সৎ পাত্রের প্রলোভন অবনীশকে মুগ্ধ করিল—বিধাতার অলক্ষ্য হস্তস্পর্শে যে ফুলটি ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে সকলেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

বিবাহের দিন সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে ইন্দুমতী মঞ্জরীকে পাত্রী সাজাইবার ভার দিয়া নিজে বাড়ীর কুটুম্বিতা রক্ষা করিতে অন্যত্র ব্যস্ত ছিল। অবনীশ বাহিরের ভদ্রতারক্ষায় নিযুক্ত।

সারাবাড়ী উৎসব-চঞ্চল,—মঞ্জরী বারান্দার একধারে বসিয়া যূথিকার ললাটে তিলকচিহ্ন অঙ্কিত করিতেছিল। এই সময়ে গ্রামসম্পর্কে অবনীশের এক কাকীমা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ঘরে পদক্ষেপ করিয়াই তিনি সহসা শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—"ওমা, বৌমার কি একটু আক্কেল আছে গা, এই দিনে কি মেয়ে সাজান'র ভার মঞ্জিকে দিতে আছে।"

কথাটা তীব্রভাবে মঞ্জরীর কাণে বাজিল! পর মুহূর্ত্তেই সে চোখ ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিয়া কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে হাতের তুলিটী নামাইয়া রাখিল।

মিনিট পাঁচেকের ভিতর এক, দুই, তিন করিয়া অনেকেই সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন। কাকীমার কর্তৃত্বে জটলা বেশ জমাট হইয়া উঠিল। সহসা তাহারি ভিতর হইতে সহানুভূতির স্বরে কে বলিল—"তা ও তো আর বিধবা নয়।"

অন্যের বোধ-হয় এটুকু সহ্য হইল না—সে বলিল—"বিধবা আবার কাকে বলে গো ঠাকরুণ, তাত জানি নে।"

কাকীমা প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিলেন—"ঠিক তো, স্বামী পুত্তুর নিয়ে যে ঘর করলে না, তাকে আর কি বলাই বা চলে?"

গ্রাম সম্পর্কে অবনীশের ভগ্নী অন্নদা সবার কথার উপরে জোর দিয়াই বলিল—"স্বামী থাকলে তো খোঁজ হ'ত। দাদার যেমন কাণ্ড, তাই আজও শাঁখা-শাড়ী পরিয়ে রেখেছেন। কি যে বোঝেন,—আর বৌদিও তেমনি বোকা, এ কাজ কি ভাল হয়েছে, দাও তুলিটা কোথায়, আমি যূথি'র তিলক দিয়ে দিচ্ছি।"

ইতিমধ্যে ইন্দুমতী কি একটা কাজের অছিলায় এঘরে আসিতেই ঘরের ভিতর গণ্ডগোল দেখিয়া থামিয়া দাঁড়াইল।—অবস্থাটা হইল ঠিক যেন মধুমক্ষিকা-বেষ্টিত মধুচক্রের মতই। কাকীমা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ধন্যি বুকের পাটা বৌমা তোমার। আজকের দিনে এই সোনার মেয়েটার সাজান'র ভার দিয়েছ ওই মঞ্জিকে! পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, তোমাদের না মোটে ওই একটা মেয়ে।"

এতক্ষণে ইন্দুমতী ঘটনাটা বুঝিল—সে কাহারো কথার কোনরূপ উত্তর না দিয়া ক্ষণেকের জন্য একবার কন্যার দিকে চাহিয়া পরক্ষণে ঈষৎ ব্যথিত দৃষ্টিতে মঞ্জরীর দিকে চাহিল।

মঞ্জরী যেন এই টুকুর'ই অপেক্ষা করিতেছিল। ইন্দুমতীকে কোন কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়াই অচঞ্চল দৃঢ়পদে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল।

আজ যেন প্রথম সুপ্তিভঙ্গের শেষ রাত্রি! অবনীশের প্রদত্ত শিক্ষায় ও সাংসারিক খুঁটিনাটী কাজের ভিতর দিয়া,—সাত বৎসরের বালিকা মঞ্জরী আসিয়া বিশ বৎসরে দাঁড়াইয়াছে, নিজের যে একটা পৃথক বিশেষত্ব আছে সে দিকে

ফিরিয়াও দেখে নাই, অচিন্তিত ধাক্কায় তার চোখের সামনের নীল পর্দাটা হঠাৎ সরিয়া গিয়া অস্পষ্ট অতীতের অনেক ছবি তার মনের ভিতর ফুটিয়া উঠিল।

জন-কোলাহল হইতে সে সরিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে ছাদের আলিসার পাশে দাঁড়াইল।

আকাশের এক কোণে কৃষ্ণাপঞ্চমীর চাঁদ তখন উঁকি দিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া মঞ্জরী আজ কত কথাই ভাবিতে বসিল,—মায়ের স্নেহ, মাটির কুটীর, গ্রামের নদী, আর! আর একরাত্রে বুঝি এমনই আনন্দোৎসব হইয়াছিল কিন্তু আর সে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না।

বিগত ঘটনার দেড় বৎসর পরে একদিন জটিল ম্যালেরিয়া-জীর্ণ ইন্দুমতীকে লইয়া চিকিৎসকের উপদেশ মত অবনীশকে দেওঘরে আশ্রয় লইতে হইল; সঙ্গে রহিল মঞ্জুরাণী, একটী পরিচারিকা ও একটী বালক ভৃত্য।

একে বিদেশ! তার উপর রুগ্না স্ত্রী,—অন্যদিকে ব্যয় বাহুল্যের অন্ত নাই, উপরন্তু বাচনিক সহানুভূতি দেখাইবার মত একটী বন্ধুও সেখানে বিরল। সুতরাং দিন কয়েক যাইতেই অবনীশ অতিষ্ঠ বোধ করিতে লাগিল। মনটা যখন বিশেষ ভারাক্রান্ত হয় তখন হাল্‌কা করিবার অভিপ্রায় মঞ্জুকে ডাক দিয়া বলে—"এখনো তোর কাজ শেষ হয় নি নাকিরে?"

মঞ্জু নীচ হইতে উত্তর দেয়—"না দাদা, একটুখানি দেরী আছে।" কিন্তু এমন দিনে ভগবানের দয়াতেই বোধ হয়,—আকস্মিক ভাবে অবনীশের একদিন এক বন্ধু জুটিয়া গেল। পূর্ব্বে কিছু পরিচয়ও ছিল, বন্যাপীড়িতের সাহায্যের জন্য একবার এই যুবক তাহার কাছে কিছু আদায়ও করিয়াছিল। তাহার লাল রংএর বাড়ীখানি অবনীশের বাসা হইতে সুস্পষ্ট দেখা যাইত।

শ্রান্ত অপরাহ্নে ক্লান্ত মনের একটী সঙ্গী পাইয়া দিনগুলি কাটিতে লাগিল মন্দ নয়। কয়দিন পরে আত্মীয়তা আরো দৃঢ় হইলে একদিন অন্তঃপুরের সহিতও ক্ষণকালের জন্য তাহার পরিচয় করাইয়া দিল। ক্রমে কষ্টি-পাথরে সোনার রেখার মত, ইন্দুমতীর স্বাস্থ্যের চিহ্ন এবং অপরিচিত স্থানে অকৃত্রিম বন্ধুলাভে মাঝের সময়টা যে সময় ভালই চলিতেছিল; বিধাতার তীব্র উপহাসে সেই অবসরে একদিন বেলা বারটার সময়, অবনীশ প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হইয়া ভাল করিয়া লেপ ঢাকা দিয়া বিছানা লইল।

চিন্তিত মুখে মঞ্জু বলিল "দাদা! তুমি আবার যে বিছানায় শু'লে।" আরক্ত মুখে একটু উদাস হাসি হাসিয়া অবনীশ বলিল—"কি করবো জ্বরকে তো আমি আসতে বলি নি, এলো যে!"

"বেশ তোমরা দুজনেই যুক্তি করে পড়লে, আমি কি করবো বলতো" ব্যথিত মুখে মঞ্জরী উত্তর দিল।

"কি আর করবি! এযে ভগবানের মার, দুজনের উপর তিনজন হ'লেও উপায় নেই—ডাক্তার বাবুতো আসেনই, চাকরটাকে দিয়ে ওষুধ আনিয়ে রাখবি—বিশেষ বাড়াবাড়ি হয় অনিল বাবুকে—"

যেন বাধা দিয়াই মঞ্জু বলিল—"সে আর কতটুকু হয় দাদা। মানুষ আপনার সামলাতেই ব্যস্ত, সবদিক সেরে অবশিষ্ট সময়ে সে আর পরের কতটুকু করতে পারে?" মঞ্জরীর মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

লেপটা ভাল করিয়া জড়াইয়া গায়ে দিতে দিতে অবনীশ বলিল, "সামলাবার মত বালাই ওর নেইরে! খুড়োর সম্পত্তি পেয়েছে, বাবুয়ানি করে খায়, খরচ করে, আর যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়ায়"—ইহার পর সে শ্রান্ত ভাবেই চুপ করিল।

সামান্য কথা এক এক সময় আশ্চর্য্য ভাবে সফল হয়। এক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না—অবনীশের মুখের কথা ঠিক দৈববাণীর মতই ফলিল। চব্বিশ ঘণ্টার পরেও যখন জ্বরের গতি কমিল না, উপরন্তু ডাক্তার বাবু ইনফ্লুয়েঞ্জার ভয় দেখাইয়া গেলেন,—তখন অনিলকে জানান ভিন্ন মঞ্জু অন্য পথ পাইল না।

ঘরের দুপাশে, দুইখানি তক্তপোষে দুইটী রোগী লইয়া এমনি ভাবে আরো তিন দিন কাটিল। রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তির জন্য সেদিন অনিল ভোরে উঠিয়াই বাড়ী চলিয়া গেল। যাবার সময় কেবল জানাইল,—"আমার বোধ হয় আসতে একটু দেরী হবে।"

মঞ্জু নীরবে কথাকয়টী শুনিল। কিছুই বলিল না। বলিবার আছেই বা কি! অনুগ্রহ কেবল অনুগ্রহই, সেখানে দাবী চলে না। সুতরাং সে নিবিষ্ট চিত্তে রোগীর প্রয়োজনীয় কাজগুলি করিয়া চলিল।

সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ! মাঝে মাঝে দুইজন রোগীর কাতর কণ্ঠ ভিন্ন কিছুই শুনা যাইতে ছিল না। যন্ত্রের মত সমস্ত দিন তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের চেষ্টায় থাকিয়া—শেষে যখন সে স্নান সারিয়া উঠিল, সামনের ঘড়িটায় সে সময়ে তিনটার ঘরে কাঁটা উঠিয়াছে।

সাময়িক তৃপ্তির সঙ্গে রোগী দুইজন তখন ঘুমাইতেছিল। অনতিদূরে খোলা জানালার পথে বাহিরের শ্রান্ত রৌদ্র-ভরা রাস্তাটীর দিকে চাহিয়া মঞ্জরী বসিয়া ছিল। মৃদু পদক্ষেপে অনিল সেইক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইল,—পদশব্দ শুনিয়া উদাস অবসন্ন মনেই সেই দিকে মঞ্জরী ফিরিয়া চাহিল।

অনিলও কি আজ প্রথম পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল? মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল কেন?—কিন্তু সে ক্ষণিক! আর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া চেয়ারখান একটু টানিয়া লইয়া অবনীশের শিয়রের নিকট সে বসিয়া পড়িল। মিনিট কয়েক এইভাবে নীরবে কাটিবার পর এইবার সে হঠাৎ প্রশ্ন করিল—"আজ খাওয়া হয়নি তোমার মঞ্জু?"

মঞ্জু হঠাৎ তাহার প্রশ্নে একটু বিব্রত বোধ করিল, বলিল—"না, খাবার—" কথা শেষ করিতে না দিয়াই অনিল বলিল—"খাবার! খাবার খেয়ে কদিন চলে এই বাংলাদেশের মানুষের?" মঞ্জু একথার কোন উত্তর না দিয়া শান্ত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চোখ নামাইয়া লইল।

অনিল হঠাৎ গম্ভীর হইয়া মিনিট পাঁচের জন্য বাহিরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। মঞ্জু ঈষৎ বিস্মিত হইল, কিন্তু প্রশ্ন কিছুই করিল না এবং করা সঙ্গতও বোধ করিল না।

ঘণ্টা কয়েক পর,—রাত্রি আটটার সময় যখন অপ্রত্যাশিতরূপে সুসজ্জিত উপকরণ সমেত অনিলের পাচক পরিষ্কার একখানি থালিতে করিয়া ভাত আনিয়া হাজির করিল,—তখন মঞ্জুর নিকট সমস্ত সুস্পষ্ট হইয়া গেল—সে কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল—"আপনি এসব কি করেচেন?"

"কিছু নয় মঞ্জু! মানুষকে বাঁচতে হলে এ চাই যে, তুমি যাও, আগে দুটো খেয়ে এস গে।"

হঠাৎ কি ভাবিয়া মঞ্জু আর একবার তাহার দিকে চাহিল, এ উপরোধকে সে অগ্রাহ্য করিতে পারিল না।

পরদিন হইতে রোগীর তত্ত্বাবধানের সঙ্গে,—মঞ্জুর খাওয়ার তত্ত্বাবধানটাও সে নিজের হাতে লইল। ইচ্ছুক না হইলেও সে ইহাতে অসম্মত হইতে পারিল না। কেবল মুক্ত দ্বার-পথে ভোরের আলো-মাখা আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—

"আমাদের জন্ত আর কত ঝঞ্ঝাট বইবেন আপনি?"

অনিল অবনীশের অল্প নিকটে একটা ইজি-চেয়ারে বসিয়া ছিল,—তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ তুলিয়া স্নিগ্ধ করুণ হাসির সঙ্গে বলিল—"ঝঞ্ঝাট—" আরো যেন কিছু বলিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও হঠাৎ সে থামিয়া গেল।

প্রতি কথার উত্তর দিবার মত মনের অবস্থা তখন মঞ্জুর নয়, তথাপি যেন অন্যমনস্ক ভাবেই সে অনিলের দিকে চাহিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মণিবন্ধের উপর দৃষ্টি পড়িতেই, অনেকটা যেন নিজেরও অজ্ঞাতসারে প্রশ্ন করিল—"আপনার হাতে ও দাগটা কিসের অনিল বাবু!"

"কিসের! কিসের ভাল করে ভেবে দেখ দেখি!"

—এ যেন গভীর রাত্রির স্বপ্ন, মঞ্জুর মুখ সহসা বেশী রকম গম্ভীর হইয়া উঠিল।

হঠাৎ এক সময় একান্ত আকস্মিক ভাবেই অনিল উঠিয়া দাঁড়াইল,—নেহাৎ সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিল—"তা হলে এখন যাই।"

মেঘ কাটিয়াছে। ঘনীভূত বিপদের অন্ধকার কয় দিনের পর সরিয়া গিয়াছে,—ইন্দুমতীর স্বাস্থ্য এখন বেশ ভালই, অবনীশও দিন দুই হইল অন্নপথ্য করিয়াছে।

কিন্তু আর একদিকে ঘটনাচক্রের গতিতে একটা মস্ত অশান্তির সূচনা হইয়াছে,—মঞ্জুর সহিত অনিলের ব্যবহারটা ইন্দুমতী যে মোটেই শুভ চোখে দেখে নাই,—এবং সে অপরাধটা যে মঞ্জুর ইচ্ছাকৃত, ইহা লইয়া ইন্দুমতী অযথা তাহাকে যখন তখন অপদস্থ করিতে সুরু করিয়াছে।

সে দিন বিকালে ধোপা চলিয়া যাওয়ার পর,—মঞ্জু গা ধুইয়া আসিয়া ফরসা কাপড়খানি ভাঙ্গিয়া পরিল সেই মুহূর্ত্তে ইন্দুমতী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া বলিল—"সখটা এখন একটু কমালেই ভাল হয়,—যেমন কপাল মানুষের তেমনি থাকাই উচিত, ভগবান একে রূপ দেবার জায়গা পাননি, তার উপর যদি পরিপাটী বাড়ে তা হলে দেওঘর থেকে ফিরে আর দেশে মুখ দেখাতে হবে না।"

এতগুলি কথার পরও যেন কিছুই হয় নাই,— মঞ্জু এই ভাবেই একবার ইন্দুমতীর মুখের দিকে চাহিল মাত্র, উপরন্তু তাহার নিকটে আসিয়া শান্তকণ্ঠেই বলিল—"বৌদি! রাতের রান্না কি হবে?"

বিরক্ত মুখেই ইন্দুমতী বলিল—"যা খুসী করগে, মানুষের হাতে খাবার মত প্রবৃত্তি যেন থাকে এই টুকু করো।"

মঞ্জু এবারও নিঃশব্দে একবার সামনের আকাশের দিকে চাহিল মাত্র।

ঠিক এমনি সময়ে অবনীশ বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিল, কয়দিন পরে আজ সে প্রথমে বাহিরে গিয়াছিল। কিন্তু ফিরিবার পথে সিঁড়িতেই তাহার কাণে যে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর আসিল,—তাহা যে ইন্দুমতীর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না,—সুতরাং উপরে উঠিয়াই বারান্দা হইতে সে প্রশ্ন করিল—"কি হল তোমাদের আবার!"

"অনেক কিছুই হয় আমাদের, তোমার কি আর সব নজর থাকে।"

ইন্দুমতী আলনার উপর কাপড় গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে পূর্ব্বের ভাবেই উত্তর দিল।

কি যেন ভাবিতে ভাবিতে একবার মাত্র অবনীশের দিকে চাহিয়া মঞ্জু সেই ক্ষণেই গৃহ ত্যাগ করিল।

অবনীশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"তবু!"

বর্ষণ-ক্লান্ত আকাশের মতই ইন্দুমতীর মনটা এখন একটু শান্ত হইয়াছিল,—এবার সে ধীরে ধীরে বলিল—"দেখ, আমি বলি কি মঞ্জুকে দেশে পাঠিয়ে দাও!"

অবনীশ স্থির স্বরে বলিল—"কারণ?"

ধীরে ধীরে ইন্দুমতী বলিল—"কারণ নেই কি? অনিলের সঙ্গে এই যে ওর ঘনিষ্ঠতা, একি শোভন না সঙ্গত? তুমি যতই মনে কর বোনটীকে শিক্ষায় দীক্ষায় খুব মানুষ করেছ, আমি তা মনে করিনে,—আর অনিলবাবুর সম্বন্ধে যদি বল—"

"না না তুমি অনিলকে চেন না ইন্দু,—খুব বড় রকমের আদর্শ তার,—দুর্ভিক্ষে জলপ্লাবনে দুঃস্থের সেবায় আগুয়ান হতে কোন দিন সে ক্লান্ত হয়নি, শিক্ষারও তার কোন রকম অপ্রতুল নেই।" ইন্দুমতীকে বাধা দিয়াই অবনীশ কথা কয়টী বলিল।

ঈষৎ গম্ভীর মুখেই ইন্দুমতী বলিল—"তবু সে সংসারী নয়, দায়িত্বজ্ঞানহীন! খেয়াল চিরদিন খেয়াল, শৃঙ্খলা নয়।"

হঠাৎ দমিয়া গিয়া অবনীশ ইন্দুমতীর মুখের দিকে চাহিল মাত্র,—কোন উত্তর দিল না।

খোলা জানালা-পথে অপরাহ্নের রক্তিমাকাশ চোখের সামনে ভাসিতেছিল, চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া সে বলিল—"তা হ'লে তাই দেব?"

শান্ত কণ্ঠে এবার ইন্দুমতী বলিল—"তাই দাও। নইলে যেন ঠিক হচ্ছে না।"

অবনীশও যে একেবারে লক্ষ্য করিত না এমন নহে,—কিন্তু সে অনিলের ব্যবহারকে শুধু একটা স্নেহের প্রকাশ বলিয়াই ধারণা করিয়া লইয়াছিল, সেখানে জট পাকাইয়া দিল ইন্দুমতী, অথচ তাহার অন্তর যেন সঠিক ভাবে এ ধারণা গ্রহণ করিতে চায় না। তথাপি চিন্তিত মুখেই বলিল—"তাহ'লে হরিচরণকে চিঠি লিখে দিই।"

"দাও, ওই সঙ্গে কাকীমাকে লিখেও দাও,—মঞ্জু গেলে তিনি যেন এ বাড়ী এসে থাকেন!" বলিয়া ইন্দুমতী চুপ করিল।

রাত্রি আটটা। মঞ্জুর খাওয়ার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। একটা তোরঙ্গ, একটা বিছানার গাঁটরী দুয়ারের নিকট রাখিয়া,—নেহাৎই পথের উপযোগী বেশে—সেমিজ, শাড়ী ও মাত্র মোটা খদ্দরের চাদরে সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া সে গাড়ীর অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। মুখে তার স্বস্তি অস্বস্তির কোন রেখাই ফুটিয়া উঠে নাই, চোখের দৃষ্টি অপরাহ্নের আকাশের মতই নিবিড় নির্লিপ্ত, তোরঙ্গের উপরেই বসিয়া সামনের অন্ধকারময়ী রাত্রির দিকে সে চাহিয়া ছিল।

নিজের বিছানায় বসিয়া হারিকেনের সাহায্যে ইন্দুমতী নীরবে কি একটা সেলাই করিয়া চলিয়াছে,—অবনীশ আরাম-কেদারার আশ্রয় লইয়া চোখ বন্ধ করিয়া বসিয়া; সারা মনটা তার যেন অকারণ চঞ্চল, কি যেন ত্রুটী হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোথায় তাহার যেন সন্ধান পাইতেছিল না। সমস্ত ঘর নিস্পন্দ নীরব।

ঠিক সেই ক্ষণে কয়দিন পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে অনিল আসিয়া দুয়ার-প্রান্তে দাঁড়াইল, ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে যেন কেমন দমিয়া গেল, ক্ষণকাল বাদে প্রশ্ন করিল "এসব আজ এখানে কেন!"

"এসব"—একটু থামিয়া লইয়া মঞ্জু বলিল, "এসব আমার বাড়ী যেতে হবে তারই বন্দোবস্ত"। কথা কয়টীর শেষের দিকে মঞ্জুর মুখে রেখার মত একটু মধুর করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

এতদিন অনিল মঞ্জুর অটল গাম্ভীর্য্যই দেখিয়া আসিয়াছে, আজ সে নূতন তাহাকে হাসিতে দেখিল, কিন্তু কি বিচিত্র অর্থপূর্ণ এই হাসি! স্থির দৃষ্টিতে সে কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—ধীরে ধীরে তাহার মুখে একটা দৃঢ়তার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল,—একটু উপেক্ষার সুরেই বলিল—"বাড়ী! সেতো তোমার দাদার ও বৌদির, তোমার কি? সেখানে যাওয়ার এখন কি দরকার হল?"

একথার মঞ্জু কি উত্তর দিবে! মাটীর দিকে চোখ করিয়া সে বসিয়া রহিল, শুধু নিজেরও অজ্ঞাতসারে কেমন করিয়া তাহার কয় বিন্দু চোখের জল ঝরিয়া পড়িল।

ইন্দুমতী হাতের সেলাই স্থগিত রাখিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে অনিলের দিকে চাহিল,—অবনীশ হেলান দিয়া ছিল, এবার সোজা হইয়া না বসিয়া পারিল না, সমস্যাপূর্ণ চিন্তিত দৃষ্টি তুলিয়া সে যেন ইহার শেষ মীমাংসা দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।

অনিল ইহার পর সহসা কিছু না বলিয়া, সামনের বারান্দায় বারকয়েক পায়চারি করিল; তার প্রকৃতিগত স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যের অন্তরাল হইতেও সমস্ত মুখে যেন অন্তরের উত্তেজনা নিবিড় ভাবেই প্রকাশ পাইতেছিল!—এমনভাবে মিনিট তিনেক কাটিলে আবার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া—ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় কণ্ঠে—একটু নাটকীয় ভাবেই, (কঠিন উত্তেজনায় সকল মানুষেরই যা হয়) সে বলিল—"মঞ্জুরাণি, যার জীবনের দীর্ঘদিন কেটে গিয়েছে কেবল তোমার সন্ধানে, সমস্ত সম্পদ থাকতেও যে একান্ত নিঃস্ব, সমস্ত সৎ উদ্দেশ্যের ভিতর যার ছিল তোমারই চিন্তা, সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তোমার সন্ধান, তার ঘরে গিয়ে সে ঘরে লক্ষ্মীর শ্রী ফুটিয়ে তুলতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?"

মঞ্জু স্বপ্ন-দৃষ্টিতে একবার চাহিল, কোন উত্তর দিল না। অবনীশ এই সময়ে সমস্যার সমাধান পাইয়াই যেন উঠিয়া দাঁড়াইল, তার সমস্ত চোখে মুখে নীরব আনন্দের সাড়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অনিল কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া তন্ময় চিত্তে বলিয়া চলিল—"মন্ত্রের জোরে বলবো না,—কোন পুরাতন যুগের অধিকারের দাবী নিয়ে লড়বো না, কেবল তুমি তোমার অন্তরের অন্তরতম অনুভূতিটীর নিছক সত্য আমায় জানালে আমি নিজের জায়গায় ফিরে যাব,—দেড়মাস ধরে আমি এই টুকুরই অপেক্ষা করছি,—চিনতে কারো ভুল হয় নি এটা ঠিক, কিন্তু মঞ্জুরাণি! পারবে কি তুমি?"

সারাদিনের পরিশ্রমে ও নানারকম মানসিক বিপ্লবে মঞ্জুর শরীর সেই সময় টলিতেছিল, তার উপর অনিলের এই আকস্মিক উত্তেজনা তাহাকে আরো ক্লান্ত করিয়া তুলিল,—অথচ এই যে মুহূর্ত্ত ইহাকে উপেক্ষা করাও কোন রকমেই চলিতে পারে না,—যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করিয়া সে মৃদু-কণ্ঠে বলিল—"না পারবার মত কিছুতো নেই।"

পরিতৃপ্তিমাখা মুখে অবনীশ এই সময়ে আসিয়া ধীরে ধীরে পরম স্নেহের সঙ্গেই অনিলের হাত চাপিয়া ধরিল।

সামান্য ক্ষণের জন্য অনিল ঈষৎ অন্যমনস্ক হইয়াছিল,—অবনীশের স্পর্শে চকিতভাবে একবার তাহার দিকে চাহিয়া বিনা প্রতিবাদেই সে তাহার অনুসরণ করিল।

সেই মুহূর্ত্তে বাহির হইতে কোচম্যান হাঁকিল, "বাবু গাড়ী।" অবনীশ ওপর হইতে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল, "দরকার নেই, ফিরতে হবে।" পরে ভৃত্যের হাত দিয়া কিছু বখসিস পাঠাইয়া দিল।

ইন্দুমতী এতক্ষণ নিশ্চলভাবে বসিয়া সব দেখিতেছিল, এইবার সে উঠিয়া আসিয়া মঞ্জুর বাম বাহু ধরিয়া বলিল—"তুই তো জিতে গিয়েছিস্‌রে! আর ভাবনা কি মঞ্জু!" ইহার পর তাহাকে অনিলের নিকট লইয়া আসিয়া স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিল—"তোমার পাওনা-গণ্ডা পিসিমা আমাদের কাছে রেখে গিয়েছেন, এখন তোমাকে দিয়ে আমাদের করণীয় শেষ হোক।"

অনিল শ্রান্তভাবে শুইয়া ছিল, একবার সেই দিকে চাহিয়া ইন্দুমতীর নিকট হইতে মঞ্জুর হাতটা নীরবেই নিজের হাতে টানিয়া লইল, একটু পরে বলিল—"পানি-গ্রহণ ব্যাপারটা অনেকদিন আগেই হয়ে গিয়েছে বৌদি।" কথাশেষের সঙ্গে মঞ্জুর হাত ছাড়িয়া দিয়া আনন্দোজ্জ্বল মুখে সে উঠিয়া বসিল। খানিকপরে অনিল বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেই,—অবনীশ বলিল "আজকের মত এখানেই—"

প্রশান্তমুখে স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া অনিল সংক্ষেপে উত্তর দিল, "না।"

আরও দুইটী দিন অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিনের অপরাহ্নে অনিল আসিয়া দাঁড়াইল,—আজ সে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে!

ঘরের ভিতর অনুযোগের সুরে ইন্দুমতী তখন মঞ্জুকে বলিতেছিল—"আজকে আটপৌরে ছেড়ে ঢাকাইটা পর, আমার কথাটা রাখলে তোর কোন দোষ হবে না।"

মঞ্জু গম্ভীর মুখেই উত্তর দিল—"ওসব আমাকে দিয়ে হবে না।"

অনেক দিনের সঞ্চিত ময়লাতে খান দুই ছবি বিশেষ অপরিষ্কার হইয়াছিল, আজ একটু সময় পাইয়া সে নিবিষ্টমনে সে গুলিকে পরিচ্ছন্ন করিতে করিতেই জবাব দিল,—কিন্তু পরক্ষণেই আকস্মিক একটু হাসিয়া বলিয়া উঠিল -"আজকে বুঝি আর দোষ হবে না বৌদি।"

সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ মুখ ফিরাইতেই দেখিল—অনিল নিঃশব্দে আসিয়া দুয়ার-প্রান্তে দাড়াইয়া স্নিগ্ধ আনন্দোজ্জল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। এদিকে সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতেই অবনীশ ডাকিল "মঞ্জু! আর তো তোমাকে রাখার অধিকার আমার নেই, অনিল সব ঠিক করেই এসেছে যে!"

বাঙ্গালীর মেয়ে সে, পাওয়ার আনন্দ আর হারানোর ব্যথা সমান সুরেই বুকে বাজে! ভাদ্রের ভরানদীর মত তার চোখের প্রান্ত জলে ভরিয়া উঠিল—শুধু ডাকিল "দাদা"—আর কিছু সে বলিতে পারিল না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অনিল আর মঞ্জুকে ট্যাক্সিতে উঠাইয়া দিয়া অবনীশ ফিরিয়া আসিল, পরে শান্ত ভাবেই বারান্দায় বেঞ্চখানির উপর শুইয়া পড়িয়া বলিল—"আজ আমার মঞ্জুর জন্য 'তারপর' কি হবে এ ভাবনার শেষ ইন্দু! যূথি আর মঞ্জুকে দিয়ে ভগবান হাতে পায়ে বেঁধেছিলেন, তাঁরই সুকৌশলে সে বাঁধন কেমন ধীরে ধীরে খসে পড়ল দেখেছ।"

ইন্দুমতী কোন উত্তর করিল না,—নিঃশব্দে সান্ধ্য নক্ষত্র ভরা আকাশের দিকে শূন্য মনে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল,—পরে একটা চাপা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"চল এখান হতে আমরা আর কোথাও যাই।"

গান

প্রভাত বায়ে তমাল-ছায়ে কে তুমি বাঁশী বাজালে,
গোপন তব মোহন সুরে উজানে তরী ভাসালে।
বনের ফুলে এ বনমালী গাঁথিলে বরমালিকা,
ছলনা তব হে চতুরালী বুঝিতে নারে বালিকা।
ডাকিলে যারে বাঁশীর সুরে
কেমনে বল রহে সে দূরে
নয়নঠারে সে অবলারে নিঠুর কালা মজালে।
উষার সীঁথি কাননবীথি অরুণরাগে রাঙিয়া,
হাসিলে মৃদু মধুর হাসি বুকের পরে রাখিয়া।
কুঞ্জে তব দোলনা দোলে
লজ্জাময়ী ঘোমটা খোলে
নীপের মালা দুলায়ে গলে লীলার ছলে সাজালে।

প্রাচীন ভারতে নারী

—শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী

স্বামী-নির্ব্বাচনে স্বাধিকার

শিক্ষার অভাবই মূঢ় শ্রদ্ধার জন্ম দেয়। কিন্তু আর্য্য-নারীর ছিল দেহ ও মনের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ। তাই দেখি তিনি স্বভাবতই বিবাহ বিষয়ে নিজের রুচি অনুযায়ী চলেছেন। তিনি রীতিমত বেদ অধ্যয়ন করেন এবং সুশিক্ষার বলে পতি অর্জ্জন করেন, নতুবা এই পরম গুরু পদার্থটি অকস্মাৎ তাঁর উপর ভর করেন না। আর তিনি মনের মত যুবা পতিকেই আকর্ষণ করেন। অথর্ব্ব বেদ[১] বলেছেন, ব্রহ্মচর্য্যের[২] বলে কন্যা যুবা পতি লাভ করেন—'ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিং'। কন্যার আত্ম-কর্ত্তৃত্বেই পতি লাভ হয়—তিনি নিষ্ক্রিয় থাকেন আর হিতৈষীর দল তাঁর জন্য পতিদেবতা সংগ্রহ ক'রে আনেন এমন নয়। নানা আনন্দ উৎসবে অবাধ যাতায়াত[৩] থাকায়, যুবক ও কুমারীগণের পরস্পর পরিচয়ের সুযোগ হ'য়ে থাকে আর সে সময় মাতা স্বীয় কন্যাকে বুদ্ধি ও প্রণালী বাৎলে দিয়ে থাকেন[৪]। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে[৫] পাই—'কত মেয়েরা ঐশ্বর্য্যে খুসী হন, আবার এমনও মার্জ্জিতমনা অনেকেই আছেন যাঁরা নিজের মনোমত পতিলাভে যত্নবতী হন।' মুয়র সাহেব[৬] বলেন—বৈদিক যুগে, অন্ততঃ কিছু কালের জন্যও, স্বামী-নির্ব্বাচনে নারীর স্বাধিকার ছিল একথা কি এই ঋক্ থেকে আমরা অনুমান কত্তে পারিনে? অথর্ব্ববেদ[৭] 'সমানমনস্ক' বরলাভের জন্য মন্ত্র রচনা করেছেন। ঋগ্বেদ[৮] বিধবাকেও নিজ কামনা অনুরূপ দ্বিতীয় বর গ্রহণে অনুরোধ করেছেন। ভাবী দম্পতির সাক্ষাৎ দেহ-মনের মধ্যে না খুঁজে সুদূর জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মধ্যে তাঁদের কল্পিত মিলের সন্ধান বৈদিকযুগে কেউ করেন নি। সেই স্বনির্ব্বাচন-সুলভ যুগে জায়াপতির মনের একান্ত মিল আদর্শ মিলনের উপমারূপে ব্যবহার হওয়ার প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। যজ্ঞ-কার্য্যে হোতা ও অধ্বর্য্যুর মধ্যে সর্ব্বপ্রকার একভাবকে[১] বলা হয়েছে এক বয়সী ও এক ঘরে বাস করে এমন দম্পতির মত দ্বৌ সবয়সা সমানযোনৌ দম্পতীব[২]।

অনুরাগমূলক বিবাহ

যথা প্রয়োজন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় ও সুশিক্ষিত অন্তঃ-করণ নিয়ে পুরুষের সঙ্গে মেলা-মেশায়[৩] প্রণয়ের সুযোগও যেমন ছিল, অপব্যবহারও তেমনই হ'তে পার্ত্তো না। অন্যদিকে বিবাহ বিষয়ে নিজের চিন্তা নিজে করায় গুরুজনেরাও অসহিষ্ণু হওয়ার কারণ পেতেন না। সর্ব্বোপরি ছিল শিক্ষার উৎকর্ষে লজ্জাশীলতার মধ্যে একটি সাবলীল সারল্যের স্বচ্ছন্দ সঞ্চার। বহুকাল পরে শিক্ষালোপের ফলে দ্বিধাবিজড়িত ও সংস্কারক্লদ্ধ লজ্জাবোধ এলো— তার চেয়ে হয়ত একান্ত অজ্ঞতায় অনেক মঙ্গল ছিল। নিজের আকাঙ্ক্ষা ও অভিরুচি প্রকাশ কত্তে বৈদিক নারীর কোন কুণ্ঠাই দেখা যায় না। সোমের উপাখ্যানটি[৪] চমৎকার।

পিতা প্রজাপতির কাছে কন্যা সীতা-সাবিত্রী তাঁর প্রেমের কাহিনী সসম্ভ্রমে অথচ অসঙ্কোচে বল্‌ছেন—আমি ভালবাসি সোমকে আর সোম ভালবাসেন শ্রদ্ধাকে; এর বিহিত করুন পিতা। বর্ত্তমান লজ্জাশীলতার আদর্শকে এ প্রগল্‌ভতা ব্যথা দিলেও প্রজাপতি সস্নেহে কন্যার ললাটে একটি মন্ত্রপূত সুগন্ধি প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন ও সোমের কাছে যেতে বল্লেন। এবারে সোম সাবিত্রীকে সমাদরে আগিয়ে নিলেন, সঙ্গদানে অঙ্গীকার-বদ্ধ হলেন ও হাতে কি পুথি আছে জিজ্ঞাসা করায়

---

(১) অথর্ব্ব—১১, ৩, ৭, ১৮। (২) ব্রহ্ম বেদঃ তদধ্যয়নার্থং আচর-ণীয়ং কর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যং—সায়নভাষ্য - অথর্ব্ব, ১১, ৩, ৭, ১৭। (৩) ঋগ্বেদ—৭, ৫৮, ৮। (৪) Kaegi—The Rigveda—Introduction. (৫) ঋ—১০, ২৭, ১২। (৬) Muir, Original S. T.—Vol. V., P. 458. (৭) অথর্ব্ব—২, ৬, ৩৬, ১—'বরেষু সমনেষু'। (৮) ঋ—১০, ১৮, ৭। এমন কি, যমী তাঁর ভ্রাতা যমকে বিব্রত করায় যম বল্‌ছেন, 'তুমি আমায় ছেড়ে অন্য কাউকে বেছে নাও—অন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ'— ঋ—১০, ১০, ১০।

(১) 'সমান বয়স্ক', 'সমান সামর্থ্য', 'সমান প্রয়োজন নিষ্পত্তি'…… তদেব পরস্পরং শরীরং মিশ্রয়িতুমিচ্ছতঃ। সায়নভাষ্য—ঋগ্বেদ—১, ১৪৪, ৩।

(২) ঋগ্বেদ—১, ১৪৪, ৪।

৩। বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র—১, ২, ৩, ২৩—ব্রহ্মচারীর বিনা প্রয়োজনে রমণী সম্ভাষণ নিষেধ।

৪। তৈত্তিরীয় ব্রাঃ—২, ৩, ১০, ১।

তিনি সাবিত্রীকে তাঁর হাতের বেদগ্রন্থ তিনখানি দিলেন। শেষোক্ত ঘটনায় রসিক ঋষি উপাখ্যানের শেষে একটি নীতি-উপদেশ দেওয়ার লোভ সম্বরণ কত্তে পারেন নি—এই থেকেই চলিত হ'লো মেয়েরা তাঁদের আলিঙ্গনাদির মূল্য চেয়ে থাকেন।

জীবন-সঙ্গীকে প্রেমের স্বাধীন সুরে আহ্বান করায় নারীত্বের নিবিড়তম ও প্রাথমিকতম আনন্দ। মাতৃত্ব ইত্যাদি নারীর যতই বড় ভাব হোক্, তবু প্রাসঙ্গিক ফল মাত্র। রামায়ণের সীতা হেন শান্ত মেয়েও পতিপ্রেমের উল্লাসে বল্‌ছেন—

ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা॥ ২১৫

স্বাধীন প্রণয়ের উজ্জ্বল প্রভায় সুবিশাল মহাভারতের[১] প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তর উদ্ভাসিত। দময়ন্তী ও সাবিত্রী সর্ব্ব সাধারণের সুগভীর শ্রদ্ধা পেয়ে আস্‌ছেন। এঁদের স্বাধীন প্রেমের কাহিনী ইউরোপীয় মনকেও পুলকিত করেছে। হিন্দুগণ আজও বিবাহের কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন—'দময়ন্তী যথা নলে', 'সাবিত্রী সমান হও'। এঁরা উভয়েই যে শক্তি ও আনন্দের বিকশিত পরিণতি লাভ করেছেন পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রেমই তার উৎস। বিচার করে বোঝা যায় প্রণয়-মূলক বিবাহের জন্যই এঁরা যুগ-যুগ-ব্যাপী মহিমান্বিত আদর্শ হওয়ার সার্থকতা অর্জ্জন করেছেন। দ্রৌপদীও কিছু কম বিস্ময়ের কারণ নন। কর্ণকে লক্ষ্যভেদে অগ্রসর দেখে সুশোভন অথচ দৃপ্ত ভঙ্গীতে তিনি অভিভাবকগণের প্রতিজ্ঞা অস্বীকার ক'রে বল্লেন, সুতপুত্রকে তিনি গ্রহণ কর্ব্বেন না। ভ্রাতা বাসুকীকে জরৎকারু পরিষ্কার বল্লেন, রমণী বিয়ে করে প্রেমের তাগিদে কিংবা কর্ত্তব্যের খাতিরে। গার্গ্য মুনিকন্যা শেষ পর্য্যন্ত কুমারীই র'য়ে গেলেন, যেহেতু—আত্মনঃ সদৃশং সা তু ভর্ত্তারং নাম্বপশ্যত।

ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ব্যবস্থা

ব্রাহ্মণ সভ্যতার সান্ধ্যযুগেও এই স্বাধীনতার সুর সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয় নি।* মুহুর্মুহু মূর্চ্ছার ক্ষণিক অবকাশে এই সুরের রেশ স্মৃতির শাসনকালেও শুন্‌তে পাওয়া যায়। ললিত-বিস্তার[১] পাঠে জানা যায় বুদ্ধদেব অভিলাষ করেছিলেন কবিতা-রচনায় সিদ্ধহস্তা, নানা সদ্‌গুণসমন্বিতা ও ধর্ম্মসূত্রে সুপণ্ডিতা কুমারী বিবাহ করবেন। স্মৃতি প্রচার কচ্চেন—'নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনম্'—কন্যাকে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়ে পিতা তার বিয়ে দেবেন না। ধর্ম্মশাস্ত্র যে বিবাহের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করেন, তার নাম 'ব্রাহ্ম বিবাহ'। বর ও কন্যা ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করবেন। শিক্ষাকালে স্ত্রী-পুরুষের অনুরাগ হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু সংযম-রক্ষার আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক নানা উপায়ে চরিত্রের সবলতা রক্ষা হ'তো। একটি নিয়মে[২] দেখা যায় ব্রহ্মচারীর উত্তম বসন-পরিধান ও দন্তধাবন নিষেধ; বোধ করি রমণীর কাছ থেকে অতি আত্মীয়তায় উৎসাহ না পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই নিয়ম। বিদ্যালাভ শেষ হ'লে ব্রহ্মচারী পত্নী-গ্রহণ-কামনায় কন্যাকে প্রার্থনা[৩] করবেন। কন্যার পিতা অনুমোদন ক'রে উভয়ের বিবাহ দেবেন। বরের পিতারও অনুজ্ঞা আবশ্যক। শেষের অংশ, পিতা মাতার মত বাদ দিলে যা' হয় তার নাম গন্ধর্ব্ব[৪] বিবাহ। কিন্তু প্রথম অংশ বাদ দিয়ে শুধু শেষটুকু রাখলে পরিশেষে দাঁড়ায় অভিজ্ঞ লোকের হিসেবী বুদ্ধির ব্যবসাদারী ঘটনা[৫]। এখনও দেখা যায় ছেলে বা মেয়ে কোন পক্ষই একটু শিক্ষিত হ'লে তাদের নিজ মত খুব সহজে উপেক্ষা করা যায় না। ধর্ম্মশাস্ত্র* বরকন্যা বিচার পূর্ব্বক শোভন সংযোগের কথা বলেছেন এবং গুণহীন বরে

১। সুভদ্রা'র প্রণয় এমন কি হিড়িম্বার প্রণয়ও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

* আপস্তম্ব, বৌধায়নাদি প্রণীত গৃহ্যসূত্রে, ধর্ম্মসূত্রে প্রভৃতি ও পরবর্ত্তী মনু, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি প্রভৃতি। এগুলি সমাজ, গৃহ ও ব্যক্তিগত সদাচার বিষয়ক ধর্ম্মের বিধি ও নিষেধ মান্য করার ফল ও অমান্য করার সাজা ইত্যাদি। হিন্দু ধর্ম্মের এটি ব্যবহারিক বা ফৌজদারী বিভাগ বলা চলে। আত্মা ও ঈশ্বর বিষয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ব্যক্তিগত সাধনা দর্শনশাস্ত্রের বিষয়।

১। ললিত বিস্তার—ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্করণ, ১৮২ পৃঃ।

২। আপস্তম্বগৃহ্য—১, ২, ৭, ১১।

৩। ঋ, বে—১০, ৮৫, ২৩; বৌধায়ন—১, ২, ২০ ২; মনু কিন্তু বলেন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ ক'রে কন্যা দান—৩, ২৭।

৪। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে গন্ধর্ব্ব বিবাহ বিশেষ প্রশংসনীয়; কন্যা হরণ ক'রে বিয়ে করাও খুব গৌরবের।

৫। অনেকটা আরম্ভ হয় 'প্রজাপত্য' মতে—মনু, ৩, ৩০—শেষ হয় 'আসুর' মতে - মনু, ৩, ৩১।

* আপস্তম্ব গৃহ্য—১, ৩, ১৮ ও ১৯—শিক্ষিত বরে সম্প্রদানের কথাও আছে; মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—৮, ৩৭, 'দেয়া বরায় বিদুষে'।

সমর্পণ না ক'রে বরং ঋতুমতী অবস্থায় কন্যাকে অনূঢ়া[১] রাখাই সঙ্গত মনে করেছেন। গৌতম বলেন[২] তিনবার ঋতু হওয়ার পর পিতৃদত্ত অলঙ্কার উপহার দিয়ে কন্যা স্বেচ্ছায় স্বামী গ্রহণ করবেন। বশিষ্ঠ[৩] বলেন ঋতুর তিন বৎসর পর আর অপেক্ষা না ক'রে কন্যা নিজেই সমতুল্য পতিবরণ করবেন। মনু[৪] বলেন ঋতুর তিন বৎসর মধ্যে বাপ মা যদি গুণবান্ বরে কন্যার বিয়ে না দেন, তবে পরে কন্যা স্বাধীন ভাবে স্বয়ম্বরা হবেন; এ ব্যবস্থায় বর কন্যা কারুর স্বেচ্ছা-বিবাহের দোষ হয় না। তবুও সূত্র যুগের সুদূর অতীত কালেই নারীর স্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে রূঢ় শাসনের সূত্রপাত হয়েছে। বৌধায়ন[৫] বলেচেন—নারীর স্বাধীনতা নেই। এ বিষয়ে এই প্রচলিত মত—কুমারী কালে কন্যা পিতার, বিবাহান্তে যৌবনে স্বামীর ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন; কোন বয়সেই নারী স্বাধীনতার উপযুক্তা নন্। মনু[৬] বেশ সদম্ভেই সে কথা বলেছেন—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য-মর্হতি'। পরবর্ত্তী[৭] স্মৃতিকারগণও এ কথার নানাভাবে পুনরাবৃত্তি করেছেন। শাসনের হুঙ্কার ও অমর্য্যাদার নিষ্পেষণের অবকাশে কচিৎ কৃপাবর্ষণে নারীর অসহায় অবস্থার বেদনাকে আরো করুণ ক'রে অতি দ্রুত তাকে স্বপ্নাবিষ্ট জড়তায় সমাচ্ছন্ন করা হয়েছে।

যৌবন-বিবাহ

অধ্যয়নব্রতের সঙ্গে বিবাহবিষয়ে নিজ অভিমত গঠন করতে আর্য্যনারীর ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করাই স্বাভাবিক। অথর্ব্ববেদের দুটি মন্ত্রে[৮] বিবাহের বয়স বেশ সহজেই অনুমান হয়—'হে অর্য্যমান দেব! এই কন্যা অপরা কন্যাগণের বিবাহ-উৎসবে গিয়ে গিয়ে বিরক্ত হয়েছেন, এবারে অন্যা রমণীগণ এঁর বিবাহে অবশ্য আসুন। হে ধাতর্! এই কন্যাকে মনের মত একটি স্বামী দাও।' এ মন্ত্র বেশ ছবি। বেশ দেখা যাচ্ছে—অপরের বিবাহদর্শনে আত্মগ্লানি আসবার মত যৌন চেতনা হয়েছে এমন বয়সী এক কন্যা এই অবস্থায় অনেক বার ফিরে এসে দীর্ঘনিশ্বাসে দর্পণ মলিন ক'রে, নিজ দেহশ্রীর প্রতি মমতাপূর্ণ অবসন্ন দৃষ্টিতে একে একে উৎসবের সাজসজ্জা উন্মোচন কচ্চেন আর যেন অকস্মাৎ ঈপ্সিত দয়িতের আশায় চঞ্চল হ'য়ে উঠছেন। কিন্তু কল্পনার প্রয়োজন নেই। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা বশ করার মন্ত্রে[১] ভাবী বর অতি স্পষ্ট বর্ণনা কচ্চেন—'কন্যানাং বিশ্বরূপাণাং'; সায়ন ভাষ্যে অর্থ দেওয়া আছে—অনুপম ভাবে পরিস্ফুট সমুদয় অঙ্গ এমন অনূঢ়া কন্যা। অন্য মন্ত্রে[২] বলছেন—'হে কামিনি! আমার দেহ, আমার পাদদ্বয়, আমার অক্ষিদ্বয়, আমার প্রতি অঙ্গ তুমি বাঞ্ছা কর; আমার বাহু ও হৃদয়ে তুমি আলিঙ্গিতা হও। তোমার চাহনির নিষ্ঠুর মায়া ও কেশরাশির বিলাস-ভঙ্গীতে আমার চিত্ত কামাগ্নিতে উষ্ণ হ'য়ে উঠ্‌ছে।' কন্যাও[৩] স্বীয় বিকশিত যৌবনের সামর্থ্যে প্রার্থনা করছেন—'আমার চিন্তা এই পুরুষের হৃদয়ে কামনার জ্বালা আনুক।' 'অল্প বয়সী বালা'র সংশ্রবে এই দৈহিক উন্মাদনা সম্ভব নয়। ঋষি-রমণী ঘোষা[৪] বলছেন, আমাতে এখন নারী-লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে ও বর এসেছেন এবারে আমায় বিয়ে কত্তে। সুবিখ্যাত সূর্য্যাসূক্তে[৫] আরো সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ সূক্তের নবম ঋকের ভাষ্যে সায়ন বলছেন—'পতিং কাময়মানাং পর্য্যাপ্ত-যৌবনামিত্যর্থঃ'। দ্বাবিংশ ঋকে বিশ্বাবসুকে বলা হয়েছে, তিনি এই বিবাহের কন্যার প্রতি লোভ ছেড়ে 'অপরা নিতম্ব-বতী অনূঢ়া কন্যা'র কাছে যান। বর কন্যাকে সম্বোধন ক'রে বলেছেন—'অবিলম্বে তুমি আমার গৃহে আধিপত্য কর'[৬], 'তুমি আমার গৃহস্থালীর কর্ত্রী হও'[৭], 'সপ্রেমে তুমি আমার প্রণয়পূর্ণ আলিঙ্গনের প্রতিদান দাও'[৮], 'তুমি আমার পিতা, মাতা,

১। মনু—৯, ৮৯।

২। গৌতম—১৮, ২০।

৩। বশিষ্ঠ—১৭, ৬৭-৬৮, 'পতিং বিন্দেৎ তুল্যম্'।

৪। মনু—৯, ৯০ ৯১; ঋ, বে—১, ১১৬, ১—সায়নভাষ্যে স্বয়ংবর বিবাহের একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। কাব্য-সাহিত্যের মত ধর্ম্ম-সাহিত্যে স্বয়ংবরের তেমন ঘটা নেই, প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় মধ্যেই স্বয়ংবর চলিত।

৫। বৌধায়ন—২, ২, ৩, ৪৪-৪৫।

৬। মনু—৯, ৩।

৭। বিষ্ণু—২৫, ১৩; বশিষ্ঠ ৫, ১-২।

৮। অথর্ব্ব—৬, ৬০, ২—৩।

১। অথর্ব্ব—২, ৩০, ৪।

২। অথর্ব্ব—৬, ৯, ১-২-৩। ঠিক্ পরের মন্ত্রেই, পুত্র জন্মের ব্যাপার—'পুত্রস্য বেদনং'—বর্ণনা আছে।

৩। অ, বে—৬, ৩০, ২।

৪। ঋ, বে—১০, ৪০, ৬।

৫। বিবাহ মন্ত্র—১০, ৮৫ সূক্ত।

৬। ঋ—১০, ৮৫, ২৬

৭। ঋ—১০, ৮৫, ২৭

৮। ঋ—১০, ৮৫, ৩৬

ভগ্নী, ভ্রাতা সকলের মধ্যে—'সাম্রাজ্ঞী ভব'—গৌরবে বিরাজ কর'[১]। বালিকার প্রতি এ সবের প্রয়োগে কি অবস্থা দাঁড়ায় রবীন্দ্রকাব্যে নব্য স্বামীর কবিত্বের উচ্ছ্বাসের প্রত্যুত্তরে বালিকা-বধূর টোপা কুল খাওয়ার প্রাহসনিক উল্লেখে আমরা তা জানি। প্রকৃতই তখন– জীবন-সঙ্গিনীর কামনায় পতি পত্নী গ্রহণ কত্তেন—রমণী তাঁর হৃদয়ে হৃদয় মেলাতেন আর ধর্ম্মকার্য্যে হাতে হাত মেলাতেন। পুলকিত-দৃষ্টি শ্বশুর-শাশুড়ীর চোখের সাম্‌নে ফুর্‌ফুর্‌ ক'রে বৌ গৃহকার্য্যে দশজনের ভার পরিতৃপ্ত করবেন আর কালেজি ছাত্র-স্বামী পত্র মারফৎ প্রণয় করবেন, এ ব্যবস্থার জন্য বৌ আন্‌বার রীতি ছিল না। অবশ্য ক্রমশঃ আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ও অনেকাংশে বাল্যবিবাহ বর্ত্তমানের এই অবস্থার জন্য দায়ী। বৈদিক যুগে স্বামী স্বতঃসিদ্ধ পাতিব্রত্যের নিশ্চিন্ত ভরসায় থাকতে পেতেন না। বিয়ের আগে ভাবী বধূর মন পাওয়ার প্রার্থনা অনেক দেখা যায় —'কামনার জ্বালায় উত্তপ্ত হৃদয়ে, হে কামিনি, আবেগ-তপ্ত শুষ্ক ওষ্ঠে তুমি এসো ; তুমি এসো মধুর প্রণয়-সম্ভাষণ কণ্ঠে নিয়ে, অহঙ্কার সরিয়ে ফেলে, কেবলমাত্র আমার হ'য়ে[২]'। বিয়ের পরেও প্রার্থনা চলেছে—'আমাদের উভয়ের আঁখি মধুমতী হোক্‌, মুখ শান্তি অনুলেপিত হোক্‌, তোমার হৃদয়ের মধ্যে আমায় রেখে দাও, আমাদের দুজনার মন নিতান্ত এক হোক'[৩]। অযত্নলব্ধা বিমূঢ়া বালিকাকে সতীত্বের অর্ডিন্যান্স-শাসনে নয়, স্বাধীন-চিন্তা যুবতী-হৃদয়কে প্রবল প্রণয়ঝঙ্কারে অনুরণিত করা হ'তো।

বেদ যৌবন-পূজার যুগ

বালিকা-বিবাহের প্রশ্নই ওঠেনা প্রাচীন যুগে। বৈদিক যুগের মন্ত্রই ছিল 'যৌবনে দাও রাজটীকা'। ইন্দ্র হ'লেন, ঋষিদের যুবা সখা[৪] ; শুধু তাই নয়, তাঁদের সুন্দরী কন্যাগণেরও সখা[৫]। অগ্নি পরম যুবা[৬] এবং কুমারীগণের জার ও স্ত্রীগণের পতি[১]। অশ্বিন্‌ দেব-যুগলও সুন্দর যুবা ব'লে কীর্ত্তিত হয়েছেন। ঋষিগণও যুবা হ'তেই চান—মধুচ্ছন্দা নিজেকে নবীন ঋষি ব'লে ঘোষণা কচ্চেন। যুবতী রোদসী দেবীকে যুবার দল[২] রথে বসিয়ে সম্বর্দ্ধনা কচ্চেন। উষা যুবতী[৩] যেহেতু পুরুষের মনে কামনা জাগিয়ে দেন। কুমারীর সঙ্গে তুলনায় উষার যে অঙ্গসৌষ্ঠব বর্ণনা হয়েছে তা থেকেই বৈদিকযুগে কত বয়স অবধি অবিবাহিতা থাকতো তার অতি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। পরিপূর্ণশ্রী অঙ্গের সকল মাধুরীই এই চিত্রে রয়েছে। তিনি স্বীয় রূপে উল্লসিতা এবং যৌবনসমাগমে উজ্জ্বল ও হাস্যময়ী, অধিকন্তু তাঁর বক্ষে এমন শোভার সমাবেশ হয়েছে যা' ক্ষণে ক্ষণে ব্যক্ত ক'রে তিনি আনন্দ পান[৪]। তাঁর লাবণ্যবিষয়ে কেমন একটি স্নিগ্ধ আত্ম-প্রত্যয় এসেছে এ সংবাদও ঋষি দিতে ভোলেন নি। 'উষা[৫] যেন পুলকিতা মাতা কর্ত্তৃক সুসজ্জিতা কন্যা, যিনি নবীন রূপের জয়গর্ব্বে প্রতি ভঙ্গীতে প্রকাশ কচ্চেন দর্শককে যাদের দৃষ্টি মুগ্ধ ও হৃদয় আনত করায় নিজের শক্তি তিনি বেশই জানেন।'

যৌবন-বিবাহে ধর্ম্ম-শাস্ত্র

ধর্ম্মশাস্ত্র নানা বিভিন্ন যুগের রচনা। এক যুগের হ'লেও দেশে দেশে এমন কি গ্রামে গ্রামে[৬] আচারের পার্থক্য হেতু আচার্য্যগণের মতভেদে সমাচ্ছন্ন। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের কাছে একমত আশা করা যায় না। মনুর 'স্ত্রীলোক বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর অধীন'[৭] ইত্যাদি রচনাকেই কিন্তু যৌবন বিবাহের এক বিশেষ প্রমাণ মনে করা যেতে পারে। বশিষ্ঠ ধর্ম্ম-সূত্রে[৮] অতি স্পষ্ট আদেশ আছে—গুরু গৃহ

১। ঋ—১০, ৮৫, ৪৬
২। অ, বে—৩,২৫, ৪।
৩। অ, বে—৭, ৩৬।
৪। ঋ—৬, ৪৫, ১।
৫। ঋ—১, ৩০, ১১।
৬। ঋ—১, ৩৬, ১৫।

১। ঋ— ১, ৬৬, ৪ — জারঃ কনীনাং পতির্জনীনাং।
২। ঋ— ১, ১৬৭, ৬।
৩। ঋ — ১, ১১৩, ৭ সায়ন ভা- কীদৃশী সা। যুবতিঃ। যাবয়িত্রী ফলানাং পুরুষৈঃ প্রাপয়িত্রী।
৪। ঋ—১, ১২৩, ১০—যথালোকে প্রগলভা যোষিৎ......প্রিয়তমস্য পুরতঃ...... ঈষদ্ধসনং কুর্ব্বতী বক্ষসোপলক্ষিতানি গোপ্যানি বাহুমূলস্তনাদীনি আবিষ্করোতি তথা ত্বমপীত্যর্থঃ—সায়নভাষ্য।
৫। ঋ—১, ১২৩, ১১।
৬। আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্র- ১, ৭, ১।
† ঋ বে—৭, ৬৭, ১০।
৭। মনু— ৫, ১৪৮ ; বশিষ্ঠ— ৫, ২ ; অন্যান্য সকলের এই মত।
৮। বশিষ্ঠ— ৮, ১।

থেকে 'সমাবর্ত্তন' ক'রে কোনো বিদ্যার্থী যখন গার্হস্থ্য ধর্ম্মে ইচ্ছুক হবেন তখন তিনি অন্যের অভুক্তা যুবতী রমণী গ্রহণ করবেন। অধুনা বরপক্ষ আত্মসম্মান নিয়ে বেজায় ব্যস্ত কিন্তু প্রাচীন যুগে বরকে কন্যার পিতার নিকট কন্যা প্রার্থনা কত্তে হ'ত[১]। 'বর' শব্দ 'বৃ' ধাতু (woo) বরণ করা, এবং 'কন্যা' শব্দ 'কম্' ধাতু (covet) কামনা করা, এই ভাব থেকে এসেচে। বর স্বয়ং কন্যা দেখে ও ভাবী শ্বশুরের কাছে আবেদন ক'রে আস্‌তেন, পরে আবার বন্ধুবান্ধবকেও পাঠাতেন[২]। বরের জ্ঞাতার্থে শাস্ত্রকার[৩] সুদীর্ঘ তালিকা দিয়ে কেমন কন্যা প্রার্থনা করা সমীচিন হবে না সে বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তালিকার দু' একটি নমুনা এই—যে কন্যা বেশী আত্মীয়গণের কড়া নজরে আছেন, যে কন্যা বড় বেশী সুশ্রী, যে কন্যার বেশী সুন্দরী কনিষ্ঠা ভগ্নী আছেন, ইত্যাদি। যাহোক্, কন্যার পিতামাতার সুবিধার জন্য স্মৃতিকারগণ[৪] বিধান দিয়েছেন, যদি উৎকৃষ্ট বর পাওয়া যায় তবে অপ্রাপ্ত-বয়স্কাকেও—অপ্রাপ্তামপি—বিবাহ দেওয়া ভাল। এ বাক্যের স্পষ্ট নির্দ্দেশ, সাধারণতঃ প্রাপ্তযৌবনাকেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য তবে বিশেষ সুযোগ মিল্‌লে ব্যতিক্রম করা উচিত। 'অপ্রাপ্তামপি' কথাটির মেধাতিথি ভাষ্য অতি প্রাঞ্জল— 'অযোগ্যামপি কামবশত্বেন বালাম্ অপ্রাপ্তং কৌমারং বয়ঃ'— উদ্ভিন্নযৌবনা না হওয়ায় কাম সম্বন্ধে ব্যর্থ। অবশ্য নব্য যৌন-বিজ্ঞান[৫] বলেন, সন্তান-ধারণ সামর্থ্যের বহু আগেই প্রকৃতির প্রসাদে নারী সম্ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করবার শক্তি ও কৌশল আয়ত্ত করেন। আয়ুর্ব্বেদ কিন্তু সাবধান কচ্চেন যেন ষোল বছরের আগে মেয়েদের জননী হ'তে না হয়। ওদিকে বিবাহের মন্ত্র প্রণয়ন ব্যাপারের বহুল আকাঙ্ক্ষার গুঞ্জরণে এবং পত্নী-সম্ভোগের মন্ত্র[৬] পত্নীকে 'তীক্ষ্ন ধারে উপপতি-ছেদনসমর্থা' হ'তে বলায় যৌন চিন্তার উষ্ণ বায়ুমণ্ডল যুবক বরের মনকে ঘিরে রাখে। বিবাহকালে পাণি-পীড়ন ও ধ্রুবতারা-দর্শনে[১] চিরস্থির প্রেমের অঙ্গীকার[২] সমাপ্ত হ'লে তখন থেকে তিন রাত সংযম। তারপর কন্যাকে বরের বাড়ী আনা হয়। তখন চতুর্থ দিবসে[৩] যৌন পরিচয় সংঘটিত হয়, আবার শ্বশুর আগেও সে পরিচয় নিষেধ; কাজেই বিবাহের বয়স অনুমানের বেশ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কামসূত্রে চতুর্থ রাত্রের শয়ন-ধর্ম্মপালনকালে বিচিত্র অদ্ভুত কৌশলে পত্নীকে রতিরঙ্গে উত্তেজিত করার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেটি বালিকার সংশ্রবে সম্ভব নয়। তবু যদি বালিকা-বিবাহ দ্বারা গার্হস্থ্য জীবনের সূচনা কত্তে আদেশ হয় আর বালিকা বধূ যদি তাঁর স্বামীকে মনঃক্ষুণ্ণ না করেন, তাঁর নিজের ভাবী যৌবন যারপর নাই ক্ষুণ্ণ হয়, আর তখন হয়ত বা গৃহপতিও অনুশোচনাই করেন। পুরাণ অনেকের অভিমান্য; স্বয়ং পুরাণই[৪] কলিযুগের দুর্ঘটনার তালিকায় বল্‌ছেন—এই যুগে অনেক বালিকা ষোল বছরের আগেই সন্তান ধারণ করবেন। কলিপূর্ব্ব যুগে বিবাহের বয়স সম্বন্ধে এ কথা খুবই মূল্যবান্ তথ্য।

যৌবন ধর্ম্ম

প্রাকৃতিক নিয়মে যৌন লালসায় প্রবৃত্তি। পুরুষের প্রাণ ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তির জন্যই এর প্রয়োজন। আর তরুণ বয়সেই এর সার্থকতা। নারীর সম্বন্ধে কৌটিল্যের বচন আছে—অসম্ভোগো জরা স্ত্রীণাং[৫]। গরুড় পুরাণে[৬] ও রামায়ণে[৭] ও এ ভাবের সমর্থন আছে। নিয়মাণতা-নাশক বলেই অথর্ব্ববেদে[৮] কাম-দেবতাকে 'সবল ও জবরদস্ত অভিভাবক' বলা হয়েছে। ঋগ্বেদে[৯] দেখা যায় নিবৃত্তির ব্যর্থতায় ক্লিষ্ট হ'য়ে কৃচ্ছ্রসাধনরত

১। সবিতার দুহিতা সূর্য্যাকে সকল দেবতাই অভিলাষ ক'রে বল্লেন, আমরা আদিত্য অবধি দৌড়বো ও যিনি জয়লাভ করবেন সূর্য্যা তাঁরই হবে— ঋ—১, ১১৬, ১৭।

২। আপস্তম্ব গৃহ্য—২, ৪, ১-৩।

৩। আপস্তম্ব—১, ৩, ১১।

৪। মনু—৯, ৮৮।

৫। Metchnikoff—'Nature of Man'.

৬। হিরণ্যকেশী গৃহ্য সূত্র—১, ৭, ২৪, ৫।

১। গোভিল—২, ৩।

২। এ সময়ে স্বামীর নাম করেন দেখা যায়।

৩। গোভিল ২, ৫, ৭-৮, "চতুর্থী কর্ম্ম" এই সম্পর্কে অথর্ব্ববেদের ৭, ৩৬ ৩৭ শ্লোকে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের গাত্র অনুলেপন করেন ও স্ত্রী তাঁর বসন দ্বারা স্বামীকে আচ্ছাদন করেন।

৪। বায়ু পুরাণ—৫৮ অধ্যায়।

৫। Freud বলেন—half-suppressed sex instinct থেকে anxiety hysteria হয়।

৬। গ, পুঃ—১১৫, ১০।

৭। রামায়ণ ৪, ৫, ৯।

৮। অ, বে—৯, ২, ৭।

৯। ঋ, বে—১, ১৭৯—অগস্ত্য ও লোপমুদ্রা।

ঋষিদম্পতি 'শ্রুত-লক্ষণ-যুক্ত সুরত সংগ্রামে' প্রবৃত্ত হয়েছেন। বর্ত্তমান যুগেও একথা স্বীকৃত হয়েছে[১] যে যৌন সংশ্রবের চাঞ্চল্য ও পরিতৃপ্তি সমর্থ বয়সে (adult years) দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য দান করে আর সন্তান-কামনার সঙ্গে এই আনন্দোচ্ছ্বাসের যোগ নেই। তাই অনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের খাতিরে সুনির্দ্দিষ্ট যৌবনের মায়া অনেক আচার্য্যই এড়াতে পারেন নি। কেহ[২] বুদ্ধি পরিণত হওয়ার আগে বিয়ে করেন। কেহ[৩] নারী-লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কত্তে বলেন। কেহ[৪] বলেন—'প্রবৃত্তে রজসি' ঋতু আরম্ভ হ'লে বিবাহ কর্ত্তব্য। কেহ[৫] বলেন, তিন বার ঋতু হ'য়ে গেলে তারপর কন্যা বিবাহযোগ্যা হন, যেহেতু প্রথম তিন ঋতু[৬] দেবগণের ভোগ্য—প্রথম ঋতু অন্তে সোম পতি, দ্বিতীয় গন্ধর্ব্ব, তৃতীয় অগ্নি, মানুষ চতুর্থ পতি। বাৎস্যায়ন বলেন, 'স্তনীং উদ্বহেৎ' আর কাত্যায়ন 'অজাতব্যঞ্জনা'[৭] কন্যার বিবাহ অনুমোদন করেন না। মানবধর্ম্ম শাস্ত্রে যে 'লক্ষণান্বিতা' অর্থে কেবল 'শুভ লক্ষণ যুক্তা' উপদেশ করা হয়েছে, সংবর্ত্ত ঐ কথাটির অর্থ গ্রহণে অনেকটা বেশী এগিয়ে বলেছেন—'লক্ষণৈশ্চ সমন্বিতাং'। নারীত্বব্যঞ্জক বিশেষ লক্ষণাদি প্রকাশিত হয়েছে এমন কন্যাকেই বিবাহ কর্ব্বে—সংবর্ত্ত* এই ভাবেই বুঝিয়েছেন ও এ বিষয়ে তিনি কাত্যায়নের সঙ্গে একমত। মনু[৮] যদিচ দ্বিজগণকে বার বৎসরের কন্যাকে বিবাহে আদেশ করেছেন এবং স্বামীর বয়সের সঙ্গে পার্থক্য রাখবার আবশ্যকবোধে প্রয়োজন মত আট বৎসরের বালিকা-বিবাহও[৯] অনুমোদন করেছেন, মেধাতিথি ভাষ্য 'যবীয়সী কন্যা বোঢ়ব্যা'—যুবতী কুমারী বিবাহ কর্ত্তব্য—এই তাৎপর্য্যই প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন এই শ্লোকে মনু মহারাজ বিবাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন বয়সের কড়াকড়ি অভিপ্রায় করেন নি, স্বামী স্ত্রীর বয়সের ব্যবধানের[১] একটা মোটা মুটি ধারণা দিয়েছেন মাত্র।

১ H. G. Wells—Work, Wealth & Happiness of Mankind.

২। মহানির্ব্বাণ—৮, ১০৭।

৩। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

৪। নারদ সংহিতা।

৫। সংবর্ত্ত।

৬। ঋ—১০, ৮৫, ৪০।

৭। কাত্যায়ন সংহিতা—২৮, ৪। ব্যঞ্জনা অর্থ—রোম, রজঃ, কুচ।

৮। মনু—৯, ৯৪।

* সংবর্ত্ত বলেছেন—
রোম দর্শন সংপ্রাপ্তে সোমোভুংক্তেহথ কন্যকাং।
রজো দৃষ্টা তু গন্ধর্ব্বঃ কুচো দৃষ্টাতু পাবকঃ॥ তারপর কন্যা পতি-ভুক্তা হওয়ার যোগ্যা হন।

৯। পরাশর—১০ বৎসর।

ধর্ম্মশাস্ত্রে বাল্য-বিবাহ-আদেশের কারণ—

তবুও উল্লিখিত কয়েকটি মতামত[১] বাদে ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই বালিকা বিবাহের আদেশ দেখতে পাওয়া যায়। ঋতুই[৩] এ আদেশের মূল কারণ। রমণীর ঋতু ব্যর্থ হ'তে দেওয়া কিছুতেই চলে না এই আদর্শ থেকে সন্তানকামী আর্য্যশাস্ত্রকারগণ বালিকা-বিবাহবিধানে উৎসুক ছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধের পর থেকে ক্ষত্রিয় রাজত্ব হীনবীর্য্য হ'ল এবং ক্রমে আর্য্য সমাজে শিথিলতা আসতে লাগলো। কাজেই উচ্চবর্ণের সামাজিক রীতিনীতির প্রচার আবশ্যক হলো। আপস্তম্ব তদীয় গৃহ্যসূত্রে নিজের যুগকে 'অবর' বলেছেন ও দুঃখ করেছেন এযুগে ঋষি আর জন্মায় না ও পাপ বেড়েই চলেছে। তার আরো পরে হয় বৌদ্ধ, নয় শূদ্র, নয় বৈদেশিক রাজত্ব চলেছে আবার তাতেও ঘন ঘন পরিবর্ত্তন। এ অবস্থায় আবার মুমূর্ষু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষার জন্য গৃহ্যসূত্র গুলির সংস্কার ক'রে স্মৃতি-সংহিতা রচনা হয়েছে। বেদের প্রাথমিক যুগেই মুষ্টিমেয় আর্য্য বহু অনার্য্যের সঙ্গে লড়তে গিয়ে বীরপুত্রের বৃদ্ধিতে পরম উৎসাহী ছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের যুগেও চাহিদা কমে নি। তাই দেখা যায় অধুনা প্রচলিত সতীত্বের আদর্শ বিপর্য্যস্ত ক'রেও নিয়োগ প্রভৃতি উপায়ে পুত্র-প্রজননের বহুল ব্যবস্থা হ'য়েছিল। স্ত্রীলোকের মন এ অবস্থার অনুগামী করার জন্য মাতৃত্বই নারীর প্রধান আদর্শ ব'লে প্রচার করা হয়েছিল। পাতিব্রত্যের যে প্রশংসা সেও প্রধানতঃ গৃহের শান্তি ও শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যেই, নতুবা প্রেমের নিজস্ব মহিমার বন্দনা ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। সংক্ষেপে শাস্ত্রের মর্ম্ম এই দাঁড়ালো—পুত্রের প্রয়োজনে সতী স্ত্রী অন্য পুরুষ সম্ভোগ কর্ব্বেন কিন্তু প্রেমের

১। আপস্তম্ব গৃহ্য—১, ৩, ১১।

২। যদিচ Bhandarkar—History of Child Marriage—P. 153—বলেন আশ্বলায়ন প্রভৃতির আমলে 'marriages after puberty were a matter of course.'

৩। মনু—৩, ৪৫—৫০।

জন্য[১] তেমন আদৌ চল্‌বে না। মাতৃত্ব নারীর মন কেমন পেয়ে বসেছিল তার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেয়া যাক্, দ্রৌপদী বল্‌ছেন—'যুধিষ্ঠিরকে মুক্ত হ'তে হবে যাতে ক'রে আমার পুত্রকে কেউ দাসের পুত্র বল্‌তে না পায়'। ঋতু বিফল হওয়ার আশঙ্কা নিবারণের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র[২] বলেছেন, বিবাহের পূর্ব্বে যতবার ঋতু অকাজে যাবে ততবার কন্যার পিতামাতা ভ্রূণহত্যার পাপগ্রস্ত হবেন। প্রাচীনতম শাস্ত্রকার গৌতম[৩] বলেন—'প্রদানম্ প্রাগ্ ঋতোঃ'—ঋতুর পূর্ব্বে সম্প্রদান কর্ত্তব্য। তৎপরবর্ত্তী বশিষ্ঠ[৪] বলেন, পিতা নগ্নিকা[৫] অবস্থায় কন্যাকে বিবাহ দেবেন। গোভিল[৬] এবং হিরণ্যকেশী[৭] এবং অনেকেই এই মত সমর্থন করেন। তবে ঋতুর পর মোটের উপর তিন বৎসর[৮] পর্য্যন্ত এঁরা দয়া করে সময় (grace) দিয়েছেন। ঋতুর গুরুত্ব সম্বন্ধে বহু নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। ঋতুস্নানান্তে পত্নীকে যে পুরুষ সঙ্গ দান না করেন রামায়ণ[৯] তাঁকে 'দুষ্টাত্মন্' বলেছেন। গরুড় পুরাণ,[১০] মার্কণ্ডেয় পুরাণ,[১১] পরাশর সংহিতা[১২] ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্র[১৩] প্রভৃতি ঋতু গমন না করা অতি গর্হিত পাপ মনে করেন। এমন কি, অভিমন্যু-শোকে[১৪] অধীরা সুভদ্রা দেবী বিলাপ কচ্চেন 'হে পুত্র, ঋতুস্নাতা পত্নীকে নিরাশ না করায় যে পুণ্য, সে সদ্গতি তুমিও যেন পাও।' ঋতুস্নানান্তে পত্নী 'ঋতুং দেহি' ব'লে ব্যাকুল আলিঙ্গনে স্বামীকে ঋতুরক্ষায় আহ্বান করেন। ঋতুপালন-কামনায় নারীর চাঞ্চল্যের স্ফীত প্রবাহ বিবাহ-সম্বন্ধের বাধা অবলীলা ক্রমে ভেঙে বেরিয়ে যায়। শর্ম্মিষ্ঠা[১] রাজা যযাতিকে প্রবল অনুনয়ে আকর্ষণ কচ্চেন—রাজন্, আপনি সখী দেবযানীর স্বামী; সখীর আর নিজের স্বামী একই। ঋতু অন্তে প্রার্থনা করি আপনি আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন·····রূপসী শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দর কুমার লাভ কল্লেন। ধৌম্যপত্নী[২] স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁর এক লাজুক শিষ্যকে ঋতুপালনে বাধ্য কল্লেন। নারদ[৩] বলেছেন—বর বিদেশে থাক্‌লে তিন বার ঋতু ব্যর্থ হওয়ার পর পত্নী আর অপেক্ষা না ক'রে পুনর্ব্বিবাহ করবেন। হৃদয়বান্ স্বামী বিদেশে গিয়ে পত্নীর ঋতুপালন-চিন্তায় বিব্রত হ'তেন দেখা যায়। রাজা উপরিচর শীকারকালে রাণীর ঋতু অবসান স্মরণ ক'রে পত্রপুটে স্বীয় বীর্য্য এক বাজপক্ষীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন, অন্য পক্ষী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় উক্ত অমোঘ বীর্য্যের যমুনা-জলে পতনফলে সত্যবতীর জন্ম হয়।

রস সাহিত্যের যুগে নারী—

ঋতুচিন্তা-সর্ব্বস্ব দেহবিলাসী বিবাহ-বিধানকে এক প্রকার জড়বাদ বল্লে অত্যুক্তি হয় না। মহাভারতে ও শকুন্তলা, রত্নাবলী, বাসবদত্তা প্রভৃতি কাব্য-সাহিত্যে হৃদয়বিলাসী আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাচুর্য্য। এ দুয়ের অনবদ্য মিলন ছিল বৈদিক যুগে। ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনে ঋতু সম্বন্ধীয় অপব্যয়ের অতিভয়বশতঃ যৌবনসমাগমে সূক্ষ্ম প্রণয়-বেদনার নিগূঢ় মাধুর্য্য থেকে নারী বঞ্চিতা হ'লেন। তাতে যদিচ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার সুস্থির গতি লাভ হ'লো কিন্তু প্রেমোন্মাদনার অপূর্ব্ব আবেদন অজ্ঞাত থাকায় প্রাণের রসোচ্ছল নৃত্যলীলায় প্রকৃতি দেবীর সখীত্বলাভের আনন্দ রইলো না। তবে অধুনা যে অতি বাল্যে প্রণয়-চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে সে বোধ হয় রোমাঞ্চকর প্রণয়ের সহস্র সহস্র বর্ষ ব্যাপী অক্লান্ত ব্যবহারের ক্রম-পরিণতি, evolution প্রসূত। পূর্ব্বে যা' ছিল উৎকর্ষের বিষয়-বিবর্ত্তন প্রসাদে, আজ তা' সহজাত প্রবৃত্তির (instinct) এলাকায়। অতএব স্কুলের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে চুম্বন আলিঙ্গন ইত্যাদি দোষগুণবিজড়িত আদিরসের মৃদুমন্দ ঊর্ম্মিলীলা ক্রমে

১। বশিষ্ঠ—১৭, ৬১—নিযুক্ত পুরুষ সম্ভোগকালেও নিযুক্তা স্ত্রীকে প্রণয় ব্যবহারে আকর্ষণ কত্তে পাবে না।

২। বশিষ্ঠ—১৭, ৭১, গৌতম—১৮, ২৩।

৩। গৌতম—১৮, ২১।

৪। বশিষ্ঠ—১৭, ৭০।

৫। নগ্নিকা—রজোদর্শন ও স্তনোদ্গমের পূর্ব্বে।

৬। গোভিল—৩, ৪, ৬।

৭। হিরণ্যকেশী—১, ৬, ১৯, ২।

৮। যথা; বশিষ্ঠ—১৭, ৬৮; বিষ্ণু—২৪, ৪০।

৯। রামায়ণ—২, ৭৫, ৫২।

১০। গঃ পুঃ—৪, ৪০।

১১। মার্ক-পু—১৪শ অধ্যায়।

১২। পরাশর—৪, ১২।

১৩। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র—৭, ২৮—৩৬।

১৪। মহাভারত—৭, ৭৮।

১। মহাভারত—১, ৮২।

২। মহাভারত—১, ৩, ৩২।

৩। নারদ সংহিতা—১২, ১৪।

অবৈধ যৌন লালসার উত্তালতরঙ্গে পরিণত হওয়ায় বাল্য-অপরাধের বিচারপতি মহাশয়[১] অতটা বিচলিত হয়েছেন। বিনা-বিবাহে বাল্য প্রেমের সঙ্গে তুলনায় বিনাপ্রেমে বাল্য-বিবাহ ভাল কি মন্দ সে তর্ক ছেড়ে কি ছিল, কতটুকু ছিল আর সেটুকু কেনই বা ছিল সেই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে দেখা যায় পূর্ব্বে প্রণয়-লীলা যৌবনের অপেক্ষা রাখ্‌তো। মার্ক প্যাটিসনের সমালোচনা সৌজন্যে যখন জান্‌তে পাই, গুজ্‌বেরীর ছোট জঙ্গলে বড় বড় বালিকাদের সঙ্গে মিল্‌টন্‌ খেলা ভালবাস্‌তেন, তখন সন্দেহ থাক্‌বার কথা নয় স্নিগ্ধ ছায়াবেষ্টিত মৃদুতর আনন্দেও কিছু বয়োবৃদ্ধিসম্পন্না বালিকা বাঞ্ছনীয়া। আর প্রতিঘাতসমর্থা যুবতীর তীক্ষ্ণ কিরণ সম্পাতেই উষ্ণতর ক্রীড়া-চাপল্য জেগে ওঠে। কৃষ্ণ-প্রণয়িনী গোপকামিনীগণ[২] সকলেই যৌবন প্রপীড়িতা এবং অসীম কামনার দাহে[৩] তাঁদের সসীম হৃদয় নিদারুণ সন্তপ্ত। স্বয়ং কৃষ্ণও দেবত্ব-গৌরবে বয়সের প্রাকৃতিক নিয়ম উপহাস ক'রে 'তেজীয়ান্‌ ও অগ্নির মতই সর্ব্বভুক'[৪]। রতিকান্তের প্রসাদপুষ্ট যৌবনোদ্গমে কাব্যসাহিত্যের কুমারী নায়িকা মাত্রেরই[৫] প্রতি অবয়ব এমনই পরিস্ফুট যে তার লালিত্যবিশ্লেষণে পুরুষের মুগ্ধ-মন্থর-দৃষ্টি ত্যাগের বিনা ক্লেশে অঙ্গ থেকে অঙ্গান্তরে যেতে পারে না। তবুও বয়স্থা বলে তাঁরা কেহ-ই বেহায়া নন। তরুণীর লাজমাধুরীর অরুণ আভায় কাব্য-যুগ বিভাসিত। অধুনা লাজনম্রা নব বধূর যে আরক্তিম আলোয় আমাদের কল্পনা আকৃষ্ট করে তাতে প্রাণের আভা নেই। বৈদিক যুগে স্বামীর কাছে এতটা লজ্জার সমাদর ছিল না বরং এবিষয়ে কিঞ্চিৎ লজ্জাহীনতার প্রশংসাই শোনা যায়। বেদে উষাকে আদর করে লজ্জাহীনা বলা হয়েছে। তবে গুরুজন-সকাশে প্রাচীন যুগের আর্য্যবধূগণ ব্রীড়াবনতা হ'তেন। ঋগ্বেদীয় সাহিত্যে[১] বধূর লজ্জাশীলতার সুমধুর নিদর্শনের একটি সুকুমার রেখাচিত্র অঙ্কিত আছে—'তদ্‌যথৈবাদ স্নুষা শ্বশুরাল্লজ্জমানা নীলিয়মানা'—যেন একটি নববধূ শ্বশুরকে দেখে লজ্জায় তাঁর কান্ত তনু মোহন ছন্দের নবীন আবর্ত্তনে অবনমিত কল্লেন। কুমারসম্ভববর্ণিতা পার্ব্বতী সর্ব্বাঙ্গে উল্লসিত যৌবনসজ্জার ও সুচারু ভঙ্গীর উজ্জ্বল আদর্শ। গৌরবান্বিত পিতা হিমালয়ের হাত ধ'রে গৌরী বেড়াচ্ছেন এমন সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল উপস্থিত। দেবর্ষিগণের সঙ্গে পিতা নানা আলাপনে ব্যাপৃত আর কন্যা সকৌতুকে শুনে যাচ্ছেন। কথায় কথায় যখন মহাদেবের সাথে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হ'লো তখন পিতার অঙ্গুলিবন্ধন থেকে পার্ব্বতীর হাত শিথিল হ'য়ে এলো, তাঁর স্বচ্ছন্দচারী দৃষ্টি নিজ ভীরু-হৃদয়ের অন্বেষণে আনতা হলো এবং তিনি আনমনে অবশ করে সন্নিবেশিত লীলাকমলের[২] পাপড়ি-গণনায় নিমগ্না হ'লেন।

১। Ben Lindsey—Revolt of Modern Youth.

২। ভাগবত—১০, ২০ ১২ পরীক্ষিত বল্‌চেন।

৩। G. R. Browning :—Love way Infinite passion and the pain of finite hearts that yearn.

৪। ভাগবত—১০, ৩৩, ৩০—শুকদেব বল্‌ছেন।

৫। দৃষ্টান্ত—কুমার সম্ভব—১, ৩১—৪০ ; ৩, ৫৪—৫৫ ; রঘুবংশ—৬, ৩৯ ও ৮৩।

১। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ - ৩, ১২, ১১।

২। 'লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী'—কুমারসম্ভবম্‌।

কৃষ্ণা

॥যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

কে তাপস প্রতিহিংসাযজ্ঞে
কৃষ্ণবর্ম্মে ঢালিল হবি ?—
কন্যা কৃষ্ণা জাগিয়া বসিল
শিখাশতদলে জন্ম লভি'।
আকাশে হৈল দৈববাণী,—
'জতুগৃহে ওই সন্ধ্যা জ্বলিল,
সাবধান, যত অসাবধানী !'

অবলার দলে তুমি বলবতী
হে দেবি, আপন পুণ্যে পাপে,
আঁকিতে তোমার মর্ম্মের ছবি
ভারত-কবিরও লেখনী কাঁপে।
যুগসঞ্চিত জঞ্জাল জ্বলে
তোমারে পরশি' হে হুতবহ !
যুগান্তরের সর্ব্বনরের,
হে নারি, স্তব্ধ প্রণাম লহ।
শুনিল যেদিন এই ভারতের
উদ্ধতশির ক্ষত্র সবে
তোমারে লভিতে হেঁটমুখে রহি'
আকাশে লক্ষ্য বিঁধিতে হবে।

এল দলে দলে অযুত নৃপতি
স্বয়ম্বরের সে সভাতলে,
তুমি দিলে মালা চীরবাসে ঢাকা
লক্ষ্যবেদ্ধা ভিখারীগলে।
অপরিচিতের পার্শ্বে দাঁড়ায়ে
নির্ভয়ে নারি, হেরিলে তুমি,
যত কাপুরুষ রাজার রক্তে
রঞ্জিত হ'ল পিতৃভূমি।
জগন্নাথের শঙ্খ ধ্বনিল
তব ভিখারীর শ্রবণ-মূলে।
স্বর্গ হইতে বাণেভরা তূণ
নেমে এসে' তার পৃষ্ঠে দুলে !
তব দয়িতের ছদ্ম বীর্য্যে
বিস্মিত হ'ল বিশ্ববাসী,
তুমি বিস্মিত হয়েছিলে কি না
সে কথা জানেনা বেদব্যাসই।

ভিখারীর সাথে ফিরিয়া কুটিরে
শুনিলে—তোমার পঞ্চপতি !
নিশীথ-ঝিল্লী থামিল কাননে,
বিকারবিহীন তুমি গো সতি !

তুমি যে জানিতে—কে আছে পুরুষ
একা ধরে তব পূর্ণ পাণি ?
উঠেছ অনলে নারীর গর্ব্বে
নারীর গর্ভ তুচ্ছ মানি !
বিবাহ-আসনে বামাঙ্গুষ্ঠ
দিলে তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরে,
তর্জ্জনী তুলি' দিলে বৃকোদরে,
মধ্যমা, হাসি' পার্থবীরে ;
ঈষৎ নামায়ে দিলে অনামিকা,
ধরিল নকুল হৃষ্টমনে,
কনিষ্ঠা তব পরশ করিয়া
সহদেব স্বীয় ভাগ্য গণে !
পাঁজি পুঁথি ল'য়ে খুঁজে মুনিগণ
সতীর পঞ্চপতির হেতু,
কল্পনা গাঁথি' জন্ম হইতে
জন্মান্তরে বাঁধিল সেতু ।
কেহ বলে—তুমি তপস্যান্তে
পাঁচবার পতি চাহিয়াছিলে,
ভাংখোর ভোলা দিল পাঁচবর,
তাই পাঁচ পতি ভাগ্যে মিলে ।
কেহ বলে—তুমি অন্য জন্মে
স্বামী লাগি' পুনঃ বসিলে তপে,
পঞ্চদেবতা আসি' এক সাথে
তোমারে তাদের হৃদয় সঁপে ।

সে সব কাহিনী জানি বা না জানি,
তেজস্বিনি গো, তোমারে চিনি,
আপন যোগ্য পুরুষ সৃজিতে
জন্ম জন্ম তপস্বিনী ।
দেবতারা মিলে' গড়িতে পারেনি
তোমার প্রাপ্য তপের নিধি,
তাই গো সাধ্বি, পঞ্চপ্রদীপে
তোমারে আরতি করিল বিধি ।
মাটীর গর্ভে জন্মে যে সতী
সে দিল পরখ অনলে পশি',
অনলকুণ্ডে জন্মিল যে বা
তার সতীত্ব কোথায় কষি ?

রাজসূয়ে যারা কোরেছিল রাণী
জুয়া হারি' তোমা বেচিল তারা,—
হে শিখারূপিণি, না জানি কেমনে
তখনো হওনি ধৈর্য্যহারা !
মর্ম্মান্তিক জাগরণে জাগি'
ফুটিল কি মুখে কুটিল হাসি,
শুনিলে যখন আজ হ'তে তুমি
নূতন রাজার পুরানো দাসী !
দম্ভস্ফীত সে রাজশাসন
কটি হ'তে তব বসন টানে !
হুতাশন হ'তে হুতাশনশিখা
গতাসু বিনা কে ছিনায়ে আনে ?

পুরুষের মাঝে বিবস্ত্রা তুমি,—
ধর্ম্মমেষেরা শাস্ত্র ভাবে !
পুরুষ ছিল কি সেই সভাতলে
যারে দেখে তুমি লজ্জা পাবে ?
শুধু বুঝে' নিলে নরের রাজ্যে
কত নিরুপায় নিখিল নারী ;
প্রমোদরাতে ও রাজার সভাতে
রহিল সমান প্রমাণ তারি।
সেদিন সহসা দিব্যদৃষ্টি
ফুটিল তোমার নয়নপাতে,
দেখিলে চাহিয়া—কোন ভেদ নাই
যুধিষ্ঠিরের, শকুনি সাথে।
কর্ণে পার্থে কি পার্থক্য ?
কি ভেদ দ্রোণে ও দৌবারিকে ?
ধর্ম্ম সে শুধু নরের জন্য,
ফিরেও চাহে না নারীর দিকে।
দুঃশাসনেরই স্বজাতি ভীষ্ম
মর্ম্মে সেদিন বুঝিলে মাতা',—
ক্রুর নগ্নোরু দুর্য্যোধন যে
বিমূঢ় গদারু ভীমেরই ভ্রাতা !
সেদিন আকাশে লিখে দিলে পণ
ক্ষণকটাক্ষে বজ্রভরা—
নরশূন্য না করিলে কখনো
নারীর যোগ্য হবে না ধরা।

তব চক্ষের বিদ্যুজ্জ্বালা
কৃষ্ণমেঘের বক্ষে ফুটে'
দিক্‌চক্রে কি ঘূর্ণা জাগা'ল ?
সারা অম্বর ছিঁড়িয়া লুটে !

বর্ষাবারিত দাবাগ্নিসম
ভ্রম বনে বনে মৌনমুখী,
সহিয়া নারীর সহজ গর্ব্বে
নারীজীবনের সর্ব্ব দুখই।
হীন পরিচয়ে কাটে কতদিন
বিরাটের হীনা রাণীর ঘরে,
কামান্ধ পশু রাজার সভায়
বামপদে তোমা প্রহার করে !
ঘরে কি বাহিরে, হে বহ্নিশিখা,
যেথা জ্বলিয়াছ সুখে কি দুখে,
পতঙ্গসম যত লাঞ্ছনা
ঝাঁপায়ে পড়ে কি তোমারি বুকে !

ঘুরে' যায় চাকা,—দূরে যায় দেখা—
প্রলয়শীর্ষে ছুটেছ রাণি,
পাঁচতুরঙ্গী মনোরথে তব
পাঁচ অঙ্গুলে বল্গা টানি'।
অক্ষৌহিণী অক্ষৌহিণী
কুরুক্ষেত্রে বাহিনী পড়ে,
পড়িল ভীষ্ম, পুড়িল দ্রোণ,
ডুবিল আরুণি, শল্য মরে !

মরে কুরু মরে পাণ্ডবদল
মরে পাঞ্চাল নির্ব্বিচারে,
বালকেরে ঘিরে' মারে সাতবীরে,
নিবারণ সেথা কে করে কারে ?
সেই নরমেধে যজ্ঞ-অগ্নি
জ্বলিছে তুমি যাজ্ঞসেনী,
উড়াইয়া শিরে শিখার শিখরে
পুঞ্জধূমের মুক্তবেণী !
যত নারী যেথা হ'ল লাঞ্ছিতা
প্রায়শ্চিত্ত করিল কুরু,—
রক্তসন্ধ্যা গড়ায় আকাশে,—
কে লুটে ধরায় ভগ্ন-উরু !

তবু কোথা শেষ ? পঞ্চপুত্র
মরিল গুপ্তঘাতক করে,—
কাঁদে ফাল্গুনী, কাঁদে বৃকোদর,
তব চোখে শুধু অগ্নি ঝরে।
তুমি শুনেছিলে—ব্রাহ্মণাধম
মৃত্যুরে নাকি দিয়েছে ফাঁকি,
তাই তব করে মৃত্যু-অধিক
শাস্তি তাহার র'য়েছে বাকি।
দিলে অনুমতি—'নরসর্পের
লাঞ্ছিত শির খড়্গে চিরে'
মিলে যদি মণি আনিবে এখনি,
উপহার দিব যুধিষ্ঠিরে।'
ক্ষতশির সেই অশ্বত্থমা
আজও ছোটে শুনি মাটীর তলে,
অমর তাহার দেহদীপাধারে
কি অনির্ব্বাণ মরণ জ্বলে !

ভারতের নর নিঃশেষ যবে
নারীমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিতে,
কে জানে সেদিন কোন ব্যথা নারি,
জেগেছিল কিনা তোমার চিতে !
সেই সন্ধ্যায় ফিরিলে যখন
শূন্য তোমার দেউল-তলে
কোথা ধূপমালা, উপচারথালা ?
শুধু সে পঞ্চপ্রদীপ জ্বলে।
ম্রিয়মাণ তার পাণ্ডুর ভাতি
কাঁপে মন্দির-অন্ধকারে,
হবিভারে হোমকুণ্ডের শিখা
মূর্চ্ছিত পাশে ভস্ম-আড়ে।
সে প্রদীপে আর সহেনা আরতি,
সে অনলে আর বহেনা হুত ;
বাহিরে ঘনায় অকূল রাত্রি
নিখিল নারীর অশ্রুপ্লুত !
মন্দির ছাড়ি' দাঁড়ালে দুয়ারে
চাহিয়া সে শীত নিশীথ নভে,
দূরে দূরে তারা জ্বলিছে নীরবে
হাতছানি তারা দিল কি সবে ?
বাহিরিলে মহাপথে হে তাপসি,
ললাটে লিখিয়া কিসের লিখা ?
বিশ্বনারীর লাঞ্ছনা, না ও
যজ্ঞশেষের ভস্মটীকা ?

* * * *

বহুযুগান্তে গগনপ্রান্তে
যুগের শঙ্খ বাজিছে ওকি !
তোমারে জাগাতে কে জ্বালে অনল ?
হে কৃষ্ণা, অয়ি কৃষ্ণসখি !

প্রেততত্ত্বে বিজ্ঞানের প্রবেশ

—শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

গত মাসে প্রেততত্ত্বের সঙ্গে আচার্য্য Crookesএর সম্বন্ধ কি তা আলোচনা করা গেছে। এ সম্বন্ধে আধুনিক এক সুপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের এই সম্বন্ধে কি মত তা এবারে জানাবো। উদীয়মান প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে J. B. S. Haldane একজন বেশ নামজাদা ব্যক্তি। মৌলিক গবেষণার দ্বারা প্রাণীতত্ত্বের বিদ্যার ভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে ইনি অনেক সাহায্য করেছেন।

দেহান্তে আত্মার সজ্ঞান অস্তিত্ব নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে নানা মতভেদ দেখা যায়।

(১) একদলতো এরূপ কথাকে পাগলামি বলেই উড়িয়েছেন। এঁরা একরকম আগে হতেই স্থির করে রেখেছেন যে এরূপ ঘটনা অসম্ভব, অবৈজ্ঞানিক। কাজেই কোন পরীক্ষা-প্রমাণে এঁরা কান দেন না।

(২) আর একদল বলেন—দেহান্তে আত্মা সজ্ঞানে থাকে এর প্রমাণ চূড়ান্ত মাত্রায় নিশ্চয়াত্মক। এ নিয়ে আর সন্দেহ করা চলে না; এ তত্ত্ব proved to the hilt.

(৩) আর একদল বৈজ্ঞানিকের position হচ্চে যাকে বলে sitting on the fence বা দুনৌকায় পা দিয়ে থাকা। তাঁরা বলেন—দেহ-ছাড়া আত্মা ভাবতে বা চিন্তা করতে পারে তা তো দেখছি না; আর দেহ ছাড়া হলেই যে আত্মা অজ্ঞান ও অশক্ত হ'য়ে যাবে তারও তো কারণ দেখি না: মোট কথা, আরো নিপুণ পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ দরকার;—সমস্যাটা not sufficiently proved এবং neither unprovable.

(৪) চতুর্থ একদল বৈজ্ঞানিক আছেন তাঁদের মতটা বড় মজার। এঁরা বলেন—"মন" যে জড় হতে উৎপন্ন, বা জড়ের by-product এ অতি অশ্রদ্ধেয় কথা; মস্তিষ্কটা যে জড় পরমাণুরই একটা mixture এ হতেই পারে না; কিন্তু তা বলে রাম, শ্যাম, Harry, Dick, Newton, Napoleon এর ছাপমারা যে বিশেষ মন, এ ধরণের 'মন' যে জড়ের সঙ্গে সম্বন্ধহীন তা নয়; কাজেই জড়দেহ নষ্ট হলে Harry, Dick, নিউটন, নেপোলিয়ন থাকবে না, থাকতে পারে তাদের মূলে যে মন ছিল তাই।

J. B. S. Haldaneএর 'পরলোকতত্ত্ব ধারণা' এই চতুর্থ শ্রেণীর। কথাগুলিতে বিশেষরকম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব আছে। ছেঁটে ফেলে দেবার কথা এগুলি নয়; কাজেই সবিশেষে এই উক্তিগুলির পরিচয় দেওয়া দরকার।

'আমি মরে কোথায় যাব বা কি হব?' এই নামে হাল্‌ডেন একটা প্রবন্ধ লেখেন, তা হতে তাঁর মত ও যুক্তি শোনাই। তিনি লিখছেন,—

মরণান্তে আমার দেহ পঞ্চভূতে লয় হলে আমার কোন অংশ বেঁচে কি টিঁকে থাকবে? অসম্ভব কিছুই নয়, তবে এ পর্য্যন্ত কোন কালেই এটা সঙ্গত বলে মনে হয় নি।

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তো, চৈতন্য নিভে আসে, ইন্দ্রিয়-গুলো অক্রিয় হয়; তার পর সব শূন্য! তবু কেউ কেউ বলেন একেবারে সজ্ঞানে জেগে উঠবো হয় স্বর্গে, না হয় নরকে, কিংবা হয়তো purgatoryতে—

কি করে তা সম্ভব? একটা লাঠির ঘা, ঘোর জ্বর, ক্লোরোফর্ম, অক্‌সিজেনের অভাব বা এমনি কিছুতে তো দেখি মস্তিষ্ক-ক্রিয়া বন্ধ হয়, যন্ত্রের কোথাও একটু কল বেগড়ালে সব শেষ হয়ে যায়।

তবু আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয় যে মস্তিষ্কের সাহায্য ছাড়াও মন থাকে!

মস্তিষ্ক ছাড়া হয়ে মন যে থাকতে পারে এর তিন শ্রেণীর পোষক যুক্তি দেওয়া হয়—

শাস্ত্রীয় প্রমাণ—বাইবেলে এই কথা বলে। কিন্তু বাইবেলে বিশ্বাসের অযোগ্য অনেক কথাই বলে। যেমন পৃথিবী অচলা হয়ে মাঝে আছে, সূর্য্য তাকে প্রদক্ষিণ করছে, ৬০০০ বছর আগে ৬ দিনে বিশ্ব সৃষ্টি হয়ে গেল।

যিশুর দোহাই দেওয়া হয়। যিশু বা অন্যান্য মহাপুরুষের দুটী অংশ থাকে—সাধারণ ও অসাধারণ অংশ। সাধারণ মানুষ হিসাবে তাঁরা স্ব-কালের অনেক ভালমন্দ কুসংস্কার পোষণ করেন। পুরুষানুক্রমে অনেক সংস্কার ও ধারণা তাঁদের মনে এসে জমা হয়, সুতরাং যিশু এ কথা বলতেন বলেই তার প্রামাণিকতা খুব বেশী নয়।

তৃতীয় যুক্তি এই—চিরকাল হ'তে সব যুগে সব দেশে সব লোক এটা মেনে এসেছে এবং দেহান্তে আত্মার অমরত্ব না মানলে ধর্ম্ম ও নীতি থাকে না। এ কথাও অশ্রদ্ধেয়; প্রাচীন Testamentএ আত্মার অমরত্বের উল্লেখ দেখি নাই। Moses Egypt হ'তে এই বিশ্বাস আনেন। সেখানে পরকালের বিশ্বাসের উপরই ধর্ম্মের যত অনুষ্ঠান।

দার্শনিকদের যে প্রমাণ তার কোন বৈজ্ঞানিকতা নাই। যদি পরকাল না থাকবে তা হ'লে কর্ম্মফলানুসারে যে শাস্তি বিধান বা পুরস্কার দান এ জন্মে দেখি না তার কি ব্যাখ্যা হবে? ঈশ্বরের রাজ্যে ন্যায় বিচার থাকে না তা হ'লে। মানুষের idea of justice ও ন্যায়ান্যায় বিচার ও শাসনের আদর্শে ঈশ্বরের বিচার ও শাসন কল্পনা করা হচ্ছে।

Spiritualistরা mediumএর ভিতর দিয়ে যে সব কথাবার্ত্তা আসে তা শুনে মনে করেন আত্মা আছে, কিন্তু এ সব কথাবার্ত্তা হতে দেহান্তগামী আত্মা আছে কিনা তার প্রমাণ হয় না। এ সব মিডিয়মেরই মনের ও মাথার কারচুপিতে হতে পারে!

Psychical Societyতে বিশ্বাসী medium হতে যে-সব চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে, আজ ৩০ বছর ধরে Lodge, Barrett, Richet প্রভৃতি পরীক্ষকরা যে সব সুপরিচালিত পরীক্ষা করেছেন, যার প্রমাণ হতে আত্মার দেহান্ত-স্থিতি ভাল ভাবেই প্রমাণ হয়েছে—তার প্রতি Haldane উপরের উক্তিতে যে খুব ভাল বিচার করেছেন তা মনে হয় না।

যাই হোক তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে কোনো বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ মন দেহান্তে মস্তিষ্ক-সম্বন্ধচ্যুত হয়ে থাকতেই পারে না।

এই বলেই তিনি বিশেষ সিদ্ধান্ত করছেন—

কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমার ব্যক্তিগত মনের নাশ হলেই যে আমার সবই শেষ হল তা হয় না। Haldane রূপে ও নামে যে মন ছিল সে না থাকতে পারে, কিন্তু তার generalised সত্তা তো থাকতে পারে!

আমি এ কথা কিছুতেই মানতে পারি না যে মন-পদার্থ জড়ের যোগাযোগ হতে উৎপন্ন। আমার মনের চিন্তা, ভাবনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি চেতনিক ক্রিয়াগুলি যদি কতকগুলা এটমের ঘসাঘসি মেশামিশি হতে উৎপন্ন হয়, তা হলে তো আমাদের এই সব thoughts ও beliefsএর কোনো পারমার্থিক মূল্যই নাই! রাসায়নিক মূল্য তাদের থাকতে পারে কিন্তু logical মূল্য তাদের কিছুই থাকে না। এ কথা বললে বৈজ্ঞানিকের দশা হয় সেই লোকের মত যে যে-ডালে বসে আছে সেই ডালই কাটছে!

কাজেই মস্তিষ্কটার ক্রিয়া(-জাত চৈতন্য) শুধু কতকগুলা atomএর হুড়াহুড়ির ধাক্কাধাক্কির ফল নয়। মনটা atomএ তৈরী নয় এই কথা। মন জড়ের দ্বারা ঘটিত ও চালিত নয়।

অথচ বিশেষ-মন, specific-মন, (যেমন রামের মন, শ্যামের মন, Platoর মন, যিশুর মন) এইরূপ বিশেষ মন জড়ের সঙ্গে সংযোগেরই ফল। ব্যক্তি-মনের অনেক সসীমতা আছে; ব্যক্তি-মন ঔষধের, বিষের, মদের, ব্যাধির, আঘাতের প্রভাবে ও প্রকোপে বাড়ে, কমে, দুর্ব্বল হয়, তীব্র হয়, উজ্জ্বল হয়, অস্ফুট হয়; এরূপভাবে যে মনের বিকাশ-তারতম্য ঘটে তার জন্য জড় পদার্থই দায়ী; অর্থাৎ সসীম দেহ বদ্ধ হওয়াতেই মনের এই রূপান্তর ঘটে।

তাই আমার ধারণা, দেহ শেষ হ'লে ব্যক্তিরূপী মনের লোপ হয়, কিন্তু অসীম মনের কিছুই হয় না।

অথবা এই বলাই ভাল—সসীম মন, (জীবরূপী মন) তার limitations ছেড়ে ফেলে অসীম যে মন প্রকৃতির বাইরে আছে তাতেই মিশিয়ে যায়; অসীম অনাদি প্রকৃতির বাইরে এক অসীম অনাদি প্রকৃতির 'মন' আছে। 'It will loose its limitations and be merged into an Infinite Mind which I have reason to suspect exists behind nature.'

এবং মানুষের এই ব্যক্তি-মন (specific mind) সেই অসীম মনের সঙ্গে এক।

এই ভাবেই দেহান্তে মনের অস্তিত্ব আমার কাছে সম্ভব ও সঙ্গত বলে মনে হয়। নচেৎ আমি Haldane ভাবেই থাক্‌বো এই যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা এরূপ বিশ্বাস স্বার্থপরতার চরম দৃষ্টান্ত -'a piece of unwarranted self-glorification.'

J. B. S. Haldaneএর philosophy বেদান্তেরই প্রতিধ্বনি। বেদান্ত মতে এক অসীম মনই আছে,

আর প্রকৃতি আছে। এই অসীম মন প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে অসীম-মনে, জীবাত্মায়, ব্যক্তিতে পরিণত হয়; তার যে জীব-ধর্ম্ম তা সব প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ বশতঃই হয়েছে। যখন সে মরে যাবে তখন সেই অনাদি অসীম মন উপাধির limitation হতে মুক্ত হবে। Haldaneএর কথা—it will loose its limitations and be merged into an infinite mind.

উপনিষদের ভাষায়—

যদা নদ্যঃ স্যন্দমানা সমুদ্রে
ইস্তং গচ্ছতি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদবিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষং উপেতি দিব্যং।

নদীরা যেমন নামরূপ ছেড়ে সমুদ্রে মিশে একাকার হয় তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি নাম ও রূপ হতে বিমুক্ত হয়ে পরাৎপর-পুরুষে মিশে যান।

উপরি-বিবৃত Haldaneএর উক্তিগুলি হতে তাঁর পরকাল সম্বন্ধে যে মত তা বুঝা গেল। আর অমি যে টীকা করলাম যে, বেদান্তের জীবব্রহ্ম-সম্বন্ধের সঙ্গে Haldaneএর জীব-মন ও অসীম-মনের সম্বন্ধবোধ, এটা মোটা কথা। Nature বা প্রকৃতির পশ্চাতে অর্থাৎ প্রকৃতি হতে স্বতন্ত্র ভাবে এক cosmic infinite মন আছে সে মন unconditioned। Haldaneএর এই কথা। এঁর মত আসলে দ্বৈতবাদ। বেদান্তে 'মন' একটী product; নির্গুণ চিৎতত্ত্ব প্রকৃতি তত্ত্বের দ্বারা conditioned হলে (=উপহিত হলে) তবে মন হয়। মনের স্বভাব হচ্ছে—feeling, willing, knowing. কিন্তু 'ব্রহ্ম' বা 'পুরুষ' এঁরা বিশুদ্ধ চিৎ-তত্ত্ব, pure awareness. জড়ের সঙ্গে জড়িত হলে অর্থাৎ 'দেহী' হলে তবে 'মন' হয়। জানা, বা ইচ্ছা করা, বা চেষ্টা করা এসব গুণ আসে মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্বন্ধ হলে। যাই হোক Haldane মন বলতে সেই আদিম unconditioned চিৎকেই বুঝছেন।

বেদান্ত হতে Haldaneএর প্রধান ভেদ পরকাল তত্ত্ব নিয়ে।

Haldaneএর কথা হতে বুঝলাম যে নির্ব্বিশেষ অসীম মন দেহ দ্বারা conditioned (উপহিত) হলে জীব-মনে পরিহিত হয়; তার যত বিশেষ ধর্ম্ম ও লক্ষণ ও limitations এসে পড়ে; সে রাম, শ্যাম, Harry, Dick হয়ে দাঁড়ায়। মৃত্যুর পর দেহ-বিমুক্ত হলে আবার সেই মন যে-কে-সেই হয়; ঘটাকাশ মহাকাশে অভেদ হয়।

এই যে পরিণতি, এ সব জীবেরই শেষ পরিণাম। সে পাপীই হোক, পুণ্যবানই হোক; জ্ঞানীই হোক অজ্ঞানীই হোক; Plato ই হন, আর স্ত্রী-ঘাতক Bluebeard ই হোক; Judas ই হোক আর যীশুই হন, সবারই ঐ পরিণাম। Haldaneএর মতে জীব হওয়াতে অগৌরব নাই, এবং দেহান্তে অসীম অখণ্ড মনে পরিণত হওয়ায় গৌরবও নাই।

বেদান্তের পরলোক-তত্ত্ব এত সহজ ও সরল নয়।

যে কারণেই হোক ব্রহ্ম (pure spirit) কোন মতে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে জীব হয়, নির্গুণ চিৎ principle subtle matter নিয়ে একটা দেহ রচনা করে, তারপর জীব লীলা আরম্ভ করে; একটা আসক্তির ভাব, বুদ্ধের ভাষায় 'তৃষ্ণা' 'তন্‌হা' এই জীবত্বের গোড়ার কারণ, ভোগের দ্বারা এই তন্‌হার শক্তি বাড়ে; বাসনাবদ্ধ জীব তার *karmic* force বাড়াতে থাকে; মাকড়শার মত আপনার সূতার জালে আপনি জড়ায়; তারপর যখন তার মৃত্যু হয়, তখন তার স্থূল দেহটাই নষ্ট হয়; subtle matter রচিত সূক্ষ্ম দেহটা যাকে বলে অতিবাহিক দেহ, সেই লিঙ্গ-শরীরটা থাকে, সেটা নষ্ট হয় না; বাসনার শক্তি (তন্‌হা) তার বিজ্ঞান-ধাতুকে দেহের সঙ্গে বেঁধে রাখে; কিন্তু এ দেহ দিয়ে ভোগ হয় না; এ দেহটা শুধু পূর্ব্ব কর্ম্মের জের টেনে নিয়ে গিয়ে নূতন ভোগদেহে বর্ত্তে দেয়। গর্ভে তৈরী হচ্ছে এমন এক দেহতে গিয়ে এই কর্ম্ম-ফলবাহী সূক্ষ্মদেহ-যোগ হয়; যার বলে পুনর্জ্জন্ম হয়।

এইভাবে জন্মের পর জন্ম হতে থাকে কত দিন, কত কাল! যতদিন না সূক্ষ্ম দেহের লয় হয় ততদিন সূক্ষ্ম দেহ লয় হয় কি করে? যখন তন্‌হা বা 'বাসনা' ঘুচে যায়। তন্‌হা বা বাসনার লয় হয় কিসে? যখন এই জ্ঞান হয় যে 'আমি' ব'লে স্বতন্ত্র একটা মন নেই। ছোট ছোট অসংখ্য আত্মা নিত্যকাল হতে আছে, তাদের ভোগ করবার শক্তি আছে, বিষয়-জগৎ তাদের ভোগ্য, এইরূপ অজ্ঞান যতদিন থাকবে ততদিনই একটা প্রবল ভোগ-বাসনা উৎপন্ন হবে, এই

বাসনাই তখন স্থূল পরমাণু সংগ্রহ করে একটা ভোগদেহ গড়ে তোলে। সুতরাং যতদিন না এই শক্তিকে নষ্ট করা হবে ততদিন finite mind এর Infinite এ merged হবার আশা নাই।

এই যে জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানকৃত জন্ম-প্রবাহের মূল রচনা এ বড় সহজ কথা নয়, বহু পুণ্যফলে এই মুক্তির ইচ্ছা আসে।

বুদ্ধদেব যখন বোধিলাভ করেন তখন পুনঃ পুনঃ জন্মলাভের কারণ ধরতে পেরে পরমানন্দে বলে উঠেছিলেন :—

"হে গৃহকারক (তৃষ্ণা) জন্মে জন্মে তুমি এই দেহঘর রচনা করে এসেছ, তোমাকে ধরতে জানতে পারি নি ; এতদিনে তোমার সন্ধান পেলাম আর তোমার দেহ-ঘর রচনা করা চলবে না।"

মতান্তর সত্ত্বেও আজ কালকার একজন বৈজ্ঞানিকের মুখে এই ধরণের কথা শোনাও আশ্বাস-জনক। আত্মা যে জড় হতে দৈবাৎ উৎপন্ন নয়, জীবাত্মা যে বিশ্বাত্মার একটা সাময়িক রূপান্তর মাত্র, এই রূপান্তর যে জড়ের সংস্পর্শে ঘটছে এরূপ কথা উনবিংশ শতাব্দীর পরে বিংশ শতাব্দীতে শোনা খুব বিস্ময়জনক বটে।

'দেহান্তে মন সজ্ঞানে থাকতে পারে না' এই যে Haldaneএর মত, এর সমর্থনে তিনি যে কোন বলবান যুক্তি প্রয়োগ করেছেন, তা পারেন নি। যে যুক্তির অবতারণা তিনি করেছেন, তার সারবত্তা বড়ই কম।

Haldane বলছেন, দেহান্তে আমি সজ্ঞানে যে থাক্‌বো তা একেবারে অসম্ভব না হলেও সম্ভবও যে বটে, তাও তো দেখছি না।

মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হলে, মস্তিষ্ক একটু আঘাত পেলে সঙ্গে সঙ্গেই সংজ্ঞা লোপ হয় ; মৃত্যুর পর তো মস্তিষ্ক একেবারে ধ্বংস হয়, সে ক্ষেত্রে mind কি করে সজ্ঞান হয়ে থাক্‌বে ? অথচ আমাকে বলা হচ্ছে 'মস্তিষ্ক না থাকলেও মন থাকে এটা তুমি বিশ্বাস করো—'

Haldane এই অসম্ভব ব্যাপার কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না।

কিন্তু তিনি এও বলছেন যে জড়বাদীদের মত যা অর্থাৎ জড়পরমাণুর মিশ্রণ হতে মন উৎপন্ন, এ অতি অশ্রদ্ধেয় অসম্ভব কথা। তিনি আরো বলছেন যে মস্তিষ্কটা (জ্ঞানযন্ত্র) শুধু কতকগুলা পরমাণুতেই তৈরী এ অতি ভুল কথা।

আরো বলছেন যে mind is not wholly conditioned by matter ; অর্থাৎ মন তার ক্রিয়ার জন্য পুরামাত্রায় জড় দ্বারা চালিত বা শাসিত নয়। 'মন' যে সর্ব্বরকমে জড়ের অধীন তার কোনো সত্যতা নাই।

উত্তম কথা। মন যদি জড় হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু হয় এবং মনের যদি দেহাতিরিক্ত স্বাধীন সত্তা থাকতেই পারে, তবে দেহান্তে আত্মা বা মন কেন থাক্‌তে পারবে না ?

Haldaneএর হয়তো মনের কথা এই—দেহান্তে মস্তিষ্ক-সংযোগহীন হয়ে 'মন' ব্যক্তিরূপে (আমি অমুক, আমার এই আকার প্রকার স্বভাব ইত্যাদি নামরূপযুক্ততা) থাকে না, তরঙ্গ as water সমুদ্রে মিশে থাকে তরঙ্গ রূপে নয়।

কিন্তু Haldaneএর এই মন যদি অন্য একটা মস্তিষ্ক-যন্ত্রের সঙ্গে কোন রূপে সাময়িক সংযোগ ঘটাতে পারে (seance medium দেহে যেমন ভর হয়) তা হলে তার পক্ষে সজ্ঞানতা লাভ সম্ভব হবে না কেন ?

আসলে Haldane Psychical Research Society র Lodge, Banett, Richet প্রমুখ বড় বড় পরীক্ষকদের পরীক্ষা-ক্ষেত্রে যোগ দেওয়া বোধ হয় দরকার ভাবেননি, কাজেই এবিষয়ে তিনি বেশ অপক্ষপাত ভাবে সুবিচার করতে পারেন নি। Prepossessed বা পূর্ব্ব হতে নিজ সংস্কারের ছাপ নিয়ে দুচারটে প্রেত-বৈঠকে বসে খুসী না হয়ে চলে এসেছেন—এসে verdict দিয়েছেন,—এই সব seance এর ফল বেশীর ভাগ fraud প্রতারণা, ফাঁকি, কোন প্রমাণই ভাল দিতে পারে না যে ব্যক্তির আত্মা দেহান্তে থাকে।

ধৈর্য্য ধরে যাঁরা প্রাণপণ যত্নে ও পরিশ্রমে আজ ৪০ বছর ধরে নানা রকমে নানা ভাবে পরীক্ষা করে আসছেন তাঁদের মতামতের যা মূল্য তা বুঝতে একটু সাধনার দরকার একথা তাঁর মত লোকের বোঝা উচিত।

ঝড়

—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

সদর দরজায় গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই আনন্দের একটা কলরোল উঠিল। ছোট ছেলেপুলেরা এবং বাড়ীর অন্যান্য সবাই হৈ চৈ করিয়া প্রায় পথের উপরেই নামিয়া আসিল, আজ দশ বছর পরে তাহাদের ছোট কাকা বিলাত হইতে ফিরিলেন। কয়েকদিন ধরিয়া দীর্ঘ প্রতীক্ষা করিয়া সকলে ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিল; ছেলেরা স্কুলে যায় নাই, ফুটবল খেলিতে বাহির হয় নাই, ঘুড়ি উড়াইতে ছাতে উঠে নাই—কেহ বা তাহার ছোট কাকাকে জন্মাবধি দেখে নাই, কেহ বা বাল্যকাল হইতে তাঁহার নামই শুধু শুনিয়া আসিতেছে। তাহাদের ছোটমাসী শিবানীর ত এমন হইয়াছে যে সেলাইয়ের কাজ করিতে গেলেই অন্যমনস্কে তাহার হাতে ছুঁচ ফুটিয়া যায়। কি একাগ্র অপেক্ষা, রুদ্ধনিশ্বাসের কি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাকুলতা, দিন যেন আর কাটে না। এই যুবকটিকে লইয়া এ বাড়ীতে নানান্ গল্প, বহুল আলোচনা, তর্কবিতর্ক, কলহ ও মনোমালিন্য। এ লোকটি তাহাদের পরিবারের উপাস্য দেবতা, রহস্য ও বিস্ময়!

মোটর আসিয়া দরজায় থামিতেই একটি বয়স্ক যুবক প্রায় লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। বলিষ্ঠ, সুপুরুষ, লাবণ্যময় শ্রী ও হাস্যমুখ। মাথার চুলগুলি ঘন বেগুনী রেশমের মত,—অগোছালো, উচ্ছৃঙ্খল; চোখ দুইটি অস্থির, অস্থির বলিয়াই সুন্দর। চঞ্চল ভঙ্গীতে কোথাও জড়তা ও সঙ্কোচ নাই, থাকিবার কথাও নয়,—দ্রুত এবং চকিত। নিমেষমাত্র তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ শিবানীর যেন ধাঁধাঁ লাগিয়া গেল, সে দাঁড়াইতেই পারিল না, ভিতরে তখনই ফিরিয়া আসিল।

বৌদিদি বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ভবেশ তাঁহার হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া কহিল, বৌদি, বাপ্‌রে বাপ, একেবারে ভারিক্কে হয়ে গেছ দেখছি! চিঠি পেয়েছিলে? আরেকটু আগেই আমি আসতাম, একটা হোটেলে উঠেছি। কেমন আছ বল? এরা কে, ক'টি ছেলেপুলে তোমার এখন বৌদি? আরে বাব্বু, তোমার নাম কি?'

ছোট একটি ছেলেকে ছোঁ দিয়া সে কাঁধে তুলিয়া লইল।

বৌদিদি কহিলেন, 'চেনাই যায় না ভাই তোমাকে। কি ছেলে বাবা, একটু মায়া মমতা নেই, সেই কুড়ি বছর বয়সে বিনা টিকিটে জাহাজে চড়ে' পালিয়েছিলে, তারপর কত বিপদ, ঝড় লাগল সমুদ্রে, জাহাজ থেকে নামিয়ে দিল—'

হা হা করিয়া ভবেশ হাসিল, বলিল, 'বিপদেই ত আমার পথ বৌদি··সেদিন ত জানো সাঁতরে গিয়ে উঠলাম এক দ্বীপে কিন্তু সেখান থেকেও তাড়া করল নেটিভরা, ঝাঁপিয়ে আবার গিয়ে পড়লাম সমুদ্রে, সে এক দিন!'

ছোট ছেলেমেয়েরা নিশ্বাস রোধ করিয়া গল্প শুনিতেছিল। বৌদিদি ভবেশের হাত ধরিয়া ভিতরে আনিতে আনিতে কহিলেন—'কি কঠিন ছেলে ভাই তুমি, কত রাত ভেবে ভেবে আমাদের ঘুম হয়নি!'

ভবেশ হাসিয়া কহিল, 'বিপদ নিয়েই আমার আয়ু। বুদ্ধি আর শক্তির পরীক্ষা বার বার আমায় দিতে হয়েছে। কথনো হেরিছি, কখনও জিতেছি।'

আদরে অভ্যর্থনায় উল্লাসে সমস্ত বাড়ীটা প্লাবিত হইতে লাগিল। কলরব, কোলাহল, হাসির শব্দ, আত্মীয়-স্বজনের আনাগোনা, মোটর হর্ণের আওয়াজ, ছেলেমেয়েদের ছুটোছুটি, সমস্ত লইয়া সবাই যেন দিশাহারা হইয়া গেল।

'শাকের তরকারি রেঁধো কিন্তু বৌদি, আর মোচার ঘণ্ট, আর ডুমুর ভাজা। পেটের মধ্যে আমার নানা জাতের পশু-পক্ষীর বাসা, এবার বসে বসে দিন কতক বন-জঙ্গল খাবো। ওখানে কে দাঁড়িয়ে বৌদি?'

বৌদিদি কহিলেন, 'ভুলে গেছ ওকে? ওযে আমার ছোট বোন, শিবানী?'

শিবানী এতক্ষণ আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহার দিদির এই একমাত্র দেবরটির ইতিবৃত্ত শুনিতে শুনিতে বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ নিজের নাম শুনিয়া সে ধীরে ধীরে দরজার একটু পাশে সরিয়া গেল। কিন্তু দিদির কথা শুনিয়া তাহাকে নিকটে আসিয়া পুনরায় দাঁড়াইতেই হইল।

ভবেশ মুখ তুলিয়া তাহার প্রতি হাসিয়া কহিল, সেই এতটুকু মেয়ে দেখে গিছলাম, রোগা দুরন্ত মেয়ে, ডাক নাম খুকি না বৌদি?'

শিবানী কহিল, 'সে নামে যেন আর ডাকবেন না।'

ভবেশ আবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'তা সত্যি,—ডাকতে গেলে বাধবে।'

শিবানী স্নিগ্ধ হাসিয়া কুটনো কুটিতে গিয়া বসিল।

বৌদিদি কহিলেন, 'মা ছিলেন, আজ তিন বছর হলো তিনিও নেই। মামার ওখানে শিবানী থাকতে চাইল না, আমার এখানেই আনলাম। আর ভাই বাঙালীর ঘর, আঠারোয় পড়েছে, দেখলে জ্বর আসে। সামনের অঘ্রাণেই—'

ভবেশ কহিল, 'বিয়ে দেবে নাকি?'

বৌদিদি কহিলেন, 'বিয়ে ত একটা দিতেই হবে ভাই!'

গলা বাড়াইয়া ভবেশ কহিল, 'কি শিবানী, এমনি করে হাত পা বেঁধে এরা তোমার বিয়ে দেবে, তুমি প্রতিবাদ করবে না?'

শিবানী লজ্জায় রাঙা হইয়া স্মিত মুখে আলুর খোসা ছাড়াইতে লাগিল, একটি কথাও বলিতে পারিল না।

বৌদিদি কহিলেন, 'ও ভাই তোমার বিলিতি মত, বিয়ে না করে কি করবে?'

ভবেশ কহিল, 'পড়াশুনা করুক না বৌদি আরো দু' পাঁচ বছর?'

'আর পড়াশুনো! ও সেই কি-জানি ফাষ্ট বুক পর্য্যন্ত পড়েছিল; বাংলা মন্দ জানে না।'

ভবেশ কহিল, 'ইংরেজি জানলেই শিক্ষা হয় তা বলিনে। শিক্ষা হয় বয়স দিয়ে, অভিজ্ঞতা দিয়ে।'

তাহার পর কত গল্পই হইল। কত রাজ্যের কথা, কত দুর্দ্দান্ত কাহিনী। আরব দস্যুর গল্প, বরফের দেশের ইতিহাস, স্বাধীন মানুষের বিচিত্র জীবন, যুদ্ধের চিত্রকথা, মেয়েদের নূতন নূতন আন্দোলন, একপাশে বসিয়া শুনিতে শুনিতে শিবানী মুগ্ধ হইয়া গেল। মনে হইল, একটা তীব্র আলোক-রশ্মির দিকে তাকাইয়া তাহার দৃষ্টি যেন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার চিরদিনের মূর্ত্তিমান বিস্ময় এই ভবেশ বাবুটি যেন সমগ্র পৃথিবীটাকে করতলগত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

মোটর ফিরিয়া গিয়াছিল, ঠিক বেলা দুইটার সময় আবার আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া হর্ণ দিল। ভবেশ পায়জামা পরিয়া ও সার্ট-কোট চড়াইয়া প্রস্তুত হইয়া বলিল, 'এখন যাই বৌদি, আবার আসবো। কে কে যাবে আমার সঙ্গে 'হাত তোলো।'

ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই হাত তুলিল, এবং হাত তুলিয়া আর অনুমতির অপেক্ষা করিল না, হৈ চৈ করিয়া মোটরে গিয়া উঠিয়া বসিল। ভবেশ বলিয়া গেল, ঘণ্টা দুই পরে তাহাদের ঘুরাইয়া আনিয়া দিবে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাহার বড় প্রিয়।

তাহাই হইল, বেলা চারটে নাগাৎ আবার সবাই ফিরিয়া আসিল। কত ফুল, খেলা, ছোটছেলের মোটর গাড়ী, জাপানী ফানুস, চকোলেট্ ও শিশুপাঠ্য বই তাহারা হাতে করিয়া আনিল। এবার শিবানীর পালা, কাপড় চোপড় পরিয়া সে প্রস্তুত হইয়াই ছিল, এবার তাহাকে ঘুরাইয়া আনিতে হইবে।

'তুমিও চল বৌদি?'

বৌদিদি কহিলেন, 'উনি যে বাড়ী নেই, এরা রয়েছে। যাবো যাবো, বেশ করে' একদিন আমায় বেড়িয়ে আন্‌বে ভাই। শিবু, রাত হয় না যেন ফিরতে।'

ড্রাইভার বসিল পিছনের সিট্-এ। শিবানী পাশে বসিল। ইতিমধ্যে কেমন করিয়া যেন তাহার লজ্জাটুকু ভাঙিয়া গিয়াছে, বেশ সহজ হইয়াই সে বসিল।

ভবেশ নিজেই চালাইতে সুরু করিল। বেপরোয়া তাহার মোটর চালনা; দ্রুতগতি, ভয় নাই, কেহ চাপা পড়িবে গ্রাহ্য নাই, কোথায় চলিয়াছে লক্ষ্য নাই! শিবানীর চুলগুলি বাতাসে বিস্রস্ত হইয়া গেল, বিপদের আশঙ্কায় সর্ব্বশরীর ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল, দ্রুতগতির একটা অস্বাভাবিক নেশায় চক্ষু দুইটি তাহার অল্পকালের মধ্যেই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। এই লোকটির নামই সে শুনিয়া আসিয়াছে, আত্মীয় বলিয়া বহুদিন ধরিয়া সে বার বার স্মরণ করিয়াছে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়াছে, ইহার দুরন্ত জীবনের প্রতি কতকাল ধরিয়া সে একটি অকারণ সহানুভূতি ও মমতা পোষণ করিয়া আসিয়াছে, অথচ ইহাকে চিনে না, জানে না, পরিচয় নাই, দুর্ব্বোধ্য ইহার চরিত্র, রহস্যময় ইহার গতিবিধি!

'শিবানী?'

গলা পরিষ্কার করিয়া শিবানী জবাব দিল, উ?'

'কেমন লাগ্‌চে?'

শিবানী কম্পিত কণ্ঠে কহিল, 'বেশ লাগচে। আস্তে আস্তে মোটর চালান্ ভবেশ বাবু, বিপদ ঘটবে যে!'

'আস্তে আস্তে আমি চালাতে পারি না যে!' ভবেশ কহিল।

আবার কিয়ৎক্ষণ চুপচাপ। হেলিয়া দুলিয়া বাঁকিয়া মোটর খানা বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। বুঝি বা কোন্ সর্ব্বনাশা মুহূর্ত্তে একটা বিপদ ঘটিয়া বসে!

'শিবানী?

'কি বলচেন?'

তোমাকে আমি কাঁধে নিয়ে ঘুরতাম, তুমি তখন এতটুকু। তোমার মনে নেই ত?'

শিবানী কহিল, 'না।'

'আমাকে মনে ছিল?'

'একটু একটু মনে ছিল।'

ভবেশ কহিল, 'আমিও তোমাকে নতুন করে' দেখতে চাই শিবানী, তুমি কী হয়ে আছো বল ত? কী আশা নিয়ে?'

শিবানী চুপ করিয়া রহিল। ভবেশ পুনরায় কহিল, 'এমন মেয়ে তুমি নষ্ট হয়ে যাবে? বিদ্রোহ করতে পারো না? নিজের স্বাধীন বুদ্ধি নেই? স্বাধীন মন?'

শিবানী এবার ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, 'কি করব বলে দিন?'

'সে-পথ তোমার নিজের, নিজেই তোমাকে খুঁজে নিতে হবে। মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে বলতে পারো না যে, তোমাদের ব্যবস্থা আমি মুখ বুজে মেনে নিতে পারব না? তোমার কি প্রতিবাদ নেই?'

এই লোকটার ধারালো তীক্ষ্ণ কথার যন্ত্রণায় শিবানী চোখ বুজিল। অত্যন্ত স্পর্শ-কাতর তাহার অন্তর। মনে হইল, এই লোকটি তীরের ফলা দিয়া তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া নিদ্রিত রক্তকে জাগাইয়া তুলিতেছে। সে যেন কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল।

বড় একটা রাস্তার উপর একটা হোটেলের সুমুখে আসিয়া মোটরখানা ঝাঁকানি দিয়া থামিল। দুইজনে নামিয়া আসিতেই গেটের চাপরাশি সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। পিছনে পিছনে ভিতরে ঢুকিয়া শিবানী দেখিল, জন চারেক ফিরিঙ্গি ও মেম হোটেলের একদিকে বিলিয়ার্ডস্ খেলিতেছে। চারিদিকে কাচের আসবাব, সুন্দর রঙীন পানীয়, বিচিত্র আহার-সামগ্রী সুসজ্জিত, সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীপুরুষরা এক এক-খানা টেবল্ লইয়া বসিয়া খানা খাইতে খাইতে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছে,—বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, পোষাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর—সমস্ত মিলিয়া শিবানীকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। হঠাৎ একটা নূতন পৃথিবী যেন তাহার চোখের সম্মুখে খুলিয়া গেল।

ভবেশ তাহার হাত ধরিয়া একটা পার্টিশানের মধ্যে চেয়ার টানিয়া বসাইল। নিজেও বসিল। বয় আসিয়া একখানা 'মেনু' দিয়া গেল। ভবেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'কি খাবে বল?'

খাইবার কথা শিবানী ভুলিয়াই গেছে। এমন একটা বিস্ময়কর জায়গায় কি লোকে খাইতে আসে? সে কহিল, 'কিছু খাবো না।'

'তাই কি হয়? আচ্ছা আমিই অর্ডার দিচ্ছি'

অর্ডার মত আহার আসিল, পানীয় আসিল। পানাহার সম্বন্ধে ভবেশের বাদ-বিচার নাই। আহারাদি করিয়া দাম চুকাইয়া বক্‌শিস দিয়া আবার তাহারা বাহিরে আসিয়া মোটরে উঠিল।

পথ এবার বেশী দূর নয়, একটা সিনেমায় আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। শিবানীর আর কোনো হাত নাই, নিষেধ নাই, অনিচ্ছা-প্রকাশের কোনো সুযোগ এবং তাগিদ নাই, সে যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট কিনিয়া দুইজনে ভিতরে ঢুকিল। ছবি দেখানো সুরু হইয়াছে। তাহারা নিজের জায়গায় গিয়া বসিল। ভবেশের কোনো গ্রাহ্য নাই, হুঁস নাই, সঙ্কোচ নাই, এ যেন তাহার খেলা, এ যেন তাহার অবকাশের স্বাভাবিক বেপরোয়া আনন্দ!

ছবি শিবানী অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া সে আর কোনোদিন দেখে নাই। ছবিখানার ঘটনা, চরিত্র, তত্ত্ব, রস, সমস্তটা যেন তাহার রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল, নিশ্চল ও নিঃশব্দ একখণ্ড পাথরের মত সে ভবেশের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল।

রাত নয়টা আন্দাজ সে বাড়ী ফিরিল। ভবেশ দরজা পর্য্যন্ত আসিল কিন্তু ভিতরে আর ঢুকিল না, সময় ছিল না, তাহাকে আবার একটা কোন্ পার্টিতে গিয়া মিলিতে হইবে।

ভিতরে গিয়া দিদিকে খবর দিয়া শিবানী উপরে উঠিয়া গেল। মাথাটা তখন তাহার ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। বিছানায় গিয়া সে শুইয়া পড়িল, মনের পুঁজি তাহার যেন সমস্ত খরচ হইয়া গিয়াছে। উৎসাহ নাই, শক্তি নাই, উত্তেজনা ফুরাইয়াছে, শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া সে এলাইয়া পড়িল। এই কয় ঘণ্টা ধরিয়া সে যেন কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ফিরিয়াছে।

রাত্রে সে ঘুমাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চোখ বুজিতে পারিল না। সমস্ত শহরটা, হোটেল্, সিনেমা, মোটরের পথটা, সেই আলো, বিগত কয় ঘণ্টার এই প্রগল্ভ জীবন—সমস্তটা যেন অন্ধকারে তাহার দৃষ্টির সম্মুখে হাততালি দিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। গত দিনের সহিত আজকার দিনের কি প্রভেদ! কাল সে ছিল শিষ্ট, শান্ত, স্বল্পভাষিণী, সপ্রতিভ, গৃহগতপ্রাণ, পরিবারের সকলের বাধ্য। আজ সকাল পর্য্যন্ত সে নিজের জীবন সম্বন্ধে একটি কথাও ভাবে নাই; শুধু জানিত তাহার বিবাহ হইবে, শ্বশুরবাড়ী যাইবে, সংসার করিবে, সাধারণের একজন হইয়া থাকিবে। সামান্য তাহার লেখাপড়া, যৎকিঞ্চিত তাহার শিক্ষা, অকিঞ্চিৎকর তাহার স্বপ্ন,—অনভিজ্ঞ, অর্ব্বাচীন কিন্তু আজ এই রাত্রে? মনে হইল তাহার স্বভাবটা পর্য্যন্ত যেন হঠাৎ বদলাইয়া গিয়াছে, নিজেকে আর চিনিবার উপায় নাই, প্রকাণ্ড একটা ধাক্কায় যেন তাহার অচলায়তন চূরমার হইয়া গেল, বাহিরের ঝড় যেন ভিতরে ঢুকিয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত, বিশৃঙ্খল ও ছন্নছাড়া করিয়া দিল। সে শিবানী যেন আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে।

তিন চারিদিন আর বিরাম রহিল না, বিশ্রাম রহিল না। ধীরে সুস্থে ভাবিবার অবকাশ নাই, প্রস্তুত হইয়া দিদি ও জামাইবাবুর অনুমতি লইয়া বাহির হইবার সময় নাই,—শিবানীকে ছুটিয়া চলিয়া আসিতে হয়। শুধু শিবানীই নয়, ভবেশের চারিদিকে গ্রহ-উপগ্রহের সংখ্যাও কম নয়। আজকাল তাহার বন্ধু ও বান্ধবী ছাড়া যেগফ্ কোম্পানীর একটি ফিরিঙ্গী যুবক ও গোটা দুই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ মেয়ে-টাইপিষ্ট্ জুটিয়াছে। তাহাদের হাঁটিতে বলিলে ছুটিয়া চলে। শিবানী তাহাদের একান্তে ভবেশের পাশে পাশে থাকে।

কিন্তু তবু ভবেশের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সে কেবল স্ফূর্ত্তিবাজ এবং চটুল স্বভাবের হইলেও না-হয় তাহাকে বোঝা যাইত, কিন্তু তাহা নয়, ইহাদের সকলের অনিত্যতার পিছনে তাহার নিজস্ব একটি দার্শনিক মতবাদ রহিয়াছে। সে অন্ধ নয়, অসচ্চরিত্র নয়, অথচ অত্যন্ত সচেতন। তাহার ক্ষুরধার বিদ্রূপ, সুতীব্র ব্যঙ্গ, মর্ম্মান্তিক শ্লেষ, অকরুণ উপহাস,—ইহারা ছিল তাহার মুখাগ্রে। সে নিজেকে ক্ষমা করে না বলিয়া অন্য কাহাকেও ক্ষমা করিতে পারিত না, এ তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তবু সে ভদ্র, শিক্ষিত, ও সুমার্জ্জিত।

শিবানীর জামাইবাবু অঘোরনাথ একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, এত বড় মেয়ের এমন অবাধ স্বাধীনতা তিনি পছন্দ করেন না। সকল পাত্রেই যে সকল বস্তু রাখা যায় না, এ তিনি বিশ্বাস করেন। মুখে তিনি কিছু বলিলেন না বটে কিন্তু মনে মনে ভবেশের আওতা হইতে তাঁহার এই সুশৃঙ্খল সংসারটিকে সামলাইবার কথা ভাবিতে লাগিলেন।

কিন্তু অনেক দেরী হইয়া গিয়াছিল, শিবানীর ফিরিবার আর পথ রহিল না। তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া দিদিকে চিন্তিত করিয়া, বোন-পো এবং বোন ঝিগুলির প্রতি উদাসীন হইয়া সে প্রতিনিয়ত ভবেশের মোটরে করিয়া বাহির হইয়া যায়। পথের প্রতি, জনসমারোহের প্রতি, দ্রুতগতির প্রতি, উগ্র আনন্দ এবং উজ্জ্বল জীবনের প্রতি তাহার কেমন একটা মোহ ধরিয়া গিয়াছে। এই লোকটার প্রচণ্ড ও ভয়াবহ আকর্ষণ তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়। ভবেশকে, তাহার চিরদিনের এই স্বপ্নপুরুষটিকে তাহার ভয় করে, ভয়ানক ভয়, তাহাকে দেখিলে গা কাঁপে, চোখে আবিল অন্ধকার নামিয়া আসে কিন্তু তাহাকে ছাড়িবারও উপায় নাই, ছাড়িয়া সে যাইবে কোথায়? যে-নদীর স্রোতে সে ভাসিয়াছে, সে-নদীর বেগ যে উদ্দাম, ভাসিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায়ই নাই! নিজের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া মোটরে বসিয়া মাথাটা তাহার পিছন দিকে হেলিয়া পড়ে।

'শিবানী?'

শিবানী মুখ তুলিল। গিয়ার-হুইলটা একটু ঘুরাইয়া ভবেশ হাসিয়া বলিল, 'দাদা, বৌদিদি—ওঁরা রাগ করেছেন নয়?'

শিবানী বলিল, 'হুঁ। আমাকে একজনরা কাল দেখতে এসেছিলেন, না পেয়ে রাগারাগি করে' চলে গেছেন!

আপনার সঙ্গে আর আমার বোধ হয় বেরুনো হবে না ভবেশবাবু।'

ভবেশ আবার হাসিল। বলিল, 'এ অতি সত্য কথা শিবানী, ওদের দোষ নেই। আমার এ দুর্দ্দম জীবন—এ ওদের সইবে কেন?'

শিবানী চুপ করিয়া রহিল। ভবেশ পুনরায় কহিল, 'কিন্তু আমি তোমারই আশা করি শিবানী। তোমার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা, অনেক স্বপ্ন—একদিন তোমার মাথা যেন সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠতে পারে। কত বিপদ, কত বাধা, তা হোক্। সমুদ্র দেখে যেন ভয় পেও না, তার ঢেউয়ের ওপর ভেসে বেড়িও, তাকে জয় ক'রো। জীবনকে লোকারণ্যে ছড়িয়ে দিও শিবানী, তাতে বড় আনন্দ!

'আপনি কি করবেন এখন ভবেশবাবু?'

'আমি? কিছু না! ছুটে যাওয়াই আমার নেশা, ছুটে চলাই আমার কাজ। থামলেই আমার চারিদিকে জঞ্জাল জমে ওঠে। শিবানী, আমি আশা করে' থাকবো, মানুষ হয়েও তুমি একদিন মানুষকে ছাড়িয়ে যাবে, কেমন?'

শিবানী ঘাড় নাড়িয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মোটর এত জোরে ছুটিতেছিল যে হাওয়ায় তাহার চোখ বুজিয়া আসিতেছে। শুধু কম্পিত কণ্ঠে এক একবার বলিতেছিল, 'আস্তে, আস্তে চালান ভবেশবাবু, এখুনি বিপদ ঘটবে।'

কিন্তু আস্তে চালানো ভবেশের রীতি নয়।

আজও একটা হোটেলে গিয়া দুইজনে ডিনার খাইতে বসিল। রাত সাড়ে আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ভিতরে মহাসমারোহে তখন জ্যাজমিউজিক্ সুরু হইয়াছে। বিলোল বিস্রস্ত আনন্দ, চারিদিকে প্রখর আলো, কাচের গেলাসের আওয়াজ, পোষাক পরিচ্ছদের চমকপ্রদ পারিপাট্য, টাকার ঝনঝনানি, সোডার বোতলের শব্দ, কলহাস্য, ইঙ্গিত ও ইসারা এবং ইহাদেরই মাঝখানে কয়েক জোড়া স্ত্রীপুরুষের বলনাচ। নাচের তালে তালে এক একবার বাজনা বাজিয়া উঠিতেছে। মানুষের নিদ্রিত, বিস্মৃত যৌবনকে উন্মত্ত নেশায় খোঁচাইয়া জাগাইয়া তোলাই ইহাদের সার্থকতা। শিবানীর চোখ বন্ধ হইয়া আসিল।

সেদিন বাড়ী ফিরিতে তাহার অনেক রাত্রি হইয়া গেল। তাহার পর দুই দিন আর ভবেশের দেখা নাই। একবার হাতছাড়া হইয়া গেলে তাহাকে ফিরিয়া পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। শিবানী বাড়ীর মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সমস্ত দিনমানের অশান্তি, সমস্ত দীর্ঘ রজনীর অস্বস্তি। সংসারের কাজ তাহার ভাল লাগে না, ফাই-ফরমাসে তাহার বিরক্তি, পরম আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া সে প্রহরের পর প্রহর গণিতে লাগিল।

কি যন্ত্রণাদায়ক প্রতীক্ষা! তাহার ব্যাকুল দুইটা চক্ষু এই বিশাল রাজধানীর জনকোলাহলের মধ্যে ভবেশকে খুঁজিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে হায়রাণ হইয়া গেল। তাহার চঞ্চল রক্তের মধ্যে যেন আগুন ধরিয়া গিয়াছে, একটা অপরিণামদর্শী উচ্চ আশা তাহার শিরায় শিরায় রঙীন মদের মত প্রবাহিত হইয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই লোকটা, এই দায়ীত্বজ্ঞানহীন ভবেশ, তাহার এই শ্রদ্ধেয় আত্মীয় এ লোকটা করিল কি? মনে হইল ভবেশ তাহাকে সংসারের আশ্রয় হইতে শ্যেনপক্ষীর মত ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া শূন্য ব্যোম-পথে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বেড়াইতেছে, নাবিবে কি রাখিবে তাহার ঠিকানা নাই!

কি যন্ত্রণাদায়ক প্রতীক্ষা! মুহূর্ত্তের পর আর মুহূর্ত্ত কাটিতে চায় না। সমগ্র পৃথিবী নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া যেন তাহার পথের দিকে চাহিয়া আছে। এ তাহার কি হইল? অন্তরে যে বিপ্লব মাতামাতি করিয়া উঠিল, ইহাকে সাম্‌লাইবে সে কেমন করিয়া? পারিবারিক জীবনের ছন্দ ডিঙাইয়া যে-জগতে লাফাইয়া পড়িয়াছে, এখান হইতে ফিরিবার ত আর পথ নাই। সে ত বেশ ছিল! সুন্দর শান্ত জীবন, ভাবী স্বামীর সংসারের সুখকল্পনা, ছোট ছেলেমেয়েদের লইয়া ছেলেখেলা; অবসর সময়ে সাময়িক পত্রের গল্প ও কবিতা লইয়া আনন্দ, সকলের স্নেহের পাত্রী হইয়া গৌরব-গর্ব্ব, এমন কাম্য জীবনকে সে হারাইল কি করিয়া? তাহার সেই দৈনন্দিন জীবনের সহিত অন্তরে অন্তরে ওই সর্ব্বনাশা চরিত্রটির কোথায় অলক্ষ্য যোগসূত্র ছিল? ক্ষণমাত্র খেলা করিয়া যাহার চলিয়া যাইবার ক্ষণটি ঘনাইয়া আসে, তাহাকে সে গোড়া হইতে চিনিতে পারে নাই কেন?

বাড়ীর মধ্যে একটা অত্যন্ত বিরুদ্ধ আবহাওয়া বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এ বাড়ীতে ভবেশের স্থান নষ্ট হইতে দেরী হইল না। ভবেশ মানব-সমাজের অনভিপ্রেত ধাতু দিয়া

তৈরী, সে অসহনীয়। তাহাকে লইয়া গল্প করাই চলে, ঘর করা চলে না। আপন বাসস্থানে আগুন লাগানোই তাহার কাজ। সেই জন্য জীবনে তাহার আশ্রয় জুটে নাই, বন্ধন-হীনতাই তাহার রূপ।

তা হোক সে অভিশপ্ত, হোক সে পরিণাম-চিন্তাহীন, তবু তাহার অভাবে শিবানীর চলিবে না। যে উজ্জ্বল জীবনের সম্ভাবনার কথা সে বলিয়াছে তাহার একটা স্পষ্ট পথ-নির্দেশ ওই লোকটার নিকট হইতে বুঝিয়া লইতেই হইবে। উহার ছায়া, উহার আশ্রয়, উহার প্রভাব ও পরিবেশ—ইহাদের অবহেলায় ত্যাগ করিয়া শিবানী কাঙাল হইতে চাহে না। নিজের জীবনকে নিজে সে সৃষ্টি করিবে বটে কিন্তু ওই যুবকটির কাছে আছে সেই জীবনের গোপন তত্ত্ব।

বাড়ীর একটা শাসন তাহার উপর উদ্যত হইয়াছিল, বিনা অনুমতিতে সদর দরজায় পর্য্যন্ত যাওয়া তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তবু সে একদিন লুকাইয়া বাহির হইয়া পড়িল, শাসন সে মানিবে না। পিছনের সমাজের বন্ধন ছিঁড়িয়া তাহাকে বিদ্রোহ করিয়া বড় হইতে হইবে, আত্মোপলব্ধি করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। বড় রাস্তাটা ধরিয়া সে দ্রুতপদে একদিকে চলিতে লাগিল। বেলা তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। হাঁটা পথ সে জানে না, সে জানে মোটরের পথ। সাহস করিয়া সে একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া চড়িয়া বসিল। কাপড়ের তলা হইতে জামাইবাবুর মণিব্যাগটা বাহির করিয়া দেখিল, অনায়াসে সে এখন কয়েকটি টাকা খরচ করিতে পারে। ভবেশের নিকট টাকা লইয়া জামাই-বাবুকে আবার ফিরাইয়া দিলেই চলিবে।

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট দিয়া চৌরঙ্গীর মোড়ে আসিয়া সে মোটর হইতে নামিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিল। কিন্তু তাহার পর কোনদিকে যাইবে? পথ যে জানা নাই! সহস্র সহস্র চক্ষুর লুব্ধ দৃষ্টির ভিতর দিয়া সে একদিকে চলিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া বাঁ দিকে ঘুরিল। ভয় ও সঙ্কোচ তাহার ছিল, কিন্তু কোথায় যেন একটা উল্লাস সে অনুভব করিতে লাগিল। এমন করিয়া একাকিনী নিজের সহিত তাহার আর কোনোদিনই পরিচয় হয় নাই, কত রাস্তা, কত দোকান, কত হোটেল ও সিনেমা সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। মুখখানি রাঙা, চোখ দুটি চকিত, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত, এবার সে চারিদিকে চাহিয়া ভীত হইয়া উঠিল। এই জনারণ্য এবং অসংখ্য অট্টালিকার জটলার ভিতর হইতে কেমন করিয়া সে সেই নিষ্ঠুর অন্তর-দেবতাটিকে খুঁজিয়া বাহির করিবে? পা দুটা ক্লান্ত হইয়া উঠিল, উত্তেজনা ফুরাইয়া আসিল, এখন এই মুখে বাড়ী ফিরিয়া সে কি বলিয়া দাঁড়াইবে? মণিব্যাগ চুরি করিয়া বাড়ী হইতে সে পলাইয়া আসিয়াছে, অন্তঃপুরের মেয়ে সে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভদ্রকন্যা সে, কি বলিয়া সে সকলের নিকট মুখ দেখাইবে? কেন সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে? কি উদ্দেশ্যে? কি তাহার লক্ষ্য? ভবেশকে খুঁজিতে বাহির হওয়া যে একটা অত্যন্ত দুর্ব্বল অছিলা, সমস্ত চিন্তা করিয়া তাহার পা কাঁপিতে লাগিল। ইহার পর যদি কেহ তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে তবে তাহার কি বলিবার থাকিবে?

'হালো শিবানী? এখানে দাঁড়িয়ে, ওপরে উঠে যাওনি যে? এই ত আমার হোটেল্!'

মোটর হইতে নামিয়া ভবেশ আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিল। তাহার পিছনে পিছনে একটি পরমা-সুন্দরী ইংরাজ যুবতীও হাসিতে হাসিতে আসিয়া দাঁড়াইল।

উত্তর দিতে গিয়া অভিমানে শিবানীর ঠোঁট দুইটি একবার কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু ভবেশ আর কথা বলিবার সময় দিল না, যুবতীটির সহিত শিবানীর পরিচয় করাইয়া দিয়া দুইটি মেয়ের হাত ধরিয়া সে ভিতরে ঢুকিল। সম্মুখেই লিফ্ট্, তাহার ভিতর তিনজন ঢুকিতেই একটা লোক চাবি টিপিয়া দিল। শিবানীর মনে হইল, তাহার পায়ের তলা আল্‌গা হইয়া যাইতেছে! তিনতলায় আসিয়া লিফ্‌ট্ থামিল। সকলে বাহির হইয়া আসিয়া বারান্দার সম্মুখে একটা ঘরে প্রবেশ করিল। যুবতীটি হাসিয়া আদর করিয়া শিবানীকে একটা চেয়ারে বসাইল, এবং ইংরাজিতে বলিল, 'ওই দুষ্টু লোকটি তোমার প্রিয়তম বুঝি? তোমার দুর্ভাগ্য!'

শিবানী ইহাদের কথাবার্ত্তায় যোগ দিতে পারিল না, শুধু সলজ্জ ও সঙ্কুচিত হইয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

পাশের ঘরে গিয়া ভবেশ একটা নূতন সুট্ পরিয়া আসিল। তারপর কহিল, 'জিনিস পত্র একটু পরে যাবে, কি বল মলি?'

মলি বলিল, 'হ্যাঁ, এখন তাড়াতাড়ি চল। It is getting nearly three-thirty, make haste.'

ভবেশ কহিল, 'তুমি বুঝি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে শিবানী, এসে ভালই হয়েছে।'

'আপনি কোথাও যাবেন বুঝি?'—শিবানী শুষ্ক কণ্ঠে কহিল। মলি বলিল, 'Yes, yes, do you like to accompany us? W'll be far away within a few hours."

ভবেশ কহিল, "Naughty girl, keep quiet She is not a flying bird, as you are.'

'What she is?"

'She is what you are not.'

'Thank you.' বলিয়া মলি পা নাচাইয়া উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, সে একটু আঘাত পাইয়াছে!

শিবানী কথা বলিবার সময়ই পাইল না। ছোট একটা ব্যাগ হাতে করিয়া মলির হাত ধরিয়া ভবেশ আবার নীচে নামিয়া আসিল। শিবানী আসিল পিছনে পিছনে। মনে হইল, ইহারই মধ্যে আবার মলির সহিত ভবেশের আপোষ হইয়া গিয়াছে।

হাসিয়া কৌতুক করিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া যখন ভবেশ মোটরে উঠিয়া মলির পাশে গিয়া বসিল, এবং যখন সে দেখিল ভবেশ আজ আর তাহাকে ভিতরে তুলিয়া লইল না, তখন শিবানী হঠাৎ ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, 'ভবেশবাবু, কোথায় চললেন?'

ভবেশ হাসিমুখে অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় কহিল, 'আমরা এখন যাবো কলম্বো, এরোপ্লেনে করে, সেখান থেকে—

'কবে ফিরবেন?'—শিবানীর গলা কাঁপিয়া উঠিল।

'ঠিক নেই, কলম্বো থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে চায়নার দিকে যাবো। বৌদিদিকে বলো শিবানী, কবে আবার দেখা হবে বল্‌তে পারি নে।'

আর একটু কথা বলিবারও সময় দিল না, মলির ইঙ্গিতে হুস করিয়া মোটরখানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। কেবল কিছুদূর গিয়া ভিতর হইতে একবার মুখ বাড়াইয়া ভবেশ বিদায়ের হাসি হাসিল।

শুধু নির্দ্দয় নির্ম্মম বলিয়াই তাহাকে আখ্যাত করা যায় না, শুধু দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অপরিণামদর্শী বলিয়াই তাহাকে মার্জ্জনা করা চলে না,—আধুনিক কালের যে ছন্নছাড়া উচ্ছৃঙ্খল যৌবন এই পৃথিবীতে পাপ, অন্যায়, দুর্নীতি ও দুঃশাসন আনিয়াছে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই পশু-প্রকৃতি যুবকটি তাহার অতি নিকৃষ্ট উদাহরণ। ইহাদের দুরন্তপণার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াই জগৎ-সমাজের এত বড় শোচনীয় অধঃপতন!

শিবানীর নড়িবার শক্তি রহিল না। মোটরের শব্দ, ট্রামের ঘর্ঘর আওয়াজ, পথের গোলমাল, অসংখ্য মানুষের আনাগোনা—ইহাদেরই একান্তে দাঁড়াইয়া এই নিরুপায় সর্ব্বস্বান্ত মেয়েটির দুই চোখ দিয়া হু-হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বাংলার পরিচিত পাখী

ছাতারে

—শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

ছাতারে পাখীকে শুদ্ধভাষায় "সাত ভাই" বলা হয় এবং উত্তর ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই এই নামে সে পরিচিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পার্থক্যটা স্মরণ রেখেই বোধ হয় ইংরাজ এর নামকরণ করেছেন—Seven Sisters. এই নামকরণের কারণ এই যে এরা কখনও একলা বা দোকলা বিচরণ করে না। সংখ্যায় পাঁচটি থেকে সাতটি পাখী এক একটি দলে দেখা যায়। অতএব এরা যে খুব সামাজিক প্রকৃতির পাখী তা সহজেই বোঝা যায়। এতখানি সামাজিকতার সঙ্ঘবদ্ধতার কারণটাও সহজেই অনুমেয়। পাখীটার শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে যে এর শরীরে যেন কোনও বাঁধুনি নাই। গদীয়ান বাবুটির মত চেহারা ঢ্যাপ্‌সা, নাদুসনুদুস; পালকগুলি যেন শরীরে কোনও মতে লেগে আছে,—একটু নাড়া দিলেই বোধ হয় ঝরে পড়বে। একটু বাতাস হ'লেই দেহের পতত্রগুলি বাতাসে উড়তে থাকে। মনে হয় এই বুঝি খ'সে পড়ল। অন্য পাখীর ডানাদুটি পৃষ্ঠের সঙ্গে নিপুণভাবে বসান থাকে। এর ডানা দুটি আল্‌গা ভাবে যেন লাগান। পুচ্ছটি শরীরের ধূসরতার চাইতে একটু গাঢ়তর বর্ণের। আর এমনভাবে শরীর থেকে ঝুলছে যেন এই খুলে পড়ে আর কি। কোনও শীকারী পাখীর থপ্পরে পড়লে এই শিথিলগঠনের পাখীটি জীবনের জন্য মোটেই সংগ্রাম করতে পারে না। কাজে কাজেই দলবদ্ধ হ'য়ে থাকা ছাড়া এদের উপায় নেই—তবু ধড়ে একটু প্রাণ থাকে, নিঃশঙ্ক বিচরণ করা চলে। গুপ্ত আততায়ীর অকস্মাৎ আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অনবরত সতর্কতা অবলম্বন ক'রে একাকী আহার অন্বেষণ করা চলে না। আবার যা খাওয়া যায় তাও বোধ হয় সহজে হজম হয় না। কিন্তু দলবদ্ধ হয়ে থাকলে ছয় সাত জোড়া চোখ অনবরত যেখানে চারদিকে পাহারা দিচ্ছে, সেখানে অকস্মাৎ বিপত্তির সম্ভাবনা ক'মেই যায়।
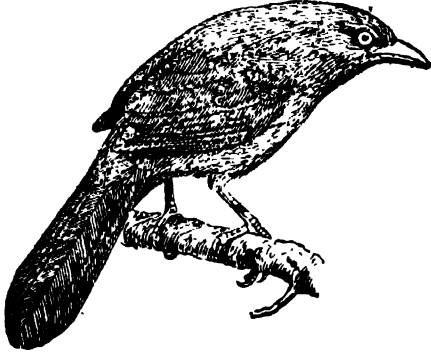
ছাতারে

এরা কেন দল বেঁধে থাকে তার কারণতো নির্দ্দেশ করা গেল। একটা প্রশ্ন এখানে স্বতঃই এসে পড়ে। এই দলগুলি কিরূপভাবে গঠিত হয়? প্রত্যেক দলের সব কয়টা পাখীই কি এক মায়ের সন্তান; অথবা, বিভিন্ন পিতামাতার সন্তানগণ বড় হয়ে সহজবুদ্ধিবশে দলবদ্ধ হ'য়ে পড়ে এবং দুই তিনটী দম্পতি একসঙ্গে বসবাস করে? এ প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয় নাই। কারণ এর যথার্থ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে হ'লে যে ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন, তা এখনও কেউ স্বীকার করেন নাই। যদি একই পিতামাতার সন্তান এরা হয়, তবে যৌনমিলন হয় কি ভাইবোনে? কোনও কোনও পক্ষি-পণ্ডিতের মতে এরা বোধ হয় একটি কুলীন পরিবার, এক ভর্ত্তা আধডজন পত্নী নিয়ে ঘর করছে। কিংবা বহুপতিত্বও এদের মধ্যে প্রচলিত থাকতে পারে—এক দ্রৌপদীর পাঁচ কি ছয় পাণ্ডব সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে।

এদের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কর্কশ এবং একটিমাত্র ধ্বনিই এদের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়। এবং এই নিতান্ত রসহীন ধ্বনি সারাক্ষণ সাতভায়ের কণ্ঠ থেকে নির্গত হচ্ছে। এই কলরবপ্রিয়তার জন্য ইংরাজ একে babbler বলেন। অনবরত ফ্যাচ ফ্যাচ করে বলে পূর্ব্ববঙ্গের স্থান বিশেষে একে "ফেচো" বলে। (সাধারণতঃ কিন্তু ফিঙ্গেই ফেচো নামে অভিহিত হয় বলে আমরা জানি)। দুর্ব্বলের অস্ত্র হচ্ছে বাক্‌পটুতা, তারা সাধারণতঃ "মুখেন মারিতং জগৎ।" ছাতারেও এই ভাবেই জীবন কাটায়। এদের বাক্যবাণের অজস্র ধারাপাতে অনেক শত্রুই বোধ হয় পলায়ন করে। প্রায়শঃ দলবদ্ধ পাখীদের মধ্যে কলরবপ্রিয়তা লক্ষিত হয়। আহার অন্বেষণ করতে করতে দলভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ার সম্ভাবনা সব সময়েই থাকে। ডাক শুনেই এরা যূথভ্রষ্ট হয় না। ওদের কাকলীর মধ্যেই আহ্বান ও সতর্কীকরণের ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়। এদের খুঁজে বের করতে কোনও পাঠককেই বেগ পেতে হবে না কেননা এরা নিজের অস্তিত্ব বেশ জোর গলাতেই প্রচার করে কলিকাতা নগরীর মহাকোলাহলের মধ্যেও এদের মহাকলরব সুস্পষ্ট শোনা যায়।

এদের কণ্ঠের কোনও সুষমাতো নেইই, দেহেও এদের কোন বর্ণসমাবেশ নাই। দেহের নিরবচ্ছিন্ন এই ধূসরতায় এদের কোনও ক্ষোভ আছে বলে মনে হয় না। কামলা-রোগীর চোখের মত ফিকে হলদে ঠোঁট আর সাদা চোখ এদের অবয়বের বৈচিত্র্য মোটেই বৃদ্ধি করে না—বরং এদের

চেহারাটাকে হাস্যোদ্দীপক ক'রে তোলে। এ বিষয়ে ভারতীয় পক্ষী-বিশেষজ্ঞ ফ্র্যাঙ্কলিন্ এক মজার গল্প বলেছেন। একবার নাকি কোনও এক বড়লাট ভারতে নূতন পদার্পণ ক'রে আগ্রায় তাজমহল দেখতে গিয়েছিলেন। সেই মর্ম্মরস্বপ্নের সম্মুখে উপনীত হ'য়ে পারিষদবর্গ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে লাট সাহেবের মুখোচ্চারিত প্রশংসাবাণীর অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু সে বাণী যখন বের হোল, তা শুনে সকলে হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়লেন, কি উত্তর দেবেন কিছুক্ষণ কেউ ঠাহর করতে পারলেন না। কারণ লাটসাহেব একদল ছাতারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বলে উঠ্‌লেন—"what are those funny birds"? কোথায় মর্ম্মর-রচিত প্রেমোচ্ছ্বাস আর কোথায় ছাতারে পাখী! রসিকজন এই লাটসাহেবের রসবোধ সম্বন্ধে কি বলবেন জানিনা। তবে মহাজনের দৃষ্টান্তদ্বারা ছাতারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার শক্তির অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল!

ছাতারের উৎপতন-ভঙ্গীরও কোন বিশেষত্ব নাই। দুর্ব্বল ডানায় ভর করে সে বেশী উড়তেও পারে না। এক সঙ্গে ৪০।৫০ গজের বেশী সে উড়ে যেতে সক্ষম নয়। তবে মাটির উপর সে বেশ ক্ষিপ্র। যুগ্মপদে উল্লম্ফন করতে করতে সে অতি দ্রুত গমন করতে পারে। শালিকের সঙ্গে এর চলনভঙ্গীর পার্থক্য লক্ষ্য করবার বিষয়।

দলবদ্ধভাবে বাস করে ব'লে পরস্পরের মধ্যে যে এদের কলহ-বিরোধ হয় না তা নয়। এত বাক্যবাগীশ যারা তাদের মধ্যে যে মাঝে মাঝে মতান্তরের সৃষ্টি হবে তাতে সন্দেহ কি? ভূগর্ভোত্থিত কোনও সুরসাল কীট বা পতঙ্গ নিয়ে মাঝে মাঝে কলহ দ্বন্দ্বে পরিণত হয় তা লক্ষ্য করেছি, তবে এই মতান্তর স্থায়ী মনান্তরে পরিণত হয় না। বিপদের সময় এরা সবাই একমত—পরস্পরকে সাহায্য করতে এরা সকল সময় প্রস্তুত। The Tribes on my Frontier পুস্তকের লেখক বলেন—"নিজেদের মধ্যে এরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝগড়া মারামারি করবে; মেছুনীদের মত অশ্রাব্য ভাষা পরস্পরের প্রতি প্রয়োগ করবে। কিন্তু অপর কেউ যদি এদের সঙ্গে লাগতে আসে, দলশুদ্ধ তখন জোট বেঁধে দাঁড়ায়।"

সাধারণতঃ পাখীর দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করার অভ্যাসটা যতই প্রকৃতিগত হোক, প্রজনন-ঋতুতে তাদের জোড়ায় জোড়ায় পৃথক পৃথক বাসা রচনা ক'রে বাস করতেও আমরা দেখেছি। বাসা নির্ম্মাণ, ডিম পাড়া, ডিমে তা' দেওয়া, সন্তানকে খাইয়ে দাইয়ে বড় ক'রে আবার তারা বৈঠকী জীবন যাপন করতে আরম্ভ করে। কিন্তু ঐ সব প্রয়োজনীয় কাজের সময়ে কেউ কারও সঙ্গে মেশে না—স্ত্রীপুরুষেই আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করে। ছাতারে কিন্তু প্রবসঋতুতেও দল বেঁধে বাস করে। এখানে সমস্যা এই যে, ছয় সাতটি পাখীর দলে যদি দুই কি তিনটি দম্পতি থাকে তারা কি ভিন্ন ভিন্ন বাসা তৈরী কোরে পৃথক পৃথক গৃহস্থালী পাতে, না সকলে মিলে একই বাসায় ডিম্ব রক্ষা করে? এ রহস্য এখনও সম্যক উদ্‌ঘাটিত হ'য়েছে বলে আমরা শুনি নাই। এরা যে কমিউনিজমের পক্ষপাতী সেটা সম্ভব হ'লেও হ'তে পারে, কারণ কোনও কোনও স্থানে এক ছাতারের বাসায় ঊর্দ্ধ সংখ্যায় আটটা ডিমও পাওয়া গিয়েছে। একটা ছাতারে চারটে কি বড় জোর পাঁচটা ডিম পাড়ে—তার বেশী এদের ক্ষমতায় কুলায় না। ডেওয়ার সাহেব আবার বলেন যে তিনটি ছাতারেকে তিনি একই বাসায় খাবার নিয়ে নিয়ে বাচ্চাদের খাওয়াতে দেখেছেন। এদের বাসাগুলিতে কোনও পারিপাট্য নেই, তবে এদের ডিম্বগুলি সুচিক্কণ ও সুন্দর নীলবর্ণ।

ছাতারে অতি সঙ্গোপনে ঝাপে ঝোপে ঘনপত্রবীথির মধ্যে কিংবা খুব পল্লববহুল বৃক্ষে বাসা নির্ম্মাণ করে। কেউ যাতে বাসার সন্ধান না পায় সে জন্য এরা সর্ব্বদাই খুব সতর্ক থাকে। অন্যান্য পাখীর বাসা খুব সহজেই বের করা যায়। আহার অন্বেষণে নিরত কোনও পাখীকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলে, সে যখন আহার্য্য নিয়ে বাসায় ফিরবে তখন তার বাসা আবিষ্কৃত হবে। কিন্তু একই বাসার মালিক ছয়সাতটি ছাতারের যেটির পশ্চাদ্ধাবন করবেন, সেটিই আপনাকে ভিন্নপথে বাসা থেকে বহুদূরে নিয়ে ফেলবে। ছাতারে যদি দেখে কেউ তার গতিবিধি লক্ষ্য করছে, সে কখনও বাসায় ফিরবে না। পূর্ব্বে যে ইংরাজী পুস্তিকার উল্লেখ করেছি তার লেখক বলেন—"একবার ছাতারে আমাকে খুব জব্দ করেছিল। এরা বোধ হয় আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল। একটা গাছে সেই জন্য এক নকল বাসা নির্ম্মাণ ক'রে ফেল্‌ল। আমি যখন গাছে উঠ্‌লাম পাখীগুলার মধ্যে কি হাসির রোল!"

আমাদের দেশে অনেকেই জানেন যে কোকিল বায়সকে দিয়ে নিজ সন্তানকে পালন করায়। কিন্তু পাপিয়াও যে কোকিলের মত অন্যপুষ্ট সে কথা হয়তো বহুলোক জানেন না। পাপিয়া ছাতারের বাসায় আপনার ডিম্ব রক্ষা কোরে তাদের দ্বারা সন্তান লালন পালন করিয়ে নেয়। কাক কোকিলের চৌর্য্যবৃত্তি ধরতে পারে না, অথচ কোকিলের উপর তার বিজাতীয় বিদ্বেষ, কোকিল দেখলেই সে তাড়া করে। ছাতারে পাখীও পাপিয়া দেখলেই মহাকলরব তুলে অকথ্য গালাগালি দিতে দিতে তাকে তাড়া করে। প্রহারের ভয়ে না হোক, বাক্যবাণের ধারাপাতে অতিষ্ঠ হ'য়ে পাপিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়।

ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ

-ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

শিরোনামা

Argumento o Disputa sobre a Ley entre hu Christao ou Catholico Romano, e hu bramene ou Mestre dos gentios; em que se mostra na lingua bengalla a falsidade da seita dos gentios, e verdade infallivel da nossa Sancta Fe Catholica, em que so ha o caminho da Salvacao eo Conhecimento da verdadeira Ley de Deos

জনৈক খৃষ্টান অথবা রোমান ক্যাথলিক ও জনৈক ব্রাহ্মণ বা হিন্দুদিগের আচার্য্যের মধ্যে শাস্ত্রসম্পর্কীয় তর্ক ও বিচার, ইহাতে বঙ্গভাষায় হিন্দু ধর্ম্মের অসারতা ও আমাদের পবিত্র ক্যাথলিক ধর্ম্মের অভ্রান্ত সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে, একমাত্র এই ধর্ম্মেই মুক্তির পথ ও ভগবানের প্রকৃত বিধানের সম্বন্ধ আছে।

Composto, por aquelle grande Cathequista Cristao, qe Converteo tantos gentios, Chamados D. Antonio, filho do Rey de Busna.

বুষণার রাজার পুত্র দোন আন্তোনিয়ো নামক বিখ্যাত খৃষ্টান প্রচারক (যিনি বহু হিন্দুকে দীক্ষিত করিয়াছেন) কর্ত্তৃক বিরচিত।

Vertida em Portuguez pelo Pe Fr Manoel da Assumpcao Religioso da Congregacao dos Eremitas de Santo Agostinho da India, natural da cidade d' Evora, sendo actualmente Reitor da Missao de Bengalla para os Missionarios poderem disputar na dita lingua com os bramanes e gentios. Vai por modo de dialogo entre o Romano Catholico e hu bramanne gentio.

যাহাতে মিশনারী প্রচারকেরা উক্ত ভাষায় (বঙ্গ) ব্রাহ্মণ ও হিন্দুদিগের সঙ্গে বিচার করিতে পারেন তাহার জন্য ভারতীয় সাধু আগস্থিনো সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসী বাঙ্গালার প্রচারক মণ্ডলের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ এভোরা সহরনিবাসী পাদ্রী ভাই মানুয়েল দা আসুম্প্সাও কর্ত্তৃক পর্ত্তুগীজ ভাষায় অনূদিত। রোমান কাথলিক এবং ব্রাহ্মণ হিন্দুর মধ্যে কথোপকথনের আকারে লিখিত।*

Bramane.—Tomi care bhoso ?
ব্রাহ্মণ।— তুমি কারে ভজো ?

Rom.—Poromexorere Purno Bromere
রোমঃ।— পরমেশ(শ্ব)রেরে পূর্ণো ব্রমে(হ্ম)রে

B.—Tobe tomora boro utom bhosona bhoso, amora tahare bhosi.
ব্র।—তবে তোমোরা বরো উত(ত্ত)ম ভজোনা ভজো, আমরা তাহারে ভজি।

R.—Zodi tomora xei Purno Bromere bhoso tobe queno eto cubit[1] cudhoran[2] nana odhormo bhosona deqhi ?
রো।—যদি তোমোরা সেই পূর্ণো ব্রমে(হ্মা)রে ভজো তবে কেনো এতো কুবিত কুধরাণ নানা অধর্ম্মো ভজোনা দেখি ?

B.—Tomi emot guia(n) monto hoia amardiguer Poromexorere ninda coroho ? ehate tomardiguer xast oparniman nahi ?
ব্র।—তুমি এমত গিয়া ন) মোন্তো হইয়া আমাদিগের পরমেশ(শ্ব)রেরে নিন্দা করহ ? এহাতে তোমারদিগের শাস্ত্রে অপরনিমান[3] নাহি ?

R.—Amarghore xastre liqhiasen ze zon dhormo ninda core, xe boro naroqui; ebons[4] ze zon odhormere dhormo bole xe moha naroqui.
আমারগোর শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যে জন ধর্ম্মো নিন্দা করে, সে বড়ো নারোকী এবং যে জন অধর্ম্মেরে ধর্ম্মো বলে সে মহা নারোকী।

B.—Tobe to tomardiguer xastre * * ze
ব্র।—তবে তো তোমাদিগের শাস্ত্রে * * যে

1. হয়ত পাদ্রী সাহেব কুৎসীত পড়িতে ভুল করিয়া কুবিত লিখিয়াছেন।

2. শেষ অক্ষর m কি n স্পষ্ট বোঝা যায় না। n হওয়াই বেশী সম্ভব।

3. লিপিকর প্রমাদ। প্রকৃত পাঠ, অপরিণাম। মন্দ পরিণাম অর্থে পূর্ব্ব বঙ্গের কথিত ভাষায় এখনও অপরিণাম শব্দ প্রচলিত আছে।

4. অন্ত্যাক্ষর লিপিকর প্রমাদ বলিয়া মনে হয়।

* এইখানে কিয়দংশ ছিন্ন।

* বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নমুনা হিসাবে এই 'ব্রাহ্মণ-রোম্যান-ক্যাথলিক-সংবাদ' মুদ্রিত হইল। পর্ত্তুগালের এভোরা পুস্তকালয়ে রোম্যান অক্ষরে লিপিবদ্ধ অবস্থায় ইহা সযত্নে সংরক্ষিত আছে। ডন্ অ্যান্টনিয়ো নামে বাঙ্গালী খৃষ্টানের সহিত জনৈক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ধর্ম্মসম্পর্কে বাদানুবাদ ইহার বিষয়-বস্তু। সংগ্রাহক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন বাঙ্গলায় রোম্যান অক্ষরের রূপকে বাঙ্গলা করিয়া দিয়াছেন। সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য আমরা মৌলিক পাণ্ডুলিপিতে যেমন লিখিত আছে, তাহার সহিত প্রত্যেক শব্দের নীচে মূল বাঙ্গলা শব্দটি মুদ্রিত করিলাম। এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ ডক্টর সেন কর্ত্তৃক আগামীতে লিখিত হইবে। পর্ত্তুগীজে লিখিত শিরোনামার বাঙ্গলা অনুবাদও দেওয়া হইল। উঃ সঃ।

ninda corile moha(r) naroqui hoe; tobe
নিন্দা করিলে মহা(হ) নারোকী হএ; তবে
queno ninda corila?
কেনো নিন্দা করিলা?

R.—Amito dhormo ninda corina, dhormer
রো।—আমিতো ধর্ম্মো নিন্দা করিনা, ধর্ম্মেরে
dhormo cohi; odhormore odhormo cohi;
ধর্ম্মো কহি; অধর্ম্মেরে অধর্ম্মো কহি;
puniore punio cohi; zononire[6] zononi cohi;
পুণ্যোরে পুণ্যো কহি; জননীরে জননী কহি;
strire stri cohi; Bromere Bramon cohi;
স্ত্রীরে স্ত্রী কহি; ব্রমে(হ্ম)রে ব্রহ্মণ কহি;
Chondalere chondal cohi; dhugdere dhugdo
চণ্ডালেরে চণ্ডাল কহি; ধু(গ্ধ)গেদরে দুগ্ধ
cohi; Gochonere gochona[7] cohi; Omertere
কহি; গোচোনেরে গোচোনা কহি; অমেরতেরে
omerto cohi; bixere bix cohi; emot cothae
অমেরতো কহি; বিষেরে বিষ কহি; এমত কথাএ
punio bade pap nahi; ehate protoquie no
পুণ্যো বাদে পাপ নাহি; এহাতে প্রতেক্ষে না
zanile dhormadhormo zanite na pare;
জানিলে ধর্ম্মাধর্ম্মো জানিতে না পারে;
porinam(e) mucti na hoe eha na zanile, e
পরিণামে মুক্তি না হএ এহা না জানিলে, এ
caron ehare ninda na cohi.
কারোণ এহারে নিন্দা না কহি।

(3) B.—Eto ze tomi cohila, eha amare
(৩) ব্র।—এতো যে তুমি কহিলা, এহা আমারে
prothoquie buzhaiba; quintu dhormadhormo
প্রত্যক্ষে বুঝাইবা; কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মো
tini loaen, dhormo tini odhormo tini.
তিনি লওয়াএনে, ধর্ম্ম তিনি অধর্ম্ম তিনি।

R.—E xocol protoqhie buzhaibo zemot
রো।—এ সকোল প্রত্যক্ষে বুঝাইবো যেমত
ziguaxa coroho; dhormadhormo tini loaen
জিজ্ঞাসা করহো; ধর্ম্মাধর্ম্ম তিনি লওয়াএন
na, dhormo carzio corite xastor diassen
না, ধর্ম্মো কার্য্য করিতে শাস্তোর দিয়াছেন
tahan crepae, amora (O) dhormo carzio
তাহান ক্রেপাএ, আমরা (আহা) ধর্ম্মো কার্য্যো
coria tahan xastre longona[8] coria pap cori;
করিয়া তাহান শাস্ত্রে লঙ্গনা করিয়া পাপ করি;
tin xastrete bemoti deen, Pixonio,[9] Bhut ar
তিনি শাস্ত্রেতে বেমতি দেন, পিশুন্যো, ভুত আর
xorir; ei xocol bromia tahan odhormo
শরীর; এই সকল ব্রমিয়া তাহান অধর্ম্মো
amora cori; ei ze dhormadhormotonuxare
আমরা করি; এই যে ধর্ম্মাধর্ম্মতোনুসারে
bhog diben xoto carzio cori, tobe mucti
ভোগ দিবেন সৎ কার্য্যো করি, তবে মুক্তি
diben; oxoto carzio cori, tobe cumoti diben
দিবেন; অসৎ কার্য্যো করি, তবে কুমতি দিবেন,
oxoto carzio cori tobe moha noroque Zom
অসৎ কার্য্যো করি তবে মহা নরোকে যোম
tarona diben, tini odhormo nohen (4) tini
তারোণা দিবেন, তিনি অধর্ম্মো নহেন (৪) তিনি
quebol poromo dhormo Raz tahan tthay
কেবোল পরমো ধর্ম্মো রাজা তাহান ঠাই
ozotharth nai,
অযোথার্থ নাই।

B.—Exocol cotha oti biloqhon; ehar
ব্র।—এসকোল কথা অতি বিলক্ষণ; এহার
moidhe amardiger xastor cohi, ei xoto
মৈধে (মধ্যে) আমারদিগের শাস্তোর কহি, এই সৎ
quaz. Zanami dhormong nocho me probirti;
কায। জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবির্তি;
zanami odhormo nocho me nibriti, toa
জানামি অধর্ম্মো নচ মে নিবৃতি, তয়া
Rhixiquexo Rhidixthiteno zotha nizotoxi
ঋষীকেশো ঋদিস্থিতেন যথা নিযোতোসি
totha coromi, ei xoloque tini rhidoe thaquia
তথা করোমি, এই শোলোকে তিনি হৃদয়ে থাকিয়া
zaha loaen taha hoe[10] cori, odhormo ba
যাহা লওয়াএন তাহা হয় করি, অধর্ম্মো বা
qui, dhormo ba qui taha na zani bole ze ami
কি, ধর্ম্মো বা কি তাহা না জানি বোলে যে আমি

6. পাদ্রী সাহেব পূর্ব্ব-বঙ্গের উচ্চারণ অনুযায়ী "জ" ও "য"এর প্রভেদ লোপ করিয়াছেন।

7. গোমূত্র।

8. লঙ্ঘন।

9 পৈশুন্য।

10. হয়—হী। তাহা হয় করি—হী তাহাই করি। পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রচলিত ভাষায় এইরূপ ব্যবহার এখনও দেখা যায়।

zanina dhormo asse qeiba na, ebong odhormo
জানিনা ধর্ম্মো আছে কিবা না, এবং অধর্ম্মো
asse quiba na, zemon poromexor bolen
আছে কিবা না, যেমোন পরমেশর বলেন
temon ami cori xorire thaquia odhormo
তেমোন আমি করি শরীরে থাকিয়া অধর্ম্মো
zanina, dhormo zanina ; ehar bichar coho
জানিনা, ধর্ম্মো জানিনা ; এহার বিচার কহো
amare e bedhar[11] cotha.
আমারে এ বেধের কথা।

R.—Hoe eha buzhaibo, xompoti[12] tomar
রো।—হএ ইহা বুঝাইবো, সম্পতি তোমার
xastrer mote buzhai, ehate coto buzho?
শাস্ত্রের মতে বুঝাই, এহাতে কাতো বুঝো ?
zodi Poromexor tomare loaiten pap corite
যদি পরমেশ্বর তোমারে লওয়াইতেন পাপ করিতে
tobe queno (5) tomar xastre paper xasti
তবে কেন (৫) তোমার শাস্ত্রে পাপের শাস্তি
liqhe ? Gobodh Brombodher matri gomoner
লিখে ? গোবধ ব্রম(হ্ম)বধের মাতৃ গমোনের
gomancho[13] bhoqhoner xurapan ar idiadi
গোমাংসো ভক্ষণের সুরাপান আর ইত্যাদি
zoto ? Poromexorer aguaie ze carzia cori
যতো ? পরমেশরের আজ্ঞাএ যে কার্য্যো করি
tahar purazhinio[14] queno ami coribo ? Amar
তাহার পুরাঝিন্ত (?) কেনো আমি করিবো ? আমার
oporad que ? tahan aquiae ami cori. Tini
অপোরাদ কি ? তাহান আজ্ঞাএ আমি করি। তিনি
Dhormoraj hoia emot obichar coriben ?
ধর্ম্মোরাজ হৈয়া এমত অবিচার করিবেন ?
Munixier moidhe ze razar aguiae chor
মুনিষ্যের মৈধে যে রাজার আজ্ঞাএ চোর
dhacaiter, ebong pitar mostoq catte tahare
ঢাকাইতের, এবং পিতার মস্তোক কাটে তাহারে
seiia[15] Razai e operadi ; taha(r) matha catte
সেইয়া রাজাই এ অপেরাদী ; তাহা(র) মাথা কাটে

na ; ze e oporad tahar nohe. Monixe, ze
না ; যে এ অপোরাদ তাহার নহে। মুনিষে (মুনিষ্য) যে
odhom, tahar bichar emot; ehate Poromexor
অধোম, তাহার বিচার এমত ; এহাতে পরমেশর
emot dhormoraz zothartho hoia emot obichar
এমত ধর্ম্মোরাজ যথার্থো হৈয়া এমত অবিচার
coriben ? Ze amare dia pap coraria amare
করিবেন ? যে আমারে দিয়া পাপ করাইয়া আমারে
noroque ze mot[16] taronae feliben ? E ni
নরোকে যে মত তারোণায় ফেলিবেন ? এ নি
uchit ? Tomar poromarthe ni loe e bichar,
উচিৎ ? তোমার পরোমার্থে নি লএ এ বিচার,
ze potit pabon coruna xindhu emot obichar
যে পতিত পাবোন করুণা সিন্ধু এমত অবিচার
coriben ?
করিবেন ?

[6] B.—Zodi poromarthe zigaxo, tobe
[৬] ব্রা।—যদি পরমার্থে জিগাসো, তবে
ze bichar tomi coho, ehate to chite
যে বিচার তুমি কহো, এহাতে তো চিতে
codachitio loean, ze Poromexor emot
কদাচিতো লয়না, যে পরমেশর এমত
coren ; quintu xastre cohe, ze e cotha
করেন ; কিন্তু শাস্ত্রে কহে যে এ কথা
zeto caler pape coromanquite loae.
যেতো কালের পাপে করমাঙ্কিতে লওয়াএ।

R.—Ze mote o cotha mitha heno
রো—যে মতে ও কথা মিথা (থ্যা) হেনো
chite tomar loilo, temot ihao buzhaibo ;
চিতে তোমার লইলো, তেমত ইহাও বুঝাইবো ;
quintu coromanquit qui ? ami to ihato
কিন্তু করমাঙ্কিত কি ? আমি তো ইহাতো
buzhina.
বুঝিনা।

B.—Coromanquit ei prob zormiasilo,
ব্র।—করমাঙ্কিত এই প্রব[17] জর্ম্মিয়াছিলো,
tahate bisti[18] pap coriasilo, e caron xei
তাহাতে বিস্তি পাপ করিয়াছিলো, এ কারোণ সেই
pape e cale pap core.[19]
পাপে এ কালে পাপ করে।

11 বেদের।

12. সম্প্রতি।

13. Gomencho ?

14. পর্ত্তুগীজ প্রতিশব্দ penitencia অনুতাপ বা প্রায়শ্চিত্ত।

15. সেইয়া = তাহা। তাহার সেই অপরাধের জন্ত রাজাই অপরাধী। পূর্ব্ব বঙ্গে ধ স্থানে দ উচ্চারণ হয়।

16. "যেমত" "এমত" স্থলে লিপিকর প্রমাদ হইতে পারে।

17. প্রব = প্রব (॥) = পূর্ব্ব।

18. বিস্তর ?

19. Corea—করায় ?

R.—Eqhon buzhilam, e eq papete ar
রো—এখন বুঝিলাম, এ এক পাপেতে আর
pap corae, tobe Poromexorer dox queno
পাপ করয়ে, তবে পরমেশ্বরের দোষ কেনো
dee? emot ar codachito na cohio, ze
দেয়? এমত আর কদাচিতো না কহিও, যে
tini loaen, ar ze liqhen queho xe
তিনি লওয়াএন, আর যে লিখেন কেহো সে
quemote?[20] tahare coho buzhaia buzhai.
কেমতে? তাহারে কহো বুঝাইয়া বুঝাই।

B.—Zodhine potitong bidhong[21] matri
ব্র।—যেদিনে পতিতং বিধং মাতৃ
gorbhe xonxarete to dine liqhitong Broma
গর্ভে সংসারেতে তো দিনে লিখিতং ব্রমা (ব্রহ্মা)
xobhaxobhani (7) zozita;[22] ehar bichar
শুভাশুভানি (৭) যোযিতা। এহার বিচার
coho xoni.
কহো শুনি।

R.—E cotha ze cohila ehate pap punio
রো—এ কথা যে কহিলা এহাতে পাপ পুণ্যো
corite liqhiten tobe ar amardiguer dox na
করিতে লিখিতেন তবে আর আমারদিগের দোষ না
hoito, eha prubei[23] cohiassi; tobe ze xuq
হইতো, এহা প্রুবেই কহিয়াছি; তবে যে সুক
duqh coho, eha liqhen nahi: quintu tini
দুঃখ কহো, এহা লিখেন নাহি। কিন্তু তিনি
xorbozan xocol zanen, ze coriben, ar hoibeq
সর্ব্বোজান সকোল জানেন, যে করিবেন, আর হইবেক
tahan ogoxor quixui nahi: eha, ze na zane
তাহান অগোচর কিছুই নাহি। এহা যে না জানে
zei cohe, ze liqhiasen lolate, e cotha mitha.
সেই কহে, যে লিখিয়াছেন ললাটে, এ কথা মিথ্যা।

(8) B.—Tomi cohila liqhon mitha?
(৮) ব্র।—তুমি কহিলা লিখন মিথ্যা?
tobe morar mostaq xocoler copale ze
তবে মরার মস্তক সকলের কপালে যে
liqhan[24] deqhi xe qui? Tahare tomora qui
লিখন দেখি সে কি? তাহারে তোমরা কি
coho? eha buzhao? Zorme zorme doridrota
কহো? ইহা বুঝাও? জর্ম্মে জর্ম্মে দরিদ্রতা
bongdhinen doxo bobixani moronong
বংধিনেন দোষো ববিষানি মরণং
gomotitire upor quinma bhovonoti.[25]
গোমতীতীরে উপর কিংমা ভবনতি।

R.—Eha emote buzhaite na paribo;
রো।—এহা এমতে বুঝাইতে না পারিবো;
tomi bixtor morar mostoq ano ami
তুমি বিস্তর মরার মস্তক আনো আমি
buzhaibo. Zodi liquia thaquen tobe xocoler
বুঝাইবো। যদি লিখিয়া থাকেন তবে সকোলের
copale liqhon thaquiben ehate zodi caro
কপালে লিখোন থাকিবেন এহাতে যদি কারো
thaque caro na thaque, tobe ehar caron
থাকে, কারো না থাকে, তবে এহার কারোণ
qui? taha amare buzhaiba.
কি? তাহা আমারে বুঝাইবা।

B.—Hoe[26]; bistor mostoq deqhiasi caro
ব্র।—হয়; বিস্তর মস্তোক দেখিয়াছি কারো
copale xuda[27] liquon [9] dequi nahi amio
কপালে শুদা লিখোন [৯] দেখি নাহি আমিও
ehate xonde coritam, ehar caron qui? tomi
এহাতে সন্দে করিতাম, এহার কারোণ কি? তুমি
coho qui caron caro emot thaque, caro emot
কহো কি কারোণ কারো এমত থাকে, কারো এমত
na thaque?
না থাকে?

R.—Caron ei caro copaler har zora
রো।—কারোণ এই কারো কপালের হার জোরা
thaque tahate liqhoner mot deqhi, e cotha
থাকে তাহাতে লিখনের মত দেখি, এ কথা
copaler harer zora coxaia[28] chao eiqhone
কপালের হারের জোরা কসাইয়া চাও এইক্ষণে
quoxibeq, arbar lagaile lague; tini emot
খসিবেক, আরবার লাগাইলে লাগে; তিনি এমত
goriassen, zahar her zora na thaque tahar
গরিয়াছেন, যাহার হার জোরা না থাকে তাহার

20. কিমতে। এরূপ প্রয়োগ পূর্ব্ববঙ্গে এখনও প্রচলিত। 21 বীর্য্যং।

22. যদ্দিনে পতিতং বীর্য্যং মাতৃ গর্ভে সুসংবৃতে।
তদ্দিনে বা লিখৎ ব্রহ্মা শুভাশুভানি যোজয়ন্॥

23. পূর্ব্বেই।

24. লিখন?

25 জন্মে জন্মে দরিদ্রত্বঃ, বন্ধ (বন্ধন) দোষো ভবিষ্যতি।
মরণং গোমতী তীরে অপরং কি ংবা ভবিষ্যতি॥

26. হাঁ, পূর্ব্ব বঙ্গে এখনও এইরূপ উচ্চারণ প্রচলিত।

27. শুধু, খালি।

28. খসাইয়া।

copale xudha deqho : tahar xirpira odhiq
কপালে শুধা দেখো। তাহার শিরপীড়া অধিক
na zanme, zohar copale zora har tahar
না জন্মে, যাহার কপালে জোরা হার তাহার
zorate zol bhor coria mundhe bedena core ;
জোরাতে জল ভর করিয়া মুণ্ডে বেদেনা করে;
ehar orth ei ; liqhon ze cohe e mitha
এহার অর্থ এই; লিখন যে কহে এ মিথা
deqho ; xei mostoquer chuxura[29] zora, xeo
দেখো; সেই মস্তোকের চৌশুরা জোরা সেও
xeirup zoragothon ehate buzhibe liqhon
সেইরূপ জোরাগঠোন এহাতে বুঝিবে লিখন
hoe [10] qui nohe ; e cotha oti murer, ze
হয় কি নহে; এ কথা অতি মূঢ়ের, যে
cohe copaler liqhon.
কহে কপালের লিখন।

B.—Ehate ei rupe buzhi, ze liqhon nohe ;
ব্র।—এহাতে এই রূপে বুঝি যে লিখন নহে;
ze caro liqhon caro no liqhon emot nohe ;
যে কারো লিখোন কারু না লিখোন এমত নহে;
otoeb mitha : quintu ar eq cotha amardiguer
অতএব মিথা! কিন্তু আর এক কথা আমাদিগের
zogue cohe, punio pap coria cohibo, ze ami
যোগে কহে, পুণ্যো পাপ করিয়া কহিবো, যে আমি
eha no corilam, Poromexor corilen, emot
এহা না করিলাম, পরমেশর করিলেন, এমত
guian tahar xei xadhu, tahar pap punio
গিয়ান (জ্ঞান) তাহার সেই সাধু, তাহার পাপ পুণ্যো
nahi, ehar bichar coho.
নাহি, এহার বিচার কহো।

R.—Eha ze zigaxila e bichar monixio[30]
রো।—এহা যে জিগাসিলা এ বিচার মুনিষ্যো
nohe, e bichar poxu poquio moxier, ze zon
নহে, এ বিচার পশু পক্ষিও মক্ষের, যে জন
monixio dhulobh[31] hoibe tahar uchit utom
মুনিষ্যো ধুলভ হৈবে তাহার উচিৎ উতম[32]
guian pap punio bichar astha bocti[33] doa
গিয়ান পাপ পুণ্যো বিচার আস্থা বক্তি দয়া
tobe xe mucti ; nohe odhormo coria cohibe
তবে সে মুক্তি; নহে অধর্ম্মো করিয়া কহিবে
tini corilen ? ehar boro naroqui nahi. [11]
তিনি করিলেন? এহার বড়ো নারোকী নাহি।
Monixio pap corite, tahar thai cohibe rodon
মুনিষ্যো পাপ করিতে, তাহার ঠাই কহিবে রোদন
coria praner bhocti coria ze thacur ami
করিয়া প্রাণের ভক্তি করিয়া যে ঠাকুর আমি
aperad coriassi tomi corunamoe amer
অপেরাদ করিয়াছি তুমি করুণাময় আমার
oporad qhemo. Tobe xe xadhu hoite pare,
অপোরাদ ক্ষেমো। তবে সে সাধু হইতে পারে,
tahan crepa hoile, zog are mucti, xorbo
তাহান ক্রেপা হইলে, যোগ আর মুক্তি, সর্ব্বো
xidhi[34] ze coribeq xe zitandrio[35] hoibeq ;
সিধি যে করিবেক সে জিতান্দ্রিয়ো হইবেক;
craper xastor palibeq, nizonam obinaxi ;
ক্রেপার শাস্তোর পালিবেক, নিজোনাম অবিনাশী;
gaitri bhedire (?) tobe xe gian cohi, nohile
গাইত্রী ভেদিরে (?) তবে সে গিয়ান কহি, নহিলে
pap punio coria cohibe thini corilen ? e
পাপ পুণ্যো করিয়া কহিবে তিনি করিলেন? এ
gorbo bichar.
গর্বো বিচার।

B.—Exocol cotha ze coho e bromo
ব্র।—এসকোল কথা যে কহো এ ব্রমো[36]
qhondibar cotha nohe ; ei xe caronio
খণ্ডিবার কথা নহে; এই সে কারণীয় (?)
cotha ; quintu Poromexor qui bon[37] ? qui
কথা কিন্তু পরমেশর কি বন? কি
rit ? qui xil ? coto nam noiracar bhabe,
রীত? কি শীল? কতো নাম নৈরাকার ভাবে,
zoto charite [12] pari ; taha caho amare,
যতো চারিতে [১২] পারি; তাহা কহো আমারে
ze rupe tahane zanite pari ; tobe tomar
যে রূপে তাহানে জানিতে পারি; তবে তোমার
xongue niae[38] coribo.
সঙ্গে নিয়াএ করিবো।

---

29. চৌশিরা, চতুঃশিরা।
30. মুনিষ্যের (মানুষের) যোগ্য নহে, মানুষীর
31. দুর্লভ।
32. উত্তম।
33. পূর্ব্ব বঙ্গের উচ্চারণে 'ভ' স্থানে "ব"।
34. সিদ্ধি।
35. জিতেন্দ্রিয়।
36. ভ্রম।
37. bonno? বন্ন—বর্ণ।
38. ন্যায়—বিচার।

R.—Tini quebol caronio toto[39]; tini
রো।—তিনি কেবল কারণীয় তত্তো; তিনি
utome[40] purno qhep, xorbo purno
উত্তমে পূর্ণো ক্ষেপ সর্ব্বো পূর্ণো
zothartho.
যথার্থো।

B.—Bhalo eqhon cohibe quemot?
ব্র।—ভালো এখন কহিবে কেমত?

R.—Xorbo corite paren; xorbo zanen,
রো।—সর্ব্বো করিতে পারেন; সর্ব্বো জানেন,
xorbo doea coren, xorbo zit, tini caro oniae
সর্ব্বো দয়া করেন, সর্ব্বো জিত, তিনি কারো অন্যায়
na coren; xocoler xohae tini, xonio xut
না করেন; সকোলের সহায় তিনি,

corite paren; tini xe iccha moe tini xocoler
করিতে পারেন; তিনি সে ইচ্ছা ময় তিনি সকোলের
porazoe corite paren; xei xe xotio
পরাজয় করিতে পারেন; সেই সে সত্য
Poromexor; ze xocol orthe xor[41] tahan
পরমেশর; যে সকোল অর্থে শর তাহান
mohima coto cohibo? cahar zoguiota?
মহিমা কতো কহিবো? কাহার যুগ্যোতো?
olpe buzho, gohine probex coria, tobe xe
অল্পে বুঝো, গহিনে প্রবেশ করিয়া, তবে সে
dhulobho[42] paiba; zahate mucti hoe
দুলভ পাইবা; যাহাতে মুক্তি হয়
nor [13] dhulobho zonmo xathoq hoe, zodi
নর [১৩] দুঃলভ জন্মো সাথোক হয়, যদি
caronio pitare bhozo.
কারণীয় পিতারে ভজো।

B.—E zoto cohila boroi utom, olpe olpe
ব্র।—এ যতো কহিলা বরোই উত্তম, অল্পে অল্পে
zigaxa cari, tomi coho; Poromexorer camo
জিগাসা করি তুমি কহো; পরমেশরের কামো
crodo nahi? lobh moho modo marthio
ক্রোদো নাহি? লোভ মোহো মদো মার্থিয়ো[43]

---

39. তত্ত্ব।

40. উত্তমে।

41. শর=ঈশর।

42. দুলভ=দুর্লভ।

43. মাৎসর্য্য।

alixio ehar quichui nahi? pap corite na
আলিস্যো এহার কিছুই নাহি? পাপ করিতে না
paren?
পারেন?

R.—Zodi ei xopto moha patoq zorit tini
রো।—যদি এই সপ্তো মহা পাতোক জরিত তিনি
hoen; tobe tini Poromexor Porom Brormo
হয়েন; তবে তিনি পরমেশর পরম ব্রর্মো
nohe. Nirmol (e) cono din mola udbhob na
নহে। নির্ম্মলে কোন দিন মলা উদ্ভব না
hoe; odhome odhom carzio zonme; utome
হয়; অধোমে অধোম কার্য্যো জন্মে; উত্তমে
utom carzio zonme, xuzone cumoti na hoe,
উত্তম কার্য্যো জন্মে, সুজোনে কুমতি না হয়,
cuzone xumoti nohe, omerter gase codachito
কুজোনে সুমতি নহে, অমেরতের গাছে কদাচিতো
omerto fol bohi ar fol na dhore: Boruner
অমেরতো ফল বহি আর ফল না ধরে। বরুণের
breqhe boruna fol bohi ar fol na hoe: xil
ব্রেক্ষে বরুণা ফল বহি আর ফল না হয়; শীল
onuxare carzio opostit hoe.
অনুসারে কার্য্যো উপস্তিত হয়।

(14) B.—Bhalo eqhon coho tomi, xei
(১৪) ব্র।—ভালো এখোন কহো তুমি, সেই
Poromo Bromo ni xacari hoiasilen
পরোমো ব্রমো নি সাকারী হইয়াছিলেন
prothibite?
প্রথিবীতে?

R.—Xei Poratpor Poromexor xacar
রো।—সেই পরাৎপর পরমেশর সাকার
hoiasilen, eq bar nor udhar corite.
হইয়াছিলেন, এক বার নর উধার করিতে।

R.—Na; zeno ek Poromexor bohi ditio
রো।—না; যেনো এক পরমেশর বহি দিতীয়ো
nahi; ze tahar conia biha coriben, ebong
নাহি; যে তাহার কন্যা বিহা করিবেন, এবং
tahar camodbhaber xil nohe.
তাহার কামোদ্ভবের শীল নহে।

B.—Xorir dhari hoile xocoli thaqhe.
ব্র।—শরীর ধারী হইলে সকোলি থাখে।

R.—Hoe noroloquer eha zorme, zini
রো।—হয়, নরলোকের এহা জর্মে যিনি

Poromexor tini xacar hoile taha xopto
পরমেশর তিনি সাকার হইলে তাহা সপ্তো
mohapatoqadi zoto carzio tahate zonmite na
মহাপাতোকাদি যতো কার্য্যো তাহাতে জন্মিতে না
pare.
পারে।

B.—Qui caron zonmite na pare pap. pap
ব্র।—কি কারোণ জন্মিতে না পারে পাপ। পাপ
carzio corite paren ; quintu tahan pap hoe
কার্য্যো করিতে পারেন; কিন্তু তাহান পাপ হয়
na (15) zemot ognite xocol dahon core ogni
না (১৫) যেমত অগ্নিতে সকোল দাহোন করে, অগ্নি
molin na hoe,ebong tezoxi poruxer dox nahi.
মলিন না হয়, এবং তেজসী পুরুষের দোষ নাহি।

R.—Tomi ze xocol cohila emot dhari
রো।—তুমি যে সকোল কহিলা এমত ধারী
naxi bichar.
নাশী বিচার।

B.—Eha queno coho ?
ব্র।—এহা কেনো কহো ?

R.—Cohi ze e bichar perthibir Raza
রো।—কহি যে এ বিচার পেরথিবির রাজা
Chocroboti caro bodh corile, tahare bodh
চক্রোবতী কারো বধ করিলে, তাহারে বধ
corite na pare ; ebong oxoto carzio corile
করিতে না পারে; এবং অসতো কার্য্যে করিলে
quichu corite na pare, Poromexor bade
কিছু . করিতে না পারে. পরমেশর বাদে
ebong ogni, zol, bau, mirthica zeto ihate
এবং অগ্নি, জল, বায়ু, মিরথিকা, যেতো ইহাতে
nosto core taha queho upolobhiote
নষ্টো করে তাহা কেহো উপলভ্যতে
naxirxter cormo ei ze nax core : quintu ze
নাশিষ্টের কর্মো এই যে নাশ করে। কিন্তু যে
zon ei bosto xocol dia nostto core, taha (r)
জন এই বস্তু সকোল দিয়া নষ্টো করে, তাহা (র)
xe dox hoe : Poromexor bichar coriben ;
সে দোষ হয়। পরমেশর বিচার করিবেন;
ze mot qhorgue bodh core ghorguer dox
যে মত ঘর্গে বধ করে ঘর্গের দোষ
nahi : zei bodhe xei theque : toto prae***
নাহি: যেই বধে সেই থেকে: ততো প্রায়***

xocol : Poromexor zothartho zania (16)
সকোল: পরমেশর যথার্থো জানিয়া (১৬)
temot xasti diben ; ze bhalo carzio coribe
তেমত শাস্তি দিবেন; যে ভালো কার্য্যো করিবে
tahar mucti diben ; zahare coho Poromexor
তাহার মুক্তি দিবেন; যাহারে কহো পরমেশর
tahan emot carzio nohe.
তাহান এমত কার্য্যো নহে।

B.—Tobe que tini xoriri hoile, xoriri
ব্র।—তবে কি তিনি শরীরী হইলে, শরীরী
bhab zonme na ?
ভাব জন্মে না ?

R.—Na quodachitio ; caron ei ze apone
রো।—না কদাচিতো; কারোণ এই যে অপনে
Poromexor xorir dhorile, tahate odhom
পরমেশর শরীর ধরিলে, তাহাতে অধোম
carzio zonmite na pare : tini Poromexor,
কার্য্যো জন্মিতে না পারে: তিনি পরমেশর,
zodi xoriri hoilen, tobe tahan moti duie e
যদি শরীরী হইলেন, তবে তাহান মতি দুইয়ে এ
cotha hoe : xacar bhabe ar Poromexor
কথা হয়! সাকার ভাবে আর পরমেশর
obhave, apone ze xorir dhorilen xe oti utem
অভাবে, আপনে যে শরীর ধরিলেন সে অতি উত্তম
nirmol xompurno doeae bocropate ocumarir
নির্ম্মল সম্পূর্ণো দয়ায় বক্রপাতে অকুমারীর
udore Poromexor omot ; xacar moti
উদরে পরমেশর অমত; সাকার মতি
xonnihito hoilen eqta, e caron xorbo
সন্নিহিতো হইলেন একটা এ কারোণ সর্ব্বো
zitendrio, oti utom Poromo dhormo raz
জিতেন্দ্রিয় অতি উত্তম পরমো ধর্ম্মো রাজ
poromo xidhi poromo xadhu moharax
পরমো সিধি পরমো সাধু মহারাজ
xochroborti, Poromexor tini Poromexor
চক্রবর্ত্তী, পরমেশর তিনি পরমেশর
Poromo Bromo, tahate ni bicar (17) tini
পরমো ব্রোমো, তাহাতে নি বিকার (১৭) তিনি
cono pap carzio porox[44] nahi xoto carzio
কোনো পাপ কার্য্যো পরশ নাহি সতো কার্য্যো
pore.[45]
পরে।

44. পরবশ? 45. সৎকার্য্যপর?

B.—Eha buzhon boro car(z)io !
ব্র।—এহা বুঝোন বরো কার্য্যো !

R.—Eha olpete buzho : zodi cono monixer
রো।—এহা অল্পেতে বুঝো : যদি কোনো মুনিষের
xorire bhute probex core tahar moti quemot
শরীরে ভুতে প্রবেশ করে তাহার মতি কিমত
hoia thaque ? taha na buzho ? xe xorirer
হইয়া থাকে ? তাহা না বুঝো ? সে শরীরের
procriti, ar bhuter procriti eqta hoi (a)
প্রকৃতি আর ভুতের প্রকৃতি একতা হৈ (য়া)
thaque, ze carzio zoqhon core eq icchae na
থাকে, যে কার্য্যো যখোন করে এক ইচ্ছায় না
core ; dhuie eqta hoia xe core ; ehate
করে ; দুইয়ে একতা হৈয়া সে করে ; এহাতে
Poromexor ze xorir dhorilen, tahate
পরমেশ্বর যে শরীর ধরিলেন, তাহাতে
quemote pap upostit hoibeq ? ebong lohate
কেমতে পাপ উপুস্তিত হইবেক ? এবং লোহাতে
porox xoaile xoborno hoe : ehate porox
পরোশ ছোয়াইলে সুবর্ণো হয় : এহাতে পরোশ
manique[46] poratpor tini xorir dhorile
মাণিক পরাৎপর তিনি শরীর ধরিলে
quimote[47] xorire pap na zonme.
কিমতে শরীরে পাপ না জন্মে।

(ক্রমশঃ)

46. manique = মাণিক ?

47. কোন মতে ?

বাঙ্গলার জাতিবিচার

(প্রতিবাদ)

—শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার

শ্রাবণের উপাসনায় শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ রায় মহাশয় 'বাঙ্গলাদেশের প্রাচীনত্ব' প্রবন্ধের শেষভাগে লিখিয়াছেন :—

"নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা আধুনিক বাঙ্গালীর নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া অনুমান করেন যে, তাহারা দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গবাসীগণকে জাতিনির্ব্বিশেষে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বলা যাইতে পারে।"

বাঙ্গলা দেশের উক্ত জাতিবিচার করিয়াছেন নৃতত্ত্ব-বিদ্দের মধ্যে একমাত্র Risley. Risleyর পর ভারতীয় নৃতত্ত্বের যে কত আলোচনা হইয়াছে তাহা বোধ হয় রায় মহাশয়ের সম্যক জানা নাই। গত বৈশাখের উপাসনাতেই ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ "ভারতে জাতিতত্ত্ব" প্রবন্ধে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গবাসীর জাতিবিচার সমন্ধে ডাঃ গুহর মত বৈশাখের উপাসনা হইতেই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"· · ·বারাণসী হইতে বিহার পর্য্যন্ত যতই পূর্ব্বে আসা যায় অপর একটী জাতি—Brachycephalic··ক্রমেই যেন সংখ্যায় বাড়িতে থাকে। বাঙ্গালীদের মধ্যে এই Brachycephalic জাতি সংখ্যায় অত্যন্ত প্রবল। Risleyর মতে বাংলার প্রত্যন্তবাসী মঙ্গোলীয় জাতির প্রভাববশতঃই বাঙ্গালীদের মস্তক এরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকায় যে মঙ্গোল উপজাতীয়েরা বাস করে, তাহারা প্রধানতঃ dolichocephalic, brachycephalic নহে। সুতরাং এইদিক হইতে মঙ্গোলীয় প্রভাবের দোহাই দিয়া বাঙ্গালীদের Brachycephalyর কারণ নিরূপণ করা যায় না। অবশ্য উত্তরের লেপ্‌চা ও ভুটানী এবং চট্টগ্রামের চাক্‌মা প্রভৃতি মঙ্গোলীয় জাতি Brachycephal বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু ইহাদের প্রভাবেই যদি বাঙ্গালীরা Brachycephal হইত তাহা হইলে ইহাদের সন্নিহিত স্থানগুলিতেই Brachycephalyর প্রাধান্য দেখা যাইত। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বাংলার দক্ষিণাংশেই এইরূপ প্রাধান্য দেখা যায়—পূর্ব্ব ও উত্তর বাংলায় নহে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে Brachycephal শ্রেণীর বাঙ্গালীর নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত। পক্ষান্তরে লেপ্‌চা প্রভৃতি উপজাতিদিগের নাসিকা দীর্ঘ হইলেও চেপ্‌টা ও উন্নচ্চ। চেপ্‌টা মুখও মঙ্গোলীয় জাতির চক্ষুর বিশিষ্টতা (epicanthic fold) প্রভৃতি অন্যান্য লক্ষণও এই জাতীয় বাঙ্গালীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের দেহের কেশ লোমাদিও মঙ্গোলীয়দের মত অপ্রচুর নহে। ফলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে এই Brachycephal জাতির লোক বাঙ্গলায় যাহারা সংখ্যায় প্রবল এবং বিহার ও যুক্তপ্রদেশে যাহাদের অনুপাত অপেক্ষাকৃত কম—ইহারা মঙ্গোলীয় রক্তে উদ্ভূত নহে। পশ্চিম-ভারতের সমুদ্রোপকণ্ঠেও এই জাতীয় লোক দেখা যাইতেছে। মধ্যভারতের ভিতর দিয়া এই শ্রেণীর বাঙ্গালীদের সহিত তাহাদের যোগাযোগ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।"

শ্রীযুত রায় মহাশয় প্রবন্ধের প্রথমেই রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়াছেন। রায় বাহাদুর চন্দই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার The Indo Aryan Races নামক পুস্তকে Risleyর প্রতিবাদ করেন। ১৯৩১এর আদমসুমারীর রিপোর্টের সহিত ডাঃ গুহর ভারতীয় নৃতত্ত্বের বহু গবেষণামূলক তথ্য প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। Risleyর পর এরূপ নিয়মিতভাবে আলোচনা একেবারেই হয় নাই বলিলেও চলে, এজন্য ডাঃ গুহর গবেষণার ফলাফলের জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন।

অহল্যা

—শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

অহল্যার শুক্লাপাঙ্গে পলক প্রচ্ছায়ে
মনোভব পাতিয়াছে শিথিল শয়ন
দ্বিপ্রহরে। মহাতপা গৌতম ঋষির
পুণ্য তপোবন আজি নিদাঘ দিবার
আপক্ক ফলের গন্ধে, পুষ্পিত তরুর
আন্দোলিত শাখার ব্যজনে আমন্থর।
অবিদূর খর্জ্জুর-কাননে ফলিয়াছে
স্বর্ণাভ খর্জ্জুর, দূরে আম্র-বাটিকায়
নব আম্রমুকুলের মধুর আঘ্রাণে
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতেছে মধুমক্ষিদল
উন্মত্তের মত।

শান্ত আশ্রম কাননে
অশ্বত্থ ছায়ায় পাতি অর্দ্ধ বস্ত্রাঞ্চল
অহল্যা চাহিয়াছিল আবিষ্ট নয়নে
পারাবত-মিথুনের পানে, স্বপ্নময়,
হেন দ্বিপ্রহরে দূর দিগন্তে চাহিয়া
সাদা চোখে দেখা যায় হৈম বসন্তের
স্বর্ণ পর্ণ, অলকে কপোলে আসি' লাগে
উড্ডীন ঋতুর মৃদু ডানার বাতাস।
আর্য্যপুত্র তপোধন গেছে অবগাহে
বহুক্ষণ, স্নান অন্তে অর্ঘ্য বিরচিয়া
গঙ্গোদকে, ঋষিবর নিত্য পূজা করে
সহস্রাংশু সমপ্রভ দেব সবিতায়।

তারপর ক্রমান্বয়ে করি আবাহন
ইন্দ্রাগ্নি, বরুণ, আর দ্যাবা পৃথিবীরে
কুটীরে আসেন ফিরে অহল্যার কাছে
মহর্ষি গৌতম মহাতপা। ততক্ষণে
আকাশে মলিন হয় দেব সবিতার
চম্পক-কুট্মল-নিভ উজ্জ্বল কিরণ।
ততক্ষণ অহল্যার সারা দেহ ঘেরি
চূত আর চম্পকের মিলিত আঘ্রাণ
উন্মত্ত সর্পের মত জড়ায়ে রহেনা
তীব্র আলিঙ্গনে; তীক্ষ্ণ রসনাগ্রে মাখি
বসন্তের বিষমোহ জর্জ্জর করে না
তনু দেহ, আবেশ আনেনা নেত্রপাতে।

মহাতপা মহর্ষি গৌতম, স্বর্গ আর
মর্ত্তলোক তাঁর কাছে করতলগত-
আমলক সম। স্বর্গ কিম্বা রসাতল
তাঁর অবিদিত নহে। ত্রিকালজ্ঞ যেই
নখাগ্রে গণিতে পারে নক্ষত্রনিচয়;
সেও হায়, শঙ্কিত, প্রকাশভীরু, ম্লান,
রমণীর হৃদয়ের গোপন কামনা
জানিতে পারে না। সবিতায় নভোব্যাপী
রশ্মির গণনা করি নয়ন যাহার
জলন্ত উজ্জ্বল, তুচ্ছ রমণী হিয়ার
ক্ষীণ আর্ত্তি তা'র চোখে ভস্ম হয়ে যায়।

তথাপি, ঈশ্বর জানে, অহল্যা মানবী।
রক্তমাংস বিনির্ম্মিত এ দেহ-মন্দিরে
অগণন দেবতার সাথে বিহরায়
সে কিশোর কুসুমেষু, যাহার আদেশে
নরনারী সৃষ্টি করে নব জনস্রোত।
ঈশ্বর জানেন, জানে দেব মনোভব
অহল্যার দুঃখের নাহিক পরিসীমা।

সর্ব্বনারীরূপশ্রেষ্ঠা অহল্যার কথা
কে না জানে? সর্ব্বদেব নয়ন-রশ্মির
সম্মিলিত তেজে ধরায় বসন্ত ল'য়ে
বৈজয়ন্ত ধামে উদিল যে, কে সে নারী?
অহল্যা, অহল্যা সেই জানে সর্ব্বজন।
তথাপি এ বসন্তের দিনে ধরণীর
বনানীর অন্ধকার কোণে অহল্যারে
কে দেখিল? কে কহিল, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নারী
অহল্যা? কেহই নহে।

সহসা চকিয়া
অহল্যা দেখিল চাহি, শ্যাম বীথি মাঝে
শুষ্ক মর্ম্মরিত পত্রপুঞ্জ পায়ে দলি'
আসিছেন আর্য্যপুত্র মহর্ষি গৌতম
মহাতপা; সবিতার অরুণ কিরণ
আশীর্ব্বাদে দীপ্ত ভাল, প্রশান্ত প্রোজ্জ্বল
দু'নয়ন, সুগভীর বলি-রেখাবলী

দীপিছে ললাট মাঝে, যেন প্রতিভার
স্বহস্ত স্বাক্ষর। এক হাতে বহিছেন
গঙ্গোদক কমণ্ডলু, আর অন্য হাতে
সিক্ত পরিধেয় বাস, গৈরিক উত্তরী।

আজি কেন গৌতমেরে অহল্যার চোখে
মনে হয় সৌম্যতর, ভাস্বর, সুন্দর ?
আজি কেন মনে হয় সর্ব্বপ্রিয়তম ?

ধীরে ধীরে অগ্রসরি আসিলা গৌতম।
প্রসারিত হস্তসম অশ্বত্থ শাখায়
রাখিয়া উত্তরী বাস বাম হাত হ'তে
কমণ্ডলু রাখি আঙিনায়, কহিলেন
সৌম্যমূর্ত্তি, "প্রিয়তমে, পবন মন্থর
আজি, বহেনা সে স্তুতি দেবতাসকাশে,
গঙ্গা শিথিলগামিনী, বিভাবসু
অন্যমনা। অসময়ে তাই আজি প্রিয়ে
এসেছি করিতে যাচ্ঞা তোমার সমীপে
জগতের শ্রেষ্ঠকাম্য সান্নিধ্য তোমার।"

যৌবনের জন্মদিন হ'তে কোন্ বাণী
অহল্যা গেঁথেছে বসি' দীর্ঘ রাত্রি জাগি
প্রহরের কৃষ্ণ-সূত্রে অতি সঙ্গোপনে ?
কোন্ কথা এখনি কহিয়া গেল কাণে
দক্ষিণের মদোন্মত্ত বায়ু ? আর্য্যপুত্র
কেমনে জানিল ?

তখন সে কোন্ ঋতু ?
তখন ফাল্গুন মাস, যে কুসুম-মাসে
এক পাত্রে প্রিয়াসহ মধু করে পান
উন্মত্ত দ্বিরেফ ; সেই সুতীক্ষ্ণ ঋতুর
শরাঘাতে, মহাযোগী, হিমাদ্রিনিবাসী
আদিদেব রুদ্ররূপা কঠোর ধূর্জ্জটী
পার্ব্বতীর মুখে চাহে মেলি ত্রিনয়ন
পলকবিহীন।

তবু যদি বসন্তের
কোমল পালক অহল্যার চক্ষুপ্রান্তে
না লাগিত, যদি স্মর মকর-কেতন
নাহি হ'ত ইন্দ্রাধীন, অহল্যা তা'হলে
দেখিত, সে লাবণ্যমণ্ডিত বরবপু
ক্রূরকর্ম্মা তপোধন গৌতমের নহে।

কিন্তু তবু তপোবনে বসন্ত তখন,
কিন্তু তবু মনোভব বৃত্রারি অধীন !

অহল্যা ! পাষাণী নারী ! পাষাণের নীচে
প্রাণ আছে ? শোনোনা কি দক্ষিণ পবন
চিরন্তন যৌবন-স্তম্ভিত শুভ্র তব
পাষাণ দেহের দ্বারে আছাড়ি পড়িছে,
আজি পুন দেখোনাকি নিদ্রিত পুরীর
অভ্যন্তরে পশি' কুমার বসন্ত ঋতু
ধরিত্রীর চোখে বুলায় সোনার কাঠি
মৃদু লঘু করে ! ধরিত্রী মেলিল আঁখি,
তুমি জানিবে না ?

অহল্যা কহেনা কথা।
মৃত্যুহীন কাব্য সম পাষাণে অটুট
যৌবন-সৌন্দর্য্য তার নিষ্পলক চোখে
চেয়ে রয় আকাশের শূন্য এক কোণে,
সমস্ত শর্ব্বরী যথা গভীর আঁধারে
একটি প্রদীপ্ত তারা জ্বলে অনির্ব্বাণ,
আকাশের একমাত্র প্রোজ্জ্বল তারকা॥

ছাত্র-সমাজের স্বাস্থ্য
জাতীয় জীবনের উপাদান

—ডাঃ শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু

বাঙ্গালী-জাতিকে আজ বহু সমস্তার সমাধান করিতে হইবে। শুধু রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার জন্য সমস্ত শক্তি ব্যয় করিলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় অভাবগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ছাত্রগণই জাতীয় জীবনের মূল উপাদান। তাহারাই ভবিষ্যতে দেশের ও সমাজের অধিনায়ক-স্বরূপ হইয়া জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিবে। অথচ এই ছাত্রগণের স্বাস্থ্য দেখিলে আশাহীন হইতে হয়। স্বাস্থ্য ভাল না হইলে মানসিক তেজ ও সাহস কমিয়া যায় এবং সকল প্রকার উন্নতির মূলে ব্যাঘাত পড়ে। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বহুবিধ রোগের প্রাদুর্ভাবে আমাদের ছেলেদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে সত্য, কিন্তু আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকিলে কতক পরিমাণে স্বাস্থ্য যে ভাল হইত—তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে রুগ্ন নহে এবং পিতার আর্থিক অবস্থার জন্য কষ্ট পায় নাই—এমন অনেক ছাত্র ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে এবং এমন কি অনেকের অকালমৃত্যু হইতেছে। সবল, সুস্থ দেহ না হইলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়াও জীবনে উন্নতি করা যায় না। এইরূপে আমাদের কত না যশস্বী বন্ধু অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পরিতাপের সহিত বিফল জীবন যাপন করিতেছেন—এরূপ যুবকের সংখ্যাও কম নহে। অকালমৃত্যু সকল দেশেই আছে কিন্তু আমাদের দেশের ন্যায় অকালমৃত্যু কোথাও নাই। অন্যান্য দেশে যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া অকালমৃত্যু কমিয়া যাইতেছে আমাদের দেশে তাহা দেশবাসীর ইচ্ছার অভাবেই সম্ভব হইতেছে না।

ছাত্রগণের স্বাস্থ্য

অকালমৃত্যু-নিবারণের নানাবিধ উপায়ের মধ্যে ছাত্রগণের শৈশব বা যুবাকাল হইতে স্বাস্থ্যোন্নতি করিবার আন্তরিক চেষ্টা অন্যতম। ছাত্রগণের স্বাস্থ্য অনেক সময় বাহির হইতে ভালই দেখায়। অথচ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে অনেক রোগের লক্ষণ ধরা পড়ে। গলার ভিতরে বড় বড় "টন্সিল্", বা বাহিরে ছোট ছোট দুই একটী বীচি (gland), কিংবা বুকে একটু সর্দ্দি কাশি, অথবা মধ্যে মধ্যে সামান্য পেটের অসুখ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগের প্রথম লক্ষণ বহু ছাত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সামান্য লক্ষণ অভিভাবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, অথচ অনেক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এইগুলি হইতেই দুরারোগ্য রোগ হয় এবং অনেক সময়ে যুবকগণের ইহাই অকালমৃত্যুর কারণ হয়।

ইউরোপের ব্যবস্থা

ইংলণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছাত্র-সমাজের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা হইতেছে। একবার যুদ্ধের সময় কলেজের ছাত্রগণের মধ্য হইতে সৈন্য-সংগ্রহ করিবার সময় দেখা গেল—বহু ছাত্রই দৈহিক অসুস্থতার জন্য সৈনিক বিভাগে কাজ করিবার অনুপযুক্ত; অনুসন্ধানে জানা গেল যে অধিকাংশ স্থলেই ঐ সকল অসুস্থতার লক্ষণ স্কুলে ছাত্রাবস্থায় তাহাদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ পাইয়া অলক্ষ্যে চিকিৎসার অভাবে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তখন হইতে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। শারীরিক ব্যায়াম বা উৎকৃষ্ট আহার ইত্যাদির দিক হইতে বহু চেষ্টা হইয়াও আশানুরূপ ফল হয় নাই। তখন স্কুলের সমুদয় ছাত্রের বৎসরে একবার করিয়া চিকিৎসকের দ্বারা স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইল। পরীক্ষায় যে সকল ছাত্রের দৈহিক অসুস্থতা প্রকাশ পাইতে লাগিল, অভিভাবকগণের নিকট স্কুল হইতে "চিঠি" লিখিয়া তাহাদের সত্বর চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করা হইল। এইরূপে কয়েক বৎসর কাজ করিবার পর দেখা গেল যে ছাত্রগণের বাস্তবিকই স্বাস্থ্যোন্নতি হইতেছে। ক্রমশঃ জনঃসাধারণ এই কার্য্যের উপকারিতা বুঝিতে পারিলেন এবং সকল স্কুলে এই কাজ আরম্ভ হইল।

এ দেশের উদাসীনতা

আর আমাদের দেশের অভিভাবক এবং শিক্ষকগণ অধিকাংশস্থলেই এ বিষয়ে উদাসীন। তাঁহারা এ বিষয়ে একটুও চিন্তা করেন না। বহু শিক্ষক ও অভিভাবক দেশের শিক্ষার অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারস্বরূপ—; তাঁহারা অন্যান্য দেশে কিরূপ কাজ হইতেছে সমস্ত জানেন অথচ এ দেশের জন্য নূতন কিছু করিবার আগ্রহ দেখান না। শিক্ষকগণ ছাত্রগণের স্বাস্থ্য খারাপ দেখিলেও সে বিষয়ে তাহাদের কিছু পরামর্শ দেন না। স্কুলে পরীক্ষায় ভাল ফল করিবার জন্য অধিক রাত্রি জাগিয়া দেহ নষ্ট করিতেছে—ইহা অভিভাবকগণ দেখিয়াও ছেলেকে কিছু বলেন না। শিক্ষকগণও তাহার ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তাহাকে তিরস্কার করেন না। ভবিষ্যতে অনেক ক্ষেত্রেই তাহাকে রুগ্ন দেহ লইয়া জীবনের বিফলতার জন্য পরিতাপ করিতে হয় এবং রুগ্ন দেহভার বহন করা তাহার কাছে দুঃসহ হইয়া উঠে। বহু মেধাবী ছাত্র বড় বড় চাকুরী ও আই, সি, এস্; বি, সি, এস্ প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কেবলমাত্র "স্বাস্থ্য-খারাপ" বলিয়া অনুপযুক্ত প্রমাণিত হইয়া বিফল-মনোরথ হয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের শিক্ষক এবং অভিভাবকগণের একটু জ্ঞান হওয়া উচিত। কেবল লেখাপড়ার ভার চাপাইয়া তাহাকে ভগ্ন-স্বাস্থ্য করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মোহর মারিয়া ছাড়িয়া দেওয়াই কি শিক্ষকগণের উচিত? সমাজের, দেশের এবং তাহার পিতামাতার ও সংসারের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধন করাই বিদ্যাশিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত।

বর্ত্তমান সভ্যতার এবং জীবনযাত্রা প্রণালীর সহিত প্রাচীন কালের কোনও সামঞ্জস্য নাই। বর্ত্তমানে যে জীবন-ধারণের জন্য এমন কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন দৈনিক জীবনের কার্য্য-পদ্ধতির এমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে এখন স্বাস্থ্য ভগ্ন হইবার সকল সম্ভবনাই বর্ত্তমানে রহিয়াছে। একদিকে আধুনিক সভ্যতায় বস-বাসের এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে পরস্পর রোগ-বিস্তারের সম্ভাবনা খুবই বেশী। অন্যদিকে প্রতিযোগিতার কঠোর পরিশ্রম এবং দুশ্চিন্তা মানুষের আভ্যন্তরিক শক্তিকে সর্ব্বদাই ক্ষয় করিতেছে। আহার ও বিহার, বিশ্রাম ও পরিশ্রম প্রভৃতি দৈনিক কার্য্যাবলীর পুরাতন শান্তিপ্রদ ব্যবস্থা গুলি আমাদের এমনই অবস্থাভাবীরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে আমাদের দেশোপযোগী ও আমাদের চির-অভ্যস্ত ঐ ব্যবস্থাগুলির অভাবে আমাদের শরীর জীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তাহার উপর আমাদের সাধারণ আর্থিক অবনতি আমাদিগকে পঙ্গু করিয়াছে। এইরূপে বহু কারণে আমাদের আভ্যন্তরীন রোগ-পরাজয়ের শক্তি কমিয়া গিয়াছে। যেখানে উপযুক্ত ক্ষেত্র বর্ত্তমান—সেখানে বীজ বপনের পরই উদ্ভিদের সম্ভাবনা খুব বেশী। আধুনিক সভ্যতায় রোগের প্রাচুর্য্য ত আছেই; তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনী শক্তিও কমিয়া গিয়াছে; এরূপ অবস্থায় রোগের সম্ভাবনা খুবই বেশী। সুতরাং প্রাচীনকালের দোহাই দিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। রোগের কারণ তাড়াইতে হইবে; দেহের শক্তি বাড়াইতে হইবে এবং অতিসামান্য অবস্থায় রোগের লক্ষণগুলি বাহির করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর্থিক উন্নতির

জানেন কি?

শতকরা ৪০টী ছাত্রের স্বাস্থ্য খারাপ।

ব্যবস্থা করা অথবা আধুনিক জীবন-যাত্রার কার্য্যধারার পরিবর্ত্তন করা—এগুলি বাঞ্ছনীয় বটে কিন্তু সময়-সাপেক্ষ এবং হয়ত দুঃসাধ্য। তাই বলিয়া ততদিন বসিয়া থাকা যায় না। কিছু করিতেই হইবে।

বহু ছাত্রের মধ্যে অলক্ষিতভাবে অনেক রোগের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। শিক্ষক বা অভিভাবক কেহই সেই রোগের সন্ধান রাখিতে পারেন না। যাহাদের দেহ শীর্ণ অথবা অন্য কোনও বিশেষ রোগের লক্ষণ সহজে যাহাদের মধ্যে দেখিতে বা বুঝিতে পারা যায়—তাহাদের দেখিয়া অসুস্থ বলিয়া ধরা সহজ হয় বটে কিন্তু সাধারণতঃ ছেলেদের মধ্যে কেহ রোগে শয্যাশায়ী না হইলে অভিভাবকগণ অসুখের কথা জানিতেই পারেন না। আপনাপন গৃহে নিজ গৃহ-চিকিৎসকের দ্বারা সুস্থ অবস্থায় মধ্যে মধ্যে ছেলেদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা কোনও গৃহস্থের দ্বারা কার্য্যতঃ ঘটিয়া উঠে না। শুধু আমাদের দেশে কেন—ইউরোপের কোনও দেশেই সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য সকল দেশেই ছাত্র-সমাজের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য স্কুলেই মধ্যে মধ্যে ছাত্রগণের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা

করা হইয়াছে। এবং গৃহ অপেক্ষা স্কুলই স্বাস্থ্য-পরীক্ষার উপযুক্ত স্থান বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

প্রতিকার

উৎকৃষ্ট আহার ও শারীরিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিয়া ছাত্রগণের মধ্যে স্বাস্থ্যের উন্নতি কিয়ৎ-পরিমাণে করা যায় সত্য। কিন্তু স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য কি তাহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। ছেলেদের মধ্যে অনেকের ভিতর অনেক এমন রোগের লক্ষণ আছে যেগুলির রীতিমত চিকিৎসা করা দরকার, নচেৎ ভবিষ্যতে সেইগুলি দুরারোগ্য রোগে পরিণত হইবে। কেবল ব্যায়ামের দ্বারা এসব ক্ষেত্রে কোনই লাভ হয় না। রোগ-পরীক্ষার দ্বারা অসুখের বিষয় অভিভাবকের দৃষ্টিগোচরে আনিতে হইবে এবং যাহাতে তিনি শীঘ্র তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন—সেজন্য বার বার চিঠি লিখিয়া স্কুল হইতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে হইবে।

সামান্য সামান্য অসুখের পরিণাম

গলায় সামান্য টন্সিল্ (tonsil) বা ঘাড়ে দুই একটী বীচি (gland) অথবা সামান্য পুরাতন সর্দ্দি-কাশি, কিছুই উপেক্ষার বিষয় নহে। যাহাদের দুই একবার নিউমোনিয়া (pneumonia) হইয়াছে বা প্লুরিসী (pleurisy) হইয়াছে তাহাদের শরীরের দিকে সর্ব্বদাই পিতামাতার দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ এইগুলি হইতে অনেকক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কাশির বা ফুসফুসের রোগের (যক্ষ্মা, phthisis) লক্ষণ প্রকাশ পায়। যাহাদের ছেলেবেলায় বাত ও জ্বর হইয়াছে বা যাহারা বেরিবেরীতে একবার ভুগিয়াছে বা যাহাদের বুকের ভিতর (heart) মধ্যে মধ্যে "ধড়ফড়" (palpitatian) করে তাহাদের উপরও সকল সময় মনোযোগ দিতে হইবে। যে সকল ছেলে অম্ল, অজীর্ণ বা পেটের অসুখে (পাতলা দাস্ত) প্রায়ই কষ্ট পায় বা খাওয়ার পর মধ্যে মধ্যে বমি করে বা পেটের ভিতর বেদনা অনুভব করে—তাহাদের ভবিষ্যতে দুরারোগ্য অজীর্ণতা (indigestion) হইতে পারে এবং এমন কি তাহারা পাকস্থলীর "ঘা" (gastric ulcer) অথবা intestinal tuberculosis প্রভৃতি কঠিন রোগে ভুগিতে পারে। অপরিষ্কার দাঁত বা পোকা-লাগা (carious teeth) দাঁত হইতে অন্য ভাল দাঁত খারাপ হইয়া যায় এবং তাহাদের চিকিৎসা না করিলে—অজীর্ণতা প্রভৃতি রোগ আসিয়া পড়ে। দৃষ্টিশক্তির সামান্য দোষ ক্রমশঃ এমন বাড়িয়া যায় যে পরে চশমা দিয়াও সংশোধন করা যায় না; অথচ প্রথমে চশমা লইলে দৃষ্টি তত খারাপ হইতে পারে না। প্রতি স্কুলেই একজন উপযুক্ত চিকিৎসক রাখিয়া বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া সমুদায় ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো দরকার। চিকিৎসক যে সকল ছাত্রের স্বাস্থ্যে কোনও অসুখের লক্ষণ পাইবেন—তাহাদের অভিভাবকের নিকট একখানি করিয়া চিঠি লিখিয়া চিকিৎসার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিবেন।

ছাত্রদের মধ্যে—

টন্সিলের দোষ—শতকরা ১৫ জনের

দৃষ্টিশক্তির দোষ—শতকরা ১২ জনের

দাঁত ও মাড়ির দোষ—শতকরা ৭ জনের

পেটের অসুখ—শতকরা ২ জনের

গলার বাহিরে বীচি (গণ্ডমালা) বা গ্ল্যাণ্ড (gland) ২০০ শতের মধ্যে একজনের

সর্দ্দি-কাশি—শতকরা ১ জনের

যক্ষ্মার সন্দেহজনক উপসর্গ বর্ত্তমান:—
১০ হাজারের মধ্যে ৫ জনের

অভিভাবকের কর্ত্তব্য

ছাত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে স্কুল হইতে কোনও চিঠি আসিলেই অভিভাবকগণের তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। তাঁহাদের অবহেলায় ছাত্রের ঐ সকল অসুখ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া আশঙ্কার কারণ হইতে পারে। পরিচিত ডাক্তারের নিকট লইয়া যাইয়া সময়মত তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অভিভাবকদের অবস্থা খারাপ হইতে পারে; যদি

বাস্তবিক তাহাই হয়—তাহা হইলে নিকটবর্ত্তী কোনও দাতব্য-চিকিৎসালয়ে যাইয়া তাহার ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সময় থাকিতে চিকিৎসা না করিলে পরে হয়ত অনুতাপের অবধি থাকিবে না। তাঁহার মনে রাখা উচিত যে যখন কোনও শক্ত অসুখে ছেলে শয্যাশায়ী হয়—তখন তিনি তাহার চিকিৎসা না করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না; সেইরূপ এই সকল সামান্য অসুখের বিষয়েও তাঁহাকে যত্ন লইতে হইবে।

> প্রতি দশ হাজারের মধ্যে ৫ জন প্রতি বৎসর "যক্ষ্মায়" মারা যায়।
>
> অথচ ছাত্রাবস্থায় অন্ততঃ ঐ ৫ জনের মধ্যে ১ জনের ঐ রোগের পূর্ব্বেও প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায়।

উৎকৃষ্ট আহার ও উপযুক্ত ব্যায়াম

উৎকৃষ্ট আহারের ব্যবস্থা করিলেই যে রোগের সম্ভাবনা একেবারে যাইবে—এইরূপ বিশ্বাস করা ভুল। কারণ, অনেক ধনীর সন্তানও ছাত্রবস্থায় নানাবিধ অসুখে আক্রান্ত হয়। উপযুক্ত ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা আছেই। তাই বলিয়া যাহাদের দেহে কোনও রোগের লক্ষণ দেখা যাইতেছে—তাহাদের কেবল আহার ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিলে দেহ নীরোগ হইবে না। রোগের চিকিৎসা করিতেই হইবে।

ব্যয়-ভার

ড্রিল করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্কুলে একজন করিয়া চিকিৎসক রাখিয়া ছাত্রদের রোগ পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য কিছু খরচ হইবে সত্য। কিন্তু জাতীয় জীবনে ইহার মূল্য উঠিয়া আসিবে। যদি বৎসরে একটী ছাত্রও অকাল মৃত্যু বা জীবন-ব্যাপী রোগভোগের হাত হইতে উদ্ধার পায় তাহা হইলেও এই কার্য্যের সার্থকতা হইবে। একটী সবল সুস্থজাতি গঠিত হইবে।

ফলাফল

ছাত্রদের যেমন চিকিৎসার জন্য পরামর্শ দিতে হইবে—সঙ্গে সঙ্গে আরও বহুবিধ পরামর্শ দিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যে সকল ছাত্রের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ—তাহাদিগকে দুই এক বৎসরের জন্য লেখাপড়া বন্ধ করাইতে হইবে। আবার অন্য ক্ষেত্রে বাড়ীতে তাহাদের পরিশ্রমের মাত্রা বিশেষ করিয়া কমাইতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্রকে সকালে ও বিকালে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা উন্মুক্ত জায়গায় বেড়াইতে হইবে এবং প্রত্যেককে বাড়ীতে প্রত্যহ কোনও না কোন প্রকার ব্যায়াম করিতে হইবে। আহারের সম্বন্ধে তাহাদিগকে কয়েকটী সাধারণ স্বাস্থ্য-প্রদ পরামর্শ দিয়া যাহাতে সেগুলি পালন করে দেখিতে হইবে। অভিভাবকের সাহায্য, সহানুভূতি ও মনোযোগ ব্যতিরেকে ছাত্রের এই সকল বিষয়ে উন্নতি হইতে পারে না। *

* ডাঃ সুধীরচন্দ্র বসু, এম্-বি, (মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা) হাতে-কলমে অভিজ্ঞতালাভ করিয়া এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন। ইনি ছাত্রসমাজ সম্বন্ধে বহু চিন্তা ও গবেষণা করিয়াছেন। আশা করি এই প্রকারের প্রয়োজনীয় নিবন্ধ আমরা মাঝে মাঝে প্রকাশ করিতে পারিব। উঃ সঃ।

মন

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শিল্পী তুমি, দ্রষ্টা তুমি,
কারিকর যে তুমি সবার বড়,
খেয়ালী যে সত্য তুমিই
যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।

তুমি আলো পঞ্চবটীর বনে
অযোধ্যার সে স্বর্ণ-সিংহাসন,
জতু-গৃহের বিভীষিকার মাঝে
রাজসূয়েরি করাও আয়োজন।

বাদশা তুমি গড়াও তাজমহল,
কবি তুমি রচো শকুন্তলা ;
গ্রীক যে তুমি শিল্পে কি সুকৌশল
ঐন্দ্রজালিক তোমায় সাজে বলা।

সিংহ তুমি হুঙ্কারেতে তব
ঘন ঘন কাঁপাও অরণ্যানী ;
আবার কভু ভীরু শশক সাজো
যাবেনাক বুকের ধুকধুকানি।

দুর্ব্বল এই পঞ্জরপিঞ্জরে
কেমন করে থাক গরুড় পাখী ?
ব্রহ্মার এই মাটীর কমণ্ডলু
গঙ্গা হয়ে তাহার মাঝে থাকি,

অগস্ত্যের এ গণ্ডুষেরি মাঝে
মহাসাগর কেমন করে রও ?
অন্ধ নরে, আঁধার কোণে রয়ে
গীতার কথা শুনাও হে সঞ্জয় !

সারথি হে তুমিই চালাও রথ,—
বামন তুমি মাগো ত্রিপাদ ভূমি,
রুদ্র করো কালকে লয়ে খেলা
হে বিশ্বরূপ প্রণাম লহ তুমি।

শরীরের নাম মহাশয়

—ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

কুড়ি বৎসর বয়সে, একটি ফরাসী যুবকের একটা ফুসফুসে ক্ষয়কাশ-ব্যারাম ধরায় সেটা একরকম নষ্টই হইয়া যায়। সে ব্যক্তি ঘড়ি-মেরামতের কায করিত এবং অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। পাছে ধুলা উড়িয়া কল খারাপ করে, এই আশঙ্কায় ঘড়ি-ওয়ালাকে সার্সি বন্ধ করিয়া কাজ করিতে হয়, এবং ঘড়ি-মেরামতের কার্য্যে সম্মুখদিকে ঝুকিয়া পড়িয়া কাজ করিতে হয় ;—অর্থাৎ, ঘড়ি-মেরামতের কায ফুসফুসের পক্ষে ভাল কায নয়। তাহা হইলেও এই যুবক মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিল —"যেমন করিয়া হউক আমাকে বাঁচিতেই হইবে।" এবং সে বাঁচিলও একশত বৎসর—এবং তা'ও মাত্র একখানা ফুসফুস লইয়া ! সে ব্যক্তি যে কি খাইত, কেমন থাকিত বা কোন্ কোন্ ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা আমাদের জানা নাই ; বস্তুতঃ আমরা তাহার জীবনচরিত লিখিতে বসি নাই। তবে ঘটনাটি সত্য এবং এই একদিকের ফুস্‌ফুস লইয়া শতায়ু হওয়ার কথাটা শুনিয়া সাধারণের মনে একটা সন্দেহ জাগিতে পারে বলিয়া দেহের কতদূর সহন-ক্ষমতা এবং আমরা এই নীরব সহনশীল দেহের উপরে যে কত অত্যাচার করি, তাহাই স্মরণ করাইবার জন্য এই বিষয়ের অবতারণা করা গেল।

আমাদের ফুস্‌ফুস্, বৃক্ক (kidney বা মূত্র-সৃজনকারী যন্ত্র), চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত-পদ—প্রত্যেকটি দুইটি করিয়া আছে। হৃৎপিণ্ড মাত্র একটি,—তা'ও জন্ম হইতে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত সমস্তক্ষণই তাহাকে খাটিতে হয়। সঞ্চয়ী লোকদের যেমন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত বা আমানতী টাকা থাকে, এবং অসময়ে বা দুঃসময়ে তাহা ভাঙ্গাইয়া স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, আমাদের যতগুলি দেহ-যন্ত্র আছে, তাহাদের প্রত্যেককে দৈনন্দিন যতটা

শ্রম বা কার্য্য করিতে হয়, অসময়ে তাহার অন্ততঃ দশগুণ তাহারা কায করিয়া যাইতে পারে—তাহাতে আমাদের দেহের এতটুকু ক্ষতিও হয় না এবং অধিকাংশ সময়ে আমরা সে অতিরিক্ত শ্রমের সংবাদও রাখি না—এত সহজে ও স্বচ্ছন্দে সে কার্য্য সাধিত হয়। চারটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। (১) সাধারণতঃ, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড চব্বিশ ঘণ্টায় ১,০০,৮০০বার স্পন্দিত হয় এবং ১৫০ মণ রক্ত শুধু পাম্প করিয়া টানিয়া লয় না, আবার তাহাকে সজোরে ঠেলিয়া দেয়। যখন আমরা দৌড়াই তখন এই কার্য্য অনায়াসে তিন বা চতুর্গুণ বা ততোধিক বেশী হইতে পারে। (২) আমরা শায়িত বা শান্ত অবস্থায়, ১৬৪ গ্রেণ ভূষা (কার্ব্বন) নিঃশ্বাসের সঙ্গে বায়ুতে ত্যাগ করি; কিন্তু দৌড়াদৌড়ি করিলে বা ব্যায়ামকালীন, তাহার স্থলে ৬৮২ গ্রেণ ভূষা বায়ুতে দিই। (৩) যে ব্যক্তি নিত্য তিনপোয়া খাদ্য ভোজন করে, চেষ্টা ও অভ্যাস করিলে হয়ত মাসান্ত কাল ধরিয়া অনায়াসে পাঁচ পোয়া খাদ্য সহজেই খাইবে ও পরিপাক করিয়া বাহ্যতঃ সুস্থও থাকিবে। (৪) ক্লোমযন্ত্র (pancreas) এর ⅛ ভাগ থাকিলেও বাঁচা সম্ভবপর হয়। এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেহের প্রত্যেক যন্ত্রেরই মধ্যে অন্ততঃ দশগুণ কার্য্যক্ষমতা নিহিত থাকে—যাহা সময়ে-অসময়ে, আমাদিগকে আকস্মিক ঘটনা হইতে রক্ষা করিতে পারে ও করে।

কাযেই একটা ফুসফুস যাওয়া কিছু বড় কথা নয়। কিন্তু তাই বলিয়া নিয়ত গড়াইলে, কলসীর জলও ফুরায়, ধনীর আমানতী টাকাও নিঃশেষ হয়—একথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। যতক্ষণ আমরা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে চলি, ততক্ষণ আমাদের ব্যারাম প্রায় হয় না। কিন্তু প্রকৃতির নির্দ্দেশকে অগ্রাহ্য করিলেই ব্যারাম সুনিশ্চিত। এখন এই "ব্যারাম" জিনিষটাকে আমরা সকল সময়ে ঠিক্ বুঝি না এবং বুঝিতে চেষ্টাও করি না। আমাদের কাছে ব্যারাম—হয় "ম্যালেরিয়া" নতুবা "টাইফয়েড", নতুবা অপর কিছু একটা "নাম" মাত্র। ব্যারাম বলিলে "চিকিৎসকেরা" তাহার একটা বিশিষ্ট "রূপ" কল্পনা করেন—ব্যারাম তাঁহাদের কাছে শুধু ফাঁকা "নাম" নহে —একটা "রূপ" ও "বিশিষ্ট রূপ"। কিন্তু যাঁহারা চিকিৎসক নন, অর্থাৎ যাঁহারা সাধারণজন, তাঁহাদের নিকটে ব্যারাম একটা ফাঁকা নাম থাকিলে ত চলিবে না। আমি এমন বলিতেছি না যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলকেই সুচিকিৎসক হইতে হইবে; আমার বক্তব্য এই যে "ব্যারাম" এই নাম করিলে এ দেহের মধ্যে কোথায় কি ওলোট-পালোট হইল বা হইবার সম্ভাবনা, তাহা বুঝা সকলেরই স্বার্থ। যতক্ষণ আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা না করিব ততক্ষণ শুধু নিজেকেই যে আত্মবঞ্চনা করিব তাহা নহে, চিকিৎসকের প্রতিও অবিচার করিব। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা "ব্যারাম" বলিলে জনসাধারণ তাহাকে কি ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, তাহা বুঝাইতেছি।

ধরুন, কোনও লোকের টাইফয়েড জ্বর হইয়াছে। এই কথাটা শুনিবামাত্রই, চিকিৎসক বুঝিবেন যে, এই লোকটির জ্বর প্রথম সপ্তাহে একটু একটু করিয়া বাড়িবে, দ্বিতীয় সপ্তাহে একই ভাবে জ্বর চলিবে এবং তৃতীয় সপ্তাহে একটু একটু করিয়া জ্বর ছাড়িয়া আসিবে; চিকিৎসক আরো বুঝিবেন যে, এই ব্যারামে নাড়ী তেমন দ্রুত হয় না, প্লীহা বাড়ে, বুকে সর্দ্দি বসে ও পেট ফাঁপে ইত্যাদি ইত্যাদি এবং মাথার দিব্য দিয়া রোগীর আত্মীয়স্বজনকে বলিয়া যাইবেন যেন রোগীকে নড়িতে আদপে না দেওয়া হয়, যেন প্রচুর পানীয় দেওয়া হয়, যেন ঘরে বেশ হাওয়া খেলিতে দেওয়া হয় এবং রীতিমত রোগীর গা মোছান হয়। ডাক্তারবাবু যতই মাথার দিব্য দিয়া যাহাই বলুন না কেন, বাঙ্গালী-গৃহস্থ তাহার কতক করেন, কতক করেন না।—এমনটি কেন হয়? ইহার উত্তর, চিকিৎসাবিষয়ে ষোলআনা অজ্ঞ হইয়াও, বাঙ্গালী সবজান্তা, বাঙ্গালীর শিখিবার—বিশেষ করিয়া শরীরতত্ত্ব ও নিদান শিখিবার আগ্রহ কোন কালে ছিল না, পঙ্গপালের মত মরিয়াও এখনো সে বিষয়ে বাঙ্গালীর বিতৃষ্ণা এবং তাহার উপরে বাঙ্গালীর সমাজে ও সংসারে উপরপড়া হইয়া উপদেশ দিবার লোকের কোন কালে অভাব ছিলও না, এখনো নাই!

যাহাই হোক, জনসাধারণের চক্ষে টাইফয়েড রোগের কথা উঠিলেই গৃহস্থের নিকট কন্যাদায়ের কথার সমান বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।—এইটি বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তির মাসিক ২০০৲ টাকা ব্যয় হইলে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তাঁহার কন্যাদায়ের দিনে অনূন ৪।৫ সহস্র মুদ্রার প্রয়োজন হয়, হয় ত তাঁহার দশ বৎসরের সঞ্চিত-ধন সবটাই বাহির হইয়া যায়;—ফলে সে ব্যক্তি বহুবৎসরাবধি আর কোনও সখের বা প্রয়োজনীয় বাড়তি-খরচের কথাও ভাবিতে পারেন

না। সেইরূপ কোনও লোকের টাইফয়েড জ্বর হওয়ার মানে কি? উহার মানে এই যে, প্রথমতঃ সেই রোগীর দেহে অসংখ্য টাইফয়েড জীবাণু (এ বার্থের ব্যাসিলাস্) বাসা বাঁধিয়া তাহার অন্ত্রে ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছে। সেই অন্ত্রক্ষতে থাকিয়া লক্ষ লক্ষ জীবাণু অপরিমেয় বিষ ঢালিতেছে। এই বিষ রক্তে মিশিয়া সারা দেহকে বিষাক্ত করিতেছে। আমাদের দেহের যন্ত্রপাতি মাত্রেই অতীব সুকুমার। তাহারা বিষের সংস্পর্শে আসিলে খুব শীঘ্রই জখম ও এমন কি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কাজেই যতক্ষণ ও যতদিন ধরিয়া রক্তে এতটুকু বিষ উক্ত জীবাণুরা ছাড়িতে থাকিবে ততদিনই—এবং ক্রমশঃ যতদিন যাইবে, তত বেশীমাত্রায় ও শীঘ্রই দেহের যন্ত্রগুলি জখম হইতে থাকিবে। আবার এই দেহের মধ্যে এমনভাবে ব্যবস্থা করা আছে যে, রক্তের প্রথম ঝলক হইতেই হৃৎপিণ্ড তাহার পোষণোপযোগী দ্রব্য উঠাইয়া লয়। কোন খাদ্য পরিপাক করিবার পরে তাহা হইতে লব্ধ পুষ্টিরস এবং ফুসফুসকর্ত্তৃক অক্সিজেন-বহুল বিশোধিত রক্তের প্রথম ঝলক হইতেই হৃৎপিণ্ড পুষ্ট হয়।—কারণ, দেহের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের বিশ্রাম অল্প এবং হৃৎপিণ্ড একটি অতীব প্রয়োজনীয় দেহযন্ত্র। এমন অবস্থায়, রক্তে যে মুহূর্ত্তে একবিন্দু জীবাণুকর্ত্তৃক প্রস্তুত বিষ পড়ে, সেই বিষের প্রথম মাত্রা হৃৎপিণ্ডকেই গ্রহণ করিতে হয়। কাজেই, প্রত্যেক জ্বরে দেহে বিষ-প্রবেশের প্রত্যেক সময়েই প্রথম মাত্রা হৃৎপিণ্ডকে ভক্ষণ করিতে হয় বলিয়া ব্যারাম মাত্রেই, রোগীকে শায়িত রাখা অতীব প্রয়োজনীয়। যেহেতু, আমরা যত নড়া-চড়া করিব, হৃৎপিণ্ডের কাজ ততবেশী বাড়িয়া যাইবে, ঐ যন্ত্র তত আরো বেশী জখম হইয়া পড়িবে। জীবাণুঘটিত ব্যারামে, সেই বিষকর্ত্তৃক হৃৎপিণ্ড ভীষণভাবে জখম হওয়ার সুন্দর দৃষ্টান্ত চারটি ব্যারামে বেশ দেখা যায়—বাত, নিউমোনিয়া, প্লেগ ও ডিপ্‌থিরিয়া নামক কণ্ঠনলের মারাত্মক পীড়ায়। এই চারটি ব্যারাম খুব বেশী দিন ভোগায় না; এবং এই চারটি ব্যারামে হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হইয়াই মৃত্যু ঘটে। এই ব্যারামগুলিতে হৃৎপিণ্ড এত *ভীষণভাবে জখম হয় যে দেখা গিয়াছে রোগীর সব লক্ষণ* ও উপসর্গ সারিয়া গিয়াছে, রোগী আরোগ্যের পথে বেশ অগ্রসর হইতেছে, এমন সময়ে বিছানায় উঠিয়া বসার চেষ্টারূপ যে সামান্য পরিশ্রম, তাহারই ফলে রোগী মারা গিয়াছে! একথা রোগীরা এবং তাঁহাদের আত্মীয়েরা সকল সময়ে বুঝেন না—দেখা গিয়াছে যে বারম্বার উঠা বসা বা বিছানায় শুইয়া নানারকম অস্থিরতা করার ফলে টাইফয়েড রোগীর ভোগ বাড়িয়া গিয়াছে।

হৃৎপিণ্ডের কথা ছাড়াও টাইফয়েড রোগে আর একটি বিপদের দিক আছে। টাইফয়েড রোগবীজাণুরা রোগীর আঁতে—তলপেটের ডানদিকে বাসা বাঁধে ও তথায় ক্ষত উৎপন্ন করে। আমাদের অন্ত্র বা নাড়ীভুঁড়ির গা খুব পাতলা; একে গা পাতলা, তাহার উপরে ক্ষত হইয়াছে; তাহার উপরে উঠিতে বসিতে আমাদের পেটের সম্মুখের দিকের মাংসপেশীগুলি পেট টেপার মত তথায় চাপ দেয়; কাজেই নড়া-চড়ার মুখে যে কোনও মুহূর্ত্তে সেই পাতলা ঘায়ের ঘায়গাটি ফাটিয়া গিয়া অজস্র রক্তপাত ঘটাইয়া মৃত্যু আনিতে পারে। জ্বর অবস্থায় নড়া-চড়ার বিপদ কত তাহা দেখাইলাম। আরো একটি দৃষ্টান্ত দিব। যাঁহাদের ক্ষয়কাশের ব্যারাম হয়, তাঁহাদের প্রায়ই জ্বর হয়। আর এই জ্বর ঔষধে সহজে জব্দ হয় না—জব্দ হয়, রোগী কাঠের মত শান্ত ও স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে। তাহার কারণ আর কিছুই নয় কেবল এই:—যখনি কোনও মাংসপেশী কাজ করে, তখনি সেই কাজের ফলে রক্তে কিছু ল্যাকটিক্ অ্যাসিড, কিছু কার্ব্বলিক অ্যাসিড ও কিছু ফাইনো-টক্‌সিক্ অ্যাসিড নামক বিষত্রয় রক্তে যাইয়া পড়ে—যে রক্তে ইতিমধ্যে ক্ষয়কাশ জীবাণুর বিষ আছেই; তাহা ছাড়া যখনি দেহের কোনও মাংসপেশী কাজ করে, তখনি কতকটা রক্তরস লসিকা শিরার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবার পথ পায় অর্থাৎ এক ঝলক টিউবারকল্ জীবাণুঘটিত বিষ দেহে ছড়াইয়া পড়িবার অবসর পায়। অর্থাৎ ক্ষয়-রোগীদের পক্ষে একটি অঙ্গুলি হেলন করাও দেহের মধ্যে বিষ ছড়ানর হেতু হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই ক্ষয়কাশরোগীর স্থির হইয়া শায়িত থাকা চাই; তিনি যদি তাহা না করেন, তবে যতদিন ও যতক্ষণ তাহা না করেন, ততক্ষণই তাঁহার *তিনদিক হইতে বিপদ বাড়ে*—জ্বর বাড়ে, মাংসপেশীর কার্য্য-জনিত ও ক্ষয়জীবাণুর দেহনিঃসৃত এই উভয় জাতীয় বিষই দেহে ব্যাপ্ত হইবার সুযোগ পায়—হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি উত্তরোত্তর জখম হইয়া পড়ে।

ক্ষয়কাশের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলাম তিনটি কারণে। প্রথমতঃ ঐ রোগ আজ যথা তথা। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশের লোকরা—এমন কি শিক্ষিতগণও—ঔষধে খুব বেশী আস্থাবান্ এবং মনে করেন, যে ঔষধ খাইলেই আর কিছু করার প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, চিকিৎসক ও তাঁহার হাতিয়ার ঔষধ প্রকৃতির সহায়ক মাত্র। প্রাকৃতিক নিয়মের স্থলাভিষিক্তও নহে বা ঔষধ সাহায্যেও তাহাকে উপেক্ষা করিবার কারণ নাই। অথচ শিক্ষিত ক্ষয়রোগীও সহজে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহে না যে, সুধু শায়িত থাকা এত প্রয়োজনীয়। যাহা হউক, উপরোক্ত চারটি দৃষ্টান্ত হইতে বেশ বুঝা গেল যে দেহে জীবাণু প্রবেশ করিলেই তাহারা দেহমধ্যে বিষ ছড়ায়। ঐ বিষ রক্তে মিশিয়া সারাদেহকে জর্জ্জরিত করে এবং বিশেষ করিয়া জখম করে সেই যন্ত্রটিকে, যাহার কৃপায় আমরা জীবিত থাকিতে পারি—অর্থাৎ হৃদপিণ্ড, হার্ট। অতএব কাহারও কর্ণে যে মুহূর্ত্তে সংবাদ আসিবে যে অমুকের অসুখ হইয়াছে—সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মানসনেত্রপথে বিপন্ন ও দুর্দ্দশাপন্ন হৃৎপিণ্ডের দৃশ্য বেশ জল জল করিয়া ফুটিয়া উঠা চাই। এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে বিশ্রামের অতি প্রয়োজনীয়তা এক রকম instinct বা সহজাত সংস্কারের মত তাহার মনে আসা চাই, তবে তাহার স্বার্থরক্ষা সম্ভবপর।

তারপর—জ্বর বাড়িলেই আমরা ব্যস্ত হই—তাড়াতাড়ি মাথায় বরফ দিবার জন্য চেষ্টিত হই—চিকিৎসক কাছে থাকুন আর না থাকুন। কেন? ইহার উত্তর—জ্বর হইলে রক্ত অতিমাত্রায় উত্তপ্ত হয়, এবং যে হারে জ্বর বাড়ে, প্রায় সেই হারেই, রক্তে জীবাণুঘটিত ও দেহক্ষয়জনিত নানা বিষ জন্মে। উক্ত উত্তপ্ত ও বিষাক্ত রক্ত অধিকক্ষণ মস্তিষ্কে থাকিলেই মস্তিষ্ককে ধ্বংস করিবে। অথচ যতক্ষণ ঠিক থাকে, ততক্ষণ আমাদের হৃৎপিণ্ডের ও শ্বাসযন্ত্রের কাযও বজায় থাকে। কাযেই হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসকার্য্যকে বজায় রাখিবার জন্য—রোগীকে আশু মৃত্যুর মুখ হইতে বাঁচাইবার জন্য আমরা স্বতঃই ব্যস্ত হইয়া পড়ি। তাহা হইলেই কাহারো প্রবল জ্বর হইয়াছে, এই কথা কাণে পৌছিবা মাত্রেই আমাদের মানস-পটে—বিপন্ন হৃৎপিণ্ডের ও শ্বাসযন্ত্রের কর্ম্মলোপের আশঙ্কার ছবি ফুটিয়া উঠা চাই—এবং যত শীঘ্র সম্ভব ও যেন তেন প্রকারেণ সেই জ্বরকে কমাইবার জন্য ছটফটানি ধরা চাই। পরমেশ্বর ১০৯° ফাঃ উত্তাপগ্রস্ত রোগীকেও বাঁচান— যদি তাহার দেহে জীবনীশক্তির উদ্ধৃতাংশ বজায় থাকে।

তাহার পরে আর দুইটি নীরব কর্ম্মীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া চাই। সেদুটি—যকৃত ও বৃক্ক বা প্রস্রাব সৃষ্টিকারীযন্ত্র। নীলকণ্ঠ যেমন বিষপান করিয়া জগতের মঙ্গল করিয়াছিলেন, এই যকৃতও সেই রকম এই দেহে যে বিষই প্রবিষ্ট হইক, তাহাকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে। বিষ বলিলে শুধু আফিম, কুঁচিলা, সেঁকো বিষ প্রভৃতিকেই বুঝিবেন না। আমরা মাছ মাংস খাইলে দেহমধ্যে তাহার অদ্ধেকটা ইউরিক নামক বিষে পরিণত হয়; আমাদের অন্ত্রস্থিত মল হইতে নিত্যই indol, skatol, phenol, প্রভৃতি বিষ উদ্ভূত হয়। বেশী চিনি খাইলে বা বেশী স্নেহজাতীয় পদার্থ ভোজনের ফলে, অথবা অজীর্ণের ফলে পেটে যে নানা জাতীয় বিষাক্ত অম্লসৃষ্টি হয় (যেমন B-oxy butyric acid ইত্যাদি)—এই সমস্ত বিষকে অপেক্ষাকৃত কম বিষাক্ত acetone নামক পদার্থে যকৃতই পরিণত করিয়া, নিত্য নীলকণ্ঠরূপী শিব হইয়া, দেহকে অশিব হইতে বাঁচাইয়া রাখে। আর এই শিবরূপী যকৃতের উপরে আমরা নিত্য কতই না অত্যাচার করিতেছি! যখন একটা কঠিন ব্যারাম ধরে যেমন ধরুন টাইফয়েড্ জ্বর—তখন দিনের পরে দিন সুদীর্ঘ এক মাসকাল ধরিয়া, অহোরাত্র অত্যধিক পরিমাণে উক্ত জীবাণুঘটিত বিষকে নীরবে এই যকৃতই ধ্বংস করে বলিয়াই আমরা নিষ্কৃতি পাই—বাঁচিয়া উঠি! সারামাসব্যাপী এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা যকৃতের মধ্যে নিহিত ছিল বলিয়াইত আমরা দীর্ঘকালব্যাপী ব্যারাম হইতে সারিয়া উঠি—নহিলে যে প্রবলবেগে এইসব ব্যারামে প্রথম দিন হইতেই বিষরাশি রক্তে আসিয়া পড়িতে থাকে, তাহার প্রথম দিনেই আমরা মৃত হইতাম! আর যে অসীম ক্ষমতা অসুস্থতার কালে নীরবে যকৃত দেখায় সুস্থাবস্থার কাজের তুলনায় তাহা দশগুণের চেয়ে ঢের বেশী! আমরা যদি জন্ম হইতে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত অতীব যত্নের সহিত এই নীলকণ্ঠরূপী যকৃতের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া চলি, তাহা হইলে দুইশত বৎসর পরমায়ু লাভ করাও কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। পক্ষান্তরে, এইরকম এক একটা দুর্জ্জয় ব্যারাম

হয়, আর পরমায়ু হইতে দশটি বৎসর আয়ু কমিয়া যায়; আমরা আলু-পটোলের হিসাবে এত সময় ব্যয় করি—কিন্তু আমাদের দেহের মধ্যে কত শক্তি সঞ্চিত আছে, তার এক একটা ব্যারামের মুখে তাহার কতটা খরচ হইতেছে, সেটার বাকী টানিয়া উশুল দিয়া কখনো দেখি কি? এ দুর্লভ মানবদেহটি শ্রীভগবানের গচ্ছিত ধন। আমরা ব্যবহার করিব ও ইহার ন্যাস রক্ষা করিব (trustee) এইত আমাদের সম্পর্ক। আমরা কি তাহা করিতেছি?

ময়লা বা আবর্জ্জনাকে মানুষ মাত্রেই ভয় করেন। আমাদের পেটে নিত্য কতই মল জন্মাইতেছে এবং প্রোটীন জাতীয় খাদ্যধ্বংসের ফলে প্রস্রাবও প্রস্তুত হইতেছে। মল "ত্যাগ" করিবারই জিনিষ। খাওয়ার দোষে, বস্ত্রাদি পরিধান করিবার দোষে, নানা অশাস্ত্রীয় কার্য্য করার ফলে, যদি নিত্য নিয়মিত দুই তিন বার দৈনিক কোষ্ঠ সাফ না হয়, এবং কিড্‌নী পীড়িত হওয়ায় প্রস্রাব সম্যকরূপে নির্গত না হয়, তবে ব্যাধি অনিবার্য্য, অথচ আহার বিহার সংবন্ধে আমরা কি অত্যাচারই না করি! প্রথম অত্যাচারের মুখেই আমাদের ভবলীলা সাঙ্গ হইত, যদি না এই যন্ত্রদ্বয়ের মধ্যে এক রকম অপরিমেয় ভাবেই অবস্থান্তরের সঙ্গে থাপ খাওয়াইবার শক্তি ইহাদের মধ্যে নিহিত থাকিত? শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের শত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছিলেন, তাহার বেশী করেন নাই। আর, আমাদের দেহের মধ্যে নীরবকর্ম্মী এই কিড্‌নীদ্বয় জীবনের প্রায় প্রত্যেক 'দিনই' শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া, আমাদিগকে অন্ততঃ ৪০।৫০ এর কোঠায় পৌছাইয়া দিতেছে। কে বলিতে পারে—আমরা যত্নশীল ও সতর্ক হইলে ইহারা অন্ততঃ দুই গুণ পরমায়ু আমাদিগকে না দিত?

ব্যারাম সম্বন্ধে আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কথা আছে। ব্যারাম সারিলে, বাহ্যতঃ আমাদের চেহারা, কর্ম্মশক্তিপ্রভৃতি সকল কিছুই পূর্ব্ববৎ হয় বলিয়া আমরা নিজেরাও মনে করি এবং লোকেরাও তাহা দেখেন। কিন্তু সত্যই কি এই বাহ্য-দৃশ্যের অনুরূপ অবস্থা ভিতরে থাকে? তাহা কখনই থাকিতে পারে না। যেহেতু একমাসকাল নিরবচ্ছিন্ন রোগের বিষের সহিত যুঝিবার সময়ে হৃৎপিণ্ডের, মস্তিষ্কের, যকৃতের ও কিড্‌নীর যে কতটা সঞ্চিত শক্তি ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে, তাহা স্বয়ং দেহীই জানেনা—কঠিন পরীক্ষাদ্বারা রসায়নাগারে বা ল্যাবরেটরিতে তাহার অনেকটা কিনারা পাওয়া যায় বটে এবং তাহা হইতে চিকিৎসকও অনেকটা অবস্থা বুঝিতে পারেন। শুনিয়াছি যে পারাবতের শৈশবে ব্যারাম হয়, সে পারাবত Wellington raceএ কস্মিন্‌কালে জিতিতে পারে না, এবং তাহার তেমন বলবান শাবক হয় না বলিয়া পারাবতের মালিকগণ সে পারাবতকে ধ্বংস করেন। একথার অর্থ এই যে, শৈশবে ব্যারাম হইলে, চিরকালের মত তাহার উদ্বৃত্ত জীবনীশক্তির হ্রাস ঘটে বলিয়া সে আর বাজি জিতিতেও পারে না এবং বাজী জিতিতে পারিবে এমন শাবকও প্রসব করিতে পারে না। এই জন্য এত করিয়া মল, মূত্র প্রভৃতি বারম্বার পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এবং প্রত্যেকবার পূর্ব্বের রিপোর্টখানি প্রত্যেক পরবর্ত্তী রিপোর্টের সঙ্গে মিলাইয়া দেখা এত প্রয়োজন। বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় একথা বুঝিবার চেষ্টাও করেন না এবং এইরূপ পরীক্ষাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন এবং রিপোর্টগুলিকে নথীভুক্ত করা দূরের কথা, রাখেনও না। আলো, বাতাস ও জল প্রকৃতিদেবী অঢেল ভাবে দিয়াছেন; আর তাহার প্রত্যেকটিকেই আমরা দূরে ফেলিয়া রাখি—চিকিৎসকের পরামর্শ সত্ত্বেও।

আজ যদি আমরা এইভাবে দেহকে ও প্রত্যেক ব্যারামকে বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে কত স্বেচ্ছাচার, কত অযত্ন, কত অত্যাচার বন্ধ করিয়া আমরাও শতায়ু হইতে পারি। তাহা না করিয়া ক্ষণিক তথাকথিত সুখের আশায় কত কদভ্যাস করিয়া নিত্যই দেহের আমানতী শক্তি ভাঙাইয়া খাই—কাজেই আমরা এত অল্পায়ু এত রোগপ্রবণ ও এত সহজে মৃত্যুমুখে পড়ি! আর অসুখ হইলে ন্যাকামি করিয়া বলি—"আমার অসুখ হইল কেন?"

আমাদের কথা আর বলিয়া লাভ নাই। শিশুদিগকে আমরা যেন শপথ হিসাবে এই শিক্ষা দিই। আশা করি, আমরা সকলেই দেহের মধ্যে যে প্রভূত সঞ্চিত শক্তি আছে তাহার অপব্যয় করিয়া দেউলিয়া হইব না, অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত ভগবদ্দত্ত এই দেহ-মন্দিরের প্রতি মর্য্যাদাবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া ইহার প্রকৃত ন্যাসরক্ষীর মতই কার্য্য করিব। *

---

* ডাঃ রমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস, (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা) অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় এই প্রকার বহু প্রবন্ধ লিখিয়া বাঙ্গালী জাতিকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় এই প্রকার সুলিখিত আলোচনায় বিশেষ উপকার হইবে। ভাঃ সঃ

আধুনিক ইংরাজ বালকের নৈতিক ও শারীরিক অধঃপতন

—শ্রীনন্দগোপাল সেন গুপ্ত

শ্রমবিমুখিতা

সম্প্রতি বৃটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের এক সভায় লান্সিং কলেজের প্রধান শিক্ষক এবং ইটনের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক মিঃ কুথ্বার্ট ব্ল্যাকীষ্টন্ ৩০ বৎসর পূর্ব্বেকার ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহিত আধুনিক ছাত্রদের তুলনা করিয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার মতে আধুনিক ছাত্রেরা সর্ব্ব বিষয়েই পূর্ব্বতন ছাত্রদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

তিনি বলেন পূর্ব্বতন ছাত্রদের সহিত আধুনিক ইংরাজ ছাত্রের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আজিকার বালকগণ প্রায় সকলেই ক্রীড়া-কৌতুক ও শ্রমবিমুখ; তাহাদের মধ্যে তেজস্বিতা ও দুঃসাহসের অভাব ঘটিয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহারা শারীরিক কষ্টকে এড়াইয়া চলিতে চায়—এক কথায় তাহারা বড় বেশী 'আয়েসী' ধরণের হইয়া পড়িয়াছে।

অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অনিচ্ছা

৩০ বৎসর আগেকার সময়ের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে ছাত্রগণের জীবন-যাপন-প্রণালী তখন অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল ছিল। তাহারা ঘোড়া, কুকুর এবং বন্দুক ভালবাসিত এবং ক্রীকেট্ ও ফুটবল খেলা বলিয়া পাগল হইত। আজিকার টেনিস্ গল্‌ফ তখন ছাত্রদের কল্পনায় একটু-একটু প্রবেশাধিকার লাভ করিতেছে মাত্র।

আধুনিক ছাত্রের কোথাও দু' পা যাইতে হইলেই মোটর চায়; ইহা ভিন্ন গ্রামোফোন্, রেডিও অনেক কিছু না হইলেই তাহাদের চলে না। তাহারা এরোপ্লেনে চড়িতে, মোটর বা নৌকা-যোগে বাইতে ওস্তাদ শতকরা ১০ জনও ঘোড়ার উপর 'জিন্' চাপাইতে জানে কিনা সন্দেহ! একবার মিঃ ব্ল্যাকীষ্টন্ একজন ছাত্রকে ঘোড়ার পিঠে জিন্ উঠাইতে বলেন—সে জানেও না কোন দিক হইতে আরম্ভ করিতে হয়।

বর্ত্তমান কালের তরুণেরা সকলেই দ্রুতগতিশীল যান আরোহণের পক্ষপাতী—তাহারা নির্জ্জনতা পছন্দ করে না, কষ্ট সহিবার শক্তি তাহাদের নাই।

কাপুরুষতা

এই সব কারণে ইংরাজ জাতির স্বভাবমুলভ সাহসিকতা এবং বিজয়-স্পৃহা ক্রমশঃ তাহাদের মন হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইহার পরিচয় পাওয়া যায় যখনই কোন ছাত্রকে বিদেশে গিয়া লেখা-পড়া করিতে বলা হয় অমনি সে মা অথবা পিসীমার উল্লেখ করিয়া ওজর দেখায়—অথচ সে নিজেই আগে তাঁহাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দেয়!

বর্ত্তমান যুগের দৌড়ঝাঁপ এবং যান্ত্রিক সুখ-সুবিধার ফলেই তাহাদের এই মানসিক অধঃপতন ঘটিয়াছে। বিগত মহাসমরের সমকালে অথবা পরে যে সমস্ত বালক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাশক্তি এবং অসম সাহসিকতা আদৌ দেখিতে পাওয়া যাওয়া যায় না। তাহারা অধিকাংশই অত্যন্ত ভীরু এবং পৌরুষশূন্য। ইহা হইতে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই যে তাহারা পূর্ব্বতন ছাত্রদের অপেক্ষা সুবাধ্য এবং শৃঙ্খলা-সম্পন্ন—পাছে কোন শাস্তি পাইতে হয় এই ভয়ে তাহারা সর্ব্বদাই আড়ষ্ট থাকে, তাই কোন উপদ্রব করিতে সাহস পায় না।

মিঃ ব্ল্যাকীষ্টন্ হাজার হাজার আধুনিক ছাত্রের খবর রাখেন যাহারা খেলা-ধূলা, কাজ-কর্ম্ম সব কিছুতেই নারাজ—তাহাদিগকে কোন কাজে লাগাইতে হইলে যথেষ্ট জোর-জুলুম আবশ্যক হয়। ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয়ে তাহাদের এই মনোভাব আরও স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

আধুনিক কালের কোন ছাত্রই ক্রিকেটের মতো ইংরাজের নিজস্ব খেলা খেলিতে প্রস্তুত নয় · তাহারা বলে উহা অত্যন্ত কুড়ে খেলা, এরূপ বাজে খেলা লইয়া দুটি, তিনটি দিন অনর্থক নষ্ট করিবার কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু সত্য সত্যই ক্রিকেট একটা বাজে খেলা নয়, পল্লী অঞ্চলের ক্রিকেট খেলার মধ্যে যথেষ্ট স্ফূর্ত্তির উপাদান আছে, তাহারা তাহার ধারও ধারে না।

কিন্তু এ সমস্ত অনিষ্ট অপেক্ষা অনেক বেশী আশঙ্কার কারণ হইতেছে আধুনিক ছাত্রদের নৈতিক অধঃপতন। আধুনিক ছাত্রদের মধ্যে কদাচিৎ সাধুতা বা মনুষ্যত্ব দেখা যায়। আগে

লোকে বলিত ইংরাজের মুখের কথায় কখনো নড়চড়্ হয় না—ইংরাজ বালক পারত পক্ষে মিথ্যা বলে না! একথা আজ আর খাটে না।

আগেকার ছাত্রেরা শুধু বন্ধুকে বাঁচাইবার জন্য ছাত্র-সমাজের চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে দলবদ্ধ ভাবে মিথ্যা কহিত —আজ ছাত্রদের সেই সহজ ঐক্য-বোধ অন্তর্হিত হইয়াছে। মিঃ ব্ল্যাকীষ্টন অনেক ছাত্রকে তাহাদের সমপাঠীদের বিরুদ্ধে এমন অনেক কদর্য্য অভিযোগ করিতে শুনিয়াছেন তদন্তে যাহার ষোল আনাই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বক্তার মতে আধুনিক কালে একটি বিদ্যালয়কে যথারীতি পরিচালনা করিবার প্রধান অন্তরায় হইতেছে ছাত্রগণের সত্যবাদিতার অভাব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করেন। একবার তিনি কোন ছাত্রকে বলেন, "জান উহা মিথ্যা কথা?" তাহার উত্তরে সে বলে, "তা হ'ক্ কিন্তু আগাগোড়া ত বজায় থাকিয়াছে।"

চৌর্য্য ও বিলাসিতা

অর্থাপহরণ অবশ্যই একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ, কিন্তু এখনকার ছাত্রদের মধ্যে পরস্পরের বই ও গ্রামোফোন্ রেকর্ড চুরি করা একটা নূতন ধরণের হাওলাতে দাঁড়াইয়াছে।

আধুনিক ছাত্রদের প্রায় সকলেরই প্রকৃতি কতকটা কাপ্তেনী ধরণের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজেকে সুন্দর দেখানর জন্য তাহারা পোষাক-আসাকে এবং যে কোন রকম প্রসাধনে অর্থব্যয় করিতে কুন্ঠিত নয়। এই মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া এক এক সময় তাহারা এমন নির্লজ্জতা প্রকাশ করে যে তাহা দেখিয়া যথেষ্ট ক্রোধের উদ্রেক হয়। মিঃ ব্ল্যাকীষ্টন্ এক এক সময় একটি ছিম্‌ছাম্ এবং প্রসাধন-তৎপর বালকের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, যে সমস্ত আত্মীয় বন্ধু তাহাদের বাড়ীতে আসিতেন তাঁহারা তাহাকে সুন্দর বলিতেন এবং আদর-যত্ন করিতেন—সেই হইতে তাহার মনে স্বকীয় সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায়।

আধুনিক ছাত্রের সমর্থনে অপরাপর শিক্ষক

মিঃ কুথবার্ট ব্ল্যাকীষ্টন্ আধুনিক ছাত্রদের বিরুদ্ধে এই সকল অভিযোগ আনয়ন করিলে লণ্ডনের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষা-বিভাগের কয়েকজন কর্ত্তৃপক্ষ তাহার প্রতিবাদ করেন। সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি কর্ত্তৃক সংগৃহীত-সেই সকল প্রতিবাদের কতকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

সাসেক্স্ আডিংলে কলেজের প্রধান শিক্ষক ডাঃ উইলসন্ বলেন, "বালকেরা স্বভাবতঃই জিনিষ-পত্র সম্বন্ধে বেহিসাবী কিন্তু মনে করাইয়া দিলে তাহারা অপরের দ্রব্য ফেরৎ দেয় না, এমন নয়। আজিকার বালকেরা খুব মিথ্যাবাদীও নহে—যুদ্ধের অল্প পরে এদেশের যুবকদের নৈতিক অধঃপতন কিছু ঘটিয়াছিল বটে কিন্তু বহুদিন হইল তাহা কাটিয়া গিয়াছে। আমি সর্ব্বদাই বালকদিগকে আত্মকৃত অপরাধ স্বীকার করিতে দেখিয়াছি—তাহারা মিথ্যার আবরণে আত্ম-রক্ষা করিবার চেষ্টা পায় না।"

মিঃ এফ, আর, ডোল (সিটি অব লণ্ডন স্কুল) বলেন, "আজিকার স্কুলের ছাত্রেরা যে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক আমি তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। তাহারা মানুষ হিসাবে বেশ ভালোই এবং বিশেষ নির্ভরযোগ্য। ৩০ বৎসর আগেকার ছাত্রদের অপেক্ষা তাহারা অনেক বেশী উন্নতও বটে।"

জাতীয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সেক্রেটারী মিঃ এ, ওয়ারেন্ বলেন, "মিঃ ব্ল্যাকীষ্টনের এই সাধারণ মন্তব্য কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না। প্রত্যেক শিক্ষকই একথা স্বীকার করিবেন যে ৩০ বৎসর পূর্ব্বেকার ছাত্রগণ অপেক্ষা আজিকার ছাত্রেরা নৈতিক সামজিক কোন দিক দিয়াই অপকৃষ্ট নয়।"

জাতীয় শিক্ষা সঙ্ঘের জনৈক কর্ম্মচারী বলেন, "২০ বৎসর আগেকার ছাত্রগণ অপেক্ষা আধুনিক ছাত্রদের আত্ম-সম্মান-জ্ঞান অনেক বেশী। তাহারা বেশ সাহস সহকারেই অপরাধের জন্য শাস্তি গ্রহণ করিয়া থাকে।"

প্রধান-শিক্ষক সঙ্ঘের অবৈতনিক সম্পাদক এবং হাক্‌নে ডাউনস্ স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিঃ জেন্‌কিন্ টমাস্ বলেন, "৩৬ বৎসর যাবৎ আমি প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেছি। আমি ছাত্রদের কোন অবনতির লক্ষণ দেখিতেছি না। বন্ধুকে বাঁচাইবার জন্য বালকেরা প্রায়ই মিথ্যা বলে, কিন্তু এরূপ মিথ্যা তাহারা চিরদিনই বলিয়াছে।"

হুইট্‌গিফ্‌ট্ গ্রামার স্কুলের প্রধান শিক্ষক বি, আর, গার্ণার বলেন, "আমি মোটেই বিশ্বাস করি না যে আজিকার স্কুলের ছাত্রেরা মিথ্যাবাদী। তাহারা খাসা ছেলে এবং মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেকার ছেলেদের চেয়ে অনেক ভালো। আজিকার ছেলেরাও খেলে—অধিকাংশই নিজের মোটর নিজেই চালায় এবং ভালোভাবেই চালায়।"

লিন্‌কলন্‌সায়ারের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, "আজিকার ছাত্রেরা যে দুর্ব্বল এ বিষয়ে আমি মিঃ ব্ল্যাকীষ্টনের সহিত একমত। ইহা গত মহাযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। আজিকার ছাত্রকে জীবনের গুরুত্ব বুঝাইতে হইলে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়—ছাত্রীরা অপেক্ষাকৃত হুঁসিয়ার এবং অধিকতর পরিশ্রমী। তবে পূর্ব্ববর্ত্তীযুগের ছাত্রদের মতো আজিকার ছাত্ররা গোঁয়ার বা হৃদয়হীন নয়।"

বিশ্ববাণী

পাশ্চাত্যের অতি-আধুনিকা

শ্রীমতী ক্লেয়ার বুথ ব্রোকেণ 'ভ্যানিটি ফেয়ার' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদিকা। এ পর্য্যন্ত তিনি ইয়াঙ্কি সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। নীচে তাঁহারই একটি রচনার কিয়দংশ দেওয়া হইল।

—আমাদের আশ্চর্য্য দেশের সর্ব্বপ্রকার আশ্চর্য্যকে খর্ব্ব করিয়াছে আমাদের সামাজিক ক্রমবিকাশ, জন-সংখ্যার ক্রম-বৃদ্ধিকেও ইহা হার মানাইয়াছে। বিভিন্ন সহরের ১৪টি সোস্যাল রেজিষ্টারে একলক্ষ নামের সন্ধান মিলিবে—১৯১৪ সন হইতে প্রায় ৫০ হাজার নাম বেশী। একশত বৎসর আগে ইহাদের সংখ্যা মাত্র ১৮ ছিল। যুদ্ধের পর এই যে-সব নামের সংযোজনা হইয়াছে, সে গুলি নকল হীরার মতই ঝুটা। এই সব সোস্যাল রেজিষ্টারাইটদের জীবন-যাত্রা বর্ণনা করিব। দুই হইতে বারো জন চাকর-বাকর, এক হইতে চারখানি মোটর গাড়ী এবং তিনটির অনধিক ছেলেমেয়ে নিয়া ইহাদের প্রত্যেকের সংসার। ভদ্রমহিলার ঘুম হইতে উঠিতে বেলা দশটা, উঠিয়া শয্যার উপর বসিয়াই ইহাঁর চা-টোষ্টের প্রাতরাশ সাঙ্গ হয়—অতঃপর সকালের ডাকের চিঠিপত্রপাঠ (দৈনন্দিন পাঠের তালিকা তাঁহার ইহার বেশী প্রায়ই নয়)। চিঠিপত্রপাঠ হইলে টেলিফোঁতে সখীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা খানিকক্ষণ—কথাবার্ত্তার অধিকাংশই 'এ উহার নামে কি বলিল' শ্রেণীর। তৎপরে সাজগোজ করিয়া তিনি বাজার করিতে বাহির হন্—নিজের কাপড়-চোপড় কি ঘর সাজাইবার আসবাব-পত্র। ঘর সাজানো তাঁহার প্রায়ই আছে আজ এ রকম, কাল সেরকম। জলযোগ প্রায়ই রেস্তোরাঁয় সাঙ্গ হয়, সঙ্গে একটি কি দুইটি বান্ধবী থাকেন—মাঝে মাঝে আট দশ কি বারোজন মিলিয়া কাহারও বাসাতেও জলযোগ হয়। সমস্ত বিকালটা ধরিয়া ব্রিজ খেলা চলে, সঙ্গে বাজীও আছে এবং প্রায়ই তাহা নিজের সঙ্গতিকে অতিক্রম করে। ইত্যাকার কাজ শেষ করিয়া যখন বাড়ী ফেরেন, তখন রাত হইয়া গিয়াছে।

ইহার উপর থিয়েটার কি নাইট-ক্লাব আছে—নিজের বাড়িতে কি এখানে ওখানে পার্টি আছে, পার্টির পর আবার তাস খেলা আছে। মোটামুটি ভাবে এই জীবন-যাত্রার প্রোগ্রাম এই। চুল কাটিবার সেলুনে কিংবা নখ-সংস্কারকারীর দোকানে যাইবার সময় ইহারই মধ্যে কোন রকমে করিয়া নিতে হয়। হয়ত একটা গানের মজলিসই বা একটা সকালে হইল—৪০০ কি ৫০০ নারী একটি টাউনের বড়-হলে সোণার পাতে মোড়া চেয়ারে সোজা খাড়া হইয়া বসিয়া ঘণ্টা দুই চারি কাটাইয়া দিলেন। অপেরার প্রথম রাত্রি কি কোনও বিবাহ-উৎসব কি রেসের সময় এবং ফ্যান্সি-ড্রেস-বল – ইহাদের যে কোনও একটী হইতেছে এই তালিকার শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। সে দিন ভদ্র মহিলার পোষাকের পরিপাট্য সকলকে তাক লাগায়।

—তাহা হইলে মোটামোটি 'সোসাইটি-ওম্যান'—সামাজিক নারী বলিতে আমরা এই বুঝি। বিংশ শতাব্দীর নারী-প্রগতির কেন্দ্রস্থল নিউ-ইয়র্কে বসিয়া জনৈকা নারী তাঁহার সমাজের সৌভাগ্যবতীদের এই ছবি আঁকিয়াছেন—কর্ম্মহীন জীবনের আলস্য ও অবসাদ, অর্থবিহীন আমোদ-প্রমোদ ছাড়া ইহাতে, এ জীবনের তালিকায় এমন কি আছে যাহাতে নাকি আমরা বুঝিতে পারি উহাদের দেশ কেবল ধনৈশ্বর্য্যে নয়, মনুষ্যত্বের উদ্বোধনেও সার্থক হইয়াছে। অন্ততঃ পক্ষে এই জীবন-যাপনের জন্য আমাদের দেশের মেয়েদের লুব্ধ হইবার কিছুই নাই।

কিন্তু এই জীবনই উহাদের নারীজাতির একমাত্র জীবন নহে। আমি জনসনও ঐ দেশেই জন্মায়, একথা ভুলিলে চলিবে না। নীচে আর একটি নারীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা দিলাম।

জীবনের অর্থ

শ্রীমতী হেলেন উইলিস্ মুডি নামজাদা টেনিস-খেলোয়াড়। ডক্টর উইল ডুরাণ্টের 'জীবনের কি অর্থ' এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখিতেছেন—

—পঁচিশ বছর বয়সে জীবনের অর্থ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া দরকার। শুনি যৌবনের লক্ষণই সব-কিছু সম্বন্ধে ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষ করিয়া ফেলা। যদি তাই হয়, তবে আমি বুড়াইয়া গিয়াছি বলিতে হইবে, কেননা কোন-কিছু সম্বন্ধেই আমি ভাবিয়া ঠিক-কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারি না।

আমার নিজের দরকার শুধু মনের মধ্যে এই অকারণ চাঞ্চল্যকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য যাহোক্ একটা কিছু কাজ—সে টেনিস খেলাই হোক্ কি ছবি আঁকাই হোক্। এই চাঞ্চল্য, ক্রমাগত এই কোন একটা কিছু করিয়া উঠাব আশা ও উন্মাদনা, ইহাকে ঠিক আত্মপ্রচার বলা চলে না। আমার কাছেতো ইহা ধর্ম্মের সামিল—কাজ করিবার প্রেরণা আমি ইহাতেই পাই।

সকলেই অবশ্য নিজের নিজের চিন্তাকে বিশেষ মূল্য দেয়—সুতরাং আমার এই চাঞ্চল্য নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত ভাবিয়া নিয়া হয়তো ভুল করিতেছি। হয়তো এই গতির যুগে সকলেই আমারই মত এই অস্থিরতার দুঃখ ভোগ করিতেছে।

কোন কিছু বাঁধা-ধরা কাজ নিয়মমত করা—করিতেই হইবে এই মন নিয়া, করা আমার ধাতে পোষায় না। রীতিনীতির কড়াক্কড়িতে আমার মন হাঁপাইয়া উঠে। জীবনে যদি নূতন নূতন কাজ করিবার দুঃসাহসই না থাকিল তবে থাকিল কি !

আমার কক্ষে মর্ম্মর-নির্ম্মিত গ্রীক স্থাপত্যের একটি নারীর মুখ আছে—পূর্ব্ব পুরুষের কাছ হইতে উত্তরাধিকারীসূত্রে ইহা আমার পাওয়া। ইহা সত্যকার প্রাচীন গ্রীসেরই ভাস্কর্য্য—মুখে চোখে ইহার দুই চারিটি টোল খাওয়া ছাড়া শতাব্দীর অভিযান ইহাকে প্রায় অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছে। আমি ইহার সুন্দর মুখের উপর চোখ বুঁজিয়া হাত বুলাইয়া যাই-- এবং আমার বুকে স্পন্দনের দ্রুতগতি অনুভব করি—আর সেই সঙ্গে অস্থির চাঞ্চল্যও।

আমার এই অস্থিরতা মিটাইবার মত কোন কাজ পাইলেই আমার জীবনকে সুখদায়ক ও আনন্দের দ্যোতক বলিয়া মনে হয়। এই কাজের মধ্যে যেন একেবারে অবসর না থাকে—সকল সময়ে যেন এই কাজ আমার মনকে ভরিয়া রাখিতে পারে। পিছনে ফিরিবার পথ নাই, এমনই পথে মনের গাড়ীখানিকে পূর্ণ গতিতে অসীম লক্ষ্যে দিগন্তপানে ছুটাইবার ইচ্ছা আমার সব সময়ে হয়।

যদি প্রশ্ন আসে 'কিন্তু তোমার স্বর্গ কোথায় ?" তবে বলিব "আমার নিজের মনের মধ্যেই।" কিন্তু পঁচিশ বছর বয়সে কোন কিছু জোর করিয়া বলা ভুল।

স্যান্তায়ানার সম্বন্ধে একটি তরুণ লেখকের কাছে আমি একটি গল্প শুনিয়াছি। বসন্তের একটা দিন। ক্লাস হইতেছে। বাহিরের রৌদ্র-কিরণ ও মৃদু বায়ু ছেলেদেরকে কেবল আনমনা করিতেছে। স্যান্তায়ানা ডেস্কে বসিয়া ছেলেদেরকে অধ্যাপনা করিতেছেন। ছেলেদের মধ্যে বহুরকমের অমনোযোগ – সহসা স্যান্তায়ানার কণ্ঠস্বর আর শোনা গেলনা, তাঁহার দৃষ্টি ছেলেদের মাথার উপর দিয়া জানলার বাহিরে একটি গাছের উপরে নিবদ্ধ হইল। সে গাছে সদ্য কিশলয় গজাইতেছে—শ্যামল ও সুন্দর। স্যান্তায়ানা বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,

—"বসন্ত আসিয়াছে যে !—" টুপি হাতে করিয়া তিনি ক্লাস হইতে বাহির হইয়া গেলেন আর ফিরিলেন না।

গল্পটা সত্য বলিয়াই মনে হয়। মনে হয়, সেই যে পথে স্যান্তায়ানা বাহির হইয়াছিলেন, আজও সেই পথেই তিনি চলিয়াছেন—। বুকে তাঁহার এই অস্থির উন্মাদনা সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতার অর্থ তাঁহার চাই-ই।

প্রাচীন যে গ্রীক ভাস্কর আমার কক্ষের এই মূর্ত্তিটি গড়িয়াছিলেন, তাঁহার মনেও এই সৌন্দর্য্যানুসন্ধানের অস্থিরতা ছিল—হয়তো যতদিন ধরিয়া এই মুখখানি তিনি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ততদিনই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দে কাটিয়াছে। বহুশতবর্ষ পরে তাই আজ আমি এই মুখ দেখিয়া ইহার নির্ম্মাতার সেই অস্থিরতার স্বাদ পাইতেছি—আর আমার মন নাচিয়া উঠিতেছে।

হঁ্যা -- আমি এই উন্মাদনা চাই—এই সতত নিযুক্ত থাকিবার মতো একটা কিছু,—যাহা আমাকে নূতন সৌন্দর্য্যের ও প্রাচুর্য্যের সন্ধান দিতে পারে। যদি আমার তেমন কিছু প্রতিভা না থাকে, কাজ করিবার ক্ষমতা তো আমার আছে, আমার আশা—এই তরুণ, অস্থির উন্মাদনা।—

বর্ত্তমান যুগের চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা সত্ত্বেও ইহার জীবনে দেখি ধ্রুবতারার আদর্শ-সন্ধান। তাই মনে হয় আধুনিক যুগের সকল ক্লেদ ও পঙ্ক স্বীকার করিয়া নিলেও মানবতার আদর্শ-সন্ধান এ যুগেও দুষ্প্রাপ্য নয়। নীচে অতি-আধুনিক যুগের অতি-আধুনিকতম বার্ত্তা হইতেও সেই কথাই বোঝা যাইবে।

১৯৩২-এর যৌবন

জুলাই সংখ্যার "পেরেণ্টস্ ম্যাগাজিন" এ এই শীর্ষে ইলিয়ানর রোল্যাণ্ড ওয়েমব্রিজ একটি প্রবন্ধ দিয়াছেন—প্রবন্ধটি

বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্যের যুবককে লক্ষ্য করিয়া লিখিত। আমাদের দেশের বর্ত্তমান যুবক সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য কিনা উহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য কিয়দংশ নীচে দেওয়া হইল।—

একটি বাড়ীর নিমন্ত্রণ সাঙ্গ করিয়া বুড়ারা বাহিরে আসিয়া গাড়ীর কাছে অপেক্ষা করিতেছেন—ছেলেমেয়েরা এখনও আসে নাই। কিছু পরেই এক দল ছেলেমেয়ে কোলাহল করিতে করিতে বাহিরে আসিল—দলপতি একটি মেয়ে, তাহার হাতে একটি পোষা ভালুক, তার সঙ্গেই উহার বেশীর ভাগ কথাবার্ত্তা চলিতেছে। এত দেরী হইল কেন জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল,—'কথাবার্ত্তা' চলিতেছিল।–কিসের কথাবার্ত্তা? না,—পরকাল সম্বন্ধীয়। মেয়েটি বলিল,—'জানেন, আমাদের অনেকে পুরো নাস্তিক, অনেকে অবিশ্যি নয়। প্রায় সবাই বুঝে ওঠে না, এ সম্বন্ধে তার নিজের মতটা কি। কিন্তু তবু তর্ক করতে কেউ পিছ-পা নই। মনে হলো যেন শেষ অবধি পরকালের গোলমাল আর ঘুচবেই না"—কথা বলিতে বলিতে মেয়েটি বাচ্চা ভালুকটাকে আদর করিতেছিল।—তাহার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম, রাত্রি তিনটা অবধি জাগিয়া ইহারা পরকাল নিয়া কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল—জানিতে পারিলে ভাল হইত।

আর একদিন এক সহরের মিটিংএ বসিয়া আছি। চারি পাশে সবাই মধ্যবয়সী। হঠাৎ একটি তরুণী আমার পাশের খালি চেয়ারটায় আসিয়া বসিয়াই হাঁপাইতে লাগিল,—"ছিঃ ছিঃ—দেরী হয়ে গেল। কিন্তু কি করি বলুন,– যে ভীড় রাস্তায়। তাড়াতাড়ি আবার ফিরতে হবে - ল' ক্লাস আছে কি না।—" বলিয়া সে মুখে চোখে খানিকটা পাউডার ঘসিয়া নিল। এই সময়ে সভানেত্রী উঠিয়া বলিলেন,—'সমিতির জুনিয়ার সভ্যা একজন এইবারে উপাসনা করবেন।' তাঁহার কথা শেষ না হইতে হইতেই আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী লাফ দিয়া উঠিয়া যেন সিগারেট ধরাইতেছে এমনই অতর্কিত ভাবে চোখ বুঁজিয়া প্রায় তিনশ মধ্যবয়সী লোকের সামনে অবলীলাক্রমে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরিয়া প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করিয়া গেল। মেয়েটি সুন্দরী, সুতরাং যাহা বলিতেছিল, তাহা কাণে ভালোই শোনাইল। সে বলিল,—পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যেসব পাপ প্রচলিত ছিল, সেসব যেন তাহারা সবাই এড়াইয়া চলিতে পারে—সে এবং তাহার বন্ধুরা। সমস্ত জাতির অধীশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া সে বলিল,—সকল যুগের, সকল দেশের, সকল জাতির জন্য আমরা যেন ভাবিতে পারি, সে কালের লোকজনের মত আমরা যেন সঙ্কীর্ণ না হই। শেষ করিয়া সে আমার পাশে আসিয়া বসিয়া বলিল,—'কি মুস্কিল দেখুন তো, এই উপাসনার পর প্রোফেসারের কাছে গিয়ে দেরীর জন্য আবার একটা মিছে কথা বল্‌তে হবে।'—বলিয়া হাসিয়া সে সাত-তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

আর একদিন ট্রেনে একটি ছেলেকে দেখিয়াছিলাম, সে বিমানপোতের কাজ করে। এরকম অস্থির ছেলে আমি আর জীবনে দুটি দেখি নাই। এই একটি বই পড়িতে না পড়িতেই দেখি পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে,—কেন নাম-করা লোকজন আটলান্টিক পার হওয়ার রেকর্ড ভাঙ্গিতে যাইবে, ও সব ছেলেছোক্‌রাদের করা উচিত। কেননা উহাতে প্রাণনাশের বিপদ আছে। নাম-করা লোককে অত সহজে মরিতে দেওয়া উচিত নয়—উহাতে সমগ্র জাতির ক্ষতি হয়, বিমান-বিজ্ঞানের ক্ষতি। এবং আমরা, এই ছেলেছোকরার দল—

মুখে-চোখে তাহার যে বীরত্ব দেখিয়াছিলাম, তাহাতে মনে হইয়াছিল, age of martyrs, বীরত্বের যুগ এখনও শেষ হয় নাই।—বিমানবিজ্ঞানের জন্য সে নিজের জীবন পাত করিতে

সম্প্রতি একটি কাগজে পড়িতেছিলাম—একটি ছেলের লেখা তাহার মৃত বন্ধুর উদ্দেশ্যে কয়েকখানা চিঠি। তাহার বন্ধু হঠাৎ মরিয়াছে, সে লিখিতেছে—'কে জানতো ষ্টেশনে তোমাকে যে উঠিয়ে দিলাম, সেই দেখাই আমাদের শেষ দেখা। কেন আরও খানিকক্ষণ থেকে তোমার সঙ্গে দুটো ভাল ক'রে কথা কইনি—হয়তো আমার শীগ্‌গির চলে আসাটা একটু অশোভনও হয়েছিল।—মনে হয় মিল্টনের 'লিসিডাস' কি শেলীর 'অ্যাডোনায়াম'এর লাইনগুলি।—স্যাম্ ফ্রাঙ্ককে লিখিতেছে "তোমার পায়জামাগুলিন যেমন রেখে গেছ, তেমনি আছে—তেম্‌নি ছড়িয়ে! সেগুলো নিয়ে কি করি বলতো?—সবাই কেমন মনমরা হয়ে গেছে। কুকুরটা পর্য্যন্ত—।

মনে হয় এই সব স্পষ্টদৃষ্টি তরুণদের সবল আদর্শবাদ মানব-জীবনে সুফলই ফলাইবে।

শিক্ষিত বেকার

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত বেকার যে ভারতবর্ষ ছাড়াও অন্যত্র থাকা সম্ভব, একথা আমরা ভাবিতে পারি না। কিন্তু 'লিভিং এজ' পত্রিকা বলিতেছেন—

ফরাসী ও জার্ম্মানি দুই দেশেই শিক্ষিত সর্ব্বহারার দল সংখ্যায় পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকের সমগ্র একটি বৃত্তিহীন বাহিনী। মার্ক্সের হিসাবে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী শ্রমিক ও ধনিক এই দুই পাথরের দুইদিককার পেষণে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু বস্তুতঃ সম্পদহীন ব্যক্তির অবস্থা এমন সহজবোধ্য নয়। জার্ম্মানির আর্থিক অবস্থা যত খারাপ হইতেছে, ততই বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক প্রবেশার্থীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। ১৯১১ সালে জার্ম্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৫০০০ হাজার; ১৯২৫এ হয় ৬০০০০ হাজার; ১৯৩১এ বাড়িয়া হয় ১০০০০০ লক্ষ। ফ্রান্সের মধ্য প্রাইমারি ইস্কুলগুলির যে ক্লাশে আগে ২৫ কি ৩০টি ছেলে পড়িত, এখন সেখানে ৫০, ৬০জন পড়িতেছে। ব্যাপার ঘটিয়াছে এই যে আগে যে সব ছেলেরা কৈশোর হইতেই কাজে লাগিয়া যাইত, তাহারাই কাজ না পাইয়া, ইস্কুলে ঢুকিতেছে কোনও বিশেষ চাকুরীর নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা নিবার জন্য। জার্ম্মানিতে গত কয়েক বছরের মধ্যে বিজ্ঞান-ছাত্রের সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে এবং ভবিষ্যৎ ধর্ম্মযাজক, ডাক্তার, আইনব্যবসায়ী, অর্থনীতিকের সংখ্যাও ঐ পরিমাণই বাড়িয়াছে।

উচ্চশিক্ষার এই ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা শুধুই যে বেকারের সংখ্যা বাড়াইতেছে, তাহাই নয়, জনসাধারণের এইকল্পে বেশী ট্যাক্সও গণিতে হইতেছে। রাইন নদীর দুই তীরের লোকেরা বাজে ছেলেকে উচ্চশিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট আয়তনগুলিতে প্রবেশের বিপক্ষবাদ করিতেছেন। কোমাডিয়া কাগজে একজন লিখিতেছেন,—'উচ্চশিক্ষা পাইবার দাবী সকলের নাই। শুধু ইহা যাহারা হজম করিতে পারে, তাহাদের জন্যই নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত—এবং যাহারা উচ্চশিক্ষা পাইয়া সমাজের কাজে নিজেদেরকে নিযুক্ত করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেই ঐ শিক্ষার অধিকার দেওয়া উচিত।' বার্লিনার টাগব্লাট পত্রিকায় এক জন আগামী বৎসর শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা একলক্ষ হইবে প্রমাণ করিয়া লিখিতেছেন,—'যাহারা স্কুলে ভাল করিয়াছে, তাহাদিগকেই শুধু উচ্চশিক্ষার অধিকারী দেওয়া উচিত।' লক্ষ্য করিতে হইবে যে ফ্রান্স মধ্যস্তরের শিক্ষা সাধারণকে দিতে নারাজ, জার্ম্মানি উচ্চশিক্ষাকেই শুধু সঙ্কীর্ণ করিতে চায়।

টমাস বাট্যা

হেন্‌রি ফোর্ডের মতই বাট্যার নাম আজ শিল্পজগতে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 'স্পেক্টেটর' পত্রিকায় তাঁহার কারখানার এই বিবরণ বাহির হইয়াছে—

মধ্য য়ুরোপের ছয়টি পরিচিততম নাম কি জিজ্ঞাসা করিলে, টমাস বাট্যাকে বাদ দেওয়া চলেনা—মুচীর ছেলে বাট্যা, নিজেও জ্লিন সহরে মুচীর কাজেই জীবন আরম্ভ করেন। আর আজ পৃথিবীর যেখানে লোকে জুতা ব্যবহার করে, সেখানেই তাঁহার নাম সুপরিচিত। 'ইউরোপের ফোর্ড' বলিয়াই লোকে তাঁহাকে জানিয়াছে।

মোরাভিয়ার জ্লিন শহরে বাট্যার কারখানায় আজ ২০০০০ হাজার লোক খাটিতেছে। সমগ্র জ্লিন শহর জুড়িয়াই বাট্যার কারখানা। প্রেগে ট্রেণে চাপিলেই প্রত্যেকের মুখেই কেবল বাট্যারই নাম। বাট্যার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমি চিঠি নিয়া গিয়াছিলাম। গিয়া শুনিলাম, তিনি কাল আকাশযানে পোল্যাণ্ড গিয়াছেন। বাট্যার দশটি আকাশযান—পৃথিবীর সর্ব্বত্র কারখানার শাখা পর্য্যবেক্ষণ করিতে ইহারা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।—কেননা আজ হয়ত পোলাণ্ড, কাল সুইট্‌জারল্যাণ্ড, পরশু হয়ত বাট্যাকে সুদূর প্রাচ্যে ছুটিতে হইবে। শুনিলাম সেদিন কোন্ সীমান্তে তাঁহার পাশপোর্ট ছিলনা বলিয়া তাঁহাকে কর্ম্মচারীরা চাপিয়া ধরিয়াছিল,—পাশপোর্ট জ্লিনে ফেলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সহকারীকে আবার আকাশযানে উড়িয়া গিয়া পাশপোর্ট আনিতে হইল।

মিঃ বাট্যার সহিত দেখা হইল না। কিন্তু তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারীকে দেখিলাম। কারখানায় 'টমি'নামে সে সুপরিচিত—সতেরো বছরের বলিষ্ঠ ছেলে। সুন্দর স্বভাব। শুনিলাম, কিছুদিন আগে বিমানপোত-চালনার লাইসেন্স পাইয়াছে। বাট্যার বাণিজ্যব্যবসায়ে বিমানপোতের প্রাধান্য বেশী, সুতরাং প্রথম প্রয়োজন হিসাবেই ইহা তাহাকে শিখিতে হইয়াছে।

বাট্যার কারখানায় সম্পূর্ণ গণতন্ত্র, নিম্নতম কর্ম্মচারীও একদিন কারখানার শ্রেষ্ঠতম পদ পাইতে পারে—কাজ সেরকম দেখিলেই হইল। কারখানায় সপ্তাহে ৫ দিন কাজ হয়, দৈনিক নয়ঘণ্টা। সকাল ৭টা হইতে ১২টা, তারপর একঘণ্টা জলযোগের ছুটি। আবার ১টা হইতে ৫টা। শনিবারের দিন শুধু বাট্যা নিজে ও ম্যানেজাররা কাজ করেন। ক্যাশ খোলা থাকে। প্রত্যেক শনিবারে সকল ডিপার্টমেণ্টের মুরুব্বিদের প্রায় দেড়শত জনের বৈঠক বসে। সেদিন তাহাদের গত সপ্তাহের কাজের আলোচনা হয়—আগামী সপ্তাহেরও।

পুস্তক-পরিচয়

মেজদার ডায়েরী—শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এণ্ড সন্স্, মাণিকতলা স্পার, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

বাংলা সাহিত্যে সম্প্রতি যে কয়খানি বিশিষ্ট পুস্তক আত্মপ্রকাশ করেছে, মেজদার ডায়েরী সেগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রথমেই এ বইখানির কোনো সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন,—গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, অথচ এর মধ্যে যে চরিত্রগুলি আনাগোনা করছে সেগুলি এতই সুস্পষ্ট ও পরস্পরের নিকট থেকে এতই স্বতন্ত্র যে ডায়েরী নাম দিয়ে এই বইখানির কপালে একটি বিশেষ ছাপ দিয়ে পাশ কাটানও কঠিন।

মেজদার ডায়েরী একখানি নূতন বই। এর ভঙ্গী, ধরণ, রূপসজ্জা এবং চিন্তাধারা—এদের বৈশিষ্ট্যে এবং বৈচিত্র্যে সবাই মুগ্ধ হবেন, আনন্দ পাবেন।

মেজদা নিজের পরিচয়ে বলেছেন—

'আমি modern নই। প্রকৃত পক্ষে আমার সে সাহসও নেই, শক্তিও নেই। আজকার যুগে যারা বেঁচে আছে তারাই যে modern এ কথা যেমন সত্য নয়—অতীতে জন্মেছিল বলেই যে কোনো মানুষ প্রাচীন একথাও তেমনি অগ্রাহ্য। কারণ আমার মনে হয় modernism মনের একটা বিশেষ স্তর, চিত্তের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী। আমার কাছে সেই শুধু modern, মানুষের এত দিনের সমস্ত ধর্ম্মবন্ধনে যার মন ধরা দেয়নি, কোনো বাঁধা ব্যবস্থাকেই সে ধ্রুব বলে জ্ঞান করে না অথচ ধর্ম্ম বা সমাজ, রাজনীতি বা অর্থনীতি, এত দিনের দৃষ্টির ভঙ্গী বা values সম্বন্ধে যে বিরাট অবিশ্বাস সত্বেও কোনো অনাচার করে না। বহু দায় থেকে সে মুক্ত, কারণ বহু মোহ-বন্ধন তার ঘুচে গেছে।'

মেজদার ডায়েরীর মধ্যে পাই একটি অপরিসীম মমত্ব-বোধের আনন্দ। একটি সচেতন হৃদয়ের সুন্দর ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। সে-হৃদয় ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্র এবং মানবতার ক্রমোবিকাশের মধ্যে আপনাকে বিস্তৃত করে দিয়ে আত্ম-পরীক্ষা করেছে। কোথাও সে নির্ঝরের মত সাবলীল, কোথাও আবেগে ও কারুণ্যে তরঙ্গময়, কোথাও সে প্রশান্তিতে উদাসীন, কোথাও বা বেদনায় ও বিক্ষোভে শ্রাবণ-গগনের মত ভারাক্রান্ত।

মৃত সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিও যেমন মেজদার সহানুভূতি নেই, বিদ্রোহের দুরন্তপনায়ও তেমনি তাঁর আস্থা অতি অল্প। মেজদার হৃদয়ের মধ্যে একটি দিগন্ত-জোড়া স্বপ্ন লোক। মাথার উপরে তাঁর আলোকোজ্জ্বল নীল আকাশের মুকুট, দুইটি চক্ষে তাঁর দূরবিস্তার অরণ্য প্রান্তরের ঘন ছায়া, পদতলে সুশ্যামল ধরিত্রী, জীবন-সমুদ্রের বিপুল গাম্ভীর্য্যে তাঁর আনন্দ, অন্তরে তাঁর অফুরন্ত মনুষ্যত্বের পিপাসা।

দুঃখের মধ্যে, বেদনার মধ্যে, জীবনের দুর্দ্দিনের মধ্যে মেজদা তাঁর কথাগুলি উপলব্ধি করেছেন, তাই এগুলি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত সত্য। যে রচনার মধ্যে পাঠক সাধারণ আপন আপন মনের প্রশ্ন ও তার কৈফিয়ৎ খুঁজে পান, যে-সাহিত্যের মধ্যে তাঁরা নিজ নিজ অন্তরের প্রতিফলিত রূপ দেখে আনন্দ লাভ করেন, তাকে আমরা সুসাহিত্য বলে বরণ করে তুলি। মেজদার এ ডায়েরী তাঁর ব্যক্তিগত, ব্যক্তিগত বক্তব্য দিয়ে রস-সাহিত্য সৃষ্টি করা তখনই সম্ভব যখন মেজদার মত একজন মানুষের মত মানুষ ডায়েরী লিখতে বসেন। তবু এ ডায়েরীর মধ্যে মেজদা একা নেই, একা থাকা যে অসঙ্গত এ তিনি জানেন। তাঁর পাশে আছেন আমাদের মহান্ চরিত্র দাদু, কল্যাণমূর্ত্তি পিতা, সমাজদ্রোহী নরুদা, স্বাধীন বিমল মামা, হতভাগিনী সিন্ধু এবং আরো কয়েকজন। আর এই গ্রহতারকার মাঝখানে আছেন আমাদের মেজদা, বুলুদা—উৎসুক, সপ্রতিভ, অনুসন্ধিৎসু, চিন্তাশীল এবং হৃদয়বান।

জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে মেজদার বাণী বহুদিন পর্য্যন্ত আমাদের মনে প্রতিধ্বনিত হবে।

'দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ-জীবন আমাদের বোধের আকাশে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎছন্দে স্পন্দমান। চিরন্তন এ আলোছায়ার লীলা। শিল্পী শুধু সেই মানুষ, এ লীলার মুগ্ধ দর্শকের ভূমিকা নিয়ে যিনি ক্ষান্ত নন্। তাঁর মনের স্বচ্ছ সায়রে ধৃত এই চিত্রকে তিনি মানুষের তুলিতে ফুটিয়ে তোলেন। মানুষের সঙ্গে জগত-জীবনের চেনা-অচেনার রাগ-বিরাগের যে অপরূপ সম্বন্ধ, দরদী হৃদয়ের ভাবাবেগের আবেশে, আত্ম-চরিতার্থতার আপন প্রয়োজনে যেদিন তা ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতার মধ্যে প্রকাশ পায়, সেদিন শিল্পের জন্মতিথি, শিল্পী জীবনের পরম ক্ষণ। সমস্ত শিল্প সৃষ্টির মূলে আছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। দর্পণের স্বচ্ছতার উপর যেমন প্রতিবিম্বের পূর্ণতা, সংস্কার-বর্জ্জিত নির্ম্মল মনের উপর নির্ভর করে তেমন অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণতা। যেখানে তা সম্পূণ, সেই খানেই তা অভিনব। শিল্পের মৌলিকতা তাই কেবল তার নূতনত্বে নয়, শিল্পীর আন্তরিকতায়। বোধ যেখানে আন্তরিক, অকৃত্রিম ও সহজ, প্রকাশ সেখানে সুন্দর ও বিচিত্র; প্রত্যেক সার্থক সৃষ্টিই তাই অনন্যপূর্ব্ব।'

শিল্প সৃষ্টির সম্বন্ধে এমন পরম সত্যোদ্ঘাটন মেজদার আগে এক মাত্র রবীন্দ্রনাথের মুখেই আমরা শুনেছি।

বাংলা সাহিত্যের বাজারে এখন চলছে বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর, আত্ম-প্রচারের নির্লজ্জ উদ্দীপনা। এর মাঝখানে মেজদার ডায়েরী যদি নিজের পথ না পায়, বুলুদা যদি অনাদৃত হয়ে উদাসীন হাসি হেসে চলে যান, তা হলে আমরা বিস্মিত হব না। কিন্তু দুর্লভ সাহিত্যের কমলবনে যেখানে সাহিত্য-ভারতীর নিভৃত আসন, আমরা নিশ্চয় জানি, সে আসনের প্রান্তে বুলুদা তাঁর যোগ্য স্থান পেয়েছেন।

—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল।

তীর্থপথে (কবিতাপুস্তক)—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা—মূল্য এক টাকা।

আধুনিক কালের একটি বিশিষ্ট ধুরা হইতেছে কাব্যে ভাব-বিলাসের স্থান নাই। মানুষের আজ দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত নাই—এই কণ্টকাকীর্ণ মাটীর পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া কল্প-লোকের বাণী শুনাইলে কোন ফল হইবে না—আজ চাঁছা-ছোলা নিছক সত্য যাহা তাহারই সাহায্যে কাব্য রচনা করা আবশ্যক এই আদর্শে ওদেশে আধুনিক কালের কাব্য রচনা হইয়াছে এবং সে কাব্য সুকাব্যও বটে।—কিন্তু আমাদের দেশে ইহার অন্ধ অনুকরণে যে সাহিত্য জন্ম গ্রহণ করিতেছে তাহার মূল্য ভবিষ্যৎ বিচার করিবে · বর্ত্তমানের মানুষ আমরা তাহার অনেকটুকুই বরদাস্ত করিতে পারি নাই।

ঠিক এই জন্যই হেমবাবুর 'তীর্থপথে' সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে একটু ইতস্তত করিতেছিলাম—কিন্তু কিছুদূর পড়িয়াই দেখিলাম হেমবাবুর কাব্যের একটা স্বকীয় ধারা আছে, যাহার সহিত কল্পনা-প্রবণ বাঙালী জাতির নাড়ীর যোগ আছে—

> 'ওগো দিশাহারা বন্দী রাগিণী তোমারে ক'য়ে
> পাঠাইনু আজি সীমার শেষে ;
> দিবস-নিশার হারা গীত-গান যেথার ব'য়ে
> কত প্রাণ চলে অনামা দেশে।
> সেই গানে আজ হারাইতে চাই হিয়া - '

তাই বলিয়া হেমবাবুর স্বপ্ন সম্ভাবনীয়তার গণ্ডী অতিক্রম করে নাই—বাস্তবকে তিনি চক্ষুর আড়ালে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—

> 'ধরার ব স্তে আমি যাপিয়াছি যে দিবস গুলি,
> কল্পনার করস্পর্শে পাসরিয়া কোলাহল ধূলি,
> আমার সে ধ্যানমগ্ন মৌন বীণা তুলিবে গুঞ্জরি॥'

'তীর্থপথে'র বিশেষত্ব হইতেছে তাঁহার এই roman ic দৃষ্টি, যাহার কতকটা কবি হয়ত কীট্‌স্ হইতে, কতকটা রবীন্দ্রনাথ হইতে, পাইয়া থাকিবেন—কিন্তু তাঁহার স্বাতন্ত্র্য আছে এবং স্বাতন্ত্র্যই তাঁহাকে বরাবর স্বপ্ন লইয়া থাকিতে দেয় নাই—অকস্মাৎ কল্পনার স্বর্গ চূরমার হইয়া তাঁহার কাব্যে দেখা দিয়াছে —

> মেশিনের ঘূর্ণী ধূমে যে আকাশে জ্বলে নাক তারা,
> যেখানে ধূলির মত চূর্ণ হয় আশা ও বাসনা,
> যেথায় প্রাণান্ত শ্রম, নিঃশ্বাসের অবসর নাই
> আলো আসে ভয়ে ভয়ে গলিপথে সুড়ঙ্গের দ্বারে
> ঘুরে যেথা টাকার চাকায়া
> সীমাহীন বর্ণ হীন পথে।

আমরা কবির অসামান্য কৃতিত্ব স্বীকার করিতে পারিতাম যদি এই দুইটি বিরুদ্ধ দৃষ্টির মধ্যে তিনি একটি স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিতেন, যাহাতে 'বন্দী কোকিল' 'প্রথম বারিধারা' 'পুরুষ' ও 'দিনমজুরের ছেলে' আমাদিগকে একই রসলোকের সন্ধান দিত! হেমবাবুর ভাষার বাস্তবতায় এই ধূলিমলিন প্রাত্যহিকতা আমাদের চোখে তেমন রূঢ় মনে হয় না। হেমবাবু যে উৎকৃষ্ট বাংলা লেখেন ইহাও তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্য।

দিদির বর—(উপন্যাস) শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল ; সিটিলাইব্রেরী, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

রসবিহারী বাবু ইতিমধ্যেই কথা-সাহিত্যে কিছু খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। 'দিদির বর' তাঁহার এই খ্যাতি আরও একটু বাড়াইবে মনে হয়। আলোচ্য বইটিতে মৃতদার ভগিনীপতির সহিত বিবাহ হওয়ায় বাঙালী মেয়ের জীবনে অনেক সময় যে ট্রাজেডী দেখা দেয় তাহারই একটি করুণ-মধুর মিলনাত্মক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ঘটনা-সমাবেশ এবং চরিত্র-চিত্রণে লেখকের শক্তি আছে—ভাবাও বেশ ঝরঝরে। এই অবস্থায় পাঠিকাদের ইহা ভাল লাগিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

— শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বিদেশী বস্ত্রের প্রতিযোগিতা ও তাহার প্রতিকার—(ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এম্, পি, গান্ধী মহাশয় রচিত "How to Compete with foreign Cloth" এর বঙ্গানুবাদ। ১০১ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা মাত্র।)

মহাত্মা গান্ধী এই বইখানির যেরূপ সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন তাহার উপর বোধ হয় আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন হইবে না। সমালোচনা করিতে বসিয়া তাই প্রথমেই মহাত্মার উক্তি তুলিয়া দিতেছি। মুখবন্ধে মহাত্মা লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমান পুস্তকখানি শ্রীযুত এম্, পি, গান্ধী লিখিত ইংরাজী পুস্তক 'How to Compete with foreign Cloth' এর বঙ্গানুবাদ। পুস্তকখানি খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে এরূপ পুস্তকের প্রকাশ অতীব বাঞ্ছনীয়। এই পুস্তক হইতে প্রমাণিত হয় যে, চরখা ও খদ্দরের সাহায্য ব্যতীত বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনে সাফল্য লাভ করা অসম্ভব। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন-কল্পে কি কি উপায় আলম্বনীয় গ্রন্থকার তাহা অতি সুকৌশলে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পুস্তকে বহু প্রয়োজনীয় হিসাব, তালিকা ও বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং আমার মনে হয় যাঁহারা বিদেশী বর্জ্জনের মূল সূত্র অনুধাবনে অভিলাষী—এই পুস্তকে তাঁহাদের যথেষ্ট সহায়তা করিবে।"

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ও পুস্তকখানির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং বিজ্ঞাপন হিসাবে বইখানির মণি-কাঞ্চনসংযোগ হইয়াছে বলিতেই হইবে।

তথাপি খদ্দর ও তাঁতের প্রসার দ্বারাই আমাদের দেশে বিদেশী বস্ত্রের প্রতিযোগিতার প্রতিকার করা সম্ভব হইবে এ যুক্তি আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছিনা। বরং লেখক মহাশয়ের হিসাব হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে বস্ত্রশিল্পে ভারতবর্ষকে স্বাবলম্বী করিতে হইলে ভারতীয় কাপড়ের কলের উৎকর্ষ ও প্রসারের প্রয়োজন। এ বিষয়ে মতভেদ যাহাই হৌক না কেন, বইখানিতে সরকারী ও বেসরকারী নানা রিপোর্ট ও পুস্তক হইতে সংগৃহীত অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য একত্র সন্নিবেশিত থাকায় উহা যে বিশেষ কাজের হইয়াছে সে বিষয়ে কোন মতভেদ থাকিতে পারে না।

বাংলা ভাষায় এরূপ সারগর্ভ তথ্যপূর্ণ পুস্তক অনূদিত করিয়া লেখক আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

অর্থের সন্ধান—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত ও শিশির পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য—১৲ এক টাকা।

অনেক স্থলেই ধৈর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হইলেও উপাসনা-সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে যথাসম্ভব যত্ন করিয়া বইখানি পড়িলাম; তবু অর্থের সন্ধান তো কোথাও মিলিল না। খুব সম্ভব লেখক ও প্রকাশক মহাশয় এই পুস্তক রচনার সময় পাঠককে অর্থের সন্ধান দিবার কথা ভাবেন নাই—এ সন্ধানটী ছিল তাঁহাদের নিজেদের। সে উদ্দেশ্য কতদুর সফল হইয়াছে বলিতে পারি না।

বই খানির নাম দেখিয়া সকলেরই পড়িয়া দেখার আগ্রহ হইবার কথা। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা থাকায় পাঠকবর্গ আরও আকৃষ্ট হইবেন আশা করা যায়। কিন্তু স্কুলের নিম্নতম শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী কয়েকটী রচনা ভিন্ন বই খানির মধ্যে অর্থ-নীতির কোন কথা যদি কেহ সন্ধান করেন তবে হতাশ হইবেন। লেখকের মূল বক্তব্য এই যে অর্থাগম করিতে হইলে মনোবৃত্তি ও চরিত্র-গঠন প্রয়োজন। তাহার জন্য যে সকল গুণাবলীর অনুশীলন দরকার তাহার মধ্যে প্রধান এই গুলি, যথা—আত্মবিশ্বাস, একাগ্রতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়, উচ্চাভিলাষ, উদ্ভাবন-শক্তি, ও স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা। এই সকল গুণ যাঁহাদের আছে তাঁহারাই ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন এবং অর্থলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে, ব্যবসা।

এই প্রসঙ্গে লেখক মহাশয় সপ্তদশ অধ্যায়ে অর্থের নিয়োগ-কৌশল সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন এবং পরিশিষ্টে যে কয়েকটী শিল্প, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে পাঠকবর্গের জানিবার জিনিস কতক রহিয়াছে। পরিশেষে কয়েকজন স্বকৃতকর্ম্মা ধনিকের জীবনী ও তাঁহাদের সাফল্যের মূলে কি রহিয়াছে তাহার বিচার করিয়া মজুমদার মহাশয় তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন।

মোটের উপর বইখানিতে অর্থের সন্ধানে যাঁহারা রত রহিয়াছেন তাঁহাদের শিক্ষণীয় কিছু না থাকিলেও ভূতের গল্প, উপন্যাস, রূপকথা ও নারী-প্রগতির চর্চ্চায় নিবিষ্ট বাংলার অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের পক্ষে শিখিবার অনেক কিছুই রহিয়াছে। —শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

মেয়েদের পাতঞ্জল—ডাক্তার শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ পাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত—প্রাপ্তিস্থান, জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—মূল্য এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থখানির নামই গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দেশ্যের সহিত সকলকে পরিচিত করে। গ্রন্থকর্ত্তা পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাখ্যা অতি সরল ভাষায় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'মেয়েদের পাতঞ্জল' এই নামটী কিন্তু গ্রন্থকারের সুবিবেচনার পরিচায়ক হয় নাই। কারণ শিক্ষিত সমাজে আজ কাল মেয়েদের স্থান অতি নিম্নে নহে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সব মেয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা পুরুষের চেয়ে শিক্ষা দীক্ষায় কোন অংশেই নূন নহে। যাহা হউক, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য একেবারে বিফল হয় নাই—তিনি যোগসূত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব-সমূহ বহু স্থলেই সরল ভাষায় বিবৃত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তবে অনেক সরল জিনিষকে সরল করিতে যাইয়া তিনি অনেক স্থলে অনেক কথা বলিয়াছেন যাহা প্রমাণসহ নহে। তিনি 'ক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত' সাধকগণের সংখ্যা শতকরা বিশ জন বাহির করিয়াছেন। জানিনা ইহার কোন statistics আছে কিনা। গ্রন্থকারের ভাষাগত দোষ বহু স্থলেই লক্ষ্য করিয়াছি। আজ কাল বাঙ্গলা ভাষার মা বাপ নাই, যে যাহা লিখে তাহাই বাঙ্গলা বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ইহার দোষ বা ত্রুটি উল্লেখ করিতে গেলেই মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হয়। গ্রন্থকারের ভাষার মধ্যে অসংযমও বহু স্থলে লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন এখনকার শতকরা ৮০ জন পিতা মাতা পশু (পৃঃ ৪) ; আর এক স্থলে লিখিয়াছেন 'মূঢ়ভূমিক চিত্ত'—ইহারা বোকা—ইহারা গাধা—ইহারা নির্ব্বোধ (পৃঃ ৫) ; আজ কাল সকলেই অল্পবিস্তর প্রাচীন আদর্শ হইতে বিচ্যুত, কাজেই কুলগুরুগণও যে অনেকে আদর্শচ্যুত হইয়াছেন এবং সকলের ন্যায় তাঁহাদেরও অনেকের মধ্যে যে দোষ প্রবেশ করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু গ্রন্থকার নির্ব্বিশেষে সকল কুলগুরুর উপরই খড়্গহস্ত এবং তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে যাইয়া তিনি যে অসংযত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা ভদ্র সমাজে চলিবার নহে। কুলগুরু কি জিনিস হয়ত তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই, অথবা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই বিষয়ে খুব তৃপ্তিকর নহে।

যোগ-সূত্রের সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে হইলে ব্যাখ্যাতার যোগী হওয়া চাই। নিজের অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি না থাকিলে অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর

জাপানের উন্নতি হইল কিরূপে—শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ, প্রবাসী কার্য্যালয় ১২০।২ অপার সার্কুলার রোড। কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

মুখবন্ধে লেখক লিখিতেছেন—"জাপানকে মৌচাকের সঙ্গে তুলনা করিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। দলের প্রত্যেক মৌমাছি সারাক্ষণ সাধ্যমত পরিশ্রম করে বলিয়াই মৌমাছির দল সতেজে বজায় থাকে। মৌমাছির দল এক বৃহৎ পরিবার। জাপানীরাও মনে করে মিকাডোর কর্ত্তৃত্বাধীনে তাহারা এক বৃহৎ পরিবার ভুক্ত। এই বৃহৎ পরিবার সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলিতেছে এবং পরিবারের প্রত্যেকে মৌমাছির ন্যায় নিজ নিজ কার্য্য ও কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাইতেছে। ইহারই ফলে তাহাদের এত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে।"

মৌমাছির জাতির এই উন্নতির ইতিহাস, ভিত্তি, সূচনা ও উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে লেখক ছয়মাস জাপানে থাকিয়া ও নিজের চিন্তাদ্বারা যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই এ পুস্তিকায় সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরিশিষ্টে জাপানী গবর্মেণ্ট ও গবর্মেণ্টের চাকুরি, জাপানের আয়ব্যয়, জাপানের বর্ত্তমান শিক্ষায়তন ও অধিবাসীদের সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞাতব্য তথ্য আছে।

যতদিন না আমাদের দেশের লোকেরা এই ধরণের পুস্তককে অপরিহার্য্য পারিবারিক সামগ্রী হিসাবে দেখিতে শিখবে, ততদিন দেশের শিক্ষার বনিয়াদ সঠিক ভাবে গঠিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

ধূপ-শিখা—উপন্যাস, শ্রীফণীন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য্য, এম্, এ ; বি, এল্। দেবসাহিত্য কুটির, ৫৪।৭ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

সহজ অনাড়ম্বর একটি কাহিনীকে গ্রন্থকার দরদ দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বইখানি মর্ম্মস্পর্শ করে। —র

জাতীয় আন্দোলনের ধারা

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয় কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার সঙ্গেসঙ্গেই। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, যে-দিন ভারতের কয়েকজন স্বদেশানুরাগী সন্তান ও ভারত-হিতৈষী ইংরাজ "ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশান্যাল্ কংগ্রেস্"-এর প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার সূচনা করেন। সে যুগের দেশ-নায়কগণ নানারূপ প্রতিকূল অবস্থা ও বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া কংগ্রেস্-আন্দোলন পরিচালনা করেন। সে আন্দোলনের প্রারম্ভে দেশ অনেক বিষয়েই পাশ্চাৎপদ ছিল। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে অশিক্ষিত ও নিরক্ষর লোকের সংখ্যাই খুব বেশী ছিল। দেশ-বাসীর সামাজিক জীবনও ছিল যুক্তিহীন অন্ধ ধারণা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। স্বাদেশিকতার মহান্ আদর্শ কিংবা জাতি-গঠনের উচ্চ ভাব ভারতীয় জনগণের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। দেশের রাষ্ট্রীয় আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা কোনো দিক দিয়াই আরব্ধ জাতীয় আন্দোলনের অনুকূল ছিল না। কিন্তু তৎসত্বেও দেশহিত-ব্রত নায়কগণ হতাশ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়েন নাই।

সে-যুগে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ধারা ছিল এ যুগের ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তখনকার দিনে বৈদেশিক শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত কোন প্রকারের সংঘর্ষ বা বিরোধের সৃষ্টি করিয়া জাতির ন্যায্য পাওনা আদায় করিয়া লওয়ার চিন্তা নেতাদের কল্পনার বহির্ভূত ছিল। দেশ-নেতারা ইংরাজের জাতীয় চরিত্রে অতি মাত্রায় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দেশের লোক দেশ-শাসনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিলে, ইংরাজ জাতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভারতবাসীর হাতে শাসনাধিকার ছাড়িয়া দিবে—ইহা তাৎকালিক নেতাদের প্রায় সকলেই বিশ্বাস করিতেন। শাসকজাতির প্রতিশ্রুতি, সদিচ্ছা, সততা ও সহৃদয়তার উপর তাঁহাদের যথেষ্ট আস্থা ছিল। আবেদন-নিবেদন করিয়া, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়া, সংবাদ-পত্রে লিখিয়া আইন-সঙ্গত বৈধ উপায়ে আন্দোলন করিয়া শাসক-জাতিকে তাঁহাদের প্রতিশ্রুতির কথা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-বাণীর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ভালো করিয়া তাহাদের দায়িত্বের কথা বুঝাইয়া দিতে পারিলেই যে কাম্য বস্তুলাভে কোনো ব্যাঘাত ঘটিবে না, দেশ-নায়কেরা ইহা মনে করিতেন। এই অভিনব ও বিচিত্র পন্থাকেই সে-কালের নেতারা স্বাধিকার-লাভের সত্য ও সহজ পথ বলিয়া জানিতেন। এই পন্থা ব্যতীত আর অন্য কোনো পন্থার চিন্তা তাঁহাদের কল্পনায় আসিত বলিয়া মনে হয় না। এই শ্রেণীর দেশ-কর্ম্মীদের তদানীন্তন মনোভাব এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও পন্থা বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মীদের কাছে যে অদ্ভুত ঠেকিবে, ইহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মনোভাবের ভুল-ভ্রান্তি এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও পন্থার ক্রটি-বিচ্যুতি সত্বেও এই কথাটি স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রগতির ইতিহাসে এই শ্রেণীর দেশ-কর্ম্মীদের দান উপেক্ষণীয় নহে।

কংগ্রেস্-আন্দোলন আরম্ভ হইবার প্রায় একুশ-বাইশ বৎসর পরে জাতীয় আন্দোলনের এই ধারাটির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। সে ১৯০৫ সনের কথা। বাংলায় বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে যে স্বদেশী-যুগের সূচনা হয়, তাহারই প্রভাবে আমাদের একুশ-বাইশ বৎসরের জাতীয় আন্দোলনের ধারায় একটা বিপুল পরিবর্ত্তন আসিয়া বাংলার রাষ্ট্র আন্দোলনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেয়। বাংলার এই যুগ-বিবর্ত্তনে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনের আদর্শ, পন্থা ও সংস্কার ভ্রান্ত বলিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রতিপন্ন হয়। যে শক্তিশালী অগ্রগামী দল এই ভ্রান্তি দর্শাইয়া দিলেন, তাঁহারা চরমপন্থী বা **Extremist** বলিয়া অভিহিত হইলেন, আর যাঁহারা এই ভ্রান্তি স্বীকার করিলেন না, তাঁহারা নরমপন্থী বা **Moderate** বলিয়াই সুপরিচিত। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনের আদর্শ ও পন্থা লইয়া চরম-দলে ও নরম-দলে যে সংঘর্ষ ও বিরোধ বাধিয়াছিল, তাহা আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

নরম-দলের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও পন্থা ভ্রান্ত বলিয়া চরম-দলের প্রধানগণ প্রমাণ করিয়া দিলেও, চরম-দলের পক্ষ হইতেও কোনো সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্রম দেশবাসীর সম্মুখে ধরা হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে, চরমপন্থী নায়কেরা স্বরাজ-লাভের ও

স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পৃথক কোনো পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন নাই। "আত্ম-শক্তি" স্বরাজ-প্রাপ্তি ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশস্ত পন্থা বলিয়া চরমপন্থী নেতারা প্রচার করিলেও রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে সে অস্ত্র কি ভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং জাতির রাষ্ট্রীয় জীবনে সে-শক্তির স্ফুরণ কি করিয়া হইতে পারে, তাঁহারা তাহা বলিয়া দিতে পারেন নাই। তাহা না পারিলেও চরমপন্থী দেশ-নায়কেরা যে জাতির angle of vision বদ্‌লাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন—দেশবাসীর রাষ্ট্রীয় চিন্তা-ধারার গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিলেন ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশাত্মবোধ ও আত্ম-সংবিৎ জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এই দলের নায়ক ছিলেন বাংলার বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, মহারাষ্ট্রের বাল-গঙ্গাধর তিলক ও পঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি। আর বিপক্ষ দলের নেতা ছিলেন বাংলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র—বোম্বায়ের ফেরোজসাহ মেটা, ওয়াচা ও গোখেল প্রভৃতি।

স্বদেশী-যুগে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে অরবিন্দের আবির্ভাব আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশেষ ঘটনা। অরবিন্দের ত্যাগ ও মনীষা, তাঁহার সতেজ লেখনী ও প্রতিভাপ্রসূত নব-নব ভাব-ধারা নূতন দলকে যে শক্তি-সম্পন্ন ও প্রভাবশালী করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা প্রতিপক্ষ-দলও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয়-নীতি-ক্ষেত্রে গোখেলের ন্যায় বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও শক্তিমান দেশ-নায়কের প্রতিভা-জ্যোতিও অরবিন্দের লোকাতীত প্রতিভার দ্যুতির নিকট ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। অরবিন্দ-প্রতিভার অবদান আমাদের রাষ্ট্র-জীবনকে যে সম্পদশালী করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। অরবিন্দ-বিপিনচন্দ্র তিলক-লাজপৎ প্রমুখ মনীষা-সম্পন্ন জাতীয়তাবাদী নায়কগণের প্রভাবে ভারতের—বিশেষ করিয়া বাংলার যুব-মন তখন নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই নূতন দল নিজকে চরমপন্থী বা Extremist বলিয়া স্বীকার করিত না, এই দলের লোকেরা ন্যাশন্যালিষ্ট, জাতীয়তাবাদী বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিত।

স্বদেশী-আন্দোলন দ্বারা ভারতের রাষ্ট্রজীবন কতটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তাহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। স্বদেশী যুগকে বাংলার Renaissanceএর যুগ বলা যাইতে পারে। স্বদেশী-আন্দোলন শুধু যে বাংলার রাষ্ট্র-জীবনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়াছিল, তাহা নহে—আমাদের সমাজ, সাহিত্য এবং শিল্প-বাণিজ্যেও এই আন্দোলন যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বদেশী-আন্দোলন বহির্মুখ বাঙ্গালীকে অন্তর্মুখ করিল, দেশের কৃষ্টি ও সাধনার প্রতি বাঙ্গালীর দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিল, ভারতের প্রনষ্ট গৌরবের অতীত স্মৃতিতে বাঙ্গালীকে মাতাইয়া তুলিল। ফেরঙ্গ-সভ্যতার যে আদর্শ ও ভাব বিজলী-চমকের মত সেকালের 'কাল্‌চার'-বিলাসী বাঙ্গালীর চক্ষুকে ঝল্‌সাইয়া দিয়া তাহাকে মোহাবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল, স্বদেশী-আন্দোলনের প্রভাবে সে মোহ-ঘোর কাটিয়া গেল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের প্রচারিত আদর্শ ও ভাব স্বদেশী-যুগের পূর্ব্বে বাঙ্গালী পড়িয়াছে, শুনিয়াছে ও বিচার-বুদ্ধি দ্বারা আলোচনাও করিয়াছে। কিন্তু তখনকার বাঙ্গালী সে আদর্শ ও ভাবকে প্রাণ দিয়া অনুভব ও হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করে নাই—করিবার কোনো আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টাও দেখা যায় নাই। স্বদেশী-যুগের আবির্ভাবে বঙ্কিম বিবেকানন্দের আদর্শ ও ভাব বাঙ্গালীর মোহাচ্ছন্ন হৃদয়-মনকে সত্যানুভূতিতে সচেতন করিয়া তুলিল। এ যুগের পূর্ব্বে 'বন্দেমাতরম্' বাঙ্গালী কানে শুনিয়াছিল মাত্র, কিন্তু তাহার প্রাণে-প্রাণে তাহা ধ্বনিয়া উঠে নাই। স্বদেশী-যুগে 'বন্দেমাতরম্' বাঙ্গালী হৃদয়ে ইষ্টমন্ত্রের মত স্থান পাইয়াছিল। সে-যুগে দেশাত্মবোধ-উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালীর মুখে শুধু 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিত হয় নাই, বাঙ্গালীর বুকের মধ্যেও সে ঋষি-বাণী অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরলোকগত গোখেল ভারতের রাষ্ট্র-জীবনগঠনে বাংলার অবদানের উল্লেখ করিয়া বাঙ্গালীর প্রতিভা ও মনীষার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালী আজ যে চিন্তা করে, সে চিন্তা সারা ভারতবর্ষ পরদিন করিয়া থাকে। ভারতের রাষ্ট্র-জীবনে বাঙ্গালী বহুকাল নেতৃত্ব করিয়াছে। রাষ্ট্র-গুরুর সে সম্মানিত পদ বাঙ্গালী তাহার নিজস্ব প্রতিভা, মনীষা, ব্যক্তিত্ব ও ত্যাগের প্রভাবে গান্ধী-যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল। কাজেই স্বদেশী-যুগে বাঙ্গালীর এই যে পরিবর্ত্তন, তাহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রাষ্ট্র-জীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বৈদেশিক রাজ-শক্তি বাংলার এই স্বদেশী আন্দোলন দমন করিবার জন্য যে নির্য্যাতন-নীতি প্রয়োগ করেন; ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাহা অভূতপূর্ব্ব। পূর্ব্ববঙ্গে ফুলারী আমলে দমন-নীতির ফলে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা তদানীন্তন দেশ-নায়কদের ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। সেই সময়েই বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের প্রবর্ত্তনে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ধারায় এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়ার সূচনা হয়। বৈপ্লবিক আদর্শ ও ভাব ভারতীয় রাষ্ট্র-জীবনকে যে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বাংলার এই বিপ্লব-বন্যার প্লাবনে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের—বিশেষ ভাবে পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় জীবন প্লাবিত হইয়াছিল। বৈপ্লবিক কর্ম্মানুষ্ঠান সে যুগে ভারতের তরুণ-চিত্তকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের রাষ্ট্র-জীবনে সে প্রভাব এখনও যে লোপ পায় নাই, ইহা কে না জানে? ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বৈপ্লবিক সাধনার একটা বিশিষ্ট রূপে আত্ম-প্রকাশ করিবার চেষ্টা দেখিতে পাই য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে, ইংরাজী ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সনের মধ্যে। ভারতীয় বিপ্লববাদীরা তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ লইয়া জার্ম্মানদের সাহায্যে ভারতবর্ষে ব্যাপক ভাবে বিদ্রোহানল জ্বালাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সংহত বৈপ্লবিক কর্ম্ম-প্রচেষ্টা কি ভাবে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহা দমন করিবার জন্য রাজ-শক্তিকে কিরূপ হয়রান হইতে হইয়াছিল, এ স্থানে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না।

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অবধি স্বদেশী যুগ পর্য্যন্ত রাষ্ট্র-নীতি ক্ষেত্রে নরম-দলের প্রভাব ও প্রাধান্য অব্যাহত ছিল,—বলা যাইতে পারে। সে যুগে ইংরাজী ১৯০৬ সনে সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনে নরমপন্থী ও জাতীয়তাবাদী দলে যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ হইয়াছিল, সেই সঙ্গে মডারেট্‌ দলের আধিপত্য আমাদের রাষ্ট্র-জীবন হইতে লোপ পায়। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে তদবধি ন্যাশনালিষ্ট দলের প্রভাব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইংরাজী ১৯১৯ সনে গান্ধী আন্দোলনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল। কংগ্রেসী রাজনীতিতে বিপ্লববাদীদের আস্থা ছিল না। নরম-পন্থী ও চরম-পন্থী—এই উভয় দলের মধ্যে বিপ্লবীরা বিশেষ কোনো পার্থক্য বা বৈষম্য দেখিতে পায় নাই। উভয় দলের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও কর্ম্ম-পন্থা বিপ্লবীদের চক্ষে সমান মূল্যেরই ছিল। বিপ্লবীদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও কর্ম্ম-পন্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল বলিয়া এবং গুপ্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের লক্ষ্য-স্থলে উপনীত হওয়া সুবিধাজনক ভাবিয়া বিপ্লবীরা কংগ্রেসী রাজনীতি লইয়া নাড়াচাড়া করে নাই। কংগ্রেস্ প্রতিষ্ঠানটিকে দখল করিবার জন্যও তাহাদের তরফ হইতে কোনো চেষ্টা হয় নাই।

ইংরাজী ১৯১৯ সনে মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর খেলাফৎ-সমস্যা যখন ভারতীয় রাষ্ট্র-নীতিতে প্রবেশাধিকার পাইল এবং খেলাফৎ-আন্দোলন আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গ-স্বরূপ হইল, তখন আমাদের রাষ্ট্র-জীবনে আর একটি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে অধিনায়ক-রূপে মহাত্মা গান্ধীর সেই প্রথম আবির্ভাব। মহাত্মাজী তৎপূর্ব্বে দেশের লোকের নিকট সুপরিচিত ছিলেন এবং রাষ্ট্র-জীবনে তাঁহার অবদান ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু মুক্তিকামী রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সেনাপতি রূপে তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ইহার পূর্ব্বে আর কখনো অবতীর্ণ হন নাই। মহাত্মাজীর এই আবির্ভাব আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষ আন্দোলিত করিয়া তুলিল। নানা দিক দিয়াই আমাদের রাষ্ট্র-জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল।

খেলাফৎ সমস্যাকে ভারতীয় রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ায় ভারতবর্ষের মোস্লেম সমাজ কংগ্রেস্-আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহাতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইয়া কিছু কালের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে সফল করিবার জন্য আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিল। একদিকে মুস্লেম-সম্প্রদায়ের কংগ্রেস-আন্দোলনে যোগদান, আর অপর দিকে মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব রাষ্ট্র-জীবনকে নব-জীবন-তরঙ্গে উদ্বেলিত ও আলোড়িত করিয়া তুলিল। মহাত্মাজী ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ধারায় স্বচ্ছ অনাবিল ও লীলা-চঞ্চল প্রবাহের সৃষ্টি করিলেন। গান্ধীজির ত্যাগ-পূত জীবনের মহিমায়, তাঁহার রাষ্ট্রীয় কর্ম্মকুশলতায়, অনবদ্য চরিত্রের মাহাত্ম্যে—তাঁহার আলোকসামান্য ব্যক্তিত্বের বিস্ময়কর প্রভাবে জাতীয়

আন্দোলনের ধারা বেগবতী স্রোতস্বতীর প্রবাহমান ধারার ন্যায় দুর্নিবার গতিতে বহিয়া যাইত লাগিল।

মহাত্মাজী রাষ্ট্রীয় মুক্তির জন্য যে নীতি প্রবর্ত্তিত করিলেন—যে পন্থা আবিষ্কার করিলেন, তাহা অভিনব ও বিচিত্র। বহু কর্ম্মী ইহার কার্য্যকারিতায় ও সম্ভাব্যতায় আস্থা স্থাপন করিয়া গান্ধী-প্রবর্ত্তিত কার্য্যক্রম গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ ইহার ভবিষ্যত সাফল্যে সন্দিহান হইয়া নিঃশব্দে গান্ধী আন্দোলনের গতি পরিণতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, আর রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে একদল লোক এই নীতি ও পন্থাকে আদর্শবাদীর অসম্ভব ও অদ্ভুত কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। গান্ধী-আন্দোলনের প্রারম্ভে বাংলায় গান্ধী-প্রভাব প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। নরমপন্থীর প্রায় সকলেই এবং ন্যাশ-ন্যালিষ্ট দলেরও অনেকে গান্ধী আন্দোলনের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। এদিকে বাংলার বিপ্লবী দলও মহাত্মা-জীর এই অভিনব মতবাদের প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মাজীর অহিংসা ব্রত নিষ্ঠার সহিত পালন করা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে কিছুতেই সম্ভব নহে, ইহাই ছিল তাঁহাদের ধারণা। কিন্তু কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন মহাত্মাজীর কর্ম্ম পদ্ধতি মানিয়া লইয়া আইন ব্যবসা ছাড়িয়া দিলেন, তখন দেশবন্ধুর অতুলনীয় ত্যাগের ফলে ও বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বাংলায় গান্ধী আন্দোলন প্রসার লাভ করিতে লাগিল। বাঙ্গালী যে মহাত্মাজীর কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়া জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়া ত্যাগে ও দুঃখ-বরণে ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে ছাড়াইয়া গেল, ইহা অনেকাংশে দেশবন্ধুরই প্রভাবে। দেশবন্ধুর কল্পনাতীত ত্যাগের মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই বাংলার তরুণেরা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত কার্য্যক্রম মানিয়া লইল, ছাত্র-সমাজ শিক্ষায়তন হইতে বাহির হইয়া পড়িল, বহু শিক্ষক ও অধ্যাপক স্কুল-কলেজ ছাড়িল, অনেক আইন-ব্যবসায়ী ব্যবসা ছাড়িয়া রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলেন। বাংলায় তরুণ, ছাত্র ও বিপ্লববাদীদের মধ্যে যাঁহারা গান্ধী আন্দোলনে যোগ দিলেন না, তাঁহারা মহাত্মাজীর অহিংসা বা nonviolenceকে creed রূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই—ইহাকে তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন policy হিসাবেই।

গান্ধী-আন্দোলনের কার্য্যক্রমের বয়কট্-নীতি বাঙ্গালীর চোখে নূতন বলিয়া ঠেকিল না। কারণ, স্বদেশী-যুগে বাংলায় বয়কট্-নীতি ব্যাপকভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। Passive resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-নীতি বাংলায় স্বদেশী-যুগে অনুষ্ঠিত না হইলেও, প্রচারিত হইয়াছিল। তবে মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহের আদর্শ সম্পূর্ণ অভিনব। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে সত্যাগ্রহকে রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে পৃথিবীর আর কোন দেশে প্রয়োগ করা হইয়াছিল কিনা জানি না। সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য, প্রতিপক্ষকে হায়রান করিয়া তাহার সহিত বিরোধ বাড়াইয়া তোলা নহে—সত্যাগ্রহ-অনুষ্ঠানে কষ্টভোগ ও দুঃখবরণ করিয়া প্রতিপক্ষের মনোভাবের পরিবর্ত্তন সাধন করাইয়া দিয়া তাহার চিত্ত জয় করাই ইহার উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক সংঘর্ষে এই অস্ত্রপ্রয়োগে কোনো কোনো স্থলে উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা হয় নাই। অনেক স্থলে এই অস্ত্র-প্রয়োগ একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

গান্ধী-আন্দোলনের মূল মন্ত্র—অহিংসা, সুতরাং ইহাকে বাদ দিতে গেলে গান্ধী-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যই লোপ পাইবে। গান্ধী-নীতি পালন করিতে হইলে কায়মনোবাক্যে অহিংস হইতে হইবে। প্রথম প্রচারকালে এই নীতির সম্ভাব্যতায় অনেকেই সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু পরে অনেকের মন হইতে সে সংশয় দূর হইয়াছে। ১৯৩০ সনের গান্ধী-আন্দোলনে যাহা প্রায় বৎসরেক পরে গান্ধী-আরুইন্ সন্ধিতে সসম্মানে পরিসমাপ্ত হইয়াছিল—অনেকেই মহাত্মাজীর প্রবর্ত্তিত নীতি ও পন্থার সম্ভাব্যতায় বিশ্বাসী হইয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, ১৯২০ সনের গান্ধী-আন্দোলন নিষ্ফল হইয়াছে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, নিষ্ফলতায় সে-আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হয় নাই। ১৯৩০ সনের গান্ধী-আন্দোলনের গতি-পরিণতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ১৯২০ সনের আন্দোলনের বিচার বিশ্লেষণ করিলে আমাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

১৯২২ সনে চৌরিচৌরায় ক্ষিপ্ত জনতার হিংস্রবৃত্তি যখন সরকারী কর্ম্মচারীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তখন মহাত্মাজী তাঁহার আরব্ধ সংগ্রাম বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবেই স্বীকার করিলেন যে, দেশ এখনও তাঁহার অহিংসা-নীতি পালন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে নাই।

সেই সময় ভারতের অনেক বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী মহাত্মাজীর এই কার্য্যকে দোষারোপ করিয়া এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে মহাত্মাজী চৌরিচৌরার দুর্ঘটনার সূত্রে সত্যাগ্রহসংগ্রাম বন্ধ করিয়া দিয়া যে হিমাদ্রি-প্রমাণ ভুল (Himalayan blunder) করিলেন, তাহাতে দেশের ক্ষতি ত হইলই, সঙ্গে-সঙ্গে তিনি তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সমাধি নিজেই খনন করিয়া রাখিলেন। মহাত্মাজী সহকর্মীদের ও জনসাধারণের এইরূপ প্রতিকূল সমালোচনায় কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। ইহার পর সুদীর্ঘ আটটি বৎসরের নীরব ও একাগ্রসাধনার পর তিনি যখন ভারতের মুক্তিকামনায় ১৯৩০ সনের মার্চ্চমাসে আবার সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন এবং ১৯৩১ সনের মার্চ্চ মাসে ইহার সম্মানজনক পরিসমাপ্তি হইল, তখন প্রতিকূল সমালোচকদের সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ১৯২০ সনে সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি ভুল করেন নাই।

গান্ধী-পূর্ব্ব যুগে কংগ্রেসী রাষ্ট্রনীতিতে যাঁহারা কর্তৃত্ব করিতেন, তাঁহারা বুর্জোয়া (Bourgeois) শ্রেণীর লোক ছিলেন। ব্যারিষ্টার, উকিল, জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরাই ছিলেন আমাদের তৎকালীন রাষ্ট্র-জীবনের নায়ক ও পরিচালক আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত ভদ্র-জনেরা ছিলেন তাঁহাদের অনুগামী। নিরক্ষর অশিক্ষিত 'ইতর-জন' বলিয়া যাহারা সমাজে অবজ্ঞাত, এবং ভারতবর্ষের ত্রিশ-বত্রিশ কোটি অধিবাসীর মধ্যে যাহারা শতকরা আশী-একাশী জন, সেই শ্রেণীর জনগণের কোনো স্থান কংগ্রেসে ছিলনা। 'মদরত'শাসিত কংগ্রেসে দেশের জন্য ত্যাগ, দুঃখবরণ ও কষ্টভোগ নায়ক-নির্ব্বাচনের মাপকাঠীতে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ছিল না। পরবর্ত্তী কালে ন্যাশন্যালিষ্ট-পরিচালিত কংগ্রেসে এই ভ্রান্ত আদর্শের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তখনো কংগ্রেসী রাজনীতিতে বুর্জোয়া-প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সেই সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের প্রভাব কংগ্রেসে কিছুকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 'মদরত'-শাসিত কংগ্রেসে লোকমান্য তিলক, অরবিন্দপ্রমুখ জন-নায়কগণ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই। গান্ধী-যুগে নায়ক-নির্ব্বাচনের এই মাপকাঠি পরিবর্ত্তিত হইল। যাঁহারা দেশের জন্য ত্যাগ, কষ্টভোগ ও দুঃখবরণ করিয়াছেন, সেই সকল জননায়ক কংগ্রেস-আন্দোলনের পুরোভাগে সম্মানিত আসন পাইলেন। গান্ধী-পূর্ব্ব যুগে অধিকাংশ স্থলেই রাজনীতি-চর্চ্চা ছিল বুর্জোয়া বা অভিজাত সম্প্রদায়ের অবসর-বিনোদন ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার পন্থাবিশেষ। কিন্তু গান্ধী-আন্দোলনে রাজনীতি-চর্চ্চার সেই সহজ পথ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় নেতাদের অনেককেই বাধ্য হইয়া রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িতে হইল। অর্থ-বলে ও পদ-মর্য্যাদায়, ধাপ্পাবাজি ও চালিয়াতির কৌশলে এবং political diplomacy ও চালাকির সাহায্যে রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে নেতৃত্ব বা শরফরাজি করিবার সুযোগ গান্ধী আন্দোলনে নাই। এই জন্যই ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক অনেক নেতা ও কর্ম্মীকে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া যাইতে হইল। গান্ধী আন্দোলন যে অবস্থার সৃষ্টি করিল, তাহাতে কোনো নেতা বা কর্ম্মীর পক্ষে রাষ্ট্র-জীবন নিরাপদ, সুখকর ও আরামপ্রদ রহিল না। রাষ্ট্র-জীবনের সূচনাতেই ত্যাগ, দুঃখবরণ ও কষ্টভোগের জন্য নেতা বা কর্ম্মীকে প্রস্তুত হইতে হইল।

গান্ধী-আন্দোলনের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য,—ভারতে masses বা সাধারণজনের জাগরণ বা গণ-চেতনা। গান্ধীজীর বিরাট মনুষ্যত্ব, অসামান্য চরিত্রবল, সমবেদনাভরা প্রাণ—আর সর্ব্বোপরি তাঁহার অভিনব কর্ম্মপন্থা ও কার্য্যক্রম সাধারণজনকে কংগ্রেসের প্রতি আকর্ষণ করিতে লাগিল। কংগ্রেসগৃহীত রাষ্ট্রধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া লইয়া, মাত্র চারিগণ্ডা পয়সা বার্ষিক চাঁদা দিতে পারিলেই কংগ্রেসের সদস্য হওয়া যায়। এই যে ব্যবস্থা—যাহা এতকাল কোনো কংগ্রেস্নায়কই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই—ইহাতে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা দেখিতে না দেখিতে এত অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গেল যে, ইতিপূর্ব্বে কোনো নেতা বা কর্ম্মী তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। সহর ছাড়াইয়া সুদূর পল্লীঅঞ্চলে কংগ্রেসের নাম প্রচারিত হইল। কংগ্রেস্ যে কি তাহা আমাদের দেশের চাষী-মজুর, মুচি-মেথর, মাঝি-মাল্লা, গাড়োয়ান-দোকানদার প্রভৃতি সাধারণ জনেরা ইতিপূর্ব্বে জানিতই না। কিন্তু মহাত্মাজীর কল্যাণে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে এই সমুদয় লোকের স্থান হইল। জনবহুল নগরের সীমা অতিক্রম করিয়াও জনবিরল পল্লীর মধ্যে কংগ্রেসের কর্ম্ম-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ধনীর প্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্রের পর্ণ-কুটির পর্য্যন্ত যে কংগ্রেসের স্থান,—কোটি কোটি নরনারীর মুখে যে

কংগ্রেসের বাণী—ইহা আমাদের জাতীয় ——— ———
বলিতে হইবে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে কতযুগ ধরিয়া আমাদের পল্লীই ছিল ভারতীয় সাধনা, সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রাণ। পল্লী-জীবনের মধ্য দিয়াই হইত জাতির বৃহত্তর জীবনের বিভিন্ন স্তরের অভিব্যক্তি ও বিকাশ। আমাদের পৌরজীবনের ভিত্তিই ছিল পল্লী। বৌদ্ধভারতে পল্লীর অতুলনীয় শ্রী-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক নিদর্শন আজিও পাওয়া যায়। মোস্লেম-ভারতেও আমাদের পল্লী-জীবনের প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই,—পল্লী শ্রীহীন হইয়া নিজস্ব সম্পদ হারাইয়া আধুনিক যুগের মত শ্মশানে পরিণত হয় নাই। ব্রিটিশ-ভারতে পাশ্চাত্য-সভ্যতার বহির্মুখ-প্রভাবে ভারতবাসী নাগরিক-জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ইহার ফলে, জাতির জীবনে পল্লীর প্রভাব লোপ পাইল;—ধনী ও শিক্ষিত, এমন কি মধ্যবিত্ত লোকেরা পর্য্যন্ত পল্লী ছাড়িয়া সহরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পল্লীর সম্পদ গেল, প্রতিষ্ঠা গেল, আকর্ষণীশক্তি বিলুপ্ত হইল, আর পল্লী-শ্রী অতীতগৌরবের স্বপ্ন-স্মৃতিতে মিলাইয়া গেল। মন্দির ও মস্‌জিদের চূড়া ভেদ করিয়া বট-অশ্বথ গজাইয়া উঠিল, ধনীর পরিত্যক্ত প্রাসাদ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া বন্যজন্তুর আবাসভূমিতে পরিণত হইল। যাহারা পল্লীর মায়া ছাড়াইতে না পারিয়া পল্লীজননীর স্নেহশীতল বুকে মাথা গুঁজিয়া রহিল, তাহাদের অধিকাংশ কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির কবলে পড়িয়া অকালে জীবন হারাইল; আর যাহারা মরিতে মরিতেও মরিল না, তাহারা বাঁচিয়া রহিল শুধু রোগেশোকে জর্জ্জরিত হইয়া হৃতসর্ব্বস্বা কাঙালিনী জননীর কোলে মাথা রাখিয়া তিলে তিলে মরিবার জন্যই।

গান্ধী-আন্দোলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল,—ভারতবাসীর বহির্দৃষ্টি ফিরাইয়া পল্লীর প্রতি তাহাদিগকে আকৃষ্ট করা, আমাদের জাতীয় জীবনে পল্লীর প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া পল্লীভূমিকে সম্পদশালী ও শ্রী-সম্পন্ন করিয়া তোলা। গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের শাখা স্থাপিত হইল, সাধারণজনকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রচারকার্য্য চলিতে লাগিল, সালিশী-কমিটি গঠন করিয়া মামলামোকদ্দমা আপোষ-নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হইল, এবং চরকা ও তাঁতের পুনঃ প্রচলন করিয়া ভারতের গৃহশিল্পকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা চলিল। গান্ধী-আন্দোলনের এই কর্ম্মপদ্ধতি গণচেতনার মধ্য দিয়া সার্থক হইয়া উঠিল। এই জনজাগরণের ফলে কংগ্রেসের শক্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। পল্লীবাসী জনগণ আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে আর উপেক্ষিত হইল না। গান্ধী-আন্দোলনের সঙ্গে খেলাফৎ-আন্দোলন সম্মিলিত ভাবে ও সমতালে পরিচালিত হওয়ায় সাধারণ জনের রাষ্ট্রনৈতিক চৈতন্যবোধ সহজেই জাগিল এবং এই ভাবটি ভারতের সর্ব্বত্র প্রসারলাভ করিল।

গান্ধী-পূর্ব্বযুগে আমাদের জাতীয় আন্দোলন শৃঙ্খলা ও সংহতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। গান্ধী-আন্দোলনই কংগ্রেসকে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। মহাত্মাজীর নেতৃত্বকে আশ্রয় করিয়া কংগ্রেসের যে সংহতিশক্তি বিকশিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাহার প্রভাব রাজশক্তিকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। ১৯৩১ সনে গান্ধী-আরুইন সন্ধির পরে ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড আরুইন্ ভারত-ত্যাগের প্রাক্কালে এক বক্তৃতায় আমাদের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে "the great Congress organisation" বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই এবং মহাত্মা গান্ধীর শক্তিকে "spiritual force" বলিতে কোনো দ্বিধাবোধ করেন নাই।

ভারতের কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সংযোগ করিয়া দিয়াছে। গান্ধী-আন্দোলন হইতেই যে ভারতে এই আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছে এবং মহাত্মা গান্ধীই যে এ দেশে কৃষক ও শ্রমিকের অধিকার-প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ-রক্ষার জন্য প্রতিপক্ষের সহিত সর্ব্বপ্রথম যুঝিয়াছেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। চম্পারণ, খয়রা ও বাদ্দোলী ইহার সাক্ষ্য দিবে। গত বৎসর কুমিল্লায় জেলা ছাত্র-সমিতি, যুবসমিতি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গান্ধী-জয়ন্তী-উৎসবে সভাপতির অভিভাষণে ঐ কথাটিই আমি আরো বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম। সেই সভায় উপস্থিত নিমন্ত্রিত অতিথি, বাংলার অন্যতম শ্রমিক নেতা, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জ্জিকে আমার উক্তি সম্বন্ধে প্রকাশ্যে প্রশ্ন করিলে তিনি ইহার নির্ভুলতা সভাস্থলেই স্বীকার করেন।

কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন যে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ধারায় একটি নূতন প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছে,

ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই আন্দোলন-প্রভাবে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের শক্তি নানা দিক দিয়াই বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে-দেশে প্রতি এক শত জনের মধ্যে চাষী-মজুরই আশী জন, সে দেশে ইহাদের বাদ দিয়া কোনো জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভবপর নহে এবং কোনো গণ-আন্দোলনই ব্যাপক-ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না আর সঙ্ঘবদ্ধ গণ-আন্দোলনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা ব্যতীত মুক্তিকামী ভারতবাসীর পক্ষে কাম্য বস্তু লাভ কথনো সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

পৃথিবীর অন্যান্য আন্দোলনের মত এদেশে কৃষক শ্রমিক আন্দোলনের আবির্ভাবও প্রথম যে-আকারে যে-ভাবে হইয়াছিল, কিছুকাল পরেই নানা অবস্থার মধ্য দিয়া পরিবর্ত্তিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া এখন ইহা নূতন রূপ ও নব-কলেবর ধারণ করিয়াছে। আমাদের রাষ্ট্র-জীবনে সেই আন্দোলনের প্রভাব বিশেষভাবেই অনুভূত হইতেছে। রাজশক্তির কাছেও এই আন্দোলন যে উপেক্ষণীয় নহে, তাহার প্রমাণ মীরাট-ষড়যন্ত্রের মামলা। এই আন্দোলন বর্ত্তমানে বিভিন্ন মতবাদকে আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন সঙ্ঘের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছে। "ট্রেড ইউনিয়নিজম", "সোস্যালিজম্" ও "কম্যুনিজম্"—এই তিনটি মতবাদের প্রাদুর্ভাবই ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কোন্ দলের প্রাধান্য ও প্রভাব বেশী এবং কোন্ মতবাদটি অধিকতর লোকপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে, তাহা বলা সহজ নহে। তবে, একথা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে কিছুকাল পূর্ব্বে কম্যুনিস্ট-শাসিত রাশিয়া সম্বন্ধে এবং রাসিয়ার রাষ্ট্র-নায়ক-মণ্ডলীর প্রচারিত কমুনিজম বা বল্‌সেভিজম্ সম্বন্ধে এ দেশে যে ধারণা বদ্ধমূল ছিল, এখন আর তাহা নাই। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু রাসিয়া পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া Soviet Rassia নামক গ্রন্থে রাসিয়া সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা প্রকাশ করেন। তারপর রবীন্দ্রনাথও ঐ দেশটি দেখিয়া আসিয়া অনেক তথ্য প্রচার করেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষে রাসিয়া ও রাসিয়ার আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে একটা অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। রাসিয়ার অর্থ-নৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রচিত ও অনুষ্ঠিত 'পঞ্চবার্ষিকী পদ্ধতি' বা 'Five-years' plan' রাসিয়া ও রাসিয়ার আধুনিক রাষ্ট্রীয় মতবাদের প্রতি এ দেশের লোকের মন আকর্ষণ করার পক্ষে যে অনেকটা সহায় হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের আবহাওয়া এই মতবাদের অনুকূল ও উপযুক্ত কিনা এবং ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে ইহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে কি না, সে সম্বন্ধে কোনো নির্ভুল সিদ্ধান্ত করা বর্ত্তমানে কঠিন।

ভারতের রাষ্ট্র-নীতি-ক্ষেত্রে কৃষক-শ্রমিক-আন্দোলন এতটা শক্তি আজও সঞ্চয় করিতে পারে নাই যে, জাতির বিরাট প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস্‌কে ছাড়াইয়া যাইতে পারে। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, কংগ্রেস্ এই আন্দোলন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইতেছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন করা এবং কংগ্রেসের করাচী-অধিবেশনে ভারতীয় জনগণের অধিকার স্বীকার করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা, ইহা কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবের ফলই বলিতে হইবে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাও মনে করেন যে, ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব যদি কোনো দিন ক্ষুণ্ণ হয় কিংবা মহাত্মাজী রাষ্ট্রনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তবে কৃষক-শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের লোকেরাই কংগ্রেস্ সম্পূর্ণভাবে দখল করিয়া বসিবে।

বন্দীদশা শুধু তো কারা-প্রাচীরের মধ্যে নয়, মানুষের অধিকার সংক্ষেপ করাই ত বন্ধন। সম্মানের খর্ব্বতার মতো কারাগার তো নেই। ভারতবর্ষে সেই সামাজিক কারাগারকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে বড়ো করেছি। এই বন্দীর দেশে আমরা মুক্তি পাব কী করে?—যারা মুক্তি দেয় তারাই তো মুক্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথ—২২।৯।৩২

মহাত্মার অনশন-ব্রতে উৎকণ্ঠিত বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ
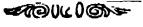
জয় হোক সেই তপস্বীর যিনি এই বসে আছেন মৃত্যুকে সামনে নিয়ে, ভগবানকে অন্তরে বসিয়ে, সমস্ত হৃদয়ের প্রেমকে উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে। তোমরা জয়ধ্বনি কর তাঁর, তোমাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছুক তাঁর আসনের কাছে, বলো তোমাকে গ্রহণ করলেম। তোমার সত্যকে স্বীকার করলেম।

রবীন্দ্রনাথ—২৪।৯।৩২

রায় জলধর সেন বাহাদুর

গত ২৮শে আগষ্ট কলিকাতার সাহিত্যিকবৃন্দের উদ্যোগে রাম মোহন হলে 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক বাংলার সর্ব্বজনপ্রিয় সাহিত্যিক রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরকে বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সোমবার ২১শে সেপ্টেম্বর বৈকাল চারিটার সময় কলিকাতা টাউন হলে ২০শে তারিখের স্থগিত 'শরৎ-বন্দনা' বহু সাহিত্যিক সমাগমে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

পুরাতন রাজপ্রাসাদ

সুরসাগরের অপর পার হইতে পুরানো কেল্লা

ডুঙ্গর কলেজ

নাগরী ভাণ্ডার
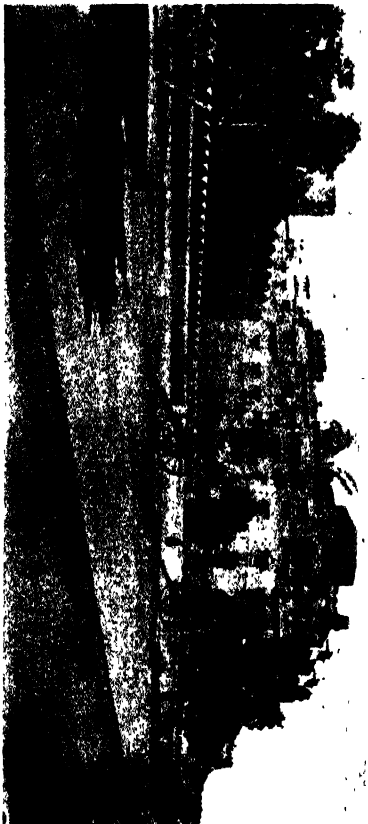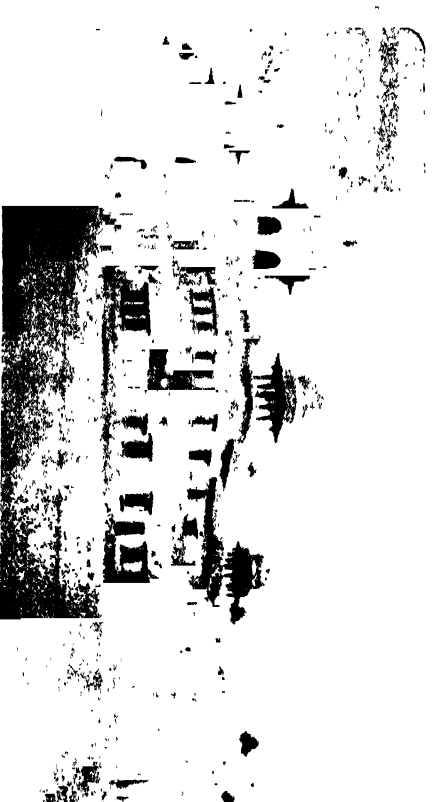
বীকানের

—শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী

যাচ্ছি বীকানের। ভোর চারটের সময় এন্, ডবলিউ, আর-এর ষ্টেশনে ভাটিণ্ডার গাড়ী বদলে বীকানের ষ্টেট রেলওয়ের ছোট্ট গাড়ীতে চড়া গেল। কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার রাত। ভোরের চাঁদের মরা আলোতে ভাটিণ্ডার গড়টা বিরাট দৈত্যের মতো দেখাচ্চে। ষ্টেশনের অনতিদূরেই গড়। আলো-আঁধারির আব্ছায়ায় গড়ের কোণায় কোণায় bastion গুলো মনে হচ্ছিল যেন মধ্যমপাণ্ডবের অতিকায় গদা মাটির ওপরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েচে।

পায়রার খোপের মত গাড়ীর কামরা। দেখি তাতে দুটি লোক দুটি বেঞ্চ জুড়ে ঘুমুচ্চে। গাড়ী ছাড়তে ছাড়তে ভোর হয়ে গেল। গড়টা দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল,—ভাবতে লাগলুম এই ইতিহাসবিশ্রুত ভাটনের গড়। তৈমুরের সময় থেকে ওর নাম ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েচে। দিল্লী আক্রমণ-কালে পথে এ গড়টি অধিকার করতে তৈমুরের বেগ পেতে হয়েছিল বিলক্ষণ, কিন্তু ভাটনের দুর্গের দুর্ভেদ্য প্রাকার তৈমুরের বিজয়লক্ষীকে বিমুখ করতে পারে নি।

জুলাই মাস। রাতভোর ভালো ঘুম হয় নি। শস্যহীন খোলামাঠ থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে আসছিল। ভাবলুম বন্ধুবান্ধব তো সবাই ভয় দেখিয়েছিলেন, ভাটিণ্ডা থেকে বীকানের যেতে জুলাই মাসের গরমে আধমরা হয়ে যাব; কিন্তু যে রকম দিল্‌খুস্ করা হাওয়া পাচ্ছি তা তো তেমন কোন বিভীষিকার সূচনা কচ্চে না। চক্ষু তখন তন্দ্রাজড়িত; ব্যাগটা মাথার নীচে দিয়ে বেঞ্চির ওপরে ঢুলে পড়লুম।

হঠাৎ একটা বহুজনকণ্ঠনিঃসৃত কোলাহল, একাধিক এঞ্জিনের ফোঁস ফোঁস শব্দ ও ফেরিওয়ালার যুগপৎ তারস্বরে যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন উঠে দেখি বীকানের রাজ্যের এলাকায় এসে পড়েছি, ষ্টেশন হনুমান-গড়। বেলা তখন বেশ বেড়েচে, কিন্তু আমার সহযাত্রী দুটির তখনো ঘুম ভাঙ্গেনি। সাশ্চর্য্যে তাদের পানে চেয়ে দেখ্‌লুম আপাদমস্তক তারা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্চে! চাদর মুড়ি দেবার মতো ঠাণ্ডা অবশ্যই পড়েনি। কিন্তু তার মানে বুঝলুম মুহূর্ত্ত পরেই নিজের গায়ের কালো কোটটির উপরে দৃষ্টি পড়তে, সেটা বিলকুল সাদা হয়ে গিয়েচে—অবশ্য বীকানেরী হাওয়ায় যে রং bleach করে তা নয়;—সর্ব্বাঙ্গে শুধু একটি বালির পুরু আস্তরণ পড়েচে। কাণে হাত দিয়ে দেখি বালি, চুলে বালি—আঁখিপল্লবে বালি! চাদর মুড়ি দেওয়ার মহিমা বোঝা গেল!

হনুমান-গড়ে একটি নতুন সহযাত্রী হলেন। ভারী খুশ্‌মেজাজী লোক। কত গল্প যে তিনি বল্লেন তার হিসেব নেই,—তার মধ্যে একটা হনুমানগড়প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এখানেও একটি দুর্গ আছে—তদনুসারেই স্থানটির নামকরণ হয়েচে। এটি বীকানের রাজ্যের সম্পত্তি। গাড়ী ষ্টেশনের ঘরদোর কলকারখানার পরিধি ছাড়িয়ে খোলা মরুভূমিতে পড়তেই অদূরে হনুমানগড় চোখে পড়ল। দেখ্‌লুম,—

> "........its towers battlements lie
> Open unto the heaven and to the sky—"

তার পানে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে সঙ্গী বল্লেন—শুনিয়ে বাবু সা-ব—। হিন্দীর তর্জমা করলে তার কথা এম্নি দাঁড়ায়। কিম্বদন্তী আছে, যে-ওস্তাদ কারিগর ভাটনের গড় গড়ে, হনুমানগড়ও নাকি তারি তৈরী। ভাটনের গড় তৈরী হবার পর নাকি তার ডানহাত কেটে ফেলা হয় এই আশঙ্কায় যে সে পাছে অম্নি দুর্ভেদ্য দুর্গ আর কারুকে তৈরী করে দেয়। সেই একহস্ত ওস্তাদ পরে শিয়ালকোটের গড় তৈরী করে শুদ্ধ কেবল তার বাঁ হাতখানি দিয়ে। কিন্তু শিয়ালকোট গড় গড়ার দক্ষিণা স্বরূপ তার বাঁ হাতখানিও কেটে ফেলা হয়। কিন্তু তদানীন্তন বীকানের-রাজ শক্তিমানের শক্তির কদর বুঝতেন। তিনি সেই কারিগরকে ডেকে এনে হনুমান গড় নির্ম্মাণকার্য্য তার ওপরে সঁপে দেন। এবং সেই অঙ্গহীন ওস্তাদদের নির্দ্দেশে মিস্ত্রীরা কাষ করে যে দুর্গ তৈরী করে তুলল, তার হিম্মৎ আর কিস্মৎ ভাটনের কি শিয়ালকোট গড়ের চাইতে একবিন্দু কম হোলো না। গল্পটি বলে বন্ধুবর সগর্ব্বে আমার মুখের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। আমি মনে মনে বল্লুম—"আজগুবী—"!

বেলা যতই বাড়তে লাগল, দিনে মরুভূবক্ষে রেলগাড়ীতে যাতায়াত যে কী যন্ত্র তত‌ই বুঝতে লাগলুম। প্রায় ঘণ্টায়

দম্‌কা আঁধি আসতে লাগল। দরোজা, জানালা সব বন্ধ থাকা সত্ত্বেও গাড়ীর ভেতরে প্রায় সিকি ইঞ্চি বালি জমে গেল। বাইরে সূর্য্যদেবের অগ্নিবর্ষণে কামরার ভেতরের তক্তাগুলো তেতে আগুণ হয়ে উঠল। আমরা জ্যান্ত মানুষ গুলো রীতিমত রোষ্ট হতে হতে সন্ধ্যা নাগাত বীকানের গিয়ে পৌঁছুলুম। কিন্তু বীকানেরের কাছে গিয়ে সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বোধ হোলো। সমস্ত দিন জনমানব ও গৃহশূন্য মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলেচি, কেননা হনুমানগড়ের পরে আর উল্লেখযোগ্য বড় ষ্টেশন নেই। ধুলোর ঝড়ের সঙ্গে সমানে তাল ঠুকে আমাদের sixteen wheeler এঞ্জিনখানা ক্ষ্যাপা দানো'র মত দিনমান ছুটেচে; দুধারে যত দূর দৃষ্টি চলে কেবল বালি—বালি—চক্রবালচুম্বী বালুকারাশি। কোথাও তা সমতল, কোথাও বা নতোন্নত বন্ধুর—কিন্তু বস্তু সেই একই—দিগন্তপ্রসারী নিরবচ্ছিন্ন বালির মহাসমুদ্র। এ উষর রুক্ষতার রাজত্বে চোখ পেতে থাকা যায় না, চোখ ঝল্‌সে যায়। কিন্তু তবু এর রুদ্র-সুন্দর রূপ মনকে আচ্ছন্ন করে, এর সীমা-হীন অনন্ত বিস্তৃতি মানুষের আমিত্বের অহঙ্কার খর্ব্ব করে জানিয়ে দেয় যে সে এই দুনিয়ায় সত্যিকার কতটুকু। এ হেন অনুর্ব্বর বিস্তৃতির ভেতর দিয়ে যেতে যেতে বীকানের যখন কাছিয়ে আসে তখন কোন মায়াদণ্ডস্পর্শে যেন আশপাশের রূপ বদলে যায়; আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের ইন্দ্রজালে যেন মরুভূবক্ষে গাছপালা গজিয়ে ওঠে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইমারৎ তাদের গম্বুজ মীনার সমেত হঠাৎ যেন ভুঁই ফুড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়!

বীকানের নেমে সেই চিরাচরিত প্রথানুযায়ী প্রথমে ধরমশালা—হাত পুড়িয়ে খাওয়া—তারপর বাসা খুঁজে নেওয়া। এসব এড়িয়ে গিয়ে প্রথমেই বল্‌ব সহরের কথা। ষ্টেশন থেকে রাস্তায় পড়েই যা চোখে পড়ে তাই যদি ওর সত্যিকার রূপের আভাস হ'ত তা' হলে দিল্লী লাহোর এর কাছে লাগত না, কিন্তু এ নেহাতই বাইরের খোলস। ষ্টেশন থেকে পুরানো কেল্লা পর্য্যন্ত চমৎকার রাস্তা, দু'ধারে বাড়ীঘর দোকানপাট সাজান-গোছান, তক্‌তক্ ঝক্‌ঝক্ কচ্চে। ষ্টেশনের ঠিক সুমুখেই প্রকাণ্ড ধরমশালা। একটু এগিয়েই বাঁদিকে ডুঙ্গর কলেজ ভূতপূর্ব্ব মহারাজার নামানুসারে দত্তনাম; বাইরে থেকে দেখতে চমৎকার ইমারৎ; বিখ্যাত স্থপতিবিদ্যাপারদর্শী Sir Swinton Jacobএর তৈরী। কিন্তু কলেজ হিসাবে একেবারে অচল। প্রায় কামরাগুলার ভেতর দিয়েই রাস্তা, কোনো ঘরেই প্রায় নিরিবিলিতে ক্লাস হবার জো নেই। কলেজের পরেই ফের বাঁহাতি "নাগরী-ভাণ্ডার"—অর্থাৎ পুরাতন ও আধুনিক নাগরী ও সংস্কৃত-সাহিত্যসম্বলিত একটি লাইব্রেরী। মন্দিরের ভিতরে সরস্বতীর সুন্দর একটি মূর্ত্তি রয়েচে। ছবিতে বেশ মালুম হবে নাগরী-ভাণ্ডারের গঠনে একটু নূতনত্ব আছে এবং তা সুন্দর তো বটেই। নাগরী-ভাণ্ডারের পরেই ঐ লাইনে Custom House ছবিতে দেখা যাচ্চে। এই Custom duty এখানকার একটি বিভীষিকা। শুল্কের হার অতি উঁচু এবং তারই জন্য জিনিষপত্র এখানে অত্যন্ত দামী হয়ে পড়ে। Custom আদায়ের রকমটাও বেশ! ষ্টেশনে নামতেই ঐ বিভাগের কর্ম্মচারীরা বাক্স-প্যাঁটরা সব তন্ন তন্ন করে খুঁজে নূতন জিনিষ কিছু পেলেই ট্যাক্স আদায় করে তবে ছাড়বে। সেই পয়সা দিতে যা বিরক্তি না হয় তার চতুর্গুণ হয় বাড়ী পৌঁছুবার আগে জিনিষপত্র সব এলোমেলো হয়ে যাওয়াতে।

Custom Houseএর পরেই বাঁদিকে একটা রাস্তা পুরানো সহরের সদর দরোজা পর্য্যন্ত গিয়েচে। তার ছবি দেওয়া হ'ল। পুরাণো সহর চারদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে এই মরুভূবেষ্টিত সুদূর দেশেও যে শত্রু এসে হানা দিত তার সাক্ষী রয়েচে সহর বেড়ে এই উঁচু দেয়াল। এই নগর-প্রাচীরের বাইরে, যেদিকে সহরের বিস্তৃতি হয়েচে সেদিক ছাড়া এই ছবির মত কেবল এখানে সেখানে কাঁটার ঝোপে ছাওয়া বালুর পাথার। সহরের সদর দরোজাটিকে বলে "কোট দরওয়াজা"। এই 'কোট' ইংরেজী courtএর অপভ্রংশ কিনা কেউ বল্‌তে পারলে না। কিন্তু বোধ হয় তাই, কেননা এখান থেকে একটি রাস্তা বেরিয়ে কোর্ট পর্য্যন্ত গেছে।

সহরের মধ্যে অত্যন্ত ঘন বস্তি। ক'লকাতার বড়বাজারের কত লক্ষপতি ক্রোড়পতির আস্তানা তার ইয়ত্তা নেই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী—তাতে চমৎকার পাথরের কাজ, কিন্তু আশেপাশে তার খোলা জমি নেই বলে তার সমস্ত সৌন্দর্য্য চাপা পড়ে গেছে। ঐ রকম এঁদো গলির ওপরে ঐসব বাড়ীগুলা যেন গোবরে পদ্মফুল। সহরের মধ্যে দ্রষ্টব্য

কিছুমাত্র নেই বল্লেই হয়, শুধু একটা জৈন মন্দির ছাড়া। এ মন্দিরটি সহরের প্রান্তভাগে নগরপ্রাকারের সঙ্গে একেবারে সংলগ্ন। মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে তিনদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে কেবল বন্ধুর বালুকাবিস্তৃতি এবং অন্যদিকে সহরের bird's-eye-view পাওয়া যায়। মন্দিরটি অনেক উঁচুতে তৈরী; দেয়ালে রাজপুত চিত্রকলাপদ্ধতিতে অঙ্কিত নানা তীর্থঙ্করদের জীবনকাহিনী;—কিন্তু সে চিত্র অতি অধুনাতন। পূর্ব্বের সে idealism ও ভাবব্যঞ্জনা শিল্পীর রেখাসম্পাতে ফুটে ওঠে নি।

নগর-প্রাচীরের বাইরে প্রধান দ্রষ্টব্য "পুরানো কেল্লা" ও তন্মধ্যে পুরাতন রাজপ্রাসাদ। কেল্লার গঠনে বৈশিষ্ট্য কিছু নেই, কেবল এর বুনিয়াদ অনেক নীচে level থেকে গড়ে তোলা হয়েচে, যেন আশ্‌পাশ থেকে কামান বন্দুকের গুলিতে গড় যথাসম্ভব কম জখম হয়। গড়ের ঠিক পাদদেশেই "সুর সাগর" নামে একটি হাতে খোঁড়া পুকুর। বর্ষার পরে প্রায় চার পাঁচ মাস এতে জল থাকে—কেন-না এর জলসম্পদ শ্রাবণ-ধারার দৌলতেই সম্ভব হয়। পূর্ব্বেই বলেছি গড়ের level অনেক নীচু; তার পাদদেশে এই পুকুরটিও কাযেই চারপাশের জমির চাইতে ঢের নীচু। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলা চারপাশ থেকে কেটে এনে এর মধ্যে ফেলা হয়েচে। বর্ষাকালে বৃষ্টি হলেই চারদিকে যেখানে যা জল জমে, ঐ সব নালা দিয়ে গড়িয়ে এসে এই পুকুরে জমা হয়। বীকানের রাজ্যের অনেক স্থানে এই জাতীয় পুকুর আছে। এবং যেসব স্থানে এইরকম পুকুর আছে সে জায়গার নামের পিছনে একটা "সর" জুড়ে দেওয়া হয়। "সর"—সংস্কৃত 'সরঃ' থেকে অপভ্রংশ। এম্‌নি করে 'পতিসর' 'পানাসর' 'গড়শীসর', ইত্যাদি নানা জায়গার নামকরণ হয়েচে। এই জলে সাধারণতঃ বছরের ৪।৫ মাস এদেশে গরুবাছুর ও উষ্ট্রাদি গৃহপালিত পশুর স্নান-পান চলে এবং জল একটু বেশী থাকতে গরীব লোকেরাও এর জল ব্যবহার করে। জলের অভাব যেন বীকানেরের ওপর বিধাতার অভিশাপ! সামান্য বৃষ্টির জল ও কূপ ছাড়া জল পাবার আর তো কোনো উপায়ই নেই। কিন্তু কূপের কথা শুনে যেন কেউ বাংলাদেশের কূয়ো কল্পনা না করেন। বীকানেরে প্রায় তিনশো ফিট খুঁড়লে তবে জল পাওয়া যায়। এমনি এক একটা কূয়ো খুঁড়তে কত খরচ তা সহজেই অনুমেয়। এম্‌নি সব গভীর কূপ থেকে pully'র ওপর লম্বা দড়ি চালিয়ে উট বা বলদ দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চামড়ার মশকে করে জল তোলা হয়। এক কেবল বীকানের রাজধানীতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রে পাম্প করে তুলে আজকাল রাস্তায় ও বাড়ীতে জল সরবরাহ করবার বন্দোবস্ত হয়েচে। কিন্তু জলের পরিমাণ কম বলে এখনও সবাই বাড়ীতে ট্যাপ নিতে পারে না। কেবল বড়লোকদের বাড়ীতেই কল আছে; এবং বেশীর ভাগ লোকেই এক ঘড়া এক পয়সা দরে কূয়োর ধার থেকে মুটে দিয়ে জল আনিয়ে নেয়।

সুরসাগরের অপর পার থেকে গড়ের ছবি নেওয়া হয়েচে। গড়ের ভেতরে দেখবার বিশেষ কিছু নেই। পুরানো ধরণের নীচু ছাতওয়ালা সব কামরা—তাদের দেয়ালে পাথরের খোদাই, আর নয়ত কারুকার্য্য। সবই প্রায় রাজপুত পদ্ধতিতে আঁকা চিত্র; মোগল পদ্ধতিতে আঁকা দু'একখানা পুরাতন রাজাদের প্রতিকৃতিও দেখ্‌লাম। আমাদের পথপ্রদর্শক বল্লে আক্রমণের সময় কামরার ভেতর শত্রুরা প্রবেশ করে তলোয়ার না ঘোরাতে পারে এই জন্য ছাত এত নীচু করা হয়েচে। গড়ে একটি পুরাতন পাণ্ডুলিপির লাইব্রেরী আছে—তাতে সঙ্গীত-শাস্ত্র, রাজপুত ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের ওপর কয়েকখানা মূল্যবান manuscript আছে। গড়ে আর দেখবার জিনিষ—অস্ত্রাগার; পুরানো অনেক অস্ত্রশস্ত্রও তাতে দেখ্‌লুম। গড়ের মধ্যস্থ রাজপ্রাসাদের ছবি দেওয়া গেল,—কিন্তু তা ছবিতেই বেশী সুন্দর। পুরাতন রাজপ্রাসাদের পূর্ব্বভাগের বর্ত্তমান মহারাজা সার গঙ্গা সিং একটা প্রকাণ্ড হল তৈরী করিয়েচেন—তাতে লাটবেলাট সব এলে ভোজ-টোজ দেওয়া হয়। বীকানের মহারাজের আতিথেয়তা, বিশেষতঃ শ্বেতাঙ্গ অতিথিসৎকার বিলাতবিশ্রুত। Sand grouse শীকারের সময়ে—শীতকালে শ্বেতাঙ্গ অতিথিসৎকারে লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়ে যায় এবং সে সময় বিশ পঁচিশ হাজার পাখী মারা পড়ে। এই Sand grouse shooting এ একটা বিশেষত্ব আছে। বীকানের থেকে আঠারো মাইল দূরে একটা কৃত্রিম হ্রদ আছে—তার নাম গজনের হ্রদ—স্থানের নামানুসারে নাম। সে স্থানটি নীচু level বলে অনেকটা ওয়েসিস্‌এর মতো—পাদপলতাসমাকীর্ণ। কিন্তু সে স্থানেও শীতকালে ঐ হ্রদে ছাড়া আর বহুদূরের মধ্যে

সহজলভ্য জল থাকে না। কাজেই পাখীর দল হাজারে হাজারে এই হ্রদে বাসা বাঁধে। শীকারের দুই তিন দিন আগে থেকে টিন ও ঢ্যাঁড়্রা পিটিয়ে তাদের হ্রদ থেকে উড়িয়ে দেওয়া হয়, এবং শীকারের দিন সকালবেলা থেকে ঐ ঐক্যতান স্থগিত থাকে। তখন তৃষ্ণার্ত্ত পাখীর দল যেই ঝাঁকে ঝাঁকে এসে হ্রদে বসতে চায়—শীকারীর দল গা ঢাকা দিয়ে তখন তাদের বংশলোপে প্রবৃত্ত হন। এক এক গুলিতে দশ পনের বিশটা মরে।

গড়ের ভিতরকার প্রাসাদ ছাড়া নগরের উপকণ্ঠে পূব-উত্তর দিকে মহারাজার আর একটি প্রাসাদ আছে—নাম লালগড় প্রাসাদ—লালপাথরে তৈরী। বিলেতী তার সাজগোজ—দৈহিক আরামের আধুনিকতম আবিষ্কারের নমুনা সেখানে পাওয়া যাবে;—Sir Swinton Jacobএর তৈরী Indo-Saracenic পদ্ধতিতে। মহারাজা সার গঙ্গাসিং—খুব বড় শীকারী, পৃথিবীর সব চাইতে বড় বাঘ নাকি তিনি মেরেচেন,—বিলাতেও তা স্বীকার করা হয়েচে। প্যালেসের সব ঘরের দেওয়ালই প্রায় শীকার-করা জানোয়ারের চামড়ায় ঢাকা।

এখানে মহারাজা সার গঙ্গাসিংএর সম্বন্ধে দু'চার কথা বল্‌তে হয়। শোনা যায় দেশীয় রাজাদের মধ্যে ইনিই সব চাইতে উপযুক্ত লোক। কথাটা একহিসাবে মিথ্যা নয়, লোকটি অসামান্য চতুর রাজনৈতিক, জ্ঞানের গভীরতা খুব না থাকলেও চমৎকার ইংরাজীতে কথা বল্‌তে, প্রবন্ধ লিখতে ও বক্তৃতাদি দিতে পারেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এলাহাবাদের কাগজ Pioneer এঁর সম্বন্ধে লিখেছিল, "He is the only Indian Prince who can tell a story with Cockney accent।" সত্যি, এঁর ইংরেজী শুন্‌লে ভারতবাসী বলে মনে হয় না, তবে লেখার ষ্টাইল একটু heavy। দীর্ঘ ছ' ফুট লম্বা পুরুষ, প্রতিভাব্যঞ্জক ললাট ও দৃষ্টি, এঁর কর্ম্মচারীরা সর্ব্বদা ভয়ে সন্ত্রস্ত। শুধু মিষ্ট কথায় তুষ্ট করতে ইনি ওস্তাদ, হাতটি উপুড় করান মুস্কিল। তবে খুসী হলেন তো বাঁদরকেও হয়ত বা মুক্তাহার দান করে ফেল্লেন। আমীরী মেজাজ বটে। ইনি Imperial War Conference ও War Cabinetএর সভ্য ছিলেন। ভার্সাই সন্ধিপত্রে এঁর স্বাক্ষর আছে—ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে। ইনি মস্ত লোক, শুধু বিদেশেই নয়,—স্বদেশেও প্রজাপুঞ্জ "অন্‌দাতা" (অন্নদাতা) বল্‌তে অজ্ঞান, কারণ তারা লেখাপড়া জানে না, দরিদ্রতার কারণ ঠিক করতে তারা অক্ষম। এখনও দেশে শিক্ষা নাই বল্লেই হয়। একটা education department আছে বটে, তার ডাইরেক্টর হচ্চেন এক ত্রিশ বৎসরের ছোক্‌রা থার্ড ক্লাস Economics এর M. A.। রাজার আমীরী মেজাজের একটি নিদর্শন। লোকদেখানো একটা কলেজও বীকানেরে আছে আগেই বলেচি, এবং আড়ম্বর করে তাতে ছাত্রদের কাছ থেকে মাইনে নেওয়াও হয় না বটে। কিন্তু এত সহৃদয়তা সত্বেও লোকেরা ছেলেদের পড়তে পাঠায় না, কারণ সবাই বোঝে এবং জানে যে শিক্ষা-বিভাগ হচ্চে দুয়োরাণীর এলাকায়, বাজেটে ব্যয় কমাতে হলে সব চাইতে প্রথম লাল-কালীর আঁচড় পড়ে এই বিভাগের ওপর। তার পর রাজার নিজস্ব খরচ তো অজস্র। নামে মাত্র একটা privy purse আছে কিন্তু তা ছাড়াও পাকে-চক্রে আরো ঢের টাকা রাজার নিজের জন্য খরচ হয় বলে শুন্‌তে পাওয়া যায়। Public Works Departmentএর সর্ব্বপ্রধান খরচ ও কায হচ্ছে রাজপ্রাসাদগুলির নির্ম্মাণ ও সংস্কার—এতে যে কত টাকা খরচ হচ্চে তার ইয়ত্তা নেই, অথচ বিগত কয়েক বছরের মধ্যেই সাধারণের জন্য একটা ভালো রাস্তা পর্য্যন্ত তৈরী হয়েচে কিনা সন্দেহ। যাই হোক্ তবু আর আর দেশীয় রাজাদের চাইতে ইনি ঢের ভালো। ষ্টেটের সব কায নিজে দেখেন এবং মানুষ হিসাবে—তার চাইতে আরো বড় কথা - অন্য অনেক রাজাদের মত ইনি মদ্যপ ও অসচ্চরিত্র নন। ষ্টেটের আয়-ব্যয় দুই-ই ইনি ঢের বাড়িয়েচেন। তবে সরকারের খয়ের-খাঁগিরিতে কারু কাছে পরাস্ত মানতে তিনি রাজী নন। দেখে রাজপুত জাতির পুরাতন ইতিহাসের কথা মনে পড়ে।

আরংজীবের সময় বীকানের রাজ্য স্থাপিত হয়। তার একটু interesting ইতিহাস আছে। একবার নাকি আরংজীবের অধীন কয়েকজন হিন্দু জননায়ক কোনো কারণে তাঁর চক্ষুশূল হ'ন, এবং ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে তাঁদের ডেকে পাঠান। পথে এই ষড়যন্ত্র তাঁদের কর্ণগোচর হয়। তখন বীকা বংশীয় বীকানের মহারাজগণের পূর্ব্বপুরুষ এই সব প্রধান-দের অধিনায়কত্ব গ্রহণ ক'রে এই মরুভূদেশে এক রাজ্য স্থাপন করেন। সেই সময়ে তাঁর নাম হয় 'জঙ্গলধর-বাদশা'

কোলায়েতের পথে সাইক্ল মেরামত
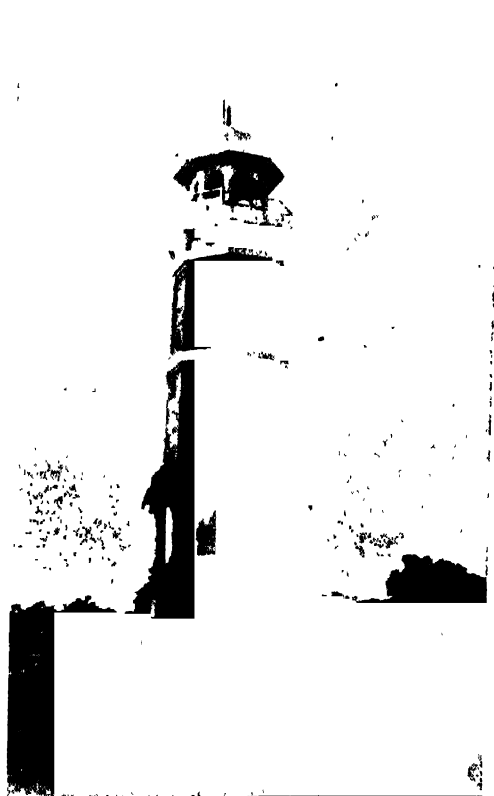
"বিজয়স্তম্ভ"—পাবলিক পার্ক

পাবলিক পার্কে উটপাখীর দল

প্রধান রাজপথ—দূরে "কোর্ট দরওয়াজা"

কপিল-হ্রদের ওপার থেকে "কৌলায়েং"

র হ্রদ

নগরপ্রাচীরের বাইরে

—কারণ এঁর রাজত্ব স্থাপিত হয় জংলা দেশে। এখনও বীকানের পতাকায় 'জয় জঙ্গলধর-বাদ্‌শা' লেখা থাকে। এই পতাকা দ্বিবর্ণ—অর্দ্ধেক লাল, অর্দ্ধেক জরদ রং। ব্রিটিশ রাজসরকারের প্রতিনিধি কেউ প্রাসাদে এলে প্রাসাদচূড়ে ইউনিয়ান জ্যাক ওড়ে—জাতীয় পতাকা নীচু করে দেওয়া হয়।

বীকানেরে একটি সুন্দর উদ্যান আছে। এটি যখন তৈরী হয়, তখন সমস্ত রাজকর্ম্মচারীদের মাইনে থেকে একমাসে শতকরা ১২॥০ টাকা কেটে নিয়ে তা দিয়ে এ বাগান তৈরী হ'য়েছিল। এদেশে ইনকাম্ ট্যাক্স নেই, কিন্তু সময়ে অসময়ে তার পরিবর্ত্তে রাজার 'মাঙন্'—অর্থাৎ যাচ্‌ঞা আছে,—তা ছাড়া দরবারের সময় বড় বড় কর্ম্মচারীদের অর্থাৎ gazetted officerদের নজর তো দিতেই হয়। শুনে এসেছি রাজকন্যার বিয়ের সময় ফের শতকরা কতটাকা মাইনে কাটা যাবে তা নিয়ে ঢের জল্পনা চল্‌চে। যাই হোক যা বল্‌ছিলুম—এই পাবলিক পার্কের কথা। পার্কে বাঘ-সিংহ-উটপাখী-হরিণ প্রভৃতি আর কিছু কিছু চিড়িয়া রাখা আছে। পার্কের ঠিক মধ্যস্থলে একটি স্তম্ভ তৈরী হয়েছে। তার নাম Victory Memorial Tower। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে যে সব বিকানেরী সৈন্য গিয়ে প্রাণ দিয়েচে তাদের স্মৃতিরক্ষার্থ এই স্তম্ভটি নির্ম্মিত হয়েচে। Pioneerএর ভাষায় বীকানের-মহারাজ 'loyal almost to a fanatic.'।

বঙ্কিম রমেশদত্তের বই পড়ে রাজবাড়ার যে সোণার স্বপন বাঙালী সৃষ্টি করে, কল্পনার-মোহন জাল বোনে,—বর্ত্তমান রাজবাড়ায় তার কিছুই নেই। সাধারণ লোকের নৈতিক চরিত্র হীন, দেহ অসুঠাম—প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ, তোষামোদ প্রবৃত্তি এদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েচে, দলাদলি ষড়যন্ত্রে দেশের লোক ওস্তাদ,—যেন মধ্যযুগের ভারত মূর্ত্তিমান্ হয়েছে, সম্পূর্ণ জাতীয়তা-বোধহীন, বিলেতী আমদানীতে সহর-গ্রাম ছাওয়া। দোলের সময় যে সব অশ্লীল বর্বরতা চোখে পড়ল তাতে শুধু লজ্জা আর ঘৃণা নয়,—চোখে জল এলো।

মাড়োয়ারী ভাষা সংস্কৃত শব্দ বহুল,—একটু কাণ পেতে শুনলেই তা বোঝা যায়। এমন কি সংস্কৃত inflexion পর্য্যন্ত বহুল প্রচলিত। যেমন 'কোথায় যাচ্চ?'—মাড়োয়ারী ভাষায় 'কোঠে যাসি'। ক্রিয়া পদটিতে 'যা' ধাতুর মধ্যমপুরুষ একবচনের form টি হুবহু রয়েচে। খুঁটিয়ে দেখলে এম্‌নি মিল ঢের পাওয়া যায়। ভাষায় শব্দ-প্রাচুর্য্য খুব কম, কাজেই উঁচুদরের সাহিত্য হওয়া অসম্ভব। একটা শব্দের বহুবিধ অর্থ হয়, যেমন—'ঘনই' মানে, গাঢ়, বহু, গুরু, বেশী, পুনঃপুনঃ ইত্যাদি। আমরা যখন বীকানেরে ছিলুম সব কথায় 'ঘনই' যোগ করে দিয়ে ওদের সঙ্গে তামাসা করতুম।

বীকানের থেকে তেত্রিশ মাইল দূরে একটি তীর্থ-স্থান আছে। সেখানে নাকি পুরাকালে কপিলমুনির আশ্রম ছিল। স্থানটির বর্ত্তমান নাম "কৌলায়ৎ",—'কপিলায়তন' কথার নাকি অপভ্রংশ! সেখানে তিনটি ছাত্র নিয়ে একবার আমি বাইসিক্লে করে গিয়েছিলুম, এবং সেই দিনই সন্ধ্যায় ফিরে আসি। রাস্তায় বাইসিক্লে একাধিকবার ছিদ্র হয়ে যাওয়াতে ভারী মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল। কৌলায়েৎ স্থানটি বেশ মনোরম। অনেকটা নীচু জমি বলে সেখানে শস্যাদি প্রচুর হয়। দিগন্তব্যাপী ধূসর-মরুভূমির পথ পেরিয়ে এসে কৌলায়েতের হরিৎ-শোভা দেখে চোখ জুড়োয়, সুদূর বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে। বন্যবরাহ এখানে প্রচুর। কৌলায়েৎ হ্রদের অপর পার থেকে যখন ছবি নিচ্চি তখন হুস্ হুস্ করে চার পাঁচটা বন্য-বরাহ আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে পালাল। ওরা তেড়ে এলে কি হতে পারত ভেবে আমরা তো বার বার শিউরে উঠলুম। বীকানেরে এক কালে নাকি খুব pig-sticking হোতো। বর্ত্তমান মহারাজার সে সখ নেই বলে তা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

কপিলায়তন থেকে ফেরার পর আর বেশীদিন আমার বীকানের থাকার সুযোগ হয় নি। মীরাট কলেজে চাকুরী নিয়ে চলে আসি। কিন্তু বীকানের আমার মনে থাকবে—চিরদিন। ওর শরতের সৈকত-প্রতিফলিত অনিন্দ্যশুভ্র জ্যোৎস্নাধারা, শিশিরকণাহীন হেমন্তরাত্রি, ওর জল-জমিয়ে-দেওয়া দারুণ শীত, সমাগম-সূচনাবিহীন বসন্ত, ওর নিদাঘের রুদ্র রূপ, ওর স্বল্পবর্ষাবারিস্নিগ্ধ দিগন্তচুম্বী মহোন্নত প্রশস্তবক্ষে দূর্ব্বাগুচ্ছের শ্যামলিমা আমার মনে চিরদিন প্রীতিময় স্মৃতি বয়ে আনবে। বাংলার যেমন নিজস্ব দুটি গানের সুর আছে বাউল ও কীর্ত্তন, তেমনি মাড়োয়ারদের নিজস্ব একটি বড় মিষ্টি সুর আছে তার নাম "মাড়"। সেই মাড় রাগিণীতে বিকানেরী বালক-বালিকারা যে গেয়ে বেড়াত "রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম মেওয়া বর্ষে শাওন বীকানের",—তার রেশ আমার কাণে এখনো লেগে আছে। সত্যি শ্রাবণধারাসিক্ত বীকানের সুন্দর, তখনও যেন সবুজ মখ্‌মলে আপনার সৈকত-শুভ্র দেহ ঢেকে প্রসাধনসজ্জা করে। কিন্তু কোন্ প্রিয়ের গোপন অভিসারে? *

---

* প্রবন্ধটি কিছুদিন আগের লেখা। উঃ সঃ।

জীবন-বীমা

—শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

১

কর্ম্মপ্রবণ মানুষ অর্থোপার্জ্জনের জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টায় আপনাকে নিযুক্ত রাখে। কিন্তু সকল লোকের সকল প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠে না। কতক নিজের দোষে, কতক পরের দোষে, কতক হিসাবের ভুলে কিংবা দূরদর্শিতার অভাবে, কতক বা দৈবের পীড়নে, তাহার অনেক চেষ্টা বিফল হয়। নিজের ভুলে বা পরের দোষে যে সকল 'বিঘ্ন' (risk) উপস্থিত হয়, যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করিলে, সে বিঘ্ন হইতে হয়তো বা অব্যাহতি লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু যে সকল আকস্মিক ঘটনা দৈবায়ত্ত—যেমন, ঝড় তুফান, বন্যা, মহামারী—সেরূপ বিঘ্ন এড়াইবার কোনও সুচারু উপায় মানুষ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। যত সাবধানতাই মানুষ অবলম্বন করুক, প্রকৃতির ধ্বংস-লীলার হস্ত হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পাইবার সামর্থ্য তাহার নাই। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে মানুষের যে অর্থহানি বা বিত্তনাশ সঙ্ঘটিত হয়, তজ্জনিত ক্ষতিপূরণ করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে সে সক্ষম। বীমার প্রণালী আবিষ্কারের দ্বারা মানুষ সে উপায় হস্তগত করিয়াছে।

পুরাকালে যখন ডিঙ্গা ভরিয়া সমুদ্রপথে মানুষ বাণিজ্য করিতে যাইত, তখন পূর্ণকাম হইয়া ঘরে ফিরিবার আশা তাহার অনিশ্চিত ছিল। সদাগরের ডিঙ্গা ঝড়ে ডুবিয়া গেলে পাছে তাহাকে কৌপীন-সম্বল হইতে হয়, তাহারই প্রতিকারের অন্বেষণে বীমার প্রণালী উদ্ভূত হয়। ব্যবসায়গত বীমার ক্রম-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের বীমাও পরিণতি লাভ করিয়াছে।

উপার্জ্জনশীল মানুষ তাহার পোষ্যবর্গের সম্পত্তি বিশেষ। সেদিক দিয়া বিচার করিলে প্রত্যেক উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির জীবনের একটা আর্থিক মূল্য আছে। সে মারা গেলে তাহার পরিবারবর্গের একটা সুনিশ্চিত আর্থিক ক্ষতি হইয়া থাকে। শুধু যে তাহার নিজ পরিজনকেই নিঃসম্বল হইয়া পড়িতে হয়, তাহা নহে, সমাজের অর্থ-নৈতিক ইমারতে যে খুঁটিস্বরূপে সে বিরাজ করিতেছিল, সেই খুঁটিটি অপসারিত হওয়ায়, সমাজেরও কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয়। বীমা এই আর্থিক ক্ষতি হইতে, মৃত-ব্যক্তির পরিজনকে ও তাহার সমাজকে রক্ষা করে। রাষ্ট্রীয় অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে বীমার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। এবং প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্র নিজ দেশের বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলির শুভাশুভ সম্বন্ধে সেইজন্যই সর্ব্বদা সচেতন থাকে।

জীবন-বীমার ক্ষেত্রে মৃত্যুই একমাত্র "বিঘ্ন" (risk) যদ্দ্বারা আর্থিক ক্ষতি সঞ্জাত হইতেছে।

মানুষ কি অনুপাতে মারা যায় সেই হিসাব আবিষ্কার করিতে পারিলে, মৃত্যুঘটিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা যায়। অল্পলোকের মৃত্যুঘটিত ক্ষতিটা যদি বহুলোকের স্কন্ধে আরোপিত করা যায়, সেটা কাহারই পক্ষে আপত্তি কিংবা বিপত্তিজনক হয় না—এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাটাও সহজে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। ইহাই জীবন-বীমার মূল সূত্র।

মৃত্যুহার গণনায় সমানুপাতিক হিসাবের (law of average) নিয়মটি বিশেষ সাহায্য করে। ইহার মূল কথা এই যে বহুব্যক্তি যদি একই বিঘ্নের বশবর্ত্তী থাকে (exposed to the same risk), তন্মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই সেই বিঘ্নদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ক্ষেত্রে মৃত্যুই হইল বিঘ্ন (risk) এবং বহুলোকের মধ্যে গড়ে অল্প লোক এই বিঘ্নে নিপতিত হয় (succumb to the risk)।

ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। কিন্তু একই বয়সের বহু সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে গড়পড়তা বাৎসরিক মৃত্যুর সংখ্যা একরূপ নির্ভুল ভাবেই বলা যায়।

এ উদ্দেশ্যে বহু গবেষণা হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, নানা বীমা কোম্পানী ও অ্যাকচুয়ারী অথবা গভর্ণমেণ্টের সুমার কর্ম্মচারীবৃন্দ বহু ব্যক্তির জন্মমৃত্যুর তালিকা প্রস্তুত করিয়া একই ফল লাভ করিয়াছেন। প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে বহু কালাবধি পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে একই সংখ্যক মানুষের বিভিন্ন দলের মধ্যে মৃত্যুহারের সংখ্যা সব দলেই (group) সমান থাকিবে, ফলে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণের মূল্যনির্দ্ধারণ সম্ভব হইয়া পড়িল। অর্থাৎ জীবন-বীমাকে গণিত-বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-সম্মত একটি শাস্ত্র হিসাবে গণ্য করা উচিত।

উক্ত গবেষণার ফলে মানুষের মৃত্যুহার-তালিকা (morta-

-lity table) গঠিত হইয়াছে। এ কাজ একদিনে সম্পন্ন হয় নাই। প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া নানা পণ্ডিতের অক্লান্ত চেষ্টায় এক্ষণে বিজ্ঞানসম্মত মৃত্যুহার-তালিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

এই মৃত্যুহার-তালিকায় বয়সানুক্রমে প্রতি বৎসরের মৃত্যুর সংখ্যা দেওয়া থাকে। সাধারণতঃ এক লক্ষ লোকের আয়ুষ্কালের গণনা আরম্ভ হয়; প্রতি বৎসর কয় জন মারা গেল এবং বৎসরান্তে কতজন অবশিষ্ট রহিল তাহা তালিকায় দেখান হয়। অতএব এক বৎসরের বীমার জন্য চাঁদা স্থির করিতে হইলে সেই বৎসরের মৃতের সংখ্যা দেখিয়া সহজেই বলিয়া দেওয়া যায়। সেই বৎসরের মৃতের সংখ্যা যাহা, বীমার চাঁদার পরিমাণও হইবে তাহাই। দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্য পরিষ্কার হইতে পারে।

ধরা যাউক, ৪০ বৎসর বয়স্ক ১০,০০০ ব্যক্তিকে লইয়া মৃত্যুহার তালিকা আরম্ভ করা হইয়াছে। তালিকায় দেখিতেছি যে প্রথম বৎসর ৯৮ জনের মৃত্যু হইতেছে; অর্থাৎ ঐ দশ হাজার ব্যক্তির সকলে ৪১ বৎসর বয়সে পৌছাইবার পূর্ব্বেই ৯৮ জনের মৃত্যু হইতেছে। মৃত্যুহার বুঝাইতে হইলে নিম্নলিখিত অঙ্ক ব্যবহৃত হইবে :—

$$\frac{৯৮}{১০,০০০} = ·০০৯৮.$$

এখন যদি উক্ত দশ হাজার ব্যক্তি বলে যে ৪১ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু হইলে ওয়ারিশকে ১৲ করিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে উক্ত দশ হাজার ব্যক্তির প্রত্যেকের নিকট ·০০৯৮ লইলেই দাবী মিটান সম্ভব হইবে। কেন না,

এক বৎসরে ৯৮ জন মারা যাওয়ায় দাবীর পরিমাণ—৯৮৲
১০,০০০ ব্যক্তির প্রত্যেকের নিকট ·০০৯৮ টাকা
লইলে পাইব ১০০০০ × ·০০৯৮ = ৯৮৲

প্রিমিয়ম বা চাঁদার হার স্থির করিবার মূলতত্ত্বটুকু এইরূপ। এক্ষণে, কিরূপে প্রিমিয়ম স্থির করা হয়, সে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

২

চাঁদার হার * বা প্রিমিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে হইলে দুইটি মুখ্য বিষয়ের প্রতি নজর রাখা কর্ত্তব্য—(১) মানুষের মৃত্যুহার (২) টাকার উপার্জ্জিতব্য সুদের হার।

মৃত্যুহার তালিকার প্রতি কেন দৃষ্টি রাখিতে হইবে তাহা বিশেষ করিয়া পুনরায় বলার প্রয়োজন নাই। বয়সানুক্রমে প্রতি বৎসর কয়জন মারা যায় সে সংখ্যা আমাদের জানা প্রয়োজন। অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারাই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আন্দাজ চলিতে পারে। বহুকালসঞ্চিত, বহু তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া বীমা কোম্পানিরা এখন নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন যে অতীতে তাঁহারা যে মৃত্যুহার পাইয়াছেন, ভবিষ্যতেও তদ্রূপই পাইতে থাকিবেন। শুধু একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। একই দেশের একই প্রকার আচার ব্যবহার ও রীতিনীতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরই মৃত্যুহার এক অনুপাতে হইতে থাকিবে।

পলিসিসমূহে কোম্পানী যে টাকা পাইবে বা যে টাকা অপরকে সে দিবে, তাহার একটা সুনিশ্চিত সময় নির্দ্ধারিত আছে। টাকা গুলি লগ্নী করিলে চক্রবৃদ্ধি সুদে বর্দ্ধিত হইবে। প্রিমিয়ম কষিবার সময় একথাটাও স্মরণ রাখিয়া হিসাব করিতে হয়।

দীর্ঘকালের বীমার জন্য বাৎসরিক প্রিমিয়ম কষিবার প্রণালী অপেক্ষাকৃত জটিল। সেই জন্য অল্প কালের বীমার জন্য "মবলগ চাঁদা" (single premium) কষিবার উপায়টা আমরা সর্ব্বপ্রথম বিচার করিব। তাহা হইলেই প্রিমিয়ম স্থির করিবার প্রণালী ক্রমশঃ সহজবোধ্য হইয়া উঠিবে।

এককালীন বা মবলগ চাঁদা নিরূপণ (Single Premium)

ধরা যাউক যে ৮০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণ তিন বৎসরের জন্য প্রত্যেকে ১০০৲ টাকার অস্থায়ী (temporary) বীমা করিতে চাহে। এখানে "অস্থায়ী" বীমার অর্থ এই যে মৃত্যু ঘটিলেই বীমার টাকা ওয়ারিশ পাইবে। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে মৃত্যু না হইলে প্রদত্ত চাঁদা ফেরত পাওয়া যাইবে না।

* "প্রিমিয়ম" শব্দটা বীমাক্ষেত্রে সুপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। উহাকে বাংলায় স্বীকার করিয়া লইলে কোনও ক্ষতি আছে বলিয়া মনে হয় না।

ঐ সকল লোকের কয়জন প্রতি বৎসর মারা যাইবে তাহা জানা দরকার। তজ্জন্য কোনও নির্ভর-যোগ্য মৃত্যুহার তালিকা (mortality table) দেখিতে হইবে। ধরুন ঐরূপ এক মৃত্যুহার-তালিকা দৃষ্টে জানা গেল যে, ৮০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ১৫ জন ৮১ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে মারা যাইবে; বাকী যাহারা ৮১ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইবে তাহাদের শতকরা ১৬ জন ৮২ বৎসর পূর্ণ না করিয়াই মারা যাইবে। ইহার পর যাহারা বাঁচিয়া রহিল তাহাদের মধ্যে আবার শতকরা ১৭ জন ৮৩ বৎসর পূর্ণ না করিয়াই ধরাধাম পরিত্যাগ করিবে। ইহাই হইল মৃত্যুহার সম্বন্ধে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা আমাদের শিখাইতেছে যে পূর্ব্বে যেরূপ ঘটিয়াছে, পরেও সেইরূপ ঘটিবে। সুতরাং ৮০ বৎসর বয়স্ক লোকের মধ্যে ঐ কয়জন করিয়াই যে মারা যাইবে তাহা নিঃসংশয়রূপে মানিয়া লওয়া চলে। অতএব উক্ত মৃত্যুহার তথ্য লইয়া হিসাব কষিলে ফলাফল এরূপ হইবে :—

১০,০০০ ব্যক্তি সকলেরই বয়স ৮০ বৎসর। তন্মধ্যে ১৫০০ জন ৮১ বৎসর বয়সে উপনীত হইল না (১৫%) বাকী ৮৫০০ জন ৮১ বৎসর বয়স পূর্ণ করিল বটে, কিন্তু ১৩৬০ জন ৮১ হইতে ৮২ বৎসর বয়সের মধ্যে মারা গেল (১৬%) বক্রী ৭১৪০ জন ৮২ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইল; তন্মধ্যে ১২১৪ জন ৮৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত টিকিল না। (১৭%)।

যদি ৮০ বৎসর বয়স্ক ১০,০০০ ব্যক্তি বীমা-কোম্পানির নিকট হইতে প্রত্যেকে ১০০৲ টাকার জন্য তিন বৎসরের অস্থায়ী বীমাপলিসি গ্রহণ করেন, তবে প্রথম বৎসরে মৃত্যু-জনিত দাবী হইবে ১৫০০; দ্বিতীয় বৎসরে ১৩৬০ ও তৃতীয় বৎসরে ১২১৪—তিন বৎসরে মোট ৪০৭৪টি দাবী উপস্থিত হইবে। প্রত্যেক দাবীর পরিমাণ ১০০৲। সুতরাং মোট দাবী হইবে ৪০৭৪ × ১০০ = ৪,০৭,৪০০৲ টাকার।

উক্ত দশ হাজার ব্যক্তির নিকট যদি ঐ টাকাটা এক-কালীন লওয়া হয়, তাহা হইলে প্রতিবৎসর যে দাবী উপস্থিত হইবে তাহা সহজেই মিটান যাইবে। প্রত্যেকের নিকট হইতে এককালীন প্রিমিয়ম কত লইতে হইবে তাহা নিম্নলিখিত অঙ্কে পাওয়া যাইতেছে।—

$$\frac{৪০৭৪০০৲}{১০,০০০} = ৪০\cdot৭৪ \text{ টাকা}$$

অর্থাৎ প্রত্যেকের নিকট এককালীন যদি ৪০ টাকা ।০ আনা ৭½ পাই লওয়া হয়, তবে তিন বৎসরে যাহারা মারা যাইবে তাহাদের ওয়ারিশগণকে অনায়াসে কোম্পানী ১০০৲ টাকা করিয়া দিতে পারিবে। এখানে প্রতি বৎসর চাঁদা লওয়া হই-তেছে না। একবারেই তিন বৎসরের বীমার চাঁদা মবলগ আদায় করা হইতেছে। ইহাই single premium, এ ক্ষেত্রে আমরা ধরিয়া লইতেছি যে কোম্পানি লাভ করিতে উৎসুক নহে, পক্ষান্তরে ক্ষতি স্বীকার করিতেও রাজী নহে।

সুদের প্রভাব

উপরের দৃষ্টান্তে আমরা সুদের কথা আদৌ উল্লেখ করি নাই। দশ হাজার ব্যক্তিকে বীমা-পত্র প্রদান করিবার সময়ে সকলের নিকট হইতে যে টাকা আদায় হইল তাহার পরিমাণ ৪,০৭,৪০০৲। এতগুলি টাকা লৌহ-সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া কেহ রাখে না। ইহা এমন কোনও নিরাপদ লগ্নীতে দাদন করা হয় যদ্দারা কিঞ্চিত বার্ষিক সুদ আমদানী হইতে পারে। তিন বৎসর পর সমস্ত দাবী চুকিয়া গেলে ঐ আমদানী সুদ কোম্পানীর হাতে উদ্বৃত্ত থাকিবে। কিন্তু আমাদের এই কল্পিত কোম্পানিকে আমরা কোনও লাভ করিতে দিতে চাই না। সুতরাং প্রাপ্ত চাঁদা সিন্দুকের মধ্যে না রাখিয়া যদি কোম্পানীকে আমরা টাকাটা সুদে খাটাইবার ক্ষমতা প্রদান করি, তবে প্রত্যেক বীমাকারীর নিকট হইতে ৪০·৭৪৲ টাকা লওয়া চলে না। তদপেক্ষা কম লইতে হইবে, কেননা বাকীটা সুদে পোষাইয়া যাইবে। এখন প্রশ্ন আসিয়া পড়ে, চাঁদার সঠিক পরিমাণ তবে কত? ৪০ টাকা ।০ চারি আনা ৭½ পাই অপেক্ষা কত কম লইলে কোম্পানি সেই টাকাটা সুদে খাটাইয়া প্রত্যেককে ঠিক ১০০৲ টাকা দিতে পারিবে?

এ প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে দেখিতে হইবে, কোম্পানি তাহার লগ্নীকৃত টাকার উপর কত সুদ অর্জ্জন করিতে সক্ষম। সুদ হইতে আয় যত বেশী হইবে, প্রিমিয়ম তত কমিয়া যাইবে। কেননা, সুদের আয় হইতে যত বেশী দাবী মিটান চলিবে, মোট দাবীর অঙ্ক হইতে সেই টাকাটা

বাদ দিয়া বাকী টাকাটাই দশ হাজার ব্যক্তির নিকট আদায় করিতে হইবে। প্রথম শ্রেণীর লগ্নী হইতে অতীতে যে সুদ পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়াই ভবিষ্যতে কি সুদ পাওয়া যাইতে পারে বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহা আন্দাজের উপর নির্ভর করে। এই আন্দাজ করিবার সময় অতীতে সুদের হ্রাস-বৃদ্ধি কিরূপ ভাবে হইয়াছে তাহা বিশেষরূপে বিবেচনা করা দরকার। যদি অত্যধিক সুদ অর্জ্জন করা যাইতে পারে এই আশায় প্রিমিয়ম কম ধার্য্য করা হয়, এবং কার্য্যকালে যদি আশানুরূপ সুদ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে লোকসান দিতে হইবে। কাজেই ভবিষ্যৎ সুদের আয় আন্দাজ করিবার কালে অর্জ্জিতব্য সুদের নিম্নতম হার অনুসারেই হিসাব করা উচিত। বিচক্ষণ কোম্পানিরা সেইরূপই করিয়া থাকেন, কেননা তাহাই নিরাপদ। সাধারণতঃ বৎসরে ৩৲ কিম্বা ৩॥০ সুদ শতকরা পাওয়া যাইবে ধরিয়া লওয়া হয়। আমরাও ঐ আন্দাজ অনুসারেই পূর্ব্বোক্ত প্রিমিয়মটি পুনরায় কষিয়া দেখিব। এখানে পুনরুল্লেখ করিয়া রাখি যে আমাদের কল্পিত কোম্পানি লাভ করিতে চায় না।

চিত্র-পরিচয়

আলোচ্য চিত্রখানির নামকরণে নীল-তারার স্থলে সবুজ তারা মুদ্রিত হওয়ায় ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছে।

নেপালের আদি বুদ্ধ কল্পনায় বুদ্ধকে পাঁচ রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক বুদ্ধের সহযোগিনীরূপে পঞ্চ তারাও অবিচ্ছেদ্য ভাবে সাধকগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছেন। নীল তারা—এই মূর্ত্তিটি পঞ্চতারা মূর্ত্তির অন্যতমা। এই চিত্রটির প্রত্যেক অঙ্গে একটা দুর্লভ সৌকুমার্য্য এবং বর্ণের হিল্লোল লক্ষ্য করা যায়। ইহাতে অজান্তার রূপধারার নিঃসঙ্গ ঐশ্বর্য্য নাই, কিন্তু পূর্ব্বভারতীয় কলার মাদকতা, নৈপুণ্য এবং অলঙ্করণের বহুরূপী শ্রী রহিয়াছে। এই রূপাদর্শই ক্রমশঃ পূর্ব্ব এশিয়ায় বিস্তৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বাঙ্গলার শিল্পধারার সহিত এক অপরূপ সঙ্গমের সৌরভ ইহার ব্যঞ্জনার প্রতি আবর্ত্তে অন্তরকে মুগ্ধ করিয়া দেয়
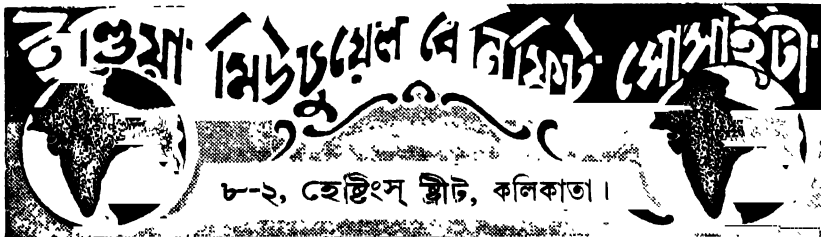
ভারতে মোটরযান

—শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

সকল দেশের বাণিজ্য ও সকল জাতির আর্থিক উন্নতি যে বহুল-পরিমাণে তাহার যানবাহনাদির ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বহু পুরাকাল হইতেই সেজন্য আমাদের রাজপুরুষেরা নৌযানের প্রসার ও প্রশস্ত রাজপথ-প্রস্তুতের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কালের প্রভাবে একে একে নূতন নূতন যানপ্রণালী দেখা দিয়াছে এবং যানানুরূপ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অতি পুরাকালে আমাদের রাস্তাঘাট যখন নিতান্ত দুর্গম ছিল তখন আমাদের শিল্প ও বানিজ্য প্রধানতঃ গ্রামের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, আমাদের সামাজিক-জীবনও ছিল সঙ্কীর্ণ। ক্রমে নৌযানের এবং সমুদ্রপথে বিচরণের উপযোগী বাণিজ্যপোতের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প বহুজনোপযোগী ও বাণিজ্য প্রশস্ত হইল। কিন্তু দূরদেশে যাতায়াতের সময় এত অধিক লাগিত যে সহজে নষ্ট না হয় এরূপ মূল্যবান পণ্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত সরবরাহ করা তখন অসম্ভব ছিল না। ইহার পরে যুগ আসিল স্থলপথে ভারবাহী পশুর এবং তাহাদের দ্বারা চালিত শকটশ্রেণীর। নদীতীর হইতে দূরে উর্ব্বরক্ষেত্রের সন্নিকটে জনসমাবেশ হইতে লাগিল ও জলপথের গণ্ডীর বাহিরেও শিল্প-সংস্থাপনা ও বাণিজ্যের বিস্তার হইল। কিন্তু ভারবাহী পশুর গতিশীলতার এবং পথের সুগমতার সীমানুযায়ী এই বিস্তৃতি সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য হইল। তাই চেষ্টা চলিতে লাগিল রাজপথ-প্রস্তুতের। কিন্তু ভারবাহী পশুর শক্তিতে আর কতদূর কুলাইবে? তাই বাণিজ্যের রূপ অধিকাংশক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণই রহিয়া গেল।

ইংরাজ বণিক এদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিবার পথে দুইটী প্রধান অন্তরায় লক্ষ্য করিল—একটী পথের দুর্গমতা, অপরটি শান্তির অভাব। পূর্ব্বতন হিন্দু ও মুসলমান রাজাগণের আমলে রাস্তা তৈয়ারীর যথেষ্ট চেষ্টা হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতের রাস্তাঘাটের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সেজন্য যাতায়াতের পথের উন্নতির প্রতি বিশেষ যত্নবান হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যেরও বিশেষ উন্নতি দেখা গেল।

তারপর যুগ আসিল রেলপথ নির্ম্মাণের। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে ভারতের নগরী ও বন্দরগুলির সীমাবদ্ধ বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং কুটীরশিল্পের পরিবর্ত্তে বৃহৎ কারখানা-শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইল। কি সামাজিক, কি অর্থ-নৈতিক জীবনে অভূতপূর্ব্ব বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল।

কিন্তু অনেক গ্রাম ও অনেক প্রান্ত তখনও নূতন জাগরণের প্রভাব হইতে দূরেই রহিয়া গেল, কারণ বহু অর্থব্যয়েও এই বিশলক্ষ বর্গমাইল প্রশস্ত মহাদেশের সকল অংশে, এমন কি সকল প্রদেশেও গতায়াতের সুবিধা করা সম্ভব হইল না, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প-সংখ্যক লোকের যেখানে বাস সেখানে রেলপথ নির্ম্মাণ অযথা ব্যয়বহুল হইয়া পড়িল।

তাহার পরে, ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে মোটরযান দেখা দিয়াছে ও অল্পকাল মধ্যেই এদেশে সকল যানবাহনের মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে। আমাদের দেশের কৃষি ও শিল্প বর্ত্তমানে যেরূপ বহির্ব্বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে কি গ্রামের, কি সহরের সকল শ্রেণীর লোকের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় মোটরযান যে বিশেষ সহায়ক হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের এই স্থিতিশীল অভাগা দেশে হয়তো কেহ কেহ এই মোটরযানের বিস্তৃতি ভাল চক্ষে দেখিতেছেন না, কিন্তু কালের প্রভাব, অর্থনীতির শক্তি রোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। মোটরযানের স্বল্প-ব্যয়-সাপেক্ষতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও ক্ষুদ্রবৃহৎ সকল শ্রেণীর যানের ব্যবস্থার সরলতা আজই হৌক কালই হৌক ইহাকে সকলপ্রকার যানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিবেই। সুতরাং অযথা বাধার সৃষ্টি করিয়া মোটরযানের প্রসার বিলম্বিত করিলে দেশের লাভের অপেক্ষা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনাই বেশী।

বর্ত্তমান দারুণ অর্থসঙ্কটের দিনে যানবাহনাদির ব্যয়-বহুলতা ও অক্ষমতা আমাদের ব্যবসায় ও শিল্পের যে বিশেষ ক্ষতি করিতেছে তাহা সকলেই বিদিত আছেন। রেলগাড়িগুলি অর্দ্ধপূর্ণ অবস্থায় গতায়াত করিতে বাধ্য হইতেছে। ফলে ব্যয় বাড়িতেছে এবং রেলপথের যেরূপ ব্যবস্থা তাহাতে

ব্যবসায়ের উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রসার ও সংকোচ সংসাধিত করা দুষ্কর। তাই মোটের উপর রেলগাড়ীগুলি অল্প ব্যয়সঙ্কুল হইলেও ক্ষেত্রবিশেষে অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া গড়ে। অথচ অপর দিকে নৌযানের ব্যবস্থা সস্তা হইলেও সকল ক্ষেত্রে উহা সম্ভব হয় না এবং অধিক সময়সাপেক্ষ বলিয়া বর্ত্তমান কালোপযোগী ব্যবসায়ের পক্ষে সকল হিসাবে সুবিধাজনক হইতে পারে না। সুতরাং যত শীঘ্র আমরা এদেশে মোটরযানের উপযুক্ত ক্ষেত্র বিচার করিয়া লইয়া তাহার বিস্তৃতির ব্যবস্থা করিতে পারিব, ততই দেশের ব্যবসায়-ক্ষেত্রের পক্ষে মঙ্গল জনক।

কোন দেশে যান-বাহনাদির সুব্যবস্থার বিচার করিতে হইলে দুইটী জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, যথা :—(ক) দেশ, কাল ও পাত্র অনুযায়ী যেখানে যে প্রকার যানের ব্যবস্থায় স্থানীয় শিল্প, ব্যবসায় ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের সুযোগ হয় অন্য কোন কথা না ভাবিয়া সেই প্রকার যানের অথবা যান সমূহের সেখানে ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা দেখিতে হইবে ; এবং (খ) জনসাধারণের সুবিধা যাহাতে অধিক হয় যেমন করিয়াই হৌক সেই ব্যবস্থাই পরিণামে অর্থকরী হইবে ইহা স্থির লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কোন যানবিশেষের প্রসার হইলে অন্য যান-বাহনের ভাগ্য কি হইবে এ চিন্তা করিতে গেলে দেশবাসীর পক্ষে যাহা মঙ্গলকর তাহার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। যদি কোন ক্ষেত্রে পুরাতন কোন ব্যবস্থার তুলনায় নূতন কোন যান যোগ্যতর বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে তাহার প্রসারে সকল বাধা দূর করিয়া ফেলিতে হইবে। পুরাতনকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিলে চলিবে না।

এ হিসাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের এই বিরাট দেশে নানা প্রকার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার অনুপাতে কি ভারবাহী পশু, কি গোশকট, কি রেলগাড়ী, কি বাষ্পীয় শক্তিচালিত নৌযান, কি মোটর গাড়ী, কি বিমানপোত সকল প্রকার যানবাহনেরই যথোপযুক্ত বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং একের সহিত অপরটীর অহেতুকী সংঘর্ষের সৃষ্টি না করিয়া যাহাতে প্রত্যেকের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্দ্ধারিত করা সম্ভবপর হয় দেশহিতৈষী মাত্রেরই সেদিকে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। আর্থিক জগৎ ক্রমোন্নতিশীল। এই উন্নতির স্রোতের সহিত সমান তালে না চলিতে পারিলে জগৎ-সভায় সম্মানের আসন লাভ করা কখনও সম্ভব নয়। পরিবর্ত্তনশীলতার সঙ্গে সঙ্গে স্থিতিস্থাপক কোন কোন ব্যবস্থার অল্প-বহুল ক্ষতি হয়তো হইবে, কিন্তু তাহার ভয়ে উন্নতির পথ রোধ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। উন্নতিশীলের গতিরোধ করার ক্ষমতা কাহারও নাই। কি উপায়ে পুরাতনীর কম ক্ষতি করিয়া উন্নতিকে বরণ করিয়া লইতে পারা যায় তাহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ভারতে মোটর-যানের প্রচলন গত ২০।২৫ বৎসর হইতে হইয়াছে বটে কিন্তু বাণিজ্যক্ষেত্রে মোটরযানের প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে গত ৭।৮ বৎসরে মাত্র। ইহার মধ্যেই অন্যান্য যানবাহনাদির তুলনায় মোটরগাড়ীও নিজ প্রাধান্য সপ্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই প্রাধান্যের মূলে রহিয়াছে দুইটী জিনিষ, যথা—মোটর-শিল্পের ক্রমোন্নতি এবং আমাদের রাস্তাঘাটের সুব্যবস্থা ও সুনির্ম্মাণ। ১৯১৩-১৪ হইতে ১৯২৮-২৯ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মোটরযানের ব্যবহার কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহার হিসাব দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়, যথা :—

বিদেশ হইতে আমদানীর তালিকা

	মোটর গাড়ী	লরী	সাইকেল
১৯১৩-১৪	২,৮৮০	৫৭	১৪৬
১৯২৮-২৯	১৯ ৫৬৭	১২,৭৯০	১,৮০২

অতিরিক্ত শুল্কের চাপে এবং হয়তো আর্থিক অসঙ্গতির জন্য ১৯২৮-২৯ সাল হইতে মোটরযানের আমদানী কতকাংশে কমিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু তথাপি এদেশের যানবাহনাদির মধ্যে মোটরচালিত গাড়ী যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইবে যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের দেশে মোটরযানের প্রকৃষ্টতা রহিয়াছে, তাহা না হইলে এরূপ অসম্ভাবিত উন্নতি হইতে পারিত না। মোটর যানের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে যে শুধু যানবাহনেরই সুবিধা হইয়াছে তাহা নহে। ইহার প্রসারে বহু দেশবাসীর নূতন বৃত্তি ও উপজীবিকার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে, এবং প্রায় প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ সহরে নানা প্রকার

মোটরের কারখানা ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহাতে যে কত লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে তাহা অনুমান করা কঠিন।

ইহা ছাড়া মোটরযোগে গতায়াতের সুবিধা হওয়ায় শুধু যে মোটর সংক্রান্ত ব্যবসায়েরই প্রসার হইয়াছে তাহা নহে। পেট্রল, রবার, পিচ্ছিলক তৈল, কাঁচ, লৌহ, ইস্পাত, কাঠ ও টিনের ব্যবসায় তো বাড়িয়াছেই, ইহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেক শিল্পও সঞ্জীবিত হইয়াছে এবং প্রায় সকল প্রকার বাণিজ্যেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নূতন প্রাণের সাড়া পড়িয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে আমাদের রেলপথের প্রসারের পরে যেরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল মোটরযানের আগমনেও আমাদের সামাজিক ও আর্থিক জীবনে প্রায় সেইরূপ পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে।

মোটরযানের আদর হইয়াছে কেন তাহা অনুসন্ধান করিতে গেলে নিম্নলিখিত গুণগুলি প্রথমেই চোখে পড়ে, যথ :—

১। মোটরযানের গতিশীলতা ও সময়ের মিতব্যয়িতা।

২। অল্পদূরব্যাপী যানবাহনাদির মধ্যে মোটর গাড়ী কম খরচসাপেক্ষ।

৩। ইহার গতি ও প্রসার চাহিদা হিসাবে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর।

৪। শিল্পী ব্যবসায়ী ও যাত্রী মাত্রেরই ঘরের দ্বার হইতে মোটরযান ব্যবহার করা যায় এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানেই ইহার গতিরোধ করা সম্ভব বলিয়া মানুষ ও মালপত্রের গতায়াত ও বাহনের পক্ষে এমন সুবিধা আর কোন যান হইতে পাওয়া যায় না।

৫। মোটরযান চলাচলের জন্য সুবৃহৎ ব্যবস্থার ও পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয় না এবং অপেক্ষাকৃত অল্প মূলধনে শীঘ্র যাতায়াতের এমন যান আর কিছু হইতে পারে না।

এই সকল সুযোগ আছে বলিয়াই মোটরের সঙ্গে অন্য যান পারিয়া উঠিতেছে না। তবে উপযুক্ত রাস্তার অভাবে এখনও আমাদের দেশের মোটর গাড়ীগুলি সুদূর পল্লীর যানবাহনের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। শতকরা ৬০।৭০ খানা মোটর গাড়ী এখনও বড় বড় সহরগুলিতে ও তাহাদের চতুষ্পার্শ্বেই সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে, এবং এখনও বাণিজ্যে ব্যবহৃত মোটরযানের তুলনায় ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ীর সংখ্যা অনেক অধিক রহিয়াছে।

মোটরযানের অন্যান্য সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ নগরীগুলিতে লোকজনের বাসস্থান বিক্ষিপ্ত করিতে উহা যেরূপ সহায়ক হইয়াছে তাহার উল্লেখ না করিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে। বর্ত্তমান সভ্যতার একটী বিষময় ফল জনসঙ্ঘকে নগরোন্মুখী করা। কারখানা-শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অল্প-পরিসর স্থানে বহু লোকের বাস অনিবার্য্য হইয়া উঠে। তাহার ফলে স্বাস্থ্যহীনতা ও দুর্নীতিপরায়ণতার প্রকোপ বাড়িয়া যায়। মোটরযানের ব্যবহারে শীঘ্র স্বল্প ব্যয়ে দূর হইতে কার্য্যস্থলে যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায় আমাদের বড় বড় সহরগুলির স্বাস্থ্যের ও নৈতিক জীবনের যে উন্নতি হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিলে মোটরযানকে আমোল না দিয়া থাকা যায় না।

ক্রমে গ্রামগুলিতে মোটর গাড়ীর প্রচলন হইবে। ইহাতে গোশকট-চালকদের কিছু অসুবিধা হইবে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া মোটরের প্রসার বন্ধ করা বাঞ্ছনীয় হইবে না। কৃষকদের মাঠ হইতে থামারে শস্য আনয়নের জন্য গো-মহিষাদির শকটের ব্যবহার থাকিবেই। কিন্তু গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এবং নিকটবর্ত্তী ব্যবসায়-কেন্দ্রে মোটরযোগে মাল সরবরাহ করিতে পারিলে সময়ের অনেক মিতব্যয়িতা হইবে এবং চাষীর মালের মূল্য অনেক অধিক পরিমাণে তাহাদের নিজের হাতে পৌছাইবার যে সম্ভাবনা হইবে সে কথা সহজেই অনুমেয়। পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাইতে হইলে বিক্রয়ের ক্ষেত্রের প্রসার হওয়া প্রয়োজন। প্রধানতঃ মোটরযানের বিস্তৃতির উপরেই ভারতবর্ষের চাষীর এই পণ্য-বিক্রয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত হওয়া নির্ভর করিতেছে।

রেলগাড়ী ও জলপথের ক্ষুদ্র বৃহৎ নৌযানের আমরা নিন্দা করিতেছি না। তাহাদেরও বিশেষ ক্ষেত্র রহিয়াছে এবং সে সকল ক্ষেত্রে তাহাদের তুলনায় মোটর গাড়ীর দ্বারা অধিক সুবিধাজনক এবং স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ যানবাহনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। প্রধানতঃ দুইটী ক্ষেত্রে রেলের তুলনায় মোটরের আদর হইতে পারে, যথা, অল্প দূরের যাত্রায়, এবং অল্প পরিমাণ পণ্য ও অল্পসংখ্যক যাত্রী লইয়া যাইতে। সেই হিসাবেই আমাদের রেল, নৌযান, মোটর প্রভৃতির পরস্পরের সুযোগ

মত ক্ষেত্র নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া যাহাতে জাতির চলাচলের সর্ব্বাঙ্গীন সুব্যবস্থা হয় তাহারই জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

দুর্ভাগ্যক্রমে এ যাবত ভারতে মোটরযানের প্রসার আমাদের দেশবাসী ও গভর্ণমেণ্ট কেহই তেমন ভাল চক্ষে দেখেন নাই, এবং নানা প্রকারে উহাতে বাধাই দিয়া আসিয়াছেন। তাহার প্রধান কারণ অবশ্য ইহাই বলিতে হইবে যে মোটর গাড়ী গুলি সবই বিদেশ হইতে আমদানী, এবং ইহাদের প্রতিযোগিতায় ভারত গভর্ণমেণ্টের আয়ের প্রধান উৎস আমাদের রেল-গাড়ীর বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। বিদেশী দ্রব্য বহিষ্করণের যে আন্দোলন দেশে চলিয়াছে তাহার প্রভাব মোটর-যানগুলিতে কিয়ৎ পরিমাণেও যে লাগিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু সুখের বিষয় ক্রমে আমাদের দেশে মোটর গাড়ীর এঞ্জিন ও মুখ্য কলকব্জা ভিন্ন অন্য সকল অংশই প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। একজন বাঙ্গালী শিল্পী অপেক্ষাকৃত কম খরচে দুইখানি সম্পূর্ণ মোটর গাড়ীও এদেশে প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং শোনা যাইতেছে যে জনৈক দেশীয় নৃপতির উৎসাহে শীঘ্রই ভারতবর্ষে মোটর গাড়ী তৈয়ারীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং আশা করা যায় যে বৎসর দশেকের মধ্যেই ভারতের বাজারে ভারতীয় মোটর গাড়ীই বিক্রীত হইবে। গ্রামের কোন কোন সঙ্কীর্ণ-চেতা ব্যক্তি ভিন্ন অতঃপর মোটর গাড়ীর বিরুদ্ধে দেশবাসীর বিশেষ কিছু বলিবার থাকিবে না আশা করা যায়।

দেশবাসীর পক্ষ হইতে আরও একটী জিনিষ ভাবিবার রহিয়াছে। আমাদের দেশের সকল স্থানের পথ-নির্ম্মাণ-সমস্যা এক প্রকারের নহে। কোন কোন স্থান সমতল, কোথাও পর্ব্বতসঙ্কুল। কোথাও বৃষ্টি একেবারেই হয় না, কোথাও আবার বর্ষা ছাড়িতেই চাহে না। কোথাও নদী ও জলাশয়ে পরিপূর্ণ, কোথাও বা জলকষ্টে লোকের প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হয়। এই সকল কারণে আমাদের দেশের পথ-নির্ম্মাণ প্রণালী ও তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বত্র একরূপ হইতে পারে না। বাংলা দেশের মত নদীবহুল প্রদেশে কেবল মাত্র মোটরযানের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি প্রশস্ত ও বহুদূরপ্রসারী রাজপথ-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে হয় তো আমাদের জলনিকাশের পথগুলির ক্ষতি হইবে এবং শুধু যে জলযানের অসুবিধা হইবে তাহা নহে, বাংলার স্বাস্থ্যেরও বিশেষ হানি হইতে পারে। এই আশঙ্কা করিয়া যতদিন উপযুক্ত অনুসন্ধান না হইতেছে এবং জলপথও স্থল পথের কোন্‌টী কোন্ অংশে উৎসাহ পাইতে পারে তাহার বিচার না হইতেছে ততদিন অন্ধভাবে পথ নির্ম্মাণ ও মোটর-যানের অনুমোদন করা আমাদের অনেকের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। সে জন্য আশা করা যায় যে শীঘ্র বাংলা সরকার উপযুক্ত অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিবেন। তাহার পর মোটরের বিরুদ্ধে আমাদের বোধ হয় আর বেশী কিছু বলিবার থাকিবে না।

সরকারের পক্ষ হইতেও মোটরযানকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয় নাই। অনেক আবেদন নিবেদনের ফলে গত তিন বৎসর হইতে নূতন পথনির্ম্মাণ ও পুরাতন রাস্তার উন্নতির জন্য পৃথক্ অর্থ যোগানর ব্যবস্থা হইয়াছে বটে কিন্তু সে অর্থও সংগৃহীত হইতেছে পেট্রলের উপর শুল্ক বসাইয়া, অর্থাৎ মোটরযানের উপর দিয়াই। ১৯১৩-১৪ সাল হইতে ১৯২০-৩০ সাল পর্য্যন্ত রাস্তা তৈয়ারী ও মেরামতের জন্য যে টাকার ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট করিয়াছিলেন তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে মোটরযানের বিস্তৃতির অনুপাতে কত কম পরিমাণ টাকা রাস্তা-মেরামতিতে ব্যয়িত হইয়াছে :—

রাস্তা খরচের তালিকা

	১৯১৩-১৪	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০
মোট টাকা (লক্ষমুদ্রা)—	৪,২১	৬,৯২	৮,০৭	৮,০৩	৭,৬৩
তুলনামূলক সংখ্যা (Index Number)—			১৯২	১৯১	১৮১

আশা করা যাইতেছে যে আর বৎসর দুই পর হইতে গড়ে প্রতি বৎসর ১০ কোটি মুদ্রা রাস্তা নির্ম্মাণ ও মেরামতের কাজে ব্যয়িত হইবে, কিন্তু এখনও গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন বলা যায় না। ভারতবর্ষে মোট প্রায় ২,০০,০০০ মাইল রাস্তার হিসাব রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মাত্র ৬০,০০০ মাইল পাকা। ইহার মধ্যে অনেক রাস্তা পাকা হইলেও সংস্কারের অভাবে প্রায় দুর্গম হইয়াই থাকে। মোটরযানের প্রচলন হইবার পর হইতে পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য

শতকরা মাত্র ১৫ অংশ বাড়িয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন রাস্তা যে পরিমাণ খারাপ হইয়া পড়িয়াছে তাহার হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে মোটের উপর মোটরযানের বিশেষ কোন সুবিধাই দাঁড়ায় নাই। রাস্তা নির্ম্মাণ ও সংস্কারের জন্য আরও অধিক ব্যবস্থা করার দাবী মোটর গাড়ীর মালিকেরা নিশ্চয়ই করিতে পারেন।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে আজকাল রাস্তায় যাহা খরচ করা হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক টাকা মোটর গাড়ী, তাহার অংশ ও পেট্রল হইতে সরকার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আমদানী শুল্ক ও ট্যাক্সে আদায় করিতেছেন। এই ট্যাক্সের ভার বহন করা মোটরযানের পক্ষে একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তাহার প্রমাণস্বরূপ দেখা যাইবে যে যখন শতকরা ২০ টাকা ছিল আমদানী শুল্ক তখন ১৯২৭-২৮ সালে মোটরের আমদানী হইয়াছিল ২৫,৯৫০ খানা ও ১৯২৮-২৯ সালে আসিয়াছিল ৩৪,০৫৯ খানা। ১৯৩০ সালে শুল্কের হার বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ২৫ টাকা হয় এবং ১৯৩১ সালে যথাক্রমে এই শুল্কের হার বাড়াইয়া ৩০৲ টাকা এবং পরে ৩৭।।০ টাকা করা হয়। ইহার ফল হাতে হাতে দেখা যাইতেছে। ১৯৩১-৩২ সালে মাত্র ১২,৪৪৮ খানা মোটরগাড়ী এদেশে আমদানী হইয়াছিল। আমদানী শুল্ক ভিন্ন নানারূপ কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সেরও ভার ক্রমবিবর্দ্ধন ভাবে মোটরযানগুলিতে সহিতে হইতেছে। ইহাতে এই শিল্প এবং এতৎসংক্রান্ত ব্যবসায়গুলি যে বিশেষ মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

কি দেশবাসীর, কি গভর্ণমেণ্টের, এক্ষণে মোটরযানগুলির প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাতের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা উন্নতির প্রতীক এই নূতন বাহন অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও লুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহাতে প্রধানতঃ ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন আমাদের স্বদেশবাসী উদ্যোগী ব্যবসায়ীগণ, বিদেশী মোটর-নির্ম্মাতাগণ নহে। মোটরযানের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হইয়া উঠিতেছিল, ক্ষতি হইবে তাহাদেরও কম নয়। আমাদের সকলেরই এজন্য সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

বিবিধ

রাসায়ণিক হীরক

এ পর্য্যন্ত ধরণী-গর্ভ খনন করিয়া বহু লোকের বহু পরিশ্রম সত্বেও যাহা দুর্ল্লভ সামগ্রী ছিল, এখন বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরীতে বসিয়া তাহা পাওয়া যাইবে। হীরা আজ আর মাত্র মনোহারিণী অলঙ্কার বলিয়াই সমাদৃত নয়; খনিজাত হীরকের শতাংশের ষাট ভাগ আজ কারবারীদের কাজে লাগে। ইস্পাত কাটিবার চক্রযন্ত্র হইতে বৃহৎ গ্রানাইট স্তর কাটিয়া কুচিকুচি করিতে গেলে হীরক ছাড়া উপায় নাই। প্রত্যেক যান্ত্রিকের দোকানে হীরকচক্র আজ অবশ্য ব্যবহার্য্য জিনিস। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ ম্যাক্‌কীর রাসায়ণিক হইতে হীরক-সম্ভবের গবেষণার মূল্য অসীম। অনেকের হয়তো জানা আছে, ভূ-প্রস্তরের কঠিন চাপ ও ভীষণ উত্তাপে হীরকের জন্ম। অধ্যাপক ম্যাককী প্রকৃতির এই সূত্র নিয়াই তাঁহার ল্যাবরেটরীতে হীরক উৎপাদন করিয়াছেন। বিদ্যুৎ-চুল্লীতে গলিত লৌহের সহিত কার্ব্বণ (অঙ্গার-ক্ষার) সিলিকন (সিকতক) ও ফস্ফোরাস (দীপক) যথাসম্ভব উত্তপ্ত করিয়া, বিশেষ-করিয়া-প্রস্তুত ইস্পাতের মঞ্জুষায়, এই উত্তপ্ত স্রাব বন্ধ রাখিয়া ধীরে ধীরে ইহাকে ঠাণ্ডা করিতে হয়। লৌহ-ধ্বংসী রাসায়ণিক সাহায্যে ডাঃ ম্যাককী ইহা হইতে হীরকখণ্ড উৎপাদনের উপায় আবিস্কার করিয়াছেন। প্রয়োজন বুঝিলে ইহাকে কারবারীদের সুবিধায় লাগানো যাইতে পারে বলিয়া তিনি বলিয়াছেন। ব্যবসায় জগতে তাঁহার এই গবেষণা যুগান্তর আনিবে বলিয়াই মনে হয়।

পতঙ্গ-পোত

একটি বিমান-পোতের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া একরাশ পতঙ্গ দক্ষিণ আমেরিকা হইতে আনিয়া মিয়ামির বিমান-বন্দরে

খালাস করা হইয়াছে। লুইসিয়ানিয়াতে আকের ক্ষেতের এক দল বিভিন্ন পতঙ্গের ইহারা মৃত্যুবাহিনী। বৎসরে বৎসরে এই রকম বহু দেশ হইতে বহু প্রকার পতঙ্গ আনিয়া আমেরিকার কৃষিবিভাগ দেশজাত কৃষিসম্পদের শত্রু-পতঙ্গ-বিনাশের ব্যবস্থা করে। কৃষি নিয়া যাঁহারাই মাথা ঘামাইয়াছেন তাঁহারা জানেন, শস্যে এ প্রকার কীটপতঙ্গ বহু লাগে মানুষ হাজার চেষ্টা করিয়াও যাহার কিছু করিতে পারেনা। এই পতঙ্গভুক্ অপর পতঙ্গ ইহার পিছনে লাগানো ছাড়া ইহা হইতে নিষ্কৃতির অন্য উপায় নাই। অ্যামেরিকার জনৈক কীটবিশেষজ্ঞ শ্রীযুত ক্লজেন এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। কিউবার সাইট্রাসকুঞ্জে ব্ল্যাকফ্লাই লাগিয়াছে। ফ্লোরিডাতে আসিতে ইহার বিলম্ব হইবে না। ব্ল্যাকফ্লাই মশার মতো দেখিতে, দুইটা পিনের মাথা জড়ো করিলে যতখানি, অবয়ব ততখানি। একটি গাছের একটি পাতায় হয়তো হাজারটি ব্ল্যাকফ্লাই পাওয়া যাইবে। রক্তবীজের ঝাড়, কত মারা যায়? একটি ক্ষেতে একবার ব্ল্যাকফ্লাই লাগিলে আর রক্ষা নাই। কিন্তু প্রকৃতি নিজে ইহার বিপক্ষকেও জন্ম দিয়াছে—এশিয়াতে ছোট্ট এক প্রকার বোল্‌তা। এশিয়া হইতে সেই বোল্‌তা কিউবায় আনিতে হইল। কিউবার ক্ষেতে সেই বোল্‌তা ছাড়িয়া ফ্লোরিডার সাইট্রাসকে বাঁচানো হইল। আবার শুধু এই বোল্‌তা হইলে চলিবে না, ইহাদের স্ত্রী-বোল্‌তা চাই। ক্লজেন সাহেব বলিতেছেন, কি করিয়া এই স্ত্রী-বোল্‌তা ব্ল্যাকফ্লাই মারে তাহা দেখিলে তাক লাগিয়া যায়। উড়িতে উড়িতে একটি গাছের পাতায় ব্ল্যাকফ্লাই দেখিয়া সেখানে নামিল। নামিয়া হুল দিয়া বেচারীকে বিঁধিয়া তাহার স্কন্ধের উপর একটি ডিম পাড়িয়া আবার নূতন শীকারের সন্ধানে উড়িল। মনে রাখিতে হইবে, হুলের বিষেই ব্ল্যাকফ্লাই মরে না। পরিত্যক্ত ডিম্ব হইতে বাচ্চা বোল্‌তা বাহির হইয়া ব্ল্যাকফ্লাইকে নিঃশেষে মারে। এই বাচ্চা বোল্‌তা ব্ল্যাক ফ্লাই মারিয়া তাহার জননীর পথে উড়িয়া যায়। অবশ্য কৃষি-বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, এই বিপক্ষ পতঙ্গের প্রতীক্ষায় কোনও বিশেষ পতঙ্গের কাছে পরাজয় মানা চলে না। কিন্তু যতদিন এ বিজ্ঞান আরও উন্নত না হয়, ততদিন এ ছাড়া আর উপায়ও নাই।

নূতন আবিষ্কার

এক মাসে উঁহাদের দেশে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের হিসাব করিতে গেলে মুস্কিলে পড়িতে হইবে। মোটরকার, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিমান বিদ্যা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে নিত্য নূতন অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্কার হইতেছে। আজ এখানে এটি হইল, কাল ওখানে আবার সেইটিরই একটি পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ দেখা গেল—মনে হয় যেন পাল্লাপাল্লি চলিতেছে। ধরুন—পুতুল-মানুষ (Robot); ইহার কত বিভিন্ন রকম হইল। বর্ত্তমানে একজন জার্ম্মাণ ইঞ্জিনিয়ার ইহার এক নূতন সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। এ শুধু কথা কয় কিংবা গান গায় না, রেডিয়ো সঙ্গীতের তালে তালে নাচেও। ভাবিয়া দেখিতে গেলে ব্যাপারটা খুব সহজ। মাথায় লাউড-স্পীকার লাগানো আছে আর তাহারই সহিত সংযোগ করিয়া হাতে-পায়ে এমন যন্ত্র আছে, যাহাতে উহা সুরে-তালে দিব্য নাচিতে পারে। মোটরকারে উঁহারা আজ টেবিল লাগাইয়াছে। সাধারণতঃ মোটরের ছাদের সহিত উহা সংযুক্ত থাকে, প্রয়োজন হইলে উহা খুলিয়া ব্যবহার করা হয়। ইহার আবিষ্কার-কর্ত্তা ইংলণ্ডের শ্রীযুক্ত রিচার্ডসন। রাস্তায় ঘাটে এক আনা পয়সা মেসিনে ফেলিয়া দিলেই একটি ব্রাস বাহির হইয়া আপনার জামা ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া সাফ করিয়া দিবে। স্যানফ্রান্‌সিস্কোর ন্যাসনাল ইন্‌ভেণ্টরস্‌ কংগ্রেসে এই আবিষ্কারের নমুনা দেখানো হইয়াছে। বোষ্টনে এক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা পোষ্টাফিসে থাকিলে প্রত্যেক পার্সেলের ভিতর কি আছে দেখা যাইবে—'এক্সরে'র নূতন ব্যবহার। যে-কোনও পার্সেলের ভিতর একটি মানুষ-মারা বোমা চালাইয়া দিবার যে নৃশংস আমোদ মাঝে মাঝে দেখা যায়,—এ যন্ত্র তাহাতে বাদ সাধিবে। 'আল্ট্রা-ভায়োলেট-রে' দিয়া মূল্যবান ছবি ইত্যাদির পুরাতনত্ব ধরার বন্দোবস্ত হইয়াছে। হয় তো কেহ একটি বড় আর্টিষ্টের নাম-করা ছবির নকলকে আসল বলিয়া চালাইতে চায়—এ আবিষ্কারে সে জোচ্চোরি আর চলিবে না। অবশ্য আমাদের দেশে কেই বা ছবি, পুরানো কি নূতন, কিনিতেছে যে তাহার জন্য আবার ভাবনা।

মৎস্য-বৃষ্টি

আমাদের দেশের বুড়া-লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাদের কেহ কেহ হয়ত মনে করিয়া বলিতে পারিবেন যে তাঁহাদের জীবিতকালে অমুক সনে, অমুক স্থানে, আকাশ হইতে ক্রমাগত ঘণ্টাখানেক ধরিয়া জীবিত ও মৃত মৎস্য বর্ষণ হইয়াছে, এ কথা তাঁহারা জানেন। বছর চারেক আগে নর্থ

ক্যারলিনার এজ্‌কম্বের জনৈক গৃহস্থ কৃষক ডাউটির বাড়ীর আশপাশ ঘেরিয়া এই কাণ্ড ঘটে। আমেরিকান মিউজিয়ামের প্রকৃতি-শাস্ত্রবিদ্‌ মৎস্য-বিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক ডাঃ গাজারকে এ কথা জানানো হয়। সম্প্রতি তিনি এ সম্পর্কে তাঁহার গবেষণার ফল সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন। ২০০ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত তিনি পৃথিবীর বহু স্থানে এই মৎস্যবৃষ্টির একাত্তরটি দৃষ্টান্তসংগ্রহে সক্ষম হইয়াছেন। মিসিসিপিতে ১৯১৫ সনে, নর্থ ক্যারলিনাতে ১৯১৯ সনে, ১৯০১এ সাউথ ক্যারলিনাতে, নিউইয়র্ক ও রোড আইল্যাণ্ড ১৯০০ সনে, ফ্লোরিডায় ১৮৯৩ সনে, সাউথ ড্যাকোটায় ১৮৮৬ সনে, নিউ জার্সি ও লুইসিয়ানা (১৮৭৫), ভার্মণ্ট (১৮৫৯), মেরিল্যাণ্ড (১৮২৯) নিউ ইয়র্ক সিটি (১৮২৮)—ইত্যাদি স্থানে এই ঘটনার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের সিঙ্গাপুরেও ১৮৬১ সনের একটি ঘটনার বৃত্তান্ত তিনি পাইয়াছেন। ঐ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুরে এক ভূমিকম্প হয়। তাহার কিছুদিন পরেই তিন দিন ধরিয়া ক্রমাগত শিলাবৃষ্টি হইতে থাকে এবং ইহারই মধ্যে খাণিকক্ষণ মৎস্য-বৃষ্টি হয়। প্রসিদ্ধ ফরাসী প্রকৃতি-বৈজ্ঞানিক কাউণ্ট অব ক্যাসেল্‌ন এ সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ইহার সত্যতা-সম্পর্কে সন্দেহ করা যায় না। ইহার কারণ নির্ণয় করিতে বসিয়া বহু জনে বহু কথা বলিয়াছেন। ১৮২৩ সনে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক হাম্বল্‌ড বলিয়াছেন, আগ্নেয়গিরির স্রাবই ইহার হেতু, পার্ব্বত্য নদীর মৎস্যগুলি এই অবস্থায় জনপদে আসিয়া এই অলৌকিক কাণ্ডের সৃষ্টি করে। কাউণ্ট অব ক্যাসেল্‌ন 'ভূমিকম্প'কেই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কয়েক জাতীয় মৎস্য গ্রীষ্মে যে কর্দ্দমে আশ্রয় করে, বৃষ্টিতে তাহারাই স্থানচ্যুত হইয়া মানুষকে সচকিত করে—এমন কারণও অনেকে দিয়াছেন। দল বাঁধিয়া নূতন জলাশ্রয়ের খোঁজে স্থলে আসিয়া মৎস্য এমন বিপদে পড়িতে পারে, ইহাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। ডাঃ গাজার ইহার সমস্ত কারণগুলি যুক্তি দিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বিপুল ঝটিকায় আকাশচুম্বী জলস্তম্ভের ফলে, জলচর অনেক জীবকে মেঘের রাজ্যে উড়াইয়া নিয়া যায়, বায়ুর বেগহ্রাসের সহিত তাহারা প্রচণ্ড বেগে নামিয়া আসে—সাধারণে ইহাকেই মৎস্যবর্ষণ বলিয়া জানে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়া তিনি নিজের মতকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

—ক

শিশু-দস্যুর দল

বিলেতে সম্প্রতি শিশু-দস্যুদের যে রকম উৎপাত আরম্ভ হ'য়েছে তা' দেখে ওখানকার অনেক বিশিষ্ট লোক পর্য্যন্ত চিন্তান্বিত হ'য়ে প'ড়েছেন। স্থানীয় শিশু-মঙ্গল সমিতিগুলির জন্য বার্মিংহামের বহুদিনকার একটা বনেদী সুখ্যাতি ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সেখানে শিশু-অপরাধীদের সংখ্যা যে রকম ভীষণ ভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তা দেখে শুনে কর্ত্তৃপক্ষ বিস্মিত হ'য়ে যাচ্ছেন! এই সমস্ত শিশু-দস্যুদের দল নাকি ওখানকার সর্ব্বত্রই দেখা যাচ্ছে। এমন কি সেখানকার সকল ছেলের মধ্যেই "ডাকাত ডাকাত" খেলাটাও বড্ড বেশী বেড়ে উঠেছে। তাই সেখানকার স্কুল-মাষ্টাররা এর বিরুদ্ধে উঠে প'ড়ে লেগেছেন। কিন্তু এমন ভাবে বাধা পাওয়া সত্ত্বেও, স্কুল আওয়ার্সের বাইরে ঐ সমস্ত ছেলে আবার, সত্যিকার অপরাধের জন্মগত সংস্কার-সম্পন্ন ছেলেদের দ্বারা উৎসাহিত হয়। এর ফলে ওখানকার সর্ব্বত্রই নিত্য অসংখ্য সাইকল্‌ চুরি, দোকান লুঠ, প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ সমূহের মহামারী উপস্থিত হ'য়েছে।

এই রকম একটা দল কিছুদিন পূর্ব্বে একটা দোকানের তালা, অফিস-ড্রয়ার প্রভৃতি ভেঙ্গে দোকানের মালপত্তর, টাকাকড়ি প্রভৃতি নিয়ে রাতারাতি পলায়ন ক'রেছে; আর সব চেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, দলের দলপতির বয়েস ছিল মাত্র এগারো বছর। তার পদাঙ্ক-অনুসরণকারী দলের অপর ছয়টি ডাকাতের বয়স ছিলো নয় থেকে ষোলো বছরের মধ্যে। তবে অনেকেই মনে করছেন যে এই সমস্ত নষ্টামি এই ছোট ছেলেরা নিজেদের মতলবেই যে ক'রছে, তা' নাও হ'তে পারে। উপরন্তু এদের পেছোনে বয়স্ক লোকেদের যে যথেষ্ট প্ররোচনা আছে এ রকম মনে করবার রীতিমত কারণ আছে। তাঁরা বলেন, যে-রকম কৃতিত্বের সঙ্গে ঐ সব ছেলের দল নিপুণভাবে ধরা পড়বার সকল সম্ভাবনাকে অতিক্রম ক'রে এই সব কাজ ক'রেছে তাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে খুব পাকা একজন বয়স্ক দস্যুদলপতি এদের শিখণ্ডীরূপে সাম্‌নে রেখে পেছোন থেকে তার অভিজ্ঞতার বাণ নিক্ষেপ করছে। বার্মিংহামের একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা একটি ক্ষেত্রে একটি বালককে এমন আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রাহাজানি করতে দেখেছিলেন যে তিনি বলেন, তিনি নিজেও ওকাজে অতখানি বাহাদুরী দেখাতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এই সমস্ত শিশু-দস্যুদের অত্যাচার আজকাল ওখানকার সুদূর পল্লী অঞ্চল-সমূহেও রীতিমত পরিব্যাপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে ব'লে প্রকাশ। সেখানকার লোক ওদের ডাকাতী, গুণ্ডামি, রাহাজানি, লুঠতরাজ, চুরী প্রভৃতির জ্বালায় অস্থির হ'য়ে উঠেছে।

—চিত্রগুপ্ত

অনশনব্রতী মহাত্মা গান্ধী ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

মহাত্মাজীর অনশন-ব্রত

১৯৩২ সালের ১১ই মার্চ্চ যারবেদা জেল হইতে মহাত্মা গান্ধী স্যর স্যামুয়েল হোরের নিকট এক পত্রে লেখেন :—

'প্রিয় স্যার সামুয়েল, আপনার হয়ত স্মরণ আছে, গোল-টেবিল বৈঠকে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের দাবী যখন উপস্থিত করা হয়, তৎকালে আমি আমার বক্তৃতার শেষ ভাগে বলিয়াছিলাম যে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য যদি স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন মঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে আমি আমার জীবন দিয়াও তাহার বিরুদ্ধতা করিব। মুহূর্ত্তের আবেগে পড়িয়া কিংবা ভাষার অলঙ্কার হিসাবে আমি ঐ কথা বলি নাই, সম্পূর্ণ গুরুত্ব সহকারেই ঐ বিবৃতি প্রদান করা হইয়াছিল। * * *

* * * নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পদ্ধতি দুঃখকষ্ট বরণ করিবার পদ্ধতি। উহার কার্য্যক্রমের একটি অংশ এই যে, কতকগুলি ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারীকে শেষ পর্য্যন্ত উপবাস করিয়াও আত্মবিসর্জ্জন করিতে হয়। আমার জন্য ঐ মুহূর্ত্ত এখনও সমুপস্থিত হয় নাই। ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আমি ভিতর হইতে এখনও অভ্রান্ত আহ্বান পাই নাই। কিন্তু বাহিরে যে-সব ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহাই আমার অন্তরাত্মা বিচলিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট। কাজেই অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য আমার উপবাস-ব্রত অবলম্বনের সম্ভাবনার কথা আপনার নিকট লিখিতে গিয়া আমি যদি আপনাকে এ কথাটাও না জানাই যে অদূর ভবিষ্যতে অনুরূপ উপবাস-ব্রত অবলম্বনের আর একটি সম্ভাবনাও রহিয়াছে, তাহা হইলে আপনার নিকট আমার কর্ত্তব্য পালন করা হইবে না বলিয়া আমি মনে করি।'

১৬ই এপ্রিল তারিখে স্যর স্যামুয়েল হোর ইহার উত্তর দেন। অতঃপর মহাত্মাজী ১৮ই আগষ্ট তারিখে প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক পত্রে লেখেন, "* * সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আমি তাহা পাঠ করিয়াছি এবং ঐ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিয়াছি। যদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন না ঘটে তাহা হইলে প্রস্তাবিত অনশন ব্রত ২০শে সেপ্টেম্বরের দ্বিপ্রহর হইতে আরম্ভ হইবে।"

মিঃ ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইহার যে উত্তর দেন, তদুত্তরে মহাত্মাজী ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে লেখেন :—"* * অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্ব্বাচনমণ্ডলী প্রতিষ্ঠায় আমি দেখিতে পাইতেছি যে, হিন্দু সমাজের ধ্বংস-কারীএক কালাগ্নিশিখাই প্রজ্জলিত করা হইয়াছে। উহা অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষেও কোনক্রমেই কল্যাণপ্রসূ হইবে না। আমাদের প্রতি আপনাদের যতই সহানুভূতি থাকুক না কেন, এ কথা বলিলে অসন্তুষ্ট হইবেন না যে, এই ধরণের একটি গুরুত্ব-পূর্ণ জটিল ও ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনারা যথাযথ সিদ্ধান্ত করিতে অক্ষম। অনুন্নত সম্প্রদায় যদি অতিমাত্রায় বেশী পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব পায়, তাহাতেও আমি আপত্তি করিব না। কিন্তু উহারা হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিবার ইচ্ছুক থাকিলে উহাদিগকে হিন্দুসমাজ হইতে আইন দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলার আমি বিরোধী। আপনারা কি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, যদি আপনাদের সিদ্ধান্ত বহাল থাকে এবং ঐ ধরণের শাসনতন্ত্র ইত্যাদি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে যে সকল হিন্দু সংস্কারক তাঁহাদের অনুন্নত ভ্রাতৃবৃন্দের উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যশক্তির অগ্রগতিকে বহুল পরিমাণে ব্যাহত করিয়া দিবেন?

এই সমস্ত কারণেই আমি আমার পূর্ব্বসিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকিতে বাধ্য হইলাম।"

১৫ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় হোম মেম্বার বলেন, গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ গান্ধী উপবাস আরম্ভ করিবামাত্র তাঁহাকে যারবেদা জেল হইতে স্থানান্তরিত করা হইবে। তাঁহাকে শুধু বলা হইবে যে তিনি যেন অন্যত্র গমন না করেন। যদি দেখা যায় তিনি আইন অমান্য অথবা অপর কোনপ্রকার গবর্ণমেণ্টবিরোধী আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার করিতেছেন, তবে তাঁহার প্রতি বিধিনিষেধ জারীর কথা বিবেচনা করা হইবে।

কিন্তু মহাত্মাজী কোন সর্ত্তাধীন মুক্তি পছন্দ করেন নাই।

উপবাস স্থগিত রাখার জন্য অনেকেই মহাত্মার নিকট তার করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাহাতে রাজী হন নাই।

কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজগোপালের তারের উত্তরে মহাত্মা জানান—"এত অসহায় বোধ করিবার কারণ নাই। বরং আনন্দ করিবার কারণ আছে। নিপীড়িত ও লাঞ্ছিতদের জন্য এই শেষ আত্মাহুতিদানের সুযোগ আমার নিকট উপস্থিত। সুতরাং উপবাস আরম্ভের তারিখ সম্পর্কে বিবেচনা করিতে পারি না।"

মিঃ জি, ডি, বিরলার তারের উত্তরে মহাত্মা বলেন—"ভগবানের নাম লইয়া যে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা পরিবর্ত্তন করিব না। এখানে থাকিয়া তোমাদের কার্য্যের সহায়তা-কল্পে কোন উপদেশ দিতে পারি না এবং বলিতে পারি না, ভবিষ্যৎ কি আকার ধারণ করিবে।"

সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু মহাত্মার নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে তার করিয়াছিলেন—

"আর একবার অবনত শ্রেণীর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আপনি স্বয়ং করুন। তৎপূর্ব্বে উপবাস আরম্ভ করিবেন না, ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ। কারণ আমি মনে করি, আপনি যদি এই সমস্যার সমাধান করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে আর কেহই একার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। হিন্দু সমাজের এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য আপনাকে অবশ্যই বাঁচিতে হইবে।"

এই তারের উত্তরে ১৭ই তারিখে মহাত্মা গান্ধী জানান,—"আপনার তারের জন্য ধন্যবাদ। ভগবানের নামে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহা পরিবর্ত্তনের জন্য আমাকে অনুরোধ করিবেন না। আপনি এবং অন্যান্য বন্ধুগণ মিলিয়া আপোষের চেষ্টা করিতে পারেন। ভগবানের ইচ্ছা থাকিলে মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত আমি উপবাস করিয়াও বাঁচিয়া থাকিব।"

২০শে সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের সহিত মহাত্মার একঘণ্টা আলাপ হয়। এই সময় তিনি বলেন,—

আব্বাস্ তায়েবজীর কন্যার রচিত একটী স্তোত্রপাঠান্তর আমি আমার প্রায়োপবেশন আরম্ভ করি। ঐ স্তোত্রের মর্ম্ম এইরূপ:—

"পথিক! নিদ্রা ত্যাগ কর; প্রভাত হইয়াছে, আর রাত্রি নাই, এখনও ঘুমাইতেছ কেন? জাগরণের সময় আসিলেও যে ঘুমায়, তাহার কাঁদিবার যথেষ্ট কারণ থাকে, হয়ত কাঁদিতেও হয়। যে নিদ্রা বর্জ্জন করিয়া জাগিয়া উঠে, তাহার অন্তরের বাসনা পূর্ণ হয়।"

যখন প্রভাত হইল, তখন আমিও আমার কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হই নাই—আমিও অনশনব্রত অবলম্বন করিলাম। অশ্রুপাতের কোন আশঙ্কা আর আমার নাই, কেননা অন্ধকার আমাকে প্রতারিত করিতে পারে নাই, এই দুর্গম ভ্রমণপথে এই সান্ত্বনাই আমাকে শক্তি দিবে।"

২১শে সেপ্টেম্বর শান্তি-নিকেতনে মহাত্মাজীর অনশন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে শোনো তাঁর বাণী। অনুভব কর কী তাঁর প্রচণ্ড সঙ্কল্পের জোর। আজ তপস্বী উপবাস আরম্ভ করেচেন, দিনের পর দিন তিনি অন্ন নেবেন না। তোমরা দেবে না তাঁকে অন্ন? তাঁর বাণীকে গ্রহণ করাই তাঁর অন্ন, তাই দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে হবে। অপরাধ অনেক করেচি, পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে! ভাইএর সঙ্গে ব্যবহার করেছি দাসের মতো, পশুর মতো; সেই অপমানে সমস্ত পৃথিবীর কাছে ছোটো করে রেখেছে আমাদের। যদি তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতাম তা হলে এত দুর্গতি হত না আমাদের। পৃথিবীর অন্য সব সমাজকে লোকে সম্মান করে, ভয় করে, কেননা তারা পরস্পর ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ। আমাদের এই হিন্দু সমাজকে আঘাত করতে, অপমান করতে কারো মনে ভয় নেই, বারবার তার প্রমাণ পাই। কিসের জোরে তাদের এই স্পর্দ্ধা সে কথাটি যেন এক মুহূর্ত্তে না ভুলি।

যে সম্মান মহাত্মাজী সবাইকে দিতে চেয়েছেন, সে সম্মান আমরা সকলকে দেব। যে পারবে না দিতে, ধিক তাকে, ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ করতে বাধা দেয় যে সমাজ, ধিক সেই জীর্ণ সমাজকে। সব চেয়ে বড়ো ভীরুতা তখনই প্রকাশ পায় যখন সত্যকে চিনতে পেরেও মানতে পারি নে। সে ভীরুতার ক্ষমা নেই।

অভিশাপ অনেক দিন থেকে আছে দেশের উপর। সেই জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেচেন একজন, সেই প্রায়শ্চিত্তে সকলকে মিলতে হবে, সেই মিলনেই আমাদের চিরমিলন সুরু হবে। মৃত্যুর বৃহৎ পাত্রে তার প্রায়শ্চিত্ত তিনি আমাদের সকলের সামনে ধরলেন, এগিয়ে দিলেন আমাদের হাতের কাছে। গ্রহণ করো সকলে, স্খালন করো পাপ। মঙ্গল হবে। তাঁর শেষ কথা আজ আমি তোমাদের শোনাতে এসেছি। তিনি দূরে আছেন, কিন্তু তিনি দূরে নেই। তিনি

আমাদের অন্তরেই আছেন। যদি জীবন দিতে হয় তাঁকে আমাদের জন্যে, তবে অন্ত থাকবে না পরিতাপের।

মাথা হেঁট হয়ে যাবে আমাদের। তিনি আমাদের কাছে যা চেয়েছেন, তা দুরূহ, দুঃসাধ্য ব্রত। কিন্তু তার চেয়ে দুঃসাধ্য কাজ তিনি করেচেন, তার চেয়ে কঠিন ব্রত তাঁর। সাহসের সঙ্গে যেন গ্রহণ করতে পারি তাঁর দেওয়া ব্রত। যাকে আমরা ভয় করচি, সে কিছুই নয়। সে মায়া, মিথ্যা। সে সত্য নয়; মানবো না আমরা তাকে। বলো আজ সবাই মিলে, আমরা মানব না সেই মিথ্যাকে। বলো, আজ সমস্ত হৃদয় দিয়ে বলো, ভয় কিসের? তিনি সমস্ত ভয় হরণ করে বসে আছেন। মৃত্যু-ভয়কে জয় করেচেন। কোনো ভয় যেন আজ থাকে না আমাদের। লোকভয়, রাজভয়, সমাজভয় কিছুতেই যেন সঙ্কুচিত না হই আমরা। তাঁর পথে তাঁরই অনুবর্ত্তী হয়ে চলব, পরাভব ঘটতে দেবনা তাঁর। সমস্ত পৃথিবী আজ তাকিয়ে আছে, যাদের মনে দরদ নেই তারা উপহাস করচে। এত বড়ো ব্যাপারটা সত্যই উপহাসের বিষয় হবে যদি আমাদের উপরে কোনো ফল না হয়। সমস্ত পৃথিবী আজ বিস্মিত হবে যদি তাঁর শক্তির আগুন আমাদের সকলের মনের মধ্যে জ্বলে ওঠে, যদি সবাই বলতে পারি, জয় হোক্ তপস্বী, তোমার তপস্যা সার্থক হোক্। এই জয়ধ্বনি সমুদ্রের পার থেকে পৌছবে আর এক পারে, সকলে বলবে, সত্যের বাণী অমোঘ, ধন্য হবে ভারতবর্ষ। আজকের দিনেও এত বড়ো সার্থকতায় যে বাধা দেবে সে অত্যন্ত হেয়, তাকে তোমরা ভয়ে যদি মানো তবে তার চেয়ে হেয় হবে তোমরা।

জয় হোক সেই তপস্বীর যিনি এই মুহূর্ত্তে বসে আছেন মৃত্যুকে সামনে নিয়ে, ভগবানকে অন্তরে বসিয়ে, সমস্ত হৃদয়ের প্রেমকে উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে। তোমরা জয়ধ্বনি করো তাঁর, তোমাদের কণ্ঠস্বর পৌছুক তাঁর আসনের কাছে, বলো তোমাকে গ্রহণ করলেম, তোমার সত্যকে স্বীকার করলেম। আমি কীই বা বলতে পারি। আমার ভাষায় জোর কোথায়? তিনি যে ভাষায় বলচেন সে কানে শোনবার নয়, সে প্রাণে শোনবার, মানুষের সেই চরম ভাষা, নিশ্চয়ই তোমাদের অন্তরে পৌচেছে।

আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য পর যখন আপন হয়। সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ, আপন যখন পর হয়। ইচ্ছে করেই আমরা যাদের হারিয়েছি, ইচ্ছে করেই আজ তাদের ফিরে ডাকো,—অপরাধের অবসান হোক্, অমঙ্গল দূর হয়ে যাক্। মানুষকে গৌরব দান করে মনুষ্যত্বের সগৌরব অধিকার লাভ করি।"

এই দারুণ সমস্যা সমাধানার্থে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী আহূত বোম্বায়ে উচ্চনীচ হিন্দু-নেতৃ-বৈঠকে অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ডাঃ আম্বেদকার এক খস্‌ড়া-প্রস্তাব দাখিল করেন।

২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে—অনুন্নত সম্প্রদায় হইতে ব্যবস্থাপক সভাসমূহে প্রতিনিধি প্রেরণ সম্বন্ধে এবং তাহাদের উন্নতিবিধায়ক অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে অনুন্নত সম্প্রদায় এবং অবশিষ্ট হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ আপোষ-মীমাংসা হয়।

১। সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য কতকগুলি আসন সংরক্ষিত থাকিবে। প্রাদেশিক আইন-সভাসমূহে নিম্নোক্তরূপ আসন বণ্টন করা হইবে।

মাদ্রাজ	৩০	মধ্যপ্রদেশ	২০
বোম্বাই (সিন্ধু)	১৫	আসাম	৭
পাঞ্জাব	৮	বাঙ্গালা	৩০
বিহার ও উড়িষ্যা	১৮	যুক্তপ্রদেশ	২২

প্রধান মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত দ্বারা যেরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে, তদনুযায়ী প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সর্ব্বমোট সংখ্যানুপাতের উপর ভিত্তি করিয়া এই সব সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

২। যুক্ত নির্ব্বাচন দ্বারা এই সব সভায় নিম্নোক্ত ব্যবস্থানুযায়ী প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হইবে—যে কোন সাধারণ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর তালিকাভুক্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেরা "একটি নির্ব্বাচক মণ্ডলী" গঠন করিয়া প্রত্যেকে একটী ভোট দ্বারা প্রত্যেক সংরক্ষিত আসনের জন্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের চারজন নির্ব্বাচন-প্রার্থীর একটী প্যানেল নির্ব্বাচন করিবেন এবং এরূপ প্রাথমিক নির্ব্বাচনে যে চারজন লোক সর্ব্বোচ্চসংখ্যক ভোট পাইবেন তাঁহারা সাধারণ নির্ব্বাচক মণ্ডলী দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবার জন্য নির্ব্বাচন প্রার্থী হইবেন।

৩। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদেও অনুরূপ ভাবে যৌথ নির্ব্বাচন প্রথা দ্বারা অনুন্নত সম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হইবে। কিন্তু প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ সম্বন্ধে ২নং সর্ত্তে যে প্রাথমিক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা আসন সংরক্ষিত থাকিবে।

৪। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদে বৃটিশ ভারতের মোট আসনের শতকরা ১৮টী হারে আসন অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

৫। সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে প্যানেল নির্ব্বাচন সম্পর্কে যে প্রাথমিক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা হইবে, ১০ বৎসরে উহার অবসান হইবে; সম্ভব হইলে তৎপূর্ব্বেও চুক্তির নিম্নোক্ত ৩ ধারানুসারে ঐ ব্যবস্থা রহিত করা হইবে।

৬। চুক্তির ১ এবং ৪ ধারানুসারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সংরক্ষিত আসনে নির্ব্বাচন ব্যবস্থা এই চুক্তির স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বহাল থাকিবে।

৭। কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক আইন সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যাপারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার লোথিয়ান কমিটির নির্দ্দেশানুরূপ হইবে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহে নির্ব্বাচন ব্যাপারে বা সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ ব্যাপারে অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া কাহারও কোনরূপ অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতা থাকিবে না। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক হইতে বিবেচনা করিয়া অনুন্নতগণকে ঐ সকল ব্যাপারে যথাযোগ্য অধিকার দানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে।

৮। প্রত্যেক প্রদেশে অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষার সুবিধা দানের জন্য সরকারী শিক্ষা ব্যয় হইতে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে।

২৫শে সেপ্টেম্বর সংবাদ-পত্র-প্রতিনিধির নিকট মহাত্মাজী বলেন—

"প্রধান মন্ত্রী যদি আপোষনামাটি হুবহু মানিয়া লন তাহা হইলে আমি উপবাস ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইব। বৃটিশ মন্ত্রিসভার নির্দ্ধারণ শাসন-সংস্কারের পথে যে বিপুল অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল—আপোষের রাজনৈতিক দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহাই দূর হইয়াছে মাত্র। আপোষের প্রকৃত কার্য্য যাহা তাহা এখন আরম্ভ হইবে; প্রধান মন্ত্রীর নিকট আপোষের যে মর্ম্ম তারযোগে প্রেরণ করা হইয়াছে তাহা যদি তিনি হুবহু মানিয়া লন তাহা হইলে আমার অনশন অবশ্যই শেষ হইবে এবং অতঃপর আমার যথার্থ সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। বস্তুতঃ মন্ত্রিসভা যদি চিঠিপত্রগুলি সময়মত প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে আমি তথাকথিত উচ্চবর্ণ হিন্দুগণের কর্ত্তব্য যথাযথ পালনের নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য হইতাম। আমি যদি তাহা না করিতাম তাহা হইলে আমি বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধে অপরাধী হইতাম। কিন্তু তাঁহারা (উচ্চবর্ণ হিন্দুগণ) আমার অনশনের সঙ্কল্প ভাবিয়া দেখিবার সময় পান নাই; কাজেই আমি আশা করিতে পারিনা যে, তাঁহারা অকস্মাৎ হিন্দুর চিন্তাজগতে বিপ্লব সৃষ্টি করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদের কাজ করিবার উপযোগী কিছু সময় চাই-ই। তাই আমি আমার সহকর্ম্মিদের বলিয়াছি যে, মন্ত্রিসভার সন্তোষজনক উত্তরের ফলে আমার এই অনশন যদি ভঙ্গ করিতে হয় তাহা হইলে ইহা সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখিতে হইবে; আগামী কয়েক মাস মধ্যে উচ্চবর্ণ হিন্দুগণ যদি তাঁহাদের কর্ত্তব্য যথাযথভাবে পালন না করেন তাহা হইলে অনশন পুনরায় আরম্ভ হইবে। এই পাঁচ দিনের মধ্যে দেশে যে বিপুল জাগরণ দেখা দিয়াছে তাহাতে আমার মন এই আশায় ভরিয়া উঠিয়াছে যে, গোঁড়ামি বিলুপ্ত হইবে এবং হিন্দু-ধর্ম্ম অস্পৃশ্যতা-দোষ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। অস্পৃশ্যতাই আজ হিন্দু-ধর্ম্মকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিতেছে।" ভবিষ্যৎ কার্য্যপন্থা সম্বন্ধে গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, "আমার মনে হয় ভবিষ্যৎ কর্ম্মধারা গবর্ন্মেন্টের হাতে।"

২৬শে সেপ্টেম্বর প্রধান মন্ত্রীর সম্মতিজ্ঞাপক সংবাদ আসিলে মহাত্মাজী তাঁহার অনশন-ব্রত ভঙ্গ করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, শ্রীমতী কমলা নেহেরু, শ্রীযুক্তা গান্ধী, বল্লভ ভাই প্যাটেল, মহাদেব দেশাই প্রভৃতি প্রায় শতাধিক আত্মীয়-বন্ধু ও সহকর্ম্মী অনশন-ব্রত ভঙ্গের সময় যারবেদা জেলে মহাত্মাজীর নিকট উপস্থিত ছিলেন।

মাসকাবারি

রাজনৈতিক বিগ্রহ

১লা সেপ্টেম্বর—মধ্যপ্রদেশ কাউন্সিলে শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরে কোন সন্তোষজনক সংবাদ পাওয়া যায়নি।

দামো জেলে বন্দী অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, ভূপতি মজুমদার, পূর্ণ দাস ও সুরেশ দাসের সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরও সন্তোষজনক নয়।

মাদুরায় ভারত লীগের মিস্ মণিকা হুইট্‌লে ব'লেছেন, বৃটিশ সংবাদ-পত্রে ভারতের খাঁটি সংবাদ পাওয়া যায় না ব'লে তাঁরা ভারত ভ্রমণে এসেছেন। লীগের প্রতিনিধিগণ সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে কাঁথি পরিদর্শন করতে পারেন।

২রা—কলিকাতার এক জনবহুল সভায় মালব্যজী বলেছেন, একই সঙ্গে দমন-নীতি ও শাসনতন্ত্র রচনা, গবর্ণমেন্টের এই দ্বৈতনীতি উদ্দেশ্যলাভে ব্যর্থ হয়েছে। পৃথক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে জাতীয় দায়িত্বশীল রাষ্ট্রতন্ত্র অসম্ভব। যুক্ত নির্ব্বাচন বিষয়ে একটা আপোষ মীমাংসার জন্য তিনি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেছেন।

৪ঠা—সাম্প্রদায়িক রায়ের প্রতিবাদার্থে কলিকাতার টাউনহলে এক বিরাট সভায় তিনটি প্রস্তাব গৃহীত।

রাণী গোদামে (গয়া) বিহার রাজনৈতিক সম্মেলন সম্পর্কে প্রায় চারশ লোক গ্রেপ্তার।

৬ই—দিল্লীর গোয়েন্দা পুলিশ দিল্লীতে এক বিপ্লবী দল আবিষ্কার করেছে, এ সম্পর্কে ১৪ জন গ্রেপ্তারও হয়েছে। নূতন এক ষড়যন্ত্র মামলা হবে ব'লে প্রকাশ।

৭ই—বোম্বায়ে কংগ্রেস পক্ষ ও পুলিশে বহুদিন ধ'রে লুকোচুরি চলেছে, অর্থাৎ পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়ে কংগ্রেস পক্ষেরা স্থানে স্থানে ভাটি ক'রে তাদের কাজ চালাচ্ছে। প্রকাশ, আজ পুলিশে গ্র্যাণ্ট রোডে এক বাড়িতে হানা দিয়ে মাল্‌গী ও চেন্দুর নামে কর্ণাটক সেবাদলের দুই পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করেছে। ঐ স্থানেই কিছুক্ষণ পরে ওয়াগ নামে আর এক ব্যক্তিকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এরাই এতদিন নাকি পুলিশের চোখে ধূলি দিয়ে আসছিল।

৮ই - শীতের প্রারম্ভে বাংলার কয়েকটি স্থানে (ঢাকা, কুমিল্লা, মৈমনসিংহ) সৈন্য সমাবেশে বাসস্থানের আয়োজন উদ্যোগাদি।

গত ৪ঠা জুলাই মেদিনীপুরে মাগুরিয়ায় নিখিল-ভারত-বন্দী দিবসোপলক্ষে একটি সভার অধিবেশনে পুলিশ গুলি চালনা করে। কাঁথি জেলে গত কাল সেই মোকর্দ্দমার এক দফা শুনানি হয়েছে।

বোম্বায়ে ডাঃ মুঞ্জে কর্ত্তৃক তাঁর ইংলণ্ডের কার্য্যের কৈফিয়ৎ হিসাবে বক্তৃতা, —আমি বাল্যকাল হতেই তিলকের শিষ্য। আমি তাঁরই মত সরকারের সঙ্গে সময়োপযোগী দর-কষাকষিতে আস্থাবান।

দ্বারভাঙ্গায় জেলা-রাষ্ট্রীয়-সম্মেলন-সভায় পুলিশ কর্ত্তৃক ৮৩ জন গ্রেপ্তার, (পরে ৭১ জন মুক্ত) ও ১০০ জন আহত।

১১ই—মৈমনসিংহে প্রায় ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নয় শত সৈন্যবাসের ছাউনি নির্ম্মাণ-ব্যবস্থার সংবাদ।

কলিকাতা-বড়বাজারে বে-আইনী ঘোষিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবক যুবকের শোভাযাত্রা পুলিশ কর্ত্তৃক ছত্রভঙ্গদৃশ্য ভারত-লীগের মিঃ হুয়েট্‌লে ও হ্যারিসন্ কর্ত্তৃক দৃষ্ট।

১২ই—মহাত্মাজী গত ১১ই মার্চ্চ তারিখে স্যর স্যামুয়েল হোরকে এক পত্র লিখে জানান যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা হ'লে তিনি প্রায়োপবেশনে মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করবেন। ১৩ই এপ্রিল তারিখে স্যর স্যামুয়েল এ চিঠির উত্তরে লেখেন, 'আমাদের অবস্থায় আপনিও এই ব্যবস্থাই করতেন।' অতঃপর ১৮ই আগষ্ট তারিখে মহাত্মাজী প্রধান মন্ত্রীকে জানান্ যে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিভিন্ন অংশ বিশেষ আপত্তিজনক, সুতরাং ২০শে সেপ্টেম্বর হ'তে তিনি প্রায়োপবেশন করবেন। প্রধান মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন, গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত হ'তে পারে না।

১৩ই—মহাত্মাজীর মৃত্যুপণে দেশব্যাপী সংক্ষোভ।

'ডেলী হেরাল্ড' 'ডেলী টেলিগ্রাফ' 'টাইমস্' 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' ইত্যাদি সমস্ত বিলাতী পত্রিকারই সুর চিন্তিত। শুধু 'মর্ণিংপোষ্ট' পত্রিকাই রক্ষণশীল দলের সুর ছাড়েনি।

লণ্ডন থেকে বিঠলভাই প্যাটেল মহাত্মাজীকে আবেদন পাঠিয়েছেন—মহাত্মাজীর জীবন-ব্রত এখনও অসমাপ্ত, আত্ম-বলিদানে তাঁর অধিকার নেই।

যতীন্দ্র-দাস-স্মৃতিদিবস উপলক্ষে কলিকাতায় বহু লোক গ্রেপ্তার।

১৪ই—ডাঃ আম্বেদকার ফ্রীপ্রেস-প্রতিনিধিকে বলেছেন, গান্ধীজীর প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশনহেতু সর্ব্বনাশ-নিবারণের উদ্দেশ্যে মালব্যজী কর্ত্তৃক ১৭।১৮ই দিল্লীতে অনুন্নত সম্প্রদায় ও অন্যান্য হিন্দু নেতাদের বৈঠক আহ্বান।

ঢাকা সহরে বিপ্লব-অনাচার-নিবারণার্থে ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক প্রহরী-সমিতি গঠন-পরামর্শ। ৮ ভাগে ও ৮৪ উপবিভাগে ঢাকা বিভক্ত।

১৫ই—কলিকাতা অ্যালবার্ট হলে শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বিরাট জন সভায় চিকিৎসার্থে সুভাষচন্দ্র ও সেনগুপ্তের অবিলম্বে মুক্তির প্রস্তাব গৃহীত।

কলিকাতা টাউন-হলে অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিরাট সভায় মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশন-ব্রত সম্পর্কে কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত।

ডাঃ মুঞ্জের বিবৃতি—যুক্তনির্ব্বাচনের ভিত্তিতে অস্পৃশ্যগণকে যদি শতকরা এক শত সদস্যপদও দেওয়া হয়, আমি আপত্তি করবো না।

১৬ই—মালব্যজীর নির্দ্দেশ—আগামী ১৮ই প্রায়োপবেশন-দিবস পালন করা হোক্। মালব্যজীর প্রস্তাবিত সভা দিল্লীতে না বসে বোম্বায়ে বসবে।

ইণ্ডিয়া লীগের সদস্যগণ কর্তৃক প্রধান মন্ত্রী, ভারত-সচিব ইত্যাদিকে ভারতে মহাত্মাজীর অবিসম্বাদী নায়কত্ব সম্পর্কে তার-প্রেরণ।

ব্যবস্থা-পরিষদে স্বরাষ্ট্র-সচিবের বিবৃতি—অনশন আরম্ভ করা মাত্র মহাত্মাজীকে সরকার কর্তৃক স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত।

এনড্রুজের তারের উত্তরে মহাত্মাজী বলেছেন—'অনশন ভগবানের আহ্বান।' লণ্ডনে ভারত-মিলন সমিতির সভায় স্থির হয়েছে সদস্যগণ মহাত্মাজীর মুক্তির জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। রবিবারে বিভিন্ন গির্জ্জাকে প্রার্থনা অনুরোধার্থে প্রস্তাব গৃহীত।

লণ্ডন 'টাইম্‌স'এ অ্যালবিয়ন ব্যানার্জ্জী মহাত্মাজীর সঙ্কল্পের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

'ভারতীয় জাতীয় সঙ্ঘ'এর ফেণার ব্রকওয়ে ইত্যাদি কর্তৃক মহাত্মাজীকে তার—সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত বাতিল করতে আমরা প্রয়াস পাবো। ক্যাণ্টারবারীর ডীন প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষরে রবিবার লণ্ডনে ভারত-সমস্যা সমাধানার্থে প্রার্থনার আবেদন।

মালব্যজীর নিমন্ত্রণে বোম্বাই বৈঠকে যোগদান 'কার্য্যোপদেশে অসম্ভব' জানিয়ে আম্বেদকার বলেছেন, বৈঠক বসবার পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধীর সুস্পষ্ট মত জানা দরকার। পূর্ব্বে তিনি সর্ব্বদা গান্ধীকে মিষ্টার অভিহিত করতেন। ফ্রী প্রেসের প্রতিনিধিকে আম্বেদকারের বিবৃতি—"যতই দোষ থাকুক না কেন মহাত্মা গান্ধী বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি, আমার আপনার মত সুবিধাবাদী নন।"

হেমচন্দ্র নস্কর, বিরলা,, যতীন্দ্র বসু, নীলরতন সরকার, নলিনীরঞ্জন সরকার কর্তৃক বড়লাটকে—মহাত্মাজীর মুক্তির জন্য তার। দেবদাস গান্ধীর বিবৃতি—মহাত্মাজী জীবিত থাকুন আর নাই থাকুন অস্পৃশ্যতাকে মরতেই হবে।

আগামী নিখিল ভারত খিলাফৎ বৈঠকের নির্ব্বাচিত সভাপতি আবদুল মজিদের বিবৃতি—মহাত্মা গান্ধীর এই দৃঢ় সঙ্কল্পের কারণ পৃথক নির্ব্বাচন-প্রথা নয়, মূল কারণ জাতিভেদ-প্রথা।

দিল্লীতে সর্ব্বপ্রথম অহিংস রাজনৈতিক মামলার শুনানি আরম্ভ। এই মামলায় ১৪জন কংগ্রেসী বেআইনী সমিতির কার্য্য-পরিচালনার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০খ ধারায় ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি সংশোধন আইনের ১৭।১ ধারায় অভিযুক্ত হয়েছেন।

বঙ্গের বিভিন্নদলের নেতৃবৃন্দকর্তৃক মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশন সম্পর্কে আবেদন—"অস্পৃশ্যদের জন্য মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত করুন।"

প্রকাশ, ঢাকায় সৈন্য-বাহিনীর বাসস্থান-নির্ম্মাণের জন্য আনুমানিক ২লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। ২০ জন অফিসার ও ৭ শত সৈন্যের জন্য ১৮টি ছাউনি হ'চ্ছে।

১৭ই—অন্ততঃ অনশন স্থগিত রাখবার জন্য শ্রীযুক্ত রাজাগোপালচারিয়ার অনুরোধের উত্তরে মহাত্মাজী বলছেন—'বেদনার কোন কারণ নেই আনন্দ কর।" গবর্ণমেণ্ট রাজাগোপালচারিয়াকে জেলে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি দেন নি।

মহাত্মাজীর নিকট ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ও পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার মিলিত আবেদন—।

লণ্ডন 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রে লেখা হয়েছে—গান্ধীজীর আত্মত্যাগ ব্যর্থ হ'লে ভারতবর্ষ হিংসানীতি অবলম্বন করবে। গান্ধীজী ভারতের অবস্থাকে চরমে উপনীত করেছেন—"গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ ব্যতীত এই অবস্থার হাত হ'তে পরিত্রাণ নেই।"

১৮ই—ডাঃ আম্বেদকার নিমন্ত্রিত হ'য়ে বোম্বায়ে নাগরিকদের এক জরুরী সভায় যোগদান করেছিলেন। সেখানে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, "যে কোনও উপায়ে মহাত্মাজীকে বাঁচাতে হবে।"

গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি (মাদ্রাজ) মিঃ শ্রীনিবাসের বিবৃতি—পৃথক নির্ব্বাচনের সিদ্ধান্ত নিম্নের কয়টি সর্ত্তে পরিত্যাগ করা যায়—(১) যদি সর্ব্বসাধারণকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হয়। (২) যদি অস্পৃশ্যতা বিধিবদ্ধ অপরাধের মধ্যে গণ্য হয়। (৩) যদি অনুন্নতদের সংখ্যা হিসাবে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য ব্যবস্থা হয়।

বাগনন থানা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে ৪৫ জন গ্রেফ্‌তার।

কলিকাতা গড়ের মাঠের সভায় মহাত্মা গান্ধীর অনশন সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত।

পুণা লাটপ্রাসাদে গবর্ণরের সঙ্গে আম্বেদকারের কথাবার্ত্তা। ফ্রীপ্রেস-প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন—সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার।

কালীঘাটের মন্দির-দ্বার অস্পৃশ্যদের নিকট মুক্ত।

মহাত্মার নিকট রবীন্দ্রনাথের তার—"আমাদের শোককাতর অন্তর শ্রদ্ধা ও প্রীতিযুক্ত হ'য়ে আপনার এই পবিত্র কৃচ্ছ্র সাধন অনুধাবন করবে।"

হিন্দু প্রতিনিধিগণের বিবৃতি—মহাত্মাজী বলেছেন যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হ'লেই তিনি অনশন ত্যাগ করবেন।

১৯শে—বোম্বায়ে সকল শ্রেণীর হিন্দু প্রতিনিধির বৈঠক দুই ঘণ্টা আলোচনার পর পুণার সংবাদ-প্রতীক্ষায় মূলতুবী।

সর্ত্তে আবদ্ধ হ'য়ে মহাত্মাজীর মুক্তিলাভে অসম্মতি-জ্ঞাপন।

আম্বেদকারের বিবৃতি—'হয় মিটমাটের কথাবার্ত্তা, না হয় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম—দু'য়ের একটা।'

বোম্বাই হাইকোর্ট কর্তৃক 'ফ্রীপ্রেস জার্ণাল'এর জামীনের টাকা বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে আপীল অগ্রাহ্য।

২০শে—দ্বিপ্রহরে মহাত্মাজীর অনশন আরম্ভ।

ব্যবস্থা-পরিষদে স্বরাষ্ট্র-সচিবের বিবৃতি—মিঃ গান্ধীকে স্থানান্তর করা বিষয়ে মিঃ গান্ধী বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে তার করেছেন, 'আমাকে বিরক্ত করবেন না। কেননা আমাকে মুক্তি দিয়ে যদি আমার স্থান থেকে স্থানে গমনাগমন সম্পর্কে কোন সর্ত্ত থাকে, তা আমি পালন করবো না।' গবর্ণমেণ্ট তাঁর এই সিদ্ধান্তে দুঃখিত। সুতরাং যারবেদা জেলে তিনি শান্তিতেই থাকুন। সেখানে তাঁর আলাপ আলোচনায় উপর কোন বাধা নিষেধ থাকবে না।

বোম্বায়ে মালবাজী আহূত হিন্দু নেতৃ-সম্মেলন অনশনারম্ভের সংবাদে দুই ঘণ্টা আলোচনার পর বন্ধ। ডাঃ আম্বেদকার সহযোগিদের সঙ্গে পরামর্শার্থে সময় চেয়েছেন।

সন্ধ্যায় মহাত্মাজীর সংবাদ-পত্র-প্রতিনিধিদের নিকট বিবৃতি—স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে জোড়াতালি চুক্তি নয়। সদস্যপদ রিজার্ভ রাখবার ব্যবস্থায় নিপীড়িত সম্প্রদায়ের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে ক্ষতি। "জীবনের স্বপ্ন সফল করবার জন্য অগ্নিদ্বারে প্রবেশ করেছি।"

মহাত্মাজীর উপবাস উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক শান্তিনিকেতনে বিশেষ বক্তৃতা।

২১শে—সাপ্রু, জয়াকর, রাজাগোপালচারিয়া, রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিরলার সহিত মহাত্মাজীর আজ সকালে সাক্ষাতের ফল আশাপ্রদ। কিন্তু মহাত্মাজী আম্বেদকার ও রাজা ইত্যাদির সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে চূড়ান্ত মতামত কিছুই প্রকাশ করবেন না।

বোম্বাই নেতৃবৃন্দের বৈঠকে আম্বেদকারের বিবৃতি। (১) অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্তে ৭১টি সদস্যপদ নির্দ্দিষ্ট আছে। তৎপরিবর্ত্তে ১৯৭টি পদ নির্দ্দিষ্ট করতে হবে (২) কতিপয় সর্ত্তসহ ১০ বৎসরের জন্য যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হ'তে পারে (৩) প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নিয়মানুযায়ী কেন্দ্রীয় পরিষদেও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য লোকসংখ্যানুসারে সদস্যপদ নির্দ্দিষ্ট রাখতে হবে।

২৩শে—অনশনের ফলে মহাত্মাজীর মধ্যে মধ্যে বমির ভাব। চোখ খুলে রাখা কষ্টকর হয়েছে, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ।

২৪শে—ডাক্তার মহাত্মাজীকে পরীক্ষা ক'রে বলেছেন, যদি তাঁর সাথে অনাবশ্যক দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করা না হয়, তাহলে উপবাস-ভঙ্গের পরও তাঁর জীবনের আশঙ্কা থাকবে। নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটা মীমাংসা হয়েছে। আপোষনামা মহাত্মাজী সই করেছেন।

প্রধান মন্ত্রীর নিকট তার-প্রেরণ।

রবীন্দ্রনাথ ও বাসন্তী দেবীর পুণা যাত্রা।

২৫শে—আপোষনামার ৯ দফা সর্ত্তের প্রধান ৩টী [১] অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য প্রাদেশিক সভায় নিম্নোক্তরূপে আসন বণ্টন করা হবে। বাঙ্গলা (৩০), বোম্বাই (১৫), মান্দ্রাজ (৩০), বিহার উড়িষ্যা (১৮) মধ্যপ্রদেশ (২০), যুক্ত-প্রদেশ (২২), পাঞ্জাব (৮), আসাম (৭)। [২] অনুন্নত সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচক মণ্ডলী প্রত্যেক সংরক্ষিত আসনের জন্য চার জন নির্ব্বাচন প্রার্থীর একটি 'প্যানেল' নির্ব্বাচন করবেন। এঁরাই সাধারণ নির্ব্বাচক মণ্ডলীর নির্ব্বাচন প্রার্থী হবেন। [৩] কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদেও অনুরূপ বন্দোবস্ত।

মহাত্মাজীর আড়াই পাউণ্ড ওজন হ্রাস। স্নানাগারে যেতে প্রচারের সাহায্য লেগেছে।

২৭শে—প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক আপোষনামার সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণ সম্পর্কিত চুক্তি সমর্থিত। মহাত্মাজীর অনশন-ভঙ্গ।

নৈতিক সন্ধি

২রা সেপ্টেম্বর—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিপ্লবী অনাচার দমন বিলের সিলেক্ট কমিটিতে পুনরায় প্রেরণের সংশোধন-প্রস্তাব (নরেন্দ্র বসু আনীত) এবং আরও কয়েকটি সংশোধন-প্রস্তাব অগ্রাহ্য। প্রশ্নোত্তরে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাড়ী-দখলের একটি তালিকা মিঃ রীড জ্ঞাপন করেছেন।

৩রা—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন সংশোধন বিল ১৫-১৮ ভোটে গৃহীত।

বিহার উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভায় রায়বাহাদুর লক্ষ্মীপ্রসাদ সিংহের আনীত—দেশের অসন্তোষ দূরীকরণার্থে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় দায়িত্বসহ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্ত্তন-প্রস্তাব অধিকাংশ ভোটে গৃহীত।

আগামী ব্যবস্থা-পরিষদে ৮টি সরকারী বিল আছে (১) আয়কর (২) ভূমাধিকার (৩) ভারতীয় মহাজনীন (৪) ব্যবসায় বিরোধ (৫) সেনা-নিবাস (৬) রেলওয়ে (৭) ফৌজদারী আইনের সংশোধন প্রস্তাব (৮) শ্রমিক বালকদের নিকট হ'তে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ নিবারণ প্রস্তাব।

৫ই - ব্যবস্থা পরিষদ উদ্বোধনে বড়লাটের বক্তৃতা। বক্তৃতায় সীমান্তের অবস্থা, অটোয়া চুক্তি ইত্যাদির উল্লেখান্তে আইন অমান্য আন্দোলন লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন, সম্মিলিত অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্ব্বেই কতকগুলি বিধান দ্বারা সাধারণ আইনকেই আরও দৃঢ় করতে হবে। অতঃপর বাংলার বিপ্লবী অনাচার, শাসনতন্ত্র রচনা, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত বিষয়ে মত জানিয়ে বলেন, 'যথাসম্ভব কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দায়িত্ব সহ নিখিল ভারত যুক্তরাষ্ট্র গঠনই বৃটিশের মূল নীতি।'

দুই ঘণ্টা বিতর্কের পর সর্দ্দার শান্ত সিংহের মুলতুবী প্রস্তাব আলোচনায় পর্য্যবসিত হয়।

প্রশ্নোত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব বলেন —আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিতা নারীর সংখ্যা গত জুলাই মাস পর্য্যন্ত—২৭১১।

৬ই—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিপ্লবী অনাচার দমন বিল ৫৮-১২ ভোটে গৃহীত ও বঙ্গীয় মিউনিপ্যাল বিল পাস।

ব্যবস্থা-পরিষদে স্যর হরিসিং গৌরের হিন্দু-বিবাহ বিচ্ছেদ-বিলের পুনঃ-প্রচারের প্রস্তাব ৩০-২৩ ভোটে গৃহীত। রাজা কৃষ্ণম্ আচারিয়ার বাল্য বিবাহ-নিরোধ আইন সংশোধনার্থে বিলের আলোচনা শ্রীযুক্ত বি দাসের ভারতের জন্য বৃটিশ সৈন্য-সংগ্রহের ব্যয় ভারতের স্কন্ধ হ'তে আদায় সম্পর্কে ট্রাইবুন্যাল-নিয়োগ বিরুদ্ধে মুলতুবী প্রস্তাব। মুলতুবী-প্রস্তাবটি ৪৯-১৮ ভোটে অগ্রাহ্য হয়েছে। প্রশ্নোত্তরে দেউলী জেলে রাজবন্দীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা ও কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশন নিষেধ করা সম্পর্কে কথা-কাটাকাটি হয়।

৭ই—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বৈঠক শেষ। মোটর আইন সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটির নির্দ্ধারণ দুই একটি সংশোধনের পর গৃহীত। কুসীদজীবী বিল সাধারণে পুনর্প্রচার প্রস্তাব পেশ।

ব্যবস্থা-পরিষদে ডাঃ জিয়াউদ্দীন আহম্মদের ভারতীয়দের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে বাণিজ্য-সুবিধাবিষয়ক বিল ৫৫-৪০ ভোটে গৃহীত। বর্ত্তমান বৈঠকে এই প্রথম সরকার পক্ষের পরাজয়।

৮ই—ব্যবস্থা-পরিষদে ফৌজদারী আইন সংশোধন-প্রস্তাব সিলেক্ট কমিটিতে প্রস্তু।

প্রশ্নোত্তরে মিঃ হেগ আইন-অমান্য আন্দোলনার্থে বে-আইনী জনতা ছত্রভঙ্গের প্রতি গুলিবর্ষণ সম্পর্কে নিম্নের বিবৃতি দান করেন।

	গুলিবর্ষণ	নিহত	আহত
বাঙ্গলা	১৭	২০	৭৪
বোম্বাই	×	৩৪	৯১
যুক্তপ্রদেশ	৭	৯	১০৬
বিহার ও উড়িষ্যা	৩	২০	৪০
মান্দ্রাজ	১	১	২
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ	১	২	১

বড়লাটের উক্তি সম্বন্ধে সাপ্রুর বিবৃতি—লক্ষ্যে পৌঁছুতে হ'লে গবর্ণমেণ্ট কিম্বা কংগ্রেসের কার্য্য-পন্থার যৌক্তিকতা প্রমাণ বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য নয়, মাত্র এক সঙ্গে সমস্ত দলের প্রতিনিধির কাজ করা যাতে সম্ভব হয়, তাই দেখা কর্ত্তব্য।

আগামী ২৩শে সিমলাতে দেশীয় নৃপতিবৃন্দের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে যে আলোচনা-বৈঠক বসবে, বড়লাট কর্ত্তৃক তাতে ২৬ জন সামন্ত নৃপতি নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

৯ই—কলিকাতায় ভারত লীগের প্রতিনিধিবৃন্দের আগমন।

১০ই—'বোম্বে ক্রণিকেল'এর সংবাদে প্রকাশ, বড়লাট উইলিংডন কাপ-দিবস উপলক্ষে পুণা-পরিদর্শনকালে মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

বোম্বায়ে উদারনৈতিক সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার পুনরায় অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত। সরকার পুনরায় গোলটেবিলের আহ্বান করাতে এই সমিতি আনন্দ বোধ করছেন। প্রতিষ্ঠান সরকারকে কয়েকটি বিষয়ে সম্মত হ'তে বলেছেন। (১) কার্য্য-তালিকা স্থির করাতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের যোগদানের অধিকার থাকবে (২) সংবাদ-পত্র ও জনসাধারণকে বৈঠকের বিবরণ জানাবার ব্যবস্থা করা হবে (৩) অর্থ নৈতিক ও অন্যান্য ব্যবস্থার শেষ নিষ্পত্তি এই বৈঠকে হবে। (৪) কেন্দ্রীয় দায়িত্ব স্থগিত রাখা উচিত হবে না (৫) তৃতীয় বৈঠকে সকলকে সহযোগিতায় নিমন্ত্রণ করতে হবে।

১২ই—প্রশ্নোত্তরে ব্যবস্থা-পরিষদে প্রকাশ, গত জানুয়ারী থেকে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক কারাদণ্ডিত বালকবালিকার সংখ্যা ২২৯৩।

প্রকাশ, গোলটেবিলের নূতন সংস্করণে আগা খাঁ, চৌধুরী জাফরুল্লা খাঁ, এ এইচ গজনভী, সাফাৎ আহম্মদ খাঁ মুসলমান পক্ষের এবং সাপ্রু, জয়াকর, প্রভাস মিত্র ও সি পি রামস্বামী আয়ার হিন্দু পক্ষের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

১৩ই—ব্যবস্থা-পরিষদের লবীমহলে গুজব যে গবর্ণমেণ্ট মহাত্মাজীকে শীঘ্রই মুক্তি প্রদান করবেন। মহাত্মাজীর পত্রালোচনা সম্পর্কে রঙ্গ আয়ারের প্রস্তাব আলোচনায় পর্য্যবসিত।

ব্যবস্থা-পরিষদে প্রশ্নোত্তরে জানা যায় সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য-নিবাস গমন এখনও সরকারের বিচারাধীন।

১৪ই—ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মিঃ হেগ অর্ডিন্যান্স বিল ও বঙ্গীয় বিপ্লবী অনাচার দমন আইন বিল পেশ করেন। ১৯৩২ সালের বিশেষ ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্সের (১০নং) বিভিন্ন বিধান এবং প্রচলিত কয়েকটি আইনের (মধ্যপ্রদেশের শিশু আইন, বঙ্গীয় শিশু আইন প্রভৃতি) সংশোধন এই বিলে আছে।

১৫ই—ভারত লীগের মিস্ উইলকিন্সন্ ও কৃষ্ণ মেননের ঢাকায় অভ্যর্থনা।

মিস হুয়েটলি ও মিঃ ম্যাটার্স মেহেরপুরে অভ্যর্থিত।

ব্যবস্থা-পরিষদে টাটা কোম্পানীর পরিচালনে তদন্ত আবশ্যক সম্পর্কে অমরনাথ দত্তের প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

১৬ই— মিস্ হুয়েটলী ও মিঃ ম্যাটার্সের কাঁথিতে ১০ হাজার নরনারী কর্ত্তৃক অভ্যর্থনা।

ব্যবস্থা-পরিষদে হজযাত্রী বিল পাশ।

২০শে—ব্যবস্থা-পরিষদে সর্দ্দা বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইন সংশোধনার্থ রাজা কৃষ্ণম আচারির বিল ২১-৫৩ ভোটে অগ্রাহ্য।

সিমলা বড়লাট ভবনে পরিষদ-কক্ষে ভারতীয় রাষ্ট্র-পরিষদের শারদীয় অধিবেশন আরম্ভ। স্যর হেনরি মনক্রিয়েফ স্মিথ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। লী কমিশনের দরুণ সুবিধা-প্রত্যাহার প্রস্তাবে রাজস্ব-বিভাগের সেক্রেটারি মিঃ টেলর বলেন,—'সরকার ঐ সমস্ত সুবিধা প্রত্যাহার ন্যায়সঙ্গত মনে করেন না।'

ব্যবস্থা-পরিষদে স্যর হরিসিং গৌর কর্ত্তৃক ১৯২২ সনের ভারতীয় ইনকাম ট্যাক্স আইনের সংশোধন বিল সিলেক্ট কমিটিতে দেবার প্রস্তাব। বিলটি জনসাধারণে প্রচারের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

২১শে—রাষ্ট্র-পরিষদে ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটির বিভিন্ন রিপোর্ট সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা। স্থায়ী প্রেসিডেণ্ট পদ রহিত।

সিমলা রাজন্য সম্মেলনে দেশীয় রাজন্যবর্গ ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সন্তোষ-জনক মীমাংসা। যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থ নৈতিক সমস্যা ও যুক্তরাষ্ট্র পরিষদে দেশীয় রাজন্যবর্গের সদস্য-পদ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় আগামী লণ্ডন বৈঠকে মীমাংসিত হবে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রসম্পর্কে

১লা সেপ্টেম্বর—ল্যাঙ্কাশায়ার ধর্ম্মঘটের ফলে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের বাজারে যথেষ্ট গোলযোগ—কণ্ট্রাক্ট অনুযায়ী মাল সরবরাহ অসম্ভব হ'য়েছে।

ভার্সাই সন্ধির সামরিক সর্ত্তের পুনরালোচনা এবং জার্ম্মান সৈন্য বিভাগের পুনর্গঠন সম্বন্ধে জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে পত্র দিয়েছেন। প্যারিসে প্রকাশ, জার্ম্মানির দাবী—তিন লক্ষ সৈন্য বৃদ্ধি, ট্যাঙ্ক ফৌজ, বৃহৎ রণতরী, ৩৫টি অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা।

মুকডেনে চৈনিক আক্রমণ, আক্রমণকারিদের সংখ্যা প্রায় ৫০০০ ব'লে টোকিয়োর এক সংবাদে প্রকাশ।

বার্লিন স্পোর্টস প্রাসাদে লৌহ-শিরস্ত্রাণ বাহিনীর এক বিরাট সভায় জার্ম্মানির ভূতপূর্ব্ব যুবরাজ ও কাইজারের অপরাপর পুত্রগণ উপস্থিত ছিলেন। বাহিনীর নেতা হের সেণ্ড বলেছেন, ভার্সাই সন্ধি ও ভাইমার শাসনতন্ত্র ভাঙ্গতে হবে, জার্ম্মানিতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করতে হবে। বিভিন্ন দলের কার্য্যকারিতা শাসনতন্ত্রে ব্যর্থ হওয়ায় সৈনিকদের যুগ আবার এসেছে, তাঁর মত এই।

২রা—জাপান ও মাঞ্চুরিয়ায় মিত্রতাসূচক সন্ধিতে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের সৈন্য-সমাবেশের অধিকার থাকবে ব'লে প্রকাশ।

বার্লিনে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত নাৎসিদিগকে সন্দেহের সুযোগ দান করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হ'য়েছে। পুনর্ব্বিচারও হ'তে পারে।

স্যান জুর্জ্জোকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করায় স্পেনে কম্যুনিষ্টদের বিদ্রোহ-ষড়যন্ত্র সংবাদে পুলিশ দেশের সর্ব্বত্র গুপ্ত-অস্ত্রাগার অনুসন্ধান করছে—২০জন কম্যুনিষ্ট গ্রেফ্‌তার হয়েছে।

৩রা—জার্ম্মানি অস্ত্রশস্ত্রের বৃদ্ধির জন্য যে প্রস্তাব এনেছিল, ফ্রান্স তার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে বলে জানা যায়।

ল্যাঙ্কাশায়ারে মধ্যস্থতায় ধর্ম্মঘট-নিবারণ চেষ্টা চলছে। তিনজন পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য ব্যর্থ হওয়ায় শ্রম বিভাগের মন্ত্রী এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন।

৫ই—নিউ ক্যাসল ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস কর্ত্তৃক ল্যাঙ্কাশায়ার ধর্ম্মঘট সমর্থিত। ধর্ম্মঘটকারীদের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহ প্রস্তাব।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে ইতালি জার্ম্মানির অস্ত্রশস্ত্রের দাবীকে সমর্থন করেছে। লোজান বৈঠকে ইতালি যে ধাক্কা খায় তার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে ইতালি জার্ম্মানির দাবী সমর্থন করেছে ব'লে আঁচা হয়েছে।

৬ই—ভূতপূর্ব্ব কাইজার আজ তাঁর ডুর্ণো নির্জ্জনাবাস হতে কিছু কালের জন্য হল্যাণ্ডের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্বাস্থ্য-নিবাস জাণ্ডভূর্ণ্তে গেছেন।

৮ই সেপ্টেম্বর—জাতিসঙ্ঘের আগামী অধিবেশনে ডি ভ্যালেরা আইরিশ ফ্রীষ্টেট প্রতিনিধির নেতারূপে গমন করবেন ব'লে সিদ্ধান্ত হয়েছে। বোঝা যায় জাতিসঙ্ঘের কাউন্সিল এবং অ্যাসেম্বলির সভায় তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর কাউন্সিলের ও ২৬শে সেপ্টেম্বর অ্যাসেম্বলির অধিবেশন আরম্ভ। যুক্তরাষ্ট্রসচিব মিঃ ষ্টিম্‌সন বলেছেন—যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক সমরঋণ ছাড়বার যে গুজব রটেছে তা মিথ্যা।

৯ই—গ্রান্‌চাকো অঞ্চল সম্পর্কে বোলিভিয়া ও প্যারাগুয়ের মধ্যে আবার সংঘর্ষ সুরু। এবারে বোলিভিয়াই প্রথম আক্রমণ করে রোজা সিল্‌ভা দুর্গ দখল করেছে।

ল্যাঙ্কাশায়ারে ধর্ম্মঘট-প্রসারের আশঙ্কায় আপোষে কলের মালিকগণের আগ্রহ। শ্রমিক সচিব যে চিঠি লিখেছেন, কাপড়ের কলের মালিকগণ তার একটি জবাব দিয়েছেন বলে প্রকাশ।

বলশেভিক রাজত্বের ১৫শ বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে পর্দ্দায় বিপ্লবের ছবিতে স্বয়ং ষ্টালিনের সঙ্গে আরও অনেক জননায়ক নামবেন বলে প্রকাশ।

মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করতে লর্ড লিটনের নেতৃত্বে এক কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল। উক্ত কমিশন মাঞ্চুরিয়াকে সমরসজ্জাহীন ও স্বাতন্ত্র্য প্রদান করতে বলেছেন। এ সম্বন্ধে চীন, জাপান ও মাঞ্চুকু গবর্ণমেণ্ট জাতি-সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে লেখালেখি চালাবেন।

১০ই—আগামী ১২ই জার্ম্মান পার্লামেণ্টে প্যাপেনের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হবার কথা ছিল। প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেণবার্গ নাৎসি দল, কেন্দ্রদল ও ব্যাভেরিয়ার গণদলের নেতৃবৃন্দকে আগামী সপ্তাহে আলোচনার্থে আহ্বান করায় পার্লামেণ্টের সভা স্থগিত রাখা হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে উক্ত দলের নেতারা প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে যথোচিত অভ্যর্থনা পাননি বলে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সে ক্ষোভের উপশম হয়েছে কিন্তু এই পুনর্ব্বিবেচনার প্রস্তাবের সঙ্গে প্যাপেনের মন্ত্রী-সভা ভঙ্গের কোন কথা নেই।

ফ্রান্সের রাজদূত লণ্ডনে সাইমনের কাছে জার্ম্মানির রণসম্ভার-দাবীর পত্রের উত্তর অর্পণ করেছেন।

শ্রমিক বিভাগের মন্ত্রী বেটারটন ল্যাঙ্কাশায়ারের মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের প্রতিনিধিগণকে ১৩ই ম্যাঞ্চেষ্টারে এক বৈঠকে মিলিত হবার জন্য আহ্বান করেছেন।

বলিভিয়া ও প্যারাগুয়েতে চব্বিশ ঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধ।

১২ই—প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ কর্ত্তৃক জার্ম্মান পার্লামেণ্ট ভঙ্গ।

ইংলণ্ডকে বার্ষিক ভূমিকর দেওয়া সম্পর্কে ডি ভ্যালেরা কিলকেনী বক্তৃতায় বলেছেন, সংগ্রামে আমরা জয়লাভ করবোই, তজ্জন্য বহু স্বার্থত্যাগে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

১৩ই—বার্লিনে পার্লামেণ্টভঙ্গে বিভিন্ন দলের চাঞ্চল্য। নাৎসিদল প্রুশিয়াতে প্যাপেনের অপ্রতিহত শাসন অপসারণ-চেষ্টায় ব্যাপৃত।

নীতিগত পার্থক্যে ম্যাকডোনাল্ডের জাতীয় শ্রমিকদলের সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের লর্ড এলেন, দলের মুখপত্র 'নিউজ লেটার'এর কার্য্যভার ত্যাগ করেছেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সোস্যালিষ্ট নীতি গ্রহণের প্রস্তাবই এই বিপর্য্যয়ের জন্য দায়ী।

মাঞ্চুরিয়াকে স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে মেনে নেবার প্রস্তাব জাপান সম্রাট অনুমোদন করেছেন। পররাষ্ট্র সচিব উচিদা জেনারেল মুটোকে চাংচুনে সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরার্থে তার করেছেন।

বৃটেন এবং আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে সমর-ঋণ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে।

১৫ই—নানকিনের জাতীয় শাসনতন্ত্র জাপানের মাঞ্চুকোকে স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে স্বীকার করবার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিংটন, রোম, জেনেভা ও প্যারিসে আন্তর্জ্জাতিক হস্তক্ষেপের জন্য তার করেছেন। নিরস্ত্রীকরণ সভার সভাপতি মিঃ হেণ্ডারসন্ ও ভাইকাউণ্ট সিসিল লণ্ডনের এক ভোজ-সভায় জার্ম্মানির অস্ত্রশস্ত্রের দাবী সমর্থন করে বক্তৃতা দিয়েছেন।

প্রকাশ, হিটলার দলের হের গোয়েরিং (বর্তমানে জার্ম্মান পার্লামেন্টের প্রেসিডেণ্ট) ব্যক্তিগত ক্ষমতাবলে চ্যান্সেলার প্যাপেনের বিপক্ষে মানহানির অভিযোগ এনেছেন। কারণ তিনি গোয়েরিংকে পার্লামেন্টে বক্তৃতা দিতে দেন নি।

১৭ই—জার্ম্মানি কর্ত্তৃক নিরস্ত্রীকরণ-বৈঠকের সঙ্গে অসহযোগিতার সিদ্ধান্ত। অস্ত্রশস্ত্রবৃদ্ধির কাজও নাকি জার্ম্মানিতে আরম্ভ হয়েছে।

আগামী ৬ই নভেম্বর রায়কষ্ট্যাগের নির্ব্বাচনের জন্য (পঞ্চম নির্ব্বাচন) ভোটগ্রহণের তারিখ ধার্য্য হয়েছে। গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে রায়কষ্ট্যাগ ভঙ্গ হ'লে প্যাপেনের মন্ত্রিসভা স্বহস্তে ক্ষমতা রাখবার ও ব্যয়সঙ্কোচ করবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ প্যাপেনকে সমর্থন করবেন ব'লে জানা গিয়েছিল। কিন্তু নূতন নির্ব্বাচনের আদেশে বোঝা যায় তিনি ভাইমার-ব্যবস্থা সমর্থন করতে

মাঞ্চুকুতে জাপানের আধিপত্যের বিরোধী সৈন্যগণ চায়নিজ ইষ্টার্ণ রেলের কতকগুলি ষ্টেশন অধিকার ক'রে স্থানীয় জাপানী সৈন্যগণকে বেষ্টন ক'রে ফেলেছে।· ··সাংহাইয়ের এক প্রদেশে একলক্ষ দশ হাজার সৈন্য গৃহবিবাদে ব্যাপৃত হয়েছে বলে প্রকাশ।

১৯শে—অন্যান্য শক্তির সমান অস্ত্র রাখবার অধিকার স্বীকৃত না হওয়ায় জার্ম্মাণি মিঃ হেণ্ডারসনকে যে চিঠি লিখেছিলেন, মিঃ হেণ্ডার্সন তার উত্তরে লিখেছেন, জার্ম্মানির উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। জার্ম্মানির অনুপস্থিতি বৈঠকের সাফল্যে বিঘ্ন ঘটাবে।

২২শে জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ-বৈঠকে জার্ম্মানির দাবী আলোচনা সম্পর্কে মিঃ হেণ্ডারসন ও স্যর্ জন সাইমনের মতান্তর।

অটোয়া-চুক্তির সম্পর্কে বৃটনে উদারনৈতিক দলের ক্ষোভ। ফলে স্যর্ হার্ব্বাট স্যামুয়েল, লর্ড লোদিয়ান প্রমুখ ক্যাবিনেটের বর্ত্তমান লিবারেল মন্ত্রী-গণের পদত্যাগ-আশঙ্কা। 'ডেলি হেরাল্ড' পত্রে লর্ড স্নোডেনের এই সম্পর্কে নিশ্চিত পদত্যাগ-বার্ত্তা।

২৩শে--অহরাত্রে উভয় পক্ষের পূর্ণ কমিটির অধিবেশনে ল্যাঙ্কাশায়ারের ধর্ম্মঘটের মীমাংসার আশা পরিলক্ষিত।

ডি ভ্যালেরার সভাপতিত্বে জাতিসঙ্ঘ পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ।

অ্যামেরিকায় মিঃ বিঠলভাই প্যাটেল।

২৪শে—জাতি সঙ্ঘ কাউন্সিলে আগামী ১৪ই নবেম্বর পর্য্যন্ত লিটন কমিশনের রিপোর্টের আলোচনা (১লা অক্টোবর প্রকাশিত হবে) স্থগিত।

ইরাকে জাতি-সঙ্ঘের সদস্য হওয়ায় ইরাক জাতি-সঙ্ঘের কর্তৃত্ব অবসান।

সুইডেনে পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত হয়েচে। ম্যাঞ্চেষ্টারে কাপড় কলের মালিক ও শ্রমিকদের মীমাংসা।

বিবিধ

১লা সেপ্টেম্বর নাগপুর মডেল মিলে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের জেরে ৬৬০০ বেকার।

নেপালের প্রধান মন্ত্রী মহারাজা ভীম শমসের জং বাহাদুরের রাত্রি ৯॥ টায় পরলোক-গমন। মহারাজা যুদ্ধ শমসের জং বাহাদুর রাণা তাঁর স্থানে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত।

৩রা—বিহারের এক মহকুমা-হাকিমের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রাচীন রাজ-গৃহের গৃধ্রকূট বুদ্ধাশ্রমের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে প্রকাশ—দুইটি খোদিত-মুশাসন ও ১২শ শতাব্দীর পালরাজদের সময়ের অনেকগুলি প্রস্তর মূর্ত্তিও পাওয়া গেছে। মিঃ কে, পি, জয়সোয়াল এগুলি পরীক্ষা করে খুসী হয়েছেন।

১৯২১ সালে গৌরীশঙ্করশৃঙ্গে প্রথম আরোহণের চেষ্টা হয়। শৃঙ্গটি প্রায় ২৯১৮০ ফুট উচ্চ। ১৯২২।২৪।২৫ সালের আরোহণ-অভিযান সফল হয় নি। পরে কর্ণেল লর্টন ও সোমারভিল ২৮,২০০ ফুট পর্য্যন্ত আরোহণ করতে সক্ষম হন। ২৪ সালে ম্যালোরী ও আরভিং বাকী হাজার ফুট আরোহণ-চেষ্টায় প্রাণ হারান। 'রয়টার'এর সংবাদে প্রকাশ ১৯৩৩ সালে পুনরভিযান আরম্ভ হবে।

ব্যয়-সঙ্কোচের ব্যবস্থাস্বরূপ বাঙ্গলা সরকার বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস, এক্সসাইজ সার্ভিস, জুনিয়র এক্সসাইজ সার্ভিসে এ বৎসরে লোক নেবেন না।

৪ঠা—গত বৎসর কলিকাতা চিড়িয়াখানার পশু পক্ষীর খাদ্য ও বাস-স্থানের জন্য মোট ৩৪,২৮৬৲ খরচ হয়েছে।

কলিকাতা পশু ক্লেশ-নিবারণী-সমিতির স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে জনসভা।

হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু)-শীকারপুরের শেঠ উদ্ধবদাস তারাদাস একটি সিভিল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য ১ লক্ষ টাকা দান করেছেন।

৫ই—ভারত সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ'র বাণী—'বাণীগ্রহণের অবস্থা ভারত বহুদিন অতিক্রম করেছে।'

ভারতে শুল্কবৃদ্ধির সংবাদে জাপানে বস্ত্রব্যবসায়ীমহল ক্রুদ্ধ; হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বস্ত্রশিল্পও বিপন্ন।

ডাঃ বরদ্রাজুলু নাইডুর সম্পাদনে মান্দ্রাজে নূতন ইংরাজী দৈনিক "ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস" প্রকাশিত।

লাহোরে চটিগেটের মধ্যস্থিত একটি কূপের অধিকার সম্পর্কে বহুকাল যাবৎ হিন্দু মুসলমানে বিরোধ ছিল। সম্প্রতি মিউনিসিপ্যালিটি ঐ বিষয়ে মুসলমানদের অনুকূল সিদ্ধান্ত করেন। আজ সকালে এই নিয়ে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের আশঙ্কা ঘটে। আলোচনার ফলে হিন্দুদের ঐ কূপে মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃত হয়েছে। পরিবর্ত্তে মুসলমানেরা একটি নলকূপ পাবে।

প্রকাশ, সুভাষচন্দ্রের দুইটি ফুসফুসই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলে শ্রীযুক্ত জে, এম্ সেনগুপ্তের রক্তের 'চাপ ভীতিজনক ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত।

নাসিক থেকে ৮৫ মাইল দূরে হিন্দুদের গণেশ-চতুর্থী উৎসব সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপক্রম যথাসময়ে পুলিশ কর্ত্তৃক বন্ধ হয়েছে।

সুভাষচন্দ্রকে ভাওয়ালী স্বাস্থ্যনিবাসে প্রেরণ করা হবে ব'লে প্রকাশ।

নাসিক জেলে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিবাদ স্বরূপ ২৪০ জন বন্দীর অনশন ব্রত ৪ঠা সেপ্টেম্বর শেষ হয়েছে।

৭ই—পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর রাত্রি প্রায় ১০টায় দেহত্যাগ।

৭ই—রুশিয়ার অনুকরণে ভারতবর্ষের আর্থিক দুরবস্থা নিরাকরণার্থে দশ-বার্ষিক প্রস্তাবের খস্‌ড়া প্রস্তুত করবার জন্য ৫০ জন রাজনীতিবিদ্ ও তৎ-সংখ্যক বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীর একটি মজলিস ডাকা হবে—বোম্বায়ের হীরাবাগে স্বদেশী সপ্তাহ উপলক্ষে এম্‌নি কথাবার্ত্তা হয়েছে।

সরকারের চিঠির উত্তরের খস্‌ড়া কলিকাতা কর্পোরেশনে ৩৩-১৮ ভোটে গৃহীত।

পুণার ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটুটকে হায়দ্রাবাদের নিজাম ২৫,০০০৲ দান করেছেন। মহাভারত সম্বন্ধে গবেষণার সাহায্যে নিজাম বাহাদুর বার্ষিক আরও ১০০০৲ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন

৮ই—গত জানুয়ারী মাস থেকে এপর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্র ৪৫ পাউণ্ড ওজনে কমেছেন।

শিমলার মার্কিন খৃষ্টান মিশনারী মিঃ ষ্টোকস্ কর্তৃক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ।

১০ই—বালিগঞ্জ ও পামার ব্রিজ পাব্লিক ষ্টেশন সংস্কার ও কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ইলেক্‌ট্রিক সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে বঙ্গীয গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে যে পত্র দেন, কর্পোরেশন-নিযুক্ত স্পেশ্যাল কমিটি সে পত্রের সরকারী অভিযোগ খণ্ডন ক'রে উত্তর রচনা করেছেন।

একটি জার্ম্মান কোম্পানি সিদ্ধান্ত করেছেন যে বিমানপোত-অবতরণের জন্য 'ওয়েষ্টফলেন' জাহাজখানিকে পশ্চিম ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে স্থাপিত করা হবে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট সমুদ্র-শুল্ক আইন অনুসারে কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনাল কিংবা সম্পর্কিত অনুষ্ঠানের কাগজপত্র বৃটিশ ভারতে আনয়ন নিষিদ্ধ করেছেন।

দেওয়ান চমনলাল প্রণীত "কুলী" বিলাতের শ্রমিক সদস্যগণের মধ্যে বিতরিত হবার জন্য প্রেরিত হয়। উক্ত পুস্তকের লণ্ডনে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছে।

মান্দ্রাজে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন। সভাপতি মিঃ জে, এন, মিত্রের অভিভাষণ।

কয়লার ব্যয়হ্রাস সম্পর্কে লণ্ডনের বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি যে আবিষ্কার করেছেন, প্রকাশ, তার ফলে কোন জাহাজে দৈনিক কয়লার ব্যবহার ৩০ টন থেকে ১৭ টনে হ্রাস পাবে।

১১ই সেপ্টেম্বর—লণ্ডনের ২৭শে আগষ্টের খবর—সাংবাদিক সঙ্ঘের সভাপতি স্যর এম্‌সলি কার কার্ডিফে ঐ সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে বলেছেন, বৃটিশ বেতার কর্পোরেশনই ভারতে রাজদ্রোহাত্মক প্রচারের জন্য দায়ী, ভারতে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত শত শত রাজদ্রোহাত্মক দৈনিক সংবাদপত্রের বি-এ ফেল কর্ম্মচারীরা বৃটিশ বেতারের দৌলতেই সংবাদ সংগ্রহ করে।

সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ আগষ্ট মাসে ভারতে ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বাণিজ্য-শুল্ক আদায় হয়েছে। গত বৎসর এমাসে ৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছিল।

কুচবিহার গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেছেন, প্রজারা যদি ৩৯ সালের রাজস্ব কিস্তিমত শোধ করে, তবে খাজনার এক-অষ্টমাংশ মাপ দেওয়া হবে।

১২ই—গত সপ্তাহে বোম্বাই থেকে ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানি হয়েছে। নিউইয়র্কে ৮৫ লক্ষ টাকার, অ্যামেষ্টার্ডামে ১১ লক্ষ ও বাকী ৬৫ লক্ষ টাকার স্বর্ণ লণ্ডনে গেছে। ইংলণ্ডের স্বর্ণমান ত্যাগের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত বোম্বাই থেকে কিঞ্চিদধিক ৮১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে গেছে।

১৩ই—ভারত সরকারের ১৯৩০-৩১এর রিপোর্ট প্রকাশিত। রিপোর্টটি নয় অধ্যায়ে বিভক্ত- জাতীয় আন্দোলন, রাজনীতি ও শাসন, কতকগুলি মৌলিক সমস্যা, রেলওয়ে ও ডাক ইত্যাদি, কংগ্রেস, রাজস্ব, বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রদেশ।

এলাহাবাদে রবীন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পৃথিবীর সন্তরণরেকর্ড ভঙ্গ। ৭১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট জলে থেকে তিনি ২৪ মিনিটে পৃথিবীর দীর্ঘতম সন্তরণকারীকে পরাজিত করেছেন।

মন্দ্রাজে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে নিম্নের প্রস্তাবগুলি সমর্থিত হয়েছে (১) রাজবন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হোক্ (২) সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত ভারতকে শতধা বিভক্ত করেছে। (৩) অটোয়া চুক্তি ভারতীয় শ্রমিকের স্বার্থ বিরোধী।

১৪ই—ফরাসী প্রেসিডেণ্ট ডুমার হত্যাকারী রাশিয়ান ডাঃ গুরগোলফের ফাঁসী।

১৬ই—কলিকাতা টাউন-হলে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের সপ্ত-পঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে অভিনন্দন-আয়োজন ব্যর্থ। এই দিন 'হিজলী দিবস' হওয়ায় এই গোলমালের কারণ ঘটে।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি মান্দ্রাজ থেকে ফিরে বলেছেন, 'সুভাষ বাবুর দেহে যক্ষ্মারোগের সমস্ত লক্ষণই পরিস্ফুট হয়েছে।'

লণ্ডনে স্যর রোনাল্ড রসের ৭৫ বছরে মৃত্যু। ভারতের ম্যালেরিয়া-দূরীকরণচেষ্টায় স্যর রোনাল্ড প্রাণপাত করে গেছেন।

১৭ই—মালদহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার অধিবেশন। সভাপতি শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অভিভাষণে সম্মিলিত উপাসনা, মহাত্মার সঙ্কল্প ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে শেষে বলেছেন, হিন্দু-মহাসভা বরাবর পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও স্বাজাতিক ব্যবস্থা চেয়ে এসেছে।

সেনেট হলে ছাত্রছাত্রীদের শরৎ বন্দনা।

ডগলাস-হত্যাকারী প্রদ্যোতের প্রাণদণ্ডের আপীল সম্পর্কে কাগজপত্রাদি প্রিভি কাউন্সিলে প্রেরিত হয়েছে। শুনানির অপেক্ষায় প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

১৮ই—কলিকাতা টাউনহলে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে শরৎ বন্দনার আনুষঙ্গিক সাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশন।

২২শে—শ্রীনগরে 'পরিচ্ছন্নতা-প্রচার সভা'র শোভাযাত্রা সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ৫০ জন আহত।

লণ্ডনে বেকার শোভাযাত্রায় ও পুলিশের সংঘর্ষের ফলে ২ পক্ষে ২ জন আহত। প্রকাশ, শোভাযাত্রার পর ৫০০০ বেকার বলপূর্ব্বক পুলিশ আইন ভাঙতে চেষ্টা করে।

জুনকিস্তির রাজস্ব আদায় না হওয়ায় নোয়াখালির কালেক্টর ১২১টি তালুক বিক্রয়ের নোটিশ দিয়েছেন।

২৩শে—দিল্লীতে হিন্দু মহাসভার ১৪ অধিবেশনে সভাপতি এন্ সি কেলকারের অভিভাষণ।

দুর্ব্বৃত্তা ও তৎসম্পর্কে

১লা সেপ্টেম্বর—গত কাল খুব ভোরে লণ্ডনের এক হাজার পুলিশের ডাকাত ধরবার বিপুল অভিযান।

পেশোয়ারের সিভিল সার্জ্জন হত্যাকারী আবদুল রসিদের ফাঁসী।

ত্রিপুরার এক গ্রামে সশস্ত্র ডাকাতিতে ২৯০০ টাকা লুণ্ঠিত।

২রা—হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু) দায়রা জজ কর্ত্তৃক নরহত্যার অভিযোগে ১১ জন খোজা মুসলমানের প্রাণদণ্ডাদেশ।

দুইটি মুচি রমণীকে ধর্ষণের অভিযোগে বহরমপুরে কতিপয় দুর্ব্বৃত্তের বিরুদ্ধে মামলা।

দিল্লীর নিকট আলিপুর ও খেরা গ্রামে জাঠেদের পরস্পর কোলাহলে ১৬ জন হতাহত।

শ্রীরামপুর চণ্ডীতলা থানার বেজশালা গ্রামে সশস্ত্র ডাকাতি।

৩রা—কিশোরগঞ্জে ১২ বৎসরের বালক শচীন্দ্র নমদাস ভগিনীর সম্মান-রক্ষার্থে মৌলভী আবদুল রেজাকে (২৫ বৎসর) টেটা দ্বারা গলাবিদ্ধ করে, ফলে মৌলভী মারা গেছে। বালকটিকে ৪৫৬।৩৫৪ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে।

চট্টগ্রামে আবগারি পুলিশ কর্ত্তৃক আসাম মেলের যাত্রী ৩ ব্যক্তি ধৃত, ৫ জন পালিয়েছে। প্রকাশ, তারা রাজকুণ্ডে ডাকাতি করতে যাচ্ছিল।

দুই শত মুসলমান কর্ত্তৃক জয়পুর রাজ্যের রামগড় হিন্দু-সভা আক্রান্ত।

পাটনার অখিলেশ্বর নামে জনৈক যুবক ইতিপূর্ব্বে বহুবার জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। কিছুদিন আগে একটি মামলায় তার ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। অতঃপর ভাগলপুরের মহকুমা হাকিম তার দণ্ডাদেশ-হ্রাসার্থে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষরিত দুখানি চিঠি পান, একটি জুডিসিয়াল সেক্রেটারির। ফলে কারাদণ্ড হ্রাস হয়। এখন প্রমাণ হয়েছে যে ঐ সব চিঠি অখিলেশ্বরের জাল। মোকদ্দমা চলছে।

৪ঠা—ঢাকা বুড়ীগঙ্গার অপর পার্শ্বে খাজনা আদায় করতে গিয়ে গত ২৫শে আগষ্ট ৪ জন মুসলমান খুন হয়েছে।

হাওড়া মৌরী গ্রামের নিকট দুর্ব্বৃত্তরা পুলিন সাঁতরা নামে জনৈক ব্যক্তিকে খুন ক'রে ৫০০ টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে।

লাহোর বোর্ষ্টাল জেলে একজন কয়েদী কর্ত্তৃক অপর একজন নিহত।

পুলিশকে গুলিমারা সম্পর্কে দিল্লীতে আটজন বাঙ্গালী যুবক গ্রেপ্তার।

৫ই—লাহোরে জালটিকিট বিক্রয় দ্বারা নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েকে প্রতারিত করবার এক বিরাট ষড়যন্ত্র পুলিশ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। এ সম্পর্কে ৩০ জন গ্রেপ্তার। এই গুপ্ত প্রতিষ্ঠান শাখা-প্রশাখার সাহায্যে ১৩ বৎসর এই কাজ করে আসছে বলে প্রকাশ।

পেশোয়ার মুলজাই থানার অ্যাসিষ্টাণ্ট পুলিশ সাব ইনস্পেক্টার গত ২রা তাজোরী গ্রামে নিদ্রিতাবস্থায় নিহত হন। হত্যাকাণ্ডের মূল কারণের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি।

চট্টগ্রামে রায়মণি নামে একটি ১৬।১৭ বৎসরের বালিকার প্রতি অত্যাচার করায় নীরদ চৌধুরী ও দেবেন্দ্র বিশ্বাস ও অপর দুই ব্যক্তি অভিযুক্ত।

৬ই—মজাফ্‌ফরপুরের সমস্তিপুরে জাল রেলের টিকিট বিক্রয়ের অভিযোগে ২৩ জনের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা আরম্ভ। ৪ জন আসামী পলাতক।

৭ই—ঢাকা রমণা পোষ্টাফিসের নিকট বরদা চৌধুরী নামে জনৈক ধনী ব্যবসায়ীকে রিভলভার দেখিয়ে টাকা কাড়বার চেষ্টায় দুই জন দুর্ব্বৃত্ত ধরা পড়েছে। দুই জনের পলায়ন।

১০ই—সেখপুরা-মণ্ডী ফাঁড়ীর জনৈক কনষ্টেবলকে এক শিখ মহিলার সতীত্বনাশের চেষ্টার অভিযোগে সসপেণ্ড করা হয়েছে।

ফরিদপুরের দায়রা জজ অধিক সংখ্যক জুরীর সঙ্গে একমত হ'য়ে কেদার শাহ কুলুকে পত্নীহত্যার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা মতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

হারবাঙ্গায় টাকা-তৈরির যন্ত্রপাতির অধিকার অভিযোগে পিতাপুত্র আবদুল আলি ও মুজাফর আলির তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

১২ই—দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক পুর্ব্বচীন রেলপথে একখানি ট্রেণের লাইনচ্যুতিতে ১০০ জন হত ও বহু আহত। গাড়ী রেলপথ হ'তে পড়ার পর দস্যুরা গাড়ীর জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে এবং কতিপয় যাত্রীকে হরণ করে নিয়ে যায়। অপহৃতদের মধ্যে ৫ জন জাপানী।

কতিপয় ব্যক্তি দিল্লী সাহাদারা ষ্টেশন হ'তে রেলওয়ে ক্যাশিয়ারকে প্রতারণা ক'রে ৬০০০৲ টাকার নোট লুণ্ঠন করেছে। একটি লোককে ক্যাশিয়ার ধরে। তদন্তের ফলে রেলওয়ের একজন পুরাতন কর্ম্মচারীও নাকি ধরা পড়েছে।

১৩ই—গত ১০ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় এটার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের তারে প্রকাশ, পুলিশ ও চার জন দস্যুর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ডাকাতদের দুই জন আহত। পুলিশের ১ জন কনষ্টেবল হত এবং একজন সাব ইন্‌স্পেক্টার ও আরও দুই ব্যক্তি আহত হয়েছে।

সাড়া পাকশী ব্রীজ থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত পাঁকুড়িয়ায় গত ৬ই তারিখে প্রায় ৩০ জন ডাকাত বহু মূল্য টাকা ও অলঙ্কার লুণ্ঠন করেছে। দিন তিনেক আগে নিকটবর্ত্তী শাহাপুর গ্রামেও এক ডাকাতি হয়েছে।

ফরিদপুর বালিয়াকান্দিতে একটি নমঃশূদ্র যুবতীর উপর পাশবিক অত্যাচার করায় চার জন নমঃশূদ্র রাজবাড়ীতে বিচারার্থে আনীত।

১৪ই—অন্দরকিল্লায় এক মুসলমান হোটেলে ৩ জন মুসলমানের নিকট থেকে ৬১টি জাল সিকি পাওয়া গেছে।

গত ৯ই সেপ্টেম্বরে বাগেরহাটে সশস্ত্র ডাকাতি হয়ে গেছে।

১৫ই—গত ১৩ই মে আসাম বেঙ্গল রেলের এক কামরা থেকে ৩০০০০৲ টাকা লুণ্ঠনের অভিযোগে ধৃত সুধীর আচার্য্য, বীরেন্দ্র দে, জ্যোতির্ম্ময় সেন ও পলাতক হেমেন্দ্র দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমার শুনানি ঢাকায় আরম্ভ।

১৭ই—গত ২০শে ডিসেম্বর তারিখে আসাম শিবসাগরের ম্যাজিষ্ট্রেট মোহম্মদ তাহের আফিং-ব্যবসায়ী দোলইয়ের সাহায্যে ২০ বৎসর বয়স্কা ভবানী কুর্ণীর প্রতি পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। পুলিশ তদন্তে আসামীরা ছাড়া পায়। হাইকোর্টে জানানোর ফলে মোকর্দ্দমা হ'লে ৫ জনের মধ্যে ৬জন জুরী আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করে।

পরবর্ত্তী সংবাদ—ম্যাজিষ্ট্রেট মুক্তি লাভ করেছেন।

এলাহাবাদে জাল মুদ্রা প্রস্তুত করা সম্পর্কে ৪৬ জন দায়রায় সোপর্দ্দ।

২৫শে—চট্টগ্রাম ইউরোপীয়ান ক্লাবে সশস্ত্র বিপ্লবীদের হানা। ফলে ছয় জন ইউরোপীয় আহত, একজন প্রৌঢ়া মহিলা নিহতা। আক্রমণকারী-দলে পুরুষ বেশে একটি যুবতীও নিহত। পরে ইহাকে বেথুন কলেজের বি-এ প্রীতি ওয়াদ্দাদার বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd., 56, Dharamtala Street, Calcutta.

নৌকাপথে

শিল্পী—শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার

১৫শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ | ৭ম সংখ্যা

অপ্রস্তুত যাত্রা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বহুদিন পরে তিনি ডেকেছেন দাসে ;—
নদী পার হ'তে হবে যেতে সে প্রবাসে
আবার ফিরিয়া একা—সে সে পার নয়,
এ পারের সঙ্গে তার দূর পরিচয় !

দীর্ঘকাল এক ঠাঁয়ে করিয়াছি বাস ;
আপন মনের মতো কত ছাইপাঁশ
হেথায় করেছি জড়ো চোখের নেশায়,
ভুলেছি যাওয়ার কথা আলসে হেলায়।

আজকাল করে' আর কাটাব ক'দিন!
উপায় কোথায়—যে বা পরের অধীন?
পাঁজির তারিখ দেখি, সময় মিলাই,—
যেতেই যখন হবে—কালই তবে যাই।

তারো বাধা এসে জোটে,—সঙ্গীসাথী যত
মুখ ভাঁর করে' তারা ফিরে অবিরত।
এটা বলে সাথে যাব, ওটা কেঁদে সারা—
আমারে নেবে না সঙ্গে—এ কেমন ধারা?

আবার তলব আসে; বিলম্ব চলে না,
পাঁজি-পুঁথি বন্ধ করি; অদৃষ্টের দেনা
শুধিতে হবেই যবে—কি করিব আর?
যতই অনিচ্ছা থাক্, হ'তে হয় বা'র।

এক পা তরীতে আর এক পা মাটিতে;
শেষকার কথাগুলো চাই যে বলিতে!
ভাঁটায় পড়িল টান—আরে, আরে—ওই-
কত-কি বলার ছিল—হ'ল আর কই!

ভারতীয় চিন্তা-ধারার চতুর্থ সত্তা

—স্বামী বাসুদেবানন্দ

আমরা নিরন্তর চিন্তাধারায় ভেসে চলেছি – বিচিত্র চিন্তা-রসে জীবন সিক্ত হয়ে ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা কত ফসলই না দিচ্চে। প্রত্যেকেরই আবার প্রায়োগিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক তিনটি দিক বেশ অনুভূত হচ্চে। কিন্তু ভারতীয় চিন্তাধারার বিশ্লেষণে আর একটা দিক পরিস্ফুট হয়ে উঠে, সেটা তার চতুর্থ সত্তা, আধ্যাত্মিকতা। ধর্ম্মের কথা ছেড়ে দিয়ে, যখনই ভারতীয় রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, স্থাপত্য বা শিল্প-কলার সংশ্লিষ্টির হেতু নির্দ্দেশ করতে যাই, তখনই দেখতে পাই, ভারতীয় যা কিছু সবই এক আনন্দ-রসে ভরপূর।

আধ্যাত্মিকতার তুলনায় ভারতে রাজনীতি বা সমাজনীতি তেমন পরিপুষ্ট না হলেও, কালের তাড়না এবং ঐতিহাসিক নানা পরিবর্ত্তনের ভেতরেও যে সে এখনও জীবিত, তার হেতু তার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা। ত্রিসত্তার (three dimensions) নাশ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, কিন্তু চতুর্থ সত্তা কালাত্মশক্তি অবিনাশী—তাই ভারত চিরসঞ্জীবিত। বহিরাক্রমণ ও অন্তর্বিপ্লব এমন ভয়াবহ ভাবে তার ভাগ্যাকাশে মেঘবিদ্যুতের সঞ্চার করেছে যে বোধ হয়েছিল যেন ধ্বংস তার আসন্ন—মৃত্যু তার ঘনায়িত। গ্রীক্, শক্, পার্শী মোগল, পাশ্চাত্ত্য প্রভৃতি নানা জাতি, বিভিন্ন শতাব্দীতে তাদের কৃষ্টির পেটিকাটি অপহরণ করে, তাদের সর্ব্বনাশের বহুবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহামায়া পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত ভারতকে উজ্জীবিত করে রক্ষা করেছেন। সে তার উদ্দেশ্যের একপ্রাণতা নিয়ে চিরকাল নাস্তিকতা ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেচে ও এখনও করচে এবং জীবিতও রয়েচে। কাম-কাঞ্চন-লাভোদ্দেশ্যে, ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলে যেমন সর্ব্ববিধ্বংসী নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েচে, তেমনি ভারতে এই চিরন্তন আধ্যাত্মিক সংগ্রামের ফলে, নানা যুগে অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক তথ্য সকলের আবিষ্কার সম্ভব হয়েচে

আধ্যাত্মিকতাই ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে বরাবর শাসন করে এসেছে। অরণ্য হতে এর আদর্শ সকল উদ্ভূত হলেও এর প্রয়োগ জনসাধারণের ভেতর যথেষ্ট অনুভূত হয়েচে। গভীর নিস্তব্ধতার ভিতর যে গীতা উপনিষদ্ উপলব্ধ হয়েচে, তার কার্য্যকারিতা দেখতে পাই সাধারণের বিশ্বাস, ধারণা ও কার্য্যকারিতার মধ্যে। গীতা উপনিষদের দার্শনিকতাকে পুরাণের গল্পগাথার ভেতর দিয়ে, একমাত্র ভারতেই সাধারণের রুচিকর করে তোলা হয়েচে। শুধু রুচিকর নয়, প্রত্যেক দার্শনিকই তাঁর নবাবিষ্কৃত সত্যের দ্বারা সাধারণের জীবনকে নিয়মিত করবার চেষ্টা করচেন অর্থাৎ প্লেটোর আদর্শ যে—দার্শনিকেরাই সমাজ-শাসক হবেন—তা ফলবতী হয়েচে ভারতীয় জীবনে।

দার্শনিকতাটাকে বাস্তব জীবনে প্রকাশ দেওয়ার নামই ধর্ম্ম। আমরা ধর্ম্মটাকে এমনি ভাবে বুঝি ব'লে, আমাদের ধর্ম্মের যে কোনও সম্প্রদায়ই হোক্ না কেন সেটা একটা যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের সম্প্রদায়গুলিতে বড় একটা অন্ধ বিশ্বাসের স্থান নেই—তবে ছোট বড় সত্য আছে—মাঝে মাঝে যুক্তিতে ভুলও আছে। কিন্তু মানব-মস্তিষ্কের বৃদ্ধির এবং আবেষ্টনীর তারতম্যের অনুযায়ী যে বড় সত্যের মত ছোট সত্যেরও প্রয়োজন, এটা হ্যাভেল সাহেবও তাঁর "ভারতে আর্য্য-শাসন" নামক গ্রন্থে স্বীকার করেছেন।*

অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ধর্ম্ম থেকে যদি যুক্তিকে বের করে দেওয়া হয়, তা হলে একটা ভাব এমন কঠিন ভাবে আমাদের মস্তিষ্ককে আবদ্ধ করে ফেলবে যে আর নতুন সত্য সেখানে প্রবেশ অসম্ভব হবে। একটা সত্য যখন সমাজে প্রচলিত হয়ে পড়ে, তারপর নতুন কিছু না পেলেই

---

* In India religion is hardly a dogma, but working hypothesis of human conduct, adapted to different stages of spiritual development and different conditions of life.

—Aryan Rule in India, P. 170.

সমাজ অসহিষ্ণু হয় ও তার গতি নাস্তিকতা এবং ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার দিকে ধাবিত হবেই। কিন্তু ভারতে যখনই এরূপ অবস্থা এসে পড়েছে, তখনি ব্যাস, বশিষ্ঠ, মহাবীর, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য অবির্ভূত হ'য়ে মানবের অন্তর্দ্দেশ আলোড়িত ক'রে, সত্যের আকর থেকে নব নব সত্য মানুষের জ্ঞান-ভূমিতে আরূঢ় করিয়ে দিয়েচেন। তারপর আবার নতুন জীবনের আরম্ভ—নতুন সমাজ, নতুন ব্যক্তি, নতুন আদর্শের দিকে চলতে থাকে। এইরূপে দার্শনিক সত্য ও বাস্তব জীবনের সমন্বয়ে ভারতীয় ধর্ম্ম এখনও সচল ও জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

মৃত্যুর পর জীবনের কী হয়—এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে আত্মতত্ত্বের আলোচনা; এবং পুরুষকার যখন ব্যর্থ হয়, তখন মানুষের মনে জিজ্ঞাসা ওঠে, এই জগতের নিয়ামক অদৃষ্ট পুরুষ কে?—এই জিজ্ঞাসার সমাধান করতে গিয়েই ঈশ্বর-তত্ত্বের উদ্ভব। ভোগ্য বস্তু যে জগৎ, যা নিরন্তর জীবের স্বাধীন ইচ্ছাকে ব্যাহত করচে, তাকে কী কৌশলে আয়ত্ত ক'রে, তা থেকে অধিক পরিমাণে ভোগ-সম্ভার নিষ্কাসিত করে নেওয়া যেতে পারে—এই প্রচেষ্টা থেকেই ভূততত্ত্বের আবিষ্কার। এই ত্রিতত্ব নিয়েই ধর্ম্ম; এবং বিভিন্ন যুগে ঐ ত্রিতত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন সন্দেহের সমাধান করতে গিয়ে দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি। শিশু-মানব এই ত্রিতত্ত্বের রহস্যসমাধানে প্রথমতঃ নানারূপ কথার সৃষ্টি করলে, কিন্তু সে সম্বন্ধে যতই প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠতে লাগল, ততই দর্শন শাস্ত্রেরও ক্রম-বিকাশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। একটা সময় ছিল, যখন মানুষ মনে করত যে ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব জীবন এবং দর্শন বিজ্ঞানের কোনও সম্বন্ধ নেই। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে-ধর্ম্ম জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারে—জীবনকে অব্যাহত রাখবার তা যদি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়—জাতীয় জীবনকে উন্নতির পথে উত্তরোত্তর যদি সে প্রবুদ্ধ না করে তোলে,—জিজ্ঞাসু মানবের বিবেককে যদি সে তৃপ্তি না দিতে পারে—তা হলে সে ধর্ম্ম-প্রবাহ কালে মানব-চিত্তে শুকিয়ে গিয়ে জলহীন নদীর মত অবস্থান করবে। কত প্রাচীন জাতির ধর্ম্ম আমরা ইতিহাসে পড়ি বটে, কিন্তু তা আর আমাদের বর্ত্তমান জীবনে কাজ বা তৃপ্তি দিতে পারে না।

ধর্ম্মের দুটো বিভাগ—জ্ঞানকাণ্ড ও ধর্ম্মকাণ্ড—দার্শনিক ও বাস্তব প্রয়োগ। যে দার্শনিক আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ নেই—সেটা কেবল বুদ্ধির ব্যায়াম মাত্র। পক্ষান্তরে আদর্শহীন বাস্তব জীবন একটা পশুর জীবন থেকে কিছু মাত্র উন্নত নয়। ভারতে এমন কোনও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নি, যিনি বাস্তব-জীবনহীন। তিনি তাঁর আদর্শ কেবল ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক এবং জাতীয় জীবনে পরিণত করবার বিপুল চেষ্টা করেচেন। শঙ্কর রামানুজের চেষ্টায় যে কত তথাকথিত নীচ জাতি উন্নতি লাভ করেচে, তা আমরা স্বামিজীর একটা কথা থেকে বেশ বুঝতে পারি। "শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বড় বড় যুগাচার্য্যগণ জাতি-গঠনকারী ছিলেন। আমার ভ্রমণে ও অভিজ্ঞতায় আমি ইহার সন্ধান পাইয়াছি। আর আমি ঐ গবেষণায় অদ্ভুত ফল লাভ করিয়াছি। সময়ে সময়ে তাঁহারা দলকে দল বেলুচি লইয়া এক মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিয়া ফেলিতেন; দলকে দল জেলে লইয়া এক মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহারা সকলেই ঋষি-মুনি ছিলেন—আমাদিগকে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ভক্তি-শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।"*

অনেকে বলেন, হিন্দুধর্ম্ম কতকগুলো প্রবাদের (tradition) সমষ্টি মাত্র। কিন্তু প্রবাদ আমাদের স্কন্ধে ও সমাজে এখনও খুব প্রবল হলেও স্বাধীন চিন্তা কখনও নীরব ছিল না। তা যদি না হত, তা হলে চার্ব্বাক থেকে আরম্ভ করে শঙ্কর পর্য্যন্ত অসংখ্য মতবাদের উত্থান ভারতে সম্ভব হতে পারত না। বর্ণবিভাগের কঠোর নিগড় সত্ত্বেও নানক, কবীর, দাদু, হরিদাস এবং দক্ষিণী আলোয়ারগণের অভাব কখনও হয় নি। নীচ জাতি হলেও তাঁরা সমাজে মহাপুরুষ বলে পরিচিত। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন, সকল প্রকার প্রাচীন প্রভুত্বকে অস্বীকার করেও এখনও স্ব-মহিমায় দণ্ডায়মান। চিন্তার স্বাধীনতা যদি ভারতে না থাকত, তা হলে কি এত ধর্ম্মদ্রোহী (heretic', সন্দেহবাদী (sceptic), অবিশ্বাসী (unbeliever), যুক্তিবাদী (rationalist), স্বাধীন-চিন্তক (freethinker) জড়বাদী (materialist) এবং ইন্দ্রিয়তান্ত্বিক (hedonist), দলের পর দল আবির্ভূত হত?—এইগুলোই ত ভারতীয় মনের জ্ঞান-পিপাসার মস্ত প্রমাণ। গোপন-সত্যকে বিকাশ করবার জন্য, তারা যে কেমন আন্তরিক ও ব্যাকুল সাধক ছিল, তার প্রমাণ তাদের ব্রহ্মবিদ্যা, দর্শন, ন্যায়, ব্যাকরণ, রসায়ণ, ভূত-

* ভারতে বিবেকানন্দ, ভারতের ভবিষ্যৎ, পৃঃ ৬৬৩।

বিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষ, পশুবিজ্ঞান, সামুদ্রিক, প্রাণায়াম, ভেষজ ও শল্য-বিদ্যা, নৌ, হস্তী ও অশ্ববিদ্যা, শিল্পকলা প্রভৃতির যে অবশেষ আছে তা থেকেই বোঝা যায়।*

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব যদি বিশ্লেষণ করা যায় তা হ'লে দেখতে পাওয়া যায়, প্রথমদের চিন্তাধারা জাতিপর (general)—অসংখ্যবিশেষের (particulars) মধ্যে অপরা ও পরা জাতির উত্তরোত্তর ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে জগতের মূল-কারণের নির্দ্দেশ। এই জাতিপর চিন্তাধারা বিশ্লেষণপর (analytic) হলেও তার গতি হচ্চে সংশ্লেষণের (synthesis) দিকে—বিশেষপর জ্ঞান নিয়ে সে বেশীক্ষণ মাথা ঘামাতে পারে না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য চায় বিশেষপর জ্ঞান নিয়ে থাকতে, specialist (বিশেষজ্ঞ) হতে। সেই জন্য তাদের মধ্যে বিশ্লেষণটা খুব বেশী, সংশ্লেষণ থাকলেও সেটা জাতি-পর না হওয়ার দরুণ সকল সময় সার্ব্বজনীন হয়ে ওঠা তাদের পক্ষে বড় কষ্টকর হয়ে পড়ে। প্রাচ্য নির্ণয় করেচে—গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র প্রাণীরও নিকট সম্বন্ধ,—যুগ, মন্বন্তর, ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল, প্রলয়ের তারিখ—আর পাশ্চাত্য নির্ণয় করেচে প্রতি প্রত্যক্ষ বস্তুর বিশেষত্ব; সেই তারা একত্ব, পূর্ণত্ব বা সমষ্টিগত ধারণা সহজে করতে পারে না এবং সাধারণতঃ ব্যাবহারিক রাজ্যে অতিরিক্ত প্রয়োজন-বাদী। প্রাচ্যের বৃত্তি সার্ব্বজনীন ব্যক্তিত্ব স্বীকার করতে চায় না—ঈশ্বরেরও নয়, তা কাল্পনিক—এমন কল্পনা যে স্বপ্নও সেখানে হার মানে—জগৎটা যেন অপরিচিত—চন্দ্র-সূর্য্যের সেখানে প্রবেশ নিষেধ—মনের পরপারে এক অপূর্ব্ব অভিনব অবস্থা। প্রকৃতির মনোরম ও সুরক্ষিত স্থানে তার বাসস্থান ব'লে সে পাশ্চাত্যের ন্যায় যুদ্ধপ্রিয় নয়—কণ্ঠ, শব্দ, অঙ্গুলি ও পদের ছন্দগণনায় তার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে।

গঠনমূলক দৃষ্টিবশতঃই ভারতীয় বিজ্ঞান দর্শনের অন্তর্ভুক্ত; কারণ বিজ্ঞান যা গড়বে তা দর্শনের অনুযায়ী হওয়া চাই। সেইজন্য ভূতবিদ্যা (Physics), পরমাণুবাদ প্রভৃতি সাংখ্য, বৈশেষিক দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক পাশ্চাত্যেরা বিজ্ঞান-গুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে কল্পনা করেছে। প্লেটোর কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টি ছিল। তাঁর মতে যা কিছু বিজ্ঞান মানব-প্রকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাই দর্শনের অঙ্গ। কিন্তু পরে সেটার

* Prof. Radha Krishnan : Indian Philosophy, P. 29—'We may quote a passage which is certainly not less than 2,000 years before the birth of Copernicus, from Aitareya Brahmana : "The Sun never sets nor rises. When people think to themselves the Sun is setting, he only changes about after reaching the end of the day, and makes night below, and day to what is on the other side. Then when people think he rises in the morning, he only shifts himself about after reaching the end of the night and makes day below and night to what is on the other side. In fact he never does set at all." Hang's Edition, iii-44 ; Chan. Up. iii II. 1-3.

Whatever conclusions we may arrive at as to the original source of the first astronomical idea current in the world, it is probable that to the Hindus is due the invention of algebra and its application to astronomy and geometry. From them also the Arobs received not only their first conceptions of analysis, but also those invaluable numerical symbols and decimal notation now current everywhere in Europe, which have rendered untold service to the progress of arithmetical science.—Monier Williams : Indian Wisdom, p. 184.

The motion of the moon and the sun were carefully observed by the Hindus, and with such success that their determination of the moon's synodical revolution is a much more correct one than the Greeks ever acheived. They had a division of the ecliptic into twenty seven and twenty eight parts, suggested evidently by the moon's period in days and seemingly their own. they were particularly conversant with the most splendid of the primary planets ; the period of Jupiter being introduced by them, in conjunction with those of the sun and the moon into the regulation of their calendar in the form of the cycle of sixty years, common to them and Chaldeans.—Colebrooke's Translation of Bhaskara, Work of Algebra, p. xx ii.

In medicine, as in astronomy and metaphysics, the Hindus once kept pace with the most enlightened nation of the world ; and they attained as thorough a proficiency in medicine and surgery as any people whose acquisitions are recorded and as indeed was practicable, before anatomy was made known to us by the discoveries of modern inquirers.—Wilson's Work, Vol. iii. p. 269.

অর্থ সংকুচিত হয়ে দর্শনে কেবল তার কল্পনার দিকটাই রয়ে গেল—ফলে আদর্শ (ideal) ও প্রয়োগ (practice) একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। কিন্তু ভারতবর্ষে দর্শনশাস্ত্র অধিকারীভেদে নানারূপ হওয়ায় এই আদর্শ ও প্রয়োগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি। খুব উচ্চ ভাবুক যাঁরা, তাঁরা সংসারকে একেবারে অস্বীকার করলেও, দ্বৈতবাদাদি অপরাপর দর্শন সংসারকে স্বীকার ক'রে তার ভেতর দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার জন্ম বলচেন। তাঁরা আত্মোন্নতির সহায় স্বরূপে বিজ্ঞান শিল্প-কলার উন্নতি সাধন করে সংসারকে ঈশ্বরের রাজ্যে পরিণত করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং এখনও করচেন। কেবল মুষ্টিমেয় উচ্চাধিকারীর ভেতর থেকেই ব্যাস, দত্তাত্রেয়, বশিষ্ঠ, অষ্টাবক্র, গৌড়পাদ, নাগসেন, নাগার্জ্জুন, শঙ্কর, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি উগ্র মায়াবাদীরা বেরিয়েছিলেন, যাঁদের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আমরা পাশ্চাত্যে পারমেনাইডস্, প্লেটো, প্লটিনাস্, স্পিনোজা, বার্কলে, হিউম, ক্যাণ্ট, সোপেন-হাউর, ব্রাডলে, বার্গসোঁ প্রভৃতির দর্শনে শুনতে পাই। আমার বোধ হয় দার্শনিক সকল তত্ত্বই ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।*

মায়াবাদটা একটা মাথার খেয়াল নয়। জগৎটাকে যে স্বানুভূতির ওপর স্বীকার করতে হয়, মায়াটাকেও সেই কারণেই স্বীকার করতে হয় এবং এই শেষোক্ত অনুভবের কাছে প্রথম অনুভব গৌণ হয়ে পড়ে; স্বামিজী বলচেন, মায়া হচ্চে একটা statement of fact—একে অস্বীকার করা চলে না। ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র বলচেন, নিত্য বস্তুর অনুসন্ধান করতে গিয়ে যখন দেখচি নানা ব্যাবর্ত্তমানের (পরিবর্ত্তনের) মধ্যে একটা অনুবর্ত্তমান (অপরিবর্ত্তন) বিদ্যমান, তখন সেইটাই নিত্য;—জাগ্রত জগৎ, স্বাপ্ন কল্পনা বা সুষুপ্তির অজ্ঞান মিথ্যা। মাস, বর্ষ, যুগ, কল্প, অতীত ও ভবিষ্যতের গতির মধ্যে এক চৈতন্যেরই উদয়াস্ত হয় না—বিদ্যারণ্য বলচেন।† আত্মার মৃত্যু নেই, জন্ম নেই, অজ, নিত্য শাশ্বত, পুরাতন পুরুষ, দেহের নাশে নষ্ট হন না—হত বা হন্তা কেহ নেই—উপনিষদ্ ও গীতার কথা।‡ ভাগবৎ কালকেই আত্মার গুণ বলচেন—এই কালাত্মাই সকল ত্রিসত্তার (three di-mensions) চতুর্থ সত্তা (fourth dimentions)। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধযুক্ত জিনিষের আদি ও অন্ত পর্য্যন্ত বুঝতে গেলে তার কাল-সত্তার (time dimension) প্রয়োজন কিন্তু তার পেছুনে যদি নির্গুণ চেতনসত্তা না থাকে তা হলে তার অস্তিত্বই উপলব্ধ হবে না। এই কালই আত্মার ওপর প্রথম অধ্যারোপ। এই কালোপহিত চৈতন্যই সকল সীমা (dimension) ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্থির সত্তা।§

তবে জগৎটা কি?—অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধি।¶ যে বস্তু যা নয় তাইতে সেই বুদ্ধি—ব্রহ্মেতে জগৎবুদ্ধি—অপরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তন বুদ্ধি—কালাতীত অসীমে দেশকালবুদ্ধি—রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি। এ ঈশ্বর—কৃষ্ণের প্রকৃতিতে অনভিমান নয়, নিম্বার্কের ব্রহ্মের পরিণাম নয়, অভিনব গুপ্তের মূলাশক্তির বস্তুর সৃষ্টিলীলা নয়—প্লেটোর reproduction of idea নয়, এ্যারিষ্টটলের specific type নয়, হেগেলের absolute process নয়, এ হোলো শঙ্কর-বিবেকানন্দের অধ্যাস—যার মূল হোলো, রামকৃষ্ণের "আঁচলে বাঁধা মাণিক"—অদ্বৈতজ্ঞান—যার আধুনিক প্রকাশ কিঞ্চিৎ দেখা যায় ক্যাণ্টের দেশকালনিমিত্তের ব্যাখ্যায়, আইনষ্টিনের আপেক্ষিকবাদে। এখন যে fourth dimensionএর সন্ধান চলেছে, এ্যারিষ্টটল যাকে বলেছিলেন motionless mover, হেগেল যার আখ্যা দিলেন absolute spirit, রামানুজের সেই চিদচিৎযুক্ত আপেক্ষিক অব্যয় অন্তর্যামী ঈশ্বর—উপনিষদের মহাবাক্যের অধিপতি দেবতার এ সব ছায়া মাত্র।

*Sir William Jones wrote : "Of the philosophical schools, it will be sufficient here to remark that the first Nyaya seems analogous to the Peripatetic ; the second, sometime called Vaisasika to the Ionik ; the two Mimamsas, of which the second is often distinguished by the name of Vedanta, to the Platonic ; the first Sankhya to the Italic ; and the second of Patanjali to the Stoic philosophy ; so that Gautama corresponds with Aristotle, Kanada with Thales, Jaimini with Socrates, Vyasa with Plato, Kapila with Pythagoras, and Patanjali with Zeno" (Works, i, 360-1) Vide also Colebrooke, Miscellaneous Essays, i. 436ff and Indian Philosophy by S. Radhakrishnan p. 24 and Carbe, Philosophy of Ancient India, Chap. ii.

† পঞ্চদশী, ১।৭।

‡ কঠ, উ, ২।১৮।১৯। গীতা, ২।১৯।২০।

§ বিষ্ণুভাগবৎ, ১১।৬।১৫।

¶ বেদান্তসূত্রে, উপদ্যাত ভাষ্য।

ভারতীয় চিন্তার একটা অভিনব বিশেষত্ব হচ্ছে, মানুষ ও ভগবানে মধুর সম্বন্ধ, মানুষ ভক্ত তিনি ভগবান, মানুষ দাস তিনি প্রভু, মানুষ সখা তিনি সুহৃৎ, মানুষ মাতা তিনি সন্তান, মানুষ সন্তান তিনি পিতা, মানুষ প্রকৃতি তিনি পুরুষ—শেষ, তুমি আমি, আমি তুমি। পাশ্চাত্ত্যে কিন্তু মানব ও ঈশ্বরে কেবল বিবাদ। সেখানে কেবল পাবে প্রমিথিয়াসের শাস্তি, জিয়াসের ক্রোধ। জিহোভার বজ্র চারিপাশে উদ্যত। প্রাচ্যে মানব "অমৃতস্য পুত্রাঃ"*—পাশ্চাত্ত্যে মানব জন্মপাপী। স্বভাবে যার পাপ, তাকে কি ভগবান "in his own image"—নিজের মত করে গড়তে পারেন! মাইকেল পিম্ (Michael Pym) নামক একজন আমেরিকার স্ত্রীলোক, তাঁর "*The Power of India*" নামক গ্রন্থে, হিন্দুরা original sin মানে না ব'লে বড় কাতর হয়ে পড়েচেন। "it seems ridiculous, if not actually blasphemous, because there is in these religions a conception of original perfection, but not one of original sin"—(p. 150). হিন্দুরাও original sin মানে, তা হচ্ছে অনাদি অবিদ্যা, তবে তা অনিত্য শুদ্ধই শুদ্ধ হতে পারে, স্বভাবপাপী কখনও শুদ্ধ হতে পারে না। যারা পাপী তাদের original sinটা একটা মহা সান্ত্বনা। 'আমাদের স্বভাবেই যখন পাপ রয়েচে, তখন আর কি করব বল?' স্বভাবপাপী বলেই পাশ্চাত্ত্য, খ্রীষ্টের যে মহতী বাণী—'I and my father are one'—আমি এবং পিতা একই, খ্রীষ্টেতেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে বাধ্য হয়েচে।—অমৃতের পুত্রেরাই বলতে পারে—আমি ও পিতা এক—জীবঃ ব্রহ্মৈব না পরঃ। সেমাইটদের মতে মানবের পাপের জন্য ভগবান চির অসন্তুষ্ট, তাই খ্রীষ্টকে মানবের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে। কারণ, খুন না হলে পাশ্চাত্ত্যে কেউ মহাপুরুষ বলে পরিচিত হতে পারেন না। প্রাচ্যে কিন্তু মানুষ ভগবানের তপস্যার ধন—তপস্যার দ্বারা তিনি এ জীব-জগৎ সৃষ্টি করে ব্যপ্ত হয়ে রয়েচেন।†

ভারতীয় চিন্তাধারার চতুর্থ-সত্তা আধ্যাত্মিকতাই হচ্ছে তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিক। তার শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সব প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিকতার ওপর—উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ। অল্পাধিকারীর জন্য কর্ম্মকাণ্ড. প্রয়োজন—তার দ্বারা স্বর্গাদি লোকও প্রাপ্ত হওয়া যেতে পারে, কিন্তু সে সব অল্প সত্য। ধ্যান-জ্ঞান এবং ভক্তির দ্বারাই চরম সত্য লাভ করা যায়, যার সাধন হচ্ছে আত্মত্যাগ। প্রতিমাপূজা না করেও, বিধিনিষেধ না মেনেও যদি কেউ ত্যাগী ও আত্মধ্যানপরায়ণ হয়, সে সাধক। এখানেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান, খ্রীষ্টান, য়াহুদীর পার্থক্য। হিন্দু বলচে, সে যত সত্যের নিকটবর্ত্তী হবে, তার তত কর্ম্মে স্বার্থত্যাগ দেখা যাবে—তিনি হবেন 'সর্ব্বভূতহিতে রত'। 'বহুজনহিতায়, বহুজন-সুখায়' তাঁর জীবনধারণ। তিনিই তত আধ্যাত্মিক, যিনি যত কাম ও কাঞ্চনত্যাগী। সেই জন্য হিন্দুর প্রত্যেক বিদ্যার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়-সংযমের ব্যবস্থা।

হিন্দুর শেষ বিশেষত্ব হচ্ছে, পুরাতন বা অল্প সত্যকে ত্যাগ না করা। কারণ সকলেরই অন্তর্নিহিত ঐ চতুর্থ সত্তা। হিন্দুর দর্শনেতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় কত যুগে কত অভিনব মতবাদ উঠেচে—পূর্ব্বসত্যগুলি নূতনের ক্ষুরধার যুক্তির আঘাতে একেবারে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে—বিজেতাই তাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করে স্বীয় ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করে নিয়েচে। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক মধুসূদন অদ্বৈত-বেদান্তকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অপরাপর মতবাদসকল ছিন্ন-ভিন্ন করে, 'প্রস্থানভেদ' নামক গ্রন্থে বলচেন যে, সকল মুনির উদ্দেশ্য হচ্ছে মায়াবাদকে প্রতিষ্ঠা করে একাত্মজ্ঞান লাভ করা—কোনও মুনিই ভুল করতে পারেন না, কারণ তাঁরা সর্ব্বজ্ঞ, তাঁরা জানতেন, বিষয়ী মানব সহজে সেই চরম সত্য অদ্বৈত-ব্রহ্মের ধারণা করতে পারবে না—সেই জন্য নানা মতবাদের সৃষ্টি করেচেন—পাছে লোকে অবৈদিক বা নাস্তিক হয়ে পড়ে; অল্পসত্যসমন্বিত মতবাদগুলি অল্পবুদ্ধি লোকেরা নিজের পছন্দানুযায়ী বেছে নিয়ে তার অনুগামী হয়েচে। "প্রবোধ-চন্দ্রোদয়" নাটকের তাৎপর্য্যই হচ্ছে এই সমন্বয়ে। বিজ্ঞান ভিক্ষু তাঁর সাংখ্যসূত্রের উপক্রমণিকা-ভাষ্যে এই সমন্বয়ের কথাই বলেচেন। মাধবাচার্য্যের 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ' পড়লে বেশ বোঝা যায় যে একটা গোটা সমষ্টিপূর্ণ মন লীলাচ্ছলে অজ্ঞান থেকে ক্রমে উচ্চ উচ্চ জ্ঞানভূমিতে আরূঢ় হচ্ছে—চার্ব্বাক থেকে আরম্ভ করে সর্ব্বশেষ 'দর্শনশিরোমণিভূত শাংকরদর্শন'।

* শ্বেত উ, ২।৫

† ঋগ্বেদ, ১০।৯॥ ১০।৮১।৩॥ শ্বেত উ ৩।৩॥ গীতা, ৭।১৮॥

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ এই ক্রমবিকাশ হেগেলের আলোকে দর্শন করেচেন।* কিন্তু হিন্দুর ক্রমবিকাশ ও হেগেলের ক্রমবিকাশে আকাশ-পাতাল তফাৎ। হেগেলের ব্রহ্ম অপূর্ণ থেকে ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হচ্চেন—ফলে আসে এতে ভোগবাদ। হিন্দুর ব্রহ্ম স্বভাবতঃ পূর্ণ, অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অপূর্ণতা থেকে ক্রমে স্বস্বরূপ পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হচ্চেন, ত্যাগের দ্বারা। যে স্বভাবতঃ অপূর্ণ সে কখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারে না। হিন্দুর আত্মা স্বভাবতঃ পূর্ণ তাই সে কালে পূর্ণতাকে প্রাপ্ত হবে। স্বামিজীর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, 'অজগৎ থেকে জগৎ শ্রেষ্ঠ নয়, মুক্তি থেকে সংসার বরিষ্ঠ নয়, কর্ম্মজালাচ্ছন্ন আত্মা কখনও চিরমুক্ত আত্মা থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না।'† অবশ্য রাধাকৃষ্ণন্ অদ্বৈতপন্থী, আমরা কেবল তাঁর উপমাটির একটু আলোচনা করলুম, পাছে হেগেল-বেদান্ত ও শঙ্কর-বেদান্তের ক্রমবিকাশকে লোকে এক ভাবে।

যা হোক্, হিন্দুর চিন্তাধারা অতীতকে বর্ত্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন না করার হেতু, সকল বৈচিত্র্যের ভেতর ঐ চতুর্থ সত্তাকে অবগত হওয়ায়; তাই এখনও কালের অত্যাচার সহ্য করেও তার হিন্দুত্ব অখণ্ড রয়েচে এবং তাই হিন্দুর ইতিহাস পাঠে সমগ্র মনুষ্যজাতির সমষ্টি-মনের ক্রমবিকাশের অখণ্ড ইতিহাস আয়ত্ত করা যায়।

"নব জীবনের সঙ্কটপথে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবে না থামি।
শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নব নব,
দুর্গম মাঝে পথ করি দিবে,—
জীবনের ব্রত তব।
যত আগে যাবে দ্বিধা সন্দেহ
ঘুচে যাবে পাছে পাছে,
পায়ে পায়ে তব ধ্বনিয়া উঠিবে
মহাবাণী—আছে আছে॥"

* In the spirit of Hegel, he (Madhava) looks upon the history of Indian philosophy as a progresive effort towards a fully articulated conception of the world. The truth is unfolded bit by bit in the successive systems and complete truth is reflected only when the series of philosophies is completed—Indian Philosophy. Vol. I. p. 48.

† ভারতে বিবেকানন্দ, সর্ব্বাবয়ব বেদান্ত, পৃঃ ৪১৪, ৭ম সং।

কস্মৈ দেবায় ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

মাটির দেওয়াল দেওয়া টিনের চালের বাড়ি। দুখানি থাকিবার ঘরের সঙ্গে একটি পাতায় ছাওয়া রান্নাঘর এবং তাহারই সংলগ্ন ছোট একটু উঠান। সস্তায় ইহার চেয়ে ভালো বাড়ি পাওয়া সহরের মধ্যে কঠিন।

বিনুর মা প্রথম দিনকয়েক স্বামীর কাছে অভিযোগ করিয়াছিলেন—"মাগো দেয়ালগুলোর অর্দ্ধেকটা পর্য্যন্ত রাত-দিন ভিজে থাকে। এমন ঘরে থাকলে অসুখ করবে যে ?"

বিনুর বাপ বলিয়াছেন—"রোসো না, কটা মাস বাদেই ত উঠে যাব! এই কদিনে কিছু হবে না।"

মা বলিয়াছেন—"নর্দ্দামাটা একেবারে বাড়ির পেছনে; রাত দিন কিরকম দুর্গন্ধ আসে দেখেছ!"

বাবা ইহার উত্তরে আর কিছু বলেন নাই, তাঁহাকে শুধু অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখাইয়াছে। দরিদ্র হইলেও এমন বাড়িতে থাকিতে তাহারা কোন দিন অভ্যস্ত নয়।

বিনু কিন্তু এ বাড়ি কোন্ দিক দিয়া খারাপ বুঝিতে পারে না। মাটির ঘরের একটি যেন বিশেষ সৌন্দর্য্য তাহার কাছে আছে। সেখানে যে সিমেন্ট-করা মেঝেতে গুলি খেলিবার গর্ত্ত করা যাইত না। এখানে কাঁচা উঠানে কত বেশী সুবিধা।

আর বাড়ির বাহিরেই যে ছোট জমিটুকু আছে তাহার আকর্ষণই কি কম! বাড়ি করিবে বলিয়া কাহারা সেখানে একগাদা ইট বহুদিন হইতে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। বাড়ি যে কারণেই হোক্ আরম্ভ হয় নাই।

সেই ইটের পাঁজায় কয়েক বৎসরের বর্ষায় প্রচুর পরিমাণ শ্যাওলা ধরিয়াছে। দুএক জায়গায় ছোট দুএকটা গাছও বাহির হইয়াছে।

সেই ইটের পাঁজার উপর আরোহণ করার মত মজা আর কিছু নাই। বিনু কখনও পাহাড় দেখে নাই, ইটের স্তূপকে পাহাড় কল্পনা করিয়া সে তাহার উপর গিয়া বসিয়া থাকে। মনে হয় সমস্ত পৃথিবী হইতে সে যেন দূরে সরিয়া আসিয়াছে। এই দূরে সরিয়া যাওয়াটাই তাহার ভাল লাগে।

যে নোংরা কাঁচা নর্দ্দামাটা সম্বন্ধে মার অত আপত্তি তাহাও বিনুর কাছে অপরূপ।

দুর্গন্ধ হয়ত একটু আছে—তা থাক্; কিন্তু তাহার কাদার উপর যে সবুজ রঙের ছোপ লাগিয়াছে তাহা বিনুর কাছে অদ্ভুত মনে হয়। বর্ষার দিনে যখন সেই কাদার ভিতর স্রোত হয়, সবুজ পঙ্কে মিশ্রিত জল প্রবল বেগে দূরের ড্রেণের ভিতর সশব্দে গিয়া পড়িতে থাকে তখন বিনুর আনন্দের অবধি থাকে না। কাগজের নৌকা ভাসাইবার এমন নদী সে কখনও পায় নাই।

নর্দ্দামা পার হইবার কাঠের তক্তাটা সেদিন একটা প্রকাণ্ড সেতু হইয়া ওঠে। কাগজের বড় বড় জাহাজ তাহার তলা দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। খেলনার একটা রেলগাড়ির জন্য তখন বিনুর মন লুব্ধ হইয়া ওঠে। ওপাড়ায় সাধনদের মত তাহার একটা খেলনার রেলগাড়ি থাকিলে বিনু পোলের উপর দিয়া চালাইয়া দিত। যাই হোক সাধনদের এমন নদী ত' নাই।

আর বর্ষার রাতে টিনের চালের উপর জলের শব্দ! বর্ষার গভীর রাত্রে হঠাৎ বজ্রপতনের শব্দে জাগিয়া উঠিয়া কি মধুর ভয়ই না বিনু অনুভব করে। টিনের চাল যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে, আকাশের সমস্ত বৃষ্টি যেন কলরব করিয়া পৃথিবীতে তাহাদের খেলার সাথী খুঁজিতে আসিয়াছে।

মায়ের গায়ে একটি হাত রাখিয়া অন্ধকার ঘরের জানলায় ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ-চমক দেখিয়া একটু একটু ভয় পাইতে বিনুর কি ভালোই না লাগে।

টিনের চালটা পুরাতন। বেশী বৃষ্টি হইলে তাহার কয়েক জায়গা দিয়া টস্টস্ করিয়া জল পড়িতে থাকে।

মা বিরক্ত হইয়া বলেন—"দেখেছ ঘরদোর সব নষ্ট হয়ে গেল।"

বিনুর বাবা উঠিয়া একটা টিনের বালতি যেখান দিয়া জল পড়ে তাহার নীচে রাখিয়াছেন। ভারী মিষ্টি বাজনার মত টুপ্টাপ্ করিয়া উপরের জল তাহার উপর পড়িতে থাকে।"

বাবা বলেন—"এই মাসটা গেলেই উঠে যাব। নেহাৎ বিপদে পড়েই না এমন বাড়ি নিয়েছিলাম।"

মা বলেন—"বাগো, মাটির ঘরে বর্ষাকালে মানুষ কি করে থাকে! ঘরের ভেতরও যেন পুকুর হয়ে আছে।"

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলেন—"ছবিগুলো দেখেছ! পেছনে সব উঁই ধরেছে! এই ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার করলাম, ওমা তারপর রাতারাতি কোত্থেকে এত উঁই যে এসে জুটল কে জানে।"

বাবা বলেন,—"কাল অফিস থেকে ফেরবার সময় একটা বাড়ি দেখে এসেছি! একজনদের সঙ্গে থাকতে হবে—তা হোক্—কোঠা ঘর। এই মাসের মাইনেটা পেলেই আগে বাড়ি বদল করে তবে অন্য কথা!"

বিনুর কিন্তু বাড়ি বদল করার কথা ভালো লাগে না। এমন সুন্দর বাড়ি, পরিত্যাগ করিবার জন্য মা বাবা কেন যে এত ব্যস্ত হইয়াছেন তাহাও সে বুঝিতে পারে না।

এখানে এত ভালো লাগার আর একটি কারণ অবশ্য তাহার বাবার সুমতি। বাবার আর একটা চাকরী হইয়াছে সে জানে। কিন্তু বাবা আজকাল অফিসে যাওয়া ছাড়া আর বাড়ির বাহির হন্ না।

বিনু আজকাল স্কুলে যায় না। সকাল বিকাল বাবা নিজে তাহাকে পড়ান।

সন্ধ্যাবেলা পড়া সাঙ্গ হইলে সে বাবার কাছটিতে বসে। ঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝের উপর একটা মাদুর বিছাইয়া হারিকেন লণ্ঠনের আলোয় বাবা একটা প্রকাণ্ড কাগজ লইয়া তাহার উপর কি ছবি আঁকেন।

বাবার কাছে শুনিয়াছে সেটা ছবি নয়—কোথায় কাহাদের বাড়ি তৈয়ারী হইবে তাহারই নক্সা বাবা নকল করেন। নানা রঙ দিয়া বাবার আঁকা সেই ছবি দেখিতে বিনুর ভারী মজা লাগে। এই ছবির জন্য বাবা পয়সা পাইবে ভাবিয়া সে আরো অবাক হইয়া যায়। অফিসের পর উপরি রোজগারের জন্য তাহার বাবা নাকি এই কাজ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনেন। বাড়ি ত' রাজমিস্ত্রীরা ইট কাঠ দিয়া তৈয়ারী করে! তাহার ছবি কি জন্য দরকার সে ভাবিয়া পায় না।

ছবির ভিতর কোন্‌টা ঘর, কোন্‌টা রান্নাঘর, কোন্‌টা উঠান বাবা সব তাহাতে দেখাইয়া দেন।

তাহার পর বাবা জিজ্ঞাসা করেন "হ্যাঁরে বিনু, এই রকম একটা বাড়ি আমাদের হলে বেশ ভালো হয় নারে?"

বিনু মাথা নাড়িয়া বলে, 'না'। এত বড় বাড়ি লইয়া তাহার কি হইবে? সেখানে টিনের চালও থাকিবে না, নৌকা ভাসাইবার মত নর্দামাও না, হয়ত ইটের পাঁজাও সেখানে নাই।

বাবা হাসিয়া তাহার মাকে ডাকিয়া বলেন—"ওগো শুনছ, তোমার ছেলে সন্ন্যেসী হবে!"

মা কাজ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করেন—"কেন?"

"এত বড় বাড়ি ঘর দেখালাম, সে ও চায় না!"

মা বলেন—"আহা, বিনু বুঝি বোকা ছেলে—ও ছবির বাড়ি ঘর নেবে কেন? সত্যিকার বাড়ি ঘর দিয়ে দেখ দিকি?"

কিন্তু বিনু মনে মনে ভাবে সত্যিকারের বাড়িঘরও ত সে চায়ে না।

বাবা অনেক রাত জাগিয়া নক্সা আঁকার কাজ করেন। রাত্রে এক একদিন উঠিয়া সে শুনিতে পায়; মা বলিতেছেন—"হ্যাগো সেই ভোরে উঠেই ত কাজে ছুটতে হবে। এত রাত জেগে কাজ করলে ঘুমোবে কখন? শরীর খারাপ হবে না!" মেঝে হইতে বাপ বলেন—"এই যে উঠি, এটা আবার কালকের মধ্যে শেষ করে না দিলে টাকা পাব না, নতুন কাজও দেবে না।"

মা বলেন, "অত টাকার আমাদের দরকার নেই। তোমার রোজ রোজ রাত জেগে শরীর নষ্ট করতে হবে না।"

বাবা হাসিয়া বলেন, "টাকা খরচ করে শরীর নষ্ট করার চেয়ে শরীর নষ্ট করে টাকা পাওয়া ভাল নয়?"

"না, কোনটারই আমাদের দরকার নেই। আর তুমি ওকাজ এনো না।"

বাবা মেঝে হইত উঠিয়া পড়িয়া গম্ভীর হইয়া বলেন—"তুমি কি ভাব এতে আমার কষ্ট হয় লীলা!"

মা ভারী গলায় বলেন—"কিন্তু আমাদের ত হয়! আমাদের এমনিই বেশ চলে যাবে! তোমায় এমন করে শরীর পাত করতে হবে না।"

বাবা বলেন, "ওকথা বোলোনা লীলা! আমায় একটু অন্ততঃ প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।"

দুজনের আর কোন কথা হয় না। বাবা কাজ সারিয়া কত রাত্রে যে ঘুমাইতে যান তাহা বিনু জানিতেই পারে না।

যে পাড়ায় বিনুরা থাকে, সে পাড়ার বাসিন্দাদের অবস্থা যে তাহাদের অপেক্ষাও খারাপ এটুকু বিনু ত' বুঝিতে পারে। মার কথাবার্ত্তা ইসারা ইঙ্গিত হইতে এটুকুও সে বুঝিয়াছে যে তাহাদের সহিত মেলা-মেশা করা উচিত নয়। আগের

বাড়িতে থাকিতে কোন কোন দিন তাহার মা পাড়ার বেড়াইতে যাইত। কিন্তু এখানে মা কাহারও বাড়ি যায় না। পাড়ার মেয়েরাও কেন বলা যায় না তাহাদের বাড়ি আসে না।

পাড়ার ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে বিনুর একটু ভাব করিতে ইচ্ছা হয় নাই এমন নয়। কিন্তু তাহার বয়সী যে কয়টি ছেলে মেয়ে আছে, তাহারা কেমন যেন তাহাকে এড়াইয়া চলে। বিনু তাই একলাই থাকে।

কিন্তু ইহার ভিতর একদিন তাহার এক জনের সঙ্গে ভাব হইয়া গেল। ভাব হইয়া গেল একটি মেয়ের সঙ্গে।

মেয়েটি বয়সে তাহার অপেক্ষা কিছু বড়ই হইবে। কিন্তু যেমন রোগা তেমনি কালো। সুন্দর কুৎসিত বিচার করিবার বয়স হইলে বিনু হয়ত বুঝিতে পারিত যে মেয়েটিকে বিধাতা সকল রকম শ্রী হইতে একেবারে বঞ্চিত করিয়া পাঠাইয়াছেন।

তাহাদের বাড়ির খানিক দূরেই তাহাদের মাটির ঘর। কাঠের তক্তা দিয়া তাহাদের বাড়িতেও নর্দামা পার হইয়া যাইতে হয়।

বিনু অনেক দিন মেয়েটিকে এক তাল গোবর লইয়া সামনের মাঠের উপর ঘুঁটে দিতে দেখিয়াছে। আলাপ করিবার কথা অবশ্য মনেও হয় নাই। মেয়েদের সহিত আলাপ করিবার তাহার ইচ্ছাই কোন দিন ছিল না।

সেদিন তাহার পাহাড় হইতে হঠাৎ একটা মস্ত বড় বাঘের তাড়া খাইয়া প্রাণপণে দৌড়াইতে দৌড়াইতে বিনু অসাবধানে মাঠের উপর শুকাইতে দেওয়া কয়েকটা ঘুঁটে ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

আর যায় কোথায়! মেয়েটি গোবরমাখা হাতে কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া সে যে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল বিনু জীবনে তাহা শোনে নাই। সেগুলি গালাগাল এই টুকু মাত্র বুঝিয়া সে মুখ চোখ লাল করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েটির মুখ হইতে যেরকম অনর্গল ধারে গালাগালির স্রোত বহিতেছিল তাহাতে বাঘে তাড়া করিলে মানুষের যে দিগ্বিদিকজ্ঞান থাকা স্বাভাবিক নয় এটুকু তাহাকে বোঝাইবার অবসর পাওয়া অসম্ভব!

মেয়েটি নিশ্বাস ফেলিবার জন্ত একবার একটু থামাতে বিনু শুধু বলিল—"আমি কি দেখে ভেঙেছি।"

কিন্তু ইহাতে অগ্নিতে ঘৃত প্রয়োগ করা হইল মাত্র।

"ওমা, ঘুঁটে ভেঙ্গে আবার মুখ নাড়া দেওয়া! দেখতে পাওনি। কেন কাণা নাকি, চোখের মাথা খেয়ে এসেছ নাকি?"

হাজার লাজুক হইলেও ওইটুকু একটা মেয়ের মুখ হইতে এত কথা শুনিতে বিনু প্রস্তুত নয়। সে একটু রাগিয়া বলিল, "যাতা বোলোনা বলছি, শুধু দুটো ত' ঘুঁটে ভেঙেছে।"

মেয়েটি এবার শুধু গালাগালি দিয়াই সন্তুষ্ট হইল না। "তবে রে হতচ্ছাড়া ছেলে—ঘুঁটে ভেঙে আবার চোপরাও! দেব মুখ খানা গোবরে রগড়ে!" বলিয়া সে সত্যই বিনুকে তাড়া করিয়া আসিল।

পিছনে গোবরের তাল ছিল, বিনু দেখিতে পায় নাই। ভয়ে পিছাইতে গিয়া গোবরে পা হড়কাইয়া সে অকস্মাৎ চিত হইয়া পড়িয়া গেল। মাথায় ত' আঘাত লাগিলই, দেখা গেল গোবরেও সর্ব্বাঙ্গ মাখামাখি হইয়া গেছে। বিনু বেদনার ভয়ে চেঁচাইয়া ফেলিল।

যে উলঙ্গ ছেলেগুলা এতক্ষণ বিনুকে গালাগালি খাইতে দেখিয়া কাছে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল তাহারা কেন বলা যায় না বিনুকে পড়িতে দেখিয়া এবার পলাইয়া গেল।

শুধু মেয়েটা কেমন যেন হতভম্ভ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিনুর গায়ে মাথায় মুখে সব জায়গায় গোবর লাগিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু বাড়ি যাইতে সাহস করিল না।

সবে খানিক আগে মায়ের কাছে অনেক অনুরোধ করার পর বাবার আনা নতুন জামাটা মা তাহাকে পরিতে অনুমতি দিয়াছেন। সে জামার এ অবস্থা মাকে সে কেমন করিয়া দেখাইবে। মাথার বেদনার চেয়ে সেই ভয়ই তাহার প্রবল হইয়া উঠিল।

গায়ের ও জামার গোবর সে নিজেই খানিকটা তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে জামার দাগ যাইবে কেন? বিনু হতাশ ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পাহাড়ের ধারে গিয়া বসিল। মা যে জানালা হইতে দেখিতে পায় নাই এই তাহার ভাগ্য! মেয়েটা তখনও তেমনি নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বিনু পড়িয়া যাওয়ার পর একটা ঝগড়া বাধিতে পারে জানিয়া তাহার জন্তই সে প্রস্তুত ছিল। বিনু যে কাহাকেও কিছু না বলিয়া এমন অসহায় ভাবে কাঁদিবে ইহা সে আশা করে নাই। বিনু বলিয়া দিয়া মার খাওয়াইতে পারে এই রকম একটা আশঙ্কা করিয়া যে ছেলেগুলা পলাইয়া

গিয়াছিল তাহারা এতক্ষণে আশ্বস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। একজন কি একটা ঠাট্টাও করিল। কিন্তু এবারে মেয়েটা তাহাদের দাঁত খিচাইয়া এক রকম তাড়াইয়াই দিল।

ছেলেরা এবার একটা নূতন মজা পাইল। মেয়েটির নাম বোধ হয় কালী। 'কালী' 'কেলিন্দী' বলিয়া এবং তাহার সহিত আহার্য্য হিসাবে অচল বিশেষ এক প্রকার কাসুন্দীর একটা অসঙ্গত মিল জুড়িয়া দিয়া তাহারা ছড়া বাঁধিয়া মেয়েটাকে দূর হইতে ক্ষেপাইতে সুরু করিল।

কালী খানিক গালাগালি দিয়া হায়রাণ হইয়া নিজের মনে আবার ঘুঁটে দিতে সুরু করিয়া দিল। কিন্তু বেশীক্ষণ নিজের কাজ করিতে সে পারিল না। খানিক বাদেই দেখা গেল বিনুর কাছে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে।

তাহাকে দেখিয়া বিনু কান্না থামাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু কথা বলিল না। কালী নিজে হইতেই বলিল, "জামা কাপড় ধুয়ে ফেলবে না?"

বিনু তথাপি চুপ করিয়া রহিল।

কালী কিন্তু হঠাৎ তাহার মনের কথাটি অনুমান করিয়া বলিল—"বাড়ি গেলে মা বকবে বুঝি!"

বিনু এবার আর কান্না রোধ করিতে পারিল না। কালী নীচু হইয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া চুপি চুপি বলিল— "কাঁদেনা, আমাদের বাড়ী গিয়ে ধোবে চল, মা জানতে পারবে না।"

যে মেয়েটার জন্য এত কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহারই সহিত তাহাদের বাড়ি যাইতে বিনুর ইচ্ছা ছিল না কিন্তু সে বাধা দিতে পারিল না। কালীর হাত ধরিয়া তাহাদের বাড়িই বিনুকে যাইতে হইল।

ইহার আগে এত নোংরা এত দরিদ্র কাহারও বাড়িতে বিনু কখনও যায় নাই। কালীদের ঘরদুয়ারের অবস্থা দেখিয়া সত্যই বিনু অবাক হইয়া গেল। এ রকম বাড়িতে এমন অবস্থায় কেহ থাকিতে পারে এ ধারণা তাহার ছিল না। অপরিচিত বাড়িতে লজ্জাও তাহার কম করিতেছিল না। বিশেষতঃ সে বাড়িতে ঢুকিতেই অপরিচিত একটি স্ত্রীলোক খনখন বলিয়া উঠিল—"ও আবার কাদের ছোঁড়াকে নিয়ে এলিরে কালী?"

কালী অবশ্য তৎক্ষণাৎ ঝঙ্কার দিয়া বলিল—"ছোঁড়া নয় গো ছোঁড়া নয়, টিনের চালের বাড়ির ভাড়াটেদের ছেলে, ওর বাবা আফিসে চাকরী করে!" স্ত্রীলোকটি তাহার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া যেন অত্যন্ত বিরক্তিভরে 'হুঁ' বলিয়া চলিয়া গেল।

বিনুর ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল। কিন্তু কালী ছাড়িল না। তাহাকে কোথা হইতে একখানা ময়লা কাপড় আনিয়া পরাইয়া একটা অন্ধকার ঘরে বসাইয়া রাখিয়া সে নোংরা কাপড় জামাগুলা কাচিতে লইয়া গেল এবং খানিক বাদে সেগুলা এক রকম পরিষ্কার করিয়া লইয়া আসিয়া বলিল—"একটু সাবান পেতুম ত একেবারে ধবধবে করে দিতুম, দেখতে! যাকগে এখন আর তত বুঝতে পারবেনা। বোলো কাদায় পড়ে গিয়ে রাস্তার কলে ধুয়ে ফেলেছি!"

সে যুক্তি মার কাছে কতদূর টিঁকিবে তাহা বিনু জানেনা, কিন্তু ইহার চেয়ে ভালো কোন কথা তাহার মনেও পড়িল না।

ভিজা কাপড় জামা পরিয়াই সে বাড়ি চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ কালী তাহাকে পিছন হইতে ডাকিল।

বিনু ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল--"কি?"

কালী অত্যন্ত কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার ওপর রাগ করনি!"

একটু বিব্রত হইয়া কি উত্তর দিবে ভাবিয়া না পাইয়া বিনু বলিয়া ফেলিল—"আগে করেছিলুম।"

"আর এখন?"

"এখন করিনি" বলিয়া বিনু হাসিয়া ফেলিল।

কালীও হাসিয়া ফেলিয়া বিনুর একটা হাত ধরিয়া হঠাৎ গলার স্বর নামাইয়া বলিল—"একটা কথা বলব?"

বিনু অবাক হইয়া বলিল—"কি?"

কালী তেমনি চুপি চুপি বলিল—"আমার বড্ড ইচ্ছে করে। তোমাদের বাড়ি একদিন যাব? তোমার মা কি তাহ'লে বকবে?"

বিনু গম্ভীর হইয়া খানিক মায়ের মনোভাব বিচার করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে বলিল—"না, যেওনা।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। অন্ধকারে কালীর মুখের ভাব অবশ্য বোঝা গেল না। (ক্রমশঃ)

নির্ব্বাণ

—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

প্রায় অর্দ্ধ-মনুষ্যজাতি আজ নির্ব্বাণ-উপাসক। চীন, জাপান, শ্যাম, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও তিব্বত প্রভৃতি দেশ নির্ব্বাণ-পন্থী। কিন্তু প্রায় সহস্রাধিক বৎসর নির্ব্বাণ ধর্ম্ম জন্মভূমি ভারত হইতে নির্ব্বাসিত ছিল। বর্ত্তমানে দেখিতেছি, বিংশ শতাব্দীর এই জাগরণের যুগে, বৌদ্ধধর্ম্ম আবার ভারতে লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। ইতিমধ্যে মালাবার, কাশ্মীর, বঙ্গ ও বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে কয়েকটী বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে এবং বৌদ্ধ প্রচারকগণ হিন্দুধর্ম্মের ত্রুটী দর্শন করাইয়া নির্ব্বাণপ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছেন। এক সময় প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী যাবৎ সমগ্র ভারত বুদ্ধের পদানত ছিল। কিন্তু যখন বৌদ্ধগণ বেদদ্রোহী হইলেন তখন বেদ-শক্তি জাগ্রত হইয়া সমগ্র বৌদ্ধ-শক্তি গ্রাস করিয়া ফেলিল।

নব্য ভারতে ভগবান বুদ্ধের স্থান কোথায়? আমার মনে হয়—রাম, শঙ্কর, কৃষ্ণ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ ও রামানুজ প্রভৃতি হিন্দু দেব-মানবগণের অন্যতম রূপে বুদ্ধ যেমন হিন্দু ভারতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন—তদ্রূপ ভবিষ্যতেও হইবেন। বৌদ্ধ প্রচারকগণ এর বেশী আশা করিয়া বৌদ্ধ-রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে নিরাশ হইবেন। বোধ করি মহম্মদ ও ঈশাও অদূর ভবিষ্যতে বুদ্ধের মতই হিন্দু প্যান্থিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-জীবনে আমরা এই জলন্ত উদাহরণ পাইয়াছি। জার্ম্মান দার্শনিক কাউণ্ট কাইসারলিং তাঁহার *Travel Diary of a Philosopher* নামক পুস্তকেও উক্ত মতই প্রকাশ করিয়াছেন। যুগে যুগে বেদ-শক্তি প্রবুদ্ধা হইয়া সমস্ত বিদ্রোহী শক্তি হজম করিয়া স্বশরীরে স্থান দিয়াছেন। ভারতেতিহাসের এই ইঙ্গিত তরুণ ভারতের স্মৃতিপটে সদাজাগরূক থাকা অত্যাবশ্যক।

বৌদ্ধ নির্ব্বাণ ও হিন্দু সমাধি কি এক? ভারতীয় ও ভারতেতর প্রদেশীয় বৌদ্ধগণ একবাক্যে বলিতেছেন—নির্ব্বাণ সমাধি নহে। আমরা হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধ-শাস্ত্র এবং হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিব—নির্ব্বাণ সমাধির নামান্তর মাত্র। ধর্ম্মরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ অনুভূতির নাম বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় শাস্ত্রেই—নির্ব্বাণ, সমাধি, মোক্ষ, নিঃশ্রেয়স প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মান্তর্গত হইলেও উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মহাযান সদা-গতিশীল (progressive) ছিল বলিয়া উত্তর ভারত হইয়া তিব্বত, চীন, জাপানে বিস্তৃত হইয়াছে এবং উহাকে বেদান্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু হীনযানের নাম হইতে বুঝা যায় উহা বৌদ্ধধর্ম্মের conservative—গতিহীন গোঁড়ামীর অংশ। হীনযানের পালি ত্রিপিটকের সহিত মহাযানের সংস্কৃত সূত্র ও ত্রিপিটক তুলনামূলক ভাবে পাঠ করিলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বা নির্ব্বাণের মূলতত্ত্ব ধরা যাইবে, নচেৎ নহে। পাশ্চাত্য বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ সমস্ত জীবন বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া এই সার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। শূন্যবাদ, সন্দেহবাদ ও নাস্তিক্যবাদের ভাষায় অনেকে নির্ব্বাণের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এ ব্যাখ্যা আদৌ সমীচীন ত নহেই, পরন্তু উহা বৌদ্ধ-শাস্ত্রসম্মত নহে। নাগার্জ্জুনের 'মাধ্যমিক কারিকা' মহাযানের বেদ। নাগার্জ্জুন মহাযানের দ্বিতীয় বুদ্ধ। অপর দিকে শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু গৌড়পাদের 'মাণ্ডুক্য কারিকা' বেদান্তের প্রধান গ্রন্থ। নাগার্জ্জুন ও গৌড়পাদের পুস্তকাবলী পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়—উভয়ের পুস্তকই বেদের ভিত্তিতে লিখিত। হইতে পারে শঙ্কর ও গৌড়পাদ নাগার্জ্জুন প্রভৃতি কর্ত্তৃক কিয়ৎ পরিমাণে ভাষা, ন্যায় ও দার্শনিক বিচার ইত্যাদিতে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন—কিন্তু নাগার্জ্জুন যে মহাযান-সৌধ বেদ-ভিত্তিতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এ বিষয়ে সমস্ত পণ্ডিতগণ একমত।

বসুমিত্র বলেন যে, ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের এক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ সঙ্ঘের মতদ্বৈধ ঘটে। মহাদেব নামক জনৈক বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। আর তখন হইতে গোঁড়া দলের নাম হইল স্থির বা স্থবির দল। উহার পালি অপভ্রংশ থেরাবাদ। থেরাবাদই হীনযান। মহাসঙ্ঘিক ক্রমে মহাযানে পরিবর্দ্ধিত হয়। উভয় যানের মত এই যে, অনুত্তর সম্যক সম্বোধিলাভই নির্ব্বাণ বা মোক্ষ। নির্ব্বাণ যেমন মোক্ষ, তেমনি সমাধিও মোক্ষ। অশ্বঘোষ, আর্য্যদেব

প্রভৃতি মহাযান-রথীগণ বলেন—ভূত-তথতা বা ধর্ম্মকায় লাভ করা এবং এই সংসারের নিবৃত্তিই নির্ব্বাণ। ধর্ম্মকায় অর্থে বোধি, বেদের ব্রহ্ম বা Absolute, তাহা অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌। শূন্যও নহে, অশূন্যও নহে। বেদ ব্রহ্মকে 'তৎ' বলিয়াছেন। ত্রিপিটক ধর্ম্মকায়কে 'তথতা' বলিয়াছেন। ডাক্তার সুজুকি তাঁহার *Outlines of Mahayan* পুস্তকে ধর্ম্মকায়ের বিভিন্ন নাম সংগ্রহ করিয়াছেন, যথা—তথাগত গর্ভ, ধর্ম্ম, বোধি, প্রজ্ঞা, বোধিচিত্ত, শূন্যতা, কুশলং, পরমার্থ, মধ্যমার্গ ও ভূতকোটী। এই ধর্ম্মকায়কে বৌদ্ধগণ যেমন তথাগত গর্ভ বলিয়াছেন, গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ (১৪।৩) বলিতেছেন—"মমযোনিমহৎ ব্রহ্ম"। বুদ্ধের তিনটি শরীর। ধর্ম্মকায়, নির্ম্মাণকায় ও সম্ভোগকায়। যেমন বেদের ব্রহ্ম (নির্গুণ ও নিরাকার), ঈশ্বর (সগুণ ও সাকার) ও অবতার। এই ধর্ম্মকায় বুদ্ধেতে লয়প্রাপ্তিই নির্ব্বাণ। যেমন গীতায় বলা হইয়াছে সমাধিই ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ। ধর্ম্মকায় বুদ্ধের আরও বিভিন্ন নাম আছে যথা—বৈরোচন-বুদ্ধ, বৈরোচন-ধর্ম্মকায় বুদ্ধ, অমিতাভ বুদ্ধ, ও অমিতায়ুর্বুদ্ধ। ধর্ম্মকায় সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বানন্দ, রূপহীন, গুণহীন, অসীম ও অনন্ত; অর্থাৎ বৈদিক ব্রহ্মের সমস্ত বর্ণনা ও লক্ষণ উহাতে দেওয়া হইয়াছে। সমাধির চরমানুভূতি যেমন সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন, নির্ব্বাণেরও ঠিক তদ্রূপ। প্রবাদ আছে যে, নির্ব্বাণলাভান্তে বুদ্ধদেব দর্শন এবং প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "সমস্ত প্রাণী-জগৎ তথাগত গর্ভের জ্ঞান ও আলোকে উদ্ভাসিত দেখিতেছি।" মহাযানবাদীগণ অতি উদার। তাঁহারা বলেন বুদ্ধদেব যেমন ধর্ম্মকায়ের অবতার তেমনি সক্রেটিশ, মহম্মদ, লাওজে, ঈশা প্রভৃতি পৃথিবীর আধ্যাত্মিক বীরগণও এই একই ধর্ম্মকায়ের অবতার। বেদে যেমন আছে যে, সমাধিকালে জ্ঞান-চক্ষু (তৃতীয় চক্ষু) কপালে উন্মীলিত হইয়া সাধকের জ্যোতি-রাজ্যদর্শন হয়, তদ্রূপ অশ্বঘোষ বলেন যে, বুদ্ধদেবেরও নির্ব্বাণকালে এই দর্শন হইয়াছিল। ধর্ম্মকায় হইতে আলয়-বিজ্ঞানের সৃষ্টি। হিন্দু প্রকৃতি বা বিশ্ব-মনের মতই ঠিক এই বৌদ্ধ আলয়-বিজ্ঞান। মহাযানের মতে ঠিক সমাধির মত নানাত্ব দর্শনান্তে 'সমতা'-দর্শনই নির্ব্বাণ। গীতাতেও ঠিক তেমনি আছে। "সমত্বং যোগ উচ্যতে"। এখানে যোগ অর্থে ব্রহ্মানুভূতি, ব্রহ্ম নির্ব্বাণ বা সমাধি।

নাগার্জ্জুন বলেন যে, সংবৃত্তি সত্য ও পারমার্থিক সত্য এই দুই প্রকার সত্য আছে। এই পারমার্থিক সত্য লাভ করাই নির্ব্বাণ। হিন্দু মতেও দুই প্রকার সত্য আছে, ব্যবহারিক সত্য ও পারমার্থিক সত্য। এই পারমার্থিক (superconscious বা absolute) জ্ঞান লাভই সমাধি। নাগার্জ্জুন তাঁহার মাধ্যমিক শাস্ত্রে বলেন :—

> দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্মশাসনাঃ।
> লোকসম্বৃত্তিসত্যাংশ্চ সত্যাংশ্চ পরমার্থতঃ॥

সম্বৃত্তি সত্য বা ব্যাবহারিক সত্য হইতেছে relative truth এবং পরমার্থিক সত্য হইতেছে transcendental truth।

> যে চানয়োর্ন জানন্তি বিভাগং সত্যয়োর্দ্বয়োঃ।
> তে তত্ত্বং নাভিজানন্তি গম্ভীরবুদ্ধশাসনে॥

অর্থাৎ সত্যের এই বিভাগদ্বয় অবগত না হইলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বুঝা যায় না। নাগার্জ্জুন বলেন পারমার্থিক সত্য শূন্য-অশূন্য, অস্তি-নাস্তি, ভাবাভাবের অতীত। আবার ব্যাবহারিক সত্যাশ্রয়েই পারমার্থিক সত্যে পৌঁছিতে হইবে। কারণ ইন্দ্রিয় জ্ঞানাবলম্বনেই ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানে যাইতে হয়। তিনি বলেন :—

> ব্যবহারম্ অনাশ্রিত্য পরমার্থো ন দেশ্যতে।
> পরমার্থমনাগম্য নির্ব্বাণমধিগম্যতে॥—মাধ্যমিক শাস্ত্র।

অর্থাৎ পারমার্থিক সম্বোধিলাভই নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ ও সংসার, স্বভাব ও পরভাব, পারমার্থিক সত্য ও ব্যাবহারিক সত্য এক। যিনি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন তিনি বৌদ্ধ তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন না। মাধ্যমিক শাস্ত্রে নাগার্জ্জুন বলেন :—

> স্বভাবং পরভাবং চ ভাবঞ্চাভাবমেব চ।
> যে পশ্যন্তি ন পশ্যন্তি তত্ত্বং হি বুদ্ধশাসনে॥

আবার এই নির্ব্বাণ বা পারমার্থিক বোধি সৎও নয়, অসৎও নয়,—নির্ব্বাণ উভয়েরই অতীত। তাঁহার মাধ্যমিক শাস্ত্রে আছে :—

> অস্তীতি শাশ্বতগ্রাহো নাস্তীত্যুচ্ছেদদর্শনম্।
> তস্মাদস্তিত্বনাস্তিত্বে নাশ্রিয়েত বিচক্ষণঃ॥

আবার বলেন :—

> অস্তীতি নাস্তীতি উভেহপি অন্তা
> শুদ্ধি অশুদ্ধীতি ইমেপি অন্তা।
> তস্মাৎ উভে অন্ত বিবর্জ্জয়িত্বা
> মধ্যেহপি স্থানং ন করোতি পণ্ডিতঃ॥

অর্থাৎ নির্ব্বাণ, অস্তি, নাস্তি, শুদ্ধি, অশুদ্ধির পরপারে। তিনি বলেন :—

অনিরোধম্ অনুৎপাদম্ অনুচ্ছেদম্ অশাশ্বতম্।
অনেকার্থম্ অনানার্থম্ অনাগমম্ অনির্গমম্॥—মাধ্যমিক শাস্ত্র।

অর্থাৎ নির্ব্বাণ নিরোধ, উৎপাদ, উচ্ছেদ, শাশ্বত, একত্ব, নানাত্ব, আগম ও নিগমের অতীত।

ভগবান বুদ্ধ উক্ত তথতার অবতার। তাহা বুঝাইতে গিয়া তিনি বলেন :—

পরং নিরোধাদ্ ভগবান্ ভবতীত্যেব নোহ্যতে।
ন ভবত্যুভয়ং চেতি নোভয়ং চেতি নোহ্যতে॥
অধীষ্যমানোঽপি ভগবান্ ভবতীত্যেব নোহ্যতে।
ন ভবত্যুভয়ং চেতি নোভয়ং চেতি নোহ্যতে॥—মাধ্যমিক শাস্ত্র।

ভগবান বুদ্ধ শরীর ত্যাগ করিলে পর কেহ যেন না ভাবেন তিনি আছেন—আবার যেন কেহ না ভাবেন তিনি নাই। তিনি অস্তি বা নাস্তির অতীত। বোধিসত্ত্ব বিমলকীর্ত্তি মঞ্জুশ্রী প্রমুখ একদল বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করেন যে, নির্ব্বাণ কি? কেহ বলিলেন অদ্বৈতধর্ম্মে প্রবেশই নির্ব্বাণ। কেহ বলিলেন অজ্ঞাননাশ ও জ্ঞানলাভই নির্ব্বাণ। মঞ্জুশ্রী বলিলেন—নির্ব্বাণ ব্যক্যমনাতীত, লিঙ্গহীন, নির্ব্বিশেষ ও অনির্ব্বচনীয়। সর্ব্বশেষে বিমলকীর্ত্তি মঞ্জুশ্রী কর্ত্তৃক নির্ব্বাণ বর্ণনা করিতে পৃষ্ট হইলে তিনি নির্ব্বাক ও নীরব হইয়া রহিলেন। তখন মঞ্জুশ্রী বলিলেন—"আপনি সত্যই বলিয়াছেন—নির্ব্বাণ অবাঙ্মনসোগোচরম্।" বেদেও আছে রাজা বাস্কলিন কর্ত্তৃক সমাধি বর্ণনা করিতে পৃষ্ট হইয়া ঋষি ভাব চুপ করিয়া রহিলেন। রাজা দ্বিতীয়, তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করিলে ভাব বলিলেন—সমাধি কি আমি বলিয়াছি আপনি বুঝেন নাই। মৌনমেব ব্রহ্ম। শান্তোঽয়ম ব্রহ্ম।

সুতরাং দেখা গেল নির্ব্বাণ অভাব, অসৎ বা শূন্য নহে। নির্ব্বাণ সৎপদবাচ্য। সমাধি যেমন সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প আছে। নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক শাস্ত্রের বিখ্যাত টীকাকার চন্দ্রকীর্ত্তি বলেন যে, নির্ব্বাণ সর্ব্ব-কল্পনা-ক্ষয় রূপং। নাগার্জ্জুনের ভাষায় নির্ব্বাণ হইতেছে :—

অপ্রহিণম্ অসম্প্রাপ্তম্ অনুচ্ছিন্নম্ অশাশ্বতম্।
অনিরুদ্ধম্ অনুৎপন্নম্ এবং নির্ব্বাণমুচ্যতে।

অর্থাৎ নির্ব্বাণ অভাবহীন, পাওয়া যায় না, উৎপন্ন হয় না ইত্যাদি। ধর্ম্মকায় ও নির্ব্বাণ অভিন্ন। কখনও কখনও নির্ব্বাণকে নিত্য, সুখ, আত্মা ও শুচি নামেও অভিহিত করা হয়। মাধ্যমিক শাস্ত্রে আছে :—

ভবেদ্ অভাবো ভাবশ্চ নির্ব্বাণম্ উভয়ং কথম্।
অসংস্কৃতং চ নির্ব্বাণং ভাবাভাবৌ চ সংস্কৃতম্॥
কিং বাঃ তস্মান্ন ভাবো নাভাবো নির্ব্বাণমিতি যুজ্যতে॥

আবার সংসার ও নির্ব্বাণ অভেদ। যথা মাধ্যমিক শাস্ত্রে—

সংসারস্য চ নির্ব্বাণাৎ কিঞ্চিন্ নাস্তি বিশেষণম্।
ন নির্ব্বাণস্য সংসারাৎ কিঞ্চিদ্ অস্তি বিশেষণম্॥

রাশিয়ার পেট্রোগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্কারবাট্‌স্কি তাঁহার *Central Conception of Nirvan* নামক বিখ্যাত পুস্তকে বলেন যে, মহাযানের উপর উপনিষদের প্রভাব যথেষ্ট। তিনি বলেন নির্ব্বাণ Absolute. যেমন নাগার্জ্জুন বলেন—

য আজবং যাভিভাব উপাদায় প্রতীত্য বা।
সোঽপ্রতীত্যানুপাদায় নির্ব্বাণম্ উপদিশ্যতে॥

অর্থাৎ কার্য্যকারণময় নামরূপময় এই জগৎ হইতে কার্য্য-কারণ, নামরূপ বাদ দিলে নির্ব্বাণ লাভ হয়। হিন্দু সমাধির বর্ণনা ঠিক এইরূপ।

উক্ত অধ্যাপক তাঁহার *Central Conception of Buddhism* নামক পুস্তকে বলেন যে, বেদান্তের বিবর্ত্তবাদ ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্যবাদ প্রায় একই। ভগবান বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেও উপনিষদে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বীজ নিহিত ছিল।

শান্তিদেবের "বোধিচর্য্যাবতার" ও "শিক্ষা সমুচ্চয়" নামক পুস্তকদ্বয়ও উক্ত মতের পরিপোষক।

বৌদ্ধ নির্ব্বাণ ও হিন্দু সমাধি একই ইন্দ্রিয়-মনাতীত অবস্থা। মহাযান ও বেদান্ত সামান্য পার্থক্য ব্যতীত এক ঔপনিষদিক দর্শনকেই বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিতেছে। নির্ব্বাণ শূন্য নহে। উহা সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান, সর্ব্বোচ্চ আনন্দের অবস্থা। নির্ব্বাণ যে কি তাহা যত নাকি অনুভব করা সম্ভব প্রকাশ করা তত সম্ভব নহে।

দেশের কথা

আমাদের ছেলে বয়সে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, গুরুজনেরাই রাজনীতির চর্চা করতেন। সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকখানায় বসে হোইটহলের আদ্যশ্রাদ্ধ হত। সে শ্রাদ্ধ-সভায় গবর্ণমেণ্টের legislative, executive এবং judicial functionsএর পৃথক্‌করণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণোচিত কূটতর্ক উঠ্‌ত! সে তর্কে বিলেতী শ্রুতিস্মৃতির বিচার চল্‌ত। এবং সে বিচারের শেষে ব্রাহ্মণ-বিদায়ের ঝামেলা সহ্য করতে হত অন্তঃপুরস্থ মহিলাদের। আমার বিশ্বাস, সেই থেকেই ভারতললনা 'সাধের ঘুমঘোর' থেকে প্রথম জেগে উঠলেন। বৎসরের শেষে, বড়দিনের ছুটিতে, কংগ্রেসের ডেলিগেট্‌ হ'য়ে কর্ত্তারা দেশভ্রমণে বেরুতেন। বৎসরারম্ভের একমাস পর্য্যন্ত ফিরোজসা মেটা, সুরেন্দ্রনাথ, দিনসা' ওয়াচা ও মালব্যজীর ইংরেজী বক্তৃতার তুলনামূলক বিচার চলত। কেউ বলতেন মেটা সাহেবের আওয়াজ সুরেন বাঁড়ুয্যের চেয়ে গম্ভীর, কিন্তু মালব্যজী কি গোখ্‌লের মত অত মিষ্টি নয়। কেউ ব্‌লতেন লালমোহনের ইংরেজী সবচেয়ে ভাল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতেন, বাঙ্গালীর কাছে কেউ লাগেনা, কি বুদ্ধি, কি বিদ্যায়, অর্থাৎ ইংরেজী বক্তৃতায়।

তারপর স্বদেশী যুগ। লাল, বাল, পাল, তখন দেশের দেবতা, অরবিন্দ শুধু দার্শনিক। ত্রিমূর্ত্তির পূজা জোরে চল্‌ল। যুবার দল সামনে এলেন, প্রৌঢ়েরা পিছিয়ে পড়লেন। সকলের মুখে বন্দেমাতরং, হাতে আনন্দমঠ, পরণে জোলার ধুতী, পকেটে যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরং, যেথায় সেথায় সভাসমিতি, সকালে বিকালে স্বদেশী গান ও মিছিল, রঙ্গমঞ্চে প্রতাপাদিত্য, শিবাজী, মুখের ও কলমের ভাষা তেজোময়, ডিপুটি মশায়দের গৃহবিচ্ছেদ, উকীলদের জয়-জয়াকার। আমরা, ছেলেছোকরারা তখন মেতে উঠিছি, প্রধান কাজ আমাদের ভলণ্টিয়ারি করা,—ভোরবেলা লাঠি-খেলা, দুপুর বেলা, স্কুল পালিয়ে গানের মহলা দেওয়া, বিকেলবেলা দেশী কাপড় ফিরি করা, রাত দশটায় বাড়ী ফেরা, আকাশে বাতাসে মাদকতা, প্রাণে আশা, মনে আবেগ। স্বদেশী বস্ত্রালয়, স্বদেশী ফ্যাক্টরী, স্বদেশী স্কুল, স্বদেশী সাহিত্য, স্বদেশী গান, স্বদেশী ব্যবসা বাণিজ্য, স্বদেশী মন, স্বদেশী যুগ।

ধূমকেতুর মতন হঠাৎ কোথা থেকে বিপ্লবপন্থীরা এসে হাজির হলেন। ব্যাপারটা ঘোরাল হয়ে উঠ্‌ল। রিজলী-সার্কুলারের দোহাইএ স্কুলের মাষ্টার ও বাড়ীর কর্ত্তারা আমাদের সঙ্গীবিচার সুরু করলেন। এধারে, উত্তর বঙ্গের জনকয়েক ছেলে স্কুল ছেড়ে কোলকাতায় এসে হাজির। জাতীয় বিদ্যালয় তৈরী হল, জনকয়েক ভাল ছেলে সেখানকার অধ্যাপক হলেন। তাঁরাই হলেন আমাদের আদর্শ। তাঁদেরই মধ্যে একজনের ভাষায় বলতে গেলে, কর্ত্তারা গেলেন 'ভড়কে'। কর্ত্তারা স্বদেশী ব্যবসায়ে কিছু টাকা দিয়েছিলেন, সে টাকা আর ঘরে এলো না। লক্ষীছেলেদের হাতে কাজ কমে এল, তাই দলে দলে বিজ্ঞান পড়তে সুরু করলাম। কলেজে বিজ্ঞানের ক্লাসে ছেলে ধরে না। সন্ধ্যাবেলায় এঁরাই নর-নারায়ণের সেবা করতেন নৈশ বিদ্যালয়ে পড়িয়ে। জনকয়েক পিক্‌রিক্‌ অ্যাসিড্‌ নিয়ে পরীক্ষাও করতেন। যাঁরা বিজ্ঞান পড়তেন না তাঁরা ভাল ভাল চাকরী নিলেন। যাঁরা বাকী রইলেন কিংবা যাঁদের পুরাতন ইতিহাস 'নির্ম্মল' নয়, তাঁরা হলেন রিসার্চ্চ-স্কলার ও অধ্যাপক।

তারপর গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। তখন যুদ্ধ বেধেছে, যুদ্ধের বাজারে দেশ বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করলো। বাংলা দেশের প্রাদেশিক কৃষ্টির অভিমান ভাঙতে আরম্ভ হল। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ তখন জেগে উঠছে, তারা বাঙ্গালীর দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি পেলে। নিখিল-ভারতীয়তার হাল্‌কা হাওয়ায় তারা নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। জালিয়ানওয়ালাবাগের পর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হল। বাংলার অন্তরীণ নীতিটা ছিল দেওয়ানী

মোকদ্দমার মতন, পঞ্জাবের কাণ্ডটা হল ফৌজদারী মামলা, তাই অতি সহজেই লোকের মন উত্তেজিত হল। নতুন আন্দোলনে বিস্তর লোক দেশের জন্য 'একটা কিছু' করবার সুবিধা পেলে। স্বদেশী যুগে যে প্রাচীন ভারতের রঙীন ছবি আঁকা হয়েছিল, আজ তারই আভাস পাওয়া গেল — সেই ত্যাগধর্ম্মে, সেই সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনে, সেই ধর্ম্ম-প্রাণতায়। কিন্তু ইংরেজী-সভ্যতায় অনুপ্রাণিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, মোহ না কাটাতে পেরে, প্রাণ খুলে অ-সহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে পারলেন না। বুঝেসুঝেই গান্ধীজী তাঁদের সাহায্য চান্ নি। বেকারের দল বড়ই মুস্কিলে পড়লেন, আন্দোলনে যোগ না দিলে দেশদ্রোহী হতে হয়, তাই যোগ দিতে হ'ল, আধখানা প্রাণ ও সিকিখানা মন নিয়ে। এই অবস্থা থেকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে বাঁচালেন চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল, স্বরাজ-দল তৈরী করে। ঘরের মধ্যে থেকেই ঘর ভাঙ্গার ফন্দী আমাদের মনোমত, তাই আমরা স্বরাজিষ্ট হলাম।

কিন্তু বেশী দিনের জন্য নয়। বুদ্ধির, বিশেষতঃ, আমাদের দেশের শিক্ষাদ্বারা মার্জ্জিত বুদ্ধির এক-চতুর্থাংশের এমন কোন সাধ্য নেই যে ভাবাবেগকে রুদ্ধ করে। ভাবাবেগ জোরে বইল ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এতদিন যে বন্ধন ছিল সেটা ছিল মাটির বন্ধন, এখন থেকে যে ঐক্য তৈরী হতে লাগল, সেটা চেতনার স্তরের। দু'দলই ধর্ম্ম ও পলিটিক্সের মধ্যে পার্থক্যটুকু অ-স্বীকার করলেন। দুদলই ন্যাশন্যালিষ্ট কিন্তু একদল ভারতবর্ষের ভৌগলিক সীমা অতিক্রম ক'রে বিদেশে জাতীয়তার ধর্ম্ম-কেন্দ্র খুঁজতে ব্যস্ত হলেন। কংগ্রেস আর গান্ধীজী এক হয়ে গেল। তার পর, তিনি মহাত্মা কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পলিটিসিয়ান এই বুঝতে বছর পাঁচেক কাটল। দেশের ইতিহাসে ও কটা বছর নিমেষ মাত্র। শেষে সিদ্ধান্ত হল, ধর্ম্মই হল তাঁর পলিটিক্স্ আর পলিটিক্সই হল তাঁর ধর্ম্ম। যুগান্তরের বাণী এতদিনে সার্থক হল, মূর্ত্ত হল। ভাগ্যিস সাইমন-সপ্তক এলেন, তাই আমরা বিরোধের নতুন বিষয় পেলাম। অকিঞ্চিৎকর আইনকানুনের নিষ্ফল তর্ক-বিতর্ক নিয়ে দেশ বেশীদিন খুশী থাকতে পারে না। পুরানো কর্ত্তার দল তখন প্রায় গত, না হয় অবসর গ্রহণ ক'রে ধর্ম্মচর্চ্চা করছেন কিংবা কীর্ত্তন গাইছেন। যুবার দল তখন জেলে গিয়ে ভুগছেন কিংবা ফিরে এসে গৃহস্থালীতে মন দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জন মারা গেলেন, মতিলালজী ছেলের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন। Holy Ghost তখন সম্পূর্ণভাবে Son কে আশ্রয় করবার সুবিধা পেলেন। কামাল পাশা খিলাফৎ আন্দোলন চালাতে দিলেন না। বাইরের বিরোধ-প্রণালী বন্ধ হয়ে বিরোধের আবেগ ঘরের মধ্যে চলে এল। ধর্ম্মের নামে চাকরী ও ভোটসংক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শেষে দাঙ্গাহাঙ্গামা পর্য্যন্ত চলল খুব। মহাত্মাজী দেশকে বিরোধের নতুন প্রণালী দেখিয়ে দিতে আত্মনির্ব্বাসনদণ্ড তুলে নিলেন। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করলেন না। তবুও তাঁর প্রভাব অপ্রতিহতই রইল। তাঁর এই পুনরাভিষেকের কথা সকলেরই মনে আছে। তার পর জোরজবরদস্তী, সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স, বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ার জন্য বাঙ্গালীর রাগ ও অভিমান, এলাহাবাদ পণ্ডিতবর্গের নেতৃত্ব, বম্বে, আমেদাবাদ, কোলকাতার ধনী সম্প্রদায়ের কবলে মহাত্মাজী ও মদনমোহনের আত্মসমর্পণ, গোলবৈঠক, মহাত্মাজীর বিলেত যাত্রা, সেখানকার নিষ্ফলতা, রাজা-রাজোয়াড়াদের আকস্মিক দেশপ্রীতি, সাম্প্রদায়িক গৃহবিবাদ, খাজনা না দেওয়ার হুকুম-জারির জন্য কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করা, এ সব ত' কালকার ঘটনা।

আজকার অবস্থা এই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যা দেবেন আমাদের তাই নিতে হবে। গৃহবিবাদের মীমাংসার ভার দিয়েছি তাঁদের উপর, তাঁরা অর্থে কন্সারভেটিভ, কেননা মন্ত্রীরা ঐ দলেরই এবং ঐ দলের ক্রীড়নক মাত্র। কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতারাই জেলে, যুবক-সম্প্রদায় চুপ্‌চাপ্, মজুরের দল মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ করছেন, হিন্দুরা অভিমান ক'রে ব'সে আছেন, মুসলমানরা আশান্বিত ও উৎফুল্ল হয়েছেন, পঞ্চমরা ঠিক্ করতে পারছেন না কোন্ দলে যাবেন, নরম-পন্থীরা একটু চড়া সুর ধরেছেন তাঁদের খাতির কমে যাচ্ছে বলে। এক শুধু স্ত্রীজাতি মাথা ঠাণ্ডা রেখে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গোটা কয়েক মূলকথা প্রস্তাববদ্ধ করেছেন। এবং রাজ্য-চালকেরা ও বিলেতী খবরের কাগজ-ওয়ালারা হাঁসছেন। অনুষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস ভেঙ্গে গেলেও কংগ্রেস না হলে কোন বন্দোবস্ত গ্রাহ্য হবেনা এই

ধারণাই হল ভারতবর্ষের পলিটিক্যাল ইতিহাসের মোটা কথা।

এ ছাড়াও আমাদের ইতিহাসের অন্ত ধারা আছে। কিন্তু চোখে পড়েনা, সে ধারা মরা নদীর মতন ঝির ঝির করে বইছে। রামন নোবেল-প্রাইজ পেলেন, মেঘনাদ, সত্যেন নতুন চিন্তা করছেন, রবি ঠাকুর নতুন বই লিখলেন, ভাতখাণ্ডের স্বপ্ন আংশিকভাবে সার্থক হল, মজুররা সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে, বারদলী ও যুক্তপ্রদেশে চাষীরা নিজেদের স্বার্থ বুঝছে, বাংলা দেশে সাহিত্যের নেশা ধরল, দিল্লীতে Council of Agricultural Research খোলা হল, পুণা ও কোয়েম্বাটুরে নতুন শস্যের পরীক্ষা আরম্ভ হল, লোক-সংখ্যা বেড়ে চল্‌ছে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় চাকরী না পেয়ে, আন্দোলনে যোগ না দিতে পেরে অনাসৃষ্টির জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন কিংবা চুপচাপ্ ব'সে আছেন, এসব ঘটনাগুলি চোখে পড়ছে না। কেন চোখে পড়ছে না তার কারণ বার করতে গেলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হতে হয়। কিন্তু একটু বাইরে থেকে কারণ খুঁজতেই হবে, নচেৎ ভবিষ্যৎকে গোটা কয়েক অন্ধ শক্তির হাতে ফেলে দিতে হবে। হয়ত কি জাগ্রত, কি অন্ধ শক্তি কিছুই নেই। তাই যদি হয়, তা হলে যা হচ্ছে তাই ভাল হচ্ছে মনে করে সুখনিদ্রায় বিভোর থাকাই একমাত্র উপায়!

অল্প কথায় আমি এই কারণগুলি ইঙ্গিত করছি।

১। পলিটিক্‌সই হয়েছে আমাদের এক ভাব, এক ধর্ম্ম।

২। কিন্তু পলিটিক্‌সকে আমরা জ্ঞানের বিষয় করিনি, ভাবরাজ্যেই রেখেছি। আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন সত্যকারের anti-intellectual ভাববিলাস মাত্র।

৩। প্রধানত এই জন্য সে আন্দোলনের সঙ্গে নানা অবান্তর জিনিষ মিশেছে, যেমন ধর্ম্ম, মেয়েলী অভিমান, এক কথায় অ-বাস্তবতা।

৪। এই আন্দোলনের যতটুকু চেতনার ক্ষেত্রে, ততটুকু বিরোধ। সর্ব্বদাই বিরোধের বস্তুকে একমাত্র সত্তা বিবেচনা করা বুদ্ধির একমাত্র অভ্যাস হয়ে উঠেছে। এ লক্ষণগুলি শুভ নয়। ভবিষ্যতে যদি এই মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তা হলে ক্ষতি বই লাভ হবে না। কোন্ ধরণের ক্ষতি হবে প্রবন্ধের শেষে আভাস দেব।

প্রথমেই একটা আপত্তির জবাব দিই। অনেকে বলেন, এ ছাড়া উপায় ছিলনা। এক কথায় তাঁদের মতে, কারণ গুলি ঐতিহাসিক। কিন্তু ইতিহাসের দৈবশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে আমার ভীষণ আপত্তি। আমাদের পরাধীনতাই হল একমাত্র fact। এটা এতদিনের পুরানো fact যে স্বাভাবিক ঘটনা, যেন দিন রাত্রির মত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সভ্য মানুষ স্বাভাবিক ঘটনাকে কেবল স্বাভাবিক ব'লেই ছেড়ে দিচ্ছে না। তাকে ভাঙছে, নতুন ক'রে গড়ছে। আমাদের পরাধীনতার মত কোন স্বাভাবিক ঘটনার শক্তিকে ও কার্য্যকে প্রত্যাহত করতে হলে নতুন কোন ইতিহাস তৈরী করতে হবে। আমরা পরাধীন এটা fact, আমাদের স্বাধীন হতে হবে—এটা হল দায়িত্বপূর্ণ event। শুধু তাই নয়। ধরা যাক্ fact ও eventএর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবু পরাধীন হলেই যে ভাব-বিলাসী হতে হবে, কিংবা জীবনের অন্য সব মূল্যজ্ঞানকে জলাঞ্জলি দিতে হবে কিংবা স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য, সর্ব্বজন স্বীকৃত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য, যে কোন অস্ত্র, যেমন ধর্ম্মকে প্রয়োগ করতে হবে এমন কোন কথা নেই। ধর্ম্ম বলতে যদি ইংরেজী religion বোঝা হয়, তা হলে অবশ্য অন্য কথা। ধর্ম্মের যে অর্থ এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে তার ইংরেজী প্রতিশব্দ spirituality, সেটা ব্যক্তিবিশেষের গুহ্য সম্পদ, তাকে অন্য কাজে লাগান যায় না। এ দুটি জবাব ছাড়া অন্য একটি জবাব দেওয়া চলে। যদি কোন ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়াকে সঠিক্ নিরূপিত করে, তা হলে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধটিকে mechanical sequence বলা হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধকে ঐতিহাসিক ধারা বলা চলে না। আমাদের ধারণা আছে যে আমরা খুব ধর্ম্মপ্রাণ, অর্থাৎ anti-mechanical, তবু কেন যে পরাধীনতার ইতিহাসই স্বাধীনতার পন্থা কেটে দেবে, অর্থাৎ যা ঘটেছে তাই ঠিক এবং সেইজন্যই যা ঘটবে তাই ঠিক হবে আমরা বিশ্বাস করি বুঝিনা। সত্যকারের ধর্ম্মের মধ্যে পুরুষকারের স্থান আছে, ঐতিহাসিক দৈবের স্থান কম। স্রোতে গা ভাসানকেই যদি সাঁতার কাটা বলি, বিদেশী সভ্যতার বিপক্ষতা আচরণের জন্যই যদি ধর্ম্মাত্মা হই,

তা হলে অন্ততঃ গত পঁচিশ বছরের ইতিহাসের সমালোচনা করা যায় না, সে ইতিহাসকে ভগবানের ইচ্ছা বলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়।

এইবার আমি কারণগুলির ব্যাখ্যা করছি। আমার আশা এই যে আমাদের জীবনের অন্ত ধারাগুলো কেন চোখে পড়েনা বুঝতে গেলেই সে ধারাগুলি প্রকট হয়ে উঠবে। পলিটিক্সই যে আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং সেই জন্যই মন অন্য কোন চিন্তাকে স্থান দিচ্ছে না তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। বোম্বাই অঞ্চলের হিন্দু জীমখানা থেকে এবার কেউ বিলেতে ক্রিকেট খেলতে গেলেন না। সব বড় বড় খেলাতেই মোহনবাগানের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নির্ব্বাচিত হবার জন্মগত অধিকার প্রকাশ্যে অস্বীকার করার বিপদ আছে। এমন খুব কম খেলা দেখেছি যেখানে দেশী টিম বিলেতী টিমের কাছে নিজের দোষে হেরে গিয়েছে দর্শকে স্বীকার করেছেন। খেলা দেখাই বাঙ্গালীর প্রধান কাজ, সেখানেই এই। কলেজ ও স্কুলের মাষ্টারদের বিশ্রামের ঘরে পলিটিক্স ছাড়া অন্য আলোচনা শুনেছি কিনা মনে হয় না। বড় বড় অধ্যাপকরা যখন রিসার্চ্চ করেন, তখন তার মধ্যে জাতীয়তার ও দেশাত্মবোধের ছাপ না থাকলে, তাঁদেরকে আমরা দেশদ্রোহী ভেবে থাকি। Scientific কিংবা Higher Cirticism যে একদম বিদেশী ও দাসমনোভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয় এই ধরণের মন্তব্য প্রকাশ ক'রে একজন প্রবীণ অধ্যাপক আমার এক পরিচিতের একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকের সমালোচনা করেন। আমাদের শিক্ষকসম্প্রদায়ের মনে যেখানে আমরা পলিটিক্স্ ছাড়া অন্য চিন্তাধারার প্রবাহ আছে আশা করিতে পারি, সেখানেও এই জাতীয়তা কি সূক্ষ্মভাবে ও অলক্ষ্যে কাজ করছে দেখলে অবাক হতে হয়। ভারতবর্ষে জাতিবিভাগ আছে, কিন্তু সেটা পশ্চিমা সমাজের অর্থমূলক শ্রেণীভাগের চেয়ে ভাল, বাল্য-বিবাহ আছে, কিন্তু তাতে অন্যান্য কুফলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আমাদের আধ্যাত্মিক গুহ্য-ধর্ম্ম জীন্স্, এডিংটন প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মতে বিজ্ঞানেরই চরম কথা। আমাদের চাষ-বাস, শিক্ষাপদ্ধতি, সব কিছুই অন্য দেশের তুলনায় কত ভাল এ সব শুধু লালা লাজপৎ রায় কিংবা রজ আয়ার লেখেন না, এ সব কথা আমাদের পণ্ডিতবর্গকেও লিখতে হয়, নচেৎ রক্ষা নাই। অধ্যাপকদের মধ্যে বুদ্ধিমানরা বলেন যে, যেকালে আমরা ঐ সব রীতি, নীতি, পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, তখন ও সব আমাদের পক্ষে ভাল বলতেই হবে। এ তর্কটা খাটে জীবজগতে। মানুষের বেলা অবশ্য ঐতিহ্য কথাটি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যেও ফাঁকি কোথায় পূর্ব্বেই দেখিয়েছি। ছবি ও গানে পলিটিক্স্ কতটা ছায়াপাত করেছে, অর্থাৎ দেশাত্মবোধ কতটা প্রবেশ করেছে বিশদ ক'রে দেখাবার অবসর নেই। অজন্তার পচা অনুকরণ করাকে আর্ট ভাবা, সঙ্গীতের উন্নতি অসম্ভব মনে করা, মাদুরা ও জগন্নাথের জবড়জং স্থাপত্যে গৌরব অনুভব, এর মধ্যে সৃষ্টির কোন সম্বন্ধ নেই, আছে ভাবাবেগের। যার একমাত্র মূল্য থাকতে পারে রাজনীতির ক্ষেত্রে। বুদ্ধির এমন ফাঁকি অন্য দেশে সম্ভব কিনা জানবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এ দেশে চলছে ও চলা অন্যায় জানি। এ ধরণের স্বদেশিয়ানা সাহেবিয়ানারই ওপিঠ।

যখন পণ্ডিতদেরই এই অবস্থা, তখন অন্যে পরে কা কথা! যখন গায়ে ফোড়া হয়, তখন সব ভাবনাই সেই তাড়সে জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে। এটা স্বাভাবিক কিন্তু বুদ্ধির কাজই অ-স্বাভাবিক রকমের। অনেকে বার্গসনের নাম উচ্চারণ করে ব'লে থাকেন যে পলিটিক্স কেন সব ক্ষেত্রেই বড় কাজের পিছনে একটা প্রচণ্ড ভাবশক্তি, ভাবাবেগ থাকতে বাধ্য, এবং কেবল বুদ্ধি দিয়ে কোন বড় কাজ করা যায় না। এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতে চাই না, বিস্তর হয়েছে। আমি শুধু বলতে চাই, রাজ্য-শাসনসংক্রান্ত আন্দোলনের মধ্যে অনেক কার্য্য-বিভাগ আছে। প্রথম, সমগ্র জাতিকে জাগিয়ে তোলা—এটা খুবই প্রয়োজনীয় জিনিষ, খুবই শক্ত কাজ ও একান্ত কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, দাবা খেলার মত বিপক্ষকে মাৎ করা, যেটাকে হয়ত নিতান্ত ছোট কাজ মনে করা হয়। দু'কাজের দু'রকম রীতিনীতি, প্রথমটার strategy, দ্বিতীয়টির tactics। এ ছাড়া একটা কার্য্য-তালিকা তৈরী করে সেই মত সমগ্র শক্তিকে নিয়োজিত করার দিকও আছে। নিতান্ত মোটামুটি ভাবে বলা হয় যে প্রথমটায় ভাবাবেগ, দ্বিতীয়টায় কূটবুদ্ধি এবং তৃতীয়টিতে কল্পনা, মার্জ্জিত বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির বেশী প্রয়োজন। এ

ধরণের ভাগ করা উচিত নয়। কেননা আমি জানি যে দেশকে জাগাতে হলেও বুদ্ধির আবশুক। একটি ছোট ছেলেকে সন্দেশের লোভ দেখিয়ে, কাতুকুতু দিয়ে, আদর করে জাগান যায়, যার পর ছেলে কেবলই খুঁৎখুঁৎ করে, কোলে উঠে সন্দেশ চায়; আবার 'খোকা ওঠ, সকাল হয়েছে, মুখ ধুয়ে গাছপালায় জল দিতে হবে, তারপর হাঁসের কলম কেটে ছোট মামাকে একটা চিঠি লিখতে হবে, শুয়ে থাকলে চলবে না।' এই ধরণের কথা ক'য়ে, ধীরে, মধুরভাবে অথচ দৃঢ়স্বরে ছেলেকে জাগান যেতে পারে। আমাদের দেশের মন যদি জেগে থাকে তা হলে প্রথম উপায়ে। আমরা গান গেয়েছি 'সোণার বাংলা' 'এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি' 'আ মরি বাংলা ভাষা'; ম্যালেরিয়া তাড়ান, দেশকে গড়ে তোলা, বাংলা ভাষার দৈন্য দূর, এ সব নিয়ে বেশী মাথা ঘামাই নি। আমরা থিয়েটার করেছি প্রতাপাদিত্য, রাণাপ্রতাপ, ছত্রপতি, নট ও নটীর, নাট্যকার ও শ্রোতার দায়িত্ব না মনে রেখে শোভাযাত্রায় জোগ দিয়েছি ভিড় করার জন্য, কংগ্রেসে বক্তৃতা দিয়েছি birthright, natural right জন্মগত স্বাধিকার নিয়ে, অধিকার অর্জ্জন আমাদেরকে ব্যস্ত করেনি। খুব চেঁচিয়েছি, গানে কবিতায়, বক্তৃতায়, লেখায়, কথাবার্ত্তায়, অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করার বদলে তাদেরকে গণ-ঈশ ভেবে খোসামোদ করেছি, বড় বড় নেতাকে পূজা করেছি, তাদের ছবি ঘরে টাঙ্গিয়েছি, মেয়েরা তাদের নামে সাড়ি পরেছেন, ব্যবসাদারেরা তাদের নাম নিয়ে ব্যবসা করেছেন, বিবেকানন্দ ঘৃত, আচার্য্য মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার, গন্ধী সিগারেট, সুভাষ পুস্তকালয় ইদানীং আবার ডিক্‌টেটার করছি। শাঁকঘণ্টা ধুপধুনোর কিছুরই ত্রুটি নেই, আছে অভাব স্থির প্রতিজ্ঞার, grim determination এর, ঋজুতার, obstinate rigourএর, অভাব আছে এখানেও বুদ্ধির প্রয়োজনস্বীকারে। একটা এত বড় দেশকে ঘুম থেকে তোলা খুব বড় সাধনা, সে সাধনা আমাদের নেই, আর নেই বলেই ভাতখাণ্ডেজীর চল্লিশ বৎসরের সাধনা, মেঘনাদ-রামন-সত্যেনের সাধনার, বেঙ্গল কেমিকালের রাজশেখর বসুর, যাদবপুরের কর্ত্তৃপক্ষের, দয়ালবাগের সাহেবজী-মহারাজের সাধনার ইতিহাস অল্প লোকেই জানে আর জানলেও তার খাতির নেই, যতটুকু খাতির আছে তাও ভারতবাসী বলে। এই সব সাধকদের আমাদের কাছে উপকারিতা মাত্র বলবার জন্য—'হে ইংরেজ, হে পশ্চিমবাসী, হে বিশ্বের অধিবাসী, তোমরা যে বলতে আমরা কেবল অতীত গৌরব নিয়েই পড়ে থাকব আমাদের বড় বৈজ্ঞানিক হবে না, শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি হবে না, এই দ্যাখ এঁরা কি তোমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিদের চেয়ে কিছু কম!'

দেশ জাগান ছেড়ে দিলে, পলিটিক্‌সের দাবার অংশ টুকুতে সয়তানী বুদ্ধিরই দরকার। সেখানে 'জয়, অমুকের জয়'এর স্থান নেই, আধ্যাত্মিকতার স্থান নেই, আছে সেখানে মারপ্যাঁচ, দরকষাকষি, আপোষ করবার ক্ষমতা, অর্থাৎ কূটবুদ্ধির প্রয়োজন। এ স্তরে সততা টিকতে পারে না, যদিও পারে, তাও সততা শ্রেষ্ঠ কৌশল হতে পারে এই হিসেবে। যে দেশে ন্যায় শাস্ত্র লেখা হয়েছে, সে দেশের কূট বুদ্ধি নেই বলা যায় না। কিন্তু রাজশাসন প্রণালী সংক্রান্ত কূটবুদ্ধিতে ইংরেজদের তুলনায় আমরা কোথায় পেছিয়ে আছি তার প্রমাণ হয়ে গেল গোলবৈঠকের সভাতে, মাত্র দুটি চালে আমরা মাৎ হয়ে গেলাম। প্রথম, প্রধান মন্ত্রীকে সাইমন সাহেব যে চিঠি লেখেন, তার ফলে ভারতের দুটি অ-সম উন্নত ও বিষমনৈতিক খণ্ড এক সূত্রে বাঁধা হয়ে গেল। আমাদের মহারথীরা যখন বিলেত পৌছলেন তখন প্রথম শুনলেন যে রাজা-রাজোয়াড়ারা হঠাৎ দেশভক্ত হয়েছেন। তখন federalism সম্বন্ধে জানবার প্রয়োজন হল। শিবস্বামী আয়ার নামে একজন নরমপন্থী মাদ্রাজী (যিনি গবর্ণমেণ্টের হয়ে মধ্যে মধ্যে ভোট দিতেন) ঐ সম্বন্ধে একটা বই লেখেন। বিলেত থেকে সেই বই পাঠাবার জন্যও তার আসতে লাগল। দ্বিতীয় চাল হল, কন্‌সার্ভেটিভদের দ্বারা আপত্তি তোলান, সে আপত্তির দ্বারা ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের ভয় দেখান, তাঁদের মনে 'এই বুঝি সব গেল' ভাবটি সৃষ্টি করা, তার পর ঠোঁটে জলপাইএর ডাল দিয়ে লর্ড রিডিং বেন সাহেব কে পাঠান, আপোষ করবার জন্য মধুর বক্তৃতা, তার মধ্যে অমনি, casually, গোটাকয়েক safeguard এর কথা তোলা। এই হৃদয়-পরিবর্ত্তনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন, ও সেই উচ্ছাসে federalism এবং safeguards দুইই গলাধঃকরণ করবার সম্মতি জ্ঞাপন করেছি। আমাদের

মত কৃতজ্ঞ জাত পৃথিবীতে ছুটি নেই। 'এই বুঝি সব গেল' 'না, আঁ বাচলাম 'ধন্যবাদ' এই হল গোল-বৈঠকের পলিটিক্স্। এখানে যেটি সংঘটিত হচ্ছে, তাকে মাত্র ঘড়িতে লম্বমান দণ্ডের আন্দোলনের সঙ্গেই তুলনা করা চলে, যার axis হল হোইটহলে, যার দোলনের শক্তি হ'ল আশা ও নিরাশা। মোদ্দা কথা দাবার চালে আমরা ঠকেছি, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ক্রাডক্ সাহেবের বক্তৃতা—'নিতান্ত ভালমানুষ পেয়ে এই ধূর্ত্তটি আপনাদের ঠকিয়ে গেল!' এই বোকা সাজাটাই হল পাবলিক্ স্কুলের প্রধান এবং ইংরেজদের পক্ষে সব চেয়ে উপকারী শিক্ষা।

গোল-বৈঠকের কথাও ছেড়ে দিচ্ছি। শুনেছি, এই অ-সহযোগ আন্দোলন পৃথিবীকে বিরোধের একটা নতুন অস্ত্র দিয়েছে। কিন্তু অন্য দেশের বিপ্লবের ইতিহাস পড়লে, এবং এই 'নতুন' আন্দোলনের লক্ষণ দেখলে, লেনিন, কামাল পাসা, মুসোলিনী, রেজা খাঁর কীর্ত্তিকলাপ ও আমাদের নেতৃবর্গের নেতৃত্ব তুলনা করলে মনে হয় যে আমাদের আন্দোলনের মধ্যে দোলনের অংশটুকুই বেশী! ক্রপটকিনের আত্মজীবনী, মির্স্কি কিংবা স্ত্রীর লেখা লেনিনের জীবনীর সঙ্গে মহাত্মাজীর আত্মকাহিনী পাশাপাশি পড়লে একটা ভীষণ পার্থক্য ধরা পড়ে। মহাত্মাজীর জীবনে প্রধান সুর হল তাঁর নিজের মোক্ষ, ক্রপটকিনের জীবনে প্রধান সুর হল দলিতের উদ্ধার-সঙ্কল্প। লেনিনের উদ্দেশ্য আরো সীমাবদ্ধ। যে অত্যাচার তাঁদের প্রত্যেকের সহ্য করতে হয়েছিল তার তুলনায় আমাদের জাতির সাধনা অ-বাস্তব ভাববিলাস মনে হয়। মনে হয়, আমাদের সঙ্কল্প দৃঢ় নয়, নিতান্তই অস্থির, আমাদের চিন্তা নিতান্তই ধেঁয়াটে ও অস্পষ্ট। তাই হতে বাধ্য যতক্ষণ না তার পিছনকার ভাবাবেগ, ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা দমিত, প্রশমিত ও চালিত না হয়। কিন্তু, নিছক ভাবাবেগকে দমন ও চালনা করবে কে? অবশ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়, যাঁরা মধ্যবিত্তের শ্রেণীভুক্ত। এঁদের প্রকৃত কাজ প্রোগ্রাম বাঁধা। বাংলা দেশে, চিত্তরঞ্জনের প্রেরণায়, কংগ্রেস-ফণ্ডের দ্বারা গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস-অফিশ তৈরী হয়েছিল, কোলকাতার করপোরেশনটা নিজেদের হাতে এসেছিল। আমাদের সহরে তারই ফলে প্রাথমিক শিক্ষার অভূতপূর্ব বিস্তার এবং নাগরিক দায়িত্ব প্রচারকল্পে একখানি উৎকৃষ্ট সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়েছিল; পাড়ায় পাড়ায় ব্যায়াম-সমিতিও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এছাড়া, অন্যত্র, ভেবে-চিন্তে একটা কোন নতুন constructive policy খাড়া করা হয়েছিল ব'লে মনে হয় না। অনেকে বলবেন, আমাদের সময় ছিল না, সুবিধা ছিলনা। তা নয়। পাছে কোন প্রোগ্রাম বাঁধতে গেলেই বাধাবিপত্তি এসে পড়ে, এই ছিল আমাদের ভয়। জন্ম-রোধের কথা তুললে ধার্ম্মিকরা সরে দাঁড়াবেন, শাস্ত্রের নামে আপত্তি তুলবেন, জমি ও আয়ের আপেক্ষিক সমভাগের কথা তুললেই জমীদার, বিত্ত ও বৃত্তিভোগীর দল পালিয়ে যাবেন—এই ধরণের ভয়কে শক্তির সঞ্চয় বলে এসেছি। তা ছাড়া, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তরফ্ থেকে এও বলা চলে যে বর্ত্তমান আন্দোলনটা অনেকটা শিক্ষার ও শিক্ষিত সমাজের বিরোধী। এ শিক্ষার অর্থ অবশ্য বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি। কিন্তু যতক্ষণ না নতুন শিক্ষা-পদ্ধতির আবিষ্কার ও বহুল প্রচার হচ্ছে, ততক্ষণ এঁদেরকে নিয়েই চলতে হবে। (অ-সহযোগ আন্দোলনের তৈরী 'আশ্রম ও বিদ্যাপীঠ'এ যে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।) নেতাদের বক্তৃতা থেকে মন্তব্য উদ্ধার ক'রে আমার বক্তব্য সমর্থন করতে চাই না। মাত্র একটি উদাহরণ দেব। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু যখন ১৯৩০ সালে জেলে যান, তখন তাঁর গোষ্ঠীর নেত্রীবৃন্দ, তাঁর মতের বিপক্ষে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ছাত্রদের কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দিতে পরোয়ানা জাহির করেন। উদ্দেশ্য হয়ত খুবই সাধু ছিল। ফলে তিনমাস প্রায় কলেজ বন্ধ থাকে, বিলেতী জিনিষ কেনাও বন্ধ হয়, কিন্তু কোনটাই ছেলেদের পিকেটিং-এর জোরে নয়, ভাড়া করা চাষী ভলান্টিয়ারদের জন্য। যে ছেলেরা কলেজ ত্যাগ করে বাড়ী ফিরে গেল তারাই ফিরে এসে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করলে এই সর্ত্তে যে শিক্ষকেরা যেন অতিরিক্ত বক্তৃতা দিয়ে ঐ তিন মাসের ক্ষতিপূরণ করেন। আমরা ক্ষতিপূরণ করলাম পরীক্ষার কিছু পূর্ব্বে এবং পরের দিন থেকেই ছাত্রেরা পরীক্ষকদের কাছে এসে, মুখ তুলেই অনুরোধ করলে 'এবার যখন ক্ষতি হয়েছে, তখন সোজা করে যেন খাতা দেখা হয়, এবং কিছু ফালতো নম্বর দেওয়া হয়।' এ অবস্থায় বুদ্ধি ও

বুদ্ধিজীবির স্থান কোথায়? স্থান একমাত্র পড়বার ঘরে, ল্যাবরেটরীতে, সেখানেও কান্নার আওয়াজ কানে আসে, তাই শুনে প্রাণটাও ব্যাকুল হয় স্বীকার করলে আশা করি দেশের নেতারা বিশ্বাস করবেন। তাঁদের একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—ঘটনাটি ঘটে বৎসরের প্রথম সপ্তাহে অর্থাৎ কলেজের কুশিক্ষা পাবার পূর্ব্বেই।

যত রকম বুদ্ধি-বিরুদ্ধ ভাব এই আন্দোলনের মধ্যে এসেছে তার মধ্যে সব চেয়ে সর্ব্বনাশ করেছে ধর্ম্ম। পুরাতন কংগ্রেসে ধর্ম্মের স্থান ছিল না, ধর্ম্ম তখন ব্যক্তিগত ছিল, লোকের গোপন সাধনা ছিল। কংগ্রেসের কর্ত্তারা গোঁড়া হিন্দু, গোঁড়া ব্রাহ্ম, আর্য্য কি প্রার্থনা-সমাজী, মুসলমান কি পার্শি হলেও ধর্ম্মের সঙ্গে পলিটিক্স মেশান নি, অন্তঃপুর-বাসিনীকে হাটবাজারে দাঁড় করিয়ে দর কষাকষি করেন নি। বাংলা দেশে ধর্ম্ম এই আন্দোলনে নাক ঢোকালে গীতার গর্ত্ত দিয়ে। যুগান্তর, বন্দেমাতরম্, সন্ধ্যার লেখা আমার মনে পড়ে, গীতা-ক্লাসে দু' একবার গিয়েওছি। বারীন্দ্র, উপেন্দ্র নিজেরা স্বীকার করেছেন যে তাঁরাই প্রথমে বুঝেছিলেন যে ধর্ম্মের সাহায্য ব্যতিরেকে, ধর্ম্মের আশ্রয় ভিন্ন দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হবে না। তাঁদের দাবী গ্রাহ্য করতেই হবে। কেননা এঁদের পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ সাধুজনের প্রবর্ত্তিত হিন্দুয়ানীর মধ্যে রাজনীতির রেশ পর্য্যন্ত ছিল না। বরঞ্চ বলা চলে যে সমাজ-সেবায় তাঁরা ধর্ম্মভাব আনতে চেয়েছিলেন। বোধ হয় বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল যে জীবন্ত সমাজের বন্ধনীকে লোকে ধর্ম্ম বলুক। রাজা রামমোহন রায়ের কৃপায় সমাজ-ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলতে সাধারণে প্রেরণা পাচ্ছিল। কিন্তু ১৯০৫।৬ সালের গীতাপাঠ একটু অন্য রকমের হল। সমাজ ধর্ম্মের এক অংশে, রাজনীতিতে ধর্ম্মের প্রভাব প্রকাশিত হল। গীতাপাঠ যখন ছেলেরা আরম্ভ করলে, বৈষ্ণবেরা কেন চুপ থাকিবেন। আরম্ভ হল কীর্ত্তন, নাচন-কাঁদন, গড়াগড়ি, বৈষ্ণব-সাহিত্য-পাঠ। একধারে অমৃতবাজারের দল, অন্যধারে চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জন ধনী, হাতে একাধিক কাগজ। বিপিনচন্দ্র পালকে দিয়ে বলান হল যে বাংলার বিশেষত্ব হল এই বৈষ্ণব সাহিত্যে, ভাবাবেগে, কান্নায়, এই 'কাছাখোলা ভাবে' ইত্যাদি। Soul of India, বাংলার প্রাণ আবিষ্কৃত হবার পর সেই soulful প্রাণ-বর্দ্ধক সাহিত্য, কলা, চারুশিল্প তৈরী ত' হ'লই, কর্ম্ম-ক্ষেত্রেও তার প্রকাশ সুরু হল। এই সময় এলেন গান্ধীজী, আমরা তাঁর মধ্যে ভারতবর্ষের প্রাণ খুঁজে পেলাম। কিন্তু তিনি মূলতঃ ধার্ম্মিক, তাঁর সমস্যা তাঁর নিজের। দুঃখ এই যে কি করে একজন ব্যক্তির সমস্যা দেশের সমস্যার সঙ্গে মিশে গেল জানতে হলে mass psychology পড়লেই যথেষ্ট হয়, পলিটিক্স্ জানবার কোন প্রয়োজন নেই। তারপর খিলাফৎ আন্দোলনের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হল স্বাধীনতার কাজে। খিলাফৎ আন্দোলনের প্রধান কথা—super-territorial sovereignty of the Khalif, আর আমাদের কথা ছিল ভৌগলিক স্বাধীনতা। সমুদ্রের জল গ্রামের নদীতে প্রবেশ করলে বান ডাকে, কিন্তু তার পর ভাঁটাও পড়ে। এখন সেই ভাঁটা চলছে। জোয়ারের জলের অংশ নিয়ে গ্রামের আলের ওপর লাঠালাঠি চলছে। মুসলমান সভ্যতা বলতে ভারতবাসী মুসলমান যা বোঝেন তাতে ধর্ম্ম ও পলিটিক্সের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ পার্থক্যহীনতা গান্ধীজীর মনোমত। তাই চরকার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের চক্রের তুলনা করলেন, সরোজিনী ও সরলা দেবী চরখা চালিয়ে মাথা ঘুরে অনেকে দিব্য-দৃষ্টি লাভ করলেন, প্রফুল্ল রায় চরখার প্রসার-কার্য্যে এবং বিদ্যামন্দির বিশেষ করে ল' কলেজ ভাঙবার crusadeএ দেশে দেশে বেড়াতে লাগলেন। চরখা হল নতুন জাতীয়তা ধর্ম্মের ত্রিশূল। এই ধরণের প্রতীক অনেক জুটল। তারপর saints খোঁজার পালা—বেহারের রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মান্দ্রাজের রাজগোপালাচারী, গান্ধীজীর উৎসব-মূর্ত্তি। তাঁদের পূজা অর্চ্চনাই দেশের প্রধান কাজ হল। এই দু'টা দৃষ্টান্তই ধর্ম্মের জয়-ঘোষণার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই সময় শত শত conversion হয়েছিল, মতিলাল, চিত্তরঞ্জন, সবে সব revealed ধরণের। গণপূজার মধ্যেও ধর্ম্মের সেই mystic whole, খদ্দর-পরিহিতের মধ্যে সেই feeling of the elect, বক্তৃতার সরল ভাষায় সেই sermonising, বিশেষ করে sermon on the mount এর গন্ধ, জেল-প্রত্যাগতের মধ্যে সেই feeling of martyrdom, ধর্ম্মের সব কিছুই এই আন্দোলনে জুটেছিল। জন, ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে religiuos revival এর তুলনা

করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে ধর্মের অংশটুকু ছাড়া অন্য অংশও ছিল। এবং যদি নাও থাকত তাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না, কিংবা ধর্মকে তাড়াবার দায়িত্ব কমে যেত না, কিংবা সেই ধর্মাংশটুকুর জন্য সে দেশে যা ক্ষতি হয়েছে তার অনুকরণ করার সার্থকতা আমাদের ছিল না, এখনও নেই। সে যা হোক্ আমাদের দেশে এতদিন আন্দোলনের পরে যদি ঐ ধরণের মিশনারী খৃষ্টানী ধর্মের অনুকরণটাই সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হয়ে থাকে তা হলে খুব একটা বড় কাজ যে হয়েছে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। ধর্মের ঠেলা কতদূর পৌঁছেছে মহাত্মাজীর একটা কার্য্য থেকেই প্রমাণিত হয়। গবর্ণমেণ্টকে জব্দ করবার জন্য তাড়ি বিক্রী বন্ধ করবার প্রয়োজন হয়। মহাত্মাজী তার একটি উপায় পর্য্যন্ত বাৎলে দিয়েছিলেন—উপায়টি তাঁর অন্যান্য উপায়ের মতনই ধার করা। এবার ধার করেন শ্রীরাধার কাছ থেকে যিনি কৃষ্ণের বাঁশীর ওপর অভিমানে বাঁশী কেন বাঁশ-ঝাড় পর্য্যন্ত উজাড় করতে চান। উপায় ঠিক হল, তাল গাছ কাটতে হবে। কাজটা নেহাৎ শক্ত নয়। কিন্তু এই সহজ কাজই একটা ছেলে করে উঠতে পারল না। সে পড়ল তালগাছা চাপা, গেল মারা। মহাত্মাজী তাঁকে martyr বল্লেন। আজ গত কয়েক বৎসর এই martyr কথাটির যত প্রচার হয়েছে অত প্রচার শিক্ষারও হয় নি, চরখারও হয় নি। সাহেব খুন করলে martyr, হিন্দুকে খুন করলে সহীদ, আবার তালগাছা চাপা পড়লেও martyr! তফাৎ কোথায়? তফাৎ নেই, কেন না সব খুনের পিছনে আছে একটা religions emotion, যার সঙ্গে উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোন যোগাযোগ নেই। দণ্ডী যাত্রার কথা, হিন্দু সভা, জমায়েৎ উলেমার কথা সকলেই জানেন। আর জানেন, কিন্তু স্বীকার করেন না, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তথাকথিত দেশাত্মবোধের বিরুদ্ধে কোন কিছু বল্লেই, যে বলে তার religious persecution, যেটা ordnance এর মতন দেহে না বাজলেও প্রাণে বাজে।

এই প্রকার ধর্মভাবের প্রাদুর্ভাব আমার কাছে আদিম অসভ্যতার পরিচায়ক। জ্ঞানের ইতিহাসে দেখেছি, প্রত্যেক জ্ঞান নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখছে, specialisation কথাটির অর্থই তাই। বিলেতে পলিটিক্সের আলোচনা ও ব্যবহার দুইই অনেক দিন ধরে চলে আসছে, সে দেশে Aristotle সর্বপ্রথমে politicsকে ethics থেকে পৃথক করেছিলেন, মধ্যে মধ্যযুগে catholic church এর যুগে পার্থক্য কমে এলেও তার পর থেকে এই পার্থক্যটা চলে আসছে। ক্যাসিষ্টরা আবার পার্থক্য দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন কিন্তু কম্যুনিজ্‌মের প্রতিকূল শক্তিতে সে চেষ্টা সফল হবে মনে হয় না। বর্ত্তমানে সর্বদেশে ধর্মকে state থেকে ভিন্ন করা হচ্ছে। এক মুসোলিনি করছেন না আর আমরা করছি না। এই আদিমতার উৎপাত সভ্য জগতে একেবারেই অচল। সচল হতে পারে জীবনকে দুই-ভাগে ভাগ করে, একটা private world আর একটা public world, এবং এই দু'এর যোগটি contractual basisএর ওপর স্থাপিত করে। ফরাসী বিপ্লবের সময় executive decreeর দ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করান, Communist গবর্ণমেণ্টের propagandaর সাহায্যে তাঁর অনস্তিত্বে বিশ্বাস করান, এবং ইটালীর cancordatএর সাহায্যে spiritual এবং temporal authorityর মধ্যে বনিবনাও করানর মধ্যে যে সচেতন delibrateners আছে, কেবলমাত্র তারই দ্বারা বর্ত্তমান সভ্য জগতে আদিম যুগের ধর্মপ্রবণতাকে এই যুগের কর্মশীলতার সঙ্গে খাপ খাওয়ান যেতে পারে। কিন্তু মহাত্মাজী তা করছেন না। তাঁর নিজের মনে, হিন্দু সভার মনে, মুসলিম লীগের মনে পলিটিক্স ও ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আমাদের বিরোধ-জ্ঞান কেবল মাত্র ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষেই খাটিয়ে নিঃশেষ হয়েছে। নচেৎ স্বরাজ পার্টির মধ্যে, কংগ্রেস দলের মধ্যে সামাজিক সংরক্ষণশীলতার প্রধান কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া যায়।

অনেকে বলেন, সব হবে, তবে এক সঙ্গে নয়। যেটা প্রথম দরকারী সেইটে আগে হোক, পরে সব; আগে রাজ্যভার আমাদের হাতে আসুক, পরে সমাজ-সংস্করণ, সাহিত্য-সৃষ্টি ইত্যাদি। এই আগে পরে জিনিষটা ঠিক বুঝি না। যদি আমাদের দেশাত্মবোধ জেগেই থাকে, তা হলে সেটা শুধু একটি মাত্র প্রণালীতে বইছে স্বীকার করা যায় না, আর যদি স্বীকার করাও যায় তা হলে বইতে দেওয়া উচিত নয়, ভবিষ্যতের দিক থেকে। আমাদের পলিটিক্স বিরোধের, সৃষ্টির নয়। সর্বদাই opposition

party, বিরুদ্ধ দল হয়ে থাকাতে যে দায়িত্বহীনতা, সৃষ্টিবিমুখীনতা, আলস্য আসে, সে সবই আমাদের এসেছে, লক্ষ্য করেছি। পরে হবার আশার মধ্যে যতটা ধৈর্য্যের ইঙ্গিত আছে, সেটুকু উপদেশেরই মধ্যে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কাজ করার মধ্যে ততটা নেই। একটা তারিখের মধ্যে স্বরাজ পাবার আশাতে অধৈর্য্যের প্রমাণই পাওয়া যায়। এ সবের পিছনে আছে একটা দায়িত্বহীনতা, যার জন্য দায়ী এই স্থায়ী বিরোধের অবস্থা। বিরোধ না হলে চলে না—কিন্তু বিরোধকে সংবদ্ধ হবার একমাত্র উপায় ভাবার মতন একদেশদর্শিতা আর দুটি নেই। যদি বিরোধকে নিজের স্থানে আবদ্ধ না রাখা হয়, তা হলে সর্ব্বনাশ হয়। সর্ব্বদাই বিরোধের উপর সৃষ্টির দৃষ্টি রাখতে হয়, তাকে একটা উপায় মাত্র ভাবতে হয়, তবেই লাভ। যেখানেই বিরোধ একটি মাত্র সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে, সেখানেই অন্যান্য সামাজিক ব্যবহার অস্বাভাবিক রকমে বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

এখন আমাদের দেশের এই political obsessionএর ফলে বিরোধ-বৃত্তকে সামলান যাচ্ছে না। অন্যান্য সমাজে যেমন খেলাধূলো, নাচগান, শোভাযাত্রা, লেখাপড়া যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা বিরোধ প্রশমিত হয়, এদেশে তা আর হচ্ছে না, কেন না ভারতবর্ষের গ্রাম্য-সমাজ ভেঙ্গেচুরে গিয়েছে, তার বদলে এসেছে নগর-সভ্যতা। মূল খুইয়ে আমরা ভেসে বেড়াচ্ছি। গ্রামকে পুনর্জীবিত করার কোন উপায় দেখি না, এক ছোট সহর হতে পারে, যেখানে মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণী বসবাস করবেন। কিন্তু তাঁরাই অন্নাভাবে লোপ পেতে বসেছেন, অতএব এখানেও হতাশ হতে হয়। সেই জন্য একমাত্র উপায় মনে হয়, জনকয়েক লোকের এই আন্দোলনের বাইরে থেকে সৃষ্টির কাজে মনোনিয়োগ করা। বিরোধ-বৃত্তির কুফল হ'তে বাঁচতে ও বাঁচাতে হলে এক দল নিষ্কাম ও নির্ব্বিকার প্রবৃত্তির লোকের একান্ত প্রয়োজন। ঠিক এই সময় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, বিশ্ববিদ্যালয়ের, লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরীর যত প্রয়োজন, অত প্রয়োজন বোধ হয় কখনও ছিল না।

বিরোধের মাত্র কয়টি কুফল দেখাচ্ছি। বিদেশী রাজাকে জয় করবার জন্য আমরা কি উপায় অবলম্বন করেছি একবার স্মরণ করি। আমরা ভাবাবেগের সাহায্য গ্রহণ করেছি, বুদ্ধি অর্থাৎ বিচার-শক্তিকে সরিয়ে রেখে, তাকে কর্ম্মপ্রবণতার প্রতিকূল ভেবে। আমরা বিশেষ করে ধর্ম্মের সাহায্য গ্রহণ করেছি এই ভেবে যে ভারতবাসী বড়ই ধর্ম্মপ্রাণ। আমরা পলিটিক্সটাকে নিতান্তই অবাস্তব জগতের সামগ্রী করে তুলেছি। আমরা সর্ব্বদাই বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে কুণ্ঠা বোধ করি নি। এখন উপায়মাত্রেরই এই স্বভাব যে তার দোষগুণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে ও সার্থকতার সঙ্গে মিশে থাকে। যখন উদ্দেশ্য সফল হয় তখন তার সাধনের ইতিহাস সিদ্ধি থেকে মুছে যায় না। সেই জন্য আমার ভয় হয় স্বরাজ গভর্ণমেণ্ট গণ-মনের ক্রীড়নক হবে এবং গণ-মন যে চপল, নির্ব্বোধ, নিষ্ঠুর এ আর বলে দিতে হবে না। জন-সাধারণকে জাগ্রত করা ভাল কাজ, পলিটিক্সের প্রধান কাজ। কিন্তু সত্যিকারের জাগ্রত অর্থাৎ শিক্ষিত হবার পূর্ব্বে যদি জনগণ আধঘুমন্ত অবস্থায় ককিয়ে ওঠেন, তা হলে সেই ককানিকে vox dei বলে পূজো করার মতন শক্তির অপচয় আর কি হতে পারে? এই জনমতের প্রভাবেই হয়ত আমাদের যুদ্ধও করতে হবে এবং বিরুদ্ধমতাবলম্বী লোকের প্রতি অত্যাচারও করতে হবে। Mass movementএর বিপদই এইখানে, সেটা anti-intellectual হয়েই পড়ে। তখন আদিম প্রবৃত্তির বশে মানুষে যা করে তাই ভাল বলে প্রমাণিত হয়।

ধর্ম্মভাব শুনেছি দরকারী জিনিষ। কিন্তু পলিটিক্স আর ধর্ম্ম মিশলে অন্ততঃ এই ধরণের কাজ আমরা করতে বাধ্য হব। স্বরাজ পেলেও দেশে চোর-জোচ্চোর থাকবে—আজ না হয় কাল মত-পার্থক্যের জন্য একাধিক দল তৈরী হবে, তার মধ্যে একটি দলের লোকসংখ্যা অন্ততঃ অন্যের অপেক্ষা কম হবে, তখন সেই দলের পাণ্ডাদের আদালতে হাজির করতে হবে, শাস্তিও দিতে হবে। সে শাস্তি আইনসঙ্গত হবে না—হবে ধর্ম্মসঙ্গত। Political offence হবে তখন sin, কিংবা heresy এবং পাপ তাড়ানর জন্য মানুষের যত উৎসাহ অত উৎসাহ আর কিছুতে নেই। ভাগ্যে বিপিনচন্দ্র পাল স্বরাজ পাবার পূর্ব্বেই মারা গেছেন।

যে Soul of India বিপিন পালের আবিষ্কৃত সেই soulই মূর্ত্ত হয়ে উঠবে একটা Hegelian Stateএ

একটা abstractionএ, ideaতে। হেগেলের state ছিল intellectual, আমাদের state হবে religious—কিংবা ethical, অনেকটা Fascist state এর মতন। ততদিনে আশা করি লাঠির বদলে সড়কি, জোলাপের বদলে আগে নিকের চলন হবে। যে দৈত্য সামনাসামনি যুদ্ধ করে তার সঙ্গে পারা যায়, কিন্তু যে মেঘের আড়াল থেকে বাণ ছোঁড়ে তার অবাস্তবতা আমাদের এতই মুহ্যমান করে যে তার বিপক্ষে হাত তোলার শক্তিই থাকে না।

সব চেয়ে ভয় হয় যে বিরোধের নেশায় আমাদের সৃষ্টির অবসর ঘটবে না। খানিকটা বিধিনিয়ম, আইন-কানুন, অনুশাসন ও অবসর দেশকে পেতেই হবে। কিন্তু দায়িত্বহীন সমালোচকের দল থাকবেই, কর্ম্ম-বিমুখতার অভ্যাস সহজে ঘোচে না, নিরর্থক সমালোচনার মোহ অনেক দূর জের টানে, কুঁড়েমীর মজা অনেকদিন থাকে। শুধু কথার জন্য কথা কওয়ার অভ্যাস ছিল উনবিংশ শতাব্দীর রুশিয়ান বিপ্লববাদীদের, এখনও যে সেই পুরাতন অভ্যাসের দোষেই পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান ততটা সার্থক হচ্ছে না এ কথা নিজেই ষ্ট্যালিন স্বীকার করেছেন। এই বিরোধের জন্য বিরোধের অভ্যাসই আমাদের স্বরাজ গবর্ণমেন্টের প্রধান শত্রু হবে। সাহিত্যেরও সর্ব্বনাশ হবে আমার মত সমালোচকদের হাতে পড়ে।

আজ যদি এই বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রয়োজন থাকে, তা হলে এখন থেকেই সাবধান হতে হবে—ভাবাবেগকে দমন করতে হবে, realist হতে হবে, ধর্ম্মকে নিজের কোঠায় বন্দী রাখতে হবে, সৃষ্টির কাজ সুরু করতে হবে, সেজন্য সুবিধা দিতে হবে। আমাদের জ্ঞান চাই। নিজেদের দেশের কথাই আমরা জানি না। কী আশ্চর্য্য। প্রত্যেক দেশের একটা দলেরই না কত Research Bureau আছে—তাদের research সব propagandist ধরণের হলেও, তার fact-finding zealকে অগ্রাহ্য করা যায় না। আমাদের কংগ্রেস এতদিন ধরে কাজ করে আসছে, আমাদের কাজ ভারতের মতন মহাদেশকে স্বাধীন করা, অথচ এতদিনে একটা Research Bureau স্থাপিত হল না। এ জগতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই প্রধান বল, তাই আমাদের নেই। আমাদের প্রতিনিধিরা Blue-book পড়েন না, কিংবা যখন পড়েন তখন সেখানে কোথায় কোন ঘটনা, কোন সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছে দেখাবার সামর্থ্য নেই—কেন না আমাদের Research Bureau নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের এই facts যোগান দেবার প্রত্যাশা করা যায় না। তাদের না আছে সময়, না আছে সুবিধা, না আছে সাহস, না আছে ক্ষমতা। যদি কোন বড় সাহেব বলেন, দেশের লোকেরা আর্থিক হিসাবে উন্নত হচ্ছে, আমাদের হাতে এমন কোন statistics নেই যার দ্বারা প্রমাণ করতে পারি, দেশের লোক গরীব হয়ে যাচ্ছে। যদি বড় কর্ত্তারা বলেন—লোকসংখ্যার হার বাড়ছে, তবুও দেশের দুর্দ্দশা বাড়ে নি—আমরা না বলতে পারি না, জোর বলতে পারি—জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। ভাবের বদলে জ্ঞানের disciplineকেই একমাত্র দেশের আশা বিবেচনা করি। *

* প্রবন্ধটি মহাত্মা গান্ধীর অনশন-ব্রত গ্রহণ ও পুণা-চুক্তির পূর্ব্বে লেখা। লেখকের উক্তির সহিত আমরা একমত না হইলেও, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর অন্ততঃ একাংশের মত হিসাবে আমরা ইহা প্রকাশ করিতেছি। উঃ সঃ।

চুক্তিনামার কথা

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

—সেদিন মাঘের রাতে,
করপল্লব রাখি' তব মম হাতুড়ী-পেটান হাতে,
দেব, দ্বিজ আর অগ্নি সাক্ষী, করনি কি প্রিয়া পণ,
আমারে ঘেরিয়া রহিবে তোমার যতেক আকিঞ্চন !
চুক্তি ছিল যে জোগাইব আমি সাধ্য যা' আছে মোর—
'ধূপছায়া' সাড়ী—'ব্রেসলেট', নয় 'নেক্‌লেস' বড় জোর !
সাধ্য যা' ছিল সবই তো করেছি—বুকে হাত দিয়ে বলি -
তবু প্রিয়া তব চুক্তি ভাঙ্গিয়া কেন গেলে মোরে ছলি' ?

জানি, ভাল করে জানি,—
নারী ও লক্ষ্মী চঞ্চলা বড় করে সবে কাণাকাণি !
আমি ভেবেছিনু, লক্ষ্মী-নারীরা হ'বে কিছু ধীরা বুঝি—
আঁচলে তাহার বাঁধিনু আমার জীবনে যা' ছিল পুঁজি !
তিলে তিলে যাহা মনের আড়ালে করেছিনু সঞ্চয়—
যাহা নিয়ে তোমা বাহুবন্ধনে করিতে চাহিনু জয় ;
ওগো চঞ্চলা ! আঁচলে তা' বাঁধি' ফেলি' গেলে বিফলতা-
ছিল কিগো সেই চুক্তিনামায় মুক্তির এ বারতা ?

চুক্তিনামার জালে—
আমি যে পড়েছি বন্দী হেথায় তুমি তো অন্তরালে !
অশরীরী রূপে চুপে চুপে গেলে জালের ছিদ্র ধরি'—
বিরাট আমার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গেনু আমি বাঁধা পড়ি !
শত চুম্বন কাঁদিছে বক্ষে—লক্ষ আলিঙ্গন—
চুক্তিনামায় যত ছিল লেখা কাহে করি বণ্টন ?
হাসে ধরিত্রী পূর্ণিমা রাতে চকোর উঠে বা গাহি'—
শুষ্কপত্র চুক্তিনামার অর্থ খুঁজিয়া চাহি !

এ মর-জগত তলে—
কুসুম-কোরক সুবাসের সাথে চুক্তি কি কভু চলে ?
হাসিয়া দখিণা উতল বক্ষে করে যদি পরশন—
পলকে লুটিয়া পড়ে যায় তার সকল আকর্ষণ !
ঝরা কলিকায় নবীন পাতায় যত হয় কাণাকাণি—
মৃত-বৎসার পুত্রের লাগি' আর্ত্ত করুণ বাণী !
মৃতে ও জীবিতে চলে চিরদিন চুক্তিনামার কথা—
যত ঘাঁটে শুধু তত বেড়ে যায় ব্যথা আর জটিলতা !

ভবিষ্যতের টানে—
কে জানিত তুমি বর্ত্তমানেরে ভুলিবে মধ্যখানে !
আমি অতীতের শুষ্ক পত্রে অঝোর অশ্রুপাতে—
বঞ্চিত প্রেমে বন্দনা করি শত অভিসম্পাতে !
প্রিয়ার সহিত প্রেম যেন মোর হ'ল চিরসমাহিত—
অশরীরী মায়া শরীরের সাথে মিলিল অতর্কিত !
না পেয়ে আধার আধেয় আমার শূন্যে ঘুরিয়া মরে—
সলিলমগ্না মরণোন্মুখ দু'হাত বাড়া'য়ে ধরে !

এমনি করিয়া তবে—
জীবন আমার চলিবে কি নিতি মরণ-মহোৎসবে ?
চলে যেন ভীত সায়ক-আহত পক্ষী মেলিয়া ডানা
রক্তে রাঙ্গা'য়ে সারা পথ শুধু হাহাকারে দেয় হানা !
অতীতের স্মৃতি জীবনে জড়া'য়ে চাহি ভবিষ্য পানে—
জানি, সে আঁধার শূন্যগর্ভ তবু প্রাণ নাহি মানে !
আকাশে, বাতাসে ছড়াইয়া দেই চুক্তি-নামার কথা—
বৃথা সবি জানি, শুধু তারি লাগি, খুঁজি' আরো বিফলতা

যোগ-বিয়োগ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পনের

ভাবপ্রবণতার দিক দিয়া যতই শোভনীয় হোক, দেখিতে শুনিতে যতই সুন্দর হোক না কেন,—বাস্তবতার এই কঠোর দুনিয়ায় এই বেণেতীর কারবারে,—যেখানে ডান হাতটী তুমি না দিলে, অপরের বাম হাতের সাহায্য পাইবে না, সেখানে বিপিনকে এই অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া গিরির সঙ্গত বা বিবেচনাসম্মত হয় নাই—এ বলিতেই হইবে।

বিপিন ধনী—বিপিনই একমাত্র ব্যক্তি যে গ্রামের মধ্যে গিরির মুখপানে চাহিয়াছিল—তা সে যত নীচ স্বার্থেই হোক। এ দুনিয়ায় ধনের একটা মত্ততা আছে,—কৃত্রিম বিনয়ে ধনী মুখে যতই বৈষ্ণবী বুলি আওড়াক—তার মনে একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার আছেই, স্বচ্ছলতার একটা অভিমান আছেই, এই অহঙ্কারে অভিমানে দুনিয়ার উপর তাহার দাবী, দুনিয়া তাহার সম্মান করিবে, মানুষের মাথার উপর দিয়া তাহার পায়ের তলার পথ তৈরী না হোক—তার পায়ের গোড়ায় মানুষের মাথা নত হইবে;—ধনের জোরে জনকে সে কিনিয়াছে মনে করে। আর সাধারণ দুনিয়ায় এই বণিকের যুগে বেণেতীর কারবারে আপনাকে মানুষের বিক্রয়ও করিতে হয়, নতুবা বেণিয়া তাহার হাতের মুঠা বন্ধ করিয়া অনাহারে দুনিয়াকে মারিবে;—মাঝে মাঝে গিরির মত অবিবেচনার কার্য্যে ক্ষণিকের জন্য সত্যকার মানুষের দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু সে ঐ ক্ষণিকেরই জন্য;—ক্ষণিকের জন্য আপনাকে ভাসাইয়া তুলিয়া সে আবার তলাইয়া যায়।

যাক্, যাহা বলিবার কথা তাহা এই—গিরির প্রত্যাখ্যানে বিপিনের ধনের অহঙ্কারে ঘা লাগিয়াছিল,—সে অপমান বোধ করিয়াছিল; সে গিরিকে সাহায্যের সঙ্কল্প ত্যাগ করিল, শুধু যে নির্লিপ্তভাবে ত্যাগ করিল তাহা নয়, তাহাকে জব্দ করার প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়ও তাহার ছিল; সে আপন ঘরে যায়, যায়, গিরির কথা মনে অহরহ ঘোরে কিন্তু প্রকাশ্যে কোন খোঁজখবরই লয় না, পথে ঘাটে পাঁচুর মায়ের সঙ্গে দেখা হইলেও প্রসঙ্গক্রমে ও কথা তোলে না।

'খাইতে না দিয়া বাজীকর বাঘ বশ করে',—এ কথাটার উপর অগাধ বিশ্বাস বিপিনের।

গিরির মনেও একটা সঙ্কল্প ছিল—সে ধনকে অবহেলা করিবে, ঘৃণা করিবে, ধনীর দুয়ারে সে হাত পাতিবে না,—বিশেষ করিয়া ওই বিপিনের সংস্রবে সে প্রাণান্তেও আসিবে না; সে পাঁচুর মাকে কহিল—

"পাঁচুর মা, তোমরা ত খেটে খাও, কি খাটুনী তোমাদের জোটে?"

পাঁচুর মা কহিল—"আমাদের কথা বাদ দাও মা, পুরুষে খেটে আনে, আমরা মেয়েরা দুটো মাছ ধরে আনি, দুটো শাক-পাত তুলে আনি,—সে কি দিন চলা—না বেঁচে থাকা!—"

গিরি কহিল—"যাদের বাড়ীতে পুরুষ নেই—?"

—"পুরুষ যাদের নাই, তাদের মা শতেক-খোয়ার, তারা কেউ খেতে পায় না,—আবার কারু রাজার হাল—"

গিরি চমকিত হইয়া কহে—"রাজার হাল? সে কি ক'রে হয় পাঁচুর মা?"

পাঁচুর মা কহিল—"সে কথা শুনতে তোমাদের নেই মা; তোমরা সৎ জাত—"

গিরি উত্তপ্ত হইয়া কহে—"জাতের কথা তুলো না পাঁচুর মা, বামুন বাগদী বলে জাত ত আর নাই, আছে বড় লোক আর গরীব লোক,—আমি ত বলেছি, আমি গরীব—আমি তোমাদের সঙ্গে একজাত।"

পাঁচুর মা বিব্রত হইয়া কহে—"তা হোক, সে শুনে কি করবে মা?"

গিরি দৃঢ় কণ্ঠে কহে—"না তুমি বল—।"

—পাঁচুর মা ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহে—"ইজ্জৎ বিক্রী করে

মা, তারা বলে খেয়ে পরে ত বাঁচি—তার পর ধর্ম। ধর্ম আমার স্বর্গ দেবে,—অ স্বর্গে আমার কাজ নাই। সে—তুমি—"

গিরি বাধা দিয়া কহিল—"থাম পাঁচুর মা,—ও কথা ত বলতে আমি বলি নাই তোমাকে—"

পাঁচুর মা অবাক হইয়া কহে—"সে কি—বৌমা তুমিই ত জোর করে,—"

উত্তেজিতা গিরি অতি দৃঢ়তার সহিত কহিল—"কক্ষণো না,—কক্ষণো আমি ও কথা বলতে বলি নাই তোমাকে—"

পাঁচুর মা এই মেয়েটীর অন্ত পাইল না, সে ভাবিতে লাগিল এ কি ধারার মানুষ? হায়—এই অশিক্ষিতা স্নেহ-মায়াসম্পনা দরদী মেয়েটি যদি ওই তরুণীর মনের বিপর্য্যয়ের সংবাদ জানিত!

পাঁচুর মা অনেকক্ষণ পর কহিল—"এক কাজ কর বৌমা, তুমি ধান ভানার কাজ কর, তুমি সিজে ভাপা করবে, আমি তোমার ভেনে কুটে দেব;– তাতেই তোমার একটা পেট—"

গিরি বর্ত্তাইয়া গেল—সে পরম কৃতজ্ঞতাভরে কহিল, "সে ত খুব ভাল হয় পাঁচুর মা, কিন্তু ধান দেবে কে— ?"

পাঁচুর মা হাসিয়া পরম তাচ্ছিল্যভরে কহিল—"তার ভাবনা কি? আজই আমি মোটা মোড়লকে বলছি—"

—"পাঁচুর মা!"

গিরির কণ্ঠস্বরে পাঁচুর মা হতভম্ব হইয়া গেল, সে বুঝিতে পারিল না ইহার মধ্যে তাহার কি অপরাধ হইয়া গেল। বিস্ময়ের ঘোরটা তাহার কাটিতেই সে ঈষৎ উষ্মাভরে কহিল—

"কি ধারার মানুষ মা তুমি, রাগের কথা ত কিছু বলি নাই আমি!"

এ উত্তরে গিরি শুধু অপ্রতিভই হইল না—আহতও হইল। সত্যই ত এরূপ রুক্ষতার হেতু কিছু হয় নাই, আর যদি হইয়াই থাকে, অজ্ঞাতে যদি কোন আঘাতই পাঁচুর মা দিয়া থাকে, তার জন্ত ওকে দোষ দেওয়া চলে না, তার জন্ত কটুকথা বলিবার তাহার অধিকারই বা কি? ওই যে নারীটী, দাসীবৃত্তি যার ব্যবসায়, যাহার উপর প্রভুত্বের অভ্যাসে এই কটু সে কথা বলিয়াছে, তাহার উপর সত্যকার প্রভুত্বের দাবী ত, কিছু নাই তার; তবে থাকিত—থাকিতে পারিত যদি তাহার অর্থ থাকিত।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখটী নীচু করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা সে কহিল—"আর কারও ঘরে ধান পাওয়া যায় না পাঁচুর মা!"

পাঁচুর মা কহিল—"আর কার অবস্থা আছে মা, যে ধানটা তারা বানী দেবে সে ধানটা থাকলে তাদের পেটের ভাত হবে। এ গাঁয়ে ধান পরকে দিয়ে চাল করিয়ে নিতে এক ওই মোটা মোড়ল।"

গিরি কহিল—"দাসী বিত্তিও একটা মেলে না পাঁচুর মা?"

—"মেলে বৈকি মা, তবে এ গাঁয়ে দাসী রাখতেও ওই মোটা মোড়ল, তবে সহরে বাইরে বেরুলে মেলে। তা তোমার এই সোমথ বয়েস, এ বয়েসে ত মা বাইরে বেরুন হয় না, তার বিপদ অনেক।"

গিরি ক্ষিপ্তার মত জিজ্ঞাসা করিল—"ভাল ভাবে বেঁচে থাকবার কি কোন উপায় নাই পাঁচুর মা?"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে পাঁচুর মা হতবাক্ হইয়া গেল, কতক্ষণ পর সে কহিল—"আমি ত উপায় বল্লাম বৌমা, মোটা মোড়লের কাছে ধান নাও, ভান।"

গিরি কহিল—"না না, তুমি এখন যাও পাঁচুর মা, আমি একটু শুই।" উত্তেজনায় তখন সর্ব্বশরীর তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, সে সেইখানেই লুটাইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল; যে রুদ্ধ কান্না তাহার বুকের মাঝে কয়দিন হইতে স্তরে স্তরে জমা হইয়া আছে সব যেন আজ নিঃশেষে বাহির হইয়া আসিতে চায়, এ গুমোট আর তাহার সহ্য হয় না; কান্না আজ তাহার সেই বিসর্জ্জিত শিশু-দেবতাটীর বিগ্রহের তরে, কান্না তাহার হতভাগ্য স্বামীর তরে, কান্না আজ তাহার নিজের তরে, জীবনের তরে। হায়, বাঁচিবার আর ত তাহার কোন উপায়ই নাই!

পাঁচুর মা যায় নাই, সে পরম স্নেহভরে তাহার সর্ব্ব অঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিল—"কেঁদ না মা, কেঁদ না ছিঃ—"

গিরি ক্রন্দনবিজড়িত কণ্ঠে মিনতি করিয়া কহিল—"তুমি যাও, তুমি যাও পাঁচুর মা, আমায় একটু কাঁদতে দাও।"

ষোল

গিরি সংকল্প করিল সে মরিবে, এমন করিয়া আপনাকে বিক্রয় করিয়া বাঁচার অপেক্ষা মরণই সহস্র গুণে কাম্য! আর মরিবে সে এই অনাহারেই শুকাইয়া শুকাইয়া, তিলে তিলে দগ্ধ হইয়াই সে মরিবে যেন তাহার যাতনার প্রতি দীর্ঘশ্বাসটী সে রাখিয়া যাইতে পারে, যাহা অভিশাপ হইয়া এই বিকি-কিনির সংসারে বাণিয়ার অঙ্কশায়িনী লক্ষ্মীর সোনার বর্ণ টাকে মসীময় করিয়া দেয়। হায়রে,—হতভাগিনী নারী জানে না ঐ রাক্ষসীর অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিতে, ঐ রাক্ষসীর চরণযুগলের অলক্তক রাগ যোগাইতে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে কত লক্ষ বলি হইয়া যাইতেছে, তবু তাহার পায়ের রং মনোমত হইতেছে না, অধরোষ্ঠে হাসির রেখা ফুটিতেছে না!

এই সংকল্প লইয়া পাঁচদিন সে কিছু খায় নাই, শুধু জলের উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া আছে। পাঁচুর মা কত সাধ্য-সাধনা করিয়াছে, তবু ও না, তাহাকে বলিয়াছে—"শরীর বড় খারাপ পাঁচুর মা, আমার অসুখ ক'রেছে।"

পাঁচুর মা নিজে হইতে সেদিন সের খানেক চাল, কয়টা বেগুণ, মূলা আনিয়া দিয়া কহিল—"বৌমা ওঠ, উঠে রেঁধে দুটো খাও; না খেয়ে তোমার শরীরের এমন হাল হয়েছে, খেলে দেলেই শরীরে বল পাবে, ফূর্ত্তি পাবে।"

গিরির মাথায় যেন আগুন জ্বলিতেছিল, সে অবজ্ঞাভরে সেই শ্রদ্ধার দানগুলাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল—"আমার কি এতই দৈন্যদশা হয়েছে পাঁচুর মা যে, তোমার কাছেও ভিক্ষে আমায় নিতে হবে?"

পাঁচুর মায়ের মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল, সে চাল তরকারিগুলি আপন আঁচলে তুলিয়া নীরবে চলিয়া গেল, একটী কথাও বলিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না।

গিরি আপন মনেই আপনাকে কহিল—"ওর ভিক্ষেই বা কেন নেব আমি; তার চেয়ে যে আপনাকে বিক্রী করাও ভাল আমার।"

এর পর হইতে পাঁচুর মা আর আসে নাই, গিরিও তাহাকে ডাকে নাই; সে আজ দুদিনের কথা।

কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণা! পেটের মধ্যে সমস্ত অন্ত্রগুলা যেন জটাইয়া প্যাকাইয়া যাইতেছে, একটা অসহ্য দাহে যেন ভিতরটা পুড়িয়া যাইতেছে; গিরি মাঝে মাঝে এক এক ঘটী জল ঢক্ ঢক্ করিয়া গেলে, পর মুহূর্ত্তে বমি হইয়া সব উঠিয়া যায়। চার দিনের সন্ধ্যা হইতেই এ যাতনাটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; আজ প্রত্যুষকাল হইতে মাঝে মাঝে যেন চেতনা লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, দৃষ্টিতে কিছু পড়েনা, কানে কিছু আসে না, অথচ মন সবটুকু অনুভব করে! মরণের ছায়া-ছবি যেন চক্ষের সম্মুখে নাচে!

কি বীভৎস! গিরির মনে হয় ওই চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার, ওই অন্ধকার দিয়া একখানা শিথিল কঙ্কালময় হস্ত ধরণীর সমস্ত ছবি তাহার চক্ষের সম্মুখে মুছিয়া দিয়া চোখ টিপিয়া ধরিতেছে, তাহার আবরুদ্ধ কানের মাঝে সেই কঙ্কালের কৌতুকের খিল্ খিল্ হাসি যেন বাজিয়া উঠিতেছে, সে যেন কৌতুক করিয়া বলিতেছে—বলত আমি কে?

সমস্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করিয়া গিরি প্রাণপণে জাগিয়া উঠিতে চাহিল; আবার অতি অল্পক্ষণ পরেই সেই অনুভূতি, তাহাকে এই ধরণীর বুক হইতে সেই হাত খানাই সবল আকর্ষণে ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে!

সভয়ে আবার গিরি আপনাকে ঝাঁকি দিয়া সচেতন করিয়া তুলিল; শীতের প্রভাতে সেদিন সমস্ত ধরণী নিবিড় কুয়াসায় আচ্ছন্ন, নিবিড় বাষ্পকুণ্ডলীর মাঝে সব যেন লুপ্ত হইয়া যাইবে—গাছের পাতা হইতে শিশিরবিন্দু বারিধারার মত ঝরিয়া পড়িতেছিল। সুতীক্ষ্ণ হিমকণায় ধরণীর জীবন জর্জ্জর হইয়া উঠিয়াছে।

চেতনা প্রবুদ্ধ করিয়াও গিরি দেখিল সমস্ত ধরণী ধূমাচ্ছন্ন। সে সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—পথ নাই, পথ নাই মাটীর বুকে ফিরিয়া যাইতে কি পথ নাই? অল্পক্ষণ পরে সে বুঝিল এ কুয়াসা, আশ্বস্ত হইয়া সে এদিক-ওদিক চায়!

আহার! আহার! একটা কিছু, যা আহার করিয়া সে এই বিভীষিকার হাত হইতে নিস্তার পায়, সে খানিকটা জল ঢক্ ঢক্ করিয়া খায়, পরক্ষণেই একটা উদগ্র উদ্গীরণের অনুভূতিতে সর্ব্বাঙ্গ মোচড় দিয়া উঠে, সে আপ্রাণ চেষ্টায় উঠিয়া পায়ের কাছের লেবু গাছটার কয়টা পাতা কচ্লাইয়া শোঁকে; একটা লেবুও নজরে পড়ে; গাছটা খুব বড় নয়, গিরি ধীরে ধীরে দেওয়াল ধরিয়া উঠিয়া লেবুটীকে পাড়িয়া লইয়া, দাঁত দিয়া কাটিয়াই লেবুটী চোষে।

লেবুটা চুষিয়া তাহার বমির ভাবটা কাটিতেই সে অনেকটা সুস্থ বোধ করিল।

দাওয়ায় এক কোণে পড়িয়া একটা মূলা আর অতি অল্প কতকগুলা চাল, পাঁচুর মায়ের তুলিয়া লইয়া যাওয়া চাল-তরকারীর অবশেষ!

আতঙ্কে, বুভুক্ষায় গিরি মূলাটা লইয়া কচ্‌কচ্‌ করিয়া চিবাইয়া খাইল। তারপর চাল কটী ঘটীর জলে ভিজাইয়া, চোখ বুজিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল, নিমীলিত চোখ হইতে দু' ফোঁটা জল টপ্‌ টপ্‌ করিয়া পড়িল, মরিতে পারিল না সেই দুঃখে, না মরণের হাত হইতে পরিত্রাণের আশ্বাসে কে জানে?

কতক্ষণ পরে চাল কটী সে অল্পে অল্পে চিবাইয়া খাইয়া ক্ষুধার দুর্দ্দান্ত জ্বালা কতকটা জুড়াইল, দেহেও যেন কতকটা বল পাইল।

রাজ্যের ভাবনা তাহার মাথায়, তাহাকে বাঁচিতে হইবে। মরিতে সে পারিবে না, মরণ অতি ভয়ঙ্কর, অতি বীভৎস! জ্ঞান সত্ত্বে, সাধ্য সত্ত্বে, সে তা'র ওই কঙ্কালময় হিমানী স্পর্শময় আলিঙ্গনের ছোঁয়াচ সহ্য করিতে পারিবে না।

কিন্তু বাঁচিবেই বা কি করিয়া? এ দেনা-পাওনার সংসারে সম্বল না থাকিলে ত বাঁচা যায় না! স্বামী হোক্‌, স্ত্রী হোক্‌, মাতা হোক্‌, পুত্র হোক্‌—নিঃসম্বলের ত উপায় নাই, স্ত্রীর অক্ষমতা, রোগ স্বামী ক্ষমা করে না, স্বামীর অক্ষমতা স্ত্রী ক্ষমা করে না। তাহার মনে পড়িল এই ত সেদিন শ্রীমন্ত তাহার কাছেই তাহার গোপন সম্বল হইতে কয়টা টাকা লইয়াছিল, তাহার জন্য সেই ত নিজে কত গঞ্জনা দিয়াছে, শ্রীমন্তের মুখের উপরই সে বলিয়াছিল—"এমন চামার স্বামীর হাতে পড়ার চেয়ে মরণ ভাল।"

সে সময়টা প্রাতঃকাল, সূর্য্যও তখন ভাল করিয়া উঠে নাই, যখন সারা রজনীর বিশ্রাম অন্তে মানুষ বিগত দুঃখ গ্লানি ভুলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বিমলানন্দ ভোগ করে, তখনই। শ্রীমন্তের মুখের কথা ফুটে নাই, সে শুধু বলিয়াছিল—"সকাল বেলায় আমায় গাল দিয়ো না বলছি।"

সে বলিয়াছিল—"আমার নিলেই আমি বলব। গাল দেব।"

তখন চোখ থাকিতে লক্ষ্যও করে নাই, ওই নিঃসম্বলের মুখখানা কেমন হইয়া গিয়াছিল, তখন মনেও একবার হয় নাই ওই মানুষটার বুকে এ আঘাত কতখানি লাগিতে পারে! আজ কথাটা মনে পড়িয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুক চিরিয়া ঝরিয়া পড়িল, হয়তো বা অক্ষয় হইয়া এ কাঁটা তাহার বুকে বসিয়া থাকিবে! একবার মনে হইল, তাহার সে উষ্মা সে ত সত্যই স্থায়ী নয়, সে অভাবের তাড়নায় মুহূর্ত্তের ভুল, সে বিকৃত ক্রোধ, পরক্ষণেই মনে হইল তাই বা কেন, এ অসন্তোষ ত অহরহ তাহার বুকেই ছিল, সে সত্যই, বরং সেই সে সত্যকে গোপন করিয়া মুখে হাসি মাখিয়া নিরীহ শ্রীমন্তকে বঞ্চনা করিয়া আসিয়াছে, ভালবাসার নামে প্রতারণা করিয়া আসিয়াছে, সে ত শুনিয়াছে সত্য যে ভালবাসা, তাহার জন্য জীবন দেওয়া যায়।

আত্ম-গ্লানির চরম উত্তেজনায় এক মুহূর্ত্তে তাহার নিজের সমস্ত জীবনটা যেন মেকী হইয়া দাঁড়াইল; কি দাম তাহার ভালবাসার! দুইটা টাকা; তবে একশো, এক হাজার, পাঁচ হাজারের জন্য সে না পারে কি? ওইত দেনা-পাওনার কষ্টি-পাথরে তাহার ভালবাসার রেখার মাঝে খাদের অংশটাই জ্বলজ্বল্‌ করিতেছে; গিরির অধরে একটা হাসির রেখা খেলিয়া গেল। অদ্ভুত সে হাসি—সে হাসির রূপই বিচিত্র। আনন্দই সংসারে হাসির উপাদান, কিন্তু গিরির হাসির রেখায় রেখায় জ্বালার তীব্র শিখা!

মিথ্যা, মিথ্যা, সে কাহাকেও ভালবাসে নাই, শ্রীমন্তকে না, গৌরীকে না, সে ভালবাসে নিজেকে! সমস্ত সংসারটার রূপ যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে নিমেষে পাণ্টাইয়া গেল, ধরণীর সুশ্যাম অঙ্গাবরণ খানি মুহূর্ত্তে কে যেন উন্মোচন করিয়া লইয়া তাহাকে দেখাইয়া দিল ইহার বীভৎস কদর্য্য ক্ষত-ভরা কুৎসিত স্বরূপ, ধরণীর সে যেন রাক্ষসী, ব্যভিচারিণী রূপ, ওই শ্যামাঞ্চলের আবরণ দিয়া রাক্ষসী উদরের জন্য সন্তানের মাংস খায়, আপনাকে বিক্রয় করে, ব্যভিচারের ফল কুৎসিত ক্ষতে তাই তার সর্ব্বাঙ্গ ভরা!

গিরি উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইল, আপন অনশন-শীর্ণ দেহ খানার পানে চাহিয়া, তাহার ধূলি-মলিন জীর্ণতার জন্য সারা অন্তর তাহার ঘৃণায় ঘিন্‌ ঘিন্‌ করিয়া উঠিল, আরও ঘৃণা জাগিল তাহার আপন অঙ্গের জীর্ণ-মলিন বাসখানার জন্য!

ভাণ্ডার খুঁজিয়া বাহির হইল—ষষ্ঠীর পূজার জন্য চাহিয়া-আনা সেই আধ পোয়াটেক আতপ চাল, ঘরের কোনে ইঁদুরে খাওয়া কয়টা আলু; ইহাতেই তাহার এক বেলা চলিয়া যাইবে!

কাঠ-কুটা চাই, গিরি দ্বিধা না করিয়া সম্মুখের ঢেঁকি ঘরের নিচু চালাটার খড়, বাতা টান মারিয়া ছাড়াইয়া লইল, দারুণ উত্তেজনায় অনশনের দুর্ব্বলতা তখন তাহার কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

চালাখানা হইয়া উঠিল কদর্য্য, সে দিকে গিরি একবার তাকাইলও না; উনানের মুখে সমস্ত গুলা জড় করিয়া ছেঁড়া গামছাখানা টানিয়া লইয়া খিড়কীর পথে সে বাহির হইয়া গেল।

দেহখানার ধূলিমালিন্য উত্তম রূপে মার্জ্জনা করিয়া কাপড় কাচিয়া ঘাটে উঠিয়া হেঁট হইয়া সে কাপড় নিঙড়াইতেছে, বুকের বাস সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত, সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িল বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়া সম্মুখের পানে; নিবিড় কুয়াসার মধ্য দিয়াও একটা মানুষের একাংশ দেখা যায়, আর দেখা যায় একটা চোখ তাহার, অতি নিকটেই লোকটা দাঁড়াইয়া আছে। দৃষ্টির লোলুপতা দিয়া সে তাহার অঙ্গ যেন লেহন করিতেছে। শ্মশানচারী শকুন যেন সদ্য-পরিত্যক্ত শবের পানে বৃক্ষশীর্ষ হইতে চাহিয়া আছে! দারুণ উত্তেজনায় গিরি যেন কেমন হইয়া গেল, সে সেই অনাবৃত অঙ্গেই খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া হাতছানি দিয়া ওই লোকটাকে ডাকিয়া ত্বরিত পদে আপন ঘরে আসিয়া উঠিল।

গিরি বুঝিয়াছিল সে কে।

বিপিন যখন উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল তখন গিরি কাপড় ছাড়িয়া ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে।

অস্বাভাবিক রূপে প্রদীপ্ত মুখ, চক্ষে জ্বালা, সারা অঙ্গে শুদ্ধ দৃঢ় সংকল্পে উপবাস হেতু একটী মহিমান্বিত শীর্ণতা, ললাট পাণ্ডুর, ভাস্বর—একটী প্রদীপ্ত ব্রতচারিণীর রূপ! সে মূর্ত্তির সম্মুখে বিপিন যেন কেমন হইয়া গেল—সে তবু সাহস করিয়া কহিল—"পাঁচুর মা বলছিল তুমি ক'দিন খাওনি।"

গিরি এক দৃষ্টে ওই লোকটার পানে চাহিয়া ছিল, সে দৃষ্টিতে নারীর লজ্জা ছিল না, মাধুর্য্য ছিল না—ছিল শুধু ঘৃণা, জ্বালা; কি বীভৎস ওই লোকটা।

ভোগের পুষ্টিতে সর্ব্ব অঙ্গে মেদবহুল কদর্য্য স্থূলতা, মুখের রেখায় রেখায় কাপুরুষ ধূর্ত্ততার ছাপ, ছোট ছোট দুটী চোখে শঙ্কিত কিন্তু লালসা-ভরা নির্ণিমেষ দৃষ্টি; গিরির ইচ্ছা করিতেছিল—বর্ব্বরটাকে সে হত্যা করে।

বিপিন গিরির এই তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে আপনাকে যেন হারাইয়া ফেলিতেছিল। বুকের মধ্যে একটা কম্পন যেন জাগিয়া উঠিতেছিল। একবার ভাবিল সে পলাইয়া যায়, পলাইবার জন্য সে ফিরিল; কিন্তু লোভী মনের তাড়নায় সে আবার ফিরিল।

আবার সে কহিল—"পাঁচুর মা বলছিল তুমি ক'দিন খাও নি—"

ওই একটী ব্যতীত অপর কোন সম্ভাষণ তার কম্পিত অন্তরে জাগিল না।

গিরি ক্ষিপ্তার মত সহসা কহিল—

"তাতে তোমার কি? তোমার কি?—কেন তুমি এমন নির্লজ্জের মত আমার উলঙ্গ দেহের পানে তাকিয়ে থাক,—কেন—কেন—"

গিরি হাঁপাইতেছিল, অস্বাভাবিক জ্বালায় চোখ দুইটার প্রতিশিরাটী রক্তরাঙা, সমস্ত দেহ তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

বিপিন প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল—

"বৌ, আমি তোমায় ভালবাসি—"

পরম ঘৃণাভরে গিরি কহিল—"না—না—আমি চাই—টাকা—ভাল খাবার,—গহনা, কাপড়—"

বাক্য আর শেষ হইল না—দুর্ব্বল দেহে বিপুল উত্তেজনায় গিরি জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেল, দাওয়ার কানায় গাঁথা ইঁটের উপর কপালটায় আঘাত পাইয়া গভীর একটা ক্ষত হইয়া গেল, ক্ষতের রক্তে সমস্ত মুখখানা তাহার রক্তাক্ত হইয়া উঠিল।

কপালের রক্তধারা নাকের কোল বহিয়া ক্ষিপ্রা, নারীটার ওষ্ঠ বহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে—যেন নিজের রক্ত সে নিজেই পান করিতেছে;—

ও যেন ছিন্নমস্তা।

বিপিন পলাইয়া গেল।

* * * *

চোখ মেলিয়া গিরি দেখিল—জলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া গেছে—আর তাহার মাথা কোলে করিয়া বসিয়া পাঁচুর মা। পরম আশ্বাসে সে আবার চোখ মুদিল—আপনার কপালে হাত বুলাইয়া ক্ষতটা অনুভব করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল,—বুকের জমা-করা সমস্ত গ্লানি যেন সে নিশ্বাসে বাহির হইয়া গেল!

পাঁচুর মা কহিল—"উঠতে পারবে মা! ওঠ দেখি। আস্তে আস্তে—ভাত কটা যে পুড়ে গেল—" জল শুকাইয়া ভাত তখন ধরিয়া গিয়াছে, একটা দুর্গন্ধে সমস্ত বাড়ীটা ভরিয়া উঠিয়াছে।

গিরির উদরের মধ্যে তখনও যেন আগুন জ্বলিতেছিল—আহার্য্যের নামে ক্ষুধাতুরার চক্ষু জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল, সে উঠিবার চেষ্টা করিল; সমস্ত কথাগুলা ভাবিয়া স্মরণ করিবার অবসর এমন কি প্রবৃত্তিও বোধ হয় হইল না; সে টলিতে টলিতে উঠিয়া গিয়া উনানের মুখে বসিয়া ঐ কদর্য্য দগ্ধ ভাতের হাঁড়িটা নামাইতে গেল।

পাঁচুর মা কহিল—"ভিজে কাদা মাখা কাপড়খানা ছাড় মা আগে—"

কথাটা যেন গিরির কানেই গেল না—সে কহিল—"এক কাঁকড় নূন এনে দিতে পার পাঁচুর মা?"

এক কাঁকড় নূন!

* * * *

দিবসান্তে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইতে না ঘনাইতে সেদিন গিরি ঘুমে ঢলিয়া পড়িল—এ কয়টা দিনের ঘুম যেন নয়ন-রেখার তটভূমিতে অপেক্ষা করিয়া ছিল; লক্ষ্মীর প্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিল।

আরও একটা সুসংবাদে গিরির মন সেদিন আশ্বস্ত হইয়াছিল, পাঁচুর মা তাহার জন্য ধানের ব্যবস্থা করিয়াছে, ও-গাঁয়ের ভবি মোড়ল ধান দিতে রাজী হইয়াছে।

পাঁচুর মা সংবাদ দিতে গিরি যেন মূক হইয়া গেল, কোন্ ভাষায় কেমন করিয়া যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না।

পাঁচুর মা তাহার ওই নীরবতায় শঙ্কিত হইয়া উঠিল—এই সৃষ্টিছাড়া মেয়েটি যে আবার কি কহিয়া বসিবে, সে যে তাহার ধারণার অতীত, এত করিয়াও যে সে মেয়েটির মনের কূল-কিনারা পাইল না;—সে গর্ব্বিত ভাবে কহিল—

"কি বলছ মা, আমি ত কথা দিয়ে এসেছি—"

গিরির চোখ দিয়া কয় ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল—সে কহিল—"কি বলব ভেবে যে পাচ্ছি না মা,—ইচ্ছে করছে তোমার গলাটা জড়িয়ে ধ'রে প্রাণ খুলে আজ কাঁদি;—পাঁচুর মা, তুমি আমার আর জন্মে মা ছিলে!"

স্বর্গ মানবচক্ষুর অগোচর—স্বর্গীয় বস্তুর সহিত মানুষের পরিচয় নাই, কিন্তু পাঁচুর মার মুখে যে হাসি, যে তৃপ্তির দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল তার একমাত্র বিশেষণ ওই স্বর্গীয়; সে কৃত্রিম বিনয়ে এ কৃতজ্ঞতা প্রত্যাখ্যান করিল না।

নিরক্ষরা সরলা পল্লীনারীটি এক মুখ হাসিয়া কহিল—

"তোমাকে আমার বড় ভাল লাগে মা।"

আরও দুই চারিটা কথার পর পাঁচুর মা চলিয়া গেলে—গিরি আঁচল পাতিয়া মাটীর উপর শুইয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল—প্রভাতের কুয়াশা কাটিয়া গেছে—আকাশ প্রগাঢ় নীল, শীতের মধ্যাহ্নের সূর্য্যকিরণে ধরণী যেন কত উপভোগ্যা—আকাশের বুকে মিশিয়া চলমান বিন্দুর মত কয়টা চিল নিরন্তর উর্দ্ধে উঠিয়া চলিয়াছে; দূরে পালেদের বাঁশবনের শীর্ষগুলি বায়ু-প্রবাহে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে।

বেশ লাগিল—গিরির আজ এগুলি বেশ লাগিল।

দাওয়ার কোলে করবী গাছটি রাঙা ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে, সহসা গিরির মনে হইল এ গাছটি তাহার নিজের হাতে রোপিত। কিন্তু যার পরিচর্য্যায় সে আজ এমন রূপে রসে বর্ণে গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে, সে গৌরী।

আহা, আজ যদি গৌরী কাছে থাকিত

সম্মুখে চালাটার উপর দুইটা পায়রা বসিয়া একটা অপর-টার মুখে আহার তুলিয়া দিতেছিল। একটা মা অপরটা সন্তান, ছানাটা পাখার ঝাপ্‌টা দিয়া আগাইয়া আসিয়া আহারের দাবী করিতেছিল; মা উড়িয়া গেল, ছানাটা পারিল না। সে ফিরিয়া ছানাটাকে চঞ্চুর আঘাতে চঞ্চল করিয়া আবার উড়িল, এবার ছানাটাও উড়িল।

গিরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখ ঘুরাইল।

হায়! তাহার বুক জুড়িয়া যদি একটা শিশু থাকিত!

ওই বিষণ্ন অবসন্নতার মধ্যেই সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

সহসা একটা আর্ত্ত কলরোলে তাহার তন্দ্রা টুটিয়া গেল, চমকিয়া সে জাগিয়া উঠিয়া বসিল।

বাগদীপাড়ায় কাহারা যেন কলরোল করিয়া কাঁদে, গিরি কান পাতিয়া শুনিল, সমস্ত কলরোল ছাপাইয়া নারী-কণ্ঠে কে যেন বিনাইয়া বিনাইয়া মর্ম্মস্পর্শী কান্না কাঁদে—বিলাপের ভাষাও যেন কিছু কিছু স্পষ্ট হইয়া কানে আসিয়া ধরা দেয়।

"ওরে সোনা—ওরে যাদু আমার—"

গিরির বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠে, সে তাড়াতাড়ি গিয়া সম্মুখের মুক্ত দুয়ারটা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে অন্ধকারে বসিয়া হাঁপায়।

কতক্ষণ পর কে জানে পাঁচুর মায়ের গলা শোনা গেল—

"কৈ গো, বৌমা কৈ? বলি ঘরে রয়েছ না কি?"

গিরি দুয়ার খুলিয়া দুয়ারের বাজু ধরিয়া দাঁড়াইল—তখন বাগদীপাড়ার কলরোল নীরব হইয়া গেছে, কিন্তু নারীকণ্ঠের বিলাপ সকরুণ মন্থর গতিতে চলিয়াছেই, বেশ বোঝা যায়। দেহ তাহার আর পারে না—কিন্তু প্রাণ তবু মানে না—দূর সুদূর কোন অদৃশ্য লোক পর্য্যন্ত আহ্বান করিয়া তাহাকে ফিরাইতে চায়—

"ওরে সোনা—ওরে যাদু আমার রে!"

পাঁচুর মা বলিতেছিল—"মনে করলাম দুপুর বেলায় এসে উঠোনটা ঢেঁকিশালটা নিকিয়ে যাব—তা বাড়ী গিয়ে এক বিপদ—"

গিরি তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—"কে এমন করে কাঁদছে পাঁচুর মা!"

পাঁচুর মা কহিল—"তাইত বলছি মা—গিয়েই দেখি আমাদের গোকুলের সন্তানটী নষ্ট হ'ল—এই নিয়ে পাঁচটী গেল। কি যে দোষ ধরেছে মা, কোঁকে একটী হ'লেই কোলেরটী যাবে, এই আবার পোয়াতি—সঙ্গে সঙ্গে কোলেরটা গেল।"

আকাশের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা গিরি কহিল—"যা করতে হয় কর পাঁচুর মা, আমায় আর ডেকো না, আমার বড় মাথা ধরেছে।"

পাঁচুর মা কহিল—"এই অবেলায়—একবারে কাপড় চোপড় কেচে—"

গিরি কহিয়া উঠিল—"না না পাঁচুর মা, ও কান্না আমি সইতে পারি না আমায় ডেকো না।"

সে আবার ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

* * * *

অন্ধকার গৃহ মধ্যে উপাধানে মুখ গুঁজিয়া গিরি শুইয়া পড়িল—রুদ্ধ দ্বারে সন্তানহারা হতভাগিনীর বিলাপধ্বনি প্রতিহত হইয়া বিষণ্ণতা বহিয়া বায়ুপ্রবাহ দিগন্তরে ভাসিয়া চলিয়া যায়—

রুদ্ধদ্বারের এ পাশে শুধু শোনা যায় বিলাপের অতি ক্ষীণ রেশ একটী, মাঝে মাঝে দুই একটা শব্দ।

সহসা গিরির মনে হইল—তাহার ভাগ্য ভাল, তাহার এই বঞ্চনার বেদনার চেয়ে ওই বিয়োগের দুঃখ ঢের, ঢের বড়! কিন্তু এ চিন্তায় সে আনন্দ পাইল না—একটী সকরুণ ম্লানিমায় মন তাহার কেমন উদাসী হইয়া উঠিল—শূন্য মন, শূন্য সংসার—শূন্য দৃষ্টিতে সে ওই অন্ধকারের পানে চাহিয়া রহিল।

এমনি অবস্থায় আবার কখন সে নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; সে নিদ্রা ভাঙিল তাহার রুদ্ধদ্বারে কাহার মৃদু করাঘাতে। কে যেন ডাকে।

গিরি উঠিয়া বসিল।

নিস্তব্ধ নীরব সব—পাখী ডাকে না, মানুষের সাড়া পাওয়া যায় না, ঘরের জীর্ণ ছিদ্রময় চালের মধ্য দিয়া ব্যোমপথ দেখা যায়—অস্পষ্ট অন্ধকার, আরও ঊর্দ্ধে দেখা যায় খানিকটা আকাশ, সে আকাশ গাঢ় কৃষ্ণ-নীল—কয়টী প্রদীপ্ত, প্রোজ্জ্বল বিন্দু; গিরি বুঝিল দিনের অবসান হইয়া গেছে, এ রাত্রি!

আবার রুদ্ধ দ্বারে মৃদু করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। গিরি বুঝিল পাঁচুর মা শুইতে আসিয়াছে, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিয়া ডাকিল—

"পাঁচুর মা!"

দাওয়ার উপর খানিকটা চাঁদের আলো তেরছা ভাবে সুশান্ত মহিমায় পড়িয়া আছে—তাহারই আভায় উপরের অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে—গিরি দেখিল দুয়ারের পাশে একটী মানুষ দাঁড়াইয়া, স্বচ্ছতার মধ্যে গিরির মানুষটিকে চিনিতে বিলম্ব হইল না—সে বিপিন!

চীৎকার করিতে স্বর ফুটিল না, ঘরে ঢুকিতে পা না—এক মুহূর্ত্তে গিরি যেন কেমন হইয়া গেল।

নিস্পন্দ, নির্ব্বাক!

দাওয়ার চন্দ্রালোকদীপ্ত অংশটুকুর উপর বিপিন কি নামাইয়া দিল।

মৃদু স্পষ্টতার মধ্যে প্রদীপ্ত রূপে দেখা না গেলেও জিনিষটাকে চেনা গেল—জিনিষটা নয়, একখানি ডালায় সাজান জিনিষের সম্ভার, একদিকে দেখা যায় কাপড় তাহারই পাশে নতুন বাটীতে বোধ করি আহার্য্য, এদিকে আরও কত কি পূর্ণরূপে চেনা যায় না, কিন্তু ওই এমন মৃদুস্নিগ্ধ আলোকেও সেগুলা ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া উঠে, কাচের জিনিষ বলিয়া বোধ হয়।

গিরি এক দৃষ্টিতে ওই দ্রব্যসম্ভারের পানে চাহিয়া থাকে!

বিপিন মৃদুস্বরে আবার কহিল—"তুমি চেয়েছিলে বৌ।"

গিরির তবু কোন সাড়া নাই, তাহার দৃষ্টি ওই দ্রব্য-সম্ভারের পানে।

বিপিন ভরসা পাইল, কহিল—"কাপড় এনেছি, খাবার এনেছি, তেল, সাবান, চিরুণী, আলতা—সব এনেছি; টাকা নাও, গয়না আমি দেব আরও—" সহসা বিপিন নীরব হইয়া চমকিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের ঢেঁকিশালার অস্পষ্ট অন্ধকার হইতে কে ডাকিয়া উঠিল—"মোটা মোড়ল!"

বিপিন থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ঢেঁকিশালার দিকে না চাহিয়াও সে বুঝিয়াছিল সে কে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে আত্ম সম্বরণ করিয়া ত্বরিত পদে খিড়কীর দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া গেল। গিরি তখনও তেমনি দাঁড়াইয়া।

ঢেঁকিশালায় দাঁড়াইয়া ছিল পাঁচুর মা আর পাঁচু, পাঁচু মাকে পৌছিয়া দিতে আসিয়াছিল।

পাঁচুর মা উঠানে নামিয়া আসিতেই পাঁচু কহিল—"মা!"

পাঁচুর মা ফিরিয়া দাঁড়াইলে পাঁচু কহিল—"ফিরে আয় মা!"

পাঁচুর মা কহিল—"দাঁড়া।"

উত্তেজিত পাঁচু কহিল—"না, ফিরে আয় বলছি।"

পাঁচুর মা কহিল—"চলনা তুই আমি যাই।"

দৃঢ়ভাবে পাঁচু কহিল—"না এখুনি আয়, নইলে তোর সঙ্গে আমার শেষ।"

পাঁচু আর অপেক্ষা করিল না, সে দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল।

পথের ওপাশেই রামকেষ্ট সাহার বাড়ী, বাড়ী হইতে রামকেষ্ট ডাকিল—"পাঁচু!"

পাঁচু চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"কে?"

—"আমি রামকেষ্ট!"

পাঁচু বিরক্তভাবে কহিল—"কি?"

খোলা জানালা হইতে রামকেষ্ট কহিল—"ধরতে পারলি নারে, কিছু আদায় হয়ে যেত—আর পারলি না দিতে বেটার ধুমসো পিঠে গদাগদ ঘা কতক!"

পাঁচু বিরক্তভাবেই কহিল—"কি সব আবোল-তাবোল ব'কছ তুমি?

হাসিয়া সাহা কহিল—"আবোল-তাবোলই বটে রে, আবোল-তাবোলই বটে,—বাবা রামকেষ্টর কান খুট করলে সাড়া দেয়, চোরের দায়ে ঘুমোবার জো আছে; শালা বিপ্‌নে ঢুকলো তাও দেখেছি পালালো তাও দেখেছি; সব আগা-গোড়া।"

সাহা হাসিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

পাঁচু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আপন পথ ধরিল।

পাঁচুর মা গিরির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও গিরি বিস্ফারিত নেত্রে দাঁড়াইয়া।

পাঁচুর মা কহিল—"বৌমা!"

গিরি চমকিয়া উঠিল—তারপর পাঁচুর মায়ের পানে চাহিয়া সে কহিল—"পাঁচুর মা! এত দেরী কি করে মা?"

পাঁচুর মা স্থির দৃষ্টিতে গিরির পানে চাহিয়া দেখিতেছিল; সহসা গিরির দৃষ্টিতে আবার পড়িল সেই দ্রব্যসম্ভার, সে দুই হাতে আপনার মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভারতের সামরিক শক্তি

—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম ফরাসীদিগের দ্বারাই সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ হয় ও আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত করা হয়। ফরাসীদের ভারতবর্ষে পদার্পণের পর ১৬৬৫ সাল হইতে এই নিয়ম-প্রবর্ত্তনের তারিখ গণনা করা যাইতে পারে। ইতি পূর্ব্বে ইংরাজদের (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) ভারতীয় ঘাঁটী-সমূহ রক্ষার্থে ইংলণ্ড হইতে এদেশে সৈন্য প্রেরিত হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে আসিয়া যে সমস্ত স্থানে কুঠী কিংবা ঘাঁটীসমূহ স্থাপন করিয়াছিল,তৎসমূহের প্রহরী বা পিওন হইতেই ইংরাজদের ভারতীয় সৈন্যের সর্ব্বপ্রথম গোড়াপত্তন হয়। ১৬৫৪ সালে মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জে এইরূপ সৈন্যের সংখ্যা ছিল দশ। প্রমাণ পাওয়া যায় ১৬৬১ সালে চারিশত সেনার এক বাহিনী কর্ত্তৃক বোম্বাই দখল করা হয়। ১৬৬৮ সালে এই সৈন্য-সংখ্যা কমিয়া মাত্র ২৮৫তে দাঁড়ায়। তন্মধ্যে ৯৩ জন ইংরাজ এবং অবশিষ্ট সকলে ফরাসী, পর্ত্তুগীজ ও দেশীয়। অতঃপর ১৭৫৭ সালে, বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধের পর, ১৭৬১ সালে ওয়াদিওয়ালের যুদ্ধে ফরাসীদিগকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিয়া ইংরাজগণ ১৭৯৬ সালে সামরিক শক্তির পুনর্গঠন করেন। ঐ সময় হইতেই প্রাদেশিক হিসাবে সৈন্য গঠন আরম্ভ হয়। এই ১৭৯৬ সালে ভারতে ইংরাজ সৈন্যের (গোরা সৈন্যের) সংখ্যা ছিল ১৩,০০০ এবং দেশীয় সৈন্যের সংখ্যা ছিল ৬৭,০০০।

ইহার কিছুকাল পরে ১৮০৬ সালে দক্ষিণ ভারতে ভেলো-রের দুর্গে এক ভীষণ বিদ্রোহ ঘটে। দুর্গের দেশীয় সৈন্যগণ হঠাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া অধিকাংশ গোরা-সৈন্য ও গোরা কর্ম্মচারী-দিগকে হত্যা করিয়া ফেলে। ১৮৫৭ সালের বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে ইংরাজদের অধীনে ভারতীয় সিপাহীদিগের যতগুলি বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ভেলোর সিপাহী বিদ্রোহই ভীষণতম। সৈন্যগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দুর্গের উপর মহীশূরের সুলতানের পতাকা উড্ডীন করিয়া দেয়। সুলতানের পুত্রদিগকে ইংরাজগণ এই দুর্গে ১৭৯৯ সালে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। কর্ণেল জিলেস্‌পি কর্ত্তৃক এই বিদ্রোহ দমিত হয়।

১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বের সৈন্য-সংখ্যার হিসাব নীচে দিতেছি।

বেঙ্গল আর্ম্মি *	২১,০০০ (গোরা),	১,৩৭,০০০ (দেশীয়)
মাদ্রাজ আর্ম্মি	৮,০০০ (গোরা),	৪৯,০০০ (দেশীয়)
বোম্বাই আর্ম্মি	৯,০০০ (গোরা),	৪৫,০০০ (দেশীয়)

সিপাহী বিদ্রোহের পর যখন ভারতের শাসনভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে ইংলণ্ডের রাজ-শক্তির অধীনে হস্তান্তরিত হয়, তখন ভারতীয় সামরিক শক্তিরও পুনর্ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে ভারতীয় সামরিক শক্তি বঙ্গ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিন বিভাগে বিভক্ত হয়। সর্ব্বসাকুল্যে এই সময়ে ভারতীয় সামরিক শক্তিতে ৬৫,০০০ ইংরাজ ও ১,৪০,০০০ ভারতীয় সৈন্য ছিল। ১৮৯৫ সালে প্রথম কমাণ্ড (command) নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। পাঞ্জাব, বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই চারি স্থানে কমাণ্ডের সৃষ্টি হয়।

১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা চলিত ছিল। ঐ সালে লর্ড কিচেনার সামরিক শক্তির পুনর্গঠন করেন। সমুদায় সৈন্যকে তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করেন, অর্থাৎ পাঞ্জাব, বাংলা ও বোম্বাই কমাণ্ডকে নর্দার্ণ (উত্তর বিভাগীয়) ইষ্টার্ণ (পূর্ব্ব বিভাগীয়) ও ওয়েষ্টার্ণ (পশ্চিম বিভাগীয়) হিসাবে তিন কমাণ্ডে পরিণত করেন। উক্ত প্রথামত সামরিক কার্য্য পরিচালনায় নানা অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায়, তিনি পুনরায় ১৯০৭ সালে সৈন্য-বিভাগের পুনর্ব্যবস্থা করেন। কমাণ্ড প্রথা একেবারেই উঠাইয়া তৎস্থলে সমুদায়

---

* স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেঙ্গল আর্ম্মি অর্থে বাঙ্গালী সৈন্য নয়। বেঙ্গল আর্ম্মির যাবতীয় সৈন্য বিহার, ইউ-পি, ও বেশীর ভাগ অযোধ্যা প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইত।

সৈন্যকে নর্দার্ণ ও সাদার্ণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল। এক এক বিভাগ একজন জেনারেল অফিসারের অধীনে স্থাপিত হইল। জেনারেল অফিসারের উপর সৈন্যদিগকে পরিচালনা করা, তাহাদের শিক্ষা দেওয়া (সামরিক) ও পরিদর্শনাদি করার ভার ন্যস্ত হইল, কিন্তু শাসন সম্বন্ধীয় কোন দায়িত্ব তাঁহার উপর রহিল না।

ভারতীয় সামরিক বিভাগ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সেক্রেটারী অব ষ্টেটই সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তা। ভারত-সচিবের ভারতীয় সামরিক বিভাগ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে প্রধান সহায়ক (adviser) বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিসের সামরিক বিভাগীয় সেক্রেটারী। ভারতীয় সৈন্য বিভাগের একজন অফিসারই এই পদ পাইয়া থাকেন। এই পদে বর্ত্তমানে নিযুক্ত রহিয়াছেন ফিল্ড-মার্শেল আর ক্লড জেকব জি-সি-বি, কে-সি-এস-আই, কে-সি-এস-জি। ইনি পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নর্দার্ণ বিভাগের জেনারেল আফিসার কমাণ্ডিং-ইন-চিফ'এর পদে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত মিলিটারী সেক্রেটারী ভারতীয় সৈন্য বিভাগ হইতে নির্ব্বাচিত, অপর একজন প্রথম শ্রেণীর ষ্টাফ (staff officer) অফিসার কর্ত্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এতদরিক্ত সেক্রেটারী-অব-ষ্টেট'এর কাউন্সিলে দীর্ঘকালের প্রথানুসারে অপর একজন প্রধান শ্রেণীর অবসর-প্রাপ্ত ভারতীয় সৈন্য বিভাগীয় অফিসারেরও একটী স্থান আছে।

ভারত-সচিবের পরে, ভারতের গভর্ণর জেনারেল ভারতীয় সৈন্য বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তা। অবশ্য তাঁহাকে ভারত-সচিবেরই যাবতীয় আদেশ পালন করিয়া চলিতে হয়। ভারতের সিভিল ও মিলিটারী গভর্ণমেন্টের পরিচালন, পরিদর্শন ও সংরক্ষণ তাঁহারই উপর সর্ব্বতোভাবে ন্যস্ত। ভারত সরকারের পরে কমাণ্ডার-ইন-চিফ এই বিভাগের প্রধান কর্ত্তা। কমাণ্ডার-ইন-চিফ ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের একজন সদস্যরূপে নিযুক্ত থাকেন। তিনি কাউন্সিল অব ষ্টেট'এরও একজন মেম্বার। বলিতে গেলে ভারতীয় সৈন্য বিভাগের ইনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। ভারতীয় সৈন্য সম্বন্ধীয় ও ব্যাপক ভাবে ভারতীয় সামরিক শক্তি সম্বন্ধীয় যাহা কিছু তৎসমস্তই ঐ একটী মাত্র লোকের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। ইনি রয়াল ইণ্ডিয়ান মেরাইন ও রয়েল এয়ার ফোর্স (Royal Indian Marine & Royal Air Force in India) প্রভৃতি বিভাগেরও কর্ত্তা। যাবতীয় সৈন্য বিভাগীয় খরচপত্র, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা ও ভারতীয় শাসন সম্বন্ধীয় নীতি প্রবর্ত্তন ও অনুসরণ ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারের দায়িত্বই ইহার উপর ন্যস্ত। কমাণ্ডার-ইন-চিফ, চারিজন ষ্টাফ অফিসার—চিফ অব দি জেনারেল ষ্টাফ, এডজুটাণ্ট জেনারেল, কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল ও মাষ্টার জেনারেল অব অর্ডনেন্স ইত্যাদির সহকারিতা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কাউন্সিল অব ষ্টেটে যেমন আর্ম্মি মেম্বার সামরিক বিভাগের প্রতিনিধি স্বরূপ কাজ করেন, তেমনি লেজিসলেটীভ এসেম্বলীতেও আর্ম্মি সেক্রেটারী সমর-বিভাগের প্রতিনিধির কাজ করেন।

কমাণ্ডার ইন চিফকে তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য একটী মিলিটারী কাউন্সিল আছে। এই কাউন্সিলের গঠন এইরূপ :—

কমাণ্ডার ইন্ চিফ্ -(প্রেসিডেণ্ট), চিফ অব দি জেনারেল ষ্টাফ (ভাইস-প্রেসিডেণ্ট), এডজুটাণ্ট জেনারেল, কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল, মাষ্টার জেনারেল অব অর্ডন্যান্স, আর্ম্মি সেক্রেটারী ও মিলিটারী ফিনেন্সিয়াল এডভাইজার।

এই কাউন্সিলের অধিবেশন বসিবার কোন সময় নির্দ্দেশ নাই। কমাণ্ডার ইন্ চিফ ঘটনাবিশেষের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে যখন সভা আহ্বান করিবেন, তখনই উহা বসিয়া থাকে।

বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষ চারিটী কমাণ্ডে বিভক্ত। ইহার এক একটী জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং-ইন-চিফ'এর অধীনে স্থাপিত। কেবল ব্রহ্মদেশ একটী স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে একজন কমাণ্ডারের অধীনে পরিচালিত হইয়া থাকে। নর্দার্ণ কমাণ্ড পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ লইয়া গঠিত ও উহার প্রধান কেন্দ্র মারি। সার্দার্ণ বা দক্ষিণ বিভাগীয় কমাণ্ড বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও অংশতঃ মধ্য প্রদেশ এবং রাজপুতানা লইয়া গঠিত। ইহার প্রধান কেন্দ্র পুণা। ইষ্টার্ণ কমাণ্ড বাংলা প্রেসিডেন্সী ও যুক্তপ্রদেশ (ইউ, পি) লইয়া গঠিত। উহার প্রধান কেন্দ্র নাইনিতাল। ওয়েষ্টার্ণ কমাণ্ড সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্থান লইয়া গঠিত এবং ইহার প্রধান কেন্দ্র কোয়েটা।

১৯২০ সালে ভারতবর্ষে 'অক্‌জিলিয়ারী' সৈন্য গঠন করার উদ্দেশ্যে এক আইন পাশ করা হয়। উক্ত আইন অনুসারে অক্‌জিলিয়ারী কোর্সে শুধু ইউরোপীয় বৃটিশ প্রজার ভর্তি হইবার অধিকার দেওয়া হয়। অক্‌জিলিয়ারী ফোর্সে অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি যাবতীয় বিভাগেরই সৈন্য তৈয়ারী করা হয়। এই সঙ্গে রেলওয়ে ব্যাটালিয়ান, মেশিন গান কোম্পানী, সিগন্যাল কোম্পানী, মেডিকাল সার্ভিস ও ভেটারিনারী সার্ভিস প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। অক্‌জিলিয়ারী ফোর্স একজন স্থানীয় সামরিক কর্ম্মচারীর ক্ষমতাধীন ভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। স্থানীয় সামরিক কর্ম্মচারী আবশ্যকবোধে ঘটনা বিচার করিয়া, যে কোন সময় এই ফোর্স ডাকিতে পারেন। এই ফোর্সের কাজ আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষা কার্য্যে সাহায্য করা।

ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল ফোর্স :—এই নামে আর একটী দেশীয় সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইণ্ডিয়া ডিফেন্স ফোর্স নামে যে সামরিক বিভাগ বিগত যুদ্ধের সময় খোলা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে উহা তাহারই স্থান অধিকার করিয়াছে। ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল ফোর্সে তিনটী বিভাগ আছে, যথা, প্রভিন্‌সিয়াল ব্যাটালিয়ান, আরবান ইউনিট ও ইউনির্ভাসিটী কোর। ইউনির্ভাসিটী ট্রেইনিং কোরে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী প্রবেশ করিতে পারে। ইউনিভার্সিটী কোর ইউনিটীর শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই সামরিক ক্ষেত্রে কার্য্য করারও দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু অপর বিভাগীয় লোকদের সে দায়িত্ব থাকে। তাহাদের প্রধান কাজ আভ্যন্তরিক ব্যাপারে ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্য দান করা।

এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে রয়েল এয়ার ফোর্স নামে এক বিভাগ খোলা হইয়াছে।

এই এয়ার ফোর্সের বিবরণ নীচের হিসাব হইতে পাওয়া যাইবে।

কর্ম্মচারী	...	২৫৯
এয়ারম্যান বা বিমান-বাহী		১৮৮৭
ভারতীয় কর্ম্মচারী		১০৯৫
সিভিলিয়ান		১৪৫

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে গোরা ও ভারতীয় সৈন্যের পরিমাণ :—

[ইহাতে প্রকৃত যোদ্ধা, পরিচালক, কুচকাওয়াজ করাইবার লোকজন, শিক্ষায়তনের লোকজন, চিকিৎসা-বিভাগের লোকজন, ভেটারিনারী বিভাগের লোক, অক্‌জিলিয়ারী ও টেরিটোরিয়াল ফোর্স ও মিলিটারী একাউণ্ট বিভাগ প্রভৃতি গণনা করা হইয়াছে।]

গোরা কর্ম্মচারী (কিংস্ কমিশন সহ) মোট		৬৭৭১
ইংরাজ সৈন্য	... ”	৫৯৮২৭
ভারতীয় কর্ম্মচারী (ভাইসরয় কমিশন সহ) মোট		৪৭৩২
ভারতীয় সৈন্য	...	১,৫৪৫৮০
কেরাণী ও অন্যান্য সিভিলিয়ান		১০৮৫৩
সঙ্গী (followers)	...	৩৭৫৯৮
ভারতীয় রিজার্ভিষ্ট	...	৪৬০৯৭

এতদ্ব্যতীত রয়েল ইণ্ডিয়ান মেরাইন নামে এক নৌ-শক্তিও গঠিত হইয়াছে। এই নৌ-শক্তির প্রধান আড্ডা বোম্বাই। কলিকাতায় ইহার এক আড্ডা আছে।

[সাইমন রিপোর্টে ভারতীয় সামরিক শক্তি সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি ও The Evolution of Indian Army নামক পুস্তক হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে।]

বাঙ্গালীর মন

শ্রীকিরণকুমার রায়

যাঁদের সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় আছে তাঁরা বলেন রোম্যান্টিক কি ক্ল্যাসিক এমন কোন শ্রেণীবিভাগ সাহিত্যে নিতান্ত অচল। সত্যকার সাহিত্যপর্য্যায়ে যে সৃষ্টি উঠেছে, তার মধ্যে যে-পরিমাণ ক্ল্যাসিক, সেই পরিমাণ রোম্যান্টিক ইঙ্গিতও আছে। হোমারের মূল অডিসি যাঁরা পড়েছেন,তাঁদের কাছে শুনি, হোমারের মধ্যে রোম্যান্টিসিজমের ছড়াছড়ি। তবুও আমরা হোমারকে ক্ল্যাসিক কবি বলি কেন? তার কারণ হয়তো এই যে মূলতঃ তাঁর ভাব ক্ল্যাসিক। যদিও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে তিনি রীতিমত রোম্যান্টিকও।

মনে হয়, সাহিত্যেরই বলি কিংবা আর যার কথাই বলি, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এমন একটি পর্য্যায় আছে যেখানে পৌছলে দেখি, সমস্ত বিভিন্ন বর্ণ সেখানে এক হ'য়ে গেছে—নীল, রক্ত, শ্বেত, পীত সব সেখানে এক অম্লান শুভ্রতার মধ্যে নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেছে।

মানুষের জীবন-বিকাশের স্তরেও তাই দেখি। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক সেখানে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বে বিলীন হ'য়েছে, এক হ'তে অপরকে পৃথক করার উপায় নেই। কে ব'লবে সেণ্ট ফ্র্যান্সিস্ অব অ্যাসিসী কবি না সন্ন্যাসী, কবীর তাপস না প্রেমিক। বলা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব। তবু আমরা জীবনের রহস্যকে সহজবোধ্য করবার জন্য সেণ্ট ফ্র্যান্সিস অব অ্যাসিসী আর কবীরকে তপস্বী ব'লেই মেনে নিই। কিন্তু দারিদ্র্যকে যিনি নববধূর মতো ভাল বেসেছিলেন সেই সেণ্ট ফ্র্যান্সিস্, আর প্রিয়তমের অট্টালিকার দিকে চেয়ে চেয়ে যিনি নিজের চোখ ঠিক্‌রে ফেল্‌লেন—সেই কবীরকে, শুধু মাত্র তাপস ব'লে বরখাস্ত ক'রে দেবার দুঃসাহস কার আছে?

ব্যক্তিগত জীবনের কথা বাদ দিলে কিন্তু দেখবো, সমষ্টিজীবনের ধারা বয়ে চলে, যে-স্তরে আমরা বর্ণবিচার করতে পারি নে সে-স্তরের অনেক নীচ দিয়েই। এ ধারার বর্ণ আছে এবং এখানে এক ধারাকে অন্য ধারা হ'তে সহজে পৃথক ব'লে বুঝি। তাই এর ধারাকে আমরা কখনও পুরিটান, কখনও বা রিনাইস্যান্স বলি।

সুতরাং জাতীয় জীবনের ধারায় বর্ণ-বৈষম্য স্বীকার ক'রে চল্‌তে হয়। এ বৈষম্য শুধু প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের নয়, দেশে দেশে, প্রদেশে প্রদেশে, সব কালে এ বৈষম্য দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। জার্ম্মানি আর ফ্রান্স বহুদিনকার প্রতিবেশী। রুশিয়া আর তুর্কী, ইতালি আর স্পেন—এরাও তাই। কিন্তু এদের—প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যে পার্থক্য আছে, তা কার না নজরে পড়ে! এতো গেল বিভিন্ন দেশের কথা। একটি দেশই বছরকয়েকের মধ্যে স্ববর্ণ হারিয়ে ফেলে—এও ত' হামেসাই দেখতে পাই। যে-অ্যামেরিকা কিছুদিন আগে 'ড্রাই' হবার শপথ করেছিল, সে-আমেরিকা আজ হুভারের দুশ্চিন্তার কারণ হয়নি।

পাশ্চাত্যের কথা ছেড়ে প্রাচ্যে এলেও এম্‌নি দেশে দেশে বর্ণ-বৈষম্যের পরিচয় পাবো। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা শুধু বর্ত্তমান বাংলার জাতীয় জীবনের বর্ণ বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা পাবো। বর্ত্তমান বাংলার জাতীয় জীবনের ধারার বর্ণ কি—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। এ ধারার বর্ণের সন্ধান ক'রতে হ'লে এর মূল সন্ধান করা দরকার, সুতরাং প্রথমেই প্রশ্ন ক'রতে হয় বর্ত্তমান বাঙালীর মনোজগতের নায়ক কে?

এইখানে এসে থেই হারিয়ে যাওয়া সম্ভব।

এমন কথা হয়ত বলা চলে যে কোন বিশেষ সময়ে কোন দেশেই কোন কালে দেশবাসীর মনোজগতের নায়ক একজন নয়। আমাদের দেশে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আরও কঠিন এই জন্য যে, আমাদের যে-'অ্যাননিমাস্' (anonymous) বাংলা, নাম গোত্র-কুলহীন অশিক্ষিত জনসাধারণ, তাদের মনের সংবাদ কে রাখে? এবং এ কথাও নিশ্চয় যে যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা সেই অনড় অচল সমষ্টি-মনকে (mass mind) একটা বিশেষ বর্ণ দিতে পারবো ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয় জীবনের বর্ণ-নির্দ্ধারণ সম্পূর্ণ সার্থক হবেনা। আজকের দিনে আমাদের জাতীয় জীবনের

বর্ণবিচার ক'রতে হ'লে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনকে নিয়েই ক'রতে হবে। এই শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁরা চাকুরীজীবী, তাঁদের মন স্থাণু মেরে গেছে—কিন্তু নেপথ্যে সে মন তাঁর পরিবারস্থ ছেলেমেয়েদের তৈরি ক'রছে, সুতরাং সে মন ফেলনার নয়। কিন্তু যে-মন সাংসারিকতায় লিপ্ত না হ'য়ে সতেজ আর সজীব আছে সে-মনের সঙ্গে ঐ স্থাণু মনের তুলনা করা চলেনা। যদি বলি যে বাংলা দেশে সতেজ আর সজীব মনের অধিকারীরা সব আজ কারাগারে, তাহ'লে এক কথায় বর্ত্তমান বাঙ্গালীর মনোজগতের কে নায়ক, তা নির্দ্ধারিত হ'য়ে যায়। কিন্তু এ কথা বলা চলেনা, কেননা যারা কারাবরণ ক'রেছে, তারা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বাঙ্গালীরও মুষ্টিমেয়তর অংশ। আর সাময়িক একটা ঘটনা দেখে জাতীয় জীবনের ধারা বিচার করাও চলেনা। কিছুদিনের জন্য দেশবন্ধুর প্রভাবে বাংলার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত নাড়া পেয়েছিল, কিন্তু তার ফল বেশীদিন জাতীয় জীবনে পরিলক্ষিত হয়নি। তাই চিত্তরঞ্জনকে আমরা যদিও বা কিছু দিনের জন্য বাঙ্গালীর মনের রাজসিংহাসনে আসীন দেখতে পাই—জাতীয় জীবনের ধারায় তাঁর সে-দান আজ আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নাই। রাজনীতির ঘূর্ণীতে আজকে যাকে দেশের মনের মাণিক করে তোলে, কাল সে দেশের কাছে অনাদৃত হয়ে ওঠে। দেশবন্ধু মাত্র সেই ঘূর্ণীর ফল নন, একথা মানতেই হবে। তাঁর ত্যাগ দেশের মনে প্রকাণ্ড দাগ দিয়েছিল। কিন্তু খুব গভীরভাবে বস্‌বার আগেই সে দাগ তিরোহিত হয়েছে। জাতীয় জীবনে সে দাগ আজ স্মৃতিচিহ্ন মাত্র।

কিন্তু রাজা রামমোহন কি স্বামী বিবেকানন্দ বাংলার জাতীয় জীবনে যে চিহ্ন এঁকেছিলেন, তা শুধু স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হয়নি। সে চিহ্ন বাঙ্গালীর মনে আজও আল্পনা-রেখায় সঞ্জীবিত হ'য়ে আছে। এবং যতদিন ইতিহাস থাকবে, ততদিন সে আলিম্পন থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে আজ রাজা রামমোহনের কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। এবং যাঁরা বিবেকানন্দের গোঁড়া নন্ তাঁরা এ কথাও স্বীকার করবেন যে স্বামীজীর প্রভাবও বাংলায় আজ নিঃশেষিত হয়ে এসেছে।

তাহ'লে আজ বাংলার মনের রাজসিংহাসনের অধিকারী কে? আমার মতে আইডিয়ালিষ্ট বাঙ্গালী বিবেকানন্দের পর আর তেমন কোন জীবন্ত আইডিয়াল আঁকড়ে ধ'রতে পারেনি, এবং একথা এখানেই স্বীকার করা ভাল যে বিবেকানন্দের আদর্শও গেরুয়া আর সন্ন্যাসধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে বাঁধা প'ড়ে বাংলায় সার্ব্বজনীন হ'য়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু তবু সে আদর্শ বাংলার স্কুলে-কলেজে, সহরে-গ্রামে ব্যাপক ভাবেই ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালীর সকাল সন্ধ্যা 'ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্য' রবে মুখর ছিল।

এই শতাব্দীর প্রারম্ভেই বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' এই আন্দোলনের অগ্রদূত। শুধু এই আন্দোলনের নয়, 'বঙ্কিম-সাহিত্য'এ বর্ত্তমান বাঙ্গালীয়ানার অনেক কিছুর ইঙ্গিতই আমরা পেইছি। বঙ্কিম-সাহিত্যের মনোযোগী পাঠককে বঙ্কিমচন্দ্রকেই বর্ত্তমান বাংলার 'ভোরের পাখী' ব'লে স্বীকার করতে হয়—যে পাখী 'ভোর না হ'তে ভোরের খবর' দিয়েছিল, 'আঁধার নিশি' আর 'কালীবরণ পুচ্ছডোরের হাজার লক্ষ পাকে'ও যার কাছে 'তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়' ধরা পড়েছিল। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালী ছেলেমেয়ের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁরা জানেন বঙ্কিম-সাহিত্যের মৌচাকে এর লোভ বাঁধা পড়ে নি। তবু 'আনন্দমঠ'কে সম্মুখে রেখেই বলা চলে, বিপ্লবীর আদর্শ সম্পূর্ণ ই বিদেশী আমদানি; কিন্তু বহু বাঙ্গালীর ছেলেকে যখন এ আদর্শে বিচলিত দেখতে পাই, তখন স্বীকার করতেই হয়, অন্ততঃ কিছুকালও কয়েক জন বাঙ্গালীকে এ আদর্শ বিচলিত করেছে, আজও ক'রছে। তবু এর প্রেরণা কৃত্রিম এবং এর উত্তেজনা ক্ষণিক। সুতরাং মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দু'চারটি বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে জাতীয় জীবনের অঙ্গ হিসাবে ধরা ভুল।

এই বিপ্লবী আদর্শ ই বাঙ্গালীর কাছে অরবিন্দকে পরিচিত করে। অরবিন্দ আজ বাংলা থেকে স্বনির্ব্বাসিত হ'লেও অনেক বাঙ্গালীর মনই পন্দিচেরীতে আবদ্ধ আছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাঁরা একটি শ্রেণীত্বের ছাড়া আর কোন বড়ো দাবী করতে পারেন না, যেমন জগদ্বন্ধুর দল কিংবা সৎসঙ্গীর দল। সুতরাং ভবিষ্যতের কথা বাদ দিয়ে বর্ত্তমানে অরবিন্দের প্রভাবকে বাংলার জাতীয় জীবনে অনুপস্থিত ব'লেই মেনে নিতে হবে।

অতএব, আধুনিক বাঙ্গালীর মনকে কে নিয়ন্ত্রিত করছে, একথা বলা কঠিন হয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে আদর্শ বাঙ্গালীর মনে রাজ্য-স্থাপন করেছিল, সে আদর্শ যে আজ আর বাংলাকে নাড়া দেয় না, এ কথা অপক্ষপাত বিচারক মাত্রকেই স্বীকার করতে হবে। তবে আধুনিক বাঙ্গালীর আদর্শ কি? আমার নিজের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে আধুনিক যুগের সাহিত্য-রসিক বাঙ্গালী খুব বড়ো আদর্শ খুঁজে পেয়েছে—যে আদর্শ সম্পর্কে বাংলার গর্ব্ব করবার আছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগ হ'তে শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনে একমাত্র প্রভাবশীল আদর্শ বোধ করি রবীন্দ্র-সাহিত্য। এই সাহিত্যের আব্‌হাওয়াতেই বর্ত্তমান আদর্শপ্রবণ বাঙ্গালীর মন-প্রাণ গড়ে উঠেছে। কিন্তু মানুষ মনুষ্যত্বের আদর্শ রক্ত-মাংসের মানুষের মধ্যেই চায়, এই সাধারণ নিয়ম। 'বুদ্ধ'কে পেলে তবে তারা 'জাতক' কি 'অজন্তা'র রস-সৃষ্টি উপলব্ধি করে। লেনিনের মধ্যে দিয়ে তারা 'ক্যাপিটাল'এর অর্থ বোঝে। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি হিসাবে কোন আদর্শের সন্ধান পায়নি। কোন সাহিত্যিক আদর্শে মানুষের জাতি হিসাবে চলেও না ব'লেই মনে হয়। তা ছাড়া ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথে আর লেখক রবীন্দ্রনাথে অসামঞ্জস্য ক্রমাগত সত্যানুসন্ধিৎসু বাঙ্গালীকে পীড়িতও করেছে। 'শান্তি-নিকেতন' কি 'বিশ্বভারতী'কে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের সামান্য মাত্র পরিহাস হিসাবে ছাড় বাঙ্গালী দেখবার চেষ্টা ক'রেও দেখতে পারেনি। সুতরাং সাহিত্যের আদর্শে আর জীবনের আদর্শের মাঝখানে আমরা বর্ত্তমান বাঙ্গালীকে দ্বিধাবিভক্ত দেখি। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আইডিয়ালিষ্ট বাঙ্গালীর এই দ্বিধা চরমে দাঁড়িয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর দিকে চেয়ে রবীন্দ্রনাথকে সে এ সময়ে সন্দেহের চোখে দেখেছে। তাকে ক্রমাগত এ সময়ে চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে গুর্জ্জরের পানে চেয়ে দেখতে হ'য়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে আদর্শের যে সন্ধান সে পেয়েছে, সে আদর্শ কি গুর্জ্জরে নীড় বাঁধল, এ প্রশ্ন তখন তার দিনের পর দিন মনে এসেছে। কিন্তু অতি মাত্রায় প্রাদেশিকতা-দোষ-দুষ্ট হওয়ার দরুণ বারেবারেই গুর্জ্জরের দিক হ'তে তার সে-দৃষ্টি বাঙ্গালী ফিরিয়ে এনেছে।

এই প্রাদেশিকতা বাংলার একদিকে যেমন পরম আশীর্ব্বাদ, অপর দিকে তেমনি তার চরম অভিশাপ। ফলে দেখা যায়, কোন দিন ভারতের অন্য প্রদেশের প্রভাব বাংলাকে পেয়ে বসেনি। পক্ষান্তরে দক্ষিণ ভারতে বিবেকানন্দের প্রভাব একটা লক্ষ্য করবার বস্তু। মাইলাপুরের 'রামকৃষ্ণ ষ্টুডেন্টস্ হোম'এর জনপ্রিয়তা তার অন্যতম নিদর্শন। অথচ স্বামী রামতীর্থের নাম ক'জন বাঙ্গালী জানে? অবাঙ্গালীর প্রভাব বাংলার বাজারের বাইরে এতটুকু যায়নি। এই প্রাদেশিকতার জন্যই মহাত্মাজীকে বাংলা নিতান্ত আপনার ব'লে কোন দিন ধ'রে উঠ্‌তে পারেনি। মাঝে মাঝে মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে বাংলা স্পষ্ট অভিযোগ এনেছে। কিছু দিনের জন্য যে বাঙ্গালী অসহযোগ আন্দোলনে একেবারে গা ভাসিয়েছিল, তার কারণ চিত্তরঞ্জনের মধ্যস্থতা। ভেবে দেখ্‌তে গেলে দেখ্‌বো চিত্তরঞ্জনের আন্দোলন মহাত্মাজীকে কষ্টে গলাধঃকরণ করতে হয়েছিল। চিত্তরঞ্জনের তিরোধানের পর বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্র যে কলহ-বিবাদে কদর্য্য হ'য়ে ওঠে তার মূলেও এই প্রাদেশিকতারই প্রেরণা ছিল।

রাজনৈতিক বাঙ্গালী যখন এম্‌নি প্রাদেশিকতাগ্রস্ত তখন আর এক দিকে বাঙ্গালীর মনে তার অলক্ষিতেই পাশ্চাত্যের প্রভাব ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে—স্কুল আর কলেজে সে ব্যাপ্তির বীজ ছড়ানো বহুদিন থেকেই সুরু হয়েছিল। বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাসে পাশ্চাত্যের অভিযানের একাধিক নজীর আছে। বারে বারে কোনও যুগ-প্রবর্ত্তক বাঙ্গালীকে এসে পাশ্চাত্যের এই অভিযানের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করতে হয়েছে। আদর্শপ্রবণ হ'লেও বাঙ্গালী স্ববিশ্লেষক, তাই পশ্চিমের মোহ তাকে সম্পূর্ণ আবিষ্ট কোনবারই করতে পারেনি। আবেশের অঞ্জন চোখে পরতেই তার সম্মুখে প্রখর সূর্য্যালোকে স্বকীয়ত্ব দ্বিগুণ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। এবং স্বহস্তে সে-অঞ্জন সে নিজেই মুছে ফেলেছে।

আজকের বাঙ্গালীর ছেলে-মেয়ের চোখে দেখি সে অঞ্জন কালো হয়ে ফুটে উঠেছে। আমি অন্যত্র 'ইংরাজী-য়ানার ক্রমপরিবর্ত্তন' শীর্ষে লিখিছিলাম—'ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আমলে দেশে স্পর্দ্ধার সহিত বিলাতীয়ানার মহড়া চলিয়াছিল। মাইকেলের জীবনচরিত ইত্যাদি পড়িলে ইহার রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। প্যাণ্ট কোট হ্যাট নেকটাই পরিয়াই সে সময়ের ইংরাজীনবিশেরা ক্ষান্ত হইতেন না,

বিসদৃশ ও উৎকট সাহেবীয়ানার যাহা কিছু লক্ষণ, মদ্যপান ও নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ হইতে সুরু করিয়া আরও অনেক কিছুই তাঁহারা গর্ব্বের সহিত অভ্যাস করিতেন। কিন্তু তবু সে সাহেবীয়ানা তাঁহাদের বাহিরের খোলসকেই শুধু বদলাইতে পারিয়াছিল, ভিতরে ভিতরে তাঁহারা ছিলেন খাঁটি দেশীয়। মাইকেলের কবিতা পড়িলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আজ কিন্তু যে সাহেবীয়ানার প্রচলন দেশে দেখা দিয়াছে তাহা স্বতন্ত্র। আজ বাহিরের সাহেবীয়ানা হয়তো বর্জ্জিত হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক যুবক আজ ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শকে মনেপ্রাণে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে।"

এর কারণ কি? আদর্শপ্রবণ জাতির আদর্শ সন্ধানকেই এর কারণ ব'লে আমার মনে হয়। কোন বৃহৎ আদর্শের আশ্রয় ছাড়া বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণতার বাঁচা কঠিন—বাঙ্গালী বুঝতে চায় যে শুধু আহার-নিদ্রা ছাড়াও তার জীবনের আর কোন কৈফিয়ৎ আছে। সে কৈফিয়ৎ কি একথা যখনই তার মনে এসেছে, তখনই সে নিজেকে অপরাধী ভেবেছে। ততক্ষণ ওদিকে চলেছে পশ্চিমের ক্রিয়া—হয় অলক্ষ্যে নয় লক্ষ্যের বস্তু ক'রে। শতাব্দীরও অধিক কাল বাংলাকে তথা ভারতবর্ষকে নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা চলেছে এবং বিদেশী আদর্শকে, যাকে গত যুগের বাঙ্গালীরা 'ফেরঙ্গবাদ' ব'লে অভিহিত করেছেন—ভারতবাসীর সম্মুখে লোভনীয়রূপে সজ্জিত ক'রে তোলা হয়েছে। সাহিত্যে, শিল্পে সে ক্রমাগত বিদেশী আদর্শের সংক্রামণ সহ্য করেছে। অত্যন্ত সবল-গঠন দেহও ক্রমাগত কোন ব্যাধির বীজাণুর প্রতিরোধে সক্ষম হয় না। সুতরাং ধীরে ধীরে ভারতবাসীর মনে পাশ্চাত্যের আদর্শ ক্রিয়াশীল হ'য়েছে। বিশেষ ক'রে বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে এ আদর্শ দ্রুত কার্য্যকরী হয়েছে। কেননা ভারতবর্ষের আর সমস্ত প্রদেশের চাইতে বাংলা বেশী ভাবপ্রবণ। কিন্তু আমি এর আগেই বলেছি যে এই ভাবপ্রবণতার সঙ্গে ফল্গু-ধারার মতো বাঙ্গালীর মনে একটি স্ব-বিশ্লেষণও প্রবাহিত দেখতে পাই। সুতরাং পাশ্চাত্যের কাছে যত সে আত্মবিক্রয় করেছে, ততই নিজেকে সে বিচার করেছে।

বাঙ্গালীর এই মনোবিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'তে অমর হ'য়ে আছে। ঘড়ীর পেণ্ডুলামের মতো 'বিমলা' সন্দীপ (ইউরোপ) আর নিখিলেশের (প্রাচীন ভারত) মধ্যে কেবলই বিচলিত হ'চ্ছে। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 'ঘরে-বাইরে'কে এই দিক হ'তেই দেখেছিলেন। অবশেষে বিমলাকে নিখিলেশের কাছেই রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়ে এনেছেন। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যের key-note, কুঞ্চিকাই এইখানে। তাঁর সাহিত্যের রসসঞ্চয় হ'তে আমরা যখনই চোখ ফেরাই অর্থাৎ যখনই তিনি নিছক স্রষ্টার আসন হ'তে নেমে এসে প্রচারকার্য্যে নেমেছেন, তখনই দেখি ছোটবড়ো সমস্ত লেখাতে তাঁর প্রতিপাদ্য এই 'তপোবনের বাণী'। বারে বারে তিনি ব'লেছেন—'হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি ত্যজিতে মুকুটদণ্ড'—'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' চিত্তকে জাগাবার জন্য কত প্রার্থনা তিনি জানিয়েছেন,—পশ্চিম তাঁর মধ্যে এই প্রাচীন ভারতের আদর্শকেই বরমাল্য দিয়াছে। আজীবন এই এক সুরের তিনি সাধনা করে এসেছেন। যে সুরকে শাদা বাংলায় বলা যায়,—নিজস্ব সাধনা ছাড়া ভারতবর্ষের 'নান্য পন্থা'। অথচ স্বীকার করতেই হবে বাঙ্গালীকে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবান্বিত করতে পারেন নি। আর সব চাইতে মজার কথা এই যে, যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে তেমন ভাবে পরিচিত নন, তাঁরা বরাবর মনে করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেম শুধু পশ্চিমের প্রতি অযথা অনুরাগেরই এক প্রকার প্রকাশ। কেন, ইতিপূর্ব্বে তার ইঙ্গিত দিয়েছি। মনে হয় লেখক রবীন্দ্রনাথ হ'তে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের স্তরে নেমে এসে রবীন্দ্রনাথও নিজেকে নিয়ে নিজে সাধারণ বাঙ্গালীর মতোই দ্বন্দ্ব ও দ্বিধার বালুবেলায় উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। একদিন তিনি 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম', 'স্বাধিকার-প্রমত্ত', 'ছোট বড়ো' রচনা ক'রে সাধারণের সম্মুখে পাঠ করেছেন, পরদিন তিনি বাঙ্গালোরে গিয়ে জানিয়েছেন, রাজনীতির আলোচনা তাঁর নয়। বারে বারে দেখি, তিনি মহাত্মাজীর কার্য্য-পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। কোথায় তাঁর বিঁধেছিল কে জানে। কিন্তু সে সমালোচনা শেষে তাঁকে থামাতে হয়েছিল।

এমনি থেমেই তিনি ছিলেন। দণ্ডীর সমুদ্রোপকূলের 'লবণ-অভিযান'এর দিনও তিনি নীরব ছিলেন। কিন্তু এই নীরবতা তাঁর এতদিনে ভেঙ্গেছে। মহাত্মাজীর অনশন-ব্রত নিয়ে বিশে এবং একুশে সেপ্টেম্বর তিনি শান্তি-নিকেতনে যে

বক্তৃতা দিয়েছিলেন,—মাহাত্ম্যের দ্বারা মহত্ত্বের এমন নিবিড় অনুভব বুঝি সাহিত্যে আর নেই। তবু বক্তৃতা দিয়েও তিনি ক্ষান্ত হননি। তারপর তিনি যারবেদায় ছুটেছেন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি 'ভারত-মিলন সমিতি'র কার্ডিদের চিঠির যে উত্তর দিয়েছেন, তাতে তাঁর মানসিক অবস্থার বর্ত্তমান ক্রম পরিস্ফুট হয়েছে।

মহাত্মাজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই কারাগারে আলিঙ্গনকে মাত্র সাংবাদিকের দৃষ্টিতে দেখলে ভুল করা হবে। দুটি পরস্পর প্রতিযোগী শক্তির মিলন হিসেবে একে দেখলে বুঝবো যে এই মিলন বাংলার জাতীয় জীবনে পথনির্দ্দেশক হ'য়ে চিরকাল দণ্ডায়মান থাকবে। কেননা এ শুধু একটি মাত্র তপস্বীর সঙ্গে একটি মাত্র কবির কিংবা একজন ত্যাগবাদীর সঙ্গে একজন সৌন্দর্য্যবাদীর মিলন নয়। ত্যাগবাদের সঙ্গে সৌন্দর্য্যবাদের এ সম্পূর্ণ আত্ম-বিনিময়। এত দিন পর্য্যন্ত আমরা বাঙ্গালীকে শুধুই যে ভাবপ্রবণ আর সৌন্দর্য্য-পূজারী ব'লে তার কার্য্যে অনিচ্ছা, অবসাদ আর আলস্যের মার্জ্জনা খুঁজে এসেছি—ভেবে দেখলে বুঝবো, এই মিলনে সেই মার্জ্জনার চিতাশয্যা রচিত হ'লো। বাংলার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ভাবাবেশ ব'লে বহুদিন বাঙ্গালী নিজেকে যে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, সে প্রশয়ের ভিত্তিতে এবার তার ঘা লাগলো। এ আঘাতের ফল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সমাজ-বিজ্ঞান-পাঠকের দৃষ্টিতে তা এর মধ্যে নিশ্চয়ই ধরা পড়েছে।

আমার বিশ্বাস, বাংলার জাতীয় জীবনে এই মিলনের ক্ষণ ভবিষ্যতের সঙ্কেত হ'য়ে থাকল এবং ব্যষ্টি-মনের অবচেতনার মতো সমষ্টি-মনেরও যে অবচেতনা আছে, বাংলার মনের সেই অবচেতনায় এই মিলন বহুদিনের ইতিহাসের প্রথম সূচনা হিসাবে জমা রইল। পশ্চিমের আদর্শে বিভ্রান্ত, আধুনিক বাঙ্গালীর স্বকীয় বিশ্লেষণের ফলে ইতিমধ্যেই তার মনে যে প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে, তার ফলের সঙ্গে ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীর এই অবচেতনা-সঞ্চিত মনোভাবের মিলন যখন ঘটবে, তখন যে ব্যাপার দাঁড়াবে তাতে আজকের বাঙ্গালীর এই ভাববিলাস আর পাশ্চাত্যবিলাসের এতটুকুও আর অবশিষ্ট থাকবে বলে মনে হয় না। কেননা নিজের পথের সন্ধান পেলে কোন মানুষকেই ঠেকিয়ে রাখা দায়। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী সে পথের সন্ধান পায়নি বল্‌লে ঠিক বলা হবে না, কিন্তু সে পথে চল্‌বার প্রেরণা তার নিজের মনের মধ্যে থেকে স্বতোৎসারিত ভাবে আসার পথে সে বাধাও পেয়েছে বিস্তর। ব্যক্তিবিশেষের ইঙ্গিত অনুযায়ী এ পথে সে তখন চল্‌বার জন্য পা এগিয়েছে মাত্র। জাতি হিসাবে এ পথে চল্‌বার প্রেরণার দিন তার ভবিষ্যতে আসছে—যে-পথে রবীন্দ্র-সাহিত্য আর মহাত্মা গান্ধীর জীবন এক হয়ে মিশেছে। যেখানে কল্পনা কর্ম্মকে বিস্তৃত করেছে আর কর্ম্ম কল্পনাকে সজ্জত ও সংযত করেছে, যেখানে ভাববিলাসের স্বপ্নসৌধের ভিত্তি কঠিন মৃত্তিকার উপর গড়া হয়েছে—ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীর সে-পথ চিনে নিতে বিলম্ব হবে না।

ভারতে জাতীয় আন্দোলন

বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য

(তৃতীয় পরিচ্ছেদ- পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

এ দেশে সংবাদপত্র প্রকাশ ইংরাজের শাসনের পর। সংবাদপত্র য়ুরোপে বিশেষ সমাদৃত ছিল এবং রাজনীতির আন্দোলনে তাহার অসাধারণ প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত সংবাদপত্রের যে আদর্শ ছিল, তাহাতে তাহা অর্থার্জ্জনের উপায় ছিল না। সংবাদপত্র-পরিচালন তখনও বণিকের ব্যবসায়ে পরিণত হয় নাই। তখন পর্য্যন্ত ইহা প্রকৃত সংবাদ প্রদান করিত অর্থাৎ কোন পক্ষের জন্য প্রয়োজনানুসারে রঞ্জিত করিয়া সংবাদ প্রকাশ করিত না এবং যাহা জনগণের ও সরকারের পক্ষে কল্যাণজনক বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই মত প্রকাশদ্বারা লোককে শিক্ষা দিত। ইহাতে দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইত এবং সত্যের প্রতি ইহার শ্রদ্ধাও সপ্রকাশ থাকিত। তখনও সংবাদপত্র কেবল লোককে উত্তেজনার উপকরণ প্রদান করিতে ব্যবসায় মাত্র হয় নাই।

সেই আদর্শ লইয়াই এ দেশে ইংরাজ প্রথম সংবাদপত্র প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু এই উষ্ণপ্রধান বিজিত দেশে যেমন ইংরাজ স্বদেশের অনেক উচ্চ আদর্শ ত্যাগ করিয়াছিলেন—তেমনই সংবাদপত্র সম্বন্ধেও স্বদেশের আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখিতে পারেন নাই। সে সময়ের সংবাদপত্রে এক দিকে তোষামোদ, অপর দিকে বিদ্বেষবিষোদ্গার লক্ষিত হইত। তাহার ক্রমপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না :—

"Scurrility and servility, indeed, long seemed the only two notes known to Calcutta journalism. Who could have foreseen that the cat-callings of bugle-boys, practising their prentice windpipes in some out-of-the-way angle of the ramparts, were destined to grow into clear trumpet notes, which should arouse sleeping camps to great constitutional struggles, and sound the charge of political parties in battle?"

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম বোল্টস নামক এক ব্যক্তি কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করা হয়। সেই বৎসরই জেম্‌স্ হিকী 'বেঙ্গল গেজেট' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্র লোককে আক্রমণ করায় ডাকঘরে ইহা প্রেরণার্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। ওয়ারেণ হেষ্টিংস মামলার পর মামলায় হিকীকে বিপন্ন করায় 'বেঙ্গল গেজেট' উঠিয়া যায়। ইহার পর 'বেঙ্গল জার্ণাল'এর সম্পাদক উইলিয়ম ডুয়েনকে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পত্রে প্রকাশিত কোন মন্তব্যের জন্য নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লীর সরকার সংবাদপত্র সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা করেন এবং ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংসের সরকার নিয়ম করেন, প্রকাশের পূর্ব্বে সংবাদপত্রের সব রচনা সরকারের কাছে পাঠাইয়া মঞ্জুরী লইতে হইবে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা জার্ণাল' সরকারের বিরাগভাজন হইলে ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সম্পাদককে ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করা হয়। এই সম্পাদকের নাম—জেম্‌স্ সিল্ক বাকিংহাম। ইঁহার বিতাড়ন বিষয় তখন পার্লামেণ্টে বিশেষরূপ আলোচিত হইয়াছিল। সিল্ক বাকিংহামের প্রতি এইরূপ আদেশ-প্রচারের পর সরকার এ দেশে সংবাদপত্রের প্রকাশ-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করিবার জন্য এক নিয়ম রচনা করিয়া তাহা বিধিবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সুপ্রিম কোর্টে পেশ করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে এই নিয়ম আদালতে পেশ হইলে ১৭ই তারিখে কয় জন

বাঙ্গালী এই নিয়মে আপত্তি জানাইয়া আদালতে আবেদন করেন। তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

চন্দ্রকুমার ঠাকুর। দ্বারকানাথ ঠাকুর।
রামমোহন রায়। হরচন্দ্র ঘোষ।
গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

এই আবেদনে লিখিত হয়, এ দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাবধি বাঙ্গালা ভাষায় বহু রচনা প্রকাশের ফলে দেশের লোক উপকৃত হইয়াছে এবং প্রধানতঃ ৪ খানি সংবাদপত্রের সাহায্যে এই কায অগ্রসর হইয়াছে। পত্রচতুষ্টয়ের ২ খানি বাঙ্গালায় ও ২ খানি ফার্সিতে লিখিত হইত। আবেদনকারীরা বলেন, এই পত্রচতুষ্টয়ের কার্য্যকালে তাঁহারা আশা করিতেছিলেন, মফঃস্বলেও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে; কিন্তু একান্ত পরিতাপের বিষয়, সপার্ষদ বড়লাট যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন, তাহাতে সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে বিষম বাধা স্থাপিত হইল।

এই আবেদন-পত্রের একাংশ এইরূপ :—

"ন্যায়পরায়ণ শাসকের পক্ষে আরও একটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা সঙ্গত। এই নিয়মের ফলে এই বিশাল দেশে নানাস্থানে রাজকর্ম্মচারীরা কোন অনাচার বা অবিচার করিলে ভারতবাসীরা তাহা শীঘ্র শীঘ্র সরকারকে জানাইতে পারিবেন না এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই দূর ভাগের অধিবাসীরা বিলাতে রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিগণকে তাঁহাদিগের প্রকৃত অবস্থার ও সরকারের নিকট তাঁহারা কিরূপ ব্যবহার লাভ করিতেছেন তাহার বিষয়ও জানাইতে পারিবেন না। কারণ, ইতঃপূর্ব্বে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত রচনার যে সব অনুবাদ ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া বিলাতে যাইত সে সব আর প্রকাশিত হইবে না এবং ভারতবাসীরা ইংরাজীতে যে সব রচনা প্রকাশের কল্পনা করিতেছিলেন সে সব রচনাও আর প্রকাশিত হইবে না।

"বৃটিশ শাসন স্থাপনাবধি তাঁহারা যে অধিকার সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, সহসা সেই মূল্যবান অধিকারে বঞ্চিত হইলে কলিকাতাবাসীরা আর ইহা মনে করিয়া গর্ব্বানুভব করিতে পারিবেন না যে, বিধাতা তাঁহাদিগকে বৃটিশ জাতির রক্ষাধীন করিয়াছেন অথবা ইংলণ্ডের রাজা ও পার্লামেন্টই তাঁহাদিগের জন্য আইন প্রণয়ন করেন এবং বিলাতের অধিবাসীরা যে সব অধিকার সম্ভোগ করেন, তাঁহারাও সেই সকল অধিকারের অধিকারী।"

ইহা হইতেই উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ শত বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে এবং এ দেশে বৃটিশ শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর অর্দ্ধশতাব্দীর কিঞ্চিদধিক মধ্যেই বাঙ্গালার অধিবাসীরা মতপ্রকাশ-স্বাধীনতার আদর করিতে শিখিয়াছিলেন। তখনই সংবাদপত্র প্রচার আরম্ভ হইয়াছে এবং তাঁহারা মনে এই আশা পোষণ করিতেন যে, তাঁহাদিগের অভাব ও অভিযোগ বিলাতে পার্লামেন্টের গোচর করিতে পারিলে প্রতিকার পাওয়া যাইবে। বার্ক প্রমুখ বিলাতের দূরদর্শী রাজনীতিকরা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে যেরূপ অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়া বিচারপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের মনে এই আশা স্থান লাভ করিয়াছিল কি না আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহারা যে মতপ্রকাশ-স্বাধীনতার আদর করিতেন, তাহা চন্দ্রকুমার ঠাকুর প্রমুখ কয় জন বাঙ্গালীর এই আবেদনেই প্রতিপন্ন হয়।

আরও একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিতে হয়। এই আবেদন লিখিত হইয়াছিল—বিলাতের অধিবাসীরা যে সব অধিকার সম্ভোগ করে, কলিকাতার অধিবাসীরা সেই অধিকারে অধিকারী মনে করিয়া গর্ব্বানুভব করেন। ইহার বহুদিন পরে যখন এ দেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও ভারতবাসীরা এই অধিকার এমনভাবে দাবি করেন নাই এবং চন্দ্রকুমার ঠাকুর প্রভৃতি ছয় জন বাঙ্গালীর এই উক্তির প্রায় শতবর্ষ পরে কংগ্রেস সুস্পষ্টরূপে বলেন—বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের প্রজারা যে সকল অধিকার সম্ভোগ করেন, সেই সকল অধিকার-লাভই ভারতবাসীর কাম্য এবং স্বরাজ বলিলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন বুঝায়।

এই আবেদন সম্বন্ধীয় ঘটনার বিষয় আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, এই সময় হইতেই এ দেশে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং বঙ্গদেশেই তাহার উদ্ভব। কারণ, এই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া রায় দিবার সময় বিচারক সার ফ্র্যান্সিস ম্যাকনাটেন বলেন—যাঁহারা সরকারের নূতন নিয়মের বিরুদ্ধে আবেদন উপস্থাপিত করিতেছেন, তাঁহারা এক ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা কিরূপে মনে করিতেছেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ? যদি এ দেশে

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহাতে তিনি কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিবেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে সে স্বাধীনতা প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি আপত্তি উত্থাপিত করিয়া গিয়াছেন এবং সার উইলিয়ম জোন্স তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত করা সঙ্গত নহে; যদি ইংরাজ বলপূর্ব্বক তাহা করেন, তবে তাহাতে ভারতবাসীর নিষ্ঠুর স্বৈরশাসনাধীনের মতই দুঃখভোগ ঘটিবে। যে দেশে শাসন-পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট নাই সে দেশে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্ভব নহে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক দিকে যেমন বাঙ্গালীরা এ দেশে বিলাতের প্রজাদিগের সকল অধিকার সম্ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনই ইংরাজ শাসক ও বিচারকগণ মনে করিতেন—এ দেশ পরাধীন, সুতরাং এ দেশে স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করা যায় না এবং স্বাধীন দেশের লোকের অধিকার প্রদান করা সম্ভব নহে।

এইরূপে বিচারক সার ফ্রান্সিস ভারতবাসীকে বুঝাইয়া দেন, ভারতবাসীরা বিজিত জাতি, সুতরাং তাহারা যদি স্বাধীন ইংলণ্ডের লোকের তুল্যাধিকার লাভ করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহারা প্রাংশুলভ্য ফললোভে উদ্বাহু বামনের মতই হাস্যাস্পদ হইবে। ইহাতে যে বাঙ্গালীর ও ভারতবাসীর আত্মসম্মানজ্ঞান আঘাত পাইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু সার ফ্রান্সিস যাহাই কেন বলুন না, ইহার পর হইতে ক্রমে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হ্রাস হয়। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংকের শাসনকালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রায় অক্ষুণ্ন ছিল। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক বিদায় লইয়া যাইবার পর সার চার্লস মেটকাফ ভারতের বড়লাট হয়েন। তখন লর্ড মেকলে ব্যবস্থা-সচিব। সার চার্লস মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। তিনি শাসনভার পাইয়া মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনতা প্রদানের জন্য আইন রচনা করিতে উপদেশ দেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে মেকলে তাঁহার আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করেন। পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মেকলে যে মতপ্রকাশক মন্তব্য প্রদান করেন, তাহাতে তিনি লিখেন :—

"ইহা স্বীকৃত যে, স্বাধীনতাই সাধারণ নিয়ম হইবে—তাহাতে বাধা প্রদান (নিয়মের ব্যতিক্রম) অস্থায়ী ব্যবস্থা হইবে।"

সার চার্লস মেটকাফ এই প্রসঙ্গে লিখেন :—

(১) রাজ্য নিরাপদ রাখিয়া যদি মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীন করা যায়, তবে তাহা স্বাধীন করাই কর্ত্তব্য। আমি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার দ্বারা সরকারের কোন বিপদের আশঙ্কা করি না। যদি সেরূপ কোন বিপদ ঘটে, তবে ব্যবস্থাপক সভা তাহার প্রতিকার করিতে পারেন।

(২) মুদ্রাযন্ত্র প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতাই সম্ভোগ করিতেছে। তাহার বিরুদ্ধ ব্যবস্থা ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় সরকারের নাই। অথচ মুদ্রাযন্ত্রকে আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিয়াছি—এই দুর্নাম আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়।

সার চার্লস মেটকাফ এ বিষয়ে মাউণ্ট ষ্টুয়ার্ট এলফিন-ষ্টোনের মত পুরাতন রাজকর্ম্মচারীর আপত্তিও অগ্রাহ্য করিয়া সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

যে সময় চন্দ্রকুমার প্রমুখ ছয় জন বাঙ্গালী সরকারের নিয়মের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন, তখন সে কায কিরূপ দুঃসাহসের পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তাহা ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুরের এক বক্তৃতা হইতে বুঝিতে পারা যায়। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টাররা এ দেশে সভানিষেধের জন্যও আদেশ প্রচার করেন। তাহার বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে আবেদন করিবার প্রস্তাব সমর্থন-কালে এক সভায় দ্বারকানাথ বলেন, যখন তিনি, তাঁহার ৩ জন স্বজন ও রামমোহন রায়ের সহযোগে ঐ আবেদন পেশ করেন, তখন তিনি কোন য়ুরোপীয়কে ঐ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দিতে বলেন নাই; কারণ, তাহা করিলে সরকার স্বাক্ষরকারী য়ুরোপীয়কে নির্ব্বাসিত করিতে পারিতেন। ভারতবাসীদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা না থাকিলেও ভারতবাসীরা ভয়ে উহাতে স্বাক্ষর করিতে বিরত ছিলেন—হয়ত তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, ঐ কার্য্যের জন্য তাঁহাদের পরদিন প্রাণদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

সার চার্লস মেটকাফ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিলে (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে) কলিকাতার টাউন হলে যে সভা হয়, তাহাতে দ্বারকানাথ বলেন, তিনি (লোকমতের)

এই জয়লাভে বিশেষ আনন্দিত, তিনি এই সংগ্রামে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া সভায় উপস্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করিতেছেন।

এই প্রস্তাবানুসারে ২০শে জুন তারিখে সার চার্লসকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়। দ্বারকানাথ অভিনন্দন-পত্র প্রদানকারীদিগের অন্যতম ছিলেন। উত্তরে সার চার্লস বলিয়াছিলেন :—

"এক কালে ভারতে সকল সম্প্রদায়ের পক্ষেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অসহনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। সে সময় আর নাই। এখন অনেকে মনে করেন, এ দেশে য়ুরোপীয়দিগকে সে স্বাধীনতা প্রদান করিলে কোন অপকার হইবে না, পরন্তু উপকার হইতে পারে; কিন্তু তাঁহারা মনে করেন, ভারত-বাসীরা এই অধিকার লাভ করিলে অপকার হইতে পারে। আমি তাহা মনে করি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতীয় প্রজাদিগের প্রতি অবিশ্বাসব্যঞ্জক কোন আইন করিলে অথবা অধিকার ও স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে ভারতীয়দিগের জন্য একরূপ ও য়ুরোপীয়দিগের জন্য অন্যরূপ আইন করিলে, তাহা অন্যায় হইবে—তাহা সমর্থনযোগ্য নহে।"

বাঙ্গালার লোক এই স্বাধীনতায় এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইহার স্মারক উৎসবে ভোজ হয়। কৃতজ্ঞ ভারতবাসীরা সার চার্লস মেট্‌কাফকে অভিনন্দিত করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই; পরন্তু তাঁহার নামে একটি বৃহৎ গৃহ রচনা করিয়া তাহা কলিকাতার জনসাধারণের জন্য পুস্তকাগারে পারণত করেন। গঙ্গার কূলে এই বৃহৎ সৌধ (মেটকাফ হল) তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। লর্ড কার্জ্জন বড়লাট হইয়া যখন কলিকাতার ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী সাধারণ পাঠাগারে পরিণত করেন, তখন সরকারের লাইব্রেরী এই লাইব্রেরীর সহিত মিলিত করা হয়। তাহার পর পুস্তক-সংগ্রহ অন্যত্র—সরকারের গৃহে, স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং সাধারণের অর্থে নির্ম্মিত ও বিশেষ কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট মেট্‌কাফ হল আজ সরকারের অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। আমরা যে প্রতিবাদের শৈথিল্যহেতু অনেক অধিকার হারাইয়াছি, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ। এখন অনেকে জানেন না, কলিকাতার উত্তরাংশে গঙ্গার তীরভূমি কলিকাতার অধিবাসীরা সরকারকে এই সর্ত্তে প্রদান করেন যে, তাহাতে নৌকা আসিয়া ঘাটে ভিড়িবে এবং কলিকাতাবাসীরা গঙ্গাস্নানের ও গঙ্গাদর্শনের সুযোগ লাভ করিবেন। প্রথমে যখন এই ভূমি সরকারের কাজে ব্যবহারের প্রস্তাব হয়, তখনও বড়লাট লর্ড ডালহৌসী কলিকাতাবাসীর এই অধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহার পর আজ পোর্ট-কমিশনারদিগের গুদাম কলিকাতাবাসীকে সেই অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গ-তরুণী

—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বঙ্গ-তরুণি, বন্দনা লহ মোর,
তব দেহমন-নন্দন-তল আনন্দে আছে ভোর।
ধাতার করুণা বিকশি' উঠিল তনুর তনিমা' পরে,
তব পয়োধর-কুম্ভ হইতে জননীর সুধা ঝরে।
থমকি' থমকি' চমকি' হরষে অঙ্গনে ফিরো শ্যামা,
চঞ্চল শিশু উরু ঘিরে তোরে চুম্বিয়া ডাকে, মা-মা!
দুরু দুরু বুকে স্নেহের উৎস উথলিয়া ওঠে তোর,
সন্তানে তুমি বাঁধ গো অমনি দিয়া রে বক্ষ-ডোর!
চঞ্চল তোর অঞ্চলে লাগে দোল্,
সুন্দরি, তব কোলে বাঁধা শিশু-গোপালের হিন্দোল

বঙ্গ-প্রাণের এ যে রমণীয় ছবি,
আদিম মাতার ছন্দ-প্রতিমা বন্দিছে তোরে কবি।
পল্লী নগরে ঘরে ঘরে তুমি রূপে রূপে হ'লে আঁকা,
ধরম-করম-নর্ম্ম ক্ষেত্র তোমারি সুবাস মাখা।
জন্মভূমির রঙ্গভূমি গো আনন্দে তব দুলে,
জীবন-সমর-প্রাঙ্গন তুমি ভরে দাও ফুলে ফুলে।
কাঙ্গাল জাতিরে করিলে ধন্য সেবার ধর্ম্ম নিয়া,
কর্ম্ম হইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে আছ তুমি মণ্ডিয়া।
তপ্ত ঊষর-মরুর পান্থবারি,
যৌবন-বন-রঙ্গিনী অয়ি বঙ্গেরি বরনারি!

মাতৃ-মূরতি আনন্দ-রতি-রমা,
তোমার কুঞ্জে নাচে ভুবনের সুন্দরী নিরুপমা।
উষার ছন্দে ছন্দিতা বামা লাবণি ভরা সে প্রাণে,
বাংলার বাটে শোভার কবাট্ খুলে দিলি আঘ্রাণে।
যুবকের প্রেম-নন্দিত হিয়া দানে দানে ভরা তোর,
মৃত্যুঞ্জয়ী সঙ্গীতে তুমি বেঁধে দিলে প্রাণ-ডোর।
তালীঘনতল-কালোদীঘিজল-হৃদি-তল আলো করি,'
বঙ্গবিপিনে স্বপ্নের ফুল পড়িয়াছ ঝরি' ঝরি'।
বিশ্বনারীর বন্দিতা কল্যাণি,
বঙ্গহৃদয়-পল্লী-কমলে দাঁড়ালে গন্ধ দানি'।

সন্ধ্যায় তব তুলসী-মঞ্চ-তলে,
দীপের আলোকে হেরিনু তোমার দেবীর মূর্ত্তি জ্বলে।
নিশীথে হেরিনু নাথের চরণে বন্দন-সেবারতা,
পতির পূজাতে হও দশভূজা হে নারী পতিব্রতা।
ভবনে ভবনে অন্নপূর্ণা বিলাও অন্নহাতে,
জননী-ভগিনী-সঙ্গিনী হ'য়ে ফির নিতি সাথে সাথে।
শিশু-সন্তানে হেরি যবে দেবী স্তনধারা ঢালা তোর,
বন্দিতে তোরে নেচে উঠে প্রাণ কেঁদে ওঠে গান মোর।
যৌবন-বন-নন্দন-রূপ-রাণি,
বঙ্গ-তরুণি বন্দি তোমায় জীবন ধন্য মানি।
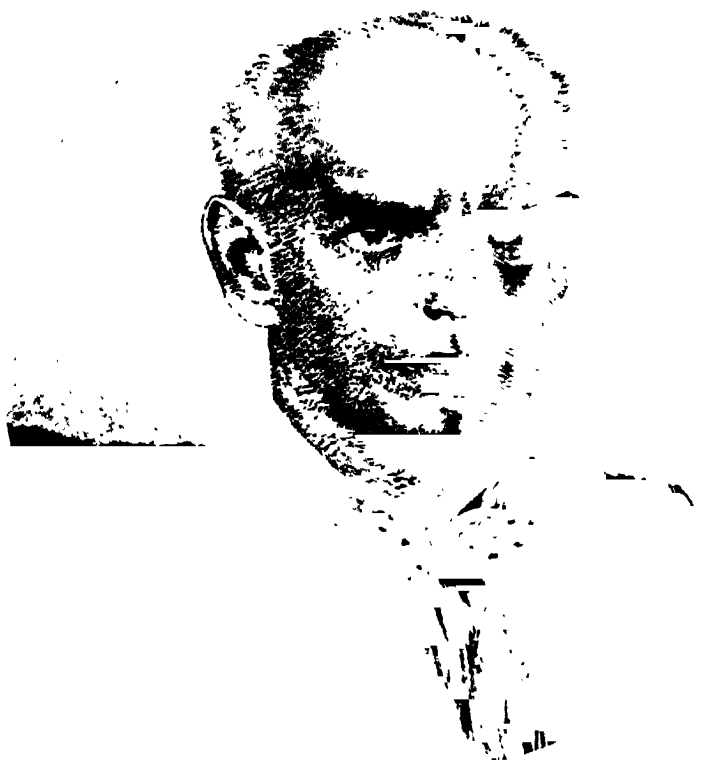
অন্তরাল

প্রকাণ্ড কাচের জানালা গুলি দিয়া বাহিরের পৃথিবী দেখা যায়; নহিলে এই ঘর গুলির মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা মৃত্যুর দিকে পা বাড়াইয়া চলিতেছি।

'বেড্' এর উপর শুইয়া যে পৃথিবীকে দেখি সে আমার এত দিনের চেনা নয়; ও ধারে সারি বাঁধিয়া যে পাহাড়গুলি চলিয়া গিয়াছে তাহার পরপারে হয়ত গ্রাম আছে, হয়ত জন-সমারোহময় কোন্ সহর, এই বিছানায় পড়িয়া কিন্তু ভুল করা যায় যে জীবন-স্পন্দনময় পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি। আকাশের বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখি, বরফের উপর ফ্যাকাসে জ্যোৎস্না নামিতে দেখি, রৌদ্রলোকে কাচের মত, বরফের মত ঝক্ ঝক্ করে; কখনও সেই তুষারপিচ্ছিল পর্ব্বত-পথ ধরিয়া দুই একটী নর-নারীকে চলাচল করিতে দেখি, তবু এখানে থাকিয়া মনে করিতে যেন কষ্ট হয় যে মৃত্যুর এখনও হয়ত কিছু দেরী আছে।

সকাল বেলায় উঠিয়া আমাদের সবাইকে স্নান সারিয়া লইতে হয়, তারপর ছাগলের দুধ, সদ্য প্রস্তুত মাখন, কিছু ফল মূল গলায় পুরিয়া দেওয়া। ঘণ্টা দুই তিন কাটিবার পর রৌদ্র যদি প্রখর হইয়া ওঠে তাহা হইলে আমাদের আর এক-দফা স্নান করিতে হয়,—রৌদ্র-স্নান। অনাবৃত দেহে সারি সারি বসিয়া যাই, হাতে হয় একদিন আগেকার কোন খবরের কাগজ, কিংবা রোমাঞ্চকর একখানি করিয়া উপন্যাস। আমরা এখানে আত্ম-বিস্মৃতির সাধনা করিতে আসিয়াছি। স্নান, খাওয়া ছাড়া খেলার সমস্ত সরঞ্জামও আমাদের হাতের কাছে। টেনিস যদি খেলিতে না পারি, দিনে একবার ব্যাডমিণ্টনের ব্যাট আমাকে হাতে করিতেই হয়; বিলিয়ার্ড এবং বেস্-বলের ব্যবস্থাও আছে।

সূর্য্যালোক এখানে বাংলার বধূ, কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে মুখ হইতে আবরণ ঘুচাইবে যেটা অতি বড় মনোবিজ্ঞান-বিশারদ না হইলে বলিবার উপায় নাই। অনেক দিন—সমস্ত দিনের মধ্যে সঙ্কোচ তাহার আর কাটেই না; কিন্তু তা'র জন্য রৌদ্র-স্নান হইতে আমরা বঞ্চিত হই না; কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা আছে। আধুনিক সভ্যতা মানুষের ফুরাইয়া-যাওয়া আয়ু ফিরাইয়া দিবার জন্য যতখানি চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত করিয়াছে তার সমস্ত পরিচয় এখানে আছে; তবু এই ঝক্‌ঝকে, আলো-বাতাসময় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘরগুলির মধ্যে পড়িয়া আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি; ফুস্‌ফুসে হাওয়া যাহাতে বেশী করিয়া যায় তার জন্য প্রাণ ভরিয়া নিশ্বাস লইতেছি, কিন্তু পৃথিবীতে আজ বোধ করি আমাদের জন্য প্রচুর বাতাস নাই!

এই নিশ্চিন্ত রোগ-শয্যায় পড়িয়া মানুষের এবং মানুষের জীবন সম্বন্ধে নিরুপদ্রবে গবেষণা করা যায়, কারণ সত্যকার জীবন এখানে একরকম শেষ হইয়া গিয়াছে, কেউ হয়ত একেবারে সীমান্তে পা দিয়াছি, কেউ বা দুই চারি দিনের জন্য সময় চাহিয়া লইয়াছি। মানুষ সম্বন্ধে অত্যন্ত বড় বড় ধারণা আমার মাথায় আসিতেছে; স্বাস্থ্য-নিবাসের কামরা দখল করিয়া কল্পনা করিতেছি যে, যে দিন—যদি কোন দিন—এই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইব, সে দিন হয়ত পরিচিত মানুষ-গুলিকে আর চিনিতেই পারিব না; দেখিব সবাই এই কয়দিনে আর এক রকম হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইবার সম্ভাবনা আজ অনেক দূর।

এই ঘরগুলির নিজস্ব একটী বৈশিষ্ট্য আছে, কোথাও এতটুকু অপরিষ্কার কিছু নাই—দিনের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে তিনবার ঘরের মেঝেগুলি ধুইয়া ফেলা হইতেছে, একেবারে দেব-মন্দিরের মত পবিত্র। আসবাবপত্রের বাহুল্য নাই—এককোণে একটী করিয়া টেব্‌ল ও একটী বেতের চেয়ার। দেওয়ালের গায়ে একটী করিয়া ঘড়ি, টেব্‌লের উপর দুই একটী ওষুধের শিশি, খানকয়েক বই। কোন কোন ঘরে তাস বা ক্যারাম-বোর্ডও মিলিবে। লোহার খাট অবশ্য সব ঘরে থাকিবেই।

ঘর গুলির সামনেই মরসুমী ফুলের প্রকাণ্ড বাগান, সেই দিকে চাহিয়া থাকিলে চোখ আপনিই জুড়াইয়া আসে এবং

সেই বাগানের মধ্যে বসিয়া, সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে যখন দিগন্তের গায়ে বিলীন তুষারাবৃত পাহাড়গুলির দিকে চাহিয়া থাকি, তখন হয় নিজের সম্বন্ধে অনেক কথাই মনে পড়ে কিংবা কিছুই নিজের সম্বন্ধে ভাবিতে ভাল লাগে না।

তিন চার জনের সঙ্গে আমার আলাপ বেশ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে বলিতে পারি।

এই ফুলের বাগানে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া গল্প করিতে করিতে পরস্পরের মাধ্য আমরা আত্মীয়তার সেতু রচনা করিয়াছি। আমরা একদেশের লোক নই, কেউ ভারতবর্ষের উত্তরের, কেউ একেবারে পশ্চিমের—তবু প্রাদেশিক বৈষম্য আমরা ঘুচাইতে পারিয়াছি। আমাদের অসার কল্পনা, হাতাশার আর্ত্তনাদ—সবাই সবাইকে শুনাইয়াছি এবং এখানে মানুষের এই সংখ্যাল্পতার মধ্যে কথা বলিবার মত অনির্ব্বচনীয় কিছুই নাই। সব সময় আমরা সকলকে সহ্য করিতে পারি তাও নয়,—অন্ততঃ আমি নিজে পারি না; অনেক সময় এক একজনের উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে বিরক্তি বোধ করিতে হয়, কিন্তু সেই বিরক্তি আবার এখানকার জীবনের মস্ত একটা বৈচিত্র্য!

দেবশঙ্কর দীক্ষিতের সঙ্গে আমার আলাপ ঘনিষ্ঠ হইয়াছে সকলের আগে। দেবশঙ্কর এলাহাবাদের লোক; বয়স কতই বা হইবে?—খুব জোর পঁয়ত্রিশ কিন্তু প্রথম দিন তার মুখে সে কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কারণ দীক্ষিতের চেহারাখানি এত ছোট এবং এত ক্ষীণ যে হঠাৎ দেখিয়া তাহাকে কুড়ি-পঁচিশের বলিয়া ভুল করা একেবারেই বিচিত্র নয়।

দেবশঙ্কর যখন নিজের কথা বলিতে সুরু করে তখন আমি কেবল তাহার ক্ষীণালোক দুইটী কোটরগত চক্ষুর দিকে চাহিয়া থাকি।

দীক্ষিতের বাবা এলাহাবাদের মস্ত বড় ব্যবসাদার। ব্যবসায়ী তাঁহারা বহু পুরুষের, কিন্তু দীক্ষিতের বাবাই সেটাকে ফাঁপাইয়া, ফুলাইয়া মস্ত বড় করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁর পৃথিবীকে বুক-কিপিং'এর একটী বই বলিতে পারি, যেখানে টাকা-আনা-পাই, ডেবিট-ক্রেডিট, ট্রায়াল ব্যালান্স, ডবল এন্ট্রী, সুদের সুদ, তাহার সুদ—এ সব ছাড়া অন্য কোন কথা নাই। বহু মানুষের পৃথিবীতে আকাশ যখন শ্রাবণের মেঘসম্ভারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, দীক্ষিতের বাবা তখন রাত্রি একটা পর্য্যন্ত অফিসে বসিয়া বিভিন্ন সহরের ব্রাঞ্চের হিসাব পরীক্ষা করেন। তাঁহার জীবনে বসন্ত-শরতের পার্থক্য কোন দিন ছিল বলিয়া জানা যায় নাই এবং আজও নাই। আজ বয়স তাঁহার তিহাত্তর বৎসর, শরীরখানি মনের মতই শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। আজও তিনি ভাড়াটে টাঙ্গায় চড়িয়া সকাল আটটার সময় অফিসে যান এবং এগারটার আগে কদাচিৎ বাড়ী ফিরিয়া আসেন। বাড়ীর পাচক নিজের হাতে করিয়া আফিসে তাঁহাকে দুইবার করিয়া খাবার দিয়া আসে, নহিলে মাঝে দুই দুই বার বাড়ী আসিয়া খাইবার জন্য নষ্ট করিবার সময় তাঁহার কই! অবসর তাঁহার কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং বিলাস অপরাধ।

দেবশঙ্কর তাঁহারই ছেলে, তার গায়ের রং দেখিয়া এখনও অনুমান করা যায় যে এককালে তার দেহে একটী সুকুমার লাবণ্য ছিল। ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইতে দীক্ষিতের বাবার আপত্তি ছিল না, কিন্তু হিসাবপত্র বুঝিয়া লইবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী নয়। তাই দেবশঙ্কর যখন সবে ইউয়িং ক্রিশ্চান কলেজে ঢুকিয়া বৃহত্তর জীবনের ছবি দেখিতে সুরু করিয়াছে, ঠিক সেই সময় তাহাকে কলেজ ছাড়িয়া লক্ষ্ণৌয়ের ব্রাঞ্চে গিয়া কাজের ভার লইতে বাধ্য করিতে তার বাপের এতটুকু বাধে নাই। ক্ষীণাঙ্গী যমুনার ধারে কলেজের ক্লাশ হইতে যে অনাবৃত আকাশ দেখা যাইত, লক্ষ্ণৌয়ের হাটের কোলাহলে সে যেন কোথায় হারাইয়া গেল।

তারপর হইতে দীক্ষিত এই পনের বছর সমস্ত ভারতবর্ষটা চরিয়া বেড়াইয়াছে। আজ শিয়ালকোট, তার একসপ্তাহ পরে রাজমহেন্দ্রী; রাজমহেন্দ্রী হইতে ফিরিয়া হয়ত ভাল করিয়া তখনও নিশ্বাস লওয়া হয় নাই—যাও আজমীর। যে বিরাট অর্থগৃধ্নুতা দীক্ষিতের বাপকে পাইয়া বসিয়াছিল, উত্তরাধিকারসূত্রে নিজেও পুরামাত্রায় দীক্ষিত সেটা অনুভব করিতে লাগিল। বাবা উৎসাহ যোগাইতে লাগিলেন, আত্মীয়রা ধন্য ধন্য করিল। দীক্ষিত এণ্ড সন্সের নাম সারা উত্তর ভারতে এবং তাহারও বাহিরে ছড়াইয়া গেল। বাংলার বাহিরে যেখানেই একটী জনবহুল সহর, সেইখানেই দীক্ষিত এণ্ড সন্সের ব্রাঞ্চ। এবং এই অসংখ্য শাখা-প্রতিষ্ঠানের

কর্ণধার দেবশঙ্কর নিজে! কাজ তাহাকে মদের মত পাইয়া বসিয়াছে, চেকের উপর মোটা মোটা টাকার অঙ্ক দেখিতে রাত তার ফুরাইয়া যায়। টাকা ও শ্রমের মধ্যে এতখানি মাদকতা থাকিতে পারে, দীক্ষিত তার কৈশোর-কল্পনায় তা' ভাবিতে পারে নাই।

বলিতে ভুলিয়াছি যে কলেজে ঢুকিবার আগে দীক্ষিতের বাবা তাকে সংসার-আশ্রমে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন অর্থাৎ একটী আট বছরের মেয়ে হাতে এক রাশি গালা ও সোণার চুড়ি পড়িয়া কাজল-মাখানো দুইটী ছোট চোখ রঙ্গীন ওড়নায় ঢাকিয়া দিনকয়েকের জন্য তার সঙ্গে তাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল। তারপর দ্বিরাগমনের আগেই বাবা তাহাকে টাকার খরস্রোতের মাঝখানে ঠেলিয়া দিলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে একটী ছেলেকে বারংবার ভারতবর্ষময় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গেল; কোথায় কে একটী গৃহস্থের ঘরে মেটে সিঁদুরের টিপ পরিয়া সিঁথি রচিয়া কি ভাবে দিন কাটাইতেছে, সে কথা ট্রেনে চলিতে চলিতে কোন জ্যোৎস্না রাত্রেই যে দীক্ষিতের মনে হয় নাই এমন নয়; কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্য, ক্ষণকালের মনোবিলাস। কল্পনায় সেই আট বৎসরের মেয়েটী হয়ত দিনের পর দিন তার মনের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কাজের ভীড়ে, বাস্তবের মাঝখানে তাহাকে আনিয়া দেখিবার মত দুঃসাহস দীক্ষিতের হয় নাই।—তার সময়ও ছিল না।

আয়ু হইতে তিরিশ বৎসর খরচ করিয়া দীক্ষিত যখন কিছু দিনের মত বিশ্রাম লইবার জন্য বাড়ী ফিরিল, তখন তার বাবা একদিন পুত্রবধূকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহার দিন তিনেক পরে "সাম্পানী" চড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যে অবগুণ্ঠিতা মেয়েটী দীক্ষিতদের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার ফুসফুস্ ফুটা হইয়া গিয়াছে। দীক্ষিত যে দিন তাকে প্রথম আদর করিয়া কাছে টানিল সেইদিনই আবেগ ও উত্তেজনায় তার স্নায়ু ও শরীরে এমনি বিশ্রী উৎপাত সুরু হইয়া গেল যে মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত দেবশঙ্করের সামনেই বাহির হইয়া পড়িল

তেইশ বছরের মেয়ে, যৌবন কানায় কানায় পূর্ণ থাকিবার কথা; কিন্তু প্রতীক্ষার রাত্রি জাগিতে জাগিতে সবটুকু লাবণ্য ও উগ্রতা তার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, শুধু চোখ দুইটী অত্যন্ত কেন, অস্বাভাবিক তীব্রতা লইয়া নিরর্থক সকলের দিকে চাহিয়া থাকে। যেন যে আয়ু সে ফুরাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাই সে ভয়ে ভয়ে সকলের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে।

বছর দুইয়ের বেশী তাহাকে শ্বশুরের ঘর করিতে হয় নাই। এতদিন ধরিয়া সে স্বামীর সঙ্গলাভের যে কল্পনা করিয়াছিল, দুই বৎসরে তাহা শেষ হইয়া গেল।

কিন্তু দীক্ষিত তার জন্য বৈরাগী সাজে নাই।

বৌ-য়ের শেষ কাজ শেষ হইতেই সে ছুটিয়াছিল আবার সেই কাজের ভিড়ের মাঝখানে; আবার সেই—আমেদাবাদ হইতে দেরাদুন, রাজকোট হইতে মাদুরা। এমনি করিয়া বছর খানেক কাটিয়া যায়। কিন্তু নেশারও নাকি ক্লান্তি আছে। তাই দেবশঙ্করও একদিন কাশিতে গিয়া আবিষ্কার করিল যে তাহার নিজের কাশির সঙ্গে যে বস্তুটা উঠিতেছে সেটা ঠিক থুতু নয়, রক্ত—প্রীতির চিহ্নস্বরূপ দীক্ষিতের বধূ স্বামীকে তার ব্যাধিটুকু দিয়া গিয়াছে।

তারপর হইতে সে এই স্যানিটেরিয়ামের কামরায়,—একদিন যেখানে সে তার পীড়িতযৌবনা বধূকে লইয়া আসিয়াছিল। সে বধূ কিন্তু তার কাছে চিরকাল নব-বধূ হইয়া রহিল,—চির রহস্যময়ী, চিরাবগুণ্ঠিতা।

ব্যাঙ্কের টাকার পরিমাণ আজ আপনা হইতেই বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহার জন্য আর দেশের এক প্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া না বেড়াইলেও চলে, কিন্তু দুইটি নর-নারীর বুকের রক্তে দেবশঙ্করের বাবার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স লাল হইয়া গেল কি না সে কথা তাঁহাকে কে বুঝাইবে।

বাবার কাছ হইতে কাল একখানা চিঠি আসিয়াছে। এই দুর্গম দেশে হঠাৎ তাঁর এক বাল্যবন্ধুর তিনি সন্ধান পাইয়াছেন। এখানকার তিনি ফরেষ্ট-অফিসার; কুড়ি বছর স্ত্রীপুত্র লইয়া এই দেশে বাস করিতে করিতে একেবারে এই দেশের লোক বনিয়া গিয়াছেন। বাবা তাঁহাকে চিঠি দিয়াছেন, আমার দেখা-শুনা করিবার জন্য, চিঠি পাইলে নিশ্চয় তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিবেন।

একটি সুস্থ লোককে দেখিতে পাইব, তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ হয়ত কথা বলিতে পারিব—কল্পনা করিয়া ভারি আরাম বোধ করিলাম। সুস্থ মানুষ সম্বন্ধে ধারণা আমাদের অনেকখানি স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। প্রতিদিন এখানে যে নিষ্ক্রিয় আলস্য উপভোগ করিতেছি, তাহাতে চলমান জীবনের ছবি

ক্রমেই পিছনে পড়িয়া যাইতেছে। মৃত্যুও এখানে মধ্যে মধ্যে আসিতেছে, কিন্তু সাড়াশব্দ সমারোহ করিয়া মৃত্যুকে একদিনও এখানে আসিতে দেখিলাম না। এখানে তাহার আনাগোনা অত্যন্ত সন্তর্পণে, চুপি চুপি আসিয়া কখন যে একেবারে বুকের অত্যন্ত কাছে গিয়া জমিছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। চারিদিকে একটা চাপাচাপি, নির্বাক শৃঙ্খলা। ঔষধ খাওয়া হইতে টেনিস খেলা পর্য্যন্ত কোথাও এতটুকু অনিয়ম হইলে চলিবে না। গতিশীল জীবনের অনিয়মের মধ্যে যে আনন্দ তার জন্য আমার সমস্ত শরীর, শরীরের সমস্ত স্নায়ু ও শিরা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই একটি সুস্থ, সবল, অপরিচিত ব্যক্তির আগমন কল্পনা করিতে ভারি আনন্দবোধ করিতেছি।

নূতন একটী লোক মনটাকে ভয়ানক দোলা দিয়াছে। পাঞ্জাবী ছোকরা, নাম দলীপ। বয়স তার আঠারো, কিন্তু এমন পরিপূর্ণ শরীর আগে দেখি নাই। ওর মুখের চারি পাশে যে দাড়ি ও এই বয়সেই সঞ্চিত করিয়াছে তার মধ্যে উজ্জ্বল দু'টী চোখ ও উন্নত নাকটা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে; দাড়ি নহিলে যেন তার সৌন্দর্য্যের অঙ্গহানি হইত।

দলীপকে দেখিলে কে বলিবে যে দীক্ষিতের মতই একটা দুষ্ট ব্যাধি তার শরীরেও বাসা বাঁধিয়াছে।

দলীপ ইচ্ছা করিলে সাহেব ড্রাইভার রাখিয়া, 'রোল্‌স'এ চড়িয়া জীবনটাকে কাটাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু কলেজে পড়িতে পড়িতে একদিন ও দেশের দুঃখের অনাবৃত মূর্ত্তিকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিল। সে দিনটা উহার জীবনে সুদিন কি দুর্দ্দিন, সে হিসাব ও রাখে নাই। ও শুধু জানে সেদিন ও লেবার কমিশনের রিপোর্ট পড়িয়া দেখিয়াছিল, হাওড়ার চটকলের বস্তীগুলির এক একটা ঘরে নাকি দশ বারো জন করিয়া লোক একসঙ্গে বাস করে, বোম্বায়ের চাওলগুলির অবস্থা বুঝি তার চেয়ে লোভনীয় নয়। একটী ঘরে হয়ত স্ত্রী পুত্র লইয়া তিনটি পরিবারের বাস। এক জনের স্ত্রী যখন সন্তান প্রসব করে তখন সেই ঘরের মধ্যেই একটী চটের পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া তার মাতৃত্বের সম্মান রাখা হয়। টাটানগরে কত শ্রমিক কলের মুখে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলি দিয়া ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করিতেছে। এই সব ভাবিতে গিয়া দলীপ একদিন ট্রেড-য়ুনিয়নের পাণ্ডা হইয়া বসিল। কয়লা-খনির নীচে নামিয়া বস্তীতে বস্তীতে ঘুরিয়া মানুষের জীবনকে সুস্থ ও সবল করিবার জন্য তখন তার কল্পনাবিহ্বল দুই চোখে সে কী উত্তেজনা। নেতা হইবার লোভ হয়ত তার ছিল না, কিন্তু টাকা তার প্রচুর, শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাকে নেতা না বানাইয়া ছাড়িবে কেন?

ছ'মাসের মধ্যে পাঞ্জাব এক নতুন শ্রমিক নেতা তৈরী করিয়া লইল।

তারপর ওই দেশেরই এক কারখানায় বাধিল ধর্ম্মঘট। শ্রমিকরা চায় বেতন বাড়াইতে, যা তারা পায় তার দেড়া না হইলে ধার না করিয়া থাকা যায় না; কিন্তু মালিকরা সে কথা শুনিবে না। কুড়িদিন ধরিয়া ধর্ম্মঘট চলে এবং এই কুড়িদিন ধরিয়া বাইশ শ' শ্রমিকের সংসারের সমস্ত খরচ জোগায় দলীপ নিজে। সেই ত উহাদের দাবী করিতে শিখাইয়াছে। কিন্তু একুশ দিনের দিন কারখানার গেটে মালিকরা এক নোটিশ টাঙ্গাইয়া দিলেন যে—"আজ যাহারা কাজে যোগ দিবে তাহাদের বেতন শতকরা সাড়ে বার টাকা হারে বাড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং যাহারা কাজে আসিবে না তাহাদের কোন দিনই আর আসিবার প্রয়োজন হইবে না।"

নোটীশের কথা দলীপ জানিত না, বেলা দশটার সময়, কারখানার সামনের ময়দানে শ্রমিকদেরই এক সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়া সে দেখিল—কারখানার গেট খুলিয়া গিয়াছে এবং সেই প্রবেশপথে শান্ত, প্রফুল্ল মুখে হল্লা করিতে করিতে যাহারা চলিয়াছে কাল সন্ধ্যার সময় তাহারাই দলীপকে মাথায় করিয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

দুই একজন তখনও ভিতরে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, দলীপ তাহাদের লইয়া সভার চেষ্টা সুরু করিয়া দিল। বক্তৃতা সবে মাত্র সুরু হইয়াছে, সবে মাত্র আবেগে তার মুষ্টি কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, বেদনায় চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে—অমনি চারিদিক হইতে বৃষ্টির মত ইঁটের টুক্‌রা, পাথরের টুক্‌রা পড়িতে আরম্ভ করিল। একখানা সূচল পাথরে দলীপের ভুরু কাটিয়া গেল—রক্তে সে চোখ দিয়া ভাল করিয়া কিছু দেখিবার উপায় নাই, তবু দলীপ চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, কাল যাহারা এই ধর্ম্মঘটে সকলের বেশী উৎসাহ দেখাইয়াছে ইহারা তাহারাই। ভিড়ের ভিতর হইতে একজন ত স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়া দিল যে—"মাহিনা যখন বাড়িয়া গেল, তখন ধর্ম্মঘট করিয়া চাকরী খোয়াইবার সখ

তাহাদের নাই। আজ না হয় মায়ের জন্য আমাদের ডালরুটী জোগাইতে তোমার আপত্তি নাই, কিন্তু সে আর কতদিন! একমাস, দুইমাস, বড় জোর ছয়মাস। তারপর—?"

হঁ্যা, তারপরও ইহাদের বাঁচিতে হইবে। বেতন কতখানি বাড়িল সে হিসাব করিবার মত বুদ্ধি এবং সময় ইহাদের নাই, কিন্তু বাঁচিবার মরীচিকা তাহারা দেখিতে জানে। তাহাই দেখুক ইহারা। দলীপ আর ইহাদের জন্য বস্তীতে বস্তীতে, ধাওড়ায় ধাওড়ায়, ব্যারাকে ব্যারাকে ঘুরিয়া বেড়াইবে না। সত্যি, টাকাই বা তার কত; সে টাকা দিয়া চিরকালের মত পৃথিবীর সমস্ত গরীবের ক্ষুধা মিটান যায় না, সুতরাং কাজ নাই। মহৎ হইবার প্রলোভন সে ত্যাগ করিবে। এবং সে প্রলোভন দলীপ সত্যি একদিন ছাড়িয়া দিল। কিন্তু রাত্রির পর রাত্রি বস্তীতে বস্তীতে ঘুরিয়া, রাত্রি জাগিয়া তার ফুসফুসের উপর বস্তীর দুর্গন্ধ এবং জঞ্জাল জমিয়া উঠিয়াছে, মানুষকে সুসম্পূর্ণ করিতে গিয়া সে ফিরিয়া আসিল নিজেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া।

তার কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারি, বিছানায় শুইয়া শুইয়া আজও সেই ব্যাধি-দুঃখ-বিকল মানুষগোষ্ঠীকে সুস্থ করিবার স্বপ্ন সে দেখিতেছে, কিন্তু সে সাহস আর তার নাই, তার বিশ্বাসের ডান হাতটা কে যেন মুচ্‌ড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

বাবার বন্ধু গিরিজাবাবু কাল আসিয়াছিলেন। চমৎকার সদালাপী মানুষ, কথা কহিতে আরম্ভ করিলে কোথায় থামিবেন তাহা বলিবার উপায় নাই। কিন্তু তার জন্যে তাঁর উপর বিরক্ত হইতে পারা যায় না। প্রত্যেক কথাটী মনোজ্ঞ করিয়া বলিবার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা। এখানে কতগুলি হ্রদ আছে, বাজার এবং স্কুল কতগুলি, বনের মধ্যে শিশু ও দেওদার গাছগুলি কত উঁচু পর্য্যন্ত মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে পারে সে সব খবর তাঁর কাছে ত' পাইলামই সেই সঙ্গে তাঁর নিজের প্রবাসী জীবনের একটী অপরিস্ফুট ছবিও তিনি আমার চোখের সামনে আঁকিয়া দিলেন। স্ত্রী তাঁর বছর সাত পূর্ব্বে ইহলৌকিক সম্পর্ক ছিঁড়িয়া গিয়াছেন, ছেলে একটীমাত্র, রুড়্‌কীতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে গিয়াছে। মেয়েও একটী, বিবাহ তাহার ধুম করিয়াই দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই মেয়ে আজ তাঁরই ঘাড়ে। বিবাহের দুই বৎসর পরেই তা'র সীঁথির সিঁদুর মুছিয়া গিয়াছে। বয়স আর কত হইবে, খুব জোর কুড়ি! এই বয়সে মেয়েকে তিনি থান পরাইতে কিছুতেই রাজী ছিলেন না, কিন্তু মেয়ে নিজে এমনি জিদ্‌ ধরিল যে থান ছাড়া আর কিছু সে পরিবে না!—এমনি গোঁয়ার মেয়ে। বাপের কথায় একগাছি করিয়া সরু সোণার চুড়ি শুধু হাতে রাখিতে রাজী হইয়াছে। এই বয়স হইতে বার-ব্রত একাদশী পালন করিতে করিতে কতদিন যে বাঁচিয়া থাকিবে তা শুধু সেই জানে। প্রথম একাদশীর রাত্রে মুখ দিয়া তার কথা বাহির হয় নাই, নাড়ীর স্পন্দন ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল, তবু এক ফোঁটা জল তার মুখে দেয় কার সাধ্য! ভাগ্যে এখানে রোগের উপদ্রব নাই, নইলে এতদিন তার বারব্রত পালন ঘুচিয়া যাইত নিশ্চয়! গিরিজাবাবুর ছোট সংসারের পুরা কর্ত্রীত্ব তাহারই উপর, তাহার সামনে গিরিজাবাবুই নিজে তটস্থ হইয়া থাকেন। মফঃস্বল হইতে গিরিজাবাবু যখন ঘোড়ায় চড়িয়া ফিরিয়া আসেন, তখন মেয়েই তাঁর দুই করতলের সেবামৃত দিয়া তাঁর সমস্ত ক্লান্তি মুছাইয়া দেয়। আমার জন্য তিনি আজ যে সামান্য খাবারগুলি নিয়া আসিয়াছেন সে সবই ত' আজ সকলি সকাল হইতে ও বসিয়া বসিয়া করিয়াছে।

বিব্রত হইয়া বলিলাম, খাবার আনাটা সত্যিই আপনার বাড়াবাড়ি কাকাবাবু, কতটুকুই বা ওরা আমায় খেতে দেবে বলুন ত?

কিন্তু গিরিজাবাবুর তাতে কি আসে যায়। বলিলেন, সবগুলি খেতে না পারো, প্রত্যেক রকমের একটী করে খেলেও মুখটা তবু বদলাবে।

গিরিজাবাবুর সামনে অবশ্য মুখ বদলান হইল না। দীক্ষিত এবং দলীপকেও চুপি চুপি সেইগুলির ভাগ দিলাম। বহুকাল পরে দুইটী কল্যাণহস্তের স্পর্শমধুর জিনিষগুলি মুখে দিয়া অনাস্বাদিত তৃপ্তি বোধ করিলাম, দীক্ষিত এবং দলীপও সেইগুলি হাতে করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। দীক্ষিতের চোখের কোলে, মনে হইয়াছিল এক ফোঁটা জল দেখিলাম, কিন্তু ঠিক করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই দেখি, সে তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

আমরা এতদিন পাশাপাশি আছে, জানা ও অজানা কত বিষয় লইয়া দিবারাত্র আলোচনা করিয়াছি,—একের দুঃখের

কথা আর একজনের কাছে গোপন রাখিবার চেষ্টা করি নাই, কিন্তু আজিকার দিনটার অবসন্ন আলোর দিকে চাহিয়া হঠাৎ মনে হইল, এত কাছাকাছি থাকিয়াও আমরা অনেক দূরে পড়িয়া আছি। এই নৈকট্যের আড়ালে আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে খানিকটা লুকাইয়া রাখিয়াছি,—পাঁচজনের সামনে তাহা প্রকাশ করিবার উপায়, সাহস এবং নির্লজ্জতা কাহারও নাই।

গিরিজাবাবু আমাকে ক্রমশঃ বিব্রত করিয়া তুলিতেছেন। বাবার সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব এককালে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল, তারপর তাঁহারা দেশের দুই প্রান্তে গিয়া পড়িয়াছেন। তিনি যেন আজ আমার উপর দিয়া সেই বিচ্ছিন্ন বন্ধুত্বের ক্ষতিপূরণ করিবেন। এই কয়দিনে কতরকমের সুস্বাদু, লোভনীয় জিনিষই যে মুখে দিলাম, তার হিসাব হয় না। যাক্, পৃথিবীতে আমার বহু আকাঙ্ক্ষা হয়ত অতৃপ্ত রহিয়া গেল, কিন্তু মরিয়া অন্ততঃ খাবারের লোভে আমাকে আবার এখানে আসিতে হইবে না।

এমনি করিয়া নানাবিধ উপাদেয় বস্তুর রসাস্বাদন করিতে করিতে গিরিজাবাবুর মেয়ের প্রতি একটা নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করিতে লাগিলাম। তাহাকে দেখি নাই, কিন্তু তাহার একটা মূর্ত্তি আমি নিজের মধ্যে কল্পনা করিয়া লইয়াছি। – শীর্ণা, কিন্তু নিষ্ঠুর তপশ্চর্য্যার একটা জ্যোতি বোধ হয় তার ম্লান মুখখানিতে মাখানো আছে। অনেক দিনের আত্ম-বিগ্রহের জন্য মুখের উপর হয়ত একটা অনির্দ্দেশ্য বিষাদের ছায়া—চোখ দুইটীতে হয়ত অনন্ত নৈরাশ্যের বেদনায় স্নিগ্ধ। শরীরটা দীর্ঘ, কিন্তু সেই দীর্ঘতায় একটা ছন্দো-মাধুর্য্য আছে, কিন্তু ভাল কবিতার মত ছন্দ বজায় রাখিয়া চলিবার কোন প্রয়াস নাই।

কোন্ উদ্দেশ্য লইয়া যে সেই দৃষ্টিসীমার বাহিরে অবস্থিতা মেয়েটার সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে এই কল্পনা দেখা দিয়াছে বলিতে পারি না ; এ যেন আপনা আপনিই আমার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই প্রকাশের ঐশ্বর্য্যে আমার দিনরাত্রিগুলি হঠাৎ মধুময় হইয়া উঠিয়াছে।

দলীপ সেদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যে তোমায় রোজ খাবার তৈরী করে পাঠায়, সে তোমার কে ?

বলিতে পারিতাম—কে আবার ! কেউ নয়। আমার বাবার কোন বন্ধুর মেয়ে। কিন্তু সেটা বলা হইল না।

বলিলাম, আমার কোন আত্মীয়া। হ্যাঁ, আত্মীয়াই ত'—নিজের মনে মনেও তাহা স্বীকার করিলাম। আত্মীয়তা কি পরিচয় ও সম্বন্ধের ধরা-বাঁধা পথ ধরিয়া চলে ?

দলীপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, নাম কি তার ?

নাম বলিতে গিয়া স্মরণ হইল, নাম কোনদিন গিরিজা-বাবুকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। কিন্তু যে আমার রোগী জীবনের উপর দূর হইতে একটা স্নেহ-হস্ত প্রসারিত করিয়াছে, তাহার নাম আমি জানি না ? জানি।

দলীপকে বলিলাম, নাম তার—সেবা। ঠিক জানিতাম যে ইহার চেয়ে উপযুক্ত নাম তাহাকে দেওয়া যায় না। আমার পঙ্গু দিবস-রাত্রির উপর সে একটা নিভৃত শুশ্রূষার উত্তরীয় বিছাইয়া দিয়াছে।

গিরিজাবাবু জানেন না, এই হাসপাতালের সবাই তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে কতদূর কৌতূহলী। বানাইয়া বানাইয়া সেবার নামে আমি যখন গল্প করি,—বলি যে এমন একটী আত্মচৈতন্যহীনা সেবাময়ী নারী এই হিসাবী পৃথিবীতে দুই একবারের বেশী চোখে পড়ে না, যাহার সহিত কোন পরিচয় নাই, যাহাকে চোখে দেখে নাই, তেমন লোককেও সেবা দিয়া, শুশ্রূষা দিয়া, হৃদয়ের অজস্র মমতা দিয়া বাঁচাইয়া তুলিতে পারে, তখন দলীপেরও চোখ দুটীতে যেন কিসের একটা ছায়া আসিয়া পড়ে ! সেও যেন মনে মনে বলে, বৃহত্তর মানব-সমাজের দুঃখ দূর করিতে না গিয়া সে যদি এমনই একটী মমতাময়ী মেয়েকে পাইবার সাধনা করিত, তাহাতে ক্ষুধিত জনসাধারণের কোন ক্ষতি ত হইতই না, কিন্তু নিজে সে বাঁচিয়া যাইত।

সেবার নামে গল্প বলিতে বলিতে, দীক্ষিতের মুখের দিকে চাহিয়া, অনেক দিন হঠাৎ আমাকে থামিয়া যাইতে হইয়াছে। দেখিয়াছি কথা শুনিতে শুনিতে হঠাৎ সে বিছানার বালিশে মুখ লুকাইয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার সেই রোগদুর্ব্বল শীর্ণ শরীরটা একেবারে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।—সেই দিকে চাহিয়া আমার রচিত মিথ্যা কাহিনী যেন মনের মধ্যে লজ্জায় মরিয়া যাইতে চায়।

কিন্তু তবু এই আমার কাহিনী বলিবার প্রয়োজন এবং প্রলোভন বুঝি আমার জীবনে ছিল। রুখু চুলের উপর দুইটী কল্যাণ করের স্পর্শ কল্পনা করিবার লোভ মানুষের পক্ষে বোকামী হইতে পারে, কিন্তু অস্বাভাবিকতা তার মধ্যে নাই। নারীকে জীবনে আমি অনেক রকমে অনুভব করিয়াছি—ত'াদের কেউ কাচের পেয়ালায় রঙ্গীন মদের মত উগ্র এবং ফেণায়মান, কেউ আত্মচৈতন্যের সুরায় মন্দির; কেউ নিকটে আসিয়াছে, কিন্তু নিকটতর হয় নাই,—এমনি বহু! যেখানে তা'রা পূজার ফুল, যেখানে তারা প্রভাতী তারার মত স্বচ্ছ, উত্তেজনাহীন, সেখানে তা'দের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নাই। আজ হাসপাতাল-শুদ্ধ লোকের কাছে সেবার নামে গল্প করিয়া আমি যে শুধু সেই দৈন্যকেই ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছি, একথা কে বুঝিবে—?

কাল গিরিজা বাবু বলিয়া গিয়াছেন সপ্তাহ খানেকের জন্য তাঁহাকে মফঃস্বলে গিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে; সুতরাং এই ক'দিনের জন্য আমি যেন তাঁকে ছুটী দিই। আমার এবং তাঁর নিজের মেয়ের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে ঘোঁড়ার উপর তাঁর হাতের লাগাম হয়ত আল্‌গা হইয়া আসিবে, কিন্তু উপায় নাই। তবে কোন কিছু দরকার মনে করিলে আমি যেন শান্তিকে খবর দিই, সে বাসা হইতে নিশ্চয় উহার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। শান্তি তাঁর মেয়ের নাম, এত দিনে জানা গেল। সেবার বদলে—শান্তি।

দরকার যদি পড়ে এবং সংবাদ যদি দেওয়া যায়, তাহা হইলে শান্তি যে একটা ব্যবস্থা করিবে, এ কথা আমিও জানি। কিন্তু কি যে দরকার পড়িতে পারে তাহা কাল রাত্রি হইতে এখন পর্য্যন্ত ভাবিয়া পাইলাম না। আমার প্রয়োজন তাকে জানাইতে হইবে। কি আমার প্রয়োজন? কেন? এ'সবের উত্তর খুঁজিয়া পাই না। আজ আর খাবার আসিবে না জানিতাম এবং তা আসিলও না। কিন্তু শান্তির নামে আজও সবার সঙ্গে গল্প করিলাম। আজও বলিলাম, তার দুই করতলে সেবার অমৃত, দুই চোখে তার মমতার সন্ধ্যা। সূর্য্যের আলো বরফ-ঢাকা পাহাড়ের ওপারে আস্তে আস্তে অন্ধকারের সঙ্গে মিলাইয়া যাইতেছে।

বিছানায় পড়িয়া ছিলাম।

নার্সের সঙ্গে একটী অপরিচিত হিন্দুস্থানী লোককে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া উঠিয়া বসিতে হইল। লোকটার হাতে একটী টিফিন-কেরিয়ার। পরিচয় তাহার কেরিয়ার হইতেই পাওয়া গেল এবং প্রৌঢ়া নার্স স্নেহের হাসি দিয়া বলিল, তোমার প্রত্যাশার বস্তু আসিয়াছে।—নার্স জানে খাবার কোথা হইতে আসে; শান্তির গল্প আমি তার কাছেও করিয়াছি।

লোকটী চাকর শ্রেণীর। নার্স চলিয়া যাইতেই বলে, কালই তাহার দিদিমণি মিঠাই তৈরী করিবার জন্য একেবারে জিদ্ ধরিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু কাল ছিল একাদশী এবং তার উপর দুপুর বেলা হঠাৎ তাঁর জ্বর আসিয়াছিল, না হইলে কালই তাহাকে আসিতে হইত। হাসপাতালে কি করিয়া ঢুকিতে হয় তা সে জানে না, কিন্তু বাকী কথাগুলি কি জানি কি মনে করিয়া চাকরটী শেষ করিল না—

তাহাকে বলিলাম, তোমার দিদিমণিকে আমার জন্যে রোজ রোজ এ'সব পাঠাতে বারণ ক'রো। এত আমরা তিন চার জনেও খেতে পারি না।

চাকরটী হাসিয়া বলিল যে তার বাবুও দিদিমণিকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিল। কিন্তু দিদিমণি সে কথা কানেই তোলেন নাই।

চাকর ঘর হইতে চলিয়া গেল এবং তাহার দিদিমণি যে গিরিজা বাবুর কথা কানে তোলে নাই তাহা শুনিয়া রাগ হইল না। লোকটী চলিয়া যাইবার পর আমার জন্য শান্তির এই আগ্রহ ও উৎকণ্ঠাটুকু অভিভূতের মত, কৃপণের মত অল্প কাল উপভোগ করিলাম, তার পর হঠাৎ মনে হইল, শান্তিকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া দুই একটী লাইন লিখিয়া দেওয়া আমার উচিত।

বিছানা হইতে উঠিয়া জানালার কাছে গেলাম। স্যানিটেরিয়াম হইতে বাহিরে যাইবার গেট জানালা দিয়া দেখা যায়, একটু পরেই চাকরটীকে সেখানে দেখা যাইবে। দাঁড়াইয়া থাকি।

অন্ধকার একটু গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু আমাদের স্যানিটেরিয়ামের মধ্যে এখনও আলো জ্বালা হয় নাই।

ভাবিতেছিলাম লোকটার নাম জিজ্ঞাসা করা হয় নাই এবং অন্ধকারে তাহাকে যদি চিনিতে না পারি তাহা হইলে কি করিব। কিন্তু কিছুই করিতে হইল না। একটু পরেই লোকটাকে গেটের কাছে পৌছিতে দেখা গেল এবং আরও দেখা গেল যে একটি নারী-মূর্ত্তি তার সঙ্গে। লম্বা, ছিপ্‌ছিপে চেহারা—অন্ধকারে গায়ের রং দূর হইতে বুঝা যায় না। কাঁধটা ঘিরিয়া একটা গরম চাদর বোধ হয়, সাদা কাপড় একটুখানি মাথা পর্য্যন্ত তুলিয়া দেওয়া। মেয়েটী আগ্রহের সঙ্গে চাকরটাকে যেন কত কি প্রশ্ন করিতেছে।

শান্তি বোধ হয়—নিশ্চয়ই শান্তি।

চাকরটা কি করিয়া এখানে আসিল সে কথা বলিতে গিয়া বলে নাই। এখন বুঝা গেল যে শান্তি নিজেই সঙ্গে করিয়া তাকে এতদূর আনিয়াছে। কিন্তু নিজে আসে নাই, ঘরের মধ্যে আসা প্রয়োজন মনে করে নাই, আমার সঙ্গে দেখা করিবার কথা আমার এত কাছে আসিয়াও তার মনে হয় নাই। আশ্চর্য্য নয়?

যে জিনিষগুলি নিজে হাতে করিয়া সে তৈরী করিয়াছে সেগুলি আজ আর বুঝি তেমন মধুর লাগিবে না। কেবলই নিজেকে জিজ্ঞাসা করিলাম এত নিকটে আসিলেও কেন সে আসিল না? তাহার মুখ অন্ধকারে আমি দেখি নাই, কিন্তু কল্পনায় যা ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, তার দীর্ঘ তনু দেহে যে তেমনি একটা ছন্দের ঢেউ দেখিলাম! যদি রোগ-শয্যা হইতে, ইলেকট্রিক ল্যাম্পের আলোক তাকে দেখিতাম এবং দেখিতাম যে, কল্পনায় তার মুখে আমি যে তপশ্চর্য্যার দ্যুতি ও অনির্দ্দেশ্য বিষাদের স্পর্শ মাখাইয়া দিয়াছিলাম, বাস্তবেও তাহা মুছিয়া যায় নাই, তাতে এমন কি ক্ষতি হইত?

আমি তেমনই করিয়া জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, মূর্ত্তি দুইটা অন্ধকারে হারাইয়া গেল।

রাত্রে শান্তির দেওয়া খাবার গুলি বাহির করিয়া বন্ধুদের দিলাম। ইহাদের কে একজন যেন রোজকার মতোই এই অন্যের মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করিল।

কি জানি কেন আজ আর ইহাদের কাছে তৈয়ারী করিয়া কোন কথা বলিয়া বাহাদুরী লইবার উৎসাহ পাইলাম না।

বলিলাম না।

"আমার যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে আমি আনন্দ অনুভব করিব, আমি নিয়ম কানুন মানিতে যাইব কেন? আমি স্বাধীন।—একথা বলিবার অধিকার কোনো সামাজিক ব্যক্তির নাই, এবং উহাই স্বাধীনতার অভিপ্রেত অর্থ নহে। উহা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর। আমার গৃহের আমিই স্বামী, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই, কিন্তু এই বলিয়া আমি ঐ গৃহে এমন কিছু করিতে পারি না, যাহা আমার চারিদিকের আর সমস্ত লোকের অনিষ্টের জন্য হয়। আমি আমার নিজেরও ঘরে আগুন লাগাইতে পারি না, কেন-না তাহাতে চারিদিকের আর সমস্ত ঘরের বিপদ্ সম্ভাবনা আছে। আমি মদ্যপান করিতে পারি না, উহাতে আমার অধিকার নাই. কারণ মত্ততায় আমার ব্যক্তিগত অপকারের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমার প্রতিবেশীদের নানাদিকে ও নানারূপে তাহাতে বহু ক্ষতি হয়। ইংলণ্ডের লোক স্বাধীন, তাই বলিয়া কাহাকেও হত্যা করিবার অধিকার তাহারও নাই। আমি নিজে নিজেকেও হত্যা করিতে পারি না। আত্মহত্যার অপরাধে সরকার বাহাদুর আমাকে দণ্ড দিবেন। এই সব অধিকার না থাকাতে যদি স্বাধীনতা না থাকে তো সেই স্বাধীনতা না থাকুক, তাহাতে কাজ নাই। যাহাতে নিজের ও অন্যের কল্যাণ না হয়, সেই স্বাধীনতা যেন কখনও কাহারও না হয়। যে সাহিত্যের সৃষ্টিতে স্রষ্টার পাঠকবর্গের কল্যাণের ইঙ্গিত না থাকে, বা কল্যাণে প্রবৃত্তি ও অকল্যাণ হইতে নিবৃত্তির ইঙ্গিত না করা হয়, বরং ইহার বিপরীতই হয় তাহার প্রয়োজন কি?"

সাময়িক প্রসঙ্গ

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বেকার-সমস্যা ও প্রতিকার—জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ব্যবসা-মন্দা হেতু বেকার-সমস্যা জটিল ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বিলাতের ত কথাই নাই, যে মার্কিণ বিলাতেরও মহাজন হইয়া স্বর্ণস্তূপ সঞ্চয় করিয়াছে ও করিতেছে, সেই মার্কিণেও বেকার-সমস্যা প্রবল হইয়াছে। তাহার কারণ, যদি বিক্রয় করা না যায় অর্থাৎ ক্রেতা না থাকে, তবে পণ্য উৎপন্ন করিয়া লাভ কি? পণ্যোৎপাদন কম করিলেই কলকারখানায় শ্রমিকের সংখ্যাহ্রাস অনিবার্য্য, এমন কি পণ্যের উপাদানের পরিমাণও অল্প হয়। ক্রেতার অভাবে পাটের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহাতেই আমরা ইহা বিশেষরূপ উপলব্ধি করিতেছি।

মার্কিণে ও বিলাতে বা য়ুরোপের অন্য দেশসমূহে বেকার-সমস্যা সরকার উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিতে পারেন না; কারণ, সে সব দেশে সরকারের অস্তিত্ব প্রজার তুষ্টির উপর নির্ভর করে। সে সব দেশে সরকার প্রজার নিকট কৈফিয়তের জন্য দায়ী। সে সব দেশে বেকারেরা না খাইয়া মরে না। তাহারা খাবার পাইবার দাবি করে এবং সরকারকে সে দাবি পূরণ করিতে হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতের সরকার বেকারদিগকে মাসহারা দিতেই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ দেশে তাহা হয় না। এ দেশে লোক না খাইয়া মরে—অদৃষ্টবাদী দেশের লোক তাহা "কপালের লিখা" বলে, সরকার মনে করেন, তাহা অনিবার্য্য। সে সব দেশে খাবারের অভাব ঘটিলে হাঙ্গামা ও রক্তপাত হয়।

এ দেশে বেকার-সমস্যা যত প্রবলই কেন হউক না, তাহার সহিত দেশে বিপ্লববাদের সম্বন্ধ আছে, সরকারের মনে এই বিশ্বাস না জন্মিলে তাহাতে সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হইত কি না এবং আকৃষ্ট হইলেও তাহার প্রতীকারের কোন-রূপ চেষ্টা হইত কি না, বলা যায় না। এই বঙ্গদেশেই বেকার-সমস্যা যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি করিতেছে এবং অসন্তোষ হইতে অশান্তির উদ্ভব হয়, তাহা ২৫ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে সার ভ্যালেন্টাইন চিরল তাঁহার 'ভারতে অশান্তি' পুস্তকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ঈপ্সিত ফল ফলে নাই।

বাঙ্গালার নূতন গভর্ণর সার জন এণ্ডারসন এ দেশে আসিলেই এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গালায় আসিবার কয় দিন পরে (৯ই এপ্রিল তারিখে) কলিকাতার মাড়বারী সভার অভিনন্দনের উত্তরে ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"আমি স্বভাবতঃ এবং শিক্ষাফলে ব্যবসাবাণিজ্যে সরকারের হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে দ্বিধানুভব করি। কিন্তু আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে, বঙ্গদেশে সরকার কৃষির ও হয়ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পেরও উন্নতি-সাধনকল্পে অন্ততঃ পরীক্ষা, গবেষণা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার দ্বারা অনেক কায করিতে পারেন। আমি আপনাদিগকে এই আশ্বাস দিতেছি যে, আমাদিগের ক্ষুণ্ণ ও ক্ষীণ আর্থিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমার মন্ত্রীরা যদি সে জন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন, তবে তাহাতে আমার সহানুভূতি প্রদানে কার্পণ্য লক্ষিত হইবে না।"

কয় মাস পরে (২১শে জুলাই তারিখে) ঢাকায় তিনি বলেন—

"আমরা এক দিকে যেমন সরকারের ব্যয় হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছি, অপর দিকে তেমনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পে ও মূল্যবান শস্যোৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করিয়া টাকার ব্যবহার বাড়াইতে এবং তাহার অভাব হ্রাস করিতে চেষ্টা করিতেছি।"

যদিও সরকারের পক্ষে কর্ম্মচারীদিগের বেতন শতকরা ১০ টাকা হিসাবে কমান ব্যতীত ব্যয়হ্রাসপ্রচেষ্টার এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পে ও মূল্যবান শস্যোৎপাদনে উৎসাহ-প্রদানের কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় দেশের লোক পায় নাই, তথাপি গভর্ণরের এই উক্তিতে মনে করা যাইতে পারে, ইহা সরকারের মনোগত অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি। বলা বাহুল্য, এই অর্থকষ্টের সময় গভর্ণর যদি শৈলবিহার বর্জ্জন করিতেন, আপনার ব্যাণ্ড ও বডিগার্ড ত্যাগ করিতেন, জাঁকজমকের ব্যয় হ্রাস করিতেন, তবে লোক সেরূপ অভিপ্রায়ের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইত। সে যাহাই হউক, সার জনের এই সব উক্তি হইতে বুঝা গিয়াছিল, সরকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পে সাহায্য-প্রদানের কথা আলোচনা করিতেছেন।

এই সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু সরকারের শিল্প-বিভাগে পরীক্ষিত অল্পব্যয়সাধ্য কতকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিয়া যে পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন।

ঢাকায় বক্তৃতার অল্পদিন পরে (১৬ই আগষ্ট তারিখে) সার্ জন চট্টগ্রামে অভিনন্দনের উত্তরে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতেও তিনি বেকার-সমস্যার উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার সহিত বিপ্লববাদের সম্বন্ধ আছে। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ—

"আপনারা জানুন, বর্ত্তমান অবস্থা যে শোচনীয় সে বিষয়ে সরকার অনবহিত নহেন। বৎসরের পর বৎসর আপনাদিগের যুবকরা এবং এখন বালিকারাও বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগের উদ্যম প্রয়োগের কোন উপায় পাইতেছে না। কাযের অভাব বর্ত্তমান বিভীষিকাপন্থীদিগের আন্দোলনের মূল কারণ নহে। কিন্তু বেকারের দল হইতে ইহার কর্ম্মী সংগৃহীত হইতে পারে এবং এই আন্দোলনের নায়কগণ লোকের মনে যে ভাবের উদ্রেক করিতে চাহে কাযের অভাবে লোকের মনে সেই ভাবপ্রবণতার সঞ্চার হয়। সরকার একক বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে পারেন না। সে জন্য লোকের সহযোগের প্রয়োজন। কিন্তু সরকারকে যদি বিভীষিকা-বিপদ নিবারণে মনোযোগী থাকিতে হয় ও সেজন্য অর্থ ব্যয় করিতে হয়, তবে সে কাযে সরকারের চেষ্টা ক্ষুণ্ণ হইবেই।"

ইহার পর তিনি বলেন, এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও সরকার দেশের সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির ও যুবকদিগকে উদ্যম-প্রয়োগের নূতন নূতন পথিনির্দ্দেশের চেষ্টা করিতেছেন

প্রাদেশিক শাসকের এই সকল উক্তির পর লোক অবশ্যই আশা করিয়াছিল—সরকার যখন বেকার-সমস্যার প্রাবল্য বুঝিয়াছেন ও স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহার সহিত বিপ্লব ও বিভীষিকার সম্বন্ধও উপলব্ধি করিয়াছেন, তখন দেশের লোকের সহিত একযোগে সরকার দেশে বেকার-সমস্যা সমাধানের কোন ব্যাপক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন।

দেশের লোকের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। দেশের শ্রমিক, চাকুরিয়া, কৃষিজীবী প্রভৃতির মধ্যে যে দারুণ দুঃখ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাদিগের কায পাইবার উপায় করিয়া সে দুঃখ দূর করিবার কোন ব্যবস্থা আজও অবলম্বিত হয় নাই। কেবল যে-মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায় হইতে বিপ্লবতন্ত্রী বিভীষিকাপন্থী সংগৃহীত হয়, সেই সম্প্রদায়ের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠার নহে—শিল্প-পরিচালনের শিক্ষা-প্রদানকল্পে ব্যবস্থা করিবার উপায় হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—সরকারের শিল্প বিভাগে পরীক্ষিত স্বল্পব্যয়সাধ্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। বাঙ্গালা সরকার সেইগুলি শিক্ষা দিবার জন্য মফঃস্বলে শিক্ষক পাঠাইবেন—এই যাযাবর শিক্ষকদিগের কার্য্যের ব্যয়জন্য বৎসরে লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার মুখপত্র যে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' সরকারের সব উদ্যোগের প্রশংসা করেন, সেই পত্রও এই কাযের জন্য বরাদ্দ টাকা যথেষ্ট নহে, বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। 'ষ্টেটস্‌ম্যান্' বলেন—যাঁহারা শ্রমিকদিগের অবস্থা অবগত আছেন, তাঁহারা ইহাতে উল্লেখযোগ্য সুফল লাভের আশা করিতে পারেন না এবং যাঁহারা কেন্দ্রে কেন্দ্রে যাইয়া লোককে শিক্ষা দিবেন, তাঁহাদিগের কায যদি বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে বরাদ্দ লক্ষ টাকা তাহাতেই ব্যয়িত হইয়া যাইবে। কেবল আরম্ভ হিসাবে এই ব্যবস্থায় আশা ও. আনন্দ প্রকাশ করা যাইতে পারে। যদি ইহার ফল ভাল হয়, তবে পরে ব্যয়ের বরাদ্দ বাড়ান যাইবে এবং তাহা হইলে তখন কাযও ব্যাপকভাবে পরিচালন করা যাইবে।

এই ব্যবস্থার সহিত আরও কতকগুলি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, সে সকলের মধ্যে বর্ত্তমানে আমরা দুইটির উল্লেখ করিব—

(১) উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা

(২) মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা

পণ্য উৎপন্ন করিবার পর তাহা বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিতে না পারিলে, পণ্যোৎপাদনের দ্বারা ঈপ্সিত ফল লাভ করা অসম্ভব। জাপানে সরকারের সাহায্যপুষ্ট কতকগুলি সমিতি ও ব্যাঙ্ক পণ্য-বিক্রয়-ব্যবস্থা করিবার ভার গ্রহণ করায় সে জন্য উৎপাদনকারীকে ব্যস্ত হইতে হয় না। এ দেশে তাহার কি হইবে? যদি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদিগের অর্থ-সংগ্রহের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, তবে উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু সে বিষয়ে যে বিশেষ সতর্কতাবলম্বন প্রয়োজন তাহা পাট ক্রয়-বিক্রয় সমিতির ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ব্যাপারে বিশেষরূপ বুঝা গিয়াছে।

মূলধন সংগ্রহেরই বা কি হইবে? কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শিল্পে সরকারী সাহায্য প্রদান সম্বন্ধে এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদেশে সে আইন বিধিবদ্ধ হইবার বহু পূর্ব্বে মাদ্রাজে ও বিহারে সেরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এই আইনের বিধানানুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য অর্থসাহায্য অগ্রিম দান হিসাবে দেওয়া যায়। আমরা শুনিয়াছি, যে তহবিল হইতে এই সাহায্য প্রদান করা হইবে, তাহাতে দেশের লোকের নিকট হইতে যত টাকা সংগৃহীত হইবে, সরকার তত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং ইতোমধ্যেই কয়জন লোক এই তহবিলে টাকা দিয়াছেন। এই তহবিল হইতে কি নূতন প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ-সাহায্য প্রদান করা হইবে? সরকার পক্ষ হইতে এ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোন কথা বলা হয় নাই। সরকার এ বিষয়ে কি ভাবে কায করিবেন, তাহা জানিবার জন্য দেশের লোকের কৌতূহল যে স্বাভাবিক তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এই ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না, ইহা মুষ্টিমেয় ভদ্র সম্প্রদায়ের বেকারদিগের জন্য উদ্দিষ্ট। তাহা সরকারই স্বীকার করিয়াছেন। গভর্ণরের চট্টগ্রামের বক্তৃতায় দেখা যায়, তিনি এই সম্প্রদায়ের বেকারদিগের জন্য চিন্তিত হইয়াছিলেন; কেন না, তাহাদিগের দল হইতে বিপ্লবপন্থী সংগ্রহের সুবিধা! যদি এই ব্যবস্থায় দেশ ও সমাজ হইতে বিভীষিকাপন্থী বিপ্লবীদিগের তিরোধান হয়, তবে তাহাতে অবশ্যই কল্যাণ সাধিত হইবে।

কিন্তু আর যে লক্ষ লক্ষ বেকার কষ্ট পাইতেছে, তাহাদিগের সম্বন্ধে সরকার কি করিতেছেন? ঢাকায় গভর্ণর বলিয়াছিলেন, সরকার মূল্যবান শস্যোৎপাদনেও উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। সেই উৎসাহ কি আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে? বাঙ্গালার কৃষি-বিভাগ ইন্দ্রসাইল ধানের ও কাকিয়া-বোম্বাই পাটের বীজ প্রচারের জন্য যথেষ্ট কৃতিত্ব দাবি করিয়া থাকেন; কিন্তু এই দুই প্রকার বীজ তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত বা মিশ্র-নির্ব্বাচনে উৎপন্ন নহে। তাহা সকল স্থানের উপযোগীও নহে। বৎসরের পর বৎসর সরকারের কৃষি-বিভাগের কার্য্য-বিবরণীতে দেখা যায়, ইক্ষুর চাষ সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে। কিন্তু সেই পরীক্ষার ফলে কত দিনে বাঙ্গালায় অধিক পরিমাণ শর্করার উৎপাদক ইক্ষুর চাষের ব্যবস্থা হইবে? সরকার এ দেশে শর্করা শিল্পে যে সাহায্য প্রদান করিতেছেন, তাহার ফলে বিহারে অনেকগুলি চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, যুক্ত-প্রদেশও এবিষয়ে অনগ্রসর নহে। কিন্তু বাঙ্গালায় কি হইতেছে? বিদেশী চুরুট ও সিগারেট বর্জ্জনের ফলে এ দেশে চুরুট ও সিগারেট প্রস্তুত করিবার উপযোগী তামাকের চাহিদা বাড়িবে। কিন্তু বাঙ্গালায় রংপুরে যে তামাকের চাষের পরীক্ষা হইয়াছে, তাহার ফলে বাঙ্গালী কিরূপে উপকৃত হইয়াছে? রংপুরে গোজাতির উন্নতি সাধনকল্পে যে পশুক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ফলে কোন্ কোন্ স্থানে উৎকৃষ্ট গাভী বা ষণ্ড সরবরাহ করা সম্ভব হইয়াছে? অথচ পুষা কৃষিক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট গাভী ও ষণ্ড পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় হংস ও কুক্কুট পালন সম্বন্ধে কোনরূপ শিক্ষাদান-ব্যবস্থা সরকার করেন নাই অথচ ইহাতে লোক লাভবান হইতে পারে।

আজ আমরা কয়টি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইলাম—স্থানাভাবে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে পারিলাম না। এমন কি বহুলোৎপাদিকা কৃষি বিষয়ে সরকারের কৃষিক্ষেত্রগুলিতে কোন শিক্ষাই প্রদান করা হয় না। এই বাঙ্গালায় এক জন ধনী কৃষি বিষয়ে পরীক্ষার জন্য লক্ষ টাকা সরকারকে দিয়াছেন এবং সরকার তাহার পুরস্কারে তাঁহাকে উপাধি প্রদান করিয়াছেন। সে টাকায় কি কৃষি-শিক্ষার সুব্যবস্থা হইতে পারে না? দেশ এখনও কৃষিপ্রধান, কৃষি-প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ দেশে কৃষিকার্য্যে উন্নতি সাধনের উপযোগিতা কখন অতিরঞ্জিত হইতে পারে না।

ভদ্র সম্প্রদায়ের বেকারদিগের কাযের ব্যবস্থা করিয়া দিবার প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করে না—করিতে পারেও না। কিন্তু কেবল সেই ব্যবস্থাই কখন যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সেই জন্যই সার জন এণ্ডারসনের মুখে সরকার মূল্যবান শস্যোৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন—এই কথা শুনিয়া দেশের লোক আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা তাহার কোন পরিচয় পাই নাই এবং আশা পূর্ণ হইতে যদি অধিক বিলম্ব ঘটে, তবে লোকের মনে অবসাদ আসিয়া পড়ে।

বাঙ্গালার শাসকের কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিবার পর ছয় মাসের মধ্যে সার জন এণ্ডারসন বেকার সমস্যা সমাধানের

যেটুকু উপায় করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহার পরিচয় আমরা দিলাম। তাহাতে এই প্রবল সমস্যার আংশিক সমাধানও সম্ভব হইতে পারে না।

সেই জন্য আমরা বাঙ্গালা সরকারকে এ বিষয়ে বিশেষ-ভাবে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

আবার গোলটেবিল বৈঠক—গোল টেবিল বৈঠক ভারতের শাসন-পদ্ধতি নির্দ্ধারণের জন্য কল্পিত হইলেও তাহা যেন বার্ষিক বিড়ম্বনায় পরিণতি লাভ করিতেছে। মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের সময় ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার ফলাফল বিচার করিয়া প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জ্জন-প্রয়োজন স্থির করিবার জন্য দশ বৎসর পরে এক তদন্ত হইবে। সেই ব্যবস্থানুসারে বিলাতের সরকার সার জন সাইমনকে সভাপতি করিয়া এক কমিশন গঠন করিয়াছিলেন। সেই কমিশন সর্ব্বতোভাবে ভারতবাসিবর্জ্জিত হওয়ায় কংগ্রেস তাহা বর্জ্জন করেন। কমিশনের সদস্যগণ পর পর দুই বৎসর ভারতে আসিয়া তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার কোন অপ্রকাশিত কারণে সেই কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া ভারতবর্ষ হইতে ভারত সরকারের মনোনীত সদস্য ও বৃটিশ সরকারের মনোনীত সদস্যে গঠিত এক গোলটেবিল বৈঠকের অনুষ্ঠান করেন। প্রথম বৈঠকে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কোন প্রতিনিধি গমন করেন নাই। দ্বিতীয় বৈঠকের পূর্ব্বাহ্নে কংগ্রেসের কারারুদ্ধ নেতৃগণকে মুক্তি প্রদান করা হয় এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে মহাত্মা গান্ধী বৈঠকে যোগ দেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠকে সাইমন কমিশনের পর আরও দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এখন তৃতীয় পর্ব্ব। এ বার প্রতিনিধিসংখ্যা অল্প, অবশ্য যে সার তেজ বাহাদুর সপ্রু ও শ্রীমুকুন্দরামরাও জয়াকর বহুবার কংগ্রেসের সহিত সরকারের দূতের কায করিয়াছেন—তাঁহারা এ বার নিমন্ত্রিত হইয়া "গিরিজায়া যায় লো" বলিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ বার শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও মডারেট নেতা শ্রীযুক্ত চিরন্তূরী যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণিও মনোনীত হয়েন নাই।

বাঙ্গালা হইতে এ বার এক জন হিন্দু ও এক জন মুসলমান মনোনীত হইয়াছেন :—

(১) সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার।

(২) মিষ্টার আবদল হালিম গজনভী।

শুনা যায়, বাঙ্গালা হইতে দুই জন অ-মুসলমানের মনোনয়ন হইবে মনে করিয়া বাঙ্গালা সরকার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ের নাম মনোনয়ন জন্য পেশ করেন এবং বিজয়প্রসাদ "যৌথ দায়িত্ব" হেতু তাঁহার দুই জন মুসলমান সহমন্ত্রীর সহিত এক নৌকার যাত্রী হইলেও ভারত সরকার তাঁহাকেই মনোনীত করেন। শেষে পারিবারিক কারণে বিজয়প্রসাদের বিলাত যাত্রা অসম্ভব হইলে যখন যতীন্দ্রনাথকে যাইবার কথা বলা হয়, তখন তিনি যাইতে সম্মত হয়েন নাই। বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারেল সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার য়ুরোপেই ছিলেন। তাঁহাকেই মনোনীত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল মনোনয়নে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

কেবল বলিতে ইচ্ছা হয়, ইংরাজ যখন আয়র্লণ্ডের সহিত মীমাংসা করেন, তখন যে বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারী, ইংরাজের বিচারে দণ্ডিত ও ইংরাজের কারাগার হইতে পলায়িত মিষ্টার ডি ভ্যালেরাকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের জনগণের উপর মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব বিবেচনা করিলে কি বলা যায় না, তাঁহাকে বৈঠকে নিমন্ত্রণ করা সঙ্গত ছিল?

বাঙ্গালা হইতে যিনি মুসলমানদিগের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন, সেই মিষ্টার গজনভীর মনোনয়ন সম্বন্ধেও একটা জনরব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের গত ও গত পূর্ব্ব অধিবেশনে সরকার যে ভাবে রেল প্রভৃতি জন্য কয়লা ক্রয় করেন তাহার এবং রেলের জন্য সরকারের খাস কয়লার খনি রাখার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তাঁহাকে রেলওয়ে বোর্ডের চীফ মাইনিং এঞ্জিনিয়ারের কার্য্য-পদ্ধতিরও তীব্র সমালোচনা করিতে হইয়াছিল। সেই জন্যই নাকি ভারত সরকার তাঁহাতে মনোনীত করিবার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বিলাতে আগা খাঁ তাঁহাকে মনোনীত করিতে বলায় ভারত-সচিবের নির্দ্দেশে ভারত সরকার তাঁহাকে মনোনীত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয়, তবে এত দিন সরকারের সেবা করিবার পর আজ এই ব্যবহারে

গজনভী সাহেব অবশ্যই ভারতচন্দ্রের সেই কথা স্মরণ করিতেছেন :—

"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ ;
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।"

বোম্বাইয়ে ব্যবসায়ী সার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস মনোনীত হইয়াছেন বটে; কিন্তু তথায় বণিক সভা তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণে তাঁহার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিবার আয়োজন করায় তিনি আপনিই কবুল জবাব দিয়াছেন, তিনি বণিক সভার বা বণিক সভাসঙ্ঘের প্রতিনিধিরূপে বৈঠকে যাইতেছেন না—ব্যক্তিগত ভাবে যাইতেছেন। সুতরাং ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কোন কথা বলিবার অধিকার তাঁহার নাই।

যে দেশে দেশবাসীর অধিকার যত সঙ্কীর্ণ সে দেশে সামান্য অধিকার লাভ করিবার জন্য লোকের ব্যগ্রতা তত অধিক হয়। সেই জন্যই বোধ হয়, মনোনয়ন লাভ করিবার জন্য কেহ কেহ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক, এই বৈঠকেই যদি ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতির খসড়া রচিত হয়, তবে মনে করা যাইতে পারিবে—ইংরাজ এখন ভারতবাসীকে এইটুকু অধিকার দিতে প্রস্তুত, তাহার অধিক নহে। তাহা হইলে ভারতবাসী প্রস্তাব সম্বন্ধে তাহাদিগের মত প্রকাশ করিতে পারিবে ; এখন অনিশ্চিতের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করা সম্ভব নহে।

যে ভাবে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতেছে তাহাও কোন পক্ষের কল্যাণজনক বলা যায় না—কেন না, দেশে তাহাতে অসন্তোষের প্রসারবৃদ্ধি হইতেছে।

যদুনাথ মজুমদার—যশোহরের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ও কর্ম্মী রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর ৭৩ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। বয়সের হিসাবে তাঁহার স্বাস্থ্য যেরূপ ছিল, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে।

যদুনাথের কর্ম্মবহুল জীবনের বৈচিত্র্য অসাধারণ। তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য করেন, কাশ্মীরে রাজস্ব বিভাগে ও নেপালে চাকরী করেন, লাহোরে সর্দ্দার দয়াল সিং মাজিথিয়ার প্রতিষ্ঠিত 'ট্রিবিউন' পত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং শেষে যশোহরে ব্যবহারাজীব হইয়া যশ অর্জ্জন করেন।

এক সময় বাঙ্গালার রাজনীতিক্ষেত্রের সকল কায কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হয় নাই ; মফঃস্বলে নানাস্থানে ব্যবহারাজীবরা সে কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। মুর্শিদাবাদে রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর, নদীয়ায় তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকায় শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র রায়, ফরিদপুরে অম্বিকাচরণ মজুমদার, ময়মনসিংহে অনাথবন্ধু গুহ, চট্টগ্রামে যাত্রামোহন সেন, বর্দ্ধমানে রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর, মেদিনীপুরে রায় কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র বাহাদুর ও যশোহরে রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর দেশে রাজনীতিক কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিষয়ক প্রতিষ্ঠানেও কর্ত্তৃত্ব করিতেন—মিউনিসিপ্যালিটীতে ও জিলা বোর্ডে লোক তাঁহাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত। এ সকল কার্য্যেই যদুনাথ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

তদ্ভিন্ন তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়, ধর্ম্মসভা প্রবর্ত্তনে ও ব্যাঙ্ক পরিচালনেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি পঠদ্দশা হইতেই 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' প্রবন্ধাদি লিখিতেন। যশোহরে যাইয়া তিনি 'সম্মিলনী' নামক সংবাদপত্র প্রচার করেন এবং পরে দীর্ঘকাল 'হিন্দু পত্রিকা' পরিচালিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন সম্ভব হইয়াছিল। তিনি তাঁহার নানা কাযের মধ্যেও অধ্যায়নাভ্যাস ত্যাগ করেন নাই এবং বেদান্তে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভও করিয়াছিলেন।

নবাব সামশুল হুদা বঙ্গীয় শাসন পরিষদের সদস্য হইয়া জিলা বোর্ডে ম্যাজেষ্ট্রেটের স্থানে বেসরকারী সভাপতি নিয়োগের সঙ্কল্প করিয়া পরীক্ষারূপে বর্দ্ধমানে রাজা বনবিহারী কাপুর বাহাদুরকে ও মুর্শিদাবাদে রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরকে বোর্ডের সভাপতি মনোনীত করিতে চাহেন। রাজা বনবিহারী সে পদ গ্রহণে অসম্মতি জানান। বৈকুণ্ঠ বাবুর দ্বারা কার্য্য পরিচালিত হইলে প্রতিপন্ন হয়, বোর্ডে ম্যাজিষ্ট্রেটকেই সভাপতি করা প্রয়োজন নহে। তখন কয়টি জিলায় বোর্ডের সদস্যদিগকে সভাপতি নির্ব্বাচনের অধিকার প্রদান করা হয়। যশোহরে যদুনাথ বাবুই প্রথম বে-সরকারী সভাপতি।

যদুনাথ বাবু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য ছিলেন। ব্যবস্থা-পরিষদে তিনিই প্রথম ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর প্রস্তাব তাঁহার পরবর্ত্তী।

যদুনাথের সর্ব্বপ্রধান কায—বঙ্গদেশে হাজা মজা নদীর সংস্কার করিয়া দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা। নদীমাতৃক বাঙ্গালার পশ্চিমার্দ্ধের নদীসমূহের বৈশিষ্ট্য তিনি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভৈরবের সংস্কার করিয়া যশোহরের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সরকারের নিকট তিনি যে সব প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, সে সকল তাঁহার অসাধারণ ও আন্তরিক পরিশ্রমের ফল। তাঁহার চেষ্টাফলে সরকার সে বিষয়ে অবহিত হইয়া সংস্কার ও সম্ভাবনা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

যদুনাথের মৃত্যুতে বাঙ্গালা হইতে একজন সামাজিক নেতার ও অসাধারণ কর্ম্মীর বিরোভাব হইল আমরা তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখানুভব করিতেছি।

সার আলি ইমাম—পাটনার প্রসিদ্ধ নেতা সার আলি ইমাম সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। যে পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সে পরিবার বিদ্যা বুদ্ধি ও কর্ম্মক্ষমতার জন্য প্রসিদ্ধ। আরা জিলা স্কুলে ও পরে পাটনা কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি বিলাতে গমন করেন এবং ব্যারিষ্টার হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিলাতে অবস্থিতি কালেই তিনি ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দান করেন এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, গণেশ নারায়ণ চন্দ্রাবরকর ও সালেম রামস্বামী মুদেলিয়ার যখন বিলাতের লোককে ভারতবাসীর অভাব, অভিযোগ ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় জানাইতে গমন করেন, তখন যুবক আলি ইমাম তাঁহাদিগের সঙ্গে নানা স্থানে গিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া তিনি ব্যবহারাজীবের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন ও অল্পদিনের মধ্যেই যশ অর্জ্জন করেন। কিন্তু ব্যবহারাজীবের কার্য্যের বিরলপ্রাপ্ত অবসরকালে তিনি জনসাধারণের কার্য্য করিতেন। তিনি জিলা বোর্ডে ও মিউনিসিপ্যালিটীতে কায করেন ও ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ফেলো শ্রেণীভুক্ত করেন। তিনি বিহারে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে ও অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন এবং তাঁহার জাতীয় ভাব নানা কার্য্যে সপ্রকাশ ছিল।

পরলোকগত লর্ড (সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন) সিংহ বড়লাটের শাসন-পরিষদে প্রথম বে-সরকারী ভারতীয় সদস্য ছিলেন। তাঁহার পদত্যাগের পর সার আলি ইমাম সেই পদ লাভ করেন। বড়লাট লর্ড হার্ডিং তাঁহার মতে কিরূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, কাণপুরের মসজেদ ভাঙ্গা ব্যাপরে তাহা বুঝিতে পারা যায়। নাগরিক কাযের সুবিধার জন্য মুসলমানদিগের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া কাণপুরে একটি মসজেদের কতকাংশ ভাঙ্গা হয়। সার জেমস (পরে লর্ড) মেষ্টন তখন যুক্ত-প্রদেশের ছোটলাট। তিনি ইহার প্রতীকার করিতে অসম্মত হইয়া মসজেদ ভাঙ্গারই সমর্থন করেন। যে সকল মুসলমান মসজেদ ভাঙ্গার বিরুদ্ধ তাহাদিগকে উৎসাহিত ও সমর্থন করার অভিযোগে মামুদাবাদের রাজার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার প্রস্তাবও হয়। সার আলি ইমাম বড়লাটকে পরামর্শ দিয়া কাণপুরে লইয়া যান এবং তিনি তথায় মসজেদের ভগ্ন অংশের পুনর্গঠনের আদেশ দেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদের নিজাম শাসন-পরিষদ গঠিত করিয়া সার আলি ইমামকে তাহার সভাপতি নিযুক্ত করেন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় তিনি ভারত সরকারের মনোনয়নে জাতিসঙ্ঘের প্রথম অধিবেশনে গমন করেন। ফিরিয়া আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবার অল্পদিন পরেই তিনি কোন অপ্রকাশিত কারণে পদত্যাগ করেন। কিন্তু ইহার পর নিজাম আবার তাঁহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে বেরার প্রদেশ পুনঃপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতে।

সার আলি ইমাম মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যৌথ নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং ভারতে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য আন্দোলনও করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্ব-দল সম্মিলনে নিযুক্ত নেহরু কমিটীর রিপোর্টে অন্যতম স্বাক্ষর-কারী

তিনি যখন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখনও বিহার বাঙ্গলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। সেই জন্য তাঁহার ভ্রাতা হাসান

ইমাম সাহেবেরই মত বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং বাঙ্গালীর নিকট বিহারের ঋণ তিনি কখন অস্বীকার করিতেন না।

সার আলি ইমাম খণ্ড ভারতের পক্ষপাতী ছিলেন না। গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াও তিনি সেই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বিহারের নানারূপ উন্নতিকর কার্য্যে তিনি সহায় ছিলেন এবং আজ যখন সাম্প্রদায়িক মতভেদে ভারতবর্ষ বিপন্ন, তখন তাঁহার মত স্থিরবুদ্ধি জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতার অভাব যে বিশেষভাবে অনুভূত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চট্টগ্রাম—গত ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় কতকগুলি লোক পাহাড়তলীতে য়ুরোপীয়ান ইনষ্টিটিউটে সমবেত নরনারীদিগকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে। তাহারা রিভলভার ও বন্দুক হইতে গুলী ছুড়িয়া ও বোমা ফেলিয়া রাত্রির অন্ধকারে যেমন আসিয়াছিল, তেমনই পলাইয়া যায়। তাহাদিগের আক্রমণফলে এক জন য়ুরোপীয় মহিলার মৃত্যু হয় ও ৭ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলা আহত হন্। ঘটনাস্থলের অনতিদূরে ১ জন বাঙ্গালী যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া যায়—বিষপান তাহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর হইতে যে চট্টগ্রামে পুলিস ও সৈনিকরা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা নষ্ট করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে, তথায় যে এক দল বিভীষিকাপন্থী এইরূপে পুলিসের সতর্কতা ব্যর্থ করিয়া নৃশংস কায করিয়া গিয়াছে, ইহা যেমন বিস্ময়কর, এই নৃশংসতা-পরিচয় তেমনই বেদনার কারণ।

এই ঘটনার কয়দিন পরে (২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে) বাঙ্গলা সরকার এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাহাতে প্রকাশ—পাহাড়তলীতে সংঘটিত ঘটনার আয়োজন ও সংঘটন যে সেই অঞ্চলের বহু অধিবাসীর অজ্ঞাতে হইতে পারে, ইহা সরকার বিশ্বাস করেন না। সুতরাং যাঁহারা ইচ্ছা করিলে এই ঘটনার বিষয় সন্ধান দিতে পারেন, এমন লোক অবশ্যই আছেন। তাঁহাদিগের পক্ষে সরকারকে সংবাদ প্রদান করা বা সন্দেহ জ্ঞাপন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। যদি ১৫ই অক্টোবর তারিখের মধ্যে সরকারকে সেরূপ সংবাদ প্রদান করা না হয়, তবে যে সম্প্রদায় সে কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ বলিয়া বিবেচিত হইবেন, সরকার তাঁহাদিগকে জরিমানা দিতে বাধ্য করিবেন।

সরকার কোন্ সম্প্রদায় সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কয় দিন পরে ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে ও উক্তিতে তাহা প্রকাশ পায়। ৪ঠা অক্টোবর তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেট দুইটি ইস্তাহার জারি করেন। দুইটিই হিন্দু ভদ্রলোক যুবকদিগের জন্য উদ্দিষ্ট। একটিতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহাদিগের পক্ষে বাইসাইকেল ব্যবহার ও সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত গৃহত্যাগ নিষিদ্ধ হয় এবং অপরটিতে কতকগুলি লোককে ১ মাস কাল গৃহের বাহিরে যাইতে নিষেধ করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, তিনি যে সংবাদ পাইয়াছেন—যে সব পত্র প্রচারিত হইয়াছে ও গত ২ বৎসরের আদালতের রায়, এই তিনের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, চট্টগ্রামে বিপ্লবীদিগের প্রতিষ্ঠান আছে এবং হিন্দু ভদ্রলোক যুবকরাই তাহার সদস্য।

বলা বাহুল্য, ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে লোককে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার গভর্ণর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। এরূপ অবস্থায় নিরপরাধের পক্ষেও অসুবিধা ভোগ অনিবার্য্য; অর্থাৎ—

"নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?"

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ চট্টগ্রামবাসীরা মানিয়া চলিয়াছেন এবং তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাহারার জন্য বন্দোবস্তও করিয়াছেন। অনেকে আশা করিয়াছিলেন, ইহার পর সরকার অবশ্যই বুঝিবেন, মুষ্টিমেয় যুবকযুবতীর বিভীষিকাত্মক কার্য্যের সহিত চট্টগ্রামের অধিকাংশ লোকের সহানুভূতির লেশমাত্র নাই এবং তাঁহারা তাহাদিগের কাযের কোন সংবাদই রাখেন না।

কিন্তু সরকার হিন্দুদিগকেই ৮০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইবে—এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন। কেবল ঐ জরিমানা আদায় এখনই না হইয়া পরে হইবে।

আমরা আশা করি, সরকার বিবেচনা করিয়া এই জরিমানা আদায়ে বিরত থাকিবেন। কারণ, নিরপরাধের দণ্ড সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে আমরা একটি কথা বলিব—

চট্টগ্রামে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহাদের এই ঘটনার সংবাদ জানা যত সম্ভব—হিন্দুদিগের তাহা জানাও

কি তত সম্ভবই নহে? আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালা সরকার হিন্দুদিগকেই বিশেষভাবে দায়ী করিতেছেন। সেদিন বিলাতে এক প্রবন্ধে কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিস কমিশনার সার চার্লস টেগার্টও বলিয়াছেন—ভারতে বিভীষিকাপন্থীদিগের আন্দোলন হিন্দুদিগের আন্দোলন। সার চার্লসের অনুরক্ত ভক্তরাও কখন তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি যে হিন্দুদিগকে দোষ দিবার আগ্রহে শিখদিগকেও হিন্দু বলিয়াছেন, তাহাতে আমরা হাস্য সংবরণ করিতে না পারিলেও বিস্মিত হই নাই। বিলাতের রাজনীতিকরাও এখন বুঝিয়াছেন, শিখরা হিন্দু নহেন এবং সেই জন্যই বিলাতের প্রধান মন্ত্রী সাম্প্রদায়িক সমস্যার যে সমাধান করিয়াছিলেন, তাহাতে পঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভায় শিখদিগের জন্য স্বতন্ত্র ৩২ জন সদস্য নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সার চার্লসের মতের অসারতা তাঁহার উক্তির আর এক অংশেও সপ্রকাশ। তিনি বলিয়াছেন—বঙ্গদেশে প্রথম যখন বিভীষিকাত্মক আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখনই স্কুল ও কলেজসমূহ তাহার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। ইহাও যে তাঁহার মৌলিক গবেষণার ফল, তাহা নহে। কারণ, আমরা জানি, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতের 'টাইম্স' পত্রের "বিশেষ সংবাদদাতা" ভারতবর্ষ হইতে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সার চার্লস, বোধ হয়, তাহারই উপর বর্ণলেপ দিয়াছেন। তাঁহার বর্ণলেপ অতিরঞ্জনের। কেন না পুলিস যে বিপ্লবীদিগের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পূর্ব্বে পায় না—এমন কি চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে যাহারা লিপ্ত ছিল, তাহাদিগের দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষার সংবাদ কখন পুলিস পায় নাই, তাহার কৈফিয়তে তিনি বলিয়াছেন :—

"এ কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না যে, কিছুকাল স্থায়ী বিদ্যালয়ের মধ্যে এমন একটিও নাই যে, তাহাতে বিভীষিকাপন্থীদিগের প্রতিষ্ঠান নাই। এই বিভীষিকাপন্থীরা তাহাদিগের নেতৃগণের নির্দ্দেশে কায করে এবং সেই জন্যই এখন যাহারা হত্যা করে, পুলিস তাহাদিগের বিষয় অবগত থাকে না।"

এমন বিষম অত্যুক্তি কিন্তু সচরাচর লক্ষিত হয় না। কারণ বঙ্গদেশে সর্ব্ববিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬৭ হাজার ৬ শত ৪০টি। এই সকলের মধ্যে ৬৬ হাজার ৭টি বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষাবোর্ড বা শিক্ষাবিভাগের অধীন। এইরূপ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায় :—

কলেজ	৬৮
উচ্চ স্কুল	১,১৩৪
মধ্য স্কুল	১,৯৩৩
প্রাথমিক স্কুল	৫৯,৭০৭
মাদ্রাসা প্রভৃতি	৩,১৬৫

যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে হিসাব হইতে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও বাঙ্গালাদেশে প্রায় ৭ হাজার বিদ্যালয় থাকে। যদি ইহাদের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান থাকে, তবে বলিতে হয়, বঙ্গদেশে কেবল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহেই সেরূপ ৭ হাজার প্রতিষ্ঠান আছে। সকল বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা ২৭ লক্ষ ১২ হাজার ৫শত ৫৩ জন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ২০ লক্ষ ৫২ হাজার ৯ শত ৯২ বাদ দিলেও প্রায় ৭ লক্ষ ছাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহারা যদি বিভীষিকামতের প্রভাবে পতিত হইয়া থাকে, তবে তাহাদিগের মধ্যে কয় জন বিভীষিকাত্মক কায করিয়াছে?

সার চার্লসের উক্তিতে বুঝিতে হয়, নেতৃগণকে পুলিস জানে। যদি তাহা সত্য হইত, তবে নানা আইন থাকিতেও পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই কেন?

গোলটেবিল বৈঠকের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালার হিন্দুদিগের সম্বন্ধে সার চার্লস টেগার্টের এইরূপ উক্তির কারণ সহজেই অনুমান করা যায়।

বিভীষিকাপন্থীদিগের কায কেহই সমর্থন করেন না ; তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তাহারা মুষ্টিমেয় এবং তাহাদিগের কাযের জন্য হিন্দুসমাজকে দায়ী করা কখনই সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

মীমাংসা—বিলাতের প্রধান মন্ত্রী সাম্প্রদায়িক সমস্যার যেরূপ সমাধান করিয়াছিলেন, তাহাকে ভারতে জাতীয়তার বিরোধী বলিয়া তাহার প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্ধারণে এ দেশের তথাকথিত "অনুন্নত সম্প্রদায়কে" ব্যবস্থাপক সভায় স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনমণ্ডলী প্রদান করা হইয়াছিল। সেই

নির্দ্ধারণ প্রকাশকালেই প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন :—

"ভারত-শাসন আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যদি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আপনারা একমত হইয়া কোন নির্দ্ধারণ স্থির করিতে পারেন, তবে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব * * * * বৃটিশ সরকার আপনাদিগের নির্দ্ধারণের পরিবর্ত্তে তাহাই গ্রহণ করিবেন।"

মহাত্মা গান্ধী স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের বিরোধী। কিন্তু মুসলমানরা প্রথমাবধি তাহা দৃঢ়ভাবে দাবি করায় তিনি অবস্থা বিবেচনা করিয়া কেবল তাঁহাদিগের জন্য সেই ব্যবস্থায় সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অনুন্নত সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র অধিকার প্রদানের ফলে হিন্দুদিগকে সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত করা তাঁহার অনভিপ্রেত ছিল এবং সেই জন্য তিনি প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

তাহার ফলে হিন্দুদিগের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসা হইয়াছে এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রতিশ্রুতি অনুসারে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী তাহা মানিয়া লইয়াছেন। শুনিতে পাই, যে মীমাংসা হইয়াছে, তাহা প্রাদেশিক শাসকদিগকে জানাইয়া তবে সে সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা ভারত সরকারের অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু বিলাতের সরকার তাহা না করিয়া সেই মীমাংসাই মানিয়া লইয়াছেন।

অবশ্য ভাগবাটোয়ারা কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী কোন কথা বলেন নাই—তিনি কেবল চাহিয়াছিলেন, হিন্দু সমাজকে অখণ্ড রাখিতে। তাঁহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার আগ্রহে হিন্দু-সমাজের "অনুন্নত" সম্প্রদায়াতিরিক্ত সম্প্রদায়সমূহ বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, "অনুন্নত" সম্প্রদায় হইতে সেরূপ ভাবের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আমরা বাঙ্গালার কথাই বলিব। স্থির হইয়াছে, বাঙ্গালার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ২ শত ৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৩০ জন ঐ সম্প্রদায়ের লোক হইবেন। সাধারণ নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে ইঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন, কিন্তু ইঁহারা ৩০টি পদ পাইবেন। বাঙ্গালার সাধারণ নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে ৮০ জন নির্ব্বাচিত হইবেন। ৮০ জনের মধ্য হইতে ২ জন স্ত্রীলোক বাদ দিলে অবশিষ্ট ৭৮ জনের মধ্যে ৩০ জন "অনুন্নত" সম্প্রদায়ের লোক হইবেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্ধারণে ছিল—বঙ্গদেশে ইঁহাদিগের সংখ্যা ১০ হইতে অধিক হইবে না। সুতরাং বঙ্গদেশে প্রধান মন্ত্রী ইঁহাদিগকে যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন ইঁহারা তাহার তিন গুণ পাইলেন।

অথচ বাঙ্গালায় "অনুন্নত" সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কত? বাঙ্গালায় - হাইকোর্টের নজিরে—ব্রাহ্মণাতিরিক্ত আর সকল বর্ণই শূদ্র। তাহার পর কোন্ কোন্ সম্প্রদায় "অনুন্নত" এবং "অনুন্নত" বলিলে কি বুঝায়, কে তাহা স্থির করিয়া দিবে? বঙ্গদেশে সুবর্ণ-বণিক, সাহা, মাহিষ্য প্রভৃতিকে কখনই "অনুন্নত" বলা যায় না—তাঁহারাও নিশ্চয়ই আপনাদিগকে "অনুন্নত" বলিবেন না। যদি তাহাই হয়, তবে আর সকলের জন্য মাত্র ৪৮টি আসন রাখিয়া অবশিষ্ট ৩০টি আসন কাহাদিগকে প্রদান করা হইবে? যাঁহারা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা যে বাঙ্গালার সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালার প্রতি সুবিচার করিয়াছেন, ইহা আমরা বলিতে পারি না। যখন প্রদেশের অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ হইয়াছে, তখন বাঙ্গালার ব্যবস্থা যে তাহার অবস্থার উপযোগী করা সঙ্গত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলিবার কথা আরও আছে;—

(১) যদি সম্প্রদায় বিশেষের বা কতকগুলি সম্প্রদায়ের জন্য সদস্যসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া যৌথনির্ব্বাচন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে সে যৌথনির্ব্বাচন প্রকৃত যৌথ-নির্ব্বাচনের তুল্য হয় না। তাহা কতকটা পাথরের সোণার বাটির মত হয়।

(২) মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনাধিকার প্রদানের ফলে দেখা গিয়াছে, তাঁহারা সে অধিকার অস্থায়ী বলিয়া বিবেচনা না করিয়া স্থায়ী করিতেই ব্যস্ত হইয়াছেন। সুতরাং তথাকথিত "অনুন্নত" সম্প্রদায় যে অধিকার পাইয়াছেন, তাহা যে সহজে ত্যাগ করিতে চাহিবেন, এমন মনে হয় না।

(৩) এই ব্যবস্থাতেও হিন্দু-সমাজে সম্প্রদায়ভেদ স্বীকৃত হইল।

আবার দেখা যাইতেছে, এই রাজনীতিক ব্যাপারকে সমাজের অন্য ব্যাপারেও লইয়া যাইবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে সমাজের এক সম্প্রদায়ের মন তিক্ত হইয়া উঠিতেছে। যে সংস্কার কালবশে ও প্রয়োজনানুসারে ধীরে ধীরে হয়,

তাহাকে সহসা প্রবর্ত্তিত করিতে যাইলে বিষম বিক্ষোভ অনিবার্য্য। তাহাতে সমাজের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়।

কিন্তু এ কথাও অবশ্যস্বীকার্য্য যে, মীমাংসা সমাজের লোক সম্মিলিত হইয়া করায় তাহা অসাধারণ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে এবং রাজনীতিক প্রয়োজনেও তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন অবিবেচনার কায হইবে। বাঙ্গালার পক্ষে প্রথমে এ বিষয়ে তাহার বক্তব্য ব্যক্ত করাই প্রয়োজন ছিল।

মুসলমানদিগের সহিত মীমাংসার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার জন্য যাহাতে বাঙ্গালার মত যথাযথভাবে গৃহীত হয়, বাঙ্গালার পক্ষ হইতে সে প্রস্তাব হইয়াছিল এবং সেই জন্য মিলন বৈঠকের পূর্ব্বে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালা শতবর্ষ ধরিয়া ভারতে জাতিগঠনের ও জাতীয় ভাব প্রচারের জন্য সাগ্রহে ত্যাগস্বীকার করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালারা বাঙ্গালার সহিত যে দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা তাহাতেও বিচলিত হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গালা আরও ত্যাগস্বীকার করিতে সম্মত থাকিলেও ত্যাগের পরিমাণ অসীম হইলে তাহা দুর্ব্বহ ভার হইয়া দাঁড়ায়। বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্ধারণ অনুসারে বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় ২ শত ৫০ জন সদস্যের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ১ শত ১৯ জন হইবে। বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯ শত ২১ এবং মুসলমানের সংখ্যা ২ কোটি ৭৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৩ শত ২১ হিসাবেও হিন্দুর প্রতিনিধিসংখ্যা অল্প হইয়াছে। যদি য়ুরোপীয়দিগকে ১১টি শ্রমিকদিগকে ৮টি, বিশ্ববিদ্যালয়কে ২টি, জমীদারদিগকে ৫টি, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দিগকে ৪টি, দেশীয় খৃষ্টানদিগকে ২টি ও বণিকদিগকে ১৯টি আসন দিতে হয়, তবে সেইগুলি বাদ দিয়া অবশিষ্ট আসনগুলি হিন্দু ও মুসলমানে জনসংখ্যার অনুপাতে বিভক্ত করিলে তাহা গণতন্ত্রের হিসাবে অসঙ্গত না হইতে পারে—কারণ, যদি শিক্ষা ও করদানের হিসাব অনুসারে ভোট দিবার অধিকার নির্দ্দিষ্ট না হয়, তবে জনপ্রতি ভোটই হইবে।

কিন্তু মুসলমানরা যদি সমগ্র সভ্যসংখ্যার শতকরা ৫১টি লয়েন এবং অ-মুসলমানদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট শতকরা ৪৯টির মধ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত আসনগুলি দিতে হয়, তবে হিন্দুর প্রতিনিধি-সংখ্যা যে অকারণ অল্প হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যৌথনির্ব্বাচনমণ্ডলীতে মুসলমানদিগের জন্য নির্দ্দিষ্টসংখ্যক আসন থাকিলে বাঙ্গালায় যে হিন্দুদিগের কোন সুবিধা হইবে, তাহা মনে না হইলেও ভবিষ্যতের জন্য আশায় হিন্দুরা তাহাতে সম্মত হইবেন বলিয়া মনে হয়।

মুসলমানদিগের সহিত মীমাংসার চেষ্টায় কি ফল হয়, দেখিবার জন্য আমরা উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম।

ফোটোগ্রাফি

(পূর্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপরিমল গোস্বামী

পূর্ব্বে প্লেটের স্পীড (speed) বা দ্রুত আলোক-ছাপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক কম ছিল। তখন ভিজা প্লেটে (wet plate) ফোটো তুলিতে হইত। ভিজা প্লেটে স্পীড বাড়ানো সম্ভব হয় নাই। ক্যামেরা হাতে ধরিয়া ফোটো তুলিতে গেলে ১/২৫ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত এক্‌স্‌পোজার নির্ভয়ে দেওয়া যায়, কাজেই কম স্পীড বিশিষ্ট প্লেটে ফোটো তুলিতে ক্যামেরা হাতে ধরিয়া তুলিবার প্রশ্নই আসে না। দ্রুত এক্‌স্‌পোজার দিবার উপযুক্ত শাটার এবং বেশি স্পীড বিশিষ্ট শুষ্ক প্লেট (dry plate) আবিষ্কার হইবার পর হইতে ক্যামেরা হাতে ধরিয়া ফোটো তুলিতে আর কোনো কষ্টই রহিল না।

হ্যাণ্ড ক্যামেরায় ফোকাসিং স্কেল ও ভিউ-ফাইণ্ডার

হ্যাণ্ড ক্যামেরায় সব চেয়ে অসুবিধাজনক ব্যাপার ফোকাস্ করা। হাতে ধরিয়া ফোকাস করিবার পর প্লেট-হোল্ডার ক্যামেরায় পরাইতে গেলে, ক্যামেরা একচুল না সরাইয়া ঠিক এক জায়গায় স্থির করিয়া রাখা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। আর ফোকাসিং'এর পর ক্যামেরা একটু নড়িয়া গেলেই ছবির কম্পোজিশান অর্থাৎ কোনো সাবজেক্টের যতটা অংশ আমি তুলিতে চাই তাহার পরিমাণ এবং গঠন-সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যাইবে। অবশ্য হ্যাণ্ড-ক্যামেরাও ষ্ট্যাণ্ডে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু তাহা হইলে এক আকৃতির ক্ষুদ্রতা ছাড়া উহাতে ত আর কোনোই বিশেষত্ব থাকে না।

কিন্তু অসুবিধা দূর করা হইয়াছে। প্রথমত ক্যামেরার সঙ্গে ভিউ-ফাইণ্ডার (view-finder বা দৃশ্য-প্রদর্শক) লাগাইয়া কম্পোজিশান ঠিক রাখিবার ব্যবস্থা, দ্বিতীয়ত ফোকাসিং-স্কেল লাগাইয়া গ্রাউণ্ড-গ্লাস ছাড়া ফোকাস্ করিবার ব্যবস্থা, এই দুই প্রকার ব্যবস্থাতে হ্যাণ্ড-ক্যামেরা ব্যবহারকারীর আর কোন দুঃখ নাই। ভিউ ফাইণ্ডার নানা রকমের আছে। বক্স-ক্যামেরা ও সাধারণ হ্যাণ্ড-ক্যামেরায় যে ফাইণ্ডার থাকে তাহা হয় আয়না, না হয় তারের তৈরী। অনেক ক্যামেরায় এই দুই রকম ফাইণ্ডারই থাকে। বক্স-ক্যামেরার দুইটি আয়নার ফাইণ্ডার তাহার গায়ে বসানো থাকে। একটি খাড়া ছবির জন্য, আর একটি আড় ছবির জন্য। ফোল্ডিং হ্যাণ্ড-ক্যামেরায় একটি থাকে। ক্যামেরা আড় করিলে ফাইণ্ডারটি আড় করিয়া ঘুরাইয়া লইতে হয়। তারের ফাইণ্ডার ক্যামেরার সামনে উপরের দিকে অথবা পাশে থাকে।

১নং চিত্র।

২নং চিত্র।

ক্যামেরার সামনের দিকে উপরে অথবা পাশে তারের ফাইণ্ডার লাগানো আছে। প্রথমটিতে আয়না এবং তার দুই প্রকার ফাইণ্ডারই রহিয়াছে। (বাক্স-ক্যামেরা)

আয়নার ফাইণ্ডারের উপরে তাকাইয়া দেখিতে হয়, তারের ফাইণ্ডারের ভিতর দিয়া দেখিতে হয়। ইহা ছাড়া

প্রেস্ ক্যামেরায় লেন্সের চতুষ্কোণ-ফাইণ্ডার লাগানো থাকে, ইহাতে সমস্ত কম্পোজিশানটি খুব মনোরম দেখায়। ইহাও সোজাসুজি দেখিতে হয়।

হ্যাণ্ড-ক্যামেরার পক্ষে ভিউ-ফাইণ্ডার অপরিহার্য্য। প্রেস-ক্যামেরার পক্ষে বিশেষ করিয়া সোজা দেখিবার ফাইণ্ডার চাই, কারণ তাহাতে প্রায়ই ক্যামেরা, ফোটো-গ্রাফারের মাথার সমান উঁচু করিয়া ধরিয়া ফোটো তুলিতে হয়। ক্যামেরা এত উঁচুতে থাকিলে ক্যামেরার গায়ে যে আয়নার ফাইণ্ডার থাকে তাহা দেখা যায় না।

প্রেস ক্যামেরার চতুষ্কোণ লেন্সের ফাইণ্ডার। পিছনে যে ক চিহ্নিত অংশটি খাড়া হইয়া আছে ঐ খানে চোখ রাখিয়া ফাইণ্ডারের কেন্দ্রে দেখিতে হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভিউ-ফাইণ্ডারের সঙ্গে ফোকাসিং'-এর কোনো সম্বন্ধ নাই। ফোকাসিং ঠিক করিবার জন্য ফোকাসিং স্কেল (focussing scale) ক্যামেরার তল-ভূমিতে লাগোনো থাকে। ফোল্ডিং ক্যামেরার সম্মুখ ভাগ সামনের দিকে টানিতে থাকিলে প্রথমে যেখানে আটকাইয়া যায় সামনে আর টানা যায় না, ফোকাসিং স্কেলে সেই চিহ্নের নাম ইনফিনিটি এবং যে কৌশলে আটকায় তাহার নাম ইনফিনিটি ক্যাচ (infinity catch), ঐখান হইতে ঐ ক্যাচটি টিপিয়া সরাইয়া দিলে তখন আবার ফোকাসিং স্কেলের অন্যান্য চিহ্নের উপরে আনা যায়। ইনফিনিটির পরে যথাক্রমে ২৫, ১৫, ৬, ৩ বা কিছু কম বেশি নম্বর দেওয়া থাকে। সাব্জেক্ট যত ফীট দূরে থাকিবে তত নম্বরের উপরে ক্যামেরার সম্মুখ ভাগ টানিয়া আনিলেই সেই সাবজেক্টের ফোকাস নির্ভুল হইবে। এইরূপ স্কেলে ফোকাস্ করিতে গ্রাউণ্ড-গ্লাস দরকার হয় না।

খুব কাছের জিনিস ফোকাস্ করিতে বিশেষ যত্ন লইতে হয়। ৩ ফীট দূরে যে জিনিসটির ফোকাস করা হইল তাহাকে যদি দুই ফীট পিছনে সরাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ফোকাসে অনেক তফাৎ হইয়া যায়। কিন্তু ২০ ফীট দূরের কোনো জিনিস ফোকাস্ করিয়া যদি তাহাকে দুই ফীট পশ্চাতে সরানো যায় তাহা হইলে ফোকাসে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা যাইবে না। এমনি করিতে করিতে এমন একটা স্থান পাওয়া যায় যেখানে কোনো জিনিস ফোকাস্ করিয়া সেখান হইতে যত দূরেই তাহাকে সরানো যাক্, ফোকাসিং'এর কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না। এই স্থান হইতে ইনফিনিটি আরম্ভ।

ডায়াফ্রামের ব্যবহার

লেন্সের মধ্যে তাহার প্রশস্ততা কমাইবার এবং বাড়াইবার যে কৌশল আছে তাহার নাম লেন্সের ডায়াফ্রাম (diaphragm)। ইহাকে ষ্টপ বা অ্যাপার্চার ও (stop, aperture) বলা হয়। এই কৌশলটি লেন্সের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ ইহার উপরেই এক্স্পোজার এবং ফোকাসিং'এর গভীরতা (depth of focus) এবং ডেফিনিশান (definition) বা সমগ্র ছবির স্পষ্টতা তীক্ষ্ণ-রূপে ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা অনেকখানি নির্ভর করে।

ঘরের বাহিরে ফোটো তুলিতে বাহিরের আলোর উপরে নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু সে আলোর জোর প্রতি মুহূর্ত্তে বাড়িতে এবং কমিতে পারে। আকাশে ঘন মেঘ থকিলে এক রকম, পাতলা মেঘ থাকিলে এক রকম, সকালে, দুপুরে বিকালে বিভিন্ন রকম। সাব্জেক্টের উজ্জ্বলতা এবং মলিনতা হিসাবেও এক্স্পোজারের বিভিন্নতা করিতে হইবে। মনে করা যাক্ একটি শাদা ইমারতের ফোটো বেলা ১১ টায় রৌদ্রের ভিতর তুলিতে হইবে। আমার যে ক্যামেরা আছে তাহার প্রশস্ততা বা অ্যাপার্চার ৪·৫, কিন্তু লেন্সে ইহা কমাইবার কোনো কৌশল নাই। এখন হিসাব করিয়া দেখা গেল আমাকে ৪·৫ অ্যাপার্চারে ঐ ফোটোটি তুলিতে এক্স্-পোজার দিতে হইবে ১/৫০০ সেকেণ্ড। কিন্তু লেন্সে যে কম্পুর শাটার লাগানো আছে তাহাতে ১/২৫০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত দেওয়া চলে না। কাজেই আমার ক্যামেরায় যদি ঐ ফোটো তুলিতে যাই তাহা হইলে এক্স্পোজার অতিরিক্ত (over exposure) হইয়া ছবি খারাপ হইয়া যাইবে। এই অবস্থায়

অ্যাপার্চার কমাইবার কৌশল থাকিলে কি হইত দেখা যাক্। ডায়াফ্রাম বা অ্যাপার্চার কমাইবার একটা মাপ আছে। ৪·৫ হইতে ৬·৮, তথা হইতে ৮, তথা হইতে ১১, তথা হইতে ১৬ এইরূপ মাত্রায় ক্রমশঃ কমাইতে পারা যায়। ৪·৫ নম্বরে যদি ১/১০০ সেকেণ্ড এক্স্‌পোজার দরকার হয়, তবে তাহার পরবর্ত্তী নম্বর ৬·৮এ কমাইয়া লইলে ১/৫০ এক্স্‌পোজার লাগে অর্থাৎ দ্বিগুণ হইয়া যায়। আরো কমাইয়া পরবর্ত্তী ৮ নম্বরে লইলে এক্স্‌পোজার ১/২৫ সেকেণ্ড দরকার হইবে, ১১তে লইলে ১/১২ সেকেণ্ড লাগিবে। আমার ক্যামেরাতে যদি অ্যাপার্চার এইরূপ কমাইবার বন্দোবস্ত থাকিত, তাহা হইলে ঐ ইমারতের ছবি তোলা সম্ভব হইত। কারণ আমার শাটারে যখন ১/১০০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত এক্স্‌পোজার দেওয়া যায়, তখন অ্যাপার্চার কমাইয়া ১/২৫ সেকেণ্ডে এক্স্‌পোজারের উপযুক্ত করিয়া লইলেই চলিত।

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে পরে বলা যাইবে।

জনপ্রিয়তা

ক্যামেরা হাতে ধরিয়া ছবি তোলা সম্ভব হইবার পর হইতেই পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে ইহার ব্যবহার সৌখীন মেয়ে পুরুষদের মধ্যে এত দুর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্যামেরা হাতে ধরিয়া ফোটো তোলার সকল রকম বাধা দূর হওয়াতে, এবং বেশির ভাগ লোক হ্যাণ্ড-ক্যামেরা ব্যবহার করাতে ইহার সঙ্গে ব্যবহারের জন্য কতনা উৎকৃষ্ট মালমসলার নিত্য নূতন দাবী হইয়াছে, এবং প্রস্তুত-কারকগণ কত না বিভিন্ন প্রকার সাজ সরঞ্জাম, মালমসলা প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বসাধারণের দাবী মিটাইয়াছেন। ফোটোগ্রাফির অগ্রগতি এবং উন্নতি অনেকটা হ্যাণ্ড-ক্যামেরা-ব্যবহার-কারীদের দাবীতেই সংসাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে হ্যাণ্ড-ক্যামেরার সঙ্গে একমাত্র প্লেটই ব্যবহৃত হইত, কিন্তু সুবিধার খাতিরে সেলুলয়েডের ফিল্ম হ্যাণ্ড-ক্যামেরার জন্যই প্রথম প্রস্তুত হয়। ফিল্ম দিনের আলোতে ক্যামেরায় পরাইয়া ব্যবহার করিবার কৌশলও হ্যাণ্ডক্যামেরার খাতিরে আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। প্রশস্ত ডায়াফ্রাম বিশিষ্ট লেন্সে প্রশস্ত-কোণের (wide angle) ফল পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল, কিন্তু সেই অসুবিধাও এই ক্যামেরার খাতিরে দূর হইয়াছে।

ফিল্ম

নেগেটিব হাল্কা হইবে, জড়াইয়া রাখা যাইবে, ভাঙিবেনা, এই সব সুবিধা চিন্তা করিয়া অ্যামেরিকার একজন প্লেট প্রস্তুত-কারক প্রথম কোডাক ক্যামেরা প্রস্তুত করেন, যাহাতে এই ধরণের নেগেটিব ব্যবহার করা চলে। ইঁহার নাম মিঃ জর্জ ঈস্‌ট্‌ম্যান। ইনিই সুবিখ্যাত কোডাক ক্যামেরার আবিষ্কারক।

মিঃ জর্জ ঈস্‌ট্‌ম্যান

(সম্প্রতি ইনি ৭৭ বৎসর বয়সে আত্মহত্যা করিয়াছেন)

ইনি প্রথমে কাগজের নেগেটিব, পরে জড়াইয়া রাখিবার উপযুক্ত ফিল্ম (roll film) নেগেটিব প্রস্তুত করেন। ফিল্ম, নেগেটিব হিসাবে সফলতা লাভ করিবার পর প্লেটের মাপে কাটা ফিল্মও (cut film) প্রস্তুত হয়, এবং অদ্যাবধি ইহার ব্যবহার চলিতেছে। সেলুলয়েড ফিল্মে নেগেটিব প্রস্তুত হইয়াছে, এবং সেই কারণেই ক্যামেরা আরো জনপ্রিয় হইতে পারিয়াছে। হ্যাণ্ড-ক্যামেরার সাইজ নানা প্রকার। ৫½×৩½ (প্লেট), ৫½×৩¼ (প্লেট বা রোল-ফিল্ম) ইহাকে পোস্‌ট্‌কার্ড সাইজ কহে। ৪¼×৩¼ (¼, কোয়ার্টার সাইজ) ৫×৪, ৩½×২½ (প্লেট), ৩¼×২¼ (ফিল্ম), ১⅝×২½ অথবা ভেস্‌ট্‌ পকেট। অল্পদিন হইল ইহা অপেক্ষাও ছোট সাইজ (ষ্ট্যাম্প সাইজ) জনপ্রিয় হইয়াছে। আর একটি সাইজ সব চেয়ে বেশী বিক্রয় হইতেছে। সেটি জার্ম্মান কোয়ার্টার সাইজ বা ৯×১২ সেন্টিমিটার সাইজ।

ইহাদের মধ্যে দুইটি মোটামুটি বিভাগ আছে। কতকগুলি ভাঁজ করা যায় (অর্থাৎ folding pattern) আর

কতকগুলি ভাঁজ করা যায় না। সাধারণত বাক্স (box form) ক্যামেরাগুলিতে বেলোজ থাকেনা, সুতরাং ভাঁজ করাও যায় না। বাক্স ক্যামেরাগুলিতে ফোকাস বাঁধা থাকে। ছোট ক্যামেরার ছোট ছবিগুলি ভাল হইলে অনেক সময়ই তাহা হইতে বড় ছবি (enlargement) করিবার প্রয়োজন হয়। সেজন্য ছোট ক্যামেরার লেন্সগুলি খুব ভাল হওয়া দরকার। লেন্স যদি নির্ভুলভাবে প্রস্তুত না হয়, (অল্প দামের মেনিস্কাস্ লেন্স সমূহ, যাহা শস্তা ক্যামেরায় ব্যবহৃত হয়, তাহা নির্ভুল নহে) তাহা হইলে ছবি তুলিবার ষ্টপ্ ছোট করিয়া লইতে হয়। সেই জন্যই অল্পদামের একক-লেন্স যাহা সাত আট টাকা দামের ক্যামেরায় থাকে তাহার ষ্টপ্ ১১ এর কম থাকে না।

বাঁধা ফোকাস (fixed-focus) ক্যামেরা

যে সকল শস্তা ক্যামেরায় ফোকাস্ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া থাকে তাহাতে খাটো বা শর্ট-ফোকাস্ লেন্স ব্যবহৃত হয়। লেন্সের ফোকাস্ বা ফোকাসের দৈর্ঘ্য (focal length) যত কম হইবে ততই কোনো নির্দ্দিষ্ট আকারের ফোটো তুলিতে হইলে ক্যামেরাকে ফোটো-বস্তুর (subject) অত্যন্ত কাছে লইয়া যাইতে হয়। ইহাতে যাহার ছবি উঠিবে তাহার চেহারা অত্যন্ত বিকৃত হইয়া পড়ে। মানুষের ছবি হইলে তাহার নাক লেন্সের সব চেয়ে কাছে থাকার দরুণ তাহার আকৃতি বেমানান ভাবে বড় দেখায়। সমতল কাগজের উপর একটি মানুষের মূর্ত্তির উঁচু নীচু সমস্ত অংশের প্রকৃত আভাস ফুটাইয়া তুলিতে হইলে লেন্স অত্যন্ত কাছে লইয়া ছবি তুলিলে কিছুতেই হইতে পারে না। সেই জন্য এই সব লেন্সে মানুষের ছবি অর্থাৎ পোর্ট্রেট তুলিবার জন্য পৃথক সহকারী লেন্স (portrait attachment) লাগাইয়া লইতে হয়। এই অ্যাটাচ্‌মেণ্ট লাগাইয়া লইলে ক্যামেরা অপেক্ষাকৃত দূরে রাখিয়াই বড় ছবি তোলা হয়।

সাত আট টাকা দামের ক্যামেরায় প্রথম শিক্ষার্থী ফোটো তুলিবার মূল তত্ত্বটি মোটামুটি আয়ত্ত করিতে পারেন, কিন্তু ইহা দ্বারা প্রথম শ্রেণীর কাজ পাওয়া দুঃসাধ্য। তবে এই ক্যামেরায় যতদূর ভাল ছবি তোলা সম্ভব তাহার সবটুকু বিশেষ যত্ন লইয়া এই ক্যামেরা হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিলে অনেক সময়েই খুব উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। প্রথম শিক্ষার্থীকে আমাদের উপদেশ এই যে তাঁহার পক্ষে এইরূপ অল্প দামের ক্যামেরাই প্রথমে ব্যবহার করা ভাল। ইহার কতখানি সুবিধা আর কতখানি অসুবিধা তাহা নিজের চেষ্টায় হাতে কলমে জানিবার একটি মূল্য আছে। বর্ত্তমানে ফোটোগ্রাফার হইতে গেলে পূর্ব্বকার মত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়া শিখিয়া তাহা অন্ধভাবে মানিয়া গেলেই চলে না, অভিজ্ঞতা যতদিকে, এবং যত বিস্তৃত ভাবে লাভ করা যায় ততই ভাল।

ফোকাসিং

শস্তা দামের বাঁধা-ফোকাস্ ক্যামেরায় ফোকাসিং সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিবার দরকার হয় না। কেননা উহা এরূপভাবে প্রস্তুত যে ছয় সাত ফীট দূর হইতে 'ইনফিনিটি' পর্য্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রের জিনিসই প্রায় এক সঙ্গে ফোকাস্ হয়। ছোট ছেলে মেয়েরাও ফোটো তুলিতে উৎসাহিত হইবে এরূপ উদ্দেশ্যেই ফিক্স্‌ড্ ফোকাস্ বা বাঁধা-ফোকাস্ ক্যামেরা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য ক্যামেরায় ফোকাস্ করিয়া তবে ফোটো তুলিতে হয়। এরোপ্লেন হইতে ফোটো তুলিবার জন্য যে ক্যামেরা ব্যবহৃত হয় তাহাও ফিক্স্‌ড্-ফোকাস। কারণ তাহার সব ছবিই এত দূর হইতে তুলিতে হয় যে এক মাত্র ইনফিনিটিতে ফোকাস্ বাঁধা থাকিলেই কাজ চলিয়া যায়। কোনো জিনিস ফোকাস্ করিয়া ফোটো তুলিতে কিছু সময় নষ্ট হয়, ইহা ছাড়া ইহার আর কোনো অসুবিধা নাই। কাহারো কাহারো ধারণা ফোটোগ্রাফিতে ফোকাসিংই সব চেয়ে কঠিন। ইহা সত্য নহে। কারণ, ইহার জন্য আন্দাজ করিতেও হয় না, গণনা করিতেও হয় না,—কেবল মাত্র চোখে দেখিয়া ঠিক করিতে হয় ফোকাসিং ঠিক হইল কি না। ক্যামেরা খুলিয়া গ্রাউণ্ড-গ্লাসে কোনো জিনিসের প্রতিচ্ছবি দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে যে (ক্যামেরা বিশেষে তাহার সম্মুখভাগ অথবা পশ্চাৎভাগ সামনে অথবা পিছনে অথবা উভয় উপায়েই টানিতে এবং ঠেলিতে হয়) সেই প্রতিচ্ছবি অস্পষ্ট অবস্থা হইতে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠে, এবং তাহার পর আবার অস্পষ্ট হইতে থাকে। ক্যামেরা খুলিয়া প্রথম অবস্থা হইতে শেষ পর্য্যন্ত গ্রাউণ্ড-গ্লাস হইতে লেন্সের দূরত্ব ক্রমশঃ বাড়াইলে প্রতিচ্ছবিটির যতগুলি অবস্থান্তর হয়, তাহার মধ্যে

একটিবার মাত্র সে সবচেয়ে স্পষ্ট হইয়া থাকে। প্রতিচ্ছবির এই স্পষ্টতম অবস্থাটাকেই নির্ভুল ফোকাসিং'এর অবস্থা বলা হয়। ফোকাসিংএর সময় ক্যামেরার সম্মুখভাগ অথবা পশ্চাৎভাগ আস্তে আস্তে সরাইতে হয়। ছবি খানিকটা স্পষ্ট হইলেই যদি কেহ মনে করিয়া বসেন ফোকাসিং ঠিক হইয়াছে, তাহা হইলে এই ভুল সংশোধনের উপায় কি ?

ছবি খানিকটা স্পষ্ট হইলেই ফোকাসিং থামাইয়া দেওয়া উচিত নহে। আরো সরাইয়া দেখিতে হয় আরো স্পষ্ট হইল কিনা। এইরূপ করিতে করিতে এমন একটি অবস্থায় আসিয়া পৌঁছে যাহার পরে গেলেই ছবি আবার অস্পষ্ট হইতে আরম্ভ করে। অস্পষ্ট হইতে আরম্ভ করিলেই আবার পিছনে সরাইয়া স্পষ্টতম জায়গাটিতে আনিয়া সরানো থামাইয়া দিতে হইবে। ইহা এতই সহজ যে যে-কোনো লোক মাত্র একবার চেষ্টা করিলেই শিখিতে পারিবেন।

ফোকাসিং'এর সময় আরো কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হয়। যে জিনিষের ছবি তুলিতে হইবে (মানুষ অথবা অন্য কিছু) তাহাকে ফোকাসিং করিবার সময় তাহার আশ-পাশের সমস্ত জায়গাটার দিকে নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইহা গ্রাউণ্ড-গ্লাসের উপর হইতেও দেখা উচিত, কেননা অনেক সময় সামান্য একটা অবান্তর, অবাঞ্ছনীয় জিনিষের প্রতিচ্ছায়া ছবিতে আসিতেছে কিনা, তাহা সেই জিনিষের দিকে তাকাইয়া বুঝা যায় না। অনেক সময় সামান্য একটা তুচ্ছ জিনিষের ফোটো আসল জিনিষের ফোটোর সঙ্গে উঠিয়া গিয়া সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়। এই দিকে খুব সযত্ন দৃষ্টি রাখা উচিত।

ফোকাসিং'এর সঙ্গে লেন্সের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে তাহা বিস্তারিত বলিতে গেলে লেন্সের অন্তত আংশিক পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এখন যাহা বলা যাইতেছে সেই কথাগুলি মনে রাখিলেই চলিবে, কারণ লেন্স সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে পরে বলিতেই হইবে। লেন্সের ফোকাল লেঙ্থ, কাভারিং পাওয়ার, ডেফিনিশান, ডেপ্থ (focal-length covering power, definition, depth) প্রভৃতির এত বৈচিত্র্য আছে যে একই ফোকাসিং'এর নিয়ম সকল লেন্সের পক্ষে খাটেনা। ফোকাল লেঙ্থের মাপ লেন্সের উপরেই লেখা থাকে। লেন্সের ফোকাল লেঙ্থ যত কম, তাহার ডেপ্থ বা গভীরতা তত বেশী। লেন্সের গভীরতা বেশী থাকা ভাল কি কম থাকা ভাল, তাহা কোন ধরণের কাজের জন্য সেই লেন্স ব্যবহৃত হইবে তাহার উপর নির্ভর করে। অ্যাপার্চারের বা ষ্টপের উপরেও ডেপ্থের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। ডায়াফ্রাম f ৪·৫ এ যদি ১৫ ফীট দূরের গাছটি ফোকাস করা হইয়া থাকে, এবং এরূপ অবস্থায় যদি ২০ ও ২৫ ফীট দূরের গাছগুলি ফোকাসে না আসিয়া থাকে তাহা হইলে ডায়াফ্রাম কমাইয়া f ১১ কিংবা f ১৬ তে লইলে সমস্তই একসঙ্গে ফোকাসে আসিবে। অর্থাৎ লেন্সের ডায়াফ্রাম বা ষ্টপ কমাইলে তাহার ডেপথ বৃদ্ধি পায়। খাটো-ফোকাস্ (short-focus) লেন্সের ডেপ্থ অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া মানুষের ছবি অর্থাৎ পোর্ট্রেট তুলিবার পক্ষে দীর্ঘ ফোকাস (long-focus) লেন্সেই উৎকৃষ্ট। শর্ট ফোকাস্ বা খাটো ফোকাস্ লেন্সে বুক পর্য্যন্ত (head & bust) ছবি তুলিতে হইতে ক্যামেরা সমেত লেন্স একেবারে নাকের কাছে লইয়া যাইতে হয়। ইহাতে পরিপ্রেক্ষিতের (perspective) ভুল হয়। নাকটি অস্বাভাবিক বড় হইয়া পড়ে। এরূপ লেন্সে পূরা মানুষের ফোটো লইবার সময় তাহার পা'টা যদি সামনের দিকে বেশী অগ্রসর থাকে, তাহা হইলে তাহাও অদ্ভুত রকম বড় হইয়া পড়িবে। শর্ট-ফোকাস্ লেন্সে আরো একটি প্রধান অসুবিধা এই যে যাহার ফোটো তোলা হইতেছে তাহাকে ছাড়া তাহার পশ্চাতে যত কিছু আছে সমস্তই অতি স্পষ্টভাবে ছবিতে আসে। ভাল ছবি ইহাই এড়াইবার চেষ্টা করে। পশ্চাৎ-ভূমি (back-ground) যত অস্পষ্ট হইবে ততই আসল বস্তুটি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে। তাহা না হইলে চারিধারের সমস্ত জিনিষই যদি এক সঙ্গে কড়া এবং স্পষ্ট হয় তবে দর্শকের দৃষ্টি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, এবং অজ্ঞাতসারে চোখ এমন পীড়িত হয় যে আসল বস্তুটিকে ভাল লাগাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়।

গ্রুপ ফোটো, জনতা বা জনসমষ্টির ফোটো লইতে হইলে লেন্সের গভীরতা চাই। কারণ, ডেপ্থ বা গভীরতা না থাকিলে একই সঙ্গে তিন চারি অথবা বেশী শ্রেণীর ফোকাস্ হয় না। সম্মুখের শ্রেণীকে ফোকাস্ করিলে, মধ্যম অথবা পশ্চাতের শ্রেণী ফোকাসের বাহিরে পড়ে। বড় গ্রুপ

সাধারণতঃ *f* ১৬ বা *f* ২২ ডায়াফ্রাম বা অ্যাপার্চারে তুলিতে হয়।

অ্যাপার্চার সম্পূর্ণ খোলা থাকা অবস্থায় প্লেটের মধ্যবর্ত্তী অংশ ছাড়াও চারি পাশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত ছবিটি একই রকম স্পষ্ট ভাবে গ্রাউণ্ডগ্লাসে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। এইরূপ এক কোণ হইতে আর এক কোণ পর্য্যন্ত সমস্ত ছবিখানি যদি সমভাবে ফোকাসে আসে তাহা হইলে লেন্সের কাভারিং পাওয়ার (covering power) বা আবরণী ক্ষমতা চমৎকার বলিতে হইবে। কাভারিং পাওয়ারের অর্থ, খোলা আপার্চারে লেন্সের ভিতর দিয়া যে প্রতিচ্ছবি গ্রাউণ্ড-গ্লাসে গিয়া পড়িতেছে, তাহা নিখুঁৎ স্পষ্ট ভাবে এবং একই রকম সুস্পষ্ট ভাবে গ্রাউণ্ড-গ্লাসের কতটা ক্ষেত্র অধিকার করিল তাহা। যদি দেখা যায়, মাঝখানে অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে খুব স্পষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ধারের দিকে অস্পষ্ট আছে, তাহা হইলে জানা যাইবে লেন্সের কাভারিং পাওয়ার কম। এইরূপ স্পষ্ট প্রতিফলনের নাম ডেফিনিশান (definition) বা সূক্ষ্ম তথ্য ফুটাইবার ক্ষমতা। প্লেটে বা গ্রাউণ্ড-গ্লাসে এই ডেফিনিশান দিবার ক্ষেত্রের বিস্তৃতির হ্রাস-বৃদ্ধিকেই যথাক্রমে কাভারিং পাওয়ারের হ্রাস বৃদ্ধি বলা হইয়া থাকে। ডেফিনিশান কিছু কম থাকিলেও যদি ছবি একই রকম স্পষ্ট ভাবে প্লেটের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয় তাহা হইলেও বলিতে হইবে লেন্সের কাভারিং পাওয়ার আছে, যদিও ডেফিনিশান নাই। পিন-ছিদ্রের ডেপ্‌থ্‌ খুব বেশি কাভারিং পাওয়ার নিখুঁৎ, কিন্তু ডেফিনিশানের অভাব। অর্থাৎ পিন-ছিদ্র হইতে প্রাপ্ত ছবির কোনো অংশই প্রখর স্পষ্ট নয়।

কাভারিং পাওয়ার কম থাকিলেও অ্যাপার্চার কমাইয়া উহা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাই করিতে হয়। কারুশিল্প, বিজ্ঞান-বিষয়ক চিত্র বা কোনো ঐতিহাসিক চিত্র তুলিতে হইলে লেন্সের উৎকৃষ্ট কাভারিং পাওয়ার এবং ডেফিনিশান দিবার ক্ষমতা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই ধরণের কাজের জন্য অপেক্ষাকৃত কম অ্যাপার্চার বিশিষ্ট প্রশস্ত-কোণ (wide angle) লেন্স ব্যবহার করিতে হয়, এবং এরূপ চিত্রে রিটাচিং retouching বা অন্য কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা নিষেধ। প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট তুলিবার সময় চিত্রকর যেমন মনের মত আলো-ছায়া পাতের দ্বারা চেহারার সৌন্দর্য্য বাড়াইবার চেষ্টা করেন, ইতিহাস কিংবা বিজ্ঞান বিষয়ক চিত্রে এরূপ করা বিধি নয়। এখানেও সুবিধা মত আলো-ছায়ার সাহায্য লইতে হয়, কিন্তু তাহা সাবজেক্টের স্বকীয় আকৃতিটিই স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু।

ফোকাসিং'এর সময় আর একটি জিনিস মনে রাখিতে হইবে। ছবি বড় করিয়া তুলিবার লোভে ক্যামেরা সাব-জেক্টের অত্যন্ত কাছে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। ক্যাবিনেট বা ½ সাইজ লেন্সে ½ সাইজ বাস্ট্ বা বুক পর্য্যন্ত ছবি, অথবা কেবল মুখের ছবি তোলা চলে না। অবশ্য ফোকাস্‌ও ঠিক হয়, এক্‌স্‌পোজারও ঠিক মত দেওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে মুখের আকৃতির ডৌল নষ্ট হইয়া ফ্ল্যাট হইতে বাধ্য। মুখের যে জীবন্ত ভাব অপেক্ষাকৃত দূর হইতে দেখিলে পাওয়া যায়,—সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে সম্মিলিত সৌন্দর্য্য এবং সুষমা, নাক হইতে চোখের, চোখ হইতে কাণের যে দূরত্ব এবং উহাদের আপেক্ষিক পরিমাণ যাহা একটু দূর হইতে দেখিলে সুন্দর ভাবে দেখা যায়, লেন্স অত্যন্ত কাছে আনিলে তাহা আর থাকে না। মুখ অযথা চ্যাপ্টা মনে হয়, এবং যে প্রত্যঙ্গটি লেন্সের সব চেয়ে কাছে থাকে তাহা অকারণ স্ফীত এবং বড় হইয়া পড়ে।

কেবল মাত্র কপি-ওয়ার্ক বা ছবি হইতে ছবি তুলিবার সময় বা কোনো জিনিসের কোনো একটা বিশেষ অংশ বড় করিয়া তুলিবার জন্য ক্যামেরা সাবজেক্টের কাছে লওয়ায় বাধা নাই।

দেখিতে হইবে ফোকাসিং'এর সময় ক্যামেরার তলভূমি (base-board) ডাহিনে কিম্বা বামে হেলিয়া না যায়। লেভেল্ বা সমতলত্ব ঠিক করিবার জন্য হ্যাণ্ড-ক্যামেরায় স্পিরিট-লেভেল সংযুক্ত থকে। কাঁচ দিয়া আবৃত একটি ছোটো পাত্রে স্পিরিট ভর্ত্তি করিয়া তাহাতে বিন্দু পরিমাণ স্পিরিট কম রাখিলেই সেখানে স্বভাবতই বায়ু থাকিয়া যায়। ক্যামেরা হাতে ধরিলে সেই বায়ু-বিন্দু যদি সেই পাত্রের কেন্দ্রে থাকে তখন জানা যায়, ক্যামেরা ঠিক লেভেলে আছে। ডাইনে সরিয়া গেলে বুঝিতে হইবে ক্যামেরা বাঁয়ে হেলিয়াছে,—এবং বাঁয়ে গেলে বুঝিতে হইবে ডাইনে হেলিয়াছে। ক্যামেরায়

পশ্চাৎ দিক উঁচু হইলে এই বায়ু-বিন্দু পিছনের দিকে সরিয়া আসে, এবং সম্মুখ ভাগ উঁচু হইলে সম্মুখে সরিয়া যায়। ক্যামেরা সম্মুখে এবং পশ্চাতে উঁচু নীচু অল্প হইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না,—অনেক সময় সামান্য একটু উঁচু-নীচু করিতেই হয়। কিন্তু ডাইনে বামে কাৎ হইলে ভয়ানক ক্ষতি হইবে।

ফোকাসিং'এ যেটুকু সময় লাগে তাহা পূরা দিতে হইবে। তাড়াতাড়ি করিলে পরে অনর্থক অনুতাপ করিতে হয়। অবশ্য ফোকাসিং'এর সময় যত দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক যথা সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে তত দিকে দৃষ্টি দিবার নিপুণতা এবং অভ্যাস আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে। ফোকাসিং'এ অত্যন্ত বেশী সময় লইলে লোকে অযথা বিরক্ত হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ক্যামেরা অল্প উঁচু কিম্বা নীচু করা আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু ইহার একটা সীমা আছে। স্ট্যাণ্ড সম্পূর্ণ খুলিয়া ক্যামেরা তাহার উপরে বসানো হইয়াছে। কিন্তু সাব্জেক্ট বসিয়াছে নীচু আসনে। এরূপ অবস্থায় তাহার ছবি ফোকাসিং গ্লাসে পাওয়াই দায়। কারণ ক্যামেরার লেন্স সাব্জেক্টের মাথা হইতে অনেক উপরে আছে। এরূপ অবস্থায় ক্যামেরার সম্মুখ ভাগ নীচু করিয়া যদি ফোটো তোলা যায় তাহা হইলে চেহারা বিকৃত দেখাইবে। ইহার বিপরীত হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। সাব্জেক্ট হইতে ক্যামেরা যদি নীচুতে থাকে তাহা হইলেও চেহারা বিকৃত হইবে। ক্যামেরা অনেকটা দূরে থাকিলে ইহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। নিকটস্থ সাব্জেক্ট, লেন্স হইতে উঁচুতে থাকিলে ক্যামেরা উঁচু করিয়া দাঁড় করাইবার ব্যবস্থা করা দরকার, এবং নীচুতে থাকিলে স্ট্যাণ্ড খাটো করিয়া ক্যামেরা নীচু করা উচিত। ইহা করা খুবই সহজ। ক্যামেরার সম্মুখ বা পশ্চাৎ ভাগ কোনো কারণেই অত্যধিক উঁচু বা নীচু করা বিধেয় নহে; পোর্ট্রেট তুলিতে সব সময়েই লক্ষ্য রাখা উচিত যাহাতে ক্যামেরা সাবজেক্ট হইতে যথা সম্ভব দূরে থাকে। সেই জন্য অন্ততঃ ½ বা ফুল সাইজ বাস্ট্ তুলিতে ১২×১০ সাইজের উপযুক্ত লেন্স ব্যবহার করা উচিত, এবং ⅓ সাইজ বাস্ট তুলিতে অন্তত ½ সাইজের উপযুক্ত লেন্স ব্যবহার করা উচিত। পার্থক্য আরো বেশি থাকিলে ফল আরো ভাল হয়।

ফোক্যাল লেঙ্থ্
(Focal Length)

ক্যামেরা ভাঁজ করা অবস্থায় লেন্স গ্রাউণ্ড-গ্লাসে প্রায় সংলগ্ন হইয়া থাকে। তারপর ফোকাস্ করিবার জন্য ক্যামেরা খুলিলে লেন্স সমেত সম্মুখ ভাগ ক্রমশ গ্রাউণ্ড-গ্লাস হইতে দূরে টানিতে হয়, অথবা পশ্চাৎ ভাগ পিছনে টানিতে হয়। এইরূপে লেন্স হইতে গ্রাউণ্ড-গ্লাসের অবস্থান ক্রমশঃ দূরে সরাইয়া লইতে সর্ব্বপ্রথম যে জিনিসের ফোকাস্ হয় তাহা ইন্‌ফিনিটিতে অবস্থিত।—অর্থাৎ ইন্‌ফিনিটি-ফোকাসই প্রথমে হয়। ক্যামেরার সম্মুখে অবস্থিত ছয় ফীট দূরের বস্তুর যে ফোকাস্, দশ ফীট দূরের বস্তুর সে ফোকাস্ নহে। কাছে অবস্থিত জিনিস সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ফোকাসিং দরকার হয়। কিন্তু আরো কিছু দূরে এমন একটি অবস্থা পাওয়া যায় যেখান হইতে আর পৃথক ফোকাসিং'এর দরকার হয় না। একশত ফীট দূরে অবস্থিত কোনো বস্তুকে ফোকাস্ করিলে এক হাজার ফীট দূরের জিনিসও একই সঙ্গে ফোকাসে আসিবে। এইরূপে যে দূরত্ব হইতে দিক্‌চক্র-রেখা পর্য্যন্ত সমস্ত জিনিস একই ফোকাসিং'এ পাওয়া যায়, সেই দূরত্ব হইতে দিগন্ত অবধি সমস্ত ক্ষেত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে ইনফিনিটি। ইন্‌ফিনিটি শব্দটির অর্থ "অসীম।" এই ইন্‌ফিনিটি ফোকাস সকলের আগে হয়। ক্যামেরা খুলিয়া যখন প্রথম এই ইনফিনিটি ফোকাসে আসিল, ঠিক তখন লেন্স হইতে গ্রাউণ্ড-গ্লাস যত ইঞ্চি দূরে থাকে তত ইঞ্চির মাপই সেই ক্যামেরায় যে লেন্স আছে তাহার ফোকাল লেঙ্থ বা ফোকাস। এই দৈর্ঘ্য মোটামুটি লেন্সের মধ্যক্ষেত্র হইতে মাপা হইয়া থাকে। ক্যামেরায় যে সাইজের প্লেট বা ফিল্ম ব্যবহৃত হয় তাহার যত দৈর্ঘ্য, সেই ক্যামেরার লেন্সের ফোকাল লেঙ্থ তাহার চেয়ে বেশী হওয়া চাই। ফুল সাইজ বা ½ প্লেটের দৈর্ঘ্য ৮½×৬½ ইঞ্চি। এই মাপের ছবির জন্য যে লেন্স ব্যবহৃত হইবে তাহার ফোকাল লেঙ্থ ঐ প্লেটের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ৮½ ইঞ্চির বেশী হওয়া চাই। কম হইলে ছবি ঐ প্লেটের প্রান্তভাগে অস্পষ্ট হইবে। অবশ্য শর্ট-ফোকাস লেন্সের অ্যাপার্চার বা ডায়াফ্রাম যদি অত্যন্ত কমাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে কাভারিং পাওয়ার বৃদ্ধি পায়। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে অসুবিধা অনেক। লেন্সের অ্যাপার্চার বা প্রশস্ততা কমাইয়া দিলে এক্সপোজার বেশী লাগে এবং তাহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফোটো তোলা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

হল-ঘরে পার্টির ছবি তুলিতে শর্ট-ফোকাস্ এবং প্রশস্ত কোণ (wide angle) লেন্স ব্যবহার করিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

সূর্য্যের আদি ও অন্ত

—শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

আধুনিকতম বিজ্ঞান শাস্ত্রের মতে সূর্য্যই পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগুলির জননী এবং অন্য এক অজ্ঞাতকুলশীল বৃহত্তর সূর্য্য বা তারা তাহাদের জনক। যে নব্যতম মত বা theory অনুসারে এই সিদ্ধান্ত স্থির হয়েছে তার নাম tidal theory। এই theoryর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা উক্ত সিদ্ধান্তের সত্যতা বুঝতে পারবেন। এই প্রবন্ধে সূর্য্যের আকার, আয়তন, গঠন প্রকৃতি প্রভৃতির পরিচয় দিতে চাই।

সূর্য্য-বিজ্ঞানের একটা বিশেষ মূল্য এই যে,—সূর্য্যকে জানলে আমরা বিশ্বের ও ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য তারকাদেরও আকৃতি-প্রকৃতির পরিচয় পাই; কেননা আমাদের সূর্য্য অন্যান্য তারকাদের সঙ্গে একই পদার্থ। সূর্য্য নিজেই একটি তারকা এবং তারকাগুলি এক একটি সূর্য্য; তফাৎ শুধু আয়তনে, তেজে ও দীপ্তিতে। আমাদের সূর্য্য একটী মাঝারি আয়তনের প্রৌঢ়বয়স্ক, হীনতেজ তারকা মাত্র।

তারা হিসাবে সূর্য্য ছোটখাটো হলেও পৃথিবীবাসীর কাছে সূর্য্যের মূল্য অন্য কারণে অনেক বেশী। সূর্য্য গ্রহদের মাতৃস্থানীয়; জীবের জীবলীলার মূলে সূর্য্যের উত্তাপ ও আলোক। শুধু জীবের প্রাণশক্তি নয়, চেতনশক্তিরও মূলে সূর্য্যের তেজ ও আলোক। প্রাচীন ঋষিদের গায়ত্রী মন্ত্রে সূর্য্য-দেবতার এই মহিমা ও শক্তিরই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গদেবস্য ধীমহি, ধীয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ—পূজনীয় সূর্য্যদেবের যে তেজশক্তি জীবের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ করেন তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি।

জীবের চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তির মূলে সূর্য্যের উত্তাপ ও আলোক কারণরূপে বর্ত্তমান থাকায় এই যে গভীর সত্যটী প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা ধরতে পেরেছিলেন এটী আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত।

বিজ্ঞান শাস্ত্রের মতে পদার্থ দু' রকম। জড় পদার্থ ও জৈব বা প্রাণীপদার্থ; প্রাণীপদার্থের শাস্ত্রীয় নাম protoplasm (জীবপঙ্ক)।

এই প্রাণীপদার্থে কি উদ্ভিদ্ কি জীব সবারই দেহ তৈরী। যে কয়টী মূল জড় পদার্থ পরমাণুসংযোগে জীবপঙ্ক তৈরী হয় তার মধ্যে carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান; এই কয়টী মূল জড় দ্রব্য এক অদৃশ্য অজ্ঞাত উপায়ে মিলে মিশে যায়, যার ফলে প্রাণধর্ম্ম দেখা দেয়, এই মিলন-মিশ্রণের মূলে সূর্য্যের উত্তাপ ও আলোক অবশ্যম্ভাবী রূপে বর্ত্তমান। সৌরতাপালোক না থাকলে জড়ের এই রহস্যময় মিলনে প্রাণ-পরিণতি কখনোই ঘটতো না।

শুধু যে প্রাণপদার্থের উৎপত্তি ঘটিয়েই সূর্য্যশক্তি বিরত হলেন তা নয়; প্রাণীমাত্রেরই জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অস্তিত্ব সূর্য্যালোক ও উত্তাপের উপর নির্ভর করে। জীবের স্থিতি ও বৃদ্ধি পনের আনা মাত্রায় সূর্য্যতেজের দ্বারা ঘটিত হয়। দু'দিন সূর্য্যের আলোক-উত্তাপ না পেলে কি উদ্ভিদ্ কি জীব কিরূপ নির্জীব ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে সবাই লক্ষ্য করেছেন।

গ্রহদের উৎপত্তি, গতি ও স্থিতির সঙ্গে সূর্য্যের কতটা নিকট সম্বন্ধ তা জ্যোতিষ শাস্ত্র ভাল ভাবেই জানিয়েছে।

জ্যোতির্ব্বিদের কাছে সূর্য্যের বিশেষ এক কারণে খুব বেশী আদর। সূর্য্য যে অসংখ্য তারাদের মধ্যে একটী তারা এ কথা সবাই এখন জানেন। আমাদের কাছ হতে দূরত্ব সব তারা হতে সূর্য্যেরই কম; মোটে ৯ কোটী ৩০ লক্ষ মাইল। এর পরই সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী যে তারা (alpha proxima) তার দূরত্ব ৬ লক্ষ কোটী মাইল। আরও দূরবর্ত্তী এবং বিশ্বের প্রান্তবর্ত্তী যে সব তারা, তাদের দূরত্ব ধারণার অতীত। এই সব দূরবর্ত্তী তারাদের আকার প্রকার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ একেবারেই অসম্ভব; তবে যে এ জ্ঞান সম্ভব হয়েছে তা শুধু সূর্য্যের কৃপায়; সূর্য্য খুবই নিকটবর্ত্তী তারা বলেই তার দেহের ভিতর ও বাহির পরীক্ষণ সাধ্য হয়েছে; সমুদ্রকূলের অসংখ্য বালুকণার কাছের কণাটীও যে পদার্থে তৈরী, শত যোজন দূরবর্ত্তী বালুকণা-টাও সেই পদার্থে তৈরী; এই অনুমানে বিশ্বস্থ সমস্ত তারকারই দেহ-পদার্থ ও গঠন একই প্রকারের। সূর্য্যের দেহজ্ঞান হতে তাই অন্যান্য দূরবর্ত্তী তারাদের দেহজ্ঞান সম্ভব হয়েছে বলেই জ্যোতির্ব্বিদরা সূর্য্যের কাছে বিশেষরূপে ঋণী।

সূর্য্য-দেহের আয়তন

সৌর-পরিবারের জননীস্থানীয় যে জ্যোতির্গোলক তা নিশ্চয়ই আয়তনে খুবই বড় হবে। পৃথিবী-গ্রহটীর ব্যাস-রেখাই ৮০০০ মাইল, এ হতেই বোঝা যায় যে ভূগোলকটী কত বড় পিণ্ড; কিন্তু এরূপ ১৩,১০,১৩০টা ভূপিণ্ডকে তাল পাকিয়ে একটা পিণ্ডে পরিণত করলে তবে সূর্য্যদেহের সমান হবে। সূর্য্যের ব্যাসরেখা ৮,৬৫,০০০ মাইল। এই শুনে যখন ভাবছি সূর্য্যগোলকটা কি প্রকাণ্ড তখনি জ্যোতিষশাস্ত্র মনে পড়িয়ে দিচ্ছে, এতো সামান্য তুচ্ছ। এমন সব ভীমকায় সূর্য্য আছেন যাঁদের তুলনায় সূর্য্য আবার হিমালয়ের তুলনায় উই-ঢিপি মাত্র। কালপুরুষ রাশির শিরোমণি অত্যুজ্জ্বল যে betelgeue (আর্দ্রা) তারকা, তার দেহায়তন এতই বিশাল যে এককোটী সূর্য্যপিণ্ডকে একত্র করলে আর্দ্রার দেহের সমান হবে। বৃশ্চিক রাশিস্থ যে antaros তারকা (জ্যেষ্ঠা), সেটী আবার আর্দ্রা হতেও বহুগুণে বড়!

সূর্য্য-দেহে বস্তু-মাত্রা

সূর্য্য-দেহ আয়তনে ১০ লক্ষাধিক ভূগোলকের সমান হলেও সে দেহে পদার্থরাশি যে সেই অনুপাতে ১০ লক্ষ গুণ বেশী তা নয়; ৩ লক্ষ ৩২ হাজারটা ভূপিণ্ডে যে পরিমাণ পদার্থ থাকতে পারে সূর্য্যদেহে তা-ই আছে; সোজা কথায় ক্ষুদ্র অথচ নিরেট ভূপিণ্ডের তুলনায় সূর্য্যপিণ্ডটী একটা ফাঁপা, বৃহৎকায় বাষ্পগোলক মাত্র। পদার্থরাশি ভূদেহে যতটা ঘন (dense) ভাবে সজ্জিত সূর্য্য-দেহে তার ঘনত্ব সিকি-মাত্রা। এই ঘনত্ব সূর্য্যদেহের উপরিভাগ হ'তে অভ্যন্তর কেন্দ্রাভিমুখে ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে; গর্ভকেন্দ্রস্থ সৌরপদার্থ খুব ঠাসা (dense), কিন্তু উপরভাগে তা খুব পাতলা, (tenuous) লঘু; খুব সম্ভব সূর্য্যের গর্ভভাগটা বায়বীয় (gaseous)। আয়তন ও বস্তুর ঘনত্বের মধ্যে এত উল্টা সম্বন্ধ।

আর্দ্রা তারকা সূর্য্য হতে আয়তনে আড়াই কোটী গুণ বেশী, কিন্তু পদার্থ রাশি তাতে মাত্র সূর্য্য হ'তে ৩৫ গুণ বেশী। সূর্য্যের দেহপদার্থ যত ঘন তার চেয়েও আর্দ্রা তারার পদার্থ কম ঘন, সহজাবস্থার বাতাস যতটা ঘন তার চেয়ে হাজার গুণ কম ঘন আর্দ্রার দেহপদার্থ। অদ্ভুত এই আর্দ্রা তারকা! পরিচিত যত তারকা আছে তাদের মধ্যে আর্দ্রা সব চেয়ে বড় অথচ তার দেহ-পদার্থের ঘনত্ব বাতাস হ'তেও হাজার গুণ কম।

আর্দ্রার ব্যাস রেখা ৩০ কোটী মাইল। কি ধারণাতীত বিশাল আয়তন! সূর্য্য হ'তে পৃথিবী ৯ কোটী ৩০ লক্ষ মাইল দূরে বিদ্যমান; মঙ্গল গ্রহ ১৪ কোটী ১৫ লক্ষ মাইল দূরে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সূর্য্যদেব মঙ্গল ও পৃথিবী দুই গ্রহকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে আর্দ্রার দেহ-গহ্বরে বিরাজ করতে পারে!

তারকারাজ আর্দ্রার তুলনায় সূর্য্য একটী 'বামন' বা বাঁটুল তারা, কিন্তু পৃথিব্যাদি গ্রহের তুলনায় সূর্য্য অতিকায় জ্যোতিষ্ক। প্রায় ১০ লক্ষাধিক মাইল ব্যাস-রেখাযুক্ত তারা আকাশবক্ষে অনেক আছে।

সূর্য্যেরও পৃথিবীর মতই আহ্নিক গতি (rotation) আছে; সূর্য্যদেহে সৌরকলঙ্ক (sunspot) হতে বোঝা গেছে যে সূর্য্যের আহ্নিক গতি আছে। এই কলঙ্ক চিহ্নগুলা নিয়মিত ভাবে দেখা দেয়, এবং স্থান পরিবর্ত্তন করতে করতে অদৃশ্য হয়। Rotation বা আবর্ত্তন ২৫ দিন ৪ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে সম্পন্ন হয়।

সূর্য্য পৃথিবী হ'তে প্রায় ৯ কোটী ৩০ লক্ষ মাইল দূরে বিদ্যমান। এই দূরত্ব আমাদের সাধারণ বোধে এতই বেশী যে এর অঙ্কটা আমাদের মনে কোনো আঁচড়ই কাটে না। দু'একটা তুলনা দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করা মন্দ নয়। আলোর তরঙ্গ সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল গতিবেগে ছোটে; এই বেগে সূর্য্য হ'তে আলো পৃথিবীতে এসে পৌছায় ৮ মিনিটে। পৃথিবীর বিষুবরেখা (equator) প্রায় ২৪০০০ মাইল; এই বিষুবরেখা ধরে ভূমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করা যায় ৬০ দিনে। যদি কোন লোক জন্মমুহূর্ত্তের পর হতেই যাত্রা করেন সূর্য্যমণ্ডলে পৌছুতে সোজা পথ ধ'রে, তা হলে তার যাত্রা শেষ হবে ৬৫০ বৎসর পরে। দেহের স্নায়ু-(nerve)-সূত্র ধরে অনুভূতি-(sensation)-প্রবাহ সেকেণ্ডে ১০০ ফুট বেগে ছোটে; এখন মনে করুন একটী লোক পৃথিবী হতে তার হাত বাড়িয়ে আঙ্গুল দিয়ে সূর্য্যকে স্পর্শ করলেন; কতক্ষণে প্রবাহের অনুভূতি তার জ্ঞানগোচর হবে? ১৬০ বছর পরে!

সূর্য্যদেহের গঠন

পৃথিবীর পাষাণ ও জলময় দেহকে আবৃত ক'রে যেমন একটা বায়ুমণ্ডল আছে সৌরদেহপিণ্ডকে আবৃত করেও তেমনি একটা বায়ুমণ্ডল আছে, যার গভীরতা ৮০০০ মাইল ; এ গভীরতা এত যে সমগ্র ভূগোলকটা এই উপরের বায়ুমণ্ডলেই ডুবে থাক্‌তে পারে। সূর্য্যের 'বায়ুমণ্ডল' বলতে পাঠক যেন না বোঝেন পৃথিবীর oxygen এবং nitrogen মিশ্রিত যে গ্যাস তাই ; তবে সূর্য্যের বায়ুমণ্ডল বল্‌তে বুঝতে হবে নানাবিধ হাল্‌কা গ্যাসের স্তর। অবশ্য এই স্তরগুলার পর পর সজ্জা সব স্থানে অভগ্ন ও অমিশ্র অবস্থায় নাই ; কেননা সূর্য্যের পৃষ্ঠদেশে প্রচণ্ড উত্তাপ হেতু ভয়াবহ ঝড়-ঝাপ্‌টা সর্ব্বদাই উঠছে ; সব উপরের স্তরটা calcium ধাতুর গ্যাসের স্তর ; এরই নীচের স্তর হচ্ছে hydrogen গ্যাসের, তার নীচের স্তর barium ধাতুর গ্যাস। তারও নীচে অন্যান্য মূল পদার্থের গ্যাসের স্তর, গুরু ও লঘু ভেদে নীচে উপরে সাজানো। পৃথিবীতে আমরা বিরানব্বই জাতীয় মূল পদার্থের সন্ধান পেয়েছি ; দুই একটা বোধ হয় এতাবৎ অনাবিষ্কৃত আছে। এই বিরানব্বই জাতীয় পদার্থের মধ্যে প্রায় চল্লিশ জাতীয় পদার্থ সূর্য্য-দেহে আছে, spectroscope যন্ত্রযোগে তা ধরা পড়েছে। খুব সম্ভব পৃথিবীর দেহ যেসব মূল পদার্থে তৈরী তা সবই সূর্য্য-দেহে আছে, কেননা তাদের দুজনের সম্বন্ধ মা ও সন্তানের। সূর্য্য হলেন 'মা' আর পৃথিবী তার কন্যা।

সূর্য্যের এই বায়ুমণ্ডলকে বলা হয় photosphere বা 'আলোকমণ্ডল'। এই বায়ুমণ্ডলের অবস্থাটা কেমন? যেন অত্যুত্তপ্ত বিশাল পরমাণুর সাগর ; এই সব পরমাণু মুহূর্ত্ত স্থির নয়, প্রচণ্ড বেগে ইতস্তত ধাবমান,—পরস্পরে ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি চল্‌ছেই অনবরত। এই প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কির ফলে পরমাণুর ইলেকট্রন চক্র হতে ইলেকট্রন খ'সে দশ দিকে ঠিক্‌রে ছুটে পালাচ্ছে ধারণাতীত বেগে। নব্য পরমাণুবাদ যাঁদের জানা আছে তাঁরা জানেন যে আধুনিক মতের এটম বা পরমাণু একটা জটীল বস্তু ; একটা মধ্য-কণাকে আবেষ্টন ক'রে এক বা এক্বাধিক তড়িৎকণা প্রচণ্ড বেগে প্রদক্ষিণ করছে ; এটমের গঠনটা সৌরজগতেরই অণুতম সংস্করণ। মধ্যস্থ তড়িৎ-কণাকে বলে প্রটন, প্রদক্ষিণকারী অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা-গুলাকে বলে ইলেকট্রন। প্রটনের বস্তুত্ব (mass) আর ইলেকট্রনদের সংখ্যার উপর মূল-পদার্থভেদ নির্ভর করে।

ভূদেহে ৯২টা মূল-পদার্থের মধ্যে radium জাতীয় গোটা সাত আট অতি ভারী ভাস্বর (radioactive) পদার্থ ছাড়া বাকী সব গুলার পরমাণু স্থির ও স্থাণু ; অর্থাৎ তাদের গঠন-চক্র হ'তে electron খসে যায় না। কিন্তু প্রচণ্ড তপ্ত তারকা-দেহে পরমাণুদের এ অবস্থা নয়। সূর্য্য-গর্ভের কথা তো আলাদা, উপরিভাগেই তাপ এত প্রচণ্ড যে, যে-সব গ্যাসে তার atmosphere গঠিত তাদের পরমাণুদের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ইলেকট্রন খসে যাচ্ছে। সে সব পদার্থ-পরমাণুর দেহ হতে দু' একটা electron খসে গেছে, তারা সব খোঁড়া বা খঞ্জ পরমাণু, ইংরাজীতে তাদের বৈজ্ঞানিক নাম ion. আসলে তা হলে সৌর বায়ুমণ্ডল (যার নাম photosphere) এই সব ion ও কক্ষ্যচ্যুত electronএরই বিক্ষুব্ধ সাগর। গভীর গর্ভদেশে উৎপন্ন প্রবল ইথর-ঝটিকা উপরের বায়ুমণ্ডলকে প্রবল তেজে বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত ক'রে, এই সব স্তর ভেদ ক'রে বাইরে মুক্ত হয়ে আসবার জন্য ব্যগ্র। কিছু কিছু ইথর-তরঙ্গ এই বহিরাবরণ ভেদ ক'রে, মুক্তিলাভান্তে শূন্য পথ মহা বেগে অতিক্রম করে আমাদের ধরাবক্ষে এসে আলোক ও উত্তাপ রূপে পৌঁছুচ্ছে।

এই সূর্য্য-গর্ভোত্থিত বিমুক্ত ইথর-তরঙ্গচ্ছটাই 'বরণীয় সবিতার ভর্গ বা জ্যোতি', যা জীবদের ধীশক্তি উদ্বুদ্ধ করছে, যা পাষাণময়ী ধরণীর বুকে প্রাণপদ্ম ফুটিয়ে তুলেছে।

সূর্য্যের অভ্যন্তর-ভাগ

সম্ভবতঃ সমগ্র সৌরগোলকটাই কেন্দ্র হতে বাহির পর্য্যন্ত গ্যাসময়। ভিতরে গর্ভস্থানে পদার্থ গ্যাস হলেও যেচাপে তা ঠাসা, তার মাত্রা খুব বেশী ; তা ছাড়া তার তাপমাত্রা এত ভয়ঙ্কর যে ধারণাও করা যায় না। সূর্য্য-দেহের উত্তাপও প্রচণ্ড ; উপরি-ভাগেরই দেহতাপ ৬০০০ c ডিগ্রি ; এই তাপ ভিতর দিকে ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে কেন্দ্রভাগে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটী ডিগ্রি c.—এ উত্তাপের মাত্রার ভীষণত্ব কি কল্পনাতেও আসে? যত তাপমাত্রার বৃদ্ধি ততই ইলেকট্রন বা অণু পরমাণুর গতি-বেগের তীব্রতা। সাধারণ তাপমাত্রায় একটা ঘরের বাতাসের অণুগুলা সেকেণ্ডে ৫৯০ গজ ছুটাছুটী করে ; সূর্য্যগর্ভের ঐ

প্রচণ্ড তাপমাত্রায় সেখানকার পরমাণুগুলার গতিবেগ সেকেণ্ডে ১০০ মাইলেরও অধিক।

সূর্য্যগাত্রে একটা বিশেষ বস্তু আছে লক্ষ্য করবার। সে বস্তু হচ্ছে solar spots বা সৌর-কলঙ্ক।

চাঁদেও কলঙ্ক আছে এবং সে কলঙ্ক সবাই সহজ দৃষ্টিতে দেখতে পান, কিন্তু সূর্য্য-কলঙ্ক বিশেষজ্ঞদের যন্ত্র-চক্ষু ছাড়া সহজ চোখে দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, চন্দ্র-কলঙ্কে ও সৌর-কলঙ্কে ভেদ অনেক। সৌর-কলঙ্ক হঠাৎ দেখা দেয় এবং হঠাৎ অদৃশ্য হয়; সব সময়ের কলঙ্ক এক রকম নয়; তাদের স্থিতিকালও সব ক্ষেত্রে এক নয়। সব সময়ে তাদের সংখ্যাও এক নয়। চাঁদের কলঙ্ক জিনিসই আলাদা; চন্দ্রের গায়ে যে সব সমুদ্র বা হ্রদের জলহীন খাত আছে সেই গুলা আলো না পেয়ে কালো ছায়াবৎ দেখায়। সূর্য্যের কলঙ্ক হচ্ছে সৌর বায়ুমণ্ডলে ছোট বড় ঘূর্ণী গর্ত্ত। হঠাৎ সৌরগর্ভে বিপ্লব দেখা দেয় এবং উপরের বায়ুমণ্ডল ভেদ ক'রে ভিতর হতে অত্যুত্তপ্ত গ্যাসরাশি পিচকারীর মত উদ্গীরিত হয়; এই উৎক্ষিপ্ত গ্যাস-প্রস্রবণ উপরে উঠে তাপ হারিয়ে ফেলে এবং পৃথিবী হ'তে সেই ঠাণ্ডা গ্যাসের বিস্তৃতি গুলাকে কাল 'ঢাকনি'র মত দেখায়। এগুলা নিশ্চয়ই উৎক্ষিপ্ত electron ও পরমাণু-রাশির প্রচণ্ড ঘূর্ণী-আবর্ত্ত; এদের বিস্তৃতি বড় কম নয়; সময়ে সময়ে তাদের ব্যাস-রেখা ৪০০০০ মাইলও হয়।

পৃথিবী হ'তে সূর্য্য-গাত্র বেশ শান্ত নিস্তরঙ্গ সিন্ধু-বক্ষবৎ দেখায়; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু photosphere বা আলোক-মণ্ডলটী তা নয়। আসলে সূর্য্যগাত্র উত্তাল তরঙ্গময় সাগরের মত। জলন্ত উনানে কড়ার দুধ যেমন টগ্‌বগ্‌ করে ফোটে ও মধ্যে মধ্যে দুধের উপর হতে শিখা উঠে, সূর্য্য-গাত্রের সর্ব্বত্র হতে তেমনি অনবরত প্রচণ্ড জলন্ত রক্তবর্ণ শিখা উঠছে। এই শিখাগুলা calciun hydrogen এবং আরো কয়েকটা গ্যাসেরই জলন্ত শিখা। সৌর বায়ুমণ্ডল হ'তে সর্ব্বদাই এই সব অগ্নি-জিহ্বা লাফিয়ে উঠছে। সময়ে সময়ে এদের উচ্চতা ১ লক্ষ ২০ হাজার মাইল হয়।

এই সৌরকলঙ্ক ও অগ্নিশিখা (prominences) গুলার একটা বিশেষত্ব আছে; সেটা হচ্ছে এই যে প্রতি ১১ বছর অন্তর এই গুলার মাত্রা-বৃদ্ধি চরমে ওঠে। খুব সম্ভব পরস্পরের মধ্যে একটা যোগ-সম্বন্ধ আছে।

সূর্য্যদেবের বহিরাবরণ—যার নাম আলোকমণ্ডল (photosphere)—তার কথা শেষ হ'ল। এবার আরো উপরে উঠতে হবে। উপরের যে বস্তুটির কথা এবার বলা যাবে তার নাম corona বা chromosphere—বর্ণ-মণ্ডল; এই বর্ণ-মণ্ডলের গভীরতা ৫০০০ মাইল। সূর্য্য যখন পূর্ণ দীপ্তিতেজে প্রকটমান, তখন এই ছটা বা বর্ণমণ্ডল দেখা যায় না, কিন্তু সূর্য্যদেহ যখন পূর্ণ গ্রহণকালে চন্দ্রচ্ছায়ায় ঢাকা পড়ে তখন এই বর্ণমণ্ডল বা কিরণ-কিরীট তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে ও জ্যোতিতে দেখতে পাওয়া যায়। অতি শুভ্র অথচ উজ্জ্বল মুক্তা-দ্যুতিময় এই কিরণ-কিরীট। বাহিরের দিক দিয়ে জিনিসটি তো এই; কিন্তু আসলে এটা কি বস্তু? কি এর উপাদান? আচার্য্য Eddington এ বিষয়ে একজন বড় বিশেষজ্ঞ—তিনি বলেন—কিরণ-কিরীটের বেশী ভাগটাই clacium পরমাণু রাশি; কিন্তু এ সব পরমাণু অঙ্গহীন, অর্থাৎ এদের পরিধি হ'তে একটা electron খসে গিয়েছে।

সূর্য্য হ'তে যে প্রচুর উত্তাপ বার হ'য়ে জগৎকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে সে উত্তাপ কোথা হতে উৎপন্ন হচ্ছে? প্রতি মুহূর্ত্তে যে উত্তাপরাশি শূন্যে মিশিয়ে যাচ্ছে তার মাত্রাতো বড় কম নয়! একা পৃথিবী যে পরিমাণ উত্তাপ সূর্য্য হ'তে পায় তার ২২০ কোটী গুণ উত্তাপ সূর্য্য হ'তে বার হয়ে শূন্যে লয় পাচ্ছে। এই উত্তাপ কোথা হতে উৎপন্ন হচ্চে? আমরা পৃথিবীতে উত্তাপের উৎস বলতে ইন্ধন-দাহই বুঝি। সূর্য্য-গর্ভে কি কোন রূপ কাঠ বা কয়লা জাতীয় ইন্ধন অনবরত পুড়ছে এবং তদ্বারা উত্তাপ উৎপাদন করছে? এক সময়ে জ্যোতির্ব্বিদ্‌রা তাই ভাবতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তা সম্ভবই নয়। সূর্য্য ও অন্যান্য সহোদর তারকাদের জন্ম হয়েছে অনুমান ৫ হতে ১০ লক্ষ কোটী বৎসর পূর্ব্বে। এই ধারণাতীত কাল হতে বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে সূর্য্যদেহের প্রতি বর্গ ইঞ্চি প্রমাণ স্থান হতে এত তেজ বার হচ্ছে যে একটা ৫০ horse-powerএর ইঞ্জিন্ অনবরত ক্রিয়াশীল থাকতে পারে! এই বিপুল পরিমাণ তাপশক্তি যদি পাথুরে কয়লা বা তৎজাতীয় ইন্ধনদাহ হ'তে উৎপন্ন হ'তো তাহ'লে কয়েক লক্ষ বছরের মধ্যেই সূর্য্যদেহ ভস্ম-শেষ হয়ে যেতো। অথচ লক্ষকোটী বছর ধ'রে সমান তেজে সূর্য্য উত্তাপ ছড়িয়ে আসছে—কোনো শক্তিহ্রাসের চিহ্নই নাই!

বৈজ্ঞানিকের কাছে তাই এটা হেঁয়ালী বা ধাঁধা হয়ে পড়েছে—কোথা হতে সূর্য্য ও তারাগুলি এত তেজশক্তি পেয়েছে? সূর্য্য হ'তে প্রতি বৎসরে যে পরিমাণ উত্তাপ বার হয় তা কাঠ বা কয়লা পুড়িয়ে জন্মাতে হ'লে ১২০ বিলিয়ন টন কাঠ বা কয়লা দরকার হ'তো। (১ বিলিয়ন=১ মিলিয়ন-মিলিয়ন) এই প্রশ্নের উত্তর মিলেছে এত দিন পরে। Eddington তাঁর *Stars and Atoms* গ্রন্থে এ বিষয়ের আলোচনা করে সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন সূর্য্যদেহে যে সব element বা মূল ধাতু আছে তাদের নিরন্তর রূপান্তর হচ্ছে, অর্থাৎ এক জাতীয় পদার্থ অন্যজাতীয় পদার্থে পরিণত হচ্ছে। যাঁরা পদার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে নব্য পরমাণু-বাদের খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে এক পদার্থের পরমাণু হ'তে দু'একটা electron খসে গেলে বা যোগ হ'লে পদার্থের রূপান্তর ঘটে। পারদের পরমাণু হ'তে একটা electron খসিয়ে নিলে সেটা সোণার পরমাণু হয়। এখন সূর্য্যের গর্ভে এই ব্যাপার অনবরত ঘটছে। এই ঘটনার ফলে প্রচুর তেজ ও শক্তি পরমাণু হ'তে বেরিয়ে আসছে। তারপর ইলেকট্রন ও প্রটনে নিরন্তর ধাকাধাক্কি চলছেই। পরমাণু হতে ইলেকট্রন খসে যেতে যেতে শেষ পর্য্যন্ত পড়ে থাকে প্রটন গুলা; অর্থাৎ পরমাণুর দেহক্ষয় হচ্ছে; আর proton ও electron উভয়ের মধ্যে collision বা সংঘর্ষ হয়ে দুয়েরই অস্তিত্ব লোপ হয়ে যাচ্ছে, তার ফলে কতকটা তেজ ইথরতরঙ্গ রূপ ধরে বার হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে;—এক কথায় সূর্য্য-গর্ভে নিরন্তর জড়ের ক্ষয় ও লয় হচ্ছে এবং তার পরিবর্ত্তে দেখা দিচ্ছে একটু তেজ বা তাপ ও আলোক-রূপ ধ'রে শূন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। জড়ের আর জড়ত্ব নাই; জড় আর বিশ্বের একটা অবিনশ্বর মূল-তত্ত্বই নয়! জড় (matter) আত্মবিনাশ দ্বারা শক্তিতে (energyতে) পরিণত হচ্ছে! আছে মাত্র একটী তত্ত্ব তার নাম শক্তি, radiation বা energy, তাই জড় রূপ ধরছে তাই আবার স্ব-রূপে পরিণত হচ্ছে! বিশ্বটা আগাগোড়া এক আদ্যাশক্তিরই লীলা-খেলা। পাঁচ দশ লক্ষকোটী বৎসর আগে যখন একটা নিরাকার নীহারিকা-দেহ কোটী কোটী তারকাবিন্দুতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, অর্থাৎ যখন সূর্য্য ও তারা গুলা জন্মায় তখন তাদের দেহ-বস্তু শুধু বিচ্ছিন্ন electron ও proton সমষ্টিই ছিল। এই সব electron ও protron স্বরূপে bottled energy ঘনীভূত তেজশক্তি; তদবধি এই সব শক্তিকণা (তড়িৎ অণু) পরস্পরে ধাকাধাক্কি করে লয় পাচ্ছে এবং শক্তিবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। ৫ লক্ষ কোটী বছর ধরে সূর্য্য-দেহের পরমাণু লয় দ্বারাই এই প্রচুর পরিমাণ উত্তাপ ও আলো বার হয়ে জগৎকে সঞ্জীবিত ও জীবকে ধীমণ্ডিত করে আসছে। এর ফলে কি সূর্য্য-দেহ অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকছে? না, সূর্য্যদেহ সঙ্কুচিত হচ্ছে, দেহ-পদার্থের হ্রাস হচ্ছে। সূর্য্যদেহের বিস্তৃতি এতই বিশাল, বস্তুত্ব (mass) এতই বেশী যে প্রতি মিনিটে ২৫ কোটী টন পদার্থ ক্ষয় হ'য়ে তাপালোকে রূপান্তর হওয়া সত্বেও আমরা দু'দশ হাজার বছরেও সূর্য্যদেহক্ষয় বুঝতে পারি না। প্রতিদিন সূর্য্যের ওজন কমে আসছে ৩৬ হাজার কোটী টন! কি ভয়ানক দেহ-বস্তুর অপচয়! প্রতিদিন সূর্য্য হতে যে মোট পরিমাণ উত্তাপ ও আলো বার হয়ে যাচ্ছে তা ৩৬০০০ কোটী টন সূর্য্যদেহপদার্থ-ক্ষয় হতে উৎপন্ন। গণিতশাস্ত্র সাহায্যে নির্ণীত হয়েছে যে এই মাত্রায় সূর্য্যদেহ ক্ষয় হ'লে সবিতাদেব আর ১৫ লক্ষকোটী বছর বাঁচবেন। সূর্য্যদেহের আয়-ব্যয়ের এই সব পরিমাণ অংশ শুনে পাঠক হয়তো গাঁজাখুরী কথা ভেবে হাসবেন, কিন্তু Dr. Jeans বলছেন "These are not mere speculative statements; they rest on observation and on generally accepted principles which are confirmed by observations" (Eos. p. 40) অর্থ:—এ গুলি মনঃকল্পিত কথা নয়; পর্য্যবেক্ষণের উপর এ সিদ্ধান্তের ভিত্তি, সাধারণ বিজ্ঞানসম্মত বিধিসূত্রের উপর স্থাপিত এবং এই সব বিধি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত ও সার্ব্বস্বীকৃত।

এ কথা সত্য হলে এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে সূর্য্যের দেহ-আয়তন জন্মকালে (৫ হতে ১০ লক্ষ কোটী বছর আগে) বর্ত্তমান আয়তন হতে বহুগুণে বড় ছিল। এবং বর্ত্তমান সময়ে সে দেহের বেশী ভাগই ক্ষয় হয়েছে। এই ক্ষয়ভাগ কতটা পরিমাণ? অঙ্কসাহায্যে নির্ণীত হয়েছে যে জন্মকালে দেহের ভার যত টন্ ছিল এখন প্রতি টনে কয়েক hundred-weight মাত্র আছে। সূর্য্য সম্বন্ধে যা সত্য, সমস্ত তারকা সম্বন্ধেও তাই। জন্মকালে তাদের আয়তন খুব বিরাট থাকে, তেজক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বস্তু ক্ষয় হতে থাকে, কাজেই আকার

যত বয়স হয় ততই তার দেহ-পদার্থ-ভার কমে আসে ও দেহায়তন সঙ্কুচিত হয়। ২০০ কোটী বছর আগে সূর্য্যদেহ এখনকারাপেক্ষা দ্বিগুণ বড় ছিল। সাড়ে সাত লক্ষ কোটী বছর আগে ২০ গুণ বড় ছিল। এর চেয়ে আরো দশহাজার কোটী বছর আগে সূর্য্যদেহ ছিল এখনকার চেয়ে ১০০ গুণ বড়।

সূর্য্য ও তারকাদের দেহের উত্তাপ-রহস্য খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞান শাস্ত্র এক আশ্চর্য্যজনক তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছে, তত্ত্বটী হচ্ছে জড়ের পরমাণু অপচয়ে শক্তির জন্ম! অনাদি অজ শাশ্বত পরমাণু আর অব্যয় ও বিকারবিহীন নয়; পরমাণু মাত্রেই প্রভূত তেজশক্তির ভাণ্ডার। আমরা এই শক্তি-ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছি মাত্র, কিন্তু এ শক্তি কাজে লাগাবার কৌশল আবিষ্কার করতে পারিনি। এখন যে শক্তি মানুষ ব্যবহার করে তা molar ও molecular শক্তি মাত্র। আণবিক শক্তি (atomic energy) করায়ত্ত হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানজগতে একটা মন্বন্তর এসে পড়বে। তখন রাশি রাশি তেল কয়লা বা কাঠ পুড়িয়ে উত্তাপ সংগ্রহ করতে হবে না। এক ফোঁটা তেলের বা জলের পদার্থ লয় ক'রে (পরমাণু ধ্বংস করে) যে তেজশক্তি পাওয়া যাবে তাতে সম্বৎসরব্যাপী ২০০ horsepower শক্তি সংগৃহীত হবে; এক ফোঁটা তেলের আণবিক শক্তি করায়ত্ব হলে Mauretaniaর মত অতিকায় জাহাজকে আটলাণ্টিক মহাসাগর পারাপার করানো চলবে। সপ্তাহে এক পাউণ্ড কয়লার atomic শক্তিযোগে সাপ্তাহিক ৫০ লক্ষ টন কয়লার কাজ হবে, মাসে ১ আউন্স কয়লার আণবিক শক্তিতে ব্রিটীশ দ্বীপের সমস্ত রেল-ইঞ্জিন চালানো সম্ভব হবে।

যাই হোক্, মানুষের দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য বশতঃ এই প্রচণ্ড গুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলবার বিদ্যা তার এখনো হয় নি; মানুষ না জানুক বা পারুক, প্রকৃতি সে বিদ্যা জানেন এবং সূর্য্য ও তারাদের গর্ভে এই আণবিক শক্তি অনবরতই বিচ্ছুরিত হচ্ছে এবং এই পরমাণু-ধ্বংস-জাত তেজই যে সূর্য্য-শক্তির মূল উৎস তাতে আর সন্দেহ নাই।

সূর্য্যের ভবিষ্যৎ

সূর্য্যের অতীত ইতিহাস হতে বুঝা যায় তার ভবিষ্যৎ কেমন দাঁড়াবে। সূর্য্যদেব যে আত্মদেহ অপচয় ক'রে জগৎকে তাপা-লোক জোগাচ্ছেন এ কথা তো স্থির। এই দেহক্ষয় মিনিটে, দিনে, বৎসরে কি পরিমাণ তাও বুঝা গেছে। ২০০ কোটী বৎসর আগে, লক্ষ লক্ষ কোটী বৎসর আগে জন্মকালে সূর্য্যদেহায়তন কত বেশী ছিল তারও আভাষ পাওয়া গিয়েছে; এ হতে সিদ্ধান্ত এই যে সূর্য্যদেব ক্রমশঃই বুড়িয়ে আসছেন, তাঁর দেহপদার্থ কমে আসছে—তিনি দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে ভুগছেন—তাঁর জ্যোতি ও দেহশক্তি কমে আসছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে এমন অবস্থা তাঁর অনিবার্য্য যে তাঁকে মরা সূর্য্যে পরিণত হতে হবে। এখনি তাঁর নাড়ী পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন যে আমাদের প্রাণদাতা পালনকর্ত্তা সূর্য্যদেব ইতিমধ্যেই 'a dying sun!' যে অবস্থায় এলে সূর্য্য বা তারা-দেহ সঙ্কুচিত হতে থাকে দ্রুত গতিতে, এবং তার তেজশক্তি বর্ত্তমান তেজমাত্রার ভগ্নাংশে দাঁড়ায় সেই বিপজ্জনক আশঙ্কাসঙ্কুল অবস্থায় আমাদের বরণীয় সবিতৃদেব প্রায় এসে পৌঁছেছেন। এ অবস্থায় এলে পরিণাম কি হবে? পৃথিবীর ধাত ছেড়ে যাবে; অর্থাৎ তার সমুদ্রগুলি জমে তুষারকঠিন হবে; তার বায়ুমণ্ডল হিমশীতল তরলাবস্থায় এসে পড়বে! এ অবস্থায় জীব-ধারণ কি ধরণীমাতার পক্ষে সম্ভব? কদাপি না!

তবে এ দুর্ঘটনা ঘটতে, সূর্য্যের নাড়ী ছাড়তে এখনো বিলম্ব আছে; ১৫ হাজার কোটী বৎসর আগে এ অবস্থা সূর্য্যের হবার ভয় নাই।

সূর্য্যের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য যা তা বলা হল। সূর্য্যের সন্তানসন্ততির কথা কিছু ব'লে প্রবন্ধের উপসংহার করা হবে। গ্রহগুলি তার পুত্র কন্যা এবং উপগ্রহগুলি পৌত্র পৌত্রী। সূর্য্য নিজ অক্ষদণ্ডের চারদিকে আবর্ত্তন করছে। আবর্ত্তন ২৫ দিন ৪ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে শেষ হয়। সূর্য্যের সব নিকটবর্ত্তী গ্রহ হ'ল বুধ, বুধের পর শুক্র, শুক্রের পর পৃথিবী, পৃথিবীর পর মঙ্গল, মঙ্গলের পর এক ঝাঁক ক্ষুদ্র গ্রহ (asteroids); তারপর অতিকায় বৃহস্পতি, তারপর সোপবীত শনৈশ্চর, তারপর Uranus বা অরুণ গ্রহ; তারপর Neptune বা বরুণ; এতদিন বরুণকেই সব শেষের গ্রহ ব'লে গণ্য করা হতো, সম্প্রতি বছর দুই হ'ল আর একটী ক্ষুদ্রকায় গ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তার নামকরণ হ'য়েছে Pluto 'যম'। Plutoর আয়তন বুধেরই মত। সূর্য্য হ'তে ৩৫৮ কোটী ৮০ লক্ষ মাইল দূরে থেকে প্রায় ২৪৯ বৎসর ধ'রে Pluto

তার প্রদক্ষিণ-কাজ শেষ করে। অয়ন-পথে তার গতিবেগ সেকেণ্ডে দুই মাইল মাত্র। এর mass, volume, density প্রভৃতি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ এখনো পাওয়া যায় নি। Plutoর আবিষ্কারফলে পাশ্চাত্য জ্যোতিষ মতে সূর্য্যের নবগ্রহ-সংখ্যা পূর্ণ হল। প্রাচ্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে চাঁদকে ধ'রে এবং রাহু-কেতুকে গ্রহ কল্পনা করে 'নবগ্রহ' গণনা হতো। কিন্তু রাহু বা কেতুর বস্তুত্বই নাই, কাজেই তারা গ্রহই নয়।

এই নয়টী গ্রহ নিয়ে হ'ল সৌরজগৎ। তারকাদের ভাগ্যে গ্রহ-উপগ্রহ-পরিবারবেষ্টিত হ'য়ে সূর্য্যত্ব-লাভ খুব একটা সাধারণ ঘটনা নয়। কি ঘটনাযোগে যে একটা একক ও সঙ্গীহীন ভ্রাম্যমান তারা গ্রহপিণ্ডদের মাতৃত্ব লাভ করে তা জানলে বুঝা যাবে যে এ ঘটনা আকাশপটে খুব বিরল; তারার পক্ষে এ একটা accident. এই accident—(দৈব ঘটনা) লক্ষ তারার মধ্যে এক আধটার ভাগ্যে ঘটেছে। যে কয়টার এইরূপ গ্রহগোষ্ঠী লাভ হয়েছে তাদের মধ্যে আমাদের সূর্য্য ছাড়া দ্বিতীয় গ্রহপতি সূর্য্যের সঙ্গে অতিকায় দূরবীণ যোগেও চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি।

গ্রহদের গতির তুলনায় সূর্য্য অচল ও 'কূটস্থ' হ'লেও সমগ্র সৌর জগৎটা স্থির ও অচল নয়; সমস্ত সূর্য্যই মহাশূন্যবক্ষে বিচরণশীল, আমাদের সূর্য্যও সপরিবারে মহাশূন্যের কোন্ এক অজানা পথে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন।

আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী তার তারকাসংখ্যা অনুমান কমপক্ষে ৪০০০ হ'তে ৫০০০ কোটি। আমাদের সূর্য্য তারই মধ্যে সাধারণ সাইজের ও মাঝারি তেজদীপ্তির একটা মাত্র। এই সূর্য্যের অধিকার-ভূমির শেষ সীমানা ৩৫৯ কোটি মাইল দূর পর্য্যন্ত। কল্পনা করুন একটা বিশাল বৃত্ত, যার ব্যাসরেখা ৭১৮ কোটি মাইল। ইতস্ততঃ দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত কয়েকটা ছোট বড় গ্রহপূর্ণ এই সুবিশাল দেশখণ্ডের নাম সৌরজগৎ।

এর পরেই সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী যে প্রতিবেশী সূর্য্যটি, (তারা) তার নাম alpha proxima এবং সূর্য্য হ'তে তার দূরত্ব ২৪ লক্ষ কোটি মাইল। এবং তা হ'তে আলোকরশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌছায় ৪ বৎসর পরে। ৪১৫ হাজার কোটি তারকা এই পরিমাণ দূরে দূরে পরস্পর হ'তে আছে। এ ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত আলোকরশ্মি পার হয় ৩ লক্ষ বৎসরে। সুতরাং পাঠক বুঝছেন 'we are citizens of no mean city!'

বঙ্গসাগরে ঝড়

—শ্রী বজয়র ঘ

কতবার আসিয়াছি, কতবার গিয়াছি, পুরীর সমুদ্রকে শুনাইয়া আমি অবশ্যই বলিতে পারি—

কতবার আসিয়া
কত ভাল বাসিয়া

গিয়াছি; কিন্তু কখনও কিছু লিখি নাই, আজ লিখিতে বসিলাম কেন? কেন, তাহা পরে বলিব।

সমুদ্র—পুরীর সমুদ্রকে আমি ভালবাসি। কতখানি ভালবাসি তাহা বলিতে পারিব না; তবে ভালবাসি—হয়ত খুবই ভালবাসি। সীমান্তরাল-বিস্তৃত নীল জলে সূর্য্য-কিরণের ঝিকিমিকি, দূরে দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ-লীলা, বেলাপহত তরঙ্গ-লীলা, জ্যোৎস্নাকিরণে গলিত স্বর্ণসম অসীম বারিবক্ষ, অন্ধকার নিশীথে রঙ্গিনীর অগ্নিক্রীড়া দেখিতে, আমি ভালবাসি—বড় ভালবাসি। তীরে বসিয়া দুরন্ত জলোচ্ছ্বাস দেখি, বিরাট গর্জ্জন শুনি—বড় ভালবাসি। সাগর যেন বড় সুদূরের কথা শুনায়, সাগর যেন প্রিয়জনের সংবাদ বহন করিয়া আনে, আমার বড় ভাল লাগে। নদীতে আমার আশ মিটে না, ঝর্ণায় আমি তৃপ্তি পাই না। ক্ষিপ্রতায় আমার আনন্দ, চাঞ্চল্যে আমার গতি মিলে, মত্ততায় আমার তৃপ্তি! সাগরের যেমন শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, শান্তি অবসাদ কিছুই নাই, সে যেমন অবিশ্রাম, অবিরাম, অবিরত গতিশীল, মানবজীবনও কি তাহাই নয়? অবসর তাহার কতটুকু? সারাজীবনই তো ছুটাছুটি! সাগর গান করে না, গর্জ্জন করে, কুলুধ্বনি তাহার কোষ্ঠিতে লেখে না, সে করে তর্জ্জন, সে যেন একটা বিরাট কর্ম্ম-কোলাহল, জগৎ-সংসারকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে—দেখিতে আমার ভাল লাগে। তাহার সুনীল বারিবক্ষ বিষুব-রেখায় মিশিয়াছে, মাঝে হয়ত কত দেশ, কত আকাশ, কত প্রান্তরের ব্যবধান, হয় ত কত ইতিহাস, কত প্রেমের, কত ভালবাসার, কত স্নেহের, কত শৌর্য্য-বীর্য্যের ইতিহাস সঞ্চিত আছে, হয়ত সবই স্বপ্নের মত অলীক, আবছায়া, তবু আমার ভাল লাগে—কল্পনা করিয়া লইতে আমি ভালবাসি। এই বারিবক্ষ চৌচির করিয়া বক্ষ ভরে কত জলযান গিয়াছে, কত বিজয় সেন হয়ত ইহার উপর দিয়াই তাহার বিজয়-বাহিনী চালনা করিয়াছে, কত যুদ্ধজয়ীর আনন্দ-উল্লাস উহার অশ্রান্ত ঝঙ্কারে মিশিয়া গিয়াছে, কত বিজিতের নয়নাশ্রু ঝরিয়া লবণাম্বু অধিকতর লবণাক্ত হইয়াছে, কত প্রিয়জন জন্মভূমি ছাড়িয়া, প্রিয়জনের প্রিয় বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া গিয়াছে, কেহ ফিরিয়াছে, কেহ ফিরে নাই, হয়ত তেমন কাহারও অভাবে কাহারও হৃদয়-দীপ চিরনির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, হয়ত বা এই সাগরের বুকে সহস্র আঁখি পাতিয়া কেহ প্রিয়জনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, সকল সমুদ্রে যোগ আছে ভাবিয়া কোন বিরহিণী হয়ত তরঙ্গকে দূত করিয়া পাঠাইবার কামনায় নয়নাসারে সিক্ত হইতেছে—ভাবিতে আমার ভাল লাগে, ভাবিতে আমি ভালবাসি।

আমি নদী ভাল বাসিতাম, তখন সমুদ্র দেখি নাই। মনে পড়ে সেই কৈশোর কালের কথা। আমার পল্লীভবন-প্রান্তবাহিনী কুলুকুলুনাদিনীপুণ্যপ্রবাহিনী ভারতের বেদ-পুরাণভারতইতিহাসবন্দিতা সুরনরনন্দিতা নির্ম্মলসলিলা ভাগীরথীর বুকখানিকে কত ভাল বাসিতাম। শিশু মা'র বুকখানিকে যেমন ভালবাসে, ভাগীরথী বক্ষঃখানি আমি তেমনই ভালবাসিতাম। মা'র বুকে শিশুর যেমন অবাধ স্বচ্ছন্দ অধিকার, জাহ্নবীর বক্ষে আমার ছিল তেমনই অধিকার! কত ডুব ফুঁড়িয়াছি, কত ঝাঁপই ঝুঁড়িয়াছি, কত সাঁতার কাটিয়াছি, কত অমৃত পান করিয়াছি! জাহ্নবী কখনও গ্রামের প্রান্ত বাহিয়া, কখনও গ্রাম হইতে দূরে উষর ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, কখনও বা কৃষকের ক্ষেত্র উর্ব্বর করিয়া, কখনও মৃদুমলয়ানিলবাহিত হইয়া মৃদুল তরঙ্গ তুলিয়া, কখনও বা স্ফীতাঙ্গে বহিয়া গিয়াছেন—দেখিতাম, ভাল বাসিতাম।

তখনও সমুদ্র দেখি নাই!

সমুদ্র দেখিলাম। প্রথম দর্শনেই আমার সেই আজন্মের পরিচিতা, হিন্দু আমি, হিন্দুর চিরনন্দিতা সুরধুনীর কথা মনে পড়িল। মনে হইল, সে যেন ছিল, বাঙলার পল্লী-গৃহস্থের গৃহ-কল্যাণী কিশোরী সরমজড়িতা একটি বধূ আর এ! এ-যেন বিশ্ববিজয়িনী এক নারী, যেন-বা সুরসভাতলে নৃত্যশীলা ছিন্ন-

স্থির-যৌবনা উর্ব্বশী ; সে-যেন সুদূরের একটি ছোট বঙ্গ-পল্লী, শ্যামল, সুশ্যামল, শান্ত শ্রীবিমণ্ডিত, লতায় পাতায় আচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ হাস্যে উজ্জ্বল, করুণ ক্রন্দনে কাতর একটি বঙ্গপল্লী ; আর এ-যেন কর্ম্মকোলাহল পূর্ণ, আত্মীয়তার লেশমাত্রহীন এক বিরাট কারখানা ; সে আমাকে ভালবাসিত, আদর করিত, কত গান শুনাইত, তাহার স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শে ছিল আত্মীয়তা, মধুরতা, আর এই সমুদ্র এ-যেন ভালবাসে না, এ-যেন সদাই মদগর্ব্বগর্ব্বিত ! তবু ভাল লাগিল ; জানি না, বোধ হয় নূতন বলিয়া !

তারপর কতকাল কাটিয়াছে, জীবন-নদে সুখ দুঃখের, শান্তি অশান্তির শত লীলা-লহর তুলিয়া গিয়াছে, কোনওটা মনে আছে, কোনটা নাই। কৈশোর ও যৌবনপ্রান্তে কত ভেদ, কত বিভেদ ; তখন যাহা চাহিতাম, এখন তাহা চাহি না ; তখন যাহা জানিতাম না, আজ তাহারই কামনা সুনিবিড় হইয়া জাগে সকল অঙ্গে ; তখন যাহাতে ছিল রুচি, এখন তাহাতে অরুচি ধরিয়া গিয়াছে ; তখন যাহা ছিল বাসনার, তাহাই এখন বর্জ্জনের তালিকাভুক্ত ; এমন কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। যেখানে ছিল—অট্টালিকা দাস দাসী হাস্যকলরবগীতি, আজ সেখানে ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ মধ্যে বন্য শৃগালের চীৎকার ! সে দিন যে জীবন ছিল আশার কুসুমে, বাসনার বাসে, আকাঙ্ক্ষার পাত্রে সজ্জিত, শোভিত, সুবাসিত, আজ সে সীমায় বদ্ধ ! সেদিন যে ছিল নীলাকাশের গায় মুক্তকণ্ঠ মুক্তপক্ষ বিহগ, আজ সে পিঞ্জরে বদ্ধ ! এমন কত পরিবর্ত্তনই হইয়াছে কিন্তু সমুদ্র ! এই সমুদ্র, সেদিন সে যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে। তেমনই নীল, তেমনই গভীর, তেমনই স্বচ্ছ, তেমনই উত্তাল ! পৃথিবী পরিবর্ত্তনশীল, কাল পরিবর্ত্তনশীল, সাগরের কাছে তাহারা বুঝি পরাজিত ! এই অনাদি অনন্তকালের অপরিবর্ত্তিতরূপ বঙ্গসাগর, আমি তোমায় ভালবাসি !

আজ সাগরের নূতন রূপ দেখিতেছি ! আজ যেন সে ক্ষিপ্ত—উন্মত্ত ! ভোরের শুকতারাটি আজ দেখি নাই, আকাশে মেঘ জমিয়াছিল। প্রভাতে উঠিয়া দেখি, আকাশ জ্যোতিঃহারা, মসীবর্ণ, দিবাকর অন্ধকারায় বন্দী ; আর সমুদ্র ! আজ যেন নূতন করিয়া দুর্দ্ধর্ষ দেব-দানবে মিলিয়া সুধার আশে সমুদ্র মন্থন করিতেছে। রোষে, বেদনায়, ক্ষোভে সমুদ্র তাথিয়া তাথিয়া মাতিয়া উঠিয়াছে ! বাসুকী যেন ভারবহনে অক্ষম হইয়া মাথা চালিতেছে। আজ সে গাঢ় নীলবর্ণ তাহার কোথায় গেল ? আজ সে স্ফটিক্ স্বচ্ছ রূপ তাহার কে হরণ করিল ?

এই কি তাণ্ডব ? দক্ষরাজ যজ্ঞগৃহে সতীকে হারাইয়া শিব সে-দিন তাণ্ডব নাচিয়াছিলেন, সেদিন ধরণী কি এই রূপ ধরিয়াছিল ?

এই কি সিংহ-গর্জ্জন ? শতসহস্র ক্ষুধার্ত্ত পশুরাজ যেন কেশর ফুলাইয়া ধাইয়া আসিতেছে।

ধরণীর বিরুদ্ধে কি সাগরের আজ এই অভিযান ? কি ভীষণ ! কি উত্তাল ! সমুদ্র যেন লক্ষ করধৃত খর তরবার লইয়া ছুটিয়া আসে ! বেলাপহত হইয়া শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়—আবার আসে, আবার যায়, আবার ফিরিয়া আসে। ধরণী যেন একটা সতর্ক দুর্গ—সমুদ্র যেন যুদ্ধোন্মাদ শত্রুসৈন্য। দুর্গ সুরক্ষিত, কবলিত করা সাধ্যায়ত্ত নয় জানিয়াও তাহার আক্রমণের বিরাম নাই।

লক্ষশত শ্বেত অশ্ব যেন সমুদ্রের বক্ষের উপর দিয়া, গ্রীবা বাঁকাইয়া, ফেনা উড়াইয়া, হ্রেষারব তুলিয়া ছুটিতেছে। ছুটিতে ছুটিতে কোনটি বা শ্রান্ত, ক্লান্ত অথবা আহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, অথবা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কোনটি প্রতিহত হইয়া রুদ্ধবিক্রমে গর্জ্জন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।

সমুদ্রে আজ যেন কুরুক্ষেত্র-সমরানল প্রজ্জ্বলিত ! ধরিত্রী টলমল করিতেছে !

ইয়োরোপের মহাযুদ্ধ আজ যেন এই বঙ্গসাগরের বুকে রূপ ধরিয়াছে। লক্ষ কামান গর্জ্জিতেছে, লক্ষ 'মাইন্' ফাটিতেছে, তরঙ্গভঙ্গে ফেনপুঞ্জ ধোঁয়ার মত আকাশে উঠিয়া যাইতেছে।

আজ যেন প্রবীরহারা জনা রণরঙ্গে মাতিয়া অর্জ্জুননিধনে ছুটিয়াছেন। মুখে হৃদয়বিদারী রব—'হা পুত্র, হা বীর, হা প্রবীর !' মেঘনাদ-বিয়োগবিধুরা রক্ষঃবধূ প্রমীলা যেন রাক্ষসবাহিনী ছুটাইয়া রামচন্দ্রের বিনাশসাধনে চলিয়াছেন। 'হা নাথ, হা রক্ষঃকুলদীপ, হা বীরশ্রেষ্ঠ' আর্ত্তনাদ যেন সসাগরা ধরিত্রীর বক্ষঃ ভেদ করিয়া ছুটিয়াছে ! রূপোন্মাদ আলাউদ্দীনের কামকটাক্ষ হইতে আত্মরক্ষার জন্য চিতোর-কামিনী পদ্মিনী যেন জহর-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে ঐ সাগরবুকেই আগুন জ্বালিয়াছেন ! অনলে অনিলে সলিলে এই তাণ্ডব !

প্রভাত—মধ্যাহ্ন—অপরাহ্ন—সায়াহ্ন—উন্মত্ততার শেষ নাই। গর্জ্জনের বিরাম নাই, তরঙ্গভঙ্গেরও অন্ত নাই। জানি না দেব-দানবের সমুদ্র-মন্থন শেষ হইবে কবে ? হাস্যাধরা স্মিতনয়না, লাবণ্যস্ফুরিতদেহা, বরাভয়দায়িনী কমলাসনা কমলা সুধাভাণ্ড হস্তে উঠিবেন কবে—পৃথিবী যে রসাতলে যায় ; সৃষ্টি যে আতঙ্কে শিহরিয়া রহিয়াছে।

হে রুদ্র, রোষ সম্বরণ কর ; হে নীলাম্বু, তোমার সে নীল বর্ণ ফিরাইয়া আন। তোমার রঙ বুকে ধরিয়া আকাশ আবার নীলবর্ণে রঞ্জিত হোক ; তোমার ঊর্ম্মির চিকিমিকি দেখিয়া আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ হাসিতে থাকুক। হে সমুদ্র, আমার কথা রাখ, আমি যে তোমায় ভালবাসি, বড় ভালবাসি !

আমাদের বাণিজ্য-সম্পদ

চতুর্থ পর্য্যায়

—শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে ভারতবর্ষের নানা বিষয়ে উন্নতি ও অবনতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য সময়ে সময়ে পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ তদন্ত-পরিষৎ বা সিলেক্ট কমিটি নিয়োজিত হইত। তদনুযায়ী ১৮৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে যে পার্লামেণ্টিয় সিলেক্ট কমিটীর অধিবেশন হয় তাহার রিপোর্ট হইতে আমাদের তদানীন্তন বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আমদানি পণ্যের উপর কি পরিমাণ শুল্ক আদায় হইত তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

১৮৩৫ হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাণিজ্যের অবস্থা।

	দ্রব্যের নাম—	শুল্কের হার
১।	পুস্তকাদি (ব্রিটীশ)—	বিনা শুল্ক
২।	ঐ (অন্যান্য দেশীয় —	শতকরা ৩ টাকা
৩।	তুলা ও রেশমের বস্ত্রাদি (ব্রিটিশ)	,, ৫ ,,
৪।	ঐ (অব্রিটীশ)—	,, ৭॥০ ,,
৫।	তুলার সূতা (অব্রিটীশ)	,, ৩॥০ ,,
৬।	ঐ (অব্রিটীশ).	,, ৭ ,,
৭।	ধাতুর দ্রব্যাদি (ব্রিটীশ)	,, ৫ ,,
৮।	ঐ (অব্রিটিশ)	,, ১০ ,,
৯।	পশমের যন্ত্রাদি (ব্রিটীশ)	,, ৫ ,,
১০।	ঐ (অব্রিটীশ)	,, ১০ ,,
১১।	জলযানের যন্ত্রাদি (ব্রিটিশ)	,, ৫ ,,
১২।	ঐ (অব্রিটিশ)	,, ১০ ,,
১৩।	চা	,, ১০ ,,
১৪।	কাফি	,, ৭॥০ ,,
১৫।	মদ্যাদি	,, ৫ ,,
১৬।	ঐ (উগ্র)	প্রতি গ্যালন ২ শিলিং
১৭।	লবণ	মণ প্রতি ৫ ,,
১৮।	অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য	শতকরা ৫ টাকা

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে ইংলণ্ডের বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স বা সাম্রাজ্যিক পক্ষপাতিত্বনীতি ভারতীয় বাণিজ্য-ক্ষেত্রে বলবতী করিবার প্রয়াস হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই নীতির কুফল আমরা সবিশেষ অনুভব করিতেছি।

একথা কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে এদেশে ব্রিটিশ রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বহির্ব্বাণিজ্যের নানারূপ বাধা বিদূরিত হইতে থাকে এবং আমাদের আভ্যন্তরীণ পণ্য সরবরাহের তাদৃশ প্রসার না পাইলেও বিদেশীয় বাণিজ্যের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে আমাদের দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা যে কতকাংশে উন্নত হয় তাহা মানিতেই হইবে, কিন্তু মোটের উপর তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে কিনা সন্দেহ। তাহার প্রধান কারণ দুইটি। প্রথমতঃ আমাদের বহির্ব্বাণিজ্য এরূপ সহসা বাড়িয়া যাইতে লাগিল যে তাহার লভ্যাংশ অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত ভারতীয়েরা সম্যক্ আদায় করিয়া উঠিতে পারিল না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিনাশ উপস্থিত হইল বিদেশী পণ্যের আমদানীতে এবং আমাদের শিল্পীগণ উপযুক্ত শিক্ষা ও উৎসাহের অভাবে নূতন পারিপার্শ্বিকতার ধারানুযায়ী নিজেদের কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিতে পারিল না।

১৮৩৪-৩৫ সাল হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বন্দরে যে পরিমাণ পণ্য ও সোনারূপা আমদানী ও রপ্তানি হইয়াছিল তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। বাংলা ও বোম্বাই'এর আমদানী ও রপ্তানি এই ২৫ বৎসরে যেরূপ বাড়িয়াছিল মাদ্রাজের বাণিজ্য সে পরিমাণ বাড়ে নাই। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় মনে করেন যে ইহার প্রধান কারণ মাদ্রাজের অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্য। ইহা ছাড়া আরও কারণ এই যে বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশে বিলাতের প্রয়োজন অনুযায়ী রপ্তানির উপযুক্ত কাঁচা মালের প্রাচুর্য্য ছিল এবং এই পণ্যের পরিবর্ত্তে গৃহীত বিদেশী দ্রব্যেরও কাটতি এখানেই বেশী সম্ভব হইত।

১৮৩৪ হইতে ১৮৫৮ পর্য্যন্ত ভারতীয় বাহবাণিজ্য

বৎসর	মোট আমদানী লক্ষ টাকা	মোট রপ্তানী লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
১৮৩৪-৩৫	৬,১৫	৮,১৯	১৫,৩৪
১৮৩৫-৩৬	৬,৯৩	১১,২১	১৮,১৪
১৮৩৬-৩৭	৭,৫৭	১৩,৫০	২১,০৭
১৮৩৭-৩৮	৭,৬৭	১১,৫৮	১৯,২৫
১৮৩৮-৩৯	৮,২৫	১২,১২	২০,৩৭
১৮৩৯-৪০	৭,৭৮	১১,৩৩	১৯,১১
১৮৪০-৪১	১০,২০	১৩,৮২	২৪,০২
'৮৪১-৪২	৯,৬৩	১৪,৩৪	২৩,৯৭
১৮৪২-৪৩	১১,০৫	১৩,৭৭	২৪,৮২
১৮৪৩-৪৪	১৩,৬১	১৮,০০	৩১,৬১
১৮৪৪-৪৫	১৪,৫১	১৭,৭০	৩২,২১
১৮৪৫-৪৬	১১,৫৮	১৭,৮৪	২৯,৪২
১৮৪৬-৪৭	১১,৮৪	১৬,০৭	২৭,৯১
১৮৪৭-৪৮	১০,৫৭	১৪,৭৪	২৫,৩১
১৮৪৮-৪৯	১২,৫৫	১৮,৬৩	৩১,১৮
১৮৪৯-৫০	১৩,৭০	১৮,২৮	৩১,৯৮
১৮৫১	১৫,৩৭	১৮,৭১	৩৪,০৮
১৮৫২	১৭,২৯	২০,৮০	৩৮,০৯
১৮৫৩	১৬,৯০	২১,৫২	৩৮,৪২
১৮৫৪	১৫,৯৯	২০,৭৮	৩৬,৭৭
১৮৫৫	১৪,৭৭	২০,১৯	৩৪,৯৬
১৮৫৬	২৫,২৪	২৩,৬৪	৪৮,৮৮
১৮৫৭	২৮,৬১	২৬,৫৯	৫৫,২০
১৮৫৮	৩১,১০	২৮,২৮	৫৯,৩৮

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ প্রায় বরাবরই অধিক ছিল। এই উদ্বৃত্ত অংশের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ কিছু পায় নাই। এজন্য ইহাকে আমাদের "ড্রেন" অথবা অন্যায় ধনস্রোত বলা হইয়া থাকে। এরূপ যে কত লক্ষ মুদ্রা ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে এ যাবৎ চলিয়া গিয়াছে তাহা হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

আর একটী দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে বিদেশ হইতে আমদানী পণ্যের মধ্যে ইংলণ্ডের দ্রব্যাদি বরাবরই অর্দ্ধেকের উপর ছিল এবং ভারতবর্ষ হইতে যে সকল মাল চালান হইত তাহার অধিকাংশ যাইত ইংলণ্ড ছাড়া অন্যান্য বিদেশে। এ বিষয়ে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের রূপ এখনও প্রায় এক রকমই রহিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আলোচ্য সময়ের মধ্যে মোটামুটি প্রধান পণ্যগুলির বাণিজ্যের প্রসার দেখিলে দেশীয় শিল্পের গতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তুলা ও সূতা, তুলা, পশম ও রেশমের বস্ত্রাদি, ধাতব দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি এইগুলিই ছিল তখন ভারতের শিল্পজাত সামগ্রীর মধ্যে প্রধান। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরে বিদেশ হইতে আমদানি তুলার বস্ত্রের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রায় চতুর্গুণ বাড়িয়া যায়। এই দশ বৎসরে পশমী কাপড়ের আমদানী দ্বিগুণ, এবং ধাতব দ্রব্যাদি প্রায় তিনগুণ বর্দ্ধিত হয়, এবং যন্ত্রপাতির আমদানী অভাবনীয়রূপে আরম্ভ হয়। ইহা হইতেই দেশীয় শিল্পের ক্রমশঃ অধোগতি বুঝিতে পারা যায়।

অপর পক্ষে আমাদের দেশের রপ্তানি পণ্যের রূপও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কাঁচা তুলার রপ্তানি ১৮৫৮ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ১,৭৮ লক্ষ টাকা হইতে ৪,৩০ লক্ষ টাকা হইয়া উঠে এবং ঐ সময়ে ভারতীয় তুলার উপর ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্প যাহাতে নির্ভরশীল হইতে পারে ও ইংলণ্ডকে আমেরিকার মুখাপেক্ষা না করিতে হয় তাহার জন্য ব্রিটীশ জাতির ব্যাকুলতা লক্ষিত হয়। কাঁচা রেশমের রপ্তানি প্রায় সমান থাকিলেও এদেশীয় রেশমের বস্ত্রের রপ্তানি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্রমেই কমিয়া যাইতে থাকে। অথচ কাঁচা পশমের রপ্তানি খুব বাড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী পশমের বস্ত্র অধিকতর ভাবে আমদানী হইতে আরম্ভ করে।

এইরূপে আমাদের শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিবর্ত্তে কাঁচা মাল বিদেশে প্রেরণ করার রীতি প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল, এবং প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-শস্যাদি রপ্তানিও চলিতে লাগিল। ১৮৪৯ হইতে ১৮৫৮ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে খাদ্য-শস্য রপ্তানি ৮৬ লক্ষ টাকা হইতে ৩,৭৯ লক্ষ টাকা পরিমাণ হইয়া উঠে। দেশীয় শিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত দ্রব্যের এইরূপ প্রসারের উপরেই দেশবাসীর অন্নসংস্থান নির্ভর করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

আর্থিক প্রসঙ্গ

ঋণ-সরবরাহ-নিয়ামক আইন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মিঃ ফজলুল হক টাকা লগ্নীকারী মহাজনদিগের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে যে খস্‌ড়া বিল পেশ করিয়াছেন, ব্যবস্থা-পরিষদ তাহার প্রস্তাবিত বিধানগুলি বিস্তারিত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। উক্ত বিলের উদ্দেশ্য ও তাহার প্রস্তাবগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য; এ সম্বন্ধে এখন হইতেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা হওয়া দরকার। আপাততঃ আমরা এই বিলের স্থূল পরিচয় দিয়া কতকগুলি অনিবার্য্য সমস্যার উল্লেখ করিতেছি।

আলোচ্য বিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মিঃ হক যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নরূপ :—

প্রথমতঃ—ইহার সহায়তায় যে সকল মহাজন খাঁটি বাঙ্গালার অধিবাসী নয়, তাহাদের স্ব স্ব নাম রেজেষ্টারী করান বাধ্যতা-মূলক করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ লওয়া বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। তৃতীয়তঃ, লগ্নী-টাকার উপর যাহাতে অতিরিক্ত সুদ ধার্য্য না করা হয়, সেজন্য সুদ-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আদালতকে সমধিক ক্ষমতা দেওয়া হইবে। এই সকল উদ্দেশ্যের হেতু নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মিঃ হক্ বলিয়াছেন যে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে অতিরিক্ত সুদ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে 'ইউজোরিয়াস লোন্‌স্ অ্যাক্ট' পাশ হইয়াছে, তাহা এখনও প্রবল রহিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার ব্যবস্থাগুলি অনেক বিষয়েই অস্পষ্ট থাকিবার দরুণ, কার্য্যতঃ ইহার প্রয়োগব্যাপারে শৈথিল্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে; ফলে ইহার মূলে দেনাদারকে রক্ষা করিবার যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। ঠিক কোন্ হারে সুদ ধার্য্য করিলে তাহা অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, সে সম্বন্ধে এই অ্যাক্টে কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই; কাজেই আদালতের পক্ষে এ সম্বন্ধে কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ প্রচলিত সুদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও আদালত এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারে না, কারণ এক প্রদেশেই বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন হারে ধার্য্য সুদ তথায় সাধারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রস্তাবিত আইনের এ বিষয়ে স্পষ্ট বিধান দিবার দিকে লক্ষ্য রহিয়াছে।

উক্ত আইনের দোষগুণ বিচার করিবার পূর্ব্বে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আমাদের দেশে টাকা-লগ্নীর ব্যাপারে যেরূপ যথেচ্ছাচার চলিতেছে তাহাতে অনতিবিলম্বেই এ বিষয়ে কোন নিয়ামক আইন পাশ হওয়া উচিত। আমাদের দেশ সর্ব্বতোভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই টাকা লগ্নীর সমস্যা মুখ্যতঃ কৃষকদিগের সমস্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই সমস্যার যথাযথ সমাধান করিয়া বাঙ্গালার ঋণগ্রস্ত চাষীদের রক্ষা করিতে পারিলে তাহাতে যে সমগ্র প্রদেশেরই প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত যুক্তি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এ সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধেও যে ভারতবাসী উদাসীন রহিয়াছে, এমন নহে। মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বেও এ সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুসন্ধান গবেষণা করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। ইঁহারা অনুসন্ধানের ফলে যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন, সেগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিলেই প্রস্তাবিত বিলের সহায়তায় সমস্যার ঠিক সমাধান হইবে কি না, তাহা বিচার করা অনায়াসসাধ্য হইবে। এজন্য বিলের তিনটী উদ্দেশ্যই পৃথক ভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে—

(১) টাকা-লগ্নীকারের নাম রেজেষ্টারি করা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি এরূপ ব্যবস্থাকে অনাবশ্যক সাব্যস্ত করিয়া বলিয়াছেন যে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে 'রেগুলেশন অফ একাউণ্টস্' নামে যে আইন পাশ হইয়াছে, অন্যান্য প্রদেশে তদনুরূপ আইন পাশ করিলে আর নাম রেজেষ্টারী করা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। উক্ত আইনে লগ্নীকারমাত্রই যাহাতে দেনদারকে মাসান্তে দেনা-পাওনার বিস্তারিত তথ্য সহ হিসাব দিতে বাধ্য হয়, এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই হিসাবের উপর নির্ভর করিয়াই আদালত

যাহাতে ডিক্রী দেয়, সেরূপ ব্যবস্থাও রহিয়াছে। প্রবঞ্চনা-মূলক ব্যবহার নিবারণ করাই এই সকল ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় কমিটির মত এই যে এরূপ কোন ব্যবস্থা থাকিলে নাম রেজেষ্টারি করার বিশেষ কোন তাৎপর্য্য থাকে না। তা' ছাড়া টাকা লগ্নী করাই যাহাদের পেশা নয়, এমন লোকের পক্ষে টাকা ধার দেওয়া নাম রেজেষ্টারী করিবার আইনে একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিবে। এই প্রকার লোকের নিকট হইতে টাকা ধার লইবার পথ বন্ধ করিয়া দিলে দেনদারের পক্ষে তাহা ক্ষতিকরই হইবে। এই হিসাবে মিঃ হক্'এর বিলের প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে হইবে, কারণ তিনি যে সকল লগ্নীকার বাঙ্গালীর অধিবাসী নয়, কেবল তাহাদের নামই রেজেষ্টারী করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে এই সকল লগ্নীকারের নাম রেজেষ্টারী করাইবার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। বাঙ্গালার যে সকল পাঠান বা কাবুলি লগ্নীকার প্রতিবৎসর নির্দ্ধারিত সময়ে আসিয়া দরিদ্র চাষীদিগকে অস্বাভাবিক চড়া সুদে টাকা ধার দিয়া থাকে, তাহারা নিজের সুবিধার জন্য অনেক সময় দেনাদারের দ্বারা খতের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের নাম লিখাইয়া লয়। যাহাতে উল্লিখিত যে কোন স্থানে নালিশ করিয়া ডিক্রী লওয়া সম্ভব হইতে পারে। সেজন্য এই প্রকার মিথ্যা খত লিখাইয়া লওয়া হয়; বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে এই প্রকার দৃষ্টান্তের উপর বিশেষ ভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর পাঠান লগ্নীকারদের ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে মিঃ হক্ নাম রেজেষ্টারী করা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় বে-আইনি ঘোষণা করা সমীচীন বোধ হইলেও তাহা কার্য্যকরী হইবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। পাওনাদার লগ্নীর মেয়াদ ফুরাইবার সময় নূতন খতে চক্রবৃদ্ধি হারে ধার্য্য সুদ যদি আসল বলিয়া লিখাইয়া লয়, তাহা হইলে দেনদার রক্ষা পাইবে কি করিয়া? আদালতে সহায়তা লইবার ভরসাও সে পাইবে না, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহাজনের নিকট খত বদলাইয়া প্রাচীন কর্জ্জের স্থিতিকাল বাড়াইয়া লইতে হয়। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং কমিটির মত এই যে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যদি বাঙ্গালার অনুরূপ আইন পাশ করেন, তাহা হইলে পাওনাদার এবং দেনদার উভয়েরই কার্য্যকলাপ স্বভাবতঃই এরূপ নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিবে যে চক্রবৃদ্ধি সুদের বিপত্তির গুরুত্ব ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে থাকিবে। কেন্দ্রীয় কমিটি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ইংলণ্ডে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের এক আইনে চক্রবৃদ্ধি সুদ বে-আইনি করিয়া দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে তথায় আইন-গ্রাহ্য উচ্চতম সুদের হার শতকরা ৪৮৲ টাকায় ধার্য্য করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় চক্রবৃদ্ধি সুদ নিবারণের তাৎপর্য্য সামান্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির এই মত বিচার-সাপেক্ষ বলিয়া মনে করি।

(৩) সুদের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মিঃ হক্ আদালতকে যে সকল অসাধারণ ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন আমরা তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করি। তবে আইনের দ্বারা কোন উচ্চতম সুদ নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইবে কি না—বা হইলেও তাহা কি হারে ধার্য্য হইবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সমস্যা রহিয়াছে। ইংলণ্ডের মত অগ্রণী দেশেও যে শতকরা ৪৮৲ সুদ ধার্য্য করিতে হইয়াছে—তাহা একেবারে নিরর্থক নহে।

কৃষকের ঋণ সমস্যা—

বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে 'বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ্ কমার্স''এর প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় ভারতীয় কৃষকের ঋণ সমস্যা সম্বন্ধে যে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীমাত্রেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। ভারতের আর্থিক মেরুদণ্ড কৃষক সম্প্রদায় যে ঋণভারে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেজন্য দেশের আর্থিক উন্নতি যে কত প্রকারে প্রতিহত হইতেছে—সে সম্বন্ধে ভারতবাসী সচেতন হইয়াছে বটে, কিন্তু এই জগদ্দল ঋণভার লঘু করিয়া দিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কোন প্রচেষ্টাই হয় নাই বলিলে চলে। এমন কি এ সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে পরিকল্পনা করিবার চেষ্টাও কেহ করেন নাই। বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আকস্মিক বিপত্তি নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন কোন সময় কর্জ্জ দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু চাষীর ঋণ-সমস্যা সমাধানের তাহা কোন সহায়তা করিতে পারে না। ইহা ছাড়া কৃষক-দিগের জন্য সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, দুই কারণে বর্ত্তমান সমিতিও কিন্তু কৃষি-ঋণসমস্যার সমাধান করিতে

অসমর্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রথমতঃ, এই সমিতিগুলি কেবলমাত্র স্বল্পকালের জন্যই কর্জ্জ দিয়া থাকে; দ্বিতীয়তঃ ইহাদের তাঁবে যে পরিমাণ টাকা রহিয়াছে, তাহার পরিমাণও খুব বেশী নহে। দু' একটি দৃষ্টান্ত হইতেই ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং কমিটি বাঙ্গলার চাষীদের ঋণের পরিমাণ প্রায় একশত কোটি টাকা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বাঙ্গালায় কৃষি-সমবায় সমিতিগুলির তাঁবে মাত্র কিঞ্চিদধিক চারি কোটি টাকা রহিয়াছে; তাহাও মাত্র স্বল্পকালের জন্যই ধার দেওয়া সম্ভব। এমতাবস্থায় বর্ত্তমান সমবায় সমিতিগুলির সহায়তায় অদূরভবিষ্যতেও কৃষকদিগকে ঋণমুক্ত করিবার ভরসা থাকিতে পারে কি? বরং যখন এই কথা মনে উদিত হইবে যে ভারতীয় কৃষকসম্প্রদায়ের সমষ্টি-দেনার পরিমাণ প্রায় ৯০০ কোটি (কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং কমিটি এইরূপ অনুমান করিয়াছেন) তখন চাষীদিগকে ঋণমুক্ত করিবার আগে ছাড়িয়া দিবারই প্রবৃত্তি হইবে।

ভারতের এই গুরুতর সমস্যা লইয়া ব্যাঙ্কিং কমিটিগুলি মাথা ঘামাইয়াছেন বটে, কিন্তু এ সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহারা পরিকল্পনা করিয়া সমাধানের পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন পথ প্রদর্শন করেন নাই। কেবলমাত্র জমী-বন্ধকী ব্যাঙ্কের সহায়তাতেই এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ও উক্ত প্রকার ব্যাঙ্কের গঠন-রীতি কি হইবে সে সম্বন্ধে মতামত জ্ঞাপন করিয়াই তাঁহারা কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় ব্যাঙ্কিং কমিটির মন্তব্যের এই অস্পষ্টতা অপসারণ করিয়া কর্ত্তব্য-পথের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় প্রথমেই বলিয়াছেন যে কৃষি-ঋণের সমষ্টি-পরিমাণের বহর দেখিয়াই আশঙ্কান্বিত হইবার কারণ নাই। ইহার মধ্যে কতকাংশ অবশ্যম্ভাবী এবং তাহা কৃষকের বিপত্তির সূচনা করে না। শিল্পের সহিত কৃষিরও একটা ব্যবসায়িক সাম্য আছে। কর্জ্জ-লব্ধ টাকায় শিল্প পরিচালিত হইলেই আমরা তাহাকে বিপন্ন বলিয়া মনে করি না। এই অনুপাতে কৃষকেরও ঠিক কৃষি-কার্য্যের জন্যই অর্থাৎ লাঙ্গল, গরু, বীজ, সার ইত্যাদির জন্য যে কর্জ্জ করিতে হয়, তাহার জন্য তাহাকে বিপন্ন মনে করিবার হেতু নাই। কর্জ্জের টাকা শিল্পের ন্যায় কৃষিতেও নিয়োগ করিয়া লাভ হইয়া থাকে, একথা ভুলিলে চলিবে না। এজন্য কৃষকদের অংশ পরিমাণ ঋণ অনিবার্য্য ও বিপদমুক্ত বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

কিন্তু সমস্যা রহিয়াছে তাহাদের ভিন্ন উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের মধ্যে। চাষীরা অনেক সময় শ্রাদ্ধ-বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান বা চিকিৎসা, মোকর্দ্দমা ইত্যাদির জন্য অনেক সময়ই কর্জ্জ লইয়া থাকে। এই প্রকার ঋণের দ্বারা লাভবান হওয়া সম্ভব নহে; বরং অত্যন্ত চড়াহারে সুদ ধার্য্য থাকিবার জন্য তাহা শেষ পর্য্যন্ত চাষীদের সর্ব্বনাশই সাধন করিয়া থাকে। তাহাদের নিয়মিত আয়ের সংস্থান এত সামান্য যে তাহার দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার পর এমন কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না, যাহার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হইতে পারে। ফলে ঋণের বোঝা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ সমেত বাড়িতে বাড়িতে এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যখন মহাজনের হাতে সর্ব্বস্ব তুলিয়া দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। এই পুঞ্জীভূত ঋণকেই সরকার মহাশয় চাষীদের ঋণ-সমস্যার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে কোন একটানা পদ্ধতিতে বা ব্যবস্থায় এই সমস্যার সমাধান করা চলিবে না। এজন্য তিনি ঋণগ্রস্ত চাষীদের মধ্যে তিনটী শ্রেণী বিভাগ করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য পৃথক ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) যে সকল চাষীর সমষ্টি-দেনার পরিমাণ তাহাদের সম্পত্তির বিক্রয়-মূল্যের অর্দ্ধেকের কম, তাহাদের তিনি প্রথম শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইহাদের সমস্যা সুদের হার এবং পরিমাণের মধ্যেই শ্রেণীভুক্ত হইয়া রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে। প্রয়োজনানুসারে ইহাদের সুদের দায় কমাইবার জন্য প্রথমে আপোষে সম্পূর্ণ দেনার পরিমাণ সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি এরূপ আপোষ সম্ভবনা হয় তাহা হইলে আদালতের সাহায্যে ইহার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। নির্দ্ধারিত দেনা যদি পাওনাদার কিস্তিবন্দীতে লইতে রাজী হয় ভালই, নতুবা জমী-বন্ধকী ব্যাঙ্ককে দেনাদারের পক্ষ হইয়া পাওনাদারের সম্পূর্ণ দাবী মিটাইয়া দিতে হইবে। অতঃপর ব্যাঙ্ক দেনাদারের নিকট হইতে কিস্তিবন্দীতে টাকা লইবে ও সেজন্য তাহার সম্পত্তি ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক থাকিবে। (২) যে সকল চাষীর সুদ সমেত দেনার পরিমাণ তাহাদের সম্পত্তির মূল্যের অর্দ্ধেকের বেশী কিন্তু সম্পূর্ণ মূল্যের কম, তাহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত

করা হইয়াছে। ইহারাও পূর্ব্ব শ্রেণীর মত প্রথমে আপোষে ঋণের দায় কমাইয়া পরিশোধনীয় টাকার পরিমাণ সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিবে। দেনার টাকা একযোগে পাইবার জন্য পাওনাদারগণ কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপে তাঁহাদের দাবীর পরিমাণ কমাইতে স্বীকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদালতের সহায়তা লইতে হইবে। আদালতকে এজন্য ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের "ইউজোরিয়াস লোনস্ অ্যাক্ট"এর ন্যায় এক বিশেষ আইনের দ্বারা কতকগুলি ক্ষমতা দিতে হইবে। আদালত অবস্থানুসারে দেনার অংশ কমাইয়া সম্পত্তির অর্দ্ধেক মূল্য পর্য্যন্ত তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন, যাহাতে বাকী বন্ধকী ব্যাঙ্ক দেনাদারের সম্পত্তি বন্ধক লইয়া পাওনাদারের ঋণের দাবী মিটাইয়া দিতে সম্মত হয়। বন্ধকী সম্পত্তির অর্দ্ধ মূল্য পর্য্যন্তই ধার দেওয়া জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের রেওয়াজ, তাহার বেশী নহে। (৩) তৃতীয় শ্রেণীতে যে সকল চাষীদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তাহাদের সুদসমেত দেনার পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে এরূপ আকৃতি ধারণ করিয়াছে, বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের সম্পত্তি সম্পূর্ণ বিক্রয় করিলেও সমষ্টি-দেনা দূরে থাক্, ঋণের আসল টাকা পরিশোধেরও উপায় নাই। ইহাদের রক্ষা করিবার জন্য একটি 'কৃষি দেউলিয়া আইন' পাশ করিবার প্রয়োজন হইবে। এই আইনের সহায়তায় দেনাদারের একান্ত প্রয়োজনীয় গরু, লাঙ্গল ও অন্যান্য কৃষি-যন্ত্রপাতি ও বসতবাটী ব্যতীত সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আদালতের সহায়তায় নিলামে বিক্রয় করিয়া তাহা দ্বারা পাওনাদারের দাবী যতদূর মিটানো সম্ভব তাহাই মিটাইয়া দেওয়া হইবে এবং সেই সঙ্গে উদ্বৃত্ত দেনা হইতে দেনাদারকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হইবে। শ্রমিক হিসাবেও যাহাতে সে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়, সেজন্য তাহার বসত-বাটীতেও গরু, লাঙ্গল ইত্যাদির উপর উপসত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে।

শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয়ের এই সকল প্রস্তাব বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি ও গবেষণার পরিচায়ক। এ বিষয়ে বাঙ্গালার জনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্টের বিশেষ আলোচনা করিয়া অনতিবিলম্বে কর্ম্ম-তৎপর হওয়া উচিত।

পাটের ফট্‌কা-বাজার নিয়ন্ত্রণ—

বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা যে পাটের দামের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভরশীল একথা এখন বাঙ্গালার অধিবাসী মাত্রের কাছেই স্থূল সত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইদানীং কেহ কেহ এরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে কলিকাতার ফট্‌কা বাজারগুলি পাটের মূল্য-হ্রাসের অন্যতম কারণ। ভবিষ্যতে মাল ডেলিভারি দিবার চুক্তিতে যে বাজারে কেনা-বেচা চলে তাহাকেই 'ফট্‌কা-বাজার' সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। এই বাজারে সকলেই যে মাল 'ডেলিভারি' লইবার বা দিবার মতলব করিয়া কেনা বা বেচার চুক্তি করিয়া থাকে, এমন নয়। বস্তুতঃ অনেকেই ডেলিভারি দিবার তারিখের বাজার দর ও চুক্তি-নির্দ্ধারিত দরের বৈষম্য-জনিত লাভালাভের জন্যই এই প্রকার চুক্তি করিয়া থাকে। বাজারদর চুক্তির দর অপেক্ষা কম হইলে বিক্রেতার লাভ,—বেশী হইলে ক্রেতার লাভ হয় বুঝিতে হইবে। এই প্রকার ফট্‌কাবাজী জুয়া খেলারই সামিল। ক্রেতার দল দর বাড়াইবে ও বিক্রেতার দল কম করিবে—এইরূপ বিপরীত আশা পোষণ করিয়া এই মারাত্মক খেলায় লিপ্ত হইয়া থাকে। ফট্‌কা বাজারের এই বিপত্তি কাহারও অজ্ঞাত নয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সকল প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনি ঘোষণা করা সম্ভব নহে। কারণ তাহা হইলে মালের খাঁটি ক্রেতা-বিক্রেতারা সমূহ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িতে পারে। আজ যে মিলওয়ালা ৬ মাস পরে কোন নির্দ্ধারিত দরে চট বিক্রয় করিবে, সে যদি এখনই আগাম চুক্তিতে নির্দ্ধারিত দরে পাট ক্রয় করিতে না পারে, এবং যদি কোন অনিবার্য্য কারণে অল্পকালের মধ্যেই পাটের দাম চড়িয়া যায়,—তাহা হইলে সে তাহার চট্ বিক্রয়ের লোকসান সামলাইবে কি করিয়া? বিক্রেতাও এরূপ আগাম চুক্তিতে মাল বিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে আপত্তি করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? ফট্‌কা-বাজারে যাহারা কেবল জুয়াখেলার অভিপ্রায়েই আসিয়া থাকে,—তাহাদের বিরুদ্ধেই আপত্তি থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেজন্য ফট্‌কা-বাজারকেই বে-আইনি ঘোষণা করিবার কারণ নাই; এইসকল বাজার যাহাতে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হয়, সেজন্য যথার্থ ব্যবস্থা করা দরকার।

সে যাহা হউক, কলিকাতার পাটের ফট্‌কা-বাজার সম্বন্ধে যে সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা উঠিয়াছে তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার সময় উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। ইদানীং ইংরেজ বণিক-সঙ্ঘ বেঙ্গল চেম্বার অফ্-কমার্সের উদ্যোগে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিবার জন্য ও কলিকাতায় পাটের ফট্‌কা-বাজার আদৌ প্রয়োজন আছে কি না বা থাকিলে তাহা কি প্রণালীতে পরিচালিত হওয়া উচিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবসায়িক সমিতির প্রতিনিধিবর্গের এক সভা আহূত হইয়াছিল; তাঁহাদের গবেষণা এখনও সমাপ্ত হয় নাই। সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা বিশেষ অনুসন্ধান ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। উক্ত সভার সভ্য-বৃন্দ কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু একথা ঠিক যে তাঁহারা যেরূপ সিদ্ধান্তই করুন, তাহা দেশবাসীর নিকট গ্রাহ্য হইবে কিনা সে সমস্যা একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসিত হইয়া যাইবে; তাহা এই "বাঙ্গালার চাষীর এ সিদ্ধান্তে কতটুকু স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে?"

বীমা প্রসঙ্গ

স্বাস্থ্য-পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের ফি

জীবন-বীমার প্রস্তাবকারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক কোম্পানীকে বহুসংখ্যক উপযুক্ত ডাক্তারকে বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত করিতে হয়। এই সমস্ত ডাক্তার কোন বেতন পান না কিন্তু প্রত্যেকটি বীমাকারীকে পরীক্ষা করিবার জন্য কোম্পানীর নির্দ্দিষ্ট ফি পাইয়া থাকেন। এই ফি'র পরিমাণ বিভিন্ন কোম্পানীতে বিভিন্ন প্রকার। কোন কোন কোম্পানী বীমার পরিমাণ অনুযায়ী ফি'এর তারতম্য করিয়া থাকেন, কেহ বা ডাক্তারের গুণপনা হিসাবে ফি'র পরিমাণ ধার্য্য করিয়া থাকেন। মোটামুটী এই ফি ৮৲ হইতে ১৬৲ পর্য্যন্ত আছে। এই ফি'র একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বা scale করিয়া দিবার জন্য বহু দিন হইল ভারতীয় বীমা-কোম্পানী-সঙ্ঘ চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রথমে তাঁহারা বিভিন্ন কোম্পানীদের এ বিষয়ে যে নিয়ম-কানুন আছে তাহা সংগ্রহ করেন, পরে ডাক্তারদের Associationএর নিকট এ বিষয় মতামত গ্রহণ করেন। Insurance Managerদের মতও গ্রহণ করা হয়। তাহার পর একটা মোটামুটী scale সাব্যস্ত করিয়া সে বিষয় একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে যে Association তাঁহাদের পাশ-করা প্রস্তাবকে আইনতঃ অচল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

এই ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যাপারে কোম্পানীগুলিকে প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের শতকরা ১৫৲ খরচ করিতে হয়, অথচ এ বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় অনেক রূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়। যে কোম্পানী বেশী ফি দেয় তাহার ডাক্তার যদি অন্য কোম্পানীরও পরীক্ষক হন্, তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থ থাকে যে যেখানে বেশী ফি পাওয়া যায় প্রত্যক্ষ না হইলেও পরোক্ষ ভাবে তাঁহার সেই কোম্পানীর পক্ষ অধিক সমর্থন করা।

কখনও বা কোন কোম্পানী আপনার নির্দ্দিষ্ট ফি'তে ভাল ডাক্তার না পাইয়া বাধ্য হইয়াই অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ডাক্তারকে দিয়া কাজ করাইতে বাধ্য হয়। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার জন্য ভারতীয় বীমা-কোম্পানী গুলির সম্মিলিত চেষ্টা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। কোন কোন বিশেষজ্ঞ মত দেন যে Life Offices' Association হইতে যদি সমস্ত দেশের প্রধান প্রধান স্থানে ডাক্তার নিযুক্ত করা হয় এবং এই নিয়ম হয় যে কোম্পানীগুলি এমনভাবে নিযুক্ত ডাক্তার ব্যতীত অন্য কোন ডাক্তারকে দিয়া কেস্ পরীক্ষা করাইতে পারিবেন না, তাহা হইলে এ সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু এ বিষয়ের ২টী বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত, প্রথমতঃ অধিকাংশ দেশীয় বীমা-কোম্পানীই Associationএর সভ্য নন্। আর Associationএর পক্ষে এইরূপ সহস্র সহস্র ডাক্তারের তালিকা করিয়া তাহা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনাদি দ্বারা উপযোগী করিয়া রাখা সম্ভব নয়।

যাহা হউক এই আদর্শ যদিও কার্য্যে পরিণত করা বর্ত্তমানে সম্ভবপর হইতে না পারে, তথাপি পারিশ্রমিকের পরিমাণের একটী সর্ব্ববাদীসম্মত scale প্রস্তুত করা আমরা অসম্ভব মনে করি না। আমরা এই বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়টীতে Indian Life Offices' Associationএর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাঁহাদের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহারা যেন উদ্যমহীন হইয়া না পড়েন।

উপযুক্ত ডাক্তার ও পরীক্ষার উপরই বীমা-কোম্পানীর স্থায়িত্ব নির্ভর করে, সুতরাং বাধাবিঘ্ন থাকিলেও এ বিষয়ে Associationএর সভ্য ও বাহিরের কোম্পানীগুলি সকলেরই সম্মিলিত চেষ্টা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বীমাক্ষেত্রে ইংলণ্ড বনাম আয়র্লণ্ড :—

আয়র্লণ্ডে যে সমস্ত বিদেশী বীমা-কোম্পানী কাজ করিবেন তাহাদিগকে চতুর্গুণ ষ্টাম্প দিয়া পলিশি প্রদান করিতে হইবে, ডি ভ্যালেরা এই হুকুম দেওয়ায় ইংরেজ বীমা-কোম্পানী মহলে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরেজ বীমা-কোম্পানীদের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে ও ব্যাপারে আয়র্লণ্ডের বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে না। অনেক আইরিশ ইংরেজ বীমা-কোম্পানীতে share কিনিয়াছেন। যে-সমস্ত কোম্পানী আয়র্লণ্ডে তাঁহাদের শাখা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ কর্ম্মচারী ও এজেন্টই আইরিশ। তাঁহারা

আরও বলিতেছেন যে বীমার চাঁদার জন্য যে টাকা প্রতি বৎসর দেশ হইতে বাহিরে যাইতেছে তাহাতে exchangeএর যে প্রভাবের কথা সাধারণে বলে তাহাতে বীমা-কোম্পানী claim প্রভৃতির যে সমস্ত টাকা প্রদান করে, তাহা ধরা হয় না। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের মতে বীমা করিলে, বীমা করিবার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত এবং আইন দ্বারা protection policy চালান' দেশের স্বার্থের পক্ষে হানিকর।

ভারতবর্ষেও বীমা বিষয়ে কেহ কেহ ঐরূপ যুক্তির অবতারণা করেন। কিন্তু ভারতবর্ষ ও আয়র্লণ্ডের মধ্যে এ বিষয়ে একটী প্রধান পার্থক্য এই যে বিদেশী বীমা-কোম্পানীর অংশীদারের মধ্যে ভারতীয়দের কোন স্থান নাই, সুতরাং কোম্পানীর পরিচালনা বিষয়ে তাঁহাদের কোনরূপ মতামত দিবার উপায় দেখা যায় না। যে সমস্ত উপরিতন কর্ম্মচারী বিদেশী এবং তাহাদের এখানে পলিশি প্রদান করিয়া যে চাঁদা লওয়া হয় তাহার জন্য কোন উপযুক্ত reserve ভারত সরকারের ক্ষমতার মধ্যে থাকে না। সত্য বটে কোন কোন কোম্পানী ভারতবর্ষে অনেক টাকা খাটাইয়া থাকেন কিন্তু উচ্চ হারে সুদের জন্য মাত্র। যে দিন ইচ্ছা তাঁহারা সেই অর্থ ভারত-সরকারের সম্মতি না লইয়াই স্থানান্তরিত করিতে পারেন। সুতরাং আমানত কি গচ্ছিত হিসাবে ভারতীয় পলিশি-হোল্ডারদের হাতে কিছুই থাকে না। আমরা একথা বলি না যে বিদেশী বীমা-কোম্পানীগুলি claim দিতে ইতস্ততঃ করেন কিন্তু "good government is no substitute for responsible government."

বীমা-কোম্পানীদের গভর্ণমেণ্টের নিকট ডিপোজিট :—

ভারত সরকারের Insurance Actএর বিধান অনুযায়ী জীবন বীমা কোম্পানীগুলিকে সরকারের নিকট ২,০০,০০০৲ টাকা জমা রাখিতে হয়। এই অর্থ বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকার গচ্ছিত রাখেন। পুরাতন কোম্পানীদের বীমাকারীদের পক্ষে এই অর্থ অতি সামান্য, এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি বহুদিন পূর্ব্বে আকর্ষণ করা হয়। উত্তরে সরকার বলেন যে এই অর্থ জীবন-বীমার reserve ভাবে লওয়া হয় না, ইহা লইবার উদ্দেশ্য bogus company স্থাপন নিবারণ করা। ২,০০,০০০৲ টাকা যাহারা জমা দিতে পারেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য দু'দিনে যাহা-কিছু পাওয়া তাহাই লইয়া প্রস্থান করা হইতে পারে না। যুক্তিটি তখন সারবান বোধ হইতেছিল। কিন্তু ক্রমে সরকার নিয়ম করিলেন যে ঐ অর্থ ২,০০,০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া জমা দিলেই দেওয়া হইল ধরিয়া লওয়া হইবে। ইহার ফলে শতকরা তিন টাকা সুদের ২,০০,০০০৲ টাকার কাগজ কমবেশী ১০০,০০০৲ টাকায় কিনিয়া দিলেই কাজ চলিয়া যাইত। অর্থাৎ ডিপোজিট ২,০০,০০০৲ টাকা স্থলে ১,০০,০০০৲ পরিণত হইল। পরোক্ষভাবে কোম্পানীগুলিকে কোম্পানীর কাগজ কিনিতে বাধ্য করিয়া অথচ তাহাদিগকে ঐ ধার্য্য মতে অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা ব্যয় করিতে দিয়া সরকার এক ঢিলে দুইটি পাখীই মারিলেন। নিজেদের কাজটিও হইল, অথচ যাহাদিগকে বাধ্য করিয়া কাগজ কিনাইতেছেন তাহারাও সন্তুষ্ট থাকিল।

এ পর্য্যন্ত থাকিলেও একরূপ হইত। কিন্তু সরকার নিয়ম করিলেন যে ঐ ২,০০,০০০৲ টাকার কাগজও একযোগে দিতে হইবে না। মাত্র ২৫০০০ টাকার কাগজ জমা দিলেই কোম্পানীগুলিকে কাজ করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে। ফলে যে কেহ ১৪।১৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই বীমা-কোম্পানী পরিচালনা করিতে সমর্থ হইলেন। এইরূপ বর্ত্তমান সময়ে প্রায় ৫০।৬০টী কোম্পানী স্থাপিত হইয়া সরকার যাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিলেন তাহাই হইতে চলিয়াছে। গত তিন বৎসরে যে সমস্ত নূতন কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি ব্যতীত বাকী গুলির উদ্বর্ত্ত-পত্র পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, সে গুলি উপযুক্ত মূলধন লইয়া কার্য্য-পরিচালনায় অগ্রসর হয় নাই।

আবার এ সামান্য ডিপোজিটের নিয়মও Provident কোম্পানীর পক্ষে প্রযুক্ত না হওয়ায় দেশব্যাপী শত শত Provident কোম্পানী ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিয়াছে। আমাদের আশঙ্কা ইহার মধ্যে অনেকগুলিই অল্পকাল মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া দেশবাসীকে স্বদেশী বীমার মূল ভিত্তি সম্বন্ধে সন্দিহান রাখিয়া যাইবে। দেশে বহু বীমা প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলি উপযুক্তভাবে পরিচালিত হইলেই আর বিদেশী বীমা-কোম্পানীর দ্বারে যাইতে হইবে না। এমতাবস্থায় যাহাতে অযথা আর অধিক বীমা-প্রতিষ্ঠান দুর্ব্বল

দেহে প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে না যাইতে পারে সে জন্য দেশবাসী ও সরকার উভয়েরই চেষ্টা করা উচিত।

আমরা মনে করি যদি Insurance কোম্পানী করিতে প্রথমে পূরা ২,০০,০০০ টাকা গভর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত রাখিবার ও Provident কোম্পানী হইলে বর্ত্তমানে বীমা কোম্পানীর যে প্রথায় ডিপোজিট দিতে হয়, সেই প্রথায় ডিপোজিটের ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে আর অযথা দুর্ব্বল বীমা-প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করিবার সুযোগ থাকে না। আমরা এ বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

এজেণ্টদের মধ্যে প্রতিযোগিতা

জীবন-বীমার প্রসারের সহিত অনেক নূতন নূতন দেশীয় বীমাকোম্পানী স্থাপিত হইতেছে। ফলে এজেণ্টদের মধ্যেও নূতন বীমা-সংগ্রহের জন্য প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। দেশীয় বীমা-কোম্পানীগুলি স্বদেশী প্রচার কার্য্য প্রধানতঃ এজেণ্টদের দ্বারাই করিয়া থাকেন। এই সমস্ত এজেণ্টগণ বীমাকারিকে বিদেশী বর্জ্জনের জন্য অনুরোধ করিয়া যুক্তি-তর্ক অবতারণা করিয়া থাকেন। কিন্তু বিষয়টী এই পর্য্যন্ত গিয়াই স্থগিত হয় না। 'ক' কোম্পানীর এজেণ্ট বা অরগ্যানাইজারের তাঁহার নিজের আফিসের জন্য কার্য্য সংগ্রহ করা যেরূপ প্রয়োজন, 'খ' কোম্পানীর এজেণ্টেরও তাঁহার নিজের আফিসের জন্য কার্য্য সংগ্রহ করা সেইরূপই প্রয়োজন। ফলে কোম্পানীর এজেণ্ট মহাশয়কে হয়তো বাধ্য হইয়া 'ক' কোম্পানীর বিরুদ্ধে সত্যাসত্য ২।৪টা কথা বলিয়া কার্য্যটি সংগ্রহ করিতে হয় এবং অনেক স্থলে হয়তো 'ক' কোম্পানীতে পলিশিটী lapse করাইয়া বা paid-up করাইয়াও তাঁহার নিজের কার্য্যোদ্ধার করিতে হয়। তিনি হয়তো মনে করেন যে 'ক' কোম্পানী এ বিষয় কিছুই জানিতে পারিবে না। কিন্তু দুই দিন অগ্রপশ্চাৎ 'ক' কোম্পানীর এজেণ্ট মহাশয় প্রকৃত সংবাদ জ্ঞাত হইয়া 'খ' কোম্পানী হইতে দুই একটী পলিশি নিজের কোম্পানীতে আনিতে চেষ্টা করেন। এই প্রতিযোগিতার ফলে স্বদেশী প্রচার কার্য্য না হইয়া স্বদেশী কোম্পানীগুলি পরস্পর পরস্পরের সত্যাসত্য দুর্ব্বলতাই প্রচার করিতে থাকেন এবং তাহাতে সকলেরই স্বার্থের হানি হইতে থাকে। এইরূপ অনিষ্টকর কার্য্য হইতে এজেণ্টদিগকে বিরত করিবার চেষ্টা করা বৃথা, কারণ নূতন কার্য্য সংগ্রহের উপর তাঁহাদের উদরান্ন নির্ভর করে। অথচ এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা না হইলে স্বদেশী বীমা ব্যবসায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

আমাদের মনে হয় স্বদেশী বীমা-কোম্পানীগুলি সংঘবদ্ধ হইয়া একত্রে প্রচারকার্য্য করিলে এই বিপদের অনেকটা লাঘব হইতে পারে। যদি পাঁচটী বাঙ্গলার কোম্পানী একত্রে বিজ্ঞাপনাদি আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এজেণ্টগণ বাধ্য হইয়া সেই সেই কোম্পানীর বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারিবে না। এই joint propaganda প্রথম বোম্বাই'এর ৫টী কোম্পানী আরম্ভ করেন এবং তাহাতে তাঁহাদের বিজ্ঞাপনের ব্যয়ও কমিয়া যায় এবং বীমা-কার্য্যও বেশী সংগ্রহ হয়। বিশেষতঃ বড় কোম্পানীর এজেণ্ট ছোট কোম্পানীর বিরুদ্ধে অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারে না।

আমাদের বাঙ্গলার বীমা কোম্পানীর ম্যানেজার মহোদয়গণ এ বিষয়টী বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি?

পলিশির সর্ত্ত

বিভিন্ন বীমাকোম্পানী বিভিন্ন প্রকার সর্ত্তে policy প্রদান করিয়া থাকেন। সাধারণে policyর সর্ত্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বুঝায় তাহার ভাল মন্দ কিছু বুঝিতে পারে না। Automatic non-forfeiture clause অনেক কোম্পানীর পলিসিতেই নাই, তাহার ফলে ২।১টী অতিশয় কষ্টকর ঘটনার বিষয় মাঝে মাঝে আমরা জানিতে পারি। সম্প্রতি কোন বৃহৎ ভারতীয় বীমা-কোম্পানীতে এক ব্যক্তি বার বৎসরে প্রায় ১৭০০৲ প্রিমিয়াম প্রদান করিয়া ২ বৎসর প্রিমিয়াম দিতে পারেন না ও মৃত্যুমুখে পতিত হন্। পলিশির সর্ত্ত অনুযায়ী উক্ত পলিশি lapse হওয়ায় তাঁহার ওয়ারিশগণ কিছুই পাইতে অধিকারী নহে। সম্ভবত তিনি জানিতেন না যে তাঁহার পলিশিতে automatic non-forfeiture clause নাই। জানিলে হয়ত সময় থাকিতে সাবধান হইতে পারিতেন।

আমাদের মতে পলিশির standard সর্ত্ত গভর্ণমেণ্ট হইতে স্থির করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে কোন অজ্ঞ ব্যক্তিও বীমা করিতে গিয়া ফাঁকিতে পড়িবেন না। অন্ততঃ পক্ষে Insurance Actএর মধ্যে যদি কতকগুলি বিশেষ সর্ত্ত সমস্ত পলিশিতেই দিতে হইবে এই মর্ম্মে একটী বিধান থাকে তাহা হইলে বীমাকারিদের সমূহ উপকার সাধিত হয়। আমরা এ বিষয়ে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বাংলার তাঁতী

—শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস

বস্ত্রবয়ন-শিল্পের প্রাচীনত্ব

বাংলা দেশের কুটীর-শিল্পের মধ্যে বস্ত্রবয়ন-শিল্পের স্থান সকলের উচ্চে, ইহা সকলেই জানেন। প্রাচীনত্ব, বিস্তৃতি, ব্যবসায়ে নিযুক্ত কারিকরের সংখ্যা, কিম্বা উৎপন্ন দ্রব্যের মোট পরিমাণ ও মূল্য যে কোনও দিক হইতেই আলোচনা করা যাউক্ না কেন, বস্ত্র-বয়ন-শিল্পের গুরুত্ব অন্য সকল প্রকার কুটীর-শিল্প অপেক্ষা অনেক বেশী। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে কুটীর-শিল্প হিসাবে যে পরিমাণ কাপড় তৈয়ারী হইত, তাহা হইতে আমাদের যাবতীয় অভাব পূরণ হইয়াও বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্য অনেক উদ্বৃত্ত থাকিত, নানাপ্রকার প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে ইহা জানা যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বের সঠিক সংবাদ জানিবার কোনও উপায় নাই; কিন্তু সেই সময়ে ভারতবর্ষে বস্ত্রশিল্পের যে খুব উন্নতি হইয়াছিল এবং নানাপ্রকার ঘটনা-স্রোতের আবর্ত্তের মধ্য দিয়া ভারতের বস্ত্রশিল্প যে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। তাহার পর ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পিগণের কাতরোক্তির ফলে সেখানকার গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ হইতে কাপড়ের আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন এবং ভারতের বস্ত্রশিল্পের সংরক্ষণ ব্যাপারে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঔদাসীন্য, প্রধানতঃ এই দুই কারণে এবং আংশিক ভাবে ইংলণ্ডের যন্ত্রশিল্প-জাত কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের সাধারণ তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের পক্ষে টিকিয়া থাকার দুরূহতার দরুণ বর্ত্তমানে আমাদের বস্ত্রশিল্পের এত অবনতি ঘটিয়াছে যে, বিদেশে রপ্তানী করা দূরে থাক্, আমাদিগকে এখন আমাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্যই বিদেশ হইতে কাপড় আমদানী করিতে হইতেছে।

অবশ্য সৌভাগ্যবশতঃ ইহার ফলে আমাদের কুটীর-শিল্প উচ্ছেদ হইয়া যায় নাই এবং গত ৫০।৬০ বৎসরের [illegible] আমাদের দেশে পাশ্চাত্য প্রথায় অনেকগুলি কাপড়ের [illegible] ফলে আমাদের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় কতক পরিমাণে আমরা নিজেরাই সরবরাহ করিতে পারিতেছি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে আমরা এখন পর্য্যন্ত এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হইতে পারি নাই, প্রতি বৎসর আমরা বিদেশ হইতে যে পরিমাণ কাপড় আমদানী করিতেছি, তাহা হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

কাপড়ের কল ও তাঁতের কাপড়

বস্তুতঃ বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতার ফলে আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্পের অনেক অসুবিধা হইতেছে এবং বিদেশী কাপড়ের উপর আমদানী-শুল্ক না বসাইলে আমাদের কাপড়ের কলগুলির সমূহ ক্ষতি হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্ট ট্যারিফ বোর্ডের উপর এই বিষয়ে তদন্তের ভার দিয়াছেন। সকলেই আশা করিতেছেন যে এই তদন্তের ফলে বিদেশী কাপড়ের উপর চড়াহারে আমদানী-শুল্ক বসানো হইবে।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা অনাবশ্যক; কিন্তু সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে বর্ত্তমানে যদিও বিদেশী বস্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের কাপড়ের কলগুলি টিকিতে পারিতেছে না, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য তাঁতী তাহাদের ব্যবসায় মোটামুটি বেশ লাভজনকভাবেই চালাইতেছে। ইহা তাহাদের পক্ষে কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে।

বাংলাদেশে বয়নশিল্পের প্রচার

বাংলাদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও কুটীর-শিল্প হিসাবে বস্ত্রবয়নকে প্রধান জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছে এমন বিস্তর তাঁতী আছে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র বাংলাদেশ সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। বাংলা দেশের এমন কোনও জেলা নাই যেখানে এই শিল্পের প্রচলন নাই। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে স্থানীয় সকল অধিবাসীই বস্ত্রবয়ন-শিল্পকে তাহাদের প্রধান জীবিকা হিসাবে

গ্রহণ করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর, নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত চৌমোহানী এবং বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোণামুখী, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের নাম করা যায়। এমন অনেক হাট আছে যেখানে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের দেশী বিদেশী কলে প্রস্তুত সূতা এবং তাঁতের কাপড় বিক্রয় হয়।

১৯২১ সালের আদম সুমারীর রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে সে সময় বাংলা দেশে ২ লক্ষ ১৪ হাজার তাঁত চলিত, এবং এই তাঁতের উপর সাক্ষাৎভাবে নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষেরও উপর। তাহার পর গত দশ বৎসরে ইহা বাড়িয়া কত হইয়াছে ১৯৩১ সালের আদম সুমারীর রিপোর্ট বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; কিন্তু এই বিষয়ে যাঁহারা খোঁজ রাখেন তাঁহারা হিসাব করিয়াছেন যে এই সময়ের মধ্যে তাঁতের সংখ্যা শতকরা ১৭½ হিসাবে পড়িয়াছে, অর্থাৎ বর্ত্তমানে বাংলা দেশে মোট তাঁতের সংখ্যা বাড়িয়া ২ লক্ষ ৫১ হাজার হইয়াছে। তাঁতের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যাও বাড়িয়াছে, এবং মোটামুটিভাবে বলা যায় যে বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। কিন্তু সকল সময়েই এই ২ লক্ষ ৫১ হাজার তাঁতের কাজ চলিতে থাকে এইরূপ অনুমান করিলে ভুল হইবে। অসুখ-বিসুখ, প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কাঁচামালের সরবরাহে অসুবিধা, তাঁতীদের সকল সময়ই কাজে নিযুক্ত থাকিতে অনিচ্ছা, তৈয়ারী মাল বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ছুটী প্রভৃতি কারণে অনেক সময়ই কতক পরিমাণ তাঁতের কাজ বন্ধ থাকে। যদি ধরা যায় যে মোট তাঁতের শতকরা ১০ ভাগ এই কারণে অব্যবহৃত থাকে তাহা হইলে দেখা যাইবে যে বর্ত্তমান সময়ে প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার তাঁত প্রকৃত পক্ষে কার্য্যকরী এবং এই সোয়া দুই লক্ষ তাঁতেও বৎসরের ৩৬৫ দিনই যে কাজ হয় তাহা নহে। সাধারণতঃ ঢাকা অঞ্চলে সারা বৎসরের মধ্যে ৩২০ দিন এবং পশ্চিম বঙ্গে ২৫০ দিন কাজ চলে, এইরূপ হিসাব করিয়া সমগ্র বাংলা দেশে মোটামুটিভাবে ৩০০ দিন কাজ করা হয় এইরূপ একটা হিসাব করিলে খুব বেশী ভুল হইবে না।

বাংলা দেশের সকল জেলার তাঁতীই যে দিনে সমপরিমাণ কাপড় তৈয়ারী করিতে পারে তাহাও নহে। ঢাকা জেলাতে "চিত্তরঞ্জন তাঁত" নামে একপ্রকার নূতন তাঁতের প্রচলন হইয়াছে, ইহার সাহায্যে সেখানকার তাঁতীরা দিনে প্রায় ২৫ গজ কাপড় তৈয়ারী করিতে পারে; কিন্তু অন্যান্য স্থানে এখন পর্য্যন্ত এই তাঁতের তেমন প্রচলন হয় নাই, এবং সকল স্থানের তাঁতীরা কার্য্যকুশলতায় সমান পারদর্শী নহে; বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে কুমিল্লার তাঁতীরা গড়-পড়্তা দৈনিক ১২ গজ, টাঙ্গাইলের তাঁতীরা ১৪ গজ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের তাঁতিরা ৮ গজ এবং বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, নদীয়া, হুগলী এবং হাওড়ার তাঁতীরা দৈনিক ৬ গজ করিয়া কাপড় বুনিতে পারে। বিভিন্ন জেলার তাঁতীদের এই বিভিন্ন প্রকার দৈনিক উৎপাদনের হিসাব করিলে মনে হয় যে সমগ্র বাংলা দেশের তাঁতীদের গড়পড়্তা দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ ৮ গজ ধরিলে খুব বেশী ভুল হইবে না।

অর্থাৎ ২ লক্ষ ২৫ হাজার তাঁতে বৎসরে ৩০০ দিন কাজ করিবার ফলে এবং প্রত্যহ প্রতি তাঁতে ৮ গজ করিয়া কাপড় তৈয়ারী হইলে সারা বৎসরে সমগ্র বাংলা দেশে প্রায় ৫৪ কোটি গজ কাপড় তৈয়ারী হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে ১৯৩১-৩২ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে বিভিন্ন কাপড়ের কলে ২৯৮ কোটি গজ কাপড় তৈয়ার হইয়াছিল; সেই বৎসর আমাদের দেশে বিদেশ হইতে ৭৬ কোটি গজ কাপড় আমদানী হইয়াছিল। ইহার সহিত বাংলা দেশের তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণ তুলনা করিলে বাংলার কুটীরশিল্পকে খুব বেশী তুচ্ছ করা যায় না—ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

তাঁতের কাপড়ের অধিক প্রচলনের কারণ

অনেকে হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন যে দেশী ও বিদেশী কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশে তাঁতের কাপড়ের এত প্রচলন কি করিয়া সম্ভব হইল? ইহার উত্তরে এই কথা বলা যায় যে আমাদের দেশের তাঁতীরা বস্ত্রবয়নে অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে। এমন অনেক প্রকার কাপড় আছে যাহা তৈয়ারী করিতে এত সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় যাহা সাধারণতঃ প্রস্তুত করিতে গেলে যথেষ্ট পরিমাণ চাহিদা না থাকিলে তৈয়ারী করার খরচ পোষায় না; এমনও অনেক প্রকার কাপড় আছে যাহা তৈয়ারী করার জন্য প্রয়োজনীয় কলকব্জার আবিষ্কার এপর্য্যন্ত হয় নাই।

তাহা ছাড়া এখনও আমাদের দেশের অনেক পরিবারে তাঁতে প্রস্তুত সাধারণ আটপৌরে কাপড় (যেমন ডুরে শাড়ী প্রভৃতি) খুব বেশী ব্যবহৃত হয়; অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক আড়ম্বর প্রভৃতি কারণেও তাঁতের কাপড়ের প্রতি লোকের একটা সহজাত আসক্তি আছে। এই সকল কারণেই এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে তাঁতীরা তাহাদের তৈয়ারী কাপড় বিক্রয় করিতে খুব বেশী অসুবিধা ভোগ করিতেছে না।

বাঙ্গালী তাঁতীর আর্থিক অবস্থা

উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে বাংলা দেশের তাঁতীদের অবস্থা খুবই ভাল, কিম্বা তাহাদের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য এখন আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁতের কাপড় আমাদের দেশে খুবই চলিতেছে বটে, কিন্তু এই বিক্রয়লব্ধ টাকার অতি সামান্য অংশই তাঁতীরা পাইতেছে ইহা হয়ত অনেকেই জানেন না।

বাংলা দেশের তাঁতীরা যে সকলেই বস্ত্রবয়নকেই তাহাদের প্রধান জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহা নহে; অধিকাংশ চাষ বাস করিয়া তাহাদের বাৎসরিক খোরাকের সম্পূর্ণ কিম্বা অংশ পরিমাণ যোগাইয়া থাকে। ইহাদের পক্ষে তাঁতের কাজ কিছু অতিরিক্ত রোজগারের সহায়ক মাত্র। কিন্তু এমনও অনেক তাঁতী আছে যাহাদের কৃষিকার্য্য হইতে প্রাপ্ত আয় খুবই সামান্য কিম্বা নাই বলিলেই চলে। উদাহরণ স্বরূপ ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলার তাঁতীদের উল্লেখ করা যাইতে পারে; সেখানে বস্ত্র-বয়ন-শিল্পে নিযুক্ত কারবারীগণকে মোটামুটি ভাবে তিনটী ভাগে ভাগ করা যায়—তাঁতী, যুগী ও জোলা; তাঁতী এবং যুগীরা হিন্দু এবং জোলারা মুসলমান। যুগী এবং জোলারা সাধারণতঃ চাষবাস করে এবং অবসর সময়ে কাপড় বুনে; কিন্তু তাঁতীরা চাষবাস করিতে বিশেষ ইচ্ছুক নয়, এবং তাহারা সম্পূর্ণভাবে তাহাদের কাপড়ের ব্যবসার উপর নির্ভরশীল; বলা বাহুল্য অন্যান্য জেলাতেও এইরূপ অবস্থা। তাহা ছাড়া বস্ত্রবয়ন কাজে নিযুক্ত সকল কারিকরই যে জাতে তাঁতী তাহা নহে। হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত [illegible]পাতে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ জাতীয় ব্যক্তিরাও সম্প্রতি এই কাজে নামিতেছেন। অন্যান্য স্থানেও এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল তাঁতীর মাসিক আয় ২০৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকার বেশী নয়। ক'এক স্থলে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়; এমন অনেক তাঁতী আছে যাহারা মাসে ৩০৲ টাকার বেশী রোজগার করে, এবং এমনও অনেক আছে যাহাদের মাসিক আয় ২০৲ টাকারও কম! কিন্তু এই দুই প্রকার তাঁতীরই সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। সে যাহাই হউক মাসিক ২০৲।২৫৲।৩০৲ টাকা আয় যে এই সকল তাঁতীর পরিবার-প্রতিপালনের পক্ষে খুবই কম, এই ক্ষুদ্র আয় যে তাহাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার নহে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ যাহাদের ইহা ছাড়া আর অন্য কোনও প্রকার আয়ের সংস্থান নাই, তাহাদের পক্ষে ইহা নিতান্তই সামান্য।

তাঁতীদের আর্থিক দুর্গতির কারণ

তাঁতীদের এত কম আয়ের কারণস্বরূপ বলা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা নিঃসম্বল অবস্থায় কাজ করে বলিয়া কাপড় তৈয়ার করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সূতা কিনিবার টাকা তাহাদের থাকে না। এবং কাপড় তৈয়ারী হইয়া যাওয়ার পরও হাটে গিয়া তাহা বিক্রয় করিবার সুবিধা অনেকেরই নাই; সেইজন্য অনেক সময় তাহারা কোনও ব্যবসায়ীর মজুর হিসাবে কাজ করে; তাঁত, সূতা প্রভৃতি সমস্তই ব্যবসায়ী সরবরাহ করে, তাহারা কেবল কাপড় বুনিয়া দেয় এবং মজুরীবাবত যৎসামান্য যাহা পায় তাহাই গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে তাঁতীরা নিজেদের তাঁতেই কাজ করে, কিন্তু সূতা কিনিবার সামর্থ্য থাকে না বলিয়া মহাজনের নিকট টাকা ধার করিয়া হাট হইতে সূতা কিনিয়া আনে, কিম্বা মহাজনের নিকটই সূতা ধার করে; পরে কাপড় তৈয়ারী করিয়া তাহা মহাজনের নিকট আবার বিক্রয় করে। এই অবস্থায় অনেক সময়েই তাহারা তাহাদের ধারের জন্য অত্যন্ত চড়া হারে সুদ দিতে বাধ্য হয়, কিম্বা ন্যায্য দাম হইতেও অধিক দরে সূতা কিনিতে বাধ্য হয় এবং তৈয়ারী কাপড় বিক্রয় করিয়া অনেক ক্ষেত্রেই উচিত মূল্য পায় না। কাজেই এই সব কারণে তাহাদের প্রকৃত

আয়ের পরিমাণ যে খুবই কম হয় তাহা কিছু মাত্র বিচিত্র নহে।

বাংলাদেশের কোনও কোনও জেলাতে তাঁতীদের মধ্যে সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের এই সকল অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে; সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি তাঁতীদিগকে অল্প হারে টাকা ধার দিতেছে, এবং সমবায় ক্রয়-বিক্রয়-সমিতিগুলি তাহাদিগকে সূতা প্রভৃতি কাঁচা মাল সুবিধা দরে বিক্রয় করিতেছে, এবং তৈয়ারী মাল উচিত মূল্যে কিনিয়া লইতেছে। ব্যাপক ভাবে এই সকল সমিতির প্রতিষ্ঠা হইলে যে এই বিষয়ে তাঁতীদের অনেক সুবিধা হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে এইরূপ সমিতির সংখ্যা নিতান্তই কম রহিয়াছে। প্রধানতঃ চাষীদিগের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য সমবায় আন্দোলনের উদ্ভব; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত চাষীদের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সমিতির সংখ্যাই খুব বেশী হয় নাই, তাঁতীদের কিম্বা অন্যপ্রকার কুটীরশিল্পে নিযুক্ত কারিকরদের জন্য যে সে তুলনায় অনেক কম সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। সে যাহাই হউক এই বিষয়ে এখন হইতেই সকলের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কার্য্যদক্ষ পরিশ্রমী তাঁতীরা তাহাদের পরিশ্রমের উচিত মূল্য পাইবে না ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে।

বাংলায় উৎকৃষ্ট তাঁতের প্রচলন

ক্রয় বিক্রয়ের সুব্যবস্থা এবং অল্প সুদে টাকা ধার করিবার সুবিধার সৃষ্টি করিয়া দিলে যে বাংলার তাঁতীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু কেবল ইহা করিলেই চলিবে না। তাহাদের উৎপাদনী শক্তি বাড়াইতে হইবে। শিল্পনৈপুণ্যে বর্ত্তমান বাংলার তাঁতী অন্যান্য দেশের এবং প্রদেশের তাঁতীদের অপেক্ষা কিছুমাত্র খাটো নহে, ইহা জোর করিয়াই বলা চলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখনও তাহারা প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে গঠিত তাঁতের সাহায্যে কাপড় বুনে। এই সকল পুরাতন তাঁতে যে নূতন উন্নত প্রণালীর তাঁতের অপেক্ষা কম পরিমাণ এবং অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট মাল তৈয়ারী হয়, অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁতীদের অনেককে এই কথা বুঝান যায় নাই। আবার অনেক ক্ষেত্রে উন্নত প্রণালীর তাঁতের কার্য্যকারিতা স্বীকার করিয়াও তাঁতীরা প্রধানতঃ অর্থাভাবের জন্যই তাহা ব্যবহার করিতে পারিতেছে না। সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত শিল্প-ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিলে তাঁতীদের এবং অন্যান্য নানাপ্রকার কুটীরশিল্পে নিযুক্ত কারিকরদের এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। সাময়িক কিস্তীতে টাকা শোধ করিবার ব্যবস্থা করিলে অপেক্ষাকৃত বেশী দামেও উন্নত প্রণালীর তাঁত কিনিতে কেহ আপত্তি করিবে না এইরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে।

বিদেশী সূতা বনাম বিদেশী তুলা

বর্ত্তমানে বাংলার তাঁতীদের আরও একটী বিষয়ে অনেক অসুবিধা হইতেছে। দেশী ও বিদেশী মিলে প্রস্তুত কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় তাঁতের কাপড়ের পক্ষে টি কিয়া থাকার প্রধান কারণ এই যে সূক্ষ্ম কাপড় তৈয়ার করিতে মিল অপেক্ষা তাঁতীদের পক্ষেই বিশেষ সুবিধা। আমাদের দেশে বিদেশী কাপড় আমদানী হওয়ার পূর্ব্বে তাঁতীরাই আমাদের সকল প্রকার অভাব পূরণ করিত, পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে; কিন্তু বিদেশী কাপড় আমদানী হওয়ার পর হইতে তাঁতীরা তাহাদের সকল প্রকার শক্তি ও নৈপুণ্য সূক্ষ্ম কাপড় (অর্থাৎ ৮০ নম্বর হইতে ১২০ নম্বর পর্য্যন্ত) তৈয়ার করিতে নিয়োগ করিতেছে এবং সকল প্রকার প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত টি কিয়া আছে। কিন্তু সকলেই হয়ত জানেন যে তুলার রকমভেদে সূতার সূক্ষ্মতা নির্ভর করে এবং যে প্রকার তুলা (long-stapled cotton) হইতে সূক্ষ্ম সূতা তৈয়ারী হয় আমাদের দেশে তাহার চাষ খুবই কম। কিছুদিন পূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশ এবং অন্য ক'একস্থানে এই সূতার চাষ আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশে তাহার চাহিদার তুলনায় বর্ত্তমানে আমাদের দেশে উৎপন্ন এই প্রকার তুলার পরিমাণ খুবই তুচ্ছ। সেই জন্য আমাদের দেশের তাঁতীদিগকে এ যাবৎ বিদেশ হইতে আমদানী করা বিদেশী মিলে তৈয়ারী সূক্ষ্ম সূতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইতেছে। কিন্তু ১৯০৫ সালে স্বদেশী সূতার দেশী তাঁতে বোনা কাপড় বিক্রয়ে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রকার কাপড়কে বিদেশী কাপড় মনে করিয়া আমাদের দেশের লোক পূর্ব্বের ন্যায় আর তাহা কিনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন না; ফলে তাঁতীদের ব্যবসায়ে

অনেক ক্ষতি হইয়াছে। ১৯২০ সালে অসহযোগ এবং ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় সুরু হওয়ার দরুণ স্বদেশী মনোভাব ক্রমশঃ বিস্মৃতি লাভ করিয়াছে এবং তাঁতীদের ব্যবসায়েও অনুরূপ সঙ্কোচ ঘটিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের দেশের কতকগুলি কাপড়ের মিল বিদেশী তুলা আমদানী করিয়া সূক্ষ্ম সূতা তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং সকল বিদেশী তুলার প্রস্তুত সূতা হইতে কাপড় বুনিয়া আমাদের তাঁতীরা কতক পরিমাণে তাহাদের পূর্ব্ব সম্পদ ফিরিয়া পাওয়ার আশা করিতেছিল। বিদেশী সূতায় এবং বিদেশী তুলা হইতে দেশী মিলে প্রস্তুত সূতায় যে অনেক তফাৎ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে উপযুক্ত প্রকার তুলার চাষ না হইতেছে ততদিন আমাদিগকে বিদেশী তুলার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেই হইবে। পক্ষান্তরে যদি আমরা বিদেশ হইতে তুলা আমদানী না করিয়া সূতা আমদানী করি, তাহা হইলে কাপড় তৈয়ারীর মোটলাভের কতকাংশ যে বিদেশীরা আত্মসাৎ করিবে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সেই জন্যই বিদেশ হইতে তুলা আমদানী করিয়া তাহা হইতে দেশী মিলে প্রস্তুত সূতায় বোনা তাঁতের কাপড় বিক্রয় হওয়ার পক্ষে এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে কোনও বাধার সৃষ্টি হয় নাই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে রাজস্বের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট বিদেশী তুলার উপর প্রতি পাউণ্ডে দুই পয়সা হিসাবে আমদানী-শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন। ইহার ফলে বিদেশ হইতে তুলা আমদানী করিয়া তাহা হইতে দেশী মিলে সূতা প্রস্তুত করার খরচ বাড়িয়া গিয়াছে এবং সেই তুলনায় এই সূতায় প্রস্তুত তাঁতের কাপড়েরও দাম বাড়িয়া গিয়াছে। এই কারণে দেশের লোকের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার সময় অপেক্ষাকৃত সস্তা বিদেশী কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকা তাঁতের কাপড়ের পক্ষে একটু কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

ভারত গভর্ণমেণ্ট রাজস্বের ঘাটতি-পূরণের জন্যই এই কর বসাইয়াছেন; কিন্তু ইহার ফলে মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলের তুলার চাষীদের একটু সুবিধা হইয়াছে, এই কারণে অনেকে এই কর উঠাইয়া দেওয়ার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই কর উঠাইয়া না দিলে যে বাংলার তাঁতীদের সমূহ ক্ষতি হইবে, ইঁহারা সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন। মিলের সহিত প্রতিযোগিতায় অন্য সকল প্রকার কাপড় তৈয়ারী করা ব্যাপারে হটিয়া গিয়া একমাত্র সূক্ষ্ম কাপড় তৈয়ারী করাই বাংলার তাঁতীদের জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন ছিল। ভিন্ন প্রদেশের চাষীদের সুবিধা করিবার জন্য বাংলার তাঁতীদের সর্ব্বনাশ করিবার এই যে উপায় অবলম্বন হইয়াছে দেশের সর্ব্বত্র ইহার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

বৌদ্ধ-যুগের নবাবিষ্কৃত দেবমূর্ত্তি—
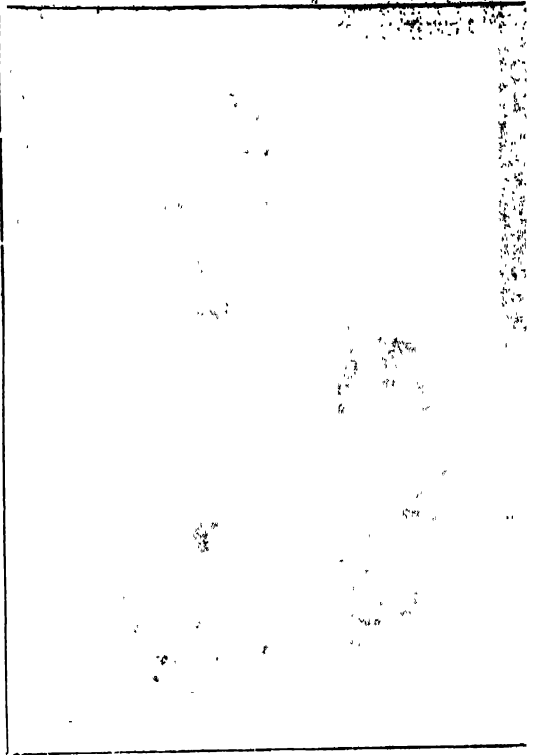
যে আফগানিস্থানের প্রতি গ্রেট বৃটেন ও রাশিয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আজ সজাগ হ'য়ে রয়েছে,—প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্ব্বে সেই পর্ব্বতসঙ্কুল রাজ্যটি ছিল একটা গ্রীক প্রদেশ। প্রথমে আফগানিস্থান ব্যাক্‌ট্রিয়াতে স্বাধীন গ্রীক রাজত্বের শাসনাধীন ছিল, তারপর খৃষ্টজন্মের প্রায় দেড়শো বছর পূর্ব্বে পার্থিয়ানরা সে-রাজ্য জয় করে, এবং খৃষ্টান যুগের প্রারম্ভে আফগানিস্থান কুশান নামে সিদিয়ান (শক) সর্দ্দারের শাসনকর্ত্তৃত্বাধীনে এসে পড়ে। সেই সময় গ্রীক চারুশিল্পের প্রভাবে আফগানিস্থানে মৃৎ-শিল্পের যথেষ্ট চর্চ্চা ও উন্নতি ছিল।

প্যারীর গুমেৎ চিত্রাগারে তারই কিছু কিছু নবাবিষ্কৃত নিদর্শন রাখা আছে। প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক জে, জে, বার্থোয়ার্ক আফগানিস্থানের মাটি খুঁড়ে কালের কবর থেকে সেই বিস্মৃত যুগের লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার করেছেন। ভূগর্ভ থেকে মিঃ বার্থোয়ার্ক প্রায় ৫৩১টা প্রাচীন দেবতা ও অপদেবতার মূর্ত্তি পেয়েছেন। এই সকল মূর্ত্তি শক্ত মাটীর তৈরী, তা'র উপর সাদা চুণের পাৎলা প্রলেপ। এগুলির সঙ্গে বিগত যুগের এক বিস্মৃতপ্রায় ধর্ম্মের ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

আবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলি যে কোন্ সময়ের, তা' এখনও ঠিক ক'রে বলা চলে না। তবে, আবিষ্কর্ত্তা অনুমান করেন, এগুলি খৃষ্ট-প্রয়াণের পরবর্ত্তী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাঁর পর্য্যটন-ইতিহাসে বলেছেন যে, পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর-পূর্ব্ব আফগানিস্থানে হাদ্দা নামক স্থানে তিনি এইরূপ প্রতিমূর্ত্তি-গঠনের চর্চ্চা দেখেছিলেন।

উপরে একটি নবাবিষ্কৃত দেবমূর্ত্তির ছবি দেওয়া হ'ল।

নিউ ব্যাবেল্‌স্‌বার্গ পর্য্যবেক্ষণাগার—

এখানে যে ছবিটী দেওয়া হয়েছে, তা' নিউ ব্যাবেল্‌স্‌বার্গ পর্য্যবেক্ষণাগারের একটি অংশের। অতিকায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রটিকে যথাস্থানে রাখা হয়েছে এবং জ্যোতির্ব্বিদ্ ডাঃ জি, ট্রু,ই সান্ধ্য-পোষাকে পরম আরামে একখানা ইজি-চেয়ারে বসে সৌরজগৎ পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক সুযোগের অপেক্ষা করচেন। এই পর্য্যবেক্ষণাগারের বন্দোবস্ত এতই চমৎকার যে, বৈজ্ঞানিক-দের কায়িক পরিশ্রম খুবই কম হয়ে থাকে।

পাতালপুরীর নাট্যশালা—

নিউকোয়ের নিকট পোর্থ নামক স্থানে উচু পাহাড়শ্রেণীর তলায় একটি প্রচ্ছন্ন 'থিয়েটার' আছে, পৃথিবীর মধ্যে এইটিই সবচেয়ে অদ্ভুত নাট্যশালা। পাতালপুরীর এই নাট্যশালায় প্রবেশপথটি এত সঙ্কীর্ণ যে, দর্শকদের হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। সমুদ্রতীরে অবস্থিত ব'লে জোয়ারের জলে প্রায়ই এই নাট্যশালাটি প্লাবিত হ'য়ে যায়। সেই কারণে এখানে বছরে মাত্র দু'বার গীত ও নাট্যাভিনয় হ'য়ে থাকে। এই নাট্যশালায় এক হাজার দর্শকের বসবার যায়গা আছে।

লণ্ডনের ডাকবাহী রেলওয়ে—

লণ্ডন সহরের রাস্তাগুলি এতই জন ও যানাকীর্ণ যে, স্থানাভাব বশতঃ লণ্ডনের ডাক রাস্তার তলা দিয়ে বহন করা হয়। প্রায় ৭০ ফিট মাটীর তলা দিয়ে জেনারেল পোষ্ট অফিসের ডাকবাহী রেলওয়ে প্যাডিংটন থেকে হোয়াইট-চ্যাপেল পর্য্যন্ত যাতায়াত করে' থাকে। প্রত্যহ ১৯ হাজার ডাকের থলি এই উপায়ে যথাস্থানে পৌঁছায়। এই গাড়ীগুলির জন্য চালকের প্রয়োজন হয় না,—বিজ্ঞানবলে আপনা-আপনিই চলে।

সৌরজগতের সঙ্গে চোখের আলাপ—

কবির কাছে যা' নিশীথরাত্রির অশ্রু বা স্বপ্নলোক, বৈজ্ঞানিকের সুদূর সন্ধানী দৃষ্টির কাছে সেগুলি বস্তুপিণ্ড মাত্র। এখানে একটী অতিকায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ছবি দেওয়া গেল। এই অতিকায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি আছে, বার্লিনের ব্যাবেল্‌সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্য্যবেক্ষণাগারে। ত্রিকোণাকৃতি লোহার আবরণের মধ্যে তিনটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র এমন ভাবে সাজানো যে, তাদের পারস্পরিক শক্তির সহায়তায় একটী বিরাট শক্তিশালী যন্ত্রের উদ্ভব হয়েচে। এই তিনটী অপেক্ষাকৃত ছোট যন্ত্রের মধ্যে আলোকচিত্রের জন্য একটী 'লেন্‌স্' দূরবীক্ষণ, একটী সুদূর দূরবীক্ষণ ও একটি দৃষ্টিপরিচালক যন্ত্র আছে।

অতিকায় যন্ত্রটির object lensএর ব্যাস ৪০ সেণ্টিমিটার। এরি সাহায্যে অনন্ত শূন্যের বহু অগোচর গ্রহ-তারকা, সূর্য্য, পৃথিবী আবিষ্কৃত হয়েচে।

পুস্তক-পরিচয়

বাঙ্গলার প্রাণ—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। আর্য্য পাব্লিশিং কোং, ২৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা চারি আনা।

আমাদের সাহিত্যে বর্ত্তমানে যাঁহারা প্রবন্ধ রচনা করিয়া সার্ব্বজনীন যশ অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নলিনী গুপ্ত মহাশয়ের নাম তালিকার প্রথম কয়েকজনের মধ্যেই। বহু পত্রিকায়—বহুকাল ধরিয়া বলিতে পারি না—কিছুকাল ধরিয়া তিনি লিখিয়াছেন। কয়েক বছর হইল তাঁহার সে লেখার স্রোতে হ্রাস দেখিতেছি। ইহার সঠিক কারণ আমাদের জানা নাই। যে কারণেই হোক্ তাঁহার প্রবন্ধের অনুরাগী পাঠক মাত্রই এজন্য মর্ম্মান্তিক দুঃখ বোধ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান পুস্তকটি ইতিপূর্ব্বে সাময়িকে প্রকাশিত কতকগুলি রচনার সমষ্টি। 'বাঙ্গলার প্রাণ' তাহাদের প্রথমটি। বছর দশেক পূর্ব্বে প্রবাসীতে যখন এ প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় তখন ইহা নিজে পড়িয়াই খুশী হই নাই, অনেককে পড়াইয়া শুনাইয়াছিলামও। আসলে যেসব কথা নিজের মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করে, সেইগুলিই আর কেহ লিখিয়াছেন দেখিলে আমরা খুশী হইয়া উঠি এবং এই কথা যত কম ব্যক্তিগত হয়, ততই সাহিত্যের পর্য্যায়ে উচ্চ স্তরে উঠে। সে হিসাবে 'বাঙ্গলার প্রাণ' কিছুদিন পূর্ব্বের বাঙ্গালীর মর্ম্মকথা। কিছু দিন পূর্ব্বের বলিতেছি এই জন্য যে—বাঙ্গালী আর এ দৃষ্টিতে নিজেকে বিচার করিয়া সান্ত্বনা পাইতেছে না। কেন পাইতেছে না, তাহা নলিনী গুপ্ত মহাশয় বাংলার বাহিরে থাকিয়া সাহিত্যের মারফৎ কিছু কিছু হয়তো জানিতে পারিতেছেন। আমাদের চিন্তা-ধারার কোনও কাল বিভাগ নাই—ইংরেজীতে যেমন সহজে 'ভিক্টোরিয়ান' কি 'এড্ওয়ার্ডিয়ান' চিন্তা-ধারা বলিলে আমরা একটি অর্থ খুঁজিয়া পাই, আমাদের বাংলায় তেমন কোন সমার্থবোধক শব্দ নাই। ইংরেজী কথা ধার করিয়া তাই বলিতে হয়—'বাঙ্গলার প্রাণ'এ 'পোষ্ট-ওয়ার' বাংলার ছাপ নাই, এক হিসাবে ইহা 'এড্ওয়ার্ডিয়ান'। ইহার কারণ অবশ্য এই যে প্রবন্ধগুলি বহু পূর্ব্বে লিখিত। বিলম্বে প্রকাশিত পুস্তকের দোষ এই। আজকালকার বাঙ্গালী তাহার ভাবপ্রবণতাকে আর গর্ব্বের বস্তু বলিয়া মনে করে না—আবহাওয়া ও ঐতিহ্যের প্রভাব এড়াইবার জন্য সে আজ বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবু এ প্রবন্ধগুলি অন্ততঃ [illegible] পূর্ব্বের একটা milestone হিসাবে বাংলা সাহিত্যের চিন্তা-[illegible]র পথে খাড়া থাকিবে। গুপ্ত মহাশয়ের চিন্তার ফাঁকী নাই। যাহা চিন্তা করেন, তাহা গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। সামাজিক [illegible] দিককে দেখিবার ক্ষমতারও তাঁহার অভাব নাই। সুতরাং তাঁহার রচনা মাত্রই আমরা ঔৎসুক্যের সহিত পাঠ করি। আমাদের মনে হয় প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীও তাই করে।

বইখানির ছাপা-বাঁধাই আরও একটু ভালো হওয়া উচিত ছিল।

মন-প্যাথি শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলা সাহিত্য-প্রাসাদের একটি নির্জ্জন কক্ষের রুদ্ধ দুয়ারের চাবির অধিকারী পরশুরাম। শিক্ষিত রসজ্ঞ বাঙ্গালীর আজ আর এমন কেহ নাই যিনি নাকি কচি সংসদের সদস্যবৃন্দের সহিত কি বিরিঞ্চিবাবার সহিত পরিচিত নন। 'ভূশণ্ডীর মাঠ' কি 'লম্বকর্ণ'কেই বা কে ভুলিয়াছে? পরশুরামের এই প্রতিভার অনেকখানিই, যাহাকে বলে dramatic genuis, তাহাই। তাঁহার চরিত্রগুলি আখ্যান-ভাগ হইতে সরাসর উঠিয়া আসিয়া হাত পা নাড়িয়া কথা কহিতে সুরু করে। কাশিমবাজারের বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, ইহা বুঝিয়াছিলেন। সেই বোধ হইতে 'মনপ্যাথি'র উৎপত্তি।

পরশুরাম স্বয়ং ভূমিকায় লিখিয়াছেন—'চিকিৎসা-সঙ্কট একটি তুচ্ছ গল্প ·········এ গল্প সাধারণের মনে লাগিয়াছে এবং ইহার অভিনয়ও বহু স্থানে হইয়াছে। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র এ বিষয়ে অগ্রণী, তিনিই সর্ব্বপ্রথম মনপ্যাথি নামে ভাষান্তরিত করিয়া ইহার অভিনয় নিজ প্রাসাদে করান। তিনি নানা গুরুকার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও যে হাস্যরসে মন দিবার সময় পান, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়—'

পরশুরাম নিজেও কম ব্যস্ত লোক বলিয়া আমরা জানি না। কিন্তু তবু 'গড্ডালিকা' ও 'কজ্জলী' কোন্ ফাঁকে বাংলা দেশের হাওয়ায় নিশ্বাস টানিল?—সুতরাং মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের এই রসজ্ঞানের পরিচয়ে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। রসজ্ঞান যে তাঁহার সুপ্রচুর—ইহার সাক্ষ্য 'মন-প্যাথি'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। পরশুরামের রস-মৌচাক হইতে মধু আহরণ করিয়া তিনি নিজের ভিয়ানে চড়াইয়া তাহা হইতে যে উপাদেয় বস্তু সাধারণে পরিবেশন করিলেন, তাহার দোষ ধরিতে পারে এমন ভোজন-রসিক আমার জানা নাই। —অভিনয়ার্থে বাংলা দেশের অ্যামেচার নাট্যদল 'মনপ্যাথি'তে একটি সুন্দর 'প্রহসন' লাভ করিল।

বলাই বাহুল্য ছাপা বাঁধাই মনোরম।

কাঠের ছাপের ছবি—শিল্পী শ্রীপ্রমথকুমার বসু। দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দেড় টাকা।

শিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মুখপত্রে লিখিতেছেন—শ্রীপ্রমথ কুমার বসু কলিকাতা আর্ট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। বাংলার অনেকগুলি সাময়িক পত্রে

তাহার কাঠ খোদাই এর চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আর্টস্কুলে তাহার কাঠ খোদাই শেখা আরম্ভ হয় কিন্তু নিজের অধ্যবসায় ও যত্নের ফলে এই কারু-শিল্পটিকে তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। তাহার কাঠ খোদাইের চিত্রগুলি একসঙ্গে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আশা করি তাঁহার উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হইবে।"

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের সংশ্লিষ্ট 'উডকাট' প্রবন্ধটিতে জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যাইবে। আমরা উডকাটগুলিতে শিল্পীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আভাষ পাইলাম।

সমাজ-বিদ্রোহ—শ্রীইন্দুপতি মুখোপাধ্যায়। ইষ্টুডেন্টস্ এম্পোরিয়াম, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৷৷০ আনা।

প্রথমেই 'উৎসর্গ-লিপি' পড়িয়া ভীত হইতে হয়। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "উৎসর্গ করব কাকে? এগিয়ে এস যদি সাহস থাকে।"—সাহিত্য-ক্ষেত্রের সহিত মল্লযুদ্ধের ক্ষেত্রের গ্রন্থকার গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকারের নিবেদনও লক্ষ্য করিবার মতো—"অহিংসার লীলাক্ষেত্রে, কৃষ্ণ-প্রেমের কুসুমিত-কুঞ্জে, ধর্ম্মের নন্দন-বনে কেন এই বিদ্রোহ?" তার উত্তর—"এ বিদ্রোহ হিন্দুসংগঠনের জন্য, এ বিদ্রোহ হিন্দুর লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্য।" আশ্বস্ত হইলাম।

প্রাচীন নাট্য-সমালোচক শ্রীমন্মথমোহন বসু ভূমিকা লিখিয়াছেন—'শ্রীমান ইন্দুপতি মুখোপাধ্যায় আমার বিশেষ স্নেহাস্পদ'—সুতরাং তিনি তাঁহার শত দোষ মার্জ্জনা করিতে পারেন। তবু তিনিই লিখিতেছেন—"নাট্য-সমালোচকের চক্ষু লইয়া বিচার করিলে ইহাতে হয়ত কিছু দোষ বাহির হইয়া পড়িবে।" ইহার উপর আমাদের আর কিছু বলিবার নাই।

কি-কু-রা

অনশনে মহাত্মা—শ্রীমতিলাল রায়, প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ১৷০।

মহাত্মাজীর অনশন উপলক্ষ করিয়া বাংলার সংবাদপত্র মহলে হৈ-চৈ হইয়া গেল। মাসিক 'প্রবর্ত্তক' এই ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করিয়া একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত করেন—বর্ত্তমান পুস্তক ঐ বিশেষ সংখ্যাটির রূপান্তর মাত্র।

এই পুস্তকে মহাত্মাজীর সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার দেশাত্মবোধের আদর্শ, অপরিমিত শক্তিমান কর্ম্মীর জীবনের সঙ্গে তাঁহাতে কি বিরাট সন্ন্যাসী জীবনের সমন্বয় ঘটিয়াছে—তাঁহার অবলম্বিত মূলনীতির সহিত ভারতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির কতটা যোগ আছে, বিশ্বের জীবন এবং চিন্তায় এই অসাধারণ পুরুষের কি দান, সমস্তই সুচিন্তিত সুললিত ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এত বড় একখানি পুস্তক মাত্র সাত দিনের মধ্যে লিখিত হইয়াছে—যাঁহার জীবনী ও বাণী লইয়া এই পুস্তক, তাঁহার সম্পর্কে কতখানি শ্রদ্ধা থাকিলে তবে এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

এরূপ পুস্তকের দেশে বহুল প্রচার হইবে, অন্ততঃ হওয়া উচিত। বাঁধাই মনোজ্ঞ, মূল্যও কম।

স্বদেশ ও সাহিত্য—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আর্য্য পাব্লিশিং হাউস—কলিকাতা।

বিভিন্ন সময়ে শরৎচন্দ্র যে সমস্ত প্রবন্ধ, চিঠি পত্র, অভিভাষণ ইত্যাদি লিখেছেন তাই একত্র ক'রে 'স্বদেশ ও সাহিত্য' নামে এই বইখানি প্রকাশিত হ'য়েছে। শরৎচন্দ্র বর্ত্তমানকালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথা-সাহিত্যিক—সমস্ত বাংলা দেশ আজ তাঁর যাদুকরী প্রতিভায় মুগ্ধ। তাঁর সুবৃহৎ সাহিত্যে আমরা জীবনের নানাদিকের অপূর্ব্ব মনোজ্ঞ আলোচনা দেখেছি—নারী, ধর্ম্ম, সমাজ রাজনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর মতামত হয়ত আজ প্রত্যেক অভিজ্ঞ পাঠকই ব'লে দিতে পারেন কারণ তাঁর কোন উপন্যাসেই তিনি এই সকল দিক দিয়ে আলোচনা ক'রতে বিরত হন্‌নি। তবুও রস-সৃষ্টির প্রয়োজনে যে সমস্ত উক্তি বা মতবাদের জন্ম, তাকে সম্পূর্ণরূপে লেখকের ব্যক্তিগত মত ব'লে স্বীকার করায় বিপদ আছে। তাই শরৎচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ-সংগ্রহের প্রয়োজন অনেকেই অনুভব ক'রেছিলেন। ঠিক উপযুক্ত সময়েই এই বইটি বা'র হ'য়েছে।

সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে শরৎচন্দ্র কোন মহিলার ব নামে 'নারীর মূল্য' ব'লে একখানি ছোট বই লেখেন। এ বইটি এখন আর বড় একটা কোথাও দেখিনে, কিন্তু চিন্তার মৌলিকতায়, প্রমাণ-প্রয়োগের পর্য্যাপ্ততায়, ভাষার সতেজ ভঙ্গিমায় 'নারীর মূল্য' একখানি অপূর্ব্ব বই—সমগ্র শরৎ সাহিত্যের গোড়ার কথা যা তাই নিয়েই এই প্রবন্ধের উদ্ভব। কাজেই সে দিক দিয়ে 'নারীর মূল্য' শরৎ-সাহিত্যের একখানি সংক্ষিপ্ত বোধিনী।

কিন্তু সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ে শরৎচন্দ্রের মতামত জানার আমাদের বিশেষ কৌতূহল ছিল—বর্ত্তমান পুস্তকে তা কতকটা মিটবে সন্দেহ নাই। সাহিত্যে শ্লীলতা, অশ্লীলতা, আর্ট, নীতি, সাহিত্যের লক্ষ্য প্রভৃতি সমস্তগুলি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কি চোখে দেখে থাকেন এই বই থেকে আমাদের তা কিছু কিছু জানার সৌভাগ্য হয়েছে। 'স্বদেশ' পর্য্যায়ের সংগ্রহ যেন বেশ সম্পূর্ণ ব'লে মনে হ'ল না—'তরুণের বিদ্রোহ' ব'লে তাঁর যে ছোট পুস্তিকাখানা বার হ'য়েছিল তাও এতে সন্নিবিষ্ট করা উচিত ছিল।

দুই একটি প্রবন্ধের উৎপত্তি সাময়িক উত্তেজনায়, সেগুলো একটু সংস্কার ক'রে ছাপালেই ভালো হ'ত ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

The Report of the Ramkrishna Mission Ashram, Sarisha, Diamond Harbour (1929-32)—রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়াও যে বর্ত্তমান কালে দেশে করিবার অনেক কাজ আছে; রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম দীর্ঘদিন হইতে আমাদিগকে সে কথা শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। ডায়মণ্ড হারবার সরিষায় সেবাশ্রমের তাহাদের যে শাখা-সমিতি আছে, গত কয়েক বৎসরে তাহাতে যে সকল অত্যাবশ্যক গঠনমূলক কার্য্য হইতেছে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে তাহার সচিত্র বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সত্যব্রতের পরীক্ষা—বৃহন্নারদীয় পুরাণ, গুরু-গীতা, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রণীত একখানি খণ্ড কাব্য—মূল্য আট আনা। প্রকাশক সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন বি-এল, মাণিকগঞ্জ।

বই খানির দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়া মনে হয় কৃতবিদ্য সমাজে ইহার সমাদর আছে। লেখক বঙ্কিম-যুগের—বইখানির ভাবধারা ও অনুপ্রেরণা সেই যুগোপযোগী। কাব্য অপেক্ষা অধ্যাত্মভাবের দিক দিয়াই পুস্তকখানির আদর হওয়া উচিত। তবে গভীর ভাবকে কবিতার মধ্য দিয়া ফুটাইতে হইলে যে কবিত্ব শক্তির প্রয়োজন তাহা যে লেখকের আছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কুসুমের মাস—আধুনিক যুগে এমন সুমধুর, রসাল, স্বচ্ছ ও হৃদয়গ্রাহী কাব্যগ্রন্থ বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি অতি আধুনিক হইলেও—(তরুণ কথাটি ব্যবহার করিতে ইচ্ছা নাই) আধুনিকতার বৈদেশিক আওতায় তাঁহার কোনও কবিতাই জন্মগ্রহণ করে নাই। একান্ত আপনার ঘরের পরিবেষ্টনী ;—প্রত্যেক কবিতাটির অনুভূতি তাই এমন হৃদয়কে নিবিড় ভাবে স্পর্শ করে—মুগ্ধ হইয়া একই কবিতা বারবার পড়িয়া যাই।—পড়িতে ভাল লাগে ;—সে আবিষ্ট মন লইয়া তাহার সমালোচনা চলে না। বিশেষতঃ কবির মন যে-কাব্যের মধ্যে উন্মনা হইয়া পড়ে—তাহাকে সে-কাব্যের সমালোচনা করিতে বলা বিড়ম্বনা মাত্র—কবি ও কবি-সমালোচক উভয়েরই পক্ষে। কারণ সমালোচনার মধ্যে যে বিশ্লেষণী প্রবৃত্তি আছে তাহা কাব্যকে ব্যবচ্ছেদ করিতে প্রণোদিত করে এবং ইহা যে কাব্য-উপভোগের পরিপন্থী সে কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কিন্তু তবু 'কুসুমের মাস'এর সমালোচনা আমাকে করিতেই হইবে।

প্রথমেই একথা মনে হইতে পারে, এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থখানি এত ভাল লাগে কেন?—ইহার উত্তরে তিনটি মুখ্য কারণ দেখান যাইতে পারে।

প্রথমতঃ—ইহার কুসুম পেলব মৃদু স্পর্শ—দ্বিতীয়তঃ—ইহার বিশিষ্ট প্রকাশ-ভঙ্গী। তৃতীয়তঃ—ইহার অকপট অনুরাগ বা ঐকান্তিকতা।

ইহা ছাড়া—ভাবধারার সাবলীল গতি—অন্তর-লোকের গোপন কথাটির অকপট অনাড়ম্বর প্রকাশ প্রকৃতিও গৌণ কারণ বিদ্যমান।

"The poems are as delicate as carved ivory and as bright as burnished silver."

কবিতার স্তরে স্তরে যেন "সৌরভ-আনত শেফালিকা," "মদালসা হেনা" "বরষা-বিলাসী কদম", "কুণ্ঠিতা অতসী", "অনিদ্রা রজনীগন্ধা" "আর সন্ধ্যা-মালতীর ফুল" ফুটিয়া আছে—স্পর্শ তাই তাহার এমনি সুকোমল যে অতি সন্তর্পণে চলিতে হয়—"নিঃশ্বাসে জাগে না যেন তন্দ্রাতুর রাতের বাতাস।" "জল, যেন মালতী না জাগে।"

> "নিশীথের হাওয়া আজ আফিমের নেশার মতন,
> (মালতীর চুলগুলি চোখের পলকে চুমো খায়),
> আকাশে আসিছে ভেসে ঘুম ঘুম মেঘে অস্পষ্ট।
> (ঘুম এসে নয়নে জড়ায়)।
> পত্রের মর্ম্মর আর শোনা যায় বাতাসের স্বর,
> নিঃশ্বাসে কাঁপিয়া ওঠে ক্ষুদ্র তারা, ক্ষীণায়ু প্রহর।
> (ঘুম কি ভাঙিয়া যাবে কপালে রাখিলে হিম হাত!)
> —এখন বাহিরে কত রাত?"

প্রকাশ-ভঙ্গীটির মধ্যে যেমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে তেমনি কবির স্বাতন্ত্র্যও তাহাতে পরিলক্ষিত হয়।—প্রিয়তমাকে দূরে রাখিয়া—হয়ত কোনও দূর দূরান্তরে অজ্ঞাত পথের অভিসারিকা করিয়া, বিজন কোনও অন্ধকারে, সুদূর কোনও নদীর ধারে প্রিয়তম পারাপার করিতেছেন, এই কল্পনা করিয়া এ কাব্যের সৃষ্টি নহে,—প্রিয়জনের একান্ত নৈকট্যই এ কাব্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে—এবং ইহাই এই কাব্যের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী—

> "আমিও কুসুমপ্রিয়। আজিকে তো কুসুমের মাস।
> মোর হাতে হাত দাও। চলো যাই কুসুম-বিতানে।"
> "বাহিরে চাহিয়া ভাখো। রাত্রি চমৎকার! নয়?
> হয়তো এমন রাত্রি এ জীবনে আসিবে না আর।
> *   *   *   *
> নিঃঝুম নিশীথ এই জীবনের দুর্লভ সময়,
> কুসুমিত অবকাশে দু'জনার কাছে আসিবার।"
> "একটুকু বসো আর ; দেখিছো না—ঘরের তিমিরে
> তোমার কেশের গন্ধে ভাসিছে কী গভীর আরাম।"
> "ভাখো ভাখো! মেঘভারে দিবালোক হয়েছে মেদুর
> তরল তন্দ্রার মত গৃহ মোর ছেয়েছে আঁধারে।"
> "এলায়ে পড়েছে রাত্রি নিদ্রাক্লান্তা মালতীর মত,
> (আমি আজ থাকিব জাগিয়া)।
> ঘুমায় দূরের বন, ঘুমে ঝরে কুসুমের জল,
> ঘুমায় পাথারপুরী, ঘুমাইছে ক্লান্ত দৈত্যদল।
> (জাগিয়া উঠিবে না তো ধরি যদি ওর দু'টি হাত?)
> —এখন বাহিরে কত রাত?"

"It is equally soothing and pleasant, like listening to a dreamy sonata."

তাই বলিয়া প্রিয়-বিরহ জ্বালা যে নাই তাহা নহে,—বিরহ না থাকিলে কবিতার অনুভূতির প্রগাঢ়তা আসে না—বিরহ আছে বলিয়াই মিলন এমন গভীরতর হইয়া হৃদয়-মন আনন্দরসে অভিভূত করিয়া দেয়—নিঃসঙ্গ জীবনের অকরুণ তিক্ততায় বিরহী তাই মিলনের পথ চাহিয়া বলে—

> "ময়লা মেঘের নীচে ঢেকে গেছে বিকালের আলো,
> বর্ষার ধোঁয়ায় আজ আকাশের আঁখি অন্ধকার ;
> আমি একা বসে আছি দৈত্যের মতন কালো কালো
> বিকট মেঘের দল চিত্ত তিক্ত করেছে আমার।
> *   *   *   *
> তবু যদি এ মুহূর্তে রহিতাম আমি তব কাছে,
> তোমার শীতল হাত কপালে রাখিতে ধীরে আসি।

ধ্বনিত বর্ষণ-শব্দে প্রণয়ের মন্দাক্রান্তা-স্তব
আনমনে সুরভি হাওয়া ; হাওয়া ? না সে তোমার নিঃশ্বাস ?
* * * *
নয়নে আসিত্তো জল, যদি থাকিতাম তব পাশে"

"যখন এ পৃথিবীর নিঃসঙ্গতা করি অনুভব—
তখন পরীর মত লঘু দেহে বায়ু ভর করি'
তুমি আসো মোর পাশে নিশীথের ছায়াপথ ধরি'
তুমি ছাড়া অর্থহীন জীবনের লক্ষ কলরব।
সমগ্র বান্ধব মাঝে তুমি মোর একান্ত বান্ধব,
নিদ্রারূপে তুমি মোর সাথে থাকো সুদীর্ঘ শর্ব্বরী
ফুলের গন্ধের মত তুমি আছো সারা মন ভরি' ;
তথাপি জীবনে তুমি ঈশ্বরের মতন দুর্লভ।
* * * *
একবার এসো কাছে আজি এই বিষাদ নিশীথে।"

"Without · passion there is no poetry ; to recognise great poetry is to hear the authentic voice. অত্যাসক্তি বা অনুরাগ ব্যতীত কোনও শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্ম হইতে পারে না। শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যেই আমরা প্রকৃত অনুরাগের কথা শুনিতে পাই। অজিত বাবুর কবিতার মধ্যে সেই অকপট অনুরাগ বা ঐকান্তিকতা আছে বলিয়া তাহা আমাদের এত ভাল লাগে।

"আজি শুধু এ জীবনে আহরিতে চাই প্রাণ ভরে'
তোমার সুন্দর প্রেম, তোমার সিন্ধুর মত স্নেহ ;
কাব্যে আহরিতে চাই সেই কথা, যাহা আর কেহ
কভু কহে নাই (অন্যে তব কথা জানিবে কী করে' ?)।
এ জীবনে তুমি থাকো, তারপর মরণের পরে
মোর কাব্যে অনশ্বর হয়ে থাক্ এ-জন্মের দেহ।"

"তুমি এলে এতদূর ? এতদূর এসেছো কখন্ ?
কেমনে চিনিলে পথ রক্তহীন এমন অমায় ?
ভাবিতেছিলাম আমি এতক্ষণ কেবল তোমায়।
তোমারেই ভাবি রোজ একা-একা থাকি যতক্ষণ।
খুলে রেখে আসিয়াছো দু'হাতের মুখর কাঁকণ ?
এমন ছায়ার মত আসিতে কি হয় নিরালায় ?
এখনি ফিরিতে হবে ? এলে শুধু দেখিতে আমায় ?
এলে যদি এতদূর এ তোমার খেয়াল কেমন ?"

"লতারে দেখেছি স্বপ্নে ? পাগল ! সে হতে পারে লতা ?
যাহারে দেখেছি কাল, কানে-কানে শোন যদি তার
তা হলে খুসিই হবে।"—

"লতা" ও রূপরিক্তা "অপরূপ মালতীকে" লইয়া পাঠকের মনে গোল বাধে—
কারণ—

হৃদয়ের পদ্মদলে যার সনে সব চেয়ে চেনা
সেইজন হেরিলো না মালতীর মধুর অধর।
সে যদি না আসে আজ, মালতীর সৌন্দর্য্য-লহর
কে হেরিবে ? কে কহিবে, "অপরূপ তুমি, প্রিয়ে লতা ?"

কবির বহুপ্রিয়া-তাগ্যকে হিংসা করিয়া লাভ নাই। তিনি তাঁহার কবিতায় যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অব্যাহতই থাকে—উপলব্ধির পক্ষে কোনও বাধা হয় না। এরূপ ত্রুটি থাক্—সুন্দর মুখের সমষ্টিগত সৌন্দর্য্যই উপভোগ্য, তিলটিকে আলাদা করিয়া দেখিলে তিলের কোনও সৌন্দর্য্যই থাকে না। কিন্তু সৌন্দর্য্য যেখানে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে—সেখানে ঐ তিলটিকে বাদও দেওয়া যায় না।

অজিত বাবুর লেখনী হইতে শুধু পুষ্পবৃষ্টিই হয়না—অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ঊর্দ্ধ সঞ্চরণও দেখিতে পাই।

"আমি সেই অভিমানী, সঙ্গীরে যে দিয়াছে ফিরায়ে
মুহূর্ত্তের অহঙ্কারে ; ঘৃণ্য কৃপা যে চাহেনি কভু ;
সে আমি—হেলায় প্রাণ দিয়েছে যে আকাশে ছড়ায়ে
মৃত্যুনীল ঊর্দ্ধ হ'তে আয়ুভিক্ষা করেনি যে তবু।"
"* * * মহেশেরে করিবে উন্মনা
তুচ্ছ উর্ব্বশীর দেহ ? এ জীবন সুদীর্ঘ শর্ব্বরী
রমণী হরিতে পারে দণ্ড দুই ; আর সারা রাত
নক্ষত্র সখার সনে, রাত্রি সনে, পৃথিবীর সাথে
মোর যত দ্বন্দ্বপ্রেম, যত ঘাত, যত প্রতিঘাত
যত আত্মনিবেদন—সব আমি চাহি যে মিশাতে।"
"বলদৃপ্ত পদাঘাতে শিহরিবে আকাশমণ্ডল
মন্থন ভুলিয়া চা'বে সুধালোভী দেবদলদল"
"মর্ত্তে পদতল মোর, অমৃত আমার করতলে
আমার বক্ষের নৃত্যে ঊর্দ্মি জাগে সাগরের জলে।"

—নাস্তিক, দুর্লভ রাত্রি, স্বপ্ন, আমি কি লুপ্ত হ'বো, মালতী ঘুমায় ও মালতী "কুসুমের মাস"এর শ্রেষ্ঠ কুসুমসম্ভার।

অতি আধুনিক লেখকদের অধিকাংশের মধ্যেই আত্মবাদ-স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিবার একটা অহঙ্কার আছে। গতানুগতিক সংস্কার বা রীতি-নীতিকে লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীন পথে চলিবার বেলা বিজ্ঞাপনের অত্যধিক চটক দেখিতে পাওয়া যায়। সত্য বটে—'age of new philosophies, new arts, new cults' আসিয়াছে, কিন্তু তাহার উপাসকদের মধ্যে—'none of them modest or sober, all full of the spirit of bravado.' কিন্তু অজিত বাবু আধুনিক হইয়াও শুধু কাব্য লিখিয়াছেন, কোনও বাণী কাহাকেও শুনাইবার অহঙ্কার তাঁহার নাই, একটা বড় কিছু দান করিয়াছি বলিয়া আত্মপ্রসাদও তিনি অনুভব করেন নাই, নিজের কবি-প্রাণের ঐকান্তিক অনুভূতি হইতেই তাঁহার কাব্যের সৃষ্টি—"His constructions rise by native spontaniety" এ কাব্য বাঙ্গলা সাহিত্যে বাঁচিতে আসিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।*

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

* কুসুমের মাস—শ্রীঅজিত কুমার দত্ত। প্রকাশক—ডি, এম্ লাইব্রেরী ৬১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। কলিকাতা। দাম পাঁচসিকা।

[illegible]

নূতন জগৎ

গত ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি ক্লাবে বক্তৃতায় মনস্বী এইচ, জি, ওয়েল্‌স বলিয়াছেন—the problem for the new spirit in the west is whether to proceed to complete break-down or begin to attempt to construct a new order using as much tradition as is wholesome. অর্থাৎ পশ্চিমের এই নব-জাগ্রত চেতনার সম্মুখীন সমস্যা এই যে, ইহার যাত্রাপথ পুরাতনের সম্পূর্ণ ধ্বংসের উপর দিয়া গড়িতে হইবে, না পুরাতনের যাহা কিছু সুস্থ ও সবল, তাহা নিয়া নুতন সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি হিউ পিল্‌চার নামে এক সাংবাদিকের সহিত সাক্ষাৎকালে যে-কথা বলিয়াছিলেন, 'পাসিং শো" পত্রিকায় তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ওয়েল্‌স্ বলিয়াছেন—নুতন পৃথিবী রচনা করিতে হইবে, আমাদের কাজ এই। পুরাতন জগৎকে একেবারে ধুইয়া পুঁছিয়া ফেলিতে হইবে। হয় আমাদের এই সভ্যতা—অর্থাৎ আমাদের নরনারীর দৈনন্দিন জীবন—নিজেই নিজের মৃত্যু ডাকিয়া আনিবে, নয় ইহাকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া সুন্দরতর ও সার্থকতায় করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ভবিষ্যতের ভাবনা

"হার্পার্স" পত্রিকায় রয় হেল্‌টন্ বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছেন—কেন আমাদের এ অশান্তি? মনে হয় ভবিষ্যতের কাছে আমরা আত্মবিক্রয় করিয়াছি বলিয়াই আমাদের এ-দুর্ভোগ। অর্থ, রাজনীতি, সমাজনীতি, আমাদের সব কিছু শুধু ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া আছে। আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিযান করিতে চাই। কালপ্রবাহকে সৃষ্টির মধ্যে আনিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের [illegible] রহিয়াছে। ফলে বর্ত্তমান আমাদের শাসনের বাহিরে [illegible] গিয়াছে।

ইহার পর তিনি সাহিত্যে, আমোদে-প্রমোদে ইহার ফল বিচার করিয়া অর্থ-নীতি সম্বন্ধে বলিতেছেন—আমরা এই ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়াই সহজশোধ্য কিস্তিতে ক্রয়-প্রথা চালু করিয়াছি। টাকা নাই, অথচ বড় মোটর-গাড়ী চাই—কিন্তু আগামী কাল হয়তো সে-টাকা হাতে আসিবে, সুতরাং ঋণ করিয়া গাড়ী কিনিলাম। জীবন-বীমার পিছনেও এমনই মানসিকতা রহিয়াছে—চাঁদা দিতে দিতে পৃষ্ঠ কুব্জ হইয়া যায়, তবু ভবিষ্যতের আশায় চাঁদা গণিতেছি। ওদিকে ধার বাড়িতেছে। ফলে মানুষের মেজাজ খারাপ হইয়া পারিবারিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হইতেছে। পারিবারিক জীবনের বাহিরে এই ভবিষ্যতের ভাবনা আরও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে দেখি। আজ আমরা নব্বই টাকা দিয়া শেয়ার কিনিতেছি, ২০০০ খৃষ্টাব্দে আমাদের অতি-ক্ষুদ্র প্রপৌত্রেরা এই নব্বই টাকার ফলে হয়তো ৯০০০ টাকা পাইবে এই আশায়। কিসের শেয়ার? না রেলের। কিন্তু এমনওতো হইতে পারে যে আর কিছুদিনের মধ্যেই রেল-কোম্পানীর একটিও হয়তো থাকিল না—আমাদের বংশধরেরা যান-বাহনের এক নূতন ব্যবস্থা আবিষ্কার করিল। তখন? একথা আমরা ভুলি কেন যে ভবিষ্যৎ আমাদের মুখ চাহিয়া বসিয়া নাই। আর ঠিক যেমনটি চাই, তেমনটি করিবার জন্তই ভবিষ্যতের কোনও মাথা-ব্যথা নাই। সুতরাং আমার নিজের জীবন-কাল ছাড়া আর আমি বেশী কি ভাবিতে পারি? আমাদের আইন কানুনেও এই সব গণ্ডগোল থাকিয়া গিয়াছে। কবে এক শত বছর আগে কি প্রয়োজনে কাহারা কোন্ আইন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে, তাহার জোয়াল কাঁধে বহন করিয়া অকারণ আমরা আজও হাসফাঁস্ করিতেছি। ভবিষ্যৎকে এই বালুর বাঁধ দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা বাতুলতা—ইহাতে আমরা ভবিষ্যতকেই শুধু শৃঙ্খলিত করিনা, বর্ত্তমানকেও তাচ্ছীল্য করি।

মাসকাবারী

ভারতবর্ষ

অনশন-ভঙ্গের পর

২৬শে সেপ্টেম্বর—রবীন্দ্রনাথের মহাত্মাসকাশে সঙ্গীত। অনশন-ভঙ্গের পর রবীন্দ্রনাথের চারি ঘণ্টাকাল মহাত্মাজীর সহিত অবস্থান।

ডাঃ গিলডার ও ডাঃ প্যাটেলের বিবৃতি—সপ্তাহখানেকের মধ্যে তাঁহার পেশীগ্রন্থি সমূহ সুস্থ হইয়া উঠিবে। রক্তের চাপ যাহাতে বৃদ্ধি না পায় সেদিকে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে হইবে।

মহাত্মাজীর বিবৃতি—সংস্কারের কার্য্য যদি দৃঢ় ভাবে পালন করা না হয়, তাহা হইলে আমার অনশন পুনরায় আরম্ভ হইবে।

স্যার হরি সিং গৌর বলিয়াছেন—ডাঃ আম্বেদকার তাঁহার দাবী কড়ায় ক্রান্তিতে বুঝিয়া পাইয়াছেন। ভাই পরমানন্দের উক্তি—ডাঃ আম্বেদকার সুযোগের যথেচ্ছ অপব্যবহার করিয়াছেন।

এণ্ড্রুজের মন্তব্য—এই ঘটনা ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে।

২৭শে—রবীন্দ্রনাথের উক্তি—এখনও মুসলমান ভ্রাতৃগণের বিশ্বাসলাভ করা হয় নাই।

কলিকাতা টাউনহলের সভায় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি কর্ত্তৃক পুণার আপোষনামা গৃহীত।

গোলটেবিল বৈঠকের সহিত সহযোগিতার সম্ভাবনা আছে কিনা প্রশ্নে মহাত্মাজী বলিয়াছেন, যোগ্য প্রস্তাব অনুমোদন করিতে আমা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দিত আর কেহ হইবে না।

মাদ্রাজে কেরালার এক কর্ম্মী কেলাপ্পান কোনও বিশেষ মন্দিরের দ্বার হরিজনের (অস্পৃশ্য) নিকট মুক্ত করিবার জন্ম প্রায়োপবেশন করিতেছেন। উক্ত মন্দির ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

লণ্ডনে ভারতবন্ধু সমিতির সভাপতি মিঃ ফেণার ব্রকওয়ে এক বিরাট সভায় বলিয়াছেন, পুণাচুক্তিতে বুঝা যায় বৃটেন কখনও ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিবে না, ভারত নিজেই উহা করিবে।

২৮শে—বোম্বায়ে সন্ধ্যায় শিবাজী-মন্দিরে মহাত্মাজীর ৬৪তম জন্মদিন অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা।

পুণা, ২৯শে—মহাত্মাজীর সহিত যখন তখন দেখা সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রত্যাহৃত।

লণ্ডন, ৩০শে—ভারত মিলন সমিতির বিবৃতি, সাক্ষাৎ বন্ধ করিলে আপোষ-মীমাংসার সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইবে।

২রা অক্টোবর—[illegible] (মালাবার) মহাত্মাজীর তারের ফলে কেলাপ্পানের অনশন-ভঙ্গ। মন্দির-দ্বারে সত্যাগ্রহ তিন মাসের জন্ম স্থগিত।

কলিকাতা—গান্ধীজীর [illegible] জন্মতিথি উৎসব যথাযথভাবে সর্ব্বত্র পালিত। [illegible] অস্পৃশ্য-ভোজন অনুষ্ঠিত।

৪ঠা—লণ্ডনে কাদার এণ্ড্রুজ [illegible] বলিয়াছেন—[illegible] প্রায়োপবেশন বীরোচিত কার্য্য।

৫ই—পার্লামেণ্টে কতিপয় মিশনারীদের [illegible] মুক্ত করিবার উপায় অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার, নচেৎ গবর্ণমেণ্টের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

শান্তিনিকেতন ১১ই—ভারত মিলনসমিতির সভাপতি কার্ল হিথের রবীন্দ্রনাথকে তার—ভবিষ্যৎ কর্ম্মপ্রণালী নির্দ্ধারণের জন্ম ভারতমিলন সমিতি আপনার মনোভাব জানিতে ব্যগ্র।

শান্তিনিকেতন, ১৫ই—ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার জন্ম ভারত মিলন সমিতির সভাপতি মিঃ কার্ল হিথ যে তার করিয়াছিলেন, কবি তার উত্তর দিয়াছেন—নিপীড়নের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা আজ লক্ষ ভারতবাসীর চক্ষে কলঙ্ক-কালিমালিপ্ত। বিবেচনাহীন গবর্ণমেণ্টের [illegible] নির্ব্বুদ্ধিতা দূরে সরাইয়া সমভাবে শাসন-তন্ত্র প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে চাই মহাত্মা গান্ধীর ও কংগ্রেস সদস্যদের মুক্তি, আর চাই বিনা সর্ত্তে অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার। শাসনকার্য্যে অক্ষমতার প্রকৃষ্ট নিদর্শনই এই অর্ডিন্যান্স।

নয়া দিল্লী, ১৬ই—বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারির শিবস্বামী আয়ারের নিকট তার—আইন অমান্যের সহিত যাহার সংস্রব আছে, এমন কোন লোকের সহিত সহযোগিতা সম্পর্কে কোন কথাই উঠিতে পারে না। মিঃ গান্ধী আইন অমান্যের সংস্রব ত্যাগ করিলে তাঁহার মুক্তির কথা উঠিতে পারে।

পুণা, ১৭ই—ডাঃ আম্বেদকারের মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ। পুণাচুক্তি কার্য্যকরী করা সম্পর্কে আলোচনা।

১৯শে—মহাত্মাজীর চিকিৎসক ডাঃ কার্টিয়ালের সহিত মহাত্মাজীর সাক্ষাৎ। মহাত্মাজীর স্বাস্থ্য বর্ত্তমানে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের সময় অপেক্ষা ভালো।

লণ্ডন, ৪ঠা—লিষ্টার শ্রমিকদল সম্মেলনে ক্যাপ্টেন বেন বলিয়াছেন গত সপ্তাহে গবর্ণমেণ্ট মূর্খতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। দেশবাসীর চক্ষে মহাত্মা গান্ধী আরও অভিনব ও গৌরবময় স্থান লাভ করিয়াছেন। ভারতীয় সমস্যা সমাধানের একটি মাত্র পথ বর্ত্তমান—শান্তি [illegible] উপায় আমাদেরই পুনরায় অবলম্বন করিতে হইবে। কার্য্যকরী সমিতির পক্ষ হইতে মিঃ ল্যান্সবেরি, ভারতবাসীগণই স্বীয় শাসন-তন্ত্র গঠনে অধিকারী, এই সম্পর্কে একটি জরুরী প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন।

পুণা চুক্তি—২৫শে সেপ্টেম্বর—নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে পুণা সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

২৬শে—ব্যবস্থা-পরিষদে পুণাচুক্তি সম্পর্কে মিঃ হেগের বিবৃতি। [illegible] সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এবং [illegible]

নির্দ্দেশানুযায়ী ভোট-গ্রহণ ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অনুন্নতগণের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন-পদ্ধতি বৃটিশ সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

খিলাফৎ—২৫শে সেপ্টেম্বর—আজমীরে খিলাফৎ সম্মেলনের অধিবেশনে মহাত্মাজী ও ডাঃ মুঞ্জেকে মীমাংসার বিলম্বের জন্য দায়ী বলিয়া সৌকত আলি বক্তৃতা দিয়াছেন।

ঐ তারিখেই আজমীরেরই এক মুসলমান সভায় খিলাফৎ নেতাদের উপর কাহারও কোন আস্থা নাই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

উদার-নৈতিক সঙ্ঘ—২৫শে সেপ্টেম্বর—বোম্বায়ে উদার নৈতিক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক নিম্নের প্রস্তাব গৃহীত—নূতন শাসন-সংস্কার পদ্ধতি নির্ব্বিঘ্নে স্থিরীকৃত হওয়ায় সঙ্ঘ বিশ্বাস করেন যে কংগ্রেস আগামী অধিবেশনে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন। জাতীয়তাবাদীদের অভিমত অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা উচিত।

৩রা অক্টোবর—মান্দ্রাজ উদারনৈতিক সঙ্ঘ মহাত্মাজীর মুক্তির জন্য ও আপোষমূলক নীতি-প্রবর্ত্তনের জন্য দমন-ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবার এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

বোম্বাই, ১০ই—পশ্চিম ভারতের জাতীয় উদারনৈতিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে এক বক্তৃতায় স্যর চিমনলাল শীতলবাদ বলিয়াছেন, পুণা চুক্তি কিরূপে প্রধান মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইল? যে সমস্ত আপত্তিকর বিষয়ের প্রতিবাদে গান্ধীজী অনশন-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহাতেও তৎসমুদয় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

সর্ব্বদল সম্মেলন

দিল্লী, ১লা অক্টোবর—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকল্পে সর্ব্বদল সম্মেলনের জন্য যে আবেদন করিয়াছেন, জামায়েৎ উলেমার অস্থায়ী ডিক্টেটর মৌলানা মহম্মদ ইসমাইল তাহা সমর্থন করিয়া বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

বোম্বাই, ২রা—মিঃ চাগলা সাম্প্রদায়িক আপোষের জন্য মালব্যজীর নিকট খোলা চিঠির আবেদনে বলিয়াছেন, 'মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত গোঁড়া তাঁহারাও মীমাংসার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।'

বোম্বাই, ৩রা—সৌকত আলি, সেখ আবদুল মজিদ এবং খিলাফৎ নেতাদের প্রায় তিন ঘণ্টা কাল আলোচনা। ডাঃ সৈয়দ মামুদ এবং মৌলানা আজাদের "বিড়লা প্রাসাদ"এ মালব্যজী ও অন্যান্য নেতাদের সহিত আলোচনা। সেখ আবদুল মজিদ (আজমীর খেলাফৎ সম্মেলনের সভাপতি) বলিয়াছেন, খেলাফৎ কমিটি কংগ্রেসের সহিত সম্মানজনক মীমাংসা করিতে প্রস্তুত।

বোম্বাই, ৪ঠা—মালব্য প্রমুখ বিশিষ্ট হিন্দু নেতাগণের সহিত জাতীয়তা-... মুসলমান ও খিলাফৎ নেতাগণের মধ্যে আলাপ আলোচনা। শীঘ্রই ... [illegible] অধিবেশন সম্ভাবনা।

[illegible] ... সৌকৎ

[illegible]

সর্ব্বদল মুসলিম সম্মেলন

বোম্বাই, ৬ই—হিন্দু মুসলমান সমস্যা সমাধানার্থে মৌলানা সৌকৎ আলি বর্ত্তমানে ১ পক্ষ কালের জন্য তাঁহার আমেরিকা যাত্রা স্থগিত রাখিলেন। তিনি বড়লাটকে মহাত্মাজীর মুক্তি প্রার্থনা করিয়া এক তার করিয়াছেন। অদূরভবিষ্যতে লক্ষ্ণৌ কিংবা দিল্লীতে বিভিন্ন মুসলমান দলের সম্মেলন-প্রস্তাব।

সিমলা, ৬ই—মৌলবী সফী দায়ুদী প্রমুখ কয়েকজন নেতার মুসলমান সম্মেলনে আপত্তি।

বোম্বাই, ৭ই—আগামী ১৫ই অক্টোবর লক্ষ্ণৌয়ে বিভিন্ন মতাবলম্বী মুসলমানদের এক বৈঠক হইবে। সৌকত আলির তারের উত্তরে সরকারের সিদ্ধান্ত—মহাত্মাজীকে মুক্তি দেওয়া হইবে না কিন্তু কতিপয় নেতাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। কংগ্রেস যতদিন আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার না করিবেন, ততদিন কোন কংগ্রেস-নেতাকে মুক্তি দেওয়া হইবেনা। কংগ্রেসকেই প্রথমে বিনা সর্ত্তে শান্তির কথা উঠাইতে হইবে।

মিঃ এ, এইচ গজনভী ও ডাঃ এ, সুরোয়ার্দীর বিবৃতি—সৌকৎ আলি নহে, আগা খাঁই মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক নেতা।

মহাত্মাজীর সৌকত আলীকে তার অনুসন্ধান করিলে আপনি এখনও আমাকে আপনার পকেটে পাইবেন।

নয়া দিল্লী, ১০ই—দিল্লী মুস্লিম সমিতির সম্পাদক হাজি রসিদ আহাম্মদ আগা খাঁ প্রেরিত দুইটি তার মুসলমান সম্মেলনের সদস্যদের মধ্যে প্রচারার্থে প্রকাশ করিয়াছেন। আলোয়ার রাজ্য ও আগামী লক্ষ্ণৌ সম্মেলন সম্পর্কে মুস্লিম সম্মেলনের সদস্যগণের কর্ত্তব্য সম্পর্কে নিখিল ভারত মুস্লিম সম্মেলনের সম্পাদক মৌলানা সফী দায়ুদীর চিঠি প্রকাশিত।

পুণা ১০ই—বোম্বাই ব্যবস্থাপক-সভার মুসলমান দলের নেতা সার শা নওয়াজ খাঁ ভাটো বলিয়াছেন,—পণ্ডিত মালব্যের আহ্বান মুসলমানদের মধ্যে দলাদলির আহ্বান।

কলিকাতা ১১ই—কেন্দ্রীয় জাতীয় মুসলমান সমিতি কর্ত্তৃক লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের বিরোধিতামূলক প্রস্তাব।

মান্দ্রাজ ১১ই—ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মৌলভী সৈয়দ মুর্ত্তাজার দ্বারা সাম্প্রদায়িক মীমাংসা-প্রস্তাব সমর্থিত।

বোম্বাই ১১ই—সম্মেলনে যোগদানার্থ মৌলানা সৌকত আলির লক্ষ্ণৌ যাত্রা। ডাঃ সৈয়দ মামুদের লক্ষ্ণৌ সম্মেলন সম্পর্কে সংবাদপত্রে বিবৃতি—মহাত্মা যদি মুক্ত হইতেন, তাহা হইলে হিন্দু ও মুসলমান নেতাগণের মধ্যে এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসা হইয়া যাইত। কলিকাতা হইতে মৌলানা আক্রাম খাঁ

নিকট তার—কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যতীত বাংলার

জার্ম্মানি হইতে ডাঃ আন্সারি ও মিঃ সেরওয়ানির

তার। নিখিল ভারত মুস্লিম যুবকের দল-সম্পাদক

লাহোর কেন্দ্রীয় খিলাফৎ সঙ্ঘের সমর্থন। ... [illegible] নিকট মহাত্মার

চিঠি—'আপনাদের মোল্লা মানসিকতা ... হউক।'

লক্ষ্ণৌ ১২ই—বিভিন্ন স্থান হইতে সৌকত আলির নিকট আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা সমর্থন করিয়া তার প্রেরণ।

বোম্বাই ১২ই—সাম্প্রদায়িক অবস্থার সম্বন্ধে পণ্ডিতজীর হিন্দু-মুসলিম-শিখ সমস্যা সম্পর্কে পাঞ্জাব গমন ব্যবস্থা।

কলিকাতা ১৩ই—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ এস কে বসুর মালব্যজীকে খোলা চিঠিতে—পূর্ব্ববর্ত্তী অনুরূপ চুক্তিগুলির মত এটিতেও বাংলার অবস্থা বিষয়ে বিবেচনা না করার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী।

লক্ষ্ণৌ ১৪ই—সৌকত আলি ইত্যাদি মুসলমান নেতার সমাবেশ। সার মহম্মদ ইকবাল ও দাদুদীর ভাবগতিকে সৌকত আলির দুঃখ প্রকাশ। গজনভী ও সাক্ষাৎ আমেদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

কলিকাতা ১৫ই—বৈঠক সম্পর্কে মিঃ এ, কে ফজলুল হকের বিবৃতি—বাংলার সমস্যাতেই বৈঠকের সমাধি হইবে, সুতরাং যোগদান নিষ্প্রয়োজন।

লক্ষ্ণৌ ১৫ই—অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘরোয়া বৈঠকে বিশিষ্ট মুসলমান নেতাগণের আলোচনা—ফলে পূর্ণ অধিবেশন স্থগিত। মিঃ জিন্নার ১৩ দফা সর্ত্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যুক্ত নির্ব্বাচন সম্পর্কে প্রস্তাব।

লক্ষ্ণৌ ১৬ই—বিভিন্ন মুস্লিমদলে ঐক্য প্রতিষ্ঠা। মীমাংসার সর্ত্ত রচনার জন্য ২৫ জন সদস্যের এক কমিটি গঠিত।

লাহোর ১৭ই—এস কে বসুর চিঠির উত্তরে মালব্যজী—বাংলার পরামর্শ ব্যতীত কোনও মীমাংসা হইবে না।

লণ্ডন ১৭ই—লণ্ডনস্থ ভারতীয় কংগ্রেস দলকর্ত্তৃক সৌকত আলির ভবিষ্যদ্বাণীতে (এক পক্ষের মধ্যে সমগ্র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিব) বিপুল আনন্দ প্রকাশ। হাইড পার্কের সভায় বহু আইরিশের যোগদান।

লক্ষ্ণৌ ১৭ই—লাহোরে মালব্যজীর নিকট সৌকত আলির সর্ব্বদল বৈঠকের স্থান ও তারিখ ধার্য্যের জন্য তার। তিনি সাপ্রুকেও তার করিয়াছেন।

অমৃতসর ১৮ই—মালব্যজীর সৌকত আলিকে তার—তিনি দিল্লী ও এলাহাবাদ থামিয়া কলিকাতা যাইবেন। মৌলানা তাঁহার সহিত এলাহাবাদ কি লক্ষ্ণৌ সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন কি না?

শিখ সম্মেলন

লাহোর ১৫ই—রাজা নরেন্দ্রনাথের ভবনে ৩৩জন হিন্দু নেতার সহিত মালব্যজীর চার ঘণ্টা বৈঠক।

লাহোর ১৭ই—সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদে আটটি প্রস্তাব শিখ সম্মেলন কর্ত্তৃক গৃহীত। সভায় মালব্যজীর বক্তৃতা। সন্ধ্যায় শিখ নেতাগণের সহিত মালব্যজীর দুইঘণ্টা আলোচনা।

লাহোর ১৮ই—মালব্যজীর পাঞ্জাব গবর্ণরের ও ডাঃ আলমের সহিত সাক্ষাৎ। সংবাদ পত্র প্রতিনিধিগণের নিকট বিবৃতি সকল দলের সমর্থন-যোগ্য ও [illegible] মীমাংসা এখনও হয় নাই।

দিল্লী ১[illegible]—সৌকত আলি দিল্লীতে পৌঁছিয়া মালব্যজীর সহিত [illegible] [illegible] কথা কহিয়াছেন। সন্ধ্যার সৌকত আলীর বড়লাটের সহিত ৪৫ মিনিটকাল সাক্ষাৎ। [illegible], মহাত্মাজীর মুক্তির জন্য তিনি বড়লাটকে বলিয়াছেন।

২০শে—মালব্যজীর সহিত সৌকত আলির ও সেখ আবদুল্লা [illegible] সাক্ষাতের অব্যবহিত [illegible] এক [illegible] বিবৃতিতে জানা যায়—লক্ষ্ণৌ মুস্লিম সম্মিলন কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিটির সহিত আলোচনার্থে এলাহাবাদে শিখ ও হিন্দু প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হইবে। মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত আপোষ-নিষ্পত্তির সমস্ত প্রস্তাব সেখানে আলোচিত হইবে। অতঃপর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য খৃষ্টান, পার্শী এংলো-ইণ্ডিয়ান, ইউরোপীয়ান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের এক সর্ব্বদল সম্মেলন আহূত হইবে।

সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট সৌকত আলির বিবৃতি—শান্তিস্থাপনের জন্য শান্তিপূর্ণ মনোভাবের দরকার। আশা করি, হিন্দুগণ আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার জন্য কংগ্রেসকে প্ররোচিত করিবেন।

২১শে—মালব্যজীর সহিত ডাঃ মুঞ্জের চারিঘণ্টা কাল আলোচনা। এলাহাবাদ সম্মেলন কয়েক দিন পিছাইবার সম্ভাবনা, কেননা ঐ তারিখে শিখ নেতাদের এক বৈঠক ইতিপূর্ব্বেই আহূত হইয়াছে।

লাহোর ২১শে—জনৈক বিশিষ্ট মুস্লিম নেতার অনুমতিসহ বহু মুসলমান নেতার এক ইস্তাহার ট্রিবিউনে প্রকাশিত—তাঁহারা সর্ব্বদাই গবর্ণমেন্টের পার্শ্বে থাকিবেন, একটি গোয়েন্দা বিভাগ খুলিবেন ও গবর্ণমেন্টকে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিবেন।

কলিকাতা ২১শে—অ্যালবার্ট হলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যস্থাপনার্থ হিন্দু মুসলমান সভায় নূতন প্রতিষ্ঠান 'ইয়ং ইণ্ডিয়ান লীগ' স্থাপিত।

নয়া দিল্লী ২২শে—সর্ব্বদল সম্মেলন ৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত। হিন্দু মহাসভা ও বঙ্গীয় হিন্দু সভা লক্ষ্ণৌ বৈঠক সম্বন্ধে অভিমত দিয়া মীমাংসায় তাঁহাদের সহযোগিতার সর্ত্ত সহিত এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

নয়া দিল্লী ২৩শে—এলাহাবাদ বৈঠকের তারিখ ৩রা নবেম্বর নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

দিল্লী ২৫শে—সর্ব্বদল বৈঠকের অধিবেশন দিল্লীতে হইবে।

এলাহাবাদ ২৬শে—বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারির নিকট মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে পত্রে সৌকত আলি কর্ত্তৃক মহাত্মাজীর মুক্তি প্রার্থনা।

নয়া দিল্লী ২৭শে—বড়লাটের সেক্রেটারি সৌকত আলির, গতবৎসরে শিবযাত্রী আয়ারকে যে পত্র বড়লাট লিখিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিতে বলিয়াছেন।

মিলন বৈঠক

এলাহাবাদ, ২৭শে—মালব্যজীর বিবৃতি। ৩রা নবেম্বর সম্মেলন বসিবার আগে ১লা হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিদের এক পরামর্শ-বৈঠক বসিবে।

কলিকাতা, ২৮শে—মালব্যজীর আগমন। অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্লান্ত। বিরলা পার্কে বাংলা হিন্দু নেতাদের সহিত বৈঠক। প্রায় ৫০ জনের সহিত ৩ ঘণ্টা কাল আলোচনা।

বোম্বাই—সৌকত আলির বিবৃতি। মহাত্মাজীর মুক্তির জন্য আমাদের অনুরোধ বড়লাট [illegible] করায় আমি দুঃখিত। বড়লাটের পরামর্শদাতারা বিশেষ বিজ্ঞের মত কাজ করেন নাই।

খৃষ্টান সম্মিলন

পুণা ২৮শে—ভারত সেবক সমিতি হলে ভারতীয় খৃষ্টান সম্মেলনের অধিবেশনে মিশ্র নির্বাচন সমর্থিত। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইবার জন্য কমিটি নিযুক্ত।

নয়াদিল্লী, ২৯শে—ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ [illegible] বিবৃতি- মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজের কোনও অব্রাহ্মণ প্রতিনিধিকে বৈঠকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে কোন সিদ্ধান্ত হইলে প্রতিবাদের সম্ভাবনা।

কলিকাতা ৩০শে—মিলন বৈঠকের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া দিল্লীতে অধিবেশন হইবে বলিয়া যে সংবাদ বাহির হইয়াছিল, উহা ভুল। বৈঠক এলাহাবাদেই হইবে।

মালব্যজীর বিবৃতি—বাংলার হিন্দু নেতা ও মুসলমান নেতাদের সহিত আলোচনা সন্তোষজনক হইয়াছে। মালব্যজী সন্ধ্যায় এলাহাবাদ রওনা হইয়াছেন।

বোম্বাই, ৩০শে—সৌকত আলি গান্ধীজির সহিত সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে এক তার করেন। সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

অস্পৃশ্যতা পরিহার আন্দোলন

২৬শে সেপ্টেম্বর—কলিকাতা অ্যালবার্ট হলে নেলী সেনগুপ্তার সভা-নেত্রীত্বে ছাত্র-ছাত্রীদের সভা।

২৭শে—লাহোরে মন্দির-দ্বার মুক্ত। খুলনায় পুণাচুক্তি সমর্থন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক ভোজ।

২৮শে—অপরাহ্নে কলিকাতার অ্যালবার্ট হলে বিরাট মহিলা সভা। গান্ধী-সেবিকা-সঙ্ঘের ঘোষণা। অস্পৃশ্যতা দূর করা এই সঙ্ঘের ব্রত।

গয়া, ২৯শে—মন্দির সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। সকল শ্রেণীর হিন্দুদের একত্রে প্রসাদ-গ্রহণ।

লক্ষ্ণৌ, ৩০শে—বহু প্রসিদ্ধ নাগরিককে লইয়া একটি সাম্যলীগ সংস্থাপিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য, বর্ণ হিন্দুর সহিত অপরাপর হিন্দুর এক অধিকার দান।

বোম্বাই, ৩০শে—অস্পৃশ্যতা দূর প্রচারার্থে প্রস্তাবিত লীগের সভায় [illegible] টাকা দানের প্রতিশ্রুতি। ভূপালের নবাব আন্দোলনে সহানুভূতি জানাইয়া ৫০০০ টাকা দিয়াছেন।

আমেদাবাদ, ১লা অক্টোবর—আমেদাবাদ আন্তর্জাতিক ভোজে ৩০০০ লোকের যোগদান।

বোম্বাই, ২রা—৭টি মন্দির দ্বার হরিজনদের নিকট মুক্ত। বিরাট সভায় [illegible] উক্তি—মানুষের সকল আত্মাই এক।

মেদিনীপুর ২রা—নাড়াজোল-কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ কর্ত্তৃক বিরাট [illegible] ভোজের পর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উপস্থিতিতে কর্ণগড় [illegible] উন্মুক্ত।

[illegible] ভারত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ৫ই—[illegible] মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত।

বোম্বাই, ১৩ই—নিখিল ভারত [illegible] [illegible] বিবৃতি প্রকাশ।

ইন্দোর, ১৩ই—[illegible] বাধিকদের [illegible]—হিন্দুধর্মে অস্পৃশ্যতা নাই।

কলিকাতা, ১৫ই—অস্পৃশ্যতা পরিহার প্রচেষ্টায় হিন্দুমিশন, রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি ও কলিকাতা হিন্দু সভার বিবৃতি।

মহীশূর, ১৫ই—অস্পৃশ্যতা নিবারণ সংঘের উদ্যোগে প্রতিনিধি-পরিষদে ২০০ শতের অধিক স্বাক্ষরযুক্ত এক ইস্তাহার। রাজপথে সকল জাতির গোআবাত্রাধিকার প্রস্তাব গৃহীত।

পুণা, ১৯শে—ভোর রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় রাজা সাহেবের ঘোষণা, অতঃপর বিদ্যালয় আদালত প্রভৃতি সাধারণ স্থানে অস্পৃশ্যতা বিদূরিত হইবে।

মাদ্রাজ—আগামী বড়দিনের ছুটিতে মাদ্রাজে নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা নিবারণের এক অধিবেশন হইবে।

বারাণসী, ২৪শে—উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের পক্ষ হইতে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের বড়লাটের নিকট অনুন্নতদের মন্দির-প্রবেশের বিপক্ষে সাহায্য প্রার্থনা।

দিল্লী, ২৭শে—বিড়লা ভবনে রাজেন্দ্র প্রসাদ, ট্যাণ্ডন, বিড়লা প্রভৃতি কর্ত্তৃক অস্পৃশ্যতা নিবারণ সঙ্ঘের অধিবেশন। ভারতবর্ষকে এই কয়টি ৩ হাজার ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের জন্য ৩ হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক

সিমলা ৩০শে সেপ্টেম্বর—গত মে মাসে পরামর্শ সমিতির বৈঠকে যে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল, সে বৈঠক না হওয়ায় নভেম্বরের গোলটেবিল বৈঠকে সেই সমস্ত বিষয় আলোচিত হইবে [ক] (১) রাস্তা সেতু খেয়া ইত্যাদি (২) ভারতীয় হিসাব রক্ষক বিভাগ ও ব্যবসাবাণিজ্য (৩) সমুদ্রপথে নৌচলাচল ও বাতিঘর (৪) ব্যবসাবাণিজ্য কোম্পানি ও অন্যান্য বিষয়ক ব্যাপার (৫) রেল অফিস [খ] (১) দেশীয় রাজ্যের রেলপথের এলাকা (২) কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শাসিত এলাকা (৩) বহির্ভুক্ত এলাকা (৪) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত দেশীয় রাজ্য সমূহের সন্ধি ও চুক্তির সর্ত [গ] কেন্দ্রীয় ও ব্যবস্থাপক সভার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা [ঘ] যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদ গঠন ও উহার ক্ষমতা [ঙ] যুক্তরাষ্ট্রীয় সমস্যা ও বিল ব্যতীত কেন্দ্রীয় ব্যাপার সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা-পদ্ধতির বিবরণ [চ] (১) দেশ রক্ষা—(ক) সাধারণ শান্তির সময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেশরক্ষার যে ব্যয় ধার্য্য করা হইবে, তার বিস্তৃত বিবরণ। (খ) ব্যবস্থা পরিষদে সৈন্য বিভাগের প্রতিনিধি প্রেরণ [ছ] অর্থনৈতিক রক্ষাকবচ [জ] শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী কমিটির সহিত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ। [ঝ] প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র [ঞ] [illegible] [illegible] স্থান ও কার্য্যাবলী [ট] প্রদেশের সীমা নির্দ্ধারণ [ঠ] [illegible] [illegible] গঠন [ড] নিম্নোক্ত কমিটিগুলির রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা (১) [illegible] অর্থনৈতিক কমিটির রিপোর্ট (২) ভোটাধিকার কমিটির রিপোর্ট (৩) দেশীয় রাজ্য [illegible] কমিটির রিপোর্ট।

নয়া দিল্লী ২৭শে অক্টোবর—[illegible] ঐ সময়ে লণ্ডনে গোল-টেবিল বৈঠকের [illegible] [illegible]। মুস্লিম [illegible] প্রতিনিধিবৃন্দ—আগা খাঁ, [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], গজনভী, [illegible], ইক্‌বাল, [illegible], [illegible] [illegible] আহ্মীর, কেলকার, রামস্বামী মুদালিয়ার, মানকচাঁদ, পাত্র, পুরোষত্তম দাস ঠাকুরদাস, সাপ্রু, সাফাৎ আমেদ খাঁ, ঋষীয় তারা সিং, চৌধুরী জাফরুল্লা খাঁ। দেশীয় রাজ্য সমূহের মধ্যে বরোদা, ভূপাল বিকানীর, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, কোলাপুর, মহীশূর, নবনগর, পাতিয়ালায় প্রতিনিধি পাঠাইবেন। জয়পুর, যোধপুর উদয়পুর সম্মিলিত প্রতিনিধি ও ক্ষুদ্ররাজ্য সমূহ সরিষার রাজাকে প্রতিনিধি পাঠাইবেন। রেওয়া ও ত্রিবাঙ্কুরকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২০শে—রয়টারের প্রতিনিধির কাছে মিঃ জিন্নার বিবৃতি—লণ্ডন গোলটেবিলে আসিবার পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক মীমাংসা হওয়া উচিত।

নয়া দিল্লী ২৯শে—আরও ৪ জন নিমন্ত্রিত—বাংলার হিন্দু প্রতিনিধি, স্যর নৃপেন্দ্র সরকার। শ্রমিক প্রতিনিধি হেদায়েৎ হোসেন, এন্ এম্ যোশী। নারী প্রতিনিধি বেগম শা নওয়াজ।

বোম্বাই ২৯শে—যাত্রার পথে কেলকারের বিবৃতি—'ভারতের পক্ষে কথা বলিবার যোগ্যতম ব্যক্তি মহাত্মা।'

বিপ্লব

২৮শে সেপ্টেম্বর—সন্ধ্যাকালে ষ্টেট্‌সম্যান সম্পাদক স্যর অ্যালফ্রেড ওয়াটসনের প্রতি গুলি। তাঁহার সেক্রেটারি ও মোটরচালক এবং তিনি নিজেও আহত। ষ্টেট্‌সম্যান সম্পাদকের আঘাত মারাত্মক নহে। ৩জন আততায়ীর দুইজন বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। একজন পলাতক।

৩০শে—স্যর অ্যালফ্রেডের আততায়ীদের মধ্যে মৃত দুইজনকে মণীন্দ্র লাহিড়ী ও অমল ভাদুড়ী বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে।

দার্জ্জিলিং ২৯শে—যদি ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে পাহাড়তলী আক্রমণের সন্ধানী সংবাদ না পাওয়া যায় তবে সরকার সমষ্টিগত ভাবে চট্টগ্রামে গুরু জরিমানা ধার্য্য করিবেন।

সিমলা ১লা—বাংলায় যে কয়টি সৈন্যবাহিনী প্রেরণের কথা ছিল, উহার প্রত্যেকটিরই অর্দ্ধেক সৈন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়াছে। বাকী অর্দ্ধেক সৈন্যও শীঘ্রই যাইতেছে।

লণ্ডন ৩রা—পাহাড়তলী ঘটনা ও স্যর অ্যালফ্রেডের প্রতি আক্রমণ প্রচেষ্টার পর বাংলাকে লণ্ডনবাসীরা পৃথিবীর কলঙ্কস্বরূপ বলিয়া মনে করিতেছেন।

সিমলা ৩রা—বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য গত ২৬শে সেপ্টেম্বর যে বৈঠক বসে, তাহাতে শিক্ষক ও সাংবাদিকদিগকে এই কার্য্যে সহায়তার জন্য আহ্বান করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম ৫ই—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কতিপয় বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমান নাগরিকের সহিত [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] নাগরিকগণের আন্তরিক সাহায্য [illegible]—[illegible] সহযোগিতায় কিছু হইবে না। [illegible]

সংবাদে বোঝা যায় যে এইরূপে একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান আছে। [illegible] দমনার্থ তিনি হিন্দু [illegible] যুবকদিগকে সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নিজ নিজ বাড়ীর মধ্যে অবস্থান করিতে আদেশ দিয়াছেন।

লণ্ডনে মিঃ ভিলিয়াস বলিয়াছেন যে, বিপ্লব আন্দোলন বাংলা হইতে অপসারিত না হইলে আমরা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দানও স্থগিত রাখিব।

কলিকাতা ১৮ই—ভারত গবর্মেন্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সদস্য মিঃ হেগ কলিকাতায় আজ পৌঁছিয়া সন্ধ্যায় দার্জ্জিলিং গিয়াছেন। বাংলার মন্ত্রীগণও ঐ সঙ্গে দার্জ্জিলিং ফিরিলেন। প্রকাশ, বিপ্লব আন্দোলন দমন উদ্দেশ্যে কঠোরতর নীতি অবলম্বনের উদ্দেশ্যেই মিঃ হেগ বাংলা গবর্ণমেন্টের সহিত আলোচনা করিতে আসিয়াছেন।

চট্টগ্রাম ১৯শে—বিপ্লব দমনার্থ চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির ৫টি ওয়ার্ড ৩০টি সাব-ওয়ার্ডে, ১০ জন বা অধিক সদস্য লইয়া এক এক কমিটিতে গঠিত হইবে।

২০শে—আন্দামান হইতে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দীরা চিঠি দিয়াছেন। একটি তেতালা দালানের নীচের তালায় তাঁহাদের থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। পরস্পরের সহিত মেলামেশায় বাধা নাই।

পাহাড়তলী গুলির জেরে ২৩ জন হাজতে আটক। ৫ জন জামিনে মুক্ত। ২৭শে চার্জ্জ দাখিল করা হইবে।

কলিকাতা ২৩শে—প্রকাশ, ষ্টেট্‌সম্যান সম্পাদক স্যর ওয়াটসন হাওয়াই [illegible] বিলাত রওনা হইয়াছেন।

লণ্ডন ২০শে—কমন্স সভায় মেজর এটিলির আন্দামানে প্রেরিত বন্দীদের সম্বন্ধে প্রশ্ন। ওয়েজউড বেনের প্রশ্নের উত্তরে স্যামুয়েল হোর বলেন যে দশ বৎসর পূর্ব্বে আন্দামানের যে অবস্থা ছিল, তাহা আর নাই।

দুর্ঘটনা—

মাদ্রাজ, ৬ই অক্টোবর—মাদ্রাজ সংশোধনাগারে [illegible]-জেলায় সুভাষচন্দ্র শয্যাশায়ী। ১০ই নাগপুর। সুভাষচন্দ্রকে ভাওয়ালী স্বাস্থ্যনিবাসে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

১০ই অক্টোবর। বেতনহ্রাসের প্রতিবাদে টিটাগড়ের চারিটি চটকলের প্রায় ১৮ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

দিল্লী, ১১ই—ভাওয়ালীর পথে সুভাষচন্দ্র মথুরায় অবতরণ করেন। প্রকাশ, সুভাষচন্দ্র এত শীর্ণ হইয়াছেন যে তাঁহাকে চিনিতে পারা যায় না।

লাহোর, ১২ই—মেয়ো হাসপাতালের প্রাইভেট ওয়ার্ডে বন্দী ডাঃ আলম মূত্রাশয়ে টিউমার রোগে শয্যাশায়ী। ৪৬ পাউণ্ড ওজন হ্রাস।

ভাওয়ালী, ১৬ই—১১ই অক্টোবর সুভাষচন্দ্রের ভাওয়ালী আগমন-সংবাদ। তাঁহার বর্ত্তমান শরীরের ওজন ১০ ষ্টোন। জ্বর প্রত্যহ বিকালে ৯৯ ডিগ্রী পর্য্যন্ত ওঠে।

সিমলা, ১৮ই—দুধলাঘা নামক স্থানে গো-হত্যার ফলে শিখ-জাট সংঘর্ষে ১৫ জন মুসলমান নিহত।

[illegible], ১৮ই—শিবপ্রসাদ গুপ্ত [illegible]-[illegible]।

জলপাইগুড়ি, ২১শে—শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্তের মেডিকেল ও রক্তপরীক্ষা পরীক্ষার্থে কলিকাতা যাত্রা।

কলিকাতা ২২শে—সেনগুপ্ত আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে চিকিৎসার্থে আনীত। তিনি বাতে কষ্ট পাইতেছেন।

কলিকাতা, ২২শে—প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিষ্ট ডাঃ ইউনান্ সন্ন্যাস রোগে ৭৩ বৎসর বয়সে দেহ রাখিয়াছেন।

টিটাগড়, ২২শে—শ্রমিক ধর্ম্মঘটের ফলে ১৪৪ ধারা জারি।

মাদ্রাজ, ২৪শে—এম্ এণ্ড এস্ এম রেলের পেরাম্বুরের কারখানায় ৬০০০ শ্রমজীবীর মধ্যে ৫৫০০ জনের ধর্ম্মঘট।

লণ্ডন, ২৪শে—কমন্স সভায় মিঃ বাটলারের বিবৃতি—মে মাসের শেষ ভাগে আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৩১, ১৯৪ কিন্তু আগষ্টের শেষ ভাগে হইয়াছে ২১,৪১২।

যশোহর,—২৭শে—যশোহর ট্রেজারীর পাহারাওয়ালাকে লক্ষ্য করিয়া চারি জন লোক সন্ধ্যায় গুলি ছোড়ে। পাহারাওয়ালারাও পাল্টা গুলি ছোড়ায় আততায়ীরা পলাইয়া যায়।

পুণা, ৩০শে—মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম প্রধান নেতা মি থেংডির অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ।

রাঁচী, ৩০শে—পাটনা হাইকোর্টের জাতীয়তাবাদী ব্যারিষ্টার স্যর আলি ইমামের ৬৩ বৎসরে আকস্মিক মৃত্যু।

ব্যবস্থা-পরিষদ

২৭শে সেপ্টেম্বর—অর্ডিন্যান্স বিলের আলোচনা। বি, আর পুরী, মিঞা শা নেওয়াজ, স্যর মহম্মদ ইয়াকুব, হরবিলাস সর্দ্দা সকলেই অল্প বিস্তর বিপক্ষবাদ করিয়া বক্তৃতা দেন।

২৬শে—পাহাড়তলীর বিপ্লবী অনাচারের নিন্দা-প্রস্তাব গৃহীত।

অর্ডিন্যান্স বিলের আলোচনা। রেড্ডী, সৈয়দ হাসানের বিরুদ্ধ বক্তৃতা।

২৯শে—অর্ডিন্যান্স বিলের প্রতিবাদ।

প্রশ্নোত্তরে স্যর সি পি রামস্বামী আয়ার বলেন, প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে ভারত গবর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে ৬,৬৩,২৮৯৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় বৈঠকের জন্য মোট ৬,৭২,৬০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার কত টাকা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

স্যর রামস্বামী আয়ার, অস্থায়ী ভাবে শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। ৩রা অক্টোবর তাঁহার কার্য্যকাল সমাপ্ত হইবে।

সিমলা, ৩০শে—অর্ডিন্যান্স বিলের আলোচনা শেষ। জনসাধারণে প্রচারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। সিলেক্ট কমিটিতে দিবার প্রস্তাব ৬৪-৩২ ভোটে গৃহীত। মিঃ হেগ বলেন, সিলেক্ট কমিটি যদি বিলের বিধান সমূহ পরিবর্ত্তিত করিয়া ছায়া মাত্রে পর্য্যবসিত করেন গবর্ণমেণ্ট সে পরিবর্ত্তনে সম্মত হইবেন না। অতঃপর ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন ৭ই নবেম্বর অবধি মুলতুবী থাকে।

অপরাহ্ণে ব্যবস্থা-পরিষদের কমিটি-কক্ষে বাঙ্গলায় শিল্প আন্দোলন বাঙ্গলায় শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন স্থগিত রাখার সম্বন্ধে [illegible] নাম পত্রিকায় ব্যবস্থা-পরিষদের ৪ জন মুসলমান সদস্যের স্বাক্ষরিত এক [illegible] বাহির হয়। স্যর আব্দার রহিম, জুলফিকার আলিখাঁ প্রমুখ পরিষদের [illegible] মুসলমান সদস্য তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

সিমলা ১২ই অক্টোবর—আগামী ৭ই নবেম্বর হইতে পরিষদের অধিবেশনে তিনটি বিষয় আলোচিত হইবে—(১) ভারতীয় প্রতিনিধিদের অটোয়া রিপোর্ট (২) অর্ডিন্যান্স বিল সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট (৩) ১৯৩২ সালের বাংলা বিপ্লব আন্দোলন দমন বিলের অংশ।

নয়াদিল্লী, ২৪শে—অর্ডিন্যান্স বিলের সিলেক্ট কমিটির বৈঠকে বিলের মেয়াদ ৩ বৎসর করিবার প্রস্তাব গৃহীত।

৩০শে,—সত্যেন্দ্র মিত্র প্রমুখ চার জন সদস্যের সিলেক্ট-কমিটির চেয়ার ম্যানের ব্যবহারের প্রতিবাদে বৈঠক-ত্যাগ।

নারীহরণ

(যশোহর) পাঁজিয়া, ২৯শে সেপ্টেম্বর—হেলাফি গ্রামে পঙ্কদাসী নামে জনৈক হিন্দু বিধবা কয়েকজন মুসলমান দ্বারা অপহৃতা হয়। মোকর্দ্দমা রুজু হইয়াছে।

গোমো ১০ই অক্টোবর—গোমোর দইহারী গ্রাম হইতে একটি হিন্দু বিধবা মুসলমান দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক অপহৃত এবং তাহার প্রতি দুর্ব্বৃত্তদের পাশবিক অত্যাচার। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভা এবিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন।

কলিকাতা, ১৮ই—হাবড়ার গোয়ালবস্তী গ্রামের হিন্দু বিধবা চারুবালা দাসী জনৈক মুসলমান কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। হিন্দু অবলা আশ্রম তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে।

সিরাজগঞ্জ, ২১শে—উল্লাপাড়া থানার এক গ্রামে কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক সুরেন্দ্রনাথ দাসের ১৫ বৎসর বয়স্কা পত্নী স্বর্ণময়ী দাসী অপহৃত। দুর্গানগর হিন্দু-সভা বালিকাটির উদ্ধারকল্পে চেষ্টা করিতেছেন।

মামলা মোকর্দ্দমা—

চট্টগ্রাম, ২৪শে—ধলঘাট মামলার রায়—সাবিত্রী দেবী, দীনেশ দাশগুপ্ত, রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, মণীন্দ্র দে ও অজিত বিশ্বাস প্রত্যেকের ১২৯ (ক) ও ২৯৬ ধারায় চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। ইহা ছাড়া জরুরী ক্ষমতার অর্ডিন্যান্সের ৪ ধারা অনুযায়ী আর ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। উভয় দণ্ড এক সঙ্গে চলিবে। যে তিন জন খালাস পাইয়াছে, তাহাদিগকে আদালত গৃহের বাহিরে আসিবা মাত্র অর্ডিন্যান্সে পুনরায় ধরা হইয়াছে।

বোম্বাই, ২৫শে—বোম্বায়ের প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট দুই জন কংগ্রেস কর্ম্মীর বিচারের সময়ে বলেন—আমি পুলিশকে অতঃপর রাজনৈতিক কারণে ধৃত ব্যক্তিকে হাতকড়া না দিতে উপদেশ দিতেছি। পুলিশের ইহা জানা কর্ত্তব্য যে দুর্দ্দান্ত না হইলে রাজনৈতিক কর্ম্মীগণকে হাতকড়া দিবার দরকার নাই।

বিবিধ—

মাদ্রাজ, ১লা অক্টোবর—শ্রীমতী এনি বেশান্তের ৮৬তম জন্মতিথি অনুষ্ঠিত।

কুচবিহার ৩রা—ভূগর্ভে ৩২১ বৎসরের (শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ভূপ ১৫৩৩ শকাব্দা, ১৬১১ খৃষ্টাব্দ) পুরানো কামান পাওয়া গিয়াছে। উহা প্রায় ৬ ফুট দীর্ঘ, ১০ হইতে ১২ ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট, মুখের ব্যাস ৩ ইঞ্চি।

লণ্ডন, ৩রা—ব্যবসায়-মন্দার জন্য আমেরিকার ধনকুবের রকফেলারের ভাণ্ডারেও ঘাটতি পড়িয়াছে। ১৯২৯ সনে যেখানে ৯০ কোটি পাউণ্ড সঞ্চিত ছিল, আজ সেখানে ৩ কোটি পাউণ্ড আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রকফেলারের পিতা ১৮৯৬ সনে ব্যবসায়-বাণিজ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, পরে নানারূপ ব্যবসায় বাণিজ্যে খাটাইয়া উহা বিশ কোটি পাউণ্ডে পরিণত করেন। ১৯২৩ সালে দানে উহার দশ কোটি পাউণ্ড ব্যয়িত হয়।

লণ্ডন ৬ই—এই বৎসরের এভারেষ্ট ব্যোম-অভিযানের সম্পর্কে সমস্ত ব্যয় লেডী হাউষ্টন বহন করিবেন। লর্ড ক্লাইড্‌সডেল বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ধারণা হইয়াছে বর্ত্তমানে বৃটেন অধঃপতিত হইয়াছে, এভারেষ্ট অভিযানে কৃতকার্য্য হইয়া আমরা ভারতবর্ষের সে ধারণা দূর করিব।

কলিকাতা, ১১ই—সরকারী বিবরণে প্রকাশ, ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লবণ শুল্ক বাদ দিয়া ভারতীয় সামুদ্রিক ও ভূমিসংক্রান্ত যে শুল্ক রাজস্ব আদায় হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। ৩১ সালের এই মাসে আদায় ছিল ৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা।

লণ্ডন, ১৪ই—'মর্ণিং পোষ্ট'এ প্রকাশিত ভারত হইতে স্বর্ণ-রপ্তানি সম্পর্কে প্রবন্ধ। এক বৎসরে প্রায় ৮৫ কোটি টাকার স্বর্ণ-রপ্তানি। সম্প্রতি পৃথিবীতে গড়ে স্বর্ণ যত উৎপন্ন হয়, তাহার তৃতীয় চতুর্থাংশ। একমাত্র এই স্বর্ণ দ্বারাই ইংলণ্ড ফরাসী ও আমেরিকার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছে।

দিল্লী, ২৬শে—হাটশালা গ্রামের প্রায় ১০০০ চামারের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ।

বিদেশ

জাতিসঙ্ঘ-পরিষদ

জেনেভা, ২৬শে—ডি ভ্যালেরা কর্ত্তৃক সঙ্ঘের কার্য্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা। নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের সাফল্যের উপর সঙ্ঘের কার্য্যের বিচার চলিবে। আয়ার্ল্যাণ্ড যদি স্বীয় নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে তবে জগতের উন্নতিতে বহু দান করিতে সক্ষম হইব। লৌসেন যদি আন্তর্জ্জাতিক ঋণ সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হয়, তবে প্রশংসনীয় কার্য্য করিবে। লিটন রিপোর্ট প্রাচ্য সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসায় সফল হইবে।

জেনেভা, ২রা—মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-দিবস উপলক্ষে ভারতীয় আন্তর্জ্জাতিক কমিটির পক্ষ হইতে জাতি-সঙ্ঘের সদস্যদিগকে যে লিপি প্রেরণ করা হইতেছে, তাহার মর্ম্ম—ভারতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিরোধ-ভাবের প্রসারতায় জগতে যে শান্তিনাশের সম্ভাবনা হইয়াছে, সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ। মার্গারেট কাজিন্সের উদ্যোগেই এ লিপি প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন, ৩রা—নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার কোনও বিশেষ বিষয় আলোচনার জন্য বৃটেন কর্ত্তৃক লণ্ডনে এক আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক আহ্বানের আয়োজন হইয়াছে। উহাতে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মানি ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য যোগদান করিবে। জার্ম্মানি কর্ত্তৃক অন্যান্য শক্তির সমান অস্ত্র রাখিবার দাবী ইহার প্রথম আলোচ্য বিষয়।

লণ্ডন, ১৪ই—মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড ও মঁ হেরিয়তের কথাবার্ত্তার ফলে জেনেভায় চারি-শক্তি বৈঠক বসিবে ঠিক হয়। জার্ম্মানি যোগদানে অসম্মতি জানাইয়াছে, কারণ জেনেভা বৈঠকে যোগদান নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে যোগদানের তুল্য।

ইংলণ্ড

লণ্ডন ২৬শে সেপ্টেম্বর—মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন সম্পর্কে পূর্ব্বাভাষ।

উদারনৈতিকগণ মনে করেন চুক্তির যে প্যারাগ্রাফে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি বিদেশী পণ্যের উপর শতকরা ১০ হিসাবে শুল্ক ধার্য্য হইবে, উপনিবেশ সমূহের সম্মতি ব্যতীত ৫ বৎসরের মধ্যে উহা হ্রাস করা হইবে না—উহা দ্বারা বৃটিশ পার্লামেণ্টকে উপনিবেশের পার্লামেণ্টের ইচ্ছার অধীন করিয়া শাসন-পদ্ধতি সম্পর্কীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে।

লণ্ডন ২৮শে—লর্ড স্নোডেন, স্যর হার্বার্ট স্যামুয়েল, সহ-ভারতসচিব লর্ড লোদিয়ান ও স্যর আর্চিবাল্ড সিনক্লেয়ারের পদত্যাগ।

৩০শে—ত্যক্ত মন্ত্রীপদে মিঃ আর এ বাটলার সহকারী ভারতসচিব ও লর্ড প্লিমাউথ সহকারী উপনিবেশ সচিব নিযুক্ত। উভয়েই রক্ষণশীল দলভুক্ত। কোষাগারের অর্থসচিব পদে সাইমনী উদারনৈতিক দলের মিঃ হোর বেলিসার নিযুক্ত। মিঃ বালডুইন স্নোডেনের স্থলে লর্ড প্রেসিডেণ্ট ও প্রিভিসিল দুই কার্য্যই করিবেন।

নিউ ইয়র্ক—১১ই—ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যে লর্ড আরউইনের পর পর লর্ড রেডিং আমেরিকা গিয়াছেন। সেখানে ইংরাজসমিতির এক ভোজসভায় তিনি বলিয়াছেন—ভারতে ইংরাজ শাসন বৃটিশেতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়।

লণ্ডন ২৮শে সেপ্টেম্বর—প্রকাশ, স্যর অসোয়াল্ড মোজ্‌লে হিটলারের আদর্শে বৃটেনে ফ্যাসিষ্ট মতবাদ গড়িয়া তুলিতে—'বৃটিশ ইউনিয়ন অব ফ্যাসিষ্ট' বলিয়া এক দল গঠন করিয়াছেন। জানুয়ারী মাসে তিনি মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

রক্ষণশীলদল সম্মেলন

লণ্ডন ৬ই অক্টোবর—ব্লাকপুল সম্মেলনে স্যর স্যামুয়েল হোর কর্ত্তৃক জাতীয় গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় নীতি সমর্থন করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা। অধিবেশনে [illegible] মিঃ চার্চ্চিল [illegible] জানাইয়াছেন, যে নির্ব্বাচনপ্রথার [illegible] পড়িয়া পশ্চিম হাবুডুবু খাইতেছে, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষকে কেন্দ্রা কেন।

শ্রমিকদল সম্মেলন

লণ্ডন ৫ঠা—জাতীয় আর্থিক অবস্থার প্রতীকারার্থে লিষ্টার শ্রমিকদল কর্ত্তৃক দেশের যাবতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানকে সাধারণের সম্পত্তি-করণ প্রস্তাব। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিঃ ড্যাল্টন প্রস্তাব করেন যে বর্ত্তমানে প্রত্যাগমন যে কোন প্রকারে বন্ধ রাখিতে হইবে।

লণ্ডন ৬ই—মিঃ হেণ্ডার্সনের আপত্তি সত্ত্বেও স্যর চার্লস্ ট্রেভেলিয়ান আনীত পরবর্ত্তী শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দলের মুখ না চাহিয়া স্পষ্ট সমাজতন্ত্র-বাদসূচক আইন-কানুন প্রস্তাব গৃহীত।

৭ই—শ্রমিক সম্মেলন কর্ত্তৃক 'হাউস অব লর্ডস' অপ্রয়োজনীয় ও বিপজ্জনক বিধায় উহার উচ্ছেদ-প্রস্তাব। ম্যাকডোনাল্ড, টমাস ও স্নোডেনকে দলে না নিবার প্রস্তাব।

লণ্ডন ১৮ই—কমন্স সভায় মিঃ ল্যান্সবেরি অটোয়া চুক্তির সম্বন্ধে বলিয়াছেন এ চুক্তি আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার পথ বন্ধ করিয়াছে। ভারতে এ চুক্তি গৃহীত হয় নাই।......মিঃ হেণ্ডারসনের শ্রমিকদলের নেতৃত্ব পরিত্যাগ। বর্ত্তমানে তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সেক্রেটারির কাজ করিবেন।

লণ্ডন ২০শে—মন্ত্রিসভায় ভারত সম্পর্কিত প্রশ্নে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে। ম্যাকডোনাল্ড প্রমুখ ৭জন আরুইন নীতি অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী, লর্ড হেলসাম প্রমুখ রক্ষণশীলরা বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। স্যমুয়েল হোর কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডকে সমর্থন করেন। ৬ জন নিরপেক্ষ। বাংলাই এই মতানৈক্যের হেতু।

লণ্ডন ২১শে—৪৭১-৮৪ ভোটে অটোয়া চুক্তি কমন্স সভায় গৃহীত।

লণ্ডন ২৬শে—কমন্স সভায় ল্যান্সবেরি কর্ত্তৃক উপস্থাপিত অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব ৪৩২-৫৫ ভোটে অগ্রাহ্য।

বেকার সমস্যা

লণ্ডন ১৭ই—ক্ষুধিত শ্রমিকদলের রাজধানী অভিমুখে আন্দোলন চেষ্টায় আগমন।

লণ্ডন ২৩শে—প্রতি পাউণ্ডে ১৮।০ পেন্স হারে বেতনহ্রাসের প্রস্তাবে ল্যাঙ্কাশায়ারে কার্টুনিবিভাগের গোলমালের মীমাংসা হইয়াছে। ৩১শে হইতে প্রস্তাব কার্য্যকরী হইবে।

লণ্ডন ২৭শে—বেকারদলের অভিযানে লণ্ডনে ভীষণ গোলযোগ। জনতার উপর পুলিশের গুলি। ১৫জন আহত ও ৩ জন গ্রেপ্তার।

লণ্ডন ২৯শে—ক্ষুধিত বেকারদের কমন্স সভায় প্রবেশের দাবী।

আয়ার্ল্যাণ্ড

লণ্ডন ৩০শে সেপ্টেম্বর - ডাবলিনে ভারতীয় আইরিশ লীগের এক সভায় মহাত্মাজীর সাফল্যে সংবর্দ্ধনা-প্রস্তাব।

লণ্ডন ৩রা অক্টোবর—ডি ভ্যালেরার নির্দ্দেশানুযায়ী সম্রাট আইরিশ ফ্রিষ্টেটের গবর্ণর জেনারেল মিঃ ম্যাকনেলের পদত্যাগ গ্রহণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ই—ডি ভ্যালেরার লণ্ডনে আগমন। বেলা ১০টায় ইঙ্গ-আইরিশ বৈঠকের আরম্ভ। ডি ভ্যালেরা এবং টমাসের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে জানা যায় ফ্রীষ্টেট ভূমিকর ইত্যাদি যে-সব টাকা ইংলণ্ডকে দেওয়া স্থগিত রাখিয়াছে, আগামী ১৪ই নবেম্বর তাহারই আপোষ-আলোচনার্থে অধিবেশন হইবে।

ডাবলিন ৬ই—বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ভূমিকরের টাকা দিলে তাহারা আয়ার্ল্যাণ্ডের জিনিসপত্রের উপরে বিশেষ কর উঠাইয়া দিবে, বৃটেনের এ প্রস্তাবে ডি ভ্যালেরা রাজী হন নাই।

লণ্ডন ১৩ই—ডি ভ্যালেরা ও আইরিশ প্রতিনিধিগণের আইরিশ সমস্যালোচনায় লণ্ডন আগমন।

১৫ই—ইঙ্গ আইরিশ আলোচনা ব্যর্থ।

চীন

জেনেভা ২রা অক্টোবর—লিটন কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ—কমিশনে বলা হইয়াছে যে মাঞ্চুরিয়া সমস্যা মীমাংসার জন্য চীন-জাপানের একটি পরামর্শ-বৈঠক বসা কর্ত্তব্য। বৈঠকে চীন জাপানের সরকারী প্রতিনিধি ও দুইজন স্থানীয় প্রতিনিধি থাকিবেন। নিরপেক্ষ প্রতিনিধিও থাকিতে পারিবেন। আলোচনার ফলাফল চারিভাগে বিভক্ত হইবে—(১) চীনের তিনটি প্রদেশের জন্য বিশিষ্ট শাসননীতির প্রবর্ত্তন (২) চীন-জাপান সন্ধি। (৩) এই সন্ধিতে সালিশ বার্ত্তা, শান্তিস্থাপন এবং প্রয়োজন হইলে পরস্পরের সাহায্যগ্রহণ (৪) বাণিজ্য-চুক্তি।

জার্ম্মাণি

বার্লিন ২৯শে—বৈদেশিক সাংবাদিকদের নিকট বক্তৃতায় পার্লামেণ্টে নাজিনেতা গোয়েরিং'এর নাজিদলের কার্য্য-পদ্ধতি বিবৃতি—মার্কসের মতবাদ ধ্বংস ও জার্ম্মানির ঐক্য-প্রতিষ্ঠান আমাদের উদ্দেশ্য আর (১) যুদ্ধের দায় হইতে জার্ম্মানিকে অব্যাহতি প্রদান (২) অন্যান্য রাজ্যের সহিত জার্ম্মাণির সমান ক্ষমতা (৩) সর্ব্ববিষয়ে জার্ম্মাণির পূর্ণ স্বাধীনতা।

বার্লিন ১লা অক্টোবর—প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গের ৮৫তম জন্মোৎসবে জার্ম্মানীতে নানা অনুষ্ঠান।

বার্লিন ১১ই—'ফরওয়ার্টস্' সংবাদপত্রের এক বিবৃতিতে প্রকাশিত, হিণ্ডেনবার্গ, প্যাপেন ও ভূতপূর্ব্ব যুবরাজের চক্রান্তজালে জার্ম্মানিতে পুনরায় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আয়োজন চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে সংবাদটি নিছক মিথ্যা।

Printed and Published by Sajani Prasanna Chatterji at the Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd., 56, Dharamtala Street, Calcutta.

২৫শ বর্ষ পৌষ, ১৩৩৯ ৮ম সংখ্যা

অন্নপূর্ণা জাগো

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

নিদ্রিতা উমা, শিব শঙ্কর জাগে,
চমকিয়া জাগে কৈলাসে মহাকাল,
ঘুমভাঙা আঁখি রাঙা নব অনুরাগে,
অনুরাগ-রাঙা যেন কালো জটাজাল।
শিবের বিভূতি লাগে পার্ব্বতী গায়,
জটার গঙ্গা অনুভবে শিহরায়;
হরের গৌরী তবু না ফিরিয়া চায়,
স্বেদ-লাঞ্ছিত ভোলা মহেশের ভাল।
ভিখারী দেবতা, ক্ষুধিত দেবতা, মাগো—
জাগো শঙ্করী, অন্নপূর্ণা জাগো।

অশিব যজ্ঞ, বন্ধ শিবের পূজা,
গৃহ গৃহীহীন, শূন্য ভিক্ষাঝুলি,
জাগো অন্নদা, জাগো দেবী দশভুজা—
একেলা প্রহর জাগিছে শম্ভুশূলী।
চরাচর ঘুরে মেলেনি ভিক্ষা তার,
ত্রিভুবন ভরি শ্মশানের হাহাকার,
চিতাহীন শব ছেয়ে আছে চারিধার—
ব্যর্থ হয়েছে 'বম্ বম' শিব-বুলি।
ব্যথিত দেবতা দুয়ারে এসেছে মাগো—
জাগো শঙ্করী, অন্নপূর্ণা জাগো।

ঘুমায় শিবানী, শিব জেগে বিহ্বল,
নিখিল বিশ্ব আছে প্রতীক্ষা করি,
জটার বাঁধনে বাঁধা গঙ্গার জল
মুক্তি লভিবে জাগিলে মহেশ্বরী।
সতী মরে নাই, শিব সেজে নটনাথ
তাণ্ডবে মেতে স্খলিত চরণপাত
করিবে না, উমা জাগিয়া অকস্মাৎ
সভয়ে শিহরি লজ্জায় যাবে মরি।
পাগল মহেশ, কে জানে কি হয় মাগো—
জাগো শঙ্করী, অন্নপূর্ণা জাগো।

জানি একদিন সতীহারা শঙ্কর,
চমকি জাগিবে প্রলয়ঙ্কর রূপে,
ফেলে বাঘছাল, নাচিবে দিগম্বর,
কাঁপন লাগিবে মৃত-কঙ্কাল-স্তূপে।
আজো আসে নাই সেই ঘোর দুর্দ্দিন,
শিবের ঘরণী গাঢ় নিদ্রায় লীন,
জাগে মহাকাল শঙ্কিত দীনহীন—
'জাগো প্রিয়া জাগো' ডাকিতেছে চুপে চুপে।
সে ডাকে বিশ্ব কাঁপিয়া জেগেছে মাগো—
জাগো শঙ্করী, অন্নপূর্ণা জাগো।

দৈবত

—বিপিনচন্দ্র পাল

মানুষের ধর্ম্মভাবের উৎপত্তি লইয়া নানা মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। একদল বলেন মানবের মধ্যে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা বা প্রত্যয় আছে। এগুলিকে ইংরাজিতে ইনটুইষণ কহে। বাঙ্গলায় এই ইনটুইষণকে কেহ বা সহজ জ্ঞান আর কেহ বা আত্ম-প্রত্যয় বলিয়া থাকেন। মানুষের মন আপনি সান্ত হইলেও, তাহারই মধ্যে অনন্ত সম্বন্ধে একটা স্বতঃসিদ্ধ ধারণা বা প্রত্যয় বা ইনটুইষণ আছে। এই ধারণাটা তাহারই মনের গঠন ও প্রকৃতির সঙ্গে জড়াইয়া আছে। মানুষ সান্ত বিষয় লইয়াই সর্ব্বদা ঘর করে। এই প্রত্যক্ষ জগতে সকলই উৎপত্তি-বিলয়ের অধীন, সকলই উপচয়-অপচয়-শীল। কিন্তু এই সকল সীমাবিশিষ্ট পদার্থের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই, এই সহজ জ্ঞানের বা আত্মপ্রত্যয়ের প্রভাবে, আমাদের মনে একটা অস্ফুট অনন্ত জ্ঞান প্রকাশিত হয়। ইহার তুলনা দিতে যাইয়া আমাদের দেশের আধুনিক আত্ম-প্রত্যয়বাদিগণ "তদ্বিষ্ণোর্পরমম্ পদম্ সদা পশ্যন্তি শূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং" এই প্রাচীন শ্রুতির উল্লেখ করিয়া থাকেন। চক্ষু যেমন বিস্তৃত পদার্থকে দেখিতে যাইয়াই তাহার চারিদিকের অসীম আকাশকে প্রত্যক্ষ করে, সেই রূপ পণ্ডিতেরা সেই বিষ্ণুর পরম পদ দর্শন করিয়া থাকেন। আয়তনের প্রতিষ্ঠা এই আকাশে। আকাশ-বস্তু চক্ষু দিয়া দেখা যায় না। কিন্তু যাহা চক্ষু দিয়া দেখা যায়, তাহাকে দেখিতে যাইয়াই এই আয়তন-ধর্ম্ম-সম্পন্ন অদৃশ্য আকাশের অনুভূতি আমাদের অন্তরে আপনা হইতে জাগিয়া উঠে। সেইরূপ অনন্তকে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না সত্য; কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল জগতের প্রত্যক্ষ সীমাবদ্ধ রূপরসাদির জ্ঞানলাভ করিতে যাইয়াই সেই অরূপ-অরস-অগন্ধ-অস্পর্শ অসীমের আভাস পাইয়া থাকে। সেই অসীমকে ছাড়িয়া কোনও সীমাবদ্ধ বস্তুর জ্ঞান, অনুভূতি বা জ্ঞান আদৌ সম্ভব হয় না। এই আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ অসীম ও অনন্ত বস্তুর সন্ধানে যাইয়াই মানুষ তিলে তিলে আপনার ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধনকে গড়িয়া তুলিয়াছে। এই আত্মপ্রত্যয় হইতেই সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে।

আর একদল বলেন মানুষ চিরদিনই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস । কোনও কোনও ইতর জন্তু যেমন চিরদিনই যূথবদ্ধ হইয়া চলাফেরা করে, মানুষের আদিম ইতিহাস আমরা যা কিছু জানি তাহাতে তাহাকে চিরদিনই এইরূপ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে দেখিয়াছি। আমরা সমাজ বলিতে এমন একটা বিস্তৃত মনুষ্যমণ্ডলীকে বুঝিয়া থাকি। এই সমাজ একটা জটিল বস্তু; বহু প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে আমাদের এই সমাজ গঠিত। কিন্তু প্রাচীন কালে সমাজে এতটা জটিলতা ছিল না। এক কুলের বা এক বংশের লোকেরাই আদিতে এক সমাজে বাস করিত। তখনও কুল-মিশ্রণ বা বংশমিশ্রণ হয় নাই। এক কুল বলিতে একজন আদি পুরুষ ও তাহার বংশপরম্পরা বুঝাইত। এই বংশ-ধারার বিশেষ বিশেষ পূর্ব্বপুরুষেরা ক্রমে কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের স্মৃতি ও প্রভাব সমাজে বিদ্যমান থাকিয়া, তাহাকে নিয়মিত ও পরিচালিত করিতেছে। কুলের শক্তি তাঁহাদিগের হইতেই পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হইয়া বর্ত্তমানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কৌলিক আচারের মধ্যে এই শক্তি প্রতিষ্ঠিত ও প্রত্যক্ষ হইয়া আছে। কেহ কেহ বা এই কুলাচারেতেই মানুষের ধর্ম্মের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতি ও সেই স্মৃতিকে জড়াইয়া আমাদের অন্তরে যে ভক্তি ও ভয় প্রভৃতি জাগিয়া রহে, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই ধর্ম্ম জন্মিয়াছে।

এই প্রত্যক্ষ জগতে, বিশেষতঃ যে আকাশ-বস্তু ওতপ্রোত ভাবে আমাদের যাবতীয় বস্তুজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যেই আদি মানব অনন্তের সন্ধান পাইয়া, সেই অনন্তকে জ্ঞানের দ্বারা জানিতে, ভাবের দ্বারা সম্ভোগ এবং কর্ম্মের দ্বারা আয়ত্ত করিতে যাইয়াই তিলে তিলে তার ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধনকে গড়িয়া তুলিয়াছে। এই পরিদৃশ্যমান নিসর্গের আশ্রয়েই, এই নিসর্গের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া মানুষ প্রথমে তার ধর্ম্মজ্ঞান লাভ ও ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করে। এই একদলের মত। আর এই যে প্রত্যক্ষ কুলধারা বা বংশধারা, যাহাকে ধরিয়া মানব-সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে,

যাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রকারের সামাজিক অনুশাসনের পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই মানুষের ধর্ম্ম জন্মিয়াছে, অপর দল এই কথাই বলেন।

ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই দুইটা মতই আংশিকভাবে সত্য, কোনটাই পূর্ণ ও সমগ্র সত্যকে ধরিতে পারে নাই। কেবল নিসর্গের মধ্যে অনন্তের সন্ধান পাইয়াও মানুষের ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় নাই; আর কেবল নিজ নিজ সামাজিক জীবনে কৌলিক আচারাদি ধরিয়াও মানুষের ধর্ম্ম জন্মে নাই। মানুষ কোনও দিনই নিসর্গের সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন হইয়া রহে নাই। কোনও দিনই সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য হইয়াও বাস করে নাই। চিরদিনই সে একদিকে ঐ নিসর্গ আর অন্যদিকে এই সমাজ, এই দুইকে লইয়া ঘর করিয়াছে। কোথাও বা হয়ত নিসর্গের উপরে তার মনের ঝোঁকটা বেশি পড়িয়াছে। কোথাওবা হয়ত সমাজের উপরেই তার দৃষ্টি বেশি পড়িয়াছে। আর এই ভাবে কোথাওবা তার ধর্ম্মেতে নিসর্গ-দেবতার পূজার, আর কোথাও বা সমাজ-দেবতা পিতৃপুরুষগণের পূজার বেশি প্রাচুর্য্য দেখা যাইতে পারে। কোথাও বা ধর্ম্মতত্ত্বের ও ধর্ম্মজীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিসর্গ-দেবতার উপরে ঝোঁক বেশি পড়িয়া, পরিণামে এই দেবতাই পিতৃলোকের নিয়ন্তা ও প্রতিষ্ঠাতারূপে সর্ব্বোপরি স্থান পাইয়াছেন। আর কোথাও বা হয়ত ক্রমে সমাজ-দেবতার উপরেই ঝোঁক বেশি পড়িয়া গিয়াছে, আর সেখানে ক্রমে ক্রমে নিসর্গ-দেবতার উপরে সমাজ-দেবতার প্রভাব বাড়িয়া গিয়া, পরিণামে সমাজের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি নিসর্গেরও নিয়ন্তারূপে কল্পিত হইয়া, বিশ্বের একচ্ছত্র অধীশ্বরজ্ঞানে পূজিত হইয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মের এই দুই ধারা কোথাও আদিতে একান্ত অবিদ্যমান বা অন্তে একেবারে লুপ্ত হয় নাই।

আমাদের দেশের ধর্ম্মের ইতিহাসে এই দুইটি ধারা বহুকাল পর্য্যন্ত যেন দুইটি সমান্তরাল রেখার মত চলিয়া আসিয়াছে। একটি ইহার দেবধারা, অপরটি পিতৃধারা। ক্রমে ভারতের পুরাতন সাধনা যখন বহুর ভিতর দিয়া একের অন্বেষণে যাইতে যাইতে সেই এককে প্রাপ্ত হইল, তখন দেবধারা যাইয়া ব্রহ্মেতে, আর পিতৃধারা প্রজাপতিতে মিলিত হইল। আর সকলের শেষে, আত্মজ্ঞানেতে যখন ব্রহ্মজ্ঞান উঠিল, তখন প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভরূপে ব্রহ্মতত্ত্বের অঙ্গীভূত ও অধীন হইয়া পড়িলেন। আর এইরূপে মূলে যখন ধর্ম্মের দুই আদি ধারা এক হইয়া গেল, তখন দেবধারা এবং সমাজ-ধারার মধ্যেও মাখামাখি ও মেশামেশি হইতে লাগিল। দেবতারাও পিতৃলোকে এবং পিতৃলোকেরাও দেবলোকে অবাধে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মলোক সর্ব্বোচ্চলোক হইয়া উঠিল। তার নিম্নে, প্রায় একই সমতল ভূমিতে দেবলোকের ও পিতৃলোকের প্রতিষ্ঠা হইল।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে সকল দেবতার অর্চ্চনা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে পুরাতন পিতৃধারার বা সমাজ-ধারার লক্ষণ বেশি ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর কাহারও কাহারও মধ্যে প্রাচীন নিসর্গধারার দেবভাব এখনও অতি পরিস্ফুট রহিয়াছে। কিন্তু প্রায় সকলের মধ্যেই পুরাতন দেবপিতৃধারা দুই অতি ঘনিষ্ট ও অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া গিয়াছে। বৈদিক দেবতারা প্রায় সকলেই নিসর্গ-ধারার অন্তর্গত ছিলেন। অগ্নিদেবতা এই নিসর্গের প্রত্যক্ষ অগ্নিই ছিলেন। "অগ্‌, জ্ঞানে চ গমনে চ" অগ্‌ ধাতু জ্ঞান ও গমন এই দুই অর্থেই প্রযুক্ত হয়। সুতরাং অগ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন অগ্নি শব্দে জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বরকেও বুঝাইতে পারে, আর গতিশীল প্রত্যক্ষ নৈসর্গিক অগ্নিকেও বুঝাইতে পারে। ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তির জোরে বেদের অগ্নিদেবতাকে পরমেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার যতই প্রয়াস পাই না কেন, অগ্নিদেবতা সম্বন্ধে বেদে যে সকল সূক্ত দেখিতে পাই, তাহাতে তিনি যে এই প্রত্যক্ষ নৈসর্গিক অগ্নি নহেন, এই অগ্নিকেই যে প্রাচীনতম বৈদিক ঋষিগণ দেবতাজ্ঞানে পূজা অর্চ্চনা করেন নাই, এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সেইরূপ বরুণ যে এই প্রত্যক্ষ আকাশ, মরুৎ যে এই প্রত্যক্ষ নৈসর্গিক বায়ু, অশ্বিনীকুমারেরা যে প্রাতঃসায়াহ্নের প্রদোষ-কাল, আর ইন্দ্র যে এই প্রত্যক্ষ বজ্রধারী মেঘ, কিংবা সবিতা এই দৃশ্যমান সূর্য্য নহেন, একথা অস্বীকার করা অসম্ভব। কি করিয়া এই সকল নৈসর্গিক বস্তু দেবতার পদ ও গৌরব প্রাপ্ত হন, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া এই বৈদিক দেবপদের আলোচনা করিলে, তাহারও অতি সুস্পষ্ট ও সুসঙ্গত প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া কঠিন হয় না।

বৈদিক দেবদেবীগণ যেমন মুখ্য ভাবে নিসর্গ-ধারাকে অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন, পৌরাণিক দেবতারা

সেইরূপ প্রধানতঃ সমাজ-ধারাকে অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছেন। বেদের ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র প্রভৃতি আদিতে ও মূলে নৈসর্গিক শক্তির অভিমানী দেবতাই ছিলেন। ক্রমে তাঁহারা সমাজের রক্ষক ও শাস্তা হইয়া উঠেন। পৌরাণিক দেবতাগণ আদিতে ও মূলে সমাজ-জীবনের সঙ্গে যুক্ত হইয়াই প্রকট হন, ক্রমে নিসর্গের উপরেও তাঁহাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কালী দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী প্রভৃতি সমাজ জীবনের আশ্রয় ও নিয়ন্তারূপে প্রথমে পালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন ইহাঁরা হিন্দুর চিন্তা, কামনা ও সাধনাতে একটা বিশ্বজনীনতা লাভ করিয়াছেন। কালী আর কেবল অসুর-দলনী নয়, কিন্তু আদ্যাশক্তি, মূল প্রকৃতি। যে শক্তি আকাশে বজ্ররূপে, বায়ুসাগরে প্রভঞ্জনরূপে, সৌরজগতে তেজ ও দীপ্তিরূপে, ভূগর্ভে আগ্নেয়গিরির অগ্নিরূপে, জীবের শরীরে কুলকুণ্ডলিনী বা স্নায়ুশক্তির মূলাধাররূপে, তার জীবনে মৃত্যুরূপে সমাজে সমর ও বিপ্লবরূপে নিয়ত বিহার করেন, কালী বলিতে এখন হিন্দু সাধক এ সকলই বুঝেন। জগদ্ধাত্রীও সমাজ-দেবতা। যে সমাজ-শক্তি নিবীড় অরণ্যানীর মধ্যে, চারিদিকের হিংস্র শ্বাপদ সকলকে নিরস্ত করিয়া, আদি মানবের জন্য এই ধরাতলে একটু নিরাপদ বাসভূমি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, জগদ্ধাত্রীর মধ্যে আজ আমরা তাঁহাকেই দেখি। এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র মহেন্দ্রকে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইতে লইয়া গিয়া, প্রথমে এই জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—"এই মা যা ছিলেন।" দুর্গা চণ্ডীরই নামান্তর বা রূপান্তর মাত্র। আর মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর আখ্যায়িকা যেই বুঝিয়া পড়িবে, তার পক্ষে চণ্ডী বা দুর্গা বা কালী যে সমাজ-শক্তিরই রূপক ও প্রতিমা, একথা অস্বীকার করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। লক্ষ্মী-দেবতা সমাজের ধনশক্তিরই রূপক। যে শক্তি কৃষি-বাণিজ্যাদির ভিতরে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকট হইয়া সমাজ-জীবনকে পরিপুষ্ট মাজের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে, লক্ষ্মী যে রূপক বা প্রতিমা ইহাই কি অস্বীকার করা সম্ভব? এই লক্ষ্মীই আবার নারায়ণের বামে বসিয়া সমগ্র সৃষ্টির আদি প্রকৃতি, জগন্মাতা, আদ্যাশক্তি, মহামায়া রূপে কল্পিত হইয়াছেন। নারায়ণ কেবল নারায়ণ নহেন, কিন্তু বিশাল বিশ্বের অয়নও তিনি। নরহৃদে বাস করেন বলিয়া তিনি নারায়ণ। আবার কারণ জলে অবস্থিত ছিলেন, সেই আদি কারণ বলিয়াও তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া থাকে, তিনি বিশ্বের স্রষ্টা, ব্রহ্মারও পিতা, ভাগবতে এই কথাই কহিয়াছেন। এই নারায়ণের অর্দ্ধাঙ্গী মহালক্ষ্মী। ভাগবতের নারায়ণই সাংখ্যের পুরুষ। তবে সাংখ্য সিদ্ধান্ত বহুপুরুষের কল্পনা করিয়াছেন। ভাগবত সেই বহুপুরুষের অভ্যন্তরে ও অন্তরালে যে মহান্ এক বিদ্যমান থাকিয়া, "সূত্রে মণিগণা ইব" ইহাদের গাঁথিয়া রাখিয়া, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও আদান-প্রদান সম্ভব করিয়া, বিশ্বের একত্বের মধ্যেই আবার অশেষ বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহাকেই নারায়ণ বলিয়াছেন। সাংখ্যের প্রকৃতিই এই নারায়ণের অঙ্কাশ্রিতা মহালক্ষ্মী। বিষ্ণুরূপে এই নারায়ণ একদিকে নিসর্গধারার সঙ্গে সংযুক্ত। আবার অন্তর্যামীরূপে প্রত্যেক জীবের সঙ্গে সংযুক্ত। অন্যপক্ষে এই নারায়ণই ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদরূপে সমাজের সমষ্টিভূত জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত। বিশ্ব-নিয়ন্তা, বিশ্বাধাররূপে তিনি মহাবিষ্ণু। আর যে শক্তির আশ্রয়ে তিনি বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন ও তাহার পরিণতিকে পরিচালিত করিতেছেন, তাহাই মহালক্ষ্মী। মহাবিষ্ণু ও মহালক্ষ্মী কেবল সমাজ-দেবতা নহেন, কিন্তু বিশ্বদেবতাও। এইরূপে প্রায় সকল পৌরাণিকী দেব-কল্পনাতেই মূলে সমাজ-ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দেখিতে পাই, ও ক্রমে এই সকল সমাজ-দেবতাই বিশ্বজনীনতা লাভ করিয়া বিশ্বদেবতা হইয়াছেন।

যুগোশ্লাভ্ সাহিত্য

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

যুগোশ্লাভ্ বলিতে আমরা যদি একটা ভাষা মনে করি, তবে ভুল হইবে। তিনটী বিভিন্ন প্রদেশ একত্র হওয়াতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তাহাদের এই নামকরণ হয়। এ রকম মিলিবার কারণ, তিনটী প্রদেশের ভাষা তিন রকম হইলেও অধিবাসীরা নিজেদের 'শ্লাভোনিক্' জাতি বলিয়াই গর্ব্ব করিত—সগোত্র বলিয়া ধারণা থাকার জন্যই এই তিন প্রদেশের অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া নিজেদের নাম দিয়াছে যুক্ত-শ্লাভোনিক্-দেশ—যুগো-শ্লাভিয়া। এ দেশের সাহিত্য আলোচনা করিতে হইলে সেইজন্যই এই তিনটী ভাষার সাহিত্যকে নিয়াই আলোচনা করিতে হইবে—কিন্তু তার বিশেষ প্রয়োজন নেই, কেননা পাশাপাশি এই তিনটী প্রদেশ ইতিপূর্ব্বে পৃথক থাকিলেও স্বজাতি-অনুভূতির ফলে এক প্রদেশের ভাষা অপর প্রদেশের ভাষার সঙ্গে পরস্পর নির্ভরশীল হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই এই তিনটী প্রদেশের সাহিত্যের ক্রমবিকাশ একই সঙ্গে ঘটিয়া উঠিয়াছে। বিশ্ব-সাহিত্যের আসরেও এই তিনটী ভাষার সাহিত্যের সেই জন্যই এক নামকরণ হইয়াছে—যুগোশ্লাভ সাহিত্য।

পৃথক্ ভাষা-ভাষী প্রদেশ তিনটীর নাম হইয়াছে—সার্বিয়া, ক্রোয়াশ্যা ও শ্লোভেনিয়া। ভাষা তিনটীর নামও ওই সব প্রদেশের নাম-গত হইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে—সার্বিয়ান, ক্রোয়াশ্যান ও শ্লোভেন্যান্।

তখন নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ।

রোম্যান্ ও হিব্রুক ভাষার চলনই তখন বিশেষ ভাবে সারা য়ুরোপের সাহিত্যে চলিত। জনসাধারণের কাছে সে ভাষার তেমন প্রভাব নাই দেখিয়া দুইজন শ্লাভ্—"সিরিল্" ও "মিথোদিয়ুস্"—শ্লাভ্ জনসাধারণের অবগতির জন্য বাইবেলের অনুবাদ করিয়া দিলেন। এই 'শ্লাভোনিক্ য়্যাপোসলস্' হইতেই শ্লাভ্ সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম সূচনা। পরবর্ত্তী প্রায় তিনশো বছর ধরিয়া এই বইখানিই ছিল শ্লাভ্ জাতির একমাত্র সম্বল—প্রথম, প্রধান, অদ্বিতীয়।

তারপর প্রায় আড়াইশো বছর পরে মহৎ ব্যক্তির জীবনী লইয়া দুই পাঁচখানা জীবনচরিত রচিত হয়—সে দ্বাদশ শতাব্দীর কথা। এই জীবনচরিতের সঙ্গে সঙ্গেই দুই পাঁচটী স্বদেশী গাথাও স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিল। প্রায় তিনশো বছর ধরিয়া চলিয়াছিল এই জীবনচরিত সৃষ্টি ও গাথা রচনা। এই সব গাথাকে আধুনিকদের মতে ঠিক সাহিত্য বলা চলে না, ইতিহাস বলিলেও অত্যধিক গৌরব দেওয়া হয়, স্বদেশপ্রেমিক ও ইতিহাস-প্রণেতার কাছে তার বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যপিপাসুদের কাছে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সাহিত্য হিসাবে তার কোন মূল্যই নাই। ইহাই সংক্ষেপে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যুগোশ্লাভ্ সাহিত্যের কথা।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে তুর্কীরা এ রাজ্যটীকে করতলগত করে। রাজ্যটীকে শুধু অধীনে আনিয়াই তুর্কীরা নিরস্ত হয় নাই, নগরের পর নগর তাহারা বিধ্বস্ত করিয়াই চলিয়াছিল। এই অত্যাচারের ফলে শ্লাভোনিক্ শিক্ষা, সভ্যতা ও সাহিত্য বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। জাতীয় জীবন বৈদেশিক দম্ভের প্রভাবে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। সওয়া চারিশত বছর ধরিয়া ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত একটি জাতি বৈদেশিক নিষ্পেষণের চাপে পড়িয়া গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

শেষে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে 'কারা জর্জ্জ' প্রথম বিদ্রোহের বাণী প্রচার করিলেন। তাঁহার আহ্বানের জন্যই বুঝি এতদিন সকলে উন্মুখ হইয়াছিল, তাই প্রাণের সাড়াও নিমিষে পাওয়া গেল, একেবারেই আকস্মিক ভাবে সারা যুগোশ্লাভিয়ায় বিদ্রোহের বহ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। চার বছর ধরিয়া এই বিপ্লব চলিয়াছিল, শেষে রুশিয়ার মধ্যস্থতায় প্রাদেশিক স্বাধীনতা ইহারা লাভ করে। ইহারই সত্তর বছর পরে রুষ-তুর্কী যুদ্ধের শেষে যুগোশ্লাভিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু রাজ্যে সম্পূর্ণভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বেই ষড়যন্ত্রের ফলে রাজাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। সে সময় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার একটা ব্যর্থ চেষ্টাও হইয়াছিল, কিন্তু শেষে কয়েক বছর অশান্তি ও অরাজকতার ফলে দেশে আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমস্ত ঐতিহাসিক কথা লইয়া এ প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, তবে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সাহিত্যের যে একটা নিকটতম সম্বন্ধ আছে সেই জন্যই এইকথার অবতারণা।

চারিশত বছর ধরিয়া এই বৈদেশিক শক্তির অত্যাচার আর তার পরবর্ত্তী যুগের বিপ্লব-বিদ্রোহের মধ্যে, সাহিত্যের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি যে মোটেই ছিল না একথা না বলিলেও চলে। কিন্তু এইরূপ আব্‌হাওয়া আর ঝড়ঝাপ্‌টার মধ্যেও কয়েক জন লেখক দেশবাসীর উদাসীনতাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াই ঐকান্তিক সাধনায় স্বদেশীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টি করিয়া যাইতেছিলেন। তুর্কীরা দেশের মুদ্রাযন্ত্রগুলিকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, যাহাতে বিপ্লবাত্মক কিছু প্রচারিত ও প্রকাশিত না হইতে পারে। এই জন্য সে যুগে রুশিয়া দেশ হইতে বই ছাপাইয়া আনান' হইত, কিন্তু সে সব বই জনসাধারণের কাছে ব্যয়াধিক্য হেতু সুলভ হইত না।

এই সময় লেখক-শ্রেষ্ঠ 'দোসিটে ওব্রাদোভিচ্' শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রীপদে উন্নীত হইয়া খুব সস্তায় বই মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাঁর চেষ্টায় আবার মুদ্রাযন্ত্রগুলি পুনঃ স্থাপিত হয় ও সাহিত্য-জগতে উৎসাহের সৃষ্টি করে। ইঁহার চেষ্টায় শ্লাভ্ সাহিত্যের 'মরা গাঙ্গ'এ আবার বাণ ডাকে।

"ভুক্ কারাজিচ্" হইতেছেন আধুনিক শ্লাভ্ সাহিত্যের জনক। দোসিটের সময়েই ইঁহার জন্ম, দোসিটের সাহিত্য-প্রেরণা খুব কিশোর বয়স হইতেই ইঁহার বুকেও জাগিয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশীয় সাহিত্যকে সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের রচিত শ্রেষ্ঠ জাতীয় গাথা, গান ও কবিতাগুলিকে সংগ্রহ করিয়া দশখণ্ডের একখানি বিরাট চয়নিকা প্রকাশ করেন। সে বইখানি আধুনিক শ্লাভ্ লেখকেরা আগ্রহ সহকারে পড়িয়া প্রেরণা লাভ করিয়া থাকেন, এ বইখানি যুগোশ্লাভ সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কারাভিচ্ জীবিত ছিলেন ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

ইঁহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যুগোশ্লাভ সাহিত্যে শক্তিশালী ঔপন্যাসিক এবং কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। তবে ছোট-গল্প-লেখক হিসাবে অনেকেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সার্ব্বিয়ার "লাজারেভিচ্" ক্রোয়াশিয়ার "মাতোশ্" ও শ্লোভেনিয়ার "কঙ্কর"ই বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। সমসাময়িক অন্যান্য লেখকেরা ইঁহাদের রচনারীতি, পদ্ধতি ও ভঙ্গিমাকে অনুকরণ করিয়া সাহিত্যে যশস্বী হইয়াছেন। এই শেষোক্তদের মধ্যে "ষ্টিফেন্ শ্রীমাক্স্" ও "সিমা মাতাভুলজ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিজেদের দেশে এই দুইজন লেখকের গল্প বিশেষ জনপ্রিয়। কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের মণীষীদের নিকট মৌলিকতার অভাবে ইঁহারা তেমন প্রতিষ্ঠা পান নাই। ইঁহারা এখনও লাজারোভিচ, মাতোশ ও কঙ্করের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নাই—প্রতিভাবলে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও চলিতে পারেন নাই।

ছোট গল্প ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এদেশে ছিল না বলিলেই চলে, এত শীঘ্র এদেশের গল্প-সাহিত্য পূর্ণতা লাভ করিয়া বিশ্বসাহিত্যে যে আদৃত হইবে একথা ধারণায় আনাই যাইত না। কিন্তু লাজারোভিচ্ মাতোশ ও কঙ্করের প্রতিভার ফলেই এদেশের সাহিত্য এত শীঘ্র পূর্ণ-বিকাশ লাভ করিতে পারিয়াছে কিন্তু তবু একেবারে নির্দ্দোষ হইতে পারে নাই। গল্পের মধ্যে গ্রাম্যতা দোষ এদেশীয় সাহিত্যে এখনও বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। এই ত্রুটী না থাকিলে এ সাহিত্য আজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বিশ্বসাহিত্যে গর্ব্ব করিতে পারিতেন। এ দোষ সত্ত্বেও এ সাহিত্যের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

যুগোশ্লাভ্ সাহিত্যের আধুনিক লেখকদের পরিচয় দিতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করিতে হইবে "লাজা লাজারোভিচ্" এর নাম। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বেল্‌গ্রেড্ সহরে এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার শিক্ষাদীক্ষা হয় এই সহরেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথমে ওকালতী পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ডাক্তারী পড়িতে সুরু করেন। ডাক্তারী উপাধি গ্রহণ করিতে বার্লিনে ইঁহার জীবনের সাতটি বৎসর কাটে। ডাক্তারী পরীক্ষাতে ইনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তারপর বেল্‌গ্রেডে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই দেশের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক উচ্চ চিকিৎসকের পদে ইনি নিযুক্ত হন। চিকিৎসক হিসাবে ভবিষ্যৎ জীবনে ইঁহার সুখ্যাতিও খুব হইয়াছিল। এই চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হইবার পর হইতেই তিনি অবসর সময়ে লিখিতে সুরু করেন। ইতিপূর্ব্বেই বিভিন্ন দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে ছাত্রাবস্থায় তিনি অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন, তাই নিজের রচনার উৎকর্ষসাধন করিতে তাঁহার বেশী সময় লাগেনাই, তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিভা বিকাশ লাভ করিয়া সাহিত্যপিপাসুদের নিকট খ্যাতি-মুখর হইয়া উঠিল। বিদেশের নানাস্থানে গমনাগমনের ফলে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও বৈদেশিক আব হাওয়াকে নিজের রচনার মধ্যে ইনি কোনদিন স্থান দেন নাই। স্বদেশের দীনদুঃখীদের গ্রাম্য জীবন চিত্রিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহার নায়ক-নায়িকার মধ্যে জনসাধারণ নিজেকে খুজিয়া পায় বলিয়াই ইঁহার এত খ্যাতি। সার্ব্বিয়ান লেখকদের মধ্যে ইনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ধরিত্রীর বুক হইতে ইনি চিরবিদায় ল'ন।

* * *

আধুনিক ক্রোয়েশিয়ান লেখকগণের মধ্যে আন্তন্ গুস্তাভ্ মাতোশ্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহার রচনাপদ্ধতিকে অনুসরণ করিয়া আধুনিক ক্রোয়েশিয়ান লেখকেরা শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টির আগ্রহে মাতিয়া উঠিয়াছেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অতি সাধারণ এক গ্রাম্য স্কুল-মাষ্টারের গৃহে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি যখন নিতান্ত

শিশু তখন 'অ্যাগ্রেব' শহরের এক বিদ্যালয়ে ইঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। সেখানকার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া ইঁহার ডাক্তার হইবার সখ হয়। তাই ডাক্তারী পড়িবার জন্য ইনি ভিয়েনা যান। সেখানে পশুচিকিৎসা সম্বন্ধেও পড়াশুনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বেশীদিন এই নিরস শাস্ত্র অধ্যয়ন তাঁর ভাল লাগিল না, পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন প্রেগে। কিন্তু এখানেও পড়াশুনার বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না। এইবার ইনি ভবঘুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। শেষে একদিন অনাহার-অনিদ্রায় পরিশ্রান্ত হইয়া এক সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। একটা সংস্থান হইল বটে, কিন্তু চিকিৎসা-বিদ্যাই যাঁর কাছে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল সামরিক কঠোর নিয়মকানুন মানিয়া তিনি কতদিন চলিতে পারিবেন ! ফলে অনেকগুলি সামরিক বাধা-নিষেধ একসঙ্গে অমান্য করার ফলে তাঁহার জেল হইল। কয়েকদিন কারাবাসের পর হঠাৎ একদিন কি একটা কৌশলে তিনি কারাগার হইতে একেবারে পলাইয়া গেলেন বেলগ্রেডে। ভিয়েনায় থাকিবার সময় ইনি চমৎকার বাজনা বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। বেলগ্রেডে আসিয়া "রয়াল থিয়েটার"এর 'অর্কেষ্ট্রা' দলে ভর্ত্তি হইয়া গেলেন। দিনগুলা মন্দ কাটিতে-ছিল না, কিন্তু হঠাৎ একদিন গুপ্তচরেরা পলাতক আসামীটিকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

অপূর্ব্ব তৎপরতার জন্য সেবারও শীকার পুলিশের হাত-এড়াইয়া গেল। মাতোশ য়ুরোপের বিভিন্ন সহরে পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কেননা এবার ধরা পড়িলে তাঁহার উপর যে একটা গুরুতর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা হইবে একথা তিনি ভাল রূপেই জানিতেন ! কিন্তু কিছু দিন পরে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে ক্ষমা করিলে তিনিও স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু ঘটে এবং ইনি পিতার শিক্ষকতার পদটী গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই ইঁহার সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ হইল এবং ইঁহার সুপ্ত প্রতিভা হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। একাধারে ইনি সব কিছুই লিখিতে পারিতেন—গল্প, প্রবন্ধ, জীবন-চরিত ; বহুমুখী ছিল ইঁহার প্রতিভা। সমালোচনা-তেও ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ইনি ছিলেন বাস্তববাদী —'রিয়ালিষ্ট'। গল্প ইনি খুব কমই লিখিয়াছেন, যা লিখিয়াছেন সেগুলি সর্ব্বত্র সুরুচির পরিচায়ক—নিজস্ব একটা মূল্যও তার আছে। ইঁহার গল্পগুলির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে 'লাজারোভিচের' গল্পগুলির বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এই জন্যই এ সম্বন্ধে পৃথক্ ভাবে এখানে আলোচনা করিব না।

ইনি 'ক্যানসার' রোগে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

* * *

এ যুগের শ্লাভোনিয়ান্ সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান স্রষ্টা হইতেছেন 'আইভ্যান্ কঙ্কর'। গল্পলেখক এবং নাট্যকার হিসাবে ইঁহার খ্যাতি খুব বেশী। ইঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য হইতেছে শিশুসুলভ সারল্য। ইনি প্রথম জীবনে শিশু-সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম ও প্রধান গল্পগ্রন্থ হইতেছে "ড্রিম্ ভিসন্‌স্"। এই বইখানির অধিকাংশ গল্পই ছেলেদের জন্য লেখা। উপন্যাসও ইনি লিখিয়াছেন কয়েকখানি। ইঁহার জনপ্রিয়তার কারণ হইতেছে যে ইঁহার রচনার মধ্য দিয়া বিষাদের এমনি একটা ফল্গুধারা বহিয়া যায় যাহা পাঠকের মনে প্রভাব বিস্তার না করিয়া থাকিতে পারে না। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা হইতেছে যে, রচনার ভিতর দিয়া ইঁহার আন্তরিক সহানুভূতি সর্ব্বত্র ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। দেশের পরাধীনতার দুঃখকষ্টে জীর্ণ শীর্ণ মানব-গোষ্ঠীর ক্রন্দনের চিত্র অনাড়ম্বর ভাবে সারল্যের সহিত চিত্রিত করিয়া ইনি পাঠকের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন। আর এ পরিচয় ইঁহার রচনার প্রতিটী পৃষ্ঠায় ধরা পড়ে। এই জন্যই পাঠকেরা তাঁহার রচনা পড়িতে পড়িতে কুত্রাপি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন না, তাহাদের মনে অবসাদ আসে না। নিজেদের সাংসারিক অবস্থাকে তাহারা ইঁহার গল্পের মধ্যে খুঁজিয়া পায় !

ইঁহার জীবন অনাড়ম্বর ভাবেই কাটিয়া গিয়াছে। ইঁহার জীবনের প্রধান বৈচিত্র্য হইতেছে যে মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপীয় সাহিত্য ইঁহার সুখ্যাতিতে মুখর হইয়া ওঠে। 'লাজারেভিচ্' ও 'মাতোশের' জীবনে এ সৌভাগ্য ঘটে নাই।

সর্ব্বিয়ান্, শ্লোভেনিয়ান্ ও ক্রোয়েশিয়ান্ সাহিত্যের একত্র মিলন হইতেই যুগোশ্লাভ সাহিত্যের জন্ম একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ! লাজারেভিচ্, মাতাশো ও কঙ্কর ছাড়া এ সাহিত্যে আর কোন বিশেষ স্রষ্টা পাওয়া যায় না। আধুনিক তরুণেরা ইঁহাদেরই সৃষ্টিধারাকে বিকশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় উৎসুক। তাই বিশ্বসাহিত্যে তাঁহারা বৈশিষ্ট্যহীন হইয়া পড়িয়াছেন। এই জন্যই এ প্রবন্ধে তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের প্রতিভাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সমাধি ও আত্মার অমরত্ববাদ

ভারতের জ্ঞানী ঋষিকুল সমাধিপূত মনের অব্যাহত জ্ঞানের আলোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে আত্মা অমর ও অক্ষয়। সেই মত উপনিষদে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। যদি কোন মতের কোন মূল্য থাকে, তাহা হইলে এঁদের মতের যে আছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যাঁরা নিজেদের দেখার উপর আস্থাপরায়ণ ও নিজেদের মতের দ্বারা আপনাদের জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁদের কথায় দার্শনিক কূট-তর্কলব্ধ সত্যতা না থাকিলেও জনগণের বিশ্বাস উৎপাদনের ক্ষমতা যে আছে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁরা আপনাদের মতের উপর নির্ভর করিয়া ভূমি-সম্পত্তি, অর্থ, শস্য, গৃহ, গৃহিণী ও সকল আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মায়ামমতা ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনান্তের দুর্লক্ষ্য প্রান্তে বসিয়া ব্রহ্মধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন, তাঁদের মত দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। তাহার বিরোধী সন্দেহ-পেচক সুদূরে অজ্ঞানান্ধকারাবৃত জন-মনো-হৃদয়ে অতিশয় সতর্কতার সহিত ভীত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। সে ধ্যানালোকের স্পর্শ একবার যাঁর হৃদয় পাইয়াছে, তাঁর সকল সন্দেহের গ্রন্থি উচ্ছিন্ন হইয়াছে। এ সন্ন্যাসীরা কামনার বীজ নির্ম্মূল করিয়াছেন। বিশ্বের চিন্তায় এঁরা মগ্ন নন্। এঁদের চিন্তার বস্তু বিশ্বেরও সূক্ষ্মতম কারণ, যাহা বিশ্বের চেয়েও মহান্। সাম্যের প্রকৃত পূজারী এঁরা। এঁদের মতে ব্রহ্মই আত্মা ও আত্মা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। এই সকল নীতিপরায়ণ তত্ত্ববাদীরা যাহা বলেন তাহার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলিতে মন যেন স্বতঃই সঙ্কুচিত হয়।

কোন মত চিরদিন চলেনা। মত-প্রবর্ত্তক ঋষির সাধনা যত প্রখ্যাতই হউক না কেন, কালের প্রভাবে ও অন্যান্য মতের আঘাতে এই মত আর তত উজ্জ্বল থাকেনা। অন্য কোন সেইরূপ তপঃসম্পন্ন ঋষি যখন মতান্তর প্রচার করেন তখন সমাধির শক্তি সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হয়। ইহার সার্ব্বভৌম শক্তির প্রতি মন সন্দিহান হইয়া উঠে। আমার দেখায় আমার যতটা বিশ্বাস হয়, ততটা বিশ্বাস অন্যের হয়না। যাঁর সমাধি হইয়াছে তাঁর আপনার সমাধিলব্ধ জ্ঞানের উপর নিরতিশয় বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু অপরের সেই জ্ঞানের উপর ততটা বিশ্বাস হয় না। সমাধিলব্ধ জ্ঞান বলিয়াই যে সে জ্ঞানের উপর সর্ব্বসাধারণের নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস ও আস্থা হইবে, তাহা মানা যায় না। কারণ সমাধি-জ্ঞান ব্যক্তিতন্ত্র। ব্যক্তিকে অতিক্রম করিতে সমাধি পারে না। কপিল পূর্ব্বকালের প্রথিত জ্ঞানী। তিনি সমাধি দ্বারা জানিয়াছেন যে প্রকৃতি ও পুরুষ বিশ্বের মূল তত্ত্ব। কণাদের নামও যোগিকুলে প্রখ্যাত। তাঁর মতে বিশ্বের মূল-পদার্থ সাতটী। বেদব্যাস কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন যুগ-ঋষি। তাঁহার মতে ব্রহ্মই এক মাত্র তত্ত্ব। যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যাতা পতঞ্জলি প্রচলিত সাংখ্য মতের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় আমরা সমাধির উপর কতদূর আস্থা করিতে পারি?

এই সকল আপত্তির উত্তরে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে বেদের সিদ্ধান্তই চরম। বেদ-বিরোধী কথা যিনি বলিবেন তাঁহার কথাই অযৌক্তিক হইবে। শঙ্করাচার্য্য আপনার প্রতিভাবলে দেখাইলেন যে মায়াবাদই বেদের সিদ্ধান্ত ও মায়াবাদ ভিন্ন বেদের অপর কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। ব্যাখ্যার কৌশলে মায়াবাদ বৈদিক হইল। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারও ত অকুশলী নন্ তাঁরা একে একে দেখাইলেন প্রকৃতিবাদ, পরমাণুবাদ প্রভৃতিও বেদে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মবাদের এত রকম ভেদ দেখা দিয়াছে যে অদ্বৈতবাদনিষ্ঠের দল দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইতেছে। ব্যাখ্যাকৌশলই মতবাদকে বৈদিক ও অবৈদিক করিয়া তুলে, অতএব কোন মতবিশেষের বৈদিক বা অবৈদিক হওয়া নির্ভর করিতেছে ধীসম্পন্ন টীকাকারের উপর। আর এক কথা, উপনিষদের ঋষিগণও যে সর্ব্বত্র একমত তাহা বর্ত্তমান বিদ্বদ্‌কুল স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে উপনিষদে সকল মতের বীজ আছে। উপনিষদ তৎকালের দার্শনিক সাহিত্য এবং কোন দর্শন বিশেষ নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, কারণ সকল দর্শনই যখন ইহার আনুকূল্য পাইয়া থাকে। ইহা দর্শনজগতে কামধেনু।

এখন একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয় যে সমাধির প্রজ্ঞালোক কি নিতান্তই নিষ্ফল? সমাধির প্রতি আমাদের অবিশ্বাস নাই, কিন্তু আস্থাও নাই। ত্রিকাল-দর্শন জ্যোতির্বিদের ভবিষ্যদ্বিজ্ঞানের মতই বস্তু। তত্ত্বদর্শন স্বকীয় ইচ্ছাশক্তির সম্যক্ পরিচালনার ফল। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুকে এইজন্য গুরুর প্রতি শ্রদ্ধালু হইতে হইবে। বিজ্ঞানসম্মত শারীরিক ব্যায়ামে শরীর যেমন সবল সুস্থ ও ইচ্ছানুসারে মাংসপেশীসমন্বিত হয়, সেইরূপ বিজ্ঞানানুযায়ী মানসিক ব্যায়ামে অর্থাৎ যোগাভ্যাসে মন সকল অনভিপ্রেত ইচ্ছা জ্ঞান ও ভাবকে আপনার অতলতলে একেবারে নিমজ্জিত রাখিয়া গুরু-অনুমোদিত জ্ঞান ইচ্ছা ও ভাবকে মনোনদীর উপরিভাগে প্রবমান করিয়া রাখে। তাহাদিগকে স্বস্থানে সংরক্ষিত করিবার জন্য এত চেষ্টা ও পুনঃ পুনঃ অভ্যাস শিষ্য করেন যে তাঁহার মন হইতে অন্য সব জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি যেন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই কৃত্রিম অবস্থা এতই সহজ হয় যে সহজ অবস্থান্তর কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। ভক্ত শিষ্য মন হইতে রূপরসের তৃষ্ণা, নানাবিষয় জ্ঞান, সাংসারিক সুখ দুঃখানুভূতি প্রভৃতি বিদূরিত করেন। 'আমি সেই বিরাট পুরুষ' 'জগতের পৃথক্‌সত্তা নাই' 'একমাত্র বিরাট পুরুষই সত্য' 'আত্মা ও ব্রহ্ম একই' 'আত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ' 'আত্মা অজর ও অমর' 'জগতের প্রতি আসক্তিই মৃত্যুর কারণ' 'বিরাট পুরুষে চিত্ত নিমগ্ন হইলে আর জরা, মৃত্যু প্রভৃতি থাকেনা' 'ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্ম হওয়া যায়' প্রভৃতি অদ্বৈতিগুরুর শিক্ষাবাণী ভক্তশিষ্যকে নূতন মানুষ করিয়া দেয়। গুরুর ইচ্ছাশক্তি এমনই প্রবল যে শিষ্য গুরুর ইচ্ছায় সম্মোহিত হইয়া পড়েন। তাঁহার প্রতি-কূল ইচ্ছা করিবার শক্তি থাকে না। নদী কত দেশ দেশান্তর বন দুর্গম গিরি অতিক্রম করিয়া আসিয়া যেমন স্বেচ্ছায় সমুদ্রকে ধরা দেয়, আপনার সত্তা বিলীন করিয়া দেয়, তেমনি সংসারে কত পথে কত ভাবে কত রকমে বিচরণ করিয়া শিষ্য স্বেচ্ছায় নিজের ইচ্ছা গুরুকে সমর্পণ করেন। তিনি সংসার-পরিভ্রমণে ক্লান্ত। কালের অত্যাচারে জর্জরিত। জীবনব্যাপী নিষ্ফলতার অভিশাপে তাঁর মন অবসন্ন। স্নেহের সামগ্রীর, ভালবাসার পাত্রের বিয়োগে হৃদয়ের গতি স্তিমিতপ্রায়। সংসার জীর্ণ অরণ্য, দৈবের বিড়ম্বনায় নৈরাশ্য মনের প্রকাণ্ড ভূমি অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। মৃত্যুর অগ্রদূত জরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, 'মৃত্যুর ভয়ে ব্যথিত' মরিবার সাহস নাই। আপনাকে শূন্যে বিলয় করিবার শক্তি নাই। তাই মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে প্রাণ-ভিক্ষা। মন সংসারের প্রতি অনাস্থায় ও বিরক্তিতে পরিপূর্ণ। এমন সময় যদি কোন সংসারত্যাগী উদাসীন অথচ নির্ভীক পুরুষ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আশার ক্ষীণ আলোক দেখা দেয়। মৃত্যুর হাত হইতে ত্রাণলাভের সম্ভাবনা গোপনে মনের কোণে ভয়ে ভয়ে উঁকি দেয়, জলে নিমজ্জিত ব্যক্তি তৃণের প্রতিও আস্থাপরায়ণ হয়। আর এই সংসারানলে দগ্ধ ব্যক্তি যদি কেবল সংসারের বাহিরে কোন নিরুদ্বেগ নির্ভীক ও শান্ত লোক দেখেন তাহা হইলে তাঁর মন প্রাণ স্বতঃই শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়ে। সেইরূপ ব্যক্তির নিকট কাতর ভাবে জীবন-ভিক্ষা করেন। এই সন্ন্যাসী দীর্ঘকাল অভ্যাসে আপনার ইচ্ছাশক্তিকে অত্যন্ত প্রবল করিয়াছেন, দুনিয়ার প্রলয় হইলেও ইঁহার ইচ্ছা অবিচলিত থাকিবে। সেই ইচ্ছা একবার যাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করে সেই ব্যক্তি তখনই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আজ্ঞাবহ হইতে পারিলে আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করে। তাড়িতস্পর্শে শরীরের যেমন প্রতি অবয়বে শিহরণ দেখা দেয়, শরীরকে যেমন ক্ষণেকের জন্য নূতন করিয়া গড়িয়া দেয়, তেমনি গুরুর দীক্ষা বা ইচ্ছাশক্তির সংক্রমণ মনকে স্থায়িভাবে নূতন করিয়া গড়িয়া দেয় ও সকল অবসাদ সকল দৈন্য দূরে যায়। গ্রীষ্মের শুষ্ক নদী বর্ষার আবির্ভাবে যেমন জলে পরিপূর্ণ ও প্রখর স্রোতস্বিনী হয় সেইরূপ এই দীক্ষায় সঙ্কুচিত মন বিকশিত হয়, ইচ্ছার প্রবল বেগ আশা-বারিকে উদ্বেলিত করিয়া চালিত করে। নৈরাশ্য প্রতিহত হইয়া আশার, দৈন্য আত্মমহিমার, ম্লানতা প্রফুল্লতার, হীনতা মহত্ত্বের, অনাস্থা আস্থার, অবসাদ উৎসাহের ও অকর্ম্মণ্যতা কর্ম্মশক্তির সৃষ্টি করে।

শিষ্যের বাঁচিবার ইচ্ছা প্রবল। আপনার শূন্যে বিলয়ের চিন্তায় হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাঁর শরীরের নাশ হইলেও অক্ষয় ও অমর একটা বস্তুর প্রয়োজন আছে। অশরীরী আত্মা আবশ্যক। গুরু অভয়-বাণী দিয়া বলিলেন, বৎস,

সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ব্রহ্মে মনোনিয়োগ কর। শিষ্যের প্রাণ শীতল হইল। সমিৎপাণি শিষ্য গুরুর পরিচর্য্যায় রত থাকিয়া ব্রহ্মোপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি রূপলোলুপ ইন্দ্রিয়সমুদয়কে আনন্দরসের প্রতি চালিত করিলেন। শিষ্য আত্মার অমরত্ববাদে শ্রদ্ধালু হইলেন। তাঁর প্রাণ ত চাহিতেছিল কবে এমন সুখ-মতবাদ মিলিবে। অমরত্ববাদের অনুকূল যুক্তি তিনি আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। পরে আত্মবাদ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে আত্মচিন্তায় বিভোর হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রত্যাবৃত্ত; মন রূপবিতৃষ্ণ ও ব্রহ্ম-রসাস্বাদে সতত ব্যস্ত। শীত গ্রীষ্ম বোধ নাই। সংসারে কাম্য বস্তু নাই। রূপের আকর্ষণী শক্তি পরাভূত হইয়াছে। তিনি শান্ত ও নিশ্চল। মনে ব্যথা নাই, অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, ভয় নাই, নিরুদ্বেগ ও নির্দ্বন্দ্ব।

সমাধি মনকে গঠিত করে নূতন ছাঁচে। সমাধির বলে তত্ত্বদর্শন হয় না, হয় তত্ত্বদর্শনের বিশ্বাস ও সামর্থ্য। সমাহিত বিশ্বের আলোড়নে আলোড়িত হন না, বিশ্বের চাঞ্চল্যে চঞ্চল হন্ না, মৃত্যুকে মৃত্যু বলিয়া ভাবেন না। মৃত্যুত জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ। আত্মা বিশ্বের আধার, বিশ্বের ঘটনাবলী আত্মাকে সংক্ষুব্ধ করিতে পারে না যদিও প্রতিপলকে শরীর শীর্ণ হইতেছে, তথাপি বিশ্বাস ক্ষয়কে অলীকের অন্ধকার ঘরে অবহেলায় নিক্ষিপ্ত করিতেছে। ক্ষয়ের জন্য মনে ব্যথা নাই বা বেদনার অনুভূতি নাই। অন্য প্রবল অনুভূতি এই দুর্ব্বল অনুভূতিকে আত্মসাৎ করিয়া আপনাকে পুষ্ট করিতেছে, বিপুল তরঙ্গ যেমন জলের হিল্লোলকে আপনার মধ্যে লইয়া আপনার আয়তন বিশাল করে। জ্ঞান ও বিশ্বাস আপনাকে মৃত্যুঞ্জয় করিয়া দেয়।

এ সমাধি মানসিক অবস্থাবিশেষ। এই অবস্থাবিশেষ মানুষের জগতের প্রতি সম্বন্ধকে পরিবর্ত্তিত করে সত্য, তথাপি সেই অবস্থাবিশেষে আমার জগৎ দেখা বিপরীত হয়, কিন্তু জগৎ ও তাহার নগ্ন ও স্বাভাবিক রূপ প্রকাশ করে না। এই অবস্থাবিশেষপ্রসূত জ্ঞান প্রকৃত জগৎ দেখা নয়। যদিও সমাধিমগ্নের কাছে এই দেখাই প্রকৃত দেখা ও প্রকৃত সত্য। এই দেখার পরে মনের গতি রুদ্ধ হয় সৃষ্টি-রহস্য অনাবৃত হয়, জন্মের আর প্রয়োজন থাকে না ও বিরাটের সহিত কল্পিত ভেদ নিবৃত্ত হয়। ইহা হইতেছে যোগীর বিশ্বাস। যদিও আমরা জানিনা আত্মা আছে কিনা, মৃত্যুর পর তাহার অস্তিত্ব আছে কি না, আত্মা অমর কি না, ব্রহ্ম বলিয়া কিছু আছে কি না, জগৎ ছাড়া আর কিছুর খবর আমাদের বুদ্ধি দেয় কি না। কারণ সমাধি ত আমার সৃষ্ট অবস্থা। যখন আমার মনে আনন্দ থাকে না তখন্ ত জগৎ নিরানন্দে ভরা। যখন আমার মনে আনন্দের তরঙ্গ ছুটিয়াছে, নূতন যৌবন, প্রভূত অর্থ, অটুট স্বাস্থ্য ও কাম্য ভোগ নির্ব্বিঘ্নে পাওয়া যায়, তখন সেই আমারই রাঙা চোখে সবই ভাল লাগে, তখন গোলাপ হাসে, চন্দ্র সুধা বর্ষণ করে, ভ্রমর ফুলের পরাগ মাখিয়া গুণ গুণ ধ্বনিতে মনকে মাতাল করিয়া দেয়, কামিনী মাত্রই স্বর্গের অপ্সরা ও অর্থকে একমাত্র গতি বলিয়া মনে হয়। যে মন দিয়া যখন দেখি তখন সে বিষয়ের উপর মনের রূপ পড়ে। বস্তুর প্রকৃত রূপ কি কখনও দেখিতে পাওয়া যায়? সমাহিত মনের ছাপ বস্তুর উপর পড়ে, বস্তুকে সেই চোখ দিয়া দেখি। সমাধির পূর্ব্বে গুরুদত্ত জ্ঞান শিষ্যের মনের বর্ণ। শিষ্য সমাধিদ্বারা মনে সেই বর্ণলেপ করিয়াছেন। আর তাঁর পরবর্ত্তী জ্ঞাতবিষয়ে মন-চশমার বর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁর দর্শন তাঁরই সৃষ্ট। ইহা এক ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ। সমাধির প্রতি এই আমাদের ধারণা। সমাধিকে এই আমাদের দেয়। এইবার ঋষিজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া দেখা যাক্ আত্মা অমর কি না।

প্রশ্নোপনিষদে তৃতীয় প্রশ্নে জীবাত্মার পরলোকপ্রাপ্তির কথা আছে। সেই উপনিষদের মতে জীবাত্মা হৃদ্দেশে অবস্থিত। পরব্রহ্মদর্শনে আত্মা মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যায় যে জীবাত্মা অমর। কারণ, জীবাত্মার যদি শরীরের সহিত বিনাশ হয় তাহা হইলে লোকান্তরপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না। মুক্তি ব্রহ্ম-লাভ। আত্মা যদি অমর না হয় তাহা হইলে উহা শাশ্বত পুরুষ হইবে কিরূপে? কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যান হইতে বেশ বুঝা যায় যে আত্মা চিরস্থায়ী পদার্থ। আত্মা অবিনশ্বর না হইলে, পুণ্য বা পাপ কর্ম্মানুসারে স্বর্গ বা নরকে যাওয়া সম্ভবপর হয় না। মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে মৃত্যুকালে যে যেরূপ কামনা করিয়া থাকে মৃত্যুর পর সে সেইরূপ ফল পাইয়া থাকে। যাহার কোন

কামনা নাই, তাহার আর জন্ম হয় না। মৃত্যুর সঙ্গে আত্মার ধ্বংস হয় না। লোকান্তরপ্রাপ্তি সত্তাহীনের হয় না। মুক্তি-দশাতে আত্মার বিলোপ হয় না, শুধু দেহের সহিত আত্মীয়তা হয় না অর্থাৎ আর দেহ-পরিগ্রহ হয় না। ঐতরেয় উপনিষদে প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে, পরব্রহ্মই জীবরূপে শরীরে প্রবিষ্ট হন্। আত্মা ও পরমেশ্বরে কোনই ভেদ নাই। যিনিই আত্মা তিনিই পরমেশ্বর, শুধু ইহাদের মধ্যে ঔপাধিক ভেদ। এই মতেও আত্মা অমর না হইয়া পারে না। শ্বেতাশ্বতরে চতুর্থ অধ্যায়ে আত্মাকে অজ ও নিত্য বলা হইয়াছে। মুক্তাবস্থায় এই মতে আত্মা পরমাত্মার নিরতিশয় তুল্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং, এই উপনিষদের মতে আত্মা যে অজর ও অমর তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ঈশোপ-নিষদে স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে যে আমিই সেই পরমপুরুষ। সুতরাং, এই সময়ে জীবাত্মা যে অজর ও অমর তাহা এত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে তাহার নির্দ্দেশের কোনই আবশ্যকতা নাই। অজ্ঞানীর মৃত্যুর পরে অন্ধকারাবৃত লোকপ্রাপ্তির কথা আছে। ইহা হইতেও বেশ বুঝা যায় যে ঈশোপনিষদে আত্মার বিনাশিতা স্বীকৃত হয় নাই। বৃহদারণ্যকে চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে আত্মার অবিনাশিতাকে ভিত্তি করিয়া আত্মার নিত্য বিজ্ঞানময়তা প্রভৃতি স্বরূপ সমর্থিত হইয়াছে। এখানে আত্মা যে অমর তাহা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের মত গৃহীত হইয়াছে। আত্মার অমরত্ববাদ এইকালে পরীক্ষার দশা উত্তীর্ণ হইয়াছে। শরীর যে আত্মা নয়, তাহা বেশ একটী সুন্দর উদাহরণ দিয়া এই অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে বুঝান হইয়াছে। সাপ যেমন ত্যক্ত খোলোসে একেবারে অভিমান-শূন্য হয়, অর্থাৎ সাপ মনে করে যে খোলসটী তাহার শরীরের কোন অবয়ব নয়, সুতরাং অনায়াসে তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি নিঃসঙ্কোচে শরীরের প্রতি আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহা হইতে বেশ বুঝা হইতেছে আত্মা যে দেহ নয় এই মত বৃহদারণ্যকের দৃঢ় সিদ্ধান্ত। এবং আত্মা জন্ম ও মৃত্যুর অতীত। ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রজাপতি ইন্দ্র ও বিরোচন-সংবাদ সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ। প্রজাপতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন 'আত্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকঃ'। অর্থাৎ আত্মার জরা, মৃত্যু ও শোক নাই। বিরোচন বুদ্ধিমান্দ্যবশতঃ দেহকেই আত্মা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। ইন্দ্র ১০১ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ও মনন করিয়া আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারেন।

আমরা বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যের শেষে উল্লেখ করিলাম, কারণ এই দুইগ্রন্থে যুক্তি দেখা দিতেছে। এই দুই গ্রন্থে শুধু মতের বিবৃতি নাই, আছে যুক্তির আমেজ। ছান্দোগ্যে যখন দেখা জিনিষ বুঝাইবার জন্য যুক্তির অবতারণা করিতে হইতেছে ও কি করিয়া গুরু দেখিয়াছেন সেই পথ নির্দ্দেশ করা হইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে দেখার মধ্যে গোল আছে। অরুন্ধতীনক্ষত্র সহজে দেখা যায় না। উহা দেখাইতে যুক্তির অবতারণা করিতে হয় না। শুধু দেখিবার পর পর সোপানগুলি বলিয়া দিতে হয়। ঐ স্থূল তারা দেখ, তার উপরের তারকা দেখ এইরূপে দুই চারটী তারকা দেখিতে দেখিতে সূক্ষ্ম অরুন্ধতী দেখা যায়। আত্মা যদি এইরূপ প্রত্যক্ষই হইত, তাহা হইলে প্রকৃত দেখিবার পর পর সোপানগুলি নির্দ্দেশ করিলেই বুঝা যাইত যে আত্মার প্রকৃতই প্রত্যক্ষ হয়। উপনিষদের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রথমে আত্ম-জিজ্ঞাসুর সংসারে প্রকৃত অনাসক্তি থাকা চাই, দ্বিতীয়তঃ তাহাকে বিচারবুদ্ধির দ্বারা গুরুপ্রোক্ত আত্মবাদ আয়ত্ত করিতে হইবে। তারপর মনঃশিক্ষার দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিয়মিত করিতে হইবে। পরে চিত্তবৃত্তির নাশ হইলে, স্বেচ্ছাকৃত সুষুপ্তির মত অবস্থা হয়। সেই অবস্থায় আত্মার দর্শন হইয়া থাকে। এই দর্শন ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। মনেও সঠিক বুঝা যায় না। আবছায়া আবছায়া যে জ্ঞান তাহারই নাম আত্মদর্শন। এই সময়ে প্রকাশ করিবার মত কোন বিষয় নাই। বিষয় না থাকিলে জ্ঞাতার জ্ঞান কিরূপে হয়? যদি শুধু আলোক থাকে, আর বস্তু না থাকে, তাহা হইলে কি বস্তুর প্রকাশ হয়? আত্মা বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ যেন রহিলেন, কিন্তু জ্ঞানের ও আনন্দের অনুভূতি কি করিয়া হইতে পারে? বিজ্ঞান ত নিজের বিষয় ও প্রকাশক হইতে পারে না? আনন্দের উপলব্ধি জ্ঞান না থাকিলে হয় না। জ্ঞানস্বরূপ আত্মা এই আনন্দকে বিষয়রূপে প্রকাশ করিতে পারেন না, কারণ আনন্দাত্মকই এই আত্মা। জ্ঞান বিষয়ী ও আনন্দ বিষয় হইলে আত্মা অখণ্ড হইতে পারেন না, কারণ আত্মার মধ্যেই স্বগত ভেদ হইয়া থাকে। আত্মাকে স্বপ্রকাশ বলিলেও কোন উত্তর

দেওয়া হইল না। আত্মা প্রকাশস্বরূপ ইহা বলা হইল মাত্র। প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইল যে জ্ঞান বিষয় না থাকিলেও আপনাকে প্রকাশ করে। বিষয়বিহীন বিজ্ঞান অননুভূত জিনিষ। এইরূপ বিজ্ঞানের সত্তাতেও আমরা সন্দিহান, তাহার উপর আবার বিষয় ব্যতিরেকে আত্মপ্রকাশ। কোন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হইলে তিনটী আবশ্যক অংশের প্রয়োজন। ভোজন ক্রিয়া উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া যাইতেছে। ভোক্তা, ভোজ্য ও ভোজন ব্যাপার অবশ্যই প্রয়োজনীয়। সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানও একটী ক্রিয়াবিশেষ। এই ক্রিয়া-সম্পাদনে অবশ্যই তিনটী বিষয়ের আবশ্যকতা আছে। এক জন দ্রষ্টা, দৃশ্যবস্তু ও দর্শন ব্যাপার আবশ্যক। অন্যান্য বস্তুরও আবশ্যকতা, যেমন ক্রিয়ার উৎপত্তির জন্য তাহার করণের প্রয়োজন। জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য মনের সাহায্যের প্রয়োজন আছে। এইরূপ সমাহিত অবস্থায় যদি দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন ব্যাপার না থাকে, তাহা হইলে সমাধিকালে আত্মদর্শন হয় কি করিয়া? যদি এইরূপই বলা যায় এই সময়ে লৌকিক জ্ঞান থাকে না, স্বয়ং জ্যোতিঃ আত্মা নিজের শুদ্ধরূপে বিরাজ-মান হন্; তাহা হইলে এই প্রশ্নই মনে উদিত হয় যে সমাধি দশায় আত্মা উপাধিবিনির্মুক্ত হন কি না? যদি হন, তাহা হইলে আত্মদর্শন জীবের হয় কি করিয়া? জীব উপাধিবিশিষ্ট আত্মা। আত্মা সর্ব্বসময়েই উপাধিমুক্ত। উপাধির আরোপ মাত্র শুদ্ধ আত্মাতে হয়। অতএব আত্মার স্বরূপে অবস্থান ত সদাসর্ব্বদাই হইতেছে, এইরূপ আত্ম-দর্শনের নিমিত্ত এত অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কি? সমাধি কালেও সকলে একমত হন না। মাধ্যমিকেরা বলেন চরম সমাধিকালে শূন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে। সে সময়ে বিষয় প্রভৃতি না থাকায় কোন জ্ঞানই হয় না। নৈয়ায়িকেরা বলেন সুষুপ্তিকালে কোন জ্ঞানই থাকে না। সমাধি অনেকটা সুষুপ্তির মত অবস্থা, সুতরাং সেই সময়ে জ্ঞান হওয়াও অসম্ভব। সাংখ্যেরাও বলেন যে সমাধিকালে আনন্দের উপলব্ধি হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যোগীদের মধ্যেও আত্মদর্শনে নানা মতভেদ। এই বিমত-স্থানে আমরা কি করিয়া বলিব যে আত্মদর্শন হইয়া থাকে, বিশেষতঃ কোন মতেই জীবের আত্মদর্শন হয় না। যতক্ষণ জীব, ততক্ষণই ত' বুদ্ধি। জীব আপনার ব্যক্তিত্ব হারাইয়া কিরূপে আত্মদর্শনে ইচ্ছুকই বা হইতে পারে ও আত্মদর্শনের ফল লাভই বা করিতে পারে? ছান্দোগ্য উপনিষদে যুক্তির প্রবেশপত্র-লাভ ঔপনিষদ মতের ধূমকেতু। যুক্তির বন্ধুত্ব পিচ্ছিল। যুক্তি বিশ্বাসের দাস নয়। সে আপনাকে স্বাধীন করিতে প্রতিপদে চায়। বিশ্বাস যদি যুক্তির বিরোধী হয়, তাহা হইলে তাহাকে উন্মূলিত করিতে দ্বিধা বোধ করে না। বিশ্বাস যখন যুক্তির সহায়তা-প্রার্থী, তখন বুঝিতে হইবে বিশ্বাসের আত্মপ্রত্যয় নাই। যুক্তি আপনার স্বভাব-বশেই বিশ্বাসের উপর অধিকার ও আধিপত্য বিস্তার করিবে। এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী দর্শন রাজ্যে যুক্তি তর্ক আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণরূপে ন্যস্ত হইয়াছে। দর্শন মত বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব না। তবে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে উপনিষদের ঋষির সমাধিসম্ভূত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিতে পারিনা যে আত্মা অমর ও অজর।

"দুর্ব্বল মোরা কত ভুল করি
অপূর্ণ সব কাজ,
নেহারি আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা
মনে মনে পাই লাজ,—
তা'বলে যা পারি তাও করিব না?
নিষ্ফল হ'ব ভবে
তোমার এমন শাণিত বচন
তাই কি অমর হ'বে?"

অপবাদ

—কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

১

বাঃ—

শুধু কি তাই? এযে চাঁদের একটি সমুজ্জ্বল খণ্ড! চমৎকার! চমৎকার!

সপ্তদশ বর্ষ বয়সে কল্পনার মায়ার অঞ্জন নয়নে নূতন দৃষ্টি দেয় না? অন্তরে সৌন্দর্য্যানুভূতির পুলক-স্পর্শ জাগায় না? ক্লাসের পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও বাবার প্রকাণ্ড পুস্তকাগারের দ্বারও মুক্তই ছিল। সুতরাং কৈশোরে কাব্য, উপন্যাস নাটকের রসগ্রহণে বাধা পড়ে নাই। শব্দ ও পদের দুরূহতা কাব্য-মাধুর্য্যের রসগ্রহণের পরিপন্থী হইতে পারে নাই। তবে গভীর রজনীর অবকাশেই গোপনে কাব্যরস চর্চ্চা করিতে হইত। কারণ বাবার কড়া শাসনের ভয় ছিল। কিন্তু তিনি এজন্য কোনদিনই আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না।

পুরীর সমুদ্র সৈকতে, প্রভাত-রবির উদয়ক্ষণে বালিকার রূপজ্যোতি দেখিয়া আমার কিশোর অন্তর নীরব প্রশংসার বন্দনা-গান অর্ঘ্য না দিয়া পরিতৃপ্ত হইল না।

সম্ভবতঃ পিতামাতা, আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়াই বালিকা সিকতাভূমিতে চঞ্চল চরণে শুক্তি সংগ্রহ করিতেছিল। তরঙ্গতাড়িত শুক্তিপুঞ্জ প্রায় প্রতি মুহূর্ত্তেই সৈকত ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

কলহাস্যের মধুর ঝঙ্কার বালিকার ঈষৎবিভিন্ন ওষ্ঠপুট-পথে থাকিয়া থাকিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল।

মুগ্ধ বিস্ময়ে বালিকাকে দেখিতেছিলাম। সহসা চমকিয়া উঠিলাম। মা ও বাবা প্রায় সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছেন। একজন বর্ষিয়সী মহিলার সহিত মা কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন দেখিতেছি। কে উনি? সিকতা-বিস্তারের উপর শুক্তিসংগ্রহরতা বালিকার উনি নিশ্চয়ই জননী। মুখের আদল অনেকটা এক।

অপর প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সহিত বাবার বেশ আলাপ আছে দেখিতেছি। উভয়ে হাসিয়া হাসিয়া কথা বলিতে[illegible]ন।

একটু দূরে তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়াছিলাম বলিয়া কাহারও কথা শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু মা দেখিলাম, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হাস্যমুখরা সুন্দরী বালিকাকে দেখাইতেছেন।

পরমূহূর্ত্তে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরাইতে বাধ্য হইলাম। জননী ও অপর মহিলার দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কি বলিতেছেন উহাঁরা?

কিশোর বক্ষ অনিশ্চিত ভাবাতিশয্যে অনেক সময় স্পন্দিত হইয়া উঠে। উপন্যাসে এমন অনেক কথা পড়ি নাই কি? প্রথম প্রভাতের অরুণরাগে নির্ম্মল আকাশের অনেকখানি বিচিত্র বর্ণসম্ভারে বিচিত্র মহিমা ধারণ করিয়া থাকে। আমারও মানসাকাশে বুঝি তাহারই দীপ্তি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল!

বাতাস অনাহত গতিতে শিকরসিক্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে পুলক-স্পন্দন জাগাইয়া তুলিতেছিল। সহসা কোমল স্নিগ্ধ স্পর্শ এবং জননীর কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলাম।

মা বলিলেন, "এদিকে আয়।"

নত দৃষ্টিতে, স্পন্দিত বক্ষে মার অনুবর্ত্তী হইলাম।

"প্রণাম কর্ সুধীর! ইনি আমার সই।"

অলক্তকরাগ-রঞ্জিত দুইখানি চমৎকার চরণের ঈষৎ উর্দ্ধে চওড়া লালপাড় শাড়ীর প্রান্তদেশ দেখিতেছিলাম। নত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিতেই, তিনি পর্য্যায়ক্রমে আমার চিবুক ও মস্তক স্পর্শ করিয়া নীরবে বোধ হয় আশীর্ব্বচনই উচ্চারণ করিলেন।

শুনিতে পাইলাম, "বেশ ছেলেটিত! পড়শুনা করছে?"

মার কথা শুনিলাম। তিনি বলিলেন, "পড়াশোনা করে বৈ কি! এবার সুধীর ম্যাট্রিক দিয়েছে।"

মাথা আমার আরও নত হইয়া পড়িল।

অপরিচিতা—আমার মার সই বলিলেন, "তা বেশ!—ভেবেছিলাম, তোমরা বড় জমীদার, লেখাপড়ার প্রয়োজন তোমাদের ছেলেদের জন্য হয়ত দরকার হয় না!"

মা হাসিয়া বলিলেন, লেখাপড়া কি জমীদারদের ক'রতে নেই, ভাই?—ওটা সকলের জন্যই দরকার।"

মুখ তুলিয়া চাহিবার ইচ্ছা হইতেছিল; কিন্তু কেহ যেন ভারী বোঝা মাথার উপর চাপাইয়া দিয়াছিল

আজীবন লাজ ও লজ্জার আতিশয্য আমাকে গৃহকোণের পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছিল। বাবার বিস্তীর্ণ জমীদারীর প্রজারা অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াও কদাচিৎ আমার দেখা পাইত। ভবিষ্যতে আমিই তাহাদের একমাত্র বিধাতাপুরুষ স্বরূপ, এই রকম নানা কথা তাহারা বলিত বলিয়া, কোন দিনই তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইতে পারি নাই। কর্ম্মচারিদিগকেও সাধ্যমত এড়াইয়া চলিতে পারিলে ইতস্ততঃ করিতাম না। শুধু আমার ব্যায়াম-শিক্ষক এবং স্কুল ও গৃহের শিক্ষক মহাশয়দিগের সাহচর্য্য আমার ভাল লাগিত। এমন কি সহপাঠীদিগকেও আমি যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতাম।

সুতরাং একজন মহিলার মুখের দিকে চাহিবার শক্তি আমার ছিল না ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। মা আমার মনের গতির সহিত পরিচিত ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আমি অস্থির হইয়া প্রায় হাঁপাইয়া উঠিয়াছি। ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা এখন বেড়াতে যা।"

মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলাম। চলিবার সময় একবার অপাঙ্গে শুক্তি-সংগ্রহকারিণী বালিকার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে তখন শুক্তি সংগ্রহ বন্ধ রাখিয়া আমার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি। তাহার অধরে কি মৃদু হাস্য-রেখা ?

হয়ত আমার অস্বাভাবিক বিমূঢ় ভাব সে লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। তাহার জননীর সহিত আমার পরিচয়ের অবস্থাটা তাহার মনে কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়াছিল না কি ?

চরণ যুগল আমাকে দ্রুতবেগে চক্রতীর্থের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম, ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্নাধারা লুটাইয়া পড়িয়াছে। একটা অবর্ণনীয় আনন্দের তরঙ্গ আসিয়া যেন হৃদয়-বেলায় লুটাইয়া পড়িল। শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম। বাতায়নপথে অদূরে, সিকতা ভূমির উপর, চন্দ্রকরদীপ্ত সমুদ্রতরঙ্গের অলস লুণ্ঠনের বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া চটি জুতা পায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

কিশোর হৃদয় সে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব মোহে যেন অভিভূত হইয়া পড়িল।

সহসা পার্শ্বের কক্ষ হইতে মার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি বলিতেছিলেন, "মেয়েটি কিন্তু বড় চমৎকার! ওকে আমার বৌ করবার বড় সাধ। তুমি কথা তুলেছিলে ?"

প্রাণটা অকস্মাৎ দুলিয়া উঠিল। সমগ্র অন্তর শ্রবণেন্দ্রিয়ে যেন কেন্দ্রীভূত হইল। প্রকৃতির—সমুদ্রের সে বিচিত্র রূপজ্যোতির আকর্ষণ এড়াইয়া মন একাগ্র হইয়া উঠিল।

বাবার গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল। তিনি বলিলেন, "তোমার কথামত সুরেন বাবুর কাছে কথাটা তুলেছিলাম। তিনি কি বলেছেন শুনবে ?"

সমুদ্র-তরঙ্গের শব্দ এবং বাতাসের মর্ম্মর-ধ্বনিকে অভিশাপ দিবার ইচ্ছা হইল। মাতার আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাইতেছি। তিনি বলিলেন, "কি বলেছেন ?"

উভয় কক্ষের মধ্যস্থ রুদ্ধ দ্বারের উপর কাণ পাতিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়াইলাম।

বাবার গম্ভীর কণ্ঠস্বর, জনরব-বর্জ্জিত রজনীতে সুস্পষ্ট ভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তিনি স্বাভাবিক ভাবেই বলিয়া উঠিলেন, "ওঁরা মেয়ের এখন বিয়ে দেবেন না। মেয়েকে ভাল করে লেখাপড়া শিখিয়ে পাশ করাবেন। তারপর ভাল লেখাপড়া-জানা পাশ-করা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন।"

মা বলিলেন, "তা বেশ ত! আমাদের সুধীরও ত লেখাপড়া শিখছে। ম্যাট্রিক পাশের খবরও ত কাল এসেছে।"

হাসিতে হাসিতে বাবা বলিলেন, "তাও সুরেশবাবু শুনেছেন। তিনি বল্লেন কি জান? আজকাল পরীক্ষা অনেক ছেলেই পাশ করে, কিন্তু লেখাপড়া ক'জন শেখে ? বিশেষতঃ—"

বাবা সহসা থামিয়া গেলেন। আমিও স্পন্দিত বক্ষে কথাটা শুনিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলাম। মা বলিলেন "থামলে কেন ? সবটা বলেই ফেল।"

বাবার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম—মনে হইল সে স্বর যেন

ঈষৎ কম্পিত। তিনি বলিলেন, "বড়লোকের, বিশেষতঃ বড় জমিদারের ছেলের প্রতি তাঁর লোভ নেই। তবে তিনি বলেছেন, সুধীর যদি ভাল করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিতে পারে, তখন বিবেচনা করে দেখবেন। তার জন্য তাড়া নেই। মেয়েকে ত এখনই তিনি বিয়ে দেবেন না পাঁচ বছর ত এমনিই চলে যাবে।"

বাবার কণ্ঠস্বরে যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমার কিশোর বয়সেও অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না।

মার তরফ হইতে আর কোন কথা শুনিতে পাইলাম না। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চলিয়া গেল। তারপর বাবা তেমনই গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোমার সাধ বলেই আমি সুরেন বাবুর কাছে কথাটা পেড়েছিলাম, কিন্তু তাঁর কাছে কথা তুলে প্রকারান্তরে আমাকে অপমানিতই হতে হয়েছে। অথচ আমি কন্যাদায়গ্রস্ত নই। আমারই ছেলে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে—"

সহসা তিনি থামিয়া গেলেন। আমি ত জানিতাম, বাবার প্রবলপ্রতাপে দেশের লোক শশব্যস্ত। রাজসরকারেই হ, অথবা বাঙ্গালার অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই হউক, বাবার সকল রকমেই সুনাম ছিল। জমীদার দিগের মধ্যে তাঁহার মত অঋণী এবং ধনকুবের বাঙ্গালা দেশে খুব কমই আছে। তাঁহার সিংহবিক্রমের কথা দেশ-বিশ্রুত হইয়া ছিল। পুত্রের বিবাহের কথা পাড়িয়া তিনি এ ভাবে উপেক্ষিত হইয়াছেন শুনিয়া আমার মত গৃহকোণের পক্ষপাতী কিশোরের মনও ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

ধনী, অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করা কি অপরাধ? ধনিপুত্র, জমিদার-সন্তান দেবী ভারতীর পূজারী হইবার অযোগ্য? তাহাদের মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ অসম্ভব? তাহাদের সবই অর্থের বিনিময়-মূল্যে আদৃত হয়?

কেন এই মিথ্যা অপবাদ?

জ্যোৎস্নাধারাস্নাত সীমাহীন সমুদ্রের বিচিত্র-রূপ আমার দৃষ্টিপথ হইতে যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল। নিজের জীবনের শ্রুত এবং দৃশ্য অনেক ঘটনার কথাই স্মৃতির অর্গলমুক্ত করিয়া দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হইতে লাগিল।

পিতামহের পিতামহ যে সম্পত্তি বুদ্ধিবলে উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা বংশধরগণের বিচক্ষণতা এবং কৃতিত্বের ফলে বাবার সময়ে বিপুলায়তন হইয়াছিল। বাবা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সোপানপথে বাণী মন্দিরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পান নাই সত্য, কিন্তু নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি কয়েকটি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দর্শন ও সাহিত্যে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। পুত্রকে রীতিমত শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। তাই গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি সাধারণ ছাত্রেরই ন্যায় আমাকে সেখানে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করেন। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত আমি কোন বিষয়েই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি নাই। কিন্তু দেশের লোক আমাদের অলক্ষ্যে বলিত, মাষ্টার মহাশয়গণ পক্ষপাতিত্ব করিয়া জমিদারের ছেলের নম্বর বাড়াইয়া দেন। বাবার কাণে একথা গিয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠভাবে না মিশিলেও কথাটা আমার অগোচর ছিল না।

বাবা গ্রামে ব্যায়াম-চর্চ্চার জন্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। শারীরিক ব্যায়াম এবং নানাবিধ পুরাতন ও আধুনিক ক্রীড়ারও তিনি উৎসাহদাতা ছিলেন। সাধারণ ছাত্র হিসাবে আমাকে সকল বিষয়েই যোগ দিতে হইত। ক্রিকেট খেলা, মল্লযুদ্ধ, মুগুর ভাঁজা, প্যারালাল বার প্রভৃতি ক্রীড়ায় আমার স্বাভাবিক আসক্তি ছিল। স্কুলের বা গ্রামের কোন ছাত্রই এই সকল ক্রীড়ায় আমাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। কিন্তু তথাপি অপবাদ ছিল, পিতার বিপুল সম্পত্তি ও প্রতাপবশতই পরীক্ষকগণ আমার ললাটে জয়টীকা পরাইয়া দিতেন। একবার বিভাগীয় কমিশনার আমাদের গ্রামে আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রীতি-বিধানার্থ নানাবিধ ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শিত হয়। তিনি আমাকে চারটি সোনার মেডেল উপহার দিয়া যান্। তাহাতেও পক্ষপাতিত্বের প্রবল গন্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রবলপ্রতাপ জমিদারতনয় না হইলে, উহা অন্যান্য ছাত্রেরই নাকি প্রাপ্য হইত।

শীকারে আমার প্রবল অনুরাগ। হরিণ বহুবার শীকার করিয়াছি। সেদিন স্বহস্তে একটি বড় বাঘ মারিয়াছিলাম। কিন্তু বাবার বেতনভুক্ত দক্ষ শীকারীরাই যে উহার প্রকৃত হন্তা, তাহা গ্রামের অনেক লোকই রটাইয়া দিয়াছিল। উহাতে আমার নাকি কোনও কৃতিত্বই ছিল না। কথাগুলি নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া, বহু বিচিত্র রূপ রস-সৃষ্টি করিয়া আমার

কাছে আসিয়া পৌছিত। মনে মনে হাসি পাইত। বাবা কিন্তু কোন দিনই কোন কথায় কাণ দেন নাই, তাহা আমি উত্তমরূপেই জানিতাম।

সমুদ্র-তরঙ্গ নিশীথ রজনীতে, জ্যোৎস্নাপ্লাবনে অভিষিক্ত হইয়া অলস উচ্ছ্বাসে সমুদ্রবেলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিল। রহস্য-যবনিকার অন্তরালে সমুদ্রের সীমাহীন দেহের প্রায়-সমগ্রভাগই আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। উদাস দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া মনে মনে হাসিয়া উঠিলাম। ধনী-সন্তানের, জমীদার-নন্দনের এ দুর্নাম অঙ্গের ভূষণ। সুতরাং সেজন্য দুঃখ করিয়া কোনও লাভ নাই।

৩

বাঙ্গালা দেশে দেবী ইন্দিরা ও ভারতীয় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মনোমালিন্য সম্বন্ধে যতপ্রকার কিংবদন্তীই প্রচলিত থাকুক্ না কেন, অদূরদর্শী মানব গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে ধনী-সন্তানের সম্বন্ধে যতপ্রকার সত্যমিথ্যা-মিশ্রিত মতবাদের জয় ঘোষণাই করুক্, একে একে কয় বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়টি তোরণ পার হইয়া গেলাম। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় যে স্থান লাভ করিয়াছিলাম, তাহা হইতে ক্রমে আরও উচ্চস্থান দখল করিতে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে অনার্সে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছি এই সংবাদ পাইয়া বাবা আমাকে তাঁহার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলাম তাঁহার নয়নে দুইবিন্দু অশ্রু টলটল করিতেছে।

অপবাদ লক্ষশীর্ষ হইয়া আপনার জয়-ঘোষণার চেষ্টা করুক্, কিন্তু সত্য কি কোনওদিন আত্মপ্রকাশ করিবে না? যদি নাই করে, তথাপি দুঃখ কিসের?

ইংরাজী সাহিত্যে এম্-এ পরীক্ষার নম্বর আনাইয়া দেখিলাম, এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার প্রতিভাশালী ছাত্রগণ যত নম্বর পাইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও পশ্চাতে আমার অর্জ্জিত সংখ্যায় স্থান নির্দ্দেশ হয় নাই।

কিন্তু চিরন্তন অপবাদের উদ্ধত মস্তক ইহাতে অবনত হইবে কি?

জ্ঞানার্জ্জনের প্রবল নেশায় আমাকে অভিভূত করিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে পুনরায় এম্-এ পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিলাম।

মা বলিলেন, "বাবা, এইবার মত কর, বউ আনি।"

অকস্মাৎ সমগ্র হৃদয়ের মধ্যে প্রবল দুর্নিবার অভিমান যেন গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সাত বৎসর পূর্ব্বের পুরীর সমুদ্র-তটবর্ত্তী দৃশ্য—পিতামাতার আলোচনার স্মৃতি মনকে যেন প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করিল।

আমাকে মৌন দেখিয়া মা বলিলেন, "বাবা, আমি আর একলা থাক্‌তে পাচ্ছিনা। ওঁকে বলেছি। উনি চুপ করে রয়েছেন। তোর মত পেলে—এখন তুই এত লেখাপড়া শিখেছিস্, খুব ভাল বৌ ঘরে আনতে পারব।"

ভাবিয়াছিলাম, বিবাহসম্বন্ধে মার সঙ্গে পুত্রের আবার আলোচনা কি? পিতামাতা যাহা সন্তানের জন্য ভাল বুঝিয়া করিবেন, তাহা কখনই অকল্যাণকর হইতে পারে না। তাঁহারা আদেশ করিবেন, সন্তান নতশিরে তাহা পালন করিবে। কিন্তু সমগ্র অন্তরমধ্যে এমন একটা প্রচণ্ড দোলা অনুভব করিলাম যে, আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেই কথাগুলি বাহির হইয়া গেল। বলিয়া উঠিলাম, "মা, জমীদারের ছেলে কখনো লেখাপড়া শেখে? তারা নাকি ঘুস্ দিয়েই পরীক্ষা পাশ করে যায়! লোকে এই কথাই বলে না?"

মা বিস্ময়স্তব্ধ ভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

জানিনা তখন আমার ওষ্ঠাধরে বিষাদ অথবা বিদ্রূপের হাস্যের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল কি না। কিন্তু জননীর ছল-ছল নেত্র দেখিয়া বলিয়া উঠিলাম, "ও কথা থাক্! তোমার ছেলের বয়স ত এখন মোটে চব্বিশ! আরও কিছুদিন থাক্ না।"

আমি এড়াইয়া যাইতে চাহিলেও আমার বুদ্ধিমতী জননী কিন্তু কথাটার উপর যবনিকা পাত হইতে দিলেন না। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ও কথা তুই বল্‌লি কেন রে? জমীদার হলেই কি সে অপদার্থ হয় নাকি? সব তাতেই ঘুষ দিয়ে তাকে নাম কিন্‌তে হয়?"

হাস্য সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলাম, "মাগো, তুমি কি আজকেই শুধু আমার মুখেই এ কথাটা শুনলে? আর কখনো শোন নি? আমিত জ্ঞান হয়ে অবধিই শুনে

আসছি। বাবা, তুমি, আমি না জানলেও অনেকেই জানে তোমার ছেলের সব রকম যশের পেছনে প্রচুর ঘুষ আছে। নইলে তোমার ছেলের সাধ্য কি এসব করতে পারে!"

আমার উচ্চ হাস্যের সহিত মা কিন্তু কণ্ঠ মিলাইতে পারিলেন না। তাঁহার আয়ত নয়ন যুগল উজ্জ্বল হইয়া । ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "এখন তোর কথা আমি বুঝেছি আচ্ছা—আচ্ছা!—"

কি বলিতে গিয়া তিনি থামিয়া গেলেন।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "মা, কথাটা তুমি বুঝতে পার নি। ধর, তুমি যদি বৌ নিয়ে এস, সে হয়ত এসে ভাববে, এখানে সবই মেকি—তোমার ভালবাসা, সেটা অভিনয়। কারণ তুমি জমীদার-গৃহিণী। যা কিছু করবে খাঁটি জিনিষ তাতে নেই। সেটা কি এ যুগে তুমি সহ্য করিতে পারবে? তার চেয়ে—"

"তুই থাম্ বাপু! বুঝেছি, আমি তোর ন্যাকা মা নই।"

মা গম্ভীর মুখে নিঃশব্দ চরণে চলিয়া গেলেন।

পাঠাগারে ফিরিয়া গেলাম।

অত্যন্ত সঙ্গোপনে, নিভৃত রজনীতে, আজ সাত বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণগুলি অতিক্রম করিবার চেষ্টা ছাড়াও দেবী ভারতীর কমল-দলরচিত, সহস্র বিগহ-কূজন-ঝঙ্কৃত পবিত্র কুঞ্জবনে প্রবেশ করিবার জন্য যে দুর্লভ সাধনা করিতেছিলাম, তাহার সংবাদ কেহই জানিত না। অজস্র রচনা স্তূপীকৃত হইয়া আলমারীর কুক্ষিগত হইয়া রহিয়াছে। কোনও মাসিকপত্রে ছাপিবার দুঃসাহস হয় নাই। গ্রন্থকারে মুদ্রিত করিতে পারিতাম, কিন্তু সারা জীবনের সঙ্কোচ ও লজ্জা প্রতিপদে বাধা জন্মাইত। মাতার চরণে গোপনে ও নীরবে অর্ঘ্য ঢালিয়া দিয়াই চরিতার্থ হইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষামন্দিরের তোরণগুলি উত্তীর্ণ হইয়াছি, এখন কি একবার সাহস করিয়া সাহিত্যের পবিত্র মন্দিরে যৎসামান্য পূজা লইয়া উপস্থিত হইব?

কিন্তু অপবাদের আশঙ্কা সেখানেও ত থাকিতে পারে!

শ্রান্ত দেহ শয্যায় বিছাইয়া দিলাম।

৪

শ্রীনিবাস আসিয়া সংবাদ দিল, বাবার ঘরে আমার ডাক পড়িয়াছে।

শ্রীনিবাস বাবার খাস্ খানসামা।

বাবা আমাকে বড় একটা ডাকেন না। বৈষয়িক ব্যাপারের কোনপ্রকার আলোচনা কোনদিনই তিনি আমার সঙ্গে করেন না, সাংসারিক ব্যাপারে ত নহেই। তিনি আমাকে নিরঙ্কুশভাবে জ্ঞানার্জ্জন করিবার সাধনার পথে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং পিতার আহ্বানে অকস্মাৎ বক্ষোমধ্যে একটা অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা অনুভব করিলাম। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেই বোধ হয় সকল মানুষই এমন উদ্বেগ অনুভব করিয়া থাকে।

শ্রীনিবাসের কাছে জানিয়া লইলাম, তিনি আফিস ঘরে নাই, তাঁহার খাস-কামরায় বসিয়া আছেন। সেখানে একটি ভদ্রলোকও আছেন।

বাবা যখন জমীদারী কাযকর্ম্মের অবকাশে বিশ্রাম করিতেন, তখন এই খাস-কামরায় গিয়া বসিতেন। তাঁহার বিশিষ্ট ও অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব ব্যতীত অন্যের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না।

বৃহৎ পুস্তকাগারের মধ্য দিয়া আমি এই সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলমে। তখন হেমন্তের অপরাহ্ন। ঘরের বাহিরে বাবার স্বহস্তে রচিত প্রকাণ্ড পুষ্পোদ্যানের বিচিত্র শ্যামশোভা।

আমি দৃষ্টি ফিরাইয়া চাহিবামাত্র বাবার পার্শ্বে কুশনের কেদারায় উপবিষ্ট একজন সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার মুখখানি যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে।

বাবা আমাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "এঁকে তুমি হয়ত চেন না, সুধীর। ইনি আমার বন্ধু সুরেন বাবু, হাই-কোর্টের একজন বড় উকীল। এঁর পত্নী তোমার গর্ভধারিণীর বাল্যসখী।"

অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু সে বিস্ময়ের ভাব সংবরণ করিতে মুহূর্ত্ত সময়ও লাগিল না।

নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

"বস, বাবা বস," বলিয়া তিনি আমার দিকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

হেমন্তের শেষ ভাগ, শীত প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তথাপি আমার ললাটে দুই এক বিন্দু স্বেদ-জল দেখা দিল।

"শশাঙ্ক বাবু আপনার ছেলে রূপে গুণে—সকল রকমেই সত্যই চমৎকার।"

বাবা কখনও নীরবে হাস্য করিতে পারিতেন না; কিন্তু সহসা মাথা তুলিতেই দেখিতে পাইলাম, তাঁহার অধরে মৃদু হাস্য রেখা!

ইহা আমার পক্ষে সত্যই নূতন অভিজ্ঞতা।

নতশিরে ইহার কারণ চিন্তা করিতেছি। এমন সময় বাবা বলিলেন, "আপনার পূর্ব্ব ধারণা তা হ'লে বদলে গেছে, সুরেন বাবু?"

আমার মাথা আরও নত হইয়া পড়িল। আট বৎসর পূর্ব্বে গোপনে পিতামাতার আলোচনা শুনিয়াছিলাম। এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে নির্ম্মম স্মৃতি আমাকে ত্যাগ করে নাই। সুতরাং বাবার কথার ইঙ্গিত আমার কাছে আজ আর রহস্য-সমাচ্ছন্ন নহে।

উচ্চহাস্যে কক্ষতল মুখরিত করিয়া সুরেন বাবু বলিলেন, "সে কথা আপনার এখনও মনে আছে বুঝি? সাধারণ ভাবেই কথাটা বলেছিলাম। আপনি কিছু মনে করবেন না, শশাঙ্ক বাবু।"

বাবা বলিলেন, "মনে করলে কি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকত।"

সুরেন বাবু আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার অধ্যাপকদের অনেকের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব আছে, সুধীর। তাঁরা তোমার সাহিত্য-রসজ্ঞানের ভারী প্রশংসা করেন। তা ছাড়া আজ বছর কয়েক ধরে তুমি বুঝি বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে গল্প, প্রবন্ধ লিখ্‌ছ?"

কোনও দিন যে ব্যক্তি গৃহকোণ ছাড়া মানুষের সঙ্গে আলাপ করিতে সঙ্কোচকে ত্যাগ করিতে পারে নাই, আজ পিতৃবন্ধুর সহিত তাহার পক্ষে এ সকল বিষয়ের আলোচনা সম্ভবপর কি?

আমি সত্যই এবার ঘামিয়া উঠিলাম।

বাবার দিকে চাহিয়া সুরেন বাবু বলিলেন, "বাজারে আপনার ছেলের খুব নাম-ডাক হয়েছে। আমি নিজে সাহিত্যিক নই, কিন্তু পড়াশোনার বাতিকটা বড় বেশী, শশাঙ্ক বাবু। রোজ দুই একখানা বই শেষ করতে না পারলে, ভাত হজম হয় না। বিদেশের সাহিত্যটার সংবাদ বেশী করেই রাখি। আমি দেখেছি, আজকালকার বেশী লেখকই খালি ভাবের ঘরে চুরি করে, পরের নকল করে বেড়ায়। কিন্তু আমি মুক্ত কণ্ঠে অনেকের কাছে বলেছি, সুধীরের লেখার মধ্যে মৌলিকত্ব আছে। ওর গল্পগুলি প্রায়ই জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই যেন লেখা। কেমন নয়, সুধীর?"

আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাস অনুভব করি নাই, একথা বলিলে মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। একজন প্রবীণ, জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতের নিকট হইতে এমন প্রশংসা বহু ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে; কিন্তু কোন মতেই মাথা তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিতে পারিলাম না।

বাবা কোন কথাই বলিলেন না। তাঁহার প্রকৃতির সহিত আমার ঘনিষ্টতম পরিচয় ছিল। তাঁহার গম্ভীর মুখে ভাষা নাই, কিন্তু বিশাল হৃদয়তট প্লাবিত করিয়া আমার সম্বন্ধে যে স্নেহের মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহা বহু ভাবেই প্রকাশ পাইতে দেখিয়াছি।

সুরেন বাবু খানিক থামিয়া বলিলেন, "আমার মেয়ে উমা সুধীরের রচনার ভারী পক্ষপাতী। সেদিন বল্‌ছিল, এমন বিশুদ্ধ ভাষা আর পবিত্র আদর্শ আজকাল কদাচিৎ কোন তরুণ লেখকের রচনায় দেখা যায়। কথাটা ঠিক, শশাঙ্ক বাবু। আপনি ওর রচনা পড়েন নি?"

বাবা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "সুধীর, তুমি একবার ভেতরে খবর দেও, সুরেন বাবু এসেছেন।"

মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আমি কক্ষ ত্যাগ করিলাম।

সহসা কাণে গেল, বাবা বলিতেছেন, "সুধীরের সব লেখা আমি আলাদা করে বাঁধিয়ে আমার ঐ আলমারীতে রেখেছি। ওকে দিয়ে আমার জীবনের স্বপ্ন সফল হচ্ছে।"

আমার চলিবার শক্তি রহিত হইল। সত্যই বলিব, পুস্তকাগারের মধ্যে জানু পাতিয়া বসিয়া ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে মনে মনে বলিয়া উঠিলাম, ভগবান, এর বেশী পুরস্কার আমার প্রয়োজন নেই। আজ আমার সাধনা সফল হয়েছে।

কোঁচার প্রান্ত দিয়া উদ্গত অশ্রুবিন্দু মুছিয়া ফেলিয়া লঘু পদে অন্দরে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই যাঁহাকে দেখিতে পাইলাম, তাঁহার সমগ্র আননে এমন অকারণ আনন্দোচ্ছ্বাস অনেকদিন দেখি নাই

বিস্মিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিতেই মা বলিলেন, "কি বল্‌বি মনে কচ্ছিস্?"

আমি বলিলাম, "বাবা বল্লেন, সুরেন বাবু এসেছেন। কিন্তু তোমার আজ কি হয়েছে, মা?'

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে তুই বুঝবি না, বাবা! সুরেন বাবু এসেছেন, তা জানি। তাঁর স্ত্রী আমার সইও চিঠি দিয়েছেন। উমার সঙ্গে তোর বিয়ের সবিশেষ অনুরোধ। ভগবান সত্যি আছেন, বাবা!"

মা আর দাঁড়াইলেন না।

কয়েক মুহূর্ত্ত সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বুঝিতেছি না, অদৃষ্ট মানুষকে কোন্ পথ দিয়া কোথায় লইয়া যায়!

নীচের দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইলাম, একখানা খোলা চিঠি। কুড়াইয়া লইতেই কয়টা ছত্র দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল—"আগের অপরাধ ক্ষমা করিস্, ভাই। উমা তোর সর্ব্বগুণাধার ছেলের যোগ্য নয়। তবু তার এতদিনের তপস্যা যেন ব্যর্থ না হয়। তার--"

কাহার পদশব্দ পাইলাম। পত্রখানি ফেলিয়া দিয়া দ্রুত পলায়ন করিলাম।

গৃহকোণ-লুব্ধ চিত্তকে কিছু বহির্মুখ করিতে হইয়াছে। দেবী ভারতীর সেবায় প্রকাশ্য ভাবে আত্মনিয়োগ করিলে অল্লাধিক এ ব্যবস্থা অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

মাসিক পত্রে রচনা প্রকাশ করা উপলক্ষে কয়েকখানি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের সম্পাদকদিগের সহিত পরিচয় ঘটিয়া গেল। পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইলে, নববধূরও রসনা ক্রমে মুখর হইয়া উঠে। ব্যাবহারিক জগতে ইহা বিরল দৃষ্টান্ত নহে।

সহরের আব্‌হাওয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিবার অবকাশ বিশেষ ভাবে ঘটে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উপলক্ষে সহরে বাস করিতে হইয়াছিল সত্য, কিন্তু পিতা ও মাতার প্রখর দৃষ্টি তাঁহার সন্তানকে অনুক্ষণ বন্ধুর ন্যায় বেষ্টন করিয়া থাকিত। পল্লীর শান্তিপূর্ণ নীড়ের সরল আবেষ্টন হইতে তাঁহারা আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া আমার সহিত কয় বৎসর সহর বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং আমার আলাপ-বিমুখ চিত্ত, গৃহকোণ ছাড়িয়া সহরের বিলাস বিভ্রম অথবা কর্ম্ম-চঞ্চলতার মধ্যে কোন দিনই ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে নাই।

সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে পিতা ও মাতা আমাকে তাঁহাদের আবেষ্টন হইতে ধীরে ধীরে মুক্তি দিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজনীয় বন্ধুর আব্‌হাওয়াই আমাকে পূর্ণবেগে আকৃষ্ট করিত। তাহারই ফাঁকে ফাঁকে কয়জন সম্পাদক বন্ধুর পরিচয় লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলাম।

দেবী ভারতীর পূজাপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ভক্তের সামান্য অর্ঘ্যভার আরাধ্যা দেবীর চরণে অঞ্জলি দিয়া মনে মনে যে অপূর্ব্ব তৃপ্তির আস্বাদ উপভোগ করিতেছিলাম, তাহাতে খ্যামিকারহিত স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য আছে মনে হইতেছিল। ধনী সন্তানের বিরুদ্ধে যে চিরন্তন অপবাদ আছে, তাহা বুঝি এখানে আর মাথা তুলিয়া বিজয়-গৌরবে অট্টহাস্য করিতে পাইবে না।

একদিন কোনও প্রবীণ সম্পাদকের সহিত সাহিত্যালোচনার আনন্দ অনুভব করিতেছি, এমন সময় একটি ভদ্রলোক তথায় প্রবেশ করিলেন। প্রবীণ সম্পাদক এই অপরিচিতের সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। জানিলাম তিনিও একখানি মাসিকের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। নবপরিচিতের সহিত আলাপ আলোচনায় যোগ দিবার শক্তি ও স্পৃহার অভাব আমার জন্মগত দুর্ব্বলতা। সুতরাং নবাগতের সান্নিধ্য আমাকে কিছু অস্থির করিয়া তুলিল।

আগন্তুক ভদ্রলোক বলিলেন, "আপনার সঙ্গে আলাপের সুযোগই আমি খুঁজ্‌ছিলাম।"

আমি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম।

ভদ্রলোক চশমার অন্তরাল হইতে আমার দিকে আগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমাদের কাগজে আপনার একটা লেখা দিন্ না?"

আশ্চর্য্য হইলাম। রচনার জন্য তাগাদা অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্র হইতে পূর্ব্বেও পাইয়াছি, সেজন্য নহে। আমার লেখার জন্য ভদ্রলোক আলাপের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন এবং গল্পের জন্য এমন ভাবে প্রথম আলাপেই তাগাদা, ইহা আমার মত বেরসিক লেখকের পক্ষে বোমা-বিদারণের মতই যেন সাংঘাতিক বলিয়া বোধ হইল।

প্রবীণ সম্পাদকের সহিত আলোচনা ত্যাগ করিয়া বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আজই পল্লীর নিভৃত, শ্যাম অঞ্চল-ছায়ায় আশ্রয় লইবার জন্য ফিরিতে হইবে।

নব-পরিচিত সম্পাদক আমার সঙ্গেই বাহিরে আসিলেন। মোটরে বসিলাম। তিনি বলিলেন, "আমার আবেদন কবে রাখ্‌বেন? আপনার লেখা আমাদের চাইই।"

বলিলাম, "আচ্ছা, যত শীঘ্র পারি চেষ্টা করে দেখ্‌ব। কিন্তু আমার লেখা কি আপনার পছন্দ হবে? আপনারা যে পথের পথিক সে পথে চলবার শক্তি ত আমার নেই!"

ভদ্রলোক বিনয়-নম্র কণ্ঠে বলিলেন, "সে জন্য চিন্তা নেই। আপনি লিখতে রাজী আছেন, এইটুকু আমার জানা দরকার। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কথাটার অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। বাড়ী ফিরিবার আকর্ষণে অন্য চিন্তা মনে স্থান পায় নাই। গৃহের আকর্ষণ তখন অত্যন্ত তীব্র।

* * * *

উমা পড়িবার ঘরে বসিয়া আমার একটি রচনা নকল করিয়া দিতেছিল। এক বৎসরে আমার হৃদয়-লক্ষ্মী, ঘরের ও বাহিরের আমার অনেক কাজের ভার নিজের স্কন্ধে হাসি মুখে তুলিয়া লইয়াছিল। নর্ম্ম-সহচরী, কর্ম্ম-সহচরীর স্থান গ্রহণ করিলে জীবনে আর কোন গ্লানিই থাকে না!

বিষয় কর্ম্মের ভার বাবা সমান ভাবেই বহিতেছিলেন তাঁহার কর্ম্ম-শক্তি অটুট। তিনি জীবনের মধুরতম মুহূর্ত্তগুলি আমাকে পূর্ণ ভাবে উপভোগ করিবার অবকাশ দিয়াছিলেন। এমন বাবা যেন জন্ম জন্ম লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি। বিষয়-পরিচালনের কথা তুলিয়া কোনও বন্ধু অনুযোগ করিলে, তিনি বলিতেন, "সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাই। এখন ওকে জীবন-স্বপ্নকে কিছু কিছু সার্থক করে গড়ে তুলবার অবকাশ দেওয়া দরকার। বিশেষতঃ যে মা লক্ষ্মীকে ঘরে এনেছি। কোন দুঃখ কোন বিষয়েই পেতে হবে না।"

সত্য কথা। উমা শুধু আমার সাহিত্য-সঙ্গিনী নহে। তাহার দৃষ্টি সকল বিষয়েই সমান ভাবে বিদ্যমান। এ পরিচয় এক বৎসরেই সকলে বিশেষ ভাবেই পাইয়াছিল। বিষয়কর্ম্ম চালাইবার বুদ্ধি বাবা সময় সময় উমার নিকট হইতেও নাকি গ্রহণ করিতেন। সে তাঁহার ও মার প্রধান মন্ত্রণা-সচিব ছিল, ইহা আমিও জানিতাম।

ডাকের চিঠিগুলি খুলিয়া খুলিয়া পড়িতেছিলাম। সহসা একখানি অপরিচিত হস্তাক্ষরের চিঠি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। খুলিয়া পড়িবা মাত্র, বোধ হয় আমার অজ্ঞাত সারেই একটা বিস্ময়-ধ্বনি মুখ হইতে নির্গত হইয়া থাকিবে। হাতের কাজ ফেলিয়া উমা আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

"কি হয়েছে?"

অতিকষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিলাম, "পড়ে দেখ!" পড়িতে পড়িতে উমার সুগৌর আননে প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল। তাহার আয়ত নেত্রযুগল জ্বলিয়া উঠিল। কুন্দদন্তে অধর ঈষৎ দংশন করিয়া সে যে আত্ম-সংবরণের চেষ্টা করিতেছিল, তাহা বুঝিলাম।

পত্রখানি নিষ্ঠীবনের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ধৃষ্টতার একটা সীমাও ত আছে! কে এ লোকটা?"

আমার মুখে তখন হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বলিলাম, "দেখতেই পাচ্ছ উনি একখানি মাসিকের সম্পাদক। আমার সঙ্গে কলকাতায় দশ মিনিটের আলাপ।"

স্ফুরিতাধরে তরুণী গৃহলক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "তোমাকে বড়লোক জেনে, তাই এমন ভাবে টাকা চাওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় এমন করে হীন অপমান করার চেষ্টা!"

আমি বলিলাম, "এটা বড়লোক হওয়ার বোধ হয় দুর্ভাগ্য।"

পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া বলিলাম, "ভদ্রলোক বিনয় জানিয়েই লিখেছেন, 'আগামী মাস হইতে আপনার নামে একখানি উপন্যাস মুদ্রিত হইতে থাকিবে, এ জন্য আপনাকে যৎসামান্য আড়াই হাজার টাকা দিলেই চলিবে। আপনার অনুমোদন অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন।'—উপন্যাস লিখ্‌বেন তিনি, নাম হবে আমার, আর সে জন্য টাকাও দিতে হবে আমাকে! মন্দ কি, উমা?"

উমা যে ক্রোধে আগুন হইয়া জ্বলিতেছিল, তাহা বুঝিয়াছিলাম। তাহার ক্রোধদীপ্ত মূর্ত্তি কোনও দিন দেখি নাই। আজ তাহার রূপ যেন আমার কাছে বিশ্বমোহিনী বলিয়া মনে হইতেছিল। দক্ষগৃহে পতিনিন্দা শুনিয়া কি সতীর মন এই ভাবের ক্রোধ ও ক্ষোভে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল?

উমা তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "অসভ্য ইতর লোকটাকে জানিয়ে দাও, জুয়াচুরির আর জায়গা পায়নি সে! আমি নিজেই চিঠি লিখছি। তুমি সই করে দাও—এখুনি।"

আমি হাসিয়া উমাকে কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিতে করিতে বলিলাম, "রাণী! তাতে কি ধনী-সন্তানের অপবাদ ঘুচে যাবে?"

উমা আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া, অপূর্ব্ব মধুর হাস্যঝঙ্কারে কক্ষতল মুখরিত করিয়া কহিল, "সাধকের সাধনা কখনো বিফল হতে দেখেছ? দুদিন পরেই নিন্দুকের রসনা মিথ্যা প্রচার করবার শক্তি হারিয়ে বসবে। সত্যের আলোকে, মিথ্যার অন্ধকার দাঁড়াতে পারে না তাত জান!"

আমি গভীর পরিতৃপ্তি সহকারে উমার আশা, বিশ্বাস ও আনন্দদীপ্ত আননের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

—শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

একখানি বই কয়দিন হলো পড়লাম। তিনজন ভাবুক লেখক, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীপ্রমথ চৌধুরী (বীরবল) ও শ্রীদিলীপ কুমার রায়, পরস্পরকে খোলা চিঠি যোগে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ সম্বন্ধে নিজেদের মতামত জানাচ্ছেন ও অপরের মতের সমালোচনা করছেন—বইখানার বিশেষত্ব এই।

দিলীপবাবু বিজ্ঞানের tragedy নামক প্রথম প্রবন্ধে এই বলে তর্কযুদ্ধের অবতারণা করেছেন যে, ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের যে প্রবল শত্রুতা ও যুদ্ধ চলে আসছিল শতাব্দী ধরে তার উপস্থিত পরিণাম এই হয়েছে যে বিজ্ঞান হার মেনে সুর বদলেছে এবং ধর্ম্ম জয়ী হয়েছে—; বিজ্ঞান সদম্ভে বলে আস্‌ছিল যে আধ্যাত্মিকতা বলে কিছুই নাই, আছে মাত্র জড়, জড়ের রাজ্য, জড়ের প্রভাব; অন্তর বা বাহ্য জগৎ, মন বা দেহ যা কিছু সবই অন্ধ পরমাণুর খেলা; Tyndall না কে বলেছিলেন "give me matter and motion and I will create a universe—"; আত্মা বা আত্মচৈতন্য কিছু না; তাণ্ডব নৃত্যোন্মত্ত পরমাণু রাশি হতে দৈবাৎ উত্থিত একটা frictional flash! epiphenomenon! ইত্যাদি ইত্যাদি—ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের ছিল এই সুর। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের সুর অন্য রকম; তার মানে উল্টা, বিংশ শতাব্দীর নব্য বিজ্ঞান, ভিত্তি যার new physics—তা অনেক ঠেকে শিখে সুর নরম করেছেন; তার দম্ভ অনেকটা চূর্ণ হয়েছে—নব্য বিজ্ঞান নিজ শক্তির সীমা দেখতে পেয়েছে, কতদূর তার স্বাধিকার এবং কোথায় তার অনধিকারচর্চ্চা তা বিনয়াবনত নব্যবিজ্ঞান জানতে পেরেছে এবং স্বীকারও করছে।"

এইকথাগুলিই ঠিক দিলীপবাবুর নয়; তবে তাঁর বক্তব্যের মূল কথা এই বটে। বিজ্ঞানের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন যে 'বিজ্ঞান' হার মেনে তার দাবী-দাওয়া সব ছেড়ে দিয়ে বসেছে এবং ধর্ম্মের সব দাবী-দাওয়া স্বীকার করে নিয়েছে। তা যদি সত্য হয় তবে বিজ্ঞানের পক্ষে খুব tragedy বটে এবং কিঞ্চিৎ comedy মিশ্রিতও বটে! তা না হলে কিন্তু 'বিজ্ঞানের Tragedy' নামটা বড় কড়া হয়েছে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় উত্তরে বলতে চান যে "new physics পুরানো ধর্ম্ম মতকে প্রমাণ করেনি, শুধু বিজ্ঞানের যে materialistic scientific philosophy ছিল তাতে একটু ধাক্কা দিয়েছে মাত্র; বিজ্ঞানের সযত্নে গড়া সৌধের structure টা demolish করতে পারে নি।

প্রমথ বাবুও অতুল বাবুর কথায় সায় দিয়ে বলছেন "এ কথা ঠিক—Russell ঘোর ধর্ম্মদ্বেষী - Whitehead, Millikan, এঁরা ধর্ম্মপ্রাণ, Eddington ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান—এঁরাও কোথাও পুরাতন creedal ধর্ম্মের হয়ে new physicsএর দোহাই দেননি—কোথাও এঁরা উল্লেখ করেন নি যে new physics ধর্ম্মকে প্রমাণ করে বসেছে—মোট কথা নব্য physics সনাতন ধর্ম্মমতকে ঠেলে তোলেন নি। গত শতাব্দীর scientific philosophyকে শুধু চিৎ করেছে।"

এই উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক প্রবন্ধগুলি শিক্ষিত বাঙ্গালীরা যদি পড়েন তা হলে অনেক বিষয় শিখতে পারবেন; অনেক ভাববার বিষয় পাবেন; প্রতীচ্য দেশে ইয়ুরোপে ও আমেরিকার জ্ঞান জগতে যে সব নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ও চিন্তা-জগতে যে সব ভাবান্তর এসেছে তারও পরিচয় পাবেন। পশ্চিমের সভ্য জাতিরা শুধু যুদ্ধই করেনা, পররাজ্য অপহরণেই ব্যস্ত নয়; ভোগ বিলাসেই ডুবে নাই; তারা জ্ঞান-রাজ্যে কি যুগান্তর এনেছে তার সঙ্গে পরিচয় এ দেশের শিক্ষিতরা কমই রাখেন।

এক শ্রেণীর পাঠক এই গ্রন্থ পড়ে খুব উল্লসিত হবেন। যাঁরা ভারতীয় আর্য্য ধর্ম্ম ও দর্শনের মহিমা অন্তরে অনুভব করে গর্ব্ব বোধ করেন তাঁরা পাশ্চাত্য নব্যবিজ্ঞানের এই নূতন সুর শুনে গর্ব্বে পুলকিত হবেন। গত বৈশাখ সংখ্যার "উপাসনায়" আমার রচিত 'প্রাচীন বেদান্ত ও নব্য বিজ্ঞান প্রবন্ধ'এ আমি আলোচনা করে সাধারণকে এই কথাই জানিয়েছি যে গত শতাব্দীর গর্ব্বান্ধ জড় বিজ্ঞান তার materialistic philosophy বর্জ্জন করে বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের উপর নিজ philosophy স্থাপিত করতে চলেছে।

এই বিষয়েই আরো বিশদ খবরাখবর এই পুস্তক মারফৎ ভাল ভাবে লেখকের লেখার ভিতর দিয়েই পাঠক পাবেন। শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর অনুপম লিপি-নৈপুণ্যের আস্বাদ পাওয়া মাসিকপত্র পাঠকের ভাগ্যে কমই ঘটে। এ গ্রন্থ পাঠে পাঠক সে আনন্দ উপভোগ করবেন।

তবে সাধারণ পাঠকবর্গের কাছে যে দুটি বিষয় 'জু জু' বা অস্পৃশ্য তা হচ্ছে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান; সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে পত্রাবলীর ভাগ্যে কি হবে!

দিলীপ বাবু বলতে চান "physics রাজ্যে হঠাৎ Revolution হওয়াতে বিজ্ঞান একদম উল্টে পড়েছে, ফলে religionএর অতঃপর জয় হয়েছে।" অতুল বাবু বলছেন "নব physics ধর্ম্মমতকে প্রমাণ করেনি শুধু তথাকথিত scientific philosphyকে ধাক্কা লাগিয়েছে!' প্রমথবাবু বলেন "অতুলবাবুর কথাই ঠিক।" এতে মোকদ্দমার ফল দাঁড়ালো এই যে দিলীপ বাবুর allegation ঠিক নয়। বিজ্ঞান হার মানেনি, ধর্ম্মও জয় লাভ করেনি।

সত্যই কি দিলীপবাবু যা বলতে চান তা নয়? মনে হয় যত গোল হচ্ছে ঐ ধর্ম্ম কথাটার অর্থ নিয়ে।

এখন ধর্ম্ম বলতে যদি দিলীপবাবু বোঝেন creed-যুক্ত ধর্ম্ম, আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম; ধর্ম্মের যে-সব বিশ্বাস তার সমষ্টি তা হলে তাঁর দাবীটা ভুল; সব ধর্ম্মই তার শাস্ত্রে cosmology, psychology, theology সম্বন্ধে অদ্ভুত বিচিত্র ধারণা রাখে; এবং ধর্ম্মপন্থীদের তাই মানতে বাধ্য করে; না মানলে তাদের 'অধার্ম্মিক' 'নাস্তিক' এই সব অপবাদ দেয়। ইয়ুরোপে যে দীর্ঘকালব্যাপী ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের যুদ্ধ, তাতো এই নিয়েই। Bible বর্ণিত সৌরজগৎতত্ত্ব বা সৃষ্টিতত্ত্ব বা খৃষ্টের 'অযোনি-সম্ভবত্ব' (virgin birth) এই সব না মানাতে কত বৈজ্ঞানিককে আগুণে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, inquisitionএর নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, তা কে না জানেন? প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রাচীন শাস্ত্রে এইরূপ সব বালকোচিত কল্পনা-জল্পনা আছে; যা না মানলে গোঁড়ারা অগ্নিশর্ম্মা হন্ ক্ষেপে!

এখন দিলীপবাবু কি বলতে চান যে new physics তথাকথিত creedal religionএর ঐ সব বিশ্বাস বা মতামতকে সমর্থন করতে আরম্ভ করেছে? খুব সম্ভব না।

দ্বিতীয়তঃ—ধর্ম্ম বলতে যদি দিলীপবাবু এই বুঝে থাকেন যে জগতের ও জীবের পেছনে (background) যে অজ্ঞেয়, চরম কারণরূপ 'বাক্যমনের অতীত' এক চিন্ময় পরম পুরুষ আছেন, তাঁর প্রতি অন্তরের attitude of love and reverence; যাঁর ধ্যান-ধারণায় এবং যাঁর সঙ্গে সাযুজ্য-বোধে জীবাত্মার সমস্ত aspirations and yearningsএর চরম চরিতার্থতা হয়—এবং এই ভাব সাধনায় বিজ্ঞান আর বাধা দেয় না এবং বিজ্ঞান তাঁকেই স্বীকার করে নিয়েছে, এবং এতেই বিজ্ঞানের হার মানা ও ধর্ম্মের জয়, তা'হলে দিলীপ বাবু খুব অন্যায় বা ভুল কথা বলেন নি। তবে বিজ্ঞানের tragedy এই নামকরণটা বড় misleading হয়েছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে গত শতাব্দীতে popal religion যে সব মানা-না-মানা নিয়ে বিজ্ঞানের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন এখন বুঝি new physics গায়ে পেতে সেইগুলাই মেনে নিচ্ছেন!

ব্যবহারিক জগতে মায়া-যবনিকার এ দিকের রাজ্যে space, time, causationএর যেখানে অপ্রতিহত প্রভাব তথায় বিজ্ঞান এখনো monarch of all it surveys। জ্যোতিষশাস্ত্রে, ভূতত্ত্বে, রসায়নশাস্ত্রে, জীবতত্ত্বে যে সমস্ত সত্যের natural lawsএর আবিষ্কার বিজ্ঞান করেছে ও করবে তা চিরকাল মান্য হবে।

কিন্তু ব্যবহারিক জগতের ওপারে যেখানে (space, time and causation) মায়ার অধিকার নাই যেটা hinterland of science, যেটাকে Eddington spiritual world বলছেন (ভূতের রাজ্য নয় আধ্যাত্মিক রাজ্য) সেখানে বিজ্ঞানের অধিকার নাই; এই জন্যই নাই যে ইন্দ্রিয়াধীন ব্যবহারিক জগতেই মাপজোঁক (metrical measurements), পরীক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণ চলে; অধ্যাত্ম-জগতে তা চলে না। অধ্যাত্মজগৎ (ব্রহ্মরাজ্য) space, time, causeএর বাইরে।

এখন দেখা যাক্ বিজ্ঞানের হার কোথায়?

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে Huxley, Haekel, Tyndall প্রভৃতির যুগে জড় বিজ্ঞান অনেকটা গর্ব্বান্ধ হয়েই পড়ে এই ভেবে যে, বিশ্বে জড়পরমাণু ছাড়া আর কিছু নাই; এই পরমাণুই চরম ও পরমতত্ত্ব; আত্মা বা চৈতন্য, মন বা চিত্ত-ধর্ম্ম, এ সমস্তই অন্ধ পরমাণুর সংঘর্ষ-জনিত; পরমাণুদের এক অজানা উপায়ে দৈব সমবায়, সংযোগ ঘটাতে এই চৈতন্যের

উৎপত্তি ; দৈবযোগে যেমন তার উৎপত্তি, দৈবযোগেই তার লয় ; thought মস্তিষ্ক হতে ক্ষরিত রস-বিশেষ ! আধ্যাত্মিক বলে কিছু নাই, given matter and motion সমস্ত বিশ্ব ও বিশ্বরহস্য তৈরী করে ফেলা যায়। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, জীব, উদ্ভিদ, দেহ বা মন সবই একটা বিরাট mechanism ; শুধু পরমাণুপুঞ্জকে সাজানোর ফল মাত্র। যা কিছু অমীমাংসিত রহস্য বিশ্বে বা জীবদেহে আছে, তা physics, chemistryর নবাবিষ্কৃত laws দিয়ে সহজ হয়ে যাবে। এই যে মত এ হ'ল খাঁটী materialism—materialistic monism ! এই মতে জড় পরমাণুই একমাত্র চরম তত্ত্ব ; চৈতন্য সাময়িক আগন্তুক তত্ত্ব মাত্র। চিত্ত ও চিত্ত-ধর্ম্ম সবই জড়জাত, জড়েই স্থিতি তাদের, জড়েই লয়। সমগ্র বিশ্বটা fortuitous concourse of atoms ঘটিত একটা ফল মাত্র।

বিংশশতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের সুর অন্যরকম—

পরমাণু সম্বন্ধে—

ঊনবিংশ শতাব্দীর atomএর পুরাতনরূপ মরেছে এবং তার পুনর্জন্ম হয়েছে electron ও protonরূপে। Atom আর অকাট্য, অবিভাজ্য নিরেট জড়কণা নয় ; স্বরূপে সে এখন একটা সৌরজগৎ, proton তার মধ্য-সূর্য্য, electron তার গ্রহরাশি। আর এই electron ? তারই বা স্বরূপ কি ? Radiant energy মাত্র ! জড়ত্ব তার নাই-ই। জড় তা হলে স্বরূপে কি ? Eddington বলছেন, We now realise that science has nothing to say as to the intrinsic nature of the atom. The physical atom is a schedule of pointer readings—attached to some unknown background.

Why not then attach *it to something of a* spiritual nature, of which a prominent characteristic is thought. It is silly to prefer attach it to something of a so-called concrete nature inconsistent with thought and then wonder where the thought came from !

মন সম্বন্ধে

[illegible] শতাব্দীর বিজ্ঞান মনকে তো জড়ের একটী [illegible]omenon বলে উড়িয়েই দিয়েছিল ; জগতের [illegible] উদ্ভিদের জীবের জীবন-ধারণের মূলে মনের (মনশ্চৈতন্যের) কোনো প্রয়োজনীয়তাই নাই। মন একটা অবান্তর তত্ত্ব। এ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক বলেন "Mind is the first and most direct thing in our experience ; all else is remote inference." (Eddington—Swarthmore lecture p. 24)

Dr. Jeans তাঁর Mysterious Universe গ্রন্থের শেষাধ্যায়ে মন সম্বন্ধে বলছেন—Mind no longer appears as an accidental intruder into the realm of matter··· we ought rather to hail it as the creator and governor of the realm of matter—(p. 140)

জড়ের চরম স্বরূপ নির্ণয় করতে New physics এর যত চেষ্টা তার আলোচনা করে Eddington এই সিদ্ধান্ত করছেন—"To put the conclusion crudely—the stuff of the world is mind-stuff—by 'mind' I do not exactly mean mind and by 'stuff' I do not at all mean stuff, the mindstuff of the world is of course something more general than our individual conscious minds·········." William Jamesএর Mind stuff, Bertrand Russell এর Neutral stuff, সাংখ্যের মহৎতত্ত্ব এসব একই তত্ত্বের নামান্তর। নব্যবিজ্ঞানবিৎ তা হলে বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে জগতের মূলে মনচৈতন্য, এবং জগতের উপাদান আসলে আমাদের মনোলব্ধ প্রত্যয় সমষ্টি percepts। "Substantial matter resolving into a creation and manifestation of mind" (Myst. Uni. p. 149)

আমাদের দেশের প্রাচীন বেদান্ত ও সাংখ্য-দর্শনেরও গোড়ার কথা তাই। উপনিষদকার ঋষি জগতের Evolution বুঝিয়েছেন সূক্ষ্ম হতে স্থূলের অভিব্যক্তি ক্রম ধরে। সব চেয়ে সূক্ষ্ম পদার্থ হচ্ছে আকাশ বা Ether ; এই আকাশ কোথা হতে ? না 'মন' হতে ; মন কোথা হতে ? আত্মা হতে—আত্মা ও ব্রহ্ম একই। আকাশ তেজ বায়ু এসব তো ভৌতিক পদার্থ ; মন হতে আকাশ বা তেজ বা বায়ু কি করে হয় ? উত্তর—আকাশ তেজ বায়ু প্রভৃতি ক্রমধরে যে স্থূলজগতের অভিব্যক্তি তা আসলে Hypothesis ; hypothesisএর উৎপত্তি মন হতে, মনচৈতন্য আত্মারই চৈতন্য। 'আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ' ; "In the Beginning was the mind"—এ সবের ঐ একই অর্থ। বেদ বা বাইবেলের ঋষিদের কথার

সুরেই নব্য-বিজ্ঞানবিদের এই কথা ; mind হতেই matter এর রূপকল্পনা ; সৃষ্টির মূলে mind বা mind-stuff।

সৃষ্টিকর্ত্তা

জগতের উপাদান কারণ যে চিৎবস্তু (mind stuff)এ সন্দেহ বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক New physicsএর সাহসে করছেন ; জগতের নিমিত্ত কারণ ? সৃষ্টিকর্ত্তা ? Dr. Jeans এর Mysterious Universe হতে কয়েকটা কথা তুলে শুনানো যাক্—

"Thirty years ago we thought we were heading towards an ultimate reality of a mechanical kind. It seemed to consist of a fortuitous jumble of atoms which was destined to perform meaningless dances for a time under the action of blind purposeless forces and then fall back to form a dead world. ..... Into this wholly mechanical world through the play of some blind forces life has stumbled by accident..........." গত শতাব্দীর মদগর্ব্বিত বিজ্ঞানের এ চিত্র—..."To day there is a wide measure of agreement which on the side of science approaches almost to unanimity that the stream of knowledge is heading towards a non-mechanical reality—the universe looks more like a great thought than like a machine ...... Mind is no longer an intruder, we ought rather to hail it as the creator & governor of the realm of matter......we discover that the universe shows evidence of a designing or controlling power that has something common with our individual minds".

এ শতাব্দীর নব্যবিজ্ঞানবিদের মুখে এই সুর :—বিশ্বটা একটা great thought—যার মূলে একটা designing & controlling mindএর evidence দেখা যাচ্ছে।

নব্য শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের মুখে এই সুর শুনে যদি কেউ বলেন যে ধর্ম্মের জয় হচ্ছে, বিজ্ঞানের হার হচ্ছে তা হলে এক ভাবে কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়।

গত শতাব্দীতে বিজ্ঞান যে সুর ধরেছিল এবং শাস্ত্র-ধর্ম্ম যে জিদ্ ধরে চলেছিল তাতে একজন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে শাস্ত্রীয় ধর্ম্মে বিশ্বাসী হওয়া অসম্ভব ছিল। ধর্ম্মে ও বিজ্ঞানে সম্বন্ধ ছিল অহি-নকুল। এ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চিন্তা-প্রণালীতে এমন সব পরিবর্ত্তন এসে পড়েছে যে বিজ্ঞানে ও ধর্ম্মে reconciliation সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞান তার আয়ত্বাধীনে যত method আছে সবের সাহায্যে জড়-জগতের চরম সীমান্তে উপনীত হয়েও কোনো concrete realityকে ধরতে ছুঁতে পেলে না, পেলে শুধু 'shadow world of symbols' এর সাক্ষাৎ! এ সব symbol এর পেছনে কি ?......something বাক্য মনের অতীত যেখানে বিজ্ঞানের জারীজুরী চলে না। এই সব দেখেশুনে বিজ্ঞানকে মানতে হ'লো যে তার অধিকারের সীমা আছে—এই সীমার বাহিরটা বিজ্ঞানের hinterland।

এর উপর new physics ১৯২৭ সালে declare করে যে material world এতেও deterministic laws এর জোর খাটে না। Causalityর চিরতরে ইতি হয়ে গেল। জড় পরমাণু বা electronগুলা যা খুসি তাই করতে পারে ; যে ভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারে! তাদের যেন free will আছে। এই সব দেখে শুনে Eddington বললেন "Religion first became possible for a reasonable scientific man about the year 1927".

গত শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকের নামের সঙ্গে ধার্ম্মিক হওয়ার অপবাদ কেহ দিতে সাহস করতে পারতো ? Huxley Haeckel এর যুগে কোনো বিজ্ঞানবিদ্যাগর্ব্বিত লোক সাহস করে বলতে পারতেন যে জড় পরমাণুগুলা shadow world এর symbol মাত্র ! বলতে পারতেন যে জড়ের রূপ মিথ্যা, জড় মূলতত্ত্ব নয়, মনই মূলতত্ত্ব ; মন creator & governor of matter ! বলতে পারতেন কেউ যে বিশ্বের গঠনে এক designing & controlling শক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে? বলতে পারতেন তিনি যে physical world এর বাইরে একটা equally real spiritual world আছে ! বলতে পারতেন তিনি mind is the first and most direct thing in our experience : all else is remote inference !"

৩০ বছর আগে বৈজ্ঞানিক যা কল্পনা করতে পারতেন না, এখনকার বৈজ্ঞানিক তা জোর-গলায় প্রচার করছেন। সিদ্ধান্ত এই যে, বিজ্ঞান নব্যশতাব্দীতে অনেক

জেনেশুনে humility শিক্ষা করেছে। নিজের অধিকার কত দূর তা জানতে পেরেছে। তার বাইরে যে আধ্যাত্মিক জগৎ আছে এবং তারও বিধিব্যবস্থা (laws) আছে, এ তত্ত্ব স্বীকার করছে ; এবং সেই বিজ্ঞান এমন সব কথা বলছে যাতে বুঝা যাচ্ছে যে বিজ্ঞানে ও ধর্ম্মে চরম মূলে কোনো ভেদ নাই ; দুএরই philosophy এক ভিত্তিতে দাঁড়াতে পারে। বিজ্ঞান ব্যবহারিক জগতের বিদ্যা ; ধর্ম্ম পারমার্থিক জগতের বিদ্যা। বিজ্ঞানের আইনের রাজ্যে ধর্ম্মের জবরদস্তি চালাতে যাওয়াতে এবং পারমার্থিক বিজ্ঞানের রাজ্যে সদর্প প্রবেশ ও অনধিকার চর্চ্চা করতে যাওয়াতেই গত শতাব্দীতে ধর্ম্মে ও বিজ্ঞানে এরূপ শত্রুতা চলেছিল। তা হলেও বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবে ও যথার্থ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে কখনো ঝগড়া হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক যে ধার্ম্মিক হতে পারেনা তা নয়; Darwin বা Kepler বা Newton কি ধার্ম্মিক ছিলেন না? কিন্তু ধার্ম্মিক ছিলেন বলে একথা যেন ধর্ম্মধ্বজীরা না মনে করেন যে প্রকৃতির রাজ্যের phenomenaর কারণ ব্যাখ্যা করতে তাঁরা শাস্ত্রের দোহাই দিতেন। ধর্ম্মপ্রাণ বৈজ্ঞানিকের খোলসা কথা এই যে, 'সৃষ্টির মূলে এক চিন্ময় পরম পুরুষ থাকতে পারাকে অসম্ভব ভাবি না ; কিন্তু সৃষ্টির পদ্ধতি ও প্রণালীকে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। এবং সিদ্ধান্ত যুক্তি প্রমাণ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। নচেৎ শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমস্ত ঘটনার কারণ নির্ণয় করা হবে, এ আমরা কিছুতেই মানতে রাজী নই।' বিজ্ঞানের কি সেই অবস্থা এসেছে? প্রকৃতির রাজ্যের phenomena ব্যাখ্যায় বিজ্ঞান যে সব nature laws আবিষ্কার করেছেন তা কি সব ভুল বলে বিজ্ঞান স্বীকার করেছে? এবং বেদ বাইবেলের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছে? সৌরজগতের সূর্য্যকেন্দ্রিক view ছেড়ে দিয়ে ভূকেন্দ্রিক view গ্রহণ করেছে? তা যদি না করে থাকে তবে বিজ্ঞান হার মেনেছে বা কাৎ হয়েছে বলি কি করে? জোর এইটুকু হয়েছে যে বিজ্ঞান তার শক্তির সীমা বুঝেছে—অধিকারের বাইরে যা সব অতীন্দ্রিয় বিষয় আছে—spiritual world, religious experience, বিশ্বের মূল তত্ত্ব প্রভৃতি—এগুলা স্বীকার করছে এবং এ সব যে বিজ্ঞানের অনধিকার চর্চ্চা তাই স্বীকার করেছে। বিজ্ঞান-শাস্ত্রী humility স্বীকার করেছেন।

উপসংহারে শেষ বক্তব্য এই যে এই শতাব্দীতে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের যা সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে, তাতে উভয়ের পুরাতন দা-কুমড়া সম্বন্ধও নাই, আবার গলাগলি কোলাকুলি সম্বন্ধও ঘটে নি। ব্যবহারিক জগতে বিজ্ঞানের পূরা আধিপত্যই আছে ; প্রাকৃত জগতের রহস্যভেদ ব্যাপারে বিজ্ঞান তার নিজ পদ্ধতির উপরই বিশ্বাসবান ; ধর্ম্মশাস্ত্র সাহায্যে ঘটনা ব্যাখ্যা করার দুর্ম্মতি তার হয়নি। কেবল জগতের পারমার্থিক ব্যাপারে transcendental worldএর, spiritual realmএর ঘটনা সম্বন্ধে বিজ্ঞান অনধিকার চর্চ্চা বুঝে সরে দাঁড়িয়েছে ; বিজ্ঞানের যে philosophy যা materialistic monism ছিল তা এক রকম psycho-physical monismএ দাঁড়াবার ভাব দেখাচ্ছে। একে বিজ্ঞানের সুর পরিবর্ত্তন বলা যায় ; তাও শুধু বিশ্বের চরম তত্ত্বের স্বরূপ বিচারে। অতুল বাবু ও প্রমথ বাবু যা বলেন, scientific philosophyতে new physics যা দিয়েছে। তাও যদি হয়, ধর্ম্ম মাত্রেই যখন একটা philosophyর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, এবং ভবিষ্য বিজ্ঞানের philosophy সেরেফ জড়বাদ না হয়ে বিশুদ্ধ চিৎবাদই (idealistic) হয় যদি, তা হলে বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ঈশ্বরপরায়ণ বা ব্রহ্মবিদ্ হওয়া আশ্চর্য্য নয়! তা যদি না হয় তা হলে গত শতাব্দীর বিজ্ঞানের গর্ব্বান্ধতার কথা ভাবলে বর্ত্তমান ভাবান্তরটা 'tragedy' একভাবে তো বটেই! ৩০ বছর আগে প্রাণহীন অন্ধ পরমাণুর জয়গান করতে করতে আজ হঠাৎ বলে বসা যে বিশ্বের মূল কারণ mechanical concrete reality নয়, পরন্তু একটা designing controlling mind power! একে এক রকম tragedy বললেও নেহাৎ ভুল হয় না। Samuel Johnson পাথরে সবুট পদাঘাত করে Berkleyর idealism refute করলেন এই বলে I prove it thus! অর্থাৎ 'matter নাই! পাদরী বার্কলি বলে কি? এই দেখ matter আছে কি না!'—আজ ১৯৩২ সালে জড় বৈজ্ঞানিকই বলেছেন "substantial matter resolving itself into a creation and manifestation of *mind.*" Tragedy ও Comedy একাধারে! *

* পত্রাবলী—ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান। লেখক—শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

নেপালের সৌধকলা

যামিনীকান্ত সেন

কাশ্মীরকে 'ভূস্বর্গ' বলা হ'য়ে থাকে—যাঁরা নেপাল দেখেছেন তাঁরা বরফাচ্ছন্ন পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতবেষ্টিত এই ভূখণ্ডটি কি বলবেন জানিনে। পৃথিবীর উচ্চতম তুষারাচ্ছন্ন পাহাড়গুলি নেপাল উপত্যকার চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে—নন্দদেবী (২৫,১০০ ফিট) পশ্চিমে, ধবলগিরি (২৬,৮৩৭ ফিট) ও গোঁসাই স্থান (২৬,৩১৩ ফিট) পূর্ব্বে ; কাঞ্চনজঙ্ঘা ও গৌরীশঙ্করও এই পর্ব্বতমালার ভিতর মাথা তুলে' আছে।

এদেশে চার হাজার ফিটের উপর বাগমতী ও বিষ্ণুমতী নদী প্রবাহিত—শীত ঋতুতে চারি দিকে বরফাচ্ছন্ন হলেও এদের স্রোতের বিরাম নেই। ত্রিশূলধারার জলপ্রপাত, নীলকণ্ঠ কুণ্ড হ্রদ প্রভৃতি এত উচ্চে অবস্থিত যে এসব জগতের দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য ইউরোপীয়েরা নেপালকে Switzerland of Asia বলে থাকে। নেপালের সর্ব্বনিম্ন অঞ্চলও উরোপের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত হ'তে উচ্চতর।

আশ্চর্য্যের বিষয় নেপাল নানাদিকেই প্রাচ্য সভ্যতার প্রতীকরূপে এ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে। অগণ্য দেবতা ও মন্দির অতি প্রাচীন কাল হ'তে প্রাচ্য সভ্যতার একটা ধারাকে এখানে প্রতিষ্ঠা দান করেছে। এই ধারা বার বার ভারতবর্ষ হ'তে পুষ্টি ও প্রাণশক্তি লাভ করেছে। নেপালের রাজন্যগণের অধিকাংশই ভারতবর্ষ হ'তে এসেছেন—নানা বংশই, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারত হ'তে নিজেদের আগমনের বিষয় বলে গেছে।

উত্তর ভারতীয় এই অনির্ব্বচনীয় ভূখণ্ডে যে ভারতীয় সভ্যতার ধারা পুষ্ট হয়েছে তা' তিব্বত, চীন ও জাপানকে নানা বিদ্যায় দীক্ষিত করেছে। খুব কম লোকেরই জানা আছে যে তিব্বতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন মন্দির ও মঠগুলি নেপালী শিল্পীর তৈরী। E. Kawa-Guchi বলেছেন, "Over a long period the Nepalis were the architects, the sculptors and the icon-painters of Tibet and the Buddhist images, pictures at present produced in Tibet are worthless compared to the art of former times."

Mr. Campbell. I.A.S.B. Vol 5. 1835. (pp. 219-27)এ বলেছেন, "Newar artisans were sent to the monasteries so far distant as the interior of Tartary, to decorate the great Lamaserais. Newars have largely influenced the art of China and this is admitted in the annals, Newar artisans were employed in Tibet, Tartary and many parts of China."

অনেকেই জানেন যাকে pagoda style of architecture বলা হয় তা'র আদিস্থান হচ্ছে নেপাল। নেপাল হ'তেই তা চীন ও জাপানে যায়। এতে মনে হয় নেপাল অনেক বিষয়ে প্রাচ্যশিল্পের শিক্ষাগুরু। বলা প্রয়োজন বাংলা দেশ আবার এই মন্ত্রে মাঝে মাঝে নেপালকে দীক্ষিত করেছে। Sir Charles Eliot বলেছেন "No doubt Tibetan Art was founded at Nepal, which in turn came from Bengal" অর্থাৎ তিব্বতীয় কলা নেপাল কলার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, নেপাল কলাও বাংলা দেশ হ'তে এসেছে।

চীন সম্রাট Kubla Khan নিজের দরবারে Aniko নামক একজন নেপালী শিল্পীকে কলাগুরু নিযুক্ত করেছিলেন। এতে সহজেই মনে হয়, যে-শিল্প বাইরে এরকম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে নেপাল উপত্যকার ভিতর সে শিল্প কি সৃষ্টি করেছে তা' বিশেষভাবে দেখবার জিনিষ। বাস্তবিক প্রাচীন ও আধুনিক সৌধকলার জন্য নেপাল জগতে খ্যাতি অর্জ্জন করতে পারে।

নেপালের স্বয়ম্ভু মন্দিরই সব চেয়ে রোমাঞ্চকর। একটু সমুচ্চ পাহাড়ের উপর এই মন্দিরটি স্থাপিত হওয়াতে বহুদূর হতে এ মন্দিরের স্বর্ণচূড়া দীপ্যমান হয়। প্রভাতের সবুজ গাছপালার আবেষ্টনের ভিতর যখন ধোঁয়ার মত কুয়াসা এদিকে ওদিকে রহস্যের আবরণ ছড়ায়, তখন অরুণালোকে এই মন্দিরের স্বর্ণচূড়া বহুদূর হ'তে এক নিঃশব্দ মায়াজাল নিক্ষেপ করে—মনে হয় বা ইন্দ্রপুরী হ'তে কোন সুবর্ণনির্ম্মিত সৌধ-কোণ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। মন্দিরের উপরকার

অংশে চারদিকেই দুটি করে' প্রকাণ্ড চোখ আঁকা - সেগুলির দৃষ্টি অসীম দিগন্তে নিবদ্ধ বলে মনে হয়—এ দৃষ্টি মন্দিরটিকেও যেন জীবন্ত করে' তুলেছে।

মন্দিরের উপরকার স্তরগুলি স্বর্ণের আস্তরণে আবৃত, উপরকার স্বর্ণছত্রও একই ব্যঞ্জনার অংশীভূত। দূর হ'তে এজন্য মন্দিরটিকে কখনও কখনও অগ্নিশিখার মত দেখা যায়। মন্দিরটি বাস্তবিকই অগ্নিশিখার প্রতিভূ। কথিত আছে, পুরাকালে উপত্যকাটি জলপূর্ণ হ্রদ ছিল—এই হ্রদে স্বয়ম্ভু অগ্নিশিখার আকারে জলে ভাসমান একটি পদ্মের উপর স্বপ্রকাশ হয়েছিলেন। এই বার্ত্তা শুনতে পেয়ে নেপালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মঞ্জুশ্রী অগ্নিশিখার সমীপে উপস্থিত হন এবং

স্বয়ম্ভু মন্দির—নেপাল

ইঙ্গিত পেয়ে পাথরের পাহাড়ের খানিকটা তরবারি দ্বারা উন্মুক্ত করে' জল-নির্গমনের পথ প্রশস্ত করেন; তা'তে করে হ্রদের সমস্ত জল নির্গত হয়ে' একটা মনোহর উপত্যকার সৃষ্টি হয়। এই মহান্ কৃত্যের জন্যই মঞ্জুশ্রী নেপালের সর্ব্ববরেণ্য দেবতা। কথিত আছে রাজা গোরাদাস প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির তৈরী করেন। মন্দিরটির সাম্নের দুয়ারের দু'খানি ছোটমন্দির আছে।

এই মন্দিরে পঞ্চবুদ্ধ স্থাপিত হয়েছেন। বলা বাহুল্য নেপালে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের একটা নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত হয়। আদিবুদ্ধ কল্পনা নেপালেই সম্ভব হয় এবং আদিবুদ্ধকে মধ্যবিন্দু করে' বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি প্রভৃতি দিব্যবুদ্ধ, বুদ্ধশক্তি ও বোধিসত্ত্ব প্রভৃতি কল্পিত হয়। এই মন্দিরের চারিদিকে অনেক ক্ষুদ্র স্তূপ দেখ্তে পাওয়া যায়। যে পাহাড়ের উপর এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত তা'র পাদদেশে কয়েকটি অতিকায় বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটির সাম্নে একটা প্রকাণ্ড চক্র আছে এবং চারিদিকে অসংখ্য প্রার্থনাচক্র আছে। ভক্তেরা এই সমস্ত চক্রকে ঘূর্ণিত ক'রে পুণ্যার্জ্জন করে থাকেন। কাটামুণ্ডুর এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এই মন্দিরটি সমগ্র উপত্যকার একটা গৌরবের বস্তু। মন্দিরের গড়ের নিম্নভাগে পাঁচটি ক্ষুদ্র আধারে পাচটি দিব্যবুদ্ধের মূর্ত্তি আছে। অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব বৈরোচন, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধ এই কয়টি দেবতা এভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন—এদের পার্শ্বের আধারে শক্তিমূর্ত্তিগুলিও আছে, লোচনা, মামকী, বজ্রধাত্বেশ্বরী, পাণ্ডরা ও তারা এমনিভাবে এই মন্দিরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করছেন। এ মন্দিরে তিব্বতীয় লামারা পূজার কাজ করেন। 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' মন্ত্র এঁদেরই একটা বিশিষ্ট জপের বিষয়।

সুরক্ষিত বজ্রটীর নীচে একটা প্রস্তর-ফলকে, যাকে ধাতু-মণ্ডল বলা হয়—তিব্বতীয় বৎসরের বার মাসের প্রতিভূস্বরূপ বারটি জন্তুর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। ইঁদুর, ষাঁড়, বাঘ, খরগোষ, শৃগাল, ড্রাগন, সাপ, ঘোড়া, ভেড়া, বানর, হাঁস এবং শূকর-ছানা এই বারটি জন্তু বারটি মাসের দ্যোতক। বজ্রটী রাজা প্রতাপমল্লের তৈরী। তিনি তান্ত্রিক সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

বৌদ্ধ মন্দিরের ভিতর পাটনের মহাবুদ্ধ মন্দির অতি বিখ্যাত। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অভয় রাজা এ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। নেপালের ইতিহাসে আছে যে বুদ্ধ গয়া হ'তে মন্দিরটির জন্য একটা নমুনা আনা হয়। এ মন্দিরে বুদ্ধের প্রায় নয় হাজার মূর্ত্তি আছে। ইহার উচ্চতা ৭৫ ফিট—তৈরী করতে প্রায় একশ' বছর দরকার হয়। মন্দিরটিতে চারটি তলা আছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ চারিদিকে ঘনসন্নিবিষ্ট গৃহাদির জন্য মন্দিরটির একটা পরিষ্কার দৃশ্য পাওয়া মুস্কিল। প্রবেশের একটী পথ আছে মাত্র—তা পূর্ব্বদিকে। মধ্য প্রকোষ্ঠেই শাক্যসিংহের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

চঙ্গুনারায়ণ মন্দির প্যাগোডা ষ্টাইলের বা প্রথার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অনেক সৌন্দর্য্যসেবীদের মতে ইহা এসিয়ার ভিতর সব চেয়ে মূল্যবান মন্দির। মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দিরও এই শ্রেণীর। মন্দিরের সামনে যে দুইটা কল্পিত সিংহের মূর্ত্তি দেওয়া হয়েছে তা' দেখতে অতি মনোহর। নিজের চোখে না দেখলে এ সব মন্দির সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু ধারণা করা মুস্কিল। আধুনিক জগতে বিজ্ঞানের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, কিন্তু সৌন্দর্য্য-রচনায় অতীতের কাছে যে বর্ত্তমান হার মানে তা' এ সব সৌধমালা দেখলে বোঝা যায়।
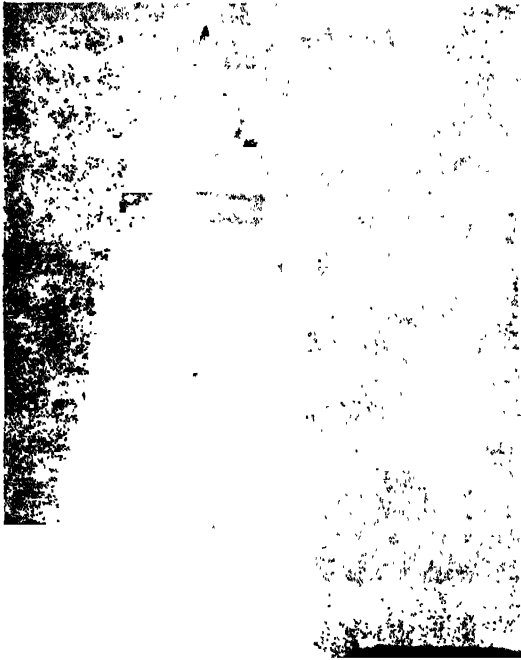
পাটনের মহাবুদ্ধ মন্দির

এ প্রসঙ্গে ভারতবিখ্যাত পশুপতিনাথের মন্দিরের উল্লেখ না করলে চলে না। প্রতি বৎসর বহু সহস্র যাত্রী ভারতের নানা জায়গা হ'তে শিবরাত্রির সময় নেপালে উপস্থিত হয়। নেপালের স্বর্গীয় মহারাজা স্যার ভীম সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা ধর্ম্মপ্রাণ শাসক ছিলেন—তাঁর অন্তর বিরাট ছিল এবং শাসন কার্য্যেও তিনি সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছিলেন। তিনি যাত্রীদের জন্য নানা সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। পশুপতিনাথের মন্দির ধাতুপাত্রে আবৃত—সামনে একটা সুবর্ণের আস্তরণে নির্ম্মিত বিরাট বৃষ আছে। এই মন্দিরটির চারিদিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র মন্দির ও স্তূপ আছে—অধিকাংশ মন্দিরেই দেবতা প্রতিষ্ঠিত। বাগ্‌মতী নদী পার্শ্বে শীর্ণাকারে প্রবাহিত। দর্শকগণ মন্দিরের চারিদিকের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ও শোভা দেখে আত্মহারা হয়। গুহ্যেশ্বরীর মন্দিরও অতি প্রসিদ্ধ। এ মন্দিরটী উপর দিকটা flat। চারিটি কোণ হ'তে চারিটী সোনার সাপ উর্দ্ধে উঠে একটা অদ্ভুত চূড়া নির্ম্মাণ করেছে। মন্দিরটী বৌদ্ধ-তান্ত্রিক—মন্দির-পূজারীরা বৌদ্ধ। বাইরে থেকে ঢোক্‌বার পথে একটা কাষ্ঠের চৌকাঠের অলঙ্করণে দেখা গেল, নর-কঙ্কালের একটা decorative scheme। দেখতে ভারি

পশুপতিনাথের মন্দির

চহৎকার। গুহ্যেশ্বরী মন্দির ও মহাকাল মন্দির মহারাজের বন্দনীয় স্থান। ভাটগাঁয়ের গণেশমন্দিরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তার প্রতিকৃতি দেওয়া হ'লো।

মহাকাল মন্দিরটি টুর্নিখেল ময়দানের উপর অবস্থিত। ইনি তান্ত্রিক দেবতাদের শ্রেষ্ঠতম। অসংখ্য লোক সব সময় এই মন্দিরটিতে আনাগোনা করে। মহারাজ এ পথে গেলে গাড়ী হ'তে অবতরণ ক'রে দেবতার কৃপা ভিক্ষা করেন। সে দৃশ্য অতি চমৎকার। নেপাল রাজ্য স্বাধীন বলে' দেবতাদের মহিমাও এ জায়গায় স্বভাবতঃই বেশী। সাধারণ লোকেরও সেই ধারণা।

নেপালের নারায়ণ মন্দিরগুলিও প্রসিদ্ধ। সমস্ত মন্দির-গুলি প্রদক্ষিণ না করলে এ সমস্তের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য প্রাণে

পড়েনা। কালী মন্দিরের ভিতর দক্ষিণ কালীমন্দিরই সুবিখ্যাত। এ মন্দিরে অষ্টমাতৃকা মূর্ত্তি আছে। পাটনের সুন্দর চকের তান্ত্রিক মন্দিরগুলিও অতি চমৎকার। গুপ্ত স্থাপত্যের প্রভাবে মন্দিরের সামনে গঙ্গা ও যমুনামূর্ত্তি রচিত হয়েছে। চৌষট্টি যোগিনী মূর্ত্তিগুলিও দেখবার জিনিষ।

অধিকাংশ মন্দিরেই ভোরে বাদ্যযন্ত্রাদির মধুর আওয়াজ পাওয়া যায়। মন্দিরাদি লক্ষ্য ক'রেই সঙ্গীতকলার বিকাশ হ'য়ে থাকে—নেপালের লোক সঙ্গীতভক্ত। অতি প্রত্যূষে অসংখ্য ফুলের সাজি হাতে নিয়ে ভক্তেরা মন্দিরে উপস্থিত হয় —সে দৃশ্য অতি চমৎকার।

ভাটগাঁও গণেশ মন্দির

আধুনিক মন্দিরের ভিতর কালমোচনের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। মহারাজা জঙ্ বাহাদুরের মূর্ত্তি এ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনিই ইহার নির্ম্মাতা—এই মন্দির ত্রিপুরেশ্বরে অবস্থিত। বলতে গেলে এই মন্দিরই অতীত ও বর্ত্তমানের সেতুস্থানীয়। অতীতের সৌধকলা এ মন্দিরে কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু মন্দিরসংলগ্ন মূর্ত্তিকলার তেজস্বিতা কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি। এই মন্দিরের গরুড় মূর্ত্তিতে বেশ নিপুণতা আছে। প্রকাণ্ড প্রাঙ্গনের মুক্ততাও উপভোগ্য এবং সুদৃশ্য। মহারাজ জঙ্ বাহাদুর ইউরোপ গিয়েছিলেন—বস্তুতঃ তিনিই প্রাচীনযুগের শেষ মহারাজা এবং নূতন যুগের প্রথম মহারাজা—তাই তাঁর সৌধকলায়ও নূতন ও পুরাতনের সংযোগ হয়েছে। মহারাজের যে মূর্ত্তি ত্রিপুরেশ্বরের মন্দিরে স্থাপিত হয়েছে, নেপাল-শিল্পের portrait soulptureএর ক্ষেত্রে বোধ হয় তাই বর্ত্তমান যুগের শেষ অবদান।

সৌধ-পরিক্রমার সময় নেপালের হৃদয়তত্ত্বের কথা ভুললে চল্‌বেনা। এই দেশ বাস্তবিকই তীর্থস্থান। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও তান্ত্রিক সকলেই নেপালকে অতি পবিত্র স্থান মনে করে। প্রায় তিন হাজার মন্দির নেপালে আছে এরকম একটা জনশ্রুতি আছে—এ সমস্ত মন্দির অধিকাংশ স্থলেই অতি প্রাচীন। অনেক গ্রন্থাদি এ সমস্ত মন্দিরে পাওয়া গেছে। অনেকের জানা আছে নেপালের বিখ্যাত বীর লাইব্রেরীতে এরকমের হস্তলিখিত প্রায় ৬০,০০০ পুঁথি আছে—মহারাজের বিশেষ অনুমতি না পেলে এসব পুঁথি দেখা যায় না। যাঁরা এ দুর্ল্লভ অনুমতি এতকাল পর্য্যন্ত পেয়েছেন তাদের মধ্যে বর্ত্তমান লেখক অন্যতম।

মন্দির-কলা আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা একটা প্রাচীনতার বিরাট ঐশ্বর্য্য দেখ্‌তে পাই। এমন ভাবে সকল ধর্ম্মের যোগ ও প্রতিষ্ঠা ভারতের অন্য কোথাও হয়নি। এইজন্যই নেপালকে পুণ্যভূমি বলা যেতে পারে। বাংলা দেশের সঙ্গে নেপালের বিশেষ আত্মীয়তা আছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বীমান ও বিট্‌পাল নেপালে কলবিদ্যার পথ-প্রদর্শক ছিলেন। সৌধকলার সার্থকতা সকল দেশেই বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। কোন পশ্চিমের সমালোচক বলেছেন, I believe arobitecture must be the beginning of arts and that others must follow her in their time and order ; and I think the prosperity of our schools of painting and sculpture depends upon that of our architecture. I think that all will languish until that takes the lead. I have nothing to do with the possibility or impossibility of it."

রাস্‌কিনের এই বহুমূল্যবান কথার সার্থকতা দেখ্‌তে পাওয়া যাবে নেপাল উপত্যকায়। নানা আর্টের ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ

সকল কলাকে ধারণ করে' নেপালের মন্দির-কলা উদ্ভাসিত। চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত সব কিছুই মন্দিরকে সুশোভিত করতে ব্যগ্র—মন্দির-কলার মাতৃস্নেহে সমস্ত কলা আশ্চর্য্য ভাবে প্রাণবান্ হয়ে উঠেছে।

সৌধ-কলা আলোচনায় প্রাচীন ও আধুনিক অট্টালিকার উল্লেখ করতে হয়। ভাটগাঁয়ের দরবারের (রাজভবনের) চিত্রে দেখি প্রাচীন সৌধ-কলার কি অসামান্য শ্রী ছিল। রাজার একটি স্বর্ণপত্রাচ্ছাদিত মনোহর মূর্ত্তি এই রাজভবনের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতি মনোহর মন্দিরাদি চারিদিকে একটা অলৌকিক আব্‌হাওয়া সঞ্চার করে। বামদিকেই অট্টালিকার ভূয়িষ্ট অংশ, অতিসূক্ষ্ম কাষ্ঠের কারুকার্য্যে দ্বারগুলি যায়, দক্ষিণ দিকে প্রচলিত ভারতীয় পদ্ধতি উড়িষ্যার মন্দিরের ছন্দকে গ্রহণ করে' দাঁড়িয়ে আছে। প্যাগোডা-পদ্ধতির অতি মনোহর নমুনা সাম্‌নে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। জনহীন এই প্রাসাদের চারিদিক না দেখ্‌লে ব্যাপকতা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়না, বস্তুতঃ রাজভবনই সমস্ত সভ্যতার কেন্দ্ররূপে সেকালে বিরাজিত ছিল। বিরাট চত্বরে কোথাও শীর্ণতা বা ক্ষুদ্রতা নেই।

রাজভবনের ভিতর ঢুকলে ব্যাপারটি গোলোক-ধাঁধা মনে হবে। সেকালে এমনি ভাবে দরবারের অভ্যন্তরভাগ তৈরী হ'ত যে সাধারণ লোক কিছুতেই বুঝতে পার্‌ত না 'plan'টি কি রকমের। রাজারা আত্মরক্ষার জন্যই প্রাসাদকে রহস্যপূর্ণ

ভাটগাঁও রাজ দরবার

তৈরী হয়েছে। এখানে একখানি স্বর্ণতোরণ ও দ্বার আছে যা পৃথিবীর ভিতর একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার। এই দ্বারে অসংখ্য মূর্ত্তি খোদিত, প্রত্যেকটি মূর্ত্তিরই সাঙ্কেতিক অর্থ আছে। য়ুরোপীয় দর্শকেরা এই দ্বারখানি দেখে মুগ্ধ হয়েছে। রাজভবনের সমগ্র ব্যবস্থাই পরিপাটি, বিচিত্র ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। প্রাচীন যুগ চলে' গেছে কিন্তু রাজভবনে তাদের মহিমার যে চিহ্ন আছে তা দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে থাকি। ভাটগাঁয়ের রাজভবনের সন্নিভূত মন্দিরগুলি বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। এ চিত্রে প্রায় পাঁচ রকমের মন্দির রচনা দেখ্‌তে পাওয়া করে রচনা কর্‌তেন। পাটন ও কাঠমুণ্ডুতেও রাজদরবার আছে। পাটনের দরবার অতি মনোহর ও প্রকাণ্ড।

এ প্রসঙ্গে একটা আধুনিক রাজভবনও আলোচনা কর্‌তে হয়। বর্ত্তমান মহারাজ সিংহদরবার নামক রাজভবনে এখনও যান নি—যাবেন কিনা কেউ বল্‌তে পারেন না, তিনি নিজের প্রাচীন দরবার হ'তে রাজকার্য্য চালাচ্ছেন। বলা প্রয়োজন নেপালের অধিরাজ একটা পুতুল মাত্র—তাঁর কোনও ক্ষমতা নেই। অধিরাজের অট্টালিকা নেপালের আধুনিক সৌধকলার একটা প্রকৃষ্ট নমুনা। য়ুরোপীয়

স্থাপত্যকলা ধীরে ধীরে হিমালয়ের গর্ভে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। য়ুরোপীয় প্রাসাদের হুবহু ভঙ্গী এই প্রাসাদে অনুকৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য সর্ব্বত্রই য়ুরোপীয় সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় স্থাপত্যের আদর্শও বিস্তৃত হয়েছে। এ অঞ্চলে হওয়া তা' অবশ্যম্ভাবী।

করবে। নেপাল প্রাচীন প্রাচ্যে এক আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। নেপালের সৌধকলা সে ইতিহাসের চিহ্ন বহন করছে। তিব্বত ও চীন যে কলাকে শিরোধার্য্য করেছিল সে কলা সামান্য ব্যাপার নয়। রূপসাধকেরা নেপালের সৌধকলায় ভারতের প্রাণকম্প লক্ষ্য করেন—ভারতের ধ্যান,
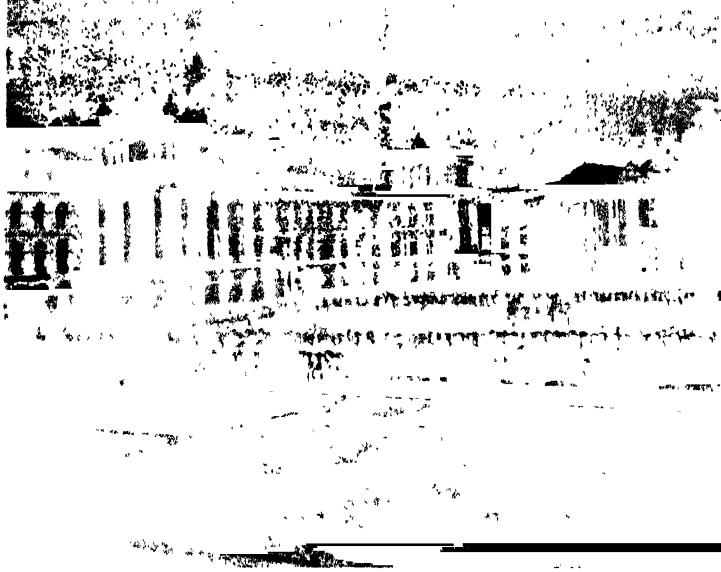
ধিরাজের অট্টালিকা

তবুও মনে রাখতে হবে অতীতের গৌরবময় দানকে। যতদিন না অতীত ধূলিসাৎ হয়, ততদিন প্রাচীন সাধনার দীপ প্রজ্জ্বলিত থাকবে এবং শিল্পীদের অনুপ্রাণিত

ভারতের ত্যাগ, ভারতের রূপস্বপ্ন হিমালয়ের অঙ্কে গৌরী-শঙ্করের পাদমূলে এখনও সুরক্ষিত আছে—এ আনন্দ আজ সকল আনন্দকে অতিক্রম করেছে।

গরমের ছুটি

—শ্রীভীমাপদ ঘোষ

এবার গরম পড়িয়াছিল খুব। গরমের ছুটী আরম্ভ হইবার দুই তিন সপ্তাহ পূর্ব্বেই নানাস্থান হইতে ছুটীতে বেড়াইতে যাইবার নিমন্ত্রণ আসিতে লাগল। সুতরাং সমস্যা দাঁড়াইল কোথায় যাই। পুত্র ধরিয়া বসিলেন যে এবার পাহাড় পর্ব্বত ও বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। যদি সম্ভব হয় কিছু কিছু শিকারের চেষ্টাও দেখা যাইতে পারে। এতএব ঠিক করিয়া ফেলা গেল যে বাঙ্গালার উত্তর সীমান্তে ভূটান রাজ্যের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে কিছুদিন বেড়াইয়া আসাম যাইব।

হাতের কাজকর্ম্মগুলি সারিয়া ও অন্যগুলির জন্য বন্দোবস্ত করিয়া জুন মাসের প্রথমেই একদিন "জয় দুর্গা" বলিয়া বাহির হইয়া পড়া গেল। রাণাঘাটে রাত্রি প্রায় নয়টায় আমরা দার্জ্জিলিং মেল ধরিলাম। গাড়ীতে ভিড় খুব। কোনও রকমে বসিবার মত জায়গা করিয়া নেওয়া গেল। দুপুর রাত্রিতে আমরা সাড়ার হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পার হইলাম। লোহালক্কড় দিয়া বিরাট সেতু প্রস্তুত হইয়াছে। অনেকবার এ রাস্তায় যাতায়াত করা গেল, কিন্তু সাড়া ঘাটের সাঁকো দেখিবার কৌতূহল পূর্ব্বের মতই আছে। সুতরাং রাত দুপুরেও পিতাপুত্রে সাঁকো দেখা গেল। শেষ রাত্রিতে গাড়ী পার্ব্বতীপুর পৌঁছাইল। এইখানে আমরা গাড়ী বদল করিয়া কুচবিহার-দলসিংপাড়া লাইনের গাড়ীতে উঠিলাম। এই গাড়ীটী লালমণিরহাট হইয়া আসামের দিকে যায়, কিন্তু একখানি গাড়ি লালমণির হাটে কাটিয়া কুচবিহার লাইনের গাড়ীতে যোগ করিয়া দেওয়া হয়। কুচবিহার-দলসিংপাড়া লাইনের গাড়ী হিমালয়ের পাদদেশে জয়ন্তী ও দলসিংপাড়া পর্য্যন্ত যায়, আবার লালমণির হাট হইতে আর একটি লাইন দোমোহানী হইয়া মাদারিহাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। লাইনের নাম বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে। দুইটি লাইনই ডুয়ার্স চা বাগান, বন ও পাহাড় পর্ব্বতের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই ঠিক করিয়াছিলাম যে আলিপুর দুয়ারে আড্ডা করিয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী নানাস্থানে বেড়ান যাইবে। তারপরদিন বেলা দশটায় আমরা আলিপুরদুয়ারে পৌঁছাইয়া সেদিনকার মত সেখানে বিশ্রাম করিলাম।

পরের দিন হইতে পাহাড়ে, জঙ্গলে, ঝরণায় ও চা বাগানে বেড়ান সুরু হইল। দলসিংপাড়া লাইনের রাজাভাতথাওয়া জংসনে গাড়ী বদল করিয়া বক্সা দুয়ার ও জয়ন্তী যাওয়া যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে বক্সাদুর্গে রাজবন্দীদের আড্ডা হওয়ায় অনেকেই এখন বক্সার নাম শুনিয়াছেন। রাজভাতথাওয়ার পরের ষ্টেশনই বক্সা রোড। এখান হইতে পদব্রজে, ঘোড়ায় বা ডাণ্ডিতে প্রায় পাঁচ মাইল পাহাড়ের উপর উঠিলে বক্সা দুর্গে যাওয়া যায়। ঘোড়ায় বা ডাণ্ডিতে যাইতে হইলে পূর্ব্বে বন্দোবস্ত করিতে হয়। বক্সা রোড ষ্টেশনটি বনের মধ্যে। এখান হইতে জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাহাড়ের উপর উঠিতে হয়। ডুয়ার্সের বনে বাঘ, ভালুক, হাতী, গণ্ডার, হরিণ প্রভৃতি নানা রকম জানোয়ার আছে। দিনের বেলায় তারা মানুষ চলাচলের পথে বড় একটা আসে না। তবে রাত্রিতে অনেক সময় পথিমধ্যেও হিংস্র জন্তু দেখা যায়। পাহাড়িয়ারা এসব আদৌ গ্রাহ্য করে না। তাহারা পাঁচ সাত জনে সন্ধ্যার পর বক্সা রোড ষ্টেশনে নামিয়া রাত্রি দশটা এগারটায় বক্সায় যায়। অস্ত্রের মধ্যে সম্বল অনেক সময়ে যষ্ঠি ও কুকুরী মাত্র। বক্সা উচ্চতায় প্রায় কারসিয়ং'এর মত, প্রায় সকল সময়েই এখানে অল্পবিস্তর শীত। বেশ মনোরম জায়গা। পাহাড়ের উপর হইতে দক্ষিণে সমতল ক্ষেত্রের বহুদূর পর্য্যন্ত উন্মুক্ত। রাজবন্দীরা এখন তথায় থাকায় আজকাল বক্সা দুর্গের নিকটে ও দূরে স্থানে স্থানে "পিকেট" বা পাহারা আছে। কাজেই বিনা অনুমতিতে আজকাল বক্সা যাওয়া যায় না।

বক্সা রোডের পরই জয়ন্তী। এটি ই, বি, রেলের উত্তর সীমান্তের শেষ ষ্টেশন। ষ্টেশনের পাশেই একটী খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদী। ষ্টেশন হইতে নদীটির গর্জ্জন শুনা যায়। এই নদীর তীরে পূর্ত্ত-বিভাগের একটী সাঁকো আছে। এখান হইতে একটী রাস্তা আসাম সীমান্তে কুমারগাঁও পর্য্যন্ত গিয়াছে। নদী পার হইলেই পাহাড় ও বন! অভ্রভেদী হিমালয় পাহাড়ের যেন অন্ত নাই। থাক্‌থাক্ করিয়া প্রায় দেড়শত মাইল ব্যাপিয়া সাজান আছে। একটীর পর একটী

ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চে গিয়াছে। শারীরিক কষ্ট হইলেও যতই যাওয়া যায় কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পায়। মনে হয় ইহার পর আর কি আছে দেখিয়া আসি। পাহাড়ের উপর পাহাড়, কিন্তু বিধাতার কি আশ্চর্য্য বিধান। অনবরত পট-পরিবর্ত্তনের মত দৃশ্যাদির পরিবর্ত্তন হইতেছে। মেঘ, বৃষ্টি, রৌদ্র ও কুয়াসা যেন অবিরাম খেলা করিতেছে। এই আছে, এই নাই! উপরে বৃষ্টি, নীচে রৌদ্র, নীচে বৃষ্টি, উপরে রৌদ্র, কখনও বা পাহাড়ের উপরে ও নীচে মেঘ, মাঝখানে রৌদ্র, এ এক অদ্ভুত খেলা। যতই যাওয়া যায় নূতন নূতন বৃক্ষ ফল ফুল দেখিয়া বিপুল আনন্দ পাওয়া যায়। এই এক হিমালয়ই ভারতের উত্তরে লম্বালম্বিভাবে প্রায় দেড় হাজার মাইল ঘিরিয়া আছে—কিন্তু সিমলা পাহাড়ের দৃশ্য ও এই দিকের দৃশ্য এক নহে।

জয়ন্তী নদীর ধার দিয়া পাহাড়ের উপর প্রায় দেড় মাইল গেলে এক বৃহৎ আম গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গুঁড়ির বেড় ২১ ফুট ও গাছটী প্রায় ২০০ ফুট উচ্চ। একবারে খাড়া লম্বা হইয়া উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে। উপরে কতকগুলি ডালাপালা আছে। এত বড় আম গাছ প্রায় দেখা যায় না। অসংখ্য ছোট ছোট আম গাছ তলায় আছে। গাছের গোড়াটী পাহাড়িয়ারা পাথর দিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে। কখনও কখনও এখানে তারাকালী পূজা করে। জয়ন্তী হইতে তিন চার মাইল দূরে এক পার্ব্বত্য গুহার মধ্যে ৺মহাকাল নামক শিব আছেন। ইহাঁর মাথায় এক ঝরণা হইতে অনবরত জল পড়িতেছে। শিবরাত্রির সময় এখানে মেলা হয় ও অনেক লোক সমাগম হয়। জয়ন্তী হইতে দুই তিন মাইল দূরে ই-বি-রেল কোম্পানীর এক জলের কল আছে। এখান হইতে জয়ন্তী, বক্সা রোড প্রভৃতি ষ্টেশনে ঝরণার জল সরবরাহ হয়। জয়ন্তীতে রেল কোম্পানীর ও পূর্ত্ত-বিভাগের ডাক-বাঙ্গলা আছে। শেষোক্ত ডাক-বাঙ্গলায় ভাড়া দিয়া থাকিতে পাওয়া যায়।

কয়েক বৎসর হইতে রেল রাস্তা, পাকা রাস্তা ও সাঁকো প্রভৃতির জন্য ছোট ও বড় প্রস্তর জয়ন্তী হইতে চালান হইতেছে। সম্প্রতি ঐ স্থানের নিকটে দুই একটি চূণা পাহাড় আছে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। আশা করা যায় যে সত্বর এই স্থানে একটী চূণ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জয়ন্তী হইতে কুমারগাঁও পর্য্যন্ত প্রায় ২৪।২৫ মাইল একটী রাস্তা বনের মধ্য দিয়া ভুটান ফরেষ্ট ও আসাম গিয়াছে। অনেক শিকারী এই সকল বনে শিকারের চেষ্টায় থাকেন। এখানে শাল, খয়ের, শিমুল, জারুল প্রভৃতি নানা প্রকার গাছ আছে। প্রায় স্থানেই আগাছা, লতাপাতা, বেত ইত্যাদিতে এত জঙ্গল হইয়া আছে যে বনের মধ্যে খালি পায়ে প্রবেশ করা কষ্টকর। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট নদী খানা, ডোবা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়! একেই ত পাহাড় পর্ব্বত ও বনে জঙ্গলে বৃষ্টি বেশী হয়। তাহার উপর নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে রৌদ্র ক্বচিৎ প্রবেশ করে। সুতরাং ঐ সকল স্থান স্যাঁতসেঁতে। কোনও কোনও স্থানে বন এত গভীর যে দিনের বেলায়ও অন্ধকার। দিবা-রাত্রি ঝিঁঝিঁ-পোকা ডাকিতেছে। গভীর বনে প্রবেশ করিলে নানা প্রকার পাখীর গান ও জীবজন্তুর ডাক শুনিতে পাওয়া যায়। শিকারীরা কেহ কেহ বৃক্ষের উপর উচ্চে মাচা বাঁধিয়া শিকারের প্রত্যাশায় রাত্রিতে বসিয়া থাকেন। জ্যোৎস্না রাত্রিতে বা শেষ রাত্রিতে শিকারের সুযোগ ভাল। তবে আজকাল টর্চ্চের আলো হইয়া সকল রাত্রিতেই শিকার চলিতেছে। ভোর রাত্রিতে হাতীতে চড়িয়া বনে প্রবেশ করিলে দুই একটি শিকার পাওয়া যায়ই। অনেক শিকারীর সাহস এরূপ যে তাঁহারা পায়ে হাঁটিয়া অনেক সময় একাকীই বনে জঙ্গলে বা জলাশয়ের তীরে শিকারের আসায় বসিয়া থাকেন। লাট-বেলাট বা রাজা মহারাজাদের শিকারের ব্যবস্থা অন্যরূপ। তাঁহাদের জন্য বহু লোকজন হাতী প্রভৃতি বন ঘেরাও করিয়া শিকার তাঁহাদের সামনে আনিয়া দেয়। আলিপুর দুয়ারের তিন চার মাইল পর দমনপুর ষ্টেশন হইতেই বন আরম্ভ। এই বন লম্বালম্বি ভাবে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অবশ্য চা বাগান আছে ও পৃথক পৃথক স্থানে বনের পৃথক্ পৃথক্ নাম।

বন হইতে গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট আয় হয়। সুতরাং ইহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গবর্ণমেণ্ট বেশ ভাল ব্যবস্থা করিয়াছেন। কন্‌সারভেটার, (conservator) রেঞ্জার, (ranger) ফরেষ্টার (forester) কুলী প্রভৃতি বহু কর্ম্মচারী বনের তদারক করেন। বনের ধারে, এমন কি অনেক সময় গভীর বনের মধ্যেও বন-বিভাগের আফিস আছে। এই সকল স্থান

হইতে গাছ কাটাই, গাছ লাগান, কাষ্ঠ দ্রব্যাদি সংগ্রহ বিক্রয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। কোনও স্থানের গাছ পরিপক্ক হইয়া বিক্রয়োপযোগী হইলে প্রথমে সেই স্থানের আগাছাগুলি পরিষ্কার করিয়া তুলিয়া লওয়া হয়। তাহার পর বড় বড় গাছগুলি কাটিয়া রেলষ্টেশনে বা গুদামে চালান দেওয়া হয়। যে স্থানের গাছ কাটা হইয়া যায় সেই স্থানে পুনরায় সারি সারি করিয়া নূতন চারা গাছ লাগান হয়। এই কার্য্যের জন্য অনেক জায়গায় পার্ব্বত্য জাতি সপরিবারে বনের মধ্যে বাস করে। তাহারা গাছগুলি প্রস্তুত করিয়া দেয় ও যতদিন গাছগুলি বড় না হয় ততদিন ঐ সকল স্থানে নানা প্রকার ফসল লাগায়। একটী ক্ষেত্রে গাছ বড় হইলে পুনরায় বনের আর এক অংশে গিয়া বাস করে। কোথাও কোথাও গভীর বনের মধ্যে বেত বা লতা দিয়া ঝুড়ি বুনিবার নিমিত্ত দুই একটি পরিবার কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। বনের মধ্যে কাহারও পথ হারাইলে "কু" "কু" করিয়া শব্দ করে। নিকটে মানুষ থাকিলে "কু" "কু" করিয়া উত্তর দেয় ও তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হয়। ডুয়ার্সের বনে কাঠ ছাড়া পিপুল ও নানা প্রকার ফলমূল প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট সমস্ত দ্রব্যই বিক্রয় করিয়া থাকেন। বিনা অনুমতিতে কেহ তথা হইতে একটী ছোট ডাল সরাইতে বা কিছু শিকার করিতে পারে না।

জয়ন্তী হইতে কুমারগাঁও'এর পথে অনেক পার্ব্বত্য নদী নালা পার হইতে হয়। ইহার সকল গুলিতে পাকা সাঁকো নাই। সুতরাং বর্ষায় এই রাস্তায় বরাবর মোটর চলে না। নদীগুলির মধ্যে রায়ডাক প্রধান। রায়ডাকের ডাক শুনিবার মত। ইহার স্রোত খুব বেশী ও অনেক দূর হইতে ইহার গর্জ্জন শুনা যায়। এই পথের ধারে ও ই-বি-আর লাইনের পার্ব্বত্য সেক্সনে টেলিগ্রাফের খুঁটী কাঠের। কোনও কোনও স্থানে বৃক্ষগাত্রেও তার লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ এই সকল স্থানে হাতীর উৎপাত খুব বেশী। বনের মধ্যে কলাই করা লোহার খুঁটী দেখিলে ইহারা কি জানি কি মনে করিয়া উহা প্রায়ই ভাঙ্গিয়া দেয়। রায়ডাক নদী হইতে কিছু দূরে একটী পর্ব্বত আছে উহার নাম যমদুয়ার। যমদুয়ারে প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটে নাই। দূর হইতেই আমরা যম রাজাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিয়াছি! একটী পার্ব্বত্য নদী দেখিলাম, তাহা কালো কর্দ্দমাক্ত ঘোলা জলে পরিপূর্ণ। আমরা বনের মধ্যে কিছু দূর গিয়া দেখিলাম যে উপর হইতে যে জল আসিতেছে তাহাও ঐরূপ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই রাস্তার ধারে মধ্যে মধ্যে চা বাগান আছে। হাতীপোতা ডাক-বাঙ্গলার নিকটে রহিমাবাদ চা বাগানে আমরা একদিন বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এই বাগানের মালিক চা ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ জলপাইগুড়ীর শ্রীযুক্ত নবাব মশারফ হোসেন সাহেব। চা বাগানের মুসলমান ম্যানেজারটী বেশ ভদ্রলোক। আমাদিগকে বিভিন্ন বিভাগে লইয়া গিয়া চা-প্রস্তুত প্রণালী দেখাইলেন। আমরা আরও দুই একটি সাহেব বাগান ও কতকগুলি বাঙ্গালী বাগান দেখিয়াছি। একটী সাহেব বাগানে দেখিলাম যে জলের স্রোতে কল চলিতেছে। একটী পার্ব্বত্য নদী হইতে খাল কাটিয়া বাগানের মধ্যে লইয়া গিয়া নকল জল-প্রপাতের সৃষ্টি করা হইয়াছে। উহার বেগে বড় বড় চাকা ঘুরিতেছে ও বাগানের কল চলিতেছে। আমাদের দেশে অসংখ্য বড় বড় নদী নালায় জলপ্রপাত প্রভৃতি আছে। কিন্তু জলের শক্তির সাহায্যে খুব কম কল চালান হয়। যাহা হউক বাঙ্গালী চা ব্যবসায়ে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তবে আজকাল চায়ের দাম সস্তা হওয়ায় অনেক বাগানের কর্ত্তৃপক্ষই মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। কুলীদের মজুরী পূর্ব্বাপেক্ষা কমাইয়া দেওয়া হইতেছে। পূর্ব্বে তাহারা পাতা তুলিবার সময় ॥৶০ বা ৷৵০ আনা দৈনিক পাইত। এখন ।৵০ বা ॥০ আনা মাত্র পাইতেছে। চা বাগানের লোকজনও অনেক কমাইয়া দেওয়া হইতেছে। এই সকল বাগানে পূর্ব্ববঙ্গ, নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি স্থানের অনেক ভদ্রসন্তান কাজ করেন। কুলীরা সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ, ছোটনাগপুর, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসে। অনেকে এই দেশেই বসবাস করিতেছে। ইহারা অল্পেই সন্তুষ্ট। প্রায় চা-বাগানের নিকটেই সপ্তাহান্তে হাট বসে। তাহারা এক সপ্তাহের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিও ঐ দিনে ক্রয় করে।

আসাম ও এই অঞ্চলের অনেক রেল ষ্টেশনের পাশেই কাঠের গুদাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্থান হইতে অনেক শাল কাঠ আমাদের দেশে চালান যায়—উহা অনেক

সময় আমাদের বাজারে নেপালী শাল বলিয়া বিক্রয় হয়। তাহা ছাড়া এদেশে অনেক কাঠ বিক্রয় হয়, কারণ এদেশের অধিকাংশ গৃহই কাঠে প্রস্তুত। রাজাভাতথাওয়ায় অনেকগুলি কাঠের গুদাম আছে। ইহার নিকটে একটী সাহেব কোম্পানী একটী বড় কাঠের কারখানা খুলিয়াছিলেন, কিন্তু উহা এখন উঠিয়া গিয়াছে। কারখানার ঘরবাড়ী এখন ভাঙ্গিয়া বিক্রয় করা হইতেছে।

রাজাভাতথাওয়া নামটা বেশ। জনশ্রুতি এই যে পূর্ব্বে কোনও সময়ে কুচবিহার রাজের সহিত ভুটান রাজের যুদ্ধ হয়। তাহাতে কিছু দিন কুচবিহার রাজা ভুটানে বন্দী অবস্থায় থাকেন। বন্দী অবস্থায় তিনি অন্ন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রকাশ, সন্ধির পর ভুটানীরা কুচবিহার রাজাকে এই খানে ছাড়িয়া দিয়া বলে "রাজা, এই বার ভাত খাও" বা ভাত খাইবার জন্য রাজাকে এই স্থান দেয়। এই হইতেই নাকি ইহার নাম রাজা-ভাতথাওয়া হইয়াছে। যাহা হউক ভুটানীরা যে পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে এই সকল দেশ আক্রমণ করিত তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ভুটান গিরিবক্ষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এখনও বক্সা দুয়ার দুর্গের মত কয়েকটী দুর্গ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভুটান রাজাকে এখনও বাৎসরিক কর দিয়া থাকেন। গত মহাযুদ্ধের সময় এই কর বৃদ্ধি হইয়াছে।

হাতীপোতা, চামুরচী প্রভৃতি পাহাড়ের সন্নিকট অনেক হাটে ভুটানীরা শাবল, ভোজালী প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র, পীচ, লেবু প্রভৃতি নানা প্রকার ফল বিক্রয় করিতে আসে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকই হাটে বাজারে বেশী আসে। পুরুষ গুলি দেখিতে রুগ্ন ও বর্ব্বর বলিয়া মনে হইলেও সাধারণতঃ ইহারা সকলের সহিত ভাল ব্যবহারই করিয়া থাকে। ইহারা বেশ অতিথি সৎকার করে। কোনও ভুটানী পল্লীতে বেড়াইতে গেলে থাকিবার ও খাইবার জন্য অনুরোধ করে। পাহাড়ের উপরে উপত্যকায় যেটুকু জমি পায় তাহাতে ইহারা ভুট্টা, গম প্রভৃতি লাগায়। এই দেশের স্ত্রী-লোকগুলি গৌরবর্ণ ও

বি-ডি-রেল পথে দোমোহনী পার হইলে লাটাগুড়ী বনের মধ্য দিয়া গাড়ী চলে। ইহার কিছু পরেই পাহাড় আরম্ভ। এই লাইনে অনেকগুলি পার্ব্বত্য নদীর উপর সাঁকো আছে। সকল সময়, বিশেষতঃ বর্ষায় এই সকল নদীর স্রোত প্রখর হয়। জলের উচ্ছ্বাস দেখিয়া একাধারে আনন্দ ও ভীতির সঞ্চার হয়। এই লাইনের দলগাঁও প্রভৃতি ষ্টেশনে নামিয়া পাহাড়ের ধারে ধারে বেড়াইতে যাওয়া যায়। আজকাল প্রায় সকল রেলষ্টেশন হইতেই পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত মোটর যায়। দলগাঁও হইতে লঙ্কাপাড়া পর্য্যন্ত বেশ সুন্দর পাকা রাস্তা আছে। লঙ্কাপাড়ার দৃশ্য অতীব মনোহর। পাহাড়ের উপর উঠিয়া কিছু দূর গেলেই বেশ সুন্দর একটী উপত্যকা পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদী, ঝরণা, সুন্দর সুন্দর বন্যফুল প্রভৃতি দেখিয়া অতুল আনন্দ হয়। এখানে পাহাড়ের ধারেই পূর্ত্ত-বিভাগের একটী বাংলা আছে। আলিপুরদুয়ার হইতে এই সকল স্থানে যাইতে হইলে লালমণিরহাট হইয়া ঘুরিয়া যাইতে হয়। এই সকল স্থান এক মহকুমার অন্তঃপাতী হইলেও যাতায়াতের সুবিধা ভাল নাই। শুনিলাম যে শীতকালে বরাবর মটরযোগে কালিম্‌পঙ্‌, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে কোনও কোনও দিন প্রাতঃকালে এই স্থান হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ দেখা যায়।

কিছু দিন পাহাড় পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া ফিরিবার সময় আমরা একদিন কুচবিহার বেড়াইয়া আসিয়াছি। কুচবিহার সহরটী মোটের উপর বেশ সুবিন্যস্ত ফিটফাট সহর। রেলষ্টেশন হইতে মোটর ভাড়া করিয়া সহরে ঢুকিয়া আমরা প্রথমেই কলেজ ও স্কুল দেখিলাম। ঐগুলি তখন বন্ধ ছিল। বাড়ীগুলির জাঁকজমক নাই, লম্বালম্বি ব্যারাকের মত। ইহার নিকটেই ঠাকুরবাটী। এখানে অনেকগুলি বিগ্রহের সেবা হয়। বৈষ্ণব দেবদেবীর পার্শ্বেই মা কালীর মন্দির দেখিলাম, সেখানে বলিও হয়। অনেক দেবদেবীই বেশ সুসজ্জিত। বিগ্রহগুলির যথেষ্ট অলঙ্কার ও তৈজস পত্রাদি আছে শুনিলাম। এখানেও সশস্ত্র পাহারার বন্দোবস্ত আছে। কেহ কেহ বলিলেন যে অতিথি, অভ্যাগত আসিলে তাঁহারা প্রসাদ পাইতে পারেন। ঠাকুরবাটীর সামনেই বৈরাগী দীঘি নামে একটী বড় দীঘি আছে। কুচবিহারে এইরূপ অনেকগুলি বড়দীঘি আছে। সাগরদীঘির চতুঃপার্শ্বে এখানকার আফিস, আদালত প্রভৃতি। আদালতে আমাদেরই দেশের মত মক্কেল, উকীল, মুহুরীর ভিড়।

এখানেও চিরপরিচিত গাছতলায় মামলা করিবার জন্য বহু লোক বসিয়া আছেন। ইহার নিকটেই রাজবাটী এক বিস্তীর্ণ খোলা ময়দানের মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্বে প্রাচীরাদি ছিল না, এখন দেখিলাম লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা হইতেছে। দূর হইতে রাজবাটি বেশ দেখায়। ইহাতে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে। দ্বিতলে মহারাজা, মহারাণী, মহারাজকুমার, কুমারী প্রভৃতিদের শুইবার, বসিবার, পড়িবার, ব্যায়াম করিবার পৃথক পৃথক ঘর আছে। ঘরগুলি প্রায়ই সজ্জিত নহে। শুনিলাম রাজবাটীতে কয়েকবৎসর পূর্ব্বে চুরি হইয়া যাওয়ায় শুধু রাজ পরিবারবর্গ এখানে থাকিবার সময় সমস্ত ঘর সাজান হয়। মোটের উপর দরবার হল ও ড্রয়িংরুম আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছিল। এক তালায় অনেকগুলি শিকারলব্ধ বৃহৎ বৃহৎ জীবজন্তুর মস্তক, চামড়া, শিং প্রভৃতি সজ্জিত আছে। কুচবিহার পরিবারের অনেকেই বেশ ভাল শিকার করিতে পারেন। কুচবিহার হইতে তিন চার মাইল দূরে একটী বন আছে। সহরের পাশে তোড়শা নদীর ধার হইতে ঐ বন দেখা যায়। জিতেন্দ্রনারায়ণ হাঁসপাতালের বাটীটি দেখিতে বেশ। নীচের তালায় পোনেরো কুড়ি জন ও উপর তালায় দুই একটি মাত্র রোগী রাখা হইয়াছে দেখিলাম। এই বাটীটি নূতন হইলেও ভূমিকম্পে ইহা অনেক স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে। আসামের নিকটবর্ত্তী বলিয়া এখানেও ভূমিকম্প একটু বেশী হয়। নরেন্দ্র-উদ্যান ও কেশবোদ্যান নামে বেড়াইবার দুইটী জায়গা আছে। কেশব-উদ্যানে কুচবিহার রাজ পরিবারবর্গের কাহারও কাহারও স্মৃতি-স্তম্ভ আছে। এখানে জলের কল, ইলেক্‌ট্রিক আলো, টেলিফোন প্রভৃতি আছে। কুচবিহারের অধিকাংশ উচ্চ কর্ম্মচারীই বঙ্গ সরকারের পেন্সনপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। সুতরাং শাসন প্রণালী অনেকটা আমাদেরই মত। বর্ত্তমান মহারাজা এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক। সুতরাং রাজমাতাই আবশ্যক মত ষ্টেটের কাজকর্ম্ম দেখিয়া থাকেন। তিনি যখন এখানে থাকেন তখন পদব্রজে বা ঘোড়ায় চড়িয়া সহরে বেড়াইয়া বেড়ান। প্রজারা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগের সুখ দুঃখের কথা তাঁহাকে জানাইতে পারে। বর্ত্তমানে এখানেও খাজনাপত্র ভাল আদায় হইতেছে না বলিয়া অর্থ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। "চিতরী" ধান (এক প্রকার আউস ধান) মাত্র ৮৹আনা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে দেখিলাম।

বহু প্রাচীনকাল হইতে ভুটান ও বঙ্গদেশের মধ্যে কুচবিহার রাজ্য buffer-stateএর মত ছিল। পূর্ব্বে এই রাজ্য দক্ষিণে সান্তাহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভুটান রাজের সহিত কুচবিহারের প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহাদি হইত। কখনও কখনও কুচবিহার রাজ প্রবল হইতেন, কখনও বা ভুটান রাজ প্রবল হইতেন। সমস্ত ডুয়ার্স এলাকা পূর্ব্বে ভুটানের অধীন ছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই এলাকা ভুটানের নিকট বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন। এই জন্য ভুটানীরা এখনও কর দাবী করে ও পাইয়া থাকে।

কুচবিহার হইতে গিতালদহ ও গোলকগঞ্জ জংসান হইয়া আমরা আসাম যাই। গোলকগঞ্জ হইতে একটী ছোট শাখা লাইন ধুবড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছে। ধুবড়ী ব্রহ্মপুত্রের উপরে। বেশ ভাল সহর। এখান হইতে উত্তর বঙ্গে অনেক মৎস্য চালান যায়। তাহার পর আমরা গোয়ালপাড়া জেলার মধ্য দিয়া কামরূপ জেলায় পৌঁছাই। এই লাইনও অনেক বন ও পাহাড় ভেদ করিয়া গিয়াছে। আসাম নাম হইতেই বুঝা যায় যে এই দেশ অসমান। উত্তর আসামের অধিকাংশ স্থানই পর্ব্বতবহুল। মধ্যে মধ্যে উপত্যকায় চাষ আবাদ হয়। খুব বেশী বৃষ্টি হয় বলিয়া এদেশে বহু চা বাগান আছে। ভারতে প্রস্তুত চায়ের ২/৩ অংশ এক আসামেই প্রস্তুত হয়। আসামীরা বয়নশিল্পে খুব নিপুণ। অনেকেই সূতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতে পারেন। ই-বি-রেলের গাড়ী একবারে ব্রহ্মপুত্রের ধারে আসিয়া আমিনগাঁও ষ্টেশনে দাঁড়ায়। ব্রহ্মপুত্র এখানে পাহাড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আমিনগাঁও হইতে ষ্টীমারে তেজপুর, শিবসাগর, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। আমিনগাঁও'এর অপর পারে পাণ্ডুঘাট ষ্টেশন। শুনা যায় যে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাত বাসের সময় এখানে আসিয়াছিলেন। তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ষ্টেশনের নিকটেই ব্রহ্মপুত্রের তীরে একটী মন্দির আছে। উহার নিকটে একটী পাহাড়ের উপর এক সাধুর চেষ্টায় 'জগৎপুর আশ্রম' নামক এক মনোরম আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানটী চারিদিক খোলা, ব্রহ্মপুত্র নদী ও চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অনেক স্থান হইতে পাহাড়ের উপর আশ্রমের ঘর বাড়ীগুলি দেখা যায়। পাহাড়টী ব্রহ্মপুত্রের তীরে খুব খাড়াই হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি

আশ্রমবাসীরা ব্রহ্মপুত্রে স্নান করেন ও ব্রহ্মপুত্রের জল ব্যবহার করেন। আশ্রমে একটী ডাক্তার থাকেন ও এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসাদি করেন। পাহাড়ের উপর ও পার্শ্বে নানা-প্রকার ফুল ও ফলের বৃক্ষাদি বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষিত হইতেছে. কালে এখানে একটী বেশ ভাল বাগান হইবে। এই আশ্রমের সহিত চট্টগ্রাম জগৎপুর আশ্রমের কোনও সম্বন্ধ নাই এইরূপ শুনিলাম। পাণ্ডুঘাট হইতে ৺কামাখ্যা পাহাড় বা নীলাচল পর্ব্বত তিন মাইল। রেলে বা মোটরে কামাখ্যা পাহাড়ের নীচে কামাখ্যা ষ্টেশনে নামিয়া প্রায় দেড় মাইল পাহাড়ের উপর উঠিলে মায়ের মন্দির ও পাণ্ডাদের বাটী পাওয়া যায়। পাহাড়ের উপরে কয়েকটী ঝরণা ও পুষ্করিণী থাকিলেও বড় জলকষ্ট। তবে কামাখ্যার পাণ্ডারা বেশ ভদ্রলোক। যাত্রীদিগের যথেষ্ট যত্ন লইয়া থাকেন। যাত্রীরা ইচ্ছা করিলে পাহাড়ের নীচে ধর্ম্মশালায় বা গৌহাটী ধর্ম্মশালায় থাকিতে পারেন। কামাখ্যা ষ্টেশন হইতে রেলযোগে গৌহাটী ছুই মাইল। পাণ্ডুঘাট হইতে গৌহাটী ও কামাখ্যায় প্রায় সকল সময়েই মোটর যাতায়াত করে। কামাখ্যা পাহাড়ের পাদদেশে পাণ্ডু গৌহাটী রাস্তার পাশে ১৯২৬ সালে ভারতের জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। প্রতি বৎসর অম্বুবাচীর সময় কামাখ্যা মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে একটী মেলা বসে। ইহাতে আসামজাত সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। এবার কিন্তু মেলায় ভিড় হয় নাই। কামাখ্যা পাহাড়ের মধ্যে ভুবনেশ্বরীর মন্দির সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত। এখান হইতে গৌহাটী সহর বেশ সুন্দর দেখায়। ব্রহ্মপুত্রের উপর নৌকাগুলি একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডের মত ও গৌহাটীর রাস্তায় মোটর গাড়ীগুলি দেশলায়ের বাক্সের মত ছোট মনে হয়।

গৌহাটী সহরটী ব্রহ্মপুত্রের তীরে। নদীর ধার দিয়া একটী পাকা রাস্তায় মোটরযোগে বা পদব্রজে বেড়ান বেশ আরামদায়ক, সহরটী বেশ বড় ও এখানে ফাঁসি বাজার, পান বাজার, উজান বাজার প্রভৃতি চার পাঁচটী বাজার আছে। সন্ধ্যার পরও ফাঁসিবাজার পূরাদমে চলে ও এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাজার। বহু মাড়ওয়ারী ও দেশীয় মহাজন এখানে ব্যবসায়ার্থ আসিয়াছেন। গৌহাটীতে একটি প্রথমশ্রেণীর গবর্ণমেন্ট কলেজ, আইন কলেজ, স্কুল প্রভৃতি আছে। এখানে ছুইটী বেসরকারী উচ্চ ইংরাজী স্কুল আছে। ভূমিকম্পের জন্য এখানকার অধিকাংশ ঘরই কাষ্ঠনির্ম্মিত ও টিনের চাল বিশিষ্ট। ঘরের সংখ্যা খুব কম। যাহা আছে তাহা ভূমিকম্পে প্রায়ই ফাটিয়া যায়। একটী বড় দীঘির পাশে "কার্জ্জন লাইব্রেরী" নামক একটী সাধারণের জন্য পাঠাগার আছে। এখানে বহু সংবাদপত্র, মাসিকপত্র প্রভৃতি আসে ও পাঠকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। এই দীঘির অপর এক পার্শ্বে "কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির" আফিস। এখানে নানা প্রকার প্রাচীন চিত্র, মূর্ত্তি, তাম্র ও শিলালিপি, লাসা প্রভৃতি জাতিদের পোষাক, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার কার্য্য অনেকটা রাজসাহীর "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির" মত, আসামের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার বিষয়ে আসামী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই চেষ্টা যে বিশেষ প্রশংসনীয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মপুত্রের তীরে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত। ইহার ঠিক সামনে নদীর মধ্যে একটী দ্বীপের মত পাহাড়ের উপর উমানন্দ ভৈরব নামক শিবের মন্দির। পাহাড়ের গাত্রে নদীর জল বাধা পাওয়ায় এই স্থানে জলের বেগ অতিশয় প্রখর হইয়াছে ও ছুই এক স্থানে ঘূর্ণ্যাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে। কামাখ্যাযাত্রীরা অনেকেই কামাখ্যাঘাট বা গৌহাটী হইতে নৌকায় উমানন্দ ভৈরব দর্শন করিতে যান। ৺উমানন্দ দর্শন করিতে হইলে প্রাণ হাতে করিয়া যাইতে হয়, কারণ এক এক স্থানে স্রোত ও তরঙ্গের বেগ এত বেশী যে নৌকা ডুবিবার বা উল্টাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। ইহার কিছু দুক্ষিণে ফাঁসিবাজার ঘাট হইতে একটী ফেরী ষ্টীমার অপর পারে উত্তর গৌহাটীতে দিনের মধ্যে অনেক বার যাতায়াত করে। কিন্তু এখানে আসিবার জন্য ষ্টীমারের বন্দোবস্ত না থাকায় সাধারণের বড়ই কষ্ট হয়। উমানন্দ পাহাড়টী বেশ উচ্চ ও এখান হইতে ব্রহ্মপুত্রের দৃশ্য খুব সুন্দর। এই পাহাড়ের পার্শ্বে সাধু সন্ন্যাসীদের নিমিত্ত ছুই একটি গুহা আছে। উত্তর গৌহাটীতে একটি ঘাটে পাহাড়ের উপর একটি মন্দির আছে। ইহাতে অন্যান্য দেবদেবীর সহিত বিষ্ণুর অনন্ত-শয্যা বিষয়ক একটী সুন্দর প্রস্তর-খোদিত চিত্র আছে। এখানে কতকগুলি সুবৃহৎ কলাগাছ দেখিলাম। উহার মোচা হইতে কলা নির্গত না হইয়া গোল গোল পাতার মত নির্গত হইয়াছে। শুনিলাম

যে উহা কাটিলে জল পড়ে। গৌহাটী শুক্রেশ্বরের মন্দির অতি প্রাচীন। ইহার পুরাতন মন্দিরটী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে রক্ষিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এখানে এক পাহাড়ের উপর নবগ্রহের মন্দির আছে। গৌহাটীতে তারা মন্দির, শিব মন্দির প্রভৃতি আরও অনেক মন্দির আছে। গৌহাটী হইতে শিলং প্রায় ৬৩ মাইল। ঐ রাস্তায় সাত মাইল গিয়া পার্শ্বে একটী কাঁচা রাস্তা দিয়া তিন চার মাইল গেলে ৺বশিষ্ঠাশ্রম পাওয়া যায়। ইহা বন ও পাহাড়ের মধ্যে এক সুন্দর তপোবন। আশ্রমের পাশেই একটী খরস্রোতা নদী অবিরত কল কলরবে প্রবাহিত হইতেছে। এখানে কোনও লোকালয় নাই। দুই চারিটি সাধু সন্ন্যাসী ব্যতীত আর কেহ এখানে থাকেন না। কামরূপ জেলা বোর্ডের এখানে একটী rest house আছে। যাত্রীরা ইচ্ছা করিলে এখানে বিশ্রাম করিতে পারেন। এই পাহাড়ে ও পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলে হরিণ ও অন্যান্য জানোয়ার আছে। স্থানটির নির্জ্জনতা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি অতীব মনোহর, কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে ঐ দেশে গেলেই কালাজ্বর ধরিবে। আসামের স্বাস্থ্য আজকাল অনেক ভাল হইয়াছে। সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়া অনেক পরিব্রাজক প্রাকৃতিক দৃশ্যাদিতে আসামকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দান করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনের মিস্ মুরিয়েল লেষ্টার—যাঁহার আতিথ্য মহাত্মা গান্ধী গ্রহণ করিয়াছিলেন—তিনি এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে অসমান বলিয়া দেশের নাম আসাম হইয়াছে। আবার অনেকে বলেন যে আহোম জাতির বাস বলিয়া ইহার নাম আসাম হইয়াছে। অনেক পণ্ডিতের ধারণা যে আসাম কেন বাঙ্গলাদেশের অধিকাংশই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ। ইহা সত্য নহে, কারণ মহাভারতে কামরূপ রাজ্যের উল্লেখ আছে। এই দেশের ক্ষমতাপন্ন রাজা ভগদত্ত বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া কুরুক্ষেত্র মহাসমরে যোগদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি চীন পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। কামাখ্যা পাহাড়কে অনেক সময় নীলাচল পাহাড় বলে। অতি প্রাচীন কালে এই পাহাড়ে কামদেব বাস করিতেন। একদা মহাদেব বহুদিন কঠোর তপস্যারত থাকায় দেবতারা সোমদেবকে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে পাঠান, হঠাৎ তপস্যা ভঙ্গ হওয়ায় মহাদেব তাঁহাকে ভস্ম করেন। যাহা হউক বহুদিন তপস্যার পর পুনরায় তিনি নিজের রূপ ফিরিয়া পান, তখন হইতে এই দেশের নাম কামরূপ হইয়াছে, এখন কিন্তু কামরূপ আসামের একটী জেলার নাম। প্রাচীনকালে কামরূপের চারিটী অংশ ছিল, যথা কামপীঠ, রত্নপীঠ, সুবর্ণপীঠ ও সৌমার পীঠ। আসামের দক্ষিণে ত্রিপুরা জেলা—প্রাচীন কিরাত রাজ্য, এক সময় ঘটককিরাত নামক রাজা কামরূপের কিছু অংশ জয় করেন, তখন কামরূপের রাজা নরকাসুর পলাইয়া গিয়া মিথিলাধিপ জনকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় যুদ্ধ বিদ্যাদি শিক্ষা করিয়া ও বহু সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া তিনি পুনরায় হৃতরাজ্য উদ্ধার করেন। কথিত আছে যে এই সময়ে কামাখ্যা দেবী নারীরূপ ধরিয়া ভক্তবৃন্দকে দেখা দিতেন। তাঁহার অসামান্য রূপে মুগ্ধ হইয়া নরকাসুর তাঁহাকে বিবাহের প্রস্তাব করেন। দেবী তাঁহাকে বলেন, "আচ্ছা তুমি যদি এক রাত্রির মধ্যে পাহাড় কাটিয়া আমার মন্দির, সিঁড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পার তাহা হইলে আমি তোমাকে বিবাহ করিব।" কিন্তু রাত্রি প্রায় এক প্রহর থাকিতে যখন কার্য্য শেষ হইতে কিছু দেরী আছে তখন একটী মোরগ ডাকিয়া উঠিল। ইহাতে দেবী বলিলেন যে "তোমার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই, অথচ রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।" ইহাতে নরকাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া মোরগটির পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চার মাইল দূরবর্ত্তী একটী পাহাড়ে উহাকে হত্যা করেন। সেই হইতে এই পাহাড়ের নাম হইয়াছে "কুকরাকাটী পাহাড়।" কথিত আছে যে নরকাসুরের অত্যাচারের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা গৌহাটি আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। ইহাঁর পুত্র ভগদত্তের কন্যা ভানুমতীর সহিত দুর্য্যোধনের বিবাহ হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অসীম শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া ভগদত্ত অর্জ্জুনের সহিত আট দিন যুদ্ধ করেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় অর্জ্জুন তাঁহাকে পরাজিত করেন। ভগদত্তের পর ঐ বংশের আরও উনিশ জন রাজা কামরূপে রাজত্ব করেন।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পূর্ব্বে শোণিতপুর ও কুণ্ডিল্য নামক রাজ্য ছিল। অনেকে মনে করেন যে বর্ত্তমান তেজপুর নগর শোণিতপুর রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই রাজ্যে বাণ নামক এক শিবভক্ত রাজা ছিলেন। উষা নামে ইহাঁর এক সুন্দরী কন্যা ছিল। তাঁহার দাসী চিত্রলেখার সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণের

নাতি অনিরুদ্ধের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহ লইয়াই উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। এক পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ, অপর পক্ষে মহাদেব। পরে দেবতারা এই বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দেন ও বাণ রাজা স্বয়ং মহাসমারোহে এই বিবাহ দেন।

আসাম সীমান্তে সদিয়ার উত্তরে কুণ্ডিল্য রাজ্য ছিল। এই রাজ্যে ভীষ্মক নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁহার রুক্ম নামক এক পুত্র ও রুক্মিণী নামক এক কন্যা ছিল। রুক্মিণী খুব বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অসামান্য শৌর্য্য, বীর্য্য ও গুণগ্রামের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গ্রহণ করেন ও মনে মনে তাঁহাকে স্বামীত্বে বরণ করেন। ওদিকে কন্যা বয়স্থা, তাঁহার পিতা যথারীতি স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময় রাজকন্যা রুক্মিণী তাঁহার মনের কথা বেদনিধি নামক রাজপুরোহিতকে নিবেদন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। বেদনিধি গোপনে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেখা করিয়া রুক্মিণীর মনের কথা তাঁহাকে জানাইলেন, রুক্মিণীর আকুল আহ্বানে ব্যথিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডিল্য রাজ্যে আগমন করেন কিন্তু যুদ্ধাদি না করিয়া কৌশলে তাঁহাকে হরণ করেন। রুক্ম এই কথা জানিতে পারায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে রুক্ম বন্দী হন কিন্তু ভগিনী রুক্মিণীর অনুরোধ মত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ক্ষমা করেন।

এই সকল কাহিনী পাঠ করিলে আসামের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না।

উপাসনা

—শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বসু

সন্ধ্যা-আঁধার ঘনায়ে এসেছে
　　প্রদীপ হয়নি জ্বালা।
পূজা উপচার হয়নি সাজান
　　গাঁথা হয়নিক মালা॥
সম্বল মোর ব্যথার কুসুম
　　অশ্রু অর্ঘ তার।
তাই দিয়ে পূজা করিব সাঙ্গ
　　খোল মন্দির-দ্বার॥
প্রয়োজন হয় দিব ডালি দিয়া
　　রিক্ত জীবন খানি।
আবেশে আবেগে তুমি শুধু মোর
　　শুধু এইটুকু জানি॥

সর্ব্বনাশী-এলোকেশী

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মহা পাষণ্ড, বদ্ধ-গোঁয়ার বলরাম দাস—

নহিলে সামান্য একটা কারণে সে যে-কাণ্ড করিয়া বসিল—মানুষে তা' করে না—করিতে পারে না।

মাটির মালিক, ভূস্বামী, রাজা, লক্ষ্মীর বরপুত্র তাঁহাকে দেশে না মানে কে? শাস্ত্রে বলে 'সর্ব্ব দেবময়ো রাজা'—তিনি যদি অন্যায়ের জন্য দুইটা অপমানই করিলেন—দশ টাকা জরিমানাই করিলেন,—তাই বলিয়া কি দেশান্তরী হইতে হইবে, পৈত্রিক জোত-জমা—পৈত্রিক-ভিটা সব পরিত্যাগ করিতে হইবে?

তোর বাপ, তোর পিতামহ—তারা কি জমিদার রাজাকে মানিয়া যায় নাই? আর জরিমানা? সে ত প্রজার ধনে রাজভাগ একটা, শাস্ত্রানুযায়ী তাঁহার প্রাপ্য!

হরিশ ভট্‌চাজ মিথ্যা বলে না—"গোঁয়ার আর বলে কাকে দাদা? গোঁয়ার গাছেও ফলে না—মাটীতেও গজায় না, গোঁয়ার ওই ওকেই বলে।"

বুড়া চাটুজ্জে বলেন—"বেটার লেজ গজিয়েছে হে। দেবতা ব্রাহ্মণ কাউকে মানা-মানি নাই! পড়বে বেটা পড়বে, তুমি দেখে নিয়ো ভায়া, এমন পড়া পড়বে বেটা—অতি বাড় বেড়ো না কথাটা শাস্ত্র বাক্য—বুঝলে ও মিথ্যা হবার নয়।"

আবার দশের কাছে বলরাম পরিচয় দেয়—"আমরা 'ত্রিপুরা-ভৈরবী বৈষ্ণব'—আমরা কারও তোয়াক্কা রাখি না।"

বৈষ্ণব জাতির ইতিহাসের মধ্যে এমন কোন একটী শাখার অস্তিত্ব আছে কি না কে জানে,—বলরাম কিন্তু ত্রিপুরা-ভৈরবী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধন-ভজন, আহার-বিহার সম্পর্কে একটী বেশ ধারাবাহিক পরিচয় দিয়া শাস্ত্র বাক্যের দোহাই পাড়ে—'কারণ' বারিতে আগে কর আচমন

মৎসে মাংসে ভোগ পরে করিবে নিবেদন।

এমন ছন্দোবদ্ধ শাস্ত্রবাক্যেও যদি লোকে অবিশ্বাস করে তবে সে দুহাতের বুড়া আঙ্গুল লোকের মুখের কাছে নাড়িয়া দিয়া কহে—

"কাঁচ-কলা,—বিশ্বাস না করলি ত আমার কাঁচ-কলা—"

বলিয়া রাগের বশে পড়্ পড়্ করিয়া জোরে জোরে হুঁক্কা টানে—টানিতে টানিতে আবার গোঁয়ারের গোঁ বাড়িয়া যায়—ঠক্ করিয়া হুঁকাটা দাওয়ার উপর নামাইয়া কহে—

"আমি খাব, আমি মদ খাব—মাংস খাব, আমার যা মন তাই ক'রব—তাতে কোন শালার কি?—"

উত্তরোত্তর ক্রোধের মাত্রা বাড়ে, কহে—"ভাগ্ শালা ভাগ,—নিকালো আমার বাড়ী হতে—আভি নিকালো।"

সামনে যে থাকে সে যদি মানে মানে এই সময় 'নিকালিল' ত' ভাল নতুবা বলরাম গলা ধরিয়া 'নিকালিয়া' দিবে।

তারপর আপন মনেই যেন আক্ষেপের সুরে কহে—

"দেখ দেখি বাপু—লোকের পেছনে লাগা। শালা মাগ না ছেলে, ঢেকি না কুলো—আমি কার তোয়াক্কা রাখিরে বাপু? যত সব মরুঞ্চে টিক্‌টিকির দল, গায়ে এক কড়া মুরদ কারু নাই—সমাধি খুঁড়তে হলে তখন বাবা বলরাম দাস ছাড়া গতি নাই—এস ডাকতে শালারা এইবার!"

সত্য,—ওই দুর্দ্ধর্ষ জোয়ানটি গ্রাম গ্রামান্তরে বৈষ্ণবদের সমাধি সৎকার একাই অক্লান্ত ভাবে করিয়া যায়। ঝগড়া বহু জনের সহিতই হয় কিন্তু শেষের দিনে সে ঝগড়া বলরাম মনে রাখে না,—সেদিন অম্লান চিত্তে পরম কৌতুকের সহিত শেষের কাজ করিয়া যায়।

মৃতের সঙ্গেও কৌতুক রহস্য ওর—যেন কিছুই হয় নাই—আবার এমন নির্ম্মম ভাবে শব-দেহগুলিকে নাড়া-চাড়া করে!

লোকের মন যে আপনি বিষাইয়া উঠে!

কিন্তু সত্য কথা বলিবার ত উপায় নাই—সত্য কথার কালও এ নয়—আর লোকটিও সোজা নয়।

সকলেরই বিশ্বাস চুরি, ডাকাতি, ঘরে আগুন, কোন কর্ম্মটীই বলরামের পক্ষে অসাধ্য নয়,—কথায় কথায় চড়-চাপড় ত অতি সোজা কর্ম্ম। তা ছাড়া লোকে অধার্ম্মিক নয়—তাহারা শাস্ত্র-বাক্য হেলন করে না—অপ্রিয় সত্য বলিয়া অধর্ম্ম তাহারা করে না;—ফলও তাহার হাতে হাতে মেলে। —মিষ্ট কথায় তুষ্ট বলরাম দোকানে ত ধার দেয়ই উপরন্তু

তাহার নিজের হাতের রচা পাঁচ বিঘা বাগানের শাকে সব্জীতে আঁচল ভরিয়া দিয়া কহে—

"নিয়ে যাও দাদা—নিয়ে যাও—আমার খাবেই বা কে—করবই বা কি? তোমরা পাঁচ জনে খেলেই আমার দেহের শ্রম সার্থক।"

লোকে বুদ্ধিমান—লোকে ধার্ম্মিক, বলরামের মত নয়।

সেদিন বুড়া চাটুজ্জে অতি কষ্টে হাঁপাইতে হাঁপাইতে চলিয়াছিলেন—কাঁকালে ডালায় নুন, তেল, দাল—আর পিঠে গামছায় বাঁধা সব্জীর বোঝা।

পথে ভট্‌চাজ জিজ্ঞাসা করিল—

"কি দাদা হাঁপাচ্ছেন যে,—কি সব এত নিয়ে চলেছেন?"

চাটুজ্জে মহাশয় আক্ষেপ করিয়া কহিলেন—

"আর বল কেন ভাই, শালা গোঁয়ার, দিলে গাধার বোঝাই পিঠে চাপিয়ে,—ওই হারামজাদা বলরাম বোরেগী হে;—কি করি বল—যে গোঁয়ার না বলবার ত জো নেই—নইলে শূদ্রের দান—রাধে রাধে! দেখি হুঁকোটা একবার দাও।"

হুঁকায় টান দিতে দিতে কহিলেন—

"শালা অহঙ্কার আর দেখাতে পাচ্ছে না হে—মাটিতে পা পড়ে না—ধনের আর দেহের অহঙ্কারে। কিন্তু ভগবান আছেন দর্পহারী, রক্তের তেজ তিনি কারও রাখেন না বুঝেছ, দেখো আমি বলে রাখলাম হরিশ, ওর কি হয় দেখো, শেষ পর্য্যন্ত ওর যদি মহাব্যাধি না হয় ত কি বলেছি আমি। বৈষ্ণব হয়ে মদ, মাংস, রাধে—রাধে!"

হরিশ গামছার গিঁটটা ফাঁক করিয়া সব্জীগুলি দেখিতে-ছিল—চাটুজ্জে পোঁটলাটা সরাইয়া রাখিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিলেন—

"শালা মুর্গীও খায় হে,—আমাকে সেদিন খানিকটা মাংস দিয়েছিল ভায়া—বল্লে পক্ষী মাংস—ফাঁদ পেতে 'সরাল' পক্ষী ধরেছি—সরু সরু হাড়,—তা আমি ভাবলাম সরাল ত বন্য হংস—এ না হয় খেতে পারা যায়। কিন্তু ভায়া দেখি মাংস অতি সুস্বাদু—ও মুর্গী না হয়ে যায় না। নিশ্চয় মুর্গী—রাধে রাধে! শালা ডাকাত হে—ওই দত্যির মত দেহ—পাঁচ বিঘে বাগান একা কোপায়—ও ডাকাতি করে না বলছ তুমি? নিশ্চয় করে, আমি বলছি নিশ্চয় করে—নইলে এত টাকা ওর হ'ল কি করে? নাও, ছাড়—ছাড়, উঠি।"

ভট্‌চাজ আবার গামছা টানিয়াছিল—চাটুজ্জে উঠিয়া গামছার বোঝা পিঠে ফেলিয়া কহিলেন—

"যাও না ভায়া বেড়াতে বেড়াতে একবার,—দুটো মিষ্টি কথা বল্লেই বাস্, বুঝেছ কিনা—"

বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ভট্‌চাজ শঙ্কাভরে কহিল—"যে গোঁয়ার বেটা—"

চাটুজ্জে গম্ভীর ভাবে কহিলেন—"তা বটে মহা পাষণ্ড—ভগবান আছেন।"

মহা পাষণ্ড তাহাতে সন্দেহ নাই—

নহিলে শাল না,—সেগুন না,—ফল না, মূল না—এ সামান্য একটা ফুলের গাছ তাহাতে মুখ দেওয়ায় কে কোথায় গো-হত্যা করিয়া বসে?

ঘটনাটা ঘটিয়াছিল এই—

বলরাম দোকানের পাশেই বহু যত্নে একটি হেনার ডাল আনিয়া পুতিয়াছিল—দিনে দশবার তাহার গোড়ায় বসিয়া সবুজ একটি অঙ্কুর-কণাবিকাশের প্রত্যাশায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া থাকিত।

ক্রমে সেই গাছটি পাতায় পাতায় ভরিয়া সতেজ একটি শিশুর মত দিন দিন নব নব লাবণ্যে ও পরিপুষ্টিতে বাড়িয়া উঠিতেছিল। বলরাম হুঁকাটি হাতে বার বার গাছটির কোমল পাতাগুলিতে মায়ের মত নিবিড় স্নেহে হাত বুলাইত—আর কোমল একটি সুখস্পর্শে বলরামের উগ্র চোখ দুটি যেন মুদিয়া আসিত!

সেদিন সবে বলরামের ভাতের নেশাটি ধরিয়া আসিয়াছে—মৃদু মৃদু নাক ডাকিতে ধরিয়াছে—এই অবসরে কোথা হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার একটা বাছুর আসিয়া গাছটি মুড়াইয়া খাইতে সুরু করিল!—প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে এমন সময় বলরামের ঘুম ভাঙিল।

দুঃখে, ক্ষোভে, ক্রোধে দুর্দ্দান্ত লোকটি যেন মূক হইয়া গেল—বিস্ফারিত নেত্রে কয়েক মুহূর্ত্ত সে ওই কাণ্ডজ্ঞানহীন পশুটার স্পর্দ্ধা দেখিল—তার পর প্রচণ্ড রাগে পাকা বাঁশের লাঠিটা লইয়া ঝাড়িয়া দিল বাছুরটার পিছনের পা চাপিয়া।

ওই এক লাঠিতেই বাছুরটা একটা অতি কাতর শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তবু বলরামের রাগ যায় না—

বাছুরটার বেদনা-বিস্ফারিত বড় বড় কাল চোখ দুইটার সম্মুখে লাঠিটা বারকয় ঠুকিয়া কহিল—

"ওঠ্ শালা—ওঠ্, আবার কলা ক'রে পড়ে আছে দেখ না ; ওঠ্ বলছি—ওঠ্!" বলিয়া আবার দুই লাথি।

ভয়বিহ্বল জীবটি বারকয় পা কয়টা আছড়াইয়া উঠিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না,—নিরুপায়ে একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হতভাগ্য জীব নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা কয়টি ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিল—পাতার সে কম্পিত আন্দোলনের চাপে দুইটি জলের ধারা গড়াইয়া গেল ; —শুধু কয়টি বিন্দু জলে চোখের পাতার দীর্ঘ রোমে শিশির বিন্দুর মত চক্ চক্ করিতে থাকিল।

অবিরাম বর্ষণেও পাথর গলে না—ক্ষয় হয়তো হয়, কিন্তু ওই দুর্ব্বল পশুটির কয় ফোঁটা চোখের জলে পাষাণে গড়া মানুষটি গলিয়া গেল। হাতের লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া বলরাম বিস্ফারিত নেত্রে পশু-শিশুটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল,—কিন্তু বড় সঙ্কোচভরে—

মানুষের লালসার অত্যাচারে মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত কঙ্কালসার জীব,—উদরের জ্বালায় অতি প্রলোভনে ওই সুশ্যাম সুরস গাছটিতে মুখ বাড়াইয়াছিল, মুখের পাশ গড়াইয়া সবুজ রস মিশ্রিত লালা এখনও গড়াইয়া পড়িতেছে—কয়টা পাতা এখনও গোটাই রহিয়াছে !

অসীম করুণায় বলরাম তাহার প্রকট পঞ্জরগুলির উপর হাত বুলাইল।

স্নেহ-স্পর্শবোধ বোধ হয় জীবজগতের জন্মগত বৃত্তি—

ওই অবোধ পশু বড় বড় কালো চোখ তুলিয়া বলরামের মুখপানে চাহিল—তাহার প্রসারিত হাত দুইখানি জিভ দিয়া চাটিতে সুরু করিল।

বলরাম কাঁদিয়া ফেলিল।

উজ্জ্বল রৌদ্রপ্রভায় ধরণীর রূপ যেন মণিদীপ্তির মত ঠিকরিয়া পড়িতেছিল—গাছের পাতায় সে প্রভার দীপ্তি, নীল আকাশ আভায় ঝল-মল,—দূর্ব্বার অগ্রবিন্দুটী পর্য্যন্ত যেন সবুজ মণিকণা ; কিন্তু বলরামের মনে হইল রূপে বর্ণে সমুজ্জ্বল ধরণী সহসা মলিন বিবর্ণ হইয়া গেছে—তাহারই নির্ম্মম দলনে রূপ লাবণ্য সব বীভৎস দুর্গন্ধময় হইয়া গেল।

* * *

পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ত অনুতাপ, পরপারের খাতায় চোখের জলে হয়ত পাপের ইতিহাস মুছিয়া যায়, কিন্তু সংসার বড় কঠিন স্থান, সেখানে পাপের নাম অন্যায়—সে অন্যায় চোখের জলে মুছিয়া যায় না—মানুষ মানুষকে এত সহজে রেহাই দেয় না।

বলরামও রেহাই পাইল না, তার উপর সে খোঁচা মারিয়াছিল ভীমরুলের চাকে ; ওই দুর্ভিক্ষপীড়িত গোবৎসটী হইতেছে এ চাকলার জমিদার বাবুর। ধনের গাদায় ও জনের মাথায় তিনি বসিয়া আছেন, অন্যায়ের দণ্ডবিধানের ভার স্বেচ্ছায় তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সহজে ছাড়িবেনই বা কেন ? স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা দায়িত্বের গুরুত্ব যে বড় বেশী।

সন্ধ্যার কাছাকাছি জন চার চাপরাশী আসিয়া হাজির—"চলো তুম্‌হি, বাবুর তলব আসে।"

বলরাম তখনও বাছুরটীকে সেঁক দিতেছিল, মুখের গোড়ায় তার কচি কচি ঘাসের বোঝা, চোখ বুঁজিয়া রোমন্থন করিতে করিতে সে পরম আরামে সেঁক লইতেছিল।

বলরাম মুখ না তুলিয়াই কহিল—"কাহে ?"

চট্ করিয়া একজন বলরামের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "পাকড়কে লে যানে কো হুকুম হ্যায়, বাবুর বাছুর মারিয়েসো তুম্ হি। ই বাছুর বাবুকে আছে।"

বলরাম ভ্রুকুটী করিয়া উঠিল, এমন ভাবে হাত চাপিয়া ধরিতে দেওয়ার অভ্যাস বলরামের কোনদিন ছিল না, একথা দশেও জানিত, সেইজন্যেই চার চার জন লোক একটা লোককে ডাক দিতে আসিয়াছিল, আর ডাক শুনাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল।

কিন্তু কি জানি কেন আজ বলরাম ভ্রুকুটী সম্বরণ করিয়া কহিল—"ধরতে হবে না, চল যাচ্ছি আমি ; দাঁড়াও একটু দরজা বন্ধ করি।"

ঘরে ঢুকিয়া দোকান সামলাইয়া বাছুরটীকে কোলে করিয়া সে আজ বাবুর কাছারীতে অপরাধীর মতই মাথা হেঁট করিয়া চলিল। চাটুজ্জে আসিতেছিলেন দোকানে, পথে দেখা হইতেই তিনি কহিলেন—"কোথায় যাচ্ছ বাবা বলরাম ?"

বলরাম উত্তর দিল না, উত্তর দিল চাপরাশী—"বাবুকে কাছারীমে ধরিয়ে লিয়ে যাচ্ছে।"

চাটুজ্জে ব্যগ্র ভাবে কহিলেন, "কেয়া ব্যাপার হোতা হুয়া।"

চাপরাশী কহিল—"বলোরাম বাবুর বাছুর মারিয়েসে ঠেঙাইয়ে।"

চাটুজ্জে আর কথা কহিলেন না, লোক কয়টা বেশ একটু দুর চলিয়া গেলে লম্বা লম্বা বকের মত পা ফেলিয়া বলরামের বাগানে ঢুকিতে ঢুকিতে কহিলেন—"রাধে রাধে বৈষ্ণব হয়ে গো-হত্যে, আরে গায়ে শক্তি আর ঘরে ধন থাকলেই কি এমনি ব্যাভিচারই করে রে বাপু!"

বাবু মুখে বিশেষ কিছু কহিলেন না, বলরাম বাছুরটী নামাইয়া নত হইয়া নমস্কার করিতেই তিনি কহিলেন, "হারামজাদা বোরেগী শালা—"

তারপর যাহা কিছু সব হাতে-হাতিয়ারে, পায়ের চটীটা হাতে লইয়া ওই নতুন চক্‌চকে চটী দিয়া বেশ ঘা কতক—আরও হয়তো ঘা কতক পড়িত, কিন্তু প্রবীণ নায়েব হাঁ হাঁ করিয়া হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "বেটা শয়তান ধর্ম্মভ্রষ্ট, ওর অঙ্গ স্পর্শ করা কি আপনার শোভা পায়? দিক বেটা পঞ্চাশ টাকা জরিমানা আর পঞ্চাশ টাকা খেসারৎ।"

নায়েব বাবুকে ঘরের ভিতর বসাইয়া মৃদু স্বরে কহিলেন, "সব্বনাশ, সব্বনাশ, ওই বেটা গোঁয়ারের গায়ে কি নিজে হাত তুলতে আছে, বেটা ডাকাত যদি—"

নায়েব শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—"যদি আপনার হাত ধরে ফেলত বেটা, কি—; যাক্ দিক্ বেটা একশো টাকা জরিমানা। হাতে মারি না ভাতে মারি;—উঃ বেটা যে কিছু করেনি এই আশ্চর্য্য!"

বলরামের এমন ধারা হীন নির্য্যাতন সহ্য করা সত্য সত্যই আশ্চর্য্য!

বাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন—সহসা বলরাম দরজার গোড়ায় আসিয়া কহিল—"তা হ'লে আমি জরিমানা আর খেসারৎ এনে দি।"

বাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—এ সংসারে এমন ক্ষেত্রে লোকে পায়ে লুটাইয়া কাঁদে, আর শক্তিমানের তাহাতেই সব চেয়ে বেশী আত্মপ্রসাদ; মানুষকে পায়ে দলিবার জন্য মানুষ চিরদিন শক্তি সঞ্চয় করে; বুকে বাঁশ দিয়া দলিয়া তাহার কাতর ক্রন্দনে গলিয়া ক্ষমা করিয়া শক্তিমান দয়াল হয়। শুধু তাই কেন? গৃহস্থ যে ভিক্ষুককে করুণা করিয়া ভিক্ষা দেয় তারও মধ্যে এই নিষ্ঠুরতার প্রভাব সূক্ষ্ম ভাবে রহিয়াছে—ভিক্ষুক জোড় হাত করিয়া ভিক্ষা চায় তাই গৃহস্থ করুণা করে, অনাহারী দরিদ্র মানুষ মানুষের অধিকারে দাবী করিলে পায় না ত কিছুই, উপরন্তু ভাগ্যে জোটে লাঞ্ছনা।

বাবুর ক্রোধ বোধ করি ফাটিয়া পড়িত কিন্তু বাস্তব রাজ্যের লোক নায়েব তার পূর্ব্বেই কহিলেন—"আধ ঘণ্টার মধ্যে—আধ ঘণ্টার মধ্যে টাকা হাজির করা চাই, যাও শিউ-শরণ সাথমে যাও, আধাঘণ্টাকে বাদ গলায় গামছা দিয়ে লে আনা।"

বলরাম ফিরিল কিন্তু আধ ঘণ্টার আগেই। টাকাগুলি ফরাসের উপর ঢালিয়া দিয়া বলরাম ছোট একটী প্রণাম করিয়া আহত বাছুরটীকে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, পশুটী মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিল। বাছুরটার জন্য খেয়াল এতক্ষণের মধ্যে কাহারও হয় নাই, বলরাম তাহাকে স্পর্শ করিতে শিউশরণ চাপরাশী কহিল, "বাছুর রাখিয়ে দেও, মাহিন্দার উস্কো লে যায়ে গা।"

নায়েব বাবু কহিলেন—"ও বাছুর তুমি নিয়ে যাও হে; অপঘাতে গো-হত্যে আমাদের বাড়ীতে হয় কেন?"

বলরাম বাছুরটীকে কোলে করিয়া উঠিয়া পড়িল।

নায়েব বাবু আবার হাঁকিয়া কহিলেন—"হাঁ, নিয়ে যাও, কিন্তু খবরদার মলে যেন ভাগাড়ে দেবে না, পুঁতে দেবে।"

জমিদার বাড়ী গো-মাতা মরিলেও তাহার শবে ছুরিকাঘাত হইতে দেওয়া হয় না।

বলরাম চলিয়া গেলে নায়েব বাবুকে কহিল, "ও তো বাঁচবেই না, গো-হত্যের পাতকের ভাগ আমরা নিই কেন?"

পরদিনই বলরাম গ্রামের বাহিরে তেপান্তর মাঠে এক ঘরের বনিয়াদ ধরিল,—এই স্থানে বিঘা দশেক নিষ্কর আখড়া করিবার জন্য বলরামের বাপ কিনিয়া গিয়াছিল।

বলরামের পণ কর সে কাহাকেও দিবে না, জমিদারের বালাই সে রাখিবে না।

চাটুজ্জে সমস্ত শুনিয়া ভট্‌চাজকে কহিলেন—"এ কি করতে হয় বল দেখি, আরে রাজা ভূস্বামী—"

ভট্‌চায কহিল—"কে সে কথা গোঁয়ারকে বলবে বল?"

চাটুজ্জে কহিলেন—"আমাকেই বলতে হবে ভাই, আমি যে আবার বেটার দোকানে জিনিষ নিই—"

ভটচায কহিল—"তার আবার ভাবনা, দশ দোর খোলা—বেণেদের দোকান—"

চাটুজ্জে কহিলেন—"বল কেন ভাই, একটী পয়সা বেটারা ধারে দেয় না ; তোমার অবিশ্যি যজমান সব, তোমাকে ত না করে না।"

চাটুজ্জে বলরামকে বলিলেন ও অনেক বুঝাইলেন—"জমিদার বাপ মা, ভূস্বামী, রাজা জানিস্ বাবা, শাস্ত্রে বলে দেবতার অংশ।"

গোঁয়ারের গোঁ, বলরাম কিছুতেই শুনিল না, হুঁকাটা ঠক্ করিয়া নামাইয়া কহিল—"কাঁচকলা জমিদার বাপ্ মা দেবতা না ইয়ে।" সে নতুন ঘরের দেওয়াল ফিরাইতে চলিয়া গেল।

* * *

মাস দেড়েকের মধ্যেই ঘরখানি সম্পূর্ণ হইয়া খড়িমাটীর লেপনে সুকোমল শুভ্রতায় যেন হাসিয়া উঠিল।

খড়িমাটী লেপন যেদিন শেষ হইল বোধ হয় তার দিন দুই পরই ঠিক ভোর হইতেই বলরাম আপনার সমস্ত অস্থাবর নতুন ঘরে স্থানান্তরিত করিতে আরম্ভ করিল।

সকল বেলাতেই চাটুজ্জে ডালাখানি হাতে বলরামের দোকান আসিয়া হাঁকিলেন "কই বাবা বলরাম, আজ দুদিন ধরে গিয়েছিলে কোথা—দোকানে এসে এসে ফিরে যাচ্ছি।"

সহসা বোঝাই গাড়ীখানি দেখিয়া কহিলেন—"ও মাল আন্‌লে বুঝি ? এ যে অনেক মাল হে!"

বলরাম তখন জিনিষ লইয়া টানাটানি করিতেছিল,—গায়ের জোরের শৃঙ্খলাহীন টানাটানিতে জড়পদার্থগুলিও যেন আঘাতের ভয়ে পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিতেছিল—কয়টা বাসন গিয়া বিছানার গাদায় ঢুকিয়াছে—বিছানার একটা প্রান্ত আবার বাক্সের কোণে আটকাইয়া গেছে। বলরাম প্রাণপণ শক্তিতে বিছানার এক প্রান্ত ধরিয়া টান মারিতেছিল। বিরক্তিতে তাহার মনটা উঠিয়াছে বিষাইয়া চাটুজ্জের কথার কোন সাড়া না দিয়া সে আপন মনেই টান মারিতে মারিতে কহিল, "হেঁই শালা হেঁই ; ছাড়ে না রে হেঁই" বলিয়া প্রচণ্ড একটান। সঙ্গে সঙ্গে বিছানাটা গেল ছিঁড়িয়া আর বাক্সের একটা কোণ আসিয়া আঘাত করিল পায়ের বাঁশীতে, সমস্ত দেহটা যেন ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল—কাটিয়া রক্তও খানিকটা পড়িল।

কোন সাড়া না পাইয়া চাটুজ্জে ঠিক এই সময়টাতেই ডাকিয়া বসিলেন—"বাবা বলরাম—বলরামরে!"

মুহূর্ত্তে বলরাম হইয়া উঠিল আগুন—আঘাতের সমস্ত যন্ত্রণা ক্রোধে রূপান্তরিত হইয়া সেটা পড়িতে উদ্যত হইল ওই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের উপর,—

হাতের বিছানাটা নির্ম্মম ভাবে ফেলিয়া দিয়া সে বাহিরে আসিতে আসিতে কহিল—"তোর ছ্যাঁচড় বামনের কিছু না করেছে—কেবল পিছু ডাকা কেবল পিছু ডাকা—বাবা বলরাম—বাবা বলরাম—বলরাম যেন ওর সাতপুরুষের বাবা! কেন কি বলছিস্ কি বুড়ো খগ—"

বৃদ্ধ চাটুজ্জে আবার বাতের রোগী, পা দুইটা বকের মত লম্বা হইলে কি হয় তুলিতে ফেলিতেই দু-টী মাস। ইষ্ট স্মরণ করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একগাল হাসিয়া কহিলেন—"কিছু ক্ষেতি হল বুঝি বাবা? পিছু ডাকা মানুষের কেমন একটা বদ রোগ—আর কি জান বাবা—ওতে মানুষের হাতও নাই—কেমন গোপনে বসে যে সব্বনাশী ডাকিয়ে দেয়! আ-হা-হা-রে কেমন করে পা টা এমন রদ্দি করলি রে?"

আঘাতটা চাটুজ্জের নজরে পড়িয়াছিল। এর পরে আর বলরামের কিছু বলা চলিল না, পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—"বাক্সের কোণাটা তা যাক্‌গে—মরুক্ গে—এমন কত লাগে!"

চাটুজ্জে ভরসা পাইয়া কহিলেন—"কাল পরশু বুঝি—সাঁইতের বাজার গিয়েছিলে মাল আনতে, এত মাল নিয়ে এলে দোকান বাড়াচ্ছ নাকি ? আচ্ছা হবে সে বাবা—বেটা বেণেদের গুমোর একবার ভাঙবে—বেটারা আবার বলে 'গদি'!"

বলরাম কহিল—"না এ সব নতুন মাল নয়—ঘরের জিনিষ সব নিয়ে চল্লাম নতুন বাড়ীতে—"

চাটুজ্জে কহিলেন—"সে কি আজই ? না-না- বাবা বলাই সে অনেক দূর যাস্‌নে বাবা তেপান্তরের মাঠে! আমি আবার বেতো মানুষ—আর এ তোর পৈত্রিক বাড়ী ঐ বাগান—"

বলরাম প্রতিবাদে চটিয়া কহিল—"রাখ ঠাকুর তোমার পৈত্রিক বাড়ী বাগান,—শালা কারু এলেকাতে বাস করছি

না—চাপরাশী দোরে আসতে দেব না। ওসব আমি চুকিয়ে দিয়ে এসেছি—সদরে গিয়ে কেলেক্টার সাহেবের কাছে সব ইস্তফা দিয়ে এসেছি আমি, রেজেষ্টারী চুটীশ জমিদারের নামে এল বলে। নিষ্কর নাথরাজ মাটীতে বাস করব, এবার একবার কেউ তলব শোনাতে আসুক্।"

চাটুজ্জে হতবাক্ হইয়া গেলেন—অবাক হইয়া বার্দ্ধক্য-নিষ্প্রভ চক্ষু দুটী বড় বড় করিয়া বলরামের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বলরাম কহিল—"যাও ঠাকুর বাড়ী যাও, দোকান এখন দুদিন মিলছে না। দু দিন পর ডাঙার বাড়ীতে যেতে পার ত যেয়ো, জিনিষ দোব।"

সে ঘরের পানে পা উঠাইল,—সঙ্গে সঙ্গে চাটুজ্জের মনের কথাটা বোধ করি মনে পড়িল, তিনি ডাকিয়া বলিলেন—"বলরাম।"

উদ্যত পদ সম্বরণ করিয়া বলরাম ফিরিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন—"কি ?"

চাটুজ্জে মহাশই ওই গম্ভীর সংহত ছোট কথাটীতে কেমন ভড়্কাইয়া গেলেন—হাঁকে ডাকে তিনি দমিতেন না—এ ভাবটা যে বলরামের কেমন অস্বাভাবিক !

চমকিয়া উঠিয়া চাটুজ্জে কহিলেন—"আজকে তেরস্পর্শ বাবা—মঘাও হয় ত হবে—আজকে আর" বলরাম গম্ভীর ভাবেই কহিল—"মাথার উপর টিক্‌টিকির মত মঘা তেরস্পর্শ কাল-ডাক ডেকো না বলছি ঠাকুর। যাও বলছি মানে মানে ঘরে যাও—"

চাটুজ্জের মেজাজটা কেমন হইয়া গেল—তিনি বলিয়া বসিলেন—"তা হ'লে বাপু আর আমার সঙ্গে কারবার চলবে না—কারুর সঙ্গেই চলবে না—"

চাটুজ্জে ফিরিয়াছিলেন কিন্তু বলরাম আসিয়া চাদরের খুঁট চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"টাকা দিয়ে যাও ঠাকুর ধারের টাকা !"

চাটুজ্জের মুখ শুকাইয়া গেল তবু তিনি থামচ্ কাটিয়া কহিলেন—"টাকা কি ট্যাঁকে ক'রে নিয়ে এসেছি নাকি !"

বলরাম চাদর ছিড়িয়া দিয়া কহিল—"কাল কিন্তু আমার টাকা চাই—নইলে তোমার গায়ের কাপড় চাদর খুলে নোব আমি।" বলিয়া সে ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হাঁপ ছাড়িয়া কয় পা আসিয়া ফিরিয়া কহিলেন—"নিব্বংশ হবে নিব্বংশ হবে—মরবি তেপান্তরে জল জল ক'রে—"

বলরাম যে অকৃতদার, শঙ্কায় ক্রোধে চাটুজ্জের সে কথাটা মনেই ছিল না।

* * *

ভূতের আবার অমাবস্যা না সম্মুখে যোগিনী, গোঁয়ারের গোঁ'এর মুখে ত্র্যহস্পর্শ না মঘা, ত্র্যহস্পর্শ মঘা পঞ্জিকার পৃষ্ঠাতেই রহিল, বলরাম সেই দিনই গৃহত্যাগ করিয়া নতুন গৃহে গৃহ-প্রবেশ করিয়া বসিল। আর করিল বিশেষ আড়ম্বরেরই সহিত—ঢোল নহবৎ বাজাইয়া, রাত্রে বন্ধু বান্ধব ভোজন করাইয়া সে এক বিরাট সমারোহ। আবার নতুন ঘরের চালের উপর এক লাল-পতাকা উড়াইয়া দিয়াছে—এ যেন সেই রক্তপতাকা উচ্চশির—গিরিকন্দরে রাণা প্রতাপের স্বাধীনতা-উৎসব।

যাক্ এ নতুন জীবন বলরামের মন্দ লাগিল না। দোকান তুলিয়া দিয়া দুইটা রাস্তার মোহড়া আগলাইয়া সে এক চালের আড়ত খুলিয়া দিল ও পাশেই বিঘা কয় জমি ঘেরিয়া বাগান রচনা সুরু করিয়া দিল।

পৃথিবী রচিয়াছেন স্রষ্টা, মানুষ তাহাতে তুলি বুলায় এ তাহার নেশা—সৃষ্টির নেশা, সেই নেশায় বিভোর মানুষ মরুর বুকে ছায়া রচিয়াছে, যুগের পর যুগ ধরিয়া কুতব-মিনার গড়িয়াছে, তাজমহল রচিয়াছে পিরামিড্ তুলিয়াছে, শূন্য প্রান্তর পৃথিবীর বুকে ইঁটে কাঠে পাথরে অপূর্ব্ব উদ্যান রচনা করিয়া চলিয়াছে।

সেই নেশায় বলরাম যেন বিভোর হইয়া উঠিল—মাটীর বুকে অফুরন্ত পরিশ্রম সে করিয়া যায়, গাছে ফুল ফুটায়, ফুলে ফল ধরায়, রুক্ষ প্রান্তরের বুকে সবুজ মায়া রচনা করে, ছোট একটু গণ্ডীর মধ্যে বলরামের সেবায় রুক্ষা ভৈরবী প্রকৃতি ধীরে ধীরে মমতাময়ী বরদা হইয়া উঠেন।

দুপুরের অবসর সময়ে সে সম্মুখের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে অলস আঁখি মেলিয়া মরীচিকার ঝিরি ঝিরি প্রবাহ দেখে, রৌদ্র-দগ্ধ বিবর্ণ আকাশের পানে চাহিয়া থাকে আর ভাবে—এই সমস্ত প্রান্তরের বুক জুড়িয়া যদি গাছের পর গাছ লাগানো যায়, তলে তলে কেমন একটি অবচ্ছিন্ন ছায়া ফুটিয়া উঠে—ছায়ার

কোল জুড়িয়া ঘাসের লাবণ্য আর মাঝ দিয়া যদি একটি জল ভরা আঁকা বাঁকা ছোট নদী বহিয়া যায়!

বলরাম ভাবে সে পারে, আপনার সমর্থ দেহের পানে চাহিয়া চাহিয়া সে ভাবে সে পারে কিন্তু জমি যে জমিদারের! মনটা তাহার বিষাইয়া উঠে।

সেই খোঁড়া বাছুরটা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হয়তো সেই সময়েই আসিয়া ওর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুখপানে চাহিয়া থাকে।

বাছুরটা মরে নাই, বলরামের সেবায় স্নেহে দিব্য সারিয়া উঠিয়াছে, পরিপুষ্টিতে শীর্ণ দেহখানি নধর হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দীর্ঘ কোমল লোমরাজি দেখা দিয়াছে, কিন্তু বলরামের আঘাত ওর অঙ্গে অক্ষয় হইয়া গেছে, একখানি পা আর সারে নাই। বলরাম কথা না কহিলে সে কখনও রাগ করিয়া গুঁতাইয়া দেয়, কখনও বা কর্‌করে জিভ দিয়া বলরামের পিঠ চাটিতে সুরু করে, বলরাম কাতুকুতুতে অস্থির হইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে ওর গলাটা জড়াইয়া চুমা খাইয়া মুখপানে চাহিয়া গান ধরিয়া দেয়—

ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যেসী
আর কি তোর মনে আছে এলোকেশী।

সে বাছুরটার নাম রাখিয়াছে এলোকেশী।

এখানে আর একটা বেশ বড় রকমের সুবিধা বলরামের হইয়াছে বৈশাখ মাসে 'জলসত্র' দেওয়ার।

এটা তাহার পৈত্রিক কীর্ত্তি। তাহার বাপ আজীবন এই ব্রতটী নিয়মিতভাবে পালন করিয়া গেছে। বৈশাখ মাসে খর রৌদ্রে ধরণী অগ্নিকুণ্ড হইয়া উঠিত, পশু পক্ষী পর্য্যন্ত ছায়াতলে আশ্রয় লইয়া সভয়ে নির্ব্বাক হইয়া থকিত, মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়, যাহাকে দেখা যায় সে যেন চিতায় অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া উঠিয়া আসিতেছে। বলরামের বাপ এই শ্রান্ত মানুষগুলির প্রতীক্ষায় পথপার্শ্বে গুড়, ছোলা, কাঁকুড়, জল লইয়া বসিয়া থাকিত, পথিক দেখিলেই আহ্বান করিত—"এস দেবতা এস, মুখে একটু ঠাণ্ডা জল দাও।" পথিককে বসাইয়া বাতাস দিয়া সুস্থ করিয়া গুড়, ছোলা, জল খাওয়াইয়া তবে সে ছাড়িত।

সেও বাপের মত প্রতি বৈশাখ মাসে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের তরে উত্তপ্ত পথ-পার্শ্বে জল লইয়া বসিয়া থাকে। রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের পানে চাহিয়া কত কি ভাবে।

লোকে হাসে বলে—"রাবণ রাজ স্বর্গের সিঁড়ি তুলছেন।"

দু'এক জন বন্ধুবান্ধব হাসিতে হাসিতে মুখের উপরেই বলে—"বোশেখ মাসে মিতে আমাদের ধার্ম্মিক হয়ে ওঠে, তা পুণ্যির কাজ বটে।"

বলরাম চটে না, কিন্তু বেশ গম্ভীর ভাবে বলে—"বাবা কি ব'লতো জানিস্, ব'লতো—বলরাম এই আগুনে পুড়তে পুড়তে যারা বের হয়রে তাদের বাইরের জ্বালাটাই দেখা যায়, কিন্তু বুকের কি পেটের যে-আগুনের জ্বালায় তারা এই আগুনের মধ্যে বেরোয় তার কথা একবার ভাব দেখি।"

বন্ধুরা সায় দিয়া কহে—"তা বটে, শাস্ত্রেও ত তাই বলে অক্ষয় পুণ্যি বৈশাখে জলদানে।"

বলরাম কহে—"সে একশো বার, যত পাপই করি এই জলদানেই আমার মুছে যাচ্ছে যদি অবিষ্যি পাপ পুণ্যি সংসারে থাকে। না থাকে তাই বা কি, বাবার কীর্ত্তি এ আমাকে ক'রতেই হবে। আর তোরা ত দেখিস্ নি—বোশেখের রোদে মাটি যখন পোড়ে তখন মাটির বুক থেকে মা ধরণী যেন তেষ্টায় হা হা করে—শুনেছিস সোঁ সোঁ একটা শব্দ?"

একটুখানি নীরব থাকিয়া আবার সে কহে—"আমার তখন মনে হয় কি জানিস্ যে, ভগীরথের মত তপস্যায় মাটির বুকে আকাশ থেকে যদি গঙ্গা ঝরাতে পারি!"

এই জলদানের সুবিধাটা বলরামের খুব বড় রকমের হইয়াছে। দুইটা পাকা রাস্তার মোহড়া আগলাইয়া তাহার বাড়ী, আঙিনার বড় তেঁতুল গাছটার ছায়ায় বসিয়া সে এবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জল দান করে শুধু তাই নয় ওই সুবিধায় সে এবার জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত জলদান চালাইয়া গেল। রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের বুকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত—প্রখর রৌদ্রে ক্ষীণ তৃণদলের মধ্যে একটা সোঁ সোঁ শব্দ, তৃণদলগুলির রস শুকাইয়া মরিয়া যাইতেছে, বলরামের মনে হইত—"এত জলও যদি ভগবান চোখে দিতেন যে মাটির বুকখানা ভিজাইয়া দেওয়া যাইত!

এলোকেশী পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার পিঠ চাটিল, বলরাম একমুঠা ছোলা তাহার মুখে ধরিয়া কহিল—"বল দেখি মা এলোকেশী জল কবে হবে?"

এলোকেশী সাদরে বলরামের মুখটা চাটিয়া দিল।

সন্ধ্যার দিকে আবার ভারে ভারে জল, বাগানের প্রতি গাছটির চারা ভরিয়া জল দেওয়া চাই—প্রতি গাছ এমন কি আঙিনার কোলের বিবর্ণ দুর্ব্বাদলগুলিতে পর্য্যন্ত জলধারা ঢালিয়া দিত, জল দিতে দিতে আপন মনেই কহিত— "আ-হা-হা—খা-খা, তেষ্টায় ত' তোদেরও ছাতি ফেটে যায়!"

* * *

চাটুজ্জে দশজনকে আশ্বাস দিতেন—"দেখবি—দেখবি, ফলবে—ফলবে। কথায় কি আছে জানিস্? কথায় আছে —যখন তখন করে পাপ সময় হ'লে ফলে পাপ, পাপ ছাড়েন না আপন বাপ। তা এত আমার বলরাম দাস!"

সেই পাপ ফলিবার সময় হইয়াছিল, না মঘার আঘাত কিম্বা এই স্পর্শের পাকচক্র কে জানে—বলরামের দেহের আকৃতি সহসা কেমন বিকৃত হইয়া উঠিল নাক কাণ কেমন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল,—সর্ব্বাঙ্গে চাকা চাকা তামাটে তামাটে দাগ।

বলরাম দাগগুলির পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবে—আয়নাতে মুখ দেখে, নাক কাণ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে,- হতাশায় বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে, নীরশ কর্কশ যে চোখে এতদিন শুধু উগ্রতার রক্ত খেলা করিয়াছে সেই চোখ দুটী কানায় কানায় জলে ভরিয়া উঠে।

লোকে কহিল—"এ জন্মের পাপ এই জন্মেই ফলে গেল; বাবা—ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি এড়াবার কি জো আছে?"

ধর্ম্মের গতি হয়তো অতি সূক্ষ্ম, ধর্ম্মের ধাতার হয় তো তিল্ল প্রমাণ অন্যায় সহ্য হয় না, সবই হয়ত ঠিক কিন্তু,যে পাপে বলরামের এত বড় সাজা হইয়া গেল, সে পাপটা বলরামের নয় এটাও সঠিক; সে পাপ বলরামের বাপের মায়ের। আত্মজকে জীবন ও রক্তদানের সময় সে পাপের বিষ তাঁহারা ঢালিয়া দিয়া গিয়াছে, এ আমরা জানি।

হয়ত বলরামের পূর্ব্বজন্মের পাপ -

কিম্বা হয়ত দেবতা ব্রাহ্মণের অভিশাপই উত্তাপে পাপের সুপ্ত বীজকে উপ্ত করিয়া দিল—

যাই হোক, বিদ্রোহী পাহাড়ের মাথায় বজ্রাঘাত হইয়া গেল।

রোগের চেয়ে অসহ্য এখন কথার জ্বালা। লোকে এখন মুখের উপরই হাসিয়া নানা কথা কয়—সেদিন ভট্চায দোকানের সম্মুখেই বলিয়া বসিল—অবশ্য ভদ্রতা করিয়া পিছন ফিরিয়া—

"হবে না, ফলবে না, ব্রহ্মবাক্য এ কি মিথ্যে হয়,—শক্তির দম্ভে দেবতা ব্রাহ্মণ রাজা কাউকে মেনেছে? তার ওপর বৈষ্ণবের ছেলে মদ মাস খাওয়া, গো হত্যে পর্য্যন্ত!"

স্বভাব যায় না ম'লে,—বলরাম ত বাঁচিয়াই ছিল; সে দুর্নিবার ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল—"বেরো হারামজাদা বামুন বেরো নইলে বলরাম দাস এখনও তোর মত সাতটা বামুনকে নিকেশ করবার ক্ষমতা ধরে।"

রোগবিকৃত চোখমুখ ক্রোধের বিকৃতিতে বীভৎস ভীষণ হইয়া উঠিল—সে মূর্ত্তি দেখিয়া প্রেতেরও বোধ করি শঙ্কা লাগে। ভট্চায কাঁপিয়া উঠিয়া ঘন ঘন পা ফেলিতে সুরু করিলেন, কিন্তু মুখে হটিলেন না, কহিলেন—"হক্ কথা ব'লব তা'—তা' ভয় কিসের রে বাপু হক্ কথা—"

হক্ কথার শেষ কথাটা বলরাম আর শুনিতে পাইল না, ভট্চায মহাশয় তখন কণ্ঠস্বরের গোচর-সীমা পার হইয়া গেছেন।

বলরাম দাওয়ার উপর বসিয়া এক দৃষ্টে সম্মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, চোখ দুইটী জলে ভরিয়া গেছে—ঠোঁট দুইটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে কি তাহার মনে হইল কে জানে —তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া পাশের পরিচ্ছন্ন স্থানটীতে বাঁধা এলোকেশীর পায়ে সে লুটাইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এলোকেশীর পায়ের ক্লেদ ধূলা সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে তাহার মুখটী ধরিয়া কহিল—

"দে মা—দে তুই আমার ভাল ক'রে দে,—তোকে মেরেই আমার এ পাপ মা—এ প্রায়শ্চিত্তি—।"

এলোকেশী পরম স্নেহভরে বলরামের রোগগ্রস্ত অঙ্গখানি লেহন করিতে করিতে শান্ত কালো চোখের দৃষ্টি দিয়া নিবিড় একটী সান্ত্বনা দিল।

বলরাম প্রত্যাশা করিল—রাত্রির মধ্যে তাহার দিব্য দেহ হইয়া যাইবে—এলোকেশীর কৃপা সে লাভ করিয়াছে। উষার

স্বচ্ছতারও আগে সে সেদিন উঠিল—আজ ভাল করিয়া দেখা যায় না—দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া চায়—আলো ধীরে ধীরে বিকশিত হয়—বলরাম ভাবে দৃষ্টির ভ্রম হয়ত—!

সোণার বর্ণ আলোয় ধরণী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হতাশায় বলরামের বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল—সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া সেই ক্ষত সেই বিকৃতি অবিকৃত অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। তবু আশার শেষ হয় না—নিত্য প্রভাতে সে একটী পরম আশা করিয়া শয্যাত্যাগ করে—

নিত্যই সেই নিরাশা—সোণার বর্ণ আলোয় কুৎসিত ক্ষতগুলা অতি বীভৎস মনে হয়—দিন দিন তাহার পরিধি যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

* * *

সে বৎসরের বর্ষাটা গেল, অনাবৃষ্টির বর্ষা—তার উপর গোটা আশ্বিনটায় এক ফোঁটা বর্ষণ হইল না।

মাঠের ফসল অকালে বিবর্ণ হইয়া ঘাসের মত মাঠেই মিলাইয়া গেল। ফাগুণের শেষ না হইতেই পুকুর বিলের জল হইয়া উঠিল ঘোলা।—সমস্ত ধরণীর মধু বসন্তেই হইয়া উঠিল রুক্ষ—মদন যেন রুদ্র-দেবতার রোষবহ্নিতে অকালে ভস্ম হইয়া গেল - ফুল কলিতে শুকাইল—ফল মুকুলেই ঝরিয়া গেল; ধ্যানমগ্ন রুদ্র বিপুল রোষে যেন প্রলয়তাণ্ডবে নাচিয়া উঠিলেন।

প্রভাত হইতে না হইতেই দ্বাদশ সূর্য্যের উদয়—আকাশের নীলিমা হইয়া উঠিয়াছে রুক্ষ বিবর্ণ, সমস্ত সৃষ্টি যেন অবিরত বিপুল তৃষ্ণায় হা-হা করিয়া চায়—জল—জল—জল!

বিশ্ব-প্রকৃতির পানে চাহিতে চোখের মণিতারা সশঙ্ক স্তিমিত হইয়া আসে—বায়ুস্তরের রুক্ষতায় চোখে জ্বালা ধরে—জল আসে

বলরামের বাড়ীর ধারে ছোট একটি পুষ্করিণী—তার জল শুকাইয়া গেছে, শুষ্ক পুষ্করিণীর গর্ভে ছোট একটি ইঁদারা কাটিয়া বলরাম জলের সংস্থান করিয়াছে, কিন্তু সে নামেই জল—যেমন পঙ্কিল তেমনি দুর্গন্ধ।

চৈত্র-সংক্রান্তির আগের দিন বলরাম গাড়ী জুড়িয়া এক ক্রোশ দূর নদী হইতে টিন ভর্ত্তি করিয়া নির্ম্মল জল লইয়া আসিল।

কাল সকাল হইতেই জলদানব্রত আরম্ভ।

সন্ধ্যায় সে গুড় বাহির করিল, ছোলা ভিজাইল, চাকা চাকা করিয়া কাঁকুড়, কচি আম কাটিয়া থরে থরে সাজাইয়া রাখিল।

প্রভাত না হইতে সে উঠিয়া স্নান সারিয়া আঙিনার বৃক্ষতলটীতে জল গুড় ছোলায় নৈবেদ্য সাজাইয়া পথিক-দেবতার প্রত্যাশায় বসিয়া রহিল।

বেলার সঙ্গে সঙ্গে এক সূর্য্য শত সূর্য্য হইয়া উঠে—রৌদ্রের প্রখরতায় সর্ব্বাঙ্গ যেন ঝলসিয়া যায়; বলরামের রোগজীর্ণ চর্ম্মে সে এক অসহ্য প্রদাহ—কে যেন আগুন বাঁটিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিয়াছে—বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত পুড়িয়া যায়।

সমস্ত দেহটায় কাপড় জড়াইয়া বলরাম চোখ দুটি শুধু বাহির করিয়া বসিয়া রহিল।

ওই দূরে সম্মুখের কম্পমান রৌদ্রধারার মধ্য দিয়া কি একটী কালো রেখার মত নড়ে চড়ে না? রেখাটী আগাইয়া আসে—দূরত্বহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে মায়া যেন কায়া গ্রহণ করে, রেখাটি মানুষ হইয়া দাঁড়ায়।

বলরাম পরম আগ্রহে পিতলের রেকাবীতে গুড়, ছোলা, কাঁকুড় ও কচি আমের কুচিতে নৈবেদ্য সাজাইতে বসে।

"জল,—একটু জল দিতে পার বাবা,—"

ক্ষীণ শুষ্ক স্বর।

শুষ্ক কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণ তাহার যেন বহুদূর হইতে জল চাহিল। বলরাম পরম আগ্রহে গায়ের কাপড় টানিয়া সামলাইয়া লইয়া কহিল—

"বসুন, বসুন দেবতা একটু ঠাণ্ডা হোন্ বসুন,—"

লোকটি এক দৃষ্টিতে বলরামের পানে চাহিয়া রহিল।

বলরাম আবার অনুরোধ করিল—

"বসুন আপনি আমি একটু বাতাস করি—তারপর—"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসে বলরাম মধ্যপথেই নির্ব্বাক হইয়া গেল;—পথিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—

"নাঃ আমায় বহুদূর যেতে হবে।"

পথিক পা বাড়াইল,—বলরাম ব্যাকুলভাবে কহিল—"তবে জল খেয়ে যান,—আপনার ভেতর যে শুকিয়ে গেল—এই—এইযে জল"—

বলরাম এক হাতে জল অপর হাতে নৈবেদ্যের থালা তাহার সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিল। পথিক আর একবার

বলরামের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে তাহার হাত ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে হইতে কহিল—"না—না—তেষ্টা আমার পায় নি—"

এমন সাদর আহ্বান প্রত্যাখানে গোঁয়ার বলরামের রৌদ্র-দগ্ধ চিত্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল—সে ঈষৎ রূঢ় ভাবে কহিল—"আমার কি অপরাধ হল বাবা ?"

পথিক উত্তর দিল না,—বলরাম আবার তেমনি রূঢ় ভাবেই ডাকিল—"বাবা—!"

পথিক চলিতে চলিতেই অবার কহিল—"অপরাধ আর কার বলব বল বাবা,—অপরাধ তোমার অদৃষ্টের, নিজের অঙ্গের পানে চেয়ে দেখ না। কুষ্ঠ রোগীর হাতের জল কেমন ক'রে খাই বল ?"

উপকরণের থালা জলের গ্লাস ঝন্‌ঝন্ করিয়া মাটীর উপর আপনি খসিয়া পড়িয়া গেল—বলরামের সর্ব্ব অঙ্গ যেন ক্ষণেকের তরে পঙ্গু অসাড় হইয়া গেল। তার পর সহসা সজাগ হইয়া লাথির পর লাথি মারিয়া জল উপচার সমস্ত মাটীর বুকে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

তৃষ্ণার্ত্ত মাটী চোঁ চোঁ করি৷ মুহূর্ত্তে টিনভর্ত্তি জলটা শুষিয়া লইল,—এলোকেশী ছুটিয়া আসিয়া ছড়ান উপকরণ গুলি কুড়াইয়া কুড়াইয়া খাইতে লাগিল,—তাহাদের পানে চাহিয়া বলরাম আপন মনেই কহিল—"মাটীকে জল দেব, গাইকে জল দেব, পশুপক্ষী জল দেব আমি।"

* * *

মানুষের উপর ক্রোধে নিজের উপর ঘৃণায় বলরাম যেন পাগল হইয়া গেল—দুরন্ত ক্রোধে সমস্ত দিনটা আহার পর্য্যন্ত করিল না ;—সন্ধ্যার দড়ির খাটিয়াটা মুক্ত আঙিনায় মুক্ত আকাশের তলে বিছাইয়া শুইয়া নক্ষত্রখচিত আকাশের পানে চাহিয়া সে কি ভাবিতেছিল। এলোকেশী মাথার গোড়ায় শুইয়া চোখ বুজিয়া রোমন্থন জুড়িয়া দিয়াছে।

বিপর্য্যস্ত মস্তিষ্কে উন্মত্ত চিন্তা অসম্ভব কল্পনা খেলা করে,—এক এক সময় ইচ্ছা করে আপনার অঙ্গের সমস্ত ব্যাধি সে যদি এই সৃষ্টিময় ছড়াইয়া দিতে পারে,—সমস্ত সৃষ্টি যদি এই বিষে পঙ্গু জর্জ্জর হইয়া যায় !—

আবার মনে হয়—সে যদি পৃথিবীর বুকের সমস্ত জলটুকু নিঃশেষে হরণ করিয়া লইতে পারিত—সমস্ত দুনিয়া তাহার দ্বারে আসিয়া করযোড়ে জল ভিক্ষা করিত! সে যদি ব্রহ্মার মত নবগঙ্গার সৃষ্টি করিতে পারিত!—এমনি রাশি রাশি অসম্ভব কল্পনা উন্মত্ত চিন্তা! তখন বোধ হয় মধ্যরাত্রি—সপ্তর্ষি-মণ্ডল পাক খাইয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে,—বলরাম সহসা খাটিয়ার উপর উঠিয়া বসিল, শিয়র হইতে দেশলাই লইয়া আলো জ্বালিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরের কোণ হইতে শাবলটা লইয়া ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া বাহির করিল—দুইটা পিতলের ঘটি—টাকায় পরিপূর্ণ! ঘটি হইতে টাকার রাশি মাটীর উপর ঢালিয়া জল্‌জ্বল্ দৃষ্টিতে সেই অর্থস্তূপের পানে চাহিয়া কি ভাবিতে বসিল।

পরদিন সকালে গ্রামে গ্রামে ঢুলি ঢোল দিয়া ফিরিল—"মজুর চাই—মজুর, বলরাম দাস পুকুর কাটাবে মজুর চাই—!"

মাটীর বুক ফালি ফালি করিয়া চিরিয়া চারিটা দিক মাটীর পাহাড় গড়িয়া তুলিল, তাহার মধ্যে গহ্বরের মত গভীর সমচতুষ্কোণ পুকুর।

কিন্তু কোথায় জল ?

পাতালের ভোগবতীর ধারাও শুকাইয়া গেছে!

লোকে কহিল—"বলরামের পাপে।"

বলরাম কাঁদিল—অফুরন্ত কান্না। কিন্তু অশ্রুজলে সে বিশাল গহ্বরের একটী বিন্দু পরিমিত স্থানও সিক্ত পঙ্কিল হইয়া উঠিল না।

সন্ধ্যার মুখে সেদিন চাটুজ্জে গ্রামান্তর হইতে ফিরিতে-ছিলেন। সঙ্গে কয়জন লোক, বলরামের দুয়ারের সম্মুখে হঠাৎ চাটুজ্জে মহাশয় দাঁড়াইয়া হাঁকিলেন—"বলরাম!"

এক ছিলিম তামাকের বড় প্রয়োজন ছিল, কিন্তু দুয়ার বন্ধ, কেহ কোথাও নাই, চাটুজ্জে ক্ষুণ্ণ মনে চলিতে চলিতে শুষ্ক পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়াইয়া সাথীদিগকে কহিলেন—

"বেটা কুঠের কীর্ত্তি দেখ—এক পুকুর কাটিয়ে ব'সল; তাই যদি গ্রহ শান্তি-টান্তি করাতো তা' হ'লে হয়ত রোগ সারত'। তা না এক পুকুর; আরে বাপু কুঠের পুকুরে যদি জল হ'ত তবে আর ভাবনা কি? ধর্ম্ম এখনও একপদ আছে। দেখো তোমরা এ পুকুরে জল হবে না—যদি হয় তবে ঘোলা—পশু পক্ষীতেও মুখ দেবে না।"

তারপর চলিতে চলিতে পশ্চিম পাহাড়ের কোণ ঘেঁসিয়া

আসিয়া পড়িয়া আবার দাঁড়াইয়া গেলেন, স্তূপীকৃত মাটীর পানে চাহিয়া কহিলেন - "কিন্তু কলা আর তরকারী যা এক-চোট হবে। বুঝেছ কিনা, ওঃ ভুতে খেতে পারবে না। তা শালা কি আর কাউকে একটা দেবে ? পুকুরের দুনো খরচ ও এতে তুলবে দেখো।"

পরদিন প্রভাতে দেখা গেল—ঘরের কড়িতে দড়ি ঝুলাইয়া বলরাম গলায় ফাঁস দিয়া ঝুলিতেছে—

বীভৎস বিকৃত মুখ বাঁকিয়া চুরিয়া আরও বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দুটী ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়াছে কিন্তু সে চোখ আজ আর সজল নয়। চোখের জল আজ তাহার শুকাইয়াছে। শুধু এলোকেশী পরম স্নেহে তার দেহখানি চাটিতেছে। বোধ করি তাহাকে ডাকিতেছিল।

এ যদি নিয়তির পরিহাস হয় তবে বড় নিষ্ঠুর পরিহাস! সেই রাত্রেই অজস্র বর্ষণে ধরণী শীতলা হইয়া গেল; বহুদিনের দগ্ধ ধরার বুকে জল জমিল না। কিন্তু প্রকৃতি সরসা হইয়া উঠিল

সব চেয়ে বড় পরিহাস—পাথরে কাঁকরে ভরা প্রান্তরের বুক ঝরিয়া বলরামের পুকুরে জল দেখা দিল, দিন দিন সে জল বাড়ে কাঁকর পাথরের বুক-ঝরা কাঁচবরণ জল।

বর্ষণের পর আবার বর্ষণ, আবার বর্ষণ।

দীঘির বুক জলে জলে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে। সে নির্ম্মল জলধারায় হিল্লোল উঠে।

মাঠের পশু তৃষ্ণায় ছুটিয়া আসিয়া আকণ্ঠ পুরিয়া জল পান করে; তৃষ্ণার্ত্ত পথিক অঞ্জলি ভরিয়া জলপানে তৃষ্ণা জুড়ায়; পল্লীবধূরা দলে দলে নির্জ্জন প্রান্তরে কলসী লইয়া সে জলে হিল্লোল তোলে, চঞ্চল ছেলের দল কলরোলে সে জলে ঝাঁপ খাইয়া সাঁতার কাটে। চাটুজ্জে স্নানান্তে আহ্নিক করিতে করিতে ছেলেদের অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া কন—"লঘু গুরু মানা-মানি নেইরে বাপু, তোরা হ'লি কি? রাধে রাধে।"

সেদিনও ওই অত্যাচারে আপনার গাড়ুটী জলে ভর্ত্তি করিয়া চাটুজ্জে গামছা খানি মাথায় দিয়া উঠিয়া পড়েন। কিন্তু ঘাটের পথ জুড়িয়া একটা খোঁড়া বাছুর, চাটুজ্জে সেটাকে তাড়ান—"হেট্‌—হেট্‌।"

এ সেই এলোকেশী—এলোকেশী আবার বাবুদের ঘরে গিয়াছে। বাবুদের ঘরের গরুর মতই রূপ হইয়াছে; শুধু এখানে আসে, খোলা পাইলেই পলাইয়া আসে।

এলোকেশী নড়ে না, অসহিষ্ণু চাটুজ্জে জলপানতৃপ্ত একটী পথিককে কহেন—"দাও ত হে বাছুরটাকে ঠেলে সরিয়ে

বাছুরটাকে সরাইয়া পথ করিয়া দিয়া পথিক কহে—"বড় চমৎকার পুকুরটী ঠাকুরমশায়, পবিত্র জল

চাটুজ্জে কহিলেন—"পাথর খেলে এ জলে হজম হয়ে যায় বাবা, এ জল ছাড়া আমি খাইনে। শুধু আমি কেন চাকলার লোকটী এই জল খায়। এই একটী গাড়ু নিয়ে চল্লাম। সারাদিন ঢুক্ ঢুক্ করে খাব। দাও ত আর একটু বাছুরটাকে সরিয়ে।"

তাড়নায় এলোকেশী খোঁড়াইয়া চলিতে চলিতে মুখ তুলিয়া চারিদিকে চায়, শেষে বলরামের ভাঙা ভিটার ধারে গিয়া ভাষাহীন পশু রব করিয়া উঠে।

সে রবের সুরটী বোঝা যায়—ব্যগ্র আহ্বানের সুর কাহাকে যেন ডাকে সে।

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পর আবার সে ডাকে।

দুই দিক

—শ্রীপ্রিয়নাথ বসু

এক

সতীশ ও তাহার পরম বন্ধু সুনীল সে দিন কি একটা স্বদেশী সভায় গরম গরম বক্তৃতা শুনিয়া গড়ের মাঠের পথ ধরিয়া নানা কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছিল। উভয়েই এক পাড়ার প্রতিবেশী, উভয়েই প্রিয়দর্শন যুবক সহপাঠী ও আশৈশব বন্ধু, সতীশ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, জ্যেষ্ঠভ্রাতা সামান্য একটা কেরাণীগিরি ও আরো কি কি করিয়া তাহাদের ছোট্ট সংসারটি স্বচ্ছল ভাবে চালাইয়া তাহার পড়ার খরচ যোগাইত। সুনীল গৃহের দুলাল, অর্থেরও যেমন তাহার অভাব নাই, মতিগতি কার্য্যকলাপ কোনটারই তেমনি কোন নির্দ্ধারিত গতি নাই, হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিতেও বেশী সময় লাগে না, আবার সহসা নিভিয়া জল হইয়া যাইতেও বিলম্ব হয় না।

সুনীল কহিল, কলেজে পড়া আর চলবে না সতীশ এখন কাজের দিন এসেছে, সবাই কাজ করবে আর আমরা নীরব থাকব কেমন করে? আমাদেরও তো একটা অংশ নেওয়া উচিত।

সতীশ সংক্ষেপে উত্তর দিল, তা ঠিক।

সুনীল উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, শুধু ঠিক নয় সতীশ, একেবারে সত্যি, এর চেয়ে বড় সত্য আর কি আছে বল? ভাব দেখি একবার দেশবন্ধুর কথা! সুখ বলতে যা কিছু তা তো সবই তাঁর আয়ত্তে ছিল, সম্পদেরও তাঁর অবধি ছিল না, তবে কেন তিনি রাজা হয়ে ভিক্ষুক সাজলেন? তোমার আমার জন্যই তো! আর আমরা কি কিছুই করতে পারব না?

সতীশ কহিল, কিছুই করতে পারব না, এ কথা তো বলচি নে সুনীল।

সুনীল অধিকতর উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, এই তার মাহেন্দ্র ক্ষণ, কাজ যদি করতে চাও তবে এই তার সময়, একবার ভেবে দেখো তো সতীশ লেখাপড়ার মূল্য কি? এতে সত্যিকারের শিক্ষা কতটুকু হয়, শুধু কোন মতে বেঁচে থাকাটাই কি ভাই সব!

সতীশ কহিল, আমি তা'তো বলচিনে, সুনীল।

তবে? তবে আর বিলম্বেরই বা প্রয়োজন কি, আর চিন্তা ক'রে দেখ্‌বারই বা অবসর কোথায়, শুনলে তো সবই—বলিয়া সুনীল দুই দীপ্ত আঁখি তুলিয়া সতীশের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সতীশ এ কথার কোন জবাব দিল না, কেবল নীরবে পথ চলিতে লাগিল। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এই ভূমিখণ্ডেরই অগণিত মানব কি ভাবে আপনার চারিদিক ঘেরিয়া হায় হায় করিয়া মরিতেছে, উদয়াস্ত কাল কি অশেষ পরিশ্রম করিয়া কোন মতে দুই মুষ্টি উদরান্ন সংস্থান করিতেছে, রোগ শোক অনাহার অর্দ্ধাহার, কিভাবে মানবের সুদীর্ঘ পরমায়ু ক্ষুণ্ণ করিয়া আনিতেছে, তাহা সতীশের অজানা নাই; চক্ষের উপর দুই চারিটা না দেখিয়াছে এমনও নয়। সে নিজেই দরিদ্রের সন্তান, কি সীমাহীন দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরবধি যুদ্ধ করিয়া তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান চলিতেছে, তাহাও সতীশ ভাল করিয়াই জানিত। ঝোঁকের মাথায় কোন কাজ করা তাহার অভ্যাস নয় বলিয়াই সে নীরব হইয়া রহিল।

নীরবে উভয়ে আরো কিছুদূর অগ্রসর হইলে সুনীল কহিল, বেশ তুমি যা হয় ভেবে দেখ, আমার ভাববার বুঝবার আর কিছু নেই সতীশ, এ আমি ঠিক করে ফেলেছি, মিছে কেন ভাই আমি তোমাকে এর মধ্যে জড়াচ্ছিলাম, তুমি যা' ভাল বোঝ, কর।

বন্ধুর অভিমান বন্ধুর বুকে আঘাত করিল, কিন্তু সতীশ শুধু মুখ তুলিয়া একটু মৃদু হাসিয়া যেমন চলিতেছিল, তেম্‌নি চলিতে লাগিল।

সুনীল কহিল, তবে তোমাকে ছাড়া আমার কোন কাজেই মন বসে না, তাই না তোমাকে এত ক'রে বলি। কি ভালই যে তোমাকে বেসেছিলুম ভাই!—বলিয়া ক্ষুদ্র একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনশ্চ কহিল, কিন্তু ভাই জোর ক'রে তোমাকে আমি কিছুই করাতে চাইনে, কোন দিন যা' পারি নি আজও তা চাইনে, হয়তো তা'তে আমাকে ঠক্‌তে হবে, হয়তো তোমার বন্ধুত্ব হারাব।

বন্ধুর কথায় সতীশের চক্ষু সজল হইয়া আসিল, সে অতিকষ্টে তাহাই গোপন করিয়া কহিল, আমি যে এ কাজে যাব না, তা'তো তোমাকে বলিনি সুনীল, আর বন্ধুত্বের গৌরব কি তোমার একার বস্তু ভাই, হারালে কি ক্ষতি আমারই কম ?

পুলকে আনন্দে সুনীলের দুই চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল, সে দুইহাতে বন্ধুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, আমি জানি ভাই, তুমি আমায় কত ভাল বাস

সতীশ শান্তকণ্ঠে কহিল, আমি শুধু ভাব্‌চি সংসারের কথা, দাদার একলার পক্ষে যে কত কষ্ট তা'তো জানো, তাঁর মনে হয়তো খুব লাগবে।

বহুক্ষণ আর কাহারো কোন কথাবার্ত্তা হইল না উভয়ে চলিতে চলিতে প্রায় বাটীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলে সুনীল কহিল, কথাটা আর একবার চিন্তা ক'রে দেখো সতীশ— বলিয়াই দ্রুত পদে আপনার গৃহপানে চলিয়া গেল।

সতীশ আপনার গৃহে প্রবেশ করিয়া নীরবে শয্যায় শুইয়া কেবল এই কথাটাই ভাবিতে লাগিল, এখন কি করা যায় ! যে কর্ম্মস্রোতে ঝাপাইয়া পড়িতে বন্ধু তাহাকে নিরতিশয় অনুরোধ করিল, সে কর্ম্মের শেষ কোথায় তাহা এক অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু ইহা যে শ্রেয় তাহাতে তো সংশয়ের লেশ মাত্রও নাই। সুনীল হয়তো আজ যাহা বলিতেছে কাল তাহা বলিবে না, হয়তো দুই দিন পরে ইহা তাহার ভাল লাগিবে না, ঝোঁকের মাথায় যাহা নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিতেছে, সে পথের দুঃখ কষ্ট গ্লানি হয়তো তাহার পক্ষে একদিন অসহ্য হইয়া উঠিবে, হয়তো সে একদিন অতি অনায়াসেই ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু সে তো তাহা করিতে পারিবে না, একবার ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে হয়তো বা ইহার শেষ না দেখিয়া আর ফিরিয়া আসা চলিবে না। কিন্তু ইহাইতো শ্রেয়। বাঁচিতে হইলে এই সংগ্রামের ভিতর দিয়াইতো শক্তি অর্জ্জন করিয়া লইতে হইবে, অলস সুখবিলাসে আর বেশী দিন বাঁচিয়া থাকা চলিবে না। নিরন্তর যে দুঃখ দৈন্য নিরাশার বেদনা পর্ব্বতাকারে চারিদিকে জমা হইয়া উঠিতেছে, অশিক্ষা ব্যাধি পীড়া শোক তাপ যে পাষাণভারে নিরবধি অতলে তলাইয়া দিতেছে, তাহার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিলে নিস্তার কোথায় ? এই সব কত কথাই না সতীশের অন্তরে জাগিতে লাগিল।

ঘরের আলো জ্বালিতে আসিয়া সতীশের বৌদি অতসী হাসিয়া কহিল, কার ধ্যান করছো ঠাকুর পো ?

সতীশ চমকিয়া উঠিয়া কহিল, কৈ, না।

অতসী আবার হাসিয়া কহিল, জান ঠাকুরপো, আমি মুখ দেখে মনের কথা ব'লে দিতে পারি, নিশ্চয় তুমি বিভার কথা ভাবছিলে।

লজ্জায় সতীশের মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া করিল, নিশ্চয় নয় বৌদি, তুমি কিছু বোঝ না, সব মিথ্যে

অতসী ছাড়িবার পাত্রী নহে, কহিল, আচ্ছা গো মশায় আর ঢাকতে হবে না। আর একটু আগে এলেইতো তার সঙ্গে দেখা হ'তো, এখানেই এসেছিল, তা' তোমার দাদা বাড়ী আসুন বলে দেখি, ভাইটী যে এদিকে শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠলেন।

সতীশ অতসীকে ভাল করিয়াই চিনিত। বছর পাঁচেক আগে এই ফুটফুটে মেয়েটী টাট্‌কা ফোটা ফুলটিরই মত হাসি আর সৌরভ নিয়া যখন তাদের সংসারে প্রবেশ করে, সে দিন অতসীকে সতীশের বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। উভয়ে প্রায় সমবয়সী, উভয়ের হাসি খেলা গল্পগুজবে কত দিনই না কাটিয়াছে। অতসীও এই নিরীহ ভাল মানুষটাকে আপনার ভাইটীর মতই আদর যত্ন করিত ; হাসি ঠাট্টা দিয়া অবসর বিনোদন করিত, এমনি করিয়া পাঁচটী বছর চলিয়া গিয়াছে, কৈশোরকে অতিক্রম করিয়া কখন যে তাহারা যৌবনের সীমানায় পা দিয়াছে তাহা বোধ করি কাহারও খেয়ালই নাই, এখনো সেই ভাব, সেই হাসি ঠাট্টা, পরস্পরের সুখে দুঃখে সেই সহানুভূতি তেমনি সজাগ রহিয়াছে। অতসী বিভাকে বড় ভাল বাসিত, দু' তিন খানা বাড়ী পরেই তাহাদের বাড়ী, বাল্যে বিভা প্রায়ই অতসীর নিকট বসিয়া লেখাপড়া সেলাই দেখাইয়া লইতে আসিত, এখন সেও শৈশব ছাড়াইয়া ফুলের কিশোর কুঁড়িটীর মত হইয়া উঠিয়াছে, এখন বড় একটা আসে না, আসিলে তাহাকেও অতসী ঠাট্টা করিতে ছাড়ে না, কে জানে সেও এই প্রিয়দর্শন নিরীহ যুবকটীকে মনে মনে কিসের জন্য সঙ্কোচ করিয়া চ'লে। আগে ইংরেজী পড়া সে সতীশের কাছে দেখিয়া লইত, এখন সতীশের পায়ের শব্দেও তাহার চোখ মুখ কেন রাঙা হইয়া ওঠে। কি এক

অজ্ঞাত দুজ্ঞেয় রহস্যের অন্তরালে রহিয়া এই দুইটী প্রাণী কিসের জন্য যে একে অপরের নাম শুনিলেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত তাহা হয়তো বা সকলে বুঝিবে না, কিন্তু অতসীর বুঝিতে এতটুকুও বিলম্ব হয় নাই। অতসীও কতদিন মনে মনে চিন্তা করিয়াছে, বিভাকে আনিতে পারিলে সতীশ নিশ্চয়ই সুখী হইবে। সতীশ আজ বাড়ী আসিলে অতসী না জানি কি একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে, লজ্জায় সতীশ মরমে মরিয়া যাইতে লাগিল, সে কহিল, তুমি দাদাকে এসব মিথ্যে কথা বল্‌লে আমি নিশ্চয় একটা কাণ্ড ক'রে বসব, আর দেখতেও পাবে না, তা বলে দিচ্ছি।

অতসী সবিস্ময়ে কহিল, কি কাণ্ড করবে, আগে শুনি।

'আমি স্বদেশী কাজে যাব।'

অতসী হাসিয়া কহিল, ও হরি, এই কাণ্ড, তা এপাড়ার কত ছেলেরাইতো এ কাণ্ড ক'রে বেড়াচ্ছে, তারা তো কেউ বাড়ী ছেড়ে যায় নি। আজ বিকেলেও তো ও পাড়ার একদল ছোক্‌রা পথে পথে গান গেয়ে যাচ্ছিল। এই ভয় তুমি দেখাচ্ছ? তা' বেশ তো ভালইতো, তুমি তো বেশ গাইতেও পার, সকালে বিকেলে বেশ কাজ করতে পারবে।

সতীশ কহিল, ওরকম কাজ নয় বৌদি, কাজ করতে হ'লে কলেজ ছাড়তে হবে, এমন কি দরকার হ'লে বাড়ী ঘরও ছাড়তে দ্বিধা করলে চলবে না।

অতসী অভিমানের সুরে কহিল, বে'র কথা বলেছি ব'লে বাড়ী ছেড়ে পালাবে ঠাকুরপো? এই ভাল তুমি বাস আমাদের? তোমার দাদাকে আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে, কষ্ট হবে না, তোমরা কি এমনই?

সতীশ কহিল, বে'র কথার জন্য নয় বৌদি, এ তোমাকে আমি বলতেই চেয়েছিলুম, দাদাকে বল্‌তে আমার সাহস হয় না, আর কষ্টের কথা যা' বললে, তা আর কি বল্‌ব বৌদি, সে কষ্ট যে তোমার ঠাকুরপোর কতটা হবে, সে এক তিনিই বুঝতে পারছেন, যাঁর কাছে মনের কোন কথাই অজানা থাকেনা।

অতসী কহিল, তবে?

সতীশ ব্যাকুল হইয়া কহিল, এর উত্তর তুমিই বল, তুমিই বলে দাও, যাওয়া উচিত কি অনুচিত, তুমি তো অশিক্ষিতা নও বৌদি, বুদ্ধিও তোমার কারো চেয়ে কম নয়, তুমিই বল, আজকের এই দিনে, তোমার স্নেহের দেবরটিকে তুমি কি ঘরের কোণে বসিয়ে রাখ্‌বে, না, আর দশজনের মত বোঁটা থেকে ছিড়ে-ফেলা ফুলটির মতই ছিঁড়ে মায়ের পায়ে ফেলে দেবে! ধ'রে তো রাখতে পারবে না, এতো একদিন শুকিয়ে ঝ'রে পড়বেই, তার জন্য কষ্ট করা কেন?

অতসী দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া কহিল, এসব বুঝি সুনীলের যুক্তি?

সতীশ হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিল, সুনীলের যুক্তি নয় বৌদি, এ আমার মনের কথা, আর তার যুক্তিই যদি হয়, দোষের তো কিছু নেই এতে।

কর যা ভাল বোঝ—বলিয়া অতসী নীরবে বাহির হইয়া গেল।

আহারের পর সতীশ নিদ্রার উদ্দেশ্যে শয্যায় গেল, কিন্তু চারিদিকে হইতে শত চিন্তা তাহার অবসন্ন দেহকে দগ্ধ করিতে লাগিল। দাদাকে বৌদিকে ছাড়িয়া থাকা সত্যই তো এক প্রকার অসম্ভব। পিতার অকালমৃত্যুর পর এই দাদা কি সীমাহীন দারিদ্র্যের কঠোরতাকে দুইহাতে ঠেলিয়া রাখিয়া ছোট ভাইটীকে আপনার স্নেহের নীড়ে সযত্নে লালন করিয়া আসিতেছে, স্বল্পভাষী সে, নিজের কর্ত্তব্য ও ব্যথার বোঝা কনিষ্ঠ ভাইটীর কাছে ন্যস্ত রাখিয়া বার্দ্ধক্যে হয়তো একটু মুক্তির আনন্দে দিন কাটাইতে পারিবে, জীবনের এই সংগ্রামের শ্রমলাঘব লইয়া আসিবে, সেই আশায়ই তো সে নীরবে সকল বহিয়া চলিয়াছে, মুখ ফুটিয়া কোনদিন কথাটী কহে নাই। সে যখন জানিতে পারিবে তাহার সেই আশা-তরুর মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বাৎসল্যে পালিত ভাইটী তাহার নীড় ছাড়িয়া পলাইয়াছে, সেদিন সে হয়তো মুখে কিছু কহিবে না, কিন্তু বুকের ভিতরটায় যে অগ্নিকাণ্ড হইবে তাহা চিন্তা করিতেও সতীশ আপনার শয্যায় শিহরিয়া উঠিল! অতসীর দুঃখও তো বড় কম হইবে না, তাহার খাওয়া পরা, আমোদ অবসর কি ভাবেই না তিক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিবে! আর বিভা, ও বাড়ীর সেই ফুটফুটে কিশোরী? কেন, বাড়ী থাকিয়া কি কাজ করা চলেনা? যদি না চলে, যদি এমন অবস্থা আসিয়া পড়ে, বহুদূরে যাইতে হইবে, কর্ম্মের স্রোত হয়তো কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, হয়তো আর ফিরিয়া আসা চলিবে না; এই সব নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে

চক্ষু তাহার তন্দ্রায় অবশ হইয়া গিয়াছে, নিদ্রায় দেহ ছাইয়া গিয়াছে কিছুই মনে নাই!

দুই

সকাল বেলা সুনীল আসিয়া ডাকিতেই সতীশের ঘুম ভাঙ্গিল। তাড়াতাড়ি করিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই সুনীল কহিল, বাবুর ঘুম ভাঙ্‌লো!

সতীশ কোন জবাব দিলনা, কেবল তাহার বিস্মিত দুই চক্ষু তুলিয়া সুনীলের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পরিধানে খদ্দরের পরিচ্ছন্ন ধুতি, গায়ে একখানা খদ্দরের চাদর, পায়ে জুতা নাই, তাহার স্বাস্থ্যসবল দেহখানি খদ্দরমণ্ডিত হইয়া এই সদ্য প্রভাতের শুভ্র রৌদ্রের মাঝে বড়ই উজ্জ্বল, বড়ই মধুর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, যেন কোন এক মাতৃমূর্ত্তির পূজারী শুভ্রবাসে পবিত্র চিত্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কপিলাবস্তর যুবরাজের মতই যেন সুনীল তাহার রাজৈশ্বর্য্য ঠেলিয়া ফেলিয়া মুক্তির সন্ধানে ছুটিয়া বাহির হইয়াছে, এমনই ভোগবিলাসম্পর্শ-লেশহীন তাহার পরিধেয়, এমনই নিষ্কাম পবিত্রোজ্জ্বল বন্ধুর মুখশ্রী, আজ সতীশের নিকট বড়ই প্রীতিপ্রদ বোধ হইল।

সুনীল কহিল, কি দেখছ হাঁ ক'রে বল তো। নাও চট্‌পট্‌ সেরে নাও, আজ মস্ত একটা কাজের 'প্রোগ্রাম' আছে, এত দেরীতে ঘুম ভাঙ্‌লে কি ক'রে চল্‌বে বল?

সতীশ নিজের বিলম্বে উঠায় লজ্জা বোধ করিল, কিন্তু চট্‌পট্‌ করিয়া প্রাঃতকৃত্য করিবার কোন গরজই সে করিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সতীশের অবস্থা দেখিয়া সুনীল হাসিয়া কহিল, কিহে কথা কইচ না যে, তুমি তা হ'লে যাচ্ছ না, বেশ তো এর আর লজ্জা কি? এ ত কলেজের পড়া নয়? এ কি সহজ কাজ সতীশ যে, সকলেই এতে যেতে পারবে?—বলিয়া সিঁড়ি বাহিয়া দ্রুত পদে নীচে নামিয়া গেল। সতীশ নীরবে আসিয়া আপনার গৃহে বসিয়া পড়িল, সুনীলের বিদ্রুপ তীক্ষ্ণ বাণের মতই গিয়া সতীশের মর্ম্মে বিঁধিল। সে কি সত্যই এত অপদার্থ যে একমাত্র কলেজের পড়া ভিন্ন আর কিছুই করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। এমনই দুর্ব্বল, এমনই ভীরু সে যে যাহা শ্রেয় বলিয়া নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে, তাহা বরণ করিয়া লইবার শক্তিও তাহার নাই। ধিক্কারে আত্মগ্লানিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। তুচ্ছ সংসারের বন্ধন, অসার মায়া মমতা স্নেহের ডোরই তাহার নিকট বড় হইয়া রহিল, আর অগণিত লাঞ্ছিত ধিকৃত মানবাত্মার সেবা, অভুক্ত বুভুক্ষের খাদ্যদান, সর্ব্বোপরি দেশের নিরুপদ্রব মুক্তির সংগ্রাম হইতে বঞ্চিত হইয়া অনায়াসে সে গৃহকোণে পড়িয়া রহিল। আর ঐ যে সুনীল, তাহার বন্ধনই কি সংসারে কম?—না এ ভাবে কিছুতেই বসিয়া থাকা চলবে না, তাহার দাদার স্নেহ, বৌদির মমতা, ক্ষুদ্র সংসারের গুরুভার, ইহারই আকর্ষণে সে যদি পিছাইয়া থাকে, তবে তাহার সংক্ষুব্ধ মানবাত্মা পিঞ্জরাবদ্ধ শ্বাপদের মতই গুমরিয়া মরিবে, ইহাকে মুক্তি দিতেই হইবে। সুনীল ঠিক পথই বাছিয়া লইয়াছে, সেই পথেই যাইতে হইবে।

অতসী গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল, কৈ চোখে মুখে জল দিলে না, চা যে জল হয়ে গেল।

সতীশ মুখ তুলিয়া কহিল, চা খাব না বৌদি।

অতসী হাসিয়া কহিল, চা যেন না খেলে ঠাকুরপো, মুখ হাত তো ধু'তে হবে। কাজ করতে হয় ক'রো, কিন্তু খাওয়া দাওয়া ছেড়ে স্বাস্থ্য নষ্ট কর্লে কি লাভ হবে তাই বল তো? তোমার কোন কাজেই তো আমরা কোন দিন বাধা দেই নি ঠাকুরপো, তোমার যা ইচ্ছে হয় করো, কিন্তু তোমার বৌদির এই কথাটা মনে রেখো, নিজে সুস্থ না থাক্‌লে তাকে দিয়ে কোন কাজই হয় না; দুর্ব্বল লোক সকল কাজেরই অযোগ্য। সে ঘরেও যেমন অযোগ্য বাইরেও ঠিক তেম্‌নি।

সতীশ উঠিয়া বৌদির পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কহিল, এই কি তোমার সত্যিকারের মত বৌদি?

অতসী সতীশের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, হাঁ ভাই এ-ই আমাদের সত্যিকারের মত। তুমি তো আড়াল ক'রে রাখার বস্তু নও, আর রাখলে চল্‌বেই বা কেন? এ যুদ্ধ তো কারো একার নয় ঠাকুরপো, এ যুদ্ধ সকলের। তুমিও তো তাদেরই একজন।

সতীশ প্রসন্ন দৃষ্টিতে স্নেহময়ী বৌদির মুখের পানে চাহিয়া কহিল, কিন্তু তোমাদের ভবিষ্যৎ?

অতসী হাসিয়া কহিল, ভবিষ্যৎ—থামিয়া একটী নিশ্বাস গোপন করিয়া আবার কহিল, সে তোমার ভাবতে হবে না ঠাকুরপো, ভবিষ্যৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন তার ব্যবস্থাও তিনিই

করবেন, কারো দিন তো কারো জন্য অচল হয়ে থাকে না। তা নিয়ে মিছে ভাবনা করা, তোমার দাদাকে তো তুমি চেন, এ সব চিন্তা-ভাবনার অতীত ক'রে ভগবান তাঁকে করেছেন, নৈলে কোন কিছুতেই তো তাঁকে টলতে দেখি নে

সতীশ আর একবার অতসীর পায়ের ধূলা লইয়া মুখ হাত ধুইবার জন্য নীচে নামিয়া গেল। হাত মুখ ধুইয়া ক্রমান্বয়ে দুই পেয়ালা চা নিঃশেষ করিয়া সতীশ আরামের নিঃশ্বাস মোচন করিয়া কহিল, বাঁচালে বৌদি।

অতসী হাসিয়া কহিল, কিসে বল তো?

সতীশ একথা এড়াইয়া চলিয়া কহিল, আচ্ছা বৌদি তোমার মত বৌদি কি সকলেরই আছে, এই যারা কাজে গেছে তাদের কথা বলছি।

অতসী হাসিয়া কহিল, এ প্রশ্নটা তোমার দাদার সম্বন্ধে কর্লেই বোধ করি ঠিক হ'তো ভাই, আমি কে, আমি তো তাঁর দাসী মাত্র।

এই পতিপরায়ণা সদাহাস্যময়ী শিক্ষিতা ভ্রাতৃবধূর নিকট সতীশের মাথা বার বার হেঁট হইয়া পড়িতে লাগিল। সে কহিল, দাদার কথা মুখে আনবার যোগ্যতা তো আমার নেই, সে যদি কারো থাকে তোমার আছে। আমায় আশীর্ব্বাদ কর বৌদি, যেন সেবার ভিতর দিয়ে সেই যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রে আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসতে পারি, তোমাদের ভার বইবার ক্ষমতা যেন আমায় দেন।

অতসী হাসিয়া কহিল, কেবল আমাদের ভার বইলেই তো চলবেনা ঠাকুরপো, আরো একটি প্রাণী সেও তো পথ চেয়ে থাকবে, তাকে ভুললে তো চলবে না।

সতীশ লজ্জায় রাঙা হইয়া কহিল, যাও তুমি ভারি দুষ্টু।

অতসী জোর দিয়া কহিল, না ভাই হাসলে চলবে না, তোমার বৌদি যে তাদের কথা দিয়েছে, সে কথার মর্য্যাদা তোমাকে রাখতে হবে ভাই।

সতীশ মুখ না তুলিয়াই কহিল, আচ্ছা সে দেখা যাবে, তোমার যত সব কাণ্ড, বলিতে বলিতে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

সমস্ত দিনমান সতীশের মন মুক্তির আনন্দে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুনীল সেই যে সকালে বাহির হইয়া গিয়াছে এখনো ফিরিয়া আসে নাই, যখন আসিয়া শুনিবে, সতীশও তাহার সমস্ত বাধা-বন্ধন ছিঁড়িয়া তাহারই পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন না জানি সুনীলের মুখখানি আনন্দে কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। তারপর দুই বন্ধু একসঙ্গে কাজ করিবে, প্রয়োজন হইলে জেলে যাইবে, এমন কি দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া নির্ব্বিবাদে জীবন পর্য্যন্ত দান করিয়া চলিয়া যাইবে। উঃ কি সুখ! সতীশের সর্ব্বাঙ্গ পুলকে শিহরিয়া উঠিল কিন্তু সন্ধ্যা হইতে চলিল সুনীল তো কৈ এখনও ফিরিয়া আসিল না। সতীশ চঞ্চল হইয়া পথে বাহির হইয়া একবার সুনীলের বাটীর দিকে চলিল। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সতীশ দেখিল, একদল লোক স্বদেশী গান গাহিতে গাহিতে এ দিকেই আসিতেছে, ঐ যে সকলের আগে পতাকা হাতে সুনীলের মত ও কে? সুনীলই তো, এদিকেই তো আসিতেছে। গানের তালে তালে সতীশের সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। ওরা আসিতেই উহাদের সাথে মিশিয়া পড়া যাইবে, এই বেশ হইয়াছে। সতীশ পথে পায়চারি করিতে লাগিল, পাশের বাড়ী হইতে বিভার দাদা অমলবাবু ডাকিলেন, এই যে সতীশ যে এস এস। আচ্ছা একটু বসাই যাক্‌না, আসুক ওরা, এখান দিয়েই তো যাবে। সতীশ যাইয়া অমল বাবুদের বসিবার ঘরে বসিল। অমলবাবু সতীশের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, একি তুমিও নাকি, বেশ বেশ, বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। সতীশ কোন জবাব দিলনা।

অমলবাবু কহিলেন, লেখাপড়া তা হ'লে ছেড়ে দিলে?

সতীশ কহিল, দিলুম বৈকি অমলদা!

অমলবাবু হাসিয়া কহিলেন, ক'দিনের জন্য শুনি?

সতীশ অমলবাবুকে বড় ভাইয়ের মত মান্য করিত। তিনি নিজে কলেজের 'প্রফেসার', অতিশয় শিক্ষিত বলিয়া তাঁহার নিজেরও যেমন সম্মান ছিল, স্কুল কলেজের প্রতি শ্রদ্ধাও তেমনি তাঁহার অপরিসীম। সতীশকে তিনি স্নেহ করিতেন এবং সতীশ যে প্রতিবৎসর ক্লাসে প্রথম হইয়া পাশ করিতেছে তাহাও তাঁহার অজানা ছিলনা। এহেন সুশীল সচ্চরিত্র শিক্ষাভিলাষী যুবক কেবল একটা হুজুগে পড়িয়া আপনার আগাগোড়া ভবিষ্যত নষ্ট করিয়া ফেলিবে ইহা অমল বাবুর বড়ই অসহ্য বোধ হইল। তিনি তো তাঁহার জীবনে এমনি কত হুজুগ দেখিলেন, কত যুবক এই হুজুগে মাতিয়া আপনার সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছে তাহাও তাঁহার অজানা নাই।

তিনি পুনশ্চ কহিলেন, দ্যাখ সতীশ, বিচার বিবেচনা না ক'রে কাজ করলেই তা'তে ঠক্‌তে হয়, সে সৎই হোক্ আর অসৎই হোক। তোমার শিক্ষাদীক্ষার ওপর ভবিষ্যতের কতটা নির্ভর কর্চ্ছে তা' বোধ হয় তুমি জান।

সতীশ ইহার কোন জবাব দিল না, মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

বিভা দাদার জন্য জল খাবার ও একবাটী চা লইয়া এঘরে ঢুকিতেই অমলবাবু কহিলেন, আর এক পেয়ালা তৈরী ক'রে আনতো বিভু।

বিভা দাদার সম্মুখে চা ও খাবার রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। অমলবাবু আপন মনে কহিতে লাগিলেন, মা-মরা আমার এই বোনটীর তুলনা নেই সতীশ, সংসারের সকল কাজ ও না থাক্‌লেই যেন কেমন অগোছাল হ'য়ে ওঠে, ওর যেমন রূপ তেমনি গুণ।

এ বিষয়ে যে অমলবাবু এতটুকুও অত্যুক্তি করেন নাই, তাহা সতীশ নিশ্চয় করিয়াই জানিত, কিন্তু কোন জবাব সে দিল না, যেমন ছিল তেমনি বসিয়া রহিল।

ইতিমধ্যে গায়কের দল দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। সতীশ কি যেন কেন এই অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তির সম্মুখ হইতে কিছুতেই উঠিয়া গিয়া তাহাতে যোগ দিতে পারিল না। সুনীল সতীশকে দেখিয়াই কহিল, কিহে এখানে কি হচ্ছে, যাবে না?

সতীশ ইহার কোন জবাব দিবার পূর্ব্বেই অমলবাবু তাহাকে ঘরে আসিতে বলিলেন। সঙ্গীতকারীর দল বিপুল উৎসাহে গাহিতে গাহিতে রাজপথ বাহিয়া চলিল।

অমলবাবু কহিলেন, বস চা খাও।

সুনীল হাসিয়া কহিল, চা পেলে তো ভালই হয়, বড্ড ঘোরা গেছে।

বিভা সতীশের জন্য চা ও কিছু খাবার লইয়া ঘরে ঢুকিতেই অমলবাবু হাসিয়া কহিলেন, আরো এক কাপ্ আন্‌তে হবে দিদি!

বিভা বুদ্ধি করিয়া হাতের চা ও খাবার সুনীলের সম্মুখে তুলিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সতীশ তো আগে এসেও ঠক্‌লে হে, বলিয়া অমলবাবু নির্ম্মল হাসিতে ঘরখানি মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

সতীশও সে হাসিতে যোগ দিল, কিন্তু সুনীলের কানে সে হাসি যেন বিদ্রূপের মতই গিয়া বিঁধিল।

সুনীল ইতিপূর্ব্বে এ বাটীতে দুই একবার আসিয়াছে, বাহির হইতেই অমলবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া সে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই গৃহের অন্তরাল হইতে যে কিশোরী এইমাত্র সতীশের চা ও খাবার তাহাকে পরিবেশন করিয়া গেল, সতীশের সঙ্গে তাহার দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলে তো সে কিছুতেই এরূপ করিতে পারিত না। সতীশ নিতান্তই আপনার জন এবং এই ব্যবহারে সে অপরাধ না লইয়া বরঞ্চ সুখীই হইবে, ইহা জানিয়াই তো সে সতীশের জন্য খাবার আনিয়াও অসঙ্কোচে তাহার সম্মুখে তুলিয়া দিয়া গেল। এই কিশোরীর তৈরী-করা চায়ের প্রলোভন যে সতীশকে এই সময়টিতে কোন দিনই বাহিরে থাকিতে দেয় না এবং সে যেখানেই থাকুক পড়ার ছুতা করিয়া কেন যে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চলিয়া আসে তাহা এক নিমেষে আবিষ্কার করিয়া লইতে সুনীলের বিলম্ব হইল না। সংসারে মুখচোরা লোক-গুলিই কি এমনই পাজি, তাহারা বাহিরে বেশী কথা কহে না নিতান্ত নিরীহের ভাণ করে, আবার গোপনে আপনার ঝোল আনা কাজ গুছাইয়া লইতেও ইহাদের বিন্দুমাত্র ত্রুটী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

অমলবাবু চা ও খাবার নিঃশেষ করিয়া পরম পরিতৃপ্তির একটা উদ্গার ছাড়িয়া কহিলেন, সতীশ বিভার গানের পরীক্ষাটা তবে কবে নিচ্ছ? ওতো এর মধ্যে অনেক নূতন গান শিখেছে, সুর নিয়ে গোলমাল ক'রে প্রায়ই আমাকে বিরক্ত করে, আমি তো ও সব প্রায় ভুলেই গেছি—বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সতীশ এ প্রসঙ্গটা কোনমতে চাপা দিয়া কহিল, আজ থাক্, হবে আর একদিন।

আবার গানও শেখান হয়! তার আবার পরীক্ষা! তাই তো স্বদেশী কাজে যোগ দিতে সতীশের এত অনিচ্ছা, কোন কাজেই বাইরে আবদ্ধ থাকিতে সে আর কিছুতেই রাজী নয়, বন্ধুর অনুরোধেও নয়। সুনীল এই বন্ধুত্বের গর্ব্ব করে, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ইহাকেই সুনীল এত ভালবাসিয়াছে। তুচ্ছ একটা মেয়ের জন্য যে সকল শ্রেয়ঃ বস্তু উপেক্ষা করিয়া চোরের মত গোপনে এড়াইয়া চলিতে পারে তাহার সঙ্গে আবার

বন্ধুত্ব! চক্ষের পলকে ঘৃণায় সুনীলের সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। সে কোন কথাই কহিতে পারিল না। অমলবাবু কহিলেন, এই কটা দিনের জন্য এগ্‌জামিন্‌টা দিলেনা সুনীল, কলেজে পড়লেই কি কাজের যোগ্যতা কমে ব'লে মনে হয়? আমার তো তা মনে হয় না।

সুনীল ধপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া কহিল, ওসব কথা আমায় বলবেন না অমলদা, আমি যা করেছি তা' উচিত মনে করেই করেছি। ও সব যদি বলতে হয় তো একে বলুন, ফল হবে। সকলেই নিজের স্বার্থ খুঁজে বেড়ায় না, আর সকলে সমান ভীরু অপদার্থও নয়, আমরা যা' করি খোলাখুলি ভাবেই করি। এসব লুকোচুরির ধার আমরা ধারিনে, এটা জানবেন। বলিয়া যেন সে যুদ্ধ জিতিয়া দ্রুতপদে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

কিসের জন্য এত উত্যক্ত হইয়া সুনীল একদমে এতখানি বক্তৃতা দিয়া গেল তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অমলবাবু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সতীশের বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। সে তার বন্ধুকে ভাল করিয়াই চিনিত। অভিমানী বন্ধু তাহার এই সৎকাজে নিরুৎসাহ দেখিয়াই যে এতটা মনক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং সেই ঝোঁকেই কি যে বলিয়া গেল ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিল না, আবার হয়তো ইহারই জন্য অনুতাপ করিয়া গভীর রাত্রিতে আসিয়া বন্ধুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা না চাহিয়া তাহার সুনিদ্রা হইবে না, তাহাও সতীশের অজানা ছিল না, সে এরূপ বহুবার দেখিয়াছে। সতীশ শুধু মনে মনে একটু হাসিল মাত্র।

অমলবাবু কহিলেন, লোকটা কি রকম হে সতীশ?

সতীশ হাসিয়া কহিল, ওটা ওর বাইরের চেহারা অমলদা, ওর ভেতরটা ঠিক এর উল্টো, ওর মত সহৃদয় লোক খুব কমই আছে। ওর সঙ্গে যে খুব মেশামেশি না করেছে সে ওকে প্রথম ভুলই করে। কিন্তু মনটা ওর বড় উঁচু।

তিন

দিন দশ পনর পর একদিন দ্বিপ্রহরে আহারে বসিয়া সতীশ কহিলেন, সতেটা তো আজও এলো না।

অতসী স্বামীকে পরিবেশন করিতেছিল, কোন কথা কহিল না আর কহিবার কিইবা আছে? আজ দশ পনর দিন হয় সতীশ সেই যে একখানি খদ্দরের ধুতি ও একখানি চাদর মাত্র সম্বল করিয়া বাটী হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছে, একয় দিনে আর একবারও আসে নাই। সতীশ সম্ভব অসম্ভব অনেক স্থানেই তাহার খোঁজ খবর লইয়া এখন এক প্রকার নিরাশ হইয়াই আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতে বসিয়াছেন! অফিসে গিয়া রীতিমত হাজিরা না দিলে চাকরী বজায় থাকেনা, কেবল সেইজন্য অবশ বিভ্রান্ত দেহখানিকে একবার টানিয়া লইয়া যান, আবার ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় বিছাইয়া নীরবে পড়িয়া থাকেন। এই ছোট্ট বাড়ীখানিতে আজ এই পনরটী দিন যাবৎ এই দুইটি প্রাণী যেন কলের পুতুলে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে কেহ আহার না করিলেও অপরে তাহার জন্য পীড়াপীড়ি করে না, নীরবে দেখিয়া শুধু পাশ ফিরিয়া চলিয়া যায় এমনই একটা অখণ্ড বেদনা এই দুইটি প্রাণীকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

গণা দুইতিন গ্রাস অন্ন জোর করিয়া মুখে পুরিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া আহার সমাপ্ত করিয়া সতীশ কহিলেন, ছোঁড়াটা শেষকালে এইভাবে গেল—বলিয়া কলতলায় গিয়া আঁচাইয়া কখন যে অফিসে চলিয়া গেলেন, অতসী তাহা জানিতেও পারিলনা। সে সেইখানে বসিয়া কত কথাই না ভাবিতে লাগিল। যে চলিয়া যায় তাহার সঙ্গে যে কত কি না লইয়া যায়, তাহা যাইবার পূর্ব্বে সে তো এতটুকুও বুঝিয়া যায় না। সতীশ যদি আর না ফিরিয়া আসে তবে ইহাদের যাহা গিয়াছে, তাহা কি চিরদিনের মত যাইবে? হাসি খেলা বিদ্রূপ স্নেহ কলরব? শুধু কেবল এই দুইটি প্রাণী নীরবে এমনই করিয়া সীমাহীন বেদনার বোঝা বহিয়া চলিবে? কেহইতো ইহার অংশ লইতে আসিবে না, সুনীল তো এই পনরটি দিনে একটি বারও আসে নাই, কেবল ঐ বাড়ীর সেই কিশোরী, বিভা, রোজই একবার আসে, সে-ই বা কি বলিবে? কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে, বলিবার তাহার কি-ই বা আছে?

কোন প্রকারে মুখে দুইটি গুঁজিয়া দিয়া অতসী প্রতি দিনের মত গিয়া জানালার পাশে বসিল। কত লোকের যাতায়াতে কোলাহলে রাস্তা ভরিয়া উঠিয়া প্রতিদিনই আবার স্তব্ধ হইয়া যায়, কিন্তু যাহার আশায় সে চাহিয়া থাকে সে-ই কেবল আসে না। আজও তো কত লোক যাইতেছে আসিতেছে, কত গাড়ী ঘোড়া, কৈ তাহাদের এই ছোট্ট

বাড়ীখানির প্রতি কেহ তো ফিরিয়াও তাকায় না। ও কি সিঁড়িতে যেন কাহার পায়ের শব্দ নয়! অতসী ছুটিয়া গিয়া দাঁড়াইল। ওঃ বিভা, আয় বিভা, বলিয়া অতসী ঘরে আসিয়া বসিল, বিভা পাশে গিয়া বসিল। কেহই কোন কথা কহিবার যেন কিছুই খুঁজিয়া পায় না, এমনই দিন কাটিতেছে। বিভা আসিয়া দুই তিন ঘণ্টা থাকে, বড় জোর দুই একটি কথা হয়, কিন্তু তবুও যেন উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। বিভাও জানালার পাশেই গিয়া বসে, কিন্তু বাহিরে চাহিয়া থাকিতে লজ্জা বোধ হয়, সে যেন কেবল নীরবে এই বেদনার অংশ লইবার জন্যই আসে, আসিলে অতসীরও বেশ লাগে। সতীশ অফিসে চলিয়া গেলে খালি বাড়ীতে অতসীর যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। বুকের ভিতরে কথার পাহাড় জমিয়া উঠিয়াছে কিন্তু কহিবার মত একটি কথাও কেহই খুঁজিয়া পায় না।

বৌদি! বলিয়াই সতীশ তিন লাফে সিড়ি পার হইয়া ঘরে ঢুকিয়াই ঢিপ্ করিয়া অতসীর পায়ে মাথা নামাইল।

অতসী যে কি করিবে, কি বলিবে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না, কেবল তাহার দুই চক্ষু বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, আর সে যেমন বসিয়াছিল তেমনি পাষাণ-প্রতিমার মত স্তব্ধ দুই আঁখি মেলিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিল।

সতীশ বৌদির পাশে বসিয়া সস্নেহে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া কহিল, এই বুঝি তোমার কাজ বৌদি! ওঠ, আজ ক'দিন আমার পেটভরে খাওয়া হয়নি, যা হয় চারটি খেতে দাও, পেট জ্বলে যাচ্ছে—বলিয়া হাসিতে চেষ্টা করিল।

অতসী বিভাকে ঠাঁই করিয়া দিতে বলিয়া সতীশের জন্য ভাত আনিতে নীচে নামিয়া গেল।

বিভা কাপড়ের আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া দিয়া পরিপাটি করিয়া আসন বিছাইয়া গ্লাসে জল গড়াইয়া দিল, অতসী ভাতের থালা সাতীশের সাম্‌নে রাখিয়া সম্মুখে গিয়া সস্নেহে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। এই পনর দিনে কি বিশ্রীই না হইয়াছে সতীশের শরীরটা, রংটাও যেন তামার বর্ণ, দাড়িগুলি খোঁচা খোঁচা উঠিয়াছে, পনর দিনের মধ্যে মাথায় চিরুণী তো পড়েই নাই, তেল পড়িয়াছে বলিয়াও তো মনে হয় না। জামা কাপড়েরই বা কি ছিরি! অতসী কহিল, এই কি তোমার স্বদেশী কাজ ঠাকুরপো?

সতীশ হাসিয়া কহিল, কেন বল তো বৌদি?

এই ক'দিনেই যা চেহারা হয়েছে, আর একটা খোঁজ খবর পর্য্যন্ত নেই, সে দেশে কি একটা ডাক ঘরও ছিল না?

সতীশ সবিস্ময়ে কহিল, কেন চিঠি পাও নি? আমি তো একখানা চিঠি দিয়ে খবর জানাতে বলেছিলুম, তা বোধ হয় সুরেশটা ভুলেই গেছে। আর যে কাজের ভিড়! সে যদি একবার দেখতে, কলকাতায় জন্ম কলকাতায়ই বড় হয়েছি, কলকাতা ছাড়া স্বদেশের সীমা সম্বন্ধে এত কাল কোন ধারণাই ছিল না, কিন্তু বৌদি আমাদের স্বদেশ যে কি আর এ দেশবাসী যে কা'রা, কি মর্ম্মান্তিক তাদের দুঃখ তা' না দেখলে তো কল্পনা করা চলে না। জল-প্লাবন যে কি বস্তু ধারণা করতে পার? নদীর বাঁধ ভেঙে দশ পনর হাত উঁচু হ'য়ে জল গর্জ্জন ক'রে একটা প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ড ভাসিয়ে নিয়ে চ'লেছে আর মানুষ কুকুর শেয়াল গরু বাছুর সব এক সঙ্গে সেই জলস্রোতে ভেসে চলেছে। যে ক'জন বেঁচে আছে কেউ বা গাছ, কেউ বা ঘরের চাল আশ্রয় ক'রে। একটা যায়গায় দেখলুম একটী মেয়ে বুকে একটি শিশুকে জড়িয়ে ধরে ভেসে চলেছে, দুই জনই মৃত, কিন্তু মা তবু সন্তানকে ছাড়ে নি! জল নেমেছে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধিপীড়া অনাহার,—কারো খাদ্য নেই, অর্থ নেই, সম্পদ নেই, মাথা গুজ্‌বার ঠাঁইটুকুও নেই বৌদি! তারা কি ভাবে আছে তাই বল তো?

অতসী ইহার কোন জবাব দিল না, দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

সতীশ আবার কহিল, আমি তো আজও আসতে পারতুম না, কেবল একজন ডাক্তার নিয়ে যেতে এসেছি।

অতসী কহিল, আজই আবার যাচ্ছ নাকি?

সতীশ মিনতির সুরে কহিল, যেতে হবে বৈ কি বৌদি! তারা যে বড় অসহায়, আমরা গিয়ে পাশে একটু দাঁড়ালেও তারা কত সাহস পায়। আমার জন্যে কিছু ভেব না বৌদি, এ কাজে আমার বেশ আনন্দ হয়।

অতসী বাধা দিবার আর কোন কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। বাহিরের প্রয়োজন যাহাকে ঘরছাড়া করিয়াছে এবং তাহারাও নিতান্ত নিরাপত্তিতে যাহাকে বিদায় দিয়াছে, তাহাকে যে আর কোন কিছু দিয়াই বাঁধিয়া ঘরে রাখবার যো নাই, বাহিরের

ডাকে তাহাকে ছুটাইয়া লইয়া যাইবেই, এ কথা অতসী নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার সময় অতসী তাড়াতাড়ি করিয়া রান্না চাপাইয়া দিল, রাত্রি আটটার গাড়ীতেই সতীশ চলিয়া যাইবে। সতীশ পিঁড়ি পাতিয়া পাশে বসিয়া নানারূপ সংলগ্ন অসংলগ্ন কথায়, হাসিঠাট্টায় ঘরখানি মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। অতসী সে হাসিতে বড় একটা যোগ দিতে পারিল না। রহিয়া রহিয়া কেবল এই কথাটাই কাঁটার মত তাহার মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করিতেছিল, এই হাসিঠাট্টা গল্পগুজবের সমাপ্তি হইতে মাত্র দুইটী ঘণ্টা বিলম্ব আছে।

সতীশ কহিল, আচ্ছা বৌদি! তুমি ভূত বিশ্বাস কর? পাড়াগাঁয়ের লোক তো খুব বিশ্বাস করে; একদিন একটা মাঠে সে কি আলেয়ার আলো! সকলেই বললে ভূত। শুনে প্রথমটা আমারও গা ছম্ ছম্ করতে লাগল, এর আগে তো আমিও কখন দেখি নি, কিন্তু সেটা যে ভূতের আলো নয় একথা কাকেও বিশ্বাস করান গেল না। আচ্ছা বৌদি তোমার বাপের বাড়ী তো পাড়াগাঁয়ে, তুমি কখনো তাদের দেখেছ?

অতসী মৃদু হাসিয়া কহিল, কাদের ঠাকুরপো?

এই যাদের নাম করতে নেই শুনি। দেহ নেই, অথচ ছায়া আছে। পাড়াগাঁয়ের নিবিড় আঁধারে বাঁশ তেতুল শ্যাওড়া গাছে যারা অবাধে বিচরণ করে, আবার দিনের বেলায় মিলিয়ে যায়। ওঝাদের সঙ্গে নাকি-সুরে কথা কয়, সুবিধা পেলে ঘাড় ভাঙ্গতেও ছাড়ে না।

অতসী হাসিয়া কহিল, তুমি দেখছি তাদের অনেক তথ্য এর মধ্যেই যোগাড় করেছ। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঠাকুরপো তোমার বৌদি তাদের কোন দিন চোখেও দেখে নি, নাকি-সুরে কথাও শোনে নি।

সতীশ জোর দিয়া কহিল, হাঁ, এরা সত্যিই আছে। হাসির কথা নয়, আলো হয় তো তারা জ্বালে না, কিন্তু তারা যে আছে আমদের কাছে কাছেই থাকে তা'তে আর ভুল নেই, নইলে এত লোকে বিশ্বাস করবে কেন? একজন প্রত্যক্ষদর্শী আমাদের ক্যাম্পে এদের সম্বন্ধে এমন সব গল্প করলে যা অবিশ্বাস করবার যো নেই, অথচ এমন সব সাংঘাতিক ঘটনা যে শুনলে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে! সে নাকি নিজেও ভূতের মন্ত্র জানে, দু'টো ভূত সে পালেও। সেই দু'টো ভূতকে দিয়ে এমন কাজ নেই যে সে না করায়। তার এখন ইচ্ছে হ'লো যে এক তোড়া ভাল বসোরার গোলাপ চাই; হুকুম করা মাত্র অমনি দু' মিনিটের মধ্যে ধপ্ ক'রে এক তোড়া টাট্‌কা ফোটা গোলাপ তার সাম্‌নে পড়ল; ইচ্ছে হ'ল যে সন্দেশ খাবে অমনি একথানা সন্দেশ এনে হাজির, এমনই কত সব। ভূতগুলো তার হুকুমের জ্বালায় অস্থির হয়ে প্রায়ই চেষ্টা করে কিসে তার ঘাড় মট্‌কাতে পারে, কিন্তু কিছুতেই পারে না, মন্ত্রটী যতদিন সে তিনবার ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পারবে ততদিন আর তার ভয় নেই।

অতসী কহিল, তা হবে ঠাকুরপো। যাদের সম্বন্ধে কিছুই জানি নে তাদের বিশ্বাস ঠিক না করলেও অবিশ্বাস করা তো তত সহজ নয়।

সতীশ কহিল, তাই তো আমিও ভাবি বৌদি, যাদের সম্বন্ধে কিছু জানি নে তাদের অবিশ্বাস করব কোন জোরে? অনেকে হেসেই উড়িয়ে দেয় কিন্তু সে গায়ের জোরে হাসা বৈ আর কিছুই নয়, তারাই আবার রাতে ভূতের নাম শুনে মূর্চ্ছা যায়।

অতসীর রান্না সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছিল, সে সতীশের ঠাঁই করিয়া দিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

সতীশকে আহারে বসাইয়া অতসী পাশে বসিয়া সযত্নে পরিবেশন করিতে লাগিল। সতীশ স্নেহময়ী বৌদির সীমাহীন স্নেহ আপনার অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতেছিল, কহিল, বৌদি দুঃখ ভোগের মধ্যে যে সুখ আছে এটা আমার তোমাকে দেখে প্রথম শিক্ষা হয়।

অতসী কহিল, কিসে বল তো ঠাকুরপো?

তোমার এই সেবাপরায়ণতা দেখে। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি এই যে কেবল খাটচো, নিশ্চয়ই এর মধ্যে তোমরা আনন্দ পাও নইলে এতটা পারতে না। আমিও এই কয়টাদিন লোকের সেবা ক'রে এলুম, সত্যি বৌদি এত আনন্দ এ জীবনে পাই নি। দুঃখের মধ্যে সুখের চরম সুখ ভগবান কেমন আড়াল ক'রে রাখেন তার খোঁজ কয়টা লোকে পায় বৌদি তাই বল তো? অনেক দুঃখ কষ্ট বেদনাকে অতিক্রম ক'রে তবে না তাকে আবিষ্কার ক'রে নিতে হয়। লোকে কেবল চেঁচিয়েই মরে, হুজুগে নাচে, কিন্তু দুঃখের স্তর

ভেদ কর্ব্বার শক্তি যাদের নেই তাদের চেঁচামেচিও দু' দিনেই বন্ধ হয়, কিন্তু যারা এই সুখের সন্ধান একবার পেয়েছে সংসারের টাকা-পয়সা, মায়া-মমতার কোন বাঁধনই তো তাদের আট্‌কে রাখতে পারে না। সে যে কত বড় অমোঘ আকর্ষণ বৌদি তা ব'লে বোঝান শক্ত। যার জন্য চৈতন্য পাগল সেজেছিলেন, কপিলাবস্তুর প্রাসাদ যার কাছে হেয়, বিপুল প্রসার প্রতিপত্তি নাম যশ ছেড়ে আজও এই হতভাগ্য দেশটার জন্য দু' একজন যার জন্য ফকির হয়ে পথে দাঁড়িয়েছেন, বিষয়ী লোকে কিন্তু এদের পাগল ব'লে ঠাট্টা করে। আচ্ছা বৌদি তুমিই বল তো বিষয় কি কারো সঙ্গে যাবে ?

অতসী কহিল, তা কি করে যাবে ভাই ?

সতীশ উত্তেজিত হইয়া কহিল, তবে ? তবে কেন মিছে তাই অর্জ্জন করতে আশৈশব এত আয়োজন ? দু' বেলা দু' মুঠো ভাত যেমন তেমন একখানা কাপড় এ-ই তো যথেষ্ট এর বেশী কামনা যার দুঃখেরও তার শেষ নেই।

অতসী কহিল, সে কথা তো সত্যিই ঠাকুরপো।

সতীশ ক্ষণকাল নীরবে আহার করিয়া কহিল, আচ্ছা বৌদি তুমি তো আমাকে খুব স্নেহ কর—না ? তোমার যদি একটা ছোট ভাই থাকতো ঠিক তার মত নয় ?

অতসী কহিল, ভাই থাকলে কি হ'তো তা তো জানি নে ঠাকুরপো, আমার তা' নাই বলেই বোধ করি তোমাকে ভাইয়ের চেয়ে অধিক স্নেহ করি।

সতীশ কহিল, তা আমি জানি বৌদি ! আচ্ছা বল তো তোমার এই স্নেহের জিনিষটিকে কি করবে ? মানুষ করবে না আর দশ জনের মত লেখা পড়া শিখিয়ে যা হোক্ একটা চাক্‌রী জুটিয়ে দিয়ে বে' থা' করিয়ে তার জীবনটাকে একটা শেয়াল কুকুরের জীবনে পরিণত করবে ?

অতসী কহিল, কেন ঠাকুরপো যারা লেখাপড়া শিখে বে' থা' করে কাজকর্ম্ম ক'রে যাচ্ছে তারা কি সবাই শেয়াল কুকুর ?

নিশ্চয় নয় বৌদি, তারা বিবেকবুদ্ধি হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ, তারা স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রতিপালন করে, শেয়াল কুকুর তা' করে না, কিন্তু সত্যিকারের মানুষ তো খুব কম। ইচ্ছা থাকলেও হবার যো নেই। চারদিকের অভাব অভিযোগ ব্যাধিপীড়ার তাড়নে তারা এমনি বিব্রত যে অন্য কথা ভাব্‌বার অবসরও তাদের নেই !

অতসী কহিল, তা নেই সত্যি ঠাকুরপো, তোমার কাজে তো আমরা বাধা দিচ্ছিনে। তুমি যা করছ তাই কর। ভগবান তোমাকে মানুষ করুন, তোমাকে নির্ভয় করুন, তোমার মঙ্গল করুন—এই শুধু আমরা তাঁর কাছে চাই, আর কিছু নয়, বলিতে বলিতে অতসীর গলা ধরিয়া আসিল।

সতীশ অশ্রু চাপিয়া কোন মতে আহার সমাধা করিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং গাড়ীর আর বিলম্ব নাই বলিয়া তাড়াতাড়ি ছোট্ট একটা পোঁট্‌লা বগলে লইয়া দাদা ও বৌদির পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া কোন এক বন্যাক্লিষ্ট ভূমিখণ্ডের আকর্ষণে বাহির হইয়া পড়িল।

চা'র

আর সুনীল ?

সে পুনরায় কলেজে প্রবেশ করিয়াছে, এবং সঙ্গীতবিদ্যার প্রতি অকস্মাৎ এমনি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে কলেজের সময়টুকু ছাড়া দুই বেলা 'হারমোনিয়াম্' লইয়া নিজের বেসুরা গলাকে মাজিয়া ঘসিয়া এক প্রকার চলনসই করিবার চোটে পাড়ার লোককে প্রায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, অথচ কাহারো কিছু বলিবাব উপায় নাই, সে নিজের গৃহে বসিয়া যাহা খুসি করিতে পারে অন্যের তাহাতে কি ?

সন্ধ্যা বেলায় অন্য সমস্ত বন্ধু বান্ধবের সঙ্গ পরিহার করিয়া সে অমল বাবুদের বাসায় রীতিমত হাজিরা দিতে সুরু করিয়াছে এবং অমল বাবুর পরমভক্ত ও বিভার সঙ্গীতের একজন অদ্বিতীয় রসজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। গল্প করার মত প্রিয় বস্তু অমল বাবুর নিকট এ সংসারে কিছুই নাই, তিনিও সুনীলের নিয়মিত আসা-যাওয়া গল্পগুজবে তাহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। সন্ধ্যার সময়টাতে সুনীলের আসিতে একটু বিলম্বও তাঁহার নিকট অসহনীয় বোধ হয়, এমনই করিয়া দিনের পর দিন চলিয়াছে।

সে দিনও সন্ধ্যাবেলায় সুনীল অমলবাবুর বসিবার ঘরে যথারীতি উপস্থিত হইয়া গল্পগুজবের ভিতর দিয়া নিজের অসামান্য পৈত্রিক সম্পত্তি কি কি সৎকাজে ব্যয় করিবে, জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিলাত যাইয়া সমস্ত ইয়োরোপ খণ্ডের জ্ঞান-

ভাণ্ডার হইতে নানা বিদ্যা কি ভাবে অর্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিবে ইত্যাদি নানা ভাবে ব্যক্ত করিতেছিল।

বিভা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া এ ঘরে আসিয়া চা প্রস্তুত করিয়া অমলবাবুর সম্মুখে ধরিয়া দিতেই তিনি পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া পূর্ব্বগল্পের ছিন্ন সূত্র যোজনা করিয়া কহিলেন, 'বরপণ'টা আমাদের দেশের কত বড় একটা অভিশাপ দেখেছ সুনীল!

সুনীল উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া কহিল, এর চেয়ে গুরুতর পাপ আমাদের সমাজে বোধ করি আর কিছু নেই অমল দা! এযে কত বড় অন্যায়, কি পাশবিক বিধান তা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি। আমাদের দেশের মেয়েদের যতদিন আমরা সম্মান করতে না শিখব, তাঁদের যতদিন না আমরা মানুষের মত রাখব, তত দিন আমাদের মুক্তি কোথায় অমল দা? কেবল দেশ দেশ ব'লে চেঁচালেই দেশোদ্ধার হ'ল না, আমরা কত বড় দুর্গতি চোখের সাম্নে তাঁদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে ব'সে আছি, একবার ভাবুন তো? এরাই আমাদের সংসারে স্নেহময়ী জননী, যৌবনে প্রেমময়ী ভার্য্যা, এরাই আমাদের সন্তানের পালিকা, আমাদের সুখের জন্য এঁরা নিজেদের জীবন-যৌবন মন-প্রাণ সব বিসর্জ্জন দিচ্ছেন, আর এমনি হতভাগা আমরা এঁদের দিয়ে দাসীবৃত্তি করাচ্ছি, এদের সকল প্রকার মর্ম্মান্তিক দুঃখ আমাদের কতই না সুখ হয়ে উঠেছে? আমাদের সকল প্রকার স্বার্থের জন্য বিয়ে করব তার সঙ্গে আবার চাই পণ! ওঃ কি সাংঘাতিক—বলিয়া সুনীল আড় চোখে বিভার দিকে চাহিল। তাহার মুখখানির উপর মৌন কৃতজ্ঞতার যে বিমল রেখাপাত হইয়াছে, তাহা সুনীলের চক্ষু এড়াইল না।

অমল বাবু এই সহৃদয় যুবকের উচ্ছ্বাসোক্তিতে কিছু মাত্র অসন্তুষ্ট হইলেন না। গভীর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, সুনীল, আমি তিনশো টাকা মাইনে পাই, একটি পয়সাও বাঁচাতে পারি নে, আমার হাত এমনই খোলা! আমার এই বোনটিকে দেখ্‌ছো, রূপে গুণে সমান। কিন্তু টাকা দিতে পারিনে ব'লে একটিও সুপাত্র আজ পর্য্যন্ত আমি যোগাড় করতে পারিনি।

সুনীল বিস্মিত দুই চক্ষু তুলিয়া কহিল, বলেন কি, টাকা নেই ব'লে এর মত লক্ষ্মীর জন্যেও ভাবনা!

অমলবাবু কহিলেন, সত্যিই তাই সুনীল! টাকা নেই, এইটেই আমার মস্ত বড় পাপ নইলে বিভা তো রাজার ঘরের যোগ্যা।

সুনীল কহিল, নিশ্চয় একশোবার।

অমলবাবু একটু থামিয়া কহিলেন, সতীশের সঙ্গে ছেলে বেলা থেকেই ওর ভাব। ইচ্ছে ছিল তার সঙ্গেই ওর বে' দেব, কিন্তু হতভাগাটা নিজের ভবিষ্যতটা একেবারে মাটী ক'রে দিলে। কেবল তাকে দেখেই আমি রাজী হয়েছিলুম, নইলে আর কি-ইবা আছে তাদের!

সুনীল সুযোগ বুঝিয়া কহিল, সত্যিইতো তাদের কিছু নেই অমল দা, সম্বলের মধ্যেতো ঐ ছোট্ট বাড়ীখানি আর কেরাণীগিরির ক'টি টাকা মাইনে, তাদেরইতো চলা কষ্ট, একে নিয়ে তারা রাখবেই বা কোথায় আর খাওয়াবেই বা কি? বলিয়া বিভার ব্যথিত আনত মুখের দিকে চাহিয়া সুনীল চুপ করিয়া গেল। সতীশকে যে বিভা ভালবাসে এ কয়টাদিনে সুনীলের তাহা বুঝিতে বাকী নাই। তাহাদেরই সংসারের দারিদ্র্যের কাহিনী আর যাহার নিকটই রুচিকর হোক্ বিভার অন্তরে যে তাহা শেলের মত বিঁধিয়াছে, সুনীলের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

অমলবাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যে কোন সুশীল সচ্চরিত্র আস্থাবান যুবকের সহিত ভগ্নীর বিবাহ দিতে পারিলে, বিভাও সুখী হইবে তিনিও নিশ্চিন্ত হইবেন, ইহাই তিনি বুঝিতেন। কহিলেন, দ্যাখো সুনীল, এই তোমাদের মত কোন সহৃদয় যুবক অনুগ্রহ ক'রে যদি ওকে গ্রহণ করতো! তোমাদের তো কতই বন্ধু বান্ধব আছে, একটু দে'খো তো চেষ্টা ক'রে।

সুনীল আচ্ছা সে দেখা যাবে, এত ব্যস্ত কেন, ইত্যাদি বলিয়া এ প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া বিভাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আজ কিন্তু একটী নূতন গান গাইতে হবে আপনার, বাস্তবিক আপনাকে রোজ রোজ বিরক্ত করছি, এটা কিন্তু আমার পক্ষে ভারী অন্যায়।

সুনীলকে নিজের পরিবারের হিতৈষী বন্ধু জ্ঞানে অমল বাবু অতিশয় ভালবাসিতেন, এবং সতীশের অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া বিভাও তাহার সঙ্গে অসঙ্কোচে গল্পগুজব করিত। বিভা কহিল, অন্যায় আর কি সুনীল বাবু, এতে তো আমারও শেখা হয়।

সুনীল অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে কহিল, তা' যদি মনে করেন তো সে আমার পরম সৌভাগ্য। এযে একটা কত বড় বিদ্যা, এত সহজে আপনি একে আয়ত্ত করেছেন, এ শুধু আশ্চর্য্য নয়, অসম্ভব, আর আপনি আমার এ বিদ্যার গুরু।

বিভা হাসিয়া কহিল, আমি আপনার গুরু, ভালই, কিন্তু আমার যিনি গুরু, তাঁর এক কণা বিদ্যাও আমি অর্জ্জন করতে পারিনি।

সুনীল একথার কোন জবাব দিল না, সহসা তাহার মুখখানি কালীবর্ণ হইয়া গেল। কে যে বিভার গুরু এবং এ বিদ্যায় তাহার সত্যিকারের দখল কতখানি তাহা সুনীলের অজানা নাই। যাহার মিথ্যা প্রশংসাতেও সুনীল একদিন নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিত, তাহারই প্রশংসাবাদে আজ সহসা তাহার অন্তর ঘেরিয়া ঈর্ষার আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। সুনীল একটিবারও ভাবিয়া দেখিল না, এ আগুণে কেবল নিরন্তর তাহাকেই দগ্ধ করিয়া মারিতেছে, যাহার নামে জ্বলিল তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিল না। সুনীল নিজে অশিক্ষিত অবোধ নয়, সে সতীশকে ভাল করিয়াই জানিত, তাহার চেয়েও বেশী জানিত, সতীশ অকপটে তাহাকে কত ভাল বাসিয়াছে এবং সে ভালবাসা আজও তেম্নি অচ্ছেদ্য অক্ষুণ্ণ হইয়া সতীশের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। যে পথে সে সতীশকে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে, সে পথের টানে সে কোথায় চলিয়া যাইবে তাহার হয়তো কোন ঠিক-ঠিকানা নাই, কিন্তু সে নিজে বন্ধুর প্রতি যে ব্যবহার করিল তাহা তো তাহাকে চিরজীবন দগ্ধ করিয়া মারিবে। নিজের সকল প্রকার কর্ম্মের ভিতর দিয়া মাঝে মাঝে অত্যন্ত ব্যথার সহিত সতীশের কথা তাহার মনে পড়িত। নির্জ্জন শয্যায় তাহারই চিন্তা তাহাকে পীড়া দিত, কিন্তু আবার কোথা দিয়া কেমন করিয়া সে সকল ভুলিয়া ঠিক সময়টীতে অমলবাবুদের বাসায় ছুটিয়া আসিত তাহা সে নিজেই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিত না।

উভয়কে নীরব দেখিয়া অমলবাবু কহিলেন, একখানা নূতন গানই তবে গাও দিদি।

বিভা নিঃশব্দে উঠিয়া হারমোনিয়ামে সুর দিয়া গাহিল,

"আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন--"

গাহিতে গাহিতে বিভার গলা মাঝে মাঝে ভারি হইয়া উঠিতেছিল, এবং সে যে চোখের জল গোপন করিবার জন্যই মুখ ফিরাইয়া গাহিতেছে তাহা বুঝিতে সুনীলের কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। এই সরলা মুগ্ধা প্রণয়িণীর আত্ম-নিবেদন সুনীলের মর্ম্মে আঘাত করিয়া তাহার যত প্রলোভন, যত অভিমান, যত আক্রোশ ব্যথার চোখের জলে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে নীরবে উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ইহার পর দিনকয়েক সুনীল আর অমলবাবুদের বাসায় আসিতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সে-ই কেবল ইহাদের মাঝখানে অলঙ্ঘ্য বাধার মত দাঁড়াইয়া এই চিরইপ্সিত মিলনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। দিন তিনেক পরে সুনীল অমলবাবুদের বাসায় আসিতেই অমলবাবু সুনীলের এই কয়দিন অনুপস্থিতির জন্য অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং এই কয়দিন সে কেন আসে নাই, এমন কি তাহার হইয়াছিল যার জন্য সে একটিবারও এ বাড়ীতে আসিতে পারে নাই ইত্যাদি প্রশ্নে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

সুনীল সংক্ষেপে কহিল, মনটা ভাল ছিল না।

অমলবাবুর চা খাওয়া সমাপ্ত হইয়াছিল তিনি সুনীলের জন্য চা আনিতে বলিয়া এবং তিনি আধ ঘণ্টার জন্য বিশেষ জরুরী কাজে বাহির হইতেছেন, এই সময়টুকু বিভার উপর তাহার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে কহিলেন, সুনীল এই সময়টুকুর জন্য আমাকে মাপ কর। তুমি কিছুতেই যেয়োনা, বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমি চট ক'রে ঘু'রে আসছি।

বিভা সুনীলের সম্মুখে চা ও খাবার ধরিয়া দিয়া পাশের একটা কৌচে বসিয়া পড়িয়া কহিল, এ ক'দিন তো আপনার দেখা পাই নি, কোন অসুখ বিসুখ ক'রেছিল না তো?

সুনীল চায়ের বাটীতে একটা চুমুক দিয়া কহিল, না, আমি ভালই ছিলুম।

তবে যে আসেন নি বড়?

সুনীল ইহার কি জবাব দিবে সহসা খুঁজিয়া পাইলনা, নীরবে চা পান করিতে লাগিল।

বিভা কহিল, আমাদের কোন ত্রুটীর জন্য—

সুনীল বাধা দিয়া কহিল, না কিছু না, আমার এখানে না আসায় আমারই তো লোকসান, আপনাদের লাভ তো এতে কিছু নেই।

আমাদের লোকসানই বা কম কি সুনীলবাবু? আপনার মত একজন বন্ধুর অদর্শন তো কম ক্ষতির কথা নয়! বিভা আপনার দুই আয়ত চক্ষু তুলিয়া সুনীলের মুখের পানে চাহিল।

সুনীল এই কিশোরীর স্নিগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে আপনাকে একেবারে হারাইয়া ফেলিল, কহিল, এ সত্যিই বলছেন? সত্যি আপনি—আপনারা আমায় এত ভালবাসেন?

বিভা স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, সত্যিই সুনীলবাবু, সত্যিই আপনাকে আমার বড্ড ভাল লাগে। এই তিনটে দিন আমার ভারি কষ্টে কেটেছে।

সুনীল মুগ্ধবিহ্বল হইয়া কহিল, এই কি তোমার প্রাণের কথা বিভা?

অকস্মাৎ দুর্দ্দমনীয় লজ্জায় বিভার মাথা হেঁট হইয়া পড়িল, সে কহিল, হাঁ সুনীলবাবু, এতে এতটুকুও অতিশয়োক্তি নেই। রূপে গুণে সৌজন্যে যিনি সকলেরই প্রিয় তাঁকে যার ভাল না লাগে দুর্ভাগ্য তো তারই।

চক্ষের পলকে সুনীলের হৃদয়ের সকল দ্বন্দ্ব, সকল গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া গেল, এবং মন তাহার মুক্ত বিহঙ্গের মতই সুনীল আকাশে স্বচ্ছন্দে ভ্রমিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিভা তাহাকে ভালবাসে, তাহার অনুপস্থিতি বিভার নিকট অসহনীয়, তবে আর সংশয় কোথায়? এ রকম কত সম্বন্ধইতো গড়িয়া ওঠে আবার ভাঙ্গিয়া যায়, বাঙ্গালী মেয়েরা তো ইহাতে অভ্যস্ত। তবে বিভারই বা দোষ কি, সুনীলেরই বা অপরাধ কোথায়, আর সতীশ শুনিলেই বা ক্ষুণ্ণ হইবে কেন? সুনীল কহিল, ব্যস্, এর বেশী আর আমায় কিছু শোনবার প্রয়োজন নেই, চাইবার আগেই যে ভিক্ষে তুমি আমাকে দিলে, তা' যেন আমার জীবনে অক্ষয় হ'য়ে থাকে।

বিভা ইহার কোন জবাব দিল না, কি একটা আনিবার ছলে নীরবে নতমুখে বাহির হইয়া গেল।

মাসছয়েক পরে আসন্ন বিবাহের সোরগোলে দুইখানি গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। আত্মীয় স্বজন এখনো সকলে আসিয়া পৌছায় নাই, বিবাহের এখনো দিন তিনেক বাকী। সুনীলের অর্থের অভাব নাই, বিবাহের সকল প্রকার ত্রুটী সে কোন দিকেই রাখিবে না। অমলবাবুর মনটা খুব বড়, কিন্তু হাতে টাকা নাই, তিনি আলাপ-আপ্যায়নে সকল ত্রুটী সারিয়া লইতে লাগিলেন। তিনি সুনীলকে কেবল বিস্তর পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া জানিতেন, কিন্তু সেই সম্পত্তির পরিমাণ নিশ্চয় করিয়া জানিয়া আপনার স্নেহময়ী ভগ্নির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া নিজেকে দায়মুক্ত বোধ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে সকলেই উৎসবের সমাগম প্রতীক্ষায় উৎসুক; অমলবাবু কেবল মাস-খানেক হইল লক্ষ্য করিতেছেন, যাহাকে লইয়া উৎসব সেই বিভার মুখখানি যেন দিন দিন নিশান্তের জ্যোৎস্নারেখার মতই ম্লান হইয়া যাইতেছে। তাহার চিরপ্রিয় সঙ্গীত, তাহা সে পরিত্যাগ করিয়া নীরবে অন্তঃপুরের একান্তে পুঁথি-পুস্তকে মনোনিবেশ করিয়াছে। সারাদিন কেবল বই লইয়া নীরবে বসিয়া থাকা ভাল লাগে না, অন্য কোন কাজেও অন্তরের কোন সাড়া না পাইয়া বহুদিন পরে সেদিন বিভা সতীশদের গৃহে গেল। তাহাকে দেখিয়াই অতসী কহিল, এ কিরে বিভা, তোকে তো বড্ড রোগা দেখাচ্ছে, কোন অসুখ বিসুখ করে নি তো?

সহসা বিভার দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল। সেই স্নেহময়ী অতসী, সেই স্নেহস্পর্শমণ্ডিত বাড়ী ঘর, সেই তাহার সুখস্বপ্নের ভবিষ্যৎ লীলানিকেতন, যাহা তাহার ভাগ্যে কেবল নিছক স্বপ্নই রহিয়া গেল। না-ইবা রহিল ইহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য ধন জন বাড়ীঘর, কিন্তু স্নেহ দিয়া ভালবাসা দিয়া ইহারা তো সকল ত্রুটী সমস্ত দুর্ভাগ্য পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে—বলিল, না বৌদি, অসুখ তো করে নি।

অতসী সস্নেহে তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিল, তবে?—তুই তো এমন ছিলি নে, কি এমন কষ্ট তোর হয়েছে বল তো শুনি।

বিভা আর পারিলনা। যত চিন্তা যত দুঃখ যত ক্লেশ সে অন্তরে জোর করিয়া চাপা দিয়া রাখিয়াছিল, স্নেহের স্পর্শে তাহা যেন বেদনায় সহস্রধারে ফাটিয়া চক্ষের ধারায় ঝর্‌ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে হঠাৎ আসনের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কহিল, জান তো সবই, তুমি ছাড়া তো আর কেউ এ দুঃখ বুঝবে না।

অতসী ইহার কোন জবাব দিতে পারিল না, কেবল ঐ সরলা কিশোরীকে আপনার বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া অবিরল অশ্রুধারায় সিক্ত করিতে লাগিল।

সুনীল প্রায় প্রতিদিনই এ বাড়ীতে একবার না হয় দুইবার এমন কি কোন কোন দিন তিনবার পর্য্যন্ত যাতায়াত করে, কিন্তু বিভার সঙ্গে তাহার আজ বহুদিন দেখা হয় না। ইহাকে একটা স্বাভাবিক লজ্জা মনে করিয়া সে-ও দেখা করার জন্য কোন সময় নিজের ব্যস্ততা প্রকাশ করে না। নিজের কাজ কর্ম্ম সারিয়া চলিয়া যায়। বিবাহের পূর্ব্বদিনও সে উপরের ঘরে বসিয়া অমল বাবুর সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেছিল, এবং নিমন্ত্রিতের তালিকা হইতে কেহ বাদ পড়িল কিনা তাহাই পরীক্ষা করিতেছিল। তালিকাটা বার দুই দেখিয়া সুনীল কহিল, সবই ঠিক হয়েছে, কেবল স'তেটাকে একটা নেমন্তন্ন করা হয় নি। এসব শুভ কাজে কাকেও তো বাদ রাখা উচিত নয় কিন্তু সে ভবঘুরেটাকে বাড়ী পাওয়াইতো শক্ত ব্যাপার—বলিয়া হাসিয়া উঠিয়া পড়িল। দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেই বিভার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া সুনীল অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিল, একি, তোমার শরীর এত রোগা হয়েচে! নিশ্চয়ই কোন অসুখ বিসুখ করেচে।

বিভা নতমুখে সবিনয়ে কহিল, আমার অসুখ দেহের নয় মনের, তা' তো আপনি জানেন।

অন্ধকারে বিদ্যুতহানার মতই এক নিমিষে অতীতের সকল কাহিনী সুনীলের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, এক দিন যে বলেছিলে তুমি আমায় বড্ড ভালবাস সে কি তবে ঠাট্টা!

সুনীলের ভিতরের উত্তাপ বিভা অনুভব করিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, ঠাট্টা হবে কেন সুনীলবাবু, সে কথা আজও তেমনি সত্য তেমনি অভ্রান্ত হয়ে আমার মনে জেগে আছে। আপনি তাঁর আশৈশব বন্ধু, তাঁর কাছে আপনাদের ভালবাসার সকল কথাই তো আমি শুনেছি, বন্ধু হিসেবে আমি আপনাকে চিরকাল ভালবাসি ও বাসবো, কিন্তু তার বেশী কিছু চাওয়া আপনারও অন্যায়, আমারও দিতে যাওয়া পাপ। আপনি শিক্ষিত, বিশেষতঃ তাঁর বন্ধু, আমি তাঁর বাগ্‌দত্তা এটা জেনেও আপনি কেন ভুল করচেন সুনীল বাবু?

সুনীলের সর্ব্বাঙ্গ থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, সে এখন কি করিবে এবং কি বলিবে এসব কথার অর্থই বা কি, কিছুই যেন উপলব্ধি করিতে পারিল না। বিদ্রূপের স্বরে কহিল, তাঁর বন্ধু সেই হিসেবে ভালবাসা! দেখা যাবে—বলিয়া প্রায় এক প্রকার টলিতে টলিতে পাশের দেয়াল ধরিয়া কোন প্রকারে বাহির হইয়া গেল।

বাড়ী গিয়া সেই যে সুনীল শয্যা আশ্রয় করিয়া শুইল, মাথা ধরার ছুতা করিয়া আর উঠিল না, আহার করিল না, কাহারো সঙ্গে কথাটি পর্য্যন্ত কহিল না। সারারাত্রি বিনিদ্র কাটাইয়া ভোর বেলায় উঠিয়া সুনীল সকলকে ডাকহাঁক করিয়া পূর্ণ উৎসাহে সকল কর্ম্মের ভিতর আপনাকে ডুবাইয়া রাখিল। কথায় অকথায় তাহার হাসির ছটায় বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলেই উৎফুল্ল হইয়া রাত্রির জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিল। কর্ম্মবাড়ীর সময় কাটিতে বেশী বিলম্ব হয় না। নানা রংয়ের বাতি, সাবেকি রং বেরংয়ের ঝাড় ফুল, পাতা মালা কার্পেট গালিচা কুশান সোফা টবে সাজান কত জাতীয় নাম-না-জানা গাছ দিয়া সুনীল আপনার মনোমত করিয়া বিবাহের আসর সাজাইল। বন্ধু বান্ধবেরা কেহ বা হাসিয়া, কেহ বা আড় চোখে চাহিয়া তাহাকে ঠাট্টা করিতে ছাড়িল না, কিন্তু সে দিকে সুনীলের কাণ দিবার সময় নাই, আজিকার দিনের একটি মুহূর্ত্তও সে নষ্ট হইতে দিবে না, এমনই একান্ত ভাবে সে কাজে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

স্নানের সময় গরদের ধুতি চাদর ও শাল সে তুলিয়া রাখিয়া নূতন খরিদকরা খদ্দর পরিয়া, ইন্দ্রপুরীর ন্যায় বিবাহ-মণ্ডপে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের উজ্জ্বল শ্রী চারি দিকে পরিপাটি করিয়া সাজান বিবাহমণ্ডপের সঙ্গে এমনই খাপ খাইয়া উঠিল যে সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। বিবাহ-বাসরে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে, এমন জাঁকের বিবাহ এ পাড়ায় ইতিপূর্ব্বে বোধ করি বা খুব কমই হইয়াছিল। সতীশ একটি কোণে বসিয়া নীরবে আপনার পরম বন্ধুর এই সুখ সৌভাগ্য হাসিমুখে উপলব্ধি করিতেছিল। সুনীলের সঙ্গে তাহার চোখোচোখি হওয়ায় সুনীল তাহাকে হাত ইসারা করিয়া ডাকিয়া কহিল, কখন এলে? এত দেরী যে?

সতীশ হাসিয়া কহিল, আর ভাই আমার কথা ব'লো না, ভোর না হ'তে বেরিয়েছিলুম সারাদিন খাওয়া হয় নি, এই মাত্র এসে পৌচেছি। তাড়াতাড়ি বে'টা হলে "মিষ্টান্নমিতরে-জনা" না হ'লে তো আর বাঁচা যায় না—বলিয়া বিমল হাসিতে আপনার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া তুলিল।

সুনীল কহিল, যাও নাই ভালই হয়েছে। সবই ভাই তাঁর ইচ্ছে, আমরা মিছেই জোর করি, তাঁর বিধান এক চুলও তো টলাতে পারিনে। আজকের এ কাজ তো ভাই আমার নয়, তোমার। বিভা তো তোমার বাগ্‌দত্তা।

সতীশ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল, আমি!

সুনীল মিনতির সুরে কহিল, হাঁ ভাই তুমি। অনেক পাপ করেছি, আর বাড়াতে চাই নে, বন্ধুকে ক্ষমা কর। দাদা আর বৌদিকে আন্‌তে পাঠাচ্ছি, তুমি চট্‌ করে সেরে নাও,—বলিয়া সুনীল সতীশকে জোর করিয়া বরের আসনে বসাইয়া অগ্রসর হইতেই বিভা কম্পিত দুই হাত বাড়াইয়া তাহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল।

যোগ-বিয়োগ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সতেরো

এ সংসারে মানুষকে কঠোর সমালোচক বলিলে তাহার অতি প্রশংসা করা হয়—মানুষ নিন্দক, পরনিন্দার উপর তাহার একটা সহজাত লিপ্সা আছে, সাদার গায়ে কালি ছিটাইয়া তাহার পরম তৃপ্তি।

প্রভাত হইতে না হইতে রামকেষ্ট 'কথামৃত' সমগ্র গ্রামের নর-নারীর কর্ণে সুধা বর্ষণ করিল, লোকে এখন দিন কতক জাবর কাটার উপযুক্ত খোরাক পাইয়া প্রবল উৎসাহে কোমর বাঁধিয়া বসিল। রামকেষ্ট আসিয়া বিপিনকে ধরিল—"মিষ্টি খাওয়াতে হবে দাদা"—বিপিন উত্তর দিল না, শুধু সলজ্জা বধূটীর মত দন্ত বিচ্ছেদ করিয়া হাসিল মাত্র।

রামকেষ্ট কহিল—"তুমি আমাকে এ কথা বল নি কেন? তা হ'লে কি ওই বাগ্দী বেটা জানতে পারে, না গাঁয়ে জানাজানি হয়? আমার জানলা থেকে নজর রাখলে কারু এড়িয়ে যাবার উপায়টি নাই বাবা- হুঁ হুঁ!"

গভীর আত্মপ্রসাদের সহিত বার দুই ঘাড় নাড়িয়া সে কথা শেষ করিল। বিপিন তবু কথা কহিল না,—রামকেষ্ট কহিল—"দাও ত খাইয়ে মিষ্টি তুমি, তারপর নির্ভয়ে চলে যেয়ো দিনে দুপুরে, দেখবো কোন শালা কি বলে?—আর দেখ না তুমি ওই শালা বাগ্দীর কি করি।"

বিপিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"তাই ত রামকেষ্ট, মিছি মিছি মেয়েটার কলঙ্ক হ'ল হে—কোন দোষের দোষী নয় হে বেচারা—"

জিভের পাশে আর তালুতে সংযোগ করিয়া একটা বিচিত্র শব্দ করিয়া রামকেষ্ট কহিল—"মাইরী আমার রসিক নাগর হে—ও নিদ্দুষী তুমি নিদ্দুষী, দুষী লোক আমরা কেমন? বলি শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়, না কাঁচের আড়ে মানুষ লুকায়? ও সব চলবে না, দাদা নগদ কিছু ছাড় এই গোটা বিশ পঁচিশ, আমরা মদ মাস খাই, আর বাকীটা বিপিনের কানে কানে বলিয়া এক তাণ্ডব হাসি হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বিপিনকে রাজী হইতে হইল; রামকেষ্ট মাটীর উপর একটা চড় কসিয়া উঠিতে উঠিতে কহিল—"নিশ্চয় তুমি, বে পরোয়া—যখন খুশী—"

মৌন হইয়া বিপিন সম্মতি লক্ষণ প্রকাশ করিল। রামকেষ্ট প্রবল উৎসাহে উঠিয়া কহিল—"ওস্তাদকে একটা খবর দিতে হবে মাইরী হরিলাল আমাদের হে।"

* * *

বেলা দ্বিপহর হইতে না হইতে সারা গ্রামে সংবাদটা কলরবে ধ্বনিয়া উঠিল। সে কলরবের প্রচণ্ডতায় গিরি—শ্রীমন্তের আগ্নেয়গিরি মূক, বিহ্বল হইয়া গেল।

সে মূক বিহ্বল হইয়া ভাবিতেছিল, আপন অদৃষ্টের কথা—হ্যাঁ তাহার অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতার চমৎকারিত্ব আছে—নিষ্ঠুরতার ক্রমবিকাশ কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই, সতেজ একটি লতার মত দিন দিন বাড়িয়া পাকে পাকে তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া চলিয়াছে, নাগপাশের মত লোহার শৃঙ্খলের মত।

হায়, শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া তাহার জীবনের শেষ যদি সে দয়া করিয়া করিয়া দিত, গিরি যেন জুড়াইয়া বাঁচিত!

একবার মনে হইল গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিয়া মরিবে—কিম্বা বিষ—বিষপান করিয়া জুড়াইবে!

চট্ করিয়া উঠিয়া সে খিড়কীর ঘাটে গিয়া কল্কেফুলের গাছটা হইতে কয়টা ফল পাড়িয়া লইয়া দাওয়ায় আসিয়া ছেঁচিতে বসিল। হাতের পাথরটা উপরে তুলিতেই একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—সেই সেদিনের সেই মৃত্যু-অনুভূতির কথা—সহনাতীত হিমানীশীতল স্পর্শ! সেই উদ্বেগ, সেই যন্ত্রণা, যে যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—সে যন্ত্রণার স্পর্শে সমস্ত চৈতন্য পঙ্গু হইয়া পড়ে—উঃ!

গিরি ফল কয়টা যথাশক্তি সজোরে প্রাচীর পার করিয়া বহু দূরে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

পাঁচুর মা আসিয়া ডাকিল "বৌ মা!"

গিরি উত্তর দিল না—তখনও সে মৃত্যুর ভয়ে যেন কাঁপিতেছিল।

পাঁচুর মা কহিল—"রান্নাবান্না কর বৌমা! আজ চাল ডাল সব আমি দোকানে ধারে নিয়ে আসচি—কাল ভবি মোড়লের ধান আসবে, কিছু ধান দিয়ে শোধ করলেই হবে!"

আবার সে চারিপাশ দেখিয়া কহিল—"ওমা খড়কুটোও যে নাই, দাঁড়াও আমি নিয়ে আসি দুটো—"

গিরি অতি ব্যগ্রতায় বাধা দিয়া কহিল—"এক কাজ কর ত পাঁচুর মা খিড়কীর ওই কল্কেফুলের গাছটা কেটে ফেল, ওতে এখন বেশ ক'দিন রান্নাবান্না চলে যাবে।"

—"বেশ বলেছ মা তাই করব, পাঁচুকে বলব আমার, ওবেলা সে কেটে দিয়ে যাবে। আজ কালের মত আমি দেব এখন, এ দিকে গাছটাও শুকিয়ে থাকবে।"

পাঁচুর মা চলিয়া গেল, কিন্তু গিরির দৃষ্টি বার বার ওই গাছটার পানে ছুটিতেছিল,—গিরি জোর করিয়া আপনাকে সংযত করিবার চেষ্টা করিল, তবু বার বার ঐ দিকে দৃষ্টি যেন ফিরিয়া যায়।

ঠিক কে যেন ডাকে, মাতালের মনকে সুরা যেমন ডাকে।

গিরি অস্থির হইয়া উঠিল;—সহসা ঘরের মধ্য হইতে কাটারীখানা বাহির করিয়া আনিয়া গাছটার গোড়ায় নিজেই সে আঘাত করিতে বসিল। আঘাতের পর আঘাত;—সে আঘাতে ছোট গাছটা থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মাটীর উপর আছাড় খাইয়া পড়িল।

শীতের দিনেও পরম উত্তেজনায় ঘর্ম্মাক্তা গিরি বিচিত্র দৃষ্টিতে গাছটার পানে চাহিয়া রহিল।

বাড়ীর ভিতর কাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—পরিচিত কণ্ঠস্বর, কিন্তু উত্তেজনার মধ্যে মানুষটীকে গিরি স্পষ্ট চিনিতে পারিল না; সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে আসিয়া মানুষটীকে দেখিয়া যেন পাথর হইয়া গেল।

গিরির ভাগ্যাকাশের ধূমকেতু হরিলাল সম্মুখের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া হি হি করিয়া হাসিতেছে।

একদফা হাসিটা শেষ করিয়া হরিলাল কহিল—"জীতা রহো ভাই,—জীতা রহো; বহুত আচ্ছা এহি তো চাহিয়ে।"

উত্তরের প্রত্যাশায় ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া হরিলাল আবার কহিল—"কেয়া ভাই, গরীব আদমী কেয়া কসুর কিয়া, আপকো পাশ? একঠো বাত তো বোল না চাহি—"

গিরি এতক্ষণে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল—"কোন সাহসে তুমি আমার বাড়ীতে মাথা গলাও,—লজ্জা করে না তোমার—

হরিলাল হা হা করিয়া হাসিয়া কহিল—"সীতারাম—সীতারাম, লজ্জাসরম তো হামারা নেহি হ্যায়—উ তো আওরৎ জেনানা কি চিজ; হাম মর্দ্দানা হ্যায়।—"

আবার একচোট জোর হাসি হাসিয়া কহিল—"আর সাহস? আরে এ তো আমার শশুরবাড়ী, শশুরবাড়ী আসতে সাহস দরকার হয় নাকি?"

গিরি প্রবল উত্তেজনায় কহিল—"বের হয়ে যাও বলছি আমার বাড়ী থেকে, এখুনি বের হয়ে যাও নইলে—" সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতখানা তুলিয়া উঠিল, সে হাতে তাহার কাটারী।

মানুষের মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ কর্ম্ম মানুষ অনুমান করে,—উত্তেজনাদৃপ্তা খড়্গহস্তা মেয়েটাকে দেখিয়া হরিলাল ভয় পাইয়া গেল—সে বুঝিল এ সর্ব্বনাশী এখন পারে সব।

হরিলাল পলাইল, কিন্তু দরজার মুখেই একবার ফিরিয়া দুই কলি গান সে গাহিয়া গেল, কহিল—"একটা গান বেঁধেছি শোন সখি।—

"বিপিনে গোপন বিহার করেন আমার বি-পিন বি-হারী।"

দ্বিতীয় কলি আর সে গাহিতে পাইলনা, গিরিও আর শুনিল না। বর্ণবৈচিত্র্যময়ী সংসার তাহার চোখের সম্মুখ হইতে মুছিয়া যাইতেছিল—অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ করিয়া সে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

রাত্রে নদীর ধারে একটা পড়ো বাড়ীতে কোলাহল উঠিতেছিল—বিপিনের প্রীতিভোজ,—নাচ গান বাজনা চীৎকার সে এক তাণ্ডব।

গিরির বাড়ী হইতে সে কলরব শোনা যাইতেছিল, ঘরে শুইয়া গিরির সর্ব্বাঙ্গ থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল, সম্মুখে ঘনান্ধকার রাত্রি, আর ওই পিশাচের দল!

পাঁচুর মা আজ আর আসে নাই, সে আর আসিবে না।

সন্ধ্যায় সমাজের মজলিসে তাহার ডাক হইয়াছিল, পঞ্চায়েৎ তাহাকে কহিয়াছে—ছিমন্তের পরিবারের সঙ্গে কাজ কম্মের সম্বন্ধ রাখ ক্ষেতি নাই কিন্তক রাতে ওর বাড়ী তোমার থাকা হবে না। ওর স্বভাব খারাপ—

পাঁচুর মা কি একটা বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু পঞ্চায়েৎ সেদিন নেশায় বিভোর, সে কথা তাহারা তাহাকে বলিতে দিল না, কহিল—"উহু কোন কথাই না, দূতীগিরি মহাপাপ, রাতে তুমি থাকলে দূতীর কাজ করা হবে।"

পাঁচুর মা সব কথা বলিয়া গিরির মুখপানে চাহিয়া কহিল—"তা হোক বৌমা, আমি আসব—"

বাধা দিয়া গিরি কহিল—"না পাঁচুর মা, আমার নিজের ঘর—একা থাকব, তার ভয় কি?"

বলিয়া ঘরের কোণের পানে চাহিল, কোণে ঠেস দিয়া রাখা ছিল সেই দা'খানা।

রাত্রি অধিক হইয়া আসিল, নদী-তীরের তাণ্ডব কোলাহল নীরব হইয়া গেল, গিরি স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চোখের উন্মুক্ত দুইটি পাতা মুদিয়া এক করিল।

নিস্তব্ধ রাত্রি—শুধু দূরে কয়টা কুকুর বোধ হয় শীতের তাড়নায় কাতরধ্বনি করিয়া উঠিতেছে, নদীর ধারে নিশাচর একটা পাখী ঘন ঘন একঘেয়ে ডাক ডাকিয়াই চলিয়াছে, নিস্তব্ধ সুষুপ্ত জীবরাজ্য।

দুটি লোক শ্রীমন্তের ঘরের প্রাচীর পার হইয়া লাফ দিয়া বাড়ীর উঠানে পড়িল।

বিপিন আর হরিলাল।

পা টিপিয়া হরিলাল গিরির রুদ্ধ দ্বারে কান পাতিয়া দাঁড়াইল।

সুষুপ্ত আশ্বস্ত মানুষের গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, চেতনার কোন লক্ষণ নাই। হরিলাল ফিরিয়া ফিস্ ফিস করিয়া বিপিনকে কহিল—"জানলাটা ভেঙেই আছে, সে আমি দিনে একবার বাড়ী ঢুকে এক নজরেই দেখে রেখেছি, একটা ধাক্কা, কিন্তু আমার টাকা—পঞ্চাশটি টাকা।"

নেশায় মত্ত বিপিনের বুকটা দুরু দুরু করিতেছিল—আশঙ্কায় প্রত্যাশায়। সে কহিল—"একশো—একশো টাকা দেব আমি—"

নোটের তাড়া সে হরিলালের হাতে গুঁজিয়া দিল।

হরিলাল অতি আনন্দে কহিল—"আও হামারা সাথ, কুছ ডর নেহি হায়, বাহাদুর হাম হায়। চলো উঠো। কিন্তু শোন—গিয়ে হাত দুটো আগে কায়দা করো, সব্বনাশীর হাতে ওবেলা আমি দা দেখেছি।"

বিপিন ভীরু, কিন্তু সে লম্পট, তার উপর নেশায় উন্মত্ত, সে নির্ভীকের মত কহিল—"উ হাম দেখলেঙ্গে।"

বাংলাভাষায় আপন উত্তেজনার দৃপ্ততা প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিল না।

* * *

সহসা বাড়ীর গণ্ডীটুকুর ভিতরে রজনীর সুপ্তি বিচলিত করিয়া একটি অস্ফুট আর্ত্ত চীৎকার ধ্বনিয়া উঠিল—তারপর একটা চাপা ক্রন্দনের ধ্বনি।

আঠারো

অহল্যা পাষাণী হইয়া গেল।

এমনি করিয়াই নারী পাষাণী হয়, মানুষ পাথর হয়।

এ দুনিয়ায় মানুষের সরমের বাঁধ একবার টুটিলে হয়। চক্ষুলজ্জা পাপ-পুণ্য সব চুকাইয়া এ দুনিয়ার বিকিকিনির হাটে বেনিয়ার দাঁড়িপাল্লায় উঠিয়া আপনার ওজনভোর স্বর্ণ মানুষ যখন গণিয়া পায় তখন কি আর রক্ষা থাকে? তখন সে আরও চায়, আরও চায়; বার বার, বার বার সে আপনাকে বিনিময় করে! তখনই তার মানুষের হিয়া জমিয়া গিয়া হয় পাষাণী। তার উপর নারী আর নয়!

গিরি যাহা চাহিয়াছিল তাহা সে পাইয়াছে, ভোজ্য পাইয়া তাহার উদর তৃপ্ত; যাহার ফলে সুকুমার কান্তি তাহার যৌবনোচ্ছল দেহে আর ধরে না; শাঁখের শাঁখার পাশে আজ তাহার সোনার শাঁখা উঠিয়াছে; জীর্ণ মলিন বসনের পরিবর্ত্তে তাহার সুন্দর দেহখানি ঘেরিয়া সুকোমল শুভ্র, সূক্ষ্ম বসনের সৌন্দর্য্য!

গিরি বসিয়া বসিয়া পান চিবাইতেছিল—আর মাঝে মাঝে ঠোঁট উল্টাইয়া নত চক্ষে ঠোঁটের লালিমার পরীক্ষা করিতেছিল।

ওদিকে বাগদীপাড়ায় কে যেন বিনাইয়া বিনাইয়া মর্ম্মস্পর্শী কান্না কাঁদে, বিলাপের ভাষাও কিছু কিছু বোঝা যায়, ওরে সোনা, ওরে যাদু আমার—

অর্থে বোঝা যায় কোন সন্তানহারা হতভাগিনীর কান্না। গিরির এ কান্নার ব্যাকুলতা ভাল লাগে না, সব আনন্দ যেন মলিন হইয়া যায়; সামান্য বেদনার আঘাতেই তাহার আনন্দের প্রাসাদ থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপে—যেন সে ঘর তাহার তাসের ঘর, ওই ঘর ভাঙিয়া গেলে উহার মধ্য হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা কল্পনা করিতেও গিরি শিহরিয়া উঠে, মনে হয় উহারই মধ্যে সঞ্চিত আছে রাশি রাশি কান্না, সে কান্নার পরিমাণ ভূপৃষ্ঠ হইতে ওই আকাশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াও কুলাইবে না!

সে ঈষৎ বিরক্তিভরেই কহিল—"কে এমন করে কাঁদে গো পাঁচুর মা?"

গিরির আশা সবই পূর্ণ হইয়াছে, পাঁচুর মা আজ তাহার বেতনভোগী দাসী।

পাঁচুর মা একটা বেদনার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"আমাদেরই পাড়ার গোকুলের বৌ, এই নিয়ে পাঁচটী সন্তান হ'ল মা, তা পাঁচটীই গেল।"

গিরি কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আবার সেই বিরক্তি ভরেই কহিল—"দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এস ত পাঁচুর মা, কান্না আমি সইতে পারি না। আমায় ডেকো না পাঁচুর মা, আমার মাথা ধরেছে।" বলিয়া সে নিজেই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। পাঁচুর মা গালে হাত দেয়; গিরি দিন দিন তাহার কাছে দুর্ব্বোধ্যতর হইয়া উঠিয়াছে।

বৈকালের দিকে বিপিন আসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া পাঁচুর মাকে কহিল—"কৈ, গেল কোথায় পাঁচুর মা?"

পাঁচুর মা কহিল—"ঘরে শুয়ে আছে—"

বিপিন চমকিয়া কহিল—"অসুখ বিসুখ করে নাই ত?"

ঈষৎ মুখ বাঁকাইয়া পাঁচুর মা কহিল—"কে জানে বাপু, ছোট লোক জাত আমরা ওসব করণ কারণ আমরা বুঝতেও নারি।"

দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গিরি ঈষৎ বাঁকা হাসি অধরে টানিয়া কহিল—"বুঝবার কথা নয় পাঁচুর মা, সত্যিই এ তুমি বুঝবে না; কিন্তু অসুখ বিসুখও কি আমার করতে নাই?"

পাঁচুর মা অপ্রস্তুত হইয়া কহিল—"তা ত বলি নাই মা, আর তুমিও ত কিছু বল নাই।"

—"বলি নাই, তা হবে; মাথা ধরেছে বলে, বলেছিলাম মনে হচ্ছে; তা যাক্‌, তুমি এখন এস।"

পাঁচুর মা পলায়নের সুযোগ পাইয়া বাঁচিয়া গেল।

বিপিন এবার আসিয়া, গিরি যে দাওয়ায় দাঁড়াইয়া ছিল, সেই দাওয়ায় বসিয়া কহিল—"মাথা ধরেছে?"

—"না, কিন্তু আমার হারের কি হ'ল?"

বিপিন কহিল—"না, এখনও কিছু হয় নাই, তবে হবে—"

গিরি অনুত্তেজিত দৃঢ় কণ্ঠে কহিল—"কিন্তু সে কথা ত ছিল না—"

বিপিন কাকুতি করিয়া কহিল—"বড় টানাটানি যাচ্ছে—

গিরি হাসিয়া কহিল—"সে কি আমার দেখবার কথা? মনে আছে তোমার, আমি চেয়েছিলাম, টাকা, গয়না কাপড়! –

—"তা কি দিতে কসুর করি আমি গিরি? আমি জমি বিক্রী করেছি--"

গিরি কহিল—"কত দিয়েছ, তোমার আজ জমি গিয়েছে, আবার কাল কিনবে, যা ছিল তার চেয়ে বেশীও হতে পারবে; কিন্তু আমার যা গিয়েছে তা কি ফিরবে, ফিরিয়ে দিতে পারবে?"

বিপিন নীরব হইয়া বসিয়া রহিল, কোন উত্তর ত ইহার নাই!

গিরি কহিল - "কাল দেবে বায়না?"

বিপিন উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল—"দোব, দোব, দোব তিন সত্যি করেছি। আমার ওপর রাগ করো না তুমি—"

বলিয়া সে আবেশভরে গিরিকে বুক টানিয়া লইতে চাহিল, কিন্তু গিরি বাধা দিয়া কহিল—"ওই মেয়েটাকে কাঁদতে বারণ করে এস তুমি, আমার বুকের ভেতর কেমন করছে;—"

সন্তানহারা হতভাগিনীর দুর্ব্বল কণ্ঠ তখনও রহিয়া রহিয়া ধনিয়া উঠিতেছিল—"ওরে যাদুরে!"

উনিশ

জেলখানার বড় ফটকটায় প্রবেশ করিতে শ্রীমন্তের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল; জানোয়ারের পিঁজরার মত গরাদে-ঘেরা রক্ত বর্ণ বিশাল লৌহদ্বার ভিতরে বাহিরে থাকীর উর্দ্দিপরা ভীমকায় প্রহরী—কাঁধে হিমশীতল লৌহময় মরণাস্ত্র, অভ্যন্তরে তার অগ্নিগর্ভ সুপ্ত মৃত্যু, সারাটা বুক বেড়িয়া লোহার মোটা শিকলে মোটা মোটা চাবীর গোছা। অবিরাম রুক্ষ শাসন করিয়া করিয়া মানুষের কোমল রক্ত মাংসের মুখও বিভীষণ ভয়াল হইয়া উঠিয়াছে। সে মুখের পানে দৃষ্টি মাত্রেই বুকের রক্ত চমকিয়া উঠে।

পিছনের লৌহদ্বারটা তাহাকে গ্রাস করিয়া বন্ধ হইয়া গেল, যেন একটা রাক্ষস আহার গিলিয়া বিরাট মুখটা বন্ধ করিল।

লোহার গরাদের ফাঁকি ফাঁকে এখনও বিশাল পৃথিবীর মুক্ত শ্যামাঞ্চলখানির অংশ দেখা যাইতেছে, মাত্র কয় পদ ব্যবধান; কিন্তু এই কয় পদ ভূমি অতিক্রম করিতে তাহার লাগিবে দীর্ঘ সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর! শ্রীমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, চোখে জলও আসিয়াছিল কিন্তু সে জল মাটিতে ফেলিতে তাহার সাহস হইল না; সান্ত্বনার, মমতার স্পর্শ না পাইলে দুঃখ মূক হইয়া যায়, আত্ম প্রকাশ করিতে তারও ভয় হয়।

শ্রীমন্তের ধারণা ছিল তাহার ওই গ্রামখানির মত নিষ্করুণ মমতাহীন ক্ষেত্র বুঝি দুনিয়ায় আর নাই—কিন্তু মৃত্যুর মত স্তব্ধ হিমশীতল এই পাষাণ-পথ, প্রতি পদক্ষেপে যে স্থান সুকঠোর প্রতিধ্বনিতে গর্জ্জন করিয়া উত্তর দেয়, চোখের জলে যে স্থান গলে না—তার চেয়ে আপন ছায়ানিবিড় কোমল মৃত্তিকাময়ী গ্রামখানি ঢের ঢের মমতাময়ী।

কিন্তু ভিতরে গিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল নয়,—আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

দুর্দ্দান্ত মানুষের মেলা—হাসি খেলা গান তাহাদের অফুরন্ত,—

শ্রীমন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল—এমন কেমন করিয়া হয়!

কিছু দিন যাইতে যাইতে সে বুঝিল—হয় এমন হয়,—দুঃখের চেয়ে মানুষের প্রাণের শক্তি অনেক বড়,—দুঃখ দূর হইতেই অসহ্য ভয়াবহ কিন্তু তাহাকে যখন মাথায় করিতে হয় তখন সে লঘুভার হইয়া যায়, তাচ্ছিল্যের সহিত তাহাকে বহন করা যায়;—প্রাণস্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি দুঃখের চাপে সে মরে না।

এতদিনে জেলখানাটা তাহার মন্দ লাগিল না—

বেশ,—উদরের চিন্তা করিতে হয় না, খাওয়াদাওয়ার তাগিদ নাই—দিনগত পাপক্ষয়—ঘানির চারিপাশে ঘুরিলেই খালাস।

দশ সের সরিষায় চৌদ্দ পোয়া তেল, বসিয়া বসিয়া তার দিনের হিসাব কর।

কষ্ট কি নাই?—

আছে বৈকি,—লোহার ঘানিটার চারিপাশে ঘুরিতে ঘুরিতে সারাটা দেহ যেন পাথরের মত জমিয়া কঠিন হইয়া আসে, স্নায়ু শিরা যেন ছিঁড়িয়া যায়,—রক্ত মাংসের মানুষ পাথর হইয়া পড়ে, কিন্তু কষ্টকে তুচ্ছ করাই ত পুরুষের পৌরুষ! আর পাথর হইলেই বা ক্ষতি কি?

সেই ত ভাল, নির্য্যাতন লজ্জা পাইবে।

কিন্তু বুকের ভিতরটা যে পাথর হয় না;—নিত্য রজনীতে গিরি যেন ওই লোহার গরাদের উপর মুখ রাখিয়া দাঁড়ায়, অশ্রুমুখী বিশীর্ণা গিরি—!

শ্রীমন্তের বুক ফাটিয়া যায়।

বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করিয়া উঠে, শ্রীমন্ত উঠিয়া বসিয়া কত অন্তহীন ভাবনা ভাবে—গিরিও হয়ত এমনি করিয়া জাগিয়া বসিয়া রাত্রির অন্ধকারে চোখের জল শেষ করিয়া রাখিতেছে;—দিনে ত তাহার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকিবে না,—উদরান্নের চেষ্টায় হা হা করিয়া বেড়াইতে হইবে!

কাজ না পাইলে—হয় তো বা ভিক্ষা—

শ্রীমন্ত আর ভাবিতে পারে না,—সে চিন্তার দায় হইতে মুক্তি পাইবার প্রত্যাশায় পাশের লোকটাকে ডাকিয়া কহে—

"শশী, শশী, ও শশী!"

ঘুমন্ত শশী উত্তর দেয় না—সে পাশ ফিরিয়া শোয়।

শশীর পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের মধ্যে চেতনার ক্ষীণ আভাষ পাইয়া শ্রীমন্ত কহে—

"তোর মার্কার হিসেব দেখতে বল্‌ছিলি না সন্ধ্যেয়।"

শশী কহে—"হুঁ।"

—"জেল তোর কত দিন,—ছ মাস ত?"

—"হুঁ।"

—"খাটা হল কত দিন?"

—"হুঁ।"

শ্রীমন্ত তাহাকে ঠেলা দিয়া কহে—"হুঁ কি রে, খাটা হ'ল কত দিন তাই বল—না—হুঁ।"

ঘুমঘোরের মধ্যেও বুঝি মুক্তির ব্যগ্রতা বন্দী ভুলিতে পারে না,—শশী জড়িত কণ্ঠে কহে—

"দেখ কেন হিসেব করে। চার মাস বিশ দিন হ'ল।"

শ্রীমন্ত কহে—"তবে ত আর মেরে দিয়েছিস্ রে! তিন ছয় আঠারো দিন বাদ গেলে থাকে তোর পাঁচ মাস বারো দিন, আর ধর গিয়ে তোর বছরের দোসরা মাসের দরুণ বাদ যাবে দু' দিন—এই তোর হ'ল গিয়ে দশ দিন—পাঁচ মাস দশ দিন,—খাটা হয়েছে তোর চার মাস বিশ দিন—রাত পোয়ালেই একুশ দিন তা হ'লে আর আছে তোর না, ন' দিন আর ন' দিন আঠারো দিন,—দশ দিনের দিন তো খালাসই পাবি।"

শশী কহে—"ক দিন বল্লি—ক'দিন?"

—"আঠারো দিন।"

—না, আরও একদিন কমবে, খালাসের দিন রবিবার পড়েছে—শনিবার দিন খালাস দেবে।"

শ্রীমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া থাকে—বাহিরে গভীর নিস্তব্ধ অন্ধকার থম্ থম্ করিতেছে,—সমস্ত ধরণী যেন ব্যথায় মূর্চ্ছিতা, আর ওই কালো অন্ধকার যেন তার আহত বুকের নীল কাঁচা রক্ত! মানুষের আপন অন্তরের প্রতিবিম্ব এমনি করিয়াই নির্জ্জন মুহূর্ত্তে তাহার চোখের উপর বহিঃপ্রকৃতির বুকে আত্মপ্রকাশ করে।

শ্রীমন্ত আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহে—

"শশী, আমার একটি কাজ করবি ভাই?"

শশীর আবার তন্দ্রা আ[illegible]—সে তন্দ্রাঘোরেই কহিল—

"উঁ।

—"আমার একটি কাজ করবি?"

—"হুঁ।"

—তোকে ত গোকুল-মাটী হয়ে বাড়ী যেতে হবে, তা তুই যদি নদীটা পার হয়ে আমাদের গাঁ হয়ে একবার যাস্,—"

—"হুঁ।"

—আমাদের বাড়ীতে যদি আমার খবরটা দিয়ে যাস্ ভাই,—

—"হুঁ।"

—"আর আমাকে একখানা চিঠি দিতে বলবি।"

শশীর আর সাড়া পাওয়া যায় না, তন্দ্রা বোধ করি ভার হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু শ্রীমন্তের তাহাতে বিশেষ আসে যায় না—সে আপন মনেই বলে—

—"তোর যত্ন কেমন করবে সে দেখবি, গুরুর আদর করবে। সে বেলা তোকে যেতে দেবে মনে করেছিস্—না খাইয়ে সে কিছুতেই ছাড়বে না

শশীর তখন নাক ডাকিতেছে, কিন্তু স্মৃতি স্মরণে ত অপরের সাহচর্য্যের প্রয়োজন হয় না, বরং নির্জ্জনতাই সে স্মৃতিগাথাকে গাঢ় উপভোগ্য করিয়া তোলে; ওই প্রগাঢ় অন্ধকারের মাঝেও গিরির ম্লান মূর্ত্তি শ্রীমন্তের চোখের সম্মুখে প্রদীপ্ত হইয়া জাগিয়া উঠে। এই জাগ্রত স্বপ্নে শ্রীমন্ত অধীর হইয়া উঠে—সে ভাবে কেন, কেন, দেহের মত বুকটাও পাষাণ হয় না কেন?

আবার প্রভাত হইতে কাজ কাজ কাজ, কাজ কর্ম্মের ব্যাপৃতিতে সময় কাটিয়া যায়; বেলা দশটায় যেই আসিয়া হাঁকে—"সোলেমান—আপিসে যাও চিঠি আছে তোমার।"

আমার—?

আমার?

আমার?

চারিদিক হইতে পাষাণ-দেহের মধ্যে কোমল মানুষ আত্মপ্রকাশ করিয়া মমতা করুণ স্বরে প্রিয়জনের বার্ত্তার

জন্ত জিজ্ঞাসা করে আমার? আমার? অথচ ওরা বেশ জানে যে বার্ত্তা নাই—বার্ত্তা!—

শ্রীমন্তও জিজ্ঞাসা করে; মেট আপন পথে চলিতে চলিতে সমবেত প্রশ্নের জবাব দিয়া যায়—না, না, না!

দুয়ারের সান্ত্রীরা কঠোর ভাবে শাসন-বাণী গর্জ্জন করে--

"এই চালাও চালাও—সব কাম চালাও।"

কিন্তু 'কাম' যে চলে না, পাথরের মত শক্ত দেহ অবশ হইয়া আসে যে!

সেদিন সকাল বেলায় হুকুম আসিল—শ্রীমন্তকে বদল করা হইয়াছে, তাহাকে যাইতে হইবে অপর জেলে।

সম্বন্ধহীন দুর্দ্দান্ত পর, তবু তারা শ্রীমন্তকে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে, কত জন কত গোপন সংবাদ বলিয়া দেয়,—"অমুকের সঙ্গে দেখা করিস্ অমুক আছে সেখানে; অমুক মেটের সঙ্গে বুঝে চলিস্, শালা এক নম্বরের বদমাস! তবে কালা-পাগড়ীটা লোক ভাল, আমার নাম করিস্।

শ্রীমন্ত শশীকে ডাকিয়া কহিল—তোর ত ভাই আর তিন চার দিন আছে, দেখিস্ ভাই আমার বাড়ী হয়ে যাস্, আমার খবরটা দিবি আর একখানি চিঠি আমাকে দিতে বলবি।"

শশী কহিল—"কোন ভাবনা করোনা দাদা, আমি নিশ্চয় বলে যাব। আমি যাব ধর চারদিনের দিন, ধর তোমার সাত দিনের দিন নিট তুমি চিঠি পাবে।"

* * *

আবার নতুন স্থান নতুন সাথী সহচর, কিন্তু নামেই নতুন, সেই সব, সেই নির্ম্মম নিরস পাষাণ-আবেষ্টনী, সেই নির্ম্মম কঠোর সান্ত্রীর দল, সেই দুর্দ্দান্ত বন্দী সহচর সব, সেই কর্ম্ম-ধারা, সেই জীবন-ধারা, এতটুকু এদিক-ওদিক নাই শুধু মুখ চিনিতে সময় লাগে।

একদিন পথে কাটিয়াছে, তার পর দিন যায়, আর শ্রীমন্ত দিন গণিয়া যায়—দুই—তিন—চার—পাঁচ—ছয়—সাত।

সকাল বেলা হইতেই সেদিন শ্রীমন্তের বুকটা কেমন করে,—

বেলা দশটার সময় যেই আসিয়া হাঁকিল—

"জাফর সেখ, হাবল বাগ্দী, চিঠি আছে, আপিসে—

"আমার?"

শ্রীমন্তের কণ্ঠধ্বনিতে সকলে চমকিয়া উঠিল, মেট আর যাইতে উত্তর দিতে পারিল না, সে ফিরিয়া শ্রীমন্তের মুখ পানে চাহিয়া কহিল—"কই আর কারু ত চিঠি নাই।"

শ্রীমন্ত বুকে ঘানির ডাণ্ডাটা লাগাইয়া দাঁড়াইয়া গেল,—সান্ত্রী তাড়া দেয়, কিন্তু শ্রীমন্ত তবু দাঁড়াইয়া—।

সিপাহীটা আসিয়া পিঠে পেটীর একটা আঘাত করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া দিল।

শ্রীমন্ত বারেক চমকিয়া সিপাহীটার পানে একটা হিংস্র দৃষ্টি হানিয়া আবার ঘানি টানিতে লাগিল। টানিতে টানিতে আপন মনেই সে মৃদু গুঞ্জনে সে গান ধরিল—

"মন তুমি কার, কেবা তোমার,
এ দুনিয়া ভোজের বাজী।"

দুনিয়া হয় তো সত্যই ভোজের বাজী কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তার সৃষ্টির মধ্যে সে ওই ভোজ বাজীরই ক্রীড়াপুত্তলী, ওই বাজীর ভেল্কী এড়াইয়া তাহার চলিবার উপায় নাই, তাই কেউ কাহারও নয় জানিয়াও পরের জন্ম মানুষকে ভাবিতে হয়—সে ভাবনার দ্বার ত রোধ করিবার উপায় নাই, চিরদিন অনাহূতই সে আসে—ললাটে নয়নপ্রান্তে গোধূলির আকাশের মত একটী বিষণ্ণ ছায়া ফেলিয়া আবার এই ভাবনাই মানুষের জীবনের পাথেয়, এ নহিলে মানুষ বাঁচে না।

শ্রীমন্তও ভাবিল, সারাটা রাত্রি কত সৃষ্টিছাড়া কল্পনা তাহার প্রিয়ার চিন্তায় ধ্যানে ক্ষণে ক্ষণে ব্যাঘাত দিল,—

শশী হয়ত যায় নাই,—সংবাদ দেয় নাই।—

আবার চিঠি লিখিতে পয়সাও ত চাই!

গিরি হয়ত বাড়ীতেই নাই,—অভাবের তাড়নায় দেশ বিদেশে কোথাও দাসীবৃত্তি করিতেছে!

আবার মনে হয় গিরি হয়তো বাঁচিয়াই নাই, অভিমানিনী গিরি সে হয়তো গলায় দড়ি দিয়া সর্ব্ব জ্বালা যন্ত্রণা এড়াইয়া চলিয়া গেছে।

বিপিনের ধান হয় তো অভাবের জ্বালায় ভাঙিয়া খাইয়াছে,—বিপিন কটুকাটব্য করিয়াছে; হরিহরের মা সেই দুইটা টাকার জন্ম কত কথাই বলিয়াছে; হয়তো বা হরিলাল আসিয়া কত নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করিয়া গিয়াছে; আর অভিমানিনী গিরি এমনি এক অন্ধকার রাত্রে ঘরের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়া কোন অজ্ঞাত মরণপথে পলাইয়া বাঁচিয়াছে।

ছঁ ছঁ করিয়া শ্রীমন্তের চোখ দিয়া অশ্রু নামিয়া আসিল। কতক্ষণ চলিয়া গেল—সহসা শ্রীমন্তের মনে হইল হয়তো বা ফটকে তাহার চিঠি চাপিয়া রাখিয়াছে, শাস্তি দিবার জন্ত ত অগণ্য পন্থা ইহাদের, হয়তো উপর হইতে হুকুম আসিয়াছে শ্রীমন্ত ঘোষকে চিঠি পত্র না দেওয়া হয়!

আচ্ছা কাল দেখা যাইবে, একদিন দেরী হওয়া আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু কাল তাহার পত্র আসিবেই।

দশটায় মেট আসিয়া হাঁকিয়া গেল—

"হরেকৃষ্ণ ডোম, জলিল সেখ, মহবুব আলি—পত্র আছে।

শ্রীমন্ত আজ আর জিজ্ঞাসা করিল না "আমার?"

সে ঘানির ডাণ্ডাটা ছাড়িয়া দিয়া বাহিরের পানে চাহিল, দুয়ারের সিপাহীটা তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—

"আরে তু কাঁহা যাতা? শালা ঘানি উলট্ দিয়া—

শ্রীমন্ত ধাক্কা দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া আবার চলিল, সিপাহীটা এবার ছুটিয়া গিয়া পিছন হইতে তাহার জামা ধরিয়া কহিল—

চিঠ্যি চিঠ্যি, চিঠ্যি তোমকো কৌন দেগা?"

শ্রীমন্ত আপনাকে মুক্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়া কহিল "আমার পরিবার আছে ঘরে।"

সিপাহী তাহাকে পেটী কষিয়া কহিল—

"পরিবার আছে, পরিবার আছে, তুমকো লাগিয়ে বসিসে আসে উ;—উ ভাগা কিধার কোইকো সাথ—"

শ্রীমন্ত জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল,—সে বাঘের মত সিপাহী-টার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া—ঘুঁসি কিল চাপড়ে তাহার মুখখানা রক্তাক্ত করিয়া দিল।

তার পর—?

পিঁজরায় বন্দী বাঘের পালাইবার ত পথ নাই,—সে যত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে, তত তাহার বন্ধন দৃঢ় হয়।

শ্রীমন্তেরও হইল, এই অপরাধের জন্ত আবার বিচার হইল, জেলের বিচারে তাহার রেমিশন কাটা গেল, আদালতের বিচারে আর দুই বৎসর হাজৎ তাহার বাড়িয়া গেল।

বিচারশেষের দিন সাজা লইয়া শ্রীমন্ত জেলে ফিরিল একটা নিষ্ঠুর হাসি হাসিতে হাসিতে।

আবার কত দিন চলিয়া গেল, আবার সে চিঠির জন্ত অস্থির হইয়া উঠিল,—এবার সঙ্গীরা পরামর্শ দিল,—

"এক কাজ কর তুই, দরখাস্ত কর তুই যে আমার বাড়ীর খবর আনিয়ে দেওয়া হোক।"

—"দেবে?"

—"আলবৎ দেবে?"

শ্রীমন্তের সে সাহস হইতেছিল না,—সংবাদের নামে তাহার বুক ধড়াস্ করিয়া উঠে—!

জীবনের এতটুকু আশা—কত সুখস্বপ্ন সে দেখায়,—সে-টুকু মুছিয়া গেলে বাঁচিবে সে কি লইয়া?

কিন্তু—তবু—।

কুড়ি

মাস পাঁচেক পর।

গিরি আপনার মধ্যে একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল—দেহের রূপ যেন কে ভাঙিয়া গড়িতে সুরু করিয়াছে, উচ্ছল যৌবন যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে; সর্ব্ব দেহে একটা আলস্য, আপনার চঞ্চল, চটুল স্বভাব-ভঙ্গী ধীর, মন্থর হইয়া পড়িয়াছে।

একটা দারুণ চিন্তায় গিরি ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

এই অস্থিরতার মধ্যে গিরি সেদিন নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে কাজল-দীঘিতে স্নানে গেল; নির্জ্জন ঘাট, সে আপন অঙ্গবাস উন্মোচন করিয়া দেহ মার্জ্জনা করিতে করিতে সহসা চমকিয়া উঠিল—দৃষ্টি তাহার পড়িল আপন বক্ষের উপর।

আর ত সন্দেহের অবকাশ নাই, এ যে নিশ্চিত।

গিরির বুকখানা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি সিক্ত বাস অঙ্গে জড়াইয়া ঘরে ফিরিল; ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া বসিয়া আপন অঙ্গখানি আবার ভাল করিয়া দেখিল,—দেখিল সত্যই সে রূপ অপরূপ,—তাহার রক্তমাংসের দেহ লইয়া কোন অজ্ঞাত শিল্পী অদৃশ্য হস্তে যেন দেবতার শ্রীমন্দির গড়িয়া তুলিয়াছে।

গিরির বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিল; হায়রে নিষ্ঠুর পরিহাসপ্রিয় শিশু-দেবতা, এ তোর কোন পরিহাস, এ তোর কোন নিষ্ঠুর খেয়াল? বিসর্জ্জনের মধ্যে আজ এ আগমনীর সুর তুলিয়া তোর তাণ্ডব নৃত্যে মাতৃবধ করিবার এ আয়োজন কেন?

গিরির চারিদিক যেন অন্ধকার হইয়া আসে, কোন উপায়, কোন উপায় নাই।

ভরসা বিপিন; গিরির অধরে একটা ঘৃণার হাসি খেলিয়া গেল, বিপিন! সে যাহা বলিবে গিরি তাহা জানে!

তবু বিপিনের ভরসায় সে বসিয়া রহিল।

বিপিন সমস্ত শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল; গিরি তাহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া কহিল—"কি হবে গো?"

বিপিন কহিল—"হবে, হবে আর কি? পদা দাইকে ডেকে বলেছি—সে দুদিনে সব সামলে দেবে।"

গিরির অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল, তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল একদিনের মনশ্চক্ষে দেখা ছবি—ধরণীর রাক্ষসী রূপ! সে এক দৃষ্টে বিপিনের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে কহিল—"যাও—তুমি যাও—চলে যাও, চলে যাও। আমার বাড়ী থেকে চলে যাও—চলে যাও বলছি।"

বিপিন উঠিয়া কহিল—"আচ্ছা, আচ্ছা, যাচ্ছি আমি, ভেবে দেখো তুমি, কাল আসব।"

গিরি চীৎকার করিয়া কহিল—"না—না—না, এসোনা তুমি আর এসোনা বলছি।"

বলিয়া সে মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, আজ তাহার তাসের ঘর ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহা হইতে আজ সত্যই বাহির হইল রাশি রাশি কান্না, জীবনে সে কান্না ফুরাইবার নয়, বুঝি মাটীর বুক হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সে কান্নার পরিমাণ কুলাইবে না।

* * *

কয় মাস গিরির কাঁদিয়া কাঁদিয়া গিয়াছে, তবু সে কান্না ফুরায় নাই; সে কান্না সত্য সত্যই আজ বুঝি আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছে, তাই বোধ হয় শ্রাবণের আকাশ ম্লান মেঘাচ্ছন্ন আর গিরির চোখের অশ্রুধারার মত অবিরাম ঝিমিঝিমি বারিধারা সে আকাশ হইতে ঝরিতেছে; মাঝে মাঝে বুকের গুপ্ত বিলাপের প্রতিধ্বনি আকাশে গুমরিয়া উঠে গুরু, গুরু, গুরু!

ওদিকে আজ আবার সকাল হইতে কে [illegible], সেই কান্না "ওরে যাদু, ওরে মাণিক!"

গিরির বুকখানা ধড়্ ফড়্ করিয়া উঠে!

পাচুর মা আজও মাঝে মাঝে আসে, বেতন সে লয় না তবু খোঁজ খবরটা করিয়া যায়; পাঁচুর মা আসিতেই আজ সে উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে কাঁদে পাঁচুর মা?"

পাঁচুর মা কহিল—"সেই গোকুলের বৌ মা, এই ছুটী গেল।"

গিরি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল—"আমার কি হবে পাঁচুর মা?"

নিরক্ষরা দরদী মেয়েটী কহিল—"ভয় কি মা? ভগবান আছেন।"

গিরি তবু আশ্বস্তা হয়।

সে পাঁচুর মাকে কহিল—"আজ আর তুমি যেয়োনা পাঁচুর মা, আমার শরীরটা কেমন করছে।"

পাঁচুর মা কহিল—"বেশ মা, যাব না, ভয় কি!"

আকাশে ঘন ঘটা, বর্ষণের বিরাম নাই, রজনী অন্ধকার, সেই অন্ধকার সন্ধ্যার বর্ষণের শব্দ ছাপাইয়া শিশু-কণ্ঠের রোদনধ্বনি বাজিয়া উঠিল।

পাচুর মা গিরিকে শুশ্রূষা করিয়া ডাকিয়া কহিল—"ওঠ মা ওঠ, নাও তোমার খোকা কোলে নাও।"

স্তিমিত দীপালোকে গিরি নির্ণিমেষ নেত্রে সেই সদ্যজাত শিশুটীর মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিল!

নিশীথ রাত্রি বারিপাতের শব্দে মুখর, মাঝে মাঝে কোন একটা গাছের উপর হইতে সিক্তপক্ষ পাখীর পাখা আছড়ানোর শব্দ শোনা যায়, পাঁচুর মা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, গিরি সেই সন্তানটী কোলে করিয়া বসিয়া, আকাশ পাতাল রাজ্যের ভাবনা তাহার মাথায়!

সহসা সে সন্তানটীকে কোলে করিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল, দুর্ব্বল দেহ, অতি সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া দরজা খুলিয়া সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে মুক্ত আকাশের তলে বাহির হইয়া পড়িল। তখনও গোকুলের ঘর হইতে বিলাপ দিয়া দিয়া জননীর ক্লান্ত কণ্ঠ মাঝে মাঝে ফুকারিয়া উঠিতেছিল,

গিরি সেই ঘর লক্ষ্য করিয়া চলিল ; এই ঘরই বটে, ওই যে ঘরের মধ্যে অতি গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যায়, ওই যে মৃদু গুঞ্জনে বিলাপের বাণী ; গিরি আপন সন্তানটীকে সম্মুখের চালায় দুয়ারের পাশে সযত্নে শোয়াইয়া দিয়া অন্ধকার মিশিয়া গেল ; চলিল সে নদীর দিকে, আজ আর তাহার ভয় হয় না, জীবনে কোন আকর্ষণ নাই আর। নদীর তট-ভূমিতে দাঁড়াইয়া সে একবার পিছন ফিরিয়া চাহিল, একটী শিশুর কান্না শোনা যায় না ?

হু হু করিয়া কানের পাশ দিয়া বহিয়া যায়, পদতলে কলরোল করিতে করিতে চলিয়াছে দুকুলস্ফীতা নদী ; গিরির অন্ধকার-অভ্যস্ত চোখে সব বেশ দেখা যায়, ওই ওপারে গোকুল-মাটি গ্রাম খানা, ওই বামে চরের উপর শ্মশানটা, ওই যে সেই ন্যাড়া বট গাছটা, আজ আর গিরির ভয় হইল না, দুচোখ ভরিয়া ধরণীর অন্ধকার রূপ দেখিয়া নিল, জন্মের শোধ বলিয়া নয়, এ অন্ধকার রূপ তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল, সমস্ত ধরণীর মুখে যেন কলঙ্কের কালী ! কিন্তু ক্লান্ত পদদ্বয় আর দেহের ভার বহিতে পারে না, শীতে বর্ষণে দেহ কাঁপে, অন্ধকারে যেন গাঢ় গাঢ়তম হইয়া আসে, আর কিছু দেখা যায় না, কাঁপিতে কাঁপিতে শীর্ণা দুর্ব্বল নারী-দেহখানি পড়িয়া গেল ঢালু তটভূমির উপর, তারপর গড়াইতে, গড়াইতে ওই দুকুলপ্লাবী তরঙ্গভঙ্গে।

একুশ

দীর্ঘ চার বৎসর পর।

কত পরিবর্ত্তন সংসারের মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে এই ছোট গ্রাম খানিরও ; বিপিন নাই, পাঁচুর মাও গিয়াছে, হতভাগিনী গোকুলের বৌও মরিয়া সন্তান-বিয়োগের দুঃখ ভুলিয়াছে, গোকুল, সেও মরিয়াছে। শ্রীমন্তের ঘরখানা এখন একটা ধ্বংসস্তূপ, চিহ্নের মধ্যে বাঁচিয়া আছে আজ এক ধারে একটা রক্তকরবীর ঝাড় আর তাহারই সমরেখায় ওদিকে সেই লেবু গাছটা, বাস্তু-ঘরের মাটির উর্ব্বরতায় গাছ দুইটা দুর্দ্দাম সতেজ আবেগে বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে, পুষ্প-সম্ভারে অপরূপ শ্রী তাহার, বর্ষার নিশীথ রাত্রে লেবুফুলের তীব্র উগ্র গন্ধে সুরভিত বর্ষাসিক্ত বায়ু চারিদিকে তাহার বার্ত্তা বহিয়া বেড়ায় ; করবীর গাছটা রক্তরাঙা ফুলে সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া বাতাসে দোলে, তাহারও ফুলে ফুলে একটা স্নিগ্ধ মিষ্ট গন্ধ, মানুষের সুখ দুঃখের কোনও স্মৃতির পরিচয়ই তাহারা দেয় না।

তবু গ্রামের লোকে বলে—এই গাছ দুইটার তলে তলে নিশীথ রাত্রে কাহাকে দেখা যায়,—শীর্ণা এক নারী দুঃখে অতি দুঃখে যেন ঘুরিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে ক্রন্দনের গুঞ্জনও নাকি শোনা যায় ; বর্ষার রাত্রে সে নাকি করুণ উচ্চ কণ্ঠে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে, সে কান্না নাকি মাটীর বুক হইতে আকাশের কোন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াও কুলায় না। লোকে তাই ওদিক দিয়া মাড়ায় না, গাছের ফুল গাছে ফুটিয়া শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে, লেবু গাছটার ফল পাকিয়া রস-ভারে মাটীতে পড়িয়া মাটীতেই মিশাইয়া যায় !

শুধু একটি শিশু হোথা আনাগোনা করে মাঝে মাঝে, ওই করবী গাছটীর তলে ওর খেলা-ঘর ; বোধ হয় ওই রাঙা পুষ্প-সম্ভার ওকে আকর্ষণ করে, রাঙা পুষ্প-সম্ভার আকর্ষণ ত' করে সব শিশুকেই, কিন্তু মা-বাপে তাদের মনে একটা ভয়ের ছবি বিভীষণ রূপে আঁকিয়া দিয়াছে ;—আর এ শিশুটীর ত' সে বালাই নাই, উলঙ্গ ধুলিমাখা দুনিয়ার হেলায় হেলায় বর্দ্ধিত শিশু, মা নাই, বাপ নাই, আপনার পাতা খেলা-ঘরে ও দিনের পর দিন আপনি বাড়িয়া উঠিয়াছে ;—উদরান্নের সংস্থানও করিতে শিখিয়াছে, গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়ায়, পাখীর মত আশীর্ব্বাদের বুলি আওড়ায়। সে সমস্ত শব্দ গুলার অর্থ হয়তো ও জানে না—"কল্যাণ হবে মা, অনাথকে দয়া কর মা"—কল্যাণ মানে ও হয়তো জানে না—অনাথ যে কি সে ধারণাও হয় তো ওর নাই।

সব দিন আশীর্ব্বাদেও গৃহস্থের হৃদয় গলে না, রূঢ় বাক্যে তাহাকে খেদাইয়া দেয়, তার জন্যও ওর কোন দুঃখ নাই, কাহারও নিকট কোন অভিযোগ নাই, সে ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া গৃহস্থকে ভেঙায়, গালি দেয়—শেষ গিয়া দাঁড়ায় সে যেখানে পাত ফেলে— ; আবার দশ বিশ দিন গ্রামান্তরে চলিয়া যায় ভিক্ষার জন্য ; দশ বিশ দিনের আদর্শনে বিন্দু বিন্দু করিয়া করুণা গ্রামের লোকের বুকে জমিয়া থাকিবে, তখন গেলেই দুটো মিলিবে, এ জ্ঞান টুকুও তাহার বেশ হইয়াছে !

কত নতুন গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করে, 'কে রে তুই' ?

ও কহে—"আমি মা"!

"তুই কে? কাদের ছেলে?"

—"তুই গাঁয়ের গো, ভিক্ষে করি গো আমি।"

ওর পরিচয় ওই ও ওই গ্রামের ছেলে, বসুমতীর সন্তান, ও মানুষ। কোন করুণাময়ী নারী হয়তো শুধায় "তোর মা বাপ কেউ নাই নয় রে—, আহা হা—"

ও নির্ব্বিকার ভাবে কহে, "হি গোঃ—চারটী মুড়ি দেবে গো, জল খাব!"

করুণার সুবিধাও গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে; জল খাবার পাইলে ও বেশ মিষ্টি করিয়া বলে—"একখানি ছেঁড়া কাপড় দেবে মা, আর একটা পয়সা?" কোমরে আবার একটা গেঁজলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে থাকে জুটো একটা পয়সা, ওর সঞ্চিত সম্বল। ওর সঙ্গী মাঝে মাঝে মেলে, গোকুল মাটির বেঁকা বুড়ী, তার মাথাটা গলার উপর অবিরাম থর্ থর্ করিয়া কাঁপে, লোল হাত পা গুলাও কাঁপে, সে গুলা মাটীতে বেশ দৃঢ় ভাবে পড়ে না, বুক পিঠ বাঁকিয়া দেহখানা কুব্জ হইয়া পড়িয়াছে, লাঠী ধরিয়া চলে, গ্রাম গ্রামান্তরে ভিখ মাগিয়া তাহাকেও বেড়াইতে হয়, কত অন্ধকার সন্ধ্যায়, কত বাদল দিনে পিছল পথে ছেলেটা ওর হাত ধরিয়া ওর বাড়ী পৌঁছিয়া দেয়, পথে চলিতে চলিতে বুড়ীকে ফেলিয়া দিবার ভাণ করে, বুড়ী গাল দেয়, ও খিল্ খিল্ করিয়া হাসে; আবার পাঁচ দিন যদি বুড়ীর দেখা না পায়, তবে একদিন ওর বাড়ী গিয়া খোঁজ করে—

"বেঁকা বুড়ী, মরেছিস্, না বেঁচে আছিস্!"

বুড়ী ঘাড় কাঁপাইতে কাঁপাইতে কহে—"কে—রে কুড়ো, আয়, আয়, বড় জ্বর রে—"

কুড়ো কহে—"কি খেলি?"

বুড়ী কহে—"কি খাব? ভিখ না করলে, তা তুই দিবি—"

কুড়ো আর শোনে না, নির্ব্বিকার চিত্তে অনির্দ্দিষ্ট পথ বহিয়া চলে, যাইবার সময় বুড়ীকে গাল দিয়া যায়—

"ভাগ বেটী তেমুণ্ডে বুড়ী, ভিক্ষে করে ওকে দিতে হবে।"

কিন্তু ফিরিবার সময় ছেঁড়া আচল হইতে কতকগুলা মুড়ী তাহাকে ঢালিয়া দিয়া যায়, কোন দিন বা একটা পয়সা ফেলিয়া দিয়া যায়, বলে, "মুড়ি কিনে খাস্।"

কত দিন আবার বুড়ীর সঙ্গে পথ চলিতে চলিতে মনের হয়—

"আচ্ছা বুড়ী সব বড়লোক গুলো যদি ম'রে যায় তো কি মজা হয় বল দেখি?"

বুড়ীর মাথায় আসে না তাহাতে কি এমন মজা হইতে পারে, বুড়ী বলে "ওসব বলতে নাই—ওরা মারবে।"

—"মারবে? হিঃ—শুনচে কে তাই মারবে?"

বুড়ী আর কথা কয় না; ও কহে—"তা হলে ওদের টাকা নিয়ে যা সন্দেশ খাই, ভাল জামা কিনি বুঝলি;—তোকেও ভাগ দিই—।"

ধনীর প্রতি ঘৃণা,—ধনের প্রতি লোভ এই শিশুর বুকে কে দিল? সর্পের মুখে বিষ যে দেয় সেই কি?

এমনি সময়ে বৈশাখের এক খর প্রভাতে, রৌদ্র তখন সবে প্রখর হইয়া উঠিতে সুরু করিয়াছে, এক আগন্তুক আসিয়া এই ধ্বংসাবশেষ ভিটীটার পাশে দাঁড়াইয়া বিস্মিত নেত্রে চাহিল;—মাথায় একরাশ চুল—অর্দ্ধেক তাহার পাকিয়া গিয়াছে, মুখে দীর্ঘ দাড়ী গোঁফ, দেহখানার কাঠামো দেখিয়া মনে হয় এক কালে তাহা পাথরের মত দৃঢ় ছিল, কিন্তু আজ তাহা শিথিল,—ভাঙিয়া পড়িয়াছে, মুখে চোখে এবং সর্ব্বদেহ ব্যাপিয়া একটা শ্রান্তির চিহ্ন, সে যেন বিশ্রাম চায়।

সে শ্রীমন্ত।

গিরির মৃত্যু-সংবাদ শ্রীমন্ত জানিত;—জেলে থাকিতেই দীর্ঘকাল গিরির কোন সংবাদ না পাইয়া সে জেলের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বাড়ীর সংবাদের জন্য আবেদন করিয়াছিল, —জেলের নিয়মানুযায়ী জেল কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীমন্তের গ্রাম যে থানার এলাকাভুক্ত সেই থানায় লিখিতে থানার কর্ম্মচারী সংবাদ দেয়—"গিরি মরিয়াছে"।

আঘাতটা শ্রীমন্তকে বড় বাজিয়াছিল, সে আঘাতের বেদনা তাহার ভুলিবার নয়;—জেল হইতে বাহির হইয়াই গিরিমাটী কিনিয়া কাপড় রঙাইয়া সে সন্ন্যাসী হইল,—মাত্র দুই দিন হইল সে মুক্তি পাইয়াছে, লক্ষ্যহীন গতিতে অনির্দ্দিষ্ট পথে আপনাকে হারাইয়া ফেলিবার আগে—সে প্রথম তীর্থে পদার্পণ করিল—আপনার ভিটাটীতে।

গাছ ভরিয়া-রাঙা করবী ফুল ফুটিয়া আছে,—কয়টা পাকালেবুর মিষ্টগন্ধে স্থানটা ভরপুর,—শ্রীমন্তের চোখে জল আসিল—, তাহার মনে পড়িল—গাছ দুটী গিরির স্বহস্ত রোপিত, ছোট্ট গৌরী খেলা-ঘরের মাটীর কলসী দিয়া কত জলই না সেচন করিয়াছে ইহাতে।

সে বসিবার জন্য একটা ছায়া খুঁজিতে লাগিল,—দেখিল করবীর বৃহৎ ছায়াযুক্ত তলদেশটী কে যেন পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে, একটী শিশুর খেলা-ঘরের চিহ্নও দেখা যায়,—শ্রীমন্ত আসিয়া সেই ছায়াতলে আশ্রয় লইল, বাতাসে ঝরিয়া পড়ে শিথিলবৃন্ত ফুলগুলি, যেন কে ঐ পুরাণো ফুলগুলি ওই আগন্তুকের শিরে বর্ষণ করিতেই গাছটির নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল,—শ্রীমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেই ছায়াতলে শুইয়া শুইয়া কত অতীত কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া গিয়াছিল,—ঘুম ভাঙিল তাহার কাহার ডাকে,—"গোঁসাই ঠাকুর, গোঁসাই ঠাকুর!"

শ্রীমন্ত চাহিয়া দেখিল—একটা উলঙ্গ শিশু, কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে—

শ্রীমন্ত তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল "কি?"

উলঙ্গ শিশু আপন কোমরের গেঞ্জলেটার দড়িটায় পাক দিতে দিতে কহিল—"আমার খেলা-ঘর ওটা।"

শ্রীমন্ত মিষ্টস্বরে কহিল—"তোমার খেলা-ঘর ত ভাঙি নাই আমি।"

মিষ্ট স্বরের আভাষ পাইয়া শিশুটী তাহার সহিত আত্মীয়তা করিতে বসিয়া গেল,—সে কহিল—"তুমি গাঁজা খাও না?"

শ্রীমন্ত হাসিয়া কহিল—"খাই।"

—"তা খাও। আমাদের মহারাজ গাঁজা খায় আর বলে—শিবকে জটা, গঙ্গা বারি, আগলাগাকে খায় ত্রিপুরারী,—হর হর বোম, হর, হর, বোম, শঙ্কর—চেৎ-চণ্ডী—।"

শ্রীমন্ত সত্যই আপন ঝুলি হইতে গাঁজার সরঞ্জাম বাহির করিয়া বসিল, সে গাঁজা তৈয়ারী করিতে করিতে কহিল—

"তুমি কাদের ছেলে—?"

"কে জানে—লোকে বলে বাগ্দীদের ছুই যে ভাঙা ঘর ছুই ওঃ—, আবার বলে চাষাদের—"

শ্রীমন্ত কহিল—"মা বাপ বুঝি নাই তোমার খোকা?"

শিশু কহিল—"খোকা কেনে হবো, আমার নাম কুড়ো, আমকে কুড়িয়ে পেয়েছিল, জান গো আমি প'ড়ে প'ড়ে কাঁদছিলাম, ছুই বাগ্দীরা বলে।"

শ্রীমন্ত বুঝিল না, সে আপন মনে গাঁজা তৈয়ারী করিতে করিতে গুনগুন্ করিয়া গাহিতেছিল—

"দেখে এলাম শ্যাম, সাধের ব্রজধাম
শুধু নাম আ—ছে।"

কুড়ো কহিল—"সন্নাসী ঠাকুর!"

—'কি?"

—"আমাকে তোমার চেলা করবে? আমি খুব ভিক্ষে করতে পারি; খুব জোরে বলতে পারি—"হর হর শঙ্কর, ভিক্ষা মেলে মায়ী।"

শ্রীমন্ত কহিল—"আমার সঙ্গে যেতে পারবে তুমি?"

—"খু-ব, আমি বলে তিন চার কোশ ভিক্ষে করতে চলে যাই। ছুই আখধারা, বামদেবপুর, তিশূলো, আমি ত ভিক্ষে করেই খাই।"

শ্রীমন্ত গাঁজা সাজিতে সাজিতে হাসিয়া কহিল—"বেশ, আমার সঙ্গে যাবে তুমি?"

পরম উৎসাহ ভরে কুড়ো কহিল—"কবে যাবে তুমি?"

—"কাল।"

—"আজ কোথা থাকবে তুমি?"

—"এইখানে।"

ভীত মৃদুকণ্ঠে কুড়ো কহিল—"এখানে ভূত আছে, জান! রোজ কেঁদে কেঁদে বেড়ায়!"

শ্রীমন্তের গাঁজা টানা বন্ধ হইয়া গেল। সে কুড়োর মুখ পানে চাহিয়া ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিয়া "ঠিক জান তুমি? কাঁদে।"

কুড়ো চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া কহিল—"হাঁ গো—কত লোক দেখেছে, গুণ্ গুণ্ করে কাঁদে।"

শ্রীমন্ত গাঁজা খাইয়া স্তব্ধ হইয়া সেইখানে চোখ বুঁজিয়া বসিয়া রহিল, থাকিতে থাকিতে দুটী নিমীলিত চোখ হইতে দুটী জলের ধারা ঝরিয়া পড়িল; তাহার মনে হইল—গিরি তাহারই বিয়োগ-বেদনায় নিশীথ রাত্রে আজও কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফেরে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, পাখীর দল কলরব করিয়া যে যাহার আশ্রয়ের পানে চলে, গ্রাম গ্রামান্তর হইতে মিল-মজুরের দল সারি দিয়া ঘরের পানে ফেরে, মাথায় ঝুড়ি, টাম্‌না; শ্রান্ত কণ্ঠে তাদের লম্বা একটানা সুরে গান শোনা যায়—

"দিন কাটি-লো খেটে খেটে—
রাত কাটিবে—ভাঙা ঘরে।"

কুড়ো কহিল—"আমিও তোমার কাছে থাকব সন্ন্যেসী ঠাকুর।"

শ্রীমন্ত কহিল—"ভয় করবে না?"

—"তুমি থাকবে যে।"

শ্রীমন্ত নীরব হইয়া রহিল, ক্ষণ পরে তাহার মনে হইল—যদি কাছে শিশুটী থাকতে গিরি দেখা না দেয়; সে রূঢ় স্বরে কুড়োকে কহিল—"না—যা তুই এখান থেকে যা।"

কুড়ো কহিল—"না তুমি পালিয়ে যাবে।"

শ্রীমন্ত অতি রূঢ় ভাবে কহিল—"ভাগ্।"

কুড়ো ধীরে ধীরে চলিয়া যায়।

প্রহরের পর প্রহর রাত্রি চলিয়াছে—সময়ের পাথায় ভর দিয়া; নিস্তব্ধ ধরণী, শুধু অবিশ্রান্ত একটা সন্‌সন্ শব্দ; শ্রীমন্ত জাগ্রত চোখে বসিয়া আছে ব্যাকুল প্রত্যাশায়—সাশ্রুনেত্রা গিরির ছায়া-মূর্ত্তি একবার দেখিবে সে!

সহসা নিকটের আম গাছটায় কি একটা শব্দ হইল, শ্রীমন্ত চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল, কোথায় কি? কোন নিশাচর পাখীর পাখা ঝাড়ার শব্দ!

উপরে নীল আকাশে অগণ্য তারা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, লেবুর মিষ্ট গন্ধ করবীর স্নিগ্ধ গন্ধে প্রাণ যেন উদাস হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু কোথায় গিরি?

তৃতীয় প্রহরে ফালি-চাঁদের ম্লান বুক হইতে ধরণীর বুকে কাক-জ্যোৎস্নার আলোকে ঝড়িয়া পড়িল।

পাখীর দল একবার কলরব করিয়া উঠিল।

শ্রীমন্ত অবসাদ ঘুচাইতে আবার গাঁজা লইয়া বসিল; গাঁজা খাইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে একবার সে হাসিল—তাহার মনে হইল, গিরি কেন প্রেত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে? স্বামীর অভাবে সে আত্মহত্যা করিয়াছে, সে স্বর্গে গিয়াছে। সে আপন মনেই বলিয়া উঠিল—"ধ্যেৎ।" বলিয়াই সে উঠিয়া পড়িল, পথে নামিতে গিয়া সে দেখিল, পথের পাশেই কুড়ো শুইয়া, মাথায় একটা ছেঁড়া কাপড়ের পুটুলী! শ্রীমন্তের হাসি আসিল, শিশু পথ আগুলিয়া শুইয়া আছে। সে একটু কি ভাবিয়া পায়ে করিয়া তাহাকে ঠেলা দিয়া কহিল—"এই এই ছোঁড়া, এই—।"

কুড়ো ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিয়া চোখ রগড়াইতে লাগিল।

শ্রীমন্ত কহিল—"এই যাবি?"

কুড়ো কাপড়ের পুঁটুলীটা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"হুঁ!"

—"হুঁ—ত' আয়।"

সম্মুখেই অসীম-বিস্তার ধরণীর বুক চিরিয়া পড়িয়া আছে বহু পথিকের পদরেখা আঁকা পথখানি। সেখানে কার ভাগ্যের সহিত আজ কার ভাগ্যের যোগ হইল কে জানে!

শেষ

বিশ্ববাণী

প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে

লিউইস্ গ্যাস্টন লিয়ারি 'স্বনায়'এ লিখিতেছেন—ছেলেমেয়েকে বড়ো হইয়া যদি সুখী দেখিতে হয় তবে তাহাদের বয়ঃসন্ধি-কালেই স্বাতন্ত্র্য অর্জ্জন করিবার সুবিধা দিতে হইবে। 'আমি বাপ-মায়ের ছেলে' 'এই গৃহ আমার আশ্রয়' এসব বোধ হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দিতে হইবে। বয়ঃসন্ধিকালে প্রত্যেক ছেলে দাম্ভিক—আত্মসচেতন হয়। এই আত্মসচেতনতাকে কোনও রকমে বিকৃত হইতে দিলে চলিবে না। 'স্ব'এর সম্পূর্ণ বিকাশের পথে তাহার এই দাম্ভিকতাকে চালাইয়া দেওয়া দরকার। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে পুত্র মিত্রবদাচরেৎ' একথা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। হয়তো নিজের কথা নিজে ভাবিতে গিয়া ছেলেমেয়ে নিজেদের ক্ষতিই করিয়া বসে—কিন্তু পিতামাতার শাসন-নীতির চাপে পড়িলেও ক্ষতি ইহার অপেক্ষা বেশী বই কম হইবে না। সুতরাং ছেলেমেয়েদেরকে নিজেদের ভাগ্য নিজেদের গড়িয়া নিতে দেওয়াই ভালো।

ছেলে কথার অবাধ্য হইতেছে বলিয়া যে-বাপের রাত্রে ঘুম হয়না তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার অন্ত নাই। এ কথা আমরা কেন যে ভুলিয়া যাই যে, আমার ছেলে আর খোকাটি নাই—তাহাকে কোলে করিয়া দুধ খাওয়াইতে চাহিলে সে এখন আপত্তি করিবেই। এই আপত্তিকেই আমরা 'তরুণের বিদ্রোহ' আখ্যা দিই। হয়তো এ বিদ্রোহের অনেক দোষ আছে কিন্তু যদি ইহা চাপিয়া-চুপিয়া রাখিতে চাই, তবে ইহা সর্ব্বনাশ করিবে। ছেলে ফুটবল খেলিয়া হয়ত হাড় ভাঙ্গিতে চায়, ভাঙুক্, জাহাজের চাকরি নিয়া কালাপাণি পার হইতে চায়, হোক্, আমি সমস্ত বিষয়ে আমার যথাসাধ্য কর্ত্তব্য করিব। যে ক্লাবে খেলিবে তাহাতে উহার যাহাতে সর্ব্বাবিধ সুবিধা হয় তাহা দেখিব। জাহাজে উহারই মধ্যে যদি পারি একটু ভালো কাজ জুটাইয়া দিবার প্রয়াস পাইব। এমন কি প্রেমে পড়িয়া যদি কোন মেয়েকে বিবাহ করিতে চায়, তবু আপত্তি করিব না, যদি নিতান্ত মেয়েটা খুনে কি খারাপ না হয়। আমার একমাত্র দ্রষ্টব্য হইবে এই যে তাহার পৃথিবীতে আমি যেন তাহাকে কেন্দ্রচ্যুত করিবার কারণ না হই।

কেননা একথা আমি জানি যে, যদি সে নিজের সমস্যা নিজে না সমাধা করিতে পারে, যদি বিপদ উত্তীর্ণ হইতে না শিক্ষা করে, যদি ভুল করিয়া না শুধ্‌রাইতে পারে, যদি নিজের বন্ধু নিজে বাছিয়া নিতে না পারে, যাহাকে বিবাহ করিবে, তাহাকে যদি নিজে পছন্দ করিয়া না আনিতে পারে তবে তাহার জীবনে সে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না। এক কথায় 'আমার ছেলে' বলিয়া তাহাকে খাটো করিয়া আমি রাখিতে চাই না, তাহাকে পূরা একটা পুরুষ হইবার ব্যবস্থা আমাকেই করিয়া দিতে হইবে।

মিকাডো

'কারেণ্ট হিষ্ট্রি' পত্রিকায় পি, ডব্লিউ উইল্‌সন্ জাপান সম্রাট মিকাডোর পরিচয় দিয়া লিখিতেছেন—১৯০১ সনে ইঁহার জন্ম। আটাসেঁটা সৈনিকের পোষাক পরণে, মাথায় একটু খাটো, মসৃণ মুখমণ্ডলে ঈষৎ গোঁফের রেখা, চোখে চসমা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। ভাবভঙ্গী, বিশেষ করিয়া চোখের ভঙ্গিমা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু জাতির যা বৈশিষ্ট্য সংযম ক্রমাগতই তা মনকে বাহিরে প্রকাশ হইবার পক্ষে বাধা সৃজন করিতেছে। মোটামুটি সম্রাট হিরোহিটোর এই বর্ণনা। ১৯২৬ সনে পিতার অসুস্থতার সময়ে কিছুদিন সিংহাসনে রাজপ্রতিনিধি হিসাবে বসিয়া তিনি রাজত্ব লাভ করেন। অত্যন্ত নীরব প্রকৃতির লোক—এখন পর্য্যন্ত তাঁহাকে কেহ বুঝিয়াই উঠিতে পারিল না।

পশ্চিমী প্রথায় ইঁহার শিক্ষাদীক্ষা জাপানেই সাঙ্গ হইয়াছে। সম্রাট দ্রুত ফরাসী, জার্ম্মন, ও ইংরেজী ভাষা বলিতে পারেন। সকালে উঠিয়া সামান্য প্রাতরাশ সাঙ্গ করিয়া - সংবাদ-পত্র পাঠ করেন আদ্যোপান্ত, তারপর বিবুধ মণ্ডলীর সহিত সাক্ষাতে অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির আলোচনা চলে। জলযোগান্তে ব্যায়াম। বিকালে রাজদর্শনে সমাগত ব্যক্তির সহিত মোলাকাৎ এবং দলিল-পত্র স্বাক্ষর। শারীর তত্ত্বের অত্যন্ত মনযোগী পাঠক। অশ্বারোহণ ও সন্তরণ ভাল বাসেন। টেনিস্ ও গল্‌ফ্‌ও খেলিয়া থাকেন।

প্রাচীন সংস্কারের প্রাচীর না মানিয়া তিনি পৃথিবীকে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের মতোই নিজের চোখে দেখিয়া ফিরিয়াছেন। এবং স্ত্রী-মনোনয়ন সম্পর্কেও তিনি নিজের বিচার-বুদ্ধি খাটাইয়াছেন।

কস্মৈ দেবায় ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

বিস্ময়ের কথা এই যে মা সে দিন বিনুকে বকিলেন না। বকা দূরের কথা, মা বরং সস্নেহে তাহার ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া দিয়া কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় পড়ে গিয়েছিলি বাবা ?"

মায়ের স্নেহের স্বরে একটু আশ্চর্য্য হইলেও বিনু ভয়ে ভয়ে তাহার পড়িয়া যাওয়ার কথা জানাইল। শুধু কালীর জামা কাপড় ধুইয়া দিবার কথা সে বলিতে পারিল না। মা কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই আদর করিয়া বলিলেন—"তাই বুঝি নিজে নিজে জামা কাপড় ধুয়ে এনেছিস্ ভয়ে ভয়ে। পাগলা ছেলে, পড়ে গেলে কি আমি বকতে পারি !"

বিনু মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। সত্যই মা আজ কাল আর বকে না। তাহাদের বাড়ির আজকাল যেন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। মার মুখে দুশ্চিন্তার সে-ছায়া আর দেখা যায় না। যেন সুখে প্রসন্ন হাসি সদাই লাগিয়া আছে। কোন দিন যে তাহাদের বাড়িতে অশান্তি ছিল সে কথা আর যেন মনেই পড়ে না।

বিনুকে পড়াইতে বসাইয়া খানিক বাদে মা কাজ করিতে উঠিয়া গেলেন কিন্তু খানিক বাদেই ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁরে আজ শনিবার না!" তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নিজের মনেই বলিলেন "শনিবার ত' এত দেরী হয় না !"

মা একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন বোঝা যায়। বাবার আজকাল কোন দিন দেরী হয় না। শনিবার দিন বিকালের আগেই তিনি বাড়ি আসেন। রাতের পর রাত তাঁহার জন্য যে একদিন বৃথা অপেক্ষা করিয়া কাটাইতে হইয়াছে একথা আর বিনুর মার মনেই যেন নাই। কিছুক্ষণ পরেই রান্নাঘর হইতে মা ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ ত বিনু, দরজার কড়া ন'ড়্‌ল যেন !

বিনু কান পাতিয়া খানিক শুনিবার চেষ্টা করিয়া বলে—"কই না ত মা !"

"আচ্ছা তুই পড়্।"

খানিক বাদে সত্যই দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। বিনুর মা রান্নাঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া দরজা খুলিতে খুলিতে বলিলেন—"আজ এত দেরী হ'ল যে !"

কিন্তু দরজা খুলিয়া তিনি লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। গোয়ালা দুধ দিতে আসিয়াছে।

দেরী হওয়ার কথায় গোয়ালা অবাক হইয়া আপত্তি জানাইল। বিনুর মা কিছু বলিতে পারিলেন না। গোয়ালা চলিয়া গেলে বিনুর মা হাসিয়া বলিলেন—"আজ এলে খুব করে বকে দিস্ ত বিনু। আজ না তোকে বেড়াতে নিয়ে যাবার কথা ছিল !"

সকাল বেলা বাবা এই রকমই একটা আশ্বাস দিয়াছিলেন এতক্ষণে বিনুর মনে পড়িল। কথা না রাখায় বাবার উপর একটু অভিমানও যে না হইল তাহা নয়, তবু বাবার দেরী করিয়া আসার ভিতর খুব বেশী দুঃখিত হইবার সে কিছু পাইল না। মা যেন তাহার মনে হইল অকারণে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

পড়িতে পড়িতে সে বুঝি একটু ঘুমের ঘোরে ঢুলিতে-ছিল। মা রান্নাঘর হইতে আসা-যাওয়ার সময় তাহা দেখিতে পাইয়া বলিলেন—"ঘুমোস্ নি বাবা। আমার রান্না হয়ে গেল বলে। উনি এলে এক সঙ্গেই খাবি কেমন !"

কিন্তু মার রান্না হইয়া গেল, তবুও বাবার আসিবার নাম নাই। বাবা এ বাড়ীতে আসা অবধি এত দেরী কখনও হয় নাই। ঘুমে চোখ জড়াইয়া না আসিলে মার মুখ যে ক্রমশঃ কাতর হইয়া উঠিতেছে সে দেখিতে পাইত।

বিনুকেই তিনি কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত দেরী হচ্ছে কেন বল ত বিনু ?"

বিনু সে কথার কি উত্তর দিবে। অত্যন্ত ঘুম পাইলেও লজ্জায় সে ক্ষুধার কথা বলিতে পারিতেছিল না। কেন বলা যায় না নিজে হইতে খাবার কথা বলিতে তাহার বাধে, —এমন কি মার কাছেও।

রাত ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল, অপেক্ষা করিয়া করিয়া হতাশ হইয়া মা কখন যে তাহাকে আধঘুমন্ত অবস্থায় খাওয়াইয়া দিয়াছেন, তাহা বিনু ভাল করিয়া টেরই পায় নাই।

হঠাৎ বিনুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। একটু একটু করিয়া নয়, তাহার মনে হইল তন্দ্রার ঘোর যেন তাহার এক মুহূর্ত্তে একেবারে কাটিয়া গিয়াছে। ভীত ত্রস্ত হইয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। বাড়িতে কি যেন একটা ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল চলিতেছে। কি যে হইতেছে ভাল করিয়া বুঝিবার তাহার ক্ষমতা নাই—তবু অজানা আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল।

মা ঘরে নাই। তাহাদের বাহিরের দরজায় কে যেন জোরে পদাঘাত করিতেছে। পরমুহূর্ত্তে মার উচ্চতীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল "কি দরকার ছিল আসবার। শেষ রাতটুকু কাটিয়ে এলেই ত পারতে।"

দরজায় আবার পদাঘাতের শব্দ শোনা গেল, তাহার পর তাহার বাবার অস্বাভাবিক রূঢ় গলার স্বর, "খোল দরজা, নইলে ভেঙ্গে ফেল্‌ব বলছি!"

"ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, ভেঙ্গেই ফেল, খুলবনা আমি কিছুতে!" তাহার মাকে এমন উন্মত্তের মত চীৎকার করিতে আর কখনও বিনু শোনে নাই। বিছানা হইতে সভয়ে নামিয়া সে ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাইরের দরজা বাবার আঘাতে মড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিতেছে। তাহার মা নিকটেই দাঁড়াইয়া আছেন।

হঠাৎ পাড়ার মধ্যে কেলেঙ্কারীর কথাটা স্মরণ করিয়া কিনা বলা যায় না বিনুর মা দরজাটা খুলিয়া দিলেন। কিন্তু কেলেঙ্কারীর কিছু বাকী রহিল না। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতর হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া বাবা মার মুখের কাছে গিয়া হাত পা নাড়িয়া আস্ফালন করিয়া কি যে বলিলেন ভাল করিয়া বিনু শুনিতে পাইল না, কিন্তু তাহার মায়ের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট। মা বলিতেছিলেন—"কেন দরজা বন্ধ রাখব না শুনি রাত তিনটের সময় বাড়ী ঢুকতে লজ্জা করে না।"

বাবা টলিতে টলিতে ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া বলিলেন—"আমার খুশী., তোমার ঘ্যানঘানানি অনেক সয়েছি তাই তোমার আস্পর্দ্ধা এত বেড়েছে।"

বাবা বিনুর পাশ দিয়াই দরজায় একবার টাল খাইয়া ঘরে ঢুকিলেন, কিন্তু বিনুকে তিনি লক্ষ্য করিলেন না।

"আমার স্পর্দ্ধা বেড়েছে?" রাগে ক্ষোভে দুঃখে মার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত শোনাইতে ছিল। বাবার পিছু পিছু দাওয়ায় উঠিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "রাত দুপুরে মাতাল হয়ে তুমি বাড়ী ফিরবে, তাই মুখ বুঁজে না সইলেই আমার স্পর্দ্ধা হয়!—কেন আমি কি তোমার কেনা বাঁদী?"

বাবা ঘরের চৌকাঠের কাছে তখন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কটু কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"চুপ চেঁচিও না।"

"কেন চেঁচাব না, যার স্বামী তোমার মত ইতর তার আবার মান সম্ভ্রম কিসের?" বিনুর মার স্বাভাবিক জ্ঞান যেন লোপ পাইয়াছে। এমন ভাবে উত্তেজিত তিনি কখনও হন নাই। স্বামীর এবারকার পরিবর্ত্তন গভীরভাবে বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই এই আকস্মিক আঘাত তাঁহাকে বুঝি এতখানি বিচলিত করিয়াছিল। অনেকখানি আশা করিবার সুযোগ দিয়া স্বামী যেন তাহাকে শেষ মুহূর্ত্তে প্রবঞ্চনা করিয়াছেন। শান্তিময় সংসারের যে স্বপ্ন তিনি অনেক কষ্টে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এমন ভাবে তাহা ধূলিসাৎ হইবার পর আর যে তাহার পুনরুদ্ধার সম্ভব হইবে না, মনের গোপনে তিনি বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁর আশাহত অন্তরের শেষ আর্ত্তনাদ তাই এমনি ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

মা আবার বলিলেন—"চিরদিন চুপ করে থেকেছি বলেই ত আমার এই দুর্দ্দশা তুমি করেছ।"

"তবে চেঁচাও" বলিয়া মাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া বাবা ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। ঠেলাটা যে অত জোর হইবে তাহার বাবাও বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই। বিনু শিহরিয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। সামলাইতে না পারিয়া মা দাওয়ার উপর হইতে একেবারে উঠানের উপর সজোরে পড়িয়া গেলেন।

বিনু আতঙ্কে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যেমন ভাবে পড়িয়াছিলেন তেমনি ভাবেই মা উঠানের উপর পড়িয়া রহিলেন—শুধু তাঁহার চাপা কান্নার শব্দ অস্পষ্টভাবে শোনা

যাইতে লাগিল। বাবা ঘরের ভিতর হইতে আর বাহির হইলেন না।

বিন্নুর সমস্ত বোধশক্তি যেন লোপ পাইয়াছে। কি যে হইয়া গেল ভাল করিয়া কিছুই সে বুঝিতে পারে নাই। শুধু নিজেকে তাহার একান্ত অসহায়, একান্ত পরিত্যক্ত বলিয়া মনে হইতেছিল। পৃথিবীতে তাহার কথা কাহারও মনে নাই—সে একান্ত অনাবশ্যক। নিজের অজ্ঞাতেই সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে সুরু করিয়া দিল, কিন্তু সে কান্না কেহ লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কখন যে সে সেখানেই ঘুমাইয়া পড়িল সে জানে না।

ভোর বেলাতেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। মা উঠানের ধারে একটি হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া বসিয়া আছেন। তাহার দিকে একবার চাহিলেন, কিন্তু সে দৃষ্টি একেবারে উদাসীন। এক রাত্রে মার যেন কত বড় একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

কি করিবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিন্নু উঠিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে ভয়ে একবার ঘরের দিকে গেল। বাবা মেঝের উপরই চিৎ হইয়া শুইয়া গভীর ভাবে ঘুমাইতেছেন। সেখান হইতে ফিরিয়া মায়ের কাছে একবার দাঁড়াইল। মা কোন প্রকার সাড়া দিলেন না। উদ্‌গত অশ্রু কোন রকমে দমন করিয়া বিন্নু ধীরে ধীরে বাহিরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। দরজা রাত হইতে তেমনি খোলাই আছে।

হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল। আজ ভোরেও কালী তাহাদের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চুপি চুপি সে ডাকিল—"শোন।"

কাহারও সঙ্গ এখন বিন্নুর ভলো লাগিতেছিল না। তাহার গভীর নিঃসঙ্গতার বেদনায় কাহারও সান্ত্বনা দিবার ক্ষমতা নাই একথা যেন সে বুঝিতে পারিয়াছে। তবু কালীর ডাকে যন্ত্রচালিতের মত সে আগাইয়া গেল।

তাহার মনের অবস্থা কালী বুঝিয়াছিল কিনা বলা যায় না কিন্তু তাহার পিঠে একটা হাত দিয়া তাহাকে লইয়া যাওয়া ছাড়া কোন কথা বলিবার চেষ্টা সে করিল না।

ইটের পাঁজার একধারে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকার পর কালী হঠাৎ আঁচল দিয়া বিন্নুর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল—"তোমাকে মারেনি ত?"

বিন্নু বলিল "না।"

কালী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আমার বাবাও মদ খেত—খুব মদ খেত।" কেন বলা যায় না কালীর বাবার সহিত তাহার বাবার তুলনাটা বিন্নুর মোটে ভাল লাগিল না। কালী যে তাহাদের গত রাত্রের কথা জানিতে পারিয়াছে ইহাতেও সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিল।

তাহার পর দিন অবশ্য যায়, কিন্তু তেমন করিয়া নয়। সেই রাত্রিটাই তাহাদের সংসারের উপর গভীরভাবে তাহার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

বাবা অবশ্য তাহার পর দিনই ঘুম হইতে উঠিয়া অনুতাপে অনুশোচনায় কাতর হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনি কোথায় যাইতেছিলেন বলা যায় না। মাঠে বিন্নুকে দেখিতে পাইয়া তিনি তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বলিয়াছিলেন, "এইটে তোমার মাকে দিয়ে আসতে পারবে বাবা?"

একটা রুমালে বাঁধা অনেকগুলো টাকা ও নোট দেখিয়া বিন্নু অবাক হইয়া গিয়াছিল। এ সময়ে দিলে মা লইবেন কিনা সে বিষয়ে বিন্নুর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু মার কাছে গিয়া দাঁড়াইতে মা তাহা লইতে আপত্তি করেন নাই। সে লওয়ার ভিতর উৎসাহ অবশ্য ছিল না। রাতের ঘটনার পর মা যেন কেমন অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। কিছুতেই যেন তাঁহার আস্থা নাই।

বিন্নু বলিয়াছিল—"বাবা দিলে, মা।"

মা 'হাঁ' বলিয়া সায় দিয়াছিলেন।

বিন্নু বাহিরে আসিয়া দেখিয়াছিল বাবা তখনও দাঁড়াইয়া আছেন। তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত দ্বিধাভরে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"নিয়েছে?"

বিন্নু মাথা নাড়ায় একসঙ্গে বিস্মিত ও আশ্বস্ত হইয়া তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন।

তাহার পরও কয়দিন অবশ্য বাবা মার সামনে ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া কথা বলেন নাই। বিন্নুর মধ্যস্থতায়

উত্তরের কথাবার্ত্তা হইয়াছে। কিন্তু সে বেশী দিন নয়। একদিন দেখা গেল আবার দুজনের মিল হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু সত্যকার মিলন তাহা বুঝি নয়। বিনুর মা কেমন যেন আজকাল বিনুর বাবাকে ভয় করিয়া চলেন। বিনু বড় হইলে বুঝিতে পারিত আগেকার সে সহজ সম্বন্ধ দু'জনের মধ্যে নাই। একটি রাত্রি দুইজনকে পরস্পরের নিকট হইতে অনেকখানি পৃথক করিয়া দিয়াছে।

সেই রাত্রির শারীরিক নয়, মানসিক আঘাত অপ্রত্যাশিত বলিয়াই হয়ত অত্যন্ত নিদারুণ হইয়াছিল। বিনুর মার আত্মমর্য্যাদাবোধের মূল পর্য্যন্ত তাহাতে শুকাইয়া গিয়াছে। কিম্বা এমনও হইতে পারে যে অন্যান্য অনেক সাধারণ মেয়ের মত সে মর্য্যাদাবোধ কোনদিনই তাঁহার গভীর ছিল না; কথনও তাহার পরীক্ষা হয় নাই বলিয়াই তাহা কোন মতে এতদিন টিকিয়া ছিল। জীবনের প্রথম আঘাতে তাহা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। স্বভাবতঃ তিনি নম্র।

বাহির হইতে দেখিলে বিনুদের সংসারে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন চোখে পড়েনা। শুধু অর্থের অনিশ্চয়তাটা একটু বাড়িয়াছে। কোনদিন বা তাহাদের সংসারে সকল জিনিষের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য দেখা যায় তাহার পর হয়ত বহুদিন ধরিয়া অভাবের আর সীমা থাকেনা।

সংসার সম্বন্ধে বিনুর অবশ্য কৌতূহল নাই, কৌতূহল থাকিবারও কথা নয়। কিন্তু টুকরাটাকরা অনেক কথা তাহার কানে আসিয়াছে। সে রাত্রে বাবা যে ঘোড়দৌড় খেলিয়া অত টাকা জিতিয়া আসিয়াছিলেন সে তাহা জানে।

ঘোড়দৌড় খেলা জুয়া বলিয়া সে সম্বন্ধে মা বুঝি একটু মৃদু আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু বাবা বুঝাইয়াছিলেন জুয়ায় হার হইলেই তাহা খারাপ, জিতিলে নয়। প্রথম যেদিন হার হইবে সেইদিনই তিনি ছাড়িয়া দিবেন—ততদিন পর্য্যন্ত উপরি টাকা যদি আসে ত আসুক না।

মার ইহাতে প্রতিবাদ করিবার কিছু ছিল কিনা বলা যায় না কিন্তু তিনি কিছু বলেন নাই। তাছাড়া উপর্য্যো-পরি কয়েকবার অনেক টাকা লইয়া আসায় মাকে খুসীই হইতে দেখা গিয়াছিল।

বাবা অবশ্য তাঁহার কথা মত কাজ করেন নাই। গত কয়েকবার তাঁহাকে শুষ্কমুখে শূন্যহাতে ফিরিতে দেখা যাইতেছে। বিস্ময়ের কথা এই যে মাও তাঁহাকে পূর্ব্বের শপথ স্মরণ করাইয়া দিতে একেবারে ভুলিয়া গেছেন। মায়ের পরাজয় যে সম্পূর্ণ হইয়াছে সে কথা বিনু কেমন করিয়া জানিবে।

শুধু সে লক্ষ্য করে যে মা আজকাল একটু উৎসাহের সহিত বাবার ঘোড়দৌড়ের কথাতেও যোগদান করেন। ভাগ্যপরীক্ষার আগের দিন সকালে হয়ত মা বলেন—"দেখ, আজ সরষের তেলের ভাঁড়টা বার করতে গিয়ে দেখি, চারটে আরসুলা পড়েছে।"

কথাটা বলিয়া বিনুর মা উৎসুক ভাবে স্বামীর মুখের দিকে তাকান।

বিনুর বাবা সকালে উঠিয়াই দাওয়ায় বই-কাগজ লইয়া রেসের হিসাব কষিতে লাগিয়া গিয়াছেন। পেন্সিলটা কাগজ হইতে তুলিয়া হাসিয়া বলেন—"তার মানে আজ চার নম্বর আসচে কেমন ?"

"যাঃ আমি বুঝি সেই কথা ভাবছি—" বলিয়া বিনুর মা চলিয়া যান, কিন্তু খানিক বাদেই ঘুরিয়া আসিয়া বলেন—"তুমি আমার কথা শুনে খেলে দেখো আজ ঠিক চার নম্বর আসবে।"

বিনুর বাবা হাসিয়া বলেন—"আচ্ছা।"

কোন দিন বা ঘোড়দৌড়ে কি ভাবে হঠাৎ লোকে বড় লোক হইয়া যায় এবং কাহার তাহা হইয়াছে বাবা তাহার গল্প করেন।

মা অনেকক্ষণ শুনিবার পর জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা তুমি একদিন ওই রকম কেউ খেলেনি এমন একটা ঘোড়া খেলতে পারনা ?"

বাবা হঠাৎ ধমক দিয়া বলেন—"যা বোঝনা তা নিয়ে যা তা বল কেন? সে রকম ঘোড়া খেললেই আসে নাকি ?" বাবার মেজাজ আজকাল সহজেই গরম হইয়া উঠে, মায়ের প্রতি ব্যবহারও আজকাল তাঁহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

মা চুপ করিয়া যান। কিন্তু কৌতূহল তাঁহার দূর হয় না। খানিক বাদে আবার বলেন—"আচ্ছা একদিনে ঠিকমত টিপ্ মিলে গেলে একশ টাকা থেকে কত টাকা করা যায় ?"

বাবা বলেন,—"তা দশ হাজার হ'তে পারে!"

মা সবিস্ময়ে শব্দটিকে যেন উপভোগ করিতে করিতে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেন—"দ-শ—হা-জা-র !" নিত্যকার অসচ্ছলতার মধ্য হইতে বিনুর মার অর্থলোভের অনায়াস-সাধ্য পদ্ধতিতে লোভ জন্মিয়াছে। তাঁহার অধঃপতন সম্পূর্ণ।

বিনুর এ সমস্ত টাকার কথা শুনিতে মন্দ লাগেনা। শনিবার সন্ধ্যার পর বাবার আসিবার আগে মার উদ্বেগ এক একদিন তাহার মধ্যেও সংক্রমিত হইয়া যায়। কিন্তু সে ক্ষণিক।

এদিকে তাহাদের সংসারে গ্লানির অন্ত নাই—সে গ্লানি বিনুকেও স্পর্শ করে না এমন নয়।

সকালে হয়ত তাহাদের দরজায় আসিয়া কেহ তাহার বাবার নাম ধরিয়া ডাকে। বিনুর বাবা মাকে ইসারায় আহ্বান করিয়া কি যেন বলেন। মা বিনুর কাছে আসিয়া তাহাকে যাহা বলিতে শিখাইয়া দেন, তাহাতে বিনু প্রথমটা অবাক হইয়া যায় তাহার পর ব্যাপারটাকে অত্যন্ত মজা বলিয়াই তাহার মনে হয়।

বাড়ির ভিতর হইতে বিনু চেঁচাইয়া বলে—"বাবা বাড়ি নেই !" কিন্তু বলিয়াই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে। কিন্তু মা যখন সঙ্গে সঙ্গে চোখ রাঙ্গাইয়া ওঠেন, তখন ব্যাপারটা শুধু আমোদের নয় বলিয়া কেমন অস্বস্তিকর সন্দেহ তাহার মনে জাগে। তাহার মন কি কারণে যে পীড়িত হইয়া উঠে সে ভালো বুঝিতে পারেনা।

প্রত্যক্ষভাবে একটু আধটু অপমান তাহাকেও ভোগ করিতে হয়। তাহাদের গলিপথ ছাড়াইলেই সদর রাস্তার উপরে মুদির দোকান। বিনুকেই আজকাল অনেক সময়ে সেখান হইতে জিনিষপত্র আনিতে হয়।

মা বুঝি তাহাকে কি আনিতে ফরমাস্ করিয়াছেন।

বিনু অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলে—"আমি ডাল আনতে যেতে পারব না।"

বিনু অবাধ্যতা করিবার মত ছেলে নয়। মা অবাক হইয়া বলেন—"সে কিরে, পারবিনা কেন ?"

বিনু কিন্তু মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া থাকে। মা আবার জিজ্ঞাসা করেন—"পারবিনা কেন বল্ ? তুই না পারলে কি আমি আনব ?"

বিনু তথাপি কোন সাড়া দেয় না। মা এবার একটু উচ্চস্বরেই বলেন—"কথার উত্তর দিচ্ছিস্ না যে বড় ?"

বিনু কাতর হইয়া মার মুখের দিকে তাকায়, তারপর ভারী গলায় বলে—"ওয়া বাকী পয়সা চায়, না দিলে যাতা বলে।"

মা ধমক দিয়া বলেন—"পয়সা চায় পয়সা দেওয়া হবে। পয়সা কখন দেওয়া হয়নি না আর দেওয়া হবে না ? তার জন্যে আবার যাতা বলবে কি ? তুই যা ত—বলিস্ এই শনিবার দিয়ে দেবে।"

ধমক খাওয়া বিনুর অভ্যাস নয়। তাহাকে সেই যাইতেই হয় কিন্তু মন তাহার অত্যন্ত খারাপ হইয়া যায়। মুদির কাছ হইতে কথা শোনার অপমান যে কত তাহা সে মাকে কেমন করিয়া বুঝাইবে ! তাছাড়া অনেক শনিবারের আশ্বাস ইতিমধ্যে মুদিকে দেওয়া হইয়াছে, শনিবারের প্রতি তাহার নিজেরই আর আস্থা যে নাই।

বিনু যাহা ভয় করিয়াছিল মুদির দোকানে তাহাই ঘটে।

ভগবান দাস শুষ্ক মরুভূমির দেশের লোক। হয়ত শুধু পিতলের লোটা সম্বল করিয়া সেও এই সুজলা সুফলা দেশে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু ঘটি তাহার আকারে হয়ত বাড়িলেও সেই পিতলেরই রহিয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে মরুভূমির চিত্র স্বরূপ চেহারার শ্রীহীন শুষ্কতা টুকুও তাহার বাঙ্গলা দেশের মোলায়েম আব্‌হাওয়া দূর করিতে পারে নাই।

জীর্ণ দেহের হাড় পাঁজরা সমস্ত বাহির করিয়া কোমরে মাত্র একটা ময়লা ছয় হাতি কাপড় জড়াইয়া ভগবান তাহার দোকানের মাচার উপরে বসিয়া দোকানদারী করে। নেহাৎ দায়ে না পড়িলে বোধ হয় কেহ তাহার দোকানে সওদা করিতে আসে না, কারণ স্বভাব তাহার অত্যন্ত খিট্‌খিটে। বাঙ্গলায় আসিয়া আর কিছু না শিখুক এ দেশের ভাষার কটুকথা গুলি সমস্তই সে আয়ত্ত করিয়াছে। দাঁত খিচাইবার সুবিধা পাইলে ভালো মন্দ কোন খরিদ্দারকেই সে রেহাই দেয় না। তাহার উন্নতি না হইবার কারণই বোধ হয় এই। এ পাড়ার লোকের দায় অত্যন্ত বেশীই বোধ হয়। দোকানে ভীড় লাগিয়াই আছে।

বিনু গিয়া একধারে চুপ করিয়া দাঁড়ায়। ভীড় না কমিলে তাহার পাইবার আশা নাই সে জানে। কিন্তু ভগবান দাসের অজীর্ণ রোগ কোনও কারণে সে দিন অতিরিক্ত রকম বাড়িয়া থাকিবে। বিনুকে দেখিতে পাইয়াই সে কালো ছোপ লাগান দাঁতের মাড়ি পর্য্যন্ত বাহির করিয়া বলে—"কি খোকা বাবু, খবর কি ? টাকা আনিয়েছো ?"

বিনু লজ্জিত হইয়া বলে, "না, টাকা শনিবার দেবে, মা আধসের অড়ল ডাল চাইলো।"

ভগবান দাস ঠোঙ্গায় করিয়া কাহার জন্য নুন ওজন করিতেছিল। বাঁটখারাটা সজোরে কাঠের তক্তার উপর নামাইয়া রাখিয়া সে বলে,—"আর চাল চাই না? আটা, ঘিউ, নুন তেল?"

বিনু প্রথমটা হতভম্ব হইয়া যায়। ভগবান দাস তখনও বলিয়া চলে "আমার দোকানটা! আমার মাথা!"

জিনিষ কিনিতে যাহারা জড় হইয়াছিল তাহারা সকলে হাসিয়া উঠে। বিনুর কাণের মূল হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠে।

ভগবান দাসের কথা তখনও ফুরায় নাই, সে উত্তেজিত ভাবে বলিতে থাকে "ডাল নিতে পাঠিয়েছেন, ডাল! ডাল আমি এখানে চেলাইতে বসেছি না! পাঁচ হপ্তা হোয়ে গেলো একটা পয়সা পাঠিয়েছে তোর মা? খালি শনিবার আর শনিবার।"

খরিদ্দারদের ভিতর একজন রসিকতা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না, ভগবানের কাছে তাহার ধারও কম নয়। বলে, "শনিবারে দেবার কথার মানে বুঝলে না, ওর বাবার টাকা যে ঘোড়ার ল্যাজে বাঁধা।"

সকলে আবার হাসিয়া উঠে। কিন্তু দুঃখে অপমানে বিনু আর চাপিয়া রাখিতে পারে না, সেই খানেই কাঁদিয়া ফেলিয়া সে ধীরে ধীরে দোকান হইতে চলিয়া যাওয়ার উপক্রম করে। কিন্তু যাওয়াও তাহার হয় না। ভগবান দাস পিছন হইতে দাঁত খিঁচাইয়া ডাকিয়া বলে—"ঈস্ রেগে একেবারে চলেই যায় যে!" তাহার পর তাহার হাতে একটা ঠোঙা দিয়া বলে, "নে, আজ দিলাম, কিন্তু এবার শনিবার টাকা না দিলে তোর বাবার কাপড় কেড়ে নিব রাস্তায়!"

মায়ের কথা ভাবিয়া সেই ঠোঙ্গাটি যে তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত হাত পাতিয়া লইতে হয় এই অপমানটিই বিনুর সবচেয়ে বেশী বাজে।

(ক্রমশঃ)

পাখীটী

—শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আমার মনের মৌন পাখীটী পিঁজ্‌রা পেয়েছে খোলা,
　　লঘু লীলায়িত পাখা-ভরে হ'ল নব-নীড় সন্ধানী ;
খেয়ালের খড়-কুটো মুখে করে' ছুটেছে আত্মভোলা,
　　আমার 'আমি'রে চিনি বা না চিনি পাখীবে আমার জানি

আঁখির সুমুখে আকাশ-সাগর,—ডাঙ্গা তার পর-পারে,
　　আমার অদেহী চপল পাখীর ওই পারে যাওয়া চাই ;
হেথায় হোথায় গতায়াতে শুধু ভুলে র'ল আপনারে,
　　বাঁধন-বিহীন এ পোড়া পাখীর কিছুর ঠিকানা নাই !

জীবনের পথে যাত্রার জয় পাখীরে বুঝাই মিছে,
　　গতি-চঞ্চল আপনারেও তো বুঝিলনা কোন' কালে ;
পারের মায়ায় প্রাণ-পৃথিবীতে পড়ে' র'ল আজো পিছে
　　নিজের নীড়ের দুর্দ্দশা বাড়ে খেয়ালের জঞ্জালে।

আমার মনের মৌন পাখীটী পিঁজ্‌রা পেয়েছে খোলা,
　　লঘু লীলায়িত পাখা-ভরে হ'ল নব-নীড় সন্ধানী ;
খেয়ালের খড়-কুটো মুখে করে' ছুটেছে আত্মভোলা,
　　আমার 'আমি'রে চিনি বা না চিনি পাখীরে আমার জানি।

ভারতে জাতীয় আন্দোলন

বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য

(তৃতীয় পরিচ্ছেদ—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বর্ত্তমানে যে ভাবে রাজনীতিক আন্দোলন পরিচালিত হয়, তাহার আদর্শ বিদেশী। তাহার কারণ অনেক। প্রধান কারণ এই যে, এ দেশে যে শাসন-পদ্ধতি ইংরাজের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বিদেশী। এদেশে যে সব প্রতিষ্ঠান ছিল, সে সকল ইংরাজ-শাসনে উচ্ছিন্ন হয় এবং তাহার স্থানে ইংরাজ স্বদেশে প্রচলিত প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন। সেই প্রয়োজনে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা যে ভাবে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার ফলে দেশে কিতাবতী শিক্ষায় শিক্ষিত এক দল লোকের আবির্ভাব হয় এবং শিল্প ব্যবসা প্রভৃতি এ দেশের লোকের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া যে সব ভারতবাসী নানা ক্ষেত্রে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মনীষা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার আবরণ ভেদ করিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ইংরাজ শাসনের সুবিধার জন্য যে শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা জাতীয় শিক্ষা নহে। জাতীয় শিক্ষা কেবল কেরাণী প্রস্তুত করা না, পরন্তু সকল সম্প্রদায়কে স্ব স্ব কার্য্যের উপযোগী করা। ইংরাজের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা সম্বন্ধে সার উইলিয়ম উইলসন্ হাণ্টার যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সমীচীন। তিনি বলেন ;—

Your stale education is producing a revolt against three principles which, although they were pushed too far in ancient India, represent the deepest wants of human nature—the principle of discipline, the principle of religion, the principle of contentment.

অর্থাৎ ইংরাজ সরকার এ দেশে যে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা মানুষের স্বাভাবিক অভাবের বিষয় অবজ্ঞা করে। শৃঙ্খলা, ধর্ম্ম ও সন্তোষ—এই তিনটির বিষয়ে প্রাচীন ভারতের অধিবাসীরা অতিমাত্র মনোযোগী ছিলেন বটে, কিন্তু মানুষের পক্ষে এই তিনের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক।

এই বিষয় বুঝাইবার জন্য তিনি বলেন :—

The old indigenous schools carried punishment to the verge of torture. Your Government schools pride themselves in having almost done away with the rod, and in due time you will have on your hands a race of young men who have grown up without discipline.

অর্থাৎ এদেশে সেকালে যে সব বিদ্যালয় ছিল, সে সকলে দণ্ড প্রায় নিষ্ঠুর হইয়া উঠিত। এখন সরকারী স্কুলগুলি এই কথা বলিয়া গর্ব্বানুভব করে যে, বেত্রাঘাত আর প্রায় প্রচলিত নাই। ফলে দেশে শৃঙ্খলার অভাবের মধ্যে বর্দ্ধিত যুবকদিগের আবির্ভাব হইবে।

তাহার পর :—

The indigenous schools made the native religions too much the staple of instruction ; opening the day's work by chanting a long invocation to the Sun or some other deity, while each boy began his exercise by writing the name of a divinity at the top. Your Government schools take credit for abstaining from religious teaching of any sort and in due time you will have on your hands a race of young men who have grown up in the public non-recognition of a God.

অর্থাৎ সেকালে দেশীয় বিদ্যালয়গুলিতে দেশীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিক মনোযোগ প্রদান করা হইত—বালকরা সূর্য্য বা অন্য কোন দেবতার স্তব পাঠ করিয়া দিবসের কার্য্য আরম্ভ করিত। কিছু লিখিবার পূর্ব্বে পত্রশিরে দেবতার নাম লিখিত। সরকারী স্কুলে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষা বর্জ্জন করা হয়। ফলে এদেশে যে যুবকদলের অবির্ভাব হইবে তাহারা ভগবানে অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হইয়াছে।

The indigenous schools educated the working and trading classes for the natural business of their lines. Your Government schools spur on every clever small boy with scholarships and money allowances, to try to get into bigger schools, with the stimulous of bigger scholarhips, to a University degree. In due time you will have on your hands an overgrown clerkly generation, whom you have traind in their youth to depend on Government allowances and to look to Government service, but whose adult ambition not all the offices of the Government would satisfy.

অর্থাৎ, দেশীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা তাহাদের জীবনযাত্রার কার্য্যের উপযোগী হইত। সরকারী বিদ্যালয়ে চতুর বালককে বৃত্তি প্রদান করিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে

এবং তথা হইতে অধিক বৃত্তি দিয়া উচ্চতর বিদ্যালয়ে ও শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইবার চেষ্টায় চেষ্টিত করা হয়, ফলে যে যুবকদলের আবির্ভাব হইবে তাহারা কেরাণীর দল। তাহারা সরকারী বৃত্তির ও সরকারী চাকরীরই আশা করিবে; কিন্তু তাহারা বড় হইলে সরকারের সব চাকরীতেও তাহাদিগের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না।

বঙ্গদেশেই এই শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তন। কিন্তু বাঙ্গালীর প্রতিভা কেবল কেরাণীগিরীতেই পরিতৃপ্ত থাকে নাই।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি, এই প্রদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর মনে রাজনীতিক অধিকারলাভের আকাঙ্ক্ষা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। সেই প্রসঙ্গে আমরা দ্বারকানাথ ঠাকুরের নামোল্লেখ করিয়াছি। ইনি এদেশে একজন ধনী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। বিলাতে ও য়ুরোপের অন্যান্য স্থানেও তিনি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার লিখিয়াছেন, তিনি প্যারিসে রাজোচিত ভাবে বাস করিতেন। তথায় রাজা লুই ফিলিপ তাঁহার এক সান্ধ্য সম্মিলনে স্বয়ং আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তখন ফরাসী মহিলারা ভারতীয় শালের বিশেষ আদর করিতেন। যে কক্ষে সম্মিলন হয়, সে কক্ষের প্রাচীর ভারতীয় শালে সুসজ্জিত হইয়াছিল। মহিলারা বিদায় লইবার সময় দ্বারকানাথ তাঁহাদিগের প্রত্যেককে একখানি করিয়া শাল উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ আনন্দ দিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ যে রাজনীতিক বিষয়ে মনোযোগ দিতেন এবং দেশের লোকের রাজনীতিক অধিকার সংরক্ষণে ও সম্বর্দ্ধনে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। বিলাতে যাইয়া তিনি যে সে বিষয়ে অবহিত থাকিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

তখন বিলাতের লোকের মনোযোগ প্রধানতঃ দুই কারণে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে :—

(১) এদেশ হইতে ফিরিয়া যাইবার পর বিলাতে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিচার হয়। সেই বিচারকালে বার্ক, শেরিড্যান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাগ্মীরা ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহার ফলে বিলাতের সকল শ্রেণীর লোকেই মনে করিতে থাকেন, ভারতবর্ষে কায করিবার বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। তখন হইতে ধনীরা ভারতে অর্থ নিয়োগ করিয়া ও ব্যবসায়ীরা তথায় ব্যবসা করিয়া যেমন সমৃদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতে থাকেন, তেমনই আবার রাজনীতিকরা ভারতবর্ষের বিষয় আলোচনা করিয়া যশ লাভের চেষ্টায় চেষ্টিত হয়েন। ভারতবর্ষ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের প্রচার-কেন্দ্র এবং জনহিতৈষীদিগেরও কার্য্যক্ষেত্রে পরিণতি লাভ করে।

যে সকল রাজনীতিক ভারতবর্ষের বিষয় আলোচনা করেন, মিঃ জর্জ্জ টমাস তাঁহাদিগের অন্যতম। দেখা যায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতেই তিনি ভারতবর্ষের ব্যাপারের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সেই বৎসর ভারতে দুর্ভিক্ষে বহু-লোকক্ষয়ের সংবাদে তিনি বিচলিত হন। তৎপূর্ব্বে তিনি আমেরিকায় নিগ্রোদিগকে সাধারণ অধিবাসীর অধিকার প্রদান সম্বন্ধীয় আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন এবং তাহার পর 'আদিম নিবাসী সংস্করণ সভা'য় যোগ দেন। সেই সভায় যোগ দিবার পর অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বুঝিতে পারেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশ করিবার জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। অল্প কাল মধ্যেই তাঁহার চেষ্টায় ভারতবাসীর কল্যাণ সাধনার জন্য একটি সভা (British Indian Soceity) প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয় এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে লর্ড ব্রুহামের সভাপতিত্বে লণ্ডনে ফ্রি মেশন হলে এক সভায় এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসরের শেষভাগে তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ছয়টি বক্তৃতা দেন। সেগুলি তৎকালে 'টাইমস্' ও 'গার্জ্জেন' পত্রে প্রকাশিত ও ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে একসঙ্গে পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়। বর্ত্তমানে আমরা সে সকল বক্তৃতার বিস্তৃত আলোচনা করিব না। তবে এ কথা বলিতেই হইবে যে, সেই বক্তৃতাগুলিতে তাঁহার ভারত-প্রীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার বক্তৃতার ফলে 'এডিনবরা রিভিউ' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পত্রে ভারতের বিষয় আলোচিত হইতে থাকে এবং তিনি স্বয়ং 'British Indian Advocate' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রচার করেন। তিনি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে শস্য আইন বিরোধী দলে যোগ দিবার সময় সর্ত্ত করেন, ঐ দলের আন্দোলন শেষ হইলে তাঁহারা ভারতবর্ষের ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। সাদাম্‌টনের উদারনীতিকরা তাঁহাকে

পার্লামেণ্টে সভ্যপদপ্রার্থী হইতে অনুরোধ করিলেও তিনি বলেন, তিনি সভ্য হইয়া ভারতের কল্যাণ করিতে ইচ্ছা করেন।

মিষ্টার টমশন যখন বিলাতে ভারতবর্ষের বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন; সেই সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে গমন করেন। উভয়ে পরিচয় হইলে ভারতবর্ষে যাইয়া সকল বিষয় দেখিবার জন্য মিষ্টার টমশন তাঁহার সহিত আসেন।

তাঁহার আগমন এদেশে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের বিশেষ আনন্দের কারণ হইয়াছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনীলেখক কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন—"The unrivalled eloquence of Mr. Thompson electrified Calcutta" অর্থাৎ মিষ্টার টমশনের প্রতিদ্বন্দ্বী-হীন বাগ্মিতায় কলিকাতায় যেন বিদ্যুতের সঞ্চার হয়;—কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে নব জীবন অনুভূত হয়। যাঁহারা মিষ্টার টমশন কর্ত্তৃক সাদরে শিক্ষার্থ গৃহীত হইয়াছিলেন তাঁহারা অনেকেই এদেশে নূতন স্থাপিত ইংরাজী বিদ্যালয়ের স্কুলের ও কলেজের—শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁহাদিগের কয় জনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

রামগোপাল ঘোষ।	দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী।	কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়।
প্যারীচাঁদ মিত্র।	কিশোরীচাঁদ মিত্র।
চন্দ্রশেখর দেব।	

তখন কলিকাতায় কোন রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না—রাজনীতিক সভার উপযুক্ত স্থানও ছিল না। স্থানের অভাব দূর করিবার জন্য মাণিকতলায় বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগান-বাড়ীতে সভাধিবেশনের ব্যবস্থা হয়। পরে ৩১নং ফৌজদারী বালাখানায় সভা হইতে থাকে। এই গৃহের নিম্ন তলে গুপ্ত মিত্র কোম্পানীর ডাক্তারখানা ছিল। তাহার স্বত্বাধিকারী ডাক্তার দ্বারকানাথ গুপ্ত ও ডাক্তার গৌরীশঙ্কর মিত্র। দ্বারকানাথ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রসিদ্ধ ঔষধ-বিক্রেতা "ডি, গুপ্ত" নামে বঙ্গদেশে বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অংশীদার গৌরীশঙ্কর দেশের রাজনীতিক উন্নতিজনক কার্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

এই গৃহেই Bengal British India Society নামক বাঙ্গালার প্রথম রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে উহা জমিদার সভা (Land-holders' Society) নামক সভার সহিত সংযুক্ত হইয়া British Indian Association এ পরিণত হয়।

কলিকাতায় অবস্থিতিকালে মিষ্টার টমশন অনেক বক্তৃতায় এ দেশের লোককে দেশের ও দশের উন্নতিকর কার্য্যে অবহিত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রাজা যজ্ঞেশ্বর মিত্র মিষ্টার টমশনের কতকগুলি বক্তৃতা সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা এদেশে রাজনীতিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বুঝিতে চাহেন আমরা তাঁহাদিগকে বিলাতে ও ভারতে মিষ্টার টমশনের বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতে বলি।

মিষ্টার টমশনের উদ্যোগে বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী স্থাপনোপলক্ষে ফৌজদারী বালাখানা গৃহে যে সভাধিবেশন হয়, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাবের আলোচনাবকাশে যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নামের তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় বহু উৎসাহী বাঙ্গালী তাঁহার কার্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অনেকেই উত্তরকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং কৃতজ্ঞ দেশবাসীরা আজ তাঁহাদিগের কৃত কার্য্যের ফল সম্ভোগ করিবার সময় তাঁহাদিগের নাম কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করিতেছেন। এ দেশে রাজনীতিক আন্দোলনে তাঁহারা অগ্রণী। নীচে তাঁহাদিগের নাম প্রদত্ত হইল—

রামচন্দ্র মিত্র।	মধুসূদন সেন।	তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী।
চন্দ্রশেখর দেব।	রামলোচন ঘোষ।	শ্যামাচরণ সেন।
প্যারীচাঁদ মিত্র।		

মিষ্টার টমশন এই সভার সভাপতি ছিলেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখে এই সভার অধিবেশনে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার কয়দিন পূর্ব্বে (৬ই এপ্রিল তারিখে) ফৌজদারী বালাখানা গৃহে সাপ্তাহিক সভায় মিষ্টার টমশন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যাদি বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছিলেন।

যে রাজনীতিক আন্দোলন আজ নানা প্রদেশে নানা সভা সমিতির সাহায্যে দেশব্যাপী হইয়াছে—যাহা নানা খাতে প্রবাহিত স্রোতস্বতীর মত আজ দেশে সর্ব্বত্র নূতন ভাবের সঞ্চার করিয়াছে—যাহা জাতীয় কংগ্রেসে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, তাহা এই বঙ্গদেশেই প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল।

যে দিন ফৌজদারী বালাখানায় ডাক্তারখানার উপরের কক্ষে প্রথম ভারতীয় রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় সে দিন—তাহার দুর্ব্বল প্রারম্ভ লক্ষ্য করিয়া কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন, বিদেশ হইতে আনীত এই ভাব বাঙ্গলার দেশসেবকদিগের ত্যাগে ও চেষ্টায় দিন দিন পুষ্ট হইয়া অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে দেশে জাতীয়তার উদ্বোধন করিবে এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ জাতি মৃণ্ময়ী জননীকে চিন্ময়ীরূপে উপলব্ধি করিয়া মনে করিবে—দেশের জন্য প্রাণপাতও গৌরবের?

(ক্রমশঃ)

আর্থিক-প্রসঙ্গ

বিদেশী লবণের উপর অতিরিক্ত শুল্কের প্রস্তাব

বাঙ্গলায় তথা ভারতবর্ষে যে বিদেশী লবণ আমদানী হয়, তাহার উপর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের এক আইন অনুসারে মণপ্রতি সাড়ে চারি আনা হারে আমদানী-শুল্ক ধার্য্য আছে। এই শুল্ক-নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী লবণের প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় লবণ-শিল্পকে রক্ষা করা। আজ কয়েকমাস যাবৎ বিদেশী লবণের মূল্য-হ্রাসের ফলে ভারতীয় লবণ-কারখানার মালিকগণ বর্ত্তমান আমদানী-শুল্কের পরিমাণ মণপ্রতি ৵০ হারে বাড়াইয়া দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন জানাইতে থাকেন। ফলে গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান করিবার জন্য কলিকাতার 'কলেক্টর অফ্ কস্টম্‌স্'এর উপর তদন্ত-ভার ন্যস্ত করেন। বিগত ৯ই নবেম্বর তারিখ হইতে উক্ত অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে এবং কলিকাতার বিভিন্ন ব্যবসায়ীসঙ্ঘ 'কলেক্টর অফ্ কস্টম্‌স্' এর নিকট তাঁহাদের স্ব স্ব মতামত জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই মতামতগুলির বৈষম্য বর্ত্তমান শুল্ক-বৃদ্ধির প্রস্তাবকে বিশেষ সমস্যামূলক করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতার অবাঙ্গালী বণিকসঙ্ঘ 'ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ্ কমার্স' ও অধুনা-প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম্ চেম্বার অফ্ কমার্স' শুল্ক-বৃদ্ধির সমর্থন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য ভারতীয় লবণ-কারখানাগুলিকে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যই এই প্রকার মতপ্রকাশের কারণ। অপর পক্ষে 'বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ্ কমার্স' শুল্ক-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়াছেন। এই মতানৈক্যের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে বর্ত্তমান শুল্কের তাৎপর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করা দরকার। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যখন মূল শুল্ক ধার্য্য হইয়াছিল তখনও এই মতানৈক্য ঘটে। তখন কেবল 'বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্স'ই নহে,—বাঙ্গালার ব্যবস্থা-পরিষদও শুল্ক-নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ভারতীয় লবণ-শিল্পের সংস্থিতি ও লবণ-আমদানী-সংশ্লিষ্ট কতিপয় অসাধারণ অবস্থাই এই অশান্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। ভারতবর্ষে যে সকল লবণের কারখানা স্থানীয় অধিবাসীর চাহিদা মিটাইয়া অতিরিক্ত পরিমাণ রপ্তানি করিতে সক্ষম—তাহাদের অধিকাংশই পশ্চিম ভারতে বোম্বাই প্রদেশে অবস্থিত; অপর পক্ষে ভারতবর্ষে ব্রহ্মদেশ বাদ দিলে মুখ্যভাবে বাঙ্গালা প্রদেশই আমদানী লবণের উপর নির্ভরশীল। ফলে বিদেশী লবণের প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষণের প্রস্তাব কেবল বোম্বাই প্রদেশের কতিপয় কারখানার সংরক্ষণেরই সামিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়; কেবল তাহাই নহে, আমদানী-শুল্কনির্দ্ধারণের জন্য মূল্য-বৃদ্ধির গুরুভারও যে দেশবাসীকে ব্যাপকভাবে বহন করিতে হইবে না, মাত্র বাঙ্গালাদেশের জনসাধারণের উপরই যে তাহা মুখ্যভাবে আরোপিত হইবে,—তাহাও সম্যক্ প্রকটিত হয়—অর্থাৎ বিদেশী লবণের উপর শুল্ক ধার্য্য করিয়া দিলে বোম্বায়ের লবণ-কারখানার মালিকরাই লাভবান হইবে, আর তাহার জন্য যাবতীয় ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে বাঙ্গালার অধিবাসীকে—ইহা নিঃসংশয়ে স্বীকৃত হয়। বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ এই প্রকার শুল্ক-ব্যবস্থাকে নিতান্ত অন্যায় সাব্যস্ত করেন এবং মণপ্রতি সাড়ে চারি আনা শুল্ক নির্দ্ধারণ করিলে যে বাঙ্গালার অধিবাসীকে প্রতি বৎসর চড়া দরের দরুণ অন্যূন ৩৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহাদের ঘোরতর আপত্তির ফলে স্বল্পকাল পরেই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থ-সচিব স্যর জর্জ্জ সুষ্টার কর্ত্তৃক আনীত এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বিদেশী আমদানী লবণের উপর ধার্য্য শুল্কের আদায় হইতে অষ্টমাংশের সাত ভাগই যে-সকল প্রদেশের অধিবাসীগণকে উক্ত শুল্কের ভার বহন করিতে হইবে, তথাকার গভর্ণমেণ্টকে স্থানীয় লবণ শিল্পের উন্নতিকল্পে প্রদান করা হইবে।—অর্থাৎ এই ব্যবস্থাকে শুল্ক-নির্দ্ধারণের আংশিক ক্ষতিপূরক ব্যবস্থা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মণপ্রতি সাড়ে চারি আনা শুল্ক আপাতঃ-পক্ষে বৎসরকাল স্থায়ী বলিয়া ধার্য্য করা হয়। তৎপর বর্ত্তমান বৎসরের প্রারম্ভে ইহার মেয়াদ আরও এক বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যে ভারত গভর্ণমেণ্টের লবণ-বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী বাঙ্গালা, বিহার,

উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে গবেষণা-অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে বাঙ্গালাদেশে লবণ-শিল্প কারখানা-ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানরূপে লাভজনক হওয়া সম্বন্ধে আশ্বস্ত হওয়া কঠিন। স্থানীয় গভর্ণমেণ্টও এ পর্য্যন্ত উক্ত বিষয়ে কোনপ্রকার প্রচেষ্টা করেন নাই। অর্থাৎ যে ক্ষতি-পূরক ব্যবস্থা পূর্ব্বতন শুল্ক নির্দ্ধারণের একমাত্র সমর্থন-যোগ্য কারণ ছিল, তাহাও এ পর্য্যন্ত ফলবতী হয় নাই। এমতাবস্থায় বাঙ্গালার অধিবাসীর পক্ষ হইতে যে বর্ত্তমান শুল্ক-বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিবে তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার।

কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান চেম্বার ও মুসলিম চেম্বার যে কারণেই উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করুন না কেন—তাঁহারা যে বাঙ্গালার অধিবাসীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই স্বীকৃত হইবে না। প্রশ্ন উঠিবে; শুল্ক-বৃদ্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে ভারতীয় লবণ-শিল্প রক্ষা পাইবে কি করিয়া? কোন ভারতীয়ের পক্ষে এই সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা সমীচীন হইতে পারে কি? আমরা এ প্রশ্নের গুরুত্ব উপলব্ধি করি এবং এ বিষয়ে 'বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার' যে বিকল্প প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করি। উক্ত চেম্বারের মত এই যে, জাতীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া শিল্প-বিশেষকে রক্ষা করিতে হইলে সমগ্র জাতিকেই তাহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। কোনও বিশেষ প্রদেশের উপর এই ত্যাগের গুরুভার ন্যস্ত করিয়া দেওয়া সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না,—বিশেষ যে প্রদেশ প্রস্তাবিত শিল্প-প্রসারণের দ্বারা পরোক্ষ-ভাবেও লাভবান হইবে না। এই যুক্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার প্রস্তাব করিয়াছেন যে পশ্চিম ভারতের যে সকল লবণ-কারখানাকে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন বলিয়া সাব্যস্ত করা হইবে, তাহাদিগকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের রাজস্বের আদায় হইতে ক্ষতি-পূরক ভাতা দেওয়া হউক.—তাহা হইলে কারখানগুলি রক্ষা পাইবে এবং তজ্জন্য ভারতীর করদাতা মাত্রকেই ত্যাগ-স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত চেম্বার এই প্রকার ভাতার পরিমাণ বাৎসরিক মাত্র ৭ লক্ষ টাকা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ-আকৃষ্ট হইয়াছে। বিগত ২রা ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে ফাইন্যান্স মেম্বর মিঃ উড্‌হেড্ বলিয়াছেন যে, ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে লবণ আমদানী শুল্কের আদায় হইতে বাঙ্গালার সরকার যে বখরা পাইয়াছেন তাহার পরিমাণ হইয়াছে ৫,৬৬,৬০০৲ টাকা;—বর্ত্তমান বৎসরে (১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দ) এপ্রিল মাস হইতে সেপ্টেম্বর অবধি এই প্রকার শুল্ক-বণ্টনের পরিমাণ হইয়াছে ৩,৫৯,১০০৲ টাকা। এই টাকার সমষ্টি-পরিমাণই নাকি বাঙ্গালা সরকারের সাধারণের রাজস্ব আদায়ে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। আমরা এই ব্যবস্থাকে নিতান্ত আপত্তিজনক বলিয়া মনে করি। যে উদ্দেশ্যে উক্ত প্রকার শুল্ক বণ্টন-ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল—তাহাতে এই ব্যবস্থা বাঙ্গালার অধিবাসীর মনে বিশেষ ক্ষোভের সৃষ্টি করিবে। আমরা আশা করি স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ তাঁহাদের সাধারণ রাজস্ব আদায় হইতে পৃথক করিয়া রাখিবেন, এবং তৎসাহায্যে অনতিকালমধ্যেই বাঙ্গালায় লবণ-শিল্প পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় অবহিত হইবেন। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী যে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন আমরা তাহা বিশেষ প্রমাণসাপেক্ষ বলিয়া মনে করি। বাঙ্গালায় বিগত শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্তও যেরূপ লবণ-শিল্পের প্রসার এবং খ্যাতি ছিল, তাহাতে উক্ত কর্ম্মচারীর অভিমতকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না।

অটোয়া-চুক্তির প্রগতি

অটোয়া বৈঠকে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি-বর্গ যে চুক্তি-পত্র স্বীকার করিয়াছেন তাহার বিস্তারিত পরিচয় আমরা আশ্বিন সংখ্যায় দিয়াছি। বিগত নবেম্বর মাসের প্রথম ভাগে এই চুক্তির সমর্থন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইলে, এ বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য পরিষদ কর্ত্তৃক এক কমিটি সংগঠিত হয়। উক্ত কমিটি নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি ভারতীয় ব্যবসায়-সঙ্ঘগুলির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে 'ফেডারেশ্যন অফ্ চেম্বার্স'এর প্রতিনিধি এমঃ সি, এন, ভোকিল কলিকাতার 'বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্স'এর প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার প্রভৃতি কতিপয়

বিশেষজ্ঞগণের নিকট হইতে মতামত গ্রহণ করেন। ইহাঁরা সকলেই অটোয়া-চুক্তি গ্রহণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান শতাব্দীতে ক্রমাগত বৃটিশ-সাম্রাজ্যের বহির্ভূক্ত দেশগুলির সহিতই বিস্তৃতভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে—এমতাবস্থায় ইংলণ্ড তথা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত দেশগুলিকে পক্ষপাতমূলক সুবিধা দিলে—ভারতবর্ষের সমগ্র বহির্ব্বাণিজ্যেই বিপর্য্যয় ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে—এই সমস্যার দিকে তাঁহারা মুখ্যভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তারপর ইংলণ্ডের নিকট হইতে যে বৈষম্য-মূলক ব্যবহার পাইবার চুক্তি হইয়াছে তাহা যে ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হইবে না—বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত দেশগুলির প্রতিযোগিতাই যে কোন প্রকার সুবিধা পাইবার পক্ষে অন্তরায়ের সৃষ্টি করিবে, তাহার প্রতিও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল যুক্তি এবং আপত্তি উপেক্ষা করিয়া ব্যবস্থা-পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কমিটির অধিকাংশ মেম্বর অটোয়া-চুক্তি গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন—তবে আপাতঃপক্ষে উক্ত প্রস্তাব তিন বৎসরের জন্য গৃহীত হউক, এইরূপ অভিমত তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী সংবাদ এই যে অটোয়া-চুক্তির প্রস্তাব ব্যবস্থা-পরিষদ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।

ব্যবস্থা-পরিষদের কমিটির এই মীমাংসার কোন তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা কঠিন। অটোয়া-চুক্তি গ্রহণ করা ভারতবর্ষের পক্ষে যদি অমঙ্গল-জনক বলিয়াই সাব্যস্ত করিতে হয়, তাহা হইলে তিন বৎসর কাল পরেই ইহা রদ করিয়া দেওয়া সহজ-সাধ্য হইবে কি? আর এই চুক্তিগ্রহণের ফলে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যে যে বিপর্য্যয় ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা করিতে হয় তাহার পক্ষে তিন বৎসর কালই যথেষ্ট নয় কি? অতঃপর ভারতবর্ষের বৃটিশ-সাম্রাজ্যের বাহিরের খরিদ্দারগণ এই দেশের প্রতি বিমুখ হইয়া দেশান্তরে পণ্যদ্রব্যাদি আমদানী-রপ্তানীর কার্য্যে অধিকতর মনোযোগী হইলে যে সকল নূতন বাণিজ্যসম্বন্ধ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, তাহাতে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের পক্ষে পূর্ব্বতন বাণিজ্য-সম্বন্ধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ব্যর্থ হইবে বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে হয়।

যাঁহারা এখনও অটোয়া-চুক্তির সহায়তায় দেশের মন্দীভূত ব্যবসাবাণিজ্যে কৃত্রিম উত্তেজনা ও প্রাণবেগ সঞ্চার করিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা বর্ত্তমান জগতের ব্যবসা-শিল্পের প্রগতি সম্বন্ধে আরও সচেতন হইতে অনুরোধ করি। এ বিষয়ে আন্তর্জ্জাতিক ধনবিজ্ঞান জগতে মনীষী মিঃ আর্থার সল্টার ইদানিং 'পলিটিক্যাল কোয়ার্টার্লি' (অক্টোবর সংখ্যা)তে এক প্রবন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার দিকে আমরা জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত প্রবন্ধে মিঃ সল্টার অটোয়া-চুক্তি সম্বন্ধে বিশেষ নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই প্রকার কৃত্রিম ব্যবসা-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে বিঘ্নসৃষ্টি করিয়া বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী মন্দীভূত ব্যবসা শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের পক্ষে প্রতিকূলতাই করিতে থাকিবে। শিল্প বাণিজ্যের পুনরুত্থানের জন্য প্রয়োজন দেশে দেশে পণ্য দ্রব্যের আদান-প্রদান সহজ করিয়া দেওয়া। অটোয়া চুক্তি ইহার বিপরীতগামী পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। ভারতবর্ষের বাণিজ্য-শিল্পের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে একবার এই সমস্যার দিকে দৃষ্টিক্ষেপও করিলেন না দেখিয়া আশঙ্কান্বিত হইতেছি।

বাঙ্গলার ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটির রিপোর্ট

বিগত ১১ই নবেম্বর বঙ্গীয় ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত কমিটি যে সকল প্রস্তাব করিয়াছে, তাহা ষোল আনা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে বাঙ্গালা সরকারের ব্যয় ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা পর্য্যন্ত কমাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটির প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই (১) বাঙ্গলার গভর্ণরের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার দুইজন সদস্যের সংখ্যা কমাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে প্রতি মাসে ৮ হাজার টাকা অর্থাৎ বৎসরে ৯৬ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ব্যয়-সঙ্কোচ করা সম্ভব হইবে। (২) বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের প্রেসিডেণ্টের বেতন প্রতি মাসে পাঁচশত টাকা কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে; ডেপুটি প্রেসিডেণ্টের পদ অবৈতনিক করিয়া দিবার ব্যবস্থাও প্রস্তাবিত হইয়াছে। (৩) বর্ত্তমান পাঁচজন 'ডিভিশনাল কমিশনার'এর স্থলে

মাত্র তিনজন থাকিবে ; অপর দুইটি পদ বিলোপ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। (৪) সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা 'জুনিয়র', তাঁহাদের বেতন প্রথমাবস্থায় মাসিক ৩৭৫৲ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধসংখ্যায় ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জন্য পৃথক ভাতার ব্যবস্থা রাখিলেই চলিতে পারে। (৫) বঙ্গীয় পুলিশ বিভাগ ও কলিকাতার পুলিশ বিভাগ, উভয়ের মধ্যে কতিপয় উচ্চতম কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া আবশ্যক ; ইহাতে প্রতিবৎসর কিঞ্চিদধিক ১১ লক্ষ টাকা বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকিবে। (৬) কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকার বরাদ্দ হইতে শতকরা ৫৲ টাকা কমাইতে হইবে। (৭) গবর্ণমেন্টের সাধারণ শাসন-ব্যয় হইতেও বাৎসরিক প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা কমাইয়া দেওয়া সম্ভব। এজন্য কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে জজিয়তি করিবার জন্য কোন সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী নিয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই। জেলা আদালতের জন্য আংশিকভাবে আইন-ব্যবসায়ীদের মধ্য হইতেও আংশিক ভাবে সব-জজগণের মধ্য হইতে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া মাসিক ১০০০৲ টাকা হইতে ১৬০০৲ টাকা বেতনে সেসন্স জজের পদে বহাল করা যাইতে পারে। 'জুডিসিয়াল' বিভাগ হইতে সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমাইয়া দিলে শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমান ১০১ জন সিভিলিয়ান পদস্থ উচ্চতম কর্ম্মচারীর মধ্যে কেবল এই কারণেই ৪৬ জনের আর স্থায়ীভাবে কোন প্রয়োজন থাকিবে না। বাকী ৫৫টি সিভিলিয়ান পদস্থ 'এক্‌সিকিউটিভ' বিভাগের কর্ম্মচারীর মধ্য হইতে ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটি দুইজন ডিভিশ্যনাল কমিশনার, দুইজন সেক্রেটারী ও দুইজন সেটেলমেণ্ট-অফিসারের পদ তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন ও এই সকল পদের জন্য বর্ত্তমান ৮ জনের স্থলে ১০ জন 'লিষ্টেড্' অফিসার অর্থাৎ প্রভিন্সিয়াল গ্রেড্ হইতে উন্নীত কর্ম্মচারীর নিয়োগ-ব্যবস্থা করিবার জন্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভিন্সিয়াল গ্রেডে বর্ত্তমানে পূর্ব্বোক্ত 'লিষ্টেড' অফিসর বাদে ৩৬২ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে। ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটি তাহা ক্রমশঃ দুইশত হওয়া উচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও ইহাদের বেতন ২০০৲ হইতে ৭৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত স্থির করিয়া দিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। সব-ডেপুটিদিগের বেতন না কমাইয়া তাহাদের সংখ্যা মোট ২০১ হইতে অর্দ্ধ-সংখ্যায় নামাইয়া আনিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। 'জুডিসিয়াল' বিভাগের নিম্নতম স্তরের জন্য ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটি মাসিক ৭৫৲ হইতে ২৫০৲ টাকা মাহিনায় সহকারী মুন্সেফ নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তবে ইহাদের মোট সংখ্যা পঁচাত্তরের বেশী হওয়া উচিত নয় বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই হিসাবে স্থায়ী মুন্সেফের মোট সংখ্যা বর্ত্তমান তিন শতর স্থলে দুইশত পঁচিশ হইবে। অতঃপর সহকারী মুন্সেফগণই যাহাতে কার্য্যে উন্নতিলাভ করিয়া মুন্সেফ নিযুক্ত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় সমুদয় 'জুডিসিয়াল' বিভাগের কর্ম্মচারীরই বেতন কমাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটি মুন্সেফদিগের বেতন মাসিক ২৭৫৲ হইতে ৬০৮৲ ও সব-জজদিগের বেতন ৬৫০৲ হইতে ৮০০৲ হওয়া উচিত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটি ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য আরও বিবিধ প্রস্তাব করিয়াছেন। যে যে দফায় তাঁহারা ব্যয়-সঙ্কোচের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার মধ্যে কতকগুলির টাকার পরিমাণ সহ নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে :—

		ব্যয়-সঙ্কোচ পরিমাণ
দেওয়ানী বিভাগ	...	২,১২,৪০০৲
এক্‌সাইজ	...	১,৮৮,৯০০৲
বন-রক্ষণ বিভাগ	...	২,৭১,৬০০৲
রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ	...	৬,৯৩,৪০০৲
জল-সেচ	...	৪,৫৮,৫০০৲
সাধারণ শাসন-ব্যয়	...	১৭,৬৯,৫০০৲
বিচার-ব্যবস্থা	...	৬,৯৭,৯০০৲
জেল বিভাগ	...	৬৪,৫০০৲
পুলিশ	...	১১,১২,০০০৲
শিল্প-বিভাগ	...	৯,১৪,০০০৲
চিকিৎসা-বিভাগ	...	৫,৩৭,৪০০৲
স্বাস্থ্য-বিভাগ	...	১,৭৪,৪০০৲
কৃষি-বিভাগ	...	৬,২৬,৯০০৲
শিল্প-বিভাগ	...	১,৮৮,২০০৲
বাণিজ্য-বিভাগ	...	৫৬,৩০০৲
পাবলিক ওয়ার্কস	...	২৪,৩৭,২০০৲

ইত্যাদি ক্রয় ও মুদ্রণের ব্যয়	১,৯৫,৩০০৲
বিবিধ কর্ম্মচারীর বেতনহ্রাস	৪৮,০০,০০০৲
অসাধারণ বেতনের হ্রাস	২,১০,৭০০৲
পরিভ্রমণের ভাতা	৬,৮০,০০০৲
হিসাবের বহির্ভূত ব্যয়	৭,০০,০০০৲
অবকাশ গ্রহণ সহায়ক অতিরিক্ত কর্ম্মচারীর ব্যয়	৯,০০,০০০৲
বিবিধ ব্যয়	১,০৮,৯০০৲
মোট	১,৮৪,৯৬,০০০৲

ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটির নির্দ্ধারিত ব্যয়সংক্ষেপের মোট পরিমাণ নিরর্থক নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে ফেডারেল ফাইন্যান্স কমিটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে রাজস্ব-সংস্থান বিষয়ে যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহাতে আসন্ন রাষ্ট্র-সংস্কারের পর বাঙ্গালীর সরকারের প্রতি বৎসর দুই কোটি টাকা বজেট ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, বিগত বৎসরেও বাজার মন্দা প্রভৃতি কারণে বাঙ্গলার সরকারের আয় অপেক্ষা দুই কোটি টাকা ব্যয়াধিক্য হইয়াছে। এই সকল কারণে বাঙ্গালীর আয়-ব্যয় সংস্থানের সাময়িক বা স্থায়ী যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্যই হউক না কেন, প্রস্তাবিত ব্যয়-সঙ্কোচের মোট পরিমাণ কমিটির বিচক্ষণতারই পরিচয় দিবে। কিন্তু এইদিকে লক্ষ্য রাখিলেও উক্ত কমিটি সর্ব্বপ্রকারে যথোপযুক্ত প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান কমিটি অকারণে তিনজন ডিভিশ্যনাল কমিশনরের পদ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন; তারপর গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের সেক্রেটারীর সংখ্যাও যথেষ্টরূপে কমাইয়া দিবার প্রস্তাব তাঁহারা করেন নাই। তুলনামূলকভাবে পুলিশ বিভাগে ব্যয়-সঙ্কোচের পরিমাণও সামান্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। এই সকল বিভাগের ব্যয় যথেষ্টরূপে কমাইয়া দিবার জন্য ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটি বিস্তারিত প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহা কার্য্যতঃ গ্রহণ করেন নাই। গভর্ণমেণ্ট তখন এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া থাকিলেও বর্ত্তমান কমিটির এ বিষয়ে ইতস্ততঃ করিয়া যথার্থ পথে অগ্রসর না হইয়া মধ্যপথ অবলম্বন করা উচিত হয় নাই। ইঁহারা যদি নিঃসংশয়ে অনাবশ্যক সকল প্রকার ব্যয়ের বিরুদ্ধবাদ করিয়া কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পদ গঠনমূলক বিভাগগুলিকে রেহাই দিতে চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে ইঁহাদের প্রস্তাবগুলি সর্ব্বতোভাবে সমর্থন-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

সেণ্ট এণ্ড্রুজ ভোজে গভর্ণরের বক্তৃতা

বাঙ্গলায় রাজনৈতিক অবস্থার হেতুনির্দ্দেশ ও সে সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নির্ণয়ে গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের মত বৈষম্য থাকিলেও বাঙ্গালার রাজস্ব-সংস্থানের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে অন্ততঃ বাঙ্গালার অধিবাসীর ও গভর্ণমেণ্টের কোন প্রকার মতভেদ নাই। বিগত ৩০শে নবেম্বর সেণ্ট এণ্ড্রুজ ভোজ সভায় বাঙ্গালার গভর্ণর স্যরজন এণ্ডারসন এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে বাঙ্গালার সরকারের আর্থিক সংস্থানের যথোচিত উন্নতি সাধন করিতে হইলে পাট-রপ্তানী-শুল্কের আদায় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই শুল্কের হস্তান্তর যে কেবল বাঙ্গালার সরকারের আর্থিক আনুকূল্যের জন্যই প্রয়োজন এমন নহে; ন্যায্যতা অনায্যতার তুলাদণ্ডে যাচাই করিলেও উক্ত শুল্কের আদায় বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্টেরই প্রাপ্য হওয়া উচিত—স্যর জন্ এণ্ডারসন এ বিষয়ে স্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন। পাট-রপ্তানী শুল্ক বাঙ্গালার সরকারের হস্তে ছাড়িয়া দিবার বিরুদ্ধে যাঁহারা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের যুক্তি এই যে এরূপ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের যে আর্থিক হানি অবশ্যম্ভাবী হইবে তাহার ক্ষতি-পূরণের দায় সাক্ষাৎ ভাবেই হউক বা পরোক্ষ ভাবেই হউক, ভারতীয় সকল প্রদেশকেই বহন করিতে হইবে। পাটরপ্তানী শুল্ক বেহাত হইবার জন্য বাঙ্গালার সরকারের আর্থিক দুর্দ্দশার কথা উঠিলে ইঁহারা বলিয়া থাকেন যে বাঙ্গালার দুর্দ্দশা আত্ম-কৃত ব্যাধির সামিল, ভূ-সত্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ করিয়া দিয়া জমির রাজস্ব যথা-সম্ভব বাড়াইয়া দিলেই বাঙ্গালার সরকার তাহার অর্থাভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে। স্যর জন এণ্ডারসন এই প্রকার সমালোচনার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি যে যুক্তি দিয়াছেন তাহার মর্ম্ম নিম্নরূপ। বাঙ্গালার ভূ-সত্বের বন্দোবস্তের জন্য বাঙ্গালার সরকার দায়ী নহে। সে যাহা হউক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ করিয়া দিয়া যদি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট জমির খাজনা যথা

সম্ভব বাড়াইয়া দিতেন।' তাহা হইলে বর্ত্তমান রপ্তানী-শুল্কের আদায় সমর্থনযোগ্য হইতে পারিত কি ? সে কথা বাদ দিলেও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের পক্ষে বাঙ্গালার কৃষির উপর অতিরিক্ত শুল্কের বোঝা চাপাইয়া দিবার সমর্থনযোগ্য কি যুক্তি থাকিতে পারে ?—বিশেষ এই প্রকার শুল্কের আদায় যখন বাঙ্গালার কোন প্রকার সহায়তা করিবার জন্য নিয়োজিত হয় না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আর্থিক আনুকূল্যের জন্য বাঙ্গালার উপর অন্যায় ভার ন্যস্ত করিয়া দিবার পক্ষে কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। পাটরপ্তানী-শুল্কের উপর কেন্দ্রীয় বা অপর কোন প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের কোন দাবী থাকিতে পারে না। তাহাদের স্ব স্ব আর্থিক অনটন এ বিষয়ে কোন অলীক অধিকার প্রতিষ্ঠার হেতু হইতে পারে না। ব্যক্তিমাত্রকে যখন দারিদ্র্যের অজুহাতে পরস্ব গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয় না, তখন বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের পরস্পর অধিকার সম্বন্ধে ভিন্ন ব্যবস্থা ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে কেন? কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টও বর্ত্তমান রাজস্ব-বিজ্ঞানের স্থূল-নীতি অনুসারে আমদানী-শুল্ক দাবী করিতে পারেন, কিন্তু রপ্তানী শুল্ক বিষয়ে তাঁহাদিগকে অনুরূপ অধিকার দেওয়া কোন ধন-বিজ্ঞান-বিশারদই সমর্থন করিবেন না।

আমরা স্যর জন এণ্ডারসনের এই স্পষ্টবাদিতার প্রশংসা করি। বাঙ্গালার রাজস্ব-সংস্থানের সমস্যা সু-মীমাংসিত না হইলে রাষ্ট্র-সংস্কারেও বাঙ্গালার যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি সাধন করা সুদূরপরাহতই থাকিবে। কেবল মাত্র ব্যয়-সঙ্কোচের দ্বারাই বাঙ্গালার আর্থিক দুর্গতি অপসারিত হইবে না, এ সম্বন্ধে সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটি স্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন। নূতন প্রকার ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করিবার পথও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। তাহাতে বাঙ্গালার দরিদ্র অধিবাসীগণের উপর আরও অসহনীয় গুরুভার চাপাইয়া দিবার ফলে অকল্যাণই সাধিত হইবে। একমাত্র পাটরপ্তানী-শুল্কের আদায় বাঙ্গালার হাতে ছাড়িয়া দিলেই বাঙ্গালার আর্থিক সমস্যা অনেক পরিমাণে সমাধান করা যাইতে পারে। এই শুল্কের পরিমাণ প্রায় ৪ কোটি টাকা হইবে। বাঙ্গালার সরকারের বর্ত্তমান রাজস্ব আদায়ের মোট কিঞ্চিদধিক ৯ কোটি টাকার সহিত তুলনা করিলে পাটরপ্তানী-শুল্কের হস্তান্তরের গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে। বাঙ্গালা প্রদেশকে তাহার এই ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার ফলেই বাঙ্গালার অধিবাসী চরম দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছে! ভবিষ্যতেও এই শুল্কের আদায় বাঙ্গালার সরকারকে প্রদান না করিলে, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট অনেক বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকিতে বাধ্য থাকিবে; রাষ্ট্র-সংস্কারেও এ বিষয়ে সহায়তা করিতে পারিবে না। স্যর জন এণ্ডারসন আসন্ন রাষ্ট্র-সংস্কারের অব্যবহিতপূর্ব্বে এ বিষয়ে পুনরায় মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বিচক্ষণতার কার্য্য করিয়াছেন।
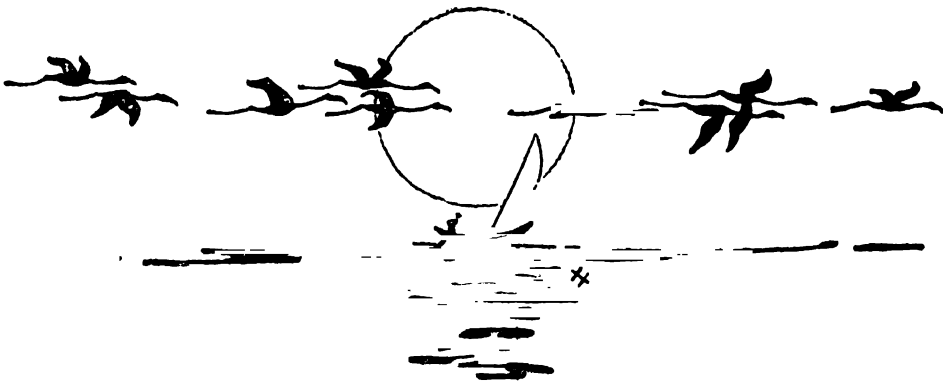
বাংলার অন্ন-সমস্যা

—শ্রীকুলেন্দ্রচন্দ্র পাল

বাংলার বেকার সমস্যা আজ গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়েরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে কেহই যথেষ্ট সচেতন হইয়াছেন ইহা কিছুতেই বলা যায় না। আমাদেরই দেশের দৈনিক ও সাময়িক ইংরেজী ও বাংলা কাগজে নিজেদের দেশের এ সমস্যার আলোচনা ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের বেকার সমস্যার তুলনায় কতই অকিঞ্চিৎকর! অবশ্য ইহার যথেষ্ট কারণও আছে। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোন উন্নত দেশের গভর্ণমেণ্টই শুধু শান্তি ও শৃঙ্খলার বন্দোবস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না, তাহাকে জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভরণপোষণ প্রভৃতির জন্যও দায়ী থাকিতে হয়। এই দায়িত্ব সম্বন্ধে যাহাতে গভর্ণমেণ্টের কোনরূপ শৈথিল্য বা ত্রুটি বিচ্যুতি না ঘটিতে পারে তার জন্য জনমত সর্ব্বদাই সভা সমিতিতে ও সংবাদ পত্রের মারফতে নিজেকে ব্যক্ত করে এবং গভর্ণমেণ্টকেও নিয়মিত ভাবে নিজেদের কাজের হিসাব প্রদান করিয়া তাহাকে শান্ত রাখিতে হয়। কাজেই এই সব দেশের গভর্ণমেণ্ট বেকার সংখ্যার সাপ্তাহিক হিসাব করে এবং সে সংখ্যার বাড়তি ও কমতি তাহাদের পক্ষে যথাক্রমে গৌরব ও অগৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। বলা বাহুল্য এ দেশে এ সব ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের আইনতঃ কোন প্রকার দায়িত্বই নাই। ফলে বিলাতে বেকার শ্রমিক তাহার নির্দ্দিষ্ট বরাদ্দে সামান্য মাত্র হাত পড়িলেও পার্লামেণ্ট ও খবরের কাগজে প্রতিবাদের ঝড় বহাইয়া প্রতিকারের আশা করে; এ দেশে শিক্ষিত যুবক অনাহারের তীব্র পীড়নে আত্মহত্যা করে তবু প্রতিকারের কথা মনেও আনে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ডিগ্রীধারী ৩০।৩৫ টাকার কাজের জন্যও লালায়িত এ কথা আমাদের নিকট প্রবাদ বাক্যেরই মত হইয়া সহিয়া গিয়াছে। ৩৫৲ টাকার একটি কেরাণীর পদের জন্য তিন জন প্রথম শ্রেণীর এম-এ আর অসংখ্য বি-এ, এম-এর সঙ্গে প্রতিযোগী পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছে এমন কথা শুনিয়াও আজ আমরা বিস্মিত হই না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এম-এ, আইন বা বি-এ ক্লাশে ছাত্রের অভাব নাই। কলেজের বেতন এবং পরীক্ষার দাক্ষিণা কোন প্রকারে সংগ্রহ করিতে পারে এমন কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয় ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়।

এ বিস্ময়কর অবস্থার জন্য দায়ী অনেক কিছুই—কিন্তু আমরা এখানে প্রধানতঃ আমাদের নিজেদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের আলোচনাই করিব। এ কথা আজ একরূপ সর্ব্ব-স্বীকৃত সত্য যে আমাদের এই অসহায় অবস্থার জন্য দায়ী প্রধানতঃ আমাদের চাকরীর মোহ। কিন্তু এ কথা বলিলেই যথেষ্ট বলা হইল না এবং এই চাকরীর মোহও একদিনে সৃষ্ট হয় নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে ভারতের বর্ত্তমান পরাধীনতার সূত্রপাত হয় বঙ্গদেশে। তার ফলে প্রথমে ইংরেজ সংস্পর্শে আসিয়া ও ইংরেজী শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া সর্ব্ব বিষয়েই বাঙ্গালী ইংরেজের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠিল। এ সময়ে সামান্য মাত্র ইংরেজী জ্ঞানও ভারতীয়দের পক্ষে কতদূর লাভজনক ব্যাপার ছিল তাহা তদানীন্তন ইতিহাস যাঁহারা সামান্য মাত্র আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। এই ইংরেজী জ্ঞানের ফলে কি রাজকার্য্যে কি ব্যবসায়ের সহকারীরূপে সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি অতি মাত্রায় বাড়িয়া গেল। বাঙ্গালী শিক্ষক, বাঙ্গালী ডাক্তার, বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার, বাঙ্গালী ব্যবহারজীবী ও বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী ক্রমে ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল; বাঙ্গালীর মেধা, বাঙ্গালীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বাঙ্গালীর মনীষা সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। বাঙ্গলায় ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ইহাই গোড়ার ইতিহাস।

এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাঙ্গালীর সে এক গৌরবের যুগই গিয়াছে। কিন্তু একথাও অতি কঠোর সত্য যে এই গৌরবের যুগেই বাঙ্গালী-চরিত্রের এক প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতারও ভিত্তিস্থাপন হইয়াছিল। অল্পায়াসলভ্য চাকুরীর সহজ নিশ্চিন্ত জীবনের লোভে বাঙ্গালী সেদিন যে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের স্বাধীন জীবনযাত্রার বন্ধুর পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারই বিষময় ফল আজ আমরা আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক অসহায় অবস্থায় ভোগ করিতেছি। অবশ্য সেদিন যেসব বাঙ্গালী চাকুরীর দিকে ঝুঁকিয়াছিল তাহারা

প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তাহাদের অনেকেরই ব্যবসায় বাণিজ্যে নামিবার মত আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। কাজেই তাহারা যে চাকুরীর নিরাপদ পথ অবলম্বন করিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। সব দেশেই সাধারণতঃ ধনীরাই শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রণী হইয়া থাকে। এদেশেও তাহারাই এ কাজ গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু বাঙ্গলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (permanent settlement) সেই দিকেই তাহার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ আকর্ষণ করিল। ফলে যে-অর্থ শিল্প-বাণিজ্যে নিয়োজিত হইয়া দেশের সমৃদ্ধি বাড়াইতে পারিত তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া নিযুক্ত রহিল জমিদারীর মুনাফা অর্জ্জনে। সুতরাং বাঙ্গালীর মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেদিন বুদ্ধি ও মনীষার ক্ষেত্রে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিল, সেদিনই তাহার ধনীদের অবহেলার সুযোগে ইংরেজ, মাড়োয়ারী প্রভৃতি দেশী ও বিদেশী অবাঙ্গালী ব্যবসায়িগণ বাঙ্গলার ব্যবসায়ক্ষেত্রে নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করিয়া কায়েমী হইয়া বসিল। এদিকে ইংরেজী শিক্ষা বেশী দিন বাঙ্গলার চতুঃসীমানায় আবদ্ধ থাকে নাই। ফলে চাকুরীর বাজার শীঘ্রই বাঙ্গালীর নিকট সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। আজ ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেরই দ্বার বাঙ্গালী চাকুরীজীবীর নিকট রুদ্ধ এবং স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের ক্ষেত্রও কি বাঙ্গলায় কি অন্যান্য প্রদেশে সর্ব্বত্রই অবাঙ্গালীর করায়ত্ব। এ অবস্থায় এত বুদ্ধি এত বিদ্যা লইয়াও যে বাঙ্গালী উপবাস করিবে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি আছে?

এইত গেল সাধারণ অবস্থার কথা। বর্ত্তমান ব্যবসায়-মন্দা এ সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে প্রধানতঃ তিন দিক দিয়া বাঙ্গালীর জীবিকার পথ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে:—

(১) প্রথমতঃ ইহার ফলে বাঙ্গালী কৃষকের আয় ভয়ানক ভাবে কমিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার প্রধান সম্বল পাট। তাহার মূল্য আজ উৎপাদন-ব্যয়েরও সমান নয়। ইহাতে যে বাঙ্গলার কৃষককুলই শুধু নিঃস্ব হইয়াছে তাহা নয়, সেই সঙ্গে বাঙ্গলার তালুকদার, জমিদার, মহাজন, ডাক্তার, উকিল এবং শিক্ষকও সর্ব্বনাশের পথে চলিয়াছে।

(২) দ্বিতীয়তঃ ইহার ফলে গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিশেষ ভাবে কমিয়া যাওয়ায় তাহাকে নানা দিক দিয়া ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইতেছে। বলা বাহুল্য ইহার ফলে অসংখ্য বাঙ্গালী সরকারী কর্ম্মচারীর কাজ যাইবে এবং তাহাতে বাঙ্গলায় চাকুরীর বাজার আরও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে। তাহার উপর দেশী ও বিদেশী বহু বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং রেল-কোম্পানী প্রভৃতির ব্যয়সঙ্কোচের ফলে পূর্ব্ব হইতেই এদিক দিয়া সমস্যা জটিল হইয়াই আছে।

(৩) তৃতীয়তঃ ব্যবসায়-বাণিজ্যের এই দুরবস্থা ও অনিশ্চয়তার সময়ে বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের পথে নূতন করিয়া অবতীর্ণ হওয়াও সহজসাধ্য হইবে না।

বাঙ্গলায় আজ যাঁহারা বেকারসমস্যার সমাধান করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে এই সমস্যাকে সমগ্রভাবে অনুধাবন করিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সমস্যা যে সহজ নয় তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা কোন শ্রেণীবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়,—আজ থাকিলেও বেশীদিন থাকিবে না—ইহা সমগ্র বাঙ্গালীজাতীরই সমস্যা এবং বাঙ্গালীর সমস্ত জাতীয় শক্তির প্রয়োগেই শুধু ইহার সমাধান সম্ভবপর।

সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণের উপরে যে সামান্য চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যাইবে কোন্ কোন্ দিক দিয়া ইহাকে আক্রমণ করিতে হইবে। বাঙ্গালার প্রধান উপজীবিকা কৃষি—এই কৃষি ও কৃষকের সমৃদ্ধির উপরই বাঙ্গালীর জাতীয় সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সুতরাং বর্ত্তমান দুর্য্যোগে বাঙ্গালীকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে প্রথমতঃ বাঙ্গলার কৃষককে বাঁচাইতে হইবে। বাঙ্গলার কৃষকের আয়, ব্যয়, ঋণ ও করভারের ইতিহাসের সঙ্গে সামান্যমাত্র যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন এ সমস্যা কত দুরূহ এবং বর্ত্তমান ব্যবসায়-মন্দা তাহাকে কি ভাবে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ঠিক সেইজন্যই আজ সমস্ত জাতীয় শক্তি ইহার সমাধানে কেন্দ্রীভূত করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলার কৃষকের সমস্যা প্রধানতঃ তিনটি—তাহার অতি সামান্য আয়, তাহার গুরুভার কর এবং তাহার পর্ব্বতপ্রমাণ ঋণ। তাহাকে বাঁচাইতে হইলে এই তিন দিক দিয়াই তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে।

প্রথমতঃ তাহার আয় বাড়াইতে হইবে। সমস্ত কৃষি-দ্রব্যের মূল্যই আজ আন্তর্জ্জাতিক উৎপাদনের পরিমাণের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করিয়া আমেরিকা বা

ইংলণ্ডের কৃষক (farmer) যে মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে মান্ধাতা আমলের নিয়মে সাধারণ লাঙ্গলের সাহায্যে উৎপন্ন ফসল ঠিক সেই মূল্যে বিক্রয় করিয়া বাঙ্গালার কৃষক যে কিছুতেই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, ইহা অতি সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং চাষের জন্য বাঙ্গালী কৃষককেও উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু তাহার জন্য শিক্ষা ও অর্থের প্রয়োজন; সুতরাং তাহা সময়সাপেক্ষ। সে সুযোগ ও সুবিধা আসিবার পূর্ব্বে তাহাকে অবসর সময়ে অন্য কাজ করিয়া আয় বাড়াইতে হইবে। বাঙ্গলায় আজ যাহারা সম্পূর্ণরূপে কৃষির উপর নির্ভরশীল তাহাদের অনেকেরই পূর্ব্বে অন্য উপজীবিকা ছিল। বাঙ্গলার অসংখ্য শিল্পী নিজেদের পুরুষপরম্পরাগত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কৃষি অবলম্বন করিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ বিদেশী সস্তা ও সৌখিন দ্রব্যের প্রতিযোগিতা এবং বহু পরিমাণে সেই সব দ্রব্য সম্বন্ধে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের ও সেই সঙ্গে জনসাধারণের কুসংস্কার-পূর্ণ মোহ। আজও সামান্য মাত্র উৎসাহ পাইলে তাহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্ব ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে। তার জন্য শিক্ষিত সমাজকে বিশেষ কোন স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে না কিন্তু মিথ্যা মোহ ও সৌখীনতা বর্জ্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তার ফলে দেশের বহু অর্থ, আজ যাহা বিদেশী বণিক ও শিল্পীর পকেটে যায়, তাহা দেশে থাকিয়া নানা ভাবে বাঙ্গলার অন্ন-সমস্যার সমাধানে সাহায্য করিবে। কিন্তু এসব ছাড়া আরও বহুভাবে বাঙ্গলার কৃষকের আয় বাড়ান যায়। সকলেই জানেন পাটের অপ্রত্যাশিত মূল্যহ্রাস বাংলার কৃষকের বর্ত্তমান দুর্গতির অন্যতম কারণ। এজন্য বাংলার কৃষকের অজ্ঞতা ও সংহতির অভাব বহুপরিমাণে দায়ী। বাংলা আজ অন্ধভাবে বিদেশী বণিক ও শিল্পীর জন্য পাট উৎপাদন করে এবং তাহাদেরই নির্দ্দিষ্ট মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। পাটের চাহিদা বাড়িল কি কমিল, বাড়িতে পারে কি বহু পরিমাণে কমিবারই সম্ভাবনা—এসব সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞানই নাই। তাহার এই অজ্ঞতা দূর করিয়া সে যাহাতে ঠিক চাহিদা অনুসারেই উৎপাদন করিয়া উপযুক্ত মূল্য আদায় করিতে পারে সে বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সেজন্য প্রয়োজন দেশব্যাপী প্রচারকার্য্য ও সংগঠন (organisation)। এ কাজ নিশ্চয়ই সহজসাধ্য নয়। কিন্তু বাঙ্গালী এসব ব্যাপারে অক্ষম নয় তাহা অনুরূপ ক্ষেত্রে বহুবার প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

বাংলার কৃষকের ঋণ ও করভারের সমস্যা আরও গুরুতর। সুখের বিষয় ইহাদের প্রথমটির সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু শুধু আইন করিয়া এরূপ বিরাট সমস্যার সমাধান কখনই সম্ভবপর নয়। তা ছাড়া এরূপ আইন প্রণয়ন দ্বারা যাহাতে মহাজন ও কৃষকের সম্পর্ক অনর্থক তিক্ত হইয়া না উঠে তাহাও দেখিতে হইবে। কারণ বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান হইতে পারে কেবল সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা দ্বারা এবং সে সহযোগিতা আসিতে পারে শুধু পরস্পরের স্বার্থের ঐক্যবোধ ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিরই ফলে। বলা বাহুল্য এই ব্যাপারে বাংলার মহাজনকে অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সে ত্যাগস্বীকারে তাহাকে সম্মত করিতে হইবে নিজেরই স্বার্থ-সম্বন্ধে তাহার স্পষ্টতর ধারণা জন্মাইয়া। তাহাকে বুঝিতে হইবে তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে কৃষকের অস্তিত্বেরই উপর; কৃষকের সর্ব্বনাশ করিয়া সে কিছুতেই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। যাঁহারা বাংলার কৃষকের ঋণভার লাঘব করিতে চাহেন তাঁহাদের প্রধান কাজ হইবে সমাজের মধ্যে এই শুভবুদ্ধি জাগাইয়া তোলা। অবশ্য শুধু দেশব্যাপী আন্দোলনেই এরূপ প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে, যেমন সফল হইয়াছে অস্পৃশ্যতা নিবারণ ও মাদকদ্রব্য বর্জ্জনের আন্দোলন।

মহাজন সম্বন্ধে যে কথা সত্য জমিদার সম্বন্ধেও তাহা অনেকটা খাটে। মহাজনের ন্যায় তাঁহাকেও এই জাতীয় সমস্যার সমাধানে সাহায্য করিতে হইবে। ইহাতে তাঁহাদের নিজেদের স্বার্থ কতটুকু জড়িত বাংলার জমিদার ও মহাজন উভয়েই তাহা আজ অতি তীব্র ভাবেই অনুভব করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারা যে স্বেচ্ছায় ও স্বাগ্রহেই এ আন্দোলনে যোগদান করিবেন এ আশা মোটেই দুরাশা নহে।

আমরা এ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ কৃষি ও কৃষকের সমস্যার কথাই আলোচনা করিয়াছি, কারণ ইহাই বাংলার অন্ন-সমস্যার গোড়ার কথা, কিন্তু আজ কোন জাতিই শুধু কৃষির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। বাংলা প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকার দ্রব্য বিদেশ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী

করিয়া থাকে। তাহার অধিকাংশ এদেশে কেন প্রস্তুত হইতে পারিবে না তাহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু সেজন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সাহায্য ও সহানুভূতির প্রয়োজন। সে সাহায্যের আবশ্যকতা প্রধানতঃ দুই দিক দিয়া—প্রথমতঃ মূলধন সরবরাহ; দ্বিতীয়তঃ উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহার (consumption)। বাংলা দেশ দরিদ্র, বড় বড় কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত মূলধন যোগাড় করা তাহার পক্ষে খুবই কষ্টকর, বিশেষতঃ বর্ত্তমান ব্যবসায়-মন্দার দিনে। কিন্তু ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাধারণকে আশ্বস্ত করিতে পারিলে এখনও তাহা অসম্ভব নয় এরূপ আশা করা যায়। ব্যবসায়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাঙ্গালীর অল্প হইলেও একেবারে নাই তাহা কিছুতেই বলা চলে না। তাছাড়া প্রকৃত চাহিদা উপস্থিত হইলে অদূরভবিষ্যতে এ দুই'এর কোনটারই যে অভাব হইবে না তাহা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রধান অন্তরায় বিদেশী ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রস্তুত দ্রব্যের প্রতিযোগিতা। সুতরাং বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া শিল্প বাণিজ্যে ব্রতী হইতে হইলে তিনটি বিষয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে—

(১) প্রথমতঃ, উপযুক্ত মুনাফার আশা না থাকিলেও বাংলার শিল্পে সকলকেই যথাসাধ্য টাকা খাটাইতে হইবে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা কারখানা চালাইবেন তাঁহারা প্রথম অবস্থায় অপেক্ষাকৃত অল্প পারিশ্রমিকে সন্তুষ্ট থাকিবেন।

(৩) এবং তৃতীয়তঃ, বাঙ্গালীকে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্য দিয়া হইলেও বাংলার শিল্পকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

মুক্ত প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালী যে বর্ত্তমানে কিছুতেই বাংলার শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহার ন্যায্য স্থান অধিকার করিতে পারে না তাহা সহজেই বোধগম্য। সুতরাং উপরি উক্ত ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোনরূপ যুক্তিতর্কের অবতারণা অনাবশ্যক। বাঙ্গালী যে স্বদেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারে পরাঙ্মুখ নয়, গত ৩০ বৎসরের স্বদেশী আন্দোলনই তাহার জলন্ত সাক্ষ্য। কিন্তু বাংলা এ ত্যাগের উপকার বিশেষ লাভ করিতে পারে নাই, অতি দুঃখের সহিতই আজ এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা এতদিন বিদেশী কাপড় বর্জ্জনের যে আন্দোলন চালাইয়াছি তার ফলে বম্বে মিলওয়ালাদের লাভের অংশই মোটা হইয়াছে—বাংলা এত ত্যাগ স্বীকার করিয়া এত দিনেও কাপড় সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে পারিল না। কিন্তু বস্ত্র সম্বন্ধে আজ স্বাবলম্বী হওয়াই বাংলার প্রধান সমস্যা নয়। প্রধান সমস্যা অন্নসংস্থানের। পেটেই দায়েই আজ বাঙ্গালীকে পূর্ণ মাত্রায় শিল্প-বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং আজ শুধু স্বদেশী ব্যবহার করিলেই চলিবে না। যথাসম্ভব বাংলার দ্রব্যই কেবল ক্রয় করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীকে পরস্পরের অন্নসংস্থানে সাহায্য করিতে হইবে। আজ বাংলার নূতন আন্দোলন হইবে—"Buy Indian" নয় "Buy Bengal".
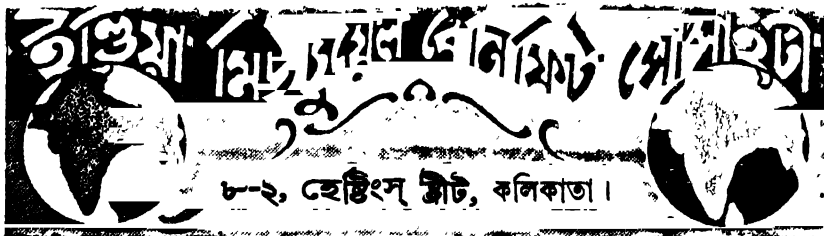
আমাদের বাণিজ্য-সম্পদ

—শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

পঞ্চম পর্য্যায়

ভারত শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তন ও বাণিজ্যের নূতন রূপ

সিপাহী বিদ্রোহের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত হইতে পার্লামেণ্ট ভারত শাসনের ভার ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের হাতে ন্যস্ত করিয়া দিল ও সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রত্যক্ষ রাজত্বের মধ্যে ভারতবর্ষ পরিগণিত হইয়া পড়িল। ভারতবর্ষের প্রজাসাধারণের আর্থিক উন্নতির প্রতি তখন হইতে কিছু কিছু দৃষ্টি পড়িতে লাগিল ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে ভারতীয় বণিকগণ পুনরায় প্রবিষ্ট হইবার কথঞ্চিৎ সুযোগ পাইতে লাগিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশে শিল্প-বাণিজ্য দ্রুত বাড়িয়া উঠিল এবং শান্তির আড়ালে বহির্ব্বাণিজ্য সুবিস্তৃত হইল।

ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যের রূপ কিন্তু পরিবর্ত্তিত হইল না। বহির্ব্বাণিজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের পূর্ব্বতম শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন কমিয়া যাইতে লাগিল এবং কৃষিজাত ও খনিজ খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচা মাল রপ্তানি বিশেষ বাড়িয়া চলিল।

ভারতীয় অর্থে পুষ্ট হইয়া ইংরাজ জাতি উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহাদের শিল্পক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয়। অনেক ঐতিহাসিক বলেন যে ইংলণ্ডের এই শিল্পোন্নতি ভারতীয় শিল্পের অবনতির অন্যতম প্রত্যক্ষ কারণ। ইহা সত্য বটে, কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের শিক্ষাহীনতা ও বাণিজ্যপ্রসারে উৎসাহের অভাবও অনেকাংশে আমাদের অবনতির জন্য দায়ী। কারণ ইহা সাধারণতঃ প্রতি ক্ষেত্রে ও প্রত্যেক দেশে দেখা গিয়াছে যে, যে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক কার্য্যতৎপর জীবন-সংগ্রামে তাহার জয় হইবেই।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর বণিক্ থাকে। এক শ্রেণী আপন উদ্যোগে দেশ বিদেশে নূতন সুযোগ সন্ধান করিয়া বাণিজ্য-ক্ষেত্রের প্রসার করেন ও অপর শ্রেণী তাঁহাদের দ্বারা অনুপ্রেরিত হইয়া আপনাপন দেশে অন্ন সংগ্রহ করেন। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর নির্দ্দেশমত বাণিজ্যের বিস্তার অবশ্যম্ভাবী। ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ইংরাজ জাতির সুযোগমত আমাদের ব্যবসায়ীরা পণ্য সংগ্রহ ও রপ্তানি করিতে লাগিলেন ও আমরা ইংরাজ বণিকদের প্রদত্ত শিল্পজাত মাল আমদানী করিয়া আমাদের প্রাপ্য মিটাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আমাদের শিল্পী ও বণিক্‌দের শিক্ষা ও কার্য্যতৎপরতা উপযুক্ত রূপ থাকিলে আমাদের বাণিজ্যের গতি অন্যরূপ হইত।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ খাল কাটা সম্পন্ন হয় ও তখন হইতে ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ঘটে। বস্তুতঃ সেই সময় হইতে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভ বলা যাইতে পারে। ইহার পর হইতেই আমাদের আমদানী ও রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ দ্রুত বাড়িয়া উঠে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে মোটামুটি আমাদের বহির্ব্বাণিজ্য ১৮৬৪-৬৫ হইতে ১৯২৮-২৯ সাল পর্য্যন্ত কি পরিমাণ বাড়িয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

আমদানী ও রপ্তানি সকল প্রকার পণ্যের মূল্য

(লক্ষ টাকা)

পাঁচ বৎসরের গড়			আমদানী	রপ্তানি	মোট
১৮৬৪-৬৫	হইতে	১৮৬৬-৬৯	৩১,৭০	৫৫,৮৬	৮৭,৫৬
১৮৬৯-৭০	„	১৮৭৩-৭৪	৩৩,০৪	৫৬,২৫	৮৯,২৯
১৮৭৪-৭৫	„	১৮৭০-৭৯	৩৮,৩৬	৬০,৩২	৯৮,৬৮
১৮৭৯-৮০	„	১৮৮৩-৮৪	৫০,১৬	৭৯,০৮	১,২৯,২৪
১৮৮৪-৮৫	„	১৮৮৮-৮৯	৬১,৫১	৮৮,৬৪	১,৫০,১৫
১৮৮৯-৯০	„	১৮৯৩-৯৪	৭০,৭৮	১,০৪,৯৯	১,৭৫,৭৭
১৮৯৪-৯৫	„	১৮৯৮-৯৯	৭৩,৬৭	১,০৭,৫৩	১,৮১,২০
১৮৯৯-০০	„	১৯০৩-০৪	৮৪,৬৮	১,২৪,৯২	২,০৯,৬০
১৯০৪-০৫	„	১৯০৮-০৯	১,১৯,৮৫	১,৬৫,৪৪	২,৮৫,২৯
১৯০৯-১০	„	১৯১৩-১৪	১,৫১,৬৭	২,২৪,২৩	৩,৭৫,৯০
১৯১৪-১৫	„	১৯১৮-১৯	১,৫৯,২৫	২,২৫,৮৩	৩,৮৫,০৮
১৯১৯-২০	„	১৯২৩-২৪	২,৬৭,০৫	৩,০৬,৩৮	৫,৭৩,৪৩
১৯২৪-২৫	„	১৯২৮-২৯	২,৫১,০২	৩,৫৩,৫১	৬,০৪,৫৩

দেখা যাইতেছে যে "১৮৬৪-৬৫ হইতে ১৮৬৮-৬৯ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের গড়ে ভারতীয় রপ্তানি বার্ষিক প্রায় ৫৬ কোটী টাকা হইতে ১৯২৪-২৫ সালে প্রায় ৪০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছিল, এবং উক্ত সময়ের মধ্যে আমাদের আমদানীর পরিমাণ প্রায় ৩২ কোটি টাকা হইতে ২৫৩ কোটি টাকায় উপনীত হয়।

বাণিজ্যের এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর আর্থিক উন্নতি তদনুরূপ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায় না, তাহার প্রধান কারণ এই যে আমাদের বহির্ব্বাণিজ্যে প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের বণিকেরা বিদেশী বণিকদের তুলনায় কম কার্য্য-তৎপর হওয়ায় ও আমাদের রপ্তানি একমাত্র খাদ্য শস্য ও শিল্পোপযোগী কাঁচা পণ্যে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ায় আমাদের দেশে আনীত বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায় আমাদিগকে বরাবরই অধিক রপ্তানি করিতে হইয়াছে ও আমাদের রপ্তানির সম্পূর্ণ ফল এদেশীয় বণিকেরা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এতদ্ভিন্ন ইংরাজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশ হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, নানা ভাবে আমাদের ধনরাশি বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। তাহার জন্যও ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি তাদৃশ সম্ভব হয় নাই। অবশ্য একথা মানিতেই হইবে যে যদিও আমাদের অধিকারমত অর্থনৈতিক উন্নতি হয় নাই তথাপি ইংরাজ জাতির আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বের অবস্থা হইতে বর্ত্তমান দেশবাসীর অবস্থা অনেকাংশে উন্নত হইয়াছে। বহির্ব্বাণিজ্যের উন্নতি তাহার অন্যতম পরিচায়ক।

বাণিজ্যের এই উন্নতির কয়েকটী মুখ্য কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ ইংরাজ শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উপযোগী কতকাংশ শান্তি ও শৃঙ্খলা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বতন যুগে যাহাই থাকুক খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এই শান্তির বিশেষ অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই শান্তির স্বরূপ বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ইউরোপীয় শিল্পজগতে অভাবনীয় উৎসাহের সূচনা হয়। তাহার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটে ও শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার উৎপন্ন বিক্রয়ের স্থানের প্রসার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে সমুদ্র ও স্থলপথ উভয়ের যানবাহনাদির বিশেষ উন্নতি হইতে আরম্ভ হয় এবং বাষ্পীয় শক্তিতে পরিচালিত জাহাজ ও রেলগাড়ীর প্রবর্ত্তন হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের পণ্যও বহুদুর পর্য্যন্ত বিক্রয়ের জন্য লইয়া যাওয়া সম্ভব হয়।

চতুর্থ সুযোগ—'সুয়েজ' খাল কর্ত্তন। ইহার ফলে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের দূরত্বের ব্যবধান প্রায় তিন হাজার মাইল কমিয়া আসে ও সমুদ্রপথে পণ্য সরবরাহ বিশেষ সহজ হইয়া পড়ে। এবং এ সকল কারণের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ প্রবর্ত্তিত অবাধ বাণিজ্যনীতি ভারতীয় বাণিজ্য প্রসারের বিশেষ সহায়ক হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ নাগাদ ইংরাজ শাসকদের ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা ছিল তাহা রদ হইয়া যায় এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রপ্তানির উপর যে শুল্ক দেয় ছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয় ও আমদানীর উপর শুল্ক নামমাত্র পরিণত করা হয়। পরিশেষে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সকল আমদানী শুল্ক উঠাইয়া দিয়া ভারতে বিদেশী পণ্যের অবাধ গতির পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়।

অষ্টাদশ শতব্দীর শেষ ভাগ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে ভারতীয় বাণিজ্যক্ষেত্রে যে সকল ইউরোপীয় রাজশক্তি প্রতিযোগিতায় ব্রতী ছিল তাহার মধ্যে ইংরাজেরা কিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বাণিজ্যে ইংরাজের এই প্রভুত্ব উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত একরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে এই প্রভুত্বের পথে বাধা পড়িতে আরম্ভ হয়, ও জার্ম্মেনী, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বণিকেরা ভারতবর্ষের বাণিজ্যে ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করেন। অবশ্য এ প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় ইংরাজদিগের পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ বর্ত্তমান ছিল ও তাহাদের অপসারণ করা অন্য বিদেশীয়ের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। কারণ ইংরাজের হাতে দেশের রাষ্ট্রীয় শাসনের ভার, ইংরাজের পরিচালিত ব্যাঙ্ক ও জাহাজের কারবারেই বহির্ব্বাণিজ্যের ব্যবস্থা, ইংরাজের বহু অর্থে ও ইংরাজ কর্ম্মচারীর প্রভুত্বে এদেশীয় রেলগাড়ী ও অন্যান্য বাণিজ্য-সহায়ক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা। তথাপি কার্য্যকুশলতার ও অধ্যবসায়ের বলে জার্ম্মেনী, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি

দেশের বণিকগণ আমাদের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরাজকে ক্রমেই হটাইয়া দিতে থাকিল। সর্ব্বপ্রথমে জার্ম্মেনী তাহার শিল্পজাত দ্রব্যাদি ভারতবর্ষে বিক্রয়ের সুবিধার জন্য ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করে এবং রুশিয়ার সহিত যুদ্ধের পর হইতে জাপানও এদেশে তাহার ব্যবসায়ের প্রসারের জন্য বিশেষ সচেষ্ট হয়। এতদুদ্দেশ্যে জার্ম্মান ও জাপানী বণিকগণ ব্যবসায়ের সুযোগের জন্য তত্তদ্দেশীয় গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় এদেশে নিজেদের ব্যাঙ্ক, নিজেদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত পণ্য সরবরাহের জাহাজ, এবং আপনাপন ব্যবসায়ের শাখা প্রতিষ্ঠা করিলেন। আমেরিকা কিন্তু এ বিষয় তেমন অগ্রণী হয় নাই। আমেরিকান বণিকেরা প্রায় বিগত মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত ইংরাজ ব্যবসায়ীদের হাত দিয়াই স্বকীয় পণ্য আদান প্রদান করিতেন।

উপরের তালিকায় ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের বিস্তৃতির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গিয়াছে তাহার গতি সকল সময়ে সমান ছিল না। ইউরোপ তথা ইংলণ্ডের চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি এবং তথাকার আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক জীবনের পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যবসায়ের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে। মোটের উপর দেখা যায় যে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, বিশেষতঃ ১৮৬৪ হইতে ১৮৬৯ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় পণ্য রপ্তানি খুব বৃদ্ধি পায়। ইহার প্রধান কারণ সে সময়ে আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় মনোমালিন্য ও তাহার ফলে আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে তুলা ও অন্যান্য কাঁচা মাল সরবরাহের পথে বাধা। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত আমাদের বহির্ব্বাণিজ্য পূর্ব্বতন গতিতে তাদৃশ বৃদ্ধি পায় নাই। ইহার প্রধান কারণ ভারতীয় রৌপ্য মুদ্রার মূল্য হ্রাস ও স্বর্ণের তুলনায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রৌপ্যের মূল্য অভাবনীয় রূপে নামিয়া যাওয়া। আমাদের মুদ্রার মূল্য হ্রাসবৃদ্ধির জন্য বহির্ব্বাণিজ্যের যে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল ১৮৯৩ সাল হইতে ১৮৯৮ সালের মধ্যে তাহা দূর করিবার বাবস্থা হয়, এবং বিংশ শতব্দীর প্রথম হইতে পুনরায় ভারতীয় আমদানী ও রপ্তানির বিপুল প্রসার দেখা দেয়। এবারে ইংলণ্ড ও ইউরোপীয় দেশ সমূহ ভিন্ন অন্যান্য দেশের সহিতও ভারতের ব্যবসায় সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে আরম্ভ করে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই রূপই চলিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

জন প্রতি কাপড়

আমাদের দেশের লোক জনপ্রতি কোন্ বৎসর কত দেশী ও বিদেশী কাপড় কিনিয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। বস্ত্র শিল্পের উন্নতিও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশ কিরূপ বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়াছে, এই তালিকা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

সন,	বিদেশী কাপড়	দেশী কাপড় গজ	মোট গজ
১৯০২-৩	৬'৮৮	১'৫১	৮'৩৯
১৯১২-১৩	৯'৩৩	৩'৫৮	১২'৯১
১৯২২-২৩	৪'৬৮	৪'৮০	৯'৪৮
১৯২৭-২৮	৫'৬৯	৬'৪২	১২'১১
১৯২৮-২৯	৫'৫৪	৫'০৪	১০'৫৮
১৯২৯-৩০	৫'৪৬	৬'৫৮	১২'০৪
১৯৩০-৩১	২'৪৮	৭'০১	৯'৪৯
১৯৩১-৩২	২'১৭	৮'২৩	১০'৪০

"সঙ্কল্প"

বীমা-প্রসঙ্গ

বীমা-কোম্পানীর সাংখ্যাধিক্য

গত মাসেও ভারতবর্ষে কয়েকটী নূতন বীমা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বসাকুল্যে শতাধিক বীমা-কোম্পানী ও প্রায় এক সহস্র প্রভিডেণ্ট বা Dividing Society অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে রেজেষ্টারী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। এখনও এ সৃষ্টির বিরাম নাই। শুনিতেছি শীঘ্রই আরও কয়েকটী প্রতিষ্ঠান রেজেষ্টারী হইবে। ভারতীয় মূলধনে ভারতবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত বীমা-প্রতিষ্ঠান সংস্থাপন আনন্দের বিষয় হইলেও বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কটের দিনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বীমা-কোম্পানী হওয়া আমরা কখনও অনুমোদন করিতে পারি না। বিশেষতঃ অনেক নূতন কোম্পানীর ইতিহাস বিশেষ রুচিকর নহে। কোন পুরাতন কোম্পানীর একজন এজেণ্ট হয়তো তাঁহার পারিশ্রমিকের বিষয়ে পরিচালক বর্গের সহিত মতানৈক্য হওয়া মাত্র চার পাঁচটি ডাই-রেক্টরের নাম সংগ্রহ করিয়া তখনই একটী কোম্পানী গড়িয়া তুলিলেন। তারপর কোন অর্থশালী বেকার আত্মীয় বা বন্ধুকে ধরিয়া তাঁহার কোম্পানীর কাগজ লইয়া জমা দিয়াই কাজ আরম্ভ করিলেন। আশা এই যে তিনি যখন নিজে বৎসরে দুই লক্ষ টাকার কাজ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন তখন অন্যান্য এজেণ্ট সহযোগে ১০ লক্ষ টাকার কাজ সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইবে না। এই দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া কাজে নামিয়াই দেখেন যে তাঁহার আশা পূরণ হইতে বহু বিলম্ব। তখন ধার-কর্জ্জ করিয়া কোম্পানী চালাইতে হয় এবং কাজ সংগ্রহ করিবার জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ে কোম্পানী শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া যান। উপযুক্ত মূলধনে উপযুক্ত পরিচালক বর্গের তত্ত্বাবধানে নূতন কোম্পানী স্থাপনে আমরা কোন আপত্তি করি না। পাঞ্জাবে 'লক্ষ্মী' বোম্বাইএ 'নিউ ইণ্ডিয়া' বাঙ্গলায় 'মেট্রোপলিটান' এই শ্রেণীর কোম্পানী। ইহাদের propaganda দেশবাসীকে বীমা বিষয়ে জাগরূক করিয়া দেশের কল্যাণ সাধনা করে। কিন্তু যে সমস্ত কোম্পানী উপযুক্ত মূলধন বা পরিচালক অভাবে অথবা অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া হীনবল হইয়া পড়ে সেগুলি দেশের বা দশের কাহারও কল্যাণকর হয় না। এই সমস্ত দুর্ব্বল কোম্পানী শীঘ্রই হউক বা দুদিন পরেই হউক দ্বার বন্ধ করিতে বাধ্য হইবে, তাহার ফলে অসংখ্য মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের সর্ব্বনাশ ত' হইবেই পরন্তু ভারতীয় বীমা-ব্যবসায়ের মূল ভিত্তিতে ভারত-বাসীকে সন্দিহান করিয়া তুলিয়া পুনরায় বিদেশী বীমা-ব্যবসায়ের প্রসার হইবার বিশেষ সম্ভাবনা গড়িয়া তুলিবে।

ইহার উপায় কি? সংবাদ-পত্রের পরিচালকদের উপরও এ বিষয়ে একটী অতি পবিত্র গুরু ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। বিজ্ঞাপন দিলেই সেই কোম্পানীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া দেশবাসীকে ভুল পথে চালিত করা, সংবাদ-পত্রগুলির একটী ব্যবসা হইয়া উঠিয়াছে। বীমা-বিষয়ক পত্রিকাগুলি প্রকাশ্যে ইস্তাহার জারী করিতেছেন যে অমুক সংখ্যা তাঁহাদের 'বিশেষ সংখ্যা', তাহাতে এক পাতা বিজ্ঞাপন দিলে (মূল্য ৬০৲ কি ৬৫৲) কোম্পানীর একটী পূরা পাতা সমালোচনা বাহির করা হইবে (এই সমালোচনা কোম্পানী নিজে লিখিয়া দিলেও ক্ষতি নাই)। এই সমস্ত সংখ্যা আবার বেশী মূল্যে বিক্রয় হয়। উদ্দেশ্য যে যে কোম্পানীর সমালোচনা(?) বাহির হইবে তাঁহারা অবশ্য একশত কি দুই শত অতিরিক্ত কাপি ক্রয় করিয়া তাঁহাদের এজেণ্টদের মধ্যে বিতরণ করিবেন। এজেণ্টগণ অবশ্য সেই সমালোচনা বিশেষতঃ বীমা-পত্রিকা-সম্পাদকের কোম্পানী সম্বন্ধে নিরপেক্ষ মত বলিয়া দেশবাসীর নিকট দেখাইয়া কার্য্য সংগ্রহ করিবেন। এইরূপ ভাবে পত্রিকা-সম্পাদকগণ বিশেষতঃ বীমাবিষয়ক পত্রিকা-সম্পাদকগণ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে জনসাধারণের মনে দুর্ব্বল কোম্পানীগুলি সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক ধারণা জন্মাইয়া অকর্ম্মণ্য অথবা অসৎ ব্যক্তিগণকে নূতন কোম্পানী স্থাপনে উৎসাহিত করিতেছেন।

ভারত গভর্ণমেণ্টের বীমা-কার্য্য পরিদর্শনের জন্য একটী বিভাগ আছে। এই বিভাগটী বিশেষজ্ঞ actuary দ্বারা পরিচালিত। ইহাদের পরিদর্শন-কার্য্য প্রতি বৎসর একখানি Year Book বাহির করিয়াই শেষ হইয়া যায়। কতকগুলি কোম্পানী নিম্ন হারে চাঁদা লইয়া ও উচ্চহারে খরচ করিয়াও

অত্যুচ্চ bonus ঘোষণা করিতেছেন। ইহা অঙ্ক শাস্ত্রের সামান্য হিসাবেও সন্দেহজনক বোধ হয় অথচ সরকার সে বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক বোধ করেন না। এই যে দেশব্যাপী অসংখ্য বীমা-প্রতিষ্ঠান গজাইয়া উঠিতেছে, তাহাদের অনেকেরই নিয়মকানুন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু সরকার সে বিষয়েও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বোধ করেন না।

তবে উপায় কি? সুপ্রতিষ্ঠিত বীমা-কোম্পানীগুলির তাঁহাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ করিয়া একত্রিত হইয়া অথবা পৃথক ভাবে জনসাধারণকে বীমার মূল সূত্রগুলি বুঝাইয়া দুর্ব্বল বা অনুপযুক্ত পরিচালক কর্ত্তৃক পরিচালিত কোম্পানীগুলি সম্পর্কে সাবধান করা কর্ত্তব্য। আমরা বহুবার এবিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। বর্ত্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত স্বদেশী বীমা কোম্পানীর পরিচালক বর্গকে এই সমস্যা বিষয়ে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। সময় থাকিতে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। যে পত্রিকা-সম্পাদক বিজ্ঞাপন পাইলেই ভাল মন্দ বিচার না করিয়া সকলেরই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিবেন, সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানীগুলি সেই পত্রিকায় তাঁহাদের বিজ্ঞাপন প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিলে ঐ সমস্ত সম্পাদকের চৈতন্য উদয় হওয়া সম্ভব হইতে পারে

বীমা-পলিশিতে স্ত্রীর স্বত্ব

পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন যে অনেক জীবন-বীমা কোম্পানীতে বীমা করিলে বীমকারীর ইচ্ছা অনুযায়ী কোম্পানী এরূপ পলিশি প্রদান করেন যে তাহাতে স্ত্রী বা পুত্রকন্যার উপকারার্থ সেই পলিশি করা হইতেছে, পলিশির ভিতর এরূপ লেখা থাকে। Married Womens' Property Actএর সর্ত্ত দ্বারা এই সমস্ত পলিশির ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ পলিশি-কর্ত্তা স্বামী বা পিতা সেই পলিশির টাকার উপর সমস্ত স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া benificiaryর পক্ষে trustee রূপে কাজ করিয়া থাকেন। পলিশি mature হইলে অথবা পলিশিকারীর মৃত্যু হইলে benificiary সেই টাকা পাঠাইয়া থাকেন।

এই সমস্ত পলিশির সর্ত্ত সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ থাকায় বর্ত্তমান অনেক কোম্পানী ঐরূপ পলিশি প্রকাশ করা স্থগিত করিয়াছেন। সম্প্রতি বিলাতে এইরূপ একটী পলিশি লইয়া সান লাইফ বনাম কাজিন্স সাহেব এক মোকর্দ্দমা হইয়াছে। মোকর্দ্দমাটি বীমাকারী ও বীমা কোম্পানী উভয়েরই পক্ষে তুল্যরূপ প্রয়োজনীয় বিধায় আমরা তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিতেছি। কাজিন্স সাহেব সান লাইফ কোম্পানীতে ১৫০০০ পাউণ্ডের একটী পলিশি করেন তাহাতে তাঁহার স্ত্রী লিলিয়ানকে benificiary উল্লেখ করেন, ১৯১২তেও তিনি ঐরূপ সর্ত্তে আর একটী পলিশি উক্ত ৩০০০ পাউণ্ডের জন্য উক্ত কোম্পানীতেই করেন। ১৯৩১ সনের ৩রা অক্টোবর তাঁহার পত্নী পরলোক গমন করেন এবং ৫ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার ত্যক্ত বীমার প্রবেট তাহার executorগণ লন।

কাজিন্স সাহেব তাঁহার মৃত্যুতে ঐ পলিশির টাকা যে নিজে পাইবেন এই বিষয়ে declaration করিবার জন্য এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। বিষয়টী জটীল বিধায় কোম্পানী সমস্ত খরচ দিয়া test case করিতে স্বীকৃত হওয়ায় এই মোকর্দ্দমা পরিচালিত হয়।

বিচারপতি রায় দিলেন যে কাজিন্স সাহেব পলিশির টাকার মালিক হইয়াছেন এবং executorগণেরও টাকার উপর কোন অধিকার নাই। কোম্পানী এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করেন। উভয় পক্ষে উপযুক্ত কৌঁসুলী দিয়া সওয়াল করান হয় এবং বিচারপতিদ্বয় দুটী পৃথক গবেষণাপূর্ণ রায় দিয়া ইহাই ধার্য্য করেন যে benificiaryর মৃত্যু হইলেই যে trust-এর উদ্দেশ্য সাধিত হইল তাহা নহে, যে পর্য্যন্ত সে বা তাহার executors পলিশির টাকা না পায় সে পর্য্যন্ত স্বামীর সে টাকায় কোন অধিকার জন্মাইবে না।

এ পর্য্যন্ত সাধারণের এবং বীমা-কোম্পানীর ধারণা ছিল যে benificiaryর মৃত্যু হইলেই পলিশির টাকা পাওয়া সম্বন্ধে স্বামীর আর কোন বাধা থাকে না, কিন্তু এই বর্ত্তমান মোকদ্দমায় দেখা যাইতেছে যে এই ধারণা ভ্রমাত্মক। ঐরূপ পলিশিতে benificiaryর মৃত্যু হইলেও তাঁহার executors বা assignees পলিশির টাকা পাইবার অধিকারী, স্বামী নহেন। বীমা-কোম্পানীগণ ও বীমাকারিগণ সকলেই এই মোকর্দ্দমার রায় দেখিয়া এ বিষয়ে সাবধান হউন।—জাবালি

কৃত্তিবাস ও কাশীদাস

—শ্রীকালিদাস রায়

কাশীরামের মহাভারত ব্যাসদেবের মহাভারতের যে অনুবাদ নহে তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। কাশীরাম সংস্কৃত একেবারেই জানিতেন না বলিয়াই মনে হয় না—তাঁহার স্বয়ংবর-ক্ষেত্রে অর্জ্জুনের রূপবর্ণনার ভাষা এবং অন্যান্য অনেক স্থল হইতে প্রমাণিত হইতে পারে যে তাঁহার কিছু কিছু সংস্কৃত জ্ঞান ছিল। ব্যাসদেবের মহাভারত এখন যে ভাবে সমগ্রটাই পাওয়া যায় সম্ভবতঃ তখন তাহা পাওয়া যাইত না। সেকালের কথকগণের পুঁজি ছিল ব্যাস-সংহিতা। বাংলা দেশে নকল শাস্ত্রেরই সংহিতা চলিত—অর্থাৎ নানা গ্রন্থের নানা অংশ লইয়া যে একটি সংহিতা রচিত হইয়াছিল—পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য সেই সংহিতাই চলিত। ব্যাসদেবরচিত নানা পুরাণ হইতে উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়া একটি বিরাট সংহিতা রচিত হইয়াছিল—সেই সংহিতাই ছিল সেকালের কথকদের সম্বল।

কাশীরাম সেই সংহিতাই অবলম্বন করিয়া তাঁহার মহাভারত রচনা করেন। কাশীরামের মহাভারতে মূল মহাভারতের অনেক কথাই নাই—আবার এমন সব উপাখ্যান আছে—যাহা মূল মহাভারতে নাই। ঐ সকল উপাখ্যান কাশীরাম নিজে রচনা করেন নাই, ব্যাস-সংহিতা হইতেই পাইয়াছেন, হরিবংশ হইতেও পাইয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারত ও বাংলা মহাভারতে এ বিষয়ে কি কি প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা দেখাইতে হইলে ছোটখাট একখানি পুস্তক হইবে। আমি কেবল দুই একটি কথার উল্লেখ করি—শাম্বের লক্ষণাহরণের কথা মূল মহাভারতে নাই—হরিবংশে আছে। শ্রীকৃষ্ণ যে দুর্য্যোধনের পরমাত্মীয় একথা দুইজনেই বার বার বলিয়াছেন। লক্ষণার সহিত শাম্বের বিবাহ হইলেই এই কথার সার্থকতা থাকে। কাশীরাম সুভদ্রাহরণের যে বর্ণনা দিয়াছেন—দুর্য্যোধনকে অপদস্থ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের যে ষড়যন্ত্রের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা মূল মহাভারতে নাই। আবার দুর্য্যোধনের মহত্ত্বের একটি উদাহরণ দিয়াছেন—চিত্রসেনের হাত হইতে অর্জ্জুন যখন দুর্য্যোধনকে উদ্ধার করেন, তখন দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে একটা কিছু প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন। অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন সময়মত চাহিয়া লইব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় ভীষ্ম যখন পঞ্চপাণ্ডবকে বধ করিবার জন্য পাঁচটি বাণ রাখিয়া দিলেন, সহদেব শিবিরে বসিয়া তাহা গণনা করিয়া বলিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তখন অর্জ্জুন কুরুশিবিরে যাইয়া দুর্য্যোধনের নিকট পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতিমত ঈপ্সিত সামগ্রী চাহিলেন। এই সামগ্রী দুর্য্যোধনের রাজমুকুট। এই মুকুট পরিধান করিয়া অর্জ্জুন দুর্য্যোধন সাজিয়া বৃদ্ধ পিতামহকে ভুলাইয়া বাণ পাঁচটি সংগ্রহ করিলেন। এই উপাখ্যান মূল মহাভাতে নাই। অশ্বমেধযজ্ঞের পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ের বর্ণনা মূল মহাভারতে অতি হ্রস্ব—বভ্রুবাহনের কথা অবশ্য আছে, কিন্তু প্রবীর-জনার উপাখ্যান বা সুধন্বার উপাখ্যান উহাতে নাই। কাশীরামের পুস্তকে বিশেষ বিস্তৃত-ভাবে এই দুইটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, উহা হইতে বাংলা সাহিত্যে একাধিক নাটক রচিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে কাশীরাম সংস্কৃত মহাভারতের কেবল মূল উপাখ্যানাংশ গ্রহণ করিয়াছেন, ফলে বহু পারিপার্শ্বিক কাহিনী ও আখ্যানের সঙ্গে তত্ত্বাংশ ও ঐতিহাসিক দিকটা বাদ গিয়াছে। যেমন বক ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে বহু প্রশ্নোত্তরের মধ্যে কাশীরাম মাত্র চারিটি গ্রহণ করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভারতের যে সকল রাজন্য যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই পাঁচটি ছাড়া বাকী সকলের নাম ধাম ও সহায়তার কথার উল্লেখ নাই। তাহা ছাড়া কাশীরাম বাঙ্গালীর রীতিনীতি, প্রবৃত্তি, প্রকৃতি, নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের খাতে মহাভারতের উপাখ্যান আগাগোড়া ঢালিয়াছেন, ফলে কাশীরামের মহাভারত প্রায় মৌলিক সৃষ্টি বলিলেই চলে। মহাভারতের প্রায় সমস্ত চরিত্রই কাশীরামের মহাভারতে বাঙ্গালী-পরিচ্ছদে সজ্জিত।

কৃত্তিবাসের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। বাল্মীকির সীতার মধ্যে যে তেজস্বিতা আছে—কৃত্তিবাসের সীতায় তাহা নাই। কৃত্তিবাসের সীতা বাঙ্গালীর মেয়ে। কৃত্তিবাস রাম চরিত্র বা লক্ষ্মণ চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথাই সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই—রাম যে স্বয়ং ভগবান, কৃত্তিবাস একবারও তাহা ভুলিতে পারেন নাই—রাবণের মুখেও তাই রামের স্তব বসাইয়াছেন। এবং রাবণের মধ্যে কোন মহত্ত্ব দেখেন নাই। বৈষ্ণব বাঙ্গালীর তুষ্টির জন্য কৃত্তিবাস তরণীসেনের সৃষ্টি করিয়াছেন—শাক্ত বাঙ্গালীর জন্য তিনি রামকে দিয়া শক্তির পূজা করাইয়াছেন—অবশ্য এ উপাখ্যানটি তিনি পদ্মপুরাণ হইতে লইয়াছেন। লবকুশের অশ্বধারণ ও রাম-লক্ষ্মণাদির লবকুশের হাতে পরাজয়ের কাহিনীটিও মূল রামায়ণে নাই, কৃত্তিবাস উহা পদ্মপুরাণ হইতে লইয়াছেন। কৃত্তিবাসের আগেই উহা রামায়ণের অন্তর্গত হইয়া উঠিয়াছিল—কারণ স্বয়ং ভবভূতিই উত্তররাম চরিতে ঐ উপাখ্যানকে নাট্যাঙ্কে পরিণত করিয়াছিলেন।

বাল্মীকি যে পূর্ব্বজীবনে দস্যু ছিলেন এবং ব্রহ্মা ও নারদের অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করেন—এই কাহিনী মূল রামায়ণে নাই—অথচ এই কাহিনী যে রামায়ণের অন্তর্গত এবিষয়ে কাহারও বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই। কৃত্তিবাস এই কাহিনী নিজে

রচনা করেন নাই—এ সাহসও তাঁহার ছিল না। তিনি ইহা পান অধ্যাত্ম রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ষষ্ঠ সর্গে। এই কাহিনী বহুকাল হইতেই প্রচলিত ছিল—নতুবা বল্মীক হইতে বাল্মীকির জন্ম এই বৈয়াকরণ ব্যুৎপত্তি কি ভাবে সম্ভবে? যাহাই হউক কৃত্তিবাসও বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ করেন নাই—সম্ভবতঃ বাল্মীকির রামায়ণ কখনও চোখেও দেখেন নাই। ব্যাস-সংহিতার মত আর একটি পুরাণ সংহিতা রামচন্দ্রের জীবন-কথাকে অবলম্বন করিয়া সঙ্কলিত হইয়াছিল এবং তাহাও কথক ঠাকুরদের সম্বল বা মূলধন ছিল। তাহা হইতেই কৃত্তিবাসের রামায়ণের সৃষ্টি।

কৃত্তিবাসও কাশীদাসের মত বাঙ্গালীর রুচি, প্রবৃত্তি নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের অনুগামী করিয়া রামায়ণের চরিত্র রচনা করিয়াছেন। ফলে কৃত্তিবাসের রামায়ণও প্রায় একটি মৌলিক রচনা। কায়স্থ কাশীরামের মহাভারতে বাঙ্গালীর ব্রাহ্মণভক্তি যেমন অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ কৃত্তিবাসের রামায়ণে তেমন সর্ব্বত্র বাঙ্গালীর অদৃষ্টবাদের জয় জয়কার।

পাড়াগেঁয়ে প্রিয়া

—শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

মোর পাড়াগেঁয়ে প্রিয়া ;
মোরি কাছে আসে সরল চোখের স্বপ্ন সঙ্গে নিয়া।
অধরে তাহার কথা কহে প্রেম, বাসনার নেশা নাহি ;
শীতল শান্তি বারিধি হইতে এসেছে সে অবগাহি'!
কম্প্র বাহুর পরশে তাহার সান্ত্বনা শুধু আছে ;
প্রণয়মুখর নহে সে কখনও আবেগের উচ্ছ্বাসে!

অভিমানী প্রিয়া মম
হাসি কান্নার ভাবে ও অভাবে অনাবিল অনুপম!
ফুলের মত সে ফুটেছে আমার জীবনের তরু ঘিরে ;
স্বপ্ন আমার মূর্ত্তি ধরেছে তাহার হৃদয়তীরে!
দু' চোখ মেলিয়া চাহিতে পারে না আজো মোর আঁখি পানে
সরম তাহার সুন্দর হয় সুনিবিড় অভিমানে!
কাজল-দীঘির ছায়া পড়ে তার বড় দুটি কালো চোখে ;
হাসিতে তাহার উঠে তরঙ্গ কবির স্বপ্ন-লোকে!
ভালবাসা কারে কহে সে জানে না অজানিতে তার হিয়া,
কানায় কানায় আমারি লাগিয়া উঠেছে উচ্ছ্বসিয়া!
দু' হাত ভরিয়া এনেছে সে স্নেহ ছোট ছোট গৃহকাজে ;
গৃহ যে আমার নন্দন হোলো তাহারি রূপের মাঝে!

মোর জীবনের পূর্ণিমা রাত্রিরে ;
রেখেছে সে তার ভীরু প্রণয়ের দুটি বাহু দিয়ে ঘিরে!

পুস্তক-পরিচয়

দিবাস্বপ্ন—সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত একখানি উপন্যাস। প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর।

কবি হিসাবে বসন্ত বাবুকে আর পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে না। "মানসী" মণ্ডলের তিনি একজন প্রধান কবি—এখনও তাঁহার লেখনী সমান ভাবে চলিতেছে। বসন্ত বাবুর লেখা মীরাবাই নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি—এবার তাঁহার লেখা উপন্যাস পড়িয়া আশ্চর্য্য হইলাম। তিনি একাধারে কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক হিসাবে যে সাহিত্যের দুরূহ পথে অভিযান সুরু করিয়াছেন—ইহা বাস্তবিকই প্রশংসার কথা।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে তিনি সমাজচিত্র ও ভালবাসার যে সরস ও সকরুণ ক্রমাভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন—তাহা পাঠক মাত্রকেই আনন্দ দিবে।

হোমিওপ্যাথিক বাংলা মেটিরিয়া মেডিকা ও থিরাপিউটিকস্ ১ম ভাগ—আমেরিকার চিকাগো নগরীর সুপ্রসিদ্ধ মিড্ওয়েষ্ট হোমিও-প্যাথিক ইনষ্টিটিউট্ নামক সমিতির সভ্য শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার বি-এ, এফ্-আর-এইচ্-এস্ প্রণীত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র। বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ হইতে এস্ এন্ সরকার এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ৫৭, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে শ্রীখগেন্দ্রকৃষ্ণ রায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

কেণ্ট, ফ্যারিংটন, ডিউএ, বোরিক প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রচলিত হোমিওপ্যাথিক জর্ণাল প্রভৃতিতে প্রকাশিত সারগর্ভ প্রবন্ধসমূহ অবলম্বনে এই মেটিরিয়া-মেডিকা ও থিরাপিউটিক্স গ্রন্থের ১ম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। গুণী চিকিৎসক বলিয়া গ্রন্থকারের খ্যাতি আছে।—তাঁহার ২৫ বৎসরের চিকিৎসার অভিজ্ঞতার ফলও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনেক মেটিরিয়া-মেডিকা গ্রন্থে কেবল রোগানুসারে ঔষধ আলোচিত হইয়াছে; তাহাতে চিকিৎসার কাজ চলিতে পারে—কিন্তু প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার তাহা বিধি নহে। এই চিকিৎসার সাফল্য রোগীর মানসিক লক্ষণ, বিশিষ্ট লক্ষণ, রোগের হ্রাসবৃদ্ধি ও ঔষধের সম্বন্ধ বিচার এই সকলের উপর নির্ভর করে। এই পুস্তকে এই সমস্ত বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। সমগুণবিশিষ্ট অথবা প্রত্যেক রোগে ব্যবহৃত বিভিন্ন ঔষধের পার্থক্য অতি সূক্ষ্মভাবে বিচারিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে এমন সুলিখিত পুস্তকের বিশেষ সমাদর হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

(১) **হিন্দুধর্ম্মের ব্যাধি ও চিকিৎসা** (২) **জাতের খবর**—এই দুইখানি পুস্তিকার লেখক—শ্রীইন্দুপতি মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—আর্য্য-সাহিত্য-মন্দির ৩৮ সরকার লেন সিমলা, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—যথাক্রমে চারি আনা ও দুই আনা।

হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহারা এই বই দুইখানি পড়িয়া বিশেষ সুখী হইবেন।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য—ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্-এ, পি-এইচ-ডি, প্রণীত,—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের মূল সূত্রগুলি আলোচনা করিয়া এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের উদাহরণ দিয়া গ্রন্থকার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে "আধুনিক সাহিত্যের যুগ হইতেছে ভাবের অশান্তি ও বিপ্লব ঘোষণার পর পুনর্গঠনের যুগ।" তাঁহার মতে 'বঙ্কিমী-সাহিত্য' ও 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-শিল্পের' দিক হইতে 'নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতেছে'। আমাদের সাহিত্য নূতন কর্ম্মজীবনের মধ্যে আমাদের জনসাধারণের লোকশিক্ষা ও লোকসাহিত্যের আদর্শের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় স্থাপন করিতেছে। অর্থাৎ এইদিক দিয়া একটা নূতন সাহিত্যের সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ইহা আশার কথা। 'বর্ত্তমান সমাজ-রাষ্ট্র অথবা সাহিত্যজীবনের নিস্ফলতার প্রধান কারণ জনসাধারণের সহিত আমাদের শিক্ষিত সমাজের ব্যবধান—এই নিদারুণ ব্যবধান আমাদের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের প্রাণঘাতী—গ্রন্থকার মনে করেন—এই ব্যবধান—অর্থাৎ "আধুনিক সাহিত্যের কৃত্রিমতা, ভাবের অস্ফুটতা ও আভিজাত্যগৌরব ঝরিয়া যাইতেছে।—তিনি সাবধান-বাণী শুনাইয়া বলিতেছেন যে "একটা স্নায়ুবিকার ও মানসিক বিক্ষোভ বর্ত্তমান বাধাবিঘ্ন ও নিরাশা-বিক্ষিপ্ত, বিপর্য্যস্ত বাঙ্গালীর ঠিক যেন স্বাভাবিক অবস্থা, তাহার ধাতেরই পরিচায়ক। এইদিক হইতে বর্ত্তমান গল্প উপন্যাস অকাল-যৌবনবিলাসী স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত বাঙ্গালী চিত্তের নিঃসঙ্কোচ প্রকাশ। ইহা হইতে আমাদের রক্ষা পাওয়া চাই।" এই গ্রন্থের বিষয়নির্ব্বাচনের ধারা—এবং প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ ও ক্রমঃপরিণতিতে গ্রন্থকারের সবিশেষ চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার এখন উত্তরভারতপ্রবাসী। বাঙ্গলা দেশে অবস্থান কালে—দীর্ঘদিন ধরিয়া বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে ধারাবাহিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—বর্ত্তমান গ্রন্থখানি তাহারই ফল। বাঙ্গলাভাষার উপর তাঁহার দখল ছিল সুপ্রচুর এবং লিখিবার ভঙ্গীটিও ছিল তাঁহার নিজস্ব—তাই প্রত্যেক আলোচনাটি এমন

সুখপাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গভারতী তাঁহাকে স্নেহাতিশয্যে যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—প্রবাসী-অধ্যাপক ডক্টর রাধাকমল সে আশীর্ব্বাদের মর্য্যাদা রাখিলেন কৈ? বঙ্গভারতীর মন্দিরে একদা যাঁহাকে নিত্যপূজার অর্ঘ্য সাজাইতে দেখিয়াছি—মন্ত্রপাঠের তন্ময়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি—বাণী বরদায়িনীর পূজামণ্ডপে যিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বঙ্গসাহিত্যের শ্রী ও কল্যাণ প্রার্থনা করিয়াছেন, পর্ব্বদিনেও আজ তাঁহাকে বাণী-বিতানে খুঁজিয়া পাই না।

তিনি বলিয়াছিলেন—"জনসমাজের জাগ্রত অনুভূতির উত্তাপ সাহিত্যকে নব কলেবর দান করিবে; সাহিত্যের সেই বিরাট কায়ায় আমাদের বিশ্বরূপ দর্শন হইবে। শুধু রূপ দর্শন নহে, অরূপও এই রূপে মিলিবে। অসীম শিল্পী এবং শাশ্বত জীবন, যাহা এখন কল্পনার মায়া, যাহা এখন ছায়ার মত অস্ফুট তখন তাহা আপনার প্রাণেরই বিস্তার বলিয়া সে চিনিবে। দুইয়ের মধ্যে দুইয়েরই চিরন্তন বিকাশ—ইহাই ত সাহিত্য। শিল্পী কি আপনাকে চিনিবেন? আপনার জীবনকে অধিকার করিবেন? তখন যে সাহিত্যের নূতন চেতনা, লীলা নব নব নিতুই নব।"—তাঁহার একথা ঠিক।

কিন্তু শিল্পী আপনাকে চিনিলেন কৈ? আপনার জীবনকে অধিকার করিবার চেষ্টাই বা তাঁহার কৈ? লেখনী তাঁহার আজ বিদেশের ভাষা-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, স্বদেশের ভাবা আর তাঁহার অন্তরকে আকর্ষণ করিতে পারে না। 'ট্রাজেডি' আর কাহাকে বলে?

মোহানা—সুকবি শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু লিখিত। অসমছন্দের দুইটি কবিতা সমন্বিত। গল্প কবিতার বই। প্রকাশক—গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং, ১১ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। দাম এক টাকা।

ইতিপূর্ব্বে যশস্বী কবি অসমছন্দে অনেক গল্প-কবিতা লিখিয়াছেন।—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "পলাতকা"র পর হইতে এই প্রকার গল্প-কবিতা লিখিবার প্রয়াস কাব্য-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মাত্র দুইটি কবিতা দিয়া একখানি কবিতার বই বাহির করিয়া কবি সাহসের পরিচয় দিয়াছেন—কিন্তু সাহসের অনুপাতে কাব্য-সম্পদের প্রাচুর্য্য থাকিলে সুখী হইতাম। "আলো"টি আমাদের ভাল লাগিল।

চীনের পাখা—ছোট ছেলেদের সচিত্র গল্পের বই। শিল্পী শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং; পাবলিশার্স ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

হেমদাবাবুর ছোট ছেলেদের গল্প লিখিবার হাত আছে। আলোচ্য বইখানি শিশু-সাহিত্য হিসাবে সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করি।

কাটিং শিক্ষা—১ম ও ২য় ভাগ। মাষ্টার কালাচাঁদ দত্ত প্রণীত। মূল্য যথাক্রমে ১৲ ও ১।৹ টাকা—

আমরা দর্জ্জির কাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নহি, কাজেই ইহার ভুল ধরিতে পারিলাম না। তবে লিখিবার প্রণালী অতি সুন্দর, বই পড়িয়া কাটিং শিখিবার পক্ষে এই বই দু'খানি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে হইল। ছাটকার্টের অনেকগুলি ছবি আছে। মেয়েরা বাড়ী বসিয়া এই পুস্তকের সাহায্যে সেলাই শিক্ষা করিতে পারিবেন।

ভারতীয় সঙ্ঘতন্ত্র—প্রণেতা শ্রীমতিলাল রায়, প্রকাশক, প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্। দাম বারো আনা।

লেখক ভূমিকায় বলিতেছেন—"বাহিরের মানুষ সংসারের ছোটখাট উদ্দেশ্য লইয়া আপনাকে দিন দিন ক্ষুদ্র করিয়া তুলিতেছে। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্য লইয়া একত্র বহু ব্যক্তির সমাবেশ গোলযোগেরই সৃষ্টি করিবে। বৃহৎ ও সত্যের জন্য অল্প লোক লইয়া যদি সাধনা আরম্ভ হয়, তাহা হইলেও উপস্থিত দেশজোড়া কাজ মূর্ত্ত হইয়া না উঠিলেও ভবিষ্যতে কিন্তু এই তপস্যাই জয়যুক্ত হইবে। আত্মার মিলন যেখানে সার্থক হইয়াছে সেই খানেই সঙ্ঘ।"

গ্রন্থখানিতে বিচার করিয়া চিন্তাশীল গ্রন্থকার তাঁহার ভূমিকায় এই উক্তিকে সপ্রমাণ করিয়াছেন।

Communism সম্পর্কে যাঁহারা আলোচনা করেন বইখানি তাঁহাদের অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত।

প্রাচ্যের জাগরণ—প্রণেতা শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত, প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত, দাম এক টাকা।

শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় বহিখানির একটী সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন।

জাপান চীন পারস্য তুর্ক আফগানিস্থান কোরিয়া শ্যাম প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রীয় চেতনা ও জাতীয়তার উদ্বোধনের ইতিহাস সংক্ষেপে এই গ্রন্থে গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রকাশের বৈশিষ্ট্যে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। বইখানির ছাপা ও বহিরাবরণ সুন্দর। অনেকগুলি হাফটোন ছবিও আছে।

রূপ ও যৌবন—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, বি, এ। নিয়োগী নিকেতন, ১১১।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৬২ পৃষ্ঠা দাম আট আনা মাত্র।

ছন্দ ও মিলের দোষ স্থানে স্থানে থাকা সত্ত্বেও বই খানিতে আমরা সত্যকার একটি কবি-হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছি। সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে বইখানি মোটেই নিখুঁৎ নহে, কিন্তু মাঝে মাঝে একটি উপমা কি একটি কলি আমাদের মনকে নাড়া দেয়, অথচ ধরিতে গেলে সে কলিটিও যে বিশেষ কোন সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক তাহা নহে, তবুও উহা মনে আশা জাগাইয়া দেয়। মোটামুটি ভাবে বইখানি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। কবিযশ অর্জ্জন করিতে গ্রন্থকারকে আরও অনেকখানি পথ চলিতে হইবে।

মাসকাবারি

ভারতবর্ষ

মিলন-বৈঠক

এলাহাবাদ, ১লা নবেম্বর—শিখ ও হিন্দু নেতাদের ৪ ঘণ্টা ব্যাপী বৈঠক।

বোম্বাই, ১লা—সৌকত আলির বক্তৃতা, 'এখন কি কলহ ও সাম্প্রদায়িক বিরোধের সময়? শান্ত, সংযত ও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের ভাব নিয়া আমাদিগকে বর্ত্তমান সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইবে।'

এলাহাবাদ, ৪ঠা—বৈঠকের কমিটিতে এখনও পাঞ্জাব ও বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যাধিক্য, সিন্ধু-বিচ্ছেদ ও যুক্ত নির্ব্বাচন বিষয়ে কিছু ঠিক হয় নাই। পাঞ্জাব সমস্তা লইয়াই সমূহ সঙ্কট বাধিয়াছে।

৫ই—সাব-কমিটি কোন সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারায় সন্ধ্যায় বৈঠকের অধিবেশন হয় নাই।

৬ই—আমেরিকা-যাত্রার্থে সৌকত আলির এলাহাবাদ-ত্যাগ।

রাজা নরেন্দ্রনাথ ও সুন্দরসিং লাহোর যাত্রা করিয়াছেন।

৭ই—বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমানগণের সর্ব্বসম্মত ভাবে সভাপতির নিকট প্রস্তাব পেশ—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য সংখ্যা নিম্নের হিসাবে করিবার জন্য প্রস্তাব হইয়াছে—মুসলমান ১২৭, হিন্দু ১১২, ইউরোপীয় ৭, এংলো-ইণ্ডিয়ান ২, ভারতীয় খৃষ্টান ২।

বোম্বাই, ৮ই—ভারতলীগের ভারত-ত্যাগের পূর্ব্বে বিবৃতি—কংগ্রেস ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল। শান্তির একমাত্র পন্থা কংগ্রেসের সাহায্য-লাভ।

এলাহাবাদ, ৯ই—বৈঠকের কর্ত্তৃপক্ষের বিবৃতি—সারাদিন আলোচিত হইবার পর পাঞ্জাব চুক্তি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

অন্যান্য প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সমূহের অবস্থা ও সিন্ধু-বিচ্ছেদ সম্পর্কে বৈঠকে আলোচনা চলিতেছে।

১১ই—মিলন-বৈঠক-কমিটি ভারপ্রাপ্ত কাজেই অবিচলিত ভাবে লাগিয়া আছেন।

১৩ই—সিন্ধু-সমস্তা সম্পর্কে একটি সর্ব্বসম্মত চুক্তি হইয়াছে। কয়েকটি সর্ত্ত ও রক্ষা-কবচ সহ সিন্ধু-পৃথক করণে মিলন-বৈঠক-কমিটি রাজী।

১৪ই—সভাপতি বিজয়রাঘব আচারিয়ার দিল্লী-যাত্রা। তাঁহার মতে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে তাঁহারা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছেন। রাজাগোপাল চারিয়ার বিবৃতি, সমস্ত জটিল সমস্তারই সমাধান হইয়া গিয়াছে।

বোম্বে ক্রনিকেলের মত, প্রধান মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত এখন এক টুকরা কাগজ মাত্র। ভারত প্রমাণ করিয়াছে যে সে নিজেই তাহার ভেদ-বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারে, বাহিরের সাহায্য সে চাহে না।

কমিটি-রুমে মিঃ জাফর আলির কবিতা আবৃত্তি—তাঁহারা প্রয়াগে শক্তি পাইয়াছেন। এই শক্তিবলে শতাব্দীর ভগ্ন সম্পর্ক জোড়া লাগিয়াছে এবং ত্রিবেণীসঙ্গমে আবার সেই হারানো বন্ধুকে ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা এই স্থান হইতে মাতৃভূমির মঙ্গলকল্পে ঐক্যের মন্ত্র লইয়া যাইতেছেন।

১৫ই—নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা সম্পর্কে নূতন সমস্তা উপস্থিত হইয়াছে।

দিল্লী, ১৫ই—বিজয়রাঘব আচারিয়ার বিবৃতি—মহম্মদ আলীর পরিকল্পনা মিশ্র-নির্ব্বাচন প্রথার আমদানী করিবে।

এলাহাবাদ, ১৬ই—অন্ত রাত্রির অধিবেশনে একটি আপোষ হইয়াছে। উহা মহম্মদ আলির পরিকল্পনারই সামান্য অদলবদল মাত্র।

১৭ই—সব-কমিটির সভায় রাত্রে সকল বিষয়ের আপোষ-নিষ্পত্তি। গান্ধীজী ও জহরলালকে তারযোগে সংবাদ প্রেরিত। কেন্দ্রীয় সভায় শিখেরা ৩০০ টির মধ্যে ১৪টি আসন সংরক্ষিত পাইবেন। শতকরা ৩২টি আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

এলাহাবাদ, ১৮ই—বাংলার হিন্দুগণ শতকরা ৪৪·৭ ও মুসলমানগণ ৫১টি সদস্য পদ পাইবেন। ১০ বৎসর পরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রহিত হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেই ভোটদানের অধিকারী হইবে।

কমিটি পুনরায় ৩রা ডিসেম্বর বসিবে। মিলন-বৈঠকের অধিবেশন ৪ঠা মেয়ো হলে (এলাহাবাদ) বসিবে।

কেন্দ্রীয় পরিষদে শতকরা ৪২·৩ মুসলমানদের জন্য শতকরা ৪·২৩ শিখদের জন্য সংরক্ষিত। (এ ব্যবস্থা শুধু বৃটিশ ভারতে প্রযোজ্য)।

পাঞ্জাব মন্ত্রিমণ্ডলে অন্ততঃ ১ জন হিন্দু ও ১ জন শিখ থাকা চাই। ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা ৫১ শিখ, হিন্দু ২৭, দেশীয় খৃষ্টান, এংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ান শতকরা ২টি।

ইহা ছাড়া ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও ব্যক্তিগত আইন, সামরিক ও বিচার বিভাগ, মন্ত্রিসভা, সরকারী চাকুরী, যুক্ত নির্ব্বাচন, বাঙ্গলা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ আপোষ হইয়াছে।

১৮ই—মালব্যজীকে রবীন্দ্রনাথের তার, দেশে মিলন-প্রতিষ্ঠা করিতে আপনার চেষ্টা সফল হৌক, ইহা আমি ক্রমাগতই প্রার্থনা করিতেছি।

মুসলমান সম্মেলন

নয়াদিল্লী, ২০শে—দিল্লীতে মুসলমান সম্মেলন। মহম্মদ হোসেনের মন্তব্য "সর্ব্ব দলের সভা নহে, তিন দলের সভা"। দুই জন প্রতিনিধির সভাত্যাগ। কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত।

২১শে—আগামী ২রা ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌয়ে সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমান প্রতিনিধিগণের এক বৈঠক আহুত হইবে।

লণ্ডন, ২৩শে—এলাহাবাদ চুক্তি সমর্থনে সৌকত আলির বক্তৃতা।

কলিকাতা, ২৫শে—ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের সহিত আলোচনার্থে মালব্যজীর কলিকাতা আগমন।

২৫শে—মিলন-বৈঠকের সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দ মালব্যের বিবৃতি—এলাহাবাদ মিলন কমিটিতে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহার আলোচনার্থে ১০ই ডিসেম্বর কমিটির বৈঠক, ১১ই ও ১২ই মিলন সম্মেলনের বৈঠক এবং ১৩ই এলাহাবাদে সর্ব্বদল সম্মেলন হইবে।

কলিকাতা, ৩০শে—১৩ই ডিসেম্বর মিলন-বৈঠক ও ১৪ই সর্ব্বদল সম্মেলনে মালব্যজী কর্ত্তৃক বিভিন্ন ৪০টি প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধি প্রেরণার্থে নিমন্ত্রণ।

১০ই ও ১১ই ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌয়ে মুসলিম সম্মেলন।

অস্পৃশ্যতা-পরিহার আন্দোলন

বোম্বাই, ৫ই—যারবেদা জেল হইতে মহাত্মাজীর বিবৃতিতে জানা যায়, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্পর্কে প্রকাশ্যে প্রচার-কার্য্য চালাইবার অনুমতি দিয়াছেন। এ সম্পর্কে দর্শকগণের সহিত অবাধ সাক্ষাৎকারের স্বাধীনতাও তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে।

পুণা, ৭ই—মহাত্মাজীর প্রেস-প্রতিনিধিকে বিবৃতি—হিন্দু ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ মতবাদ নয়—"শ্রীযুত কেলাপ্পান যদি উপবাস ব্রত পুনরায় আরম্ভ করা আবশ্যক মনে করেন, তাহা হইলে আমিও তাঁহার সহিত উপবাস করিতে বাধ্য।"

পুণা, ৯ই—যারবেদা চুক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তর দিয়া মহাত্মাজী বিবৃতি দিয়া বলিয়াছেন,—"জননায়কগণ ও জনসাধারণ যতই তাঁহাদের মত প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবেন ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।"

বোম্বাই, ১১ই—"যদি জামোরিন ১লা জানুয়ারীর মধ্যে সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে না পারেন, তাহা হইলে স্বভাবতঃই আমার এবং কেলাপ্পানের অদৃষ্টে দ্বিতীয়বার অনশন-ব্রত লেখা আছে" গুরুবায়ুর মন্দির সমস্যা সম্বন্ধে 'টাইম্‌স'এর এক সংবাদদাতাকে গান্ধীজী এই কথা বলিয়াছেন।

পুণা, ১৪ই—মিঃ পি এন-রাজভোজের মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাতের বিবৃতি। গুরুবায়ুর মন্দির প্রবেশ সম্পর্কে মহাত্মাজী ২রা জানুয়ারী হইতে অনশন আরম্ভ করার সঙ্কল্প তাঁহাকে জানাইয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর পঞ্চম বিবৃতি—আন্দোলনে হরিজনরা কি সাহায্য করিতে পারে।

কলিকাতা, ১৪ই—শ্রীযুক্ত বি, সি, চ্যাটার্জ্জি পুণা-চুক্তিতে বাংলার প্রতি অবিচার দর্শাইয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন, বাংলায় প্রচণ্ড অস্পৃশ্যতা নাই।

বোম্বাই, ১৩ই—অস্পৃশ্যগণের উন্নতিবিধায়ক লীগ-গঠন।

চন্দননগর ১৪ই—প্রবর্ত্তক আশ্রমের মতি বাবুকে মহাত্মাজীর চিঠি, বর্ণাশ্রম পাপ নহে, জাতিভেদ পাপ।

পুণা, ১৫ই—মহাত্মা গান্ধীর ষষ্ঠ বিবৃতি—উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও হরিজনদের মধ্যে কার্য্য-পদ্ধতির নির্দ্দেশ।

পুণা, ১৬ই—মহাত্মাজীর সপ্তম বিবৃতিতে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন সম্পর্কে সনাতনীদের প্রশ্নের উত্তর।

কালিকট, ১৬ই—'জামোরিণ'এর বিবৃতির উত্তরে কেলাপ্পান—তিনি যদি বুঝিতে পারেন বাধা-নিষেধ ধর্ম্ম ও মানবতাকে কলুষিত করে, তবেই মন্দির-দ্বার খুলিয়া দিবেন, নচেৎ প্রয়োজন নাই।

পুণা, ১৭ই—অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন সম্পর্কে মহাত্মার অষ্টম বিবৃতি—"জীবন্ত মানব সমাজের সাধু আচরণই প্রকৃত শাস্ত্র।"

কলিকাতা, ১৮ই—ভারতীয় অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সমিতির বাঙ্গলা শাখা সমিতি গঠিত।

কালিকট, ১৮ই—সংবাদ-পত্র প্রতিনিধির নিকট কেলাপ্পানের বিবৃতি, অনশন আত্মহত্যা নহে।

বারাণসী, ২১শে—বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য-সঙ্ঘ-সম্মেলনের সভাপতি জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য সঙ্ঘের অধিবেশন-অভিভাষণে বলেন—অস্পৃশ্যদিগের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া পাপ।

নয়া দিল্লী, ২৩শে—জামোরিনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গান্ধীজী দ্বিতীয় বার অনশন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই হয়তো তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। লর্ড স্যাঙ্কি মহাত্মার মুক্তির জন্য বৃটিশ মন্ত্রিসভার উপর চাপ দেওয়ায় স্যামুয়েল হোরও তাঁহার মুক্তিদানের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন এবং যথাসত্বর গান্ধীজীকে মুক্তি দিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

লণ্ডন, ২৪শে—সাপ্রু, জয়াকর ও লর্ড স্যাঙ্কির মধ্যে কথোপকথন। মহাত্মাজীর মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পুণা, ২৬শে—জনমত প্রতিকূল হইলে গুরুবায়ুর অনশনে মহাত্মাজীর বিরত থাকিবার সম্ভাবনা।

নয়াদিল্লী, ২৮শে—গুরুবায়ুর মন্দির উন্মোচন ব্যাপারে মহাত্মাজীর অনশন সম্পর্কে এম, সি, রাজার বিবৃতি—এই সঙ্কটের সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যথাসম্ভব সত্বর জামোরিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জাতির জন্য মহাত্মাজীর জীবনরক্ষার্থে একটি মীমাংসা করা উচিত।

লণ্ডন, ২৭শে—ফ্রি প্রেসের স্পেশ্যাল কমিশনার অবগত হইয়াছেন যে মহাত্মাজীর অনশনের বিষয় লইয়া গবর্ণমেণ্ট বড়লাটের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

নয়াদিল্লী, ২৭শে—ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য মিঃ থাপ্পানের উক্তি—গুরুবায়ুর মন্দির ব্যক্তিগত সম্পত্তি। উহাকে সাধারণের সম্পত্তি মনে করিয়া তথায় সত্যাগ্রহ করা কোনও হোটেলে কয়েক জন বন্ধুকে এক টেবিলে ভোজন করিতে আপত্তি করার সমতুল্য। হরিজনদের জন্য প্রভাতে কিছুক্ষণ মন্দির উন্মুক্ত রাখিবার প্রস্তাব।

২৮শে—মহাত্মাজীর নবম বিবৃতি—নারীদের প্রতি উপদেশ, মালাবারে যাও।

নয়া দিল্লী, ৩০শে—ইতিপূর্ব্বে ২৫ জন হিন্দু (বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য) লণ্ডনে স্যর এন্ এন্ সরকারকে তার করিয়াছিলেন যে পুণায় অনুন্নত জাতিসংক্রান্ত চুক্তি-নামাটি বাংলার হিন্দুগণের সহিত পরামর্শ না করিয়াই রচিত হইয়াছিল। সুতরাং উহার সংশোধন আবশ্যক। ইহার উত্তরে নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা পরিহার সঙ্ঘের সভাপতি বিড়লা ও সম্পাদক ঠকর লণ্ডনে আম্বেদকারকে এক তার করিয়া জানাইয়াছেন—বাংলার হিন্দুগণ কর্ত্তব্যে ত্রুটি করিয়াছেন। কলিকাতায় মিঃ ঠকর দেখিয়াছেন যে সাধারণ ভাবে হিন্দুগণের মনোভাব পুণা-চুক্তির অনুকূলে, কাজেই যে-চুক্তি মন্ত্রি-সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে, তাহার সংশোধন হইতে পারে না।

বিপ্লব

যশোহর, ১লা—২৭শে অক্টোবর তারিখের যশোহর ট্রেজারি আক্রমণের সংবাদ অলস মস্তিষ্কের কল্পনা বলিয়া প্রমাণিত।

লণ্ডন, ১লা নবেম্বর—রয়াল এম্পায়ার সোসাইটিতে ভারতে বিপ্লবী অনাচার সম্বন্ধে স্যর চার্লস্ টেগার্ট বক্তৃতা দিয়াছেন—শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান মাত্রেই বিপ্লবী দলভুক্ত ছেলে রহিয়াছে।

ঢাকা, ১লা—স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনাল কর্ত্তৃক কামাখ্যা সেন হত্যার আসামী কালীপদ মুখার্জ্জীর বিচার সুরু।

কলিকাতা, ২রা—আলিপুরে ষ্টেট্স্‌ম্যান সম্পাদক স্যর ওয়াটসন হত্যা ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ধৃত ছয় জনের বিচার সুরু।

চট্টগ্রাম, ৬ই—জন-সভায় হিন্দুদের উপর আশী হাজার টাকা ট্যাক্স ও দমননীতির নিন্দা।

ঢাকা, ৮ই—কে, পি, সেন হত্যা মামলায় আসামী কালিপদ মুখোপাধ্যায় (২৩ বৎসর) ৩০২ ধারা অনুসারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

কলিকাতা, ৯ই—ওয়াটসন প্রাণনাশ চেষ্টার আসামীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও ২১১ ধারার সহিত ১২০ (খ) অনুসারে চার্জ্জ গঠিত।

ঢাকা, ১১ই—গত ২৮শে আগষ্ট গ্র্যাসবি হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত বিনয়ভূষণ দে রায়ের (২৪ বৎসর) বিচার স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালে আরম্ভ।

কলিকাতা, ১৪ই—ওয়াটসন মামলায় আসামী পক্ষের সওয়াল জবাবে কে, সি, চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া এই অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় নাই। ইহা রাজনৈতিক অপরাধ। ভ্রান্ত মতের বশবর্ত্তী হইয়া ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। ডি ভ্যালেরার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, পূর্ব্বে ডি ভ্যালেরা অধ্যাপক ছিলেন, পরে হত্যাকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের অবিসম্বাদী নেতা।

মীরাট, ১৫ই—মীরাট মামলার রায় ১লা ডিসেম্বর প্রদত্ত না হইয়া ১৫ই প্রদত্ত হইবে।

কলিকাতা, ১৭ই—ওয়াটসন মামলার রায়: সুনীলের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। প্রমোদের ১০ বৎসর ও অমরের ২ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড। প্রাণকুমার, অবনী ও মদনের মুক্তি।

ঢাকা, ১৮ই—গ্র্যাসবি মামলায় রায়—বিনয়ভূষণ দে রায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত।

রাজসাহী, ১৮ই—রাজসাহী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ লিউক্‌কে গুলি। স্কন্ধে ও গলদেশে তিনটি আঘাত। আহত কলিকাতায় স্থানান্তরিত।

লণ্ডন, ১১ই—ডগলাস হত্যার অভিযুক্ত প্রদ্যোৎকুমারের আপীল অগ্রাহ্য, তাহার ফাঁসীই বাহাল থাকিল।

মেদিনীপুর, ২৪শে—প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্যের মাতা কর্ত্তৃক তাঁহার প্রাণভিক্ষার আবেদন বাংলার গবর্ণর কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য।

চট্টগ্রাম, ২৮শে—অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ফেরারী আসামীর সন্ধানে পটিয়ার নিকট জঙ্গলখাইন গ্রামে পুলিশের হানা। ফলে ১ জন খুন ও ২ জন গ্রেপ্তার।

লণ্ডন, ২৮শে—কমন্স সভায় মেজর মিল্‌নারের প্রশ্নোত্তরে হোর বলেন, বাংলা দেশে অনেক লোক প্রকারান্তরে বিপ্লবীদের কার্য্যে সায় দিয়া চলে এবং সহায়তাও করে। এরূপ অবস্থায় সম্মিলিত জরিমানা অবশ্যম্ভাবী।

লণ্ডন, ২৮শে—এক ভোজসভা-বক্তৃতায় স্যর অ্যালফ্রেড ওয়াটসন্ কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বী সংবাদ-পত্র স্থাপনের প্রস্তাব।

কলিকাতা, ৩০শে—গ্র্যাণ্ড হোটেলে সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ ভোজ-সভায় বাংলার গবর্ণর বক্তৃতায় বলিয়াছেন—দমননীতি কঠিন হয় নাই, আবশ্যকমত প্রয়োগ হইয়াছে মাত্র।

ব্যবস্থা-পরিষদ

নয়াদিল্লী, ৭ই—অধিবেশন আরম্ভ। স্যর জোসেফ ভোরের অটোয়া চুক্তি গ্রহণের প্রস্তাব।

৮ই—অটোয়া প্রস্তাবের আলোচনা।

৯ই—বি ভি যাদব, এস সি মিত্র, আজাহার আলি, গয়াপ্রসাদ সিংহ এবং এস জি যোগ কৌশলে সরকারের অর্ডিন্যান্স বিলের সমস্ত বিধান অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টার বিবরণ দিয়া স্বতন্ত্র অভিমত সহ অর্ডিন্যান্স বিলের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট সই করিয়াছেন।

১০ই—ডাঃ গৌরের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় অটোয়া চুক্তি আলোচনার্থে কমিটিতে প্রেরিত। কমিটির সদস্যগণ (১) ভোর (২) পার্সন্‌স্ (৩) সমুখম্ চেট্টি (৪) শেঠ আব্দুল্লা (৫) জেম্‌স্ (৬) বি দাস (৭) ইয়াসিন খাঁ (৮) ডি সুজা (৯) রঙ্গ আয়ার (১০) আব্দার রহিম (১১) মোদী (১২) জিয়াউদ্দীন (১৩) সীতারাম রাজু (১৪) জুলফিকার আলিখাঁ (১৫) হরিসিং গৌর।

১৪ই—মিঃ হেগের বিপ্লবী অনাচার দমন বিলের প্রস্তাবের উত্তরে স্যর হরি সিং গৌরের আপত্তি—বিলের ৫ম ধারা ভারত গবর্মেণ্ট আইনের ১০৭ ধারার বিরোধী। কারণ উহাতে হাইকোর্টের ক্ষমতা সংকুচিত করা হইয়াছে। আপত্তি গৃহীত।

১৫ই—অর্ডিন্যান্স বিলের আলোচনা।

দিল্লী, ১৫ই—সিলেক্ট কমিটিতে চার ঘণ্টাকাল অটোয়া চুক্তির আলোচনা।

নয়াদিল্লী, ১৭ই—অর্ডিন্যান্স বিলের।

নয়াদিল্লী, ১৯শে—অটোয়া কমিটির অধিবেশন। নলিনীরঞ্জন সরকার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন—অটোয়া চুক্তি ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপোষক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

২১শে—সেখ সাদেক হোসেন অর্ডিন্যান্স বিল সাধারণে প্রচার করিবার যে প্রস্তাব আনিয়াছিলেন—৬৩-৪০ ভোটে তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট অনুসারে বিল আলোচনা করিবার প্রস্তাব ৬৩-৩৯ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

২২শে—সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া অর্ডিন্যান্স বিলের ২নং ধারা সৈন্য ও পুলিশ বিভাগে যোগদান না করার প্ররোচনায় কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা পাশ।

২৩শে অর্ডিন্যান্স বিলের পুনরালোচনা। ভোটের অল্পতায় এস্ সি মিত্র ও অন্যান্য সদস্যদের বিভিন্ন সংশোধন-প্রস্তাব অগ্রাহ্য। ৩য় ধারা গৃহীত।

নয়াদিল্লী, ২৭শে—অটোয়া কমিটির ৩ জন ব্যতীত সকল সদস্যই স্যর হরি সিং গৌরের পরিকল্পনানুযায়ী অটোয়া চুক্তি ৩ বৎসরের জন্য অনুমোদনার্থে প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন।

২৮শে—পরিষদে অটোয়া কমিটির রিপোর্ট পেশ। সাময়িক ভাবে তিন বৎসরের জন্য অনুমোদন।

অর্ডিন্যান্স বিলের আলোচনা।

২৯শে—অর্ডিন্যান্স বিলের ৫ম ও ৬ষ্ঠ ধারা গৃহীত। ৭ম ধারার আলোচনা।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভা

কলিকাতা, ২১শে—অধিবেশন আরম্ভ। প্রশ্নোত্তরে জানা যায় বর্ত্তমান বৎসরে ৫২ জন বন্দী আন্দামানে প্রেরিত। অটোয়া সম্মেলনের নির্দ্ধারিত প্রস্তাব সম্পর্কে বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের সহিত কোন পরামর্শ করা হয় নাই।

২২শে—কলিকাতা কর্পোরেশনে পৃথক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার অবসানে মৌঃ কাশেমের নূতন বিল উত্থাপনে স্বায়ত্ত শাসন মন্ত্রীর বিবৃতি—গবর্ণমেণ্ট এই অধিবেশনেই এ বিষয়ে বিল উপস্থাপিত করিবেন। খাঁ বাহাদুর আজিজুল হকের কুসীদজীবী বিল ২৫ জন সদস্যের সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত। হকের বঙ্গীয় মেলায় স্বাস্থ্যের অবস্থা বিল ও সৈয়দ মজিদ বক্সের বঙ্গীয় প্রজাগণকে অত্যধিক সুদ হইতে রক্ষার বিলও সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত।

২১শে—মৌলবী তমিজুদ্দিন খাঁ আনীত প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধক প্রস্তাবে জমির মালিক কে, জমিদার না প্রজা সম্পর্কে বিতর্ক।

২৩শে—জনরক্ষা বিল মিঃ প্রেন্টিস্ কর্ত্তৃক উপস্থাপিত। জনমত সংগ্রহার্থে বেসরকারী প্রস্তাব ৬৬-১৭ ভোটে অগ্রাহ্য।

২৪শে—ঘণ্টাখানেকের অধিবেশনে মিঃ এ রহিমের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা বাহাল রাখার প্রস্তাব ৩৮-৩২ ভোটে অগ্রাহ্য। অতঃপর আজিজুল হকের নদীয়া জলপথ বিল সাধারণে প্রচারার্থে প্রস্তাব গৃহীত।

২৫শে—বাংলার একটি উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপক সভা গঠনের জন্য শ্রীযুক্ত এস্ এম্ বসুর উৎস্থাপিত প্রস্তাব ৪৬-৪৪ ভোটে অগ্রাহ্য।

সুভাষচন্দ্র ও সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আনীত মুলতুবী প্রস্তাব হিন্দু ও মুসলমান সদস্যগণের সমর্থনে গৃহীত।

২৯শে—স্বায়ত্ত শাসন আইন সংশোধন বিলের পুনরালোচনা।

৩০শে—মিঃ প্রেন্টিস্ বঙ্গীয় জনরক্ষা বিলের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন।

গোলটেবিল বৈঠক

নয়া দিল্লী, ৪ঠা নবেম্বর—বৃটিশ পার্লামেণ্টের পক্ষ হইতে তৃতীয় বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করিবেন (১) ম্যাকডোনাল্ড (২) স্যাঙ্কি (৩) হোর (৪) হেলস্যাম (৫) সাইমন (৬) আরুইন (৭) ডেভিডসন্ (৮) বাট্‌লার; বেসরকারী প্রতিনিধি (১) পীল (২) উইণ্টারটন (৩) রেডিং (৪) লোদিয়ান। শ্রমিক দল বৈঠকে যোগদান করিতে অনিচ্ছুক।

বোম্বাই, ৭ই—গোলটেবিল বৈঠক যোগদানার্থী ডাঃ আম্বেদকার বলিয়াছেন—আমি তৃতীয় গোলটেবিলের ফলাফল সম্বন্ধে খুব আশান্বিত নহি।

লণ্ডন, ১২ই—১০ জন প্রতিনিধির লণ্ডন আগমন। অবশিষ্ট ১৪ জন ১ সপ্তাহের মধ্যে পৌঁছিবেন।

লণ্ডন, ১৬ই—গতকল্য রাত্রে বৈঠকের প্রতিনিধিগণ বৈঠকের আলোচ্য তালিকা পাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় দায়িত্বের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রতিনিধিদের মত নেওয়া হইতেছে।

লণ্ডন, ১৭ই—গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা। আগাখাঁ বক্তৃতা দেওয়ার পর স্যামুয়েল হোর বলেন—আগামী ২৯শে ডিসেম্বরের মধ্যে বৈঠকের কাজ শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লণ্ডন, ২০শে—বর্ম্মা হইতে মিঃ চীৎলাইং এক তার করিয়াছেন যে বর্ম্মার নির্ব্বাচক মণ্ডলী বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে পরিষ্কার ভাবে মত দিয়াছে। অতএব গোলটেবিল বৈঠকে যেন বর্ম্মার পক্ষে প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়।

লণ্ডন, ২১শে—গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভোট সম্বন্ধে আলোচনা। বেগম শা নওয়াজ সকল বিষয়েই স্ত্রীলোকদের পুরুষদের সহিত সমানাধিকার দাবী করেন।

২৪শে—কেন্দ্রীয় পরিষদের সহিত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনায় সাব্যস্ত হয় যে যুক্তরাষ্ট্র গঠন কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট অনুসারে সম্পর্কের নীতি বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইবে। এই কমিটির রিপোর্টের অপেক্ষায় ২৮শে পর্যন্ত বৈঠক মুলতুবী।

২৫শে—ফ্রী প্রেসের বিশেষ কমিশনার গোলটেবিল বৈঠকের কার্য্যাবলী পরিদর্শনার্থে লণ্ডন পৌঁছিয়া লিখিতেছেন, ভারত সম্পর্কে গোঁড়াদল মন্ত্রিসভাকে জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেস অথবা মহাত্মার সহিত কোন অবস্থাতেই সন্ধি হইবে না। এই প্রশ্ন লইয়াই প্রগতিপন্থীরা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন।

লণ্ডন ২৮শে—বৈঠকে আইন ও শৃঙ্খলা এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের সহিত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সম্পর্ক আলোচনায় তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা। স্যর

ব্রিটিশ রাজ বলেন যে, বাংলায় অস্ত্র বিশেষ ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। এন্ এন্ সরকার তাঁহাকে সমর্থন করেন। প্রকাশ, গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তে বড়লাট ও প্রাদেশিক গবর্ণরদের হস্তে অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

২৯শে—লর্ড আরুইন ও স্যাপ্রুর সতর্ক বাণী—কংগ্রেস কাউন্সিলগুলি দখল করিয়া শাসনতন্ত্র অচল করিয়া ফেলিবে।

বিদেশ—

ওয়াশিংটন, ৩১শে অক্টোবর—ওহিয়োর অন্তর্গত এথেন্সের নিকট প্রেসিডেন্ট হুভারের স্পেশাল-ট্রেন ধ্বংসের প্রচেষ্টা।

টোকিও, ৫ই নবেম্বর—সমাজতন্ত্রী সৈন্যবাহিনী গঠনের অভিযোগে এক জাতীয়তবাদী নেতার পুত্র হেদেজো তারমা ও তাঁহার ৫ জন সহকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বার্লিন, ৭ই—জার্ম্মান পার্লামেণ্টের সদস্য-নির্ব্বাচনের ফল—নাজি ১৯৫, সোস্যালিষ্ট ১২১, কম্যুনিষ্ট ১০০, জার্ম্মান জাতীয়তাবাদী ৫১ ইত্যাদি। ভোটের উপর নূতন পার্লামেণ্টে প্যাপেন-বিরোধী দলই প্রবল হইবে। নাজি দলের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ। গত বার তাহাদের সংখ্যা ছিল ২৩০।

লণ্ডন, ৭ই—কমন্স সভায় প্রশ্নোত্তরে স্যামুয়েল হোর বলিয়াছেন—গোল-টেবিল বৈঠকগুলির ব্যয় বাবদ বরাদ্দ ১,৯৫,০০০ পাউণ্ডের মধ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ৭১০০০ ও ভারত গবর্ণমেণ্ট ১২৪০০০ পাউণ্ড দিবেন।

নিউইয়র্ক, ৯ই—প্রজাতন্ত্রীদলের প্রার্থী নিউইয়র্ক রাজ্যের গবর্ণর মিঃ রুজভেল্ট অধিকাংশ ভোটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ডাবলিন, ৯ই—গতকল্য সন্ধ্যায় 'ফায়না ফেল' (ডি ভ্যালেরার দল) এর বার্ষিক সভায় ক্লিফেট-মন্ত্রীসভার প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশিত হইয়াছে।

১১ই—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় ইউনিয়ন জ্যাক পোড়ান হইয়াছে।

টোকিও, ১২ই—চাইনিজ ইষ্টার্ণ রেলপথের ধারে যুদ্ধ হওয়ায় ১৩ জন জাপানী ও ৫০০ শত মাঞ্চুরিয়ান নিহত।

পেশোয়ার, ১৩ই—আফগানিস্থানে রাজতন্ত্রী ষড়যন্ত্রের ফলে কাবুলে জেনারেল গোলাম নবি খাঁর ফাঁসি।

ওয়াশিংটন, ১৩ই—সমর ঋণ সম্বন্ধে মিঃ রুজভেল্টের নিকট মিঃ হুভারের পত্র।......যুক্তরাষ্ট্রের নিকট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের লিপি : বৃটিশ সমর ঋণের পরবর্ত্তী কিস্তি দিবার তারিখ ১৫ই নবেম্বর—কিন্তু অর্থনৈতিক বৈঠকের অধিবেশন পর্য্যন্ত ঋণের টাকা পরিশোধ স্থগিত রাখার অনুরোধ। ফরাসী গবর্ণমেণ্টও অনুরূপ চিঠি দিয়াছেন।

জেনেভা, ১৫ই—নিরস্ত্রীকরণ কমিটিতে দারুণ গোলযোগ।

লণ্ডন, ১৫ই—অটোয়া চুক্তি লর্ড-সভায় চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত। আজ সম্রাট উহাতে সম্মতি দিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড এখনও চুক্তি গ্রহণ করে নাই। সুতরাং ঐ দুই দেশে আইন-প্রয়োগ-ব্যবস্থা হয় নাই।

ডাবলিন, ১৬ই—মিঃ কস্‌গ্রেভ গবর্ণমেণ্টের উপর অনাস্থা প্রকাশ করিয়া আইরিশ পার্লামেণ্টে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ৭৬-৭০ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

ইস্তাম্বুল, ১৬ই—মিঃ ট্রট্‌স্কী ডেনমার্কে আশ্রয়লাভে সমর্থ হইয়াছেন। সপরিবারে ইতালি হইতে তিনি কোপেনহেগেনে যাত্রা করিয়াছেন।

সাংহাই, ১৭ই—গত মার্চ্চ মাসের মধ্য হইতে চীন ও তিব্বতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে প্রাচীরবেষ্টিত বাটাং সহর ৪৮ দিন অবরুদ্ধ ছিল।

বার্লিন ১৮ই—প্রুশিয়ার শাসনকর্ত্তা পদে প্যাপেন। হিট্‌লারের চ্যান্সেলার পদপ্রাপ্তির আশা সুদূরপরাহত।

বার্লিন, ১৯শে—জার্ম্মানিতে সম্মিলিত গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় বিভিন্ন দলে পরামর্শ। প্রেসিডেণ্ট ও হিটলারের কথাবার্ত্তা।

প্যারিস, ২০শে—রেল লাইনে বোমা দিয়া হেরিয়তের গাড়ি উড়াইবার চেষ্টা। এ কাজ বৃটন জাতীয়তাবাদীদের, অনেকেরই এই ধারণা।

জাতি-সঙ্ঘ পরিষদ

জেনেভা, ২০শে—লিটন কমিশনের প্রায় সমস্ত প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া জাপানের বিবৃতি।

২১শে—মাঞ্চুরিয়া সমস্যা সম্পর্কে ডি ভ্যালেরার সভাপতিত্বে জাতিসঙ্ঘ কাউন্সিলের অধিবেশন। জাপানী প্রতিনিধির ৪০ মিনিট বক্তৃতা।

লণ্ডন, ২২শে—ডাবলিনের ভারতীয় আইরিশ স্বাধীনতা-সঙ্ঘের সদস্যগণ জেনেভায় ডি ভ্যালেরাকে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণার্থে তার করিয়াছেন।

বার্লিন, ২২শে—নিয়মানুযায়ী অধিক সংখ্যক ভোটলাভ করিলে হিটলারের চ্যান্সেলার পদের দাবী হিণ্ডেনবার্গ স্বীকার করিতে রাজী হইয়াছেন।

ওয়াসিংটন, ২৩শে—হুভার রুজভেল্টের সাক্ষাৎ। সমর ঋণ সম্বন্ধে আলোচনা।

বার্লিন, ২৩শে—হের হিটলার প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গকে জানাইয়াছেন যে, তিনি যে-সকল সর্ত্ত দিয়াছিলেন তাহা পূরণ করিয়া পার্লামেণ্টে ভোটাধিক্য সহ কোন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

২৩শে—১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে অধমর্ণ রাজ্যগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ পরিশোধ করিতেই হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের এই নির্দ্দেশে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে চাঞ্চল্য।

জেনেভা, ২৫শে—জাতিসঙ্ঘ কাউন্সিলে লিটন কর্ত্তৃক ডি ভ্যালেরার নিকট কমিশনের সিদ্ধান্তের বিবৃতি। অবিলম্বে সন্তোষজনক মীমাংসা হওয়া অসম্ভব, একথা প্রথমে উল্লেখ করিয়াও লর্ড লিটন মাঞ্চুরিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য চীন ও জাপান প্রতিনিধিদের সাহায্য করিতে বলেন।

ডাবলিন, ২৬শে—আইরিশ পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ ডেনিয়েল বাক্‌লে ফ্রী ষ্টেটের গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd., 56, Dharamtala Street, Calcutta.